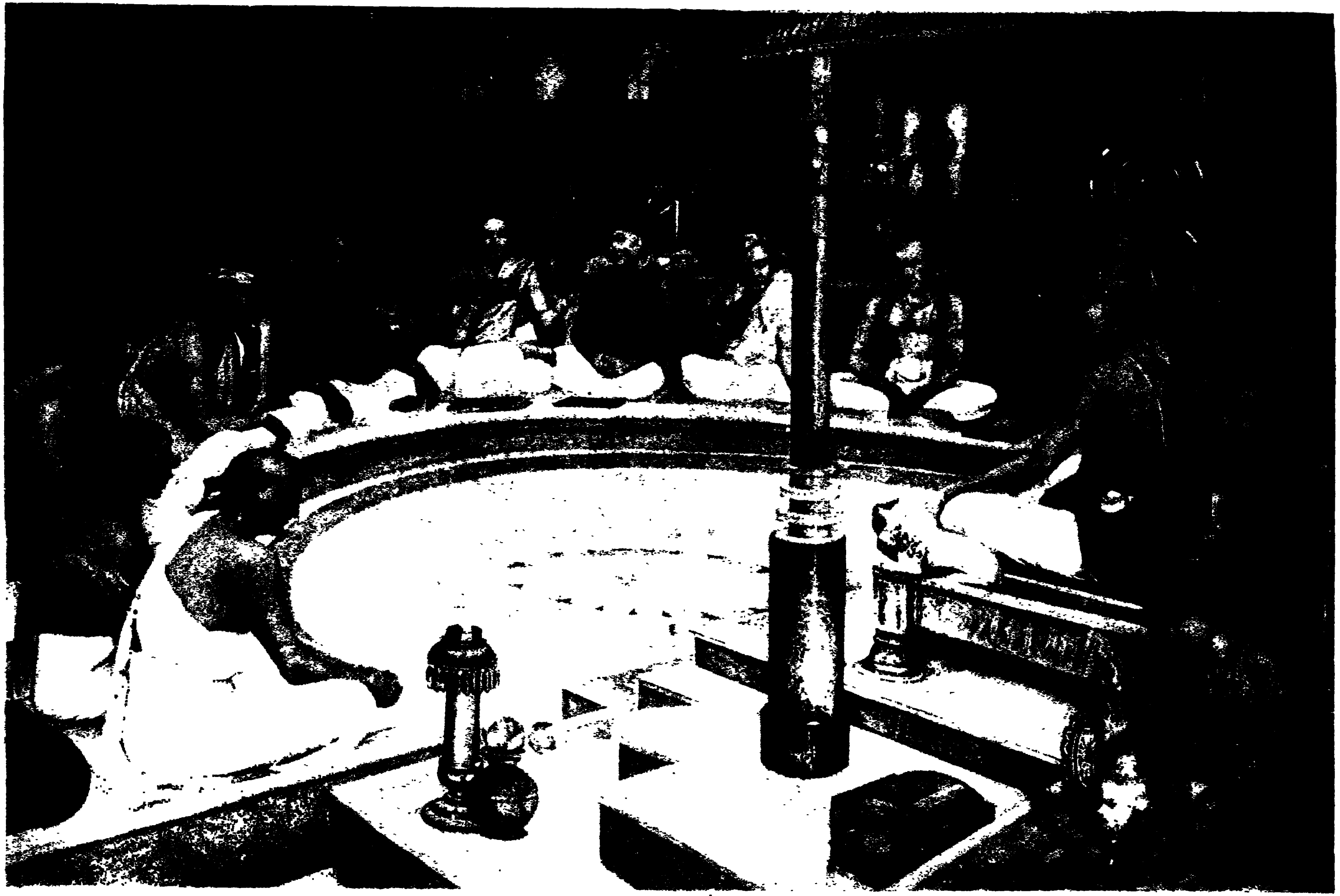


শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী　　বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাসের মেঘদূত পাঠ　　Bharatvarsha Printing Works



দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চবিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

উপনিষদের নীতি

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

(প্রবন্ধ)

উপনিষদের নীতির যে বিবরণ দেবার আমি প্রস্তাব করছি, তা কোন্ উপনিষদ হতে আহৃত হবে তার পরিচয় প্রথমেই দেওয়া উচিত বিবেচনা করি। এখন যে সব উপনিষদ প্রচলিত তাদের সংখ্যা অনেক। কোলব্রুক এবং নারায়ণের নিকট আমরা বাহান্নখানি উপনিষদের তালিকা পাই। মুক্তিক উপনিষদে যে তালিকা আছে তা আরও লম্বা; তাতে আমরা ১০৮ খানি উপনিষদের তালিকা পাই। আসলে উপনিষদ বল্‌তে আমরা যা বুঝি তা হল বেদের অংশ বিশেষ। আমরা জানি বেদের প্রধানতঃ দুইটি অংশ আছে—সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ। সংহিতায় কেবলমাত্র সূত্র থাকে এবং ব্রাহ্মণে তার অর্থ ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারের বিবরণ থাকে। এই ব্রাহ্মণেরই এক অংশ জুড়ে আরণ্যক এবং উপনিষদ থাকে। উপনিষদ সবার শেষে থাকে বলে তাকে "বেদান্ত"ও বলা হয়ে থাকে। উপরে লিখিত ১০৮ উপনিষদের সবগুলিই এইরূপ বেদের অংশ হিসাবে খাঁটি উপনিষদ নয়। বেদের ভাষারও তাদের ভাষার সঙ্গে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না; বেদের ভাবের সঙ্গেও নয়। উপনিষদের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও মূল্য হেতু অল্পকালেই তার একটা সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছিল। অনেক পরবর্ত্তীকালে যত নূতন মত ও সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল তাঁদের কোন কোন পৃষ্ঠপোষক সেই মত-গুলিকে উপনিষদের আকারে প্রকাশ করেন এই আশা নিয়ে—যে তা হলে তার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অবশ্যম্ভাবী হবে। এই চেষ্টার ফলেই এখন যত উপনিষদ দৃষ্ট হয় তাদের বেশীর ভাগের জন্ম। এই কথাটি প্রমাণ করা বিশেষ কষ্টকর নয়। পরবর্ত্তী যুগের এই প্রক্ষিপ্ত উপনিষদ-গুলিকে শুধু ভাষা দিয়েই চেনা যায় না, চেনবার আরও একটি সহজ উপায় আছে। প্রাচীন উপনিষদগুলির ভাবধারার মধ্যে একটা পরস্পর সামঞ্জস্য আছে, সেই সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করেই বদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন

সম্ভব হয়েছে। সেই ভাবগুলি পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত উপনিষদে বজায় থাকে নি। যে সম্প্রদায়ের তরফ হতে যে উপনিষদ রচিত, সে সম্প্রদায়ের বিশেষ মত তাতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়েছে। এইভাবে তাদের কতকগুলি শৈবমতে অনুপ্রাণিত যেমন কৈবল্য-উপনিষদ; কতকগুলি যোগদর্শনের পৃষ্ঠপোষক যেমন হংস, তেজোবিন্দু, নাদবিন্দু ইত্যাদি; আবার কতকগুলি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত—যেমন রাম-রহস্য, নারায়ণ, সীতা ইত্যাদি। এইরূপে আসল খাঁটি উপনিষদ এবং পরবর্ত্তী যুগের তথাকথিত উপনিষদের মাঝখানে একটি পার্থক্য আপনা হতেই ধরা পড়ে। তাদের কোনটি প্রক্ষিপ্ত এবং কোনটি খাঁটি, তা ঠিক করা সেই কারণে বিশেষ শক্ত হয়ে পড়ে না। বদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে যে সব উপনিষদের বচন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তাদের নাম হল এইগুলি—(১) ছান্দোগ্য (২) বৃহদারণ্যক (৩) কঠ (৪) তৈত্তিরিয় (৫) মুণ্ড (৬) প্রশ্ন (৭) শ্বেতাশ্বতর (৮) ঐতরেয় (৯) কৈশিতকী। (ক) এই-গুলি যে প্রাচীন উপনিষদ, এই প্রমাণের উপর নির্ভর করেই আমরা সেই সিদ্ধান্তে আস্তে পারি। শঙ্করের উৎপত্তিকাল অষ্টম শতাব্দী। তিনি যে উপনিষদগুলির উপর ভাষ্য লিখেছিলেন সেগুলিকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করেন নি, তাও অনুমান করে নিতে পারি। তিনি এই এগারটি উপনিষদের উপর ভাষ্য লিখেছিলেন—ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরিয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য। মোটামুটি দেখা যাবে যে এঁরা যে উপনিষদগুলিকে গ্রহণ করেছেন তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই আসল উপনিষদের যা লক্ষণ তা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় কেবল এই উপনিষদগুলির উপর ভিত্তি করে যে নীতিকে আমরা পাই তারই পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। পরবর্ত্তীকালের প্রক্ষিপ্ত উপনিষদের মতগুলি এ আলোচনায় স্থান পাবে না।

মানুষের নীতির সম্পর্ক ষোলআনা মানুষের স্বেচ্ছাধীন কর্ম্মগুলির সঙ্গে—এ হল নীতিশাস্ত্রের গোড়ার কথা। যেখানে মানুষের কর্ম্ম তার ইচ্ছাধীন সেই কর্ম্মগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করাই হল নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এ গুলিকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত কি ভাবে নয়—দুইটি পরস্পর-বিরোধী কর্ম্ম পদ্ধতির কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে কোনটি হবে না—এর উত্তর নির্ভর করে মানুষের পুরুষার্থ কি সেই প্রশ্নের মীমাংসার উপর। অর্থাৎ মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত কি—সেই প্রশ্নের উত্তরই নীতির নিয়ম কি হবে না হবে, তা ঠিক করে দেবে। কাজেই উপনিষদের মতে মানুষের পুরুষার্থ কি, সেইটি আমাদের প্রথমেই জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

উপনিষদের কাছে মানুষের পুরুষার্থ হল জ্ঞান অর্জ্জন। সুখলাভ বা সিদ্ধিলাভ বা পরলোকে সুফললাভ ইত্যাদি কোন আশাই উপনিষদের কাছে মানুষের পুরুষার্থ বলে গণ্য নয়। কেবল নিছক জ্ঞানলাভই মানুষের পুরুষার্থ—এই হল তাঁদের বিশ্বাস। এই বিদ্যাকে তাঁরা দুইভাগে ভাগ করেন; এক হল পরা বিদ্যা ও অন্যটি হল অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা হল নিকৃষ্ট স্তরের, তা হল ব্যবহারিক জগতে যে সমস্ত বিদ্যা কাজে লাগে তাই, যেমন ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। (দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চ॥ তত্রাপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি॥ অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥) (খ) পরা হল শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং এই পরা বিদ্যা অর্জ্জনই মানুষের পুরুষার্থ। পরা বিদ্যা হল—যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সমস্ত সৃষ্টির অন্তর্নিহিত যে তত্ত্ব আছে তাকে আয়ত্ত করা যায়। মানুষের এই হল কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য আপাতদৃষ্টিতে মধুর নয়, তা কষ্টকর। যা আমাদের ইন্দ্রিয়সুখকর তাই হল প্রেয়। বিষয়ভোগের প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে; কিন্তু এই পরাবিদ্যা তাকে আমল দেয় না। তাই এই পরাবিদ্যার অনুসন্ধানে যেতে ইন্দ্রিয়নিচয়ের স্বাভাবিক বিরতি। এই হিসাবে তারা পরা বিদ্যালাভে ব্যাঘাত ঘটায়। সেই জন্যই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন আছে। এই ইন্দ্রিয়গুলিকে দুষ্ট অশ্বের সহিত তুলনা করা হয়েছে; দুষ্ট অশ্ব যেমন বিপথগামী হতে সতত উন্মুখ হয় এই ইন্দ্রিয়গুলি সেইরূপ অত্যন্ত বিষয়াসক্ত। শরীররূপ রথের এই অশ্বগুলিকে তাই বশে রাখার বিশেষ

(ক) Deussen—Philosophy of the Upanishads p. 28.

(খ) মুণ্ডক—১।১।১

প্রয়োজন। এই ইন্দ্রিয়ের সংযম অভ্যাস না হলে মনের বিক্ষেপ ঘটে এবং জ্ঞানার্জ্জনে মনোনিবেশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু॥ বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়ানি হয়ান্যাহু-র্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্॥) (গ) অবশ্য এই ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজনীয়তা এবং তার সংযমের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় দর্শনের যতখানি নজর পড়েছিল উপনিষদে সে প্রয়োজনের তীব্রতাবোধ ততখানি পাওয়া যায় না। আমরা জানি যোগদর্শনের বিশেষ বিষয়ই হল—কি উপায়ে আমরা শরীর ও ইন্দ্রিয়-নিচয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হই এবং মানসিক একাগ্রতাকে শক্তিশালী করতে পারি। তবে তখনকার যুগে মোটামুটি তার একটা প্রয়োজনীয়তা উপনিষদকার অল্পবিস্তর অনুভব করেছিলেন।

ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজনীয়তাবোধ তেমন বড় করে সে যুগে না জাগলেও বৈষয়িক সুখভোগে একটা স্বাভাবিক বিরাগ এবং বিত্তার্জ্জন বিশেষ করে দার্শনিক বিত্তালাভের একটা সুগভীর আশঙ্কা আমরা উপনিষদের বাণীতে বিশেষ করে লক্ষ্য করতে পারি। এই জিনিসটি উপনিষদের দুটি ক্ষুদ্র গল্পের মধ্যে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে, কাজেই সেই গল্প দুটি উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করা বিশেষ শক্ত হয়ে পড়ে।

কঠ উপনিষদে আমরা নচিকেতার গল্প পাই। নচি-কেতার পিতা উশন্ বাজশ্রবাকে বহু গরু দান করতে আরম্ভ করেন। শিশু-সুলভ কৌতূহল প্রণোদিত হয়ে তাঁর পুত্র নচিকেতা তাই দেখে পিতাকে বার বার প্রশ্ন করেন—"বাবা তুমি আমায় কাকে দেবে?" এই অবান্তর প্রশ্ন তাঁর পিতার কাছে তিনি দুবার তিনবার করলেন! ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে পিতা উত্তর করলেন "তোমায় যমকে দেব।" যেমন বলা তেমন ফল্‌ল। নচিকেতা যমের বাড়ী গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তিনি তিনদিন উপবাসী কিছু খান্ না। ব্রাহ্মণের ছেলে অনাহারে রয়েছেন যমের বাড়ী, যমের তা সহ্য হল না। যম তাঁকে অনুরোধ করলেন যে যদি তিনি উপবাস ভঙ্গ করেন তাঁকে তিনটি পুরস্কার দেবেন। এই সর্ত্তে উভয়ে রাজী, ফলে তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে নচিকেতার যমের নিকট প্রশ্ন হল এই—"মৃত মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ঠিক নাই; কেউ বলে আছে, কেউ বলে নাই; তুমি আমায় জানিয়ে দেবে কোনটা ঠিক, এই আমার তৃতীয় বর।" (যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥) (ঘ) যম এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছুতেই রাজী হন না; নচিকেতাও কিছুতেই ছাড়িবেন না; কারণ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যম ভিন্ন উপযুক্ততর ব্যক্তি কে আছে? অগত্যা যম নচিকেতাকে লোভ দেখাতে আরম্ভ করলেন, বল্‌লেন—পৃথিবীতে যে সব সুখ পাওয়া যায় না তোমার জন্য তাই ব্যবস্থা করব, তোমায় দেব সুদীর্ঘ জীবন, বিশাল জমিদারী, আর দেব সভূষণা স্বরথা সুন্দরী স্বর্গের অপ্সরা—যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না; এ ইচ্ছা তুমি পরিত্যাগ কর। (যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ। (ঙ) নচিকেতাকে কিন্তু এই বিষয় সম্ভোগের লোভ জ্ঞানের তৃষ্ণা হতে নিবৃত্ত করতে পারলে না। তিনি তার উত্তরে যে গর্ব্বিত বাণী বলেছিলেন তা সারা বিশ্বের প্রণিধানের যোগ্য। তাঁর যা উপলব্ধি তা পৃথিবীর কয়জন লোক উপলব্ধি করে? তিনি বলেছিলেন—"অপি সর্ব্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ॥" (চ) মানুষের তৃপ্তি বিষয়ভোগে নয়, মানুষের তৃপ্তি মানুষের পরমার্থ সত্যানুসন্ধানে, জ্ঞানবিবর্দ্ধনে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের গল্প হতেও আমরা এই উপলব্ধিরই বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পাই। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজিত হতে সংকল্প করলেন। সেই কারণে প্রথমা পত্নী মৈত্রিয়ীকে ডেকে বল্‌লেন—"আমি প্রব্রজিত হব, এস কাত্যায়নীকে আর তোমাকে আমার সম্পত্তি ভাগ করে দেব।" মৈত্রেয়ী বল্‌লেন—"যদি এই সমগ্র পৃথিবী

(গ) কঠ—৪।৩।১

(ঘ) কঠ—২০।১।১

(ঙ) কঠ—২০।১।১

(চ) কঠ—২৭।১।১

ধনে পূর্ণ হয়ে আমার হত' তাহলে কি আমি অমৃত হতাম?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন যে তা হতেন না। মৈত্রেয়ী তখন এই উত্তর করলেন—"আমি যাতে অমৃতা হতে পারব না তা নিয়ে আমি কি করব? বরং আপনি যা জানেন তাই আমাকে বলুন।" (যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্ যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রুহীতি) (ছ) এখানে তাহলে আমরা দেখি একটি সামান্যা নারী বিষয়সুখের যা উপায় তাকে পায়ে ঠেলে নিছক দার্শনিক জ্ঞানকেই তার থেকে উপরে স্থান দিলেন। সত্যের অনুসন্ধান, জ্ঞানের পিপাসা উপনিষদকারের মনকে এমনি আকৃষ্ট করত।

এই আলোচনা হতে আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে উপনিষদের মতে পুরুষার্থ হল বিদ্যা আহরণ। এই বিদ্যা সাধারণ বিদ্যা, যে বিদ্যা আমাদের ব্যবহারিক জগতে সুবিধা আনে সে বিদ্যা নয়—পরাবিদ্যা বা দার্শনিকবিদ্যা। এই পরাবিদ্যালাভের জন্য তাঁদের কি গভীর ব্যাকুলতা! একথা তাঁদের একটি সাধারণ উক্তি হতেই বোঝা যায়। উপনিষদের ঋষি বলছেন—"হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। কে সে সত্যকে পোষণ করে রেখেছ তাকে আবরণহীন কর, যাতে আমরা সত্যকে দেখতে পাই। (হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং তত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে) (জ) এই পরাবিদ্যা লাভের চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়সুখকর নয়, তা কষ্টকর। পরাবিদ্যালাভের পথ শুধু কষ্টকর নয়, তা দুর্গম, তা বহু দূরের পথ, তা ক্ষুরের ধারার ন্যায় শাণিত পথ। সেইজন্য তা প্রেয় নয়। সাধারণ ইন্দ্রিয়ভোগের যে পথ তা আপাত মধুর, তা প্রেয়। কিন্তু মানুষকে তার পরমার্থ হতে তা বিচ্যুত করে। পরাবিদ্যার পথ আপাতমধুর নয়, তা কষ্টকর, তা দুঃসাধ্য, তবু তা শ্রেয়। শ্রেয়কে যে গ্রহণ করে সে পরমার্থকে পায়। (ঝ)

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশেই বলা হয়েছে যে উপনিষদের পুরুষার্থ হল ব্রহ্মবিদ্যালাভ, পরাবিদ্যালাভ, দার্শনিক জ্ঞানলাভ। ভারতীয় দর্শনের পরবর্তী যুগে যাঁরা জ্ঞানমার্গ অনুমোদন করতেন তাঁদের উদ্দেশ্য কিন্তু কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যই যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ছিল—তা নয়। এই বিষয়ে উপনিষদের মতের সহিত তাঁদের মতের পার্থক্য একটু বিস্তারিতভাবে বুঝান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হিন্দু ষড়-দর্শনেরও উদ্দেশ্য দার্শনিক জ্ঞানলাভ; কিন্তু তাই বলে সেইটাই তাঁদের পুরুষার্থ বা পরমার্থ ছিল না। এই দার্শনিক জ্ঞানলাভ তাঁদের একটা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু পরমার্থ কখনই ছিল না। এই সকল দর্শনগুলিই ধরে নিতেন যে মানুষের পরজন্ম আছে এবং পার্থিব জীবন আসলে অতি কষ্টকর জিনিষ। যে মানুষ পার্থিব জীবনকে নানা যন্ত্রণার আধার স্বরূপ দেখে, তার সে যন্ত্রণা হতে সহজ নিষ্কৃতির উপায় হল আত্মহত্যা করা। কিন্তু ভারতীয় দর্শন তা অনুমোদন করতেন না। ভারতীয় সকল দর্শনের মনেই এই ধারণা দৃঢ় ছিল যে মরণের সঙ্গেই জীবনের শেষ হয় না, পরে আবার পরজন্ম আছে। এক চার্ব্বাক দর্শন ছাড়া সকল দর্শনই এই তত্বটিকে অবিসম্বাদী সত্য বলে গ্রহণ করতেন, এমন কি বৌদ্ধ জৈন দর্শনও তা মেনে নিতেন। কাজেই এক্ষেত্রে আত্মহত্যা প্রকৃষ্ট পথ বলে তাঁদের মনে হয় নি। জীবনের বন্ধনকে এড়াতে বা মুক্তিলাভ করতে হবে—এই দাঁড়িয়েছিল তাঁদের কামনার বিষয়; এই হয়েছিল তাঁদের মতে মানুষের পরমার্থ। কিন্তু ষড়দর্শনের মতে এই মুক্তির সহজ উপায় হল—জ্ঞানের দ্বারা, সৃষ্টির রহস্য ভেদের দ্বারা, দার্শনিক বিদ্যার দ্বারা।

উপনিষদের যুগে কিন্তু এই মুক্তির পিপাসা তেমন বড় করে দেখা দেয় নি, জ্ঞানের পিপাসা তাঁদের প্রধান ও পরম লক্ষ্য ছিল। সকল উপনিষদেরই গোড়ার কথা হল আত্মাকে জান, ব্রহ্মকে জান—তাঁকে জানলেই সব জানা হয়ে যাবে। নিছক পরাবিদ্যালাভের আশাতেই তাঁরা পরাবিদ্যার অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন, এটি তাঁদের অন্য কোন মুখ্য উদ্দেশ্য লাভের উপায়স্বরূপ মাত্র ছিল না। এখন এই উক্তির প্রমাণের প্রয়োজন।

এই কথাটির প্রথম প্রমাণ হল এই যে উপনিষদের যুগে উপনিষদগুলি আমাদের আলোচনার বিষয়—তাঁদের যুগে পরজন্মবাদ তখনও জন্মলাভ করেনি। কোথাও পাই পরজন্মের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের পরিচয়, কোথাও পাই পরজন্ম হয়ত থাকতে পারে এইরূপ একটি সন্দেহের আভাস

(ছ) বৃহদারণ্যক—৩।৪।২

(জ) ছান্দোগ্য—

(ঝ) কঠ—১।২।২

মাত্র। যে আকারে পরজন্মবাদ ভারতীয় দর্শনে পরবর্ত্তী কালে দেখা দিয়েছিল, সে আকার উপনিষদের যুগে সে গ্রহণ করে নি।

প্রথম আমরা এক জাতীয় মত পাই যেখানে পরজন্মের উপর সম্পূর্ণরূপ অনাস্থা প্রকাশিত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই পরলোক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে এবং এটা নিঃসন্দেহ যে এই উপনিষদটি প্রাচীনতম উপনিষদের অন্যতম। এখানে যাজ্ঞবল্ক্য একাধিকবার পরজন্ম সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এই সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর উত্তর মোটামুটি এইরূপ:—মৈত্রেয়ীকে তিনি বুঝাচ্ছেন "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি"। (ঞ) মৈত্রেয়ী একথা ভাল করে বুঝ্‌তে পারলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে বল্‌লেন যে যেখানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই দুই বর্ত্তমান, সেখানেই জ্ঞানের অবস্থিতি, যেমন আমাদের বাস্তব জগৎ। যখন মৃত্যু ঘটে তখন এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিভেদ অর্থাৎ দ্বৈতভাব লোপ পায়, কাজেই সংজ্ঞা বা জ্ঞানের অবস্থান সেখানে লোপ পায়। সেখানে আত্মা অবশ্য লোপ পায় না বটে—কারণ "অবিনাশি তু অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" —কিন্তু তার সংজ্ঞা লোপ পায়। তখন জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ লোপ পেয়ে যায়, সাধু আত্মা হয়ে যায়; কাজেই কে কাকে জানবে? কে কাকে আঘ্রাণ কর্‌বে? কে কাকে স্পর্শ কর্‌বে? (যত্রবা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং শৃণুয়াৎ···॥ (ট) কাজেই মৃত্যুর পর জীবাত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায় এই তাঁর মত।

এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে পরে আরও স্পষ্টরূপ প্রশ্ন করা হয়েছিল। জনকের এক যজ্ঞে বহু জ্ঞানী দার্শনিক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে পরাশরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেকালে এটি একটি রীতি ছিল। সেখানে জরৎকারুর পুত্র আর্ত্তভাগ নামে এক পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে মৃত্যুর পরে মানুষের প্রাণ বা আত্মা কি উর্দ্ধে গমন করে? এর থেকে স্পষ্টতর প্রশ্ন এ বিষয়ে হতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তরে বলেছিলেন—না তার প্রাণ উর্দ্ধে গমন করে না, এখানেই থাকে; তার শরীর বাহিরের বায়ুতে পূর্ণ হয় এবং সে মরে এখানেই পড়ে থাকে। (যাজ্ঞবল্ক্যেতিহোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে তদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্তি আহ নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমানীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়তি আত্মায়তি আত্মামে মৃতঃ শেতে) (ঠ) মোটের উপর তাঁর মতে মৃত্যুর পর জীবাত্মা তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যে আলাদা জীবন পোষণ করত কিম্বা নূতন দেহ ধারণ কর্‌ত যাজ্ঞবল্ক্য সে কথা বিশ্বাস করতেন না। তাঁর এই পরজন্মে অবিশ্বাস বৃহদারণ্যক উপনিষদের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তিনি আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন। লবণ যেমন লবণাক্ত জলের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে মিলিত থাকে, তার থেকে তা বিভিন্ন নয়, তার বাহিরে তা বর্ত্তমান নয়, জল হতেই উৎপন্ন হয়ে আবার তাতেই বিলীন হয়ে যায়—তেমনি এই জীবকূলের সঙ্গে আত্মা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের থেকেই তার উৎপত্তি, আবার মৃত্যু ঘট্‌লে তাদের মধ্যেই তার বিলয়। সেই কারণে মরণের পরে বিশিষ্ট সংজ্ঞা তার কিছু থাকে না। (স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যো সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি অরে ব্রবীমীতিহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥) (ড) এই মতখানি কেবল যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিগত মত মাত্র নয়, সমগ্র বৃহদারণ্যক উপনিষদের সাধারণ মত।

উপনিষদে আর এক প্রকারের মত পাই যেখানে দেখি পরজন্মবাদ স্পষ্ট আকার পরিগ্রহ করে নি; কেবল মৃত্যুর সঙ্গেই জীবনের শেষ হয় না, পরলোক হয় ত আছে, এইরূপ একটি সন্দেহ মাত্র থেকে থেকে ঋষিদের মনে উদয় হয়। এই ভাবে ঈশ উপনিষদে দেখি যে আত্মহত্যাকে বড় ঘৃণা করা হয় এবং আত্মহত্যা হতে নিবৃত্ত করার জন্য ভয় দেখান হয় এই বলে যে—যারা আত্মঘাতী তারা মৃত্যুর পর সূর্য্যহীন এক লোকে যায়, তার নাম অনন্দা এবং অন্ধ তমের দ্বারা তা আবৃত। (অনন্দা নাম তা লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ (ঢ) এ

(ঞ) বৃহদারণ্যক—১৪।৫।১২

(ট) বৃহদারণ্যক—১৪।৪।২

(ঠ) বৃহদারণ্যক—১৷১২।৩

(ড) বৃহদারণ্যক—১৩।৫।৪

(ঢ) ঈশ—৩

হতে আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে—যে মনীষী এই অংশ রচনা করেছিলেন তাঁর মতে মৃত্যুর পরেও একটা পরলোক আছে। অবশ্য এখানেও জন্মান্তরবাদের স্পষ্ট স্বীকার আমরা পাই না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এই উক্তিটি পাই: "যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে স আদিত্যম্ আগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খং তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে স লোকমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খং তেন স ঊর্দ্ধ আক্রমতে স লোকমাগচ্ছতি অশোকমহিমং তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ॥" (ণ) এই কথা অনুসারে আমরা এই বর্ণনা পাই যে মৃত্যুর পর ব্রহ্মজ্ঞ মানুষ প্রথমে বাতাসে মিশে যায়, সেখান হতে সে আদিত্যে যায় ও সেখান হতে চন্দ্রলোকে যায় এবং সর্ব্বশেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে সেখানে চিরস্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। এখানেও তা হলে আমরা স্পষ্ট পরজন্মের স্বীকারোক্তি পাই না, কেবল বিমুক্ত আত্মার ব্রহ্মের সহিত মিলনের যে পথ তার বিস্তারিত কিম্বা রূপক বর্ণনা মাত্র পাই। তার পর আমাদের যেতে হবে মুণ্ডক উপনিষদে। সেখানে আমরা এই আভাস পাই যে যাঁর কামনা নাই, যিনি সম্পূর্ণ তৃপ্তি পেয়ে কামনার উপরে উঠে গিয়েছেন, কেবল তিনিই মৃত্যুর পর ব্রহ্মের সঙ্গে বিলীন হয়ে যান, তাঁর পরজন্ম বা পরলোক থাকে না। কিন্তু যে মানুষের কামনা পরিতৃপ্ত হয় নি তার কামনার তৃপ্তির জন্য মৃত্যুর পর নূতন করে নূতন বেশে জন্মাতে হয়। (কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র॥ পর্য্যাপ্ত কামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলয়ন্তি কামাঃ) (ত) এখানেই আমরা প্রথম তা হলে পরজন্মের উল্লেখ পাই; যদিও কর্ম্মফলপ্রাপ্তি হেতুই যে পরজন্মের প্রয়োজন এ তত্ত্বের কোন আভাস আমরা পাই না। এখানে তাহলে আমরা পরজন্মবাদকে অঙ্কুরের অবস্থায় পাই। আরও পরবর্ত্তী অবস্থায় উপনিষদের মধ্যেই আমরা প্রায় সম্পূর্ণ পরজন্মবাদটিকে পেয়ে বসি। সে হল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। এই উপনিষদের মতে মানুষের নিজের প্রবৃত্তির অনুরূপ এবং নিজের গুণের অনুরূপ স্থূল সূক্ষ্ম নানা রূপ প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও কর্ম্মফলের গুণেও তাদের নূতন রূপের সঙ্গে সংযোগ দেখা যায়। (কামানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে॥ স্থূলানি সূক্ষ্মানি বহূনি চৈবরূপাণি দেহী স্বগুণৈঃ বৃণোতি। ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥) (থ) অবশ্য এখানেও তার পরিপূর্ণ রূপটিকে পাই না, তবে তার স্পষ্ট আভাস পাই। এখানে এইটুকু উল্লেখ করা দরকার হবে যে—সকল খাঁটি উপনিষদের মধ্যে এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ নিঃসন্দেহভাবে সবার নূতন। কারণ এক জায়গায় তা স্পষ্টতই সাংখ্য ও যোগদর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করেছে। "তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" কাজেই এটা সহজেই প্রমাণ হয় যে তা সাংখ্য ও যোগদর্শনের পরবর্ত্তী গ্রন্থ।

এখন এই কথাটি সহজেই বোঝা যাবে যে উপনিষদের জ্ঞান-পিপাসা নিছক জ্ঞান-পিপাসার খাতিরেই, তা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের উপায়স্বরূপ মাত্র নয়। তবে তার উদ্দেশ্য কি একটা ছিল না? ছিল বৈকি। তা হল এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ব্রহ্ম যে আনন্দের অধিকারী তার ভাগ পাওয়া। আমরা প্রথমেই বলেছি যে পার্থিব কোন সুখের প্রতিই উপনিষদের কণামাত্র আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু এ অবহেলা নিছক বৈরাগ্যপ্রণোদিত নয় বা একেবারে সকল কামনাকে উন্মূলিত কর্‌বার জন্যও নয়। তার কারণ তাঁরা বিশ্বাস কর্‌তেন না যে একেবারে কামনাবিহীন হয়ে কোন কর্ম্ম করা সম্ভব। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন যে মানুষ কাজ করে সুখ পায় বলে বা সুখ লাভের আশা করে বলে; সুখ যদি না পেত তা হলে স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম করা ছেড়ে দিত। (যদা বৈ সুখং লভতে অথ করোতি না সুখং লব্ধা করোতি সুখমেব লব্ধা করোতি॥) (দ) তৈত্তিরীয় উপনিষদেও আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই। সেখানে বলা হয়েছে যে এই আকাশ হতে আনন্দের ধারা যদি না ঝরত তা হলে কেই বা এই পৃথিবীতে বাঁচ্‌তে চাইত? (কো হ্যেবান্যাৎ কাঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ) (ধ)। সেই কারণে তাঁরা যখন পার্থিব সুখকে দূরে

(ণ) বৃহদারণ্যক—৫।১০।১

(ত) মুণ্ডক—৩।২।২

(থ) শ্বেতাশ্বতর—৫।১১

(দ) ছান্দোগ্য—৭।২২।১

(ধ) তৈত্তিরীয়—২।৭

ঠেল্‌তেন তার কারণ এই নয় যে তাঁরা বৈরাগ্যপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে চাইতেন না ; তার কারণ এই যে—পার্থিব সকল সুখই ক্ষণস্থায়ী, সেই কারণেই তার প্রতি তাঁদের মন টান্‌ত না। তাঁরা চাইতেন অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ, ভূমানন্দ। সেই কারণেই নাচিকেতা যমের অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডারকে পায়ে ঠেলেছিলেন এই বলে যে "সর্ব্বং জীবিত স্বল্পমেব" এবং মৈত্রেয়ী তাঁর স্বামীর প্রদত্ত সম্পদ গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হয়েছিলেন এই বলে যে "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"। ঠিক এই কারণেই তাঁরা অল্প সুখের মোহকে ত্যাগ করে ভূমানন্দকে চাইতেন। তাঁদের মতে এই ভূমানন্দের অধিকারী ব্রহ্ম স্বয়ং, কারণ তিনি রস-ঘন, তিনি সকল রসের আধার। আমরা পার্থিব জীবনে পার্থিব ভোগসুখের মধ্যে তাঁর সেই অনন্ত রসের ধারার কণামাত্র পেয়ে থাকি ; তাইতেই এত আনন্দ। (রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি) (ম) কাজেই যিনি সকল রস সকল আনন্দের অধিকারী, যিনি ভূমানন্দের ভাণ্ডারী, তাঁর আনন্দ না জানি কি অনন্ত অপূর্ব্ব জিনিষ। (নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্) (প) ব্রহ্মজ্ঞান হলে আমরা ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হব এবং সেই কারণেই ভূমানন্দের অধিকারী হব। পরাবিদ্যালাভে ব্রতী হতে সেই কারণে তাঁরা এত পাগল।

জ্ঞানের সঙ্গে নীতির একটি অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নীতি না হলে জ্ঞানের সদ্ব্যবহার হয় না, আবার সুনীতিকে পরিচালিত করতে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মায়ের সন্তানের প্রতি স্বতই ভালবাসা প্রবাহিত হয় এবং সন্তানের মঙ্গলার্থে তিনি সবই করতে পারেন ; কিন্তু তাঁর সন্তানের প্রতি এই সুনীতি-পরায়ণতা সার্থক হয় না, যদি না তিনি জ্ঞানের দ্বারা নীত হন। অজ্ঞ মা অনেক সময় অন্ধ ভালবাসার বসে সন্তানের বাস্তবিক যা মঙ্গল আন্‌তে সক্ষম তা ঘট্‌তে দিতে পারেন না, বরং অনেক সময় তার বাধা-স্বরূপ হন। এর উদাহরণ খুঁজ্‌লে প্রচুর মেলে। অন্য দিকে অন্ধ নীতিহীন জ্ঞান মানুষের কোন কল্যাণ করতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান মানুষকে শক্তি দেয় ; কিন্তু সে শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে তা নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার উপর। অন্ধভাবে শক্তি পরিচালিত হলে তা মানুষের মঙ্গল হতে অমঙ্গল সাধনই করে বেশী। এই শক্তি যদি আবার নীতিবিহীন মানুষের হাতে পড়ে তা আনে মানুষের ভাগ্যে দুঃখ, অত্যাচার এবং উৎপীড়ন। ভগবান বুদ্ধ জন্মেছিলেন সেই আড়াই হাজার বছর আগে। তখনকার দিনে মানুষের নৈতিক উন্নতি যা হয়েছিল তাকে মানুষ এখনও ডিঙিয়ে যেতে পারে নি। অপর পক্ষে মানুষের জ্ঞানের প্রসার হয়েছে এই আড়াই হাজার বছরে অপরিমিত। ফলে মানুষের শক্তি সঞ্চয় হয়েছে ঢের বেশী ; কিন্তু সে শক্তি মানুষকে সুখ বা শান্তি দান করতে সমর্থ হয় নি। বরং জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষের সঙ্কীর্ণতার সংঘর্ষে উদ্ভূত যে বিষ তাতে মানুষের বক্ষ আজ জর্জ্জরিত। সম্মুখে ভীষণ প্রলয়ের আতঙ্ক, অদূর ভবিষ্যতে তার নিবৃত্তিরও কোন আশা করা যায় না। তার কারণ আর কিছুই নয়, মানুষের যে পরিমাণে জ্ঞান সঞ্চয় হয়ে শক্তি বর্দ্ধিত হয়েছে, সেই পরিমাণে তার হৃদয়বৃত্তি প্রসার লাভ করে নি, তার নীতিজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হয় নি। ঠিক এই কারণেই নীতির সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন। যেখানে নীতি ও জ্ঞান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সেখানে শক্তি ও শুভ ইচ্ছা একত্রিত হয় এবং তার ফলে মানুষ পায় সুখ, শান্তি, পবিত্রতা, সব কিছুই। চাই শক্তি আর তার সদ্ব্যবহার। জ্ঞান দেবে শক্তি এবং নীতি দেবে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবার ক্ষমতা। তা যদি সম্ভব হয় তাহলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করা আর দুঃসাধ্য কাজ থাকে না।

এই জ্ঞান ও নীতিতে মিত্রতা স্থাপন সম্ভব হয় হৃদয়-বৃত্তির প্রসারের সাহায্যে, ভালবাসার বিস্তারের উপর। এই প্রেম বা ভালবাসাই হল তাদের সখ্য স্থাপনের রাখী, তাদের পরস্পরের গ্রন্থি। মানুষ যদি সকল মানুষকে, সকল জীবকে আপনার বলে ভালবাস্‌তে শেখে, তা হলে সকলেই—সে যেমন নিজের কাছে প্রিয়, তেমনি তার কাছে প্রিয় হয়ে দাঁড়াবে। সকলেই যদি তার প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সকলের সম্মিলিত স্বার্থ এবং তার স্বার্থ একীভূত হয়ে যাবে। তাহলে আর তাদের স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব রইল কোথায়? মা যে সন্তানের মঙ্গল সাধন করেন সে নিস্বার্থ

(ম) তৈত্তিরীয়—৭।২
(প) ছান্দোগ্য—১।২৩।২৭

হয়ে নয়, নিজের স্বার্থ এবং সন্তানের স্বার্থ সেখানে জড়িত হয়ে এক হয়ে গিয়েছে বলেই। যেখানে স্বামী স্ত্রীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তে উন্মুখ হন সেখানেও তার কারণ হল স্ত্রী তাঁর কাছে তাঁর নিজের মতই আপন হয়ে গিয়েছেন বলে। আমাদের তা হলে চাই জ্ঞান এবং ভালবাসার বিস্তার। জগতে যত অত্যাচার বা অনাচার মানুষ মানুষের প্রতি করে—তার কারণ হল মানুষ তেমন করে এখনও সকলকে ভালবাসতে শেখেনি। আমাদের চাই এই ভালবাসা বৃত্তির পরিবর্দ্ধন। সেটা আবার সম্ভব করে জ্ঞানের বর্দ্ধন, বিশেষ করে দার্শনিক জ্ঞানের বিস্তার। উপনিষদ বলেন জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম সমস্ত জগতকেই ব্যাপ্ত করে; বর্ত্তমান দৃশ্যমান জগতের যা কিছু পাই, সবই তাঁর রূপান্তর মাত্র। এই ব্রহ্মজ্ঞান হতে আমরা তাহলে এই শিক্ষা পাই—যে আমি, তুমি, রাম, শ্যাম, যদু, পৃথিবীর যে কেহ নরনারী, জীবজন্তু, সবই সেই একই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ। তা যদি হয় আমাদের সকলের মধ্যে একই ব্রহ্ম বর্ত্তমান, আমরা সকলেই একই মহান সত্তার অংশ—তা হলে কি বিরোধের কোন অর্থ থাকে? হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি নীচ মনোবৃত্তির কোন স্থান সম্ভব হয়? বরং ভালবাসার বৃত্তির দাবী সে ক্ষেত্রে আদৌ রোধ করা যায় না। আমরা সকলে একই ব্রহ্মের অংশ, কাজেই সকলে সকলকে ভালবাস্‌ব, আপনার মত ভালবাস্‌ব, সকলের স্বার্থকেই আমরা সম্মান করব। ঈশোপনিষদের গোড়ার কথাই হল এই এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাতে যা যুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, তাও ঠিক এই। "ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিৎ ধনম্‌॥"(ফ) আমরা সকলেই যখন একই ঈশ্বরের অংশ, আমাদের কারও অন্য কারও স্বার্থে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নাই, আমরা ভোগ করব, কিন্তু এমন ভাবে ভোগ কর্‌ব—যাতে অন্যের স্বার্থের হানি না হয়। এই হল "ত্যাগের সহিত ভোগ করা"। এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ আরও স্পষ্ট। তিনি বলেন—পতি যে স্ত্রীর কাছে প্রিয় হন, সে তাঁর নিজের কারণে নয়; তার কারণ এই যে উভয়ের মধ্যেই আত্মা বর্ত্তমান; তেমনি পুত্রের কারণেই পুত্র মায়ের কাছে প্রিয় হন না, তার কারণ উভয়ের মধ্যেই আত্মা বর্ত্তমান; সেইরূপ আব্রহ্মাণ্ড সকল বস্তুই আমার কাছে প্রিয় হবার কারণ, সকলের মধ্যেই আত্মা আছেন। (স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি……ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি) (ব) এইরূপে আমরা দেখি যে পরাবিদ্যা সমস্ত জীব জগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়ে ভালবাসার অঙ্কুরকে ফুটাতে উপযুক্ত ভূমি তৈরী করে দেয়। জ্ঞান কেবলমাত্র নিছক মানসিক তৃপ্তি লাভেই পর্য্যবসিত হয় না, নৈতিক চরিত্রকে সম্মার্জ্জিত করে, হৃদয়বৃত্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে, অন্যকে, সকলকে, বিশ্ববাসীকে ভালবাসার পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

উপনিষদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত আকারে যা ছোট ছোট নীতির বচন পাই তাও মোটামুটি উপরের উক্তিকে সমর্থন করে। দার্শনিক জ্ঞান পিপাসা তাঁদের যে শুধু তীব্র ছিল তাই নয়, দার্শনিক জ্ঞান প্রচারের আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের তেমনি গভীর ছিল। সেকালে রাজারা বড় বড় দার্শনিকদের একত্র আহ্বান করে তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যবস্থা করতেন; তাতে যিনি জয়লাভ কর্‌তেন, তাঁকে পুরস্কৃত কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌তেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজা জনকের সভায় এইরূপ অনেক তর্কের ব্যবস্থার গল্প পাই। একদিকে যেমন এইরূপ বিদ্বানকে পুরস্কৃত কর্‌বার আমরা চেষ্টা দেখ্‌তে পাই, অন্য-দিকে তেমনি যিনি জ্ঞানী তাঁকে বিদ্যাদানের জন্য পারি-তোষিক গ্রহণে পরাঙ্মুখ দেখ্‌তে পাই। যাজ্ঞবল্ক্য এক প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় এইরূপ জয়লাভ কর্‌লে পর জনক তাঁকে বিশেষ ভাবে পারিতোষিক দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু জনক তাঁকে সব ফিরিয়ে দেন এই বলে যে তাঁর পিতার উপদেশ আছে যে শিক্ষা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ কর্‌বে না। (হস্ত্যষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেহমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি)(ভ)

—

(ফ) ঈশ—(১)

(ব) বৃহদারণ্যক—২।৪।২

(ভ) বৃহদারণ্যক—২।১।৪

গুরু শিষ্যকে যে সাধারণ নৈতিক উপদেশ দেন তার এক তালিকা আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাই। তা হল এই —"সত্যং বদ॥ ধর্ম্মং চর॥······সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্॥ কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্॥ ·····মাতৃদেবো ভব॥ পিতৃদেবো ভব॥ আচার্য্যদেবো ভব॥ অতিথিদেবো ভব॥ যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি॥ তানি সেবিতব্যানি॥ নো ইতরাণি॥ যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি॥ নো ইতরাণি॥".(ম) এই যে নীতি-কর্ম্মের তালিকা তা সর্ব্বজনসম্মত ভাবে সুন্দর এবং জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যে কোন মানুষের প্রতি প্রযোজ্য, তাতে কোন সন্দেহ নাই। শুধু তাই নয়, উপনিষদের ঋষি প্রাকৃতিক শব্দের মধ্যেও নীতির বাণীর সন্ধান পেতেন, যেমন পরবর্ত্তীকালে কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ পেতেন। বজ্রের নির্ঘোষের মধ্যে তাঁরা যে নীতির প্রচারের আবিষ্কার করেছিলেন তা হল এই:—বজ্র বলে "দ দ দ," অর্থ হল এই "আত্মদমন কর, দান কর এবং দয়া কর।" (তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নু দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি) (য) পরা বিদ্যার বিবর্দ্ধনের জন্য আত্মদমন, হৃদয়বৃত্তির প্রসারের জন্য দয়া এবং দান এই হল তাঁদের সাধারণ মানুষের জন্য নৈতিক ব্যবস্থা।

উপনিষদের নৈতিক মতের মোটামুটি লক্ষণগুলি হল তা হলে এই। তাঁরা পরা বিদ্যালাভকেই জীবনের পরমার্থ বলে নির্দ্দেশ করতেন। বিদ্যা সঞ্চয়কে সহজ সাধ্য করতে যতখানি সংযমের প্রয়োজন সেটুকু তাঁরা অনুমোদন করতেন। বিদ্যা সঞ্চয় তাঁদের কাছে অন্য স্বতন্ত্র কোন মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ ছিল না, সেই ছিল তাঁদের চরম এবং পরম পুরুষার্থ। আর সর্ব্বশেষে তাঁরা হৃদয়বৃত্তির, দয়া মায়া ভালবাসা প্রভৃতি গুণেরও সমাদর করতেন। কাজেই নৈতিক জীবনকে মোটামুটি সার্থক করতে হলে যা কিছুর প্রয়োজন তাই আমরা এখানে পাই। পূর্ব্বেই বলেছি যে জ্ঞানের সঙ্গে যদি প্রেমের যোগ হয় তা হলে নীতির যে ভিত্তি স্থাপিত হয় তা অতি দৃঢ় এবং তা অতি সহজেই মানুষকে তার সর্ব্বাঙ্গীন সাধনার পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এই মতের উৎকৃষ্টতা আমরা আরও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারব, অন্যের মতের সহিত এর তুলনা করলে। এই সম্পর্কে আমরা কাণ্ট ও গীতার নীতির সঙ্গে এই নীতির সংক্ষেপে তুলনা করবার প্রস্তাব করি।

কাণ্টের মতে সাধারণ জীব সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালিত। কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে তার মধ্যে জ্ঞানশক্তির বিকাশলাভ হয়েছে। এর ইঙ্গিত হল এই যে মানুষের জন্তুর জীবন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিলাসের জীবনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করে জ্ঞানের জীবনকেই অসপত্নভাবে বরণ করে নেবে। তাঁর নিজের ভাষায়ই বলি—"বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি মানুষ সেই বুদ্ধিবৃত্তিকে ইন্দ্রিয়সুখ সন্ধানেই ইতর প্রাণীর মত নিযুক্ত করে—তা হলে জন্তুত্বের থেকে তার উচ্চতার প্রমাণ রইল কোথায়?" (র) সেই কারণে তাঁর মত হল—মানুষের কর্ত্তব্য কেবল জ্ঞানসঞ্চয়ের চেষ্টায় জীবন কাটান এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে কাজ করতে বলবে সেই কাজ করা। তিনি হৃদয়বৃত্তিকে নীতির রাজ্য হতে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে চাইতেন, কারণ তা দেহের সঙ্গে, অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনেক নীতিজ্ঞ অনুভূতিকে আমল দিতে চান না; তার কারণ, সুখের আশায় কাজ করতে গেলে অনেক সময় দুঃখ এসে পড়ে, ফলে মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটতে পারে; কিন্তু কাণ্ট তাকে নির্ব্বাসিত করতে চাইলেন অন্য কারণে। তিনি বলেন—সুখের আশায় বা শান্তির আশায় বা মনে কোন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করা খাঁটি নীতিসম্মত কাজ নয়। আমাদের নীতিবুদ্ধি আমাদের এমন কথা বলেনা যে সুখ চাও বা আনন্দ চাও ত এই কাজ কর; তা বলে এইটা কর কারণ এইটা করা আমার কর্ত্তব্য।, তার ফল কি হবে ভাববার অধিকার নাই। মানুষের অন্তর্নিহিত নীতিবুদ্ধি তাকে আদেশ করবে, যে কাজ বিশ্বের সকলের অনুমোদিত হবে সেই কাজ তুমি করে যাবে, বিনা দ্বিধায়, বিনা বাক্যব্যয়ে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সে কাজ করবে না, এমন কি কোন মহান হৃদয়বৃত্তির প্ররোচনায়ও কোন কাজ করবে না। কাজেই স্নেহপরবশ হয়ে বা দয়া ও মায়াপরবশ হয়ে কোন কাজ করাও তাঁর নীতির মত অনুসারে নিষিদ্ধ কর্ম্ম। নিজের কাজ

(ম) তৈত্তিরীয়—২-৩।১১।১

(য) বৃহদারণ্যক—৫।২।৫

(র) Kant—Critique of Practical Reason.

কর্‌বার খাতিরেই, কর্ত্তব্যের খাতিরেই কাজ করে যেতে হবে। হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক থাকবে না, হৃদয়বৃত্তিকে নীতির রাজত্ব হতে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে হবে।

কাণ্টের এই আদর্শের সঙ্গে গীতার নীতির আদর্শের একটা মোটামুটি বড় রকম মিল পাই। গীতায় পরজন্ম যে আছে, সেটা ধ্রুব সত্য বলে গৃহীত হয়ে গিয়েছে এবং কর্ম্মফলই যে পরজন্ম আনে সেটাও নির্দ্ধারিত হয়ে গিয়েছে। কর্ম্ম কর্‌লেই কর্ম্মফল ভোগ কর্‌বার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কাজেই মানুষে মাকড়সার মত নিজের বোনা জালে নিজে জড়িয়ে পড়ে। এই শিক্ষায় মন যেখানে অনুপ্রাণিত হয় সেখানে মানুষের স্বভাবত ইচ্ছা জাগে—কর্ম্ম হতে নিবৃত্ত হওয়া, কর্ম্মহীন জীবন যাপন করা। কিন্তু তা কর্‌লে ত আমাদের সংসার চলে না। সেই কারণেই গীতা এদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আন্‌লেন। গীতা এই নীতির প্রচার কর্‌লেন যে কর্ম্ম না কর্‌লেই মানুষ নিষ্কর্ম্মতা পায় না, (ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে) (ল)। কাজ মানুষের কর্‌তেই হবে, তবে এমন কর্ম্ম কর্‌তে হবে যার বন্ধন শক্তি নাই, যার ফল আমাদের ভোগ কর্‌তে হবে না। সেটা সম্ভব হয় কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করে কর্ম্ম কর্‌লে। তাই গীতার আদর্শ হল কামনাহীন হয়ে কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করে নিছক কর্ত্তব্যের খাতিরেই কর্ম্ম করা। (প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থমনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥) (শ) কাজেই গীতার আদর্শের সঙ্গে কাণ্টের আদর্শের একটা বড় মিল পাই। উভয়েই বলেন কর্ত্তব্যের খাতিরেই কর্ম্ম কর্‌তে হবে, কোন আকাঙ্ক্ষা বা আশা পূরণের জন্য নয়। গীতার নীচে উদ্ধৃত উক্তি হতে সেটা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে—

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলংচৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ (ষ)

কাজেই গীতা যে নীতির প্রচার করেন তাতেও অনুভূতির স্থান নাই; তারও নির্দ্দেশ হল এই যে হৃদয়বৃত্তিকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে হবে।

(ল) গীতা—৩।৪
(শ) গীতা—২।৫৫
(ষ) গীতা—১৮।৯

এইখানেই গীতা ও কাণ্টের সহিত উপনিষদের মতের একটি বড় পার্থক্য। উপনিষদ হৃদয়বৃত্তির দাবীকে স্বীকার করেন, তাকে সাদরে নীতির রাজ্যে স্থান দেন। উপনিষদ বলেন, তোমরা দান কর, তোমরা দয়া কর। উপনিষদ বলেন—মা সন্তানের প্রিয় হক, সন্তান মায়ের প্রিয় হক, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা পরিবর্দ্ধিত হক, বিশ্ববাসী বিশ্ববাসীকে ভালবাসুক, ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে তারা পরস্পরের সহিত একত্ব অনুভব করুক। এইখানেই উপনিষদের মতের উৎকর্ষ। মানুষের মনখানি যে কেবলমাত্র চিন্তাবৃত্তি বা ইচ্ছাবৃত্তি দিয়ে গঠিত, তাত নয়; তার হৃদয়বৃত্তিও আছে। এই তিনটি নিয়েই ত তার মন সম্পূর্ণ হয়। এই তিনটি ওতঃপ্রোতভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত এবং পরস্পরের সহায়কারী। মানুষ চিন্তাশক্তির সাহায্যে ঠিক কর্‌বে তার ইচ্ছাশক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বে। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তিকে বলবান কর্‌বার যে কর্ত্তা তা হল অনুভূতি বা হৃদয়বৃত্তি। মানুষের হৃদয়বৃত্তিই তার কাজে তাকে উৎসাহ এনে দেয়, প্রেরণা এনে দেয়। মানুষের কাজ কর্‌বার ক্ষমতা তার প্রেরণার গভীরতার উপরেই নির্ভর করে। কোন অত্যাচারের গুরুত্ব আমরা যে পরিমাণে অনুভব কর্‌ব, তাকে দমন কর্‌বার ইচ্ছার শক্তিও আমাদের সেই পরিমাণে। শুধু তাই নয়, হৃদয়বৃত্তি যদি না থাকে, অনুভূতি শক্তিকে যদি বনবাসে পাঠান হয়, তা হলে আমাদের কর্ম্মে রস থাকৃত কোথায়? জীবন তা হলে রসহীন শুষ্ক মরুভূমির মত ঠেক্‌ত। নীতি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ যদি হয় নীতির রূপ, তা হলে অনুভূতিশক্তি হল তার দেহ। অনুভূতিশক্তি নীতিকে পূর্ণতা দেয়, তাকে রক্ত মাংসের দেহে পরিণত করে, কেবলমাত্র কঙ্কাল রাখে না। আমাদের যা প্রয়োজন তা হল—অনুভূতিকে মেরে ফেলা নয়, তাকে পরিবর্দ্ধিত করা—স্বার্থকে বিসর্জ্জন দেওয়া নয়, স্বার্থকে বিস্তারিত করা, তাকে সঙ্কীর্ণতার দোষ হতে মুক্ত করা। আমাদের নিজের স্বার্থকে সকলের স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। সেই ত হল প্রয়োজন। আমাদের বিশ্ববাসীকে নিজের মত ভালবাস্‌তে হবে। তা না করে, আমরা যদি কাণ্ট ও গীতার নির্দ্দেশ মত হৃদয়বৃত্তিকে একেবারে নিষ্পেষিত করি, তা হলে জীবনের সকল সৌন্দর্য্য, কর্ম্মের মাধুর্য্য হারিয়ে যাবে। মানুষ ফলে হয়ে পড়ে যন্ত্র-

চালিত জীবের মত, কাজ তার কাছে খেলার সামিল থাকে না, কর্ত্তব্য নিতান্তই তার কাছে বোঝা হয়ে পড়ে। নৈতিক জীবনে অনুভূতির খুবই প্রয়োজন আছে, যেমন জীবনের বিকাশের জন্য দেহের প্রয়োজন আছে। উপনিষদ হৃদয়বৃত্তিকে নির্ব্বাসন না দিয়ে বুকে টেনে নিয়েছিলেন বলেই উপনিষদের পত্রে পত্রে এত আনন্দের উচ্ছাস। তাই তাঁরা আকাশে, বাতাসে, নদীতে, বনস্পতিতে এত মধুর আস্বাদ পেতেন; তাই তাঁরা পৃথিবীর সকল জিনিষকেই মধুময় বলে অনুভব করতেন। উপনিষদের মতে চাই শুদ্ধ জ্ঞান পিপাসা, চাই ব্রহ্মবিদ্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির সহিত একতাবোধপ্রসূত অনন্তবিস্তারী ভালবাসা এবং চাই অনবদ্য সর্ব্বজনসম্মত সুন্দর কর্ম্মপূর্ণ জীবন। উপনিষদের নীতি আধুনিক কবি ব্রীজ্‌এর ভাষায় সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করেছে—

"করমে দাও মাধুরী ভূষা, হৃদয়ে পর প্রণয় হার;
চিত্ত তব সত্য পথে লুটাক গিয়ে চরণে তাঁর:
যাঁহার তরে সকল আছে, করেন যিনি সকল কাজ,
সত্য প্রেম রসের রূপে প্রকট যিনি বিশ্বমাঝ।"

চিরন্তনের সাথী

শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, রাজবন্দী

জীবন যদি এম্‌নি করেই কাটে—
ধরার ঘাটে ঘাটে
এম্‌নি করে' ভেসেই যদি বেড়ায় আমার তরী
অনাদি কাল ধরি'
(আমার) নেই তা'তে দুখ—
পথের নেশায় চিত্ত যে মোর একান্ত উন্মুখ।

জানি, জানি, সেথায় আছে কাল-বোশেখীর ঝড়,
পথ সে ভয়ঙ্কর,
পদে পদে বাধ্‌বে নূতন বাধা,
অন্ধকারে পথ হারাবে, লাগ্‌বে চোখে ধাঁধা।

তখন কাটেই যদি হালের বাঁধন ছিঁড়ে পালের দড়ি
তবু বাইতে হ'বে তরী
বিপদ্‌ আপদ্‌ না করি দৃক্‌পাত:
মিল্‌বে তবে বিশ্বমায়ের রুদ্র-আশীর্ব্বাদ।

দুয়ের সাথে মিতালি মোর, সুখের সাথে আড়ি,
সেই ভরসায় মত্ত সাগর একাই দিব পাড়ি।

পূজা আমার শেষ করেছি, এবার বিসর্জ্জন—
তারই আয়োজন
আপন হাতেই করবো এবার আমি,
চলার পথে আর কতকাল রইবো ওগো আমি'?
দুঃখ কিসের ছিঁড়্‌তে মায়া ডোর?
অনিশ্চিতের আঁধার পথে যাত্রা আজি মোর—
নেইকো সেথায় পূর্ণমসীর চাঁদ,
সেথা দখিন হাওয়ায় টুট্‌বে না গো অশ্রুজলের বাঁধ,
যত্নে গড়া অহঙ্কারের ভিৎ
লুটিয়ে দিতে হবে ধূলায় তবেই হবে জিৎ।

এই তো জীবন, এই তো আমার খেলা—
সারা সকাল বেলা।
গড়্‌বো যাহা যত্ন করে ভাঙ্গ্‌বো তাহা সাঁঝে,
আমার সকল কাজে
এমনি ধারা সৃষ্টিছাড়া পাগলা ক্ষ্যাপা ছন্দ,
চিরন্তনের যাত্রী আমি, এম্‌নি নিঠুর অন্দ!



দারিদ্র্যের ইতিহাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৯)

ভগবতী অপেরাপার্টি—

বেশীর ভাগ লোকই ছোট জাতের, কয়েকজন মাত্র ভদ্র সন্তান আছে। ছোট জাতের ছোট ছোট ছেলেদের সুন্দর চেহারা দেখে দলে নেওয়া হয়।

এরা সব পার্টিতে নাচ গান করে, মাঝে মাঝে অন্য ভালো পার্টও নেয়। নাচ গানের জন্যই এই অপেরাপার্টি বিশেষ করে খ্যাতি লাভ করেছে, কোথাও গান হবে শুনলে ছয় সাত ক্রোশ দূর হতেও গ্রামের লোক হেঁটে আসে।

এদেরই দলের মধ্যে নিতাই নামে একটী ছেলে বিখ্যাত নিমাই-সন্ন্যাস পালায় নিমাই সাজে।

ভগবতী অপেরাপার্টিতে এই পালাই অতি বিখ্যাত। সবাই বলে এমন পালা তারা জীবনে দেখেনি বা শোনে নি। এই নিমাই-সন্ন্যাস পালা কেবল নিমাইয়ের জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

বয়স বড় জোর পনের ষোল হবে। তার চেহারা সত্যই অতি সুন্দর, দেখলেই তাকে ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়।

অনেক কাল সে যাত্রার দলে আছে, তার বয়স তখন সাত আট বৎসর হবে। পরিচয়হীন, গোত্রহীন একটী ছেলে—কেউ তার আছে কিনা নিজেই সে তা জানে না।

অনন্ত একবার চাঁদপুরে গিয়েছিল; সেইখানে আর পাঁচজন গরীব ছেলের সঙ্গে মিশে সেও অনন্তের কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল। তার পরম সুন্দর চেহারা অনন্তকে তার পানে আকৃষ্ট করেছিল এবং সে ছেলেটীর পরিচয় জানতে চেয়েছিল কিন্তু পরিচয় কিছুই মেলে নি। বাপ মা, দেশ ও জাতির কথা জিজ্ঞাসা করতে বালক নিতাই অবাক হয়ে খানিক অনন্তের পানে তাকিয়েছিল; তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেছিল—সে কোন খবর জানে না, কেবল জানে—সে মানুষ।

বাস, এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। সে মানুষ—জীব নয়, জন্তু নয়, প্রাণহীন অচেতন পদার্থ নয়, সে মানুষ। মানুষ বলেই মানুষের সমান অধিকার পাওয়ার দাবী সে করে এবং করে যাবেও।

অনন্তের অন্তর একেবারে দ্রব হয়ে গিয়েছিল, সে নিতাইকে সঙ্গে করে একেবারে গ্রামে এসে পৌচেছিল।—

নিতাই তার কাছেই থেকে গেল। সমস্তদিন সংসারের ফাই ফরমাস খাটত, পার্ট মুখস্থ করত, যাত্রার দিনে সাজত।

অসিত নিজের থাকার জন্য ইচ্ছামতী নদীর তীরে বাড়ী পছন্দ করলে। অনন্ত তার সুবিধার জন্য নিতাইকে তার কাছে রাখলে।

নদীর ধারের এই বাড়ীতে প্রত্যহ রিহার্সাল সুরু হল, গান আরম্ভ হল; নিস্তব্ধ নদীতীর শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

এই গ্রাম্য নদীতীরে শান্ত সন্ধ্যাটী বড় ভালো লাগে। নদী রিণিঝিনি বয়ে যায়, সান্ধ্য মৃদুল বাতাসে তার বুকে কখনও কখনও মৃদু তরঙ্গের সাতটা সুর বাজে, দু পাশে শ্যামল দূর্বাচ্ছাদিত তীর অবাক হয়ে সেই সুর শোনে।

আকাশ নক্ষত্রমালায় সুন্দর হয়ে ওঠে, কখনও চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; আকাশের ছবিও পড়ে নদীর স্বচ্ছ কালো জলে—জলের কাঁপনে থর থর কাঁপে, দোলা খায়।

ওপারে কোথায় কোন গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে কোন পাখী ডাকে, এপারে পাখীর তন্দ্রা ছুটে যায়, সে উসখুস করে; সদ্য ঘুম ভাঙ্গা আলস্য জড়ানো সুরে সে পরিচিত প্রিয়ের ডাকে সাড়া দেয়। নদীর ধারে কত রকমের ফুল ফুটে গন্ধ ছড়ায়—পথিক পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ফুল খোঁজে, কিন্তু কোথায় যে ফুল লুকিয়ে থাকে—তাকে দেখা যায় না।

এই ইচ্ছামতীর তীরে ঘাটের পরে একা বসে অসিত হাজার স্বপ্ন দেখে।

এ সব তার চেনা—নিবিড়ভাবে চেনা এই রকম শান্ত গ্রাম, এই নদী, গাছ, লতা, ফুল, পাখী, সবই তার বড় পরিচিত। সে যা কিছু দেখছে, তার মন বলছে—একে চিনি, একে চিনি।"

কত যুগ যুগান্তর আগে হতে জন্মে আসছে সে এমনই গ্রামের বুকে—একবার নয়—দুবার নয়, বহুবার, হয় তো লক্ষবারই হবে। প্রতিবারেই সে দেখেছে, তার কুঁড়ে ঘরের পাশ দিয়ে বয়ে যায় কালো জলভরা নদী—তার বুকে স্রোত ছিল না, তাই তার বুকে ফুটত লাল পদ্ম, লাল চোখ মেলে চেয়ে থাকতো সূর্য্যের পানে—কালো জলের পরে মেলে থাকতো তার সবুজ রংয়ের গোলপাতা।

কালো জলে সাঁতার কেটে তরঙ্গ তুলে সে তুলে আনত লাল পদ্ম, তা দিয়ে গাঁথত মালা, গড়তো তোড়া, তার পর ভক্তিনম্রচিত্তে সেই মালা আর তোড়া নিয়ে গিয়ে তার দেবীর বেদীতলে সমর্পণ করত।

নিষ্ঠুরা দেবী তার পূজাই নিয়েছে, চোখ তুলে তার এই একনিষ্ঠ ভক্তের পানে কোনদিন চাইলে কি?

পাখীরা এমনি করে এমনি সুরেই গান গেয়েছিল, বাতাস এমনি করেই বয়ে এনেছিল ফুলের সুগন্ধ; আজও সব তেমনই আছে, নাই কেবল সে—নাই তার দেবী।

দারিদ্র্য মহাপাপ—

অসিত চমকে ওঠে—

মহাপাপ?—কে বলে? দারিদ্র্য জগৎ চিনতে শিখায়, মানুষের কাছে মানুষের পরিচয় দেয়। দারিদ্র্য মনুষ্যত্বের পরিচায়ক; পদে পদে বাধা দিয়ে মানুষকে করে তোলে দৃঢ়, সক্ষম ও কর্ম্মাসক্ত। মানুষ সাধনায় পায় সিদ্ধি, কর্ম্মফল গ্রহণে একমাত্র তারই থাকে অধিকার।

অসিত পরম শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়—

না, ধনী হতে সে চায় না, আজও চায় না, কোনদিন চাইবেও না। ধনীকে সে দেখেছে, দরিদ্রের ঘরে জন্মে তার সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য সে লাভ করেছে। ভগবান তোমায় এজন্য শত ধন্যবাদ, সহস্র ধন্যবাদ, লক্ষ ধন্যবাদ।

শিক্ষার অহঙ্কার হয় তো অজ্ঞাতসারেই কোনদিন মনের কোনে জমেছিল, আজ তাও নাই। সে আজ জেনেছে তার শিক্ষা সার্থকতায় ভরে উঠতে পারে যদি সে দরিদ্রের কোন কাজে লাগতে পারে। সে শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করেছে, আজ সে মিশতে এসেছে এই সব দরিদ্র গ্রামবাসীর সঙ্গে। অভিজ্ঞতা আরও চাই, এখনও তার পাওয়া শেষ হয় নি।

নিতাই সময় সময় এসে তার পাশে বসে, নিস্তব্ধ ভাবে বসে থাকে, একটী কথাও কোনদিন বলে না।

চোখ ফিরাতে তার দিকে দৃষ্টি পড়ে।

অসিত জিজ্ঞাসা করে, "কি রে নিতাই, কোনও দরকার আছে নাকি?"

নিতাই মাথা নাড়ে—না, কোন দরকার নেই।

নদীর পানে তাকিয়ে, আকাশের পানে তাকিয়ে সেও বুঝি স্বপ্ন দেখে কোন স্বর্গের—সে স্বর্গে কি আছে—কারা আছে কে জানে।

আজকাল সে অনেক বুঝতে শিখেছে। নিতান্ত অকারণেও তার চিত্ত ব্যথায় ভরে ওঠে, অতি গোপনে চোখের কোনে হয় তো জলও এসে পড়ে।

যাত্রার দলে যখন সে নিমাই সাজে, তখন চারিদিকে করতালির শব্দ পাওয়া যায়, কত চক্ষু অশ্রুসিক্ত দেখতে পাওয়া যায়, কত কথাও কানে আসে—নির্জ্জলা প্রশংসার বাণী—সব মিথ্যা। তখন নিতাই গোত্রহীন, পরিচয়হীন নিতাই নয়, সে তখন নিমাই—একটা মহান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, একটা জাতির রক্ষাকর্ত্তা—তার মা শচীদেবী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র।

কিন্তু তারপর?—

আসর হতে বাইরে এসে দাঁড়াতেই তাকে ঘিরে ধরে দুর্নিবার লজ্জা, সঙ্কোচ। কে সে, কি আছে তার? জাতি, নাম, পিতৃপরিচয় কিছুই তার নাই। সে জাতিহারা—গোত্রহারা—এক হতভাগা কিশোর।

তার সুন্দর আকৃতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সবাই তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, তার পরিচয় পেতে চায়—কিন্তু কি পরিচয় আছে তার, কি সে জানাবে?

অসিতই একা সেই লোক—যে তার পরিচয় নিয়ে স্থান দেয় নি, কেবল মানুষ বলেই তাকে টেনে নিয়েছে—স্থান দিয়েছে। তাই সে বড় কৃতজ্ঞ, কুকুরের মত সে অসিতের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, অসিতের পাশে চুপ করে বসে থাকে—সেও তার ভালো।

অসিত করুণাবশে তার মুখের পানে চেয়ে থাকে, কত

কি ভাবনা তার মনে জাগে—হতভাগা—বড় হতভাগা—

কিন্তু উপায় কই—পথ কোথায়? এরা এমনই ভাবে জন্মায়, মানুষ হয় পথের ধারে, চলতে শেখে পথে। আজন্ম পরিচয় থাকে পথের সঙ্গে, স্থায়ী ঘর বাঁধবার অধিকার এদের নাই।

অসিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

(২০)

মেনকার একখানা পত্র পাওয়া গেছে।

আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা, লাইনগুলোও বাঁ দিকে উপর হতে ডাইনের কোনে ভেঙ্গে পড়েছে, তবুও সেখানা তার পত্র, তার অনেক কথা বহন করে এনেছে।

অসিত পত্রের পানে চেয়ে থাকে—

অভাগিনী বাংলার মেয়ে—

শিক্ষিতার চেয়ে অশিক্ষিতার সংখ্যা বেশী—যারা পথ চিনতে পারে না, সোজা পথে চলতে চলতে গিয়ে পড়ে বাঁকা পথে—তারপর আর পেছনে ফিরবার ক্ষমতা কই তার?

শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা এই বিশাল নারী সমাজের মধ্যে কয়টী? আর শিক্ষিতা হয়েই বা এরা করবে কি, কয়জন প্রলোভন এড়াতে পারে? কেবল মেনকার দোষ দেওয়া চলে না; গ্রামের মেয়ে—ভালো মন্দ বুঝবার ক্ষমতা তার নাই, তাই স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র কুটার মতই সে ভেসে গেছে, থামবার এতটুকু স্থান সে পায় নি।

তার সব দিকের পথ আজ বন্ধ—

সন্তান-সম্ভাবিতা অবস্থায় সামান্য একটা ত্রুটি ধরে কানাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অভাগিনী মেয়েটীকে কে একজন মহানুভব খৃশ্চানদের হোমে তুলে দিয়েছিল। মেনকা আজ হিন্দু নয়, স্বেচ্ছায় সে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেছে।

অসিত একটা নিঃশ্বাস ফেললে—

এত বড় হিন্দু-সমাজ তাকে স্থান দিলে না—তার মত ক্ষুদ্র একটী মেয়ের স্থান এতে নাই—এই যা বড় দুঃখের, বড় কষ্টের কথা। অট্টালিকার ছায়া সে না পাক, একখানা কুঁড়ে ঘরের বারান্দাও কি জুটল না মাথা গুঁজবার মত?

কিন্তু না, হিন্দু সমাজ সে স্থানটুকুও দেবে না, ওতে তার বাধবে; নিষ্ঠায় বাধবে, সংস্কারে বাধবে, ধর্ম্মে বাধবে। মুসলমান তাকে স্থান দেবে, খৃশ্চান তাকে স্থান দেবে, দেবে না শুধু হিন্দু, কারণ সে জাতিতে হিন্দু ছিল।

অসিত মেনকার পত্রখানা সযত্নে তুলে রাখলে—লোককে দেখানোর মত জিনিস। দেশের অনেকের মুখে সে অনেক উপদেশ অনেক বক্তৃতা শুনেছে—দেশ যায়, ধর্ম্ম যায়, হিন্দুর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অচিরে সাবধান হওয়া দরকার ইত্যাদি—ইত্যাদি।

এই কয়েকটা দিন আগে পার্শ্ববর্ত্তী আনন্দপাড়া গ্রামে একটা ভীষণ মারামারি হয়ে গেল এমনই একটা ব্যাপার নিয়ে। ঘটনাচক্রে অসিত সেখানে গিয়ে পড়েছিল এবং সব শুনে ধিক্কার দিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেছিল।

আনন্দপাড়া গ্রামের গোবিন্দ ঘোষের কনিষ্ঠা পুত্রবধূর বয়স পনের কি ষোল বৎসর মাত্র। বিবাহ হয়েছিল খুব ছোট বয়সে, তখন তার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র, বিবাহের দুই বৎসর পরেই সে বিধবা হয়।

কিছুদিন হতে বউটীর স্বভাব-চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে বাড়ীসুদ্ধ লোক তাকে নির্য্যাতন করতে সুরু করে। মেয়েটীর পিত্রালয়ের সম্পর্কে এ মেয়েটীর এমন কেউই ছিল না যার কাছে সে অন্ততঃ পক্ষে দুদিনের জন্যও আশ্রয় নিতে পারে।

একদিন হঠাৎ শোনা গেল সে গৃহত্যাগ করেছে এবং গ্রামেরই অধিবাসী কালুসেখের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে।

বলা বাহুল্য দেখতে দেখতে একথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং গোবিন্দ ঘোষের জাতিকুল নষ্টের বেদনা ব্রাহ্মণ হতে আরম্ভ করে সকলেই অন্তরে অন্তরে অনুভব করলে। যাদের অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য বলে চিরদিন গ্রামের স্পৃশ্য সম্প্রদায় একপাশে ঠেলে রেখেছে, সেই সব বাগদি, ডোম প্রভৃতিরাও নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো এবং স্পষ্টই বললে—এর বিহিত করা অবিলম্বেই দরকার।

একে একে সকলেই গোবিন্দ ঘোষের কুটীর প্রাঙ্গণে সমবেত হল।

নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করা ভালো, তা বলে আর কেউ যে মাঝখানে এসে দাঁড়াবে তা সহ্য হয় না। সকলেই একবাক্যে বললে, "মুসলমানের অত্যাচার আর সহ্য হয় না, এর প্রতিবিধান অত্যাবশ্যক।"

এরই ফলে আরম্ভ হলো গরীব কালুসেখের উপর

অত্যাচার, নিপীড়ন। হিন্দুপ্রধান গ্রামে একা বেচারা কালুসেখ একেবারে বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠলো।

অসিত কার্য্য ব্যপদেশে যেদিন সেখানে গিয়ে পড়েছিল সেদিন নাকি হিন্দুরা কালুসেখের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। কালুসেখের নির্য্যাতন-বার্ত্তা তার আত্মীয়বন্ধুরা শুনতে পেয়ে অনেক লোকজন নিয়ে এসে পড়েছিল এবং সেখানে রীতিমত একটী খণ্ডযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল।

উভয়পক্ষকে থামানোর জন্ম অসিত অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোন ফলই হয় নি, শেষে সে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

কিন্তু এরই জের যে তাকে টেনে চলতে হবে তা সে স্বপ্নেও আশা করেনি। একদিন পরেই কালুসেখ একটী মেয়েকে এনে অসিতের কাছে পৌছে দিলে; স্পষ্টই জানিয়ে গেল—যে মেয়েটীকে নিয়ে এত কাণ্ড মারামারি হয়েছে, এখনও হচ্ছে, এই সেই মেয়েটা। কালু সেখ তাকে আশ্রয় দিয়েছিল মাত্র; তার নিজেরও স্ত্রী কন্যা আছে এবং সে মুসলমান হলেও হৃদয়হীন পশু নয়। মেয়েটাকে সে আশ্রয় মাত্র দিয়েছিল, তার আহারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাও সে করেছিল, সেদিক দিয়ে তার এতটুকু ধর্ম্মহানি হয় নি।

নিতান্ত অসহায়ভাবেই বাণী অসিতের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছিল, "আমায় বাঁচতে দাও বাবা, আমায় মানুষ হয়ে নিজের ধর্ম্মে থাকতে দাও। সকলের মত তুমিও আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না; মনে কর তোমার ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম এক, তোমার সমাজ হতে আমায় তাড়িয়ো না।"

ধর্ম্ম এক—

অসিতের হাসি পায়—

ধর্ম্ম—ধর্ম্ম কি? যা নাকি ধারণ করে তাই ধর্ম্ম। এতে পার্থক্যই বা কেন—কিন্তু মুসলমান, খৃশ্চান—কি দরকার মানুষের এই খুঁটিনাটি জাতি বিচারে?

ভাতের হাঁড়িতে, হুঁকাতে আর জলের কলসীতে যে জাতির ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ, সেই নাকি একটা জাতি? কতক্ষণ এ জাতি টিঁকে থাকতে পারবে নিজেকে সব রকম ছোঁয়াচ হতে অতি সন্তর্পণে বাঁচিয়ে? পারবে কি?

অসিতের মনে পড়ে গেল—একদিন গাঙ্গুলী মশাইয়ের রান্নাঘরের চালে একটা মুরগী এসে বসেছিল। প্রথমেই কাজ হল মুরগীটাকে মারা—সেও কি বড় কম কষ্টকর ব্যাপার। মুরগীও ছোটে, পেছনে পেছনে লাঠি নিয়ে মানুষও ছোটে—যেমন করেই হোক তাকে মারতেই হবে।

মুরগীটা মরলও—বেচারার নিতান্ত মরণ দশা ধরেছিল—নইলে সে এত জায়গা থাকতে গাঙ্গুলী মশাইয়ের রান্নাঘরের চালেই বা বসতে যাবে কেন? যে গাঙ্গুলী মশাই নবীন কাওরার ছায়া স্পর্শকেও মহাপাপ বলে শিউরে ওঠেন, সেই গাঙ্গুলী মশাইয়ের রান্নাঘরের চালে অস্পৃশ্য মুরগী? ভোরে যার ডাক শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়, সেই মুরগী—?

মুরগীকে যমালয়ে পাঠিয়ে ফিরে এসে সেই রান্নাঘরের ভিতরকার সংস্কার সুরু হল। রান্নাঘরের উনানটা পর্য্যন্ত ফেলতে হল, হাঁড়ি কড়ার তো কথাই নাই।

যার মুরগী সেই সৈয়দ আলি ব্যাপার দেখে আর মুরগীর দাবী পর্য্যন্ত করতে এল না।

কিন্তু তাতেই বা নিস্তার কই? গাঙ্গুলী মশাই একদিন বাড়ী গিয়ে ধরলেন—"তোমার মুরগী না সৈয়দ, এত বড় স্পর্দ্ধা তার যে সে হিন্দু বামুনের রান্নাঘরের চালে গিয়ে বসে। এখন এই যে আমার সব জিনিস নষ্ট হল এর ক্ষতিপূরণ করবে কে?"

সৈয়দ আলি অত্যন্ত কাতরভাবে জানালে সে মুরগীকে কিছুই শিখিয়ে দেয় নি—মুরগী নিজেই গিয়েছিল, তার ফলও তো সে হাতে হাতে পেয়েছে।

গাঙ্গুলী মশাই তবু বার বার বলে দিয়ে এলেন—আর কোনও মুরগী যেন এমন কাজ না করে, তাঁর বাড়ীর দিকে না যায়। এবার যদি যায়, তিনি সহজে ছাড়বেন না—ভালো করে সৈয়দকে দেখে নেবেন।

এই তো হিন্দুর জাতি বিচার, তার ধর্ম্মাভিমান।

অসিত আজকার দিনের কথা মনে করতে সেই দিনের কথাই মনে করে।

হাসবে না মনে করে, তবু কেন আর কেমন করে যে হাসি আসে তাই সে বুঝতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

(প্রবন্ধ)

দীপ্তাজাতি তীব্রা, রৌদ্রী, বজ্রিকা ও উগ্রা এই চারিভাগে বিভক্ত। এইরূপ আয়তাজাতীয় শ্রুতিসমূহ কুমুদ্বতী, ক্রোধা, প্রসারিণী, সন্দীপনী ও রোহিণী এই পাঁচভাগে বিভক্ত। করুণাজাতীয় শ্রুতিসমূহ দয়াবতী, আলাপিনী ও মদন্তিকা এই তিনভাগে বিভক্ত। মৃদু জাতীয় শ্রুতি-সমূহ মন্দা, রতিকা, প্রীতি ও ক্ষ্মা বা ক্ষিতি এই চারিভাগে বিভক্ত। মধ্যাজাতীয়া শ্রুতিসমূহ ছন্দোবতী, রঞ্জিনী, মার্জনী, রক্তিকা, রম্যা ও ক্ষোভিণী এই ছয়ভাগে বিভক্ত। এইরূপে পাঁচপ্রকার জাতিতে বিভক্ত শ্রুতি-সমূহ অবান্তর বাইশ প্রকার এবং এই বাইশটি শ্রুতি হইতে সাতটী স্বর নিষ্পন্ন। যথা—দীপ্তাজাতীয় তীব্রা, আয়তাজাতীয় কুমুদ্বতী, মৃদুজাতীয় মন্দা ও মধ্যাজাতায় ছন্দোবতী এই চারিশ্রুতির সমবায়ে ষড়জস্বর উৎপন্ন। এইরূপ করুণা-জাতীয় দয়াবতী, মৃদুজাতীয় রতিকা ও মধ্যাজাতীয় রঞ্জিনী এই তিনটী শ্রুতি হইতে ঋষভস্বর উৎপন্ন। দীপ্তাজাতীয় রৌদ্রী ও আয়তাজাতীয় ক্রোধা এই দুইটী শ্রুতি হইতে গান্ধার স্বর উৎপন্ন। দীপ্তাজাতীয় বজ্রিকা, আয়তাজাতীয় প্রসারিণী, মৃদুজাতীয় প্রীতি ও মধ্যাজাতীয় মার্জনী এই চারিটি শ্রুতি হইতে মধ্যমস্বর উদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপ মৃদুজাতীয় ক্ষিতি, মধ্যাজাতীয় রক্তা, আয়তাজাতীয় সন্দীপনী ও করুণাজাতীয় আলাপিনী এই চারিটি শ্রুতি হইতে পঞ্চমস্বর উৎপন্ন। করুণাজাতীয় মদন্তিকা, আয়তা-জাতীয় রোহিণী ও মধ্যাজাতীয় রম্যা এই তিনটি শ্রুতি হইতে ধৈবতস্বর উৎপন্ন। এইরূপ দীপ্তাজাতীয় উগ্রা ও মধ্যাজাতীয় ক্ষোভিণী এই শ্রুতি হইতে নিষাদস্বর উৎপন্ন হইয়াছে।

ষড়জাদি কোন্ স্বরে কি জাতীয় কোন্ শ্রুতি বিদ্যমান তাহার সুস্পষ্ট পরিচয়ের জন্য আমরা নিম্নে একটি সারণী (Table) প্রদান করিতেছি।

শ্রুতিসমূহের পাঁচ জাতি—দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু, মধ্যা॥ প্রতিজাতির অবান্তর ভেদ এইরূপ—

(১) দীপ্তা :—তীব্রা, রৌদ্রী, বজ্রিকা, উগ্রা।

(২) আয়তা :—কুমুদ্বতী, ক্রোধা, প্রসারিণী, সন্দীপনী, রোহিণী।

(৩) করুণা :—দয়াবতী, আলাপিনী, মদন্তিকা

(৪) মৃদু :—মন্দা, রতিকা, প্রীতি, ক্ষিতি বা ক্ষ্মা।

(৫) মধ্যা :—ছন্দোবতী, রঞ্জনী, মার্জনী, রক্তিকা, রম্যা, ক্ষোভিণী।

ষড়জ	দীপ্তাজাতীয় তীব্রা	আয়তাজাতীয় কুমুদ্বতী	মৃদুজাতীয় মন্দা	মধ্যাজাতীয় ছন্দোবতী
ঋষভ	করুণাজাতীয় দয়াবতী	মৃদুজাতীয় রতিকা	মধ্যাজাতীয় রঞ্জনী	×
গান্ধার	দীপ্তাজাতীয় রৌদ্রী	আয়তাজাতীয় ক্রোধা	×	×
মধ্যম	দীপ্তাজাতীয় বজ্রিকা	আয়তাজাতীয় প্রসারিণী	মৃদুজাতীয় প্রীতি	মধ্যাজাতীয় মার্জনী
পঞ্চম	মৃদুজাতীয় ক্ষিতি	মধ্যাজাতীয় রক্তা	আয়তাজাতীয় সন্দীপনী	করুণাজাতীয় আলাপিনী
ধৈবত	করুণাজাতীয় মদন্তী	আয়তাজাতীয় রোহিণী	মধ্যাজাতীয় রম্যা	×
নিষাদ	দীপ্তাজাতীয় উগ্রা	মধ্যাজাতীয় ক্ষোভিণী	×	×

ক্ষুদ্র বৃহৎ ও বৃহত্তর যে কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে শক্তি ও গুণের তারতম্য অনুসারে বস্তু ও ব্যক্তিসমূহের মধ্যে অগণিত জাতিভেদ বা শ্রেণী-বিভাগ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জাতি ও ব্যক্তি যখন বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যে কোন কার্য সাধনের পথে অগ্রসর হয় তখনও দেখা যায়, উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী শক্তি ও গুণ সকলের সমান নহে। কাহারও শক্তি ও গুণ উত্তম, কাহার ও মধ্যম, কাহারও বা অধম। কেহ দ্রুতগতি, কেহ মধ্যগতি, কেহ বা মন্দগতি লইয়া উদ্দেশ্য পথে অগ্রসর হইয়া থাকে; এইরূপ ক্ষেত্রে শক্তি ও গুণের তারতম্যমূলক গতিভেদে সাধকমণ্ডলীর মধ্যে যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিকসিত হয় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কেবল ব্যক্তিসমূহের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, বস্তুসমূহের মধ্যে শক্তি গুণের তারতম্যে এই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয় ঋষিগণ এইজন্যই মানব-সমাজকেও যেমন অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ বস্তুসমূহকেও অগণিত শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দুর্লক্ষ্য শ্রুতিসমূহের মধ্যেও এই জাতিবিভাগ তাঁহাদের সূক্ষ্মদর্শিতারই ফল। স্থূলদর্শী আধুনিক গায়কগণ যেখানে শ্রুতিসমূহের স্বরূপ পরিচয়েই অসমর্থ, ভারতীয় ঋষিগণ সেখানে শ্রুতিসমূহের শুধু পরিচয় করিয়াই বিরত হন নাই, গুণভেদে এই শ্রুতিসমূহ কতপ্রকার জাতিতে বিভক্ত, ঐ জাতিসমূহের অবান্তর ভেদ কত প্রকার তাহা নির্ণয় পূর্বক কোন্ স্বরটী কোন্ কোন্ জাতীয় শ্রুতিসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া কোন্ জাতীয় গুণসম্পন্ন হয় তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন; আধুনিক গায়কগণের মধ্যে অনেকে আবার প্রাচীন সঙ্গীতাচার্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি স্বীকার করিবার জন্য উপহাসও করিয়াছেন। যাঁহারা নিরন্তর শ্রুতির অল্পতায় যে কোমলস্বরের উদ্ভব হয় এবং শ্রুতির বাহুল্যে যে কড়ি বা তীব্রস্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা গীতে বা বাদ্যে ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না তাঁহাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শনপূর্বক শ্রুতির পরিচয় প্রদান করিয়া যাঁহারা শ্রুতির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সে আলোচনাও কি কারণে উপহাসাস্পদ হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ গণিতজ্ঞান স্বরস্বরূপ শব্দস্পন্দনের সংখ্যা নির্দেশ করিয় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি অভিনিবেশ করিলেও স্বরের অংশস্বরূপ শ্রুতিসমূহের পরিচয় আমরা পাইতে পারি। যাহা হউক এই স্বরসমূহ অভিব্যক্তিস্থানের ভেদ-নিবন্ধন মন্দ্র, মধ্য ও তার নামে তিন প্রকার। তন্মধ্যে হৃদয়কে মন্দ্রস্থান, কণ্ঠকে মধ্যস্থান ও মস্তককে তার স্থান বলে। এই তিনটি স্থানে বাইশটী করিয়া তির্যক নাড়ী বিদ্যমান। বায়ুর আঘাতে এই বাইশটি নাড়ী হইতে বাইশ প্রকার শ্রুতি ও তাহা হইতে সাতটী স্বর নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা তিনস্থানেই কি শ্রুতি-উৎপাদক বাইশটি করিয়া ছয়ষট্টিটি নাড়ী বিদ্যমান রহিয়াছে অথবা কেবল কণ্ঠদেশেই বাইশটি শ্রুতি-উৎপাদক নাড়ী বা স্বরনলী বিদ্যমান এবং বিভিন্ন স্থানগত বায়ুর বেগ-তারতম্যেই বিভিন্নভাবে ঐ শ্রুতি-উৎপাদক স্বরযন্ত্র স্পন্দিত হইয়া মন্দ্র, মধ্য ও তারস্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। যদিও পাশ্চাত্য শরীরবিজ্ঞান অনুসারে Larynx বা স্বরযন্ত্র হইতেই স্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে বলা হয় এবং স্থূলদৃষ্টিতে আমাদের তাহাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে রত্নাকরবর্ণিত শিরা-সমষ্টি হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা তালুদেশে বিদ্যমান থাকিয়া মন্দ্র, মধ্য ও তারস্বর উৎপাদনের হেতুভূত নহে এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিশেষজ্ঞগণের সহায়তা আমরা আহ্বান করিতেছি।

বিকৃত স্বর

আমরা পূর্বে যে সাতটি স্বরের কথা বলিয়াছি উহা শুদ্ধস্বর। এতদ্ভিন্ন স্বাভাবিক শ্রুতিসংখ্যার হ্রাস ও বৃদ্ধিবশতঃ বার প্রকার বিকৃতস্বর নিষ্পন্ন হইয়া থাকে (পরবর্ত্তী যুগে পণ্ডিতবর অহোবল তাঁহার সঙ্গীত পারিজাতে আরও কতিপয় বিকৃতস্বরের ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন। বোধহয়, রত্নাকরের যুগে এত অধিক বিকৃতস্বরের প্রচলন হয় নাই)। নিম্নে এই বার প্রকার বিকৃত স্বরের পরিচয় নিম্নলিখিত রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। শুদ্ধ ষড়্জস্বর স্বভাবতঃ চারিশ্রুতি সম্পন্ন। অবস্থাভেদে এই ষড়্জস্বর তিন বা দুই শ্রুতি সম্পন্ন হইলে চ্যুত ও অচ্যুতভেদে বিকৃত ষড়্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋষভস্বর যখন ষড়জস্বরের চতুর্থ-

শ্রুতি গ্রহণ করিয়া চারিশ্রুতি সম্পন্ন হয়, ফলে ষড়জস্বর যখন স্বাভাবিক নিষ্পত্তিস্থান চতুর্থশ্রুতি হারাইয়া তৃতীয় শ্রুতিতে নিষ্পন্ন হয়, তখন এই তিনশ্রুতিসম্পন্ন ষড়জ স্বরকেই ষড়জ সাধারণ বা চ্যুত ষড়জ বলে। আর নিষাদ ষড়জস্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুইটী শ্রুতি লইয়া যখন চতুঃশ্রুতিসম্পন্ন হইয়া থাকে তখন ষড়্জ স্বরটী অবশিষ্ট দ্বিশ্রুতি সম্পন্ন হয় এবং তাহাকেই বলে অচ্যুত ষড়্জ। এইরূপে ষড়জস্বরের দুই প্রকার বিকৃতি—চ্যুত ষড়্জ ও অচ্যুত ষড়্জ। চ্যুত ষড়্জ বা ষড়্জ সাধারণ অবস্থায় ঋষভ যখন চারিশ্রুতি সম্পন্ন হয়, তখন ইহাই ঋষভের বিকৃত অবস্থা। ইহাকে "চতুঃশ্রুতিক ঋষভ" বলে। এইরূপ গান্ধারের বিকৃতি দুই প্রকার—ত্রিশ্রুতিক গান্ধার ও চতুঃশ্রুতিক (বা অন্তর) গান্ধার। গান্ধার যখন মধ্যমের প্রথম শ্রুতিটি গ্রহণ করিয়া তিনশ্রুতি বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকেই বলে ত্রিশ্রুতিবিশিষ্ট গান্ধার। আর মধ্যমের প্রথম ও দ্বিতীয় দুইটী শ্রুতি গ্রহণ করিয়া গান্ধার যখন চারিশ্রুতি সম্পন্ন হয় তখন তাহাই হইল চতুঃশ্রুতিক গান্ধার বা অন্তর গান্ধার।

মধ্যম স্বর ও ষড়্জের ন্যায় দুই শ্রুতি বিশিষ্ট হইয়া চ্যুত ও অচ্যুত ভেদে দুই প্রকার বিকৃত মধ্যমরূপে পরিণত হয়।

ষড়জ গ্রামের শুদ্ধ পঞ্চম স্বর স্বভাবতঃ চারিশ্রুতি সম্পন্ন। কিন্তু মধ্যম গ্রামে পঞ্চম তিন শ্রুতি বিশিষ্ট হইয়া এক প্রকার বিকৃত পঞ্চম নিষ্পন্ন হয়। আবার এই মধ্যম গ্রামেই মধ্যম স্বরের এক শ্রুতি লইয়া ঐ তিন শ্রুতি সম্পন্ন পঞ্চম চারি শ্রুতি সম্পন্ন হইয়া আর এক প্রকার বিকৃত পঞ্চমের সৃষ্টি করে। গ্রন্থে ইহার কোন পৃথক নামকরণ দেখা যায় না। এইরূপে মধ্যম গ্রামে পঞ্চম স্বরের বিকৃতি দুই প্রকার। শুদ্ধ ধৈবত ষড়জ গ্রামে স্বভাবতঃ তিন শ্রুতি সম্পন্ন। মধ্যম গ্রামের ধৈবত বিকৃতরূপ গ্রহণ করিয়া চারিশ্রুতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। শুদ্ধ নিষাদ স্বভাবতঃ দুই শ্রুতি সম্পন্ন। কিন্তু ষড়জ সাধারণে ষড়জ স্বরের প্রথম শ্রুতি লইয়া এই নিষাদ যখন তিন শ্রুতি সম্পন্ন হয়, তখন তাহাকে "কৈশিক নিষাদ" বলে এবং ষড়জ স্বরের দুই শ্রুতি লইয়া নিষাদ যখন চারি শ্রুতি সম্পন্ন হয় তখন তাহাতে "কাকলী নিষাদ" বলে। এইরূপে কৈশিক ও কাকলী ভেদে নিষাদ স্বরের দুইটী বিকৃতি। পূর্বোক্তরূপে (সা=২, রি=১, গা=২, মা=২, পা=২, ধা=১, নি=২=১২) বিকৃত স্বর বার প্রকার। পূর্বোক্ত সাত প্রকার শুদ্ধ স্বর ও এই বার প্রকার বিকৃত স্বরের যোগে স্বরের সমষ্টি সংখ্যা ১৯।

"তৈঃ শুদ্ধৈঃ সপ্তভিঃ সার্দ্ধং ভবন্ত্যেকোন-বিংশতিঃ।"

আমরা নিম্নে ষড়জ গ্রামের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের একটি সারণী (Table) বোধ-সৌকর্য্যার্থ প্রদান করিতেছি। মধ্যম গ্রামের বিকৃত স্বরের জন্য পৃথক সারণী অনাবশ্যক।

ষড়জ গ্রামে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের সারণী

ষড়জ গ্রাম

শ্রুতি	জাতি	শুদ্ধস্বর	বিকৃতস্বর
(১) তীব্রা	(দীপ্তা)	×	কৈষিক নিষাদ
(২) কুমুদ্বতী	(আয়তা)	×	কাকলী নিষাদ
(৩) মন্দা	(মৃদু)	×	চ্যুত ষড়জ
(৪) ছন্দোবতী	(মধ্যা)	ষড়জ	অচ্যুত ষড়জ
(৫) দয়াবতী	(করুণা)	×	×
(৬) রতিকা	(মৃদু)	×	×
(৭) রঞ্জনী	(মধ্যা)	ঋষভ	চতুঃশ্রুতি ঋষভ
(৮) রৌদ্রী	(দীপ্তা)	×	×
(৯) ক্রোধা	(আয়তা)	গান্ধার	×
(১০) বজ্রিকা	(দীপ্তা)	×	ত্রিশ্রুতি গান্ধার
(১১) প্রসারিণী	(আয়তা)	×	অন্তর গান্ধার
(১২) প্রীতি	(মৃদু)	×	চ্যুত মধ্যম
(১৩) মার্জনী	(মধ্যা)	×	অচ্যুত মধ্যম
(১৪) ক্ষিতি	(মৃদু)	×	×

(১৫)	রক্তা	(মধ্যা)	×	×
(১৬)	সন্দীপনী	(আয়তা)	×	×
(১৭)	আলাপিনী	(করুণা)	পঞ্চম	×
(১৮)	মদন্তী	(করুণা)	×	×
(১৯)	রোহিণী	(আয়তা)	×	×
(২০)	রম্যা	(মধ্যা)	ধৈবত	×
(২১)	উগ্রা	(দীপ্তা)	×	×
(২২)	ক্ষোভিণী	(ক্ষোভিণী)	নিষাদ	×

সপ্ত স্বরের আদর্শ স্থানসপ্তক ময়ূরের কণ্ঠে সাধারণতঃ ষড়জ স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে। এইরূপ চাতকের কণ্ঠে ঋষভ, ছাগের কণ্ঠে গান্ধার, বকের কণ্ঠে মধ্যম, কোকিলের কণ্ঠে পঞ্চম, ভেক-কণ্ঠে ধৈবত ও হস্তীর কণ্ঠে নিষাদ স্বর উচ্চারিত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ স্বর্ণের সহযোগে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় সে ঔষধ যেমন ব্যাধি নিবারণে সমর্থ, বিমিশ্র সুবর্ণের সহযোগে প্রস্তুত ঔষধ ব্যাধির উপশমনে তেমন সমর্থ নহে। এইরূপ স্বরেরও স্বাভাবিক ফল বিশুদ্ধ স্বরে রচিত বা উচ্চারিত সঙ্গীত হইতেই সম্ভবপর, স্বর অশুদ্ধভাবে রচিত বা উচ্চারিত হইলে সে ফল সম্ভাবিত নহে। আমরা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি—পুরাকালে সঙ্গীতের সাহায্যে সঙ্গীতাচার্য মহর্ষিগণ লৌকিক ও অলৌকিক বিবিধ বিস্ময়কর ফললাভ করিতেন। যতদিন পর্যন্ত এদেশে বিবিধ ফল সম্পাদনের জন্য সঙ্গীত প্রয়োগ প্রচলিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত এদেশের গায়কগণ স্বরের বিশুদ্ধি সম্পাদনে সতর্ক ছিলেন। অধুনা সঙ্গীতের সহিত কোনও অন্য ফলের সম্পর্ক নাই; সঙ্গীত কেবল সাময়িক চিত্ত বিনোদনের উপকরণ মাত্র। এই চিত্ত-বিনোদনও সাধনামূলক নহে—ভোগ-প্রবণ। স্বর-ঝঙ্কারের এমনই মাধুরী যে উহা যে কোনও প্রকারেই সম্পাদিত হয়, তাহাতেই জীবের হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলে উচ্চ-আকাঙ্ক্ষাবর্জিত ভোগ-লোলুপ সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ এই আপাতমনোরম স্বরঝঙ্কারেই কৃতার্থ থাকিয়া স্বরের বিশুদ্ধি সম্পাদনে অলস হইয়া পড়েন। হার্মোনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্রের যে কোন পর্দা হইতে স্বর সপ্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। স্বর-রচনার এই স্বৈরাচার বিশুদ্ধির পরিপন্থী। এই জন্য প্রাচীন সঙ্গীতাচার্যগণ ময়ুর, চাতক প্রভৃতি তির্যক জাতীয় জীবের অপরিবর্তনীয় স্বাভাবিক স্বর-ঝঙ্কারকে ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি স্বরসপ্তকের আদর্শরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। দেশ ভেদে মানবের স্বর-ঝঙ্কারের পরিবর্তন হয়, কিন্তু সকল দেশেই তির্যক জাতীয় স্বর একই রূপ। তির্যক জাতির কণ্ঠ সকল দেশেই অপরিবর্তনীয়রূপে একই প্রকার স্বর-ঝঙ্কার তুলিয়া থাকে।

সঙ্গীতের প্রয়োগকালে এই স্বরসমূহ বাদী, সম্বাদী, বিবাদী ও অনুবাদীরূপে চতুর্বিধ অবস্থায় পরিণত হয়। তন্মধ্যে যে স্বরসমূহ রাগের প্রতিপাদক বা জনক তাহাকে বাদী স্বর বলে। রাগরচনাকালে যে স্বর বাদী স্বরের সহায়ক হয় তাহারই নাম সম্বাদী। যে স্বর রাগের পরিপন্থী তাহার নাম বিবাদী, আর যে স্বর বাদী ও সম্বাদী স্বরের সম্পাদিত রক্তির অনুকূল, তাহারই নাম অনুবাদী স্বর। বাদীস্বর নৃপতি স্থানীয়, সম্বাদী স্বর মন্ত্রীর ন্যায় বাদীর মুখ্য সহায়ক। অনুবাদী ভৃত্যের ন্যায় রাগ-সম্পাদনে বাদীর সাহায্য করে। সম্বাদী ও অনুবাদী স্বরের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। যে দুইটি স্বরের মধ্যে আটটী বা বারটী শ্রুতির ব্যবধান থাকে সেই দুইটী স্বর পরস্পর বাদী সম্বাদী। নিষাদ ও গান্ধার অন্য পাঁচটী স্বরের বিবাদী অথবা নিষাদ ও গান্ধার ঋষভ ও ধৈবতের বিবাদী, এইরূপ ঋষভ ও ধৈবত নিষাদ ও গান্ধারের বিবাদী। রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ গ্রন্থকারোক্ত এই মতান্তরের কারণ বলিয়াছেন, "অনেক স্থলে দেখা যায় শুদ্ধ মধ্যম ও শুদ্ধ নিষাদ পরস্পর সম্বাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং নিষাদ ও গান্ধার অন্য পাঁচটী স্বরের বিবাদী হইতে পারে না। এই জন্যই গ্রন্থকার 'ঋধয়োরেব বান্যাতাম্' ইত্যাদি শ্লোকে মতান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন।" যে স্বরগুলি বাদী, সম্বাদী বা বিবাদী লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত নহে তাহারাই অনুবাদী স্বর।

কিছুক্ষণ

"বনফুল"

১০

আহারাদির পর দেখা গেল বেলা তিনটা বাজিয়াছে। পাবদা মাছের ঝাল সত্যই ভাল হইয়াছিল। পান চিবাইতে চিবাইতে মাখনবাবু বলিলেন "আপনি একটু বসুন সার—আমি দেখে আসি রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে—আপনি শুয়ে পড়ুন না ততক্ষণ!"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আপনার স্ত্রীর খাওয়া হয়ে গেছে কি? তাঁর আবার শরীরটা ভাল নয় শুনলাম—"

"হ্যাঁ, শরীরটা তেমন সুবিধে নেই বলছিল। মুড়ি দিয়ে ত পাশের ঘরটায় শুয়েছে। জ্বরটর এসেছে বোধহয়! ম্যালেরিয়ায় ত প্রায়ই ভোগে। আচ্ছা, দেখি দাঁড়ান—" বলিয়া মাখনবাবু পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরে পাশের ঘর হইতেই আমাকে ডাকিলেন—"শুনে যান—"

গেলাম। গিয়া দেখি মাখনবাবুর স্ত্রী জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম—গা পুড়িয়া যাইতেছে।

মাথায় জলপটি দিয়া হাওয়া করিতে বলিলাম। শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু বলিলেন, "সিরিয়াস্ বুঝছেন নাকি কিছু?"

"না—জ্বরটা একটু বেশী হয়েছে কিনা—তাই ওই রকম করে রয়েছেন। কুইনিন পাওয়া যাবে এখানে?"

"ছিল ত আমার কাছেই কয়েকটা গুলি। দেখি দাঁড়ান। ও ঘরে র‍্যাক্‌টায় ছিল মনে হচ্ছে—"

"আপনি আগে মাথায় জল দিয়ে ভাল করে বাতাস করুন। আমি দেখছি র‍্যাক্‌টা খুঁজে—" ফিরিয়া আসিয়া র‍্যাকটা খুঁজিয়া দেখিলাম। একটি খালি কুইনিনের টিউব রহিয়াছে। কুইনিন নাই।

মাখনবাবু এই শুনিয়া ওঘর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন—মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় পাওয়া সম্ভব। মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতে গেলাম। পাশের বাড়ী। সেখানে গিয়া দেখি মাষ্টার মহাশয় বাসায় নাই—ষ্টেশনে গিয়াছেন। একটি দশবছরের ছেলে বাসা হইতে বাহির হইয়া এই খবরটি দিল। তাহাকে বলিলাম যে মাখনবাবুর স্ত্রীর খুব জ্বর হইয়াছে—বাড়ীতে যদি কুইনিন থাকে একটু চাই। খোকা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল এবং একটু পরেই কুইনিন পিল কয়েকটা লইয়া হাজির হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম একটি আধময়লা-কাপড়-পরা আধঘোমটা দেওয়া মহিলাও বাহির হইলেন এবং একটু দূরে আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী বোধহয়।

ফিরিয়া দেখি মাথায় জল দেওয়াতে বিনুর জ্ঞান হইয়াছে। মাখনবাবু প্রাণপণ শক্তিতে হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন।

"পেলেন কুইনিন সার?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি—"

"মাষ্টার মশায়ের হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—এই যে স্বয়ং লক্ষ্মীও এসে হাজির হয়ে গেছেন দেখছি। আসুন বৌদি—চাঙ্গা করে তুলুন। এসব আমার কর্ম্ম নয়—" বলিয়া মাখনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী বিনুর শিয়রে গিয়া বসিলেন।

"বাস্ নিশ্চিন্দি! এইবার দেখা যাক রামদীন ব্যাটা কদ্দুর কি করলে—হ্যাঁ কুইনিনটা কি এখনই দিয়ে দিতে হবে?"

"দিলেই ভাল হয়—দুটো পিল দিন—"

আমার হাত হইতে কুইনিনের পিলগুলি লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীর হাতে সেগুলি দিয়া মাখনবাবু বলিলেন—"শুনলেন ত? দুটো পিল দিয়ে দিন এখুনি—জাস্ট্ নাউ! বুঝলেন?"

মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী ঘাড় কাৎ করিয়া জানাইলেন যে তিনি বুঝিয়াছেন এবং ফিস্ ফিস করিয়া বলিলেন যে আমরা বাহিরে গেলেই তিনি পিল দুইটি খাওয়াইয়া দিবেন।

মাখনবাবু আমাকে বলিলেন, "চলুন সার, তবে বাইরে যাই। বৌদি এসে গেছেন যখন, তখন আর কিছু দেখবার দরকার নেই। কিছুক্ষণ পরে চাই কি উনি চা-ও খাইয়ে দেবেন আমাদের—"

ফিস্ ফিস্ করিয়া বৌদি আবার বলিলেন—"ও বাড়ীতে যান না—চায়ের জল বসানই আছে। খোকনকে বল্লেই সে সব ঠিক করে দেবে—"

সস্মিত দৃষ্টিতে মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন —"শুনলেন ত ?"

"চলুন আমরা বাইরে যাই—" বলিয়া আমি মাখনবাবুকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম। মাখনবাবু বলিলেন— "রামদীন ব্যাটা কদ্দুর কি করলে একবার দেখতে হচ্ছে। ব্যাটাকে একটা টাকা দিয়েছি ত অনেকক্ষণ হল—"

"কেন ?"

"ড্রাইভার ব্যাটাকে যদি ফুস্‌লে ফাস্‌লে মদ খাওয়াতে পারে—"

হঠাৎ আমার মনের ভিতরটাতে কে যেন একটা মোচড় দিয়া গেল। এই চক্রান্তে সত্যই যদি ড্রাইভারের চাকরিটা যায়। আমি অনর্থক ইহার মধ্যে নিজেকে জড়াইলাম কেন ? নিতান্ত নিরীহ একটা লোককে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন ভাবে—

"কি ভাবছেন সার ?"

"কিছু না—"

এমন সময় দূরে দেখা গেল সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া আবার সেলাম করিলেন। ইহাঁর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সব মনে পড়িয়া গেল। মাখনবাবুকে বলিলাম—"আবার এক ফ্যাঁসাদে পড়েছি মশাই—"

"কি ফ্যাঁসাদ ?"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা মাখনবাবুকে বলিলাম। মাখনবাবু নির্ব্বিকারচিত্তে বলিলেন, "কত টাকা দিতে চায় ?"

"সে দরদস্তুর ত করি নি। টাকা নেবেন নাকি সত্যি ?"

"সার্‌টেন্‌লি ! টাকা পেলে ছাড়তে আছে ?"

বলিয়া মাখনবাবু হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিলেন। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও ইহারই জন্য ওৎ পাতিয়া ছিলেন বলিয়া মনে হইল। আমি বলিলাম—"আপনারা তাহলে কথাবার্ত্তা চালান। আমি প্ল্যাটফর্মটার খবর নিয়ে আসি একবার। সেই মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে জানেন ত ?"

"কোন মেয়েটি ? সেই মুচির মেয়ে ?"

"হ্যাঁ—"

"কেমন করে জানলেন আপনি ?"

"পুকুর ধারে ছিল। আমার সঙ্গেই ফিরে এসেছে— প্ল্যাটফর্মের দিকে গেছে। খবর নিয়ে আসি একবার—"

"মুচির মেয়েকে নিয়ে আর অত বেশী মাখামাখি করবেন না। ওসব টেন্‌ডেন্‌সি ছাড়ুন। মরুকগে ও—"

"না মাখামাখি করব কেন ? আপনি শেঠজির সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ করুন না। আমি এখনি ফিরে আসছি—"

শেঠজি আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

মাখনবাবু তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমি প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

•

প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া একটা হাসির হর্‌রা শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম সেই ছোকরার দল হাসিতেছে। হাসির উপকরণ এবারে তাহারা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের নিজেদের মধ্যেই একজন দেখিলাম ঘোমটা দিয়া বউ সাজিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে একটি ছোকরা অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাহিতেছে—

কাদের কুলের বউ গো তুমি
কাদের কুলের বউ—

বাকী সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছে।

একটু দূরে একটা গাছতলায় দেখিলাম সেই ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান-দম্পতি বেশ গুছাইয়া বসিয়াছেন। একটা বেতের বাক্স হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি বাহির হইয়াছে। পাউরুটি, মাখন এবং একটা জ্যামের শিশি দূর হইতেই বেশ দেখা যাইতেছে। লাল চোঙ্-ওলা একটা শস্তা গ্রামোফোনে একটা বিলাতী প্রচলিত গৎ বাজাইয়া তাঁহারা ভোজন-ব্যাপারে ইউরোপীয় আবহাওয়া সৃষ্টিরও প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিলাম। কতকগুলি অর্দ্ধ-নগ্ন গ্রাম্য বালকবালিকা—

কিছুদূরে দলবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই ক্রিশ্চান-দম্পতির সঙ্গীতময় ভোজনবিলাস সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছে।

সেই মেয়েটিও সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে দেখিলাম। ধর্ম্মগত মিল থাকাতে আলাপ-পরিচয়ে বেশ একটা হৃদ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

উহাদের নিকট যাওয়া সঙ্গত হইবে কিনা চিন্তা করিতেছি এমন সময় মাখনবাবু ঊর্দ্ধ শ্বাসে আসিয়া বলিলেন—

"একটু তাড়াতাড়ি আসুন সার! বড় বিপদে পড়েছি—রামদীন ব্যাটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাদের 'এন্‌কোয়্যারিং' অফিসর এখুনি আসছেন ট্রলি করে। ড্রাইভারটারও পাত্তা নেই!"

"আমি তার কি করব?"

"আহা, আসুনই না আমার সঙ্গে। ওদিকে চা-ও হয়ে গেছে। নিন একটা সিগ্রেট নিন। মাথা ঠিক রাখুন এ সময়ে! আপনি ঘাবড়ালেই ত গেছি আমরা—" বলিয়া তিনি ফস্ করিয়া একটা দিয়াশালাই জ্বালাইয়া ধরিলেন, "আসুন সার—চলুন—'নো টাইম্ টু লুজ্'"

মহা বিপদে পড়িয়াছি এ ভদ্রলোককে লইয়া! অথচ এড়াইবার উপায় নাই।

গেলাম সঙ্গে।

বাহিরে আসিতেই কনুই দিয়া আমাকে একটা খোঁচা দিয়া মাখনবাবু সহাস্যে বলিলেন—"টোপ গিলিতং!"

"তার মানে?"

"তার মানে শ্রীমান ড্রাইভারচন্দ্র খুব টেনে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন ওই ওদিককার গুমটির ধারে। আপনার প্ল্যান কোয়াইট্ সাক্‌সেসফুল!"

"রামদীন কোথায়?"

"চা করছে আসুন—"

"আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?"

"বিল্কু অল্ রাইট্। বল্লাম ত বৌদি যখন গেছেন তখন নো ফিয়ার!"

নিজেকে আবার কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। ড্রাইভারটার যদি চাকরি যায়! এ কি ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে অনর্থক জড়াইলাম! "ওদিকে নয় সার—এদিকে আসুন। চা হচ্ছে মাষ্টার মশায়ের বাসায়—"

উভয়ে মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতে প্রবেশ করিলাম

২১

প্ল্যাটফর্মের কোলাহলটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

"সায়েব এল বোধ হয়—"

মাখনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে উঠিয়া পড়িলেন।

মাষ্টার মশাই ঊর্দ্ধ-নেত্র হইয়া চক্ষু মিট্ মিট্ করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনারা বসুন। আমি দেখে আসি চট্ করে ব্যাপারটা কি—"

মাখনবাবু বলিলেন, "যাবার সময় আপনি রামদীনটাকে একটু পাঠিয়ে দিয়ে যান ত। একটু শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা দরকার ব্যাটাকে!"

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রামদীন দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিয়া সোজা প্ল্যাটফর্মের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। প্ল্যাটফমে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।

দেখিলাম সেই ক্রিশ্চান মেয়েটিকে ঘিরিয়া আবার সেই অশিষ্ট যুবকদল মহাকলরব সুরু করিয়াছে। আমি আগাইয়া আসিয়া বলিলাম—"আবার আপনারা ওকে অপমান করছেন—?"

সেই ট্যারা ছোকরাটি ছিল।

সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কিছু অপমান করিনি মশাই। ভীড়ে যেতে যেতে ওঁর গায়ে আমার একটু গা ঠেকে গিয়েছিল—উনি হঠাৎ আমাকে গালাগালি দিয়ে বল্লেন 'ইডিয়ট্'। আমি বরং ভালভাবে বল্লাম—'দয়াময়ি, রাগ করছ কেন—দয়া কর—দয়া পরম ধর্ম্ম!'"

বলিয়া ছোকরা ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। ছোকরার মুখের হাসির উপরই একটি প্রকাণ্ড চড় বসাইয়া দিলাম। আর একটি ছোকরা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল তাহাকেও এক ঘা দিলাম।

"ছি, ছি মারামারি করবেন না ওসব ছোটলোকদের সঙ্গে। আসুন—বাইরে আসুন—"

আমার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীরুর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। আরও নানা লোক আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া মেয়েটিকে দেখিতে পাইলাম না। একটু দূরে দেখিলাম লাল কোট পরিয়া সেই বেঁটে

ভদ্রলোকটি আমার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া আরও দুই তিনজন লোককে কি যেন বলিতেছেন।

আমার সহিত চোখোচোখি হইতেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন এবং মুখে একটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—

"নমস্কার দারোগা বাবু" এবং সরিয়া দাঁড়াইলেন।

"মেয়েটি কোন দিকে গেল দেখেছেন ?"

তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে মেয়েটি 'গেট' দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

পুলিশের লোকের সহিত বেশী বাক্যালাপ করাটা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না বোধ হয়।

বাহিরে গেলাম।

বাহিরে গিয়াই মাখনবাবুর সঙ্গে দেখা।

"সায়েব এল না কি ?"

"না। সেই মেয়েটি কোথা গেল দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ—সে ত আমার বাসায় গিয়ে ঢুকল ফের। আমি দাঁড়িয়েছিলাম মশাই—কিছু বলতে পারলাম না। মহা মুস্কিল হল দেখছি—জাতজন্ম আর কিছু রইল না—"

এমন সময় হঠাৎ তিনজন সাহেব আসিয়া হাজির। একজনের কাঁধে রক্তাক্ত একটা বুড়ী।

এ কি কাণ্ড!

সাহেবেরা প্রথমেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে নিকটে কোন ডাক্তার আছে কি না। কাছাকাছি হাসপাতালই বা কতদূর।

মাখনবাবু শশব্যস্ত হইয়া মাষ্টার মশাইকে ডাকিয়া দিলেন। সাহেবের নাম শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় দিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে আসিয়া হাজির হইলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইহাঁদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

সাহেবেরা তিনজন সেই ফার্ষ্টক্লাসের যাত্রী। নিকটবর্ত্তী ঝিলে পক্ষী-শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই ঘুঁটে-কুড়ানী বুড়ীটা ঝিলের ধারে গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক সাহেবের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বুড়ীকে লাগিয়াছে।

সাহেবেরা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিতেছেন শুনিলাম যে যত টাকাই খরচ হউক না কেন—বুড়ীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

হাসপাতাল কত দূরে ?

মাষ্টার মহাশয় জানাইলেন যে প্রায় মাইল চারেক দূরে একটি সরকারি হাসপাতাল আছে।

সাহেবেরা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন কাছাকাছি আর কোন 'মেডিক্যাল হেল্‌প' পাওয়া সম্ভব কি না। আর কোন ডাক্তার নাই ?

মাখনবাবু হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—

"হিয়ার ইজ্‌ ওয়ান্‌ মেডিকেল কলেজ ষ্টুডেণ্ট সার—ভেরি এক্সপার্ট—"

আমাকে আগাইয়া আসিতে হইল।

বুড়ীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম যে যদিও আঘাত গুরুতর—কিন্তু হাসপাতালে লইয়া গিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদি করিলে বাঁচিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। বাহিরে ইহার চিকিৎসা হইতে পারে না—বিশেষত এ স্থানে।

এই কথা শুনিবামাত্র একটি কুলিকে সঙ্গে লইয়া সাহেব তিনজন চার মাইল দূরবর্ত্তী হাসপাতাল অভিমুখে পদব্রজে রওনা হইয়া গেলেন। পাল্‌কি কিম্বা ডুলি না পাওয়া যাওয়াতে বুড়ীকে কাঁধে করিয়াই তুলিয়া লইয়া গেলেন।

তাহারা চলিয়া গেলে মাখনবাবু বলিলেন—"দেখলেন শালার ব্যাটাদের কাণ্ড!"

মাস্টার মহাশয় ঊর্দ্ধ-নেত্র মিটিমিটি করিয়া বলিলেন—"পুলিশ কেস হলে আবার সাক্ষী ফাক্কি দিতে না হয়! এ এক ভারি হাঙ্গামায় পড়া গেল দেখ্‌ছি—"

এমন সময় ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে আবার একটা কলরব শোনা গেল। রামদীন ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে ট্রলি করিয়া দুইজন সাহেব আসিয়াছেন।

মাস্টার মহাশয়ের টুপি পরাই ছিল।

তিনি সোজা চলিয়া গেলেন।

মাখনবাবুও পিছু পিছু গেলেন।

আমিও গেলাম।

একজন খাঁটি শ্বেতাঙ্গ—আর একজন ব্রাউন রঙের। তবে ব্রাউন রঙের হইলেও তিনি যে একজন পদস্থ

অফিসার তাহা মাস্টার মহাশয় ও মাখনবাবুর ব্যবহারে বোঝা গেল।

মাস্টার মশাই দেখিলাম হাত কচলাইতেছেন ও ভুল ইংরেজিতে বলিতেছেন যে দোষ ড্রাইভারের। সে লোকটা মাতাল অবস্থায় সিগ্‌ন্যাল অগ্রাহ্য করিয়া 'ফুল ফোর্সে' স্টেশনে ট্রেন 'ইন' করিয়াছিল।

শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি মুখ হইতে পাইপ নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন যাত্রী জখম হইয়াছে কিনা। হয় নাই শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে ড্রাইভার কোথায়?

মাখনবাবু বলিলেন যে সে মত্ত অবস্থায় গুম্‌টির ধারের রাস্তায় শুইয়া আছে। ট্রেণ ডিরেল্‌ড্‌ হইবার পর সে ক্রমাগত মদ খাইতেছে।

সাহেব বলিলেন—"লেট আস সি হিম্‌"—

সকলে অগ্রসর হইলাম।

গেট হইতে বাহির হইয়া কিছুদুর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময়ে মাখনবাবুর বাসা হইতে সেই খৃষ্টান মেয়েটি বাহির হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল—"হ্যালো পল্‌—ইউ আর হিয়ার! বাই গড্‌। হাউ ইউ বিন্‌ ট্র্যান্সফারড্‌?"

"মার্থা? হোয়াট ব্রিংস্‌ ইউ হিয়ার?"

"আই ওয়াজ্‌ অন্‌ মাই ওয়ে টু ইউ!"

ব্রাউন রঙের সাহেবটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

মার্থা তখন আসিয়া সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করিতে লাগিল যে তাহাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে কোন খবর না দিয়াই সে তাহার কাছে যাইতেছিল। হঠাৎ পথে এই বিপদ।

তাহার পর তাহারা গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গেল। তাহাদের কথা-বার্ত্তা আর শুনিতে পাইলাম না। শ্বেতাঙ্গ সাহেবটিও দেখিলাম সহাস্যমুখে হ্যাটটা একটু খুলিয়া মার্থাকে অভিবাদন করিলেন।

মাখনবাবু চুপি চুপি আমার কানে কানে বলিলেন "সারলে দেখছি সার। ওই সায়েব হচ্ছে পি. ডব্লিউ. আই। এ মেয়েটার সঙ্গে বেশ ভাব আছে দেখছি। মাগী আমাদের নামে না লাগায়!" আমি কোন উত্তর দিলাম না।

আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না।

গুমটির নিকট পৌঁছিয়া দেখা গেল ড্রাইভার রাস্তার ধারে শুইয়া আছে। পাশে একটা মদের বোতলও রহিয়াছে। তাহার একজন অর্দ্ধমত্ত সঙ্গী তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে উঠাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ড্রাইভার কিন্তু বেহুঁস। শুধু বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে।

কাছেই একটা ঝোপের ধারে দেখিলাম সেই ফুট্‌ফুটে বেণীদোলান মেয়েটি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া একটা প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সহসা এতগুলি লোকের সমাগমে সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল—প্রজাপতি উড়িয়া গেল।

সাহেবেরা গিয়া ড্রাইভারকে দেখিতে লাগিলেন। ভাঙা হিন্দীতে শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি ড্রাইভারের সঙ্গীটিকে প্রশ্ন করিলেন যে ড্রাইভার কখন হইতে মদ খাইতেছে। সে সত্য কথাই বলিল। সে বলিল যে এখানে ট্রেণ 'ডিরেল্‌ড্‌' হইবার পর তবে তাহারা মদ খাইয়াছে। স্টেশনের পয়েণ্টস্‌ম্যান্‌ রামদীন সাক্ষী আছে।

স্টেশন মাষ্টার চক্ষু মিট্‌ মিট্‌ করিয়া ইংরেজীতে বলিলেন —"অল্‌ ফল্‌স্‌—"

অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না।

হঠাৎ সেই ব্রাউন রঙের সাহেবটি মাখনবাবু ও আমার দিকে ফিরিয়া ইংরেজিতে বলিলেন যে এই বিপদে আমরা তাঁহার বাগদত্তা পত্নীর প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহার জন্য তিনি আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ওই মেয়েটি ইহাঁর বাগদত্তা পত্নী!

মাখনবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল।

তিনি ও মাস্টার মহাশয় উভয়েই নত হইয়া এখন তাঁহাকে সেলাম করিলেন।

সাহেবেরা কার্য্য শেষ করিয়া আবার স্টেশনের দিকে ফিরিলেন। আমার আর স্টেশনে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মাখনবাবুকে বলিলাম— "আমি একটু বেড়িয়ে আসি। আপনারা যান—"

সকলে চলিয়া গেলে আমি ড্রাইভারের সেই মুসলমান সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ওই সবুজ ওড়না পরা মেয়েটি কাহার। মেয়েটি দেখিলাম একটু দূরে আবার প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটি বলিল যে মেয়েটি এই ড্রাইভারেরই মা-মরা মেয়ে। বাপ যখন যেখানে য় প্রায়ই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

সংবাদটা শুনিয়া কেমন যেন হইয়া গেলাম। অজ্ঞাতসারে ইহার কি সর্ব্বনাশটাই করিয়াছি। একবার ভাবিলাম সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিই। কিন্তু মাখনবাবুর কথা স্মরণ করিয়া তাহা পারিলাম না।

অন্যমনস্ক ভাবে মাঠের দিকে অগ্রসর হইলাম।

১২

কতক্ষণ হাঁটিয়াছিলাম খেয়াল ছিল না। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এক নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। জটিল শাখা-প্রশাখাময় বিরাট কি একটা গাছ দূরে দাঁড়াইয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র তাহার আড়ালে উঠিতেছে দেখিতে পাইলাম। কোথাও একটু বসিতে পাইলে যেন বাঁচিতাম।

পা দুইটা ব্যথা করিতেছিল।

ধীরে ধীরে গাছটার দিকেই অগ্রসর হইলাম। গাছের নিকটবর্ত্তী হইতেই তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে অন্ধকারকে চিরিয়া একটা শকুনি ডাকিয়া উঠিল। ডানার ঝট্‌পট্ শুনিয়া বুঝিলাম এই গাছেই বোধ হয় শকুনিদের বাসা আছে।

দূরে কোথায় একটা ফেউ ডাকিতে লাগিল। গাছটার ও-পাশে গিয়া দেখি একটা উঁচু মত ঢিবি রহিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্ব দিগন্তে চাহিয়া রহিলাম। চাঁদ উঠিতেছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। ফাঁকা মাঠে ঝির ঝির করিয়া সুন্দর বাতাস বহিতেছে।

একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। তবু কিন্তু ভালই লাগিতেছিল। চাঁদ আর একটু উঠিলে দেখিতে পাইলাম যে একটু দূরে একটা ছোট নদীও রহিয়াছে। ঢিপি হইতে নামিয়া সেই দিকেই গেলাম। শীর্ণস্রোতা নদীটির উপর ক্ষীণ জ্যোৎস্না পড়িয়া সেই নির্জ্জন প্রান্তরে এমন একটা শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

সেই নদীর ধারেই একটি ফাঁকা জায়গা বাছিয়া বসিলাম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাণ্ড উল্কাপাত হইয়া গেল। সমস্ত মাঠটা আলোকিত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিনের অবসাদে শরীর মন ক্লান্ত। মাঠের মাঝে হাওয়াটুকু বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

ভাবিলাম একটু বিশ্রাম করিয়া স্টেশনের দিকে যাওয়া যাইবে।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখি একটু দূরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। কাছেই কতকগুলি লোক বসিয়া আছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

লোকগুলির নিকটে গেলাম।

ইহারা মড়া পোড়াইতেছে! যাহা জ্বলিতেছে তাহা চিতা। আমি এতক্ষণ শ্মশানে শুইয়া ছিলাম!

রাত্রি কত হইয়াছে?

একজন বলিল—"বারটা হবে—"

বারটা?

স্টেশনের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলাম।

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি চারিদিক নিস্তব্ধ। মাখনবাবু বসিয়া টেলিগ্রাফ-যন্ত্রে টক্কা টরে করিতেছেন। সমস্ত যাত্রীদের লইয়া ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

একজনও নাই।

আমি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাহাদের লইয়া সমস্ত দিন এত উৎসাহে এত আগ্রহে এত সত্য-মিথ্যার জাল বুনিতেছিলাম তাহারা অতর্কিতে এমন করিয়া ফেলিয়া গেল! আর জীবনে দেখা হইবে না!

ধীরে ধীরে মাখনবাবুর কাছে গেলাম।

মাখনবাবু বলিলেন, "অনেকক্ষণ আপনি বেড়ালেন ত সার। আপনারও ট্রেন এল বলে। সিগন্যাল দিয়েছে। আপনার জন্যে রুটি করিয়ে রেখেছি। খাবেন কি? সময় কিন্তু নেই—"

"থাক দরকার নেই—"

"আচ্ছা—ওয়েট এ মিনিট্—আপনার সঙ্গে খাবারগুলো বেঁধে দিই না হয়—"

শশব্যস্ত হইয়া মাখানবাবু চলিয়া গেলেন। আমি একা নির্জ্জন প্ল্যাটফর্মে সিগ্‌ন্যালটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম···ওই ট্রেন আসিতেছে। একটু পরেই আমিও আর এখানে থাকিব না।

শেষ



সঙ্গীত

অমৃতময়ী সাবিত্রী

মিশ্র রাগ

মৃত্যু-আহত দয়িতের তব শোন করুণ মিনতি
অমৃতময়ী মৃত্যুঞ্জয়ী হে সাবিত্রী সতী।
ঘন অরণ্যে বাজে মোর স্বর
মোরই রোদনের উঠিয়াছে ঝড়
সাঁঝের চিতায় ঐ নিভে যায় মম নয়নের জ্যোতি
হে সাবিত্রী সতী।
যুগে যুগে তুমি বাঁচায়েছ মোরে মৃত্যুর হাত হ'তে
দেবী সাবিত্রী সতী
মোরই হাত ধরে রাজপুরী ছেড়ে চলেছ বনের পথে
বিধুরা অশ্রুমতী
জীবনের তৃষা মেটেনি আমার
তুমি এসে মোরে বাঁচাও আবার
মৃত্যু তোমারে করিবে প্রণাম ধরার অরুন্ধতী
হে সাবিত্রী সতী॥

কথা—কাজী নজরুল ইসলাম | সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

+		২		+		২	
II { মধা -পধা র্সণা		ণা ণা ণধপা	I	পধা পধা পগা			-পধা মা গরগা	I
মৃ -- ত্যু		আ হ ত-		দ- য়ি তে			-র্ ত ব-	

মা -া মা | -া -া -া ‖I (মসা রা মা | মপা পধাঃ -ণপঃ I পধণা -পধা -র্র্সা |
শো - ন   - - -   ক রু ণ   মি ন - -   তি- - - - - -

সণা -া -ধপা) } I { গমা -পণা পা | গমা মা মা I জ্ঞা -সা গা | -মা মা মা } I
- - - -   অ - - - মৃ   ত ম য়ী   মৃ - ত্যু   ন্ জ য়ী

পণা -পা পা | না -র্সা র্সা I র্সা -নর্সা -র্রসা | র্সণা -া ণা | পধা-ধর্সা -া |
হে - সা বি - ত্রী স - - - - তী - হে সা বি -

ধা -দধা ধর্সা I ধা -া মা | -া -া -া II
ত্রী - - স তী - - - - -

II মা মা মা | মর্সা -া র্সা I র্সা র্সা র্সা | -র্গর্রা র্সা -া I র্সনা না না |
ঘ ন অ র - ণ্যে বা জে মো - র স্ব র্ মো রি রো

না র্সা -নর্সা I র্সধা র্সা র্সর্রা | র্সণা ণা -া I -ধর্সা ণা- -ধা | -া -া -া I
দ নে - র্ উ ঠি য়া ছে ঝ - - - - - - - ড়্ -

ধা ধা -স্মা | স্মা মা -া I গা মা গরা | গা মা -ধা I ধনা ধনা -ধা |
সাঁ ঝে র্ চি তা য়্ ও ই নি - ভে যা য়্ সাঁ - ঝে - র্

স্মা মা -া I গা মা গরা | গা মা -ধা I ধা ধা না | র্রা র্সনা র্রা I
চি তা য়্ ও ই নি - ভে যা য়্ ম ম ন য় নে র

র্রর্রা -নর্রা -র্গর্মর্গা | র্রর্সা -া র্সা I র্সা র্সর্মা -র্রা | র্রা -র্সা র্সা I
জ্যো - - - - - তি - - হে সা বি - ত্রী - স

নর্সা -র্রর্সা -া | -ণা -া ণা I পধা ধর্সা -া | ধা -দধা ধর্সা I ধা -া -মা |
তী - - - - - - - হে সা বি - ত্রী - - স তী - -

-া -া -া I গা গা গা | গা গা সা I সা গা রগা | গপা মা মা I
- - - যু গে যু গে তু মি বাঁ চা য়ে ছ মো রে

মা -গপা পা | পা মগা -রগা I মধা পধা -া | -া -া -া I ধা -া -া | মা -া মা I
মৃ - - ত্যু র হা - - ত্ হো - তে - - - - দে - - বী - সা

ধা -া -না | না -ধা না I র্সা -া -া | -া -া -া I না -া -া | পা -া পা I
বি - - ত্রী - স তী - - - - - দে - - বী - সা ·

না -া -ধনা | নর্রা -া র্গর্রা I র্সা -া -া | -া -ণা -া I ণা ণা ণা | -া ণা ধপা I
বি - -- ত্রী - স তী - - - - - মো রি হা ত্ ধ রে-

পা -ধা ণধা | ধপা মা গা I গসা গা মা | পা পধা পধা I পধা মা -া | -া -া -া I
রা জ্ পু- রী- ছে ড়ে চ লে ছ ব নে র প - থে - - - -

মরা মা পা | পা -দা পদণা I দা পা -া | -া -া -া I মা মা মমা |
বি ধু রা অ - শ্রু - - ম তী - - - - জী ব নে-

ধণর্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্গর্রা | র্রা র্সা -া I না না না | না না র্সা I
- - ম্ তৃ ষা মে টে নি- আ মা র্ তু মি এ সে মো রে

ধর্সা ধা -র্সা | -া -া -া I ধর্সা ধা -র্সা | ণা ণধা -র্সণা I -ধপা -ধা -া | -া -া -া I
বাঁ চা - - - ও বাঁ চা ও আ বা - - - - - - - - র্ -

ধা -া ধা | ধজ্ঞা জ্ঞা মা I গা মগা গরা | গমা মা -ধা I ধা -নধা নধা |
মৃ - ত্যু তো মা রে ক রি - বে - প্র - ণা ম্ মৃ - - ত্যু-

ধজ্ঞা জ্ঞা মা I গা মগা গরা | গমা মা -ধা I ধা ধা ধা | নর্রা নর্রা -া I
তো- মা রে ক রি - বে - প্র - ণা ম্ ধ রা র অ - রু ণ্

র্র্রা -নর্রা -র্গর্মর্গা | র্র্সা -া র্সা I র্সা র্সর্মা -র্রা | র্রা -র্সা র্সা I
ধ - -- --- তী - - হে সা বি - ত্রী - স

নর্সা -র্র্সা -া | -ণা -া ণা I পধা ধর্সা -া | ধা-দধা ধর্সা I ধা -া -মা |
তী - - - - - - - হে সা বি - ত্রী - - স তী - - -

-া -া -া II II
- - -

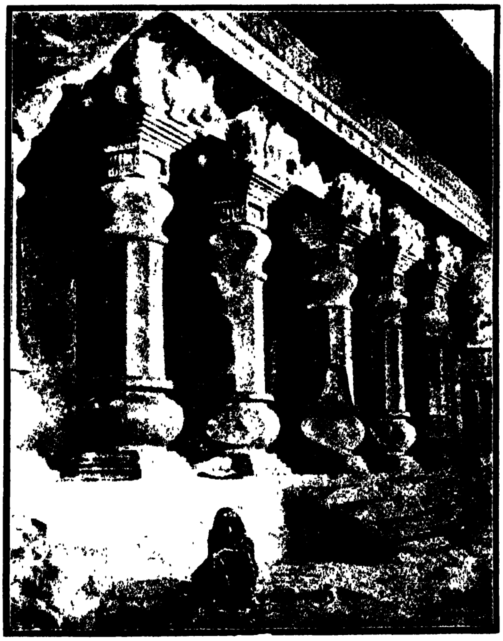
এ গানটি শ্রীযুত সত্যবান মহাশয় হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্ রেকর্ডে গাহিয়াছেন।



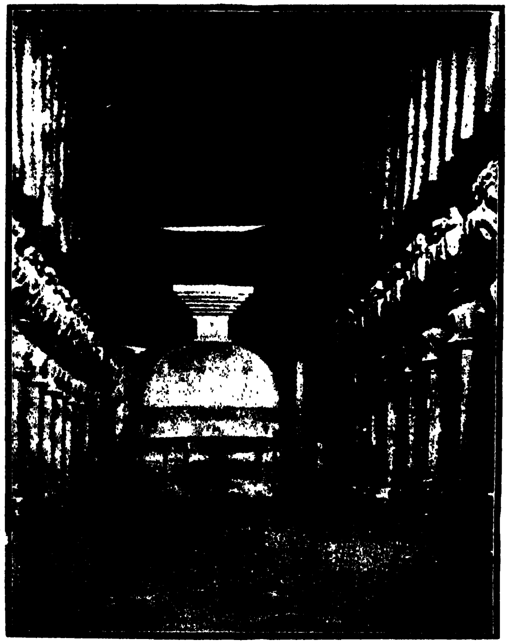
বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রদেশ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি

জুন মাসের প্রারম্ভে আমরা বোম্বাই সহর ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের কেন্দ্রস্থান পুনা সহর দেখিতে গিয়াছিলাম। হিন্দুদিগের পবিত্র স্থান নাসিক দেশটীও দেখিলাম। বোম্বাই সহরটী অত্যন্ত সুন্দর এবং সুবৃহৎ; রাস্তাঘাট পরিষ্কার এবং বহু জনাকীর্ণ! এই সুবৃহৎ নগরে বহু শ্রেণীর লোক বাস করে এবং অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা ব্যবসা। পার্শী, মহারাষ্ট্রী, কচ্ছী ও গুজ্‌রাটীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমুদ্রতীরে সহরটী অবস্থিত বলিয়া ইহার সৌন্দর্য্য অধিক। সমুদ্রতীরে প্রস্তর এবং মধ্যে মধ্যে বালি দেখিতে পাওয়া যায়। চৌপাটী নামক স্থানে সমুদ্রতট বালুকাময়। এখানে ধীবরেরা সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করে। বোম্বাই সহরের সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম স্থান "মালাবার পর্ব্বত" এবং "কাম্বালা পর্ব্বত"। কাথিয়ারের অন্তর্গত লিম্‌ডি রাজ্যের যুবরাজের মালাবারস্থিত প্রাসাদে আমরা কিছুদিনের জন্য বাস করিয়াছিলাম। মালাবার পর্ব্বতে বোম্বাই সহরের শ্রেষ্ঠ ধনীরা বাস করে এবং হায়দ্রাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের প্রাসাদ এই পর্ব্বতে অবস্থিত। মালাবার পর্ব্বতে সর্ব্বসাধারণের জন্য "Hanging Garden" (দোদুল্যমান উদ্যান) নামে একটী সুন্দর বাগান আছে। এই বাগানটী পর্ব্বতের উচ্চ স্থানে এবং সমুদ্রতীরে অবস্থিত! এখান হইতে বোম্বাই সহরের দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। এই বাগানটী প্রায় ২০।২৫ বিঘা জমি লইয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং ইহা সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ ও পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। এই বাগানের নিকটে পর্ব্বতের নিম্নভাগে পার্শীদিগের শবদেহ নিক্ষেপ করিবার



নাসিক গুহার একটি দৃশ্য



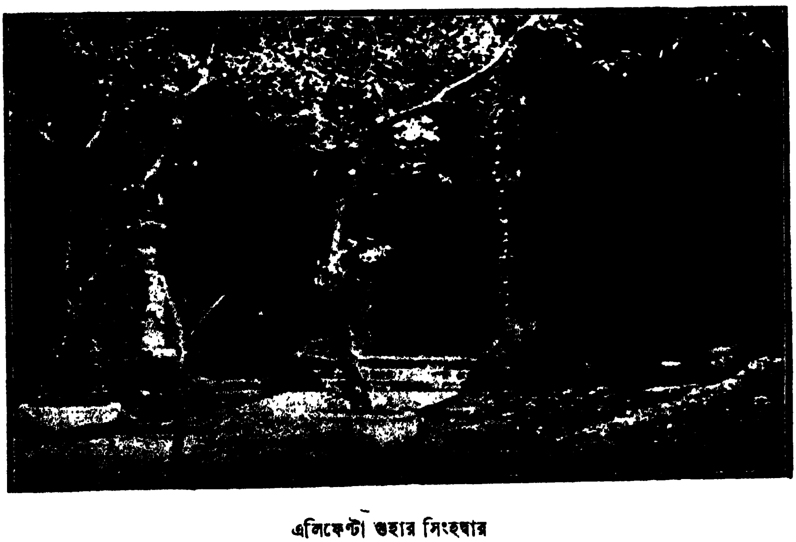
কার্লি গুহায় বৌদ্ধ চৈত্য

জন্য বাগানের মধ্যে একটী সুবৃহৎ কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম "Tower of Silence"। পার্শী-দিগের এই শ্মশানটী ৮ হাজার বর্গ গজ জমির উপর



মালাবার পর্ব্বতে দোদুল্যমান উদ্যান
(Hanging Garden)

অবস্থিত। পার্শীরা মৃতদেহ সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে এবং শকুনিগণের খাদ্যস্বরূপ অর্পণ করে। তাহারা শব দাহ করে না কিংবা কবরস্থ করে না। অনুমতি বিনা



এলিফেণ্টা গুহার সিংহদ্বার

এই স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মালাবার পাহাড়ে বোম্বাইপ্রদেশের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরের বাসস্থান আছে।

কাম্বালা পর্ব্বতেও অনেক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং বহু ধনীর বাস আছে। বোম্বাই সহরে একটী যাদুঘর আছে; ইহা "Prince of Wales museum" নামে পরিচিত। এই যাদুঘরটী সহরের একটী সুবিস্তৃত বাগানের মধ্যে একটী সুন্দর অট্টালিকায় রাখা হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন "ওয়েল্‌স"এর যুবরাজ হইয়া ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তিনি এই যাদুঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বনামধন্য রতন টাটা এবং মাননীয় আকবর হায়দারী বহুমূল্য সামগ্রী এই যাদুঘরে দান করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বহু পুরাতন প্রস্তর মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে। এখানে সুরক্ষিত অবস্থায় মৃত জীব-জন্তুও আছে। যাদুঘরের উদ্যানে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই সহরের চিড়িয়া-খানায় অনেক জীবজন্তু যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে। এই পশুশালায় আমাদের কোনো একটী বন্ধু ছোট ছোট দুইটী ব্যাঘ্রের ছানা কোলে তুলিয়া লইতে গিয়া নিজের পরিধানের বস্ত্র নষ্ট করিয়াছিলেন।

Hornby Road সহরের মধ্যে একটী প্রধান রাস্তা। এই রাস্তার দুই ধারে ব্যাঙ্ক এবং বড় বড় দোকান আছে। এ্যাপোলো ষ্ট্রীটে বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজার দেখিলাম। ইহা কলিকাতার শেয়ার বাজার হইতে বড় এবং সেখানে প্রত্যহ বহু পরিমাণে কাজ হইয়া থাকে।

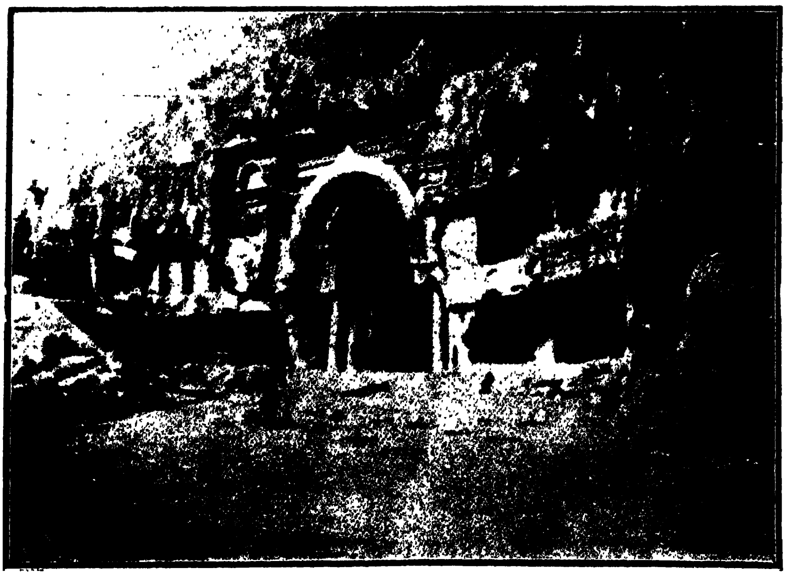
বোম্বাই সহরে "এ্যাপোলো বন্দর" নামে একটী সুবিখ্যাত বন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের গবর্ণর বাহাদুর লর্ড সিডন্‌হ্যাম "ভারতের গেট" নামে একটী সুবৃহৎ এবং সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত তোরণ দ্বারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই দ্বার মহামান্য বড়লাট বাহাদুর আর্ল-অফ্-রেডিং উদ্‌ঘাটন করেন। ভারতের এই দ্বারটী খুব উচ্চ এবং বহু দূর হইতে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী এবং বহু গণ্য

মান্য ব্যক্তি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই দ্বারে পদার্পণ করেন। এ্যাপোলো বন্দরের সম্মুখে ভারতের সুবিখ্যাত "তাজমহল" হোটেল অবস্থিত। হোটেলটীতে অনেকগুলি ঘর আছে এবং বহু দেশ-বিদেশ হইতে ধনিগণ আসিয়া কিছুদিনের জন্য বাস করেন। এই হোটেলটী আমরা পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছি। এই প্রকার হোটেল কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ভারতের অন্য কোথাও আছে কিনা, আমার জানা নাই।



এলিফেণ্টা গুহায় বৌদ্ধচৈত্য

ইহা ব্যতীত আমরা বোম্বাই সহরের "ডক্" দেখিলাম। ইহা কলিকাতার খিদিরপুরের "ডক্" হইতে বড়। ডকের মধ্যে মাল রাখিবার জন্য সুবিশাল ঘর আছে। Ballard Pier নামক স্থানটী খুব মনোহর। এখানে Blue Train আসিয়া পৌছে এবং যাত্রীরা জাহাজ নিকটেই পায়। বোম্বাই সহরের বড় স্টেশন "ভিক্টোরিয়া টার্‌মিনাস্" (Victoria Terminus) নামে পরিচিত। ইহা আমাদের হাওড়া স্টেশনঅপেক্ষা বড়। ইহা ব্যতীত সহরে High Court, University, Race Course, Municipal Building, Elphinstone College, St. Xavier's College, St Andrew's church প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। Hornby Roadএ একটী সুন্দর বাগানের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পার্শী দাতা Sir Jamsetji Jijibhoy এর অর্থানুকূল্যে বোম্বাই সহরের সুবিখ্যাত ভাস্কর্য্যের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। Sir Jamsetji Jijibhoy এই স্কুল স্থাপনের জন্য ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।



ভাজা গুহা

আমোদ প্রমোদের জন্য অনেক সিনেমা এবং থিয়েটার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—Capital, Regal, Alexandra, Empire, Globe, Lamington Talkies, Plaza Talkies, Central Cinema, Minerva Talkies, Laxmi Talkies, Alfred Cinema, Imperial Talkies, Kohinoor Talkies, Victoria Theatre ইত্যাদি। বোম্বাই সহরে কতকগুলি ব্যাণ্ড বাজাইবার স্থান আছে। আমরা যেখানে ছিলাম তাহার সন্নিকটে Sir Phirojsha Mehtaর বাগানে ব্যাণ্ড বাজাইবার স্থান আছে। ইহা ব্যতীত Bycullaর Victoria Gardenএ, দাদরের Parsee Colonyতে, Joseph Baptista বাগানে এবং চৌপট্টির সমুদ্রতটে ব্যাণ্ডবাজাইবার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।



নাসিকে গোদাবরী

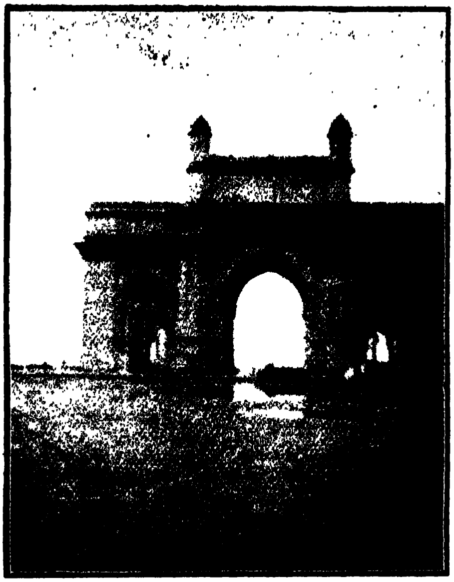
বোম্বাই সহরের আকারটী অশ্বের ক্ষুরের ন্যায় বলিয়া মনে হয়। আর একটী নূতন জিনিস দেখিলাম যে সহরের মধ্য দিয়া electric train (B. B. C. I) চলিতেছে। এই ট্রেন হইতে কোনরূপ ধোঁয়া সহরের স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে না। কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইবার পথে ইগাত্‌পুরি স্টেশন হইতে সকল ট্রেন ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল ট্রেণ কতকগুলি



কানহেরী গুহা

সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া ধাবিত হয় এবং যাত্রীরা ধোঁয়ার কষ্ট অনুভব করে না।

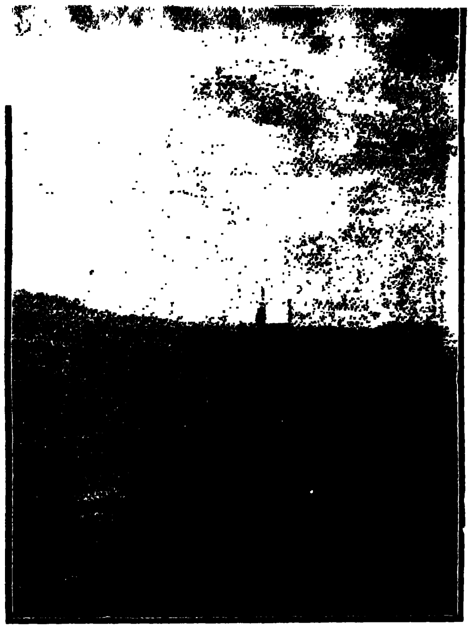
কলিকাতা সহর অপেক্ষা বোম্বাই সহর পরিষ্কার বলিয়া মনে হয়। রাস্তা-ঘাটে আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় না। বোম্বাইয়ের জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর নহে। সেদেশের লোকরা পরোপকারী এবং অমায়িক। ধনী হইলেও তাহারা সামান্তভাবে দিনযাপন করে। এই সহরে একটী সুন্দর লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে। এখানে লক্ষ্মীর পূজা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বোম্বাই সহরের জাগ্রত দেবী মুম্বাদেবী নামে সুবিখ্যাত। এই সহরে অনেকগুলি



ভারতের প্রবেশ দ্বার (Gate of India)

বাজার আছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাজারের নাম Crawford Market। বোম্বাই সহরে Mint এবং Light House আছে। বোম্বাই সহরে Lamington Road স্থিত যমুনাবাই নায়ারের দাতব্য চিকিৎসালয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই হাসপাতালটী বড় এবং এখানে বহুসংখ্যক রোগী চিকিৎসিত হয়। এখানে সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা হইয়া থাকে এবং ইহার মধ্যে Medical School আছে। ছাত্রছাত্রীগণ এখানে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করে। এই হাসপাতালের মধ্যে

"আনন্দ-বিহার" নামে একটী সুনির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অট্টালিকার উপরকার ঘরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে। অট্টালিকার নিম্নতলে একটী Lecture Hall আছে। এই বিহার বুদ্ধ-সোসাইটীর দ্বারা পরিচালিত। সুপ্রসিদ্ধ নায়ার বোম্বাইয়ের একজন ধনী এবং এই সকলে তাঁহার কীর্ত্তি বিরাজিত। আমার বিশিষ্ট বন্ধু বোম্বাই সহরের একজন সুপরিচিত ধনী Dr. Venkat Rao J. P.র তত্ত্বাবধানে এই বিখ্যাত চিকিৎসালয়, মেডিকেল স্কুল এবং বুদ্ধ-সোসাইটী সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে।



বোম্বাই সমুদ্রের অপর একটি দৃশ্য

এইবার আমরা বোম্বাই সহরের মফঃস্বলের কথা কিছু বলিব। বোম্বাই সহরের দক্ষিণ দিকে "কোলাবা" নামে একটী স্থান আছে। ঐ স্থানে কোলীরা সর্ব্বপ্রথম বাস করিত এবং তাহাদের নাম হইতে 'কোলাবা' নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে এখন গোরাদের বাসস্থান আছে। স্থানটী খুব পরিষ্কার এবং শান্তিপূর্ণ। মধ্য কোলাবার ডক্ হইতে Elephanta দেখিবার জন্য ষ্টীমার ছাড়ে। বর্ষার সময়ে সমুদ্র অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে এবং এ সময়ে "এলিফ্যান্টা" দেখিতে যাইবার সময় নহে। শীতকালে

ইহা দেখিবার ঠিক সময়। বোম্বাই হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। "এলিফ্যান্টা" গুহার দক্ষিণ দিকে একটী সুবৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত হস্তীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় পোর্টুগীজেরা ইহার এই নামকরণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গহ্বর আছে এবং ত্রিমূর্ত্তি (ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু) দেখিতে পাওয়া যায়। হরপার্ব্বতী মূর্ত্তিও আছে। কালভৈরব, কৈলাস পর্ব্বত এবং কৈলাস পর্ব্বতের নিম্নে রাবণের মূর্ত্তিও বিদ্যমান আছে। 'এলিফ্যান্টার' গহ্বরে লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। ধর্ম্মরাজ, শিব এবং তাণ্ডব-নৃত্য এখানকার ভাস্কর্য্যে পরিলক্ষিত হয়।

বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে সমুদ্র সৈকতে "জুহু" নামক একটী মনোরম স্থান আছে। জুহুতে



এপলো বন্দরে বসিবার স্থান

সমুদ্রতীর বালুকাময় এবং অনেকটা পুরীর সমুদ্রতীরের মত। বোম্বাই সহরের লোকেরা এই স্থানে প্রত্যহ স্নান করে। এখানে অনেক নারিকেল গাছ আছে। এখান হইতে উড়ো জাহাজ উঠে। এখানকার "Flying Club"টী উল্লেখযোগ্য। জুহু যাইতে হইলে "খর" নামক একটী মফঃস্বল সহরের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। "খরে" বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাস এবং এখানকার অট্টালিকাগুলি নূতন এবং সুনির্ম্মিত। এখানকার রাস্তা-ঘাট পীচ দিয়া বাঁধান এবং ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বোধ হয়।

বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে নূতন "ওর্‌লি" নামে আর একটী মনোরম স্থান আছে। এই স্থানটী সমুদ্রতটে অবস্থিত। এখানে Improvement Trust অনেকগুলি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং করিতেছে। এই স্থানটী বোম্বাই সহরের একটী উচ্চ স্থান। খুব শীঘ্রই এই স্থানটী জনবহুল হইবে বলিয়া মনে হয়; এখান হইতে ভালভাবে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই সহর হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে "থানা" নামে একটী পুরাতন স্থান আছে। থানা এবং বেহারের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ "কান্‌হেরি" গুহা অবস্থিত। গুহার নিকটস্থ রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। এই গুহায় যাইতে হইলে আর



বোম্বাই অট্টালিকার নমুনা

একটী পথ আছে। B. B. C. I. Railwayর "বোরিভলি" ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে এই গুহাগুলি অবস্থিত। বৌদ্ধ যুগে এই গুহাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই গুহায় অনেকগুলি ঘর আছে। এই ঘরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করিত। এই গুহার মধ্যে একটী চৈত্য আছে; ইহা প্রায় ২৩ ফুট দীর্ঘ। এখানে "দরবার" নামে গহ্বরটী সুপ্রসিদ্ধ। এই গহ্বরে দুইটী প্রস্তরনির্ম্মিত সুদীর্ঘ বসিবার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে এখান হইতে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত করিয়া পোর্টুগীজেরা এই গহ্বরগুলির দখল

লইয়াছিল। "সাল্‌সেট্" দ্বীপের পশ্চিমাংশে আরও কতকগুলি ছোট ছোট গুহা আছে, যথা—যোগেশ্বরী, মহাকালী ইত্যাদি।

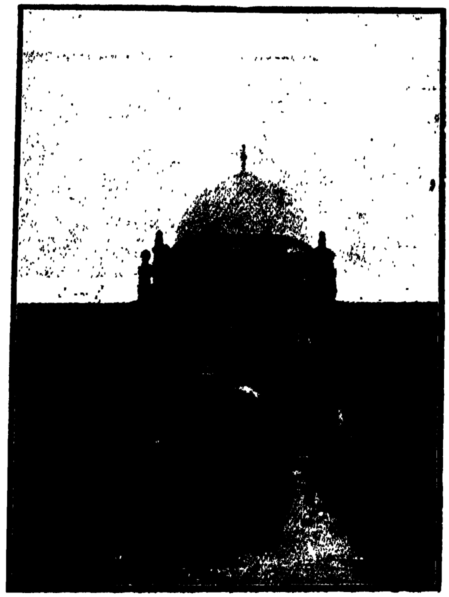
B. B. C. I.এর "আন্ধেরি" ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে "জারশোভা" নামক আর একটী রমণীয় স্থান আছে। ইহা সমুদ্র স্নানের আর একটী স্থান। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং সমুদ্রের দৃশ্য মনোহর। বোম্বাই সহরের বহু স্বনামধন্য লোক এই স্থানে আসিয়া বাস করে। বোম্বাই সহরে বাস করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব'লয়া অনেকে মফঃস্বল



তাজমহল হোটেল

সহরে বাস করে। বোম্বাই সহরের সন্নিকটে দাদর, বাইকুল্লা, মাজগাঁও প্রভৃতি মফঃস্বল সহর উল্লেখযোগ্য। এখানকার লোকসংখ্যাও কম নহে। মধ্যবিত্ত ও গরীব লোকেরা এই সকল স্থানে বাস করে। সহরের সকল সুবিধা এখানে বিদ্যমান। এই সকল স্থান হইতে বোম্বাই সহরে যাইবার জন্য প্রত্যহ ইলেকট্রিক ট্রেন অনেকবার করিয়া চলাচল করে। বোম্বাই সহর হইতে ৩৭ মাইল দূরে "সোপারা" নামে একটী ছোট নগর আছে। বহুপূর্ব্বে ইহা একটী বন্দর ছিল এবং ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এখানে এক সময়ে বৌদ্ধদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

আমরা বোম্বাই হইতে সকাল ৮টার ট্রেনে পুনার উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম এবং ১১টার সময় পুনা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পুনা সহরে মহারাষ্ট্র নেতা শিবাজীর বাসস্থান ছিল। পুনা সহর "ডেকানের রাণী" নামে বিখ্যাত। বোম্বাই হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমগ্র পথ ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেনে যাইতে হয়। ২০০০ ফুট উচ্চে পুনা সহর অবস্থিত এবং পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এ স্থানে বাঙ্গালীর বাস আছে এবং অধিকাংশ লোক মহারাষ্ট্রী। পুনার স্বাস্থ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সকল দেশের স্বাস্থ্য অপেক্ষা ভাল। বাঙ্গালা



প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স যাদুঘর

দেশের নবদ্বীপ কিংবা ভাটপাড়ার ন্যায় ইহা একটী সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রস্থান। বহু সংস্কৃতবিদ্ মারাঠী পণ্ডিত এখানে বাস করেন। সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের স্মৃতি-রক্ষার জন্য একটী সুবিখ্যাত Oriental Research Institute স্থাপিত হইয়াছে। সুখ আন্‌কর, গোডি, বাপথ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখানে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ আলোচনায় নিরত। উচ্চ শিক্ষার জন্য Deccan এবং Ferguson College নামে দুইটী সুপ্রসিদ্ধ কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে একটী পার্ব্বতীর মন্দির আছে। রাস্তা ঘাট প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। "গণেশখিণ্ড" নামক স্থানে

বোম্বাইয়ের মাননীয় গবর্ণর বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস আছে। গণেশখিণ্ডের সন্নিকটে বাংলাগুলি বড় বড় উদ্যান দ্বারা সুশোভিত এবং দূরে দূরে অবস্থিত। পুনার Race Course সুবিখ্যাত। এখানে Cantonment আছে। উড়ো জাহাজ উঠিবার ও নামিবার মাঠ আছে। সহরে বহু দোকান দেখিতে পাওয়া যায় এবং মোটর, বাস প্রভৃতি সকল প্রকার যান পাওয়া যায়। পুনা সহরের মধ্য দিয়া "মুড়া মুথা" নামে দুইটী নদী প্রবাহিত। ইহাদের সঙ্গম স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পুণা সহরের সন্নিকটে "কিরকি" এবং "ভাম্বুর্দা" নামে দুইটী স্থান আছে। ইহারা পুনার



বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে সার জাহাঙ্গীর পেটিট হল

অন্তর্গত। বোম্বাই হইতে পুনা যাইবার রেলপথটী অতি মনোরম। বহু সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া রেলপথ তৈয়ারী করা হইয়াছে। পুনা হইতে মহাবালেশ্বর নামে একটী স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য দেশে মোটর যোগে যাওয়া যায়। মহাবালেশ্বর বোম্বাই হইতে ২৪ ঘণ্টার পথ এবং ইহা ৬০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। মহাবালেশ্বরের দৃশ্য মনোরম এবং স্বাস্থ্য ভাল। এখানেও বোম্বাইয়ের মহামান্য গবর্ণর বাহাদুরের বাসস্থান আছে। বোম্বাই হইতে পুনা যাইবার পথে আমরা "নেড়াল" ষ্টেশন দেখিয়াছি। এই নেড়াল ষ্টেশন হইতে "ম্যাথিরান্" নামে আর একটী সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য প্রদেশে যাওয়া যায়। এই দেশটী বোম্বাই হইতে প্রায় ৫৫ মাইল দূরে এবং ইহা শান্তিপূর্ণ ও বনশোভায় সুশোভিত। এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। কার্লি ও ভাজা নামে দুইটী গুহা বোম্বাই হইতে পুনা যাইবার পথে অবস্থিত। লোনাভেলা ষ্টেশনে নামিয়া এই বৌদ্ধ গুহাগুলিতে যাইতে হয়।

বোম্বাই সহরে বাসকালে আমরা একদিন খুব প্রত্যুষে G. I. P.র এলাহাবাদ এক্সপ্রেসে নাসিক যাত্রা করিয়াছিলাম। সকাল ১০টার মধ্যে নাসিক রোড ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশন হইতে একটা বড় বাস লইয়া নাসিক সহরে উপস্থিত হইলাম। নাসিক রোড হইতে নাসিক সহর প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই সহরটী হিন্দুদিগের একটী পুণ্যতীর্থ এবং পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদীর তীরে স্থিত। এখানে আমরা রামসীতার মন্দির দেখিলাম এবং পঞ্চবটীও দেখিলাম। এখান হইতে আমরা প্রায় ৮ মাইল দূরে তপোবন দেখিতে গিয়াছিলাম। এই তপোবনে লক্ষ্মীদেবীর এবং রামসীতার মন্দির আছে। এইখানে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিলেন। পাণ্ডাগণ, মনে হইল, সুরাটবাসী। এখানে ঠাকুরকে রুটী এবং ডাল ভোগ দেওয়া হয়। এই তপোবনে পৌঁছিতে হইলে অনেকটা পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। কোনরূপ যান যাইবার উপায় নাই। এই মন্দিরগুলি গোদাবরীর তীরে স্থিত। হিন্দুদিগের পুণ্য নদী স্বচ্ছসলিলা গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা "ত্র্যম্বকেশ্বর" নামে পরিচিত। এই স্থানটী গভীর অরণ্যমধ্যে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত আমরা নাসিকের বাজার, রাস্তা ঘাট প্রভৃতি দেখিলাম। নাসিকে বৌদ্ধদিগের কতকগুলি গুহা আছে। পুরী জেলার অন্তর্গত উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহা অপেক্ষা নাসিকের গুহা অনেক বড়। নাসিক স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বহু লোক ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে আসিয়া বাস করে। নাসিক রোড ষ্টেশনের সন্নিকটে কতকগুলি ছোট ছোট কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই সকল কুটীর স্বাস্থ্যনিবাস (Sanitarium) নামে খ্যাত।

জুতো

শ্রীরামকৃষ্ণ মজুমদার

জুতো জোড়া কিনে বাড়ী ফেরবার পথে পাঁচুর প্রথম মনে উদয় হয়েছিল কাজটা দুঃসাহসিকতায় পূর্ণ, তার করা উচিত হয় নি ; কিন্তু এতটা যে অশান্তির সৃষ্টি হবে তা' ধারণাতীত। বাড়ীতে ঢুকতেই প্রথমে দেখা হল মামাবাবুর সঙ্গে। রোয়াকে বসে বসে তিনি তামাক খাচ্ছিলেন, পাঁচুকে দেখেই বলে উঠলেন হাঁরে পাঁচু, আসতে এত দেরী হল ? মাইনে পেয়েছিস ত ?"

"আজ্ঞে হাঁ—"

"বগলে আবার ওটা কি নিয়ে এলি ?"

"আজ্ঞে একজোড়া জুতো—"

"ওঃ মাইনের টাকা হাতে পেয়েই বুঝি কিনে আনা হল, একটু সবুর আর করতে পারলে না। দে, টাকা কটা দে—"

কোঁচার বিচ্ছিন্ন খুঁট কয়েকটা খুলে জুতো কেনা বাদ মাইনের সব কয়টা টাকাই সে মামাবাবুর হাতে তুলে দিল।

একবার গুণেই মামাবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বললেন "এ যে আট টাকা চার আনা রয়েছে রে, জুতো কত দিয়ে কিনেছিস ?"

"তিন টাকা বার আনা—"

দো-দমার মধ্যের বারুদে আগুন এসে পৌছলে যেমন সেটা একটা শব্দ করে লাফিয়ে ওঠে তেমনিভাবে লাফিয়ে উঠে মামাবাবু চিৎকার করে বললেন "ওরে আমার নবাব পুত্তুর, তুমি তিনটাকা বার আনার জুতো পরবে ? তিন টাকা বার আনার ? দেশে হেট হেট করে যে গরু চরাতিস রে, ছমাস কলকাতায় এসেই এত বাবুগিরী ? যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে, পৌনে চার টাকার জুতো পরে বাবু সাজবার জায়গা আমার বাড়ীতে নেই। যা বেরিয়ে যা—"

পাঁচু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। গোলমাল শুনে রান্নাঘর থেকে মামীমা বেরিয়ে এলেন, অবুও এল পাশের ঘর থেকে।

"অত চেঁচাচ্ছ কেন গো, হলো কি…"

"হবে আর কি, তোমার গুণধর ভাগ্নের আস্পদ্দাটা শুধু একবার দেখ। তুই চলি চাষার ছেলে, দেশে ট্যানা পরে ত গরু চরাতিস, তোর এত বাবুগিরী কেন শুনি ? তা জুতো পরবার যদি এতই সখ হয়ে থাকে, দুদিন সবুরই কর না, হপ্তার দিন দেখে শুনে না হয় একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতোই কিনে দিতাম। তা নয়, মাইনে পেয়েই উনি অমনি বুক ফুলিয়ে জুতো কিনে আনলেন। আজকাল একটা পয়সা ঠকাতে পারলে কেউ ছাড়ে না, তুই চোদ্দ পনের বছরের একটা অজ পাড়াগেঁয়ে ছেলে, কি বলে নিজে জুতো কিনতে গেলি ? তাও এক আধ টাকা নয়, তিন টাকা বার আনা ! বলি তোর বাবা কখন জুতো পরেছিল ?"

পাঁচু মামীমার মুখের পানে একবার আড়চোখে তাকিয়েই যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তখনই বলেছিলাম—ছোঁড়াকে এখানে এনে ঝঞ্ঝাট আর বাড়াব না, দেশে যেমন গরু চরিয়ে নিজের পেটটা চালাচ্ছিল, তেমনি ভাবেই থাকুক তো। তুমি ত তা শুনলে না, বললে—আহা ছোঁড়াটার আমরা ছাড়া আর কেউ নেই, না দেখলে পাপ হবে। এখন এ পাপ সামলায় কে বলত ? ছ মাস বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ালাম, এখন এক ফোঁটা একটু কাজ হতে না হতেই নিজ মূর্ত্তি ধরেছে। এ মাসে দেখছ তিন টাকা বার আনায় জুতো কিনে এনেছে, আসছে মাসে দেখবে ছ টাকা বার আনায় সিল্কের পাঞ্জাবী শান্তিপুরী ধুতি কিনে আনছে, তার পরের মাসে শুনবে একপেট মদ খেয়ে বাড়ী ঢুকছে—"

"এতটুকু ছেলে কি যা তা বলছ, ও তোমার ভাগ্নে না ?"

"হাঁ, হাঁ, ভারী ত ভাগ্নে, খুড়তুত বোনের সতীন পো—ও রকম ভাগনে রাস্তাঘাটে কত মেলা দিয়ে বসে আছে, দেখগে যাও। তোমার আদরে আদরেই ত ছেলেটার 'আস্পদ্দা' এত বেড়ে গেছে। নইলে পাড়ার লোকের কার ঘাড়ে দুটো মাথা হয় যে আমার মুখের ওপর একটা কথা বলে ? সকলের দরদ একেবারে উথলে ওঠে ছোঁড়াটার জন্যে। এ বলছে—ঐটুকু ছেলে অত বড় বাঁকে করে রাস্তার কল থেকে জল টানতে পারে নিবারণ ; ও বলছে—ঐটুকু ছেলে কি তোমার দু-বিঘে বাগান কোপাতে পারে নিবারণ ; সে বলছে—মা বাপ-মরা ভাগ্নেটাকে দিয়ে গঙ্গার চড়া থেকে এই এতটা রাস্তা ঐ বিচুলির বোঝা মাথায় চাপিয়ে আনা কি ঠিক হচ্ছে নিবারণ । কিন্তু যখন এই ছমাস ধরে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ালাম, মরণাপন্ন অসুখে বার চোদ্দ টাকা খরচ করে 'চিকিচ্ছে' করালাম, সাত টাকা ঘুস দিয়ে কাগজ কলে কাজ করে দিলাম—তখন ত কোন ব্যাটা বেটী একবার দেখতেও আসে না। পাড়ার লোকে যে যাই বলুক, আমার সাফ কথা, হয় ও জুতো ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে আসুক, নয় ঐ জুতো নিয়ে আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাক, থাকতে হবে না।"

জুতোর বাক্স বগলে পাঁচু যেমন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। মামীমা একটু আগিয়ে এসে বললেন "হাঁরে পাঁচু, দিন দিন তুই কি হচ্ছিস বলত ? প্রথম মাইনে পেয়ে কোথায় সব টাকা এনে মামার হাতে তুলে দিয়ে নমস্কার করবি, না নিজের খেয়ালমত উড়িয়ে দিয়ে বাড়ী ঢুকলি। দিন দিন বুদ্ধি বাড়ছে না কমছে ?"

পাঁচু অপরাধীর দৃষ্টিতে একবার মামীমার মুখের পানে তাকিয়ে নিঃশব্দে নিজের দোষ স্বীকার করে নিল। আরো খানিকটা বকুনির

পর মামীমা বললেন "যাক্—যা হবার হয়ে গেছে, আর কখন যেন এমন কাজ করিস নে পাঁচু। যা এগিয়ে গিয়ে তোর মামার পা ছুঁয়ে বলগে যা—আর কখন এমন কাজ করব না, এবার থেকে মাইনের সব টাকা আপনার হাতে এনে দেব।"

জুতোর বাক্সটা উঠানের উপর নামিয়ে রেখে মামীমার নির্দ্দেশ মত মামাবাবুর পায়ে ধরবার জন্যে পাঁচু রোয়াকে এসে উঠল। মামার রাগ তখনও কমেনি একটু সরে দাঁড়িয়ে বললেন "না, না, ঢের হয়েছে, পায়ে আর ধরতে হবে না। আমার এক কথা, হয় জুতো ফিরিয়ে দিয়ে আয়, নয় এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা—"

"ছেলেমানুষ, অন্যায় করে ফেলেছে এবারের মত ওকে মাপ করো। ও বলছে যখন, আর কখন এমন · "

"না, না, তুমি আর ওকে আস্কারা দিওনা, বৌ। তোমার জন্যেই ত ওর অত আস্পদ্দা' বেড়েছে ; নইলে ওর ক্ষমতা হয় আমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে হট করে চার-চারটে টাকা খরচ করে জুতো কিনে আনে ?"

"বেশ ত, অন্যায় করে ফেলেছে স্বীকার করছে। এবারের মত "

"অন্যায় করে স্বীকার করলেই যদি সব গণ্ডগোল মিটে যায় তবে সকলেই ত অন্যায় করতে সুরু করবে গো। আমার এক কথা—হয় টাকা ফেরত আসুক, নয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাক্—"

মামীমার মুখটা কঠোর হয়ে উঠল।

"ও নিজের উপায়ের টাকায় জুতো এনেছে, তোমার টাকা নষ্ট .."

"ওঃ নিজের উপায়ের টাকা উপায়ের টাকা বলি উপায় করল কোথা থেকে শুনি ? এই মামা না থাকলে…"

"খুব ত মামাগিরি দেখাচ্ছ, তবু যদি সব না জানতাম। পেটভাতায় চাকর করে ত রেখেছ—তাও মানুষে সামান্য একটা চাকরের ওপরও অতটা নিষ্ঠুর হয় না। এই যে ছমাস ধরে হাদাচ্ছে—এক জোড়া জুতো, এক জোড়া জুতো করে, পেরেছিলে নিজের গাঁট থেকে একটা টাকা খায় করে কিনে দিতে ? ছেলেমানুষ—আমারও ত পেটের সন্তান রয়েছে, তার বেলা চোখ তাকিয়ে দেখতে পাও না ? আজ হাতকাটা শার্টরে, কাল সিল্কের পাঞ্জাবী রে, পরশু ফুটবল খেলবার প্যান্ট রে, কৈ তার বেলা ত বেশ খরচ কর—কথাটী কও না। আমায় উড়নচোড়ে, আলক্ষ্মী, ঘর জ্বালানে পর ভোলানে যাই বল, আমি কিন্তু বাপু ওসব এক চোখোমী দেখতে পারি না। পরের ছেলে হলোই বা, একটা শিশু বালক বৈ ত নয়। অন্যায় করেছে, স্বীকার করে পায়ে ধরে মাপ চাইল, ব্যস চুকে গেল।"

মামাবাবু রাগে ফেটে পড়বার আগেই মামীমা উঠানে নেমে জুতোর বাক্সটা কুড়িয়ে নিলেন। পরে পাঁচুর হাত ধরে একটা টান দিয়ে ঘরের মধ্যে যেতে যেতে বললেন "আয় পাঁচু, ঘরে আয়। এতক্ষণে হয়ত ডালটা পুড়ে গেল, আর পারিনা বাপু .."

নিস্ফল আক্রোশে ঘণ্টাখানেক মামাবাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে গেলেন। মামীমা আর একটী কথাও কইলেন না, পাঁচুও ভয়ে ভয়ে তার নিত্য কর্ম্ম করে চলল।

রাস্তার কল থেকে জল তু তে গিয়ে যাত্রাদলের গৌরের সঙ্গে পাঁচুর দেখা হল। অপমানের কোন জ্বালা আর অবশিষ্ট ছিল না, মনের আনন্দেই সে বলে উঠল "আজ একজোড়া জুতো কিনলাম গৌর—"

"কি জুতো ?"

"সু। কি দাম নিয়েছে—তিন টাকা বার আনা। দামটা একটু বেশীই নিয়েছে তা জুতো'টাও তেমনি খুব ভাল। প্রথমে ভাবলাম একজোড়া চটি কি'ন, কিন্তু পা ঢাকা দেবার জন্যেই ত জুতো, চটিতে পা বেরিয়ে থাকে। নিধুদার মত ফিতে নেই সেই জুতোও কিনতে পারতাম, দামও সস্তা পড়ত—কিন্তু এইটাই আমার সব চেয়ে বেশী পছন্দ হল—লাল রং, চমৎকার দেখতে। কাল সকালে পরে কলে যাব দেখিস'খন।"

গরুর জাব মেখে দিয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে আসতেই নবু বললে "তোমার জুতোটা দেখলাম পাঁচদা, বেশ হয়েছে।"

জুতোর সুখ্যাতিতে পাঁচুর মন অতিরিক্ত খুসী হয়ে উঠল। মামীমার দিকে একবার গর্ব্বের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে নবুর পাশে বসে পড়ল খাবার জন্যে। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খাবার পর নবু বললে 'কিন্তু ও জুতো তুমি পরবে কখন শুনি ? সেই গাড়, যন্তরটা করে মেসিনের ফুটোয় যখন তেল ঢালবে তখন বুঝি ?"

নবু হি হি করে হেসে উঠল, বললে "তার চেয়ে আর একটা কাজ ক'রো না, রাস্তার কল থেকে যখন জল তুলতে যাবে তখন প'রো।"

পরিহাসে পাঁচুর মনটা ছোট হয়ে গেল। মামীমা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন "নে নে, ঢের ফাজলামো হয়েছে, আর বকবক করতে হবে না। রাত দশটা বেজে গেছে।"

খানিকক্ষণ আবার নীরবে কেটে গেল। হঠাৎ নবু বলে উঠল "তোমার জুতো জোড়াটা আমি বদলে নেব পাঁচদা, বাবাকে বলেছি।"

মুখের গ্রাসটা নামিয়ে পাঁচু নবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। শেষে তার অজ্ঞাতেই যেন বেরিয়ে এল এ্যাঃ !"

"ও জুতো পরে কি কেউ কলে বয়ের কাজ করতে যায় আমি বরং ইস্কুলে পরে যাব। বাবাকে বলেছি তোমাকে একজোড়া ভাল ক্যাম্বিসের জুতো কিনে দেবেন।"

"ক্যাম্বিসের জুতো ত স্যাকড়ার জুতো, আমার দরকার নেই—"

"তবে ভাল একজোড়া চামড়ার জুতোই কিনে দিতে বলব—"

হতাশায় এবং অভিমানে পাঁচুর গলা বন্ধ হয়ে এল, বললে "না, আর আমার জুতোর দরকার নেই নবু, তুমি ওটা নাও গে !"

মামীমা নিজের কাজে ব্যস্ত থেকেই এতক্ষণ ওদের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এইবার তিনি বললেন তুইও যেমন হয়েছিস পাঁচু, ও তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছে "

"না মা, ঠাট্টা করছি না। সত্যিই বাবাকে বলেছি, আমাকে নিতে বলেছেন।"

মামীমা ঘুরে বসে আশ্চর্য্য হয়ে নবুর মুখের পানে তাকালেন। 'কি বলছিস নবু !"

"হাঁ, সত্যি কথাই ত বলছি। ঐ জুতো পরে কি কেউ কলে বয়ের কাজ করতে যায়, তার চেয়ে আমি যদি পরি আমায় মানায়--"

"বটে!"

"তাছাড়া আমি ত অমনি নিচ্ছি নে, বাবা একজোড়া জুতো ওকে কিনে দেবেন বলেছেন।"

"হাঁরে নবু, তুই যদি পছন্দ করে একটা জিনিস কিনিস, আর কেউ সেটা জোর করে তোর কাছ থেকে কেড়ে নেয়, তোর মনটা কেমন হয় শুনি?"

"কেমন আবার হবে? কিচ্ছু না—"

"নাঃ, কিচ্ছু নয়, খবরদার ওর জুতো নিসনে।"

"নেব ত বাবাকে বলেছি—"

"তা জানি, নেবার বেলায় সবাই পটু। পাঁচু যে জীবনে কখন জুতো পরে নি, একজোড়া জুতোর জন্যে বেচারা প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল, পেরেছিলি তোর পুরণো জুতো জোড়াটা ওকে দিতে? একদিন তোর জুতোয় পা ঢুকিয়েছিল বলে বাপকে বলে দিয়ে ত মার খাওয়ালি। নতুন জুতো এনেছে কিনা, তাই ওর সঙ্গে এখন বড় ভাব—পাঁচদা, পাঁচদা।"

নবুর মত ফিরিল না, জুতো জোড়া নেবার জন্যে সে জেদ ধরে রইল।

মাতা পুত্রের বিবাদের মাঝেই পাঁচু কোনরকমে খাওয়া শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুঃসাহসিকতা, মামাবাবুর তীব্র অপমান সে সহ্য করেছিল জুতো জোড়া পাওয়ার আনন্দে, কিন্তু এবার আর সে চোখের জল রুখতে পারল না। হঠাৎ এতদিন পরে তার বাপ মার কথা স্মরণ হল। কোন রকমে মামাবাবুর জন্যে এক কলকে তামাক সেজে দিয়ে সে থামের আড়ালে বসে কাঁদতে লাগল।

ঘরের কাজ সেরে মামীমা শুতে যাচ্ছিলেন, সে তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেল। পাঁচুকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'হাঁরে পাঁচু, এখনও শুতে যাস নি?"

পাছে মামীমার কাছে চোখের জল ধরা পড়ে যায় এই ভয়ে মুখ না তুলেই সে বললে "এইবার যাই—"

"বসে বসে কাঁদছিস্ বুঝি?" হাত দিয়ে তিনি পাঁচুর মুখটা তুলে ধরলেন।

"নাঃ, কাঁদব কেন?"

"আচ্ছা জুতো-পাগলা ছেলে বাপু! কাল সকালে তুই জুতো পরে কলে যাস্, নবু আর ওটা নেবে না। আমি টাকা দেব'খন, নবুকে সঙ্গে করে আসছে শনিবার ঠিক ঐ রকম একজোড়া জুতো তাকে কিনে দিস, কেমন?"

পাঁচু মুখ তুলে মামীমার মুখের পানে তাকাল। নিষ্ফলতার অশ্রুর খাদে নেমে এল গভীর ধারা, দ্বিগুণ বেগে। কোন কথা সে কইতে পারল না মামীমার পায়ে শুধু একবার লুটিয়ে পড়ল।

নির্ভয়ে ঘরে শুতে এসে জুতো জোড়াটা আবার বাক্স থেকে বার করে পরীক্ষা করতে লাগল। যে ঝড়ঝাপটা জুতো জোড়াটার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তাতে যেন সেটা আরও মূল্যবান হয়ে উঠেছে। পায়ে দেবার কোনরকম চেষ্টা না করে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে দেখতে লাগল। কি সুন্দর উজ্জ্বল এবং মসৃণ! দিনের বেলায় নিশ্চয়ই আরসীর মত এতে মুখ দেখা যাবে। পরে কাজে যাবার সময় তাকে কেমন মানাবে এবং কে কি রকম মতামত প্রকাশ করবে সে সম্বন্ধে কয়েক মিনিট ধরে ভাববার পর, জুতো জোড়া মাথার শিয়রে রেখে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

ভোর বেলায় কলের প্রথম বাঁশীর শব্দে পাঁচুর ঘুম ভেঙে গেল। এক লাফে মাদুর থেকে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে হাত মুখ ধোবার জন্যে সে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়াল। নিজের ওপর তার ভীষণ রাগ হতে লাগল, কেন সে একটু আগে ঘুম থেকে উঠল না। পনের মিনিটের মধ্যে তাকে হাত পা ধুতে হবে, কাপড় কাচতে হবে, দু বালতি জল তুলতে হবে, তারপর নতুন জুতো জোড়াটা পরে এই এতখানি পথ হেঁটে কাগজকলে যেতে হবে। শুধু কলে যেতেই ত দশ মিনিট লাগবে।

সকল কাজ তাড়াতাড়ি সেরে সে ভোরের অস্পষ্ট আলোয় জুতো পরতে বসল। দোকানদারটা কত সহজে পরিয়ে দিয়েছিল, অথচ সে কিছুতেই পারছে না। পায়ের পাতা অর্দ্ধেকটা যায় তার পর আর কিছুতেই এগোয় না। ফিতে আলগা করে দিয়ে, শরীরের সকল বল দিয়ে, পাটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে, দুমড়ে সে চেষ্টা করতে লাগল। এদিকে আবার মামাবাবু তাড়া দিচ্ছেন—এখনও দেরী করছিস কেন, পাঁচু? প্রথম বাঁশি যে অনেক'খন হয়ে গেছে, শিগ্‌গীর যা—'

প্রাণপণ চেষ্টা করেও জুতোর মধ্যে পা ঢোকে না, পাঁচুর কান্না পেতে লাগল। উপায় থাকলে একটা হাতুড়ি দিয়ে মেরে পা দুটোকে সে ছোট করে নিত। পাটাকে বার করে আবার নব উদ্যমে সে পরতে সুরু করল। দু হাত দিয়ে টিপে টিপে অনেকটা সে এবার এগিয়ে দিল, কিন্তু গোড়ালিটা—। মামার গলার শব্দ আবার কানে এল—'ও পাঁচু, গেলি?' শরীরের সব শক্তি দিয়ে পাঁচু গোড়ালিতে চাপ দিল। পা ঢুকল না, কিন্তু গোড়ালিটা বেঁকে দুমড়ে গেল। অতিরিক্ত বিরক্ত হয়ে আবার সে পাটাকে বার করতে লাগল। মামাবাবু দরজার সামনে এসে পাঁচুর জুতো পরবার ধরণ দেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন "ওঃ হরি, ঐ বুঝি তোর জুতো পরা হচ্ছে রে গর্দ্দভ? বাঁ পায়েরটা ডান পায়ে পরতে গিয়ে নূতন জুতোটা যে একেবারে নষ্ট করে ফেললি, হতভাগা। তখনই বলেছিলাম চাষার ছেলের পৌষে চার টাকার জুতোর কি দরকার। এখন নাও, জুতো পরা রেখে কাজে যাও, তারপর দুপুরে এসে—"

জুতোর পাটিটা পাঁচুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গোড়ালিটা টিপতে টিপতে আবার বললেন "এ্যাঃ—নতুন জুতো জোড়াটার মাথা একদম খেলে গা! কাল কিনে আজই এই অবস্থা"

সময় হয়ে গিয়েছিল, জুতোর কথা মুলতুবি রেখে পাঁচু ছুটল

কাগজকলের দিকে। ভয়, পাছে তাকে দেখতে না পেয়ে মিস্তিরি সাহেবকে বলে দেয়। এমনি একটু আধটু দোষেই ত তার চুল ধরে টানে, কান মলে দেয়, গালে চড় মারে। মিস্তিরির চোখকে এড়াবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি প্রকাণ্ড অয়েল পটটা তুলে নিয়ে উল্টো দিকে গিয়ে ব্যাম্বু ক্রাসারে তেল ঢালতে সুরু করল। মিস্তিরি দুবার এসে তাকে আড়চোখে দেখে গেল, তার বিলম্ব করে আসা ধরতে পারল না। প্রকাণ্ড দুর্ভাবনাটা দূর হবার পর আবার সে জুতোর কথা ভাবতে লাগল। তাইত, নতুন জুতোটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল, গোড়ালিটা দুমড়ে একেবারে চুপসে গেছে। কিন্তু সে কি একটা আস্ত গাধা? উল্টো করে যে জুতো পরছে, তা একবারের জন্যেও খেয়াল হল না! দু চার দিন ঠিক করে পায়ে দিতে দিতে কি আর ঠিক হয়ে যাবে?—বোধ হয় না। মুচিকে আবার হয়ত দু এক আনা পয়সা দিতে হবে। কিন্তু নূতন জুতো কিনেই মুচিকে দিয়ে সারাতে দেখলে নবু কি বলবে? হয়ত গৌরকে, মতেকে, পাড়ার সবাইকে বলে দেবে। তারা তার নতুন তালি দেওয়া জুতোর পানে তাকাবে আর হাসবে। কিন্তু মামাবাবু যদি জুতোটা তাকে আর পরতে না দেন ”

হঠাৎ তার পায়ের কাছে কিসের একট টান পড়ল, ভাল করে দেখবার আগেই ভীষণ চিৎকার করে পাঁচু মেসিনের ওপর পড়ে গেল।

* * * * *

জ্ঞান হলে পাঁচু দেখল সে একটা নতুন জায়গায় শুয়ে আছে। তার মামাবাবু আর একটা সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে দুজনে হিন্দিতে কথা কইছেন। পাঁচুর চোখের ওপর থেকে যেন কুয়াশার মত পাতলা একটা অন্ধকার আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল, সে আশ্চর্য্য হয়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আশে পাশে অগুন্তি খাট, প্রত্যেকটায় এক একটা লোক শুয়ে। কেউ চুপ করে শুয়ে আছে, কেউ গোঙাচ্ছে, আবার কেউ বা চিৎকার করে চলেছে। শাদা শাদা টুপী পরা কয়েকটা মেম ব্যস্ত ভাবে এধার ওধার করছে, এক একটা খাটের কাছে দু এক মিনিটের জন্যে দাঁড়াচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ আবছায়ার মধ্য থেকে তার স্মরণ হল সে ব্যাম্বু ক্রাসারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল; আর সেই প্রকাণ্ড মেসিনের দাঁতগুলো চেপে ধরেছিল তার পা দুটোকে। সাহেবের একটা কথা পাঁচুর কানে এল "ডাক্তার আর কি করবে? দুটো পাই একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে, বাদ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট নেই।"

পা বাদ দেওয়া হবে, কার? পাঁচু তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেল। পাশ থেকে একটা মেম ছুটে এসে তাকে উঠতে না দিয়ে আবার শুইয়ে দিল।

মামাবাবু পাঁচুর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন "নড়িস না পাঁচু, চুপ করে শুয়ে থাক। তোর কোমর খাটের সঙ্গে বাঁধা আছে।"

তবে তারই পা বাদ দেওয়া হবে। কিন্তু

পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়বার আগে তার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল শুধু একটী কথার সঙ্গে "মামাবাবু, আমার জুতো—"

বঙ্গদেশে ফলের ব্যবসা

শ্রীদেবদেব ভট্টাচার্য্য এম-এ

প্রবন্ধ

ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এমন কি বিদেশ হইতেও কলিকাতার বাজারে প্রচুর পরিমাণে ফলের আমদানী হয়। মাত্র আপেল ফলের কথা ধরিলেই বলা যায় যে আপেল ফল কলিকাতার বাজারে যে কেবল কাশ্মীর বা কুলু হইতেই আসে তাহা নহে, জাপান এবং কালিফর্ণিয়া হইতেও আসে এবং প্রকৃত পক্ষে কালিফর্ণিয়া ও জাপানের আপেলেই কলিকাতার বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে বলা চলে। কালিফর্ণিয়া ও জাপান হইতে যে পরিমাণ আপেল প্রতি মাসে কলিকাতায় আসে নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

ঝুড়ির সংখ্যা	কালিফর্ণিয়া ঝুড়ি প্রতি আপেলের সংখ্যা	প্রতি ঝুড়ির মূল্য
৮০০—১০০০	২১৬	১১৲ হইতে ১৩৲

ইহা হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায়, যে কালিফর্ণিয়া হইতে কলিকাতায় আমদানী আপেলের মোট মূল্য প্রতি মাসে দশ হাজার টাকারও অধিক, অথবা প্রতি বৎসর প্রায় একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।

ঝুড়ির সংখ্যা	জাপান ঝুড়ি প্রতি আপেলের সংখ্যা	প্রতি ঝুড়ির মূল্য
১০০০—১২০০	১০০—১২০	৭৲ হইতে ৯৲



ইহা হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে জাপান হইতে কলিকাতায় আমদানী আপেলের মোট মূল্য প্রতি মাসে প্রায় দশ হাজার টাকা—অথবা গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় একলক্ষ বিশ হাজার টাকা।

বঙ্গদেশে এক হিমালয়ের ন্যায় পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও আপেল জন্মায় না; তবে বাঙ্গালার নিজস্ব এমন কতকগুলি ফল আছে যাহা সহজেই রপ্তানি করা বা দেশের মধ্যেই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা চলে।

ফলের বাগান তৈয়ারী করিবার প্রয়োজনীয়তা যুক্ত-প্রদেশ (U. P.) বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। বিহারের জাপ্‌লা নামক স্থানে শিক্ষিত যুবকগণ ফলের ব্যবসা ও ফলের বাগান তৈয়ারীতে অগ্রণী হইয়াছেন এইরূপ জানা গিয়াছে। জনৈক লেখক ফলের বাগান তৈয়ারীর সহিত জীবনবীমা প্রথার অতি সুন্দর তুলনা দিয়াছেন। সাধারণতঃ ফলের গাছ পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিণত হয় এবং ৩০।৪০ বৎসর বেশ মোটা বোনাস দিয়া যায় (এবং সময় সময় ঐরূপ সুবিধা কয়েক পুরুষ ধরিয়া ভোগ করাও সম্ভবপর হয়)। ফলের বাগান পুরাতন হইলে গাছ হইতে জ্বালানি কাঠ বা কড়িকাঠ বা ক্ষেত্র বিশেষে ঐ দুই প্রকার বস্তুই পাওয়া যায়।

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কৃষি বিভাগীয় পরিচালক মিঃ য়্যালেন (Mr. R. G. Allen) যুক্ত প্রদেশের ফ্রুট ডেভেলপ্‌মেণ্ট বোর্ডকে (Fruit Development Board of U. P.) উৎসাহ দিবার জন্য এক আবেদন প্রচার করেন। উহাতে তিনি বলেন যে বর্ত্তমানে ভারতের ফল বাহিরে রপ্তানি করা অপেক্ষা যাহাতে বাহিরের ফল ভারতে না আসে তাহার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক। এদেশের বাজারেই ফলের চাহিদা এত অধিক যে এখানেই দেশীয় ফলের ব্যবসায়ের যথেষ্ট ক্ষেত্র বর্ত্তমান।

তিনি (Mr. R. G. Allen) একটি তালিকার সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে গ্রেট বৃটেনের ফলের খরচ মাথা পিছু ১০.৪ পাউণ্ড (১৯২৫ খৃষ্টাব্দ) হইতে ১৯.৯ পাউণ্ড (১৯৩১ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাতে (গ্রেট ব্রিটেনে) ফলের আমদানী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৬,৬১৪০০০ হন্দর হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৪৩,১৩৪০০০ হন্দর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ফলের চাহিদা মাথা পিছু ৮০ পাউণ্ড করিয়া এবং ফল জীবন ধারণের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য বলিয়া গৃহীত। ফলের এইরূপ অত্যধিক ব্যবহার আপনা হইতে আসে নাই; ইহার জন্য ফলোৎপাদক সমিতিগুলিকে স্বদেশে ও বিদেশে আন্দোলন চালাইতে হইয়াছে, সংবাদপত্রে প্রচার করিতে হইয়াছে, বিজ্ঞাপন দিতে হইয়াছে, চিকিৎসক ও শিক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিয়া একটি সমগ্র জাতিকে ফলাহারী করিয়া তুলিতে হইয়াছে। ভাল ফল তৈয়ারীর ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিবার দরুণ ফলের দাম কমান সম্ভব হইয়াছে এবং তাহার ফলে কাটতি বাড়িয়াছে। ফল বিক্রয়ের অন্ততঃ পক্ষে কয়েকটি সমিতি ইয়োরোপের বাজারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভারতের বাজারের দিকে লক্ষ্য দিয়াছে। মিঃ য়্যালেনের মত হইতেছে যে যুক্তপ্রদেশের ফ্রুট ডেভেলপ্‌মেণ্ট বোর্ড এরূপভাবে বাজারের সুবন্দোবস্ত করিবেন যাহাতে ক্রেতার পক্ষে সুবিধা দর লাভ হইলেও বিক্রেতার পক্ষে লাভের হার কমিবে না।

ভারতের বাজার সম্বন্ধে য়্যালেন (Mr. Allen) সাহেব ভালই বলিয়াছেন; কিন্তু তথাপি বিদেশের বাজারও অবহেলা করা চলে না। বোম্বাই হইতে লণ্ডনে সর্ব্বপ্রথম আমের চালান যায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। চিকিৎসকগণ এই সময় এক বাক্যে আমের প্রশংসা করেন। তাঁহারা বলেন আমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভাইটামিন "সি" আছে, সংক্রামকতা প্রতিষেধক ভাইটামিন "এ"র পরিমাণও যথেষ্ট আছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আম বিক্রয় হয় প্রতিটি এক শিলিং ছয় পেন্স হিসাবে! ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল লণ্ডনের ফিরিওয়ালারা ঠেলা গাড়ীতে করিয়া রাস্তায় আম বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ ক্রমশঃই আমের ভক্ত হইয়া পড়িতেছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ম্যাঙ্গোষ্টীন তৃতীয়বার লণ্ডনের বাজারে প্রেরিত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় আনারস ও কলা লণ্ডনের বাজারে স্থান পায়।

ভারতের পেশোয়ার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ফলের ব্যবসা বৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু বঙ্গদেশে যথেষ্ট ফল জন্মিলেও ফলের ব্যবসায়ের উন্নতি যাহাতে হয় এইরূপ চেষ্টা সবিশেষ হয় নাই।

ফলের বাগানের পক্ষে বঙ্গদেশের উর্ব্বর জমি যে বিশেষ

উপযোগী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাত্র দুই এক পুরুষ পূর্ব্বেও যে গৃহস্থের সামান্য কিছু সঙ্গতি ছিল তাহারই কিছু না কিছু জমিতে ফলের বাগান থাকিত। ফলের বাগানে—আম, জাম. কাঁটাল, লিচু, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি ফলের গাছ সারি সারি করিয়া লাগান থাকিত। ফল, মূল, কাঠ, খড়ি ইহার কিছুরই অভাব বঙ্গদেশে ছিল না। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের যে কোনও বাঙ্গালী পরিবারের বাস্তুভিটার সহিত অথবা তাহা হইতে কিছু দূরে একখানি ফলের বাগান থাকিত। উহা যে বিলাসিতার জন্য ছিল তাহা নহে, উহা ছিল নিত্যকার প্রয়োজনীয় হিসাবে। সাধারণতঃ বাগানে একটি করিয়া পুকুর থাকিত তাহা হইতে কিছু কিছু মাছও পাওয়া যাইত; ফলের গাছে জল দেওয়াও চলিত আবার তাহার পাড়ে যে তরিতরকারী জন্মিত তাহাতে প্রাত্যহিক আহার্য্যের উপকরণের কাজও মিটিত। সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের বড় একটা ফলমূল কিনিয়া খাইতে হইত না।

আজকাল বাঙ্গালায় ত্রিহুত হইতে আম আসে, সুদূর বারাণসী এমন কি দূরবর্ত্তী বোম্বাই হইতেও আম আসে; সিঙ্গাপুর হইতে আসে আনারস, বোম্বাই হইতে কলা, মধ্য ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আসে পেয়ারা এবং আরও অন্যান্য ফল; যদিও পূর্ব্বে ঐ সকল ফলই এদেশে জন্মিত এবং এখনও উহা এ প্রদেশে জন্মান সম্ভব।

মুর্শিদাবাদ, মালদহ, হুগলী, দিনাজপুর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে নানা ধরণের সুখাদ্য আম এখনও জন্মায়। কলা, পেঁপে, পেয়ারা ও কাঁটাল অল্পবিস্তর বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

ফলের বাগান তৈয়ারী করা যে কেবল ফলের এবং কাঠের জন্যই দরকার তাহা নহে, প্রচুর বারিপাতের জন্যও যথেষ্ট গাছ গাছড়ার দরকার ইহা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিবেন। বৃক্ষাদির আধিক্যে বারিপাতের আধিক্য, বৃক্ষাদির অল্পতায় বারিপাতের অল্পতা—ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

গো মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদের খাদ্যাভাব সমস্যার সমাধানের পক্ষেও বাগানের উপকারিতা কম নহে। যখন ক্ষেত্রে তৃণের সম্পূর্ণ অভাব হয় এবং গবাদি জন্তুর অন্য প্রকার আহার্য্য আদৌ মেলে না—তখন বাগানের লতা, পাতা, গুল্ম খাইয়া গৃহপালিত পশুগণ প্রাণধারণ করিতে পারে।

রৌদ্রে ছায়া, ক্ষুধায় আহার্য্য ও পিপাসায় জল ইহা আম, নারিকেল, পেঁপে প্রভৃতি ফল হইতে লাভ করা যায়। পেশোয়ার হইতে যদি কলা বিলাতে পাঠান চলে, তবে চট্টগ্রাম ও কলিকাতা এই দুইটি বন্দর বঙ্গদেশে থাকিলেও কেন যে এখান হইতে বিদেশে ফল রপ্তানি করা চলিবে না ইহা বুঝা যায় না! মনে হয় একটু চেষ্টা করিলে বাঙ্গালার প্রয়োজন মিটাইয়া যথেষ্ট ফল বাঙ্গালার বাহিরের বাজারে পাঠান চলে।

আধুনিক অষ্ট্রেলিয়াতে কৃষি বিভাগ যেরূপ উন্নত ধরণের ফলের বাগান প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়াছেন বঙ্গদেশের কৃষি-বিভাগের পক্ষেও তাহার অনুরূপ চেষ্টা হওয়া দরকার। কীট, পতঙ্গ ও দূষিত বাষ্প প্রভৃতির উপদ্রব হইতে ফলের গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য অষ্ট্রেলিয়াতে সরকারী বাগিচাগুলিতে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, ঐরূপ ব্যবস্থা যাহাতে এদেশেও অবলম্বিত হইতে পারে এজন্য বঙ্গদেশীয় কৃষি বিভাগের পক্ষে বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত করিয়া সাধারণের নিকট উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করা অত্যাবশ্যক। প্রসঙ্গত ফল বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা যে বিশেষ প্রয়োজন এ কথা বোধ হয় বলা অত্যুক্তি হইবে না। ফল ঝুড়িবন্দী বা বাক্সবন্দী করা, ফলের বাগানের দর দস্তুর ঠিক করা, কোল্ড ষ্টোরেজ (Cold Storage) মারফৎ অবিকৃত অবস্থায় ফল চালান দেওয়া, ফলের সিরাপ, জেলি (Jelly) প্রভৃতি তৈয়ারী করা, এ সকলই ফলের ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক হিসাবে অবশ্য শিক্ষণীয়।



কবে তুমি আসবে

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী এম-এ

(১৬)

ইতোমধ্যে বিজয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিল রবিবার সে বাসন্তী থিয়েটারে যাইবে না এবং তরুবালার বাড়ীতেও যাইবে না। অবশ্য সে কথা দিয়াছে, কিন্তু তাহার দেহ ও মনের আজকাল যে অবস্থা, তাহাতে অসুস্থতার অজুহাতে যদি সে না যায়—সেটা তেমন মিথ্যাচরণও হয় না। শনিবার সে তরুবালার নামে এক পত্র দিল; 'আমার শরীর অসুস্থ বোধ করিতেছি বলিয়া কাল থিয়েটারে যাইতে পারিব না—তোমার বিজ্ঞপ্তির জন্য লিখিলাম। ইতি' এবং সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ীর বাহির হইল না। কি জানি খেয়ালী রমণী যদি সেদিনকার মত তাহার বাড়ীতে আসিয়া—থিয়েটারের আগেই হৌক বা পরেই হৌক হানা দেয়। রবিবার দিন ম্যাটিনী, তাতে পিয়ারার অভিনয় তো নাটক দুই তৃতীয়াংশ হইতেই শেষ—বেশী রাত হইবে না, সুতরাং তখনই তাহার বাড়ী বলিয়া যদি সে ট্যাক্সি লইয়া রওনা হইয়া আসে—তাহা তাহার পক্ষে এমন বিচিত্র হইবে না।

এই রমণী আবার আসিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে—কল্পনা করিতেও তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং সে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছিল যে আজ যদি সে আসে সে স্পষ্ট বলিয়া দিবে—তাহাদের সহিত আর সে কোনো সম্বন্ধ রাখিতে চায় না; সে তাহার জীবনের ধারা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। সে যেন আর না আসে—কিন্তু পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পাঁচহাজার টাকা—সে আর তাহাকে বিরক্ত করিবে না এই সর্ত্তে—দিতে রাজী আছে।

এই সব ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটিল, রাতও কাটিল, কিন্তু তরুবালা আসিল না। তখন সে আপন মনে একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল; ভাবিল—'ওকে এখন আমি কি চক্ষে দেখি তা সেদিন স্পষ্ট বুঝে গিয়েছে—হয়তো এখন আর এদিকের ছায়াও মাড়াবে না। আঃ বাঁচা গেল'।

তরুবালা সেদিন আসিল না—কিন্তু আসিল পরদিন। তখন সাতটা, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বিজয়ের গৃহে পৌছিয়া সে জানিল বিজয় বেলা তিনটায় বাহির হইয়া গিয়াছে। মুচিপাড়ায় একটা নৈশ বিদ্যালয় খোলা উপলক্ষে কি সভা আছে—সেখান হইতে আরো কোথায় কোথায় যাইয়া ফিরিতে প্রায় তাহার আটটা হইবে। তবে ঠিক করিল এই এক ঘণ্টা সে ড্রয়িংরুমের পাশে বিজয়ের সেই পড়ার ঘরটায় অপেক্ষা করিবে। দারোয়ান তাহাকে সেই ঘরে রাখিয়া আসিল।

তরুবালা ঘরে ঢুকিয়া সময়টা কি করিয়া কাটাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া সদ্য অধিকৃত চেয়ারখানা ছাড়িয়া দেয়ালের ছবিগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। একে একে সবগুলি দেখা শেষ হইলে, আসবাব-পত্রগুলা দু' একটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। তারপর প্রকাণ্ড আর্সিখানার সামনে দাঁড়াইয়া একটু মুচ্‌কি হাসিল। তাহার সারা দেহের উচ্ছ্বসিত রূপরাশি যেন সেদিন তাহার মনের মধ্যে সফেন তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আপনাতে আপনি সম্বৃত হইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। তাহার সেদিনকার বেশভূষা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার নহে। পরণে চওড়া পাড়ের মিহি ঢাকাই শাড়ী—গায়ে শুদ্ধ মাত্র শাদা মস্‌লিনের ফিন্‌ফিনে একটা ব্লাউস—তাহার ভিতর দিয়া বরাঙ্গের অনিন্দ্যশুভ্র বর্ণ ও পরিপুষ্ট যৌবনশ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পায়ে জরির কাজ করা নাগরা জুতা। সেদিন সে বেণী বাঁধে নাই—মাথা ঘষিয়া ফুর্‌ফুরে চুলের রাশ হাতে কুণ্ডলীবদ্ধ করিয়া পেছনে খোঁপা বাঁধিয়াছে—দুই একটা চূর্ণ কুন্তল গোলাপী গণ্ডের উপরে লুটোপুটি খাইতেছিল ও আশে পাশে উড়িতেছিল। কুঁদিয়া কাটা পাতলা ঠোঁট দুখানি পানের রসে টুক্‌টুকে রাঙা; কিন্তু দাঁতগুলি কুন্দ ফুলের মতো ধব্‌ধবে শাদা, পানের রসের চিহ্ন মাত্র নাই। হাতে দু'গাছি মাত্র ব্রেসলেট, পীন

পয়োধরের উপরে সরু একটা পান্নার লকেটওয়ালা সোনার চেন লতাইয়া পড়িয়াছে, কানে সেই হীরার দুল—গায়ে সেইদিনকার সেই শালখানিই যেমন তেমন করিয়া জড়ান।

আর্সির দিকে চাহিয়া সে একবার তৃপ্তির হাসি হাসিল। তারপর কি ভাবিয়া যাইয়া চেয়ারে না বসিয়া সোফাখানার উপরে গা এলাইয়া দিল। সোফার উপরে শাদা ঝালর দেওয়া দামী চাদর পাতা। শিয়রের দিকে হিমশুভ্র রেশমের কাজ করা আবরণে মোড়া একটা বড় বালিশ, তাহার মাঝখানটা মাথার তেলে ঈষৎ ময়লা হইয়াছিল। তরুবালা সেটাকে টানিয়া লইতেই সেটা হইতে জবাকুসুম তৈলের ঘ্রাণ পাইল। সে জানিত বিজয় জবাকুসুম তৈল মাথে এবং একথা মনে হইবামাত্র সে বালিশটাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তাহার পুনঃপুনঃ ঘ্রাণ লইয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিল বিজয়ের পাশে সে এই শয্যার ভাগিনী হইয়াছে; বিজয় তাহাকে কত আদর করিল—সোহাগ করিল—সাধ্যসাধনা করিল তাহার ওষ্ঠে একটি চুম্বন দিবার জন্য—সে অভিমান করিয়া কিছুতেই ওষ্ঠ তুলিয়া ধরিল না, বালিশে মুখ গুঁজিয়া রহিল—কেন সে এতদিন এমন করিয়া তাহাকে পায়ে ঠেলিয়াছে?—অভিমান শত্রু হইয়া তাহাকে চুম্বন পাইতে দিল না বটে, কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত ওষ্ঠ নিরস্ত রহিল না, পার্শ্বশায়ী দয়িতের ওষ্ঠ উদ্দেশ্যে লুকাইয়া সহস্র চুম্বন উপাধানকে মণ্ডিত করিল।

এমন সময় ঢং করিয়া দেয়ালের বড় ঘড়িটাতে সাড়ে সাতটা বাজিয়া তাহাকে বাস্তব জগতে ফিরাইয়া আনিল। সে দেখিল নিজের উন্মত্ততায় বিছানার চাদরটাকে সে বিস্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে—সেটাকে ঝাড়িয়া ভাল করিয়া পাতিল এবং বালিশটাকে যথাস্থানে রাখিয়া তথন টেবিলের কাছে একখানা চেয়ার টানিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল।

বসিবার অত্যল্প পরেই সে লক্ষ্য করিল—টেবিলের উপরে একখানা রূপার ট্রে'র মধ্যে খানকয়েক না-খোলা চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে। সে বুঝিল এগুলি বিকেলবেলার বিটের চিঠি—বিজয় বাহির হইয়া যাইবার পর আসায় বেয়ারা তাহার ট্রের উপরে রাখিয়া গিয়াছে। স্ত্রীসুলভ কৌতুহলবশতঃ সে চিঠিগুলি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল—বিশেষতঃ এগুলা যখন বিজয়ের চিঠি। দেখিয়া দেখিয়া একখানা করিয়া চিঠি ট্রেতে রাখিতে রাখিতে হঠাৎ একখানা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহার উপরে সুছাদে পরিষ্কার মেয়েলী হরপে লেখা, "শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার দত্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু"। ডাকঘরের সিল রহিয়াছে চক্রধরপুরের। দেখিয়া হঠাৎ তাহার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল—কে এই চিঠি লিখিল?—একবার ভাবিল তাহার পিশিমা লিখিতে পারেন—তথনই আবার মনে হইল তাহার পিশিমা তো বহুদিন হইতে তাঁহার কলিকাতার বাসাতেই আছেন সে খবর পাইয়াছিল। তবে? - পরের চিঠি খুলিয়া পড়া কি অন্যায় তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই তথন তাহার ছিল না—সে ক্ষিপ্র কম্পিত হাতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া চিঠি ছিঁড়িয়া বাহির করিয়া পড়িল;—পড়িবার আগে দরোজায় খিল দিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে এইরূপ লেখা:—

শ্রদ্ধাস্পদেষু, প্রিয় বিজয়বাবু,

আমি পিতৃহীনা হইয়াছি। কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া পরশু বাবা হঠাৎ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। শেষ সময়ে তিনি পুনঃ পুনঃ আপনার কথা বলিয়াছিলেন।

বুঝিতেই পারিতেছেন আমি কি বিপদে পড়িয়াছি। হঠাৎ লোকান্তরিত হওয়ায় তিনি আমার সম্বন্ধে কোনোই ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় আপনার বিশেষ প্রতিবন্ধক না থাকিলে এখানে দয়া করিয়া একবার আসিবেন কি?—আমি আমাদের বাড়ীতেই আছি। স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক আমাকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বাবার স্মৃতিবিজড়িত এ বাড়ীখানি ত্যাগ করিয়া চক্রধরপুর থাকিয়াও অন্যত্র গিয়া থাকিতে মন সরিল না। ইতি শ্রীরমা সেনগুপ্ত।

পুঃ—বাবা মৃত্যুকালে আমাদের বিবাহে স্ব-ইচ্ছায় সম্মতি দিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে আপনার সম্মতি-অসম্মতি না খতাইয়া একথা বলিব কিনা ইতস্ততঃ করিতেছিলাম; কিন্তু পরে দেখিলাম তুচ্ছ আত্মাভিমানের খাতিরে একথা গোপন করিবার কোনো হেতু নাই। ইতি।"

মুহূর্ত্তে তাহার সুখস্বপ্নের রেশ কর্পূরের মতো উবিয়া গেল। কেন এতদিন বিনয় আর চক্রধরপুর ফেরে নাই, কেন সে আর তাহার ওখানেও যায় নাই—তাহার দেহমনের অসুস্থতার গোড়া কোথায়—এ সমস্ত এক

লহমায় তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে চিঠিখানা হাতের মুঠার মধ্যে করিয়া শূন্যভাবে তাহার দিকে মিনিট খানেক চাহিয়া রহিল, পরে হঠাৎ ত্রাস্তে উঠিয়া ঘরের দরোজা যেমন খোলা ছিল খুলিয়া রাখিল। দরোজা খুলিয়া সে আর বসিল না—বামহাতে মুষ্টিবদ্ধ পত্র লইয়া সে খাঁচায় আবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহীর মতো ঘরে ইতস্ততঃ পাইচারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ পত্র সে কিছুতেই বিনয়ের হাতে পৌছিতে দিবে না; আর—আজ—আজই তাহার শেষ চাল চালিবার দিন; হয় বাজী মাৎ করিবে—নয়, নয় তো তাহা চটিয়া যাইবে। তাহার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে—থাকিয়া থাকিয়া সুকুমার অধরোষ্ঠ উত্তেজনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে আর একবার যাইয়া আর্সির সাম্‌নে দাঁড়াইল—নিজের ভুবন-বিজয়ী মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবির দিকে আপাদ-মস্তক চাহিয়া তাহার ওষ্ঠের কোণায় একবার শুষ্ক একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। এমন সময় ভেঁপু বাজাইয়া একখানা মোটর বাড়ীর ফটকের মধ্যে ঢুকিল। ঘরের জানালা দিয়া ফটক দেখা যায়। সে ঈষৎ গলা বাড়াইয়া দেখিল বিজয়ই আসিয়াছে বটে। ঘড়িতে পোনে আটটা বাজিয়াছে। ত্রাস্তে পত্রখানা কাপড়ের তলে সাবধানে লুকাইয়া ফেলিয়া সে যথাসাধ্য শান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া টেবিলের উপর হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ফটকে দারোয়ান তরুবালার আগমনবার্ত্তা তাহাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। বৈকালিক ডাকের চিঠি লইতে পড়ার ঘরে ঢুকিয়া হঠাৎ তরুবালাকে দেখিয়া বিজয় বিস্ময়ে কহিয়া উঠিল—"এ কি। তুমি এখানে কখন এলে?"

মধুর হাসিয়া হাতের বইখানা রাখিয়া তরুবালা কহিল "কেন দারোয়ান বলেনি?—আমি তো প্রায় একঘণ্টা থেকে তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি।"

"একঘণ্টা থেকে—?"

"হ্যাঁ—যাক্ সে কথা। তোমার শরীর কেমন? ভেবেছিলাম কালই একবার আস্‌ব, কিন্তু হয়ে উঠ্‌ল না।"

ক্ষীণস্বরে বিজয় বলিল "আজ এক রকম আছি"—তাহার পূর্ব্বের স্পষ্টকথা বলিবার সকল দৃঢ়সঙ্কল্প যেন এখন ভাঙিয়া পড়িতেছিল।

"কিন্তু কাল কি এতই শরীর খারাপ হয়েছিল যে বাড়ী থেকে বেরুতে মাত্র পারলে না? রবিবারের ম্যাটিনী তো দশটায় শেষ হয়ে যেতো—না হয় আমার ওখানে না-ই যেতে। তোমার শরীর ভালো নয় জান্‌লে কি আমি পীড়াপীড়ি করতাম?"

"সে তো তোমায় চিঠিতেই লিখেছি—পারলে আমি যেতাম—তুমি যদি বিশ্বাস না কর—"

বাধা দিয়া তরু কহিল "বিশ্বাস না ক'রব কেন?—কিন্তু কালকের এই অসুস্থতার পরে আজকে পাঁচ ঘণ্টা হৈ হৈ করে যে এলে—এটা কি ভালো হোলো? একবার ভেবেছিলাম এতক্ষণ বসে না থেকে চলেই যাবো; তারপর আবার ভাবলাম তোমায় আজ সত্যিই একটু বকুনি দিয়ে যাবো। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলে কেন?—বোস"—বলিয়া একখানা চেয়ার তাহার সমুখে ঠেলিয়া দিল। সে চেয়ারে না বসিয়া বিজয় নিঃশব্দে যাইয়া সোফার উপরে বসিল। শালটা চেয়ারের উপর খুলিয়া রাখিয়া তরুবালা উঠিয়া পাখার সুইচ্‌টা টানিয়া দিল। আসিয়া ফের বসিবার বেলা মাথার কাপড় খসিয়া গেল—কিন্তু সে তাহা আর তুলিয়া দিল না।

তাহার বসিবার রকম দেখিয়া বিজয় শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল—আজ আবার এ কতক্ষণে ওঠে তার ঠিক কি? আজ পাঁচঘণ্টা ছুটাছুটি করিয়া তাহার সত্যই অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছিল—কথা কহিতে মোটে ইচ্ছা হইতেছিল না। সে দিনকার মত যদি তরুবালা আবার নার্স'গিরি করিতে সাজিয়া বসে তবেই তো হইয়াছে।

এ-ও-তা দু' চারটা কথা কহিতে কহিতে বিজয় মাঝে মাঝে ডানহাত দিয়া যে নাকের ডগা চাপিয়া ধরিতেছে তাহা তরু লক্ষ্য করিয়াছিল। সে একবার জিজ্ঞাসা করিল "রোদের মধ্যে দেশহিতৈষণায় বেরিয়ে মাথাটি বুঝি ধরিয়ে এসেছো?"

"না—হ্যাঁ—একটু বেদনা করছে বৈকি?"

উত্তরে তরুবালা সোফার পাশে যাইয়া বিজয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া মধুর কটাক্ষ হানিয়া বলিল—"তুমি শোও, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি—"

বিজয় শশব্যস্তে কহিল—"না, না, দরকার নেই—"

গায়ের কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া স্বীয় বস্ত্রভার পীড়িত দেহ-সুষমাকে মস্‌লিনের জামার আব্রু মাত্র রাখিয়া মুক্ত করিয়া দিয়া—সে টেবিলের উপরে একটা ও-ডি-কলোনের শিশি পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছিল—সেটা বাঁ হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল—"আচ্ছা টেপবার দরকার না আছে একটু ও-ডি-কোলোন দিয়ে দি"—বলিয়া ঘরের কোণে একটা গেলাসের মধ্যে জল গড়াইতে লাগিল।

বিজয় পূর্ববৎ কহিল, "না-তাও দরকার নেই—"

"খুব আছে"—বলিয়া একরকম জোর করিয়াই বিজয়কে হঠাৎ কাৎ করিয়া বালিশটা গুঁজিয়া দিল।

এবার বিজয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। পরক্ষণেই সে চট্‌ করিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি সেদিন থেকে এম্‌নি করে আমায় জ্বালাচ্ছ কেন বল ত?"

ছল ছল চোখে তরু কহিল, "আমার ওপর রাগ কোরো না। আসি বলে কি এমন করে বক্‌তে হয়?"

ইহার উপর রাগ করা চলে না। গলার আওয়াজ একটু মোলায়েম করিয়া বিজয় কহিল, "আগে তো তোমায় সাধ্যসাধনা করে পাওয়া যেতো না—আর আজকাল এত দরদ—এর মানেটা কি তরু?" বিজয় তখন পর্য্যন্তও ভাবে নাই এ রমণী তাহাকে ভালোবাসে। সে ভাবিতেছিল ইহারা পুরুষ লইয়া খেলাইয়া আনন্দ পায়—সে হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া পুনরায় তাহাকে হাত করিবার জন্য এ রমণী এসব নূতন জাল বিস্তার করিতেছে।

উত্তরে তরুবালা কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "তখন ভাবতাম আমিই মহাজন, আজ যে দেখ্‌ছি আমিই ভিখারিণী হয়ে পড়েছি বিজয়!"

বিজয় মনে মনে বলিল—চমৎকার নাটক করতে পারে বটে! ইহা মনে করিয়া ঘৃণা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল এবং প্রথমে তাহাকে স্পষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিতে যে বাধ বাধ ঠেকিতেছিল এখন আর তাহা রহিল না। তাই সে তখন বলিল—"ছাখ তরু, ওসব কথায় ভোলবার দিন আমার গিয়েছে। আমি স্থির করেছি আগের মত্ততা সব ছেড়ে এবার জানোয়ার থেকে একটু মানুষ হবার চেষ্টা করব। তুমি আর আমার কাছে এসো না, কি আমাকেও প্রত্যাশা কোরো না। তোমায় আমি হাজার পাঁচেক টাকা দিচ্ছি—এ নিয়ে তুমি আমায় রেহাই দাও। আমি নিজের দোষ সাফাই করে তোমার কাছে ভালোমানুষ সাজতে চাই না, আমি তোমার কাছেও অপরাধী এবং সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুমি যদি দশ হাজার টাকাও চাও আমি তা-ও দিতে কুণ্ঠিত হব না।"

কাতরকণ্ঠে তরু কহিল, "আবার তুমি সেই টাকার কথা তোল। তোমার শপথ, তুমি ভেবে দেখ—সত্যিই অর্থের জন্য তোমায় আমি—আমি ভালো—হ্যাঁ তোমায় আমি ভালোবেসেছি কিনা। তুমি খুসী হয়ে যখন তখন ইনাম দিয়েছ—তোমার সেটা খেয়াল-খুসীর দান ছিল, কিন্তু আমার কাছে তার মূল্য ছিল অমূল্য। তুমি কোনোদিন কাঁচা টাকা আমার হাতে দাও নি—হয় মোহর দিয়েছ, নয় নোট দিয়েছ—তুমি বিশ্বাস করবে কি বিজয়, প্রাণে ধরে তার এক কাণ কড়িও আমি খরচ করতে পারি নি। কিন্তু ঐ যে বল্লাম—তখন আমার ধারণা ছিল আমি হ'লাম মহাজন, তুমি ছিলে খাতক। তাই জয়ের গর্বে আত্মাভিমান চরিতার্থ করবার জন্য আর সবার মত তোমার কাছ থেকেও দু' একদিন টাকা চেয়ে নিয়েছি—কিন্তু আমার তখনি ভয় হোতো যে সে জয় বুঝি আমার সত্যিকার জয় নয়—" বলিয়া তরু কাঁদিতে লাগিল।

এইবার বিজয়ের মনে ঘা লাগিল। এ তো নিছক অভিনয়ের মতো শুনাইতেছে না। সত্যিই কি তবে এ নারী তাহার কাছে বিকাইয়াছে? সে ভাবিয়া দেখিল—স্ক্রু প্যাঁচ কষিয়া এ নারী তাহার নিকট হইতে সত্যিই টাকা আদায় করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়ে না। সে একটু পরে বলিল "হতে পারে তুমি আমায় ভালোবাসো; কিন্তু আমাদের মিলন যে সমাজে হতে পারে না এ তুমি বেশ বোঝো। বিশেষতঃ আমি তখন তোমায় ভালোবাসি না, ভালোবাসতে পারি না। এ অবস্থায় আমাদের আর দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই কর্ত্তব্য।"

দুই হাতে চোখের জল মুছিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মহিমময়ী মূর্ত্তিতে বিজয়ের পানে চাহিয়া তরু কহিল "কেন ভালোবাসতে পারবে না বিজয়—আমি কি কুৎসিত?"—বুকের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "কতজনের ঈপ্সিত এ প্রাণ আর দেহের যত মধু যত গন্ধ তোমার পায়ে উৎসর্গিত হবার জন্য আকুলি বিকুলি করছে

তুমি তা' প্রত্যাখ্যান করবে, এত নিষ্ঠুর তুমি? বিজয়, বিজয়—আমায় তোমার কাছ থেকে তাড়িও না, তাহলে আমি বাঁচব না" তাহার গলা আবার ভারী হইয়া উঠিল—"তোমার অত বড় বুকের একটু কোণায় আমার স্থান হবে না?—বিজয়—বিজয়—আমাকে নাও"—বলিয়া ছুটিয়া বিজয়ের বক্ষের উপর যাইয়া পড়িয়া দুই হাতে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া উন্মাদের মত ওষ্ঠে গণ্ডে কণ্ঠে চুম্বন করিতে লাগিল।

"না, না, তরু—এ হ'তে পারেনা, এ হবেনা"—বলিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে তরুর দুই বাহু ধরিয়া বিজয়কুমার তাহাকে বুক হইতে ঠেলিয়া দিল!

তখন উন্মাদিনীর মত সে বিজয়ের পায়ে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল "আমায় বুকে স্থান দিতে না পার, পায়ে স্থান দাও—আমি তোমার বাড়ীতে দাসী হয়ে থাকব, আমায় তাড়িও না।"

তখন তাহার কেশ-জাল বিস্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অঞ্চল মেঝের উপর লুটাইতেছে, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে ব্লাউসের বোতামগুলি খুলিয়া বক্ষ নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। নগ্নবক্ষে বিস্ময়ে পা চাপিয়া ধরিয়া সে কেবল বার বার কহিতেছিল—"আমায় তাড়িওনা, তাড়িওনা।"

পা সহজে ছাড়াইতে না পারিয়া বিজয় অবশেষে তাহাকে ভয় দেখাইয়া বিরক্তিতিক্ত কণ্ঠে কহিল—"পা' ছাড় তরু, কথা যদি না শোনো তবে শেষে চাকরবাকর ডাক্‌তে হবে—তা কি ভালো হবে?"

হঠাৎ পা' ছাড়িয়া আবার তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া তরু মিনতির সুরে বলিল "ওগো আমায় নাও—একটি দিনের জন্য—একটিবার আমায় চুমু দাও" বলিয়া ওষ্ঠ পাতিয়া দিল।

তাহার উদ্যত মুখ এক হাতে ও বাহু এক হাতে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বিজয় সরিয়া দাঁড়াইতেই ধাক্কা লাগিয়া টেবিলের এক কোণায় মাথা ঠুকিয়া তরুবালার খানিকটা কাটিয়া গেল।

আঘাত পাইয়াছে দেখিয়াও বিজয় ত্রাস্তে সাহায্য করিতে সাহস পাইতেছিল না—আবার সেই সুযোগে যদি পাগলিনী তাহাকে জড়াইয়া ধরে। কিন্তু এবার আর তরুবালা অগ্রসর হইল না। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া একহাতে মাটী হইতে আঁচলটা টানিয়া লইল ও অন্য হাতের তর্জনী কম্পিত করিয়া চেঁচাইয়া বলিল—

"বটে, এতদূর—আমায় ভালোবাস্‌তে পারবে না—পারবে কাকে শুনি—রমা সেনগুপ্তকে?—আচ্ছা দেখা যাবে।"

বিস্ময় বিমূঢ়কণ্ঠে বিজয় বলিল "রমা—রমা সেনগুপ্তকে তুমি জান্‌লে কি করে?" চকিতে তাহার মনে পড়িল গোলাপঝিকে সে চক্রধরপুর ছাড়িবার দিন স্টেশনে দেখিয়াছিল। সে কেন সেখানে আসিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিয়াছিল—তাহার এক আত্মীয় সেখানে আছে। মুহূর্ত্তে তাহার উপস্থিতির কারণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিজয় ঘৃণায় ও ক্রোধে আবার জ্বলিয়া উঠিল।

তরুবালা পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিল, "আমি সব জানি তোমার ধূর্ত্তামি—ছলে কৌশলে আমার মনপ্রাণসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে—চক্রধরপুর গিয়ে পীরিত করা হচ্ছিল। রমা সেনগুপ্তের জন্যে তুমি হায় হায় করে মরছ—আর আমি তোমায় মাথার মণি করে রাখতাম—"

বিজয়ের আর সহ্য হইল না; সেও তীব্র কণ্ঠে কহিল "ফের রমা সেনগুপ্তের নাম যদি তুমি ও মুখে উচ্চারণ করবে তোমায় আমি দারোয়ান ডেকে বাড়ীর বার করে দেবো। ভারী যে বড়াই কচ্ছ সর্ব্বস্ব তোমার আমি কেড়ে নিয়েছি—কিন্তু ক'গণ্ডা লোকের সঙ্গে কালও থিয়েটারে ইয়ার্কি দিয়েছ আমায় হিসাব করে একদিন বোলো। বাস্‌, আজ চুপ—আজ আর কিছু শুন্‌তে চাইনা। তুমি বাড়ী যাও।" বলিয়া বিজয় দরোজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

"মনে রেখো তরুবালা প্রকাশমণি কীর্ত্তনওয়ালীর মেয়ে—সে একথা ভুলবে না—" বলিয়া শালখানা তুলিয়া লইয়া ঝড়ের মতো তরু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছুটিয়া যাইবার সময় বিজয়ের চোখে পড়িল তাহার বাম কপোল বহিয়া সূক্ষ্ম একটা রক্তের ধারা উজ্জ্বল বিজলী আলোতে টিক্ টিক্ করিয়া উঠিল। তরুবালার নিজের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলনা।

তরুবালা চলিয়া গেলে সোফার উপরে উপুড় হইয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া বিজয় অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। তরুবালা ততক্ষণে চলন্ত ট্যাক্সির পেছনের গদিতে একলা বসিয়া দুই হাতে ঘর্ষণ করিতে করিতে বার বার বলিতেছিল, "আমি কি করি—আমি কি করি" তাহার শুষ্ক চক্ষু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

কথা কয়োনাকো

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

কথা কয়োনাকো নেমেছে আঁধার
নিবিড় কালো,
দিনশেষে এসে ম্রিয়মাণ হলো
দিনের আলো।
বাতাসে বাজে না বন-মর্ম্মর,
কল কোলাহল হলো মন্থর ;
নব ছায়ালোকে খুলি অন্তর
চেতনা জ্বালো।
বসো এইখানে নেমেছে আঁধার
নিবিড় কালো।

যেই মনোবেগ কেবলি ছুটেছে
তুরঙ্গম,
তারে বেঁধে রেখে এইখানে বসো,
নিকটতম !
হয়তো কেঁদেছে হাতের কাঁকন—
এলোচুল কোন মানে নি শাসন ;
বুঝিবা জেগেছে ভীরু আশা বুকে
বেদনা সম।
রাখো সেই স্মৃতি দিশাহারা যেই
তুরঙ্গম।

রাত্রির রূপ দেখেছ কখনো
গরিমাময় ?
ঘন নীল-কালো আকাশে খচিত
তারকাচয় ?
দূর প্রান্তর কান্তার স্থির,
চল-চঞ্চল নহে নদী নীর,
নিখিল ভুবন সহসা যেন বা
মৌন রয়।
রাত্রির রূপ দেখেছ কখনো
গরিমাময় ?

রাত্রির সাথে যেন মোর চির
আত্মীয়তা ;
আমাদের মাঝে বহে ভাষাহীন
নিশ্চলতা।
যেন কোন এক সুরভি স্বপন
ভরে দিয়ে গেছে সারা তনু-মন,
মোরা অনুসরি তারি পলাতক
প্রগলভতা।
রাত্রির সাথে যেন মোর চির
আত্মীয়তা।

আমি যেন ছিনু বসুধা ছড়ায়ে
বিধুর-মন,
দেখিনি আমায় আমি একান্তে
কত না ক্ষণ।
যাদেরে খুঁজিতে ভেঙেছিনু দোর
তারা ভিড় করে আসে প্রাণে মোর,
আমি অখণ্ড ঘন আশ্লেষে
নব-নূতন।
আমি যেন ছিনু বসুধা ছড়ায়ে
বিধুর-মন।

আকাশে মাটিতে মুখোমুখি হয়ে
যে কথা বলে,
তারারা যে গান কানে কানে বলে
পাতার দলে,
তারা কি কখনো আসি তব কানে
অবারিত সুর ঢেউ তোলে প্রাণে ?
আমি ডুবে যাই তাদেরি শান্ত
অতল তলে।
আমি কানে শুনি আকাশে মাটিতে
যে কথা বলে।

আকাশের মতো মেলি ধরো দু'টি
অতল চোখ।
আলস-বিলাসে ভেসে ওঠে নব
অমৃত-লোক !
ওই চোখে তব তারকার বাণী
থমকিয়া রবে জানি আমি জানি,
তারি পানে চেয়ে ম্লানিমা আমার
বিদূর হোক।
আকাশের মতো মেলি ধরো দু'টি
অতল চোখ !

বিশ্বকর্ম্মার স্বপ্ন

শ্রীসুরসকুসুম সেন

পয়লা এপ্রিল। আমাদের সান্ধ্য অধিবেশনটা জমেছে মন্দ নয়।

কেস্ খুলে বেপরোয়াভাবে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে এক একটা সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরটায় অগ্নিসংযোগ করে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, ভেবেছিলাম শীগগিরই একটা লিফ্‌ট্ পাবো। এখন দেখছি রিট্রেঞ্চমেন্টে পড়ে চাকুরিটি যাবে।

বিশ্বকর্ম্মার পিতৃদত্ত নাম অহিভূষণ; কিন্তু লোহার কারখানায় কাজ করেন বলে আমরা ওঁকে বিশ্বকর্ম্মা নাম দিয়েছি।

ওঁর কথার সত্যতা সম্বন্ধে বন্ধুরা মূল্য নির্দ্ধারণ করে রেখেছেন দু-পয়সা মাত্র অর্থাৎ ওঁর কথার সাড়ে পনেরো আনা ছুট দিয়ে দু-পয়সা গ্রহণ করাই আমাদের রীতিতে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু চাকুরি বিচ্ছেদ বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী-বিচ্ছেদের মতই বাঙালী জীবনের একটা বড় ট্র্যাজেডি; অতএব সিগারেট গ্রহিতারা সকলেই সহানুভূতি দেখিয়ে কাছে চেপে বসলেন।

দৈনিকের সম্পাদক আগ্রহের সুরে বললেন, কেন, কি ব্যাপার হল বল দেখি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, কাল বেজায় গরম পড়েছিল, সারারাত ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, মনে হল কে এসে শিয়রের কাছে দাঁড়ালেন। চোখ খুলে দেখলাম—হিট্‌লার।

সকলেই প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, কি বললে?

গম্ভীর স্বরে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, হিটলার—হার হিটলার।

ধীরেনবাবু ডাক্তার—কিন্তু বন্ধুরা বলেন কবিরাজ; যেহেতু তিনি কবিতাও লিখে থাকেন। কলেজে পড়ার সময় সু-অভিনেতা বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। নাটকের দিকে ঝোঁকটা এতই বেশি যে সাধারণ কথাবার্ত্তাও তিনি নাটকীয় সুরেই আবৃত্তি করে যান। 'রীতিমত নাটক' দেখার পর থেকে বক্তৃতার মাঝে মাঝে আবার ইংরিজি বুক্‌নি দেওয়া সুরু করেছেন।

কবিরাজ বললেন, সেই হিটলার যিনি—

কবিরাজ একবার বক্তৃতা আরম্ভ করলে সহজে দাঁড়ি টানতে চাননা; তাই সূচনায়ই বাধা দিয়ে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, হ্যাঁ, যিনি জার্ম্মাণীর কান ধরে আছেন, তিনিই। এবার বোধগম্য হল?

বাধা দিয়ে কবিরাজ বললেন, 'শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে'—মাথার দু-একটা 'স্ক্রু' তোমার আলগা হয়ে যায়নি তো?

বিশ্বকর্ম্মা বললেন, দেখ, ও-রকম বাধা দিতে থাকলে গল্পও বলা যায় না—এতো সত্য ঘটনা।

কবিরাজ বললেন, The truth of to-day is the lie of yesterday and it will be the paradox of to-morrow. অতএব সত্য মিথ্যায় কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু তোমার হার হিটলারকে Stand up করে রেখে আর ফ্যাঁসাদ বাঁধিও না। আমি ত্রিসত্য করে shut up হচ্ছি। 'সত্যভঙ্গ হবে না আমার—তুমি মোর পেয়েছ সাক্ষর দেওয়া মহা-অঙ্গীকার চির অধিকার-লিপি।' হল তো? এবার তোমার গল্প থুড়ি সত্য ঘটনা বিবৃত করহ।

বিশ্বকর্ম্মা বললেন, আমি নাৎসি কায়দায় সেলাম ঠুকে বললাম, 'প্রভু, আপনি এখানে কেন?' তিনি বললেন, আমি রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছি। মহাবীর এবং গৌতমের দেশ ভারতে এসে বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম ভেক নিতে। কিন্তু দেখলাম বৈষ্ণবধর্ম্মে অভিজাত শ্রেণী বলে কিছু নেই; ফুঙ্গী হব ভাবছি। কলেজ স্কোয়ারে মূলগন্ধ বিহারের রাস্তাটা বাৎলে দিতে পার?' আমি পরীক্ষা করার জন্যে গোটাকয়েক প্রশ্ন করলাম। তিনি যথাযথ তার উত্তর দিয়ে বিদায় নিলেন। প্রায় তৎক্ষণাৎ খোকার মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। খোকার মা খন্ খন্ করে বলছিলেন, 'ঘুমের ঘোরে কি বক্‌ছ?' তাঁর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আমি উঠে পাঁজিটা বার করলাম। তাতে কি লেখা রয়েছে বলতে পার?

স্বপ্নতত্ত্বের অধ্যায়টা কারুর-ই কণ্ঠস্থ ছিল না। সম্পাদক বললেন, সর্ব্বৈব মিথ্যা! রাবিশ!

সম্পাদক নিশ্চয়ই বিশ্বকর্ম্মার মিথ্যাভাষণের প্রতিই বিশেষণ দুইটি প্রয়োগ করেছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ইঙ্গিতটা গায়ে না মেখে বললেন, ঠিক তার উল্টো। পাঁজিতে স্পষ্ট লেখা আছে 'কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে ভোরের দেখা স্বপ্ন কদাচ বিফল হতে পারে না।'

সম্পাদক বললেন, কিন্তু হিটলার কৃষ্ণং শরণং গচ্ছামি-ই করুন, কিম্বা বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি-ই করুন—তাতে তোমার কি এসে যায়?

—এসে যায় অনেক কিছু। জান তো লোহার কারখানায় কাজ করি। বৃন্দাবনে যেমন কৃষ্ণ ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ নেই, বর্ত্তমান য়ুরোপেও তেমনি হিটলার মুসোলিনী ছাড়া তৃতীয় পুরুষ নেই। ওঁরা দাঁত কিড়মিড় করে জগতকে এক একটি শান্তির বাণী শোনাচ্ছেন—সঙ্গে সঙ্গে লোহার ব্যবসাগুলো কেঁপে উঠছে। মাণিকজোড়ের একটি বিদায় নিলে—কারখানাগুলোর অর্দ্ধেক লোক যে বেকার হয়ে পড়বে এই সহজ সত্যটাও তোমাকে অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিতে হবে নাকি?

এতক্ষণে হিটলারের সঙ্গে রিট্রেঞ্চমেন্টের যোগাযোগটা বুঝা গেল।

কথা না বলতে পেয়ে কবিরাজ উসখুস করছিলেন, এবার মিনতির সুরে বললেন, একটা গান গাইব? নিতান্ত সাময়িক এবং—

বিশ্বকর্ম্মা বললেন কেন আবার বাধা দিচ্ছ ?

কবিরাজ বললেন, কথা না বলবারই-তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—গানের তো দিইনি। বিশেষত রাজা যখন সন্ন্যাসে যান—সভাসদ এমন কি বেহালা বাদক পর্য্যন্ত গান গেয়ে থাকে।

অন্তত একজন শ্রোতাকেও বিচলিত হতে দেখে বিশ্বকর্ম্মা খুশি হয়েই বললেন, কি গান গাইবে ? নিমাই-সন্ন্যাস ?

কবিরাজ বললেন, আরে না, না। যাদব চক্রবর্ত্তীর বিধবা স্ত্রীর বিরহ-সঙ্গীত। 'ওহে প্রাণনাথ পতি তুমি কোথায় গেলে গো।'

শ্লেষের গন্ধ পেয়ে বিশ্বকর্ম্মা দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, ও গান নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক, অতএব চলবে না।

সম্পাদক প্রশ্ন করলেন, তোমার বিশ্বাস তুমি সত্যি হিটলারকে দেখেছ ?

—ঐ যে বললাম, গোটাকয়েক প্রশ্ন করেও দেখেছি।

ভাষাতত্ত্ববিদ জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাষায় আলাপ হল ?

—কেন জার্ম্মান ভাষায়।

—তুমি জার্ম্মান জান ?

—এই সেদিন আমাদের কারখানায় একটা কল কিনেছে made in Germany, আর এককোটি টাকা তার দাম। আমি জার্ম্মান জানিনা, কি যে বল !

ভাষাতত্ত্ববিদ বাংলায় এম-এ পাশ করেছেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে পড়বার সময় চর্য্যাপদের সন্ধান পেয়ে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের চেয়েও প্রাচীন বলে তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল। সেই সন্দেহ পরে বিশ্বাসে পরিণত হওয়ায় সম্প্রতি নানা প্রমাণ সহযোগে সংস্কৃতের চেয়ে বাংলার প্রাচীনত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখাটি আমাদের অনেকবারই পড়ে শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ভাষা যত দুর্ব্বোধ্য সে ভাষা তত প্রাচীন। যেহেতু চর্য্যাপদের ভাষা সংস্কৃতের চেয়ে দুর্ব্বোধ্য অতএব বাংলা সংস্কৃতের চেয়ে প্রাচীন। শুধু তাই নয়—ভাষাবিদের মতে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কাব্য-ই মূল বাংলা হতে অনুদিত। তিনি বলেন, অপর ভাষায় কাব্যের অনুবাদ করতে গেলে মিল রাখা দুরূহ—প্রমাণ ইংরিজি গীতাঞ্জলি। বাংলা রামায়ণ মহাভারতে যে মিল দেখতে পাই সংস্কৃতে তা নেই ; অতএব বাল্মীকি বেদব্যাস আমাদের কৃত্তিবাস কাশীদাসের অনুবাদকের চেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না।

ভাষাবিদের প্রবন্ধে এমন আরো অনেক কঠিন গবেষণা স্থান পেয়েছে যা না হয় জলে সিদ্ধ, না হয় আগুনে দগ্ধ। আমরা তাঁকে প্রবন্ধটি ছাপিয়ে ফেলতে বারবার উৎসাহিত করেছি কিন্তু তিনি বলেন, 'সবুরে মেওয়া ফলে।' তাঁর বিশ্বাস আর্য্যরা তাঁদের আদিম বাসস্থান থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বার আগে যে ভাষায় কথা বলতেন সে হচ্ছে বাংলা। সুতরাং শুধু সংস্কৃতই নয়, এশিয়া য়ুরোপের প্রচলিত অপ্রচলিত সমস্ত আর্য্যভাষার তুলনায় বাংলাই প্রাচীনতম। একথা প্রমাণ করার জন্যে সমস্ত আর্য্যভাষারই তিনি চর্চ্চা সুরু করেছেন এ সংবাদও একাধিকবার আমাদের জানিয়েছেন। এই সূত্রেই তাঁকে আমরা ভাষাবিদ উপাধি দিয়েছি।

এ হেন ভাষাবিদ যখন বললেন, 'আচ্ছা, দু-একটা জার্ম্মান শব্দ আমি বলছি তার মানে বল দেখি ?'—তখন আমাদের কুরুক্ষেত্রে তৃতীয় পাণ্ডবের মত বিষাদ যোগ উপস্থিত হল। বিষাদের কারণ—বিশ্বকর্ম্মার আজগুবি ও রসাল গল্পটি সূতিকাগারেই বিনষ্ট হল বলে। ভাষাবিদের কোন ভাষায়ই দখল থাকবার কথা নয় ; কিন্তু ওঁর—কঠিন ভাষা চর্চ্চার ফলে দু-একটি জার্ম্মান শব্দের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাও একেবারে অসম্ভব নয়। বিশ্বকর্ম্মার বিদ্যার পরিধি আমাদের জানা ছিল সুতরাং ভাষাবিদের বিন্দুমাত্র ভাষাজ্ঞান ওযে গল্প-শিশুটির প্রাণসংহারে পটেসিয়াম সায়ানাইডের মতই কার্য্যকরী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

বিশ্বকর্ম্মা কিন্তু সহজে হটবার পাত্রই নন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, ওটা জার্ম্মান নয়। জার্ম্মান হলেও প্রি-হিটলারি হবে। পোষ্ট-হিটলারি জার্ম্মান যদি জানতো বল—আমি হয়তো তার মানে বলতেও পারি।

দেখা গেল ভাষাবিদের ডজনখানেক জার্ম্মান শব্দের সঙ্গে পরিচয় আছে। বিশ্বকর্ম্মা সবকয়টি প্রি-হিটলারি বলে অগ্রাহ্য করায় রেগে গিয়ে ভাষাবিদ বললেন, ওঃ শিখেছেন এক প্রি-হিটলারি পোষ্ট-হিটলারি ! আরে হিটলার তো সেদিনকার লোক—তাঁকে দিয়ে হয়েছে একটা ভাষার গোড়াপত্তন ? একেবারে বিদ্যার বিদ্যাধরী খাল !

—তুমিও বাপু রামসুন্দর বসাকের একপয়সা দামের একটি বর্ণবোধ ! কিন্তু মনে রেখো ঐ কেতাবের বাইরেও অনেক কিছু আছে। একবার নব্য-তুরস্কে যেয়ে কামাল পাশার নাম উচ্চারণ কর দেখি ? ঠিক গর্দ্দানটি হারাবে। বলতে হবে কামাল আতাতুর্ক। আতাতুর্ক আর কদিন ধরে বাদশাগিরি নিয়েছেন ? ওরি মধ্যে তো শুনছি আদ্ধেক শব্দ বিদেশী বলে অভিধান থেকে ঝেড়ে ফেলেছেন। ঘরের কথাই ধর না। হালের বাংলার তুমি কতটা জান ? নজরুলী গজলের কিম্বা জসিমউদ্দিনী মেঠো-গানের কয়টা শব্দের মানে তুমি বলতে পার ? রং উঠে গেলেও কাঠের বেড়ালের ইঁদুর ধরবার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে কিন্তু এই গজল আর মেঠো-গান বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের থাকে কি ? এরপর আবার উর্দ্দু ভাষীদের মিনিষ্ট্রি আরম্ভ হয়েছে। ওঁরা যে আদ্ধেক উর্দ্দু ঢোকাবে তাতো ভদ্রভাবে আগেই নোটিশ দিয়ে রেখেছে। পাঁচ-বছর পরেকার বাংলাভাষার অনেক শব্দের মানেই হয়তো তোমার মত বাংলার এম-এ বলতে পারবে না।

ভাষাবিদ রেগে গিয়ে বললেন, যাও, যাও, আর পাণ্ডিত্য ফলাতে হবে না।

—আমার পণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু একটা কথা অনেকবার বলেছি আবারও বলছি—বাংলা মিনিষ্ট্রির ধ্বংসাবশেষ থাকতে থাকতে হাইস্কুলের একটা সেকেণ্ড পণ্ডিতি নিয়ে পাণ্ডিত্যের সাধ মেটাও। হেড্‌পণ্ডিতি তোমার মিলবে না যেহেতু সংস্কৃতে তুমি অজ্ঞ। উর্দ্দু মিনিষ্ট্রি দিন কয়েক চললে যে সনাতনী বাংলা শিখেছ তাতে করে আর মক্তব মাদ্রাসার মৌলবীগিরি চলবে না।

—কিন্তু তুমি বাপু তোমার পোষ্ট-হিটলারি ভাষার সন্ধান পেলে কি তোমার এককোটি টাকার কলটার কাছে?

—অত দামী জিনিসটাতো আর বে-ওয়ারিশ মাল নয়! যে ইঞ্জিনিয়ার কলটি নিয়ে এসেছিলেন ভাষাটির সন্ধান তাঁর-ই কাছে পেয়েছি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হাত-পা ছুঁড়বার বহর দেখলে তোমার মত ভাষাতত্ত্ব-অজ্ঞও বুঝতে পারত যে তিনি হিটলারের ছেলে না হয়ে যান না। অতএব ভাষাটি পোষ্ট-হিটলারি।

—তোমার পাণ্ডিত্যের বালাই নিয়ে মরতে সাধ হয়! হিটলার তো বাপু বিয়েই করেন নি—তাঁর আবার ছেলে হবে কি করে?

বিয়ে করেননি বলে কি প্রজাসাধারণের পিতৃত্বের দাবিটাও তাঁর নেই?

ইন্সিওরেন্সের দালাল বললেন, ঐ সঙ্গে মাতৃত্বের দাবিটাও জানিয়ে রাখ। রাজাতো প্রজার মা-বাপ। তবে হিটলার নাকি স্ত্রী-বিদ্বেষী তদুপরি জঠর যন্ত্রণার ভয়। মাতৃত্বের দাবিটা হয়তো করবেন না।

বিশ্বকর্ম্মা বললেন না করতে পারেন কিন্তু করার অধিকার তাঁর আছে।

ভাষাবিদ বললেন, এ সব অনধিকার চর্চ্চা ছেড়ে হিটলারের জবানিটাই বলে দাও। আমিও দেখি প্রি-হিটলারির ধ্বংসাবশেষ কিছু মিলে কি না।

—জবানি বলব কি করে? আমি শুধু জার্ম্মান ভাষার স্বরূপটাই চিনি। ইংরিজিকে সংস্কৃত করে বললে যেমন শোনায় জার্ম্মান ও অবিকল তাই।

—কিন্তু ইংরিজি সংস্কৃত কোনটায়ই যে তোমার ব্যুৎপত্তি নেই!

—ও দুটোয় তোমার তো উৎপত্তি-ও নেই। ব্যুৎপত্তি আমার মাতৃভাষায়-ও নেই জার্ম্মান তো দূরের কথা!

—তবে যে বললে জার্ম্মান ভাষায় কথা হল?

—ভাষাটা বলতে পারি না সুতরাং বুঝতেও পারি না এই হল তোমার যুক্তি? তোমার দেখছি খাঁটি পণ্ডিতের মত দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাবার আর বাকি নেই।

পাণ্ডিত্যকে বারবার ধূল্যবলুণ্ঠিত হতে দেখে ভাষাবিদ নীরব হলেন।

ইন্সিওরেন্সের দালাল এবার সাহায্যার্থ এগিয়ে এলেন। কোন ?ই চোখ এড়ায় না বলে বন্ধুরা ওঁকে বলেন সহস্রলোচন।

সহস্রলোচন বললেন, হিটলারের ভাষা নয় তুমি বুঝলে, কিন্তু তোমার ভাষা হিটলার বুঝলেন কি করে? তুমি তো মাতৃভাষা আর ভাঙা-হিন্দী ছাড়া কিছুই জান না।

—তুমি তো বাপু ভাঙা-হিন্দীটাও জান না। জানাজানির কথা ছাড়, আমি যে ভাষায় কাজ চালিয়েছি—সে ভাষা সকলেই বুঝতে পারে।

পাণ্ডিত্যের লোভ সংবরণ করতে না পেরে ভাষাবিদ বললেন, এস্পারেণ্টোতে কথা বলেছ বলতে চাও? সে তো য়ুরোপের সবগুলো ভাষারই যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা দরকার।

তাচ্ছিল্যের স্বরে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, রেখে দাও তোমার পোর্টম্যাণ্টো আর য়ুরোপ। ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি চাঁদ। আমি যে ভাষায় কথা বলেছি সে তোমার য়ুরোপও যেমন বুঝবে হনুলুলুও তেমনি বুঝবে।

ভাষাবিদ নীরবে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

সহস্রলোচন সাহস সঞ্চয় করে বললেন, সে ভাষার নামটা অন্তত বলতে বাধা নেই নিশ্চয়।

—কিছু না! অঙ্গভঙ্গী। বুঝলে?

—অঙ্গভঙ্গী। ঐ করে তুমি হিটলারের সঙ্গে আলাপ চালালে?

—কেন? এ-ও অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে নাকি? উদয়শঙ্কর সারা জগতকে হিন্দু-পুরাণের জটিল আখ্যায়িকা শুনিয়ে এলেন যে ভাষায়, সে ভাষাকে তোমরা কি এতই দুর্ব্বল মনে কর যে আমার গোটাকয়েক মনের কথাকে সঠিক রূপ দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই?

ভাষাবিদ শ্লেষ করে বললেন, হুঁ, বাহাদুর!

জেরার মুখে পড়ে অঙ্গভঙ্গীর কথা স্বীকার করতে বাধ্য হওয়ায় বিশ্বকর্ম্মা নিজেকে একটু খেলো হতে হয়েছে বলে সন্দেহ করছিলেন; এখন ভাষাবিদের বক্রোক্তিতে তাঁর মুখভাব একটু কঠিন হল।

বেশি উত্তক্ত করলে এবার হয়তো বৈঠকখানায় কারখানার ভাষা চালু করবে অতএব নির্ব্বিবাদে ওঁকে গল্প বলতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করে সহস্রলোচন বললেন, তার পর কি হল?

কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদক ভিন্ন চিজ্‌। সংবাদের গন্ধ পেলে এঁদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সম্পাদক একটা ভুল সংবাদ ছাপিয়ে মানহানির মামলায় পড়েছিলেন; সম্প্রতি সর্ত্তবিহীন ক্ষমা প্রার্থনা করে রেহাই পেয়েছেন। বর্ত্তমানে খুবই সতর্ক—সংবাদমাত্রই ভালভাবে যাচাই না করে গ্রহণ করেন না—বিশেষত সংবাদদাতার উপর বিশ্বাসটা যেখানে খুবই কম।

সম্পাদক বিশ্বকর্ম্মার কঠিন মুখভাব অগ্রাহ্য করে বে-পরওয়াভাবে চুল-চেরা জেরা আরম্ভ করলেন। সম্পাদককে কিছুতেই নিরস্ত করা যাবে না জেনে শ্রোতারা সকলেই সশঙ্কচিত্তে রোমরাজি এবং কর্ণযুগল খাড়া করে সওয়াল-জবাব শুনতে লাগলেন।

সম্পাদক—হিটলারের পোষাকটার বর্ণনা দেও দেখি। জামার কোন কোন জায়গায় স্বস্তিকা ছিল? স্বস্তিকার হাতগুলো ডান দিকে না বাঁ দিকে ঘুরোনো?

বিশ্বকর্ম্মা—বললাম বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন ভেক নিতে। পরণে গেরুয়া লুঙ্গী আর আলখাল্লা—স্বস্তিকা আসবে কোথা থেকে?

সম্পাদক উৎসাহিত হয়ে বললেন, তাই বল, একেবারে বাবাজির পোষাক! ও পোষাকে তো হিটলারকে চিনবার কথা নয়; বাবাজির পোষাকে হাজির হলে মাতাজিরাও চিনতে পারেন না—তাঁদের ভাইয়েরাও না। তুমি কি তাঁদের চেয়েও বড় কুটুম?

—আত্মীয় বিশেষকে সুবিধামত চিনতে পারা না পারার অধিকার তোমার এবং তোমার বোনের আছে, কিন্তু এসব ঘরোয়া ব্যাপারে আমাদের টান কেন?

—আহা চট কেন? সন্ন্যাসীর বেশ গৃহীর চেহারায় কি পরিবর্ত্তন আনে না?

—সবার আনে না। তুমি কম্বল গায়ে দিলে লোকে যে তোমাকে জাম্বমানের মাসতুতো ভাই বলেও ভুল করতে পারে, তার কারণ তোমার মুখশ্রী। হিটলার যে বেশেই দর্শন দিন না কেন ওঁকে অন্য কারুর সঙ্গে ভুল করবে না কেউ। সেই চোখ সেই নাক সেই মুখ—এগুলো কি ভুল করবার জিনিস?

—সবই সেই রকম দেখলে? সেই কান সেই টেরি সেই গোঁফ—

—অ-বি-কল! কিন্তু চালাকি করছ কেন? হিটলারের আবার গোঁফ এল কোথা থেকে?

শ্রোতারা সকলেই চমকে উঠলেন। বিশ্বকর্ম্মা এবার সত্যই ঘায়েল হয়েছেন।

সহস্রলোচন বললেন, সে কি! সেই সুবিখ্যাত গোঁফ যা চার্লি চ্যাপলিনকেও কোণঠাসা করেছে, তাই তোমার চোখে পড়েনি?

সম্পাদক নিজের শিকারলব্ধ ইঁদুর নিয়ে অন্য বেড়ালকে খেলা দিতে রাজি ছিলেন না। সহস্রলোচনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, কেন বাজে বকছ? চার্লির গোঁফতো তাঁর নিজস্ব নয়—ষ্টুডিওর ধার করা।

এবার বিশ্বকর্ম্মার দিকে চেয়ে বিজয়ের হাসি হেসে সম্পাদক বললেন, পথে এস বাপধন! হিটলারকে সশরীরে দর্শন করাতো দূরের কথা তাঁর ফটো দেখবার সৌভাগ্যও যে তোমার হয়নি একথা একবার উচ্চৈস্বরে বদনভরে বল দেখি?

বিশ্বকর্ম্মাকে রীতিমত অপ্রতিভ মনে হল—ঘাবড়ানো-ও অসম্ভব নয়। ইটালীর মোষেরও গোঁফ নেই, ভারতীয় নৃত্যকুশলা মিস রাজহংসীর-ও নেই। হিটলারকে এঁদের সঙ্গে তাল পাকিয়ে ফেলা একটুও অসম্ভব নয়—যেহেতু কাগজওয়ালারা এই ত্রিমূর্ত্তির ছবি গত কয়বৎসরে কত সহস্রবার যে ছেপেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র বিশ্বকর্ম্মা নন। তিনি বিদ্রূপ করে বললেন, নাঃ, শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর! ফটো দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তোমার, আর তোমার কাগজের পাঠকদের। সম্বলের মধ্যে তো ঐ এক ধ্যাবড়া অশরীরী মূর্ত্তির ফটো। পুরুষ কি নারী—মানুষ কি ভূত—চেনবার যো নেই। ঐ একই ছবি একবার মিঃ লিণ্ডবার্গ, একবার মিসেস সিমসন, প্রয়োজন মত সব নামেই ছাপিয়ে পাঠকদের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করছ। আবার গর্ব্ব করে বলা হয় একটির পর একটি বিছিয়ে দিয়ে কাগজের সারি আপিস থেকে নরকের দ্বারে পৌছয়। ও-রকম কাগজ যে বাপু রামধন মুদীর দোকান অবধিই যায়—তার একচুল বেশিও নয় কমও নয়—সে কথা ভেবেছ? তোমার নিযুক্ত ঝাঁকামুটেরাই জানে আর আমরা বুঝতে পারি না?

বিশ্বকর্ম্মার ফটোঘটিত অভিযোগটা আংশিক সত্য যেহেতু আকস্মিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে কাগজওয়ালাদের নাকি সবারই ও-রকম একটা ব্লক না রেখে উপায় নেই।

কিন্তু কাগজের প্রচার বিষয়ক অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ নই। লেখার জন্যেই হউক কিম্বা ধোঁয়াহীন আগুনদানের জন্যেই হউক, কাগজটার উৎকর্ষতার কথাই কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। সম্পাদকের মাথায় কলপ মাখানো চুলের সুবিন্যস্ত ঢেউ, মুখে বাঁধানো দাঁতের মিষ্টি হাসি—এ বিষয়ে তাঁর স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ব্যবসাগত এই আক্রমণের পর বাঁধানো দাঁতের মালিক অগত্যা মুখ বন্ধ করলেন।

বিশ্বকর্ম্মার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রি ছিল না। কোন বিষয়েই বিশেষ কিছু তিনি জানতেন না, যদিও অনেক বিষয়েই ভাসা ভাসা জ্ঞান তাঁর ছিল। নিজের ডিগ্রি-বিহীনতার জন্যেই হউক কিম্বা ডিগ্রিধারীদের সব বিষয়েই একটা হামবড়া ভাব দেখেই হউক, মোটের উপর জ্ঞান-অজ্ঞানতার উল্লেখমাত্রকেই তিনি নিজের উপর আক্রমণ বলে ধরে নিয়ে কঠিন ভাষায় তার জবাব দিতেন, আর যুক্তিহীনতার ফাঁকগুলো ভরে দিতেন গালাগাল দিয়ে।

যে পরাজিত হয়েও পরাজয় স্বীকার করে না তাকে পরাজিত করা সব চেয়ে কঠিন—উদাহরণ লিগ্‌ অব্‌ নেশনস্‌ এবং আমাদের এই বিশ্বকর্ম্মা। সম্পাদকের করুণ চোখের দিকে চেয়ে দয়াপরবশ হয়ে সহস্রলোচন সশঙ্কচিত্তে বললেন, কিন্তু হিটলারের গোঁফজোড়া যাবে কোথায়?

বিশ্বকর্ম্মা হাসতে লাগলেন। হাসি দেখে মনে হল ত্রিমূর্ত্তির চিত্র প্রদর্শনীতে যে জট পাকিয়েছিল তাহা ইতিমধ্যে খুলে নিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা জানবেই বা কি করে? সে রহস্যটা যে তোমাদের বলা হয়নি এখনো। ক্রমাগত ও-রকম বাধা দিতে থাকলে আগের কথা পাছে—পাছের কথা আগে না বলে উপায় নেই। আমিও তোমাদেরই মত ভুল করে হিটলারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রভু! মাথা নেড়া করেন নি অথচ ক্ষুদ্র বীজমন্ত্রের মত অসীম ভাবপ্রকাশক ঐ গোঁফজোড়া নির্ম্মূল করলেন কেন?

পাকা গল্পকারের মত শ্রোতাদের কৌতূহল জাগিয়ে বিশ্বকর্ম্মা চুপ করলেন। ধীরে ধীরে কেস খুলে সন্তর্পণে একটা সিগারেট নির্ব্বাচন করে দেশলাইয়ের বাক্সের উপর তার একটা দিক নির্লিপ্তভাবে ঠুকতে লাগলেন।

গুম্ফহীনতার ব্যাখ্যাটা মল্লিনাথের চেয়ে উৎকৃষ্টতর করার জন্তে সম্ভবত বিশ্বকর্ম্মা তাঁর মনের মধ্যে ইত্যবসরে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলেন।

সম্পাদক বিমর্ষভাব ঝেড়ে ফেলে অধৈর্য্যভাবে বললেন, আবার চুপ করলে কেন? কি বলবে বলেই ফেল না—কুযুক্তির চেয়ে অযুক্তিই মিথ্যাকে মানায় ভাল।

ঐ দোষেই তোমার কোন সদ্গতি হল না। সবাইকে নির্বিচারে বিশ্বাস করা কিম্বা অবিশ্বাস করা দুটোই সংবাদপত্র-সম্পাদকের গতির পথে হিমালয়ের মত বাধা।

লম্বা একটা হাই তুলে ন্যূনপক্ষে এক ডজন তুড়ি মেরে—ধীরে ধীরে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, হিটলার আমার প্রশ্নের জবাবে হো হো করে হাসতে লাগলেন। হাসি থামিয়ে বললেন—বৎস! তুমি মূর্খ।

সম্পাদক মুখ টিপে হেসে বললেন, এক মিনিটের পরিচয়েই চিনে ফেললেন? হিটলার সত্যই অতি-মানুষ।

বিশ্বকর্ম্মা বললেন, হাঁ, তোমাদেরও চিনলেন।

—মিথ্যা প্রশংসা করছ কেন? হিটলারের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য তো আমাদের হয়নি।

—পরিচিতকে চিনে নেওয়া সেতো সাধারণ মানুষেও পারে—অপরিচিতকেও যদি চিনতে না পারেন তবে আর অতি-মানুষ হলেন কি করে? সবটা শুনেই নাও তারপর ফোড়ন দিও। তিনি বললেন, শুধু তুমিই নও, অনেক মূর্খই ওকে গোঁফ বলে ভুল করেছে। আসলে ওগুলো আমার নাসিকা বিবর জাত রোমরাজি।

বিশ্বকর্ম্মা একবার শ্রোতাদের মুখভাব লক্ষ্য করে নিলেন। কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করে অমর হয়েছেন। তাঁর চেয়ে কোনমতেই নিম্নশ্রেণীর বলা চলে না এমন একজন আবিষ্কর্ত্তা আমাদেরই বন্ধু। বন্ধুর সত্তা চোখ কান দিয়ে উপলব্ধি করে আমাদের যুগপৎ সাত্বিক স্বেদ ও রোমাঞ্চ হতে লাগল।

বিশ্বকর্ম্মা বলতে লাগলেন, সত্যিকার গোঁফ কখনো অত ক্ষুদ্র হতে পারে? চার্লির কৃত্রিম গোঁফও যে এর চারগুণ লম্বা! অনেক দুঃখেই তোমাদের মূর্খ বলছি। যে দেশে কাইজারি গোঁফ ফলে, সে দেশের মাটিতে ও রকম ক্ষুদ্র গোঁফাভাসের-ও চাষ হয় এমন অদ্ভুত কল্পনা মাথায় আসে কি করে?

বক্তৃতার শেষাংশটা হিটলারের না বিশ্বকর্ম্মার ঠিক বুঝা গেল না।

সম্পাদক বললেন, তাহলে গোঁফাভাসের আভাসটা নিতান্তই বেদান্তের মায়া? এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করনি?

তাচ্ছিল্যের স্বরে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, মূর্খের মত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে কসুর করিনি আর সে শুধু তোমাদেরই জন্তে। তোমাদের শুকনো মগজ যে অল্প কথায় ভিজবে না সে আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

নির্ব্বাপিত প্রায় সিগারেটে একটা জোর টান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, নেগাসের মত ফ্যুরহার মানে হিটলার গোটাকয়েক লোক পুষে থাকেন—যাদের দেখতে অবিকল হিটলারের মতই তা বোধ হয় জান?

সম্পাদক বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, হাঁ, হাঁ, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। ওগুলো সবারই জানা আছে—বলে যাও।

বিশ্বকর্ম্মা হেসে বললেন, কথায় বলে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। কিছু কিছু জান বলেই তো যত গোল বাধাও। রাষ্ট্রসংক্রান্ত সব কিছু কাজ হিটলারের নামে ঐ সব নকল হিটলারেরা-ই করে থাকে। আসল হিটলার যিনি—তিনি দিব্য আরামে নাকে কানে তেল দিয়ে শুধু ঘুমান। কিন্তু তেল শুকিয়ে এলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে সাথে লোমগুলো নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায় তাই ওগুলো ছেঁটে ফেলেছেন বললেন।

কবিরাজ একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, অহো! বর্দ্ধিষ্ণু রোমরাজির কি শোচনীয় পরিণতি! কথাটা বলে নির্ব্বাক থাকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন মনে হওয়ায় তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে কবিরাজ নাক ঘসতে লাগলেন।

বিশ্বকর্ম্মা বললেন, তবু মন্দের ভাল বলতে হবে যে একেবারে নির্ম্মূল করেন নি—শুধু ছেঁটে দিয়েছেন। অপরিণামদর্শী আরশুলা পক্ষিত্বের দাবী করলে সময়ে ওর চেয়ে শোচনীয় দুর্ঘটনাও ঘটে।

অভিনবত্বের মোহে সকলেই একটু অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। শ্রোতাদের নির্ব্বাক দেখে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, আরেকটা খবর দিচ্ছি তোমাদের—একেবারে নিউজ যাকে বলে। হিটলার নাকি ইহুদি!

সম্পাদক বললেন, রাবিশ!

—তবু ভাল, বলনি যে খবরটার কিছু কিছু তোমারও জানা ছিল।

কবিরাজ বললেন, Oh! what an awful awakening! During all these—কয় বৎসর ধরে হিটলারি-যুগ চলছে হে?

মাতৃভাষায় উক্তিটা আমাদের লক্ষ্য করে।

সহস্রলোচন বললেন, যুগ বলতে গেলে ছয়বছর না বলে উপায় নেই।

কবিরাজ আবার সুরু করলেন, During all these—বছর তিনেক হবে মানে ছয় বছর না বলে উপায় নেই—he who was my pride—

বাধা দিয়ে বিশ্বকর্ম্মা বললেন, তোমার মহা-সঙ্গীতলিপি এবার বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিই—কেমন?

কবিরাজ বললেন, Oh! the hideousness of it! Ugh! Ugh! Ugh! তোমার হিটলার যে দেখছি প্রচ্ছন্ন রয়েলিষ্ট্। ওঁর পাল্লায় পড়ে আমার অঙ্গীকার—আমার অঙ্গীকারলিপি ও Scrap of paper হয়ে গেল?

সহস্রলোচন বললেন, সেতো তুমিই তামাদি করে ফেলেছ অনেকক্ষণ।

কবিরাজ চোখ বড় করে বললেন, কখ্খনো না। ভদ্রলোকের এক কথা। এই আমি নাক মলে মুখের কপাট বন্ধ করলাম। একেবারে শেকল লাগিয়ে দিচ্ছি—দেখি কে খোলে!

শিকলের পরিবর্ত্তে কবিরাজ তাঁর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বন্ধ ঠোঁটের উপর রাখলেন। সহস্রলোচন বিশ্বকর্ম্মাকে প্রশ্ন করলেন, ইহুদি-নির্য্যাতনটা তাহলে—

কবিরাজ চেঁচিয়ে উঠলেন, হাঁ, হাঁ, ঐ ইহুদি—। বিশ্বকর্ম্মা ওঁর দিকে চাইতেই মিনতির সুরে বললেন—শুধু ঐ ইহুদি! কথাটা বলে কবিরাজ আবার ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে মৃদু একটা হিস্-স্ শব্দ করলেন।

বিশ্বকর্ম্মা ওঁর রকম দেখে হেসে বললেন, সবই বলছি। দেশাত্মবোধ এবং একাত্মবোধ না থাকলে আজকাল জাতির টিঁকে থাকা দায়। ইহুদিদের একাত্মবোধ আছে কিন্তু দেশাত্মবোধ নেই—কারণ দেশই নেই। ভারতবাসীর দেশ থাকা সত্বেও দেশাত্মবোধ নেই—একাত্মবোধ তো কোনদিনই ছিল না। কথাগুলো কিন্তু একটিও আমার নয়—সবই হিটলারের জবানি। ইহুদি নির্য্যাতনের অন্তরালে ছিল নাকি তাদের মনে তীব্র দেশাত্মবোধ জাগানো। ভগবানের দেওয়া ইহুদিদের বাসভূমি প্যালেষ্টাইনে যে শীগ্‌গিরই হাঙ্গামা বাধবে, তা নাকি হিটলার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন নির্য্যাতনের পর দলে দলে ইহুদিরা প্যালেষ্টাইনে চলে যাবে—কিন্তু তা হয়নি। ফলে প্যালেষ্টাইন হাঙ্গামায় সংখ্যালঘিষ্ঠ ইহুদিদেরই ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভবিষ্যৎ নাকি তাদের আরো অন্ধকার। এসব নানাকারণেই মনের দুঃখে হিটলার সন্ন্যাস নিয়েছেন।

রাত হয়েছিল মন্দ নয়। উদর ও গৃহের আহ্বানে আমরা পথে বের হলাম। সম্পাদক তাঁর প্রেসের উদ্দেশে একটা অন্ধকার গলিতে মোড় নিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বললেন, শোন সম্পাদক, বিশিষ্ট সংবাদদাতার পত্র বলে আমার স্বপ্নটা যেন ছেপে দিও না।

অন্ধকার থেকে জবাব এল, নিশ্চয় ছাপবো। তার সঙ্গে আরো একটা। নওগাঁ থেকে এক অশিষ্ট সংবাদদাতা পত্র লিখেছিলেন—সেখানকার গাঁজার ডিপো নাকি লুট হয়েছে। বিশ্বাস করিনি—এখন দেখছি সত্যি। তোমার সংবাদের পাশে টিপ্পনী হিসাবে ওটাও ছাপতে হবে।

হাস্য বিনিময় করে যে যার পথ বেছে নিলাম।

রিক্‌স

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

টুং টুং ঘণ্টা, যান আগুয়ান
রাজপথ দিয়ে জোরে টান্‌ছে জোয়ান।
টুকটুকে লাল তার সুখাসন ভাই,
হিন্দোলা নয়, হয় দুজনার ঠাঁই।
সন্ সন্ ধায় ট্রাম মটরের দল,
রিক্‌সএ টুনটুনি তাহারা ঈগল।
ফায়ার ব্রিগেড ছোটে নাহিক গুঞ্জার,
এ যেন রে জেলে-ডিঙ্গি, তাহারা কুঞ্জার।

ভালবাসি আমি তার ক্ষীণ শোভাটী,
গ্রাণ্ডিফ্লোরার মাঝে দীন দোপাটী।
নয় হীরা জহরত উঁচু নয় শির,
চুম্‌কি সে যেন হায় রঙিন পুঁতির।
গতির সে মেঘনা কি নয় দামোদর,
সে যেন রে অতি ছোট স্বচ্ছ নিঝর।
যেতে নারে দুর্ব্বল দেহ তার ক্ষীণ
মরু হতে মেরু, আর পেরু হতে চীন।

যান রাজ্যের মহাকাব্য না হোক,
স্নিগ্ধ সে সুন্দর উদ্ভট শ্লোক।
ধ্রুপদ দীপক নয় নাই মান তার
তাঁহরে নারে সে যেন মিষ্ট সবার।
পজ্ঝটিকা সে নয়, নয় ত্রিষ্টুভ,
সে লঘু দ্বিপদী নব ছন্দের রূপ।
নয় সে ত হঠযোগী, নাই যোগবল
সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল।

বৌদ্ধ-বিহার

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

প্রবন্ধ

জীবনোপায়ের ভাবনা, নিন্দাভাজন হওয়া, মৃত্যু, পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ এবং সাংসারিক ক্লেশ—এই পঞ্চ ভাবনার পথ হইতে দূরে থাকিয়া অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞানোৎপত্তি প্রভৃতি দুঃখস্কন্দ নিরোধ করিয়া কিরূপে নির্ব্বাণ লাভ করা যায়, এতদুদ্দেশ্যে অনেক বৌদ্ধ সংসার-ত্যাগ করিয়া আসিতেন। গৃহীও নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন; কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়া আসিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিত্ত অধিকতর স্থির ও অবহিত হয়, এই কারণে ভগবান বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হইতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভিনিষ্ক্রমণের পর নানা স্থানে সুদীর্ঘ ছয় বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াও ইন্দ্রিয়নিরোধ, পাপচিন্তার অবসান ও মানসিক স্থৈর্য্য সাধিত হইল না দেখিয়া তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কঠোর তপশ্চর্যায় দেহকে নিগ্রহ করা নিতান্তই নিরর্থক। অতএব বিলাসিতা ও কঠোরতা এই দুইয়ের 'মধ্যপথ' অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের উদারতায় কাহারও যেমন গৃহত্যাগ করার পক্ষে বাধাবাধকতা ছিল না, অতি-বিরক্তের পক্ষে তেমনই অরণ্যবাসেরও নিষেধ ছিল না। গৃহে অনেকেই 'উপাসক' ভাবে থাকিতেন, গৃহত্যাগ করিয়া অনেকে অরণ্যেও চলিয়া যাইতেন। কিন্তু বাকী গৃহত্যাগী যে ভিক্ষুগণ—তাঁহারা কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন?

তাঁহারা সাধারণতঃ থাকিতেন 'বিহারে'। 'বিহার' ব্যতীত তাঁহাদের জন্য আর চারি প্রকার বাসস্থানও বুদ্ধদেব অনুমোদন করিয়াছিলেন—'অদ্ধযোগ', 'পাসাদ', 'হম্মিয়' ও 'গুহা' (বিনয়-পিটক, চুল্লবগ্‌গ, ৬।১।২)। এ পাঁচটির সমষ্টিগত নাম 'পঞ্চলেনানি'। অশ্বঘোষ শেষ চারিটির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "অদ্ধযোগো তি সুবণ্ণবঙ্গগেহম্," সুবর্ণরঞ্জিত বঙ্গদেশীয় গৃহের অনুরূপ গৃহের নাম 'অদ্ধযোগ' (অর্দ্ধযোগ)। "পাষাদো তি দীঘপাসাদো", (তলাযুক্ত) দীর্ঘ প্রাসাদের নাম 'পাসাদ' (প্রাসাদ)। "হম্মিয়ন তি উপরি আকাশতলে পতিথিত কূটাগারো পাসাদ এব," যে প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ তলায় একটি কূটাগার (গৃহ) থাকে, তাহার নাম হম্মিয় (হর্ম্ম্য)। আর, "গুহা তি ইথকগুহা শিলাগুহা দারুগুহা পংশুগুহা," গুহা ইষ্টক-নির্ম্মিত, পাহাড়ে খোদিত বা কাষ্ঠে রচিত কুটীর[১]।

'অদ্ধযোগ' শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিলে বুঝিতে হয়, মহারাজ কণিষ্কের সমসাময়িক অশ্বঘোষের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম (অথবা দ্বিতীয়) শতাব্দীতে, বঙ্গদেশে সুবর্ণরঞ্জিত এক প্রকার বাড়ী তৈয়ার হইত এবং বাংলার বাহিরেও তাহার খ্যাতি ছিল। কিন্তু এই অর্থ সমীচীন নয়। কার্ণ সাহেব অর্থ করিয়াছেন, "সুবর্ণ ও টিন (বঙ্গ) দ্বারা প্রস্তুত বাড়ী" (Manual of Indian Buddhism, p. 81, note 5)। এই অর্থ আরও কম গ্রহণযোগ্য। ব্যাখ্যার পাঠই অশুদ্ধ, উহার প্রকৃত পাঠ Rhys Davids and Stede-এর Pali-English Dictionary-তে আছে, "সুপণ্ণ-বঙ্ক-গেহ," গরুড় পক্ষীর বক্র ডানার ন্যায় গৃহ, অর্থাৎ যে গৃহের ছাদ একদিকে ঢালু[২]।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের বাসস্থান হিসাবে অদ্ধযোগ, পাসাদ ও হম্মিয়ের কথা বড় বেশী শুনা যায় না। গুহায় কতক কতক ভিক্ষু থাকিতেন বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই থাকিতেন 'বিহারে'। কিন্তু বিহার' কি?

'বিহার' বলিতে পরবর্ত্তীকালে বা অধুনা আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, বৌদ্ধদিগের প্রাচীন পালি-সাহিত্যে তাহা

(১) S. B. E., Vol. XIII, Vinaya Texts, Pt. I. pp. 173-74, footnote.

(২) এই প্রকৃত পাঠের জন্য আমি শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের নিকট ঋণী।

বুঝাইত না। উহাতে 'বিহার' অর্থ—এক একজন ভিক্ষুর বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট এক একটি স্বতন্ত্র কক্ষ। এই অর্থে 'বিহার' শব্দ 'বিনয়পিটকে'র অন্তর্গত মহাবগ্‌গে (যথা, ১।২৫।১৪) ও চুল্লবগ্‌গে (যথা, ২।১।২) এবং পালি-সাহিত্যের অন্যত্র স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে[৩]। কিন্তু পরে 'বিহার' বলিতে বুঝাইত, যেখানে কতকগুলি ভিক্ষু বাস করিতেন সেই সমগ্র নিকেতনটা বা মঠটা। অথচ দেখি, শ্রাবস্তী নগরীর অনতিদূরে যে 'জেতবনে' বুদ্ধদেব পঞ্চবিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন, সেই জেতবন সুদত্ত অনাথপিণ্ডদ-নামা বণিক বুদ্ধদেবের বাসার্থ সমগ্র উদ্যানটি স্বর্ণমুদ্রায় আবৃত করিয়া সেই অগ্নিমূল্যে শ্রাবস্তীর কোনও রাজকুমারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, তন্মধ্যে একটি 'সপ্ততল বিহার' নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অতএব প্রাচীন পালি সাহিত্যের 'বিহার'-এর সহিত এই 'বিহার'-এর অর্থসঙ্গতি থাকিতেছে না। তবে স্বয়ং বুদ্ধদেবের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই, বোধ করি, অনাথপিণ্ডদের বিহার সপ্ততল হইয়াছিল, নচেৎ আদিতে সাধারণ ভিক্ষুর জন্য বিহার ঐ একটি স্বতন্ত্র কক্ষমাত্রই ছিল।

এইরূপ আর একটা শব্দ, 'পরিবেণ'। আদিতে ইহার অর্থ ছিল, কতগুলি বিহারের অর্থাৎ কক্ষের সমষ্টি। পরে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছিল প্রকোষ্ঠ (৪)। আবার 'পরিবেণ' অর্থ বিদ্যা-মন্দিরও দেখা যায়। যথা সিংহলের কলম্বো নগরের 'বিদ্যোদয় পরিবেণ'। অথবা 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' গ্রন্থে বর্ণিত 'সংখেয্য পরিবেণ'।

আর একটা শব্দও আছে, 'আরাম'। সাধারণতঃ উদ্যানে বা উপবনে বিহার নির্ম্মিত হইত, সেই উদ্যান বা উপবনকেই 'আরাম' বলে। কিন্তু প্রাচীনকালে 'আরাম' ঐ উদ্যানসহ বিহারকেও বুঝাইত (৫)। মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পাটলিপুত্রের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে এক হাজার ভিক্ষুর বাসোপযোগী যে বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার নাম 'অশোকারাম' বা 'কুক্কুটারাম'।

'চেতিয়' বা 'চৈত্য' অনেক ক্ষেত্রে বিহারের সংশ্লিষ্ট থাকিলেও (৬) 'চেতিয়' ও 'বিহার' এক পদার্থ নয়। কিন্তু ভোজনগরের আনন্দ-চেতিয়, বৈশালীর সারন্দদ-চেতিয় ও বহুপুত্ত-চেতিয় প্রভৃতি প্রাচীন কতকগুলি চেতিয় বিহার ছিল বলিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয় মতপ্রকাশ করিয়াছেন (৭)।

ভিক্ষুদিগের বাসের নিমিত্ত কক্ষগুলি ব্যতীত বৌদ্ধ মঠের অত্যাবশ্যক অংশগুলির নাম 'জন্তাগার' (স্নান কক্ষ), 'উপস্থান-শালা' (সভা গৃহ ; যেখানে প্রভাতে ও সায়াহ্নে ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন), 'উপহার-শালা' (ভোজনাগার), 'অগ্নিশালা' (রান্নাঘর), 'কোষ্ঠক' (ভাণ্ডার-ঘর), 'বর্চ্চঃকুটি' (পায়খানা) ও দীর্ঘিকা। এই সমস্তগুলির নাম 'সঙ্ঘারাম'। কিন্তু অন্ততঃ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে অনেক ক্ষেত্রে 'সঙ্ঘারাম' স্থলে 'বিহার' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বুদ্ধদেব বারাণসী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যে স্থানে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, তাহার নাম 'মৃগদাব' (বর্ত্তমান সারনাথ)। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে চীনা পরিব্রাজক হুয়েন-সাং-এর এই স্থানের বর্ণনায় পাই, "এখানে একটি সঙ্ঘারাম আছে। তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা আটটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু সমগ্র চত্বরকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বিভিন্ন খণ্ডগুলির সংযোগসাধন করা হইয়াছে।............ঐ প্রাচীরের অভ্যন্তরে দুই শত ফিট উচ্চ বিহার বিদ্যমান আছে।" এই বর্ণনায় সঙ্ঘারাম ও বিহারের পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়। অথচ হুয়েন্‌-সাংই আবার নালন্দা প্রভৃতি সঙ্ঘারামকে বিহার বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু।

বিহার বলিতে যখন একজন ভিক্ষুর বাসের জন্য স্বতন্ত্র একটি কক্ষ বুঝাইত, তখন এক জায়গায় কম-বেশী অনেকগুলি বিহার কাছাকাছি থাকিত। ঐগুলি পাথর, ইট বা

(৩) S. B. E., Vol. XVII, Vinaya Texts, Pt. II, p. 386, footnote 4, and Oldenberg's Buddha, London, 1882, p. 361, footnote.

(৪) S. B. E., Vol. XX, p. 203, Cullab-gga, VI. 11. 3.

(৫) Ibid, Vol. XIII, p. 23, footnote 2.

(৬) Buddhist Art in India, Grunwedel and Burgess, 1910, p. 21.

(৭) 'Cetiya' in the Buddhist Literature : Sonderdruck Aus Studia Indo-Iranica / Ehrengabe Fur Wilhelm Geiger, 1931, pp. 42 ff কিন্তু শ্রীযুক্ত ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের ব্যাখ্যা অন্যবিধ, Indian Culture, Vol. 1, pt. 1 দ্রষ্টব্য।

কাঠ দিয়া নির্ম্মিত হইত। কে নির্ম্মাণ করিত? বন হইতে কাঠ-খড়ি ও তৃণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভিক্ষুদের নিজেদের পক্ষে এইরূপ একটি ছোট-খাট বিহার তৈয়ার করিয়া লওয়া বেশী আয়াস-সাধ্য ছিল না; অনেক সময়ে করিতেনও তাহাই; আর গৃহিগণ ও গ্রামবাসিগণ ঐ নির্ম্মাণ কার্য্যে অনেক সময় যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। কিন্তু, বলা বাহুল্য, বৃহদায়তন বিহারগুলি এইভাবে নির্ম্মিত হইতে পারিত না। সেগুলি বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী নৃপতিবৃন্দ, ধনাঢ্য গৃহস্থ ও বণিকগণ নিজেরা অর্থ ব্যয় করিয়া অথবা নাগরিকগণ চাঁদা তুলিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন।

এই সকল বিহার নগরের বা গ্রামের ভিতর নির্ম্মিত হইত না, নগর বা গ্রাম হইতে দূরে। বেশী দূরেও নয়, কারণ ভিক্ষুদের নিত্য নগরে বা গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিতে হইত এবং সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত। কাজেই নগর বা গ্রাম হইতে বেশী দূরে বিহার অবস্থিত হইলে ভিক্ষুদের অসুবিধার সীমা থাকে না। বনে, জঙ্গলে, বা পর্ব্বতগুহায় যে সকল ভিক্ষু আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাও লোকালয় হইতে বড় বেশী দূরে থাকিতেন না, কারণ প্রত্যহ আসিয়া ভিক্ষা ত করিতে হইবে।

ভিক্ষুদের বাসের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া অতীব পুণ্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। অশোক যেরূপ তাঁহার অনুশাসনে বলিয়াছেন, 'ধম্ম' দানের মত দান আর নাই[৮]—চুল্লবগ্‌গে তেমনই আছে. বৌদ্ধসঙ্ঘকে বিহার দানের মত দান আর নাই; অতএব যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা ইচ্ছানুযায়ী রমণীয় বিহার নির্ম্মাণ করিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠা করুন এবং তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করুন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের নিকট 'সত্যের' বাণী প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন। চুল্লবগ্‌গ, ৬।১।৫)। 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' গ্রন্থেও (৬।৫।৩ দেখা যায়, "সমস্ত বুদ্ধগণই বিহার দানের প্রশংসা, অনুমোদন, সমাদর ও ও গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ দান করেন, তাঁহারা পুনর্জন্ম, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন।......"

তক্ষশীলা খননের পর সার্ জন্ মার্শাল সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিহারগুলির অভ্যন্তর পলস্তারা দ্বারা লিপ্ত হইত এবং তদ্ব্যতীত তথায় সম্ভবতঃ কোনওরূপ কারুকার্য্য (বা চিত্র) থাকিত না; কিন্তু বারান্দার প্রাচীর রঙ্গে রঞ্জিত হইত; আর যেখানে যেখানে কাঠের কাজ থাকিত, সেই সকল কাঠ কারুকার্য্যে শোভিত এবং চিত্রাঙ্কিত হইত[৯]। পক্ষান্তরে হুয়েন-সাং বলেন, "বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের বাসগৃহের অভ্যন্তর কারুকার্য্যখচিত, কিন্তু বহির্ভাগ অনলঙ্কৃত।" 'চুল্লবগ্‌গে' দেখা যায়, 'ছব্বগ্‌গিয়' নামা ভিক্ষুগণ পুরুষ ও নারীর কল্পিত চিত্র বিহারের ভিত্তি-গাত্রে অঙ্কিত করিতেন এবং একথা বুদ্ধদেবের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি ঐরূপ চিত্র অঙ্কন করিতে নিষেধ করিয়া কেবল মাল্য, লতা প্রভৃতি সাধারণ বস্তুর চিত্র অঙ্কনের বিধান দিয়াছিলেন[১০]।

হুয়েন-সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে দুই-তিনটি বিহারের বর্ণনা উদ্ধৃত করিব। বোধ্-গয়ায় "বোধিদ্রুমের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ দূরে ১৬০ কি ১৭০ ফিট উচ্চ একটি বিহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের মণিমুক্তাখচিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের বর্ণিত এই অট্টালিকা নীলবর্ণ ইষ্টক গ্রথিত এবং শ্বেতচূর্ণ আস্তৃত। সমস্ত অট্টালিকাটি একাধিক তলবিশিষ্ট; প্রত্যেক তলের কুলুঙ্গি সকলে স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপিত। ইহার চতুষ্পার্শ্ব বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভিত, পূর্ব্বমুখে নাটমন্দির বিদ্যমান, এই নাটমন্দিরও একাধিক তলবিশিষ্ট; ইহার উদ্গত ছাঁচ (caves) একটির উপরে আর একটি উত্থিত হইয়া তিনটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় উচ্চ হইয়াছে। উদ্গত ছাঁচ, স্তম্ভ, কড়িকাঠ, দ্বার, বাতায়ন, সমস্তই স্বর্ণরৌপ্যের কারুকার্য্য-খচিত, তৎসমুদয়ের সন্ধিস্থল পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে মণিমুক্তা সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক তলের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ এবং গুপ্ত কক্ষের দ্বার আছে। বহিঃতোরণের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বস্থিত কুলুঙ্গি প্রকোষ্ঠের ন্যায় প্রশস্ত; দক্ষিণ পার্শ্বে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের এবং বাম পার্শ্বে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তিদ্বয়

(৮) V. A. Smith, 'Asoke', Oxford. 1909, p. 169.

(৯) Guide to Taxila, Second Ed, Calcutta, 1921, p. 109.

(১০) S. B. E., Vinaya Texts, Part III, pp. 172 73.

রৌপ্য নির্ম্মিত এবং দশ ফিট উচ্চ[১১]।” দক্ষিণ কোশলের “রাজধানীর তিন শত লি দূরে ব্রহ্মগিরি নামক পর্ব্বত বিদ্যমান ছিল। এই পর্ব্বতমালার সর্ব্বোন্নত শৃঙ্গে রাজা সদ্বাহ আচার্য্য নাগার্জ্জুনের সন্তোষ সাধন জন্য একটি অতি মনোরম সঙ্ঘারাম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম পঞ্চতল ছিল; প্রত্যেক তলে চতুঃসংখ্যক বৃহৎ গৃহ নির্ম্মিত এবং প্রত্যেক গৃহ বিহারে পরিণত হইয়াছিল; প্রত্যেক বিহারে সুগঠিত ও সুসজ্জিত স্বর্ণ নির্ম্মিত পূর্ণাবয়ব বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রহ্মগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ হইতে স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হইয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরের ন্যায় সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত তল অভিষিক্ত করিয়া বহির্ভাগে গমন করিয়াছিল। আচার্য্য নাগার্জ্জুন এই সঙ্ঘারামে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী ও সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব্বোচ্চতলে বুদ্ধমূর্ত্তি, বুদ্ধের উপদেশাবলী ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত হইয়াছিল। পঞ্চম অর্থাৎ সর্ব্বনিম্নতলে বিশুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ তলে শ্রমণগণ শিষ্যবৃন্দের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চায় কাল অতিবাহিত করিতেন[১২]।” “মহারাষ্ট্র দেশের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি উচ্চ-শৃঙ্গ পর্ব্বত বিদ্যমান আছে। এই পর্ব্বতের অন্ধকার উপত্যকাভূমিতে একটি সঙ্ঘারাম (আধুনিক অজন্তা গুহা) নির্ম্মিত হইয়াছে।......সঙ্ঘারামের অন্তর্ভুক্ত বিহার এক শত ফিট উচ্চ। তদভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের সত্তর ফিট উচ্চ প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তির মস্তকোপরি ক্রমান্বয়ে সপ্তসংখ্যক চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। এই সকল চন্দ্রাতপ দৃশ্যতঃ নিরবলম্ব এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বিহারের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তর প্রাচীরে বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনার চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়[১৩]।”

চীনা পরিব্রাজক আই-সিং-এর লিখিত বিবরণেও বিহার সম্বন্ধে পাই, “শ্রমণগণ যে কক্ষে বাস করেন, সেই কক্ষের বাতায়ন পথে অথবা কুলঙ্গিতে সময় সময় পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভোজনকালে ঐ মূর্ত্তি পর্দ্দা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। শ্রমণগণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করেন এবং তার পর ঐ মূর্ত্তির নিকট ধূপ-ধুনা ও পুষ্পাঞ্জলি দেন। ভোজনের পূর্ব্বে তাঁহারা আহার সামগ্রীর কিয়দংশ ঐ পবিত্র মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। রাত্রিকালে তাঁহাদের শয়নের পূর্ব্বে পবিত্র মূর্ত্তি কক্ষান্তরে নীত হয়[১৪]।”

আদিতে যাহা একান্তভাবে ভিক্ষুগণের বাসোদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইত, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে কালক্রমে সেই বিহারগুলি বিদ্যায়তনে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। পেশোয়ারের কনিষ্ক বিহার, মগধের নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদ্দণ্ডপুর, বাংলার সোমপুরী, জগদ্দাল, সিংহলের দীপদত্তম প্রভৃতি বিহার (বা সঙ্ঘারাম)গুলি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কিছুই নয়। মিলিন্দ-পঞ্‌হো পাঠেই দেখা যায়, বিহারগুলি পরিবেণ বা বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার যখন অবস্থা এবং যখন একই বিহারে (বা সঙ্ঘারামে) বহু শত বা বহু সহস্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেন, তখন প্রাত্যহিক ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীতে যে বিহারের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না, ইহা বলাই বাহুল্য। কাজেই ঐ উদ্দেশ্যে বিহারের সংলগ্ন ভূমি ও উদ্যান থাকিত। ফা-হিয়ান্ (৪র্থ শতক) বলেন, “এই দেশের রাজন্যবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসকল ও নাগরিকগণ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর হইতে শ্রমণবর্গের জন্য বিহার নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য ভূমি, গৃহ ও উদ্যান দান করিয়া আসিতেছেন। এক রাজার পর আর এক রাজা তজ্জন্য তাম্রলিপি দান করিয়া থাকেন; এই কারণে কেহ সে সমুদয় বাজেয়াপ্ত করিতে সমর্থ হয় নাই[১৫]।” আই-সিং-এর উক্তি আরও বিশদ—“মহাবুদ্ধ ভিক্ষুগণকে কর্ষণ করিতে নিষেধ করায় তাঁহারা তাঁহাদের ভূমি বিনা করে অপরকে কর্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অংশ-বিশেষ মাত্র গ্রহণ করেন। এবম্প্রকারে তাঁহারা সদাচারে জীবনাতিপাত করেন এবং সাংসারিক চিন্তা হইতে বিরত থাকিয়া হল-চালনা ও জল সেচনের দ্বারা প্রাণিহত্যার অপরাধ হইতে

(১১) ৺রামপ্রাণ গুপ্তের বঙ্গানুবাদ, 'প্রাচীন ভারত', ঢাকা ১৩২১, পৃঃ ২৪১-৪২।

(১২) ঐ, পৃঃ ২৯৫-৯৬।

(১৩) ঐ, পৃঃ ৩০৪-৫।

(১৪) ঐ, পৃঃ ৩৪২।

(১৫) ঐ, পৃঃ ১০০-৯১

মুক্তি পাইয়া থাকেন।......সকল ভারতীয় বিহারেই ভিক্ষুর পরিচ্ছদের ব্যয় সঙ্ঘের সাধারণ সম্পত্তি হইতে বহন করা হইয়া থাকে। উদ্যান ও ক্ষেত্রের উৎপাদিত শস্য এবং বৃক্ষ ও ফলজাত আয় পরিচ্ছদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রতি বৎসর বিতরিত হইয়া থাকে।......ভারতীয় বিহারগুলি বিশেষ নিষ্কর ভূমি ভোগ করে এবং এই সকল ভূমির উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা শ্রমণগণের বস্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়।...... আহার গ্রহণ করিলেও কেহই নিন্দনীয় হইবেন না। যদি আহার্য্য ও পরিচ্ছদের চিন্তা না করিতে হয় তবে অধিকতর স্বচ্ছন্দচিত্তে ধ্যান ও পূজায় বিহারে সময়াতিপাত করিতে পারেন[১৬]।" খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে সিরিয়া দেশের বারদি সানেস্ নামা পণ্ডিত সিরিয়ায় প্রেরিত ভারতবর্ষীয় কয়েকজন দূতের মুখে ভারত-তথ্য শুনিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ণিত বৌদ্ধ শ্রমণদিগের বিবরণের সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, "যদি কেহ শ্রমণ শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে গ্রাম্য বা নাগরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানে তিনি সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি মস্তক মুণ্ডন ও শ্রমণ-কুল-সুলভ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শ্রমণগণের সহিত বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতে তিনি পুত্রকলত্রাদির সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের চিন্তা হইতে বিরত হন। দেশাধিপতি ঈদৃশ গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেন। পত্নীর সমস্ত ভার আত্মীয় স্বজনের উপর অর্পিত হয়। শ্রমণগণ নগরের বহির্ভাগে বাস করেন; ধর্ম্মের আলোচনায় তাঁহাদের অহোরাত্র অতিবাহিত হয়। তাঁহারা রাজব্যয়ে নির্ম্মিত মঠে ও মন্দিরে বাস করেন। এই সকল মঠে কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আশ্রমের জন্য আহার্য্যবস্তু সমুদয় রাজভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত হন। এই সকল আশ্রমে ঘণ্টাধ্বনি হইলে আগন্তুকগণ প্রস্থান করেন এবং শ্রমণগণ উপস্থিত হইয়া ধ্যানে নিরত হন। তাঁহাদের ধ্যান পরিসমাপ্ত হইলে দ্বিতীয়বার ঘণ্টা-ধ্বনি হয়। তখন তাঁহারা আহারে উপবেশন করেন। এই সময়ে ভৃত্যগণ অন্ন পরিবেশন করে; যদি কোনও শ্রমণ একাধিক বস্তু আহার করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে শাকসব্‌জী অথবা ফল দেওয়া হয়। ভোজনক্রিয়া সমাপ্ত হইবামাত্র তাঁহারা পুনর্ব্বার শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত হন। শ্রমণগণের পক্ষে বিবাহ বা ধনার্জ্জন নিষিদ্ধ (১৭)।"

যখন কোনও নূতন ভিক্ষু কোনও বিহারে ভর্ত্তি হইতে আসিবেন, তখন তিনি কি করিবেন? চুল্লবগ্‌গে (৮।১-২) আছে, "যখন তিনি বুঝিতে পারিবেন যে তিনি বিহারের সমীপস্থ হইয়াছেন তখন তিনি পা হইতে চটি-জোড়া খুলিয়া উপরদিক নীচে করিয়া বেশ করিয়া পিটিয়া ধূলা ঝাড়িয়া পুনরায় উপরের দিকে করিয়া হাতে লইবেন; ছাতাটি বন্ধ করিবেন, মাথার পাগ্‌ড়িটি খুলিয়া ফেলিবেন; বহির্ব্বাসখানি ভাঁজ করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইবেন এবং পরে সতর্কতার সহিত ও ধীরপাদক্ষেপে বিহারে (আরামে) প্রবেশ করিবেন। প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য করিবেন, বিহারের বাসিন্দা-ভিক্ষুগণ কোনদিকে গিয়াছেন এবং প্রার্থনাগৃহে, মণ্ডপে অথবা কোনও বৃক্ষতলে যেদিকেই গিয়া থাকুন না কেন, সেইদিকে তিনি যাইবেন এবং একদিকে তাঁহার ভিক্ষাপাত্র ও অপরদিকে তাঁহার চীবর রাখিয়া—তিনি যথোপযুক্ত এক আসন দেখিয়া উপবেশন করিবেন। তারপর তিনি পানীয় ও হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্য জল কোনদিকে আছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। যদি পানীয় জলের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহা হইলে উঠিয়া গিয়া লইয়া আসিবেন। হস্তপদ প্রক্ষালনের জলও লইয়া আসিবেন। যে হস্ত দ্বারা জল ঢালিবেন, সেই হস্তেই আবার পদ-প্রক্ষালন করিবেন না। পরে একখণ্ড বস্ত্র (ন্যাকড়া) চাহিয়া লইয়া জুতা পরিষ্কার করিবেন। (তাঁহার ভার-প্রাপ্ত) বাসিন্দা-ভিক্ষু বয়সে বড় হইলে তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন, ছোট হইলে তাঁহার নিকট হইতে নমস্কার লাভ করিবেন। তাঁহার জন্য কোন্ কক্ষটি নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা বাসিন্দা-ভিক্ষুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। সকল স্থানে বা সকল বাটীতে ভিক্ষার জন্য যাওয়া চলে না, কোথায় চলিবে সেগুলিও জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। বিহারটি (কক্ষটি) অপরিষ্কৃত থাকিলে উহার জিনিসপত্র যথানিয়মে সরাইয়া ও রৌদ্রে দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবেন।

(১৬) ৺যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের বঙ্গানুবাদ, 'সমসাময়িক ভারত', একাদশ খণ্ড, পাটনা, ১৩২৪, পৃঃ ১০৩, ৩০০-২।

(১৭) 'প্রাচীন ভারত' পৃঃ ১৭৯-৮০।

জুতা পায়ে দিয়া, ছাতা খুলিয়া, মস্তক আবৃত করিয়া কিম্বা বহির্ব্বাস পুঁটুলি করিয়া মাথায় লইয়া বিহারে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। বিহারে যে সকল বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু থাকেন, তাঁহাদের অভিবাদন না করা এবং ইচ্ছামত যে কোনও কক্ষে শয্যারচনা করা দোষাবহ।

বাসিন্দা-ভিক্ষুও যখন দেখিবেন যে আগন্তুক-ভিক্ষু তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড়, তখন তিনি তাঁহার জন্য একখানি আসন ঠিক করিয়া রাখিয়া তাঁহার পদপ্রক্ষালনের জন্য জল, জলচৌকি ও গামছার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিবেন; নিকটে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবেন ও তাঁহার পরিচ্ছদ ও ভিক্ষাপাত্রের ভার গ্রহণ করিবেন; তিনি জলপান করিতে ইচ্ছা করেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন এবং (যদি তাঁহাকে সম্মত করাইতে পারেন তাহা হইলে) তাঁহার জুতাও পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

আগন্তুক ভিক্ষুকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য। তাঁহার জন্য একটি শয্যা রচনা করিয়া তাঁহাকে বলিতে হইবে, "আপনার জন্য এই শয্যা।" তাঁহাকে আরও জানাইয়া দিতে হইবে ঐ শয়নকক্ষ অপর কোনও ভিক্ষু কর্ত্তৃক অধিকৃত কিনা এবং কোন্ কোন্ পরিবার (ভিক্ষাদানের পক্ষে) সরকারিভাবে অভাবগ্রস্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। উপরন্তু তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে বিহারের কোথায় কি আছে, পানীয় ও প্রক্ষালনের জল কোথায় মিলে, সঙ্ঘের সভা কোথায় বসে, বিহার হইতে কখন বাহিরে যাওয়া উচিত ও কখন ফিরিয়া আসা উচিত ইত্যাদি।

যদি আগন্তুক-ভিক্ষু বাসিন্দা-ভিক্ষু অপেক্ষা বয়সে ছোট হন, তাহা হইলে বাসিন্দা-ভিক্ষু আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই তাঁহাকে বলিয়া দিবেন, কোথায় তাঁহার ভিক্ষা-পাত্র ও চীবর রাখিতে হইবে, কোথায় পানীয় ও প্রক্ষালনের জল আছে এবং কোথায় জুতা মুছিবার ন্যাকড়া পাওয়া যাইবে। আগন্তুক-ভিক্ষু এই ক্ষেত্রে বাসিন্দা-ভিক্ষুকে অভিবাদন করিবেন এবং বাসিন্দা-ভিক্ষু বলিয়া দিবেন, কোথায় তিনি শয্যাগ্রহণ করিবেন।

ইহা গেল প্রবেশের পালা। তারপর কি হয়? আই-সিং-এর বর্ণনায় পাই, "অপরিচিত ভিক্ষু বিহারে উপস্থিত হইলে পাঁচ দিবস তাঁহাকে উত্তম খাদ্যাদি দ্বারা পরিচর্য্যা এবং বিশ্রামার্থ অনুরোধ করা হয়। এই কয়দিবস অন্তে তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় গ্রহণ করা হয়। সচ্চরিত্র হইলে সঙ্ঘ তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত বাস করিতে অনুরোধ করেন ও তাঁহার পদমর্য্যাদানুযায়ী শয্যাবস্ত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু শিক্ষিত না হইলে তাঁহাকে সাধারণ ভিক্ষুর ন্যায় পরিগণিত করা হয়। পক্ষান্তরে তিনি শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইলে তাঁহার প্রতি উল্লিখিতভাবে ব্যবহার করা হয়। এরূপ হইলে তাঁহার নাম তালিকাভুক্ত করিয়া তাঁহাকে ঐ বিহারবাসী বলিয়া পরিগণিত করা হয়। তাঁহাকে তখন বিহারের পুরাতন অধিবাসীর ন্যায়ই গণ্য করা হয়। কোনও গৃহস্থ সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তথায় আগমন করিলে প্রথমতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করা হয় এবং তাঁহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণেচ্ছু দেখিলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করা হয়। অতঃপর রাজ্যের তালিকার সহিত তাঁহার আর কোনও সম্পর্ক থাকে না, সঙ্ঘেরই ভিন্ন তালিকা আছে এবং তাঁহার নাম এই তালিকাভুক্ত হয়। নিয়ম ভঙ্গ করিলে ও আচার প্রতিপালনে অন্যথা করিলে তাঁহাকে বিহার হইতে দূরীভূত করা হইত এবং এরূপ ক্ষেত্রে ঘণ্টাধ্বনি করা হইত না (১৮)।"

বাহ্যাকৃতি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অবহেলা বা ঔদাসীন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে নিন্দিত। যে সকল বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুর তত্ত্বাবধানে যে সকল অল্পবয়স্ক ভিক্ষু থাকিতেন, তাঁহাদের দেখিতে হইত যে ঐ সকল অল্পবয়স্ক ভিক্ষুরা যথাযথভাবে পরিচ্ছদ ধারণ করেন, রঞ্জিত করেন এবং ধৌত করেন (১৯)। এইরূপ, বিহারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আলো বাতাসের দিকেও ভিক্ষুকের প্রখর দৃষ্টি ছিল। বিনয়পিটকের 'মহাবগ্‌গে' (১।২৫।১৪-১৯) এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ বা নির্দ্দেশ রহিয়াছে। নেহাৎ অসমর্থ না হইলে 'সদ্ধিবিহারিক'কে (শিষ্যকে) উপজ্ঝায়ের (উপাধ্যায়ের গুরুর) বিহার অপরিষ্কৃত হইলে, উপজ্ঝায়ের আসবাব পত্র, যথা, ভিক্ষাপাত্র, চীবর, মাদুর, চাদর, তোষক, বালিশ, কেদারা, পিক্‌দানি, হেলান দিবার

(১৮) সমসাময়িক ভারত, ঐ, পৃঃ ১০৫-৬।

(১৯) Oldenberg. op. cit, p. 359. এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'মহাপরি নির্ব্বাণ বিহারের' ভিক্ষুগণ তাঁহাদের চিঠি পত্রাদি মুদ্রা (seal) দ্বারা মোহর করিয়া পাঠাইতেন এবং এইরূপ অন্ততঃ ৫৬৩টি মুদ্রা কাসিয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কাষ্ঠফলক, শতরঞ্জ প্রভৃতি সযত্নে এবং কোন্‌টা কি ভাবে কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া একে একে বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে। ঘরে মাকড়সার জাল থাকিলে তাহা দূর করিতে হইবে। জানালা, গৃহকোণ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। দেয়াল অপরিচ্ছন্ন বা দাগযুক্ত থাকিলে সম্মার্জ্জনী ভিজাইয়া তাহার জল নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা দেয়ালের ঐ স্থান ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। মেজে অপরিষ্কার বা নোংরা থাকিলে ঐরূপভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে এবং ঘরের যাবতীয় আবর্জ্জনা একত্র করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিতে হইবে। তারপর আসবাবগুলি ঝাড়িয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে দিতে হইবে এবং পরে আবার সেগুলি সযত্নে একে একে ঘরে আনিয়া যথাস্থানে, যেরূপভাবে ছিল, স্থাপন করিতে হইবে। যেদিক হইতে ধূলিময় বাতাস আসিবে, সেদিককার জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। শীতকালে দিনে জানালা খুলিয়া রাখিতে হইবে এবং রাত্রিতে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে জানালা দিনে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং রাত্রিতে খুলিয়া দিতে হইবে। এইরূপে কোষ্ঠক, অগ্নিশালা, উপহার-শালা, এমন কি বর্চ্চঃকুটি পর্য্যন্ত পরিষ্কারের ভারও শিষ্যের উপর। কক্ষে পানীয় জল না থাকিলে তাঁহাকে তাহা আনিয়া রাখিতে হইবে। কমণ্ডলুতে আচমনের জল না থাকিলে তাহাও আনিয়া রাখিতে হইবে।

বিহার পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ও কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। যথা, কাষ্ঠনির্ম্মিত ও মৃণ্ময় দ্রব্যগুলি ও দগ্ধ মৃৎভাণ্ডসমূহ যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে যথাযোগ্যরূপে রাখিয়া যাইতে হইবে, কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া যাইতে হইবে, শয্যাস্থান কাহারও ন্যাসে অর্পণ করিয়া যাইতে হইবে ইত্যাদি এবং এ সকল না করিয়া যাওয়া দোষজনক। আই-সিং বলেন, না করিয়া গেলে ভিক্ষু প্রায়শ্চিত্তীয় অপরাধে অপরাধী হন।

কিন্তু কেবল ভিক্ষু লইয়াই বৌদ্ধসঙ্ঘ ছিল না, ভিক্ষুণীসঙ্ঘও ছিল এবং এই দুইয়ের সমবায়কে 'উভতোসঙ্ঘ' বলিত। তবে ভিক্ষুর সংখ্যা অপেক্ষা ভিক্ষুণীর সংখ্যা বরাবরই কম ছিল। ভিক্ষুণীদের জীবনযাত্রা প্রণালী ভিক্ষুদের হইতে বেশী বিভিন্ন ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে একান্ত নির্জ্জনে বাস করা ও একাকী কোনও বিহারে থাকাটা নিয়ম-বহির্ভূত ছিল। অরণ্যবাসও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। বরঞ্চ কতকটা নগর বা গ্রামের গণ্ডীর ভিতরে কুটীরে বা বিহারে দুই বা ততোধিক সংখ্যায় তাঁহাদের বাস করাটাই অভিপ্রেত ছিল। সে স্থান হইতে তাঁহাদের দৈনিক ভিক্ষায় বাহির হওয়ারও সুবিধা হইত।

সঙ্ঘে ভিক্ষুণীদের প্রবেশাধিকার বুদ্ধদেব অনেকটা অনিচ্ছার সহিতই দিয়াছিলেন এবং দিলেনও যখন তখন এইরূপ সকল নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যেন ভিক্ষুণীসঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘের অধীনস্থ থাকে। আদিতে ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুদের সহিত একই বিহারে বা সঙ্ঘারামে থাকিতে পারিতেন কিনা ঠিক জানা যায় না; কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর শেষে বা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমে আলেকজাণ্ড্রিয়াবাসী ষ্ট্রাবো তাঁহার ভূগোল-বৃত্তান্তে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "বৌদ্ধবিহারে শ্রমণদের সঙ্গে বৌদ্ধ রমণীরাও বাস করেন, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন।" উত্তরকালেও অনেক বিহার বা সঙ্ঘারামে এইরূপই দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা ও ভিক্ষুরা সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে থাকিতেন। এমন কি, যে ভিক্ষু বা শ্রমণ ভিক্ষুণীদের নিকট ধর্ম্মপ্রচার বা ব্যাখ্যা করিতে যাইতেন, তিনিও ভিক্ষুণীদের বিহারে (কক্ষে) প্রবেশ করিতে পারিতেন না। পারিতেন কেবল তখনই, যখন কোনও ভিক্ষুণী পীড়িতা হইয়া তাঁহার নিকট সান্ত্বনা লাভের প্রয়োজন অনুভব করিতেন। কোনও ভিক্ষুণীর সহিত ভ্রমণ করা, একই নৌকায় পার হওয়া অথবা কোনও সাক্ষীর অসমক্ষে তাঁহার সহিত একাকী উপবেশন করা—ভিক্ষুর পক্ষে এই সকল একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। ভিক্ষুণীদের গতিবিধিও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইত। আই-সিং বলেন "সন্ন্যাসিনীগণ বিহারে যতিগণের নিকট গমনকালে সঙ্ঘকে নিবেদন করিয়া পরে তথায় গমন করিবেন। যতিগণকে সন্ন্যাসিনীগণের কক্ষে যাইতে হইলে অনুসন্ধান করিয়া গমন করিতে হয়। বিহার হইতে দূরে ভ্রমণকালে সন্ন্যাসিনীগণ একাকী গমন করিতেন না; আর কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিতে হইলে তাঁহারা একত্রে চারিজনের কমে গমন করিতেন না।... স্ত্রীলোকগণ বিহারে প্রবেশকালে কদাপি যতিগণের কক্ষে প্রবেশ

করেন না ; অলিন্দে থাকিয়া মুহূর্ত্তমাত্র কথোপকথন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন (২০)।"

বর্ত্তমান 'বিহার' প্রদেশের নামও একটি বৌদ্ধ-বিহার হইতে প্রাপ্ত। প্রাচীন মগধে ছিল উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরী বিহার। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে, ঐ বিহার বাংলার পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। উদ্দণ্ডপুর নগরের পর্ব্বতশীর্ষে ঐ বিহারটি অবস্থিত ছিল, আর উহা ছিল অনেকটা দুর্গের মতই সুরক্ষিত। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই-বখত্‌ইয়ার আসিয়া (দুর্গ ভ্রমে) ঐ বিহার অধিকার করিয়া জিনিস-পত্র লুণ্ঠন করিয়া যাবতীয় 'মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণদিগকে' (বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে) নিহত করিলেন ; কিন্তু পরে দেখা গেল, উহার মধ্যে অসংখ্য পুঁথি রহিয়াছে এবং উহা একটি বিদ্যালয় মাত্র। আক্রমণকারিগণ শুনিলেন, হিন্দুদিগের ভাষায় বিদ্যালয়কে 'বিহার' বলে ("in the Hindl tongue, they call a College Bihar.")। বলা বাহুল্য, বিহারের পুঁথিগুলিও নিষ্কৃতি পায় নাই, মহম্মদ-ই-বখত্‌ইয়ারের আদেশে ওগুলি ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজের 'তবকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে এই বিহারের নাম 'অদন্দ-বিহার' লিখিত আছে, কিন্তু সাধারণতঃ লেখকগণ 'বিহার' এই নামটিই প্রয়োগ করিতেন। ক্রমশঃ সমস্ত মগধ (এবং মিথিলারও কিয়দংশ) মুসলমানদের লেখনীতে 'বিহার' নাম ধারণ করিল। পাটনা জেলায় 'বিহার' নামে এখনও যে মহকুমা আছে, উহাই প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর বিহারের অবস্থানের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

(২০) 'সমসাময়িক ভারত', ঐ, পৃঃ ১০৩-৪।

জাপানের পথে

যাদুকর পি, সি, সরকার

প্রবন্ধ

সাংহাই

সাংহাইতে পৌছিয়া দেখি এ বড়ই মজার সহর। সহরের একদিক দেখিলে মনে হয় যেন ফ্রান্সের কোন টাউন ; কারণ সমস্তই ফরাসী লোক, সমস্ত সাইনবোর্ড ফরাসী ভাষায় লেখা, রাস্তাঘাট সবগুলিই ফরাসী নামের। আবার কিছুদূর যাইয়া মনে হইল এ যেন চীইনিজ টাউন ; কারণ নোংরা চীনাদের পচা মাছমাংসের গন্ধ—আর চীনাভাষা ও চীনা অধিবাসী ছাড়া কিছুই চক্ষুতে পড়ে না। King Edward the Seventh Avenueতে আসিয়া মনে হইল এ যেন কলিকাতার সাহেব-পল্লী ; কারণ সমস্ত পাঞ্জাবী পুলিশ ও ইংরেজরাই সেখানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কিছুদূরেই আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহরের ন্যায় গগনস্পর্শী কুড়ি পঁচিশ ত্রিশতলা অট্টালিকা আর রক্ত-মুখী আমেরিকাবাসীরাই সেখানকার মালিক। জাপানী অংশে শতশত জাপানী আপনমনে তাঁহাদের জাপানী-ধরণের গৃহে বসিয়া আপন আপন কাজ করিতেছে। এ সব দেখিয়া মনে হইল এখানে যেন 'সর্ব্বদেশের সমন্বয়' হইয়াছে ; আমার দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিল—It is a league of nations Sir, দোভাষীর ইংরাজী শুনিয়া আমরা মোটরশুদ্ধ লোক যুগপৎ হাসিয়া উঠিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, সাংহাই চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও ইহা international Port, পৃথিবীর ৩৫ জাতি এখানে মিলিত হইয়া ব্যবসা করে। তন্মধ্যে ৫।৪টী প্রধান ও ক্ষমতাশালী জাতি মিলিত হইয়া এখানে মিউনিসিপালিটী গঠিত করিয়াছে। এই মিউনিসিপালিটীর আইন স্বতন্ত্র ও তদনুযায়ীই এই সহর শাসিত হইয়া থাকে।

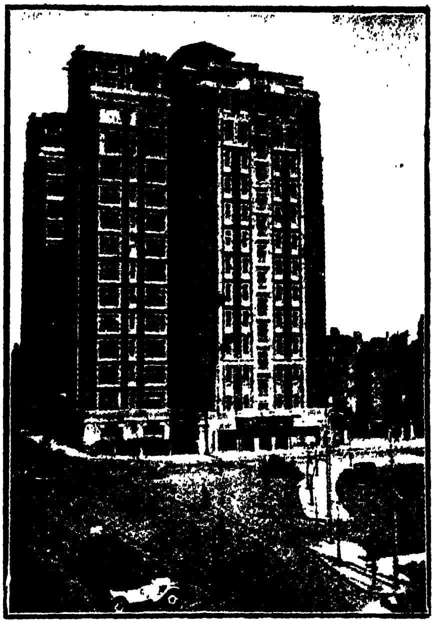
এখানে চাইনিজ, ইংরেজ, জাপানী, আমেরিকান, ফরাসী সবদেশেরই পুলিশ আছে। বহু পাঞ্জাবী শিখ পুলিশও এখানে কাজ করে—তাহারা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে নিযুক্ত হয়। এই পাঞ্জাবী শিখ পুলিশগুলি বিদেশীয়দের পরমবন্ধু। কারণ চুরি জুয়াচুরির জন্ম—বিশেষ করিয়া পকেট মারায় সাংহাই সহর পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমায় পকেট হইতে রুমাল, মণিব্যাগ, পিক্চার পোষ্টকার্ড, মায় বাহিরের ছাতাটা পর্য্যন্ত ম্যাজিক হইয়া উড়িয়া গেল। একটা অফিসে নুতন 'হ্যাট' পরিয়া দেখা করিতে যাই—কিছুকাল পরে দেখি যাদুকরের উপর যাদু হইয়া গিয়াছে—নুতন আর একটা 'হ্যাট' কিনিয়া হোটেলে ফিরিলাম। শুধু চীনারাই যে এই হস্তকৌশলে সিদ্ধহস্ত তাহা নহে এ যেন চীনের আবহাওয়ারই গুণ। ট্রামে দুইজন সুন্দরী অল্পবয়স্কা মেমসাহেব উঠিলেন—শুনিলাম আমেরিকান টুরিষ্ট—কিছুকাল পরেই তাঁহারা নামিয়া গেলেন—উঃ কি ভদ্রলোক—কি সুন্দর ব্যবহার! আমার পাশে যে দুই চাব মিনিট স্থান করিয়া দিয়াছিলাম ততক্ষণ একটা ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠছাড়া আর কিছুই করিলেন না। কিন্তু নামিয়া যাইবার পর দেখি যে আমার পকেট হইতে দশ ডলারের নোটটী ও অপর একজন ভদ্রলোকের সত্তর ডলারসহ মণিব্যাগটী অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। পাঞ্জাবী পুলিশ বলিল দুইজন মেমসাহেব আজ এক সপ্তাহ যাবৎ বহুলোকের পকেট মারিতেছে—কোনক্রমেই তাঁহাদিগকে হাতে হাতে ধরা যাইতেছে না। আমাদের নিকট তখন সমস্ত ব্যাপারই জলের মত সোজা ও পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি যাদুকর হিসাবে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা ঐন্দ্রজালিক দুইজনকে আমি দেখিয়াছি। ধন্য তাঁহাদের অপূর্ব্ব শিক্ষা কৌশল, ধন্য তাঁহাদের সাধনা! সাংহাইতে পাঞ্জাবী পুলিশরা এই সমস্ত লোকের নিকট যমস্বরূপ। বিশেষতঃ চাইনিজরা ইংরেজ বা ফরাসী সার্জ্জেণ্টদিগকে মোটেই ভয় পায় না—কিন্তু ঐ দীর্ঘাবয়ব শিখদিগের ধমকে বাঘে গরুতে একত্র জল খায়। এক ড্রাইভার আমেরিকান অংশ হইতে ফরাসী অঞ্চলের একটা ডান্স হলে যাইবার ভাড়া চাহিতেছিল পাঁচ ডলার; কিন্তু ইহা শুনিবার পর একজন শিখ পুলিশ আসিতেছিল দেখিয়া সে এক ডলারে রাজী হইয়া পৌছাইয়া দিয়াছিল; অবশ্য পরে গোলমাল করিয়া আবার পঞ্চাশ সেণ্ট বেশী আদায় করিয়াছিল। রাস্তার ট্রাফিক রেগুলেশন বড়ই কড়া। কথায় কথায় সামান্য ত্রুটীর জন্যই বহু ডলার জরিমানা দিতে হয়। ড্রাইভাররা যথাসাধ্য এইগুলিকে বাঁচাইয়া চলে। একবার বিনা পয়সায় দুই তিন মাইল বেড়ান গেল; কারণ খালি মোটর লইয়া সেস্থানে যাওয়া নিষেধ, অথচ ড্রাইভারের সেস্থান অতিক্রম করা বিশেষ প্রয়োজন। ড্রাইভার আসিয়া আমাদিগকে বিনা পয়সায় চড়িতে অনুরোধ করিল; আমি বুঝিতে না পারিয়া রাজী হই নাই—কিন্তু আমাদের চাইনিজ বন্ধুটী এই ধরণের ব্যাপারে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মোটরে চাপিলেন ও আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। পরে বুঝাইয়া দিলে দেখিলাম বেশ মজা ত!

সে যাহা হউক ব্যক্তিগত ঘটনাসমূহ বর্ণনা না করিয়া সহরের ইতিহাস বর্ণনা করা যাউক। সাংহাই সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সকলেই কিছু শুনিতে উৎসুক—ইহা পৃথিবীর পঞ্চম বন্দর (সহর) হিসাবে নহে, বর্ত্তমানে চীনজাপানের যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল বলিয়া। সাংহাই—সাংহাই—সাংহাই—সকলের মুখে এখন এককথা। সহর হিসাবে ইহা বর্ত্তমানে প্যারিস, রোম, বোষ্টন ও লস্ এঞ্জেলেস প্রভৃতির উচ্চে। বোধহয় দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গ সহর ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে সাংহাই ছাড়া অন্য কোন সহর অতি অল্পকাল মধ্যে এতটা উল্লেখযোগ্য ও প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই জোহেন্সবার্গ সমগ্র আফ্রিকামধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা ও ব্যবসাক্ষেত্র হিসাবে সর্ব্ববৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাংহাই সহরটীও সেইরূপভাবে মাত্র ৯৩ বৎসরকাল মধ্যে সমগ্র এশিয়ার সর্ব্ববৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃটীশ রাজত্বের দ্বিতীয় নগরী কলিকাতাও তুলনায় সাংহাইএর নিকট শিশুসদৃশ। অথচ ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সাংহাই সহরটী ওয়াংপু নদীর তীরে সামান্য মাটীর কুটীর পূর্ণ নোংরা চাইনিজদের আড্ডাস্থল ছিল। সাংহাই সহরের এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের সুরু হয় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট, যখন নানকিনে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া ইংরেজগণের সহিত বৈরিতা দূর হয়। তৎপর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর

তারিখে যে চুক্তিপত্র হয় তাহাতে সাংহাই সহরকে বিদেশীয়দের ব্যবসাকেন্দ্র ও বাসস্থান করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। তখন সাংহাই সহরের মোট লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ২৭০,০০০ দুই লক্ষ সত্তর হাজার আর বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার প্রায় বার গুণ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ লক্ষ। শুধু এই জনসংখ্যার বৃদ্ধিই সহরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মাপকাঠি নহে। সুখের বিষয় এই যে সমগ্র চীন সাম্রাজ্যে আমদানী ও রপ্তানীর মালসমূহের শতকরা ৪৪ ভাগই এই সাংহাই বন্দর সাহায্যে যাতায়াত করে। সাংহাইর আন্তর্জাতিক সেটেলমেণ্টের সীমানা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের পুস্তকে পাওয়া যায় যে আন্তর্জাতিক অংশে সীমানা নিম্নোক্তরূপ—পূর্ব্বে ওয়াংপু নদী, দক্ষিণে ইয়াং কিংপাং ক্রিক (বর্ত্তমানে সপ্তম এডোয়ার্ড এভিনিউ), উত্তরে চৈনিকরাজ্য লিকিয়াচাং (বর্ত্তমানে বৃটীশ কনসালের বাসস্থান)। ইহা হইতে দেখা যায় যে পশ্চিমের সীমা তখন নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই ভূ-টুকু পরবর্ত্তীকালে সাংহাইর আন্তর্জাতিক অংশ পশ্চিম অভিমুখে দ্রুত বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সাংহাইএর 'টাওটাই' ও বৃটীশ কনসাল যে চুক্তি করেন তদনুযায়ী 'ব্যারিয়ার রোড' (বর্ত্তমানে হোনান রোড) পশ্চিম সীমানারূপে নির্দ্ধারিত হয়। তখন এই সেটেলমেণ্টের আয়তন ছিল ৮৩০ মো অর্থাৎ মাত্র ১৩৮ একর। দুই বৎসর পরে পরবর্ত্তী অপর একটী চুক্তি অনুসারে পশ্চিমের সীমানা 'ডিফেন্স ক্রীক' (বা বর্ত্তমানের টিবেট রোড) পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লওয়া হয়। তখন ইহার আয়তন হয় ২,৮২০ মো বা ৪৭০ একর। এর পর আমেরিকান অংশ যুক্ত হইয়া ও পশ্চিমের সীমানা আরও বড় হইয়া ৫,৫৮৪ একর বা ৮২১৩ বর্গ মাইলে পরিণত হয়। বর্ত্তমানে ফরাসী অঞ্চলের ৪বর্গ মাইল যোগ দিয়া বৃহত্তর সাংহাইর মোট আয়তন অন্যূন ৩৩২ বর্গ মাইল। সাংহাই নগরীর এই জনসংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঞ্চলের অপরাপর বিষয়েরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক অঞ্চলে পৃথিবীর নানাস্থানের ৫০ হইতে ৬০ বিভিন্ন জাতীয় লোক মোট ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার জন অন্নের সংস্থান করিতেছে। সাংহাইতে জাপানীদের সংখ্যা অন্যূন ১৯,০০০ (উনিশ হাজার), ইংরেজ ৮,৫০০ (আট হাজার পাঁচ শত), রুশদেশীয় ৮,০০০ (আট হাজার), আমেরিকান ৩,১০০ (তিন হাজার একশত), ভারতীয় ১,৮০০ (এক হাজার আট শত) পর্ত্তুগীজ ১,৬০০ (এক হাজার ছয় শত) ও ফরাসী ১,৪০০ (এক হাজার চারিশত)। অপর জাতিসমূহের মধ্যে কেহই এক হাজারের উপরে নহে। সাংহাই বন্দরটীর ভৌগলিক অবস্থান বড়ই সুন্দর। দেশের সর্ব্ববৃহৎ নদী 'ইয়াংসিকিয়াং'এর মোহনায় অবস্থিত বলিয়া—ইহা দেশের মাল রপ্তানী ও আমদানীর উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব রাখে। বিগত ১৯১৪—১৮ খৃষ্টাব্দে যে মহাসমর হয় সেই সময়ই বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা সাংহাই সহরের প্রভূত উন্নতি হয়। এই সময়ের কল্যাণেই আজ সাংহাই পঞ্চম সহর। মহাযুদ্ধের হিড়িক বিগত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া সাংহাই প্রায় এই সময় পর্য্যন্ত ক্রমাগত ডবল প্রমোশনে উন্নতি করিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে ওয়াংপু নদীর তীরে নামিয়া বিদেশীয় লোকেরা সাংহাইর ঐশ্বর্য্য দর্শনে চমকিত হইয়া যায়। কে বলিবে যে ইহা চাইনিজ বা প্রাচ্যের সহর! নদীটী অসংখ্য জাহাজে পরিপূর্ণ, সমস্ত জাহাজের মাস্তুল জমাট বাঁধিয়া নিবীড় বন সৃষ্টি করিয়াছে। আমেরিকা, বৃটীশ, জাপান, ফরাসী নানা দেশের যুদ্ধ জাহাজ সমস্ত জেঠীগুলিকে উপযাচক হইয়া পাহারা দিতেছে। অদূরেই সহরের চিমনি হইতে ফ্যাক্টরীসমূহের ধূম গগনমণ্ডল অন্ধকার করিয়া চলিয়াছে। দেখিয়া মনে হয় যেন লণ্ডন বা নিউইয়র্কেই বুঝি আসিয়া পৌছিয়াছি। একমাত্র নদীতে ছোট ছোট চাইনিজ নৌকা 'সাম্পানগুলি' ছাড়া চাইনিজদের কোন চিহ্ন নাই। এই আধুনিকতাপূর্ণ বিরাট সহর দেখিয়া কে ধারণা করিতে পারিবে যে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে শুধু মেটেবাড়ী ও জোচ্চোরের আড্ডা ছিল! সহরে নামিলেই জাহাজ-নির্ম্মাণ কেন্দ্র, কটন মিল, সিল্ক ও বয়ন শিল্পাগার, তৈলের ট্যাঙ্ক ও সাংহাই হইতে-উসাংগামী দ্রুতগতির রেলগাড়ীসমূহ বিশেষভাবে চক্ষুতে পড়ে। সাংহাই এক্সপ্রেসের বা এই বিশেষ দ্রুতগামী ট্রেণের এই লাইন প্রথম সাংহাই ও কিয়াংওয়ান ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় বিগত ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে একটী ইংরেজ কোম্পানী কর্ত্তৃক। আজ উহা চীনাদের সম্মিলিত চেষ্টায় একটী বিশেষ নাম করা, দ্রুতগামী ও প্রয়োজনীয় রেল লাইন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাংহাইর Bund অঞ্চলে আমেরিকার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, কারণ অধিকাংশই

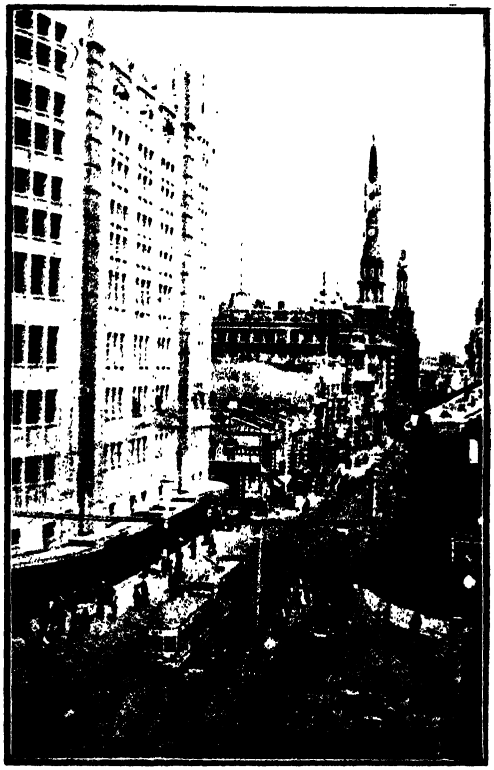
এখানে ২০।২১ তলা সুউচ্চ অট্টালিকা অবস্থিত। কলিকাতাবাসী আমরা উক্ত শ্রেণীর দালান বা উহার নির্ম্মাণকৌশল সম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারিব না। কিছু দূরেই French Bund ও নানকিন রোড। সাংহাই সহরের এই স্থানটীই সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল, সুন্দর, প্রয়োজনীয় ও উল্লেখযোগ্য। নানকিন রোডের দুই পাশেই দুইটী সুবৃহৎ অট্টালিকা—একটী ক্যাথে হোটেল অপরটী প্যালেস হোটেল; অদূরেই বহু ব্যাঙ্ক ও প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "North China Daily News" অফিস অবস্থিত। সম্প্রতি সংবাদপত্রে



সাংহাইএর একটি গগনস্পর্শী অট্টালিকা—
বোমা বিস্ফোরণে ধ্বংস হইয়াছে।

দেখা গেল যে চীনজাপান সংঘর্ষের ফলে এই স্থানটী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে—গগনস্পর্শী উভয় হোটেলই ধূলিতে পরিণত হইয়াছে এবং অন্যূন তিন হাজার লোক বোমা বিস্ফোরণে ও বিষাক্ত গ্যাসের প্রকোপে পড়িয়া এই নানকিন রোডের উপর ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে Cathey Hotelএর ভগ্নাবশেষ চিত্র দেখিয়া মনে হইল—হায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জিনিসের আজ এই অবস্থা! ইহাকেই বলে প্রকৃতির নির্ম্মম পরিহাস।

সাংহাই বাণিজ্যপ্রধান স্থান হইলেও শিল্পেও ইহা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। বর্ত্তমানে ৬১টী কাপড়ের কল, ৬৬টী সিল্কের ফ্যাক্টরী, ৩৪টী লোহ কারখানা ও বহু দিয়াশলাই, সাবান, সিগারেট ও কাগজের কল এই সহরের বুকে পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। পুস্তকাদি ও সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রকাশের সাংহাই সহরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ Publishing Centre—এখানেই চীনের অধিকাংশ সংবাদপত্র, পুস্তক ও অপরাপর বিজাতীয় ভাষার বিষয়সমূহ



সাংহাই সহরের প্রসিদ্ধ রাস্তা—নানকিং রোড—
সম্প্রতি ইহা বোমাবর্ষণে ধ্বংসীকৃত হইয়াছে।

ছাপান হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে সাংহাই পাওয়ার কোম্পানী, সাংহাই টেলিফোন কোং, সাংহাই ইলেকট্রক কনষ্ট্রাকশন কোম্পানী (ট্রামওয়ে), সাংহাই জেনারেল অমনিবাস কোম্পানী, গ্যাস কোম্পানী, ওয়াটার ওয়ার্কস কোম্পানী প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চশ্রেণীর কাজ সরবরাহ করিয়া সাংহাইকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সহর-সমূহের অন্যতম করিয়া তুলিয়াছে। অনেকেই হয়ত জ্ঞাত

নহেন যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা ইলেক্‌ট্রিসিটী ও বাসভাড়া পাওয়া যায় একমাত্র এই সাংহাই সহরে।



ডাকটিকিট কাটীয়া প্রস্তুত একটি চীনা মেয়ের ছবি টিকিটে সানইয়াৎ সেনের ছবি দেখা যায়।



জলযান বহুল সাংহাই বন্দরের একাংশ (সম্প্রতি বোমাবর্ষণে এই অংশ ধ্বংস হইয়াছে)

সাংহাইকে আধুনিক সহর বলিতেই হইবে—বিগত কয়েক বৎসরে ইলেট্রিসিটী প্রভৃতির খরচের আধিক্য দেখিলেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৭,৯১৯,৮৪১ ইউনিট ইলেকট্রিসিটি জ্বালান হইয়াছিল; বিগত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে উহা বাড়িয়া ৫৭৫,৬৪৭,৯০৭ ইউনিটে উঠিয়াছে; বর্ত্তমানে অবশ্য আরও অনেক বেশী। অনুরূপভাবে কয়লার খরচা (গ্যাসের জন্য) ২০,৪৫৬ টন হইতে ৫০১,৬৩০ টনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সাংহাই নদীর ধারে অবস্থিত বলিয়াই হউক বা অপর কোন অজ্ঞাত কারণেই হউক স্থানটী এখনও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কোন কোন অঞ্চলে এখনও নবাগতদিগের টাইফয়েড প্রভৃতি যথেষ্ট হইতে শুনা যায়। ইহার মাটী (Soil) মোটেই ভাল নয়। উহার উপর কাঠ ইট প্রভৃতি ফেলিয়া প্রত্যেক বৎসর শক্ত করিবার প্রয়াস হইতেছে এবং এই চেষ্টা অনেকাংশে সাফল্য লাভও করিয়াছে। কারণ এই ভিত্তির উপরই বর্ত্তমানে অসংখ্য ২৫।৩০ তলা সুরম্য অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। সাংহাইর মাটীর এই দোষেই এখানে মাটীর নীচে রেলগাড়ী (underground বা tube railway) প্রভৃতির প্রবর্ত্তন হয় নাই। কথিত আছে যখন ইংরেজগণ প্রথমে এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন তখন এই স্থান স্যাঁতসেতে ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহু খারাপ রোগের বাসস্থান ছিল। বর্ত্তমানেও নাকি ওয়াংপুর হাওয়া লাগাইলে ও জল পান করিলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য স্থানীয় 'ওয়াটার ওয়ার্কস' বিশেষ ভাবে পরিশ্রুত জল সর্ব্বসাধারণের নিকট সরবরাহ করেন। প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র সাংহাইর আন্তর্জাতিক সহরেই গড়ে ৬৫,০০০,০০০ গ্যালন জল ব্যয়িত হয়। স্থানীয় এই ওয়াটার ওয়ার্কসের চেষ্টায় সাংহাইর জলের কষ্ট সর্ব্বাংশে দূর হইয়াছে বলিতে হইবে।

সাংহাই সহর নানাভাবে উপভোগ্য। রাত্রি বেলাই ইহা বিশেষ উপভোগ্য—(Shanghai by night) সাংহাইর নৈশজীবন এত প্রসিদ্ধ যে প্যারিস প্রভৃতি পৃথিবীবিখ্যাত সহরসমূহের নৈশজীবনের সহিত সমান ভাবে তুলনা চলে। নানকিন রোড বাহিয়া প্রায় দেড় মাইল রাস্তা যাইবারপর দুইটী গগনস্পর্শী অট্টালিকা চক্ষুতে পড়ে। একটীর নাম Wing on ও অপরটী Sincere. দুইটীই বড় দোকান বা departmental store. এক একটী দোকান এত বড় যে সমগ্র (Hogg) মিউনিসিপাল মার্কেটের মত দুই তিনটী উহার ভিতর ভরিয়া রাখা যায়। প্রাতঃকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত এই দোকান সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে এবং রাত্রি ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত এই পঁচিশতলা দালানের ছাদের উপর roof garden করা হয়।



সাংহাই পোষ্টাফিস

Roof garden সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। টিকিট করিয়া পরে Lift সাহায্যে এই বিশাল অট্টালিকার ছাদে উঠিলাম। দেখি আশ্চর্য্য ব্যাপার—এ যেন আমাদের দেশের 'কার্নিভ্যাল'। ছাদে বাগান আছে—থিয়েটার, বায়োস্কোপ, ম্যাজিক, নাচ, গান প্রভৃতি এক এক কোঠায় হইতেছে। সব স্থান ভর্ত্তি অন্ততঃ ৪।৫ হাজার লোক উহার দর্শক। এই দর্শকের মধ্যে অধিকাংশই যুবক ও বাকী সমস্ত যুবতী। অল্প পরিসর কোঠার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া ইহারা নানারূপ আমোদ উপভোগ করিতেছে। কোথাও বা মেয়েরা অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করিতেছে, আর ছাত্ররা দর্শক হিসাবে তাহাদের নাচের তারিফ করিতেছে। উগ্র মদের গন্ধে স্থান ভরপুর—অসভ্যতার যত কিছু আছে সমস্তই সেখানে পাওয়া যায়। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত এই লোকসমাগম ও ছেলে মেয়েদের অবাধ মিলামিশা প্রভৃতি এখানে চলিবে—সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে কতজনের স্বাস্থ্য, অর্থ, চরিত্র। অল্প কথায় ইহাকে 'উদ্যান' না



সাংহাইএর প্রসিদ্ধ রাস্তা নানকিন রোড—বোমাবর্ষণে বর্ত্তমানে ধ্বংস হইয়াছে

বলিয়া "নরককুণ্ড" নাম দিলে শোভন হইত। আমার একজন বন্ধু বলিলেন এইগুলি বর্ত্তমান সভ্যতার চিহ্ন। আমি মনে মনে বর্ত্তমান সভ্যতার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরে দেখিলাম যে জাপানের কোবে, ওশাকা ও টোকিও প্রভৃতি স্থানও এই সভ্যতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। 'হংকং'এও এই Wing on ও Sincereএর ব্রাঞ্চ অফিস আছে, তাহা পরে দেশে ফিরিবার সময় চক্ষুতে পড়িয়াছিল। সুখের বিষয় এই যে ঐ সভ্যতার হাওয়া এখনও ভারতবর্ষে সংক্রামিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রগতির যুগে "Calcutta By Night" শীঘ্রই হইয়া উঠিবে—এ আশঙ্কা যে মনে মনে একেবারে



নদীর ওপারে সাংহাইএর প্রসিদ্ধ রাস্তা—The Bund—বর্ত্তমানে যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্র।

নাই এমন নহে। সুখের বিষয় এই যে এই সভ্যতার আলোক কলিকাতায় যত বিলম্বে আসে ততই এদেশবাসীর বিশেষ করিয়া তরুণ ছাত্রমণ্ডলীর কল্যাণকর।

সাংহাইতে আমার দিনগুলি খুবই সুখে কাটিতেছিল। একদিন প্রসিদ্ধ চৈনিক যাদুকর লং টাক সাম মহাশয়ের প্রেক্ষাগৃহটী দেখিয়া আসিলাম। 'লং টাক সাম' চীন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর, ইতিপূর্ব্বে চিং লিং সুঃ ছাড়া অপর কোন চাইনিজ যাদুকর পৃথিবীতে এত নাম করিতে সমর্থ হন নাই। লং টাক সাম তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমেরিকায় ও ইউরোপে কাটাইয়া থাকেন। ৫।৭ বৎসর পর কদাচিৎ মাতৃভূমিতে পদার্পণ করেন। বিখ্যাত ইংরেজ যাদুকর মিষ্টার ই, এ, ডার্ণ মহাশয় তখন সদলবলে সাংহাইতে ছিলেন। আমার সাংহাইতে আগমনবার্ত্তা শুনিয়া ডার্ণ সাহেব আমাকে সম্বর্দ্ধনাদানের বিপুল বন্দোবস্ত করেন; সদলবলে আমাকে তিনি চা-পার্টি ও প্রীতিভোজ দানে আপ্যায়িত করেন। পরে উভয় দেশের দুইজনের ভাবের আদান প্রদান হইল। দেখিলাম মিষ্টার ডার্ণ একজন উচ্চশ্রেণীর যাদুকর—তিনি থ্‌ার্সটন, কার্টার, লেভান্তে, নিকোলা, মেডাম হারম্যান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাদুকরের বন্ধু এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকর 'হাউডিনি' বা 'হুডিনি'র পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি আমার খেলা দেখিয়া আমাকে 'Houdini of India' নাম দিলেন। অবশ্য সিঙ্গাপুরের Sunday Tribune প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহ ইতিপূর্ব্বেই আমাকে ঐ নাম দিয়াছিল। ডার্ণ সাহেব ইতিমধ্যে এক প্যাকেট প্রকাণ্ড বড় (Giant Card) তাস আনিয়া আমার হাতে দিলেন ও বলিলেন "তোমার ভারতীয় যাদুবিদ্যার কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত হইল।" (In appreciation of the great achievement you have made in the art of Indian Conjuring) এত বড় তাস আমি জীবনে কখনও দেখি নাই—পরে ঐ সাহেব আমাকে ঐ তাসের ভাল ভাল কতকগুলি খেলাও শিখাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন চাইনিজদের থিয়েটার দেখিতে যাই—উহাদের নৃত্য ও গীত বেশ মনোমুগ্ধকর ও শ্রুতিমধুর। চীনের সিনেমাচিত্রগুলি বেশ আধুনিক ও উহাদের চিত্রগৃহ আরও আধুনিক। কলিকাতায় ঐরূপ চিত্রগৃহ একটীও নাই। সাংহাইতে পোষ্টাফিস গৃহটীও বিরাট—এখানকার পোষ্টাফিসের কাজকর্ম্ম বিশেষ প্রশংসনীয়। যাহা হউক চীন সম্বন্ধে আমাদের একটী অত্যন্ত খারাপ ধারণা আছে। উহাদের ভিতর শিক্ষা, কৃষ্টি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি যে

উন্নতি করিতে পারে উহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু নব্য-চীন জগতে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহা অবর্ণনীয়। কবি একদিন এই চীন ও জাপানকে 'অসভ্য' বলিয়াছিলেন কিন্তু উভয় দেশই তাহার পাল্টা-জবাব হাতে-কলমে দিতে ভুলে নাই। ডাক্তার সান ইয়াৎ সেন চীনে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণ আনিয়া দিয়াছেন। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ চাইনিজরা নিজের দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে বসিয়াছে। বর্ত্তমানে সান ইয়াৎ সেন আর ইহজগতে নাই—কিন্তু তিনি যে প্রেরণা দেশমধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অমর। তাঁহার প্রিয় শিষ্য 'চিয়াং চাইশেক' তাঁহারই আদর্শে চলিয়া চীনের বর্ত্তমান ভাগ্য-নিয়ন্তা। সাংহাইর অদূরেই নানকিনে তাঁহার কর্ম্মস্থল। এই নানকিন সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন। সাংহাই হইতে ট্রেণে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই চীন সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পৌছান যায়। চিয়াং কাইশেকের চেষ্টায় নানকিন আজ চীনের শ্রেষ্ঠ সহরের অন্যতম। অসংখ্য সুরম্য অট্টালিকা—উন্নত ধরণের রাজপথ, গাড়ী ঘোড়া ও উড়োজাহাজের শব্দে আজ নানকিন সহর শোভিত ও মুখরিত। ডাক্তার সানইয়াৎ সেন যেরূপ কাণ্টন সহরকে কয়েক বৎসর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন জেনারেল চিয়াং কাইশেকের অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় আজ নানকিন চীন সাম্রাজ্যে তদ্রূপই একটী সমৃদ্ধিশালী সহরে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি চীন ও জাপানের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছে ইহার ফল কি হইবে জানি না। হয়ত বা একটা স্বাধীন জাতি আবিসিনিয়ার ন্যায় শত চেষ্টা করিয়াও আর আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। সাম্রাজ্যবাদী জাপান হয়ত ছুরিকা সাহায্যে কেকের মত চীন সাম্রাজ্যের এক অংশ শীঘ্রই কাটিয়া লইতে সমর্থ হইবে। কিন্তু চীন বর্ত্তমানে যেরূপ দেশভক্তি দেখাইতেছে ও দেশের জন্য আজ তাহারা যেরূপ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত তাহা জগতের ইতিহাসে চিরদিন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। জেনারেল চিয়াং আজ চীনকে নূতন রূপ দিয়াছেন, আজ তিনিই সমগ্র সাম্রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। জাপানের সামরিক বিভাগের ক্ষমতা কতদূর তাহা তিনি বিগত দশ বৎসর জাপানে দ্বীপান্তরিত থাকা অবস্থায় বিশেষ অবগত আছেন। তাহাদের বিজয় গর্ব্বের হুমকি এবং শত শত শিক্ষিত সৈন্য ও মারণ অস্ত্রের সম্মুখে জেনারেল চিয়াং যেভাবে দাঁড়াইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। দুর্ব্বলের প্রতি দুর্ব্বলের সহানুভূতি থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক; তাই চীনের বিজয়ে দুর্ব্বল ভারতবাসী আমরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিব।" তাই জেনারেল চিয়াং কাইশেক আজ দেশমধ্যে যে ঐক্য ও স্বদেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে সুদূর ভারতবাসী আমরাও যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইতেছি। সাংহাইর উপকূলে চীন-জাপান সংঘর্ষে চিয়াং এর বিজয় নিশান দেখিবার জন্য দুর্ব্বল আমরা অতিশয় ব্যগ্রভাবে তাকাইয়া আছি। চীনের ভাগ্যনিয়ন্তা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হউন তাহাই আমাদের অভিলাষ। (ক্রমশঃ)

বিসর্জ্জন

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

ভাসান দেখিয়া এনু জাহ্নবীর তীরে।
হেরিলাম বিসর্জ্জন বহু মূরতির
নদীর কাজল জলে নিথর গভীর,
গুরুভার লয়ে বক্ষে ফিরিনু কুটীরে।

স্তব্ধ অর্দ্ধ রাত্রি এবে, মোর আঙিনায়
একাকী বসিয়া আছি; আঁধার গগনে
অযুত নক্ষত্ররাজি মোর পানে চায়
তিমির পল্লব তলে নিস্পন্দ নয়নে।

কানে আর নাহি জাগে মাদলের রব,
মশালের দীপ্রালোকে অমল প্রতিমা
মানবী আকারে আর মুগ্ধ নাহি করে।
ঘনীভূত অন্ধকারে ডুবিয়াছে সব
রূপরেখা, কল্পনার বাসনার সীমা,
তিমিরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহস্য শিহরে।

"শনৈঃ"

শ্রীমতী মলিনাবালা ঘোষ

(গত আশ্বিনে প্রকাশিত অংশের পর)

মণিকা বাড়ী ফিরে স্বামী প্রিয়রঞ্জনকে গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে "স্বদেশী-বিদেশীর" তর্ক আলোচনার কথা সব বিস্তারিত বল্‌লে। প্রিয়বাবু সমস্ত কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং মাঝে মাঝে দু একটা প্রশ্ন করে জেনে নিলেন—মণিকার তর্ক এবং উপদেশের মূল তাৎপর্য্য কি। তিনি বল্লেন "তুমি ত অনেক কথা ব'লে এলে, কিন্তু বিদেশী বিদায় করবার উপদেশটা নিজের ঘরে পালন কর্ত্তে পারবে ত?"

মণিকা বল্লে—"তা কেন পারব না? আমার যেটুকু অসুবিধে সেটা তোমার চাকরী; তা না হ'লে আমি সমস্তই স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করতাম।"

প্রিয়বাবু উত্তর দিলেন, "ওটা ঠিক কাজের কথা নয়, কারণ আমার চাকরীর মধ্যে এমন কোন কথাই নেই যে বিদেশী জিনিষ কিনতেই হবে। আসল কথা, তোমাদের মনের সঙ্গে কাজের মিলনটা ঘটে কম; যখন আলোচনা কর, তখন ঠিক; দোকানে ঢুকে জিনিষ কেনবার সময় আর মাথা ঠিক থাকে না। পয়সা ব্যাগে থাকে, আর জিনিষের quality (গুণ) খুঁজতে খুঁজতে পছন্দ দাঁড়িয়ে যায় বিদেশী জিনিষের ওপর।"

মণিকা বল্লে, "আমি জানি তুমি দিশী জিনিষ তেমন পছন্দ কর না, তাই আমি মনোমত জিনিষ বিদেশী হ'লেও কিনে থাকি; তোমারই মনস্তুষ্টির জন্যে করি, আর তুমিই বল 'চোর'।"

প্রিয়বাবু—"তা হ'লে আর আমার চাকরীর জন্যে বিদেশী কেনা নয়! দেখ তোমার মনের মধ্যেই গলদ রয়ে গেছে। তর্কে লাভ নেই; আমিও তোমার সঙ্গে একমত যে একেবারে সমস্ত জিনিষ স্বদেশীই নেব; এখন একদিনে তা সম্ভব হবে না কিন্তু চেষ্টা করলে আমরা অত্যাবশ্যকীয় বিদেশী জিনিষের ধরণের জিনিষগুলো দেশে তৈরী ক'রে নিতে পারব। কিন্তু ইতিমধ্যে বিলাস উপকরণের বস্তুগুলো আমরা বর্জ্জন করতে পারি। 'নেব না'—এই একমাত্র কথা। Refrigerator কেনবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়েছ, সেটা কিনব না; ঘর যে "air conditioned" করবার কথা হ'চ্ছে, সে বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে; Radioর গান না শুনলে চ'লে যাবে, অনেক টাকায় কেনা হ'য়েছে, এস ওটা বিক্রী ক'রে ফেলি। Camera, binocular প্রভৃতি না হ'লে কি আসে যায়? Camera ব্যবহার করা মানে প্রতিপদে বিলিতি জিনিস কেনা। অনেক ছবি আছে, এখন আর নতুন দরকার নেই। সপ্তাহে সপ্তাহে তোমার ওজন নেওয়ার জন্যে weighing machineটা রয়েছে; একেবারে অপ্রয়োজনীয় না হ'লেও প্রয়োজন যতটা, তার জন্যে যেমন প্রতি ঘরে কেনার বাতিক হ'য়েছে, সেটা দূর করাই ভাল।"

মণিকা একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। এর অনেকগুলো জিনিষেই তার লোভ ছিল। কেবল যে বেঁচে থাকার আরাম বাড়বে সে কারণে নয়, তার সব বড় বড় বন্ধু মহলে furnished বাড়ীর মালিক হিসাবে তার যে প্রতিপত্তিটা গ'ড়ে উঠ্‌ছিল সেটা ভেঙ্গে যাবার জোগাড় হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু নিজের ফাঁদে নিজে প'ড়ে গেছে, উপায় নেই। বল্লে "একেবারে এত না হ'লেও চলত।"

প্রিয়বাবু বল্লেন, "তবেই দেখ তোমার মনের অবস্থাটা কি? না হ'লে চলবে কি ক'রে? গোবিন্দবাবু আর তাঁর অনেক সঙ্গী এ সব আরাম আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভোগ করতে পারতেন কিন্তু পাগলাগুলো কিসের জন্যে সে সব ছেড়ে দুঃখ বরণ করছে, নির্য্যাতন ভোগ করছে! আর কোনও কারণে না হ'লেও এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হ'লে, চোখোচোখি চাইতে হ'লে আমাদেরও ত কতকটা ত্যাগ করতে হবে। এতে সুবিধা হবে কাদের? আমাদেরই ছেলেপুলের; তারা দুমুঠো খেতে পাবে। আমি তোমার সেলাই কল রাখবার পক্ষপাতী, আমার টেলিফোনটা থাকলেও হয়, গেলেও হয়। আমার typewriterটা দরকার। Cycleটা সংসারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু মোটরখানা যদি বিদেয় করি, কেমন লাগবে তোমার?"

মণিকা বুঝলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। গোবিন্দবাবুর কাছে সে বেশ বক্তৃতা ক'রে এসেছিল, কিন্তু স্বামীর ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি বুঝে চিন্তায় পড়ল।

প্রিয়বাবু বলে গেলেন "আমাদের মত লোকই দেশের আবহাওয়া নষ্ট ক'রেছে। অবস্থার বাইরে হ'লেও আমরা অনেক জিনিষ ক'রে বসি। মেয়েছেলের বিয়ে, Party, Excursion, ছুটী পেলেই বায়ু পরিবর্ত্তন, ছুতো পেলেই উপহার, যৌতুক এ সব ক'রে থাকি; মধ্যবিত্ত গরীব, তারাই অনুকরণ করতে গিয়ে মারা পড়ে। মণি, তুমি বেশ ক'রে দেখ আজ আমরা কোথায় দাঁড়িয়েছি। কত লোক নিরন্ন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, শিক্ষা, চিকিৎসা বিহনে জড়পিণ্ডের মত আছে। তুমি গোবিন্দবাবুকে যে পরামর্শ দিয়েছ, এস আমরা তা পালন করি। মনে মনে আড়ম্বর ত্যাগ ক'রে, আমরা তাই করি। বাহিরের ব্যবহারে লোক বুঝুক আমাদের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি; কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমরা চেষ্টা করি যাতে দেশের পয়সা দেশে রাখতে পারি, দেশের লোকের মুখে অন্ন দিতে পারি। তুমি ভেবে দেখ গোবিন্দবাবুর কথা অনেকটা ঠিক; একেবারে খাঁটী স্বদেশী হব, প্রতিজ্ঞা করলেও অনেক বিদেশী জিনিষ আমাদের ঘরে প্রবেশ করবেই। আজ আর

আমার Pencil sharpner না হ'লে চলে না, fountain pen, torch, safety razor, flask, nail cutter, stove, curtains, curtain rods—আবার একটা কথা মনে প'ড়ে গেল, এটা আমাদের আর কাঠের হ'লে চলে না—এখন একেবারে "Made in England" এবং spring হ'তে তৈরী, টানলে বাড়ে, বলবার খাতিরে আমরা তাকে "rod" বলে থাকি—এ সব আমাদের চাই। তোরঙ্গ বিদেয় ক'রেছি এখন আমাদের হ'য়েছে Suit case, attache case, holdall প্রভৃতি। একটা Rain coat এখন বাইরের সঙ্গী। ঘরের মধ্যে আসবাব গুলোও যথারীতি বদলে যাচ্ছে। চেয়ার, easy chair, টেবিল, drawing room suite, dressing table, cushion, hat stand প্রভৃতি মাত্র কয়েকটা নাম বল্লাম! পাপোষ বিদেয় হ'য়েছে; তারের এবং বিলিতি door mats, stair treads প্রভৃতি আমদানী হ'য়েছে।"

মণিকা বল্লে, "জীবন ধারণ করতে যেটুকু সুখ ভোগ করা যায়, সেটুকু ছেড়ে দেওয়া মানুষের উচিৎ নয়। আমাদের standard of living নাবিয়ে দিয়ে, আমরা সুখীর চেয়ে দুঃখী হ'য়েছি বেশী। জগতের কাছে আর আমাদের ইজ্জত নেই।"

প্রিয়বাবু বুঝলেন মণিকা মনে মনে রাগতে আরম্ভ ক'রেছে। বাইরের আন্দোলন দেখে তাঁর নিজের মনের মধ্যে অনেক দিন এ বিষয় তোলাপাড়া করছিল; পাছে মণিকা মনে কষ্ট পায়, কতকটা নিজের মনের কোন গোপন কোণে এর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন আসক্তি, কতকটা সুযোগের অভাব, আর কতকটা আলস্য, এই সব মিলিয়ে মন তৈরী হ'লেও প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। সরকারী চাকরী তাঁর মন জয় করতে পারেনি; লাট বেলাটের সঙ্গে মিশতে মিশতে, আদব কায়দা কিছু কিছু ঘরে প্রবেশ করছিল বটে, কিন্তু ভারতের আথিক অবস্থা তাঁকে পীড়া দিত। ছেলেমেয়েরা এই হাওয়ায় বাড়ে, সেটা তিনি অপছন্দ করেন; আবার বিনা কারণে জেলে যায়, লেখাপড়ার ক্ষতি করে, অনধিকার ব্যাপারে লিপ্ত হয়, এগুলোও তাঁর মনোগত ইচ্ছা নয়। আজ মণিকা যখন কথাটা তুলেছে তখন এই ঝোঁকে একটা মীমাংসা হওয়া মন্দ হবে না, মনে করলেন। তিনি বিচলিত না হ'য়েই বল্লেন "standard of living কয়েকজনের বাড়লে ত হবে না, সমস্ত জাতের বাড়লে তবেই হবে। বিলাতী ধরণে জীবনের চাল এবং অভাব বাড়ালে হবে না; দেশের হাওয়া দেখে, দেশে কি পাওয়া যায় তাই দেখে, সাধারণ লোকে যাতে খরচায় কুলোতে পারে তাই দেখে, চাল বাড়ালে তবেই ভাল। বিলিতি ধরণের জিনিষ দেশী ক'রে চালাতে গেলেও একটু বিপদ যে নেই তা নয়। তখন আবার পছন্দসই জিনিষের প্রশ্ন উঠে পড়ে, আর সেই রন্ধ্রে বিলিতি শনি প্রবেশ করে, একথা তুমি স্বীকার করেছ। আমরা যে কি অবস্থায় আছি, তা ভেবে দেখ। ছোট জিনিষেও আমরা নিজসত্তা হারিয়েছি। কেউ বাড়ী এলেই চায়ের কথা বলে আমাদের ছুটী। চা উপলক্ষে দেখ ব্যবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কি? আমাদের চা, কফি, কোকো, এই হ'ল সাধারণ পানীয়। কেট্‌লি, কপ্, ডিস্, ট্রে, ইত্যাদি তাদের সঙ্গী। আরও 'জলপথে' অনেক কিছু আছে, সে কথা থাক। ছেলেদের lozenge, ice cream, "Happy Boy," chocolate প্রভৃতি চল্‌ছে। Jam, jelliesএর শ্রাদ্ধ করি, দেশী মোরব্বা ভাল লাগে না। সিগার আর সিগারেট, তামাক বেচারাকে দূর করেছে। সিগারেট তৈরী করবার কাগজ, মশলা, pipe, pouch বহু টাকা নিয়ে যায়; আর রেখে যায় ভগ্নস্বাস্থ্য। মণি, দেখতে পাওনা তোমার আর তোমার মেয়ের প্রসাধনে কি বিপর্য্যয় ঘটে গেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলে সর ময়দা" যে কেবল ময়লা দূর করে তা নয়, ত্বক্ সুস্থ ও মোলায়েম রাখে। তোমার এখন snow, cream, pom de, powder, rouge, lip-stick ইত্যাদি ছাই ভস্ম কত কি চাই। এসেন্স, (এখন আতর গেছে), অডিকলম (Eaudecologne), সাবান, আর soap-case বা কত বদলালে, এখনও যে পছন্দ শেষ হ'য়েছে ব'লে ত মনে হয় না। মাথার বুরুষ, কামাবার বুরুষ আমারও দরকার। Shampoo আবার দরকারী জিনিষ হ'য়ে পড়ছে; জানি না standard of living কি বাড়বে এতে? তোমার এমব্রয়ডারী, ক্রচেট্, কার্পেট, সেলাইয়ের ছুঁচ, চুলের বিলাতী কাঁটা, সেফ্‌টী-পিন, ক্লিপ প্রভৃতি সব মিলিয়ে কেবল যে চাল খারাপ করে তা নয়; টাকাও যথেষ্ট নিয়ে যায়। টাকা যতটা বিদেশে যায় ততটা আরাম দিতে পারে কিনা বলতে পারি না। সামান্য জিনিষ টুথব্রাস্ টুথপেষ্ট কেমন স্থান দখল করেছে। বিদেশী অনেক অভিজ্ঞের মত যে এর অনেকগুলোই একেবারে বাজে এবং মাজনের অনেকগুলোর ভিতর মাড়ীর ক্ষতিকারক রাসায়নিক জিনিষ থাকে। বেচারা "জিবছোলা"র প্রাণান্ত ঘটেছে "tongue scraper"এর হাতে পড়ে।"

মণিকার প্রথম উত্তেজনা অনেকটা সংযত হয়েছে। গোবিন্দবাবুকে দেওয়া কার্য্যপদ্ধতি স্বামীর আলোচনায় অনেকটা বিপন্ন হ'য়ে উঠেছিল। কথাবার্ত্তার মাঝে চঞ্চলতা খানিক দেখাও দিয়েছিল; স্বামীর সমস্ত কথা শুনে তার অনেকটা কেটে গেল।

তখন বল্লে "যা হ'য় স্থির কর, সেই রকম করা যাবে।"

প্রিয়বাবু দেখলেন হঠাৎ কিছু করলে মণিকার এমনই কোনও কষ্ট না হ'ক, মনের ওপর কতকটা অত্যাচার করা হবে। কিন্তু গোবিন্দবাবুকে যখন নিজে পরামর্শ দিয়েছে, তখন তাঁর সামনে কথাবার্ত্তা হ'লে নিজের মান বজায় রাখবার জন্যে সে অনেকটা কঠোরতা অবলম্বন করতে পারবে। তাইতে বল্লেন "একদিন গোবিন্দবাবুকে আনা যাক্, তারপর স্থির হবে।"

মণিকা কতকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল, কিন্তু মনের মধ্যে তার বেশ আলোড়ন সুরু হ'য়ে গেছে। তাই সে স্থির করলে শীঘ্রই একদিন সেখানে যাবে।

*   *   *   *

গোবিন্দ বাড়ীতে কতকটা পরিবর্ত্তন সাধন করেছে। প্রথমে বিলিতি জিনিষ বর্জ্জন সুরু করলে, দেখলে তার ঘরে ও রকম বিশেষ কিছু নেই। হরিকেন, টর্চ্চ প্রভৃতি যা সামান্য ছিল, পরিবর্ত্তে প্রদীপ

প্রভৃতি চালালে। নিমের দাঁতন প্রচলিত হয়েছে। একখানা rug বা কম্বল আর একটা flask ছিল, তা এক ভাগ্নেকে দান ক'রে দিলে; তার লেখবার fountain penটারও ঐ রকম দশা করলে। তার এ সম্বন্ধে বেশী কিছু করবার ছিল না। ষ্টোভ নিয়ে বিপদে পড়ল, বড় দরকার অথচ দেশী নয়; এ রকম আরও দু-একটা যা বেরিয়ে পড়ল তা সুলেখার নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে ঘরে রাখতে বাধ্য হ'ল। বিদেশী ধরণের তৈরী দিশী জিনিষ পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প তখনকার মত স্থগিত রাখতে হ'ল। তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়ালো উপার্জ্জন যথাশক্তি করে নিয়ে এসে, স্বদেশী প্রচার করে বেড়ানো।

একদিন সংবাদ পেলে যে প্রতিবেশী নরনাথ বাবু কি এক পত্রিকা ছাপিয়ে রাজদ্রোহে পড়েছে এবং বছর খানেক তাঁর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়েছে। সংসারে এমন কিছুই রেখে যান নি যে পরিবারবর্গের দু-বেলা দু-মুঠো জোটে। ভিক্ষা করা গোবিন্দের প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল। ভাবলে, মণিকার মধ্যে বেশ দেশাত্মবোধ জন্মেছে হয়ত চাঁদা কিছু সেখানে পাবে। যেতে যেতে পথে এক যায়গায় দেখলে বেশ ভিড় হয়েছে। দাঁড়াতেই দেখ্‌লে মাঠের একধারে শিশুরা করছে "skipping"। শুনলে নানা রকম ব্যায়ামের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বিবরণ শুনে মনে মনে হাস্‌লে, দৌড় নাম পেয়েছে 'Race' আর প্রতিযোগিতা হচ্ছে, Hurdle race, Potato race, Spoon race, Egg race, ইত্যাদি। লাফ গুলো নাম পেয়েছে, Long jump, high jump, pole vault ইত্যাদি। সব বাঙ্গালীই, এমন কি তার মধ্যে নিরক্ষর যারা, বিনা কষ্টে তারা এ সব উচ্চারণ করছে এবং বুঝছেও বেশ। মনে ভাবলে ব্যায়ামগুলোরও ঐ রকম রূপান্তর হয়েছে, Drillএর মধ্যে সব ইংরাজি নাম। ব্যায়ামের কতগুলো Parallel Bar, Horizontal Bar, Ring প্রভৃতি সবই বিদেশী নাম। Dumb-bell আর Sandow একই জিনিষ। যন্ত্রবিহীন ব্যায়াম "Free-hand Exercise" আর মুলার (Muller) সাহেব নাকি ইহার প্রবর্ত্তক। মরেনি বোধ হয়, ডন্ বৈঠক, কিন্তু মুগুরভাজা বিদেয় হয়েছে। মাটীর কুস্তিটা, বাঙ্গলা দেশে থানার উঠানে স্থান পেয়েছে গোবিন্দ কয়েকবার থানায় হাজতবাসে এটা লক্ষ্য করেছে। লাঠি খেলা চলবার উপায় নেই।

চিন্তিত হ'ল; সে দেশের মধ্যে বিদেশী ভাব কতটা দখল করে বসেছে মণিকার কথার পর সেটা লক্ষ্য করতে শিখেছে, এখন সব ব্যাপারেই সে বিদেশী দেখ্‌তে আরম্ভ করেছে, তার যেন আতঙ্ক হ'য়ে পড়েছে। প্রিয়বাবুদের বাড়ী পৌঁছে সে যেন অবাক হ'য়ে গেল। আগে সে কখনও আসে নি; চারিদিকে চেয়ে মনে মনে বুঝলে কেন মণিকা বিদেশী ধরণের দিশী জিনিষ দূর করতে ভয় পায়। বাড়ীখানা পর্য্যন্ত ত্যাগ করলে তবে গোবিন্দর মতের সঙ্গে মেলে।

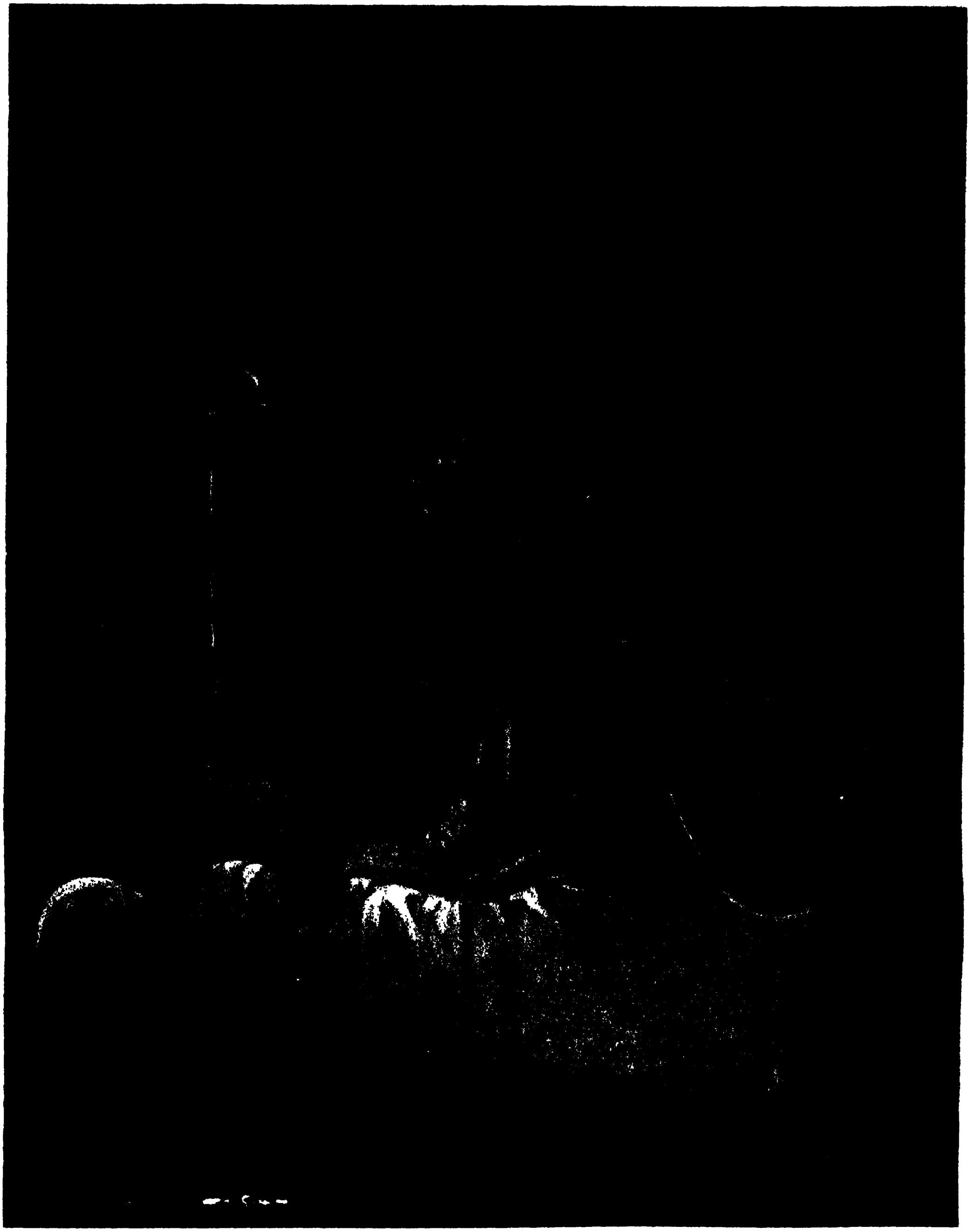
প্রিয়বাবু তাড়াতাড়ি এসে দেখা ক'রে বল্লেন "আসুন খেতে খেতে গল্প করি। আপনার সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা আলোচনা করেছি এবং আমার মতও অনেক বিষয়ে আপনার সঙ্গে এক।" গোবিন্দ আনন্দিত ও বিস্মিত হ'ল। প্রিয়বাবুকে সে একটু ভয়ের এবং অবজ্ঞার চক্ষে দেখত। গোবিন্দর দলের ধারণা, যারাই সরকারী চাক্‌রী করে—বিশেষতঃ মোটা মাহিনা পায়, তারা অপদার্থ; তাদের মতগুলো সবই দেশের স্বার্থের বিরোধী। প্রথম বিস্ময় চেপে সে সামান্য একটু উত্তর দিয়ে যেন অবাক হ'য়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। প্রিয়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে একটু হেসে বল্লে, "আপনার এ ঘরে ঢুকলে আর মনে হয় না, বাঙ্গালা দেশের কোথাও আছি। Crockery আর cutlery, ঘরের অন্য সাজ সরঞ্জাম, সাজিয়ে রাখবার সব আদব কায়দা, টেবিল চেয়ারে খাওয়া, তার আবার টেবিলখানি বেশ ঢাকা, নিজের গায়েও এক তোয়ালে ঢাক্‌লেন, ডিসের পর ডিস্ বদলে যাচ্ছে, যে দিচ্ছে তার চেহারা আর পোসাক, আপনার খাবার ভঙ্গী—এসব দেখে মনে হচ্ছে আমি বিনা মাশুলে লণ্ডন বা প্যারী সহরে এসে পড়েছি।"

প্রিয়বাবুর উত্তরে কিন্তু ক্ষোভ বা রাগ কিছুই নেই। মণিকা ইতিমধ্যে এসে প'ড়েছিল, সে যেন বড়ই লজ্জা অনুভব করছিল। প্রিয়বাবু বল্লেন "আমরা এসব ধরণ বদল করব স্থির করেছি; আপনার সঙ্গে আমাদের পরামর্শ আছে।"

গোবিন্দ যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে মনে করেছিল কিছু লাঞ্ছনাই সে পাবে, কিন্তু উত্তর শুনে সে বিশেষ লজ্জিত হ'ল। সে বল্লে, "আপনাদের তাহ'লে বড় কষ্ট হবে, অতয় কাজ নেই। আপনারা ইলেকট্রিকের যে পাখা, stand, shade, holder, bracket, calling bell heating apparatus প্রভৃতি ব্যবস্থা ক'রেছেন এসব ছাড়লে আপনাদের চল্‌বে কি ক'রে? আমাদের মত পাগলের বুদ্ধিতে পড়ে আপনাদের দুঃখ বাড়াবেন না?"

প্রিয়বাবু বল্লেন "আপনার মতন আমরা হয়ত অত পারব না; কিন্তু কতকটা ত পারি। আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থায় নিজেরাই লজ্জিত; আপনি যা বল্‌ছেন বা আপনি যতটা সংবাদ রাখেন, তার চেয়েও আমাদের লোকের অবস্থা আরও খারাপ। আমাদের বাগানের দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবেন, তার barbed wire fencing, mower, pruning shears, forks, trowels, sprayers, hose, syringe প্রভৃতি সবই বিলিতি। আমরা স্থির করেছি, এর কতটা দূর করতে পারি। অনেক ভাল ভাল বাগান আগে হ'ত, এঁরা যখন এদেশে আসে নি। আমি আপনার মত সবই শুনেছি। একটা পরামর্শ দিন না, কি ক'রে আরম্ভটা করা যায়।"

গোবিন্দ বল্লে "আপনার স্ত্রী ত সমস্তই বোঝেন এবং নিশ্চয়ই আপনাকে সব ব'লেছেন। আপনারাও ত আলোচনা ক'রেছেন যে বিলাসিতার জিনিষগুলো বিলিতি হ'লে মোটেই কেনা হবে না; বিলিতি ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো দেশে তৈরী করিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে হবে; যেগুলো বিদেশী না হ'লে চলবার যো নেই, তাদের বিলিতিই ব্যবহার করতে হবে। আমার আগে মত ঠিক



শিল্পী শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন ঠাকুর

পূজারী

Bharatvarsha Printing Works

এরকম ছিল না আপনার মিসেস্‌এর কথায় এটা স্থির করেছি। তেবে দেখলাম বিদেশী জিনিস, বিদেশী নেশা শনৈঃ অন্দরে প্রবেশ করেছে, ধীরে ধীরে তাদের substitute বা পরিবর্ত্ত দেখে নিয়ে তাড়াতে হবে।"

প্রিয়বাবু বল্লেন, "এটা এখনই কার্য্যে পরিণত করতে হবে। কিন্তু মতটা আমার আপনার আগেকার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে এক অর্থাৎ বিদেশী ধরণের জিনিসও দেশী হ'লেও, বিশেষতঃ যদি সহজেই ত্যাগ করায় গুরুতর অসুবিধা না হয়, তবে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই দূর করা ভাল। না হ'লে বিদেশী আসবেই।"

গোবিন্দর মন আনন্দে ভ'রে উঠল। তার সেখানে থাকার আর যেন কোনও প্রয়োজন নেই, এই তার কেবল মনে হ'তে লাগল। তাই "আজ আসি" ব'লে সঙ্গে সঙ্গে তার আসার কারণ জানালে। মাসিক কিছু সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গোবিন্দ একেবারে যেন গ'লে গেল এবং অনেক কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে প্রিয়বাবুর কাছে একটা ধমক্ খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বাঙ্গালীর খাদ্য

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এসসি

প্রবন্ধ

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই খাদ্য বিষয়ে উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কোন্ বয়সে কোন্ খাদ্য কি পরিমাণে আবশ্যক, কি প্রকারে রান্না করিলে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান অটুট থাকে, কোন্ দ্রব্যে খাদ্যের কোন্ প্রয়োজনীয় উপাদান বেশী এবং কিরূপে খাদ্যসামগ্রী সংরক্ষণ করা যায় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বৈজ্ঞানিকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের (League of Nations) একটি বিভাগ খাদ্যবিষয়ক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। সম্প্রতি ঐ বিভাগের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের খাদ্য গবেষণার বিষয় উল্লিখিত আছে; দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের নাম ঐ তালিকার মধ্যে নাই। সকল সভ্যদেশই জানে, প্রত্যেকটি নরনারী তাহার জাতীয় সম্পদ্, তাহাদের উন্নতিতে দেশের উন্নতি—জাতির মঙ্গল।

অনেকেই বলিবেন, আমাদের অন্ন-সমস্যা এত তীব্র ও শোচনীয় যে খাদ্যাখাদ্যের কথা শুনিয়া আমাদের লাভ কি? যদিও বার আনা বাঙ্গালীর পক্ষে একথা অতি সত্য তথাপি অবশিষ্ট চার আনা লোকের খাদ্য বিষয়ে ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবে যে কুফল ঘটিয়া থাকে তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

খাদ্য মানে যা খাওয়া উচিত; অবশ্য বিভিন্ন বয়স, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদির উপর এই ঔচিত্য নির্ভর করে। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর নিকট সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক হিসাবেও খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়। তবে আমি প্রধানতঃ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই দুই চারিটি কথা বলিব।

বৈজ্ঞানিকগণ পদতলস্থ বালুকণা হইতে সুদূর নক্ষত্র-লোকের সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে যেরূপ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—অন্যদিকে তেমনি আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য আহার্য্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমাদের খাদ্য পদার্থগুলি শরীরের উপর তাহাদের ক্রিয়া অনুসারে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম—তেজ সরবরাহকারী, দ্বিতীয়—গঠনমূলক। কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ—অর্থাৎ ভাত, রুটি, আলু এবং ঘৃততৈলাদি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রোটিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ মৎস্য, ছানা, ডিম এবং বিভিন্ন খাদ্যস্থ লবণ পদার্থ-গুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় পদার্থ মুখ্যতঃ গঠনমূলক হইলেও উহা স্থল বিশেষে প্রথম শ্রেণীর পদার্থের মত ব্যবহার করিতে পারা যায়। উল্লিখিত দুই শ্রেণীর পদার্থ ভিন্ন আর এক শ্রেণীর পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে। এই পদার্থগুলিকে ভাইটামিন বলা হয়। ভাইটামিনগুলি প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর খাদ্যকে শরীরের কার্য্যে যথাযথ নিয়োগ করিতে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন।

প্রথমে কার্বোহাইড্রেট সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। চাউল কম ছাঁটা হইলে এবং রুটি ময়দার না হইয়া আটার (whole wheat) হইলেই ভাল, কারণ তাহাতে তেজোৎপাদক উপাদান বাদে ভাইটামিন ও লবণ পদার্থ বেশী পাওয়া যায়। শাদা চিনির অপেক্ষা গুড় উল্লিখিত কারণেই শ্রেষ্ঠ। ভাত রুটি প্রভৃতি যত চিবাইয়া খাওয়া যায় ততই মঙ্গল, কারণ তাহাতে জীর্ণকারী লালারস সম্যক্ মিশিতে পারে; তদ্ভিন্ন অতি ক্ষুদ্রকণায় বিভক্ত হইলে উহারা পরে পাকস্থলী ও অন্ত্রের জারক-রসে সহজেই আর্দ্র হইতে পারে—ফলে পরিপাকের সুবিধা হয়। ভাত রুটি প্রভৃতি যে পরিপাকান্তে গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা শর্করাতে পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করে তাহা অনেকেই জানেন।

কার্বোহাইড্রেট পদার্থ পরিপাকান্তে যেরূপ গ্লুকোজে পরিণত হয় প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় পদার্থ সেইরূপ অ্যাসিডরূপে রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। শ্বেতসার, ইক্ষু-শর্করা প্রভৃতি যাবতীয় কার্বোহাইড্রেট হইতেই যেরূপ পরিশেষে একমাত্র গ্লুকোজ জন্মে—ডাল, ছানা, ডিম, মাংস প্রভৃতি সমুদয় প্রোটিন শ্রেণীর অন্তর্গত হইলেও উহারা সকলেই কিন্তু একই প্রকার অ্যামিনো এ্যাসিড উৎপন্ন করে না। অনেকেই অবগত আছেন এক একটি প্রোটিন পাচকরসের ক্রিয়াতে অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ছানা পরিপাক হইয়া যে যে অ্যামিনো অ্যাসিড যে যে সংখ্যায় উৎপন্ন করে ডালের প্রোটিন কিন্তু সেই সেই অ্যামিনো অ্যাসিড পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় জন্মায় না। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি রক্তস্রোতে প্রবেশ করিয়া নূতন মাংসপেশী নির্ম্মাণ ও পুরাতন মাংস-পেশীর ক্ষয়পূরণ করিয়া থাকে। আমাদের রস, রক্ত, স্নায়ুমণ্ডলী, ফুসফুস্, যকৃৎ, মস্তিষ্ক ও যাবতীয় মাংসপেশীর প্রধান উপাদান প্রোটিন—তদ্ভিন্ন পরিপাক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যে জারকরস নিঃসৃত হয় তাহাদের প্রধান উপাদান বা এন্‌জাইমগুলিও (Enzyme) প্রোটিন পদার্থ বলিয়াই সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। অথচ আমিষ খাদ্যের নামে আমাদের অনেকেরই অমূলক আতঙ্ক আছে। বিশেষতঃ মাংসের প্রোটিন উত্তেজক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মাংসের প্রোটিনে এমন ২।১টি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে যাহারা শরীর ক্রিয়া (metabolism) বৃদ্ধি করে বলিয়া শরীরের সাময়িক উত্তাপ বাড়ায়; কিন্তু তাহাতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। ফলতঃ গীতায় 'রস্যা, স্নিগ্ধা, স্থিরা, হৃদ্যা' বলিয়া আহার্য্যের যে বিশেষণ দেখা যায় তাহাতে স্থিরা মানে যাহার সারাংশ শরীরে থাকিয়া যায় ধরিলে উহা যে প্রোটিন এবং শরীর গঠনের উপযোগী প্রোটিন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ডাল, দুধ প্রভৃতির যে আমিষ পদার্থ গ্রহণ করি তাহাদের উৎপাদক সকল অ্যামিনো অ্যাসিডই যে আমাদের শরীর গঠনে লাগে তাহা নয়। যেগুলি আমাদের পেশী গঠনে (বিভিন্ন অঙ্গের) আবশ্যক সেগুলি গঠনমূলক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অপর অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির অ্যামিনো অংশ যকৃত বিচ্যুত হইয়া উহারা কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের ন্যায় তেজোৎ-পাদন করে। বিচ্যুত অ্যামিনো অংশ ইউরিয়া (urea) রূপে মূত্রযন্ত্র বা কিড্‌নী দিয়া মূত্রের সহিত নির্গত হয়। এই কারণে আমাদের শরীরের অনুপযোগী প্রোটিন বেশী খাইলে অথবা উপযোগী প্রোটিনও আবশ্যকাতিরিক্ত আহার করিলে উহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যবহার করে; ফলে কিড্‌নী ও লিভারের খাটুনী বাড়িয়া যায় এবং তজ্জন্য শরীরের সুস্থতার ব্যাঘাত জন্মে। বয়স্ক লোকের পক্ষে—যখন শরীরের গঠনমূলক কার্য্য প্রায় স্থগিত হয়, তখন বেশী আমিষ আহার এই কারণেই অবিধেয়। এই অবস্থায় আমাদের পিতা-পিতামহ পরিণত বয়সে আমিষ আহার নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে সপ্তাহের কোন দুই একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে যে আমিষ খাদ্য স্পর্শ করিতেন না তাহা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসঙ্গত। তবে বার্দ্ধক্যে বা প্রৌঢ়ে মাছ মাংসের প্রয়োজনের অভাব বিধায় বাড়ী হইতে আঁশের পাক তুলিয়া দেওয়া এবং শিশু ও বালক-বালিকাদিগকে 'নিজেদের' চেলা করিয়া তুলা যে মহা অনিষ্টকর তাহা স্থিরবুদ্ধি সকলেই বুঝিতে পারিবেন। অনেক সময় ঘৃত-দুগ্ধপুষ্ট মোহান্ত বাবাজী আমাদের দরিদ্র কাঁকড়া-চিংড়ী-খল্‌সে-পুঁটী-সম্বল গ্রাম্য কৃষকদিগকে নিরামিষের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া জাতীয় স্বাস্থ্যের যে কি মহা সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন তাহাও অনেকে অবগত আছেন। অজৈব প্রোটিনের মধ্যে চাউল ও গোল আলুর প্রোটিন আমাদের মাংস পেশীর ক্ষতিপূরণে উপকারী। তবে ছাঁটা চাউল ও

খোসাছাড়ান আলুতে ঐ উপকারী পদার্থ থাকে না বলিলেই চলে। অজৈব প্রোটিনের মধ্যে মসুরী, মুগ প্রভৃতি ডা'ল উপকারী হইলেও—জৈব প্রোটিনের মত সক্রিয় নয়। জৈব প্রোটিনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে খাদ্যবিদ্‌গণ সকলেই একমত পোষণ করেন। চৈত্র ১৩৪৩এর 'প্রবাসী'তে "ভারতে কৃষির উন্নতি" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে ডাঃ নীলরতন ধর মহাশয় বলিয়াছেন—"ডা'ল ছোলা ইত্যাদিতে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে কিন্তু এই সব উদ্ভিদ্ প্রোটিনে মস্তিষ্ক-বৃদ্ধি বিশেষ হয় না। মানসিক উন্নতির জন্য জৈব প্রোটিন খাওয়া উচিত। জৈব প্রোটিন ঘটিত পদার্থ—দুধ, দধি, মাংস, মৎস্য, ডিম্ ইত্যাদিতে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। জগতের বুদ্ধিমান জাতি মাত্রেই এই সব খাদ্য খাইয়া থাকে।" আমিষ নিরামিষ আহার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"যাঁর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্ম্মজীবন তাঁর পক্ষে নিরামিষ, আর যাঁকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে তাঁকে মাংস খেতে হবে বৈকি? রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বলিলে চলে না—জাতির তুলনা করে দেখ। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে হজম করতে। যদি হজমেই সব শক্তিটুকু গেল, বাকী আর কি কাম করবার শক্তি রইল!"

উপযুক্ত পরিমাণে উপযুক্ত প্রোটিনের অভাবে মানুষের অবয়ব হ্রাস পায়, শক্তিহীনতা জন্মে, প্রজনন-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ব্যাধি প্রতিষেধক ক্ষমতাও লোপ পায়।

প্রাণীজ প্রোটিনের মধ্যে দুগ্ধের স্থান অতি উচ্চে। আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর দুগ্ধের প্রাচুর্য্য ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কারণে গোচারণ ভূমি আবাদী জমিতে পরিণত হওয়ায় গোপালন কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নোক্ত কারণও উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে একান্নভুক্ত বৃহৎ কৃষক পরিবারে পাঁচ ভাই থাকিলে কেহ গোপালন করিত, কেহ বা মৎস্যাদি সংগ্রহ করিত এবং অপর তিন ভাই চাষবাস দেখিত। কিন্তু কালদোষে এখন গ্রাম্য কৃষকদের মধ্যেও 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হওয়ায় তাহারা হালের বলদ ব্যতীত অতিরিক্ত গোপালনে অসমর্থ এবং মৎস্যাদি ধরিবার তাহাদের অবসর মিলে না। এদিকে দারিদ্র্য প্রযুক্ত মাছ দুধ কিনিয়া খাইবার তাহাদের সামর্থ্য নাই। সুতরাং খাদ্যের প্রধান দুইটি অঙ্গ বাদ পড়াতে ইহারা দিন দিন ক্ষীণ-স্বাস্থ্য হইয়া ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগে সহজেই আক্রান্ত হইতেছে। এইরূপে বাংলার অনেক জেলাতেই কৃষিজীবী সম্প্রদায়—বিশেষতঃ হিন্দু কৃষকদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যহীনতা ও মৃত্যুর হার বৃদ্ধি এবং বংশ বিস্তারের কম্‌তি লক্ষিত হইতেছে। এদিকে দরিদ্র পরিবারে গৃহিণীও একক হইলে গৃহস্থালীর কাজ সারিয়া রান্নার জন্য বেশী সময় ও মনোযোগ দিতে পারেন না। ডা'লের বড়ী বড়া তৈরী করা বা গৃহ প্রাঙ্গণে জাত শাক, ডাঁটা, ডুমুর, থোড় প্রভৃতি যোগে মুখরোচক ব্যঞ্জনাদি তৈরীর সময় পান না—আচার আমচুর প্রস্তুত ত দূরের কথা। ফলে 'ম্যাল্‌নিউট্রিশন' বা উপযোগী খাদ্যের অভাব চলিতে থাকে। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'রামধন পোদ' প্রসঙ্গে বাঙ্গালী কৃষকের খাদ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"ইহাদের ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনর আনা সাড়ে উনিশ গণ্ডা, ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া—সুতরাং ইহাকেও শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। বাংলার চৌদ্দ আনা লোক এরূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে জীবন রক্ষা হইতে পারে, হইয়াও থাকে—কিন্তু এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন করে, আর এরূপ শরীরে বল থাকে না।"

বাঙ্গালী চিরদিনই দুধে-মাছে মানুষ; কিন্তু বর্ত্তমান কালের ন্যায় দুধের দুর্ভিক্ষ বোধ হয় বাংলা দেশে কোন সময়েই হয় নাই। রামপ্রসাদ সেনের কাব্যে "ফুল-চিনি-লুচি দধি-দুগ্ধ-ক্ষীর-ছানা" এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক গানে "দারা-সুত পরিপাটি, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি"—প্রভৃতি পদে তৎকালীন দুগ্ধের প্রাচুর্য্যই প্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য জীবনের যে চিত্র দিয়াছেন—তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ভরুইপুরের নিমাইমণি—"মল্লিকা ফুলের মত পরিষ্কার চালের অন্ন, কাঁচা কলাইয়ের ডা'ল, জঙ্গুলে ডুমুরের ডাল্‌না, পুকুরের রুই মাছের ঝোল এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল।" আহারান্তে সুমিষ্ট পাকা কাঁটালের সদ্ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানের যে কোন দিনই অভাব ছিল না তাহা উল্লিখিত উদাহরণেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

এখন মাছ দুধ যখন দুর্ম্মূল্য দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে তখন আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে খাদ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন আনিতেই হইবে। বাপ পিতামহ ডিম মাংস বাড়ীতে আনেন নাই বলিলে আর চলিবে না। তাঁহাদের মত দুধ মাছ পেট পুরিয়া পাইলে খাদ্য পরিবর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন। অভাবে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। 'আগে চল আগে চল ভাই'—'চল যাই, চল যাই'—প্রভৃতি গানের সহিত সুর মিলাইয়া এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল জাতির সহিত সমান তালে চলিতে হইলে চাই সুপুষ্ট মাংসপেশী, সুগঠিত মস্তিষ্ক এবং তার জন্য চাই বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত আহার।

এস্থলে স্নেহ-পদার্থ বা তেল-ঘি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এই পদার্থ শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং পরিপাক-সহায়ক ক্লোমরস (pancreatic juice) নিঃসরণে ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাকরণেও ইহার প্রভাব বিদ্যমান। তদ্ভিন্ন ঘৃত-মাখন ও মৎস্যাদির যকৃৎ তৈলে শরীরের পুষ্টি ও সুস্থতাবর্দ্ধক ভাইটামিন 'এ' দৃষ্ট হয়। মার্গারিণ ও ভয়সা ঘি প্রভৃতি স্বাদগন্ধে অপকৃষ্ট হইলেও শরীরের শক্তি সরবরাহে উহারা অপকৃষ্ট নয়, সুতরাং যাঁহারা ঘৃত মাখন ব্যবহারে অক্ষম তাঁহাদের পক্ষে ইহার ব্যবহার প্রয়োজনীয়।

'নুন খাই যার, গুণ গাই তার' কথা হইতেই লবণ পদার্থের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যায়। আমাদের করকচ, সৈন্ধব লবণ বাদে ক্যালসিয়ম্, ফস্ফরস, পটাসিয়াম, লৌহ প্রভৃতি ঘটিত লবণপদার্থ শরীরগঠনে ও উহার সুস্থতা সম্পাদনে অপরিহার্য্য। ক্যালসিয়ম ও ফস্ফরস ঘটিত লবণ আমাদের হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান। এই কারণে গর্ভিণী, প্রসূতি, শিশু ও বৃদ্ধির বয়সের বালক-বালিকাগণের পক্ষে এই দুই লবণ অত্যুপকারী। দুধ, ডিম, বিবিধ ফল ও শাকসব্জীতে এই দুইটি পদার্থ বেশ পাওয়া যায়। দুধ ডিমই এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লৌহ রক্তকণিকার বিশিষ্ট উপাদান। রস-রক্তে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ঘটিত লবণের বিশেষ আধিক্য দেখা যায়। এগুলি আমরা সাধারণতঃ খাইবার লবণ, ফল ও শাকসব্জী হইতে পাইয়া থাকি। ঘামের সহিত যথেষ্ট লবণ শরীর হইতে নির্গত হয়। গ্রীষ্মকালে মাঠ হইতে সদ্য প্রত্যাগত কৃষকদের পিঠে লবণ জমিতে দেখা যায়। এই অবস্থায় ইহাদের লবণের চাহিদা বেশী—অভাবে রক্তাল্পতা ও দৌর্বল্য জন্মে। অম্লমধুর ফলের সহিত ব্যবহৃত লবণ এই লবণের অভাব পূরণ করিতে পারে। এই কারণে মাঠ হইতে ফিরিলে আম্রাদি ফল ও টম্যাটো লবণ সংযোগে খাওয়া বা অন্ততঃ আহার কালে টক খাওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। ফলতঃ সকলেরই দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় টক বা চাটনি রাখা বিধেয়। তাম্রঘটিত লবণ রক্তকণিকা গঠনে আবশ্যক এবং আয়োডিন গলগণ্ড রোগ নিবারণে ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্য আবশ্যক বলিয়া জানা গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সব লবণও সাধারণতঃ শাক-সব্‌জী ও মৎস্যাদি (গুগ্‌লি কাঁকড়া প্রভৃতি) হইতে পাওয়া যায়। ফলমূল ও শাক-সব্‌জীর লবণ পদার্থ কোষ্ঠপরিষ্কারেও উপকারী। সুতরাং দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় পালং প্রভৃতি শাকের ব্যবস্থা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

এক্ষণে ভাইটামিন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ভাইটামিনগুলি রাসায়নিকের ভাষায় জৈব-শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের অনেকগুলি আজকাল কৃত্রিম নীলের ন্যায় রসায়নাগারে প্রস্তুত করা হইতেছে। সুতরাং ইহা নিরাকার ব্রহ্মের মত বা বিশ্বব্যাপী ইথরের ন্যায় কাল্পনিক বস্তু নহে। ভাইটামিনগুলি অদ্ভুত তেজস্কর এবং অত্যল্প মাত্রাতেই কার্য্যকরী। ইহাদের অভাবে কার্ব্বোহাইড্রেট ও লবণ পদার্থ শরীরের কাজে লাগিতে পারে না। তদ্ভিন্ন ইহাদের অভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যাধি (deficiency disease) প্রকাশ পায়। শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন সুস্থতার জন্যও ভাইটামিনগুলির আবশ্যকতা স্বীকার্য্য। ভাইটামিনের জন্য পয়সা খরচ করিয়া কডলিভার তৈল বা বিলাতি শিশির ঔষধ খাইতে হইবে এমন নয়। শাক-সব্জী, টম্যাটো, আম প্রভৃতি ফল, দুধ, ডিম ও আমাদের দেশী মাছের লিভার তৈলে ও গুগ্‌লিতে যথেষ্ট ভাইটামিন 'এ' পাওয়া যায়। চা'লের উপরের পর্দ্দায়, আটাতে, মুগ, মসুরি প্রভৃতি ডালে, সুজী এবং চিঁড়ার মধ্যে প্রচুর বি-ভাইটামিন থাকে। লেবু, টম্যাটো, আম, লিচু, আনারস প্রভৃতি ফলে ভাইটামিন সি এবং মাখন, ডিম ও মাছের যকৃৎ-তৈলে ভাইটামিন-ডি পাওয়া যায়। এক কথায় বি-ভাইটামিন

হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা ও সবলতা বজায় রাখিতে, এ-ভাইটামিন চোখের পীড়া ও রাতকাণা নিবারণে, সি-ভাইটামিন স্বার্ভি রোগ নিবারণে ও ডি-ভাইটামিন হাড় দাঁত গঠনে উপকারী। পাঁচমিশালী খাদ্য খাইলে ভাইটামিনের ভাবনা ভাবিতে হয় না। রান্না করিলেই ভাইটামিন নষ্ট হয় বলিয়া অনেকের ধারণা। ফলতঃ ভাইটামিন সি বাদে অন্য কোন ভাইটামিন রান্নাতে নষ্ট হয় না। সকলেই মনে রাখিবেন, এ, বি, সি ভাইটামিনপূর্ণ টম্যাটোর চাষ ও উহার প্রভূত প্রচলন আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য্য। গর্ভিণী ও প্রসূতিদের পক্ষে এবং বাড়্তির বয়সে ভাইটামিনের চাহিদা স্বতই বেশী; সঙ্গে সঙ্গে লবণ পদার্থ ও প্রোটিনের পরিমাণও বেশী প্রয়োজন।

যদিও পুষ্টিকর আহার্যের অভাবই আমাদের প্রধান বক্তব্য, তথাপি কোন কোন স্থলে অতি ও অনিয়মিত ভোজন-জনিত বহুমূত্র ও মেদবৃদ্ধি রোগ দেখা যায়। আমাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা আর এক অনিষ্টকর ব্যাপার। সাধারণতঃ নিমন্ত্রণ বাড়ীতে অনিয়মিত সময়ে তেল-ঘি, মাছ-মাংস এত বেশী গলাধঃকরণ করা হয় যে তাহাতে উপকারের পরিবর্তে অপকারই বেশী হয়। কলিকাতার রেস্তোঁরাতে আহার অতিশয় দূষণীয়। ইহাতে সাধারণতঃ আমিষ খাদ্য বেশী খাওয়া হয় এবং আমিষ ও কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের সহিত ফলমূল শাক-সব্জি সম্যক্ না খাইলে অম্লাধিক্য জন্মে। কারণ অনেকেই জানেন প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট পরিপাকান্তে অম্ল পদার্থ উৎপাদন করে এবং এই অম্লকে প্রশমিত রাখিতে (neutralise করিতে) উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষার বা লবণ পদার্থ আবশ্যক। ক্ষার ও অম্ল উৎপাদক পদার্থের অসামঞ্জস্য—বিশেষতঃ অম্লোৎপাদক পদার্থের আধিক্যে শরীরের অতিশয় ক্ষতি হইয়া থাকে। তার পর রেস্তোঁরাতে কাপ ডিসের দ্বারা যক্ষা, কুষ্ঠ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটিয়া থাকে। পরন্তু কলিকাতা ও মফঃস্বল সহরের হোটেলের থালা গেলাসের কথা ভাবিতেও ভয় হয়। আমরা ইউরোপীয়দের আংশিক অনুকরণ করিয়াই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছি। আমরা অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণে সুখময় পারিবারিক জীবন ছাড়িয়া দিয়া হোটেল-মেসে বাসা বাঁধিতেছি, অথচ হোটেলের কর্তৃপক্ষের বা আমাদের নিজেদের কাহারও জন-স্বা্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই। আমরা অধিকাংশ স্থলে অতি নীচ ক্ষুদ্র স্বার্থের বাহিরে জাতি বা দেশের জন্য ভাবিতে পারি না। তাই বলি—আমরা অভিমন্যুর মত ব্যূহপ্রবেশের মন্ত্র মাত্রই শিখিয়াছি—আমরা সহরে বাস করিতে চাই কিন্তু পাশ্চাত্যের নাগরিক-জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের কাহারও জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জানি না কবে শিক্ষা এবং মনুষ্যত্বের বিমল আলোকে আমরা ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ হইব।

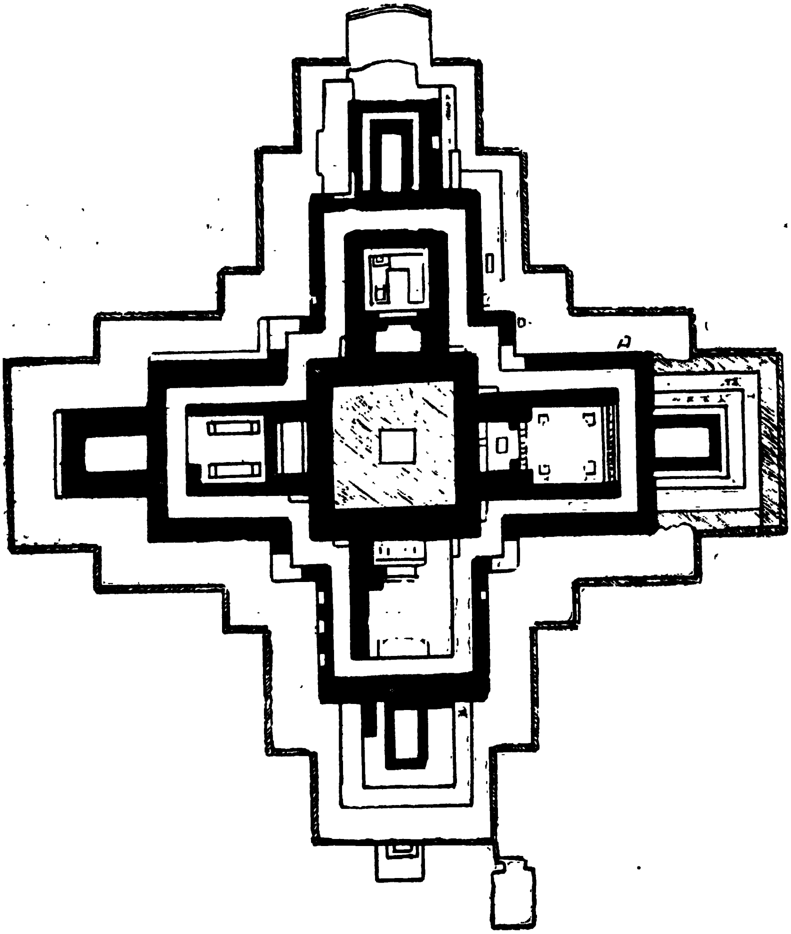
উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, আলো বাতাস বহুল স্থানে বাস ও নিদ্রা এবং সর্ববিষয়ে সময়ানুবর্তিতা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনলাভের প্রশস্ত সোপান। শৈশবে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটিলে পরবর্তীকালে যথোপযুক্ত খাদ্যেও সেই ক্ষতির পূরণ হয় না—ইহা সর্ববাদিসম্মত। এই কারণে ইউরোপের সর্বত্রই বিদ্যালয়ের বালকদের খাদ্যের প্রতি সরকারপক্ষের সজাগ দৃষ্টি পাইয়াছে। পুষ্টিকর খাদ্যের সহিত বিজ্ঞানসম্মত শরীর-চর্চাও ওদেশের লোকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গত বৎসর ১০ই নভেম্বর হাউস অব্ লর্ডসের এক বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। ঐ সভায় লর্ড মিল্নে (Lord Milne) উন্নত ধরণের বে-সরকারী শরীর-চর্চা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপরে বিশেষ জোর দিয়াছেন। (Nature Nov 21, 1936). আমাদের দেশেও যে অনুরূপ ব্যবস্থা অগৌণে অবলম্বনীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই—আমাদের স্থানকাল পরিবর্তনের সহিত খাদ্যবিষয়ে পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন অবশ্য কর্তব্য—বিলম্বে সমূহ জাতীয় অমঙ্গলের আশঙ্কা বিদ্যমান এবং এই পরিবর্তন যাহাতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় তাহার জন্য দেশের শিক্ষক ও অভিভাবকগণের চেষ্টা সর্বাগ্রে করণীয়। আমরা অধিকাংশস্থলে জাতিগত ঔদাসীন্য, অনুদারতা ও গৃহিণীর অবজ্ঞাবশতঃ কোন পরিবর্তন বা সংস্কার অবলম্বনে তৎপরতা দেখাইতে পারি না। প্রগতিশীল জীবন্ত জাতির পক্ষে ইহা সর্বতোভাবে মারাত্মক। বর্তমানে খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান প্রচারের যেরূপ তীব্র আবশ্যকতা বিদ্যমান, দেশে কৃষির উন্নতি, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবাদি পশু এবং হাঁস-মুরগী প্রভৃতির পালন, মাছের চাষ, গ্রাম-সংস্কার ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনও তুল্যরূপে অপরিহার্য।

বাংলার গৌরব পাহাড়পুর

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ প্রাচীন বাংলার একটি স্মরণীয় কাল। এই সময় বাংলাকে কেন্দ্র করিয়া "বাংলা ও মগধের বৌদ্ধকোষ, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ ভাস্কর্য" প্রভৃতি শুধু সমগ্র ভারতেই বিস্তৃতি লাভ করে নাই, একাধারে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কেন্দ্রভূমি বলিয়া বংগদেশ ভারতে এবং ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।



পাহাড়পুরের ভিত্তিভূমি

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরে যে অপূর্ব মন্দির সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহাকে বলা হয় No single monastery of such dimensions has yet come to light in India সেইস্থানেই এইরূপ বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি বহু ধর্মের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাহাড়পুর সমগ্র ভারতীয় সাধনার একটি অন্যতম প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং ইহা দ্বারা ভারতেতিহাসের এবং স্থাপত্য শিল্পের একটি লুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে এই পাহাড়পুরে একটি বহুদিনের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মাটীর নীচে চাপা রহিয়াছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" পক্ষ হইতে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার রায় এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় পাহাড়পুরের স্তূপ উদ্ধার কার্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করিতে কৃত-সংকল্প হন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে যথেষ্ট উৎসাহের সহিত কাজ করেন। কিন্তু তৎপরে গভর্ণমেণ্ট নিজ হাতে পাহাড়পুরের খনন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিখ্যাত

প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত সুযোগ্য ব্যক্তিকে এই কার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

বহু বৎসরাবধি এই খনন কার্য চলিতে থাকে এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্‌ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় পাহাড়পুরের চতুর্মুখ বিহার সম্বন্ধে একটি মূল্যবান বিবরণী প্রস্তুত করেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ১৯২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে এই স্তূপ খননে আবিষ্কৃত মন্দির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, (মর্মানুবাদ) "মন্দিরের



পোড়ামাটির ফলক

গঠন নিতান্ত সরল। ইহা একটি ত্রিতল মন্দির। নিম্নাংশ ক্রুশের আকারে নির্মিত। এই ক্রুশের দীর্ঘতম বাহু ছিল উত্তর দিকে। নিম্নতলে কোনও গৃহাদি নাই, একেবারে ভরাট গাঁথুনি। তাহার উপরে দ্বিতলটি একটি নিরেট গাঁথা পোতার উপর নির্মিত হইয়াছে। দ্বিতলের পোতার চতুর্দিকে একটি সুবিস্তৃত প্রদক্ষিণ পথ। পথটি বাহিরের দিকে আবক্ষ-উন্নত নিম্ন প্রাচীর দিয়া ঘেরা। এই প্রাচীরের বহির্ভাগ মৃত্তিকা-নির্মিত মূর্তিফলক দ্বারা বিচিত্রিত। * * * মন্দিরের প্রধান বেদীটি একটি খিলান-করা ছাদবিশিষ্ট কক্ষমধ্যে রক্ষিত। কক্ষাদির উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে স্তম্ভপরিবৃত এক-একটি সুবৃহৎ মণ্ডপগৃহ। প্রত্যেক মণ্ডপের তিন পার্শ্বে সুউচ্চ সংকীর্ণ দালান। উত্তরের মণ্ডপটাই সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার; উহা ন্যূনাধিক ২৭ ফিট্ লম্বা ও ২৩ ফিট্ ৫ ইঞ্চি চওড়া।

মন্দিরটি বর্তমানে যেমন আছে তাহাতে উহা উত্তর-দক্ষিণে ৩৬১ ফিট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৮ ফিট বিস্তৃত ছিল দেখা যায়। বর্গক্ষেত্রের আকৃতিতে মন্দিরটি নির্মিত কিন্তু প্রত্যেক ধারেই কতকটা অংশ বর্দ্ধিত আছে। উত্তর ধারের বর্দ্ধিত অংশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, কারণ উহার উপর দিয়া সিঁড়ি গিয়াছে। তিনটী ক্রমহ্রস্বায়মান তলে মন্দিরটী সম্পূর্ণ। উত্তর দিকের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরের তল-



পোড়ামাটির ফলক

গুলিতে উঠা যায়।" শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয়ের মতে পাহাড়পুরের প্রস্তরমূর্তিগুলির মধ্যে কয়েকটির কারুকার্য গুপ্ত-রাজত্বের শেষাশেষি সময়ের ভাস্কর্য-শিল্পের নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই মূর্তিগুলি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে পাহাড়পুর আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে জাভার ক্রুশ-চিহ্নিত ভিত্তির মূল ভারতে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং সেই জন্য অনেক মনীষী ইহাও বলিয়াছেন যে উহা জাভার নিজস্ব স্থাপত্যধারা। কিন্তু বহু খোদিত লিপি, তাম্রশাসনপত্রের বিবৃতি প্রভৃতি হইতে বুঝা যাইত যে স্থলপথে ও জলপথে বংগদেশের সহিত দ্বীপময়

ভারতের যোগাযোগ ছিল। বিশেষভাবে দ্বীপময় ভারতের মন্দিরগুলি হইতে তিন-চারিশত বৎসরের পূর্বের পাহাড়পুর আবিষ্কৃত হওয়ার পর উক্ত কথা অস্বীকার করিবার



শিবের সংসার

আর উপায় নাই। দীক্ষিত মহাশয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক বিবরণীর (১৯২৬-২৭) ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "স্থাপত্য শিল্প-শাস্ত্রে ভারতীয় মন্দিরের প্রধান তিনটী

ত্রিতল অথবা চতুস্তল মন্দির পাহাড়পুর ভিন্ন ভারতের অন্য কোন প্রদেশে পাওয়া যায় নাই এবং বোধ হয় উহার নির্মাণ-পদ্ধতি বহু পূর্বেই অন্যান্য প্রদেশবাসী ভুলিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় এই বিশিষ্ট স্থাপত্য-পদ্ধতি সুদূর পূর্বখণ্ডে বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ, জাভা এবং কাম্বোডিয়ার স্থাপত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। পাহাড়পুরের পরি-



পোড়ামাটির ফলক

শ্রেণীর কথা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি নাগরী, দ্বিতীয়টী দ্রাবিড় ও চালুক্য অর্থাৎ বেশর এবং তৃতীয়টি সর্বতোভদ্র। এই সর্বতোভদ্র ধারার অর্থাৎ যথানুপাতিক

কল্পনা ও গঠনপ্রণালীর নিকটতম আদর্শ কেবলমাত্র এ পর্যন্ত মধ্যজাভায় প্রাম্বানামের সন্নিকটস্থ চণ্ডী-সোরো জংগ্রাং এবং চণ্ডী-সেউ মন্দিরের স্থাপত্যে দেখিতে পাওয়া

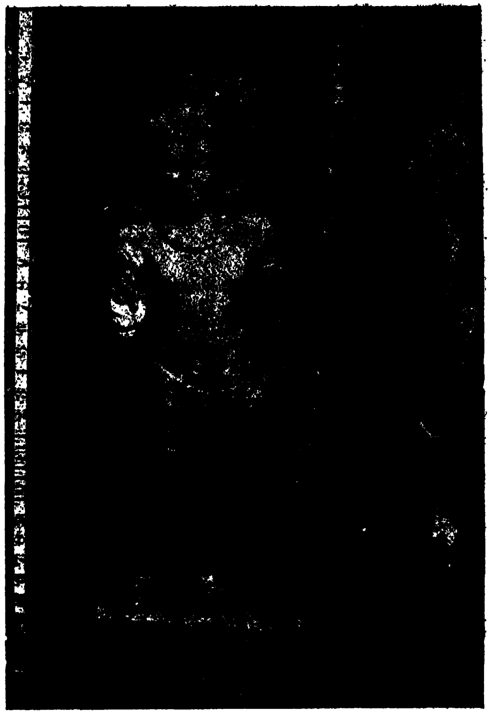
যায়। চণ্ডী-লোরো-জংগ্রাং মন্দিরের বর্দ্ধিত কোণ, অর্দ্ধ-পিরামিডাকৃতি এবং অলংকৃত সমতল ভারতীয় মন্দিরের বিশিষ্ট পদ্ধতিকে প্রদর্শন করে। চণ্ডী-সেউ মন্দিরের ভিতরকার নক্সার সহিত পাহাড়পুরের প্রধান মন্দির ও দ্বিতীয় পোতার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলি নবম শতাব্দীর অর্থাৎ পাহাড়পুর হইতে প্রায় তিন শতাব্দী পরে নির্মিত। সুতরাং ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় এই বিশিষ্ট পদ্ধতি এই মন্দির-গুলির মূল আদর্শ।"



কেশী বধ

পাহাড়পুরের আবিষ্কারে তৎকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারিতেছি। এখানে যে সমস্ত 'টেরা-কোটা' বা পোড়ামাটির জিনিস, প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এইস্থান একসঙ্গে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও জৈনদের লীলাক্ষেত্র ছিল। ইহা তৎকালীন ভারতের আকর্ষণের বস্তু ছিল বলিয়া বিভিন্ন দূরদেশ হইতে শিক্ষার্থী ও তীর্থযাত্রী আসিত। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে দশম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পাহাড়পুর একটি প্রসিদ্ধ নগরে পরিণত হইয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলোচ্য মন্দিরটী বৌদ্ধকীর্তি হইলেও নিম্নতলের দেওয়ালের প্রায় প্রতি কোণেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

একনম্বর চিত্রখানি শিবমূর্তির; তাঁহার একহস্ত কটীদেশ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; অন্য হস্তে একটি ফুল তুলিয়া ধরিয়া আছেন।



শিব (?)

দ্বিতীয়টি শ্রীকৃষ্ণের বালকমূর্তি। তিনি দুই ভূপতিত বামনের পৃষ্ঠের উপর নৃত্য করিতেছেন এবং দুই হস্তে দুইটি বৃক্ষকাণ্ড বিনমিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কেশগুচ্ছ দীর্ঘ, গলদেশে শিশুর রক্ষাকবচ স্বরূপে বাঘনখের মালা।

তৃতীয়টী প্রেমাসক্ত যুগল-মূর্তি; পুরুষমূর্তিটী শ্রীকৃষ্ণের বংকিম ভংগীতে পায়ের উপর পা দিয়া দণ্ডায়মান; সম্ভবতঃ ইহা রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

চতুর্থটী অন্নপূর্ণার দৃশ্য বলিয়া অনেকে অনুমান করেন

এবং পঞ্চম চিত্রটী কেশী বধের দৃশ্য। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির পরিচয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয় জার্নাল অফ দি ডিপার্টমেণ্ট্ অফ্ লেটার্সে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ পর্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক মৃন্ময় ফলক পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের বিষয়বস্তু বা নির্মাণ পদ্ধতি একশ্রেণীর নহে। পাহাড়পুরের ক্ষুদ্র আকৃতির ফলকগুলি শিল্পহিসাবে অধিকতর সূক্ষ্ম ও সুন্দর। মৃত্তিকায় নির্মিত বস্তুগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক চিত্র বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, বৃক্ষ-লতার সংখ্যা অজস্র। ইহা ব্যতীত বিচিত্র জীবজগতের সব কিছুরই সন্ধান ইহাদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধে একজোড়া হনুমান অনুরাগ-বশে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে; কোথাও বা দুইটি নীল-বানর উভয়ের দিকে একাগ্রচিত্তে তাকাইয়া আছে। মনুষ্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির মধ্যে চুঙ্গি-লাগান বোতল, সরুগলা পাত্র, পিলসুজ, তেপায়ার উপর রক্ষিত আসন প্রভৃতি অঙ্কিত আছে। পূজার সামগ্রীর মধ্যে বিশেষ করিয়া নজরে পড়ে লিংগ ভস্মাধার, বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতীক চক্র প্রভৃতি। যত বিভিন্ন প্রকারের পুষ্পের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পদ্মেরই প্রতিপত্তি অধিক।



কৃষ্ণ অর্জুনবৃক্ষ ধারণ করিয়া আছেন



রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি (?)

এইভাবে আমরা দেখিতে পাই পাহাড়পুর শিক্ষা, ধর্ম, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া ভারতের তথা বহির্ভারতের অন্যতম একটি প্রধান তীর্থস্থানে পরিণত হইয়া বাংলার গৌরবময় যুগের একটি লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিয়া দিয়াছে।

[এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]



ইউরোপের চিঠি

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, পি-এইচ-ডি

(ভ্রমণ)

আমি এতদিন তোমাদের কোন পত্র লিখি নি। এখানে Easter। এদের একটা প্রধান ধর্মোৎসব। এই উৎসব দেখবার জন্য আমি নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম দু' একটা চার্চে, St. Sebastian ও St. Peters. শ্রদ্ধেয় বন্ধু Scarpa যাতে আমি এদের উৎসব গুলি বেশ ভালরূপে দেখতে পাই, তার বন্দবস্ত করেছিলেন।

St. Sebastianএ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। আমি অধ্যাপক রায়ের সঙ্গে Easterএর দিন সকালবেলা churchএ যাই। আমাদের বস্‌বার স্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল উপরে গ্যালারীতে। আমি সমস্ত উৎসবটা অতি আগ্রহ-সহকারে দেখেছিলাম। রোমের বিশিষ্ট লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতের সহিত উৎসব আরম্ভ হল। Easterএর প্রথম দিন শোকের দিন। এই দিন খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়—এর পরে হয় তাঁর resurrection—পুনরাবির্ভাব।

এই প্রথম দিনের উৎসবে সর্বত্রই একটা করুণ সুরের হয় প্রকাশ। সকল গানগুলির ভেতর থাকে একটা অন্তর্বেদনার রেশ। প্রথম দু' তিনটী গানের পরে প্রধান ধর্মযাজক উপস্থিত হন বেদীর ওপর। উপস্থিতি মাত্রই তার পোষাক বদলান হয় এবং অন্যান্য ধর্মযাজকেরা নতজানু হয়ে' তাকে প্রণাম করে। এই প্রণাম পর্ব শেষ হলেই সকলে একত্র হয়ে সারি বেঁধে গমন করেন অন্যত্র এবং কিছুক্ষণ পরে খৃষ্টের একটী ধাতুমূর্তি কোলে করে' সকলে পুনরায় উপাসনা গৃহে প্রবেশ করেন। সেই মূর্ত্তিকে বেদীর পর রেখে সকলেই নতজানু হয়ে তাকে শ্রদ্ধা দেখান। এদিকে করুণ সুরে গীত হতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে খৃষ্টের মূর্তি নিয়ে সকলদিকে গমন করা হয় এবং সকলে দুঃখের গান গেয়ে থাকেন। সকাল ৭টা হতে প্রায় ৯।৯।০টা পর্যন্ত এই উৎসব হয়। এদিন কোন আনন্দ প্রকাশের কোন চিহ্ন থাকে না—খৃষ্টের মৃত্যুর নিদারুণ স্মৃতির ব্যথা সকলেই বহন করেন।

Easterএর পরদিন আনন্দোৎসব হয়। আলোকমালায় চার্চগুলি সজ্জিত হয়—কথায়, গানে, সুরে সর্বত্রই আনন্দ প্রকাশিত হয়। গানের সুর এদিন আনন্দের উদ্দীপনায় ভরে দেয়—খৃষ্টের প্রতীককে নানাবিধ পুষ্প-সম্ভারে সাজিয়ে দেওয়া হয়। নানা গন্ধের সুবাসে, নানা বর্ণের বিকাশে ঘ্রাণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের আরাম দেয়।

মৃত্যু ও জীবন—এই দুটী প্রধান ঘটনা—সকল সৃষ্ট বস্তুর। এর জন্য সকলেই শোকাশ্রু ও আনন্দাশ্রু সিঞ্চন করে। এতে কোন বিশেষত্ব কিছু নেই—এ ত দৈনন্দিন ঘটনা। তবে কেন ব্যক্তিবিশেষের জীবন ও মরণ এত আকর্ষণ করে মানুষের দৃষ্টি? খৃষ্টধর্ম উপাসকের কাছে খৃষ্টের মৃত্যু ও খৃষ্টের আবির্ভাব ধর্মজীবনে এমন ঘটনা—যার অর্থ আমরা সব সময় ঠিক বুঝি নে। ব্যক্তিবিশেষ জীবনে এরূপ অনুভূতির স্তরে আরোহণ করেন, যেখান হতে তিনি সুস্পষ্ট অনুভব করেন—সকল মানবের সহিত তার ঐক্য এবং ঈশ্বরের সহিত তার ঐক্য। এই অনুভূতি ধারণা নয়, ইহা সুস্পষ্ট স্বচ্ছ জ্ঞান।

খৃষ্টের ভেতর ঈশ্বরীয় শক্তির আবির্ভাব হয় যে খৃষ্টানেরা মনে করেন যে—ঈশ্বর খৃষ্টের ভেতর দিয়া তাকে প্রকাশ ক'রেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সন্তান। তার এই সন্তানত্ব নিত্য। পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নিত্য। এইরূপ দিব্য বোধে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হ'লেই—ঈশা মুষা কেন—সকলেই ঈশ্বরের নিত্য সন্তানত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠা তাকে এমন শক্তি ও সুষমা দেয়—যে তার ভেতর অলৌকিকত্ব স্ফুরণ হয়। সেই আধারকে অবলম্বন ক'রে ঈশ্বরীয় প্রতিভা ও বিভূতির প্রকাশ হয়। এ কথাটা কিছু নূতন নয়। এই অলৌকিকত্বের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সর্ব্বত্র থাকিলে, আস্পৃহা ও প্রকৃত চেতনার অভাবে এরূপ অলৌকিকতার প্রকাশ সর্ব্বত্র হয় না। খৃষ্টানদের বিশ্বাসের লাঘবতা এখানেই যে তারা খৃষ্ট ভিন্ন অন্য কোথাও ঈশ্বরের সনাতন সন্তানত্ব দেখ্‌তে পান না।

সে যাহা হউক, ক্রাইষ্টএর মৃত্যু বিশ্ব পরিত্রাণের জন্য হয়েছিল। বিশ্বের সমস্ত পাপ খৃষ্ট গ্রহণ ক'রেছিলেন বলেই তিনি বিশ্বকে পাপ হইতে মুক্ত ক'রবার জন্য আত্মবিসর্জ্জন ক'রেছিলেন। জীবনের ভেতর তিনি যে ব্রত গ্রহণ ক'রেছিলেন, মরণই হ'য়েছিল তার সিদ্ধি। মরণের ভেতর দিয়েই তিনি অনন্ত জীবনকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। এই জন্যই cross খৃষ্টানের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কারণ ইহা ভগবানের প্রীতি ও কৃপার নিদর্শন।

ক্রাইষ্টের মৃত্যুর পর পুনরায় আবির্ভাব (resurrection) অধ্যাত্ম জগতে একটী বিশেষ ঘটনা। এই পুনরাবির্ভাব নিত্য জীবনের সন্ধান দেয়। জীবনই নিত্য, মৃত্যু কখনও জীবনকে নষ্ট করিতে পারে না। Resurrection এই শিক্ষাই দেয়। নিত্যত্ব, অভিনব প্রকাশত্বই জীবনের স্বরূপ। মৃত্যু এই অভিনব প্রকাশের পথ রচনা করে।

খৃষ্টধর্মে বড় কথা হ'চ্ছে জীবন এবং প্রেম। প্রেমই জীবন, জীবনই প্রেম। প্রেম জীবনকে নিত্য সঞ্চার ক'রে তোলে এবং জীবন পায় প্রেমে তার পূর্ণ বিকাশ।

প্রেম তার সর্বস্ব দিয়ে চায় জীবন, জীবন তার সর্ব্বস্ব দিয়ে চায় প্রেম। প্রথমটী দেয় সৃষ্টির নব নব বিকাশ, দ্বিতীয়টী দেয় জীবনের রমণীয় ভাগবত বিকাশ। সৃষ্টির বৈচিত্র্যে এরূপ ভাবে বিকাশের সহিত অভিন্ন হ'য়ে থাকে —প্রেমের সরসতা ও উর্দ্ধমুখী বৃত্তি। সৃষ্টি প্রেমে বিকশিত, সৃষ্টির ধারা প্রেমেই পূর্ণতা লাভ করে। জীবনের উৎপত্তি প্রেমে—জীবনের নিয়তিও প্রেমে। এই প্রেম অনন্য-সাধারণ। ইহার ভেতর এমনই গতি আছে যে জীবনকে সুন্দর ও মধুর করবার জন্য ইহা করে আত্মোৎসর্গ। এ আত্মোৎসর্গ প্রেমের শ্রেষ্ঠ অবদান। ঈশ্বরের ভিতর এই আত্মোৎসর্গ বৃত্তি আছে বলেই তার কখনও কখনও এই সৃষ্টিধারায় অবতরণ করতে হয়, ইহার ভিতর শক্তির সঞ্চার ক'রতে এবং ইহাকে প্রেমে পুলকিত ক'রতে। ঈশ্বরের ভিতর আছে একটী কল্যাণ বৃত্তি যাহা সৃষ্টিকে মানবকে সুন্দর ও রমণীয় ক'রে তোলে, তাকে পূর্ণ চেতনাময় ও আনন্দময় ক'রে তোলে, তার দিব্য স্বরূপ স্ফূর্ত্ত করে ইহাই খৃষ্টধর্মের প্রধান কথা। খৃষ্টের দৃষ্টি ছিল এ বিশ্বে ঈশ্বরীয় রাজ্য স্থাপন করতে যে ব্যবধান স্বর্গকে মর্ত হ'তে দূরে ক'রে রেখেছে, তাহা নষ্ট হয় প্রেমের উৎসর্গের দ্বারা। প্রেমই সেই আকর্ষণ যাহা ঈশ্বর শক্তিকে মর্ত্যে অবতরণ ক'রে মর্ত্যকে সকল সুষমা ও সৌন্দর্যে পূর্ণ করতে পারে।

খৃষ্টের মহনীয় আদর্শ ইউরোপ যে সর্বাংশে গ্রহণ ক'রেছে তাহা বলা যায় না। ইউরোপের যত শক্তি থাকুক না কেন, ইউরোপ এই সার্বভৌমিক প্রেমের আদর্শ হ'তে এখনও বহু দূরে। কিন্তু খৃষ্টধর্মের ভেতর আছে সেবাবৃত্তি —তা ইউরোপে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। এখনও নানা স্থানে নানা রূপে ধর্ম্মের নামে সেবাব্রত উদ্‌যাপিত হচ্ছে। বহু সেবক-সঙ্ঘ মানব-সেবাকে খৃষ্ট-সেবারূপে গ্রহণ করে বহু লোকের সুখের কারণ হইতেছে। কর্মতৎপরতায় এ দেশ পূর্ণ। ইহার অন্যান্য কারণ থাকিলেও খৃষ্টধর্মে আছে যে জীবন-সংবাদ তাহাও একটী প্রধান কারণ।

খৃষ্ট ধর্মে যারা অনুরক্ত তারা এই জীবন-বাদকে মূর্তি দিচ্ছেন তাদের চিন্তায়, কর্ম্মে, সেবায়। জীবন ত্যাগ করেই তারা অনন্ত জীবনকে পেতে চাইছেন। খৃষ্টের রূপ ত এই। এইজন্যই খৃষ্টধর্ম্মে বৈরাগ্যের ও ত্যাগের কথা থাকলেও, এদের ভেতর দিয়ে সকলেই খুজেছেন স্বর্গীয় জীবনের সুষমা ও আস্বাদ। স্বর্গ ও মর্ত্যের ব্যবধান দূর করবার জন্যই মহাপুরুষদের হয় অবতরণ—মর্ত্য-জীবনেও আছে দিব্যলোকের আনন্দের সংবেগ—এই দৃষ্টি দেয় আমাদের কাছে এক গভীর সত্য। কারণ, মানুষ তার দিব্যাদর্শকে কল্পনালোকে পেয়েই হয় না সুখী ; সে ধন্য হয় যদি সে এরূপ জীবনের স্পর্শ পায় এখানেই তার অন্তর সত্তায়। তখনই সে অনুভব করে স্বর্গের ও মর্ত্যের সংযোজনা। তখনই সে উদ্‌বুদ্ধ হয় এক মহনীয় জ্ঞানে ও শক্তিতে। বিশ্বে এই দিব্য শক্তির ও প্রেমের আবির্ভাব জীবনের সকল স্পন্দন ও সংবেগের ভেতর দিয়ে অনুভব করাইবার জন্য খৃষ্টের মর্ত্যজীবনে অবতরণ হয়েছিল।

ইউরোপকে এই জীবন-বাদ অনুপ্রাণিত করলেও ইহার পূর্ণ পরিণতি ইউরোপে বড় দেখা যায় না। দিব্য-শক্তির প্রেরণা ও পরশ এত সূক্ষ্ম যে আত্ম-নিবেদন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হলে ইহা কার্য্যকরী হয় না।

এই তত্ত্বের সম্যক পরিচয় না থাকবার জন্য ইউরোপে শক্তিবাদ চিন্তায় ও কর্মের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হলেও, তার দিব্যত্বের স্ফুরণ বিশিষ্টরূপে হচ্ছে না। মানব-জীবনের ভিতর আছে একটা পার্থিব সুখ ও স্বচ্ছন্দের সহিত

অপার্থিব জীবনের আকর্ষণের একটা দ্বন্দ্ব—এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা সহজ নয়। পার্থিবের ভেতর অপার্থিবের প্রতিষ্ঠা তখনই হয়—যখন পার্থিবকে অপার্থিবের কাছে দেওয়া হয় পূর্ণ বিসর্জন। কিন্তু এইটা দেওয়াই ত কঠিন। মানুষের কেন্দ্র সত্তার সহিত পূর্ণরূপে ভাগবত সংস্পর্শ না হলে এই দ্বন্দ্ব হতে মানুষ মুক্ত হতে পারে না। এখানেই অধ্যাত্ম-জীবনের পরম রমণীয়তা, এখানেই তার বিকাশের পথে পরম বাধা। জীবনের এই পার্থিব আপনকেও বিকাশকে ধর্ম্ম-জীবনের অঙ্গীভূত করে নিলেও হয়তো এর ভিতর পেতে পারি আনন্দের স্পর্শ, কিন্তু তাতে পূর্ণ তৃপ্তি আমরা পাই নে। সূক্ষ্ম বিকাশ দেয় আনন্দের সূক্ষ্ম রূপ ও জীবনের সূক্ষ্ম-সংবেদনা—তাতেই আমরা পাই এমন কিছু যা' পার্থিব জীবনের সুখের ভেতর পাই নে। এই জন্যই পার্থিবকে পূর্ণ সমর্পণ না করতে পারলে অপার্থিবের সূক্ষ্ম আকর্ষণ ও মহনীয় প্রকাশকে উপলব্ধি করতে পারি নে। এই জন্যই সকল ধর্মে পার্থিবকে অপার্থিবের বেদীতে বিসর্জন দিয়ে জীবনের দিব্য প্রকাশের কথা আছে। এটা কিছু নূতন নয়—ধর্মের ও কল্যাণের আস্পৃহায় মানুষ তার নিজের অন্তর সত্তার কেন্দ্র হতে মুক্ত বিশ্ব-সত্তার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

এই বিশ্বকেন্দ্রস্থিত হয়ে বিশ্ব-সেবায় উদ্বোধিত হবার জন্য মানুষ সব দেশেই করেছে সন্যাস আশ্রয়। বর্ত্তমান যুগে এই সর্ব্বস্ব ত্যাগ আদর্শটা মানব সমাজে তত আদরণীয় না হলেও, একথা কিন্তু ঠিক যে মানুষ যখনই বরণ করবে এইরূপ জীবন-ব্রতকে, তখন সে হবে অন্তরে নিত্য সন্যাসী। মানুষ শূন্য হলেই হয় পূর্ণ—শূন্য করেই করতে হয় নিজেকে পূর্ণ। তখন অন্তর সত্তার ভেতর অনুভূত হয় এমন কিছু যাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না।

খৃষ্টকে অবলম্বন করে জীবনের এই দৃষ্টি বহু মানব-মানবীর ভিতর হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সর্বত্রই এই দৃষ্টির সম্যক উদ্বোধন হয়নি। অন্তরে ভাগবতী বৃত্তি প্রতিষ্ঠা না হলে শূন্য হৃদয় পূর্ণ হয় না। হৃদয়ও শূন্য হয়ে থাকতে পারে না। জীবনের নানা আকর্ষণের হাত হতে মুক্ত হয়ে এরূপ জীবন-ব্রত যিনি গ্রহণ করেছেন, তিনি পরম-ধন্য। কিন্তু যারা তা পারে নাই, তাদের সংগ্রাম অত্যন্ত বেশী হলেও, তাদের আস্পৃহা তাদের দেয় যুদ্ধের শক্তি। এই যুদ্ধকে তারা বরণ করে নেয় বলেই তারা মহৎ।

খৃষ্টের জীবন যে কত লোককে এইভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তা' দেখবার ও বুঝবার অবকাশ হয়েছিল যেদিন Scorfoligio পরিবারের সঙ্গে আমি গিয়েছিলেন St. Peters দেখতে।

St. Petersএ সেদিন Easterএর উৎসব। পৃথিবীর মধ্যে এত বড় church আর নেই। সেদিন church নানা আলোকমালায় সজ্জিত হয়েছিল। St. Petersএর সামনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট জনতা একত্র হয়েছিল। ৮।১০টী জলপ্রপাত (artificial fountain) হতে নির্ঝর ধারা চারিদিকের আবহাওয়াকে শীতল করছিল।

এই বিরাট জনতা সারি বেঁধে St. Petersএ প্রবেশ করেছিল। এর মধ্যে ছিল Catholic Churchএর নানা Orderএর লোক—যথা Order of St. Gregory, Order of St. Assisi, Order of St. Benedict order of St. Francis। এক এক order এক এক বর্ণের পোষাকে বিভূষিত—লাল, নীল, পীত, সাদা, কালো। প্রত্যেক order-টীর আছে বৈশিষ্ট্য—কোনটী সেবাব্রত, কোনটী ধ্যানব্রত, কোনটী জ্ঞানব্রত গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক order ও বিশাল জনতা অতি সুন্দর সঙ্গীত গাইতে গাইতে St. Petersএ প্রবেশ করেছিল। সে সঙ্গীত ধারা এত শান্ত অথচ সুমিষ্ট যে হৃদয়ে এক গভীর বৃত্তির সহিত সুখবোধ সঞ্চার করেছিল। হৃদয়ের শান্তবৃত্তির ভেতরই হয় চিন্ময় ভাবের বিকাশ। সহস্র কণ্ঠ হতে সঙ্গীত-লহরী উত্থিত হলেও মনে হচ্ছিল যেন কোন দূর দেশে দুর্ভেদ্য নীরবতার ভেতর হতে পীযূষধারা বর্ষণ করতে করতে শব্দ-লহরী কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে। এত লোকের সমাগমেও নৈশব্দটী নষ্ট হয় নি বলেই সঙ্গীত ধারাটী লাগছিল বড় ভাল।

ধীরে জনতা যেমন এগুতে লাগল, আমরাও এগুতে লাগলেম। এগুতে এগুতে St. Petersএর কেন্দ্রস্থানে আসলেম। এখানে আছে একটী বেদিকা—বেদিকার উপর আছে প্রতিষ্ঠিত একটী সোণার Dove (ঘুঘু)। এটী হল Holy Gheostএর প্রতীক। 'The spirit of Dove' কথাটী প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। খৃষ্টানেরা ঈশ্বরের অবতরণের কথা বলে থাকেন এবং সেই অবতরণ হয়

Holy Ghostকে অবলম্বন করে'। ঈশ্বর জগতে অবতরণ করবার সময় এরূপ শক্তিকে গ্রহণ করেই অবতরণ করেন। আমাদের দেশে বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাকে যোগমায়া বলে। শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করেছিলেন এরূপ যোগমায়াকে অবলম্বন করেই। যোগমায়া সাধারণ মায়া হতে পৃথক। মায়া সৃষ্টির কারণ, যোগমায়া সৃষ্টিতে ভগবানের অবতরণের কারণ। Christianদের এই Holy Ghost বা বৈষ্ণবদের এই যোগমায়ার ধারণা অনেকেরই সুস্পষ্ট নয়—অনেকেই এটাকে আজকাল ধর্মের ভিতর অন্ধ গতানুগতিক ধারণা বলে মনে করেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। যাঁরা ভাগবত জন, তাঁরা ঈশ্বরের এরূপ শক্তিকে অনুভব করে থাকেন এবং এরূপ শক্তিকেই মনে করেন ঈশ্বর-প্রাপ্তির পরম কারণ। ঈশ্বরকে কোন মানসিক ধারণায় তাঁরা বদ্ধ করতে চান না—তাঁরা চান সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ধারণা—যাহা যোগমায়া আমাদের কাছে প্রকাশিত করে।

খৃষ্টধর্মের প্রধান অবলম্বন এই Holy Ghost—বা যোগমায়া। ইহার দু'টী শক্তি আছে। একে অবলম্বন করে ঈশ্বরের অবতরণ হয় ঈশ্বরের সন্তানরূপে (God the Son) এবং এর সাহচর্যে মানুষ God the Sonএর মহিমা বুঝতে পারে। সত্যি এই Holy Ghost হচ্ছে ঈশ্বরীয় শক্তি—যা' মুক্তির পথ, প্রেমের পথ আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে—যা' মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করে, ঈশ্বর সন্তানের সহিত মিলিত করে, ঈশ্বরলাভ করতে সাহায্য করে। সাধনার প্রধান আশ্রয় এই যোগমায়া বা Holy Spirit। Holy Ghost যাকে আশ্রয় দেয়—মুক্তি, ভক্তি তার করতলগত। কারণ ইহার শক্তি তখন হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে আমাদিগকে অধ্যাত্মজ্ঞানে বিভূষিত করে। এই শক্তি আছে বলেই, ইহার Catholic Churchএ এত মর্যাদা। এই জন্যই St. Petersএর এই Holy Spirit প্রতীক Doveকে কেন্দ্র-স্থানে রাখা হয়েছে এবং সকলকেই ইহার নিকট আত্মসমর্পণ করতে দেখলাম।

যাঁরা অধ্যাত্মানুভূতি বা জীবনকে সুধু জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁরা আত্ম-বিচার ও আত্ম-শক্তিতেই সত্যলাভ করতে চেষ্টা করেন। ধ্যানের গভীরতায় সত্যের রূপ প্রকাশিত হয় অন্তরে। কিন্তু যাঁরা অধ্যাত্মানুভূতির বিকাশের জন্য আত্ম-সমর্পণ করেন এরূপ যোগমায়ার বা Holy Spiritএর নিকট, তাঁদের অন্তর প্রোজ্জ্বলিত হয় এরূপ শক্তির সাহচর্য্যে। তাঁদের এই শক্তি প্রতিষ্ঠা হতে হয় প্রকৃত সাধনা। শক্তিই অন্তরকে জ্ঞানদীপ্ত ও প্রেমপূর্ণ করে' ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত করে। এই যোগমায়ার স্পর্শে অন্তরের সকল মালিন্য দূরীভূত হয়ে অন্তর স্বচ্ছ হয় ও দিব্য ভাবের আশ্রয় হয়। নানা দিব্যশ্রুতি, দিব্যগন্ধ, দিব্য স্পর্শ লাভ করে। প্রতি মুহূর্ত্তে নবীনতার হয় সঞ্চার। দিব্য মাধুরীতে হৃদয় হয় অভিষিক্ত এবং একটা দিব্য-শক্তি ও বিভূতি সাধককে থাকে ঘিরে। অধ্যাত্ম জীবনে তখনই হয় ইহা স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, যখন এই শক্তি ক্রিয়াশীল হয় সাধকের অন্তরে। এই দিব্য-শক্তির স্পর্শে সাধকের হৃদয়ের সব লঘুতা সব কালিমা নষ্ট হয়ে যায় এবং তাহার দিব্যানুভূতির যোগ্যতা অর্জ্জিত হয়।

Catholic Churchএ এই শক্তির একটা সূক্ষ্ম অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও, সাধারণতঃ Christendomএ এইরূপ ধারণাকে বড় আদর করা হয় না। আমি আমার কোন বন্ধুকে—যিনি মুসোলিনীর গভর্ণমেণ্টের উচ্চ পদ অধিকার করেন—বলতে শুনেছি "Catholic Church এর বিশেষ কিছু নেই, তারা কতকটা আপনাদের দেশের পৌত্ত-লিকতাকে আশ্রয় করে সেটাকেই বড় করে দেখছেন এবং Holy Ghost এর উপসনাকেই আশ্রয় করে—একালের মধ্যযুগের ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে থাকেন।" তাঁর কথাগুলি হয়ত সাধারণ Catholic Churchএ যে প্রথায় অনুসরণ হয় তার প্রতি লক্ষ্য করেই বলা হয়েছিল। কিন্তু একথা বল্‌লে ভুল হবে যে মানুষের শক্তির ভিতর এরকম দিব্য-শক্তির আবির্ভাব হয় না এবং Holy Spirit একটী কথা মাত্র। মানুষের সত্তার ভেতর দিয়ে এরকম শক্তির আবির্ভাব শক্ত হতে পারে, কিন্তু মানুষ এরূপ শক্তির সাহচর্য্যে অলৌকিক জ্ঞান বিজ্ঞান পেতে পারে, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। শক্তির স্বরূপ চিরকালই রহস্যাবৃত, কি জড় শক্তি, কি চিন্ময় শক্তি। শক্তির চিন্ময় রূপ মানুষের ধ্যানের কাম্য—আত্ম-সমর্পণ পূর্ণ হলেই এরূপ শক্তির প্রকাশ ও জাগরণ হয়। অধ্যাত্মবিদ্যা এরকম শক্তিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়। এরূপ শক্তির প্রকাশ ভিন্ন সূক্ষ্ম স্তরগুলি বিকশিত হয় না। তবে এরূপ দিব্যশক্তির উদ্বোধনের প্রতি মানুষের সাধারণ অশ্রদ্ধা

এসেছে বিশেষ কারণ হতে। যাঁরা এরকম দিব্যশক্তির আশ্রয় হতে পারেন নি, তাঁরা অনেক সময় এর নামে অনেক কিছু করতে যান। যে কঠোর সাধনা ও তপস্যার আবশ্যক হয় এরূপ শক্তিকে লাভ করবার জন্য— তাহা প্রায়ই কোথায় দেখতে পাওয়া যায় না। আধার শুদ্ধ ও পবিত্র না হলে দিব্যশক্তির আবির্ভাব কখনই হয় না। একথা ভুলে' উপাসনার বাহিরের বাহ্যাড়ম্বর কোন ব্যক্তিকেই এরূপ অপার্থিব সম্পদ লাভ করবার সাহায্য করে নি। চিত্তের সাময়িক পবিত্রতা সম্পাদন করা এক কথা, দিব্যশক্তির আধার হওয়া আর এক কথা।

ইউরোপে যাঁরা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মবিদ, তাঁরা এই Holy Spirit এর সাহচর্য্যের কথা তাঁদের পুস্তকে অনেক লিখেছেন। Catholic Churchএর সাধক শ্রেণীদের ভিতরে অনেক বড় বড় সাধক হয়েছেন—যথা St. John on the Cross, Pascal, St. Theresa প্রভৃতি। সকলেই এই Holy Spiritএর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রায় একমত। এই Holy Spirit এর আশ্রয়ে জীবকোষ-গুলি এমনভাবে উন্মুক্ত হয় যে সাধক জ্ঞানের ও প্রেমের শক্তির স্তর হতে গভীরতর স্তরে উন্নীত হয়। এই উন্নয়ন শেষ পর্য্যন্ত এমন গভীরতম অবস্থায় উপনীত হয় যেখানে জীবও শিবের ভেদ বোধ থাকে না। Catholic সম্প্রদায়ে একেই বলা হয় Dark night of the soul. এমন অবস্থা বিশেষের সহিত আমাদের সাধারণ জ্ঞান-ভূমিকার কোন সম্বন্ধ থাকে না। মানুষের বুদ্ধির নিকট ঈশ্বরীয় শক্তির ধারণা এখনও সুস্পষ্ট নয়। এই জন্যই এরূপ শক্তিকে মানুষ সব সময় মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু এরূপ শক্তির সাহায্য ভিন্ন মানুষের সত্তার দৈব পরিণতি হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্ম আজ সর্ব্বত্রই অনাদৃত— তাহার কারণ ধর্ম্ম-শক্তির সম্বন্ধে মানুষের ধারণা অস্পষ্ট। সব দেশেই মানবের জ্ঞান বিজ্ঞান শক্তি এত বর্দ্ধিত হয়েছে এবং তাতেই মানুষ এত আকৃষ্ট যে ধর্ম্মের অপূর্ব্বতার আস্বাদ লাভ করবার সুযোগ বড় হয়না। কোন বস্তুকে বরণ করলেই তার শক্তির প্রভাব অনুভব হয়। ঈশ্বরকে বরণ না করলে তার শক্তির অনুভূতি কি করে হবে? কিন্তু শক্তি কখনই নষ্ট হয় না—উপযুক্ত আধার পেলেই কালে তার বিকাশ হয়। যে সম্পদ বিজ্ঞান আমাদের কাছে দিচ্ছে, সে সম্পদ অপেক্ষা অধ্যাত্ম সম্পদ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু একে ঠিক নেওয়া চাই—হৃদয়ের দ্বার খুলে আমরা নিতে পাচ্ছি না বলেই মনে হচ্ছে ধর্ম্ম-শক্তি ম্লান হয়েছে। বস্তুতঃ মানুষের ভেতর ধর্ম্ম জাগিয়ে তোলে কত অপার্থিব সৃজন প্রতিভা কত দিকে—সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, শিল্প, দর্শন সকলেরই উৎপত্তি হয়েছে ধর্ম্মের মূল উৎস হতে। অধ্যাত্ম-শক্তি আমাদের সত্তার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। এই শক্তির প্রকাশের সঙ্গে আমাদের অন্তরের দিব্য সম্পদগুলি বিকশিত হতে থাকে। ধর্ম্মের ভিত্তি জ্ঞানে বা ভক্তিতে, তার আশ্রয় মস্তিষ্ককেন্দ্র বা হৃদয়— এই প্রশ্নগুলি নিয়ে সবদেশেই মনস্বী সমাজে নানাবিধ চিন্তা আছে—কিন্তু ধর্ম্ম যে আমাদের জীবনের সমস্তটাকে অধিকার করে আমাদের ভিতরে উদার জ্ঞান, অপ্রতিহত কর্ম্মপ্রেরণা ও নির্ম্মল প্রেমের মধ্য দিয়ে মানবকে অলৌকিক দিব্য জীবনের আস্বাদে তৃপ্ত করে সে বিষয় আমাদের সুষ্ঠু ধারণা নেই।

এই জন্যই ধর্ম্মবিচার হতে প্রকৃত ধর্ম্মবোধ যে পৃথক সে বিষয়ে আমরা সম্যক অবহিত নই। এই ধর্ম্মবোধ একরূপ আমাদের সত্তার জাগরণ—অলৌকিক শক্তিতে স্ফুরণ—যা' মানসানুভূতিকে অতিক্রম করে বিকশিত হয়। সুধু বিচারের মধ্যে ধর্ম্মবোধ কখনই বদ্ধ থাকে না এবং দেখা গেছে যেখানে ধর্ম্ম হয়েছে জ্ঞান বিচারে প্রতিষ্ঠিত সেখানে তাহা হারিয়েছে জীবনকে অনুপ্রাণিত করবার শক্তি। এরূপক্ষেত্রে ধর্ম্মের বিজ্ঞান নিয়েই নানা কথা হয়—কিন্তু তাহার অন্তরে প্রবেশ করবার শক্তি বা চেষ্টা থাকে না। ধর্ম্ম যেখানে তার শুভ্ররূপে হয় প্রকাশিত। সেখানে সত্তার ভিতর সঞ্চালিত হয় নানা বিকাশ, নানা শক্তি—যাহা কল্পনাতেও আমরা ধরতে পারিনা। অন্তঃ-চেতনা বিরামাভিমুখী হয়ে' বিরাট সত্তা হতে সংগ্রহ করে নানাবিধ ভাব ও জ্ঞান বিকাশ। এরূপ বিকাশ সম্ভব হয় না যদি আমাদের অন্তর প্রোজ্জ্বলিত ও প্রভাবিত না হয় দিব্যশক্তি দ্বারা। এজন্যই Christianদের Holy Ghost বা Holy Spirit এর ধর্ম্মজীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় স্থান আছে। এই দিব্যশক্তি আমাদের অন্তরে সব সময়ই আছে, ইহাকে ক্রিয়াশীল করতে হলে ইহার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়। এরূপ সমর্পণ সিদ্ধ হলে'

এই শক্তি তখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠ হয়ে আমাদের বৃত্তিগুলিকে সংযত, পবিত্র ও প্রস্ফুটিত করে।

ধর্ম্ম শুধু অন্তরকে উর্দ্ধমুখে উন্নীত করে না—নানাবিধ সৃষ্টি কৌশলে ও উদ্দীপনায় পূর্ণ করে। যেখানে ধর্ম্ম সুধু চিন্তায় বদ্ধ, জীবনে বিকশিত নয়, সেখানে ধর্ম্মপ্রেরণা নানাবিধ সৃষ্টি প্রেরণায় আমাদের উন্মুখ করে না। Aldous Haxley বলেছেন "as a believer in order and the decencies, a lover of the arts I prefer the Catholic method to that of the Orysbantic Protestants? Catholic Churchএর এই Holy Spirit এর অনুভূতি সর্ব্বত্র Christian জগতে সুস্পষ্ট নয়—কিন্তু তা'হলেও Catholicএরা একে জড়িয়ে আছে। কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছুক নয়। তার কারণ বোধ হয় Church মনে করে—এর ভিতর এমন একটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, যা' আর কোথায় পাওয়া সম্ভব নয়। Whitehead বলেছেন অধ্যাত্ম জীবন নীরবতার জীবন। নীরবতার বেদীতে জীব-ঈশ্বরে হয় সংযোগ ও সহবাস—এতেই কিন্তু Catholic Church হয়না সন্তুষ্ট। নীরবতার ভিতর দিয়ে অন্তর জাগরণ হতে পারে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়; চেতনার উচ্চ হতে উচ্চতর ভূমিকাগুলিকে লাভ করবার জন্য কোন অচ্ছিদ্র্য শক্তির আবির্ভাব ও প্রেরণার আবশ্যক আছে। ইহার সাহায্য ভিন্ন এসব স্তর অধিকার করা ও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের যত শক্তি আছে, Holy Spiritএর শক্তি তাদের চেয়ে অনেক বেশী।

এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে Catholic Church দাঁড়িয়ে আছে। রোমে Universtiy of St. Gregory নামক Catholic সম্প্রদায়ের একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ব প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানকার Rectorএর সহিত আলাপ হয়েছিল; তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন "বিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা দিই, তার প্রধান কারণ কোথায় বিজ্ঞানের শক্তির লাঘবতা এবং কোথায় Holy Ghostএর শক্তিই তাহাই দেখাবার জন্য বিজ্ঞানের নিকট যে শক্তি পরিচিত তার চেয়ে সূক্ষ্মতর শক্তি Holy Ghost—একে অবলম্বন না করলে বৃহত্তর ও দিব্যতর জীবন সম্ভব হয় না।" কথাগুলি আমার ভাল লাগল। অন্ততঃ এইজন্যে যে মানুষের বিজ্ঞানের দৃষ্টি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অধিকতর প্রসারিত। এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পরিপূর্ণতার জন্য আবশ্যক এমন শক্তি যাহার স্থিতি বিজ্ঞানের উর্দ্ধে। মানুষের অভিব্যক্তির সীমা মানুষও জানে না—এই জন্যই উর্দ্ধ শক্তির হাতে নিজকে সমর্পণ করলে যে অধ্যাত্ম সম্পদ ও জ্ঞান অর্জ্জন করা যেতে পারে, তাহা অনুরূপ হয় না।

একথায় সকলেই সায় দেবেন না, হয়ত তোমরাও দেবে না; তার কারণ মানুষের বুদ্ধির নিকট এই সূক্ষ্ম শক্তির পরিচয় সাধারণতঃ হয় না। এখনও আমাদের সত্তার সংবেদন এত তীব্র হয়নি যে জীবনের সকল সঞ্চারের ভেতর এই যোগমায়ার সঞ্চার অনুভব করব। অধ্যাত্ম জীবনের এই শক্তির সাহায্যেই তার রমণীয় বিকাশ হয়; এই শক্তির সাহায্য ভিন্ন অধ্যাত্ম জীবনের পরিপূর্ণতা হয় না। সৌন্দর্য্যবোধের আবশ্যক আছে—যেমন সুন্দরের স্বরূপকে সুধু বোঝা নয়, একটা ধারণা করবার শক্তি। তেমনি অধ্যাত্মবোধের আবশ্যক আছে—অধ্যাত্মকে সুধু বোঝা নয়, ধারণা ও অনুভব করবার শক্তি। এই শক্তির আবশ্যকতা যাঁরা স্বীকার করেন, তাঁরাও অনেক সময় একে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস পান না। একে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এর হাতেই ছেড়ে দিতে হয় সর্ব্বস্বকে—এতে আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা বড় রাজী হয় না—কারণ সে গতানুগতিককে ত্যাগ করে এত অনিশ্চিতের মধ্যে যেতে রাজী হয় না। অধ্যাত্ম জীবন কিন্তু চায় আত্মার সর্ব্বস্ব দান; কোথাও এতটুকু ক্ষুদ্র আকর্ষণ থাকলে তার পূর্ণ বিকাশ হয় না। সত্যিকার ধর্ম্মের ভিতর একটা কৌশল আছে। সেই কৌশল হচ্ছে —সাধারণ জীবনের গতিকে (Life impulse) পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয়—তবেই সুষ্ঠুতর ও শোভনতর শক্তির হয় প্রকাশ। পূর্ব্ব সংস্কারের জন্যই আমাদের বুদ্ধির বিকাশ হয়েও জীবনের গতির পরিবর্ত্তন হয় না। অধ্যাত্ম বিকাশের জন্য সুধু বুদ্ধিরই প্রখরতার ও ঔজ্জ্বল্যের আবশ্যক নেই, তার জন্য বিশেষ আবশ্যক আছে সংস্কারের পরিবর্ত্তন। এই সংস্কারের পরিবর্ত্তনের জন্য যোগমায়ার সঞ্চারের হয় আবশ্যকতা। ইহার সঞ্চার হলেই আমাদের সত্তা দীপ্ত হয়ে ওঠে অলৌকিক প্রভায় ও প্রতিভায়।

এই সত্য একদিন saintদের জীবনে প্রতিভাত হয়েছিল বলেই এবং তাদের শক্তি এখনও ক্রিয়াশীল বলেই Catholic Church এখন অধ্যাত্ম সম্পদে জীবন্ত—Protestant Church নীরস নয়, কারণ তারা ধর্মের বিজ্ঞান-সম্মত চর্চা করতে গিয়ে ধর্মকে কতকটা মস্তিষ্কের ব্যাপার করে তুলছেন—এই জন্যই অধ্যাত্ম সম্পদ ও শক্তি তার অদৃশ্য শক্তি নিয়ে সেখানে কাজ করে না। অধ্যাত্ম জীবনে স্বভাব ও রূপ নীতির বা বোধের জীবন অপেক্ষা ভিন্ন। এই জন্যই দেখতে পাওয়া যায় অধ্যাত্ম জীবনে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের ভাষা অন্যরূপ, ভঙ্গী অন্যরূপ, ভাব-সম্পদ অন্যরূপ। তাঁরা যা' বলে যান বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গিয়ে তার কত ভাষ্য ও টীকা হয়। কিন্তু তাঁরা তাকে সহজ বস্তু রূপেই পান, সহজ ভাবেই প্রকাশ করেন—অথচ বিষয় হয় কত গভীর। এইরূপে সত্যকে পাওয়াই অকৃত্রিম পাওয়া—এইজন্যই বুদ্ধ ও Christএর প্রকৃত স্থান হয়ত গভীর দার্শনিকের ধ্যান ও চিন্তার অতি উর্ধ্বে। St. Peters হতে আমরা যখন বেরুলেম সূর্য তখন অস্তমিত হচ্ছেন। Scorfalagio পরিবার আমাকে motorএ নিয়ে এলেন এক উদ্যানে, সেখানে বসে রোমের একটী সুন্দর সন্ধ্যা দেখলেম। নীরবতার ভিতর সন্ধ্যার এই শান্ত শীতল স্পর্শে এবং St. Petersএর কোরানের স্মৃতি—দুই মিলে আমাদের আনন্দে পূর্ণ করল। অনন্ত আকাশে ভেতর-জীবনের স্বচ্ছ বিকাশ আমার মানসশান্তির পটে ফুটে উঠল—আমি জীবনের একটি দিনের মধুর স্মৃতি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

মোহ-ভঙ্গ

শ্রীজ্ঞানরঞ্জন দত্ত বি-এ

বারটা নাগাদ সমীর ছুটতে ছুটতে এসে কলকাতাগামী একটা ট্রেণে উঠে বসলে। সমীরের যাত্রা সুরু ঢাকা থেকে—শেষ কলকাতা।

"এই যে আপনি?"

"নমস্কার মিস্ হালদার।"

জগদম্বা গার্লস্ স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্ মিস্ অসীমা হালদার চলেছেন কলকাতায়, সমীর তা সহজেই আন্দাজ করলে।

"যাক্ বাঁচা গেল; সমস্ত রাস্তাটা আপনার সঙ্গে গল্প করে কাটানো যাবে। তা না হলে—"

"তা না হলে আমিও হাঁপিয়ে উঠতুম। আপনাকে পেয়ে এই নিঃসঙ্গ পথের কষ্ট অনেকটা লঘু হয়ে আসবে; অর্থাৎ Dacca to Calcutta ..." বলেই সমীর আত্ম-তৃপ্তিতে হেসে উঠলো।

সমীর সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি তার সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে যে সে সম্পূর্ণ বেকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী সে সংগ্রহ করেছে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা কোন কাজে লাগেনি। অধ্যাপক-গোষ্ঠী একযোগে ঘোষণা করেছেন—জল-বায়ু নির্দ্ধারণের যে সরকারী বিভাগ আছে, সেখানে সমীরকে তাঁরা উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্ সমীর একবার চেষ্টা করে দেখবে। তাই সে চলেছে কলকাতা।

"ষ্টিমারে গিয়ে আমরা একই কমপার্টমেন্ট দখল করে বসবো—কি বলেন সমীরবাবু?"

মিস্ হালদার তাঁর অসংখ্য লটবহরের মাঝখান থেকে কুঁজোটা টেনে নিতে নিতে পুনরায় বল্লেন, "দেখুন সমীরবাবু, আপনার কাছে আমার এক বিষয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত।"

প্রথমটায় সমীর বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে অনেকটা সময় নিলো। তারপর বল্লে, "ক্ষমা? ক্ষমার কথা কি বলছেন মিস্ হালদার?"

"নিশ্চয়ই—আপনার এতগুলো চিঠি আমি যখন যথাসময়েই পেয়েছি, তখন অন্ততঃ আমার একটা প্রাপ্তি সংবাদও আপনাকে দেওয়া উচিত ছিল। ছি ছি—লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।"

জগদম্বা গার্লস্ স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেসের লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে—কথাটা শুনে প্রথমতঃ সমীরের বিশ্বাস হচ্ছিল না।

চিঠি? হ্যাঁ, সে নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে একখানা করে চিঠি মিস্ অসীমা হালদারকে লিখেছে। কিন্তু উত্তর পায়নি সে একখানারও। কথাটা ভাবতেই সমীর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

"যাক্, আজকে আপনাকে পেয়ে আমার সে দুশ্চিন্তার অবসান হলো। আরো একটা সুবিধে হলো—আমার এই এতগুলো জিনিস—সব সময় নিজে নজর রাখতে না পারলেও আপনার দ্বারা আমার অনেক সাহায্য হবে। শুধু ঐ কাঠের বাক্সটা নিয়েই যত বিপদ। অবিশ্যি, ওটা কেরোসিন কাঠের; কিন্তু ওতে আছে কতগুলো অত্যন্ত delicate

things—একটু ঝাঁকুনিতেই ভেঙে চৌচির হয়ে যেতে পারে। যাক্, আপনি আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করেছেন?"

অসীমা হালদারের অপ্রত্যাশিত আবেগ ও আন্তরিকতায় সমীর সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগলো। সেদিনের সন্ধ্যাবেলার কথা ওর স্পষ্ট মনে আছে। রমনার পশ্চিম প্রান্তে যে ঈষৎ লাল রাস্তাটা সোজা গিয়ে উঠেছে নব নির্ম্মিত ও নব প্রতিষ্ঠিত জগদম্বা গার্লস্ স্কুলের প্রাঙ্গণ ভেদ করে—তারই ঠিক অপর পার্শ্বে সমীরদের বৃহৎ অট্টালিকা। ওর স্পষ্ট মনে আছে মিস্ অসীমা হালদার যেদিন পঞ্চাশজন ছাত্রী নিয়ে এই জগদম্বা গার্লস্ স্কুলের প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন করলেন সেদিনই সমীরের হয় love at first sight.

অসীমা হালদারও কলকাতার কৃষ্টি নিয়ে যেদিন প্রথম জগদম্বা স্কুলের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন সেদিনই তিনি লক্ষ্য করলেন—সম্মুখে সমীরদের বৃহৎ অট্টালিকা। অসীমা আকাশের দিকে চেয়ে ভগবানকে স্মরণ করলেন একবার। ঠিক তার পরের দিনই তিনি প্রথম চিঠি পেলেন সমীরের কাছ থেকে।

দুই

ষ্টিমারে উঠে অসীমা হালদার বল্লেন "চিঠির উত্তর অবিশ্যি আমি দিই নি আপনার, কিন্তু মনে মনে আপনাকে আমি ভালবাসতাম তখন থেকেই।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী সমীরের বুক গর্ব্বে স্ফীত হয়ে উঠলো।

"আপনার চিঠির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বুঝতেই পারছেন, আপনার চিঠির প্রতি ছত্রে আপনার যে অগাধ বিদ্যে বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় আমি পেয়েছি, তার যোগ্য উত্তর দেওয়ার মত বিদ্যে আমার পেটে নেই। তা ছাড়া কবিতার যে কোটেশন্ আপনি দিয়েছেন, তার অর্থ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে পারি তেমন কোন ডিগ্রীও আমার নেই।—" বলেই অসীমা হালদার কেরোসিন কাঠের বাক্সটা সন্তর্পণে বেঞ্চের নীচে ঠেলে দিলেন।

"বুঝতেই পারছেন এটাকে একটু সাবধানে রাখা উচিত—ভেতরের জিনিসগুলো অত্যন্ত delicate—"

অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল সমীরের দিক থেকে প্রকাশ পেলো না; কিন্তু ও বল্লে, "এক গ্লাস জল কুঁজো থেকে গড়িয়ে নিতে পারলে মন্দ হতো না—যদি অনুমতি করেন—"

"সে কি! আমিই দিচ্ছি; এ কাজ তো মেয়েমানুষের।"

—অসীমা মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করে সমীরের জন্য কাচের গ্লাসে করে জল নিয়ে এলেন।

ধন্য সমীর! চার মাস চিঠি লিখে সে পায়নি মুহূর্ত্তের জন্যে ওর সঙ্গে আলাপ করবার অনুমতি। আর আজকে সেই জগদম্বা গার্লস্ স্কুলের হেড মিস্ট্রেস্ স্বহস্তে তাকে করছেন জল পরিবেশন। পৃথিবীতে এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হতে পারে!

চায়ে চুমুক দিয়ে অসীমা বল্লেন, "সত্যি, আপনিই ভেবে দেখুন, আমাদের মত লোকের 2nd class-এ travel করার মত দুঃসাহস না থাকাই উচিত। ৫০৲ পেয়ে খাতায় ১০০৲ লিখতে হয়। তবু 2nd class-এ travel করছি, তার কারণ luxury নয়, নিতান্ত প্রয়োজন বলেই।"

সমীর অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে প্রশ্ন করলে, "কি প্রয়োজন।"

"প্রয়োজন? হ্যাঁ, প্রয়োজন নয় তো কি? রাস্তায় বেরুলে আশ-পাশের লোকগুলোর নির্লজ্জ দৃষ্টিতে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথায় বিষিয়ে ওঠে। ছিঃ, ভদ্র যুবকদের দৃষ্টির এমন অভদ্র ব্যবহার—তার চাইতে মুসলমানদের 'বোরখা' system অনেক ভাল। তা হলে অন্ততঃ 2nd class-এর ভাড়াটা আমার বেঁচে যেতো।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অসীমা অবশিষ্ট চাটুকু নিঃশেষ করে ফেল্লেন।

পূর্ব্ব কথারই সুর টেনে অসীমা হালদার আবার বল্লেন, "ছিঃ, সমীরবাবু, আমার লজ্জার কথা আপনি ভাবছেন না—এই তো চায়ের জন্য দেড় টাকা খরচ করে ফেল্লেন, অথচ আট আনা পয়সা spare করবার মত ক্ষমতা নেই আমার। আপনারা বড় লোক, ৫০৲ হয়ত আপনার সিগারেটে খরচ হয়—sorry, আপনি বুঝি সিগারেট খান না?"

ফস্ করে সমীর মিথ্যে কথা বলে ফেল্লে, "কই, না—সিগারেট তো আমি খাই নে।"

"সত্যি কথা বলতে কি, পুরুষ জাতির মধ্যে আপনিই একমাত্র exception—আপনাকে দেখে আমার প্রথম থেকেই ঠিক এমনটি-ই কল্পনায় এসেছিল। মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে আমার পূর্ব্ব জন্মের সম্বন্ধ।"

সমীর পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান 'বয়'-এর হাতে দেড় টাকা চায়ের দামের সঙ্গে আরও এক টাকা বকশিস দিয়ে তাকে বিদায় করলে।

মনে মনে সমীর ভাবলে, হেলেনের জন্য সমস্ত ট্রয় নগরটা পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল, আর জগদম্বা গার্লস স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেসের জন্য এক টাকা খরচ করা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়।!

মিস্ অসীমা হালদার অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সমীরকে উদ্দেশ করে বল্লেন, "রাত্তিরে নিশ্চয়ই খাওয়ার বন্দোবস্ত এখানেই করতে হবে—গোয়ালন্দ থেকে তারপর ট্রেণে বসে সমস্ত রাতটা দু'জনে গল্প করে কাটাবো। আর দেখুন এমন একটা কমপার্টমেন্ট নেবেন যেখানে আমরা ছাড়া আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি থাকবে না।"

উৎসাহ-উদ্দীপনায় সমীরের হৃদ্‌পিণ্ড তার বুকের মাঝে যেন শব্দ করতে লাগলো। সমীর বল্লে "না এমন কিছু ভীড় তো নেই আজকে। শুধু second class-এ একজন কলেজের অধ্যাপক আছেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি বটে—মিঃ শঙ্কর চাকলাদার।"

"আশ্চর্য্য! মিস্ হালদার, তা হলে আপনি তাঁকে নিশ্চয়ই চেনেন?"

অসীমা উত্তর দিলেন, "কি আর এমন আশ্চর্য্য হবার আছে তাতে? তাঁর সঙ্গে আমার আলাপও আছে।"

"চমৎকার লোক ঐ মিঃ চাকলাদার, যেমন বিদ্বান্ তেমন অমায়িক; এমন profound scholar, অথচ এতটুকু অহঙ্কার নেই মনে।"—বলেই সমীর বাইরে গেল।

অসীমা আন্দাজ করলেন, সমীর নিশ্চয়ই গেছে রাত্রির আহারের বিশেষ বন্দোবস্তে।

এমন সময় ওপাশের কামরা থেকে মিঃ চাকলাদার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে অসীমার সম্মুখীন হলেন।

"মিস্ হালদার যে! এত জিনিস-পত্র নিয়ে চল্লেন কোথায়?"

অসীমা তাঁর কেরোসিন কাঠের বাক্সের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য একবার দৃষ্টি দিয়ে বল্লেন, "সে কি, আপনি বুঝি খবর পান নি যে জগদম্বা গার্লস স্কুল উঠে গেল?"

"কেন?"

ঔদাস্যের ঝাঁজ মিশিয়ে অসীমা বল্লেন, "পঞ্চাশটি দুধের শিশু নিয়ে কি আর একটা স্কুল চলতে পারে! যাক্ এসে তবু তো আপনাদের সঙ্গে খুবই সৌহৃদ্য হয়ে গেল।—জীবনে সত্য বন্ধুত্বই তো দুর্লভ।"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই। পৃথিবীতে সত্যিকারের বন্ধুত্ব ক'টা সম্ভব হয়েছে, আর ক'টাই বা সম্ভব হবে। আমার জীবনে প্রকৃত বন্ধু আজ পর্য্যন্ত ক'টি পেয়েছি তা আমি নিজেও ঠিক জানি নে।"

"আমার সে বিষয়ে ভাগ্য আছে বলতে হবে কিন্তু। ট্রেণে চেপে আপনাদেরই সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে এমন একটি ছেলের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব হয়েছে। দেখতে তো পাচ্ছেনই সঙ্গে একটা পুরো সংসার, সব জিনিসই চোখে চোখে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না"—বলে মিস্ অসীমা হালদার সেই সযত্নে রক্ষিত কেরোসিন কাঠের বাক্সটার দিকে পুনরায় একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

"ঐ যে বন্ধুটি আপনার আসছেন মিস হালদার—" মিঃ চাকলাদার কথাটা শেষ না করেই দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। পথে সমীরের সঙ্গে দেখা। সমীর সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাতে মিঃ চাকলাদার প্রতি-নমস্কার করে বল্লেন, "ভাল কথা, সমীর তুমি তো কলকাতা যাচ্ছ। সেই সঙ্গে তোমাকে একটা কাজ করে আসতে হবে কিন্তু। নেহাতই আমার কাজ, তাই তোমাকে অনুরোধ করা। বিশেষ করে তোমার মত student জীবনে আমি আর একটি মাত্রই দেখেছি। নামও হয়ত শুনে থাকবে ফরিদপুরের হরিহর নাগের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী ক্ষণিকা নাগ। যেমন তার অসাধারণ ইংরেজী লেখার style, আর সেই সঙ্গে অল্প বয়সে জ্ঞান-সঞ্চয়ও করেছে অপরিসীম।"

'কিন্তু, কলকাতায় গিয়ে আপনার কি কাজ আমায় করতে হবে sir?"

আশু কর্ত্তব্য সম্পাদনের গৌরবে সমীরের মুখাবয়ব সহসা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ, কাজ এমন বিশেষ কিছু নয়। আমারই জীবনের একটা স্মরণীয় ব্যাপার—অবশ্যি তোমার কাছে তার মূল্যই বা কি।—কিন্তু সমীর, তবু আমার আন্তরিক ইচ্ছে আমার বিয়েতে তুমি যোগদান কর।"

সমীর এতক্ষণ পর নিশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলো। উৎসাহ-আবেগে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছে sir? কার মেয়ে, কি নাম?"

"কার মেয়ে? এমন কিছু বড়লোকের মেয়ে কিংবা আত্মীয়া সে নয় সমীর, যে তার বিশেষ কিছু একটা পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, বলতে পার student হিসেবে তুমি ছাড়া তার আর কোন সমকক্ষ নেই। ২১ নং বেনিয়াপুকুর রোডে মেয়েটার বাবা হরিহরবাবু সম্প্রতি দু'মাস ধরে আছেন। অবিশ্যি বিয়ের পর সেখানে যে বেশী দিন থাকবেন তার কিছু নিশ্চয়তা নেই; আর পয়সা খরচ করে শুধু শুধু কলকাতায় থাকা উচিতও নয়। ভাল কথা, তুমি মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করছিলে না? মেয়েটার নাম ক্ষণিকা নাগ। হরিহর বাবু বড্ড unhappy; কারণ তাঁর আর কোন সন্তান নেই। শুনেছি ফরিদপুরের দিকে তাঁর যথেষ্ট landed property আছে। কিন্তু তাঁর বাৎসরিক আয়ের কোন পরিমাণ আমি নির্দ্দিষ্ট ভাবে আজ পর্য্যন্ত জানি নে। সে দিকে হরিহরবাবুর বিশেষ কোন খেয়ালও নেই; সদাশিব মানুষ—দিনরাত বই নিয়েই আছেন; বইয়ের বাইরেও যে একটা জাজ্জ্বল্যমান জগৎ বর্ত্তমান, সে দিকে অনেক সময় যেন তাঁর খেয়ালই থাকে না। তুমি হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছ সমীর, যে সংসারে এমন indifferent লোকও হতে পারে! সত্যি, সংসারে কি যে হতে পারে—আর কি যে হতে পারে না, সে সম্বন্ধে মানুষ কতটুকু জানে? আর তুমি তো সবে এম্-এস্‌সি পাশ করে বেরুলে।"

মিঃ চাকলাদার মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হলেন। সমীর নিঃশব্দে মূঢ়ের মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর কামরায় ফিরবার পূর্ব্বেই 'শুভ বিবাহে'র চিঠিখানা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে আকাশের দিকে দিলো উড়িয়ে। সমীর একবার ফিরেও দেখলে না কাগজের টুকরোগুলো নদী-বক্ষে কোথায় যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তিন

"যাক্ বাঁচা গেল—এবার আর কোন গোলমাল নেই, একেবারে কলকাতা।"—গোয়ালন্দে ট্রেণে উঠে মিস্ অসীমা হালদার নিজেকে যথেষ্ট নিরাপদ মনে করলেন। অসীমা আবার বল্লেন, "সত্যি সমীরবাবু, রাত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুবিধে এই যে গাড়ীতে কখনো 'চেকার' ওঠে না।"

"উঠলেই বা ক্ষতি কি?" মূর্খ সমীর ততোধিক অজ্ঞতা নিয়ে অসীমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে রইলো।

"হ্যাঁ, ক্ষতি আছে বই কি? দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ঘুমের ব্যাঘাত তারা কোন রকমেই করতে পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণী কিংবা প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে তাইতো আইন। সত্যি, সমীরবাবু, সেই জন্যেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে travel করে আরাম আছে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সমীর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঐ যে রেলের টুপীপরা ভদ্র লোকটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলেন, তিনি কি বাঙ্গালী ?"

আশ্চর্য্য! অনর্থক কৌতূহলে সমীরের কি যে লাভ অসীমা তা ভেবে পেলেন না। বল্লেন, "হাঁ, বাঙ্গালী বই কি। এই কিছুক্ষণ আগেই হলো তাঁর সঙ্গে আলাপ। ভদ্রলোকটি বি-এ পাশ করতে না পেরে রেলের চাকুরীতে ঢুকে পড়েন; এখন Crew-in-charge, আশা আছে ভবিষ্যতে উনি উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠবেন।"—অসীমার মুখে অবজ্ঞা মেশানো একটু বক্র হাসি খেলে গেল।

"Parts থাকলে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠবেন এতে আশ্চর্য্য কি?"—সমীর বল্লে।

"Parts! সমীর বাবু, আপনার মত বিদ্যে বা ডিগ্রী আমার না থাকতে পারে, কিন্তু আমি মানুষ চিনি। Parts হয়ত অনেকেরই থাকে, তবে ক'জনই বা সে parts সম্বন্ধে Conscious, আর ক'জনই বা তার সদ্ব্যবহার করতে জানে? যাক্‌গে, দয়া করে আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন। বলা যায় না—হয়ত রাতদুপুরে এসে ভদ্রলোকটি আড্ডা জমাতে পারেন।"

সমীর মিস্ অসীমা হালদারের কথার চাতুর্য্যে ক্রমশঃই চমৎকৃত হচ্ছিল।

পূর্ব্ব কথারই সুর টেনে অসীমা বলতে লাগলো, "আর বুঝতে পারছেন তো—night duty দিতে দিতে এদের জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। এরই মধ্যে একটু বিশ্রামের জায়গা যদি পান তা হলে ঘাড় গুঁজে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে চাইবেন। আর আমিও চাইনে আমাদের মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি থাকে; সুতরাং—" কথাটা অসমাপ্ত রেখেই অসীমা ভেতর থেকে দরজাটা দিলেন বন্ধ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী যুবক সমীরের শরীরে রক্তের বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেন শুকিয়ে উঠলো। এমন অভূতপূর্ব্ব কল্পনাতীত অভিজ্ঞতা জীবনে সে কখনো আশা করতে পারেনি। না হয়, চা আর 'ডিনারে'র জন্য তার দশ-পনর টাকাই খরচ হয়েছে, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সে যে তার জীবনের মানসীকে এমন রোমাঞ্চকর আবহাওয়ার মধ্যে খুঁজে পাবে সে কথা ভাবতেও সমীরের চমক লাগছিল। বেকার-জীবনের তিক্ততা আজকে ওর কাছে হয়ে উঠলো মাধুর্য্যময়, রসাপ্লুত। কে কল্পনা করতে পারে বাঙ্গালী যুবকের হাতের এত কাছে স্বর্গ-সৃষ্টি সত্যই সম্ভব হবে! বিশেষ করে যারা গড়ে ২২ বছর আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে তারা অসীমার এই আকস্মিক সান্নিধ্য কি করে উপভোগ করতে পারে!

"এইবার আপনি জামাটা খুলে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে দিব্বি আরামে শুয়ে পড়ুন। বলা যায় না, আলো দেখে সেই রেলের টুপীপরা ভদ্রলোকটী হয়ত মাঝ রাত্তিরে এসে দরজা ধাকাধাক্কি করতে পারেন। ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য রকমের আড্ডা প্রিয়।" অসীমা কেরোসিন কাঠের বাক্সটা একটু নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখে দেহের কাপড়টা একটু গোছাতে লাগলেন।

"আপনারা—পুরুষরা কিন্তু একটা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে দিয়েই খালাস। আর আমাদের বেলায়ই কাপড়, কাপড় আর কাপড়। দেহের আবরণের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে নিজেরই কষ্ট হয়।"—জগদম্বা স্কুলের হেড্ মিস্‌ট্রেস্ কথাটা বলতে বলতে মাথার উপরের বৈদ্যুতিক পাখাটা দিলেন খুলে।

অসীমা আবার বল্লেন, "আর তার উপর অসংখ্য বাঙ্গালী পুরুষের অত্যুগ্র প্রেমের উত্তাপে দেহের কোন অংশই ফোস্কা থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। আপনাদের মিঃ চাকলাদার এ বিষয়ে অত্যন্ত ভদ্র; তাই রাত্তিরে আড্ডা জমাবার কোন মতলব আঁটেন নি।"

কথাটা শুনে সমীর গা থেকে পাঞ্জাবীটা টান মেরে খুলে ফেল্লে। তার পর সেটা সযত্নে 'ব্রাকেটে' ঝুলিয়ে রেখে বল্লে, "এবার আলোটা নিভিয়ে দেয়া যেতে পারে।"

"হ্যাঁ, তাই দিন। তার পর আসুন আমাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা নিয়ে খানিকটা আলাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ি। আপনার নিশ্চয়ই ঘুমুতে আপত্তি নেই?" সমীর অন্ধকারে ঠিক আন্দাজ করলে অসীমা নিশ্চয়ই উত্তরের অপেক্ষায় আছেন।

"-না, আপত্তি আর কি? তবে ট্রেণে আমি আদৌ ঘুমুতে পারি নে।"

"আমার কিন্তু ট্রেণের একটু ঝাঁকুনিতেই ঘুম এসে যাবে। যত ভাবনা ঐ কেরোসিন কাঠের বাক্সটা নিয়ে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সমীর বল্লে, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন মিঃ চাকলাদার কলকাতায় বিয়ে করতে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ, তা জানি বই কি! নইলে আর কলকাতা যাচ্ছি কেন? যাচ্ছি তো তাঁরই বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে।"—অসীমা হো হো করে হেসে উঠলেন। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমীরের মনে হলো অসীমা যেন তাকে ব্যঙ্গোক্তি করছেন।

"সত্যি, সমীরবাবু, কতো পুরুষের জীবনে এমনতরো মর্ম্মান্তিক পরিণতি আমি কতোবার যে ঘটতে দেখেছি তার কোন সংখ্যা করা যায় না। ভালবাসার এই তো বিড়ম্বনা—তা আপনিই কতকটা বুঝতে পারবেন শেয়ালদা ষ্টেশনে নেবেই; আর—" কথাটা শেষ না করেই অসীমা বল্লেন, "একটা সিগারেট আনিয়ে দিতে পারেন সমীরবাবু?"

আশ্চর্য্য! বলে কি! জগদম্বা স্কুলের হেড্ মিস্‌ট্রেস্ শুয়ে শুয়ে সিগারেট ফুঁকবে—কথাটা ভাবতে গিয়ে সমীর অন্ধকারে অপরিমিতভাবে ঘেমে উঠলো।

সিগারেটে আগুন ধরিয়ে মিস্ অসীমা হালদার বল্লেন, "পৃথিবীতে এক দলের লোক আছেন যাঁরা প্রেম করবার সময় আর বিয়ে করবার সময় পাত্রী পরিবর্ত্তন করে থাকেন। কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমার ভরসা এই, আপনার মধ্যে সে রকম কোন আধুনিক পশুত্ব জন্ম নেয় নি।"

সমীর সঙ্কুচিত ভাবে বল্লে, "আপনি আমাকে অনর্থক বড্ড উঁচুতে তুলছেন মিস্ হালদার।"

অসীমা সমীরের কথায় কান না দিয়ে বলে বল্লেন, "—কিন্তু পৃথিবীতে এক দল মেয়ে আছে যারা প্রথমটায় চরিত্রটিকে পবিত্র রেখে মনটাকে দেয় ছেড়ে পরের হাতে—তারপর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা নিয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করা চলে। চলে না শুধু কোন ভদ্রলোককে বিয়ে করা। কিন্তু আপনাকে পেয়ে আমার সে ভয় আর নেই।" অসীমা দগ্ধ সিগারেটের টুকরোটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন।

শঙ্কিত মনে সমীর জিজ্ঞাসা করলো, "ও কি? আপনি নেবে যাচ্ছেন নাকি?"

"অত বড় মূর্খ আমি নই, সমীরবাবু। রাত দুপুরে আপনার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে রাজ্যের লটবহর নিয়ে compartment বদলাবো এত বড় মূর্খ আমায় কি করে ভাবলেন আপনি? তার ওপর ঐ কেরোসিন কাঠের বাক্সটা টানা হেঁচড়া করা কত যে বিপজ্জনক তা আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে কি?"

লজ্জিত হয়ে সমীর বল্লে, "আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন মিস্ হালদার।"

"অপরাধ? কি যে বলেন আপনি! উপরন্তু আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, আপনার ভেতরে বিন্দুমাত্র পশুত্ব নেই। আপনি অসাধারণ ভদ্রলোক; এক জায়গায় রাত কাটিয়েও কাল সকালে আমরা দেখবো আমরা কেউ কাউকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করি নি। মিঃ চাকলাদারকে কাল জোর গলায় বলতে পারবো, সমীরবাবুর মতো চরিত্র সংসারে দু'জনের নেই।"

অসীমার কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সমীর ঘুমিয়ে পড়লো। আর অসীমা? আরও একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকারে কতক্ষণ পায়চারী করলেন। তার পর নিজের মনেই হেসে উঠে ভাবলেন, সমীর তার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট হবে অর্থাৎ সমীরের বয়স যদি পঁচিশ বছর হয়, তাহলে সে ত্রিশে পড়েছে। জগদম্বা গার্লস স্কুলের হেড্-মিস্‌ট্রেস বুকের উপর হাত রেখে সে কথা তীব্রভাবে অনুভব করলেন। নিঃশেষিত যৌবনের দুইটী পরিত্যক্ত কঙ্কাল এক কামরায় শুয়ে থেকেই চরিত্রের পবিত্রতা বাঁচিয়েছে—পৃথিবীতে এর চেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা আর কোথাও সংঘটিত হয় নি। কথাটা ভাবতে ভাবতে অসীমার দ্বিতীয় সিগারেটও প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলো।

* * * * *

অপ্রতিহত গতিতে ট্রেণ ছুটে চলেছে। একটা ক্রুদ্ধ অজগর যেন এই সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে কোন প্রতিশোধ নিতে। অসংখ্য লোক অসংখ্য সমস্যা নিয়ে কামরায় বসে যখন ঝিমাচ্ছিল, তখন সমীর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। সহসা কিসের একটা আর্ত্তনাদে সমীরের ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার কামরায় আন্দাজ করা সমীরের পক্ষে অসম্ভব হলো। ও জিজ্ঞাসা করলো, "মিস্ হালদার, আপনি ঘুমুচ্ছেন?"

"না, ঘুম আর আসছে কোথায়! কিন্তু, হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙে গেল যে?"

"হ্যাঁ, কিসের যেন একটা শব্দ হলো। উঠে দেখবো?"

"না, না, কিচ্ছু দরকার নেই। কোন এক মেমসাহেব বোধ হয় ভুলে তাঁর প্রিয় কুকুর-বাচ্চা ফেলে গেছেন। আমি 'বাথ-রুমে' আটকে রেখেছি; প্রিয়-হারা প্রিয়ার সকরুণ আর্ত্তনাদের মতো কুকুরের বাচ্চাটা মাঝে মাঝেই এরকম চীৎকার করে উঠছে। আপনি আবার ঘুমিয়ে পড়ুন।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পর সমীর আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

চার

"হ্যাঁ, এবার আপনি জিনিসগুলো কুলীর মাথায় দিয়ে নিরাপদে নেমে আসুন। আমি যাচ্ছি বাইরে—একটা Taxi ঠিক করে আসি।"—বলেই অসীমা 'প্ল্যাটফর্মে' নেমে পড়লেন।

অসীমা 'প্ল্যাটফর্মে' নামতেই সামনেই পেলেন বন্ধু পল্লব পাত্রনবীশকে।

"Hallo! এই যে, পল্লব, তোমাকেই খুঁজছিলাম। ঠিক সময়ে চিঠি পেয়েছিলে তো? চলো বাইরে যাওয়া যাক্।"

'প্ল্যাটফর্ম' থেকে বাইরে এসে পল্লব জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার জিনিসপত্তর কি জগদম্বা গার্লস স্কুলেই রেখে এলে নাকি?"

"না, না,—তোমার কোন ভাবনা নেই, পল্লব। আপাততঃ কলকাতায়ই কিছুদিন থাকবো, অন্ততঃ যতদিন না আর একটা চাকরী জুটছে। আচ্ছা, তুমি এবার যাও তো, একটা Taxi ঠিক করে এসো। পেছনেই আসছে আমার জিনিস-পত্তর।"

"পেছনে আসছে মানে? জিনিসগুলো কি হেঁটে আসবে নাকি?"

"তোমার তাতে ভয় কিসের, পল্লব? তারা হেঁটেই আসুক বা মাথায় বসেই আসুক, তোমাকে তো আমি পেয়েছি। চলো, এই ফাঁকে এক কাপ চা খেয়ে নেয়া যাক্।"

সমীর ট্রেন থেকে নেমে একটা কুলীকে বল্লে, "এই কাঠের বাক্সটা সাবধানে নামিও।"

কিন্তু সাবধানে নামাতে গিয়েও বাক্সটা হাত থেকে ছিটকে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল। সেই মুহূর্ত্তেই সমীর স্পষ্ট শুনতে পেলো, বাক্স থেকে আসছে বিকট একটা আর্ত্তনাদ।

কুলী বল্লে, "বাবু, ইসমে কুত্তা হায়—শালা চিল্লাতা।"

এমন সময় সেই রেলের টুপী-পরা ভদ্রলোকটি সামনে এসে সমীরকে বল্লেন, "আপনাকে এর ভাড়া দিতে হবে।"

"তার মানে?"

মুচকি হেসে ভদ্রলোক বল্লেন, "মানে, পৃথিবীতে যতগুলো বে-আইনী কাজ আছে, ট্রেনে বিনা ভাড়ায় লুকিয়ে কুকুর নিয়ে যাওয়াও তার মধ্যে একটা। আর আপনার টিকিটটি দয়া করে একটু দেখাবেন।"

সমীর পকেট থেকে টিকিট বার করতে গেল। "আশ্চর্য্য! টিকিট যে পাচ্ছি নে। এই পকেটেই তো ছিল।"

সমীর পুনরায় কামরায় উঠে তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলো। কিন্তু—?

"টিকিট যে পাওয়া গেল না। অসম্ভব ব্যাপার!" সমীরের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে এলো।

"তাই বলে রেল কোম্পানী কাউকে ক্ষমা করবে না। আপনাকে সমস্ত ভাড়া দিতে হবে।" আনন্দে রেল-কর্ম্মচারীর মুখ ঈষৎ হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

"আচ্ছা, তাই নিন।" সমীর পকেট থেকে টাকা বার করতে গিয়ে মূর্চ্ছিতের মত বসে পড়লো কাঠের বাক্সটার উপর।

"সর্ব্বনাশ! পঞ্চাশ টাকার একটী আধলাও যে নেই।"

পেছন থেকে মিঃ চাকলাদার বলে উঠলেন, "কি হে সমীর, Platform-এ বসে আছ যে? ওকি তুমি এমন হতভম্ব কেন?"

"Sir, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। পকেট থেকে টিকিট গেছে, টাকা গেছে, তার উপরে ঐ কুকুরের বাচ্চা—Platform-এ নেমেই এমন চীৎকার সুরু করে দিয়েছে যে রেলের কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত শুনতে পেলে।"

"আমি সব বুঝতে পেরেছি, সমীর। যা'হোক্, তোমাকে আমি এই পঞ্চাশ টাকা দিলুম, অর্থাৎ ধার দিলুম। তুমি এখনি থানায় গিয়ে একটা 'ডাইরী' করে এসো। হ্যাঁ, আর দেখো সমীর, তোমার সঙ্গে যে সব Passenger এসেছে তাদের নাম আর ঠিকানা পুলিশকে দিতে ভুলো না যেন।" মিঃ চাকলাদার আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

সমীর বাইরে এসে অসীমাকে বল্লে, "এই যে আপনি। আপনার জিনিসগুলো সব দেখে নিন।"

"দেখে আর কি নেব, সমীরবাবু; দেখবার কিই বা আছে? শুধু ভাবনা ঐ কেরোসিন কাঠের বাক্সটার জন্যে। ওতে কতোগুলো জিনিস আছে কিনা, যা অত্যন্ত delicate—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সমীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সমীরের গা জ্বালা করছিলো।

"হ্যাঁ, ভালকথা, সমীরবাবু, ইনি আমার একজন বিশিষ্টবন্ধু পল্লব পাত্রনবীশ, কলকাতার একজন নামজাদা Advocate, roaring practice."

সমীর বল্লে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তারপর অসীমা Taxiতে উঠে বসতেই Taxi ছুটে বেরিয়ে গেল।

Taxi রাস্তায় বেরুলে পল্লব জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি এর পরিচয় পেলে কি করে, অসীমা?"

"তাতে আর তোমার ভয় কি, পল্লব? উনি তো আর আমার ঠিকানা জানেন না। তা ছাড়া—" অসীমা কথাটা শেষ করতে না করতেই Taxi এসে দাঁড়ালো একটা প্রকাণ্ড হোটেলের সামনে।

জাপান

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

(৪)

নিজের গৃহের বিশৃঙ্খলতার উপলব্ধি অথবা কোন জিনিসের প্রয়োজনীয়তা এত সহজে আসে না, প্রতিবেশীর শ্রীবৃদ্ধিতে যেমন ধারা উহা বিভিন্ন প্রকারের চিকীর্ষা নিয়ে আসে। পরশ্রীকাতরতা সর্ব্বদাই অমার্জ্জনীয়; ইহা অতি নিম্নস্তরের দোষ; প্রতিযোগিতাকে আদর্শের আহ্বান বলে নেওয়াই মনের স্বাভাবিক বুদ্ধির উত্তেজনা। ইয়োরোপের নগণ্য ক্ষুদ্র জাতিগুলি এই প্রতিযোগিতার উন্মত্ততাতেই তো আজ প্রত্যেকে এক একটী 'গণ্য' জাতি বলিয়া নিজেদের জাতির বিশিষ্টতায় স্ফীত! ভারত ভৌগলিক অবস্থায় আবদ্ধ থাকায় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছিল সীমাবিশিষ্ট অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশগুলির মধ্যে। ঘোড়ার কপাল-বোর্ডে জয়পত্রিকা লট্‌কিয়ে রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার দাবী করিয়া অন্যান্য রাজন্য-বর্গকে যুদ্ধে আহ্বান করার যে প্রথা ছিল উহা সাম্যতা উদ্বোধনের সহায়ক ছিল না একেবারেই; পক্ষান্তরে বর্ব্বর বৈষম্যতার বীজই সৃষ্টি করিত। ইয়োরোপে এই বর্ব্বরতা অত্যধিক মাত্রায় থাকিলেও অধিকাংশ জাতিগুলির মনই বহির্মুখীন হয়ে পড়েছিল। পর্ত্তুগীজ, স্পেনিয়ার্ড, ডচ্, ফরাসী, ব্রিটিশ প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে লেগে গিয়েছিল

সমুদ্র মন্থনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা; জাপান ছিল মাতৃগহ্বরে, একেবারে জরায়ুর মধ্যে; ভারত ছিল ডিম্বাশয়ে।

সমুদ্র মন্থন—পৌরাণিক যুগে দেবতা এবং অসুরের মধ্যে সমুদ্র বক্ষে হস্তী, অশ্ব, ধনরত্নবহুল দেশগুলি অধিকারের দ্বন্দ্ব বলিয়াই মনে হয় এবং দেবতা ও অসুর সম্প্রদায়ও যে দুইটী বিভিন্ন সভ্য অসভ্য, শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় অথবা আর্য্য অনার্য্য সমাজ বিশেষ ছিল এই সিদ্ধান্তও একেবারে উপেক্ষিত নয়; যুদ্ধের পরিণাম জয় পরাজয়ও যে রূপকভাবে অমৃত এবং বিষ বলে বর্ণিত ইহাও অযৌক্তিক নয়; কিন্তু তথাপি অমানুষিক দৈব প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়ার সৌভাগ্য দেশের লোকের ভাগ্যে ঘটে নাই; এ সৌভাগ্য জাপানের হয়েছিল। আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতা, জাপানে ততোধিক। পায়খানার অধিপতিও একটী দেবতা! মন্দিরগুলিই যে দেবতাদের একচেটীয়া সম্পত্তি হবে ইহাই বা কেমন কথা! ভারতের দেবতাগুলি বোধ হয় বাহ্যে প্রস্রাব করেই না; জাপানের দেবতাগুলি বাহ্যে প্রস্রাব করে বলিয়াই পায়খানায়ও উহাদের একজন প্রতিনিধি রেখে দিয়েছে; কাযেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে পায়খানার প্রতি কখনই ঔদাসীন্য দেখান হয় না। জাপানের দেবতাগুলির মধ্যে এই প্রকার উদার সোসিয়ালিজম্ (সমাজনীতি) ছিল বলিয়াই জাপান সহজে ঘাড়চাপা ধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতের দেবতাগুলির মধ্যে উক্ত প্রকারের উদার সমাজনীতি তো নেইই; বরং পক্ষান্তরে আমিষ নিরামিষের গণ্ডী সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির সহায়ক; কোন দেবতা খায় পাঁঠা মহিষ, কোন দেবতা খায় শাক ভাজা পুয়ের চড়্চড়ি! যে দেশের দেবতাগুলিই পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, সে দেশের লোক যে মেথরের ছায়া মাড়াইলে গঙ্গায় মুক্তিস্নান করিবে তাহাতে বিস্মিত না হওয়াই তো মূর্খতা! পেট করিয়া থাকে সর্ব্বদা আহারের চিন্তা, মাথা করে ধর্ম্মের আবশ্যকতা উপলব্ধি; পেট যদি মস্তিষ্কের পরিপোষণ না যোগায়, তবে ধর্ম্ম বেচারাকে শুকিয়ে মরতে হয় না কি? জাপান এই বিষয়টী এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে, সমস্ত জাতিই পেটের সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছিল। ধর্ম্ম সমাজের উপরই স্থাপিত; সমাজ সুগঠিত না হইলে ধর্ম্মের চূড়া ধ্বশে পড়ে যায় এবং তাহার স্থান অধিকার করে অজ্ঞতা এবং মূর্খতার গোঁড়ামি।

মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার প্রথম কান্নাই সূচিত করে একটা শারীরিক আবশ্যকতা। তাহার শরীরস্থ রক্ত চায় অক্সিজেন; সেই আবশ্যকতার উপলব্ধিতে শিশু ক্রন্দন করিলেই তাহার ফুস্ফুসে অক্সিজেন বায়ু প্রবেশ করিয়া শিশুকে বাঁচায়; সেই সময় হইতেই আরম্ভ হয় মরণ বাঁচনের সংগ্রাম; মরণ পর্য্যন্ত এই জীবন সংগ্রামে খাদ্যই হয়েছে প্রধান আবশ্যকীয়। এই আবশ্যকীয় বিষয়টাকে জাপানিগণ ইয়োরোপীয়ান্দের মত অত্যাবশ্যকীয় করে নিয়েছে। জাপানিগণ এক আদিত্যে দ্বিভোজন করিলেও একাদিত্যে এক-আহারী বাঙ্গালিগণ পাকস্থলীকে যে প্রকার নির্দ্দয়ভাবে গরুর গাড়ীর মত বোঝাই করে, ইহারা সেই প্রকার করে না। জাপানীদের খাদ্যে মূলতঃ বেশী সারবান উপাদান না থাকিলেও উহা বাঙ্গালীর খাদ্য অপেক্ষা সারবান; কারণ দুগ্ধের সর ফেলে দুগ্ধ খাওয়া যেমন মূর্খতা প্রকাশক, ভাতের মাড় ফেলে ভাত খাওয়াও তেমন মূর্খতা প্রকাশক বলিয়া উহারা ভাতের মাড় ফেলে ভাত খায় না। দধি দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি স্নেহময় খাদ্য উহারা বিশেষ পছন্দই করে না; ঘৃতের গন্ধে বিষ্ঠার ন্যায় ঘৃণা প্রকাশ করে। সহরবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ মাংসাশী হইলেও পল্লীবাসিগণ অনেকেই অধিক সময় শাকশব্জী এবং মৎস্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যথার্থ নিরামিষাশী অর্থাৎ যাহারা দধি, দুগ্ধ, মাছ, মাংস স্পর্শ করে না এমন লোকের সংখ্যা বেশী নয়। ইহাদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ রাজসিক ভাবের নয়; অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দৈ দে, লুচি আন্, হরেকে ডেকে দে, কেষ্টাকে তামাক দিতে বল প্রভৃতি রকমের হৈ হৈ রৈ রৈএর বিশৃঙ্খলতা স্থান পায় না। শব যাত্রাতেও বিহ্বলতা দেখায় না, আমোদ-আহ্লাদেও হট্টগোল বাধায় না। ধর্ম্ম মন্দিরেও ইহারা এমন সুনিপুণ সুশৃঙ্খলার সহিত অভিবাদনের ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে যে সৈন্যবিভাগের সৈন্যদের কুচ্কাওয়াজের সামরিক ঐক্যতাও ইহার নিকট হার মানে! ইহাদের চরিত্রের বিশিষ্টতা শুধু দ্রষ্টব্য নয় গ্রহণীয়! ইহারা মেয়ে-পুরুষ সকলেই অল্পভাষী; উচ্চারণও মৃদু; পুরুষের ভাষার মধ্যে দৃঢ়তা, হাসির মধ্যে অট্টভাব, চোখ্ যায় বুজে;

মেয়েদের মুখে ফুলের হাসি; ধার করা না! কুৎসিত বাক্য প্রয়োগপ্রথা ভাষার মধ্যেই প্রচলিত নাই; মা ভগ্নী উচ্চারণ করে গালি দেওয়ার দুর্ব্বলতা জাপানীদের মধ্যে ধারণাতীত! রাগ করে গালি দেওয়া যে চরিত্রের একটা কত বড় দুর্ব্বলতা, তাহা একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিলেই এই সামান্য বিষয় হইতে জাপানীদের চরিত্রের যে মহত্ত্ব বাহির হয়ে পড়িবে, তাহা পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যেই পাওয়া যাবে না। ভারতবাসী এবং ইয়োরোপীয়ান্‌দের মধ্যে যে কতপ্রকারের কুৎসিত গালি আছে তাহার ইয়ত্তাই নেই! জাপানীদের চরিত্রে এই বিষয়টী, এমন একটী বিশিষ্টতাপ্রকাশক যে, প্রতিবেশী চীনাদের মধ্যে নানাবিধ কুৎসিতবাক্য প্রয়োগপ্রথা থাকা সত্ত্বেও জাপানিগণ উঁহাদের সভ্যতার সংসর্গে আসিয়াও উঁহার একটী বর্ণও গ্রহণ করে নাই। এই বিষয়টীর পশ্চাতে জাপানী সমাজে যে একটী বিশিষ্ট রকমের মৌলিকতা বর্ত্তমান তাহা সকল জাতিরই আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

জীবনমরণের জটীল প্রশ্নের সমাধান জাপানিগণ নিরপেক্ষভাবে সমাধান করে নিয়েছে। জীবনধারণ করা যেমন আবশ্যক, মরণটাও তেমনি অত্যাবশ্যক; ইহাই উঁহাদের জাতির সিদ্ধান্ত হয়ে পড়েছে। কোন খেলার প্রতিযোগিতায় বিজয়মুখীদল দর্শকদের উৎসাহবাক্যে যেমন দ্বিগুণ উৎসাহে উত্তেজিত হয়, সেই প্রকার পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মুখে জাপানের প্রশংসাগুলি উঁহাদের জাতীয় জীবন গঠনে কস্তুরীভৈরবের কায করিতেছে। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের কল্যাণে বলি দিতে পুরোহিতের দরকারই হয় না; দেশব্যাপী মহা স্বার্থের প্রেরণা এখন উঁহাদের হাড় মাস ছেড়ে মজ্জার অধিবাসী হয়ে পড়েছে। এই পরিবর্ত্তনের মূলভিত্তি যদি কতক জাপানের ভূমিকম্পের উপর আরোপ করা যায়, তবে তাহা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক বলিয়া হেসে বাতিল করা চলিবে না। ইয়োরোপের জাতিগুলি যেমন একে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সুযোগে শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছে, জাপান চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেই প্রকার কতকটা শক্তিশালী হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই দণ্ডায়মানশক্তি সমস্ত জাতির মন হইতে মৃত্যুভয় দুরীভূত করিয়া জাতিকে তেমন ভাবে শক্তিশালী করিতে পারে নাই যেমন ভাবে অগণিত ভূমিকম্প উঁহাদের মৃত্যুভয় শিথিল করিয়া জাতিকে পরাক্রমশালী বিজয়ী করিয়া তুলিয়াছে। ম্যালেরিয়া কম্পনের ন্যায় ভূমিকম্পের কম্পনে "গৃহীত এব কেশেষু মৃত্যুনা" ইহা মনে করিয়া দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা ভূমিকম্পে প্রাণ পরিত্যাগ করা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ বলিয়া সকলেই এই ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে। এমন কোন দিনই যায় না যে কম বেশী কম্পন সিস্‌মোগ্রাফে অনুভূত হয় না! বাড়ী ঘর ধ্বংসের আশঙ্কা এবং মৃত্যুর ভয় সর্ব্বদার জন্য জাপানীদের প্রাণে যেমন ভাবে জাগ্রত, এমন অনির্দ্দিষ্টভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণও শঙ্কিত থাকে না। এই প্রকার শঙ্কান্বিত হয়ে থাকার অভ্যাস হইতে মৃত্যুকে ভয় না করা শিক্ষায় অনেকেই এমন ভাবে দীক্ষিত হয়েছে যে তাহাদিগকে মৃত্যুঞ্জয় বলিলে মহাদেবের অবমাননা করা হয় না মোটেই। ভূমিকম্পে বাড়ী ঘর যে কতবার পড়ে গিয়েছে তাহার কেহ জমা খরচ রাখেই না; ভেঙে যায় গড়ে নেয়; আরও যে কতবার পড়িবে তাহার পরোয়াই করে না; ভূমিকম্পের ভয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশত্যাগ করার বুদ্ধি ইহাদের গৃহিণীদেরও নাই; কারণ উঁহারাই তো দেশাত্মবোধ প্রসব করে সন্তানগুলির রক্তমাংসের সঙ্গে! জাপানী গৃহিণীদের স্বামীর কানে ফুস্‌ফুসে কথা কইবার যাদুবিদ্যা অজ্ঞাত বলিয়া ইঁহাদের জীবন যাত্রার পথে মৃত্যু পর্য্যন্ত বক্রতা নাই কোন স্থানেই! জাপানিগণ দেশ ত্যাগ করে বটে; কিন্তু তাহার মধ্যেও আদর্শ আছে। শিশু বয়সে বড় ভাইটী যে বুদ্ধির প্রেরণায় ছোট ভাইয়ের জন্য মায়ের বুক পরিত্যাগ করিয়া যায়, ইহারা সেই বুদ্ধিবলে মাঞ্চুরিয়ায় অথবা দক্ষিণ আমেরিকায় দলে দলে গিয়ে কলোনি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে জাপানিগণ উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটে যাওয়া বিশেষ পছন্দ করিত; ভারতবাসিগণের মধ্যে পাঞ্জাবের শিখগণের মধ্যেও আমেরিকায় যাওয়ার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং দলে দলে যেতও; ইহারা তথায় গিয়ে দৈনিক সাত আট টাকায় মজুরের কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ অর্থাৎ শুধু গিনি সোণা নিয়ে ফিরিত; কারণ আমেরিকায় সোণায় মুদ্রা বিনিময়ের হার চলে আস্‌ছে (Gold standard)। আমেরিকার সরকারের ইহা অসহনীয় হওয়ায় ভবিষ্যতে ভারতবাসীদের তথায় যাওয়ার

পথ রুদ্ধ করিয়া জাপানীদের এবং চীনাদের বিরুদ্ধে জেণ্টলমেন্ এক্ট (Gentlemen act) অর্থাৎ ভদ্রভাবে চলা ফিরার আইন ঘোষণা করিয়া অগণিত জাপানী এবং চীনাদের আগমন কতকটা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে ভারতবাসিগণ, চীনা এবং জাপানিগণ আমেরিকার শ্বেতকায় মজুরদের অপেক্ষা অবস্থা বিশেষে নিম্নহারে কার্য্য করিত; উক্ত আইন হওয়ার পরে কাহারও নিম্ন হারে কার্য্য করিবার অধিকার ছিল না। জাপানিগণ এবং চীনাগণ উক্ত আইন যথাযথ পালন করিয়া চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু গুপ্তভাবে চীনাদের আমদানী চলিতে থাকে। চীনাগণ দেশ হইতে কেনেডায় যেত এবং তথা হইতে রাত্রিতে নৌকাযোগে সেণ্ট্ লরেন্স নদী পার হইয়া ইউনাইটেড্ ষ্টেটে পৌছিত। এই সেণ্ট্-লরেন্স নদী হয়েছে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ এবং কেনেডার মধ্যস্থ সীমানা। এই নদীর স্রোত এমন খরতর যে উক্ত প্রকারে গোপনে রাত্রিযোগে নদী পার হইতে গিয়া যে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তাই নাই; এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্যে উত্তীর্ণ হইয়াও কত চীনা ইউনাইটেড্ ষ্টেটের সীমান্ত রক্ষী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া চীনে প্রেরিত হইয়াছে! একবার উত্তীর্ণ হইয়া ওপারে দলে মিশিতে পারিলে চীনাদিগকে ধরা সহজসাধ্য ছিল না; কারণ চীনাদের চেহারার মধ্যে পরস্পরের অনেক সাদৃশ্য আছে। বলা বাহুল্য অপিয়ম্ কোকেন প্রভৃতি নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য আমদানী করিয়া যেমন অনেকে প্রভূত অর্থ উপায় করিয়া থাকে, আমেরিকায় সেই প্রকার কতক সময়ের জন্য গোপনে চীনা লোক আমদানী করিয়া অনেকে বিশেষতঃ সীমান্ত প্রদেশের লোক বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়াছে। একটী চীনা পার করিতে পারিলে তিন চার হাজার টাকা পাওয়া যেত। জাপানিগণ এই সব কার্য্য জাতীয় জীবনের কলঙ্ক মনে করিয়া ইহা হইতে এক প্রকার বিমুক্ত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বিশেষতঃ জাপান সরকারও ছাড়পত্র দেওয়া সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিল। জাতির গৌরব রক্ষার জন্য চীন এবং জাপানের মধ্যে যে কত পার্থক্য তাহা এই কার্য্য হইতেও সহজে অনুমান করা যায়।

সুচতুর জাপান এই সময় দুইটি বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল; চীন যে আমেরিকানদের সংশ্রবে থাকিয়া আর বেশী দিন রাজনীতিক ও সামাজিক সংস্কারে বিমুখ হইয়া থাকিবে না এবং উহাদিগকে ও চীনাদিগকে যে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকা হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে এই বিষয় দুইটী জাপান নখদর্পণে দেখিয়াছিল। এই জন্য ১৯১১-১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনে ডাক্তার সানইয়াট্ সেন কর্ত্তৃক গণতন্ত্র স্থাপন কালে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই সময় মাঞ্চুরাজ সিংহাসনের নাবালক উত্তরাধিকারী দেশ হইতে বিতাড়িত হওয়ায় জাপান তাহাকে আশ্রয় দিয়া ভবিষ্যতের গোলার আশা মজুত করিয়া রাখে। সেই সঞ্চিত আশাটী এখন একটী সুন্দর বিল্ব বৃক্ষের স্বরূপ ধরেছে; তাহাতে অনেক পাকা বেলও ঝুলছে, লোভী কাকগুলি কা কা রবে উন্মত্ত; কিন্তু ঠোঁট্ বসাইবার সাধ্য নেই!

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মহাসমরে ইয়োরোপের শক্তিবর্গ যখন বুঝে নিয়েছিল যে যুদ্ধটা দীর্ঘ সময়ের জন্য চলিবে জাপান তখন একটা বিশেষ সুযোগভোগের চেষ্টায় ছিল। মিত্র-শক্তিবর্গের সঙ্গে জাপান জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনের জার্ম্মাণ অধিকৃত কলোনি অর্থাৎ উপনিবেশ দখল করিয়া লইল। সান্টাং ছিল জার্ম্মাণ উপনিবেশ; জাপান এই উপনিবেশ দখল করিয়া চীন রাজ্যে রেল বিস্তার, খনিজপদার্থের উদ্ঘাটন, ইয়াংসি, মাঞ্চুরিয়া এবং মঙ্গোলিয়াতে বিশেষ অধিকার স্থাপন, চীনের পুলিশের এবং সৈন্যবাহিনীর উপর আধিপত্য, উহাদের রাজনীতি এবং অর্থনীতির উপর কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে একুশ দফা দাবী করিয়া চীনকে গ্রাস করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু চীনে ইংরেজ, আমেরিকা, ফরাসী, ইটালী, পূর্ত্তুগীজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয়ানদের বিশেষ স্বার্থ থাকায় জাপান তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। এমন কি শক্তিবর্গের চোখ রাঙ্গানতে জাপানকে সানটাং প্রদেশ পর্য্যন্ত চীনকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে সানটাং যখন জার্ম্মাণীর অধীনে ছিল তখন শক্তিবর্গের কোন উচ্চ-বাচ্য ছিল না; কিন্তু উহা জাপানের হস্তগত হওয়াতেই শক্তিবর্গের গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। জাপান জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিণাম দেখিয়া এবং নিজের অবস্থা বুঝিয়া তখন ভিজে বিড়ালের মত চুপটী করে বসেছিল। ১৯১৮

খৃষ্টাব্দে ভার্সেলিজ সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইকোয়েটারের অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তরস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের জার্ম্মেণীর পূর্ব্ব-অধিকৃত কেরোলিন, মার্সেল, মোরিয়ান্ এবং পিলু প্রভৃতি দ্বীপগুলির মেণ্ডেটারী ক্ষমতা অর্থাৎ অভিভাবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া জাপান সময়ের প্রতীক্ষা করাই সমীচীন মনে করিল। অষ্ট্রেলিয়ার উপর যে জাপানের শ্যেন দৃষ্টি ছিল—কি এখনও আছে, ইহা সকলেরই বিদিত; এমতাবস্থায় জাপান অষ্ট্রেলিয়ার আরও নিকটবর্ত্তী হওয়ায় শ্যেনপাখী যদি ছোঁ মেরে দেয়, এই আশঙ্কাতে ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কনফারেন্সে অনেকগুলি রক্ষা মাদুলির ব্যবস্থা করা হয়।

ভার্সেলিজের সন্ধিসর্ত্তানুসারে দক্ষিণ প্রশান্তে জার্ম্মাণ অধিকৃত নিউগিনি এবং বিসমার্ক দ্বীপের শাসন কর্ত্তৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হল অষ্ট্রেলিয়ার উপর এবং সেমোয়া দ্বীপের ভার দেওয়া হয় নিউজিলাণ্ডের উপর। জাপান, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিলাণ্ড এই দেশত্রয় উক্ত ভার্সেলিজ সন্ধির সর্ত্তানুসারে এই দ্বীপগুলিতে যথার্থ সভ্যতা এবং শিক্ষা-বিস্তারে ন্যায়তঃ বাধ্য থাকিবে। উক্ত দ্বীপগুলির লোকের মধ্যে যাহাতে দাস ব্যবসা প্রথা এবং মাদকতা বৃদ্ধি না পায় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; অস্ত্র-শস্ত্রের আমদানী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য করিয়া রাখিতে হইবে; বৎসরান্তে লিগ্ অব নেশনের অর্থাৎ জাতি-সঙ্ঘের নিকট উক্ত দ্বীপগুলির আয় ব্যয় এবং স্থিতির একটী জমা খরচ দাখিল করিয়া দিতে হইবে।

লিগ-অব্-নেশনস্ অর্থাৎ জাতি-সঙ্ঘ ভার্সেলিজের সন্ধিতে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অনুন্নত জাতিগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে একটু উন্নত ব্যবস্থা করেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নেই। ইয়োরোপের সুসভ্য জাতির জন্য দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরস্থ অনেক অসভ্য জাতি সাগরগর্ভে সমাধিলাভ করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার টাসমেনিয়া দ্বীপের আদিম অধিবাসীগুলি যে সাগরের কোন বনে লুকাল তাহার সন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গেও বর্ব্বরতা সমভাবেই মিশ্রিত। অষ্ট্রেলিয়ার নিগ্রোগণও প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছে। নিউজিলাণ্ডের মাওয়ারিগণের অবস্থা অন্য প্রকারের হলেও শ্বেতাঙ্গের সংমিশ্রণে অদূর ভবিষ্যতে উহাদের বিলোপও অবশ্যম্ভাবী। দক্ষিণ প্রশান্তে প্রায় ছাব্বিশ হাজার দ্বীপ অবস্থিত; ইহার অধিকাংশই ক্ষুদ্র রকি আয়ল্যাণ্ড অর্থাৎ পাহাড়ময় দ্বীপ, জনমানবশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই আদিযুগের (primitive age) বর্ব্বরতায় সমাচ্ছন্ন। কতকগুলি বন্য পশুপক্ষী আছে উহারা কিছুতেই পোষ মানে না; ধরে আন্লে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি শুধু মুক্তির সন্ধান করিয়া চির নিদ্রার স্বাধীন ক্রোড়ে স্থান লাভ করে। মানব সমাজেও এই প্রকার এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তথাপি পরাধীনতার তর্জ্জনে বেঁচে থাকার বুদ্ধি গর্জ্জনে বিসর্জ্জন করে। পণ্ডিত লোক বিপদে পড়িয়া অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া পাণ্ডিত্য রক্ষা করে; অর্থাৎ অপর পক্ষে মূর্খ লোক বিপদে পড়িলে যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেয়। কথাটার মধ্যে ভীরুতা প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়াই মনে হয়। অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া পাণ্ডিত্য রক্ষা করিয়া যদি প্রতিহিংসার অনুসন্ধান করা হয়, তবে উহা চাণক্যের মত রাজনীতিকদের অনুমোদনীয় হইলেও উহার মধ্যে দুর্ব্বলতা, ধূর্ত্ততা এবং ক্লীবত্ব এই তিনটীর বন্ধুত্ব দেখা যায়। মূর্খের গোঁড়ামি প্রাণান্তকর হইলেও তাহার মরণের নিনাদ আকাশের প্রান্তরে চিরকালই সত্যের প্রতিধ্বনি করে। এই প্রকারের মূর্খতা সমস্ত প্রশান্ত দ্বীপবাসীগুলির মধ্যেই ছিল; জাপান জাতির মধ্যেও ছিল। রুষ জাপান যুদ্ধে রুষের পোর্ট-আর্থার-বিজয়ী জেনারেল পোগি জাপান সম্রাটের মৃত্যুর পর নিজের পেট চিরিয়া হারিকিরী করেছিল; পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজই ইহা অনুমোদন করে নাই। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে দুটা প্রান্ত সম্মুখভাবে এবং পশ্চাৎভাবে উভয় দিকেই মিলিত হয়; জাপানীদেরও কতকটা সেই প্রকারের অবস্থা, ইহাদের অসভ্যতা সভ্যতার সঙ্গে মিশে জাতির মুক্তিপথ ও স্বাধীনতা গড়েছে।

জাপানের লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে ছয় কোটিরও বেশী; প্রতি বৎসর প্রায় ছয় লক্ষ করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দেড় লক্ষ বর্গ মাইলের মধ্যে শতকরা ষোল সতর ভাগ জমি চাষের উপযুক্ত; অবশিষ্ট পর্ব্বতাকীর্ণ তুষারাবৃত। প্রতি বর্গ মাইলে ৩৭৩জন লোক বাস করে। এই প্রকার হারে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার স্থানের চিন্তাও জাপানের উন্নতির পথে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

গত মহাযুদ্ধটা পরাধীন জাতিগুলির মধ্যে যেমন জাগরণের সাড়া এনে দিয়েছে, স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যেও তেমন হুঁসিয়ার হওয়ার উত্তেজনাও এনে দিয়েছে। আমেরিকা জেণ্টলম্যান্ এক্ট করার পরেও যখন দলে দলে জাপানী ও চীনা আমেরিকায় যেতে লাগ্‌লো, তখন আমেরিকা একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়্‌লো মামা শকুনির পরামর্শে! "ও কচ্ছ কি, শেষে কি পিণ্ডি লোপ পাবে?" এতদিন আমেরিকা পরের দুঃখে একটু সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল; এইবার তাহার সহানুভূতি পরিবর্ত্তিত হল ভারতবাসীকে ঘৃণা করাতে, জাপানকে হিংসা করাতে এবং চীনাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করাতে! ভারতবাসীকে ঘৃণা করিলে ভারতে বাণিজ্যের প্রসার অবশ্যম্ভাবী; জাপানকে হিংসা করিলে ময়ূরের দল নাচ্‌বে; চীনের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার অর্থ হয়েছে "মায়ের চেয়ে ভালবাসে বেশী সে ডাইনী!" এই ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে রাজনীতিজ্ঞের সুপ্ত ইচ্ছা হল যে প্রাচীকে "শ্বেতাঙ্গায় নমঃ" বলিতেই হইবে। মামা ভাগিনেয়ের পরামর্শ হল প্রশান্তে একটা বৈঠক বসিয়ে জাপানের যুদ্ধ জাহাজগুলির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হউক। ঠিক্ কথা! বেশ কথা! উত্তম পরামর্শ!

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জাপান সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপান সওদাগরী এবং যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্যে ইয়োরোপের অন্যান্য স্বাধীন জাতিদের সমকক্ষ পারদর্শী হইয়া উঠে। ১৯০৪-১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপান রুষের সঙ্গে নৌ যুদ্ধে নিজেদের নির্ম্মিত জাহাজও ব্যবহার করেছিল। বাল্টিকবাহিনী-বিজয়ী জাপান তাহার উন্মত্ততা প্রশমিত করেছিল অগণিত যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া! বলা বাহুল্য জাপান গভর্ণমেণ্ট নৌযুদ্ধবাহিনী গঠন করিতেই যে শুধু অজস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিল তাহা নয়, বেসরকারী বিভিন্ন কোম্পানীর সওদাগরী জাহাজ নির্ম্মাণেও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য (subsidy) করেছিল। দেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য ধনিগণও হয়েছিল উন্মত্ততায় মুক্তহস্ত। জাপানে যতগুলি সওদাগরী জাহাজ কোম্পানী আছে তন্মধ্যে এন্-ওয়াই-কে এবং ও-এস-কে এই দুইটা বিশেষ বড় কোম্পানী; ইহাদের ফ্লিটে শতাধিক জাহাজ বর্ত্তমান। একটা জাতি যে শুধু কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই বাঁচিতে পারে না, লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জাপান ইহা ভগবানের নিগ্রহে বেশ বুঝিতে পারিয়াই জাহাজ নির্ম্মাণের ডক্‌ইয়ার্ড এবং অন্যান্য কারখানা স্থাপন করিয়া অগণিত লোকের জীবিকানির্ব্বাহের পথ সুগম করে দিয়েছিল। বিবিধ কারখানার উৎপাদিত পণ্যগুলি দেশ বিদেশে সরবরাহ করিবার জন্য এবং বিদেশ হইতে নানাপ্রকার কাঁচা ফল আমদানীর জন্য অনেক জাহাজের দরকার হওয়ায় নাগাসাকি, কোবি, ওসাকা, টোকিও প্রভৃতি স্থানে জাহাজ নির্ম্মাণের অনেকগুলি ডক্‌ইয়ার্ড স্থাপিত হয়ে যায়। এই সব ডক্‌ইয়ার্ড হইতে নির্ম্মিত অগণিত জাহাজগুলি উহাদের পেছনে ছোট একটী মাস্তুলে সূর্য্য মার্কা স্বীয় জাতীয় নিশান উড়াইয়া সপ্ত সাগর মন্থন করে। সাগর মন্থনে অসুরের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী; বিশেষতঃ চীনসমুদ্রে পাইরেট্ অর্থাৎ জলদস্যুর উৎপাত সর্ব্বদার জন্য লেগেই ছিল; এজন্য এই বিশাল বাণিজ্যপোতগুলিকে রক্ষা করা দরকার মনে করিয়া জাপান অসংখ্য যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সংখ্যায় পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বসে। জাপানের যুদ্ধজাহাজগুলি যে শুধু সংখ্যায় বেশী এমত নয়; গত মহাযুদ্ধের সময় এই সব যুদ্ধ জাহাজগুলি প্রশান্তে এবং ভারত মহাসাগরে যে প্রকার তৎপরতার সহিত মিত্র-শক্তিবর্গের সৈন্য বোঝাই করা জাহাজগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে তাহাতে অনেকের চক্ষু কোটরগত হয়ে যাওয়াতেই ভিতরে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

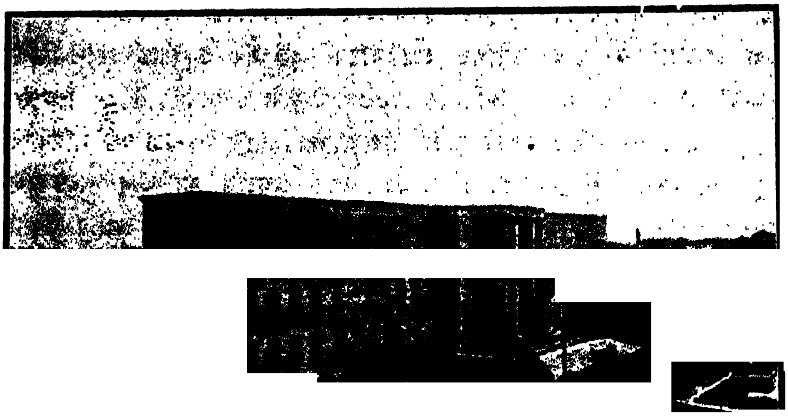


ছাত্রাবাস

ডক্টর মণীন্দ্র মৌলিক ডি-এস সি

চিত্র

রোম সহরের এক প্রান্তে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর স্থাপত্য-শিল্পের যতখানি আধুনিকতা আছে তার একেবারে শোভাযাত্রা চলেছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকৃতিতে। দালানগুলির স্থূলত্বে কিংবা গাম্ভীর্য্যে আমি কোন সৌন্দর্য্য খুঁজে পাইনি, কিন্তু একটা প্রেরণার সন্ধান পেয়েছি তাদের সীমা রেখায়—যাতে একটা নতুন জীবনের গন্ধ আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসটিও আধুনিক কায়দায় তৈরী এবং কলেজেরই গায়ে। খানিকটা দূরেই রোম সহরের সীমানা এবং গ্রামের পথ আরম্ভ। ছাত্রাবাসের একদিকে সমাধিক্ষেত্র এবং আর একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রাবাস থেকে সমাধি ক্ষেত্রের সাইপ্রাস গাছের দীর্ঘ সমুন্নত শীর্ষগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়—মনে হয় কতকগুলি মুক্তির প্রার্থনা আকাশের দিকে কৃতাঞ্জলি করে অহোরাত্র দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছে। তারই পশ্চাতে দিগন্তের কোলে সাইবিনি পাহাড়ের শ্রেণী, যার সমুচ্চ শিখরমালায় শীতবসন্তের রং ফলে। শীতকালে বরফে ভরে যায় এই পাহাড়ের চূড়াগুলি আর যেদিন রোদ ওঠে সেদিন ওখানে রংয়ের হোলি-উৎসব আরম্ভ হয়ে যায়। সাইপ্রাস শ্রেণীর শীর্ষরেখা ছাড়িয়ে উঠেছে সেন্ট্‌ লরেন্স্‌ গীর্জ্জার চূড়া যাতে সমস্ত আবেষ্টনটিতে দিয়েছে একটু পবিত্রতার স্পর্শ, আর মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রে অমরত্বের একটু গোপন আভাস। সূর্য্যের আলো হয়ে উঠত যেদিন প্রখর আর কুয়াসার লজ্জা যেত ঘুচে—সেদিন পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রামগুলির দিকে চেয়ে থাকতে আমার ভাল লাগত। ঐ গ্রামগুলিতে তৈরী হয় পৃথিবীর মধ্যে একপ্রকার শ্রেষ্ঠ সুরা যার নাম "কাস্তেল্লি রোমাণী"। ঐ সমস্ত অঞ্চলটায় হয় খালি আঙ্গুরের চাষ। গ্রীষ্মের কত অলস অপরাহ্নে ওরই পাড়ায় পাড়ায় কত ভবঘুরেমি করে বেড়িয়েছি তার স্মৃতিটা হয়ত কোনওদিনই লুপ্ত হবেনা। ইতালিয়ান চাষীদের মত সুরসিক ও অতিথি-পরায়ণ কৃষক-সম্প্রদায় অন্য কোনও দেশে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের সম্মুখ দ্বার

সহরের অনেক হোটেল, বোর্ডিং এবং ভদ্র পরিবারের আতিথ্য ভোগ করে বিরক্ত হয়ে যেদিন এই ছাত্রাবাসে উঠে আসি, শীতের সেই অন্ধকার সকালটার কথা আজও

মনে পড়ে। হোটেলে বোর্ডিংএ থাকতে থাকতে একাকিত্বটা এক রকম সয়ে গিয়েছিল। তবুও ভাবলাম তরুণদের আড্ডায় গিয়ে যে বৈচিত্র্যের আস্বাদন পাব তাতে যদি কাজের ক্ষতিও হয় জীবনের অভিজ্ঞতার দিকে তার পূরণ হবে। কাজের ক্ষতি খুব বেশী না হলেও জীবনের অভিজ্ঞতার দিক থেকে যে লাভবান্ হয়েছি তা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইয়ুরোপের যুবক-শক্তির সঙ্গে যে আত্মিক পরিচয় আমার ঘটেছে তা প্রধানতঃ এই ছাত্রাবাসটিকে কেন্দ্র করে। সে পরিচয় বহুমুখী—শুধু একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের পরিচয় নয়; একটা সভ্যতার সঙ্গে আর একটা সভ্যতার পরিচয় একটা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আর একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আর একটা আধ্যাত্মিকতার পরিচয়। ইয়ুরোপের যুবক প্রাণটা কি, যৌব-শক্তিটা কি এক কথায় তার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর নয়, তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে ইয়ুরোপের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অদম্য উৎসাহ, তেজস্বিতা এবং নির্ভীকতা তার মূলে আছে একটা প্রকাণ্ড দিগ্বিজয়ের প্রেরণা; শুধু সামরিক দিগ্বিজয়ী নয়, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রিক এমন কি দার্শনিক। অথচ নিজেদের সভ্যতা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির মধ্যে ইয়ুরোপ এখনও এমন অন্ধভাবে আবদ্ধ সে অন্য একটা সভ্যতা কিংবা আদর্শের মুখোমুখি হলেই বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে পড়ে, নতুবা শ্রদ্ধাহীন অবজ্ঞা প্রকাশ করে। কিন্তু এই ইয়ুরোপেও একদিকে যেমন কর্ম্মী এবং নেতৃত্বাভিলাষী লোকের ভিড়, অন্যদিকে তেমনি প্রেমিকেরও অভাব নেই। তাঁরা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন যে সভ্যতার চেয়ে মানুষ বড়, জয়ের চেয়ে প্রেম বড় এবং জ্ঞানের আনন্দই একমাত্র সত্য।

ছাত্রাবাসের বিভিন্ন মহলে আমার পরিচয় হয়ে গেল এক অদ্ভুত সূত্রে। কণ্ট্রাক্ট ব্রীজে বরাবরই আমার একটু দখল এবং হাতযশ ছিল। দুতিন দিন খেলার ঘরে যাতায়াত করবার পরই দেখলাম অনেক ছেলের আমার সম্বন্ধে কৌতূহলের অভাব নেই! ইয়ুরোপের সমাজে মিশতে হলে হয় নাচের আসরে অথবা গসিপের বৈঠকে কিংবা তাসের আড্ডায় একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন—খালি পরীক্ষার নম্বর দেখিয়ে সমাজে চলা যায় না। যাহোক্, ক্রমশঃ কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল; তাদের প্রত্যেকেই ছিল একটি স্বতন্ত্র "টাইপ"। তাদের কথাই এখানে বল্‌ব।

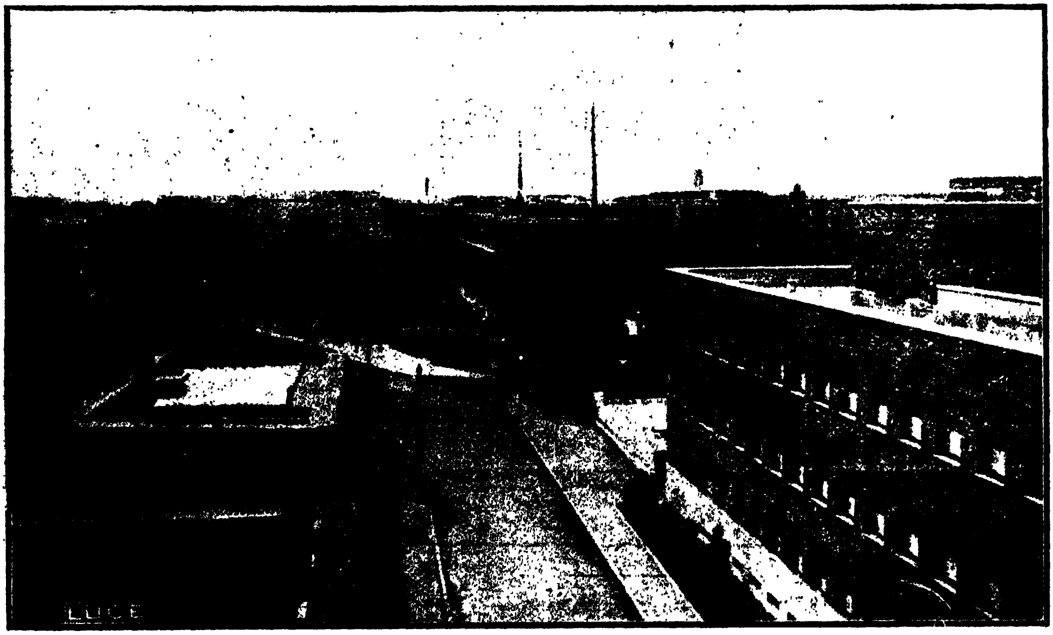


প্রবেশ তোরণ

একদিন নৈশ-ভোজনের পরে নিজের ঘরে বসে কাগজ পড়ছি এমনি সময়ে দ্বারে করাঘাত শুন্‌তে পেলাম। ভিতরে ঢুক্‌ল জিকা—স্মার্টনেসের অবতার। বাড়ী তার বুকারেষ্টে, বয়স আঠার উনিশ, হোষ্টেলের সব চাইতে ধনী বলে তার সুখ্যাতি, কারো মতে অখ্যাতি, ছিল। দিনের মধ্যে চারবার সুট্ বদ্‌লাত, আর তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নাকি সিগারেট কিংবা সিনেমার পয়সা খরচ করতে হত না। আমার হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে বল্‌লে—বুঝেছ, রোমে আমার আর থাকা চল্‌বে না, অত্যন্ত একঘেয়ে লাগেনা তোমার এখানে? রোমের নৈশজীবনের অপরিসরতার বিরুদ্ধে তার

অভিযোগ। মধ্যাহ্ন-ভোজনের আগে অতিশয় কষ্ট করে তাকে ঘুম থেকে উঠ্‌তে হত, তাই রাত জাগার সুযোগের অভাবে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছে। কলেজে যায় না কেন কেউ জিজ্ঞেস করলে বল্‌ত যে রোমে তার মতন ছেলের কোন সমাদর নেই, সে যাবে অক্সফোর্ডে অথবা কেম্ব্রিজে, তার প্রসাধনের চাকচিক্যে মূর্চ্ছা যাবে ইংলণ্ডের তরুণ আভিজাত্য। সে রোমে চিরকাল থাকতে আসেনি। আর ইংরেজির মত ভাষা আছে? (ভাগ্যিস্‌ তখনও শেখেনি!) রুমানিয়ান্‌ আর ইতালিয়ান অনেকটা কাছা-কাছি ভাষা, দুটারই জন্ম ল্যাটিন্‌ থেকে। তাই কষ্ট

ওদের বাড়ী যাব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।—তেরেসা খুব সুন্দরী; শুধু তাই নয় বুদ্ধিমতীও, কারণ জিকার পকেটের দিকের খবরটা সে রাখে। আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বল্‌লাম "তুমি এখনও কাপড় বদলাও নি, এরকম ভাবে কি করে যাবে ওদের বাড়ীতে?" জিকাও বোধহয় তেরেসার আসল অভিসন্ধির আভাস পেয়েছিল; উত্তরে খুব ডন্‌-জোয়ানী চালে বল্লে—"জান, ওকে জয় করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; ও আমাকে চায় না, চায় আমার বিলাসের অংশীদার হতে। আমি হয়ত যাব ওখানে, অভিনয়ও করব—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তেরেসাকে জানিয়ে



নূতন য়ুনিভার্সিটি সিটির সাধারণ দৃশ্য

করে ইতালিয়ান না শিখে রুমানিয়ানের উপর অনুস্বার বিসর্গ লাগিয়ে অনর্গল ইতালিয়ান বলে যেত। ব্যাকরণকে সে ঘৃণা করত। যাহোক্‌, টেনিশ্‌টা খেলত চমৎকার। সেদিনই অপরাহ্নে একজন বড় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। আমি তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বল্‌লাম যে তোমার ওয়েম্‌ব্লেডনে যাওয়া উচিত। কথাটা কানে যেন তেমন ধরল না, বল্লে—কি কাণ্ড জান? আজকে খেলার মাঠে তেরেসা আমাকে কিছুতেই ছাড়ল না। আমি

দিয়ে আসব যে আমি তাকেই আত্ম-সমর্পণ করব যে আমাকে চায়, আমার ব্যাঙ্কের খাতা কিংবা আমার সামাজিক পরিচয়কে নয়।"

ছাত্রমহলে জিকার চেয়ে ভাল নাচ্‌তে কেউ পারত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। মেয়েরা তার সঙ্গে নাচ্‌তে পেলে নিজেদের ভাগ্যবতী মনে করত। তার অভ্রভেদী অহঙ্কারের কাছে যৌবনের সবগুলি দুর্ব্বলতা পর্য্যন্ত হার মেনে থাকত। তাই শ্লীলতায়

জিকার কোনদিন অভাব ঘটেনি; সমাজের উচ্চস্তরে এই সুদর্শন অভিমানী যুবকটির কোটেশান্‌ও খুব উঁচু দরেরই ছিল। পড়াশুনার বিষয়ের কোন আলোচনা যেখানে হত তার চতুঃসীমায় সে আসত না; বল্‌ত যে ওসব হচ্ছে গরীবদের স্ববারী, পাণ্ডিত্য দেখিয়ে দুনিয়ার আসল ক্ষমতার ইন্দ্রজালকে তারা বশ করতে চায়। দুনিয়ার আসল ক্ষমতাটা হল, তার মতে টাকা। তার আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে কেউ কৌতূহল প্রকাশ করলে বলত যে সে সংসারে আর কিছুই চায় না, একমাত্র অর্থ, প্রচুর অর্থ। তার সৌখীনতার প্রধান উপকরণ ছিল একখানা চক্‌চকে আল্‌কা রোমেয়ো গাড়ী, আর একখানা ইণ্টার ন্যাশনাল লাইসেন্স। হয়ত রাত্তির দু'টো পর্য্যন্ত গল্প করে সাঁ করে মিলান চলে গিয়ে সেখান থেকে সকালে বন্ধুদের টেলিগ্রাম করে অবাক্ করতে তার ভারি মজা লাগত। কখন কখনও প্যারিস ভিয়েনা পর্য্যন্ত চলে যেত। একটিমাত্র দিন যখন জিকাকে একটু দমে যেতে দেখেছিলাম সেদিন তার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। অসতর্কতায়, অন্য মনে পানাধিক্য বশতঃ, একটি লোককে চাপা দিয়েছিল। এ ঘটনার কিছুদিন পরেই সে রোম ছেড়ে চলে যায়; বল্লে, গাড়ী ছাড়া সে জীবন কল্পনা করতে পারে না। বুকারেষ্টে গিয়ে সে আবার লাইসেন্স পাবে।

জিকার এই পরিচয়ই সবাই জান্‌ত, কিন্তু তার চরিত্রের যে আর একটা দিক ছিল তা অনেকেই বুঝতে পারে নি—তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও না, কারণ তারা জিকাকে কেউ আসলে শ্রদ্ধা করত না।

সেদিন রাত্রে তেরেসার প্রসঙ্গ শেষ হবার পরে তার উত্তেজনাটা হঠাৎ যেন কমে গেল। কিছু মনে কোরো না, এই বলে হাত পা ছড়িয়ে একটা উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। আমি ওকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। খুব জোরে কয়েকটা টান দিয়ে বল্‌লে—ভারতবর্ষ দেশটা কেমন আমায় একটু বলত ভাই। আমি বল্লাম, হঠাৎ এই বৈরাগ্য কেন তোমার। উত্তরে সে যা বল্লে তা থেকেই পাওয়া গেল তার আসল পরিচয়। তার কথার মর্ম্ম এই যে ইয়ুরোপকে তার আর ভাল লাগে না। একটা নির্ম্মম সমাজের প্রচণ্ড আত্ম-প্রতারণার মধ্যে তার সত্যিকারের বিলাসী মন বিদ্রোহ করে বসে, তার অন্তরাত্মায় বিপ্লবের ছোঁয়াচ লাগে। বিলাসিতার চূড়ান্ত সে দেখেছে,

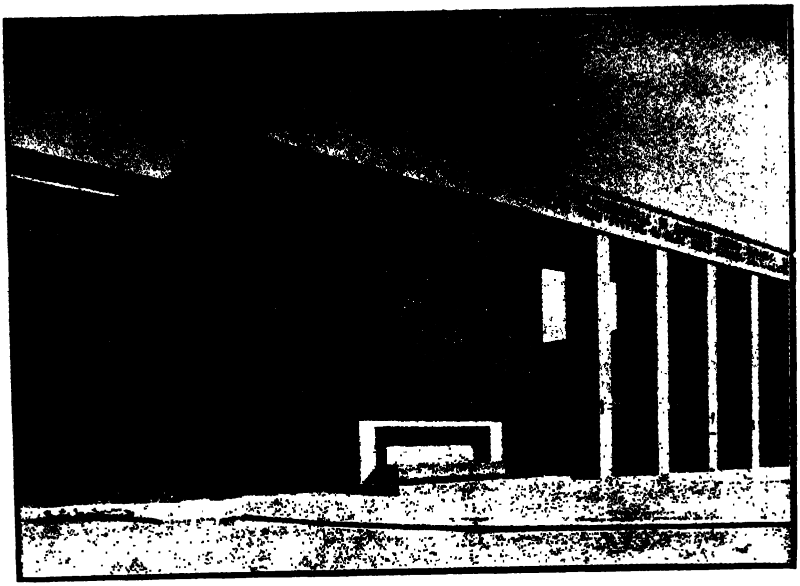


ছাত্রাবাসের খেলার ঘর

কাজেই মধ্যবিত্তের আভিজাত্য-প্রয়াস তাকে পীড়া দেয়। সে চায় একটা নতুন দেশ, একটা নতুন আবহাওয়া, নতুন সমাজ যেখানে তার চেতনা মুক্তি পেতে পারে অভিনয়ের দাসত্ব হতে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গল্প শুনবার এত আগ্রহ এবং এত ধৈর্য্য অন্ততঃ জিকার কাছে কখনও প্রত্যাশা করতে পারিনি। কিন্তু শেষটা সে সিনেমায় না গিয়ে আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত হিন্দুস্থানের গল্প শুনবার জন্যে। সমাধি-ক্ষেত্রের নৈশ নির্জ্জনতায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিতে গলিতে চল্‌ত আমাদের কথোপকথন।

জিকার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বকে যে অপছন্দ করত সে

ছিল হোস্টেলে অনেক বিষয়ে অদ্বিতীয় এবং আমার অন্তরঙ্গদের মধ্যে অন্যতম। নাম তার জুসেপ্পে (ইংরেজি জোসেফ), কিন্তু সবাই ডাকত তাকে 'পেপস্' এই সংক্ষিপ্ত নামে। লম্বায় ছয় ফিটেরও উপর, কাঠখোট্টা চেহারা, কিন্তু চোখ দুটোতে অসাধারণ দীপ্তি এবং বুদ্ধির প্রখরতা। পড়ত চিকিৎসা-শাস্ত্র, কিন্তু বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিশেষতঃ তার নিজের ইতালির, কোনটাতেই তার সমকক্ষ কেহ ছিল না সমস্ত ছাত্রাবাসে। গান গাইতে কিংবা পিয়ানো বাজাতে পারত না, কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে ছিল তার অসাধারণ দখল; প্রাণীতত্ত্বের একটা জটিল সমস্যাকে সে যে রকম প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিত একজন অর্থনীতির ছাত্রকে, বেঠোফেনের নবম সিম্ফানিটার অর্থ এবং রস মাধুর্য্যও ঠিক সে রকম সহজে বুঝিয়ে দিতে পারত একজন মজুরকে। ইয়ুরোপে জেলখানার সংস্কার নিয়ে যে সব আন্দোলন চলেছে তাই নিয়ে তার সঙ্গে একদিন আলাপ করে অবাক হয়ে গেলাম যে কি করে ওর সম্ভব হয় সকল দিকের এমন খবর রাখবার। শুধু রাজনীতিটা ভাল বুঝত না—কিংবা হয়ত বুঝতে চাইত না। সে তার সমস্ত সত্ত্বা এবং প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করত যে ফাসিজ্‌ম্‌এর চাইতে কোন উন্নত রাষ্ট্র ধর্ম্ম কিংবা সামাজিক পদ্ধতি দুনিয়াতে নেই এবং ফাসি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা মুসোলিনী সম্বন্ধে কোন তর্কে কখনও তাহাকে নাবান যেত না। রোমে মুসোলিনীর এমন কোন একটা বক্তৃতা হয়নি যা পেপ্‌স্‌ না শুনেছে। রাত্রি দশটায় যদি পিয়াৎসা ভেনেৎসিয়াতে মুসোলিনীর বক্তৃতা হওয়ার কথা থাকত, তবে আটটা থেকে গিয়ে সেই প্রসিদ্ধ ব্যালকনির নিচে কয়েকটা খবরের কাগজ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকত। এই নিয়ে তাকে কেউ ইঙ্গিত করলে বলত—আমি ছোটবেলায় নেপোলিয়নের খুব ভক্ত ছিলাম; তাকে আমি ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর বলে স্বীকার করতাম; কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি যে আমাদের মধ্যেও একজন নেপোলিয়ন আছেন যার কীর্ত্তি পরবর্ত্তীকালে ফরাসী নেতার কীর্ত্তিকেও ছাড়িয়ে যাবে। তার কালকুর্ত্তা আর লম্বা বুট—তার রাজনৈতিক মতের সাক্ষ্য দিত। অন্য দিকে খেলা ধুলার মাঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কয়েকজনের মধ্যেই সে গণ্য হত, আর ওজন নিক্ষেপে ছিল রোম জেলার চ্যাম্পিয়ন্‌। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে টোকিয়োর অলিম্পিকে আমার সঙ্গে দেখা হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যেমন ফুটবলের মাঠে, তেমনি ব্রীজের আড্ডায় তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্বটা বিশেষভাবে জমবার আর একটা কারণ ছিল এই যে সে ছিল আমার ব্রীজের পার্টনার। এই বলিষ্ঠ উন্নতশির যুবকটির সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার হিংসা করত অনেকেই আমাদের ছাত্রাবাসে।



প্রবেশ দ্বারের আর একটিদৃশ্য

ইথিওপিয়ার যুদ্ধের সময়ে সমর-বিভাগে দরখাস্ত করেছিল যুদ্ধে যাবে এই প্রার্থনা করে। কিন্তু বয়স অল্প বলে ওর দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না, তাতে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল; কিন্তু একজন সতীর্থ খুব অসমর্থ বলে ঠাট্টা

করতেই সে জবাব দিয়েছিল—সমর-সচিব আমাকে কি বলেছে জানিস্? বলেছে যে আমার মত ছেলেকে ইথিওপিয়ায় গিয়ে শক্তির অপচয় করতে হবে না। ইয়ুরোপে যে যুদ্ধ ঘনিয়ে আস্‌ছে তাতে আমার প্রয়োজন হবে বেশী। আমি সেই যুদ্ধে লড়ব, দেখিয়ে দেব যে ইতালিয়ানরা শুধু বেহালাই বাজায় না, গুলিও চালাতে জানে। তখন ইতালির রাষ্ট্রিক অবস্থাটা ছিল একটু ভাঙ্গার মুখে। মেয়েদের সঙ্গে সে বেশী মেলামেশা করত না; তার ধারণা ছিল যে মেয়েরা ওকে দেখে একটু ভয় পায়, অন্ততঃ একটু ত্রস্ত হয়। অধিকন্তু যারা একটু প্রেমিক কিংবা কবি ধরণের ছেলে ছিল তাদের নিয়ে সে ভীষণ শ্লেষ করত। আমি জানি অনেক মেয়ে তাকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু কেউ বল্লে ওসব কথা সে হেসেই উড়িয়ে দিত। কোন মেয়ে তার প্রতি আসক্ত হতে পারে একথা সে আদৌ বিশ্বাস করত না। আর একটা ব্যাপারে সে ছিল ভীষণ ছেলেমানুষ। তার একটা নোট বই ছিল যাতে বিভিন্ন দেশের যত ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হত তাদের থেকে ঐ সব দেশের সাধারণভাবে প্রচলিত গালি-গালাজগুলো লিখে রাখত। আর তাই মুখস্ত করত। তার থিওরি ছিল এই—কোন্ দেশ কতটা রসিক কিংবা কোন্ জাতের মেজাজ কি রকম তা খুব সহজে বোঝা যায় তারা কি ভাষায় গালি-গালাজ করে তার মধ্য দিয়ে। কোন বিদেশী নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে তাকে তাদের ভাষার সঙ্গে যে ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে সেইটে জানিয়ে দিত। এজন্যে বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে তার একটা অখ্যাতি ছিল।

হোষ্টেলে কোন ছেলের অসুখ হলে তার প্রথম ডাক্তার ছিল পেপ্‌স্। সমস্ত বাড়ীটাকে সে দেখ্‌ত একটা হাসপাতালের মত করে, আর অকারণেও তার বন্ধুদের বুক হৃদ্‌যন্ত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করতে চাইত। বইতে যা পড়ত তা তখনি যাচাই করে নিত বন্ধুদের দেহের উপর দিয়ে। এই করতে গিয়ে কত ছেলের দৈহিক ত্রুটির আবিষ্কার সে করেছিল যারা এই সম্বন্ধে ছিল একেবারে অচেতন। তার নিজের ঘরটা ছিল একটা লেবরেটরী বিশেষ—একদিকে মাইক্রস্‌কোপ, আর একটা খাঁচায় কতগুলো ইঁদুর। আমাদের পাড়ার একটি গরীব ছেলেকে সে পয়সা দিত ওকে ইঁদুর সংগ্রহ করে দেবার জন্যে, আর সে ছেলেটি যবের ক্ষেত থেকে ইঁদুর সংগ্রহ করে আন্‌ত। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে তার প্রাণীতত্ত্বের গবেষণা চল্‌ত। বিলাস-প্রিয় ছেলেরা রাত্রি শেষে যখন হোষ্টেলে ফিরত তাদের কাছে শুন্‌তে পেতাম যে পেপ্‌স্‌এর ঘরে তিন্‌টা চারটা পর্য্যন্ত আলো জ্বলে। তার ঘরের দেয়াল ছিল ছবিতে ভরা, তার মধ্যে প্রথমেই নজরে পড়ে পাস্তুরের এবং বেটোফেনের দুখানা বড় চিত্র। একদিকে তার বন্ধুদের ভিজিটিং কার্ডগুলি আঠা দিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে রেখেছে, অন্যদিকে তার পরিবারের ফটোগুলো টাঙ্গানো। একটি নর কঙ্কাল ঘরের এক কোণে ঝুলিয়ে রেখেছে। অত ছবির ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন তরুণীর ফটোও ছিল, যাদের সঙ্গে জীবনে কখনও ওর পরিচয় হয়নি। আমি একদিন জিজ্ঞেস্ করেছিলাম যে এসব দুর্ব্বলতা তোমার কেন? সে জবাবে বললে—আছে, থাকতে দাও। লোকে মনে করুক যে আমারও বান্ধবী আছে।

প্রতিভার চেয়ে তার অহঙ্কার কম ছিল না। নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে সে ছিল অত্যন্ত গর্ব্বিত এবং জীবনে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। পাস্তুর ছিল তার আদর্শ এবং মানবের দুঃখ মোচন করবার অভিলাষই ছিল তার একমাত্র প্রেরণা। সে বল্‌ত যে চিকিৎসা-শাস্ত্র এখনও শৈশবে পড়ে আছে। রোগকে জয় করা ত দূরের কথা, সংসারে যত রকমের রোগ আছে তাই আবিষ্কার করতেই আরও অনেক শতাব্দী লেগে যাবে। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির জন্য যে একনিষ্ঠ সাধনা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দরকার তার জন্যে সে প্রস্তুত আছে।

পেপ্‌সের শিক্ষায় একটি মাত্র দৈন্য ছিল, সে সম্বন্ধে নিজেরই তার কোন চেতনা ছিল না। ইয়ুরোপের এবং আমেরিকার বাইরে যে আরও সভ্যতা, আরও সমাজ, আরও সাহিত্য এবং আরও আধ্যাত্মিকতা আছে এই সম্বন্ধে কখনও সে চিন্তা করেনি। তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গভীর হওয়ার অবসরে এই কথাটা ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমার কাছে প্রকাশ হয়েছিল। সে সম্বন্ধে বিশেষ যে কোন কৌতূহলও ছিল তার—এমন নয়। তার অন্য একজন ইতালিয়ান বন্ধুর সঙ্গে যে ব্যবহার করত আমার সঙ্গেও গোড়াতে সে সেই ব্যবহারই করত। আমার

জগত, আমার কল্পনার খাদ্য যে তার জগতের বাইরে হতে পারে এমন সন্দেহ সে কখনও করেনি। পেপ্‌সের চিন্তাধারার উদারতার কথা ভেবে আর তার মেধার সর্ব্বগ্রাহী শক্তির উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার কৌতূহলকে উদ্‌বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলাম। তখন শীতকাল; নৈশ-ভোজনের পরে আমরা কয়েকজনে জটলা করে বাইরের কুয়াসা আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিলাম। পেপ্‌স্‌কে সেদিন দেখলাম একটু অস্বাভাবিক রকম অন্যমনস্ক। তার স্বাভাবিক উত্তেজনা নিয়ে কথাবার্ত্তায় যোগ দিচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি শরীর ভাল নেই? বল্লে, না, শরীর ভালই আছে কিন্তু মনটা বড় ক্লান্তবোধ হচ্ছে। ভাবলাম, আজই একটা সুযোগ। দল থেকে মুক্ত করে তাকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। চেয়ারে না বসে একেবারে বিছানায় গা ঢেলে শুয়ে পড়ল। আমি বল্লাম, তোমাকে কয়েকটা পদ্য পড়ে শোনাব, তোমার হয়ত ভাল লাগবে। পেপ্‌স্‌ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমার ক্রমশঃ বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে—সে আসলে ছিল একটি শিশু, জীবনটা ছিল তার কাছে একটা খেলার মত, শৈশবের অনুসন্ধিৎসা এবং অদম্য কৌতূহল ছিল তার সকল বস্তু সম্বন্ধে। তাই আমি রবীন্দ্রনাথের "শিশুর" কয়েকটা পদ্য Crescent Moon থেকে পড়ে শোনাতে লাগলাম। সে ইংরাজি জানত খুব ভাল, কাজেই বুঝতে কোন কষ্টই হল না। দু তিনটা পদ্য পড়ার পরেই সে উঠে বসল এবং কবির নাম জানতে চাইল। রবীন্দ্রনাথের নাম সে জান্‌ত, কিন্তু তাঁর কবিতার সঙ্গে ওর কোন পরিচয় ইতিপূর্ব্বে ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, বাংলা দেশ সম্বন্ধে তার কৌতূহল একটা উৎকণ্ঠিত সাধনার আকার ধারণ করেছিল কিছুদিনের মধ্যেই। তারপরে সে প্রত্যহ রাত্রিতে আমার ঘরে আসত এবং এক ঘণ্টা করে রবীন্দ্রনাথের গদ্য, পদ্য, নাটক ইত্যাদি শুনে যেত। একদিন মনে আছে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী" (Red Oleanders) তাকে আবৃত্তি করে পড়ে শুনিয়েছিলাম। এই সব প্রসঙ্গে আমাদের শিল্পের ও সাহিত্যের রূপ এবং আকাঙ্ক্ষা তাকে ব্যাখ্যা করে দিতাম। রবীন্দ্রকাব্যের ভিতর দিয়েই পেপ্‌সের হিন্দু সভ্যতার প্রতি অনুরাগ উদ্‌বুদ্ধ হয়। তারপরে সে কি করেছিল শুনলে আপনারা অবাক্‌ হয়ে যাবেন। একদিন আমাকে এসে বল্লে, ভাই, যে কাব্যের অনুবাদই এত হৃদয়স্পর্শী তার আসল ছন্দ এবং মাধুর্য্য না জানি কি রকম! আমি বাংলা শিখব, তোমার বাংলার ক্লাসে আমি ভর্ত্তি হব। সেই থেকে এক বছর পর্য্যন্ত সে আমার বাংলার ক্লাসে রীতিমত পড়াশুনা করত এবং যে ক'জন ছাত্রছাত্রী ছিল তার মধ্যে সেই শিখেছিল বেশী। গীতাঞ্জলির কয়েকটা পদ্য তার এখনও মুখস্থ আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে যে ইতালিয়ান ছেলেটি গীতাঞ্জলির চর্চ্চা করতে পর্য্যন্ত ছাড়েনি তাকে আর যা হোক, নিশ্চয়ই সাধারণ বলা যেতে পারে না।

তর্কে ছিল তার গভীর আনন্দ। বাংলা খানিকটা শিখে আর হিন্দু দর্শনের গোড়ার কয়েকটা কথা আয়ত্ব করে ছাত্রমহলে তার হয়ে গেল ভারি সুবিধে। কোন রকমে যদি কখনও কোণঠাসা হয়ে পড়ত, তখন দু' একটা বাংলা পদ্য আউড়িয়ে সবাইকে জব্দ করে দিত।

পেপ্‌স্‌ একবার ডোলোমাইট্‌ পাহাড়ে স্কী করতে গিয়ে পা ভেঙে এসেছিল। আমি ছিলাম তখন হাঙ্গেরিতে। ফিরে এসে শুনেছিলাম যে হাসপাতালে সে খালি রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা (ইংরেজি) পড়্‌ত। তার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে বন্ধুরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে হোষ্টেলের কক্ষেতেই এক বন্ধুর প্রতীক্ষা করছি, এমনি সময়ে একটি ছেলে আমার কাছে এসে বল্লে—তোমাকে কফি অফার্‌ করতে পারি? ধন্যবাদ দিয়ে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। বাড়ী তার জেনোয়ায়; বয়স বছর বিশেক হবে। কথাবার্ত্তায় একটা এলোমেলো ভাব, চোখে একটা উদাসীন অন্যমনস্কতা। জেনোয়ার লোকদের খুব ব্যবসায়ী বলে সুখ্যাতি কিংবা অখ্যাতি আছে, কিন্তু কথাবার্ত্তায় তার কোন আভাসই পেলাম না। আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হতে পেল না; আমার বন্ধু এসে পড়ল। ছেলেটি তার ঘরের নম্বরটি দিয়ে আমাকে বল্লে যে রাত্তিরে যদি সময় পাই তবে তার ঘরে যেতে। সে ছবি আঁকে, তাই আমাকে দেখাবে। খুব কৌতূহলী হয়ে রইলাম। শুধু মনে হল যে তার বাহ্যিক সৌজন্য এবং অমায়িকতার পেছনে একটা গভীর আত্মাভিমান প্রচ্ছন্ন আছে।

আমি যাবার আগেই আমাকে ডাকতে এল। একসঙ্গে ওঁর ঘরে গিয়ে বসলাম। নাম তার মার্কি। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটা দৈন্য বেশ সুস্পষ্ট। পড়ে স্থাপত্য-বিজ্ঞান। টেবিলের ওপরে অল্প কয়েকটা বই ছড়ান, আর তার অধিকাংশই সাহিত্য এবং চিত্রকলা সম্বন্ধে। একদিকের দেয়ালে তার নিজেরই আঁকা লেওনার্দ দা ভিঞ্চির একটা কেরিকেচার—সাদা কাগজের উপর কাল পেন্সিলের সূক্ষ্ম রেখার অদ্ভুত নিপুণ কাজ। অন্য দেয়ালে একটি তরুণীর বড় একখানা ফটো, চারকোণে চারটি পিনের আশ্রয়ে ঝুলচে। তার কেরিকেচারের নৈপুণ্যের প্রশংসার প্রসঙ্গে আর্টের কথা উঠ্‌ল।

আর্টের কথা উঠতেই লেওনার্দ দা ভিঞ্চির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল এই তরুণ শিল্প সাধকটি। বল্লে শুধু তার কেন, সমস্ত ইতালিয়ান জাতটার আদর্শ হওয়া উচিত লেওনাদ। তার মতে, বহুমুখী ইতালিয়ান প্রতিভাকে যিনি শ্রেষ্ঠ সমন্বয়ী অভিব্যক্তি দিয়েছিলেন তিনি লেওনাদ ইত্যাদি। বর্ত্তমান ইতালিয়ান শিল্প-চর্চ্চার উপরে যে রাজনীতির ছায়া পড়েছে তার থেকে ওকে মুক্ত না করতে পারলে ইতালির অত বড় গৌরবময় শিল্পী অতীতকে বর্ত্তমান সাধনার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। রাজনীতির দাসত্ব থেকে শিল্পীর প্রেরণাকে মুক্তি না দিতে পারলে তার সৃষ্টি হয়ে যাবে অর্থহীন, প্রাণহীন। এই অকপট, তেজস্বী ইতালিয়ান তরুণ শিল্প-সাধকের দুঃসাহসিকতার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ছাত্র মহলে ত দূরের কথা, কারো ঘরের কোণে বসেও এমন একটা কথা একজন অন্তরঙ্গকে বলা সমীচীন মনে করে না কেউ বর্ত্তমান ইতালিতে। আমি বল্লাম, তাহলে তুমি কি চাও? উত্তরে বল্লে, কিছুই না। শুধু নিছক সৌন্দর্য্য-সেবায় শিল্পীর মুক্তি, স্বাধীনতা, অবাধ কল্পনা-বিলাস। আমি তাকে সতর্ক করবার ঢংএ বল্‌লাম—এ সব কথা বাজারে বলবার যে বিপদ আছে তা তুমি জান? বল্‌লে—নিশ্চয়ই জানি, শুধু তাই নয়, আমার এই স্বাধীন চিন্তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করে ব'লে পিতৃদেবের সঙ্গে পর্য্যন্ত আমার বিবাদ হয়ে গেছে। আমাকে ত তিনি এক পয়সা দিয়েও সাহায্য করেন না। তাহলে তোমার চলে কি করে, যদি কিছু মনে না করো—জিজ্ঞেস করলাম। এর উত্তরে সে কোন কথা না বলে, ওয়ারড্রোবের একটা তাক খুলে আমাকে দেখাল প্রায় দশ পনেরটা প্যাণ্ট, কয়েকটা কোট আর একটা ইস্তিরি করবার যন্ত্র। বল্লে, ধোপা বাড়ীতে একটা প্যাণ্ট ইস্তিরি করতে নেয় চার লিরা, আর আমি নেই এক লিরা মাত্র; একটা সুট্ ইস্তিরি করতে ওরা নেয় দশ লিরা, আর আমি নেই তিন লিরা মাত্র। হোষ্টেলে ছাত্র আছে ১৬০ জন; তার মধ্যে পঞ্চাশ ষাট্ জন ইতিমধ্যেই আমার কারখানার খদ্দের হয়ে গেছে। সময় অনেক নষ্ট হয় বটে, কিন্তু এখানকার খরচটা ওই করে চলে যায়। তাছাড়া সে পোর্ট্রেট্ আঁকে; প্রত্যেক পোর্ট্রেটের জন্যে বিশ লিরা করে নেয়। ছাত্রাবাসের পাঁচ ছটি ছেলের পোর্ট্রেট্ আমাকে দেখলে—অদ্ভুত নিপুণতার দৃষ্টান্ত। আমি অবাক্ হয়ে শুন্‌তে ও দেখতে লাগলাম। সে যে জেনোয়ার লোক, তার একটা সার্থকতা অন্ততঃ বুঝতে পারলাম। ঠিক হয়ে গেল আমার সুটও তার কারখানায় আসবে, আমার একটা ছবি সে করবে। সেদিন এ পর্য্যন্তই কথা হল। নিজের ঘরে এসে এই অদ্ভুত পরিশ্রমী ও আত্মনির্ভরশীল তরুণটির কথা ভাবতে লাগলাম।

হোষ্টেলে সবাই তাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত না; কেউ কেউ তাকে প্রকাশ্যে "জেনোভেইজে" (অর্থাৎ গেনোয়ার অধিবাসী, কদর্থে ব্যবহৃত) বলে সম্বোধন করত। তাতে অন্তরে সে ক্ষুণ্ণ হত খুবই, কিন্তু বাইরে একটু অর্থহীন হাসি হেসে জবাব দিত—জেনোয়া কার জন্মভূমি জানিস্, একটা গোটা নয়া দুনিয়াকে যে আবিষ্কার করেছিল —কলম্বাস্। আমি আর কলম্বাস্ এক গ্রামের অধিবাসী, এটা জেনে রাখিস্। দুষ্টু ছেলেদের কণ্ঠে হাসির রোল উঠ্‌ত এ কথার পর। একটা গম্ভীর ঔদাসীন্য দেখাবার ভাণ করে চলে যেত এই খেয়ালি ছেলেটি। কোন কোন বন্ধুদের নির্দ্দয়তা সম্বন্ধে একদিন মাত্র তাকে অভিযোগ করতে শুনেছিলাম। যেদিন তার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর খবর এল ইথিওপিয়ার সমর প্রাঙ্গণ থেকে। বলেছিল, ওরা কি জানে জীবন-সংগ্রামের রহস্য? ওদের স্বাচ্ছন্দ্যকে আমি হিংসা করি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষাকে ওদের হিংসা করা উচিত।—আমার ভাইয়ের বীরত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি—কিন্তু তার পুরস্কার হবে একখণ্ড প্রস্তরে হাজার নামের মধ্যে তার নামটাও হয়ত খোদিত হয়ে থাকবে। আমি

তুনিয়াকে দিয়ে যাব, এমন জিনিস যার জন্তে আমার কীর্ত্তির স্তম্ভ উঠবে মানবের অন্তরাকাশে অমরত্বের বাণী নিয়ে। যে ছেলে কাপড় ইস্তিরি করে একবেলা খাওয়ার পয়সা জোগায় তার মুখে অমরত্বের আস্ফালন শুনে বিস্মিত হয়ে যেতাম।

মার্কির ঘরটাকে দেখলে কখনই মনে হত না যে ওটা পড়ার ঘর। ওর মধ্যে তার ষ্টুডিও, কতগুলি রং, তুলি এবং কাগজের ছড়াছড়ি; একদিকে তার কিচেন, ডিমের খোসা, কফির বাটি এবং মদের বোতল; অন্যদিকে তার ইস্তিরির কারখানা। বিছানার উপরে তার নিজের জামাকাপড়গুলি ছড়ান থাকত এবং রাত্তিরে পাজামা পরে সে কখনো ঘুমোত না, বল্‌ত যে ওতে সময় নষ্ট হয় সকালবেলা আবার নতুন করে কাপড় পরতে। তাসের আড্ডায় কিংবা নাচের জলসায় তাকে কখনও দেখিনি। তার একমাত্র বিলাস ছিল রোম সহরের আশে পাশে বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আসরে রং ও তুলি নিয়ে খেলা করা। একদিন অক্লান্ত বৃষ্টিবর্ষণের মধ্যে তাকে যে তন্ময়তার সঙ্গে সেণ্ট্ লরেন্স গীর্জ্জার ছবি আঁকতে দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল যে ওর শিল্প-সাধনার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা আছে তা আমাদের দেশের সত্যিকারের ঈশ্বর-প্রেমিকদের চেয়ে কম একাগ্র নয়।

মার্কির ষ্টুডিওতে যেদিন আমার পোর্ট্রেটের জন্য গেলাম, সেদিন নিজে থেকেই সে অনেক কথা আমাকে বল্‌তে লাগল। সে কথা গুলি সাধারণ একজন ব্যবসায়ী তার খদ্দেরকে খুসী করবার জন্তে যেমন বলে থাকে সে ধরণের নয়। নিজের জীবনের অনুভূতির এবং অভিজ্ঞতার কথা। তার বাবাও একজন বড় আর্টিষ্ট; তাঁর কাছ থেকেই সে ছবি আঁকা শিখেছে। কিন্তু তার বাবা এটা পছন্দ করতেন না যে ছেলেও শিল্পী হয়ে আজীবন দারিদ্র্যকে বরণ করুক। সেজন্য পুত্রকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে দিলেন। ওর স্থাপত্যে তত মন বস্‌ছিল না, তবুও পড়াশুনা কোন রকমে চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে মার্কি বাড়ী গিয়ে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ল এবং তার পিতৃদেবের কঠোর শাসনকে উপেক্ষা করেও সে ওই মেয়েটাকে নিয়ে ছবি আঁকতে যেত জেনোয়ার সমুদ্র উপকূলে, প্রকৃতিদেবীর অজস্র বর্ণসম্পদের কোলে। সেই মেয়েটির হাজার রকমের ছবি এঁকেছিল তু'মাসের মধ্যে। এই সব নিয়ে পিতৃদেবের সঙ্গে হয় মতের বৈষম্য; তারপরে আর বাড়ী যায়নি। মাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে, আর মা ওর জন্মদিনে কিছু আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যখন মুখ তুলে চাইল তখন দেখলাম চোখের কোণে জল। আমি কিছু জিজ্ঞেস না করতেই বল্লে—যাকে নিয়ে আমার জীবনের সব তুঃখ এবং দৈন্য উজ্জ্বল এবং মধুর করে তুলব ভেবেছিলাম সেও আজ নেই। এই বলে দেয়ালের গায়ে যে ফটোখানা ছিল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে। তার ঔদাসীন্তের খানিকটা অর্থ এতদিনে খুঁজে পেলাম। একটু উত্তেজিত হয়ে বল্লে—আমার মাঝে মাঝে জাহান্নামে যেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু নিজের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা সম্পাদন না করে যেতে পারি না। সে প্রতিজ্ঞাটি হচ্ছে এই যে আমার আর্টের মধ্য দিয়ে আমার প্রেয়সীকে অমর করে রেখে যাব। তারপরে আমার ছুটি, আমি তুনিয়ার সবাইকে কলা দেখাব। মার্কির আঁকা ছবিখানা আজও যত্ন করে রেখেছি।

জিকা, পেপ্‌স্, মার্কির মত অনেক ছেলের সঙ্গেই খুব অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছি এবং তাদের বুঝতে চেষ্টা করেছি। তাদের সবার কথা বলতে গেলে রামায়ণ মহাভারত লিখতে হয়। ইয়ুরোপের যুবকদের মধ্যে যে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষার স্পর্শ পেয়েছি তা আমাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার চেয়ে আলাদা হলেও তার মধ্যে একটা কিছু সত্য আছে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। ইয়ুরোপ যে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তা এই আকাঙ্ক্ষার শক্তিযোগে। জিকার ধনাকাঙ্ক্ষা, পেপ্‌সের মানবের তুঃখ-মোচনের সঙ্কল্প, মার্কির অমরত্বাভিলাষ—এর প্রত্যেকটার মধ্যেই যে একটা বিশেষ ধরণের আধ্যাত্মিকতা আছে, যাকে ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ বলেছিলেন উন্নতির ধর্ম্ম, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। রোমের ছাত্রাবাসের প্রত্যেকটি দেয়ালে যত তরুণের স্বপ্ন জড়িত ছিল তা হয়ত একবার হোয়াইট্ ওয়াসেই মুছে যেতে পারে; অন্য একদল ছেলে এসে হয়ত পেপসের আর মার্কির ঘরের দেয়ালে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের ছবি লাগাবে, কিন্তু পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষার এবং জীবন-স্বপ্নের সমারোহে এই ছাত্রাবাসটি হয়ে উঠবে একটি পবিত্র পুণ্যময় যৌবন-তীর্থ। অনন্তকালের ছায়াপথে যদি একটি তারকা-বিন্দুর অস্তিত্বের সার্থকতা থেকে থাকে, তবে মহামানবের যৌবন-স্রোতেও জিকা-পেপস্-মার্কির আকাঙ্ক্ষা-বুদ্‌বুদের সার্থকতা আছে। অমরত্ব সাধনার এইটেই গোপন কথা।

বৃন্দাবন

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

বাড়ী থেকে ক্রমাগত তাগিদ আস্‌তে লাগ্‌ল বাসা করার। অথচ কি সম্বল নিয়ে যে বাসা করব, তা'র কোনো স্থিরতা নেই। বয়স তিনের কোঠা ঘেঁসে চলেছে, এই বয়সে সমস্ত দিনের কর্ম্মশেষে একটু সেবা একটু যত্নের প্রত্যাশা করাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিদ্যা-উপার্জ্জন এবং অর্থ-উপার্জ্জন—এই উভয় পরিশ্রমের আশ্রয়স্থল এপর্য্যন্ত মেসই ছিল। অনেকদিনের অভ্যস্ত আশ্রয় হঠাৎ ত্যাগ ক'রে নতুন কিছু করার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু মানুষকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক কিছু কর্‌তে হয়—আমার বাসা করাটাও সেবার অনেকটা সেই ধরণের হ'য়েছিল।

স্বভাবটাকে মোটামুটি আরামপ্রিয় বলা যেতে পারে। নিশ্চিন্ত বিশ্রামের আমি এত ভক্ত যে সেটা কোনো উপায়ে হাতের কাছে এলে প্রিয়তম বন্ধুর সঙ্গও তা'র চেয়ে বেশী বাঞ্ছনীয় হয় না। আরাম, অর্থ, সুবিধা—এই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা ক'রে বাসা করার সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছন' গেল। বাসা স্থিরও হ'ল। বাসার সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত রকমের সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে ছেলেমেয়ে এবং তা'দের মাকে নিয়ে আসা হ'বে—এই রকম ইচ্ছা ছিল।

আধুনিক ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। তা'দের অনুসন্ধিৎসা শেষপর্য্যন্ত দুরন্তপনায় গিয়ে পৌঁছয়। মেসের নিরালা নির্ঝঞ্ঝাট একান্ত স্বার্থপর জীবনযাত্রায় কোনো বাধা না ঘটে অথচ বাসার স্বাচ্ছন্দ্যও ষোলো আনা পাওয়া যায়, এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান অন্তরায় ছেলে-মেয়েরা। তা'দের প্রয়োজন সম্বন্ধে ভাবা যায় না—তা'দের দৌরাত্ম্যও সম্পূর্ণ অতর্কিত। কখন কোন্ সময়ে এসে তা'রা একসঙ্গে পড়ার টেবিলের চারিদিকে সোরগোল তুল্‌বে, সেটা আগে থেকে স্থির করা দুঃসাধ্য। অনেক ভেবে চিন্তে ব্যবস্থা করা গেল। নীচেকার একখানি ঘর একেবারে বাইরের কোলাহল থেকে যা'তে সম্পূর্ণ মুক্ত থাক্‌তে পারে, তা'রই ব্যবস্থা কর্‌লাম। লেখাপড়ার জন্য টেবিল চেয়ার—পুস্তকাদি এবং আমার নিজের জন্য চৌকী একখানি—প্রভৃতি যা' কিছু একান্ত আমার নিরালা জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তু তাই দিয়ে ত ঘরখানিকে সাজানো গেল। দক্ষিণের জানালা খুল্‌লেই সম্মুখে প্রাচীর। অবশ্য তা'তে হাওয়া আস্‌বার বাধা ঘটে না। সদর রাস্তার সোরগোল প্রাচীরে বাধা পায়। প্রায়ান্ধকার নির্জ্জন ঘরে টেবিলে হাত রেখে আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতম প্রশ্ন সমস্যা এবং প্রাচীনদিনের সুদূর স্বপ্ন—এই উভয়বিধ বিষয়ই চিন্তা কর্‌বার কোনো অসুবিধা নেই।

ছেলেমেয়ে এবং তা'দের মা তখনো এসে পৌঁছ'ন নি। নীচেকার ঘরটি একরকম গুছিয়ে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে ব'সে আছি। নূতন ঠিকানায় দু'একজন বন্ধুর আসার কথা। তাঁদেরই অপেক্ষা করছি। নূতন বাসায় আর কি কি প্রয়োজনীয়—এই ছিল ভাববার বিষয়। হয় ঝি, না হয় চাকর—যে কোনো একটি ব্যবস্থা বাকী ছিল। তা'রপরেই ছেলেমেয়ে এবং তা'দের মা'র আসার কথা।

একশ্রেণীর চাকর দেখা যায়, তা'রা জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব কিছুই কর্‌তে পারে। প্রয়োজন হ'লে তা'রা রান্নাও কর্‌তে পারে। বিদেশ-বিভুঁই—যেখানে অর্থ বিনিময়ে সব কিছুরই ব্যবস্থা, সেখানে এই ধরণের একটি ভৃত্য পাওয়া গেলে বেশ ভালো হয়—এই রকম ভাব্‌ছিলাম। নূতন বাসায় এসে উঠেছি। কাছেই হোটেল, আহারের ব্যবস্থা সেইখানেই চলে। কাজকর্ম্ম এবং বিশ্রাম নূতন বাসায় চল্‌ছে। কয়েকজন অভিজ্ঞ বন্ধুকে একটি ভৃত্যের সন্ধান দেবার অনুরোধ ক'রেছি।

নির্জ্জন বাসা ; সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একলা ব'সে আছি। এক পেয়ালা চা-পানান্তে বন্ধুদের আগমনের প্রতীক্ষা কর্‌ছি। এমন সময়ে দরজার কাছে কা'র যেন ছায়া এবং পদশব্দ একই সঙ্গে আগিয়ে এল। ভাব্‌লাম, বোধহয় বন্ধুদের কেউ এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে, হরবিলাস না কি ?'

খুব সসঙ্কোচে দরজার পাশ থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে না, তিনিই পাঠিয়েছেন আমাকে আপনার কাছে।'

বল্‌লাম, 'ও, তা' তুমি দরজার পাশে কেন ? ঘরের মধ্যে এস, তোমার নাম কি ? কি চাও ?' অনুমানে বুঝ্‌লাম, বন্ধুবর বোধ হয় ভৃত্যের সন্ধান পেয়ে তা'কেই আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

দরজার পাশ থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে আমার নাম বৃন্দাবন। ঘরের মধ্যে আর যা'ব নি বাবু, আপনি চাকর রাখ্‌বেন শুনেছিলাম, রাখ্‌বেন কি ?'

চেয়ার ছেড়ে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। বল্‌লাম, 'তুমি ঘরের মধ্যে এস বৃন্দাবন, তোমার চেহারাটা ত আমার দেখা দরকার।'

এই কথায় বৃন্দাবন ত ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়া'লো। অত্যন্ত সঙ্কুচিত তা'র ভাব। শীর্ণকায় আধাবয়সী মেদিনীপুর জেলার লোক। দাড়ি গোঁফ সযত্নে কামানো। উঁচু চোয়ালের ভিতর দু'টি ছোট ছোট তীব্র চোখ্ সকলের আগে চোখে পড়ে। কোঁচার খুঁট্ গায়ে জড়ানো ; দ্বিতীয় আর কোনো জামাকাপড় নেই।

ঘরের মধ্যে এসেই সে আমার পায়ের কাছে ঝুপ্ ক'রে ব'সে পড়্‌ল। তারপর হাত দু'টি জোড় ক'রে তা'র সঙ্কোচ কাটিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল ; 'হুজুর, আমি বড়ই কষ্টে আছি। আজ কয়েকমাস ধ'রে আমার চাকরী নেই। আপনি যদি একটু আশ্রয় দেন, তা'হ'লে বেঁচে যাই। আজ দু'তিন দিন আমার পেটে অন্ন নেই হুজুর। কল্‌কাতা বড় বিষম স্থান

দয়াময়, কেবল পয়সা আর পয়সা—' ব'লেই সে কান্না আরম্ভ করল। কান্নার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে কাশি।

আমি দেখ্‌লাম অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। বল্‌লাম, 'তুমি এই পয়সা নাও, কিছু জলটল খাও গে। একটু সুস্থ হ'লে কাজ করতে এসো।'

সে তা'র শিরা বাহির-করা শীর্ণ হাতখানি বা'র ক'রে পয়সা নিয়ে কপালে, বুকে এবং চোখে ঠেকিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে রাখ্‌ল। পয়সা নিয়ে চ'লে যাওয়ার কথা দূরে থাক্‌, ক্রমশঃ চেয়ারের কাছে আগিয়ে এসে আমার পা' থেকে ধীরে ধীরে চটিজোড়া সরিয়ে নিয়ে পায়ের উপর হাত বুলোতে লাগ্‌ল। আমার যেন কেমন বাক্‌রোধ হ'য়ে গেল। কিছুই বলতে পারলাম না। আর দেখ্‌লাম—অদ্ভুত তা'র কণ্ঠস্বর। এই যে কাঁদছিল, সে কান্নার চিহ্নমাত্রও তা'র গলাতে নেই। যেন সে আমাকে ছোট বয়স থেকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছে—এই রকম তা'র ভাব। ধীরে ধীরে সে পা টিপ্‌তে আরম্ভ করল।

আমি একটু বিচলিত হ'লাম, বল্‌লাম, 'বৃন্দাবন, তাহ'লে তুমি এখানে কাজ করতে চাও? পারবে ত? আমার ছেলেমেয়ে আছে, তাঁ'দের মা আছেন—তাঁ'রা এখনো আসে নি। বাজার, রান্নার জোগাড় ক'রে দেওয়া, ছেলেদের দেখা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, বাসন মাজা, এই সব কাজই তোমাকে করতে হ'বে। তুমি যদি না পারো, আমাকে অন্য লোক দেখ্‌তে হয়। তা ছাড়া, তোমার ত শরীর ভালো নয়, বৃন্দাবন—তুমি পারবে কি?'

সে আমার সে সব কথা যেন শুনতে পায় নি—এমনি ভাবে আমার দিকে চেয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, 'হুজুর দয়াময় আপনি যদি চৌকীতে একটু শুয়ে পড়েন, তা হ'লে বড় ভালো হয়।'

আমি বল্লাম, 'কেন?'

'আজ্ঞে হুজুর, আপনার শরীর আরামের শরীর। আমি একটু আপনার পদসেবা করি।' বৃন্দাবনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মত মনের জোর অন্তত আমার সে সময়ে ছিল না। আমি চৌকীতে দেহভার ন্যস্ত করলাম। হরবিলাসের জানা লোক। অবিশ্বাস করার মত নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আমায় অত ভাববার অবসর সে দিল না। সে আমার পদতল থেকে আরম্ভ ক'রে শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থানগুলিতে এত নিপুণভাবে হস্তচালনা করতে আরম্ভ করল, মনে হ'ল যেন বহুযুগ ধ'রে শরীরের ঐ সব অংশে অজ্ঞাত পতঙ্গের দল বাসা বেঁধেছিল। বৃন্দাবনের সুশিক্ষিত ক্ষিপ্র অঙ্গুলিতাড়নায় তা'রা বিচলিত হ'য়ে আমার কানের কাছে জলতরঙ্গ ঝঙ্কার আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। তা'র হাত এবং আঙুল চল্‌ছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে তা'র অদ্ভুত ঝাঁঝালো গলায় তা'র গত দুই বছরের ইতিহাস ব'লে চ'লেছে। মেদিনীপুর জেলায় অজন্মা হ'য়েছিল কত সনে, তা'র কত বিঘা জমি, কত খাজনা, তা'র কোন্ কোন্ জমিতে খাজনা লাগে না, বাড়ীতে তা'র কে কে আছে, ছেলেমেয়ে কয়টি, কবে থেকে সে কল্‌কাতায় কাজ করতে এসেছে, কোথায় কোথায় কাজ করেছে, কেন সে সব জায়গায় তা'র চাকরী গেল—এই সব কথা। তারপর ডিমের অমলেট সে ভাজ্‌তে পারে, মাংস, পরটা, কালিয়া, পোলাও থেকে আরম্ভ ক'রে শাক্‌শবজির চপ্‌, চিংড়ীমাছের বিভিন্ন রকমের তরকারী সে রাঁধ্‌তে পারে, তারপর বাজার কি ক'রে করতে হয়, ঘর ঝাঁট দেওয়া একটা বিশেষ পরিশ্রমের কাজ, কল্‌কাতায় বর্ষা হ'লে সে এক বিষম ঝক্‌মারি অবস্থা, আজকালকার বাবুরা একেবারে অপদার্থ প্রভৃতি বহু বিষয়ে কখনো নিম্নস্বরে, কখনো উচ্চকণ্ঠে সালঙ্কারে বর্ণনা ক'রে গেল। আমার শরীর যখন রাত্রির আহারের অপেক্ষা না রেখে ঘুমে কাতর, কথা শুনবার এবং কইবার প্রবৃত্তি যখন আর নেই, ঠিক এমনি সময়ে হরবিলাস পান চিবোতে চিবোতে এসে চৌকীর এক পাশে ব'সে বল্‌লেন, 'তাহ'লে বৃন্দাবন, তুই এসেছিস্। বেশ, ওহে শ্রীকণ্ঠ, খাওয়া-দাওয়া সারা হ'য়েছে তোমার? এই যে বৃন্দাবন দেখ্‌ছো এ তোমার একটা asset বুঝ্‌লে?'

আমি অর্দ্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বল্‌লাম, 'কত মাইনে দিতে হ'বে? সুন্দর গা-হাত পা টেপে।'

আমার এই কথায় হরবিলাস বৃন্দাবনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। এইটুকু লক্ষ্য ক'রেছিলাম। তারপর, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কিছুই মনে নেই। ভোরবেলায় একবার উঠে দেখ্‌লাম, মশারি সযত্নে টাঙানো। টেবিলের উপরে জলের গ্লাস বই-ঢাকা। গামছা সযত্নে ভাঁজ-করা একপাশে। আর বৃন্দাবন আমার চৌকীর পাশে একখানা কম্বল বিছিয়ে কতকগুলো পুরনো খবরের কাগজ মাথায় দিয়ে ঘুমুচ্ছে। তা'র দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে আবার শয্যা গ্রহণ করলাম। ছেলেমেয়ে এবং ছেলেমেয়ের মা'র পরদিন আসার কথা।

*

সকালে উঠে দেখি, বৃন্দাবন সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা করতে আরম্ভ ক'রেছে। সে যেন বহুদিনকার পুরাণো চাকর। যেখানে যে বস্তুটি রাখ্‌লে ভালো দেখায়, সেখানে সেটি ঠিকমত সাজিয়ে রাখ্‌ছে। যা' নেই, অথচ আনা'তে হ'বে, তা'র একটা ফর্দ্দ করবার জন্য অনুরোধ করছে। বস্তা খুলে চা তৈরী করার সরঞ্জাম বা'র ক'রেছে এবং হিন্দুস্থানী গয়লার কাছ থেকে দুধ আনিয়ে চা তৈরী ক'রে টেবিলের উপর রেখে বল্‌ল, 'বাবু, চা খা'ন।'

বিনা বাক্যব্যয়ে চা পান করছি। সে আবার আমার পায়ের কাছে ব'সে বল্‌ল, 'বাবু, মা'রা কখন আসবেন?'

আমি চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে বল্‌লাম,—"তা'ত হ'ল বৃন্দাবন, তোমার মাইনেটা—"

সে মুহূর্ত্তমধ্যে আমার পায়ের উপর তা'র হাত দু'টি দিয়ে বল্‌ল, 'হুজুর, মা-বাপ—যা' দেবেন হাতে ক'রে দয়াময়, তাই নেব, তা'র জন্যে কি?'

চা অত্যন্ত গরম, এক পাশে রেখে দিয়ে বল্‌লাম, 'তাহ'লেও সব ঠিক ক'রে ফেলা দরকার, সব খরচের ব্যাপার কি না। সেইজন্যে আগে থাক্‌তে ঠিক ক'রে ফেলা ভালো।'

সে আর বেশী কিছু বল্‌তে চাইল না। শুধু বল্‌ল, 'হুজুর, যা' ব্যবস্থা করবেন।' আমি তা'র অতিমাত্র বিনয়-নম্র ভাব দেখে সহজে

তা'র আচরণ সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, 'আমি তোমাকে পাঁচ ছ'টাকা দিতে পারি—তুমি কি বলো? আমি কিন্তু ওর বেশী দিতে পারব না।'

এই কথায় বৃন্দাবন আমার দিকে একটি কাতর ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হাতমুখ নেড়ে বোঝা'তে চেষ্টা করল যে, সে যেভাবে কাজ করবে, তা'র যথার্থ দাম হিসেব করা যায় না। আমিও একদিনেই বুঝেছিলাম যে, বৃন্দাবনকে আমার দরকার। সুতরাং আরও কিছু বেশী দিয়ে তা'র সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা গেল।

*

নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবনযাত্রা কে না চায়? বাইরের জীবনের ক্লান্তিরও পরিমাপ হয় না। গৃহিণীও যে সারাক্ষণ মিষ্ট আলাপ করবেন, তা'রই বা স্থিরতা কি? ছেলেমেয়েরাও যে চিরকাল সুস্থ সুবোধ থাকবে সেটাও নিঃসংশয়ে বলা চলে না। সে ক্ষেত্রে বৃন্দাবন আছে, এত বড় একটা নির্ভরতা, বাস্তবিক তা'র কাজের হিসেব ক'রে দাম দেওয়া যায় না। এটা হ'ল ভাবপ্রবণতার কথা!

কিন্তু মুখে হরবিলাসকে বললাম, 'ওহে হরবিলাস, বৃন্দাবন বাস্তবিকই লোক ভালো। পাকাপাকি ব্যবস্থা একটা তা'র সঙ্গে ক'রে ফেললাম। তুমি তোমার অবসর মত একদিন এসো। এঁরা সব এসেছেন।'

তারপরের ব্যাপারটা নিত্যনৈমিত্তিক। কয়েকখানি খাতা—মুদীখানা, ধোপা, ডাক্তারখানা, কাপড় জামা, দুগ্ধ, বাজার প্রভৃতি। 'বাসা' নামধারী শকটের অদৃশ্য চাকাগুলি প্রতিদিনের পথে চলতে থাকে। আর, বৃন্দাবনও ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত চলে। ভোরবেলায় ওঠে। ঘর ঝাঁট দিয়ে এবং ধুয়ে, বাসন কোসন মেজে, তরকারি এবং দুগ্ধাদির ব্যবস্থা করে। ষ্টোভ জ্বালে—চা তৈরী করে খাওয়ায়। গৃহিণী স্নানাদি সেরে যখন রাঁধতে বসেন, সেই সময়ে সে বাজারের পয়সা চেয়ে নেয় এবং সকালবেলাকার সব দাবী মিটিয়ে বাজারে চ'লে যায়। অন্য চাকরদের অনেক ব'কে অনেক চেষ্টা ক'রে কাজ করা'তে হয়। বৃন্দাবনকে কিছুই বলতে হয় না। রৌদ্রে ছাদের উপর বিছানাপত্র মেলে দিয়ে, টেবিল পরিষ্কার ক'রে, বই খাতাপত্র ঠিকমত সাজিয়ে রেখে সে প্রায় গৃহিণীর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করেছে এমন সময়ে একদা গৃহিণী সন্ধ্যার অবসরে আমার নির্জ্জন ঘরটিতে নিঃশব্দে এসে জানিয়ে গেলেন, 'চাকরটি তোমার বড় বাক্যবাগীশ; আমায় বলে কি না—মা, রান্নাটা ত তেমন সুবিধে হচ্ছে না। এর মানে কি? কৈ, তুমি ত কোনোদিন কিছু বলো না!'

আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, বললাম, 'তাই নাকি? আচ্ছা, তা'কে আমি ব'লে দিচ্ছি।' ঠিক এমনি সময়ে বৃন্দাবন উনুন ধরাবার সরঞ্জাম নিয়ে অতি ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে এসে আবার বেরিয়ে গেল।

গৃহিণী আমার অন্যমনস্কতায় বিরক্ত হ'লেন বোধ হয়। বললেন, 'তোমার আর কি? উঠতে বসতে বৃন্দাবন। আমার কথায় কিন্তু ও তেমন কান দেয় না।'

আমি বই বন্ধ ক'রে চশমা খাপে রেখে বললাম, 'তাহ'লে উপায়?'

'জানি নে, যাও—' ব'লে' গৃহিণী মুখ ভার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

*

অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। চশমা খাপে রেখে দিয়ে স্থির হ'য়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলাম। রান্না সম্বন্ধে অভিযোগ—বিশেষ ক'রে সে অভিযোগ আবার বৃন্দাবনের তরফ থেকে। মেয়েদের পক্ষে তা' সহ্য করা কঠিন; বৃন্দাবনকে অবশ্য গৃহিণীর অলক্ষ্যে ডাকা হ'ল। তা'কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হে বৃন্দাবন, তোমার কি কাজ করতে ভালো লাগছে না?' কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ক'রে বললাম, 'ভালো না লাগে, সে কথা স্পষ্ট ক'রে জবাব দাও না কেন?'

এই কথায় বৃন্দাবন যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'আজ্ঞে দয়াময়, আমার অপরাধ কি? কৈ আমি ত কিছু—' ব'লেই সে চোখ হাত দিয়ে রগড়াতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর সে যেন সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিল। তারপর সে মুহূর্ত্ত মধ্যে মুখভাব বদলে ফেলল। প্রসন্ন হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত ক'রে সে বলল, 'হুজুর, আমি চাকর—সে কথা একশ'বার, কিন্তু মা'র ত আমি সন্তান, মুখে ভালো না লাগলে বলতে পা'ব না?' তারপর সে আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সংসারের খুঁটি-নাটি কাজ করতে আরম্ভ ক'রে দিল। কাজ করে, আর আপন মনেই বলে,—'রান্নাটা কি যে সে জিনিস? ও একটা শিল্প কাজ! এই বৃন্দাবন তা' জানে, সামান্য একটু মশলা, কিংবা একটু নুন—এদিক্ ওদিক্ হ'য়েছে কি, সব গোলমাল হ'য়ে যা'বে।' আবার কিছুক্ষণ থেমে থাকে। আবার কাজ করতে করতে বলে—রাঁধতে রাঁধতে যদি একটু অন্য কথা ভাবো, বাস্,—বুঝলে কিনা বৃন্দাবন, সব নষ্ট হ'য়ে যা'বে।'

আমি আর সময় নষ্ট না ক'রে নিজের কাজ নিয়ে ব'সেছি। উপর থেকে গৃহিণী রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'বেশী ব'কো না বৃন্দাবন, তুমি বড্ড বক্-বক্ করো।' সেদিনকার মত ব্যাপারটী সহজেই মিটে গেল।

* * * * *

ছাত্র পড়িয়ে ফিরতে একটু রাত্রি বেশী হয়। সেদিন ফিরে এসে দেখি, বৃন্দাবন একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে ব'সে ছেলেমেয়েদের খাওয়ার তত্ত্বাবধান করছে। একটু বিস্মিত হ'লাম। এ কাজটি গৃহিণীর নিজস্ব। এখানেও বৃন্দাবন প্রবেশ ক'রেছে, আর তা'র ধমকে আমার দুরন্ততম তনয় রবিনহুড্ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে ব'সে ব'সে খাচ্ছে।

আমি বললাম, 'কি ব্যাপার, বৃন্দাবন?'

বৃন্দাবন একটু হেসে বলল, 'হুজুর, মা'র বোধ হয় শরীর ভালো নেই—তাই আমি দেখছি।'

আমি বিশ্রাম নিতে নিতে বললাম, 'বেশ।'

এই অসুখ ব্যাপারটিকে আমার বড় ভয়। সমস্ত সাবধানতা, শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্ত্তিতাকে লঙ্ঘন ক'রে কখন যে ইনি নিঃশব্দে আসেন, এঁর পাল্টা আক্রমণ করবার জন্য কত কি যে দরকার, তা'র আর ইয়ত্তা নেই। যা'দের অসুখ করে নি, তা'দের বাঁচিয়ে—যা'দের ক'রেছে,

তা'দের সম্বন্ধে নূতন নিয়ম পালন ক'রে যাওয়া, আর, বিশেষ ক'রে ছেলেমেয়ের মা যিনি, তিনি যদি শয্যাশায়িনী হ'ন, তাহ'লে ত কথাই নেই। সংসারের উপর দিয়ে তাঁ'র সুস্থ হ'য়ে না ওঠা পর্য্যন্ত একটা ছোট খাটো ঝড় ব'হে যায়।

উপরে গিয়ে দেখি, গৃহিণী শয্যাশায়িনী। আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে প্রবল জ্বরের প্রথম অবস্থার শীতে হি-হি ক'রে কাঁপ্ছেন। আমাকে দেখে বল্লেন, 'এসেছ, খাওয়া হ'য়েছে তোমার ?'

আমি বল্লাম, 'খাওয়া ব্যাপারটায় হাঙ্গামা মোটেই নেই। তুমি আবার অসুখ বাধিয়ে বস্লে—এই ত মুস্কিল !'

'কেউ কি আর সাধ ক'রে অসুখ করে ? একটু ব'সো না বাপু তুমি। আমার মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও দেখি লক্ষ্মীটি।'

এর মধ্যে দেখি, বৃন্দাবন ছেলেমেয়েদের কোলে পিঠে ক'রে নিয়ে আসছে। তা'দের জন্যে পৃথক্ বিছানা ক'রে, মশারি টাঙিয়ে—সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে সে আমার খাবার ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য নীচে চ'লে গেল।

আমি গৃহিণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্লাম। তিনি বল্লেন, 'সব কি আর তোমার ঐ চাকরে পার্‌বে ? আমি ত তখুনি ব'লেছিলাম, একটা ঝি দেখে নিয়ো। তা' তুমি বল্লে ঝি—এমন চাকর পেয়েছি, যে তুমি না থাক্লেও চলে।'—ব'লে তিনি একটু ম্লান হাস্লেন।

আমি বল্লাম, 'ব্যবস্থা একটা হবেই—চিন্তা নেই। বৃন্দাবনও কাজ করে না এমন নয়, তবে একটু বেশী বকে।'

গৃহিণী পাশ ফিরে শুলেন, বললেন, 'সে যা' হয়, হ'বে। এখন অসুখটা সার্‌লে বাঁচি।'

বুঝ্লাম, বৃন্দাবনের কাজ-কর্ম্ম গৃহিণীর ঠিক পছন্দমত নয়। নীচে গিয়ে দেখি, বৃন্দাবনের আহার্য্য-পরিবেশনের ব্যবস্থা। গৃহিণী যে ভাবে সব ব্যবস্থা করেন, কুশলী বৃন্দাবন ঠিক সেইভাবে সব ব্যবস্থা ক'রে দরজার একপাশে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার খাওয়া শেষ হ'লে, সে গৃহিণীর পথ্য দিয়ে আস্‌বার জন্য উপরে চ'লে গেল। মনে হ'ল, বৃন্দাবন না হ'লে বাসা অচল হ'ত।

* * * * *

ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি। গৃহিণীর অসুখে দশ বারোদিন যেন খণ্ড প্রলয় ব'য়ে গেল বাসার উপর দিয়ে। যেদিন গৃহিণী উঠে পথ্য কর্‌বেন, তা'র আগের দিন থেকে বৃন্দাবন—সুক্ত একটা তৈরী কর্‌বে, এবং লপূপাক মাছ কি-কি, তা'রই একটা ফর্দ্দ অন্তত দশ বারোবার মনে মনে আবৃত্তি ক'রে গেল। গৃহিণী সুস্থ দেহে এবং শান্ত মনে উঠে পথ্য কর্‌লেন, বৃন্দাবনের রান্নার প্রশংসা কর্‌লেন ; দেখে আমি বিস্মিত হ'য়ে কর্ম্মস্থানে চ'লে গেলাম।

সন্ধ্যার দিকে হরবিলাস এলেন। তাঁ'কে দেখে বল্লাম—'বসো। তুমি ত খুব কম আসো। অসুখ-বিসুখ নিয়ে আমি অত্যন্ত বিব্রত থাকি।'

হরবিলাস অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে বল্লেন, 'অসুখ কি রকম ? কা'র অসুখ ?'

আমি বল্লাম, 'আবার কা'র ? রবিন্ হুডের মা'র।'

'কৈ আমি ত কিছু শুনি নি। তুমি দেখা হ'লেও সব খবর ত দেবে না। একেবারে চুপ্‌চাপ্ থাক্‌বে। এখন কেমন আছেন ?'

'অনেকটা কম পড়েছে। তুমি ব'সো—দাঁড়িয়ে রইলে যে !'

'এই যে, বসি'—ব'লে হরবিলাস চৌকীর একপ্রান্তে বসলেন। ক্রমশঃ আমার নির্জ্জনঘর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। ছেলেমেয়েরা, তাদের অতি শীর্ণা মা ঘরে এসে দাঁড়া'লেন। সুজাতা হরবিলাসকে লজ্জা কর্‌তেন না। ভুল হ'য়েছে—আমার গৃহিণীর নাম সুজাতা—সেটা বলা হয় নি। বৃন্দাবন দরজার পাশে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে আবার অন্তর্হিত হ'ল।

হরবিলাস সুজাতার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'একি, আপনার যে কঙ্কালসার অবস্থা হ'য়েছে।' তারপরেই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'তুমি changeএ যাও ভাই, এঁকে নিয়ে। কল্‌কাতায় স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার আশা কম।'

একখানি ছোট ইজিচেয়ার ঘরের একপ্রান্তে ছিল। সুজাতা তা'তেই দেহভার ন্যস্ত করলেন। রুক্ষ চুলগুলো কপালের উপর দিকে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'আর স্বাস্থ্য, আপনাদের ত শুধু কাজ আর কাজ ; মেয়েরা মরে আর বাঁচে, সেদিকে লক্ষ্য দেবার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই।'

বৃন্দাবন আর একবার ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল দেখ্লাম। হরবিলাসকে বোধ হয় সে সত্যসত্যই ভয় করে ব'লে মনে হ'ল। হরবিলাস না এলে, সে যে এর মধ্যে কতবার আমার কাছে বিনাপ্রয়োজনে আস্‌ত, তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

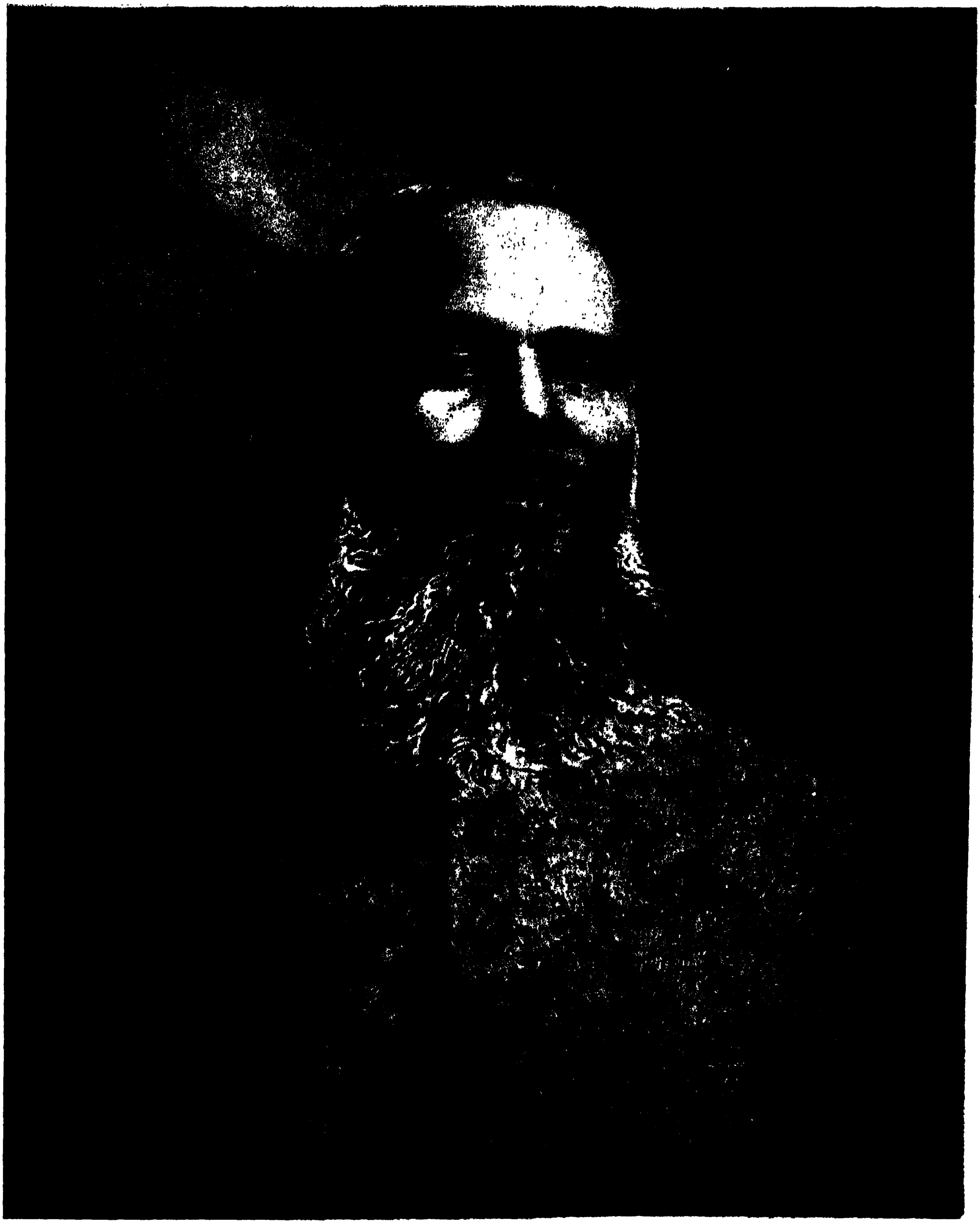
আমি হরবিলাসের change-এর প্রস্তাবে, তাঁ'র দিকে তাকিয়ে বললাম—'শরীরে রোগ ব্যাধি না থাকলে, বাংলা দেশের জলহাওয়াতেই সুস্থতা আসে—change-এর ব্যয় বহন করাই আমাদের মত লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য।'

সুজাতার বোধ হয় এ কথা ভালোই লাগ্‌ল। তিনি বল্লেন, 'না, আমি এখানেই সেরে যা'ব—চিন্তা নেই। তবে যে চাকরটি আপনি দিয়েছেন, ও বড্ড বেশী বকে। ওর বকুনীটা আপনি কমা'তে পারেন ?'

হরবিলাসের কাছে এ প্রস্তাব অবশ্য মারাত্মক নয়। তিনি ভ্রূ কুঁচকে বল্লেন, 'কেন বকে ? বকুনীতেই আপনার অসুখ কর্‌ল নাকি ?'—ব'লে সুজাতার দিকে চেয়ে তিনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

সুজাতা একটু লজ্জিত হ'লেন। বললেন, 'দেখুন, একেবারে একা থাকতে হয় বাসায়। জনপ্রাণী কেউ নেই। সে অবস্থায় যদি ক্রমাগত একটা লোক ঘুর্‌ছে, ফির্‌ছে—আর আপন মনে বক্ বক্ ক'রে বর্ক্‌ছে—এই শুন্‌তে হয়, তা'হলে বিরক্তি আসে নাকি ?'

হরবিলাস মাথা নেড়ে বল্লেন, 'সে কথা মিথ্যা নয়। আচ্ছা, আমি ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।'



জন্ম—১২ই শ্রাবণ, ১২৬৩ সাল — মহারাজা গিরিজানাথ রায় — মৃত্যু—১৩২৬ সাল, ৬ই পৌষ

সুজাতা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বললেন, 'এ'র দ্বারা কিছু হ'বে না, অত্যন্ত শান্ত লোক। হিসেব যা' দিচ্ছে, তা-ই লিখে নিচ্ছেন. বকা নেই, ঝকা নেই—বিশ্বাস করা অবশ্য ভালো—কিন্তু সব ব্যবস্থা ঐ বৃন্দাবন করবে—এতটা কি ভালো ?'

আমি ঈষৎ হেসে বললাম, 'তুমি সবে অসুখ থেকে উঠেছ, এখন হিসেব বা সংসার সম্বন্ধে অত ভেবো না। সুস্থ হ'য়ে দেখাশুনা করো।'

হরবিলাস মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। বললেন, 'তাহ'লে বৃন্দাবন তোমাদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ও-রকম হয়। একটু expert লোক. আপনাকে বোধ হয় কোনো কাজই করতে দেয় না।'

সুজাতা বললেন, 'না, কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই। আমি কিছু করতে গেলেই, হাঁ, হাঁ—করেন কি, করেন কি—বলতে বলতে ছুটে আসে। সে বিষয়ে খুবই ভালো। তবে এঁর সম্বন্ধে বলছি, অত ঢিলঢিলে হ'লে সংসার চ'লবে কি ক'রে ?'

বৃন্দাবনের মুখখানা আমি তৃতীয়বার দেখতে পেয়েই হেঁকে বললাম, 'ওরে বৃন্দাবন. চা'র ব্যবস্থা কর। কিছু খাবার-টাবার নিয়ে আয়।'

'যে আজ্ঞে হুজুর'—ব'লেই সে শরীরের উর্দ্ধাংশ নিমেষমধ্যে নত ক'রে ফেলে একসঙ্গে অনেক কাজ সারতে সারতে চ'লে গেল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সে চা এবং খাবার নিয়ে উপস্থিত। সুজাতা তাঁর শীর্ণ শরীর নিয়ে খাবার প্লেটে সাজিয়ে আমাদের দু'জনের সম্মুখে রাখলেন ও ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে বসলেন।

বৃন্দাবন তেমনি শরীর নত ক'রে বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে বলল, 'মা, আপনি কেন কষ্ট করতে গেলেন, আমি ত আছি।'

একটি তীক্ষ্ণ অথচ মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে সুজাতা বললেন, 'তোমার কি অন্য কাজ নেই ?' বৃন্দাবন নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

আমরা চা'য়ে চুমুক দিতে দিতে এ-কথা সে-কথা আলোচনা করতে লাগলাম। আলোচনা এবং চা-পানান্তে হরবিলাস বললেন, 'চলো হে, পার্কের দিকে কোথাও যাওয়া টাওয়া যাক্।'

সুজাতা বললেন, 'একটু শীগ্‌গির ফিরবার চেষ্টা ক'রো।'

হরবিলাস বললেন, 'না, সেজন্যে ভাবতে হ'বে না। শীগ্‌গির কর্ত্তাটিকে পাঠিয়ে দেব।' আমি বললাম, 'একটু দাঁড়াও হরবিলাস, আমি জামাটা গায়ে দিয়ে নি।'—ব'লে আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা হাত বাড়িয়ে টেনে পরলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য. বোতামের ঘরগুলিতে এক সেট্ সোণার বোতাম ছিল, কোথায় গেল ? এখানে, সেখানে, আলমারির পাশে, ট্রাঙ্কের পাশে, ঘরের মেঝেয় তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম—কোথাও বোতাম পাওয়া গেল না। এটুকু আমার মনে আছে, আগের দিন বাসায় এসে সোনার বোতাম সমেত পাঞ্জাবীটা আলনায় ঝুলিয়ে রেখেছি। অথচ, এরি মধ্যে বোতাম কোথায় গেল ?

হরবিলাস বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, চেঁচিয়ে বললেন, 'কি হে শ্রীকণ্ঠ, দেরী হচ্ছে কেন ?' আমি ভিতর থেকে চাপাগলায় বললাম, 'তাই ত হে, পার্কে যাওয়া বোধহয় হয় না।'

'কেন ?'

'সোনার বোতাম সেটটা হারাচ্ছে।'

'বলো কি ?'—ব'লে হরবিলাস ঘরে এসে দাঁড়ালেন। 'ভালো ক'রে খুঁজে দেখ দেখি, সব জায়গায়। যা'বে কোথায় ?'

সে এক অদ্ভুত অবস্থা। অথণ্ড মনোযোগের সঙ্গে বিছানা বালিশ উল্টে, চৌকীর তলা হাতড়িয়ে, সেল্ফ, আলমারি, টেবিল, দেরাজ, ট্রাঙ্ক সমস্ত খুলে নূতন উৎসাহে আবার খুঁজতে আরম্ভ করলাম। মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস, সে আর পাওয়া যা'বে না। সুজাতাকে তখনো জানানো হয় নি। বৃন্দাবন বাজার চ'লে গেছে কি আনবার জন্য।

পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বৃন্দাবনের ব্যবহৃত কয়েক বাণ্ডিল বিড়ী এবং দেশলাই প্রভৃতি হাতে এসে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের কথা মনে হ'ল। সে কোথাও রাখে নি ত। হরবিলাসও বললেন, 'এইবার গিন্নীকে জানাও।'

বেশী কিছু বলতে হ'ল না। নীচে ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ হ'তেই সুজাতা নেমে এসেছেন। বললেন, 'কি হারিয়েছে, বোতাম বুঝি ?'

'পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি রাখো নি ত !'

'আমি কি জন্যে রাখতে যা'ব ? তোমার বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করো।'—ব'লে তিনি যেমন এসেছিলেন, তেমনি ধীরভাবে উপরে চ'লে গেলেন। যাক্ বাঁচা গেল। এইবার বৃন্দাবন এলেই একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। আমি তখন খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে পড়েছি। সুজাতার কাছ থেকে বোতাম সেটটা চেয়ে নেওয়াই অন্যায় হ'য়েছে। হারিয়ে যা'বে, তা'-ই বা কে জানত ? ধীরে ধীরে সব মনে পড়তে লাগল। আলনার ঠিক নীচেই বৃন্দাবন বিছানা ক'রে শোয়। রাত্রে তা'কে আমি ব'লেছিলাম, 'বৃন্দাবন, আমার সোনার বোতাম কিন্তু পাঞ্জাবীতে রইল।' বৃন্দাবন অর্দ্ধতন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে ব'লেছিল, 'আচ্ছা।' তা'হ'লে নিশ্চয়ই একমাত্র সে-ই জানে। হরবিলাসকে সব কথা বললাম। হরবিলাস বললেন, 'তাহ'লে সে ই কোথাও নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে। চিন্তা করার কিছু নেই।'

এমন সময় বৃন্দাবন কি একটা হাতে ক'রে ঘরে এসে দাঁড়া'ল। ঘরের জিনিষপত্র তচ্‌নচ্। এই দেখে সে ব্যস্ত হ'য়ে কি বলতে যা'বে আমি তখনি তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বৃন্দাবন, আমার সোনার বোতাম !'

এই কথায় তা'র মুখখানা যে কি আশ্চর্য্য রকম নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল, তা' ঠিক বোঝানো যায় না। সে ভালো ক'রে কথাই বলতে পারল না। মাথাটা বারকয়েক চুলকে সে বলল, 'কৈ বাবু, আমি ত কিছু জানি নে।'

তা'র মুখের দিকে তাকিয়ে হরবিলাস দৃঢ়স্বরে বললেন, 'ঠিক ত !'

দাঁতে দাঁতে চেপে মুখভঙ্গীটি অদ্ভুতরকম ক'রে বৃন্দাবন পাঞ্জাবীটি খুঁজতে লাগল।

আমি বললাম, 'কি খুঁজছ ?'

'পাঞ্জাবী হুজুর, তা'তেই ত রেখেছিলেন বোতাম, না কি ?'

'পাঞ্জাবী আমার গায়েই আছে।'

'পকেট-টকেট দেখেছেন ত ভালো ক'রে ?'

হরবিলাস চেঁচিয়ে বললেন. 'তুই একটা আহাম্মক, দেখছিস্ না

জিনিষপত্র ঘরময় ছড়ানো—সব খোঁজা হ'য়েছে। তুই যদি কোথাও রেখে থাকিস্ ত বল্।'

এই কথায় তা'র গলার স্বর আট্‌কে গেল। কি সে বল্‌তে চায়—অথচ বল্‌তে পার্‌ল না। তা'র তখনকার মুখ দেখ্‌লেই মনে হয়, সে বোতাম সম্বন্ধে জানে। হয় সে নিজে নিয়েছে, নয়, সে কা'কেও নিতে দেখেছে—এইরকম তা'র মুখভাব। এই অবস্থায় সে তা'র বিড়ীর বাণ্ডিলের পাশে হাত দিয়ে খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল।

হরবিলাস বিরক্ত হ'য়েই ছিলেন—সেই অবস্থায় তা'র কান ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে বারকতক তা'র মাথাটা ঝাঁকিয়ে বল্‌লেন, 'তুই-ই নিয়েছিস্ মনে হচ্ছে! কেমন?' তখনো তা'র মুখ দিয়ে কোনো প্রতিবাদ বা'র হ'ল না।

হরবিলাস তা'র গালে দুই এক ঘা চড় মেরে বল্‌লেন, 'বিক্রী ক'রেছিস্ না কি হতভাগা! কোথায়, তা'দের ঠিকানা কি বল্! নৈলে, শেষটায় তোকে পুলিশে দেব।'

আমারও তখন বৃন্দাবনের উপরই সন্দেহ দৃঢ়তর হ'তে লাগ্‌ল। বল্‌লাম, 'পুলিশেই দাও, বুঝ্‌লে বিলাস?'

একটা অদ্ভুত হাসি তখন বৃন্দাবনের মুখে। উঁচু চোয়ালের নীচ থেকে তা'র ছোট ছোট চোখ্ দু'টো মিট্‌মিট্ কর্‌ছে। হাঁ কি না—কিছুই তা'র মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না। হরবিলাসের ক্রোধ তখন শেষ-সীমায় পৌঁচেছে। তিনি তা'র চুলের মুঠি চেপে ধ'রে তা'র পিঠে ঘা-কতক দিতেই দরজার পাশে সুজাতা এসে দাঁড়ালেন। আমার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লেন, 'যে চোর, সে কখনো স্বীকার করে না। ওকে না মেরে পুলিশে দিলেই ভালো হ'ত না কি?'

আমি বল্‌লাম, 'কাজ ত ওর গেলই। সেই সঙ্গে ৫।৬ মাসের মাইনের ব্যবস্থাও ত ক'রে ফেল্‌ল। থাক্, আর মেরো না হে হরবিলাস। কে জান্‌ত, ও একটা বিশ্রী কাণ্ড ক'রে বস্‌বে?'

বৃন্দাবনকে ছেড়ে দিয়ে হরবিলাস তখন চৌকীতে ব'সে পড়েছেন। আর বৃন্দাবন ঝুপ্ ক'রে আবার আমার পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে মাথা টিপে ধ'রে হু-হু ক'রে কাঁদতে লাগ্‌ল। কান্নাটা তা'র গলাতেই র'য়ে গেল। চোখ্ দিয়ে একফোঁটা জলও পড়্‌ল না।

হরবিলাস বল্‌লেন, 'নে ওঠ্, চল্, থানায় চল।'

আমি বল্‌লাম, 'আর দরকার নেই থানা-পুলিশ করবার। ওকে আমি জবাব দিচ্ছি। বোতাম ও-ই নিয়েছে। বিক্রীই ক'রেছে ব'লে মনে হয়। ও তা'র জিনিষপত্র নিয়ে চ'লে যাক্।'

সুজাতা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তা'রপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'অতি ভক্তির পরিণাম শেষ পর্য্যন্ত এই হয়। বোতাম-সেটটা তখন বা'র ক'রে না দিলেই ভালো হ'ত।'

হরবিলাস বল্‌লেন, 'যা' তুই চ'লে যা, ব'সে রইলি যে?'

এতক্ষণ পরে বৃন্দাবনের কণ্ঠ দিয়ে স্বর নির্গত হ'ল। সে বল্‌ল, 'হুজুর, আমি নিই নি। ছেলেরা হয়ত কোথাও রেখে থাক্‌বে, ভালো ক'রে তা'দের জিজ্ঞাসা করুন্।'

সে আর বেশী কিছু বল্‌ল না; কাপড়ের একটি ছোট পুঁটুলি তা'র ছিল, সেইটি টেনে নিয়ে সে ধীরে ধীরে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল্।

হরবিলাস যা'বার সময় বল্‌লেন, 'ট্র্যাজিক ব্যাপার, আর চাকর-টাকর রেখো না হে শ্রীকণ্ঠ, ওকে ত বিশ্বাসী ব'লেই জানতাম—শেষটায় ও—' ব'লে তিনি-ও চ'লে গেলেন।

বেড়া'তে যাওয়া দূরে থাক্—আবার নূতন ক'রে ঘর গোছাতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। সমস্ত জগৎ-সংসারের উপর নিদারুণ বিরক্তি আর অবিশ্বাস মনের মধ্যে একটা ঘন অন্ধকারের ছায়া ঘনিয়ে তুল্‌ল।

মাসখানেক পরের কথা। সুজাতা সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছেন। চাকর বা ঝি কিছুই রাখেন নি তিনি। নিজেই সব করেন। বল্‌তে গেলে বলেন, আমার শরীর এতেই বেশ ভালো আছে।'

সন্ধ্যার দিকে ছাত্র পড়ানোর কাজ সেরে ইজিচেয়ারে দেহভার ন্যস্ত ক'রে কি একটা পড়্‌ছিলাম। ছেলেমেয়েরা বোধহয় খাবার এবং দুধ খাচ্ছিল। সুজাতা মেঝেয় ব'সেছিলেন। কেন জানি না, হঠাৎ সেদিন বৃন্দাবনের কথা মনে পড়্‌ল। তা'র অভাব অবশ্য প্রতি পদে পদেই বুঝতে পারি। আজকাল খাটুনী আমাদের উভয়েরই বেড়েছে। সেটা অবশ্য সকলদিকেই ভালো। কিন্তু অতি পরিশ্রমে মাঝে মাঝে বৃন্দাবনকে মনে পড়ে।

নীচেকার আমার নির্জ্জন ঘরটি অল্প একটু অন্ধকার। দক্ষিণের প্রাচীর পার হ'য়ে ভারি সুন্দর একটি শীতল বায়ুস্রোত ভেসে আসছে। সুজাতার বিশেষ তাড়াতাড়ি নেই। তাঁ'র খাবার খাওয়ানো এবং আমার বইপড়া—বেশনিশ্চিন্ত অবসরের নেশায় জমে উঠেছে। এমন সময় সুজাতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক্‌লেন,—'এই রবীন হুড্, তুই টেবিলের নীচে কেন?'

খাবার খেতে খেতে কখন যে রবিন্ হুড্ আমার টেবিলের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সেদিকে সুজাতা ততটা লক্ষ্য দেন নি। টেবিলের অন্ধকার কোণ থেকে উত্তর এল,—'এখানে বেশ ভালো।'

'দাঁড়া ত হতভাগা তোর বেশ ভালো বা'র কর্‌ছি আমি—দাঁড়া! বেরিয়ে আয় বল্‌ছি, শীগ্‌গির বেরিয়ে আয়!'

রবিন্ হুড্ বল্‌ল, 'আমি একটা জিনিষ পেয়েছি এখানে—যা'ব না।'

'কৈ, কি জিনিষ, দেখি!'—ব'লে আমরা উভয়েই সেইদিকে ঝুঁকে পড়্‌লাম। দেখি, দেরাজের শেষপ্রান্ত থেকে সোণার বোতামের সেট্ একহাতে টেনে ধ'রে রবিন্ হুড্ ব'সে ব'সে খাবার চিবোচ্ছেন।

দু'জনে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে ব'সে রইলাম। একমাস পূর্ব্বেকার একটি দৃশ্য যেন চোখের সম্মুখে এসে দাঁড়া'লো। বেশ দেখ্‌তে পেলাম, নিরপরাধ বৃন্দাবন তা'র ছোট কাপড়ের পুঁটুলিটি হাতে নিয়ে ম্লান নিষ্প্রভ মুখে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। তা'র সেই মূর্ত্তিটা ভুলে যা'বার চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু সেটা যেন ছায়ার মত চোখের সম্মুখে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল।

মোটরে সাতদিন

শ্রীবীণা গুহ বি-এ

প্রচুর আনন্দে পূজায় কয়েকটা দিন কি করে কাটান যায় তারই জল্পনা করতে করতে একসময়ে আমাদের স্থির হোল যে মোটরে দিন কয়েক বাইরে বেড়িয়ে আসা হবে। কোন কাজে দেরী আমাদের সয়না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ঠিক্ হোল যে পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবারই (২৬শে আশ্বিন) বেরিয়ে পড়া যাক্। গন্তব্য স্থানের নির্দ্দিষ্টতা নেই, খুব খানিকটা ঘুরে আসতে হবে এইটেই অভিপ্রায়। তবে প্রথমতঃ রাঁচী যাওয়া হবে, উপস্থিত এই ঠিক্ রইল।

মঙ্গলবার বেলা তিনটায় বেরিয়ে পড়লাম; সঙ্গে আবশ্যকীয় সব জিনিসই আছে—গোটাদুই সুট্‌কেশ, বিছানা ছাড়া রান্নার জন্য কিছু বাসন, চাল ডাল ইত্যাদি, এমন কি গ্রামোফোন পর্য্যন্ত। মোট কথা সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে নেবার পর আমাদের মোটরটা হোয়ে দাঁড়াল যেন একটা ছোটখাট চলন্ত সংসার। বিকালের দিকে এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে চা খেয়ে নিলাম। রাত নয়টা আন্দাজ আসানসোলে পৌছলাম। রাত্রে গাড়ী চালান হবে না এই ঠিক্ ছিল তাই এখানে এক চেনা ভদ্রলোকের বাড়ীতে উঠলাম। আগে থেকে খবর দেবার দরুণ আমাদের খাবার শোবার কোনই অসুবিধা হোল না।

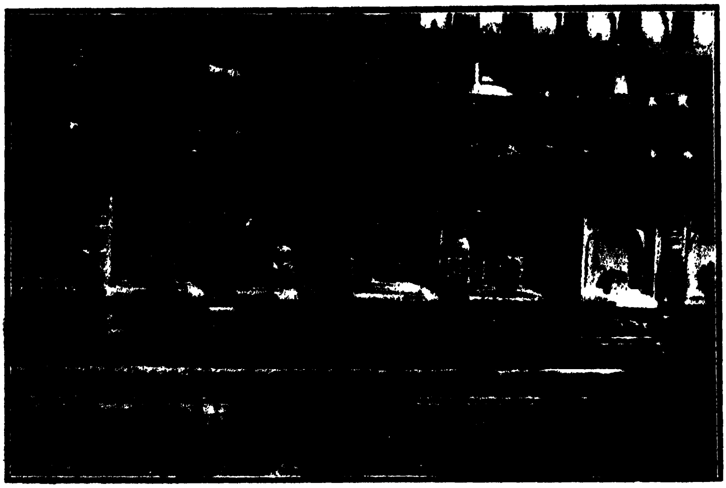


বোধিদ্রুম—বুদ্ধগয়া

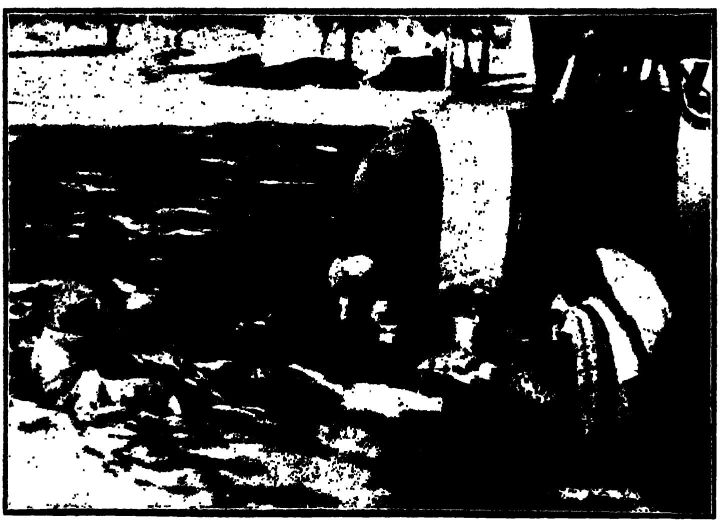
ভোর রাতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ক্রমে চারদিক আলো হোয়ে উঠল। মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগছে। দুপাশে শিশির-ভেজা মাঠ। আসানসোল ছাড়বার পরই লোক চলাচল খুব কম। পথ কোথাও নীচুতে নেমে আবার উপরে উঠে গেছে। সারথী বিক্রমদা খুব স্পীডে গাড়ী চালাচ্ছিল। ড্রাইভিংয়ে বিক্রমদার সমকক্ষ কম আছে বলেই মনে হয়। সঙ্গে ড্রাইভার নিলেও যাতায়াতে বেশীর ভাগ পথ বিক্রমদাই চালিয়েছে। মাঝে মাঝে দু-একটা মাটীর ঘর, দেয়ালে তাদের চিত্রকার্য্য, ওদেশী লোকেদের কোন পরব হোয়ে গেছে বা হবে, সেই উপলক্ষেই হয়ত ওই আল্‌পনা। ঘরের বাইরে খাটিয়ার উপর কেউ হয়ত মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে; কোথাও বা গলা পর্য্যন্ত কাপড় বাঁধা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মায়ের আঁচল ধরে কূয়া হতে ফিরছে।

সকাল সাতটা সাড়ে-সাতটা আন্দাজ আমরা পরেশনাথ পাহাড়ের কাছাকাছি এলাম। পাহাড়ের মাঝামাঝি মেঘ জমে প্রাতঃকালের রোদে অপূর্ব্ব দেখাচ্ছিল। একটা টিলার তলায় গাড়ী থামিয়ে আমরা

চা খাবার ব্যবস্থা করলাম। একটা ঢিপির উপর, ঝোপের আড়ালে ষ্টোভ রেখে, অতি কষ্টে জ্বালানো হোল। চা তৈরী করে, খাওয়া সেরে আমরা আবার যাত্রা করলাম। আগের দিন এ. এ. বি ট্রায়াল(A, A.B. Trial)



প্রাচীর গাত্র—বুদ্ধগয়া



পথের ধারে আমাদের রান্না—বুদ্ধগয়া

গেছে, তারই একটা গাড়ী ভগ্নাবস্থায় পথের ধারে দেখতে পেলাম। রোদ তখন প্রচণ্ড হোয়ে উঠেছে, দুপাশে হাজারী-বাগের ঘন জঙ্গল। রাঁচী হতে কিছু দূরে সে জায়গাটাও হাজারীবাগের ভিতরে। সেখানে যে দৃশ্য দেখলাম, জীবনে তা ভুলব না। পথ চক্রাকারে উপরে উঠে গিয়েছে; ডানদিকে খাড়া পাহাড় আর বাঁ-দিকে অনেক নীচে সমতল ভূমি দেখাচ্ছে যেন অদৃশ্য মহা শিল্পীর সযত্নে চিত্রিত সাধের একখানা ছবি। গাড়ী থামিয়ে আমরা সেখানে একটু বেড়ালাম। একটা আপেল খেয়ে অবশিষ্টটুকু "শুট্" করতে গিয়ে বিক্রমদার একপাটী জুতা কোথায় ছিটকে পড়ল। আমার বোন রমা হেসেই অস্থির। কিন্তু এক পায়ে জুতা—সে চেহারা দেখে হাসির চাইতে দুঃখই বেশী হোতে লাগল। যাক্, কাছেই একটা ঝোপ থেকে জুতা উদ্ধার হোল, রাঁচী পৌছাবার আগেই এভাবে জুতা হারালে আফ্‌শোষের আর সীমা থাকত না।

বেলা সাড়ে বারটা আন্দাজ রাঁচী পৌছে পথে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইণ্ডিয়ান হোটেলের ভিতরে ইম্পীরিয়ালই ভাল, তারই ব্রাঞ্চ হিল্‌ভিউ সাম্‌নে পেয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম। ম্যানেজারের সঙ্গে দরদস্তুর করে দোতলায় একটা ঘর ঠিক্ করে নেওয়া গেল। সেদিন স্নান করে, খাওয়া সেরে বিকালের দিকটা রাঁচী সহরটা আমরা একটু ঘুরে এলাম। পরদিন (২৮শে আশ্বিন) হুডু ও জোনা জলপ্রপাত দেখতে যাব। শেষ রাত্রে জেগে দেখি বৃষ্টি পড়ছে। মন খারাপ হোয়ে গেল; সময় অল্প, এরই ভিতরে যে সব আমাদের দেখে

যেতে হবে। সকালে উঠে দেখ্‌লাম আকাশ পরিষ্কার, যাক্, অদৃষ্ট আমাদের ভাল। আমরা কাপড় পরে নিলাম। মা টিফিন কেরিয়ারে লুচি তরকারী সাজিয়ে নিলেন। লুচি ভেজে বিক্রমদা মার কাছ থেকে রান্নার খুব বড় সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। হুড্রু যাবার পথ ভারী চমৎকার। একটা গাড়ী যাবার মত সরু রাস্তা, দুপাশে ঘন ঝোপ, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। রাতে বৃষ্টি হবার দরুণ ঘাস পাতা সব ভিজে। গাড়ী থামিয়ে হুড্রুতে দেড় মাইল পথ হেঁটে যেতে হয়, উঁচু নীচু পাথুরে রাস্তা, গাড়ী ওখানে যায় না। পথে খানিকটা জল, আনা কয়েক পয়সার বিনিময়ে ওদেশী লোকেরা খাটিয়ায় করে যাত্রী পার করে দেয়। এ-ছাড়া পাথর দিয়ে একটা পিছল পথ আছে, সেখান দিয়ে পার হওয়া বিপজ্জনক। দেখে-শুনে ত চক্ষু স্থির, শেষে খাটিয়ায় চড়তে হবে! অথচ হুড্রু না দেখে ফেরাও যায় না। চোখ কান বুজে চড়ে বস্‌লাম। দুজন মুখোমুখি বসতে হয়। ভবতারণ, আমাদের ড্রাইভার সটান শুয়েই পড়ল।

আয়তনে হুড্রু খুব বড়। কোন মহা উচ্চ থেকে বিশাল জলধারা ভৈরব নিনাদে অবিশ্রাম ঝরে পড়ছে। এখানে এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ আর দেরী করলে এ যাত্রা জোনা দেখা হয় না। অনিচ্ছাসত্বে তাই রওনা হোলাম। ওখানকার আদিম অধিবাসী সাঁওতাল জাতীয়। ওদের কি এক পর্ব্ব উপলক্ষে পাঁঠা বলি দিয়ে তারা পথের ধারে মহা নাচ গান জুড়ে দিয়েছে। জোনা পৌঁছে আমরা খেয়ে নিলাম। আড়াইশোর উপর পাথরের ধাপ বেয়ে জোনায় নামতে হয়। দুজন পোর্টারের হাতে টর্চ্চ, ক্যামেরা ইত্যাদি চাপিয়ে আমরা নামতে সুরু করলাম। দুধারে গোটা দুই বিশ্রামের স্থান দেখ্‌লাম। আয়তনে জোনা হুড্রুর চাইতে অনেক ছোট। হুড্রুর জলধারার পতন-স্থানে আমরা নামতে পারিনি, খুব নাকি বিপজ্জনক। এখানে আমরা একেবারে সামনে একটা পাথরে গিয়ে বস্‌লাম। জলকণা আমাদের গায়ে এসে লাগ্‌ল। পথের কষ্ট সব যেন এক নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বিরাট জলধারা উৎস হতে নির্গত হোয়ে কোন অনাদি কাল থেকে কত উপলখণ্ড, কত জনপদের ভিতর দিয়ে অজানার উদ্দেশে বয়ে চলেছে। প্রকৃতির এই লীলা-নিকেতনে আস্‌লে ঘোর অবিশ্বাসীর মন হতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় ক্ষণেকের জন্য দূর হোয়ে যায়।

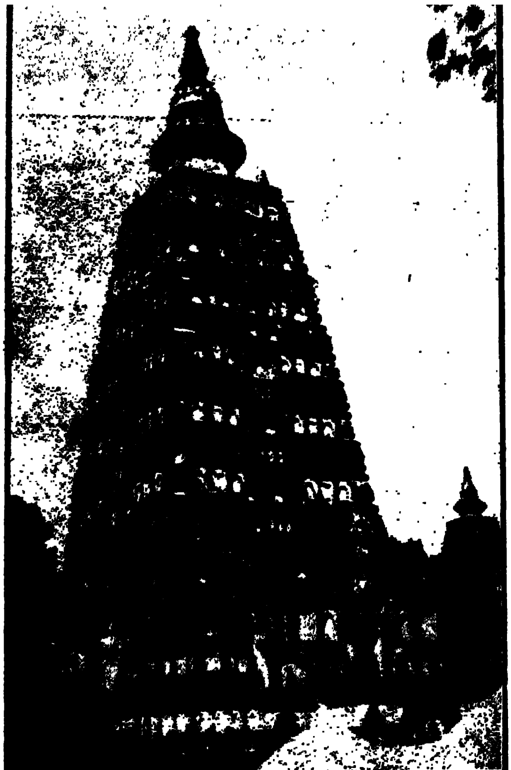


মন্দিরপ্রাঙ্গণ—বুদ্ধগয়া

সন্ধ্যা হোয়ে গেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে অসুবিধা হবে, তাই আমরা যাত্রার উদ্যোগ করলাম। জল ফুরিয়ে গিয়েছিল, খানিকটা জল নিলাম। জোনার জল বেশ মিষ্টি ও ঠাণ্ডা। পাথরের ধাপের ধারে গাছে এক রকম মাকড়শা দেখ্‌লাম, দেহটা কেমন লম্বা মত। রমার মাকড়শায় ভয়ানক ভয়। সে দু পা ওঠে ত একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখে। উপরে বিড়লার স্থাপিত ভগবান বুদ্ধের একটা মন্দির আছে। সেখানে জলের ব্যবস্থা ভারী অদ্ভুত। একটা পরিষ্কার বাঁধান জায়গায় বৃষ্টির যে জল পড়ে, একটা কূয়ার মত জায়গায় ধরে রেখে তাই ব্যবহার করা হয়।

রাত আটটা আন্দাজ হোটেলে পৌছালাম। পরদিন (২৯শে আশ্বিন) পাগলা গারদ দেখে রঁাচী ত্যাগ করব। পাগলা গারদের ব্যবস্থা ভালই, বেশ পরিষ্কার, বড় কম্পাউণ্ড আছে, পাগলদের হাতের অনেক কাজ দেখ্‌লাম। ইউরোপীয় বিভাগ দেখা হোল না, সেখানে যেতে বাঙ্গালীর পক্ষে নাকি বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন। রঁাচী থেকে আমরা কিছু কাঠের খেল্‌না কিনে নিলাম।

রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। পরদিন (৩০শে আশ্বিন) ভোরে স্নান সেরে আমরা মন্দির দেখতে বেরোলাম। পথের সন্ধান নিতে আমরা এক পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে গেলাম, সে গাড়ীর পাদানিতে চড়েই সঙ্গে যাবে। উপস্থিত-বুদ্ধি হিসাবে বিক্রমদা চমৎকার, সে চট্‌ করে বলে দিল, আমরা যে ক্রিশ্চান। আঁৎকে উঠে পাণ্ডা বেচারী সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ল, আবার স্নান করে তাকে হয়ত শুদ্ধ হোতে হবে। মন্দির দর্শন করলাম,



বুদ্ধগয়ার মন্দির



মন্দিরের প্রবেশদ্বার—বুদ্ধগয়া

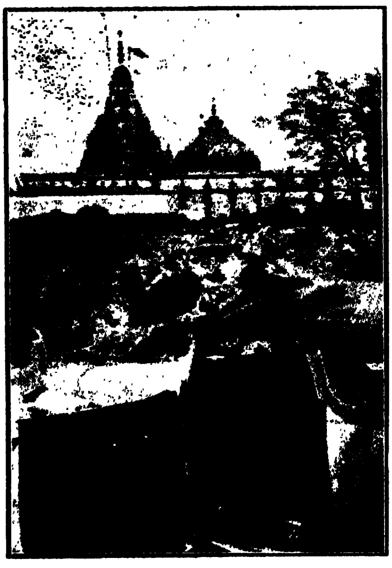
রঁাচী হিল্‌, রঁাচী লেকের ধার দিয়ে আমরা গয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হোলাম। বিকাল সাড়ে চারটা আন্দাজ সেখানে পৌছলাম, কিন্তু একটা থাকবার আস্তানা খুঁজে পেতেই গোল বাধল। সুবিধামত হোটেল বা ধর্ম্মশালা পেলাম না। গয়া সহরটা যেমন নোংরা তেমনি ঘিঞ্জি। সন্ধ্যার দিকে আমরা ডাকবাংলোয় উপস্থিত হোলাম, এ জায়গাটা বেশ পরিষ্কার, আমাদের পছন্দ হোল। সেদিন

খুব ভীড়, হাজার হাজার লোক স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষদের আত্মার কল্যাণ কামনায় পিণ্ডদান করছে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটা ধাতু-নির্ম্মিত ঘড়ি দেখ্‌লাম, সূর্য্যের গতির সঙ্গে তার সময় নিরূপিত হয়। মন্দিরের পাশে ফল্গু নদী, জল খুব কম, মানুষ হেঁটেই পার হোচ্ছে। শুনলাম নাকি সময় সময় জল একেবারে শুকিয়ে যায়। চড়ার উপর তিন জায়গায় শবদাহ হোচ্ছে, কতগুলি শকুনি, শূয়র ঘুরে

বেড়াচ্ছে। চিঁড়া, দই, প্যাঁড়া কিনে আমরা ফিরে এলাম। সেদিন দুপুরে তাই খাওয়া হোল। ডাকবাংলো-সংলগ্ন কম্পাউণ্ড ও বাগানটা ভারী সুন্দর। খাওয়া সেরে আমরা সেখানে খানিক বস্‌লাম। বিকাল পড়তে চা খেয়ে আমরা



হুড্রুর একটা দৃশ্য—রাঁচী



বিষ্ণুপাদ মন্দির,—গয়া

সহর দেখতে বেরোলাম। গয়ায় বেশ কাঁচের চুড়ি পাওয়া যায়। কিছু চুড়ি, পাথর বাটী, বিহারী ছাপা শাড়ী কিনে আমরা ফিরে এলাম। পরদিন (৩১শে আশ্বিন) সকালে জিনিসপত্র গুছিয়ে আমরা বুদ্ধগয়ার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় বাংলোর মালী আমাদের অনেক ফুল দিল।

বুদ্ধগয়া দেখে বেশ তৃপ্তি পেলাম। খুব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। বাঁধান গোটাকতক ধাপ বেয়ে নীচে নামতে হয়। প্রাঙ্গণে মৃত্তিকাগর্ভ হতে উদ্ধৃত পুরাকালের ভাস্করদের বহু কীর্ত্তিকলাপ রয়েছে। মন্দিরে বুদ্ধদেবের ধাতুনির্ম্মিত



ফল্গুনদী—গয়া

বিরাট মূর্ত্তি স্থাপিত। শাক্যসিংহ, মায়াদেবী, গোপাদেবীর মূর্ত্তি দেখ্‌লাম। প্রাচীন শিল্পীদের নিপুণতা দেখ্‌লে সত্যিই মুগ্ধ হোতে হয়—অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রত্যেকটীর মুখেই কি অনির্ব্বচনীয় দিব্যভাব! বোধিবৃক্ষের তলায় প্রস্তরাসন দেখ্‌লাম। জীবের পার্থিব যন্ত্রণায় ব্যথিত



জোনা জলপ্রপাত—রাঁচী

হোয়ে সেই সন্ন্যাসী রাজকুমার সংসারের সব কিছু ভোগ-বিলাসের মায়া কাটিয়ে ব্যথিতচিত্তে কত জনপদে, কত গহন-কাননে ঘুরে অবশেষে এইখানে এসে ঈপ্সিত ফল লাভ করে-ছিলেন। আজও যেন এখানে এক পবিত্র সত্ত্বা বিরাজ করছে। দিব্য জ্ঞান লাভ করে ভগবান তথাগত যখন

গাত্রোত্থান করেছিলেন, তাঁর চরণকমল স্থাপনের জন্য নাকি শতদল ফুটে উঠেছিল, তারই ছাপ পাথরের উপরে দেখ্‌লাম। হিন্দুধর্ম্মের ছায়াতেই যে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি এবং বিস্তার তা এখানে এলে বেশ বোঝা যায়। মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির পাশে শিবলিঙ্গ, প্রাঙ্গণে গদাধরের পাদপদ্ম এর প্রমাণ।



সাঁওতালী নাচ—রাঁচী

সব দেখা হোলে বেরিয়ে পড়লাম। একটা পুকুরের ধারে, গাছের তলায় গাড়ী থামান হোল। সঙ্গে জল-খাবার নেই, গাড়ীর দরজার আড়ালে ষ্টোভ জ্বালিয়ে মা খিচুড়ি চাপিয়ে দিলেন। রান্নার দেরী আছে সুতরাং সতরঞ্চি বিছিয়ে আমরা গ্রামোফোন বাজাতে সুরু করে দিলাম। ওদেশী মজুর শ্রেণীর একদল লোক শব্দে আকৃষ্ট হোয়ে কাছে এসে বসল। একটা বাক্স থেকে শব্দ বার হোচ্ছে—অদম্য কৌতূহলে তারা তাই দেখতে লাগল। পারলে তারা গ্রামোফোনের ভিতরেই ঢুকে পড়ে আর কি। অনেক বোঝাবার পর তারা কিছু দূরে সরে বসল। খাওয়া সেরে আমরা আবার যাত্রা করলাম। বিকাল চারটা আন্দাজ পরেশনাথ পাহাড়ের তলায় এলাম। এখানে অনেক জৈন মন্দির আছে। উপরে ওঠার মত সময় ছিল না, আমরা শুধু মধুবন দেখে নিলাম। দেওয়ালী উপলক্ষে সব চুণকাম হোচ্ছে। মন্দিরগুলি বেশ ভাল লাগল, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বিকাল পড়ে এসেছে, এবার চা খেয়ে নিতে হয়। ল্যাগেজ ক্যারিয়ার (Luggage Carrier) খুলতে গিয়ে দেখি কি সর্ব্বনাশ—ভবতারণ এমন চাবি দিয়েছে যে কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। এদিকে ফ্লাস্ক ভর্ত্তি চা, বিস্কুট, মিষ্টি সব যে তারই ভিতরে বন্ধ। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি, অনেক চেষ্টা করা গেল কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। নিরাশমনে আমরা গাড়ীতে চড়ে বস্‌লাম। সকলে হাই তুল্‌তে সুরু করেছে, অথচ কাছাকাছি কোথাও থেকেই বা চা পাওয়া যায়। সন্ধ্যা হয় হয়। গাড়ীর তেল কমে এসেছে। সামনেই পেট্রোলের দোকান দেখে গাড়ী থামান হোল। দোকানদার আমাদের চা-বিভ্রাটের কথা শুনে, চা তৈরী করে দিতে চাইল, কিন্তু দেবার মত তার বাসনের অভাব। কুঁজায় চাপা দেওয়া একটা কাঁচের গ্লাস ছাড়া, বাইরে আমাদের আর কোন পাত্র নেই। তাইতেই ঢেলে আমরা চা খেয়ে নিলাম। চায়ে কেমন যেন একটা বুনো গন্ধ, হয়ত বা কাঁচা দুধ দিয়ে করেছে। তা হোক্, দোকানীকে অশেষ ধন্যবাদ, তবু ত চা খাওয়া হোল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। দুদিন বাদে কোজাগর পূর্ণিমা। দূরের পাহাড়গুলির মাথায় চাঁদের আলো যেন মায়ালোক সৃষ্টি করেছে। আরো দূরে রাণীগঞ্জ কয়লাখনির আলো দেখা যাচ্ছে। সে রাত্রের মত আমরা



হুড্রু জলপ্রপাত—রাঁচী

আসানসোলের সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হোলাম। পরদিন (১লা কার্ত্তিক) বেলা বারোটা আন্দাজ আবার সেই কল্‌কাতা। কর্ম্মমুখর, জনাকীর্ণ রাজধানীর পথের দিকে চেয়ে সহরের নিয়ম-বাঁধা জীবনের বাইরে, দিনকয়েকের জন্য মুক্তির আস্বাদন পাওয়া মন যেন আমাদের গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন হোয়ে গেল।

মহারাজ গিরিজানাথ রায়

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

এবারে আমরা দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের চিত্র ও জীবনকথা প্রকাশ করিলাম। তাঁহার মত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দানশীল জমীদার অতি অল্প সংখ্যকই দেখা যায়।

দিনাজপুর রাজবংশের ইতিহাস অতি বিচিত্র। গৌড়াধীপ আদিশূরের সময়ে ৫ জন ব্রাহ্মণের সহিত যে ৫ জন কায়স্থ বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই জনের নাম যথাক্রমে সোম ঘোষ ও দেব দত্ত। দেব দত্তের বংশ-সম্ভূত বিষ্ণু দত্ত বাঙ্গালার সুবাদার কর্ত্তৃক কানুনগো নিযুক্ত হইয়া দিনাজপুরে যাইয়া বাস করেন ও তথায় ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত 'চৌধুরী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্তের কন্তা গৌরীকে সোম ঘোষের বংশধর হরিরাম ঘোষ বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্বশুরের আগ্রহে হরিরাম দিনাজপুরে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীমন্তের পুত্র হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভাগিনেয়—হরিরামের পুত্র শুকদেব সমস্ত সম্পত্তির মালিক হন। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩টি পরগণা শুকদেবের শাসনাধীন ছিল। ঐ সময়ে দিনাজপুর অঞ্চলের কয়েকটি পরগণায় বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় দিল্লীশ্বর সেগুলিও শুক-দেবের শাসনাধীন করিয়া দেন এবং রাজ্যশাসন বিষয়ে শুক-দেবের নৈপুণ্য দর্শনে তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন।

বৃত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বসতি প্রদান, চতুষ্পাঠী ও অন্নসত্র স্থাপন, জলাশয় খনন প্রভৃতি কার্য্যে শুকদেবের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল। শুকদেবের পুত্র প্রাণনাথ ঘোড়াঘাটে বিদ্রোহ দমন করিয়া ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে গমন করিলে বাদশাহ ঔরঙ্গজের তাঁহাকে 'মহারাজা বাহাদুর' ও 'বাদশাহের উকীল' উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রাণনাথ বহু দেবালয় নির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন এবং দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর ও মহলান ভূমি দান করিয়াছিলেন।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাণনাথের মৃত্যু হয়—সে সময়ে ১১২টি পরগণা তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তৎপরে তাঁহার দত্তকপুত্র রামনাথ, তাহার পর রামনাথের পুত্র বৈদ্যনাথ ও তাহার পর বৈদ্যনাথের পত্নী কর্ত্তৃক গৃহীত দত্তকপুত্র রাধানাথ দিনাজ-পুরের সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাধানাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরী গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দনাথ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হন। গোবিন্দনাথের পুত্র তারকনাথ ২৪ বৎসর রাজ্যভোগের পর অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তৎপত্নী শ্যামমোহিনী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গিরিজানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই গিরিজানাথই আমাদের বর্ত্তমান মাসের আলোচ্য ব্যক্তি।

তারকনাথের রাজত্বকালে সিপাহী যুদ্ধ, ভুটান যুদ্ধ ও সাওতাল-হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। সকল সময়েই মহারাজ তারকনাথ বৃটীশ গভর্ণমেন্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেজন্য লর্ড লরেন্স দিনাজপুর রাজবংশকে বংশগত 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধি দানের ব্যবস্থার জন্য রাজ্যের পুরাতন কাগজপত্রগুলি কলিকাতায় প্রেরণ করেন; তখন নৌকাযোগে তাহা লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ঝড়ে নৌকাডুবি হওয়ায় সকল কাগজ-পত্রই নষ্ট হইয়া যায়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই (১৭৮৪ শকাব্দ ১২ই শ্রাবণ) রবিবার ই-বি-রেলের চিরির বন্দর ষ্টেশনের নিকটস্থ দামুর গ্রামে মহারাজা গিরিজানাথের জন্ম হয়। মহারাণী শ্যামমোহিনীও কর্ম্মকুশলা ছিলেন। তিনি দিনাজপুর সহরের ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ৬ মাইল দীর্ঘ কাচাই খাল খনন করাইয়াছিলেন। সহরে তাঁহার নামে একটি বড় রাস্তা আছে; তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্যেও মহারাণী প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন। দিনাজপুর ও রায়গঞ্জের দাতব্য চিকিৎসা-লয় তাঁহার দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় রাজ্যের নানাস্থানে তিনি অন্নসত্র খুলিয়া-ছিলেন। সেজন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাণী উপাধি ও ৫০ জন সশস্ত্র অনুচর রাখিবার অনুমতি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

মহারাণী শ্যামমোহিনী গিরিজানাথকে সুশিক্ষিত করিবারও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজধানীতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট মহারাজা বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। গিরিজানাথ ১৮৭১ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীধামে কুইন্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। তাহার পর রাজধানীতে বাস করিয়াই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, যশোদানন্দন প্রামাণিক এম-এ, বি-এল ও পণ্ডিত বৃন্দাবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার শিক্ষক ছিলেন।

মহারাজের সুশিক্ষালাভের সুফলও ফলিয়াছিল। তিনি ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে ও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। সংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়া তিনি রাজনীতি ও সমাজনীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা নিজ কার্য্যে প্রযুক্ত করিতেন। মহারাজ গোপনে দান করিতে ভালবাসিতেন।

গিরিজানাথ একজন সুশিক্ষিত কুস্তীগির ও অশ্বারোহী ছিলেন। অশ্ব পরিচালনায় নৈপুণ্য ও বন্দুক পরিচালনায় দক্ষতার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে তাঁহার মত সঙ্গীত-বোদ্ধা বাঙ্গালা দেশে অতি অল্পই ছিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গিরিজানাথ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। উপযুক্ত মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন; প্রাচীন রীতিনীতি ও কার্য্য-প্রণালী বজায় রাখা তাঁহার কার্য্যপদ্ধতির মূলসূত্র ছিল। ধর্ম্মনীতির সম্পর্কশূন্য রাজনীতি তাঁহার নিকট আদৃত হইত না।

গণিত-জ্যোতিষ, ফলিত-জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক জ্যোতিষ—এই তিন শাস্ত্রের প্রতিই মহারাজের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। জীবনের শেষ ভাগে ১৫।১৬ বৎসর তিনি সুপণ্ডিতগণের সাহায্যে ঐ সকল শাস্ত্র আলোচনায় সময়াতিপাত করিতেন।

মহারাজ গিরিজানাথ একজন প্রেমিক বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁহার নিত্যপাঠ্য ছিল। তিনি বিশুদ্ধভাবে সকল বৈষ্ণবাচার পালন করিতেন।

জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ ছিল। গিরিজানাথ বহুকাল জেলা বোর্ডের সদস্য ও দিনাজপুর সদর বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ৯ বৎসর তিনি দিনাজপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। যতদিন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা ছিল, ততদিনই তিনি তাহার সদস্য ছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফণ্ডে ২৫ হাজার টাকা, কিং এডয়ার্ড ফণ্ডে ১০ হাজার টাকা প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন।

গিরিজানাথের স্বজাতিপ্রীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কিছুকাল তিনি কায়স্থ সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৩০৮ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার সম্পাদক ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত কায়স্থ সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্মিলনের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

দিনাজপুরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গিরিজানাথ বহু ব্যয়ে 'টমসন খাল' ও 'ঘাগরাখাল' খনন করাইয়াছিলেন। দিনাজপুরে তিনি জুবিলী স্কুল, বয়ন বিদ্যালয়, সংস্কৃত টোল, গিরিজানাথ হাই স্কুল, হিন্দু মুসলমান ছাত্রনিবাস প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মহারাণী শ্যামমোহিনীর কাশীপ্রাপ্তি হইলে গিরিজানাথ আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'মহারাজা', ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে 'মহারাজা বাহাদুর' ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে 'কে-সি-আই-ই' উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

১৩২৬ সালের ৫ই পৌষ মহারাজ গিরিজানাথ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। পুত্র না হওয়ায় তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জগদীশনাথকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ জগদীশনাথ এখন দিনাজপুরের রাজগদীতে আসীন আছেন।

আলো আঁধারে — আঁধারে আলো

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

নিত্য তোমারে ডাকিব বলিয়া
নিত্য ভুলিয়া যাই,
সত্য ত্যজিয়া কেবল মিথ্যা
চিত্ত চাহে সদাই।

বুঝেও বুঝিনা কিবা অনিত্য,
তারি পাছে তবু ধাই,—
অর্থের তরে ঘটে অনর্থ
তোমারে খুঁজে না পাই।

পরিজন আর আপনার তরে
কতটুকু প্রয়োজন?
অনেক চাহিয়া এনেছি ডাকিয়া
লাঞ্ছনা অগণন।

কল্পনা করে অভাব সৃজন
জল্পনা করে মন—
"অল্প কি হেতু আমার কপালে,
বেশী পায় দশজন?"

অন্যের সাথে তুলনায় নিজ
স্থান করি নির্ণয়—
"ধনসম্পদে গণ্যমান্য,
নহে কিবা পরিচয়?"

এই অভিমান-বৈরীপ্রধান
চালাইছে মনোরথ,
তোমা হ'তে আজি কতখানি দূরে
এনেছে ভুলায়ে পথ!

ছুটি দিশাহারা পাগলের পারা
তব আলো রাখি পাছে,
নিজ ছায়া তাই বড় হ'য়ে চলে
সম্মুখে কাছে কাছে।

আপন সৃষ্ট "আলো আঁধারে"তে
হারায়েছি পথচিহ্ন,
বিপথে আসিয়া উপলখণ্ডে
চরণ ছিন্নভিন্ন।

অন্তরে থাকি কতবার তুমি
ডাকিয়া বলেছ মোরে—
"মৃগতৃষ্ণিকা পাছে কত আর
চলিবি এমন ক'রে?

"দাঁড়াও, পান্থ! মোরে অবহেলি
যেওনাকো দূরে চলি,
বন্ধু তোমার ডাকিতেছি, শুন
হিতকথা দু'টো বলি।

"আমি যে দাঁড়ায়ে হাতে লয়ে আলো
ঘুচাতে তোমার ভ্রম,
মুগ্ধ পথিক! কোথা যাও, মোরে
করিয়া অতিক্রম?

"আলোর পিছনে এসো মোর সনে
সুপথ লক্ষ্য করি,
শতকণ্টকে বাধা না ঘটাবে,
বিঘ্ন যাইবে সরি।

"গান গেয়ে আমি দানিব অভয়
নাশিব চলার শ্রম,
তোমার দু'ধারে ফুটাব কুসুম
সুবাসিত মনোরম।

"নির্ভয়ে চলো, সম্মুখে আলো
উজ্জ্বল নির্ম্মল,
পিছে প'ড়ে রবে পুঞ্জ আঁধার
পলাইবে রিপুদল।"

শ্রবণে যখন প'শেছিল ওই
বরাভয়মাখা বাণী,
নির্দ্দেশ তব নত করি শির
লয়েছিনু সব মানি।

তবু ভুলে যাই, এ কি রে বালাই!
সুমুখে রাখিতে আলো,
পথ চলা ভার করে বারবার
"আমার" যে ছায়া কালো।

আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া

অতুল দত্ত

চীন-জাপান সংঘর্ষ

তিন মাসের উপর হইল চীন-জাপান যুদ্ধ প্রবলভাবে চলিতেছে। উত্তর চীন এবং সাংহাই প্রধান রণক্ষেত্র। কখনও কখনও চীনা সৈন্যের প্রবল বিক্রমে জাপ-বাহিনী বিধ্বস্ত হইলেও মোটের উপর জাপ-সৈন্য তাহাদের আধুনিক রণসম্ভারের সাহায্যে ক্রমেই নূতন নূতন স্থান অধিকার করিতেছে। পিকিং-হাঙ্কাও রেলপথ ধরিয়া জাপ-বাহিনী সিংসিয়াং পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, পশ্চিমে সান্‌সী প্রদেশের রাজধানী টাইয়ানকু তাহাদের করতলগত হইয়াছে। সাংহাইতে জাপ সৈন্য ট্যাজাং, চেপী এবং নানটাও অধিকার করিয়াছে; চীনের "ভেনিস্" বলিয়া বর্ণিত সুচাউ নগরকে তাহারা শ্মশান করিয়াছে। বস্তুতঃ সাংহাইএর চীনা অঞ্চল এক্ষণে জাপ-সৈন্যের করতলগত।

যুদ্ধের গতি

চীন যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, জাপান প্রথমে আশা করিয়াছিল, অতি অল্প কালের মধ্যে চীনের রণ-কণ্ডূয়ন মিটাইয়া সে নিজ অভিসন্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। এই আশাতেই সে একটী সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ আরম্ভ করে। প্রথমেই জাপান সাংহাই হইতে সোয়াটো পর্য্যন্ত এক সহস্র মাইল উপকূল অবরোধ ঘোষণা করিয়া চীনের বহির্বাণিজ্য নষ্ট করে এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করে। অতঃপর সে উত্তরাঞ্চলে ক্যান্টন্-হাঙ্কাও এবং তিয়ান্‌সীন্ নান্‌কিং রেলপথ লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে। দক্ষিণে ক্যান্টন্ নগরে অমানুষিকভাবে বোমা বর্ষণ করিয়া প্রধানতঃ রেল ষ্টেশনটী ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। বহির্বাণিজ্য নষ্ট করিবার সঙ্গে সঙ্গে চীনের অন্তর্বাণিজ্য নষ্ট করা তাহার লক্ষ্য হয়। নান্‌কিং সহরের সরকারী গৃহগুলিতে বোমা বর্ষণ করিয়া জাপ-সৈন্য চীনের শাসনকেন্দ্র বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে। এতদ্ব্যতীত, বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদে নৃশংসভাবে বোমা বর্ষণ করিয়া তাহারা চীনবাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে চাহে। জাপান আশা করিয়াছিল যে, বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য নষ্ট হইলে এবং শাসনকেন্দ্র বিধ্বস্ত হইলে চীনা সৈন্য সত্বর আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, জাপানের এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়া অসম্ভব। আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত জাপ-সৈন্যের প্রবল আক্রমণের সম্মুখে চীনা-সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেও বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জাপানের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা প্রয়োজন হইয়াছে।

জাপানের নিষ্ঠুরতা

জাপান নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত চীনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ নগরগুলিতে বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিয়া চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছে। ইহার মধ্যে ক্যান্টন, হাঙ্কাও এবং নান্‌কিংএর বোমা-বর্ষণই ভয়াবহ। এই সকল বিমান আক্রমণে বিশেষ সাবধানতার সহিত বে-সামরিক অঞ্চলের উপর বোমা বর্ষিত হইয়াছে। বহু স্থানে সৈন্যাবাসের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে একটীও বোমা পতিত হয় নাই। ক্যান্টনের বোমা বর্ষণের পর যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তৎ সম্পর্কে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন—

"...whole streets of poorer dwellings literally torn asunder with corpses 'as thick as flies on flypaper'. There was utter confusion, hundreds of weeping women scrambling in the ruins hunting for the remains of their relatives. Many minds have been deranged by the horror." কিন্তু এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য এই "no military objectives suffered." হাঙ্কাওর বোমা বর্ষণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন—"Mutilated bodies were strewn everywhere or piled in heaps by rescuers, while more ghastly still was an occasional arm or leg waving feebly from beneath masonry... Particularly pathetic were stretchers bearing infants who were bleeding from gaping wounds and completely naked. The proportion of children killed seemed to be inordinately large. এই পাশবিকতা সংসাধিত হইয়াছে কোথায়?—"Most of the slaughter occurred in the slum section of the city, where there are no military establishments."

নিরীহ নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ, রুগ্ন-পঙ্গুকে এইরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করায় কোন সামরিক উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। জাপান এই পাশবিক কার্য্যের দ্বারা চীনবাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহার ফল হইয়াছে বিপরীত। জাপ-সৈন্যের এই অমানুষিকতায় সমগ্র চীন জাপ বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়াছে, চীনের বিবদমান দলগুলির ঐক্যের পথে যে সামান্য বিঘ্ন ছিল তাহা এক্ষণে দূরীভূত হইয়াছে। চিয়াং-কাই-সেকের ভূতপূর্ব্ব শত্রু শানটুঙ্গের গভর্ণর হান্‌ফুচু এবং কোয়াংসীর গভর্ণর লীৎ-সুং নান্‌কিং গভর্ণমেন্টের পক্ষে যোগদান করিয়াছেন। এক্ষণে কোয়াংসীর দুই লক্ষ সৈন্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। চীনবাসীর এই একতা লক্ষ্য করিয়া লণ্ডনের "টাইমস্" পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন—

"The policy of Japanese military authorities has done more to weld China in the last three months than Russian propaganda has done in 15 years."

জাপানের অত্যাচারে চীনের বাহিরে বৈদেশিক জাতিগুলির মনও ঘৃণায় পূর্ণ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশে জাপানী পণ্য বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন্-সঙ্ঘে সর্ব্বসম্মতিক্রমে জাপানী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে জাপান-বিরোধী মনোভাব এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জাপান গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আমেরিকায় ও ইউরোপে প্রচার কার্য্য চালাইবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছে।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ও ব্রুসেল্‌স সম্মিলন

কিছু দিন পূর্ব্বে জাপানের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে চীন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিকট প্রতিবাদ জানান হইয়াছিল। রাষ্ট্র-সঙ্ঘ অভিমত প্রকাশ করেন যে, জাপান ১৯২২ খৃষ্টাব্দের নয়-শক্তির সন্ধির (Nine-Power Treaty) সর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া চীনকে আক্রমণ করিয়াছে। নয় শক্তির সন্ধির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জাপান চীনের sovereignty, independence, ও territorial integrity রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। রাষ্ট্র সঙ্ঘের সুপারিশ অনুযায়ী বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ নগরে মঃ স্প্যাকের সভাপতিত্বে নয়-শক্তির সন্ধির স্বাক্ষরকারী এবং সুদূর প্রাচীতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গের এক সম্মিলনী আহূত হইয়াছে। একাধিকবার আমন্ত্রিত হইয়াও জাপান এই সম্মিলনীতে যোগদান করে নাই। সে অভিমান করিয়া জানাইয়াছে যে, পূর্ব্বাহ্ণেই যখন তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তখন তাহার পক্ষে এই সম্মিলনীতে যোগ দেওয়া নিরর্থক। জাপান আরও জানাইয়াছে যে, সুদূর প্রাচীর এই বিরোধ লইয়া তৃতীয় পক্ষের 'মাথা ঘামাইয়া' লাভ নাই—একমাত্র বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সরাসরি আলোচনার দ্বারা এই বিরোধের মীমাংসা সম্ভবপর। অর্থাৎ চীন যদি নির্ব্বিরোধে তাহার প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিবেশীর পদানত হইতে সম্মত হয়, একমাত্র তাহা হইলেই সুদূর প্রাচীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বৈদেশিক শক্তিবর্গের মনোভাব

চীন-জাপান সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইবার অল্পকাল পরে (আগষ্ট মাসের শেষভাগে) সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত চীনের এক অনাক্রমণাত্মক চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তির সর্ত্তাবলী প্রকাশিত হইবার পর এই মর্ম্মে জনরব শ্রুত হইয়াছিল যে, সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত চীনের এক গোপন সামরিক চুক্তিও হইয়াছে। এই জনরবের কোন ভিত্তি আছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জাপানের প্রবল শত্রু রুশিয়া এই যুদ্ধে চীনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহা সত্য। কিন্তু চীনের সহায়তায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার মত মনোভাব তাহার আছে বলিয়া মনে হয় না ; প্রয়োজন হইলে সে চীন গভর্ণমেণ্টকে সমরোপকরণ প্রেরণ করিয়া সাহায্য করিতে পারে। বৃটেন্ এই যুদ্ধে বরাবরই জাপানের 'মন রাখিয়া' চলিতে চেষ্টা করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে চীনস্থিত বৃটীশ দূত জাপ বিমান হইতে গোলা বর্ষণে গুরুতর-রূপে আহত হইয়াছিলেন, সাংহাইতে বৃটীশ স্বার্থের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু এই সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে মামুলী প্রতিবাদ জ্ঞাপন ব্যতীত বৃটেন আর কিছুই করে নাই এবং জাপানের মামুলী দুঃখ প্রকাশেই সে সন্তুষ্ট হইয়াছে। বৃটেন্ তাহার প্রশান্ত মহাসাগরগামী জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিয়াছে যে, জাপ রণপোত কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে তাঁহারা যেন নিজ নিজ কাগজপত্র প্রদর্শন করেন। সর্ব্বশেষে, রাষ্ট্র সঙ্ঘে যখন চীন-জাপান সমস্যা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন বৃটেন্ কোন প্রকার উৎসাহ দেখান দূরে থাকুক—বৃটীশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন্ বিষয়টী 'ধামা-চাপা' দিবার উদ্দেশ্যে 'নাকী সুরে' বলিয়াছিলেন—"efforts of third parties to check the hostilities in the Far East had not been availed of." আজ জাপান এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিতেছে। এই সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পর হইতে আমেরিকা চরম দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছে। সংঘর্ষ আরম্ভ হইবামাত্র প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চীনের সমস্ত মার্কিনীকে ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। প্রবাসী মার্কিনীদিগের তীব্র প্রতিবাদে আমেরিকান্ গভর্ণমেণ্ট পরে এই আদেশ নাকচ করেন। ইহার কিছু দিন পরেই আমেরিকা হইতে যুধ্যমান শক্তিদ্বয়কে অস্ত্র শস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিষেধাজ্ঞা যে প্রকারান্তরে চীনের বিরুদ্ধেই আরোপিত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট ; কারণ বৈদেশিক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন তাহারই অধিক। চীন-জাপান সংঘর্ষ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য রাষ্ট্র-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য্য করিবার অক্ষমতা আমেরিকা পূর্ব্বাহ্ণেই জানাইয়াছিল। জাপানের নৃশংসতায় আমেরিকাবাসীর মন ঘৃণায় পূর্ণ হইয়াছে এবং তথায় জাপানী পণ্য বর্জ্জনের আন্দোলন দেখা দিয়াছে। কাজেই, জনমতের চাপে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জাপানের আক্রমণাত্মক কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহার পরেই ব্রুসেল্‌স্ সম্মিলনীতে মার্কিন্ প্রতিনিধি মিঃ নর্ম্মান্ ডেভিস্ যেরূপ সতর্কতার সহিত "সকল দিক বাঁচাইয়া" বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, জাপানের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যে আমেরিকা কখনই সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইবে না।

চীন-জাপান সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই "কমিণ্টার্ণ" নামক আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিজম্ আন্দোলনের বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে জাপানের সহিত জার্ম্মাণীর এক চুক্তি হইয়াছিল। সম্প্রতি ইটালীও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। ইটালী কর্ত্তৃক এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বে সীনর মুসোলিনী ও হের হিট্‌লার উভয়েই চীন-জাপান সংঘর্ষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছিলেন। মুসোলিনি বলিয়াছিলেন,

চীনের বর্ত্তমান সংগ্রাম যদি কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে পরিচালিত "ধর্ম্মযুদ্ধে" পরিণত হয়, তাহা হইলে ইটালী জাপানকে সামরিক সাহায্য দান করিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। হের হিট্‌লার দৃঢ়তা সহকারে বলিয়াছেন, চীনে জার্ম্মাণীর যে স্বার্থ আছে, প্রয়োজন হইলে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াও তিনি জাপানকে সাহায্য করিবেন। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা প্রয়োজন—জাপান একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছে যে, কম্যুনিষ্টদিগের প্ররোচনায় চীনে জাপ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই জন্যই সে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইয়াছে।

বৈদেশিক শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য

সুদূর প্রাচীত বৃটেন্ ও আমেরিকাকে আমরা চিরদিন জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া জানিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে এই দুইটী শক্তির ঔদাসীন্য কৌতুহলোদ্দীপক। আমেরিকার মনোভাব পরিবর্ত্তনের কারণ সন্ধান করিতে অধিক দূর যাইতে হইবে না ; গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপানের সহিত আমেরিকার ব্যবসা-সম্বন্ধ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে —American dollars...are more numerous in the Mikado's Land than in struggling Nationalist China for whom Washington professes an occasional solicitude. এই জন্যই আমেরিকার এই নির্লজ্জতা, এই দুর্ব্বলতা। সুদূর প্রাচীর এই সংঘর্ষ সম্পর্কে বৃটেনের ঔদাসীন্য সত্যই দুর্ব্বোধ্য। কেহ কেহ বলেন, চীনকে আপোষে ভাগ করিয়া লইবার জন্য বৃটেন্ ও জাপানের মধ্যে এক গোপন চুক্তি আছে। এই চুক্তি অনুসারে চীনের উত্তরাংশ জাপান এবং দক্ষিণাংশ বৃটেন্ প্রাপ্ত হইবে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, ধনিক প্রভাবান্বিত রক্ষণশীল বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট "কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে" চাহিতেছেন। বৃটীশ ধনিকগণ জাপান এবং সোভিয়েট রুশিয়া উভয়েরই বলক্ষয় করিতে চাহেন। তাঁহারা জানেন, চীনে জাপানের শক্তি বৃদ্ধি হইলে রুষ-জাপান সংঘর্ষ নিশ্চিত। কাজেই, চীনে জাপানের শক্তি বৃদ্ধিতে তাঁহারা আনন্দিতই হইতেছেন। ঠিক এই কারণেই ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও তাঁহারা উদাসীন। যাহা হউক বৃটেনের প্রকৃত উদ্দেশ্য "দেবাঃ ন জানন্তি"।

বর্ত্তমান চীন-জাপান সংঘর্ষ সম্পর্কে জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান কর্ত্তৃক কম্যুনিজম দমনের প্রসঙ্গ উত্থাপনের মূলে গূঢ় উদ্দেশ্য রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে চীন-জাপান সংঘর্ষ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আরব্ধ জাতীয় সংগ্রাম ; কম্যুনিজমের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। চিয়াং-কাই-সেকের কম্যুনিজম-ভীতির সুযোগে এত দিন জাপান নির্ব্বিরোধে চীনে অধিকার বিস্তার করিতেছিল, এক্ষণে তাহার সে চাতুরী ধরা পড়িয়াছে—তাহার বিরুদ্ধে চীনের সর্ব্ব মতাবলম্বী সম্প্রদায়ই এক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই ঐক্যবদ্ধ চীন কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিতও নহে। তবে,এই যুদ্ধে জাপান জয়ী হইলে রুশিয়ার পক্ষে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কাজেই, শেষ মুহূর্ত্তে রুশিয়া চীনের পক্ষাবলম্বন করিলেও করিতে পারে। ঠিক এই জন্যই জাপান কম্যুনিজম-দমনের রব তুলিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই তাহাকে প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। জার্ম্মানী ও ইটালী মতবাদের দিক হইতে যেমন রুশিয়ার বিরোধিতা করিতে চাহে, তেমনি তাহাদের উভয়েরই উপনিবেশের ক্ষুধা অত্যন্ত প্রবল। মুসোলিনি তাঁহার নব-সাম্রাজ্য সম্পর্কে যতই বহ্বাস্ফোট করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে আবিসিনিয়ায় ইটালী "ডিক্রী" পাইয়াছে বটে, কিন্তু "দখল" পায় নাই। জার্ম্মানী ত উপনিবেশের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে। বর্ত্তমান সংঘর্ষে জাপান জয়ী হইলে এই দুইটী দেশ তাহাদের উপনিবেশের ক্ষুধা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পায়।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয়, বর্ত্তমান সংঘর্ষে আধুনিক যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত সুশিক্ষিত জাপ-সৈন্যের নিকট চীনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু উভয় দেশের অবস্থা এবং চীনা সৈন্যের প্রতিরোধ-শক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে জাপানের জয়লাভের সম্ভাবনায় সন্দেহ উপস্থিত হইবে। চীনা সৈন্য যেরূপ দৃঢ়তার সহিত জাপ-সৈন্যকে প্রতিরোধ করিতেছে—প্রত্যেক ইঞ্চি পরিমাণ ভূমির জন্য জাপ-সৈন্যকে যে পরিমাণ সময় এবং শক্তি নষ্ট করিতে হইতেছে, তাহাতে নিশ্চিত মনে হয়, এই যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না। এরূপ ভীষণ প্রতিরোধ প্রাপ্তির সম্ভাবনা জাপান পূর্ব্বে বুঝে নাই। এক্ষণে জাপানের প্রত্যেক রাজনীতিজ্ঞ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সত্বর এই যুদ্ধের অবসান হওয়া অসম্ভব। বহু দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিলে চীনের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ নাই ; তাহার অগণিত অধিবাসী অনাহার অর্দ্ধাহারে অভ্যস্ত। দুই এক বৎসরের যুদ্ধে চিরদুঃখী চীনবাসীর আর নূতন দুঃখ কি হইবে ? পক্ষান্তরে জাপানের দেশ ক্ষুদ্র, চীনের তুলনায় তাহার জনসংখ্যা নগণ্য, বৃটেন প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী জাতির ন্যায় তাহার বিশাল উপনিবেশ নাই। কাজেই, বহুদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে হইলে ক্ষুদ্র দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সামরিক প্রয়োজনে নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক হইবে। ইহাতে জাপানবাসীর আর্থনীতিক দুর্দ্দশা চরমে পৌছিবে। কাজেই, বহুদিন ধরিয়া যদি সংঘর্ষ চলে, তাহা হইলে জাপান বিপন্ন হইয়া পড়িবে। শেষ পর্য্যন্ত যদি সে জয়লাভও করে, তাহা হইলেও তাহার শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস হইবে, দেশময় অন্নাভাব দেখা দিবে, দেশবাসীর দুর্গতি চরম সীমায় পৌছিবে।

স্পেনের অন্তর্ব্বিপ্লব ও ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট প্রাধান্য

গত দুই মাসের মধ্যে স্পেনের অন্তর্ব্বিপ্লবে দুইটী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছে—স্পেনের উত্তরাঞ্চলে স্যাণ্টাডার বিদ্রোহিগণ অধিকার করিয়াছে এবং এষ্টুরিয়াস্ প্রদেশের গিজো নগর তাহাদের করতলগত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ভ্যালেন্‌সিয়া হইতে সরকারপক্ষের রাজধানী বার্সিলোনায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। উভয় পক্ষের বিমান হইতে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বোমা বর্ষণ চলিতেছে। বিপ্লবের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে

হয়, সরকারপক্ষের প্রতিরোধ-শক্তি ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে—ক্রমে ক্রমে সমগ্র স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তখন একরূপ নিশ্চিত।

নিরপেক্ষতা-সমিতিতে এখনও প্রহসন চলিতেছে। বিদ্রোহীদিগকে যুধ্যমান শক্তির অধিকার দান এবং বৈদেশিক স্বেচ্ছাসৈন্য অপসারণ সম্পর্কে নিরপেক্ষতা-সমিতিতে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সম্প্রতি দূরীভূত হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে কিছু কিছু বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব ফ্রাঙ্কোর নিকট এবং স্পেন গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যুধ্যমান শক্তির অধিকার দান সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়া আপত্তি তুলিয়াছে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট-প্রতিনিধির সহিত পৃথকভাবে আলোচনা হইবে। নিরপেক্ষতা-প্রহসন সম্পর্কে একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বিদ্রোহী পক্ষকে ইটালীর সাহায্য প্রদান এক্ষণে আর গোপন নাই। স্পেনে ইটালীয় সৈন্যের বীরত্ব কাহিনী মুসোলিনী দম্ভভরে বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্পেনে ইটালীয় সৈন্য হতাহতের তালিকা উজ্জ্বল অক্ষরে ইটালীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে।

ভূমধ্য-সাগরে উপদ্রব ও নিয়ন্ সম্মিলনী

স্পেনে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইবার পর হইতে ভূমধ্য-সাগরে বৈদেশিক জাহাজের উপর কখনও কখনও অতর্কিতে গোলা ও বোমা বর্ষণ এবং তজ্জন্য বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল। অকস্মাৎ গত আগষ্ট মাসের শেষভাগে ভূমধ্য-সাগরে কয়েকখানি অজ্ঞাতপরিচয় সাব-মেরিণের আবির্ভাব হয়। এই সাব-মেরিণগুলি জিব্রল্টরের নিকট হইতে দার্দ্দানেলিজ পর্য্যন্ত ধ্বংসাত্মক কার্য্য চালাইতে থাকে। স্পেনের সরকার পক্ষের পাঁচখানি এবং সোভিয়েট রুশিয়ার দুইখানি জাহাজ সাব্-মেরিণের আক্রমণে জলমগ্ন হয়। কয়েকখানি বৃটীশ জাহাজ আক্রান্ত হইয়াছিল কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এই সাব্-মেরিণগুলি কাহার তাহা জানা যায় নাই। সোভিয়েট রুশিয়া এবং স্পেনের সরকার-পক্ষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে যে সাব্মেরিণগুলি ইটালীর, বৃটেন্ ও ফ্রান্স কাহারও নাম উল্লেখ করে নাই। সাব্মেরিণ যাহারই হউক না কেন, উহারা যে স্পেনের বিদ্রোহী পক্ষের অনুকূলে ধ্বংসাত্মক কার্য্য চালাইয়াছে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। একই সময়ে সমগ্র ভূমধ্য-সাগরে উপদ্রব সৃষ্টি করিবার মত সাব্-মেরিণ বিদ্রোহী পক্ষের ছিল না। ইটালী স্পেনের বিদ্রোহী পক্ষকে যেরূপভাবে সাহায্য দান করিয়াছে এবং বিদ্রোহীদিগের এক একটী বিজয়ে যেরূপভাবে উল্লসিত হইয়াছে, তাহাতে ইটালীয় সাব্-মেরিণের দ্বারা এই কার্য্য সংঘটিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

অকস্মাৎ সাব্-মেরিণের এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় বৃটেন্ এবং ফ্রান্স উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্য সাগরে রণপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। অতঃপর এই উপদ্রবের প্রতিবিধান করিবার উদ্দেশ্যে জেনেভার নিকটবর্ত্তী নিয়নে ভূমধ্যসাগরতীরস্থ শক্তিবর্গের এক সম্মিলনী আহূত হয়। স্পেনকে ইচ্ছা করিয়াই এই সম্মিলনীতে আমন্ত্রণ করা হয় নাই। রুশিয়ার দুইখানি জাহাজ জলমগ্ন হইবার জন্য সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্ট ইটালীকে দায়ী করিয়া উপর্য্যুপরি দুইখানি প্রতিবাদ-লিপি প্রেরণ করেন। ইহাতে ইটালী উত্তেজিত হইয়া সোভিয়েটের সহিত এক সঙ্গে নিয়ন্ সম্মিলনীতে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। অবশিষ্ট শক্তিবর্গের প্রতিনিধি এই সম্মিলনীতে স্থির করেন যে, ভূমধ্য সাগরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক রণপোত বৃদ্ধি করিয়া উক্ত সাগরের বিভিন্ন অংশে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইবে। অজ্ঞাতপরিচয় সাব্-মেরিণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহা জলমগ্ন করিবার অধিকার প্রত্যেক রণপোতের থাকিবে। কোন সাব্মেরিণ যদি নিজ দেশের পরিচয় প্রদান করিয়া কোন রণপোতকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে ঐ কার্য্যকে আক্রান্ত শক্তির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা বলিয়া গণ্য করা হইবে। স্পেন গভর্ণমেণ্টকে এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ভূমধ্য সাগরের একটী অংশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য ইটালীকেও আহ্বান করা হইয়াছিল; কিন্তু ইটালী এই অজুহাতে উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত হয় যে, ভূমধ্য সাগরে তাহার অধিকার ফ্রান্স ও বৃটেনের সমান বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। ইটালীর অভিমান দূর করিবার জন্য তখন বৃটেন্ ও ফ্রান্সের পক্ষ হইতে তাহাকে পুনরায় একটী বৈঠকে আহ্বান করা হয়। প্যারী নগরীতে ত্রিশক্তির নৌ-বিশেষজ্ঞগণ একত্র হইয়া ভূমধ্য সাগর সমস্যার সমাধান করেন।

বৃটেনের দুর্ব্বলতা

স্পেনে ক্রমে ক্রমে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা এক্ষণে সুস্পষ্ট। সম আদর্শবোধ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সর্ব্বোপরি আর্থনৈতিক স্বার্থবোধ এই তিনটী বস্তু একত্র হইয়া ইটালী ও জার্ম্মানীকে স্পেনের ফ্যাসিষ্টদিগকে প্রথম হইতেই সাহায্য দানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। বৃটেন্ ও ফ্রান্স এই অন্তর্বিপ্লবে নিরপেক্ষতার ভাণ করিলেও তাহারা জার্ম্মানী ও ইটালীর মন যোগাইয়া চলিয়াছে। কাজেই, বস্তুতঃ তাহারা ফ্যাসিষ্টদিগকেই সহায়তা করিয়াছে। এক্ষণে বৃটীশ কূটনীতিজ্ঞ বুঝিয়াছেন, ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি আর প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নহে—অবশ্য প্রতিরোধ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা তাহারা কখনও করেন নাই। স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইউরোপের প্রধান ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের সহিত জাপানের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে, সম্প্রতি মুসোলিনীর জার্ম্মানী পরিভ্রমণের ফলে ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের মিলন অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই, বৃটেন এক্ষণে এই দুইটী শক্তির তোষামোদ করিয়া তাহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে চাহিতেছে। সম্প্রতি বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন্ "Rome-Berlin Axis"এ সংশ্লিষ্ট শক্তিদ্বয়ের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন; যে সকল শক্তি জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়াসী হইয়া "keep the rules of international conduct," তাহাদিগকে তিনি আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছেন। বৃটেনের এই প্রেম-বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া অসুবিধায় পড়িয়াছে ফ্রান্স। তাহার পুরাতন বন্ধু

বৃটেনের এই দুর্ব্বলতা, নূতন বন্ধু রুশিয়ার গৃহে অশান্তি! বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের শক্তিবর্গ যে দুইটী প্রধান দলে বিভক্ত হইতেছে, তাহাতে বৃটেন্ যেদিকে যোগ দিবে, সেইদিকের পাল্লাই অধিক ভারী হইবে। বৃটেনের এই দুর্ব্বলতা কিন্তু আকস্মিক নহে; সে বরাবরই ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়কে তুষ্ট করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মানী যখন একটার পর একটা সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াছে, তখন সে তাহা 'গায়ে মাখিয়া' লইয়াছে; সে ফ্রান্সকে উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মানীর সহিত নৌচুক্তি করিয়াছে, ইটালী রাষ্ট্র-সংঘকে অবমাননা করিয়া আবিসিনিয়ার ধ্বংস-সাধন করা সত্ত্বেও যে ইটালীর সহিত ভূমধ্য সাগর সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ হইতে অগ্রণী হইয়াছে। এক্ষণে, যে ইটালী নিরুপদ্রব আবিসিনিয়াকে শ্মশান করিয়াছে, স্পেনের অন্তর্ব্বিপ্লবে প্রকাশ্যে ফ্যাসিষ্টদিগকে সাহায্য দান করিয়াছে, এবং যে জার্ম্মানী একাধিকবার চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, এল্‌মেরিয়ার নিরীহ অধিবাসীর প্রতি অতর্কিতে গোলা বর্ষণ করিয়াছে, তাহারা উভয়েই চেম্বারলেনের ভাষায় will keep the rules of international conduct" কারণ "he has faith is human nature"! সম্প্রতি স্পেনের বিদ্রোহি-অধিকৃত অঞ্চলের বৃটীশ-স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে বিদ্রোহী নেতা ফ্রাঙ্কোর সহিত বৃটেনের প্রতিনিধি বিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের নিকট এইরূপ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করায় বৃটেন্ ভূমধ্যসাগরে নিজ প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিতেছে এবং ইহার ফলে তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতেছে।

হইতে পারে, বৃটেনের রণসম্ভার এখনও বিরাট সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইবার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গও বসিয়া নাই, তাহারা প্রাণপণ শক্তিতে সমরোপকরণ বৃদ্ধি করিতেছে। জার্ম্মানীর স্থল সৈন্যের সংখ্যা এক্ষণে ৮০০০০০; ইঙ্গ-জার্ম্মান্ নৌ-চুক্তির বলে বৃটীশ রণপোতের শতকরা ৩৫ ভাগ রণপোত প্রস্তুত করিবার অধিকার সে পাইয়াছে, বৃটেনের নৌবহর বৃদ্ধির অনুপাতে তাহারও নৌবহর বৃদ্ধি পাইতেছে। বিমান-শক্তিতে জার্ম্মানী অত্যন্ত প্রবল, এক্ষণে সে ফ্রান্স ও রুশিয়ার সম্মিলিত বিমানশক্তির সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছে। গত মার্চ্চ মাসে মুসোলিনী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি প্রয়োজন হইলে ৮০০০০০০ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারেন। বিমান বহর সম্পর্কে ইটালী যে পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠনকার্য্য চালাইতেছে, উহাতে আগামী ১৯৪১ সালে তাহার বিমানের সংখ্যা ৪০০০ হইবে। প্রয়োজন হইলে ইটালী যাহাতে ভূমধ্য সাগরে বৃটেনের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তদুদ্দেশ্যে ইটালী তাহার নৌবহর বৃদ্ধির জন্য মনোযোগী হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তথায় ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে—"As England builds, Italy will build." ইটালীর নৌ সৈন্যের সংখ্যা ৬০,০০০ হইতে বর্দ্ধিত হইয়া ১০০,০০০ হইয়াছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার রণপোত ও বহু সাব্-মেরিণ গঠিত হইতেছে; এল্‌বা ও ট্যারেন্টোয় নূতন নৌঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছে, লিবিয়া ও ত্রিপলিতে নৌ যুদ্ধের আয়োজন বৃদ্ধি করা হইতেছে। ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয়ের এই রণসম্ভার বৃদ্ধি, আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি এবং তাহাদের অতৃপ্ত সাম্রাজ্য-ক্ষুধা ভবিষ্যৎ-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোন্ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্যালেষ্টাইনের আরব-বিদ্রোহ ও বৃটীশ-নীতি

বৃটীশ পার্লমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত পীল্-কমিশনে প্যালেষ্টাইন্‌কে ত্রিধা বিভক্ত করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে জনৈক মার্কিন্ বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করিয়াছেন—"...if Palestine be really the land flowing with milk and honey spoken of in the Bible, the Report gives the English and the Jews all the cream and the proteins in the milk and all the nutritious substances in the honey and it le ves the water and the waste to the Arabs. সমগ্র মোস্‌লেম জগতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এ হেন পিল্ কমিশনের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বৃটেন্ একরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্যালেষ্টাইন্ শাসনের "ম্যাণ্ডেট" প্রাপ্ত হইয়া বৃটেন্ যে গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছে, উহার পালনে তাহার কিছু মাত্র স্বার্থ আছে এরূপ "কুকথা" যাহাতে "কুজনে" না বলিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে বৃটীশ মন্ত্রিসভা পীল্ কমিশনের প্রস্তাবগুলি সরাসরি রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিকট পেশ করিয়াছেন। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের "ম্যাণ্ডেট্‌স্ কমিশনে" প্যালেষ্টাইন সংক্রান্ত প্রশ্নের প্রাথমিক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এই কমিশন্ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের আরব বিদ্রোহের জন্য ম্যাণ্ডেটারী শক্তিকেই (অর্থাৎ বৃটীশ) দায়ী করিয়াছেন। ইহুদীদিগের জন্য বিগলিত-অশ্রু হইয়া বলিয়াছেন, তাহাদের দুঃখের সহিত আরবদিগের দুঃখের তুলনা হয় না; অদূর প্রাচীর বিশাল অঞ্চল আরবদিগের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে পক্ষান্তরে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ইহুদীদিগের প্রবেশ বন্ধ হইতেছে। উক্ত কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে, আরব ও ইহুদী রাষ্ট্র উভয়ের পক্ষেই আরও কিছুকাল রাজনীতিক শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষানবিশীর জন্য উভয় রাষ্ট্রকে আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থার স্বাধীনতা দান করিয়া দেশ-রক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগের ভার ম্যাণ্ডেটারী শক্তির হাতে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা উভয় রাষ্ট্রকে পৃথক্‌ভাবে ম্যাণ্ডেটের অধীনে রাখা যাইতে পারে। এক্ষণে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে নিযুক্ত একটী কমিটীতে প্যালেষ্টাইন্ সম্পর্কে প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘ প্যালেষ্টাইনের আরবদিগের ভাগ্য কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, তাহা ম্যাণ্ডেট্‌স্ কমিশনের রিপোর্ট হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘ এক্ষণে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের 'খাস বৈঠকখানায়' পরিণত হইয়াছে; তথায় বৃটীশের ইচ্ছার বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। ইতিমধ্যে বৃটীশের অনুগত মাননীয় আগা খাঁকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাপতির আসনে বসান হইয়াছে; মনে করা হইতেছে যে, আগা খাঁর সভাপতিত্বে রাষ্ট্র-সঙ্ঘে প্যালেষ্টাইন্ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, উহা সমগ্র মোস্‌লেম্ জগৎ অবনত মস্তকে মানিয়া লইবে।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘে প্যালেষ্টাইন-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার কিছু পূর্ব্বে কিছুকাল ধরিয়া প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র-সঙ্ঘে আলোচনা আরম্ভ হইবার পর হইতে দ্বিগুণভাবে হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যহ ইহুদী অথবা ইংরাজদিগকে বিদ্রোহী আরবগণ আক্রমণ করিতেছে, কোথাও চোরা গুলী চলিতেছে, কোথাও ডাইনামাইট্ ফাটিতেছে, কোথাও বা বিস্ফোরক পদার্থ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এবার বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট—সম্ভবতঃ ম্যাণ্ডেট্স্ কমিশনের তিরস্কারের জন্যই অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন। আরবদিগের সর্ব্বপ্রকার বৈধ এবং অবৈধ আন্দোলন দমন করিবার জন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। বিনা বিচারে আটক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অবৈধ ঘোষণা, সাজ্বা-আইন্, সামরিক আদালত প্রভৃতি আয়ুধগুলির অবাধ ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। আরব উচ্চতর কমিটী নামক নিয়মানুগ প্রতিষ্ঠানটী এবং সমগ্র প্যালেষ্টাইনের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অবৈধ ঘোষিত হইয়াছে। আরব উচ্চতর কমিটীর সেক্রেটারী, জেরুজালেমের মেয়র এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট আরবকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্র্যাণ্ড মুফ্‌তীকে সুপ্রীম মোস্‌লেম্ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্টের পদ এবং ওয়াক্‌ফ্ কমিটীর চেয়ারম্যানের পদ হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। তিনি এক্ষণে সীরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনের পুলিস বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সন্ত্রাসবাদ দমনে দক্ষ কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিস কমিশনার স্যর চার্লস্ টেগার্টকে নিয়োগ করা হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের বর্ত্তমান হাই কমিশনার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার স্থানে, বাঙ্গালা ও আয়র্লণ্ডের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্যর জন্ এণ্ডার্সন্ অথবা ভারতের ভূতপূর্ব্ব জবরদস্ত প্রধান সেনাপতি স্যর ফিলিপ্ চেট্উড্‌কে নিয়োগ করিবার কথা হইতেছে।

ইহুদীদিগের দুঃখের জন্য ম্যাণ্ডেট্স্ কমিশন "কুম্ভীরাশ্রু" পাত করিলেও ইহুদিদিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই সমর্থন করিবে না। এতদিন ইহুদিগণ প্রবাসে কোনপ্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে, কিন্তু শক্তিবর্গ মিলিত হইয়া তাহাদের জন্য যে National Home নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, তথায় তাহাদের প্রাণে বাঁচা দায় হইয়াছে। এই সম্পর্কে একটা কথা বলা প্রয়োজন—প্যালেষ্টাইনের আরবদিগের প্রতি মিত্রশক্তি চরম অন্যায় করিয়াছেন সন্দেহ নাই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া একমাত্র এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য যদি আরবগণ আন্দোলন করিত, তাহা হইলে এই আন্দোলন খুবই মহৎ হইত। কিন্তু তাহারা স্বদেশহারা গৃহহারা নিরীহ ইহুদীদিগকে হত্যা করিয়া এই আন্দোলনকে কলঙ্কিত করিতেছে।

হতভাগ্য ইহুদিগণ প্যালেষ্টাইনে আজ শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় প্রাণ হারাইতেছে। বৃটেন্ আশা করে, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে—ও ধীরে ধীরে প্যালেষ্টাইনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রবল বৃটীশ সিংহের নিকট ক্ষুদ্র আরব জাতি নগণ্য—বৃটীশের পক্ষে তাহাদের এই বিদ্রোহ সাময়িক ভাবে দমন করা অসম্ভব নহে।

হেমন্তে

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

হিম কুহেলিকা, হিম কুহেলিকা,
ধূসর আঁচলে দিলে সকলি ঢাকা,
তব আগমনী কথা কেউ না জানে,
মঞ্জীর রব মৃদু পশেনি কানে,
যেন, নিভৃত নিশীথের অভিসারিকা,
নাকেতে বেশর শোভা, কানে মতি দুল,
মুক্তার হালি দিয়ে জালি বাঁধা চুল,
ললাটে হিম-মতি ললাটিকা,
কণ্ঠে তোমার মতি সাতনরী হার,
কটীতে মেখলা মুক্তামালার,
সাদা, ওড়্নায় ঢাকা রবি দীপ্ত-শিখা।

শিশির সলিলে-ধোয়া বাটে
হরিতে পীতে ভরা মাঠে
শীত-শীহরণময় বাতাসে।
যে শোভা দিবসের গগনে,
প্রোজ্জ্বল নীলিমার স্ফুরণে,
অস্ফুট গ্রহভরা আকাশে।
পল্লীহাটে হাঁটে পশারিণী,
ভূষণে বাজে মৃদু রিণিরিণি,
সন্ধ্যার ললাটে হিমকণা মুক্তায়
সিঁথিপাটী গাঁথা হয়,
বাতাসের নিশাসে নিশাসে।

ঔপন্যাসিক মারতাঁ দ্যু গার্দ্ (১৮৮১)

শ্রীমণি বাগচি

এই বছরে সাহিত্যের বহু-আকাঙ্ক্ষিত নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ফরাসীর জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ম’শিয়ে রজার মারতাঁ দ্যু গার্দ—(M. Roger Martin Du Gard)। সংবাদটি নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ; কেন না ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যে-সব ঔপন্যাসিক, কবি ও অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই তালিকার মধ্যে দ্যু গার্দের নাম, তাঁর বই পড়া বা দেখা দূরে থাক, আমরা কদাচিৎ পেয়েছি। এমন কি, মূল ফরাসী ভাষার চর্চ্চা যে দু’চারজন এখানে ক’রে থাকেন, তাঁরাও এই ফরাসী সাহিত্যিকের নাম শোনা ছাড়া, তাঁর বিষয় বিশেষ কোনো খবরই রাখেন না। অথচ ফরাসী সাহিত্যে দ্যু গার্দের জনপ্রিয়তা রোমা র’ল্যা অপেক্ষা অনেক বেশী।

ফরাসী সাহিত্যের যুগ-বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে দ্যু গার্দের আবির্ভাব। উনবিংশ শতকের শেষভাগে ফরাসী কথা-সাহিত্য পরিপূর্ণভাবে গ’ড়ে ওঠে আভিজাত্য আশ্রয় ক’রে। অভাব, দৈন্য, অনাদর, লাঞ্ছনা এই সবের মধ্যে যে শ্রেণীর জীবন তখন কাট্‌তো—সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্য ও পরাভূত জীবনের করুণ চিত্র প্রথম প্রকাশ পেলো দ্যু গার্দের রচনায়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মাত্র তিরিশ বৎসর বয়সে সেই সময়কার গ্রাম্য-জীবনের রূঢ়তা ও রিক্ততাকে বিশ্লেষণ ক’রে তিনি ‘The Will of Father Leleu’ নামে প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। তখনই দ্যু গার্দের প্রতিভা সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিককেই বিস্মিত ক’রেছিল। আভিজাত্যের দৃষ্টিক্ষেত্রকে অতিক্রম ক’রে সমাজ-জীবনের এই ছবি ফরাসী সাহিত্যে প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করে। রোমা র’ল্যা, আঁদ্রে জিদ্ এবং হেন্‌রী বারবুজ্ প্রভৃতি সাহিত্য-ধুরন্ধরগণ একবাক্যে দ্যু গার্দের সৃজনী-শক্তিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

দ্যু গার্দের আগে এবং পরে স্‌্যাঁসন (Chamson), গিওনো ও ম্যালরু প্রভৃতি দু’একজন সাহিত্যিক অনেক দিক দিয়ে আভিজাত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম ক’রেছেন, কিন্তু তাঁরাও খুব বেশী দূর যান নি। ভদ্রসমাজের ক্ষেত্রের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁদের দৃষ্টি তাঁরা কতক পরিমাণে বাইরের জগতে চালিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনও সেই ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়ে তাঁদের প্রতিভাকে অবনত, পরাভূত, দরিদ্র, লাঞ্ছিত জীবনের অশেষ কারুণ্য প্রকাশে তাঁরা বলিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি। কথা-সাহিত্য দরিদ্র ও অভিশপ্তের ইতিহাস বর্ণনা করতে কতদূর শক্তিমান হতে পারে তারই একটা বৃহৎ দৃষ্টান্ত “The Will of Father Leleu”। ফরাসীর উন্নত শ্রেণীর জনসাধারণের ভেতর দরিদ্র জীবনের দুঃখ ও দুর্দ্দশা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি ক’রে দ্যু গার্দ যে সব চিত্র এঁকেছেন, কথা-সাহিত্যে তার তুলনা নেই। সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবনের ভেতর যা কিছু রমণীয় যা কিছু মহৎ তাও তিনি দেখিয়েছেন। দরিদ্রের নৈতিক অধোগতি হ’লেই যে সে পশুত্বের স্তরে নেমে যাবে, তার চরিত্র-গৌরব থাকবে না, দ্যু গার্দ এ কথা বিশ্বাস করেন না। তাই ত দ্যু গার্দের নিপুণ তুলিকায় তাদের জীবনের এ দিকটাও ফুটে উঠেছে। বিশাল অন্তর ও কল্পনার বিরাট প্রসার এবং সেই সঙ্গে এই শ্রেণীর জীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা আছে ব’লেই দ্যু গার্দের চক্ষে দীন-দরিদ্রের মলিন আবেষ্টন ও নীচতার আবহাওয়ার ভেতর তাদের চরিত্র-গৌরব এবং তাদের জীবনের সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য উপলব্ধ হ’য়েছে এবং লেখার মধ্যে তিনি তা ফুটিয়ে তুল্‌তে সমর্থ হ’য়েছেন। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রধান দোষ এই যে, দরিদ্র ও পরাভূত লোকের জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক রূপ সেখানে কিছুমাত্র প্রতিফলিত হয় না। আধুনিক লেখকরা intellectualised conceptএর চশমা দিয়ে আশপাশের জীবন ও জগৎকে দেখ্‌তে শিখেছেন। দ্যু গার্দের সাহিত্য এর বিরুদ্ধে একটা মস্ত বড় প্রতিবাদ এবং তথাকথিত সহজ-লভ্য জনপ্রিয়তা তিনি এই কারণে আজও অর্জ্জন করতে পারেন নি। তবু তাঁকে বাহাদুরী দিই এই জন্যে যে সস্তা খ্যাতির মোহে এই মনীষী আজও তাঁর লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট

হন নি। এই হিসেবে বল্‌তে গেলে, দ্যগার্দ্দ নোবেল পুরস্কারকেই ধন্য ক'রেছেন তা গ্রহণ ক'রে।

প্রথম উপন্যাসে অসামান্য সাফল্য লাভ ক'রে দ্য গার্দ্দ কিছুকাল পরে (১৯১৯) আর একখানি উপন্যাস প্রকাশ করেন। বইখানির নাম—জঁা ব্যারয় (Jean Barois); ইহা একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের উপন্যাস এবং এই বইখানিকে উপলক্ষ করে তখনকার ফরাসী সাহিত্যে যে ভীষণ আন্দোলন হয়, তা ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। আধুনিকতম বিচারের সূক্ষ্মতম রস-বিচারে Jean Baroisএর সাহিত্যিক মূল্য কি নির্দ্ধারিত হবে তা বলা শক্ত। কারণ এই উপন্যাসখানির মূল প্রেরণা ছিল, দ্য গার্দ্দের নিজের ভাষায়—A synthetic tableau of a generation which is characterised by moral and intellectual bankruptcy. সমাজ বা সমাজের ভেতরের জীবের কদর্য্যতায় তার নৈতিক অধঃপতনের প্রতিবাদ স্বরূপ জাতীয় অনুপ্রেরণা ও উপাদান দ্য গার্দ্দের এই উপন্যাসখানির ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'Art for art's sake' এই নীতির আশ্রয়ে দ্য গার্দ্দের রচনা বিকাশলাভ করে নি। সুনীতি-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তাঁর সমগ্র রচনার মূল প্রেরণা। এই বিষয়ে দ্য গার্দ্দের নিজের উক্তি খুব স্পষ্ট—"French literature is on the whole a literature of moralists. For four centuries the Frenchmen have been depicting the morals of their time in the secret or avowed purpose of correcting them—"। শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের যা অন্তর্গূঢ় মর্ম্ম তা এ থেকে অনেকটা বুঝা যায়। রস-বিচারের অজুহাতে দ্য গার্দ্দের বিপক্ষ সমালোচনার আজও শেষ নেই। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে আমি এই বল্‌বো যে—এই শক্তিশালী ঔপন্যাসিকের রচনা থেকে যদি কোনো সুনীতিরই প্রবর্ত্তন হয়ে থাকে, তবু তার রূপ ধর্ম্মযাজক বা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের রূপ নয়, সত্যকারের আত্মসমাহিত সৌন্দর্য্যকামী স্রষ্টার রূপ। দারিদ্র্য ও অভিশপ্ত শ্রেণীর উপেক্ষিত জীবন তাঁর রচনার প্রেরণা হ'লেও, 'জঁা ব্যারয়ের' বিরাট চরিত্র বিশ্লেষণ করলে পরে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির নিবিড় রসানুভূতি তার মধ্যে গৌণভাবে আত্মগোপন ক'রে নেই।

এই কারণেই দ্য গার্দ্দের প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা রস-বিচারের কঠিন আঘাত অনায়াসেই সইতে পেরেছিল। প্রকৃত বীরের ন্যায় তিনি একহাতে সাহিত্য-সৃষ্টির আদর্শ দেখিয়েছেন, অন্য হাতে আবর্জ্জনারাশি থেকে সাহিত্য মন্দিরের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য বজায় রেখেছেন। এই অপসরণ কাজের জন্যে হয়ত দ্য গার্দ্দের সৃষ্টি-নৈপুণ্য কোথাও কোথাও ব্যাহত হ'য়েছে, তবু বিচিত্রতা ও ব্যাপকতায় তাঁর উপন্যাস-সৃষ্টি সমগ্র ফরাসী সাহিত্যে অতুলনীয় ও অনবদ্য। কথা-সাহিত্যের গল্পাংশের মাধুর্য্য সর্ব্বত্র অব্যাহত রেখে দ্য গার্দ্দ তাঁর উপন্যাসরাজির বিশেষ বিশেষত্ব সম্পাদন করেছেন।

দ্য গার্দ্দের উপন্যাসে কল্পনার আধিক্য থেকে ঘটনার স্বাভাবিকত্ব বেশী। এইজন্য তাঁর রচনায় বস্তুতন্ত্রবাদ ও আদর্শবাদ দুই-ই থাকা সত্বেও তাঁকে বস্তুতন্ত্রবাদী পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় এবং তাঁর উপন্যাসগুলির অধিকাংশই romance না হয়ে novel হয়েছে। ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনের সংযোগ রেখে, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ রেখে দ্য গার্দ্দ তাঁর রচনাকে মাত্র আলোকচিত্র হতে দেন নি, বরং সার্ব্বজনীন কল্যাণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে রস-বোধের সাহিত্য বা সংযোগে তাঁর উপন্যাস সৃষ্টি ফরাসী সাহিত্যের অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টি। ইহার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন—'Les Thibault' নামক সুবৃহৎ উপন্যাস। দশ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিরাট উপন্যাসখানি দ্য গার্দ্দ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান। ইংরাজী সাহিত্যে মাত্র এর দুই খণ্ড এ পর্য্যন্ত অনুদিত হয়েছে। ফরাসীর বিলুপ্তপ্রায় মধ্যশ্রেণীর ইতিহাসের মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য হিসাবে সমসাময়িক সাহিত্যে এর তুলনা নেই বল্‌লেই চলে।

মধ্যবিত্তের সংসারের নিত্য বাস্তব ঘটনা বর্ণনে মনস্তত্ত্বের এমন সুন্দর বিশ্লেষণে, বহু সামাজিক সত্য ও তথ্যের অনুসন্ধানে সাহিত্যে শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে, ভাষার সরলতা ও সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে—এই বিরাট উপন্যাসখানি এ যুগের সাহিত্যে অতুলনীয় এবং আদর্শস্থানীয় বল্‌লে, এতটুকু অত্যুক্তি করা হয় না।

দ্য গার্দ্দ সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে যে তাঁর জীবনী; তাঁর শৈশব ও যৌবনের ইতিহাস জনসাধারণের কাছে আদৌ সুপরিচিত নয়। তাঁর রচনার ভেতর দিয়ে

তাঁর জীবনের পরিচয় ত আবিষ্কার করা যায়-ই না, এমন কি কেউ যদি তাঁকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করে ত্য গার্দ্দ অমনি তাকে সহাস্যে বলেন—I confess it rather distresses me to publish myself abroad in the way of pictures and details about in my life.···I would like to be known not for myself, but for my books. I take the artist as important only because of his art and am not interested in the personality of the artist." ত্য গার্দ্দের এই উক্তি থেকেই আমরা তাঁর শিল্পী-মনের যে পরিচয় পাই, তা দেশ ও কালের গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিকে কালজয়ী ক'রে রাখ্‌বে। ত্য গার্দ্দ সম্বন্ধে আজ মাত্র এইটুকু 'ভারতবর্ষে'র পাঠকদের উপহার দিলাম।

প্রাচীর চিত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি

(অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

গত কার্ত্তিক মাসের ভারতবর্ষে (৭৭৪-৭৮ পৃঃ) শিল্পী শ্রীমান্ নিশীথকুমার রায়চৌধুরী "প্রাচীর চিত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে কয়েকটি গুরুতর ঐতিহাসিক ভুল রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রাচীর চিত্রগুলির বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "পঞ্চম চিত্র :—প্রথমার্দ্ধে—মহারাজ অশোক সপারিষদ উপবিষ্ট—সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজদূত তাঁহার সভায় সমবেত। গ্রীসের রাজদূত, মিসরের রাজদূত, প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙ্গ তাঁহাকে শুভাশীষ জ্ঞাপন করিতেছেন।" ৭৭৭-৭৮ পৃঃ। পণ্ডিতগণের মতে মৌর্য্যরাজ অশোক অনুমান খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৩ হইতে ২৩২ অব্দ পর্য্যন্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং ৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম "পাশ্চাত্য দেশ" ভ্রমণে বহির্গত হন; তিনি ৬৩০ হইতে ৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইউয়ান চোয়াং মৌর্য্যবংশীয় অশোকের প্রায় সাড়ে আটশত বৎসরকাল পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে মৌর্য্যরাজকে শুভাশীষ জ্ঞাপন করা একেবারেই অসম্ভব।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে "চীন" দেশের নামটি আদিম "ৎসিন" Tsin রাজবংশের শাসনকাল দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এই ৎসিন বংশীয় সাতজন রাজা খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫৫ হইতে ২০২ অব্দ পর্য্যন্ত চীনসাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের প্রথম চারিজন রাজাকে অশোকের সমসাময়িক বলিতে পারা যায়। সুতরাং অশোকের রাজত্বকালে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটা অসম্ভব নহে। কিন্তু চীনদেশের সহিত অশোকের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, থাকিলেও বা কি প্রকারের সম্পর্ক ছিল, সে বিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। চীনের হানবংশীয় সম্রাট্ মিংতি ৫৮ হইতে ৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদেশ অপেক্ষা পশ্চিমদেশীয় রাজগণের সহিত অশোকের সম্পর্ক স্থিররূপে নির্দ্ধারণ করা যায়। অশোকের শিলালিপিতে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের পাঁচজন গ্রীকরাজার নামোল্লেখ আছে।

ষষ্ঠ চিত্রখানির বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন, "বাঙ্গালার সাধারণতন্ত্রের নির্ব্বাচিত রাজা গোপালদেব" ইত্যাদি। ৭৭৮পৃঃ। এই স্থলে সাধারণতন্ত্র কথাটার ব্যবহার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পালসম্রাট্‌গণ যে একটি

Republicএর President ছিলেন, এরূপ ধারণা করা নিতান্তই অসম্ভব। ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে চতুর্থ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে আছে যে, "মাৎস্য ন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিল, নৃপকুলচূড়ামণি সেই শ্রীগোপাল তাঁহার (অর্থাৎ বপ্যটের) পুত্র।" ইহা Republicএর President নির্ব্বাচন নহে। পূর্ব্ব ভারতের আরও একজন নরপতি প্রজাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে; ইনি কামরূপের পালবংশের আদিপুরুষ ব্রহ্মপাল। ব্রহ্মপালের নির্ব্বাচন হইতে গোপালের নির্ব্বাচনরহস্য বুঝিতে পারা যায়; ব্রহ্মপালের পুত্র রত্নপালের তাম্রশাসনের দশম শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, "নরকবংশীয় শ্রীত্যাগ সিংহ নামক নৃপতিকে নির্ব্বংশ অবস্থায় স্বর্গগত হইতে দেখিয়া, 'পুনশ্চ আমাদের নরকবংশীয় রাজারই প্রয়োজন' এই ভাবিয়া প্রজাগণ পূর্ব্ব-রাজার জ্ঞাতিত্ব হেতু ভূভারবহন-সমর্থ ব্রহ্মপালকে রাজা মনোনীত করিয়াছিল।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কৈবর্ত্তবংশীয় দিব্যও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রজাগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এইরূপ যে মতটি সম্প্রতি গড়িয়া উঠিতেছে, উহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিবার মত কোন প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

আকাশ-প্রদীপ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

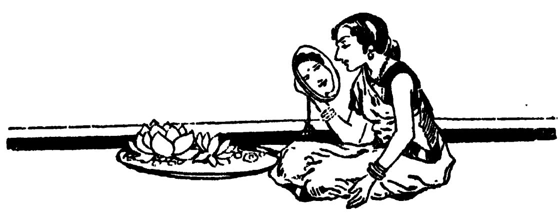
ক্ষেত ভরিয়াছে ধানে আশায় ভরেছে বুকগুলি,
অপগত মেঘমালা উঠিয়াছে নীলিমা উছলি'
নির্ম্মল গগন তলে, কার্ত্তিক সন্ধ্যায় আজিকার
পল্লীর হৃদয়খানি নিবেদিনু উদ্দেশে তোমার

হে দেবতা। তার ক্ষীণ দীপ্তিরেখা করুক স্পর্শন
তব বেদী, কর কর আশীর্ব্বাদ মাঙ্গল্য বর্ষণ
এ পল্লীর নতশিরে। তোমার অনন্ত নভস্তলে
এই ক্ষীণ দীপটিকে কোটি কোটি তারকার দলে

দাও ঠাঁই। প্রান্তরের পথহারা ক্লান্ত পান্থজনে
হাতছানি দিয়া যেন ডেকে আনে স্নিগ্ধ আমন্ত্রণে
রাত্রির আতিথ্য লাগি'। এ পল্লীর প্রবাসী সন্তান
সন্ধ্যায় ফিরিবে যবে দূর করি তার ব্যবধান

এই দীপখানি যেন দেয় তারে মধুর আশ্বাস,
এ আলোকে পায় যেন গৃহমুখী প্রথম সম্ভাষ।
বহে যেন তব পায় এ পল্লীর সবার প্রণতি
এ প্রদীপ। হেমন্তের নম্র বায়ু মন্দ করি গতি

সেবা যেন করে এর। ঊর্দ্ধে রহি প্রহরীর মত
অলক্ষ্মী তাড়ায় যেন দূর করে অকল্যাণ শত।
সকল হিংসার ঊর্দ্ধে নিবেদিত পুণ্য দীপখানি,
নাহি করে যেন মূঢ় পতঙ্গের জীবনের হানি।



আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ

কয়েক বৎসর পূর্বে আচার্যদেব বলিয়াছিলেন "জীবনের যখন পূর্ণশক্তি, তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পারিতেছি, কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই তাহার সুকৃতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি। তবে বলিবার তাহার কি আছে? সাফাই করিবার কথা যখন কিছুই নাই, তখন তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া সে কেবল বলিবে—আসামী হাজির।"

বিশ্বের সকল জীবের সুকৃতি-দুষ্কৃতির যিনি বিচারক তাঁহার পদপ্রান্তে ঐ 'আসামী' আজ হাজির। বিচারক দেখিতেছেন—এই আসামী যৌবনে তাহার দেশে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া তখনকার দিনের প্রচণ্ড সামাজিক বাধা-বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া দেশদেশান্তে নব নব জ্ঞান আহরণ করিতে একদিন ছুটিয়াছিল, দেখিতেছেন—সেই জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া ঐ যুবক পরিতৃপ্ত রহিল না, মানবজাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতে নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিল। বাহিরের কি প্রবল বাধা এবং তাহার বিরুদ্ধে কি প্রচণ্ড সংগ্রাম! সফলতা একদিন দেখা দিল; পরিশেষে ঐ আসামী শুধু নিজের একটি জীবনের সাধনায় তৃপ্ত হইতে পারিল না। আজীবন যাহা উপার্জন করিয়াছেন তাহার মাত্র এক পঞ্চমাংশ নিজেদের জন্য ব্যয় করিয়া বাকি সমস্তই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া আসিলেন এবং সেই সঞ্চিত অর্থ যে বিপুল সম্পত্তিতে দাঁড়াইল তদ্বারা জ্ঞানের চর্চার জন্য চিরদিনের ব্যবস্থা করিয়া যাইলেন।

মানবের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে বিচারকর্তা আসামীর দোষ দেখিলে তাহাকে শাস্তি দেন তাহার গুণের পুরস্কার দেন না। কিন্তু বিশ্বের বিচারকর্তা শুধু দুষ্কৃতির দণ্ড দেন না, সুকৃতিরও মর্যাদা প্রদান করেন। আজ সেই বিচারকর্তা 'আসামী' বলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত এই মহামানবের অনন্তকাল নিবাসের জন্য কোন্ স্বর্লোকের ব্যবস্থা করিলেন তাহা শুধু তিনিই জানেন। কিন্তু বিচারকর্তা তাঁহাকে আবার যদি মানবজাতির কল্যাণার্থ এই পৃথিবীতে পাঠান তো আচার্যদেবের ইচ্ছা যেন পূরণ করেন। একদিন তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—

"বন্ধু, আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ব বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশীয় আত্মম্ভরি, বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। তুমি মানুষ প্রস্তুত কর। জীবনে সেই পুরাকালের লক্ষ্য অঙ্কিত করিয়া দাও। আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।"

আচার্যের পরিত্যক্ত আসন শূন্য পড়িয়া থাকিবে; যুগে যুগে এই হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার ত্যক্ত আসন তিনি গ্রহণ করুন।

বৈজ্ঞানিক বলিয়া জগদীশচন্দ্রের প্রসিদ্ধি; বিজ্ঞানকে তিনি নানা দিক হইতে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে এই বৈজ্ঞানিকের ভিতরে যে দেশভক্ত, সাহিত্যসেবক, আড়ম্বরহীন, নিরভিমান, কৌতুকপ্রিয় মানুষটি রহিয়াছে তাহাকে আজ স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য হই।

দেশভক্ত জগদীশচন্দ্র

দেশের প্রতি জগদীশচন্দ্রের অনুরাগ, ভারতবর্ষকে তাহার পূর্বগরিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রত্যেক কথাবার্তায়, তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সেটা ১৯০৩ সাল, এম-এ ক্লাশে আমরা তখন তাঁহার

ছাত্র। সমস্ত ছাত্রকে তিনি বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। খাবারের আয়োজন হইতেছে। তখন ফনোগ্রাফ উঠিয়াছে এবং স্বদেশী রেকর্ডও তৈয়ারি হইতেছে। ফনোগ্রাফে একটা গান তিনি দিলেন, গানের প্রথম লাইনটা এই—'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতি পারলেম না।' গানের এই একটা লাইন দিয়া হঠাৎ বন্ধ রাখিলেন। আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমরা ভাল করিয়া এই গানটা শোন; একটা চাষা সমস্ত দিন মাঠে পরিশ্রম ক'রে বাড়ী ফেরবার সময় কি গাইতে গাইতে আসচে।" গান আবার আরম্ভ হইল, শেষ হইলে দেখা গেল তাঁহার মুখচোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে; তিনি বলিয়া উঠিলেন "আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে আমাদের যথার্থ গৌরব ভুলে গিয়ে মিছা আড়ম্বর নিয়ে আমরা ভুলে আছি। অনেক দেশ এখন ঘুরে এসেছি, কোন্ দেশে সভ্যতা এত নিম্নস্তর অবধি পৌচেছে? কোন্ জাত অনার্যকে আর্য করতে পেরেছে?"

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল ইনষ্টিটিউসনের এক অধিবেশনে পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীকে তিনি পরীক্ষায় দেখাইলেন যে একখণ্ড টিন, একটি গাছের ডাল এবং একটি ব্যাঙের পেশী বাহিরের উত্তেজনায় একই ভাবে সাড়া দেয়। ঐ সকল সাড়া লিপির একতা প্রদর্শন করিয়া উপসংহারে তিনি বলিলেন—

"আলোকে ভাসমান ক্ষুদ্র ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত জীব ও আকাশের দীপ্যমান অসংখ্য সূর্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য যখন লক্ষ্য করিলাম তখন আমার পূর্বপুরুষগণ তিন সহস্র বৎসর পূর্বে গঙ্গাতীরে যে মহান সত্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল—বিশ্বের এই নিয়ত পরিবর্তনশীল অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহারা সেই এককে দেখিতে পায় সত্য শুধু তাহারাই পায়, আর কেহ নয়, আর কেহ নয়।"

সেদিন বক্তৃতা শেষে শ্রোতৃমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিলেন এবং সে যুগের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি জীবনে এত বড় কিছু কখন শুনি নাই।" সেদিন ভারতমাতার গলে আবার জয়মাল্য আসিয়া পৌছিল।

ইহার ৪ বৎসর পূর্বে জগদীশচন্দ্রের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা যখন পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীকে সচকিত করে এবং বিজ্ঞানের একটা নূতন দিক খুলিয়া দেয়—সে দিন বহুযুগ পরে ভারতবর্ষ জগৎসভায় আবার তাহার উচ্চ মহান আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে দিন তাঁহার আজীবন-বন্ধু রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া পাঠান—

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি, জয়মাল্য খানি
সেথা হ'তে আনি'
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত সভায়
বহু সাধুবাদ ধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে,
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে যায় চারিধারে
হ'য়ে সিন্ধুপার।
আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদ খানি
জগৎ সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

১৯০০ সালে প্যারিসে জগদীশচন্দ্র যখন ঐ পরীক্ষাগুলি দেখান তখন স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তাঁহার ডায়রিতে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"এ বৎসর এ প্যারিস সভ্যজগতে এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশসমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করবেন আজ এই প্যারিসে। সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহা-রাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম

নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহুগৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্যে হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন—সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার জে-সি-বোস। একা, যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্যমণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা-মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ-সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন-তরঙ্গ-সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু, ভারতবাসী, বঙ্গবাসী। ধন্য বীর।"

জগদীশচন্দ্রের দেশাত্মবোধ যে কি মহান্ ছিল তাঁহার এই সময়ের একখানা পত্র হইতে তাহা সহজেই জানা যায়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্যারিস হইতে তিনি লিখিতেছেন—

"সারাদিন ঝঞ্ঝাট। সন্ধ্যার পর বাহিরের আঁধারের সহিত অন্তরের আলো জ্বলিয়া উঠে। তখন আমি জন্মভূমির কোলে স্থান পাই। ছেলেবেলা ইংরাজী শিক্ষার সহিত যে পাক পড়িয়াছিল এতদিনে তাহা আস্তে আস্তে খুলিয়াছে, এখন স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া সব দেখিতে পারিতেছি। পশ্চিমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সব দেখিতে পাইয়া অনেক মোহ দূর হইয়াছে। তবে পরের দোষ দেখিয়া আমাদের কি লাভ? কি করিয়া আমরা বিলাসের পথ হইতে উদ্ধার পাইব?

"সচরাচর শুনিতে পাই হিন্দু স্বভাবতই সংসারবিমুখ, জীবনের সংগ্রাম হইতে পলাতক। এ কথা কি ঠিক? হিন্দুরা কি সমস্ত জীবন দিয়া অভীষ্টের অনুসন্ধান করেন নাই? এত জ্ঞান কি বিনা চেষ্টায় হইয়াছে? শঙ্করাচার্যের বিজয়যাত্রা কোন্ অংশে যুদ্ধযাত্রার অপেক্ষা কম? এরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম প্রয়োগ এ কালে কি দেখা যায়?

"তবে হিন্দু চিরকাল আসক্তিহীন। 'আমি' কেহই নই, যিনি আমাকে চালাইতেছেন তিনিই সব।

"তিনি বিশ্বকর্মারূপে আমাদের হৃদয় মন পরাস্ত করিয়াছেন। আবার সখারূপে অতি সন্নিকটে। যিনি আমাদিগকে প্রেমপাশে বাঁধিয়াছেন তাঁহার চরণে প্রতি মুহূর্তে আত্মবলি দিতে হৃদয় উৎসুক। সুখের দিনে কিছু জানাইতে পারি না। কিন্তু দুঃখের দিনে একটু জানাইতে পারি। তিনি আমাদিগকে যেখানে রাখিয়াছেন দাস সেস্থানেই থাকিবে, সমস্ত কলঙ্ক বহন করিবে, সমস্ত নিষ্ফলতার মধ্যে সমস্ত চেষ্টা নিবেদন করিবে। আমাদের শক্তিই বা কি, কিন্তু কোটী কোটী ক্ষুদ্র প্রবাল-পঞ্জরে মহাদেশ গঠিত হইয়াছে। এই তো আমাদের একমাত্র আশা। যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে সেই জন্মভূমির জন্য আমাদের দেহ মন পর্যবসিত হয় ইহা ব্যতীত তো আর আমাদের করিবার নাই।"

জগদীশচন্দ্রের বিবিধ লেখা হইতে দেখা যায় বঙ্গ-সাহিত্যেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন

"বন্ধু, যদিও বিজ্ঞান-রাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য-সরস্বতী সে-পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃতা হইয়া আছে।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ Response in living and non-living প্রকাশিত হইল। উৎসর্গ পত্রে এই ছত্রটি দেখা গেল।

"To my countrymen this work is dedicated."

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হন। শিক্ষা বিভাগে উপযুক্ত ভারতবাসীর পরিবর্তে কম-উপযুক্ত বিদেশী নিয়োগে তিনি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় একজন ভারতবাসী অপেক্ষা একজন সাহেবের বেশী মাহিনার প্রয়োজন হয় কিনা। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন "আমাদিগকে বেশী মাহিনা দিলে আমরাও আহাম্মুকের মত বেশী খরচ করিতে পারি।" তিনি পরে বেশী মাহিনাই পাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সে মাহিনার অধিকাংশই রহিয়া গেল তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে, শিক্ষার উন্নতির পরিকল্পে।

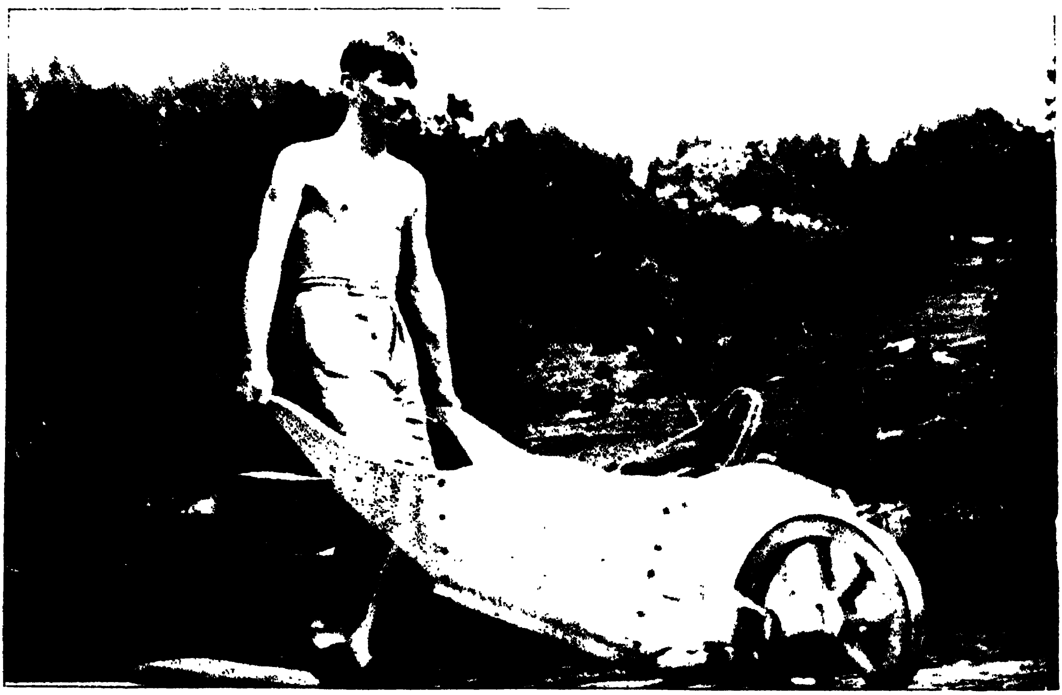
জীবনের অধিকাংশ দিন জগদীশচন্দ্র শহরে কাটাইয়াছেন। সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশের বহুস্থান তিনি ঘুরিয়া আসিয়াছেন। দেশের কোটী কোটী অনশনক্লিষ্ট পতিত অস্পৃশ্য জাতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না, কিন্তু ইহাদিগকে তিনি দেশের মেরুদণ্ড বলিয়া মনে করিতেন। ইহাদিগের কথায় তিনি বিচলিত হইয়া উঠিতেন। ইহার একমাত্র কারণ শৈশবে তিনি ইহাদের মধ্যে বসবাস করিয়া



জগদীশচন্দ্র বসু



মুসোলিনী অভিবাদন লইতেছেন



বালক রাজা পিটার ঠেলা গাড়ী ঠেলিয়া ব্যায়াম করছেন

ইহাদের সুখ দুঃখের অংশীদার হইয়া প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন। এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামে এক ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম; সম্ভবত প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ী ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখন মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাকুড়ায় পতিত অস্পৃশ্য জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাহারা যৎসামান্য আহার্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষু স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য পাইয়া তাহা দশ জনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা? আর এক কথা। তুমি ও আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃত পক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে হইলে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিবে পংকে অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই "পতিত" শ্রেণীরাই ধনধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে।"

জগদীশচন্দ্রের একটি মহতী বাণী তাঁহার দেশবাসী যেন সর্বদাই উদ্বুদ্ধ রাখে।

"বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল—সেই নীতি যেন বর্তমানকালেও জীবন্ত ভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোন দিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরান্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সুবিখ্যাত সংগীত "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।" জগদীশচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় রচিত হয়।

১৯০৭ সালের জুন মাস, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন গয়ায় বাস করিতেছেন এবং জগদীশচন্দ্রও কিছুদিন সেখানে গিয়াছেন। একদিন জগদীশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে বলিলেন—

"আপনি রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙালীকে দেখাইতে হইবে, যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙালাদেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত' একবার সেই আদর্শ এ বাঙালী-জাতিকে দেখাইয়া আবার তাহাদিগকে জাগাইয়া-মাতাইয়া তুলুন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী-লেখক বলিতেছেন "বলা বাহুল্য, মাতৃভূমির সুসন্তান দেশভক্ত জগদীশচন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া তখনই এক অভূতপূর্ব আন্দোলন উপস্থিত করিল এবং তাহারই ফলে, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধের মহান সংগীত "আমার দেশ" রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

পরে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী-লেখক স্বর্গীয় দেবকুমার রায় চৌধুরীকে জগদীশচন্দ্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

"কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখন ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা সে দিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষায় করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিলেন, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিংগনভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।

ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভার বহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহার মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্ম-যুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্র-ধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।"

তাঁহার দেহরক্ষার প্রায় একমাস পূর্বে শ্রীযুক্ত সুভাষ-চন্দ্র বসুর পত্রের উত্তরে জগদীশচন্দ্র লেখেন—"যাঁহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া আসিতেছি সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদকল্পনা করিতে পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতে স্বতই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনা-আপনি সমস্ত ভারতবর্ষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ইহার কারণ ঐ ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।"

এই "বন্দে-মাতরম্" গান শুনিতে জগদীশচন্দ্র বড়ই ভালবাসিতেন। এই গান তাঁহাকে বিশেষভাবে অভিভূত করিত। তাই তাঁহার দেহ যখন গিরিডি হইতে আনিবার আয়োজন হয় তখন তাঁহার সহধর্মিণী সমবেত জনমণ্ডলীকে তাঁহার স্বামীর প্রিয় এই "বন্দেমাতরম্" সংগীত গাহিতে অনুরোধ করেন। সেই নশ্বর পার্থিব দেহ এ গান শুনিতে পায় নাই, কিন্তু তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির বন্দনাগীতিতে নিশ্চয় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

মুক্তি

শ্রীনারায়ণদাস ভট্টাচার্য

প্রারব্ধে অব্যর্থ বলি করিয়া প্রচার
বজ্রসম ব্যথা দাও জীবে, সুখ শত
দাও তারে উদাসীনপ্রায়; অবসন্ন
চিত্তে তার নিদেশিয়া কর্মফল ত্যাগ
কম্বুকণ্ঠে সুস্পষ্ট ভাষায়, শান্তভাবে
আকর্ষিছ তারে নিয়ত স্বরূপ পানে।

জ্ঞানোন্মেষে ধীরে জীব বাসনা ত্যাগিয়া
পরম সাধনা ফল সমর্পিয়া সুখে
তোমার চরণতলে, কর্মভারহীন
প্রশান্ত অন্তরে বলে "প্রভু, লও মোরে।"

তব পুণ্য দৃষ্টি বলে ক্ষুদ্র হৃদিমাঝে
লভে সে অমূল্যধন; অনুকূল সবে;
মিত্র হেরে রিপুচয়ে; প্রত্যক্ষে বিস্ময়ে-
মুক্ত সে যে নিত্যদাস তব লীলাস্থলে।

পরেশের সাহিত্য-সাধনা

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যহ পোষ্টাফিসে হাজিরা দেওয়া পরেশের একটা নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহার নামে প্রায়ই কোন চিঠিপত্র আসে না—কোথাও তেমন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব নাই—কলেজের সহপাঠীদিগের সহিত চিঠি লেখালেখি অনেকদিন বন্ধ হইয়াছে—অর্দ্ধাঙ্গিনীও কাছে আছেন—তথাপি পরেশ কেন যে ঠিক ডাক আসিবার সময় পোষ্টাফিসে গিয়া হাজিরা দেয় এবং সগুকাটা ব্যাগের ভিতরকার রাশীকৃত ছাপমারা পোষ্টকার্ড, খাম, বুকপ্যাকেট, পার্শ্বেল এবং মোড়ক-করা অন্যের নামে ঠিকানা লেখা খবরের কাগজের পানে সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়া থাকে—তাহার কারণ বুঝা কঠিন। বুকপ্যাকেট দেখিলেই একটা আজানা আশঙ্কায় তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে থাকে—তাহার পর যখন দেখে কভারে অপরের নাম লেখা—তখন তাহার হৃদয় স্বাভাবিক সুস্থতা লাভ করে। ঐ চৌকাখামে মোড়া বুকপ্যাকেট গুলার উপর তাহার দারুণ বিতৃষ্ণা। সেইজন্য পোষ্টাফিসে যাইবার সময় সে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে—হে ভগবান, তাহার নামে যেন কোন বুকপ্যাকেট না থাকে। ভগবান পরেশের কথায় কর্ণপাত করেন কিনা জানিনা—আমরা কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি ঐ বুকপ্যাকেটের জ্বালায় সে অনেকবার জ্বলিয়াছে। বুকপ্যাকেট সংক্রান্ত দুঃখের ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো। উদীয়মান গল্পলেখক মাত্রই সে হৃদয়বিদারক কাহিনী অবগত আছেন।

প্রত্যহই কি একটা আশা করিয়া যায় এবং কিছু নাই দেখিয়া বিমর্ষ হইয়া ফিরিয়া আসে। একেইতো পোষ্টকার্ড ও খামের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় লোকের চিঠিপত্র লেখা কমিয়া গিয়াছে—তাহার উপর এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে তিনপয়সা খরচ করিয়া পরেশকে যে কেহ একখানি পোষ্টকার্ড লিখিবে এমন সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়স্বজনও কেহ নাই। আর খামের চিঠি আসাতো পরেশের কাছে এখন স্বপ্নকথায় পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বে—অর্থাৎ বিবাহের পর গৃহিণীর পিতৃগৃহে থাকাকালীন তাহার নামে দুই একখানি খামের চিঠি আসিত ইদানীং সে সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত। চিঠি পাইবার জন্য কেহ ত আর সাধ করিয়া গৃহিণীকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিতে পারে না? শ্বশুর শাশুড়ী বহুদিন পূর্ব্বে গত হইয়াছেন—থাকিবার মধ্যে আছে এক লক্ষ্মীছাড়া শ্যালক—সে তো ভুলিয়াও ভগ্নীর নাম করে না।

তবে কেন এই হাজিরা দেওয়া?' কেন এই ঘোরাফেরা? সে কি একজন গল্পলেখক? এ প্রশ্নের উত্তর তাহার মুখেই পাওয়া যাইবে।

সেদিন পোষ্টাফিস হইতে রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরিবার সময় পরেশ মনে মনে কহিল—দুইমাসের উপর হইতে চলিল আজও কোন সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল না? এতদিন যখন ফেরৎ আসিল না তখন খুব সম্ভব এবার গল্পটি আমার মনোনীত হইয়াছে। যাহোক—আর এক সপ্তাহ দেখিয়া রিপ্লাই কার্ড লিখিব—সঠিক সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত মন সুস্থ হইবে না।

'হাঁ—হাঁ-হাঁ-বাবু! সরে দাঁড়ান—গাড়ী চাপা পড়বেন—"

পরেশের গা ঘেঁষিয়া একটা বোঝাই গোরুর গাড়ী চলিয়া গেল। "উঃ খুব বেঁচে গেছি। পাজী ব্যাটা আর একটু হলেই চাপা দিয়ে ছিল—" বলিয়া লাফাইয়া একটা বাড়ীর দাবায় উঠিল—তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

স্ত্রী শৈলবালার জীবন পরেশ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। সে বেচারা সারাদিন ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম করিয়া—রাঁধিয়া বাড়িয়া—দিয়া থুইয়া—শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়াইয়া রাত্রিতে যে একটু শান্তিতে ঘুমাইবে—পরেশের জ্বালায় তাহারো জো নাই। ঠিক সেই সময়টি পরেশ খাতা খুলিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতে বসে—শুনিতে শুনিতে ঘুমে যখন শৈলবালার চোখের পাতা জড়াইয়া আসে—তখন মহাবিরক্ত হইয়া পরেশ বলে—ওগো শুনচো! না খালি ঘুমুচ্চো?" নিদ্রালস চোখে চাহিয়া শৈল বলে—হাঁ—হাঁ—শুনচি—শুনচি—বে—বে—বেশ—লা—আ—গ" বলিতে বলিতে চোখ বুজিয়া আসে—সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাগর্জ্জন।

'আমি বোকে মরছি—আর উনি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন—" বলিয়া জোরপূর্ব্বক শৈলবালার ঘুম ভাঙাইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করে—ওদিকে খোকাও সময় বুঝিয়া হাত পা ছুড়িয়া কাঁদিয়া উঠে—শৈলবালা পাশ ফিরিয়া খোকার পিঠ থাবড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করে—পরেশের পড়াশুনা বন্ধ হইয়া যায়।

শৈল বলে—"আজ বন্ধ থাক! বাকীটা কাল শুনবো।" এ কথার কোন উত্তর না করিয়া রসভঙ্গকারী ছেলেটার উপর একটা অগ্নিকটাক্ষ হানিয়া পরেশ খাতা বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়ে। ঘুম কি সহজে আসে? মগজের ফাঁকে ফাঁকে গল্পের কথাগুলা পোকার মত কিলবিল করিয়া বেড়ায়—যদি বা একচটকা ঘুম আসে—তাহাও স্বপ্নবহুল—কেবল গল্পের কথায় পরিপূর্ণ।

*　　*　　*　　*

পাড়াপ্রতিবেশীও পরেশের খাতার ভয়ে তাহার বৈঠকখানার সামনে রাস্তা দিয়া চলাফেরা বন্ধ করিয়াছে। রাস্তার লোককে ডাকিয়া পরেশ খাতা খুলিয়া গল্প শুনাইতে বসিত—কাজ কামাই করিয়া গল্প শুনিতে লোকে বিরক্ত হইত—পালাইবার জন্য উসখুস করিত এবং কোন একটা ছুতায় ধাঁ করিয়া বাহির হইয়া যাইত—আর সে পথ মাড়াইত না।

ইদানীং গল্প শুনাইবার লোকাভাববশতঃ পরেশ নিজের লেখা গল্প নিজেই শোনে।

ইতিপূর্ব্বে যতগুলি গল্প সে মাসিকে ছাপাইতে পাঠাইয়াছে—সবগুলাই পত্রপাঠ ধন্যবাদসহকারে ফেরত আসিয়াছে। কিন্তু হতাশ হওয়া তাহার কোষ্ঠীতে লেখা নাই—সে উত্তমশীল—লাগিয়া থাকিতে জানে—আজিকালি না হোক একদিন সম্পাদকগণ তাহার গল্পের সমাদর করিবেন—এ বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

মাস দুই পূর্ব্বে "খেয়াঘাটে" শীর্ষক যে গল্পটি পাঠাইয়াছে—সেটির সংবাদ জানিবার জন্য প্রত্যহ পোষ্টাফিসে হাঁটাহাঁটি সুরু করিয়াছে। অতিরিক্ত বিলম্ব হওয়ার দরুণ এবার তাহার মনে আশা জন্মিয়াছে—গল্পটি হয়তো মনোনীত হইয়াছে। কিন্তু সঠিক সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছে না। পত্র লিখিতেও সাহস হইতেছে না—পাছে মন্দ সংবাদ আসে—হয়তো বা বিরক্ত হইয়া সম্পাদক মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি ফেরত পাঠাইয়া দেন। এই দ্বিধায় পড়িয়া কি যে করিবে তাহা সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে তাহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল—প্রত্যহই ভাবে কাল সংবাদ আসিবে—কিন্তু হায়, ঈপ্সিত সংবাদ আর আসিয়া পৌঁছায় না।

অবশেষে স্থির করিল—যা থাকে বরাতে, একখানি রিপ্লাই কার্ড এবার লিখিয়া ফেলিবে। ছয় পয়সা খরচ করিয়া লিখিল :—

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ই তারিখ—আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র "বিশ্ববন্ধু"র জন্য "খেয়াঘাটে" শীর্ষক যে একটি গল্প পাঠাইয়াছি—দুঃখের বিষয় সঙ্গে ষ্ট্যাম্প দেওয়া সত্ত্বেও সেটির বিচারফল এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। আপনার মতামত জানিবার জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখিলাম—আশা করি শীঘ্র উত্তর পাইব। ইতি বিনীত—পরেশ মিত্র

চিঠিখানি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দেওয়ার পর পরেশ কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। তিন চারি দিনের মধ্যে ফলাফল জানিতে পারিবে—যতদূর সম্ভব গল্পটি মনোনীত হওয়ার সংবাদই আসিবে। এবার মাসিকের পৃষ্ঠায় ছাপা গল্প দেখাইয়া শৈলবালার নয়নের নিদ্রা ছুটাইয়া দিবে।

তাহার স্বামী কেবল খাতার পৃষ্ঠায় মক্স করিয়াই দিন কাটায় না—সে একজন রীতিমত কথাসাহিত্যিক। "বিশ্ববন্ধু"তে গল্প ছাপানো কি সহজ কথা? ভগবদ্দত্ত প্রতিভা থাকা চাই। বীণাপাণির বিশেষ কৃপা না থাকিলে কেহ গল্পলেখক হইতে পারে না।

পাঁচদিন পরে উত্তর আসিল।

সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আপনার গল্পটি ভাদ্র সংখ্যা 'বিশ্ববন্ধু'তে ছাপাইতে দিয়াছি। যথাসময়ে মাসিক পাইবেন। বারান্তরে কোন গল্প লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি বিনীত—

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিঃ সঃ

চিঠিখানি হাতে করিয়া পড়িয়া দেখিয়া প্রথমটা পরেশের বিশ্বাস হইল না—মনে হইল স্বপ্ন দেখিতেছে—তাহার পর ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া পড়িয়া দেখিল—স্বপ্ন নহে—সত্যই তাহার "খেয়া-ঘাটে" মনোনীত হইয়াছে। আত্মগর্ব্বে তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল। বহুদিনের নির্জ্জন কল্পনা আজ সার্থক হইয়াছে।

পোষ্টাফিস হইতে এক রকম ছুটিতে ছুটিতে ঘরে আসিয়া শৈলবালাকে ডাকিয়া কহিল—"ওগো, শোন—শোন—ভারী একটা মজার খবর আছে—"

শৈলবালা আসিয়া কহিল—"কি খবর?"

তাহার হাতে চিঠিখানি দিয়া পরেশ কহিল—"পড়ে দেখ।"

চিঠি পড়িয়া শৈল বলিল—"তোমার গল্প ছাপা হবে—এতো সুখের বিষয়। ছাপা হয়ে আসুক—তখন শুনবো।" বলিয়া শৈলবালা হেঁসেল ঘরে গিয়া বঁটি পাতিয়া তরকারী কুটিতে বসিল। তরকারী কুটিবার উপযুক্ত সময়ই বটে!

পরেশ হেঁসেল ঘর পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া কহিল—"খাতাটা এনে হাতে লেখা গল্পটা একবার শোনাবো কি?"

গম্ভীর হইয়া শৈলবালা কহিল—"নাঃ—এখন আমার কাজ আছে।"

এত বড় একটা সংবাদ শৈলবালা এমন সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিল দেখিয়া পরেশ দুঃখিত হইল। শৈলবালার মধ্যে কি রসবোধ বলিয়া কোন পদার্থ নাই? সে ব্যাপারটা এমন ভাবে লইল—যেন ইহা একটি নিত্য-পরিচিত তুচ্ছ ঘটনা। ইহার মধ্যে স্বামীর যে কতটা কৃতিত্ব আছে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিল না। ধীরবুদ্ধি পরেশ মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল—ছাপা গল্প শুনাইয়া শৈলবালার অসাড় মানস-প্রকৃতিকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—তখন তাহার বিমুখ চিত্ত সহজেই গল্পের রসে আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। এখন ইহা লইয়া দুঃখ প্রকাশ করা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র।

সম্পাদকের চিঠি পাওয়ার পর হইতে পরেশের পোষ্টাফিস আনাগোনা কমিয়া গেল। একমাস পরে গল্পটাই যখন ছাপা হইয়া আসিবে তখন আর বৃথা পোষ্টাফিস হাঁটিয়া ফল কি?

প্রথম প্রথম সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত চিঠিখানি রাস্তার লোককে ধরিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছিল—শৈলবালার প্রবল আপত্তিতে সেটা বন্ধ হইয়াছে।

শ্রাবণ মাসটা এবার আর শেষ হইতে চাহে না। দিনগুলা যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া পরেশকে লইয়া রঙ্গ করে। মেঘের আড়ালে সূর্য্যদেব গুটি-সুটি হইয়া চোখ বুজিয়া ঝিমাইতে থাকেন—নড়িবার চড়িবার নামও করেন না। কতদিনে ভাদ্র মাস পড়িবে এবং তাহার সাধের "খেয়াঘাটে" বুকে করিয়া "বিশ্ববন্ধু" আসিয়া পৌঁছাইবে—পরেশ মনে মনে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আছে। "বিশ্ববন্ধু"র পৃষ্ঠায় নিজের ছাপানো গল্প দেখাইয়া সবাইকে এবার তাক্ লাগাইয়া দিবে।

ইতিমধ্যে খাতা খুলিয়া পাঁচ সাতবার গল্পটা পড়িয়া শৈলবালাকে শুনাইয়াছে—পরেশের পড়া শুনিয়া শুনিয়া গল্পটি শৈলবালার একরকম মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। পরেশ "বিশ্ববন্ধু"র পুরাতন গ্রাহক। তাহার গল্প ফেরৎ দেওয়ার জন্য বছর দুই পূর্ব্বে রাগ করিয়া একবার কাগজ ছাড়িয়া দিয়াছিল। গত বৎসর হইতে আবার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত

হইয়াছে। এতদিন যাহার পাঠকমাত্র ছিল—এবার তাহার লেখক হইতে চলিয়াছে। পদোন্নতি আর কাহাকে বলে? একেবারে পাঠক হইতে লেখকের পদটাতে উঠা—যাহার তাহার কর্ম্ম নহে।

দেবী ভারতী এতদিনে পরেশের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন বলিতে হইবে।

পরেশ সঙ্কল্প করিল গল্পটি ছাপা হইয়া আসিলে একটি টাকা ব্যয় করিয়া শ্বেতভুজা বীণাপাণির পূজা দিবে। পূজার দরুণ টাকাটি সে পৃথক রাখিয়া দিল। এই টাকা রাখার কথা সে গৃহিণীর কাছে গোপন রাখিল।

সব হইল, কিন্তু শ্রাবণ মাস কি এবার শেষ হইবে? ইংরাজিতে একটি প্রচলন আছে—An watched pan is long in boiling—যাহার জন্য অত্যন্ত আশা করা যায়—সেই অত্যন্ত দেরীতে আসে। অলসমেঘাচ্ছন্ন লম্বা লম্বা দিনগুলা আর যাইতে চাহে না। পরেশ দুই হাত দিয়া মন্থরগতি দিনগুলাকে পিছন দিকে ঠেলিতে লাগিল।

* * * * *

অবশেষে শ্রাবণ মাস ফুরাইল। গতকল্য বাঞ্ছিত ভাদ্র মাস পড়িয়াছে। পরেশ আশাপূর্ণ চিত্তে পোষ্টাফিসে গিয়া দেখিল—তাহার নামে "বিশ্ববন্ধু" এবং তৎসঙ্গে উক্ত আফিস হইতে একটি বুকপ্যাকেট আসিয়াছে। আবার বুকপ্যাকেট কেন? মনের তারগুলা যে সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল—সে সুর হঠাৎ যেন খাদে নামিয়া গেল।

কম্পিত হস্তে সে "বিশ্ববন্ধু" ও বুকপ্যাকেটটি তুলিয়া লইল। তাহার মুখের পানে তাকাইয়া নবাগত পোষ্টমাষ্টার তারাদাসবাবু বলিলেন—"পরেশবাবুর লেখা টেপার বাণ্ডিক আছে নাকি?"

পলকের জন্য পরেশের মুখের উপর একটা কালো ছায়া পড়িল—আমতা আমতা করিয়া কহিল—"হাঁ—মাঝে মাঝে—এই বুঝলেন কিনা—"

"ওঃ বুঝেছি!" বলিয়া তারাদাস নিজের কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে বক্র হাসি দেখা গেল নাকি?

বাড়ী আসিয়া নিজের শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া বুকপ্যাকেটটি খুলিয়া দেখিল—তাহার "খেয়াঘাটে" ফেরৎ আসিয়াছে। শেষের পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় মন্তব্যের স্থলে লাল কালীতে মোটা অক্ষরে লেখা আছে—"না"—

পরেশের বুকের মধ্যে কে যেন জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিল। অধিকন্তু তারাদাসবাবুর বিদ্রূপের হাসি মনে করিয়া তাহার প্রাণ ছিঁড়িয়া যেন রক্ত ঝরিতে লাগিল। হায়, যাহারা মনস্তত্ত্ব লইয়া কারবার করে—তাহারা পরের সামান্য হাসিও সহ্য করিতে পারে না।

সম্পাদক মহাশয় যদি জানিতেন, তাঁহার সামান্য একটু কলমের খোঁচায় একজন নিরীহ ভদ্রসন্তান এমন কাতর হইয়া পড়িবে তাহা হইলে হয়তো এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহারই বা অপরাধ কি? তাঁহাকে তো কঠিন দায়িত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে! অযোগ্য রচনাকে স্থান দিয়া তিনি তো আর কাগজের সুনাম নষ্ট করিতে পারেন না?

যাই হোক, বড় আশায় হতাশ হইয়া প্রথমটা খুব মুষড়াইয়া পড়িলেও পূর্ব্বাভ্যাস হেতু কিছুক্ষণ পরে এ আঘাত সে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সামলাইয়া উঠিল। Patience is a plaster for all sores.

অহিফুতার অবতার পরেশ আত্মস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিল—একমাস পূর্ব্বে "খেয়াঘাটে" মনোনীত হওয়ার সংবাদ দিয়া সম্পাদক মহাশয় যে চিঠি দিয়াছিলেন—তাহাতে কি তিনি অপরিচিত লেখকের সহিত রহস্য করিয়াছিলেন? দেশবিখ্যাত প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় যে তাহার সহিত রঙ্গ করিবেন—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হয় না। তবে সে চিঠি কি ভুল?

মোড়ক ছিঁড়িয়া 'বিশ্ববন্ধু' খুলিয়া "সূচীপত্রে" চোখ বুলাইয়া দেখিল—কিন্তু আশ্চর্য্য! এতক্ষণ সে বৃথায় কষ্ট পাইতেছিল, তাহার "খেয়াঘাটে" তো ছাপা হইয়াছে।

পরমুহূর্ত্তে লেখকের নাম দেখিয়া পরেশের সুখস্বপ্ন ছুটিয়া গেল—এই মুদ্রিত "খেয়াঘাটে"র লেখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক—শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার তাহার কাছে দিবালোকের মত স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। সম্পাদক মহাশয় কি মারাত্মক ভুলই করিয়াছিলেন? অদৃষ্টের পরিহাস আর কাহাকে বলে? Paresh Mitter যে কেমন করিয়া Naresh Mitterএ রূপান্তরিত হয় এ রহস্য এতদিনে উদ্ঘাটিত হইল।

একটা সান্ত্বনার কথা এই যে সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত—নামজাদা প্রবীণ সাহিত্যিক নরেশবাবুও "খেয়াঘাট" সম্বন্ধে মাথা ঘামান? তাহা হইলে পরেশের আর আক্ষেপ করিবার কোন হেতু নাই।

* * * * *

পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিল—দ্বিতীয় রবার্ট ব্রুস পরেশচন্দ্র কিন্তু হতাশ হইল না। এবার "খেয়াঘাটে" ছাড়িয়া "পল্লীবাটে" ধরিয়াছে—তাহাতে ধানের ক্ষেত, নদী তীর, তালবাগান, বেণুকুঞ্জ, পাখীর গান, খোলামাঠ, মহাজনী নৌকা, পায়ে চলা পথ, সানবাঁধানো দীঘি প্রভৃতি সব থাকিবে।

গল্পটি এখনো শেষ হয় নাই। শেষ হইলে আগামী মাসের পয়লা তারিখ—অর্থাৎ অগস্ত্যযাত্রার দিনে ছাপাইতে পাঠাইয়া দিবে—যেদিন কেহ কোথাও গেলে আর ফিরিয়া আসে না। হাঁ, গল্প পাঠাইবার পক্ষে অগস্ত্যযাত্রার দিনটাই প্রশস্ত বটে।

এবার তাহার সাহিত্য-সাধনা সার্থক হইবে না কি? দেবী ভারতীর পূজা আপততঃ মুলতবী রহিল।

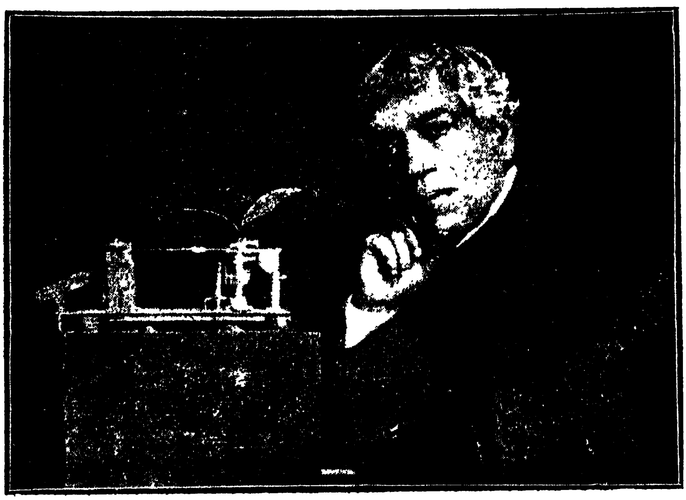
* * * * *

শৈলবালা কি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কিন্তু সে ঐ সম্বন্ধে পরেশকে কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করে নাই। শৈল কথাটা এমনি ভুলিয়া গিয়াছিল, না ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়াছিল—তাহা সেই জানে। পরেশও "খেয়াঘাট" লইয়া কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করে না। তবে ভাদ্র সংখ্যা "বিশ্ববন্ধু"খানি সে যে কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে—সেটার আর খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

সাময়িকী

পরলোকে জগদীশচন্দ্র—

বাঙ্গালার দুর্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালী মনীষিবৃন্দ একে একে নিজ নিজ কার্য সমাধা করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিতেছেন। বাঙ্গালার গর্ব করিবার যাহা ছিল, তাহা চলিয়া যাইতেছে—সম্মুখে শুধু গভীর অন্ধকার। সে অন্ধকারে আলো দেখাইবার লোক কোথায়? আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্রকে হারাইয়াছি; তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, আশুতোষও বাঙ্গালাকে দরিদ্র করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগে আমাদের গৌরবের আধার তিনজন—রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র; গত ৭ই অগ্রহায়ণ আমরা জগদীশচন্দ্রকে হারাইয়াছি। আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গত ২রা নভেম্বর গিরিডিতে গমন করেন; তথায় তিনি তাঁহার আত্মীয় অবসর-প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্রের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। ২৮শে নভেম্বর তাঁহার কলিকাতায় ফিরিবার কথা ছিল—৩০শে নভেম্বর বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে তাঁহার ৮০তম জন্মোৎসব ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল।



বিজ্ঞানাগারে—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

জগদীশচন্দ্র ২২শে নভেম্বর সোমবার পর্যন্ত বেশ সুস্থ ছিলেন। রাত্রি ১০টায় তিনি যথানিয়মে শয়ন করেন। মঙ্গলবার প্রাতে উঠিয়া স্নান করিতে যান। স্নানাগার হইতে ফিরিতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁহার পত্নী লেডী অবলা বসু স্নানাগারে গিয়া দেখেন, জগদীশচন্দ্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন; মঙ্গলবার বেলা ৮টা ১৫ মিনিটের সময় তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

সেইদিনই বেলা ১১টার সময় সেই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছিল। তাঁহার মৃতদেহ মোটরবাসে করিয়া গিরিডি হইতে কলিকাতায় আনা হয়। রাত্রি ৪টায় বাস বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে পৌঁছিয়াছিল। পরদিন বুধবার সকালে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সেই শব প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, তৎপরে প্রেসিডেন্সি ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং শেষে ক্রিমেটোরিয়ামে লইয়া যাওয়া হয়; তথায় বৈজ্ঞানিক প্রথায় বৈজ্ঞানিকের শব দাহ করা হইয়াছে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন; ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জগদীশচন্দ্র বাঙ্গালা পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন; তৎপরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। সেখানে মাত্র ৩ মাস অধ্যয়নের পর জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে তাঁহার ইংরাজি ও বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম এই বিদ্যালয়ে তাঁহাকে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু নিজ চেষ্টায় তিনি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি

স্কুলের শিক্ষা শেষ করিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হন; সে সময়ে খ্যাতনামা বিজ্ঞানাধ্যাপক ফাদার লাফোঁর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, তিনি বিলাত যাইয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবেন। কিন্তু পিতা ভগবানচন্দ্র তাঁহাকে বড় পণ্ডিত করিতে চাহেন; সেজন্য জগদীশচন্দ্রের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। সে সময়ে ভগবানচন্দ্রের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ায় তিনি অর্থ-কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন—অর্থাভাবের জন্য তিনি পুত্রকে বিলাত পাঠাইতে সম্মত হন নাই। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের মাতা নিজ অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া জগদীশচন্দ্রের বিলাত যাত্রার আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই জগদীশচন্দ্র বিলাত গমন করেন। বিলাতে যাইয়া প্রথমে তিনি ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁহাকে ডাক্তারি পড়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তখন তিনি লণ্ডন হইতে কেম্ব্রিজে যাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন ও বৃত্তি পাইয়া ক্রাইষ্ট কলেজে বিজ্ঞান পড়িতে লাগিলেন। একই সময়ে তিনি কেম্ব্রিজের ট্রাইপস ও লণ্ডনের বি-এস-সি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিলাত হইতে জগদীশচন্দ্র ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপনের নামে এক পত্র আনিয়াছিলেন। সিমলায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাত করিয়া তিনি বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা বিভাগে চাকরীর জন্য সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে ভারতবাসীদিগকে সরাসরিভাবে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হইত না। জগদীশচন্দ্রকে বড়লাটের অনুরোধে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে শ্বেতাঙ্গদিগের বেতনের অর্দ্ধেক বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জগদীশচন্দ্র তাহার প্রতিবাদে বেতন গ্রহণ বন্ধ করিয়া আন্দোলন করিতে থাকেন ও পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সমস্ত টাকা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এদিকে জগদীশচন্দ্রের পিতা নানাপ্রকার ব্যবসা করিতে যাইয়া শেষে বহু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; জগদীশচন্দ্র সেই ঋণশোধের জন্য দেশের সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দেন; মাতার নিকট যাহা কিছু ছিল, সকলই দেনা-শোধের জন্য ব্যয় করেন এবং চাকরীর প্রথম ৯ বৎসরকাল নিজের বেতনের কতকাংশও দেনাশোধের জন্য দিয়াছিলেন।

তাঁহার অধ্যাপনা প্রণালীতে ছাত্রগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হওয়ায় দিন দিন তাঁহার সুনাম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং শিক্ষা-বিভাগের যাঁহারা তাঁহার নিয়োগে আপত্তি করিয়াছিলেন তাঁহারাই স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে স্থায়ীভাবে অধ্যাপকের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। দেনা পরিশোধের পর এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল এবং তাহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার মাতৃদেবীও স্বধামে গমন করিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্মতিথি ৩০শে নভেম্বর তারিখে তিনি নূতন জ্ঞানের সন্ধানের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করেন ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীতে তাঁহার মৌলিক গবেষণার বিবরণ পাঠ করেন। তাঁহার গবেষণার ফল শীঘ্রই বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং বিলাতের রয়াল সোসাইটী তাঁহার গবেষণা ছাপিবার ভার লইলেন ও গবেষণা চালাইবার জন্য জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। সেই সময় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এস-সি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র প্যারিসে বিজ্ঞান কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হন; সেই সময়ে তিনি লণ্ডনে যাইয়া ও অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং উভয় স্থানেই তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনা, কালিফোর্ণিয়া, নিউ ইয়র্ক, হার্ভার্ড, কলম্বিয়া, চিকাগো প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বীয় গবেষণার কথা সর্ব্বত্র জানাইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে ডি-এস-সি উপাধি প্রদান করা হয়।

বেতার টেলিগ্রাফ জগদীশচন্দ্রের মহান আবিষ্কার বটে, কিন্তু উদ্ভিদে প্রাণের অস্তিত্বই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

জগদীশচন্দ্র তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য শুধু তাঁহার দেশবাসীরাই তাঁহাকে নানাপ্রকারে সম্মানিত করেন নাই—গভর্ণমেণ্ট ও তাহাকে নানারূপ সম্মানসূচক উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি

সি-আই-ই, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সি-এস-আই ও ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে নাইট (সার) উপাধি লাভ করেন।

জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ইহা সর্বজনবিদিত—সমগ্র পৃথিবীর লোক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট তাঁহার আর একটী পরিচয় আছে—জগদীশচন্দ্র সাহিত্যসেবী ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিরূপে যাহাতে বাঙ্গালাদেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা বাঙ্গালা ভাষাতেই তাঁহাদের গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন সেই জন্য জগদীশচন্দ্র একাধিকবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মারফত বাঙ্গালীর নিকট আবেদন জানাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অব্যক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় এ বিষয়ে তাঁহার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি সুস্পষ্ট। তিনি লিখিয়াছেন—"ভিতরের ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সেই ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষে বিবিধ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে, সেখানে বাদ প্রতিবাদ কেবল ইউরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এদেশেও প্রিভি কাউন্সিলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল হয় ত এ জীবনে দেখিব না; প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরের ভবিষ্যত বিধাতার হস্তে। বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত



জগদীশচন্দ্রের শবের শোভাযাত্রা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে

জগদীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে।"

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগদীশচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

করিলাম। চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত, তাহার দু-একটি কাহিনী বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি লেখা মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

এই 'অব্যক্ত' বাঙ্গালা ভাষায় জগদীশচন্দ্রের অমর দান। এই পুস্তকের 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' নামক প্রবন্ধ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তরুণ বিদ্যার্থীদের পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র স্বচ্ছ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় জীবজগৎ, বস্তুজগৎ, নভোবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কিত বহু জটিল বিষয়কে বোধগম্য করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ শিশুদিগের উপযোগী করিয়া সরল ভাষায় লিখিতে জগদীশচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এককালে বাঙ্গালার শিশুদিগের জন্য তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। গাছের কথা, উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু, মন্ত্রের সাধন প্রভৃতি প্রবন্ধ শিশুসাহিত্যে তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। 'পলাতক তুফান' পাঠ করিলে হাস্যরসিক জগদীশচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

সাহিত্য বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা জগদীশচন্দ্র ভাল করিয়া বলিয়াছেন—"আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এইস্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব; সেই জন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।"

জগদীশচন্দ্রের এই সাহিত্যানুরাগের সঙ্গে স্বদেশানুরাগও প্রবলভাবেই বিদ্যমান ছিল। নিম্নের একটি ঘটনা হইতে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়।

একবার জগদীশচন্দ্র বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে তাঁহার কয়েকজন ইউরোপীয় বন্ধুকে অভিনন্দন উপলক্ষে কলিকাতার কতিপয় খ্যাতনামা ব্যায়ামবীরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ সকল শ্বেতাঙ্গ অতিথির সম্মুখে ভারতের অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা সম্বন্ধে ক্ষেদ প্রকাশ করায় জগদীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"আমাদের দোষ ত্রুটি যাহা আছে, তাহা আমরা জানি। আমরা নিজেদের দ্বারা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে পারি ভাল, না পারিলে অনর্থক বিদেশীদের নিকট বলিয়া অসম্মান কুড়াই কেন? উহারা দেশে ফিরিয়া খবরের কাগজে আপনাদের কথাগুলিকে আরও বাড়াইয়া ফলাও করিয়া লিখিবে—ভারতবর্ষ একটী বর্ব্বর দেশ।"

এই সকল ঘটনা কি তাঁহার গভীর দেশপ্রেমের পরিচায়ক নহে।

জগদীশচন্দ্র শুধু নিজে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। এ দেশে যাহাতে চিরদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলে, তিনি তাহার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সারাজীবনের সঞ্চয় ১৭ লক্ষ টাকা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পরই তিনি এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। সুসজ্জিত গবেষণাগার না থাকিলে বৈজ্ঞানিককে যে কত কষ্ট পাইতে হয়, তাহা তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ভালরূপ শিক্ষা করেন। প্রাচীন ভারতের তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতির আদর্শে ইহা গঠিত। এই মন্দির তিনি বিলাতী শিল্প-পদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত না করিয়া প্রাচীন ভারতীয় শিল্প পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত করেন। শিল্পী শ্রীযুত নন্দলাল বসু প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে এই মন্দির চিত্রিত করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি জগদীশচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ এই গবেষণাগারের নির্ম্মাণের মধ্যে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

জগদীশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, বিলাতে শিক্ষিত, এই কারণে কেহ কেহ তাঁহাকে বিলাতী ভাবাপন্ন মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণ স্বদেশী ছিল।

জগদীশচন্দ্র খাঁটি ভারতীয় সাধক। তিনি জানিতেন, প্রাচীন ভারত হইতে অনুপ্রেরণা পাইতে হইলে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি পরিদর্শন করা আবশ্যক। সেজন্য জগদীশচন্দ্র ভারতের প্রাচীন তীর্থগুলি দর্শন করিয়াছিলেন। নালন্দা, তক্ষশীলা, গয়া, অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করিয়াই জগদীশচন্দ্র তাঁহার বসু বিজ্ঞান-মন্দির

স্থাপনের অনুপ্রেরণা পান। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার পত্নী লেডী অবলা বসুকে সঙ্গে লইয়া তুষারাবৃত কেদারনাথ ও বদরীকাশ্রম দর্শন করিতেও গিয়াছিলেন। তাহার নিকট হিমানীক্ষেত্র দেখিয়া নন্দাদেবী, ত্রিশূল প্রভৃতি পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলেন। সেই কাহিনী তিনি নিজে তাঁহার একটি প্রবন্ধে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র প্রথম নালন্দা দেখিতে যান। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা ও অধ্যাপক (পরে সার) যদুনাথ সরকার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তখন বিহার সরিফ পর্য্যন্ত মাত্র রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় নালন্দা গিয়াছিলেন ও সেখান হইতে রাজগীরে যাইয়া তথায় এক পক্ষ কাল বাস করিয়াছিলেন।

আচার্য্য বসু তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল ইংরাজি ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—(১) Response in the Living and Non-Living (২) Plant Response (৩) Comparative Electro-Physiology (৪) Researches on Irritabity of Plants.

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের পর হইতে আচার্য্য বসু তাঁহার গবেষণার ফল Transactions of the Bose Institute পুস্তকে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। উহা প্রতি বৎসর এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হয়। উহাতে (১) Life Movements in Plants (২) Motor Mechanisms of Plants (৩) Growth and Tropic Movements of Plants প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে ফরিদপুরের একটি খেজুর গাছের অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই গাছটি সকালে মস্তক তুলিত ও সন্ধ্যার সময় মাথা নত করিয়া মাটি স্পর্শ করিত। সকলে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারায় পরিশেষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে এ বিষয় জানান হয়। তিনি এই খেজুর গাছটি পরীক্ষা করিয়া ইহার নাম দেন "প্রার্থনারত খেজুর গাছ।" এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে সকল গাছেরই অনুভব শক্তি আছে। একথা পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন হইল ফরিদপুরের খেজুর বৃক্ষ আমার কথা প্রমাণ করিয়াছে। এই গাছটি প্রত্যূষে মস্তক উত্তোলন করিত, আর সন্ধ্যার সময় মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। ইহা যে গাছের বাহিরের পরিবর্ত্তনের অনুভূতি-জনিত, তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি যখন দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইল, যখন বিদেশী বৈজ্ঞানিকরাও তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইলেন, তখন বাঙ্গালা দেশেও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বসু ও তাঁহার পত্নী ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্রগণ তাঁহার সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ১লা ডিসেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঐ উপলক্ষে একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

এইখানে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল—কবি যে ভাবে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পর আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে না—

"ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলি তলে?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জন-কোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্র মাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র পশুপক্ষী ধূলার প্রস্তরে—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে। মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতি দূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পর-বাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীত কণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে? আপনার শুদ্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে? সংযত গম্ভীর করি মন,

ছিলে রত তপস্যায় অরূপ রশ্মির অন্বেষণে
লোক লোকান্তের অন্তরালে—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড় হাতে
হে তপস্বী, ডাক তুমি সাম মন্ত্রে জলদ-গর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত নিবোধত"। ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন, দ্বন্দ্বহীন, শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।

নূতন মোহান্তের কার্য্যভার গ্রহণ—

তারকেশ্বরের মোহান্ত ও তাঁহার সম্পত্তি লইয়া এতদিন ধরিয়া যে মামলা-মোকদ্দমা চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহা শেষ হইয়াছে ও গত ২৮শে নভেম্বর নূতন মোহান্ত দণ্ডী স্বামী জগন্নাথ আশ্রম কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। হাইকোর্টের নির্দ্দেশমত নিম্নলিখিত ১০জন সদস্যকে লইয়া তারকেশ্বর-পরিচালন-কমিটী গঠিত হইয়াছে—(১) নূতন মোহান্ত (২) শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম এ-বি-চট্টোপাধ্যায় আই সি-এস (৩) উত্তর পাড়ার জমীদার শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় (৪) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (৫) ডাক্তার আশুতোষ দাস (৬) পণ্ডিত শরৎচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (৭) শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ সিংহ রায় (৮) শ্রীযুক্ত এককড়ি মুখোপাধ্যায় (৯) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও (১০) শ্রীযুত জি-সি-বাগারিয়া। মোহান্ত মহারাজ এই কমিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ আগামী ৩ মাসের জন্য কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ দিনই নূতন মোহান্ত রিসিভারের নিকট হইতে সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ও রিসিভার শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে ৩ মাসের জন্য সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইয়াছে। নূতন মোহান্ত ত্যাগী সন্ন্যাসী—তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার এই বিরাট দেবস্থান পবিত্রতায় পূর্ণ হইলে বাঙ্গালী মাত্রের পক্ষেই তাহা আনন্দের ও গৌরবের বিষয় হইবে। নূতন মোহান্ত বাঙ্গালী—ইহাও বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়—

গত ৭ই নভেম্বর উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার রচিত ভীষ্মমহাদর্শন, মৃত্যুপথ, গো-গঙ্গা-গায়ত্রী, সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

লণ্ডনে হিন্দু মন্দির ও আশ্রম—

লণ্ডন সহরে ভারতের হিন্দু অধিবাসীদিগের জন্য একটি মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। ঐ আশ্রমে উপাসনা গৃহ, বক্তৃতা-হল, পুস্তকাগার প্রভৃতিও থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার গৌড়ীয় মিশনের একজন সন্ন্যাসী লণ্ডনে যাইয়া ঐ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজা সার বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থাটি পূর্ণ করিতে এখনও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য ভারতের বহু খ্যাতনামা হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দুর এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যটির জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

আমীর আমানুল্লার শুভেচ্ছা—

গত অক্টোবর মাসে দিল্লীর খ্যাতনামা সংবাদপত্রসেবী শ্রীযুত চমনলাল রোমে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট আমীর আমানুল্লার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমানুল্লা বর্ত্তমানে রোমের বিলাসীদিগের পাড়ায় এক বাংলোতে বাস করেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসিতেন বলিয়াই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে। বৃটেন সন্দেহ করিত, তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান একই দেশ ছিল—উভয় দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে সম্পর্ক বিদ্যমান।" আমানুল্লা ও তাঁহার পত্নী

স্থাপনের অনুপ্রেরণা পান। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার পত্নী লেডী অবলা বসুকে সঙ্গে লইয়া তুষারাবৃত কেদারনাথ ও বদরীকাশ্রম দর্শন করিতেও গিয়াছিলেন। তাহার নিকট হিমানীক্ষেত্র দেখিয়া নন্দাদেবী, ত্রিশূল প্রভৃতি পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিলেন। সেই কাহিনী তিনি নিজে তাঁহার একটি প্রবন্ধে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র প্রথম নালন্দা দেখিতে যান। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা ও অধ্যাপক (পরে সার) যদুনাথ সরকার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তখন বিহার সরিফ পর্য্যন্ত মাত্র রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় নালন্দা গিয়াছিলেন ও সেখান হইতে রাজগীরে যাইয়া তথায় এক পক্ষ কাল বাস করিয়াছিলেন।

আচার্য্য বসু তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল ইংরাজি ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—(১) Response in the Living and Non-Living (২) Plant Response (৩) Comparative Electro-Physiology (৪) Researches on Irritability of Plants.

বসু-বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের পর হইতে আচার্য্য বসু তাঁহার গবেষণার ফল Transactions of the Bose Institute পুস্তকে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। উহা প্রতি বৎসর এক এক খণ্ড করিয়া প্রকাশিত হয়। উহাতে (১) Life Movements in Plants (২) Motor Mechanisms of Plants (৩) Growth and Tropic Movements of Plants প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে ফরিদপুরের একটি খেজুর গাছের অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই গাছটি সকালে মস্তক তুলিত ও সন্ধ্যার সময় মাথা নত করিয়া মাটি স্পর্শ করিত। সকলে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারায় পরিশেষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে এ বিষয় জানান হয়। তিনি এই খেজুর গাছটি পরীক্ষা করিয়া ইহার নাম দেন "প্রার্থনারত খেজুর গাছ।" এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে সকল গাছেরই অনুভব শক্তি আছে। একথা পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন হইল ফরিদপুরের খেজুর বৃক্ষ আমার কথা প্রমাণ করিয়াছে। এই গাছটি প্রত্যূষে মস্তক উত্তোলন করিত, আর সন্ধ্যার সময় মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। ইহা যে গাছের বাহিরের পরিবর্ত্তনের অনুভূতি-জনিত, তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি যখন দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইল, যখন বিদেশী বৈজ্ঞানিকরাও তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইলেন, তখন বাঙ্গালা দেশেও তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বসু ও তাঁহার পত্নী ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্রগণ তাঁহার সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ১লা ডিসেম্বর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঐ উপলক্ষে একটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

এইখানে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল—কবি যে ভাবে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পর আর কিছু বলিবার থাকিতে পারে না—

"ভারতের কোন বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য জগদীশ ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলি তলে ?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জন-কোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্র মাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র পশুপক্ষী ধূলার প্রস্তরে—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে। মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতি দূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পর-বাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীত কণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে ? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে ? সংযত গম্ভীর করি মন.

ছিলে রত তপস্যায় অরূপ রশ্মির অন্বেষণে
লোক লোকান্তের অন্তরালে—যেথা পূর্ব্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড় হাতে
হে তপস্বী, ডাক তুমি সাম মন্ত্রে জলদ-গর্জ্জনে
"উত্তিষ্ঠত নিবোধত"। ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ড তর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন, দ্বন্দ্বহীন, শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।

নূতন মোহান্তের কার্য্যভার গ্রহণ—

তারকেশ্বরের মোহান্ত ও তাঁহার সম্পত্তি লইয়া এতদিন ধরিয়া যে মামলা-মোকদ্দমা চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহা শেষ হইয়াছে ও গত ২৮শে নভেম্বর নূতন মোহান্ত দণ্ডী স্বামী জগন্নাথ আশ্রম কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। হাইকোর্টের নির্দ্দেশমত নিম্নলিখিত ১০জন সদস্যকে লইয়া তারকেশ্বর-পরিচালন-কমিটী গঠিত হইয়াছে—(১) নূতন মোহান্ত (২) শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম এ-বি-চট্টোপাধ্যায় আই সি-এস (৩) উত্তর পাড়ার জমীদার শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় (৪) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (৫) ডাক্তার আশুতোষ দাস (৬) পণ্ডিত শরৎচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (৭) শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ সিংহ রায় (৮) শ্রীযুক্ত এককড়ি মুখোপাধ্যায় (৯) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও (১০) শ্রীযুত জি-সি-বাগারিয়া। মোহান্ত মহারাজ এই কমিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ আগামী ৩ মাসের জন্য কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঐ দিনই নূতন মোহান্ত রিসিভারের নিকট হইতে সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন ও রিসিভার শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে ৩ মাসের জন্য সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত করা হইয়াছে। নূতন মোহান্ত ত্যাগী সন্ন্যাসী—তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার এই বিরাট দেবস্থান পবিত্রতায় পূর্ণ হইলে বাঙ্গালী মাত্রের পক্ষেই তাহা আনন্দের ও গৌরবের বিষয় হইবে। নূতন মোহান্ত বাঙ্গালী—ইহাও বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়—

গত ৭ই নভেম্বর উত্তরপাড়ার খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৭৩ বৎসর বয়সে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার রচিত ভীষ্মমহাদর্শন, মৃত্যুপথ, গো-গঙ্গা-গায়ত্রী, সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

লণ্ডনে হিন্দু মন্দির ও আশ্রম—

লণ্ডন সহরে ভারতের হিন্দু অধিবাসীদিগের জন্য একটি মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। ঐ আশ্রমে উপাসনা গৃহ, বক্তৃতা-হল, পুস্তকাগার প্রভৃতিও থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার গৌড়ীয় মিশনের একজন সন্ন্যাসী লণ্ডনে যাইয়া ঐ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পর ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজা সার বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু ব্যবস্থাটি পূর্ণ করিতে এখনও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য ভারতের বহু খ্যাতনামা হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, হিন্দুর এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যটির জন্য অর্থের অভাব হইবে না।

আমীর আমানুল্লার শুভেচ্ছা—

গত অক্টোবর মাসে দিল্লীর খ্যাতনামা সংবাদপত্রসেবী শ্রীযুত চমনলাল রোমে আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট আমীর আমানুল্লার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমানুল্লা বর্ত্তমানে রোমের বিলাসীদিগের পাড়ায় এক বাংলোতে বাস করেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসিতেন বলিয়াই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে। বৃটেন সন্দেহ করিত, তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান একই দেশ ছিল—উভয় দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে সম্পর্ক বিদ্যমান।" আমানুল্লা ও তাঁহার পত্নী

তথায় তাঁহাদের তিনটি পুত্র ও ছয়টি কন্যা—মোট নয়টি সন্তান লইয়া বাস করেন। পুত্রকন্যাদের শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহাদের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। অর্থাভাবে তাঁহারা পুত্রকন্যাদিগকে উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশান্তরে প্রেরণ করিতে পারেন না। সিংহাসনচ্যুত হইয়াও আমানুল্লা যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি বজায় রাখিয়াছেন, ইহাই ভারতবাসীর পক্ষে সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করে।

হরেন্দ্রলাল রায়—

গত ১৫ই আশ্বিন ভাগ্যকুলের জমীদার রায় বাহাদুর হরেন্দ্রলাল রায় পরলোক গমন করিয়াছেন। শিক্ষা বিস্তার ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা



রায়বাহাদুর হরেন্দ্রলাল রায়

দান করিয়া গিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের হরেন্দ্রলাল কলেজ, হরেন্দ্রলাল উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, রোণাল্ডসে পার্ক প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

বাঙ্গালায় মাছের ব্যবসা—

বাঙ্গালী মাছ-ভাত খাইয়া সাধারণতঃ জীবনধারণ করে; কিন্তু ক্রমে এদেশে মাছ এত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হইতেছে যে এখন আর লোক মাছ-ভাতও খাইতে পায় না। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে মাছের সরবরাহ বৃদ্ধির উপায় স্থির করিবার জন্য একজন মাদ্রাজী বিশেষজ্ঞকে এদেশে আনয়ন করিয়াছেন। তিনি ইউরোপের নানা স্থান ঘুরিয়া সে দেশের মাছের চাষ ও ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন; তিনি মাদ্রাজের সরকারী মৎস্য বিভাগে ২২ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। সুজলা সুফলা বাঙ্গালা দেশে যে একটু চেষ্টা করিলেই প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই চেষ্টায় দেশের যুবকগণকে প্রবৃত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত বেসরকারী ভাবেই এ চেষ্টা চলিতেছিল; এখন গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অবহিত হওয়ায় আশা করা যায় যে—অচিরে মাছের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া বহু শিক্ষিত বেকার বাঙ্গালী যুবক জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইবে।

কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ—

কংগ্রেসের প্রতি দেশের লোকের অনুরাগ যে দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। গত বৎসর যে স্থলে সমগ্র ভারতে ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ১ শত ৩১ জন লোক কংগ্রেসের সদস্য হইয়াছিলেন, এ বৎসর সে স্থলে ৩১ লক্ষ ৩৪ হাজার ২ শত ৮৯ জন লোক কংগ্রেসের সদস্য হইয়াছেন। ব্রহ্ম ও সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস-সদস্যের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই—তাহাদের লইয়া মোট সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে। ভারতের ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস নেতারা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করায় দেশের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই ভাবে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে কংগ্রেসে যে অবশিষ্ট কয়টি প্রদেশেও মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবেন তাহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

চিন্তার বিষয়—

বাঙ্গালী জাতি বর্ত্তমানে সকল কার্য্যক্ষেত্রে যে কেন অন্যান্য দেশের লোকের নিকট পরাজিত হইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইতেছে, তাহা প্রকৃতই দেশবাসীর প্রধান চিন্তার বিষয়। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অক্সফোর্ড মিশন হোষ্টেলের এক ছাত্রসভায় বলিয়াছেন—বাঙ্গালার যুবকগণকে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী যুবকগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া হিন্দুদের মধ্যে—যে দারুণ বেকার-

সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার জন্য বাঙ্গালী যুবকগণকে কৃষি বাণিজ্যাদির পথ গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙ্গালী যুবকগণ যাহাতে কৃষি ও বাণিজ্য শিক্ষার সুবিধা পায়, সেজন্যও বিশ্ববিদ্যালয় অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল কি হইবে বলা যায় না। সত্যই কি বাঙ্গালী জাতি জীবন-সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে?

দ্রবময়ী ঘোষ—

ঢাকার স্বর্গত উকীল লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষের বিধবা পত্নী দ্রবময়ী ঘোষ গত ১৬ই অক্টোবর ৯৭ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যে যুগে



দ্রবময়ী ঘোষ

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুগের আদর্শ গৃহিণী ছিলেন। তাঁহার ৪ পুত্র—রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার জে-এন-ঘোষ, ডাঃ এস-এন-ঘোষ ও ব্যারিষ্টার এচ-এন-ঘোষ ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

চিত্তরঞ্জন কটন মিল—

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে গত ১২ই নভেম্বর চিত্তরঞ্জন কটন মিলের শুভ উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় উৎসবে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। বস্ত্র শিল্পে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বসু উক্ত কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার; তিনি উৎসবে জানাইয়াছেন—বাঙ্গালায় যে পরিমাণ বস্ত্র প্রয়োজন হয়, তাহার মাত্র শতকরা ৬ ভাগ বস্ত্র বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন হয়; কাজেই বাঙ্গালায় এখনও বহু কাপড়ের কল নির্ম্মাণ হওয়া প্রয়োজন। আচার্য্য রায় মহাশয় বাঙ্গালার ধনীদিগকে অল্প সুদে বা বিনা সুদে ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া তাহা বাঙ্গালীর পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত করিতে উপদেশ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার শহীদুল্লাহ প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম-পূত এই মিলটি যাহাতে কর্ম্মীদিগের পরিশ্রম, সাধুতা ও মিতব্যয়িতার ফলে দিন দিন উন্নতিলাভ করে, দেশবাসী সকলের সেজন্য সহযোগিতা করা উচিত।

পরিণত বয়সে পরলোক প্রাপ্তি—

কলিকাতার বিখ্যাত এটর্ণী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মাতৃদেবী গত ২৮শে কার্ত্তিক রবিবার ১০১ বৎসর বয়সে তাঁহাদের গুপ্তিপাড়ার পৈত্রিক বাসভবনে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অকালমৃত্যুর দেশ বাঙ্গালায় এরূপ দীর্ঘজীবন ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদান—

ভারতবর্ষের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে মহাত্মা গান্ধী এবার কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া রাজবন্দীদিগের মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অসুস্থ দেহ লইয়াও সেজন্য তাঁহাকে নানা স্থানে ছুটাছুটি করিতে হইয়াছিল এবং চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্বেও বাঙ্গালার মন্ত্রীদিগের সহিত দীর্ঘকাল তাঁহাকে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইয়াছিল। আনন্দের বিষয় এই যে, গান্ধীজির এই চেষ্টা আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডারসনের সহিত গান্ধীজির আলোচনার ফলে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ১১শত রাজবন্দীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে এই সকল রাজবন্দীর আরও পূর্ব্বেই মুক্ত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তথাপি এই বিলম্বিত মুক্তিতেও আমরা আনন্দিত। আরও সাড়ে ৪শত রাজবন্দী সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন; গান্ধীজি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিলে ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে তবেই ঐ সাড়ে ৪শত বন্দী মুক্তিলাভ করিবেন। আমরা এই প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্য বুঝিতে অসমর্থ এবং বিশ্বাস করি, এই ১১শত বন্দীকে মুক্তি দান করিয়া গভর্ণমেণ্ট যদি বিপন্ন না হইয়া থাকেন, তবে আরও সাড়ে ৪শত বন্দী মুক্তিলাভ করিলেও তাঁহারা বিপন্ন হইবেন না। দেশে শান্তির আবহাওয়া প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, তাহা কি এখনও গভর্ণমেণ্ট বুঝিতেছেন না।

আকাশ পথে ভারত আক্রমণ—

জাপান কর্ত্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ায় চীনে যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ওদিকে ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার এবং ইটালীর সহিত জার্ম্মানী ও জাপানের গোপন চুক্তির ফলে একদল লোকের ধারণা হইয়াছে, এখন জাপান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণও আর অসম্ভব নহে। চীনে জাপান কর্ত্তৃক বৃটীশ স্বার্থ নষ্ট হওয়া সত্বেও বৃটেন তাহার কোন প্রতিবাদ করে নাই। সর্ব্বোপরি, সম্প্রতি করাচীতে জনসাধারণকে 'উড়োজাহাজের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা' শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই সকল ঘটনা মিলিয়া ভারতে জনগণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতাতেও নাকি শীঘ্রই করাচীর মত 'আত্মরক্ষা' শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইউরোপে গত মহাযুদ্ধে বহু লোকক্ষয়ের পর সকল জাতিই আত্মরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। যুদ্ধ হউক বা না হউক, আকাশ হইতে বোমা আক্রমণের সম্ভাবনা থাক বা নাই থাক, লোককে সেই সকল বিপদ হইতে আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা দিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। ভারতেও ঠিক একই কারণেই করাচীতে লোককে 'আত্মরক্ষা' শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আকাশ পথে বৃটেনের কোন শত্রু যে অবিলম্বে ভারত আক্রমণ করিবে, এমন কোন সম্ভাবনা বর্ত্তমানে নাই। কাজেই কলিকাতায়ও যদি লোককে আত্মরক্ষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, তাহাতেও জনসাধারণের শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই।

আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন—

এলাহাবাদ হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য জে-বি কৃপালানী জানাইয়াছেন, কংগ্রেসের আগামী সাধারণ অধিবেশনের তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; আগামী ১৯শে, ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারী গুজরাটের হরিপুরা গ্রামে কংগ্রেস হইবে। তৎপূর্ব্বে ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী তথায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইবে। ইতিমধ্যে নাগপুরে আর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইবে না।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বাঙ্গালা—

আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার কিছুদিন হইতে "বাঙ্গালা ভাষার ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা" সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। তিনি গত ৫ই ডিসেম্বর রবিবাসরের এক অধিবেশনে ঐ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতাও করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী ভাষা যাহাতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হয়, সেজন্য একদল লোক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; ঐ দলের অন্যতম নেতা কাকা কালেলকার কলিকাতায় আসিয়া যখন তাঁহার বক্তব্য জানাইয়াছিলেন, তখন তাহার উত্তরে প্রফুল্লবাবু ও "বাঙ্গালা ভাষা কি কারণে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য" তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যে কারণে হিন্দুস্থানী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা চলিতেছে, বাঙ্গালা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রফুল্লবাবু এ বিষয়ে যে সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া যদি বাঙ্গালার পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে লোক তাঁহার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বুঝিতে পারিবে। বাঙ্গালা এখন ভারতের অন্যান্য বহু প্রদেশের তুলনায় সকল বিষয়েই হীন হইয়া পড়িয়াছে—প্রফুল্লবাবুর চেষ্টায় যদি বাঙ্গালা ভাষা ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়া গৃহীত হয়, তবে তাহার ফলে বাঙ্গালার লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন—

গত ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্যোগে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে হইয়া গিয়াছে। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা সমগ্র জগতে প্রচারের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা-দিগের উদ্যম অতি প্রশংসনীয়। আমাদের কিছুই ছিল না এবং এখনও নাই, এইরূপ মনোভাবের অবশ্য অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু এইরূপ সম্মেলনের অধিবেশন সময়ে সময়ে হইলে এই মনোভাব আরও দ্রুত দূর হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। এইরূপ সম্মেলনের আরও প্রয়োজন আছে—বিভিন্ন স্থান হইতে পণ্ডিতগণ একত্র মিলিয়া পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করিবার সুযোগ পান। কেবল ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে নয়, ভারতের বাহিরেরও কোনও কোনও স্থান হইতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণ এই সম্মেলনে 'ডেলিগেট' নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেশের ধনবানগণ ভারতীয় সংস্কৃতির নামে যেরূপ বিরক্ত হইতেন এখন আর সেরূপ অবস্থা নাই; বরং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রমুখ অনেক ধনবানই এই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট অবহিত হইয়াছিলেন। ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যার সময় সার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভা-পতিত্বে সম্মেলনের সাধারণ সভা হইয়া গেলে ৫ই হইতে ৭ই পর্য্যন্ত তিন দিন ধরিয়া ১২টি শাখা-সভার অধিবেশন হয়। এই শাখা-সভাগুলির নাম—(১) বৈদিক, (২) শিল্প ও স্থাপত্য, (৩) ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, (৪) দর্শন, (৫) সংস্কৃত, (৬) আরব্য ও পারসিক, (৭) বৌদ্ধ, (৮) জৈন, (৯) বাঙ্গালা, (১০) ভারতীয় বাস্তব বিজ্ঞান, (১১) জরুসৃতীয়, ও (১২) আয়ুর্ব্বেদ। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, মৌলভী হিদায়েৎ হোসেন, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত ডি, এন্ ওয়াদিয়া এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয়গণ যথাক্রমে ঐ সকল শাখা-সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। এই সকল বিভিন্ন শাখায় অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করা হয়। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, শ্রীযুক্ত টি, পি রাজু (অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ-গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মণিলাল প্যাটেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ—

কলিকাতায় পরলোকগত সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য যে কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটীর নির্দ্দেশে মাদ্রাজ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল



সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি

শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় সার সুরেন্দ্রনাথের একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তির চিত্র আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। মূর্ত্তির পার্শ্বেই দেবীপ্রসাদ-বাবুও দণ্ডায়মান আছেন। মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া কলিকাতায় আসিলে তাহা নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি বহু পূর্ব্বেই কলিকাতায় স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল; যাহা হউক—"একেবারে না হওয়ার অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া ভাল" এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া আমরা মনকে প্রবোধ দিতে পারি।

বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর—

বাঙ্গালার নূতন গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ ও তাঁহার পত্নী গত ২৭শে নভেম্বর কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। লর্ড ব্রাবোর্ণ ভারতের শাসন-ব্যাপারে অপরিচিত বা অনভিজ্ঞ নহেন; তিনি ইতিপূর্ব্বে বোম্বায়ের গভর্ণর থাকিয়া কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা আজ নানা দারুণ সমস্যার সম্মুখে উপস্থিত—তাঁহার হস্তে বাঙ্গলার বিবিধ সমস্যার সমাধান হইবে কি? আমরা নূতন গভর্ণরকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

নূতন শিক্ষা-বিলের গলদ—

বাঙ্গালা দেশের উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী তথা শিক্ষা সচিব যে নূতন বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বঙ্গবাসী-মাত্রই দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে স্যাডলার কমিশন এদেশে আসিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন; তাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষার ভার নূতন বোর্ড গঠন করিয়া তাহার উপর অর্পণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডও গঠিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালায় যে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, প্রধানতঃ তিনটি কারণে দেশবাসী সকলেরই তাহার বিরোধিতা করা উচিত—(১) যে বোর্ড গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেণ্টের অধীন থাকিবে। (২) বোর্ড সাম্প্রদায়িক ভাবে গঠনের ব্যবস্থা আছে; তাহার ফলে শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই বোর্ডের সদস্য হইতে পারিবে না। (৩) বোর্ডের সকল কার্য্যই গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হওয়ায় গভর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে বোর্ড পরিচালিত হইবে। বাঙ্গালা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলিয়াই নাকি এমন ভাবে বোর্ডে মুসলমানের প্রাধান্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বোর্ডের ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ১৯ জন যদি মুসলমান হন, তাহা হইলে হিন্দুর স্বার্থ দেখিবার লোক পাওয়া যাইবে না। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে যে প্রায় ১২ শত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় আছে, তাহার মধ্যে একশতটিও মুসলমানদের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই বা পরিচালিত হয় না। বোর্ডের উপর এই সকল বিদ্যালয় রক্ষা করা সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব আছে, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত অচিরে বাঙ্গালার এই ১২ শত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮ শতটি বোর্ড উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। তাহার ফলে দেশে ত শিক্ষা বিস্তার বাড়িবে না, অধিকন্তু ক্রমে শিক্ষিতের সংখ্যা কমিয়াই যাইবে। ১২ শত স্কুলে যত অধিক সংখ্যক বালককে শিক্ষা দেওয়া যায়, ৪ শত স্কুলে কিছুতেই তাহাপেক্ষা অধিক ছাত্রকে শিক্ষাদান করা সম্ভব হইতে পারে না। স্কুলগুলি উঠিয়া গেলে কলেজগুলিও ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইবে। কলেজে ভর্ত্তি হইবার মত ছাত্র পাওয়া যাইবে না, কাজেই কলেজ কর্ত্তৃপক্ষগণ ছাত্রের অভাবে অচিরে কলেজের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন। বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে হিন্দুদিগের স্বার্থ আর নিরাপদ নহে; অথচ নূতন বিলে বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য প্রদান বিষয়ক যে পরামর্শ কমিটী গঠিত হইবে তাহাতে হিন্দুর সংখ্যা অতি কম; তাহাদের কোন ক্ষমতাই থাকিবে না; তাহার ফলে হিন্দুদের বিদ্যালয়গুলি যে সাহায্য লাভে কৃতকার্য্য হইবে না সে সন্দেহ অহেতুক নহে।

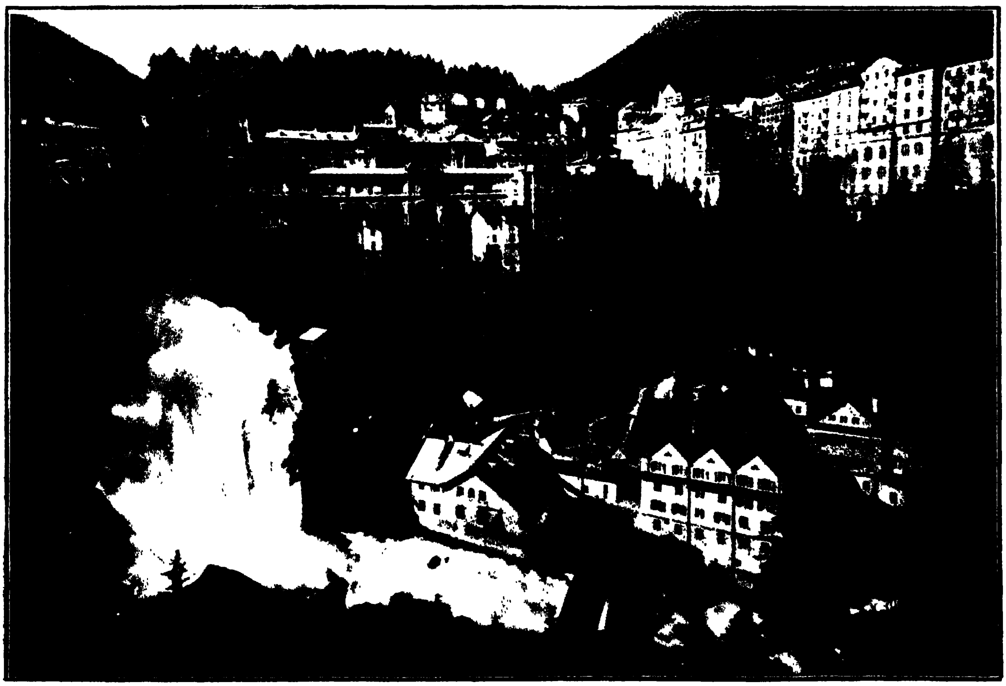
বাঙ্গালা দেশের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিতে বর্ত্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু খারাপ অবস্থা হইতে ভাল অবস্থা করিবার জন্যই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়; কিন্তু নূতন যে বিল রচনা করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নহে; যেহেতু শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কম, অতএব যে কোন প্রকারে সর্ব্বত্র মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই নূতন বিলের উদ্দেশ্য। হিন্দুদের হাতে



লর্ড ব্রাবোর্ণ
বাঙ্গলার নূতন লাট।



লেডী ব্রাবোর্ণ



বাদগাষ্টিন উপত্যকা। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু স্বাস্থ্যলাভের জন্য বিমানযোগে এখানে গিয়াছেন



বাঁশরীর তান

ছবি—নীরোদ রায়

যে মুসলমানদিগের স্বার্থ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না, তাহা গত ৮০ বৎসরের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস হইতেই বুঝা যায়। মফঃস্বলেও সর্ব্বত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-সমূহে মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ অনায়াসে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। তথাপি কেন যে নূতন ব্যবস্থায় সর্ব্বত্র সংখ্যানুপাতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। শিক্ষিতের সংখ্যার অনুপাতে এখনও বাঙ্গালা দেশে হিন্দুর প্রাধান্যই স্বীকৃত হইবে। সেজন্য হিন্দুরা দায়ী নহেন, মুসলমানগণই দায়ী। নূতন বিলে যে ভাবে প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; যেখানে ১১ শত হিন্দু বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ২ জন প্রতিনিধি লওয়া হইবে—সেখানে কিন্তু মাত্র একশত মুসলমান বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতেও ২ জন প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় মুসলমান সদস্যের সংখ্যা খুব কম—অথচ সিনেট হইতেও ২ জন হিন্দু ও ২ জন মুসলমান প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী (ইনিই শিক্ষামন্ত্রী) যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা কমাইয়া দিবার জন্য এই নূতন বিল প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বিলটি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

এই বিলটি যাহাতে আইনে পরিণত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য দেশে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; সর্ব্বত্র জনসভায় ও গণপ্রতিষ্ঠানে বিলের নিন্দা করা হইতেছে। গত ৮ই ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতায় এক জনসভায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ শিক্ষা-ব্রতীরা এই বিলের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, জ্ঞানরঞ্জনবাবু নিজে খৃষ্টান; তথাপি তিনি হিন্দুদিগের এই অধিকার সঙ্কোচে ব্যথিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে বিলের কোনও অংশ-বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলে চলিবে না, উহাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। নূতন বিলে বোর্ড গঠনের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে গভর্ণমেণ্ট যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি বোর্ড গঠন করিয়া দেন, তাহা হইলে শুধু যে কাজ ভাল হইবে তাহা নহে, গভর্ণমেণ্টের অযথা বহু অর্থব্যয়ও হইবে না। আমরা বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজকে এই নূতন বিল সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

ভারতে লর্ড লোথিয়ান—

ভারতবর্ষের নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা (যাহা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে) যখন বিলাতে রচিত হয়, তখন লর্ড লোথিয়ান তাহার অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি ২ মাসকাল ভারতে থাকিয়া কি ভাবে নূতন শাসন-ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য গত ৩রা ডিসেম্বর ভারতে আগমন করিয়াছেন। ভারতের কয়েকটি মাত্র প্রদেশে কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হওয়ায় যে বিষম অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, বর্ত্তমান আইনে সে সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা নাই। যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র একই প্রকার শাসন-ব্যবস্থা চলে, তাহার জন্য বিলাতের রাজনীতিকগণ চিন্তা করিতেছেন। লর্ড লোথিয়ানের সহিত এই ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে কি না কে জানে? যাহা হউক, বাঙ্গালা, আসাম, পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে যাহাতে সত্বর কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়, সে জন্য ভারতবাসী সকলেই বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। লর্ড লোথিয়ান যদি তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবেই তাঁহার ভারতাগমন সার্থক হইবে।



লর্ড লোথিয়ান

যতীন্দ্রমোহন সিংহ—

আমরা জানিয়া ব্যথিত হইলাম যে খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় গত ১লা ডিসেম্বর কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর ইদানীং ফরিদপুরে বাস করিতেছিলেন। কাশীর পথে তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার জামাতা শ্রীযুত তারকেশ্বর মিত্রের কলিকাতা ১৭৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ডাক্তার সুরেন্দ্রমোহন সিংহ পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ফরিদপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। যতীন্দ্র-

মোহনের সাহিত্য সেবার পরিচয় সকলেই জানেন। তাঁহার রচিত 'উড়িষ্যার চিত্র', 'ধ্রুবতারা', 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা,' অনুপমা, সন্ধি, সাকার ও নিরাকারতত্ত্ববিচার প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে সাহিত্যে শুচিতা রক্ষার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার গুরুদেব স্বর্গত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দার্শনিক অভিমত সম্বলিত একখানি পুস্তক লিখিতেছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, এক পুত্র ও চারি কন্যা বর্ত্তমান।

ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ইউরোপের জুরিচ ও ভিয়েনা সহর ভ্রমণের পর গত ১৩ই নভেম্বর লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত থাকিয়া সেখানকার সকল চক্ষু চিকিৎসাগার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। লণ্ডনে তাঁহার ছাত্র ডাক্তার কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুশীলবাবুকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন—কিরণচন্দ্র গত ৭ বৎসর লণ্ডনে বাস করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। এডিনবার্গে ডাক্তার এ-ডি ষ্টুয়ার্ট এবং ডাণ্ডিতে মেসার্স টমাস ডাফ এণ্ড কোং সুশীলকুমারকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। কায়রোতে আন্তর্জাতিক চক্ষু-চিকিৎসা সম্মিলন উপলক্ষে ৮ দিন তথায় বাস করিয়া সুশীলকুমার ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১২ই নভেম্বর কলিকাতার ৯এ সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটস্থ বাসবাটীতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।



বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তিনি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ও সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী, ৭টি পুত্র ও ৫টি কন্যা বর্ত্তমান।

খান বাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী

মৃত্যু তুমি নহ ভয় নহ বিভীষিকা
অরূপা শান্তির রূপে তুমি বিগঠিত
ধ্যানের মাঝারে তব সৌন্দর্য্যের শিখা
আমার হৃদয়ে করে আনন্দে স্পন্দিত
আমার জড়িত সখা মজিদ আমার
শান্তিপুরে গেছে লয়ে মঞ্জুল মরণ,
নাহি সেথা রোগ শোক নাহি অহঙ্কার
নাহি সেথা ক্ষমতার উৎকট পীড়ন।

কীর্ত্তি তার কালবক্ষে দ্যুতি ছড়াইয়া
স্মৃতিরে উজ্জল করে রাখিবে সতত
উদাত্ত হৃদয় তার মৃদুল হাসিয়া
ফিরায়ে আনিবে তাহা হয়েছে যা গত।
হার্দ্দ্য কোমলতা তার বহিবে সুবাস
দেখাবে প্রকৃতি তার মৃদু-মধু হাস।

আজ তুমি গেছ সখা দেখার বাহিরে
সৃষ্টি ক'রে চিত্তমাঝে মহা শূন্যতায়
ব্যথা মাথা ভালবাসা ছুটিয়া তিমিরে,
বলিতেছে ফুকারিয়া "কোথায় কোথায়"?
বিষাদে গিয়াছে ভরি প্রকৃতি বদন,
সংসার হ'য়েছে যেন কেমন মলিন;
জনপ্রিয় তার দুঃখ করিয়া রণন
শোকের সাগর মাঝে হ'তেছে বিলীন।

কে করিবে সযতনে অতিথি সৎকার
বুভুক্ষার তীব্রতায় কে ঢালিবে জল?
কে করিবে প্রাণপণে শিক্ষার প্রচার!
নাহি তুমি তাই আজি হৃদয় চঞ্চল
তুমি ছিলে কি-যেন-কি অপূর্ব্ব রতন
এমন হবেনা আর, হবেনা এমন।



ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্স ঃ

বিলাতের অবৈতনিক বাছাই ফুটবল দল ভারতে প্রথম খেলা খেলেন কলিকাতায় মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৭। খেলাটি ড্র হয়েছে এবং এখানকার নিয়মানুসারে ২৫ মিনিট করে মোট ৫০ মিনিট খেলা হয়। দর্শক সমাগম চৈনিক ফুটবল দলের আগমনোপলক্ষের সমতুল্য হয় নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বেই সমস্ত রিজার্ভ ও বিনা রিজার্ভ সীজন টিকিট বিক্রিত হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু দৈনিক টিকিট বিক্রয় আশানুরূপ হয় নি। মহমেডানেদের লীগ খেলায়ও ইহাপেক্ষা অধিক ভীড় দৃষ্ট হয়েছে। খেলাও খুব উচ্চদরের হয় নি। খেলার শেষে অনেককেই বলতে শোনা গেছে যে বিলাতী দল খুব শক্তিশালী নয় এবং তাদের খেলার চাতুর্য্যও বিশেষ দর্শনীয় নহে, ইহাদের তুলনায় চৈনিকদল অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ক্ষিপ্রতাই তাদের একমাত্র বিশিষ্ট। নগ্নপদ ভারতীয়রাও তাদের কাছে গতিশক্তিতে পরাজিত হচ্ছিল। এক লহমাও তারা বিলম্ব করে না। পূর্ব্বে শোনা যায় যে তাদের খেলায় অবৈধ বা উৎকট ধাক্কাধাক্কি নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহা ভ্রম সংবাদে পরিণত হয়েছে। তাদের 'শোল্ডার চার্জ্জ' ও ধাক্কায় বহুবার ভারতীয় খেলোয়াড়দের মাঠে গড়াগড়ি দিতে দেখা গিয়েছিল। পশ্চাৎ থেকে অবৈধ ধাক্কাও দৃষ্ট হয়েছিল। প্রথম দিনের খেলা একেবারেই



কোরিন্থিয়ান্স ও আই এফ এর নিখিল ভারত দলের খেলোয়াড়গণ — ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

তাদের বহু ঢক্কানিনাদিত সুযশের তুল্য হয় নাই। একমাত্র ওজর থাকতে পারে যে দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর তারা বিশেষ ক্লান্ত ছিল এবং প্রথম দিন তাদের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নামে নাই। ইহাদের খেলার পদ্ধতি বা কৌশলে কিছু বিশেষত্ব আছে। তারা তিনজন ব্যাক পদ্ধতিতে খেলে। তাদের খেলায় নিপুণতা অপেক্ষা শারীরিক বল প্রয়োগই অধিক প্রকটিত হয়েছে।

বিলাতী দল গোল করবার যত সুযোগ পেয়েছিল তাতে তারা জয়ী হতে পারতো। কিন্তু সেণ্টার ফরওয়ার্ড শেরউড কয়েকটি এবং মিলারও একটি অব্যর্থ গোল নষ্ট করে। মহমেডানদের খেলাও আশানুরূপ হয় নাই। নূরমহম্মদ ভালো খেলতে পারে নি, জুম্মাখাঁ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলেছে। বাচ্চিখাঁ ও ওসমান ভালো খেলেছে। ফরওয়ার্ডদের খেলা ভাল হয় নাই, একমাত্র রহিম মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করেছে। সামাদ কয়েকবার লম্বা দৌড় দেওয়া ছাড়া কার্য্যকরী কিছু করে নাই।

জামসেদপুরে অল্ ব্লুজ দলের সঙ্গে তাদের ভারতের দ্বিতীয় খেলা হয়। ৫-২ গোলে জয়ী হয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। অল্ ব্লুজের নিউম্যান প্রথম গোল করে এবং হেমান দ্বিতীয় গোলটি দেয়। এদিন উইংফিল্ড গোলরক্ষক ছিল।

কলিকাতার দ্বিতীয় খেলা হয় মোহনবাগানের সঙ্গে ১৬ই তারিখে। ইসলিংটন একটি গোলে জয়ী হতে সক্ষম হয়েছে। বিজিত মোহনবাগানই অধিক সংখ্যক গোল করবার সুযোগ পেয়েছিল কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। পরাজিত হলেও খেলার গৌরবের দাবী সবটাই তাদের প্রাপ্য। এদিন কোরিন্থিয়ান্সদের দল অধিকতর শক্তিশালী ছিল। মোহনবাগান দলের সম্মথ দত্ত ও বেণীপ্রসাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রশংসনীয় খেলা খেলেছেন, তারপরেই দরবারী, কে দত্ত, প্রেমলালের নাম করা যেতে পারে। বিমল ও নন্দচৌধুরী মোটেই খেলতে পারে নি। কে ভট্টাচার্য্যের খেলা তার সুনামের মতন হয় নি, সতু চৌধুরীর সেণ্টার থেকে বল পেয়ে সে বেশ সুন্দর সট করে, লংম্যান পরাজিত হলেও ভাগ্যদেবীর নির্ম্মম পরিহাসে বল বারের কোণে লেগে বেরিয়ে আসে।



কোরিন্থিয়ানের গোলরক্ষক লংম্যান লক্ষীনারায়ণের নিকট থেকে অব্যর্থ গোল রক্ষা করছে ছবি—জে কে সান্যাল

বিজয়ী দলের লংম্যান, ক্লার্ক, মার্টিন, হুইটেকার ও রাইট বেশ ভালো খেলেছেন। সেণ্টার ফরওয়ার্ড ট্যারাণ্ট যে খুব সুযোগ সন্ধানী তা' তার ঐ একমাত্র গোলটি করায় প্রমাণিত হয়েছে।

এদিন পুরা একঘণ্টা খেলা হয়। কারণ বিলাতী দল অল্প সময় খেলতে অসুবিধা বোধ করে। যারা অধিক সময় খেলতে সক্ষম তারা কেন যে অল্প সময় খেলতে অসুবিধা বোধ করবে তা বোঝা যায় না। কম সময়ে খেলতে অভ্যস্ত যারা তাদের যদি অধিক সময় খেলতে বাধ্য করা হয় তাতে তাদেরই বেশী অসুবিধা এবং কষ্টদায়ক হওয়া স্বাভাবিক। স্থানীয় নিয়মানুসারে খেলা হওয়াই উচিত। অন্যত্র তাই হয়ে থাকে, কেবল আমাদের দেশ ছাড়া। ক্রিকেটের টেষ্ট প্রতিযোগিতা যে দেশে যখন হয়, সেই স্থানের নিয়মানুযায়ী বিদেশীকে খেলতে হয়। যেমন আট বলের ওভার অষ্ট্রেলিয়াতে চলছে এবং এবার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও চলবে। আগামী বৎসর এম সি সি দলকেও সেখানে ঐ নিয়মে খেলতে হবে। অথচ

ইংলণ্ডে ছয় বলের ওভারই চলিত আছে। বলাই চট্টোপাধ্যায়ের খেলা পরিচালনা সম্বন্ধে ষ্টেটসম্যান লিখেছেন, 'শোল্ডার চার্জ্জ' সম্বন্ধে এবং অত্যধিক ফাউল দেওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিদেশী দলের বিরুদ্ধে যখন ভারতীয় দল খেলবে তখন বিলাতের নিয়মানুযায়ী যেন খেলা পরিচালনা করা হয়। কারণ parent body F Aর নিয়ম অন্য রকম। জানি না এফ এর নিয়মে ইহা আছে কিনা, যে পেছন থেকে অবৈধ ধাক্কা দিলেও তা' ফাউল হয় না। আর এক কথা, বিলাতী অবৈতনিক খেলোওয়াড় দলই না হয় এই প্রথম এদেশে এসেছে। কিন্তু খাস বিলাতী সৈনিক দলরা এবং বিলাতী খেলোয়াড় সমন্বিত ইউরোপীয় দলরা তো বহুদিন থেকে এদেশে খেলছে, তাদের পক্ষে কখনও তো এ ওজর পূর্ব্বে ষ্টেটসম্যান তোলেন নি। বিদেশীদের স্থানীয় নিয়মাধীনে খেলতে হয়,—ইহাই নিয়ম এবং অন্য দেশে এখনও তাহাই বর্ত্তমান আছে। এই কারণে আমরা ষ্টেটসম্যানকে সমর্থন করি না।

তৃতীয় খেলা হয় আই এফ এ একাদশের সঙ্গে ১৭ই নভেম্বর। খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে সমাপ্ত হয়েছে। রেফারিংয়ে ত্রুটি ছিল। তা' সত্ত্বেও কোরিন্থিয়ান্স দলের খেলোয়াড়দের রেফারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অশিষ্ট আচরণ কোনরূপে সমর্থিত হতে পারে না। বিলাতী খেলোয়াড়রা খেলোয়াড়-জনোচিত ব্যবহার শিক্ষা করে নাই, ইহা তাজ্জব ব্যাপার। ষ্টেটসম্যান কি বলেন,—বিলাতের মাঠে ঐ রকম ভাবে রেফারিকে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করে তার নির্দ্দেশের প্রতিবাদ করলে এফ এ কি অনুজ্ঞা দিতো?



ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্স ও মোহনবাগানের খেলোয়াড়গণ

আই এফ এ দলের বাছা বাছা ফরওয়ার্ডরা কার্য্যক্ষেত্রে সকলকে হতাশ করেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুর্গেশ রহমৎ থেকেও আদান প্রদান নিখুঁত ছবির মতন না হওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার। এন ঘোষ ও সামাদের কয়েকটি সেণ্টার ভালই হয়েছিল। সামাদের একটি সুন্দর সেণ্টার মার্টিন হাত দিয়ে রোধ করায় পেনালটি হয় এবং জুম্মা খাঁ



প্রেসিডেণ্ট মহারাজা সন্তোষ আই এফ এ ও কোরিন্থিয়ান্স দলের সঙ্গে করমর্দ্দন করছেন ছবি—জে কে সান্যাল

ঐ পেনালটি থেকে গোল দেয়। ভারতীয় দলে আর্ম্‌ষ্ট্রং, টেলার, বাচ্চি খাঁ সুন্দর খেলেছেন। আর্ম্‌ষ্ট্রংয়ের কয়েকটি গোল বাঁচান সত্যই অত্যাশ্চর্য্য।

কোরিন্থিয়ান্সদের ব্রাড্‌বারী সকলের চেয়ে বিপজ্জনক ফরওয়ার্ড, সেই গোলটি দেয়। তার পরেই ট্যারাণ্ট ও জে মিলারকে গণ্য করা যায়। হুইটেকার, ক্লার্ক, ডবলিউ মিলার এবং লংম্যান রক্ষণভাগে চমৎকার খেলেছে।

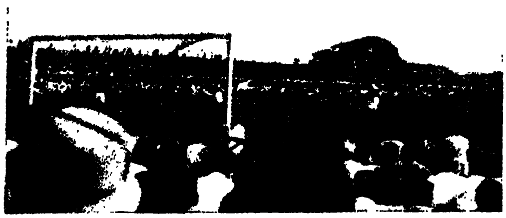


আর্ম্‌ষ্ট্রং



সি লংম্যান

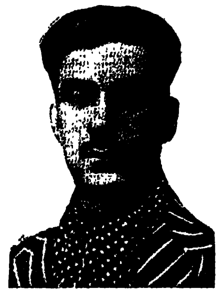
আই এফ এ দল আর একটি পেনালটি পায় প্রথমার্দ্ধে, হুইটেকার পেছন থেকে রহমৎকে ধাক্কা দেওয়ায়। কিন্তু টেলারের গোলার মতন সট পোষ্টে লেগে মাঠে ফিরে আসে। ইস্‌লিংটনের পক্ষে ফ্রি কিক্ রেফারি কেন যে দিলে তা' বোঝা গেল না। দ্বিতীয় পেনালটি শেষার্দ্ধের



কোরিন্থিয়ান্স ও মহমেডান স্পোর্টিংএর খেলার দৃশ্য

ছবি—রমেন চট্টোপাধ্যায়

২১ মিনিটের সময় হলে বিলাতী খেলোয়াড়দের অনেকে রেফারিকে ধরে বাদানুবাদ করতে আরম্ভ করে, ইহা মোটেই খেলোয়াড়জনোচিত নহে। পরদিন আই এফ এর ভোজে ম্যানেজার স্মিথ অবশ্য এই ব্যাপারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন তাঁরা দর্শনীয় ফুটবল খেলেন না, যেমন এখানে ভারতীয়রা খেলেন। বিলাতে গোল দেবার জন্য বিশেষ বলপ্রয়োগের আবশ্যক, যেহেতু তাঁদের পেশাদারী খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে হয়। পরিচালকের সিদ্ধান্তে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। দলের খেলোয়াড়দের অখেলোয়াড়ী ব্যবহারের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেও, তাঁর ঐ অজুহাত সমর্থন করা যায় না। মার্টিন পেনালটি সীমানায় হ্যাণ্ড বল করলেও রেফারিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়—ইহা বলপ্রয়োগের সম্বন্ধে নিয়ম ও বিধি



জুম্মা খাঁ



মাহমুদ

প্রয়োগের তারতম্য নহে। পেনালটি সীমানায় হ্যাণ্ডবল করলে সব দেশেই পেনালটি দেওয়া হয়ে থাকে।

মোহনবাগান-ক্যালকাটার ব্যাপারে ষ্টেটস্‌ম্যান ও ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া খুব বড় বড় স্পোর্টিংএর কথা বলেছিল। রেফারির নির্দ্দেশে বিরক্তি প্রকাশ করেছিল মোহনবাগান



ব্রেথওয়েট



জি ডান্স

মাঠে থেকে খেলায় যোগ না দিয়ে, তারা রেফারিকে ধরে টানাটানি করে নাই।

চতুর্থ খেলা হয় আই এফ এর নিখিল ভারত দলের সঙ্গে, তাতে তারা ২-০ গোলে জয়ী হয়। এদিন সত্যই তারা খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যের উৎকর্ষতা প্রদর্শন

করেছে। তারা জয়ী হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে খেলছিল, আর নিখিল ভারত (অবশ্য আই এফ এর) ঐ দিন আরো নিকৃষ্টতর খেলা খেলেছে। আই এফ এর নিখিল ভারত ঠিক যেন সোনার পাথর বাটীর মতন। আই



জে, কে, রাইট



রহিম
(ক্যাপটেন—মহমেডান স্পোর্টিং)

এফ এ সম্ভবতঃ অল ইণ্ডিয়া দল নাম দিতে পারেন না, সে ক্ষমতা এখন এ আই এফ এতে বর্ত্তেছে। অতএব, আই এফ এর অল ইণ্ডিয়া নাম দেওয়া হলো। এর পর ঢাকার অল ইণ্ডিয়া, জামসেদপুরের অল ইণ্ডিয়া, এইরকম অনেক অল ইণ্ডিয়ার উৎপত্তি হবে বোধ হয়!

সন্মথ দত্ত প্রশংসনীয় এবং জুম্মা খাঁ, বাচ্চি খাঁ সুন্দর খেলেছে। ইহাদের বাধাদান এবং ওসমানের অপূর্ব্ব গোল



ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্স ও মোহনবাগানের খেলার দৃশ্য   ছবি—দীপেন চট্টোপাধ্যায়

রক্ষার জন্যই ভারতীয় দল অধিক সংখ্যক গোল খায় নাই। কোরিন্থিয়ানদের ফরওয়ার্ডরা নিখুঁত আদান-প্রদান, ঐক্য ও সমন্বয় প্রদর্শন করে এতদিনে তাঁদের সুনামের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতীয় ফরওয়ার্ডদের ঐক্য ও সমন্বয় ছিল না, তাদের এদিনের খেলা বিপক্ষের তুলনায় অত্যন্ত ম্লান প্রতীয়মান হয়েছিল।

বিজয়ীদলের আক্রমণভাগে ব্র্যাডবেরী, ট্যারাণ্ট ও জে মিলারের খেলাই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মিলারকে



পিয়ার্স্



আর, পি, ট্যারাণ্ট

আটকাবার শক্তি বিমলের ছিল না। রক্ষণভাগে ক্যাপটেন ক্লার্কের প্রতিপক্ষের নিকট থেকে বল কাড়বার কৌশল প্রশংসনীয়। হাফব্যাকে হুইটেকারের খেলা প্রীতিপ্রদ, বল আট্‌কাবার ও বিপক্ষকে বাধা দানের ক্ষমতা তার অদ্ভুত। তার কাছে নুরমহম্মদ ম্লান হয়ে গিয়েছিল। গোলরক্ষক লংম্যানের গোলরক্ষণ দ্রষ্টব্য ও উপভোগ্য। তার নিপুণতার জন্যই ভারতীয়রা গোল করতে পারে নি। কলিকাতায় ৪টি খেলায় মাত্র ১টি গোল তার বিপক্ষে হয়, তাও পেনালটি থেকে। মুর্গেশ ও রহমৎ কেহই ভাল খেলতে পারে নি। মুর্গেশ একটি অব্যর্থ গোল নষ্ট করে। এন ঘোষ কয়েকটি সুন্দর সেণ্টার করেছে।



মার্টিন

সন্মথ দত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রদর্শন করে কয়েকটি অব্যর্থ গোল রক্ষা করলেও, প্রথম গোলটি তারই হ্যাণ্ডবলের জন্য পেনালটি থেকে হয়, ক্লার্ক গোল করে। দ্বিতীয় গোলটি রীডের সেণ্টার থেকে

ট্যারাণ্ট অপূর্ব্ব কৌশলে মস্তক সঞ্চালনে ওসমানকে পরাস্ত করে।

বলাই দাস চট্টোপাধ্যায় রেফারি ছিলেন। খেলা পরিচালনা উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। অধিনায়ক ক্লার্ক ও ম্যানেজার স্মিথ বলাই চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনার প্রশংসা করেছেন।

কোরিন্থিয়ান্সের প্রথম পরাজয়ঃ

ঢাকায় কোরিন্থিয়ান্স দল প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের কাছে এক গোলে। বি সেন (পাখী) ঐ অতি প্রয়োজনীয় গোলটি দেয়। অবশ্য সেদিন বিদেশী দল বিশেষ শক্তিশালী ছিল না। লংম্যান, ক্লার্ক রক্ষণভাগের এই দুইজন বিখ্যাত খেলোয়াড় ক্লান্তি বশতঃ খেলেন নি। প্রথমার্দ্ধে ঢাকা দল ভালো খেলে। গোলে আর বোস, ব্যাকে রাখাল মজুমদার ও ফরওয়ার্ডে পাখী সেনের খেলা বেশ দর্শনীয় হয়েছিল।



শেরউড

ক্লার্ক ঢাকার খেলার সম্বন্ধে বলেছেন,—কলিকাতায় যেরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির খেলা হয় সে তুলনায় ঢাকার খেলা নিষ্প্রভ। তবে ঢাকার খেলোয়াড়দের উৎসাহ অধিক। অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনার জন্য ঢাকা দল জয়ী হতে পেরেছে।

দ্বিতীয় দিনে কোরিন্থিয়ান্সরা শক্তিশালী দল গঠন করে ১-০ গোলে ঢাকাকে পরাজিত করে শোধ নিয়েছে। যদিও বিদেশী দলই বেশীর ভাগ আক্রমণ করে এবং জয় তাদেরই প্রাপ্য, তথাপি গোলটি স্থানীয় দলের ভুলের জন্যই হয়। রেফারির বাঁশী বেজেছে মনে করে ঢাকা দলের খেলোয়াড়রা খেলা বন্ধ করলে সেই সুযোগে ট্যারাণ্ট গোলটি দেয়।



পি. বি ক্লার্ক
ক্যাপ্টেন—কোরিন্থিয়ান্স

কোরিন্থিয়ান্স ৬-১ গোলে ময়মনসিংহকে, ৬-০ গোলে কিশোরগঞ্জকে, ৩-০ গোলে কুমিল্লা ও ডিষ্ট্রিক্টকে, ১-০ গোলে চট্টগ্রামকে, ২-০ গোলে ক্যামারোনিয়নকে, ৩-১ গোলে বহরমপুরকে, ৩-১ গোলে বি এন আর দলকে, হাজারীবাগে আই এফ দলকে ১-০ গোলে, পাটনায় বিহার দলকে ৫-০ গোলে পরাজিত করেছে। ধানবাদে আই এফ এর সঙ্গে ও ইউ পি দলের সঙ্গে লক্ষ্ণৌতে ০-০ গোলে ড্র করেছে।

চট্টগ্রাম অপূর্ব্ব ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়ে ভাগ্যবিপর্যায়ে পরাজিত হয়েছে। গোলরক্ষকের ত্রুটীর জন্য গোলটি হয়। ইষ্টবেঙ্গলের দুলাল ক্যাপ্টেন হয়েছিল। খেলা সম্বন্ধে অধিনায়ক প্যাট ক্লার্ক বলেছেন, কলিকাতা ও ঢাকা অপেক্ষা কোন অংশে চট্টগ্রামের খেলা নিকৃষ্ট হয় নাই। আমরা শারীরিক বলপ্রয়োগ করে খেলে থাকি; দেখা গেলো, চট্টগ্রামও বলপ্রয়োগে প্রত্যুত্তর দিতে জানে। বাম ব্যাক শচী অতি চমৎকার, বাম আউট আলাউদ্দীন বেশ এবং সেণ্টার হাফ কালু সিং অতি সুন্দর খেলেছে।

খেলার সম্বন্ধে বিদেশীদের মতামতঃ

মোহনবাগানের খেলা সম্বন্ধে ম্যানেজার মিষ্টার স্মিথ বলেছেন,—"* * * in his opinion the Mohun Bagan team was one of the best teams he has seen in this tour who played a very sporting game. * * * We were lucky to win to-day's match and I am sure my boys will agree with me when I say so."



মিষ্টার স্মিথ
(ম্যানেজার—কোরিন্থিয়ান্স)



এল ব্রাডবারী

ক্যাপটেন পি বি ক্লার্ক বলেছেন,—"Indeed Mohon Bagan are quite a clever side. We were really struck by the amazingly good fight they put up against us. We think, they are very much faster and nippier than the Mohammedans. In Bhattacharya and Premlal they have two very good forwards who may be well-compared with some of the well-known amateurs in English football. As for the defence I can say this much that the backs were more resourceful than the halves."



কোরিন্থিয়ান্স ও নিখিল ভারত দলের খেলার দৃশ্য　　ছবি—শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

ক্লার্ক মহমেডানদের খেলা সম্বন্ধে বলেছেন—ইহাদের খেলায় যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণতা দেখা গিয়াছে। ইহাদের খেলা দেখে মিশরের ফুটবল দলের কথা মনে পড়ে। তুলনা করলে, পারিপাট্য ও উৎকর্ষতা এ দলের বেশী, কিন্তু মিশর দলের খেলায় ক্ষিপ্রগতি অনেক বেশী।

রঞ্জি প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নসিপ রঞ্জি প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা এক ইনিংস ও ১৬৬ রানে বিহার প্রদেশকে শোচনীয় ভাবে পরাজয় করেছে। বাঙ্গলাকে এবার মধ্যভারতের সঙ্গে খেলতে হবে। তিন দিনব্যাপী খেলা দুই দিনেই সমাপ্ত হয়েছে। বিহার গতবারের চেয়েও শোচনীয় ভাবে হেরেছে।



এ এল হোসী
(ক্যাপ্টেন—বাঙ্গলা)

বাঙ্গলা—৩৭২ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

বিহার—৯৯ ও ১০৭

বাঙ্গলার পক্ষে সকলেই ভালো খেলেছে। ব্যাটিংএ—ভাণ্ডারগাচ ৬৯, কে ভট্টাচার্য্য ৬১, ইওার (নট আউট) ৫৭, এ এল হোসী (ক্যাপ্টেন) ৫১, টি সি লংফিল্ড ৪১। বোলিংয়ে—(প্রথম ইনিংস) কে ভট্টাচার্য্য ২০ রানে ৪, জে এন ব্যানার্জ্জি ২৮ রানে ৩, ইওার ৬ রানে ২, স্কট ১৯ রানে ১ উইকেট; (দ্বিতীয় ইনিংস) লংফিল্ড ১২ রানে ৬, জে এন ব্যানার্জ্জি ১৬ রানে ২, কে ভট্টাচার্য্য ৩৩ রানে ১ ও কে খাম্বাটা ৩৩ রানে ১ উইকেট পেয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে প্রবীণ কেণ্ট বোলার লংফিল্ড বোলিংয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে 'হ্যাট্ ট্রিক' দেখিয়ে এক ওভারের পর পর তিন বলে ৩জনকে আউট করেছেন।



লংফিল্ড

বিহার দলের ব্যাটিং বিশেষ নিষ্প্রভ ছিল। একমাত্র মোহনবাগানের ফুটবল খেলোয়াড় বিজয় সেন দ্বিতীয় ইনিংসে প্রশংসনীয় খেলে ৪৬ রান করতে সক্ষম হন। অপর ব্যাটস্ম্যানরা নিতান্ত আনাড়ীর ন্যায় খেলেছেন। বোলিংয়ে এফ্ এম খাঁ (ক্যাপ্টেন) ৫১ রানে ২, এম কুরেসী ১১৩ রানে ২ ও জে দাশগুপ্ত ৯৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। কে ভট্টাচার্য্য ও লংফিল্ড রান আউট হয়ে যান।

বিহার গত বৎসরাপেক্ষা খারাপ ফল দেখিয়েছে। আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার মতন দল গঠন করবার উপযুক্ত খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে এখনও তারা অক্ষম।



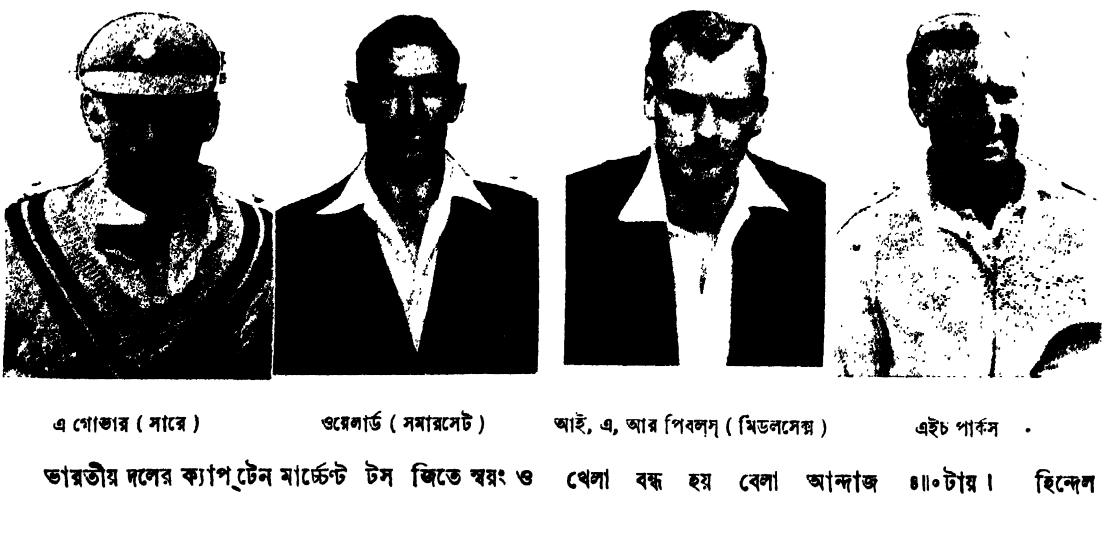
রঞ্জি প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা ও বিহারের খেলোয়াড়গণ ছবি—জে কে সান্ন্যাল

প্রথম বে-সরকারী টেষ্ট ঃ

লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে ১৩ই নভেম্বর লর্ড টেনিসন দলের সঙ্গে প্রথম বে-সরকারী টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়ে চার দিনের স্থলে তৃতীয় দিনেই সমাপ্ত হয়েছে। নিখিল ভারত দল নয় উইকেটে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে।

লর্ড টেনিসন দল—২০৭ ও ১১৪ (১ উইকেট)

নিখিল ভারত—১২১ ও ১৯৯



এ গোভার (সারে) ওয়েলার্ড (সমারসেট) আই, এ, আর পিবলস্ (মিডলসেক্স) এইচ পার্কস

ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন মার্চ্চেন্ট টস জিতে স্বয়ং ও হিন্দেলকারে মিলে খেলা আরম্ভ করেন। গোভার ও ওয়েলার্ডের মারাত্মক বোলিংয়ের কাছে ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানেরা দাঁড়াতে পারেন না, মাত্র ১২১ রানে সকলে আউট হয়ে যান।

যুবরাজ পাতিয়ালা (নট আউট) ৪১, হিন্দেলকার ২৪, মাস্তাক আলি ২১। গোভার ৪০ রানে ৭ ও ওয়েলার্ড ৩৯ রানে ২ ও স্মিথ ৩১ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

ইয়ার্ডলে ৯৬, এড্‌রিচ্‌ ৫৪, ল্যাংরিজ ২৮। অমরসিং ৬৯ রানে ৪, অমরনাথ ৩৫ রানে ২, আমীর ইলাহী ৪০ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় দিনে ভূমিকম্পের জন্য কয়েক মিনিট খেলা বন্ধ হয় বেলা আন্দাজ ৪॥০টায়। হিন্দেল

কারের অত্যাশ্চর্য্য উইকেট রক্ষায় একটিও ‘বাই’ হয় নাই।

দ্বিতীয় ইনিংসে—অমরনাথ ৪৪, হাজারী ৩১, হিন্দেলকার ২০, অমর সিং ২২, রাম সিং ২২। গোভার ৬৬ রানে ৪, স্মিথ ৩৪ রানে ৩, ওয়েলার্ড ৬৪ রানে ২ উইকেট।



লাহোর টেষ্টে
যুবরাজ পাতিয়ালা খেলতে যাচ্ছেন

এড্‌রিচ্‌ (নট আউট) ৫০, হার্ডষ্টাফ্‌ (নট আউট) ৩৪, পার্কস্‌ ২৩। অমর সিং ৪৯ রানে ১ উইকেট।

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মনোনয়ন কর্ত্তা কর্ণেল মিস্ত্রি লাহোরের প্রথম বে-সরকারী টেষ্ট খেলা সম্বন্ধে বলেছেন,—ভারতীয় দল ফাষ্ট´ বোলার অভাবে পরাজিত হয়েছে। বিপক্ষ পক্ষে ফাষ্ট´ বোলাররা কৃতকার্য্য হয়েছে। দলগত ঐক্য চমৎকার ও খেলোয়াড় জনোচিত মনোভাব প্রশংসনীয়। হাজারী ও রামসিং তাদের ব্যাটিং ও ফিল্ডিং দ্বারা দলভুক্ত হবার যোগ্যতা প্রমাণিত করেছে।

লর্ড টেনিসন বলেছেন,—ম্যাচটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। উভয় পক্ষই খেলোয়াড়জনোচিত মনোবৃত্তি নিয়ে খেলেছে। জয়ের জন্য আমাদের ফাষ্ট´ বোলারদের চমৎকার বোলিং এবং এড্‌রিচ্‌ ও ইয়ার্ডলের কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং প্রশংসনীয়। ইয়ার্ডলের ক্যাচটি অপূর্ব্ব।

টেনিসন দলের প্রথম পরাজয়ঃ

২১শে নভেম্বর ভারতের পক্ষে ‘রেড লেটার দে’। ঐ দিনে দু’টি খাস বিলাতী খেলোয়াড় দলেরই ভারতের কাছে পরাজয় ঘটে। লর্ড টেনিসনের ক্রিকেট দল ইতঃপূর্ব্বে একটি খেলাতেও হারে নাই। আজমীরে রাজপুতানা ও সংশ্লিষ্ট জেলা দলের কাছে তারা দুই উইকেটে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

রাজপুতানা—২৩৭ ও ৮৯ (৮ উইকেট)

টেনিসন দল—২১২ ও ১১২



মাস্তাক আলি ব্যাট করতে যাচ্ছেন

প্রথম উইকেট সহযোগিতায় রেকর্ড রান ১১৭ উঠায় মাস্তাক আলি ও হিন্দেলকারে মিলে। মাস্তাক চতুর্দ্দিকে পিটে খেলেছেন, প্রত্যেক বলে অন্ততঃ একটি রান করেছেন। মোট শত রান ওঠে ৭৩ মিনিটে, প্রথম উইকেটে দ্রুততার রেকর্ডও বটে।

তৃতীয় বা শেষ দিনের খেলায় একটি উল্লেখযোগ্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। নরসিং রাও কেশরীর বল স্মিথের ব্যাট থেকে তার প্যাডে লাগে, কেশরীর আবেদনে আম্পায়ার এল-বি দেন। ডুঙ্গারপুরের অধিনায়ক মহারাওয়াল স্মিথকে প্যাভিলন থেকে ফিরিয়ে এনে সমবেত জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে খেলতে দেন। খেলোয়াড়োচিত ব্যবহার সন্দেহ নাই! আম্পায়ার অপর আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনা করবার পর খেলারম্ভের আদেশ দেন।

এরূপ আর একটি ঘটনা পূর্ব্বে ঘটেছিল অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেষ্ট খেলায় বোম্বাইতে। ভারতের ক্যাপ্টেন পাতিয়ালার যুবরাজ আম্পায়ারের আউট নির্দ্দেশিত অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়কে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আম্পায়ার মিষ্টার ওয়ালি মোহাম্মদ তাঁর অনুজ্ঞা বদলাতে রাজী হন নাই।

নরসিংরাও কেশরীর উৎকৃষ্ট ব্যাটিং ও অপূর্ব্ব বোলিংএর জন্যই রাজপুতানা জয়ী হতে পেরেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে যখন ধুরন্ধর ব্যাটগুলিও কিছু করতে পারে নাই, তখন তিনি সর্ব্বোচ্চ ২৩ রান করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে



কুচবিহার মহারাজার ক্রিকেট দল। সম্মিলিত ইউনিভার্সিটি দলকে পরাজিত করেছে

ছবি—জে কে সান্যাল

টেনিসন দলের ৭ জনকে মাত্র ৪৭ রানে আউট করেন। আমীর ইলাহী ৪২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

প্রথম ইনিংসে—অমরনাথ ৩৭ রানে ৩, কেশরী ৩৮ রানে ২, আমীর ইলাহী ৪৬ রানে ২, ব্রাডস ৫৬ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

বোলিং—স্মিথ ৭৯ রানে ৪ উইকেট, গোভার ৮ রানে ৩ উইকেট।



নিসার



ভাবিজদার

দ্বিতীয় ইনিংসে—মাস্তাক আলী ৮১, হিন্দেলকার ৩৭, আজিম খাঁ ২২, আস্তিক হোসেন ২২।

পোপ ২১ রানে ৫ এবং গোভার ৪২ রানে ২ উইকেট।

ব্যাটিং—পোপ ৫২, ইয়ার্ডলে ৪৬, পার্কস ৩০, এড্রিচ ২৫; (দ্বিতীয় ইনিংস) পোপ ২৯, স্মিথ (নট আউট) ২৫, এডরিচ ১৬।

টেনিসন দল—৪২০

গুজরাট—২১১ ও ২২৮

(৯ উইকেট)

খেলা ড্র হয়েছে। গুজরাট ফলো-অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে নয় উইকেট ২২৮ রান করলে সময়াভাবে খেলা ড্র হয়।

গীব্ (নট আউট) ১৩৬, ল্যাংরিজ ৮০, পোপ (রান আউট) ৬০, হার্ডষ্টাফ ৩৫, এড্রিচ্ ৩২।

গান্ধী ৩, সৈয়দ আহমেদ ২, টিপ্পা ২ উইকেট পেয়েছে।

গুজরাট:—ফয়েজ আহমেদ ৫৩, মানাভাদারের খাঁ সাহেব ৪৩, ভগবান দাস (রান আউট) ৩২।

পোপ ৫৯ রানে ৪, ওয়ার্দ্দিংটন ২০ রানে ৩ উইকেট।

(দ্বিতীয় ইনিংসে) সৈয়দ আহমেদ ৮৬, মানাভাদার ৩০, গান্ধী ২৩।

ওয়েলার্ড ৩৮ রানে ৪, ওয়ার্দ্দিংটন ২০ রানে ৩ উইকেট। সৈয়দ আহমেদ ক্রটিহীন খেলে ৮৬ করে দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ফয়েজ আহমেদের ৫০ রানের মধ্যে ১০টি বাউণ্ডারী ছিল।



ওয়ার্দ্দিংটন

টেনিসন দলের দ্বিতীয় পরাজয় ঃ

নওয়া নগর—২০৬ ও ২২৩ (৭ উইকেট)

টেনিসন দল—১২৬ ও ২৬৯

আন্তঃপ্রাদেশিক চ্যাম্পিয়ন নওয়া নগর ৩৪ রানে লর্ড টেনিসন দলকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

টেনিসন দলকে ১৫০ রানের পর নূতন বল দেওয়া হয়—নিয়মের ব্যতিক্রম ?

প্রথম ইনিংসে মাত্র ১২৬ রানে টেনিসন দলকে আউট করবার জন্য দায়ী অমরসিং ও মানকাদের মারাত্মক বোলিং। দ্বিতীয় ইনিংসে অমরসিং চমকপ্রদ ব্যাটিং করে



অমরসিং

৪৩ মিনিটে ৮১ রান করেন, ১২টি ৪ ও ১টি ৬ ছিল। তিনি একটিও সুযোগ দেন নি। লর্ড টেনিসন অমরসিংয়ের অনন্য সাধারণ খেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। মানকাদ সুন্দর খেলে ৬৭ করে নট আউট থাকেন, প্রথম ইনিংসেও তিনি সর্ব্বোচ্চ ৬২ রান করেন।

টেনিসন :—ওয়েলার্ড ৩০, এড্‌রিচ্‌ ২৮, হার্ডষ্টাফ ২২ ; (দ্বিতীয় ইনিংসে) ওয়েলার্ড ৯০, এড্‌রিচ্‌ ৫৩, ইয়ার্ডলে ২২।

বোলিং :—অমরসিং ৩৫ রানে ৫, মানকাদ ৫৩ রানে ৪, ব্যানার্জ্জি ৪১ রানে ১-উইকেট। (দ্বিতীয় ইনিংসে) —অমরসিং ৬৮ রানে ৫, ব্যানার্জ্জি ৫৭ রানে ২, মানকাদ ৫৬ রানে ২।

নওয়া নগর :—মানকাদ ৬২, রনভিরসিংজী ৩৬, ওয়েন্সলে ২৮, ইন্দ্রবিজয়সিংজী ২৪ ; (দ্বিতীয় ইনিংসে) অমরসিং ৮১, মানকাদ ৬৭, রনভিরসিংজী ২১, ইন্দ্রবিজয়সিংজী ১৫।

বোলিং :—এড্‌রিচ ২৫ রানে ৪, স্মিথ ৩৯ রানে ২, ওয়ার্দ্দিংটন ৭৭ রানে ২ ; (দ্বিতীয় ইনিংসে) স্মিথ ৬১ রানে ৪, পার্কস্‌ ৬ রানে ১, ওয়ার্দ্দিংটন ১৭ রানে ১, গোভার ৪৩ রানে ১।

লর্ড টেনিসন—৩১৯ ও ৪২ (২ উইকেট)

মহারাষ্ট্র—২৭৩

খেলা ড্র হয়েছে। মহারাষ্ট্র দলের অধিনায়ক অধ্যাপক দেওধর অপূর্ব্ব খেলে ১১৮ রান করেন। টেনিসন দলের বিরুদ্ধে প্রথম সেঞ্চুরী করবার সৌভাগ্য তাঁরই হলো। ১৯২৬ সালে বোম্বাইয়ে এম সি সি দলের বিপক্ষে হিন্দু দলে খেলে তিনিই প্রথম সেঞ্চুরী করবার গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন।



দেওধর
(ক্যাপ্‌টেন—মহারাষ্ট্র)

যাদব (নট আউট) ২৯, নাগরওয়ালা ২১, ডক্টর ১৯। বোলিং :—ওয়ার্দ্দিংটন ৪৯ রানে ৪, পোপ ৩২ রানে ৪।

পার্কস্‌ ৬৪, ইয়ার্ডলে ৫০, পোপ ৪৩, গীব (নট আউট) ৪০।

বোলিং :—পটবর্দ্ধন ৯৯ রানে ৫, শোহোনী ৪২ রানে ২, হ্যারিস ৬৬ রানে ২।

ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়াম ঃ

৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৭ সালে বোম্বাইয়ের বর্ত্তমান গভর্ণর স্যর রোজার লাম্‌লি ভূতপূর্ব্ব বোম্বাই গভর্ণর ও অধুনা কলিকাতার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণের নামানুসারে বোম্বাইতে ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়মের উদ্বোধন করেছেন। মাননীয় বড়লাট,

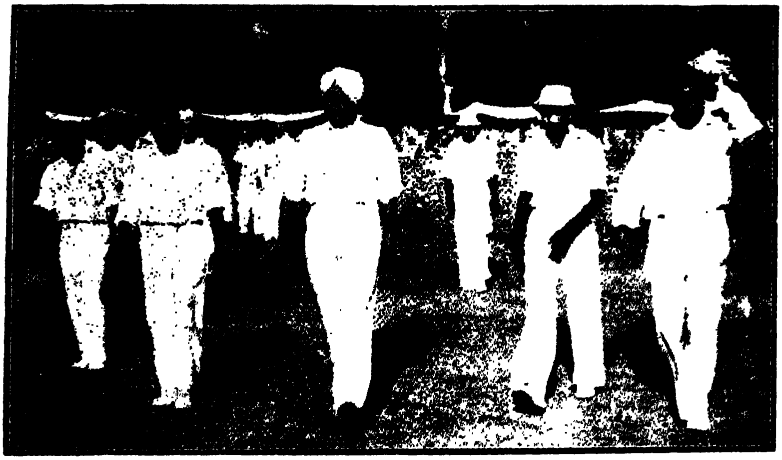


বে-সরকারী টেষ্টে লর্ড টেনিসনের দল ফিল্ড করতে যাচ্ছেন

লর্ড ব্রাবোর্ণ, এম সি সি, ক্রিকেট ক্লাব অফ্ নিউজিল্যাণ্ড, স্যার ফিরোজ খাঁ নুন প্রভৃতির নিকট থেকে প্রাপ্ত শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক বাণী পাওয়া গেছে। লর্ড ব্রাবোর্ণ তাঁর বাণীতে লিখেছেন, * * * I am indeed proud that the Cricket Club of India have done the honour of associating my name with the stadium and, * * * I feel that I now stand as good a chance of immortality as the late Mr. Lord who started the famous ground in London over 100 years ago. * * *

ষ্টেডিয়মে ৩৫ হাজার দর্শকের স্থান হবে। প্রধানতঃ ইহার উদ্বোধন উপলক্ষেই লর্ড টেনিসনের দল ভারতে আসেন। উদ্বোধন উৎসবের পর লর্ড টেনিসনের দলের সঙ্গে ক্রিকেট ক্লাব অফ্ ইণ্ডিয়ার তিনদিন ব্যাপী খেলা হয়েছে। লর্ড টেনিসন অসুস্থতানিবন্ধন খেলতে পারেন নাই। ক্যাপটেন জেমসন অধিনায়কত্ব করেন। ক্রিকেট ক্লাবের নায়ক হন এল পি জয়।

ষ্ট্যাণ্ডের নামকরণ হয়েছে বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় রঞ্জির নামে—রঞ্জি ষ্ট্যাণ্ড। রঞ্জি ষ্ট্যাণ্ড ফণ্ড খোলা হয়েছে, মহারাজা পাতিয়ালা ও জাম সাহেব নওয়ানগর প্রত্যেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন।



লাহোরে প্রথম বে-সরকারী টেষ্টে ভারতীয় দল ফিল্ড করতে যাচ্ছেন



এল্ ম্যাককরকেল (ল্যাঙ্কাসায়ার)



সিডনেতে এম্পায়ার গেম রীগেটায় ইংলণ্ড দলে ইহারা নৌ-চালনা করবেন—প্রাক্‌টিস করছেন

লর্ড টেনিসন—৩৬৭

ক্রিকেট ক্লাব অফ্ ইণ্ডিয়া—১৮৯ ও ২৯৭

খেলা ড্র হয়েছে।

ক্যাপটেন জেমসন টসে জয়ী হন। প্রথম দিনের খেলায় ৫ উইকেট খুইয়ে টেনিসন দল ৩০০ রান করেন। জেমস্ ল্যাংরিজ ১২৯ রান করে নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনে ৩৬৭ রান করে সকলে আউট হয়ে যান। ল্যাংরিজ ১৪৪, ইয়ার্ডলে ৮৭, ম্যাক্‌করকেল (নট আউট) ১৮, গীব্ ১৭।

ব্যানার্জ্জি বোলিংয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ৮৯ রানে ৬ উইকেট নিয়ে। মানকাদ ৬৩ রানে ৩ ও অমর সিং ১০১ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।



উত্তর ভারত চ্যাম্পিয়নসিপ্ বিজয়িনী মিস লীলা রাও (বামে) ও বিজিতা মিস ডুবাস



বিজয়িনী মিস আর সোহানী (বামে) ও বিজিতা মিস্ রাম সিং

ক্রিকেট ক্লাবের মাত্র ১৮৯ রানে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। মহম্মদ সৈয়দ ৫৩, হপ্‌কিন্স ৩৩, মার্চ্চেণ্ট (হিট উইকেট) ৩২, ব্যানার্জ্জি (নট আউট) ৮, মেহেরমজি ২৩।

পোপ ৩১ রানে ৪, গোভার ৪৩ রানে ৪, এড্‌রিচ্‌ ৯ রানে ১, জেমসন ১৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

তৃতীয় দিনে ক্রিকেট ক্লাবকে ফলো-অন করতে হয় এবং বেলা শেষে ৫ উইকেট খুইয়ে মোট ২৯৭ রান ওঠে।



উত্তর ভারত চ্যাম্পিয়ন গাউস মহম্মদ (দক্ষিণে) ও বিজিত এস এল সোহানী

অমরনাথ ৬৪, মার্চ্চেণ্ট ৬০, মানকদ ৫০, মহম্মদ সৈয়দ ৩৩, রণভিরসিংজী ২৯, ইন্দ্রবিজয়সিংজী ২৭, জয় (নট আউট) ২০। পোপ, ল্যাংরিজ, এড্‌রিচ্‌, ইয়ার্ডলে ও ওয়ার্দ্দিংটন প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় বে-সরকারী টেষ্ট ঃ

বোম্বাইয়ে ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, দ্বিতীয় বে-সরকারী টেষ্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে লর্ড টেনিসন দলের সঙ্গে। নিখিল ভারত দল প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে মাত্র ১৫৩ রানে সকলে আউট হয়ে যান বেলা ৩।৪২ মিনিটে। লাঞ্চের পর

এক ঘণ্টার মধ্যে ৩৫ রানে ৬ উইকেট পড়ে গেলো। মানকাদ ৩৮, অমরনাথ ৩০, কমুরুদ্দিন ২৯, হিন্দেলকার ২১। কেম্ব্রিজ উইকেট-রক্ষক গীবের অত্যাশ্চর্য্য ক্যাচ্ ধরবার ফলে এবং গোভারের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য ভারতীয় দলের এরূপ শোচনীয় পতন ঘটেছে। গোভার ৪৬ রানে ৫ এবং ওয়েলার্ড ৩০ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। গীব ৬টি ব্যাটস্-



এস্ ব্যানার্জ্জি গীব্

ম্যানকে উইকেটের পশ্চাতেধরেছেন—ক্যাচগুলি অতুলনীয়, —প্রায় অসম্ভব ছিল। ক্যাপটেন মার্চ্চেণ্টের ব্যাটিং পর্য্যায় ভাল হয় নাই।

দ্বিতীয় দিনে ২১৫৬ মিনিটে লর্ড টেনিসন দলের সকলে মাত্র ১৯১ রানে আউট হয়ে যান। তাঁদের ৫ উইকেটে ১৪১ রান ওঠে, কিন্তু শেষের ৫ উইকেট মাত্র ৫০ রানে পড়ে যায়। পার্কস্ ৪৪, এড্রিচ্ ৪২, ওয়ার্দ্দিংটন (নট আউট) ৩১, ল্যাংরিজ ২৩, ইয়ার্ডলে ১৪।

ভারতীয় দলের বোলাররা বেশ মারাত্মক বল করেছে এবং ফিল্ডাররা তাদের সঙ্গে সুন্দর সহযোগিতা করেছে।

ব্যানার্জ্জি ৪৭ রানে ৩, মানকাদ ৬ রানে ২, অমরসিং ৪৬ রানে ২, নিসার ৭৭ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

নিখিল ভারত দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে ৩১৫ মিনিটে এবং বেলা শেষে ৬৮ রান করেছে। মার্চ্চেণ্ট ১, হিন্দেলকার ১২, অমরনাথ ১, মহম্মদ সৈয়দ ৯, —চার উইকেট পড়ে গেছে। —১°।১২।৩৭

গামার মল্ল যুদ্ধাহ্বান ঃ

ভারতের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর গামা বোম্বাইস্থ সকল বৈদেশিক পালোয়ানকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেছেন ;—

মল্লভূমি থেকে বের না হয়ে একাদিক্রমে বিনা বিশ্রামে সকল বৈদেশিক মল্লবীরের সঙ্গে তিনি লড়তে প্রস্তুত আছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করতে বা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাভূত হবেন বা সমান সমান হবে ততক্ষণ কুস্তি চলবে।

ইউরোপীয় পালোয়ানদের প্রস্তাবিত যে কোন ব্যাঙ্কে তিনি পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখতে প্রস্তুত। কাহারও সহিত সমান সমান বা কাহারও নিকট পরাজিত হলে ঐ টাকা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাপ্ত হবে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত (উপন্যাস) "হংস-বলাকা"—২৲
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রোমাঞ্চ সিরিজের 'রক্তপিপাসা"—৸৹
সুরুচিবালা সেন প্রণীত ছেলেমেয়েদের জন্য "ছন্দে পুরাতনী"—১৲
শ্রীসুশীলকুমার দত্ত প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "হেমনলিনী"—।৷৹
শ্রীহৃষীকেশ শীল প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ "শ্রীহরিনাম"—৸৶৹
শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা"—৷৶৹ ও "শ্রদ্ধামাধুরী"—।৹
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত সাধুদের জীবনী "উপদেশবাণী"—৷৹
শ্রীআশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "যে ঢেউ ভাঙ্গিয়া গেছে—১৷৹
সন্তোষবিহারী বসু প্রণীত কৃষিগ্রন্থ "সারতত্ত্ব"—৷৹
আবদুল কাদের প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "সোলতান মাহ্মুদ"—৷৶৹
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত (পারিবারিক চিত্র) "দুঃখের পাঁচালী"—১৷৹
শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী) প্রণীত "নারী পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু সমাজে"—১৲
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত "শ্রীসূক্তম্ ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীতত্ত্ব"—।৶৹
৺দীনবন্ধু রায়চৌধুরী ও শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত "পরিচয়" (বঙ্গজ কায়স্থগণের সামাজিক ইতিহাসসহ দক্ষিণ ফরিদপুরের বিলপ্রদেশের বিবরণ)—২৲
শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মাষ্টার সাহেব"—১৷৹
চৌধুরী শ্রীরাধাগোবিন্দ পাল প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সমুদ্র-মন্থন কাব্য"—১।৹
আশীষ গুপ্ত প্রণীত "বন্দিনী সুভদ্রা"—১৷৹

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ চক্রবর্ত্তী চৌধুরী

শীতের রাতে

Bharatvarsha Printing Works



ভারতবর্ষ



মাঘ—১৩৪৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

হরিবর্ম্মদেবের সামন্তসার তাম্রশাসন

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পিএইচ-ডি

১৩১১ সনে—তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বৈদিক-ব্রাহ্মণ বিবরণ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম এই তাম্রশাসনখানির বিবরণ প্রকাশিত হয়। বসু মহাশয় এই গ্রন্থে তাম্রশাসনখানির একটি ক্ষুদ্র অস্পষ্ট হাফটোন ছবি মুদ্রিত করেন এবং গদ্যাংশের একটি পাঠও প্রকাশিত করেন। এই পাঠানুসারে তিনি সাব্যস্ত করেন যে :—

(১) এই শাসনদ্বারা ঋগ্বেদীয় বাৎস্যগোত্রীয় কৃষ্ণধর মিশ্র নামক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছে।

(২) তাঁহাকে বঙ্গে সামন্তসারের অদূরেস্থিত বেজনীসার নামক গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। বসু মহাশয় এই সিদ্ধান্তানুসারে শাসনখানিকে হরিবর্ম্মদেবের বেজনীসার লিপি বলিয়া বিদ্বজ্জনসমাজে পরিচিত করিয়াছেন।

(৩) শাসনখানি হরিবর্ম্মদেবের দ্বিচত্বারিংশৎ রাজ্য সম্বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

বসুমহাশয়প্রদত্ত পাঠের পাদটীকা পাঠে জানা যায়, শাসনখানি ফরিদপুর জেলায় ইদিলপুর পরগণার সামন্তসার গ্রামনিবাসী কাশীচন্দ্র সমদ্দার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের হস্তে ছিল। তিনি ইহাকে সামলবর্ম্মের তাম্রশাসন বলিয়া মনে করিতেন। বৈদিক কুলপঞ্জিকায় এই কল্পিত সামলবর্ম্মের শাসনের এক কল্পিত পাঠও গৃহীত হইয়াছিল। এই কল্পিত পাঠ সেনবংশের কেশব সেন এবং বিশ্বরূপ সেনের শাসনের পাঠের অনুকরণ। গৃহদাহে আগুনের তাপে আলোচ্য শাসনখানি নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় স্ব-গ্রামস্থ গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে পাঠোদ্ধারের জন্য শাসনখানি সমর্পণ করেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতার বিদ্বজ্জনসমাজে পরিচিত ছিলেন এবং অবশেষে

হাওড়ার উত্তরস্থ বালিতে বাড়ীঘর করেন। তিনি পাঠোদ্ধারের জন্য শাসনখানি মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়কে অর্পণ করেন। বসু মহাশয় অসীম অধ্যবসায় সহকারে এই নিতান্ত অস্পষ্ট শাসনের গদ্যাংশের একটা যথাসম্ভব মূলানুগত পাঠ প্রস্তুত করেন এবং তাহাই তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয়ভাগে প্রকাশিত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ জানেন, ইদিলপুরে অন্ততঃ আরও দুইখানি তাম্রশাসনের আবিষ্কারবার্ত্তা আমরা জানি। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন প্রিন্সেপকর্ত্তৃক বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আর শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর শাসনের একটা সংক্ষিপ্তসার স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর কর্ত্তৃক ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ঐ বিবরণ শ্রীচন্দ্রের কেদারপুর শাসন প্রকাশকালে এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা পত্রিকায় (১৭শ খণ্ড) আমাকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হয়। আলোচ্য হরিবর্ম্মের তাম্রশাসন সামন্তসারের সমদ্দারদের ঘরে রক্ষিত ছিল, এই পর্য্যন্তই সঠিক সংবাদ জানা যায়। সমদ্দারদের ঘরেই ইহা অগ্নিদাহে বিকৃত হয়। কিন্তু ঠিক্ কোন্ গ্রামে ইহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা জানিবার আর কোন উপায় নাই। শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর-শাসন অদ্যাপি লোকলোচনের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। এই শাসনখানি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমি একবার অনুসন্ধান করি। তখন স্থানীয় বৃদ্ধগণের নিকট অবগত হই যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাবুদের জমীদারীতে সামন্তসারের নিকটে মেঘনার পারে একটা মাটির হাঁড়ীতে কয়েকখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। কেশবসেনের ইদিলপুর শাসন এবং শ্রীচন্দ্রের ইদিলপুর শাসন এইরূপে একত্রে পাওয়া যায়। সামন্তসারের সমদ্দারগণও এই পাওয়া হইতে একখানি তাম্রশাসন লইয়া যান। ইহাই সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে আলোচ্য এই হরিবর্ম্মের তাম্রশাসন। এই সংবাদ কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না। তবে হরিবর্ম্মের তাম্রশাসনের দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ বাৎস্যগোত্রীয়, কেশবসেনের শাসনের দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণও বাৎস্যগোত্রীয়।

বসু মহাশয় যখন হরিবর্ম্মের শাসনের পাঠ প্রকাশিত করেন, তখন বঙ্গে প্রত্নচর্চ্চার প্রায় আদি যুগ। কাজেই বসু মহাশয় যতটুকু পড়িতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্যই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ভুল যদি কিছু করিয়া থাকেন, তাহার জন্য তিনি বিশেষ নিন্দার্হ নহেন। বসু মহাশয়ের পাঠাবলম্বনে এই শাসনখানি লইয়া পরে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। হরিবর্ম্ম যদি ৪২ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া থাকেন, তবে শ্রীচন্দ্র এবং বিজয় সেনের মধ্যে বর্ম্ম-বংশের জাতবর্ম্ম, হরিবর্ম্ম, সামলবর্ম্ম এবং ভোজবর্ম্মকে ধরান যে অসম্ভব, তাহাও সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। কাজেই কোথাও কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে, এই অনুমানও অনেকেই করিয়াছেন। তথাপি হরিবর্ম্মের তাম্রশাসনখানির খোঁজ করিয়া—ফিরিয়া পরীক্ষা করিবার উদ্যম কাহারও দেখা যায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকারেই বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড় শাসন এবং হরিবর্ম্মের শাসন, এই উভয় শাসনেরই খোঁজ করিতে সমর্থ হই। উভয় শাসনই ঢাকা মিউজিয়মে সংগৃহীত হইয়াছে। পরে দেখা যাইবে হরিবর্ম্মের শাসনে বেজনীসার গ্রামের কোন উল্লেখ নাই। এই অবস্থায় এই শাসনখানি যে গ্রামে রক্ষিত ছিল, তাহার নাম অনুসারেই **হরিবর্ম্মের সামন্তসার তাম্রশাসন** বলিয়া পরিচিত হওয়া উচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই শাসনখানির সম্মুখ ভাগ অগ্নিদাহে নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাম্রশাসনখানির রাজকীয় লাঞ্ছনযুক্ত মস্তক খসিয়া হারাইয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম পৃষ্ঠে ২৮ ছত্র লেখা ছিল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৩টি পূর্ণছত্র এবং একটি অর্দ্ধছত্র লেখা আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠের নিম্নভাগে এক ইঞ্চির বেশী স্থান শাদা রহিয়া গিয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠার সাত লাইন পর্য্যন্ত অক্ষরের আকৃতি মোটামোটি অনুধাবন করা যায়। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও কোন ছত্রেরই অর্থসঙ্গত পাঠ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। ভোজবর্ম্মের বেলাব-শাসনে আদৌ "ওঁ সিদ্ধি" আছে। এই শাসনখানি সেই ভাবেই আরব্ধ কিনা, তাহা পর্য্যন্ত স্থির করিয়া বলিতে পারিতেছি না। নিতান্ত সংশয়াকুলিত চিত্তে প্রথম ছত্রের প্রথম অক্ষর কয়টি নিম্নরূপ পাঠ করা যায়:—

ওঁ সিদ্ধং। দানাদিব জয়টতি দে * * ও যম্ময় সঙ্ক * * * * * *

উল্লেখ করা আবশ্যক যে সপ্তম ও অষ্টম অক্ষর ব ও জ ভিন্ন এই পাঠের আর একটি অক্ষরও সংশয়রহিত নহে। ইহা হইতেই এই তাম্রশাসনের সম্মুখ-পৃষ্ঠের অবস্থা বুঝা যাইবে। আর প্রথম কয় ছত্রের পাঠোদ্ধারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবার প্রয়োজনের অভাব। কারণ প্রথম শ্লোকে সম্ভবতঃ বিষ্ণুর স্তুতি আছে এবং দ্বিতীয় শ্লোকে যাদব বংশের আদি পুরুষ চন্দ্রের স্তুতি থাকাই সম্ভব। ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ শ্লোকগুলি একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে।

একেবারে শেষ ছত্রের আদিতে সৌভাগ্যক্রমে "পুর-সমাবাসিত" কথা কয়টি অধিক আয়াস বিনাই পাঠ করা যায়। ইহা হইতেই বসু মহাশয় সম্ভবতঃ "ইহ খলু বিক্রমপুর সমাবাসিত"—ইত্যাদি ধরিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক এই অংশের বসুমহাশয়প্রদত্ত পাঠ নিম্নরূপ :—

প্রথম পৃষ্ঠ

২৭। - ইহ খলু বিক্রম

২৮। পুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ জ্যোতির্বর্ম্ম পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব

২৮শ ছত্রে হরিবর্ম্মের পিতার নাম নিশ্চয়ই আছে। হরিবর্ম্মের পিতার নাম ঠিকমত জানা বর্ম্মবংশের ইতিহাস উদ্ধারের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই ছত্রটি মুছিয়া এমনি অস্পষ্ট হইয়াছে যে প্রথম দিকের "পুর সমাবাসিত" এবং শেষের "পরমবৈষ্ণব" ভিন্ন আর কিছুই নিশ্চিতরূপে পড়া যায় না। লক্ষ্য করা আবশ্যক, হরিবর্ম্মের পিতার নাম বসু মহাশয় "জ্যোতির্বর্ম্ম" পড়িয়াছেন। প্রাচীন তাম্রশাসনে রেফ্‌যোগে দ্বিত্ব অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। কাজেই নামটির বানান "জ্যোতির্বর্ম্ম" না হইয়া "জ্যোতির্ব্বর্ম্ম" হওয়া উচিত। "র্ম্ম" অক্ষরটি এখনও বেশ স্পষ্ট আছে। বসু মহাশয় দেখিয়াছিলেন এবং এখনও আভাসে অনুধাবন করা যায় যে "র্ম্ম" যুক্তাক্ষরটির পূর্ব্বের ব-অক্ষরে দ্বিত্ব নাই। এই জন্যই বসুমহাশয় উহা "র্ব"রূপে পাঠ করিয়াছিলেন।

বসু মহাশয় "জ্যোতির্বর্ম্ম" শব্দের পূর্ব্বে "শ্রী" পাঠ করেন নাই। ভোজবর্ম্মের বেলাবশাসনে ভোজবর্ম্মের পিতা সামলবর্ম্মের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" দেখা যায়। কাজেই হরিবর্ম্মের শাসনেও হরিবর্ম্মের পিতার নামের পূর্ব্বে শ্রী থাকা সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে শ্রী আছে এবং তাহার স্পষ্ট আভাস এখনও মূল শাসনে অনুধাবন করা যায়। 'বর্ম্ম' শব্দের পূর্ব্বে 'ত' অক্ষরটিও অদ্যাপি বেশ ধরা যায়। 'শ্রী'র ঈকারের পরে জ-অক্ষরের আরম্ভ। মধ্যে এ-কার চিহ্ন নাই। অধিকন্তু শ্রী এবং ত-অক্ষরের মধ্যে 'জ্যো' এত বড় একটা যুক্তাক্ষর লিখিবার স্থান মোটেই নাই। এই সমস্ত বিচার করিয়া, বিশেষতঃ ব-অক্ষরে দ্বিত্বাভাব দেখিয়া নামটি "জাতবর্ম্ম" রূপেই পাঠ করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সমস্ত বিচার করিয়াও সর্ব্বশেষ এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে র্ম্মভিন্ন অন্য অক্ষরগুলি এমনি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে উপরের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া জোর করা চলে না।

তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আছে। অন্যান্য শাসন অবলম্বনে এই যুগের বঙ্গীয় তাম্রশাসনের গদ্যাংশের পাঠ সুনির্দ্দিষ্ট থাকায় এই অংশের পাঠোদ্ধারে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু যেখানেই নূতন কথা আছে সেখানেই বসুমহাশয় পাঠে ভুল করিয়াছেন। ভোজবর্ম্মের বেলাবশাসন আবিষ্কারেও বসুমহাশয়ের পাঠের কতক কতক ভুল সংশোধিত হইতে পারিয়াছে।

দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী এবং বাৎস্যগোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহের নামটি ঠিকমত পড়িতে পারিলাম না। বসু মহাশয়—"ভট্টপুত্র জয়বাচি শ্রীদেব প্রপৌত্রায়" পড়িয়াছেন। কিন্তু "প্রপৌত্রায়" শব্দের পূর্ব্বে "শর্ম্মণঃ" শব্দের বিসর্গযুক্ত শেষ অক্ষরটি স্পষ্ট দেখা যায়। নামটি "জয়রামিত" বা "জয়রাশ্রিত" বা "জয়বাসিত" ছাড়া অন্য কিছু পড়া যায় না। দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের নামটি বসু মহাশয় নিতান্ত জোর করিয়া, সম্ভবতঃ সামন্তসার ও কোটালিপাড়ের বৈদিকগণের আদিপুরুষ যশোধরের নামের সহিত মিল রাখিবার জন্য ব্রেকেটে [শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্র] এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। এই নামটি যেই স্থানে লিখিত, সেই স্থানে তাম্রশাসনখানি প্রায় ১½ ইঞ্চি পরিমিত ফাটা। নামাক্ষরের ঠিক মধ্য দিয়া এই ফাটল চলিয়া গিয়াছে। কাজেই নামটি একেবারেই পড়া যায় না। শুধু শেষ অক্ষরটি কতকটা স্পষ্ট আছে। উহা যি বা পি বা সি হইবে। নামটি "শেষশায়ি" বা "সোমপায়ি" হওয়া অসম্ভব নহে। উহা "কৃষ্ণধর মিশ্র" নহে ইহা জোর করিয়াই বলা যায়। দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণের প্রপিতামহের নাম জয়রামিত বা জয়রাশ্রিত বা জয়বাসিত। পিতামহের নাম

বেদগর্ভ। পিতার নাম পদ্মনাভ। বঙ্গীয় বৈদিক সমাজে ঋগ্বেদী বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন কিনা জানিনা। যদি কেহ থাকেন, দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের পুস্তকে বৈদিক বিবরণে ঋগ্বেদী বাৎস্যগোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইলাম না। সামন্তসারের বৈদিকগণ শৌনিক যশোধরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। কোটালিপাড়ের বৈদিকগণ শুনক যশোধরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। বসুমহাশয় অনুমান করিয়াছেন, শুনক ও শৌনিক যশোধর অভিন্ন ব্যক্তি। প্রাধান্য দাবী করিয়া এই দুইসমাজে বিলক্ষণ রেষারেষি বর্ত্তমান ছিল। নিজ নিজ সমাজের প্রাধান্য সপ্রমাণ করিবার জন্য উভয় সমাজই একএকখানি তাম্রশাসন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উভয় তাম্রশাসনের গ্রহীতাই বাৎস্যগোত্রীয়। মদনপাড় শাসনের গ্রহীতায় বেদের উল্লেখ নাই। হরিবর্ম্মের শাসনের গ্রহীতা বাৎস্যগোত্রীয় এবং ঋগ্বেদী। কাজেই এই দুই শাসনের একখানার সহিতও এই দুই বৈদিক সমাজের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক কুলপঞ্জীতে শ্যামল বর্ম্মার (প্রকৃত নাম সামল বর্ম্ম) শাসন বলিয়া যে শাসনের পাঠ গৃহীত হইয়াছে, উহা স্পষ্টই বিশ্বরূপ সেন অথবা কেশব সেনের শাসনের পাঠের অবিকল অনুকরণ। উহা সামল বর্ম্মের শাসনের পাঠ হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কুলগৌরব প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় ইতিহাস বহুদিন ধরিয়া বিকৃত হইয়া আসিতেছে। আজকাল কুলগৌরবের প্রতাপ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে—কুলগৌরব প্রতিষ্ঠাচেষ্টায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ যে কতদূর ঘৃণ্য, আশা করি দেশবাসিগণ তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। বিখ্যাত ফরাসী লেখক রুশো তাঁহার আত্মজীবনীতে মুখবন্ধ করিয়াছেন যে, ঐতিহাসিকের আদর্শ ভারতের মহাভারতকার ব্যাস—তিনি নিজের রচিত গ্রন্থে মৎস্যজীবীকন্যাগর্ভে নিজের অগৌরবজনক জন্মকাহিনী পর্য্যন্ত অম্লানবদনে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসকারের আদর্শও অনুরূপ সত্যসন্ধ হওয়া আবশ্যক। সামাজিক ইতিহাসের রচনায় এইরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতে যাওয়ায় বিপদ আছে। যাঁহারা সেই বিপদকে ভয় করেন, তাঁহাদের সামাজিক ইতিহাস রচনায় হাত দেওয়া উচিত নহে।

নিম্নে হরিবর্ম্মের সামন্তসার শাসনের পাঠ উদ্ধৃত হইল। পাদটীকায় বসুমহাশয়ের পাঠের ভুলগুলি প্রদর্শিত হইল।

প্রথম পৃষ্ঠ

২৭। স খলু শ্রীবিক্রম

২৮। পুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীজাতবর্ম্মপাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

১। পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেবঃ কুশলী॥

২। শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতি পঞ্চবাসমণ্ডলে ময়ূরবিড়্জ-বিষয় সং। বরপর্ব্বত গ্রামে। অশীতিষষ্ঠ্যা—(১)

৩। ধিক ষড্দ্রোণোপেত (২) হল ভূমৌ॥ সমুপগতাশেষ রাজপুরুষ রাজ্ঞী রাণক রাজপুত্র রাজামাত্য মহা

৪। বূ্যহপতি মণ্ডলপতি মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহা-সেনাপেতি (৩) মহাক্ষপটলিক মহামুদ্রাধিকৃত্য (৪)

৫। মহাপ্রতীহার কোট্টপাল দৌঃসাধসাধনিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্ব গো মহিষা জা

৬। বিকাদি ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদিনন্যাংশ্চ সকল রাজপাদো

৭। পজীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতানন্যাংশ্চ(৫) আচট্টভট্ট জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্ম-

৮। ণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি [বোধয়তি (৬)] সমাদিশতী চ (৭) মতমস্ত ভবতাং যথোপরি লিখিতা ভূমিরি-(৮)

৯। য়ং স্বসীমাবচ্ছিন্না তৃণপূতি [গোচর পর্য্যন্তা (৯)]

(১) এই ছত্রে বসুমহাশয়ের পাঠ :—"শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতি পঞ্চ-কুসুম্বশৈল উপরনিচক্রবিষয়স্থ বরপর্ব্বত গ্রামে স্বশ্রীত্রিষষ্ট্যা"—

(২) বসু :—"ষড়্দ্রাণ্যপেত"। (৩) "পতি" পাঠ্য। (৪) "কৃত" পাঠ্য। (৫) এই ছত্রের এই অংশ অত্যন্ত অস্পষ্ট। (৬) অস্পষ্ট। (৭) "সমাদিশতি" পাঠ্য।

(৮) বসু :—"মানয়তি [বোধয়তি সমাদি] শতীদমত্রযস্ত ভবতাং বঙ্গে বেজনীশার"। তাম্রশাসনবস্তুর সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, এই স্থানে বেজনীশার গ্রামের নাম আসিতেই পারে না। কারণ বসুমহাশয় দ্বিতীয় পংক্তিতে নিজেই পড়িয়াছেন যে শাসনগ্রামের নাম বরপর্ব্বত, বেজনীশার নহে। (৯) অস্পষ্ট।

সতলা সজলস্থলা সগর্ত্তোষরা সদশাপরাধা স (১০)

১০। চৌরোদ্ধরণা পরিহৃতসর্ব্বপীড়া [আচাড়ভড়প্রবেশা] অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা সমস্ত রাজভোগকর হির-(১১)

১১। ণ্যপ্রত্যায়োপসহিতা (১২)॥ বৎসসগোত্রায় ভার্গব চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব জমদগ্নি পঞ্চর্ষি প্রবরায়

১২। ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িনে ভট্টপুত্র জয়-বাসিত (১৩) শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়। ভট্টপুত্র বেদ গ

১৩। র্ভ-শর্ম্মণঃ পৌত্রায়। ভট্টপুত্র পদ্মনাভ শর্ম্মণঃ পুত্রায় ভট্টপুত্র শান্তিবারিক শ্রী — — —(১৪) রি [মি ? পি ? সি ?]

১৪। শর্ম্মণে শ্রীমতা হরিবর্ম্মদেবেন পুণ্যেঽহনি বিধি-বদুকপূর্ব্বকং কৃত্বা [ভগবন্তং বাসু] দেব ভট্টা (১৫)

১৫। রকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভি-বৃদ্ধয়ে (১৬) আচন্দ্রার্কক্ষিতি [সমকালং যাবৎ] ভূমি (১৭)

১৬। চ্ছিদ্র ন্যায়েন শ্রীমদ্বিষ্ণুচক্রমুদ্রয়া (১৮) তাম্র-শাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ॥ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরনুম

১৭। ন্তব্যং ভাবিভিরপি ভূপতিভিঃ পালনে দানফল গৌরবাৎ হরণে মহানরকপাতভয়াৎ দানমিদম-

১৮। নুমোদ্যানুপালনীয়মিতি নিবাসিভিঃ (১৯) ক্ষেত্র-করৈশ্চ [আজ্ঞাশ্রবণবিধেয়ীভূয় যথোচিত প্রত্যায়োপনয়ঃ কা]

১৯। র্য্য ইতি। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ

২০। তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। ষষ্টিং-র্ষসহস্রানি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চা

২১। নুমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেত্। স্বদত্তাং পর-দত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাং। সবিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভি

২২। স্সহ পচ্যতে। বহুভির্বসুধাদত্তা রাজভিস্স গরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং।

২৩। ইতি কমল দলাম্বু বিন্দু লোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন

২৪। হি পুরুষৈঃ পর কীর্ত্তয়োর্ব্বিলোপ্যাঃ॥ O (২০)

দেখা গেল, বসু মহাশয় যেখানে "দ্বাচত্বারিংশদব্দীয় মুদ্রয়া" পাঠ করিয়া শাসনখানি হরিবর্ম্মদেবের ৪২শ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সেই স্থানের প্রকৃত পাঠ ভোজবর্ম্মের বেলাবশাসনেরই মত "শ্রীমদ্বিষ্ণু চক্র-মুদ্রয়া"। বর্ম্মরাজগণের কালপরম্পরা স্থিরীকরণে বঙ্গের ঐতিহাসিকগণ হরিবর্ম্মের ৪২ বৎসর রাজত্বের স্থান দিতে বহুকাল ধরিয়া হিমসিম খাইয়া আসিতেছেন। এইবার স্থিররূপে জানা গেল যে মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের মন্ত্রণা প্রভাবে হরিবর্ম্মদেব "সুচির"কাল রাজ্য করিয়া থাকিলেও, সেই সুচিরকালের পরিমাণ বিয়াল্লিশ বৎসর ধার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই।

আলোচ্য হরিবর্ম্মের শাসনখানি বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানী হইতে প্রদত্ত। সামলবর্ম্মের খণ্ডিত বজ্রযোগিনী শাসনে দেখা যায়, উহাও বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত। সামলের পুত্র ভোজবর্ম্মের বেলাব শাসনও বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত। বজ্রযোগিনী শাসনে হরিবর্ম্মের নাম সামলবর্ম্মের প্রসঙ্গের পূর্ব্বে পাওয়া যায়। কাজেই হরিবর্ম্ম, সামলবর্ম্ম এবং ভোজবর্ম্ম একই

(১০) এই ছত্রের অধিকাংশই বসুমহাশয় পড়িতে পারেন নাই। (১১) এই ছত্রেরও অধিকাংশই বসুমহাশয় পড়িতে পারেন নাই। (১২) বসু :—"যাগা গ্রামোঽয়মুদ্দিশ্য।" (১৩) জয়রামিত ? জয়রাশ্রিত ? মুখবন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। (১৪) বসু :—"ভট্টপুত্র বেদার্থবাচিক [শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্র]"। মুখবন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। (১৫) বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশ অস্পষ্ট। বসুমহাশয়ের পাঠ :—"ভগবন্তং কৃষ্ণধরভট্টারকমুদ্দিশ্য।" কৃষ্ণধরের নাম এই শাসনে কোথাও নাই। বেলাব-শাসনেও এই স্থানে "বাসুদেব-ভট্টারকমুদ্দিশ্য"ই আছে।

(১৬) বসু :—"পুত্রপুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে"। (১৭) বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ অস্পষ্ট। (১৮) বসু :—দ্বাচত্বারিংশদব্দীয় মুদ্রয়া"। এই মারাত্মক ভুলে বহু গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে।

(১৯) বসু :—হরণে সত্যো নরকপাতভয়াদিদং নাম দাতব্যং সদ্ধর্ম্ম পরিপালনীয়ঃ ভবদ্ভিঃ"।

(২০) তাম্রশাসনগুলির শেষে সাধারণতঃ "নি অনু মহাক্ষ নি" অথবা "মহাসাং করণ নি" ইত্যাদি সাঙ্কেতিক বাক্যে উহাদের সরকারী নিবন্ধন বা রেজিষ্ট্রেশন উল্লিখিত থাকে। শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনে তাহা নাই। (Ep. Ind. Vol. XII P. 136)। দুই দাঁড়ী দিয়া ইংরেজী বড় হাতের O আকৃতির একটি চিহ্ন লিখিয়া তাম্র-শাসন শেষ হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনখানিও অবিকল সেই প্রকারে শেষ। ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত, অদ্যাপি অপ্রকাশিত শ্রীচন্দ্রের ধুল্লাশাসনে কিন্তু O চিহ্নের পরে আবার দুই দাঁড়ী দিয়া সন তারিখ এবং "মহাসাং নি অনু। মহাক্ষনি"— এই কথা কয়টি লিখিত আছে।

রাজধানীযুক্ত একই রাজ্যে পর পর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য।

আলোচ্য তাম্রশাসনে উল্লিখিত পঞ্চবাস মণ্ডল, ময়ুরবিড়ঙ্গ বিষয় এবং বরপর্ব্বত গ্রাম কোথায় ছিল তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। বিক্রমপুরে প্রাচীন সেন রাজধানী রামপালের নিকট পঞ্চসার নামে একখানি বিখ্যাত গ্রাম আছে। কিন্তু পঞ্চবাস মণ্ডলের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া কল্পনা করা নিরর্থক।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে আলোচ্য শাসনখানির পাঠ শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের পাঠের সহিত মিলাইলেই বুঝা যাইবে যে উভয়ের মুসাবিদা এক এবং এই মুসাবিদা সেনরাজগণের মুসাবিদার সহিত সর্ব্বত্র মিলে না। হরিবর্ম্মের শাসনের পাঠ যে শ্রীচন্দ্রের শাসনের পাঠ অনুসরণ করিয়াছে, ইহাতে পূর্ব্বানুমিত এই সত্যই পুনরায় সমর্থিত হইল যে পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মরাজগণের শাসন চন্দ্ররাজগণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী।

বেদনার হে পথিক—

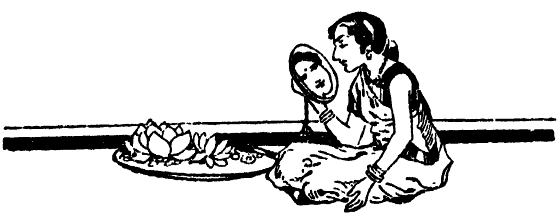
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেদনার হে পথিক, চেয়ে দেখো দূর দিগন্তরে
উঠিয়াছে উদ্বেলিয়া অন্তহীন অশ্রুর সাগর,
শূন্যতা মুখরি' ওঠে ব্যথা-ক্ষুব্ধ তরঙ্গ-মর্মরে,
পশ্চাতে মিলায়ে যায় দগ্ধরিক্ত ধরিত্রী-প্রান্তর।

সেথায় করিছে নৃত্য অবাস্তব মরু-মরীচিকা,
প্রাণের স্পন্দন নহে, নাহি সেথা প্রশান্তি-প্রচ্ছায়া,
শীত-রিক্ত পত্রহারা মৃত্যুমগ্ন অরণ্য-বীথিকা,
রুদ্র রৌদ্রে দিবানিশি দীপ্যমান বেদনার মায়া।

সম্মুখে অসীম সিন্ধু অনাদ্যন্ত ওঠে তরঙ্গিয়া,
তুমি তা'র তটপ্রান্তে আশাহীন দাঁড়ালে একাকী,
অন্তরের দীপশিখা ঝঞ্ঝা-স্পর্শে গেলো নিভাইয়',
রিক্ততার পূর্ণ পাত্র,—এতটুকু রহিলো না বাকী।

সাধনার বেদীমূলে হে পথিক, এই তব বলি
লহো ওগো সর্বহারা, মোর তপ্ত অশ্রুর অঞ্জলি।



দারিদ্র্যের ইতিহাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২১)

অসিত আশ্রয় দিলে।

অতখানি ধর্ম্মভয় তার ছিল না, যাতে করে মেয়েটাকে সেও ছেড়ে দেবে। একটা কথাও এতে বলা চলবে না— না এদিক, না ওদিক।

বলবেই বা কি? সত্যই এই মেয়েটা কোথায় ভেসে চলে যাবে—যদি এইটুকু আশ্রয় তাকে না দেওয়া হয়।

কিন্তু দেশের লোক হয়ে উঠল বিপক্ষ।

আগে গোপনে দু'এক জায়গায় মাত্র আলোচনা চললো, তারপর হল প্রকাশ্যভাবে যেখানে সেখানে ব্যাপক ভাবে। অনেকে অসিতকে উপদেশ দিলেন—"ওকে কেন জায়গা দিলে অসিত, বের করে দাও; ও নিজের পথ নিজে চিনে নিতে পারবে।"

পথ—?

অসিতের আজও হাসি পায়।

পথ কথাটা বলতে ভালো, কিন্তু সে পথের সন্ধান কে দেবে? পথ হয় তো ছিল, কিন্তু সে পথ যে বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র মরণের পথটাই খোলা রয়েছে। আশ্চর্য্য দেশের লোক—তারা সোজা সেইটাই চায়।

কিন্তু বাঁচার অধিকার ওদের মত এ মেয়েটারও আছে, কারণ এও ওদের মত মানুষ। সমাজের—ধর্ম্ম-সেবার অধিকার এর নাই থাক, মনুষ্যত্বের দাবী নিয়ে এতো বেঁচে থাকতে পারে, আর বাঁচবেও তাই।

কেউ কেউ বলে—মনুষ্যত্ব, আত্মমর্য্যাদা প্রভৃতি গাল-ভরা কথাগুলো বাঁধা গৎ ছাড়া আর কিছুই নয়; নেহাৎ বড় বিপাকে পড়ে মানুষ এই কথাগুলোই আউড়ে যায়। কিন্তু হোক বাঁধা গৎ, এই গতের ধারানুসারে মানুষের জীবনের গতিও তো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; মানুষ সব জেনেও তো এর প্রভাব এড়াতে পারে না।

কিন্তু এতে সত্য আছে বই কি, নেহাৎ বাজে কথা নয়।· কোনকালে যা হয়নি তাও তো সম্ভব হচ্ছে। মনুষ্যত্ব আত্মমর্য্যাদা প্রভৃতি উঁচুদরের কথাগুলো শুনতে শুনতে মানুষের মনে করে যে সেই সুপ্ত অনুভূতি জেগে ওঠে এবং ক্রমে রক্তপিপাসু জোঁকের মতই স্ফীত হয়ে ওঠে, তাই বা কে জানে।

মনের কোন অন্তরালে এই অতি সূক্ষ্ম অনুভূতি ঘুমিয়ে থাকে, মানুষ তাই জানতে পারে না। অতি শান্ত প্রকৃতির লোকও সময় সময় ক্রোধে জ্ঞান হারায়, তাই না জগতেই ঘটে কত অনিচ্ছাপ্রণোদিত চুরি, ডাকাতি, আত্মহত্যা— এমন কি পরকেও হত্যা করা। অতি আঘাতে মানুষ কখন চৈতন্যহীন হয়ে পড়ে, ঝিমিয়ে পড়ে যায়; সাড়া তখন এনে ফেলে সত্যকার জাগরণ, প্রাণের বিকাশ সেই করে তোলে; তখন নিজের শক্তি সম্বন্ধে মানুষের সন্দেহ থাকে না।

এরই জন্যেই না জগাই মাধাই হল সাধু, লালাবাবু হলেন ত্যাগী। কখন কার কি সময় আসে কে জানে; মানুষ তখনই নিজেকে মুক্ত মনে ক'রে—পূর্ণোদ্যমে ছুটে চলে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে।

পদে পদে বাধা, বিপদ, দ্বন্দ্ব, ভয় কাটিয়েও মানুষকে তবু বাঁচতে হবে। দুঃখ কষ্টের অমোঘ শক্তি, অমোঘ প্রতাপ, মানুষকে যে অভিভূত করতে পারে—মানুষের পরাজয় হয় তো সেইখানেই—প্রকৃত মৃত্যুই যে তাই।

হোক মানুষের শক্তি দুর্ব্বার, অপরিমিত—মানুষ অনাহারে, অনিদ্রায়, লক্ষ অশান্তির মধ্যে ও দাঁড়াবে, বাঁচবে, এগিয়ে যাবে।

অসিত ভাবে এই রকম করে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কতটা শক্তি সংগ্রহ করা দরকার? মানুষ সেটুকু শক্তি সংগ্রহ করে নি কি? সাপ, ব্যাঙের মত অন্ত্যজ জীবও যখন অন্ততঃ পক্ষে কয়েক মাসের মত আহার্য্যস্বরূপ চর্ব্বি নিজেদের শরীরে সঞ্চয় করে রাখতে পারে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কি তেমনই এতটুকু বেলা হতে এতটুকু শক্তিও সঞ্চয় করে রাখে নি, এতটুকু দুধও কি তারা খেতে পায় নি?

দুধ ?—দুধ খাবে কে—ধনী সন্তান—দরিদ্র কি তার সমান হতে পারে ?

মায়ের দুধে যে পুষ্টিলাভ করবে—এদেশের মাতৃস্তন্যে সে দুধটুকু কই ? অসিত দেখতে পাচ্ছে এদেশের মায়েদের—অতি ক্ষীণা, দুর্ব্বলা ; কোনরকমে তারা দিন কাটায়। শারীরিক বলের অভাবে মানসিক উৎকর্ষতার অভাব পদে পদে, তাই সন্তান কেবল দৈহিক দীনতা নিয়েই সঙ্কুচিত থাকে না, মনও হয় তার অতি নিস্তেজ—কিছু ভাবার সামর্থ্যও তাদের থাকে না।

বাংলার মেয়ে ; কেউ বা ভেসে চলেছে পাশ্চাত্যের স্রোতে, হারিয়েছে নিজের বৈশিষ্ট্য, সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তি। কেউ বা ঘরে পড়ে সইছে অত্যাচার নিপীড়ন, ধরে আছে সেই বহু পুরাতন যুগের আদর্শের ছায়া মাত্র। ভুলে গেছে নূতন যুগে সে আদর্শ খাপ খায় না। চাই পুরাতন ও নূতনে সমন্বয়, হাঁসের মত জল ফেলে দুধটুকু খাওয়া।

শক্তি মানুষ পাবে কোথা হতে। চলতে নুইয়ে পড়ে, মেরুদণ্ড গেছে বেঁকে, পায়ের সরুর অংশটা রোগা দেহের ভারই বইতে অক্ষম, দুই পা গিয়ে তাই হাঁফায়। একটা দিন না খেয়ে যুদ্ধ করার শক্তি ওদের নাই ; নিজেকে পরের হাতে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে এতটুকু পাওয়ার উপর দিয়ে তারা বাঁচতে চায় এবং কয়েকটা বৎসর বেঁচেও থাকে।

অসিত মানুষকে ডাকে, তার দেশবাসীকে ডাকে—ওরে, তোরা জাগ—জেগে ওঠ ; অন্ততঃ পক্ষে তোরা যে বেঁচে জেগে আছিস সেইটুকু প্রাণের সাড়া দে। বুকে হাত দিয়ে–স্পন্দন যতক্ষণ আছে—তোদের শক্তিও ততক্ষণ ফুরায় নি। সেই শক্তিকে স্বীকার কর, সেই হোক তোদের মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই স্বীকারই হোক তোদের পরম ও চরম সাধনা। এমন ভাবে পড়ে থাকা কেন—সকলের পদদলিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত মানুষ—এতে কি সার্থকতা পাবি ?

কিন্তু এই যে ভাগ্য—

অসিত নিজের কপালে হাত বুলায়—পারলে সে এই কপালটাকে কেটে বাদ দিত ; আর একখানা কপাল এখানে জুগিয়ে দিত। সে কপাল হত কল্পতরু, তাকেই সহায় করে অনেক কিছু কাজ করা যেত।

বাণী এখানেই রইল—

মেনকার কথা মনে হয় বাণীর পানে তাকিয়ে। মেনকা ? সে কোথায় কে জানে ? কিই বা ক্ষতি হল কার, কারই বা কতটুকু এলো গেল ?

এ দেশের মেয়েরা এখনও নিজেদের বোঝার মতই ভাবে—।

যাক, একে একে সবাই যাক—মেনকার মত আরও কত মেয়ে আছে বাংলার ঘরে, তারা কত সইছে, এখনও কত সইবে। কতক করবে আত্মহত্যা, কতক যাবে ঘর ছেড়ে বাইরে, কতক ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে অদৃষ্টলিপি বলেই সব মেনে নেবে।

তারাই আবার টিপ্পনী কাটবে পরের সম্বন্ধে, ব্যতিক্রম দেখলে তারাই দেবে গালে চূণ-কালি—এইটাই বড় আশ্চর্য্য ঠেকে।

তারা আঘাত পাচ্ছে বলেই আঘাত দিতে চায় বেশী—এ তো জানা কথা।

অসিত সব ভুলে যেতে চেষ্টা করে, কাজের মধ্যে ডুবতে চায়।

(২২)

জীবিকার্জ্জনের জন্য অবশেষে যাত্রার দল—তাই সই।

অথচ গ্র্যাজুয়েট ছিল সে, উচ্চ সম্মানের সঙ্গে বি-এ পাস করেছিল। তবে সে তার সেই পরিচয়পত্রখানা ছিঁড়ে শতখণ্ড করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছে।

সেটা চোখের সামনে না পড়াই ভালো, মনে কেবল অহঙ্কারই জাগিয়ে তোলে বই তো নয় ;—এই সব দরিদ্র অশিক্ষিতও তার মাঝখানে একটা উঁচু প্রাচীর তুলে দেয়। যা দিয়ে কোনও উপকার নেই, কোন কাজ পাওয়া যায় না—কি হবে তা রেখে ?

রোখের বশে সার্টিফিকেটখানা একদিন ছিঁড়ে ফেলে অসিত কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল ; কতক্ষণ ধরে দেখছিল—ছেঁড়া ছোট ছোট টুকরোগুলো হালকা বাতাসে নাচতে নাচতে কেমন সরে পালায়।

যৌবনের স্বপ্ন অমনই ভাবে মিলিয়ে যায়। কত আশা একদিন জাগে, কত ভরসা একদিন আসে, কিন্তু একদিন হয়ে যায় সবই মরীচিকা—সবই স্বপ্ন। এ স্বপ্নেও হয় তো সার্থকতা আছে—ঘুমিয়েও মানুষ একটু শান্তি পায়, সেই-

টুকুই হয় সার্থকতা। জাগলে মনে হয় স্বপ্ন স্বপ্নই—একেবারে অসার, একেবারে ফাঁকা।

যেমন করে হোক বাঁচতে হবে, আহার্য্য সংগ্রহ করতেই হবে; তার জন্যে যত নীচ কাজই হোক না করা চাই—করতেও হবে। কবে একদিন ষোড়শোপচারে খাওয়া হয়েছে, তার গন্ধটা আজও হাতে লেগে থাকবে এবং নাকের কাছে হাতটা ধরে মনে সান্ত্বনা লাভ করতে হবে—অনেক খেয়েছি। গত-কাল অতীতেই পর্য্যবসিত হয়ে যায়, আবার আগামী কালের জন্য মানুষকে প্রস্তুত হতে হবে।

যাত্রার দল—ছোটলোক অশিক্ষিত হোক না, তাতেই বা কি? আসল জিনিস খাওয়া—বেঁচে থাকা। যখন মানুষ গণার দিন আসবে—তখন নিজের স্বাতিত্ব প্রতিপন্ন করা।

সবাই বেঁচে আছে, অসিতই বা বাঁচবে না কেন? ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধ শিউচরণ বাতে পঙ্গু অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। তার পরে নিত্য সর্দ্দি, জ্বর, গলা-ব্যথা ইত্যাদি—কথা বলতে স্বর বার হয় না, তবুও সে মরতে চায় না; তবুও সে জোর করে মাটি আঁকড়ে ধরে এই মাটিরই সব স্নেহটুকু উপভোগ করতে চায়।

অনন্তকে নোবল প্রাইজ যেমন করেই হোক যোগাড় করে দিতে হবে।

আশ্চর্য্য বোকা এবং অন্ধ এই লোকটা। বয়স তার বড় কম নয়, তবু সে যাত্রা করে, নোবল প্রাইজ পাওয়ার আশা করে, আর তার জন্য খাটেও বড় কম নয়। এই ভগবতী অপেরাপার্টি নিয়ে তার দিনে আহার নাই, রাত্রে ঘুম নাই।

সবই হল, মুস্কিল বাধল নিতাইকে নিয়ে।

তার পরম সুন্দর আকৃতি অতি সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত—তার উপর ছিল তার প্রাণবন্ত অভিনয়। যে কোন পার্টে সে নামলেও তার অভিনয় হয়ে উঠতো জীবন্ত, মনে হতো না অভিনয় দেখা হচ্ছে।

অনন্ত তাকে অত্যন্ত আদর দিত, কিন্তু দলের আর কেউ তাকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে নি।

সেদিন যখন দলেরই একটী ছেলেকে সে বেশী রকম প্রহার ক'রে বেশ শান্ত ভাবেই ফিরে এসেছিল ঘরের কোণে, তখন তাকে দেখে কেউই বুঝতে পারে নি সে কতখানি রেগে উঠেছিল।

সে কথা অবিলম্বে অসিতের কাণে এসে পৌছল; প্রহৃত ছেলেটীর গায়ের দাগ দেখে সে খানিক স্তব্ধ হয়ে রইল। নিতাইকে তাদের সামনে সে অপমান করতে পারলে না, কেবলমাত্র বললে—"আচ্ছা, তোমরা যাও, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করব এখন—"

রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, ধরণীর মুখে দিনের আলো নিভে গেল।

দিনের আলোয় যে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারা যায় নি, রাত্রের অন্ধকারে সে কথা জিজ্ঞাসা করা সহজ হল; অসিত জিজ্ঞাসা করলে, "শচীকে অমন করে মেরেছিস কেন নিতাই, ও তোর কি করেছিল?"

নিতাই উত্তর দিল না।

অনেক জিজ্ঞাসার পর রুদ্ধকণ্ঠে সে উত্তর দিলে, "কেন মারব না? ওরা এক সঙ্গে দল বেঁধে প্রতিদিন আমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, আমার মা বাপ কেউ নেই কিনা—"

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, "মা বাপ নেই তাতে হয়েছে কি? মা বাপ কারও কি চিরকাল থাকে?"

নিতাই চুপ করে রইল।

সে কিছু না বলুক, কথা কোন দিনই চাপা থাকে না; তাই পরদিনই সব কথা জানা গেল।

অজ্ঞাতকুলশীল এই ছেলেটীকে কেউই গ্রহণ করতে পারে নি, সবাই তাকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছিল। অভিনয় ক্ষেত্রে সে সকলের পাশে এসে দাঁড়াবার অধিকার পেয়েছিল মাত্র, তার বাইরে সে ঘৃণিত, অতি হেয়, অতি তুচ্ছ।

অসিত আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

অতি ক্ষুদ্রের মনেও এত পার্থক্য, এত সূক্ষ্ম বিচার-শক্তি? সে এতদিন এদিকটার পানে চায় নি, চেয়েছিল শুধু বাইরের দিকে।

এই প্রথম সে দেখলে জাতি হিসাবে এরা পরস্পর হতে কত দূরে সরে রয়েছে, সেখানে কেউ কারও নাগাল পায় না। এরা নিজেরাই নিজেদের চারিধারে গণ্ডী দিয়ে রাখে, কেউ কারও ছোঁওয়া জল খায় না—পাশাপাশি খেতে বসে না, জায়গা টেনে দূরে সরিয়ে নেয়।

এ দেশের জাতি ভাতের হাঁড়িতে—কথাটা মোটেই মিছে নয়।

সেদিন সামনেই দেখা গিয়েছিল নবীন মুচি খেতে বসে বাগ্দি কালীচরণ দাসকে ছুঁয়ে ফেলেছিল; এই নিয়ে সেখানে রীতিমত মারামারি বেধে গিয়েছিল।

অথচ এরা দুইজনেই অন্ত্যজ, যে কোন জলাচরণীয় জাতি এদের দুই জনকেই সমান ঘৃণা করে দূরে রেখে চলে। সেখানে তারা দুই-ই সমান, কিন্তু এখানে এই আহারের সময় তারা পরস্পর জাতীয় পার্থক্য বাঁচিয়ে চলে।

এই হিন্দু জাতি, নিজেদের মধ্যেই এরা আবার হাজার গণ্ডী সৃষ্টি করেছে; সেই গণ্ডীর মধ্যে নিজেরা গুটিপোকার মত বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে—পরম নিশ্চিন্তভাবে, পরম শান্তভাবে। নিজেদের গণ্ডীর বাইরে বিস্তৃত হওয়ার ক্ষমতা তাদের নাই, গণ্ডীর সীমানায় কেউ পা দিলে বেধে যায় মারামারি কাটাকাটি। এমনই করে এরা আজও প্রতিনিয়ত আত্মক্ষয় করছে, নিজেদের রক্তমোক্ষণ নিজেরাই করছে, নিজেদের দারিদ্র্য নিজেরাই বাড়িয়ে তুলছে, আর নির্ব্বিবাদে সে সব দোষ চাপাচ্ছে নিতান্ত গো-বেচারা ভগবানের মাথায়।

এরা পরম অদৃষ্টবাদী, পদে পদে জন্মান্তর মানে; শুধু মানে বললেই চলে না—এদের রক্তের প্রতি কণিকায় এই জন্মান্তরবাদ অদৃষ্টবাদ জড়িয়ে রয়েছে—এই সংস্কারবাদ হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় তাদের নাই। এরা জানে পূর্ব্বজন্মে যে পাপ করে এসেছে বর্ত্তমান জন্মে তারই ফলভোগ করছে, আবার এ জন্মের বোঝাও বইতে হবে পরের জন্মে।

এমনই করে এতটুকু বেলা হতে অদৃষ্ট আর জন্মান্তর মেনে এরা হয়ে পড়েছে ক্লীব নিস্তেজ; সেইজন্য প্রাণপণে উঠবার চেষ্টা করেও তারা নেমে পড়ছে আরও গভীর পাঁকের তলায়, মুক্তি সেখানে সুদূরপরাহত, ছায়ার মায়া মাত্র।

উদ্ধার, মুক্তি—স্বাধীনতা—

শুনে হাসি পায়—

মুক্তি কোথায়—স্বাধীনতা কই? এই জাতি অর্দ্ধেকের বেশী অঙ্গ জড় করে রেখেছে—শুধু আঘাত দিয়ে—শুধু বেদনা দিয়ে। এরা নাকি আলো পেতে চায়, এরাই নাকি স্বাধীনতা লাভ করবে?

যারা নারীর সম্মান রাখতে জানেনা, আজও যারা নারীকে দেখে কেবল উপভোগের বস্তু হিসাবে—আঘাত করে করে সমাজের জাতির একটা প্রধান অঙ্গকে যারা নিষ্ক্রিয় করে রাখে, তারাই হবে মানুষ—জগতে নাম রাখতে চায় তারাই—?

অসিত দুই চোখ যথাসম্ভব বিস্তৃত করে চেয়ে থাকে দূরের পানে।

কানে শব্দ আসে—উনোনে আগুন দিয়েছি, সে উঠেছে।

অসিত চোখ নামায়, সামনে নিতাই।

একটু হেসে সে বললে, "হচ্ছে রে বাপু, জলন্ত সে উনোন—আচ্ছা, এক কাজ কর না নিতাই, তুই-ই আজ রাঁধ না, দুজনেই খাওয়া যাবে।"

নিতাই গুটিয়ে একেবারে এতটুকুটি হয়ে গেল, বললে, "তা কি হয়, আমার যে জাত নেই।"

সেই জাত—আবার সেই জাত—

অসিতের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল।

আজ নিতাইকে অধিকার দিতে গেলেও সে নিতে পারেনা—রাণীকে দিতে গেলেও সে নেয়নি—সংস্কার ওদের মনে এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে বার বার করে লক্ষবার নাড়া দিলেও ওরা তাকে দূর করতে পারবে না।

এমনই করে ধর্ম্মের নামে, নীতি রক্ষার নামে, বিবেকের গণ্ডী দিয়ে—দিয়ে দেশকে দশকে উচ্ছন্ন দেওয়া হয়েছে। মানুষের প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময় হতে পাপ পুণ্য নিক্তি দিয়ে ওজন করতে, চুল চিরে ভাগ করতে পারার অভ্যাস হয়েছে; আজ তাদের মেরুদণ্ডে এমন একটু শক্তি নাই যার পরে ভর দিয়ে মানুষ দাঁড়াবে।

আজ বুঝিয়ে জোর করে ভয় দেখিয়ে কিছুতেই একে বিশ্বাস করানো যাবেনা—এর সবই আছে, এর কিছুই যায়নি।

দেবতা, তুমি বড় অকরুণ, তুমি অন্ধ—তুমি বধির, তুমি নির্দ্দয়—হৃদয়হীন। একটা জাতিকে—একটা দেশকে, একটা সমাজকে তুমি একেবারে ধ্বংস না করে ধ্বংস করছো তিলে তিলে। জানা কথা—একদিন লুপ্ত করে দেবেই, কিন্তু সেদিনের আর দেরী কত?

(২৩)

নিতাই পালিয়ে গিয়েছিল, অনেক খুঁজে অনন্ত আবার তাকে ধরে এনেছে।

নিতাই বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছে।

বুঝবার সময় তার এসেছে। মানুষের স্বাভাবিক আত্মমর্য্যাদাবোধ তার মনে কবে হতে জাগতে সুরু করেছিল; আজ সে অনুভূতি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

যতদিন শিশু ছিল, নিজের সম্বন্ধে সে ছিল একেবারেই অজ্ঞ. কোন অনুভূতিই তার মনে কোনদিন জাগেনি। আজও জাগত না। যদি না সে আহত হতো।

নিজের মা বাপকে জানবার ইচ্ছা আজ তার মনে জেগেছে, সে সারাজগৎ খুঁজে সেই মহাসত্যকে আবিষ্কার করবেই এই তার প্রতিজ্ঞা। তার সারা চিত্ত সেই একটী আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে, যদিও সে জানে না তার সে আশা পূর্ণ হবে কিনা।

হয়তো কোনদিন তার বাপ মায়ের সন্ধান পাওয়া যাবে—ভুঁইফোড় সে নয় তা সে জানে। কোনদিন কোথায় অতর্কিতে মিলে যাবে তার মা বাপ, গভীর অন্ধকারে হঠাৎ একটি আলো প্রকাশ হয়ে পথিকের সামনে যেমন করে পথনির্দ্দেশ করে—ঠিক তেমনই ভাবে।

নিতাই সেইদিনের স্বপ্ন দেখে।

তারা মরেনি, মরতে পারে না। অন্ততঃপক্ষে তার মা, সে মরেনি। তার সন্তানকে এমনভাবে সংসার সমুদ্রে একা ভাসিয়ে দিয়ে সে মরতে পারেনা।

হয়তো মা তাকে খেতে দেয়নি একদিনের জন্যও, হয়তো পথের ধারে লোকের কৃপা দৃষ্টির আশায় তাকে শুইয়ে রেখে নিজে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করেছিল—কেউ তার সন্তানকে তুলে নিয়ে গেল কিনা। কেউ হয়তো তখন তুলে নিয়েছিল, এতটুকু করে দুধ খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নামটাও সেই রেখেছিল।

কে সে? হয়তো কোন দয়াবতী নারী, কিন্তু সেই বোধ হয় জগতে নাই। পথে শিয়াল কুকুরের মত সে ঘুরে বেড়িয়েছে, একমুঠো ভাত পাওয়ার আশায় লোকের দরজার সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে।

তবু আছে তার সেই মা—যে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল। হয়তো আছে কোন নিভৃত গোপন সংসারের মাঝখানে—হয়তো তার মনেও সেই নবপ্রসূত শিশুর মুখের ছায়া জাগে, হাজার শিশুর কলরোলের মধ্যে সে কচি একটী কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

নিতাই স্বপ্ন দেখে।

স্রোত আসছে—চলে যাচ্ছে। তীরে কত কি পড়ে রইল, তীরের কত কি নিয়ে গেল—সে নিজেই তা জানেনা।

কিন্তু সে এসেছে একথাও যেমন সত্য—পায়নি সে কিছু এ কথাও তেমনি সত্য। সময়ের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, চিহ্ন রেখে যাচ্ছে কেবল দেহের পরেই নয়—মনের উপরে পর্য্যন্ত।

কোথায় গেল সে মন—সেই সুস্থ সবল মন—সেই আত্মবিস্মৃত মন? পরিবর্ত্তন কি এতই জাগে মানুষের মনে?

অথচ কালের আবর্ত্তনে পৃথিবীর তো কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। আকাশ এক হাজার বৎসর আগে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। তেমনই নীল আকাশে সূর্য্য, চাঁদ, তারা জাগে, তেমনই মেঘ সেজে আসে, জমাট বাঁধে—ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ে, বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্র ডাকে; আবহমানকাল পাতা ঝরে, নূতন পাতা জন্মায়, ফুল ফোটে—আবার ঝরে পড়ে; ফল হয়, বীজ হতে আবার অঙ্কুরোদ্গম—সবাই এক ধারায় চলে, চলেনা কেবল মানুষ, বদলায় কেবল মানুষের মন।

সামনের কৃষ্ণ যবনিকা নিতাই আজ তুলে ফেলতে চায়, ছিঁড়ে ফেলতে চায়—বার করতে চায় সত্যকে—সেই চিরসত্যকে—যা জগতের বুকে চিরকালই রয়েছে সুন্দর অটুট হয়ে, চিরকাল থাকবেও। মিথ্যা নিতান্তই ভঙ্গুর, জলাবম্বের মত উঠে মিলিয়ে যায়।

গুপ্তের আবরণে সত্য চিরকালই থাকে প্রচ্ছন্ন—তাকে জোর করে প্রকাশ করার দুঃসাহস একমাত্র রয়েছে কেবল মানুষের। সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবে মণিমুক্তা আহরণ করে ডুবুরী, কালো কয়লার খনিতে নেমে হীরা চিনে বাইরে আনে জহুরী—তারাও মানুষ, প্রকাশ করার স্পর্দ্ধা কেবল এরাই করে।

রাইচরণ আসা পর্য্যন্ত নিতাইয়ের সম্বন্ধে সকলের মনে একই প্রশ্ন জাগে। রাইচরণ খুঁটিয়ে সবারই পরিচয় নিয়েছে, পরিচয় পাওয়া যায়নি কেবল নিতাইয়ের। তাকে জিজ্ঞাসা করলে কিছু পাওয়া যায়না, সে একেবারে নির্বাক হয়ে যায়।

একদিন উষার আলো ধরার মুখে প্রথম চুম্বন রেখা

এঁকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত ধরার বুকে সেও জেগেছিল। আকাশ তাকে বরণ করেছিল, মাটির ধরা লক্ষ বাহুর বাঁধনে তাকে বেঁধেছিল, পাখীরা কলগান করে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল। মানুষ হয়ে মানুষকে চেনে নি, মানুষ হয়ে মানুষকে তারা অবজ্ঞায় ফেলে দিয়েছিল পথের ধারে, মাটি-মা তাকে তখন সহস্র বাহু দিয়ে ঘিরে রেখেছিল—যেন শত্রুর ছোঁয়াচ না লাগে।

নিশ্চিন্ত মনে মাটি-মা আবার তাকেই সঁপে দিল মানুষের কোলে—মানুষই দিল তাকে স্নেহ ভালোবাসা।

ঘৃণা, অনাদর, অবহেলা, কিন্তু তারও মূলে এতটুকু করুণা ছিল—নইলে সে অতটুকু বেলায় বাঁচত কি করে?

অনন্ত তার অন্তরের সন্ধান পেয়েছিল, অসিতও তার বেদনা বুঝেছিল। একদিন সে তার চেয়ে তিন বৎসরের বড় রাইচরণকে মেরে উধাও হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ রাইচরণ তাকে তীব্র বিদ্রূপ করেছিল।

রাইচরণ নাকি বলেছিল, সে নাকি নিতাইয়ের মাকে কলকাতায় একটা জঘন্য গলিতে একটা অতি নোংরা খোলার ঘরে জঘন্য জীবন যাপন করতে দেখে এসেছে।

এরকম কথা—মায়ের নামে নিন্দাবাদ কোন সন্তানই সইতে পারে না—মায়ের অপবিত্রতা কোন সন্তান কল্পনাও করতে পারে না—কারণ সন্তান মাকে দেবী বলে মনে করে—কল্পনা করে।

নিতাই যদি সেদিন এজন্য রাইচরণকে মেরে থাকে, তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

বিশ্বাসও হয় নি তবু কেন সে পালিয়ে গিয়েছিল সেই কলকাতায়।

সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ কলকাতা—এর কোন পথ সে চেনে না, কোন লোককে সে চেনে না, তবু সে তিনটে দিন পথে পথে ঘুরেছে। বড় রাস্তা, ছোট ছোট সরু গলি সব তার দেখা হয়ে গেছে; প্রত্যেক খোলার বস্তীর সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে কোন নারীর সঙ্গে তার অন্তরের মধ্যে কল্পনায় গঠিত মায়ের সাদৃশ্য মেলে কিনা।

সে তার মাকে জানে কোনদিন না দেখলেও মায়ের একটা ছবি মনে গড়ে রেখেছে। অতি শান্ত—অতি পবিত্র একটী নারী মূর্ত্তি, জগতের কোটি মেয়ের কোনটীর সঙ্গে তার তুলনা মেলে না।

বস্তীর কোন নারীর মূর্ত্তির সঙ্গে সে মূর্ত্তির এতটুকু মিল হয় নি, আকাশ পাতাল তফাৎ, স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য।

অনন্ত অনেক খোঁজ করে কলকাতায় গিয়ে তাকে কুড়িয়ে পেলে একটা পথের ধারে; শ্রান্ত দেহে সে সেখানে বসেছিল, তার সন্ধানী চোখের দৃষ্টি পথে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল সে তার মাকে খুঁজতে এসেছে।

সে হেসে বলেছিল, "দূর বোকা, কে বললে তোর মা আছে? সে তোকে তিন মাসের রেখে মারা গেছে জানিস তো।"

সন্দেহে নিতাইয়ের মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে বলেছিল, "কিন্তু যে আমায় মানুষ করেছিল সে—সেও কি নেই।"

অনন্ত তার সম্বন্ধে কিছু না জানলেও অনায়াসে চটপট উত্তর দিয়েছিল, "থাকলে তোকে কি একবারও দেখতে যেত না? আমি শুনেছি সেও মরে গেছে।"

মরণের দেশ, মরণের শাসন—কঠোর আইন, তারপরে তো মানুষের হাত চলে না। ইহলোকে হিসাব দিতে পরলোকের জের টানা চলে না; ইহলোকের সীমানা—মরণের কোল ছুঁয়ে জীবন যেখান হতে উজ্জ্বলতম হয়ে উঠেছে, সেই কালো রেখাটা ছুঁয়ে মাত্র—কাজেই নিতাইকে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু এ স্তব্ধতাতেও আছে শান্তি;—তার মা জগতে নেই—স্বর্গে আছে, এ কল্পনাতেও আছে তৃপ্তির অনাবিল আনন্দ।

সে ফিরে এলো আবার গ্রামের বুকে—আবার নিমাইয়ের পার্টের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। সম্প্রতি অনন্ত বায়না নিয়েছে জমীদারবাড়ীতে। জমীদারবাবু ও তাঁর একমাত্র কন্যা দীর্ঘ পনের বৎসর পরে বাড়ী ফিরেছেন। পরম ধর্ম্মশীলা জমীদার কন্যা সম্প্রতি নূতন বিগ্রহ এনে নূতন মন্দির গড়ে প্রতিষ্ঠা করছেন, সেখানে আগামী কুড়ি তারিখ হতে যে উৎসব আরম্ভ হবে সেখানে ভগবতী অপেরা পার্টিকে দুইদিনের জন্য বায়না দেওয়া হয়েছে।

পালা হবে নিমাই-সন্ন্যাস ও ধ্রুব। সুনন্দা পরম

বৈষ্ণবী, তাই বৈষ্ণব কবির রচিত পালা তাঁর কাছে অতি মনোরম ও শান্তিপ্রদ মনে হবে। সেইজন্য অনন্ত বেছে বেছে এই দুইটী পালাই মনোনীত করেছে।

অনন্ত প্রাণপণে রিহার্স'ল দেওয়াচ্ছিল, অসিতও খাটছিল বড় কম নয়। অনন্ত অসিতের হাত দুখানা ধরে বলেছিল, "নোবল প্রাইজের কথা এখন তোলা থাক অসিত, আগে এ দায়টা হতে মুক্তি পাই—তারপর সে অনিশ্চিতের ভাবনা ভাবব। যদি কোন রকমে ওঁকে মোহিত করতে পারি, যথেষ্ট টাকা পাব, যাতে পোষাক-গুলো নতুন দেখে কিনতে পারব।"

বাস্তবিক এ পোষাকে আর চলে না। বৎসরের পর কত বৎসর কেটে গেছে, পোষাক জীর্ণ হতে জীর্ণতর হয়ে গেছে, জোড়াতাড়া দিয়ে আর কাজ চলে না।

অসিত নিতাইকে ডেকে বিশেষ করে বলে দিলে—"দেখিস নিতাই, দলের মুখ তোর উপর নির্ভর করছে, তুই যেন কোন রকমে নষ্ট করিসনে।"

নিতাই আশ্বাস দিলে, কোন ভাবনা নেই, সে সবদিক বজায় রাখবে, সব ঠিক করে দেবে।

(ক্রমশঃ)

মানসিক যোগমায়া

শ্রীভোলানাথ ঘোষ

প্রবন্ধ

কশের দিকের দুইটি দাঁত কয়দিন থেকেই একটু একটু কন্‌কন করিতেছিল; আজ তাহা বাড়িয়াছে। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, ও-দুটি তুলাইয়া ফেলাই ভাল; নতুবা এই পড়তি বয়সে ওই থেকেই নাকি অনেক খারাপ অসুখ জুটিবার সম্ভাবনা। আজ থেকেই বোধ হয় বর্ষা আরম্ভ হইল; সকাল হইতেই সেই যে জল পড়িতে সুরু হইয়াছে, কখন বেশী—কখন কম, থামিবার আর নামই নাই। প্রথম বর্ষাগমে কদম ফুলের রোমাঞ্চ অনুভব করিবার বয়স আর নাই, শীতে হাড়ের ভিতর রোমাঞ্চ ধরিয়াছে। কম্‌ফর্টরটা ভাল করিয়া গলা ও গালের চারিপাশে জড়াইয়া একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা খুলিয়া বসিয়াছি।

বইখানি আমার নয়। সাময়িক কাগজের পাতা উল্টাইবার অভ্যাস বহুদিন হইল ছাড়িয়া দিয়াছি। বইখানি শ্রীমতী যোগমায়া দেবী কি-জানি কোথা থেকে যোগাড় করিয়া আনিয়াছেন। যোগমায়া আমার স্ত্রী। গল্প গিলিবার জাতীয়-অভ্যাস তিনি আজিও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পাড়াপড়শীর হাঁড়ির খবর যদিও তিনি প্রচুর পরিমাণেই নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তথাপি যাহারা পৃথিবীতে আজিও জন্মায় নাই এবং কোনদিন জন্মিবেও না, সেই সব কাল্পনিক নরনারীর হাঁড়ির ভিতর মাথা গলাইবার আগ্রহও তাঁহার কিছু কম নয়।

যাই হ'ক, পত্রিকাটি নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম। করিতে করিতে একটি কবিতার উপর চোখ পড়িয়া গেল। কবি কোথায় এক চতুর্দশী কিশোরীকে দেখিয়া আসা অবধি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। মলয় বহিতেছে, পাতা কাঁপিতেছে, চাঁদ উঠিয়াছে, কোকিল ডাকিতেছে, এইরূপ নানা কাব্যিক সংঘটনযুক্ত এক অপূর্ব ক্ষণে কিশোরীকে বুকে ধরিতে না পাইয়া ব্যথিত কবির আশা গুম্‌রিয়া গুম্‌রিয়া কবির বুকে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে; ইত্যাদি।

যৌবন আমার জীবনেও একদিন আসিয়াছিল। আমিও একটি মেয়েকে দেখিয়া চুপি চুপি একবার কবিতা

লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আজ ভাবিতেও হাসি পায়, তাহার নরম চুলের সঙ্গে কত যে সম্ভব-অসম্ভব জিনিসের তুলনা করিয়াছিলাম, তাহার আর ইয়ত্তাই নাই। জীবনের আলো কিরূপ হয় তাহা কখনও চোখে দেখি নাই; চোখের আলোর গঠন সম্বন্ধেও এখনও আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তথাপি মেয়েটির চোখের আলোকে আমারই জীবনের আলো বলিয়া উপমিত করা একটুও সেদিন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ করি নাই।

কিন্তু সেইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গিয়াছিল। খোঁপায় কাজললতা গুঁজিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, চিত্রিত পিঁড়িতে বসিয়া অতঃপর যিনি আমার জীবনে আলো জ্বালাইতে আসিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার নাম শ্রীমতী যোগমায়া। সে কথা উপরেই বলিয়াছি।

শ্রীমতী যোগমায়ার হাতে আমার জীবনের আলো কিরূপ জ্বলিয়াছিল, তাহা নিতান্তই বাস্তবিক ব্যাপার। আপনারা নিজেদের চিত্তবিনোদনের আশায় গল্প পড়িতে বসিয়াছেন, সে-কথা আর আপনাদের শুনিয়া কাজ নাই। তবে এই কথাটুকুমাত্র স্বীকার করিয়া লই যে তিনিও একদিন চতুর্দশী ছিলেন এবং দেখিতেছি এ কথাও গোপন করিয়া কোন লাভ নাই যে, আজ তাঁহার বয়স কিন্তু অনেক বাড়িয়া গেছে। যত না তাঁহার বয়স বাড়িয়াছে, বানুপাতক্রমে অতিশয় বেআড়া রকমে বাড়িয়াছে তাঁহার দৈহিক আয়তনের পরিধি ও ব্যাস। একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না, আজকাল তিনি মাটিতে বসিলে মাটি না ধরিয়া আর উঠিতেই পারেন না।

তাই বলিয়া তাঁহার প্রতি আমার স্নেহের উৎসটি যে একেবারেই শুখাইয়া গেছে, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। যৌবনের সেই পদ্য-লিখন-প্রয়াসী মনটা বয়স ও বিস্মৃতির সমাধি-তলে আজিও বোধ করি একটু-আধটু কোথাও বাঁচিয়া আছে। সত্য বলিতে কি, আজই সকালে বর্ষার সূচনার শুভ মুহূর্তটিতে দাঁতের কন্‌কনানি অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীমতীকে একটু আদর করিয়া লইয়াছি। বলিয়াছি, "বড্ড কিন্তু শরীরটি তোমার আজ কাহিল কাহিল মনে হচ্ছে মণি, কেন বল তো?"

ইহা পরিহাস নহে; ইহা একান্তই স্নেহের ব্যাপার। নিতান্তই স্নেহান্ধ না হইলে শ্রীমতীর দৈহিক বিস্তার সম্বন্ধে এরূপ দারুণ দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মিবার আর কোনই কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এ কথা বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে যে পারেন নাই, তাহা তাঁহার নৈরাশ্যজনক রূঢ় প্রত্যাচরণে আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম। আপনারা তাঁহার দোষ লইবেন না, আমার পরিহাস ও গুরু কথা লইয়া ভুল-বুঝাবুঝি তাঁহার চিরদিনের অভ্যাস।

আপনারা অবশ্যই জানেন, পত্নীর প্রতি স্বামীর প্রগাঢ় স্নেহের আর একটি সর্বজনপ্রিয় সংজ্ঞা আছে। বয়স হইয়াছে তাই তাঁহার প্রতি আমার সম্বন্ধে সে-সংজ্ঞাটির ব্যবহারে সংকোচ বোধ করিয়াছি। আশা করি, এজন্যও আপনারা কিছু মনে করিবেন না।

স্বীকার করি, তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আমার কথায় একটু ব্যঙ্গের সুর আসিয়া পড়িতেছে; কিন্তু উহা আমার স্বভাব। আগে ছিল না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জানি না কিভাবে—শ্রীমতীর মতে, নানা সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাত ও টানাটানির মধ্য দিয়া পথ করিতে গিয়াই নাকি—তাহা আমার মধ্যে আজ এমন বড় হইয়া উঠিয়াছে। আসলে যোগমায়া লোক ভাল। আহা, আমার হাতে পড়িয়া বেচারার জীবনের অধিকাংশ সাধ-আহ্লাদই নাকি অপূর্ণ রহিয়া গেছে!

'সাধ-আহ্লাদ' কথাটা যোগমায়ার। আমার ভাষায় উহা—স্বপ্ন'। তা একদিন আমিও কি কিছু কম স্বপ্ন দেখিয়াছি? না আমারই সে-সব স্বপ্ন সফল হইয়াছে? যৌবনে যে-আমি একদিন স্বপ্নের রথে সওয়ার হইয়া প্রতি নিয়তই কণ্টিনেণ্ট্যাল টুর না করিয়া থাকিতে পারিতাম না, সেই আমিই আজ শ্রীশ্রীমহাবীরজী জুট মিল্‌স্‌-এর শুধু আটত্রিশ টাকা মাহিনার একজন কেরানী মাত্র। যৌবনে যে-আমি সর্বদাই, কাব্যিক ভাষায় বলিতে গেলে, আমার নিজস্ব একটি 'পুষ্প-উদার চৈত্র-বন' এবং সেখানে কত-না তিলোত্তমার যাওয়া-আসার স্বপ্ন দেখিয়াছি, পরিবর্তে সেই আমারই ঘেঁটু ও ঘলঘসি-বনকে অন্ধকার করিয়া শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এমনই সে কত! কিন্তু সেজন্য কি আমার মনে বিন্দুমাত্রও দুঃখ জমিয়া আছে? রামঃ! বরঞ্চ সেই ছেলেমানুষী সব স্বপ্নের কথা

মনে করিতে গেলেও লজ্জায় যেন আজকাল এতটুকু হইয়া যাই।

ইহাই তো স্বাভাবিক! স্বপ্ন যদি বিফলই না হইবে, তো তাহার স্বপ্ন হওয়ায় লাভ? আমি তবু এ-সকল কথা বুঝিতে পারি, কিন্তু যোগমায়া তাহা পারেন না। আজিও, তাঁহার এই পরিণত বয়সেও, বাড়িতে যদি মোটরে চড়িয়া গহনা পরিয়া কোন ডালপালা সম্পর্কীয়া আত্মীয়ারা বেড়াইতে আসেন, তো অমনি অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদগুলির স্মৃতি তাঁহার মনের দুই কূল ছাপাইয়া একেবারে উথ্‌লিয়া ওঠে। ফলে খালি গায়ে খালি পায়েই গাঁট-বাবুর বাসায় একটু তামুকের সন্ধানে তখনই বাহির-হইয়া-যাওয়া ছাড়া আর আমার গত্যন্তর থাকে না।

* * * * *

আমি তবু কত তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করি। কত বলি যে—দুঃখ-দারিদ্র্যই আমাদের ললাট-লিপি। যোগমায়া দুঃখ করিলেই কি আর সে মনের দুঃখে বনে চলিয়া যাইবে? না তাঁহার চোখেরই জলে ডুবাইয়া তাহাকে জব্দ করিয়া দেওয়া চলিবে? তাহার চেয়ে তুড়ি দিয়াই তাহাকে তিনি উড়াইয়া দিন! সম্মুখ সমরে যদি তাহাকে না-ই আঁটিয়া উঠিতে পারেন, তো চোখ মুদিয়াই তাহাকে তিনি অস্বীকার করুন।

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী কিন্তু সম্পূর্ণ জাতীয় পথ ধরিয়া চলেন। তাঁহার ধারণা—চোখ তো আমি বুজিয়াই আছি; চোখ কি আমার আছে? থাকিলে দেখিতে পাইতাম, অত বড় সোমত্ত মেয়েটা হাত দুইটাতে যেন বিধবা সাজিয়া আছে। মেজ মেয়েটার তো যাহাকে বলে 'দুর্গতি হেন বোল'! এবং আর সকলের কথা (অর্থাৎ তাঁহার নিজের কথা) তিনি না হয় ছাড়িয়াই দিলেন; সন্তান বলিয়া কোলের মেয়েটারও প্রতি তো বাপের একটা ভালবাসা আছে! এই যে প্রায় দিগম্বরী হইয়াই মেয়েটা দিন-রাত টন্‌মন্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, বলি এও কি আমার চোখে পড়ে না?

—কে বলিল চোখে পড়ে না? নিশ্চয় পড়ে। যদি না-ই পড়িবে, তবে গেল বছর পূজার সময় নগদ দুই টাকা দিয়া তাহাকে সিল্কের জামা কিনিয়া দিলাম কেন? কুটুম-সাক্ষাৎ আসিলে সেই জামাটাই তো ইচ্ছা করিলে যোগমায়া খুকীকে পরাইয়া দিতে পারেন। তবে হাঁ, নেড়া কুয়াটার চারিদিকে ঘুরঘুর করিয়া বেড়ান যেন মেয়েটার রোগ! সিল্কের জামা পরিয়াই না শেষকালে আবার—

এক মুহূর্তেই দুই চোখ তাঁহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়—ষাট, আমি কি মানুষ, না কি বলুন দেখি! দয়া মায়া বলিয়া কি এক রতিও কিছু নাই আমার মনে? নিজের মেয়ের জীবনের চেয়ে ঐ তুচ্ছ জামাটারই দাম হইল আমার কাছে বেশী?—বাপ তো আমি নই, যেন চণ্ডাল!

—ছি, কাঁদে না অমন করিয়া! বড় মেয়েটা আসিয়া পড়িলে কি মনে করিবে বলুন দেখি? ভাল আমি বাসি; সবাইকেই বাসি। যোগমায়ার যখন জ্বর হয় তখন কতবার তাঁহার জন্য আমার মন কেমন করে; আপিসে বসিয়া কতদিন মনে হয়, খুকীটার জন্য এক পয়সার লজেন্‌জুস লইয়া যাই।—বাড়িতে কেন বাসি না? তা, যখন-তখন মেয়েটা অমন করিয়া আম খায় কেন? যদি বা আম খায়ই তো হাঁড়ির মত উঁচু পেট বহিয়া তার টস্‌টস্‌ করিয়া অমন রস গড়াইয়া পড়ে কেন? আর, যখন সে আম না-ও খায় তখনও, সে কাছ দিয়া চলিয়া গেলে কেন মনে হয় যে, একদলা আমসত্ব চলিয়া গেল? আমার দয়া মায়া নাই, আমি মানুষ নই, সবেতেই আমার দোষ, না?

—আহা, সঙের মত যা আমার কথা বলিবার ছিরি! ভব্যী হইয়া কি মানুষে আমার সঙ্গে কথা বলিতে পারে?

শ্রীমতী রাগ করিয়া চলিয়া যান।

এমনিই! চিরকাল!

* * * * *

একটি গল্প পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

কোনও আপ-টু-ডেট বাড়ির কম্পাউণ্ডে কত সব ইংরেজী নামওয়ালা ফুটন্ত ফুলগাছের মধ্যে লাল সুরকি-ঢালা পথের উপর একটি টু-সীটর মোটর নিঃশব্দে আসিয়াই হর্ন্‌ বাজাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে পড়ি-কি-মরি করিতে করিতে রীতা নাম্নী একটি চতুর্দশবর্ষীয়া কিশোরী তরতর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। কানের ঝুমকোয় তার মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে, হাতে এক কাপি 'লণ্ডন মার্কারি'। তাহার পর—

পুরবী শাড়ীতে ওকে কী সুন্দর দেখায়! আঁট-সাঁট কোরে-পরা ফিন্‌ফিনে পাতলা শাড়ীর বাঁধন ভেঙে রীতার দেহের রেখায়িত প্রকাশ যেন ফেটে পোড়েছে; গুচ্ছে-গুচ্ছে পুঞ্জে-পুঞ্জে শাড়ী চাপা দিয়ে তাকে লুকিয়ে রাখবার সকল চেষ্টা ওর ব্যর্থ!...

Hush! এইবার ও কথা কইচে। শুনুন উপলপ্রতিহত ঝর্ণার কলধ্বনি ওর গলায়:—

—হ্যালো, মনীশদা? Sweet evening!—কিন্তু, ইয়ে,—awfully bad of you! কাল আসেন নি কেন? Sincerely speaking—আপনি না এলে—so horribly I miss you!...

অভিমানের আবেগে ওর গলা পিচ্ছলায়িত হোয়ে গ্যালো। হাতের magazineখানা দিয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে মনীশের গালে ঝড়ে-উড়ে-আসা ছোট্ট পাখীর আলুলায়িত কোমল ডানার এক ভীরু ঝাপটের মত একটী মৃদু আঘাত কোরে ও বোল্লে—naughty fool!—...

বাঃ! ভারী চমৎকার ফাঁদিয়াছে তো?—গ্র্যাণ্ড! লেখার স্টাইলেও দেখিতেছি একেবারে যুগান্তর আসিয়া গেছে! উল্লসিত হইয়া আমি নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম।—খাসা!

সত্য, খাসা জিনিস প্রেম। এ কথা আমি যোগমায়াকে প্রায়ই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। বলি দেখ, খাসাই যদি না হইবে তো কবিরা কি আর চিরদিন আপিসের বড় সাহেবের দাবড়ানির ভয়ে অমন 'প্রেম প্রেম' করিয়া চীৎকার করিয়াছে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রেম যে কি স্বর্গীয় জিনিস এ কথা তিনি কিছুতেই স্বীকার করিতে চান না; চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও না। বলেন, সাতাত্তর হইবার আগেই নাকি আমার ভীমরতি হইয়াছে। অথচ মাত্র দুই দিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়াছিলাম বলিয়া অতীত কালে এই যোগমায়াই একদিন হা-হুতাশ করিয়াছিলেন; লিখিয়াছিলেন, "তোমাকে দেখিতে না পেলে আমার বুক কেমন করে। খালি খালি কান্না পায়—"।

মনের আনন্দে পড়িতে লাগিলাম,—

ছুটে এসেছিলো বোলে ওর বুক ওঠা-নামা কোরছিলো দারুণ!—ওর যৌবন-পরিপুষ্ট বুকের সমুন্নত মহিমার দিকে প্রশংসান্বিত এক দৃষ্টিক্ষেপ কোরলে মনীশ...

রীতা regular blush কোরে গ্যালো।—

সত্য বলিতে কি, আমিও রেগুলার ব্লাশ করিয়া গেলাম। অত উৎসাহ এক মুহূর্তেই যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। আর পড়িবার সাহস হইল না, পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

তাই তো, ইহাই কি যুগের বাণী? সম্ভব। কেননা ইহা সংক্ষেপের যুগ। ঠিকই তো! বাহুল্যবর্জনের যুগে কি আর সাহিত্যিক পাঁয়তাড়ার অবসর আছে? লজ্জা যদি আমি পাইয়া থাকি, তো সে আমার নিজেরই দোষ। ছি, সেকেলে মনটা দেখিতেছি আজিও একালের দিকে পিছন ফিরিয়া আছে। মন, উঠ, জাগ্রত হও! কালের বিরাট রথচক্রতলে যদি পিষ্ট হইয়া মরিবার ইচ্ছা না থাকে তো তাহার তালে তালে পা ফেলিতে থাক।

পা ফেলিতে থাকিলাম অর্থাৎ পাতা উ'টাইতে লাগিলাম।

একটি কবিতা। নাম 'বহুভোগ্যা'।

দেখিলাম, কবিতাটিতেও একটি ষোড়শীর শাড়ী ও ব্লাউস লইয়া কবি কর্তৃক অত্যন্ত আপত্তিজনকভাবে টানাটানি চলিয়াছে। পাতা উল্টাইয়া চলিলাম।

আর একটি গল্প। নাম 'রতিবিলাস'।

গল্পের প্রথমেই দেখি, নায়কের ইচ্ছা করিতেছে, নায়িকাকে একখানা সুইমিং কস্‌টুম পরাইয়া 'স্ন্যাক্' করিয়া তাহার একখানা ছবি তুলিয়া লইতে—ইত্যাদি।

পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

উল্টাইতে উল্টাইতে এইবার কয়েকটি হলিউড-মার্কা ছবি আসিয়া পড়িল। একটিতে দেখিলাম, একসার অর্ধোলঙ্গ নারী নৃত্যের ছলে বিটকেল অঙ্গভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নীচে পত্রিকার তরফ থেকে লেখা আছে, "পাঠক, কোন্‌টিকে আপনি পছন্দ করেন?" আর একটিতে এক মহিলা—প্রায় উলঙ্গ, কিন্তু পিছন ফিরিয়া আছেন। কোমরের অনেক নীচে একটি চিত্রবিচিত্র ঘাগরার মত বস্ত্রখণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। মহিলা কোনমতে ভঙ্গিম হস্তে তাহার স্খলন রোধ করিয়া, বোধ হয় লজ্জা পাইয়াই, মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন। নীচে লেখা আছে, "ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো!"

এতক্ষণে মনে হইতেছে যেন একটু নার্ভাস হইয়া পড়িতেছি। কালের তালে পা বেতালা পড়িতেছে নিশ্চয়! ঝুনা হাড়ের সংস্কারও দেখিতেছি ঝুনা হইয়া আছে।

যাই হ'ক আর একটি গল্প পড়িবার ইচ্ছা করিলাম। ইচ্ছা করিয়া পড়িলামও; কিন্তু আর ভাল লাগিল না। প্রেম জিনিসটা আমি খুবই পছন্দ করি বটে, কিন্তু শাড়ি ও

গহনার নামাবলি আমার ভাল লাগে না। নায়ক-নায়িকা-দের ঐশ্বর্যের ভিড়ে, ঘন ঘন মোটরের শব্দে, তের চৌদ্দ বছরের সব এতটুকু-টুকু মেয়েদের মুখে অজস্র ইংরেজী শব্দে-ভরা পাকা পাকা ন্যাকা-কথার জ্বালায় সমস্ত মন আমার উত্যক্ত হইয়া উঠিল।

গল্পের রাজ্যে দেখিতেছি, আমাদের মত গরীব মানুষের আর পা বাড়াইবার উপায় নাই। মোটরে, আসবাবে, শাড়িতে, গহনায়, বিদেশী সাহিত্যিকদের রাশি-রাশি পুস্তকের তালিকার স্তূপে—পা বাধিয়া প্রতি মুহূর্তেই ডিগবাজি খাইবার যোগাড়! সত্যই কি বাঙ্গালীরা আজ এত ঐশ্বর্যবান হইয়া উঠিয়াছে? না লেখকেরা নিজেরাই দরিদ্র বলিয়া কাগজে-কলমে এমন করিয়া ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখে?—কি জানি!

কিন্তু যোগমায়া? তিনিও কি কালের তালে তালে পা ফেলিতেছেন না কি? এই সব গল্প তিনিও পড়েন? অথচ আশ্চর্য, তাঁহার নিকট প্রেমের মত জিনিসেরও সুখ্যাতি করিতে গেলে রাগিয়া একেবারে—

সত্য—'দেবা ন জানন্তি'।

তাই! তাই বই খুলিয়া বুকের তলায় বালিশ দিয়া অমন জগৎ ভুলিয়া থাকা! পিঠের উপর ছোট মেয়েটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ বসাইলেও তাই অমন অবিচলিত ধ্যান!

নাঃ, ডাকিয়া তাঁহাকে নিষেধই করিয়া দিই। বুঝাইয়া বলি যে আমাদের যৌবনকাল যেহেতু অতীত হইয়াছে, অতএব যুগের ধর্মে আমরাও অতীত। এমন অবস্থায় কি দরকার আর আমাদের কালের তালে তালে পা ফেলিতে যাওয়ার! তা ছাড়া, এই শেষ বয়সে আর কি আমাদের তাথৈ তাথৈ করা সাজে?

* * * * *

আজিকার বর্ষার প্রসঙ্গকেই ভূমিকা করিলাম। বলিলাম—কি চমৎকার আজ বৃষ্টি নামিয়াছে! নয়?

—এই কথা বলিবার জন্যই কি আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছি না কি?

—না, তাই বলিতেছি।—রান্না কি হইয়া গেছে? কটা বাজিল?

—যটাই বাজুক; হাতে তো আর তাঁহার কল লাগান নাই, যে হুট্ করিতেই রান্না হইয়া যাইবে?

—না, মানে—ঠিক কথা! কলের কথা উঠিতেই মনে পড়িয়া গেল, একরকম কলের মানুষ বাহির হইয়াছে; যোগমায়া কি তাহার ছবি দেখিয়াছেন এই বইয়ে? কাজ করিবে, গান গাহিবে, ফরমাস খাটিবে—আশ্চর্য! কি কাণ্ডটাই না করিতেছে ওরা কলে!

—করিতেছেই তো! পাটের গাঁট বাঁধিতেছে, চট বুনিতেছে, আমার মত পুরুষ-পুংগবকে এ-বেলা ও-বেলা ছুটাছুটি করাইতেছে, আর সাত সকালে ভাতের হাঁড়ি ঠেলাইয়া ঠেলাইয়া শ্রীমতীকে হাড়ে-নাড়ে জ্বালাইয়া খাইতেছে;—আ-জী-ব-ন!

—সত্যই, খুবই ঠিক কথা। তা, যোগমায়া হাজার হ'ক বই-টই পড়িবার অবসর পান তবু, আমার পোড়া সে-সুবিধাও নাই। এই পত্রিকাটার কথাই ধরা যাক, কি চমৎকার সব গল্প রহিয়াছে এতে! কিন্তু ছাই, পড়িবার কি জো আছে আমার?—যোগমায়া পড়িয়াছেন নাকি গল্পগুলি?

—হাঁ, পড়িয়াছেন। আহা, চমৎকার না ছাই!

—ঠিক বটে; দু-একটা গল্প পড়িয়া আমারও তাই মনে হইয়াছে। বরঞ্চ মনে হইয়াছে, বিশ্রী! এমন কি, এ কথাও মনে হইয়াছে যে, এ-সব গল্প পড়া-ই উচিত নয় একেবারে। যোগমায়া কি বলেন?

কেন, পড়া উচিত নয় কেন? খুব ভাল না হইতে পারে, কিন্তু নেহাৎ মন্দই বা এমন কি লিখিয়াছে?

না, মানে, মন্দ ঠিক বলিতেছি না; কিন্তু মিথ্যা। একেবারে অসম্ভব। আর, যাহা সত্য নয় তাহা কি ভাল? মিথ্যা বলাও পাপ, মিথ্যা শোনাও পাপ।

আহা, কি বুদ্ধি রে আমার! গল্প আবার সত্য হইয়াছে কবে?

না না, সে-কথা বলিতেছি না; কিন্তু সম্ভব অসম্ভব বলিয়াও তো একটা কথা আছে? এই যে কথায় কথায় মেয়েরা সব মোটর কিনিয়া বেড়ায়, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব হীরা-মুক্তা-চুনি-পান্না-বসান গহনা আঁটিয়া থাকে, আমাদের মত গরীবের দেশে তাহা কি সম্ভব, না বিশ্বাস্য? হাঃ হাঃ, শাড়ির সব নামই বা কত!—'ভৈরবী, খাম্বাজ, মনোচোরা, সন্ধ্যাতারা, চোখ-ছল্‌ছল্, মন-টল্‌টল্'—ব্যা-ট্রা-রা!—এই লেখকদেরই কথা বলিতেছি, কুঁচো চিংড়ির ঝাল জোটে না, পোলাওএর ঢেকুর!

নাঃ, জোটে না! আমার নিজেরই জোটে না কি না, তাই মনে করি যে দুনিয়াসুদ্ধ লোক বুঝি উপবাস করিয়াই আছে।—আমার হাসি দেখিলে গা জ্বালা করে যোগমায়ার!—নিজে হা-ঘ'রে হইলে অমনিই হয়, লোকের ঐশ্বর্য দেখিলেই গা জ্বালা করে। কুয়োর ব্যাং হইয়াই রহিয়া গেলাম চিরদিন তো বিশ্বাস করিব 'কোথেকে'? ভবানীবাবুর ভাইঝি আসিয়াছিল সেদিন, তাহাকেও যদি একবার দেখিতাম! সে যে-শাড়ি পরিয়া আসিয়াছিল, তাহার নাম আমি জন্মেও শুনিয়াছি কি?—'এরোপ্লেন'! সে কি তার জৌলুস! চোখ ধাঁধিয়া যায় যেন। আর, একখানা ব্রোচ বা সে পরিয়া আসিয়াছিল, দেখিবার মত জিনিস;—দুই দিক্ থেকে দুইটা ঝক্ঝকে প্লাটিনম্ এর তীর আসিয়া একখানা এ—ই বড় হীরার খণ্ডকে বিঁধিয়া ধরিয়াছে। শুধু হীরাটারই দাম নাকি এক হাজার!

বা-ব্বা! অত? হইবে বা। তা ও-সব কথা ছাড়িয়া দিলে, অন্য আর আর কারণেও এইসব কাগজের গল্প পাঠ করা আমি অনুচিত ব'লিয়া মনে করি। এই গল্পটার কথাই ধরা যাক্—আঃ কোথায় গেল আবার?—এই যে! এই দেখুন দেখি তিনি—উন্নত মহিমা টহিমা—সব কি বিশ্রী! এইসব লেখা পড়িলে ছেলেমেয়েদের কচি মনের বিকার ঘটা তো খুবই স্বাভাবিক। নয়?—না না, যোগমায়াকে আর কিছু বলিতে হইবে না; এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত যে কি, সে কি আর আমি বুঝিতে পারি না? শুধু যোগমায়া কেন, আমি স্থির জানি, ভদ্রমহিলা-মাত্রেই আমার মতে নিশ্চয় সায় দিবেন।

দেখিলাম, যোগমায়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছেন। বক্তৃতায় ফল হইতেছে নিশ্চয়। বলিয়া চলিলাম—সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, এইসব বই না পড়াই ভাল। সবচেয়ে ভাল একেবারে বাড়িতেই না আনা। মানে—যোগমায়া যেন আবার অন্য কিছু না ভাবিয়া বসেন—মেয়ে দুইটা ওদিকে, অর্থাৎ ডাগর হইয়া উঠিতেছে কি না, তাই বলিতেছি। নতুবা, হাঃ, হাসিও পায়, এইসব ছেলেমানুষী গল্প পড়িয়া যোগমায়ার বয়সের মেয়েদেরও নাকি আবার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিতে পারে!—আর, ইয়ে, এইসব ছবি দেখিয়াছেন কি যোগমায়া? ছি ছি, সম্মানবোধ বলিয়াও তো পাঠিকাদের একটা—

শ্রীমতীর ভ্রূ সংকুচিত হইয়া গেল—মানে? চিত্ত-বিকার ফিত্ত-বিকার এ-সব কি আমি তাঁহাকে বলিতেছি? বলি, আমার ইয়ে-টা কি শুনি? বাদলার বাতাসে ভীমরতিটা আজ ভেপ্‌সে উঠিয়াছে বুঝি? গল্প পড়িয়া আর ছবি দেখিয়া চিত্ত-বিকার মেয়ে-জাতের হয় না, বুঝিলেন? যে-জাতের হয়, সে-জাতের নাম পুরুষ!

এই দেখুন, আরে! যোগমায়া বুঝি রাগ করিতে-ছেন আমার উপর? আমি কি—

থাক্, আর মুখ নাড়িয়া কাজ নাই আমার। পুরুষ জাতটাকে চিনিতে আর তাঁহার বাকী নাই কিছু। হাড়ে বিশ্বাসঘাতক! বুড়া হইয়া মরিতে বসিলেও তাহার স্বভাব মারবে না। সাধ করিয়া কি আর বইগুলাকে তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া ফেরেন? এইবার থেকে চাবিরই ভিতর রাখিতে হইবে দেখিতেছি। মেয়েদের সম্বন্ধে কথা বলিবার ছিরি কি আবার! মুখের লাগামটা পর্যন্ত যেন দিন-কে-দিন খসিয়া পড়িতেছে।

এঃ, কথাটা তিনি আমার মোটেই বুঝিতে পারিলেন না দেখিতেছি; অথচ—ও কি! তিনি কি চলিয়া যাইতেছেন না কি?

যোগমায়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চোখে জল। আমার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ধরা গলায় থামিয়া থামিয়া খুব শান্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—তিনি সবই বুঝিতে পারেন। তিনি কি আর কচি খুকী? কাছা দিয়া কাপড় পরিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই বটে, কিন্তু আমার মতন দশটা পুরুষকে তিনি এক হাটে কিনিয়া আর এক হাটে বিক্রি করিয়া আসিবার ক্ষমতা রাখেন, বুঝিলেন? চিত্ত-চাঞ্চল্য ফিত্ত-চাঞ্চল্যের ছলনা দিয়া কি আর তাঁহাকে ভুলান যায়? ওই সব গয়না-গাঁটি, জামা-কাপড়, বড়লোকী সব কথা পড়িয়া পাছে তাঁহার মন অন্যরকম হইয়া যায়, পাছে তিনি জামাকাপড়ের কথা পাড়িয়া কখনও আমাকে বিরক্ত করিতে আসেন, সেইজন্যই অমন,—এ পড়িও না, আর সে পড়িও না! তা আমার গলায় মালা দিবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে তাঁহার সাধ-আহ্লাদের মুখে চিরদিনেরই জন্য ছাই পড়িয়া গেছে, সে-কথা বুঝিতে কি আর তিন কাল লাগে? ধান থেকে যে চালের উৎপত্তি, সেই চালের ভাত তিনিও খাইয়া থাকেন।

যোগমায়া চলিয়া গেলেন। মনের ভিতর কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল; আমি পুনরায় পত্রিকাটির পাতা খুলিয়া বসিলাম।

*　* * *　*

বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি নাড়াচাড়া করিতে গিয়া দৈবাৎ একটি অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়িয়া গেল। কোনও এক অলংকার বিক্রেতার পূর্ণপৃষ্ঠব্যাপী এক সচিত্র বিজ্ঞাপনের চারিদিকে খুদী খুদী অক্ষরে যোগমায়ার হাতে লেখা মেলাই টীকা-টিপ্পনী রহিয়াছে দেখিলাম। দেখিলাম, এক জায়গায় লেখা আছে, "কি সুন্দর ছোট্ট চুড়ী, খুকুমণির হাতে চমৎকার মানাইবে"। আর এক জায়গায়, "প্লেন এগ্‌জিবিসন চুড়ীর আর চল নেই"। অন্যত্র দেখিলাম, "এই ঝুমকো জোড়া পেলে নিলী মুখপুড়ীর [মেজ মেয়ে] গোমদা মুখে নিশ্চয়ই হাসি ফুটিবে"। অপর এক জায়গায়, "চমৎকার প্যাটানের চুড়ী, পীতুর [বড় মেয়ে] গোলগাল হাতে বেশ কাপ হয়ে বসিবে"। অন্য আর এক স্থানে, "এই ধরণের চুড়ী আমাদের মত গিন্নীবান্নীদের হাতেই মানায়"। স্থানান্তরে আছে দেখিলাম, "কি চমৎকার আংটী, ওঁকে যদি এইখানি কিনে দিতে পারিতাম"।—

দাঁতের বেদনা ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম যে আপিসের বেলা হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ কেমন করিয়া কি যে হইয়া গেল, বহু দিন বহু বর্ষের দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মন চলিয়া গেল সুদূর অতীতের এক বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীর মধ্যে।

সেখানে গরীব গৃহস্থ-ঘরের এক নববিবাহিত প্রণয়-বিমূঢ় দম্পতি সারা দিন আড়ালে আবডালে নানা ছলে খুনসুড় করিয়া ফেরে, রাত্রি হইলেই পরস্পরের আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া জগৎ ভুলিয়া যায়।

প্রণয়ের শান্ত প্রবাহে এমনি করিয়াই তাহাদের দিন ভাসিয়া চলে।

তাহার পর একদিন, তাহাদের প্রণয়-যাত্রার এই সহজ ধারায় সামান্য একটি ছেদ আসিয়া পড়ে—চাকরির সম্ভাবনায় ছেলেটিকে সুদূর বিদেশযাত্রার আয়োজন করিতে হয়। আয়োজন, অর্থাৎ পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা। কিন্তু কে তাহাকে সাহায্য করিবে? তাহার এই জীবনযাত্রার বন্ধুর পথে সহায় হইবে কে? অবশেষে তাহার বালিকা-বধূটিই সহধর্মিণীর গৌরবে ছেলেটির পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। রাত্রে একসময় গলার একমাত্র হারটি খুলিয়া ছেলেটির গলায় পরাইয়া দিয়াই সে লজ্জায় ছেলেটির বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলে। বলে, "তা হোক গে, নিয়ে যাও তুমি ও হার। বিক্রি তো আর করতে যাচ্ছ না, চাকরি হ'লে তখন ছাড়িয়ে নিলেই তো হবে!"

চাকরি ছেলেটির হয় নাই সেখানে। হারটিরও উদ্ধার হয় নাই আর।

তাহার পর দু-এক বছর পরে একদিন গভীর রাত্রে কি যেন স্বপ্ন দেখিয়া বধূটি কাঁদিয়া উঠিয়াছে। ছোট মেয়ের মত ঠোঁট ফুলাইয়া ফুলাইয়া সে কি কান্না! আদর করিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিলে সে শুধু হাসে, কোনমতেই বলিতে চায় না স্বপনের কথা। বলে, "না, শুনলে তুমি হাসবে, ঠাট্টা করবে আমায়"। শেষে অনেক সাধ্য-সাধনার পর অনেক লজ্জায় অনেক সংকোচে মেয়েটির মুখ খোলে। বলে, "কি দেখাছলুম জান? যেন সেই হারটা আবার ছাড়িয়ে এনেছ তুমি। খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি গলায় পরতে গিয়ে দেখি, ও মা! অমন সুন্দর পেট-ফুলো ধুকধুকিটা চিবিয়ে-মিবিয়ে কে যেন চিঁড়ে-চ্যাপটা ক'রে দিয়েছে একেবারে। তাই না অত মন কেমন ক'রে উঠল আমার!"

পত্রিকাটি চোখের সম্মুখে খোলাই রহিল মাত্র, আমি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। যৌবনের সেই কাব্য-লিখন-প্রয়াসী মনটা বুকের মধ্যে আবার বুঝি কোথায় মাথা তুলিয়া বসিতেছে। বিস্মৃতির ঘন পুঞ্জীভূত অন্ধকার ছিন্ন করিয়া আবার যেন একটি দুটি আলো—

কিন্তু ছি, ভাব-প্রবণতা আমার দুই চক্ষুর বিষ!

আপিসের বেলা হইয়াছে; বইখানা বন্ধ করিয়া দিলাম।

প্রবারণ

শ্রীসুশীলচন্দ্র রাহা

আমি তখন মাদ্রাজ অঞ্চলে একটা বড়রকম সরকারী চাকুরীতে অধিষ্ঠিত। একদিন অপরাহ্ন বেলা বাসায় ফিরিয়া দেখি আমার আড়াই বৎসর বয়সের পুত্ররত্নটি একটি সন্ন্যাসিনী গোছের মেয়ের কোলে চাপিয়া কি সব কথা অনবরত বকিয়া চলিয়াছে। খোকা আমাকে দেখিয়া অন্যান্য দিনের মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; কিন্তু আজ ছুটিয়া আসিল না।

খোকাকে কোলে লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল সন্ন্যাসিনী মেয়েটি। সহাস্যে ওদের দেশী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, এইটি তোমার ছেলে?" আমি স্মিতহাস্যে সায় দিলে পর সে কহিল "ভারী ভাল।" এই বলিয়া হাত দিয়া খোকার মুখখানা নিজের পানে ফিরাইয়া লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল—খোকাও আপত্তি করিল না। উহাদের মধ্যে এত পরিচয় হইল কখন—ভাবিতে ভাবিতে জামা কাপড় ছাড়িতে ঘরে যাইয়া প্রবেশ করিলাম।

গৃহিণীর কাছে রাত্রে শুনিলাম, কিছুদিন আগে ভিক্ষা নিতে আসিয়া ওর খোকার সঙ্গে আলাপ হয়। ওর নাম কাঞ্চন। কাঞ্চন আমাদের বাসায় আসে আজকাল রোজই, খোকাকে কোলে লইয়া বুকে চাপিয়া বড় আদর করে। "আর আদর না করে কি পারে?" বলিয়া গৃহিণী খোকাকে কোলে লইয়া অজস্র মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

ঐ সন্ন্যাসিনী মেয়েটিকে আমি আরও দেখিয়াছি। অদূরে রাস্তার মোড় ফিরিতে প্রকাণ্ড পুষ্প-বাগানসমেত যে বৌদ্ধ-বিহারটি—উনি সেখানে থাকেন।—একজন ভিক্ষুণী। ওর বয়স ২২ কি ২৩শের মধ্যে, কচি ঘাসের মত ওর স্বর্ণাভ চিক্কণ বরণ কষায় বসনে সম্বৃত—পরিপূর্ণ দেহতট ব্যাপিয়া একটি আনন্দোদ্ভাসিত যৌবনশ্রী বিরাজিত। সংযমের শাসনে দেহ লতিকা একটু ক্ষীণ বটে—যদিও বিকশিত পদ্মের মত সুকুমার।

সহর হইতে মাইল তিনেক দূরে অনেকটা নিভৃতে আমার বাসা। পথে এই বিহারটি। যাতায়াতের পথে বিহারটি প্রায় প্রদক্ষিণ করিতে হয়। অনেক দিন প্রভাতে বা সন্ধ্যায় কাঞ্চনকে দেখিয়াছি, মন্দিরের পৈঠায় বাগানে বটবৃক্ষের নিম্নে শিলাসনে কিংবা পুষ্পচয়নে। ওর সুন্দর শান্ত মুখশ্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। আমি মনে মনে ভাবিতাম, উমার মত এই যে মেয়েটি যৌবনে যোগিনী হইয়াছে ইহা কিসের জন্য? কোন্ মহার্ঘ রত্নে ইহার লোভ? অনন্ত নির্ব্বাণই কি ইহার কাম্য? আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কেহ অবশ্য ছিল না।

উক্ত বিহারটি বেশ প্রাচীন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থানীয় কোন রাজা উহা নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধ সংঘের পাদমূলে দান করিয়াছিলেন। উহার সাধারণ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু ভূমিও আছে। একদিকে ভিক্ষুদের, অপর দিকে ভিক্ষুণীদের থাকিবার জন্য পৃথক পৃথক 'আরাম' আছে'—বাহিরের দিকে সাধারণ সভামণ্ডপ এবং মাঝখানে মন্দির। মন্দিরের ভিতরে শ্বেত প্রস্তরের নির্ম্মিত বেদির উপর ধ্যানী-বুদ্ধ অমিতাভের একখানা সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এমন এক সময় ছিল. যখন এখানে বহু ভিক্ষু ভিক্ষুণী থাকিত, কালক্রমে তাহা লোপ হইয়াছে এবং সেই সুবৃহৎ 'আরাম'গুলি প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র বিহারটি সংস্কারাভাবে জরাজীর্ণ, বৃদ্ধের মত গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। পাশের বাগানের অতীত যুগের বড় বড় গাছগুলি স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া যেন ঝিমাইতেছে। উহাদের শাখাপ্রশাখার বন্ধন অতিক্রম করিয়া সূর্য্যকর নিম্নের মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারে না। একটা স্যাঁতসেঁতে ভাপসা গন্ধে প্রাচীনত্ব যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, পুরাতন যুগের ঐ আবেষ্টনীর মধ্যেও কাঞ্চনকে যেন চিরনূতন বলিয়াই মনে হইয়াছে। আবার একদিন বাসায় ফিরিয়া দেখি, খোকার সঙ্গে ভিক্ষুণী কাঞ্চন খেলায় লাগিয়া গিয়াছে। খোকা কখনো বা ছুটিতেছে, পড়িতেছে, উঠিতেছে, কখনো বা কাঞ্চনকে প্রশ্ন করিতেছে, আদর করিয়া আপনার ক্ষুদ্র কোমল বাহু দুইটি দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে—অঞ্চল প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া তাহাকে অপর দিকে লইয়া যাইতেছে। জুতা জামা ছাড়িয়া বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া চা খাইতে খাইতে আমি দৃশ্যটি উপভোগ করিতে লাগিলাম। কাঞ্চনের মুখে উহার নিবিড় কৃষ্ণ চক্ষু তারকা দুইটিতে একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। "মুদে ন কস্য কিমু বালকেলিঃ"- হৃদি হারিণী বাল্য ক্রীড়া কাহাকে না আনন্দ দেয়? বিশেষ কাঞ্চন ভিক্ষুণী হউন বা নাই হউন, জননীর জাত তো!

এ পথে খোকাকে একবার দেখিয়া যাওয়া ভিক্ষুণীর নিত্যকর্ম্মের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল ; কিন্তু অনুরোধ করিলেও সপ্তাহে একদিনের অধিক 'ভিক্ষা' গ্রহণ করিত না। আমার পত্নী যত্ন করিয়া কাঞ্চনকে 'ভিক্ষা' দিতেন। বাংলা মুলুকে থাকিতে দেখিয়াছি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বৈরাগী সম্প্রদায়ের তিনি অনুরক্ত ছিলেন না—আদর্শ যাহাই থাকুক, উহার শোচনীয় বাস্তব দিকটার কথা ভাবিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। পত্নী বলেন, তাঁহার সেই মত আজিও পরিবর্ত্তিত হয় নাই ; কিন্তু কাঞ্চন সে জাতের নয়। ইতিমধ্যে কাঞ্চনের সঙ্গে কয়দিন আমরা বিহারটি দেখিতে গিয়াছি। কতদিন সন্ধ্যারতির সময়ও সেখানে ছিলাম। ধর্ম্মে, বিশ্বাসে, বিচারে, যেদিক হইতেই বিচার করি না কেন, কাঞ্চনকে সাধারণের সংজ্ঞায় ফেলিতে মন চায় না।

একদিন কথা প্রসঙ্গে পত্নী বলিলেন, 'জানো সত্যি চমৎকার মেয়ে ঐ কাঞ্চন।"

আমি হাসিয়া কহিলাম,"তোমার খোকাকে ভালবাসে বলে তো?"

উনি কহিলেন—"ঠাট্টা নয়, সত্যি ভাল মেয়ে। ধর্ম্ম জিনিষটা এত সহজ ভাবে কেউ গ্রহণ করতে পারে, এ আমি আর কখনো দেখিনি।"

পত্নী দেখিয়াছেন, কাঞ্চন ধর্ম্ম বস্তুটি সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছে। উনি ভাগ্যবতী, দেখিয়াই চিনিতে পারেন—আমি অভাগা শুনিয়াও সব কথার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারি না। আমি কহিলাম "তাইতো, সহজকে যে এত সহজে চেনে, এমন রত্নটি ঘরে থাকতেও চিনতে পারিনি!"

আমার স্ত্রী তাহার কথাটির পুনরুক্তি করিয়া কহিলেন—"সহজিয়ারাও এমন কথা বলে কিনা আমি জানিনে। ধর্ম্মটা ওর কাছে আচার বিচারের বস্তু নয়, দেহ মন প্রাণের বস্তু। কি চমৎকার!"

ইদানিং অপরাহ্ণে কাঞ্চন আসিলে পর খোকার দাইটা যায় ছুটি লইয়া ওর মাসির সঙ্গে দেখা করিতে—বারান্দায় বসিয়া খোকার মা আর কাঞ্চন গল্প করে—খোকা মাতিয়া মাতিয়া খেলা করে। একে খেলে, দুয়ে দেখে।

কাঞ্চনের বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদি পড়াশুনা আছে। খোকার মা হয়তো সে সব শুনিয়াই কাঞ্চনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। বুদ্ধদেব যে মানুষকে সহজ পথে চলিতে বলিয়াছেন, ইহাও সত্য। ওদের মন্দিরের বৃদ্ধ যতী বিষ্ণুবর্দ্ধনের পাশে বসিয়া সন্ধ্যাবেলা স্তোমারতির পরে পিটকের ব্যাখ্যা শুনিতে দেখিয়াছি। আর কাঞ্চন যাহা করে, শ্রদ্ধা-ভরেই করে—অন্ততঃ দেখিয়া তাহাই মনে হয়।

খোকার মা এবার আস্তে আস্তে কহিলেন "কাঞ্চন বলে কি—শুনবে? বলে 'খোকাকে কোলে করে মনে হয় আমি যদি এর মা হতেম।' আবার বলে 'আমার মা হতে ইচ্ছে হয়েছে—সেই হবে আমার সহজ ধর্ম্ম; আচ্ছা তুমিই বল, এতবড় সত্যকথা যে মেয়ে মুখে বলতে পেরেছে সে কি ধর্ম্মকে চেনেনি?"

আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। জগতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। কাঞ্চন হয়তো একটা বড় সত্যই বলিয়াছে।

২

দিন পাঁচ হয় আর কাঞ্চনের দেখা নাই। অফিস হইতে ফিরিলে খোকা জিজ্ঞাসা করে "কাঞ্চন কই।" খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মনে মনে বলি, সেই সত্য কথাটাই কাঞ্চনের এখানে আসার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বোধহয় সে বুঝিয়াছে ভিক্ষুণীর পক্ষে মাতৃত্ব কামনা করা পাপ। তাই হইবে। মানুষের মন—সব সময় সমাজ, সংস্কার, বিধিনিয়মের ঊর্দ্ধে যাইয়া—প্রচলিত ধর্ম্মমতের সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় সহজ ধর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবার মত নির্ভর পায় না।

তাই কাঞ্চন সেদিন যাহা তাহার স্বভাবতঃ ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করিয়াছিল আজ হয় তো তাহাই তোমাকে পীড়া দিতেছে এবং লজ্জায় সে খোকাকে পর্য্যন্ত দেখিতে আসিতে পারে নাই।

বিকালে খোকাকে লইয়া তাহার মা এক বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। একাই বেড়াইয়া বাসায় ফিরিবার পথে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কাঞ্চনের একবার খোঁজ লইতে বাগানের সরু পথ দিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। ঘনায়মান আঁধারের সঙ্গে সুবৃহৎ গাছগুলির ছায়ায় মিলিয়া এই স্তব্ধতার রাজ্যে যেন একটা গোল পাকাইয়া তুলিতেছিল।

দূর হইতেই দেখা গেল মন্দিরের মধ্যে একটি আলো মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। কানে ভাসিয়া আসিল বৃদ্ধ বিষ্ণুবর্দ্ধনের স্তোত্র-পাঠের সুর। নিকটে যাইয়া দেখি, অমিতাভের চরণপ্রান্তে একটি নারী মূর্ত্তি অবনত হইয়া রহিয়াছে। চিনিলাম এ কাঞ্চন। কিছু বাদে বৃদ্ধ গ্রন্থখানা মুড়িয়া রাখিয়া দিলেন। এইবার কাঞ্চন উঠিয়া বসিয়া করজোড়ে বৃদ্ধের সঙ্গে আবৃত্তি করিল—

"সর্ব্ব-পাপসস অকরণং
কুসলসস্ উপসম্পদা
সচিত্ত পরিয়োদপণং
এসং বুদ্ধাসাশনম্।"

কাঞ্চন পুনরায় ভূমি সংলগ্ন হইয়া প্রণাম করিল। ঘাড় ফিরাইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ অভ্যর্থনা করিলেন—আমি যাইয়া তাহার পার্শ্বে বসিলাম। কাঞ্চন তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল তাহার মুখখানা করুণ ও নিষ্প্রভ দেখিয়া আমি মনের মধ্যে কেমন ব্যথা বোধ করিতে লাগিলাম। মন্দিরটি তেমনি স্তব্ধ, কেবল কিছুক্ষণ পূর্ব্বের প্রার্থনার রেশটি কাণে বাজিতে লাগিল এবং বৃদ্ধ আলোক শিখাটি একটু বাড়াইয়া দিলে পর অমিতাভ মূর্ত্তির ওষ্ঠপ্রান্তে একটি মৃদু হাসি-রেখা যেন ফুটিয়া উঠিল বলিয়া মনে হইল।

কাঞ্চনই আমাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কেমন আছে এবং খোকা ভাল আছে শুনিয়া নিমেষে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আধ ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর উঠিয়া আসিবার সময় বৃদ্ধ আমাকে অনুরোধ করিলেন—সামনে ছুটির দিন বর্ষোৎসব, সেদিন আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

প্রতি বৎসর ওখানকার বৌদ্ধদের মধ্যে এই সমারোহপূর্ণ উৎসবটি হয়। তখন বর্ষা অপগত, রোদে আবার নূতন রং ধরে। কর্ম্মের জগতে ও ধর্ম্মের জগতে বৌদ্ধরা উৎসবের পর নবোদ্যমে কাজ সুরু করে। দূর দূরান্তর হইতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক, ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রমণ, যতী প্রভৃতি সব আসিয়া মিলিত হয়। শাস্ত্র ও ধর্ম্মের আলোচনায়, মাঙ্গলিক ক্রিয়ায় মিলন সার্থক হইয়া উঠে।

বর্ষোৎসবের আয়োজনে কাঞ্চন ব্যস্ত ছিল—খোকাকে দেখিতে না যাওয়ার ইহাই কারণ হইবে মনে করিয়া উহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম তাহার জন্য মনে মনে লজ্জিত হইলাম। সাধারণ নারীর মত বুক চাপা ক্রন্দন তো উহার শোভা পায় না। সেবার মধ্য দিয়া বিশ্বের মাতৃত্বের দ্বারই তো উহার কাছে মুক্ত। কি ভুলই না বুঝিয়াছি।

বর্ষোৎসবের দিন আসিল। এই দিনটিতে পুরাতন মন্দিরটির শোভা এক বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমতঃ বাহিরের প্রবেশ দ্বারে লতাপাতা-মণ্ডিত একটা বিশাল তোরণ করা হইয়াছে। আরও গোটা কয়েক অপেক্ষাকৃত ছোট তোরণ মন্দিরের সভামণ্ডলের বা ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। পাশে ছোট ছোট ছাউনী

করিয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতির কতকগুলি নিদর্শন প্রদর্শনীর আকারে সজ্জিত রহিয়াছে। তোরণ শীর্ষে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বা কোথাও অন্যান্য বৌদ্ধ অনুশাসন লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সভা আরম্ভ হওয়ার কিছু পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া আসন গ্রহণ করিলাম। সভা 'আরম্ভ' হইল। বড় বড় উপাধিধারী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন। ফলে কোন পিটক কবে লেখা আরম্ভ হইয়া কবে শেষ হইয়াছিল, অথবা সংঘমিত্রা কোন তিথিতে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন এসকল তথ্য নিখুঁৎ প্রমাণ হইয়া গেল। একজন তেবিজ্জ সুত্তের উপর যে নূতন আলোকপাত করিলেন তাহাতে উপস্থিত সকলে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল!

সমবেত জনতার মধ্যে কাঞ্চনকে একবারও দেখিতে পাই নাই। বাসায় ফিরিব এমন সময় মন্দিরের কাছে তাহার দেখা পাইলাম। তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিল, আজকের মেঘমুক্ত আকাশের মতই প্রফুল্ল মুখে আমাকে কহিল—'কাল প্রবারণ উৎসব, তুমি কিন্তু আসবে।'

স্বীকৃত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, কাঞ্চনের মুখে এমন হাসি তো কখনো দেখি নাই।

পরদিন প্রাতে কাঞ্চন আমাদের বাসায় যাইয়া হাজির। বলে 'খোকাকে দেখতে এলাম।' দাইর কোল হইতে খোকাকে লইয়া নানারূপ আদর করিতে লাগিল, নিজেই খোকাকে অনেকগুলি চুম্বন করিয়া ফেলিল। কাঞ্চন যেন আজ একটু বাচাল, একটু অধীর বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু মুখখানা তেমনি হাস্যোজ্জ্বল, মালিন্য বিরহিত। শেষটা যাইবার সময় আমাকে অপরাহ্নের উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য আর একবার অনুরোধ করিয়া গেল।

এই দিনকার কাজ হইল—বৌদ্ধ সঙ্ঘের অন্তর্গত কাহারো জীবনে কোন পাপ জমা হইয়া থাকিলে সর্ব্বসমক্ষে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভিক্ষা করিয়া লওয়া। দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের দেখা আর এইদিন মেলে না। বোধহয় তাহাদের পাপ থাকে না। দুই একজন ধর্ম্মপ্রাণ ভীরু ব্যক্তি মাত্র হাজির থাকে—কাজেই অবস্থাটা হয় ভাঙ্গা হাটের মত।

কেন যে কাঞ্চন অত আগ্রহ করিয়া এই উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করিল তাহা বুঝিতে না পারিয়াও যথাসময়ে আসিয়া উৎসবে উপস্থিত হইলাম। মাঙ্গলিক মন্ত্রাদি পাঠ সমাপ্ত হইল। এক বৃদ্ধ উঠিয়া কবে একদিন অপরের বাগানে ফল দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিল এই অপরাধ জানাইয়া প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করিল। আরও কয়েকজন এমনি লোভ, ভয়, অতিভোজন প্রভৃতি অনাচার দোষ স্বীকার করিয়া অনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত ভিক্ষা করিল।

সবিস্ময়ে দেখিলাম এমন সময় উঠিল কাঞ্চন। সে একবার চারিদিকে তাকাইল, আমার পানে চোক পড়িতে তাহার দৃষ্টি যেন স্থির হইয়া আসিল, ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল। তারপর দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লইয়া একেবারে ঋজু হইয়া দাঁড়াইল। মুখে প্রভাতের সেই হাসিটি নাই; একটি অপরূপ দৃঢ়তার রেখা সেখানে বিরাজমান। কষায় বসনাঞ্চল তাহার দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া বামবাহুমূলে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, ক্ষীণ বায়ুবেগে তাহা পতাকার মত দুলিয়া উঠিল। কাঞ্চন কি আজ জয় পতাকা উড়াইবে?

কাঞ্চন যুক্তকরে ভগবান বুদ্ধদেবকে ও মাতা মহাপ্রজাপতিকে নমস্কার করিল।

একটি মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া অকম্পিত কণ্ঠে কাঞ্চন কহিল "আজ আমি সঙ্ঘ হতে বিদায় নেব স্থির করিয়াছি, কেননা আমার মধ্যে সংসারাসক্তি আসিয়াছে।" নিয়ম আছে বটে কোনও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী ইচ্ছা হইলে সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে—কিন্তু নিয়মটি প্রতিপালিত হইতে বয়োবৃদ্ধ 'স্থবির'রাও তাহাদের জীবিত কালের মধ্যে দেখেন নাই। সভার সকলে রুদ্ধ শ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিল; আমি এমনি একটা কিছু অনুমান করিতেছিলাম।

কিন্তু ইহার পর কাঞ্চন যাহা কহিল, তাহা একেবারে অচিন্তাপূর্ব্ব। কহিল— এই বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে একদিন প্রত্যুষে আমাদের বাগানে ভগবানের পূজার জন্য ফুল তুলিতেছিলাম। আমি তখন চরণাঙ্গুলিতে ভর দিয়া আগ ডালের একটি ফুল তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম— বসনাঞ্চল বক্ষচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। সহসা চাহিয়া দেখিলাম, যুবা বয়সের একটি ভিক্ষু আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যেন মূর্ত্তিমান যৌবন দেবতা! ভগবানের পূজার জন্য যে ফুল তুলিয়াছিলাম, তাহা সেই পুরুষের চরণপ্রান্তে পড়িয়া গেল। আমি লজ্জা লুকাইবার ঠাঁই পাইলাম না।"

"পরদিন হ'তে প্রতিদিন ভগবান বুদ্ধদেবকে আত্মদান করিতে চাহিয়াছি—কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি। সেই পুরুষটি অলক্ষ্য চরণ সম্পাতে আমার হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া মাথামণ্ড চড়াইতে থাকে। আমার মনে হয় আমার সন্দেহ মন দিয়া ভগবানের নামে যেন এতকাল তাহারই আরাধনা করিয়াছি। নির্ব্বাণের শীতল সলিলে অবগাহন হইতে সৃষ্টির কামনাময় অগ্নিদাহনই আমার শ্রেয়ঃ।"

দুইহাত যুক্ত করিয়া কাঞ্চন আবার নমস্কার করিয়া কহিল— প্রিয় ভ্রাতা ভগ্নিগণ। সঙ্ঘ! বিদায়—আজ আমার একটি মাত্র মন্ত্র রহিল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।" বাক্য সমাপ্ত হইলে অনেকগুলি কৌতূহলী বিস্মৃত লোকলোচনের সম্মুখ হইতে কাঞ্চন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কাঞ্চনের মুখে তার নিজের সম্বন্ধে শ্রুত উপাখ্যান, তার মনের জোর, সহজ ধর্ম্মবোধ, তারমধ্যে জাগ্রত মাতৃত্ব প্রভৃতি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কখনো মনে হ'ল অদ্ভুত কখনো মনে হইল চমৎকার। প্রভাতে খোকার সঙ্গে এই বিদায়ের পালাটা অভিনীত হইয়াছিল মনে পড়িয়া গেল—যদিও তখন স্পষ্ট বুঝি নাই

একদিন খোকা জিজ্ঞাসা করে 'বাবা কাঞ্চন কোথা।' তাহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

শিকারীর স্মৃতি

মহারাজা শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম-এ (সুসঙ্গ)

সে আজ ৭।৮ বৎসরের কথা। কয়েক দিন হইল পাহাড়ে আছি—ফাল্গুন মাস। গাছের পাতা শুকাইয়া গিয়াছে—চিরশ্যামল গারো পাহাড়ের রূপও বড় রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি বসন্তের বর্ণসম্ভারের পরিবর্ত্তে পাহাড়ীদের কৃষি-চেষ্টায় কাটা-বনের নিষ্করুণ শুষ্করূপ চারিদিকের দৃশ্যপট আরও শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছে।

এ সময়ে জলের ধারে পাহাড়ের জন্তুর সমাগম স্বাভাবিক। আমরা গারো পাহাড়ে সোমেশ্বরী নদীর তীরে আগ্রামের চড়ে যে জায়গাটী শিকারের জন্য ঠিক করিয়াছিলাম সেটীর অধিকাংশই পাহাড়ী তৃণের জঙ্গলে ঢাকা—কোথাও কোথাও বাতা ইঁকড় প্রভৃতি বনও আছে। এই সময়ে জঙ্গলের অনেক স্থানই কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে যে ছোট ছোট বনভূমি রহিয়া গিয়াছে সেইগুলিই জন্তুর আশ্রয় স্থল। শিকারের চেষ্টায় একই জায়গায় ঠিক একত্রে না হইলেও অল্প দূরে দূরেই কোনও কোনও দিন ১০।১২টী গাউজ হরিণ তাড়াইয়া বাহির করিতে দেখিয়াছি। খেদাড়ুর তাড়া খাইয়া মুক্ত স্থান দিয়া পলায়নের সময় ইচ্ছামত শৃঙ্গী-হরিণকে অথবা দন্ত-বরাহকে বধ করিয়া শিকার বৃত্তি চরিতার্থ করা অতি অল্প আয়াসসাধ্য।

আমাদের তাঁবুটা ছিল ঠিক সোমেশ্বরী নদীর ধারে, উব্রেক্ ও সোমেশ্বরীর সঙ্গম স্থলেই বলা যাইতে পারে। উব্রেক ছড়া পাহাড়ের ভিতরে বনানীর মধ্য দিয়া আসিয়া পূর্ব্ব দিক হইতে সোমেশ্বরীতে মিশিয়াছে—ছড়ার দুই দিকেই পাহাড়। দক্ষিণে সোজা পাহাড়ের উপর দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে, এই পথের নীচেই নদীর ধারে কয়েকটী বাঁশের ঝাড়—ইহাদের ছায়াতলেই আমাদের তাঁবু—সুতরাং তাঁবুর পিছনে ছড়া এবং সম্মুখে নদী বহিয়া চলিয়াছে। উব্রেক ছড়ার দুই পাশে নল, ইকড় প্রভৃতির ঘন বন থাকায় এই স্থানগুলি সকল রকম বন্য জন্তুর স্বাভাবিক বিচরণভূমি—বিশেষ করিয়া বৎসরের এই সময়টায় এখানে নানা রকম বন্য জন্তুর যথেষ্ট ভিড় জমে।

নদীর অপর পারে আল্‌কফাং বস্তী। এপার হইতে অপর পারে পাহাড়ের গায়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে গারোদের মাচাং—পাহাড়ের নীচেও অনেকটা বিস্তৃত সমতল ভূমি—সেখানে বিদ্যালয় ও গির্জ্জাঘর—এমন কি ছাত্রদের ফুটবল খেলার মাঠ—গ্রামের সম্মুখে অনেকটা বালিময় তটভূমি—দুই পাড়ের মধ্যে স্বচ্ছসলিলা স্রোতবহুলা নদী—গারোদের নিত্য জীবনযাপনের আভাষ দূর হইতে কিছু কিছু পাওয়া যাইত। নদীটী গ্রাম ঘেঁষিয়া প্রায় বৃত্তাকারে ঘুরিয়া গিয়াছে—আমাদের কিছু দক্ষিণেই বাঘমারা রিজার্ভ আরম্ভ এবং উজানে আগ্রামের সুবিখ্যাত ডোবা—ডোবার পাশে খাড়া পাহাড় ও তাহার প্রতিবিম্ব স্থানটীর গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে—অপর পাড়ে সুউচ্চ বালির চর—উজানে বিস্তৃত সমতল ভূমি। ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে গভীর বনানী পরিপূর্ণ থাকায় হস্তী, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি জন্তুর অতি আকর্ষণীয় বিহারভূমি ছিল, বর্ত্তমানে ইহার অধিকাংশ স্থানই মানুষের কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দূরবিস্তীর্ণ প্রায়-সমতটের পর সবুজ পাহাড়ের পিছনে সমুন্নত শিরে দাঁড়াইয়া নীল পাহাড়ের শ্রেণী। আগ্রামের বালির চর হইতে স্থানটীর সাধারণ দৃশ্য বড়ই সুন্দর গম্ভীর। জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে এ স্থান স্বপ্নলোকের মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে।

এখানকার দৃশ্য যেমন সুন্দর, মৎস্য হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ পক্ষী ও জন্তু শিকারের পক্ষেও স্থানটী তেমনই উপযোগী। আজকাল এরূপ স্থান অল্পই দেখা যায়। এখানে গারোদের নানারকম মাছ ধরার কৌশল দেখিয়া সময় কাটান একান্ত অলস দিনেও সহজেই সম্ভব। শিকারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছি, সঙ্গে দুইটী পোষা হাতী, দুইজন খুঁজি; তা'ছাড়া অপর তিন জন ভদ্রলোক আছেন এবং আবশ্যক সঙ্গীয় লোকজনও আছে।

মাহুতরা নদীর অপর ধারে ডেরা বাঁধিয়া থাকিত, অন্যান্য লোকজন আমাদের সঙ্গেই থাকে। আমাদের আস্তানা নদীর জল হইতে বোধ হয় ৩০।৪০ ফিট্ উপরে—

সেখানে ছোট টিলাটীর উপরিভাগ প্রায় সমতল, সুতরাং তাঁবু খাটানর পক্ষে উপযোগী। পাকের চালা, তাঁবু ও জলের মাঝামাঝি স্থানে। টীলার পাশ ঘেঁসিয়া উব্রেক ছড়া আসিয়া নদীতে মিশিয়াছে। ছড়ার অপর পার ভীষণ জঙ্গলে ঢাকা।

হাতী দুইটীর একটী নদীর এপারে এবং অপরটী ঐ পারের জঙ্গলে রাত্রিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইত—কারণ অনেক সময় রাত্রিতে বন্য হস্তী গৃহপালিত হস্তীকে আক্রমণ করে; সেই অবস্থায় সাহায্য দেওয়া আবশ্যক হইলে দুইটী হস্তী একত্র থাকিলে অনেক সময় অসুবিধা হয় বোধেই এই ব্যবস্থা করা হইত। এমন স্থানে লোকের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে হাতীকে স্বচ্ছন্দ বিহার করিয়া স্বাভাবিক আহার্য্য সংস্থান করিতে দেওয়া আমার অভ্যাস।

সেদিন ফাগুয়ার পূর্ব্বের দিন—প্রাতে কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছন্ন। আমরা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া চা পান করিতেছি এমন সময় অতি স্পষ্টরূপে হস্তী-শাবকের ডাক ২।৩ বার শুনিলাম। শোনা মাত্র জংলা হাতী দেখার জন্য প্রত্যেকে উৎসুক হইয়া উঠিলাম। বনে জঙ্গলে স্বচ্ছন্দ-বিহারী হস্তীকে দেখিবার সুযোগ যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারা এই বিশাল শোভন জন্তুগুলির স্বাভাবিক জীবন যাপনের দৃশ্য পুনঃ পুনঃ দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন বলিয়া মনে করি না। বনে জঙ্গলে চিরদিনের সহচর, একান্ত নির্ভরযোগ্য, অদ্ভুতকর্ম্মা "জুম্মা"কে জিজ্ঞাসা করিলাম—সে বলিল, হাতীর বাচ্চা খেলার ছলে চেঁচাইতেছে—সে আরও বলিল, ইচ্ছা করিলে অতি অনায়াসে হাতীর দল নিরাপদে দেখা যাইবে। কুয়াসা কাটিয়া গেলে রৌদ্রে বাহির হইয়া কিছু সময় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্থানে বিচরণ করিবার সময় হাতীগুলিকে সহজেই দেখা যাইবে। জুম্মাকে সঙ্গে লইয়া কালবিলম্ব না করিয়া আমরা তাঁবুর পাশের রাস্তায় পাহাড়ে উঠিলাম। তখনও উব্রেক ছড়ার উপত্যকার কুয়াসা দূর হয় নাই; কিন্তু অপর দিকে পাহাড়ের কুয়াসা ক্রমশঃ অপঃসৃত হইয়া যাওয়ায় গাছগুলি সবেমাত্র শীতের তন্দ্রা জড়িমা কাটাইয়া ওঠায় চোখ মেলিয়া আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া দেখা দিতেছে। এখানেও পাহাড়ের বন অধিকাংশই গারোরা কাটিয়া "হাদাং" (অর্থাৎ ক্ষেত) করার জন্য পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।

হঠাৎ…"ন"…বাবু, "দেখুন দেখুন হাতী দেখা যাইতেছে" বলিয়া সোৎসাহে অপর দিকের পাহাড়ের উপরিভাগে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিলেন। অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও কয়েকটা ধূসর প্রস্তর স্তূপ ভিন্ন অপর কিছুই যেন দেখিতে পাইলাম না।—কিন্তু প্রায় ৩।৪ মিনিট নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করিবার পর হঠাৎ যেন হাতীর কাণের মত কি নড়িয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর স্তূপও সচল হইয়া উঠিল। বুঝিলাম হাতীই বটে! বস্তুতঃ বন্য জন্তু নিশ্চল ভাবে বনের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাদের অস্তিত্ব বোঝা দায়—সে হাতীই হউক, আর খরগোসই হউক। কিন্তু একটু সচল হইলেই ইহারা দৃষ্টিপথে পড়ে।

হাতী চোখে দেখা মাত্র ঐ দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম—একটীর পর একটী হাতী বৃক্ষবহুল শিখরদেশ হইতে পাহাড় বাহিয়া পূর্ব্বদিকে মৃদু মন্থর গতিতে চলিয়াছে—মধ্যে মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কখনও হঠাৎ শুঁড় দিয়া মাটিতে বন্দুকের মত শব্দ করিয়া কান মেলিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে মাথা ও শুঁড় তুলিয়া গন্ধ লইতেছে—কখনও ধূলি-রাশির মেঘাবরণ সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। কতক দূর যায়, আর থামিয়া দাঁড়ায়। কখনও উচ্ছৃঙ্খল যুবক হস্তী দুই একটা গাছের ডাল মড়্মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া দিতেছে অথবা লাইন ছাড়িয়া আপন বয়সোচিত চাঞ্চল্যের পরিচয় দিতেছে! আবার আপন প্রমত্ততায় অপর কোনও সহচর কিম্বা সহচরীকে শুণ্ড কিম্বা দন্ত দ্বারা আঘাত করিতেছে—ছোট শাবকগুলি "গুট্" "গুট্" করিয়া মায়ের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মাতা কখনও কখনও সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে শুঁড় দিয়া শাবককে টানিয়া আনিতেছে আপন বুকের কাছে—অথবা সামান্য আঘাত করিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছে। এইভাবে হাতীগুলি একটী পরিত্যক্ত গারোর ক্ষেত্রে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

সেখানে সমস্তগুলি হাতী একত্রে দাঁড়াইয়া আছে—সহসা একটী প্রকাণ্ড হস্তিনী অনেক দূর পর্য্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ একটা শঙ্খনাদের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্য সব হাতী সেই দিকে কাণ মেলিয়া শুঁড় গুটাইয়া মাথা উঁচু করিয়া মহা ক্রোধে যেন কোনও জন্তুকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ধাবমান হইল। উত্তেজিত মাতা এদিকে শাবককে বুকের নীচে টানিয়

সতর্ক দৃষ্টিতে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় কোথা হইতে এক প্রকাণ্ডকায় দন্তী-হাতী ঝড়ের মত বেগে সম্মুখে আসিয়া সদর্পে ধাবিত হইয়া অন্ততঃ ৫০ গজ পর্য্যন্ত যাইয়া কল্পিত শত্রুর উদ্দেশ্যে একস্থানে দাঁড়াইয়া পদাঘাতে ধূলি ও প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরই সমস্ত-গুলি হাতী সবেগে ফিরিয়া শাবকসহ অপেক্ষাকারী মায়ের দলের সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকার শব্দে পাহাড় প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ঐ প্রকাণ্ডকায় হস্তীটি কিন্তু অনেক সময় ধরিয়া সদর্পে প্রহরীর কার্য্য করিয়া সক্রোধে ঘাড় বাঁকাইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে ধীর গম্ভীর ভাবে ফিরিয়া গাছের অন্তরালে আশ্রয় লইল। রৌদ্রতাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য হাতীগুলিও গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন এই অঞ্চল দেখিয়া এমন মনে হইল না যে এই সকল জঙ্গলে একটীও হাতী আছে!

এভাবে হাতীর চলা ফেরা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। উহাদের ঐ হঠাৎ ক্রোধের কারণ অরণ্য-বন্ধু জুম্মাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "বোধ হয় বাঘ দেখিয়াছে, তাই এভাবে তাড়া করিয়া গিয়াছে।" অনেক সময় দলবদ্ধ হাতীর নিকটেই বাঘ থাকিতে সে নাকি দেখিয়াছে। তাহার মতে হস্তী প্রসব করিবার পর গর্ভফুল (Placenta) খাইতে বাঘ খুবই ভালবাসে। Mr. Sanderson বলেন—সুযোগ পাইলে ব্যাঘ্র নবপ্রসূত হস্তী-শাবক বধ করিয়া ভক্ষণ করে। পরদিনের এক ঘটনা হইতে বিশ্বাস হয় হাতীগুলি বাঘই তাড়া করিয়া গিয়াছিল।

এখানে একটা কথা স্বতঃই মনে হইতেছে—ব্যাঘ্র সিংহাদির প্রকৃতির সহিত হস্তীর স্বভাবের তুলনামূলক চিত্র। ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদের খল প্রকৃতি আর হস্তীর উদার গম্ভীর স্বভাব—এতদুভয়ের তুলনা করিবার সুযোগ একবার পাইলে হাতীই যে বনানীর অবিসম্বাদিত প্রভু হওয়ার উপযুক্ত, এ সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা কাহারও থাকে না।

হাতী দেখিয়া প্রাতঃকাল বেশ কাটিয়া গেল। দ্বিপ্রহরে শিকারে বাহির হইলাম। দেখিয়াছি দ্বিপ্রহরের রুদ্রতাই শিকারের ন্যায় অদ্ভুত আনন্দলাভের শ্রেষ্ঠ সময়। ভোরে এবং সন্ধ্যায় শিকার সহজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃতির মধুর আবেষ্টনী চিত্তকে তখন এমনই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে যে তখন হত্যায় আনন্দের পরিবর্ত্তে আত্মগ্লানিই প্রাণে বাজে! তাছাড়া বনানীর উত্তেজক গন্ধের প্রতিক্রিয়াও দ্বিপ্রহরের রুদ্রতায় এবং গভীর নিশীথে যেরূপ বোধ করা যায়, অন্য সময় তাদৃশ হয় না।

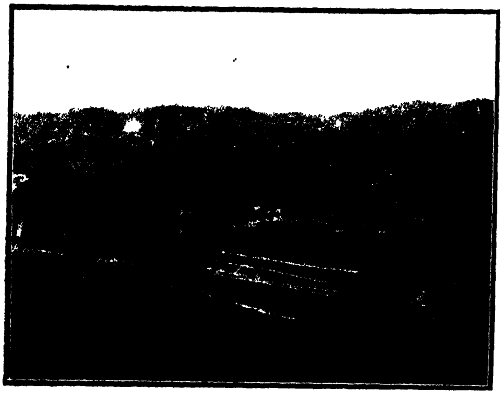
সঙ্গে হাতী নিলাম না; ১৫।২০ জন খেদারু (beaters) সঙ্গে লইয়া কোন্দা নৌকা (dig out) যোগে পূর্ব্ববর্ণিত শিকার ভূমিতে গেলাম। প্রথম বন হাঁকাও করিতে কেবল একজোড়া বনমুরগী উড়িয়া গেল—তখন বনমোরগ শিকারের কাল আইনতঃ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং মুরগী শিকার করা হইল না। একটু পরই শুষ্ক বনানীতে হড়্ হড়্ গড়্ গড়্ শব্দ করিয়া উঠিল, আর ভীষণ শব্দে খেদারুগণ চারিদিকের পাহাড় প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল—ইহারা "হল্লা" করিতে করিতে যখন বনভূমির শেষপ্রান্তে আসিয়াছে তখন জঙ্গল হইতে চকিতে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল এক প্রকাণ্ড গাউজ হরিণী। অবধ্যাবোধে Rifle নামাইলাম। বিপদের স্থান নিরূপণের চেষ্টায় কাণ বাঁকাইয়া, চকিত স্থির দৃষ্টি ও



সোমেশ্বরী নদীর ধারে টীলার উপর গারোবস্তী —(কুমার বিমলেন্দু সিংহের সৌজন্যে)

অপূর্ব্ব গ্রীবা ভঙ্গিমায় যখন সে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল তখন নয়ন মন মুগ্ধ হইয়া গেল। আমি জঙ্গল-কাটা পরিষ্কার জায়গায় একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকাইয়া ছিলাম।

হরিণী ক্ষণিকের জন্য এদিক ওদিক দেখিয়া সহসা প্রাণভয়ে পলায়নপর হইল—আমার ২০ গজের ভিতর দিয়াই চলিল। পলায়নপর হরিণীর অভিরাম গ্রীবা-



আলকুফাং বস্তীর অপর দৃশ্য

—(কুমার বিমলেন্দু সিংহের সৌজন্যে)

ভঙ্গিমায় মুহুর্মুহু পশ্চাতে ভয়চকিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকান, আর প্রকাণ্ড শরীর লইয়া সাবলীল গতিতে বহুক্ষণ ধরিয়া মাঠ ও পাহাড়ের উপর দিয়া পলায়নের চিত্র বহুদিন মনে আঁকা থাকিবে। আরও ৪।৫ বার বন 'হাঁকাও' করা হইল; হরিণও প্রত্যেকবারই ২।১টা দেখিলাম, কিন্তু বধযোগ্য হরিণ একটীও বাহির করা গেল না! আশায় আশায় প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হওয়া গেল না—তাই তাঁবুতে ফিরিতে বেশ একটু বিলম্ব হইয়া গেল। আগ্রামের ডোবার নিকট আসিতেই অন্ধকার হইল—চাঁদ তখনও পাহাড়ের প্রাচীর ভেদ করিয়া দেখা দেয় নাই। আমরা নৌকাযোগে ফিরিতেছি—পথে একজন গারো ডাকিয়া বলিল যে বন্য হস্তী আমাদের তাঁবু আক্রমণ করায় তাঁবু হইতে ৩।৪টা বন্দুকের আওয়াজ হইয়াছে। এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম এবং উৎসাহ ও উৎকণ্ঠায় সমস্ত শরীর উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

দূর হইতে দেখি তাঁবুর স্থান অন্ধকার এবং নদীর অপর পারে গ্রামবাসিগণ খুব আগুন জ্বালাইয়াছে। অন্ধকারে নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁসিয়া লোকালয়ের দিক দিয়া সভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—চোখে কিছু দেখা যায় না, কি জানি যদি জলপানের জন্য জংলী হাতী নদীতে নামিয়া থাকে। অন্ধকারে হঠাৎ ছায়ার মত এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা ঔৎসুক্যের সহিত তাকাইয়া দেখি—বড় মাহুত। সে অতি ধীরে ধীরে বলিল "মোকনী হাতী (অর্থাৎ দন্তহীন পুং হস্তী) নদীর ধারেই দাঁড়াইয়া আছে, আমরা ভয়ে সকলে তাঁবু হইতে চলিয়া আসিয়াছি, আপনারা কোনও মতেই ঐদিকে যাইবেন না—হাতীটা পোষা হাতী ও মানুষ উভয়কেই আক্রমণ করে।" মাহুতকে এভাবে তাঁবু ছাড়িয়া চলিয়া আসায় খুবই ভর্ৎসনা করিলাম এবং আমাদের সঙ্গে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া তাঁবুর নিকটে গেলাম। এভাবে যাইবার সময় আমাদের প্রাণেও যথেষ্ট আতঙ্ক হইতেছিল—তথাপি পাছে নিজের ভয়ত্রাস্ত ভাবের আভাস সঙ্গিগণ পাইলে তাহারা আরও ভীত হইয়া



গারোদম্পতী পাহাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়াছে

উঠে, কাজেই নিজের ভাব গোপন করিয়াই চলিলাম। ইতিমধ্যেই অনুসন্ধানে জানিয়া লইলাম তাঁবুর নীচেই উত্রেক ছড়ায় দলবদ্ধ হাতী আসিয়াছে দেখিয়াই ভয়ে ভৃত্য কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছে। বস্তুতঃ কোনও হাতী মানুষ কিম্বা তাঁবু আক্রমণ করে নাই। চাকরটী নূতন—সে ইতিপূর্ব্বে এভাবে হস্তীযূথ পরিবৃত হয় নাই।

যে কোনও নূতন মানুষ এভাবে হাতী দেখিলে যে অত্যন্ত ভয় পাইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অবস্থা বুঝিয়া পোষা হাতী দুইটাকেই এই পারে আনাইলাম। ইতিমধ্যে গ্রামের মাষ্টার গংসেন ছাত্রদের সাহায্যে তাঁবু রক্ষার্থ বহু জ্বালানি কাঠ পাঠাইয়া দিল। তাহার সৌজন্য কখনও ভুলিবার নহে। মাহুতদের তাঁবু আগের দিনেই আমাদের পাকের চালার নীচে উব্রেক ও সোমেশ্বরীর মোহনায় ছোট বালিচরে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। এখন তাহাদিগকে এই ডেরা উঠাইয়া আমাদের তাঁবুর পিছনে লইতে বলিলাম দুই কারণে; প্রথমতঃ বন্য হস্তী নামিয়া আসা মাত্র এমন অতর্কিতভাবে ইহাদের ডেরা আক্রমণ করিবে যে ইহারা আত্মরক্ষার অবসরই পাইবে না; দ্বিতীয়তঃ ইহারা আমাদের তাঁবুর পিছনে থাকিলে সেই দিকটা সুরক্ষিত হইবে। ইহার পর "বুনো" হাতী আসিবার সম্ভবপর পথে প্রয়োজন হইলে দ্রুত অগ্নি জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিয়া হস্তী দুইটাকে নদীর দুই পারে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমরাও এখন শিকারীর বেশ পরিবর্তন করিয়া বাঙ্গালীর স্বাভাবিক বেশ কাপড় ও চটীজুতা পরিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

সান্ধ্যকৃত্য শেষ করিয়া চা পানের সময় আলোচনা করা গেল, সহসা কোনও বিপদ হইলে অর্থাৎ হাতী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলে কোথায় কাহাকে কিভাবে আশ্রয় লইতে হইবে। এই সমস্ত আলোচনায় দেখা গেল যে আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থান—তাঁবুর পিছনে যেখানে টিলাটা সোজাভাবে নামিয়া গিয়াছে ছড়া পর্য্যন্ত সেই স্থানে।

এই সময় হঠাৎ হাতীর গাছ ভাঙ্গার শব্দের সঙ্গে আমাদের পোষা হাতীর ডাক শুনিলাম। মাহুত বলিল "বনা" হাতী আমাদের হাতীকে মারিতেছে, এ তাহারই শব্দ। এ অবস্থায় কি করা যাইবে ভাবিবার অবসর পাওয়ার আগেই হুড়্‌মুড়্ করিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে—পূর্ব্বে মাহুতগণ ছড়ার মুখে যেখানে ডেরা খাটাইয়াছিল সেইখানে—পোষা হস্তিনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—আর তা'র লেজের উপরেই দন্তযুগল স্থাপন করিয়া আছে একটী সুন্দর জোয়ান হস্তী—তাহার পশ্চাতে অপর একটী অল্প বয়স্ক দন্তী। জংলা হাতীটা আমাদের হস্তিনীকে মারিবার উপক্রম করিয়াছে বোধে যেই (torch) টর্চ্চ হাতীর চোখে ফেলিলাম অমনি সে একটু পিছাইয়া গেল এবং দুইটা ফাঁকা আওয়াজ (Blank shot) করায় পশ্চাতের হস্তীটি সশব্দে পলায়ন করিল। কিন্তু অপর হস্তীটি বন্দুকের আওয়াজ গ্রাহ্য না করিয়া আমাদের হস্তিনীটার সঙ্গে আসিয়া নদীর ভিতর উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইল। ইতিপূর্ব্বেই কখন চাঁদ আকাশে উঠিয়াছে লক্ষ্য করি নাই। চন্দ্রালোকে শুভ্রদন্ত, প্রকাণ্ড, সুঠাম, বলদৃপ্ত হস্তীপ্রবর ও তাহার পার্শ্বে হস্তিনীকে দেখিয়া যেমন আনন্দ, তেমনই প্রতি মুহূর্ত্তেই কোনও বিপদের আশঙ্কায় প্রাণে এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য জাগিতেছিল। হাতী এভাবে আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া অপর পারে গারোগণ মাদল টীন প্রভৃতির শব্দে



খুঁজিদ্বয়—জুম্মা ও দুর্গা

নিস্তব্ধ রজনী ভীষণ শব্দমুখর করিয়া তুলিল। এদিকে বনে দলের অন্যান্য হাতীগুলি কিছু সময় সম্পূর্ণ স্তব্ধপ্রায় থাকিয়া পুনরায় গাছ ভাঙ্গিয়া সশব্দে উদর পরিতৃপ্তি করিতে আরম্ভ করায় চতুর্দ্দিক একটা অদ্ভুত কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমাদের হস্তিনীটা বন্য হস্তীর সঙ্গ পছন্দ করিতেছিল না; কেমন যেন ভয়ত্রস্ত ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছিল। বলা বাহুল্য বন্য হস্তীর গণ্ডযুগ বাহিয়া মদস্রাব ঝরিয়া পড়িতেছিল। পালিত হস্তীটি লোকালয়ের আশ্রয় নিরাপদ মনে করিয়াই হউক, অথবা সঙ্গিনীর সান্নিধ্য এ অবস্থায় কাম্যবোধেই হউক—ধীরে ধীরে নদীর অপর তীরের দিকে

অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল—কিন্তু গুণ্ডা হাতীটাও কিছুতেই তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ হইতে বিরত হইতেছিল না। অধিকন্তু হস্তিনীটা যাহাতে বেশীদূর যাইতে না পারে সেইজন্য তাহাকে দাঁত ও শুঁড় দিয়া মধ্যে মধ্যে ঠেলিয়া পুনরায় নদীর এই দিকে লইয়া আসিতেছিল। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমরা এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ এই হাতীর মাহুত জোরে একটা কথা বলায় পোষা হাতীটা পাগলের মত দৌড়াইয়া আমাদের তাঁবুর দিকে চলিয়া আসিল। পিছনে পিছনে ভীম বেগে নদী আলোড়িত করিয়া আসিতেছে মত্ত হস্তী! আর অবসর নাই—মাহুতকে সত্বর আগুন জ্বালাইবার আদেশ দিয়া সকলকে নিজ নিজ আশ্রয় স্থলে দাঁড়াইবার জন্য বলিয়া নিজ মনোনীত নিরাপদ জায়গায় যেই দাঁড়াইব—তখন হঠাৎ আমার চটী ফস্‌কাইয়া পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেলাম! আমার হাতের বন্দুক নীচে পড়িয়া গেল! ঠিক এই সময় নীচের দিকে ভীষণ জলের শব্দে বুঝিলাম হস্তীপ্রবর উর্দ্ধশ্বাসে হুড়া দিয়া আমার দিকে আসিতেছে! এবার আর রক্ষা নাই—মজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসমান কুটা গাছটীও সাগ্রহে ধরিতে যায় আমার অবস্থাও তাহাই হইল—পাহাড়ের গায়ে লতা, ঘাস যাহা পাই তাহাই ধরিতে যাই কিন্তু উপ্‌ড়াইয়া যায়! সহসা হাত একটা গাছের মোটা ডালে লাগায় তাহা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিলাম—কপালে ঘাম ছুটিয়াছে—ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে—আর হৃদ্‌স্পন্দনে বুকের ছাতি ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে। এই অবস্থায় গাছ ধরিয়া ঝুলিতেছি—একপায়ে কিন্তু তখনও চটীজুতা রহিয়া গিয়াছে!

এদিকে হাতী ঠিক আমার নীচে দাঁড়াইয়া আছে—ইচ্ছা করিলে অনায়াসে আমাকে শুঁড় দিয়া পা ধরিয়া নীচে টানিয়া এ যাত্রার মত পৃথিবীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিতে পারিত। প্রায় শ্বাসরোধ করিয়া আছি—এদিকে সঙ্গিগণ আমাকে না দেখিয়া ব্যস্ততার সহিত খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি হাতীর ভয়ে কোন সাড়াও দিতে পারিতেছি না। আগুনের ভয়ে পোষা হাতীটা যেই নদীতে নামিয়াছে, বন্য হস্তীও দৌড়াইয়া তাহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল—আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সঙ্গিদিগকে ডাকিয়া আমাকে এই দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার করিতে বলিলাম। অনেক চেষ্টায় তাহারা আমাকে টানাটানি করিয়া তুলিবার পর—দলপতির এবম্বিধ দুরবস্থা দর্শনে সকলেই যথেচ্ছ হাসিয়া লইল; আমাকেও এই সঙ্গে যোগদান করিয়া কাষ্ঠ হাসিতে Sportsman spirit বহাল রাখিতে হইল। কিন্তু দেখিলাম শরীরের অনেক স্থানই ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে—কাপড় ও জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।



গংসেন মাষ্টার ও তাহার স্ত্রী মাচাংএর সম্মুখে দাঁড়াইয়া

এদিকে রজনীযোগে অনেক সময় গারোগণ নৌকায় যাতায়াত করে—সময় সময় বন্দুক লইয়াও চলা ফেরা করিয়া থাকে। সুতরাং বন্য হস্তী ভ্রমে ইহারা পোষা হাতীকে গুলি না করে, আবার লোকজন পোষা হাতী ভ্রমে বন্য হস্তীর সম্মুখে আসিয়া না বিপদগ্রস্ত হয়—সেই জন্য

সঙ্গীয় গারোগণ ক্রমান্বয় গারো ভাষায় চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—জংলা এবং পোষা দুই হাতীই আছে, কেহ যেন এ পথে না আসে।

রাত্রি প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত এইভাবে হস্তীর লীলা দেখিতে দেখিতে আমরা প্রায় অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছি—সমস্ত দিনও পরিশ্রম ও উত্তেজনার আতিশয্যে পরিপূর্ণ ছিল—সুতরাং এখন রোমাঞ্চকর ঘটনার বাহুল্য হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা দেখাই স্থির করিলাম। সুতরাং এখন বন্য হস্তীকে যে কোনও উপায়েই হউক তাড়াইতে হইবে। এইবার হস্তীর শরীরের অতি নিকটেই একটা Rocket cartridge আওয়াজ করিলাম। হাতে হাতে ফল ফলিল—কোথায় গেল হাতীর মদমত্ত অবস্থা, আর কোথায় গেল তাহার বলদৃপ্ত ভাব।

চীৎকার করিয়া শুঁড় গুটাইয়া হাতী দৌড়াইয়া পলায়ন করিল! আবার একটা "হাওই cartridge" আওয়াজ করায় দ্বিগুণ ভয়ে হাতী কোথায় অন্তর্ধান করিল! পোষা হস্তিনীও রক্ষা পাইল। সে প্রাণপণ দ্রুতগতিতে অপর পারে যাইয়া সঙ্গিনীর সহিত বাকি রাত্রি কাটাইয়া দিল!

শিকার করিতে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া হাতী দেখিয়া এভাবে আমোদে রাত্রি কাটান আর কখনও ঘটে নাই। সেবারের শিকার



হাতীগুলিকে পাহাড়ে যাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে

যাত্রা একাধিক কারণে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

উদ্বোধন

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

নাই যা আমাতে তাই তুমি দেখ চোখে
অথবা যা দেখ সে শুধু তোমারি আলো,
বিজলী দীপের শিখাটিরে যেন জ্বালো
আতপদৃপ্ত শিখার শুভ্রালোকে।

সাগরে জোয়ার উদ্বেল উচ্ছ্বাসে
ওঠে জাগি যবে গম্ভীর কলতানে,
চাঁদের জোছনা তাহারে যে টেনে আনে
পূর্ণিমা রাতে উর্ম্মিল উল্লাসে!

এ আলো বাতাস জলতরঙ্গ রাজি
ফুটিত না কভু তুমি না আসিতে যদি;
সে কুসুমে আজি ভরি লয়ে যাও সাজি
রহিত তাহারা অস্ফুট নিরবধি।
পুষ্প জনমে এনেছ তাদেরে তুমি
শীর্ণ শাখীর শব-কঙ্কাল চুমি।

কবে তুমি আসবে

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী এম-এ

(১৭)

যখন সকলেই বুঝিতে পারিল রমার পিতার জীবনের আশা আর নাই—তিনি নিজেও কতকটা অনুমান করিয়া লইলেন—তখন বৃদ্ধ একান্তে কন্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন "মা, আমার সময় হয় তো হয়ে এসেছে, কিন্তু যেখানে যাচ্ছি সেখানের ভাবনার চাইতে তোর ভাবনাটা আমার বড় হয়ে উঠেছে। তুই দুষ্টুমী করে বল্‌তিস 'আমায় যখন ছেড়ে যাবে মজাটা বুঝবে' সেটা যে এতদূর সত্য হবে তা' কোনো দিন বুঝি নি।"

"তোমার আগে আমি মরব এত বড় স্বার্থপর ইচ্ছা আমি কোনোদিন করি নি; কিন্তু বাবা—আজ ভেবে পাচ্ছি না, তোমায় ছেড়ে আমি কি করে থাকব, কি করে বাঁচব। আমার কি গতি হবে সে চিন্তা করে তুমি দুঃখ পেও না বাবা, তুমি তো ভগবান্‌কে এত ভালোবাস—তাঁরই হাতে আমায় দিয়ে যাও না কেন? তাঁতে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে আমার জন্য তোমার আর কোন ভাবনা আস্‌বে না।" রমার চোখ বার বার ছাপিয়া আসা অশ্রু মুছিতে মুছিতে লাল ও স্ফীত হইয়াছিল।

"ভগবান্‌কে বিশ্বাস যদি করি বল্লে মা! তিনিই জানেন তা করি কি না, কিন্তু তবু যে মা মন মানে না। মন মানে না—মানে না—এ দুর্ব্বলতা তিনি ক্ষমা করুন। কিন্তু আমার উপায়ই বা কি? তাঁর উপরে তোর জন্য নির্ভর করা ছাড়া আর আমার উপায়ই বা কি? এ বাড়ীখানা ছাড়া আর তো আপনার বল্‌তে আমার কিছুই নেই। তোর মা'র দু' চারখানা গয়না আছে মা তা—"

রমা বাধা দিয়া কহিল, "বাবা, এসময় তুমি আবার ঐ সব ছাই-পাঁশ ভাব্‌ছ?"

"না—না মা, ভাবব না—ভাবব না। আমার মায়ের কথা আমি চিরকাল শুনে এলাম, আর যাবার বেলা আজ শুন্‌ব না? শুন্‌ব বৈকি? কিন্তু বুঝ্‌লি মা—এখানে কোনো দরকার হলে ডাক্তার বোরকার আছেন, রামলিঙ্গম্ আছেন, এঁরা তোর খুব সাহায্য করবেন। বিশেষ ঠেকলে অপরেশের কাছে তুই তোর দরকারের কথা জানাতে লজ্জা করিস্ নি। অপরেশের সঙ্গে আমি এতটুকুনটি থেকে বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত পড়েছি। তার পুত্রবধূ করার সখ তোকে দিয়ে না মিট্‌লেও, সে তোকে মেয়ের মতোই ভালোবাসবে। আমি তাকে কিছু বলে যেতে পারলাম না, কিন্তু আমি না বল্লেও সে বুঝবে"—

"এই বুঝি তোমার না-ভাবা। তুমি গেলে ভগবান্ আমায় পথ দেখিয়ে দেবেন এ ভরসা আমি রাখি—তুমি এ সময় আমার কোলে মাথা রেখে একটু তাঁর চিন্তাই কর, আমার সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হয় তাঁরই কাছে বল।"—বলিয়া পিতার মাথা অতি সন্তর্পণে কোলে লইয়া বসিয়া কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ শান্ত শিশুর মত চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তাই—তাই ঠিক মা, ভগবানই তোমায় দেখ্‌বেন। আমার চেষ্টার কি মূল্য আছে?"

একটু পরে আবার বলিলেন, "আর একটা কথা মা—বিজয়—বিজয়ের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয়—'যদি' কেন, দেখা হবেই—তখন তাকে বোলো সেদিন আশাভঙ্গে ও অসংস্থিত চিত্তে তাকে মনোকষ্ট দিয়ে বিদায় করেছি বলে আমিও পরে বড় কম কষ্ট পাই নি। সে নাস্তিক হোক চাই না হোক, ভগবানের চোখে সে তুমি আমি সবই যখন সমান, তখন তার প্রতি অকারণ রূঢ় ব্যবহার করবার আমার কি অধিকার আছে?"—

বৃদ্ধ চুপ করিয়া দম লইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই থেকে আমি আর একটা সিদ্ধান্তে এসেছি মা—যে তোমাদের বিবাহে বাধার কিছুই নেই। তোমরা পরস্পরকে চাও এবং যদি মনপ্রাণ দিয়ে চাও, তাই বিবাহ বন্ধনকে সুদৃঢ় করবার জন্য যথেষ্ট। বিবাহ সম্বন্ধে তার ধারণা আমার ভালো লাগে নি—হোক না সে নাস্তিক—কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে চাও আমি তার ঐ অপরাধে তাতে বাধা দিতে পারি না। মা, আমরা মুখে অনেক সময়ে বলি পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করি—কিন্তু বুকে জোর নিয়ে

তদনুযায়ী কাজ করতে পারি না। তুই সেদিন বল্লি, ভগবানে বিশ্বাস আন্‌তে তুই হয়তো তার সাহায্য করতে পারতিস্— তার পরেই আমার মনে হোলো—ভগবানের তাই যে ইচ্ছা নয় কে বল্‌তে পারে? মনে হোলো তাঁতে বিশ্বাস থাক্‌লে বিজয়ের হাতে তোকে দিয়ে যেতে আমার সংশয় হবে কেন? আমি নয় সেদিন তোকে আগ্‌লে রাখলাম, চিরকাল যে পারছি না—তা তো আজই বুঝ্‌তে পারছি। ক্রমে আমার সংশয় কেটে গিয়েছিল মা—ভেবেছিলাম বিজয়ের হাতে আমিই তোকে দিয়ে যাবো—শুধু ক'টা দিন দেরী করছিলাম তোদের মন পরীক্ষা করতে, তোদের এ আকর্ষণের দৃঢ়তা কতটা হয়েছে তাই দেখ্‌তে। তার পর তার বংশ-পরিচয় ও বাড়ী-ঘরের খবর-টবর নিতে একবার ক'লকাতা যাব—এ ও ভাবছিলাম বটে, কিন্তু হঠাৎ তো আমার ডাক পড়্‌ল। কিন্তু যাবার সময় আমি তোদের অনুমতি দিয়ে যাচ্ছি, তোরা মিলিস্। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তিনিই যন্ত্রী, আমরা তো যন্ত্র মাত্র মা।" থামিয়া থামিয়া বলিলেও দুর্ব্বল দেহে এ দীর্ঘ বাক্যস্রোতে তিনি অবসাদগ্রস্ত হইয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া স্তব্ধ হইলেন। পিতা তাহাকে কি গভীর ভাবে ভালোবাসেন এ উপলব্ধি তাহার আজ নূতন নয়—কিন্তু জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তাহারই সুখের জন্য পিতার এ ব্যাকুলতা রমাকে অভিভূত করিয়াছিল হায় রে—কি বস্তু সে আজ হারাইতে চলিয়াছে। যে দুর্ভেদ্য সংযমে নিজেকে ঢাকিয়া সে তাহার বাবার মা হইয়া তাঁহার মাথা কোলে করিয়া লইয়া বসিয়াছিল—সে সংযম এবার টুটিল। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া পিতার বুকের উপর বাষ্পবারিসিক্ত মুখ চাপিয়া ধরিল। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ক্ষীণ দুর্ব্বল বাহুতে তাহার মাথা তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কলেরা রোগীর গায়ে এমনি করে মুখ রাখ্‌তে নেই মা। আজ কতদিন পরে আমি তোর মায়ের কাছে যাচ্ছি—এখন আমায় কেঁদে বিদায় দিবি রমা? আজ তের চৌদ্দ বছর তোদের দুজনার ভাবনা ভেবে এসেছি, আজ স্বর্গে গিয়ে কেবল তোর ভাবনাটা বাকী থাকবে। কাঁদিস্ নে—পাগলি—কাঁদিস্ নে।"

রমা নিঃশব্দে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

* * * *

পিতার মৃত্যুর দুই দিন পরে রমা বিজয়কে পূর্ব্বোক্ত চিঠি দেয়। সে আশা করিয়াছিল পত্র পাঠ বিজয় নিশ্চয় চলিয়া আসিবে। একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন গেল—বিজয় যখন তখনও আসিল না তখন সে ভাবিল বিজয় হয়তো কলিকাতায় নাই, তাই পত্র পায় নাই। বিশেষ কাজে সে আসিতে না পারিলে অন্ততঃ একখানা চিঠিও দিত। এদিকে সে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না। শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করা আবশ্যক—বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহার স্থিতি সম্বন্ধে সঠিক কিছু স্থির করা আবশ্যক। বোরকার ও রামলিঙ্গম্ তাহাদের বাসায় যাইয়া তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু একজন বর্ষীয়সী ঝি রাখিয়া তাঁহাদের সে প্রস্তাব সে ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এ ব্যবস্থা তো আর চিরকালের জন্য হইতে পারে না—তবে পিতার শেষ স্মৃতিমণ্ডিত এ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সে দুদিনের জন্যই বা অন্যত্র যায় কেন? এ দুঃখের সময় বিজয়ের সান্নিধ্য তাহাকে কতকটা শান্তি দিতে পারিত। সে কথা ছাড়া এই সমস্ত বিষয়ে তাহার সহিত একটা পরামর্শ করিতে সে বিশেষ উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিল—কারণ বিজয় যদি তাহাকে বিবাহ করেও, পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে রমা তো তাহাতে রাজী হইতে পারে না। এই সময়টা সে কোথায় কি করিয়া কাহার সহিত কাটাইবে? চক্রধরপুরে ঝি-চাকর লইয়া একা এক বাড়ীতে এক বৎসর কাটান তাহার সুদুঃসহ বোধ হইতেছিল—অন্য কাহারও বাড়ীতে এক বৎসর কাটানো ত' অসম্ভব। আর এক আছে অপরেশবাবুর ভরসা;—তা' রমা নেহাত সর্ব্বশেষ পন্থা বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

তিন দিনের দিনও বিজয় যখন আসিল না বা তাহার পত্র আসিল না—তখন তাহার চিঠি কবে কোথায় বিজয়ের কাছে পৌঁছায় এবং মোটে পৌঁছায় কি না, এ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া রমা কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিতে লাগিল, যে মেয়েদের বোর্ডিংযুক্ত কোনো স্কুলে সে একটা চাকুরী পায় কি না। তাহা হইলে তাহার স্থিতি-সমস্যার কতকটা সমাধান হয়—মেয়েদের লইয়া কাজকর্ম্মে থাকিলে মনটাও ব্যাপৃত থাকিবে, ঝি-চাকরের বোঝাও তাহাকে বহিতে

হইবে না। ঠাকুরকে তো তুলিয়াই দিয়াছিল—কিন্তু বৈজুকে ছাড়িতে তাহার প্রাণ চাহিতেছিল না—সে তাহার বাবার চিহ্ন ;—তা ছাড়া বৈজুও তাহার দিদিমণিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে কল্পনায় ইহারই মধ্যে একদিন কাঁদিয়া ভাসাইয়াছে। তবে বৈজু কিছুদিনের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী যাইতে পারে—পরে চক্রধরপুরের বাড়ীর পাহারাদার হইতে পারে—রমা নিজে স্কুলের ছুটীতে ছুটীতে তো এখানেই আসিবে। আর ছুটীর সময় যদি বাড়ীতে ভাড়াটিয়া থাকে—রমা ভ্রমণ-সুখে যেখানেই থাকিবে, সেও নয় ছুটীর কয়দিন সেইখানেই কাটাইয়া আসিবে। এমন বিশ্বাসী লোক সহজে মেলে না।

পিতার মৃত্যুর সাত আট দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় সে হলের মধ্যে বসিয়া এম্‌নি সব সাত পাঁচ কথা ভাবিতেছিল—এমন সময় বাড়ীর দরোজায় একখানি গাড়ী আসিল। রমা ঔৎসুক্যভরে লক্ষ্য করিয়া দেখিল গাড়ী হইতে নামিয়া একটী ভদ্রমহিলা সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছেন। পরণে তাহার লালপেড়ে শাড়ী—নেহাত আটপৌরে, গায়ে একটা মোটা ব্লাউস, চুল যেমন তেমন করিয়া বাঁধা, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে তু' তু' গাছি সোনার রুলীর উপর একখানা করিয়া সাদা শাঁখা। মহিলাটি নিকটস্থ হইলে রমার সে মুখখানি অত্যন্ত পরিচিত মনে হইতেছিল। ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সে মহিলাটী প্রশ্ন করিলেন "আপনার নামই রমা দেবী ?" বিদ্যুৎ-বরণী মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিতে গিয়া হঠাৎ রমার মনে পড়িয়া গেল—সেই যে বিজয়ের কাছে যে একখানা ছবি সে দেখিয়াছিল সে প্রতিকৃতি ইঁহারই। মনে হইবামাত্রই সহস্র প্রশ্ন তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি একাকিনী কেন হঠাৎ এভাবে এখানে আসিলেন ?—তবে কি বিজয় অসুস্থ ?—তবে কি বিজয় কলিকাতায় নাই ? তবে কি বিজয় তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং ভগ্নীকে পাঠাইয়া দিয়াছে ?—না এ মেয়েটি আরেক রকম দুর্লঙ্ঘ্য-বাধার সৃষ্টি করিতে এখানে আসিল ? না তাহার প্রতি তিরস্কার —সংশয়াকুল চিত্তে সে বলিল "আমার যদি নেহাত ভুল না হয়ে থাকে আপনি বোধ হয় বিজয়বাবুর বোন্ ?—আপনাকে যে আমি চিনি।" বলিয়া মৃদু হাসিয়া মহিলাটির পানে হাত বাড়াইয়া তাহাকে সাদরে সাম্‌নের চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিল।

যেন শিহরিয়া তু' পা পিছাইয়া তরুবালা কহিল—"কি বল্লেন ?—আমি বিজয়বাবুর কে ?"

"কেন বোন্ ? আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত না হলেও আপনার ছবির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি আমি অনেক দিন। কিন্তু ছবির আপনি এত রোগা ছিলেন না তো।"

নিপুণ তুলিকা স্পর্শে অভিনেত্রীর রূপে ক্লিষ্টতার ছাপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মায়—চোখের কোলের কালিটুকু পর্য্যন্ত। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তার কারসাজি ধরা পড়িবার জো ছিল না।

তুই চক্ষু কপালে তুলিয়া তরুবালা কহিল, "আমি বিজয়—বিজয়বাবুর বোন্ ?"

তাহার ভাবে একটু বিস্মিত হইয়া রমা কহিল "ছবিতে আপনার সাজসজ্জা অবশ্য খুব জমকালো ছিল, কিন্তু এত ভুল আমার চোখের হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আপনার মুখের মতো মুখ সহজে ভোলা চলে না ! কিন্তু আপনি এমন কচ্ছেন কেন ? বিজয়বাবু ভালো আছেন তো ?"

কপালে করাঘাত করিয়া তরুবালা কহিল, "হায় রে আমার অদৃষ্ট—এই ক'রেই সে আপনাকে জড়িয়েছে। কিন্তু এর আগে আমার মরণ হোলো না কেন ?—স্বামী—আমার ইহপরকালের দেবতা, তার এ শোচনীয় অধঃপতনের আগে আমি চিতায় উঠলাম না কেন ? আজ পরের কাছে আমি কি করে এ লজ্জা ঢাকব ?"

রমা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে শুধু বলিতে পারিল —"বিজয়—বিজয়বাবু আপনার স্বামী ?" তাহার মনে হইতেছিল, হয় তো রমণী উন্মাদ !

উত্তরে তরুবালা কাঁপিতে কাঁপিতে রমার জানু তুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাহাতে মুখ লুকাইয়া মাটীতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল,—"সে লজ্জার কথা কি করে আপনাকে বল্‌ব রমা দেবী ?—কিন্তু—কিন্তু আপনার কাছে আজ আমি স্বামী-ভিক্ষা চাইতে এসেছি—আপনাকে সবই বল্‌তে আমার হবে। তিন বছর আগে—তখন আমি মুক্ত হাওয়ায় প্রজাপতির মতো আপনার আনন্দে আপনি

ঘুরে বেড়াতাম—তখন বিজয়বাবু হাস্যে লাস্যে ঐ ভুবনমোহন রূপ নিয়ে আমার সাম্‌নে এসে আমার সর্বনাশ করেন। বাবার ভয়ে শেষে আমায় বিয়ে করতেও বাধ্য হন। কিন্তু আমার ভাঙা কপাল বাবা জোড়া দেবেন কি করে?—বড়লোক—দু'লাখ টাকার উপর সম্পত্তি—খেয়াল ছুটতে তাঁর বাধা কি?—আমি ঘরকরণার দাসী হলাম। তবু আমি তো আশা ছাড়তে পারি নি, তাকে একদিন আবার পাবো—আমার ভালোবাসার টানে বাইরের এসব বাঁধন একদিন ছিঁড়ে যাবে। ওঁকে একবার পেয়ে তাঁকে হারানো যে কি শক্ত তা আপনি হয় তো বুঝ্‌বেন না—" উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। রমার এতক্ষণ মনে হইতেছিল—ইহার কথাগুলি তো ঠিক পাগলের মতো শুনাইতেছে না। তবে তবে—কি—··· বিশ্বসংসার তাহার চক্ষে কালোয় কালোয় একাকার হইয়া গেল। সে কি বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু কম্পিত ওষ্ঠ একটু অস্ফুট শব্দ ছাড়া আর কিছু বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। তরুবালা একটু যেন সাম্‌লাইয়া আবার কহিতে আরম্ভ করিল—"কিন্তু এ চিঠিখানা তাঁর নেহাত সাবধানতা সত্বেও আমার হাতে এসে পড়াতে বুঝ্‌তে পারছি আমার কপাল জোড়া লাগবার নয়। আপনার সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্ত্তা এতদূর এগিয়ে গেছে, অথচ—অথচ হতভাগী আমি তার বিন্দুবিসর্গ জান্‌তে পারি নি।—আর হরি হরি—আপনি জানেন আমি তার 'ভগ্নী'। এ মুখ কি করে আমি মানুষের সমাজে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াই—আমার অহর্নিশি যে পোড়ানি—আপনি কি তার' অংশীদার হতে এ পাপের সংসারে আস্‌তে চান্?—একদিন তাকে ফিরে পাবার আমার ক্ষীণ আশাটুকুও কি আপনি কেড়ে নেবেন? আপনি হয়তো আশ্চর্য্য হচ্ছেন, ব্যাভিচারী স্বামী যদি পত্ন্যন্তর গ্রহণান্তে নিয়ন্ত্রিত-চরিত্র হয় তাতে আমার এত আপত্তি কেন—কিন্তু চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের এ অছিলায় নারীজাতির উপরে একটা কত বড় অপমান—কত বড় জুলুমের প্রশ্রয় দেওয়া হয়—তা কি আপনি বুঝবেন না? আপনি তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন—কিন্তু তখন তো আপনি সব কথা জানতেন না। তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এত বড় অন্যায় কি আপনি হতে দেবেন? আমায় ভিক্ষা দিন, ভিক্ষা দিন—আমি আশায় আশায় যে আকাশ-কুসুম রচনা করেছি তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন না"—বলিয়া সে রমার পায়ের উপর মুখ থুবড়িয়া পড়িল। এতক্ষণে রমার বুকের মধ্যে লজ্জা ঘৃণা ক্রোধের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—বিচারবোধও কতকটা ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে দুই হাতে তরুবালাকে টানিয়া তুলিয়া পাশের চেয়ারটাতে বসাইয়া স্থিরকণ্ঠে কহিল "আপনার কথা যে সত্য তার প্রমাণ?"

তরু দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"প্রমাণ? প্রমাণ আমার কথায়, আমার শাঁখায়, সিন্দূরে—এই আপনার লেখা পত্রে—এই আমার আংটিতে—এই বুকের লকেটে—"

রমা একটু অপ্রস্তুত হইল। সত্যই তো একজন ভদ্র-মহিলা একথা যথার্থ না হইলে এমন করিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া আসিবে কেন? তা' ছাড়া আংটিতে বিজয়ের নাম খোদা—লকেটে বিজয়ের ফটো—তবু অবিশ্বাস?—কিন্তু সে বিশ্বাস করে কি করিয়া—সেই দৃষ্টি, সেই ব্যাকুলতা, সেই আত্মদান—কি করিয়া তাহাতে ছলনা থাকিতে পারে?

রমা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"আপনি বল্‌ছিলেন বিজয়বাবু দু'লাখ টাকার উপর সম্পত্তির মালিক—কথাটা কি ঠিক?"

"ঠিক? আপনারা এখানে তার কথা না জান্‌তে পারেন—কিন্তু ক'লকাতায় খোলামকুচির মতো পয়সা ছড়াতে তার মতো ক'জনে পারে জানি নে। তার বাবা ৺প্রকাশ দত্ত মহাশয় যা সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন তা অনেকখানি উড়িয়ে দিলেও যা আছে তা' দুলাখ টাকার সম্পত্তির ওপরে হবে বৈ কি!—এই পয়সা—পয়সাই তো আমার কাল হোলো—এ আপদ না থাকলে হয়তো আমি তাকে হারাতাম না"—বলিয়া অঞ্চলের কোণায় আবার সে চক্ষু মুছিল।

রমার মনে পড়িল তাহার বাবা প্রকাশ দত্তকে জানিতেন—তার ছেলে বিজয় দত্তের খবরও অল্পবিস্তর জানিতেন। কিন্তু বিজয় আত্মগোপন করিয়াছে—সে এত বড় ধনী এ কথা তাহাদের নিকট গোপন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? শুদ্ধ তাহাকে ঠকাইবার জন্যই কি? তাহার উপর সে বিবাহিত! হায় ভগবান্—আকাশ হইতে একটা

বাজ ফেলিয়া ইহার আগে রমাকে পুড়াইয়া মারিলে না কেন? সে আগুনের জ্বালা যে ইহার কাছে চন্দনের প্রলেপ হইত!······কিন্তু সেই রুদ্ধ কণ্ঠ, বদ্ধ দৃষ্টি, সর্ব্বস্ব বিলাইয়া রিক্ত হইয়া পাইবার উগ্র আগ্রহ— এগুলি কি এতই ফাঁকি হইতে পারে—সে কি এতই বোকা—কাঁচকে সে হীরা বলিয়াই তুলিয়া লইল? মেকির ফাঁকিতে এতই মূর্খের মত যাইল?······

রমাকে স্তব্ধ দেখিয়া তরুবালা কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া আবার তাহার পা ধরিতে যাইতেছিল;—এবার তাহাকে দুই হাত দিয়া বাধা দিয়া রমা কহিল "আপনি ছেলেমানুষী করবেন না। আমাদের বিয়ে আর হতে পারে না, একথা বলাও বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। আমি বড্ড শ্রান্ত বোধ কচ্ছি—এখন বিদায় নিতে চাই। ঝিকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি—আপনার যা দরকার সব কাজ করবে। আপনারা যে ট্রেণে খুসী ফিরবেন- আর যাবার আগে একবার দেখা করে যেতে ভুলবেন না।"

রমা অগ্রসর হইতেছিল—তরু তাহাকে হাত বাড়াইয়া বাধা দিয়া কহিল "আমি রাত-প্যাসেঞ্জারেই কলকাতা ফিরব, কাজেই এক্ষুণি যেতে হচ্ছে। রাস্তায় গাড়ীতে আমার ঝি রয়েছে—আপনার কোনো কষ্ট করবার দরকার নাই"—তারপর রমার হাত দুখানি নিজের মুঠায় তুলিয়া লইয়া কহিল—"তুমি আমায় যতই বেহায়া মনে করে থাক বোন্, কিন্তু যা তুমি আজ আমায় ফিরিয়ে দিলে এর জন্য ভগবান তোমার ভালো করবেন - আর আমি তোমার পায়ে বিকিয়ে রইলাম যদিও আমার মতো নগণ্য মেয়ে-মানুষের মূল্য তোমার কাছে কিছুই নয়" বলিয়া রমাকে একবার আলিঙ্গন করিল। রমা সসঙ্কোচে নিজেকে মুক্ত করিয়া কহিল, "আপনি তাহলে এক্ষুণি যাচ্ছেন? আচ্ছা নমস্কার। কৃতজ্ঞ আমিও আপনার কাছে অনেকখানি—নইলে আমার পরিণামে কি হোতো ভাবতেও আমি শিউরে উঠ্‌ছি। যাক্—আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না কে জানে?—আপনার নামটা জানতে একটু কৌতূহল হয়ে থাকলে তা মাপ করবেন কি?" স্মিতমুখে তরু মুখ তুলিয়া কহিল, "তুমি আমার বুকের যতখানি জায়গা জুড়েছ বোন্, তাতে মাপ টাপ করবার কথা তুল্লে আমি মনে বেদনা পাই—তাছাড়া এ তো অতি তুচ্ছ কথা। আমার নাম তরুবালা।" কথাটা কহিয়া ফেলিয়াই সে মনে মনে একটু চমকিয়া উঠিল—সত্য নামটা বলিয়া ফেলা এক্ষেত্রে উচিত হইল কিনা! বিজয়ের সহিত সাক্ষাতে যদি সব ধরা পড়িয়া যায়! পরক্ষণেই তরুবালা আবার কহিল "তাহলে আসি বোন্! আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরলাম। তুমি একখানা চিঠি লিখে দিও যে তুমি সব জেনেছ—কিন্তু বুঝ্‌তেই পারছ আমার প্রসঙ্গটা তাতে না থাকাই বোধ হয় ভালো হবে।"

কথাটা শুনিয়া রমার এত দুঃখেও হাসি পাইল। সে কহিল "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনি সর্ব্বথা নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন। আমি তাঁর সঙ্গে আর দেখা পর্য্যন্ত করব না। নমস্কার।"

তরু মানুষ চিনিত। সে বুঝিল সত্যই রমা বিজয়ের সহিত আর দেখাও করিবে না। সেও রমাকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তরু বাহির হইয়া গেলে রমা মুহ্যমান হইয়া সাম্নের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িল। ভগবান্ তাহার কপালে কি শেষে এত দুঃখই লিখিয়াছিলেন? তরুবালা নামটা শুনিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল সেইদিন পাহাড় উৎরাইতে অচেতন অবস্থায় বিজয় 'তরুবালার' নাম উচ্চারণ করিয়াছিল। তখন সে সে কথায় মনোযোগ দেয় নাই। আজ বুঝিল তাহার মানে কি?

আর ইহাকেই কিছুদিন পূর্ব্বে রমা যাচিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। ঘৃণায় ক্ষোভে অপমানে তাহার চিত্ত জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। এতদিন যেমন সে আশা করিতেছিল, যদি আজ বিজয় আসে, যদি আজ, যদি আজ···। এখন তার তেমনই ভয় হইতে লাগল—যদি আজ বিজয় আসিয়া পড়ে, যদি কাল—যদি পর্শু—! স্থির করিল আর চক্রধরপুরে থাকা নয় পলাইতেই হইবে।

কিন্তু চাকরী তো জুটিল না। জুটুক বলিলেই ও জিনিসটা সহজে জোটেও না। তাই সে এলাহাবাদে অপরেশবাবুকে তার করিয়া দিল, কালই সে এলাহাবাদে তাঁহার ওখানে রওনা হইতেছে। পিতার মৃত্যু সংবাদ সে অবশ্য পূর্ব্বেই দিয়াছিল এবং তিনিও আগ্রহ করিয়া রমাকে পূর্ব্বেই তাঁহার বাড়ীতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ইহা পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সাময়িক অসুস্থতা-

নিবন্ধন তিনি অবশ্য আসিতে পারিবেন না, কিন্তু রমার আসবার সঙ্গতি না থাকিলে তিনি তাঁহার ছেলে যতীশকে পাঠাইয়া দিবেন। যতীশও সম্প্রতি রিসার্চএর কাযের জন্য লক্ষ্ণৌ গিয়াছে, নয়তো ইতঃপূর্বেই সে রওনা হইয়া আসিত।

পরদিন ভোরবেলা রমা বৈজুকে লইয়া এলাহাবাদ যাত্রার উপযোগী বাঁধাছাঁদার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ যতীশ আসিয়া উপস্থিত। শ্যামবর্ণ চার হাত লম্বা, আধ ময়লা খদ্দরের জামা কাপড়ে মোড়া ভদ্রলোকটি একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে সোজা বাড়ীর বারান্দায় উঠিল; রমাকে সামনে পাইয়াই সে জিজ্ঞাসা করিল "আপনিই বোধ হয় রমা দেবী?"—তখন রমা যেমন আশ্চর্য্য তেমন বিরক্ত হইয়াছিল।—অদ্ভুত ইহার আচরণ, ভদ্রতা জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই, একটা নমস্কার পর্য্যন্ত এ করিল না! রমা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনার কি চাই?"

"আমার নাম যতীশ, এলাহাবাদের অপরেশবাবুর ওখান থেকে আসছি।"

রমার চোখে একটু বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল—সে বলিল "ও:" -তারপর বৈজুকে ডাকিয়া একখানা চেয়ার দিতে বলিল।

ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যতীশ কহিল—"আপনি দেখ্‌চি প্যাক কচ্চেন, কোথাও যাওয়া আমি পৌছুবার আগেই স্থির করে ফেলেচেন নাকি? বাবা বল্‌ছিলেন—"

কথা শেষ না হইতেই রমা বলিল—"আমি এলাহাবাদই তো আজ রওনা হব ভাবছিলুম। কাল আপনার বাবাকে তার করে দিয়েছি।"

এমন সময় ঝি রমার প্রাতঃকালিক চা লইয়া আসিল। ছোট্ট টিপয়ের ওপর পেয়ালাটা যতীশের পানে ঠেলিয়া রমা শুধু বলিল "খান—"।

"আচ্ছা, কাল রাত জেগেচি এক পেয়ালা খাওয়া যাক —শরীরটা সত্যিই একটু চাঙ্গা হয় কিনা দেখি।"

ইতোমধ্যে রমারও চা আসিল, কিন্তু তার পূর্বেই স'সারে ঢালিয়া যতীশ খাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রমা অবাক হইয়া লোকটির ধরণধারণ দেখিতে লাগিল।

চা'য়ের পেয়ালা যতীশের অর্দ্ধেক খালি হইয়াছে এমন সময় সে দেখিল, বৈজু বারান্দার এক কোণায় একটা প্রকাণ্ড বিছানা বাঁধিবার চেষ্টায় হিমসিম খাইয়া গেল, কিছুতেই বাণ্ডিলটা আঁট হইতেছে না। পেয়ালা রাখিয়া যতীশ নিঃশব্দে যাইয়া বৈজুর সাহায্যে লাগিয়া গেল। ঢিলা হাতার জামাটায় কাযে অসুবিধা হইতেছিল। ধাঁ করিয়া সেটা খুলিয়া চেয়ারের উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া যতীশ উঁচু হইয়া দড়ি কষিতে লাগিল। এবার রমা সত্যই একটু বিরক্ত বোধ করিল। তরুণী ভদ্রমহিলা সে, তাহারই সাম্‌নে হঠাৎ একজন নবাগত পুরুষ নগ্নগাত্র হইয়া গেল, তাহার অবস্থিতিতে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, ইহাতে তাহার সহজ সমীহবোধ আঘাত পাইতেছিল। অন্দরের দিকে ত্রাস্তে চ'লয়া যাইতে যাইতে তাহার ডাক্তারী চক্ষে কিন্তু সে ঐ লোকটির সুগঠিত অপূর্ব স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল দেহখানির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। কালো পাথরে অ্যাপোলোর মূর্ত্তি কুঁদিয়া তোলা হইলে যা হয়, এ যেন ঠিক তাই এমনি তাহার প্রত্যেক মাংসপেশী ও সমস্ত অবয়বের সুসামঞ্জস্য।—তফাৎ শুধু এই যে লোকটির সমস্তখানি বুক চুলে ঢাকা।

রমা রান্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভাবিতে লাগিল—আশ্চর্য্য এই জংলী মানুষটি। এ এম্-এ পাশ করিয়াছে কেন—লেখাপড়া যে শিখিয়াছে ইহাই বিশ্বাস হইতে চায় না। ইহারই সঙ্গে নাকি বাবা তাহার বিবাহের কল্পনা করিতেছিলেন!—বিজয়ের সঙ্গে এই লোকটির কখনো তুলনা চলে?

তারপর এই লোকটি তাহার পিতা অপরেশবাবুর ইচ্ছার কথা কি জানে না? জানিলে কি সে তাহার সামনে একটু জড়িমা, একটু সঙ্কোচও বোধ করিত না? মহিলা সমাজে লোকটা যে মেশে নাই ইহাতো সুনিশ্চিত এবং অন্ততঃ সেইজন্যও তো রমার সমক্ষে ইহার একটু সঙ্কোচ বোধ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।—কি জানি এ কি ধরণের মানুষ!

(ক্রমশঃ)



কুড়ানো চিঠি

শ্রীভবেশ্বর ভট্টশালী

রায়েদের বৈঠকখানা। সন্ধ্যার সঙ্গেই পাড়ার যত যুবক আসিয়া জোটে এখানে। চায়ের সঙ্গে অনেক কিছুই চলে এখানে। গ্রাম-হিতৈষণা, রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া পরনিন্দা পরচর্চ্চা সবই চলে। সেদিন আকাশে মেঘ উঠিয়াছে। টিপ্-টিপ্ বৃষ্টিও পড়িতেছে। ব্রিজ খেলা সবে আরম্ভ হইয়াছে, আর সুধীনের বৌ-এর হাতের তৈয়ারী টাট্‌কা ফুলকপির কচুরী ও কড়াইশুটি ভাজা চলিতেছে এমন সময়ে 'মাতুল' আসিয়া উপস্থিত। অমনি সুধীন কহিল, মাতুল যে, কোত্থেকে? আমরা ভাব্‌লুম বুঝি মাতুল আমাদের একেবারেই ফাঁকি দিলেন। তার পর!—অনেক কষ্টে আপনার আখ্‌ড়া তো আমরা জিইয়ে রেখেছি, তবে সে তুলসী তলার পিদিমের মতো মিটি-মিটি জ্বল্‌ছে।

মাতুল সুধীনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, সাবাস্ বাবা! সাবাস! এই তো চাই!

সুরেশ মাতুলের খুব কাছে যাইয়া কহিল, মাতুলের কাছে আমার একটা গোপন কথা ছিল।

মাতুল হো হো রবে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, বয়স বাড়লেও সুরেশ কিন্তু আমাদের সেই সুরেশই আছে! তারপর সুরেশকে বলিল, বেশ! কিন্তু বাপু তোমার আমার সঙ্গে এমন কি গোপন কথা থাকতে পারে! ছোটবেলা থেকে সুনামই বল, আর বদনামই বল আমার একটা নাম ছিল; আমি নাকি ইঁচড়ে-পাকা ছিলুম—আর সেই বয়েস থেকে জানতুম—গোপন কথাটা নব-বধূর সঙ্গেই হয়, আর হয় গুপ্তপ্রণয়ী প্রণয়িনীর। আচ্ছা বাপু, তুমি যখন আমার সঙ্গে গোপন কথা বলবেই—তা' এই কাণ পাত্‌ছি, এবার বলে ফেলো তো বাপধন তোমার গোপন কথাটি! সুরেশ মাতুলের কাণের কাছে মুখ লইয়া কহিল, একটা নতুন গল্প।

সুরেশের গোপন কথা শেষ হইতেই রাজু বলিয়া উঠিল, মাতুল! আমি কিন্তু বল্‌তে পারি সুরেশ আপনার নিকট গোপনে কি বল্‌ল। একটা গল্পের জন্য বলে নি মাতুল?

মাতুল বিস্ময়ের স্বরে কহিল, তাই তো সবটাই তো তুমি বলে ফেললে! তুমি আজকাল জ্যোতিষ শিখ্‌ছ নাকি, না 'সরস্বতী বা শনিকবচ' একটা নিয়েছ?

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, রাজু সরস্বতী কবচই নিক্ আর শনি কবচই নিক্, তাতে আমাদের কিছু নেই। সুরেশের গোপন কথাটা যদি রাজুর অনুমান অনুযায়ীই হয়, তাহলে আমরাও সুরেশের আবেদনটাকে সমর্থন করি এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে রাজুর জ্যোতিষ বিদ্যাকে স্বীকার করে নিতেও স্বীকৃত। আজ আপনার শুভাগমনের পরে আর শুক্‌নো খড় চিবানোর মতো ব্রিজ ভাল হবে না। আপনার নতুন যা' production আছে তাই শুন্‌তে চাই।

মাতুলের একটা পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন পাঠকদের কাছে। মাতুলের বয়স যে কত তাহা এই রায়গ্রামের কেহই বলিতে পারে না। যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই বলিবে, তা' মাতুলকে তো আমি জন্মাবধিই এইরূপই দেখ্‌ছি। শুনেছি আমাদের ঠাকুরদাদার আমলেও নাকি তাঁহার ঠিক ঐ এক চেহারাই ছিল। মাতুলের বয়সও যেমন কেউ বলিতে পারে না, ঠিক ঐ রকম তাহার বাড়ী কোথায় এবং তাহার নামই বা কি তাহাও কেহ বলিতে পারে না। গ্রাম ভরিয়া বালক-বৃদ্ধ সবারই সে মাতুল। রায়েদের বৈঠকখানায় যে আখ্‌ড়া—উহার স্থাপয়িতা মাতুলই। রায়েদের পূর্ব্বপুরুষের কাহার যুবক বয়সে স্ত্রী মারা গেলে সে যখন পাগলের মতো হইয়া যায় তখন মাতুল তাহার পশ্চাতে লাগিয়া এই আখ্‌ড়া স্থাপন করেন এবং তাহাকে আবার গৃহী করেন। সেই হইতে এই আখ্‌ড়ায় মাতুল তাহার একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়া আছেন। আখড়ার যাহারা সদস্য তাহারা অধিকাংশই মৃতদার যুবক, আর বাকী যারা তারা প্রায়ই অবিবাহিত নিষ্কর্ম্মা বেকার গ্রাম্যযুবক। মাতুলের এই আখ্‌ড়ায় কাজ, নিত্য নূতন গল্প বলিয়া রসপিপাসু যুবকগণের রস-পিপাসা আরো বর্দ্ধিত করা।

মাতুল সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কহিলেন, আজ গল্প না বলে তোমাদের একটি চিঠি পড়ে' শোনাব। গল্প শুনে তোমরা যা' আনন্দ পাও এই চিঠিখানি শুনে তার চাইতে বেশি বই কম আনন্দ পাবে না। চিঠিটা আমি পেয়েছি কুড়িয়ে। জায়গায় জায়গায় পোকায় কাটলেও লেখা সবই বোঝা যায়। শোন তবে,—

.. কি লিখ্‌চি, কা'কে লিখ্‌চি এবং কেন লিখ্‌চি—এর কৈফিয়ৎটা প্রথমেই দেওয়া আমার কর্ত্তব্য; তাই পর পর প্রশ্ন তিনটার উত্তর লিখ্‌তে চেষ্টা করছি। লিখ্‌চি একখানা চিঠি। সম্বোধনের স্থানটা শূন্য, কারণ যাকে উদ্দেশ করে' আমার এই চিঠি লেখা তাকে আমার মন 'প্রিয়া' সম্বোধন করতে চাইলেও করতে পারি নি। সম্বোধন করবারও একটা অধিকার চাই। আমার দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সে অধিকার আমার আছে; কারণ ঐ অধিকার দাবী করতে হ'লে নিজেকে যেখানে নিতে হয়, নিজেকে যতটুকু বিলিয়ে দিতে হয় তা' করতে বোধ হয় মোটেই কার্পণ্য করিনি। বলবে তবে সম্বোধনে বাধা কিসের? যাকে সম্বোধন করব তারও তো একটা অনুমতি প্রয়োজন। তার অনুমতির প্রয়োজন নেই আমার অন্তরে, যেখানে আমি তাকে আমার যা' সম্বোধন করতে ইচ্ছে হয় তাই সম্বোধন করি, আর ঐ সম্বোধনে পাই একটা অপূর্ব্ব আনন্দ। চোখ মুদে ঐ সম্বোধন করতেই সারা দেহে,

সারা মন-প্রাণে বয়ে যায় এক পুলক শিহরণ।··আমার এই লেখার কি যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ কেন যে লিখ্‌ছি হয় তো নিজের কাছে নিজে এই প্রশ্ন করলেই ভালো ক'রে উত্তর দিতে পারব না, অন্যের কাছে তো আরো কঠিন। তবে এইটুকু বলিতে পারি, অনেক কালের অনেক কিছু যখন দিনের পর দিন ক্রমান্বয়ে হৃদয় কোণে জমে উঠে বুকের 'পরে চেপে থাকে একটা জগদ্দল পাথরের মতো, তখন সত্যই মন চায় তাকে মুক্ত করতে—মানুষ হয়ে ওঠে লেখক, নির্জ্জনতা-প্রিয়, চায় সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কোলে ব্যথার ভারে নত ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে অঘোরে কাঁদতে। হয়তো আজ আমার মনের অবস্থা তাই—হয়তো ব্যথায় ভরা বুকটা একটুও যদি হাল্কা হয় তাই আমার চেষ্টা।

অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিক, অনেক বড়ো বড়ো মনস্তত্ত্ববিদ্ বলে গিয়েছেন, মানুষ জীবনটা নাকি নাটক নয় বরং একখানি উপন্যাস। আমার কিন্তু মনে হয় মানুষের জীবন ও দু'টোর একটাও নয়, মানুষের জীবনটা একটা মরুভূমি, তবে একেবারে ওয়েসিস বিহীন নয়। এ মরুভূমির শেষ সেদিন, যেদিন মৃত্যু আসে শীতল বারি হাতে ল'য়ে লতা পুষ্পভারে সজ্জিত হয়ে। অবশ্য আমার এই সিদ্ধান্তে আমি আরো দৃঢ় হয়েছি আমার নিজের জীবনটা পর্য্যালোচনা করে।

আমার এই ছোট্ট জীবনের সেটুকু মনে পড়ে—আমি পাইনি কারো কাছ থেকে সত্যিকারের একটু নির্ম্মল দরদ, ভালবাসা—এমন কি হয়তো অনেকেই আশ্চর্য্য হবে—মায়ের স্নেহ থেকেও বোধহয় আমি বঞ্চিত; কারণ কোন দিনতো আবহাওয়ায় তার আভাস পাইনি একটুকুও। বাহ্যিক আভাসটাই কি সব? অন্তরটা কি কিছুই নয়? না, তবে এটা ঠিক, ভালবাসা যেখানে প্রচ্ছন্ন থাকে, দেহের উত্তেজনা সেখানে তার সত্তাকে উদ্বোধিত করে। সত্যি আমি বড়ো ভালবাসার কাঙাল। জানিনা, ভালবাসা পাইনি বলেই বোধহয় যাকে যেখানে ভাল লেগেছে তাকেই উজাড় করে' দিয়েছি আমার অতি গোপনে সঞ্চিত ভালবাসা। জানি আমি, মানুষের জীবনে কতোখানি প্রয়োজন আছে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার।

মনে পড়ে একদিনের একটী ছোট্ট ঘটনা। স্কুলে পড়ি। বয়স ষোল-সতেরো বৎসর। বৈশাখের দুপুরে গির্জ্জার সুমুখের বাগানের একটা করবী ফুল গাছের তলায় একবন্ধু নানা কথার মাঝে বলেছিল, 'সত্যি, যদি আমি কাউকে তেমন করে ভালবেসে থাকি সে তুই।" লাল মাটীর দেশে শুক্‌নো ঘাসের ওপর দালানের ছায়ায় দুইয়ে দুইয়ের কণ্ঠ জড়িয়ে কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছিলুম। সেদিন আমার এত আনন্দ হয়েছিল যে আজ কেন, সেদিনও ভাষায় প্রকাশ করা ছিল আমার আয়ত্তের বাইরে। শৈশব হ'তে কৈশোর-যৌবন সন্ধিক্ষণ পর্য্যন্ত যে কেবল ছুটে বেড়িয়েছে একটু ভালবাসা পাবার জন্য—সে যদি এমনিভাবে না চাইতেই ভালবাসা পায় তবে তার সেই আনন্দ রাখ্‌বার কি আর জায়গা থাকে? আমারও হয়েছিল তাই; তারপর কেন জানিনা, জীবন পথে এলো একটা ছোট্ট ঝড়—জীবনেরও গতিতে হ'লো একটু পরিবর্ত্তন। হঠাৎ একদিন জান্‌তে পায়লুম আমাকে সেদিন বলা বন্ধুর ঐ উক্তি —একটা মুখের কথাছাড়া আর কিছুই নয়। এর পূর্ব্বে এবং পরেও ওরূপ অনেককেই সে বলে বেড়িয়েছে। সাঁঝের আঁধার সারা আকাশ-খানাকে ছেয়ে ফেল্‌ছিল, আমি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরছিলুম সহরের প্রান্তস্থিত যে পার্ব্বত্য নদীটা—তারই তীর বেয়ে যাওয়া আঁকা বাঁকা পথ ধরে। শ্মশানের কাছে আস্‌তেই শুন্‌তে পেলুম কে এক ব্যথার ব্যথী নদীর কূলে পাথরে বসে' গাইছে—

"বাঁধন যেথায় চেয়েছিলেম
সেথায় পেলেম ছাড়া
তাইতো আমার মরণ পানে
বইল জীবন ধারা।"······

তারপর অনেক কাল কেটে গিয়েছে। ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। চলার পথে কতো পথিকই না পড়েছে, গড়েছে আমার সঙ্গে সম্বন্ধ—পুরানো অভ্যাসটাকে নষ্ট করতে পারিনি, পথের পরিচয়েই তাদের ভালবেসে ফেলেছি। তারপর পথ হয়ে যেতো বিভিন্ন।·মানুষের গড়াবন্ধন মানুষকেই ছিঁড়তে হয়, তাই আমাকেও হতো। তাদের একেবারে ভুল্‌তে পারতুম না। পথ বিভিন্ন হয়ে যাবার পরেও তাদের খোঁজ নিতে চেষ্টা করতুম, হয়তো অনেকের সঙ্গে কিছুদিন সম্বন্ধটা বেঁচেও থাক্‌তো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঁধন যে কি ভাবে কেটে যেতো আজও ভেবে পাইনা। বাহ্যিক বাঁধনটাই আসল নয়; তাই বুঝি যখনই ধরা পড়তো অভাব আছে আন্তরিক বন্ধনের, তখনই যেতে বাহ্যিক বন্ধন রজ্জুটা ছিঁড়ে। জন্মের সময় পরাণটা আমার ছিল শাদা কাপড়ের মতো; তারপর একে একে কত লোকই যে এসে ঐ শাদা কাপড়ের উপর দিয়ে গেলো লালকালো ছাপ মেরে—হয়ে গেলো শাদা কাপড়টা একখানা দাবার ছক। কিছু বাকী ছিল, আজ বুঝি তাও হয়ে যায় লালকালো দাগে পূর্ণ।

কোথাকার জল গড়িয়ে গড়িয়ে কোথায় গিয়ে পড়ে। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি তিব্বত-ভারত-সীমান্তে মানস সরোবরে; গড়াতে গড়াতে তিব্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসাম প্রদেশ ভেদ করে বাংলার একটা দিক প্লাবিত করে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে ছুটেছে সে সমুদ্রাভিমুখে। লক্ষ্য তার ছিল সমুদ্র, পৌঁচেছেও—হয়তো গতির পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। আমার জীবনেরও যে একটা লক্ষ্য না ছিল তাও নয়। জানিনা শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব কিনা; তবে ইহা জানি, যেদিকে গতি রেখে প্রথমে আমার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন পড়াতে তারও পরিবর্ত্তন হয়েছে অনেক। বাংলার বাইরে আমার জন্ম হয়েছিল। বাল্যের শিক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গের কোন একটা গ্রাম্য স্কুলে। তারপর বাংলাও বাংলার বাইরে ঘুরেছি অনেক; শেষটাতে এসে স্থান পেলুম যেখানে সেখানে কয়েকটা দিন কাট্‌লো বেশ। আবার এলো একটু পরিবর্ত্তন। বিশ্রামের পর আবার পথ বেয়ে চল্‌তে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়। বৈশাখের নব কিশলয়ের মতো তুমি এলে, সকাল বেলার সোনালী রোদ দিয়েছিল তোমার মুখখানাকে উজ্জ্বল করে। দু'-একদিন অতি তুচ্ছ দু'-

একটা কথা হলো, তোমাকে লাগলো আমার ভালো। তোমার অজ্ঞাতে তোমাকে নিয়ে অনেক কিছু প্ল্যান আঁকলুম; শেষটায় তোমাকে একদিন বলেও ফেল্লুম। তুমি কথাটা শুনে আমার দিকে যে দৃষ্টিতে চেয়েছিলে, ঐ দৃষ্টিটা আমায় একটু বেশই আনন্দ দিয়েছিল।

একদিনের কথা। তোমায় পড়াতুম। দুপুরবেলা, আম-কাঁটালের দিন স্বভাবতঃ খাওয়ার পরে আসে একটা ঘুমের আমেজ। শুয়ে একখানি ইংরিজি নভেল পড়ছিলুম। পড়া ভাল লাগ্‌লো না—ঘুম এলো সারা চোখ জুড়ে। তুমি বই নিয়ে এসে পড়তে বস্‌লে। একটু-খানি দেখিয়ে দিয়েই বল্লুম আজ আর নয়, হয়ে গিয়েছে। তুমি চলে গেলে। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম, তুমি এসে প্রথমে ডাক্‌লে, একটু নড়ে-চড়ে আবার চুপ করে গেলুম। কাছেই ছিল দোয়াত কলম, মাথা নুইয়ে মুখের ওপর মুখ নিয়ে গালে মুখে কেটে দিলে কালির আঁচড়। আধ-ভাঙা ঘুমটা গেল ভেঙে। মুখে হাত দিয়ে দেখি একরাশ কালি। আমি বল্লুম, ওকি করেছ? তুমি শুধু আমার চোখের 'পরে চোখ্‌ তুলে একটু সলজ্জ হাসি হেসে মুখ নত করলে। আমার সারা অন্তরটা তৃপ্তিতে ভরে গেল।

তারপর? আরো কিছুকাল এক সঙ্গে কাটলো। ভাঙন ধর্‌লো। আজও আমি ঘুমুই, প্রতীক্ষায় থাকি তুমি অমনি করে এসে ঘুম ভাঙাবে; কিন্তু কই আসনাতো? বিষয়টা কিছুই নয়, ঘুমোন আর ঘুম ভাঙান, কিন্তু এই অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্য দিয়ে সেদিন তোমার অন্তরের যে দিকটা আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল আজ কেন তার অভাব দেখি?

আরো অনেক কিছু ছিল তোমাকে লিখ্‌বার—কিন্তু বড়ই পরিশ্রান্ত ক্লান্ত আমি। অবসাদ এসে গিয়েছে আমার সারাদেহে। চাইনা আর কথার জাল বুনে যেতে। কামনা কিছু আছে—একমৃত্যু, আর? বিদায়—

তোমার সুচিত্র'

মাতুলের চিঠি পড়া শেষ হবার সঙ্গে সবাই চুপ করে গেলো। কারো মুখ দিয়ে কোন কিছুই বেরোল না। যার যার কোঁচার খুটে চোখ্‌ মুছ্‌লো। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এমন একটা স্থান আছে সেখানটা সকলেরই এক; আর সেখানে ঘা পড়লে মানুষ মাত্রেরই হৃদয়-তন্ত্রী একসুরে বেজে ওঠে। সেই স্থান। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার আধার।

বাংলার লোন কোম্পানী

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী এম্‌ এ

প্রবন্ধ

বাংলার ব্যাঙ্কিং জগতে লোন কোম্পানীগুলি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই প্রদেশের ভূস্বামী ও কৃষকদিগকে জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিবার নিমিত্তই এই প্রকার ব্যাঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ফরিদপুর লোন আফিস সর্ব্বপ্রথম ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কিং কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহার পাঁচবৎসরের মধ্যেই মৈমনসিংহে ময়মনসিংহ লোন অফিস নামক দুইটা এবং ত্রিপুরা, বগুড়া ও বাখরগঞ্জে একটা করিয়া তিনটা লোন কোম্পানী স্থাপিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে এই প্রকার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মহাযুদ্ধের সময়ে এই ব্যাপারে অনেকটা অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আবার লোন কোম্পানী স্থাপনের ধুম পড়িয়া যায় এবং ১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দেই ১৬৪টা লোন কোম্পানী রেজিষ্টারী করা হয়। Bengal Banking Enquiry Committeeর হিসাবমত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাস পর্য্যন্ত উহাদের সংখ্যা ৭৯৯টিতে পৌঁছে এবং ইহাদের মূলধন ও আমানতের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি টাকা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

এই লোন কোম্পানীসমূহের মধ্যে অধিকসংখ্যক কোম্পানী ময়মনসিংহ জেলাতে দৃষ্ট হয়। ইহার পর রঙ্গপুরের নাম করিতে হয় এবং বগুড়া ও ত্রিপুরা এই বিষয়ে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে। যে সকল অঞ্চলে প্রথম কয়েকটা শক্তিশালী লোন কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সব অঞ্চলে তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও অনেক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। আবার যে সকল জেলাতে জমি খুব উর্ব্বর, অথচ টাকা ধার দিবার মত সক্ষম প্রতিষ্ঠান বিরল—সেইসব স্থানে অধিক সংখ্যক লোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব কারণে পূর্ব্ববঙ্গে লোন কোম্পানীর আধিক্য দৃষ্ট হয়।

বাংলার লোন কোম্পানীগুলির কয়েকটা বৈশিষ্ট্য

প্রথমেই উল্লেখ করিব। ইহাদের আদায়ী মূলধন তাহাদের আকার ও পসারের তুলনায় খুবই অল্প। কিন্তু প্রচুর আমানত সংগ্রহ করিয়া ইহারা ব্যবসা চালাইতেছে। এই আমানতী টাকার বেশীর ভাগ আবার একমাস হইতে দুই বৎসরের মেয়াদে আমানত রাখা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, প্রায় প্রত্যেক লোন কোম্পানীর—বিশেষ ভাবে নূতন লোন কোম্পানীসমূহের রিজার্ভ ফণ্ড আদায়ী মূলধনের তুলনায় খুবই অল্প।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ব্যাঙ্কসমূহের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জমি বন্ধক মূলে ভূস্বামী ও কৃষকদিগকে টাকা ধার দেওয়া। সাধারণতঃ ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা প্রয়োগ করে না। তবে জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং এবং ট্রেডিং কর্পোরেশনের ন্যায় কয়েকটী পুরাতন প্রতিষ্ঠান চা-বাগানের পরিচালকদিগকে দীর্ঘ ও অল্প সময়ের জন্য টাকা ধার দিয়া থাকে। ইহা বলাই বহুল্য যে লোন কোম্পানী সন্তোষজনক বন্ধক পাইলেই টাকা ধার দিতে স্বীকৃত। এই টাকার সাহায্যে খাতকবর্গের আর্থিক উন্নতি হইতেছে কিনা এই প্রশ্ন তাহাদের চিন্তনীয় নহে। কোন লোন কোম্পানী এ পর্য্যন্ত ডিবেঞ্চার বাহির করিয়া মূলধন যোগাড় করে নাই। শেয়ার বিক্রি করিয়া এবং বিশেষভাবে স্থায়ী ও অস্থায়ী অমানতী টাকা সংগ্রহ করিয়াই দরকারী মূলধন পাইয়া থাকে। স্থায়ী আমানতের উপর শতকরা ৮৲ টাকা এবং অস্থায়ী আমানতের উপর শতকরা ৪৲ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইয়া থাকে। স্থায়ী আমানতের মেয়াদ পাচ বৎসরের বেশী হইতে দেখা যায় না। অনেক সময় শুধু ব্যক্তিগত মাতব্বরিতেও টাকা ধার দেওয়া হইয়া থাকে। বন্ধকী ঋণের সুদ সাধারণতঃ ১২-১৮৲ টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋণের সুদ এই হার হইতে আরও বেশী। সুদের হার আবার ঋণের পরিমাণের উপরও কতক ভাবে নির্ভর করে। অল্প ঋণের জন্য সাধারণতঃ বেশী সুদ দাবী করা হইয়া থাকে। তবে মোটামোটিভাবে ইহা বলা চলে যে ঋণদান ব্যাপারে লোন কোম্পানীগুলি—বিশেষভাবে পুরাতন কোম্পানীসমূহ—খুব সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। লগ্নী টাকা সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে আদায় করা সম্ভব না হইলেও তাহা সুরাক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, খাতকবর্গের আর্থিক অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াই পরিচালকগণ টাকা ধার দিয়া থাকেন। পুরাতন কোম্পানীসমূহের সাফল্যের মূল কারণ ইহাই এবং এই জন্যই ইহারা উচ্চহারে ডিভিডেণ্ড দিতে সমর্থ হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাযুদ্ধের পর যে সকল নূতন লোন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে সেই ব্যাঙ্কগুলি ঋণদান ব্যাপারে উপযুক্ত সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করে নাই। আরও দুঃখের কথা এই যে, ইহাদের মধ্যে তীব্র ও অসঙ্গত প্রতিযোগিতার ফলে তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি অনিষ্টকর রীতিনীতি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ ইহারা অধিকাংশ টাকা জমি বা অলঙ্কার প্রভৃতির ন্যায় অন্য প্রকার মূল্যবান জিনিস বন্ধক না রাখিয়াই ধার দিয়াছে। আবার এক কোম্পানীর খাতক এই ভাবে একাধিক কোম্পানী হইতে টাকা ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমানতী টাকা পাইবার জন্য এই নূতন কোম্পানীগুলি এতটা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে যে অতি উচ্চহারে সুদের প্রলোভন দেখাইতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। এই ভাবে ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটা নূতন ব্যাঙ্ক ১৫৲ টাকা হারে আমানতী টাকার উপর সুদ দিতে থাকে এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী কোম্পানী যে সকল খাতক-দিগকে টাকা ধার দেওয়া সঙ্গত মনে করে নাই তাহাদিগকে ইহারা উচ্চতর সুদে এই ভাবে সংগৃহীত টাকা ধার দিতে থাকে।

এই সব অশুভ লক্ষণ দেখিয়া—Bengal Banking Enquiry committee ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্পষ্টভাবে বলিয়া-ছিলেন যে, যদি কোন প্রকার অর্থসঙ্কট দেখা দেয় তাহা হইলে এই শ্রেণীর লোন কোম্পানীসমূহের অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে এবং কার্য্যতঃ অবস্থাও তাহাই হইয়া উঠিয়াছে। এই অননুভূতপূর্ব্ব অর্থ এবং কৃষিসঙ্কটের ফলে অধিকাংশ লোন কোম্পানীগুলির অবস্থা এতটা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে যে ইহারা খাতকদিগের নিকট হইতে আসল বা সুদ বাবদ কিছুই পাইতেছে না এবং আমানতী টাকাও ফিরাইয়া দিতে অক্ষম হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে এই জন্য যে, অনেকগুলি লোন কোম্পানীর রিজার্ভ ফণ্ড বলিয়া তেমন

কিছুই নাই। এই অবস্থায় ইহাদের লগ্নীর কয়েক হাজার টাকা নষ্ট হইলেই যে তাহাদিগকে সঙ্কটে পতিত হইতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাহাই নহে। অর্থসঙ্কটের গুরুত্ব, বিস্তৃতি ও তীব্রতার দরুণ পুরাতন এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লোন কোম্পানীসমূহের অবস্থাও হীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণে নূতন লোন কোম্পানীগুলির উপর লোকের আস্থা খুবই হ্রাস পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কোম্পানীগুলির প্রতিও একটা অনাস্থার ভাব উদয় হইয়াছে। অথচ ইহা অতি মোটা কথা যে ব্যাঙ্ক-ব্যবসা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বাস গাড়তে বহু বৎসর সময় লাগে, কিন্তু উহা আবার একদিনে ভাঙিয়া যাইতে পারে। একবার ভাঙিলে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা কষ্টকর ও সময়-সাপেক্ষ। এই ভাবে কতকগুলি অপারণামদর্শী কোম্পানীর কার্য্যকলাপের দরুণ এবং এই অননুভূতপূর্ব্ব অর্থসঙ্কটের দরুণ পল্লী-বাংলার সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে।

যাহাতে এই প্রকার অপরিণামদর্শীর কার্য্য-কলাপের এবং পূর্ব্ববর্ণিত ভুল ত্রুটীর পুনরাবৃত্তি না হয় সেই উদ্দেশ্যে Bengal Banking Enquiry Committee কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। একটা Special Act প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবগুলি শীঘ্র কার্য্যকরী করার স্বপক্ষে তাঁহারা স্পষ্টমত প্রকাশ করিয়াছেন। Banking Committeeর মূল প্রস্তাবগুলি এই স্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটা প্রস্তাব হইতেছে এই যে, ভবিষ্যতে প্রত্যেক নূতন কোম্পানীর বিলীকৃত মূলধনের পরিমাণ অন্ততঃ ৫০,০০০ টাকা এবং আদায়ী মূলধনের পরিমাণ অন্ততঃ ২৫,০০০ টাকা হইতে হইবে। এইভাবে সামান্য মূলধন লইয়া অগণিত নূতন ব্যাঙ্কের আবির্ভাবের পথ রুদ্ধ করা যাইবে। আর যে সকল লোন কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বর্ত্তমানে ২৫,০০০ টাকা হইতে কম, তাহাদিগকে গভর্ণমেন্টের সহিত সেই পরিমাণ সিকিউরিটি গচ্ছিত রাখিতে হইবে—যাহাতে আদায়ী মূলধন ও গচ্ছিত সিকিউরিটির মূল্য একযোগে ২৫,০০০ টাকা হয়। যে সকল লোন অফিস এই সর্ত্ত কোন ভাবেই পূরণ করিতে সমর্থ নহে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্য কোম্পানীর সহিত সম্মিলিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক কোম্পানীর মঞ্জুরীকৃত এবং বিলীকৃত মূলধনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ আমানতকারী উক্ত পার্থক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব ও সামর্থ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। ইহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোন লোন অফিসের মঞ্জুরীকৃত মূলধন ইহার বিলীকৃত মূলধনের চতুর্গুণের অধিক হইতে পারিবে না। অনেক কোম্পানীকে তাহাদের স্বীয় শেয়ারের উপর টাকা ধার দিতে দেখা যায়। কিন্তু এই প্রকার ঋণদাননীতি বর্ত্তমানে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির বিরুদ্ধে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রথা অনুসৃত না হয় সেই উদ্দেশ্যেও আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। লোন কোম্পানীসমূহের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, অধিকাংশ অফিসগুলি তাহাদের লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে ডিভিডেণ্ডরূপে বিতরণ করিয়া অল্প টাকাই রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিয়াছে। যত দিন প্রচুর আমানত পাওয়া যাইত ততদিন এই মারাত্মক ত্রুটী সত্ত্বেও ইহারা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করে নাই। কিন্তু কৃষি ও অর্থসঙ্কটের ফলে আমানতী টাকার আমদানী খুবই হ্রাস পাইয়াছে এবং উপযুক্ত তহবিলের অভাবে কোম্পানীগুলির পক্ষে আমানত-কারীদের দাবী মিটানই এক সমস্যা হইয়া দাড়াইয়াছে। এই ত্রুটী দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে প্রতি বৎসর প্রত্যেক কোম্পানীকে লাভের শতকরা অন্ততঃ ২৫৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিতে হইবে। কিন্তু এই তহবিলের টাকা উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য-ভাবে রাখাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মফঃস্বলের কোম্পানীসমূহকে সমবায় সমিতির ন্যায় Postal Savings Bank Account খুলিবার ও ব্যবহার করিবার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত এবং যাহাতে ইহারা ২০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত Postal Cash Certificate ক্রয় করিতে পারে সেই বন্দোবস্তও করা দরকার। তাঁহাদের আর একটা প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। লোন কোম্পানীসমূহ যদি গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া Imperial Bankএর কলিকাতা অফিসে গচ্ছিত রাখে তাহা হইলে তাহারা অতি সহজে ও অল্প সময়ে



শিল্পী— শ্রীযুক্ত বলাইবন্ধু রায়　　　কুসুম মঞ্জরী　　　Bharatvarsha Printing Works

ইহার ব্রাঞ্চ অফিস হইতে উপযুক্ত পরিমাণে টাকা ধার পাইতে পারে। এই প্রথা অনুসরণ করিলে রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা খুব স্পষ্টভাবে বলা এবং পরিষ্কারভাবে বুঝা দরকার যে, শুধু আইন প্রণয়ন করিয়া কোন দেশের ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতি সাধন করা যায় না। অধ্যবসায়ী, দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যাঙ্ক-পরিচালকদের উপরই বাংলার লোন কোম্পানীসমূহের ভবিষ্যত সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

কিন্তু বাংলার লোন কোম্পানীসমূহকে শক্তিশালী ও কার্য্যকরী অবস্থায় বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে—যে সমস্ত স্থানে একাধিক ব্যাঙ্ক পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে সেই সব স্থানে তাহাদিগকে একত্রীভূত করিয়া একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা। এই ব্যাপারে ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণীর দৃষ্টান্ত খুবই আশাপ্রদ। ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পাঁচটা ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটিই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের মিলনে পরিপুষ্ট হইয়াছে। আমেরিকাতেও এই প্রকার মিলিত ব্যাঙ্কের প্রচলন খুবই বেশী। এই প্রকার amalgamationএর ফলে সেই সব দেশের ব্যাঙ্কগুলির আকার ও পসার যেমন অতুলনীয়, তেমন অভিজ্ঞ পরিচালনার দরুণ ইহাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও অসামান্য। বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি এই প্রদেশেও ছোট ছোট লোন কোম্পানীগুলির সমন্বয়সাধনে কতকগুলি শক্তিশালী ও বৃহৎ ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা যায়—তাহা হইলে ইহাদের পক্ষে দ্রুত উন্নতিলাভ করা, কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্যকে উপযুক্তরূপে সাহায্য করা এবং গ্রাম্য জনসাধারণকে আধুনিক রীতিনীতি অনুযায়ী সর্ব্বশ্রেণীর ব্যাঙ্কিং সুবিধা দেওয়া সম্ভব ও সহজ হইবে।

কিন্তু amalgamation খুব সহজসাধ্য কার্য্য বলিয়া মনে করা ভুল। প্রথমতঃ সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও প্রভাব খুব অল্প হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের অল্পসংখ্যক লোন কোম্পানীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ এই আন্দোলনকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে অনেক জটিল সমস্যার মীমাংসা এবং বহু সূক্ষ্ম প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান করিতে হইবে। যদি কয়েকজন প্রভাবশালী ও অভিজ্ঞ ব্যাঙ্কার উদার মন ও অদম্য আগ্রহ নিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন ও এই ব্যাপারে অগ্রণী হন, তাহা হইলে এই আন্দোলন কেন ক্রমে ক্রমে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে না তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্থানীয় লোন কোম্পানী-সমূহের পরিচালকবর্গ মিলিত হইয়া যদি সাধারণ ব্যাপার-গুলি নিষ্পত্তি করেন এবং জটিলতর প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য যদি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য লয়েন, তাহা হইলে সমন্বয়ের পথ অনেকটা সহজ হইবে। ইহা বলাই বাহুল্য যে এইভাবে মিলিত হইলে মিলনকামী প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পরিচালকদের কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ অপরিহার্য্য। কিন্তু জাতির সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করা বাঙ্গালীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। গভর্ণমেণ্টও এই আন্দোলনকে অনেক ভাবেই সাহায্য করিতে পারেন। সম্মিলিত ব্যাঙ্ককে আবার রেজিষ্টারী করার সময় যদি কোন stamp duty দাবী করা না হয় তাহা হইলে এই আন্দোলনকে কতক উৎসাহ দেওয়া হইবে। ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণীর শিল্পজগতের এই প্রকার সমন্বয় আন্দোলনকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে সেই সব দেশের গভর্ণমেণ্ট নানা প্রকার আর্থিক সাহায্য ও বিশেষ সুবিধা প্রদান করিতে পশ্চাদপদ হন নাই। বাংলার গভর্ণমেণ্টও যদি এই প্রকার মনোবৃত্তি নিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে এই আন্দোলনকে সাফল্যের পথে অনেকটা অগ্রসর করাইয়া দিতে পারেন।

সর্ব্বশেষে আর একটী ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। কিছুকাল হইল কলিকাতায় লোন-কোম্পানীসমূহের পরিচালকদের যে সম্মিলন হইয়াছিল তাহাতে একটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। উক্ত সম্মিলনে লোন কোম্পানীসমূহকে Bengal Agricultural Debtors Actএর কবল হইতে রেহাই দিবার স্বপক্ষে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের মূল বক্তব্য এই যে, লোন কোম্পানীসমূহের পক্ষে গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক Debt Conciliation Boardএর সমক্ষে খাতকবর্গের ইচ্ছানুযায়ী উপস্থিত হওয়া খুবই অসুবিধাজনক, ক্ষতিকর এবং ব্যয়সাপেক্ষ। তাহাদের মতে গ্রাম্য সালিশী বোর্ডের পরিবর্ত্তে যদি প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান সহরে কতকগুলি Special

Debt Conciliation Board প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহারা লোন কোম্পানীর খাতকবর্গের ঋণ সম্বন্ধে একটা বিলি-ব্যবস্থা করে তাহা হইলে তাহাদিগের কোন বিশেষ ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না এবং আমানতকারীদের স্বার্থও অক্ষুণ্ণ থাকে।

কিন্তু Agricultural Debtors Actএর উদ্দেশ্য ও বিধান অনুযায়ী যদি Debt Conciliation Boardএর কার্য্য পরিচালিত হয় তাহা হইলে লোন কোম্পানীসমূহের তাহাতে কোন শঙ্কার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কৃষকদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় বিনষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের বাৎসরিক আয় হইতে প্রত্যেক মহাজনকে হারাহারিভাবে কিস্তিক্রমে ঋণ শোধ করিবার সুযোগ দেওয়াই হইতেছে এই সব বোর্ডের উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় যদি লোন কোম্পানীদিগকে এই আইনের কবল হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় তাহা হইলে পরিণামে তাহাদেরই ক্ষতি হইবে। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত কৃষক বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাৎসরিক কিস্তি দ্বারা অন্য মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিতে থাকিবে ততদিন কৃষকের জমি লোন কোম্পানী ঋণের টাকার পরিবর্ত্তে দখল করিতে পারিবে না। ইহার অর্থ এই যে কৃষকের পক্ষে লোন কোম্পানীর টাকা পরিশোধের প্রশ্ন অনেক বিলম্বে উঠিবে। ইহা অবশ্য সত্য যে অনেক স্থলে লোন কোম্পানী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই কৃষকের সামর্থ্য অনুযায়ী ঋণভার লাঘব করিয়া তাহাকে ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে। ইহাতে তাহাদের যেমন ঔদার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে তেমন তাহাদের বৃহত্তর স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই স্থানে ইহা বলা দরকার যে অধিক লাভের প্রলোভনে যে সকল অপকৃষ্ট শ্রেণীর দাদন (Bad debts) প্রদান করা হইয়াছে সেই সকল লগ্নীর আশা লোন কোম্পানীদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য শ্রেণীর লগ্নীর বিষয়েও লোন কোম্পানীদের পক্ষে সুদের হার হ্রাস করিয়া এবং আসল টাকার ব্যাপারে ঔদার্য্য দেখাইয়া কৃষকদিগকে ঋণ পরিশোধ করিবার—সুস্থ ও স্বচ্ছল ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার এবং ব্যাঙ্ক-সমূহের ও পল্লী-বাংলার সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষিত করিবার জন্য কতক ত্যাগ স্বীকার করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ লোন কোম্পানীর অধিকাংশ খাতক কৃষিজ আয়ের উপর নির্ভর করে এবং বাংলার কৃষি ও কৃষকের আর্থিক উন্নতির উপরই লোন কোম্পানীসমূহের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার ও সঙ্কটের অপনোদন বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। এই অবস্থায় Conciliation Boardকে কৃষকদের লোন কোম্পানী হইতে গৃহীত ঋণ সম্পর্কে কোন বিলি ব্যবস্থা করিতে না দেওয়ার কোনই অর্থ হইতে পারে না। তাই কি ভাবে কৃষকবর্গের সমুদয় ঋণভার লাঘব ও অপনোদন করা যায় সেই চেষ্টা একবারে এবং এক সময়ে না করিলে এই গুরুতর সমস্যার কোন প্রকৃত সমাধান হইবে না। প্রত্যেক লোন কোম্পানী ইহার বক্তব্য Debt Conciliation Boardএর সমীপে উপস্থিত করার জন্য কতিপয় কর্ম্মচারী স্বচ্ছন্দে নিযুক্ত করিতে পারে এবং ইহা খুব ব্যয়সাপেক্ষ হইবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ দেখিতেছি না।

শীত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(বিপ্রলব্ধা)

বাসক শয়ন সাজে—সে আসেনি,
ছিঁড়ে গেছে মুক্তামালা অভিমানিনী,
বাঁধেনি কুন্তলচারু, ললাটে আঁকেনি কারু,
পরেনি রঙীন সাড়ী, উদাসিনী।
(তার) গায়ের গন্ধে অন্ধ অলি ঘুরে না বুলে,
শিরিষ চাঁপা কদম যুঁথি পরেনি চুলে,
অধরের রাগ মুছে, ভূষণ ফেলিয়া দে'ছে
হাসিতে ভুলিয়া গেছে, সুহাসিনী।

(বিধবা)

নীরব কোকিল গাহে না গান
কুলগন্ধহীনা, আজি পুষ্প-বিতান,
শীত-শীর্ণ শাখে, পাখী না ডাকে,
অকাল সন্ধ্যায় ম্লানায়মান।
স্মিতহাস্য ভুলি, সতী প্রকৃতি আজি,
শিতশুভ্র-বাসে, বসে, বিধবা সাজি,
তার গণ্ডো পরে, শিশিরাশ্রু ঝরে,
বিষাদ-স্তব্ধ সে, নত বয়ান।

বাঁশী

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি-এ

রাত্রি বারোটা তখন হ'বে।

একটা বিলিতি ফিল্ম্ দেখে' ফিরছি।

নির্জ্জন পথ, গ্রীষ্মের রাত্রি, সুন্দর হাওয়া বইছে। এতক্ষণ বন্ধ ঘরে থাকার পর হাওয়ায় ভরা এই নির্জ্জন পথ দিয়ে যেতে ভারী ভালো লাগ্‌ছিল। তা' ছাড়া আজ্‌কের এই রাত্রে যেন একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে! আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় ভ ঙা-তরোয়ালের মত একটুখানি চাঁদ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তা'র নরম আলো গলে' গলে' পড়্‌ছে কোল্‌কাতার এই নীরব মৌনতার ওপর। পরিষ্কার তক্‌তকে পথ, আবছা আলোয় মায়াময় হ'য়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে শুধু এলোমেলো ক'য়েকটি শুষ্ক ঝরাপাতা, মন্দির প্রাঙ্গণে ছেঁড়া ফুলের মতই। কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো তা'দের নতুন ফুলের উচ্ছ্বাসে যেন কথা ক'য়ে উঠ্‌ছে; মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠ্‌ছে দূরের নারিকেল কুঞ্জ। রাত্রের কোল্‌কাতার এই অপরূপরূপ আমার খুব ভালো লাগে—কোথাও নেই একটুও শব্দ, আশে পাশের মৌন বিরাট বাড়ীগুলো যেন রূপকথার রাজ্যে সবাই পড়্‌'ছে ঘুমিয়ে—ঘুমিয়ে পড়্‌'ছে কোল্‌কাতা তা'র সমস্ত কোলাহল চাঞ্চল্য নিয়ে, ঘুমিয়ে পড়্‌'ছে কোল্‌কাতা ও তা'র কালো বাঁকা পথ, তার বাড়ী, তা'র পার্ক!

বিলিতি বাজ্‌নার কয়েকটি মিষ্টি সুর মনের ভেতর তখনও যেন মীড় দিয়ে উঠ্‌ছে। হাল্‌কা মনে এলোমেলো শিস্ দিয়ে সেই সুর অনুকরণ কর্‌তে চেষ্টা করছি।

কিছুদূরে একটা পার্ক, তারপর এক চৌমাথা রাস্তা পেরিয়েই আমাদের মেস্ বাড়ীটা। পার্কের কাছাকাছি তখন এসেছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এলো বাঁশীর মৃদু সুর। কে এখন বাঁশী বাজায়, এতো রাতে? কিন্তু যেই বাজাক্ না কেন যে সুর সে বাজিয়ে চলে'ছে সত্যিই তা' অপূর্ব্ব। এই গ্রীষ্ম-রাত্রির সঙ্গে, এই মর্ম্মরিত নারিকেল-কুঞ্জের সঙ্গে কোথাও যেন তা'র একটুও অসামঞ্জস্য নেই। বড় মিষ্টি, বড় করুণ সে সুর; করুণ কান্নার ঢেউ তুলে' তা' যেন এই নিঝুম প্রকৃতির বুকে আছড়ে আছড়ে পড়্‌ছে! কখনও সে সুর উঠ্‌ছে চড়ায়—সমস্ত প্রকৃতি তখন যেন রুদ্ধ নিঃশ্বেসে স্তব্ধ হ'য়ে যাচ্ছে; তারপর নাম্‌ছে সে সুর কোমল হ'য়ে, মৃদু থেকে মৃদু হ'য়ে তা' যেন মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের বুকে আর সেই সঙ্গে হাওয়ায় ভরা এই গ্রীষ্ম-রাত্রি গভীর বেদনায় যেন ফেল্‌ছে দীর্ঘশ্বাস!

পার্কের লোহার রেলিঙের ধারে এক পাতা-বাহারি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে পড়্‌লুম। সত্যিই কি অদ্ভুত সুন্দর সেই সুর! সেই সুরের মূর্চ্ছনায় সমস্তই যেন অবাস্তব হ'য়ে উঠেছে। ভাব্‌লুম, কে সেই শিল্পী—যে এরকম অদ্ভুত সুরে বাজাতে পারে বাঁশী? কি তা'র দুঃখ, যা'র পরশে এই রকম করুণ হ'য়ে উঠেছে তা'র সুর?

পাতা-বাহারী গাছটা দুলে' উঠ্‌ল মাথার ওপর, একটা চলন্ত শাদা মেঘে ঢেকে গেল মাঝ আকাশের ভাঙা তরোয়ালের মত টুক্‌রো চাঁদটা, আর ঠিক আমারই পেছন থেকে কে যেন কথা ক'য়ে উঠ্‌ল, "বাবুজী।"

চম্‌কে উঠ্‌লুম।

তারপর চাইলুম পেছুনে। মেঘের ও গাছের ছায়ায় সে জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। তবুও যেন আব্‌ছা দেখ্‌তে পেলুম এক মানুষের মূর্ত্তি সেখানে। চাপা গলায় জিগ্‌গেস্ কর্‌লুম, "কে ওখানে?"

ভাঙা ভাঙা পশ্চিমে গলায় উত্তর এলো, "হামি বাবুজি।"

"কে তুমি?" ততক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে এসেছি।

"হামি?" সে যেন কি খানিক ভেবে বল্‌ল, "হামি বাঁশীওলা।"

আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন কর্‌লুম, "তুমিই কি বাঁশী বাজাচ্ছিলে?"

"হাঁ বাবু।" একটু থেমে একটা ঢোক গিলে' সে যেন উত্তর দিল। "আপ্‌নায় দাঁড়াতে দেখে' মন্ হ'ল আপনে বাঁশী নেবে। তাই আসছে।"

"তুমি কি বাঁশী বিক্রী কর?" আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন কর্‌লুম।

"হামি? না বাবুজি।" তারপর খানিক থেমে যেন করুণ সুরে সে বল্‌ল, "আজ হামি বিক্রী কোরবে।"

"কৈ দেখি তোমার বাঁশী?" বলে' হাত বাড়ালুম। সেই গাছের ছায়ার ভেতর থেকে সে তা'র ছেঁড়া জামায় ঢাকা একটা বাঁশী বার করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

বল্‌লুম, "কৈ তোমার আর বাঁশি?"

"আউর নেই বাবুজি," সে বলে' চল্‌ল, "হামি তো বাঁশী বেচি না, হামি বাজায়। কিন্তু" এ জায়গায় তা'র স্বরটা যেন ভারী করুণ হয়ে এলো "কিন্তু আজ হামি বেচ্‌বে। বড় ভালো বাঁশী বাবু, হামি নিজে বানিয়েছে। ফুঁ দেন বাবু, এ বাঁশী বুলি বল্‌বে।"

বল্‌লুম, "সে তো আমি শুনেইছি, বড় মিষ্টি সুর। এতো সুন্দর সুর আগে আমি কখনও শুনি নি। তা ঐ বাঁশীর দাম কত?"

"আপ্‌নে যা' দেবেন বাবুজী তাই খুশীমে নেবে। বহুৎ মুস্‌কিল।"

পকেট থেকে একটা টাকা বার করে' তা'কে দিলুম। বস্তুতঃ এ যেন বাঁশীর দাম নয়, যে অদ্ভুত সুর আজ এই নিঝুম রাতে শুনেছি এ যেন তারই খানিকটা কৃতজ্ঞতা! খুশী হ'য়ে লোকটা যথাবিধি ধন্যবাদ জানিয়ে ওধারের পথের বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চাঁদটা আবার পরিষ্কার আকাশে জ্বল্‌ছে, ঝিকঝিক কর্‌ছে অনেক অনেক তারা,

মর্ম্মরিত হয়ে উঠেছে নারিকেলকুঞ্জ, আর কৃষ্ণচূড়ার সারি।.. তাড়াতাড়ি মেসের দিকে পা বাড়ালুম।

মেসের চারতলায় এক্‌লা একটি ছোট ঘরে থাকি। কাপড়-জামা বদ্‌লিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। সারাদিন আজ অনেক ঘুরেছি, রাত্রিও হ'য়েছে অনেক—ভেবেছিলুম শুলেই ঘুমিয়ে পড়্‌ব। কিন্তু ঘুম আজ কোথায়? বাঁশীর সেই বিশেষ সুরে সমস্ত দেহটা রিম্‌ঝিম্ করছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়্‌লুম। জান্‌লার পাশে লেখার টেব্‌ল্। আলো না জ্বালিয়ে বসে' পড়্‌লুম তারই পাশের চেয়ারটায়। জান্‌লার ভেতর দিয়ে এক ঝলক মৃদু জ্যোৎস্না বাঁকা ভাবে টেবলটায় এসে পড়েছে। সেই মৃদু আলোয় দেখ্‌লুম টেব্‌ল্এর ওপর আজ রাত্রে কেনা বাঁশীটাকে, তার গায়ে জড়ানো সোনালী তারগুলো ঝিক্‌মিক্ করছে—যেন ঝিকিয়ে ওঠা কোনও নরম স্রোত।· বাঁশীটা বাজালে তো হয়। বাঁশী আমি ভালোই বাজাই; দেখি, যে অদ্ভুত সুর আজ শুনেছি সে সুর আবার সৃষ্টি করতে পারি কিনা!

ধীরে ধীরে বাঁশীটা বেজে চল্‌ল। প্রথমে আঙুলে একটু জড়তা ছিল, ক্রমশঃ সে জড়তা গেল কেটে, ফুঁ দেবার আড়ষ্ট ভাবটাও সহজ হয়ে এলো। তারপর যেন আপন গতিতেই সে বাঁশী চল্‌ল বেজে'! সে বাঁশী বেজে' চলেছে আপন খুশীমত, আমি যেন শুধু একটা উপলক্ষ মাত্র! কখনও তা'র সুর উঠ্‌ছে চড়ায়, সূক্ষ্ম থেকে' সূক্ষ্মতর হ'য়ে——আজকের এই নিঝুম রাত্রি, দক্ষিণ-বাতাসে মর্ম্মরিত এই নারিকেল-কুঞ্জ যেন শিউরে শিউরে উঠছে সে সুরে, তারপর কোমল হ'য়ে আস্‌ছে তা'র সুর, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি যেন করুণ কান্নায় গলে' যাচ্ছে! নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম, এতো সুন্দর বাঁশী বাজাতে আমি তো কৈ কখনই পারি না! আমি যেন শুধু শ্রোতা হয়ে নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনতে লাগ্‌লুম—সে সুর আর আমারই কাছে দাঁড়িয়ে কোন্ এক অদৃশ্য শিল্পী যেন বাজিয়ে চল্‌ল সেই বাঁশী এক অদ্ভুত অপার্থিব কৌশলে!···

কতক্ষণ যে সেই রকম তন্ময় হয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলেছিলুম নিজেরই তা' খেয়াল নেই। হঠাৎ ঠিক পেছন থেকে শুন্‌লুম সেই স্বর, "বাবুজী!" চমকে উঠ্‌লুম, বাঁশী গেল থেমে'। মনে হ'ল যেন একটা পাৎলা কাঁচের বাসন মাটিতে পড়ে' ঝন্‌ঝন্ করে' চুরমার হ'য়ে গেল!

বল্‌লুম, "কে তুমি?"

"বাঁশীওলা।"

"কি করে এলে' তুমি এখানে, আর এতো রাত্রেই বা কেন?' বলতে বলতে হাতের কাছের আলোর সুইচ্‌টা টিপ্‌তে গেলুম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই অতি পরিচিত সুইচ্‌টা খুঁজে পেলুম না!

আবার শোনা গেল সেই স্বর, "বাতি জ্বেলে' কি হোবে বাবু? এম্‌নি আঁধারই থাক্।···বাবুজী, হামায় বাঁশীটা ফিরিয়ে দেন, হামি বিক্রী কোর্‌বে না।"

বল্‌লুম, "কেন? তুমি কি আরও বেশী দাম চাও? কত চাও, বল।"

বাঁশীওলা তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌ল, "না না বাবু। রূপেয়ার জন্যে বল্‌ছে না। "আমার দেওয়া টাকাটা সে ঠং করে' টেব্‌ল্এর ওপর ফেলে' দিল; "রূপেয়ার আর জরুরৎ নেই বাবু।···ও বাঁশী হামার চাই।"

দুঃখিত হয়ে বাঁশীটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লুম, "এটা তোমার বাঁশী, বিক্রী করা না করা সম্পূর্ণ তোমার খুশীর ওপর নির্ভর করে। কিন্তু বাঁশীটা সত্যিই আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।"

ছায়ামূর্ত্তি আমার হাত থেকে বাঁশীটা নিয়ে বল্‌ল, "বেয়াদপি মাফ্ কর্‌বেন বাবুজী। হামার কথা শুনেন্ ··" সে ধীরে ধীরে যা' বলে' চল্‌ল তা' এই:

তারা পশ্চিমে মুসলমান, বাবা তা'দের বাঁশী তৈরী কর্‌ত আর বাজাত। মা নেই ছেলেবেলা থেকে, সে আর তা'র একমাত্র ছোট বোন্, এই নিয়েই সংসার। তা'র বাবার কাছ থেকে সে বাঁশী বাজাতে শেখে'; কিন্তু হঠাৎ বুকের অসুখে তা'র বাবা মারা যায়। পথে পথে বাঁশী বাজিয়ে সে যা' পেতো তা'তেই তা'দের দু'জনের কোনও রকমে চলে' যেত। কিন্তু হঠাৎ তা'র ছোট বোন পড়্‌ল অসুখে; বাঁশি বাজিয়ে ডাক্তার আর পথ্যর টাকা তো আর জোগাড় করা চলে না। হু হু করে' অসুখ বেড়ে' চল্‌ল। তা'র বোন বাঁশী শুনতে খুব ভালোবাসে, জ্বরের ঘোরে কেবলই সে বাঁশী শুনতে চাইত—আর মাঝে মাঝে বল্‌ত সে মারা গেলে প্রত্যহ সন্ধ্যেয় তা'র দাদা যেন তা'র কবরের পাশে বসে বাঁশী বাজায়। আজ নাকি তা'র খুব বাড়াবাড়ী, পাড়ার এক ডাক্তার দয়া করে ভিজিট না নিয়েই তা'কে দেখে গিয়েছেন; কিন্তু ওষুধ কেনার পয়সাও তা'র কাছে নেই। কাজেই সে বাঁশীটা বিক্রী করেছিল। কিন্তু বাড়ী গিয়ে দেখে তা'র আর ওষুধ কেনার প্রয়োজন নেই, বোন্‌টি তা'কে ছেড়ে চিরকালের মত চলে গিয়েছে। তাই বাঁশী তা'র চাই-ই। এই বাঁশীর চেয়ে প্রয়োজনীয় তা'র কাছে আজ আর কিছু নেই!

বলতে বলতে বাঁশীওলার সুর ক্রমশঃ মিলিয়ে এলো।

বল্‌লুম, "চলে' গেলে না কি?"

কোনও উত্তর নেই। পূব্-আকাশে ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে শাদা আলো ফুটে' উঠ্‌ছে, যেন আলোর নিঃশ্বেসে উড়ে' যাচ্ছে অন্ধকারের ধুঁয়ো! সুইচের জন্যে হাত বাড়ালুম, কি আশ্চর্য্য—হাতের কাছেই তো সেটা রয়েছে!

সমস্ত ঘরটা আলোয় ভরে' উঠ্‌ল। ঘরের দরজা যথাবিধি বন্ধ; আর টেব্‌লএর ওপর কোথায় টাকাটা? কালো বাঁশিটা তা'র সোণালী তারে জড়ানো দেহটা নিয়ে ইলেকট্রিক্ আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে।

আখের ছোব্‌ড়া

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ এম-এ

(প্রবন্ধ)

হেয় অনাদৃত একান্ত অকিঞ্চিৎকর আখের ছোব্‌ড়ার আবার ভবিষ্যৎ! তবু মনে আশা জন্মে, যখন সহৃদয় ভাবুক কেহ আমার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া আমাকে স্বপ্ন-বিভোর করেন। গ্রাৎসিয়ানির নির্ম্মম দণ্ডে নিপীড়িত হাব্‌সীদের মত আমরাও দলে দলে যন্ত্র দানবের দশনে নিষ্পিষ্ট। যুনিভার্সিটির পাশকরা বাংলার যুবকদের মত স্তূপাকারে পড়ে আছি শীতলখ্যা, শোণ আর ঘর্ঘরার তীরে—শিথিলতনু, হৃতবিভব ও আনন্দরস-লেশহীন। মনে জাগে অতীত গৌরব, মিষ্ট রসে পূর্ণ ছিল যখন আমার ঋজু দৃঢ় তনু, মুক্তাদন্ত ও সুকোমল সরস অধরের মদির-মোহে আত্মবিসর্জ্জনের নির্ম্মম কাহিনী; তার পর পথ পার্শ্বে, আঙ্গিনার আনাচে কানাচে প'ড়ে থাকা জাতি-কুল-মানহীন স্বজন-পরিত্যক্ত লাঞ্ছিত রমণীর মত লুব্ধ কৃমি কীটের আক্রমণের দুর্ভাবনা নিয়া। হয়তো কোন করুণাময়ী একটু আশ্রয় দিতেন—শীতের রাত্রিতে সেবা লাভের সদিচ্ছায়! তবু ভাল ছিলাম, একা একা জ্বলিয়াই নিঃশেষিত হইতাম। কিন্তু আজ আর তাহা হয় না। এখন আমরা জ্বলি দলে দলে, স্তূপাকারে বিরাট উনানে, নিগ্রহকারীর শক্তি বৃদ্ধি কল্পে। সাঁওতালী কালো কদাকার কয়লার পরিবর্ত্তে কলওয়ালারা আমাদের তুষার-শুভ্র ক্লিষ্ট তনুই পোড়ায়, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিতে, আমাদের স্ববর্গ চিনি জ্বাল দিতে—অসহায় আমরা অনিচ্ছায় ভ্রাতৃবিরোধের হেতুভূত হই। আমাদের তাপ-শক্তি দ্বারাই মাত্‌গুড় ও চিনিকে তারা বিচ্ছিন্ন করে। বিলাস প্রসাধনে মাজ্জিত করিয়া চিনিকে তারা সভ্য পংক্তিতে তুলিয়া লয়। চিনি তখন নিজ আত্মীয়কেও চিনিতে পারে না, হাল আমলের প্রভুপদসেবী বড় চাকুরেদের মত। চিনি অনেক বিষয়ে এই সকল চাকুরেদিগের সহিত তুল্য গুণ সম্পন্ন। হয়ত এ কারণেই তাহাদের বৈঠকখানা (drawing room) হইতে রান্না ঘর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র চিনির এত আদর! উজ্জ্বল কাচ পাত্রে চায়ের সরঞ্জামের সহিত চিনিও তাহাদের অপরিহার্য্য সঙ্গী। বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে চিনির মধ্যে প্রাণবস্তুর (vitamine) একান্তই অভাব। কিন্তু তাহারই স্ববর্গ মাত্‌গুড়ে মিষ্টত্ব এবং প্রাণ-বস্তু (vitamine) উভয়ই বর্ত্তমান। তবু মলিন মাত্‌গুড় উপেক্ষিত ও "অপমানিত"; তাহাকে নিষ্ফল বিনাশের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে লোকচক্ষুর অগোচরে—বাংলার দরিদ্র কৃষকদের মত—যারা প্রতিনিয়ত মরিতেছে ম্যালেরিয়া, কলেরা, অনশন ও বসন্তে, অজ্ঞাতে, দেশ প্রান্তে। এদের কাহারও দুর্দ্দশা ঘোচাবার চেষ্টা দেশের কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। সমভাবে বিপন্ন বলিয়াই হয়ত ইহাদের উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। চাষীর চাই মাত্‌গুড় ২৪ ঘণ্টা, তাম্রকূট সেবন জন্য। চাষী বৌর চাই সস্তা গুড়, গরিবের ঘরের মোয়া লাড্ডু তৈরীর জন্য। মাত্‌গুড়ের এই অল্পপরিসর স্থান-টুকুর উপরও জোর আক্রমণ চলিয়াছে—বিদেশী সিগারেট আসিয়াছে তাহার কটু-তীব্র গন্ধ নিয়া। এখন কৃষকের মন 'মাঠে' তৈরী তামাকের "ভিজা-মিঠা" গন্ধে আর আবদ্ধ থাকিতে চাহে না!

মাত্‌গুড়ের দুঃখের অন্ত নাই! আমি আখের ছোব্‌ড়া জ্বলি, মুহূর্ত্তে ভস্ম হই; দুঃখের দিনের অন্ত হয়। কিন্তু মাত্‌গুড়ের জন্য ব্যবস্থা অন্যরূপ। তাহাকে জীবন্ত ফেলিয়া দেয়, নালায় ও নদীতে; সেখানে হয় তাহাকে বালুর সহিত মিশিয়া থাকিতে হয়, নয় তাহার পচা বিভক্ত শরীর মাছ ও কুমীরে খায়। বঙ্গ-বিহারের নিরন্ন কৃষকের মত মাত্‌গুড়ও দশ ও দেশের জন্য নিজের শক্তিটুকু নিঃশেষে নিয়োগ করিতে উৎসুক;—তাহারা উপায় খুঁজিয়া পায় না মহানুভব কেহ তাহাদের অন্তর্গূঢ় বেদনায় ব্যথিত হইলে

তাহাদের শক্তির সুসঞ্চয় ও প্রয়োগের যথাযথ নির্দ্দেশ দিতে অগ্রসর হয়েন না! ছোট বড় সকল স্বাধীন দেশেই উপেক্ষিত কৃষক ও মাত্‌গুড়ের দীন দশার উন্নতি হইয়াছে। মাত্‌গুড়কে এখানেও দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে লাগান যাইতে পারে। বাংলা বিহারে যারা কাজের অভাবে বেকার—তাহাদিগের চাহিদা হয়—দূর দেশে চা, চিনি ও রবারের ক্ষেত্রের সস্তা কুলিগিরির জন্য। উপেক্ষিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হাড়ের আদর হয় সাগর পারের দেশগুলিতে। জাহাজ বোঝাই করিয়া সেগুলি চালান করা হয়। এদিকে দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি তুচ্ছ হাড়গুলির অভাবে নষ্ট হয়। হাড়ের মতই অপ্রয়োজনীয় বোধে যে-মাত্‌গুড়ের অমিত অপচয় হইতেছে, তাহাকেই বিদেশী বণিক জাহাজে বোঝাই করিয়া নিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। বিলাতে ভারতীয় মাত্‌গুড় চালান দিবার জন্য একটী কোম্পানীও অধুনা গঠিত হইয়াছে। মাঠে ঘাটের হাড়গুলিকে হাতছাড়া করিবার ফলে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দেশের লোক এখন অবশ্যই বুঝিয়াছে। মাত্‌গুড়ের সেইরূপ অপচয় না ঘটে তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যে-যে-ভাবে ব্যবহৃত হইয়া মাত্‌গুড় দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে নিম্নে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল।

১। জমির সার হিসাবে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলরতন ধর মহাশয় এ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন এবং অন্যান্য দেশেও ইহার অনুরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে।

২। গরুর খাদ্য হিসাবেও ইহা প্রচলিত হইতে পারে। প্রভূত পরিমাণে রাবগুড় উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া ইহার মূল্য খুব কম। এই কারণে দরিদ্র কৃষককুল গরুর খাদ্য হিসাবে ইহা ব্যবহার করিতে পারিবে।

৩। পিচের পরিবর্ত্তে ইহা রাস্তায় ব্যবহার করা যায় কিনা এবং কি ভাবে করা যাইতে পারে তাহা পরীক্ষা করাও প্রয়োজন।

৪। অন্য প্রকারে ব্যবহার সম্ভব না হইলে নদীতে না ফেলিয়া আখের ছোব্‌ড়ার সঙ্গে ইহাকে জ্বালান যায় কিনা সেই চেষ্টাও নিরর্থক হইবে না।

৫। মাত্‌গুড় হইতে যথেষ্টপরিমাণ সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। প্রভূত পরিমাণে সুরাসার প্রস্তুত হইলে তাহা প্রয়োগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। "মেথিলেটেড্‌ স্পিরিট" ইহা হইতেই প্রস্তুত হইতে পারে। বহু পরিমাণ সস্তা "মেঃ স্পিরিট" বাংলাদেশে আসে জাভার চিনি-কোম্পানীগুলি হইতে। বাংলা ও বিহারের চিনির কলে এই স্পিরিট তৈয়ারীর আনুসঙ্গিক কারখানা স্থাপিত হইলে জাভার স্পিরিটের পরিবর্ত্তে দেশজাত স্পিরিট পাওয়া যাইতে পারে আরো সস্তায়। এইরূপে ধুঁয়াহীন জ্বালানীরূপে ইহার বিস্তৃত ব্যবহারও প্রচলিত হইতে পারে। মটরগাড়ীর পেট্রোলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া তরল ইন্ধন রূপে বিভিন্ন দেশে ইহা প্রচলিত হইয়াছে আইনের সাহায্যে। ব্রাজিলে যত পেট্রোল ব্যয় হয়, তার শতকরা ৫ ভাগ সুরাসার ক্রয় করা পেট্রোল ব্যবহারকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক।

ছোট্ট রাষ্ট্র জেকোশ্লোভোকিয়ায় প্রতিবৎসর সুরাসার মিশ্রিত পেট্রোল ব্যয় হয় প্রায় ১ কোটী ১০ লক্ষ গ্যালন। ইহার শতকরা ৯৮ ভাগ পেট্রোলই সুরাসার মিশ্রিত; সুরাসারের অংশ ইহাতে শতকরা বিশভাগের কম নহে। ইহার ব্যতিক্রমকারী দেশের আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, গ্রীস, ইটালী, অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গারী, অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন, ল্যাটাভিয়া, যুগশ্লেভিয়া প্রভৃতি দেশে পেট্রোলের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুরাসার মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা চিনির কলে উৎপন্ন মাত্‌গুড়ের অপচয় নিবারিত হইয়াছে। পরন্তু ইহার আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে সহজাত চিনির সমপর্য্যায়ভুক্ত সভ্য শ্রেণীতে ইহার আদর বাড়িয়াছে। বাংলা ও বিহারেও মাত্‌গুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত হইলে দেশের বিশেষতঃ চিনির কলগুলির আয় বাড়িবে। এদিকে সুরাসার সস্তায় পাওয়া গেলে রাসায়নিক ও নানাবিধ শিল্প প্রচেষ্টার বিস্তারও সম্ভব হইবে। অপর দিকে চিনির উপর উৎপাদন-শুল্ক বসাইয়া চিনির কলগুলির যে ক্ষতি করা হইয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ পূরণ হইবে। মেঃ স্পিরিটের বর্ত্তমান মূল্য অপেক্ষা দেশজাত স্পিরিটের মূল্য কম হইবে, তদ্দরুণ বিদেশী কেরোসিনের সহিতও ইহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। কেরোসিনের বাতির

পরিবর্ত্তে "স্পিরিটের" উজ্জ্বল আলো দেশ মধ্যেই উদ্ভাবিত হইবে। তখন ধূম্রবহুল কেরোসিনের লণ্ঠন অনেকটা অপাংক্তেয় হইয়া পড়িবে। আমাদের একমাত্র আশঙ্কা এই পরিকল্পনায় বিদেশী বণিক বিমর্ষ হইবে এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার পথে নানা বাধা সৃষ্টি করিবে।

মাত্‌গুড়ের "পারমার্থিক" জীবনের চিত্রটী আশাপ্রদ হইলেও আখের ছোব্‌ড়ার ভবিষ্যত তেমন উজ্জ্বল নয়; তথাপি এখনও আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হই নাই। এখন আমরা সঙ্ঘশক্তির কথা প্রতি নিয়ত শুনি এবং তাহাতে বিশ্বাস ও নির্ভর করি। আখের ছোব্‌ড়াও নিম্ন প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ করিতে পারে।

১। আখের ছোব্‌ড়াকে আরো মর্দ্দিত মথিত করিয়া ছাতকের চূণ ও কর্ণফুলীর কর্দ্দমের সহিত একত্র পোড়াইয়া এক প্রকার সিমেণ্টের টালি করা সম্ভব হইতে পারে। উহা পাতলা ও শক্ত হইবে। টিনের পরিবর্ত্তে ইহার প্রচলন বেশী হইবে—কারণ ইহা এক দিকে যেমন সস্তা হইবে, অপরদিকে টিনের ঘর অপেক্ষা অনেক শীতল হইবে।

২। কাগজ তৈরী করার জন্য বাঁশের ও কাঠের পিণ্ডের পরিবর্ত্তে ইহাদের পিণ্ডও ব্যবহৃত হইতে পারে। আখের ছোব্‌ড়ার পিণ্ড হইতে যে কাগজ তৈরী হইবে তাহা একটু খস্‌খসে হওয়া সম্ভব। তাহা দ্বারা লিখিবার কাগজ ভাল না হইলেও বস্তা ও পোট্‌লা বাঁধার কাজ চলিবে। বিশেষতঃ তাহা চিনির ছালা স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আজকাল চিনিকে পাটের ছালার আশ্রয় নিতে হয় বলিয়া তাহার মধ্যে পাটের আঁশের বিরক্তিকর আবির্ভাব সর্ব্বদাই ঘটে। চিনিকে শ্রদ্ধার সহিত আমরা বেশী পরিষ্কৃত রাখিতে পারিব। আমাদের তৈরী কাগজ ওরূপ লোমশ হইবে না।

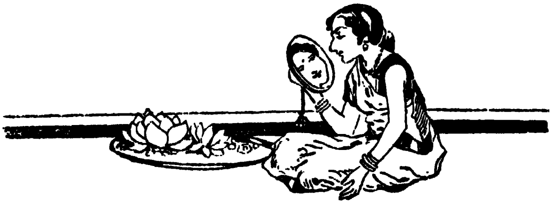
৩। জলে ভিজাইয়া মাত্‌গুড় সহযোগে আমাদিগকে বর্ষাকালে গরুর খাদ্য হিসাবে কাজে লাগান যায় কি না তাহার পরীক্ষাও আমরা দিতে প্রস্তুত।

৪। আমাদের আঁশ বেশ দৃঢ় ও লম্বা। নারিকেলের রশির মত রশিও হয়ত আমরা পাকাইতে পারি। তাহাদের মত গরম জাজিমও আমরা না করিতে পারি তা' নয়। তবে উহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার অভিলাস সম্প্রতি আমাদের নাই।

৫। নাইট্রিক এসিড্‌ সহযোগে নাইট্রো সেলিউলোজ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদির প্রয়োগ-সম্পর্কিত হইয়া সেলিউলয়েড্‌ জাতীয় পদার্থ প্রণয়নে আমাদের উপযোগিতা আছে কি না, সুধীগণ তাহা বিচার করিবেন।

[দেশে ক্রমশই চিনির কলের সংখ্যা বাড়িতেছে। সেজন্য তাহাদের পরস্পর প্রতিযোগিতাও দিন দিন বাড়িবে। উৎপাদন-শুল্ক প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বহির্ভারতীয় চিনির সহিতও দেশীয় চিনির প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। নূতন নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ পনর ষোল বৎসর পরে চিনির কলগুলিকে একে অন্যের সহিত যে ভাবে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে, তাহাতে চিনি কোম্পানীগুলির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে।

মাত্‌গুড় ও আখের ছোব্‌ড়াগুলির অপচয় না করিয়া তাহা হইতে কিছু লাভ হইতে পারে এরূপ কোন শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস উৎসাহ ও সমর্থন পাইবার যোগ্য। যে সময়ে চিনির কলগুলি বন্ধ থাকে, ঐ সময়ে এই সকল শিল্পের কাজ অল্পায়াসে ও স্বল্পব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা হইতে অল্প পরিমাণ লাভ দাঁড়াইলে ও প্রবল প্রতিযোগিতার সময়ে চিনির কলগুলির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।]



ঝিন্দের বন্দী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার পূর্ব্বদক্ষিণ অঞ্চলে কোনো একটা নামজাদা রাস্তার উপর পদার্পণ করিলেই জমিদার রায়-বংশের যে প্রকাণ্ড বাড়ীখানা চোখে পড়ে, সেটা প্রায় বিঘা দশেক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। আগাগোড়া পাথরে তৈয়ারী দুই-মহল বাড়ী, সম্মুখে মোটামোটা থামের সিং-দরজা। সিং-দরজার ভিতর দিয়া লাল কঙ্করের চওড়া রাস্তা বাড়ীর সম্মুখের গাড়ী বারান্দা ঘুরিয়া আবার ফটকের কাছে আসিয়া মিলিয়াছে। বাড়ীর দক্ষিণ দিকে কিছুদূরে জমিদারী শেরেস্তার একটানা ছোট ছোট কুঠরি ও গাড়ি-মোটর রাখিবার গারাজ ইত্যাদি। বাঁ-দিকে টেনিস খেলিবার ছাঁটা ঘাসের মাঠ ও ব্যায়ামের নানাবিধ সরঞ্জাম। চারিদিকে দেশী বিলাতী ফুলের বাগান এবং সর্ব্বশেষে বসতবাটি ঘিরিয়া ঢালাই লোহার উচ্চ গরাদযুক্ত পাঁচিল।

এই বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক দুই ভাই, শিবশঙ্কর ও গৌরীশঙ্কর রায়। জ্যেষ্ঠ শিবশঙ্করের বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর, ইনি বিবাহিত। প্রত্নতত্ত্বের দিকে খুব ঝোঁক—সর্ব্বদাই লাইব্রেরীতে বসিয়া পুরাতত্ত্ববিষয়ক বই পড়েন, কিম্বা নিজের বংশের পুরাতন পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরোধ সম্বন্ধে কয়েকটা নূতন কথা আবিষ্কার করিয়া গুণীসমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

ছোট ভাই গৌরীশঙ্করের মনের গতি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-ধারী হইলেও খেলাধূলা ব্যায়াম জিমন্যাষ্টিকের দিকেই তাঁহার আকর্ষণ বেশী, দাদার মত বই মুখে দিয়া পড়িয়া থাকিতে কিম্বা পুরাতন দলিল ঘাঁটিয়া পিতৃ-পিতামহের দুষ্কৃতির নজির বাহির করিতে তিনি ব্যগ্র নন। গৌরীশঙ্কর অদ্যাপি অবিবাহিত, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়—অতিশয় সুপুরুষ। রায় বংশ ডাকসাইটে সুপুরুষ বংশ বলিয়া পরিচিত; গৌরীশঙ্কর যে তাহার ব্যতিক্রম নয় তাহা তাঁহার গৌরবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই আর সন্দেহ থাকে না।

কিন্তু ইঁহাদের কথা পরে হইবে। প্রথমে এই রায়বংশের গোড়ার কথাটা বলিয়া লওয়া যাক।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে এই বংশের ঊর্দ্ধতম পঞ্চম-পুরুষ কালীশঙ্কর রায় হঠাৎ একদিন পাঁচখানা বজ্‌রা সহযোগে আদিগঙ্গার ঘাটে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং কালীঘাটে মহাসমারোহে সোপচারে পূজা দিলেন। অতঃপর অল্পকালের মধ্যে তিনি দক্ষিণ অঞ্চলে এক মস্ত জমিদারী কিনিয়া ফেলিলেন এবং কলিকাতার সন্নিকটে মাঠের মাঝখানে এক ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া রায় দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় উপাধি ধারণ করিয়া মহা ধুম-ধামের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কোথা হইতে আসিলেন কেহ জানিল না; কিন্তু সেজন্য সমাজে তাঁহার গতি প্রতিহত হইল না। যাহার টাকা আছে তাহার দ্বারা সকলই সম্ভব; বিশেষ কালীশঙ্কর বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি তাৎকালিক কলিকাতার বরেণ্য সমাজের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। কলিকাতার শতাব্দী পূর্ব্বের সামাজিক ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, রায় দেওয়ান কালীশঙ্করের নাম সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অপর্য্যাপ্ত ভাবে ছড়ানো আছে।

কিন্তু এতবড় লোকের বংশরক্ষার দিকেও নজর রাখিতে হয়। বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করিয়া গেলেও কালীশঙ্কর অতিশয় সুপুরুষ ও মজ্‌বুত লোক ছিলেন; সুতরাং তিনি অবিলম্বে সদ্বংশজাতা একটি স্ত্রী গ্রহণ করিয়া একযোগে সংসার ধর্ম্ম ও পারলৌকিক ইষ্টের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

রায় দেওয়ানকে কিন্তু স্ত্রী ও সাংসারিক সুখৈশ্বর্য্য বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না।

বছর পাঁচেক পরে একদিন রাত্রিকালে কোনো ধনী-বন্ধুর বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিবার পথে নিজের সিংদরজার প্রায় সম্মুখে রায় দেওয়ান খুন হইলেন। তিনি পাল্‌কি চড়িয়া আসিতেছিলেন, সঙ্গে হুঁকা-বরদার ও দুইজন মশাল্‌চি ছিল। নির্জ্জন রাত্রি, হঠাৎ চারজন অস্ত্রধারী দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাল্‌কির বেহারা উড়িয়াগণ পাল্‌কি ফেলিয়া দৌড় মারিল। হুঁকা বরদার ও মশাল্‌চিদ্বয়ও বোধকরি উড়িয়াদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা পরে তাহা স্বীকার করিল না। বরঞ্চ প্রভুর রক্ষার জন্য আততায়ীর সহিত কিরূপ অমিত-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ নিজ নিজ দেহে বহু দাহ ও ক্ষতচিহ্ন দেখাইল। সে যাহোক, দেউড়ি হইতে লোকজন আসিয়া যখন রায় দেওয়ানকে পালকি হইতে বাহির করিল তখন তাঁহার দেহে প্রাণ নাই, শুধু একটা ছোরার সোনালি মুঠ্‌ বুকের উপর উঁচু হইয়া আছে।

কলিকাতায় কোম্পানীর শাসন তখন খুব দৃঢ় হয় নাই। এরকম খুনজখম লুটতরাজ প্রায়ই শুনা যাইত। কলিকাতা সহর তখন অর্দ্ধেক জঙ্গল বলিলেই চলে; দিনের বেলা চৌরঙ্গীর আশে পাশে বাঘের ডাক শুনা যাইত। সুতরাং কাহারা রায় দেওয়ানকে খুন করিল এবং কেনই বা করিল তাহার কোনো কিনারা হইল না। উপরন্তু রায় দেওয়ানের অঙ্গস্থিত হীরার আংটি সোনার চেন কিছুই খোয়া যায় নাই দেখিয়া আততায়ীদের এই অহেতুক জীবহিংসায় সকলের মনেই একটা ধাঁধাঁর ভাব রহিয়া গেল।

শুধু অনেক অনুসন্ধানের পর হুঁকাবরদারের নিকট হইতে এইটুকু জানা গেল যে হত্যাকারীরা এদেশীয় লোক নয়; তবে তাহারা যে কোন্ দেশের লোক তাহাও সে বলিতে পারিল না। কারণ হত্যা করিবার পূর্ব্বে যে ভাষায় তাহারা রায় দেওয়ানকে সম্বোধন করিয়াছিল তাহা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

এ ছাড়া প্রমাণের মধ্যে সেই সোনার মুঠ-যুক্ত বাঁকা ইস্পাতের ছুরিখানা। ছুরীখানার গঠন এতই অদ্ভুত যে তাহা বাংলা দেশে তৈয়ার বলিয়া মনে হয় না। সেই সোনার মুঠের উপর যে দু' চারিটি অক্ষর খোদাই করা ছিল আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে পারে নাই।

এই সমস্ত প্রমাণ সাক্ষী সাবুদ একত্র করিয়া কেবল এইটুকুই অনুমান করা গেল যে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণের সময় কালীশঙ্কর হয়ত কোনো শক্তিশালী লোকের শত্রুতা করিয়াছিলেন—তাহারি অনুচরেরা খুঁজিতে খুঁজিতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। এ ছাড়া এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোন দিক দিয়া আর কিছু জানা গেল না।

ইহাই বলিতে গেলে রায়বংশের আদিপর্ব্ব। তারপর কি করিয়া কালীশঙ্করের সেই স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্র কোলে লইয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে জমিদারী শাসন করিয়া অচিরাৎ 'রায়-বাঘিনী' উপাধি অর্জ্জন করিলেন এবং তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত রায় পরিবার কি করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব ও বংশগরিমা রক্ষা করিয়া আসিতেছে সে-সব কথা লিখিয়া গ্রন্থ ভারাক্রান্ত করিতে চাহিনা। রায়বংশের ইতিহাস এইখানেই চাপা থাকুক। পরে প্রয়োজন হইলে এই ছেঁড়া পুঁথির পাতা আবার খুলিলেই চলিবে।

সন্ধ্যার পর শিবশঙ্কর তাঁহার বৃহৎ লাইব্রেরী ঘরে বিদ্যুৎবাতি জ্বালিয়া একাকী বসিয়া একখানা মোটা চামড়া বাঁধানো পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। ঘরের দেয়ালগুলা অধিকাংশই মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত পুস্তকের আলমারি দিয়া ঢাকা। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা—চলিতে ফিরিতে শব্দ হয় না। ঘরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটেরিয়েট্ টেব্‌ল, তাহার চারিপাশে কতকগুলি গদিমোড়া চেয়ার। ঘরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখের দেয়ালে একখানা তৈলচিত্র টাঙানো দেখা যায়—এটি বংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান কালীশঙ্করের প্রতিকৃতি। প্রমাণ মানুষের ছবি—মাথায় পাগড়ী ও গায়ে ঘুন্টিদার মেরজাই পরা; মুখচোখ বুদ্ধির প্রভায় যেন জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। দেড়শত বৎসরের পুরাতন হইলেও ছবিখানি এখনো বেশ ভাল অবস্থায় আছে—দাগ ধরিয়া বা পোকায় কাটিয়া নষ্ট হয় নাই।

শিবশঙ্কর একমনে পড়িতেছেন এমন সময় তাঁহার স্ত্রী অচলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ স্বামীর চেয়ারের

পিছনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বেশ একটু শব্দ করিয়া পাশের একখানা চেয়ারে বসিলেন। প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে এই উনিশ বছরের বধূটি একেবারে একা—বাড়ীতে দাসী চাকরাণী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক নাই। তাই দিনের বেলাটা কাজে কর্ম্মে যদি বা কোনো মতে কাটিয়া যায়, সন্ধ্যার পর স্বামী লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলে আর যেন সময় কাটিতে চাহে না। দেবর গৌরীশঙ্করও কয়েকদিন ধরিয়া কি একটা খেলায় এমন মাতিয়াছেন যে দুদণ্ড বসিয়া গল্প করা ত দূরের কথা, তাঁহার দর্শন পাওয়াই ভার হইয়া উঠিয়াছে।

শব্দ শুনিয়া শিবশঙ্কর বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং স্ত্রীর দিকে ফিকা রকম একটু হাসিয়া আবার পুস্তকে মনোনিবেশের উদ্যোগ করিলেন।

অচলা নিজের চেয়ারখানা স্বামীর দিকে একটু টানিয়া আনিয়া বলিল—'বই রাখো। এস না একটু গল্প করি।'

শিবশঙ্কর চমকিত হইয়া বলিলেন—'অ্যাঁ। ওঃ—হ্যাঁ, বেশ ত। তা—গৌরী কোথায়?'

অচলা হাসিয়া বলিল—'ঠাকুরপো এখনো ক্লাব থেকে ফেরেনি। ভারি মুষ্‌ড়ে গেলে—না? ঠাকুরপো থাকলে আমাকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বই পড়তে পারতে।'

শিবশঙ্করও হাসিয়া ফেলিলেন—'না না, তা নয়। তাকে ক'দিন দেখিনি কিনা—তাই ভাবছিলুম, সেবারকার মত লক্ষ্ণৌ কি লাহোর পাড়ি দিলে বুঝি।'

অচলা বলিল—'তোমাকে না বলে, তোমার অনুমতি না নিয়ে ত ঠাকুরপো কোথাও যায় না।'

'তা বটে'—শিবশঙ্কর একটু হাসিলেন—'আজকাল বুঝি তলোয়ার খেলায় মেতেছে। গোয়ালিয়র না যোধপুর থেকে একজন বড় তলোয়ার খেলোয়াড় এসেছে, তারই কাছে দিশী তলোয়ার খেলা শেখা হচ্ছে। এই ত মাস কয়েক আগে কোন্ একটা ইটালিয়ান্‌কে মাইনে দিয়ে রেখে ফেন্সিং শিখ্‌ছিল। তার আগে কিছু দিন বক্সিংএর পালা গেছে। এবার গোয়ালিয়র ঘাড় থেকে নামলে আবার কি চাপে দেখ।'

অচলা বলিল—'সত্যি বাপু, সময়ে বিয়ে না দিলে আজকালকার ছেলেরা কেমন একরকম হয়ে যায়। তুমিও ত কিছু করবে না, কেবল বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকবে। ঠাকুরপোর বৌ এলে আমার কত সুবিধা হয় ভাব দেখি? এক্‌লাটি এত বড় সংসারে কি মন লাগে?'

শিবশঙ্কর মৃদুহাস্যে বলিলেন—'সেইটেই তাহলে আসল কথা। কিন্তু কি করি বল, বিয়ের কথা তুললেই সে হেসে উড়িয়ে দেয়।'

অচলা বলিল—'তাই বলে সারা জন্ম কি কুস্তি করে আর তলোয়ার খেলে কাটাবে না কি। বিয়ে-থা সংসার ধর্ম্ম করতে হবে না?'

বাহিরের গাড়ীবারান্দায় মোটরের গুঞ্জন শব্দ শোনা গেল। শিবশঙ্কর বলিলেন—'প্রশ্নটা ওকেই করে দেখ। ওই বুঝি সে এল।'

হাফ্‌প্যাণ্ট পরা কামিজের গলা খোলা গৌরীশঙ্কর সেই ঘরেই আসিয়া প্রবেশ করিল। অচলাকে দেখিয়া বলিল—'ইস্, অচলবৌদি' একেবারে দাদার ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়েছ যে। এবারে দেখছি দাদাকে লাইব্রেরীর দোরে শান্ত্রী বসাতে হবে।'

অচলা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—'তুমি আমাকে অচল-বৌদি বলবে কেন বল ত? শুধু বৌদি বলতে পার না?'

গৌরী বলিল—'বৌদিদি-হিসাবে তুমি যে একেবারেই অচল এইটি পাঁচজনকে জানানোই আমার উদ্দেশ্য—এ ছাড়া অন্য অভিপ্রায় নেই।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'আজকাল ত তবু খাতির করে অচল-বৌদি বল্‌ছে, বছর চারেক আগে পর্য্যন্ত যে শুধু অচল বলেই ডাকত!'

বস্তুত অচলা এ সংসারে আসিয়া অবধি এই দুইটি কিশোরকিশোরীর মধ্যে দেবর-ভ্রাতৃজায়ার সরস সম্পর্কের সহিত ভাইবোনের মধুর স্নেহ মিশিয়াছিল। অচলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—'বেশ ত, আমি যদি এতই অচল হয়ে থাকি, একটি সচল বৌদি ঘরে নিয়ে এস; আমি না হয় এক কোণে পড়ে থাক্‌ব।'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'ওরে বাস্ রে, তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে! দাদাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সকলকে সেই কোণেই আশ্রয় নিতে হবে যে।'

অচলা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—'সে যেন হল। কিন্তু আজ তিন জন ঘটক এসেছিল যে!'

গৌরী বলিল—'আবার ঘটক! দরোয়ানগুলোকে

তাড়াতে হল দেখছি। তাদের পৈ পৈ করে বলে দিয়েছি ঘটক দেখলেই অর্দ্ধচন্দ্র দেবে, তা হতভাগারা কথা শোনে না।'

এই সময় বেয়ারা দরজার বাহির হইতে জানাইল যে একটি ভদ্রলোক মুলাকাত করিতে চাহেন, হুকুম পাইলে সে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসে।

গৌরী বলিল—'এই সেরেছে—ঘটক নিশ্চয়। আমাকে পালাতে হ'ল। দাদা তুমি লোকটাকে ভালয় ভালয় বিদেয় করে দাও।'

'খবরদার বলছি, ঘটক তাড়াতে পাবে না। বাড়ীতে সোমত্ত আইবুড় ছেলে, ঘটক আসবে না ত কি?' বলিয়া অচলা হাসিতে হাসিতে ভিতরের দরজা দিয়া প্রস্থান করিল।

গৌরীও অচলার অনুগমন করিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন—'পালাস্ নে, ব'স্। হুকুম শুন্‌লি ত।'

গৌরী টেব্‌লের একটা কোণে বসিয়া বলিল—'না: এরা আর বাড়ীতে টি'কতে দিলে না। এবার লম্বা পাড়ি জমাতে হবে দেখছি—একেবারে কাশ্মীর, না হয় আরাকান।'

শিবশঙ্কর আগন্তুককে ডাকিয়া আনিবার জন্য বেয়ারাকে হুকুম দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিছুক্ষণ পরে যে লোকটি পরদা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল তাহাকে কিন্তু বাংলা দেশের ঘটক সম্প্রদায়-ভুক্ত করা একেবারেই অসম্ভব। লোকটি বাঙালী নয়, তবে কোন জাতীয় তাহা চেহারা বা বেশভূষা দেখিয়া অনুমান করা কঠিন। মাথায় মাড়োয়ারী ধরণের খুনখারাবী রঙের পাগড়ী, গায়ে দামী সিল্কের সেকেলে ধরণের পুরা আস্তিন আঙ্‌রাখা, পরিধানে বারাণসী চেলী, পায়ে লাল মখমলের উপর সাঁচ্চার কাজ করা নাগ্‌রা। গলায় সরু সোনার শিকলি দিয়া আট্‌কানো একটা মোহর—তাহার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পান্না ঝকঝক করিতেছে। দুই কানে দুটা সুপুরীর মত রুবি হইতে আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

লোকটির বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোঁপ কাঁচাপাকা। গায়ের বর্ণ নিকষের মত কালো। কিন্তু কি অপূর্ব্ব দেহের ও মুখের গঠন। যেন হাতুড়ি দিয়া লোহা পিটিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে। ঘন ভ্রূর নীচে চক্ষু দুটা ইস্পাতের ছুরির মত ধারালো।

লোকটি ঘরে ঢুকিয়াই দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার দৃষ্টি দেয়ালে টাঙানো কালীশঙ্করের তৈল-চিত্রটার উপর নিবদ্ধ হইল। কিছুক্ষণ নিষ্পলকনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে চক্ষু ফিরাইয়া বিশুদ্ধ ব্রজবুলিতে জিজ্ঞাসা করিল—'এ ছবি এখানে কি করে এল?'

আগন্তুকের অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া দুই ভাই অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, এইবার গৌরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—'মাপ করবেন। আমার ব্যবহারে আপনারা কিছু আশ্চর্য্য হয়েছেন। আমি এখনি নিজের পরিচয় দেব; কিন্তু তার আগে ইনি কে জানতে পারি কি?'

গৌরী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'উনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান কালীশঙ্কর রায়।'

'কালীশঙ্কর রাও!' লোকটির দুই চোখ উত্তেজনায় জ্বলিয়া উঠিল; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল; তারপর বলিল,—'বস্‌তে পারি কি?'

গৌরী স্বহস্তে একখানা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল—'বসুন।'

লোকটি উপবেশন করিয়া বলিল—'বাবু সাহেব, সমস্তই নিয়তির খেলা। তা না হলে—নিতান্ত অপরিচিত আমি, আজ দেওয়ান কালীশঙ্কর রাওয়ের বংশধরদের সঙ্গে কথা কইছি কি করে?'

গৌরী হাসিতে হাসিতে বলিল—'এ আর আশ্চর্য্য কি! কালীশঙ্কর রায়ের বংশধরদের সঙ্গে অনেকেই ত কথা কয়ে থাকেন!'

লোকটি বলিল—'তা নয়। আপনি এখন আমার কথা বুঝ্‌বেন না।—আচ্ছা, আপনারা কখনো ঝিন্দ দেশের নাম শুনেছেন কি?'

গৌরী স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'ঝিন্দ্! ঝিন্দ্! নামটা চেনা-চেনা ঠেক্‌ছে—'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'ঝিন্দ মধ্য ভারতের একটা ছোট্ট স্বাধীন রাজ্য। দাঁড়ান্ বলছি।' তিনি উঠিয়া একটা আল্‌মারি হইতে একখণ্ড মোটা বই বাহির করিয়া সেটার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একস্থানে আসিয়া থামিলেন। বলিলেন—'এই যে ঝিন্দ্-ঝড়োয়া। মধ্যভারতেই বটে। স্বাধীন—ইংরাজের মিত্ররাজ্য। ঝিন্দ্ এবং ঝড়োয়া ছুটি পাশাপাশি যুগ্ম রাজ্য। পার্ব্বত্য দেশ—একটি নদী আছে, নাম কিস্তা [সম্ভবতঃ কৃষ্ণতোয়ার অপভ্রংশ], ঝিন্দের আয়তন—১৫৫৪ বর্গ মাইল; রাজধানী—সিংগড়। ঝড়োয়ার আয়তন—১৪৮৫ বর্গ মাইল; রাজধানী—বেতপুর। সর্ব্বসুদ্ধ জনসংখ্যা—১১৮৯৫৩; প্রধান উপজীব্য শিল্প; খনিজ সম্পত্তি প্রচুর। দুই রাজ্যেই হিন্দু রাজা।'

আগন্তুক বলিল—'হ্যাঁ ঐ ঝিন্দ-ঝড়োয়া। এইবার আমার পরিচয় দিই—আমি ঝিন্দের একজন ফৌজী সর্দ্দার—আমার নাম সর্দ্দার ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী। ঝিন্দের রাজার আমরা বংশানুক্রমিক পার্শ্বচর।'

শিবশঙ্কর শিষ্টতা দেখাইয়া বলিলেন—'আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে খুবই আনন্দিত হলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঝিন্দের ফৌজীসর্দ্দারের কি প্রয়োজন থাক্‌তে পারে সেইটেই ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না।'

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী বলিলেন—'বাবুসাব, কিছুক্ষণ আগে ঐ ছবিটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় আপনারা কিছু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমি আপনাদের এমন একটা কাহিনী বলতে পারি যা শুনে আপনারা আরো আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। আপনাদের এই পূর্ব্বপুরুষটির যে অদ্ভুত জীবন বৃত্তান্ত আমি জানি, তার শতাংশের একাংশও আপনারা জানেন না। কিন্তু সে-কথা এখন নয়; যদি কখনো দিন পাই বল্‌ব। এখন আমার প্রয়োজনের কথাটাই বলি।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী আবার আরম্ভ করিলেন—'আপনারা যে দুই ভাই তা আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাদের বেয়ারার কাছে জেনেছি, তাই যে-কথা আজ শুধু একজনকে বলব বলেই এসেছিলাম তা আপনাদের দু'জনকেই বলছি। আশা করি আমাদের কথাবার্ত্তা অন্য কেউ শুনতে পাবে না।'

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রীর কথার ভঙ্গীতে দু'জনেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; গৌরী উঠিয়া গিয়া ঘরের দ্বারগুলা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়া একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল। বলিল—'এবার বলুন; আর কারুর শোনবার সম্ভাবনা নেই।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'আর এক কথা। আপনারা আমার প্রস্তাবে রাজী হোন্ বা না হোন্, আমার কথা ঘুণাক্ষরে কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না এই প্রতিশ্রুতি না পেলে আমি কিছু বলতে পারব না।'

দুজনেই প্রতিশ্রুত হইলেন।

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন—'দেখুন, ঝিন্দ্-ঝড়োয়া রাজ্য দুটি বরোদা বা হায়দ্রাবাদের মত বড় রাজ্য নয়। ইতিহাস এবং ভূগোলে তাদের নাম ছোট করেই লেখা আছে—তাই বৃটিশ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে ঝিন্দ-ঝড়োয়ার নাম জানে না। কিন্তু ছোট হ'লেও তারা একেবারে নগণ্য নয়। সেখানে বৃটিশ্ গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি আছে, ভারত সম্রাটের দরবারে এই দুই রাজ্যের রাজার একটা নির্দ্দিষ্ট আসন আছে।'

'আপনারা ঝিন্দ-ঝড়োয়া সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলেই এর পূর্ব্বতন ইতিহাস কিছু বলা দরকার। ভারতবর্ষে হূন অভিযানের কথা আপনারা পড়েছেন। সেই সময় মথুরার যুবরাজ স্বরজিৎ সিংহ এবং তাঁর ভগিনীপতি বেত্রবর্ম্মা হূন কর্ত্তৃক রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। দক্ষিণাপথে সপরিবারে পালাতে পালাতে তাঁরা এক দুর্গম পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। স্থানটি প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনে এমন ভাবে সুরক্ষিত যে স্বরজিৎ সিংহ তাঁর দক্ষিণ যাত্রা এইখানেই নিরুদ্ধ করলেন এবং সেখানকার আটবিক বন্য জাতিকে বাহুবলে পরাস্ত করে এই ঝিন্দ্ রাজ্য স্থাপন করলেন। অতঃপর ভগিনীপতি বেত্রবর্ম্মার সঙ্গে মনের মিল না হওয়াতে দুজনে রাজ্য সমান ভাগ করে নিলেন। পৃথক হয়ে বেত্রবর্ম্মা তাঁর রাজ্যের নাম রাখলেন ঝড়োয়া। দুই রাজ্যের মাঝখানে পার্ব্বত্য নদী কৃষ্ণতোয়া সীমানা রক্ষা করছে।'

'সেই অবধি এই দুই রাজবংশ ঝিন্দ ও ঝড়োয়ায় রাজত্ব করে আসছে। ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে নিয়তির শত শত ঝড় বয়ে গেছে—পাঠান মোগল ইরাণী মারাঠী

ইংরেজ হিন্দুস্থানকে নিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করেছে, কিন্তু ঝিন্দ-ঝড়োয়া তার দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, কখনো তার গায়ে একটা আঁচড় লাগেনি। একে অনুর্ব্বর পাহাড়ে দেশ, তার ওপর বাহিরের কলহে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তাই কোনদিন কোনো শক্তিশালী জাতির লোলুপ দৃষ্টি তার ওপর পড়েনি।

'এই ত গেল অতীতের কাহিনী। বর্ত্তমানের কথা সংক্ষেপে বলছি। বর্ত্তমানে অবস্থা হচ্চে এই যে, ঝিন্দের মহারাজ ভাস্কর সিংহ আজ ছয়মাস হল গতাসু হয়েছেন। মহারাজ ভাস্কর সিংহের দুই পুত্র—কুমার শঙ্কর সিং ও কুমার উদিত সিং। কুমার শঙ্কর স্বর্গীয়া পাটরাণী রুক্মা দেবীর গর্ভজাত, আর কুমার উদিত স্বর্গীয়া দ্বিতীয়া মহিষী লখিমা দেবীর গর্ভজাত। দুজনের বয়স সমান, শুধু কুমার শঙ্কর উদিতের চেয়ে ঘণ্টা খানেকের বড়। সুতরাং তিনিই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী।'

'এইখানেই গণ্ডগোলের আরম্ভ। বাপের মৃত্যুর পর উদিত সিং ছোট হয়েও গদীতে বসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঝিন্দের সিংহাসন যে ন্যায়তঃ তাঁরই, এই কথা প্রমাণ করবার জন্য তিনি তাঁর জন্মকালীন ধাত্রী ডাক্তার প্রভৃতিকে সাক্ষী করে দাঁড় করালেন। কিন্তু দেশের লোক তাঁকে চায় না, তারা চায় কুমার শঙ্কর সিংকে। তার একটা কারণ, মাতাল লম্পট হলেও কুমার শঙ্করের প্রাণটা ভারি দরাজ, আর উদিত সিং দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী। এতবড় ক্রূরপ্রকৃতি স্বার্থপর ভোগবিলাসী লোক খুব কম দেখা যায়।'

'দেশে নিজের পরিপোষক না পেয়ে উদিত সিং গোপনে গোপনে ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে নিজের দাবী জানিয়ে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু ভারত সরকারও সেদিকে কর্ণপাত করলেন না; দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে তাঁরা কোনো-রকমে হস্তক্ষেপ করবেন না বলে জানালেন। ওদিকে সুবিধা করতে না পেরে কুমার উদিত অন্য রাস্তা ধরলেন।'

'এদিকে কুমার শঙ্করের অভিষেকের আয়োজন হ'তে লাগল। সমস্ত ঠিক, স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের কাছ থেকে রাজকীয় অভিনন্দন পত্র পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত—এমন সময় এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ঘটল; যখন অভিষেকের আর দশদিন মাত্র বাকী তখন হঠাৎ কুমার শঙ্করসিং নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সেইসঙ্গে একজন আর্ম্মাণী ব্যবসাদারের সুন্দরী স্ত্রীকেও খুঁজে পাওয়া গেলনা। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।'

'অভিষেক পেছিয়ে গেল। তারপর মাসখানেক পরে যুবরাজ রাজ্যে ফিরে এলেন।'

'আবার অভিষেকের দিন স্থির হ'ল এবং এবারও নির্দ্দিষ্ট দিনের একসপ্তাহ আগে কুমার হঠাৎ গা-ঢাকা দিলেন। এবার তাঁর সঙ্গিনী একটি বিবাহিতা কাশ্মিরী সুন্দরী।'

'বারবার দু'বার এই রকম বিশ্রী কাণ্ড দেখে দেশসুদ্ধ লোক কুমার শঙ্করের ওপর চটে গেল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও জানালেন যে ভবিষ্যতে যদি ফের এইরূপ হাস্যকর অভিনয় হয় তাহলে তাঁরা কুমার উদিতের দাবী গ্রাহ্য করে তাঁকেই সিংহাসনে বসাবেন।'

'আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এ সমস্ত কুমার উদিতের কারসাজি। সোজাপথে বিফল হয়ে তিনি চেষ্টা করছেন—বড় রাজকুমারকে দায়িত্বশূন্য অপদার্থ প্রতিপন্ন করে নিজের দাবী পাকা করতে। সত্য বল্‌তে কি, কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়েছেন। এরই মধ্যে দেশে একদল লোক দাঁড়িয়েছে যারা উদিত রাজা হলেই বেশী খুসী হয়।'

'আমাদের মত যারা ন্যায্য অধিকারীকে সিংহাসনে বসাতে চায় তাদের অবস্থা একবার ভেবে দেখুন। একদিকে উচ্ছৃঙ্খল রাজকুমার—সরল সাহসী কাণ্ডজ্ঞানহীন, কিছুতেই পরোয়া নেই—অপরদিকে কূটচক্রী রাজ্যলোলুপ তাঁর ছোট ভাই। বাবুসাব, আমি ঝিন্দের রাজ পরিবারের বংশগত ভৃত্য, বৃদ্ধ মহারাজ ভাস্কর সিং মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমার হাত ধরে বলে গিয়েছিলেন যেন কুমার শঙ্করকে গদীতে বসাই। মুমূর্ষু রাজার সে হুকুম আমি ভুলিনি। আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে পারি শঙ্করসিংকে সিংহাসনে বসাব।'

'তাই, বৃদ্ধ দেওয়ান বজ্রপাণির সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ বার রাজ্যাভিষেকের দিন স্থির করলাম। আগামী ২৩শে আশ্বিন হচ্চে সেইদিন, অর্থাৎ আজ থেকে সাতদিন মাত্র বাকি। দিনস্থির করে যুবরাজের মহালের চারিদিকে পাহারা বসালাম। জেলখানার কয়েদীকেও বোধহয় এত

সতর্কভাবে পাহারা দিতে হয় না। মহলের মধ্যে তিনি যখন যেখানে যান সঙ্গে লোক থাকে, বাইরে যেতে চাইলে দশজন সওয়ার নিয়ে আমি সঙ্গে থাকি।'

'যুবরাজ প্রথমটা কিছু বলতে পারলেন না, কিন্তু ক্রমে আমাকে ডেকে নানারকম ভৎর্সনা তিরস্কার আরম্ভ করে দিলেন। আমি কিন্তু অটল হয়ে রইলাম, বললাম—যুবরাজ তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে তবে মুক্তি দেব, তার আগে নয়।—তিনি আমাকে অনেক আশ্বাস দিলেন যে এবার কিছুতেই রাজ্য ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু আমি তাঁর দুর্ব্বল চিত্ত জানতাম, কিছুতেই রাজি হ'লাম না।'

'এই সময় কুমার উদিত একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দুইভায়ে বাহিরে বেশ সৌহার্দ্দ্য ছিল—তার কারণ আপনারা বুঝতেই পারছেন। সুন্দরী স্ত্রীলোকের লোভ দেখিয়ে উদিত বড় ভাইকে বশ করে রেখেছিলেন। স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যেই যে উদিত তাঁকে ব্যভিচারের পথে নিয়ে যাচ্ছে একথা গোঁয়ার শঙ্করসিং বুঝেও বুঝতেন না।'

'উদিতকে আসতে দেখে আমি ভারি ভয় পেয়ে গেলাম। দুইভায়ে কি কথা হল জানিনা; কিন্তু উদিত চলে যাবার পরই আমি প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম এবং স্বয়ং রাজকুমারের ঘরের দরজায় পাহারা দেব স্থির করলাম।'

'কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরে রাখা গেলনা—পরদিন সকালে দেখলাম পাখী উড়েছে। কিস্তার জলে নৌকার বন্দোবস্ত ছিল, কুমার শোবার ঘরের জানালা থেকে জলে লাফিয়ে পড়ে সেই নৌকায় চড়ে অন্তর্হিত হয়েছেন।'

'এবার আর ব্যাপারটা জানাজানি হ'তে দিলাম না। পাহারা যেমন ছিল তেমনি রইল। মহালে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবেনা—এই হুকুম জারি করে দিয়ে আমি যুবরাজকে খুঁজ্‌তে বেরুলাম। দু'দিন সন্ধান করবার পর খবর পেলাম যে তিনি কলকাতায় এসেছেন।

'তখন আমার অধীনস্থ একজন বিশ্বস্ত সেনানী সর্দ্দার রুদ্ররূপকে আমার জায়গায় বসিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। রাজ্যে রটিয়ে দেওয়া হল যে কুমারের শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাই তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।'

'আজ দু'দিন হ'ল আমি কলকাতায় এসেছি। এসে পর্য্যন্ত চারিদিকে কুমারের খোঁজ করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না। এতবড় সহরে একজন লোককে খুঁজে বার করা সহজ কথা নয়, এদিকে অভিষেকের দিনও ক্রমে এগিয়ে আসছে।

'কুমার শঙ্কর খুব মিশুক লোক, তাই এ শহরে যত বড় বড় ক্লাব আছে সেইসব ক্লাবে কুমারের খোঁজ নিলাম; তারপর বড় বড় হোটেলে তল্লাস করলাম কিন্তু কোথাও কোনো ফল পেলাম না। বুক দমে গেল। তবে কি মিথ্যা খবর পেয়ে এতদূর ছুটে এলাম! যুবরাজ কি এখানে আসেন নি?'

'আজ বৈকালবেলা নিতান্ত হতাশ হয়েই একটা ট্যাক্সিতে চড়ে আপনাদের এই লেকের চারিধারে ঘুরছিলাম আর ভাবছিলাম এখন কি করা যায়। এমন সময় হঠাৎ আমার নজর পড়ল, একটি যুবাপুরুষ একখানা প্রকাণ্ড বাড়ীর সাম্‌নে মোটর থেকে নামছেন।'

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ধনঞ্জয় চুপ করিলেন; তারপর গৌরী-শঙ্করের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'সে যুবাপুরুষটি আপনি।'

শ্রোতৃযুগল এতক্ষণ তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছিলেন, চমক ভাঙিয়া গৌরী বলিল—'ক্লাবের সামনে আমাকে নামতে দেখে থাকবেন।'

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'হাঁ—ক্লাবের সামনেই বটে। আপনাকে দেখে আমি প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, তারপর একলাফে ট্যাক্সি থেকে নেমে আপনার অনুসরণ করলাম।'

'আপনি তখন ক্লাবের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। আমি দরোয়ানকে বললাম—'কুমার শঙ্করসিংয়ের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই—তাঁকে খবর দাও।'

'দরোয়ান বললে শঙ্করসিং বলে কাউকে সে চেনে না। আমি তাকে একটা তাড়া দিয়ে বললাম—এইমাত্র যিনি এ বাড়ীতে ঢুকলেন তিনিই শঙ্করসিং—শীঘ্র আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।'

'দরোয়ানটা হেসে বললে—আপনি ভুল করেছেন; যিনি এইমাত্র এলেন তাঁর নাম জমিদার বাবু গৌরীশঙ্কর রায়।

'আমি বললাম—'কখনই নয়। তিনি শঙ্করসিং—আমি স্বচক্ষে তাকে এখানে ঢুকতে দেখেছি।'

'দরোয়ান বললে—হুজুর বিশ্বাস না হয় সেক্রেটারি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন।—ব'লে আমাকে সেক্রেটারির ঘরে নিয়ে গেল।'

'সেক্রেটারী বাবুটি অতি ভদ্রলোক। তিনি আমার কথা শুনে বললেন, শঙ্কর সিং বলে ক্লাবের কোনো সভ্য নেই, তবে কোনো সভ্যের বন্ধু হিসাবে ক্লাবে এসে থাকতে পারেন। বিশেষতঃ আজ ক্লাবে তলোয়ার খেলার একটা প্রদর্শনী আছে—তাই বাইরের লোকও অনেক এসেছেন। এই ব'লে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ভিতরে গেলেন। একই হলে অনেক লোক জমা হয়েছিল এবং তারই মাঝখানে তলোয়ার খেলা চলছিল। সেক্রেটারী বাবু আমাকে বললেন—দেখুন দেখি, আপনার শঙ্কর সিং এখানে আছেন কি না।'

'প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পেরেছিলাম, যে দুজন লোক তলোয়ার খেলছেন, শঙ্কর সিং তাদেরি মধ্যে একজন। আমি আঙুল দেখিয়ে বল্লাম—ঐ শঙ্কর সিং।'

'সেক্রেটারি বাবু হেসে উঠ্লেন—আপনি ভুল করেছেন। উনি গৌরীশঙ্কর রায়, আমাদের ক্লাবের একজন সভ্য।'

'আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। এও কি সম্ভব! পৃথিবীতে দুজন লোকের কি এক রকম চেহারা হয়। না এরা সকলে মিলে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে?'

গৌরীশঙ্কর আস্তে আস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধনঞ্জয় তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন—'ব্যাপারটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন? এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি, এ যে হ'তে পারে তা কখনো কল্পনা করিনি। আপনার শরীরের এমন কোনো স্থান নেই যা অবিকল শঙ্কর সিংএর মত নয়। এমন কি আপনার গলার আওয়াজ পর্য্যন্ত হুবহু তাঁর মত। সৃষ্টির এ যেন এক অদ্ভুত প্রহেলিকা। অন্ততঃ তখন আমার তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আপনাদের এই ঘরে ঢুকে আমার মনে হচ্ছে যেন সে প্রহেলিকার উত্তর পেয়েছি।' বলিয়া তিনি দেয়ালে লম্বিত কালীশঙ্করের ছবিখানার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর দুই ভায়ের বুক হইতে বহুক্ষণের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস সশব্দে বাহির হইল।

জাপান

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(প্রবন্ধ)

(৫)

লিগ অব নেশনের কোন ক্ষমতা থাক্ আর নাই থাক্, কিন্তু ইয়োরোপিয়ান জাতিদের মধ্যে যে একটা সংঘবদ্ধ ঐক্যতার দরকার, লিগ অব নেশনের চালকগণ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ইহা প্রচার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সম্যক-ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; এখন তো ইহা মরণ দশায় উপস্থিত। লিগ অব নেশনের মধ্যে যদি একদেশদর্শিতার ভাব প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত না থাকিত, তাহা হইলে উহা এইভাবে আত্মঘাতী হইতে পারিত বলিয়াও মনে হয় না। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির—বিশেষতঃ জাপানের জাতিসঙ্ঘের উপর কোন আস্থাই ছিল না। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশের যে সন্ধি হয় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় নূতনভাবে স্থাপিত হইয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। এই সন্ধির সর্ত্ত ছিল যে রুশিয়া কি ফরাসী যদি কাহাকে আক্রমণ করে তবে ব্রিটিশ ও জাপান পরস্পরকে সাহায্য করিবে। সেই সময় ফরাসী রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল

ব্রিটিশ সেই সময় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ চীনে উহাদের স্বার্থ-রক্ষার্থ বর্ত্তমানের মত শক্তিশালী ছিল না; কারণ সিঙ্গাপুরে তখন পর্য্যন্তও নৌ-ঘাটী স্থাপিত হয় নাই। কাযেই প্রাচীর কামধেনুটা এবং চীনের গাভীটাকে নিশ্চিন্তভাবে নিষ্কণ্টক রাখিবার জন্ম ব্রিটিশ জাপানের সখ্যতা বাঞ্ছনীয় মনে করিত। রুশিয়াতে বলশেভিক্ শাসন প্রবর্ত্তন হওয়াতে রুশ যে কতক দিনের জন্ম নিজের দেশের গভর্ণমেন্ট পরিবর্ত্তন বশতঃ অবধারিত বিশৃঙ্খলতার মধ্যে পড়িয়া নিজের ঘর লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে এবং সেই সময় যে অন্ত কোন দেশের প্রতি তাহার লোভ করিবার শক্তি সামর্থ্য থাকিবে না—ইহা ব্রিটিশ বেশ সুচতুরতার সহিত বুঝিয়া কিছু দিনের জন্ম জাপানের সখ্যতা অনাবশ্যক মনে করিয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর জাপানের সঙ্গে পূর্ব্ব সন্ধি পুনঃ স্থাপন করে নাই; অধিকন্ত আমেরিকার সঙ্গে তাহার সুরে সুর মিশাইয়া জাপানকে আমেরিকায় আহ্বান করিল প্রশান্তে শান্তি রক্ষার জন্ম!

১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে এই কনফারেন্স অর্থাৎ বৈঠক বসে। আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হার্ডিং-এর নিমন্ত্রণে ব্রিটিশ, ফরাসী, ইটালী, বেলজিয়ম, ডচ্, পুর্ত্তুগীজ, জাপান এবং চীন সরকার আমন্ত্রিত হয়। এই সম্মিলনের মৌখিক প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল, প্রশান্ত-বক্ষে যুদ্ধ-জাহাজগুলির সংখ্যা এবং রণসম্ভার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া; কারণ দেখান হল, পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা! জাপান এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ না করিয়া অনেকটা উহাদের মতে তথাস্তু বলিয়া যে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিল, তাহা অন্যান্য শক্তিবর্গ জাপানের দুর্ব্বলতা মনে করিয়া—জাপান "শ্বেতাঙ্গায় নমঃ" করেছে এই গৌরবের—সুখ অনুভব করিল। বড় যুদ্ধ-জাহাজগুলির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে রাজী হইলেও জাপান সাবমেরিণ অথবা এয়ারোপ্লেন সম্বন্ধে যুদ্ধের সময় উহা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করে। এই কন্‌ফারেন্সের প্রধান চুক্তির বিষয় হয় যে, প্রশান্তে কোন শক্তিই উহাদের নৌযুদ্ধের আড্ডা (naval base)-গুলির শক্তি বৃদ্ধিও করিতে পারিবে না, অথবা নূতন কোন নৌ-আড্ডাও স্থাপন করিতে পারিবে না। সাবমেরিণ দ্বারা বাণিজ্যের ক্ষতিকারক কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না এবং বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার হইতে সকলেই বিরত থাকিবে; বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে চীনের দ্বার সকল জাতির জন্যই উন্মুক্ত থাকিবে। ব্রিটিশ, ফরাসী, আমেরিকা এবং জাপানের মধ্যে আরও একটা চুক্তি হয় যে প্রশান্ত বক্ষে এই চার শক্তির যে দ্বীপগুলি আছে, তাহা অন্য শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যোগাযোগে একে অন্যকে সাহায্য করিবে; এই শেষোক্ত চুক্তিটী অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, হাওয়াই (উত্তর প্রশান্তে আমেরিকার অধিকৃত দ্বীপ) এবং ফিলিপাইন (আমেরিকা) সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; জাপান আক্রান্ত হইলে এই চুক্তি চলিবে না। এই চুক্তি দশ বৎসরের জন্ম বলবৎ থাকিবে। প্রথম সন্ধিটী ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স বলিয়া কথিত, দ্বিতীয়টী উহার কঞ্চি—বাঁশের চেয়েও শক্ত! কিন্তু "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার"!

মহাযুদ্ধের সময় জাপানের মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করিবার উদ্দেশ্য যাহাই থাক্ না কেন, ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে জাপান একটা বৃহৎ রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। যুদ্ধের সময় জাপান চীনের জার্ম্মান অধিকৃত কলোনি সান্‌টাঙ্গ প্রদেশ জয় করিয়া ওয়াশিংটন্ কন্‌ফারেন্সের চুক্তি অনুযায়ীই উহা চীনকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়; অবশ্য ইংরেজও ওই-হেই-ওই এবং ফরাসী কাঙ্গরো পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হয়; কিন্তু উহাদের অসংখ্য কলোনি থাকাতে উক্ত ক্ষুদ্র স্থান দুটী হাতছাড়া হওয়ায় উহাদের বিশেষ ক্ষতি বোধ হইল না; জাপানের ছিল স্থানাভাবের জ্বালা, কাযেই সে সান্‌টাঙ্গ প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ায় মহাযুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিয়া মনের বিকারে দগ্ধ হইয়া গেলেন। মহাযুদ্ধ যে শুধু জাপানকেই এই মহাশিক্ষা দিয়েছিল এমন নয়, অন্যান্য পরাধীন জাতিও—যাহারা মিত্রশক্তি পক্ষে যোগদান করেছিল—তাহারা দিব্যজ্ঞানে বুঝে নিয়েছিল যে শক্তিশালী জাতিও কার্য্যান্তে বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়ে অত্যাচার উৎপীড়নে ভীষণ অত্যাচারী রোমান সম্রাট নীরোকেও লজ্জা দিতে পারে।

ইতিপূর্ব্বে চীনে পোষ্ট অফিসে, রেলে, রেডিওর উপর এবং আমদানীকৃত পণ্যের উপর শুল্ক বসাইবার কর্ত্তৃত্ব ছিল বিদেশীদের হাতে; ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সের চুক্তিতে

উক্ত কর্তৃত্বভার চীন সরকারের হাতে প্রদান করা হয় এবং চীনকে শক্তিবর্গ একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়; কিন্তু চীনকে অন্যান্য জাতিদিগের জন্য সর্ব্বদাই ওপেন্-ডোর অর্থাৎ সদর দরজা খুলিয়া রাখিতে হইবে; তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই চুক্তিতে চীনের স্বাধীনতাই যে শুধু সোনার পাথরের বাটীর ন্যায় হ'য়ে পড়েছিল তাহা নয়, শক্তিমান জাপানকেও শক্তিবর্গের নিকট মস্তক অনেকটা নোয়াইতে হয়েছিল। এই সব সন্ধির পেছনে যে একটী বিশেষ অভিসন্ধি বর্ত্তমান ছিল, সুচতুর জাপান তাহা বুঝিয়া "সবুরে মেওয়া ফলে" এ নীতি অবলম্বন করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া ইয়াকোহামা এবং টোকিওতে লক্ষাধিক লোক মারা যায়। ভূমিকম্পের সময় সহরের গ্যাস্ পাইপ্ গুলি ফাটিয়া যাওয়ায় উহাতে অগ্নি সংযোগে সমস্ত ইয়াকোহামা সহরটী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ইয়াকোহামাতে পেট্রোল-সঞ্চিত বহু টাঙ্ক ছিল; সে সময় সেগুলিও বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সমস্ত হারবারটী অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। ভাসমান কাঠের নৌকাগুলি সব পুড়ে যায়। এত অধিক পরিমাণ পেট্রোল হারবারে জলের উপর জ্বলন্ত অবস্থায় ভাসিতেছিল যে, নঙ্গর করা সমস্ত জাহাজগুলিকে নঙ্গর উত্তোলন করিয়া বাধ্য হইয়া বহিঃসমুদ্রে যেতে হয়েছিল। সহরে উত্তাপের মাত্রা এত অধিক হয়েছিল যে বাড়ীর জানালার আয়নাগুলি সব গলিয়া গিয়াছিল!

জাপানে বেশ্যার ব্যবসাও অন্যান্য ব্যবসার মত গঠিত। যে কোন ব্যক্তি সরকার হইতে লাইসেন্স নিয়ে কতকগুলি মেয়ে রেখে ব্যবসা চালাইতে পারে; কোন স্থানে ইহা লিমিটেড্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ইয়াকোহামাতে নেক্‌টারীন নামে একটী বৃহৎ বেশ্যাশালা ছিল। ইহাতে প্রায় চার পাঁচ হাজার বেশ্যা ছিল; উক্ত ভূমিকম্পের সময় চুক্তিবদ্ধ মেয়েরা পালিয়ে যাবে বলিয়া উহাদিগকে বাহির হইতে না দেওয়ায় উক্ত বাড়ীর দগ্ধাবশেষ ভস্ম রাশির স্তূপে অতগুলি মেয়ের ভস্মাবশেষ ছিল লুকিয়ে। উহাদের আর্ত্তনাদ মিশে গিয়েছিল উর্দ্ধগ অগ্নিশিখায়! এই ভূমিকম্পের সময় ইয়াকোহামার কোরিয়ানগণ সুযোগ বুঝিয়া স্বাধীনতার উত্তেজনা দেখাইতেই জাপ যুবকগণ মুক্ত তরবারি হস্তে উহাদের সেই উত্তেজনা প্রশমিত করিয়া দিয়াছিল। আমেরিকা সাহায্যের জন্য যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়াছিল, কিন্তু জাপান গভর্ণমেণ্ট মার্শেল ল অর্থাৎ সামরিক আইন জারী করিয়া উহাদিগের হারবারে প্রবেশ বন্ধ করিয়াছিল; কাযেই আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজগুলিকে তীর হইতে ছয় মাইল দূরে নঙ্গর করিয়া থাকিতে হয়। মহাযুদ্ধের সময় ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, জাপান উক্ত ভূমিকম্পে ঠিক্ সেই প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। আমরা অদৃষ্টবাদী তো আছিই, পাপ-পুণ্যবাদীও! জাপানের উক্ত ভূমিকম্প তাহার পাপের ফল বলিয়া আমরা সান্ত্বনা পাই; জনমানবশূন্য দ্বীপে ভূমিকম্প হয় কি প্রকৃতির পাপে? জাপানিগণ পাপী হউক অথবা পুণ্যাত্মাই হউক, দুই মাসের মধ্যে ইয়াকোহামাকে এমন-ভাবে পুনর্নির্ম্মিত করিল যে নবাগত তো দূরের কথা— পূর্ব্বাগতকেও মেনে নিতে হত যে ইয়াকোহামা পূর্ব্বেও এই প্রকারেরই ছিল। যুদ্ধের সময় জাপান শক্তিবর্গের নিকট বিবিধ আবশ্যকীয় পণ্য বিক্রয় করিয়া এবং চীনে ও ভারতবর্ষে বাণিজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া যে অর্থ লাভ করেছিল তাহাতে অনেকেরই গাত্রদাহ জন্মেছিল; কিন্তু প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে জাপানের উক্ত অবস্থা হয়ে পড়াতে গাত্রদাহ কতকটা শিথিল হয়ে গেল। ইতিপূর্ব্বে ওয়াশিংটন কনফারেন্সে জাপানের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয়েছিল, তদুপরি ভূমিকম্পের জন্য লোকক্ষয় এবং প্রচুর অর্থক্ষয় হওয়াতে স্বভাবতঃই জাপান কতকটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। আমেরিকা জাপানের এই অবস্থার সুযোগ ভোগ করার উপেক্ষা কখনই সমীচীন মনে না করিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এক্সক্লুশান্ অর্থাৎ নিষেধ বিধি জারী করিয়া জাপানী এবং চীনাদিগকে আমেরিকায় প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দেয়। জাপানের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান কারণ দেখান হইল যে জাপান তাহার জাতীয় বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া একটী ভিন্ন সম্প্রদায়ভাবে আমেরিকায় বসবাস করিতে চায়; কিন্তু আমেরিকা চায় জাতির মধ্যে যেন কোন প্রকার বৈষম্য না আসিতে পারে। জাতির শক্তি সংবদ্ধ করিতে যে উহা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় ভারতের

অধঃপতিত অবস্থাই উহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকিবে। আমেরিকায় সকল জাতিদিগকে মালাগাঁথা করিবার প্রচেষ্টা হয়েছে উহাদের জাতীয় জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য; কিন্তু উদ্দেশ্যটার মধ্যে এমন একটা টাট্‌কা ধাপ্পাবাজী রয়েছে যে, সে স্থানে এই সব যু্ক্ত বিশেষ স্থান পায় না। প্রথমতঃ আমেরিকা ছিল রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌দের দেশ; তাহার পর তথায় হল ইয়োরোপিয়ান্‌দের আবির্ভাব—সঙ্গে ভৃত্য গেল আফ্রিকার কতক নিগ্রো। বর্ত্তমানে রেড্‌ ইণ্ডিয়ানগণের অনেকেই বিষ্ণুপদে লয় পেয়েছে; নিগ্রোগণ বেঁচে আছে সেবার জন্য! যে সব রেড্‌ ইণ্ডিয়ান বেঁচে আছে, আমেরিকা তাহাদের নিজেদের দেশ হওয়া সত্বেও তাহারা ইয়োরোপীয়ানদের সঙ্গে সমান ভাবে রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারিতেছে না; নিগ্রোগুলি তো কোন হোটেলেই প্রবেশ করিতে পারে না; যাহার সমাজেই স্থান নেই তাহার রাজনৈতিক অধিকার! কাজেই চীনা ও জাপানীদিগকে যে অজুহাতে আইন জারী করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল, তাহা হইয়াছে শ্বেতাঙ্গদের শিবজ্ঞানজাত আইন! দলে দলে জার্ম্মান, ইটালিয়ান, ইহুদী, আইরিশ প্রভৃতি জাতি তথায় গিয়া তাহাদের জাতির বিশিষ্টতা লইয়া বাস করিতেছে। দুই এক পুরুষের মধ্যে জাতির প্রধান বিশিষ্টতা মাতৃভাষা ত্যাগ করাও অসম্ভব; অন্যান্য জাতির পক্ষে সম্ভব হলেও ইহুদীদের পক্ষে উহা পৃথিবীর কোন স্থানেই সম্ভব হয় নাই; আমেরিকা উহাদের সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চবাচ্য না ক'রে শুধু এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে একটা উক্ত প্রকারের আইন করিয়া এশিয়াবাসীদিগকে যে ভাবে অবজ্ঞা করেছে তাহার প্রতিবিধান করিবার ক্ষমতা কোন এশিয়াবাসী জাতিরই নাই, কোন দিন হবে কিনা তাহা সুদূরপরাহত! ভারতবাসী যখন বহিষ্কৃত হয় তখন তাহাদের অবস্থা হল সাহারা মরুভূমিতে বসে রোদন করার ন্যায়! চীন জাপান বহিষ্কৃত হওয়ার সময় চীন রোদনই করিল না—মনে ভাবিল "পেটে দিলে পিটে সয়"; জাপান কতকদিন প্রতিবাদ করে আস্ফালন করিল বটে; কিন্তু সব দুদিনেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল! উক্ত আইন প্রণয়ন কালে আমেরিকাস্থ জাপানী কন্‌সল উত্তেজিতভাবে বলেছিল যে এই প্রকার আইন প্রণয়ন করা হইলে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ হইবে। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট ততোধিক উত্তেজিত হইয়া অবিলম্বে উক্ত আইন ঘোষণা করিয়া দেয়! জাপান এই প্রকার দ্বিবিধভাবে অপমানিত হয়ে উহা হজম করিতে বাধ্য হল! উহা ভিন্ন জাপানের গত্যন্তর ছিল না; কারণ প্রায় চার হাজার মাইল দূরে গিয়ে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা জাপানের তখন ছিল না; তবে জাপান যুদ্ধ না করিয়াও কোন কোন বিষয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধতা করিতে পারিত; কিন্তু জাপানের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল. এই যে, জাপানের উৎপাদিত রেশমের শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগই আমেরিকায় রপ্তানি হইয়া থাকে; কাযেই বিষাক্ত বটীটিকে জাপান হজম করে ফেলেছে—কি পকেটে রেখে দিয়েছে সময় তাহার উত্তর দিবে! এশিয়ার বহিষ্কৃত জাতিগুলির পক্ষে একটী দেখ্‌বার বিষয় আছে যে এই আইন প্রণয়নকালে আমেরিকা "এই—সব আসিতে পারিবে না" এই বলিয়া ইয়োরোপীয়ানদিগকেও একটু সতর্ক করিয়া দিয়াছে। আমেরিকানগণ যে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড্‌ ইণ্ডিয়ানদের ভগ্নস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা তাহারা ভাবিতে লজ্জা পকেটে রেখে দেয়।

১৭৭৬-১৭৮২ পর্য্যন্ত আমেরিকা ব্রিটিশের কবল হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধীনতার যুদ্ধ করে। আমেরিকার প্রধান সহায় ছিল ফরাসী; ফরাসী সরকার ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেও ব্রিটিশ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তাহার পর আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লয়। আমেরিকা যুক্ত হল বটে কিন্তু উত্তর আমেরিকার এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য ইয়োরোপীয় উপনিবেশবাসিগণ যে ইয়োরোপের অঙ্গুলি সঞ্চালনে চলিতে লাগিল ইহাও আমেরিকার সহ্য হইল না। আমেরিকা অগ্রবর্ত্তী হইয়া উত্তর আমেরিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচার কার্য্য চালাইতে থাকে; অবশেষে ১৮২৩ খৃঃ আমেরিকার তৎকালিক প্রেসিডেণ্ট মনরো এক বাণী প্রচার করেন যে, উক্ত সময় হইতে ইয়োরোপের কোন শক্তিই আমেরিকার কোন দেশ উহাদের উপনিবেশ বলিয়া মনে করিতে পারিবে না। উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত জাতি সংঘবদ্ধভাবে উক্ত বাণী গ্রহণ করে এবং ইয়োরোপও সেলাম দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতার এই মহান বাণীই মনরো ডক্‌ট্রিন বলিয়া কথিত হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের

কোন বেসরকারী কাগজ প্রাচ্য সম্বন্ধেও উক্ত প্রকারের একটী বাণীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছিল জাপানের পক্ষে উক্ত বাণী প্রচার করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করা কতদূর সম্ভব তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত হইলেও উহা যে দুঃস্থ জাতির জন্য অভিভাবকত্বসূচক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জাপানের যথাযোগ্য শক্তি সামর্থ্য না থাকিলে এতবড় একটা কথা বেসরকারীভাবে প্রচার করাও তো একেবারে রং তামাসা নয়! দ্বিতীয়তঃ লিগ অব নেশন্ পরিত্যাগ, সমস্ত ইয়োরোপীয় জাতির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য স্থাপন এবং নৌবহরে বৃহৎ যুদ্ধজাহাজের সমানসংখ্যা দাবী প্রভৃতি বিষয়গুলি তো একেবারে দুর্ব্বলতা-প্রকাশক নয়! জাপানের এই সব দুঃসাহসের কার্য্যগুলি আমেরিকা এবং ইয়োরোপের দুই তিনটী জাতির নিকট বেশ একটি উত্তেজক আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে।

আমেরিকা এবং ইয়োরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে ডচ্, ইংরেজ, জার্ম্মান, ফরাসী, ইটালী প্রভৃতি জাতিগুলির কতকগুলি মাল-জাহাজ মালের চাহিদা অনুসারে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যাতায়াত করে; এতদ্ভিন্ন ঐ সব জাতির কতকগুলি আরোহী-জাহাজ আছে; এই সব জাহাজ নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে মাল এবং আরোহী লইয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করে; আমেরিকা ব্রিটিশ ফরাসী প্রভৃতি জাতির যেমন জাপান পর্য্যন্ত আরোহী জাহাজের লাইন আছে, জাপানীদেরও সেই প্রকার জাপান হইতে লণ্ডন আমেরিকা পর্য্যন্ত লাইন আছে। এই সব জাহাজগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়া উহাদিগকে 'লাইনার' বলা হয়। জাপানী লাইনারগুলির মধ্যে কয়েকখানা আমেরিকার ভ্যাঙ্কুবার স্যানফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। এই সব নিজেদের জাহাজে জাপানিগণ দলে দলে আমেরিকায় যেভাবে যাইতেছিল তাহাতে আমেরিকার ভবিষ্যৎ চিন্তা আসা স্বাভাবিক। শুধু কালিফোর্ণিয়াতেই পঞ্চাশ হাজারের অধিক জাপানী বাস করিয়া থাকে। বহিষ্করণ আইনের বলে জাপানিগণ আমেরিকায় যাইতে অসমর্থ হওয়াতেই মাঞ্চুরিয়ার উপর উহাদের সমধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং উহারা তথায় উপনিবেশ স্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করে; কিন্তু মাঞ্চুরিয়া অনুন্নত, জলহীন, শীতপ্রধান স্থান হওয়াতে আশানুযায়ী বসতি বিস্তৃত হয় না; আমেরিকায় বহিষ্করণ আইন হওয়ার পরেই অষ্ট্রেলিয়ায় এবং নিউজিলণ্ডে প্রবেশের পথও এশিয়াবাসীর পক্ষে রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এশিয়ার মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন এবং জাপান এই তিন দেশেরই প্রধানতঃ স্থানাভাব। ভারতবর্ষ হইতে স্থানাভাববশতঃ বর্ত্তমান যুগে অন্য দেশে কলোনি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে সব লোক গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য; অধিক লোকই চুক্তিবদ্ধ কুলী হয়ে আফ্রিকায়, মরিশসে, সিংহলে, মালয়দেশে, ফিজি-দ্বীপে এবং কিউবাতে যাইয়া চুক্তি অন্তে তথাকার অধিবাসী হইয়া ঐ সব দেশে বাস করিতেছে; চীনাদের অবস্থাও তথৈবচ; ইহাদের প্রধান কলোনি সিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গ, মালক্কা প্রভৃতি মালয় দেশের প্রধান বন্দরগুলি; সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিন্ প্রভৃতি দ্বীপেও ইহাদের সংখ্যা কম নয়; এই সব স্থানে চীনা কুলী, মুটে, মজুরের সংখ্যাই বেশী। জাপান স্বাধীন জাতি; তাহার স্বাধীনতার একটা গৌরবজনক মূল্য আছে; কাযেই তাহারা ভারতবাসী এবং চীনাদের মত যেথা সেথা কুলী বলে অভিহিত হইতেও ঘৃণা বোধ করে বলিয়া ঐ সব স্থানে তাহাদের সংখ্যা কম হইলেও উপেক্ষণীয় নয়। জাভাতে অনেক জাপানীর চিনির কল আছে; বলা বাহুল্য এই সব অধিকাংশ কলেই জাপানী এবং চীনা কুলী কার্য্য করিয়া থাকে। মালয় প্রদেশেও সিঙ্গাপুর, কোলালামপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক জাপানীর রবারের কারখানা আছে; এই সব কারখানায় অধিকাংশই ভারতীয় এবং চীনা কুলী; ইহার প্রধান কারণ হয়েছে জাপানের লেবার ইউনিয়ন অর্থাৎ শ্রমিক সঙ্ঘ কোন জাপানী কুলীকে চীনা এবং ভারতবাসী কুলীর সমকক্ষ হারে কার্য্য করিতে একেবারেই অনুমোদন করে না; কাজেই মালয় প্রদেশে জাপানী কুলীর সংখ্যা কম; বিশেষতঃ সত্য কথা বল্তে গেলে স্বাধীনতার একটা মূল্য আছে, সেই হিসেবে মূল্যহীন জাতকে যে উহারা একটু অবজ্ঞার চোখে দেখিবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে! এজন্য ইহারা পরাধীন জাতির সঙ্গে হীন কায করিতে লজ্জাবোধ না করিলেও ঘৃণা বোধ করে। জাপানী কুলীদের এই আত্ম-সম্মানবোধ ইহাদের জাতীয় শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে বেড়ে চল্ছে। ভারতীয় শ্রমিকগণ

অপেক্ষাকৃত আলস্যপরায়ণ; চীনা শ্রমিকগণ তদপেক্ষা তৎপর, জাপানী শ্রমিকগণও প্রায় উহাদের সমকক্ষ অথবা একটু বেশী হইতে পারে; কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার জোরে বেশী তৎপর মনে করে; এজন্য উহারা বেশী বেতনের হার দাবী করিয়া চীনা এবং ভারতীয় শ্রমিকের সঙ্গে বেতনের প্রতিযোগিতায় পারে না বলিয়া মালয় প্রদেশে জাপানী শ্রমিক না আনিয়া দেখাইতে চায় যে, জাপানী শ্রমিক কুলী নয়; অথচ দেশও বোঝাই—ধরে না, কাজেই দেশী লোকের জ্ঞাতসারে হীন কাজ করা অপেক্ষা উহাদের অজ্ঞাতসারে বিদেশে তদপেক্ষা হীন কাজ করা সম্মানজনক মনে করিয়া ইহারা দলে দলে দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল প্রায় ভারতবর্ষের ন্যায় বৃহৎ দেশ, উর্ব্বরা শক্তিও কম নয়; কিন্তু লোকসংখ্যা একেবারেই কম। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেশের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিদেশীদের প্রবেশের পক্ষে সাধারণ পাশপোর্ট ভিন্ন বিশেষ কোন বাধা নাই। ইতিপূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন উদ্দেশ্যে এবং শ্রমিকের কার্য্য করিবার জন্য অনেক জাপানী তথায় গিয়াছে। আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটের ধনকুবেরগণ ব্রাজিলে বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া রবারের চাষে অনেক জাপানী কুলী নিযুক্ত করায় জাপানীদের স্থানাভাব কতকটা হ্রাস পেয়েছিল। বর্ত্তমানে মাঞ্চুরিয়ায় নানাবিধ খনিজ পদার্থের আবিষ্কার হওয়ায় অর্থের লোভে মুকডেন্, হায়ারন্, ডেরিন প্রভৃতি বন্দর-গুলিতে জাপানিগণ দলে দলে আসিয়া বসবাসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছে। এখনও উহাদের স্থানাভাব আছে ইহা বলা চলে না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির অভাব চিরকালই থাকবে।

সমস্ত জাপানে সাতটী সোনার, সাত আটটি কয়লার খনি, লোহার খনি তিনটি, বারটী রূপার খনি ও এগারটী তামার খনি আছে; বারুদ এবং নানাবিধ বিস্ফোরক নির্ম্মাণে সলফার অর্থাৎ গন্ধকের অভাব নেই; জাপান এতদিন লোহার কাঙ্গাল ছিল বেশী; মাঞ্চুরিয়ায় মৌরসী পাট্টা পাওয়ায় এখন বোধ হয় ঐ সব অভাব কতকটা পরিপূরণ হইবে; কিন্তু ক্ষুধা মিটিবে না সমস্ত চীন সাম্রাজ্য গ্রাস করিলেও! শুধু জাপানকে দোষী করিয়া লাভ কি? বিশেষতঃ মাঞ্চুরিয়ায় ও মঙ্গোলিয়ায় অনধিকৃত বিস্তৃত পরিত্যক্ত স্থান পড়ে আছে; চীন জাপানের প্রতিবাসী, এমতাবস্থায় ব্রাজিল জাপানীদিগকে তথায় যে ভাবে স্থান দিয়েছে চীন যদি জাপানকে সেপ্রকার উদারভাবে স্থান দিত অথবা পরোক্ষভাবে বিদেশী শক্তির উত্তেজনায় জাপানের বিরুদ্ধতা না করিত, তাহা হইলে চীন জাপানের মধ্যে এতটা কুরু-পাণ্ডবত্ব বৃদ্ধি পেত কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয়। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স বৃহৎ নৌবহর দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা রক্ষার মাতব্বরিতা করে; আজকাল কুলীরাও সর্দ্দারের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব চায় না; কাজেই ব্রাজিল তাহার ছাগল লেজের দিকে কাটিলেও মাতব্বরের কোনপ্রকার অযাচিত উপদেশ এখন প্যর্যন্ত গ্রহণ করে নাই; চক্রান্তে পড়িলে ব্রাজিলও দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে। চীনের মাথায় বুদ্ধির অভাব নেই; কিন্তু মন্থরা জুটেছে অনেক। রাজনীতির নিকট বেশ্যার নীতিও হার মানে; বেশ্যা বেশ্যা বলেই পরিচিত; কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ কিছুতেই মুখোস খুলিয়া পরিচিত হইতে যায় না, অন্যে টেনে না খোলা পর্য্যন্ত! ব্রাজিলের অধিকাংশ অধিবাসীই স্পেনিশ অর্থাৎ স্পেন দেশ হইতে আগত খৃষ্টান। খৃষ্টান ব্রাজিলবাসিগণ খৃষ্টান হয়েও বিধর্ম্মী জাপানীদিগকে যে ভাবে স্থান দিয়েছে এই ভাব যদি চীনের মধ্যে থাকিত এবং জাপানও যদি আঙ্গুল দেখালে সম্পূর্ণ হাত খাওয়ার বুদ্ধিতে লুব্ধ না হত, তাহলে বিশ্বরাষ্ট্রে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে একটা ভয়ানক উলটু পালটু হয়ে যেত; কিন্তু তাহা হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কারণ চীন জাপানকে ছোট মনে করিয়া এতদিন তাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছে; চীন জাপানের প্রতি অত্যাচারও কম করে নাই; কাজেই জাপান সেগুলি ভুলিবে কেন? সময়ে উভয় জাতির মনের কষাকষি কিন্তু ঢিলা হইলেই তাল বেতালের চক্রান্তে উভয় জাতি উতলা হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ)

[চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্ব্বে লিখিত। ভাঃ সঃ]

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা-

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

ঘুম ভাঙিতেই প্রথম মনে হইল সকালের আলোটায় "আলো"র পরিমাণ যেন অন্যদিন অপেক্ষা অনেক বেশী। কাহার সহিত দেখা না হইতেই ছুটিয়া গেল রাধা ছাদে। কেন গেল সেই জানে, অথবা সেও জানে না।

কলিকাতার বাড়ীর ছাদে উঠিয়াই যে রাধা সহসা মনোরম একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সূর্য্যোদয়ের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটা দেখিয়া মুগ্ধ হইল এমন মনে করিবার হেতু নাই। তবু সে অহেতুক আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধ হৃদয়ে মনে মনে উচ্চারণ করিল বাঃ। শ্যাওলা পড়া ছাদের আলিসা ধরিয়া কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়াইয়া থাকিল। আবার চঞ্চলচিত্তে—গুন গুন করিয়া একটা বহু পুরাতন গানের এককলি গাহিতে গাহিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; "নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসী, যে পথ দিয়া চলিয়া যাবো—সবারে যাবো তুষি'। বাতাস জল, আকাশ আলো—সবারে কবে বাসিব ভালো—হৃদয় সভা জুড়িয়া তা'রা—

অকস্মাৎ খোঁপায় 'হ্যাঁচ্‌কা' এক টান্ খাইয়া মাথাটা পিছনের দিকে ঝুলিয়া পড়িল এবং রবিবাবুর মর্য্যাদা ভুলিয়া রাধা গানের মাঝখানে চীৎকার করিয়া উঠিল—উঃ।

আক্রমণকারী ততক্ষণে নিরীহভাবে বইখাতা লইয়া গুছাইয়া বসিবার বাসনায় ছাদে একখানি মাদুর বিছাইতেছে; রাধা বিরক্তকণ্ঠে কহিল, এটা কি হল শিশির?

ষোল বছরের ছেলেকে যুবক বলিলে যদি শ্রুতিকটু না হয় তো উক্ত যুবক, অথবা বালক বলিলে যদি মর্য্যাদাহানি না হয় তো উক্ত বালক —নিজের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ আশা করিয়াছিল একটি অগ্নিবর্ষণকারী তীব্র দৃষ্টি এবং একটি উত্তপ্ত কণ্ঠের মর্ম্মভেদী ডাক—"শিশির"।

সেস্থানে রাধার বিরক্তিপূর্ণ প্রশ্নটা অনেক কোমল বলিয়া বোধ হইল। কাজেই আরো ক্ষেপাইবার উদ্দেশ্যে কহিল—কোনটা? ওঃ চুলটানা? শ্রীরাধা ধ্যানে মগ্ন, অথচ চায়ের জল প্রতীক্ষা করে করে শীতল হয়ে উঠছে—তাই।

রাধা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিল—শিশির, ফের তুমি ওই রকম ইয়ার্কি দিয়ে কথা বলছো? কলেজে ঢুকে তোমার বড় বাড় বেড়েছে না? মাসীর সঙ্গে আবার ঠাট্টা কি?

শিশির সবিনয়ে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া কহিল—ও 'সরি' ছোটমাসীমাতা ঠাকুরাণী, চায়ের জলটা আপনার আশায় থেকে থেকে হতাশ হয়ে উঠছে—দয়া করে যদি বেচারাকে কেটলীর পেট থেকে মুক্তি দেন।

রাধা কিঞ্চিৎ নরম হইয়া কহিল—দাদু উঠেছেন না কি? কতই বা বেলা হয়েছে?

আপনার কি আজ সময়ের জ্ঞান আছে? ধ্যানমগ্ন হয়ে কতক্ষণ ছিলেন সেটা যদি ঘড়ি ধরে দেখতেন?

শিশির ভারী অসভ্য হয়েছ তুমি, চল বড়দির কাছে তোমার মজা দেখাচ্ছি।

'বড়দির' নামে শিশির সবিনয় শিথিলতা ত্যাগ করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—কি মজা দেখাবে শুনি? অসভ্যতাটা কি করা হয়েছে? 'ধ্যানমগ্ন' কথাটা বুঝি খুব অসভ্য? সাধু সন্ন্যাসীরা ভোর বেলা নির্জ্জনে বসে ঈশ্বর চিন্তা করেন না? তুমি যদি নিজের মনের মতন মানে বের করো কি করবো? সেই যে বলে না 'চোরের মন বোঁচকার দিকে' তোমার তাই হয়েছে দেখছি। চল—তুমিই চল, সবাইকে জিগ্যেস করি গিয়ে—

'সবাইকে জিগ্যেস' করিবার নামেই রাধার বীরত্ব কমিয়া আসিয়াছিল? কিন্তু মুখে স্বীকার না করিয়া মাসীগিরি বজায় রাখিয়া কহিল—আচ্ছা খুব হয়েছে—সকাল বেলা বুঝি লেখা পড়া নেই? ফার্ষ্ট ইয়ারে ফেল্ করলে খুব মুখ উজ্জ্বল হবে—কলেজের ছেলেরা চাঁটি মেরে বের করে দেবে যখন, তখন দেখবে মজা। বলিয়াই বোধকরি নিজেই চাঁটি খাইবার ভয়ে দুড়দুড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

শিশির হাসিয়া পাঠে মনঃসংযোগ করিল; অন্যদিন হইলে চুল টানার অজুহাতে একটা খণ্ড প্রলয় ঘটিয়া যাইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র।

রাধার কপালে আজ অনেক দুঃখ, বড়দি যে বড়দি এত গম্ভীর মানুষ, তিনি আজ পর্য্যন্ত রাধাকে দেখিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—রাধারাণীর যে রাত না পোয়াতেই ঘুম ভেঙেছে দেখছি! কে জাগালে গো?

এ কি অন্যায় বলতো—রাধার না হয় 'ঘুম-কাতুরে' বলিয়া একটু বদনাম আছে, তাই বলিয়া কি না ডাকিলে কোনদিনই ওঠে না? এই তো সেদিন—কবে যেন ভাল—রাধা ভোরবেলা উঠিয়া বড়দিরই খোকাকে পাউডার মাখাইল, টিপ কাজল পরাইল, কোলে করিয়া সাত রাজ্য ঘুরিয়া বেড়াইল—বড়দির তখন অর্দ্ধেক রাত! ইতিমধ্যেই সে সব ভুল, অকৃতজ্ঞ হইলেই এইরকম হয় বটে।

আজ একটু সকাল সকাল ঘুম ভাঙিয়াছে বলিয়া পরিহাস কিসের বাপু? ছেলে তো এদিকে ধ্যানমগ্নটগ্ন কত কি যা তা' বলিয়া বসিল। বাঃ রে, রোজই বুঝি ডেকে দিতে হয়? বলিয়া রাধা সরিয়া পড়িল। কিন্তু পড়িল একেবারে বাঘের মুখে—বড় জামাইবাবু যে টে্রণের 'ধকলে' সারাদিন কাটাইয়া রাত্রি বারোটায় শয্যাগ্রহণ করিয়া সকালবেলাই সেই শয্যার মায়া ত্যাগ করিবেন এটা রাধার কল্পনারও অতীত।

জামাইবাবুর পক্ষে রাধাকে গ্রেপ্তার করা এমন কিছু কঠিন নয়, যার জন্ত রাধা ভদ্রলোককে "লোহার থাবা" নামে অভিহিত করে। হাত ছাড়িবার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখাইয়া ভদ্রলোক এমন সব অশিষ্ট কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন যাহা দাঁড়াইয়া শোনা অসম্ভব বলিলেও হয়, ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাধা বিরক্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—আপনি যে বড় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করেন? আপনার ছেলেই বলে আমার চেয়ে বড়, হ্যাঁ। ভারী একেবারে—

তাতে কি? শ্যালী ইজ্ শ্যালী, ছেলের চেয়ে ছোট বলে শ্যালীকে নাত বৌ বলতে হবে না কি? লজিক পড়া বরের সঙ্গে মিশে এই বুদ্ধি হচ্ছে বুঝি? এঃ হে হেঃ।

লাগছে, ছাড়ুন বলছি, আঃ—অনেক কষ্টে শৃঙ্খল ভাঙিয়া দে ছুট। রাধার পিছনে সকলে মিলিয়া এমন করিয়া লাগিবার হেতুটা কি? বেচারাকে কি কাঁদাইয়া ছাড়িবে?

জামাইবাবুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাধা প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়াই স্নানের ঘরে ঢুকিল, সন্দেহ হইতে পারে হয়তো বা কাঁদিতেই গেল। কিন্তু স্নানের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আর্শীটা যদি আর্শী না হইয়া ক্যামেরা হইত তাহা হইলে হয়তো বিপরীত সাক্ষ্য দিয়া লোক-সমাজে তাহাকে অপদস্থ করিয়া ছাড়িত।

বহুক্ষণ ধরিয়া জল মাখাইয়া ছিটাইয়া রাধা যখন বর্ষা ধোয়া শ্যামল লতার মত একটা স্নিগ্ধশ্রী লইয়া স্নান সারিয়া বাহির হইল, তখন আপনার তনুর কমনীয়তায় আপনা আপনি মনটা তাহার অপূর্ব্ব পুলকে মুগ্ধ বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সুন্দর স্নানের পর, বাদামী সিল্কের ব্লাউসের সহিত, রূপালী জরিপাড় মিহি নীলাম্বরী শাড়ীখানি পরিলেই অবশ্য মানায় ভালো; কিন্তু পরিলে বাড়ীর সকলে তাহাকে 'আস্ত' রাখিবে কি না সে বিষয়ে রাধার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অগত্যাই ঈষৎ ক্ষুণ্ণ মনে নিত্য ব্যবহৃত শাড়ী ব্লাউস পরিয়া সারিতে হইল।

চুল আঁচড়ানো অথবা টিপ্ পরা অবশ্য প্রাত্যহিক কর্ম্মের মধ্যে পড়ে—করিলে নিন্দা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রাধার ভাগ্যে আজকে হয়তো লোকচক্ষে তাহারও একটা বিশেষ অর্থ বাহির হইবে, কাজ নাই বাপু।

বরং ইচ্ছা করিয়াই চুলগুলা একটু এলোমেলো করিয়া রাখিল; মায়ের চক্ষে পড়িলে যদি কিছু সুরাহা হয়। হায় এত ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা সত্ত্বেও ঘর হইতে বাহির হইতে মেজদা অনায়াসে বলিয়া বসিল—রাধি যে খুব ফরসা হয়েছিস দেখছি? সকাল থেকেই পাউডার মাখতে আরম্ভ করেছিস বুঝি?

দেখিলে একবার আক্কেলখানা? কবে আবার 'রাধি' সকালবেলা পাউডার মাখিয়া বেড়ায়, তাই আজই অমনি মাখিয়া বসিবে। বা নয় তাই। ইহারা দেখছি রাধাকে বাড়ী ছাড়া করিয়া ছাড়িবে। মেজদাকে উপযুক্ত উত্তর দিবার আগেই সে অবশ্য চলিয়া গিয়াছে; ড্রয়ার হইতে কাঁচিখানা বাহির করিয়া লইয়া।

রাধা হাঁকিয়া বলিল, বড় কাঁচি নিচ্ছ যে মেজদা? মা বকবে কিন্তু, কি করবে কাঁচি?

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে মেজদা বলিয়া গেল, এক ভদ্রলোকের নাক আর কান কাটা হবে। শুনিলে কথা? সাধে বলিয়াছি রাধাকে ইহারা বাড়ী ছাড়া না করিয়া ছাড়বে না। এমন করিয়া যদি—দূর ছাই, তা'র চেয়ে ভাঁড়ার ঘরে মা ঠাকুমার কাছে গিয়া বসা যাক, নিরাপদ দুর্গ।

রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, সেখানে বিরাট ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। তিনটা উনুন জ্বালিয়া বামুন ঠাকুর যেন কল্কি অবতারের দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় 'ম্লেচ্ছ-নিধন' ছাড়িয়া মৎস্য-নিধন কার্য্যে লাগিয়াছে। মসলার গন্ধে রন্ধনশালা ভরপুর। একদিকে আবার তোলা উনুন জ্বালিয়া মা পায়েস চড়াইয়াছেন। বাবা বাবা! বিয়ে নাকি বাড়ীতে? প্রসন্নমুখে কোন রকমে অপ্রসন্ন ভাব টানিয়া আনিয়া রাধা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল—বাবারে বাবা, ঠামা যে একেবারে খাবারের বৃন্দাবন করে বসেছ, আমাদের বুঝি খিদে পায়না? বারে! ঠামা ঝুড়ি ঝুড়ি হরেক রকম মিষ্টি লইয়া রেকাবীতে "বাটা" সাজাইতেছিলেন, রাধাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া হাসিয়া হাত নাড়িয়া গাহিয়া উঠিলেন—"রাধার কুঞ্জবনে, আজ গোপনে, আসবে শ্যামরায়।" বলি রাধালতার আজ 'বার' নেই কেন গো? অন্যদিন যে এতক্ষণে সাতবার দেখা মেলে!

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া রাধা মার কান বাঁচাইয়া কহিল—ঠামা তো বেশ কেত্তন গাইতে পারো। ভালো লোককে শোনাতে পারলে বক্শিষ পেতে।

ওলো, ভালো কি আর আছে? ভালো কালো হয়ে গেছে, সব গোপিনী ভাসিয়ে দিয়ে রাধার পায়ে পড়ে আছে।

আমাদের কপালে ভাল আর নেই গো রাধালতা। পাথর বাটিটা দেতো ভাই ওদিক থেকে। পাথর বাটি সরাইয়া দিয়া রাধা কৌতুক-কণ্ঠে কহিল—কেন তোমারটি তো আর কেউ কেড়ে নেয়নি বাবু?

আর দিদি, সেকাল কি আছে? যে একটি কথা কইবার জন্যে, মুখখানি একটু দেখবার জন্যে—চাতক পক্ষীর মতন ঘুর ঘুর করে বেড়াবে? এখনি না হ'ক কত মুখনাড়া দিয়ে গেল, বুড়ি বলেই না?

রাধা হাসিমুখে আর কিছু বলিতে যাইতেছিল, মা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন—ন'খুড়ি পায়েসের কিসমিস ক'টা বাছা হয়েছে না কি! হয়ে থাকে তো দাও। ঠামা নিবিষ্ট মনে শশার চাকায় ফুল কাটিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন—কিসমিস পেস্তা বাদাম এলাচ কর্পূর সব তো বৌমা রেখে এসেছি? জলচৌকীর নীচে রেকাবে আছে।

রাধার মা কন্তার দিকে চাহিয়া কহিলেন, রাধা কোথায় ছিলিরে? সকলের "ঘাটের জল" নেওয়া হয়েছে শুধু তোরই বাকী আছে, ছুটে যেন পালাসনে? 'ঘাটের জল' দেব—মিষ্টি হাতে দেব। আসছি পায়েসটা নামিয়ে।

রাধা বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; সত্যই কি তাহার স্নানের ঘরে এত

দেরী হইয়া গিয়াছে। 'ঠাম্মা' রাধার লজ্জিতভাব লক্ষ্য না করিয়া আপনার মনেই কহিতে লাগিলেন—

এদের সব এখনকার ধরণধারণ বুঝিনে, রান্না বান্না করে ব্যস্ত; এদিকে মেয়েটা একখানা ময়লা কাপড় পরে বেড়াচ্ছে তা' ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদের কালে যদি জামাই নেমন্তন্ন হয়েছে তো সাত পাড়ার বৌ ঝি জড় হয়েছে মেয়ে সাজাতে। তা' এখনকার মেয়েদের করেই বা দেবে কি, নিজেরাই কত সাজতে জানে! যা লো রাধা, যা মনের মত করে একটু সাজসজ্জা করগে, পায়ে একটু আলতা ছোঁয়াস। টিপ, কাজল কতই তো পরিস লো, আজ এমন যোগিনী বেশ কেন? কি যে সেই গাস তোরা—"যোগিনী হইয়ে যাবো সেই দেশে"—তাই বুঝি। রাধা মুচকি হাসিয়া কহিল, ঠাম্মার যেমন সব অদ্ভুত কথা, যোগিনী বেশ কোথা দেখলে? 'এই তো ডুরে শাড়ী পরেছি। তা হো'ক দিদি, বচ্ছরকার দিন নতুন বর আসবে, একখানি ভাল কাপড় পরতে হয়—ওলো অ' শান্তি! এই যে শিশির, তোর মাকে ডেকে দেতো? দিক্ এসে মেয়েটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে—রাধারাণী তো আমার এখনকার মেয়েদের মতন নয়। একটা দুর্ভাবনা ঘুচিল, বড়দি'র কাছে কৌশল করিয়া রাধার তবু নীলাম্বরী শাড়ীখানির কথা উল্লেখ করিতে হইবে। নীলাম্বরীর একটা মধুর ইতিহাস আছে বলিয়াই না রাধার এত চিন্তা। মনে মনে হাসিয়া ভাবিল, নাঃ রাধা মোটেই একেলে নয়—ভারী সেকেলে।

বড়দি না ডাকিলে তো যাওয়া যায় না; তা' ছাড়া মা নিষেধ করিয়া গেছেন ছুটিয়া পলাইতে; রাধা অন্যমনস্কভাবে কহিল—আচ্ছা ঠা'মা, তোমার বিয়ে হয়েছে কত'দিন হ'ল?

কেন রে—হঠাৎ এ খোঁজ কেন? সে কি আজকের কথা? ন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, আর এই উনষাট হ'ল; পঞ্চাশ বছরের কথা, চার যুগ বেরিয়ে গেছে। বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ঠাকুরমাও কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, অতীতের কোন দৃশ্য কল্পনা করিয়া না জানি শিরাবহুল শীর্ণ মুখে একটু মধুর স্নিগ্ধতা ফুটিয়া উঠিল।

আচ্ছা ঠা'মা, দাদু তোমায় খুব আদর করতেন?

আ মোলো! কি পাপ!! সকাল বেলা ছুঁড়ির মাথা বিগড়ে গেল না কি? সর সর কাজ আছে।

ও ঠাকুমা বল না, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—

ওলো করতো লো করতো, এখনকার ছোঁড়ারা সোহাগের জানে কি? 'বিশবছুরে' কনে সব—তারাই থাকে হাঁ করে, বর পেয়ে বর্তে যায়। তখনকার এতটুকুন মেয়ে—পাখী পোষার মতন করে বশ করতে' হ'ত; তবে না মনের মতনটি হ'ত? সে সব সোহাগের মর্ম্ম তোরা বুঝবি কি?

রাধার অবশ্য বিশ বছর বয়স নয়, তাই শ্লেষটা গায়ে মাখিল না; বলিয়া উঠিল—তবে এখন যে দাদুর সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া করো বড়ো? দাদুও তো তোমায় কেবলি বকেন?

রাধা, তোর কথায় বাছা মরা মানষেরও হাসি পায়। বকবে না তো কি এখনো কোলে বসিয়ে সোহাগ করবে? সকাল বেলা রাজ্যের ছিষ্টিছাড়া কথা নিয়ে কাজ ভণ্ডুল। নে সর, কত কাজ বাকী এখনো। ওই আসছেন তাড়া দিতে। বসে বসে তামাক খাবার যম। খালি ফোঁকোর দালালী।

আসিতেছেনই বটে, চটি জুতার শব্দে পাড়া মুখরিত করিয়া দাদু আসিয়া দর্শন দিলেন—কি এখনো তোমাদের হয়নি তো? আঃ, আজ আর দেখছি তোমরা ভদ্রলোকের ছেলেদের বেলা দুটোর আগে খেতে দিচ্ছ না। পিত্তি পড়িয়ে অসুখ করাবে আর কি—

ষাট্ অসুখ করবে কি দুঃখে? কথার কি ছিরি, মরে যাই। বেলা দশটা না বাজতেই নিজের যদি পিত্তি পড়ে যায় তো গিলে নাওগে যাও। ভদ্দর লোকের ছেলেরা এসেছে সবাই?—আসা আসি আর কি, সুধাংশু তো রয়েইছে—বিজয়ও এসে পড়বে এখুনি রবিবার আছে, খা'লি মনোজ—'তা'কে আনতে যাবে তবে তো? কথা কয়টা কহিয়াই 'দাদু' বারকতক তামাকে টান দিয়া লইলেন, বোধ হয় শ্রম লাঘব করিতে।

যেতে হবে তো—যাওনা? বসে বসে তো তামাকের ছেরাদ্দ করছো; গেরস্থর একটা কাজে লাগলেও তো হয়? দিবা রাত্তির "ভুড়ুক ভুড়ুক" দেখলে যেন হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

শীর্ণ মুখ বিকৃত করিয়া 'ঠা'মা' এমনভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন যে দেখিলে "পিত্ত জ্বলিয়া" যাওয়া সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না।

রাধা অবশ্য জন্মাবধি এই দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছে এবং দাদু যে কোন কালে ঠাম্মার 'বর' বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ঘণ্টাখানেক আগে পর্য্যন্ত একথা তাহার কখনো মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ যেন আজকেই বিশেষ করিয়া কথাটা স্মরণ হইয়া তাহার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। এই দন্তহীন কেশহীন বিকৃত-দর্শন বৃদ্ধ একদা যুবকরূপে তরুণী পত্নীকে ভালবাসিয়াছে আদর করিয়াছে, যেমন করিয়া মনোজ তাহাকে—? কি ভীষণ! এই রকম হইয়া যাইবে মনোজ? তাহাকে আর ভালবাসিবে না, আদরে ডুবাইয়া দিবে না। এতটুকু মন খারাপ করিলে শত প্রকার সাধ্য সাধনায় মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিবে না। কথায় কথায় গঞ্জনা দিবে, কলহ করিবে?

আর রাধা? রাধাও এমনি শিরাবহুল শীর্ণ হাত নাড়িয়া সারাদিন সংসারের কাজ করিবে? আর রাত্রে নাতি নাতনীর পাশতলায়, যেখানে সেখানে একটু স্থান করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইবে? অসম্ভব! রাধা কখনো বুড়ি হইয়া বাঁচিবে না। কিন্তু মনোজ? তাহার সম্বন্ধে ও কথা ভাবিতে নাই, সে বাঁচিয়া থাকুক, কিন্তু বুড়া হইবে? ছিঃ।

ঠাম্মা রান্না ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছেন, দাদুর চটির শব্দ কখন মিলাইয়া গেছে রাধা অন্যমনা; শিশিরের সশব্দ হাস্যে চৈতন্য ফিরিল বেচারার।

বাবা ! মেয়েকে সকালে কি একটু বলেছিলাম বলে তো তেড়ে মারতে এলেন, ধ্যান ছাড়া এটা কি হচ্ছে ছোট মাসী ? রাধা মুখ তুলিয়া চাহিল মাত্র, কিছু বলিল না।

শিশির রাধার প্রকৃতি-ছাড়া ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইল। ছোটমাসী আবার গম্ভীর হইবে ! বিবাহ ব্যাপারটা যে মেয়েদের পরকাল ঝরঝরে করিয়া দিবার প্রধান 'কল', তাহাতে আর শিশিরের সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

মেয়েদের যে কতই ঢং। যাও, মা তোমার জন্যে রাজ্যের বেনারসী শাড়ী ছড়িয়ে বসে ডাকাডাকি করছেন। কি যে সব বুঝি না বাবা। বলিয়া দুইখানা হাত যতটা সম্ভব উল্টাইয়া মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেল। মূল কথা ছোট মাসীর সঙ্গে ভাল মতন একটা ঝগড়া না বাধান পর্য্যন্ত তাহার মনে একবিন্দু শান্তি নাই। ভোজের ব্যাপারটি বেশ লোভনীয় হইয়াছে দেখা যাইতেছে, হজম হইবে কিরূপে ? লাগিবে নাকি মেজ-মামার সঙ্গে একবার ? নাঃ, বড় লায়েক হইয়া গিয়াছে আজকাল সে—শিশিরের সঙ্গে কথা কয় যেন পিঠ চাপড়াইয়া, তেমন জমিবে না। ছোট মেসোমশাইটী আসিলে হয়। লোকটী তবু ভদ্র আছে ; সে দিন খাসা হারিয়াছিল 'ক্যারমে'।

বড়দির কাছে আবার 'ডাক খাইয়া' রাধা উপরে গেল।

বড়দি ট্রাঙ্ক খুলিয়া খানকতক রঙিন শাড়ী বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, দেখিয়া বলিলেন—রাধা শোন্, দেখতো কোন কাপড়টা দেব।

রাধার মন ভাল থাকিলে বড়দির সামনে একটু লজ্জার অভিনয় করিয়া জানাইত—বেশ সাজ আছে তাহার। মনটা তাহার সহসা এমন ভারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে যে নিরুৎসাহভাবে শুধু বলিল, দাওনা যা হয়। নীলাম্বরীর কথা মনেই পড়িলনা।

বড়দি বাছিয়া বাছিয়া একখানা বেগুনী ছাপা ছিটের শাড়ী ও ব্লাউস পরাইয়া চুল আঁচড়াইয়া টিপ্ পরাইয়া আলতা পরাইয়া বলিলেন—বসে থাক সভ্য ভব্য হয়ে। এখুনি যেন শিশিরটার সঙ্গে মারামারি করে রণচণ্ডী বেশ করিসনে বাপু।

শিশিরের সঙ্গে ? তাহার সম্মুখে বাহির হইতে হইলে তো রাধা মরিয়াই যাইবে। কাহার সামনেই বা নয় ? বাবা, দাদু, মেজদা, জামাইবাবু—উঃ সর্ব্বনাশ আর কি ?

তিনতলায় দাদার ঘরটা খালি পড়িয়া আছে। দাদা বৌ লইয়া শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে, অথবা বৌদি বর লইয়া বাপের বাড়ী। রাধা আসিয়া জানলার ধারে ইজি-চেয়ারটা টানিয়া শুইয়া পড়িল।

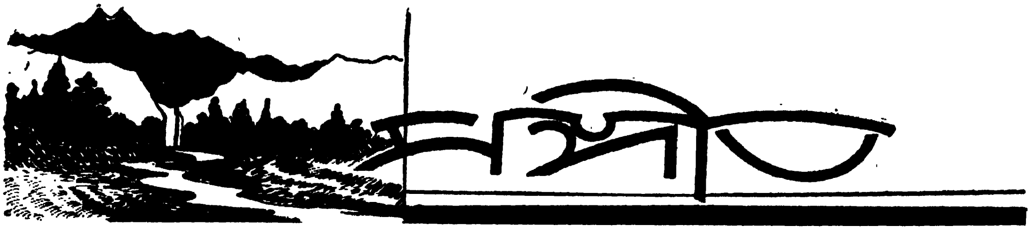
কালই তো মনোজের চিঠি আসিয়াছে ; হাতের কাছে না থাকিলেও রাধার প্রায় মুখস্থ। ওই যে লিখিয়াছে রাণি আমাদের ভালবাসা চির-নবীন চিরসুন্দর, অক্ষয়, যুগযুগান্তর আমরা পরস্পরকে ইত্যাদি ইত্যাদি সে সমস্তই—তাহা হইলে অসার কবিত্ব ? "যুবক 'দাদু' ও তরুণী "ঠাকুমা" এমন একটা হাস্যকর চিত্র কল্পনা করিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাওয়ার পরিবর্ত্তে এত দুশ্চিন্তা কেন ? হইল কি রাধার।

শিশির মিথ্যা বলে না, "মেয়েদের সব ঢংই" বটে।

রাধার চিন্তাজাল ভেদ করিয়া সুধার কলকণ্ঠ ধ্বনিয়া উঠিল নীচের তলায়—ছোড়দি আসিয়াছে ? আসিবার কথা ছিল না কি ? রাধার কি কিছু হুঁস পর্য্যন্ত ছিল না ? না—ওই যে সুধার খানানো সাধা গলার প্রত্যেকটি কথা শোনা যাইতেছে, রাধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল ; ছোড়দি আসিলে রাধার ঝড়ে উড়িয়া নীচে পড়িবার কথা · কিন্তু বলিতেছে কি ?—হ্যাঁ গো তাইতো এলাম। আমি না থাকলে নতুন জামাইয়ের কান মলবে কে ? তোমাদের বাপু আচ্ছা আক্কেল, ঘরের মেয়েকে বাদ দিয়ে পরের ছেলেকে নেমন্তন্ন ! রাধি' এসেছে—বড়দি রয়েছে—আমি না এসে থাকতে পারি ? রাত থেকে ঘুম হচ্ছিল না, নিয়ে আসবে প্রতিজ্ঞা করিয়ে তবে ঘুমোই। কই গো দাদু, তোমাদের 'চাঁদের হাট-বাজার' দেখলে ? তিনটি রত্ন তোমার ঘরের তিন কোণ উজ্জ্বল করে বসেছেন, এইবার তুমি গিয়ে এদিকে বসলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

শেষের কথা কয়টা কানে ঢুকিবার পথ না পাইয়া ভাসিয়া গেল ; রাধার কানে শুধু বাজিতে লাগিল—"তিনটি রত্ন"—মনোজও আসিয়াছে তাহা হইলে ? অত করিয়া লিখিয়াছিল মনোজ, ঠিক দশটা দশ মিনিটের সময় ছাতের পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে থেকো লক্ষ্মীটি, আমি দূর থেকে আসতে আসতে দেখবো—অভিসারিকা শ্রীরাধার মত তোমার সেই নীল শাড়ীর আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে · থাকবে তো ? আমি ঠিক মোড়ের মাথায় গাড়ীটা ইচ্ছে করে বিগড়ে ফেলবো, আর অনে—কক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হবে ওপর দিকে তাকিয়ে, কেমন ? লোকের কিছু মনে করবার হেতু নেই, গাড়ীই যখন চলছে না ? সত্যি রাণি, তোমাদের বাড়ীর সেই জনারণ্য ভেদ করে কখন যে দেখা হবে—" মনোজ ছাদের দিকে চাহিতে চাহিতে আসিয়া হতাশ হইয়া গিয়াছে ? কোন তুচ্ছ কথায় ভুলিয়া এমন প্রয়োজনীয় কথা ভুলিল রাধা ? হইয়াছিল কি তাহার ? এতক্ষণের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন একটা পথ পাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। ··





বাঙ্গাল্ *—ত্রিতালী

আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী।
নেচে নেচে আয় বুকে আয়—
দিয়ে তাথৈ তাথৈ করতালী ॥
দশদিক আলো ক'রে,
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর প'রে,
দুরন্ত রূপ ধ'রে আয়—
মায়ার সংসারে আগুন জ্বালি' ॥
আমার স্নেহের রাঙা জবা পায়ে দ'লে
কালোরূপ-তরঙ্গ তুলে,
গগন-তলে, সিন্ধুজলে—
আমার কোলে—আয় মা আয়।
তোর চপলতায় মা কবে—
শান্ত ভবন প্রাণ চঞ্চল হবে,
এলোকেশে এনে ঝড় মায়ার এ-খেলাঘর
ভেঙে দে'মা, আনন্দ-দুলালী ॥

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল্ ইস্লাম্ — স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

	০					১					২´					৩					
II {	গা	-া	-া	৺রগা	|	গা	-া	৺পমা	-া	|	মা	-গা	রা	সা	|	সা	-ন্া	ধ্া	প্া	I
	আ	০	০	য়্		মা	০	০	০		চ	ন্	চ	লা		মু	ক্	ত	কে		

* বাঙ্গাল্—বঙ্গাল্ (হিন্দী)। অপ্রচলিত লুপ্তপ্রায় রাগগুলির মধ্যে এটী অন্যতম। এই রাগের ঐরূপ নামের কোন প্রকৃত তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ, বঙ্গদেশে এককালে ইহার প্রচলনাধিক্য হেতু হিন্দুস্থানী গায়কেরা ইহার নাম "বঙ্গাল" রাখিয়াছিলেন। আদি রাগ রাগিণীর সংখ্যা-সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থকারগণ বিভিন্ন মত দিয়া গিয়াছেন। "সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে" যে বিংশতিটী আদি রাগের নাম পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে "বঙ্গাল" রাগের উল্লেখ আছে, যথা :—

"শ্রী-রাগ নট্টো বঙ্গালো ভাষ মধ্যম ষাড়বৌ।
................................"—ইত্যাদি।

এই রাগ সম্পূর্ণজাতি এবং ইহা বেলাবলী ঠাটে গীত হয়। ইহার আরোহী—স, র, গ, ম, প, র্স এবং অবরোহী—র্স, ন, ধ, প, ম, গ, র, স।

I প্‌সা -া -া ন্‌া | ন্‌রা -া -া সা | সগা -া -রগরা সা | সা -া -া -া} I
শী • • • শ্যা মা • • • কা • • • • লী • • •

I পা মা গা রা | সন্‌া -সা ধ্‌া ন্‌া | সা -রা -গা -রগরা | -সা -া পা পা I
নে চে নে চে আ• য়্‌ বু কে আ • • • • • • য়্‌ দি য়ে

I পা পর্সা -া পা | পর্সা -া র্সা র্সা | র্সা -না -ধা -পধপ | মা -া -া -া II
তা থৈ • তা থৈ • ক র তা • • • • লী • • •

০ ১ ২ ৩
পা পা II পর্সা -া -া -া | র্সা -া র্সা -া | র্সর্রা -া র্সা -া | র্সা -া -া -া I
দ শ দি • • ক্‌ আ • লো • ক' • • • রে • • •

I র্সা -না ধা পা | মা -া পা পা | পা -পর্রা -া র্সা | র্সা -া -া -া I
ঝ ন্‌ ঝা র ম ন্‌ জী র প' • • • • রে • • •

I র্সা র্রা -র্গা র্মা | র্গর্মর্গা -া র্রা র্রা | র্রর্গা -র্রা -র্সা -া | -া -া -া -া I
দু র ন্‌ ত রূ • প্‌ ধ' রে আ • • • • • • য়্‌

I র্সা না -ধা -পা | পধা -পা মা গা | রা রমা মগা রা | রসা -া -া -া II
মা য়া • র্‌ স ঙ্‌ সা রে আ গু ন জ্বা লি' • • •

০ ১ ২ ৩
-া -া II ধা ধপা পা পমা | মগা -া গা গাম | রা রমা গা রা | ন্‌া -সা ধ্‌া -ন্‌া I
• • আ মা র স্নে হে সু রা ঙা জ বা পা য়ে দ' • লে •

প্রথম শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীগণের সুবিধার জন্য এই গানখানির স্বরলিপিতে আমি প্রতি অর্দ্ধমাত্রাকে একমাত্রা হিসাবে ধরিয়া ভাগ করিয়াছি। প্রথমে গানখানির সুর, প্রদত্ত তালে ও ছন্দে আয়ত্ত করিয়া লইয়া, পরে প্রতি দুই দুই মাত্রাকে একমাত্রা হিসাবে ধরিয়া, উক্ত স্বরলিপিতে প্রদত্ত ৩২ মাত্রাকে ১৬ মাত্রার তালে অপেক্ষাকৃত একটু জলদ গাহিলেই গানখানি ঠিকমত গাওয়া হইবে। ইতি—স্বরলিপিকার

I সা রা গা মা | পা পর্সা -া র্সা | র্সা -া পা -া | গা মা -রা মা I
কা লো রূ প ত র০ ঙ্ গ তু ০ লে ০ গ গ ন ত

I গা -া রা -মা | গা রা সা -া | সা সা পা্ পা্ | পা্রা -া সা -া I
লে ০ সি ন্ ধু জ লে ০ আ মা র্ কো লে০ ০ ০ ০

I সা -া -রা -া | রা -গা -া -গামা | গা মা -া -া | -া -া -া রা I
আ ০ ০ য়্ মা ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I পা -া পা পা | পা পর্সা -া র্সা | র্সর্রা -া র্সা -া | -া -া -া -া I
তো র্ চ প ল তা০ য়্ মা ক০ ০ বে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা না ধা পা | পা মা মা -া | পা র্রা -র্সা -া | র্সা -া র্সা -া I
শা ন্ ত ভ ব ন্ প্রা ণ্ চ ন্ চ ল্ হ ০ বে ০

I র্সা র্রা র্গা র্মা | র্গা র্রর্গর্রা র্রা -া | র্রা র্রা র্গা র্গর্রা | র্সা র্সা র্সপা র্সা I
এ লো কে শে এ নে০ ঝ ড়্ মা য়া র্ এ খে লা ঘ র্

I র্সা না ধা -পা | পধা -া -া মা | মা গা -রা রমা | গা রগরা রসা -া II II
ভে ঙে দে ০ মা ০ ০ ০ আ ন ন্ দ০ দু লা০ লী ০



নিকোলাস রোরিক

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বর্ত্তমানে যে কয়জন অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি সমগ্র সভ্যজগতে যথেষ্ট সম্মান ও সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রোফেসর নিকোলাস রোরিক (Prof. Nicholas de Roerich) অন্যতম। তিনি শিল্প, সংস্কৃতি ও জ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ আদর্শবাদের উপাসক এবং সৌন্দর্য্য ও শান্তির পবিত্র ধ্যানে মগ্নচিত্ত।



প্রোফেসর নিকোলাস রোরিক

তাঁহার হিমালয় প্রদেশস্থ আশ্রম হইতে তিনি শান্তি ও ঐক্যের প্রগাঢ় চিন্তাধারা দেশবিদেশে প্রবাহিত করিতেছেন।

ভুবন-বিখ্যাত চিত্রশিল্পী নিকোলাস রোরিক সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ উপাসক। এতকাল ধরিয়া তিনি শিল্প ও সংস্কৃতিকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া আসিতেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার সে ভালবাসার বিরাম নাই, বরং তাহা আরও বৃদ্ধির দিকেই যাইতেছে।

যে দেশে পুস্‌কিন্, টলষ্টয়, লেনিন্, গোর্কি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশেই আর একজন প্রতিভাশালী পুরুষ নিকোলাস রোরিকের জন্ম হইয়াছে। রোরিক শিল্প ও সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া জগতে আন্তর্জাতিক শান্তি আনয়নের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তিনি তাঁহার এই আদর্শের অন্বেষণে হিমালয়ে সাধনায় রত রহিয়াছেন। ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয় যে, প্রোফেসর রোরিক বিগত কয়েক বৎসর হইতে এ দেশের অধিবাসী হইয়াছেন। উত্তর পাঞ্জাবে স্থাপিত তাঁহার প্রিয় "উরসবতী হিমালয়ান ইনিষ্টিটিউটে"র প্রতি সমগ্র সভ্যজগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

নিকোলাস রোরিক ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রুশ-সাম্রাজ্যের পুরাতন রাজধানী সেণ্টপিটার্সবার্গে (লেনিনগ্রাড্) একটী সম্ভ্রান্ত স্কেণ্ডিনেভিয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কনষ্টান্‌টাইন্ এফ্ রোরিক মহামান্য জারের সময়কার একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন। বাল্যে নিকোলাস বিদ্যালয়ে একটি অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং একবার দুই শ্রেণীর ও একবার তিন শ্রেণীর শিক্ষা তিনি এক বৎসর সময়ের মধ্যে শেষ করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই নিকোলাসের প্রত্নবিদ্যায় সবিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল। মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি একটী অতি প্রাচীন স্তূপ খনন করিয়া নানা দ্রব্য প্রত্নতাত্বিক সভায় উপহার প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিশেষ প্রশংসার অধিকারী হইয়াছিলেন। পনের বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই নিকোলাস রেখাঙ্কন ও চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা লাভ করেন।

নিকোলাসের পিতার ইচ্ছা ছিল যে, পুত্র কালে আইন-ব্যবসায়ে তাঁহার স্থান অধিকার করিবে। সেজন্য নিকোলাসকে আইনের ছাত্ররূপে সেণ্টপিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুকাল আইন অধ্যয়নের পর তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া "একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টসে" প্রবেশ করেন। নিকোলাস সেখানে শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নের মধ্যে নিজেকে একেবারে মগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যা ব্যতীত ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রাচীন ভাষারও তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। যথাসময়ে উচ্চ সম্মানের সহিত নিকোলাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করেন।

পরে বিশেষ শিল্প-শিক্ষালাভের জন্য নিকোলাস প্যারিসে গিয়াছিলেন। সেখানে প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পীর ছাত্র হইয়া তিনি কিছুকাল চিত্রাঙ্কনের সাধনা করেন। চিত্র-শিল্পের সাধক হইলেও নিকোলাসের মনে উচ্চতর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। সেজন্য তিনি তথায় তাঁহার প্রিয় বিষয় চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান এবং প্রত্নতত্ত্ব বিষয়েও অধ্যয়নে রত হইয়াছিলেন।

দেশে ফিরিয়া নিকোলাস রোরিক "সোসাইটি ফর দি এনকরেজমেণ্ট অফ্ আর্টস্"এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি "ইম্পিরিয়েল একাডেমি অফ্ আর্কিওলজি"র একজন অধ্যাপক ছিলেন। সেই সময় তিনি "আর্ট" পত্রিকার সম্পাদকতাও করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার "আর্কিটেক্‌চারেল সোসাইটি" শিল্পী রোরিককে একজন সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। সেই সময় এই উচ্চ সম্মান কয়েকজন মাত্র বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও স্থাপত্যবিদ্যা-বিশারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একটী বিশেষ চমকপ্রদ ঘটনার ফলেই তিনি এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। রুশিয়ার জার একটী গির্জ্জার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিকল্পনার জন্য পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করিয়াছিলেন। খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থপতিগণকে অতিশয় বিস্মিত করিয়া, চিত্রশিল্পী প্রোফেসর রোরিকের প্রেরিত পরিকল্পনাটাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় এবং তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন।

তরুণ বয়সেই রোরিক রুশিয়ার একজন প্রধান শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "একাডেমি ফর দি এনকরেজমেণ্ট অফ্ ফাইন আর্টস্ ইন্ রুশিয়া"র বিশেষ সম্মানার্হ ডিরেক্টরের পদ লাভ করেন। তাঁহার অধিনায়কতায় এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ইহার পর রোরিক ইউরোপের নানা দেশে পরিভ্রমণ করেন। বলশেভিক-বিপ্লবের সময়ে রোরিককে চারুকলা বিভাগের মন্ত্রিত্ব পদ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু তিনি সে সময় আমেরিকায় চলিয়া যান।



"পদ্ম" নিকোলাস রোরিক

আমেরিকা-যাত্রা হইতেই রোরিকের জীবনের আর এক অধ্যায় সুরু হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রোরিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন "Mir Iskusstva"—দি ওয়ার্লড অফ্ আর্ট—সভার প্রথম সভাপতি হন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে লণ্ডনে এবং শেষ ভাগে নিউইয়র্কে রোরিকের অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রথম প্রদর্শনী হয়। পরে ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র, বিভিন্ন সহরে চিত্রগুলি প্রদর্শিত এবং বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকাতেই নিকোলাস রোরিক সমুজ্জ্বল প্রতিভার মধ্য দিয়া ক্রমে নিজ জীবনের সর্ব্বোচ্চ যশশিখরে আরোহণ করেন।

তাঁহার বিপুল উদ্যমে ও সাধারণের সহযোগিতায় নিউ-ইয়র্কে "মাষ্টার ইনিষ্টিটিউট অফ্ ইউনাইটেড আর্টিষ্ট" নামক একটী আন্তর্জাতিক শিল্প-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। এই শিল্পকেন্দ্র হইতেই চিত্রাঙ্কনে রোরিক-পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমেরিকার সুসভ্য অধিবাসীরা যে প্রোফেসর রোরিককে কতটা উচ্চ সম্মান দান করিয়াছেন তাহা, নিউইয়র্কে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে একটী আকাশ-চুম্বী ভবন নির্ম্মাণ করিয়া সুবৃহৎ "রোরিক-মিউজিয়ম" প্রতিষ্ঠা করা হইতেই বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। শিল্প ও সংস্কৃতির এই



উরসবতী হিমালয়ান রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট

অন্যতম বৃহৎ নিকেতনে রোরিকের অঙ্কিত উৎকৃষ্টতম এক সহস্র চিত্র স্থানলাভ করিয়াছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসর রোরিক ভারতে আগমন করেন এবং উত্তর পাঞ্জাবে তাঁহার "উরসবতী হিমালয়ান রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট" স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষ হইতেই রোরিক তাঁহার তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও চীন-তুর্কিস্থানের সুদীর্ঘ অভিযান সুরু করেন। রোরিকের এই "মধ্য-এশিয়া অভিযান" ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সে সময় তিনি মনোমুগ্ধকর পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলীর কয়েক শত চিত্র অঙ্কিত করেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অভিযান হইতে ফিরিয়া প্রোফেসর রোরিক আর একবার আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তৎপরে ভারতে আসিয়া তাঁহার স্থাপিত "হিমালয়ান ইনিষ্টিটিউটে"র নানারূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি নিশ্চিন্ত যে, আমেরিকায় তাঁহার স্থাপিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি সুদক্ষ ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবেই পরিচালিত হইতেছে এবং সে সকলের খ্যাতি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল ভারতে বাস করার পর প্রোফেসর রোরিক ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে পুনরায় ইউরোপ ও আমেরিকায় গমন করেন এবং তথা হইতে বিশেষ নিমন্ত্রণে জাপান ও মাঞ্চুকা রাজ্য পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি বিশেষ অভ্যর্থনা ও যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। বৃদ্ধ বয়সেও প্রোফেসর রোরিকের উৎসাহ কমে নাই; তিনি জ্ঞান বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি অঞ্চলে দ্বিতীয় অভিযানে গিয়াছিলেন।

শেষ জীবনে রোরিক ভারতবর্ষকেই তাঁহার আবাসভূমি করিয়াছেন। অভ্রভেদী হিমালয়ের সৌন্দর্য্য, গরিমা ও পবিত্রতা তাঁহাকে একজন অধ্যাত্মবাদীতে পরিণত করিয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাচ্য-দর্শন তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে এবং তিনি কেবল প্রাচ্য বিষয়ে চিত্র অঙ্কন আরম্ভ করিয়াছেন।

রোরিকের অঙ্কিত চিত্রগুলি ভাবপ্রধান, এক নিগূঢ় মরমীবাদের অভিমুখী। সাধারণের চক্ষে তাঁহার অঙ্কন-রীতিতে তিনি অনধিগম্য, তাঁহার আদর্শেও তিনি অভাবনীয়! রোরিকের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"যখন আমি



"গুহাবাসী" নিকোলাস রোরিক

নিজের কাছে আপনার অঙ্কিত চিত্র কোন্ আদর্শের সন্ধান দিতেছে তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে বিষয়ে অপারগই হইয়াছি। কারণ, বাক্যের ভাষায় কেবল সত্যের একটা বিশেষরূপই প্রকাশ করা যায় এবং চিত্রের ভাষা সত্যের মাঝেই আধিপত্য করে—যেখানে বাক্যের প্রবেশ নাই।"

রোরিকের অঙ্কিত আধুনিক চিত্রাবলীর অনেকগুলিই হিমালয়ের মহত্ব প্রকাশক। এই সকল চিত্র প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী ও মনীষিগণের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা ও সাধুবাদ অর্জ্জন করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রোরিকের অঙ্কিত এই সকল চিত্রের ন্যায় ইতিপূর্ব্বে আর কাহারও চিত্রে হিমালয়ের মহান সত্ত্বা এরূপ নিরতিশয়ভাবে প্রকাশ পায় নাই।

প্রোফেসর রোরিকের রচিত নানা গ্রন্থ এবং বিভিন্ন বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি ইউরোপীয় প্রায় সকল ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত "হার্ট অফ্ এশিয়া", "পাথ্স অফ্ ব্লেসিং" "এডামেণ্ট" "আলতাই হিমালয়া" "রিলম্ অফ্ লাইট" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। চিত্র-তুলিকার মত এখনও তাঁহার লেখনি পরিচালনারও বিরাম হয় নাই। ভারতের কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি পত্রিকায়ও মধ্যে মধ্যে প্রোফেসর রোরিকের লিখিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শিল্পে অসামান্য প্রতিভাশালী প্রোফেসর রোরিক জগতের শান্তির জন্যও একজন অতি উৎসাহী সাধক। তিনি শিল্প ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া আন্তর্জাতিক



রোরিক মিউজিয়ম—নিউইয়র্ক

শান্তির কল্পনায় বিভোর। রোরিক বলেন—"শিল্পের কার্য্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়াই আমরা জয়লাভ করি, সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়াই মিলিত হই এবং সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়াই আমরা ভগবানের উপাসনা করি।"

রোরিকের কল্পনার আদর্শ এই যে, জগতের সমস্ত জাতি তাঁহার প্রস্তাবিত "শান্তি-পতাকা"র (Banner of Peace) তলে আসিয়া মিলিত হইবে ও বিশ্বমানবের একটীমাত্র সংঘরূপে দাঁড়াইবে এবং আন্তর্জাতিকভাবের ঘনিষ্ঠ আদান প্রদানে যে উজ্জ্বল আলোকপাত হইবে, তাহাতে প্রত্যেকের জীবন শান্তিময় ও বাধাহীন করিয়া তুলিবে।

তখনি তোর যাত্রা হবে সুরু

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

(১)

দিগন্তে ঐ ঘনিয়ে আসে মেঘ,
অসীম ধরা আঁধার হয়ে আসে,
ধীরে ধীরে বাড়ে বায়ুর বেগ,
গাছের পাতা কাঁপে তার-ই ত্রাসে।

(২)

বিজ্‌লী ভয়ে চম্‌কে যেন ওঠে,
বজ্র ভীষণ গর্জ্জে গুরু গুরু ;
ওরে পথিক, ওরে অবোধ পথিক,
এখনি তোর যাত্রা হবে সুরু।

(৩)

নদীর বুকে উঠ্‌ছে ক্ষেপে বারি,
ঢেউগুলি সব আছ্‌ড়ে পড়ে কূলে,
এমন দিনে দেয় না যে কেউ পাড়ি,
হাওয়ায় তরী কাঁপ্‌ছে দুলে দুলে।

(৪)

যখনি তোর জাগ্‌বে মনে ভয়,
বুকের ভিতর করবে দুরু দুরু ;
তখনি তোর, ওরে অবোধ পথিক,
তখনি তোর যাত্রা হবে সুরু।

(৫)

দুখের মাঝে হবে যে তোর জয়,
দুর্য্যোগই যে হবে আপন সাথী ;
স্নিগ্ধ আলো—কেউ তো সে তোর নয়,
সঙ্গী যে তোর কাজল ঘন রাতি।

(৬)

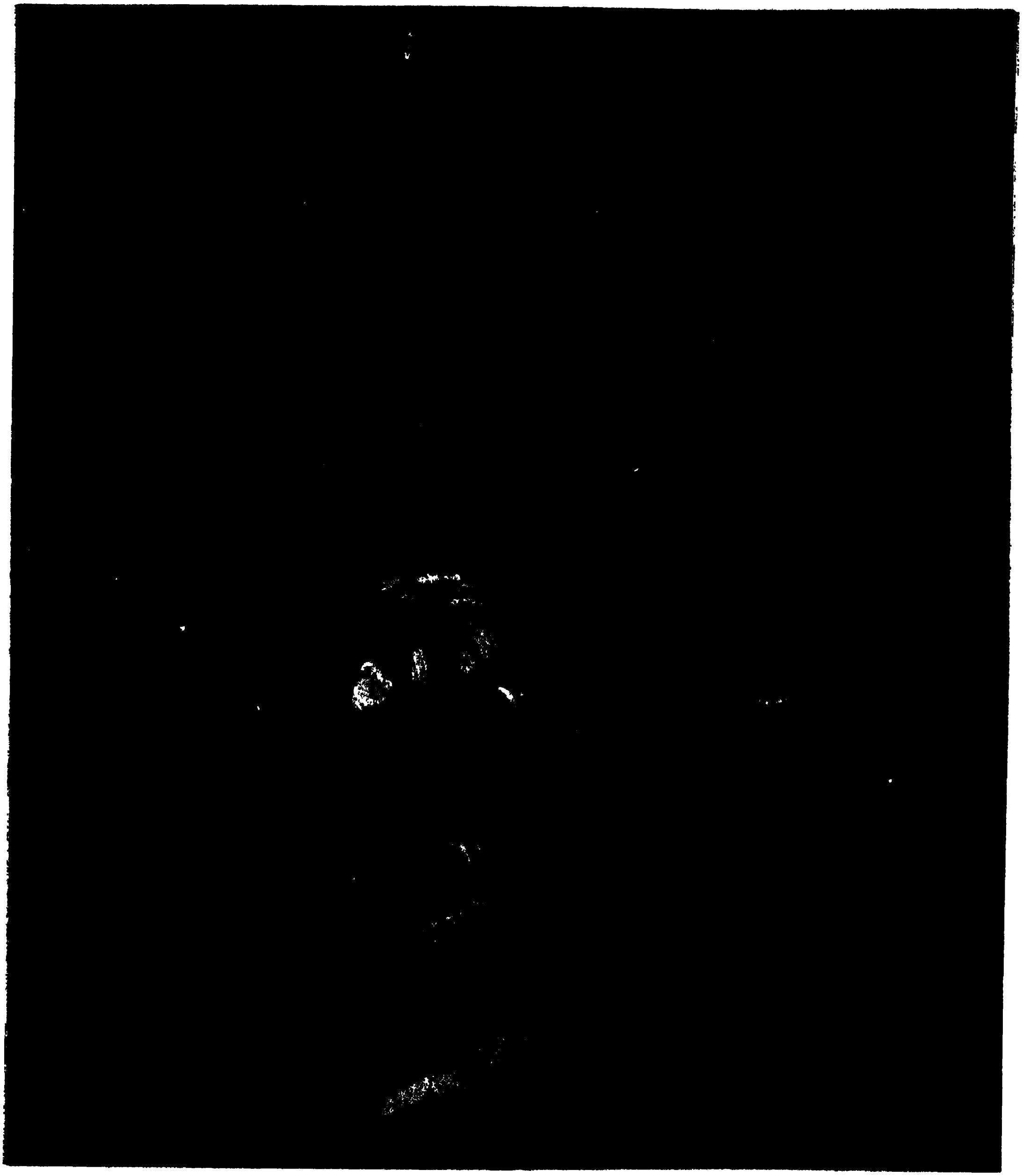
বাহিরের ঐ বিষম গণ্ডগোলে
যখনি তোর কাঁপ্‌বে চোখের ভুরু,
ওরে পথিক, ওরে অবোধ পথিক,
তখনি তোর যাত্রা হবে সুরু।

(৭)

জানিস্ নাকি অবোধ পথিক ওরে
সুখের হাসি দুখের পরেই আসে,
ভয় কিরে তোর অমন কাজল ঘোরে,
রাতের শেষে ভোরের আলোক হাসে।

(৮)

যখনি তোর ভাঙা ঘরের ছই
বাতাসেতে করবে উড়ু উড়ু ;
তখনি তোর, ওরে অবোধ পথিক,
ঘর ছেড়ে সেই যাত্রা হবে সুরু।



বেলা শেষে

সৌমেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

Bharatvarsha Printing Works

যাদুবিদ্যায় বাঙ্গালী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এম-এ

প্রবন্ধ

অনেকদিন পূর্ব্বে যখন যাদুকর গণপতির অদ্ভুত যাদুবিদ্যা দেখিয়াছিলাম তখন বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছিলাম যে বাঙ্গালীও এত অদ্ভুত যাদুক্রিয়া প্রদর্শন করিতে সমর্থ। তৎকালে থ্রাসটন, গ্রসী, কার্টার ও নিকোলা প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশী ঐন্দ্রজালিক ছাড়া আর কেহ এই বিদ্যায় এতদূর বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন নাই। যাদুকর গণপতিকে হাত পা বন্ধ করিয়া সকলের পরীক্ষিত একটী থলের ভিতর বন্ধ করিয়া একটী সকলের পরীক্ষিত বড় বাক্সে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রফেসর গণপতি চক্রবর্ত্তী মুহূর্ত্তে ঐ বাক্স হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন ও পুনঃ প্রবেশ করিতেন। এই ক্রিয়া-সম্পাদন এত ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার সহিত তিনি করিতে সমর্থ হইতেন যে দর্শকমণ্ডলী শত চেষ্টাতেও উহার কৌশল আয়ত্ব করিতে পারেন নাই।

যাদুকর গণপতির আর একটী বিস্ময়কর খেলা ব্লাকার্ট' (Black Art); দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বল আলোক-আবার গাঢ় অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারময় গৃহে নরকঙ্কালের আবির্ভাব—হাঃ—হাঃ—হিঃ—হিঃ—অট্টহাস্যে রঙ্গমঞ্চ ঘন ঘন আলোড়িত হইতে থাকে—তারপর সেই নৃত্যপরায়ণ কঙ্কালগুলি মিলিয়া একটী নারীমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। চেয়ার-টেবিল চায়ের কাপ ডিস সমস্তই শূন্যে উড়িয়া আসে যায়—একটী ভয়ঙ্কর মড়ার মাথা উড়িয়া আসিয়া গণপতিবাবুর মুখ হইতে জ্বলন্ত সিগারেট কাড়িয়া লইয়া ধূমপান করে। মুঠি মুঠি ধূলি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এক একজন সুন্দরী নারীমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। হাঁসের ডিম হইতে হাঁস ও পায়রার ডিম হইতে পায়রা জন্মগ্রহণ করিয়া আকাশে উড়িতে আরম্ভ করে। ইহা যেমন ভয়াবহ—তেমনই রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়জনক। এইরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা ঐন্দ্রজালিককে পাইয়া বাংলাদেশ বাস্তবিকই গর্ব্ব অনুভব করিত। কারণ 'ইন্দ্রজাল' বা যাদুবিদ্যা ভারতবর্ষের নিজস্ব বিদ্যা। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ইহা এদেশে প্রচলিত। প্রাচীন ভারতের অনেক গ্রন্থেই এই যাদুবিদ্যা ও অদ্ভুতকর্ম্মা যাদুকরদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তসূত্রেও স্থানে স্থানে তৎকালীন ঐন্দ্রজালিকদের অদ্ভুত ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যদেশে 'হিপ্নোটিজম্' বা 'মেস্‌মেরিজম' প্রভৃতি যে সমস্ত অদ্ভুত



গণপতি

বিদ্যার কথা শুনা যায় উহা ভারতীয় সম্মোহন বিদ্যার নিম্ন অংশ মাত্র। এই 'সম্মোহন বিদ্যা'—ভারতীয় যোগশাস্ত্রেরই একটী বিশিষ্ট অংশ এবং অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধির মধ্যে 'বশিত্ব' সিদ্ধির পর্য্যায়ভুক্ত। রামায়ণ, মহাভারত, উত্তররামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে ঐন্দ্রজালিকের বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা জানা যায়। ইতিহাস পাঠে

জানা যায়, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর উহার বিবরণ পারস্য ভাষায় স্বরচিত আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঠিক ইহার পরই এই বিশিষ্ট বিদ্যাটীর স্রোতে ভাঁটা পড়িতে পড়িতে বর্ত্তমানে উহা পথের বেদিয়ার হাতে একটী খেলার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বেদিয়ারাই বংশ-পরম্পরানুযায়ী বাঁধাধরা কতকগুলি খেলাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ঐগুলিই প্রকৃষ্ট ভারতীয় যাদুবিদ্যার একমাত্র ভগ্নাবশেষ। নিছক অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই তাহারা এই খেলা দেখাইয়া থাকে—কাজেই ঐ অর্দ্ধ ও অশিক্ষিতদের



পি-সি-সরকার

হাতে খেলাগুলির ক্রমশঃ অবনতিই হইয়া চলিয়াছিল। তথাপি এখনও উহাদের হাতে ছোটখাট দু'চারটী প্রাচীন খেলা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। কিরূপে উহারা একটী আমের আঁটী মাটিতে পুতিয়া মুহূর্ত্তে ফলসহ আম্রবৃক্ষ উৎপাদন করে, কিরূপে উহারা একটী বালককে ঝুড়িতে বদ্ধ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য করে এবং কিরূপে তাহারা খালি পায়ে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর হাঁটিতে সমর্থ হয়। কোনরূপ বাঁধা ষ্টেজ নাই—সামান্য কয়েকটী যন্ত্রপাতি লইয়া উহারা যে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে উহা শুধু আমাদিগকেই নহে, পাশ্চাত্যের বহু বিজ্ঞানবিদ্‌কেই বিস্মিত করিয়া ছাড়িয়াছে। এতদিন অশিক্ষিতদের হাতেই এই বিদ্যা পড়িয়াছিল; কাজেই ইহার কোনও উন্নতি সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি শিক্ষিত সমাজের এইদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে দেখা যাইতেছে। করাঙ্গুলীতে গণা যায় মুষ্টিমেয় এই কয়েকজন গবেষণাকারী ছাত্রদিগের মধ্যে—পি, সি, সরকার অন্যতম। কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স লইয়া যখন তিনি বি-এ পড়িতেছিলেন তখনই তিনি বাংলা-দেশের একজন প্রসিদ্ধ যাদুকর এবং তৎকালেই তাঁহার 'ম্যাজিক' ও 'হিপ্নোটিজম্' সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক বাজারে বাহির হয়। শ্রীযুক্ত সরকারের প্রথম ম্যাজিক আলোচনা আরম্ভ হয় ট্রেণে টিকিট চেকারের টিকিট লইয়া, দেশে দুধ ওয়ালার ভাঁড়ের দুধ লইয়া, ছাতাওয়ালার ছাতা ও কমলা-ওয়ালার কমলা উড়াইয়া। এই সমস্ত ছোটখাট খেলা তিনি পথের বেদিয়াদের শিষ্যত্ব করিয়াই অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। এইরূপ ছোটখাট খেলা লইয়া আরম্ভ হইলেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল 'নূতন কিছু করা।' এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের খেলাসমূহ লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন। এই বিদ্যাকে সায়েন্সের পর্য্যায়ে ফেলিয়া তিনি ইহা হইতে বর্ত্তমানে অনেক রহস্যই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

পল্লীগ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের সন্ন্যাসীদের লৌহশলাকা সাহায্যে জিবফোঁড়া খেলাকে সায়েন্সের পর্য্যায়ে ফেলিয়া তিনি তাঁহার অধুনা প্রসিদ্ধ "জীবিত মনুষ্যের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুনরায় জোড়া দেওয়া" খেলাটীর আবিষ্কার করিয়াছেন। সিভিলসার্জ্জনগণ নিজেদের একজন লোকের জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া স্বহস্তে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিবার পর তিনি অক্লেশে উহার পুনরায় সংযোগ সাধন করেন। রংপুর তাজহাট রাজবাড়ীতে তাঁহার এই ক্রিয়া তত্ত্বাবধান করিতে যাইয়া মিষ্টার এফ, বেল নামক জনৈক ইংরেজ আই-সি-এস রাজকর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। বাংলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন্ সাহেব শ্রীযুক্ত সরকারের খেলা অত্যন্ত পছন্দ করিলেও এই লোমহর্ষণ খেলাটী দেখিতে রাজী হন নাই। পাবনাতে সিভিলসার্জ্জনের নিজের হাঁসপাতালের রোগী কানাই-লালের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিবার পর যখন যাদুকর সরকার ইহা বেমালুম জুড়িয়া দেন তখন তদঞ্চলে

যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাঁহার এই খেলা ব্রহ্মদেশ, শানরাজ্য সর্ব্বত্রই যথেষ্ট হুলস্থুলের সৃষ্টি করিয়াছিল। কারণ এই বীভৎস দৃশ্যে শুধু লোকে বিস্মিতই হয় না—উহা তাহাদের শ্বাসরোধ করিয়া আনে। 'যে কোন দেশের হাতকড়ি অগ্রাহ্য করা' তাঁহার একটী বিশিষ্ট খেলা। বাংলার সর্ব্বোচ্চ পুলিশ অফিসার আই-জি-পি-অব-বেঙ্গল মিষ্টার জে-সি-ফার্ম্মার স্বহস্তে গভর্ণমেণ্টের নূতন দুই জোড়া হাতকড়িদ্বারা তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া দিবার পরও তিনি মুহূর্ত্তে উহা খুলিয়া ফেলেন। 'ডুমকা'তে বহু ইংরেজ সিভিল ও মিলিটারী অফিসার মিলিত হইয়া তাঁহাকে বিহার গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "Sealed Sample" হাতকড়ি দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারায় তাঁহারা মিলিত হইয়া তাঁহাকে একটী স্বাক্ষর-পত্র দিয়াছেন—"যে বিহার গভর্ণমেণ্টের কঠিনতম হাতকড়ি দ্বারাও তাঁহারা মিষ্টার সরকারকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন নাই।" এবার চীনে অবস্থানকালে তিনি হাতকড়ির যে খেলা দেখাইয়াছেন, বোধহয় বর্ত্তমান যাদুবিদ্যাজগতে এরূপ ভীষণ পরীক্ষা আর কেহই করেন নাই। তাঁহাকে 'হংকং' এ রেলের লাইনের সহিত একটী বিশেষ দ্রুতগামী ট্রেন আসার মাত্র ৩৮ সেকেণ্ড পূর্ব্বে দুইজোড়া হাতকড়ি আবদ্ধ করিয়া রাখা সত্ত্বেও তিনি নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত হইয়া আসেন। 'ইউনাইটেড প্রেসে'র মারফৎ এই বার্ত্তা পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের যাদুকর সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার ডব্লিউ, গল্ডষ্টন (Will Goldston) শ্রীযুক্ত সরকারকে "you are a born showman" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

যাদুকর পি-সি-সরকারের অপর একটী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খেলা তাঁহার বিখ্যাত "এক্স-রে চক্ষুর ক্রিয়া।" উভয় চক্ষুর উপর পুরু ময়দার আঠা মাখাইয়া তদুপরি ডাক্তারী ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তিনি জনযানবহুল রাজপথে অক্লেশে সাইকেলে যাতায়াত করিয়াছেন। উক্ত অবস্থায় তিনি তাস খেলিয়া, বই ও খবরের কাগজ পাঠ করিয়া, বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিষয় সঠিক লিখিয়া বা পাঠ করিয়া, অঙ্ক কষিয়া, ছবি আঁকিয়া—শুধু এতদ্দেশেই নহে, সুদূর জাপানেও অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এই খেলাটীর জন্য তিনি 'এক্স-রে চক্ষুযুক্ত লোক' বা "The Man with X'Ray Eyes" নামে জগদ্বিখ্যাত। সংবাদপত্র-সেবীগণ অবগত আছেন যে "জাপানে তাঁহার ম্যাজিক বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং তাঁহার ম্যাজিকে সেদেশের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যাইবে বিবেচনায় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে, টাকা উপায়ের জন্য তিনি কোনরূপ অভিনয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিল। জাপানীরা তাঁহার খেলা পছন্দ করিতে লাগিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ নানা স্থান হইতে টাকাপূর্ণ থলে পুরস্কার দিতে আরম্ভ করেন। ফলে তাঁহার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। শ্রীযুত সরকার আগামী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে 'অলিম্পিক প্রতিযোগিতা' হইবে, তাহাতে এখনই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এইরূপ শুধু জাপানে নহে—সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তিনি "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর" প্রতিপন্ন হইয়াছেন—ইহা ভারতবাসীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে।"···(আনন্দবাজার পত্রিকা)

যাদুকর পি-সি-সরকারের আবিষ্কৃত 'ফোর্স রাইটিং' খেলাটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবার যখন বাংলায় প্রথম হক-মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়, তখন উহাদের প্রীতিভোজে শ্রীযুক্ত সরকার যাদুবিদ্যা প্রদর্শনার্থ আহুত হন। ইম্পিরিয়াল রেষ্টুরেণ্টে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে ঐ প্রীতি অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য খেলা দেখাইবার পর যাদুকর সরকার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিষ্টার ফজলুলহক সাহেবের হাতে সাদাকাগজ দিয়া কিছু লিখিতে বলেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কিছু লিখিয়া উক্ত লিখিত বিষয় অপরাপর মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে দেন। তখন মন্ত্রীমণ্ডলী একে একে সকলে উহাতে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করেন। তৎপর সকলের স্বাক্ষরিত ঐ বিষয়টী কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিষ্টার কলশনের হাতে পড়িবার জন্য দেওয়া হয়। তদনুযায়ী মিষ্টার কলশন পড়েন যে—"আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সকলে এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলাম এবং আজ হইতে যাদুকর পি-সি-সরকার বাংলার মন্ত্রী হইলেন।" এরপর বিরাট হাস্য সহকারে প্রধান মন্ত্রী এবং অপরাপর মন্ত্রীগণ বলিলেন—তাঁহারা ঐরূপ বিষয় লিখেন নাই বা ঐরূপ কিছুতে স্বাক্ষর করেন নাই; কিন্তু সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন তাঁহাদের হাতে ঐরূপ লেখা হইল কি করিয়া এবং

স্বাক্ষর গেলই বা কিরূপে! এই হাস্যকর খেলার বিবরণ পরদিন কলিকাতায় সমস্ত সংবাদপত্রে 'বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগ!' 'প্রীতিভোজে হাস্যকর ব্যাপার' প্রভৃতি বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এই খেলার পর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার বাংলার মন্ত্রী না হইলেও তাঁহার যাদুবিদ্যায় 'শ্রেষ্ঠত্ব' ও তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা আবালবৃদ্ধবনিতা মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

যাদুকর গণপতি চক্রবর্ত্তী ও প্রফেসার পি-সি-সরকার উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় যে দুইজন যাদুবিদ্যায় দুইদিকে প্রতিভা দেখাইতেছেন। পাশ্চাত্যের যাদুকরগণ নূতন নূতন ক্রিয়া উদ্ভাবিত করিয়া যখন হুলুস্থুলের সৃষ্টি করেন যাদুকর গণপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সেই খেলাটী অনুকরণ করিয়া ফেলেন। সে খেলা যত কঠিনই হউক না কেন, গণপতি তাহার কৌশল আবিষ্কার করিবেনই। যাদুকর সরকারের লক্ষ্য অন্যরূপ; তিনি প্রাচীন ভারতের কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রণালীকে বিশ্লেষণ করিয়া এমন সব খেলা বাহির করেন যাহা একমাত্র ভারতীয়ের দ্বারাই সম্ভব—পৃথিবীর অপর জাতির নিকট তাহা সুদূরপরাহত। সকলেই অবগত আছেন যে পাশ্চাত্যের মণীষীগণ হস্ত-কৌশলপূর্ণ ও যান্ত্রিককৌশলপূর্ণ খেলায় ওস্তাদ, তাঁহারা ভারতের গুপ্ততত্ত্বসম্বলিত 'হঠযোগ' বা ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি সম্বলিত খেলায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সেইজন্যই যে কোন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় যাদুকর এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড বা আমেরিকায় গিয়াছেন সকলেই সেখানে হুলুস্থুলের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাদুকর সরকার 'ভারতীয় যাদুবিদ্যার প্রকৃষ্ট পরিচয়দাতা'—তবে তিনি যে পাশ্চাত্য খেলাসমূহে অনভিজ্ঞ তাহাও নহে। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার বহু যাদুকর সম্মিলনীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি সকল কৌশলই অবগত—তাঁহার বাক্সে অসংখ্য আধুনিক ও প্রাচীন বিলাতী পুস্তক, খেলার কৌশল ও যন্ত্রপাতি এখনও শোভা পাইতেছে; কিন্তু তিনি সেগুলি পছন্দ করেন না। ভারতীয় যাদুবিদ্যায় নূতন কিছু করা চাই ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং তাহা লইয়াই তিনি প্রাণপাত করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে যাদুকর সরকার অর্থাৎ অধুনা প্রসিদ্ধ 'যাদুসম্রাট' পি-সি-সরকার ভুবনবিখ্যাত যাদুকলাসম্রাট গণপতি চক্রবর্ত্তীরই শিষ্য। তাঁহার নিকট হইতে শৈশবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই তিনি যাদুবিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার এই অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টার মূলে আছেন বৃদ্ধ গণপতি স্বয়ং। আজ যাদুসম্রাট সরকারের যাদুবিদ্যা সাফল্যে বোধহয় গুরু গণপতিই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। কারণ শাস্ত্রে আছে যে সর্ব্বত্র জয়ের ইচ্ছা করিলেও পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয়ই আশা করিবে। সেইজন্যই বোধহয় গণপতি নিজেই সরকারকে 'যাদুসম্রাট' ও 'কৃতিত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাদুকর পি-সি-সরকারের নাম, যশ ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বহুপূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার ছাত্রসমূহের মধ্যে কৃতিত্বে তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তোমার যাদুসম্রাট নাম সার্থক করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি আরও পারদর্শী হইয়া আমার ও দেশের নাম অধিকতর উজ্জ্বল কর।"

যাদুবিদ্যার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রত্যেকটী ক্রিয়ার নিশ্চয়ই কোন সহজসাধ্য "গুপ্ত-কৌশল" আছে—যাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু সাধারণ চক্ষুর নিকট ঐগুলি এক একটী মস্তবড় সমস্যা। লোককে আনন্দ দিবার উহা একটী নির্দ্দোষ উপায় মাত্র—দূর হইতে দেখিতে উহা রামধনুর মতই চমকপ্রদ, কৌতুহলোদ্দীপক ও সুন্দর। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চক্ষুতে হয়ত ঐ রামধনু শুধু জলবিম্ব বা সূর্য্যকিরণেরই (Collection of prismatic colours) একটী ক্রিয়া মাত্র, কিন্তু আমরা রামধনুকে রামধনুই দেখিতে চাহি উহাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ভাঙিয়া ছোট করিতে রাজী নহি। যত অকিঞ্চিৎকরই হউক না, প্রত্যেকটী যাদুক্রিয়ার কৌশলকে আমরা ভারতের লুপ্তবিদ্যার একাংশ বলিয়াই জানিব। সেইজন্য প্রকৃষ্ট ভারতীয় যাদুবিদ্যার যাঁহারা পরিচয় দিতেছেন বা যাঁহারা ইহার উদ্ধারের নিমিত্ত কৃতসংকল্প তাঁহারা প্রত্যেকেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। বিশ্বের জনসমাজে যে সমস্ত বাঙ্গালী ভারতীয় যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন—তাঁহারা শুধু বাংলার নহে ভারতের প্রাচীন বিদ্যার গৌরব-বৃদ্ধি করিতেছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত। বিদেশে তাঁহাদের সাফল্যে আমরা গৌরবান্বিত ও গর্ব্বিত সন্দেহ নাই।

তাম্র-যোগ (৩)

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

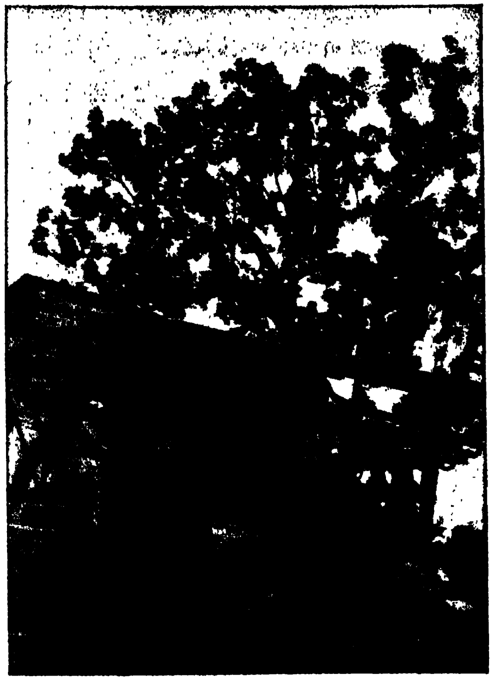
ভারতের রাশি রাশি তাম্র হো-দেশের সুবর্ণরেখা-প্রদেশে প্রস্তুত হয়ে জল ও স্থল পথে তাম্রলিপ্ত বন্দরে এসে চীনে ও দূর-প্রাচ্যে প্রেরিত হোতো। ঐ স্থান হোতে ঐ দ্রব্যের অবিরত এতাধিক রপ্তানি হেতু ঐ বন্দর ক্রমশঃ তাম্র-বন্দর বা তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাতি লাভ করে।

"হো"-দেশে তাম্র-যোগের প্রসার বলতে গিয়ে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। কত কি যে আছে, কত চলে গেছে, তা এখনও এ সব পাহাড় জঙ্গলে বেরুলে চোখে পড়ে। নাদুপের প্রাচীন খনি-সমূহের সুড়ঙ্গাভ্যন্তরে দলবদ্ধ অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব-সহ কি ভাবে গড়াগড়ি ও 'বিপথ-চিৎ' হতে হয়েছিল তা পূর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে ও তৎপ্রসঙ্গে সে সব প্রাচীন খনির কথঞ্চিৎ আলোচনাও হয়েছে [গৌ. চ. ব,—'ভারতবর্ষ' অগ্রঃ ১৩৪২]।

ঐ সব তাম্র-প্রদেশের যথা তথা 'তাম্র-মল' (slag) এর সু-প্রচুর অবস্থিতি স্বতঃই সপ্রমাণ করে—কত শতসহস্র বৎসর ধরে সে সব দেশে তাম্র নিষ্কাশিত হয়ে আসছে। সে সব যুগে বড় বড় কারখানা নিশ্চয়ই ছিল না। তবুও নানারূপ ধাতু নিষ্কাশিত হোতো। বৃহদায়তনের কাযও হোতো। যেমন—কুতুবের লৌহ-স্তম্ভ। সেটা এক খণ্ড গোটা স্তম্ভ নয় নানা খণ্ডে প্রস্তুত। সেই বিভিন্ন খণ্ড একত্রিত ও 'ঝালিত' হয়েই স্তম্ভীভূত। কিন্তু এমন সুন্দররূপে তা 'ঝালা' যে বিশেষভাবে পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে ধরা পড়ে না। বহু প্রাচীন কামানও ঐভাবে তৈরী হয়েছিল। এখনও তা পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পারা যায়।

লোহার কথা এখন অবশ্য বলছিনে। তামা কিভাবে 'গালাই' হোতো সেইটেই এইখানে বক্তব্য। প্রাচীন পদ্ধতিতে লৌহ-গালাই আজও অনেক পাহাড়-জঙ্গলে চোখে পড়ে, কিন্তু তাম্র-গালাই প্রায় লুপ্ত। কদাচিৎ কোথাও একটু আধটু রেখা দেখতে পাওয়া যায়। একস্থানে এমনি একটা প্রাচীন 'গালাই-স্থানের' সন্ধানে গিয়ে সেই 'গালাই-উনুনের (ovens) অংশ বিশেষ নিয়েও এসেছিলাম।

বহু প্রাচীন যুগে ঠিক কি পদ্ধতিতে তাম্র-গালাই হোতো তার সঠিক পরিচয় না পেলেও খানিকটা আভাস পরবর্ত্তী দেশীয় প্রথা থেকে পাওয়া যায়।



শূন্য পথে চালিত তাম্র প্রস্তর

সাধারণতঃ প্রস্তরময় খানিকটা স্থানকে সমতল করে নিয়ে তদুপরি অথবা একখানা সমতল প্রস্তরখণ্ডে আবশ্যকানুযায়ী তাম্র মাক্ষিক (Copper Ore) রেখে, বৃহৎ 'নোড়া' সাহায্যে ভগ্ন ও যথাসম্ভব চূর্ণিত করা হোতো। এই প্রক্রিয়ার ফলে সমতল প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কতকটা 'গামলা'-আকার হয়ে পড়তো, আর সেই বৃহৎ 'নোড়া'টাও 'এব্ড়ো-খেব্ড়ো' হয়ে যেতো। কোন কোন

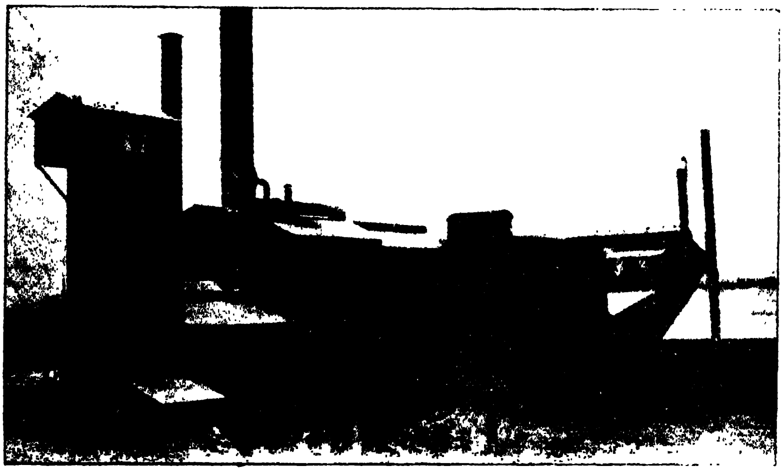
নোড়ার উভয় দিকই ব্যবহৃত হোতো—একদিক টুক্‌রা ও অপরদিক চূর্ণ-করণার্থে। তার পর সেই চূর্ণীকৃত মাক্ষিক গালাই হোতো। গালাই-এর পদ্ধতি ছিল অনেকটা প্রাচীন প্রথার লৌহ-গালাই-এর মত।

তাম্র-গালাই-এর ভাটা বা উনুন (ovens) প্রস্তুত হোতো প্রায়শঃই মাটী ও প্রস্তর-চূর্ণ মিশ্রিত করে ও তদভ্যন্তরে শক্ত পদার্থ সন্নিবেশ করে। এমনও কোথাও কোথাও নিদর্শন পাওয়া যায় যে ভাটার অভ্যন্তরে, তার সমান মাপের মৃত্তিকা ও প্রস্তর-চূর্ণ সহযোগে প্রস্তুত "শান্‌কী" বা 'গামলা'কৃতি একটা আধার বসিয়ে দেওয়া হোতো। গলন্ত তাম্র তাতেই জমা হোতো। অন্যথায়, ভাটার অভ্যন্তরে বালুকা-বিস্তার করেও এ কার্য্য চল্‌তো। এমন 'শানকী-ভাঙাও' পাওয়া গেছে বেশ তাম্রময় অবস্থায়।

গালাই এর পূর্ব্বে আরও কিছু প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। চূর্ণীকৃত মাক্ষিক গোময় সহযোগে ছোট ছোট ইষ্টকাকারে রৌদ্র শুষ্ক হওয়ার পর, দু'হাত আড়াই হাত ব্যাস ও দেড় হাত-দু'হাত উচ্চ ভাটায়, অথবা যে কোন প্রকারে অগ্নি সংযুক্ত হয়ে সমস্ত রাত্রি ধরে যথেষ্ট ইন্ধন সহকারে উত্তপ্ত ও দগ্ধান্তরে রূপান্তরিত হয়ে বেশ লাল্‌চে রূপ ধারণ করতো। তখন—তার তাম্রের প্রথম অবস্থা।

সেগুলি সংগৃহীত হয়ে হাপর সংযুক্ত অনুরূপ ভাটায় কাঠ কয়লার ব্লাষ্ট-ফারণেস্ প্রথায় 'গালিত' হয়ে দেখা দিত তাম্র-অবস্থায়। কিন্তু বিশুদ্ধ নয়।

বিশুদ্ধ করণার্থে আরও একবার বা দুইবার ঐ প্রথারই পুনরাভিনয়ের সঙ্গে এক প্রকার পাতার রস ব্যবহার দ্বারা তাম্রকে পাওয়া যেতো তার প্রকৃত উজ্জল লোহিত আভায় —— সেকালে তখন তাকে বলা হোতো—"লোহিতায়স্"।



সুবর্ণরেখাতটে তাঁবার কারখানা—ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন

এইরূপ পাতা ব্যবহার প্রসঙ্গ বহু পূর্ব্বে একবার ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছিলাম—'ইব্ ও যাশ্ এবং সুবর্ণরেখা প্রদেশে 'ঝোরা গন্দ' ও 'হো'-সম্প্রদায়ের 'সুবর্ণক্ষরণ' প্রসঙ্গে।

বিভিন্ন মুখে হাপর সাহায্যে ভাঁটাভ্যন্তরে উত্তপ্ত বায়ুর প্রবেশ যেরূপ সহজসাধ্য, অন্যমুখে ময়লা নিষ্কাশিত হওয়াও তদ্রূপ। পত্র-রস এই 'গাদ-নিষ্কাশনে' যে সাহায্য করে, তাহা কিছুমাত্র কম নয় বরং যথেষ্ট। ওদিকে বালুকা, কাষ্ঠ, ঘুঁটে, কয়লা ইত্যাদি উত্তাপ সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়ক। তদ্দ্বারা গালাই কার্য্যের উৎকর্ষ্য সাধিত হয় অধিকতর সুন্দররূপে। স্থান বা প্রয়োজন ভেদে বালুকা-স্তর অল্প-বিস্তর ব্যবহৃত হোতো। গলন্ত তাম্র ধারণার্থে ভাঁটার নিম্ন ভাগ প্রস্তুত হোতো—অল্প বা অধিক পরিসর অথবা অল্প বা অধিক গভীর আকারে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক বিধানে বিবিধ ব্যবস্থা ব্যাখ্যাত বা প্রবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন প্রথায় একটী ভাঁটায় ৫।৭ সের তামা দৈনিক পাওয়া যেতে পারতো। এখন কারখানার শক্তি অনুসারে যদৃচ্ছা পাওয়া যায়। এদেশে বর্তমানে দৈনিক ২০ টন পর্য্যন্ত (১ টন=২৭৷৹ মন) পাওয়া যেতে পারে।

এখনকার বৈজ্ঞানিক কারখানায় আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত নিষ্কাশনই চলছে। প্রথমতঃ তাম্র-মাক্ষিক বা তাম্র-

প্রস্তর একদফা ভগ্ন বা চূর্ণিত হবে প্রাইমারি ক্রাশারে (Primary Crusherএ)। সেখান থেকে 'ওর-বিন্' (Ore Bin) এ জমায়েত হয়ে প্রেরিত হয়—প্রথম গ্রাইণ্ডিং প্লাণ্টে (Grinding Plant) গুঁড়া হবার জন্য। তৎপর ফ্লোটেশন্ প্লাণ্ট (Flotation Plant) এ—তাম্রাংশ ও প্রস্তরাংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথকীভূত হতো। তাতেও যা অবশিষ্ট থাকে তা পরিষ্কৃত হয় ফিল্টারিং প্লাণ্ট (Filtering Plant) এ। তবুও কিছু কিছু বাজে ক্ষুদ্রাংশ থেকে যায়। ড্রাইং (Drying) প্লাণ্টে শুষ্ক হয়ে সমস্তটা বালুকাকারে পরিণত হয়। তখন এর নাম হয় কন্‌সেনট্রেটেড্ ওর্ (Concentrated Ore)। এও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়।

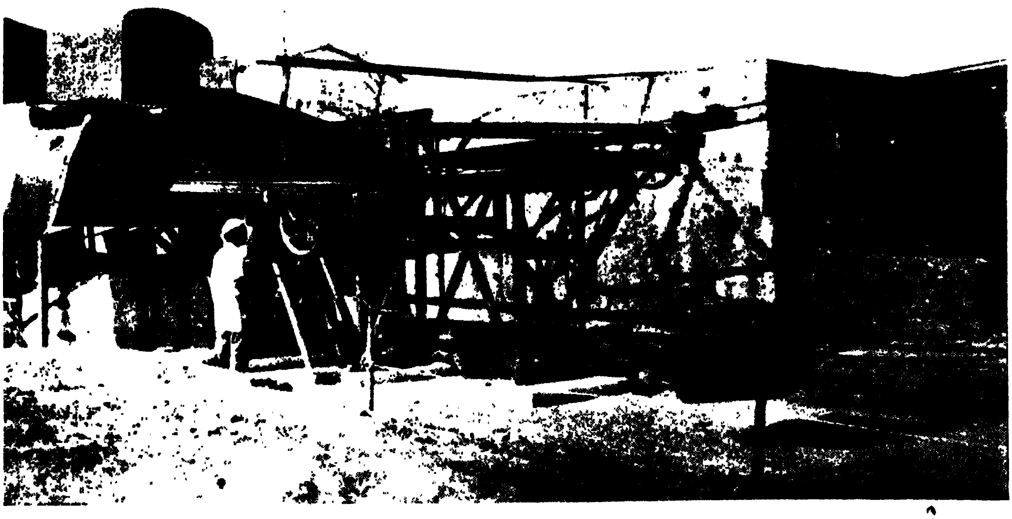
এর পর এই concentrated ore অন্যত্র 'বেডিং বিন্'এ উপস্থিত হয়, গালাই (Smelting) উদ্দেশ্যে। 'ওর-বিন্'এর মত 'বেডিং বিন্'ও তিন ভাগে বিভক্ত। রিভার্‌বারোটারী (Reverbaratory) ফারণেসে গালাই হয়ে 'মল' (slag) উপরে ও তামা নীচে পড়ে। তাতে এই 'মল' (slag)কে বের করে দেওয়ার সুবিধা হয়। তরল গলন্ত তাম্র তখন ল্যাড্‌ল (Ladle)এ বা উত্তাপসহ ইষ্টকে মোড়া বৃহদায়তনের বাল্‌তিতে ওভার হেড ক্রেন্ সাহায্যে 'কন্‌ভারটার' (Converter)এ চালিত হয়। এ সবই বিশুদ্ধীকরণ উদ্দেশ্যে, কারণ এততেও তাম্র স্ব-রূপে ধরা দেন নি। এখনও 'মলের' ছোঁয়াচ তাতে বর্ত্তমান।

এইবার শেষ পর্য্যায়—'রিফাইনারি' (Refinery) ফারণেস্। এইখানে সব 'মল্' নিষ্কাশিত হয়ে খাঁটী তামার দর্শন মেলে। তরল গলন্ত তামা এখান থেকে বেরিয়ে ছাঁচে 'ইন্‌গটে' (Ingotএ) রূপান্তরিত হয়—ইষ্টকাকারে। বর্ণ লালিমাভ।

পিত্তল প্রস্তুত হয় এই তাম্র হতে—দস্তার সংমিশ্রণে। বর্ণ হরিদ্রাভ, নাম ইয়েলো মেটাল (Yellow Metal)।

* * * *

আমাদের এ অঞ্চলে তাম্র-সমাবেশের যে মানচিত্র পূর্ব্বে দেখান হয়েছে [গৌ, চ, ব,—ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪] তা থেকে প্রতীয়মান হবে যে সিংভূম থেকে মধ্য প্রদেশের সীমান্ত পর্য্যন্ত এবং তার পরও তাম্ররেখা বিস্তৃত। বিন্ধ্যাচলের এই সব শাখা-প্রশাখায় কত রত্ন লুকানো আছে তা আজও সঠিক বলা যায় না। অগণিত রত্নসম্ভারের এই দেশ। ভূ-তত্ত্ব মতে হিমালয় অপেক্ষাও প্রবীণ ও ততোধিক সারগর্ভ। সুতরাং কত



মুসাবনী খনিতে শূন্য-পথে মাল প্রেরণের ব্যবস্থা

কি গুপ্ত তথ্য, কত অজানা, অজ্ঞাত, অশ্রুত, অভুতপূর্ব্ব, অত্যদ্ভুত ব্যাপার যে এই সব স্থানের দৃশ্যপটে লুক্কায়িত, ক'জন তা নির্ণয় করতে পেরেছেন!

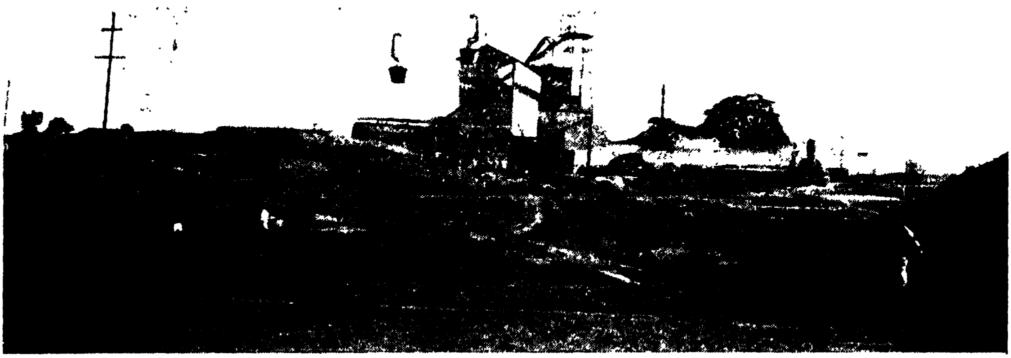
এই তাম্র-যোগ বলতে গিয়ে এমনি কত তথ্য চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। বাংলায় এ সম্বন্ধে যে বড় বেশী কিছু বেরিয়েছে তা নয়। তবুও কিছু কাল আগে শ্রীযুক্ত পিনাকীলাল রায় মহাশয় এক প্রবন্ধে অনেক তথ্যাদি দিয়েছেন এবং বহুকাল আগের একটী অত্যাশ্চর্য্য গুপ্ত তথ্যের বিবরণ পুরাতন 'জন্মভূমি' থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তা রোমঞ্চকর (ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৩৮)—

বেঙ্গল নাগপুর রেলের বিলাসপুর কাটনী ব্রাঞ্চের পথ প্রস্তুত কাযে কত লোক যে হিংস্র জন্তুর কবলে প্রাণ হারিয়েছে তা বলা যায় না। জনৈক ইয়োরোপিয়ান কন্‌ষ্ট্রাক্‌সন-অফিসার সস্ত্রীক ক্যাম্পে বাস করতেন ও এই পথ প্রস্তুত কার্য্য পরিচালনা করতেন। হস্তীপৃষ্ঠে তাঁরা চলেন আগে আগে। দামামা গুরু গুরু গম্ভীর নাদে হস্তীর তালে তালে চলনের সঙ্গে বেজে যায়। পেছনে হৈ হৈ কোরে 'হো' রা ও অন্যান্য শ্রমজীবীকুল বন জঙ্গল ভেঙে চলে। পথ তৈরী হয়। সন্ধ্যায় এক স্থানে আগুন জ্বেলে বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। এমনি করে একদিন এক বৃহৎ কদলী বনে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন। সকলেই চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট; কিরূপে এখানে এই কদলী বনের সত্তা! বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—সাহেব মেম একটা ছোট পাহাড়ের ওপর তাঁবু খাটানো দেখছেন ও ঘুরছেন। হঠাৎ দেখলেন—একটা গুহার মুখে শতাধিক তাম্র তৈজস—কোশাকুশী, পরাত, টাট্ট, পঞ্চ-প্রদীপ, পুষ্পপাত্র, প্রদীপ, কমণ্ডলু ইত্যাদি। যেন কেউ কিছু পূর্ব্বেও সে সব নিয়ে কায করছিল। সে সব এত বড় যে সাধারণ মানুষের ব্যবহারোপযোগী নয়। পরন্তু এই দ্রব্যাদি যে যুগের, সে যুগের, মানুষ ছিল নিশ্চয়ই বহুগুণে সবল ও বিরাটকায়।

সাহেব, মেমসাহেব, ইঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, কর্ম্মচারী-বৃন্দ সকলেই বিস্ময়নেত্রে সব দেখলেন, আর দেখলেন কদলীর সুপক্ক কাঁদি। সাহেব আদেশ দিলেন—সেদিকে যেন কেউ না যায়, কলা কেউ না খায়, যাদের জিনিস তাদেরই থাকবে। তৈজসাদির ওজন অনুমান দেড় শত মণ।

অন্যত্র এক গুহার অভ্যন্তরে দৃষ্ট হল প্রায় অর্দ্ধমণ ওজনের কয়েকটী তামার 'চ্যাঙ্গড়'। তারও ওজন প্রায় দেড়শত মণ। এত তামা কিরূপে এখানে সম্ভব হ'ল সাহেব তা চিন্তা করতে করতে লক্ষ্য করলেন—অদূরে প্রচুর 'তাম্রমল'। সুতরাং তাম্র যে সেখানে প্রস্তুত হয় তাও নিশ্চয়। কিন্তু করে কে? লোকজন তো নেই!

যাই হোক তিনি আদেশ দিলেন যে খুব সাবধানে সব লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যাদের এই সব দ্রব্যাদি তারা এলে তাদের কোন রকমে বিরক্ত না করে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়—তিনিই দেখ্‌বেন। তাম্র চ্যাঙ্গড়গুলি মাত্র সাহেবের তাঁবুতে স্থানান্তরিত হ'ল।



মোসাবনী খনিতে আকাশ পথের প্রথম ষ্টেসন

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাহেব কায থেকে তাঁবুতে ফিরলেন। দেখলেন মেম সাহেব ভীতি-বিহ্বলা। ব্যাপার এই যে ঐ তাঁবু অন্যান্য তাঁবুর চেয়ে উর্দ্ধে অবস্থিত। সেখান থেকে মেমসাহেব চারিদিক দেখছেন—অল্প দূরে নদী, জল চকমক্ করছে, নানারকম গাছের বিভিন্ন ভাব ভঙ্গী। সূর্য্যদেব পাহাড়ের পশ্চাতে যেতে সচেষ্ট। পাহাড়ের নিম্নদেশে কিছু দূরে নদীর বাঁকে বিরাটকায়, গৌরবর্ণ, দৈর্ঘ্যে ৭।৮ হাত ৫টী মনুষ্যমূর্ত্তি—দীর্ঘ শ্মশ্রু, আপাদমস্তক জটাবৃত, হস্তে কমণ্ডলু, কটীতে রজ্জু সংবদ্ধ।

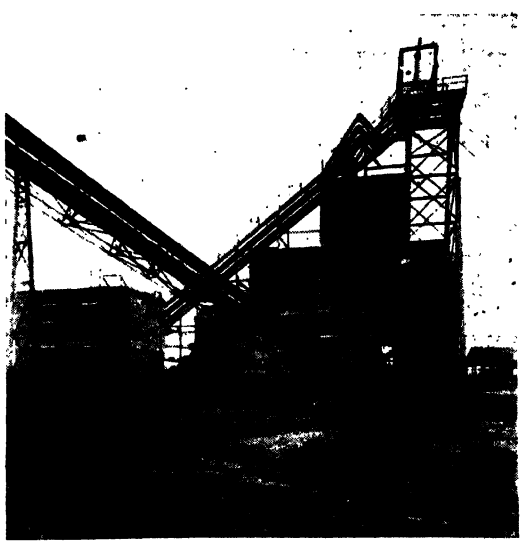
মেম সাহেব প্রায় জ্ঞানশূন্য—মনুষ্যমূর্ত্তিও তাঁকে দেখে চকিতে উল্লম্ফনে নদীর পরপারে অদৃশ্য। সাহেব বুঝিলেন, প্রাচীন যৌগিক ভারতের কোন কিছুর নিদর্শন। অনেক অনুসন্ধানেও কিন্তু সে সব মানুষের আর কোন সন্ধান মেলেনি। কয়েকদিন পরেই দূরবীণে চতুষ্পার্শ্ব অবলোকনে ব্যস্ত সাহেব হঠাৎ সেইরকম মূর্ত্তি দেখে লক্ষ্য করে এইটুকু মাত্র পেলেন যে, উক্তরূপ দুই মূর্ত্তি অবলীলাক্রমে পাহাড়ের এক শৃঙ্গ হতে অপর শৃঙ্গে উপনীত হয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সাহেব পরে আরও খুঁজেছিলেন কিন্তু কোন সন্ধান মেলেনি।

যাক্, আমার নিজের অবশ্য এ-রকম অভিজ্ঞতা হয়নি, হবার ভরসাও নেই। যা হয়েছে তারই ২।১টী কথা বলে থামতে চাই। কি ভীতি-সঙ্কুল, কত ভয়াবহ সে সব স্থান তা অনুমানও করা যায় না। স-দলে পাহাড়ে-জঙ্গলে অনেক ঘুরেছি। এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন ধলভূমের এক নিভৃত জঙ্গল ও পাহাড়ময় এক স্থানে এসে উপস্থিত হই—ময়ূরভঞ্জের প্রায় সীমান্তে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব শুনেছিলেন যে কোনও এক পাহাড়ের ওপর একটা সুড়ঙ্গের ধারে, অতি দুর্গম এক স্থানে, একটা লৌহ শিকল এমন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ আছে যা বহু যুগ ধরেও কেউ খুলতে পারেনি। প্রবাদ সেটা নাকি বহু প্রাচীন—কত প্রাচীন তা কেউ বলতে পারে না।

অনেক চেষ্টা করে, অনেককে খোসামোদ করে, অনেক পাহাড় জঙ্গল ভেঙ্গে, মিতাদের বহু তোয়াজ করে একটা পাহাড়ের ধারে এসে উপস্থিত হই। অনেক কোল্ বা 'হো'-দের সাধ্য-সাধনা করে সে স্থান দেখতে যাই। অনুরোধের মধ্যে অনেক কিছু ভাবও রাখতে হয়; কারণ দেখা গেল যে সে স্থানটী তারা ভক্তিভাবেই দেখে। কিন্তু ফল বিশেষ ফল্‌ল না। তারা বল্লে—"আছেন বটে, তবে সবাই তা দেখ্‌তে পাবে না। সে সব দেবতাদের জিনিস, তাঁরা খুশী হয়ে যাকে দেখাবেন সেই দেখ্‌বে। আর রোজ আবার তার দর্শন মেলে না। নড়ে-চড়ে বটে কিন্তু কেউ খুলতে বা সরাতে পারে না। অর্থাৎ যেন ত্রিবেণীর গঙ্গাপূজক পরমভক্ত গাজী দরাফ্ খাঁর সেই কুড়ুল, যার নাম "গাজীর কুড়ুল—নড়ে-চড়ে পড়ে না।"

যাই হোক্, অনেক চেষ্টায় তাঁরা এইটুকু বললেন যে পূজক মহাশয় না এলে কিছুই হবে না। হতাশভাবে ফিরবার উপক্রম করছি, এমন সময় দেখি মিশ্-কালো মসীবর্ণ ঝাঁকড়া চুল, লম্বাদাড়ী, জলন্ত গুলের মত কপালে সিঁদুর ফোঁটা, টক্‌টকে লাল বা রক্তবর্ণ কাপড়-পরা ও গলায় মালা-কোরে পৈতে পরা একজন লোক আসছে। দেখ্‌লে বাস্তবিকই ভয়ের উদ্রেক হয়। তিনি 'ঠাকুর'। তাঁর অনুগ্রহ না হলে সেখানকার ঠাকুর বা লোহার শিকল কিছুই দেখা যায় না।

সুতরাং তাঁর অনুগ্রহ চাইলাম। তিনি কিন্তু বড়ই কঠোর। অনেক অনুনয়ের পর বল্লেন যে পূজোপকরণ দক্ষিণাদি চাই, 'বলি' চাই। 'বলি' নইলে দেবতা খুসী হবেন না। এই 'বলি' সম্বন্ধে ২।৪ জনের নিকট থেকে মোটামুটি যে তথ্য সংগ্রহ করলাম সে বড় প্রীতিপ্রদ নয়।



তাম্রখনিতে মেন্ শ্যাফ্‌ট্ হেড ফ্রেম (অপর দৃশ্য)

ছোট, বড়, মায় 'মহাবলি'ও হয়ে থাকে, সুযোগের মাত্র অপেক্ষা; কারণ এমন সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হলে তাকে ত্যাগ করা কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির মোটেই কর্তব্য নয়। কেন না দেবতা নাকি 'মহাবলি' (নর-বলি)তে মহা খুসী। জানা আছে, ঘাটশিলার রঙ্কিনী মন্দির যখন পাহাড়ের ওপরে ছিল তখন এ 'বলি' প্রায়ই হোতো। তারই নিরাকরণার্থ ইংরেজ আমলে রঙ্কিনী দেবীকে থানা সীমানার ভেতর নতুন মন্দিরে আসতে হয়েছে।

'ঠাকুর' মশায় আমাদের আদেশ দিলেন যে এত লোক একসঙ্গে এলে দর্শন মিলবে না। আমার ওপর তাঁর দেখ্‌লাম অসীম দয়া—বোধ হয় আমাকে পালের 'গোদা' ঠাউরে। তাই আমাকে নির্দ্দেশ করে বললেন—"দেঁখ্, তুঁই একা আঁস্‌বিক্। অঁত বেলা নাই কঁরবিক। বন্দুক উন্দুক নাই আঁন্‌বিক্। ঝঁটো-পঁটো আঁধার থাকতেই সিনাবিক্ আর ভোঁর ভোঁর লে ইঠিন্‌টায় আঁসে করে হামাকে পাবিক। পুঁজা আন্‌বিক, ভেড়াঁ পাঁঠা আঁন্‌বিক্, নাই হোঁক তো হাঁসটা কুঁছুটাও তো আন্‌বিক, জুতা নাই আনিস্। তবে তাঁকে লিঁহ্যা যাঁবোক্।"

সব বুঝলাম। সুধু অবস্থা ভাল বুঝলাম না, তাই তাঁর উপদেশ শোনবার ভরসাও হোলো না। অনুসন্ধান অবশ্য করেছিলাম। সুড়ঙ্গটা মনে হোলো তাম্র-নিষ্কাশিত প্রাচীন খনির চিহ্ন, আর শিকলটাও প্রাচীন তাঁবারই নিদর্শন। তবে সঠিক বলা সুকঠিন, সন্নিকট-পরীক্ষা ততোধিক; স-শরীরে মুক্তিলাভের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা। তাম্র না হলে সেটা লৌহ। কিন্তু সুড়ঙ্গের অবস্থিতি তাম্র-পরিচায়ক এইটুকু বলা যেতে পারে, আর তার অভ্যন্তর-ভাগ-প্রস্তরগাত্র সিন্দুর-বিলেপনে রক্তবর্ণ ছাড়া, অন্য কত ভাবে রহস্যাবৃত কঙ্কালময়, তা বলা দুরূহ। তবে তাম্রের অবস্থিতি যে সেথায় প্রচুর তাও লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

হলুদপুকুর (ধলভূম, সিংভূম—'হো' দেশ) থেকে ১০।১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে একটা জঙ্গলময় পাহাড়ে 'অসুর হাড়' বর্ত্তমান। প্রবাদার্থ—অসুর-হাড়—দৈত্য-দানব বা কোন অসুরের কঙ্কাল। কিন্তু আসলে সে সব পাহাড়গাত্রবা সংলগ্ন 'ফসিল' (fossil) বহু বহু পুরাতন বৃক্ষ-সমুদ্ভূত। কাল-প্রভাবে নানারূপ অদ্ভূত আকারে প্রস্তরীভূত ও রূপান্তরিত। কারো বিকট 'হাঁ', কদাকার মুখ, ব্যাদান-বদন। অমানুষিক লম্বা পদদ্বয় বা কিম্ভূতকিমাকার গঠনসম্পন্ন হস্তদ্বয় বা দেহ। সে সব ব্যাদিত বদনাভ্যন্তরে বন্য ভল্লুকের বাসস্থানের অসম্ভাব নেই। আশে পাশে সর্প ব্যাঘ্র শ্বাপদাদির বাসের প্রচুর সম্ভাব। এমন অসুর-হাড় পূর্ব্বেও পাওয়া গেছে।—[লেখকের—"কৃষ্ণের কংসবধ, (অভিনব)"; লেখকাসুর সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের "বকাসুরের হাড়" ইত্যাদি—পুরাতন ভারতবর্ষ]।

এ-সব খনির দেশ। অসুর-হাড় সেদিন অদৃষ্টে ছিল না। নিজেদের হাড়-মাস নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হ'ল। একটা বৃক্ষাদিশূন্য পাহাড়ের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হতেই গোলযোগ—একটু আগেই বাঘ বেরিয়েছিল। একটা ছেলে গরু চরাচ্ছিল। সে আমাদের হুঁসিয়ার করে দিল। বোধ হয় সঙ্গে বন্দুক দেখে। কিন্তু সে নিজে হুঁসিয়ার হবার কতটা ব্যবস্থা করেছে তা বুঝলাম না, গরু তার যেমন চরে বেড়াচ্ছিল তেমনি থাকল। তবে এই যে, তারা ব্যাঘ্র দর্শনে অভ্যস্ত।

আমাদের সঙ্গেকার 'হো' মিতারা সেই পাহাড়টা দেখিয়ে বল্লেন যে তার কিছুদূরে একটা ছোট সুড়ঙ্গে কষ্টে সৃষ্টে ঢুকতে পারলে একটা প্রকাণ্ড ঘর মিলবে। সেই সুড়ঙ্গ পথে আরও অগ্রসর হলে ও অনেকদূর গেলে অপর মুখ দিয়ে পাহাড়ের প্রায় উপরিভাগে উপস্থিত হওয়া যাবে ও সেখানে এমন সব বৃহদাকার পাথর নজরে পড়বে যা নড়ানো দুঃসাধ্য কিন্তু ঘা দিলে সাড়া দেবে।

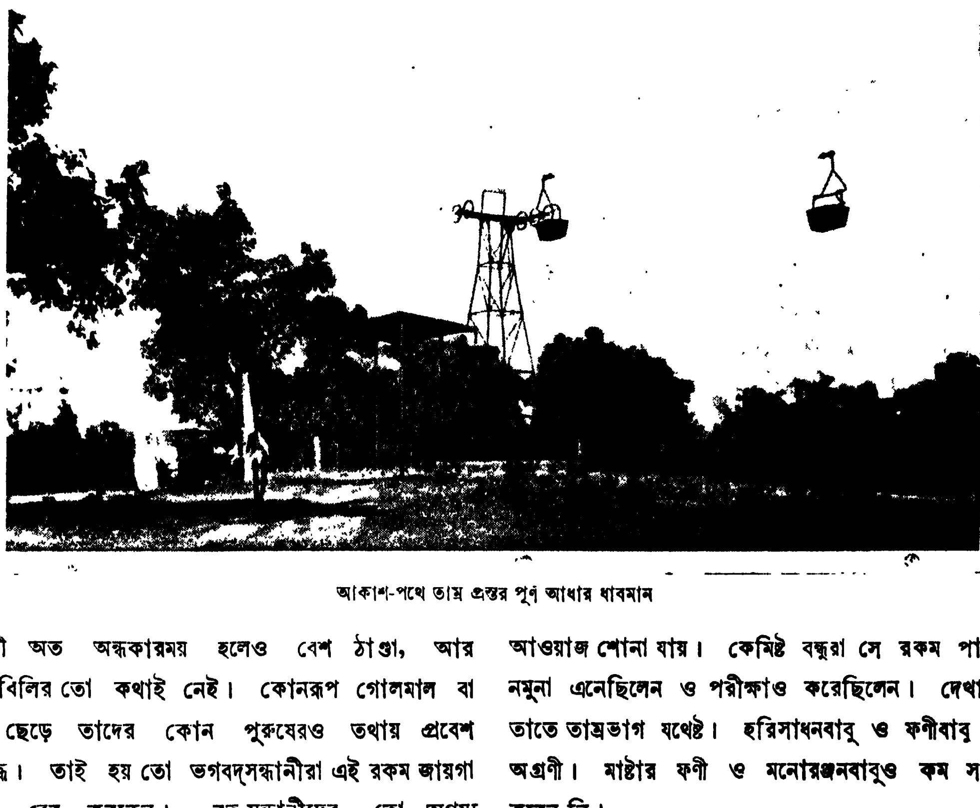
সুড়ঙ্গ মুখে উপস্থিত হয়ে যা দেখ্‌লাম তা মোটেই মোলায়েম নয়। ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত পুঞ্জ পুঞ্জ মেষলোম ও তাজা রক্ত। মন তখন বেশ ইতস্তত: করছে। 'মিতারা' কিন্তু নাছোড়বান্দা। অভয় অকুণ্ঠ—সঙ্গে টাঙি আছে, ভয় কিসের? বিদ্রূপেঙ্গিতও যে না ছিল তা নয়। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আগে মিতাবর্গ পিছনেও তাই, মাঝখানে আমরা সদলে। একটা কিসের বিকট গন্ধে নাক যেন জ্বলে যেতে লাগল, দম্ বন্ধ হয়ে এল, প্রমাদ গুণলাম। উপায় কিন্তু মিল্‌ল না। অনেক কষ্টে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মিতাদের বর্ণিত সেই প্রকাণ্ড ঘরে উপস্থিত হলাম। ঘর না হলেও পাহাড়ের গর্ভ প্রদেশে একটা বড় ফাঁকা অভ্যন্তর ভাগ, মনে হোলো সবটুকুই যেন প্রকৃতিদত্ত নয়। টর্চের আলোয় বেশ করে দেখে

অনুমান হোলো হয় তো বহু পূর্ব্বকালে, সহস্রাধিক বছর আগে, কেউ কেউ কিছু কিছু তাঁবা এখান থেকে বের করে নিয়ে গেছে। এসব গহ্বরাদি বা সুড়ঙ্গ তারই স্মৃতি-চিহ্ন।

সুড়ঙ্গাভ্যন্তরে কক্ষ বিশেষ স্থানের ঘোরান্ধকারে মিতারা, পাতা পাকানো চোঙা বিশেষ, আধ-হাত-খানেক লম্বা তথাকথিত বিড়ি ধরালেন। জমাট আঁধারের কালো পর্দ্দার মাঝে মাঝে সেই ধকধকে আগুন দেখতে বড় মন্দ হোলো না। কেবলি মনে হতে লাগল সেই 'বলি' দাবীকার কাপালিক ঠাকুরের কপালের সিঁদুরের ফোঁটা। স্থানটী অত অন্ধকারময় হলেও বেশ ঠাণ্ডা, আর নিরিবিলির তো কথাই নেই। কোনরূপ গোলমাল বা শব্দ ছেড়ে তাদের কোন পুরুষেরও তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই হয় তো ভগবদ্‌সন্ধানীরা এই রকম জায়গা খুঁজে বের করতেন। রত্ন-সন্ধানীদের তো অগম্য স্থানই নেই।

কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রামের পর ওঠা গেল বহির্মুখী হবার উদ্দেশ্যে। আবার সেই কষ্ট, সেই হামাগুড়ি, সেই দুর্গন্ধ। বুঝতে পারলাম সুড়ঙ্গের নানা স্থানে নানা শাখা-সুড়ঙ্গ এসে মিলিত হয়েছে ও শ্বাপদাদির আশ্রয় স্থলে তাদের গন্ধময় দেহ ছাড়া ভুক্তাবশিষ্টও বাস বিকীরণ করে। ভূ-পর্য্যটক দীনেশ একদম 'মরিয়া'। ভ্রূক্ষেপ নেই। সবাইকে কেবলি উৎসাহ দিচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ বেরিয়ে এলাম প্রায় শিখরে। কোথায় সেই অন্ধকার ও দুর্গন্ধ! প্রচণ্ড রৌদ্র ও মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে কি অভিনব আনন্দ! মিতারা টাঙির মোটা দিক উল্টো করে বড় বড় প্রস্তরে ঘা দিতে তারা সাড়া দিল ঢং ঢং ঢং—যেন ঝোলানো চক্রঘণ্টায় বা পেটা ঘড়িতে মুদ্গরাঘাত। শুনলাম অনেক দূর থেকেও এ আওয়াজ শোনা যায়। কেমিষ্ট বন্ধুরা সে রকম পাথরের নমুনা এনেছিলেন ও পরীক্ষাও করেছিলেন। দেখা গেল তাতে তাম্রভাগ যথেষ্ট। হরিসাধনবাবু ও ফণীবাবু এতে অগ্রণী। মাষ্টার ফণী ও মনোরঞ্জনবাবুও কম সাহায্য করেন নি।



আকাশ-পথে তাম্র প্রস্তর পূর্ণ আধার ধাবমান

দুচার-টুকরো পাথর প্রায় সকলেই সংগ্রহ করেছিলেন। তন্মধ্যে প্রতিভা পুং ও মেলিং সোম ওজন না বুঝে ব্যবস্থা করায় পথিমধ্যেই প্রস্তর-মায়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সতীশ দাসও তাই। মনে হোলো রত্ন-গহ্বরে পৌঁছে গল্পের সেই লোকটীর হাল। যতক্ষণ সম্ভব—হাতে, তার

পর কানের ভাঁজে, তারপর বগলে, চাদরে, গামছায়, পকেটে; শেষে বসনাঞ্চল থেকে সমগ্র বসনখানিতে ও রত্ন বেঁধে নিয়েও সোয়াস্তি এল না। কিন্তু আর তো নেবার উপায় নেই। মুস্কিল মালুম হ'ল কিন্তু নিয়ে যাবার সময়। বিনয়বাবু ভারত সরকারের বড় অফিসর (ধাতব); মহাদেববাবু গাইয়ে। উভয়েই নিজনিজ লাইনে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

এই সব প্রাচীন সুড়ঙ্গ পথের কত বিপদ তা বলে শেষ হয় না। জন্তু জানোয়ার ছাড়া সরীসৃপকুলও নানা রকম। ভয়াবহ ও যথেষ্ট। বিশেষ করে অজগর মহাশয়কেই ভয় সব চেয়ে বেশী। সুড়ঙ্গের গায়ে কোন্‌খানে যে তিনি আশ্রয় নিয়ে আরাম উপভোগ করছেন, জানবার কিছুমাত্র উপায় নেই। একবার সাদর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেই ব্যস্। ভালুক তো অজস্র। সুধু টর্চের ভরসা বড় বেশী ভরসা নয়। সাক্ষাৎ অগ্নি বা মশাল সবচেয়ে ভাল। কেউ কাছেও ঘেঁসবে না, কিন্তু এই সব প্রাচীন সুড়ঙ্গের অভ্যন্তর ভাগে, অনেক স্থলে এতাধিক দুর্গন্ধ ও নানারূপ গ্যাসপরিপূর্ণ যে অগ্নি স্বয়ংই গ্যাস সংস্পর্শে অনায়াসেই বিপদ ঘটাইতে পারেন। তাহলেও এই সব হিংস্র মহলে আগুন বাস্তবিকই ব্যবহারিক বস্তু।

সন্ধ্যাবেলা জঙ্গল পথে 'হো' মিতা চলেছেন। জিজ্ঞাসায় জানলাম সারা রাতই তিনি চলে তবে গন্তব্য স্থানে



হস্তী-যুদ্ধে হত হস্তী

পৌছবেন। হাতখানেক লম্বা ২।৩ টুকরো কাঠ ও একখানি টাঙি ভরসা। একখানি কাষ্ঠাগ্রে অগ্নি ধিক্ ধিক্ করছে অঙ্গারের সঙ্গে। কখন কখন ফুল্কি ক্ষেপণও হচ্ছে। মিতা বুঝিয়ে দিলেন ওই যথেষ্ট—কেউ কাছে আসবে না। ভালুক তো আগে সরে পড়বে। তার যে গা-ময় দাড়ী! বাঘ সাপ সবাই পথ সাফ্ রাখবে। বুনো হাতী অত্যন্ত গোঁয়ার, কিন্তু সেও ছ্যাঁকা লাগার ভয়ে সন্ত্রস্ত।

শিবু বন্দ্যো এদেশের প্রায় বাসিন্দা, সে মিতাদের অনেক খবর রাখে। তাই আমাদের অনুরোধে মিতাদের সঙ্গে আগুন তৈরী করার প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন। নরেন গাঙ্গুলী সে প্রথা নোট করেছিলেন—কাঠে কাঠে ঘর্ষণ দ্বারা কি করে আগুন উৎপাদন করতে হয়। আমিও মিতাদের বিড়ি উদ্দেশ্যে খরচ করে সে প্রথা দেখে নিয়েছি। ছোট একখানি কুরচির ডালকে (অবশ্য শুষ্ক বা প্রায় শুষ্ক) চিরে নিয়ে, পায়ের নীচে ফেলে চেপে ধরে, চেরা দিকে একটা অ-চেরা কুরচির কাঠি খাড়াভাবে বসিয়ে, ডাল রাঁধবার সময়ে যেভাবে তাতে কাঁটা ঘোরানো হয়, সেইভাবে কিছুক্ষণ ঘোরাতেই, কাষ্ঠ গুঁড়া নীচের শুকনো পাতায় পড়ে, অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রথম ধূম ও পরে আগুন দেখা দিল ও জ্বলে উঠলো। চেরা কাষ্ঠ-খণ্ডে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাতে এই ঘোরানোজনিত সংঘর্ষ অটুট থাকে, এজন্য মিতা তাতে একটা চিহ্ন করে নিয়েছিল। ডাক্তার বিশ্বাস তাদের মধ্যে অনেকদিন ছিলেন। তিনি এটা জানতেন। উকীল সত্যবাবু বা চট্টো রাধাবাবু একটুও জানতেন না। তাই বেশ করে দেখে নিলেন বা শিখে নিলেন। কি জানি যদিই জঙ্গলে বাস করতে হয়! দেশের যা অবস্থা!

রাখা-খনির পাহাড় পথে অনেক সময় হাতী নামে। স্থূল দেহ নিয়ে খাদ থেকে তারা উঠতে পারে না, তাই দ'কে তাদের বড় ভয়। এইজন্য "হাতীর 'দ'কে পড়া" কথা প্রচলিত। বাঘও প্রচুর, ভালুকের তো কথাই নাই। ও অঞ্চলে একটা বা দুটো পাহাড় এমনি যে তাতে নানা জাতির সর্পকুল যেন উপনিবেশ স্থাপন করেছে। মিতারা সে পাহাড়ের নাম রেখেছেন—"সাঁপ-ডুঙ্গরী" (ডুঙ্গরী-পাহাড়)।

তেমনি "পায়রা-ডুঙ্গরী"ও আছে। হাতী কখন কখন খাদে পড়েছে এমনও শোনা গেছে। একবার একটী হস্তী-শিশু প্রাচীন তাম্র-খাদানের গর্ত্তে পড়ে যায়। তাতে হস্তী-যূথ এসে এক মহাকাণ্ড সুরু করে তার উদ্ধার সাধন করে। কি উপায়ে তা বলা অসম্ভব, কেন না সেটা লক্ষ্য করবার লোক মিলতে পারে না। হস্তীরা বেশ রসিক। সুবর্ণরেখার নির্জ্জন স্থানে স্নানরত মিতাদের বসন অপহরণের অপবাদ শ্রুতিগোচর হ'য়েছে। স্নানার্থীর স্নানান্তে উঠে এসে যে কি হাল তা অনুমেয়, কারণ ঐ এক বস্ত্রই তার সম্বল।

প্রায় দশ বছর আগে রাখার সীমানায় দুটো ঐরাবৎ দুদিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে সমস্ত রাত তথাকার হাসপাতালের নিকট প্রলয় করে সমর-শেষে একটা সেই স্থানে, ও অন্যটা কিছু দূরে ধরাশায়ী হয়।

এসব খনির দেশে এমন বিপদ অনেক। কিন্তু 'রত্নের সন্ধানে' যাঁরা বেরোন তাঁদের তো এসব দেখলে চলে না। বিপদ-যোগ সকল যোগ-সাধনেই আছে। তাম্রযোগই বা বাদ যাবে কেন?



লেখক

উপেক্ষিত

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জীবন সোপান শ্রেণী সংসারের পুরাতন ঘাটে
ভেঙে পড়ে—বিহঙ্গেরা যেথা হ'তে মাগিছে বিদায়,
পথিকের পদলেখা চিহ্নহীন হোলো যার বাটে,
আমার নয়ন দু'টী ব্যথাতুর সেইদিকে চায়।
মেঘরেণু অঙ্গে মাখি দিক্‌বধূ করে আজো খেলা
তারি সাথে ছায়াপথে। অতীতের স্মৃতি-পুষ্প আনি'
এইঘাটে একদিন ভেসেছিল বেহুলার ভেলা,
তোমাদের কাছে তার মূল্য নাই—উপেক্ষিত জানি।
কত না আবর্ত্ত আসি তিলে তিলে করিয়াছে ক্ষয়
তাহারি সুদৃঢ় ভিত্তি। শক্তি তার করি' অবহেলা
কালের প্রবাহ বহে! দূরপানে শুধু চেয়ে রব
অস্তগামী সূর্য্য তার, ব'ল বন্ধু, বসিবে কি পাটে?
যুগস্রোতে ভেসে যায় অতীতের পূজার কুসুম,
তাহারে নূতন ঘাটে আনিবার সাধ ছিল মনে,
যেথায় পঙ্কের মাঝে হাসিতেছে প্রাণের কুঙ্কুম,
গাহন করিতে নামে পঙ্কজিনী প্রভাতের সনে!
হৃদয়ের পণ্য যত ওঠে বিশ্ব চিত্ততরী হ'তে—
নিঃশেষে ফুরায়ে যাবে। ভাবি তাই বড় বেদনায়,
কেনা-বেচা করি বটে! লাভক্ষতি রাখি কোনমতে!
বহ্নির বিপুল শিখা তবু জাগে আনন্দের হাটে!

মা ফলেষু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'জানিস আমি বিয়ে করছি। যাবি তো বরযাত্রী?' প্রতুল ঘরের মধ্যে আচমকা ঢুকে পড়লো।

খোলা ক্ষুরে মুরারি দাড়ি কামাচ্ছিলো। সন্ত্রস্ত হ'য়ে ফলাটা মুড়ে রেখে কতকটা অবাক হ'য়ে সে বললে, 'বলিস কি রে?'

'হ্যাঁ, কাঁহাতক আর এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবো!' প্রতুল মুরারির তক্তপোষে ছড়িয়ে বসে' পড়লো। পকেট থেকে সিল্কের একটা রুমাল—সেটাকে অনায়াসে টেব্ল্-ক্লথ ভাবা যেতে পারে—বা'র করে' ঘাড়ের ঘাম মুছতে-মুছতে স্নিগ্ধহাস্যে বললে, 'এবার রাস্তা থেকে ঘরে আসবো ভাবছি, দোকান থেকে দেবালয়ে। বিয়ে কর্, তুইও বিয়ে কর্, মুরারি।'

মুরারি সম্পূর্ণ করে' তাকালো একবার বন্ধুর দিকে। এমনিতেই প্রতুল সব সময়ে বাবু, তার মুখের দাড়ি কখনো বাসি হয় না, ঘাড়ের চুল তার এ-জন্মে কেউ কখনো আঙুল দিয়ে ধরতে পারে নি, যে-জামার সে ভাঁজ ভেঙেছে—ছাড়তে গেলেই সটান চলে' গেছে সেটা ধোপাবাড়ি, কোঁচার ঝুলে রাস্তা সে ঝাঁট দিয়ে চলেছে, কিন্তু পাড়ে যদি লেগেছে এতটুকু মাটি, এক গ্যালন দুধে এক বিন্দু চোনার অপরাধে সেটা অমনি হয়েছে কক্ষচ্যুত। কিন্তু, তবু, এত সব সত্ত্বেও, আজ যেন তাকে আরো বেশি প্রখর, আরো বেশি প্রদীপ্ত মনে হচ্ছিলো। মুরারি তাই টিপ্পনি কেটে বললে, 'আহ্লাদে একেবারে আটখানা দেখছি যে।'

'এখনো একমাত্র বিয়ের নামেই আমরা রোমাঞ্চিত হ'তে পারি। ঝানু যে ডাক্তার, কোথায় কী বায় জানতে বাকি নেই, সেও এই বিয়ের নামেই কবি হ'য়ে ওঠে। নে, রাখ্ তোর দাড়ি-কামানো, সিগরেট খা।' বলে' প্রতুল তার পকেট থেকে মার্কোভিচের টিন বার করে' গোটা দু'তিন সিগরেট মুরারির দিকে ছুঁড়ে মারলো।

একটাকে শূন্য থেকে লুফে নিয়ে টেবল থেকে দেয়াশলাই কুড়িয়ে ফেনা-মুখে সেটাকে ধরাতে-ধরাতে মুরারি বললে, 'ভীষণ ফুর্তি! পাচ্ছিস বুঝি কিছু মোটা রকম?'

'এক ফোঁটাও নয়।'

'কিছুই না?' মুরারি বিশ্বাস করলো না।

'বিশ্বাস কর্, কিছুই না। পেলে বলতে আমার বাধা কী? চিরকাল দাম দিয়ে এসেছি, এবারো দেবো। তবে সে-দামে আর এ-দামে ঢের তফাৎ আছে ভাই।' প্রতুল গলায় একটু গাম্ভীর্য আনলো।

'কোথাকার মেয়ে?'

'বিক্রমপুর—অমিয়দেরই গ্রামে।'

'দেখেছিস তাকে?'

'সেই সেবার অমিয় আমাকে তাদের বাড়ি ধরে' নিয়ে গেলো না! একদিন সন্ধেবেলা মেয়েটিকে পুকুর-ঘাট থেকে কলসিতে করে' জল নিয়ে যেতে দেখলাম।'

'এ যে উপন্যাস, ফিল্ম্-সট্!' মুরারি সকৌতুক কৌতূহলের সঙ্গে বললে, 'দেখতে কেমন?'

'তা দেখি নি।' প্রতুল উদাসীনের মতো বললে।

এ তার অনেক হেঁয়ালির মধ্যে আরেকটা। মুরারি ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'তবে দেখলি কী?'

'দেখলাম সে আমার অনেক জন্মের চেনা, তাকে আমার চাই, তাকে না হ'লে আমার চলবে না—দেখলাম সেই একমাত্র সত্যকে।'

'মেয়েটির বাপ কী করে?'

'তার খোঁজ নিই নি। জিনিসই দামি, দোকানদার নয়।'

মুরারি খাপ থেকে ফের ক্ষুর খুললো, গালের উপর দিয়ে তেরছা করে' টানতে-টানতে বললে 'কা'র কী সর্বনাশ করছিস কে জানে!'

প্রতুলের বুকের ভিতরটা আঁৎকে উঠলো কি না কে বলবে! ঈষৎ বেসুরো গলায় সে বললে, 'সর্বনাশ করছি মানে?'

'বিয়েটা তো আর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়া নয়, দস্তুরমতো তাতে দায়িত্ব আছে।'

'একশো বার আছে। তুই কি মনে করিস আমি আমার স্ত্রীকে খাওয়াতে-পরাতে পারবো না?'

'তা হয়তো পারবি।'

'একটা তাকে বাড়ি করে' দিতে পারবো না? একটা মোটর গাড়ি?'

'হয়তো তা-ও।'

'তবে?'

'তাকে তুই সুখী করতে পারবি না।'

'সুখী! সুখী কে সংসারে?' প্রতুল গলা ছেড়ে অনর্গল হেসে উঠলো। দার্শনিক নির্লিপ্ততায় বললে 'একনিষ্ঠা বৈদেহীও সুখী ছিলেন না।' বলে' সে জায়গা ছেড়ে মুরারির টেব্লের কাছে উঠে এলো: 'সুখের কথা পরে হবে। তুই এখন আমার সঙ্গে যাচ্ছিস কিনা বরযাত্রী!'

'তোর সঙ্গে কোথায় না গেছি!' মুরারি বাঁকা কটাক্ষ করলো।

খবরটা ইতিমধ্যে মেসের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা তার চেনা সবাই প্রতুলকে ছেঁকে ধরলো: 'আমাদেরো নিচ্ছেন সঙ্গে করে'?'

'নিশ্চয়ই। বিষয়টা যখন আর কিছু লুকিয়ে হচ্ছে না, আর ইতর

আপনারা যখন শুধু মিষ্টান্ন পেলেই খুসি। নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো। যে যেতে চান।' প্রতুল ঘর থেকে বেরোবার উদ্যোগ করলো, যাবার আগে মুরারিকে বললে, 'সব সময়েই রেডি থাকবি, বিয়ের দিন ঠিক হ'লেই এসে খবর দেবো।'

রহস্যে আবৃত এই প্রতুল। তার সঙ্গে মুরারির প্রথম আলাপ দু' বছর আগে, রেস-কোর্সে। সেদিন তারা দু'জনে একই ডার্ক-হর্সের উপর বাজি ধরেছিলো, যেটা সমস্ত ঘোড়াকে পিছনে ফেলে সটান তাদের পকেটে পড়লো ঢুকে। অভ্রভেদী আনন্দের মধ্য দিয়ে মুহূর্তে তারা অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলো, যে-অন্তরঙ্গতা অমিতব্যয়িতার প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। ট্যাক্সি ছুটিয়ে তারা চলে' এলো ইম্পিরিয়্যালে; যে-পয়সা আকাশ ফুঁড়ে আসে সে-পয়সা পকেট ফুঁড়েই বেরিয়ে যাওয়া উচিত—তার আসা ও যাওয়ার মাঝে সমান চমক থাকা দরকার; সেখান থেকে চলে' গেলো তারা ধূসর উত্তরাঞ্চলে। সেখানে মুরারি দেখলো কী উত্তুঙ্গ রাজপদে প্রতুলের প্রতিষ্ঠা, আর তার প্রভাব কী অপ্রতিহত! বলতে গেলে সেখানেই সে বিস্তীর্ণ রাজ্যবিস্তার করে' বসেছে। কিন্তু তা-ও বা সুনিশ্চিত বলা যায় কি করে'! দেখা গেলো হঠাৎ সে সমস্ত সংস্রব ছেড়ে নিজেই একটা বাড়ি-ভাড়া করে' বসেছে। কোথাও আর বেরোয় না, সমস্ত সংসারের পরে উদাসীন, নিজের গত জীবনের ওপর অসীম তিক্ত-বিরক্ত। সেখানেও বা তাকে ধরে' রাখবে কে! ক'দিন পরে দেখা গেলো হ্যপেন্‌স্‌-এর দোকানের সুট পরে ক্যামাক ষ্ট্রিটে সে এক স্যুইট নিয়ে বসেছে। এক সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখ, তার কলার-পিনটিও সেখানে পড়ে' নেই, চলে' গেছে সে লাক্ষ্ণৌ, সপ্তাহান্তরে লাহোরে, সেখান থেকে বা লাণ্ডিকোটালে। আবার চুপচাপ বসে' আছো, দেখবে সে কলকাতায়, তোমার চোখের সুমুখে। আজ রয়েছে একটা রঙিন হোটেলে, কাল রয়েছে একটা বিবর্ণ পল্লীতে। তার কোথাও ঠিকানা নেই, সে কেবল শাখাই মেলেছে, শিকড় গজায় নি। তার বাড়ি কোথায় জিগগেস করো: আজ বলবে পটিয়া, কাল বলবে নেত্রকোনা, পশু' বলবে বাগেরহাট। সব রকম প্রাদেশিকতায়ই সে তুখোড়, ধরা দেবে না। যদি জিগগেস করো: তোর এত পয়সা কি করে', সে আজ বলবে, রেঙ্গুনে তার ব্যবসা আছে চালের, কাল বলবে, আগ্রায় তার চামড়ার, পশু' বলবে, নাগপুরে তার তুলোর। যে করে'ই হোক তার পয়সা আছে, আর সে-পয়সা তার বাক্সে নয়, ব্যাঙ্কে নয়, লগ্নিতে নয়, একেবারে তার বুক-পকেটে। একমাত্র জিনিস যা পরকে দিতে আমরা কার্পণ্য করি না তা দেয়াশলাইয়ের কাঠি: তেমনি ওর টাকা; যদি উড়িয়ে দিতে চাও, চাইলেই তা পাবে। টাকা আমরা অনেক দেখি, কিন্তু এমন বিবেক-হীন নির্দয় অমিতব্যয়িতা কখনো দেখি নি। যেন ঘর থেকে হাওয়া বার করে' দিতে পারলেই আসবে আরো অনেক হাওয়া, দরজা-জানলা এঁটে আটকে রাখলেই দম বন্ধ হ'য়ে মারা যাবো। তেমনি হাত থেকে টাকাটা বা'র করে' দিতে পারলেই যেন পকেট আবার ভরে' উঠবে। আলাদিনের এ প্রলয়-প্রদীপ জ্বলছে কোথায়! রেসে মানুষ দ্বিতীয় দিন জেতে না, শেয়ার-মার্কেটে মানুষ হুমড়ি খেয়েও পড়ে মাঝে-মাঝে, আর ব্যবসা করতে বসলে কার না একটা অন্তত হিসেবের খাতা থাকে। দেশে জমিদারি আছে বলতে পারো, কিন্তু জমিদারকেও রাজস্ব দিতে হয়, মামলা-মোকদ্দমা চালাতে হয়, প্রজারক্ষা করতে হয়। কোন জমিদারির এত উদ্বৃত্তি আছে যা মাত্র নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাবে! শুধু একটি জিজ্ঞাসাই তার কাছ থেকে সমান উত্তর পেয়েছে: সংসারে তার কেউ নেই, কিছু নেই, না সুদূরতম আত্মীয়, না সূচ্যগ্রতম মেদিনী। বসুধাই তার কুটুম্ব, বসুধাই তার বাসভূমি। এ হেন প্রতুলকে ধাঁধা বলবে না তো কী! কোথায় সে আছে, কী সে করে, কিসে সে চালায়, আদ্যোপান্ত সবই একটা ঘন কুয়াসা দিয়ে ঢাকা। দু' বছরেও মুরারি তাকে ধরতে-ছুঁতে পায় নি।

হয়তো দরকারও ছিলো না, কিন্তু এ-হেন প্রতুল অপূর্ব অক্লেশে বিয়ে করবার জন্যে মেতে উঠলো—এটা যেন কেমন ভাবা যাচ্ছে না, কিম্বা ভাবতে ভালো লাগছে না। আর সব রকম সাধুকাজ সে করেছে ভাবা যেতে পারে, এমন কি সন্ন্যেসি হওয়া পর্য্যন্ত, কিন্তু নেহাৎই একটি অপাপবিদ্ধা কুমারীকে সে বিয়ে করেছে ভাবতে কেমন মনটা বেঁকে বসে। সেটা ভয়, না ঘৃণা, না দুঃখ, না এমনিতেই একটা বিস্ময় বোঝা দায়। ব্যাপারটা সত্যি কী জানবার জন্যে মুরারি একদিন অমিয়র মেসের দিকে পা বাড়ালো।

রাত হয়েছে। আপিস থেকে ফিরে মেসের একতলায় তক্তপোষের উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে লণ্ঠনের আলোতে অমিয় একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় কাননবালার একটা ছবি দেখছিলো, আলোটা হঠাৎ আড়াল হ'য়ে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো: 'এ কি, মুরারিবাবু যে, কি মনে করে'?'

ঘরে আর লোক ছিলো না, পার্শ্বস্থায়ী ভদ্রলোকটি ট্যুইশানি করতে গেছেন, এখনো ফেরেন নি। মুরারি লোহার একটা বাঁকানো চেয়ারে বসে' পড়ে' আলটপকা জিগগেস করলে: 'হ্যাঁ হে, প্রতুল নাকি বিয়ে করছে?'

'হ্যাঁ, আপনি শুনলেন কোত্থেকে?'

'আমাকে সেদিন বলছিলো ঘটা করে'। প্রথম পলক-পাতেই নাকি প্রেম, জন্ম-জন্মান্তরের আলাপ।'

'প্রেম না হাতি!' লজ্জিত হাস্যে অমিয় বললে।

'তবে কী ব্যাপারখানা?'

'বলতে গেলে বলতে হয়, স্রেফ মহানুভবতা।'

এতটা মুরারি প্রত্যাশা করে নি। শূন্য থেকে বললে, 'তার মানে?'

'মানে, গরিবের উপর দয়া, আদর্শবাদ, যুবক বাঙলার কাছে জীবন্ত উদাহরণ, যা বলতে চান।'

এ-ও আরেক প্রলাপভাষী। মুরারি অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'মেয়েটি কে? চেন?'

'চিনি না? আমাদেরই গ্রামের মেয়ে, এক ঢিল দূরে ওদের বাসা, রেথাকে আমি চিনি না? ঘটকালি কর্‌লে কে জিগগেস করি?'

'মেয়েটি দেখতে কেমন ?'

'স্বাস্থ্যবতী ছাড়া আর কিছুই বলতে পারেন না।'

'খারাপ দেখতে ?'

'প্রতুল-দা বিয়ে করছেন, এখন আর তাকে খারাপ বলি কি করে' ? নইলে কোনোদিন আমার থিয়েটার-পার্টিতে এসে জয়েন করলে তাকে একটা ঝির পার্টও দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

'এত কুৎসিত ! মোটে বিয়ে হচ্ছিলো না বুঝি ?'

'আজ এই বিশ বৎসর। আপনিই বলুন, কুড়ি বছরের মেয়ের বড় জোর স্বাস্থ্য থাকতে পারে, কিন্তু রূপ কোথায় ? গানই বলুন, য়্যাক্টিংই বলুন, আর রূপই বলুন, সব চর্চার জিনিস। চর্চা করেন নি, কি মর্চে ধরতে সুরু করেছে।'

'লেখাপড়া শেখে নি ?'

'এই, অষ্ট রম্ভা।' অমিয় কাঁচকলা দেখালো। বললে, 'বলে গ্রামে মেয়েদের একটা মাইনর-ইস্কুলই নেই। আমার ভয় হয় রেখাকে প্রতুল-দার সব সময়ে কাছে-কাছে রাখতে হ'বে।'

'কেন ?'

'কেন নয় ? দূরে থাকলে প্রতুলদাকে ও চিঠি লিখবে কি করে' ?'

'এত দূর !' মুরারি হাসলো। বললে, 'টাকাও তো প্রতুল কিছু পাচ্ছে না।'

'টাকা পাবে না দিল্লির মসনদ পাবে ! বিয়ে করবার আগে প্রতুল-দাকে ওদের বাড়ির চাল ছেয়ে দিয়ে আসতে হ'বে, নইলে এই আষাঢ়ে আর বিয়ে হ'তে পারবে না।'

মুরারি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। বললে, 'এমন মেয়েকে প্রতুল পছন্দ করলো কি করে' ?'

'বললুম না জীবে দয়া, স্রেফ জীবে দয়া। সেবার আমার দেশে গিয়ে প্রতুলদা রেখাকে একদিন দেখলেন রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে। জিগগেস করলেন, 'কে ওই মেয়েটি ?' দিলুম ওর পরিচয়, বললুম ওদের অবস্থার কথা। ওর বাপ কি-রকম হন্তে হ'য়ে ওর বিয়ের জন্যে বুড়ো থেকে বালকের কাছে গিয়ে হাতজোড় করছেন। একে কালো—তার লেখাপড়ার জৌলুস নেই, নেই সহরে চুণকাম, তাই কেউ মুখ তুলছে না। বুড়ো ভদ্রলোকের কেবল আত্মহত্যা করতে বাকি। কিন্তু মরলেও বা শান্তি কই ? স্বর্গেই যান বা নরকেই যান, আজকালকার পল্লীগ্রামের অবস্থার কথা তো খবরের কাগজ খুললেই পড়তে পারবেন !'

'তারপর ?' মুরারি তাকে সুতো ধরিয়ে দিলো।

'তারপর, নৌকোয় যখন উঠবেন, প্রতুলদা আমাকে বললেন, রেখাকে তিনি বিয়ে করবেন। কথাটা যেন বাড়ি ফিরেই পাড়ি ওদের কাছে।'

'পাড়লে কথাটা ?'

'বাড়ি ফিরেই। তক্ষুনিই।'

'ওরা কী বললে ?'

'বললে ? শুধু বললে ? চেঁচিয়ে উঠলো। লাফিয়ে উঠলো। গান গেয়ে উঠলো।'

মুরারি অল্প একটু হাসলো। বললে, 'কি-রকম পাত্র সে-সম্বন্ধে কোনো খোঁজ নেয়া দরকার মনে করলো না ?'

'কি রকম পাত্র !' এমন একটা প্রশ্নও হ'তে পারে ভাবতে অমিয়র চক্ষু গোলাকার হ'য়ে উঠলো। অসহিষ্ণু হ'য়ে বললে, 'আর, কি-রকম পাত্রী তার খবর রাখেন ?'

'তা তো ঠিকই। তবে কিনা—'

'প্রতুল-দাকে যদি অপাত্র বলেন তবে রসগোল্লাকেও অখাদ্য বলতে হয়। ক্রিকেটে যেমন ব্র্যাডম্যান, বিয়ের বাজারে তেম্‌নি প্রতুল-দা। কিসে তিনি ছোট ? চেহারায় কার্তিক না হ'লেও গণেশ নন, আর ময়মনসিং-সর্বেবাড়িতে তাঁর প্রকাণ্ড পাটের ব্যবসা, পয়সায় তিনি গড়াগড়ি যাচ্ছেন। রাখুন মশাই, অমন কাঁচা পয়সা হাতে এলে এখানে-সেখানে বেরিয়ে যায়ই এক-আধটু—সেটা পয়সার স্বভাব, মানুষের চরিত্রের দোষ নয়।'

'কিন্তু ওরা যদি সে-কথা শোনে ?'

'কারা ?'

'মেয়েপক্ষ।'

'ঢোঁক গিলে হজম করে' ফেলবে। ভাববে, দুর্নীতিটা গরিব লোকের বেলায় যতটা কলঙ্ক, বড়লোকের বেলায় ততটাই অলঙ্কার। সেটাকে কেউ পাপ বলবেনা, বলবে একটা খেয়াল।'

'তা বলেছ ঠিক। কিন্তু তোমার কি মনে হয়,' মুরারি গম্ভীর হ'বার চেষ্টা করলো : 'বিয়ে করে' প্রতুল ঘর বাঁধতে পারবে—আজ যে মাইশোর আর কাল যে মুশৌরি করছে ? বিয়েটা তার পক্ষে একটা বাধা হ'বে না ?'

'আমার তো মনে হয় আকাশ থেকে এখন নীড়ে আসবার জন্যেই উনি ব্যস্ত। আর যাই বলুন, লঙ্কাকাণ্ডে সীতা-উদ্ধার পর্যন্তই আমরা আছি, উত্তরকাণ্ডের কথা বাল্মীকি ভাববেন, মানে গ্রন্থকর্তা, অর্থাৎ মেয়ের বাপ।'

'ভদ্রলোক বুঝি খুবই গরিব ! করেন না কিছু ?'

'করতেন, কিন্তু ছেলের দুর্দান্ত স্বদেশিয়ানায় সেটা খুইয়েছেন।'

'নেই কেউ ?'

'এক ভাই আছে, সিলেটে না শিলচরে কি কাজ করে, ঝুলি ঝেড়ে মাসান্তে কিছু পাঠায়। জমি-জমা বাকি খাজনার ডিক্রিতে নিলেম হ'য়ে গেছে, জমিদারের হাতে-পায়ে ধরে' ভিটে আঁকড়ে পড়ে' আছেন এখনো।'

'ভদ্রলোকের নাম কী ?'

'ভবানন্দ মুখুজ্জে।'

'বলো কী হে, অমিয় ?' মুরারি পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে উঠলো 'আর প্রতুলরা যে দাস।'

অমিয় উঠলো হেসে। বললে, 'আপনি তা হ'লে ওঁকে চেনেন না।

ওঁর আসল নাম হচ্ছে জগদীশ ব্যানার্জি—কার্তিকপুরের গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে।'

'এ কী হেঁয়ালি বলছ ?' মুরারি থ হ'য়ে গেল।

'ধাঁধার উত্তরও এই বলে' দিচ্ছি আপনাকে।' অমিয় গ্যাঁট হ'য়ে বসলো, বললে, 'ছেলেবেলা থেকেই উনি বখা, বুঝতেই পারেন ভোরবেলা দেখেই দিন বোঝা যায়, বাপের শাসন-ত্রাসন না মেনে মা-মরা ছেলে একদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। বহু বছর আগেকার কথা। চলে' গেলেন রেঙ্গুন না কয়েম্বেটোর, ধুলো মুঠ করে' নিয়ে গেলেন—খুলে দেখলেন সোনা হয়ে গিয়েছে। ফিরে এলেন কোলকাতায়, সেখান থেকে স্থলপথে আর জলপথে অনায়াসে তাঁদের বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে আর গেলেন না, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে, যারা তাঁকে কুলাঙ্গার বলেছে, তাঁকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে যারা তাঁর বাপের সহায়ক ছিলো, দুর্বল বার্ধক্যেও যারা তাঁর বাপকে কোনোদিন তাঁর জন্যে কাঁদতে দেয় নি। আর কেনই বা যাবে! গদাধরবাবু তো আর বেঁচে নেই।'

'তুমি এত সব জানলে কি করে' ?'

'আমি কেন, বিক্রমপুর-পরগণার সবাই জানে যে গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে ভাগ্য-জয় করে' ফিরেছে।'

'কিন্তু তুমি তো আর জগদীশকে দেখ নি।'

'দেখি নি, কিন্তু গদাধরবাবু যখন নোয়াখালিতে সাবরেজিষ্ট্রার ছিলেন, আমি জানতুম ওদের পরিবারকে। শুনেছিলুম, তাঁর বড় ছেলে নিরুদ্দেশ, কেউ বলে সন্ন্যেসি, কেউ বলে ডাকাত, কেউ বা সরাসরি বলে, শিঙে ফুঁকেছে। আমার সঙ্গে প্রথম যখন ওঁর আলাপ, চার বছর আগের কথা বলছি, প্রথমেই বললেন, উনি নোয়াখালির গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে, জগদীশ।'

'তার আগে, তোমার বাবা এককালে নোয়াখালির ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, এ-কথা বলেছিলে তাকে ?' ডিটেকটিভ পুলিশের মতো মুরারি সূক্ষ্ম একটু হাসলো।

'তা বলে' থাকতে পারি বটে, আমার মনে নেই।' অমিয় বিরক্ত হ'য়ে জিগগেস করলে : 'তা, আপনার সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?'

'তা একটু-একটু হচ্ছে বৈ কি।' এতক্ষণে মুরারি একটা সিগরেট ধরাবার সময় পেলো। বললে, 'নইলে জগদীশ কেন প্রতুল হ'তে যাবে, নাম জাত-গোত্র বদলে ?'

'এইটুকু আপনার বুদ্ধি হ'লো না ? আপনি যখন ও-সব জায়গায় যান, আর যখন ওরা আপনার নাম জিগগেস করে, তখন কি সত্যি-সত্যি মুরারি ব্রহ্মই বলেন, না, মনীন্দ্র সমাদ্দার বলে' আসেন ? আর যে-নাম একবার চ'লে গেছে বাজারে, কালক্রমে তারো একটা গুডউইল দাঁড়িয়ে যায়। যায় না ?'

'সেটা তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু প্রতুল এখন কোথায় বলতে পারো ?'

'কোয়েটায়। কাল চিঠি পেয়েছি।'

'কোয়েটায় ?'

'হ্যাঁ, সেখান থেকে করাচি হ'য়ে এক হপ্তার মধ্যেই কোলকাতায় ফিরবেন।'

'তার বিয়ে কবে ?'

'সামনে মাসেই। আপনারা জানতে পারবেন বৈ কি।'

'আচ্ছা, তা হ'লে উঠি।'

'কিন্তু এতক্ষণ বাদে একটা কথা আপনাকে জিগগেস করবো।' অমিয় নিভৃত হবার চেষ্টা করে' বললে, 'প্রতুলদার বিয়েতে আপনার সায় নেই কেন বলতে পারেন ?'

'তুমি এত বোঝ আর এটা বুঝলে না ?' মুরারি হাসলো : 'জাহাজের কাপ্তানই যদি আত্মহত্যা করে, তবে জাহাজের কী দশা হয় ?'

'বানচাল, ছত্রখান হ'য়ে যায়।'

'আমরা তাই হ'তে বসেছি।' মুরারি ততোধিক হাসলো : 'আমাদের কাপ্তেনই যদি চলে' যায় তো আমরা কোথায়! তখন তার জামায় কি আর পকেট থাকবে ? তোমার সেই রেখা এসে সব সেলাই করে' দেবে না ?' মুরারি যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো।

এ-দিকটা অমিয় ভেবে দেখে নি। বাপ তার খরচ-পত্র বন্ধ করেছে অনেক দিন, যে-দিন থেকে সে এক থিয়েটার-পার্টি খুলে বসেছে। সে-পার্টি বাঁচিয়ে রেখেছে শুধু প্রতুলের পয়সা, এমন-কি আনকোরা সব নটী ও অভিনেত্রী পর্যন্ত জুটিয়ে দিয়েছে সে। প্রতুল-দা যদি সত্যিই এবার নীড়ে ফিরে আসেন আর তাঁর জামার পকেটগুলো যদি একে-একে সেলাই হ'য়ে যায়, তবে তার পার্টি তো একেবারে পপাত উলটোবে!

মনে-মনে সে অস্থির হ'য়ে উঠলো। বললে, 'সে আর কত দিন, বড়ো জোর মাসখানেক। বুড়ি যে একবার ছুঁয়ে এসেছে মুরারিবাবু, সে আর কখনো মরে না। এ ভরসা আমার আছে।'

'তা বলেছ ঠিক। দিন-ক্ষণ ঠিক হ'লে আমাকে জানিয়ো, আমি যাবো বরযাত্রী।'

'নিশ্চয়। আর কারু নয়, প্রতুল-দার বিয়ে!'

কি ভেবে দু'জনে হেসে উঠলো।

২

করাচি থেকে ফিরে প্রতুল অমিয়র মেসে এসেই উঠলো। ট্যাক্সি-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে প্রথম কথাই এই বললে, 'ওদের আজকেই টেলি করে' দাও অমিয়, সাতদিনের মধ্যেই বিয়ের দিন ঠিক করা চাই।'

'সাত দিনের মধ্যে!' অমিয় ভেবড়ে গেল : 'এত শিগগির!'

'কোন জিনিসটা আমি গড়িমসি করে' করেছি শুনি ? বেশি দেরি করতে গেলে মত বদলে যেতে পারে। এ বাবা মানুষের মন, রেসের ঘোড়ার চেয়েও অনিশ্চিত।'

'কিন্তু সাতদিনের মধ্যে কি ওরা তৈরি হ'তে পারবে ?'

'এই নাও টাকা,' পকেট থেকে প্রতুল একটা একশো টাকার নোট বার করলো : 'টি-এম-ও করে' দাও। আর লিখে দাও, আয়োজন খুব সংক্ষেপ করতে। শাঁখা আর সিঁদুর, শাঁখের আওয়াজ আর শালগ্রাম-

শিক্ষা। আমাদের দেশে আইন করে' আয়-মাফিক বিয়ের খরচ বেঁধে দেয়া উচিত।'

'ওদের একটা নেমন্তন্ন-পত্রও তো ছাপাতে হ'বে। জ্ঞাতি-কুটুম্ব দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে, প্রথম মেয়ের বিয়ে, না জানালে কি ভালো দেখায়?'

'রেখে দাও তোমার জ্ঞাতি-কুটুম্ব! বলে, তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি।' প্রতুল মুখ বেঁকালো: 'গ্রামের দু' পাঁচ জন মাতব্বরকে ধরে' খাইয়ে দেবে। দুটো গ্যাস, একটা সামিয়ানা, আর একখানা পাট-কাপড়। বিয়ে হ'য়ে যাক, জ্ঞাতিগুষ্টি ডাকিয়ে আমিই একদিন না-হয় ফিরপোতে ডিনার খাইয়ে দেবো। হ্যাঁ, প্রিপেড টেলি করবে। এক্ষুনি উত্তর চাই, সাতদিনে তারা রেডি হ'তে রাজি আছে কিনা।'

'কিন্তু,' অমিয় আমতা-আমতা করে' বললে, 'কিন্তু সাতদিনে বিয়ের দিন আছে কিনা কে জানে।'

'আমি জানি, দিন নেই।' প্রতুল ক্রুদ্ধ গলায় বললে, 'দক্ষিণা পেলেই পাঁজির ব্যাখ্যা করে' জ্যোতিষীরা দিন বা'র করে' দেয়। আর এ-ক্ষেত্রে কন্যা অরক্ষণীয়া, মনে রেখো। দিন বেঠিক হ'লেই বিয়েটা বে-আইনি হয় না। তুমি ওদের লিখে দাও তো, গরজ কার বোঝা যাবে।'

পরের দিনই টেলিগ্রামের উত্তর এসে হাজির।

মেয়ের বাপ লিখেছে, আসচে সাতাশে তারিখেই তারা প্রস্তুত, যদিও অজ-পাড়াগাঁয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে সব জোগাড়যন্ত্র করে' ওঠা মুস্কিল। বরযাত্রী ক'জন আসবে দয়া করে' তার সংখ্যাটা যেন জানান।

'লিখে দাও পনেরো জন।' আয়নার সামনে প্রতুল চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে বললে।

'এত? ওরা নাজেহাল হ'য়ে যাবে যে।'

'তবে কেটে সাত করে' দাও। তুমি আছ, মুরারি আছে, ওর মেসের দু'-একজন ভদ্রলোক যাবে বলেছে, প্রফুল্ল, তার ভাই প্রমোদ; নিপু আর হরিকুমারকেও বলতে হ'বে—এ তো আর-কিছু নয় যে দল ভারি হ'লে দুশ্চিন্তা হ'বে, এ বাবা, রিলিজিয়স য়্যাক্ট, বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'না, সেভেন ইজ এ ডিসেন্ট নাম্বার!'

'হ্যাঁ, আর লিখে দেবে, লিস্ট্ পসিব্‌ল্ ফাস্। একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড করে' বসে না।'

'কোত্থেকে করবে?'

'আর এ-ও লিখে দিতে পারো, মেয়ের বিয়েতে উপযুক্ত গয়না বা শাড়ি-ব্লাউজ দিতে না পেরে ওরা যেন না দুঃখ করে। সব আমি দেবো।'

'তা তারা জানে।' অমিয় হাসলো।

'আর শোনো, চাকরকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলো, আমি এখুনি একবার শ্রীরামপুর যাবো। আর তোমাকে এই টাকা দিয়ে যাচ্ছি, পঁচিশে তারিখ ইংরিজি কতই জুন হয় দেখে নিয়ো, ঢাকা মেলে আমার আর তোমার দু'খানা টিকিট কেটে বার্থ রিজার্ভ করে' রাখবে। আর কে যায় না যায়, দেখে পরের টিকিট পরে করা যাবে।'

'আপনি কি এর মধ্যে আর ফিরে আসছেন না নাকি?' অমিয়র গলায় কেমন অস্বস্তি।

'না, সেখান থেকে আমাকে একবার ধানবাদ যেতে হ'তে পারে। তা তোমার ভয় নেই, পঁচিশে তারিখ, ইংরিজি কতই জুন হয় দেখে নিয়ো, রাত ঠিক দশটার সময় শেয়ালদা ষ্টেশনে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটের কাছে আমাকে দেখতে পাবে। কাজ, কাজ, বিয়ে যে করবো তাতে পর্যন্ত কাজের কমতি নেই। জিনিসপত্র কেনাকাটা আছে, সামান্য টুথব্রাশ থেকে রেখার জন্যে জড়োয়া একটা নেকলেস পর্যন্ত, বন্ধু-বান্ধবদের দোরে-দোরে গিয়ে নেমন্তন্ন করতে হ'বে, পত্রদ্বারা যখন ত্রুটি করা যাবে না, তারপর বাড়ি একখানা ঠিক করে' রাখতে হ'বে, চাকর-বাকর, ফার্নিচার, কম-সে-কম টু-সিটার একখানা গাড়ি—কাজের কি আর শেষ আছে ভাই? তুমি কিচ্ছু ভেবো না, সব ভুলতে পারি, রেখাকে ভুলতে পারবো না—এই নাও টাকা, আজই গিয়ে বার্থ দু'খানা রিজার্ভ করে' এসো।' বলে' পকেট থেকে প্রতুল গুণে-গুণে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে' দিলো।

'খেয়ে যাবেন না?' হতবুদ্ধির মতো অমিয় বললে।

'না, ষ্টেশনের রিফ্রেসমেন্ট-রুমেই সেটা সেরে নেবো। কই রে, গাড়ি কই?'

প্রতুল বেরিয়ে গেলো।

পঁচিশে তারিখ, ইংরিজি নয়ই জুন, টিকিট কেটে, বার্থ রিজার্ভ করে', কামরাতে মাল-পত্র চাপিয়ে, সাড়ে নটা থেকে অমিয় ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে পাইচারি করছে। সেকেণ্ডক্লাশ-ওয়ালারা এত আগে কেউ আসে না, ঢাকা-মেলেও না; কিন্তু দশটা ছেড়ে সাড়ে-দশটা প্রায় বাজে, প্রতুলের দেখা নেই। নিশান নিয়ে গার্ড পর্যন্ত তার গাড়িতে এসে উঠলো, কার্স্ট বেল প্রায় পড়ো-পড়ো, কোথায় প্রতুল? এ একা সে চলেছে কোথায়—অসহায় উদ্বেগে অমিয় একেবারে দিশেহারা হ'য়ে উঠলো। মাল-পত্র সে নামিয়ে নেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় প্রতুল এসে হাজির।

'কই হে, বুক্-ঠুক্ হয়ে গেছে সব? কম্প্লিট?'

'এ কি, কী হয়েছে আপনার?' অমিয় প্রতুলের মাথার দিকে ইঙ্গিত করলো।

দেখা যাচ্ছিলো, প্রতুল তার মাথাটা নির্মূল ন্যাড়া করেছে, যদিও তার উপরে সিল্কের একটা পাকানো পাগড়ি, পাঞ্জাবির ধরনে বাঁধা, যদিও ন্যাজ নেই।

'ও আর বোলো না হে। গিয়েছিলাম ফ্যাসান করে' এক বিলিতি দোকানে চুল ছাঁটতে। চুল যেন কাটছে না শালারা, কোদলাচ্ছে। হাল চালিয়ে এবড়ো-খেবড়ো একটা মাঠ বানিয়ে ফেললে। শালাদের শাপান্ত করতে-করতে শেষকালে ফুটপাতের ধারে একটা খোট্টাই ক্ষুরের

তলায় গিয়ে মাথা গলিয়ে দিলাম ; বললাম, বেশ গোল করে' নাড়ুটির মতো কামিয়ে দাও তো, গোপাল।'

'আমি বা ভাবলাম, আর কোনো হঠাৎ বিপদ হ'লো বুঝি ! কিন্তু সেই সঙ্গে গোঁফ জোড়াও কামালেন কেন ?'

'নইলে যে ব্যালেন্স থাকে না। কই হে, এই আমাদের গাড়ি নাকি ? উপরে-নিচে আর কেউ আছে নাকি এ-গাড়িতে ?' প্রতুল সঙ্গের কুলিটাকে দাঁড় করালো।

এ-পাশে ও-পাশে ঘন-ঘন তাকাতে-তাকাতে অমিয় বললে, 'আর কেউ এলো না ?'

'বোলো না আর অদৃষ্টের কথা. শুভ কাজে সঙ্গী মেলে না।' প্রতুল গাড়িতে উঠে কুলি খাটাতে-খাটাতে বললে, 'মুরারির মেসে গিয়ে দেখি, প্রবল গ্রীষ্মে লেপমুড়ি দিয়ে হি-হি করে' কাঁপছে, মুরারি যাবে না দেখে ওদের ওখানকার আর-কাউকে রাজি করানো গেল না. কাল মেডিকেল কলেজে প্রফুল্লর শালির য়্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশান হ'বে সে যেতে পারবে না. ওর ভাই প্রমোদ ন্যাম্বোগোতে ভুগছে, ওঠায় কা'র সাধ্যি। নিপুর কাছে গেলাম, ষ্টুপিডটা দাঁত বার করে' বললে, পশু' তার ছেলের অন্নপ্রাশন। চললাম, বেলগাছিয়ার হরিকুমারের বাড়ি, দেখি গলির মোড়ে কঞ্জুসটা ভেণ্ডারের থেকে এক সিকি আফিং কিনছে। টানলাম তার জামা ধরে', বললাম, 'চল্, বিয়ের বরযাত্রী যাবি' ; ও ওর চোখ দুটো ছোট করতে-করতে দুটো সূক্ষ্ম শুভ্র রেখায় পরিণত করে' বললে, 'আবার বিয়ে ! মাপ করো দাদা, ও-নাম মুখেও উচ্চারণ করো না।' নেশাখোর স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার ! উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, হুইস্‌ল্ দিচ্ছে।'

গাড়িতে উঠতে-উঠতে অমিয় বললে, একটু-বা বিরস গলায় : 'কেবল আপনি আর আমি !'

'তাই যথেষ্ট, আমি বর আর তুমি নিতবর।' প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির সঙ্গে নিজের কব্জির ঘড়িটা মিলিয়ে নিতে-নিতে প্রতুল বললে, 'আশ্চর্য্য, আমার ঘড়িও কিনা স্লো যায়।'

গাড়ি ছেড়ে দিলো।

অমিয় বললে, 'ওরা কিন্তু এত কম লোক দেখে বড্ড হতাশ হয়ে যাবে।'

'আরে বন্ধু, তুমি কী চাও ? দশ সহস্র অক্ষৌহিণী সেনা চাও, না স্বয়ং জনার্দনকে চাও ? ঘড়িটা যেমন স্লো যাচ্ছিলো, যদি নিক অফ টাইমে না এসে পড়তে পারতাম, তবে ভদ্রলোকরা কি অধিকতরো আরাম পেতেন নাকি ?'

'কিন্তু সঙ্গে একটা চাকর পর্য্যন্ত নিয়ে এলেন না ?'

'কেন, তোমাদের গাঁয়ে সকলেই এককেটা জেলার হাকিম নাকি, একটা চাকর পাওয়া যাবে না, জুতোজোড়াটা যে এগিয়ে দেয়, কাপড়-খানা কুঁচিয়ে রাখে ?'

'অধিবাসের তত্ত্ব কী পাঠাবেন ?'

'তুমি যে দেখছি একেবারেই য়্যাডভেঞ্চেরাস নও ! কেন, তোমাদের ওখানে ময়রা কি মুদির দোকান নেই? এক হাঁড়ি চিনি, এক হাঁড়ি মিছরি, এক হাঁড়ি বাতাসা, এক হাঁড়ি গুড়, এক হাঁড়ি নকুলদানা, এক হাঁড়ি বাসি জিলিপি—একুশ না হোক এগারো হাঁড়ি সাজিয়ে দিতে পারবো না ? তত্ত্ব দেখতে চাও তো দেখ আমার এই ট্রাঙ্ক।' নিজেই দু' হাতে করে' ভারি মজবুত ট্রাঙ্কটা প্রতুল মেঝে থেকে বার্থের উপর তুলে আনলো।

নতুন, সদ্য কেনা ট্রাঙ্ক, মনে হয় গায়ের রঙ এখনো শুকোয় নি। পকেট থেকে চাবি বা'র করে' ডালাটা খুলে ফেলে প্রতুল বললে, 'দেখ।'

কত রকমের শাড়ি—বেনারসি, মান্দ্রাজি, ভাগলপুরি, কাবেরি। স্কার্ট-পাড়, জংলি, একরঙা। পাড়ের কী ছটা ! আর এই ব্লাউজের স্তূপ। কাঁধকাটা, ফুল্ হাতা, ভি-গলা, কোনোটা বা মোগলি আমলের গলা-তোলা। আর এই সায়া-সেমিজ। আর এই সব আরো আধুনিক-তরো দেহ-শাসন-বস্ত্র। শুকনো শাড়িতেই সে বাক্স বোঝাই করে' আনে নি। এই দেখ তলায় পড়ে' রয়েছে এই নেকলেসের কেসটা, লীলারামের দোকান থেকে কেনা, রিয়েল পার্ল ; আর এই তোমার ঝুমকো না ঝাড়লণ্ঠন যা বলতে চাও ; আর এটা একটা আংটি না তো মনে হচ্ছে আকাশের তারার টুকরো ; আর এই দেখ রিষ্ট-ওয়াচ, মাইক্রস্কোপ লাগিয়ে সেকেণ্ডের কাঁটা দেখতে হয়। তারপর এই বড়ো বাণ্ডিলটা খোলো : আয়না আর চিরুনি, তেল আর তোয়ালে, ফিতে আর কাঁটা, স্নো আর পাউডার, ক্রিম আর ওয়্যাক্স্, আলতা আর সুর্মা, লিপ্‌স্টিক আর কিউটেক্স, সাবান আর স্পঞ্জ, প্যাড আর খাম, জুইব আর পার্কার, কুরসি আর কাঠি, নিটিং-কেস আর পিক্টোগ্রাফ ! কত ! কত ! অধিবাসের তত্ত্বের জন্যে ভাবনা !

বিস্ময়ে অমিয় একেবারে সাদা হ'য়ে গেল। বললে, 'এত ?'

'হ্যাঁ। আর-কাউকে নয়, বউকে দিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারবে না বাবা।' গর্বিত মুখে প্রতুল একটু হাসলো : 'তবু এ তো শুধু অবতরণিকা।'

'না, এত সব আপনি এক অধিবাসের তত্ত্বেই দিয়ে দিতে পারবেন না।' অমিয় আপত্তি করলো।

'তা তুমি যখন বরকর্তা, তুমি যা বলো সেই অনুসারেই হ'বে। নিতকামও তুমিই করাবে, আর বিয়ের সভাতে আমাকে নিয়ে যাবে তোমারই অনুমতি নিয়ে।'

'আমারো হয়েছে পোড়ো বাড়ি, স্থানেস্থিতিতে ঠাকুমাটা ছিলো, তাও পটল তুললে। মা তো বাবার সঙ্গেই, সিউড়িতে। আমি কি কিছু জানি কী করতে হয় বা না-হয় !'

'রেখে দাও, বয়ের আবার ভাবনা। টাকা ফেললে ওরাই সব ঠিক-ঠাক করে' দেবে। নাও, সিগরেট খাও', প্রতুল মার্কোভিচের টিন বার করলো : 'গলাটা শুকিয়ে গেল।'

অমিয় তার দিকে চেয়ে কি-রকম করে' যেন হাসলো।

'কি আর করা ! নেহাৎ বিয়ে করতে যাচ্ছি বিভুঁয়ে, মুখে তো আর গল্প করতে পারি না।'

সিগরেট ধরিয়ে অমিয় বললে, 'কিন্তু সঙ্গে একটা বেডিং আনেন নি কেন ?'

'এক রাত্রির তো মামলা, তোমারটাতেই ভাগাভাগি করে' চালিয়ে নিতে পারবো। তারপর ওরাই তো শয্যা দেবে, যদিও আমি সে-শয্যা তোলবার জন্যে শালা-শালির হাতে আমার জরিমানা আছে।' প্রতুল বিরাট একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলো ; বললে, 'আর নয়, আলো নিভিয়ে এবার শুয়ে পড়া যাক। হ্যাঁ, পাখাটা চলুক। ক্যাচ দু'টো ফেলে দাও দরজার। প্রত্যুষে সেই গোয়ালন্দ।'

গন্তব্য গ্রামে এসে তারা পৌঁছুলো, বেলা তখন প্রায় দেড়টার কাছাকাছি। ষ্টিমার-ঘাটে দু'-দুখানা গয়নার নৌকো ছিলো, একখানা শূন্য ফিরলো। গ্রামের ঘাটে অনেক লোকের ভিড় জমেছে, ভদ্রলোক থেকে চাষা-মজুর, কোঁচা থেকে গামছা পর্যন্ত। দুটো কলাগাছ পোঁতা, কলসীর উপরে ডাব বসানো, লাল-নীল কাগজের শিকল ঝুলছে। ঢাক আর কাঁসিও জুটেছে দু'টো।

নৌকো থেকে নামলো শুধু অমিয় আর প্রতুল, মাথায় সিল্কের পাগড়ি বাঁধা, আর মাঝির মাথায় মাল-পত্র।

রাজেন বিশ্বাস, গ্রামের ডাক্তার, ক্যাম্বেলের, কন্যার দিক থেকে এ-বিয়ের তদারক করছিলো। ঢাক-ঢোল, লতা-পাতা যেটুকু জাঁক-জমক দেখা যাচ্ছে সব তার উদ্যোগে। এমন-কি বিয়ের রাত্রের জন্যে গোটা কয় হাণ্ডাই আর সাপবাজি পর্যন্ত সে সংগ্রহ করেছে।

অমিয় তার অচেনা নয়, তাকেই সে সম্বোধন করে' বললে. 'কি হে, আর কই ?'

অমিয় ডাক্তারকে প্রণাম করলো, বয়েস তার চল্লিশের ওপারে। বললে, 'শেষ পর্যন্ত কেউ আসতে পারলো না। কারু মেনিনজাইটিস, কারু পিতৃশ্রাদ্ধ, কেউ-বা ব্যারারে বিলেত চলেছে।'

'এ কেমন কথা ! তুমিই কি বরকর্তা নাকি ?'

'আমি উভচর।' অমিয় হাসলো।

জাগোয়া জমিদারের কাচারি-বাড়িতে বরের জায়গা হয়েছে। নিচু তক্তপোষে পুরু করে' ফরাস-পাতা, তাকিয়াও আছে দু'-একটা, এনা-মেলের ট্রে-তে করে' পান-সিগরেট সাজানো, উপরে ইলেকট্রিক ফ্যান না হ'লেও মাদুরের টানা পাখা ঝুলছে, প্রতুল ভাবলো, উপক্রমণিকাটা মন্দ মিলছে না। ঘরে ঢুকতেই কে কোত্থেকে ক'টা পটকা ফোটালো, গর্জনের চেয়ে ধোঁয়াই যার বেশি, কিন্তু আওয়াজটা সব চেয়ে বেসুরো লাগলো রাজেনের কানে। ব্যাপারটা যেন তার কাছে বিয়ের মতো বলে'ই মনে হচ্ছে না।

অমিয় বললে, 'একটা চাকর চাই। আরেকটা পুরুত। কী লাগবে না লাগবে কিছুই আমাদের জানা নেই। একটা মুকুট পর্যন্ত আমাদের কেনা হয় নি।'

রাজেন ভরসা দিয়ে বললে, 'পাঁচ মিনিটে আমি সব জোগাড় করে' দিচ্ছি, কিচ্ছু তোমাদের ভাবতে হ'বে না। আগে খানিক বিশ্রাম করো। ওরে, বাবুদের ডাব কেটে দে।'

পাথরের বাটিতে করে', প্রতুল ভাবলে। এখন সুশীতল পানীয়ই চাই।

মন্দ মিলছে না।

রাজেন বললে, 'তোমরা কি পুকুরে স্নান করবে, না, বালতি করে' জল তুলে দেবে ? গরম জল ঠাণ্ডা করা আছে।'

প্রতুল বললে, 'পুকুরে।'

স্নান করবার প্রাকালে অমিয়কে রাজেন ভবানন্দবাবুর কাছে টেনে নিয়ে গেল। বললে, 'এ কেমনতরো বিয়ে ? সঙ্গে আত্মীয় নেই, জ্ঞাতি-কুটুম নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই—এ কি দুষ্মন্তের বিয়ে নাকি ?'

'কোথায় পাবেন উনি আত্মীয়-স্বজন ?' অমিয় একটু-বা বিরক্ত হ'য়েই বললে, 'যারা ওঁকে পরিত্যাগ করেছে সদলে তাদেরকেও উনি অস্বীকার করতে চান। আর গুচ্ছের আত্মীয়-কুটুম্ব এলেই আপনারা সামলাতে পারতেন নাকি ?'

'তা তো ঠিকই।' ভবানন্দবাবু সায় দিলেন : 'আমাদের সামর্থ্য কোথায় যে ওঁদের অভ্যর্থনা করবো।'

'আর এলে কোন আত্মীয় কোথা দিয়ে কী গোলমাল বাধাতো তার ঠিক আছে ? পণ নেই, দানসামগ্রী নেই, নমো-নমো করে' কাজ সেরে দেয়া—এ তারা বরদাস্ত করতো নাকি ?' অমিয় প্রায় রাগ করে' উঠলো।

'তা যা বলেছ, একশোবার !' ভবানন্দবাবু ঘাড় ফেলালেন।

'কিন্তু ব্যাপারটা যেন কেমন লুকিয়ে হচ্ছে বলে' মনে হচ্ছে না ?' রাজেন বিশ্বাস তবু আপত্তি করলো।

'তা একটু লুকিয়েই হচ্ছে বৈ কি।' অমিয় ঝাঁজালো গলায় বললে, 'জগদীশ যে কোলকাতায় ফিরেছে এ-খবরই তো তার আত্মীয়-স্বজনরা কেউ জানে না। জানে না, কারণ, ইচ্ছে করে'ই তাদেরকে তিনি কিছু জানান নি। কারণ, তা হ'লে দিগ্বিদিক থেকে শত হস্ত এসে প্রসারিত হ'বে ওঁর পকেটের গহ্বরে, যে-সব হাত একদিন তাঁকে মারতে পর্যন্ত উদ্যত হয়েছিলো। সংসারে যার আত্মীয় নেই, কিম্বা যে আত্মীয়তা অস্বীকার করে, তার কখনো বিয়ে হ'তে পারবে না ?'

'যাই বলুন, ব্যাপারটা আমার বিশেষ ভালো লাগছে না।' রাজেনের মুখ তেমনি মেঘলা করে'ই রইলো।

'তা হ'লে এই বিয়ে আপনারা বন্ধ করে' দিতে বলেন নাকি ?' অমিয় রুখে উঠলো।

'কী সর্বনাশ !' দুই হাত তুলে ভবানন্দবাবু হাঁ-হাঁ করে' উঠলেন।

'আর এই পাত্র !' অমিয় গদগদ গলায় বললে : 'লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। টাকা, টাকা, এ-যুগে টাকাই হচ্ছে ক্রাইটিরিয়ান, সভ্যতার, সংস্কারের, এমন-কি মর‍্যালিটির। সেই টাকা ওঁর কাছে হাতের ময়লা। আর সেই সঙ্গে দয়া করে' আপনাদের মেয়েটির কথাও ভেবে দেখবেন।'

'সহস্রবার !' ভবানন্দবাবু নিশ্চিন্ত সায় দিলেন।

'আমার তো মনে হয় রেখার পূর্বজন্মের তপস্যা ছিলো, দুশ্চর তপস্যা।' অমিয় বলে' চললো : 'নইলে এ-জন্মে এমন বরলাভ ঘটতো

না। আজকালকার ছেলে, টাকা যখন আছে তখন সবই আছে, ইচ্ছে করলে কা'কে না বিয়ে করতে পারতেন, ম্যাট্রিক থেকে বি-এ বি-টি পর্য্যন্ত—দিশি, বিলিতি, ইঙ্গ-বঙ্গী, কা'কে নয়? কী শুভক্ষণে রেখাকে কেমন তাঁর চোখে লেগে গেছে, তাই তিনি না উপযাচক হ'য়ে পাণি-প্রার্থনা করে' বসেছেন! নইলে তাঁর কী দায় পড়েছিলো সিমলের মেয়ে না বিয়ে করে' এই গেঁয়ো মেয়ে বিয়ে করা? আমার তো মনে হয় মহাভারতের পরে এমন উদারতার দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় নি।'

'এক বর্ণও তুমি মিথ্যা বলো নি।' ভবানন্দবাবু কৃতজ্ঞতায় গলে' গিয়ে বললেন, 'দুর্লভ মহানুভবতা। সবই ঈশ্বরের করুণা, তাঁর বিধান।' পরে তিনি রাজেনের কাঁধে হাত রাখলেন: 'মিছে তুমি মুষড়ে যাচ্ছ! শিব নিয়ে আমাদের কথা, তার প্রমথদের নিয়ে নয়। কী হ'বে আমার কুটুম্ব নিয়ে, যদি জামাইর মতো জামাই পাই!'

'ও মাথা মুড়েছে কেন বলতে পারো?' রাজেনের কোথায় আটকাচ্ছে বোঝা গেল এতক্ষণে।

'এই কথা?' অমিয় উঠলো অনর্গল হেসে। বিলিতি হেয়ার-কাটিং সেলুনে প্রতুলের দুর্গতির সে বর্ণবহুল কাহিনী বললে।

রাজেনের ঠিক মনঃপুত হ'লো কিনা বোঝা গেল না। ভবানন্দ-বাবুর দিকে ফিরে সে হঠাৎ জিগগেস করলে: 'পাশের গাঁয়ে গদাধর-বাবুর এক বিধবা বোন থাকতেন না?'

ভবানন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আছেন এখনো।'

'তাঁকে আনতে ডুলি পাঠান। আর ঢাকায় গদাধরবাবুর বড়ো মেয়ে আছে, তাকেও একটা টেলি করে' দিন। কালই এসে পৌঁছে যেতে পারবে।'

'তার স্বামীর নাম তো জানি না।'

'আমি জানি।' রাজেন জোর-গলায় বললে, 'সনৎ চক্রবর্তী, লক্ষ্মী-বাজারে থাকে। একই বছর আমরা ক্যাম্বেল থেকে বেরুই।'

'কী বলো অমিয়?' ভবানন্দবাবু অমিয়র অনুমোদন প্রার্থনা করলেন।

'নিশ্চয়ই। কন্যাপক্ষ থেকে যাকে খুসি আপনারা নিমন্ত্রণ করতে পারেন, আমাদের কী বলবার আছে!' অমিয় কথার ভিতরে একটা রাগ পুষে রেখে বললে, 'কিন্তু এ-সব যদি হীন সন্দেহ করে' আমার বন্ধুকে অপমান করবার মতলোব হয়, তবে কাজ নেই এ-বিয়েতে. এ-বিয়ে না হ'লে জগদীশ-দা আর সন্ন্যেসি হ'য়ে যাবেন না।'

অমিয় চলে' যায় আর-কি।

'দরকার নেই, দরকার নেই ও-সবে।' ভবানন্দবাবু দশ হাতে ত্রস্ত-ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন: 'ও-সব তোমার অন্যায় বাড়াবাড়ি, রাজেন। ডুলি-ফুলি আমি পাঠাতে পারবো না, নেমন্তন্ন-চিঠি পর্য্যন্ত আমি ছাপাতে পারি নি, ও-সব অনাবশ্যক টেলি কেলি করা আমার পোষাবে না। গুভেলাতে বিয়েটা হ'য়ে গেলেই আমি পার পাই। একেকসময় মাথাটা কেমন তোমার বিগড়ে যায়, রাজেন। আমাদের অমিয়ই তো আছে, তবে কিসের কী!' ক্ষিপ্রহাতে অমিয়কে তিনি ধরে' ফেললেন।

কাচারি-বাড়িতে ফিরে এসে অমিয় দেখে, সুটকেস থেকে স্নানের আনুষঙ্গিক একটাল জিনিস-পত্র খুলে প্রতুল ম্লান মুখে বাঁ-হাত দিয়ে ডান-হাতের নাড়ি টিপছে।

'কি হ'লো?'

'গ্রামটায় বুঝি খুব ম্যালেরিয়া?' চোখে একটা ছলছলে ভাব এনে প্রতুল বললে, 'কেমন জ্বর-জ্বর করছে ভাই।'

'জ্বর?' বলে' অমিয় তার কপালে গলায় বুকে ঘন-ঘন হাত রাখতে লাগলো; বললে, 'কই, গা তো পাথরের মতো ঠাণ্ডা।'

'না, শরীরটা ভালো নেই, স্নান করবো না, শুধু মাথা ধোবো। অল্পেতেই সাবধান হওয়া ভালো।' বলে' প্রতুল অমিয়কে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললে, 'আসল কথা কী জানো? পৈতে আনতেই ভুলে গেছি।'

'কেন, আপনার ছিলো না?'

'ছিলো বৈ কি, আগে ছিলো। কখনো মাজায়, কখনো গলায়, কখনো ব্র্যাকেটে। কিন্তু যখন দেখলাম নাপিত পর্য্যন্ত পৈতে নিচ্ছে, ঘেন্না ধরে' গেলো, ওটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলাম। মনে-মনে বললাম,' প্রতুল একটা থিয়েটারি ভঙ্গি করলো: মনে-মনে বললাম, আমি মানুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি বীর্য্যবান।'

'কিন্তু এই আধুনিক পোজ্‌টা এরা এপ্রিসিয়েট করতে পারবে কি না সন্দেহ হচ্ছে।' অমিয় চিন্তিত মুখে বললে।

'সেই জন্যেই তো গেঞ্জিটা গা থেকে খুলতে পারলাম না। মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে, আশ্চর্য্য, আমারো ভুল হয়!'

প্রতুল ন্যাড়া মাথাটাই ক'বার চুলকে নিলো: 'কিন্তু এর একটা তোমার ব্যবস্থা করতে হয়, অমিয়। তোমার গ্রাম, ফাঁক-ফন্দি তুমিই ভালো জানো।'

'তা আমি জোগাড় করে' দিচ্ছি।'

জ্বর-জ্বর ভাব শুনে বরের জন্যে ফুলকো লুচির বন্দোবস্ত হচ্ছিলো, কিন্তু শ্রান্ত প্রতুল কালকের আসন্ন উপবাস ও আজকের তার ক্ষুধার্ত উদরের পরিধির কথা স্মরণ করে' বললে, 'না, চাট্টি গরম ভাতই খাবো। আজকালকার ডাক্তারি মতে গরম ভাতটা আর জ্বরের কুপথ্য বলে' ভাবা হচ্ছে না।' বলে' সে কার্মাকোলজির নতুন একটা থিওরি আওড়ে দিলো। রাজেন বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে' বললে, 'জিগগেস করুন না ওঁকে।'

রাজেন বিশ্বাস হাঁ-না কিছু বললে না, মুখে তার আরেক পর্দা গাম্ভীর্য উঠলো ঘনিয়ে।

খাওয়া দাওয়া সেরে শালা-শালিদের নিয়ে প্রতুল গল্প করতে বসেছে, একক্ষেত্রে সমস্ত গ্রামবাসী ও বাসিনীকেই সে সেই চোখে দেখছে; খুলে দেখাচ্ছে তার ইলেকট্রিক টর্চ, চকিত আলোর ঝাপটায় কৌতূহলী মুখ-চোখ সব ঝলসে দিচ্ছে—খুলে দেখাচ্ছে তার ক্যামেরা, সেকেণ্ডে-সেকেণ্ডে স্ন্যাপ নিচ্ছে—খুলে দেখাচ্ছে তার বাইনাকিউলার, দূরের মানুষকে মুহূর্তে টেনে আনছে একেবারে মুঠোর কাছে। এমনি যখন সে মশগুল,

অমিয় তার পাশে বসে' বললে, 'আপনার পিসিমা আসছেন, আজই, সন্ধের আগে।'

'পিসিমা ?' প্রতুল একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

'হ্যাঁ, এই পাশের গ্রামেই নাকি থাকেন। ডুলি গেছে তাঁকে আনতে।'

'ও, হ্যাঁ !' প্রতুল মনে করবার অস্পষ্ট চেষ্টা করলো : 'হ্যাঁ, আছেন বটে পিসিমা। এই পাশের গ্রামেই থাকতেন বলে' শুনেছি। তা, তিনি আসছেন কেন ?'

'আপনাকে সনাক্ত করতে।'

প্রতুল অজস্র হেসে উঠলো। বললে, 'আমাকে পারবেন তিনি চিনতে ? কত ছোটটি দেখেছেন। দেখেছেন কিনা সন্দেহ। বাবার সংসারে থাকতেন না, থাকতেন এই গ্রামে পড়ে'। তিনি তো বিধবা ?'

'তাই তো শুনলাম। নিঃসন্তান।'

'কচি বয়সে বিধবা হয়েছিলেন যে, বিয়ের বছর দুই পরেই। তা আমাকে এখন চিনতে পারলে হয়।'

'আর আপনার দিদিও আসছেন, কালকের ষ্টিমারে।'

'কে বড়দি ? ঢাকা থেকে ?'

'হ্যাঁ, রাজেন বিশ্বাস টেলি করে' দিয়েছে। ওঁর ডাক্তার-স্বামী নাকি তার বন্ধু।'

'হ্যাঁ, ডাক্তার, কিমেল-ডিজিজে খুব পসার জামাইবাবুর। তা মন্দ নয়, এলে দেখা হ'বে। আঠারো বছর আজ নিরুদ্দেশ, এই আমার আজ চৌত্রিশ। এসে এক লহমায় সব চিনতে পারবে কিনা কে জানে।' প্রতুল একটু বিষণ্ণ গলায় বললে, 'ওঁদের সব এমন করে' ডেকে না পাঠালেই এঁরা ভালো করতেন।'

'তা আমি বারণ করে' দিয়েছিলাম। ভবানন্দবাবু শুনতেন, কিন্তু রাজেন বিশ্বেসের গোঁ আর ষাঁড়ের গোঁ এক জাতের।'

'বুঝলে না, আমারই আত্মীয়-স্বজন, আমি ডাকলাম না, মেয়ের বাড়ির নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এলো, ব্যাপারটা ভালো দেখায় না। এতে কি তাদের ঠিক সম্মান করা হ'বে ?'

'আমি বারণ করে' দিয়েছিলাম, কিন্তু রাজেন বিশ্বেসটা হচ্ছে ডাকসাট ডাকাত। এইটুকু কোঁড়া হ'লে কাটবে সে এতখানি। জ্বর ছাড়লেও সাত দিনে সে ভাত দেবে না। আমি যাচ্ছি এখুনি,' অমিয় উঠে পড়লো : 'এর একটা হেস্তনেস্ত করে' আসতে হ'বে।'

'থাক, এ নিয়ে আর গোলমাল করে' লাভ নেই।' প্রতুল তাকে বাধা দিয়ে বসিয়ে রাখলো, বললে, 'পাশার দান যখন পড়ে' গেছে, চাল দিতেই হবে, ঘুঁটি পাকুক আর কাঁচুক। মন্দ কি, আসুক না সবাই। তুমি ওদেরকে শুধু বলে' দাও—বড়দি তার ছেলেপিলে নিয়ে এলে মেয়ের বাড়িতে কিছুতেই আমি থাকতে দেবো না। আমাকে এর জন্যে আলাদা বাড়ি দিতে হ'বে, সমস্ত রকম সুখ আর সুবিধে, এতটুকু ত্রুটি কোথাও সইবো না বলে' রাখছি। দিদি আমার, ওদের কে ?'

'এখুনি বলছি গিয়ে।' অমিয় উঠে পড়লো : 'টের পাবেন এবার বাছুরা।'

'আর শোনো,' প্রতুল জিনিস-পত্রগুলো বাক্সে তুলে রাখতে লাগলো : 'সন্ধের আগেই মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করবো বলে' এসো।'

৩

রাজেন বিশ্বাস বাড়ি দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু বিয়ের আগে স্বয়ং বরের কনে-আশীর্বাদের প্রস্তাবে সে সম্মত হচ্ছে না। বলছে, এমন নিয়ম অন্তত আমাদের এ-অঞ্চলে প্রচলিত নেই।

অমিয় বললে, 'আপনাদের এ-অঞ্চলটাই শুধু সভ্যতার আলো পায় নি। মশা, সাপ, কচুরিপানা আর হাতুড়ে ডাক্তারে ভরতি।'

এ-ব্যাপারে ভবানন্দবাবুর পুরো সমর্থন আছে, তাঁর বাড়ির মেয়েদের আঠারো আনা। আশীর্বাদের ব্যাপারটার থেকে আশীর্বাদের জিনিসটার প্রতিই এদের বেশি কৌতূহল।

ভবানন্দবাবুর প্ররোচনায় বৃদ্ধ কেদার দাস বললেন, 'তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, রাজেন। সেকাল আর নেই ভাই, এই গাঁয়েও নেই। নইলে এত বড়ো মেয়ে নিয়ে ভবানন্দ নির্বিবাদে টিঁকে আছে, একঘরে হচ্ছে না ? আজকালকার ছেলেরা বিয়ের আগে কোর্টসিপ করে, চিঠি লেখে, ফটো পাঠায়, আর এ তো নিরিমিষ আশীর্বাদ করা। মানে, একটা কিছু প্রেজেন্ট করা। বলে নি যে, মেয়ের সঙ্গে নিরালায় আজ একটু কথা কয়ে' দেখবো, এই ঢের।'

'আর সেটায় মধ্যেও লেজিটিমেসি ছিলো।' অমিয় ফোড়ন দিলো।

'না, না, করতে চায়, করবে বই কি আশীর্বাদ।' ভবানন্দবাবু ফতোয়া দিলেন : 'আর, স্বামী দেবতা, সেই তো আশীর্বাদ করবে। তুমি যাও, অমিয়, জগদীশকে নিয়ে এসো। চলো, আমিও যাচ্ছি।'

মেয়েরা সমস্বরে কলধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। রাজেন রইলো চুপ করে', গুম্‌ হ'য়ে। অর্থাৎ সেখানে সে আর রইলো না।

রেণুকে কোণের ঘরে বসিয়ে সাজাচ্ছিলো, ঝাঁকে-ঝাঁকে মেয়েলি কণ্ঠের উলু শুনে সে বুঝলো, জগদীশ তাকে দেখতে আসছে। বুকের মধ্যিটা অসহ্য আনন্দে কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে জমাট বেঁধে গেল, মনে হ'লো তার শরীর এত মূর্ছনা যেন সইতে পারবে না।

কতদিন পরে সে আসছে, যেন জন্ম-জন্ম পরে। তার জন্যে কতকাল সে প্রতীক্ষা করে' বসে' ছিলো, দিনের নিরালায় আর রাতের অঘুমে। কাউকে তোমরা বলো না, রোজ সকালে ঘুম ভেঙে ঈশ্বরের কাছে সে প্রার্থনা করেছে, আর কিছু নয়, তার যেন বিয়ে হয়। আজ তার অধিবাস, কাল তার সেই বিয়ে। আশ্চর্য, তারো জীবনে সে এলো, পথ চিনে কোথা দিয়ে কী করে' যে এলো তা কে বলবে ! এ কি কখনো ভাবা যায় দিনের আলোয়, এ কি কখনো ধরা যায় হাত বাড়িয়ে ? শুধু সে তার গরিব বাপ-মাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে না—নিজেও সে মুক্তিতে বিস্ফারিত হয়ে পড়বে, সমস্তটা আকাশের মতো ! মুহূর্তে তার সমস্ত

দারিদ্র্য যাবে ঝরে', গৃহ থেকে, দেহ থেকে। সে সেজে উঠবে, বেজে উঠবে, ভরে' উঠবে। ভাবতেও ভয় করে। খুব একটা সুখের সময়, ভালোবাসার সময়, মানুষের বুঝি এমনি ভয় হয়।

মাকে প্রণাম করবার সময় তাঁর পা দুটো সে অনেকক্ষণ আঁকড়ে রইলো।

মা বললেন, 'ভয় কিসের ?'

সূর্য্যকে আর যে-ই ভয় করুক, সূর্য্যমুখী করে না। রেখা মনে-মনে একটু হাসলো।

মাথায় পাগড়িটা ভালো করে' এঁটে প্রতুল চাদর-ঢাকা সতরঞ্চির উপর বসেছে, কুণ্ঠিত মুখে রেখা এসে দাঁড়ালো।

অমিয় বললে, 'বোসো।'

দু'টি পা মুড়ে মনোরম কোমলতার ভঙ্গিতে রেখা বসলো।

প্রতুল তাকে দেখলো এবার মুখোমুখি। কালো বটে দেখতে, কিন্তু এ-কালো যেন শান্তি, এ-কালো যেন শীতলতা। তেমন করে' দেখতে জানলে সব কিছুরই যেন নতুনতরো অর্থ ফুটে ওঠে। প্রথমাগমের দিন থেকে ধরলে যৌবন তার দেহে তখন রাশীকৃত হ'য়ে ওঠবার কথা, কিন্তু শ্রমে ও সেবায় সমস্তটি শরীর তার মার্জিত, মেদবিরল। সহরে মেয়েদের বেলায় যেটা রুক্ষতা বলতে পারো সেটা এখানে বিষণ্ণতা, যে-বিষণ্ণতা গ্রামের সমস্ত সবুজে, সমস্ত নীলিমায়। সুন্দরী বলতে পারো না, বলতে পারো পরিচ্ছন্ন। সতেজ একটি সজীবতা তার শরীরে সহজ একটি দীপ্তি বিস্তার করেছে। মাটির সঙ্গে সংযুক্ত সবৃন্ত একটি সদ্যস্ফুট ফুল, তোমার ফুলদানির ফুল নয়। প্রথমে দেখলেই মনে হয় মেয়েটি অত্যন্ত সুস্থ, আর সে-স্বাস্থ্য শুধু একটা শারীরিক অর্থে নয়। যদি বলি তার এই লজ্জাটুকু পর্য্যন্ত সুস্থ, তা হ'লেই কিছুটা হয়তো বুঝতে পারবে।

এমন কি, প্রতুল যে প্রতুল, তারো একবার মনে হলো এ-মেয়ে তার যোগ্য নয়। কথাটা ঘৃণার নয়, বিষাদের। তার এত অভিজ্ঞতা, এত অজস্রতা, এত ঐশ্বর্য্য—কিছুই যেন কুলিয়ে উঠবে না।

কিন্তু ঐ তার ফিলজফি, পাশার দান যখন পড়ে' গেছে, তখন চাল দিতেই হ'বে, ঘুঁটি পাকুক কিম্বা কাঁচুক। চাদরের তলা থেকে মখমলের একটা কেস বা'র করে' রেখার হাতের কাছে সে এগিয়ে দিলো।

'খুলেই দেখান মা কী আছে।' কে-একটি প্রগলভা মেয়ে ভিড়ের মধ্য থেকে বলে' উঠলো।

মোড়ক খুলে অমিয় দেখালো, মুক্তোর নেকলেস।

'কী চমৎকার!' বহু কণ্ঠ ঝলসে গেল সেই মুক্তোর দ্যুতিতে।

সেই প্রগলভা মেয়েটিই বুঝি বললে, 'ওটা অমনি করে' হাতে দিলে চলবে না, গলায় পরিয়ে দিতে হ'বে।'

'তা দিচ্ছি পরিয়ে।'

প্রতুল এতে পেছপা নয়, হাঁটু মুড়ে সে এগিয়ে এলো, আর, কে জানে, রেখাও হয়তো গলাটা দিলো সামান্য বাড়িয়ে। কিন্তু ঘাড়ের উপর তার স্তূপীকৃত খোঁপাটা হঠাৎ ভেঙে পড়াতে দু'পারের হুকদু'টোর সংস্থিতি ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না। চুলের মধ্যে খানিকক্ষণ অযথা হাঁপিয়ে উঠে দুশ্চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে প্রতুল বললে, 'ও তুমিই পরো। আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

অল্প একটু হেসে কাঁধের ওপারে হাত দু'টি উত্তোলিত করে' রেখা চোখের এক পলকে নেকলেসটা পরে' ফেললো।

সঙ্গে-সঙ্গে শত রসনায় হাসি, অনেকটা যেন প্রতুলের পরাজয়ে। নিচু মুখে রেখাও হাসছে, কিন্তু সে-হাসির অর্থ: তুমি এত সহজে হার মানলে কেন?

এমনি একটা ভাববিনিময়ের সময়, ভর সন্ধে বেলা, উঠোনের ও-কোণ থেকে তীক্ষ্ণ গলায় একটা আর্তনাদ উঠলো: 'ওরে জগু এসেছিস, আমার জগু এতদিনে ফিরে এলি বাবা।'

প্রতুল তড়াক করে' লাফিয়ে উঠলো: 'পিসিমা।'

প্রায় ষাট-সত্তর বছরের এক বুড়ি কাঁদতে-কাঁদতে টলতে-টলতে বারান্দায় উঠে এলেন, মুখে তাঁর সেই এক আর্তনাদ: 'ওরে কোথায় তুই ?'

প্রতুল তাঁকে দু'হাতে সাপটে ধরলো।

'ওরে হতভাগা, এতদিন বাদে আমাদের মনে পড়লো?' পিসিমা, জরায় কুঞ্চিত, খর্ব পিসিমা, প্রতুলের প্রশস্ত বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে হাপুস-চোখে কেঁদে উঠলেন: 'গদা তোকে ডেকে-ডেকে হায়-হায় করে' চলে' গেল, তুই একটিবারো ফিরে তাকালি না। কোথায় ছিলি এতদিন?'

'বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে।' প্রতুল তাঁকে নিচু হ'য়ে প্রণাম করলো: 'অমন অস্থির হয়ো না, এখানটাতে বোসো। এই তো ফিরে এসেছি এবার ভয় কী।' প্রতুল বুড়িকে সতরঞ্চির উপর বসিয়ে দিলো।

পিসিমা তার বুকে-পিঠে সস্নেহ হাত বুলুতে-বুলুতে বললেন, 'কতো বড়োটি হ'য়ে উঠেছিস, কী জোয়ান। সেই সে-দিনের জগু!'

'সময়ের দোষ, পিসিমা।'

'হ্যাঁ রে, তুই নাকি খুব বড়োলোক হয়েছিস, কী সব তিসির না পিপুলের ব্যবসা করে'?'

'তোমাদের আশীর্বাদে, পিসিমা। শিগগিরই আরো বড়োলোক হ'তে যাচ্ছি।' বলে' প্রতুল পার্শ্বাসীনা রেখার দিকে সসঙ্কেত দৃষ্টিক্ষেপ করলে। বললে, 'কেমন আছো তুমি?'

'আর আছি!' পিসিমা আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন, 'তুই নাকি ভবার বড়ো মেয়েটাকে বিয়ে করছিস?'

তাঁর কথা শুনে সকলে গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

'তোরা হাসছিস কেন লা ছুঁড়িরা?' পিসিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: 'এক পয়সা দেবে না থোবে না, উপোস করিয়ে দান, উপোস করিয়ে বিদায়—এ আবার একটা বিয়ে নাকি?'

'দেয়া-থোয়া দিয়ে কী হ'বে, পিসিমা, আমার অনেকই তো আছে।' প্রতুল সকরুণ স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'এখন কেবল পাত্রীটি নিয়ে কথা।

শিবকেও একদিন ভিক্ষায় বেরুতে হয়েছিলো পিসিমা, কিন্তু তার ক্ষুধা মিটিয়েছিলো শুধু অন্নপূর্ণা।'

'এ আবার একটা পাত্রী নাকি?' পিসিমা ততোধিক ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠলেন: 'অন্নপূর্ণা তো নয়, শ্মশানকালী। আমি বুঝি তাকে দেখি নি ভেবেছিস? এইটুকু বেলা থেকে দেখছি।'

কিন্তু সম্প্রতি তাকে দেখতে পাচ্ছেন বলে' মনে হ'লো না।

তাই সন্তর্পণে রেখার দিকে একটু এগিয়ে তাকে চুপি-চুপি বলার মতো করে' প্রতুল বললে, 'তুমি এখন যাও। আমারই সামনে তুমি তোমার নিন্দা শুনবে এটা অসহ্য।'

রেখা উঠে চলে' গেল।

পিসিমা তাঁর আগের কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'এ-বিয়ে আমি হ'তে দেবো না।'

প্রতুল বললে, 'এ-বিয়ে হ'বে ব'লেই তো তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।'

'হ'বে বললেই হ'বে।' পিসিমার চোখে আবার বান ডেকে এলো: 'গদা আজ বেঁচে থাকলে এ-বিয়ে সে আজ ঘটতে দিতো নাকি? এমন একটা পোড়ো ঘরে?'

প্রতুল দেখলো, এ-আলোচনা অবান্তর। তাই সে বললে, 'আমাকে না বলে' কন্যাকর্তাদের বলো। আমি চললাম, অমিয়। তোমার লোক হাট থেকে মিষ্টি নিয়ে ফিরেছে। অধিবাসের তত্ত্ব সাজাই গে যাই। তুমি এসো চটপট।'

পিসিমা যখন আসেন, রাজেন বিশ্বাস বা'র-বাড়িতে মজুর খাটাতে ব্যস্ত, তাই এ-আলোচনায় সে পক্ষ ছিলো না। খবর পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে সে ছুটে এলো। এসে দেখলো বুড়ি নির্দন্ত মুখে অগ্নিস্রাব করছে।

কার্য্য-কারণ খোঁজ না করে' সে সটান প্রশ্ন করলে: 'চিনতে পারলেন জগদীশকে?'

'চিনবো না, সোনার কার্তিক জগদীশ দিগ্বিজয় করে' বাড়ি ফিরেছে, চিনতে পারবো না? একটা হাঁচি দিলে পর্য্যন্ত তাকে চিনতে পারি। রক্তের টান, নাড়ির টান।'

রাজেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। বললে, 'চিনতে পারলেন, এ গদাধরের ছেলে জগদীশ?'

'তবে কি এ করিমদ্দির ছেলে অজিমদ্দি?' পিসিমা মুখিয়ে উঠলেন: 'কই, ডাকো দেখি তোমাদের ভবানন্দকে। তার আক্কেলটা একবার দেখতে চাই।'

ভবানন্দবাবু কাছেই কোথায় ছিলেন, অপরাধীর মতো সামনে এসে জানতে চাইলেন, তাঁর কী ঘাট হয়েছে।

'আপনার কী আস্পর্ধা শুনি, আপনি গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলেকে জামাই করতে চান?' পিসিমা কোমর বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ভবানন্দবাবুর মুখ কাঁচুমাচু করে' উঠলো। বললেন, 'আমাদের চাওয়াতে কি কিছু হয়? সব ভগবানের ইচ্ছে।'

'তা তো বুঝলুম, কিন্তু ক'টি হাজার টাকা তাকে দিয়েছেন শুনি?'

'কোত্থেকে দেবো?' ভবানন্দবাবু ম্লানমুখে বললেন।

'কোত্থেকে দেবো!' পিসিমা উঠলেন ভেঙচিয়ে: 'ছেলেমানুষ ভুলিয়ে কেলে-কিষ্কিন্দি মেয়ে পার করছেন, বলি মাগনা?'

'সব ঐ জগদীশ, জগদীশের উদারতা।'

'খুব যে উদারতা কলাচ্ছেন দেখছি, কিন্তু ছেলের মাথার উপরে কেউ নেই এমন কথা মনেও স্থান দেবেন না।' পিসিমা তাঁর বৃদ্ধবয়সে যতদূর সম্ভব একটা বীরত্বের ভঙ্গি করলেন: 'আমি আছি। এমন শুকনো বিয়ে আমি হ'তে দেবো না।'

ভবানন্দবাবু নিতান্ত বিরক্তমুখে রাজেনের দিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন। বললেন, 'তখন বলেছিলাম এ-সব হাঙ্গাম বাধিয়ে কাজ নেই। গোঁয়ারের একশেষ, কথাটা তুমি কানেই তুললে না।'

রাজেন সাঙ্ঘাতিক অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল।

তার এই দুরবস্থাটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করলো অমিয়, যে আনুপূর্বিক সমস্ত ব্যাপারটা ধাপে-ধাপে অনুধাবন করেছে। এ-সব কথা সে তো আগেই বলে' রেখেছিলো—সত্যি কিনা! নাটক নিয়ে তার কারবার, সে জানে কোন দৃশ্যে কী ঘটে' ওঠে!

কাচারি-বাড়িতে যাবার আগে সে শুধু বললে, 'হাতুড়ি থাকলেই ডাক্তারি করা চলে না, বুদ্ধি থাকা চাই। এখন পিসিমার শুকনো হাত তৈলাক্ত করুন।'

সে-দিনের রাত্রিটা দু' কারণে উল্লেখযোগ্য। এক, পথশ্রান্তিতেই হোক বা যে কারণেই হোক, প্রতুল বিভোর ঘুমিয়ে পড়লো—আর অতি-অধিক গরম পড়ার জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক, রেখার চোখে এক রেখা ঘুম এলো না। ঘুমের মধ্যে প্রতুল কী স্বপ্ন দেখলো তা কে জানে, কিন্তু রেখা দেখলো জেগে-জেগে স্বপ্ন, যে-স্বপ্নে রয়েছে দুর্দান্ত কল্পনা, যে স্বপ্নে তুমি যা ইচ্ছে তা ভাবতে পারো, গড়তে পারো, মুছতে পারো। যাকে লেখাপড়া বলে রেখা তার কিছুই শেখেনি বটে, কিন্তু কল্পনার উদ্দামতায় সে পিছে পড়ে' থাকবে না। কী যে সে ভাবছে তার কোনো হিসেব নেই, কেননা ঘুমে যে স্বপ্ন দেখা যায়, জেগে উঠে তুমি তার একটা বিবরণ দিতে পারো, কিন্তু জাগন্ত যে-স্বপ্ন তার তুমি কোনো চেহারা আঁকতে পারো না। সে রেখা থেকে রেখায় যায় গড়িয়ে, রঙ থেকে রঙে যায় ফেটে, বিবর্ণ, একাকার হ'য়ে। এ-দিক ঠিক করেছ, ও-দিক পড়েছে ভেঙে; ও-দিক সামলাতে গেছ, এ-দিককেও আর খুঁজে পাচ্ছ না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, যে-স্বপ্ন সে দেখছে সে একটা খুব সুখের স্বপ্ন: সে-সুখের আকৃতি নেই অবয়ব নেই, তবু সে একটা প্রচণ্ড, প্রকাণ্ড সুখ। এই সুখ নিয়ে, এত সুখ নিয়ে সে ঘুমুতে পাচ্ছে না, পাছে ঘুমুলেই সেটা শুধু একটা স্বপ্ন হ'য়ে ওঠে।

শেষরাতের ঘোলাটে জ্যোৎস্না ফিকে হ'তে-হ'তে ভোর হ'য়ে গেল। দধিমঙ্গল সেরে রেখা আবার এসে শুয়েছে। শুয়ে-শুয়ে রেখা দেখলো সমস্ত সংসার কাজে-কর্মে মেতে উঠেছে—ঘর-ধোয়ার শব্দ, বাসন-মাজার শব্দ, কাপড়-কাচার শব্দ। কোন ছেলেটা কাঁদছে, কার হাত থেকে কোন জিনিস পড়ে' ভেঙে যাচ্ছে, একটা করতে আরেকটা কে ছড়িয়ে-

ছিটিয়ে দিচ্ছে। সে আছে শুয়ে, কুঁকড়ে, জামদানি শাড়ির রাঙা আঁচলে গা ঢেকে।

পাড়ার সমবয়সী অথচ বিবাহিতা একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে বললে, 'তুই এখনো শুয়ে আছিস, রেখা ?'

রেখা মিষ্টি করে' হাসলো : 'আজ আমার ছুটি।'

মেয়েটি তার পাশে বসে' বললে, 'শেষকালে তোরো বিয়ে হ'লো।'

এক গা রমণীয় রুক্ষতা নিয়ে রেখা উঠে বসলো। চুলটা ভেঙে ফেলতে-ফেলতে হেসে বললে : 'আমারো।'

'আর এমন রাজপুত্রের সঙ্গে।'

রেখা গলা নামিয়ে বললে, 'সন্নেসির সঙ্গে।'

'ওমা, নেকলেসটা পরে'ই শুয়ে পড়েছিলি।' মেয়েটি বিদ্রূপ করে' উঠলো।

'সত্যিই তো!' সলজ্জ সন্ত্রাসে রেখা তাড়াতাড়ি সেটাকে খুলে ফেললো ; বললে, 'মা বলেছিলেন বাক্সে তুলে রাখতে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, একদম মনে ছিলো না। ছি ছি, সবাই দেখলে কী ভাববে!' রেখা একেক করে' চুলের কাঁটাগুলো খুলে ফেলতে লাগলো।

'এখনো তো এটাকে তুই তুলে রাখছিস না, কোলে নিয়ে আছিস।'

'বাক্সের চাবিটা মা'র আঁচলে। মনে পড়লো, তখন ভুল করে' বাক্সের মধ্যে খাপটাই শুধু তুলে রেখেছিলাম।' রেখা তেমনি নির্ভয়ে হাসলো।

এদিকে প্রতুলের হয়েছে মুস্কিল। এক মুহূর্ত সে একা থাকতে পারছে না, সব সময়েই তাকে ঘিরে গোলাকার একটি ভিড় হ'য়ে আছে। দাড়ি কামাচ্ছে, সব রয়েছে তার মুখের দিকে চেয়ে, সাবানে তার কত ফেনা ওঠে, ব্লেডের তার কী পরিমাণ ধার। সিগরেট খাচ্ছে, সবাই হাঁ করে' আছে ধোঁয়া গেলবার জন্যে। ঘড়িতে চাবি দিচ্ছে, এটা যেন প্রায় মোটর চালানো। তার কাপড়ের ঝুল, জুতোর পালিশ, পাঞ্জাবির ঢিলেমি—সব কিছুর মধ্যে'ই যেন একটা অলৌকিকতা আছে, এমন কি, যখন সে একটা হাই তোলে, হাঁচি দেয়। প্রতুলের মনে হচ্ছিলো সবাই যেন তাকে বেশি করে' দেখছে, একটু-বা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, তাকে সনাক্ত করতে, তাকে বা'র করে' ফেলতে। সবাইর চোখে যেন রাজেনের সেই বিষাক্ত, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

কেননা একসময় স্পষ্ট শুনতে পেলো—রাজেন কোন একজন অপরিচিত যুবককে সম্বোধন করে' বলছে ; 'কোলকাতায় তুই একে কোনোদিন দেখেছিস, ব্রজ ?'

ব্রজ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো : 'দেখেছি বই কি, এ যে ভারি নোন্ কেস।'

'কে ও ?'

'দেশসেবক, ভীষণ স্বদেশী।'

'নাম জানিস ?'

'নাম কী করে' বলবো ? তবে বক্তৃতা দিতে শুনেছি।'

'কোথায় ?'

'শ্রদ্ধানন্দ-পার্কে। ঠিক এমনি পাগড়ি মাথায় দিয়ে।'

দুপুরের ষ্টিমারের সময় প্রতুল অমিয়কে চুপিচুপি জিগগেস করলে : 'বড়দির আসার কিছু খবর পেলে ?'

'জিগগেস করি নি।' এ-সব ব্যাপারে অমিয়র মেজাজ ভারি চটে আছে।

'একবার খোঁজ নিলে মন্দ কী।'

'এলে আসবেন। এক পিসিমাকে নিয়েই হাঁপিয়ে উঠেছেন বাছাধনরা! এর পর বড়দি এলে ল্যাজে-গোবরে হ'য়ে যাবেন। আসুন না। তাঁর আসাই তো চাই।'

কিন্তু খবর পাওয়া গেল দুপুরের ষ্টিমারে কেউ আসে নি।

কিন্তু এর পরেও একটা ফেরি আছে, রাত ঘেঁসে।

৪

দশটা চুয়ান্ন মিনিটে লগ্ন, এগারোটা পঁচিশ মিনিট পর্য্যন্ত। আরেক লগ্ন আছে সেই ভোর রাত্রে, সাড়ে-তিনটের কাছাকাছি। আটটা বাজতেই বর এসেছে আসরে, একটু আগেই, কেননা আগে থেকেই সভাসীন থাকাটাই প্রায় অর্ধেক পাসদখল। এদিক থেকে অনুষ্ঠানের অনেক ত্রুটি ছিলো, কিন্তু বিপদে নিয়ম চলে না, যেহেতু নিয়মকর্ত্তারা মানে শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতরাও এক্ষেত্রে আর্থিক বিপন্ন। টাকা পেলে টিকি পর্য্যন্ত কেটে ফেলা যায়, এ তো ক'টা নিয়ম-কানুন ছাঁট-কাট করা। সাতপুরুষের নাম না জানলে বিয়েটা আর পণ্ড হ'য়ে যাবে না। শোলোক আওড়ে পুরোতরাই প্রতুলকে অভয় দিয়েছে।

মফস্বলের নিমন্ত্রণ হয় মধ্যাহ্নে, আর সে-খাওয়া সুরু হয় ঠিক সন্ধেবেলা। পরের দিন না রেখে এরা আগের দিনে উপোস করিয়ে রাখে। সেই সব উপোসির দল খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতীক্ষা করে' আছে বিয়ে দেখবার জন্যে। যাত্রা শুনবার জন্যে যেমন তারা ভিড় করে' থাকে, তখন থেকে, যখন বাঁশ খাটিয়ে সামিয়ানাটা শুধু টাঙানো হয়েছে।

এমন সময় জনরব, রাতের ফেরিতে সনৎ এসেছে।

রাজেন উঠলো উৎফুল্ল হ'য়ে। বললে, 'তোমার স্ত্রী কোথায় ?'

শোনা গেল, তার এখন ভরা মাস, রেলে-ইষ্টিমারে আসবার তার অবস্থা নয়।

রাজেন তবু দমলো না। বললে, 'চেন একে ?'

সনৎ হেসে বললে, 'হ্যাঁ-না বলা আমার সাধ্য নয়। জগদীশের যখন দশ বছর বয়েস তখন আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর ওকে আমি বেশি দেখি নি। জানোই তো, তখন আমি আলোয়ারে একটা চাকরি নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'তবে, ঘোড়ার ডিম, তোমাকে ডেকে আনতে গেলাম কেন ?' রাজেন মাটিতে একটা লাথি মারলো।

'ওর দিদিই উদ্যোগ করে' আমাকে পাঠিয়ে দিলে, বৌ-সমেত ওকে একেবারে আমাদের ওখানে ধরে' নিয়ে যেতে।'

'আমাকে কৃতার্থ করতে।' রাজেন ভেঙচিয়ে উঠলো: 'একবার চেয়ে দেখ না ভালো করে', তোমার স্ত্রীর চেহারার সঙ্গে কোথাও এর এতটুকু সাদৃশ্য আছে কিনা।'

সনৎ ইতস্তত করে' বললে, 'আমি ভাই ফিজিওগনমিতে এক্সপার্ট নই।'

'কিন্তু গাধার সঙ্গে তো তোমাকে গরুর মিল করতে বলছি না। দেখনা একটু ভালো করে'।'

'তা যদি বলো', দূর থেকে নির্নিমেষে খানিকক্ষণ প্রতুলের দিকে চেয়ে থেকে সনৎ বললে, 'মিল খানিকটা আছে ভাই। চিবুকের দিকটা ঠিক আমার স্ত্রীর মতো।'

'আর আমার এই কপালের দিকটা।' এটাও ঠিক তোমার স্ত্রীর মতো নয়?' রাজেন দাঁত খিঁচোল। বললে, 'সমস্ত সংসার তুমি স্ত্রী-ময় দেখছ। নইলে এই বুড়ো বয়সে—'

তাকে বাধা দিয়ে সনৎ বললে, 'কেন, তোমার সন্দেহ করবার কারণ কী?'

'কারণ কী! বিয়ে করতে কেউ কখনো মাথায় পাগড়ি বেঁধে আসে? এটা কি মাড়োয়ারির বিয়ে?'

'সেটা এক্সপ্লেন করে নি?'

'বলেছে, চুল ছাঁটতে গিয়ে অসমান হয়েছিলো। এটা একটা এক্সপ্লেনেশান?'

'হ'তে পারে মাথায় কোনো কাটা-ফাটার দাগ আছে, সেটা ঢেকে রাখতে চায়।'

'এই না হ'লে বুদ্ধি!' রাজেন খেঁকিয়ে উঠলো: দাগ থাকবে তো সে চুল গজাবে, বাবরি রাখবে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবার কী!'

'তা ছাড়া, বিয়ে করতে আসছে, সঙ্গে একটা বরযাত্রী নেই?'

'এই কথা! দাঁড়াও, আমি একটু কথা কয়ে দেখি।' বলে' সনৎ আসরের দিকে অগ্রসর হ'লো।

'কে, জামাইবাবু না?' প্রতুল উৎফুল্ল ব্যস্ততায় দুই হাতে সনতের পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

'আমাকে চিনতে পারলে?' সনৎ সস্নেহে হাসলো।

'আমাকে আপনি চিনতে পারলেন, আর আমি পারবো না? বিয়েতে ডাকিনি বলে' কি আপনাদের সবাইকে ভুলে গেছি নাকি? বড়দি কেমন আছেন?'

জগদীশ বড়দি বলে'ই ডাকতো তার স্ত্রীকে।

সনৎ প্রতুলের পাশ ঘেঁসে বসলো। ক্রমান্বয়ে তার দীর্ঘ অজ্ঞাত-বাসের কথা, বিপজ্জনক জীবনযাপনের কথা, বর্তমান সম্পদ-প্রতিপত্তির কথা সেরে আস্তে আস্তে সে ঘরোয়া কথার অবতারণা করলে। কিন্তু মনে রাখতে হ'বে—জগদীশ নিরুদ্দেশ হয়েছিলো যোলো বছরে পা না দিতেই এবং তার আগের পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে সনতেরো জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার ব্যক্তিত্ব যাচাই করতে হবে এমন ভাবে সে মোটেই প্রস্তুত হ'য়ে আসে নি, নইলে সে স্ত্রীর কাছ থেকে ছোট-খাটো অথচ অনেক সব সবিশেষ ঘটনার তালিকা নিয়ে আসতো। এতদিন পরে নিরুদ্দেশ ভাই ফিরে এসেছে খবর পেয়ে ব্যাকুল বোন বেচারা তাকে দুই হাতে ঠেলে পাঠিয়েছে তাকে ধরে' নিয়ে আসবার জন্যে। এ যে তার ভাই না-ও হ'তে পারে, এমন অসম্ভব সন্দেহ তাদের কারুরই মনে আসে নি। তবু কথার নিবিড়তার মাঝে সনৎ তাকে দু-একটা প্রশ্ন করলে, যেগুলি নেহাৎই মামুলি ও মোটা। এই যেমন, বাবাকে তার মনে পড়ে কিনা, তাদের চাঁদপুরের সেই বাসা, বড়দির বিয়েতে তার সেই গলায় মাছের কাঁটা আটকানো এবং, সব সে নির্ভুল উত্তর দিলে। সনতের মনে কুয়াসার একটি আঁশও রইলো না। কথোপকথনের তরলতায়, বয়স্থ শালার সঙ্গে যতটা সম্ভব, সে দু'টো-একটা খেলো রসিকতাও করলে।

সনৎ উঠে এলে রাজেন উৎসুক হ'য়ে জিগগেস করলো: 'কী দেখলে?'

'আমার শ্যালক।'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু। চলো, চা খাবে চলো।' রাজেন সনৎকে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। প্রতুল ঘড়িতে দেখলো, সাড়ে ন'টা। আর বেশি দেরি নেই।

মধুর সম্বন্ধের একটি ছেলে কোত্থেকে একটা হার্মোনিয়াম নিয়ে এসে অনেকক্ষণ ধরে' প্রতুলকে একটা গান গাইবার জন্যে সাধাসাধি করছিলো, কিন্তু প্রতুল কর্ণপাত করে নি। কিন্তু এবার, এতক্ষণে, তার সত্যি-সত্যি ইচ্ছা করলো, গান গায়। মনেও বেশ স্ফূর্তির হাওয়া দিয়েছে, লগ্নও আসন্ন, আর এতগুলি লোক কখন থেকে খড়কে মুখে দিয়ে বসে' আছে। প্রতুল মধুরসম্পর্কিতকে বললে, 'আনো তোমার হার্মোনিয়াম।'

সবাই ভেবেছিলো বিয়ের আসরে সব বরকেই গান গাইতে বলা হয়, আর কোনো বরই গায় না। আর যদি বা কেউ গায় কালে-ভদ্রে, নেহাৎ পাড়াগাঁ বলে'ই গায়, যেখানে খোলের উপরে বাজনা নেই, হরেকৃষ্ণ-র উপরে গান নেই। বড়লোক গাইবে, মিষ্টি লাগতেও পারে বা।

প্রতুল চাবি টিপলো ও সঙ্গে-সঙ্গেই গলা দিলো ছেড়ে। সে-গলা সচরাচর শোনা যায় না, গ্রামে কেন, মফস্বলের সহরেও নয়। ভোর রাতে উঠে সাধা গলা, দরাজ, নিভাঁজ। চড়ার দিকে যেমন কাজ, তেমনি নেমে-আসার পথে ছোট-ছোট খোঁচ। আর হার্মোনিয়ামের চাবিগুলি নিয়ে সে যেন আঙুলের সার্কাস দেখাচ্ছে! অগায়ক গ্রামের লোক শুনছে বলে' এতটুকু সে কার্পণ্য বা কাতরতা দেখাচ্ছে না, সে গান গাচ্ছে শুধু নিজের উন্মাদনায়, কে শুনছে বা না শুনছে তার খেয়াল নেই। যে যেখানে ছিলো ঘনিয়ে আসতে লাগলো, এমন-কি বাড়ির মেয়েরাও হাতের কাজ ফেলে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো।

একখানা লুচির সঙ্গে আস্ত একটা কাঁচাগোল্লা মুখে পুরে সনৎ জিগগেস করলে: 'কে গায়?'

এক আঁটি কুশাসন নিয়ে কে-একটা চাকর যাচ্ছিলো এখান দিয়ে হেঁটে, বললে, 'নতুন জামাইবাবু।'

'কে, জগদীশ ?' সনৎ ভরামুখে অস্পষ্ট একটা বিস্ময়োক্তি করলে।

'তাই হ'বে।' রাজেন বাইরে উঁকি মারলো: 'এ-অঞ্চলে এমন গান তো কই শুনিনি।'

'বলো কি, জগদীশ এমন গায়! চলো, শুনি গে।' দাঁতের পাটি দুটো বিকৃতির সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করে' সনৎ কাঁচাগোল্লাটা দ্রুত গলাধঃকরণ করলো, এক ঢোঁকে খানিকটা জল খেয়ে রাজেনকে টানতে-টানতে বললে, 'চলো।'

রাজেন প্রতিবাদ করলো: 'গান শোনবার আমার সময় নেই। যজ্ঞের জন্যে এখন আমাকে ইঁট জোগাড় করতে যেতে হবে।'

'হবে 'খন তোমার ইঁট।' সনৎ তাকে টেনে নিয়ে গেল।

তাদেরকে দেখে এবং রাজেনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' অমিয় বললে, 'আসুন সনৎবাবু।'

সনৎকে দেখে প্রতুল নিঃশব্দে একটু হাসলো এবং গুণী সমঝদারের উপস্থিতি বিবেচনা করে' উদারা থেকে তারা পর্যন্ত গলার সে একটা নিদারুণ কেরামতি দেখালো।

ভিড় ঠেলে সনৎ আর এগিয়ে এলো না, দরজার কাছেই রইলো দাঁড়িয়ে। গান থামলে শুধু বললে, 'আরেকখানা ধরো, বেশ বিফিটিং দি অকেশান।'

এবার প্রতুল ধরলো একটা গজল। আর, তবলার অভাবে অমিয় ঠেকা দিতে লাগলো তাকিয়ায়।

গান শেষ হ'বার আগেই সনৎ রাজেনকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। কিছুটা দূর আড়ালে চলে' গিয়ে সনৎ বললে, 'এ জগদীশ নয়।'

'নয় ?' রাজেন তার মর্মমূল পর্যন্ত চমকে উঠলো: 'এই দিব্যজ্ঞান হঠাৎ হলো কি করে' ?'

'জগদীশ গান গাইতে পারে না।' শেষের কথাটায় সনৎ অসম্ভব জোর দিলে।

'তার মানে ?'

'তার মানে, আমার শ্বশুরবাড়িতে কোনো শালাও গাইতে জানে না। ভাত-খাওয়া আর হাই-তোলা ছাড়া কেউ কোনোদিন হাঁ করে নি।'

'এটা তোমার কোনো কাজের কথাই হ'লো না।' তর্কের কষ্টি-পাথরে যুক্তিটা রাজেন যাচাই করতে চাইলো: 'পরেও তো সে শিখতে পারে।'

'পারে না। যোলো বছর বয়েস পর্যন্ত যে গানের গা জানতো না, যে-বাড়িতে গানের কথা উঠলে বাড়ির কর্তা সিন্দুক খুলে রাম-দা নিয়ে বেরুতেন, সে-বাড়ির ছেলে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠবে, এ অবিশ্বাস্য। শোনো,' রাজেনকে নিয়ে সনৎ আরো কিছুদূর অগ্রসর হ'লো: 'আমার জন্তে মেয়ে দেখতে গিয়ে বাবা শ্বশুরমশাইকে জিগগেস করেছিলেন: তাঁর মেয়ে গাইতে-বাজাতে পারে কিনা, তার উত্তরে শ্বশুরমশাই স্থান-কাল ভুলে সটান বলে' উঠেছিলেন: 'গাইয়ে-বাজিয়ে চান, বাজারে ঢের বাইজি পাবেন, আমার মেয়েকে নয়।' এমন বাপের ছেলে জগদীশ।'

'হ'তে পারে সেই রিপ্রেশানের এই প্রতিক্রিয়া।'

'হ'তে পারে না।' সনৎ গলায় আরো দৃঢ়তা আনলো: 'যোলো বছর পরে হঠাৎ তার এই গানবাজনার দিকে ঝুঁকে পড়াটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আর এ-গান খেয়ালের গান নয়, শুনেই বুঝতে পারছ, এটা দীর্ঘ সাধনায় পাওয়া। আরামের মধ্যে, কর্মহীনতার মধ্যে, একটু বা বিলাসের মধ্যে যে-সাধনা সম্ভব। যোলো বছরের যে-ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে পথে বেরিয়েছে, খাওয়া ও থাকার যার সংস্থান নেই, আজ কুলি কাল ভিখিরি সেজে যাকে খাদ্য জোটাতে হয়েছে—সব খানিক আগে তার নিজের মুখে শুনলুম—বিনে টিকিটে যে ভারত ভ্রমণ করেছে, আজ রেঙ্গুন আর কাল কোয়েটা, সে বসে'-বসে' অনায়াসে দিব্যি এই বাঙলা গীতাভ্যাস করলো—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবো না।'

'কিন্তু তার পরেও তো সে শিখতে পারে, যখন ব্যবসা করে' হাতে তার অনেক টাকা এলো ?'

'সে তো আরো পরে। তখন আরো অসম্ভব। আর পৃথিবীতে এমন ব্যবসাদার তুমি পাবে না যে টাকা না বাজিয়ে হার্মোনিয়াম বাজাতে বসেছে। মোটকথা,' সনৎ তপ্ত, অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'তার রক্তেই এই গানের বীজ নেই। ভাইয়ে-বোনে তারা ছ' জন, কিন্তু এরা কেউ সুর করে' কাঁদতে পর্যন্ত পারে নি। এমন পরিবার তুমি পাবে না, যেখানে সবাইকে ফেলে একজন মাত্র গাইতে পেরেছে, আর এমন উঁচু দরের গান।'

'পরিবারের বাইরে, বিদেশে থাকলে পারবে না কেন ?'

'বিদেশে থাকলেও, যে-অবস্থায় সে ছিলো, তার পক্ষে গানের এই ঝোঁক হওয়াটাই অহৈতুক। সে তো তোমাকে আগেই বললুম। জগদীশ যদি গাইতে পারতো, তবে তার ভাই-বোনদের মধ্যে আর-কেউও নিশ্চয় পারতো। আমার দিকটা যেমন শুকনো, আমার স্ত্রীর দিকটাও তেমনি; তাই বিয়ের যুগ্যি বড়ো মেয়েটা শত চেষ্টা-চরিত্র করে'ও আজ পর্যন্ত এক লাইন ভ্যাবাতে পারলো না।'

রাজেন হেসে বললে, 'তোমার মেয়ে পারে নি বলে' আর কেউ পারবে না এটা ভাবা তোমার বাড়াবাড়ি।'

'তবেই বুঝতে পারছ, আমার দিক থেকে যেমন নয়, তার মা'র দিক থেকেও সে এ-রস গ্রহণ করতে পারে নি। তার মামারা মুগুর ভাঁজতে পারে, কিন্তু সুর ভাঁজে নি জীবনে, আর মামিরা বাইজি হ'বার ভয়ে গান গাওয়া দূরের কথা, গান শুনেছে কিনা সন্দেহ। সেই দৈত্যকুলে এই প্রহ্লাদের আবির্ভাব হ'লো এটা আমি মানতে পারবো না, কিছুতেই না। তর্ক নয়, তর্কে হেরে যেতে পারি,' সনৎ প্রায় আস্তিন গুটোলো: 'কিন্তু আমি ওকে ধরবো। তুমি এসো।'

তার ভার আর কেউ নিলো বলে' রাজেন কিছুটা আশ্বস্ত হ'লো বটে, কিন্তু সনতের যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'তে পারলো না। বরঞ্চ

নিরাত্মীয় এই বিয়ে করতে আসা ও অহৈতুক মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধা, এ দু'টোই তার প্রধান চক্ষুশূল।

দ্বিতীয় গান শেষ করে' প্রতুল একটা সিগরেট ধরিয়েছে, দরজার কাছে এসে সনৎ ডাকলে : 'জগদীশ, শোনো।'

জামাইবাবু ডাকছেন, জুতোর মধ্যে প্রায় কোঁচাশুদ্ধু পা ঢুকিয়ে কাউকে ঠুকে কাউকে ঠেলে প্রতুল হন্ত-দন্ত হ'য়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

সনৎ বললে, আমার সঙ্গে একটু এসো, দরকার আছে।'

জামাইবাবু তার বিবাহের বরযাত্রী-জনোচিত কোনো অনুপান চান কিনা জানবার কৌতূহলে সে একটু হেসে বললে, 'কোথায়?'

'কোথাও নয়। এই রাস্তায় একটু বেড়াবো, কতদিন পরে দেখা।'

'কিন্তু—'

'বিয়ের লগ্নের এখনো দেরি আছে। দাও, একটা সিগরেট দাও।' সনৎ তার পকেটের দিকে হাত বাড়ালো।

টিন থেকে সিগরেট খুলে দিয়ে প্রতুল বললে, 'চারদিক যে অন্ধকার।'

'ভয় নেই, সঙ্গে আমার টর্চ আছে। পাড়াগাঁয়ে এসেছি টর্চ আর পিস্তল দুটোই আমার সঙ্গে করে' এনেছি।' বলে' শেষেরটা বার না করে' টর্চটাই সম্প্রতি সনৎ বার করলো। খানিকটা আলো হ'তেই প্রতুল তার মুখের দিকে তাকালো, তার অদ্ভুত লাগলো দেখতে সনৎ ঠোঁটে চেপে সিগরেট এখনো ধরতে শেখে নি।

ব্যাপারটা প্রতুলের ভালো লাগলো না। বিশেষ করে' রাজেন বিশ্বাসও যখন তাদের পিছু আসছে। একবার বললে, 'অমিয়কে ডাকি।'

'তুমি এত কাবুল-কান্দাহার করে' এলে, আর এই সামান্য অন্ধকারকে তোমার ভয়!' সনৎ চলতে লাগলো : 'তারপর সঙ্গে আমরা দু'-দু'টো নামজাদা ডাক্তার। সাপও যদি কামড়ায়, ফার্ষ্ট-এইড থেকে বঞ্চিত হ'বে না।'

'বিয়ে করলেই লোকে একটু ভীরু হয়, না?' প্রতুল আলাপটাকে নৈর্ব্যক্তিক করতে চাইলো : 'তখনই তো লোকে লাইফ-ইনসিয়োর করে, রিস্‌ক্‌ নিতে ভয় পায়।'

'তা, বিয়ে তো এখনো হয় নি। আরে ভাই, বিয়ে করলেই তো ফুরিয়ে গেলো; তখন আর পরের মেয়ে রইলো না, নিজেরই বউ হ'য়ে উঠলো। দর্জির দোকানে জামার ছিট যখন পছন্দ করে' আসি, ভাবি, কী খোলতাইই না-জানি হ'বে, ছেঁটে-কেটে ছিটটা যখন জামা হ'য়ে গায়ে ওঠে, মনে হয়, ধ্যেৎ, ঠকিয়ে দিয়েছে।'

প্রতুল হেসে উঠলো। বললে, 'আবার আপনার গায়ের জামা দেখে অন্য লোকের চোখ টাটায়।'

'তা টাটাক্। তোমার নিজের কথা বলো। রাজপুতানায় কোথায় গিয়েছিলে?'

'যোধপুরে।'

'সেখানে করতে কী?'

'ধর্মশালা ঝাঁট দিতাম।'

'সেখানেও ধর্মশালা আছে নাকি?'

'ধর্মশালা কোথায় নেই?'

এমনি কথা বলতে বলতে তারা এগোতে লাগলো। অনেকটা এগিয়ে এসে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে পড়ে' হাতের সিগরেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলা-কওয়া নেই সনৎ প্রতুলের বাঁ হাতটা বাঘের থাবা দিয়ে চেপে ধরলো। হঠাৎ তার গলার স্বর অন্তরঙ্গ থেকে এক লাফে উত্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলো। বললে, 'বলো, এ-গান তুমি শিখলে কোথায়?'

প্রথমটা প্রতুল কিছু হদিস পেলো না। শূন্য চোখে চারদিকে একবার চাইলো। ভীত, মৃদু গলায় বললে, 'কেন, গানটা কি ভালো নয়?'

'ভালো নয়! ভীষণ ভালো, চমৎকার ভালো, ক্ল্যাসিক্যাল গান! ভালো বলে'ই তো বলছি, এ-গান তোমাকে শেখালো কে, কবে?' সনৎ আরো জোরে চাপ দিলো।

'শেখাবে কে! ও আমার ইনবর্ণ। ছেলেবেলা থেকেই আমি গাই। বাবার তানপুরা ছিলো তাই নিয়ে গলা সাধতাম। পরে যখন লাক্ষ্ণৌ ছিলাম, ওস্তাদের কাছে শিখেছি।' প্রতুলের স্বর কেমন আর্ত আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো।

'ওস্তাদ! তোমার বাবার তানপুরা ছিলো, ছেলেবেলা থেকে তুমি গলা সাধতে!' সনৎ সজোরে তার হাত মুচড়ে দিলো, বাজের মতো হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'বলো, তুমি কে?'

'কে আবার! জগদীশ—'

'জগদীশ তো আমার চাকরেরো নাম। বলো শিগগির।'

'আমি গদাধর বন্দোপাধ্যায়ের বড়ো ছেলে, আমার ছোট ভাইর নাম কালীকৃষ্ণ, তার ছোটটির নাম—'

'রাখো তোমার এই মুখস্ত। বলো, তোমার বাবা তানপুরা ছাড়া আর কী বাজাতেন?'

'তাঁর সেতার ছিলো, এস্রাজ ছিলো, স্বরোদ ছিলো।'

'বলো, তাঁর বাড়িতে কখন গানের আসর বসতো?'

'দোলের সময়, সরস্বতীপুজোর সময়। কেন, বড়দির কাছ থেকে শোনেন নি?'

'রাজেন, এ সব জানে, সব জানে।' বলে' সনৎ প্রতুলের মুখের উপর মারলো এক প্রবল ঘুসি। বললে, 'এখনো বলো তুমি কে?'

'একি, ভদ্রলোকের ছেলেকে আপনি মারবেন নাকি?' প্রতুল অন্ধকারের উপর অন্ধকার দেখলো।

'গদাধর ছেড়ে এখন বুঝি শুধু ভদ্রলোকে এসেছ?' এই বলে' রাজেন তার বাঁ-হাত ধরলো চেপে। এতক্ষণে রাস্তা পেয়ে তার রাগ একেবারে লেলিহান হ'য়ে উঠলো : 'ষ্টুপিড, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার, এক নিরীহ ভদ্রলোকের মেয়ের তুমি সর্বনাশ করতে এসেছ?'

এত বিপদেও প্রতুল হাসলো। বললে, 'বিয়ে করা কি মেয়ের সর্বনাশ করা?'

'একশোবার। যদি সে-বিয়ে বেজাত, বেঘরে বিয়ে হয়। তুমি

তো অন্যের নাম ভাঁড়িয়ে ঠকাতে এসেছ, জোচ্চোর, সুইণ্ডলার !' বলে' রাজেন তার ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে বসলো।

'কিন্তু ঠকিয়ে আমার লাভ কী বলুন।' প্রতুল একটা কাতরোক্তি করলো: 'ভেবে দেখুন, এতে আমার কী সুসারটা হ'বে, এই বিয়ে করে'। মেয়ে আপনাদের একটা কিন্নরী নয়, আর তার ভেতর দিয়ে রাজত্বও কিছু একটা আমি পাবো না। বরং উলটে আমাকেই এই বিয়ের খরচ জোগাতে হয়েছে।'

'কলিকালে সেইটেই তো আশ্চর্য্য। গাঁটের পয়সা খরচ করে' ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কালো মেয়ে বিয়ে করতে আসা।'

'চোখে যাকে ভালো লাগে, তার জন্যে মানুষে আরো অনেক দাম দেয়।' এত দুঃখেও প্রতুল কবিত্ব করতে ছাড়লো না: 'বুঝলাম আমার বেলায় এই দাম পর্য্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে নি। বেশ তো', দু'জনের মুঠির মধ্যে দু'টো হাতই শিথিল করে' দিয়ে সে বললে, 'বেশ তো, আমার আইডেন্টি নিয়ে যখন আপনাদের সন্দেহ হচ্ছে, আর মানুষের বংশপরিচয়টা যখন তার ললাটে লেখা থাকে না, তখন মিছে গোল করে' লাভ নেই। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চলে' যাই।'

'তাই যাবে, তবে দু' ক্রোশ দূরে থানাটা একটু ঘুরে যেতে হ'বে কষ্ট করে'।' বলে' রাজেন তাকে সামনের দিকে সজোরে আকর্ষণ করলো। আর সেই সহানুভূতিতে সনৎ।

'তাই যাচ্ছি, হাত ছাড়ুন।' প্রতুল সনতের দিকে ঘাড় ফেরালো: 'এ নিয়ে একদিন আপনাকে অনুতাপ করতে হ'বে, জামাইবাবু। হাত ছাড়ুন বলছি। এ কী অন্যায় কথা! সারা রাস্তা আমাকে এমনি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবেন নাকি?'

'তবে তোমার পাগড়িটা খুলে দাও, কোমরে একটা গেরো দিয়ে রাখি।' বলে' একটানে সনৎ তার পাগড়িটা খুলে ফেললো।

'কী হাত ছাড়বেন না?' প্রতুলের কী যে দুর্মতি হ'লো, গেল জোর করে' হাত ছিনিয়ে নিতে।

আর যায় কোথা! মুহূর্তে তার জামা গেলো ছিঁড়ে, পাশের একটা দাঁত গেল আলগা হ'য়ে, নাক ফেটে দরদর করে' রক্ত বেরুলো।

গ্রামান্তরে ক'টা চাষা যাচ্ছিলো, সঙ্গে একটা কালি-পড়া হ্যারিকেন। একজন রাজেন বিশ্বাসকে চিনলো, এগিয়ে এসে জিগগেস করলো: 'কী হয়েছে ডাক্তারবাবু?'

রাজেন হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'মেয়ে চুরি করে' নিয়ে পালাচ্ছিলো।'

অভিযোগটা এ-অঞ্চলে অপ্রতুল ছিলো না। তাই কেউ উঠলো রেগে, কেউ উঠলো চমকে, আর কেউ বা পেলো মজা। শেষের জন জিগগেস করলে: 'কার মেয়ে?'

'যারই মেয়ে হোক না কেন, শালাকে ধর দিকি পাঁজাকোলে করে', বোধহয় বেহুঁস হ'য়ে পড়েছে। সামনেই রামসুন্দরের ছাড়া বাড়িটা পড়ে' আছে না, সেখানে নিয়ে চল্। আর শোন', রাজেন দলের একজনকে জিগগেস করলে: তোর ঐ বোঁচকাতে ঘটি-বাটি শিশি-বোতল কিছু আছে, চট্ করে' পুকুর থেকে খানিকটা জল নিয়ে আয়। আর তুই একবার ছুটে মুখুজ্জে-বাড়িতে চলে' যা, সেইখানে কর্তাকে গিয়ে বলবি, যে বিয়ে করতে এসেছিলো, সে ধরা পড়ে' গেছে. সে জামাই নয়, অন্য লোক, একটা বাটপাড় বদমাস। সেই সঙ্গে আমার বাড়ি গিয়ে আমার কম্পাউণ্ডারকে বলবি, ওষুধের ব্যাগটা নিয়ে যেন এক্ষুনি চলে' আসে।'

তখন থেকেই অমিয়র মনে একটা অস্বস্তি ছিলো, প্রতুলকে অমনি ডেকে নিয়ে যাওয়ার থেকে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে ফিরলো না দেখে একটা লণ্ঠন নিয়ে সে খুঁজতে বেরুলো। আ'রো দু-একজনকে পা'ঠিয়ে দিলো এদিকে-সেদিকে। বিয়ের কথা তিনি ভুলে গেলেন নাকি?

কিন্তু সবাইর আগে অমিয়ই পেলো সন্ধান। বেড়ার ফাঁকে আলো ও ব্যস্ত একটা জনতার আভাসে।

তার চেয়ে পৃথিবীতে আর যা-হোক কিছু সে ভাবতে পারতো; অমিয় মৃত, স্তব্ধ একটা শিলাস্তূপের মতো রইলো দাঁড়িয়ে।

দেখলো বেড়ার গায়ে ঠেসান দিয়ে প্রতুল-দা বসা, সারা শরীর ভিজা, মুহ্যমান। নাকটা ফুলে উঠেছে, নাসা-রন্ধ্রের কাছে কালো-কালো রক্তের ডেলা, ভুরুর উপরে কপালটা ফাটা, চিবুকের কাছটায় খানিকটা মাংস নিয়েছে খুবলে। সিল্কের পাঞ্জাবিটা ছেঁড়া, বোতামের ফিতেটা ঝুলছে আলগা হ'য়ে।

'দেখে যাও তোমার বন্ধুর কীর্তি।' রাজেন অমিয়কে সম্বর্ধনা করলো।

অমিয়র দিকে প্রতুল কী রকম করে' যে চাইলো বলা যায় না।

সনৎ এগিয়ে এসে বললে, 'এখনো বলো তুমি কে?'

'বলছি,' প্রতুল শুকনো গলায় ঢোঁক গিললো: 'তার আগে আমাকে কথা দিন, আমার একটা অনুরোধ শুধু রাখবেন।'

'রাখবো। কী অনুরোধ?' সনৎ বললে।

'আমাকে দয়া করে' পুলিসে দেবেন না।' প্রতুল মাথা নামালো।

'আচ্ছা, তবু সত্য কথা তুমি বলো।'

'বলছি।' প্রতুল জলের জন্য এ-দিক ও-দিক চেয়ে আরেকটা ঢোঁক গিললো: 'আমি জগদীশ নই।'

'তবে কে তুই?' এবার রাজেন উঠলো হুঙ্কার দিয়ে।

'তাতে আমাদের আর কোনো ইনটারেষ্ট নেই।' সনৎ বাধা দিলো; বললে 'তবে জগদীশের এত কথা তুমি জানলে কোত্থেকে?'

'ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো রেঙ্গুনে, বছর তিনেক আগে।' প্রতুল বললে।

'এখন সে কোথায়?'

'সাংহাইয়ে কিম্বা আর কোথায়, আমি জানি না।'

'তবে ওর নাম তুমি ব্যবহার করতে চেয়েছিলে কেন?'

'নইলে তাকে পাওয়া আমার সম্ভব ছিলো না।'

'তাকে দিয়ে তুমি কী করতে?'

'কী করতাম জানি না, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমি শপথ করে' বলছি', প্রতুলের দুই চোখে কান্না দাঁড়িয়ে গেল : 'তাকে বিয়ে করতাম, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতাম, তাকে নিয়ে সুখী হতাম।'

'সুখ বার করছি তোমার।' বলে' রাজেন প্রতুলের শিথিল একটা হাত ধরে' সবেগে টান মারলো। মুখ খিঁচিয়ে বললে, 'চলো, শ্রীঘরে না গেলে তোমার এই সুখের ষোলকলা পূর্ণ হ'বে না।'

'খবরদার।' দপ করে' অমিয় উঠলো জ্বলে' : 'কথা দিয়েছেন পুলিসে দেবেন না। কথা রাখুন। একজনের সত্য যেমন পেলেন, তেমনি নিজের সত্যও রক্ষা করুন।'

সনৎও পুরোমাত্রায় সায় দিলো। বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে। হয়তো বা তারো কিছু বেশি। এর পর আর কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি তুমি ভবানন্দবাবু তাঁর মেয়ে সব নিয়ে একটা ল্যাজে গোবরে কাণ্ড হ'য়ে যাবে। খবরের কাগজের কাটতি বাড়িয়ে কিছু লাভ হ'বে না।'

কম্পাউণ্ডার ওষুধের ব্যাগ নিয়ে এসে হাজির হ'লো। আর তার পশ্চাতে একটা উত্তাল জনসমুদ্র। যারা ছিলো শ্রোতা, এখন তারা দর্শক।

যতদূর সম্ভব রাজেন আর তার কম্পাউণ্ডার তাদের ঠেকিয়ে রাখতে লাগলো, আর সনৎ লাগলো সন্তর্পণে প্রতুলের ক্ষতস্থানগুলি ড্রেস করে' দিতে।

ভুরুর উপর প্ল্যাষ্টার লাগাতে-লাগাতে সনৎ বললে, একটু-বা সমবেদনার সুরে : 'এখন কী করবেন ?'

প্রতুল একবার ঘরের চারদিকে, একবার অমিয়র মুখের দিকে, একবার নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকালো। বললে, 'আপনারাই জানেন।'

'আমি বলি কি,' সনৎ অমিয়কে লক্ষ্য করে' বললে, 'ওঁকে আমরা ঘাটে নিয়ে গিয়ে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসি, উনি চলে' যান। কী, পারবেন যেতে ?'

কষ্টে দাঁড়াবার চেষ্টা করে' প্রতুল বললে, 'পারবো। তেমনি আপনি আর অমিয় যদি হাত ধরেন।'

হাত বাড়িয়ে সন্তর্পণে অমিয় তাকে দাঁড় করালো, জামার ঘরে বোতামের ফিতেটা আটকে দিলো একেক করে'।

রাজেনের দিকে ফিরে সনৎ বললে, 'তোমারই জয় হ'লো, রাজেন। তুমি এদেরকে নিয়ে উল্লাস করো, আমি আর অমিয়বাবু এঁকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সনৎ প্রশ্ন করলো : 'আপনার জিনিস-পত্র ?'

প্রতুল বললে, 'ও কিছু নয়। ও থাকবে অমিয়র কাছে। ইচ্ছে হয় আমাকে একদিন পৌঁছে দেবে, না হয় ফেলে দেবে আস্তাকুঁড়ে।'

এ-দিকে লগ্ন আসন্ন, বিয়ের বর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভবানন্দবাবুর কাছে পাখা মেলে খবর পৌঁছে গেছে, ও-বর বর নয়, ছদ্মবেশী জুয়াচোর, গর্জনেই বোঝা গেছে, গাধার গায়ে সিংহের চামড়া। তারপর অর্ধচন্দ্রের স্বাদ পেতেই বাছাধন হুড়হুড় করে' স্বরূপ খুলে দেখিয়েছেন।

'মিথ্যে কথা।' ভবানন্দবাবু গর্জন করে' উঠলেন : 'সব ঐ রাজেন বিশ্বেসের কারসাজি। বিয়ে একটা কেউ তৈরি করতে পারেনা, ভাঙতে ওস্তাদ। স্বীকার করেছে ! কী স্বীকার করছে শুনি ? নৃশংস মার খেলে নির্দোষীও পরের দোষ নিজের বলে' স্বীকার করে ! কী ওদের আস্পর্ধা শুনি আমার জামাইর গায়ে ওরা হাত তোলে ! পুলিস ! পুলিস কেবল ওদের একচেটে ! ওদেরকে আমি পুলিসে দিতে পারি না, যারা আসর থেকে বর তুলে নিয়ে গিয়ে মার দেয় ! ওদের কী ! দোবোই আমি বিয়ে।' বাড়িময় ঘুরে-ঘুরে ভবানন্দবাবু অস্থির উন্মত্ততা করলেন : 'এ-লগ্ন চলে' যায়, সাড়ে-তিনটের লগ্নেতে বিয়ে দেবো। নাই বা হ'লো সে গদাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে, হলোই বা সে বেজাত-বেঘর, তাতে রাজেনের কী, গদাধর বাঁড়ুয্যের জামাইর কী ! জাত বড়ো, ধর্ম বড়ো, পরকাল বড়ো, না আমার মেয়ের সুখ বড়ো। ডাকো সবাইকে, আমি এর হাতেই মেয়ে দেবো। এমন চেহারা, এমন বুদ্ধি, এমন উদারতা ! ঠকিয়ে বিয়ে করতে এসেছে ! আসুক ! ঠকবে কে ? আমার মেয়ে না রাজেন বিশ্বেস ? তোমরা ডাক ওকে, ধরে' নিয়ে এসো, যে করে' হোক আজ রাত্রেই আমি ওদের দু'হাত এক করে' দেবো। কাল ভোরে আমি আমার মা'র ম্লান মুখখানা দেখতে পারবো না।' ভবানন্দ দুই হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন।

ঘাটে নৌকো ঠিক করে' দিয়ে সনৎ বললে, 'কেউ আপনার সঙ্গে যাবে ?'

অমিয় ইতস্তত করছিলো তার বিমূঢ় আচ্ছন্নতার মধ্যে ; প্রতুল বললে, 'না, দরকার হ'বে না। শরীর এখন অনেক সুস্থবোধ করছি। নৌকো বেশ বড়ো আছে, মাঝিরা একটা বালিস দিয়েছে, পাটাতনের উপর দিব্যি শুয়ে যেতে পারবো। ষ্টিমার ঘাটটা আর না ছুঁয়ে সটান গোয়ালন্দ চলে' যাবো ভাবছি, যদি এরা পথিমধ্যে রাজি হয়। কতক্ষণ পরেই চাঁদ উঠবে।'

নিজের পকেটটা অনুভব করে' সনৎ বললে, 'সঙ্গে টাকা আছে ?'

প্রতুল একটু-বা হাসলো। বললে, 'আছে। হয়তো একটু বেশিই আছে। সেটা নিরাপদ নয়।' বলে' মানিব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বা'র করে' অমিয়র হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'যদি পারো, এই টাকাটা ভবানন্দবাবুকে দিয়ো। তাঁর অনেক ক্ষতি, অনেক দুঃখ, অনেক মনস্তাপ ঘটালাম। আর,' প্রতুল এক মুহূর্ত থামলো, বললে, 'আর, অধিবাসের তত্ত্বে আজেক জিনিসও দেয়া হয় নি। যা কিছু রইলো, সমস্ত টাঙ্কটাই রেখাকে উপহার দিলাম। না, আর পাগড়ি নয়, এটাকে এখন সিকের চাদর করবো। নমস্কার।' প্রতুল নৌকোয় উঠলো ; আবার বললে, 'নমস্কার। বড়দিকে আমার প্রণাম দেবেন।'

উৎসবের বাড়ি কখন অন্ধকারে ডুবে গেছে। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে-কাঁদতে উপবাসী রেখা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, এক ঘুম পরে গা ঝেড়ে উঠে বসে' ভাবলো, বা, আজ ত র বিয়ে না? সাড়ে তিনটের লগ্নে? তবে, এ কী! মা এখনো শুয়ে আছেন কেন? এ কী, আলো জ্বলছে না, বাজনা বাজছে না, পা টিপে-টিপে দরজা খুলে রেখা বারান্দায় ও বারান্দা থেকে উঠোনে বেরিয়ে এলো, সামিয়ানাটা পর্য্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে! সব গেল কোথায়?

কোথায়, কতদূরে সে গেছে? নিশি-পাওয়ার মতো রেখা উঠোনটুকু পেরিয়ে বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়ালো। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ এসেছে আকাশে, তারই মতো চেহারায়, উপোসে শীর্ণ, প্রতীক্ষায় ক্লান্ত; তারি মতো বিনিদ্র বিছানা থেকে উঠে। সমস্ত রাতটাকে কি-রকম যেন অন্তরকম লাগছে, তার প্রথম অচেনা রাত। যেন এইখানেই কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তার জন্যে। সে তো বর নয় চোর। তবু তার সঙ্গেই সে আজ যাবে। তাকে কী করবে সে? খুন করবে? কিসের লোভে? তার গলায় যে এ-নেকলেস এ-ও তারি দেয়া। তবে, তাকে আর-কোথাও বেচে দিয়ে আসবে? কোথায়! রেখা মনে-মনে হাসলো। তার আগে রেখার কাছে নিজেকে সে বেচে দিতো না?

আমলকি গাছের উপর থেকে একটা প্যাঁচা উঠলো ডেকে, শুকনো পাতায় কি-একটা উঠলো খসখস করে'। রেখা আস্তে-আস্তে তার মায়ের পাশ ঘেঁসে এসে শুয়ে পড়লো।

দরশন

শ্রীবীরেন দে

মাগো,
আমি তব কৃপার কাঙ্গাল,
জীবনের সুখ-দুখ, মান-অভিমান
দিনু তব পায়ে বিসর্জ্জন—
চিরসত্য অমরতা লাগি।
তাই মাগি—
তব দরশন
স্নেহ-কর স্নিগ্ধ পরশন
শ্রান্ত মম ক্লান্ত দেহে।

এ বিশ্বের যত কোলাহল
অবিরল দগ্ধ করে প্রাণ
লাঞ্ছিতেরে করে অপমান;
যত শক্তিমান
ভীষণ দস্যুবেশে—
উদ্দাম এ স্বেচ্ছাচার-স্রোতে—
আপন স্বার্থের লাগি।

—মুক্তি, সে তো নয় প্রহেলিকা,
মিথ্যা স্বপ্নজাল।
সত্যেরে মন্থন করি'
উদিবে সে অপরূপ
মোহিনী মূরতি
দূর করি তুচ্ছ সব
মিথ্যার জঞ্জাল।

আপনার অক্ষমতা,
স্নেহের বন্ধন,
বিলাসের অনন্ত সে মায়া
দিয়ো বিসর্জ্জন
ছুটে যাই অনন্ত অসীম পানে
উদার উল্লাসে—
নব সৃষ্টি মাঝে
প্রলয়ের শেষে
হেরিতে তোমার সেই সত্যকার ছবি
রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে।



মহিলা কবি বৈজয়ন্তী দেবী

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ

প্রবন্ধ

অধিকাংশ লোকের ধারণা প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ভাগে বাংলাদেশ হ'তে নারী-শিক্ষার গঙ্গা-যাত্রা করে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের শিক্ষার প্রতি তখন এসেছিল—দেশের লোকের তীব্র বিতৃষ্ণা। আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান-হারেমের অনুকরণে স্থান-লাভ করেছিল—প্রবল অবরোধ-প্রথা। বোরকা যে সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয় নি—অনেকের মতে সেইটিই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু তাকেও ঠিক অভিনন্দন করে নেয় নি—বলে, তার কর-রেখার ছাপ হ'তেও হিন্দু-সমাজ বাদ পড়ে নি। বোরকাকে আমল না দিলেও ঘোমটাকে বরণ করে নিল। নারীর গতির যতি ভেঙে গেল—

সরম-জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথেরি মাঝে—বলে নয়। ঘোমটার আড়ালে এমনভাবে চোখ ঢাকা পড়ে গেল—যে তার দৃষ্টি-শক্তি আপনার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে হোল—ক্ষুণ্ণ।

এই যুগেরই একটি মেয়ের কথা বল্‌বো—যাঁর ললাটে বাগ্‌দেবী সার্থকতার জয় রেখা এঁকে দিয়েছিলেন। এই মহিলা কবির নাম—বৈজয়ন্তী দেবী। তাঁর স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম একজন অসাধারণ কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আনন্দ-লতিকা নামে চম্পুকাব্যের লেখক। এই কাব্যখানি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে রচনা করা হয়। তাঁর সহধর্ম্মিণী বৈজয়ন্তী দেবী এই কাব্য-রচনায় স্বামীর সাহায্য করেছিলেন। তাই আনন্দলতিকা-গ্রন্থে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ লিখে গেছেন—

"আনন্দলতিকা গ্রন্থো যেনাকারি প্রিয়া সহ।"

উক্ত গ্রন্থের কোন কোন শ্লোক কাহার লেখা—তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। তবে উক্ত গ্রন্থখানি যে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর রচনা—স্বামীর এই সাহসিক স্বীকারোক্তিই তার প্রমাণ। কেউ কেউ বলেন—বৈজয়ন্তী দেবী আনন্দ-লতিকার অর্দ্ধাংশ রচনা করেন। বৈজয়ন্তী দেবী নিজের বিরহ অবস্থায় স্বামীকে যে পত্র লেখেন এবং স্বামী পণ্ডিত-প্রবর কৃষ্ণনাথ তাঁর অভ্যর্থনা করে যে শ্লোক রচনা করেন—এই কাব্যে সেই কবিতা দু'টি নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিরূপে তোলা হয়েছে। এই কবিতা দু'টি দেখেই তাঁদের দু'জনের রচনার তফাৎ বোঝা যায়।

ধামুকা গ্রামের কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র ময়ূরভট্টের বংশে বৈজয়ন্তী দেবীর জন্ম হয়। অতি বালিকা অবস্থায় তিনি পিতার টোলের ছাত্রদের পড়া শুনে তাদের কথাগুলির অনুকরণ করার স্পৃহাতেই অস্ফুটস্বরে অনুরাগের সঙ্গে সেই সব শ্লোক উচ্চারণ করতেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

তাই তিনি মেয়ের এই স্বাভাবিক শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা দেখে—তাঁকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিতে হাতে-খড়ি দিলেন, বৈজয়ন্তী দেবীও তাঁর অসীম প্রতিভা-বলে অল্পদিনের ভিতরেই বর্ণ-জ্ঞান লাভ করে ব্যাকরণ ও কাব্য শেষ করেন। কিন্তু তাতেও তাঁর শিক্ষালাভের বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁর একান্ত আগ্রহবশতই পিতা তাঁকে ন্যায়-শাস্ত্র পড়াতে আরম্ভ করেন।

এই সময়ে তাঁর বিয়ে হোয়ে যায়—কৃষ্ণনাথের সঙ্গে। তাঁরা কোটালিপাড়া সমাজের বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাল্যবিবাহ তাঁদের অস্থিমজ্জাগত। তাঁর পিতা মেয়ের পাঠের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখে কিছু বড় করেই বিয়ে দেন। সেই অবসরে বৈজয়ন্তী দেবী ন্যায়শাস্ত্রেরও কিছু কিছু অংশ পড়ে ফেলেন। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ—তাই বিয়ে হোল—পণ্ডিত কৃষ্ণনাথের সঙ্গে। কৃষ্ণনাথ বিয়ের পরও তাঁকে শিক্ষালাভের সুযোগ দান করেন। বৈজয়ন্তী দেবী এই বিয়ের পরও পিতৃগৃহে অবস্থান করে ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এটি কিন্তু কৃষ্ণনাথের প্রশংসাপত্র নয়। এর কারণ তাঁর মেয়ে অপছন্দ হয়েছিল।

পড়ার সুবিধা—শিক্ষিত স্বামী পেয়েও বৈজয়ন্তী দেবীর বিবাহিত বাল্যজীবন সুখের হয় নি। বংশ মর্য্যাদায় কিছু ন্যূন বলে শ্বশুর কুলের জাত্যাভিমানী কুটীল দৃষ্টিতে পড়ে—আর রূপের কিছু অভাব বশতঃ রূপ-পিয়াসী পতির মনোযোগের অভাবে যৌবনের কিছুকাল তাঁর অশান্তিতে কাটে।

তিনি পতি-বিরহে ব্যথিত হোয়ে তাঁর পরিতুষ্টির জন্য বাপের বাড়ী থেকে প্রথমে সামান্য অনুষ্টুপ ছন্দে নিজের দুরবস্থা জানান। যে গভীর করুণ রসাত্মক কবিতা লিখে পাঠান—তাতে তাঁর অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্লোকটি সাধারণের অবগতির জন্য তুলে দিলাম—

জিত ধূম ময়ূহায় জিত ব্যজন বায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে।

দুঃখের কথা কি জানাব—মশা ধূমেও যায় না—বায়ুতেও নিবারিত হয় না। সন্ধ্যাকাল হ'তেই আমি এদের আমার দেহ সমর্পণ করি। অন্য ধ্বনিত অর্থ—যে দেহ আমি তোমাকে দেব সেই দেহ তোমার অভাবে আমাকে মশাকে দিতে হচ্ছে। এ কি কম দুঃখের কথা।

এই রকমে তিনি মাঝে মাঝে কবিতা লিখে স্বামীর কাছে পাঠাতেন। স্ত্রীর অসাধারণ কবিত্ব শক্তি—অশেষ পাণ্ডিত্য, অপরিসীম স্বামী-ভক্তি কৃষ্ণনাথের মনকে নরম করে দিল—রূপের ব্যথাকে—অপ্রাপ্তির জ্বালাকে খর্ব্ব করে আন্‌ল। তাঁর অভিমান দূর হোয়ে এল। কিন্তু প্রথম যৌবনে বিদ্বেষভাব দেখাইয়াছেন—সহসা সাদরে কাছে টেনে নিতেও তিনি সঙ্কোচবোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু এ-ভাবের প্রেমপত্রে তরুণের মাথা ঘুলিয়ে যায়। তাঁরও গেল। পত্নীকে তিনি আদর করে চিঠি দিলেন।

বৈজয়ন্তী দেবীর অদৃষ্টে এই প্রথম প্রেমপত্র। তার আগে তিনি কখনও স্বামীর আদর পান নাই। সহসা পতি সোহাগে আপ্যায়িত হয়ে গাম্ভীর্য্য ও ব্যঙ্গের সঙ্গে স্বামীকে এই সুন্দর কবিতাটি লিখে পাঠান—

পুন্নাগচম্পক লবঙ্গ সরোজমল্লি
মাকন্দ যূথিরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎকুন্দবৃন্দ কুটজেষপি পক্ষপাতঃ
সদ্বংশজস্য মহতো হি মহত্বমেতৎ।

হে ভৃঙ্গ, তুমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার নাগেশ্বর চম্পক, লবঙ্গ পদ্ম, মাকন্দ, জুঁই প্রভৃতি নানা সরস সুগন্ধ ফুলের মধুপানের সম্ভাবনা থাকৃতেও এই ক্ষুদ্র কুন্দ ও কুটজ ফুলের মধুপানে অভিলাষী হোয়েছে—এ তোমার মহত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কবিতাতে বৈজয়ন্তী দেবী স্বামীর বংশগরিমার খোঁটা দিয়েছেন।

বৈজয়ন্তীর এই পত্র পাইয়া কৃষ্ণনাথও ছন্দোবন্ধে লিখিলেন যে—

যামিনী-বিরহ-দূন-মানসঃ
ত্যক্ত-কুট্মলিত-ভূরি-ভূরুহঃ।
বিন্দু-বিন্দু মকরন্দ-লোলুপঃ
পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে।

রাত্রিতে পদ্মিনীর বিরহে ব্যথিত ভ্রমর মুকুলিত লতা-বিতান ত্যাগ করে রাত্রিশেষে পদ্মিনীর সেই বিন্দু বিন্দু মকরন্দ পানেই পরিতৃপ্ত হোয়ে থাকে।

পণ্ডিতের সরল অন্তঃকরণ খুলে গেল। তিনি নিজেই শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে বৈজয়ন্তী দেবীকে নিজের বাড়ী নিয়ে এলেন। বহুদিনের বিরহ-বহ্নি নিবে গেল। পরম শান্তিতে ও সুখে এই কবি মিথুনের দিন চলে গেল—অশ্রান্ত বসন্ত গীতির উচ্ছল কল-ঝঙ্কারে।

বৈজয়ন্তী দেবীর শিখিবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল ছিল। এখানে এসেও তিনি স্বামীর কাছে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ কর্‌লেন। উত্তরকালে তিনি দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণনাথ তালপাতা আর কালি-কলম নিয়ে আনন্দ লতিকার শ্লোক রচনা কর্‌তে বসে-ছিলেন। রাত প্রায় শেষ হোয়ে এল—এমন সময় বৈজয়ন্তী দেবীর লক্ষ্য পড়্‌ল—সেইদিকে, তিনি হেসে বল্‌লেন—সন্ধ্যার সময় বসেছ—রাতও ত শেষ হোয়ে এল? এত কি লিখ্‌ছ।

কৃষ্ণনাথ কেবল একটি শ্লোক লিখে তখন শেষ

করেছেন।—আরামের নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বল্‌লেন—আজ আমার নায়িকার রূপ বর্ণনা প্রায় শেষ করে নিয়ে এলাম।

শুনে বৈজয়ন্তী দেবী হেসে ফেল্‌লেন; বল্‌লেন—একটা মেয়ে মানুষের রূপ বর্ণনায় এত সময় লাগে। আচ্ছা, দেখ; আমি একটি শ্লোকে তোমার নায়িকার তিন অঙ্গ বর্ণনা করে দিচ্ছি। এই বলে আনন্দ লতিকার এই শ্লোকটি লিখে দিলেন—

অহিরয়ং কল-ধৌত গিরি ভ্রমাৎ
স্তনমগাৎকিল নাভি-হ্রদোত্থিতঃ।
ইতি নিবেদয়িতুং নয়নে হি যৎ
শ্রবণসীমনি কিং সমুপস্থিতে॥

রমণীর কমনীয় রোমাবলি কালভুজঙ্গ। সে বুঝি নাভিহ্রদ হতে উঠে সুবর্ণ গিরিভ্রম করে স্তনদ্বয়ের মাঝখান পর্য্যন্ত এসেছে। আর এই খবরটি দেওয়ার জন্যই বুঝি চোখ দু'টি কাণের কাছে এসেছে অর্থাৎ চোখে বক্র-কটাক্ষ সঞ্চার হয়েছে।

ইহা ছাড়া তিনি দীক্ষা নেওয়ার পর আরাধ্যা দেবীর উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষায় সুললিত সুন্দর স্তোত্র তৈরি করেছেন। তা' ভিন্নও তাঁর লেখা অনেকগুলি উদ্ভট কবিতা আছে। সেগুলিও ভারি-সুন্দর—ভাব-মধুর।

একদিন প্রাচীন মহিলা কবি গর্ব্বভরে বলেছেন—

একোঽভূন্নলিনাৎ ততোঽতিপুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ।
তে সর্ব্বেকবয়ঃ প্রমাণপটবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্য-পদ্য-রচনৈশ্চেতোশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাট রাজপ্রিয়া।

কর্ণাট রাজমহিষীর মত এই বাঙ্গালী স্ত্রীকবি কোনও অহঙ্কারের বাণী না রেখে গেলেও—যে সব কবিতা তিনি রেখে গেছেন—তাঁরই দৌলতে এই পল্লীকবির স্থান ঐ রাণী-কবির ঠিক পার্শ্বেই চিরদিন রয়ে যাবে।

এই কবির সময়ে যদি হিন্দু সমাজ জীবিত থাকৃত—তার সাহিত্য যদি শাসকের সহানুভূতির স্পর্শ পেত—তাহলে এই সকল মহিলা কবি—য়ুরোপের মহিলা কবিদের সহিত সমান স্থান লাভ করে দেশের জাতীয় সাহিত্য রচনায় চিরদিন অমর হয়ে থাকৃতে পার্‌তেন।

ক্ষৌণীনায়ক ভীম

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

প্রবন্ধ

একাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর তৃতীয় বিগ্রহপাল মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল নামক পুত্রত্রয় রাখিয়া পরলোক গমন করিলে পর মহীপাল পালসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন; তিনি সত্য ও নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতঃ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ করেন। তাঁহার এইরূপ আচরণের ফলে এদেশে আর একবার প্রজাশক্তির প্রশংসনীয় বিকাশ সাধিত হয়। ইহার বিস্তৃত ইতিহাস আবিষ্কারের পূর্ব্বে কমৌলি তাম্রশাসন হইতে জানা যায়—

তস্যোর্জ্জস্বল পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ
পুত্র পালকুলাব্ধিশীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতি ভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূ-লাভাদ্ যথাবচ্ছশঃ
ক্ষৌণীনায়ক-ভীম-রাবণ বধাদ্বাহ্বার্ণবোল্লং ঘনাৎ॥

"নৃপতি বিগ্রহপালের পুত্র রামপাল যুদ্ধরূপ সাগর লঙ্ঘন করিয়া ভীমরূপ রাবণকে বধ করিয়া জনকভূ বরেন্দ্রীরূপা সীতার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন।" ইহাতে যে ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে পালরাজকবি সন্ধ্যাকর-নন্দীরচিত 'রামচরিত' আবিষ্কৃত হওয়ায় তাহা জনসাধারণের গোচরীভূত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। রামচরিত ও সমসাময়িক তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে রাজকীয় অনৈতিক আচরণের ফলে বরেন্দ্রীর 'অনন্তসামন্তচক্র' সম্মুখযুদ্ধে গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপালকে বধ করিয়া গৌড়রাজ-লক্ষ্মীর অংশভাগী বীরশ্রেষ্ঠ দিব্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে দিব্য রাজদণ্ড গ্রহণ করেন বটে কিন্তু সিংহাসনপ্রাপ্তির পর তিনি বেশী দিন

বাঁচেন নাই। "তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হইলেন এবং জ্যাঠার মহৎ কাজ সম্পূর্ণ করিলেন। এই ভীম যেমন বীর তেমনি বুদ্ধিমান, আর কাজের লোক।" (১) দিব্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রজাশক্তির উন্মেষ দেখিয়া নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রত্যাশী রামপাল শূরপাল সহ জন্মভূমি পরিত্যাগ-করতঃ মাতুলালয়ে রাষ্ট্রকূট রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। (রামচরিত ১।৪০)

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই ভীমের কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে সিরাজগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় বেষ্টনী গঠন-করতঃ বগুড়া, মহাস্থানগড়, বিরাট ও কুড়িগ্রাম হইয়া ধুবড়ী পর্য্যন্ত এবং নওগাঁর নিকটস্থ 'ভীমসাগর' হইতে আরম্ভ করিয়া দিনাজপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত 'ভীম জাঙ্গাল' নামক সুবৃহৎ রথ্যা দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ গরুড়-স্তম্ভের পার্শ্বে পুরাতন মন্দিরে প্রস্তরময়ী হরগৌরী ও জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি এবং শিবলিঙ্গকে স্থানীয় লোকে ভীমের প্রতিষ্ঠিত মনে করিয়া অর্চ্চনা করে। 'ভীমপুর' ও 'ভীমের গোয়াল' নামক প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানসমূহও নীরবে তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। 'জাঙ্গাল' সমূহের কেন্দ্রভূমি অনুসরণ করিলে মহাস্থানগড়ের দিকে আসিতে হয়। মহাস্থানেই পালরাজগণের রাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী ছিল। বরেন্দ্রী ভীমের হস্তগত হওয়ায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাজধানীর পার্শ্ব দিয়া তিনি এই সকল 'জাঙ্গাল' নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। 'জাঙ্গালের' পার্শ্বে মহাস্থান হইতে ২০ মাইল উত্তরে কতিপয় দীঘি, প্রাচীন ইষ্টক, দগ্ধ মৃত্তিকায় সমাচ্ছন্ন শালদহ নামক গ্রামকে লোকে ভীমের আদি বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—Sureswar the author of a Sanskrit Dictionary of medical Botany, (২) who served under a king named Bhimpal, the ruler of Padi, perhaps the same Bhim who wrested Northern Bengal from the Pals for a time.—"বৈদ্যক শাস্ত্রের একখানা অভিধান সুরেশ্বর কর্ত্তৃক লিখিত হয়। ইনি পদীর রাজা ভীমপালের সভায় ছিলেন। সম্ভবতঃ এই ভীম পালদিগের হস্ত হইতে উত্তর বঙ্গ কিছুদিনের জন্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন।" এই অনুমান সত্য হইলে শালদহ পদীরাজ্য কিনা তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। ভীম যে বিদ্বান ও গুণগ্রাহী ছিলেন তাহা ভীমপ্রশস্তি হইতে পরে দেখাইব।

পলায়িত রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধার বিষয়ে একরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষে পুত্র, সহচর ও মাতুলাদির পরামর্শে রাজ্যোদ্ধারের উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। ভীমের পিতৃব্য দিব্য অনন্তসামন্তচক্র নির্ব্বাচিত নরপতি, ভীমও প্রথিতযশাঃ রাজা; সুতরাং তাঁহাকে পরাজিত করা রামপালের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। কাজেই তিনি মাতুল মহন ও মাতুলপুত্র শিবরাজসহ (রামচরিত ১।৪৫ টীকা) —'ভূমের্বিপুলস্য ধনস্য দানস্ত্যাগাৎ অনুকূপিতঃ"—ভূমি ও বিপুল অর্থ উৎকোচ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজগণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন। (৩) যখন এইরূপে সৈন্য সংগৃহীত হইতেছিল তখন বরেন্দ্রভূমির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণার্থ সেনানী শিবরাজ প্রেরিত হন। তিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের সম্পত্তির কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না এইরূপ আশ্বাস দিয়া স্থানে স্থানে ভীমের রথ্যা (জাঙ্গাল) ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। (১।৪৮-৪৯) বৌদ্ধরাজা মহীপাল কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রমী হিন্দুর উপর হয়ত কিছু অত্যাচার সংঘটিত হওয়ায় রামপাল কর্ত্তৃক তাহার সংশোধন চেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশমধ্যে ভেদনীতির সৃষ্টি হইয়াছিল। স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় বলেন—তখন বোধ হয় ভীম নিজে উত্তরে ছিলেন।...যেই বরেন্দ্রী সৈন্য আসিয়া পৌছিল অমনি শিবরাজ গঙ্গাপারে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। (দিব্য স্মৃতি উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ)

অবশেষে পর্ব্বত অরণ্যানি পরিবেষ্টিত মগধ, পীঠি, দণ্ডভুক্তি, অপার মন্দার, কুজবটী, কযঙ্গলী ইত্যাদি প্রধান

(১) দ্বিতীয় বার্ষিক দিব্য স্মৃতি উৎসবে সভাপতি স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ।

(২) সুরেশ্বর 'শব্দপ্রদীপ' নামক অভিধান প্রণয়ন করেন। J. A. S. B. 1907 P. 206

(৩) ১।২৫ শ্লোকের টীকায়ও উৎকোচের আভাষ আছে,—"বুধান্ পণ্ডিতান্ অমূতৈরযাচিতৈ দানৈ র্দধতি"—"পণ্ডিতদিগকে অযাচিত দানে বশীভূত করিয়া"—বিশেষ উদ্দেশ্যে অযাচিত দান উৎকোচের নামান্তর।

প্রধান রাজ্যের মহামাণ্ডলিক ও মণ্ডাধিপতির পশ্চাতে (৪) —অপরে চ সামন্তাঃ—আরও বহুসংখ্যক সামন্ত নরপতি—রামপালের আহ্বানে বিপুল সৈন্যসম্ভার লইয়া বরেন্দ্রীর নবোন্মেষিত গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করিতে অগ্রসর হন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই অভিযান সম্পর্কে বলিয়াছেন —রাজগণ স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্যপ্রণোদিত হইয়া রামপালের সাহায্য করেন নাই, বালিবধের পর রাজ্যলাভের বিনিময়ে যেমন সুগ্রীব রামের সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারাও সেইরূপ অর্থ ও ভূসম্পত্তির বিনিময়ে রামপালকে সাহায্য করিতে সম্মত হন। (৫)

এই সময় বরেন্দ্রীমণ্ডলে কোটীবর্ষবিষয় গোকলিকামণ্ডল প্রভৃতি রাজ্য ও বিলাসপুর, শোণিতপুর, বাণপুর প্রমুখ রাজনগরী বিদ্যমান থাকিলেও ভীমের বিরুদ্ধে সজ্জিত রাজন্যমণ্ডলী মধ্যে এই সকল রাজ্যের রাজার নাম নাই। রামপালের পক্ষভুক্ত রাজগণের মধ্যে কেহই যে বরেন্দ্রীর সামন্ত নরপতি ছিলেন না তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতেও প্রমাণিত হয়।

তস্য ম (মা) হা বাহিন্যাং গুপ্তায়াং তরণি সন্তবেনাভৃৎ।
দ্বিষমভিষেণয়তো মুখরিত দিক্কোলাহলঃ সমুত্তারঃ ॥২।১০

"রামপাল শত্রুসেনাভিমুখে যাত্রা করিতে করিতে নৌকা-মেলকে গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া মহাবাহিনী লইয়া অপর-পারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সৈন্যগণের সমুত্তার ব্যাপারে দিক্ কোলাহলময় হইয়াছিল।" স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলিয়াছেন—সামন্তগণ গঙ্গার অপর পার হইতে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কেহই বরেন্দ্রভূমির লোক হইতে পারেন না। (৬) এইস্থানে আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভীমের রাজ্যে কোথাও বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই; এরূপ ঘটিলে মহাবাহিনী লইয়া রামপাল যখন বরেন্দ্রাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন তখন তিনি বিদ্রোহী সামন্তগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেন এবং এই সকল ঘটনা শত্রুপক্ষীয় কবি অসঙ্কোচে সাড়ম্বরে বর্ণন করিতেন। পরে বর্ণিত ২।২১ শ্লোক হইতে বরং দেখা যায় যে সামন্ত রাজগণ ভীমের পক্ষভুক্ত ছিলেন।

রামচরিত বা অন্য কোথাও এই যুদ্ধে ভীমের বলাবল বর্ণিত হয় নাই। তবে প্রতিপক্ষের আয়োজনের এই বিপুলতা হইতে বরেন্দ্রীর তৎকালীন প্রজাশক্তির গুরুত্ব অনুভূত হয়। যাহা হউক ভীম স্বীয় রাজ্যমধ্যে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালীর এই সর্ব্বনাশের গতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোকে রামপাল কর্ত্তৃক ভীমের 'আবার' সুরক্ষিত দৃঢ় স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকে যুদ্ধবর্ণিত হইয়াছে। ভীমবাহিনীর অপূর্ব্ব সাহসিকতা ও বীরত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত শ্লোকে কিঞ্চিত আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে—

সহ (হো) সাবিঘটনয়া জাবগ্রহ গ্রাহিতাহিত প্রবরম্।
স্ফুরদসমধাম সম্পত্তিমীয়মান বলসংবাধম্ ॥ ২।১৭

টীকানুযায়ী ব্যাখ্যা—বিধি বিড়ম্বনা বশতঃ সেই শত্রু-শ্রেষ্ঠ ভীম জীবিতাবস্থাতেই বলপূর্ব্বক রামপাল কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। ভীমের সৈন্যগণ প্রতিপক্ষ সেনা কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিল না।

বরেন্দ্রীর বীরসেনা দশদিন প্রজাশক্তির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যেভাবে রণক্ষেত্রে জীবনাহুতি দিয়াছে এবং রাজকবির ভাষায় উহা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা গঙ্গারাঢ়ীয়গণের বীরত্ব বর্ণনায় মহাকবি ভার্জ্জিল ও প্রতিশোধকামী গৌড়পতির অনুচরবর্গের বীরত্ব বর্ণনায় কাশ্মীর কবি কহ্লনের ভাষা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভীমের পরাজয়ে তথা জন্মভূমির গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধে কবির হৃদগত ব্যথারাশি রাজসভার আবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকে ভীমের বীরত্ব ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি বলিয়াছেন—

সম্যগনুগতর সাশেনা প্রথম সহোদরেন রামেন
ভীমঃ স সিন্ধুর গতোরণং রচয়তা কিলাবন্ধি ॥ ২।২০

টীকানুযায়ী ব্যাখ্যা—যুদ্ধরচনার দ্বারা পৃথিবী প্রাপ্তির আশাধারী রাজা রামপাল কর্ত্তৃক ভূপতি ভীম যাহাতে খ্যাতির কোন হানি না হয় এইভাবে হস্তিপৃষ্ঠে অবতিষ্ঠমান্ অবস্থাতে যেন দাবা খেলিবার কোঠে বন্ধনপ্রাপ্ত হইলেন।

তেনাবলম্বি পরো বিতীর্ণ রত্ননিধিনা ধরিত্রীভৃৎ।
স সুবলোহপগতায়া জনকভুবো বার্ত্তয়োৎসবং দধতা ॥২।২৮

(৪) পূর্ব্বে দ্বাদশ জন রাজার রাজ্য পরিমাণকে মণ্ডল ও তাহার অধিপতিকে মণ্ডলাধিপতি এবং বহু সামন্তের অধীশ্বরকে মহামাণ্ডলিক বলা হইত।

(৫) ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত সিনেট হলের বক্তৃতা।

(৬) সিনেটহলের বক্তৃতা।

"বন্দীভূত ভীম নৃপতিরূপ শত্রু রামপাল কর্ত্তৃক গজযূথমধ্য হইতে অবতারিত হইয়াছিলেন। রামপাল শুভক্ষণে বরেন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছেন এই মঙ্গলময় বার্ত্তা প্রচার করিয়া প্রজাবর্গকে উৎসব করিতে আদেশ দিলেন।" কিন্তু সেদিন গণতন্ত্রের শেষ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ বরেন্দ্রীর বীর প্রজাবৃন্দ উৎসব করিল—ভীমের সুহৃদ হরি নামক একজন সেনানায়কের নেতৃত্বে রণভূমে অবতীর্ণ হইয়া! তাহারা রামপালকে রাজা বলিয়া স্বীকারই করিল না। কবি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩০ হইতে ৩৫, ৩৮ হইতে ৪২ শ্লোকে হরি কর্ত্তৃক রাজ্য এবং সৈন্যমধ্যে শৃঙ্খলা সম্পাদন চেষ্টা ও রামপালের সহিত যুদ্ধ এবং ৪৩ শ্লোকে হরির পরাভব বর্ণন করিয়াছেন। বন্দীভূত ভীম রামপাল কর্ত্তৃক বিত্তপালসূনু হস্তে সমর্পিত হন। (২।৩৬)

স্বর্গীয় মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন—বন্দীভূত ভীম বরেন্দ্রের জনসাধারণের প্রিয়পাত্র। সুতরাং তাঁহাকে নিহত করিলেবিষম অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে, আবার তাঁহাকে বরেন্দ্রভূমিতে রাখিলেও বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে। হয়ত এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া রাজনীতিকুশল রামপাল ভীমকে সুদূরবর্ত্তী কোন প্রদেশে বন্দী করিয়া রাখেন। (৭) ২।৩৭ শ্লোক হইতে জানা যায় ভীম তাঁহার রক্ষকের সৌজন্যে শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ার সুযোগে পলায়ন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে বহুসংখ্যক লোককে নিহত করতঃ যমরাজের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ২।৪৫ হইতে ৪৮ শ্লোকে হরির পরাজয়ে উল্লসিত রামপালের সহিত ভীমের পুনর্ব্বার প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং ৪৯ শ্লোকে রামপাল কর্ত্তৃক ভীমের শোকাবহ নিধন বর্ণিত হইয়াছে। ভীমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু জনসাধারণের বীর্য্য-গরিমা চিরতরে অস্তমিত ও কলিঙ্গের মহাশ্মশানে অশোকের জয়পতাকার ন্যায় বীর বাঙ্গালার চূর্ণীকৃত অস্থিপঞ্জরের উপর অবাঙ্গালী দ্বারা রামপালের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়।

এত কঠোর নিষ্পেষণেও বরেন্দ্রীর প্রজাগণ রামপালের সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসে নাই দেখিয়া তাঁহাকে অন্যবিধ উপায়াবলম্বন করিতে হইয়াছিল। নিম্নলিখিত শ্লোকে একটি উপায় বর্ণিত হইয়াছে—

ক্রূর করাপীড়িতা সাবিতি ভর্ত্তুর্মৃদুকরগ্রহাৎ কৃপয়া
কৃষ্টোপচিতাং সপদি স্খলিত প্রতিপক্ষমার দহন শুচম্॥৩।২৭

(৭) সিনেটহলের বক্তৃতা।

রামপাল প্রজার মনোরঞ্জন ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য তাহাদের রাজস্ব হ্রাস করিয়াছিলেন।

ক্ষৌণীনায়ক ভীমের প্রশস্তি রচনা করা কবির উদ্দেশ্য ছিল না। তথাপি পূর্ব্বোদ্ধৃত কয়েকটী শ্লোকে তিনি ভীম চরিত্রের যে আভাষ দিয়াছেন ২।২১ হইতে ২।২৭ শ্লোকে তাহা পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন—

ভীমপক্ষীয় ভূপালগণ রক্ষাযোগ্য ব্যক্তিমাত্রেরই রক্ষক সেই ভীমকে আশ্রয় করিয়া রামপালরূপ শত্রুকে জয়শীল দেখিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ২।২১

ভীমসমীপে বিপক্ষ নরপতিগণের দুর্ব্বার সর্ব্বপ্রকার বাহিনী সহস্র ভগ্ন বা বিকল হইয়া যাইত। ২।২২

বহুতর রত্নরাজির আশ্রয়ে সরস্বতী বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীরূপে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সঙ্গে পরাজিত শত্রুলব্ধ অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন হইয়াছিল। ২।২৩

রাজা ভীমকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করিয়াছিল। সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন; পৃথিবী কল্যাণ লাভ করিয়াছিল। ২।২৪

তিনি এই সমস্ত জগৎ পরের জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন; কল্পতরুসদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার সেবকও অবিরল যাচকগণ অস্খলিত পদে আরোহণ করিয়া অবস্থিত হইতেন। ২।২৫

তিনি সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্ম হইতে মুক্ত ছিলেন; তাঁহার হৃদয়ে চন্দ্রকলাশোভিত ভুজঙ্গমভূষিত দেবদেব মহেশ্বর ভবানীসহ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন। ২।২৬

তিনি বিপুল যশদ্বারা দিগ্‌ভিত্তি শোভিত করিয়াছিলেন। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন না; ধর্ম্মবর্ত্ম অনুসরণ দ্বারা মহাশয়তা লাভ করিয়াছিলেন। ২।২৭

ইহা উত্তরাধিকারী, সামন্ত বা স্বরচিত প্রশস্তি নহে; সুতরাং ইহাতে অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই; বরং সত্য প্রকাশের কৃপণতা অনুমান করা যাইতে পারে। রাজ্য-শাসনের সাফল্য সম্বন্ধে শত্রুপক্ষের নিকট এইরূপ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ জগতে অতি অল্পসংখ্যক ভূপতির ভাগ্যে ঘটিয়াছে। প্রজাবর্গের হৃদয়রাজ্যে ভীমের রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে অরাতিকণ্ঠ হইতে কখন এরূপ

প্রশংসাগীতি উচ্চারিত হইত না। এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত ভূপতি সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশের অলঙ্কার স্বরূপ।

"রামপালের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জয় পরাজয় নহে, ইহা একটী মহাব্রতের অবসান কাহিনী। দিব্য কর্ত্তৃক এই মহাব্রত আরব্ধ হইয়াছিল, সেই ব্রত উদ্‌যাপিত হওয়ার পূর্ব্বেই রামপালের ক্রীতদাস সামন্তরাজগণ তাহার ধ্বংস সাধন করিলেন। কবির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য সহজে রামপালের করায়ত্ব হয় নাই। প্রাচ্যদেশে সাধারণতঃ রাজা বা সেনাপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের অবসান হইত। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি ভীমের পরাজয়ের পরও রামপাল বরেন্দ্রী অধিকার করিতে পারেন নাই। ভীমের সুহৃদ হরির নেতৃত্বে বরেন্দ্রের প্রজাগণ প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছিল। হরির পরাজয়েও এই যুদ্ধের মীমাংসা হয় নাই। ভীম পুনরায় ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া রামপালের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের প্রজাগণ যতদূর সাধ্য প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত ত্যাগ স্বীকার করিয়াও অঙ্গ মগধাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র শক্তি জয়লাভ করিতে পারে নাই।......ভাড়াকরা সৈন্যের সাহায্যে রামপাল প্রজাশক্তির উন্মূলিত করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যাহা হারাইয়াছিলেন তাহা আর ফিরিয়া পাইলেন না। যে প্রজাশক্তি পাল-সাম্রাজ্যের সঞ্জীবনী শক্তির আধার ছিল, অর্থবলে ক্রীত বিপুল সৈন্যের শাণিত তরবারির আঘাতে চিরদিনের নিমিত্ত তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। যে প্রজাশক্তির সাহায্যে আসমুদ্র হিমালয় পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহের উপর দিয়া শকট চালাইয়া রামপাল পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসেন। (৮) বাঙ্গালীর গণতন্ত্রের সহিত অবাঙ্গালীর রাজতন্ত্রের এই বিরাট সঙ্ঘর্ষের পর হইতে "মাৎস্যন্যায় নিবারণের অথবা অনীতিকারম্ভের প্রতিকারের অধিকার বিস্মৃত হইয়া গৌড়জন কালস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন" (৯) বলিয়া বঙ্গে বিদেশীয় সেন বংশের অভ্যুদয়।

(৮) ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্কলিত সিনেট হলে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের বক্তৃতা।

রামচরিতে রামপাল অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র, বরেন্দ্রভূমি সীতা, শিবরাজ হনুমান, দিব্য ও ভীম রাবণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, ভীম সুহৃদ হরি কখন রাম (২।৩৮) কখন কুম্ভকর্ণ (২।৪৩) হইয়াছেন। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন প্রভৃতির সহিত রামচরিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে রামপালকে রামের সহিত তুলনা করা তৎকালীন প্রথারূপে দাঁড়াইয়াছিল। (১০) ব্যাস বা বাল্মীকীর মন দুর্য্যোধন বা রাবণের দিকে ছিল না কিন্তু সন্ধ্যাকরের মন ভীমের দিকে ছিল। (১১)

ভীমরাজের রাজ্যসীমা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া দিব্য স্মৃতি উৎসবের সভাপতিরূপে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—'পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে পদ্মা, পূর্ব্বে করতোয়া ও প্রাচীন তিস্তাএর মধ্যকার দেশ।' ভীম জাঙ্গালসমূহের অবস্থান লক্ষ্য করিলে আমাদেরও অনুমান হয় বর্ত্তমানের সমুদয় উত্তরবঙ্গ ভীমের রাজ্য ছিল।

সরকার মহোদয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অভিভাষণে বলিয়াছেন—'ভীম অনেক বৎসর ধরিয়া দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন' —কত বৎসর তাহা রামচরিত বা অন্য কোথাও নাই। যাহা হউক দিব্য বা ভীম যত অল্প বা অধিক দিন রাজত্ব করুন না কেন, তাঁহারা যে তাঁহাদের জন্মভূমির অতিশয় দুর্দ্দশার দিনে অতুলনীয় দেশপ্রীতিপ্রণোদিত অপূর্ব্ব বীরত্ব ও মঙ্গলময় ঐক্যে 'অরবিন্দেন্দীবরময় সলিল সুরভি শীতল' পুণ্যভূ বরেন্দ্রীর সুমতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন সেই ইতিবৃত্ত আজিকার বাঙ্গালীকে সুপথ প্রদর্শন করিবে।

(৯) রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত—'গৌড়রাজমালা' ৬৭ পৃষ্ঠা।

(১০) শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিত 'মহীপাল প্রসঙ্গ'—প্রবাসী মাঘ ১৩২১।

(১১) দিব্যের সহিত রাবণের তুলনা প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—রামপালবংশের খোসামুদে কবি নিজ কাব্যে দিব্যকে রাবণ বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহা মানিব কেন? দুজনার কাজ দেখিয়া মহীপালকে রাবণ এবং দিব্যকে দৈত্যনাশকারী অবতার বলিলে সত্য কথা হইত। (দিব্য-স্মৃতি উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ)।

অতীন্দ্রিয়

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়নের আলো দিয়া আঁধার ভেদিতে কেবা পারে?
নয়ন সে আলোর ভিখারী,
আলো পান করিয়া সে রামধনু রঙের মাতাল
আঁধারের নহে অধিকারী।

তমসার কূলে কূলে বেড়ায় লোলুপ হিয়া মোর
খোঁজে অজানার পরিচয়—
অতলের তলে তলে কোথা জ্বলে তিমির-মণিকা
প্রভাহীন মুকুতা-নিচয়।

দীপহীন অমা পুরে নিকষ-কুট্টিম পরে পড়ি
কে তরুণী কাঁদে নিরাকারা
নীরব রোদন তার চেতনা অতীত-সুরে আসি
বেদনার দিয়ে যায় সাড়া।

অতীন্দ্রিয় সে-বেদনা ঘুরে মরে মর্ম্মের কন্দরে
কায়াহীন স্বপ্ন-নিশাচরী
কী যেন বলিতে চায় ভাষাহারা অব্যক্তের বাণী
মূক কণ্ঠে গুমরি গুমরি'।

মনে হয়, ডাকে মোরে অপলক নয়ন-সঙ্কেতে
বলে, 'ওগো বন্ধন-বিলাসী,
আলোকের কারাগারে স্বপ্নঘোরে শুনিতে কি পাও
তামসীর অনাহত বাঁশী?

* * * *

ইন্দ্রিয়ের পরপারে ইন্দ্রনীল সুপ্তি-মায়াপুরে
জাগরূকা, হে অভিসারিণী,
পাই নি তোমারে কভু; শব্দ-রূপ-গন্ধের ইঙ্গিতে
চিনি গো তোমারে তবু চিনি।

যে আলোর সপ্ত-সুরে বাঁধা মোর জীবনের বীণা
সে আলোর সপ্তক-রঞ্জন—
তোমার কুন্তল মাঝে ক্ষীণশিখা খদ্যোত-কণিকা,
প্রান্ত-ধারা বসন-শোভন।

তোমারি নিশ্বাস বহে ধরণীর মধু-গন্ধবহ
সুগোপন গহন সৌরভ
সঙ্গীতের স্বর-তন্ত্রে ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠে তব
নূপুর-ছন্দন-কলরব।

পাই নাই যাহা কিছু, পাইব না যে-ধন কখনো
ঢাকা আছে তোমার অঞ্চলে;
অমৃতের পূর্ণ পাত্র, পরম তৃষ্ণার অবসান—
তারি লাগি হৃদয় চঞ্চলে।

চির-তমিস্রার মাঝে চিরন্তন বাজে তব বাঁশী
মোহময় কুহক-মধুর—
শিথিল ইন্দ্রিয়-গ্রন্থি, সম্মোহিত বিবশ চেতনা
আত্মহারা পরাণ বঁধুর।

টেনে লও বুকে তারে, তমোময়ী অয়ি বিমোহিনী
অরূপা অনন্ত রূপবতী
ক্ষুদ্র আলো ক্ষণিকের—সীমাচক্রমসীরেখাঙ্কিত
নিখিলের তুমিই শাশ্বতী।



বাঙ্গালার ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ পুরাতত্ত্বরত্ন

প্রবন্ধ

কাল চলে জলের স্রোতের মত। তাহার আবর্ত্তে পড়িয়া কত স্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়া যায়—নিশ্চিহ্ন হয়। সেই দুর্ণিবার আবর্ত্তকে যিনি জীবনান্তে অতিক্রম করেন, লোকে বলে তাঁহার জন্মই সার্থক। আচার্য্য অক্ষয়কুমার ছিলেন একজন সেই ধরণের পুরুষ—বঙ্গসাহিত্য যাঁহাকে ইতিহাসের মণিকোঠায় রত্নবেদীর উপর আসন দিয়া অক্ষয় করিয়াছে —কাল পরাজয় মানিয়াছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা লোকে ভুলিতে পারে—তাহাদের চিত্র স্মৃতির পটে প্রায়ই অস্পষ্ট হইয়া উঠে; কিন্তু যে ইতিহাস জাতির অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া তাহাকে তাহার প্রাচীন গৌরব-বিভবের সন্ধান দেয়, সেই ইতিহাসের লেখক ঐতিহাসিকের আসন জাতির মর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়াই অপরাজেয় কাল সেইখানে নতশির। অক্ষয়কুমার যে যুগে ঐতিহাসিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন সে যুগে ইতিহাস বাঙ্গালীর নিকট তেমন মর্য্যাদা পাইত না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঐতিহাসিক তখন বাঙ্গালার কাহিনী লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের লিখন ভঙ্গী ছিল এমন সরস যে তাহা পাঠককে মাতাইয়া তুলিত। ঐতিহাসিক সত্যকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আর কেহ তাঁহার মত করিয়া বাঙ্গালার ইতি-কথা শুনাইতে পারিতেন বলিয়া মনে পড়ে না।

অক্ষয়কুমারের দেহত্যাগের পর প্রায় সাত বৎসর যাইতে চলিল। এইকালের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধই আমাদের দেশের নানা মাসিকপত্রে দেখিয়াছি, কিন্তু অক্ষয়কুমারের লেখার মত প্রাণস্পর্শী লেখা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। সে লেখার উচ্ছ্বাস জাতির মর্ম্মকথার উচ্ছ্বাস ছিল। অতলবিস্মৃত ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করিবার মত তুরী-ভেরী-নাদ তাঁহার লেখায় বাজিয়া উঠিত—সে লেখা নাচাইত, দোলাইত—স্তম্ভিত করিয়া দিত—আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি—আবার কি হইতে পারি—সে লেখা সেইদিকে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ না করিয়া ছাড়িত না; সময়ে সময়ে সে লেখা উপরে-উপরে যতখানি প্রকাশ করিত, ভাবাইয়া তুলিত তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। পরবর্ত্তী যুগের—সম্ভবতঃ অধুনা বিলুপ্ত-প্রায় ঐতিহাসিক রচনার বিজ্ঞানানুমোদিত রীতিও অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক গবেষণার মধ্যে ফাঁক দেখাইতে পারে নাই। নানা কারণে একালে ঐতিহাসিক আলোচনার পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে। অক্ষয়কুমার যে সময় ঐতিহাসিক আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন সে সময়ে পথ এত সহজ ছিল না; তখন রথীকেই পথ আবিষ্কার করিয়া সেই বিলুপ্তপ্রায় পথ-চিহ্নকে আশ্রয় করিয়া রথ্যা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে—তাহার উপর দিয়া চলিয়াছে রথ, এক সিদ্ধান্ত হইতে সিদ্ধান্তান্তরে—এক কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে—এক যুগ হইতে যুগান্তরে—অন্ধকার হইতে কুয়াসায়—কুয়াসা হইতে আলোকে। সত্য যদি একথা বলি যে অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক গবেষণার শেষ যুগে আমাদের দেশে বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনা করিবার যে একটী শুভ সূচনা জাগ্রত হইয়াছিল, ভট্টপল্লীর শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং রাজসাহীর অক্ষয়কুমারের দান সেদিকে কম সাহায্য করে নাই। আজ যদি একথাও বলি যে, ইঁহারা উভয়েই একালের কতকগুলি ঐতিহাসিক লেখকের জন্মদাতা—আশা করি ধীরচিত্ত পাঠক অতিশয়োক্তি বলিয়া সেকথা উড়াইয়া না দিয়া 'সাহিত্য', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' এবং 'বসুমতীর' কয়েক সহস্র পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির সম্বর্দ্ধনা করিয়া ঋণমুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অক্ষয়কুমার এখন পর্য্যন্ত অসম্বর্দ্ধিতই রহিয়া গেলেন; কেবল স্বর্গীয় স্বনামধন্য গ্রন্থপ্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রদ্বয় পিতৃস্মৃতি রক্ষার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-মন্দিরে অক্ষয়কুমারের একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে রাজসাহী



অক্ষয়কুমারের আশৈশব ক্রীড়াভূমি, পরিণত বয়সের কর্ম্মক্ষেত্র, উত্তরবঙ্গে সারস্বতকুঞ্জগঠনের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র—বাঙ্গালার পুরাতত্ব উদ্ধার ও রক্ষার সাধনক্ষেত্র—সেই রাজসাহীর গণ্যমান্য বরেণ্য বদান্য ব্যক্তিরাও রাজপথের একটা গলির সঙ্গে অক্ষয়কুমারের নাম সংযুক্ত করিয়াই ঋণমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন; ইহা যে শুধু পরিতাপের বিষয় তাহা নহে—ইহা লজ্জারও বিষয়! কাব্যনিকুঞ্জের সুধাকণ্ঠপিক মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ জীবিত থাকিলে বহুদিন পূর্ব্বেই রাজসাহীর এই কলঙ্ক কালিমা প্রক্ষালিত হইত; ফলত অক্ষয় প্রতিভার জ্যোতিতে আজও যাঁহারা লোকচক্ষে সমুজ্জ্বল, কৃতজ্ঞতার দাবীকে 'কালে বিবেচ্য' রূপে গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা চেষ্টিত থাকিলে হয়ত বা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্ত্রণা-সভায় কথাটা মীমাংসার জন্য উঠিতে পারিত। অক্ষয়কুমারের স্মৃতি তাঁহার স্বদেশবাসীর সম্বর্দ্ধনা-লাভ করিবার জন্য কাঙ্গাল নহে, কারণ তিনি নিজেই তাঁহার স্মৃতি-মন্দির রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সিরাজ-উদ্-দৌলা, মীরজাফর, মীরকাশেম, গৌড়লেখমালা প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে অক্ষয় হইয়াই রহিবে। রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কলাভবন বা কলিকাতার সাহিত্য পরিষদের মন্দির হয়ত কালে নিশ্চিহ্ন হইতে পারে এবং "পুনর্ণব" করিয়া তাহাদের সংগঠন আর হয়ত সম্ভব না-ও হইতে পারে—কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মৃত্যু নাই—সেইজন্যই অক্ষয়কুমারেরও মৃত্যু নাই।

রাজসাহী অক্ষয়কুমারের কর্ম্মক্ষেত্র, রাজসাহী তাঁহার জন্মস্থান নহে। তাঁহার জন্মস্থান নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মীরপুর নামক রেলষ্টেসনের সন্নিকটে ক্ষুদ্রকায়া গৌরী নদী। গৌরীর তীরে সিমলা গ্রাম। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিমলা গ্রামে ভগবানচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাস ছিল। সেই সালে তাঁহারই বাড়ীতে ১লা মার্চ্চ অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই দেখা গেল শিশু মৃতপ্রায়। মৃতপ্রায় শিশুর জীবনের আশা নাই মনে করিয়া ধাত্রী তাহাকে ত্যাগ করিল। মীরপুরে সাহেবদের একটী কুঠি ছিল। সেই কুঠির একজন ইংরাজ-ধাত্রী আসিয়া শিশুকে বাঁচাইয়া তুলিলেন।

অক্ষয়কুমারের পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়। তাঁহার পিতামহী শ্যামমোহিনী নীলকরদিগের অত্যাচারে স্বামীর ভদ্রাসনে টিঁকিতে না পারিয়া পুত্রকন্যাসহ নদীয়া জেলার কুমারখালিতে পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। পিতা মথুরানাথ কুমারখালী গ্রামের বাসিন্দা হইয়া বাঙ্গালার ধর্ম্ম-জীবনের ইতিহাসে সুপরিচিত—ধর্ম্মসঙ্গীত রচনায় ও গানে সিদ্ধহস্ত—কাঙ্গাল হরিনাথকে বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন; কুমার-খালি এখনও একখানি বৃহৎ গ্রাম। পূর্ব্বের সে ঘন-বসতি আর নাই, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তির জন্মভূমি এই কুমারখালি। মথুরানাথ এবং কাঙ্গাল হরিনাথ সেই সুপ্রাচীনকালেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালার গ্রামই বাঙ্গলার প্রাণ। সেই প্রাণে শক্তি-সঞ্চার করিবার জন্য দুই বন্ধু কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। বাঙ্গালার তাৎকালিক শিক্ষিত সমাজে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধাবলী ও পুস্তকাদি সমাদরে গৃহীত ও পঠিত হইত। মথুরানাথ সেই সকল প্রবন্ধ ও পুস্তক পাঠ করিয়া এমনি প্রভাবান্বিত হইলেন যে কাঙ্গাল হরিনাথের সম্মতিক্রমে পুত্রের নাম রাখিলেন অক্ষয়কুমার। পুত্র যাহাতে সুশিক্ষা লাভ করিয়া স্বনামখ্যাত বঙ্গবিশ্রুত অক্ষয়-কুমারের মত হইতে পারে, ইহাই ছিল মথুরানাথের কামনা। নদীয়া জেলার নানা স্থানে নীলকরদিগের ভীষণ অত্যাচার ছিল। সেই অত্যাচারের তাপ হইতে কুমার-খালিও নিষ্কৃতি পায় নাই। কলিকাতার "হিন্দু-পেট্রিয়ট" এবং "সংবাদপ্রভাকর" তখন "নীলকর-বিষধর"দিগের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেন। সেকাল এমনি ছিল যে নীলকরদিগের দ্বারা অত্যাচারিত হইয়াও অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিবার সাহস কাহারও ছিল না। কুঠিয়াল সাহেবের চাবুক খাইয়াও সেলাম করিতে হইত! নির্ভীক মথুরানাথ এবং কাঙ্গাল হরিনাথ উল্টা পথ ধরিলেন। কিছুদিন পর কাঙ্গাল হরিনাথের "গ্রাম-বার্ত্তা প্রকাশিকা" নামক পত্রিকা বাহির হইয়া নির্ভয়ে গ্রামের বার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করিতে লাগিল। অক্ষয়কুমার তখন বালক মাত্র। গ্রামের পাঠশালায় পড়েন। পাঠশালার একজন গুরু মহাশয় থাকিলেও স্বয়ং "কাঙ্গাল" করেন গুরুগিরি। সুতরাং সেকালের এই পাঠশালার ছাত্র-গণ যে শুধু সটকে নামতাই শিখিত তাহা নহে—তাহারা দেশকে ভালবাসিতে শিখিত, জ্ঞানের সমাদর করিতে শিখিত, নির্ভীক হইতে অভ্যাস করিত। সেখানে তাহাদের

চরিত্র গঠিত হইত—তাহাদের কোমল হৃদয়ে মুক্তহস্তে বীজ বপন করিয়া "কাঙ্গাল" সেখানে মানুষ তৈয়ার করিতেন। মনুষ্যত্বের সেই শিল্প-গৃহে অক্ষয়কুমারের সতীর্থ ছিলেন ভারতবর্ষ-সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন, যাঁহার অনুরোধ-পত্রের তাগিদে এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। উত্তরকালে বঙ্গবিশ্রুত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ও এই সময়ে অক্ষয়কুমারের অন্য সতীর্থ ছিলেন। পাঠশালার যে গুরুমহাশয় অক্ষয়কুমার, জলধর ও শিবচন্দ্রের ন্যায় মানুষ তৈয়ারি করিয়াছিলেন—একালের সেকেণ্ডারি শিক্ষাব্যবস্থার চক্রে তাঁহার স্থান কোথায় হইবে জানি না, কিন্তু সেকালে কাঙ্গালের নামে বালক, যুবক, বৃদ্ধ মাতিয়া উঠিত; গ্রামে, গ্রামান্তরে এবং দূর দূরান্তরেও কাঙ্গালের গান শুনিয়া নর-নারীর চক্ষু ভিজিয়া উঠিত—সসম্ভ্রমে মস্তক নত হইত। বাঙ্গালী কাঙ্গালী। "কাঙ্গাল" তাই অনেকেরই হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পর রাজকার্য্য উপলক্ষে মথুরানাথ পুত্র-পরিবারসহ রাজসাহী শহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রাজসাহীই অক্ষয়কুমারের দ্বিতীয় বাসভূমি হইয়াছিল। রাজসাহীর ভদ্রসমাজ তখন ছিল বিদ্যালোচনার জন্য সুপরিচিত। রাজসাহীর যুবকগণ তখন মাতৃভাষার বিশেষ চর্চ্চা করিতেন। আমার পাঠ্যাবস্থাতেও কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা এবং বক্তৃতাদি দেওয়ার ক্লাবে আমি উপস্থিত হইয়াছি। আমার মনে পড়ে—বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান উপলক্ষে আমরা স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ মিলিয়া একটী বৃহৎ শোকসভার আয়োজন করিয়াছিলাম। সেই সভায় অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। স্বর্গগত লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস্ মহাশয় তখন রাজসাহীতে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি পদস্থ বাঙ্গালী বলিয়া আমরা তাঁহাকেই সভাপতির পদে বরণ করিয়াছিলাম। সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য। সেই লোকারণ্যের মধ্যে অক্ষয়কুমারের মর্ম্ম-স্পর্শী প্রবন্ধ সুললিত কণ্ঠে পঠিত হইয়া গেল। লোকেন্দ্রনাথ উঠিয়া ইংরাজিতে সভাপতির অভিভাষণ দিতে আরম্ভ করা মাত্র আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "শুনিব না, শুনিব না—ইংরাজি বক্তৃতা শুনিব না।" সভায় এমন গণ্ডগোল উপস্থিত হইল যে উপস্থিত রাজপুরুষগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। শেষে অক্ষয়কুমার উঠিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে লোকেন্দ্রনাথ আজীবন বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত—কলিকাতা হইতে তাঁহার পুস্তকাবলী বিলাতে লইয়া গিয়া পাঠ করিতেন। তবে বহুদিন বিলাতে থাকায় বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার সাধ্যের অতীত, সেজন্য তিনি দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করিতেছেন ইত্যাদি। সে সময়ে অক্ষয়কুমারই ছিলেন রাজসাহী কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদের নেতা। তাঁহার কথায় আমরা শেষে সভাপতির ইংরাজি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কত অসীম শ্রদ্ধাই না প্রকাশিত হইয়াছিল অক্ষয়কুমারের সেই অভিভাষণে।

অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-চর্চ্চা বাল্যকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখনই গ্রের এলিজির এমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছিলেন যে রচনানৈপুণ্য দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন তখনকার রচিত তাঁহার একখানি গ্রন্থের নাম "বঙ্গবিজয়।" ঐ সময়ের আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ "সমর-সিংহ" মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার একখণ্ড অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমার প্রদত্ত উপহারস্বরূপ আমি রক্ষা করিয়াছিলাম। আমার পুস্তকাদির মধ্যে এখনও উহা আছে কিনা বলিতে পারি না। পরবর্ত্তীকালে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে নাট্যাভিনয়ে মাতিয়াছিলেন সে সময় তিনি "আশা", "আবাহন" ও "বাসবদত্তা" নামে তিনখানি নাটক রচনা করিয়া অভিনয় করাইয়াছিলেন। রাজসাহীতে আমরা বহুবার "আশা" ও "আবাহন" অভিনয় করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছি। বগুড়া শহরেও কয়েক রাত্রি "আবাহন" অভিনীত হইয়াছিল। মহাস্থানগড়ের কাহিনী অবলম্বনে উহা রচিত হয়। নাটকখানি এমন উত্তেজনাপূর্ণ ছিল যে ঘরে বসিয়া পড়িতে গেলেই দেহে রোমাঞ্চ হইত। বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে এমন একখানি সুন্দর নাটক মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এই সকল নাটক বা কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার এত দ্রুত রচনা করিতে পারিতেন যে আমাদের সম্মুখেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া যাইতেন—কখনো কাট-কুট করিতে হইত না।

বঙ্গসাহিত্যে কবি ও সমালোচক বলিয়া অক্ষয়কুমারের প্রসিদ্ধি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। দেখিয়াছি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সমালোচনার

জন্য তাঁহার নিকট পুস্তক পাঠাইয়াছেন। পরস্পর পত্র-ব্যবহারও সর্ব্বদাই হইত। অক্ষয়কুমার কবিও ছিলেন, সমালোচনা-কুশলও ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ ছিল বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে। নিজে ঐতিহাসিক রচনায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই গিয়াছি। তখন তাঁহাকে কত যে পড়িতে ও লিখিতে দেখিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। কত তর্ক করিয়াছি, ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি; লিখিত প্রবন্ধ ডাকে ফেলিবার জন্য বাঁধা হইবার পরও আটক করিয়াছি। তাঁহাকে অসহিষ্ণু হইতে দেখি নাই। তিনি আবার রজনীর পর বিনিদ্র রজনী পাঠ করিয়া নূতন নূতন টীকা টিপ্পনী বাহির করিয়া দেখাইয়া আমার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। আটক করা প্রবন্ধ তখন ডাকে গিয়াছে। তিনি ছিলেন রাজসাহী জেলাকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব। মামলা-মোকদ্দমার কাজেই অবসর ছিল না। এই যে তাঁহার অতি-প্রবল সাহিত্য-চর্চ্চা—ইতিহাস ও দর্শনের চর্চ্চা, ইহা ছিল তাহার উপর। কত ধৈর্য্য ও শ্রমানুরাগ থাকিলে এবং দেশের ইতিহাসের প্রতি মমতা থাকিলে মানুষ নিজেকে সর্ব্বপ্রকার আরাম-বিরাম হইতে বঞ্চিত করিয়া অনায়াসে দিনের পর দিন এত খাটিতে পারে তাহা অনুমান করাও সহজ নহে। দেশের ইতিহাসকে উদ্ধার করিব—বাঙ্গালীকে তাহার পিতৃপুরুষের কাহিনী শুনাইব—দেশের শিক্ষিত সমাজে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিব—ইহাই ছিল তাঁহার পণ। তাঁহাকে ঘিরিয়া আমরাও করিয়াছিলাম সেই পণ—তবে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দেশের লোক জানুক শিখুক বুঝুক, জাতি হিসাবে বিশ্বসভায় কোথায় ছিল তার স্থান—এই আকাঙ্ক্ষাকেই জীবনের একমাত্র কাম্য করিয়া বাঙ্গালার কয়জন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের মত তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন জানি না।

অক্ষয়কুমারকে একটী বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইয়াছে, কাজেই অর্থাগমের চেষ্টাকেই জীবনব্যাপী কর্ম্ম-তালিকার শীর্ষে রাখিতে হইয়াছে। যদি তাঁহার সমস্ত সময় তিনি পুরাতত্ত্বালোচনায় দিতে পারিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালার বিলুপ্ত ইতিহাসের অনেক অধ্যায় সর্ব্বজনমান্য ও প্রামাণ্য করিয়া লিখিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। সে পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুধু যে এদেশের সুধী সমাজেই হইয়াছে তাহা নহে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ডক্টর টমাস্ গৌড়লেখমালায় নিবদ্ধ টীকা টিপ্পনীর আলোচনা করিয়া লণ্ডনে বক্তৃতা দিবার সময় অক্ষয়কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পাঠকদিগের মধ্যে বোধহয় অল্প লোকেই অক্ষয়কুমারের "সাগরিকা"র সঙ্গে পরিচিত। যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের মধ্যেও বোধ হয় অল্প কয়েকজনেরই মনে আছে যে অক্ষয়কুমারই সর্ব্ব-প্রথমে প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সভ্যতা একদিন বঙ্গের বাহিরে বৃহদ্বঙ্গ রচনা করিয়াছিল। এখন এ বিষয়ে অনেকেই মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন, কিন্তু অক্ষয়কুমারের নাম করিতে বিস্মৃতি ঘটে! সে আজ বহুদিনের কথা—১৩১৯ বঙ্গাব্দের "সাহিত্য" পত্রিকায় "সাগরিকা" প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন পাঠকের কৌতূহল থাকিলে তিনি পুরাতন সাহিত্যের দপ্তর অন্বেষণ করিতে পারেন।

অনন্যসাধারণ কর্ম্মী অক্ষয়কুমার, প্রতিভাশালী ব্যবহারাজীব অক্ষয়কুমার—কবি ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার—ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার এবং সুপণ্ডিত ও নট অক্ষয়কুমার—তাঁহার সকল পরিচয় সকলে জানে না; না জানিবার প্রধান কারণ এই যে তাঁহার সমস্ত জীবন কাটিয়াছে মফস্বলের একটী শহরে—কলিকাতা হইতে বহু দূরে—তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার ক্ষেত্রও ছিল সেইখানে। কলিকাতার দুই একটী প্রসিদ্ধ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিলেও সে সম্বন্ধ তত নিবিড় ছিল না। সুতরাং অক্ষয়কুমারকে নেপথ্যে থাকিয়াই অন্তর্হিত হইতে হইয়াছে। সরকার তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি দিয়া গুণের পূজা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে সাধক ইতিহাসের ভিতর দিয়া স্বদেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে প্রাণপাত করিয়াছেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই ইতি-কথারই আলোচনা করিয়াছেন—আমরা তাঁহাকে কি মান দিলাম। হে পাঠক! নিজের হৃদয়কে একবার সেই কথা জিজ্ঞাসা করুন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি অক্ষয়কুমারের দেহ-ভস্ম পদ্মার শীতল সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে। তারপর প্রায় আটটী বৎসর অতীত হইতে চলিল—এখনো কি আমাদের এই আত্ম-জিজ্ঞাসার সময় আসে নাই—বরেন্দ্র

অনুসন্ধান সমিতির স্রষ্টা ও সারথীর স্মৃতির প্রতি বাঙ্গালা দেশ কি যথাযোগ্য মান দেখাইয়াছে ?

আজ মনে পড়ে সেইকালের কথা—আমরা যখন অক্ষয়কুমারকে সারথী করিয়া উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। বয়োবৃদ্ধ অক্ষয়কুমার হইতে রাজার দুলাল পর্য্যন্ত সে সময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মুড়ী গুড় অবলম্বন করিয়া কত ধূলিধূসরিত পথ—কত কঙ্কর ও বালুতে পরিপূর্ণ কণ্টকলতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত প্রান্তর—দিনের পর দিন, কখনো পদব্রজে, কখনো গো-যানে, কখনো বা হস্তী-পৃষ্ঠে অকাতরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও কুমার শরৎকুমারের অর্থানুকূল্যই রাজসাহী-নগরে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার পুরাকীর্ত্তি রক্ষা করিয়া তীর্থক্ষেত্র করিয়াছে। বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গে সাহিত্যালোচনার প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়। অক্ষয়কুমারের পৌরহিত্যে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন রঙ্গপুরে হইয়াছিল। বগুড়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের ঐতিহাসিক বিশিষ্টতার আলোচনা করিয়া এবং কতকগুলি শিলামূর্ত্তি ও অন্যান্য নিদর্শনের আলোকচিত্র দিয়া সম্মেলনে পাঠের জন্য আমি একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম। এই সামান্য ব্যাপারের সঙ্গে যে কোনো দিন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্বন্ধ ঘটিবে, ইহা তখন কে ভাবিতে পারিয়াছে ? পর বৎসর সম্মেলন বগুড়া শহরে হয়। আমি তখন সেখানে ছিলাম। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ঠিক একই সময়ে রাজসাহী শহরেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। আমি যখন অক্ষয়বাবুকে সংবাদ দিলাম যে বগুড়ার ঐতিহাসিক নিদর্শন আমি আরও সংগ্রহ করিয়াছি, তখন তিনি রাজসাহী সম্মেলন ছাড়িয়া বগুড়ায় আসিলেন। এই উপলক্ষে যে কয়দিন তিনি আমার অতিথিরূপে বগুড়ায় ছিলেন, সে কয়দিন কেবল এই আলোচনাই হইয়াছিল যে সমস্ত উত্তরবঙ্গে ঐতিহাসিক নিদর্শনের অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং নিদর্শনগুলি কোনো একটী স্থানে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এইভাবে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। (ভারতবর্ষ, ১৩৩৭)।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কলাভবন ছিল অক্ষয়কুমারের প্রাণাধিক প্রিয়। উহা বঙ্গের গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব এবং অক্ষয়কুমারের যোগ্য স্মৃতি-সৌধ। বৃদ্ধ অক্ষয়কুমার যুবজনোচিত কর্ম্মশক্তি লইয়া যদি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সারথী, সংগ্রাহক, প্রচারক এবং প্রকাশক না হইতেন, একথা বিশেষরূপে সত্য যে অনুসন্ধান সমিতি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিত না এবং সম্ভবতঃ কলাভবনও বাঙ্গালীর চেষ্টায় গঠিত একমাত্র মিউজিয়মরূপে স্বদেশে এবং বিদেশে সুপরিচিত হইতে পারিত না। কলাভবনের উদ্বোধনের দিনে অক্ষয়কুমার যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা সেদিনের প্রধান অতিথি লর্ড কার্মাইকেলকেও চমৎকৃত করিয়াছিল। বক্তৃতা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার বলিয়াছিলেন—"Is it man's? It shall fade away. Is it God's? It shall ever stay." দুরন্ত কালই একদিন বলিয়া দিবে বঙ্গগৌরব রাজসাহীর কলাভবন মানুষের অবদান, কি দেবতার আশীর্ব্বাদ। সেইদিন দেখিবার জন্য বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যজ্ঞে কাষ্ঠ ও প্রস্তরাদি বহনকারী আমার মত মজুরের দলের অনেকেই হয়ত থাকিবে না—আজও কেহ কেহ নাই! কিন্তু এই মজুরের দলের হৃদয়ের রক্তে যে মন্দিরের শিলাবিন্যাস হইয়াছিল তাহা যে ভগবানের দান—ইহা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন প্রমাণিত হইয়া যাইবে।

উত্তরবঙ্গের এই কলাভবনের কথা বলিতে গেলেই পাহাড়পুরের কথা বলিতে হয়, কারণ কলাভবন যেমন বলিতে গেলে অক্ষয়কুমারের কীর্ত্তি (অর্থের দিক দিয়া নহে—প্রতিভা, কল্পনা ও স্বাদেশিকতার দিক দিয়া), পাহাড়পুরের স্তূপ যে শেষে খনিত হইয়াছে ইহাও তাঁহারই কীর্ত্তি। পাহাড়পুর স্তূপ খনিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের পুরাতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি প্রধানতঃ বিহার ও মধ্যপ্রদেশেই নিবদ্ধ ছিল, পুরাতত্ত্বের দিক হইতে বাঙ্গালার কোনো স্তূপের যে কোনো বিশিষ্টতা আছে একথা সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগ স্বীকার করিতেন না। রাজকার্য্যে পাহাড়পুর অঞ্চলে যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় আমি যেদিন স্তূপটী প্রথম দেখি, সেদিন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে এই স্তূপ সম্বন্ধে বুকানন হ্যামিল্টন্ সাহেবের "পূর্ব্ব ভারত" এবং ওয়েষ্টমেকট সাহেবের বিবরণী পাঠ করিয়াছিলাম। তাঁহারা যে স্তূপটিকে বৌদ্ধ সংঘাবাস

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ক্যানিংহাম সাহেব ইহাকে হিন্দু দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়াছেন তাহা আমি জানিতাম। স্তূপের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে উহার একটি স্থানে কারুকার্য্যময় কোমরবন্ধের মত একটী সজ্জা ও কয়েকটী হস্তীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া খুলিয়া আনিয়া অক্ষয়কুমারকে দিয়াছিলাম। এই স্তূপ যে খনিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন এ বিষয়ে তখনই সিদ্ধান্ত করিয়া আমরা সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে পুরাতত্ত্ববিৎ রাজসাহী বিভাগের কমিশনর মোনাহান সাহেবের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে পারিয়া আমি যথেষ্ট আশান্বিত হইয়াছিলাম এবং তাঁহাকে এই স্তূপ ও গরুড়স্তম্ভ দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলাম। রাখাল বালকগণ স্তম্ভটীর দেহ কাটিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে দেখিয়া মোনাহান্ সাহেব তখনই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের ব্যয়ে উহার চতুর্দ্দিক উচ্চ লৌহ রেলিং বসাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন! এখন যদি কেহ গরুড়স্তম্ভ দেখিতে যান, মোনাহান সাহেব প্রদত্ত রেলিং তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইবে।

তাহার পর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্র মহাশয় পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ একটী লিপির কিয়দংশ অক্ষয়কুমারকে দিলে পর তিনি উহার নিম্নলিখিতরূপ পাঠ উদ্ধার করেন :—

রত্নত্রয়ো প্রমোদেনা (ন)
সত্ত্বানাং হিতকাঙ্ক্ষয়া
স্ত্রীদলচল গর্ব্বেণ
স্তম্ভোজয় (ঃ) স্কারিতো বরঃ।

পাঠোদ্ধার হইলে পর অক্ষয়কুমার কাল বিলম্ব না করিয়া এই ত্রিরত্ন স্তম্ভলিপির ছাপ, স্থানীয় বিবরণ এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঐতিহাসিকতত্ত্ব সম্বলিত একটী রিপোর্ট প্রত্নতত্ত্ববিভাগে প্রেরণ করেন এবং স্তূপটী খনন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ইহার কয়েকবৎসর পর পরলোকগত বাংলার ব্যাঘ্র সার আশুতোষের উৎসাহে এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (তথা অক্ষয়কুমারের) প্রযত্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের পরিচালনায় প্রথম খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। দিঘাপতিয়ার বদান্য কুমার শরৎকুমার রায়—বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির জীবন স্বরূপ যিনি—তাঁহারই অর্থানুকূল্যে যে মহৎ কার্য্যের সূচনা হইয়াছিল পরে গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পাহাড়পুর এখন বাঙ্গালী মাত্রেরই তীর্থক্ষেত্র—উহা প্রত্নসম্ভারে পরিপূর্ণ নানাযুগের কলাভবন—উহা প্রাচীন বাঙ্গালার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পরিচায়ক বহুমূল্য ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং বাঙ্গালার শিল্পরীতির ও সংস্কৃতির গতি ও অভিব্যক্তির গৌরবপূর্ণ জলন্ত নিদর্শন। সেই পাহাড়পুরের খননকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা সরকারকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য অক্ষয়কুমার কয়েকবৎসর ধরিয়া যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন, সেরূপ না হইলে হয়ত বাঙ্গালার প্রাচীন গৌরবকাহিনী এখনো ভূগর্ভেই ঢাকিয়া থাকিত। পাহাড়পুর যে খনিত হইয়াছে উহাও অক্ষয়কুমারেরই অন্যতম কীর্ত্তি। যেদিন উহা প্রথম খনিত হইতে আরম্ভ হয় সেদিন "প্রাচীন ভারতের জীর্ণোদ্ধার করিবার প্রথা সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিবার পর কুমার শরৎকুমার রায় সমবেত কর্ম্মীবৃন্দের আনন্দধ্বনির মধ্যে প্রথম কুদালি চালনা করেন (turned the first sod)।"

বাঙ্গালীর পুরাকীর্ত্তি প্রচারে জন্য এইভাবে জীবন ক্ষয় করিয়া গেলেন যিনি, হে পাঠক! আবার জিজ্ঞাসা করি—সেই অক্ষয়কুমারের জন্য আমরা কি করিলাম ?



বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-সমস্যা ও তাহার সমাধান

শ্রীসনৎকুমার ঘোষ এম-এস্‌সি

শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রফুল্লতালাভের প্রয়োজনীয়তা মনুষ্যমাত্রেই অনুভব করেন ; কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে কয়জন ইহা লাভ করিয়াছেন ? বাঙ্গালী যে দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে, কঠিন জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত অবসন্ন বাঙ্গালী যে আজ আপনার বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছে সেকথা আজ কেহ অস্বীকার করিবেন না। পূর্ব্বেও কি বাঙ্গালীর



শ্যামাপদ বিশ্বাস ও কার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ল্যাডার ব্যালান্স।

এই অবস্থা ছিল। পূর্ব্বে যে বাঙ্গালীর প্রচুর খাদ্য ছিল, সুগঠিত দেহ ছিল, বুকে সাহস ও বাহুতে বল ছিল—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ; এমন কি এদেশে ইংরাজশাসনের প্রারম্ভকালে ইংরাজলিখিত রিপোর্টে একথার সত্যতা দেখিতে পাওয়া যায় ; মাত্র একশতাব্দীর মধ্যেই বাঙ্গালীর যে কিরূপ দৈহিক ও মানসিক অবনতি হইয়াছে তাহা আজকালের বাঙ্গালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায়।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ আমরা স্বল্পায়াসেই অনুসন্ধান করিতে পারি ; সেই কারণগুলির যথাসম্ভব প্রতীকার করিতে পারিলে বাঙ্গালী যে তাহার হৃতস্বাস্থ্য কতকাংশে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কারণগুলি ও তাহার নিবারণকল্পে আমাদের যাহা করা আবশ্যক সেই বিষয় একটু বিশদরূপে আলোচিত হইতেছে।

(১) ম্যালেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতি মহামারী (২) খাদ্যের মধ্যে যথোপযোগী পুষ্টিকর উপাদানের অভাব (৩) ব্যায়ামবিমুখতা (৪) ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব।

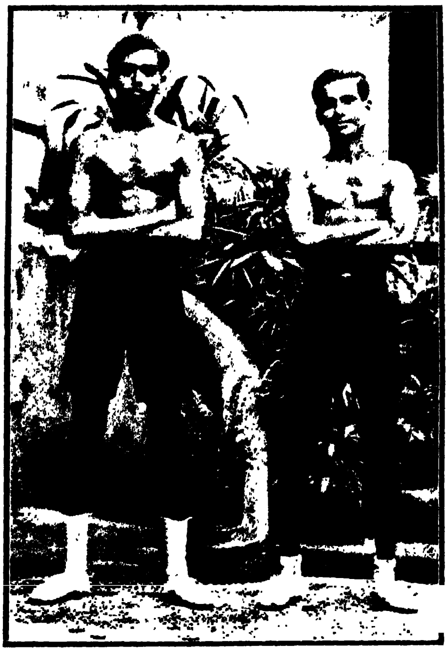
(১) ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধি বাঙ্গালীর প্রধানতম শত্রু। ন্যূনাধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয় ; ইহাদের প্রভাবে যে কত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কত নরনারী যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বা মরণাপন্ন অবস্থায় কালযাপন করিতেছে তাহার অবধি নাই ; এই মহাব্যাধিদ্বয়ই যে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যলাভের প্রধান অন্তরায় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্বে যখন এই ব্যাধির উৎপত্তি ও নিরাকরণ সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান খুব অল্প ছিল তখন মনে হইত, এই ব্যাধি দূর করা অসম্ভব বা প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ, —গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত অসম্ভব (অন্যান্যদেশে ইহা অবশ্য এইরূপে সম্ভবপর হইয়াছে)। কিন্তু এখন দেশবাসীর অজ্ঞতা দূরীভূত হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যে আপনাদের গ্রামকে এই করাল ব্যাধির গ্রাস হইতে মুক্ত রাখা সম্ভব ; এখন গ্রামে গ্রামে "ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি," "পল্লীমঙ্গল সমিতি" প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় ইহা কতকাংশে সফল হইয়াছে।

রায় বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মহতী চেষ্টায় যে "সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ এ্যান্টিম্যালেরিয়া-সোসাইটী"—স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আজ সফল হইয়াছে; এই কো-অপারেটিভ সোসাইটীর অধীনে বঙ্গদেশে প্রায় দুইসহস্রাধিক পল্লীসমিতি আছে এবং ইহাদের সাহায্যে দেশের ম্যালেরিয়া নিবারণকল্পে যে যথেষ্ট কার্য্য হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

(২) স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান; সুতরাং এই "স্বাস্থ্যসমস্যা"র প্রবন্ধে 'খাদ্য' বিশেষতঃ "বাঙ্গালীর খাদ্য" সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খাদ্যরূপে আমরা যাহা গ্রহণ করি তাহা দ্বারা আমাদের দেহের বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন, বলাধান, তাপ সংরক্ষণ ও জীবনীশক্তির বৃদ্ধিসাধন প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে। খাদ্যের সারভূত উপাদানসমূহ দেহমধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধীভূত হয় এবং তাপ উৎপাদন করে; ঐ তাপ দেহমধ্যস্থ যাবতীয় যন্ত্রকে কার্য্যক্ষম করিয়া আমাদের কার্য্যকরীশক্তি প্রদান করে। শরীরের যাবতীয় কার্য্যের জন্য আমাদের খাদ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি (Nutritive principles) থাকা আবশ্যক:—যথা (১) ছানা-জাতীয় উপাদান (Proteins) (২) তৈল ও চর্ব্বি-জাতীয় উপাদান (Fats) (৩) শর্করা-জাতীয় উপাদান (carbo-hydrates) (৪) লবণ জাতীয় পদার্থ (Mineral principles) (৫) খাদ্যপ্রাণ (Vitamins)।

এখন এই সমস্ত উপাদানগুলি শরীরের উপর কি ভাবে কাজ করে এবং এ সকলের অভাবে শরীর কি ভাবে অসুস্থ, অকর্ম্মণ্য ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহার একটু আলোচনা করিব।

(১) প্রোটিন জাতীয় খাদ্য:—এই জাতীয় খাদ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রচুর হওয়ায় ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট; ইহাতে শতকরা ১৪—১৮ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এই জাতীয় খাদ্য দ্বারা পেশী সংগঠন ও শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কিরূপে যে এই প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের আশোষণ (assimilation) হয় এবং কিরূপে ইহা পেশীসংগঠক কার্য্যে সহায়তা করে তাহা জানা আবশ্যক; সংপ্রতি বৈজ্ঞানিক মনীষী ডাঃ হপ্ কিন্স (Dr. Hopkins) বহু পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছেন যে প্রোটীনজাতীয় খাদ্য মূলতঃ এমিনো এসিডে (amino acids) পরিণত হয় এবং এই "এমিনো-এসিড" গুলিই আমাদের দেহ গঠনের উপাদান-স্বরূপ। আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে পাচকরসের (gastric juice) সহিত যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড আছে তাহাই এই প্রোটিনকে হাইড্রোলিসিস্ (hydrolysis) দ্বারা এমিনো এসিডে পরিণত করে; এই সকল এমিনো এসিড-গুলিই আমাদের রক্তকোষে প্রবেশ করে এবং নূতন নূতন স্নায়ুগুলী প্রস্তুত করে। আমরা সাধারণতঃ প্রোটীন জাতীয়



হরাইজণ্টাল বারের খেলোয়াড় সরোজকুমার ঘোষ ও সমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খাদ্যই গ্রহণ করি। চাল, ডাল, যব, গম, মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, শাক-শবজী এবং ফল:—এ সমুদয়েই প্রোটীন রহিয়াছে; একথা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন যে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ, মৎস্য প্রভৃতি খাদ্যের অভাব, মূল্যাধিক্য ও অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুন বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটীনের অভাব ঘটিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল; কিন্তু গমের পুষ্টিকরী ক্ষমতা চাউলের দ্বিগুণ; সুতরাং বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যে প্রোটীনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে আমাদের

রুটি খাওয়া উচিত। কিন্তু বাঙ্গালী অন্নগতপ্রাণ—দুইবেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলে সে আর কিছু চায় না; সাধারণ বাঙ্গালী যুবকের দৈনিক খাদ্যে ৯০ গ্রাম প্রোটীন থাকা আবশ্যক; কিন্তু আমাদের খাদ্যে সাধারণতঃ ৫০—৬০ গ্রামের অধিক প্রোটীন থাকে না। পূর্ব্ববঙ্গে মাছ সহজ-লভ্য, সেজন্য পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের খাদ্যে প্রোটীনের অভাব হয় না; এজন্য তাহারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণ অপেক্ষা বলিষ্ঠ, কর্ম্মক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের এবং



মাণিক স্বর্ণকার ও পশুপত নন্দীর প্যারালাল বারের ক্রীড়া।

ইউরোপীয় অধিবাসীদের খাদ্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তন্মধ্যে প্রোটীনের পরিমাণ অনেক বেশী আছে। বিভিন্ন পরিমাণ প্রোটীনযুক্ত খাদ্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক Col. Mc. Kay সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে দৈনিকখাদ্যে প্রোটিনের অভাব স্বাস্থ্য-হীনতার অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও জীবদেহের উপর বহু পরীক্ষা দ্বারা Col. Mc. Carrison এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে পাঞ্জাবীগণ যে খাদ্যগ্রহণ করেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাঁহার মতে পাঞ্জাবীগণের মত সুগঠিত দেহসম্পন্ন, সবল ও কর্ম্মঠ জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে; ইহাদের খাদ্যে আটা, ডাল, আলু, তরিতরকারী, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও মাংস আছে; বাঙ্গালীর খাদ্য অন্নপ্রধান এবং তাহারা অতি অল্প পরিমাণে ডাল গ্রহণ করিয়া থাকে; সুতরাং পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর খাদ্য যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; সুতরাং সুগঠিত পেশীসম্পন্ন, বলিষ্ঠ ও শ্রমশীল দেহ পাইতে হইলে বাঙ্গালীর খাদ্য সংস্কার যে অত্যাবশ্যক তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

(২১৩) চর্ব্বিজাতীয় ও শর্করা জাতীয় খাদ্য :—শরীরের উপর এই উভয় জাতীয় খাদ্যের কার্য্যপ্রণালী অনুরূপ; ইহাদের প্রধানকার্য্য শরীরের মধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করা; তবে শর্করাজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা চর্ব্বি-জাতীয় খাদ্যের তাপ-উৎপাদনকারী শক্তি (Calorific value) অনেক বেশী। অধিক পরিমাণে মাখনজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে ইহার কিছু অংশ অপরিপুষ্ট অবস্থায় শরীর হইতে নির্গত হয় ও অপর অংশ দেহে সঞ্চিত হয়; শরীরে অধিক পরিমাণে মেদ সঞ্চিত হইলে শরীর স্থূল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, মাংসের চর্ব্বি, মাছের তৈল, নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল প্রভৃতি হইতে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বিজাতীয় উপাদান পাইয়া থাকি। এই জাতীয় খাদ্যের আর একটি উপকারিতা এই যে ইহা আমাদের মাংসপেশীর উপর সঞ্চিত হয় এবং খাদ্যাভাব ও রোগাক্রমণের সময় আমাদিগকে সাহায্য করে।

আমরা সাধারণতঃ খাদ্যরূপে যে সমস্ত শর্করাজাতীয় উপাদান গ্রহণ করি তাহা দুইভাগে বিভক্ত; (১) শ্বেতসার (starch) এবং (২) শর্করা (sugar)। এই শ্রেণীর আর একপ্রকার পদার্থ সেলিউলোজ (cellulose) আমরা গ্রহণ করিতে সমর্থ হই না; শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যে মিষ্টতা নাই; চাউল, বিভিন্নপ্রকার ডাল, যব, গম, আলু, কাঁচকলা, মানকচু ও অন্যান্য তরি-তরকারীর মধ্যে মধ্যে আমরা প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার পাই। শর্করা-জাতীয় পদার্থে অল্পবিস্তর মিষ্টতা আছে; আখ, বীট, গুড়, চিনি, মধু, দুগ্ধ, খেজুররস ও বিভিন্নপ্রকার মিষ্টফল প্রভৃতি হইতে আমরা শর্করা পাইয়া থাকি। ইহার মধ্যে আখ ও বীটে ইক্ষু শর্করা (cane sugar), বিভিন্ন প্রকার ফলে

ফল-শর্করা (fructus) ও দুগ্ধে দুগ্ধ-শর্করা (milk sugar) পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ইক্ষুশর্করা সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট ও অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে দন্তের ক্ষতি হয়। বিভিন্ন প্রকার শর্করা শরীরের উপর বিভিন্ন প্রকার কার্য্য করে; শর্করাজাতীয় খাদ্যের তাপোৎপাদক শক্তি মাখনজাতীয় খাদ্য হইতে কম হইলেও ইহা শরীর মধ্যে সহজে দগ্ধ হয় বলিয়া ইহার কার্য্যকারিতা বেশী; ব্যায়াম ও অন্যবিধ পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য আমাদের যে তাপ ও শক্তির প্রয়োজন হয় তাহা আমরা শর্করা ও মাখন জাতীয় খাদ্য হইতে পাইয়া থাকি। বাঙ্গালীর খাদ্যে শর্করা-জাতীয় পদার্থের প্রাধান্য দেখা যায়; সেজন্য তাহা পাকস্থলীতে ঠিকভাবে পরিপুষ্ট হয় না এবং অন্ত্রদেশে (intestines) এসিডের (acid) সৃষ্টি করে। সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যে দৈনিক ১ ছটাক পরিমাণ চর্ব্বি-জাতীয় খাদ্য ও আধসের পরিমাণ শ্বেতসার (water-free carbo-hy-drates) থাকিলে আমরা আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় তাপ রক্ষা করিয়া যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারি।

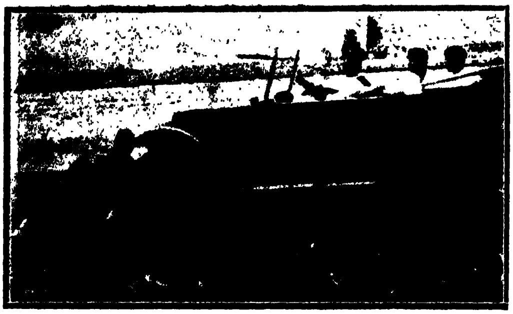
(৪) আমরা বিভিন্নপ্রকার খাদ্যের সহিত লবণঘটিত পদার্থ গ্রহণ করি; ভিন্ন ভিন্ন মূলপদার্থ ঘটিতলবণ (salts of different elements) বিভিন্নপ্রকারে আমাদের দেহযন্ত্রের সহায়তা ও সমতা রক্ষা করে। সোডিয়াম্ (sodium), পটাসিয়াম্ (potasium), চুণ (calcium), লৌহ (iron), ফস্ফরাস (phosphorus), আয়োডিন (Iodine), গন্ধক প্রভৃতি মূলপদার্থঘটিত লবণই আমাদের প্রয়োজন; চুণ আমাদের অস্থির ও দন্তের পুষ্টির কার্য্যে সহায়তা করে; ছানা, দুগ্ধ, নানাপ্রকার ডাল ও ফল, ডিমের পীতাংশ হইতে আমরা চুণ পাইয়া থাকি। আমাদের দেহের লোহিত রক্তকণিকার প্রধানতম উপাদান লৌহ; এই রক্তকণিকা দ্বারাই খাদ্যের দহনক্রিয়া ও তাপ রক্ষা হয়; কারণ ইহা নিশ্বাস বায়ু হইতে অক্সিজেন (Oxygen) গ্রহণ করে; শরীরে উপযুক্ত পরিমাণে লৌহের অভাব ঘটিলে রক্তহীনতা উপস্থিত হয়। টম্যাটো (বিলাতী বেগুন), কাঁচাকলা, মোচা, ডাল, পেঁয়াজ, নানাবিধ ফল, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে প্রয়োজনমত লৌহ পাইয়া থাকি। ফস্ফরাস্ আমাদের দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। আমাদের হাতের প্রধান উপকরণ ক্যাল-সিয়াম ফস্ফেট্ (calcium phosphate)। ইহা ব্যতীত ফস্ফরাস আমাদের রক্তকণাকে সবল করে ও tissue সমূহের গঠনকার্য্যে সহায়তা করে। দুগ্ধ, ডিম, ডাল, মাছ, মাংস প্রভৃতির মধ্যে ফস্ফরাস্ পাওয়া যায়; লবণ (sodium chloride) আমরা প্রত্যহ যথা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহা হইতে পাকস্থলীতে (gastric juice)



শূন্যে ট্রাপিজের ক্রীড়া।

পাচক-রসের উদ্ভব হয় এবং এই পাচক-রসই প্রোটীন খাদ্যের পরিপাককার্য্য সমাধা করে। মাছের তৈল ও নানাজাতীয় শাকসব্জি হইতে আমরা প্রয়োজনমত আয়োডিন্ (Iodine) পাইয়া থাকি।

(৫) খাদ্যপ্রাণ (Vitamins) :—"খাদ্যপ্রাণ শব্দটি বঙ্গভাষায় নূতন; অনেকে ইহার নাম শুনিয়াছেন কিন্তু ইহার প্রকৃতি, উপকারিতা, কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান অতি অল্প। খাদ্যের অন্তর্নিহিত প্রাণস্বরূপ এই ভাইটামিনের প্রকৃতি ও কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে খাদ্য বিষয়ে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; সুতরাং খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধের অন্তর্গত না হইলে ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় অত্যাবশ্যক। খাদ্যের মধ্যে আনুবীক্ষণিক পরিমাণে অবস্থিত এই



শ্রীমান নীলমণি বক্সী চাকা ধরিয়া একটি মোটরের গতিরোধ করিতেছেন।

প্রয়োজনীয় সারভূত পদার্থের অস্তিত্ব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেহ অবগত ছিলেন না; রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহার অস্তিত্ব নির্ণয় করা যাইত না; নব্যরসায়নশাস্ত্রের উন্নতি ও উন্নতপ্রকারের বিশ্লেষণ প্রণালীর (improved analytical methods) আবিষ্কার হওয়াতে বর্ত্তমানে ইহা সম্ভব হইয়াছে। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ডাঃ হপ্‌কিন্স (Hopkins) তাঁহার একনিষ্ঠ সাধনার বলে "খাদ্য, পুষ্টি ও বৃদ্ধি"—(foods, nutritions and growth) সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক গবেষণা দ্বারা এই ভাইটামিন্ তথ্য আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকগণকে চমৎকৃত করিয়াছেন ও তাঁহার সাধনার পুরস্কারস্বরূপ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। প্রথমে তিনিই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে উপরিউক্ত প্রোটীন্ কার্ব্বোহাইড্রেট প্রভৃতি খাদ্যের সারভূত উপাদানগুলি যথোপযুক্তভাবে গ্রহণ করিলেও যদি খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব হয় তাহা হইলে আমাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে—"the absence of factors which add almost nothing to the bulk at a dietery may make the whole entirely inadequate" ও আমরা কতকগুলি বিশিষ্ট কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হই। পরে ওস্‌বোর্ণ (T. B. Osborne), মেণ্ডেল (L. B. Mendel), ম্যাক্ কলাম্ (Mc. Collum), ডেভিস্ (M. Davis), ড্রামণ্ড (Drummond), হেস (A. F. Hess), শেরম্যান (H. C. Sherman) ও স্মিথ প্রমুখ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ভাইটামিন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের রাসায়নিক পণ্ডিত ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রকৃতির অনেক গোপন তথ্যের আবিষ্কার ও জটিলতর খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। জীবদেহে নানাপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা, রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাইটামিনের অস্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, উন্নততর রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কয়েকটি ভাইটামিন কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করাও সম্ভবপর হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক প্রমাণ হইতে জীবদেহে ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমান করা যায়; কোন খাদ্যে কোন প্রকার ভাইটামিন কত পরিমাণে বর্ত্তমান তাহা জানা উচিত। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাখন, কডলিভার অয়েল, মাছ, মাংস, ডিম, ঢেঁকিছাটা চাউল, আটা, টাটকা তরী তরকারী, শাকসবজী, কমলালেবু, পাতিলেবু, নানা জাতীয় ফল, টম্যাটো, পালমশাক, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ প্রভৃতি ডাল, কলাইশুঁটি, পিঁয়াজ কপি, শালগম প্রভৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে এক, দুই বা ততোধিক প্রকার ভাইটামিন আছে। সুতরাং এই সমুদয় খাদ্য পর্য্যায়ক্রমে গ্রহণ করিলে আমাদের দেহে ভাইটামিনের অভাব ঘটে না; বাংলায় ফল ও শাকসব্জীর অভাব নাই; প্রকৃতি তাঁহার বিবিধ ফল ও শস্যসম্পদ প্রদানে কার্পণ্য

করেন নাই; একটু সচেষ্ট হইলে আমরা সহজেই প্রয়োজনীয় খাদ্যপ্রাণযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারি এবং নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারি।

(৩) ব্যায়াম-বিমুখতা:—বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার অপর একটি প্রধান কারণ ব্যায়াম-বিমুখতা; শরীরচর্চ্চায় এরূপ অপূর্ব্ব বৈরাগ্য জগতে বিরল। সাধারণ বাঙ্গালীর কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই; অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০।৬৫জন ছাত্র কোনপ্রকার শরীর চর্চ্চা করে না। ঠিকমত ব্যায়ামচর্চ্চা করে এরূপ বাঙ্গালী ছাত্র শতকরা ১০জন আছে কিনা সন্দেহ; ছাত্রজীবনেই এই অবস্থা—তাহা হইলে কর্ম্ম-জীবনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিলেই আমরা সকল প্রকার শরীরচর্চ্চা একেবারেই ছাড়িয়া দিই এবং সকল প্রকার শারীরিক শ্রমের কার্য্যই আমাদের অসহনীয় ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের, অধিকন্তু ইউরোপীয় দেশসমূহের অধিবাসীদিগের মধ্যে ব্যায়ামের যথেষ্ট প্রচলন রহিয়াছে; শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যকাল অবধি আজীবন তাহারা কোন না কোন প্রকার খেলাধূলা বা ব্যায়ামচর্চ্চা করিয়া থাকেন এবং তাহার সুফলস্বরূপ বৃদ্ধ বয়সেও তাহাদের দেহ সুগঠিত ও বলসম্পন্ন থাকে, মন প্রফুল্ল ও উৎসাহপূর্ণ থাকে এবং নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করেন। আর শরীরচর্চ্চার একান্ত অভাবে ও অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার প্রভাবে—শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়—যৌবনসীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বহুমূত্র প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অকালবার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেছে ও প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভেই কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। আজকাল বাঙ্গালী যুবক ও ছাত্রগণের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চার প্রচলন কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সংপ্রতি কয়েকজন কৃতবিদ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি শরীরচর্চ্চার ব্যাপকপ্রচার ও উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দৃষ্টিও এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্কুল ও কলেজসমূহের ছাত্রগণের মধ্যে বাধ্যতামূলক ব্যায়ামশিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন; ইহা আরও সুখের বিষয় যে কলিকাতার বালিকা বিদ্যালয়-গুলিতেও ব্যায়ামের প্রচলন হইতেছে—মাতৃজাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি যে জাতীয় স্বাস্থ্য সংগঠনে সহায়তা করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এবারে ব্যায়াম—"আদর্শ ব্যায়াম" কি, স্বাস্থ্যলাভ করিতে হইলে প্রথম শিক্ষার্থীকে কিরূপ পদ্ধতি অনুসারে ব্যায়াম করিতে হইবে ও জনসাধারণের মধ্যে শরীরচর্চ্চার ব্যাপকপ্রচার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে; কেহ কেহ মনে করেন যে, যে কোন

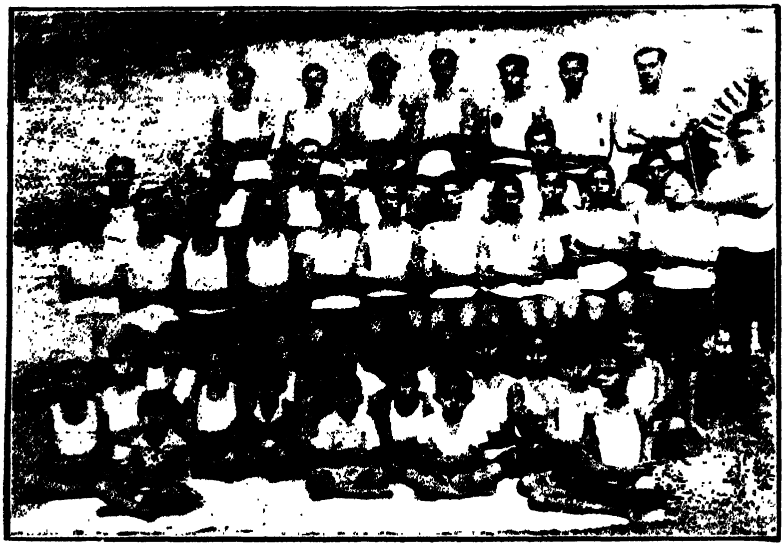


শ্রীমান অমূল্যরতন ঘোষ বুকের উপর দিয়া ২৫জন লোক সমেত একখানি গরুর গাড়ী চালাইতেছেন।

প্রকার দৈহিক পরিশ্রমের কার্য্য দ্বারা ব্যায়ামের প্রয়োজন সাধিত হয়; তাঁহাদের ধারণা কতকাংশে সত্য হইলেও—"আদর্শ ব্যায়াম"—তাহার প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষাপ্রণালী ও তাহার ফল সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা নাই। শুধু দৈহিক উৎকর্ষ ও বলাধানই যথার্থ ব্যায়ামের উদ্দেশ্য নয়; সকলেই জানেন শরীরের সহিত মনের অতি সূক্ষ্ম সম্বন্ধ বিদ্যমান; সুতরাং যথোপযোগী ব্যায়াম দ্বারা মানসিক বৃত্তিগুলিকে স্ববশে আনয়ন করা সম্ভব; শুধু তাই নয়, ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক-বিকাশের সহায়তা লাভ করা যায়; এইরূপে শরীর মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ কার্য্যের উপযোগী হইতে পারে; যে ব্যায়াম-প্রণালী দ্বারা শরীর, মন ও জীবনী-শক্তি পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হয় তাহাই বিজ্ঞানসম্মত ও আদর্শস্থানীয়।

স্বাস্থ্যলাভের জন্য ব্যায়াম অভ্যাসের প্রণালী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে; প্রথম শিক্ষার্থীগণ সাধারণতঃ ডন, বৈঠক, শুধু হাতে ব্যায়াম (Free hand exercise) প্রভৃতি অভ্যাস করেন অথবা প্যারালাল বার (Parallel bars), ডাম্বেল (Dumb-bell), বারবেল (Barbel), কুস্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যায়াম করিতে পারেন; কিন্তু এ বিষয়ের সমাধান করিতে হইলে একজন ব্যায়ামবিদের সাহায্য প্রয়োজন; সেই প্রণালী অনুযায়ী ব্যায়াম করিলে শীঘ্রই সুফল প্রত্যাশা করা যায়; সুগঠিত-দেহ বলবান ব্যক্তিমাত্রেই যে ব্যায়াম-শিক্ষক হইতে পারেন তাহা নয়; আদর্শ ব্যায়াম শিক্ষকের শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কারণ তাহা না হইলে তিনি ব্যক্তিবিশেষের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী ব্যায়াম-প্রণালী নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইবেন। এরূপ ব্যায়াম-শিক্ষকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অল্প হইলেও এরূপ অনেক ব্যায়ামবিৎ আছেন যাঁহাদের প্রণালী অনুযায়ী ব্যায়াম করিলে সুফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। বঙ্গের ব্যায়ামবিদ্‌গণের মধ্যে বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ গুহ [গোবরবাবু], বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দাস, ক্যাপ্টেন পি-কে-গুপ্ত প্রভৃতির নাম সকলেই জানেন। ইঁহারা এবং কলিকাতা ও মফঃস্বলের উদীয়মান তরুণ যুবকগণ যদি স্বার্থত্যাগ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

ব্যায়ামশিক্ষার বহুল প্রচারোদ্দেশে বঙ্গের সর্ব্বত্র উপযুক্ত শিক্ষক পরিচালিত ব্যায়ামাগারের আবশ্যক। কলিকাতায় এরূপ ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই, কিন্তু পল্লীগ্রামে ইহার একান্ত অভাব; কয়েকজন উদ্যমশীল যুবকের প্রচেষ্টায় এইরূপ সমিতি গঠন করিয়া পল্লীর জনসাধারণ, ছাত্র ও বালকগণের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চার প্রেরণা আনা যাইতে পারে। শরীরচর্চ্চাকে ব্যায়ামাগারের আদর্শরূপে রাখিয়া নানাপ্রকার জিম্‌নাষ্টিক্ ক্রীড়াও (Gymnastics) এই সকল প্রতিষ্ঠানে রাখা আবশ্যক; কারণ তাহা ব্যায়ামের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়া বিশেষ বিশেষ পেশী সংগঠনে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহার আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা দ্বারা এককালেই সাহস ও বলবৃদ্ধি হয় এবং তৎপরতা (agility), সহনশীলতা (stamina), প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি পুরুষোচিত সদ্‌গুণ লাভ করা যায়। শরীরচর্চ্চার প্রচারোদ্দেশে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ও আদর্শ-ব্যায়ামশিক্ষার আচার্য্যস্বরূপ আমরা ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করিতে পারি; ইনি বিভিন্ন প্রকার ব্যায়ামচর্চ্চায় অত্যাশ্চর্য্য পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন ও শক্তিচর্চ্চায় অনেক রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত "বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম সমিতি" কলিকাতার—কেন ভারতের—একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান; ইহা ব্যতীত ইনি কলিকাতার ও বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানে



"সুখচর ওরিয়েণ্টাল জিম্‌নাসিয়ামের" সদস্যবৃন্দ।

প্রায় দুই শতাধিক ব্যায়ামাগারের পরিচালক ও অবৈতনিক শিক্ষক। উদাহরণস্বরূপ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পল্লীগ্রামের একটি ব্যায়াম সমিতি—"সুখচর ওরিয়েণ্টাল জিম্‌নাসিয়ামের" উল্লেখ করা যাইতে পারে। আচার্য্য বসন্তকুমারের শিক্ষকতায় উক্ত গ্রামের বালক ও যুবকগণ তাহাদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছে ও নানা প্রকার ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শনে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। ২৪পরগণার মধ্যে ইহাকে একটি শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। উক্ত জিম্‌নাসিয়ামের ব্যায়ামোৎসাহী বালক ও যুবকবৃন্দের সৌজন্যে তাহাদের ব্যায়াম ও শক্তি-ক্রীড়ার কয়েকটি চিত্র এখানে দেওয়া হইল। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালার ডিরেক্টার অফ্ ফিজিক্যাল ইন্‌স্ট্রাকসন্ (Director of Physical Instruction) জেমস বুকানন (James Buchanon) সাহেবের শিক্ষকতায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে বঙ্গের বিভিন্ন জেলার স্কুলের শিক্ষকগণ ব্যায়াম প্রণালী ও ব্যায়ামের মূলতথ্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতেছেন; এতদ্বারা স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে ব্যায়ামের বহুল প্রচার ঘটিবে সন্দেহ নাই; স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে একজন উৎসাহী ব্যায়ামবিদ্ ছিলেন ও শরীরচর্চ্চার প্রসারকল্পে প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন; ইহা হইতে স্বতঃই অনুভূত হয় যে দেশে ব্যায়ামচর্চ্চা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে ও অদূর ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং তাহা হইলে দেশের যে মঙ্গল হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৪) বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার চতুর্থ কারণ সম্বন্ধে দুই একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া এই স্বাস্থ্য-প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেকেই হয়ত এই কারণটিকে প্রয়োজনীয় ও সঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন না। চিন্তার সহিত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে অপর কারণগুলির মত ইহাও স্বাস্থ্যহীনতার একটি প্রধান কারণ। বাস্তবিক ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহিত জীবনে সংযমের অভাবে আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্য ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িতেছে; ছাত্রজীবনে ইন্দ্রিয়সংযমের অভাবজনিত কুফল একবার ঘটিলে যাবজ্জীবন তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। কুরুচিপূর্ণ পুস্তক পাঠ ও দুর্নীতিবহুল চলচ্চিত্র-দর্শন সুকুমারমতি ছাত্রদিগের মনে কিরূপ বিষময় ফল উৎপাদন করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রগতিবাদী লেখক ও সিনেমাওয়ালাদিগের অনুগ্রহে দেশ এই দুইটি জিনিসে পূর্ণ হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবাদীগণ (Modernists) হয়ত একথা শুনিয়া হাসিবেন; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন



আট বৎসরের বালক শ্রীমান করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় গলনলীর সাহায্যে একটি রড বাঁকাইতেছেন। (½″ × ১২′)

যে জাতীয় জীবন ইহার দ্বারা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বিবাহিত জীবনে সংযমাভাবের জন্যই দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারে "ফলরূপ পুত্রকন্যার" আবির্ভাব হইতেছে এবং উপযুক্ত খাদ্যাভাবে তাহারা হীনস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে ও অন্নসমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিতেছে। জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানকল্পে স্বাস্থ্যরক্ষার এই শেষোক্ত কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং ইহার আংশিক সমাধান হইলেও যে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞানের নূতন দৃষ্টিকোণ

কমলেশ রায়

প্রবন্ধ

সবেরই পরিবর্তন হচ্ছে। ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তনের মূলে অনেকগুলি কারণের প্রভাব বর্তমান থাকে। সব কারণগুলি যথাযথ নির্ণয় করা সম্ভব নয় বলে সাধারণতঃ লোক বলে থাকে 'যুগধর্ম্ম' বা 'কালের প্রভাব'। বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্ত্তন অতি দ্রুত। এর কারণও খুব স্পষ্ট। বিজ্ঞানের প্রতি 'কালের প্রভাব' 'যুগধর্ম্ম' প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট ভাবপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করবার প্রয়োজন নাই।

সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত ;—সূক্ষ্ম-কর্ম্ম-পটু হাত এবং সূক্ষ্মতম যন্ত্রাদি বিজ্ঞানে নিযুক্ত র'য়েছে। প্রকৃত বিজ্ঞান—পরীক্ষা বিজ্ঞান (experimental science) আরম্ভ হ'য়েছে আজ প্রায় তিনশ বছর হ'ল—গ্যালিলিও ও নিউটনের সময় থেকে। গণিত এবং জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান (astronomy) প্রায় তিনহাজার বছরের পুরানো ; যদিও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের জন্ম হয় গ্যালিলিওর হাতে। উন্নত গণিত 'ক্যালকুলাস' নিউটন ও তাঁর সমসাময়িক লাইবনিৎজের মানসিক উৎকর্ষ ও গভীর জ্ঞানের ফল। এই গণিত হ'য়ে উঠ্‌ল পরবর্ত্তী কালের বিজ্ঞানের সুষ্ঠু ভাষা। শুধু তাই নয়, এটা একটি উপযোগী যুক্তি-যন্ত্র বিশেষ, যা'র সাহায্য না পেলে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ত।

বিজ্ঞানের যে অভাবনীয় উন্নতি হ'য়েছে—বিশেষতঃ গত কয় বছরের মধ্যে, সেকথ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। শুধু বিজ্ঞানের ফলে কয়েকটি মৌলিক ভাবধারা পরিবর্ত্তনের কথা আলোচনা করব মনে করেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নব্য বিজ্ঞানের যুগ ১৮৯০ থেকে—যেটা আরম্ভ হ'য়েছে কয়েকটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, যথা রঞ্জনরশ্মি, রেডিয়াম, ইলেক্‌ট্রণ, ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পরীক্ষালব্ধ তথ্য চিন্তাধারাকে নব নব পথে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছে।

বাস্তবিক পরীক্ষা ও গণিতই বিজ্ঞানের অবলম্বন। 'পরীক্ষা'রূপ নিকষে যাচাই না হ'লে বৈজ্ঞানিক কোনও তথ্যের বা মতবাদের (theory) সত্যতা সম্বন্ধে কোনও মূল্যই ধার্য্য হ'বে না। এটাই বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। পরীক্ষাই বিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তি।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে যে প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছে, তার সহস্রগুণ পরিবর্তন এসেছে দর্শনের দৃষ্টিকোণে। প্রত্যেকটি দিক পৃথকভাবে আলোচনা করতে গেলে এক একটি বিরাট গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে, তাই সংক্ষেপে অল্পবিষয় আলোচনা করব।

যে তিনটি পরীক্ষালব্ধ আবিষ্কারের কথা বলেছি—রঞ্জনরশ্মি, রেডিয়াম, ইলেক্‌ট্রণ—তা'রা সূক্ষ্ম জগতের গূঢ় পরিচয়। এদের অবলম্বন ক'রে যে চিন্তাধারা গড়ে উঠ্‌ল এবং মানুষ যে সত্যের সন্ধান পেলো, তা' অভাবনীয় অপূর্ব্ব।

বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেছিলেন যে, যে-সকল প্রাকৃতিক আইন সূত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে সেগুলি সকল স্থানেই প্রযোজ্য। কিন্তু অনেকগুলি সূত্র দেখা যায় কেবলমাত্র স্থূলরাজ্যেই প্রযোজ্য, সূক্ষ্ম পরমাণবিক জগতে নয়। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের আইনকানুন বিভিন্ন।

আমাদের দৃষ্টি স্থূল হ'তে সূক্ষ্মের দিকে চালিত হ'চ্ছে। কেপ্‌লার, নিউটন, গ্যালিলিও এঁ'রা যে সব সূত্র আবিষ্কার করেছেন সেগুলি স্থূল জগতের পক্ষে যথেষ্ট ; আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও সকলপ্রকার ব্যবহারিক বিজ্ঞান জগতে আমরাও যথেষ্ট স্থূল মাপকাঠিতে গড়া। কিন্তু মন? মানুষের মন, বুদ্ধি, অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম! তা'ই সে জানতে চেয়েছে এবং জানতে পেরেছে স্থূলেরও গঠনমূলে কত সূক্ষ্ম উপাদান রয়েছে। এই সূক্ষ্ম পরমানবিক জগতের মাপকাঠি এবং হিসাবনিকাশও অনুরূপ সূক্ষ্ম। স্থূলজগতের আইনকানুন সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম আইন-কানুনের মোটামুটি প্রান্তিক (approximate) হিসাব। এইজন্য সূক্ষ্মজগতের নিখুঁত হিসাব স্থূল জগতের পক্ষে বাড়াবাড়ি এবং স্থূল জগতের সূত্র সূক্ষ্ম জগতে অচল।

ম্যাক্সওয়েলের আবিষ্কৃত আলোকের তাড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গবাদ সাধারণ আলোকের বেলা সম্পূর্ণ ব্যাপকভাবে খাটে না, কারণ এই আলোক সৃষ্টি হয় জড় পরমাণুর অন্তর্দ্দেশ থেকে এবং এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও অতি অল্প—এক ইঞ্চির প্রায় লক্ষভাগ। কিন্তু সুদীর্ঘ বেতার তরঙ্গের প্রতি ম্যাক্সওয়েলের সূত্র সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

আবার বিদ্যুৎযুক্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে কুলম্বের যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ সূত্র, নিকটবর্ত্তী পরমাণু কেন্দ্রীন ও আল্‌ফা কণিকার বেলা সেই সূত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

যে প্রক্রিয়ায় বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি হয় ব'লে জানা আছে, ঠিক সেই কারণে সাধারণ আলোক সৃষ্টি হ'লে জড় পরমাণু এতদিনে লুপ্ত হ'য়ে যেতো। বেতার-বিকীরণ হয় যন্ত্রস্থিত বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্ত্তনের ফলে। যখনই বিদ্যুৎপ্রবাহ গতিবেগ বা গতিমুখ পরিবর্তন করে তখনই আলোক জাতীয় তরঙ্গ বিকীর্ণ হয়। কিন্তু এই মত সাধারণ পরমাণু নির্গত কিরণের বেলা খাটে না। রাদারফোর্ড বোরের চিত্র অনুসারে এক একটি পরমাণু একটি কেন্দ্রীন (nucleus) ও পারিপার্শ্বিক ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রন দ্বারা গঠিত। 'ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রন'গুলি পরিবর্তনশীল

বেগ সম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহের অনুরূপ অতএব পরমাণু মাত্রেরই সর্ব্বদাই আলোক বিকীরণ করা উচিত। এরূপ হ'লে ইলেক্‌ট্রনগুলি ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে কেন্দ্রীনের সাথে মিলিত হ'য়ে পরমাণুর গঠন লুপ্ত ক'রে দেবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা' হয় না।

এই সকল কারণে পরমাণু রাজ্যের জন্য ভিন্ন দর্শন, ভিন্ন ব্যবস্থা, ভিন্ন সূত্র ও ভিন্ন গণিতের আবশ্যক হ'য়েছে। প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনষ্টাইন্‌, ডু-ব্রগ্‌লী, স্রোডিংগার, সোমেরফেল্‌ড্‌, ম্যাক্স্‌বর্ণ—এঁরা পরমাণু বিজ্ঞান মীমাংসার ভার নিয়ে অগ্রণী হ'লেন।

এই সময় একটি বিষয় আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না। জড়ের অক্ষয়তা ও বিশ্বের সমগ্র শক্তির অব্যয়তার সত্য বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ। প্রদীপের তৈল দৃশ্যতঃ বিলুপ্ত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে অঙ্গারাম্ল, জলীয়বাষ্প প্রভৃতিতে রূপান্তর হয় মাত্র। এইরূপে বিদ্যুৎশক্তির পরিণতি আলোকে, আলোকের রূপান্তর তাপে, তাপের রূপান্তর এঞ্জিনের চলচ্ছক্তিতে হ'তে পারে, বিলুপ্ত হয় না। ডিমোক্রিটাসও বলেছিলেন—প্রকৃতির এই সংরক্ষণশীলতা না থাক্‌লে সৃষ্টি এতদিনে নিঃশেষ হ'য়ে যেতো। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে আইনষ্টাইন দেখিয়েছেন, জড় ও শক্তি পৃথকভাবে সংরক্ষিত (conserved) হয় না উহারা পরস্পর রূপান্তরশীল। কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্মরাজ্যের আইনকানুনের পার্থক্য দেখে অনেকের মনে সন্দেহ হ'য়েছে—বুঝি বা সূক্ষ্ম জগতে এই যুগ্ম সংরক্ষণ প্রণালীরও ব্যতিক্রম দেখা যাবে এবং হয়তো এই সংরক্ষণ-শীলতা প্রকৃতির একটি সমষ্টিগত সত্য (statistical truth)। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক শ্যাঙ্কল্যাণ্ড সূক্ষ্ম রাজ্যের এই সংরক্ষণশীলতা সম্বন্ধে গবেষণা করেন। প্রথম পরীক্ষায় তিনি এই সূত্রের ব্যতিক্রম সন্দেহ করেন; তখন বিজ্ঞান জগতে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু প্রচুর পরীক্ষা ও গবেষণার পর তিনি প্রমাণ করেছেন যে এই সংরক্ষণসূত্র অতি নিখুঁতভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সূক্ষ্মরাজ্যেও বর্ত্তমান।

পরীক্ষা ও মীমাংসা এই যুগে অতি প্রবল বেগে চলেছে। প্রত্যেক দিন কত নূতন নূতন আবিষ্কার হ'চ্ছে তা'র ইয়ত্তা নেই। সকলগুলির মীমাংসা হ'য়ে উঠ্‌ছে না। মৈমাংসিক বিজ্ঞানের (theoretical science) এ এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।

বাস্তবিক বিজ্ঞানে 'মীমাংসার' অর্থ কি? মীমাংসার অর্থ প্রযুক্ত-সূত্রের ব্যাপকতা। প্রযুক্ত ব্যাখ্যা ও মতবাদ যত ব্যাপক হবে তার' উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা ও তত বেশী। ব্যাখ্যা নির্ভুল হ'লে সেই সূত্র সার্ব্বিক হ'বে এবং তৎপ্রয়োগে অ-দৃষ্ট ঘটনার অস্তিত্ব ভবিষ্যদ্‌-বাণী করা সম্ভব হয়। এইরূপে আইনষ্টাইন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মতবাদ অনুসারে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে আলোক বক্রণের যে ভবিষ্যদ্‌-বাণী করেন তা' ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পরীক্ষা দ্বারা যথাযথ প্রমাণিত হয়। বোরের বর্ণচ্ছত্র মতবাদ প্রয়োগ ক'রে কতগুলি অনাবিষ্কৃত বর্ণালোক রেখা (spectral line) খুঁজে বা'র করা সম্ভব হ'য়েছে।

প্লাঙ্ক ও আইনষ্টাইনের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে পাওয়া গেল—আলোক-তরঙ্গের সূক্ষ্ম কণিকা-প্রকৃতির মূল রূপ। যেটা নিউটনের আলোককণা-বাদের যুগে কিছুই জানা যায় নি। এইজন্য বলে রাখি, নিউটনের 'আলোক কণিকা' ও বর্ত্তমানে আলোকের 'কণা'বাদ সম্পূর্ণ পৃথক, যদিও শব্দগত বর্ণনা একই। দুইয়ের মূলগত ভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নব্য বিজ্ঞান মতে আলোকের মধ্যে তরঙ্গ-প্রকৃতি ও কণিকা-প্রকৃতি উভয়ই বিদ্যমান এবং আজ পর্য্যন্ত অসংখ্য পরীক্ষা দ্বারা এর প্রকৃত রূপ অনেকটা নিরূপিত হ'য়েছে। আবার গত দশ বারো বছর হ'লো জানা গিয়েছে যে সূক্ষ্ম জড়কণা 'ইলেক্‌ট্রণ' যথেষ্ট বেগ সম্পন্ন হ'লে তাদের মধ্যে তরঙ্গ-ধর্ম্ম পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। অর্থাৎ 'জড়ত্ব' ও 'তরঙ্গতা' প্রকৃতির যুগ্ম ধর্ম্ম। পূর্ব্বে যেমন জড় ও শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় মৌলিক সত্তা ব'লে মনে করা হ'তো, এখন সে কথা ঠিক বলা চলে না। উপরন্তু পরমাণুর মৌলিক গঠনপ্রণালী ও সেখানকার গতি-বিজ্ঞান সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে জড়ত্ব অপেক্ষা তরঙ্গভাবই স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে। ডু ব্রগ্‌লী, স্রোডিংগার, হাইসেনবার্গ—এঁরা পরমাণু রাজ্যে উর্ম্মিবিজ্ঞান (wave mechanics) প্রয়োগ ক'রে সবিশেষ ফল লাভ করেছেন। এই উর্ম্মিবিজ্ঞানের মূলে যে দুরূহ গণিত রয়েছে তা বিংশ শতাব্দীর সূক্ষ্ম যুক্তি বিচারের চরম নিদর্শন।

কিন্তু অন্যদিকে অল্প অসুবিধা দেখা যায়। পরীক্ষা, গণিত ও বিবেচনা বিজ্ঞানে যেরূপ অবশ্য প্রয়োজন, ব্যাখ্যায় মানসিক চিত্রের প্রয়োজনীয়তাও অল্প নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে গণিতিক ব্যাখ্যা ছাড়াও ম্যাক্সওয়েল ও ফ্যারাডে বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের প্রভাবে আকাশে যে কর্ষ (Strain) সৃষ্টি হয় তা'র চিত্র এঁকেছিলেন। রাদার-ফোর্ড ও বোর পরমাণু-সংগঠনে সৌরজগতের অনুরূপ চিত্র এঁকেছিলেন। ডু ব্রগ্‌লীও ইলেক্‌ট্রণ তরঙ্গের মোটামুটি চিত্র দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কণিকাবিজ্ঞান ও উর্ম্মিবিজ্ঞানের কোনওরূপ ছবিই প্রায় দেওয়া যায় নি বা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। আধুনিক ব্যাখ্যাগুলি অধিকাংশই গণিতের প্রভাবে চল্‌ছে। কিন্তু মনের পক্ষে চিত্রের প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। যে গতিশীল ইলেক্‌ট্রণ তরঙ্গরূপ প্রকটিত করছে তা'কে দেখা সম্ভব হ'লে কি 'রূপে' তাকে দেখ্‌তাম সেই চিত্রের কল্পনায় আমাদের মন উন্মুখ হ'য়ে থাকে। যদিও গণিতিক হিসাব দিয়ে নিখুঁতভাবে তার ফলাফল নির্ণয় করতে পারছি, তবু তার প্রকৃত প্রক্রিয়ার চিত্র থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদের মন অতৃপ্ত থেকে যায়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে অনেক ক্ষেত্রেই ঐরূপ চিত্রের কোনও মূল্য নেই, অতএব ঐ অলীক চিত্রের জন্য ব্যস্ত হওয়ারও প্রয়োজন নাই। স্রোডিংগারের উর্ম্মিবিজ্ঞানে জড়পরমাণুর কোনও গঠনচিত্র দেওয়া হয় নাই—যেটা বোরের মতবাদে ছিল। এতে অবশ্য কোনও ক্ষতি হয় নাই। পরমাণুর অন্তর্দ্দেশ দেখা এবং ভিতরের কোনও মাপজোপ করা সম্ভব নয়। বাইরে থেকে এর প্রকৃতির যে যে প্রক্রিয়া (যথা, আলোক কম্পন ইত্যাদি) আমাদের পরিমাপযন্ত্রে ধরা দেয় সেইগুলিই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য এবং এরই উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যা' আমরা ধরতে পারবো না, মাপতে পারবো না, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে যার সাড়া পাবো না, তার মূল্য আমাদের কাছে কিছুই নয়।

বহুকাল থেকে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতিবিধি এরূপ নিখুঁতভাবে জানা গিয়েছে যে হিসাব ক'রে নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়—কোন্‌টি কখন কোথায় থাকবে। জ্যোতিষ্ক জগতের মতো পরমাণবিক জগতকেও সেই রকম জ্ঞানের আয়ত্বাধীনে আনা যায় না কি? মানুষ কতদূর জানতে পারে? প্রকৃতির প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া জানা সম্ভব কিনা এবং বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে মানুষ ত্রিকালজ্ঞ হ'তে পারে কিনা!

ডিমোক্রিটাস জড়জগতকে দেশ ও জড়পরমাণুর (space and atoms) সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। এপিকিউরাস, লুক্রেসাস্—এ-রাও সৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ জড়বাদী ছিলেন। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেই জড়বাদী দার্শনিকগণ বলেছিলেন—জড়জগতের সকল ঘটনার মূল জড়ের আণবিকতা। এই সকল অণুপরমাণুর বিবিধ গতিবিধি, সংযোজন, বিয়োজনের ফলে বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার উৎপত্তি। প্রায় চল্লিশ বছর হ'ল আমরা জানতে পেরেছি যে পরমাণুর গঠনমূলে সূক্ষ্মতর ইলেক্‌ট্রণ। অতএব এখনকার জড়বাদীরা বলেন—সকল ঘটনার মূল কারণ ইলেক্‌ট্রণের অবস্থান ও গতিবিধি।

যদি সমস্ত ইলেক্‌ট্রণের অবস্থান ও গতিবিধি নির্ণয় করা যায় তবে অনায়াসে বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যতকে গণনার আয়ত্বের মধ্যে আনা যাবে, প্রকৃতির অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হ'বে। এটা সম্ভব কিনা সে কথা পরে আলোচনা করছি, এখন দেখা যাক্ প্রকৃতির এই নির্দ্ধারকতার (determinacy) ফল কি?

আমরা মনে করি বিশ্বজগৎ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের একটি সুগঠিত বিরাট যন্ত্র। এই কার্য্যকারণ সূত্র (law of causality) এরূপ গূঢ় এবং ব্যাপক যে, সে এই যন্ত্রের প্রত্যেকটি অণু পরমাণু ও ইলেক্‌ট্রণকেও নিয়ন্ত্রিত করছে—তাহ'লে বলতে হয় 'ভবিষ্যতের' মূলে রয়েছে নির্দ্দিষ্ট 'বর্ত্তমান'। অর্থাৎ 'বর্ত্তমান'রূপ কারণের ফল হ'চ্ছে 'ভবিষ্যৎ'। কারণ এই মুহূর্ত্তে অণুপরমাণু ও ইলেক্‌ট্রণগুলি যে স্থানে যে বেগে এবং যে অবস্থায় রয়েছে তারি ফলে তা'রা ভবিষ্যতের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উপনীত হ'বে। অতএব সৃষ্টির আদিমকাল হ'তেই জগতের ক্রমপরিণতি ও নিয়তি নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে আছে, কারো পরিবর্ত্তন করবার সাধ্য নাই। এমন কি, আমরা যা' ভাবছি, যা' করছি—তা'ও প্রকৃতির ঐ নির্দ্দিষ্টতা দ্বারা স্থির হ'য়েছিল। এই দর্শন মতে মানুষের স্বাধীন চিন্তা (freedom of will) ব'লে কোনও সত্ত্বা নাই এবং চিন্তাধারা, জগতের উন্নতি, অবনতি সকলই নিয়তির নির্দ্দিষ্ট সূত্রে চলছে। এই মতবাদ কতদূর সত্য সেকথা পরে আলোচনা করছি, কিন্তু স্বাধীন চিন্তাপ্রিয়দের কাছে মনের উপর এই অপবাদ প্রয়োগ একটুও বাঞ্ছনীয় নয়। শুধু তাই নয়, এই দর্শনবাদ অত্যন্ত নিরুৎসাহব্যঞ্জক এবং সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর।

স্থূলজগতে কার্য্য-কারণ সূত্রের দৃঢ়তা আমরা যত স্পষ্টভাবেই দেখি না কেন, সূক্ষ্মতম রাজ্যে তা'কে ধরা বড় কঠিন, হয়তো অসম্ভব! হাইসেনবার্গ প্রমুখ পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন কোনও ঘটনার নিরীক্ষণ-প্রণালীই (method of observation) এরূপ যে সেটা প্রয়োগ করা মাত্রই দৃষ্ট ঘটনার পূর্ব্বাবস্থা অনিশ্চিতরূপে পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ যে অবস্থায় তাকে দেখ্‌লাম, দেখার ফলে সেই অবস্থায় আর সে থাক্‌ল না; অতএব যে উদ্দেশ্যে দেখ্‌তে চেয়েছিলাম সেটা অপূর্ণই রয়ে গেল। কারণ যা' দেখ্‌লাম সেই অবস্থার তৎক্ষণাৎ অনিশ্চিত পরিবর্তন হওয়ায় নিরীক্ষা মতে তার ভবিষ্যৎ ফলাফল গণনা করা সম্পূর্ণ ভুল হ'বে। পর্য্যবেক্ষণ যন্ত্রের যান্ত্রিক অপকৃষ্টতার জন্যই যে কেবল আমাদের পর্য্যবেক্ষণ নির্ভুল হয় না তা' নয়, পর্য্যবেক্ষণ প্রণালীর মধ্যেই ভুলের বীজ নিহিত রয়েছে, ফলতঃ সেই প্রণালী প্রয়োগ করলেই ভুলের অঙ্কুর উদ্গম হ'য়ে দৃষ্টিকে অল্পবিস্তর বিকৃত করবে। স্থূল রাজ্যে নিরীক্ষণ প্রণালী দ্বারা অনিশ্চয়তার পরিমাণ এত অল্প যে, সেটা গ্রাহ্য করবার প্রয়োজন নাই; এইজন্য সেখানে কার্য্যকারণের এত নিবিড় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখ্‌তে পাই। কিন্তু সূক্ষ্ম রাজ্যে আমাদের নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াই সেই রাজ্যের পূর্ব্বাবস্থা অনিশ্চিতভাবে বিকৃত করে ফেলে। এই অতি সূক্ষ্ম রাজ্যের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা এদের সমষ্টিগত (statistical) গতিবিধির দিকেই দৃষ্টি রাখি।

পূর্ব্বে বলেছি—সকল ঘটনার মূলে ইলেক্‌ট্রণের অবস্থান ও গতিবিধি কারণ সূক্ষ্মতম রাজ্য ইলেক্‌ট্রণের। ইলেক্‌ট্রণ অতি সূক্ষ্ম অতি লঘু বিদ্যুৎকণা। হাইসেনবার্গ দেখিয়েছেন ইলেক্‌ট্রণের মতো সূক্ষ্মকণার 'অবস্থান'ও 'গতিবেগ' নির্ভুল ভাবে এককালে নির্ণয় করা অসম্ভব। যদি অবস্থান নির্ণয় নির্ভুল ভাবে করতে চাই, গতিবেগ নির্ণয়ে অনির্দ্দিষ্ট ভুল এসে পড়বে; আবার গতিবেগ নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করতে গেলে 'অবস্থান' অনির্দ্দিষ্ট হ'য়ে পড়ে—নিখুঁত যন্ত্র প্রয়োগ সত্বেও। কি ভাবে হয়, একটি উদাহরণ দিয়ে বলছি।

মনে করা যাক্ একটি ইলেক্‌ট্রণকে আমরা নিরীক্ষণ করতে চাই—তার অবস্থা (অর্থাৎ অবস্থান ও গতিবেগ) নির্ণয় করবার জন্য। তা'র জন্য নিয়োগ করলাম উচ্চশক্তির একটি নিখুঁত অণুবীক্ষণ যন্ত্র (কাল্পনিক)। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনও বস্তু দেখ্‌তে হ'লে তা'কে আলোকিত করতে হ'বে এবং সূক্ষ্ম বস্তু দেখ্‌তে হ'লে উপযুক্ত ক্ষুদ্রতরঙ্গ আলোকের প্রয়োজন। ইলেক্‌ট্রণকে দেখতে হ'লে (ধ'রে নেওয়া যাক্, দেখা সম্ভব) অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আলোকের (রেডিয়াম নির্গত গামারশ্মি) প্রয়োজন হ'বে। কিন্তু এই শক্তিশালী রশ্মির বেগভারও (momentum) যথেষ্ট—ফলতঃ এই আলোকপাতে ইলেক্‌ট্রণটি ইতস্ততঃ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিক্ষিপ্ত হ'বে, অতএব নির্দ্দিষ্টভাবে তা'র গতিবেগ নির্ণয় করা সম্ভব হ'বে না। আবার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-তরঙ্গ আলোক ব্যবহারে গতিবেগের 'অনির্দ্দেশ' (uncertainity) অল্প হ'বে বটে কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে এর প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হ'য়ে পড়বে, ফলে অবস্থান নির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটবে। বলাবাহুল্য স্থূল জড়পিণ্ডের উপর এইরূপ আলোকাঘাতের ফল অতি সামান্য; এই কারণে স্থূল পর্য্যবেক্ষণে অনির্দ্দিষ্টতার পরিমাণও তদনুরূপ অকিঞ্চিৎকর। জু ব্রগ্‌লী উপমা দিয়ে বলেছেন যে, সূক্ষ্ম কণিকার 'অবস্থান' এবং 'গতিবেগ' যেন কাচখণ্ডের দুই পৃষ্ঠে আঁকা।—যদি একটির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করি তবে অন্যটি

দৃষ্টিপথে ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে এবং যতই নিবিষ্ট হ'য়ে একটিকে দেখ্‌তে চাই—অন্যটির চিত্র ততই অস্পষ্ট হ'য়ে পড়ে। একই সময় দুইটিকে সুস্পষ্টভাবে দেখা অসম্ভব।—উপমাটি সুন্দর।

সূক্ষ্মতম পরিমাপের মধ্যে যে অনিশ্চয়তার মূল রয়েছে সেটাই প্রকৃতির চরম আবরণ। এই অবগুণ্ঠন উন্মোচন করা মানুষের সাধ্য নয়—এই দিয়ে মানুষের তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অন্তরালে প্রকৃতি আপনাকে চির-রহস্যজালে আবৃত ক'রে রাখ্‌বে।

প্রকৃতির এই অনির্দ্দিষ্টতা যদিও চরম জ্ঞানলাভের চির অন্তরায়, তবু আমাদের প্রচুর আশার কথা এই যে, এখনও জান্‌বার বিষয় অসীম পড়ে রয়েছে। বাস্তবিক, মানুষ যতই নূতন মীমাংসা নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করছে, ততই নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হ'চ্ছে। শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল সমস্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ কল্পনাও করতে পারে নাই, তা'র অনেকগুলিই আজ মীমাংসা হ'য়ে গিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও শত শত নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোনও বৈজ্ঞানিক বলেছেন—"সমস্যার সমাধান অপেক্ষা নূতন নূতন সমস্যার আবির্ভাবই আমার মন ও চিন্তাধারাকে অধিকতর আনন্দ ও উৎসাহ দেয়।" যদি কেউ আগেই চরম জ্ঞান লাভ করবার জন্য ব্যস্ত হ'ন তবে প্রকৃতির এই অনির্দ্দেশবাদে অকারণ নিরুৎসাহ হ'তে পারেন।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—বিজ্ঞান আশাবাদী না নৈরাশ্যবাদী, তবে সেকথার উত্তর দেওয়া একটু কঠিন হ'বে। কারণ এ বিষয়ে বিজ্ঞান নির্লিপ্ত নির্ব্বাক। বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃত যোগী। সাধনাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেটা সাধন করেন ধীর, স্থির, ধারাবাহিক ভা'বে। তাঁরা যেন—"কর্ত্তব্যে তোমার অধিকার, ফলের জন্য চিন্তা করিও না"—এই শাস্ত্রবাক্যে দীক্ষিত।

জ্ঞান বিজ্ঞানের পথই এইরূপ; এই পথে চল্‌তে হ'বে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে। অসীম সত্য অসীমেই থাক্‌বে, কিন্তু সেটাই হ'বে আমাদের আদর্শ লক্ষ্য—যার প্রেরণায় আমরা অগ্রসর হ'বো। এই অগ্রসর হওয়াই আমাদের কাছে চরম সত্য।

মোহন-তন্দ্রা

শ্রীমতী সাধনা ঘোষ

ওগো আঁধারের আলো লেগেছিল ভাল
সেদিন চাঁদিনী সন্ধ্যায়,
যবে অলস জোছনা আছিল ঘুমায়ে—
শ্যামল শীতল বনছায়।
সেই বিটপী কুঞ্জ কাননে, চিরবাঞ্ছিত চরণে
এসেছিলে তুমি স্বপনের মত,
নীরব নিথর এ হিয়ায়।

তব সোহাগ অঙ্গুলি পরশে
ফুলকুঁড়ি জাগি হরষে
ডুবাইল হৃদি মোহন গন্ধে
আবেশ তন্দ্রা মদিরায়।
সেদিন চাঁদিনী সন্ধ্যায়॥
হায়! কাটিল মোহন তন্দ্রা,
কাল ঘন মেঘ ঢাকিল আকাশ,
মলিন হইল চন্দ্রা!

ফুরাইল হাসি, ফুল বনবীথী
আবরিল আঁখি বেদনায়,
চির সে আঁধার সন্ধ্যায়॥



গোলকোণ্ডা

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস

মধ্যযুগে গোলকোণ্ডা দাক্ষিণাত্যের একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। বার বার শত্রুবাহিনী ইহা অবরোধ করিয়াও অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়া ইহাকে—দক্ষিণাপথের চিতোর—এই বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছিল। মুসিনদীর পরপারে এবং পুরাতন হায়দ্রাবাদ সহরের অনতিদূরে ইহার বিরাট ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। নিজাম বাহাদুরের সেনাবাহিনীর দু একটী দল এখনও এখানে অবস্থান করে। শত শত যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া জরাজীর্ণ দেহে চারি মাইল ব্যাপী দুর্গপ্রাচীর এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ইহার প্রত্যেকটী কোণ এক একটী সুদৃঢ় গুম্বজ দ্বারা শোভিত। আরও সুরক্ষিত করিবার জন্য পর্ব্বতের সানুদেশে প্রায় পঞ্চাশ ফিট একটী পরিখা তাহার পঙ্কিল বক্ষ লইয়া এখনও বিদ্যমান।

প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান প্রাকার চারিটী দুর্গ বেষ্টন করিয়া আছে; ইহার শত শত গজ উপরে দুর্ভেদ্য আরও একটী প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের নাম বালা-হিসার। ইহার মধ্যে গোলকোণ্ডার কুতবসাহীবংশীয় নরপতিগণ একটী সুদৃশ্য দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সমতল ক্ষেত্রে যখন তাঁহারা অরাতির গতিরোধ করিতে সমর্থ হইতেন না—তখন পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে তাঁহারা সুরক্ষিত গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন। বালা-হিসারে গমনাগমনের জন্য কঠিন পাষাণক্ষোদিত করিয়া প্রায় দুইশত সোপানশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানেই প্রাচীন হিন্দুরাজগণের দুর্গ অবস্থিত ছিল। তাঁহাদের সময়ে নির্ম্মিত গিরিগুহাগুলি শূন্যগহ্বরে সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া ম্রিয়মানভাবে এখনও বিরাজমান।

দুর্গের প্রায় অর্দ্ধমাইল উত্তরে কুতবসাহীবংশীয়দের সমাধিগুলি অত্যন্ত হতশ্রী ভাবে নীল আকাশের তলে তাহাদের তুঙ্গ শিখরগুলি লইয়া দণ্ডায়মান। এক সময়ে তাহারা অতি সুসজ্জিত ছিল। প্রাচীন গৌড়ের হর্ম্ম্যরাজির ন্যায় এনামেল করা ইষ্টকদ্বারা ইহাদের শোভিত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার একখণ্ডও বর্ত্তমানে তাহাদের গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীগণ তাহা বহুপূর্ব্বে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ত্রিকোণ খিলানসমন্বিত বৃহৎ বৃহৎ দালান বেষ্টিত হইয়া বহুমূল্য কৃষ্ণবর্ণ বা সবুজবর্ণ প্রস্তরদ্বারা আচ্ছাদিত রাজসমাধি অত্যন্ত হতাদরে আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া থাকিত। এখন নিজাম বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ খাঁন বাহাদুর গুলাম ইয়াজদানি কর্ত্তৃক তাহারা যথোপযুক্ত সমাদরে রক্ষিত হইতেছে। গোলকোণ্ডার শোণিতময় সুদীর্ঘ ইতিহাসের শেষ অধ্যায় বর্ণনা করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারীর কথা। দাক্ষিণাত্যের শীত উত্তরাপথের ন্যায় প্রচণ্ড নহে; দিবসের নাতিশীতল বায়ু বসন্তের মলয়ের ন্যায় আরামদায়ক। উপরোক্ত দিবসের প্রভাতে তাহা দক্ষিণাপথের বন্ধুর-বক্ষ অতিক্রম করিয়া বালা-হিসারের মস্তকে কুতবসাহীবংশের রাজপতাকা ধীরে ধীরে আন্দোলন করিতেছিল। দুর্গের প্রায় সওয়া এক-মাইল দূরে এক বৃহৎ বাহিনীর পুরোভাগে এক কুদর্শন প্রৌঢ় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোলকোণ্ডা দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ইতিহাসে তিনি ঔরঙ্গজীব আলমগীর নামে পরিচিত। হিন্দুকুশ হইতে কুমারিকা ও আরবসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাট মুস্লিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্খার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যৌবনের লীলাক্ষেত্র দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু যতদিন বাহ্‌মনী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজাপুরের আদিল-সাহী ও গোলকোণ্ডার কুতবসাহী বংশ স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন আলমগীরের উচ্চাশা পূর্ণ করিবার কোন উপায়ই ছিল না। সেইজন্যই এই বিরাট সমরায়োজন।

প্রথম পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া সম্রাট একদল সৈন্যকে পরিখার পারে অবস্থিত কুতবসাহী সৈন্যদের আক্রমণের আদেশ দিলেন। উপলনির্ম্মুক্ত গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় সম্রাটবাহিনী মুষ্টিমেয় সৈন্যদের উপর পতিত হইল। শত-শতের সহস্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব বুঝিয়া সুদক্ষ সেনানায়ক তাঁহার অধীনস্থ কুতবসাহী সৈন্যদের দুর্গপ্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু দুর্গপ্রবেশপথে বাধা। কালিচ খাঁ নামক একজন মুঘল সেনানায়ক দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন রোধ করিবার জন্য দ্বারাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। তাঁহার সহযোগী যোদ্ধগণ পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন। কালিচ খাঁর সঙ্কল্প সফল হইল না, দুর্গদ্বারে শত্রুনিক্ষিপ্ত গুলি তাঁহার স্কন্ধের অস্থি চূর্ণ করায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল যখন নিকটস্থ হইল, তখন দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারাক্রান্তহৃদয়ে মুঘল সেনা চিরপরিচিত সেনাপতির রক্তাপ্লুত দেহ লইয়া ম্লানায়মান সন্ধ্যায় স্কন্ধাবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শিবিরে সম্রাট প্রেরিত হাকিম যখন তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে ভগ্ন অস্থি নিষ্কাষিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন হাস্যমুখে বীর সেনাপতি সকল যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া তাঁহার দর্জ্জির সহিত নূতন পোষাকের ফরমায়েস দিতেছিলেন। কিন্তু সম্রাটের শতচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। কালিচ খাঁ হায়দ্রাবাদের নিজামবংশের পূর্ব্বপুরুষ, প্রথম নিজামের পিতামহ। তাঁহার সময় হইতেই এই বংশের দক্ষিণাপথের সহিত পরিচয় হয়।

কুত্‌বসাহী নরপতি ব্যাকুলভাবে সন্ধি ভিক্ষা করিয়া সম্রাট সকাশে দূতপ্রেরণ করিলেন; কিন্তু বাদশাহ্ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। নিষ্ঠাবান সম্রাট এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজবংশের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; সুতরাং আবুল হাসানের সকল আবেদনই বিফল হইল। নিরুপায়ের সাহস লইয়া গোলকোণ্ডার অধিপতি অবরোধে বাধা দিতে চেষ্টিত হইলেন। গোলকোণ্ডার অনতিদূরে শিবির সংস্থাপন করিয়া তাঁহার বিভিন্ন সেনাপতিকে অবরোধের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যভার প্রদান করিয়া সম্রাট তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অন্তর্বিপ্লবে অবরোধ কার্য্য সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হইল। সম্রাটপুত্র শাহ্-আলম ইহার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী; আজীবন দিল্লীর বিলাসব্যসনে লালিতপালিত হইয়া শাহজাদা শাহ্-আলম যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করিতেন না। ইহা ব্যতীত মুঘল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ফিরোজ-জঙ্গ তাঁহার চক্ষুশূল। তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য শাহ্-আলম অবরুদ্ধ আবুল-হাসামকে অভয়প্রদান করিলেন যে, তিনি পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি যে শত্রুর সহিত পত্রের আদানপ্রদান করিয়াছেন তাহা প্রকাশ হইয়া যাওয়াতে সম্রাটের আদেশে তিনি বন্দী হইলেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সৈন্যগণের গমনাগমনের সুবিধার জন্য পরিখা খনন আরম্ভ হইল। শত্রুপক্ষের অনবরত গোলাগুলিবর্ষণে শত শত মুঘল সেনানী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কার্য্য বন্ধ হইল না। গোলন্দাজ সেনাদের নায়কের অধীনস্থে অত্যুচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর কামান স্থাপন করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে গোলাবর্ষণের আয়োজন সুসমাপ্ত হইল।

সেনাবাহিনীর একাংশ যখন এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল তখন প্রধান সেনাপতি ফিরোজ-জঙ্গ দুর্গ অধিকারের জন্য নূতনপন্থা স্থির করিলেন। একদিন রাত্রিযোগে তিনি এবং তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর দুর্গের একদিক অরক্ষিত দেখিয়া প্রাকারতলে সমবেত হইলেন। স্থির হইল যে দুইজন সেনানী তাহাদের সাহায্যে প্রাকারে উঠিয়া রজ্জুনির্ম্মিত আরোহণি নামাইয়া দিলে অবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে প্রধানবাহিনী দুর্গ আক্রমণ করিবেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। মুঘল সেনা দুইটী প্রাকারে আরোহণ করিলে দূরে দণ্ডায়মান এক নীচজাতীয় সারমেয় চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাতে রক্ষী সৈন্যদল জাগরিত হওয়ায় তাহারা মুঘলসেনা দুইটীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া প্রাকার তলে নিক্ষেপ করিল। শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারার ন্যায় অজস্র গোগাগুলি বর্ষণে শত শত হতাহত ত্যাগ করিয়া প্রধান মুঘলবাহিনী শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল। ঊষার প্রথম আলো যখন পূর্ব্ব গগন ঈষৎ রক্তিমচ্ছটায় রাঙাইয়া তুলিতেছিল তখন হতাবশিষ্ট অনুচর লইয়া প্রধান সেনাপতি তূর্য্যনিনাদ করিতে করিতে বিজয়ী বীরের ন্যায় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ সৈন্যগণ হঠাৎ মুঘলবাহিনী আক্রমণ করিল। মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া তাহারা গোলন্দাজদিগকে সম্মুখযুদ্ধে হত করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রস্থান করিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে সুদীর্ঘ ছয়টী মাস অতীত হইল কিন্তু দুর্গজয়ের কোন চেষ্টাই সফল হইল না। যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে অজন্মা হইয়াছিল; এই বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য কৃষকেরা শস্য রোপণ করিতে পারিল না। দিল্লী ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রেরিত খাদ্য-দ্রব্যাদি পথে মারাঠা অশ্বারোহী কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল। সঞ্চিত খাদ্য শেষ হইলে মুঘল স্কন্ধাবারে খাদ্যাভাব হইল। জুন মাসের প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্যের স্বচ্ছনীল আকাশ খণ্ড খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া গেল। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপাত শুষ্ক নদীগহ্বর খরস্রোত বারিরাশিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। ধূলিপূর্ণ বাদসাহী-সড়ক কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হওয়াতে চলাচল অসম্ভব হইয়া পড়িল। কঠিন পরিশ্রমে নির্ম্মিত মৃত্তিকা স্তূপ শিখরস্থ কামানের সহিত ধরাপৃষ্ঠ অবলম্বন করিল। পরিখার প্রাচীর ধ্বসিয়া গিয়া পরিখা বুজাইয়া দিল। অন্যদিকে নদীর জলোচ্ছ্বাস দুকূল প্লাবিত করিয়া মুঘল শিবিরে প্রবেশ করিল।

কুতবসাহী সেনাগণ মুঘল সেনার দুর্দ্দশার এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। ১৫ই জুন রাত্রে বৃষ্টিপাতের মধ্যে কামানরক্ষী পরিখাস্থ সৈন্যদের হত্যা করিয়া প্রধান গোলন্দাজ সরববাহ খাঁ আরও দুইজন সেনাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। সম্রাট এই নিদারুণ সংবাদপ্রাপ্ত হওয়ামাত্রই হায়াৎ খাঁ নামক একজন সেনা-নায়কের অধীনে ৭০টী হস্তী তাঁহার সৈন্যদের সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পথে একটী খাল তাহাদের মনোরথ সফল হইতে দিল না। বৎসরের অধিকাংশ সময় তাহাতে জল থাকিত না; কিন্তু বর্ষার বারিধারা এখন তাহাকে খরস্রোতা বেগবতী নদীতে পরিণত করিয়াছিল। সুসজ্জিত হস্তীযূথ তাহাতে অবতরণ করিতে সাহসী হইল না। তীরে দাঁড়াইয়া হায়াৎ খাঁ সহকর্ম্মীদের নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ড অবলোকন করিলেন; দৃঢ়-মুষ্টিতে ধৃত অস্ত্র ব্যবহার করিবার সুযোগও হইল না।

আবুল হাসান বন্দীদের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মিত হন নাই। তিনি তাহাদের যথোচিত আদর আপ্যায়ন করিয়া বহু মূল্য উপঢৌকনের সহিত সম্রাট সকাশে প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গত রাত্রের নিদারুণ পরাজয় ও তাঁহারই স্কন্ধাবারে অধীনস্থ সৈন্যদলের নির্দ্দয় হত্যা দিল্লীশ্বরের আত্মসম্মানে আঘাত করিয়াছিল। যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়া উঠিত, যাঁহার বিজয়বাহিনী সাগর হইতে সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুস্থান নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, সুদূর আফগানি-স্তানের ও হিন্দুকুশের দুর্দ্ধর্ষ পাঠান জাতিসমূহ এবং মরুময় ও পার্ব্বত্য-সঙ্কুল রাজপুতানার গর্ব্বোদ্ধত রাজন্যগণ যাঁহার সিংহাসনতলে মস্তক অবনত করিয়া কুর্ণিশ করিতে আসিতেন, সেই আলমগীর ক্ষুদ্র কুতবসাহীর কাছে পরাজিত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, ইহা বাদশাহের নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সুতরাং অবরোধের কার্য্য বন্ধ হইল না।

পরিখার ভিতর দিয়া গমন করিয়া মুঘল সৈন্যগণ প্রাকারের তিনটী বিভিন্ন গুম্বজের তলায় গহ্বর খনন করিয়া বারুদ সংস্থাপন করিল। ইচ্ছা ছিল যে বারুদের আগুনে প্রাকারের অংশ ধ্বংস হইলে সেই পথ দিয়া মুঘলবাহিনী দুর্গ আক্রমণ করিবে। ২৫শে জুন প্রাতঃকালে সহস্র সহস্র মুঘল পদাতিক অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধভাবে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। হঠাৎ সহস্র সহস্র বজ্র নির্ঘোষে সমস্ত ভূমি আলোড়ন করিয়া পর্ব্বতের উর্দ্ধাংশ নক্ষত্রবেগে নীলগগনের দিকে ধাবিত হইল। তাহার পর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু প্রস্তরের রাশি বৃষ্টিধারার ন্যায় সুসজ্জিত মুঘল বাহিনীর উপর পতিত হইতে আরম্ভ হইল। মুহূর্ত্তে বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। মরণোন্মুখের করুণ আর্ত্তনাদ, আহতের হৃদয়ভেদী চীৎকার, উষার স্নিগ্ধ কমনীয়তাকে বীভৎস করিয়া তুলিল। বিনা অস্ত্রাঘাতে একাদশ শত মুঘলবীর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। শত্রুপক্ষ সুযোগ বুঝিয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হতাবশিষ্ট মুঘলবাহিনীর উপর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় পতিত হইল। তাহাদের বাধা দিবার শক্তি তখন কাহারও ছিল না। সম্রাট তাহাদের সাহায্যার্থে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলে কুতবসাহী সৈন্যদল দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই দ্বিতীয় খনিটী বজ্রনিনাদে ফাটিয়া গিয়া আর একবার মুঘলবাহিনীর মস্তকে সহস্র

সহস্র প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ করিল। পূর্ত্তবিভাগের ভ্রমের জন্য বারুদের বিস্ফোরণ পর্ব্বতের অন্তঃস্থলের দিকে ধাবিত না হইয়া বাহিরে গিয়াছিল; তাহার ফলে প্রাকারের কিয়দংশ নষ্ট হইল। মুঘল সেনানায়কদের আশা সম্পূর্ণ হইল না। দ্বিতীয়বার কুতবসাহী সৈন্য হতাবশিষ্ট মুঘলবাহিনীকে আক্রমণ করিয়া পর্য্যুদস্ত করিল। প্রধান সেনাপতি স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু এবার আর কুতবসাহী সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল না। উন্মুক্ত অসি দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া মুষ্টিমেয় দাক্ষিণাত্য-সেনা বিশাল মুঘলবাহিনীকে আক্রমণ করিল এবং প্রাকারস্থিত তাহাদের সহকর্ম্মীরা অব্যর্থ লক্ষ্যের সহিত শত্রু সৈন্যের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মুঘল সেনাপতি একপদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ঠিক এই সময় ঘন কৃষ্ণবর্ণ এক খণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে সমস্ত গগন ছাইয়া ফেলিল; প্রবল ঝঞ্ঝার সহিত অবিশ্রাম বর্ষণ সুরু হইল, কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই। অন্ধকারে শত্রুমিত্র ভেদাভেদ রহিল না।

উপরোক্ত দিবসের যুদ্ধফল মুঘলবাহিনীকে নিরুৎসাহ করিয়া ফেলিল। সাহজাদা আজম এবং রুহুল্লাহ খাঁ নূতন সেনাবাহিনী লইয়া সম্রাট শিবিরে যোগদান করিল; অন্নাভাব ও মহামারীর করালগ্রাস তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। অতি অল্পকালমধ্যেই হায়দ্রাবাদ সহর জনশূন্য হইল, পথে ঘাটে অনশনক্লিষ্ট নরনারীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিল, সম্রাট শিবিরের অবস্থাও তদনুরূপ। গলিত শবের পূতিগন্ধ বায়ুস্তর বিষময় করিয়া তুলিল; তাহাদের দাহ করিবার কিম্বা কবর দিবার কোনও আয়োজন সম্ভবপর হইল না।

অবশেষে ভাগ্যলক্ষ্মী মুঘলদিগের দিকে সুপ্রসন্ন হইলেন। বর্ষার শেষে দাক্ষিণাত্যের সুন্দর আকাশ রূপসী তরুণীর স্বচ্ছ নীল নয়নের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সূর্য্যের প্রখর তাপে প্রান্তর ও পথের জল শুষ্ক হইল। দিল্লী হইতে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যাদি সুরক্ষিত হইয়া স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিল। বহুদিন বাদে বুভুক্ষিত সৈন্যদল খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া নবজীবন লাভ করিল। অবশেষে দীর্ঘ আটমাস অবরোধের পথ ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গোলকোণ্ডা দুর্গ বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে মুঘলদিগের কবলিত হইল। আব্দুল্লাহ্ খাঁ নামক একজন আফগান সেনানায়ক দুর্গপ্রবেশের ক্ষুদ্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিলে রুহুল্লাহ্ খাঁ দুর্গে প্রবেশ করিয়া প্রধান দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই পথ দিয়া সাহজাদা আজম তূর্য্যনিনাদ করিতে করিতে সুপ্ত অবরুদ্ধ সেনাদলকে আক্রমণ করিলেন। সে প্রচণ্ড আক্রমণে বাধা দিবার শক্তি নিরুপায় কুতবসাহী সৈন্যদের ছিল না। পশুবলে বলীয়ান হইয়া মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া মানব যেমন অসহায় নারীর উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহার আবেদন মিনতি ও অশ্রুজল যেমন তাহার দানবীয় প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ কুতবসাহী সৈন্যগণের বাধা তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড সূর্য্য যখন তাঁহার প্রখর তাপে ধরিত্রী দগ্ধ করিতেছিলেন তখন গোলকোণ্ডার তুঙ্গশিখরে মুঘলের বিজয়কেতন দাক্ষিণাত্যের সুমিষ্ট বায়ুতে হিল্লোলিত হইতেছিল এবং দুর্গের প্রধান দ্বার দিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ কুতবসাহী বংশের শেষ নরপতি নির্জ্জন ও দুরারোহ দৌলতাবাদ দুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।



ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলন

শ্রীভাস্কর বাগচি

গত পঁচিশ বছর ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে একটি গৌরবময় যুগ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে ভারতবাসীর বহুমুখী গবেষণা ভারতকে জগতের বিজ্ঞান-সভায় আজ শুধু যে সম্মানের আসন দিয়েছে তা নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিভাকে শ্রদ্ধার এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান চর্চ্চায় একাধিক কৃতী ভারতবাসী যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন, বিংশ-শতকের বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে তা সগৌরবে মিশে আছে। গত পঁচিশ বছরে ভারতের বহু তীর্থ-যাত্রী বিজ্ঞান-মন্দিরের অভিমুখে অভিযান করেছেন, নতুন নতুন গবেষণায় নব নব তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের কেহ কেহ আবার পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-জগতে গৌরবময় আসনও অধিকার করেছেন। সেই অধিকারের দাবীতেই বুঝি ভারতীয়-বিজ্ঞান-সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী উৎসবে দেশ-দেশান্তরের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শতাধিক বৈজ্ঞানিক যোগদান ক'রে এই উৎসবকে একটা বিশেষ মর্য্যাদা দান করলেন। বিজ্ঞান-সম্মেলনের এই পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশনের গুরুত্বের আরও একটা দিক আছে।

পঁচিশ বছর আগে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা যখন তার অনিশ্চিত শৈশব অতিক্রম করে নি তখন স্বভাবতঃ এদেশের বিজ্ঞানচর্চ্চা বৃটিশ বিজ্ঞান-জগতের কাছে নিতান্তই উপহাসের জিনিষ ছিল। শুধু একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-অনুশীলনের ফলে রামানুজম্, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীরা মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করতে মন দিয়েছিলেন। তারপর পরবর্ত্তী যুগে তাঁদের ব্যক্তিগত বিজ্ঞান-অনুশীলন ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত যে নবীন বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে, প্রধানতঃ তাঁদের নিয়েই ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান-মণ্ডল গঠিত। এই পঁচিশ বছরে বিজ্ঞান-জগতের নানা বিভাগে ভারতের একটা নিজস্ব স্থান স্বীকৃত হ'য়েছে ব'লেই এর এই পঞ্চবিংশতিতম উৎসবের সঙ্গে বিলাতের বিজ্ঞান-সভার প্রথম মিলিত অধিবেশন আজ সম্ভবপর হ'লো। ভারতের মনীষার সাগরতীরে দাঁড়িয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ যখন এই দুই মিলিত উৎসবে যোগদান ক'রে নানা বিষয়ের আলোচনা করছিলেন তখন আমাদের স্বতঃই মনে হ'য়েছিল—মহামানবের সমাজে ভারত আজ এক সমৃদ্ধ অতিথি; মুক্তহাতে সে আজ তার জ্ঞান-সমৃদ্ধি বিতরণ করতে কৃতসংকল্প। অতীতের ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে পদরক্ষা করে সে ভবিষ্যতের গৌরবমাল্য দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করছে। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের এই উৎসব তাই অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

আজ ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের উৎসবের সমারোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে তাকালে সকলের আগে এই প্রসঙ্গে যাঁর নাম আমাদের মনে পড়ে, তিনি হলেন বাংলার বরেণ্য সন্তান ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সরকার প্রথম যেদিন বহুবাজারের এক ক্ষুদ্র অপরিসর গৃহে ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন, ভারতের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে সেই দিনটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাক্‌বার কথা। ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চার পথ তিনিই অনেকটা সুগম করে দেন। তখনও পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীরা মনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাক্‌লেও সুযোগের অভাবে ঠিক পথের সন্ধান পেয়ে ওঠেন নি, সুতরাং তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হোয়ে যাচ্ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি গবর্ণমেণ্ট-কলেজের সীমাবদ্ধ গবেষণাগারই তখন ভারতবাসীর একমাত্র গবেষণাস্থান ছিল এবং এইগুলিই গবেষণাক্ষেত্রে ভারতবাসীর অল্পবিস্তর সহায়তা করছিল। কিন্তু সুযোগ এত সংকীর্ণ ছিল যে, অনেক লোকের তাতে লাভ হতো না এবং বেশীর ভাগ শিক্ষার্থীই পথপ্রদর্শকের অভাবে গবেষণা-ক্ষেত্রে পদার্পণ করবার আকাঙ্খা অচিরেই বিসর্জ্জন দিত। ডাঃ সরকার সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য এমন একটা বিজ্ঞান সমিতির অভাব দেশে বোধ করেন যেখানে স্বাধীন-ভাবে গবেষণা কার্য্য চল্‌তে পারে। একথা বল্‌লে খুব বেশী

বলা হবে না যে ডাঃ সরকারের চেষ্টাতেই আজ সমগ্র ভারতে বিজ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। জনসাধারণকে সেদিন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্য তাঁকে কম ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতির নতুন বাড়ীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা করা হয়। এর পৌরহিত্য করেন লর্ড রিপণ। এর সংলগ্ন গবেষণাগারটি তৈরী হয় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। যাঁদের অকুণ্ঠ বদান্যতায় ও অযাচিত দানে এই সমিতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় রায় বাহাদুর বিহারীলাল মিত্রের। তাঁর দানের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ টাকা। এ ছাড়া বাংলার ও বাংলার বাহিরের বহু খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী এই সমিতির জন্য যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন। এইরূপে স্বাধীনভাবে বিজ্ঞান সাধনার প্রথম আরম্ভ।

ক্রমে স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ প্রভৃতির নেতৃত্বে ডাঃ সরকার-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিজ্ঞান সমিতির গবেষণাগারের সংস্কার হয় এবং বাংলার বিজ্ঞানোৎসাহী মনীষীগণ বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করবার জন্য উদ্যোগী হলেন। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যায় গবেষণার ব্যবস্থা হয় এবং বিজ্ঞান সমিতির অন্তর্ভুক্ত কলিকাতা গণিতানুশীলনী (Calcutta Mathematical Society) সমিতি স্থাপিত হ'য়ে গণিত বিষয়ে মৌলিক গবেষণার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। এইরূপে অনতিকালের মধ্যে কলিকাতা ভারতবাসীর বিজ্ঞান-সাধনায় প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এ যুগ মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক যুগ। প্রকৃতির রহস্য একে একে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে উন্মোচন করতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেকটি অভাব মেটাবার জন্য আমরা বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করেছি। তবু একথাও স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগের ফলে মানুষের যেমন অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তেমনি এর অপপ্রয়োগ আত্মধ্বংসের পথ সহজ করে তুলেছে। মারণাস্ত্রের উন্নতি ও বিষবাষ্পের আবিষ্কার এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। বিগত মহাযুদ্ধের আগে আমরা দেখ্‌তে পাই সমগ্র ইউরোপের মধ্যে বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রধান কেন্দ্র-রূপে জার্মাণীর কত সম্মান ছিল। তখন জার্মাণী মানুষের কাজে বিজ্ঞানকে প্রযুক্ত করে জগতের নানা কল্যাণ সাধন করেছিল। তারপর সেই জার্মাণীরই সংহারমূর্ত্তি আমরা দেখ্‌তে পাই মহাযুদ্ধের সময়। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপপ্রয়োগ মানবসমাজে নিদারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। অবশ্য রাষ্ট্রনীতির কূট চক্রান্ত এবং ধনতান্ত্রিকদের উগ্র লালসাই এর জন্য বেশী দায়ী। বৈজ্ঞানিক সত্যকে মানব সমাজের উন্নতি সাধনে প্রয়োগ করতে না পারলে তার সত্যিকারের সার্থকতা কোথায়? ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয় এবং সেই কারণে আবিষ্কারের তালিকায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অবদানের সংখ্যা হয়ত খুবই কম; তবু আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা এই যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত অপপ্রয়োগের অপবাদে কলঙ্কিত হয় নি।

তবে ভারতের বিজ্ঞানচর্চ্চার অপবাদ এক হিসাবে আছে। ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে এদেশের ধনবানদের অকৃপণ দানশীলতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সযত্নে প্রতিপালিত না হ'লে এর সমস্ত প্রাথমিক উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো। বিজ্ঞান চর্চ্চা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এ দরিদ্র দেশে গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্য ও উৎসাহের অভাবে এর বিস্তৃতি আদৌ সম্ভব নহে। স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্রের প্রথম বিলাত যাত্রা প্রসঙ্গ স্মরণ করলে আমরা এই অপ্রিয় সত্যের একটা মস্ত বড় প্রমাণ পাই। ভারতের জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই পঁচিশ বছরে যতটুকু হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি কেন? তার একমাত্র কারণ, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভারতবাসীর পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই আজ মাত্র লাইব্রেরী ও গবেষণাগারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে আছে। জাতির প্রাত্যহিক জীবনে এর প্রয়োগ ও প্রসার খুবই কম। অথচ ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে প্রত্যেক উন্নত রাষ্ট্রই বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে জাতীয় উন্নতিমূলক কার্য্যে নিয়োগ করবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করে থাকেন এবং সেজন্য প্রচুর টাকা খরচ করে থাকেন। এদেশে কৃষি ও শিল্প আজও অনুন্নত; চিকিৎসা, খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করবার কত বাকী রয়েছে; কিন্তু সরকারী সাহায্যে পরিচালিত তেমন

উপযুক্ত গবেষণাগার কই ? অতি-আধুনিক কালের বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রসারে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহায়তা নিতান্তই নগণ্য। দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, দিল্লীর কৃষি গবেষণাগার বা অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হেলথ্ এণ্ড্ হাইজিন প্রভৃতি দুই চারটা সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিশাল ভারতবর্ষের পক্ষে কিছুই নয়।

গত পঁচিশ বছরে ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে কি কি গবেষণা করিয়াছে তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণার কিছু কিছু ব্যবস্থা হবার পর আধুনিক প্রণালীতে গঠিত পরীক্ষাগারের অভাব দূর করবার জন্য যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য পুরুষ স্যার আশুতোষ। তাঁরই অনুরোধে দানবীর তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন করবার জন্য নিজের বাসস্থান ও কয়েক লক্ষ টাকা দান করেন। এইখানেই ভারতবর্ষে প্রথম আধুনিক প্রণালীতে সুগঠিত পরীক্ষাগার-সমন্বিত বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয়। প্রথমেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের বিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই দুই বিভাগের পরিচালকরূপে স্যার সি-ভি-রমণ ও আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্রকে নিযুক্ত করা হয়। এর আগে থেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলায় রসায়ন-গবেষকসংঘ গ'ড়ে ওঠে; তাঁরই নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষক ছাত্রবৃন্দ ভারতের বিবিধ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিভাগে গবেষণাকেন্দ্রের অধিনায়ক হিসাবে রসায়নচর্চ্চার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

তারপর স্যার আশুতোষের চেষ্টায় স্যার রাসবিহারী ঘোষও তারকনাথ পালিতের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ১৯১৩ ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বহু লক্ষ টাকা বিজ্ঞান-কলেজের উন্নতিকল্পে দান করেন। এই সময় থেকেই বিজ্ঞান কলেজে মিশ্র-গণিত, ব্যবহারিক পদার্থ বিদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। এই দুই দানবীরের দানে পুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান কলেজই ভারতের সর্ব্বপ্রথম এবং অদ্যাবধি সর্ব্বপ্রধান গবেষণা কেন্দ্র।

কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠার সময়েই আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্বন্ধে এখানে নানা মৌলিক গবেষণা চলতে থাকে। জগদীশচন্দ্রের নিজের গবেষণা পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বিলাতের রয়াল সোসাইটির সদস্য হন। বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই F. R. S. উপাধি সর্ব্বোচ্চ সম্মান। আচার্য্য বসু উদ্ভিদ ও জীব-জগতের মধ্যে যে সামঞ্জস্য লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকানো আছে সেই রহস্যের দ্বার সর্ব্বপ্রথম উদ্ঘাটিত করেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল-এর উদ্যোগে ভারতের নানা প্রদেশের বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই বিজ্ঞান সম্মিলনই এদেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের ক্ষেত্র সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি করে। স্যার আশুতোষ ছিলেন এই সম্মিলনের প্রথম সভাপতি। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর নানা অনুকূল স্রোতের প্রবাহে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা এইরূপে বেগবতী হতে পেরেছে বলেই আজ পৃথিবীর শতাধিক কীর্ত্তিমান বৈজ্ঞানিক এসে এই সম্মেলনের উৎসবে যোগদান করেছেন।

বিশুদ্ধ গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গবেষণা গত পঁচিশ বছরে এদেশে হয়েছে এবং এই তিনটি বিভাগের গবেষণার মৌলিকত্ব সমগ্র পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই তিনটি বিভাগে ভারতবাসীর কৃতিত্ব দেখে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হয়েছেন। স্বর্গীয় রামানুজন্ বিশুদ্ধ গণিত বিভাগে গবেষণা করে সর্ব্বপ্রথম যশস্বী হন এবং ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রয়েল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। তাঁর অকালমৃত্যুর পরে এই বিভাগে মৌলিক তথ্য প্রকাশ করে আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে স্বর্গীয় অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হনুমন্ত রাও, অধ্যাপক চাউলা, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশ্রগণিতের ক্ষেত্রে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম আজ কারও অজানা নেই। ইনি আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করে কৃতিত্ব লাভ করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত গবেষণার

বিজ্ঞান কংগ্রেসে সমবেত ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকবৃন্দ



ডাক্তার এফ ডবলিউ এষ্টন



অধ্যাপক পি-জি-এচ-বসওয়েল



বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি
সার জেম্‌স জিন্‌স



সার আর্থার হিল



অধ্যাপক এচ-জে-এস-পিক



ডাক্তার ও-জে-আর হাওয়ার্থ



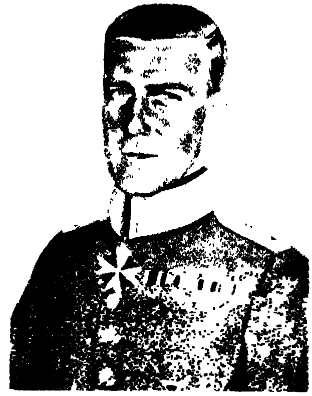
সার এ-এস-এডিংটন



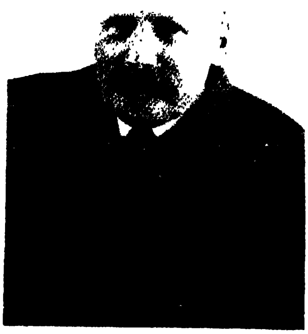
অধ্যাপক সি-জি-ডারউইন



অধ্যাপক ষ্ট্রাটন



ব্যারন ভন ভেলচ্চিন



অধ্যাপক ক্রিস্



ডাক্তার জন আর্চিবল্ড ভেন



অধ্যাপক হেল কার্পেণ্টার



অধ্যাপক এচ-এম-হলস্‌ওয়ার্থ



অধ্যাপক হাগ লস গেট্‌স



অধ্যাপক ভি-আর-ব্ল্যাকম্যান

ফল এখন 'বোস-আইনইন ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌' নামে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেছে।

রসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা ভারতবর্ষে অনেক দিন থেকে চলে আস্‌ছে। সে ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর কৃতী ছাত্রবৃন্দ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নাধ্যাপক নীলরতন ধর, লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাট্‌নগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী ও অধ্যাপক অনুকুলচন্দ্র সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মান্দ্রাজের অধ্যাপক ভেঙ্কটারাম আইয়া ও অধ্যাপক বিমান দে প্রমুখ রসায়নবিদ্‌গণ রসায়নের নানা বিভাগে গবেষণা করে বহু মৌলিক তথ্য প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি কৃষিসম্বন্ধীয় রসায়নে কাহারও কাহারও দৃষ্টি পড়েছে।

পদার্থ বিজ্ঞানে গবেষণার ফলে স্যর সি-ভি-রমণ এক নতুন রকমের রশ্মি আবিষ্কার ক'রে বিশ্বব্যাপী সম্মান লাভ করেছেন। এই আবিষ্কারের ফলেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এসিয়াবাসীদের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বৈজ্ঞানিক সমাজে ভারতবাসীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদার্থ-বিদ্যায় গবেষণা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা গণিতসংশ্লিষ্ট পদার্থবিদ্যায় মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। অধ্যাপক সাহা জ্যোতিষ্ক-পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধেও গবেষণা করে বিজ্ঞান জগতে অতুল খ্যাতি লাভ করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে রয়েল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন। অধ্যাপক সাহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে সেইস্থানে একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণা-কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। যুক্তপ্রদেশের বিজ্ঞান পরিষদের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ম্মাধ্যক্ষ।

এই প্রসঙ্গে ব্যবহারিক পদার্থ বিদ্যা ও ব্যবহারিক রসায়নবিদ্যায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন। আগেই বলেছি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে এর কোনো সার্থকতাই থাকে না। তাছাড়া বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, একের উন্নতির উপর অন্যের উন্নতি নির্ভর করে। প্রতিভা ও প্রতিভার কার্য্যকরী নিয়োগ দুইয়েরই সমান দরকার। বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি একটিকে বাদ দিয়া আদৌ সম্ভবপর নয়। দরিদ্র ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে বসে শুধু আবিষ্কারই করতে পারে—তার আবিষ্কার-লব্ধ তথ্যকে জীবনের প্রয়োজনে নিয়োজিত করবার—তার স্বপ্নকে রূপ দেবার সামর্থ্য কই? তবু গত পঁচিশ বছরে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে যতটুকু গবেষণার কায আরম্ভ হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য।

ব্যবহারিক পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ে বোধহয় ভারতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভিন্ন অন্যত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছে। অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ও অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের পরিচালনায় ব্যবহারিক পদার্থ-বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা আরম্ভ হয়েছে। অধ্যাপক মিত্র নিজে বেতার টেলিগ্রাম, রেডিও, টেলিভিসন প্রভৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করছেন এবং তাঁর কয়েকটি ছাত্রও ব্যবহারিক শব্দ-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করে মৌলিক তথ্য প্রকাশ করেছেন।

ব্যবহারিক রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষণায় উন্নতি আরও অনেক হয়েছে। রসায়নের সাহায্যে নানা ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উৎপাদন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের উদ্যোগে সম্পন্ন হয়ে আস্‌ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ডাক্তার হেমেন্দ্রকুমার সেন এই বিষয়ে বহুবিধ গবেষণা করে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। অধ্যাপক সেন পচন নিবারণ, ভূমির সার উৎপাদন, fermentation প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কার করে ব্যবহারিক উপযোগিতা হিসেবে এদের প্রচার করেছেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গড বোলের পরিচালনায় সম্প্রতি সেখানে ভৈষজ্য রসায়ন সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

এছাড়া প্রাণীতত্ত্ববিদ্যা, ডাক্তারী বিদ্যা, ব্যবহারিক মনোবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের আরও অন্যান্য বিভাগে ভারতীয় প্রতিভা :আপন আপন গবেষণা কার্য্যে ব্যস্ত আছে। তার অল্প-বিস্তর পরিচয় এরই মধ্যে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

এর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনেই শুধু যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ আজ ব্যস্ত তা নয়—গবেষণা-লব্ধ তথ্যকে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করার দায়িত্ব সম্বন্ধেও তাঁরা যথেষ্ট সচেতন। তাঁরা আজ বুঝতে পেরেছেন যে একটা মৌলিক তথ্য আবিষ্কার ক'রে পাশ্চাত্য জগতে সম্মানিত হওয়ার চেয়ে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে দেশের শিল্প-সম্পদে রূপান্তরিত করাই এখন সবচেয়ে বড় গবেষণা। ব্যক্তিগত প্রতিভার মূল্য যেমন আছে, তেমনি দরকার আমাদের এই দরিদ্র দেশে এডিসন, মার্কনি বা ফোর্ডের মত ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিকের। ভারতীয় বিজ্ঞান-সম্মেলনের এই পঞ্চবিংশতিতম উৎসবে সমাগত বিভিন্ন প্রদেশের বৈজ্ঞানিকগণ যেন আজ এই বিষয়টা বিশেষ করে ভেবে দেখেন।

গত পঁচিশ বছরে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে ভারত অনেক দিক দিয়ে অগ্রসর হয়েছে; কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের স্কন্ধে আরও দায়িত্বভার ন্যস্ত হতে পারে। পূর্ব্বেই বলেছি বর্ত্তমান যুগকে একটি বৈজ্ঞানিক যুগ বলা হয় এবং পরলোকগত বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ডের কথায় "জাতীয় উন্নতির পক্ষে বিজ্ঞান যে বিশেষ সহায়ক একথা সর্ব্বদেশে স্বীকৃত হয়েছে।" বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে শিল্প বিশেষজ্ঞদের যোগাযোগে দেশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারে। আজকের দিনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাগত নবীন প্রতিভাদের সকলের আগে এই কথা মনে রাখতে হবে।

বিজ্ঞান আজও তার শেষ কথা বলেনি, তার আবিষ্কারে আজও পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি। যুগে যুগে মানুষ প্রকৃতির রহস্যের রঙীন অবগুণ্ঠন দূর করার জন্যে—তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার জন্যে জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা হাতে নিয়ে দুর্গমের পথে অভিযান করেছে। তার সে অভিযান আজও ফুরোয় নি। কত বৈজ্ঞানিকের প্রাণপাত সাধনায় সে দীর্ঘ অভিযানের পথ ভাস্বর হোয়ে আছে। তবু স্যর অলিভার লজের কথায়—"তবু মানুষের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ—সীমাহীন কালের তরঙ্গ-চূড়ায় যুগে যুগে এক একটি প্রতিভার যে আবির্ভাব—তার সংখ্যা কত কম!" জীবনকে তন্ন তন্ন করে বিচার করে ভারতীয় প্রজ্ঞান একদিন অধ্যাত্ম জগতের সকল রহস্য উদ্ঘাটন ও উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল; আজ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান তেমনি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথে চলেছে—ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনের উপায় বের করে জীবনকে সকল দিক দিয়ে সম্পূর্ণতর ও সমৃদ্ধিতর করে তুলবার এই যে সমবেত প্রয়াস—এর যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা সহজ কথা নয়। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ যে বিশ্ব-বিস্তার জ্ঞান-তৃষ্ণার খাদ কেটেছেন, ভাবী যুগের জ্ঞান-ভগীরথরাই সেই পথ দিয়ে কল্যাণের পূতধারাকে বইয়ে নিয়ে যাবার অপেক্ষায় রয়েছেন।

নিতুই নব

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমার কলকণ্ঠে গুণী, যেন শুনি নিতুই নব গান।
ঢালো তোমার নিতুই নব রঙিন সুধা—উছল করো প্রাণ।
প্রিয়ের করে আপনারে দাও সঁপি—পরে নিকুঞ্জে নিরালে
লও চেয়ে তার নিতুই নব শিহর ভরা চুমন-বরদান।

লো অমিয়া সাকী প্রিয়া! ফুরায় স্বপন—প্রেমের পেয়ালায়
ঢালো নিতুই নব অঝোর আবেশ বিভোর—নেই যার অবসান।
মনমোহিনী বিনোদিনী, আমার তরে আঁকলে কতই ছবি
রূপে রেখায় গন্ধে রঙে—বইয়ে নিতুই নব রসের বান!

অরুণ-সমীর! যাও আজ আমার রাগের রাণী অপ্সরী নিধান
বোলো—হাফেজ তার সুবাসেই রচে নিতুই নব ফুলের তান।

হাফেজের বিখ্যাত "তাজা বতাজা নও বনও" গজলের অনুবাদ।

সাময়িকী

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ২৯শে মাঘ হইতে দিবসত্রয় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হইবে স্থির হইয়াছে। তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—মূল সভাপতি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত; কাব্যশাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী; সাংবাদিক সাহিত্যশাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার; পদাবলী ও কীর্ত্তনসাহিত্য শাখার সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী; দর্শনশাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য; বিজ্ঞানশাখার সভাপতি—ডাক্তার কুদরতি খোদা; ইতিহাস শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী; চারুকলা শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও সঙ্গীতসাহিত্য শাখার সভাপতি—মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায়। একজন মূল সভাপতি ছাড়াও এবার ১০টি বিভিন্ন শাখাসাহিত্যের ১০জন সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। কৃষ্ণনগর এককালে বাঙ্গালার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, সেই কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। আমরা নদীয়াবাসীদিগের পক্ষ হইতে কৃষ্ণনগরে বাঙ্গালার সাহিত্যিকবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

এবার পাটনা সহরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হুইলার সিনেট হলে প্রবাসীবঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে পাটনায় রামমোহন-রায়-সেমিনারী স্কুল গৃহে একটি প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। বিহারের কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এবার উক্ত সম্মিলনের উদ্বোধন করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল; তিনি বাঙ্গালী না হইলেও বাঙ্গালীদের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে প্রবাসীবঙ্গসাহিত্যসম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে তাঁহাকে আহ্বানে কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"অপরাপর ক্ষেত্রে আমরা—বিহারী ও বাঙ্গালীরা—একযোগে কাজ না করিতে পারি, কিন্তু মাতা সরস্বতীর আরাধনা সম্পর্কে কোনপ্রকার মতভেদ না থাকাই উচিত; তাহা হইলে সকল প্রকার ভেদাভেদ দূর হইবে এবং আমরা দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইব।" তিনি আরও বলেন—"কংগ্রেসকর্ম্মীরা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ মনে করেন যে একটা জাতীয় ভাষা না থাকিলে জাতীয় লক্ষ্যে পৌছান যায় না। আন্তঃপ্রাদেশিক মনোভাবের আদানপ্রদানের সুবিধার্থ একটি জাতীয় ভাষার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। ইহার অর্থ এই নহে যে ইহা দ্বারা কোন প্রাদেশিক ভাষা কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হইবে। ইংরেজি ভাষার পরিবর্ত্তে অপর একটি ভাষা ব্যবহার হয়, ইহাই শুধু তাঁহাদের কাম্য।" কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধানবিচারপতি ও বর্ত্তমানে পাটনা হাইকোর্টের এডভোকেট সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবার সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"প্রবাসী হইলেও স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ আমাদের সকলেরই অন্তরে পূর্ণভাবে জাগরিত আছে। বিশ্বের বিজ্ঞানে, বিশ্বের সাহিত্যসভ্যতায়, বিশ্বের রাজনীতিতে আজ বাঙ্গালী দ্রুত তাহার স্থান করিয়া লইতেছে। জগতের এত বড় একটী অভ্যুদয়ের যুগে এত বড় একটী জাতি কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? কখনই না। ভাষায় যে নবযুগ আসিয়াছে, তাহাতে ভাষার কতটা উন্নতি হইয়াছে বা যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে কি না, তাহা আজ আপনাদের চিন্তা ও আলোচনার বিষয়। ভাষার ঝঙ্কারে, ভাবের বিশুদ্ধতায়, কথাশিল্পের চাতুর্য্যে বা মাধুর্য্যে বর্ত্তমান যুগের ভাষা এখনও পুরাতন আদর্শকে

পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই। নবযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক সময় একটি বৈদেশিকতার মূর্ত্তি দেখিতে পাই ও এই মূর্ত্তির মধ্যে একটা নৈরাশ্যের অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। কবিতা সম্বন্ধেও সেই কথা।" সম্মিলনের মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়। তিনি এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"সাহিত্যই জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে; জাতির মানসিক,সামাজিক, অর্থনীতিক—সকল অবস্থার পরিচায়ক বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর পরাজয়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন—"বাঙ্গালীর এই শোচনীয় জীবন সমস্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীরও দায়িত্ব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কলিকাতা প্রবাসী মাড়োয়ারীগণ পরস্পর সহানুভূতি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা ব্যবসার বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে—প্রবাসী বাঙ্গালী তাহাদের অপেক্ষা শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াও আজ জীবন সমস্যায় পরাভূত হইতেছে; তাহাদের না গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যবসার ক্ষেত্র, না গড়িয়া উঠিয়াছে উপার্জ্জনের কোন স্থায়ী পথ। প্রবাসী বাঙ্গালীর



প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দ—মধ্যস্থলে মূল-সভাপতি আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও অভ্যর্থনা সভাপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

ও পরিমাপক—জাতীয় সাহিত্য। কৃষিশিল্পবাণিজ্যের, জাতির সমাজবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা দেখিতে চাই।" বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তকের অভাব সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়া আচার্য্য রায় বলেন—"মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত পরিভাষার অভাব। কোন বিশিষ্ট ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মানিয়া না চলিলে এই সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব নহে।" তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে ও জীবন সমস্যায় জীবনের সমস্যাগুলিও ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। যাঁহারা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, সাহিত্য, অন্নসমস্যা প্রভৃতি বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কোনরূপ সমাধানে উপস্থিত হইতে পারিলেই প্রবাসী বাঙ্গালীর এই সম্মিলনের পূর্ণ সার্থকতা হইবে।" ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর ৪ দিন সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিনেই সম্মিলনের স্থায়ী সমিতির সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনকে সম্বর্দ্ধনা ও মানপত্র প্রদান করা হয়।

তাহা ছাড়া ৯টি শাখা সম্মিলন হইয়াছিল ; তাহাতে নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—(১) মহিলা শাখা—সভানেত্রী ময়ুরভঞ্জের রাজমাতা শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী (২) দর্শন শাখা—সভাপতি—কাশীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী (৩) সঙ্গীত শাখা—সভানেত্রী শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী—দেশবন্ধু দাশের কন্যা (·) সাহিত্য শাখা —সভাপতি ঢাকার অধ্যাপক শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদার (৫) ইতিহাসশাখা—সভাপতি শ্রীযুত ননীগোপাল মজুমদার—ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (৬) অর্থনীতি শাখা—সভাপতি বোম্বায়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ (৭) বিজ্ঞান শাখা—সভাপতি ডাক্তার রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল—দিল্লীস্থ সরকারী কৃষি গবেষণা মন্দিরের গবেষক (৮) বৃহত্তর বঙ্গ শাখা—সভাপতি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন (৯) কলা বিভাগ—সভাপতি কলিকাতার অধ্যাপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শেষ দিনে আচার্য্য রায় অনুপস্থিত থাকায় এলাহাবাদপ্রবাসী সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিনে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল ও শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন—

গত বড়দিনের ছুটীতে যে সকল সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন তন্মধ্যে অন্যতম। ব্রহ্মদেশবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ গত দুই বৎসর হইতে এই সম্মিলনে সমবেত হইতেছেন। এবার শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সম্মিলনের মূল-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া কলিকাতা হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ব্রহ্মবাসী সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন শাখাসম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন—সাহিত্য-শাখা—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী; ললিতকলা শাখা—মেমাওএর এডভোকেট শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; ইতিহাস শাখা—ব্রহ্মের ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব শাখা—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভৌমিক; দর্শনশাখা—শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বিজ্ঞানশাখা—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মজুমদার। ব্রহ্মদেশবাসী বাঙ্গালীদের এই সম্মিলন একটি বার্ষিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এরূপ সম্মিলনের ফলে পরস্পরের মধ্যে যে মেলামেশা হইয়া থাকে, তাহার অবশ্যই সার্থকতা আছে।

হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব—

মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আগামী ১৩৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সম্পাদিত হইবে। তাঁহার জন্মভূমি রাজবলহাটে ও বাসস্থান খিদিরপুরে উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। স্থির হইয়াছে (১) রাজবল-হাটে তাঁহার জন্মস্থানে 'হেমচন্দ্র-মণ্ডপ' নির্ম্মাণ করা হইবে; (২) খিদিরপুরস্থ পদ্মপুকুর স্কোয়ারে এক আবক্ষ মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে ও (৩) তাঁহার রচনার শতবার্ষিকী সংস্করণ প্রকাশ করা হইবে। সেজন্য ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। গুণী ব্যক্তির আদর করিয়া জাতি ধন্য হয়—হেমচন্দ্র জাতির জন্য কম দান করেন নাই; আশা করি, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার এই ব্যবস্থায় অর্থের অভাব হইবে না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন—

আগামী ১৫ই ও ১৬ই মাঘ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। বগুড়ার খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুও তৎপূর্ব্বে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্মিলনে যোগদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বিষ্ণুপুর তাহার পুরাকীর্ত্তির জন্য বাঙ্গালার ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ; সেই বিষ্ণুপুরে প্রাদেশিক সম্মিলনও এবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইবে। বাঙ্গালার রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা এখন এরূপ হইয়াছে যে বাঙ্গালাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিতে না পারিলে রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালার আর কোন স্থান থাকিবে না। সুভাষচন্দ্র বহুদিন রোগভোগ ও বিদেশবাসের পর আবার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন। তাঁহার সেই শুভযাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার বিষ্ণুপুর গমন; দেশ আজ তাঁহার নিকট নেতৃত্ব আশা করিতেছে; তিনিও নেতারূপে বাঙ্গালাকে সুপথে পরিচালিত করুন—ইহাই আমাদের নিবেদন।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী—

গত ১৩ই ডিসেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ কনভোকেসন সভা করিয়া ভারতের বহু বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ঐ দিন পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জরু, শ্রীযুক্ত এম-আর-জয়াকর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতিকে এল-এল-ডি উপাধি, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ, শ্রীযুক্ত সি-ওয়াই চিন্তামণি প্রভৃতিকে ডি লিট উপাধি এবং সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সার আর্থার এডিংটন, মিষ্টার ব্ল্যাকম্যান প্রভৃতিকে ডি-এস-সি উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতব্যক্তিকে উপাধিহীন হইয়া থাকিতে হইত—গত কয়বৎসর সম্মানসূচক উপাধি প্রদান ব্যবস্থার ফলে তাঁহারা উপাধি লাভ করিতেছেন। জুবিলী উপলক্ষে সমাগত পণ্ডিতবর্গকে এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে পৌর-সম্বর্দ্ধনাও করা হইয়াছিল। গুণীর আদর যাঁহারা করেন, তাহাতে তাঁহাদের মহত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লণ্ডনে হিন্দুমন্দির ও ধর্ম্মশালা—

ভারতবন্ধু সি-এফ-এণ্ডরুজ সাহেব সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ভারতীয়গণের একটি অভাবের বিষয়ে সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে সকল যুবক বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য লণ্ডনে যায়, লণ্ডনের আবহাওয়া প্রায়ই তাহাদিগকে দুশ্চরিত্র করিয়া ফেলে। তাহারা যাহাতে লণ্ডনেও হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সহিত সংযোগ রাখে, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য লণ্ডনে একটি হিন্দু মন্দির ও একটি হিন্দু ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন। মন্দিরে ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীগণ বাস করিয়া সমাগত হিন্দু যুবকদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতে পারিবেন ও ভারতীয় ছাত্রগণের খোঁজ খবর রাখিয়া তাহারা যাহাতে বিপথগামী না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ছাত্রগণ প্রথমে লণ্ডনে যাইয়া থাকিবার স্থানের জন্য বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন; সেজন্য তথায় একটি হিন্দু ধর্ম্মশালা থাকা ও বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রগণ প্রথম কয়েকদিন তথায় থাকিয়া নিজ নিজ উপযুক্ত বাসস্থান খুঁজিয়া লইবার সময় ও সুযোগ লাভ করিতে পারিবেন। মহাপ্রাণ এণ্ডরুজ বহুদিন লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রগণের অবস্থা দেখিয়া তাহাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহার এই আবেদন যাহাতে সত্বর পূর্ণ করা হয়, প্রত্যেক ভারতবাসীরই সেজন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।



পরলোকগত রায় বাহাদুর সতীন্দ্রমোহন সিংহ এম এ
গত মাসে ইঁহার মৃত্যু সংবাদ আমরা প্রকাশ করিয়াছি

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মিলন—

বড়দিনের ছুটীতে এবার কলিকাতায় অন্যান্য বারের মত বহু সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল; তন্মধ্যে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মিলনের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ২৭শে ডিসেম্বর সোমবার হইতে কয়েকদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে উক্ত সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত সি-আর-রেড্ডী সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ডাক্তার সার নীলরতন সরকার সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সনৎকুমার রায়চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সভাপতি শ্রীযুত রেড্ডী তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—"যতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গতানুগতিক ধারায় চলিত, ততদিন গভর্ণমেণ্টের তরফ

হইতে কোন গণ্ডগোল দেখা যাইত না। কিন্তু সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন করিলে পর যখন এই বিদ্যালয় হইতে বড় বড় জ্ঞানী ও গুণী লোক বাহির হইতে থাকে তখনই গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যত আপত্তি উঠিতে থাকে।" সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালা সরকারের প্রস্তাবিত শিক্ষা-বিলেরও তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়—

আমরা জানিয়া ব্যথিত হইলাম, গৃহস্থ-মঙ্গল পত্রিকার সম্পাদক অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ৫ই নভেম্বর মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বল গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি



অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ গৃহস্থের উপকারী কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং সেগুলি পাঠকসমাজে আদৃতও হইয়াছিল। নিজে তেমন অর্থশালী না হইয়াও তিনি সর্ব্বদা পরোপকার করিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক, বাঙ্গালী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন—এ সংবাদে বাঙ্গালীমাত্রই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। যুক্তপ্রদেশে এই প্রথম একজন বেসরকারী ভদ্রলোককে এইপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ধূর্জ্জটীবাবু গুণী ব্যক্তি—কাজেই তিনি যে এই কার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা প্রকাশে সমর্থ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর এই অসাধারণ সম্মানলাভ শুধু ধূর্জ্জটীবাবুর পক্ষে নহে—বাঙ্গালী মাত্রেরই পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

কীর্ত্তনীয়া গণেশ দাশ—

বাঙ্গালাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক গণেশদাশ মহাশয় গত ৩১শে আশ্বিন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার নিকটস্থ গড়দুয়ারা নামক স্থানে নিজ গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমে



গণেশ দাস

সাধনোচিতধামে গমন করিয়াছেন। ১২৬৭ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ নদীয়া জেলার বারুইপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা মহেশচন্দ্র দাশ মহাশয়ও খ্যাতনামা কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন। গণেশ দাশের কণ্ঠস্বর অতিশয় মধুর ছিল—তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল বাঙ্গালীকে সুমধুর লীলাকীর্ত্তন শুনাইয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় গণেশদাশের কীর্ত্তনের অনুরাগী

ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত পি-আর-দাশ গণেশের নিকট কীর্ত্তন-শিক্ষা করিয়াছিলেন। গণেশের মৃত্যুতে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

বালক যাদুকর—

কলিকাতা বরাহনগর ২৪ নং বরদা বসাক ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুত দুর্গাদাস ঘোষাল মহাশয়ের ১৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান দেবকুমার ঘোষাল অপূর্ব্ব ম্যাজিক দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন। তিনি বিখ্যাত যাদুকর গণপতির প্রিয়তম শিষ্য। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির নিকট হইতে সেজন্য প্রশংসাও লাভ করিয়াছেন। তিনি চক্ষু বাঁধা অবস্থায় অঙ্ক কসিতে ও ছবি আঁকিতে পারেন। চতুর্দ্দশবৎসরবয়স্ক বালকের পক্ষে এরূপ যাদুবিদ্যা প্রদর্শন বাস্তবিকই বিস্ময়কর।



দেবকুমার ঘোষাল

বিপন্ন চীনকে সাহায্য দান ঃ—

জাপান কর্ত্তৃক চীনে যে ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার প্রতিবাদে সকল দেশকে জাপানী পণ্য বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিয়া কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত মনীষী এক নিবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার জন ডিউই, অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন, মিঃ বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও মঃ রোমা রোলা ঐ নিবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যাহাতে জাপানী পণ্য বর্জ্জন করে ও চীনের এই দুর্দ্দিনে তাহাকে সাহায্য করে, সে জন্যও উক্ত পণ্ডিতচতুষ্টয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে এক পত্র লিখিয়াছেন। ঐ পত্রের উত্তরে পণ্ডিত জহরলাল তাঁহাদের জানাইয়াছেন—কংগ্রেস ইতিপূর্ব্বেই জাপানের এই আক্রমণ নীতির নিন্দা করিয়াছে, ভারতবাসী সকলকে জাপানী পণ্য বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিয়াছে ও চীনের বিপদে তাহাকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছে। ভারতবাসীরা যাহাতে চীনে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করে, কংগ্রেস হইতে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে; উপযুক্ত অর্থ সঞ্চিত হইলে চীনে চিকিৎসার দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হইবে।

কুমারী অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায়—

দিল্লী অঞ্চলে অসাধারণ সঙ্গীত নিপুণতার জন্য কুমারী অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

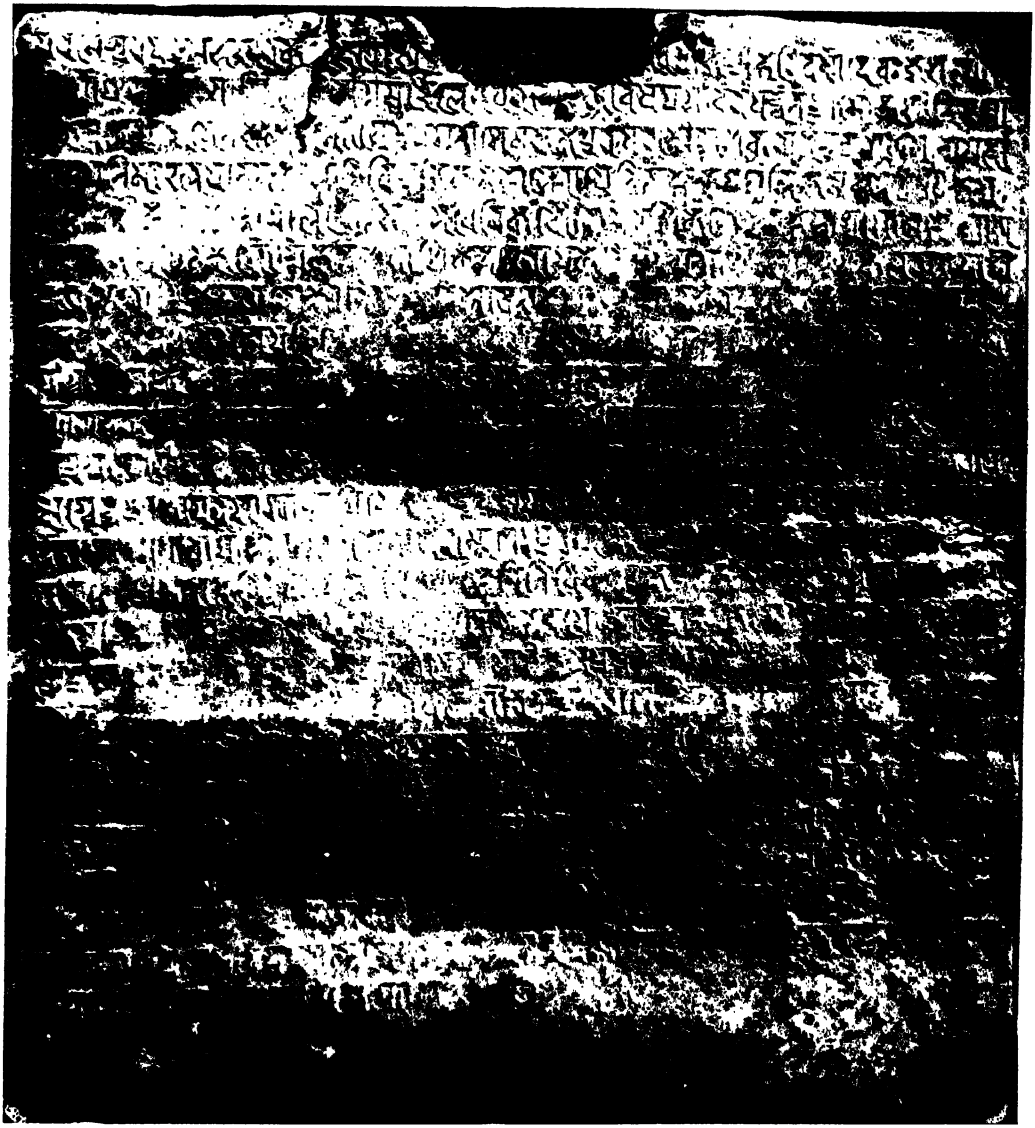


কুমারী অসীমা বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার বয়স ৯ বৎসর। তিনি দিল্লী ও সিমলায় কয়েকটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক কাপ ও মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্বর অতি মধুর। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ঃ—

গত ২৮শে ডিসেম্বর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিংশ-বার্ষিক উপাধি বিতরণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার কাশীর মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য উপাধি বিতরণ করিয়াছিলেন। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষও এবার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান-সূচক উপাধি প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসে সমাগত বহু বৈজ্ঞানিক, ভারতের বহু খ্যাতনামা নেতা এবং বহুসংখ্যক রাজা মহারাজা সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়াছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি সার জেম্স



হরিবর্ম্মদেবের সামন্তসার তাম্রশাসন

[১৬৯ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]



লাট ন

জীন্‌স উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মালব্যজী এই উৎসবে ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতিও সেরূপ ব্যবহার কর—এই সত্য যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে সে কখনও অন্যের অন্তরে বেদনা দিবে না। আজ পৃথিবীতে এই শিক্ষার বড় বেশী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রগণ সত্য বলিবে, কর্ত্তব্য করিবে, পাঠে অবহেলা করিবে না, দেবদ্বিজ ও পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবে, মনু ও গীতার শিক্ষার প্রতি অবহিত থাকিয়া তদনুযায়ী নিজদিগকে গড়িয়া তুলিবে—ইহাতেই তাহাদের কল্যাণ হইবে।"

ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মিলন ঃ—

কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পঞ্চবিংশতিতম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লর্ড রাদারফোর্ড নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি হঠাৎ পরলোক গমন করায় সার জেম্‌স জীন্‌সকে সভাপতি পদে বরণ করা হয়। রাদারফোর্ড নিউজীলণ্ডের অন্তর্গত নেলসন সহরের লোক, তিনি পরে বিলাতের কেম্ব্রিজে যাইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস মার্কনিই বেতার বার্ত্তা প্রেরণের যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে লর্ড রাদারফোর্ডই প্রথম কেম্ব্রিজে ইহা আবিষ্কার করেন। রাদারফোর্ড বহুবর্ষব্যাপী গবেষণা দ্বারা অতি-বেগুনী (Ultra Violet) রশ্মি সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি Radio activity সম্বন্ধে তাঁহার যুগপ্রলয়কারী গবেষণা। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সার জেম্‌স জীন্‌সও কেম্ব্রিজের ছাত্র; তিনি বিলাতের রয়াল সোসাইটীর সদস্য, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিভাগের পরামর্শ কমিটীর সদস্যের কার্য্য করিতেছেন।

লর্ড রাদারফোর্ড বিজ্ঞান সম্মিলনের জন্য সভাপতির অভিভাষণ লিখিয়াছিলেন; তাহা কলিকাতায় পঠিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি ভারতের বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। সভাপতি সার জেম্‌স জীন্‌স তাঁর অভিভাষণে রাদারফোর্ডের জীবনী ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। উভয়ের অভিভাষণ একত্র করিলে তাহা বিজ্ঞান-জগতের একখানি ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় বিজ্ঞান সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে ভারতের বড়লাট লর্ড লিংলিথগো সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছেন। তাহার পর ৭ দিন ধরিয়া বিজ্ঞান সম্মিলনের বিভিন্ন বিভাগের অধিবেশনে বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বহু প্রবন্ধ পঠিত ও বহু বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা স্থানান্তরে বিজ্ঞান সম্মিলনে আগত বহু বিদেশী বৈজ্ঞানিকের চিত্র প্রকাশ করিলাম।

স্বরূপরাণী নেহরু—

কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জননী স্বরূপরাণী নেহরু গত ৯ই জানুয়ারী রাত্রিতে এলাহাবাদে পরিণত বয়সে পরলোকগতা হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি তাঁহার স্বামী দেশবরেণ্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত দেশসেবার কার্য্যে যোগদান করিয়া নানাপ্রকার নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি জহরলালের যোগ্যা জননীই ছিলেন। তাঁহার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে শ্রীমতীবিজয়লক্ষ্মীপণ্ডিত বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী। জহরলাল কিছুকাল পূর্ব্বে বিপত্নীক হইয়াছেন; তাঁহার এই মাতৃশোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই।

ভারতীয় ইতিহাস পরিষদ ঃ—

গত বড়দিনের ছুটীতে কাশীধামে পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের এক সম্মিলন হইয়াছিল; তথায় ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য একটি ইতিহাস-পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদ 'ভারত সেবক সমিতি'র কার্য্য পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ—রেক্টার। সার যদুনাথ সরকার—ডিরেক্টার। ডাক্তার হীরানন্দ

শাস্ত্রী—সহকারী ডিরেক্টার। শেঠ যমুনালাজ বাজাজ কোষাধ্যক্ষ। কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার —সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঙ্গালার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ব্যবস্থা হইয়াছে; এই পরিষদের যত্নে যদি ভারতের একখানি নিখুঁত ইতিহাস রচিত হয়, তাহা অবশ্যই দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলের বিষয়।

প্রজাস্বত্ব বিলের সংশোধন—

গত সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রজাস্বত্ব বিলের সংশোধনের ফলে বাঙ্গালা দেশের কৃষকদিগের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি হইয়াছে—(১) জমী হস্তান্তরিত করার সময় জমীদারকে যে সেলামী দিতে হইত, তাহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (২) দখলী স্বত্ব বিক্রয় করা হইলে নূতন ব্যবস্থায় জমীদারের প্রথম ক্রয়ের দাবী থাকিবে না এবং অংশীদার প্রজা ইচ্ছা করিলেই প্রথম ক্রয় করিতে পারিবে। (৩) বাকী খাজনার উপর ধার্য্য সুদ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে—পূর্ব্বে সুদের হার ছিল ১২ টাকা ৮ আনা—এখন হইয়াছে ৬ টাকা ৪ আনা। (৪) প্রজাস্বত্ব আইনে রায়তদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু আগামী ১০ বৎসরের জন্য ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ আছে। (৫) নূতন ব্যবস্থায় স্বত্বাধিকারী রায়তের মত তাহার অধীন রায়তদিগকেও অধিকার হস্তান্তরিত করিবার বা তাহাতে ইস্তফা দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। (৬) যদি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পরে কোন রায়ত বা অধীন রায়ত তাহার জমী খাইখালাসি রেহান দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ঋণের আসল টাকা ও সুদ দিয়া দিলেই ১৫ বৎসর পরে তাহার জমী ফিরাইয়া পাইবে। (৭) জমিদারগণ খাজনা আদায় করিবার জন্য সার্টিফিকেট জারি করিতে পারিবেন না। (৮) আব্‌ওয়াব আদায় দণ্ডনীয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। (৯) যদি কোন প্রজার জমী বন্যায় প্লাবিত হয় তাহা হইলে প্রজার (ক) ন্যায়সঙ্গত খাজনা কমাইতে ও (খ) ২০ বৎসরের মধ্যে জমা উদ্ধার হইলে ৪ বৎসরের খাজনা লইতে জমীদার বাধ্য থাকিবেন। কাজেই এই নূতন ব্যবস্থায় প্রজা যদি সুবিধা পায়, তাহা হইলে বিবাদ যে অনেকাংশে কমিয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হাসপাতালের জন্য সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা দান—

হাওড়া জেলার মৌড়ীগ্রামের জমীদারবংশের শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ কুণ্ডু চৌধুরী মহাশয় উক্ত গ্রামে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা তথায় আউট ডোর বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ তিন শত রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসিত ও ঔষধপ্রাপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি হাসপাতালের ইনডোর বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আরও দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। মৌড়ীর কুণ্ডুবাবুরা তাঁহাদের দানের জন্য চিরদিন বিখ্যাত; কমলবাবু বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিলেন। দাতা-শতংজীবতু।

গভর্ণর ও খাদিপ্রদর্শনী—

ভারতের যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন সে সকল প্রদেশের রাজনীতিক আবহাওয়া কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সেখানকার ২।১টি ঘটনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। খদ্দর পরিধান এক সময়ে এদেশে রাজনীতিক অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত; খদ্দর পরার জন্য বহু সরকারী কর্ম্মচারীকে পূর্ব্বে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। এখন গভর্ণরগণ পর্য্যন্ত (অবশ্য কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে) খদ্দর ব্যবহার করিতেছেন এবং গত ২৩শে ডিসেম্বর মাদ্রাজের গভর্ণর তথায় খদ্দর প্রদর্শনীতে দেখিতে যাইয়া খদ্দর ক্রয় করিয়াছেন। সত্যই কি তবে শ্বেতাঙ্গ-শাসকগণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রীমান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দারুণ পাকস্থলীর রোগে আক্রান্ত হইয়া নার্সিং-হোমে বাস করিতেছেন—এ সংবাদে দেশবাসী সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সত্বর সুস্থ হইয়া আবার বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন। তাঁহার দেশবাসী সকলকেও আমরা আমাদের এই প্রার্থনায় যোগদান করিতে অনুরোধ করি।



ভারতের প্রথম জয় ঃ

তৃতীয় বে-সরকারী টেষ্ট ঃ

১৯৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে ভারতবর্ষ ও লর্ড টেনিসনের দলের তৃতীয় বে-সরকারী টেষ্ট আরম্ভ হয়ে ১৯৩৮ সালের ৩রা জানুয়ারী বেলা ২-১০ মিনিটে শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষ এই সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধিমূলক টেষ্টখেলায় ৯৩ রানে জয়ী হলো। ১৯৩২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা চলছে, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে কখনও ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় নাই। যদিও ইহা বে সরকারী টেষ্ট খেলা তথাপি এ গৌরব ও জয়ের আনন্দ বহুদিন ভারতবাসীর মনে জাগরূক থাকবে। মাদ্রাজে চতুর্থ টেষ্ট খেলা হবে এবং খুব সম্ভবত পঞ্চম টেষ্ট খেলা হবে বোম্বাইয়ে। এই দু'টি খেলায় যদি ভারতবর্ষ জয়ী হতে পারলে তারা 'রবার' পাবে।

ভারতবর্ষ—৩৫০ ও ১৯২

লর্ড টেনিসন দল—২৫৭ ও ১৯২

এই জয়লাভ সম্ভব হয়েছে অমরনাথ, মাস্তাক আলি, মানকাদ ও হিন্দেলকারের ব্যাটিং এবং অমরসিং, মানকাদ ও নিসারের বোলিংয়ের জন্য। দুর্ঘটনা বৈচিত্র্যের জন্যও এই টেষ্টটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতবর্ষ প্রথম দিনের শেষে ৫ উইকেটে আশাতীত ৩১৩ রান তোলে। কিন্তু পরদিন ৩৫ মিনিটের মধ্যে মাত্র ৩৭ রানে বাকী ৫টি উইকেট অপ্রত্যাশিত ভাবে পড়ে যায়। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দলের দু'জন খেলোয়াড় শতাধিক রান করেন। দু' ইনিংসে টেনিসন দলের কেহই শতাধিক রান করতে পারেন নাই। উভয় দলেরই দ্বিতীয় ইনিংস ১৯২ রানে সমাপ্ত হয়। ভারতের প্রথম ইনিংসের অধিক ৯৩ রান সংখ্যাই শেষ পর্য্যন্ত রয়ে গেলো। প্রথম ইনিংসে মাস্তাক আলির ১০১, অমরনাথের ১২৩ ও মানকাদের ৫৫ বিপক্ষ ক্যাপটেনের ও দলের মনে ভীতি উৎপাদন করেছিল। মাস্তাকের মানকাদের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেট সহযোগিতায় ১০৯ রান এবং অমরনাথের সঙ্গে সহযোগিতায় ৭৭ রান উঠেছিল।



বিজয় মার্চেন্ট
(ক্যাপটেন—ভারতবর্ষ)

মাস্তাক আলি তিনটি সুযোগ দিলেও স্বচ্ছন্দভাবে সুন্দর মেরে খেলেছেন, মারগুলি বেশ দর্শনীয় এবং তাঁর 'ফুট ওয়ার্ক' মনোরম ও প্রশংসনীয়। অমরনাথ ও মানকাদ কোন সুযোগ দেন নাই। তাঁরা উইকেটের চতুর্দ্দিকে পিটিয়ে অতি



ভিনু মানকাদ



অমরনাথ



অমর সিং

সুন্দর খেলেছেন। অমরনাথের খেলা অতুলনীয়, তাঁর ১২৩ রান টেনিসন দলের বিপক্ষে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ রান। মানকাদের এবারের ৫৫ টেনিসন দলের বিপক্ষে সাত ইনিংসে পঞ্চম অর্দ্ধশত রান।

ভিনু মানকাদ সম্বন্ধে লর্ড টেনিসন বলেছেন—'that the real find of the present series of test is Vinoo Mankad—the seventeen year old Jamnagar boy. He is a fine all-rounder, a magnificient and a brilliant bowler. আম্পায়ার বিল হিচ্ মানকাদের সম্বন্ধে বলেছেন –'I liked Mankad's batting. This young player tender in years is already on the long way to Big Cricket. বিল অমরনাথ সম্বন্ধে বলেছেন,—Amarnath's Innings was of a class by itself. The way the young Punjab cricketer hurled defiance at the English bowling when it looked pretty devastative deserved the highest praise. He has a delightfully carefree style and * * * shall I add, "self-confidence." Some of his shots, which he sent in all directions of the wicket were perfect gems.

*** Amarnath was definitely on top and he secured his advantage with the natural grace of an artist. People who had seen him play against Jardine's men at Bombay could never forget the fluent stream of runs that flowed from his bat. *** today he has walked straight to the front rank of Indian Cricket.



ল্যাংরিজ



লর্ড টেনিসন



গোভার



ওয়েলার্ড



এডরিচ্



গিব্



ইয়ার্ডলে

হিন্দেলকারের সুন্দর উইকেট রক্ষা সকলকে বিশেষ

বিমোহিত করেছে। হার্ডষ্টাফের দুরূহ ক্যাচটি অতি তৎপরতার সঙ্গে নিয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়েও বেশ কৃতিত্ব দেখিয়ে সর্ব্বোচ্চ রান ৬০ করেছে। ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে নির্ভর করছে মাস্তাক আলি, অমরনাথ ও মানকাদের উপর। মার্চ্চেণ্টের উপর অধিনায়কের ভার পড়ার পর থেকে তাঁর ব্যাটিংয়ের শক্তি অন্তর্হিত হয়েছে।

কামারুদ্দিন ও আব্বাস খাঁ মনোনীত হওয়ার যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে নি। তবে আব্বাস খাঁর ফিল্ডিং বেশ উচ্চাঙ্গের হয়েছে। কমল ভট্টাচার্য্যকে ও কার্ত্তিক বসুকে উপস্থিত থাকবার জন্য জানিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গলার একজনকেও মনোনীত না করাতে স্থানীয় ক্রীড়ামোদীরা বিশেষ দুঃখিত ও আশাহত হয়েছেন। মার্চ্চেণ্ট কার্ত্তিক বসুর সম্বন্ধে জানান যে কার্ত্তিক বোম্বাই থেকে সময়ে না ফেরায় দলভুক্ত হতে পারেন নি। কিন্তু কমল ভট্টাচার্য্য কি জন্য মনোনীত হ'লো না? কে ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে বিল হিচ্ বলেছেন,—'Personally I would have liked to have seen K. Bhattacharjee in action in this Test as I consider him to be one of the finest all-rounders in Bengal.



মাস্তাক আলি



হিন্দেলকার



নিসার

বোলিংয়ে মহম্মদ নিসার প্রথম ইনিংসে কৃতকার্য্য হয়েছেন। অমরসিংয়ের বোলিং দু' ইনিংসেই বেশ মা রা ত্ম ক হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসেও মানকাদ বোলিংয়ে বেশ কৃতকার্য্য হয়েছে। ব্যানার্জ্জির বোলিং ভাল হয় নি, 'লেংথ' ভাল হয় নি, একটিও উইকেট পায় নি।

টেনিসন দলের ব্যাটিং প্রশংসনীয় হয় নাই। হার্ডষ্টাফ, ই য়া র্ড লে, ল্যাংরিজ, পোপ, লর্ড টেনিসন ও গিব মাত্র কিছু রান তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। হার্ডষ্টাফ দু' ইনিংসেই ভালো ব্যাট করেছেন। হার্ডষ্টাফ সত্যই ভালো ব্যাট; তাঁর সম্বন্ধে বিল হিচ্ বলেছেন,—'This player is one of England's finest batsmen when going. His crisp driving off his back foot is a pleasure to watch.

বোলিংয়ে পোপ, গোভার, ওয়েলার্ড ও ল্যাংরিজ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পোপের এককালীন বিশ্লেষণ দাঁড়িয়েছিল, ৫ ওভারে ১ মেডেন, ১১ রানে ৫ উইকেট।



ম্যাক্‌কর্কেল



পোপ



ওয়ার্দিংটন



হার্ডষ্টাফ ব্যাট করছেন

উইকেট পতন :—২৪ রানে ১, ১৩৩ রানে ২, ২১০ রানে ৩, ২৩৪ রানে ৪, ৩০৯ রানে ৫, ৩১৪ রানে ৬, ৩৩৭ রানে ৭, ৩৩৮ রানে ৮, ৩৩৮ রানে ৯, ৩৫০ রানে ১০

বোলিং :— প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
গোভার	২২	৩	৯৩	৪
ওয়েলার্ড	২৯	৩	১০৯	০
পোপ	২০	৩	৭০	৫
ল্যাংরিজ	৮	০	২৫	০
ওয়ার্দিংটন	৮	০	২৮	১

ভারতবর্ষ

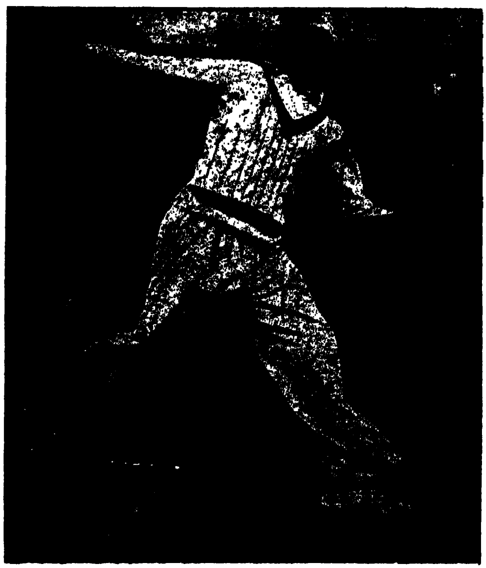
তৃতীয় টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

মান্তাক আলি…কট ম্যাক্‌করকেল, ব ল্যাংরিজ	৫৫
হিন্দেলকার…কট ওয়েলার্ড, ব ল্যাংরিজ	৬০
মানকাদ…ব ল্যাংরিজ	২৫
অমর সিং …ব ওয়েলার্ড	২
অমরনাথ…কট ওয়ার্দিংটন, ব ল্যাংরিজ	০
মার্চেন্ট…এল-বি (নূতন), ব ওয়েলার্ড	৯
কামারুদ্দিন…এল-বি, ব ওয়েলার্ড	২
আব্বাস খাঁ…ব ল্যাংরিজ	১৩
এস ব্যানার্জ্জি…কট ম্যাক্‌করকেল, ব ওয়েলার্ড	০
আমীর ইলাহী… নট আউট	১৫
নিসার…ব ল্যাংরিজ	১
অতিরিক্ত	১০
মোট	১৯২

ভারতবর্ষ

তৃতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

মান্তাক আলি…কট এড্‌রিচ্, ব গোভার	১০১
ভি ডি হিন্দেলকার কট এড্‌রিচ্, ব গোভার	১০
ভিন্নু মানকাদ …কট ওয়েলার্ড, ব গোভার	৫৫
এল অমরনাথ …এল-বি, ব পোপ	১২৩
কামারুদ্দিন · এল-বি, ব গোভার	৪
ভি এম মার্চেন্ট …এল-বি, ব ওয়ার্দিংটন	১৯
আব্বাস খাঁ…কট এড্‌রিচ্, ব পোপ	২
এস ব্যানার্জ্জি …ব পোপ	২
অমরসিং… নট আউট	৯
আমীর ইলাহী…কট ম্যাক্‌করকেল, ব পোপ	০
নিসার · এল-বি, ব পোপ	০
অতিরিক্ত	২৫
মোট	৩৫০



আমীর ইলাহী বল করছেন

উইকেট পতন :—৮৪ রানে ১, ১৩৮ রানে ২, ১৪২ রানে ৩, ১৪৭ রানে ৪, ১৫০ রানে ৫, ১৫৩ রানে ৬, ১৭৬ রানে ৭, ১৭৬ রানে ৮, ১৮২ রানে ৯, ১৯২ রানে ১০

বোলিং :— দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
গোভার	১	০	৯	০
ওয়েলার্ড	১৮	১	৬১	৪
ওয়ার্দ্দিংটন	৫	২	১০	০
পোপ	১২	০	৫৫	০
ল্যাংরিজ	১৬.৪	৪	৪১	৬

লর্ড টেনিসন দল

তৃতীয় টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

এড্‌রিচ্‌···কট নিসার, ব অমর সিং	১৯
ম্যাক্‌কর্‌কেল···কট নিসার, ব আমীর ইলাহী	২৮
হার্ডষ্টাফ্‌···কট হিন্দেলকার, ব নিসার	৫৯
ইয়ার্ডলে···কট হিন্দেলকার, ব নিসার	৩৮
ল্যাংরিজ···কট ব্যানার্জ্জি, ব নিসার	০
ওয়ার্দ্দিংটন···ব নিসার	১
গিব্‌···ব নিসার	৬
ওয়েলার্ড·· ব আমীর ইলাহী	২২
লর্ড টেনিসন·· ব অমর সিং	২৮
পোপ··· নট আউট	৪১
গোভার ··কট হিন্দেলকার, ব অমর সিং	৩
অতিরিক্ত	১২
মোট	২৫৭

উইকেট পতন :—২১ রানে ১, ৭৫ রানে ২, ১৪০ রানে ৩, ১৪০ রানে ৪, ১৪৪ রানে ৫, ১৫০ রানে ৬, ১৫৭ রানে ৭, ১৮৩ রানে ৮, ২৩৭ রানে ৯, ২৫৭ রানে ১০

বোলিং :— প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
মহম্মদ নিসার	২৭	৬	৭৯	৫
অমর সিং	২৬.১	৪	৬৫	৩
ব্যানার্জ্জি	১০	১	৪০	০
অমরনাথ	৬	১	৮	০
আমীর ইলাহী	১৪	১	৫১	২
মানকাদ	২	১	২	০

লর্ড টেনিসন দল

তৃতীয় টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

এডরিচ্‌ · কট মানকাদ, ব অমর সিং	৩
ম্যাক্‌করকেল···ব অমর সিং	৩
হার্ডষ্টাফ···ব অমর সিং	৪৯
ইয়ার্ডলে···কট মাস্তাক আলি, ব অমর সিং	১৫
ল্যাংরিজ · কট ও ব মানকাদ	৩০
ওয়ার্দ্দিংটন···কট আমীর ইলাহী, ব মানকাদ	১১
পোপ···কট হিন্দেলকার, ব মানকাদ	২
গিব্‌··· নট আউট	২১
লর্ড টেনিসন···কট মানকাদ, ব আমীর ইলাহী	৮
ওয়েলার্ড···কট ব্যানার্জ্জি, ব আমীর ইলাহী	১৫
গোভার···কট নিসার, ব মানকাদ	১৩
অতিরিক্ত	১৪
মোট	১৯২

উইকেট পতন :—৩ রানে ১, ১২ রানে ২, ৪৬ রানে ৩, ৮১ রানে ৪, ১১২ রানে ৫, ১২৫ রানে ৬, ১২৮ রানে ৭, ১৩৯ রানে ৮, ১৫৭ রানে ৯, ১৯২ রানে ১০

বোলিং :— দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
মহম্মদ নিসার	৯	২	২২	০
অমর সিং	৩৩	৪	৭৬	৪
অমরনাথ	৩	২	৮	০
আমীর ইলাহী	৭	০	২৫	২
মানকাদ	১৬.৪	৩	৪৭	৪

দ্বিতীয় বে-সরকারী টেষ্ট ঃ

লর্ড টেনিসন দল—১৯১ ও ১৭১ (৪ উইকেট)

ভারতবর্ষ—১৫৩ ও ২০৮

বোম্বাইয়ে লর্ড টেনিসন দল দ্বিতীয় টেষ্টে ৬ উইকেটে বিজয়ী হয়েছেন। চতুর্থ দিনে মাত্র ৮১ রান করলেই টেনিসন দল জয়ী হবে। এড্‌রিচ ও ওয়ার্দ্দিংটন মিলে ঐ প্রয়োজনীয় রান দু'ঘণ্টার কম সময়ে তুললে টেনিসন দল জয়ী হয়।

পার্ক ৪৪, এড্রিচ ৪২, ওয়ার্দ্দিংটন ৩১; দ্বিতীয় ইনিংসে এডরিচ্ (নট আউট) ৮৬, ওয়ার্দ্দিংটন (নট আউট ৪৯।

ব্যানার্জ্জি ৪৭ রানে ৩, অমরসিং ৪৬ রানে ২, নিসার ৭১ রানে ২, মানকাদ ৬ রানে ২, অমরনাথ ৮ রানে ১ উইকেট; দ্বিতীয় ইনিংসে অমরসিং ৫৭ রানে ২, অমরনাথ ১৫ রানে ১, নিসার ৩৫ রানে ১ উইকেট।

ভারতীয় দলের মানকাদ ৩৮, অমরনাথ ৫০, কামারুদ্দিন ২৯, হিন্দেলকার ২১; দ্বিতীয় ইনিংস মানকাদ ৮৮, ব্যানার্জ্জি ৩৬, যুবরাজ পাতিয়ালা ২২; অমরসিং রান আউট হন।



তৃতীয় টেষ্টের নিখিল ভারত ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ

গোভার ৪৬ রানে ৫, ওয়েলার্ড ৩০ রানে ৩, পোপ ৩৯ রানে ২ উইকেট; দ্বিতীয় ইনিংসে গোভার ৮৮ রানে ৫, ওয়েলার্ড ৬১ রানে ৪ উইকেট।

টেনিসন দল—১৪৫ ও ২০১ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

যুক্ত প্রদেশ—১৫৪ ও ৬৭ (১ উইকেট)

দু'দিনের খেলা সময়াভাবে অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে। প্রথম ইনিংসে মহম্মদ নিসার ৫৮ রানে ৭ উইকেট নিয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সালাউদ্দীন ৮০ রানে ৩, মূর্ত্তি ২৭ রানে ৩ ও ফিরাসাৎ ২৪ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

টেনিসন দল—১৯২ ও ১২৬ (৪ উইকেট)

মধ্য ভারত—১৯১ ও ১৮২ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

সময়াভাবে খেলা ড্র হয়েছে।

প্রথম ইনিংস ইস্তাক আলি ৩৪, ভায়া ৭৮; (গোভার ৫৮ রানে ৪, পোপ ৫১ রানে ৫ উইকেট); দ্বিতীয় ইনিংস মাস্তাক আলি ২৮; (গোভার ৩৫ রানে ৩, পোপ ৫৭ রানে ৩, ল্যাংরিজ ২৮ রানে ২ উইকেট)

ওয়ার্দ্দিংটন ৬২, গিব্ ৩১; (হাজারী ৫৪ রানে ৬, নাইডু ৭০ রানে ৩ উইকেট); দ্বিতীয় ইনিংস এড্রিচ্ (নট আউট) ৬৬, হার্ডষ্টাফ ২৬; (সি কে নাইডু ৩৩ রানে ৩ উইকেট)

টেনিসন দল—২১১ (৬ উইকেট)

বিহার দল—৮৪

একদিনের খেলায় বিহার দল ১০ উইকেটে পরাজিত হয়েছে। টেনিসন দল কোন উইকেট না খুইয়েই বিহার দলের রান সংখ্যা অতিক্রম করেন। ল্যাংরিজ ১৩ রানে ৪, পোপ ১২ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। এফ এ খাঁ ১৬ রানে ৩ উইকেট পেয়েছে।

হিন্দু জিমখানার বিশেষ খেলা ঃ

বোম্বাইয়ে হিন্দু জিমখানার উদ্যোগে নাইডুর একাদশ বনাম দেওধরের একাদশের মধ্যে প্রীতি সম্মিলন খেলায় নাইডুর দল ৯২ রানে বিজয়ী হয়েছে।

নাইডুর দল ঃ—২২৩ ও ৪৫৩ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড),

দেওধরের দল ঃ—৩০৬ ও ২৭৫

নাইডুর দলের প্রথম ইনিংসে ওয়াদকার ৪৮, ডাঃ গুর্ত্ত (নট আউট) ৫০; (স্যুঁটে ব্যানার্জ্জি ৪৩ রানে ৪ উইকেট)।

দ্বিতীয় ইনিংসে নাইডু ১২০, হাজারী (নট আউট) ১০৮, ভগবান দাস ৪৬, রোসনলাল ৪২, গোদাম্বে (নট



এস ব্যানার্জ্জি



কার্ত্তিক বসু

আউট) ৩২ ; (স্যুঁটে ব্যানার্জ্জি ৯৮ রানে ৩, গান্ধী ১০৯ রানে ৩, নিম্বলকার ৩৬ রানে ২ উইকেট)



সি কে নাইডু

দেওধরের দলের প্রথম ইনিংসে হিন্দেলকার ৭২, কার্ত্তিক বসু ৪৫, নিম্বলকার (নট আ উ ট) ৫৪ ; (নাইডু ৮৯ রানে ৪ উইকেট)

দ্বিতীয় ইনিংসে মাস্তাক আলি ৫১, কার্ত্তিক বসু ৫৪, নিম্বলকার ৩২, হাবিবুল্লা (নট আউট) ৪৫ ; (মেজর নাইডু ৬৯ রানে ৫, নওমল ১৩১ রানে ৩)

কার্ত্তিক বসু ৫০ মিনিট খেলে ৫৪ করেছেন, ২টি ছয় ও ৯টি চার ছিল।

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

মুস্‌লিম ঃ—২০১ ও ১০৪ (২ উইকেট)

পার্শী ঃ—১৭৮ ও ১২৬

মুসলিম দল ৮ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে। হিন্দু জিমখানা ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে আসন ভাগ নিয়ে গোলযোগ হওয়া ঐ মাঠে খেলতে অসম্মত হওয়ায় রেষ্ট দলের সঙ্গে মুস্‌লিম দলের খেলা হয় এবং মুস্‌লিম দল ৩৩ রানে জয়ী হয়েছে।

মুস্‌লিম ঃ—২৪০ ও ২২৫ (ফৈজ আহমদ ১০০, আব্বাস খাঁ ৫০)

রেষ্টদল ঃ—১৯৯ ও ২৩৩ [ডিসায়াম (নট আউট) ১২২]

মুস্‌লিম ও ইউরোপীয় দলের মধ্যে পেণ্টাঙ্গুলার ফাইনাল খেলা হয় এবং মুস্‌লিম দল এক ইনিংস ও ৯১ রানে ইউরোপীয়দের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে।

মুস্‌লিম ঃ—২৩৯

(মাস্তাক আলি ১৩৫, কামারুদ্দিন ৫০)

ইউরোপীয় ঃ—৬৪ ও ৮৪

[হপ্‌কিন্স (নট আউট) ২১ ; সামারহেজ ২৯]

২ উইকেটে ১১৭ রান করবার পর অবশিষ্ট ৮ উইকেটে মাত্র ৬২ রানে খুইয়ে মুসলিম দলের ইনিংস শেষ হয়। নূতন বল নিয়ে 'অক্সফোর্ডের' ব্রাডস ৭·৩ ওভারে মাত্র ১০ রানে ৭ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন। মাস্তাক আলি সাড়ে তিন ঘণ্টা খেলে ১৩৫ রান করে ব্রাডসের বলে বোল্‌ড হন।

মুসলিম বোলারদের তীব্র আক্রমণের কাছে দ্বিতীয় ইনিংসেও ইউরোপীয় দল দাঁড়াতে পারে নাই। ৪০ রানে প্রথম ৩ উইকেট যায় এবং বাকী ৬ উইকেট ৪৪ রানে মাত্র একঘণ্টার মধ্যে খোয়া যায়। সিদ আমেদ ৯ রানে ৪, আমীর ইলাহী ২০ রানে ৩ উইকেট, সাহাবুদ্দিন ৩০ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।



ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের স্পোর্টসের প্রতিযোগিনীগণ ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপ, বিজয়ী যুধিষ্ঠির সিং (দক্ষিণে) ও বিজিত মদনমোহন ছবি—জে কে সান্যাল

বেঙ্গল লন্‌ টেনিস ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—যুধিষ্ঠির সিং ৭-৫, ৬-৩, ১-৬, ৬-০ গেমে মদনমোহনকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—মিসেস বোলাণ্ড ৬-২, ৬-৩ গেমে মিসেস ফুটিটকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের ডবলসে—মিসেস বোলাণ্ড ও মিস্‌ হার্ভে জনষ্টন ৬-৩, ১-৬, ৬-২ গেমে মিসেস ফুটিট ও মিস্‌ হোম্যানকে পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবল্‌সে—গাউস মহম্মদ ও যুধিষ্ঠির সিং ১-৬, ৪ ৬, ৬-১, ৬-৩ ও ৬-১ গেমে এস সি বিটি ও জে এম মেটাকে পরাজিত করেছেন।

মিক্সড ডবল্‌সে—জে এম মেটা ও মিসেস ফুটিট ৬-২, ৭-৫ গেমে ডি এ হজেস ও মিস হার্ভে জনষ্টনকে পরাজিত করেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ ঃ



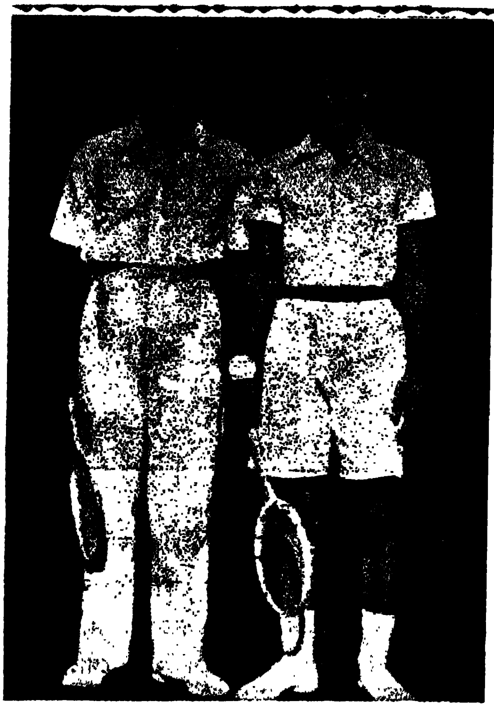
বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপের মেয়েদের ডবলস্‌ বিজয়িনী মিসেস বোলাণ্ড ও মিস হার্ভে জনষ্টন ও বিজিতা মিসেস ফুটিট ও মিস্‌ হোম্যান ছবি—জে কে সান্যাল

কলিকাতা সাউথ ক্লাবের পূর্ব্ব ভারত লন টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ খেলায় নিম্নরূপ ফলাফল হয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলসে—গাউস মহম্মদ ৬-২, ৪-৬, ৭-৫, ৬ ৩ গেমে এস এল সোহানীকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

পুরুষদের ডবলসে—এস এল আর সোহানী ও এইচ এল সোনী ৬-১, ৬-৩, ৭-৫ গেমে কৃষ্ণস্বামী ও এস সি বিটিকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে—মিসেস বোলাণ্ড ৬ ৩, ৭-৫ গেমে মিস লীলা রাও কে হারিয়েছেন।



ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী গাউস মহম্মদ ও বিজিত সোহানী (বামে)



মিস লীলা রাও ও মিসেস বোলাণ্ড। মিসেস বোলাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়িনী হয়েছেন ছবি—জে কে সান্যাল

মহিলাদের ডবলসে—মিসেস বোলাণ্ড ও মিসেস এড্‌নে ৬-৩, ৬-৩ গেমে মিসেস লেকম্যান ও মিসেস ষ্টর্ককে পরাজিত করেছেন।

মিক্সড ডবলসে—জে এম মেটা ও মিসেস আর এল সি ফুটিট ৬-২, ৬-৩ গেমে গাউস মহম্মদ ও মিস লীলা রাওকে হারিয়েছেন।

সেমিফাইনালে—মদনমোহন গাউস মহম্মদের কাছে পরাজিত হন ২-৬, ৬-৪, ৮-৬, ১-৬ ও ৬-৪ গেমে এবং জুগোস্লোভিয়াবাসী বেঁয়ো খেলোয়াড় এফ্ কুকুলজেভিক্ ৬-১, ৬-৩, ৬-৪ গেমে সোহানীর কাছে হারেন।



ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ ও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপের মিক্সড ডবলস্ বিজয়ী জে মেটা ও মিসেস ফুটিট (দক্ষিণে) ও বিজিত গাউস মহম্মদ ও মিস লীলা রাও ছবি—জে কে সান্যাল

বাঙ্গলা ও আসামের ঃ

লর্ড টেনিসন ক্রিকেট দলকে ক্রিকেট এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত সরকারী লাঞ্চে প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার ল্যাগ্‌ডেন বক্তৃতায় নিখিল ভারত দল নির্ব্বাচন সম্বন্ধে মন্তব্য করেন,—'* * * * how one man with the captain as the co-opted member could undertake the selection of an All-India team unless they have opportunities to travel around the country and watch the form of players or consult persons at different centres. Bengal had seldom been consulted and perhaps will not be consulted in future. আমরাও মিষ্টার ল্যাগ্‌ডেনকে সমর্থন করি। মনোনয়ন কর্ত্তাদের হয় সকল প্রদেশের খেলোয়াড়দের ক্রীড়া দেখতে হবে, নতুবা সেই সকল প্রদেশের স্থানীয় কর্ত্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিখিল ভারত দলে স্থানীয় খেলোয়াড়দের মনোনয়ন দ্বারা সেই প্রদেশের খেলোয়াড়দের ক্রীড়ার উন্নতির সহায়তা করতে হবে। যে প্রদেশে টেষ্ট খেলা হবে, অন্ততঃ পক্ষে সেই প্রদেশের দু'একজন উপযুক্ত খেলোয়াড়কে দলে স্থান দিয়ে উৎসাহিত না করলে বিদেশী দলকে অজস্র অর্থ ব্যয়ে ভারতে আনবার উপকারিতা কি? টেনিসন দলের খেলার জন্য কলিকাতাবাসী যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে তার বিনিময়েও কি কলিকাতার একজন খেলোয়াড়কেও দলভুক্ত করা যেতো না!

কোরিন্থিয়ান্স ঃ

কোরিন্থিয়ান্স দল দিল্লীর বাছাই দলকে ২-০ গোলে, রাজপুতানা দলকে ৩-১ গোলে, দিল্লী ইয়ং দলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। দিল্লী দল ভালো খেলেও পরাজিত হয়েছে। লাহোরে উত্তর পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশনের সঙ্গে খেলা ০-০ ড্র হয়েছে। ভাগ্যক্রমে কোরিন্থিয়ান্স পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচে গেছে। হেতমপুরের নির্ব্বাচিত দলকে ২-০ গোলে, হাওড়ায় অল্ বুজকে ২-০ গোলে, ফোর্টে



ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের (কলেজ বিভাগ) অব্‌জারভেসান টেষ্ট।
প্রথম—অরুণা মুখোপাধ্যায় ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



হাজারীবাগে কোরিন্থিয়ান্স ক্যাপ্টেন মাস্কট নকল সিংহ বগলে কিন্তু আই এফ এ ক্যাপ্টেন জীবন্ত নেকড়ে মাস্কট সহ ছবি—তারকদাস

কে ও এস বিকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। কোরিন্থিয়ান্সরা ৩১শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনাভিমুখে যাত্রা করেছে। ভারতবর্ষে তারা মাত্র একটি ম্যাচ হেরেছে, ঢাকায় ঢাকা দলের কাছে।

রেঙ্গুনে তাদের প্রথম খেলা অল বর্ম্মনদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। দ্বিতীয় খেলায় তারা ১-০ গোলে বর্ম্মা এথ্‌লেটিক এসোসিয়েশনের নির্ব্বাচিত একাদশের কাছে পরাজিত হয়েছে। পেনাল্টি পেয়েও হুইটেকার গোল করতে পারে নি। এই অভিযানে এটি তাদের দ্বিতীয় পরাজয়।

ভারতে বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় ঃ

আমেরিকা ও ফরাসীবাসী টেনিস খেলোয়াড় চতুষ্টয় ভারতে খেলতে এসেছেন। দলে আছেন, উইলিয়ম টিলডেন, ফরাসী খেলোয়াড় র‍্যামিলঁর কাছে ৬-৭, ৬-২ গেমে পরাজিত হয়েছেন।

ফ্রান্সবাসী কোসে ৬-৩, ৬ ২ গেমে বার্ককে এবং ৭-৫, ৬-৪ গেমে টিলডেনকে এবং ডবলসে কোসে ও র‍্যামিলঁ ৬-২, ৬ ০ গেমে টিলডেন ও বার্ককে হারিয়েছেন।

ত্রিচিনিপোলীতে র‍্যামিলঁ ৬-২, ৬-১ গেমে বার্ককে, কোসে ৬-২, ৭-৫ গেমে টিলডেনকে এবং ডবলসে কোসে ও র‍্যামিলঁ ৭-৫, ৬-২ গেমে টিলডেন ও বার্ককে পরাজিত করেছেন।

বাঙ্গালোরে বার্ক পূর্ব্ব হারের প্রতিশোধ নিয়েছে র‍্যামিলঁকে 'ষ্ট্রেট' সেটে হারিয়ে; কিন্তু টিলডেন ৬-৩, ৬-৩ গেমে কোসের কাছে পরাস্ত হয়েছেন। কোসে ও র‍্যামিলঁ ৬ ২, ৬-২ গেমে টিলডেন ও বার্ককে হারিয়েছেন।



বৈদেশিক বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়গণ। ফরাসী খেলোয়াড় র‍্যামিলঁ ও কোসে এবং আমেরিকান খেলোয়াড় বার্ক ও টিলডেন ছবি—জে কে সান্যাল

বার্ক, হেনরী কোসে ও র‍্যামিলঁ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইঁহারা পরস্পরের মধ্যে প্রদর্শনী খেলা দেখাচ্ছেন।

মাদ্রাজে বিখ্যাত আমেরিকাবাসী খেলোয়াড় টিলডেন সেকেন্দ্রাবাদে কোসে ও র‍্যামিলঁ এবং টিলডেন ও বার্কের খেলা ৬ ১, ২-৬ গেমে অমীমাংসিত হয়েছে। টিলডেন ৬-৪, ৬-২ গেমে র‍্যামিলঁকে হারিয়ে মাদ্রাজের

পরাজয়ের শোধ নিয়েছেন। কোসে ৬-৪, ৬-৩ গেমে বার্ককে হারিয়েছেন।

হায়দ্রাবাদে কোসে ৬-৪, ৬-৪ গেমে টিলডেনকে, র‍্যামিলঁ ৬-২, ৬-৩ গোলে বার্ককে এবং কোসে ও র‍্যামিলঁ ৩-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে টিলডেন ও বার্ককে হারিয়েছেন।

কলিকাতার সাউথ ক্লাবে ইঁহাদের কয়েকটি প্রদর্শনী ক্রীড়া হয়েছিল, তার নিম্নরূপ ফলাফল হয়েছে :—

সিঙ্গলসে—টিলডেন ৬-৩, ৬-২ গেমে বার্ককে, টিলডেন ৬-৩, ৬-৩ গেমে র‍্যামিলঁকে, কোসে ৬-২, ৬-৩ গেমে র‍্যামিলঁকে, কোসে ৬-২, ৬-২ গেমে বার্ককে, কোসে ৬-২, ৪-৬, ৯-৭, ৬-২ গেমে টিলডেনকে, র‍্যামিলঁ ৬-০, ৬-৩ গেমে বার্ককে, পরাজিত করেছেন।

ডবলসে—টিলডেন ও র‍্যামিলঁ ৬-৩, ১০-৮, ৭-৫ গেমে কোসে ও বার্ককে, কোসে ও র‍্যামিলঁ ৬-৩, ৬-১, ৪-৬, ৬-৩ গেমে টিলডেন ও বার্ককে, র‍্যামিলঁ ও বার্ক ৮-৬, ৪-২ (পরিত্যক্ত) গেমে কোসে ও টিলডেনকে পরাজিত করেছেন।

কোসে ও টিলডেনের খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। টিলডেন আক্রমণ করে খেলেছেন এবং কোসে প্রতিরোধ করেছেন। টিলডেনের সার্ভিসের তীব্রতা অতি ভীষণ, যদিও সার্ভিসে কয়েকবার 'ডবল ফল্ট' হয়েছে। টিলডেনের 'কোরহ্যাণ্ড ড্রাইভে অত্যন্ত স্পিন থাকে তার ষ্ট্রোকগুলি খুব দর্শনীয় হয়েছিল। তাঁর ব্যাক হ্যাণ্ডও বেশ ভাল। অনেক সুন্দর সুন্দর সটে তাঁর অতীতের গৌরবপূর্ণ সময়ের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোসে জয়ী হয়েছেন তার 'ড্রপ্ সট' ও বয়সের জন্য। তাঁর অত্যধিক দৃঢ়তা ছিল এবং তিনি অতি অল্পই ভুল করেছেন। কিন্তু টিলডেন অতি মনোরম ক্রীড়া দেখিয়েছেন। তৃতীয় সেটে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা হয় এবং টিলডেনের এই সেটটি হারায় দর্শকরা দুঃখিত হন। চতুর্থ সেটে টিলডেন বিশেষ ক্লান্ত হন এবং তাঁকে অনবরত মাথায় জল ঢালতে দেখা যায়। বয়সের জন্য শেষ পর্য্যন্ত যুঝতে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

পাটনায় র‍্যামিলঁ ৬-০, ৬-২ গেমে বার্ককে, কোসে ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩ গেমে টিলডেনকে এবং কোসে ও র‍্যামিলঁ ৬-১, ৯-৭ গেমে টিলডেন ও বার্ককে হারিয়েছেন।

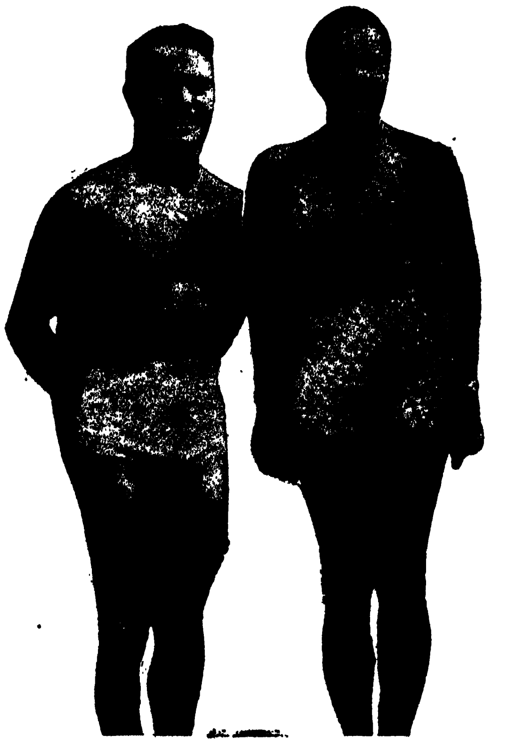
এলাহাবাদে টিলডেন ৬-৩, ৬-৩ গেমে কোসেকে, র‍্যামিলঁ ৬-০, ৬-৩ গেমে বার্ককে এবং কোসে ও র‍্যামিলঁ ৮-৬, ৮-৬ গেমে টিলডেন ও বার্ককে হারিয়েছেন।

লক্ষ্ণৌতে টিলডেন ৬-১-৬-৪ গেমে কোসেকে, র‍্যামিলঁ ৬-১, ৬-২ গেমে বার্ককে, কোসে ও র‍্যামিলঁ ৩-৬, ৭-৫, ৬-৩, ৬-৪ গেমে টিলডেন ও বার্ককে হারিয়েছেন।

দিল্লীতে টিলডেন ৬-২, ৬-০ গেমে কোসেকে, র‍্যামিলঁ ৬-১, ৬-৪ গেমে বার্ককে, টিলডেন ও বার্ক ৭-৫, ৫-৭, ৬-৪ গেমে কোসে ও বার্ককে পরাজিত করেছেন।

ডাইভিং প্রদর্শনী ঃ

কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার পুষ্করিণীতে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাইভার পিট্ ডেস্জার্ডিন্স ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী তরুণী মেরিয়ন ম্যান্সফিল্ড ডাইভিংয়ে ও সন্তরণে বিভিন্ন



বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকাবাসী ডাইভার ডেস্জার্ডিন্স ও সুন্দরী ম্যান্সফিল্ড ছবি—জে কে সান্যাল

প্রকার কৌশল প্রদর্শন করেছেন। ইঁহাদের প্রদর্শিত কৌশলগুলি দেখে বেশ বোঝা গেলো আমরা এখনও ডাইভিং ও সন্তরণে কত পশ্চাতে পড়ে আছি। ডাইভিংয়ে বিশেষ



কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে আমেরিকাবাসিনী সুন্দরী কুমারী ম্যান্সফিল্ডের সুন্দর ডাইভিংয়ের একটি দৃশ্য ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



বিশ্ববিখ্যাত সন্তরণকারী পিট্ ডেস্জার্ডিন্সের অপূর্ব্ব ডাইভিংয়ের একটি ভঙ্গি ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

কৃতিত্ব লাভ করতে মাংসপেশী যুক্ত সবল ও নমনীয় দেহের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন। এই দু'জন নর ও নারী সন্তরণকারীদের দৈহিক গঠন তার জলন্ত নিদর্শন।

পিট্ ডেস্জার্ডিন্স স্প্রিং বোর্ডে কুড়িটি এবং হাই বোর্ডে তিনটি কৌশল প্রদর্শন করেছেন। মিস্ ম্যান্সফিল্ড আমেরিকার বুক সাঁতার, বাটারফ্লাই বুক সাঁতার, পিট সাঁতার ও আমেরিকার ফ্রি ষ্টাইলের নানা কৌশল দেখিয়েছেন। উভয়ের নানা প্রকার ফ্যান্সি সন্তরণ কৌশল অপূর্ব্ব দৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। বারির ভিতরে স্ক্রিলের কসরৎ পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

পলো ঃ

আই পি এ চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী হয়েছে এবারও জয়পুর দল ৪-৩ গোলে ভূপালদলকে পরাজিত করে। জয়পুরের ইহা উপর্যুপরী ষষ্ঠ বিজয়। খেলাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। মহারাজা জয়পুর ও হনৎ সিং রক্ষণকার্য্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। জয়পুরের জয়ের জন্য পৃথ্বিসিং সম্পূর্ণরূপে দায়ী, তিনিই তিনটি গোল দিয়েছেন, অপরটি দিয়েছেন অভয় সিং।

কারমাইকেল কাপ জয়ী হয়েছে দারভাঙ্গা দল ৩-২½ গোলে ক্যামারোনিয়ান্স দলকে হারিয়ে। ক্যামারোনিয়ানরা ১½ গোল হ্যাণ্ডিকাপে পেয়েছিল। গত বৎসর এরা

বিজয়ী ছিল। বিজয়ী পক্ষে রাজা বাহাদুর বিশেশ্বর সিং ব্যাকে খুব সুন্দর খেলেছেন, তাঁর নিপুণ অশ্ব পরিচালনা, নিখুঁত ষ্টিকওয়ার্ক ও অব্যর্থ মারগুলি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

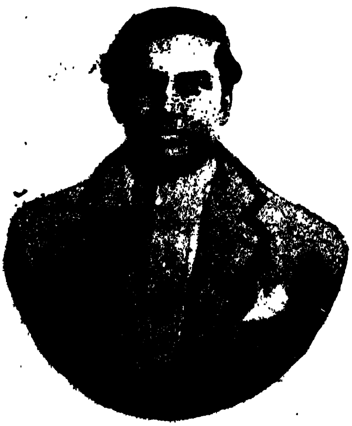
এজরা কাপ্ জয়ী হয়েছে ১৭।২১ ল্যান্সারস্ দারভাঙ্গাকে হারিয়ে ৩½—১ গোলে। গতবৎসরেও ল্যান্সারস্ বিজয়ী ছিল। বিজয়ী দল ২½ গোল হ্যাণ্ডিক্যাপে পেয়েছিল।

টেনিসন দল—৩১৬ ও ১২১ (১উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

কুচবিহার দল—১৬৭ ও ৮৩

লর্ড টেনিসন দলের কলিকাতায় দ্বিতীয় ম্যাচ খেলা হয় মহারাজা কুচবিহার একাদশের সঙ্গে।

লর্ড টেনিসনের দল ১৮৭ রানে জয়ী হয়েছেন। স্থানীয় দলের ব্যাটিং অত্যন্ত হতাশাজনক হয়েছে। বৈদেশিক দলের মারাত্মক বোলিংয়ের কাছে ভারতীয়রা মোটেই খেলতে পারেন নি। কার্ত্তিক বসু প্রথমদিন খানিকক্ষণ ফিল্ড করবার পরে অসুস্থতার জন্য মাঠ ত্যাগ করেন আর কোনদিনই খেলতে নামেন নাই। স্থানীয় দলকে একজন কম ব্যাটিং করতে হয়েছে। প্রথম ইনিংসে ভাণ্ডারগাচ্ ৪২, লংফিল্ড ৩৭, কাটার ২৩, স্কট ১৭, কে ভট্টাচার্য্য ১৪। দ্বিতীয় ইনিংসে এঁরাও বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। কমল ভট্টাচার্য্য বোলিং বা ব্যাটিংয়ে তাঁর সুনাম রাখতে পারেন নি। ল্যাংরিজের এক রকমের বলে ভাণ্ডারগাচ্, লংফিল্ড ও কুচবিহার মহারাজাকে অতি তৎপরতার সঙ্গে ম্যাককরকেল ষ্টাম্পড করেছে। এক রানের জন্য ফলো-অন অতিকষ্টে বেঁচে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে টেনিসন দলের হার্ডষ্টাফ ও ওয়ার্দ্দিংটন নেমে পিটতে আরম্ভ করে বেলাশেষে ৩০ মিনিটে ৪৯রান তোলেন। পরদিন প্রথম ৪০ মিনিট আগন্তুক দল পিটে রান তুলতে লাগেন, ৩৫ রান ওঠে ১৫ মিনিটে। হার্ডষ্টাফের ষ্ট্রেট্ ও কভার ড্রাইভ উভয়ই সুন্দর, তিনি সকল বোলারকেই তাচ্ছিল্যভাবে পিটেছেন। মোট ১০০ রান ওঠে ৫০ মিনিটে।



মহারাজা কুচবিহার
(ক্যাপ্‌টেন)

কুচবিহার দলে মহারাজা কুচবিহার (ক্যাপটেন), লংফিল্ড, ভাণ্ডারগাচ্, কাটার, স্কট, কে ভট্টাচার্য্য, জে এন ব্যানার্জ্জি, সুধীর চ্যাটার্জ্জি, এস বসু, এ জব্বার খেলেছেন। বোলিং—পোপ ৫৩ রানে ৪, ল্যাংরিজ ৪০ রানে ৩, ওয়ার্দ্দিংটন ১৯ রানে ১, পিবলস্ ৪৫ রানে ১ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে পোপ ৩৫ রানে ৫, ল্যাংরিজ ২২ রানে ৪ উইকেট।

টেনিসন দলে লর্ড টেনিসন ২৭, পার্কস ৮৯, ল্যাংরিজ (রান আউট) ৮৩, পোপ ৪৪ ও (নট আউট) ১৩, হার্ডষ্টাফ ২১ ও (নট আউট) ৬৪, ওয়ার্দ্দিংটন ১ ও ৪৩, ম্যাক্‌করকেল ৮, গিব (রান আউট) ১৩, হোসী ১১, জেমিসন ৬ ও পিবলস্ (নট আউট) ৬।

জে এন ব্যানার্জ্জি ৮৪ রানে ৩, মহারাজা ২২ রানে ২, এস চ্যাটার্জ্জি ১০ রানে ১, স্কট ৬৮ রানে ১ ও লংফিল্ড ৬৮ রানে ১; দ্বিতীয় ইনিংসে কমল ভট্টাচার্য্য ১৯ রানে ১।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ("বনফুল") প্রণীত উপন্যাস 'কিছুক্ষণ'—১।০

ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস 'বহ্নিদেবতা'—২৲

শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস 'যৌবনের সিন্ধুতটে'—২৲

'যে ঢেউ ভাঙ্গিয়া গেছে'—১।০ ও 'জীবনের যাত্রাপথে'—১।০

শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায় বি-এ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'কবির স্বপ্নস্বপ্না ছন্দে গানে'—১।০

শ্রীরমেশচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত প্রেম ও ভক্তি রসাত্মক নাটক 'বিদ্যাপতি'—১।০

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা প্রণীত পৌরাণিক নাটক 'বভ্রুবাহন'—১৲

চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রমের পূর্ণানন্দ স্বামীর 'পত্রাবলী, প্রথম খণ্ড'—১৲

শ্রীরাধানাথ কাবাসী সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার' চতুর্থ খণ্ড—১৷৶০

রায় বাহাদুর শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'গায়ত্রী রহস্য'—১।০

শ্রীগোপীনাথ মিত্র প্রণীত 'পরমেশ্বর ও তাঁহাকে লাভের উপায়'—।০

রায় বাহাদুর শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক প্রণীত 'শ্রীশ্রী৺মার্কণ্ডেয় চণ্ডী'—১৲

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস 'বাঁকের মুখে'—২৲

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বন্দে মাতরম্

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঙ্গ্‌লার কণ্ঠ হ'তে যেদিন উঠিল ধ্বনি—বন্দে মাতরম্,
মাতৃমন্ত্র বলি' তারে ভারতের সরস্বতী বরিলা স্বয়ম্।
বিস্মিত দেশের চক্ষে অমনি উঠিল ফুটি' শ্যামা জন্মভূমি
জননীর মূর্ত্তি ধরি', সাতকোটি সন্তানের মুখচন্দ্র চুমি'
সুজলা সুফলা রূপে। বহিল মলয়ানিল চন্দন-শীতল।
সুশ্যামল শস্যশীর্ষে দুলিয়া উঠিল তাঁরই স্নিগ্ধ চেলাঞ্চল।
শুভ্র জ্যোৎস্নাজুয়ারের আলোকে উঠিল পুরি' অন্ধ নিশীথিনী।
কুসুমিত দ্রুমদলে হাসিলা মধুর হাসি মর্ম্মরভাষিণী।
সুখদা বরদা মাতা অতি অপরূপ রূপে সন্তানের চোখে
দেখা দিলা ঋষি-কবি বঙ্কিমের সত্যদর্শী প্রতিভা-আলোকে।

এ কি দশভুজা-মূর্ত্তি ! দশ ভুজে জননীর দশপ্রহরণ,
অক্ষম সন্তানতরে স্নেহধর্ম্মে দশদিক্ করিয়া রক্ষণ !
লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্যরাশি ধনে-ধান্যে দশদিশি উঠে উছলিয়া,
বিদ্যাদাত্রী ভারতীর বরবাণী নিঃস্যন্দিত শ্রবণ ভরিয়া !
—মরি মরি ! এত রূপ—এত শোভা জননীর কে দেখেছে কবে ?
সাতকোটি নরনারী সঞ্জীবনী লভি' যেন নবীন গৌরবে
ভূমিশয্যা ছাড়ি' উঠে অর্চ্চনা করিতে সেই মায়ের মন্দিরে,
আশার বর্ত্তিকা জ্বালি' শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জড়ত্ব-তিমিরে !
বন্দিগণ মহানন্দে গাহে গান কণ্ঠ ভরি'—বন্দে মাতরম্—
সপ্তকোটি সন্তানের চক্ষে যেন আবির্ভূত সারদা স্বয়ম্।

সেদিন কি গেছে চলি' ? নহে, নহে ; দিনে দিনে বাড়ি' সেই স্বর
সুরতরঙ্গিনী মাত্র ছিল যাহা একদিন, হয়েছে সাগর !
ভারতের দিক্ হ'তে দিগন্তরে ভাসাইয়া অমৃত-প্লাবনে
সাত হ'তে ত্রিশকোটি সন্তানের তৃষ্ণা তৃপ্তি করি' জনে-জনে !
যে কেহ সে মাতৃবক্ষে জীবনের সুখেদুঃখে লভিয়াছে স্থান,
যাঁর শস্যে যাঁর জলে যাঁর স্নেহচ্ছায়াতলে বাঁচে তার প্রাণ,
যে আলোকে তার দৃষ্টি, যে ধাতুতে তার সৃষ্টি, শ্বাসে যাঁর বায়ু,
পিতৃপিতামহ ধরি' যে মাটী আশ্রয় করি' কাটে পরমায়ু,—
সেই জগদ্ধাত্রী-ক্রোড়ে মানব জনম ধরে' যে পেয়েছে ঠাঁই,
তাঁহারি বন্দনাগানে যে আনন্দ তার প্রাণে, সীমা তার নাই।

ত্রিশকোটি ভায়ে ভায়ে ডাকিবে আপন মায়ে—এমন যে মাতা—
তারও মাঝে ভেদ সৃষ্টি, হায় রে মোহান্ধ দৃষ্টি, হায় রে বিধাতা !
ছন্নছাড়া সর্ব্বহারা মুছি' নয়নের ধারা পাইয়াছে ফিরে'
সর্ব্ববরাভয়দাত্রী অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী দেশ-জননীরে—
স্বর্গ চেয়ে শ্রেষ্ঠ যিনি—তাঁহারি সঙ্কেত চিনি' যদি তাঁর পথে
একত্রে চলিতে পারে, সে গতি কে রোধ করে এ মর জগতে ?
জীবনের সুখেদুখে ত্রিশকোটি বুকে হোক্ সেই নাম আঁকা,
বাহুতে তাঁহারি শক্তি হৃদয়ে সে ভক্তি হোক্ জাতীয় পতাকা !
ভরিয়া নিখিল ব্যোম শিহরিয়া সূর্য্যসোম গাহ তাঁরই গান—
বন্দে মাতরম্ বলে' মায়ের মন্দিরতলে কর অর্ঘ্য দান।

সাংখ্যযোগী বুদ্ধ

সমাধিপ্রকাশ আরণ্য

প্রবন্ধ

(১) বুদ্ধের ঋষিঋণ

গোতম বুদ্ধের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আর্য্যধর্ম্ম। গোতম বুদ্ধ সম্পূর্ণ ব্রহ্মবাদী, আত্মবাদী, দেবদেবীবাদী, স্বর্গনরকবাদী এবং জন্মান্তরবাদী। বুদ্ধদেবের এই ধর্ম্মবাদ সাংখ্য-যোগ-সাধনা ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। গোতম বুদ্ধ এবং তাঁহার সমসাময়িক জৈনধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর স্বামী উভয়েই তৎকাল-প্রচলিত ঔপনিষদিক এবং সাংখ্যযোগ-ধর্ম্ম-সাধনায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মহাবীর স্বামী স্বীয় শিষ্য ইন্দ্রভূতি গোতমকে যে আগম উপদেশ দান করেন তাহার মধ্যে 'ভগবতী-সূত্রে', 'অনুযোগদ্বারসূত্রে', 'কল্পসূত্রে' ও 'নন্দী-সূত্রে' সাংখ্যযোগাদির উল্লেখ আছে। জৈনদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক 'কল্পসূত্র'তে এবং কল্পসূত্রাপেক্ষা প্রাচীন 'অনুযোগ-দ্বারসূত্রে'তে আছে যে, মহাবীর বা 'নিগণ্ঠনাতপুত্ত' ষড়ঙ্গ বেদ ও সাংখ্যযোগাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কল্পসূত্রো-ল্লিখিত "রিউবের জউবের সামবের অথর্ব্বণবের ইতিহাস পঞ্চমানং · সট্ঠিতন্ত" প্রভৃতিই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারতাদি) · ষষ্টিতন্ত্র বা সাংখ্য-যোগবিদ্যা। ললিত-বিস্তরে আছে—'নিগম পুরাণে ইতিহাসে বেদে ব্যাকরণে···সাংখ্যযোগক্রিয়াকল্পে·· সর্ব্বত্র বোধিসত্ত্ব এব বিশিষ্যতে স্ম" (১) অর্থাৎ :—বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধদেব) নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, ব্যাকরণ, সাংখ্যযোগ, ক্রিয়া-কল্প প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যায় বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। বুদ্ধদেব যে বেদ, উপনিষদ্, সাংখ্যযোগাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নিকট বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন তাহা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন। রীজ ডেভিড্‌স্ বলেন :—"There can be but little doubt that Gotama, during his years of study and austerity, before he attained Nirvana under the tree of Wisdom, had come into contact of very beliefs, or at least with beliefs similar to those, now preserved in the Upanishads and that his general conclusion was based upon them." (২) অর্থাৎ :—এ সম্বন্ধে প্রায় সন্দেহ নাই বলিলেই চলে যে, গোতম বোধিদ্রুমতলে নির্ব্বাণ-লাভের পূর্ব্বে তাঁহার অধ্যয়ন এবং তপস্যার বৎসরগুলিতে, বর্ত্তমানে উপনিষৎ-সমূহে রক্ষিত বিশ্বাস-সমূহের অথবা অন্ততঃ তদনুরূপ বিশ্বাস-সমূহের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধারণ সিদ্ধান্ত তাহাদের উপর নিহিত ছিল। H. C. Warran বলিয়াছেন, "Now the search after a Nirvana or release from the miseries of rebirth, was not a peculiarity of Gotama, but was a common striving of the age and country in which he lived and many methods of acquiring the desired end were in vogue." (৩) অর্থাৎ :—নির্ব্বাণের অনুসন্ধান বা পুনর্জ্জন্মের দুঃখ-সমূহ হইতে মুক্তি গোতমের বিশেষত্ব ছিল না। তিনি যে দেশে এবং যে কালে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন তখনকার এবং সেই দেশের উহা সাধারণ প্রচেষ্টা ছিল এবং এ উদ্দেশ্য-লাভের জন্য নানা উপায়ও প্রচলিত ছিল। পণ্ডিত ম্যাক্‌সমূলরও বলেন :—"It has been rightly said, without Brahmanism no Buddhism" (৪) অর্থাৎ :—ইহা সঙ্গতভাবেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ব্যতিরেকে বুদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই। ম্যাক্‌সমূলর অন্যত্র আরও বলিয়াছেন :—The Buddhists···are the debtors of the Brahmans in almost all their philosophical speculations." (৫) অর্থাৎ :—বৌদ্ধেরা তাঁহাদের প্রায় সমস্ত দার্শনিক আলোচনায় ব্রাহ্মণদিগের নিকট ঋণী। বুদ্ধদেবের 'চারি আর্য্য-সত্য' (৫ক) 'সপ্ত বোধ্যঙ্গ'

---

(১) ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সং, ১২।১৯৯ পৃঃ।

(২) Dialogues of the Buddha, p. 211 (৩) Budhism in Translations p. 281 (1900 ed). (৪) The six systems of Indian Philosophy, p 237. (৫) Introduction to Budhist Mahayana Texts Pt II p. xxii (1894 ed) । (৫ ক) সংযুক্ত, ৫৬।১।৩।২,৫ ; ৫৬।২৪, ২, ৬।

(৫খ) 'চাতুব্রহ্মবিহার' (৫গ) 'আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' (৫ঘ), 'শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা—পঞ্চবল' (৫ঙ) 'অষ্ট বা নব সমাপত্তি বা 'বিমোক্ষ' (৫চ) এবং 'নির্ব্বাণ' (৫ছ) যে গোতম বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক শ্রমণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা বুদ্ধদেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। পারিপার্শ্বিক এবং আবেষ্টনীর সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক অন্নজলের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া মহাবৃক্ষ স্বীয় কলেবর বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত করিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের ঔপনিষদিক বা বৈদিক এবং সাংখ্যযোগাদি-প্রচলিত ধর্ম্ম ও দর্শনসমূহের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক আবেষ্টনী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই মহৎনির্ব্বাণ-সাধক গোতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়।

দীঘনিকায়ের 'ব্রহ্মজালসুত্তে' (৬) যে 'শাশ্বতবাদী' এবং 'নির্ব্বাণবাদী' শ্রমণ ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারাই যে 'সাংখ্য' এবং 'যোগী' তাহা বেশ অনুধাবন করা যায়। প্রোফেসর 'গার্ঠে'ও ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। (৭) আমরা 'বুদ্ধচরিতের আভাষ', 'পুরুষ বা আত্মা—শূন্য, এক বা বহু' এবং 'Psychology of Yoga or Nirvana' নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বুদ্ধদেব সাংখ্যের নিগুর্ণ আত্মবাদী বা ব্রহ্মবাদী এবং চিত্তের সম্যক্ নিরোধ পূর্ব্বক যোগ বা নির্ব্বাণবাদী। এস্থানে তাহার আর পুনরালোচনা করিব না। এখন আমরা বুদ্ধদেবের দুই প্রধান গুরু বা আচার্য্যের সাধনা ও মতবাদ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইব যে বুদ্ধদেব সাংখ্যযোগধর্ম্ম-সাধনার এক অভিনব অভিব্যক্তি, এক দিব্য পরিণতি, এক পরম "অরহত্তফলম্"।

(২) সাংখ্যযোগীশিষ্য গোতম বুদ্ধের যোগ বা নির্ব্বাণ-সাধনা

মজ্ঝিম-নিকায়ের 'অরিয়-পরিয়েসনাসুত্ত'তে (৮) 'বোধিরাজকুমার সুত্ত'তে (৯) এবং 'সঙ্গারবসুত্ত'তে (১০) 'বিনয়ে' (১১) 'সংযুত্ত-নিকায়ে' (১২) 'জাতকের নিদান-কথা'য় (১৩) 'মিলিন্দ-পঞ্হ'তে ও (১৪) অশ্বঘোষের শ্রীবুদ্ধচরিত মহাকাব্য (১৫) প্রভৃতিতে আমরা বুদ্ধদেবের দুই গুরু 'আড়ার কালাম' এবং 'রুদ্রক রামপুত্রে'র পরিষ্কার উল্লেখ পাই। উহার অনেকগুলিতে বুদ্ধদেব স্বমুখে 'আনন্দ' প্রভৃতি শিষ্যবর্গকে বলিতেছেন যে, তিনি ঐ উভয় গুরুর নিকট হইতে শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা (১৬) শিক্ষা করেন এবং কালাম-গোত্রীয় আরাড়ের নিকট "আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং" নামক বৌদ্ধদের সপ্তম 'সমাপত্তি' এবং রামপুত্র 'উদ্দক' বা 'রুদ্রকে'র নিকট "নেব সঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনং" নামক বৌদ্ধদের অষ্টম 'সমাপত্তি' বা চতুর্থ 'অরূপ ঝান' (অরূপ ধ্যান-বিশেষ) শিক্ষা পূর্ব্বক তাহাদিগের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার করেন (১৭)। মিলিন্দ-পঞ্হ'তে পাই যে, গোতম বুদ্ধের দ্বিতীয় আচার্য্য ("আচরিয়") "সব্বমিত্ত" বুদ্ধকে ষড়ঙ্গ বেদাদি শিক্ষা দেন এবং চতুর্থ আচার্য্য 'আড়ার কালাম' ও পঞ্চম আচার্য্য "উদ্দক রামপুত্ত" সাধনোপদেশ দেন। (১৮) আড়ার কালাম গভীর ধ্যান এবং সমাধিতে মগ্ন হইতে পারিতেন। দীঘ নিকায়ের 'মহাপরিনিব্বাণ সুত্তে' (১৯) আছে যে আরাড় কালাম এরূপ ধ্যানস্থ হইতে পারিতেন যে পাঁচশত যান তাঁহার সম্মুখ দিয়া তাঁহার বস্ত্রে কর্দ্দম লিপ্ত করিয়া গেলেও তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। মজ্ঝিম-নিকায়ের অন্যত্রও (২০) বুদ্ধদেব আরাড় গুরুদেবের ধ্যান-মহিমা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে অনুরূপ বাক্যসমূহ বলিয়াছেন। 'অথসালিনী'তে ও (২১) আড়ারের অনুরূপ ধ্যানের কথা আছে। জাতকের নিদানকথা বা উপক্রমণিকাতে (২২) আছে যে, বুদ্ধদেব আরাড়কালাম এবং রাম-শিষ্য উদ্দকের নিকট হইতে অষ্টপ্রকার বিখ্যাত বৌদ্ধ বা আর্য্য-

---

(৫খ) সংযুত্ত ৪৬।৫২।২০-২৮। (৫গ) সংযুত্ত ৪৬।৫৪।৫-৭। (৫ঘ) মজ্ঝিম, ১।১১০ পৃঃ। (৫ঙ) সংযুত্ত ৪৮।৫৭।৫। (৫চ) দীঘ, ব্রহ্মজাল-সুত্ত, ১।৩৪—৩৬ পৃঃ। (৫ছ) মজ্ঝিম ১।৫১০ পৃঃ, অঙ্গুত্তর ৫।১০-৩২ পৃঃ; দীঘনিকায় ১।৩৬-৩৮ পৃঃ। (৬) I. 13—22 pp. and I. 36-39 pp. (৭) Sankhya Philosophy, Intr. p. 57। (৮) ১।১৬৩-১৬৬ পৃঃ (E. ed)। (৯) ২.৯৩ পৃঃ। (১০) ২।২১২ পৃঃ।

(১১) ১ ৬।১-৪। (১২) ৩৬ ১০৩। (১৩) ১ম খণ্ড, ৬৬ পৃঃ। (১৪) ২৩০ পৃঃ (Trenckner Ed.)। (১৫) ১২শ সর্গ। (১৬) মজ্ঝিম-নিকায়, অরিয় পরিয়েসনাসুত্ত—১।১৬৪-১৬৬ পৃঃ ঐ, মহাসমকসুত্ত, ১।২৪০ পৃঃ cf. "শ্রদ্ধাবীর্য স্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্"—যোগসূত্র, ১।২০। (১৭) মজ, ১।১৬৪- ১৬৬ পৃঃ। (১৮) ঐ ২৩৬ পৃঃ (Trenckner Ed)। (১৯) ২ ১৩০ পৃঃ। (২০) ২।৯৩, ২১২ পৃঃ। (২১) ২০২। (২২) ৬৬ পৃঃ।

ধ্যান বা সমাপত্তি শিক্ষা করেন। এখন প্রশ্ন এই হইতেছে যে, এই কালাম-গোত্রীয় 'আড়ার' মুনি এবং রামপুত্র বা শিষ্য 'রুদ্রক' মুনি কোন্ মতবাদী ছিলেন ?

অশ্বঘোষের শ্রীবুদ্ধচরিত মহাকাব্য হইতে আমরা পরিষ্কার নির্দ্দেশ পাইতেছি যে, আড়ার মুনি বিমোক্ষবাদী সাংখ্য (২৩) ছিলেন। তাহার সাক্ষ্য :—

"তত্র তু প্রকৃতির্নাম বিদ্ধি প্রকৃতি কোবিদ।
পঞ্চভূতান্যহংকারং বুদ্ধিমব্যক্তমেব চ ॥
বিকার ইতি বুদ্ধিং তু বিষয়ানিন্দ্রিয়াণি চ।
পাণিপাদং চ বাদ্য চ পায়ূপস্থং তথা মনঃ ॥
অস্য ক্ষেত্রস্য বিজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি সংজ্ঞি চ।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাত্মানং কথয়ন্ত্যাত্মচিন্তকাঃ ॥
সশিষ্যকপিলশ্চেহপ্রতিবুদ্ধ ইতি স্মৃতিঃ।" (২৪)

অর্থাৎ :—পঞ্চভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, প্রকৃতি, বুদ্ধির বিকার বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সমূহ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন এইসকল ক্ষেত্র এবং ইঁহাদের বিজ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা; এই সমস্ত বিষয়ে সশিষ্য কপিল প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকসমূহে বিশুদ্ধ সাংখ্যমত উল্লিখিত না হইলেও উহা যে সাংখ্যমত বা সাংখ্যকপিল-মতের প্রতিধ্বনি তাহাতে সন্দেহ নাই। অশ্বঘোষ এখানেই কেবল সাংখ্যমত-প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কপিলের নামোল্লেখ করেন নাই। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি 'কপিলবস্তু' যে কপিলেরই নামানুসারে হয় তাহাও অশ্বঘোষ বলিয়াছেন 'গগনে ইব গাঢ়ং পুরং মহর্ষেঃ কপিলস্য বস্তু' (২৫) অর্থাৎ মহর্ষি কপিলের বস্তু বা বাস্তু গগনে অবগাঢ়পুর। আড়ার বুদ্ধদেবকে ব্রহ্মতত্ত্ব এবং মোক্ষ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—"এতত্তৎ পরমং ব্রহ্মনির্লিঙ্গং ধ্রুবমক্ষরং। যন্মোক্ষ ইতি তত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ ॥" (২৬) অর্থাৎ—ইহাই, সেই পরম ব্রহ্ম যাহা নির্লিঙ্গ ধ্রুব ও অক্ষর। তত্ত্বজ্ঞ মনীষীরা যাঁহাকে লাভ করাই মোক্ষ বলিয়া থাকেন। আড়ার কালাম যোগের চারিপ্রকার ধ্যান ও সমাধির কথাও বুদ্ধদেবকে উপদেশ দেন। শ্রীবুদ্ধচরিত কাব্যে (২৭) যে 'বিতর্ক', 'অবিতর্ক' প্রীতিসুখযুক্ত, প্রীতিবিবর্জ্জিতসুখযুক্ত ও সুখদুঃখবিবর্জ্জিত যে চারিপ্রকার ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে তাহা পাতঞ্জল যোগদর্শনের "বিতর্ক বিচারানন্দাস্মিতা" (২৮) রূপ 'সম্প্রজ্ঞাত' যোগেরই রূপান্তর। বৌদ্ধ শাস্ত্রের 'সবিতর্কা' ও নির্ব্বিতকা সমাপত্তি অথবা তাঁহাদের অষ্টম বা পরমপ্রকার সমাপত্তি যোগ-দর্শনের ১।১৭ ও ১।৪৪-৪৫ সূত্রেরই রূপান্তর। বুদ্ধদেবের "নৈব-সংজ্ঞানাহসংজ্ঞা" রূপ ধ্যানে আমরা রুদ্রকের উপদেশেরই প্রতিধ্বনি পাই। রুদ্রক বুদ্ধদেবকে "নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞা" পর্য্যন্ত ধ্যান বা সমাপত্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন, ঐ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার করিয়া "সংজ্ঞাসংজ্ঞিত্বয়োে দোষং জ্ঞাত্বা হি মুনি রুদ্রকঃ। আকিঞ্চনাৎ পরং লোভ সংজ্ঞা সংজ্ঞাত্মিকাং গতিঃ ॥" (২৯) অর্থাৎ :—মুনি রুদ্রক সংজ্ঞা ও সংজ্ঞিত্বের দোষ জানিয়া 'অকিঞ্চন' ধ্যানের পর যে সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞাত্মিকা গতি তাহাই লাভ করিয়াছিলেন; বুদ্ধদেব এই নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞারূপ ধ্যানে বিগতস্পৃহ হইয়া ইহাপেক্ষা উচ্চতর ধ্যানের সন্ধানে গিয়াছিলেন। "না সংজ্ঞী নৈব সংজ্ঞীতি তস্মাত্তত্র গতস্পৃহ" (৩০) এই "নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা" ধ্যানে বীতস্পৃহ হইয়া বুদ্ধদেব "অনুত্তরং সন্তিবরপদং পরিয়ে সমানো" (৩১) অনুত্তর শান্তিবরপ্রদ বা পরম শান্তিস্বরূপ (৩২) অনুসন্ধানপরায়ণ হইয়া "যোগক্ষেম নির্ব্বাণ" সাক্ষাৎকারের জন্য উরুবেলায় যাইয়া ঐ অনুত্তর যোগক্ষেম নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার করেন ("অনুত্তরং যোগক্খেমং নিব্বাণং অজ্ঝগমনং" (৩৩)। মুনি রুদ্রকের সাক্ষাৎকৃত ওই ধ্যান বা সমাপত্তি যোগের 'অস্মিতামাত্র' সাক্ষাৎকারের ন্যায় 'বুদ্ধি'র এই ধ্যান-রাজ্যে 'সংজ্ঞা আছে'—ইহাও বলা চলে না; আবার 'সংজ্ঞা নাই' ইহাও বলা চলে না। গভীর যোগাঙ্গ ধ্যানে এই 'অস্মিতা মাত্রে'র ধ্যানে ও চিত্তের সম্যক্ নিরোধ হয় না। ইহাতেও 'আমি আছি' 'আমি জ্ঞাতা,' 'আমি আত্মা' এইরূপ সূক্ষ্ম 'অস্মিতই' বা 'আমি আছি' এইরূপ বোধমাত্র। যোগী রুদ্রক এই পর্য্যন্তই বুদ্ধদেবকে যোগসাধনা শিখাইয়াছিলেন। (৩৪) কিন্তু ইহার পরেও 'বুদ্ধি'র বা 'অস্মিতা মাত্রে'র নিরোধরূপ চিত্তের সম্যক্ নিরোধ পূর্ব্বক "অনুত্তরং সন্তিবরপদ্য" "যোগক্ষেমং নির্ব্বাণং"

(২৩) "মুনেররাড়স্য বিমোক্ষবাদিন," ঐ ১১ ৭২। (২৪) বুদ্ধচরিত, ১২।১৮-২১। (২৫) ঐ, ১।২। (২৬) ঐ, ১২,৬৫। (২৭) ঐ, ১২।৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৭।

(২৮) ১।১৭। (২৯) শ্রীবুদ্ধচরিত মহাকাব্য ; ১২।৮৩ ; (৩০) ঐ, ১২।৮৪ ; (৩১) মজ্ঝিম ১.৬৬ পৃঃ। (৩২) তুলনীয় গীতা, ৬।১৫। (৩৩) মজ্ঝিম, ১।১৬৭ পৃঃ। (৩৪) মজ্ঝিম, ১।১৬৫ পৃঃ।

(৩৫) সাক্ষাৎকার বুদ্ধদেবের বাকি ছিল। বুদ্ধদেবের অষ্টম বা নবম বা শেষ সমাপত্তিই সেই "সংজ্ঞাবেদয়িতনিরোধ" (৩৬), ইহাও বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বেই সাধকদিগের বিজ্ঞাত ছিল "অর্হৎসম্যক্ সম্বুদ্ধ" ককুসন্ধ বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। ককুসন্ধ এবং তাহার 'অগ্রশ্রাবক' বা প্রধান শিষ্য 'সঞ্জীব' "সজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ-সমাপন্ন" ছিলেন (৩৬ ক) মজ্‌ঝিম, ১৷৩৩৩ পৃঃ। আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ, অমৃতত্ব এবং "নিব্বাণং পরমং সুখং" সাধনাতে সম্যক্ সম্বুদ্ধ হওয়ার সাধনাও যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বুদ্ধদেব নিজেই বলিয়াছেন "পুব্বকেহি এসামাগণ্ডির অবহুন্তে হি সম্মাসম্বুদ্ধেহি গাথা "ভাসিতা"···নিব্বানং পরমং সুখং অট্‌ঠঙ্গিকো চ মগ্গানং খেমং অমত গামিনন্তি" ৩৬ (খ — মজ্‌ঝিম. ১৷৫১০ পৃঃ। অর্থাৎ হে মা গণ্ডীর পরিব্রাজক পূর্ব্বেও অর্হৎ এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ কর্ত্তৃক এই গাথা ভাসিত হইয়াছে যে নির্ব্বাণ পরম সুখ, অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ, অমৃতগামিত্বই পরম ক্ষেম। এই বুদ্ধির নিরোধকে লক্ষ্য করিয়াই পাতঞ্জল যোগদশন "তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ" (৩৭) বলিয়াছেন। যোগের এই চরম ভূমিই বুদ্ধদেব সাক্ষাৎকার করিয়া তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন "সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ" সমাপত্তি। আর যোগদর্শন তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন"নির্ব্বিচারা সমাপত্তি"র ও নিরোধ করিয়া "নির্বীজঃ সমাধিঃ" বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ" (৩৮)। উভয়েই উহাকে শাস্তিবর ভেদ "মোক্ষ" বা "বিমোক্ষ" "যোগ" বা নির্ব্বাণ বলিয়াছেন। "মিলিন্দ পঞ্‌হোতে (৩৯) আমরা "যোগী" এবং ঐ অর্থবোধক "যোগাবচারো" "যোগিনা যোগাবচারেন," "যোগী যোগাবচারো" (৪০) শব্দ পাই। "যোগাবচারো শীলং নিস্‌সায়, শীলে পতিট্‌ঠায়, পঞ্চি'ন্দ্রিয়ানি ভাবেতি—সদ্ধি-'ন্দ্রিয়ং, বিরিয়ি'ন্দ্রিয়ং, সতি'ন্দ্রিয়ং, সমাধি'ন্দ্রিয়ং, পঞ্‌ঞি'-ন্দ্রিয়ন্তি।" (৪১) অর্থাৎ যোগী শীল আশ্রয় করিয়া, শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়বলের ভাবনা করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বলের ভাবন করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা ভাবনা যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। সংযুক্ত, ৪৮৷৫৭৷৫ দ্রষ্টব্য। সংযুত্তনিকায় মনোবিজ্ঞের ধর্ম্মসমূহের "প্রহান" বা ত্যাগকে "যোগ" বলিয়াছেন এবং এইজন্য বুদ্ধদেবকে "যোগক্‌খেমী" বলিয়াছেন সংযুক্ত, ৩৫৷১০৪৷৯। মিলিন্দ পঞ্‌হো তে "যোগং করোতি"র মানে আছে "অপ্পত্তস্‌স পত্তিয়া, অনধিগমস্‌স অধিগমায়, অসচ্ছিকতস্‌স সচ্ছিকিরিয়ায়" (৪২) অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি অনধিগত বস্তুর অধিগম ও অসাক্ষাৎ কৃত বস্তুর সাক্ষাৎকার। শঙ্করাচার্য্য দেব ও যোগ অর্থে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি বুঝাইয়াছেন ("যোগঃ অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং") (৪৩) ইহা যে যোগদর্শনের চিত্ত নিরোধের পরে "তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (৪৪) এবং "কৈবল্যং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি" (৪৫) অর্থাৎ অপ্রাপ্য, অনধিগত ও সাক্ষাৎকৃত দ্রষ্টা চিতি শক্তির কৈবল্য রূপ স্বরূপ অবস্থানের প্রাপ্তি অধিগম বা সাক্ষাৎকার তাহা বেশ বোঝা যায়। "অনুত্তরং যোগক্‌খেমং" (৪৬) "অমতং পদং" (৪৭) "অত্তদীপা অত্তসরণা" (৪৮) "যে সুবিমুক্তা তে কেবলিনো" (৪৯) এবং "কেবলী বুসিতবা উত্তমপুরিসো" (৫০) বলিয়া ত্রিপিটক সেই কৈবল্যপদপ্রাপ্ত, ব্রহ্মপ্রাপ্ত ("ব্রহ্মপত্ত" (৫১)) "ব্রহ্মভূত" (৫২) "কূটস্থ" (কুটটাধং" (৫৩)) অমৃতত্বপ্রাপ্ত ("অমতপত্তো-অনুত্তর, (৫৩ক) পুরুষ বা উত্তম পুরুষ আত্মাকেই বুঝাইয়াছেন। পাতঞ্জল যোগদর্শনের কৈবল্যও (৫৪) তাহাই।

পাঠকপাঠিকাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইবে বলিয়া সাধন রাজ্যের এই গুহ্যতম দার্শনিক গবেষণায় আমরা

(৩৫) মজ্‌, ১৷৬৬-১৭৬ পৃঃ : (৩৬ক) মজ্‌ঝিম, ১৷৩৩৩ পৃঃ মজ্‌ঝিম ৩৷৪৫ ; দীঘনিকায় ২৷৭১, ২৷১১১-১১২, ২ ১৫৬ পৃঃ ইত্যাদি ; অঙ্গুত্তর ৪৷৪০৬ পৃঃ ইত্যাদি। (৩৭) ১৷৫১ সূত্র। (৩৮) ১৷৪৪-৫১ সূত্র। (৩৯) Rhys D.vids এর মতে মিলিন্দ পঞ্‌হের রচনা-কাল "little after the beginning of Christian era" S. B. E. vol. xxxv. Inti, p. : xi (1890) ; (৪০) মিলিন্দ-পঞ্‌হ ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯, ৪১৩ পৃঃ (বহুবার এইরূপ উক্ত) (৪১) মিলিন্দ-পঞ্‌হ।

(৪২) ঐ, ৬৮, ৬৯ পৃঃ। (৪৩) ঐ গীতাভাষ্য, ৯৷২২ শ্লোক ; (৪৪) ১৷৩ ; (৪৫) ৪৷৩৪। (৪৬) মজ্‌ঝিম ১৷১৬৩ ; ইতিবুত্তক, ৩৪ ; অঙ্গুত্তর, ১৭৷২ ২ ইত্যাদি। (৪৭) সংযুত্ত, ১.২১২ পৃঃ ; অঙ্গুত্তর, ১৷৪৫—৪৬ পৃঃ। (৪৮) দীঘনিকায়, ২৷১০০ ; সংযুত্ত, ২২৷৪৩৷৩ ইত্যাদি ; (৪৯) সংযুত্ত ২২৷৫৬৷৯, ১২, ১৫, ১৮, ২১ ; ২২৷৫৭৷১৩৷১৮, ২১,২৫, ২৯। (৫০) অঙ্গুত্তর ১০৷২৷১২৷১৩৷৫.১৬ পৃঃ)। সংযুত্ত, ২২৷৫৭৷৩-৩২ ; (৫১) মজ্‌ঝিম, ১৷৩৮৬ পৃঃ। (৫২) মজ্‌ ১৷১১১ পৃঃ। (৫৩) দীঘনিকায়, ১৷১৬, ৩৷১০৮-(৫৩ক) ; অঙ্গুত্তর ৪৷৪৫৬ পৃঃ। (৫৪) যোগদর্শন, ৪৷৩৪, ৩৷৫০, ৫৫।

আরও প্রবেশ করিতে বিরত হইলাম। মোট কথা বুদ্ধদেব উপনিষদিক সাংখ্যযোগের ব্রহ্মবিদ্যা-সাধনাতেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রচলিত লৌকিক ভাষাতেই দার্শনিক পরিভাষা শূন্য করিয়া তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবকে 'ব্রহ্মবাদী' বা 'আত্মবাদী' না বলিয়া যাঁহারা তাঁহাকে "শূন্যবাদী" বা "Nihilist" বলিয়াছেন তাঁহারা একান্ত ভ্রান্ত। (৫৫)

(৩) বৌদ্ধমতবাদ অপেক্ষা সাংখ্যযোগমতবাদের প্রাচীনত্ব

এক্ষণে অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এবং তাঁহাদের পর-প্রত্যয়নেয়বুদ্ধি প্রাচ্য শিষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে পাতঞ্জল যোগদর্শন এবং সাংখ্যযোগাদি মতবাদ বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালে রচিত। ত্রিপিটকাদি গ্রন্থে বহুস্থলে বুদ্ধদেব নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রধান দুই গুরু আড়ার কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের নিকট হইতে তিনি অনেক গুহ্য সাধন-রহস্য বিজ্ঞাত হন; তথাপি অনেকে বলিতে চাহেন যে সাংখ্যযোগ মতবাদগুলি বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী কালে রচিত। আমরা এস্থলে আপাততঃ কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া দেখাইব যে সাংখ্যযোগ মতবাদ বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অশ্বঘোষ প্রচলিত ঐতিহাসিক সত্যানুসারেই সাংখ্যযোগকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বকালীন করিয়াছেন। অশ্বঘোষের প্রাদুর্ভাব সমসাময়িক ব্যক্তি এবং তাঁহার ধর্ম্মগুরু ছিলেন। চীন 'Jsah-pao-tsang-king' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের কয়েক স্থলে চন্দন "কনিক" বা কনিষ্কের কয়েকটী গল্প আছে। তাহার একটীতে (৫৬) অশ্বঘোষকে 'বোধিসত্ত্ব' বলা হইয়াছে এবং তিনি যে কনিষ্কের ধর্ম্মগুরু ছিলেন তাহাও পরিষ্কার বলা হইয়াছে। (৫৭) বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ বুদ্ধদেবের পরে দ্বাদশ বৌদ্ধসঙ্ঘ গুরু ছিলেন। ইহাতেও অনুমান করা যায় যে বুদ্ধদেবের প্রায় পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই অশ্বঘোষ প্রাদুর্ভূত হন। কাশ্মীররাজ কনিষ্ক বসুমিত্রের সভাপতিত্বে ১ম শকাব্দে (৭৮ খৃষ্টাব্দে) 'তামস বনে' (৫৮) চতুর্থ বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্গীতি বা সম্মিলনী আহূত করেন। (৫৯) ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে অশ্বঘোষের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এবং তাঁহার শ্রীবুদ্ধচরিত মহাকাব্য রচনার কালও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে যে ভারতে এক বুদ্ধচরিত-কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহা প্রাচীন চীন বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত; কিন্তু অধুনা লুপ্ত 'চূফলন' বা 'গোভরণ' কর্ত্তৃক ভারত হইতে আনীত এবং ৬৮—৭০ খৃষ্টাব্দে অনূদিত 'ফো-পেন্-ঙি-কিঙ্' হইতে পাওয়া যায়। চীনগ্রন্থ 'কওসাংকু'তে এবং 'লৈটৈসান্পাও'তে আছে যে শ্রমণ ধর্ম্মফল কপিলবাস্তু হইতে 'সিউহিঙ্ পেনক্ই কিঙ্' নামক এক বুদ্ধজীবনী আনেন। তাহার 'চুতলিহ' ('মহাবাল') এবং 'কঙ্ মঙ্ ইৎসিয়ঙ' নামক দুইজন ভারতীয় শ্রমণ ১৯৪ খৃষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনূদিত করেন। এই 'সিউ হিঙ্ পেন্ কই কিঙ্' ('Siu-hing-pen-k'i-king') গ্রন্থের পঞ্চম বর্গে আছে যে বুদ্ধদেব আড়ার কালামের নিকট হইতে সাধনতত্ত্ব উপদেশ দেন। মূল সংস্কৃত বুদ্ধচরিত হইতে চীন ভাষায় 'ফো শো হিঙ সন্ কিঙ্' ('Fo-Sho-Hing-Tsan-king') বলিয়া যে গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে, স্যামুয়েল বীল আবার সেই চীন অনুবাদের ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাহার তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গের নামকরণ সম্বন্ধে 'নোটে' বীল সাহেব লিখিয়াছেন—"The compound in the original probably represents Adara Ratama and Udra (Ka) Ramputra"(৬০) অর্থাৎ :—মূলের মিশ্র শব্দটী বোধ হয় আড়ার কালাম ও উদ্রক রামপুত্র বুঝাইতেছে। ইহার তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪শ বর্গের ৮৫ শ্লোকে ও আড়ার কালাম এবং উদ্রক রামপুত্রের উল্লেখ আছে। এই অধ্যায়ে আড়ার কালাম কয়েক স্থলে 'সূত্র' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপিটকও (৬০ক) (অঙ্গুত্তর, ৪।১১৩; ৩।১৭৭ পৃঃ; মজ্ঝিম, ১।১১৩ পৃঃ ইত্যাদি) বহু স্থলে 'সূত্র' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 'সূত্র' সাংখ্য-যোগ-

(৫৫) মৎপ্রণীত 'বুদ্ধচরিতের আভাষ; পুরুষ বা আত্মাশূন্য এক বা বহু ও Psychology of Yoga or Nirvana দ্রষ্টব্য। (৫৬) fol. 13।

(৫৭) Introduction to the Fo-Sho-Hing-Tsang-king' by Samuel Beal, p. xx. vi, S, B, E by F. Max Muller, vol xix.

(৫৮) Cunningham এর মতে পঞ্জাবের মুলতানপুর এবং বীলের মতে শতদ্রু বিপাসার সঙ্গমে। (৫৯) Beal's Introduction to Fa Hian দ্রষ্টব্য।

(৬০) The Fo Sho-Hing-Tsan-king, A life of Buddha by Aswaghosh Bodhisattwa, tr. Sanskrit into chinese from English by S. Beal, p. 131 (1863 ed.).

সূত্রাদি নির্দ্দেশ করে নাকি? ঐ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে সপ্তদশবর্গের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে (৬১) আছে যে ঋষি কপিলের অসংখ্য শিষ্য (অর্থাৎ কপিলপন্থী; কারণ কপিলদেব বুদ্ধদেবের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত হন) ছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে উপতিষ্য বা শারীপুত্র খুব বিখ্যাত ছিলেন। কপিলের সাংখ্যযোগ-পন্থী পূর্ব্ব হইতেই সুবিখ্যাত সাধক এই শারীপুত্র বুদ্ধদেবের একজন বিখ্যাত সর্ব্বপ্রধান শিষ্য হন।

সাংখ্যধর্ম্ম-প্রবক্তা "সিদ্ধানা, কপিলো মুনিঃ" (৬২) সিদ্ধদিগের মধ্যে পরমর্ষি কপিলমুনির প্রশিষ্য ও আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য— মিথিলরাজ 'জনদেব' জনকের সভায় শত আচার্য্যকে পরাস্ত করিয়া জনদেব জনককে শিষ্য করেন এবং তাঁহাকে আত্মতত্ব বা সাংখ্য-যোগবিদ্যার উপদেশ দান করেন। (৬৩) "বশিষ্ঠ করাল জনক সংবাদে" (৬৪) এবং যাজ্ঞবল্ক্য জনক ('দৈবরাতি জনক') সংবাদে (৬৫) আমরা সাংখ্যযোগ ব্রহ্মবিদ্যার পরিষ্কার আলোচনা পাই। বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য জনকাদির 'ধর্ম্মযুগ' যে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা খুবই প্রাচীন তাহা বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদ্ ও রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস বারবার সাক্ষ্য দিয়াছেন। সাংখ্যযোগী বশিষ্ঠ, কৃষ্ণ, জনকাদি যে বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা বুদ্ধদেবই নিজমুখে ত্রিপিটকে বহুবার স্বীকার করিয়াছেন। (৬৬) ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন "ফলতঃ রামায়ণ ও মহাভারত যে জাতক রচনাকালে, এমন কি বুদ্ধদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল, জাতকের নানা অংশে তত্তদ্‌গ্রন্থ-বর্ণিত ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। জাতকের প্রাচীন গাথাগুলির সঙ্গেও এই গ্রন্থদ্বয়ের কুত্রাপি কোন বিরোধ নাই।" (৬৭)—পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অথচ গায়ের জোরে তাঁহারা যোগশাস্ত্রকে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছু পরেই (৬৮) 'ললিত-বিস্তর' নামক বিখ্যাত বৌদ্ধগ্রন্থের অনেকাংশ বিরচিত হয়। উহার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে পঞ্চশিখিদয় এবং তাঁহার যমনিয়মাদি দশ ধর্ম্ম-চর্য্যার প্রসঙ্গ আছে। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মের বিখ্যাত দশশীল এবং যোগশাস্ত্রের দশবিধ নিয়ম। কপিল-প্রশিষ্য আসুরির শিষ্য জনকগুরু পঞ্চশিখাচার্য্যের এই যমনিয়মাচরণ তখন খুব বিখ্যাত না হইলে তাহার এইরূপ উল্লেখ থাকিতে পারে না। বুদ্ধদেবের দশশীল যে পূর্ব্বেকার, তাহা পালি ত্রিপিটকে বুদ্ধদেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (৬৯), ঐ ললিত-বিস্তরের ৩য় অধ্যায়ে কংসরাজ্য, কুরুপাণ্ডব এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এবং ১১ অধ্যায়ে বীর কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। ঘটজাতকে ও 'কণ্-পেত-বথু'তে বাসুদেব কৃষ্ণ, বলদেব, অর্জ্জুন, রোহিণী, দ্বারকা প্রভৃতির কথা আছে; আর মজ্‌ঝিম-নিকায়ে (৭০) "পাণ্ডব পর্ব্বত" "অচ্যুত" ও "আনন্দনন্দ উপানন্দ" নামক মুক্ত মহর্ষির কথা আছে। 'বুদ্ধদেবের অব্যবহিত পরেই মহাভারতের এই প্রধান কাহিনী এবং সাংখ্যযোগী কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতির প্রধান কাহিনী তিব্বত, চীন, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইতে হইলে তাহা নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবের পূর্ব্বের কথা। ললিত-বিস্তরের একাদশ অধ্যায়ে পতঞ্জলির যোগদর্শনের বিতর্ক বিচার আনন্দ অস্মিতা রূপ চতুর্ব্বিধ ধ্যানে (৭১) বুদ্ধদেবের ধ্যানস্থ হইবার কথা আছে। বুদ্ধদেবের উপদেশে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে অসংখ্য সাংখ্য ও যোগ শব্দ এবং পরিভাষার ব্যবহার ও নির্দ্দেশ করে যে বুদ্ধধর্ম্ম সাংখ্যযোগের নিকট ঋণী। ললিত-বিস্তরের দ্বাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধদেব যে সাংখ্যযোগ-দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মপদের অনেক শ্লোকই মহাভারতের অন্তর্গত সাংখ্য এবং যোগ-সম্বন্ধীয় শ্লোক-সমূহের পালিতে ভাষান্তর মাত্র। প্রাচীন ভারতের অনেক কথা ও কাহিনী যে বুদ্ধদেব নিজস্ব করিয়া লন এবং পরে তাহারা যে পালি 'জাতক' সমূহে স্থান প্রাপ্ত হয় তাহার

(৬১) ১৯৩ ও ১৯৪ পৃঃ। (৬২) গীতা, ১০।২৬। (৬৩) মহাভারতম্, শান্তি, ২১৮-২১৯ অধ্যায়; (৬৪) মহা, ৩০২-৩০৮ অধ্যায়। (৬৫) মহাভারতম্. শান্তি, ৩১৪-৩১৮ অধ্যায়; (৬৬) মজ্‌ঝিম, ২।৭৪-৮২ পৃঃ; দীঘ, ২।১৯৬ পৃঃ; ১।২৪২; ইত্যাদি; ঘট জাতক (৪৫৪ নং), কুম্ভজাতক (৫১২ নং), সংকৃত্য জাতক (৫৩০ নং), কুণাল জাতক (৫৩৬ নং), মহাজনক জাতক (৫৩৯ নং), নিমি জাতক (৫৪১ নং), বিদুর পণ্ডিত জাতক (৫৪৫ নং) ইত্যাদি। (৬৭) জাতক (ঈশান ঘোষ), ৫ম খণ্ড, ১৭ পৃঃ পাদটীকা।

(৬৮) পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ মধ্যে।

(৬৯) দীঘ, ব্রহ্মজাল সুত্ত, সামঞ্ঞফল সুত্ত। (৭০) ৩।৬৮-৭১ পৃঃ। (৭১) ১।১৭;

সাক্ষ্য Robert Chalmersও দিয়াছেন। (১২) বিনয়-পিটক গ্রন্থে পাওয়া যায়—বুদ্ধের শিষ্য মহারাজ বিম্বিসারের সভা-'চিকিৎসক' 'জীবক' তক্ষশিলায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। অনেক বৌদ্ধজাতক গ্রন্থেও আছে যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হইতেই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বেদ এবং অষ্টাদশ বিদ্যা ('বিজ্জা') অধ্যয়ন করিবার নিয়ম ভদ্রমহলে প্রচলিত ছিল। (১৩)

পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন :—"it is possible that he (Buddha) might quote ancient antivedic philosophers, as Kapila and others, (১৪)in support of his opinions···The technology of the Buddhists is to a great extent borrowed from the literature of the Brahmans. The Vija-mantra of Buddha begins with on, their metaphysical terms are exclusively Hindu and the names of most of their divinities are taken from the Hindu Pantheon." (১৫) অর্থাৎ—ইহা সম্ভব যে বুদ্ধদেব তাঁহার মত-সমর্থনের জন্য, কপিল এবং অন্যান্যের ন্যায় অনেক প্রাচীন বেদবিরোধী দার্শনিকদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন।···বৌদ্ধদের পরিভাষা অনেকাংশে ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্য হইতে ঋণ লওয়া। বুদ্ধের বীজমন্ত্র ওঁ দিয়া আরম্ভ, তাঁহাদের দার্শনিক শব্দসমূহ বিশিষ্টভাবে হিন্দু এবং তাঁহাদের অধিকাংশ দেবতাই হিন্দুদের বেদ হইতে গৃহীত।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এবং যোগ, নির্ব্বাণ ও মোক্ষের প্রাচীনত্ব ত্রিপিটকে বুদ্ধদেব স্বয়ংই নানা স্থানে স্বীকার করিয়াছেন। Mrs. Rhys Davidsও বলিয়াছেন—"The samapattis or various stages of self-concentration, include the Jhanas···and the forms of Samadhi all Pre-Buddhistic and all utilised in the body of Buddhistic doctrine and culture." (১৬) অর্থাৎ :—সমাপত্তিগুলি অথবা বিভিন্ন স্তরের আত্ম-একাগ্রতা সমূহ, ধ্যানগুলিকে এবং সমাধির বিভিন্ন রূপগুলিকে অন্তর্গত করে; ইহার সকলগুলিই বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ইহাদের সবগুলিকেই বুদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতির অঙ্গরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। অশ্বঘোষের শ্রীবুদ্ধচরিত-মহাকাব্য,ললিত-বিস্তর,মিলিন্দ-পঞ্হো প্রভৃতি হইতে আমরা পাই যে বুদ্ধদেব তীর্থঙ্কর মহাবীরের ন্যায় (১৭) সাংখ্যযোগাদি-দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহএবং বুদ্ধজীবনীকার সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, গোতম বুদ্ধদেব ছিলেন সাংখ্যযোগী আড়ার কালাম ও রুদ্রক রামপুত্রের শিষ্য।

(৪) সিদ্ধান্ত

পরিশেষে আমাদের সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে :—সাংখ্য-যোগের মোক্ষ-সাধনা এবং বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-সাধনা একই। বুদ্ধদেব ও উপনিষদ্, সাংখ্যযোগ দর্শনাদির ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্ম বা আত্মবাদী, সগুণ ঈশ্বরবাদী এবং দেবদেবীবাদী, স্বর্গ নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং জন্মান্তরবাদী (১৮) আর্য্য পৌরাণিক হিন্দু বুদ্ধদেবকে নারায়ণের নবম অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং বুদ্ধদেবও নিজেকে বহুবার আর্য্য ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার ধর্ম্মমতকে আর্য্যধর্ম্ম বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবেরও বীজমন্ত্র "ওঁ" এবং সাংখ্যযোগেরও বীজমন্ত্র "ওঁ"। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মকে এবং সাংখ্যকে "নিরীশ্বরবাদী" বলেন তাঁহারা একান্তই ভ্রান্ত। আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি যে, গোতম বুদ্ধ এবং কপিল সাংখ্য প্রভৃতি মহাসাধকেরা সম্পূর্ণ দার্শনিক ঈশ্বরবাদী। ইঁহারা উভয়েই প্রাচীন উপনিষদের ন্যায় পৌরাণিক 'অবতারবাদ' বা নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ ঈশ্বরত্ব ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন যে কৈবল্য, মোক্ষ বা মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত ব্রহ্ম বা আত্মা আর পুনরায় সগুণ ঈশ্বরত্ব বা জগদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয় না। অতএব আমাদের শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভূতি সম্ভূত সিদ্ধান্ত এই যে, গোতম বুদ্ধদেব উপনিষদিক সাংখ্যযোগেরই এক বিপুল বোধিদ্রুম, অশ্বত্থবৃক্ষ, প্রশান্ত মহাসাগর, এক অমৃতবার্ত্তা, এক ব্রহ্মচিন্তন সাধনা, নির্ব্বাণ বা যোগের এক অভিনব সিদ্ধি, রসামৃতসিন্ধুর এক দিব্য অবদান, "বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়" উৎসর্গীকৃত প্রাণ, এক অমিয়বারতার সুধাময় সামগান 'ওম্'।

(১২) The Journal of the Royal Asiatic Society, January, 1892. (১৩) দুর্মেধাজাতক, ১ ১০৭ পৃঃ ঈশান সং ; কৌসেরী জাতক, ১।২৪২ ; ভীমসেন জাতক,১।১৭৩ পৃঃ অসদৃস জাতক ২২।৫৪ ; মহাধর্ম্মপাল জাতক, ৫।৩৮ ; সর্ব্বদংষ্ট্রা জাতক, ২।১৫১ পৃঃ। (১৪) ইহা সম্পূর্ণ ভুল ; কপিল আদৌ বেদ উপনিষদের দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যার বিরোধী ছিলেন না। (১৫) Lalitavistara by Rajendra Lall Mitra, p p 7-8.

(১৬) A Buddhist Manual of Psychological Ethics ···Dhamma-Sangani, Foot note 3, p. 346 by c. A' F. Rhys Davids (১৭) কালসূত্রাদি দ্রষ্টব্য। (১৮) আমাদের পুরুষ বা আত্মা-শূন্য. এক বা বহুতে আমরা ইহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা ও সাক্ষ্য দিয়াছি।

ঝিন্দের বন্দী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনুমতি

'তারপর ?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'যখন সত্যিই বুঝতে পারলাম যে ইনি শঙ্করসিং নয় তখন মন নিরাশায় ভরে গেল। শঙ্করসিংকে ধরেছি মনে করে যেমন আনন্দ হয়েছিল ঠিক অনুরূপ বিষাদে বুক অন্ধকার হয়ে গেল। সাতদিনের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ খুঁজে একটি লোককে ধরবার চেষ্টা যে আমার কত বড় পাগলামি তা বুঝতে পারলাম। সত্যিই ত! শঙ্করসিং যদি কলকাতায় না এসে দিল্লী কিম্বা বোম্বাই গিয়ে থাকেন ? যদি তিনি অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকেন—তাহলে তাঁকে ধরব কি করে ? তিনি যে কলকাতায় এসেছেন এ খবর মিথ্যাও ত হ'তে পারে !

'কিন্তু এ কয়দিনের মধ্যে যদি কুমারকে খুঁজে না পাই তাহলে উপায় ? হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেল। কুমারকে যতদিন না পাই ততদিন আর কোনো লোককে শঙ্করসিং সাজিয়ে কি কাজ চলে না ? এই যে বাঙালী যুবা পুরুষটি তলোয়ার খেলছেন এঁকে যদি—বিদ্যুৎ চমকের মত এই চিন্তা আমার মাথায় জ্বলে উঠ্‌ল।

'স্থির হয়ে ভাববার জন্য আমি সেক্রেটারী সাহেবের ঘরে এসে বসলাম। তিনি আমার বিচলিত অবস্থা দেখে যত্ন করে বসালেন এবং নানাপ্রকার আলাপে আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বাস্তবিক এই বাবুটির মত প্রকৃত সজ্জন আমি খুব কম দেখেছি।

'আমার মাথায় কিন্তু এই সর্ব্বগ্রাসী চিন্তা আগুনের মত জ্বলতেই লাগল। কি উপায়! কি উপায়! শেষে উদিত সিংএর কূটবুদ্ধিই জয়ী হবে! আর আমি রাজার কাছে চুল পাকিয়ে শেষে এই চব্বিশ বছরের ছোঁড়ার চালে বাজীমাৎ হয়ে মুখে কালী মেখে দেশে ফিরে যাব! দেশে ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে ? আর সব সহ্য হবে, কিন্তু উদিতসিং আর ময়ূরবাহনের বাঁকা বিদ্রূপভরা হাসি আমার সহ্য হবে না।

'ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, আমি সেক্রেটারীবাবুর ঘরে বসে ভাবতেই লাগলাম। তিনিও আমায় নিজের চিন্তায় মগ্ন দেখে কাজকর্ম্মে মন দিলেন। তারপর যখন ভেবে আর কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না এমন সময় ইনি তলোয়ার খেলা শেষ করে অন্যান্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

'আর ভাবতে পারলাম না। মনে করলাম, নিয়তির মনে যা আছে তা যখন হবেই এবং ঝিন্দ্‌ রাজ্যটাকে বাজী ধরে যখন জুয়া খেলতেই বসেছি তখন একবার ভাল করেই জুয়া খেলব। সর্ব্বস্ব হারানোই যদি ভাগ্যে থাকে তবে খেলার উত্তেজনা থেকে বঞ্চিত হই কেন ? না খেললেও ত সেই হারতেই হবে!—সেক্রেটারীবাবুর কাছ থেকে তাঁর ঠিকানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

'তারপর এখানে এসে যখন এই ছবিখানার ওপর চোখ পড়ল তখন বুঝলাম যে আমি নিয়তির হাতের খেলার পুতুল মাত্র; আমি যদি না আসতাম নিয়তি কাণ ধরে আমাকে এখানে টেনে আন্‌ত। বাবুজী, এ দুনিয়াটা একটা সতরঞ্চের ছক, দেড় শতাব্দী আগে সুদূর মধ্যভারতের এক খেলোয়াড় যে চাল দিয়েছিলেন আজ তার পালটা চাল দেবার জন্যে আপনার ডাক পড়েছে। এ ডাক অমান্য করবার উপায় নেই—এ খেলা খেলতেই হবে। এই নিয়তির বিধান।'

ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী মৌন হইলেন। প্রায় পাঁচমিনিট কাল ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ গৌরীশঙ্কর উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'আমি রাজী। রাজা হবার সুযোগ জীবনে একবার বই দুবার আসে না, অতএব এ সুযোগ ছাড়া যেতে পারে না। ভগবান যখন রাজকুমারের মত চেহারাটা ভুল করে দিয়ে

ফেলেছেন তখন দিনকতক রাজত্ব করে নেওয়া যাক। দাদা কি বল?'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'না ভেবে চিন্তে কোনো কথা বলা ঠিক নয়। রাজা হবার বিপদও ত আছে। এই রকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাবে খামকা রাজী না হয়ে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দেখা উচিত।'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'দাদা, কথাটা নেহাৎ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের মত হল। মূর্ত্তিমান রোমান্স্ আমাদের বাড়ী বয়ে এসে এই চেয়ারে আমাদের মুখ চেয়ে বসে আছেন, আর আমরা কিনা অগ্রপশ্চাৎ ভেবে সময় নষ্ট করব?

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে!
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে
পুচ্ছ নাচাতে!'

শিবশঙ্কর ঈষৎ অধীরকণ্ঠে বলিলেন—'পুচ্ছ নাচাতে পারলেও সে-কাজটা সব সময় শোভন এবং রুচিসঙ্গত নয়। গৌরী, তুই চুপ্ করে ব'স্, আমি এঁকে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করি।' ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'দেখুন, আমার ভাই রাজা রাজ্ড়ার চালচলন রীতিনীতি কিছু জানেন না, সুতরাং রাজা সাজ্তে গেলে তাঁর ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশী।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'সম্ভাবনা একেবারে নেই তা বলতে পারি না; তবে আমি যতক্ষণ সঙ্গে থাকবো ততক্ষণ নেই।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'দ্বিতীয়তঃ ঝিন্দ্ দেশের প্রচলিত ভাষা ওঁর জানা নেই। এ একটা মস্ত আপত্তি।'

ধনঞ্জয় বলিলেন,—'আমরা উপস্থিত যে ভাষায় কথা কইছি তাই ঝিন্দের প্রচলিত ভাষা। এ ভাষায় আপনার ভাই ত চমৎকার কথা বলেন।'

শিবশঙ্কর কহিলেন—'তা যেন হ'ল। কিন্তু ধরুন, কোনো কারণে আমার ভাই যদি জাল-রাজা বলে ধরা পড়েন তখন ত তাঁর বিপদ হতে পারে।'

ধনঞ্জয় ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'বিপদের আশঙ্কা যে একেবারে নেই তা বলতে পারি না। কিন্তু বাবুসাব, বিপদের ভয়ে যদি চুপ করে বসে থাকতে হয় তাহলে ত কোনো কাজই করা চলে না।'

শিবশঙ্কর পুনশ্চ বলিলেন—'প্রাণের আশঙ্কাও থাকতে পারে?'

ধনঞ্জয় ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন—'তা থাকতে পারে বই কি?'

'আমি আমার ভাইকে যেতে দিতে পারি না।'

ধনঞ্জয় আস্তে আস্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ওষ্ঠাধর বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকা হইয়া উঠিল; বলিলেন—'তবে কি বুঝ্ব বাঙ্গালী জাতটা সত্যই ভীরু! এ নিন্দা আমি অনেকের মুখে শুনেছি বটে কিন্তু এতদিন বিশ্বাস করি নি।'

শিবশঙ্করের মুখ লাল হইয়া উঠিল, বলিলেন—'সখ করে পরের বিপদ ঘাড়ে না নেওয়া ভীরুতা নয়।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'সব বিপদ থেকে নিজের প্রাণটুকু সাবধানে বাঁচিয়ে চলা সুবুদ্ধির কাজ হতে পারে সাহসের কাজ নয় বাবুজি।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'আমি তর্ক করতে চাই না। আপনার এ প্রস্তাবে আমার মত নেই।'

ধনঞ্জয় গৌরীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারও কি এই মত?'

গৌরী মিনতির চক্ষে একবার দাদার দিকে চাহিল—কোনো উত্তর দিল না।

ধনঞ্জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'অন্য কোনো প্রদেশের—মারাঠী কি গুজ্রাটি যুবককে যদি এ প্রস্তাব করতাম, সে একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করত না। আর আপনারা দেওয়ান কালীশঙ্করের বংশধর! যাক—আমার আর কিছু বলবার নেই।'

শিবশঙ্কর উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া ধনঞ্জয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কালীশঙ্করের সম্বন্ধে আপনি অনেক কথা জানেন এই ইঙ্গিত কয়েকবার করেছেন। শেষ বয়সে তিনি খুন হয়েছিলেন এ খবর আপনার জানা আছে কি?'

'খুন হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে আপনারই দেশের কোনো লোক তাঁকে খুন করিয়েছিল।'

'তার কোনো প্রমাণ আছে কি?'

'প্রমাণ কিছু নেই। শুধু একখানা ছোরা আছে—যা দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছিল।'

'শুধু একখানা ছোরা?'

'হ্যাঁ।'

'ছোরাখানা একবার দেখতে পারি কি?'

চাবি দিয়া টেব্‌লের দেরাজ খুলিয়া শিবশঙ্কর একটা গহনার বাক্সের মত চ্যাপ্টা ধরণের মখমলের বাক্স বাহির করিলেন। তারপর সেটা খুলিয়া মখমলের খাঁজকাটা আস্তরণের উপর হইতে সাবধানে ছুরিখানা তুলিয়া ধনঞ্জয়ের হাতে দিলেন। ঝক্‌ঝকে ধারালো প্রায় পনের ইঞ্চি লম্বা ভোজালীর মত ঈষৎ বাঁকা বিচিত্র গঠনের ছুরি—কোথাও মলিনতা বা মরিচার এতটুকু চিহ্ন নাই। সোনার মুঠ এবং ইস্পাতের ফলা যেন বিদ্যুতের আলোয় হাসিয়া উঠিল।

ধনঞ্জয় গভীর মনঃসংযোগে ছোরাখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার লোহার মত মুখ যেন আরো কঠিন হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে গলাটা পরিষ্কার করিয়া তিনি নিম্নস্বরে কহিলেন—'এতদিনে কালীশঙ্করের জীবনের ইতিহাস আমার কাছে সম্পূর্ণ হ'ল। এই উপসংহারটুকুই আমি জানতাম না বাবুজি।'

তারপর ছোরাখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—'এ ছোরা কার জানেন? ঝিন্দ রাজবংশের। বংশের আদি-পুরুষ স্বরজিৎ সিংহের আমল থেকে এ ছুরি রাজবংশের দণ্ড মুকুটের মত মহামূল্য সম্পত্তি বলে চলে আসছিল। তারপর হঠাৎ শতবর্ষ পূর্ব্বে ছুরিখানা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ছুরি যে আপনার বংশে এসে আশ্রয় নিয়েছে তা বোধ হয় একজন ছাড়া আর কেউ জানত না। ছুরির মুঠের উপর কতকগুলি অক্ষর খোদাই করা আছে—পড়তে পারেন কি?'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'না, আমি অনেক চেষ্টা করেও পড়তে পারি নি।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'এ অক্ষরগুলি প্রাচীন সৌরসেনী ভাষায় লেখা। এর অর্থ হচ্ছে—যে আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবে এই ছুরি তার জন্য।'

শিবশঙ্কর ছুরিখানা নিজের হাতে লইয়া লেখাগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে অন্যমনস্কে বলিলেন—'হতেও পারে—হতেও পারে। তারপর?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'তারপর আর কিছু নেই। এই ছুরি একদিন যে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল, সেই রক্ত আপনাদের শরীরে বইছে। সেই রক্ত আজ আপনাদের ডাকছে ঝিন্দে যাবার জন্য। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না? আশ্চর্য্য!'

গৌরীশঙ্কর বলিয়া উঠিল—'আমি শুনতে পাচ্ছি।—দাদা, অনুমতি দাও আমি যাব।'

শিবশঙ্কর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন—'কিন্তু—কিন্তু—অজানা দেশ—কতরকম বিপদ—'

গৌরী বলিল—'আমি ছেলেমানুষ নই। তুমি মন খুলে অনুমতি দাও, কোনো বিপদ হবে না।'

শিবশঙ্কর বলিলেন—'তা না হয়—কিন্তু—'

ধনঞ্জয়ের মুখের বাঁকা বিদ্রূপ আরো ক্ষুরধার হইয়া উঠিল। গৌরী ছুরিখানা টেব্‌লের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—'দাদা, ফের যদি সর্দ্দার আমাদের ভীতু বলবার অবকাশ পায় তাহলে এই ছুরি দিয়ে আমি একটা বিশ্রী কাণ্ড করে ফেল্‌ব। বারবার ভীরু অপবাদ আমার সহ্য হবে না।'

শিবশঙ্কর চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—'আচ্ছা যা—আমি অনুমতি দিলাম!' তারপর ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'দেখুন, আমরা এই বাঙালী জাতটা, যতক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা থাকে ততক্ষণ সহজে ঘর থেকে বার হই না—পাছে রাস্তায় কুকুরে কামড়ায় কিম্বা গাড়ী চাপা পড়ি; কিন্তু একবার রক্ত গরম হ'লে আর রক্ষে নেই, তখন একলাফে একেবারে দুঃসাহসিকতার চরম সীমায় পৌঁছে যাই।' ছুরিখানা গৌরীর হাত হইতে লইয়া বলিলেন—'এর ওপর ঝিন্দের রাজার আর কোনো অধিকার নেই। রক্তের দাম দিয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ একে কিনে নিয়েছেন; এ ছুরি আমাদের বংশের। সুতরাং আমি এ ছুরি হাতে নিয়ে বল্‌তে পারি—'যে আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবে, এ ছুরি তার জন্য। সাবধান সর্দ্দার ধনঞ্জয়! ভীরু বলে যেন আমার বংশে কলঙ্কারোপ করবেন না।' বলিয়া সহাস্যে ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

ধনঞ্জয় দ্রুত আসিয়া দুই হাতে দুই ভাইয়ের হাত ধরিলেন ও উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন—'আমি জানতাম—আমি জানতাম বাবুজি। কালীশঙ্কর রাওয়ের বংশধর কখনো ভীরু হ'তে পারে না।'

* * * *

রাত্রে আহারাদির পর দুই ভাই এবং অচলা পুনরায় লাইব্রেরী ঘরে আসিয়া বসিলেন। গৌরী এবং শিবশঙ্কর দু'জনেই অন্যমনস্ক—অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। শেষে অচলা বলিল—'কি হল তোমাদের? মুখে একটি কথা নেই—এত ভাব্‌ছ কি?'

শিবশঙ্কর চেয়ারে নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—'গৌরী কাল বিদেশে যাচ্চে।'

অচলা বলিল—'কৈ আগে ত কিছু শুনিনি, কখন ঠিক করলে?'

গৌরী বলিল—'আজই। আবার কিছুদিন ঘুরে আসা যাক, বৌদি।'

অচলা বলিল—'সত্যিই ঘটকের ভয়ে পালাচ্ছ নাকি ঠাকুরপো?'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'না গো না। এবার দেখো না, তুমি যা চাও তাই একটা ধরে নিয়ে আসব। আর তা যদি নিতান্তই না পারি, অন্ততঃ নিজে সশরীরে ফিরে আসবই।'

অচলা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—'ও কি কথা ঠাকুরপো! কোথায় যাচ্চ ঠিক করে বল।

গৌরী বলিল—'বলবার উপায় নেই বৌদি—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফিরে এসে যদি পারি বলব। ততদিন আমাদের ঘরের অচলা লক্ষ্মীটির মতন ধৈর্য্য ধরে থেকো।'

অচলার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সে চোখ মুছিয়া বলিল—'কি কাজে যাচ্ছ তুমিই জান; আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে তোমাদের কথা শুনে।'

গৌরী বলিল—'এই দেখ! একেবারে কান্না? এই জন্তেই শাস্ত্রে বলেছে—নারী নদীবৎ—স্রেফ্‌ জল। তোমাদের নিংড়োলে কতখানি করে জল বেরোয় বল ত বৌদি?'

অচলা উত্তর দিল না। গৌরীর জোর করিয়া পরিহাসের চেষ্টা অন্য দুইজনের আশঙ্কাভারাক্রান্ত মনে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া যেন ঘরের আবহাওয়াকে আরো মুহ্যমান করিয়া তুলিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শিবশঙ্কর বলিলেন—'রাত হল, গৌরী শুগে যা। কালীশঙ্করের ইতিহাস যদি কিছু পাস—নোট করে নিস্।—আর এই ছুরিখানাও তুই সঙ্গে রাখ।' বলিয়া দেরাজ হইতে আবার ছোরাটা বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আলু পৌঁছিল

ছোট লাইনের রেলপথ বৃটিশ রাজ্যের সদর ষ্টেশন ছাড়িয়া প্রায় ত্রিশ মাইল পার্ব্বত্য চড়াই ঘুরিতে ঘুরিতে উঠিয়া যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখান হইতে ঝিন্দ্‌ রাজ্যের আরম্ভ। এই ছোট লাইনের ছোট ছোট গাড়ীগুলি পাহাড়ী পথে কখনো হাঁপাইতে হাঁপাইতে কখনো বাঁশীর আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বহির্জগতের যাত্রীগুলিকে ঝিন্দের তোরণদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। এই ত্রিশ মাইলের মধ্যে কেবল আর একটি ষ্টেশন আছে—সেটি ঝড়োয়া ষ্টেশন। ঝিন্দ্‌-ঝড়োয়ার গিরি-সঙ্কটে প্রবেশের উহা দ্বিতীয় দ্বার। এই দুই ষ্টেশনে নামিয়া যাত্রীদের হাঁটা-পথ ধরিতে হয়। ঝিন্দ-ঝড়োয়া রাজ্যের মধ্যে এখনো রেল প্রবেশ করে নাই।

উত্তুঙ্গ পাহাড়ের কোলের কাছে ছোট্ট সুদৃশ্য ঝিন্দ ষ্টেশনটি নিতান্তই খেলাঘরের ষ্টেশন বলিয়া মনে হয়। কারণ এইখান হইতে অভ্রভেদী পর্ব্বতের শ্রেণী শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ তুলিয়া আকাশের একটা দিক একেবারে আড়াল করিয়া দিয়াছে। উহারি অভ্যন্তরে মালার ভিতর নারিকেলের শস্যের ন্যায় ঝিন্দ্‌-ঝড়োয়া রাজ্য লুকাইয়া আছে। ষ্টেশনের সম্মুখ হইতে একটা অনতিপ্রশস্ত পথ পাহাড়ের উপর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাড়োয়ারীর পাগড়ীর মত সরু পথ পর্ব্বতের বিরাট মস্তক বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। সে পথে ঘোড়া কিম্বা মানুষ-টানা রিক্‌শ চলিতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো প্রকার যান-বাহনের চলাচল অসম্ভব।

ষ্টেশনের সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র টেলিগ্রাফ আফিস, সেখান হইতে টেলিগ্রাফ তারের একটা প্রান্ত পাহাড়ের ভিতর দিয়া ঝিন্দের দিকে গিয়াছে। ষ্টেশনের কাছে দুইটা দোকান, একটা সরাইখানা—সহর বাজার কিছুই নাই। দিনে রাত্রে দুইবার ট্রেণ আসে, সেই সময় যা-কিছু যাত্রীর ভিড়। অন্য সময় স্থানটি নিঃঝুমভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঝিমাইতে থাকে।

দ্বিপ্রহরের কিছু পরে ঝিন্দ ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার প্ল্যাটফর্ম্মের উপর রৌদ্রে চারপাই বিছাইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, দূর হইতে ট্রেণের বাঁশীর শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি তখন ধীরে সুস্থে গাত্রোত্থান করিয়া কুলী ডাকিয়া সিগ্‌নাল ফেলিবার হুকুম দিলেন; আর একজন কুলীকে চারপাইখানা সরাইয়া ফেলিতে বলিলেন। তারপর চোখে চশমা ও মাথায় টুপী আঁটিয়া গম্ভীরভাবে কঙ্করাকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

লোহালক্কড়ের ঝন্ ঝন্ ঝড়্ ঝড়্ শব্দে, ইঞ্জিনের পরিশ্রান্ত ফোঁস ফোঁস আওয়াজ এবং বাঁশীর গগনভেদী চীৎকারে শব্দজগতে বিষম হুলস্থুল বাধাইয়া ট্রেণ আসিয়া পড়িল। গাড়ী থামিলে গুটিকয়েক আরোহী মন্থরভাবে মোটঘাট লইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। অধিকাংশই মোসাফির, তাহার মধ্যে দু'একজন ভদ্রলোকশ্রেণীভুক্ত—দেখিলে মনে হয় ঝিন্দে বেড়াইতে আসিতেছে। সম্প্রতি রাজ-অভিষেক উপলক্ষে আবার একটা কিছু কাণ্ড ঘটিতে পারে এই আশায় সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টারও সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এই ট্রেণে আসিয়াছে।

ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত যাত্রীদের টিকিট গ্রহণ করিলেন; তারপর প্ল্যাটফর্ম্মের ফটক বন্ধ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিলেন। ষ্টেশন মাষ্টারের নাম স্বরূপদাস, লোকটির বয়স হইয়াছে, গত বিশ বৎসর তিনি এই ঝিন্দের সিংহদ্বারে প্রহরীর কাজ করিতেছেন। বাহিরের লোক যে কেবল তাঁহার কৃপায় ঝিন্দে প্রবেশ লাভ করিতে পারে এ কথা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরূক থাকে। তাই নিজের পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়া আগন্তুক যাত্রীদের সম্মুখে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া থাকেন। স্পর্দ্ধাবশতঃ কোনো যাত্রী কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সগর্ব্ব বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর না দিয়াই অবজ্ঞাভরে আবার নিজের কাজে মনঃসংযোগ করেন।

ঘরে বসিয়া স্বরূপদাস দৈনিক হিসাব প্রায় শেষ করিয়াছেন এমন সময় দ্বারের নিকট হইতে শব্দ আসিল—'ষ্টেশনমাষ্টার, এখনি আমার দুটো ভাল ঘোড়া চাই।'

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া মুখ তুলিয়াই ষ্টেশন-মাষ্টার একেবারে কাঠ হইয়া গেলেন। দেখিলেন দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া—সর্দ্দার ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী। প্রকাণ্ড পাগড়ী তাঁহার সুকৃষ্ণ মুখের উপর ছায়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু কানের রুবি দু'টা খরগোশের চোখের মত জ্বলিতেছে। স্বরূপদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফৌজী প্রথায় সেলাম করিল। মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না।

ধনঞ্জয় ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন—'শুনতে পাচ্চ? এখনি দুটো ভাল ঘোড়া আমার চাই। ঝিন্দে যেতে হবে।'

'যো হুকুম' বলিয়া আর একবার সেলাম করিয়া প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতে স্বরূপদাস বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সে খবর দিল যে সৌভাগ্যবশতঃ দুটা ঘোড়া পাওয়া গিয়াছে—জিন্ চড়াইয়া মোসাফির আলীর ফটকের কাছে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে, এখন সর্দ্দার মর্জ্জি করিলেই হয়।

সর্দ্দার একখানা দশ টাকার নোট তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—'গোলমাল করো না। তোমার ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ কর। উঁকি মেরো না—বুঝলে? যাও।'

নোটখানা কুড়াইয়া লইয়া স্বরূপদাস সবিনয়ে নিজের ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সর্দ্দার ধনঞ্জয় তখন একবার প্ল্যাটফর্ম্মের চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন—কেহ কোথাও নাই। কুলী দুটা চলিয়া গিয়াছে—পরদিন সকালের আগে ট্রেণ ছাড়িবে না, কাজেই তাহাদের ছুটি। আগত ট্রেণের গার্ড ড্রাইভার ফায়ার-ম্যানেরা বোধ করি ক্লান্তি বিনোদনের জন্য সরাইখানায় ঢুকিয়াছে। পরিত্যক্ত গাড়ীখানা নিষ্প্রাণভাবে লাইনের উপর পড়িয়া আছে। সর্দ্দার ধনঞ্জয় একখানা প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর সম্মুখে গিয়া ডাকিলেন—'বেরিয়ে আসুন—রাস্তা সাফ্।'

একজন সাহেব বেশধারী লোক গাড়ী হইতে নামিলেন। মাথায় ফেল্টের টুপী মুখের ঊর্দ্ধাংশ প্রায় ঢাকিয়া দিয়াছে। ওভারকোর্টের উল্টানো কলারের আড়ালে মুখের অধোভাগ ঢাকা। এই দু'য়ের মধ্য হইতে কেবল নাকের ডগাটুকু জাগিয়া আছে।

দু'জনে নীরবে ষ্টেশনের ফটক পর্য্যন্ত গেলেন। তারপর ধনঞ্জয় বলিলেন—'একটু দাঁড়ান—আমি আসছি।'

ফিরিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের ঘর পর্য্যন্ত আসিয়া ধনঞ্জয় দ্বার ঠেলিয়া দেখিলেন বন্ধ। জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাষ্টার ঘরে আছ ?'

ভিতর হইতে শব্দ হইল—'হুজুর !'

'উঁকি মারো নি ত ?'

'জী নহি।'

'আবার হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি, যদি কিছু বুঝে থাকো কারুর কাছে উচ্চারণ করো না। উচ্চারণ করলে গর্দ্দানা নিয়ে মুস্কিলে পড়বে। বুঝেছ ?'

ভীতকণ্ঠে জবাব আসিল—'হুজুর।'

মৃদু হাসিয়া ধনঞ্জয় ফিরিয়া গেলেন। সরাইখানার সম্মুখে দুজনে দুই ঘোড়ায় চড়িয়া পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর ধনঞ্জয় সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'এতদূর পর্য্যন্ত ত নিরাপদে আসা গেছে—মাঝে আর আঠারো মাইল বাকী। আজ রাত্রে যদি আপনাকে রাজমহালের মধ্যে পুরতে পারি—তারপরে ব্যাস্। —ষ্টেশনমাষ্টারটাকে খুব ধমকে দিয়েছি—সে যদি বা কিছু সন্দেহ করে থাকে—ভয়ে প্রকাশ করবে না।'

ধনঞ্জয় যদি সঞ্জয়ের মত দূরদর্শী হইতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, তাঁহারা পর্ব্বতের আড়ালে অন্তর্হিত হইলে পর ষ্টেশনমাষ্টার আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইল। তারপর সাবধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা দৌড়িতে আরম্ভ করিল। টেলিগ্রাফ্ অফিসে পৌঁছিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—বৃজ্‌লাল, জলদি, জলদি, একটা ফর্ম্ম্ দাও ত। জরুরী তার পাঠাতে হবে।'

বৃজ্‌লাল একহাতে বল নাড়িতে নাড়িতে অন্য হাতে একটা ফর্ম্ম্ দিল। মাষ্টার কিছুক্ষণ ভাবিয়া তাহাতে লিখিল—

আলু পৌঁছিয়াছে, সঙ্গে একটি অন্য মাল আছে চেনা গেল না ; ঘোড়ার পিঠে ঝিন্দ্ রওনা হইল।

এই লিখিয়া নিজের নাম সহি করিয়া টেলিগ্রামটি রাজধানীর এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পুরুষোত্তমদাসের নামে পাঠাইয়া দিল।

তার পর নিজের গর্দ্দানার কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কালো ঘোড়ায় সওয়ার

আলু এবং অজ্ঞাত মালটি তখন উপরে উঠিতেছেন।

যত উপরে উঠিতেছেন, শীতের সায়াহ্নে পারিপার্শ্বিক দৃশ্য ততই সুন্দর ও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে। পথের একধারে খাড়া পাহাড় বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, অন্যধারে তেমনি খাড়া খাদ কোন অতলে নামিয়া গিয়াছে। মধ্যে সঙ্কীর্ণ ঢালু পথ দেয়ালের গায়ে কার্ণিশের মত যেন কোনো-ক্রমে নিজেকে পাহাড়ের অঙ্গে জুড়িয়া রাখিয়াছে। পথ কোথাও সিধা নয়, কেবলি ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, কোথাও সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইতেছে। চারিদিকে দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী দুইজনে চলিতে লাগিলেন।

পাহাড়ের গা কোথাও বনজঙ্গলে ঢাকা, কোথাও বা কর্কশ উলঙ্গ। পথের যে-ধারটায় পাহাড়, সেই ধারে স্থানে স্থানে পাথর ফাটিয়া জল বাহির হইতেছে। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জল—রাস্তার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া নীচের খাদে ঝরিয়া পড়িতেছে। কোথাও বন্য ফলের গাছ সারা অঙ্গে রাঙা রাঙা ফল লইয়া পথের উপর প্রায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ঘোড়ার রেকাবে উঁচু হইয়া দাঁড়াইলে হাত বাড়াইয়া ফল পাড়া যায়। একবার ঊর্দ্ধে গাছপালার মধ্যে একটা ময়ূরের গায়ে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া ঝকমক করিয়া উঠিল। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সচকিত হইয়া ময়ূরটা ঘাড় বাঁকাইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল, তারপর সজোরে দুইবার কেকাধ্বনি করিয়া দ্রুতপদে পাহাড়ের ফাঁকে গিয়া লুকাইল। তাহার উচ্চ কেকারবের প্রতিধ্বনি পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া বারবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

আর একবার একটা মোড় ফিরিতেই ভীষণ গম্‌গম্ শব্দে চমকিত হইয়া গৌরীশঙ্কর দেখিল, দূরে পাহাড়ের একটা রন্ধ্র বহিয়া প্রকাণ্ড একটা ঝর্ণা নির্ঝরশিখরে চারিদিক বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া গভীর খাদে গিয়া পড়িতেছে। অস্তমান সূর্য্যকিরণে সেটাকে সোনালি জরি-মোড়া অপ্সরীর দোদুল্য-মান বেণীর মত দেখাইতেছে।

মাথার টুপীটা খুলিয়া ফেলিয়া উৎফুল্লনেত্রে ঝর্ণা দেখিতে দেখিতে গৌরী বলিল—'সর্দ্দার, তোমাদের রাজ্য রাজা হবার মত দেশ বটে। কুমারসম্ভব পড়েছ ?—

ভাগীরথী নির্ঝর শীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত দেবদারুঃ
ভদ্বায়রন্বিষ্ট মৃগৈঃ কিরাতৈ
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডি বর্হঃ।

গদ্যপ্রকৃতি ধনঞ্জয় বলিলেন—'টুপীটা একেবারে খুলে ফেল্‌লেন যে! শেষে তীরে এসে তরী ডোবাবেন? টুপী পরুন।'

গৌরী সহাস্যে বলিল—'তা না হয় পরছি। কিন্তু লোক কৈ? এতটা রাস্তা এলুম কোথাও একটা জনমানব নেই। একটু জোরে ঘোড়া চালালে হয় না?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'না, ট্রেণের যাত্রীরা সব এগিয়ে আছে, তারা এগিয়েই থাক। অন্ধকার হোক—তখন জোরে চালালেই হবে।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'আগাগোড়াই কি চড়াই উঠ্‌তে হবে? তোমাদের রাজ্যটা কি পাহাড়ের টঙের ওপর?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'না, আরো মাইল সাত আট উঠ্‌তে হবে। 'শিরপৌচ' সরাইয়ের পর থেকে উৎরাই আরম্ভ। তবে যতটা উঠ্‌তে হবে ততটা নামতে হবে না। ঝিন্দ-ঝড়োয়ার গড়ন অনেকটা কানা-উঁচু কাঠের পরাতের মত। আমরা এখন বাইরে থেকে পিঁপ্‌ড়ের মত তার কানা বেয়ে উঠ্‌ছি, 'শিরপেচ' সরাই পার হয়ে আবার কানা বেয়ে নেমে তবে ঝিন্দের সরোজমিনে গিয়ে পৌছুতে হবে।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, ও ঝর্ণাটার নাম কি? এত্তবড় ঝর্ণা আমি আর কোথাও দেখিনি।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ওটা সামান্য পাহাড়ে ঝর্ণা নয়, আমাদের দেশের যে প্রধান নদী, সেই কিস্তা এইখানে ঝর্ণা হয়ে রাজ্য থেকে ঝরে পড়েছে। কিস্তার উৎপত্তি রাজ্যের অন্য প্রান্তে, সেখান থেকে বেরিয়ে রাজ্যের বুক চিরে এসে এইখানে চঞ্চলা অপ্সরীর মত সে পাহাড়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'বাহবা সর্দ্দার, তোমার প্রাণেও পদ্য এসে পড়েছে দেখছি। তবে আর ভাবনা নেই। আচ্ছা, ঝিন্দ্‌ সী লেভ্‌ল থেকে কত উঁচু বলতে পারো?'

'চার হাজার ফুটের কিছু কম, তবে চারিধারের পাহাড়-গুলো আরো উঁচু। ঐ দেখুন না।'—ধনঞ্জয়ের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া গৌরী দেখিল, আরো কিছুদূর উপর হইতে পাইনের গাছ আরম্ভ হইয়াছে। সরু লম্বা গাছগুলি যেন সারবন্দী হইয়া একটা অদৃশ্য রেখার উর্দ্ধে জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমে সূর্য্য বাঁ-দিকের অল্প নিম্নভূমির পরপারে অস্ত যাইবার উপক্রম করিল। খাদের অন্ধকারের ভিতর হইতে শৃগালের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। উপরে তখনো দিন রহিয়াছে কিন্তু নিম্নের উপত্যকায় নামিয়াছে। দুজনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন।

সহসা সম্মুখে দ্রুত অশ্বক্ষুর ধ্বনি হইল। ধনঞ্জয় চকিত হইয়া ঘোড়ার উপর সোজা হইয়া বসিলেন, গৌরী টুপীটা তাড়াতাড়ি চোখের উপর টানিয়া দিল। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ আগে রাস্তার একটা মোড় ছিল, দেখিলে মনে হয় যেন পথ ঐ পর্য্যন্ত গিয়া হঠাৎ অতল স্পর্শে খাদের সম্মুখে থামিয়া গিয়াছে। ক্ষুর ধ্বনি শ্রুত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঁকের মুখ তীরবেগে ঘুরিয়া একজন অশ্বারোহী দেখা দিল। সূর্য্য তখনো অস্ত যায় নাই, তাহার শেষ রশ্মি সওয়ারের উপর পড়িল। কুচকুচে কালো ঘোড়া—মুখ ও লাগাম ফেণায় শাদা হইয়া গিয়াছে—আর তাহার পিঠে ঝুঁকিয়া বসিয়া আরোহী নির্দ্দয়ভাবে তাহার উপর কশা চালাইতেছে।

ধনঞ্জয়ের দাঁতের ভিতর হইতে চাপা আওয়াজ বাহির হইল, 'ময়ূরবাহন! কি আপদ! পথ ছেড়ে দিন, পথ ছেড়ে দিন, বেরিয়ে যাক।' বলিয়া বাঁ-হাতে নিজের মুখের উপর রুমাল চাপিয়া ধরিলেন।

রাস্তা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে কালো ঘোড়ার সওয়ার প্রচণ্ডবেগে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। বোধ করি আর এক মুহূর্ত্তে সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া যাইত কিন্তু হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পথের ধারে দুইটি অশ্বারোহীর উপর পড়িতেই সে দুহাতে রাশ টানিয়া ধরিল—ঘোড়াটা সম্মুখের দুই পা তুলিয়া সম্পূর্ণ একটা পাক খাইয়া এই দুর্ব্বার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরবাহনের উচ্চ কণ্ঠের হাস্যধ্বনি পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলিল। হাসি থামিলে সে বলিল—'আরে কে ও? সর্দ্দার ধনঞ্জয় নাকি? 'বনে বনে ঢুঁড়ি এ

ধুযা কঁহা গয়ি'—তোমার বিরহে আমরা সবাই ভয়ঙ্কর হেদিয়ে উঠেছিলাম যে সর্দ্দার! এতদিন ছিলে কোথায়?'

'সে খবরে তোমার দরকার নেই'—বলিয়া ধনঞ্জয় চলিবার উপক্রম করিলেন; কিন্তু তাঁহার ঘোড়া পা বাড়াইবার পূর্ব্বেই ময়ূরবাহনের ঘোড়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

'বলি চল্‌লে যে! একটু দাঁড়াও না ছাই। সফর থেকে আসছ, দুটো কথাও কি বন্ধুলোকের সঙ্গে কইতে নেই।—সঙ্গে ওটি কে?' ময়ূরবাহন কথা কহিতেছিল বটে কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গৌরীশঙ্করের উপর নিবদ্ধ ছিল—'কৌতূহল ভীষণ বেড়ে যাচ্চে। আপাদমস্তক ঢাকা ছদ্মবেশী মানুষটি কে? কোন্ জাতীয়? বলি স্ত্রীজাতীয় নয়ত?—অ্যাঁ সর্দ্দার! বৃদ্ধ বয়সে তোমার এ কি রোগ? হায় হায়! অসৎ সঙ্গে পড়ে মানুষের কি সর্ব্বনাশই হয়। শঙ্করসিং শেষে তোমার চরিত্রেও ঘুণ ধরিয়ে দিলে!' বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িল।

'পথ ছাড়ো।' বলিয়া ধনঞ্জয় অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ময়ূরবাহন নড়িল না, রক্তের মত রাঙা দুই ঠোঁটের ভিতর হইতে দাঁত বাহির করিয়া বলিল—তা কি হয় সর্দ্দার! তুমি একটা আদমের কালের বুড়ো, এই ছুকরিকে নিয়ে পালাবে—আর আমি জোয়ান মর্দ্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখব? এ হতেই পারে না—বিলকুল নামঞ্জুর!'

'পথ ছাড়বে না?'

'ছাড়বো বই কি, কিন্তু তার আগে তোমার পিয়ারীকে একবার দর্শন—' বলিয়া গৌরীর দিকে অগ্রসর হইল।

'ব্যস্! খবরদার!' ময়ূরবাহন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ধনঞ্জয়ের হাতে একটা ভীষণ দর্শন কালো রিভল্‌বার নিশ্চলভাবে তাহার বুকের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে।

ময়ূরবাহন দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহার মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'খামোশ্। আজ জিতে গেলে সর্দ্দার। তোমার পিয়ারী নাজ্‌নির চাঁদমুখ দেখবার বড়ই আগ্রহ হয়েছিল—তা থাক, আর এক সময় হবে।—ভাল কথা, তোমার শঙ্করসিং ভাল আছে ত? অভিষেক ঠিক সময়ে হচ্চে ত? এবার কিন্তু অভিষেক পিছিয়ে গেলে আমরা সবাই ভারি দুঃখিত হব তা বলে দিচ্ছি। খুব সাবধানে তাকে আটকে রেখো—আবার না পালায়। আচ্ছা, এক কাজ করলে ত পারো। শঙ্করসিং যখন পরের এঁটো খেতে এত ভালবাসে তখন কতকগুলি বিয়াহি আওরাৎ ধরে এনে তার মহালে পুরে রেখে দাও না! তাহলে শঙ্করসিং আর কোথাও যাবে না।—আর ভেবে দেখ, রাজা হলেই ত আবার ঝড়োয়ার কুণ্ডারীকে বিয়ে করতে হবে; সে সোঁদা ফুল শঙ্করসিংএর ভাল লাগবে না, তার চেয়ে—'

ধনঞ্জয়ের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—'চোপরাও অসভ্য কুত্তা! ফের যদি ও নাম মুখে এনেছিস, গুলি করে তোর খুলি উড়িয়ে দেব।'

'ফুঃ!'—তাচ্ছিল্যভরে ময়ূরবাহন ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া লইল, তারপর ঘাড় বাঁকাইয়া ধনঞ্জয়ের দিকে 'বেনিয়া বান্দার বাচ্চা!' এই কথাগুলো নিক্ষেপ করিয়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া বৈশাখী ঘূর্ণীর মত নিম্নাভিমুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো ঘোড়ার সওয়ার মিলাইয়া গেলে ধনঞ্জয় রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিলেন। বিকৃত-কণ্ঠে কহিলেন—'বেয়াদব শয়তান!'

গৌরী টুপী খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'লোকটা কে সর্দ্দার?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'উদিত সিংএর ইয়ার, আর তার শনি। উদিতের চেয়েও বদমায়েস যদি কেউ থাকে ত ঐ ময়ূরবাহন।'

গৌরী বলিল—'কিন্তু যাই বল, চেহারাখানা সত্যিই ময়ূরবাহনের মতন। কি নাক কি মুখ কি চোখ! আর অদ্ভুত ঘোড়সওয়ার।

ধনঞ্জয় কতকটা নিজমনেই বলিলেন—'ইচ্ছে হয়েছিল শেষ করে দিই। কেন যে দিলাম না তাও জানি না। যাক্, আর দেরী করে কাজ নেই—রাত্রি হয়ে গেছে। এখনো প্রায় অর্দ্ধেক পথ বাকি। দুপুর রাত্রির মধ্যে সিংগড়ে পৌঁছুনো চাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'ঝড়োয়ার কুমারীর সঙ্গে বিয়ের কথা কি বলছিল?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ঝড়োয়ায় উপস্থিত রাজা নেই—

মৃত রাজার একমাত্র মেয়েই রাজ্যের অধিকারিণী। মহারাজ ভাস্কর সিং মৃত্যুর আগে কুমার শঙ্করের সঙ্গে কস্তুরীবাঈয়ের বিবাহ স্থির করে গিয়েছিলেন। কথা আছে যে অভিষেকের দিন কস্তুরীবাঈএর সঙ্গে শঙ্কর সিংএর তিলক হবে।'

গৌরী বিস্মিত হইয়া বলিল—'নাবালক রাণী—ঝড়োয়ার রাজ্য চলছে কি করে?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'মন্ত্রী আছে, দেওয়ান আছে, আইন আছে—রাজার অভাবে কি রাজ্যের কাজ আটকায়?'

'তা বটে! আচ্ছা, এই কস্তুরীবাঈয়ের বয়স কত হবে?'

'রাণীর বয়স? বছর উনিশ-কুড়ি হবে।' বলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ধনঞ্জয় ঘোড়া চালাইলেন।

আরো দু'একটা প্রশ্ন মনে উদিত হইলেও গৌরী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

ফটকের ঘড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা পড়িতেছে এমন সময় দুজন ক্লান্ত অশ্বারোহী রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

প্রহরী কর্কশ কণ্ঠে হাঁকিল—'হু কম্ দার?'

ধনঞ্জয় মৃদুস্বরে কহিলেন—'আমি, সর্দার ধনঞ্জয়। রুদ্ররূপকে খবর দাও। জল্‌দি।'

অল্পক্ষণ পরেই রুদ্ররূপ আসিয়া ফৌজী সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। ধনঞ্জয় ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোনো গোলমাল হয়নি।'

'না। উদিত রোজ একবার করে মহালে ঢোকবার চেষ্টা করেছে আমি ঢুকতে দিইনি।'

'বেশ। কুমারের কোনো খবর নেই?'

'কিছু না।'

'অভিষেকের আয়োজন সব ঠিক?'

'সমস্ত। ভার্গবজি আপনার জন্য বড় ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন।'

'আচ্ছা, আর ভাবনার কোনো কারণ নেই। এখন আমাদের ভিতরে নিয়ে চল। আর পাহারা সরিয়ে নাও—কাল থেকে পাহারার দরকার নেই। শুধু তুমি তায়নাৎ থাকো।'

'যো হুকুম' বলিয়া রুদ্ররূপ আলো আনিবার আদেশ দিতেছিল, ধনঞ্জয় মানা করিলেন—'আলোর দরকার নেই—অন্ধকারেই নিয়ে চল।'

তখন রুদ্ররূপের অনুগামী হইয়া দুজনে অন্ধকারে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। (ক্রমশঃ)

আদিম ধর্ম্ম

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রবন্ধ

"Are there, or have there been, tribes of men so low in culture as to have no religious conceptions whatever? This is practically the question of the Universality of religion, which for so many centuries has been affirmed and denied, with a confidence in striking contrast to the imperfect evidence on which both affirmation and denial have been based."

Edward Burneth Tylor, 1871.

স্যর এড্‌ওয়ার্ড টাইলরকৃত 'প্রিমিটিভ্ কালচার' নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে উপরি উদ্ধৃত অংশের উল্লেখ আছে; কিন্তু তিনিই আবার নানা আলোচনা প্রসঙ্গে শেষে এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি হারাইয়া নিজের ভিত্তিহীন ধারণাকেই শ্রেষ্ঠস্থান দান করিয়াছেন। এতদ্‌সম্পর্কে তাঁহার উক্তিরই পুনরুল্লেখ করা সমীচীন হইবে এবং তাহা হইলে পাঠকগণও সমালোচনার অন্ধ-ধারণা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে

"অসম্পূর্ণ নির্দ্দেশ প্রমাণের বিস্ময়কর বৈষম্যের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াই" (১) তিনি নিজ উক্তি সত্ত্বেও নিজের নিরপেক্ষ বিচারশক্তিকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আদিম-ধর্ম্ম ও মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আরও যাহা বিবৃত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম পাঠকদের জ্ঞাতার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"কৃষ্টির নিম্নতম স্তরে—যাহার সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ অবগত আছি তাহাতে—মানুষের দেহে থাকিয়া প্রেতাত্মা মানুষকে সজীব করিয়া রাখে—এই বিশ্বাস অস্থি-মজ্জাগত হইয়া আছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া বর্ব্বর অসভ্য জাতীয়গণ এই প্রকার বিশ্বাস-ধারণায় শিক্ষা লাভ করিয়াছে, অথবা শ্রেষ্ঠতর কৃষ্টি হইতে অধঃপতিত বর্ব্বর জাতির শিক্ষা-দীক্ষার ইহা ধ্বংসাবশেষ মাত্র—এমন ভাবিয়া লওয়ার কোন হেতু নাই। কারণ এস্থলে যাহা আদিম প্রেতবাদ বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে তাহা অসভ্যগণের মধ্যে সুপরিজ্ঞাত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানতঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতির অস্তিত্ব হইতে তাহারা ইহা মানিয়া চলে বলিয়া মনে হয় এবং তাহাদের চিন্তাধারা অনুসারে যুক্তিসঙ্গত প্রাণীতত্ত্বের সাহায্যে ইহার ব্যাখ্যাও উপস্থাপিত করা হইয়াছে।...

"বর্ব্বরগণের এই প্রাণীতান্ত্রিকতা নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার উৎপত্তির সন্ধানও ইহা হইতেই পাওয়া যাও।"

ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা সম্বন্ধে স্যর এড্‌ওয়ার্ড টাইলর যখন তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাসকে সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে গত ষাট বৎসরে জ্ঞানের পরিধি যতখানি বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাতে এই উক্তির যথার্থ কোন তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই আধুনিক নৃজাতি-বিজ্ঞানবিদ্‌গণের (২) প্রায় কেহই প্রেত-তান্ত্রিকতা সম্বন্ধে টাইলরের মতবাদকে গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু এখন যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা হইতে আদিম মানবের যথার্থই 'মানুষকে উজ্জীবিতকারী' প্রেতাত্মায় বিশ্বাস ছিল কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। অপ্রত্যাদিষ্ট মানবের আদৌ কোন ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল অথবা আদিম ধর্ম্ম যখন প্রবর্ত্তিত হয় তখন তাহাতে প্রেতাত্মা-বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল এমন ধারণা পোষণ করিবার যথার্থপক্ষে কোনই হেতু নাই। বস্তুতঃ ধর্ম্ম সভ্য মানবেরই আবিষ্কার এবং খুব সম্ভব ছয় হাজার বৎসরেরও ন্যূনকাল পূর্ব্বে রাজত্ব-ধারণার প্রতিষ্ঠাপন কালেই এতদ্বিষয়ে পরিকল্পনা হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরীয় লিপি হইতে ধর্ম্মমতের অস্তিত্ব-প্রমাণোপযোগী প্রাচীনতম নিদর্শন সংগৃহীত হইতে পারে; তাহাতে সর্ব্বপ্রথম যে দেবতার উল্লেখ আছে ডাঃ আলন গার্ডিনারের (Dr. Alan Gardiner) মতানুসারে সেই দেবতা মৃত রাজা ভিন্ন আর কেহ নহে। পটী জড়ান দণ্ডের চিত্রদ্বারা দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের যে ধারণা ছিল তাহাই প্রতিবিম্বিত করা হইত; ইহা হইতে নিঃসন্দেহে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তাহাদের প্রথমতম দেবতা হইল রাজার মমী। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—মৃত রাজার সংরক্ষিত দেহকে নানা উৎসব আয়োজন করিয়া পুনরুজ্জীবিত করা হইত—মুখাবরণ উন্মোচনান্তে গন্ধ-ধূপ জ্বালাইয়া, তর্পণোদক (৩) ঢালিয়া এবং নৃত্য, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত ও ক্রীড়াকৌতুকাদি নানা ক্রিয়াকাণ্ডের সহযোগে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। আইভর ব্রাউন (৪) (Mr. Ivor Brown) ও কুমারী ইভেলীন শার্প (৫) (Miss Evelyn Sharp) যথাক্রমে প্রাচীনতম নাট্যকলা ও নৃত্যশিল্পের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাকল্পে তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থদ্বয়ে অতি মুখর আলোচনা করিয়াছেন।

মমীকৃত রাজা অসিরিসকে প্রথম দেবতা বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহার সহিত ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার কোনরকম সাদৃশ্য বা তুল্যার্থ কল্পনা করা সমীচীন নহে। ইহাকে মানুষের প্রয়োজনে তৎকালীন যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞানের প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। রাজা প্রথম চাষ-আবাদ ও জল নিষেচন প্রভৃতির সহিত সকলকে পরিচিত করেন এবং তদ্রূপে অতি আশ্চর্য্যভাবে খাদ্যের

(১) পূর্ব্বে উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য।

(২) যাঁহারা বিভিন্ন মানব পরিবারের ভাষা, ধর্ম্ম, রীতি-নীতি ও শরীর-গঠনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

(৩) দেবোদ্দেশে তর্পণ দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত পানীয় (প্রধানতঃ সুরাসার)।

(৪) *First Player.*

(৫) *Here We Go Round.*

প্রাচুর্য্য সাধন করিতে সমর্থ হন। ইহাতে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং রাজাকে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করে। তখন রাজা কেবল প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের মালিক বলিয়াই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না, নিষেচন-জলের জীবনোৎপাদিকা শক্তি রাজাই দান করিতেন এবং মৃত বা শুষ্ক বীজের সঞ্জীবন ক্ষমতাও তাঁহারই প্রদত্ত বলিয়া তখনকার বিশ্বাস ছিল। রাজা প্রাণদাতা। মৃত্যু হইলে তদীয় দেহ গন্ধ-দ্রব্য প্রলিপ্ত করিলে তাঁহার স্থিতিকাল দীর্ঘ করা যায়—ইহাই ছিল তখনকার ধারণা; কাজেই তাঁহাকে দেবত্বারোপ করা হইত, রাজা তাই হইতেন তখন দেবতা। তাঁহার সেই



মিশরের অন্যতম আদিমতম রাজা—জল সেচনের নিমিত্ত খাল কাটিতে ব্যাপৃত। সির্কা ৩৪০০ খ্রীঃ পূঃ
[জে, ই, কুইবেল অনুসারে]

সৃষ্টিকরণ ও জীবন দান ক্ষমতা জীবিতকালে যতটুকু ছিল তাহা দেবতারূপে আরও উৎকৃষ্টতর ও শ্রেষ্ঠতর হইয়া প্রতিভাত হইত। অঙ্কুরোদ্গম ও প্রজননক্রিয়ার এবং বিশেষ করিয়া নানা প্রয়োজনে জলের আবশ্যকতার ব্যাখ্যাকল্পে প্রথম যে চেষ্টা চলিতেছিল পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বৈব সে প্রচেষ্টার ফল। ইহা ধর্ম্ম নহে, বরং ইহাকে আদিম প্রাণীতত্ত্বের মতবাদ বলা যাইতে পারে; সেই মতবাদকে যাহারা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিয়াছিল তাহারা সুযুক্তিসম্পন্ন বলিয়াই বিশ্বাস করিত। তা'রপর জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভ্রান্তি প্রণিহিত হইলে পরেও যাহারা আত্ম-রক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা যখন এমন সুখ সম্ভোগের আশা ত্যাগ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া এই বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া রহিল তখন হইতেই পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধারণা সকল বিশ্বাস ধর্ম্মাকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায়।

নদী ও প্লাবন সম্পর্কিত ঘটনাবলী, নদীর গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণে অলক্ষ্য দিব্য শক্তির প্রভাব (যেমন নারী দেহে জীবনদান ক্ষমতা চন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া বিশ্বাস ছিল) —এই সমস্ত একত্রিত করিয়া প্রাণীতত্ত্বের বিভিন্ন ঘটনাবলীর যথাযথ ব্যাখ্যা উপস্থাপনকল্পে সেই প্রাচীনতম কল্পনাসূত্র গঠিত হইয়া উঠে। যতদিন না জাগতিক ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রণ-শক্তি চন্দ্রের পরিবর্ত্তে সূর্য্যের উপর আরোপিত হইয়াছিল ততকাল পর্য্যন্ত নভোজগতের কোন প্রকার ধারণাই মানুষের মনে উদিত হয় নাই। তখন যদিও নারীর জীবন-দান কার্য্যের নিয়ন্ত্রণ শক্তি চন্দ্রের উপরে আরোপিত ছিল, তথাপি রাজাই সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইতেন; রাজাই ছিলেন সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই প্রজাগণের প্রাণদাতা ছিলেন এবং যে শস্যাদির উপরে লোকের অস্তিত্ব বা জীবিকা নির্ভর করিত তাহার সেই জীবনীশক্তিও দান করিতেন রাজা। তা'রপর চন্দ্রের অপেক্ষা সূর্য্যের গতিবিধির সাহায্যে অধিকতর নির্ভুলরূপে বর্ষ গণনা করা যাইতে পারে বলিয়া যখন উপলব্ধি করিতে পারিল (হিলিওপলিসের যাজকগণ) তখনই মাত্র বিশ্বের নিয়ামক শক্তির আকর স্বরূপে মৃত রাজাকে সূর্য্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রচার করা হয়। এইরূপে আকাশ-জগতের ধারণার উৎপত্তি হয়। রাজা মৃত্যুর পরে সেই নভোজগতে যাইয়া সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া ঐহিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন ভার গ্রহণ করেন।

মিশরীয় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে স্বর্গ-গমনের সমস্যার সম্মুখীন হইলেন যেন ইহা সম্পূর্ণ পার্থিব ব্যাপার। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন মর্ত্ত্যবাসী কিরূপে স্বর্গে যাইতে পারে; কোন্ প্রকারের যানবাহন স্বর্গরাজ্যে পৌঁছিবার পক্ষে উপযুক্ত? বিংশ শতাব্দীর খৃষ্টধর্ম্মী ইংরাজগণ সম্বন্ধে ডীন্

আয়েন্‌গে (Dean Inge) নাকি বলিয়াছেন যে, "স্বর্গের ভূসংস্থান বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও কল্পনার খোরাক হিসাবে ইহা অপরিবর্জ্জনীয়।" কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়গণের নিকট স্বর্গভূমির ধারণাই ছিল তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রধানতম সম্বল; তাহারা তাই স্বর্গের সেই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক বর্ণনা নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করিয়াছে এবং তথায় যাইবার পথও আধুনিক দিক্‌দর্শন পুস্তকানুরূপ নির্ভুলভাবে অতি সূক্ষ্ম বর্ণনা করিয়া মানচিত্রে অঙ্কিত করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে এই প্রকার একখানা মানচিত্র দিয়া দেওয়া হইত, যেন সে তাহা দেখিয়া দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া যাইয়া স্বর্গভূমে পৌছিতে পারে।

স্বর্গরাজ্যে পৌছিবার পথ যদিও বহু ছিল, যানবাহন বলিতে কিন্তু ছিল এক এবং অদ্বিতীয়; কেবলমাত্র সে-ই সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে মানুষকে স্বর্গভূমে পৌছাইয়া দিতে পারিত। মিশরীয় ইতিহাসের গোড়া হইতে একমাত্র এই বাহনই মৃতদেহ রক্ষাকরতঃ স্বর্গে পৌছাইয়া দিয়া মৃতকে অবিনশ্বর করিতে পারে বলিয়া খ্যাতি রহিয়াছে। স্বর্গ গাভী মাতৃরূপা হাথর ছিল বাহন। হাথর কেবল জন্মের সহিত নশ্বর দেহে প্রাণ-সঞ্চালনই করিত না, নশ্বর মানব জীবিতকালব্যাপী তাহার অকৃপণ পয়োধারায় জীবন রক্ষা করিত; আবার মৃত্যুর পরেও হাথরই নিরাপদে শূন্য-রাজ্যে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে পারিত।

আদিম কাহিনীতে [রাজগণের স্মৃতিস্তম্ভসম্বলিত- থিবন উপত্যকার (Theban Valley) প্রথম সেটির (Seti I) সমাধি-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে খোদিত] বর্ণিত আছে যে সূর্য্যদেব 'রী' হইলেন পৃথিবীর রাজা; তিনি পুনঃসঞ্জীবিত হইলে যখন দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে সমাজের অবিশ্বাসী প্রজাগণের কারণে অত্যন্ত অবসাদ অনুভব করেন। রাজার বার্দ্ধক্য-জরার মধ্য দিয়া তাহাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা "মানবের পতন" প্রকাশ পাইত। রাজার বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে কোন প্রকার জনরব প্রচারিত হওয়া ছিল তাঁহার পক্ষে বিশেষ ক্ষতি- জনক; কারণ শাসকের শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস পাইলে তাঁহার প্রাণদণ্ড ছিল পুরাকালে মিশরের প্রথা।

'রি' শূন্য-জগতে প্রয়াণের নিমিত্ত গাভীকে বাহকরূপে ব্যবহার করিতেন। ইহা হইতে মনে হয় সূর্য্যের সহিত লীন হইয়া দেবতা 'রী'-রূপে পরিণত হইত বলিয়া যে ধারণার সূত্রপাত হয়, তাহার পূর্ব্বে চলিত বিশ্বাস ছিল কামধেনু



স্বর্গগাভী হাথর—পাখীর মত "আত্মা" সহ মৃতব্যক্তিকে স্বর্গ-জগতে বহন করিয়া নিতেছে

আকাশ ও চন্দ্রের সহিত অভিন্নদেহা এবং ইহা তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইতেছে।

মমীকরণ প্রথার সঙ্গে সঙ্গে মৃতের চিত্রাঙ্কিত প্রতিকৃতির প্রচলন আরম্ভ হয়। রাজার মমীর ন্যায় এই সকল জীবন- চিত্রও সঞ্জীবিত করা যায় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। বস্তুতঃ প্রাচীনতম যুগের মন্দিরগুলি ছিল স্মৃতি-সৌধেরই কাটামো। প্রতিকৃতির নিকট নানা ক্রিয়াকর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী করিয়াই এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের আয়োজন যে কোন প্রকার অর্চ্চনার উদ্দেশ্যে বা বরানুগ্রহ লাভের আশায় করা হইত তাহা নহে; উদ্দেশ্য হইল মৃত রাজাকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং তাঁহার আত্ম- রক্ষার্থ খাদ্য ও পানীয়ের ভেট দান করা।

মিশরীয় ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে মৃত রাজা অসিরিস বা তাঁহার অভিব্যক্তি 'রী'কে ঘিরিয়া; 'রী' আবার সৌর শক্তি-সামর্থ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

নিম্নে যে দুইটি উদ্ধৃতাংশের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল তাহা হইতেই অসিরিস্ সম্বন্ধে মিশরীয় ধারণার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে।(৬)

(৬) নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে যথাক্রমে উদ্ধৃতাংশের সারাংশ সংগৃহীত হইয়াছে :—

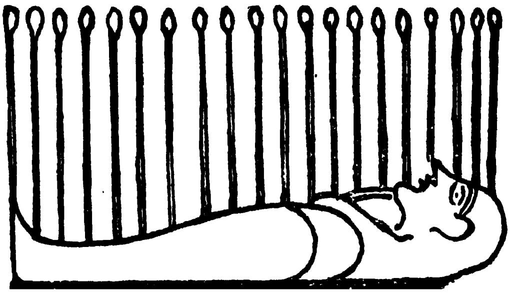
(ক) Papyrus of Ani, a recension of the Book of the Dead.

(খ) *Zeitschrift fur agnplische sprache.*

"...বৃক্ষাদি জন্মে বড় হয় তোমারই ইচ্ছায়। তুমিই প্রধান, তুমিই ভ্রাতৃগণের দলপতি, তুমি দেবগণের দলপতি, তুমি সর্ব্বত্র ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা কর।...তুমি মহা-পরাক্রমশালী, যাহারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদের তুমি বিপর্য্যস্ত কর, মহাশক্তিশালী বলিষ্ঠ হস্ত তোমার, তুমি তোমার শত্রুকে নিহত কর।...তুমি নিজের হাতে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছ; পৃথিবীর জল, বাতাস, গুল্ম, ওষধি এবং গো মহিষাদি সমস্ত চতুষ্পদ পশুই তোমার সৃজন।"(৭)

"পৃথিবী তোমারই বাহুর উপরে সংস্থিত, ইহার চতুঃসীমা তোমারই স্বেচ্ছাধীন হইয়া আছে। তুমি নড়িলে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠে...এবং (নাইল নদী) তোমারই ঘর্ম্মসিক্ত হস্ত হইতে উৎসারিত হইতেছে। তুমি তোমার কণ্ঠনালী হইতে মানবের নাসারন্ধ্রে প্রশ্বাস প্রবাহিত কর। বৃক্ষ এবং ওষধি, যব ও গম ইত্যাদি যাহা কিছুর উপরে লোকের জীবন নির্ভর করে তাহার সমস্তই অলৌকিক শক্তি উদ্ভূত এবং তোমারই নিকট হইতে আগত।...তুমি মানবজাতির পিতামাতা উভয়ই, তাহারা তোমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসে জীবন ধারণ করে, তোমারই দেহ-মাংস খায়।"(৮)

উল্লিখিত অংশের শেষ কথাটি (তাহারা তোমার দেহ-মাংস খায়) হইতে তখনকার মানুষকে নরমাংসভুক্ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই কথার অর্থ অন্যরূপও হইতে পারে—যব ও গম খাদ্যরূপে ব্যবহারের ইঙ্গিতই হয় উহাতে পরিস্ফুট। তৎকালীন বিশ্বাস ছিল যে যব আর গম অসিরিসের



"বুক অব দি ডেড" হইতে গৃহীত চিত্র—প্রজননে অঙ্কুরিত অসিরিস্‌কে দেখান হইয়াছে। [রোজেলিনি অনুসারে]

দেহজাত। অসিরিস্ "আমিই যব" বলিয়াছিলেন বলিয়া কথিতও আছে। স্পষ্টতঃ ইহা খৃষ্টধর্ম্মিগণের ইউকেরিস্ট্ (৯) (Eucharist) উৎসবেরই অনুরূপ।

স্যর ওয়ালিস্ বাজ্ (Sir Wallis Budge) আধুনিক মিশরীয়গণের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে একটি কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। (১০) সে আখ্যানভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"গমের উৎপত্তি সম্বন্ধে কপ্‌টগণের মধ্যে এক বিস্ময়কর কাহিনী চলিত আছে। তা'রপর প্রভু তাঁহার দেহের পবিত্র অংশ হইতে ছোট এক টুকরা মাংস-খণ্ড তুলিয়া লইয়া ঘসিয়া ঘসিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করিয়া ফেলেন; পরে নিয়া তাঁহার পিতাকে দেখান; দেখিয়া পিতা কহিলেন, 'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আমার দেহের খানিকটা মাংস দিতেছি, কিন্তু তাহা অদৃশ্য।' তাহার পরে ভগবান তাঁহার দেহ হইতে খানিকটা মাংস তুলিয়া লইয়া তাহা হইতে গমের একটি দানা প্রস্তুত করেন। দানাটি তৈরী হইলে আলো-বাতাস সহ তাহা মিল্ করিয়া প্রভুর হাতে দিয়া

(৭) "Thou makest plants to grow at thy desire... Thou art the chief and prince of thy brethern, thou art the prince of the company of the gods, thou establishest right and truth everywhere...Thou art exceedingly mighty, thou overthrowest those who oppose thee, thou art mighty of hand and thou slaughterest thine enemy...Thou hast made the earth by thine hand, and the waters thereof, and the winds thereof, and the herb thereof, all the cattle thereof, and all the four-footed beats thereof." (Ani lii).

(৮) "The earth lies upon thine arm, and its corners upon thee even unto the four pillars of heaven. Dost thou stir thyself, the earth trembles and (the Nile) comes forth from the sweat of thy hands. Thou providest the breath out of thy throat for the nostrils of mankind. Everything whereby man lives, trees and herbs, barley and wheat, is of divine origin and comes from thee...Thou art the father and mother of mankind, they live by thy breath, they eat the flesh of thy body." (Z, a, S, 38, 32)

(৯) যীশুখৃষ্ট মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে শিষ্যগণের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন; তৎস্মরণে খৃষ্টীয় সমাজে একটি ধর্ম্মক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাকে Eucharist বলে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রুটি ও সুরা যীশুখৃষ্টের মাংস ও রক্তস্বরূপ আহার করা হয়।

(The Modern Anglo-Bengali Dictionary, C. Guha.)

(১০) *The Book of the Cave of Treasures*. pp. 18 and 19.

প্রধান দেবদূত মাইকেলকে দিতে বলিলেন—মাইকেলকে ইহা নিয়া আবার আদমকে দিতে হইবে এবং আদমকে ইহা রোপণ করিবার প্রণালী যথাযথ শিখাইয়া দিতে হইবে এবং এতদুৎপন্ন শস্য কেমন করিয়া কাটিয়া ঘরে লইতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতে হইবে।"

অসিরিস্ কেবল জগত-স্রষ্টা এবং প্রাণীগণের জীবনদাতা-রূপেই শ্রদ্ধান্বিত হইতেন না; নাইল নদী, ভূমি ও যবের সহিত অসিরিস্ ছিলেন অভিন্ন দেহ।

পীরামিড্ যুগের গ্রন্থাদিই একমাত্র সুদূর অতীতের সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যই কেবল আমরা পাইতে পারি। ঐ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাই মৃত নৃপতি নাইল নদীর প্লাবন-কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মিশরের সেই আদি রাজাই নিশ্চিত এই শক্তির আধার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মিশরীয়গণের বিশ্বাস ছিল যবে প্রাণ-বস্তু দান করে জল। এই ধারণা হইতে তাহারা মীমাংসা করিয়া লয় (যাহা পরবর্ত্তী কালে গ্রীসান্তর্গত আওনীয়াবাসী দার্শনিকগণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন) যে সমস্ত প্রাণ-বস্তুই মূলীভূত সাগর হইতে লব্ধ; মূলীভূত সাগর বলিতে তাহারা নাইল নদীকেই বুঝাইত। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস টাহ (Ptah মেম্ফাইটবাসীর কল্পিত মমীকৃত অসিরিসের প্রতিনিধি) জলরাশির তলদেশ হইতে প্রথম স্থলভূমি উত্তোলিত করেন, এই কথাই আদিম যুগে অন্য-ভাবে বলা হইত—তখন বলিত ভগবান প্লাবনের জলরাশি প্রশমিত করিয়া তবে শুষ্ক স্থলভূমির সৃষ্টি করেন। এই বিবরণ নিশ্চিত দিগ্‌দিগন্তরে প্রচারিত হইয়া জাপান, ওশেনীয়া ও আমেরিকাতে যাইয়া এক অপরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। ডাঃ ডব্লিউ, জে, পেরী তাঁহার 'গড্‌স্ এণ্ড্ মেন' গ্রন্থে এই জল-নিম্ন হইতে স্থল-ভূমির উত্তোলন সম্পর্কে চমকপ্রদ তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। মিশরীয়গণ এই সৃষ্টিতত্ত্বের অভিব্যক্তিস্বরূপ হিলিওপলিস্, মেম্ফিস্ ও থেব্‌স্ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরের ন্যায় সমাধি মন্দিরের মধ্যে সেই মূলীভূত সাগরের পরিবর্ত্তে ছোট ছোট ডোবা কাটিয়া লইত। ডোবাগুলি ছিল নানা ক্রিয়াকাণ্ডের অন্যতম আবশ্যকীয় অঙ্গ। সৃষ্টিধারার এই প্রকার কৃত্রিম অনুকরণ-আড়ম্বরের অনুষ্ঠান করিয়া যাজকগণ মনে করিত তাহারা রাজার প্রজাগণকে নূতন প্রাণ নব উদ্দীপনা দান করিয়া তাহাদের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছে। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের দিনে—যে দিন নাইল নদীতে প্লাবনের বাণ ডাকিত—সেই দিন সূর্য্যদেব গভীর জলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া আসেন। মিশরীয় বেদী ও জলাশয়গুলির ভারতীয় মন্দিরের বিশেষত্বের সহিত হুবহু মিল ছিল; কিন্তু এই বিশেষত্বের প্রকৃত ব্যাখ্যা কেবল মিশরেই পাওয়া যায়। মূলীভূত সাগর হইল নাইল নদীর প্লাবন, জীবনের মূলাধার। বেদী বা টিপিটি হইল প্লাবন প্রশমিত হইতে থাকিলে যে স্থলভূমি আবির্ভূত হয় সেই মূল ভূমিরই ক্ষুদ্রানুকৃতি।

ভগবানের কল্পনা স্পষ্টতঃ মিশরেই ভিত্তি লাভ করিয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বংশের রাজত্বকালের পীরামিড্ যুগের গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে ভগবান যে মৃত ও মমীকৃত রাজা ছাড়া আর কেহ নহেন তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে হয়। এই আবিষ্কার হইয়াছিল সেই সময়ে—যে সময়ে পৃথিবী তখনও আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই অর্থাৎ নভোজগত আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে।

ডাঃ ডব্লিউ, জে, পেরী তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (১১) প্রাচীন ভারতীয় লিপি-বিবরণ (ব্রাহ্মণ) ও উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতির মধ্যে প্রচলিত উপাখ্যানাবলীর (পনী) পরস্পরকে বিশ্লেষণকরতঃ তুলনা করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন যে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস আদি মিশরীয় কল্পনারাশিকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

উক্ত গ্রন্থে তিনি আরও প্রমাণিত করিয়াছেন যে, সভ্যতার জন্মভূমি হইতে বহু দূরে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্থান-সমূহের বহু স্থলে মিশরীয় ধারণার বিশেষত্বগুলি এমনভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে সেই সকল স্থানের নিজস্ব বা স্বতন্ত্র বলিবার স্পষ্টতঃ কোনই কারণ নাই। এই সকল স্থানের অনেক স্থলেই কিংবদন্তি আছে যে অতি পূর্ব্বে সৃষ্টির অনুকরণে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে মানুষ স্বর্গবাসিগণের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিত। প্রাচীন ভারতে রাজার অভিষেক উৎসব মিশরে উদ্ভাবিত কল্পনানুসারে পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির অনুকরণে সম্পাদিত হইত; এইরূপ উৎসবা-নুষ্ঠান ভারতের পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন স্থানে আজিও প্রচলিত রহিয়া গিয়াছে। রাজা তখন ছিলেন তাঁহার

(১১) *Gods and Men.*

দেশের অবতার। তিনি আর রাষ্ট্র ছিল অভিন্ন। ফরাসী দেশে লুই দি ফোর্টিন্থ্ (Louis XIV) দম্ভভরে ঘোষণা করিয়াছিলেন রাষ্ট্র বলিতে তিনি স্বয়ং। কিন্তু ইহাদের সেই রাষ্ট্র-রাজার অভিন্নত্ব ধারণা লুইর চাইতে আরও সম্পূর্ণ আরও কঠোর, অবিচ্ছেদ্য। রাজবংশে জন্ম বলিয়া, একমাত্র রাজ্যশাসনাধিকারদাত্রী রাণীর পাণিগ্রহণের দাবীতেই রাজা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হইতে পারিতেন না, যদি সৃষ্টির গৃহীত তত্ত্বানুরূপ উৎসবাদির অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে যথারীতি অভিষিক্ত করা না হইত। এই অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিয়া সৃষ্টির অর্থাৎ প্রাণদানের ক্ষমতা রাজার উপর আরোপিত করা যায় বলিয়া অনুমিত হইত। অতএব এ অনুষ্ঠান অপরিবর্জ্জনীয়, কেন না সৃষ্টি করা হইল রাজার প্রধানতম কর্ত্তব্য।

অভিষেক উৎসবে রাজা স্রষ্টার কার্য্য করেন। এই ক্রিয়ানুষ্ঠানে আরও কয়েকটি ছোট-খাট বিধি প্রতিপালন করিতে হয়; সেই সমুদায়ের উদ্দেশ্য হইল বৃক্ষ ও পশু আকারে তাঁহার প্রজাগণের প্রয়োজনীয় খাদ্য সৃষ্টি করা। অভিষেককালে শস্য ও গৃহপালিত পশুর উৎকর্ষ ও স্বাস্থ্য রক্ষাকরণোপযোগী যাদুবলও রাজার উপর সংস্থাপিত হইত। অপর কথায় বলিতে গেলে তিনি যাদুকর ও প্রাণদাতা ছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন রাষ্ট্রের শুভসাধনের প্রতীক।

মূল সৃষ্টির অনুকরণে রাজা তাঁহার প্রজাগণকে গড়িয়া তোলেন বলিয়া তাহারা মনে করিত। তাঁহার অভিষেক উৎসবের কালে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এবং যাহাতে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একতাবন্ধনে সকলে আবদ্ধ থাকিয়া সুচারুরূপে রাষ্ট্র সংগঠন হইতে পারে তজ্জন্য তিনি দেশের প্রধান প্রধান লোকের সহিত নিজে যাইয়া সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন।

পনীশ্রেণীর ন্যায় আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ানগণের মূল উৎসবাদির মধ্যেও অনুরূপ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল উৎসব-অনুষ্ঠানে জাতি বিভিন্ন দল-নেতার চতুষ্পার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, যেন নেতা তাহাদের স্বর্গের দেবতা। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতের প্রাচীন রাষ্ট্র-সংগঠনে এই প্রকারের বিধি বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়। রাজাকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রের যাহা কিছু এই বিধি-ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইতে হইত। রাজাকে বাদ দিলে রাষ্ট্রের বড় কিছুই থাকে না।

রাজাকে বিভিন্ন দেবতারূপে কল্পনা করা হইত। রাজত্বের বিভিন্ন রাজ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ হইল এই দেবতাগণ; অতএব স্বতঃসিদ্ধরূপে বলা যাইতে পারে দেবতারা রাজার স্ফুরিত শক্তির প্রকাশ মাত্র। রাজ-গুণের ধারা বিভিন্ন; সকল দিক দিয়াই রাজাকে পবিত্রদেহ অমর-লোকবাসী করিয়া তুলিবার চেষ্টা প্রতিভাত হয়। তাই রাজত্ব গ্রহণের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি সমস্তই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যরূপে গৃহীত হয়। সেই জন্যই ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অপরাপর দেবতাগণের অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই। ইঁহারা সকলেই সৌর দেবতা। সুতরাং রাজত্বের সহিত ইঁহাদের অপর আর এক রকমের যোগসূত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে, কারণ রাজত্বও সৌরগুণসম্পন্ন। রাজা নিজে সূর্য্যদেব, গোমাতা অদিতির পুত্ররূপে পরিচিত হন। মূলতঃ ইহা অদ্বৈতবাদসম্মত রাজত্ব; কিন্তু একের মধ্যে বহু পরিস্ফুট গুণের সমাবেশ কল্পিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতম ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মই বটে। একই ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণাবলীকে একাধিক দেবতার মধ্য দিয়া কল্পনা করা হইত। এই বহু রূপের কল্পনা হইতেই শেষে বহু-ঈশ্বরবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। মিশরে একই অসিরিস্ সৌরশক্তিরূপে হইলেন 'রী', সৃষ্টিকর্ত্তারূপে খ্নুম্ (khnum), লিপিকর (recorder) রূপে হইলেন থথ্ (thoth)—এমনি বিভিন্ন রূপের মধ্যে তাঁহাকে কল্পনা করা হয়। ভারতবর্ষে অভিষেকের সময় রাজা নিজে পবিত্র হইয়া দেবতারূপে পরিণত হইতেন এবং তৎসঙ্গে নিজেকে প্রজাপতির (১২) পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন (ভারতীয় অসিরিস্)। গ্রন্থান্তরে দেবতাগণও প্রজাপতির সন্তান বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং এই দিক দিয়া তাঁহারাও রাজার সহিত সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত।

আদি পুরুষ হইলেন প্রজাপতি, সৃষ্টির ঈশ্বর; অতএব রাজার পিতা বা জনক। রাজার পিতা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই তিনি দেবতাগণকে সৃজন করেন।

ভারতীয় ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থরাজিতে (১৩) উক্ত হইয়াছে—

(১২) বিধাতা, ব্রহ্মা; বিশ্বকর্ম্মা। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ—এই দশজন সৃষ্টিকর্ত্তা। (সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবল মিত্র)।

(১৩) বেদাংশ বিশেষ—ব্রহ্মন্ (বেদ)+ষ্ণ ইদমর্থে। (সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবল মিত্র)।

দেবতাগণ যতদিন না স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন ততদিন পর্য্যন্ত দেবত্ব গ্রহণ করিতেন না। রাজা দেহশুদ্ধি করিয়া স্বর্গগমনে সমর্থ। রাজা ও রাণী সপ্তদশপার্শ্ব-সম্বলিত স্তম্ভ অবলম্বনে স্বর্গারোহণ করেন। রাজা স্তম্ভের শীর্ষতম প্রান্তের ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলিত করিয়া ঘোষণা করেন যে তিনি আকাশের ঊর্দ্ধ জগতে প্রয়াণ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন; অনন্তর প্রচার করেন যে তিনি প্রজাপতির পুত্রত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছেন অর্থাৎ তিনি তখন দেবতা। স্বর্গভূমে পৌছিলে অমরত্ব লাভ হয়; তাই এইরূপে রাজা মৃত্যু-আশঙ্কা হইতে বিমুক্ত হইয়া দেবতা হইয়া থাকেন।

দীর্ঘায়ু লাভের আসক্তিতে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা চিন্তিত ব্যতিব্যস্ত। যাজকগণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবিনশ্বরত্ব লাভই চরম পরিণতি বলিয়া প্রচার করেন। যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্মাদি যাহা কিছু সমস্তই এই অবিনশ্বরত্ব লাভের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইত। অগ্নি-বেদীর মন্দিরের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল জীবদ্দশায় আকাশের ঊর্দ্ধদেশে পৌছিয়া রাজার দেহ যেন অজরামর হইয়া থাকে। অজরামরত্ব লাভের নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বিত হইত এখন তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ইষ্টকনির্ম্মিত বিশালকায় শ্যেন পক্ষীর সাহায্যে একটি স্বর্ণাবয়ব মানবমূর্ত্তি ও একখানা স্বর্ণ-থালা আকাশে সংস্থাপিত হইত, কারণ আকাশ হইল আত্মা ও অবিনশ্বরত্বের মূলাধার। ব্রাহ্মণগণ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতেন স্বর্ণ অক্ষয়; তাই রাজার অবিনশ্বরত্ব লাভ কামনায় স্বর্ণের ব্যবহার অপরিহার্য্য ছিল।

আদিম মানব কি ভাবে কি হইতে যে 'আত্মা' অমর এবং মৃত্যুর পরেও আত্মা সজ্ঞানে সচেতন থাকে বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে, তাহার ব্যাখ্যাকল্পে যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনা যুক্তি-তর্ক উপস্থাপিত হয় তন্মধ্যে স্যর এড্‌ওয়ার্ড টাইলর কৃত গ্রন্থে (যাহার উল্লেখ পূর্ব্বেও করা হইয়াছে) উল্লিখিত যুক্তির বেশ একটু বিশেষত্ব রহিয়াছে। অবিনশ্বরত্ব লাভের নিমিত্ত রাজাকে যথেষ্ট কালক্ষেপ এবং প্রভূত কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইত। এইটুকু হইতে এই ধরণের সুখসাধ্য যুক্তি উপস্থাপিত করা যে কতদূর অযুক্তি-সিদ্ধ ও অসংলগ্ন তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজা সম্পূর্ণ মৌলিকতাহীন অভ্যাসসিদ্ধ উপায়ে এই অবিনশ্বরত্ব লাভ করিতেন। বস্তুতঃ তিনি দেহকে অমর করিয়া লইতেন যেন মৃত্যুর পরেও সে দেহে বাস করিতে পারেন। দেহের এইরূপ স্থায়িত্ব রক্ষা না করিতে পারিলে অমরত্ব লাভেও সমর্থ হইতেন না। আদি-মানবেরা তাহাদের স্বকীয় চেষ্টায় অমর হইত, কেবল কল্পনার জাল বুনিয়া অমর হওয়ার সাধ তাহাদের ছিল না। পৃথিবীর যেখানকারই নিদর্শন পাওয়া যায় সর্ব্বত্র, আদি ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস মূলতঃ একই প্রকারের বলিয়া প্রতিভাত হয়। সম্পূর্ণ সহজকল্পিত ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া আত্মার অধিকার জ্ঞান বা ভবিষ্যৎ জীবনের উৎকর্ষ লাভের আকাঙ্খা গড়িয়া উঠে নাই; ইহা সম্পূর্ণ খেয়াল মত গঠিত রাজা সম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করিয়া। রাজা প্রাণ-দানের সমস্ত ধারাগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতেন এবং এতদ্‌বিষয়ে তিনিই ছিলেন একমাত্র অধিকারী।

কি প্রকারে এই মূল সূত্র হইতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় অত্যাবশ্যক সত্য—যাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কালে উৎসারিত হইয়া আসিয়াছে—সেইগুলি যাহাতে দৃষ্টি না এড়ায় তৎপ্রতি অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নভোজগতের ধারণা, সর্ব্বপ্রধান দেবতা, যাঁহাকে স্বর্গলোকের সূর্য্যদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইত, তৎপুত্র যিনি পৃথিবীর শাসনাধিকারী রাজা প্রভৃতির কল্পনা, অতিপ্রাকৃত গর্ভাধানের ফলে রাজার জন্ম, সৃষ্টি-কালের কল্পিত ঘটনানুকরণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম্ম দ্বারা রাজার দেহশুদ্ধি ও অভিষেক উৎসবের বিশিষ্ট আচরণসমূহ ইত্যাদি এবং জলপ্লাবনের কাহিনী, পৃথিবীর সৃষ্টি-কথা এবং সূর্য্যদেব-পুত্রের স্বর্গারোহণ-আখ্যান সমস্তই প্রত্যেক ধর্ম্মাচরণের অন্তর্গত প্রাণ-দান ক্রিয়া-কাণ্ডের সার মর্ম্ম এবং মিশরে উদ্ভূত। দক্ষিণ মিশরের বিশিষ্ট নৈসর্গিক ঘটনানিচয়ের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া হিলিওপলিসের যাজকগণ যে সকল বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা বা অনুধ্যান করিয়াছেন তাহারই ফলে এই সকলের উদ্ভব। (১৪)

(১৪) Prof. C. Elliot Smith প্রণীত "IN THE BEGINNING" অবলম্বনে লিখিত; চিত্রগুলিও উক্ত পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

দারিদ্র্যের ইতিহাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৪)

জমীদার কালীপদ গাঙ্গুলীর একমাত্র কন্যা সুনন্দা বালবিধবা। গাঙ্গুলী মহাশয় সুপাত্র পেয়ে দশ বৎসর বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না, সেইজন্যই ভেবেছিলেন সুনন্দার বিবাহ দিয়ে পুত্রের ক্ষোভ মিটাবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। তাই এক বৎসর না যেতে যেতে সুনন্দা বিধবা হয়েছে।

তার পরের বৎসর সুনন্দার মা মারা যান ; এই বিধবা বালিকা কন্যাকে উপলক্ষ করে পিতা জীবন্মৃত অবস্থায় তবুও সংসারে বাস করছিলেন।

সুনন্দা বিধবা হওয়ার পর পাঁচ ছয় বৎসর এঁরা গ্রামেই ছিলেন, তারপরে কাশী চলে যান। দীর্ঘ পনের ষোল বৎসর পরে পিতা ও কন্যা আবার দেশে ফিরেছেন।

কাশীতে বাস করলেও দেশের ছোট বড় সমস্ত খবরই সুনন্দা রাখতেন, তাঁর প্রদত্ত মাসোহারা প্রতিমাসে নিয়মিত-ভাবে কাশী হতে বাংলার এই ছোট পল্লীতে এসে পৌঁছাত। নিজে তিনি না এলেও তাঁরই ইচ্ছায় ও চেষ্টায় গ্রামে কতকগুলি টিউবওয়েল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; সরকারী ডাক্তার-খানা স্থাপিত হয়েছে, কয়েকটা পুষ্করিণী সংস্কার ও বন-জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে।

শুধু তাঁর নিজের গ্রামেই তিনি বিখ্যাত নন, বাংলার অনেক দুঃখী আতুর তাঁর দান পায়, কাশীর অনেকেই এই দয়াশীলা মহিলাকে চেনে। যে কোন দেশের প্লাবনে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে অযাচিতভাবে এই মহীয়সী মহিলার দান গিয়ে পৌঁছায়।

দিনরাত পূজার্চ্চনায় কেটে যায় ; সংসারের সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে থেকেও তিনি সংসারে পরম নির্লিপ্ত।

গ্রামে পৌঁছেই তিনি গ্রামের সকলের খোঁজ নিয়েছিলেন ; গরীব দুঃস্থদের দ্বারে দ্বারে তাঁর সাহায্য পৌঁচেছিল, সবাই মুক্তকণ্ঠে তাঁর জয়গান করেছিল—সবাই বলেছিল—এমন মেয়ে আর হবে না।

এই পরম করুণাময়ী মেয়েটীকে দেখার কামনা সকলের মত নিতাইয়ের মনেও জেগেছিল—একদিন সে দূর হতে সামান্য ক্ষণের জন্য ছায়ার মত তাঁকে দেখতেও পেয়েছিল।

সেদিন জমীদার বাড়ীতে বসেছে যাত্রার আসর।

ম্যানেজার অসিতকে ডাকিয়ে সুনন্দা চিকের আড়াল হতে বলে দিয়েছেন "আমি কিন্তু থিয়েটার বায়স্কোপ দেখা মোটেই পছন্দ করিনে। যাত্রা শুনতে ভালোবাসি বটে, তাও যদি তেমন যাত্রা হয়। শুনেছি আপনাদের দলের নিমাই-সন্ন্যাস খুব ভালো হয়—দেখবেন—যেন যা তা একটা কিছু করে বসবেন না।"

গ্রামের সমস্ত মেয়েপুরুষ সেদিন জমীদার বাড়ী যাত্রা শুনতে এসেছিল।

সাধারণ সব মেয়েদের মন্দিরের বারান্দায় জায়গা করে বসানো হয়েছে। সুনন্দা চিকের আড়ালে নিজের ঘরের বারান্দায় বসেছিলেন।

যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, সুনন্দা মুগ্ধ বিস্ময়ে যাত্রা শুনছিলেন।

কি চমৎকার নিমাই ছেলেটী, সে যেন সত্য সত্যই নিমাই—শচীমায়ের অঞ্চলের নিধি ?

এতটুকু ছেলে এমনভাবে অভিনয় করতে পারে ? তার চলা, তার কথা, তার হাসি, সবই স্বপ্নময়।

সুনন্দার চোখে পলক পড়ছিল না ; পার্শ্বোপবিষ্টা দাসীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "যে ছেলেটী নিমাই সেজেছে ওকে চিনিস মতি—কার ছেলে—কোথায় বাড়ী বল তো ?"

মতি ঘুমের চোখে দুইহাতে জল দিয়ে একবার পূর্ণদৃষ্টিতে ভালো করে দেখে বললে, "ওমা, ও যে আমাদের নিমাই মা লক্ষ্মী, ও এখানেই ওই যাত্রার দলের ম্যানেজারবাবুর কাছে থাকে।"

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন—ওর কেউ নেই—মা, বাপ, ভাই, বোন—?

মতি একটু হেসে উত্তর দিলে, "কে জানে মা, কে ওর

মা বাপ। মা বাপেরই ঠিকানা নেই—তার আবার ভাই বোন? আপনারা তখন এখানেই ছিলেন না—সেই কাশী যাওয়ার আগের কথা—তখন আমি কাজ করতুম না, নিজের বাড়ীতেই থাকতুম। আপনি তখন ছেলেমানুষ, তা ছাড়া বাইরের একটা কথা তো কখনও জমীদার বাড়ীর মধ্যে পৌঁছাত না—আপনি কি করেই বা জানবেন? ওই ছেলেটাকে এখানকার চৈতন্য বাবাজি নাকি নদীর ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন—।"

"কুড়িয়ে পেয়েছিলেন—নদীর ধারে –"

সুনন্দা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেলেন।

মতি বললে, "হ্যাঁ মা, তাই তো জানি। রাত্রে ছেলেটা জন্মেছিল—কিন্তু কোন সে হতভাগী মা—অমন চাঁদের মত ছেলে কোলে রাখার মত সাহস তার ছিল না—তাই রাতারাতি পথের ধারে ফেলে দিয়েছিল।"

উদ্বিগ্নভাবে সুনন্দা বলে উঠলেন, "বাজারে—শুধু ধূলোতে পড়েছিল?"

মতি বললে, "না মা, একখানা দামী শালে জড়ানো, মাথার তলায় পাঁচশো টাকার পাঁচখানা নোট ছিল, আর কিছু ছিল না। চৈতন্যদাস পথ দিয়ে যেতে ছেলেটার কান্না শুনে কাছে গিয়ে দেখে ওকে তুলে নেয়। আশ্চর্য্যি দেখ—শেয়াল কুকুরে খায়নি—যেমন তেমনিই ছিল। বাবাজি ওকে নিয়ে কোথায় চলে যায় কে জানে। কয়টা বছর পরে আমাদের অনন্তবাবু সেই মাদুলি-পরা ছেলেটাকে চৈতন্যদাসের ওখান হতে নিয়ে এসে যাত্রার দলে নেন। শুনি—চৈতন্যদাস মরে যেতে তার আখড়ার লোকেরা ওকে রাখে নি, তাই পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াতো। এ তবু ওর একটা গতি হল –কোথায় ভেসে যেত—কেই বা দেখত—"

সুনন্দা বদ্ধদৃষ্টিতে ছেলেটার পানে তাকিয়ে রইলেন।

মতি নিজের মনেই বলে যাচ্ছিল—"তাই তো ভাবি মা, এমন রাক্কুসী মাও আছে—এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে এমনভাবেও বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে। চুলোয় যাক সমাজ, চুলোয় যাক আত্মীয়স্বজন, কোন মায়ে এমন সন্তানকে অমন করে পথে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে?"

বিরক্ত হয়ে সুনন্দা বললেন, "তুই থাম মতি, একটা কথা বলতে লাখ কথা এনে ফেলিস এই হয় তোর দোষ। ওর সাত পুরুষের খবর নেওয়ার দরকার আমার নেই—তোকে অত পরিচয় দিতে হবে না।"

ধমক খেয়ে মতি একেবারে এতটুকু হয়ে গেল, আর একটী কথাও সে বলতে পারলে না।

সুনন্দা উঠে দাঁড়ালেন।

মতি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "উঠলেন যে?"

সুনন্দা উত্তর দিলেন, "আর ভালো লাগছে না, খানিকটা শুয়ে থাকি গিয়ে।"

উৎকণ্ঠিতা হয়ে মতি বললে, "তা আর হবে না মা; সারাদিন কি খাটনীটাই না খেটেছেন, শরীর খারাপ তো হওয়ারই কথা।"

সুনন্দা চলতে চলতে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, নিমাই তখন ঘর ছেড়ে চলেছে দূরের ডাকে দূরের পানে; বাঁশি তাকে ডেকেছে, সে আর ঘরে থাকতে পারছে না।

পুরুষ ও মেয়ে সবাই তখন চোখ মুচছিলেন। সুনন্দার চোখেও জল এসেছিল; তিনি মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

অপেরাপার্টির পালা শেষ হতে রাত দশটা বেজে গেল।

গোলমাল খুব বেশী রকম শোনা যাচ্ছিল, সুনন্দা মুখখানা বালিসের মধ্যে গুঁজে দিয়ে দুই কানে হাত চাপা দিয়ে নিস্তব্ধে পড়ে রইলেন।

"সুনন্দা, দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি—"

সুনন্দা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন—তাই তো, ও কে? ও কে সেই—সেই ছেলেটী—সেই নিমাই—

বিস্ফারিতনেত্রে নিমাইও তাকিয়েছিল সুনন্দার পানে—

বয়স বড়জোর তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে, অনুপম সুন্দরী মেয়ে; মুখ দেখলে মনে হয় বয়স এখনও বাইশ তেইশের মধ্যেই আছে।

মাথার চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা; পরণে শুভ্র একখানি থান; সেই শুভ্র থানের ভিতর হতে ফুটে উঠছিল দেহের অপূর্ব্ব দীপ্তি।

গাঙ্গুলী মহাশয় হর্ষপূর্ণ কণ্ঠে বলছিলেন, "এই দেখ সুনন্দা, এই ছেলেটাই নিমাই হয়েছিল। লোভ সামলাতে পারলুম না, তাই তোর কাছে পর্য্যন্ত টেনে এনেছি। সার্থক এর অভিনয় করা—এমন কোন লোক নেই যে এর

অভিনয় দেখে চোখের জল সামলাতে পারে। আমি একে আমার আংটীটা দিয়ে ফেলেছি, আর—"

একটু কঠোরকণ্ঠে সুনন্দা বললেন, "বেশ করেছ বাবা। তোমার যে অমনিই দস্তুর তা আমি বেশ জানি। যার ওপর সদয় হবে তাকে যথাসর্ব্বস্ব ঢেলে দিয়েও তোমার শান্তি হয় না। বরাবর তো এমনি করেই না সব নষ্ট করে আসছ।"

এ রকম কথা কোনদিনই সুনন্দার মুখে শুনতে পাওয়া যায় নি, এ যেন তাঁর স্বভাবের একেবারে বিরুদ্ধ।

সেইজন্যই স্নেহশীল পিতা বিস্ময় নির্ব্বাক হয়ে কন্যার পানে তাকিয়ে রইলেন।

খানিক চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "কিন্তু তুমি কি একে কিছু দেবে না মা, তুমি যে বলেছিলে—"

সুনন্দা মাথা তুললেন—"না, আমি যে দেব একথা তো বলি নি বাবা—"

গাঙ্গুলী মহাশয় নিতাইয়ের পানে চাইলেন, সে তখনও বিস্মিত ও মুগ্ধনেত্রে সুনন্দার পানে চেয়ে রয়েছে।

গাঙ্গুলী মহাশয় বললেন, "চল বাবা, আর এখানে দরকার নেই। সুনুর শরীরটা আজ খারাপ কিনা, তাই আজ কিছুই করা গেল না। আজ থাক, কাল না হয় হবে।"

নিতাই ফিরিল।

যতক্ষণ তাকে দেখা যায় সুনন্দা বদ্ধদৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে রইলেন। যখন আর তাকে দেখা গেল না, তখন তিনি আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

আলো—কোথায় আলো? অন্ধকারে এত ভীষণতাও আছে—এর দিকে যে চাওয়া যায় না, এ জাল যে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছেঁড়া যায় না। সুনন্দা হাঁপিয়ে ওঠেন, চোখে জল আসে না—দুই চোখে আগুন জ্বলে।

(২৫)

দুইদিনই যাত্রা হয়ে গেছে, যাত্রাদল মেডেল পুরস্কার পেয়েছে, নিতাই বিশেষ করে পুরস্কৃত হয়েছে।

সুনন্দা প্রথম দিন খানিকক্ষণ যাত্রা শুনেছিলেন, দ্বিতীয় দিন শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি উঠতে পারেন নি, যাত্রা শোনাও হয়নি।

এখানে যাত্রা গান করবার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত অনেক জায়গা হতে বায়না পেলে—মহানন্দে সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু মুস্কিল হল নিতাইকে নিয়ে।

দ্বিতীয় দিন যাত্রা করে এসেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল।

কলকাতায় সেদিনে যাওয়ার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল, যাত্রার জন্য কতকগুলি জিনিস আনতে হবে, অসিতকে তাই রওনা হতে হল।

যাওয়ার আগে সে নিতাইয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখলে খুব গরম; তাকে আবশ্যকীয় কয়েকটা উপদেশ দিয়ে, অনন্তকে তার দিকে দৃষ্টি দিতে বলে অসিত চলে গেল।

যে যে দিনের জন্য বায়না নেওয়া হয়েছে সে সে দিন উপস্থিত হতেই হবে, ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না। নিতাইকে বাদ দিয়েও তাই অনন্তকে প্রস্তুত হতে হল এবং জ্বরে জ্ঞানশূন্য নিতাইয়ের ভার তার একজন আত্মীয়ের পরে দিয়ে ডাক্তার দেখার ব্যবস্থা করে অনন্ত অন্য সবাইকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য রওনা হল।

বেচারা নিতাই—

একা সে বিছানায় পড়ে থাকে; বেশী জ্বর যখন আসে, সে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। কেউ পাশে থাকে না যে তার মাথায় একটু হাত বুলায়, মুখে একটু জল দেয়, দুইটা কথা বলে সান্ত্বনা দেয়।

মনে পড়ে মায়ের কথা।

তার মা নাই, নিশ্চয়ই নাই; থাকলে কি তার মা আজও তফাতে থাকতে পারত?

সে আধঘুমন্তভাবে মায়ের স্বপ্ন দেখে।

তার মা—স্বর্গাদপী গরীয়সী মা। তার মা দেখতে কি রকম ছিল কি রকম কথাবার্ত্তা তাঁর ছিল? কোন মেয়ের সঙ্গে তাঁর মেলে না—কোন মেয়ের সঙ্গেই নয়—কেবল একজন ছাড়া। সুনন্দার মত—হ্যাঁ, ঠিক অমনিই ছিল তার মা।

কি চমৎকার মুখ—কি চমৎকার শান্ত হাসি। অমন মুখ, অমন হাসি, অমন কথা মানুষের হয় কি? স্বর্গের দেবীর নাম সবাই শুনেছে, নিতাইও শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখতে পায় নি, এই প্রথম সে স্বর্গের দেবীকে চোখে দেখেছে।

নিতাই চমকে জেগে উঠল—

তার মা আর সুনন্দা—?

কোথায় স্বর্গ আর কোথায় ধরিত্রী, মাঝখানে অসীম অনন্ত ব্যবধান, কেউ কারও নাগাল কখনও পায় নি, কোনদিন পাবেও না। শূন্য—তার মহাশূন্য—তার বুকফাটা হাহাকার নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে জেগে রয়েছে মাঝখানে, এপারের বার্ত্তা ওপারে পৌছায় না, ওপারের শব্দ এপারে ভেসে আসে না।

নিতাই আবার আধঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, স্বপ্নের জাল আবার চোখের উপর ছড়িয়ে পড়ে।

সবারই মা আছে, মা নাই তার। ওই নরেনের মত অপদার্থ ছেলে—তারও মা আছে। এই কিছুদিন আগে নরেনের জ্বর হয়েছিল, নিতাই দেখেছিল তার মায়ের ব্যগ্রতা।

একদণ্ড সে ছেলের মাথার কাছ ছেড়ে ওঠে নি, কয়দিন খায়ওনি।

আর ও দেখেছে অর্জ্জুনের মাকে—

পতিতা ঘৃণ্যা নারী, কিন্তু সেই ঘৃণ্য দেহের আড়ালে যে বাস করছিল—সে তার মা, পরম স্নেহময়ী, পরম কল্যাণী মা। অর্জ্জুন যখন ইহলোক ত্যাগ করলে তখন সেই মাকে দেখা গিয়েছিল কি বেশে, আজও তা নিতাইয়ের মনে পড়ে।

আর নিতাই—

সে বড় একা, নিতান্তই একা। তার মাথার কাছে কেউ নেই, সে কাঁদলে তার চোখ মুছিয়ে দিতে কেউ আসবে না, তাকে একটা সান্ত্বনার বাণী কেউ বলবে না।

মুদিত চোখের দুটী পাশ দিয়ে নিঃশব্দে শুধু জল ঝরতে লাগল।

বাইরে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদখানা কখন আকাশে জেগে উঠল, কখন আবার ডুবে গেল, অন্ধকার সমস্ত গ্রামের বুকখানা ছেয়ে ফেললে।

সন্ধ্যারাতে দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের আলোয় কোথায় একটা পাপিয়া চীৎকার করেছিল, এখন সে একেবারে চুপ করে গেছে। রাতের জমাট বাঁধা অন্ধকারে বুকখানা ভয় পেয়ে থমকে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অপর্য্যাপ্ত ঘেমে উঠে কি একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে নিতাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, হঠাৎ তার মনে হল—যেন কার কোলে তার মাথা রয়েছে। অতি কোমল—অতি স্নেহময় কোল, কে যেন তার কপালে হাত রেখেছে—সে হাত অতি কোমল।

মনে হল কার চোখের গরম জল ঝরে পড়ছে তার মুখের পরে—

কে গো—কে তুমি?

নিতাই সেই গভীর অন্ধকারে দুই চোখ বিস্ফারিত করে প্রাণপণে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘনতম অন্ধকার উজল করে যে আলো জ্বলে ওঠে—সে আলো সে দেখতে পেলে না।

"মা—মাগো—"

একটী বার এই মা বলে ডাকার জন্য কতকাল ধরে ব্যগ্র হয়ে রয়েছে, কিন্তু মা বলে সে কাউকে ডাকতে পারে নি। কাউকে সে মায়ের মত দেখতে পায় নি, তার ক্ষোভ মেটে নি।

কয়দিন জ্বরের ঝোঁকে গভীর রাতে এই স্নেহময় কোলটীকেই বুঝি সে পেতে চেয়েছিল। ডাকতে সে পারে নি, গাঢ় ঘুমের বুকে তার কণ্ঠের ভাষা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, সেই হারাণ ভাষা এই মুহূর্ত্তে সে কুড়িয়ে পেয়েছে—তাই সে চীৎকার করে উঠলো—"মা—মাগো—"

একবিন্দু জল ঝরে পড়ল, সে জায়গাটা আগুনের মত জ্বলতে লাগল।

গভীর অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। চেনা যায় না এ কে—কোন রহস্যময়ী এই অন্ধকারে তার কাছে এসেছে।

হাঁপিয়ে উঠে নিতাই বললে, "বল তুমি কে, একটীবার বল কে তুমি?"

অন্ধকারে নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই সে চমকে উঠলো, তার সুর দেয়ালে প্রতিহত হয়ে তারই কানে ফিরে এসে বাজলো।

একটা উত্তরও পাওয়া গেল না।

মাথার বালিশের তলায় একটা দেয়াশলাই ছিল নিতাই হাতড়িয়ে সেটা বার করে দপ করে একটা কাঠি জ্বাললে।

মুহূর্ত্তের জন্য আলোতে ঘরটা ভরে উঠলো।

নিতাইয়ের মাথার কাছে বসে সুনন্দা—মুখ ঢাকতে পারেন নি, দুই চোখ দিয়ে অশ্রু-ধারা ঝরছে।

নিতাই তীরের মত ঠেলে উঠে বসল—তখনই শ্রান্তভাবে দুই হাতের মধ্যে মুখখানা গুঁজে শুয়ে পড়ে শ্রান্তভাবে হাঁফাতে লাগল।

(২৬)

ধনীর একমাত্র দুহিতা, আদরের দুলালী এই কুঁড়ে ঘরে এসেছেন এই গভীররাত্রে—এও কি সম্ভব ?

কিন্তু মিথ্যাও তো নয়। নিতাই নিজের চোখে দেখতে পেয়েছে তিনি এসেছেন; কেবল এসেছেন নয়, তার অপরিষ্কার বিছানায় বসে তার মাথা কোলে করে নিয়েছেন, কিন্তু কেন—কিসের জন্য ?

নিতাইয়ের সমস্ত অন্তর কেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

এ যেন গভীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা। সে কি জেগে আছে, সেকি বেঁচে আছে ? একদিন অসিতের মুখে সে গল্প শুনেছিল—একজন লোক হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখে সে সম্রাট হয়ে গেছে, তখন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

আজ তারও অবস্থা ঠিক সেই রকমই। সে ঘুম ভেঙ্গে দেখছে সে সম্রাট হয়ে গেছে। যাকে একবার দেখার জন্য সে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল, যার একটি কথা শুনবার জন্য সে অধীর হয়ে উঠেছিল—সেই দেবী—সেই সুনন্দা—আজ তারই কুটীরে তারই মাথা কোলে নিয়ে বসে—একি স্বপ্ন, না সত্য ?

আর্দ্রকণ্ঠে সুনন্দা ডাকলেন—"নিতাই—"

স্বপ্নাবিষ্টের মতই নিতাই উত্তর দিল "আজ্ঞে—"

সুনন্দা বললেন, "তোমার জ্বর এখনও সম্পূর্ণ ছাড়ে নি। আর খানিক শুয়ে ঘুমাও, আমার কোলে মাথা থাক, আমি বরং বাতাস করি।"

দুর্ব্বলমস্তিষ্ক নিতাইয়ের প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা ছিল না; সে উঠেছিল, আবার নিঃশব্দে সুনন্দার কোলেই মাথা রেখে সে শুয়ে পড়ল। নিঃশব্দে সুনন্দা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

নিতাই জাগলো—

জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি এখানে এতরাত্রে এসেছেন কেন ?"

সরল বালকের প্রশ্ন, এই প্রশ্নটাই তার মনে জাগছিল।

সুনন্দা অন্ধকারেই হাসলেন।

আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমার যে অন্ধকার ছাড়া আলোয় আসার উপায় নেই নিতাই, তাই তোমার অসুখ শুনে পর্য্যন্ত রোজই এমনই অন্ধকারের মধ্যে এখানে আসি; আলোকে আমার ভয় করে, তাই তাকে এড়িয়ে চলি। ভোরের আলো যখন নেমে আসে, তার আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে যাই।

তবে সে স্বপ্ন নয়। প্রতিরাত্রে নিতাই যে কার সুকোমল কোলে মাথা রাখে, কার স্নেহময় স্পর্শ সারা গায়ে মুখে মাথায় অনুভব করে, সে সত্য।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব।

সুনন্দা কথা বললেন—"তোমার কি কেউ নেই নিতাই, এমনভাবে একা পড়ে থাকবার কারণ তো কিছু বুঝি নে।"

নিতাই কেবল মাথা নাড়লে, "কেউ নেই, এত বড় দুনিয়ায় আমার বলতে কেউ নেই; আমি একা—একেবারে একা—।"

সুনন্দা বললেন, "কিন্তু এ জগতে স্থানেরও তো অভাব নেই নিতাই। এখানে এই ছোট গ্রামে এমনভাবে সকলের কাছে হীন হয়ে ঘৃণা অপমান লাঞ্ছনা সয়ে থাকার চেয়ে আর কোথাও চলে যাওয়া ভালো নয় কি ?"

স্থান ? বিশাল জগতে হয় তো যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু কোথায় সে যাবে ? এই গ্রামের বাইরে গেলে সে পথ হারায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বিশাল জগতে স্থান আছে সবারই, পরিচয় করে নিতে পারে সবাই, কিন্তু এই ছেলেটী যে ভাষা হারায়, মূক হয়ে পড়ে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, "আমি যে কিছুই চিনি নে মা, কাউকে যে চিনি নে।"

সুনন্দা বললেন, "চেনা কারও সঙ্গে কারও থাকে না—চিনে নিতে হয়—আর সে চেনার সাফল্য নির্ভর করে নিজেরই ওপরে। শুনলুম কিছুদিন আগে কলকাতায় গিয়েছিলে ?"

সে একটা দুঃখপূর্ণ স্মৃতি—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিতাই উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, তিনদিন ছিলুম।"

সুনন্দা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মাকে খুঁজতে গিয়েছিলে ?"

নিতাই দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢাকলে।

সুনন্দা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন, "একটা কাজ কর নিতাই; তুমি এবার ভালো হয়েই এখান হতে আর কোথাও চলে যেয়ো, আর এখানে থেকো না। লোকের এত ঘৃণা লাঞ্ছনা অনাদর—এও কি তোমার বুকে আঘাত দেয় না? তারপর প্রায়ই এ রকম করে অসুখে ভোগা—"

নিতাই মুখ হতে হাত সরালে—বললে, "কিন্তু কোথায় যাব? আমার তো কোথাও জায়গা নেই, কে আমায় আশ্রয় দেবে?"

সুনন্দা বললেন, "জায়গা আছে বই কি, সবাই তোমায় আশ্রয় দেবে, যদি তোমার টাকা থাকে। আমি তোমায় বরং কিছু টাকা দিচ্ছি। আমার নিজের পাঁচহাজার টাকা একটা ব্যাঙ্কে আছে, সেটা তোমায় লেখাপড়া করে দেব, তুমি কলকাতায় গিয়ে থাকো।"

নিতাই নির্জ্জীবভাবে পড়ে রইল।

সুনন্দা বলতে লাগলেন, "কলকাতায় আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে তুমি থাকবে, সেখানে তোমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা আমি করে দেব, তুমি স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকতে পারবে। এখানে ছোটলোকের মত ছোটলোকের সঙ্গে মিশে জীবন কাটাবে কেন, ভদ্রলোকের মত ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশে জীবন যাপন কর গিয়ে।"

নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, শুষ্ককণ্ঠে বললে, "আমি নিজেই ছোটলোক, ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশলেই কি ভদ্রলোক হতে পারব?"

সুনন্দার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে উঠেছিল, তিনি বললেন, "পারবে বই কি। কত নীচলোকের ছেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশে ভদ্র হয়ে গেছে। তুমি এ গ্রাম ছেড়ে কোনদিন বার হও নি, তাই বাইরের সঙ্গে পরিচয় নেই—কিছু জানো না। একবার বার হয়ে দেখ, জগতে তোমার জন্যেও ঢের জায়গা আছে।"

নিতাই খানিক চুপ করে রইল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু আপনি আমায় অত টাকা দেবেন কেন—আপনার কেন এত মাথাব্যথা? কই, এতলোক রয়েছে, কেউ তো আমার জন্যে এমন ভাবে না, আপনি কেন এত ভাবছেন?"

সুনন্দা যেন আশা করেন নি তার মত ছেলে এ রকম প্রশ্ন করতে পারে। তিনি ভেবেছিলেন সে টাকা পাওয়ার আনন্দে অধীর হয়ে উঠবে, প্রশ্ন করবার মত কোন কথা তার মনে জাগবে না, জাগলেও মুখে ফুটবে না, তাই তিনি থতমত খেয়ে গেলেন।

একমুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললেন, "কেন দিচ্ছি সে কথা আজ নাই বা জানলে নিতাই, আমি দিচ্ছি—মোট এই কথাটাই জেনে রাখ না কেন?"

নিতাই মাথা নাড়লে, "কিন্তু আমি তাই জেনে যে খুসি হয়ে থাকতে পারি নে মা। আমি এ রকমভাবে টাকা নিতে পারি নে, কোনদিন এ রকমভাবে কারও এতটুকু সাহায্যও আমি নেই নি।"

সুনন্দা চমৎকৃতা হয়ে গেলেন, বললেন, "বুঝেছি, কিন্তু কেন যে তোমায় দিচ্ছি সে কথাটা আজ জেনে কাজ নেই। একটা দিন হয় তো আসবে যেদিন তুমি সবই জানতে পারবে; আমায় কিছু বলতে হবে না, ঘটনাচক্র আপনিই তোমার সামনে সব কিছু বলে দেবে। তুমি শুধু একটা কথা জেনে রেখো নিতাই, বিনাসম্পর্কে কেউ কাউকে একটা পয়সাও দেয় না, আমিও তোমায় এতগুলি টাকা এমনিই দিচ্ছি নে।"

"বিনা সম্পর্কে—"

নিতাইয়ের চোখ দুইটী সেই অন্ধকারে দীপ্ত হয়ে উঠলো ধকধক করে জ্বলতে লাগল—ঠিক শিকারী বাঘের মতই। তার কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠলো দড়ির মতই—যেন অধিক রক্তসঞ্চালনে ছিঁড়ে যাবে।

আত্মহারা নিতাই সুনন্দার হাতখানা এত জোরে চেপে ধরলে যে যন্ত্রণায় সুনন্দার হাত আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

আর্ত্তকণ্ঠে নিতাই বলে উঠলো—"বলুন, বলুন আপনি কে—আপনি আমার কে?"

সুনন্দা তার হাত হতে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিলেন, তার মুখখানা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন; নিঃশব্দে তাঁর চোখ হতে ঝরঝর করে কয়েকফোঁটা জল ঝরে পড়ে নিতাইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিলে।

নিতাই জলমগ্নের মত হাঁপিয়ে উঠল, "বুঝেছি—মা—আমার মা—"

ক্রমশঃ

মন্দার পাহাড়

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

ভ্রমণ

সন্ধ্যায় হাওড়ায় ট্রেণে চেপে সকালে গাড়ী চলতে চলতে তার গতি এমন জায়গায় এসে বন্ধ হ'ল যে কিছু কূলকিনারা করতে পারা গেল না। দু-দিকে মাটি সমান ভাবে কাটা, তার ওপরে উঠেছে বেশ সবুজ ঘাস, সেখানে নেই কোন দালান কোঠা; কিন্তু গাড়ী গেল দাঁড়িয়ে। দু-জন যাত্রী উঠে গাড়ীর গার্ডের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে নিয়ে নিলেন দুটো হলদে টুকরো কাগজের পাশপত্র। বাইরে তখন ভাল ক'রে চাইলাম। দেখলাম এক জায়গায় লেখা রয়েছে Koili—Khutaha halt। শেষে জানলাম; এগুলো ষ্টেশন নয়, এগুলোকে বলে 'halt'। এখানে শুধু গাড়ী থামে, আর কাজ চলে সব গার্ডের মারফতেই, সর্ব্বময় কর্ত্তা তিনিই। এই দুর্দ্দিনে ট্রেণ কোম্পানীর পথের প্রতি-বন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে Busগুলো—প্রতিযোগিতা করতে হ'বে তাদের সাথে। কাজেই এখানে Busএর সাথে পাল্লা দেবার জন্তে ঘনঘন ষ্টেশন আর halt করতে হয়েছে।

আবার আগের মত Ganidham নামে আর একটা haltএ গাড়ী এসে দাঁড়ালো। কিছুদূরে দেখলাম একটা মন্দির, তারও নাম শুনলাম "গৈনুধাম"। মনে হয় মন্দির থেকেই haltএর নাম হয়েছে। জানতে পারলাম, মন্দিরের নাকি একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বছরের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বহু অন্ধ এসে এখানে হত্যা দেয়, ভালও হয় কেউ কেউ নাকি। মনে হ'ল, দেশের লোকের দেবতায় বিশ্বাসের কথা। আর কিছু না হোক্, এই অচলা ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস, এর জোরেই তো তারা ভাল হবার দাবী করতে পারে।

এর পরের ষ্টেশন Hatpurainiতে গাড়ী থামতে আমি একটু ভীষণ ভাবেই হেসে উঠলাম। দুটো Goods Trainএর কুঠ্‌রীর ওপরে চালা ক'রে ষ্টেশনের ঘর করা হয়েছে, আর তাদের সঙ্গ নিয়েছে একটা খোলার ঘর!

তারপর দুটো halt ও দুটো ষ্টেশন পেরিয়ে Barahat ষ্টেশনে গাড়ী বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। লোকজনের নামা-ওঠা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গাড়ী থেমে থাকে; কিন্তু এরও ব্যতিক্রম দেখলাম এই বারাহাট ষ্টেশনে। গাড়ী সবেমাত্র ছেড়েছে ষ্টেশন থেকে, দেখি এক বেহারী ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে আসছেন। গাড়ীর সাম্নে এসে যেমন ক'রে আমরা Train বা Bus থামাতে হাত দেখাই, তিনি তেম্‌নি ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু গাড়ী চলেছেই, তবে আমি বুঝলাম যে তার গতি হয়ে আসছে মন্থর। শেষে গাড়ী যখন বেহারী ভদ্রলোককে ছেড়ে যাবার উপক্রম করেছে, তখন বেহারী ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠবার আশা নেই ভেবে দু-হাত নাড়'লেন—বোধহয় গাড়ী না পাবার দুঃখেই গাড়ী থেকে কজন বেহারী ভদ্রলোক তেম্‌নি হাত নাড়ালেন; নিশ্চয়ই জাত-ভায়ের প্রতি সহানুভূতিতে। কিন্তু সেই ব্যথিতের মুখেই ফুটে উঠলো হাসির রেখা, যখন গাড়ী গেল থেমে।

দূর থেকে মন্দার পাহাড় দেখতে দেখতে চলেছি, হঠাৎ গাড়ী গেল থেমে। যে ষ্টেশন দেখে আমি না হেসে থাকতে পারিনি, এটা তারি সামিল! এরপরেই মধুসূদননগর halt—মন্দার হিল ষ্টেশন থেকে মাইল দেড়েক আগে হবে। এখানেই halt থেকে একটু দূরে যে বাড়ীটায় উঠবো সেই বাড়ীটা। কাজেই মন্দার পর্য্যন্ত আমাদের অবাধ গতি থাকা সত্ত্বেও আমরা এখানেই নেমে গেলাম।

এখানে এসে গুছিয়ে নিতেই একদিন আর একরাত কেটে গেল। আসার পরেই একটা জিনিষের বড় অভাব মনে হ'ল। বাঙ্গালা দেশে মা-দুর্গার পূজোর সাড়া অনেক আগেই পাওয়া যায়, আনন্দময়ী মার আগমনীর বাঁশী বহু আগেই ওঠে বেজে। এখানে কিন্তু কিছুই বোঝা গেলনা। শুনলাম ৩।৪ মাইল দূরে পূজো আছে—তা' আবার বেহারীদের—তারপর অজানা অচেনা জায়গা। মনে হ'ল পূজোর আনন্দটা এবার আমার ভাগ্যে বাদ গেল। একটু ব্যথাও যে পেলাম না এমন নয়। ব্যথা পেলেই আমরা

শান্তি খুঁজি ; "নতুন জায়গা দেখবার আনন্দটা কম নয়" এই ব'লেই মনকে দিলাম সান্ত্বনা।

অষ্টমী পুজোর দিন ভোরে প্রথমে মন্দার পাহাড়ে গিয়েছিলাম ; তার পরেও গিয়েছি। সবুজে ঢাকা মন্দার পাহাড় বাড়ী থেকেই দেখা যেত। মনে করেছিলাম পাহাড় বুঝি বাড়ী থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ। কিন্তু সে ভুল ভেঙ্গেছে। মাইল তিনেক দূর, তবু মনে হয় যেন কত কাছে !

পাহাড়ের পায়ে প্রকাণ্ড একটা পুকুরের মত ; নাম তার 'পাপহরণী'। এর পেছনেই উঠে গেছে পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় আবার মধুসূদন ও জৈনদের মন্দির ; দেখলে মনে হয় ঠিক যেন একটা ছবি ! পাহাড়ের ওপরে যে মন্দির আছে সেখানে মধুসূদনের মূর্ত্তি থাকে না। মন্দার ষ্টেশনের কাছেই মধুসূদনের মূর্ত্তিটি আছে আর একটি মন্দিরে। আমি মনে করেছিলাম মধুসূদনের নাম থেকেই গ্রামটার নাম হয়েছে 'মধুসূদননগর' ; কিন্তু অনুসন্ধানে জেনেছি, এখানকার বর্ত্তমান জমিদারের পিতামহের নাম ছিল মধুসূদন সিংহ—তার নাম থেকেই মধুসূদননগর নাম হয়েছে।

পাপহরণীর যে ঘাটলা, তা' থেকে বেশ বোঝা যায় যে এ অনেকদিনের পুরণো। ঘাটলার গায়ে বেশ সুন্দর সুন্দর কাজ করা পাথরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে, আবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইটের সিঁড়িও দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায় বাইশ শ' বছর আগে চোল নামে কাঞ্চিপুরের এক রাজা মন্দার-পাহাড়ে মৃগয়ায় এসেছিলেন। তাঁর ছিল কুষ্ঠ ব্যাধি। নানা তীর্থ ঘুরেও রোগমুক্ত না হ'তে পেরে তিনি খুব মনোকষ্টে ছিলেন। মন্দারের পাপহারিণীর জলে স্নান ক'রে তিনি এই কুৎসিত রোগ থেকে রেহাই পান। তা'তে তাঁর এ জায়গাটার উপর খুব একটা আকর্ষণ হয় ; আর তাই তিনি এটাকে একেবারে নিজের রাজধানীই ক'রে ফেলেছিলেন। পাপহারিণীর ঘাটলা তিনিই তৈরী করিয়েছিলেন।

তিনি মন্দার আসবার আগে এই পাপহারিণীর নাম ছিল "মনোহরকুণ্ড"। রাজা চোলই এর নাম দিয়েছিলেন পাপ-হারিণী। পাপহারিণী নাম তিনি বোধ হয় এই ভেবে দিয়েছিলেন যে এতে স্নান করলে মানুষের যত পাপ সব ধুয়ে মুছে যাবে—এর জল তার সব পাপ হরণ ক'রে নেবে।

বহুকাল আগে মন্দারের চারদিকে যে প্রকাণ্ড নগর ছিল, তাতে একটুও সন্দেহ করবার কিছু নেই। যবন ও জৈনদের আক্রমণে সে নগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তবু ধ্বংসাবশেষ তার এখনও সব রয়ে গিয়েছে পাহাড়ের চার-দিকেই। পাহাড়ের চারদিকে পুরণো সব কুয়ো, আর পুরণো অনেক পুকুর দেখতে পাওয়া যায়। যদিও পাহাড়ের নীচে প্রায় জায়গাতেই এখন চাষ আবাদ হয়—তবু ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে এখনও দেখা যায় অনেক বড় বড় রাস্তার চিহ্ন। আর মনে হয় রাস্তাগুলো সব নানা দিক থেকে এসে পাহাড়ের সাথেই মিশেছিল। কিম্বদন্তী আছে, এই পাহাড়কে কেন্দ্র ক'রে যে নগর ছিল তাতে বাহান্নটি বাজার ও তিপ্পান্নটি রাস্তা ছিল। কাজে কাজেই নগরটা একটা বিরাট কিছু ছিল—সামান্য কিছু যে ছিল



মধুসূদন ঠাকুর—সঙ্গে পূজকগণ

না তা' বেশ বুঝতে পারা যায়। তা' ছাড়া একটা শিলা-লিপি থেকে নাকি জানতে পারা গিয়েছে যে তিন শ' বছর আগেও এ নগরের অস্তিত্ব ছিল।

মনে পড়ে, স্কুলে থাকতে রামায়ণে পড়েছিলাম—"মন্দরং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং পাপিনা হর্ত্তুমিচ্ছসি।" এই মন্দার পর্ব্বত দিয়েই নাকি সত্যযুগে দেবতা-অসুরের সমুদ্র মন্থন হয়েছিল। পাহাড়ের গায়ে মন্থনের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। আর এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটে সাপের ফণার ছাপও দেখতে পাওয়া যায়। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য যে একদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—একটা পাথরই উঠে গেছে এর শেষ পর্য্যন্ত। আর তার ওপরেই ঠিক মন্দির। তখন মনে হয় পাহাড়টি

দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেন একটি মন্থন দণ্ডের মত। পাহাড়টি ১০০ ফুট উঁচু হ'বে—একটা পাথরই যে ১০০ ফুট সোজা উঠে গেছে দেখে আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

মন্দার পাহাড় যে কতদিনের তা' জানতে হ'লে আমাদের চলে যেতে হ'বে একেবারে সৃষ্টির আদিতে। বিষ্ণু যখন মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয়ের বিনাশ করেন তখন মধুর মাথা থেকে সৃষ্টি হ'ল মন্দার পাহাড়ের। আজও পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় মধু দৈত্যের মাথা খোদাই অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। মধু দৈত্যের head-dressটা বহু পুরনো; আর ঐতিহাসিকদের একটা study করবার বিষয় বলে' মনে হয়। মধুকে মেরে বিষ্ণু হলেন শ্রীমধুসূদন; আর ব্রহ্মা মন্দারে মধুসূদন প্রতিষ্ঠিত করলেন।

আগেই বলেছি, মধুসূদনের যে মন্দির আছে পাহাড়ে সেখানে মূর্ত্তিটি এখন থাকে না। মূর্ত্তিটি যে কি ক'রে ষ্টেশনের কাছে স্থাপিত হয়েছিল তা' একটা জানবার বিষয়। শোনা যায়, আওরঙ্গজেব বাদসা' একবার এখানে এসে অনেক মন্দির ভাঙ্গতে আরম্ভ করেন। সেই ভয়েতেই মধুসূদনকে নাকি মন্দার থেকে মানভূম জেলায় কাশীপুর গ্রামে—পঞ্চকোট পর্ব্বতের কাছে এনে স্থাপিত করা হয়। আজও সেখানে মধুসূদনদেবের মন্দির আছে।

মন্দারের রাজা বসিয়াসিংহ ক্ষেত্রী মধুসূদনকে আবার মন্দারে আনেন। তাঁর তৈরী বৌসী গ্রামে মন্দার ষ্টেশনের কাছে মধুসূদন দেবের বিগ্রহ স্থাপিত রয়েছে। পৌষ সংক্রান্তির দিন মধুসূদনকে মন্দার পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পনেরো দিন ধ'রে বিরাট মেলা হয়, অনেক লোকের ভিড় হয়, 'পাপহারিণীর' জলে স্নান ক'রে শত শত লোক পাপমুক্ত হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিনেই নাকি রাজা চোল রোগমুক্ত হন; তাই তিনি এ মেলার প্রবর্ত্তন করেন। মেলা সেই থেকে এখনও চলে আসছে।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, তীর্থস্থান হিসেবেও মন্দারের মূল্য বড় কম নয়। মনে হয়, যবন ও জৈনদের আক্রমণে এর নাম, প্রসিদ্ধি ও পরিচয় লোপ পেয়েছে। এককালে অনেক জায়গা থেকে ভক্তেরা এখানে তীর্থদর্শনে আসতো—প্রমাণ দেখতে চাইলে এখানকার অধিবাসীরা আজ পর্য্যন্তও তা দেখাতে পারে। তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা মন্দার ও মধুসূদন-স্নেহে অক্ষুণ্ণ ও অটুট হয়ে রয়েছে। এর পরিচয় আমরা আরো ভালভাবে পাই একটা জনশ্রুতিতে, যা' এখনও এদের মুখে লেগে রয়েছে—

"মন্দারং শিখরং দৃষ্ট্বা, দৃষ্ট্বা বা মধুসূদনম্।
কামধেন্বা মুখং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
চীরচান্দনয়োর্মধ্যে মন্দার নাম পর্ব্বতঃ।
তস্যারোহণমাত্রেন নরঃ নারায়ণো ভবেৎ॥"

মন্দার পাহাড়ের পূবে একটা কামধেনুর মূর্ত্তি আছে। চীর ও চান্দন দুটো নদী—পাহাড়ের পূবে চীর, পশ্চিমে চান্দন। তাই দেখতে পাই মন্দারের শিখর, মধুসূদনের মূর্ত্তি, আর কামধেনুর মুখ—এর যে কোন একটা দেখলে আমাদের আর পুনর্জন্ম হবে না; আবার মন্দার পাহাড়ে উঠলে আমরা একেবারে নারায়ণ হয়ে যাব।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় মন্দার আক্রমণ করেন। বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি তিনি ভেঙ্গে ফেলেন। আজও পাহাড়ের ওপরে ও আশেপাশে বহু মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ছোট ছোট মূর্ত্তি পাণ্ডারা নিয়ে গিয়ে মন্দিরে রেখেছে, তার ভেতরে দু-একটা সুন্দর মূর্ত্তিও পাওয়া যায়।

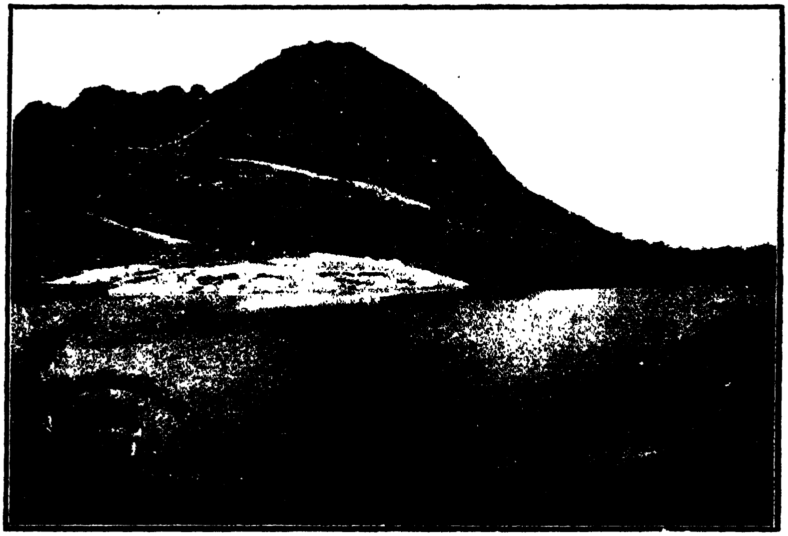
পাহাড়ে উঠতেই প্রথমে দেখা যায় একটি ভগবতী ও একটি গণেশের মূর্ত্তি। পাহাড়ে উঠবার জন্য পাঁচ শ' ফুট পাথর কেটে কেটে সিঁড়ি করা রয়েছে। সিঁড়ি যেখানে শেষ, সেখানে পাহাড় বেশ সমতল। এখানে হাত পনেরো চওড়া ও হাত তিরিশেক লম্বা একটা পুকুর মত আছে, নাম সীতাকুণ্ড। তার পাশেই একটা কুঁড়ে ঘর—ভারী সুন্দর দেখতে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা মাঝে মাঝে এখানে এসে সংসার পেতে বসেন। এ জায়গাটায় যে দু-একটা মন্দির ছিল, তা' বেশ বোঝা যায়; কারণ, অনেক সুন্দর সুন্দর নক্সা করা পাথর, আর এম্নি পাথরের সব চৌকোণা টুকরো স্তূপীকৃত হয়ে পুকুরের পাশে প'ড়ে রয়েছে। পুকুরের পাশেই দুটো গণেশ ধরণের মূর্ত্তি আছে, অর্দ্ধেকটা তাদের পাহাড়ের ভেতরে আছে। আগে যে কুঁড়েটার কথা বলেছি তার পাশেই বামন অবতারের মূর্ত্তি পাহাড়ের গায়ে। এখানে একটা গুহা মত আছে—গুহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি রয়েছে যা' অতীত দিনের শিল্পের দুর্লভ উদাহরণ। বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি

দেবদেবীর মূর্ত্তি এতে রয়েছে ; তবু এর ভেতরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নৃসিংহ অবতারের মূর্ত্তি।

কুঁড়েটার সাম্নে দিয়ে একটা সিঁড়ি খানিক দূর ওপরে উঠেছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠলে দেখা যায় পাহাড়ের ভেতর একটা গর্ত্ত মত চলে গিয়েছে কিছু দূর, তার মধ্যে বেশ পরিষ্কার জল—গভীর হ'বে হাত তিনেক, নাম তার 'আকাশগঙ্গা'। পাহাড়ের মাথায় যেখানে বৃষ্টির জল ঢুকবার পথও বন্ধ, সেখানে এ জল যে কোত্থেকে আসছে তা' বোঝবার জো নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে, এর জল যতবার বের ক'রে দেওয়া হয়েছে, ততবার কোন অজানিত উৎস থেকে জলের ধারা এসে একে ভরিয়ে দিয়েছে—সার্থক ক'রে তু'লেছে এর "আকাশগঙ্গা" নাম।

আকাশ গঙ্গার পাশেই পাহাড়ের গায়ে মধুদৈত্যের প্রকাণ্ড মুখটি খোদাই করা রয়েছে। সিঁড়ির সাম্নেই একটা পাথরের ফটক মত আছে, নাম যমদ্বার। এই যমদ্বার দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কিছু ওপরে উঠলে দেখা যায়, পাহাড়ের পাথর কেটে কেটে দুটো খুব ছোট কুঠুরী মত করা—তার একটিতে মহাদেবের মূর্ত্তি, আর একটিতে মহাবীরের ; এরই সাম্নে হাত তিনেক চওড়া আর হাত পনেরো লম্বা একটা জালার মত আছে—নাম তার কামাখ্যাকুণ্ড। আরো কিছু ওপরে পাহাড়ের গায়ে একটা বড় শঙ্খ আঁকা রয়েছে ; ঠিক তারই নীচে এক জায়গায় খানিকটা জল জমে' রয়েছে। জায়গাটিকে বলে শঙ্খকুণ্ড। কিম্বদন্তী আছে, এই শঙ্খই নাকি মহাভারতের 'পাঞ্চজন্য'—যার শব্দে শত শত বিপক্ষ সৈন্য ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেত। শঙ্খকুণ্ডের ওপরে যোনিপীঠ সিদ্ধস্থান ; আর পাহাড়ের মাথায় ব্রহ্মকুণ্ড। এই সব কুণ্ডের জল নাকি সব সময়েই আছে, কিন্তু পাহাড়ের ওপরে যে এসব কি ক'রে সম্ভব হয়েছে দেখে সত্যিই আশ্চর্য্য হ'তে হয়। অতীত দিনের কীর্ত্তি দেখে মন বিস্ময়ে ও আনন্দে ভ'রে ওঠে।

পাহাড়ের নানা জায়গায় পাথরের ওপরে আরো অনেক রকম মূর্ত্তি খোদাই করা আছে। তারা তাদের প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতে এখনও র'য়ে গেছে। অনেক মূর্ত্তি যে কোন দেব-দেবীর তা' বোঝাই গেল না। শোনা যায়, উগ্রভৈরব নামে একজন বৌদ্ধ রাজা মন্দারে এসেছিলেন; তিনি হয়তো কয়েকটি মূর্ত্তি তৈরী করিয়েছিলেন। তা ছাড়া পাহাড়ের চূড়ায় একটা জৈন মন্দির আছে আগেই ব'লেছি। পাহাড়ের পাথর কেটে কেটে অনেক জায়গায় শিবমূর্ত্তি আঁকা রয়েছে। দু-তিনটে শিব-মন্দিরও আছে। পাহাড়ের মাথার মন্দির দুটোতে ধরতে গেলে কিছুই নেই। দুটোতে শুধু দুটো বেদী রয়েছে; তার একটাতে দুটো কালো পাথরের ছোট ছোট পায়ের দাগ—মনে হয় মধুসূদনের। রেল হবার পর জায়গাটির নাম হয়েছে "মন্দার"—মন্দার হিল্ ষ্টেশনটি বোঁসী গ্রামের নিকটে। রেল হবার পর জায়গাটির নাম আস্তে আস্তে বাড়ছে, যদিও এখনও এর নাম অনেকেরই জানা নেই। তবে অনেকে এখন এ জায়গাটায় বাড়ী করা সুরু করেছেন। আশা করা যায়, কিছুদিনের ভেতরে জায়গাটা সহর মত হয়ে উঠবে। রেল কোম্পানী আজকাল মন্দার হিল্ জায়গাটিকে



মন্দার পাহাড়—পাদদেশে পাপহারিণী

স্বাস্থ্যনিবাস বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি, যতদিন এখানে ছিলাম বেশ ভালই ছিলাম। তবু শুধু স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে নয়—কতদিনের কত স্মৃতি দিয়ে জড়ানো, প্রকৃতির কত ছবিতে ভরা, ভক্তের কত আকুতি মাখানো, এ জায়গার রূপ আমার চোখে দিয়েছে ধরা।

একদিন এখান থেকে ন' মাইল দূরে রাজাপুকুর নামে এক জায়গায় গিয়েছিলাম। জায়গাটি মন্দারের দক্ষিণে, ভাগলপুরের প্রান্তসীমায়। এর পরেই সাঁওতাল পরগণা।

একটা কথা বলা হয়নি—আমাদের ভাগলপুর থেকে মন্দারের পথে ছ' সাতটি পাহাড়ী নদী পড়েছিল; আবার মন্দার থেকে রাজাপুকুর যেতে দেখলাম সব পাহাড়ী নদী। চোখের সামে প্রথমে যে নদীটি এল, তার নাম "আগ্রা"। ভাগলপুর থেকে মন্দারে আসতে যে সব নদী দেখেছিলাম, তা' বেশীর ভাগ বালুতেই ভর্ত্তি। মাঝে মাঝে একটু একটু জল—হয়ত পায়ের পাতাও ডোবে না। দু-একটিতে সামান্য জল যে নেই তা' নয়। এদের তুলনায় আগ্রা নদীতে জল একটু বেশী—বেশী জল হলেও আমাদের হাঁটুর বেশী উঠতে পারে না। তবে আগ্রা নদীতেও এমন জায়গার অভাব নেই, যেখানে পায়ের পাতা ডোবে না, আর এ-নদীও বেশীর ভাগ বালুতেই ভর্ত্তি। এর পরেই 'সুখানিয়া' নদী। সুখানিয়া নদীতে আমরা নেমে গেলাম। হাত পঞ্চাশেক হয়তো নদীটা চওড়া, কিন্তু জল বইছে ঠিক দু-হাত জায়গা নিয়ে। বালুর ওপর দিয়ে অবাধে লোকজন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। আমরা হাত দিয়ে বালু খুঁড়ে দেখলাম বালুর নীচে জল আছে।

সুখানিয়ার পরে প্রায়ই সব সবুজ ধান ক্ষেত। যে সব ক্ষেতের কাছে জলা আছে, সেখানেই কৃষকেরা জল দিতে ব্যস্ত। পরে অনেক জায়গাতেই ক্ষেত নেই—খালি শুধু সবুজ মাঠের রাজত্ব, আর মাঝে মাঝে বড় বড় গাছে ভর্ত্তি প্রান্তর।

রাজাপুকুরের মাইল তিনেক আগে থাকতেই পথের দু-পাশে সব পাথর প'ড়ে রয়েছে, অনেকটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। তাদের উচ্চতা দু-তিন হাত থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত অবধি আছে। প্রায়ই এ-সব পাহাড়ের বৃদ্ধি বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়; আর পাথর সব সরকারী পূর্ত্ত বিভাগ কাজে লাগায়।

দূর থেকে রাজাপুকুরের পাহাড় দেখতে পেলাম। কুয়াসা-ঢাকা পাহাড়ের চূড়োতে ভোরের সূর্য্যের আলো পড়ায় মনে হচ্ছিল যেন বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়োয় বরফ! রোদে গলে যাচ্ছে—আর তার ওপর একটু একটু ধোঁয়া উঠছে, দেখতে ভারী সুন্দর। দেখতে দেখতে রাজাপুকুরের কাছে এসে গেলাম। যেদিকে তাকাই, সারি সারি পাহাড় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে শুধু পাহাড়ের মেলা, খালি পাহাড় আর পাহাড়। পশ্চিমের দিকটায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাহাড় প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে—যেন সকলের পথরোধ করবে সে—কাউকে আসতে দেবে না, এই পণ নিয়েই সে আজ দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে এমন, যে রাস্তার গা ঘেঁসে দুদিকে পাহাড়, তার ভেতর দিয়ে সুন্দর রাস্তা চলে গিয়েছে।

পাহাড়কে ভেঙ্গে চুরে' বেয়ে চলেছে এক নদী তার অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে। এম্নিতরো সুন্দর শোভা আমি এখানকার কোন নদীতে পাইনি! সাঁওতাল পরগণার ভেতরে এম্নি সুন্দর দু-একটা জায়গা মেলে। এ যেন প্রকৃতির আপন দুরন্ত প্রিয়জন; আদরের দুলালী তার। দুরন্ত হ'লেও দুলালীকে আদর না ক'রে কেউ পারে না, প্রকৃতিও পারে নি। নিজেকে সে নিঃস্ব ক'রে দিয়েছে একে সাজাতে, তার যত সম্পদ সবই সে খরচ করেছে এর পেছনে। এর শোভা, এর সৌন্দর্য্য, আমার চোখেতে লাগিয়ে দিল—কি যে মায়া! কি যে নেশা! কি যে ছন্দ! টেনে নামালো আমাকে এর বুকে। বালুর ভেতর দিয়ে অল্প জল বয়ে চলেছে—কি স্বচ্ছ! কি সুন্দর! রূপালী রোদের আলোয় জল ঝক্‌ঝক্ করছে, বালুগুলো করছে চিক্‌মিক্। বালুর ওপরে-ভেতরে সুন্দর ছোট ছোট নানা রকমের পাথর। মাঝে মাঝে বালুর ওপরে বড় বড় পাথর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। কোথায়ও দুটো-তিনটে পাথরের ভেতর দিয়ে জল সুন্দর শব্দ ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথায়ও পাথর সব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, কি সুন্দর back groundই না সৃষ্টি করেছে। কোথায়ও জল একটু বেশী—দেখতে নীল—খানিকটা জায়গা জুড়ে পুকুরের শোভা

সৃষ্টি করেছে; কোথায়ও বা নদীর ভেতর পাথর তুলেছে মাথা, দু-ধার দিয়ে তার গান করতে করতে জল চলেছে বয়ে, এমন ধারা কত কি! নদীর বুকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিলাম; কিন্তু খুঁত তার কোথায়ও একটু পেলাম না! যত যাই, ততই নতুনের মোহ আমাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে চলেছিল। সে পথের আকর্ষণ যায় না ছাড়া—সে শুধু হাতছানি দেয়—কেবল ডাকে, কেবলই ডাকে।

ভারতের কৃষিসম্পদ—তিসি বা মসিনা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রবন্ধ

আদিকথা

তিসির কথা লোকে বহুদিন হইতে জানে, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে ইহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তিসি বর্ত্তমানে একটী মূল্যবান কৃষিলব্ধ বস্তু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঔষধ হিসাবে তিসি-ফলের বা দানার বিশেষ উল্লেখ আছে। প্রদাহে স্বেদ বা সেঁক দিবার জন্য তিসির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত। সুশ্রুত তিসির তেলকে সামান্য মৎস্য-গন্ধী, ঝাঁঝাল এবং কোষ্ঠশুদ্ধিসহায়ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তিসির দানার যত পুরাতন পরিচয় পাওয়া যায়, তুলনায় তন্তুর কথার সে পরিমাণ পরিচয় পাওয়া যায় না। মনু প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থাদিতে ক্ষুমা বা অতসী বস্ত্রেরও উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ক্ষুমাজাত বস্ত্র বা ক্ষৌম যে রেশম হইতে বিভিন্ন বস্তু তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে গাছ হইতে শণতন্তু পাওয়া যায়, তাহাতে বীজ ভাল হয়না এবং তন্তু-প্রধান বৃক্ষগুলি শীতপ্রধান দেশে বিশেষ ভাবে জন্মিয়া থাকে; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহাদের স্ফূর্ত্তি হয় না। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ বীজ জন্মে, সে তুলনায় তন্তু কিছুই পাওয়া যায় না; পুরাতন গ্রন্থাদিতে বীজ এবং তৈলের যেরূপ ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে তাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে—আবহমানকাল বীজবহুল বৃক্ষেরই চাষ হইয়া আসিতেছে। ক্ষৌমবস্ত্র বিশেষ প্রচলিত ছিল না; হয়ত তাহা রেশম হইতে প্রাপ্ত।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন শণের আদিবাস পারস্য উপসাগর এবং কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল। তথা হইতে ইউরোপের নানাদেশে শণ বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইউরোপ ও অন্যান্য শীতপ্রধান দেশে বীজের জন্য তিসির চাষ করা হয় না। সুতরাং মূল্যবান শণতন্তু পাওয়া না গেলেও ভারতবর্ষের এদিক দিয়া একটু বিশেষ সুবিধা আছে।

ভারতে তন্তু ও বীজের মিলন চেষ্টা

শণতন্তুর জগতের বাজারে বিশেষ দাম আছে, সে কারণে ভারতের মাটিতে প্রচুর বীজ জন্মিলেও এখানে তন্তুপ্রধান বৃক্ষের চাষ করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান হওয়ায় বা অন্য কোনও কারণে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৭৯০ হইতে ১৮১০ পর্য্যন্ত বিশ বৎসর একাদিক্রমে পরীক্ষা ও গবেষণা করা হইয়াছিল; ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ গবেষণা হয় এবং তখন চেষ্টা হয় যে বীজ ও তন্তুর মিলন একই বৃক্ষে সম্ভব না হইলে, কেবল তন্তু-প্রধান বৃক্ষের চাষ সম্ভব কিনা। দুঃখের বিষয় তাহাতেও কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ আশা করেন বীজবহুল বৃক্ষে যদিও উৎকৃষ্ট তন্তু পাওয়া যায় না, তথাপি যদি ঐ সকল বৃক্ষ হইতে তন্তু পৃথক করিয়া লওয়া যায়, তাহাতে স্থূলতম রজ্জু প্রস্তুত করা সম্ভব। শণজাত বলিয়া উহা পাটের দড়ি অপেক্ষা সমধিক দৃঢ় হইবে। কিছু না পাওয়া গেলেও ঐ শণ হইতে কাগজ তৈয়ারী হওয়া সম্ভব।

তিসির ফসল

শণতন্তু যখন ভারতের কৃষির কোনও প্রয়োজনীয় অংশ নহে, তখন আমরা পূর্ব্বে বীজের বিষয় আলোচনা করিতে পারি। পৃথিবীতে তন্তুর উৎপত্তি স্থান ও পরিমাণ সম্বন্ধে পরে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষে—আন্দাজ ৩৪ লক্ষ একর জমিতে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টন ফসল হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতে আছে ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার একর জমি অর্থাৎ মোট তিসি চাষের জমির শতকরা ৭৯·৭৫ ভাগ, আর করদরাজ্যসমূহে বাকী ২০·২৫ অংশ বা ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার একর জমি। ফসলের বেলা দেখা যায় বৃটিশ ভারতে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টন অর্থাৎ শতকরা ৮৫·৬৮, আর করদরাজ্যসমূহে ৫৫ হাজার টন বা শতকরা ১৪·৩২ ভাগ পড়ে। জমির অনুপাতে বৃটিশ ভারতে ফসল অনেক বেশী হইয়া থাকে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও ফসলের অংশ

বৃটিশ ভারতের মধ্যেও সকলস্থানে একই পরিমাণ হারে ফসল হয়না, তাহা বলাই বাহুল্য। স্থানের বিভিন্নতা হেতু প্রতি প্রদেশেই ফলনের তারতম্য আছে। জমির পরিমাণের তুলনায় যুক্তপ্রদেশে তিসির ফলন

খুব বেশী ; আবার মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে ফলন খুবই কম। নিম্নলিখিত অঙ্ক হইতে সহজেই একটী ধারণা করা যাইতে পারে :—

বৃটিশ ভারতে—

মোট জমি	২১	লক্ষ	১৩	হাজার	একর
মোট ফসল	৩	"	২৯	"	টন

তন্মধ্যে—

প্রদেশ	জমির পরিমাণ শতকরা	ফসলের পরিমাণ শতকরা
বঙ্গ	৬·৫	৫·০
বিহার ও উড়িষ্যা	২০·০	৩১·১
বোম্বাই	৪·০৯	৩·৬
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	৪০·১০	২২·৭
পঞ্চনদ	১·০৩	·৬
যুক্তপ্রদেশ	৩১·১০	৩৪·৬

জমি ও ফসলের যে পরিমাণ দেওয়া হইল, তাহা নিতান্ত আনুমাণিক বলিয়া মনে করিলেও ভুল হয়না। তিসির চাষ প্রায়ই অন্য কোনও ফসলের সহিত মিলাইয়া করা হয়, আবার কখনও কখনও অন্য তৈল বীজের চাষের জমির ধারে ধারে বেড়ার মত করিয়া গাছ দেওয়া হয় ; এই সকল কারণে তিসির চাষ সম্বন্ধে স্থিরভাবে কিছু বলা বড় কঠিন।

বিভিন্ন প্রদেশ ও উল্লেখযোগ্য জেলাসমূহ

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নদীয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জমিতে তিসি চাষ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ২৯,৯০০ একর। তাহার পরই মুর্শিদাবাদ, তাহাতে আন্দাজ ২৫'০০০ একর তিসি চাষ হয়। যশোহর, মেদিনীপুর, পাবনা, রাজসাহী, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেক তিসি জন্মিয়া থাকে।

বিহারে চম্পারণ জেলায় খুব বেশী জমিতে তিসি চাষ হয় (৯৫,০০০ একর) ; দ্বিতীয় গয়া (৭৪,০০০), তৃতীয় ভাগলপুর (৬৫,০০০)। সম্বলপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর জেলায়ও তিসি চাষের পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বোম্বায়ে বিজাপুরের স্থান প্রথম, সে জেলায় প্রায় ৫০,০০০ একর জমিতে তিসি চাষ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় আহম্মদ নগর, তৃতীয় নাসিক। সোলাপুর, ধারোয়ার প্রভৃতি জেলাগুলি তিসি চাষের জন্য প্রসিদ্ধ।

মধ্যপ্রদেশ ও বিরারের মধ্যে দ্রুগ, হোসাঙ্গাবাদ, বিলাসপুরের স্থান প্রায় একই। সওয়া লক্ষ হইতে দেড় লক্ষ একর জমিতে তিসি চাষ হইয়া থাকে। বলাঘাট, চন্দা, সগর, জব্বলপুর প্রভৃতি জেলাতেও প্রচুর তিসি উৎপাদিত হয়।

পাঞ্জাবে কাঙ্গড়া জেলা এবং যুক্তপ্রদেশে জলাওন (৪৪,৭০০ একর) প্রথম। গোরক্ষপুর, গোণ্ডা, এলাহাবাদ, বারইচ জেলাগুলিই তিসি চাষের জন্য প্রধান। বস্তি, বন্দা, ঝান্সীতেও প্রচুর তিসি চাষ হইয়া থাকে।

রপ্তানী

এত করিয়া তিসির হিসাব কেহই হয়ত রাখিত না যদি তিসির প্রয়োজনীয়তা না থাকিত। এই সামান্য তিসি ভারতবাসীর ব্যবহারে লাগিয়াও এক বৎসরে ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা (৪,৭৩,২২,২২৬৲) বিদেশ হইতে আনিয়াছে। পৃথিবীর বাজারে কোন্ বৎসর কত পরিমাণ তিসির প্রয়োজন হইবে স্থিরভাবে জানা না থাকায় চাষীরা মহাবিপদে পড়ে। ১৯৩৫-৬ সালে ভারত হইতে মোট ২ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকার (২,৬৫,৮৩২০০৲) তিসি, তেল ও খইল রপ্তানী হয়। পরবৎসর উহা হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। যদি ১৯৩৬-৩৭এর হিসাবে কেহ চাষ করে, তাহা হইলে হয়ত সে আরও টাকা পাইতে পারে ; কিন্তু যদি কোনও কারণে রপ্তানীর পরিমাণ কমে তাহা হইলে তাহার মহা বিপদ।

১৯৩৫-৩৬ সালে ২ কোটী ২১ লক্ষ টাকার বীজ, ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার তেল, আর ৪৪ লক্ষ টাকার খইল রপ্তানী হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রায় ৫ লক্ষ টন বীজ, মূল্য ৪ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা ; ১ লক্ষ ৩৫ হাজার গ্যালন তেল, মূল্য ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা—আর ৫০ হাজার টন খইল, সাড়ে ৩৪ লক্ষ টাকা মূল্যে ভারত হইতে রপ্তানী হইয়াছিল।

১৯২৬-৩৭ সালে আন্দাজ ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার তেল বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

রপ্তানীর মধ্যে তিসির বীজের অনুপাত শতকরা ৯০·২, খইল ৭·২, আর তেল ২·৫ ; অর্থাৎ লোকে যাহা লয় তাহা কাঁচা মাল, তাহা হইতে তাহারা নানা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিজেদের কাজে লাগায়, আর দেশ বিদেশ হইতে টাকা আনে।

পৃথিবীতে তিসি চাষের পরিমাণ

তিসির নানারূপ ব্যবহার থাকায় পৃথিবীর নানা দেশে প্রচুর তিসি চাষ হইয়া থাকে। সরকারী হিসাবে ধরা হয় মোট ফসলের পরিমাণ আন্দাজ ৩৬ লক্ষ টন। আর্জ্জেন্টাইনা তিসি চাষে সকলের অগ্রণী ; সেখানে মোট পরিমাণের শতকরা ৫৪·১ অংশ ফসল হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বিভিন্ন দেশের স্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে।

মোট ফসল ৩৬ লক্ষ টন

দেশ	শতকরা অংশ
আর্জ্জেন্টাইনা	৫৪·১
রুষগণতন্ত্র	২০·০
ভারতবর্ষ	১০·৬
যুক্তরাজ্য	৩·৬
উরুগায়	৩·৩
পোলণ্ড	১·৫

তিসি চাষেও ভারতের স্থান নিতান্ত মন্দ নয় ; কিন্তু তিসি বা তেল

হইতে যে সকল পণ্য প্রস্তুত হয়, তাহা যথারীতি ভারতে কিছুই হয় না। এ সকল বস্তু আমাদের আবার বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া আনিতে হয়।

ভারতের ক্রেতা

ভারতবর্ষের তিসি ইউরোপ আফ্রিকা প্রভৃতি সকল দেশেই কিছু কিছু গিয়া থকে। বীজ বিক্রয় হয় ৪ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকার; তন্মধ্যে—

শতকরা অংশের—

ইংলণ্ড লয়	৬৮·২
মিসর	৮·৮
অষ্ট্রেলিয়া	৬·২
যুক্তরাজ্য	৫·৭
জার্ম্মাণী	৪·৫
ফরাসী	২ ১
নেদারলণ্ড	২·০ ইত্যাদি।

খইল একা যুক্তরাজ্য (ইংলণ্ড) মোট—৮৮ ৫% লইয়া থাকে। মিসর ৪ ৯%, আর নেদারলণ্ড ৩২%। আর যাহা যায়, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

ফসল

বাঙ্গালা দেশে ভাদ্র আশ্বিন মাসে তিসি চাষ সুরু হইয়া থাকে। জমি যত গভীরভাবে কর্ষিত হয়, চাষের পক্ষে ততই মঙ্গলজনক। একর প্রতি ৪ হইতে ৬ সের বীজ হইলে যথেষ্ট হইয়া থাকে। বীজ রোপণে বিলম্ব হইলে ক্ষেত্রে জলসেচ করিতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু একবার "ফুল আসিবার" পর সামান্য মাত্র বর্ষায় ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। মাঘ ফাল্গুন মাসে সমস্ত গাছ কাটিয়া "খামারে" আনা হয় এবং আছড়াইয়া বা "বাড়ি পিটিয়া" বীজ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া হয়। প্রতি একরে ৬ হইতে ৮ মণ তিসি পাওয়া যাইতে পারে।

তিসির ব্যবহার

তিসির আদর তিসির তেলের জন্য। যদিও সামান্য পরিমাণ তিসি পুল্টিস্ বা সেঁক দিবার জন্য লাগে, কিন্তু তাহাই তিসির রপ্তানীর কারণ নহে। তিসির তেল আপনা হইতে "টানিক্" বা শুকাইয়া উঠে বলিয়া রঙের কাজে তিসির তেলের বহু প্রয়োজন। কখনও কখনও তিসির তেলের সহিত ধাতব লবণ, যথা লিথার্জ্জ (Litharge), রেড লেড (Red lead) এ্যাসিটেট, (Lead acetate), ম্যানগানিস্ ডায়োক্সাইড (Manganese dioxide) প্রভৃতি মিলাইয়া শীঘ্র শুকাইয়া যাইবার উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। রঙ এবং বার্ণিশের জন্য, এক রকম নরম সাবান, ছাপার কালি, অয়েল ক্লথ ও লাইনোলিয়ম (oil cloth, Linoleum) প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে তিসির তেলের একান্ত প্রয়োজন। অয়েল ক্লথ, লাইনোলিয়ম তিসির তেল না হইলে হওয়ার সম্ভাবনা নাই। লাইনোলিয়ম ও অয়েল ক্লথ ভারতবর্ষ হইতে বহু লক্ষ টাকা বিদেশে লইয়া যায়; সুখের বিষয়—আমাদের দেশেও অয়েল ক্লথ তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লাইনোলিয়ম অয়েল ক্লথ হইতে মূল্যবান এবং নানারকম রঙে চিত্রিত হওয়ায় অতি সুন্দর। তাহার ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বড় বড় দোকানের বা ধনী গৃহস্থের ঘরের মেঝেতে পাতিয়া রাখা হয়।

শণ ভারতবর্ষে অতি সামান্যই হইয়া থাকে; সুতরাং শণের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের নূতন কিছুই বিশেষ ভাবিবার নাই। সুতা বা সুতালি, দড়ি, দড়া, দৃঢ় চট, ক্যানভাস্ প্রভৃতি কার্য্যে শণ অদ্বিতীয়। তাঁবু, পর্দ্দা বর্ষাতি (water proof) প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজে অনেক সময় শণনির্ম্মিত কাপড়ই সমধিক উপযোগী। শণের পরিত্যক্ত অংশ মাল চালানের প্যাকিং প্রভৃতি কাজে বিশেষ লাগে। ফেল্ট (Fe't) নামক বস্তু তৈয়ারী করিতে, দৃঢ় কাগজ তৈয়ারী করিতে (যথা Greese proof butter pa er), সিগারেট মোড়া কাগজ প্রভৃতিতে শণ লাগে। বয়লার ঢাকিতে এক প্রকার বস্তু (Boiler-covering composition) করিতে শণের অংশ নিতান্ত কম নয়।

বিশুদ্ধ সেলুলোস্ (Cellulose)ও শণ হইতে পাওয়া যায় এবং সেলুলয়েডের নানা বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নকল সিল্ক বা Rayon বহু পরিমাণ তৈয়ারী হইয়া থাকে।

শণের কাঠিও কাগজের কলে, আস্তাবলে ঘোড়ার "বিছানা" করিতে, পশুখাদ্যরূপে এবং জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়।

তিসির খইল পশুখাদ্যরূপে যত ব্যবহার হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় সাররূপে। তিসির খইল অত্যন্ত তেজবান্ সার এবং কোনও কোনও চাষে বিশেষভাবে প্রয়োজন।

যাহারা জানে তাহারা শণের কোনও অংশ নষ্ট করে না, আর আমরা বিদেশে কেবল বীজ রপ্তানী করিয়া নিশ্চিন্ত। এখানেও কয়েকটী তেলের কল হইয়াছে, কিন্তু তাহা অধিকাংশই অবাঙ্গালী পরিচালিত।

শণের কথা

শণের ব্যবহার বলা হইল এবং ভারতে তাহা অধিক পাওয়া যায় না তাহা বলা হইয়াছে। শণ পৃথিবীতে মোট ৬৮ লক্ষ টন জন্মায়, তন্মধ্যে ৮০ ভাগ এক রুষ গণতন্ত্র দিয়া থাকে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন ১০০ মাপের জন্মিত, রুষে এখন সেখানে ১৭৭ পরিমাণের জন্মিতেছে। রুষ সকল কৃষির দিকে যেমন মনঃসংযোগ করিয়াছে, এদিকেও সে বিশেষ অবহিত হইয়াছে। যখন তাহার দেশের আবহাওয়া এ বিষয়ে অনুকূল, তখন সে এ সুযোগ ছাড়ে নাই। জগতে এখনও শণের বহু প্রয়োজন; কে জানে একদিন শণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া পাটের সমকক্ষ হইবে না? আবার শণ পাট অপেক্ষা বহুগুণ শক্ত; সেজন্য শণ দ্বারা পাটের কাজ সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু পাট দ্বারা শণের কাজ চলে না। অন্যান্য দেশের মধ্যে পোলণ্ড, লিথুয়ানিয়া, বেলজিয়ম, ল্যাটাভিয়া, জুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি স্থান শণ চাষের পক্ষে উপযোগী এবং জগতের শণের বাজারে, তাহারাও কিঞ্চিৎ বেসাতি করিয়া লয়।

কবে তুমি আসবে

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী এম-এ

(১৮)

এলাহাবাদে আসিয়া রমা দেখিল সে এক অদ্ভুত জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। বাড়ীতে একপাল লোক। তার উপর অতিথি আনাগোনার অন্ত নাই—বাড়ীখানা একটা হোটেল বলিলেই চলে। অপরেশবাবু ওকালতি করিয়া এলাহাবাদে নাম ও অর্থ দুই-ই যথেষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ী হইতে অতিথি ফিরিত না। এ সব বিষয়ে তিনি যেমন পুরাতন ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন, অনেক বিষয়ে তিনি আবার বর্ত্তমান প্রগতির সঙ্গে তাল দিয়া চলিতেন। পর্দ্দা বাড়ীতে প্রায় নাই বলিলেই হয়; চৌদ্দ বছরের মেয়ে তাঁর —লীলা নবম শ্রেণীতে জগৎতারিণী স্কুলে পড়ে। ছেলে —বড়টি বিলাত ফেরত সতীশ—ব্যারিষ্টার, বাপ প্র্যাক্‌টিস্ ছাড়িয়া দেওয়ায় তাঁহার স্থানে জাঁকিয়া বসিয়াছে—দ্বিতীয় যতীশ, অপরটি রতীশ। বাইশ বছরের একহারা ছোক্‌রা রতীশ, বি-এ পরীক্ষায় দুইবার ফেল করিয়া হঠাৎ তাহার খেয়াল হয় ব্যবসা করিবে। ইতোমধ্যেই কয়লায় হাজার তিনেক টাকা লোকসান দিয়া সম্প্রতি কাপড় ধরিয়াছে। পূর্ব্বের অভিজ্ঞতায় এবার প্রথমেই বড় দোকান ফাঁদিয়া বসে নাই; একটা কুলীর মাথায় মোট চাপাইয়া বাড়ী বাড়ী ফিরি করিয়া ঘোরে। এত বড়লোক বাপের ছেলে—লোকে ঠাট্টা করে—সে কাণ দেয় না। বাপ-ও মনে মনে আশীর্ব্বাদ করেন, উৎসাহ দেন, কিন্তু ছেলেকে রোদে পুড়িতে ও জলে ভিজিতে দেখিয়া একদিনের তরেও বলেন না 'একখানা টাঙ্গা নিয়ে ফিরি কর'। সতীশ কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিত 'ছোঃ'! অপরেশবাবু বিপত্নীক—সুতরাং সতীশের স্ত্রী নীরজাই সংসারের গৃহিণী। নীরজা পঞ্চবিংশ-বর্ষীয়া যুবতী—সুন্দরী সুশিক্ষিতা!—গৃহকর্ম্মকুশলা। স্বামীর মতো সাহেবিয়ানা নাই, তবে তাঁহার সঙ্গে পা ফেলিয়া না চলিয়াও তো উপায় নাই।

ইহা ছাড়া মামার শালা পিশের ভাই প্রমুখ বেকার দল এবং জ্ঞাতিসম্পর্কীয়া নিঃসহায়া খুড়ী পিশি মাসীর দলও বাড়ীতে কম ছিল না—তাহাদের আমাদের গল্পের জন্য প্রয়োজন নাই। শুধু এই বলিলেই চলিবে যে এ হেন বাড়ীতে ডিনারপার্টি হইতে আরম্ভ করিয়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন লক্ষ্মীপূজা সবই চলিত। অপরেশ জীবিত থাকিতে সতীশ ইচ্ছা করিলেও এর কোনোটাতে বাধা দিতে সাহস পাইতেন না, অবশ্য তাঁহার সাহেবিয়ানাতেও অপরেশ বাধা দিতেন না। সবার ছোটটি বলিয়া লীলা বাপের আদরের মেয়ে—সে বলে—"বড়-দা' সাহেবি-য়ানা করে যে কি সুখ পান জানি নে, দারুণ গরমে পাৎলা জামাটা পর্য্যন্ত গায়ে রাখতে ইচ্ছে হয় না—উনি দিনরাত হ্যাট, কোট, প্যাণ্ট পরেই আছেন"। অপরেশবাবু জবাব দেন, "সবারই প্রবৃত্তি এক হয় না মা, সবার সাফল্য ও সার্থকতার পথও এক নয় মা, ও সাহেবি-য়ানাই যদি পছন্দ করে তো করুক।"

আবার রতীশের সম্বন্ধে সতীশ যখন বলেন "ওর কিচ্ছু হবে না—ব্যবসা কর্ব্বেন—না শুধু পয়সা উড়ুবেন।" অপরেশ বাবু বলেন "ওড়াক না বাবা দু'চার পয়সা, ও বদ্‌খেয়ালে তো ওড়াচ্ছে না আর। সবাই যে ব্যারিষ্টার হবে, না তো M. A. পাশ করবে—তার মানে কি আছে?"

এম্‌নি ইহাদের সংসার। ইহার মধ্যে আসিয়া রমা ফাঁপরে পড়িল। তাহার উপর অপরেশবাবু কিছুতেই তাহাকে চাকুরী করিতে দিবেন না—বলিলেন, "আমার নতুন মা'টিকে কি চাকরী করতে পাঠাতে পারি? ছেলে ম'রে গেলে কোরো তো কোরো। তবে মা, পড়তে যদি চাও কলেজে ভর্ত্তি হয়ে যাও"। অগত্যা সে লীলার সঙ্গে এক গাড়ীতেই কলেজে যাতায়াত করিতে লাগিল।

অপরেশ তাহাকে পুত্রবধূ করিবেন এ আশঙ্কা বা আশায় পাছে বা তাহাকে খাটিয়া খাইতে দিতে গররাজী হইয়া থাকেন—এ আশঙ্কা সে প্রথমটাতে করিয়াছিল; কিন্তু এ ভয় দূর হইতে তাহার বেশী দিন গেল না। কেন-না অপরেশবাবু আকারে ইঙ্গিতে তো ঘুণাক্ষরেও একথা প্রকাশ করিলেনই না, এমন কি তাঁহার পুত্র যতীশও সেই যে ৫।৬ মাস হইল তাহাকে লইয়া আসিয়াছে তাহার পর আর



ঝড়ের পরে

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Ptg. Works

তাহার সঙ্গে যা কথাবার্ত্তা কহিয়াছে বোধ হয় আঙ্গুলে গুণিয়া শেষ করা যায়। আর সে কথা কহিবেই বা কি? পি-আর-এস-এর থিসিস্ শেষ হইয়াছে তো, তার এবার ঘুরিয়া বেড়াইবার বাই ধরিয়াছে। আজ কানপুর, কাল পাটনা, পর্শু লক্ষ্ণৌ—এম্নি করিয়া সে নিয়ত চক্রভ্রমণে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে এলাহাবাদে আসে। সে সময় যে কয় দিন থাকে নিজের ঘরখানিতে মৌরসী পাট্টা গাড়িয়া বসে—এমন কি সতীশের ড্রইংরুমে যখন পার্টি বসে বা গান জমে, তখন সে তরুণ তরুণী অভ্যাগতদের সে আসরে একবার মাত্র পদার্পণ করিয়াও তাহার কৌতূহল প্রকাশ করে না। মধ্যে মধ্যে বদ্ধদ্বার তাহার কক্ষের ভিতর হইতে একটা আধভাঙ্গা সেতারের বুকে—কখনো বেদনা কখনো আনন্দের গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া ঘরের বাহিরে তাহার রেশ পৌছাইয়া দেয় মাত্র। সঙ্গীতজ্ঞ রমা বুঝিত এই অদ্ভুত লোকটি আর কিছু জানুক না জানুক সেতারে একেবারে সিদ্ধহস্ত।

কাজের লোক সতীশ এই অকেজো ভাইটিকেও মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বিলাত পাঠাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সেদিন দেরাদুন যাত্রা-মুখে সে অপরেশ, লীলা, রমা, সতীশ, রতীশ—সবার সামনে বলিয়া গেল "বিলেত ফিলেত আমি যাবো না।" অপরেশবাবু মাথার টাকে হাত বুলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, সতীশ ভাইয়ের রকম দেখিয়া রাগিয়া কাঁই হইল, রতীশ ও লীলা উচ্চহাস্যে ফাটিয়া পড়িল, রমা অপরেশবাবুর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ভাবিতেছিল —কত কম কথা কয় এই লোকটি, অথচ যেটুকু বলে তাতে যে আর অন্যথা হইবার জো নাই তা স্বরের প্রত্যেকটি ধ্বনিতে টের পাওয়া যায়।

ইহার মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের এক অধ্যাপকের পদ খালি হইতে সতীশ এবার বাপের কাছে গিয়া বলিল "যতীশকে বলে দেখুন, এ চাক্‌রীটার জন্য যদি চেষ্টা করে। পি-আর-এস পেয়েচে, হয়েও যেতে পারে। Dean of the faculty of Science আমার বিশেষ বন্ধু—তাঁকে আমি বল্লে chanceও বেশ আছে।"

সেদিন যতীশ মাসেক পরে দেরাদুন হইতে ফিরিয়াছে। অপরেশ তাহাকে ডাকিয়া আরম্ভ করিলেন "সতীশ বল্‌ছি—" সব শুনিয়া মাথা নীচু করিয়া যতীশ বলিল, "আমায় চাকরী করতে বলবেন না।"

পার্শ্বোপবিষ্টা রমাকে উদ্দেশ করিয়া অপরেশ কহিলেন "ফ্যানটা খুলে দাও তো মা—বেশ। হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলে। চাক্‌রী না করতে চাও তো কি করবে? একটা কিছু তো করতেই হবে?"

যতীশ পূর্ব্ববৎ কহিল "সেটা এখনো ভালো করে ভেবে দেখিনি, যা হয় একটা কিছু করা যাবে।"

"যাই কর একটা তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলাই কি উচিত নয়? সংসারী লোকে এ বয়সে যথাসাধ্য উপার্জ্জনের চেষ্টাই করে। অবশ্য তুমি সংসারী হও নি, কিন্তু হবে তো একদিন।"

যতীশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার মুখ তুলিয়া বলিল, "আমি যদি সংসারী না-ই হই, তাতেই বা ক্ষতি কি? আমার বিবাহে ইচ্ছা নেই।"

এসব প্রসঙ্গের অবতারণা দেখিয়া রমার ইচ্ছা হইতেছিল উঠিয়া যায়, কিন্তু যে বইখানা সে অপরেশকে পড়িয়া শুনাইতেছিল তাহা একটা মধ্য পরিচ্ছেদে আসিয়া থামিয়াছে—সেটা শেষ না করিয়া উঠিয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা ইতঃস্ততঃ করিয়া সে বলিল "এখন বইটা কি থাকবে জ্যেঠামশাই?"

অপরেশ কহিলেন, "বই থাক। কিন্তু বোসো।—হ্যাঁ তোমার বিবাহে অনিচ্ছা। কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে একথা যখন একবার উঠেছিল তখন তো অনিচ্ছা প্রকাশ করনি।"

রমা ঘামিয়া উঠিতেছিল যে পাছে তাহার কথা এ প্রসঙ্গে উঠিয়া পড়ে! সেই কারণেই বৃদ্ধ তাহাকে বসিতে বলিলেন কি? তাহাও তো সম্ভব নয়, তাহার জ্যেঠামশাই এত অবিবেচক হইতে পারেন না। কিন্তু রমার অন্তর-কোণে এ কুণ্ঠার মধ্যেও একটা কৌতূহল উঁকিঝুকি মারিতেছিল, যে এই ক্ষ্যাপাটে লোকটি বাপের কাছে কি বলিতে চায়?

যতীশ বলিল—"তখন ভেবেছিলুম বে' করব, এখন নানা কারণে ইচ্ছা নেই।"

"আবার তো ইচ্ছা হতেও পারে, সেজন্যও উপার্জ্জনে অন্ততঃ একেবারে নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নয় বোধ হয়।"

"সে হয়, তখন দেখা যাবে; এত ভবিষ্যত ভেবে কি কায করতে সবাই পারে?—আমি অন্ততঃ পারিনে।"

কিছুক্ষণ সস্নেহে পুত্রের পানে তাকাইয়া থাকিয়া

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া অপরেশ কহিলেন "আচ্ছা এখন যাও, এ সম্বন্ধে আরো একটু ভালো করে ভেবে দেখো।"

যতীশ চলিয়া গেলে রমাকে লক্ষ্য করিয়া অপরেশ কহিলেন—"জানো মা এই যতীশটা একেবারে পাগল। তুমি হয় তো কিছু কিছু জানো, তোমায় ওকে দিয়ে একান্ত আপনার করে নেবার আমার ইচ্ছা ছিল। সেই জন্যই ওকে ওর M.A. পরীক্ষার পর তোমার বাবার পরামর্শে চক্রধরপুর পাঠাবো ভেবেছিলুম। ও অমনি ক্ষ্যাপা বলে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা ওকে অবশ্য বলিনি। কিন্তু তখন ও P. R. S.এর কথা নিয়ে এত মেতে গেল যে বল্লে, ক'লকাতা ছেড়ে ও কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু যাক—লোকে ভাবে এক, হয় আর। বলে যে বে' করবে না"—পরে একটু থামিয়া জানালা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া অস্ফুটে বলিলেন, "কি যে করবে ও, কে জানে।"

একটু পরে ফের রমাকে বলিলেন—"পড় মা পড়—Chapterটা শেষ করেই রেখে দে।···কিন্তু যাই হোক, এক পক্ষে ভালই হোলো—ওর হাতে পড়লে তোর দুর্গতি হোতো। কিন্তু মা—তোর বাবা স্বর্গে, এখন আর আমায় লজ্জা করলে চলবে না। সুরেশ লিখেছিল অন্য কোথাও তোর বে'র কি একটু সূত্রপাত হয়েছিল—তারা কি সে মরে যাওয়ার পর কোনো খোঁজখবর নিয়েছিল? শিবছাড়া উমাকে তো আর বেশী দিন রাখা উচিত নয়।"

রমা কহিল "না জ্যেঠামশাই, আপনার সামনে লজ্জা! সে কোথায় কি কথা উঠেছিল বটে—কিন্তু তা তখনই বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনিও যে বাবার মতো আমায় তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। তা হ'লে কলেজেই বা যাচ্ছি কেন?—লেখাপড়াটা শেষ করে তো নি—"

অপরেশ হাসিয়া কহিলেন—"বেশ খুব ক'ষে লেখাপড়া কর। এবার সুরু কর দেখি বইটা।"

(১৯)

কালের চাকা ঘুরিয়া চলে। ক্রমে দিনে দিনে মাস, মাসে মাসে বৎসর। থাকিয়া থাকিয়া এ বাড়ীর কল-কোলাহলের আবহাওয়া রমার সহিয়া গেল। সে মাসী-পিশিদের দলে মিশিয়া কখনো ব্রতকথাও শোনে, আবার সতীশের পার্টিরও সম্মান রক্ষা করে। কিন্তু সতীশ-নীরজার পার্টিগুলাকে অবলম্বন করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে কতকগুলি ছেলের যে স্তবগুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা রমাকে প্রথমটাতে পীড়া দিত। চক্রধরপুরে যে কাযের ক্ষেত্র সে পাইয়াছিল এখানে তাহা নাই; পরের বাড়ীতে থাকিয়া সে রকম ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লওয়াও এখানে মুস্কিল, বিশেষতঃ কলেজের নিয়মিত পড়া আছে। কাযেই চিত্ত-বৃত্তির অন্য কোনদিকে প্রসারণ সম্ভব না হওয়াতে ক্রমশঃ ঐ সব স্তবগুঞ্জন তাহাকে যে শুধু আর পীড়া দিত না তাহাই নহে, একটা ক্ষীণ আত্মপ্রসাদও ক্রমে সৃষ্টি করিত। কিন্তু কোনো ছেলেকেই বিন্দুমাত্র সে আশ্‌কারা দেয় নাই, বিজয়ের স্মৃতি তাহার অন্তর ছাইয়া আছে। সে যে অত বড় অপদার্থ, তবু সে তাহাকে ভুলিতে পারে না; এ হেন অপমানিত হইয়াও বুঝি ভুলিতে চায়ও না।

কিন্তু নিরন্তর এই স্তুতি-বাণী শুনিয়া শুনিয়া রমা নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন নিজের অন্তর-বাহিরের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে অনেকটা প্রলুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে বুঝিতেছিল সে পুরুষের কাম্য—আদরের আকাঙ্ক্ষার বস্তু। কিন্তু এ বাড়ীতে ঐ যে একটি পাগ্‌লা রাসায়নিক পণ্ডিত তাহার অস্তিত্বটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতে চায় না, ইহাতে সে যেমন বোধ করিত আশ্চর্য্য, তেমন বোধ করিত অপমান। এই দুইটা বস্তুর কোনটাই অবশ্য সে মানিতে চাহিত না কিন্তু অস্বীকার করিলেই তো আর সত্য মিথ্যা হইয়া যায় না।

ইহার মধ্যে যতীশ আর একটা ভাল চাকুরী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সতীশ চটিয়া নীরজাকে বলিতে-ছিলেন, "Jati is becoming a parasite on the family"—এমন সময়ে গয়া হইতে সদ্য-প্রত্যাগত যতীশ ব্যাগ হাতে—"বৌদি—" হাঁকিয়া সে ঘরে ঢুকিল। দাদার মন্তব্যটা তাহার কাণে গিয়াছিল। সে ঈষৎ হাসিয়া হাতের ব্যাগটা খুলিয়া দশখানা দশটাকার নোট নীরজার পানে বাড়াইয়া ধরিয়া কহিল—"নাও বৌদি—বিশ টাকা হিসাবে আমার পাঁচ মাসের খোরাক তোমায় দিলুম—এর মধ্যে আর 'parasite' বল্‌তে পারবে না। নাও গুণে নিও।"

নীরজা হাসিয়া ফেলিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া কহিল "যেমন দাদা তেমন ভাইটি, কেমন জবাব পেয়েচ?"

সতীশ সহসা একথার উত্তরে ওয়ালক্লকটার পানে

তাকাইয়া যেন চম্‌কিয়া বলিয়া উঠিলেন "By Jove—দশটা বেজে গেছে—কোর্টে আবার আজ—" সঙ্গে সঙ্গে কামরা হইতে অন্তর্ধান।

কি একটা কাযে রমা সে সময় ওঘরে আসিয়া দেখিল, বৌদি ও যতীশে বচসা হইতেছে ঐ একশোটা টাকা লইয়া। বৌদিও কিছুতেই লইবে না, যতীশও কিছুতেই ছাড়িবে না। অবশেষে নীরজা কহিল "আচ্ছা এ টাকা তোলা রৈল, তোমার বৌকে একদিন গওনা গড়িয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু হঠাৎ একমাসের মধ্যে এ টাকা পেলে কোথায় ?"

যতীশ হাসিয়া কহিল—"চুরিও করিনি, ডাকাতিও করিনি, যে কোনো রকমেই হোক রোজগারই করেচি—এ তো বিশ্বাস করবে। বাস্ তা' হলেই হল।"

সেদিন কি মনে করিয়া রমা বৈকালে এক পেয়ালা চা ও একটু মিষ্টি লইয়া নিজেই যতীশের ঘরে ঢুকিল। অন্যদিন লীলাকে দিয়া সে চা পাঠাইয়া দেয়—কেন-না যতীশ দলে ভিড়িয়া চা'য়ের আসর জমায় না। সেদিন লীলা কাছে ছিল না বলিয়া ডাকাডাকির পর্ব্ব এড়াইবার জন্য রমাই অগ্রসর হইয়া গেল।

যতীশ কি লিখিতেছিল ; তাহার পানে চোখ তুলিয়া বলিল—"আপনি যে !—চা ?—আচ্ছা রাখুন।" টেবিলের উপর হইতে কাগজের রাশ সরাইয়া সে এক কোণায় একটু জায়গা করিয়া দিল।

"লীলাকে কাছে পেলুম না। কিন্তু বিকেল বেলা ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে ব'সে ব'সে কি সব লিখে যাচ্চেন বলুন তো—ধন্য মানুষ আপনি।"

"হুঁ—" বলিয়া এক চুমুক চা খাইয়া সে পুনরায় লেখায় মন দিল। রমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইতে তাহার চোখ পড়িল টেবিলের উপর একখানা খোলা চেক্-এর উপর। কোন অর্থনীতি-পত্রিকার সম্পাদক যতীশ রায়ের নামে দুই পাউণ্ডের চেক পাঠাইয়াছে। যতীশের টাকা যে কোথা হইতে আসে তাহা বুঝিতে রমার বাকী রহিল না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ যতীশ একবার কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া রমাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিল—"বাঃ—আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন যে"—এবং দাঁড়াইয়া বলিল—"কোনো কায আছে কি ?"

"নাঃ"—বলিয়া রমা বাহির হইয়া একটু মুচকি হাসিয়া ভাবিল—কায ভিন্ন এ লোকটির আর কোন কথা নেই।

ইহার দিন পনের পরে বৈজ্ঞানিকটি এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। সেদিন রমা দরোজা ভেজাইয়া একা এস্রাজটা বাজাইতেছিল। বাড়ীশুদ্ধ কেউ নাই—কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছে—কেবল অপরেশ তাঁহার ঘরে দুপুর বেলা ঘুমাইতেছেন। এমন সময় চট্‌পট শব্দ করিয়া যতীশ তালা খুলিয়া তাহার ঘরে ঢুকিল। বাহির হইবার সময় সে সর্ব্বদা ঘরে তালা দিয়া যাইত।

যতীশের আওয়াজ শুনিয়া একবার রমা ভাবিল বাজনা বন্ধ করে, আবার ভাবিল—কেন ?—এতদিন পরে নিরালা বাড়ীতে আজ যদি একটু সুযোগ মিলিয়াছে তো সে তাহা ছাড়ে কেন ? তা ছাড়া, যতীশ নিজে গুণী লোক, যদি সে কাণ পাতিয়া তাহার বাজ্‌নার মনে মনে একটু তারিফ করে—এ কল্পনাটাও বিশ্রী লাগিল না। এস্রাজের তারে মল্লারের সুর কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সে যন্ত্রটা ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া তাহার টেবিলটা গোছাইতেছে, এমন সময় ভেজানো দরোজার বাহির হইতে যতীশ কহিল "আমি একটু আসতে পারি কি ?"

আজ চৌদ্দ মাস হইল রমা এ বাড়ীতে আসিয়াছে, কিন্তু যতীশ একদিনের তরে তাহার সঙ্গে যাচিয়া কথা কয় নাই—এই প্রথম। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া রমা ঘরের দরোজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া বলিল 'আসুন।'

রমার কক্ষে চেয়ার ছিল না। তক্তপোষের অল্প দূরেই একটা টেবিল। একটা মাদুর বিছাইয়া রমা কাজ কর্ম্ম করিত। সুতরাং সে নিজে দাঁড়াইয়া তক্তপোষটার পানে ঘাড় কাত করিয়া বলিল 'বসুন'।

যতীশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বসিল না। টেবিলের উপরের একখানা বই নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আপনার বাজনায় কিন্তু চমৎকার হাত, কিন্তু কৈ এর আগে তো কখন শুনি নি।"

রমার সুগৌর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া যতীশই ফের

বলিল—"কিন্তু যাক্, সেজন্য আমি আসি নি। আমি—আমি এসেচি আর একটা কথা বল্‌তে।"

রমা প্রশ্ন করিল—"কি?"

"কাল লীলার কাছে শুনলুম বাবা কিনা—ইয়ে—আমার বে' দেবার জল্পনা কচ্চেন এবং তাও"—হাসির চেষ্টায় একটা উচ্চ আওয়াজ করিয়া—"দুনিয়ার আর কেউ নয়—আপনার সঙ্গে। আমাকে আপনার কখনই পছন্দ হতে পারে না তা জানি, কিন্তু লজ্জায় মুখটি বন্ধ করে থেকে হয়তো আপনি আপত্তি নাও করতে পারেন এই ভয়ে কাল থেকে ভেবে ভেবে আপনাকে বল্‌তে এলাম—এমনি করে লজ্জার খাতিরে নিজের সর্ব্বনাশ করবেন না। বাবাকে স্পষ্ট বলবেন আমায় বে' করা আপনার পোষাবে না।"

বলিয়া বজ্রাহতবৎ স্তব্ধ রমাকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া যতীশ বাহির হইয়া গেল। লীলার কাছে এ খবর পাইয়া অবধি মূর্খ পণ্ডিতটি অনেক ভাবিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ এই—বিবাহ সে করিবে না; কিন্তু প্রত্যাখ্যানটা তাহার তরফ হইতে আসার চাইতে রমার তরফ হইতে আসাই ভাল;—কেননা সে প্রত্যাখ্যান করিলে পিতার অসন্তুষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও রমাও কতকটা অপমানিত ও অবজ্ঞাত বোধ করিতে পারে। তাহা ছাড়া ইহা সে এক প্রকার স্থির ঠাওরাইয়া লইয়াছিল, রমার মত অপরূপ সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে তাহার মত অদ্ভুত লোককে কিছুতেই পছন্দ করিতে পারে না। সুতরাং একথা গিয়া তাহাকে বলিবে ইত্যাদি। কিন্তু এক তরফ বিচার করিতে গিয়া এতবড় পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক একবার ভাবিয়া দেখিল না যে একথা যদি সত্যই ওঠে, আশ্রিতা মেয়েমানুষ হইয়া তাহার জ্যেঠামশাইর একান্ত কামনাকে এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করা রমার পক্ষে কিরূপ শক্ত হইতে পারে।

সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রণ বাড়ী হইতে ফিরিয়া লীলা রমাকে লইয়া পড়িল। সেদিন রবিবার, পরদিনও কি একটা পর্ব উপলক্ষে স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল।

লীলা কহিল "ভাই রমা-দি, তোমায় একটা কথা আর না বলে পাচ্চি নে, মেজদা'র সঙ্গে যে তোমার বে' হবে।"

রমা ভ্রূ কুঁচকাইয়া রাগের ভান করিয়া কহিল—"কি হবে?"

"বে' গো—বে'—উদ্বাহ—উদ্বন্ধন! তা সত্যি মেজ্‌দা যে পাগ্‌লা, ওর সঙ্গে বে উদ্বন্ধনের সামিল বৈ কি!"

"যা'তা' বোকোনা লীলা"—

"সত্যি ভাই, বাবা কাল আমায় বল্লেন—'আচ্ছা লীলা, যতীশের সঙ্গে রমার বে' হলে বেশ হয় না? ওর মত উড়ো ছেলের মন বাঁধতে হলে রমার মত মেয়ে চাই। তুই এ সম্বন্ধে যতীশের মত জানতে পারিস্ লিলি—কোনো পাকে চক্করে? তোর মা আজ থাকলে সেই এ কায করত, তা তোরও তো প্রায় সতের বয়েস হোলো—দেখিস্ না একবার তোর দাদাকে এ কথার আঁচ দিয়ে।' তার পরে আরো বল্লেন—'রমার সঙ্গে এ নিয়ে কিন্তু এখনি ইয়ার্কি কত্তে যাস্‌নে।' কিন্তু ভাই, কাল থেকে আমি আই-ঢাই কচ্চি, তোমায় একথা না বলে কিছুতে পাল্লুম না।"

রমা এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—"আসল কথা হচ্চে এই যে তিনি আমায় ভালোবাসেন বলে একান্ত আপনার করে রাখতে চান। কিন্তু আমার কথা উঠ্‌লে তাঁকে বোলো যে এ বিয়ে কখনোই—না থাক্ কিছু বলবার দরকার নেই, তিনি আপনিই সব বুঝে নেবেন ক্রমে।"

"কখনোই—মানে 'কখনোই হতে পারে না' ত? কেন রমা-দি? এবার তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করব, আমার ভাইকে অপছন্দ করা? কেন—অত বড় বিদ্বান্—অমন সুন্দর চেহারা—তা হোলোই বা কালো?—অমন—"

"থাম থাম লিলি—অস্বীকার কচ্চে কে তোমার দাদা রূপে কার্ত্তিক বিদ্যায় গণেশ, কিন্তু তাই বলেই তাকে বে' কত্তে হবে বা তিনিই বে' করতে চাইবেন তার মানে কি আছে?"

লীলা এবার হাসিয়া গড়াইয়া কহিল, "ও—তাই কারণ, মানে—শেষেরটাই হচ্চে আসল কারণ? তা তোমায় অভয় দিচ্চি রমা-দি, কাল একথা পাড়তেই মেজ্‌দা প্রথমটাতে যেন কাণই দিলেন না, তারপরে যেমন তেড়ে মারতে এলেন তাতে আমার আর সন্দেহ নেই তাঁর ভেতরে ভেতরে লোভ হয়েচে—মুখফুটে বলতেই লজ্জা। ওসব indifferenceএর ভান এর মানে আমি বুঝি।—"

রমাও এবার হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—"তা আর বুঝবে না কেন?—বিনয় তোমায় যে ডেঁপো করে তুলেচে!"—তারপর একটু রাগতস্বরে ফের বলিল, "কিন্তু লিলি, যা বোঝ না, তা বোঝ মনে করে এত বড়াই কোরো না।"

বিনয় এলাহাবাদের এক ব্যারিষ্টারের ছেলে—বাইশ বছর বয়েস, এম্-এ পড়ে, সতীশের পার্টিতে যাতায়াত করে এবং লীলার সঙ্গে প্রেম করে। বিবাহের পাত্র ও চরিত্র হিসাবে ছেলেটি মন্দ নয়। এখনো ব্রীফলেস্ ব্যারিষ্টার হলেও পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে। ভবিষ্যৎ আছে।

লীলা ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, "নাঃ, বুঝিনা কিসের? আমার বয়েস সতের বছর হোলো জান—বাবা বলেচেন—"

রমা মিটিমিটি হাসিয়া শুধাইল—"বিনয়ের অর্থহীন ভাবে ভরা ভাষা শুনে তুই বুঝি খুব indifference দেখাস্?"

"যাঃ—ও"—বলিয়া লীলা এবার ছুটিয়া পালাইল। রমা পিছন হইতে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল—"কেমন, আমার পিছনে আর লাগতে আসবে?"

লীলা চলিয়া গেলে সামনের আর্সিটাতে রমার দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল! বক্ষের অঞ্চল অসংবৃত, আঁটসাট জামা ভেদ করিয়া সর্বাঙ্গের যৌবন যেন উছলিয়া পড়িতেছে। দেহ তাহার কাঁটা দিয়া উঠিল। বাইশ বছর ধরিয়া বসন্ত তাহার দেহমনের দুয়ার গোড়ায় আনাগোনা করিয়াছে—কিন্তু চক্রধরপুরের শেষ কয়টি মাস ছাড়া—সে যেন অস্ফুট পদসঞ্চারে। তারপর আসিল ব্যথা—সে নিদারুণ বেদনায় কতদিন তো দেহের পানে তাকাইবার ফুরসৎ ছিল না। সমস্ত পুরুষ জাতি তাহার কাছে হইয়া উঠিয়াছিল যেন ধূর্ত্ততার প্রতীক! কিন্তু কালের মোহময় প্রক্ষেপ সে বেদনার তীব্রতা হরিয়া লইয়াছে। আজ আবার যৌবন তার দাবী জানাইতে চায়। কিন্তু কি সে দাবী?—তা সে নিজেই কি জানে?—কেউ যে রহস্যের মর্ম্ম জানিল না সেই বা জানিবে কি করিয়া? রমা অস্ফুটে আবৃত্তি করিল—

"আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয় বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কি দেয় তাতে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কি কথা ওঠে মর্ম্মরিয়া বকুল তরু পল্লবে
ভ্রমর ওঠে গুঞ্জরিয়া কি ভাষা।
ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে
নির্ঝরিণী বহিছে কোন পিপাসা—"

অজানিত একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়া আসিল। মনে পড়িল বিজয়ের কথা। কত তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথা—এখন মনে করিলে লজ্জাবোধ হয়—এমন কি অপমানও বোধ হয়—কিন্তু অপমান ভুলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্যও যে চিত্ত উন্মুখ হইয়া ওঠে নাই তাহা নহে। হোক না বিজয় বিবাহিত, তবু তাহারই জন্য তো প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া সংসার সমাজের গঞ্জনা মাথায় লইতে অগ্রসর হইয়া সে আসিয়াছিল। এই দুর্নিবার সাহস—হোক না তাহা দুঃসাহস—ইহাই কি তাহার প্রেমের একটা পরিচয়ও নয়? নিজের বিবাহের কথা রমাকে বিজয় লুকাইয়াছে, কিন্তু রমার প্রত্যাখ্যান পাইবার আশঙ্কাই কি এ লুকোনোর কারণ নয়? বিজয় রমাকে ভালোবাসিত, থাক্ না তাহার চরিত্রে হাজার দুর্ব্বলতা—তবু সে ভালো তো বাসিত। থাক, বিজয়ের স্মৃতি তাহার মনে অক্ষয় হইয়া থাক্।

কিন্তু আজ আঠার মাস পরে মর্ম্মরের মতো শুভ্র অথচ কঠিন এই নির্লিপ্ত লোকটির পাশে বিজয়ের ছবি ভাসিয়া উঠিলে বিজয়ের জন্য হয় করুণা, যতীশের জন্য হয় শ্রদ্ধা। অজানিতে প্রেম যে কখন গিয়া করুণায় পর্য্যবসিত হইয়াছে সে জানে না। অথচ চিত্ত তাহা স্বীকার করিতে চায় না। সে যে মনে প্রাণে বিশ্বাস করিত "Love is not love which alters when its alteration finds"—অন্তরের এ অসম্ভব পরিবর্ত্তন সে আজ অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিবে কি করিয়া? ...তা ছাড়া কোনো পুরুষ মানুষকে রমা ফের শ্রদ্ধা করিতে পারিল?—সেও এক আশ্চর্য্য! কিন্তু বিরাট্ বীর্য্যবান্ নিরাসক্ত পুরুষকে বন্দী করিবার জন্যই যে প্রকৃতির চিরন্তন প্রয়াস—সৃষ্টির এ গোপন কথা বেচারী রমার জানা ছিল না। তাই সে বুঝিত না, কেন যতীশের কঠোরতা, ছন্নছাড়া ভাব—এমন কি অবহেলাও তাহাকে এমন করিয়া টানে।

ইহার মধ্যে রায় পরিবারে হঠাৎ এক বিপৎপাত হইয়া গেল। একদিন বাড়ী ঘেরাও করিয়া পুলিশে যতীশ রায়কে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদ্রোহিতার আসামী করিয়া চালান দিল। মামলায় সতীশ ও আরো ৪।৫ জন ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষে লড়িয়া কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। যতীশের পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাবাসের হুকুম হইয়া গেল। পুলিশ তাহার ঘরে অনেক চিঠি ও কাগজপত্র পাইয়াছিল; আর তাহার ঘরে পাওয়া যায় একটা revolver ও কিছু কার্ত্তুজ। ইহার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহা ফলিল।

(ক্রমশঃ)

এলাহাবাদের বাঙ্গালী কীৰ্ত্তি

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রবন্ধ

দোলের ছুটিতে এলাহাবাদ যাচ্ছিলুম। প্রত্যূষে যখন ঘুম ভাঙলো তখন পাশের বেঞ্চির এক ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মোটা সোটা চেহারা, ভুঁড়ি আছে, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথায় টিকি, দেহের তুলনায় মাথাটা বরঞ্চ একটু ছোট, মুখে বসন্তর দাগ—এক কথায় বল্‌তে গেলে বলা যায় যে চেহারাটা আদৌ 'স্মার্ট' নয়। কিছুক্ষণ পরেই তিনি ট্রেণের জান্‌লার ধারে ব'সে নিমের দাঁতন সহযোগে দন্তচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হলেন। হাতে আর কোন কাজ



স্বরাজ-ভবন--এলাহাবাদ শিল্পী—লেখক

না থাকায় আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপকা শুভ নাম?'

নিবেদন করলুম।

পুনরায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপকা শুভ নাম?'

উত্তরে যে তিনি শুধু নিজের শুভনামটি বল্‌লেন তাই নয়, আরো বললেন যে তিনি পাটনা হাইকোর্টের ব্যবহারাজীব, অপি চ বিহারের লেজিস্‌লেটিভ অ্যাসেম্বিলির সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন—সম্প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল কর্ত্তৃক দিল্লীতে আহূত কন্‌ভেনশানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, এখন পাটনায় ফিরে যাচ্ছেন।

একজন এম-এল-এ-এর এত নিকট সান্নিধ্য লাভ ক'রে গৌরব অনুভব করলুম। মনে হ'ল এঁর কাছ থেকে অনেক রাজনৈতিক সমস্যার সদুত্তর শুনতে পাওয়া যাবে। কংগ্রেস তখন office acceptance policy ভোটাধিক্যে গ্রহণ করেচে—সুতরাং গরম গরম সেই প্রশ্নটাই মনের মধ্যে ধোঁয়াচ্ছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম, আপনাকে যদি ভোট দিতে হ'ত তবে আপনি office acceptanceএর পক্ষে দিতেন, কিম্বা বিরুদ্ধে দিতেন?

বল্‌লেন, পক্ষে দিতুম।

প্রশ্ন তুল্‌লুম, কিন্তু কংগ্রেস পূর্ব্বাপর ব'লে এসেচে যে তারা constitution ধ্বংস করবে, এখন যদি তারা সেই শাসনযন্ত্র চালাতে চায় তবে পূর্ব্বেকার কথার সঙ্গে একটু অমিল বোধ হয় না কি?

ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, তা' বটে।

অতএব বুঝলুম এ-রকম মানুষের সঙ্গে ও-প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। হয় এ-সব প্রশ্ন সম্বন্ধে ওঁর মনের কোন সজাগতা নেই, নয় ত ইচ্ছে করেই উনি এ বিষয় আলোচনা করতে চান না। অতএব প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করাই ভাল।

জিজ্ঞাসা করলুম, পাটনায় বাঙ্গালীর সংখ্যা কত?

এম-এল-এ বল্‌লেন, 'অগণিত্ হায়'—বলেই তিনি ঘন ঘন দাঁতনের নিষ্ঠীবন ট্রেণের কামরার বাইরে ত্যাগ করতে লাগলেন। অগণিত বাঙ্গালীর পাটনায় উপস্থিতি তিনি যে মনে মনে পছন্দ করেন না সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না।

ইতিমধ্যে ট্রেণ এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছে গেল। বেলা তখন ৯টা। দাঁতনরত এম-এল-এ-কে ট্রেণে রেখে আমি নেমে পড়লুম।

হপ্তা খানেক এলাহাবাদে ছিলুম। এই সপ্তাহবাসের ফলে এবং এলাহাবাদের বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরাঘুরির থেকে আমার মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েচে—সেটি হচ্চে এই যে বাঙ্গালীর প্রভাব এলাহাবাদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। অনেক রাস্তায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেচি পথচারীদের মধ্যে এক বাঙ্গালী ছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের যেন নজরেই পড়ে না। আমার মনে হয় বাঙ্গালীরাই যেন এলাহাবাদকে গ'ড়ে তুলেচেন। বাংলার বাইরে অপর কোন বড় সহরে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা এত বেশি ব'লে আমার ধারণা নাই।

এলাহাবাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি গ'ড়ে তুল্‌তে যাঁরা সাহায্য করেচেন, তাঁদের মধ্যে প্রথম নাম করবো পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্যের। বেণীমাধবের মাতামহ রাজীব-লোচন তর্কালঙ্কার দেশ ছেড়ে এলাহাবাদে বাস করতে আসেন। বেণীমাধব যুক্তপ্রদেশ সেক্রেটারিয়েটের Apptt. Branch এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তখনকার দিনে এ চাকরি ছোট ছিল না। কিন্তু সেই চাকরি করেও তিনি যে কি ভাবে নিজের ব্রাহ্মণোচিত নিষ্ঠা বজায় রেখেছিলেন সেইটি প্রণিধান করবার যোগ্য। বেণীমাধব নিয়মিতভাবে নিজগৃহে প্রতিষ্ঠিত দামোদরের সেবা করতেন। প্রত্যহ আপিস থেকে এসে কি শীতকাল কি গ্রীষ্মকাল পুনরায় স্নান করতেন। তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না—দু'টি মেয়ে। মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বাবা, তুমি রোজ আপিস থেকে এসে স্নান কর কেন? উত্তরে বলেছিলেন—কি জানিস্ মা, অনেক সায়েব সুবো আসে, আমার সঙ্গে আপিসে হ্যাণ্ড শেক্ করে। তার পর আমি কি না নেয়ে দামোদরের ভোগ দিতে পারি? আমার যেন কেমন ঘেন্না ঘেন্না করে।

এই দামোদরের জন্তেই তাঁর চাকরির আরো উন্নতি যা' হ'তে পারতো তা' হ'ল না। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বলেছিলেন যে তিনি যদি নাইনিতাল যান তবে তাঁরা তাঁকে Asstt. Secretary নিযুক্ত করবেন। কিন্তু দামোদরকে ছেড়ে তিনি এলাহাবাদ ত্যাগ করতে রাজী হলেন না।

পেন্‌সান নেওয়ার পরও তিনি বছর কুড়ি বেঁচে ছিলেন। পেন্‌সান মঞ্জুর হ'লে তিনি গবর্ণমেণ্টকে জানান যে তিনি জীবনে কখনো কারোর দান প্রতিগ্রহ করেন নি। সুতরাং বিনা পরিশ্রমে তিনি গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পেন্সান গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত বোধ কচ্চেন। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁকে কোন কাজ ক'রে দিতে অনুমতি করেন তবে তার পরিবর্ত্তে তিনি পেন্সান নিতে পারেন। প্রত্যুত্তরে গবর্ণমেণ্ট তাঁকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেছিলেন। এই দান প্রতিগ্রহ করার বোধ তাঁর এত তীক্ষ্ণ ছিল যে নিজের ছোট ভাইয়ের বাগানে উৎপন্ন ফলমূল শাকসব্জিও কোন দিন



এলাহাবাদ হাইকোর্ট শিল্পী—অনিল মিত্র

তিনি গ্রহণ করেন নি। মৃত্যুর ১৩ দিন আগে পর্য্যন্ত তিনি স্বপাক খেয়েছেন। নিজে রান্না ক'রে দামোদরকে নিবেদন করার পর সেই প্রসাদ গ্রহণ করা ছিল তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস। নিজের মেয়ের হাতের রান্নাও তিনি গ্রহণ করতেন না। মৃত্যুর ১৩ দিন আগে তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই ত্রিবেণীসঙ্গমে তাঁর দেহান্ত ঘটে। এখনো "পণ্ডিত মাধো"জীর নাম করলে এলাহাবাদের অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায় যুক্তকরে তাঁর উদ্দেশে নমস্কার করে। তিনি সারাজীবন ধ'রে অপামর সাধারণ সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ ক'রে গেছেন এবং জীবনের পরপারে গিয়েও আজ পূজিত হচ্চেন। শুন্‌তে পাওয়া যায় তাঁর এক আত্মীয়ার বিয়ের তারিখ মুসলমানদের এক পর্ব্বদিনে পড়েছিল। তার ফলে মুসলমানেরা আপত্তি করেছিল যে

তারা বিবাহের বরযাত্রী পার্টিকে আলো বাজি বাজ্‌না প্রভৃতি নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে মসজিদের সাম্‌নে দিয়ে যেতে দেবে না। এই কথা শুনে বেণীমাধব নিজে গিয়ে সেই মসজিদের সাম্‌নে দাঁড়ালেন এবং বল্‌লেন—আমার আত্মীয়ার আজ বিয়ে, আর এই দিনটি ছাড়া এ বছর আর দিন নেই। আমার আত্মীয়ার বিয়েতে বাজি বাজ্‌না হবে না এ হ'তে পারে না। বলা বাহুল্য কেউ আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করলে না। শোভাযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে পার হ'য়ে গেল।

তাই মনে হয় বেণীমাধবের গোঁড়ামি এবং ছুঁৎমার্গের মধ্যে যুক্তিই বা ছিল কতটুকু, আর কতটাই বা ছিল অতি-নিষ্ঠার অন্ধ অনুশাসন—সে বিচার আজ নয়। আজকের দিনে যখন একদিকে অনাচারের এবং স্বৈরা-চারের ঘূর্ণাবর্ত্তে সমাজ আচ্ছন্ন, আর একদিকে কুটিল যুক্তিবাদের জটিল জালে বুদ্ধি উদ্‌ভ্রান্ত, তখন বেণীমাধবের মত ব্রাহ্মণের জন্মগ্রহণ আর সম্ভব নয়। কিন্তু বেণীমাধবের চরিত্রের যে সত্যটুকু আজ পূজা পাচ্চে সে তাঁর গোঁড়ামি নয়, সে হচ্চে তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি আন্তরিকতা, যার ফলে তিনি তাঁর ৬০।৭০ হাজার টাকার যাবতীয় সম্পত্তি দামোদরের সেবার জন্য উৎসর্গ ক'রে গেছেন।

বেণীমাধবের ছোট ভাই ছিলেন মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য। এঁর নাম এলাহাবাদে তাদৃশ অপরিচিত নয়। কেন না ইনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং এঁর বহু বাঙ্গালী এবং অ-বাঙ্গালী ছাত্র আজ বর্ত্তমান। এমন লোক এখনো



মিওর কলেজ—এলাহাবাদ শিল্পী—অনিল মিত্র

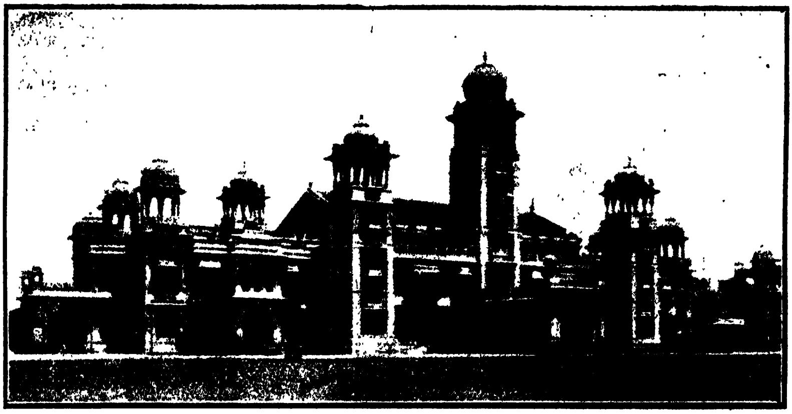
আছেন যাঁরা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে আদিত্যরামের পায়ের ধুলো নিতে দেখেচেন। আদিত্যরাম ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় খুব কৃতী ছিলেন এবং বরাবর বহু মেডেল এবং পুরস্কার পেয়ে এসেচেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে এম-এ পাশ ক'রে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রবেশিকা থেকে সুরু ক'রে এম-এ পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃতের পরীক্ষক থাক্‌তেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি কিছুকাল প্রোঃ-ভাইস-চেন্সেলার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী এবং স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতো। গৃহস্থাশ্রমে থেকেও তিনি তপস্বীর ন্যায় থাক্‌তেন। তিনি যেদিন 'মহামহো-পাধ্যায়' উপাধি লাভ করলেন সে দিন বেণীমাধব আদিত্য-রামকে কোলে বসিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন। বল্‌লেন, তুই আমার সেই আদু, তুই আজ মহামহো-পাধ্যায় হয়েছিস্! দুই ভাই-য়ের মধ্যে কি নিবিড় সৌহার্দ্দ্য এবং প্রীতিই যে ছিল!

আদিত্যরামের একমাত্র পুত্র সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য। বিপত্নীক হওয়ার পর আদিত্যরামের ইচ্ছা সত্ত্বেও সত্যব্রত আর দারপরিগ্রহ করেন নি। ইনি অবৈতনিকভাবে অনেক দিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতা করেছেন। সত্যব্রতর সন্তানাদি না থাকায় আদিত্যরাম নিজের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি গঙ্গাতীরের ভদ্রাসন প্রভৃতি সমস্তই দান করে গেছেন। এই অর্থ থেকে একটি সংস্কৃত পাঠশালার সমস্ত খরচ, তার ছাত্রদের ভরণপোষণের ব্যয় ইত্যাদি নির্ব্বাহ হ'য়ে থাকে। এই পাঠশালার নাম শিবশর্ম্মা নামক একজন নেপালী সাধুর নামানুসারে দেওয়া হয়েচে। উক্ত সাধু শেষ জীবনে প্রয়াগের গঙ্গাতীরে আদিত্যরামের দারাগঞ্জের বাড়ীর কাছেই বাস করতেন। আদিত্যরাম স্বীয় জননী ধন্তগোপী

দেবীর নামানুসারে একটি লাইব্রেরীও স্থাপন ক'রে গেছেন। ডাঃ গঙ্গানাথ ঝার মেধা মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরামই আবিষ্কার করেছিলেন। বেণীমাধব এবং আদিত্যরাম সম্বন্ধে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো। দেশমাতৃকাকে সম্বোধন ক'রে পণ্ডিত মদনমোহন বল্‌চেন, "মাতঃ! ফির পণ্ডিত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য অউর পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যকে সমান গৃহস্থ, তপস্বী, ত্যাগী, ভগবদ্ভক্ত, দেশভক্ত, হিন্দুধর্ম্ম অউর হিন্দুজাতি কে প্রেমী, ধর্ম্ম মে দৃঢ় পুরুষো কো জন্ম দেও।"

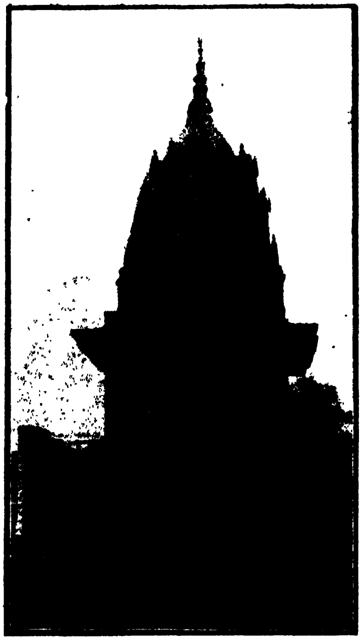
বেণীমাধব এবং আদিত্যরামের পর জাষ্টিস্ সার প্রমোদাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজিয়তি করে গেছেন। শোনা যায় আইন সম্বন্ধে তাঁর এতদূর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ছিল যে তাঁর প্রদত্ত কোন রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল ক'রেও তার কোন বদল হয় নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ললিত-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও জজ ছিলেন এবং একই সময়ে পিতা পুত্রে জজিয়তি করেছেন; অতএব তাঁদের বাড়ীকে জজের বাড়ী বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। প্রমোদাচরণের স্ত্রীর বহু প্রশংসা শুন্‌তে পাওয়া যায়; তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী ছিলেন এবং তাঁর জন্যেই বাইরে ইংরাজি চালচলন বাবুর্চ্চি খানসামায় প্রাদুর্ভাব হ'লেও অন্তঃপুরে হিন্দুয়ানির নৈষ্ঠিক আবহাওয়া বজায় ছিল। তাঁর মৃত্যুর কারণটিও অত্যন্ত দুঃখের। একবার তাঁদের বাড়ীর একটি চাকরের প্লেগ হয়। সকলে তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেও গিন্নিমা অর্থাৎ প্রমোদাচরণের স্ত্রী তাকে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারলেন না। তিনি নিজে তার দেখাশোনা করতে লাগলেন। তার ফলে এই হল যে রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্যে'র মত সেই চাকরটির প্রাণ রক্ষা হ'ল, কিন্তু গিন্নিমা প্লেগে আক্রান্ত হলেন এবং সেই রোগে তাঁর মৃত্যু হ'ল। প্রমোদাচরণ এই সাধ্বী রমণীর সম্মান রক্ষা করেছিলেন। যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন স্ত্রীর মৃত্যুর বাৎসরিক তিথি পালন করতেন। এই উপলক্ষে এলাহাবাদে উপস্থিত কোন ব্রাহ্মণ সন্তানের সেদিন নিমন্ত্রণ হ'তে বাকি থাকৃতো না। প্রমোদাচরণ নিজে প্রত্যেকের বাড়ী এসে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যেতেন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও তুল্যাংশে উল্লেখযোগ্য; তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। দুর্গাচরণের নামের সঙ্গে এলাহাবাদের অ্যাংলো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের নাম জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সত্যই বিচিত্র। কি রকম ক'রে সামান্য প্রাইমারি স্কুল থেকে সুরু ক'রে দুস্তর বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হ'য়ে এই প্রতিষ্ঠান আজ যুক্তপ্রদেশের একটি সেকেণ্ড গ্রেড্ কলেজে পরিণত হয়েচে তার খবর বোধ হয় অনেকে রাখেন না। এটি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ম্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায় এবং বদান্যতার ফলে। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন আশ্রমের প্রখ্যাতনামা শিক্ষক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় একদা এই অ্যাংলো বেঙ্গলী স্কুলের হেড্-মাষ্টার ছিলেন। এই কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপক প্রায় সকলেই বাঙালী। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বাংলা দেশ থেকে বেছে বেছে গুণী অধ্যাপক এবং শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়ে আস্‌তেন। তাঁর সে নির্ব্বাচন যে ভুল হ'ত না তার একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। ফকিরচাঁদ ঘোষ ব'লে তিনি একজন



এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পী—অনিল মিত্র

শিক্ষককে নিয়ে এসেছিলেন। ফকিরচাঁদ তদানীন্তনকালের গ্র্যাজুয়েট ছিলেন, অধিকন্তু শিক্ষকতার কাজে তাঁর বেশ সুনাম হ'ল। সুতরাং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করার জন্যে তাঁর কাছে প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু ফকিরচাঁদ শিক্ষকতার কাজেই নিজের জীবন অতিবাহিত করবেন এই সংকল্প জানালেন; সারাজীবন এই কার্য্যে ব্যয়িত ক'রে বৃদ্ধ বয়সে ফকিরচাঁদ যখন অবসর গ্রহণ করলেন, তখন একদিকে যেমন তাঁর উপর নির্ভরশীল প্রকাণ্ড এক পরিবার, অপরদিকে তেমনি নির্ভরযোগ্য না পেন্সান, না প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, না সঞ্চিত অর্থ। তাঁর বহু ছাত্রের প্রাণে প্রাক্তন



মুঠীগঞ্জের শিবমন্দির—এলাহাবাদ শিল্পী—লেখক

শিক্ষকের এই উপায়হীনতা বড় বেজেছিল। তাই তাঁরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এক সভায় একটি অর্থপূর্ণ থলি নির্লোভ গুরুকে উপহার দিয়েছিলেন। সেদিন ফকিরচাঁদ ঘোষ অশ্রু সম্বরণ করতে পারেন নি।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী স্বনামধন্য লেখিকা। তিনি পিতার আদর্শ-পুত্রী হিসাবে বঙ্গবাণীর সেবায় নিয়োজিতা আছেন।

ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এইবার উল্লেখ করবো। তিনি এলাহাবাদে ডাঃ সতীশ নামেই বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য এখানে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন। তাঁকে ডাক্তার সতীশ বলার উদ্দেশ্য আমার মনে হয় তাঁর ডাক্তারত্ব বা পাণ্ডিত্য লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। তিনি আইনের ডাক্তার ত ছিলেনই, অধিকন্তু রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব'লে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। তিনি অল্প-বয়সে মারা না গেলে অনেকে অনুমান করেন কালে তিনি ডাঃ তেজবাহাদুর সাপ্রু বা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মত নাম করতে পারতেন। ডাঃ সতীশ অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন এবং তাঁর যে কত গুপ্ত দান ছিল সেটা তাঁর মৃত্যুর পরে টের পাওয়া গেল।

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও সমধিক উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসা-জগতে তদানীন্তনকালে তিনি ধন্বন্তরীর মত আদৃত হতেন। রোগনির্ণয়ে তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি শুনতে পাওয়া যায়। একবার এক ভদ্রলোকের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর রাত্রে জ্বরভাব হয়। প্রাতঃকালে উঠে তাড়াতাড়ি তিনি অবিনাশ ডাক্তারকে কল্ দিলেন। অবিনাশ ডাক্তার যখন তাঁর বাড়ী গেলেন তখন রোগিণী রান্না চড়িয়েচেন এবং ডাক্তার দেখে তাঁর মুখে হাস্যোদ্রেক ব্যতীত আর কিছুই হ'ল না। ডাক্তার কিন্তু রোগিণীর চেহারা দেখে বল্‌লেন যে সন্ধ্যে নাগাদ তাঁর জ্বর হবে এবং তার প্রতিষেধকস্বরূপ তিনি ওষুধ দিয়ে গেলেন। ওষুধ যেন অবশ্যই খাওয়ান হয় সে বিষয়েও পুনঃপুনঃ সতর্ক ক'রে দিয়ে গেলেন। উক্ত ভদ্র-লোকের এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুর পরামর্শমত অবিনাশ ডাক্তারের ওষুধ না খাইয়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ানো হ'ল। বলা বাহুল্য সন্ধ্যে নাগাদ জ্বর এল এবং দুপুর রাত নাগাদ রোগিণীর অবস্থা মন্দ হ'য়ে গেল। পরদিন প্রাতঃকালে অবিনাশ ডাক্তারকে যখন পুনরায় কল্ দেওয়া হ'ল তখন রোগিণী সংজ্ঞাহীন, ডাক্তার রোগী দেখে বল্‌লেন যে এখন আর কোন উপায় নেই। রোগিণীর সেইদিনই মৃত্যু হ'ল। অবিনাশ ডাক্তার বল্‌লেন, সাপ্রেস্‌ড পক্‌স (Suppressed Pox)

কিন্তু এরকম শোনা ঘটনা বাদ দিয়েও আমার পরিচিত দুই বন্ধুর জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করতে পারি—যা কম

আশ্চর্য্যজনক নয়। এঁরা দুজনেই এখন সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে এলাহাবাদে বাস করচেন এবং প্রয়োজন হ'লে এঁদের সাফাই দেওয়া যেতে পারে। একজনের টি-বি অব দি লাং হয়েছে ব'লে দেশের বহু ডাক্তার এবং কবিরাজ তাঁর জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন। বন্ধুও দিন দিন ক্রমশঃ শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিলেন। এই অবস্থায় একদিন তিনি নেহাত অনিচ্ছা সহকারে অবিনাশ ডাক্তারের ডাক্তারখানায় যান। অবিনাশ ডাক্তার বন্ধুর প্রেস্‌কি্‌পসান্‌গুলো দেখ্‌তে চাইলেন। দেখে বল্‌লেন, ডায়াগনোশিস্‌ ঠিক হয় নি, বুকে তোমার কোন অসুখ নেই। কাল তুমি মাথা ন্যাড়া ক'রে আমার কাছে এস— আমি ওষুধ দেব। এর পরে কয়েক দিন অবিনাশ ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে তিনি রোগমুক্ত হ'য়ে গেলেন।

আর এক বন্ধুর একবার আমাশয় হয়েছিল—খুব বেশি দাস্ত, দিনে রাতে হাতের জল শুকোয় না। বন্ধু ত শয্যা গ্রহণ করলেন। এ যে সময়কার ঘটনা তখন অবিনাশ ডাক্তার খুব বুড়ো হয়েচেন—বড় একটা কলে যান না। বন্ধুর এক আত্মীয় অবিনাশ ডাক্তারের কাছে গিয়ে রোগের বিবরণ জানালেন। তিনি শুনেই দুটি লাল রংয়ের কুচের মত ছোট বড়ি দিলেন। একটি খাওয়ানোর পর বন্ধুর নিদ্রাকর্ষণ হ'ল—দ্বিতীয়টি আর খাওয়ানোর প্রয়োজন হ'ল না। মাঝে একদিন গেল—তৃতীয় দিনে বন্ধু স্বাভাবিক সুস্থ হ'লেন। সে অনেক দিন আগের কথা—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পুনরায় বন্ধুর আমাশয় রোগ আর দেখা দেয় নি।

জনশ্রুতি এই যে অবিনাশ ডাক্তার সবই যে এলোপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করতেন তা নয়—দেশী গাছগাছড়ার থেকে প্রস্তুত বহু ওষুধ তিনি কাজে লাগাতেন এবং সে ওষুধ তাঁর ডাক্তারখানা ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যেত না। এই দেশী ওষুধে খরচ যেমন ছিল সামান্ত, আয় তেমনি ছিল যথেষ্ট।

মোট কথা অবিনাশ ডাক্তারের পর আর কোন ডাক্তারই আজ পর্য্যন্ত এলাহাবাদে তাঁর মত কৃতিত্ব অর্জ্জন করতে পারেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম করছি যিনি স্মৃতিশক্তির প্রাথর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর নাম সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি সকালে দৈনিক সংবাদপত্র 'লিডারে' যা পড়তেন সন্ধ্যাবেলা অবলীলাক্রমে তা' মুখস্থ বল্‌তে পারতেন। তাঁর এই স্মৃতিশক্তির কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়েছিল। সতীশচন্দ্রের স্ত্রী অতিশয় হৃদয়বতী রমণী ছিলেন। তাঁর হৃদয়বত্তার উদাহরণস্বরূপ একবারকার ঘটনার উল্লেখ করছি। সতীশচন্দ্রের বাসায় এক রাত্রে আগুন লেগে গিয়েছিল। বাসা ত্যাগ ক'রে বাইরে এসে যখন সকলের খোঁজখবর নেওয়ার সময় হ'ল তখন দেখা গেল বাড়ীর একজন অল্পবয়স্ক চাকর একটি ঘরে ঘুমিয়ে আছে—সে বেরিয়ে আসে নি। তার ঘরটির চারিদিকে তখন দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বল্‌ছে। সতীশচন্দ্রের স্ত্রী তখুনি নিজের ছেলেকে হুকুম করলেন—সেই ঘর থেকে চাকরটিকে বের ক'রে আন্‌তে। ছেলেও মাতৃ আজ্ঞা মাথায় নিয়ে তৎক্ষণাৎ আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সুখের বিষয় দু'জনেই বেঁচে আস্‌তে পেরেছিল। কিন্তু ঘটনাটি অবহেলার নয়; যে কর্ত্তব্য-বোধ এবং মানুষের প্রতি মমতা পুত্রবৎসলা নারীকে তার পুত্র-স্নেহ এবং



ত্রিবেণী সঙ্গমে সূর্য্যাস্ত—এলাহাবাদ শিল্পী—লেখক

পুত্রের নিরাপত্তার কথাও ভুলিয়ে দেয় সে বস্তু নিশ্চিত স্মরণ রাখ্‌বার যোগ্য।

এইবার আমি যাঁর নামোল্লেখ করবো তাঁকে এলাহাবাদের বেশি লোকে চেনেন কিনা সন্দেহ; যদিও বা

চেনেন, তাঁর বিশেষত্বের কথা সকলে স্বীকার করবেন কিনা জানি নে। তাঁর নাম ছিল সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু তিনি ছিলেন আপামর সাধারণ সকলেরই 'সীতে খুড়ো'। ভদ্রলোকের জ্যেষ্ঠ পুত্রী এবং একমাত্র অবলম্বন ছিল তাঁর একটি কন্যা। যথাকালে অবস্থাপন্ন এক স্থানীয় উকীলের ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন। নিজের সঙ্গতি কোনদিনই বেশি ছিল না, সামান্য যা' কিছু ছিল তা-ও এই বিয়ের ব্যাপারে ঘুচে গেল। বৈবাহিক সজ্জন, পরম সমাদরে সীতে খুড়োকে নিজের আবাসে আশ্রয় দিতে চাইলেন। নিজের মানসম্ভ্রম, মর্য্যাদা প্রভৃতি সম্বন্ধেও



লেখক

ইঙ্গিত করতে ভুললেন না। কিন্তু সীতে খুড়োর কৌলীন্য-বোধের সংজ্ঞা ছিল স্বতন্ত্র। তাই তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রসাধনের সামান্য কয়েকটি দ্রব্য ফেরি ক'রে বেড়াতে সুরু করলেন। লভ্যাংশ তাতে কি থাকতো জানা গেল না কিন্তু দেখা গেল তার উপর নির্ভর ক'রেই সীতে খুড়ো দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্চেন। জীবনটা কাটিয়ে দিলেনও, কেবল মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে অজ্ঞান অবস্থায় বৈবাহিক তাঁকে স্বগৃহে তুলে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরের ঘাড়ে ব'সে খেতে পারলে যে যুগে লোকে মেহন্নত করতে চাইত না, পরকে বোকা বানিয়ে দু'পয়সা রোজগার করা পরবর্ত্তী যে যুগের নীতি, সেই যুগের বিচার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত আমার মন। এরি মধ্যে সীতে খুড়োর মত সুতীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ আমার কাছে খুব আশ্চর্য্য ব'লেই প্রতিভাত হয়।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ এবং মেজর বি-ডি-বসু এবং তাঁহার পাণিণি আপিসের কথা সকলেই অল্পবিস্তর জানেন। তাই পুনরুক্তি ভয়ে তাঁদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হ'ল না।

উপরে যাঁদের নাম করলুম তাঁরা সকলেই বিগত যুগের। তাঁদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সহজ। তাঁরা ব্যতীত যাঁদের কর্ম্মধারা আজো অসমাপ্ত, চলার পথ এখনো অনতিক্রান্ত তাঁদের কথা বলার সময় এখনো আসে নি। তাই জাষ্টিস সার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুত প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হরিমোহন রায় প্রভৃতির নাম ভবিষ্যতের জন্যে রেখে দিলুম।

এলাহাবাদের দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান—একটি হিউএট্ রোডে বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির, অপরটি মুঠীগঞ্জের বাণী মন্দির। প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্য মন্দির ১৩০৬ সালে স্থাপিত। 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একদা এর ডাইরেক্টার ছিলেন। মুঠীগঞ্জের বাণী মন্দির বেশ ভালই চল্‌ছে দেখ্‌লুম। এলাহাবাদ স্পোর্টিং ক্লাবের খেলাধূলার রেকর্ডও বিশেষ প্রশংসনীয়।

এলাহাবাদের আর একটা জিনিষ আমার খুব মনে আছে—ওখানে এক্কার চলন খুব বেশী। যুক্তপ্রদেশে সাধারণত টাঙ্গার ব্যবহার বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু এলাহাবাদে দেখলুম টাঙ্গার চেয়ে এক্কার প্রচলন বেশী। বলা বাহুল্য এক্কার ভাড়া টাঙ্গার তুলনায় সস্তা। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে বাঙ্গালী মেয়েরা, এমন কি বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরাও ওখানে এক্কায় চড়তে দ্বিধাবোধ করেন না।

এলাহাবাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের কথা বল্‌তে গিয়ে আমি এতক্ষণ কয়েকজন বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণনা করেছি। তার হেতু একটু বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে। কোন মানুষের জীবনই detached বা পরিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নিজেদের গুণাবলী দ্বারা যাঁরা

সাধারণ থেকে বিশেষ হ'য়ে ওঠেন তাঁরা সমকালীন লোক এবং যুগকে গড়ে তোলেন। তাঁদের প্রভাব তৎকালীন সমাজ-জীবনকে প্রভাবান্বিত করবেই। সেই হিসাবে এলাহাবাদের তদানীন্তন যুগে ক্রমবিকাশের ইতিহাসে যাঁদের দান বর্ত্তমান তাঁদের নাম স্মরণ রাখ্‌বার যোগ্য।

আমার উপরের কথা থেকে কারোর হয়ত মনে হবে যে আমি আজকের দিনেও প্রভিন্‌সিয়ালিজম্‌ প্রচার করছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য আদৌ তা নয়। নিজে বাঙালী ব'লে বাঙালীর মনীষা, বুদ্ধি এবং সংস্কৃতিতে আমি আস্থাবান। কিন্তু সেগুলি যে কেবলমাত্র আমাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নয় সে জ্ঞানও আমার আছে। আমাদের প্রবাস জীবনে যাঁরা লিডার তাঁরা পুনঃ পুনঃ এই উগ্র প্রভিন্‌সিয়ালিজ্‌মের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করেছেন। এ কথাও সত্য যে সময়ে অসময়ে এই প্রভিন্‌সিয়ালিজ্‌মের অজুগুপ্সিত প্রকাশে আমরা অন্যদের বৈরিতা অর্জ্জন করেছি। কিন্তু তবু দেখে আশ্চর্য্য হলুম যে যুক্তপ্রদেশের ডাইরেক্‌টার অব পাব্‌লিক ইনস্‌ট্রাকশান মিঃ উইয়ার (Mr. Weir) গত ফেব্রুয়ারি মাসেও * এংলো বেঙ্গলী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় বলেছেন, "Bengalis were the Scotsmen of India, * * Many people asked him why there should be seperate Bengali schools. There were many reasons for it ; the Bengalis had a culture peculiar to the community ; eminent Bengalis like Dr. Tagore and others inspired other provinces ; everywhere the names of Bengalis were prominent—in the bazar, in the market, in the files and so forth —and therefore, they were justified in preserving their language and their culture. * * *"

* Leader d/- 25. 2. 37.

মুসাফির

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

দুপুরের স্তব্ধ অবসরে ব্ল্যাকফোর্ডের পাহাড়গুলি যেন ধ্যানমগ্ন। নীরবতার ইঙ্গিত প্রসারিত পাইনগাছের সবুজে, সুনীল আকাশের অসীম বিস্তারে, স্কটল্যাণ্ডের মধুর গ্রীষ্মের অপরূপ স্নিগ্ধতায়। নৈঃশব্দ্যের এই নিবিড় টানে শ্রীরেখা ঘরে থাকতে পারে না প্রায়ই। জনময়ী এডিনবরাকে পিছনে ফেলে চুপি চুপি আসে পালিয়ে। নিথর পাহাড়ের মৌন আলিঙ্গনে ঘন হয়ে ওঠে মিলন, পার্বত্য প্রকৃতির উদাস সৌন্দর্য্য অকারণে কোন্‌ অজানার পথে বাহু বাড়িয়ে কেবলই ডাকে। সুন্দরের আবেগ শ্রীরেখার বুকে বাজে ঠিক ব্যথার মতো। পরিপূর্ণ উচ্ছলতায় হাতের তুলি রেখার পরে রেখা এঁকে চলে—হৃদয়ের সুন্দর যেন মোহন-চিত্রে রূপের প্রকাশে ধরা দিতে চায়।

নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্ন অগ্রসর হয়ে চলে অপরাহ্নের দিকে। শ্রীরেখা নতমুখে কী ভাবে। তুলিটি হাতে ধরা, কবরী খুলে কোমল ললাটের দুইপাশে চুল পড়েছে এলিয়ে। ধীরে—অতি ধীরে চোখের পাতা নেমে আসে, ঘন পক্ষ্ম প্রায় কপোল স্পর্শ করে। হঠাৎ দক্ষিণের ঝোপ থেকে আসে চঞ্চল সাড়া, পাহাড়বাসী কারো বুঝি বিশ্রাম সাঙ্গ হ'ল। শ্রীরেখা মাথা তুলে হাসিমুখে অপেক্ষা করে। কিন্তু এ কী, এ শব্দ তো পরিচিত নয়! প্রসাদ-লোলুপ যারা নিত্য অতিথি, তারা কই?... কুকুর, না শিকারী? কেউ কোথাও নেই! একটু ভয় হয়—নির্জন পাহাড়—

তারপরেই রুষ্টমুখে চেঁচিয়ে ওঠে, "তুমি? ছি ছি, ভারি অন্যায়, জানো?"

"জানি।" অনন্ত ঝুপ ক'রে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে। পায়ের কাছে চিৎ হয়ে শুয়ে বললে "আঃ!"

শ্রীরেখা পা গুটিয়ে নেয়। খানিক পরে আস্তে আস্তে বলে, "কেন এসেছ?"

"আসতে নেই?"

"শরীর ভালো?"

"ভয়ঙ্কর।"

শ্রীরেখা নরম হয়ে বললে, "রাগ কেন? কিন্তু পায়ের কাছ থেকে এবার ওঠো। বলেছি তো, ঠিক এমনি সময়েই আসে নিরঞ্জন।"

অনন্ত স'রে গেল না। আরো কাছে এসে মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, "ওকে তুমি ভালোবেসেছ!"

শ্রীরেখা হেসে বললে, "বাসব না!"

অনন্তও হাসলে। বললে, "কি রকম?"

—"রকম আবার কী। যা শোনবার, শুনলে।"

"আচ্ছা বেশ," অনন্ত আবার হাসলে। মাথার উপর নীলের বুকে কোমল মেঘের পালক—মধুর হাওয়ায় ধীরে ধীরে কোথায় না জানি ভেসে চলেছে। অনন্তর হৃদয়ও এ কোন্ অপূর্ব মধুরতায় আনন্দের লঘু পাখা খুলে নিরুদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে! উঠে বললে, "যাই।"

স্নিগ্ধচোখে চেয়ে শ্রীরেখা বললে, "না।"

—"নিরঞ্জনের আসার সময় হ'ল।"

—"বোসো না তুমি।"

—"কী পরিচয় দেবে?"

—"সত্য পরিচয়।"

—"কী?"

শ্রীরেখা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভারি গলায় বললে, "প্রতিবেশীর ছেলে।"

অনন্তর বুকে ধক্ ক'রে উঠল, স্থির হয়ে আঘাত সহ্য করলে। শ্রীরেখার হাতের পরে হাত রেখে কী বলবে ভাবছে, সে ত্রস্ত হয়ে উঠল, "পালাতে চাও তো এই বেলা। ওই দেখ নিরঞ্জন।"

* * * *

বিচিত্র জীবন এই দুজনের। শ্রীরেখা রাগ করেই বলেছিল পরিচয় দেবে 'প্রতিবেশীর ছেলে।' কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়। পাশাপাশি বাড়ি, সমবয়সী, একত্র লেখাপড়া করেছে। তারপরের ইতিহাসটাই বাইরের লোকের অজানা। দু'একজন অতি অন্তরঙ্গ ওদের কাছেই শুনেছে কিছু।

শ্রীরেখার বাবা আধুনিক, অনন্তর মা সকল আধুনিকতার মূর্ত-বিরোধ। ছেলে-সমান বিবি বউ ঘরে আনতে রাজি নন। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও সংস্কারের পাষাণ-স্তূপ টলল না। ক্ষোভে অভিমানে অনন্ত পাগলের মতো হয়ে উঠল। গোপনে দেখা করে বললে, "শ্রী, বিয়েটা কি বাইরের?"

শ্রীরেখা চোখের জলের ভিতর দিয়ে হেসে বললে, "না। কিন্তু তোমার উপযুক্তও নই যে।"

—"কিছু কি আমারও নয়?"

—"একটুও না। মনে রেখো সেই ছেলেবেলায় সব ঠিক হয়ে গেছে।"

—"ওগো সে ভোলবার নয়। কিন্তু সমাজ স্বজনও সত্যি। তাদেরও মানতে হয়। অন্তর-বাহির দুই নিয়েই তো মানুষ, একটার ত্যাজ্য হয়ে অন্যটা—"

অসহিষ্ণু অনন্ত। মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিল, "আমি কি কচি ছেলে যে কথায় ভোলাতে চাও? তোমার ভিতরটা ঠিক আছে কিনা তাই বলো। সেখানে যদি—সন্দেহ এসে থাকে—"

উত্তরে শ্রীরেখা কিছুই বলেনি। শুধু মুহূর্তপরে অনন্ত নত হয়ে অশ্রুসিক্ত মুখখানি দু'হাতে তুলে ধরে বলেছিল, "তবে স্বীকার করো সে কথাটা। সাক্ষী আমাদের অন্তর্যামী। শ্রী, বলো।"

এই অদ্ভুত বিয়ের সাক্ষী রইল না আর কেউ। পরদিনই অনন্ত পালিয়ে গেল বোম্বাইয়ে, বোম্বে থেকে বিলেত। মা অনেকদিন পথ চেয়ে রইলেন, কত ডাকাডাকি—ছেলে ফিরল না। মন ভেঙে গেল, সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সেই ধিঙ্গি মেয়েটার উপর। ওর কাছে কিছুতেই হার মানবেন না, কিন্তু টানাটানিতে শরীরও টিকল না আর। যাবার সময় অভিশাপ দিয়ে গেলেন, "মনের মিলন ওদের হবে না। ওরে আমার ফাঁদে-পড়া-ছেলে, মা চিনলি না, চিনলি শুধু এক ডাইনির মায়া? আমি মরলে ওর তো হাড় জুড়োয়। কিন্তু—রইল আমার মরণ ওর চোখের সামনে।"

কথাগুলো কে তুলেছিল অনন্তর কানে, শ্রীরেখা জানে না। কেউ না তুললে সে-ই তুলত। পণ ছিল ওর—কাউকে ঠকাবে না। মনের মোহ না ভাঙলে পুরুষ মানুষকে নাকি ঠিক চেনা দায়। সংসারের রূঢ় আঘাতে, অনন্তর এ মোহ যদি ভঙ্গুরই হয়, ভাঙুক না। তলায় যদিই কিছু থিতিয়ে থাকে, সে-ই তো সোণা—সে অটুট। আবর্জনা যাক না ধুয়ে স্রোতের টানে। মায়ের মরণের ঠিক ষোলো দিন পরে জরুরী তারে শ্রীরেখাকে ও যখন করল ঘরছাড়া, সবাই ভাবলে আধুনিকীই হ'ল জয়।। বাপ-মা, রক্তের বাঁধন—কলিকালে ওকি আবার একটা কথা!

রহস্যের ঘন আবরণে সত্যকে লুকিয়ে সংসারকে যেমন ওরা করল উপেক্ষা, সংসারও তেমনি ওদের জন্যে বজ্র উদ্যত ক'রে রাখল। দুই বিদ্রোহী তবু নিশ্চিন্ত; শুধু নিশ্চিন্ত নয়—পরিতৃপ্ত, যেন একপরে হওয়াটাই ওদের জীবনের লক্ষ্য। লোকে ভেবে পায় না কেন এই জেদ। মায়ের সেন্টিমেন্ট বাধা হ'ল না মিলনের, হ'ল শুধু সমাজ-আচার-সঙ্গত বিয়ের! না যৌবন এমনিই উদ্ধত!

তারপর একদিন অনন্ত কেন গেল ইউরোপের দক্ষিণে, আর শ্রীরেখা বোর্ডিংহাউসে, তাও কেউ জানলে না। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এই দ্বিতীয় সাক্ষাত। শ্রীরেখার বোর্ডিংএ অনেক লোক, অনন্ত ভিড় পছন্দ করে না। নিরঞ্জন সেখানে নবাগত।

* * * *

সুশ্রী ছেলেটি। ধীরে ধীরে উঠে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। দূর থেকে শ্রীরেখাকে দেখলে, খুলে ফেললে টুপি। লম্বা চুলের গোছা বাতাসে দুলছে, সরু সরু আঙুল দিয়ে টেনে কপালের উপর তুলে দিল। অনন্ত চকিত হয়ে বললে, "এ অচেনা মুখ নয়।"

"কোথায় দেখলে?"

"ভেনিসে। আর্টিষ্ট না?"

বিস্মিত চোখ তুলে নিরঞ্জনও ওকে চেয়ে দেখল। মানুষের বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রীরেখা ও অনন্তর নিত্য পরিচয়। কিন্তু এ বিস্ময় যেন সে বস্তুই নয়। রাত্রিশেষের শুকতারা যে বিস্ময়ে প্রভাতের দিকে চেয়ে থাকে, এর চোখে তারি আভাস। মুগ্ধ হ'ল অনন্তর মন।

শ্রীরেখা বললে, "বোসো নিরঞ্জন। এঁকে চেনো না, কিন্তু আশ্বাস দিতে পারি দেরি হবে না চিনতে। এতদিন দু'জন ছিলাম, এবার থেকে বসবে আমাদের তিনের বৈঠক।"

নিরঞ্জন শুধু বললে, "নিশ্চয়।" কিন্তু অনন্তর মনে হ'ল ছোট কয়টি অক্ষরে এত গভীর কথা কেউ কখনো বলেনি।…

মুখর আলাপ জমে যাদের নিয়ে নিরঞ্জন শ্রীরেখা বা অনন্ত সে জাতের নয়। ওরা থাকে চুপ ক'রে, জনতার আকর্ষণ ওদের নেই, জনতাও তাই ওদের চায় না। তবু মধুর স্বভাবের গুণে নিরঞ্জন ছিল জনপ্রিয়। তাকেই এখন এই উপেক্ষিত বিদ্রোহীদের জন্যে হারাতে হয় দেখে নিতান্ত নিরীহও উঠল রেগে। অনেক কথাই শুনতে হ'ল, কোনোটাই শ্রুতিমধুর নয়—চুপ ক'রে শোনে নিরঞ্জন। মনে মনে আশ্চর্য্যও হয় কিন্তু তিনের বৈঠকে হাজিরা দিতে ভুল হয় না একটিবারও। দিন দিন শ্রীরেখার মুখের দীপ্তি দেখে অনন্তর মুখও প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

একদিন বললে, "শ্রী, সেকথাটা এবার বলা যাক?"

শ্রীরেখা একটু ভেবে উত্তর করলে, "তাড়া কিসের? বলবার হলে সুযোগও হবে।"

সেবার শীতের সুরুতেই বোর্ডিংবাস ছেড়ে ওরা উঠে এলো আলাদা এক ফ্ল্যাটে। তেতলায় একপাশে পার্কের উপর চারখানি ঘর, বাড়ির বুড়ি গিন্নী মাত্র চতুর্থ সঙ্গী। কিন্তু সঙ্গীহিসেবে দাবি-দাওয়া তার কম। ডাকলে আসে কাছে, নয় তো সাড়াই পাওয়া যায় না। গরমিল হয় না তিনের বৈঠকে।

একখানি মোটে বসবার ঘর তিনের মিলন ক্ষেত্র। রাত বারোটার পরে ঘরখানি যেন ঘুমোয়। মাঝে মাঝেই লোভ হয় নিরঞ্জনের, ঘরের স্তব্ধতা বুঝি ওকে ডাকে। ওঠে না; ভাবে এ অহেতুক আকর্ষণ কেন?

একদিন কিন্তু রেহাই পেল না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে কিসের টানে যে ঘরে এসে ঢুকল সে-ই জানে। পার্কের আঁকাবাঁকা রাস্তার আলো আর শীতের পত্রহীন শীর্ণ গাছগুলোর দীর্ঘ ছায়ায় ঘরে আলো-আঁধারের অপূর্ব মায়া। ঘুমের ঘোর ভেঙে গেল, আবিষ্কার করতে দেরি হ'ল না ঘরের বিস্ময়কে। শ্রীরেখার মুদিত নেত্রে আলো পড়েছে বাঁকা হ'য়ে, ওধারে পরদা-ওঠানো জানলার গায়ে ঠেস দিয়ে অনন্ত আছে দাঁড়িয়ে। স্বচ্ছ হীরার মতো একটি মাত্র তারা, অসীম আকাশের উজ্জ্বল সত্তা—ওরই পানে চেয়ে অনন্ত যেন আত্মহারা।

সে যে অনাহুত, একথা একবারও মনে এলো না নিরঞ্জনের। নিঃশব্দে বসল সোফায়।

তারপর এমন কত রাত্রি। তিন নীরব সঙ্গী অপ্রকাশের তীরে তীরে কী যে বেড়ায় খুঁজে, নিজেরাও বোঝে না। মন কিন্তু আনন্দে ভরপুর।

মাঝে মাঝে ভাবে নিরঞ্জন—এই কি ওদের বিদ্রোহের ভিত—যার উপর দাঁড়িয়ে সংসারকে রাখে দূরে শান্ত উপেক্ষায়?

একদিন বললে, "শ্রীরেখা, মোটে দু'বছরের মেয়াদ, যাবার দিন এগিয়ে এলো। তার আগে আর্জি আছে।"

—"বলো।"

—"প্রবাসের বন্ধুকে কি কখনো মনে পড়বে?"

শ্রীরেখা পাল্টা প্রশ্ন করলে, "কী মনে হয় তোমার?"

—"মনে যা হয়, কাণে সেটা ভালো শোনায় না।"

শ্রীরেখা হাসলে। চোখে কিন্তু বিষাদের ম্লানিমা।

ব্ল্যাকফোর্ডের সেই পাহাড়। এবার আর নির্জন নয়; অস্তগামী সূর্য্যের রঙীন আলোয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো পাহাড়ের পাদশায়ী কৃত্রিম হ্রদের রাজহাঁস দু'টিকে রুটির টুকরো খাওয়ানো নিয়ে কলরব তুলেছে। ওদেরই একপাশে দাঁড়িয়ে শ্রীরেখা ও নিরঞ্জন। শ্রীরেখা অন্যমনস্ক, অদূরে অদৃশ্যপ্রায় অনন্তকে চোখ দু'টি নিবিষ্টভাবে অনুসরণ করছে। নিরঞ্জন সেটা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করেছিল মৃদুকণ্ঠে বললে, "ডাকলে না কেন?"

শ্রীরেখা চমকে উঠে দৃষ্টি অপসারিত করলে। মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে, নিরঞ্জন না দেখেও বুঝল।

অনন্তর ব্যবহার রহস্যময়। প্রায়ই দেখা যায় একাকী হ'বার সুযোগ খোঁজে, পেলে ছাড়ে না। শ্রীরেখার অবচেতন সত্তায় যেন পড়েছে একটা ছায়া। কে জানে চিন্তার না ভয়ের।

কিন্তু বিদ্রোহী মেয়ের সহানুভূতি-শঙ্কিত মন বাইরে যে সকলই হেসে উড়াতে চায়। তাই কি কণ্ঠের সুরে হাসির উচ্ছলতা এনে বললে, "অনন্ত জানে two is company, three none! কাল যাবে তুমি, আজ আমাদের সুযোগ দিয়ে গেল নিভৃত আলাপের!"

গম্ভীর হ'ল নিরঞ্জনের মুখ—সে জানে এ নিছক পরিহাস।

শ্রীরেখা আবার হেসে বললে, "কথা ছিল—'এক নৌকোয় শুধু তুমি আর আমি।' কিন্তু অকূলে পাড়ি দেবার আগেই মাঝি যে আমার ক্লান্ত হয়ে পড়ল!"

হাসির আড়ালে কী যেন ছিল। নিরঞ্জন হঠাৎ বিচলিত হ'য়ে বললে, "ফিরে চলো শ্রী।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে দু'জনে নিঃশব্দে ঘরে বসে রইল। অনন্ত এলো না।…

সকালে ট্রেণ ধরাধরি।

তারই মাঝে একটুখানি সময় ক'রে নিয়ে শ্রীরেখাকে একলা ডেকে বললে নিরঞ্জন, "মনে থাকবে?"

—"কিন্তু নিরঞ্জন—"

—"আবার 'কিন্তু'?"

"কিছুই যে জানো না আমার। সবাইর কাছে কী ব'লে দেবে পরিচয়?"

নিরঞ্জন বিবর্ণ হ'য়ে বললে, "কেন মিছে দুঃখ দাও!"

শ্রীরেখা ম্লান হেসে বললে, "আচ্ছা থাক ওকথা। যদি কখনো দরকার হয়, ভুলব না—তোমার বাড়িতে রইল আমার নিমন্ত্রণ।"

নিরঞ্জন ওদেশে বন্ধু রেখে আসেনি, কিন্তু শ্রীরেখার শত্রু ছিল অনেক। বছর না যেতে কত খবরই এলো। শেষ খবর দিল অনন্ত

স্বয়ং। বেশি না, ছোট্ট দু'টি কথা—"শ্রীকে দেখো।" পত্রে ঠিকানা নেই, খামের উপর ডোভারের ছাপ।

বালিগঞ্জে এসে নিরঞ্জন চিঠিখানা সুচিত্রার হাতে গুঁজে দিয়ে চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ পরে সুচিত্রা শুষ্ক হেসে বললে, "আমি তো বুঝতে পারি না এত ভাবনার কী হয়েছে।"·· বাস্তবিক, কে এই মেয়ে? গত বছর সুচিত্রার টাইফয়েড হয়, বাঁচবার আশা ছিল না। যখন প্রথম শুনল ডাক্তারের মুখে, নিরঞ্জনের চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল এমনি একটা বিহ্বল ছায়া। তীব্রতর হয় সুচিত্রার বাঁচবার ইচ্ছা। অমন স্বামী! আজ সে-ই কিনা ঠিক অতটাই কাতর হ'ল কোথাকার কোন্ এক সর্বহারা মেয়ের দুঃখে! কঠিন হয়ে উঠল মন। বললে, "কী ভাবছ?"

নিরঞ্জন বললে, "মনে হয় ভয়ানক বিপদ তাদের। অনন্তকে তুমি চেনো না শুচি, নইলে বুঝতে সহজে লেখেনি এমন চিঠি। কিন্তু ভাবছি আমি—শ্রীরেখা এখন কোথায়?"

—"উপায় কী বলো? কোথাও কিছু না, হঠাৎ এক চিঠি—" থেমে গেল। এত উষ্মা! নিরঞ্জন কী ভাববে—

—"উপায় একটা করতেই হবে। শ্রীরেখার দুঃসময়ে চুপ ক'রে থাকব আমি!" নিরঞ্জন উঠে গেল।

এই বয়সী পুরুষের একটা দিক সংসার সম্বন্ধে উদাসীন নয় শুধু, অনভিজ্ঞ। নইলে নিরঞ্জন সুচিত্রাকেই দিত শ্রীরেখার ভাবনা। স্বামী যদি বান্ধবীর জন্যে একলাই হয়ে ওঠে ব্যাকুল, স্ত্রীর সহানুভূতির আশা করা বাতুলতা। নিরঞ্জনের কাঁচা মন পদে পদে ঠোকর খায়, তবু বুঝতে পারে না কোথায় গলদ। ভেবে পায় না সুচিত্রা শ্রীরেখার সন্ধানে কেন এত নিরুৎসুক। সে কি ভাবে—শ্রীরেখাকে নিরঞ্জন যতটা বড় মনে করে, বাস্তবিক তত নয় সে—

কিন্তু প্রবাসের সেই বিচিত্র দিনগুলো!

শ্রীরেখার প্রশান্ত ধ্যানমূর্ত্তি—সে যে নিরঞ্জনের আবিষ্কার। রাত্রের গভীরতায় যা ছিল গোপন, তাকে হঠাৎ দেখার সুযোগ সুচিত্রার তো হয়নি। তাছাড়া স্নেহ কি নিরঞ্জনের এতই অক্ষম? শুধুই গুণাবেশু?

ঠিক এই সময়ে সন্ধান মিলল—শ্রীরেখা বোম্বে থেকে পূর্ববঙ্গের দিকে গেছে। কিন্তু বাঙলা দেশের পুবদিকটা বিশ্বের ম্যাপে ঠাঁই বেশি না জুড়লেও নিরঞ্জনের মনের ম্যাপে অজানা তেপান্তর। যে বান্ধবী এমন দেশেও নিরুদ্দেশ হ'তে পারে, ভাগ্যক্রমে দেখা পেলে তাকে কী ব'লে করবে পরিহাস, মনে মনে নিরঞ্জন তারই রিহার্সেল দিয়ে রাখল। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। পুনশ্চ খবর এলো—ওই নামেরই এক বাঙালী মহিলাকে হিমালয়ের পথে দেখেছে কেউ। নিরাশায় নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। হায় শ্রীরেখা, সুদূর বিদেশে তোমার স্নেহ ও সঙ্গের আলো যাকে বাঁচিয়েছিল হাজার জোনাকির ক্ষণধর্মী আলেয়া থেকে, আজ তোমারই আপন প্রয়োজনে তাকে কি একটিবারও পারলে না বিশ্বাস করতে? স্মরণ হয়নি—একথা নিরঞ্জনই বা বিশ্বাস করবে কি ক'রে? যে দুঃসাহসে মাত্র ভালোবাসার জোরে অনন্তকে দিয়েছিল সর্বস্ব, স'য়েছে মানুষের ঘৃণা, সমাজের উপেক্ষা—তবু মন্ত্র প'ড়ে অন্তরের সত্যকে আইনের নিগড় পরাতে হয়নি নত, এও সেই দুঃসাহসেরই অনুরূপ—দুর্দম স্বাধীন শিখা।

কাছে পেলো না বলেই, নিরঞ্জনের অন্তর্দৃষ্টি রাত্রিদিন অনুসরণ ক'রে ফিরতে লাগল সেই শিখাময়ীকে। দ্বিধা হয়ে গেল জীবন। সুচিত্রা পায় সঙ্গ, পায় না ভাবনার অংশ। স্নেহ পায়, পায় না হৃদয়ের স্নেহাতীত গভীরতা। ভাবে, হঠাৎ এ কী হ'ল? ধরা-ছেঁায়া যায় না যাকে, তাকে নিয়ে অভিযোগও বা চলে কেমন ক'রে? এর চেয়ে যে শ্রীরেখা কাছে এলেই হ'ত ভালো। রক্ত-মাংসের নারী—সে কি হয়ে উঠত ধ্যানের দেবী! সুচিত্রা স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে শ্রীরেখার সন্ধানে লোক লাগাল। কিন্তু যাকে কেউ চেনে না, কঠিন ব্যাপার তার খোঁজ পাওয়া।

এমনি ক'রে বছর ঘুরে এলো ঠিক সে মাসটায়, যে মাসে বোম্বে থেকে প্রথম খবর আসে শ্রীরেখার। দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় শ্রান্ত দেহ এলিয়ে বাগানে বসেছিল নিরঞ্জন। দেহে মনে ক্লান্তির সীমা নেই। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিত—একথা সুচিত্রা মনে করিয়ে দেয় প্রায় প্রতিদিন। আজও একটু আগে এই নিয়ে বচসা হয়ে গেছে। চোখের জল গোপন করে সুচিত্রা উঠে গেল। নিরঞ্জন বোঝে এমন ক'রে আর চলতে পারে না বেশিদিন, কিন্তু কোথায় যেন একটুখানি ক্ষীণ আশা, তারই টানে বাড়ি আগলিয়ে আছে প'ড়ে। যদি ফিরে আসে, কোথায় যাবে সমাজ-পরিত্যক্তা অভিমানিনী? যাবার স্থান থাকলে অনন্ত ওরই হাতে শ্রীরেখাকে স'পে দিত না। সুচিত্রা বোঝে না, কিন্তু উপায় কী।

কখনো ভাবে অন্তরের যোগ যেখানে এত গভীর, বাইরে সেখানে জটিল গ্রন্থি কেন? কিসের টানে ওই বিদেশেও শ্রীরেখার অমন অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম বুঝি না। কিন্তু মনে হয় মিলনের সে সূত্র আমাদের আজো ছিন্ন হয়নি, কেবল কোথায় গেছে হারিয়ে। ভাবল—ফিরিয়ে আনব তাকে; হারানো শ্রীরেখাও কি তাহ'লে ফিরবে না?

অমনি লাগল কাজে। টেনে নিয়ে বসল পুরানো যত সরঞ্জাম—চিত্রকরী বিস্তার। নির্জন রাতে জপ-তপ হ'ল সুরু। হুকুম হয়ে গেল বাড়িতে—বাবুর মাছ-মাংস বন্ধ, খাওয়া হবে শুধু নিরামিষ। স্বামীর মতি-গতি ভয় পাইয়ে দিল সুচিত্রাকে। সে জানত না যে শ্রীরেখারও ঐ ছিল কাজ—আঁকত ছবি, আর বোধ হয় নিজেরও অজ্ঞাতে খুঁজে ফিরত অন্তরতম এমন কোনো ধন, যাকে পেলে মানুষের মন—পদ্মফুলের মতো কাদার উপর মাথা তুলে পারে দাঁড়াতে। ওর এই রহস্য ধরা পড়েছিল নিরঞ্জনের গভীর মনে। তাই প্রীতির বাঁধনও এত গভীর। সুচিত্রার বেদনার আবেদনও পারল না তাকে টলাতে।

একদিনের কথা মনে পড়ে নিরঞ্জনের। শ্রীরেখার বাবার চিঠিতে কী ছিল কে জানে। অনন্ত তখন বাড়ি নেই। একলা ঘরে কেঁদে-কেটে শ্রীর চোখ দু'টো হয়ে উঠল লাল জবা। তারপর বসবার ঘরে বাজাতে বসল পিয়ানো। নিজের ঘর থেকে শুনছে নিরঞ্জন তন্ময়

হয়ে, হঠাৎ বাজনা গেল থেমে—ঠিক যেন কেঁদে ভেঙে পড়ল সঙ্গীতের আত্মা। ছুটে গেল দেখতে। ওর দুয়ার খোলার শব্দ কেউ শুনতে পায়নি। পিয়ানোর উপর মাথা রেখে শ্রীরেখা কাঁদছে নিঃশব্দে, অনন্ত পাশে—নতজানু, শ্রীর বিস্রস্ত চুলের বোঝায় মুখ তার দেখা যায় না। বলছে, "বলো, শুধু একটিবার রাজি হও তুমি।"

চাপাকণ্ঠে শ্রীরেখার উত্তর শোনা গেল, "অসম্ভব অনন্ত, অসম্ভব।"

"কেন?" অনন্ত উত্তেজিত হয়ে বললে, "আমার জন্যে তোমার এই অপমান, সে আমি সইতে পারি না আর।"

শ্রী নিরুত্তর।

অনন্ত আবার বললে, "মানুষের জগতে আবার আদর্শ! ওরা বোঝে কিছু? চায় বাহবা, হাততালি, তুচ্ছ—"

শ্রীরেখা সগর্বে মাথা তুলে বললে, "কা'কে বলছ এসব? বাবাকে কি তুমি সাধারণ ভাবলে? আসল ব্যাপার জানেন না বলেই—"

এতক্ষণে নিরঞ্জনের খেয়াল হ'ল—আর শুনতে নেই।..

যখনই মনে পড়ে একথা, ভেবে পায় না কী হ'ল ওদের। শেষের দিকে কেনই বা পালিয়ে বেড়াত অনন্ত? যার জন্যে সর্বস্ব দিল শ্রীরেখা, সেও যে সাধারণ নয়, সে তো নিরঞ্জনের চোখেও ধরা পড়তে দেরি হয়নি। তবে কি—?

কিন্তু—না। অতবড় ভালোবাসা তার সঞ্চয় হারিয়ে ফেলেছে একথা নিরঞ্জন ভাবতেও পারে না। হাঁ হারায় বটে এক ধরণের ভালোবাসা, কিন্তু শেষকালে কি এই বিশ্বাস করতে হবে যে সংসারে মুড়ি মিছরির সমান দর? তাহ'লে নিরঞ্জনেরই অন্তরে এ আলো জ্বালিয়ে গেল কে?

একদিন সুচিত্রা ধরে বসল, "কী হয়েছে বলো। কেন এই পাগলামি? আমাকে কি চাও না আর?"

নিরঞ্জন বললে, "জল যখন স্থির, ছায়াও তখনই স্থির। আমার মনের নীরে প্রেমের ছায়াকে যদি চিরস্থায়ী করতে চাই, মনটাকে আগে শুদ্ধ করা দরকার।"

সুচিত্রা অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে, "তাই বুঝি এত জপ-তপ? হঠাৎ এই কবিত্বই বা কেন?"

আঘাত লাগল নিরঞ্জনের মনে। সুচিত্রা বুঝল না। অপরকে বুঝতে হ'লে নিজেকে ভুলে যাওয়া চাই—সুচির সে বয়স নয়। তাছাড়া, অহঙ্কারে ঘা লাগলে যে কোনো বয়সের মানুষই বুদ্ধিভ্রষ্ট হতে পারে। সুচিত্রার অভিজ্ঞতা তো সামান্য।

পেষণ সুরু হ'ল ঘরে বাইরে। বন্ধুরা দিল টিটকারী, সুচিত্রা থাকে গভীর অভিমানের আড়ালে। ক্রমে অভিমানের রূপান্তর হ'ল তিক্ত উদাসীনতায়। এদিকে নিরঞ্জন পেয়েছে গভীরের রস। আর্টিষ্ট চিরকালই একাকী। জনতা ওর বন্ধন, নিজের নির্জন সৃষ্টির মাঝেই তার মুক্তি। সাধারণের পক্ষে একথা বোঝা শক্ত, কারণ আর্ট সাধারণের নয়; আর্টিষ্টের প্রকৃতিও প্রিয় নয় তাদের। ওরা বোঝে না—যে মানুষ একেবারে একলা, তারও আছে সঙ্গী। সুচিত্রার সহানুভূতি পেলে শ্রীরেখাকে ভুলে নিরঞ্জন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিও পারত ভুলতে। বাস্তবের টানে মানুষ কল্পলোককে বারেবারেই ভুলেছে। সেই বাস্তবই যখন তাকে অনাদর করে, ঠেলে দেয় কল্পনার কেন্দ্রে, নিরাশ্রয় মন একদিন-না একদিন পরম আশ্রয় পায় খুঁজে। সে আশ্রয় বাইরের নয় বলেই শিল্পী হ'য়ে পড়ে জগতবিচ্যুত। মানুষের চোখে সে খাপছাড়া, কারণ মানুষের সঙ্গে রফা করে চলবার ইচ্ছা, ধৈর্য ও ব্যবসায়-বুদ্ধি, তিনটেই তার কম।

শ্রীরেখার রহস্যময় দুঃখ করল বীজবপন; অতীত দিনের প্রিয় স্মৃতির রসে সে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে নিরঞ্জনের মন শাখায় পল্লবে ছেয়ে যাবার আগে, ঠিক রূপটি তার সুচিত্রা পারল না চিনতে। ওর ভালোবাসায় তটে ধরল ভাঙন। যে বিশ্বাসে একদিন মন খুলে দেখাতে পারত মনের সকল জমা-খরচ, সে বিশ্বাস আর রইল না। ভাবল, স্বামী যার অনন্যচিত্তে ধ্যান করতে পারে অন্যকে, তার জীবনে সত্য কোথায়? এই থেকেই সুরু হ'ল ট্র্যাজেডি।

ধীরে ধীরে গেল বদলে, গেল দূরে।

যে সমাজকে এতদিন রেখেছিল তফাতে, যেখানে মনে আনন্দ না থাকলেও বাইরে আমোদের হয় না অভাব, অন্তরের নিষেধের প্রস্তাব ঠেলে সুচিত্রা মিশে পড়ল সেই সমাজের হৈ-চৈ-এ। অনতিকালের মধ্যে নিরঞ্জনের বাড়ির নির্জনতার শান্ত বেড়া ভেঙে প্রীতির কমল লুটপাট ক'রে দিয়ে গেল জনতার গুণ্ডামি। তখন নিরালা মানুষটি বেরিয়ে এলো সদ্য-জাগ্রত রুদ্রের রূপে। সুচিত্রা ভেবেছিল স্বামীর উপর শোধ নিতে হয় এমনি ক'রেই—পুরুষ বোঝে না স্ত্রীর আসল দর কোথায়! কী করতে কী হ'ল দেখে মুখে তার কথা সরল না। যেন স্বপ্নের মাঝে শুনলে নিরঞ্জন বলছে, "আমি চললাম।"

কোথায়-সুচিত্রা একবার জিজ্ঞাসাও করতে পারলে না। আপন পর হ'লে বুঝি এমনই হয়। খোঁজ নিয়ে দেখলে সামান্য কাপড়-চোপড় ছাড়া নিরঞ্জন কিছুই নেয়নি সঙ্গে। নিশ্চিন্ত হ'ল—বেশি দূর নয়, বড় জোর শিলঙ বা মুসৌরী পাহাড়। কিন্তু দিন, সপ্তাহ, ক্রমে মাসও পেরিয়ে যায়—নিরঞ্জনের কোনো খবর নেই। ভাবলে, এত ঔদাসীন্য? আচ্ছা, আমারও রইল এই কঠিন শপথ—

তারপর থেকে নিরঞ্জনের স্ত্রীর আধুনিকত্ব আধুনিক কালকেও গেল ছাড়িয়ে। ভবিষ্যতের দৈত্য যাদের বাহন ক'রে সমাজের 'অগ্রগতি'র লড়াই করে ঘোষণা, তাদেরই দলের অন্তত আধেক ডজন ওরই কথায় করে ওঠা-বসা। মন্মথ আবার এহেন ভক্তদেরও অগ্রণী। সুচিত্রার বাইরের উন্নতি যত চমকপ্রদ, ভিতরের উন্নতিও সেই পরিমাণে দ্রুত অগ্রসর হতে পারলে তবেই মন্মথর শেষ ক্ষোভটুকুও থাকত না! কিন্তু এত বুদ্ধিমতী মেয়েরও কোথায় যেন একটুখানি—মন্মথর ভাষায়, যাকে বলে প্রেজুডিস। তাছাড়া স্বামী একদিন ফিরবে, এ আশা সুচিত্রা ছাড়েনি। মনের কোণে কোথায় ওর বিশ্বাস ছিল এমন নিরঞ্জনের দু'দিনের খেয়াল, চিরদিনের ব্যাপার বা ব্যবস্থা নয়। আপনার ফিরবার দিনের জন্যে নিজেকে সে মনে মনে তৈরী ক'রে রাখছিল। ও আরও

না যে মন্মথ একজন সাইকলজিষ্ট। তাই যখন প্রমাণ করল—নিরঞ্জন কিছুতেই আর ফিরবে না, গেল নিজে শিলঙে মুসৌরী পাহাড়ে, পাছে তবু সুচিত্রা বিশ্বাস না করে সেই ভয়ে নিরপেক্ষ সাক্ষীর অকাট্য প্রমাণ আনিয়ে দিল—নিরঞ্জন ওই দুই পরিচিত জায়গার কোথাও একটি বারো যায়নি, তখন সুচিত্রার মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেল। মনের যত কঠিনতা এক মুহূর্তে গেল ভেঙে। ভীতি-বিবর্ণ মুখে মন্মথর হাত চেপে ধরে বললে, "তাহ'লে কোথায় গেলেন উনি? বেঁচে আছেন তো? মন্মথ, আমি তোমার বোন—"

কথা শেষ না হতে দু'টি চোখে নামল ধারা।

মন্মথ বিচলিত হয়ে বললে, "আপনি কি কোনো খবরই রাখেন না?"

—"প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—"

মন্মথ বললে, "কী কাণ্ড আপনাদের! যাক, শুনুন। ওর ব্যাঙ্কে খবর নিয়েছিলাম জরুরী তাগিদে।"

সুচিত্রা নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে শুনতে লাগল।

মন্মথ একবার একটুখানি ইতস্তত করলে। পরক্ষণে মরীয়া হয়ে বলে উঠল, "অনেকদিন ধরে হিমালয়ের পথে নানা ষ্টেশনে টাকা গেছে নিরঞ্জনের নামে।"

সুচিত্রার রক্তস্রোত শীতল হয়ে এলো।

মন্মথ বলতে লাগল, "কে তাকে পথে বা'র করলে? সুচিত্রা দেবী, কিছুই জানেন না—আপনি সত্যিই কি এত ছেলেমানুষ?"

সুচিত্রা কষ্টে উত্তর করলে, "কী বলছেন?"

মন্মথ রাগ করল, "শ্রীরেখা কে? সমস্ত কলকাতা জানে যে ব্যাপার—"

অপমানে সুচিত্রার মুখ কালো হয়ে গেল। কী বুঝল, কতখানি ভাবল, প্রকাশ করল না আর। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের মতো নিঝুম হয়ে রইল বসে।

তার পরের দিন মন্মথ আর ওকে জীবিত দেখেনি।

বন্ধুরা কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে মন্মথর গায়ে কাঁটা দিত—সে দুঃস্বপ্ন! থাক, থাক—ওকথা।

সুচিত্রাকে সে নিজের ধরণে ভালোবেসেছিল। এমন শাস্তি জীবনে পায়নি।

* * * * *

শ্রীরেখার সন্ধানে প্রকাশ্যভাবে লোক লাগানোর কতটা কদর্য হতে পারে একথা নিরঞ্জনের মনে হয়নি। হিমালয়ের পথে যে বান্ধবী গেছে হারিয়ে, তার জন্যে নিজে সন্ধানী হয়ে বেরিয়ে পড়াও ওর মনের বিচারে বিচিত্র নয়। সুচিত্রার ঔদাসীন্য ও অন্তর্মুখিতা সংসারের উপর এনে দিলে বিরাগ। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে পড়েছিল শান্তির আশায়; তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াত, সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এবার যদি শ্রীরেখারও উদ্দেশ পাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে যাত্রীরা কোন্ এক পরিব্রাজিকা বাঙালী মেয়ের কথা বলে। নিরঞ্জনের দৃঢ় বিশ্বাস এ শ্রীরেখা; কারণ, ওর মতে, এমন দুঃসাহসী মেয়ে বাঙ্গালা দেশে দ্বিতীয় নেই। গুজবের ক্ষীণ সূত্র ধ'রে কত জায়গায়ই না ঘুরল। দরকার হলে বোধ হয় তিব্বতেও যেত। ইতিমধ্যে হৃষীকেশে অভূতপূর্ব ঘটনা। একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে গেল সন্ন্যাসীবেশী পুরাণো এক বন্ধুর সঙ্গে। লোকটি পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই নিরঞ্জন খপ্ ক'রে ধরল তার হাত। অসিত মুখ তুলে হেসে বললে, "চিনলে কি ক'রে?"

নিরঞ্জন ভিতরের আবেগ দমন করতে পারলে না, বন্ধুকে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধ'রে বললে, "মুণ্ডিত মস্তক আর গেরুয়ার আড়ালে সন্তর্পণে উঁকি দিচ্ছিল এডিনবরার সেই ক্ষণে ক্ষণে আমোদপ্রিয় দুরন্ত স্বভাবটি। সে কি লুকোনো যায়? তবু ইতস্তত করছিলাম, কিন্তু আর সন্দেহের অবকাশ দিল না তোমার ওই পাশ কাটানোর চেষ্টা। সে কথা থাক। এখন শ্রীরেখাদের খবর কী বলতে পারো?"

বিস্মিত হ'ল অসিত। বললে, "তাদের খবর তোমারই তো জানবার কথা। শ্রীরেখা দেশে ফিরেছিল। তারপর এই দেড় বছর কিছুই জানিনে। জানবার কথাও নয়, এক জায়গায় কি বেশি দিন থাকতে দেয়?" ব'লে হাসলে।

নিরঞ্জন উৎকণ্ঠা গোপন করতে পারল না।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপার কী?"

—"শ্রীরেখা এই পথে এসেছিল। তারপর নিরুদ্দেশ।"

—"একা এসেছিল?"

—"একাই তো। অসিত, তুমি কী জানো বলো। অনন্ত কোথায়?"

অসিত বললে, "বোসো না ওই পাথরটার ওপর। পা কাঁপছে, ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? প্রথম প্রথম আমারও ওরকম হ'ত। অনন্তর কথা? কেন, কাগজে দেখনি? ডোভারেই ধরা পড়ে।"

নিরঞ্জন বুঝতে পারলে না।

অসিত অধিকতর আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, "সে কি, এতদিন একসঙ্গে থেকেও কিছুই জানো না? দেশে ফিরছিল, সঙ্গে—" বাকি কথা অত্যন্ত চুপি-চুপি বললে। চেঁচিয়ে উঠল নিরঞ্জন, "অনন্ত—"

অসিত বাধা দিয়ে বললে, "আস্তে ভাই, আস্তে। যদিও শিলা ছাড়া কোথাও কিছু দেখা যায় না, কিন্তু এই হতভাগা দেশে পাথরেরও নাকি শ্রবণশক্তি আছে।"

একটু পরে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, "অসিত, তোমার এই বেশ কেন?"

অসিত নিঃশব্দে হাসলে।

সেদিকে চেয়ে নিরঞ্জনের চোখের কোণ সজল হয়ে এলো, "ভাই অনন্ত তোমায় পছন্দ করত। আচ্ছা, তারপরে কী হ'ল?"

—"তারপরেও কি আমার জানবার কথা?" অসিত জীর্ণ গেরুয়া তুলে দেখালে, "তখন থেকে এই বুড়ো হিমালয়ের সাথে মিতালি। রাজার নজর যার উপর, সে কি যে-সে লোক? হয়ত জীবনের শেষ

পর্যন্ত পর্বত-মূষিক হয়েই থাকতে হবে।" চির-অভ্যাস মতো অসিত আবার হাসলে।

নিরঞ্জনের হাসি এলো না।

অসিত বললে, 'কিন্তু শ্রীরেখা। নিরঞ্জন, ওকে চেনোনি, ওখানেই তোমার ত্রুটি।"

নিরঞ্জন রুদ্ধশ্বাসে বললে, "তার মানে?"

অসিত আপনমনে ব'লে চলল, "একেই বলে ভাগ্য-বিপর্যয়। শ্রীরেখা কবি, শিল্পী। ধ্যানী বুদ্ধের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকত ছবি আঁকবার আগে। তার সে মূর্ত্তি দেখোনি? আমি দেখেছি—কতবার। এমন মেয়ে ভালোবাসল বেদুইনের মতো প্রবল-প্রাণ—না, এক উদ্দাম ঝড়কে। রক্তাক্ত হয়ে গেল ওর সুকুমার মন। সুন্দরের ভক্ত প্রচণ্ডের পূজারীর গলায় দিয়েছে বরণমালা, শুনেছ এমন কথা আগে কখনো? যেন ভৈরবের বুকে শ্বেত পুষ্পমালা। ওর উচিত ছিল তোমাকে ভালোবাসা!"

চমকে উঠল নিরঞ্জন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে অসিত বলতে লাগল, "কারো কারো জীবনটা যেন আগাগোড়াই এক ট্র্যাজেডি। অথচ ওরা সাধ ক'রেই দুঃখকে ডেকে আনে ঘরে। এ আমি কতবার দেখলাম। কিন্তু অনন্তও স্বার্থপর ছিল না। ইচ্ছা করলেই বাঁধন ছিঁড়তে পারত শ্রীরেখা। অনন্ত বুঝেছিল তোমার সঙ্গেই ও সুখী—"

নিরঞ্জন আর থাকতে পারল না; পাগলের মতো বলে উঠল, "কী বলো অসিত!"

অসিত হাসল, "এতই ঠুনকো মন—একটা কথার ঘা পারে না সইতে! কিন্তু ভয় নেই। সহজ মেয়ে হ'ত যদি শ্রীরেখা কঠিনের পথে যেচে পা বাড়াত না। ওর প্রেমও যে ওরই সুন্দরের অভিব্যক্তি—শোনোনি তার অদ্ভুত আইডিয়াগুলো?"

মানসের ক্ষুধা নিরঞ্জনের চোখের দৃষ্টিতে এতই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল যে অসিত মুহূর্ত্তখানেক স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে বললে, "প্রবল ঝড়ের আড়ালে সে দেখত নাকি শিবের শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি। কে জানে, হয়ত অনন্তও এমন কোনো টানেই টানত ওকে যার রূপ ছিল চোখের অগোচর—"

নিরঞ্জন বাধা দিয়ে বললে, "তুমি কি ভাবো আমি দেখিনি ওদের গভীর মিলনের সেই অপরূপ মুহূর্ত্তগুলো? একটু আগে মনটাকে ঠুনকো বলে গাল দিলে, কিন্তু ভেবে দেখলে না মানুষের মনে এমন অপূর্ব বস্তুরও ছায়া প'ড়ে থাকতে পারে, যা এ জগতেরই নয়। তোমার বাস্তবের মলিন স্পর্শ, কুশ্রী ইঙ্গিত সয় না তাকে—সয় না!" বলেই নিরঞ্জন মাথা নিচু করলে। কী এক আবেগে ওষ্ঠাধর বারবার কেঁপে উঠল।

অসিত বিস্মিত ব্যথায় ক্ষণেক চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "তুমি নিজেই জানো না নিরঞ্জন, কোথায় তোমার অত্যন্ত লেগেছে। শ্রীরেখাকে তুমি ভালোবাসো—গভীরভাবে। সে অপ্রাপ্যা, তাই কখনো—"

আহত পশুর মতো নিরঞ্জন ছিটকে উঠে দাঁড়াল। দুই চোখের অভিযোগী দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধতে লাগল অসিতকে। তারপর, কিছু না ব'লেই, হঠাৎ ছুটে চলে গেল যে পথে এসেছিল তার উল্টোদিকে।

*

* *

পরম বেদনার মুহূর্ত্তে মানুষ কত যে একা, তা সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। তবু গভীর উপলব্ধির জন্যে এর চেয়ে ক্রততর উপায়ও আছে কমই।

সারা রাত ভেবে নিরঞ্জন ঠিক করলে বাড়ি ওকে ফিরতেই হবে। সুচিত্রার সব অদ্ভুত ব্যবহার মনে পড়ল। ধিক্কার দিল নিজেকে—কেন আগে বুঝতে পারেনি। দোষী হয়ে রইল চিরকাল, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়, জেনেশুনে নয়। তাই ফিরে গিয়ে চাইতে হবে ক্ষমা, বলতে হবে—সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকেই চেয়েছিলাম একদিন। এ দেহ আজও তোমার, কলঙ্ক স্পর্শ করেনি কোথাও, ঠকাইনি কা'কেও। তবু তোমার ক্ষমা ব'য়ে নিয়ে আজ আমায় ফিরতে দাও আমার মনের মুক্তির মধ্যে। সেখানে যদি আমি আর কাউকে ভালোবেসে থাকি, সে হ'ল আমার অগোচর পাপ। তাকে কখনো পাবার ইচ্ছা করিনি এই মাটির জগতে। হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তোমার কাছে যেমন স্থান নেই আমার, তেমনি তার কাছেও না।

কিন্তু হায়, এখন সুচিত্রা কি শুনবে? দেবে কি সেই মুক্তি যার জন্যে সমস্ত হৃদয় এমন উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে?

কোথায় শ্রীরেখা, নিরঞ্জন আর চায় না জানতে। শ্রীরেখা ওর সত্তার রূপ, হ'লই বা নারী-দেহধারিণী। মানুষের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি করতে পারে ব্যঙ্গ। করুক। নিরঞ্জনের অন্তরের সত্য এতই কি ভঙ্গুর?

তারার পথে আলোকের যে জগত যায় খুলে, তার জন্যে তারা দায়ী কতটুকু? শুধু এটুকু যে, সে আলোময়ী। পৃথিবীর কোনো মুগ্ধ মন যদি সে স্বয়ম্প্রভাকে ভালোবাসে, ছিঁড়ে ফেলতে চায় মাটির বাঁধন, লোকে তাকে বলে পাগল। বুঝতে পারে না এ আলোর প্রেম। সুচিত্রাও বোঝেনি, বুঝবে না। না-ই বা বুঝল। তবু তাকে হবে না ঠকানো। বলতেই হবে যা বলবার।

পরদিনই ফিরল হৃষীকেশ থেকে। প্রয়াগে থাকে ওরই পিসতুতো ভাই সত্যেন্দ্র। অনেক বিষয়ে পরামর্শ করবার ছিল। ভাবলে এখনই সব সেরে নিই না কেন? সমস্ত সম্পত্তি সুচিত্রার। সত্যেন্দ্রের সাহায্যে যত শীগ্‌গির সম্ভব পাকা বন্দোবস্ত একটা হওয়া চাই।

নেমে পড়ল প্রয়াগে। দু'ভাই আশৈশব বন্ধু। কিন্তু আজ নিরঞ্জনকে দেখে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল সত্যেন্দ্রের মুখ। বুঝতে পারল নিরঞ্জন—পরীক্ষার প্রথম দফা হ'ল সুরু। কী কৈফিয়ত দেবে ভবঘুরে মন? কিছুই না বলে রইল চুপ ক'রে। সত্যেন্দ্রের মৌন তবু ভাঙল না।

অবশেষে খাওয়াদাওয়ার পরে নিরঞ্জন আর পারল না থাকতে। বললে, "বুঝতে পারছি সত্য, অভিযোগ অনেক জমা হয়েছে। কিন্তু এ নীরবতার চেয়ে বরং কটু কথা ভালো। কী বলবার আছে তোমার?"

সত্যেন্দ্র শুধু বললে, "কোথা থেকে আসছ?"

—"হৃষীকেশ থেকে।"

তারপর আবার সব চুপ।

নিরঞ্জন ডাকলে, "সত্য!"

সত্যেন্দ্র মুখ তুলল না।

নিরঞ্জন শঙ্কিত হয়ে বললে, "কী যেন হয়েছে। লুকোচ্ছ কেন?"

এতক্ষণে সত্যেন্দ্র নিশ্চিন্ত হ'ল নিরঞ্জন কিছুই জানে না। জিজ্ঞাসা করলে, "বাড়ির খবর জানো?"

"চিঠি খবরের বেত উঁচিয়ে পিছু-তাড়া ক'রে বেড়ায়, জমি-জমা মহাল নিয়ে গণ্ডগোল—ওসব পড়তে হবে? আমি ভাবি কাজ কী? তার জন্যে যোগ্যতর লোক রয়েছে। ফেরত পাঠিয়ে দিই। নিজে কেবল পালিয়ে চলেছি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়।"

সত্যেন্দ্র কেমন একরকম ক'রে তাকিয়ে বললে, "একলা?"

—"একলাই তো। শুচি—"

—"তার কথা নয়। আর কে আছে সঙ্গে?"

—"কী বলছ? স্পষ্ট ক'রে বলো।"

হঠাৎ সত্যেন্দ্র উত্তেজিত হয়ে উঠল, "নিরুদা, বিশ্বাস করতে না চাও, বলো না। কিন্তু তোমার উপর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল যে! সেই তুমি—কী করলে—বৌদি—"

নিরঞ্জনের মুখে কথা ফুটল না।

অমন মুখ দেখেও সত্যেন্দ্র শান্ত হ'ল না। বললে "যাকে হারালে, এ জীবনে সে আর ফিরবে না। কিন্তু কিসের মোহে করলে এমন কাজ?"

নিরঞ্জন ধীরে ধীরে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অস্ফুট কণ্ঠে কী একটা বলল, ভালো বোঝা গেল না।

আর ভাববার নেই, রইল না ভয়। এ কী ভীষণ, এ কী রুদ্র রূপ মুক্তির! হঠাৎ যেন ভৈরবের চাহনি থেকে রোষের স্ফুলিঙ্গ ছুটে এসে প্রলয়-দাহনে বিশ্বের সবুজ-বন্ধন গেল খসিয়ে। তারপর ওই যে মরু—প্রচণ্ড, উত্তপ্ত, সীমাহীন—একে পার হ'বার মহামন্ত্র কোন্ দেবতার হাতে?

উদ্‌ভ্রান্ত মন—অসহ্য মানুষের সঙ্গ। মূক বৃক্ষলতাও হৃদয় দিয়ে আর্তের বেদনা বোঝে, কিন্তু মানুষের চোখে বিষ।

খুনী? হাঁ তাই তো। মানুষ ক্ষমা করবে কেন?

প্রজ্বলন্ত ধূমকেতুর মতো নিরঞ্জন দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে চলে—তেমনি অশান্ত তেমনি লক্ষ্যহারা।

আলমোড়ায় আবার অসিত। সমস্ত শুনে হাত চেপে ধরে বললে, "চলো পালাই। আরো দূরে।"

নিরঞ্জন উত্তর দিল না।

অসিত রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "নিরঞ্জন, বাঁচতে চাও না? এমন ক'রে লাভ কী?"

নিরঞ্জন ফিরে তাকা'ল। চোখে প্রশ্ন। অসিত দৃষ্টি নামিয়ে বললে, "সবই বুঝি, কিন্তু—"

একটু পরে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যেতে বলো?"

—"যাবে মানস-সরোবরে? শুনেছি একদল যাত্রী আসছে।"

অনেকক্ষণ ভেবে নিরঞ্জন রাজি হ'ল। দুর্গমের অভিযানেও যদি ভুলতে পারা যায় এ জ্বালা! ...

দিন দুই পরে অসময়ে নিরঞ্জনের ঘরে এসে অসিত চুপ ক'রে বসল। একটু আনমনা, কী বলতে চায় বারবার, কিন্তু প্রতিবারেই থেমে যায়। এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে বৃথা সময় কাটিয়ে দিলে। নিরঞ্জন বুঝল ওকে সাহস দেওয়া দরকার; হয়ত অভাবের কথা, মুখ ফুটে বলতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করলে, 'কিছু বলবে আমায়?"

অসিত কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে বললে, "জনকয়েক যাত্রী এসেছে।"

নিরঞ্জন চুপ করে শুনতে লাগল। স্পষ্ট বুঝতে পারলে কী একটা ঘটেছে।

হঠাৎ অসিত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "জানো সঙ্গে কে?"

নিরঞ্জন আশ্চর্য্য হ'ল—অসিতের গলা কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল!

স্তম্ভিতের মতো ক্ষণেক চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে নিরঞ্জন কাছে স'রে এলো, "সত্যি বলছ?"

অসিত নিশ্বাস ফেলে বলল, "নিজের চোখে দেখবে চলো।"

—"কিন্তু—"

—"ভয় নেই। তোমার কথা জানে না। যদি বলতে দাও—এইবার।"

স্বপ্নমুগ্ধের মতো নিরঞ্জন বেরিয়ে এলো। ঘোর অন্ধকারেই নাকি গ্রহ নক্ষত্র উজ্জ্বলতর হয়ে ফোটে! ...

সেই শ্রীরেখা! তবু—সে নয়। মাথার চুলে পড়েনি জটা, পরণে নাই গেরুয়া। তবু এ কোন্ সন্ন্যাসিনী!

স্তব্ধ নিরঞ্জনের পিঠে হাত দিয়ে অসিত চাপা গলায় বললে, "দাঁড়িয়ে কেন? চলো।"

চমকে উঠল, "কোথায়?"

অসিত ব্যস্ত হয়ে বললে, "ওকি?"

নিরঞ্জন তখন ফিরে চলেছে। ঘরে এসে অসিত বললে, "একি ছেলেমানুষি!"

* * * *

গভীর রাত্রে নিরঞ্জন বন্ধুর ঘরে এসে বললে, "আমি চললাম।"

ঘুম ভেঙে অসিত বিহ্বলের মতো চেয়ে রইল।

অনেকদিন পরে নিরঞ্জন হাসলে, "ভাবছ কেন? আমার যা পাবার ছিল পেয়েছি, যেটুকু দেখবার ছিল—দেখেছি। এবার শুধু যাত্রার পালা। বন্ধু, সে পথেই পা বড়ালাম। তবে ভাবনা কিসের?"

—"কিন্তু শ্রী—"

নিরঞ্জন বললে, "যে পথের আলো চোখে যায় না দেখা, তারই একটি কণা এসে পড়েছে ওর মুখে। ভিক্ষাপাত্র ভরিয়ে নিয়ে চললাম। কাছে যাবার দরকার কী।" ..

অসিত উঠে পড়ল, "চলো এগিয়ে দিই খানিকটা।"

রাতের স্তব্ধতায় দু'জনে নক্ষত্রভরা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াল।



কথা, সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীদিলীপকুমার

তারার প্রেম

(গান)

ওগো বিধুরা তারা
তুমি তন্দ্রাহারা
কার ধ্রুব শরণে ?
কার পথ চাহিয়া
দীপ- খেয়া বাহিয়া
এলে দিন-মরণে ?
কার বরণে তারা
তুমি শ্রান্তিহারা ?

মেঘ- ঢেউয়ে গগনে
সাঁঝ- ম্লানিমা-ক্ষণে
তুমি কোথা ভেসে যাও ?
যার ঘরে উজালা
তব রূপসী ডালা
তারি তরে কি উধাও
তব তরণী তারা,
প্রেম- স্বপনে হারা ?

তুমি চির বিবাগী
জাগো কাহার লাগি'
ওই নীল-শয়নে ?
চারি ধারে করো কার
কায়া- গন্ধ-বিথার
ছায়া- ফুল-চয়নে ?
কার ধেয়ানে তারা
তুমি আপনাহারা ?

তুমি কত যে দূরে,
তবু কাছের সুরে
তব যে কিঙ্কিণি
বাজে অন্তরে মোর—
গাও তারি কি অঝোর
সুর- সুধারাগিণী
নভো- বীণায় তারা,
চির- শ্রান্তিহারা ?

তাই গোধূলি-হিয়া
ওঠে উচ্ছলিয়া
বুঝি তোমারে বরি' ?
কূল- মুগ্ধ আশা
লভে আকূল-ভাষা
তব আরতি করি' ?
মোরা তাই কি তারা
তব সুদূর-হারা ?

০ ১ + ৩
II সা রা | সণ্‌া -া জ্ঞসা -া | মজ্ঞা -া পমা -া | পণা -া সণা -া | র্সা -া র্রা -া |
ও গো বি - ধু - রা - তা - রা - - - তু - মি -
মে ঘ ঢেউ - য়ে - গ - গ - নে - - - সাঁ - ঝ -

০ ১ + ॥ ৩ ০
সণা -া সধা ণা | দপা -া পদা -া | পা -া -া -া | সা -া রা -া | সণ্‌া-া জ্ঞসা -া
ত ন - - দ্রা - হা - রা - - - ও - গো - বি - ধু -
ম্লা - নি - মা - ক্ষ - শে - - - তু - মি - কো - থা -

১ + ৩ ০ ১
মজ্ঞা -া পমা -া | পপা -া সণা -া | র্রা -া র্সা -া | ণা র্সা ণা ধা | দা -া পা মা |
রা - তা - রা - - - তু - মি - ত ন্‌ - - দ্রা - হা -
ভে - সে - যা - - ও সাঁ - ঝ - ম্লা - নি - মা - ক্ষ -

+ ৩ ০ ১ +
পা ধা ণা -া | ধর্সা ণধা ণা -া | জ্ঞা -া পমা -া | পপা ণা র্সা র্রা | র্রা -া পা -া |
রা - - - কা - - র ঞ্জ - ব - শ - র - শে - - -
শে - - - তু - মি - কো - থা - ভে - সে - যা - - ও

৩ ০ ১ + ৩
পমা জ্ঞরা সণ্‌া সা | ন্‌া -া সা -া | রা -া জ্ঞা -া | মা -া পা -া | ধা -া ণা -া |
কা - - র প - থ - চা - হি - য়া - - - দী - প -
যা - - র ব - রে - উ - জা - লা - - - ত - ব -

০ ১ + ৩ ০
র্সা -া র্রা -া | র্জ্ঞা -া র্রা -া র্সা -া ণা -া | ধা -া পা -া | মপা ধণা ণা -া |
খে - য়া - বা - হি - য়া - - - এ - লে - দি - ন -
রূ - প - সী - ডা - লা - - - তা - রি - ত - রে -

১ + ৩ ০ ১
মজ্ঞা মজ্ঞা মা পা | সরা জ্ঞমা পমা জ্ঞরা | সা -া সা রা | ণ্‌া -া ণা -া | ণা -া ণা -া |
ম - র - শে - - - - - কা র ব - র - শে - তা -
কি - উ - ধা - - - - ও ত ব ত - র - নী - তা -

+ ৩ ০ ১
পণা সর্রা জ্ঞর্রা সণা | পর্সা ণা র্রা র্সা | ণা র্সা পা -া | পদা -া পা মপা |
রা - - - - - তু মি শ্রা ন্‌ - - তি - হা -
রা - - - - - প্রে ম ম - প - নে - হা -

\+ ৩ ৩ ০ ১
পদা পমা জ্ঞরা সরা | জ্ঞপা মা II পা -া জ্ঞাঁ -া | রাঁ -া সাঁ -া | ণা -া ধা -া |
রা - - - - - তু - মি - চি - র - বি - বা -
রা - - - - - তু - মি - ক - ত - যে - দূ -

\+ ৩ ০ ১ +
সঁণা -া পা -া | পা -া দপা মা | পমা জ্ঞা মজ্ঞা রা | জ্ঞরা সা রসা ণ্া | প্া -া পা -া |
গী - - - জা - গো - কা - হা - র - লা - গি - - -
রে - - - ত - বু - কা - ছে - র - সু - রে - - -

৩ ০ ১ + ৩
পা ধা ণা সাঁ | পা রাঁ সাঁ -া | ণা জ্ঞাঁ রাঁ -া | জ্ঞাঁরাঁ সাঁ ধসাঁ ণা | ধা ণা ধা সাঁ |
ও - - ই নী - ল - শ - য় - নে - - - চা - রি -
ত - ব - যে - কি ঙ্ - - কি - গি - - - বা - জে -

০ ১ + ৩ ০
ণা -া সাঁ পা | পা -া ধপা ধা | সাঁ -া -া -া | ধা সাঁ ধসাঁ রাঁমাঁ | রাঁমাঁ জ্ঞাঁরাঁ সাঁ রাঁ |
ধা - রে - ক - রো - কা - - র কা - য়া - গন্ - - -
অ ন্ - - ত - রে - মো - - র গা - ও - তা - রি -

১ + ৩ ০ ১
ধা -া রাঁ -া | সাঁরাঁ সাঁসাঁ ণা -া | ধা -া সঁণা -া | দা -া পা -া | মগা -া মা -া |
ধ - বি - থা - - র ছা - য়া - ফু - ল - চ - র -
কি - দো - স - - র সু - র - সু - ধা - রা - গি -

\+ ৩ ০ ১
পা সঁণা রসাঁ রাঁ | রাঁমাঁ জ্ঞাঁরাঁ সঁণা ধণা | পা -া ধা -া | সাঁ -া রাঁ -া |
নে - - - কা - - - র ধে - য়া - নে - তা -
নী - - - ন - ভো - বী - ণা - - র তা -

\+ ৩ ০ ১
জ্ঞাঁরাঁ সঁণা ধপা ধণা | রসাঁ ণধা পদা পা | সা -া সাঁ -া | ণা -া পা -া |
রা - - - - - তু মি আ - প - না - হা -
রা - - - - - চি র ভ্রা - - ন্ তি - হা -

\+ ৩
দপা মজ্ঞা রসা রজ্ঞা | পমা জ্ঞরা II
রা - - - - -
রা - - - - -

৩ ০ ১ + ৩

পা ধা ণা -া | পা স́া ণা -া | র́া -া স́া -া | ণস́া ণণা ধা ণা | পা সণা রস́া র́া |

তা - ই - গো - ধূ - লি - হি - য়া - - - ও - ঠে -

০ ১ + ৩

ণা ম́া জ্ঞ́া র́া | সজ্ঞ́া র́া সণা স́া | পণা সর́া জ্ঞর́া সণা | পস́া ণা ধা ণা |

উ - - চ্ ছ - লি - য়া - - - - - বু ঝি

০ ১ + ৩ ০

পা -া জ্ঞ́া -া | র́া -া ঋ́া -া | স́া -া -া -া | ণা ধা সণা -া | পা -া ধা -া |

তো - মা - রে - ব - রি - - - কূ - ল - মু - - গ্

১ + ৩ ০ ১

স́া -া স́া -া | সর́া সস́া ণধা ণা | ধা -া সণা -া | ধপা -া ধা -া | রস́া -া র́া -া |

ধা - আ - শা - - - ল - ভে - অ - কূ - ল - ভা -

+ ৩ ০ ১ +

স́া -া ণা -া | ধা -া মজ্ঞ́া -া | সর́া -া ণস́া -া | ধণা -া পদা -া | পা -া -া -া |

যা - - - ত - ব - আ - র - তি - ক - রি - - -

৩ ০ ১ +

মা -া পা -া | জ্ঞা -া পমা -া | ণপা -া সণা -া | জ্ঞস́া -া মজ্ঞ́া -া |

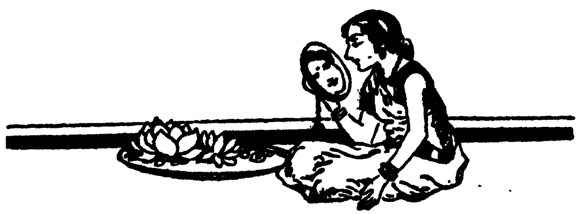
মো - রা - তা - ই - কি - তা - রা - - -

সর্র্া -া সণা -া | ণপা সণা রস́া জ্ঞ́া | র́া -া সণা -া | পধা ণস́া রস́া ণধা |

ত - ব - সু - দূ - র - হা - রা - - -

পমা জ্ঞরা সরা জ্ঞমা | পা -া II

যদি সমস্ত গানটি বড় মনে হয়, তবে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকটি গেয় ; কেন না প্রথম স্তবকটি তৃতীয় স্তবকের, এবং দ্বিতীয় স্তবকটি চতুর্থ স্তবকের সুরের অনুরূপ।



হায়দ্রাবাদে বাঙ্গালার ব্রতচারী

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ

প্রবন্ধ

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগর ময়।"

সেই অতীত গৌরবের কথা মনে পড়িয়া গেল—যখন দেখিলাম বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ের প্রায় সমস্ত বড় বড় ষ্টেশনে নিজাম বাহাদুর কর্ত্তৃক আহুত বাঙ্গালার ব্রতচারীগণকে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে অভিনন্দিত করিয়া সহরের কৃত্রিম সভ্যতা সেই সুদূর হায়দ্রাবাদে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন না; তাহাদের এই বিজয় অভিযান জাতীয় সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত—যেখানে আমাদের মা-বোনেরা তুলসীমঞ্চের গোড়ায় মাটির সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইয়া দেবতার কাছে মঙ্গলভিক্ষা করিয়া থাকেন, যেখানে আঙ্গিনার উপর আলপনার চাষ-রেখায় ব্রতের ঘট স্থাপনা করেন, যেখানে

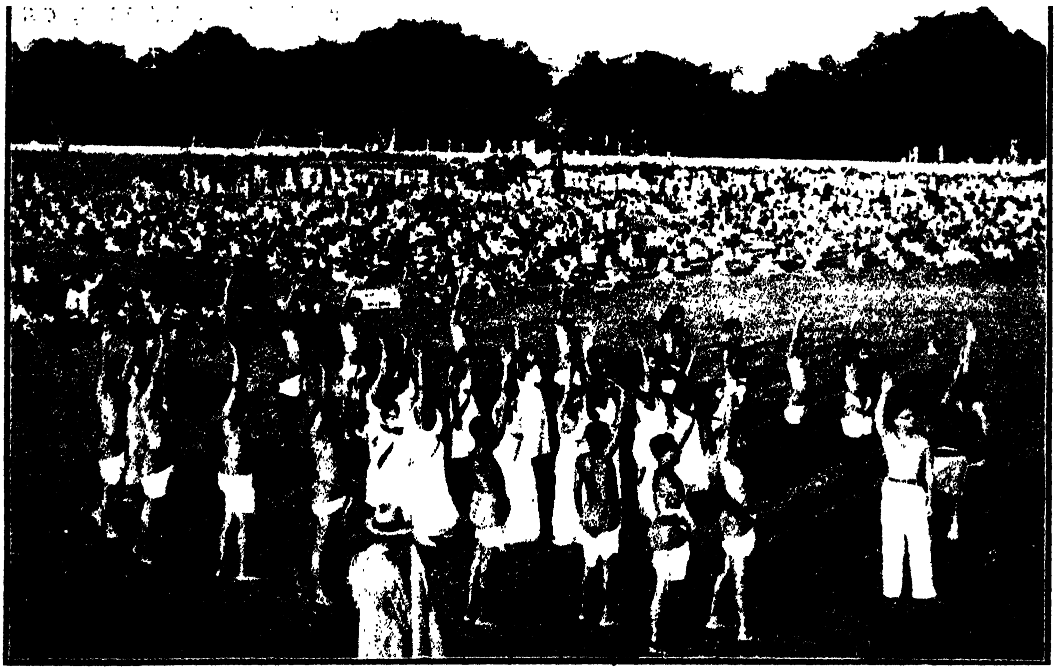


হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত 'ফতে ময়দানে' ৫০ হাজার লোকের সম্মুখে "রায়বেঁশে" নৃত্য

যাইতেছে। শত বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালী শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বে তাহার শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও আধ্যাত্মিকতায় এক গৌরবময় দান করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আজিকার ব্রতচারীগণের এই দাক্ষিণাত্য অভিযানে একটু বিশেষত্ব আছে—যে বিশেষত্ব ছিল পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে। ব্রতচারীগণ কোন উৎসব আয়োজনে সহজ, সুন্দর ও নির্ম্মল নৃত্যগীত করা হইয়া থাকে—সেই নিজস্ব জাতীয় বৈচিত্র্যের ভাবধারাকে বুঝাইবার জন্য তাঁহারা চলিয়াছেন। এই পথচলার আনন্দে কেমন করিয়া যে দুইটি দিন কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

২৫শে আশ্বিন বেলা প্রায় ৮টায় সময় আমরা

হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। গাড়ী থামিতে না থামিতেই ডি-পি-আই, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ ডি-পি-আই প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ ব্রতচারী অধিনেতা শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয় ও ব্রতচারীগণকে অভিনন্দিত করিলেন। প্রত্যুত্তরে আমরা "জ-সো-ভা" "জয়-সোণার-ভারত" বলিলাম। ষ্টেশনে ফটো প্রভৃতি গ্রহণ করিবার পর আমরা বাসে আসিয়া উঠিলাম। ষ্টেট্ হইতে তিনটি বাস ও একটি ষ্টেট্ মোটরগাড়ী আমাদের যাতায়াতের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। ষ্টেটের আভ্যন্তরীণ সমস্ত রাজকার্য্য আমাদের গাড়ীগুলি থামিতেই পুলিশ রাস্তার অন্যান্য যানবাহনের চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের রাস্তা করিয়া দিতেছে; শুনিলাম আমাদের এখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই স্থানীয় প্রত্যেক কাগজে "বাঙ্গালার ব্রতচারীগণের আগমন সংবাদ" প্রকাশিত হইয়াছে। এইভাবে আমাদের গাড়ী কিছুক্ষণের মধ্যেই সহরের অন্য প্রান্তে পৌছিয়া 'জুবিলি হিলের' উপরিভাগে উঠিতে লাগিল। এই 'জুবিলি হিল' হায়দ্রাবাদ সহরের একপ্রান্তে অবস্থিত, ইহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতীব মনোরম। সামনেই বিখ্যাত হোসেন সাগর



নৃত্যের পর গুরুসদয় দত্ত ও ব্রতচারীগণ কর্ত্তৃক 'ইষ্ট আভাষণ' জ্ঞাপন

নিজাম বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিচালিত করা হয় বলিয়া আমাদিগকে প্রথমে কাষ্টমস্ হাউসে লইয়া যাওয়া হয়; কিন্তু কর্ম্মচারীগণ আমাদিগকে রাজ-অতিথি জানিতে পারিয়া তখনই ছাড়িয়া দিলেন।

সহরের আঁকাবাঁকা পথে আমাদের বাস তিনখানি দ্রুতবেগে চলিতেছে। ফুটপথের দুই ধারের লোকগুলির মুখে কৌতুহলোদ্দীপক ভাব, যেন এতগুলি বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে তাহারা এই প্রথম দেখিতে পাইল। চৌমাথার মোড়ে এবং অন্য তিনদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় চলিয়া গিয়াছে। এই সব পাহাড় গাত্রে ধনীলোকের বাস।

যতই গাড়ীগুলি উপরে উঠিতেছে ততই মনে হইতে লাগিল যেন আমরা দার্জ্জিলিং-এর পথে চলিয়াছি। উতরাই, চড়াই, আঁকাবাঁকা পথে গাড়ীগুলি প্রাণপণে উঠিতে চেষ্টা করিয়াও মাঝে মাঝে থামিয়া যায়। তখন মনে হয় যেন আর একটু এদিক ওদিক হইলেই ৫০০ ফুট নীচে পড়িয়া বাসগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। এইভাবে ধীরে ধীরে

"জুবিলী হিলের" উপরিভাগে অবস্থিত 'রক্ ক্যাসল্ হোটেলে' আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তকজী শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয় উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের সহিত হোটেলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি আমাদের থাকিবার স্থান প্রভৃতি দেখাইয়া দিয়া 'জুবিলি হিলের' অনতিদূরে 'প্রেম পর্ব্বত' নামক রাজ-অতিথিশালায় চলিয়া গেলেন।

হায়দ্রাবাদের মধ্যে 'রক্ ক্যাসল্ হোটেলটিই' সর্ব্বপ্রধান 'ইউরোপীয়ান্ হোটেল'। এখানে সাধারণতঃ ইউরোপীয়গণ এবং নিজাম বাহাদুরের অতিথিদের থাকিবার অনুমতি

সাগর এবং হিম্যৎ সাগর দেখিতে রওনা হইলাম। হায়দ্রাবাদ সহর হইতে গোলকণ্ডা প্রায় ১৫।১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রথমে কুতুবশাহি বংশের কবরভূমি ও মসজিদগুলি দেখিয়া প্রসিদ্ধ কুতুব কবরভূমিতে আসিলাম। এখান হইতে বিখ্যাত গোলকণ্ডা দুর্গ দেখা যায়। দুর্গকে পশ্চাতে রাখিয়া কয়েকখানি ফটো গ্রহণ করিবার পর দুর্গ অভিমুখে রওনা দিলাম। প্রথমেই বিরাট দুর্গতোরণ, ফ্লেট্ হর্ণ দিতেই প্রহরী দ্বার খুলিয়া দিল। এইরূপে তিন চারিটি তোরণদ্বার পার হইয়া ধীরে ধীরে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিলাম। গোলকণ্ডা দুর্গ প্রথমে হিন্দু রাজার



প্রদর্শনীর পর শিক্ষাসচিব বক্তৃতা করিতেছেন

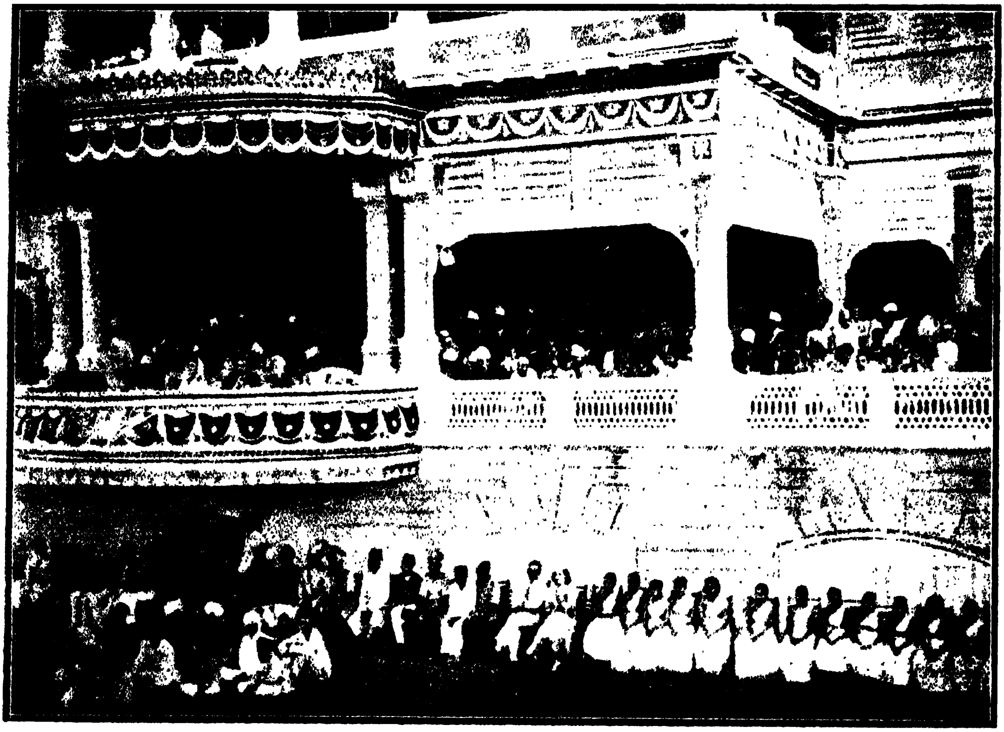
দেওয়া হয়। হোটেলটির যে বাড়ীতে খাবার ঘর এবং 'ড্রইং রুম' আছে সেই বাড়ীতে মেয়ে ব্রতচারীদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল এবং অন্য দুইটি বাড়ী ও তৎসংলগ্ন দুইটি তাঁবুতে পুরুষ ব্রতচারীদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন বিছানা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কলিকাতা হইতে যে সমস্ত বিছানা সঙ্গে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা আর খুলিবার প্রয়োজন হইল না।

সেইদিন বিশ্রাম লইবার পর ২৬শে আশ্বিন মঙ্গলবার সাড়ে চারিটার সময় আমরা গোলকণ্ডা, ওসমান-

অধীনে ছিল, কিন্তু ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব উক্ত দুর্গ দখল করিয়া তাঁহার সুবাদারকে (যাঁহার সময় হইতেই বর্ত্তমান নিজাম পরিবারের প্রতিষ্ঠা হয়) দিয়া যান। বর্ত্তমানে দুর্গে কোন সৈন্যাবাস নাই, কেবলমাত্র দ্বাররক্ষক হিসাবে কতকগুলি প্রহরী নিজাম বাহাদুর কর্ত্তৃক নিযুক্ত করা হইয়াছে। দুর্গপ্রাচীরের ভিতর কতকগুলি বস্তীতে স্থানীয় লোক বাস করে এবং পাহাড়ের উপর প্রধান দুর্গটী প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত আছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া যাইবে বলিয়া আমাদের উপরে উঠা আর হইল না। দুর্গের

বহির্দ্বার দিয়া আসিয়া আমরা ওসমান ও হিম্মৎ সাগর উদ্দেশ্যে চলিলাম।

ওসমান সাগরে যখন আসিয়া পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জনমানবহীন পাহাড়-বেষ্টিত স্থানে নদীর ও পাহাড়ের জল বাঁধ দিয়া নিজাম বাহাদুরের নামানুসারে এই ওসমান সাগরটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। জলপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং রাজ্যের কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্যই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হায়দ্রাবাদে এইরূপ বহু বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ওসমান সাগরের ভিতর ফল-ফুলশোভিত একটি সুন্দর ছোট দ্বীপ করা হইয়াছে। সেখানে একেবারে নীচের সিঁড়ি দিয়া আসিয়া আমরা জলের ধারে বসিলাম। ব্রতচারীগণের ভিতর পাঁচজন মুসলমান ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জলের ধারে বসিয়া নামাজ পড়িয়া লইলেন। অনেকক্ষণ গান ও গল্প প্রভৃতি করিবার পর যাইবার সময় আমরা জাতীয় সঙ্গীত "জয় জয় ভারতমাতা" গানটি করিলাম। এ্যাসিষ্টাণ্ট ডি-পি-আই মহম্মদ এরাজ খাঁ (ইনি ষ্টেটের তরফ হইতে আমাদের দেখাশুনা বিষয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন) গানটি শুনিয়া একেবারে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। এরাজজীকে আমাদের প্রীতির বন্ধন জানাইয়া 'এরাজজী আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয়" গানটি করিয়া ব্রতচারী ইষ্ট আভাষণ 'জ-সো-ভা' বলিলে প্রত্যুত্তরে তিনি 'জ-সো-ভা' বলিলেন। এইরূপভাবে আমোদ আহ্লাদ করিয়া প্রায় আধঘণ্টা পরে হিম্যৎ সাগরে আসিয়া পৌছিলাম। নিজামের জ্যেষ্ঠপুত্র বেরারের যুবরাজ হিম্যৎ আলি খাঁ বাহাদুরের নামানুসারেই এই সাগরের নামকরণ হইয়াছে।



রাজন্যবর্গ প্রদর্শনী দেখিতেছেন

আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তকজী ও এরাজজী পৌছিয়া গিয়াছেন। প্রবর্ত্তকজী বলিলেন, এরাজজীর বিশেষ অনুরোধ, আমাদের 'বন্দেমাতরম্' গানটি গাহিতে হইবে। প্রত্যেকে একটি রেলিংএর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম, প্রবর্ত্তকজী গানটি ধরিলেন। অন্ধকার-ভরা দিগন্ত প্রসারিত নিস্তব্ধ আকাশের নীচে শত বৎসরের

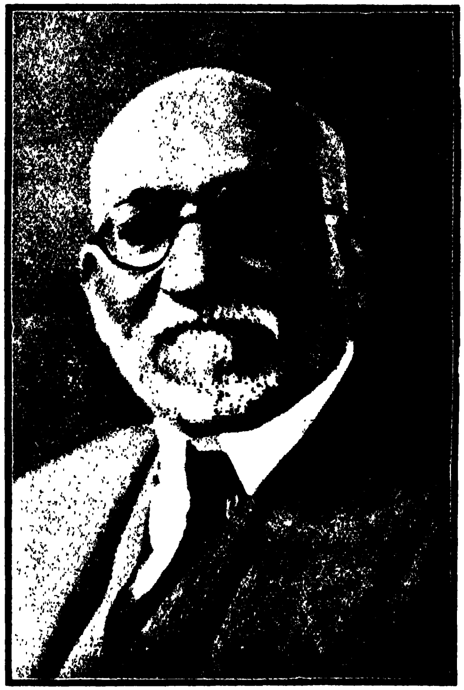
বেদনা মথিত করিয়া 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই ধ্বনি বাঙ্গালার উপকূলে আসিয়া পৌঁছিল কিনা জানি না—যদি পৌঁছিয়া থাকে তবে দেখিতে পাইতেন কেমন করিয়া সহস্র মাইল দূরে হিন্দু মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত হিম্যৎ-সাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

পরের দিন ২৭শে আশ্বিন। এক্ষণে হয়ত' বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মহাষ্টমী পূজায় উদ্ভাসিত, আমাদেরও সেদিন এক মহাপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। নিজাম



বেরারের যুবরাণী— দুরেশার বেগম

বাহাদুরের সমস্ত রাজন্য পরিবারবর্গ হায়দ্রাবাদ সহরের বিখ্যাত 'ফতে ময়দানে' উপস্থিত থাকিয়া ব্রতচারী-প্রদর্শনী দেখিবেন। ব্রতচারী-প্রদর্শনীর সঙ্গে স্থানীয় স্কুলের প্রায় ৫ হাজার ছেলে ব্যাপকভাবে ড্রিল ও নানারূপ কসরৎ দেখাইবে। চারিটা বাজিতে না বাজিতেই সমস্ত উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ আসিয়া পৌঁছিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধান মন্ত্রী স্যার আকবর হায়দারী, ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট, বেরারের যুবরাজ ও যুবরাণী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি উপস্থিত হইলে ছেলেদের ব্যাপক ড্রিল আরম্ভ হইল। পাশ্চাত্যপ্রথানুযায়ী মিলিটারী কায়দায় অতি সাধারণ ড্রিল, ইহাতে বিশেষত্ব তেমন কিছুই নাই। ইতিমধ্যে দত্ত মহাশয় সমস্ত রাজন্য পরিবারবর্গ ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী-দের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার লিখিত ব্রতচারী সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক দিয়া আসিলেন। এইবার ব্রতচারী-প্রদর্শনী আরম্ভ হইল। চারিদিকে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ লোক ইহা দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। প্রবর্ত্তকজী—প্রথমে অতি সংক্ষেপে 'লাউড স্পীকারে' ব্রতচারী উদ্দেশ্য



নিজামের প্রধান মন্ত্রী সার আকবর হায়দারী

সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিলেন। তারপর ধীরে ধীরে মেয়েদের প্রথমে রাখিয়া পশ্চাতে ছেলেরা প্রদর্শনীক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। একদিকে পাশ্চাত্য রীতি অনুকরণে প্রবৃত্ত বিপুল জনসাধারণ—অন্যদিকে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ, মাঝখানে অতি সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী এবং শাড়ী পরা বাঙ্গালার ব্রতচারীগণের সহিত যখন প্রবর্ত্তকজী সমবেত কণ্ঠে দুই বাহু ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া



কুমারী সুধা গাঙ্গুলী

"হ'ল মাটিতে চাঁদের উদয়
কে দেখবি আয়
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস্ নাই
দেখসে নদীয়ায়।"

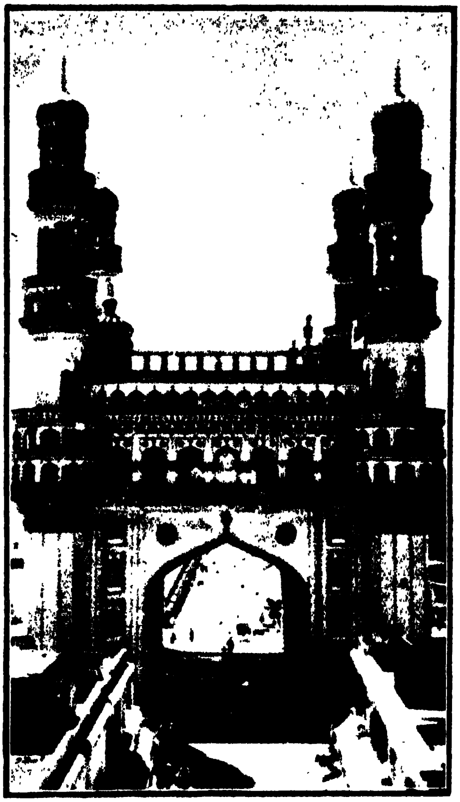
বাউল নৃত্য শেষ করিতে না করিতেই চতুর্দ্দিক হইতে বজ্রপাতের মত করতালিধ্বনি উত্থিত হইল। 'বাঙ্গালা-দেশের মাটি' ও 'কোদাল চালাই' গীতনৃত্য দেখানর পর-মুহূর্ত্তেই ছেলেরা উন্মুক্ত দেহে শুধু মালকোচা দিয়া ঢোল ও কাঁসির তালে তালে 'কাঠিনৃত্য' দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। ঢোলের বাদ্য যতই দ্রুত হইতে লাগিল ততই ব্রতচারীগণ কাঠি চালনায় ক্ষিপ্রতর হইতে লাগিলেন। কেহ বা মাটিতে শুইয়া যেন আহত অবস্থায় কাঠি চালাইতেছেন—কখনও লাফাইয়া লাফাইয়া কাঠি চালাইতে লাগিলেন। কাঠি চালনা ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর হইয়া উঠিলে দত্ত মহাশয় অন্য কয়েক জন ব্রতচারীকে সঙ্গে লইয়া কাঠি নৃত্যের সময়ে আনুসঙ্গিক গান ধরিলেন, 'কাঠি সামালো রে ভাই, কাঠি সামালো'। দেখিতে দেখিতে মাদলের বাদ্য, কাঠির ঠকাঠক্ শব্দ, জয়গান এবং চতুর্দ্দিকের মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনিতে মনে হইল যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে 'পবনে গগনে সাগরে আজিকে' তুফান বহিয়া গেল।

সময় আর বেশী নাই। মেয়েদের জারী নৃত্য ও ব্রত-নৃত্য হইয়া যাইবার পর বিশ্বের বিস্ময় 'রায় বেঁশে' নৃত্য 'ভগবান হে, খোদাতাল্লা হে' বলিয়া 'প্রার্থনা' সঙ্গীত করিলেন তখনকার সে দৃশ্য অভূতপূর্ব্ব। সমস্ত কোলাহল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যেন কোন যাদুস্পর্শে এক মুহূর্ত্তে ধনীর গর্ব্ব ও সাধারণের কৃত্রিম মুখোস খুলিয়া পড়িল। ব্রত-চারী ভুক্তি প্রভৃতি দেখাই-বার পর মেয়েরা প্রথমে বাউল নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে আরম্ভ করিলেন—



হিম্মৎ সাগর

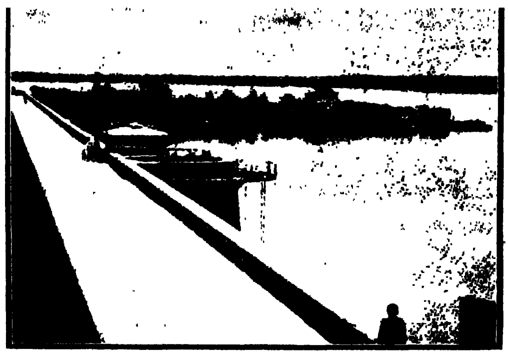
আরম্ভ হইল। দত্ত মহাশয় সকলকে বিস্মিত করিয়া যখন খালি গায়ে ঐ তেজোময় নৃত্যে ক্ষিপ্রগতিতে স্বয়ং যোগ দিলেন তখন উপস্থিত আপামর জনসাধারণ নির্ব্বাক—যেন স্পন্দহীন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর জয়জয়কার পড়িয়া গেল। ইহার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক ব্যাপক ড্রিল হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর জমিতে পারিল না। মঞ্চ হইতে সমস্ত রাজন্য পরিবারবর্গ, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নামিয়া আসিলে পর যুবরাজ, যুবরাণী, স্যার আকবর



চার মিনার

হায়দারী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মাননীয় নবাব মেদি ইয়ার জং তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া ব্রতচারী আন্দোলনের মানসিক ও শারীরিক উন্নতির এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে এবং বিশেষ ভাবে বাঙ্গালী পুরুষদের সুগঠিত, বলিষ্ঠ দেহের তেজোময় চালনা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাদি করিলেন। যুবরাণী নিজে ব্রতচারীগণের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের অভিনন্দিত করিয়া গেলেন। এইরূপে সেদিন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া একরূপ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়াই হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

২৮শে আশ্বিন দশহরা উৎসব। এইখানে দশহরার দিন স্থানীয় লোকদের মধ্যে খুব নৃত্যগীত ও আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। দশহরার মেলা প্রভৃতি দেখিবার জন্য সেই দিন আমরাও ছুটি পাইলাম। প্রবর্ত্তকজী আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেকেন্দরাবাদের বিখ্যাত মেলায় আসিলেন। মেলায় স্থানীয় লোকদের নৃত্যগীত হইবার কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় পূর্ব্বদিনই উহা হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা অবাধ ভ্রমণ করিব স্থির করিয়াছি। মেলায় আর দেখিবার বিশেষ কিছুই ছিল না। হোসেন সাগরের পাড় বাঁধিয়া যে বিখ্যাত রাস্তা নিজাম বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে—বরাবর ঐ রাস্তা দিয়া হায়দ্রাবাদ সহরে পৌছান



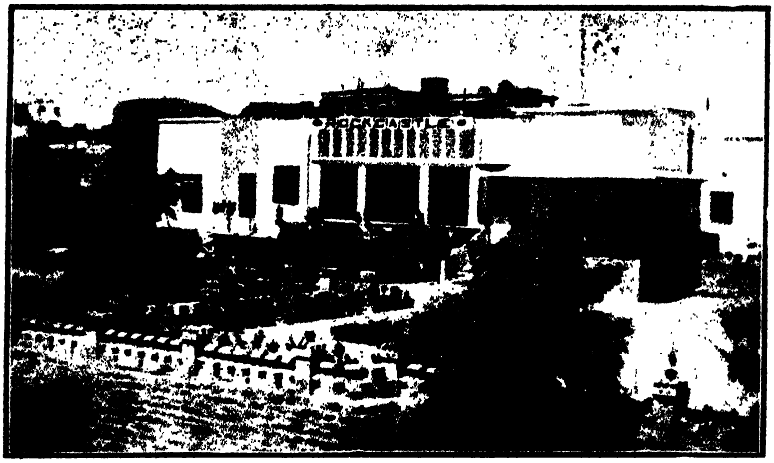
ওসমানিয়া সাগর

গেল। পথে ওসমানিয়া হাসপাতাল, হাইকোর্ট, চারমিনার, নতুন বাজার প্রভৃতি দেখিয়া মক্কা মসজিদে উপস্থিত হইলাম। বৃহৎ একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে পুকুর; তাহারই পার্শ্বে মর্ম্মর শোভিত বর্ত্তমান নিজাম বাহাদুরের পূর্ব্ব-পুরুষদের কবরভূমি পর পর সাজান রহিয়াছে। উহারই সম্মুখে আকাশচুম্বিত মক্কা মসজিদ। মোগল স্থাপত্যানুযায়ী নির্ম্মিত বিরাট হলে আসিয়া দাঁড়াইলেই মস্তক আপনা হইতেই সেই খোদাতাল্লার উদ্দেশে নত হইয়া পড়ে। ইহারই পার্শ্বের প্রাঙ্গণে একটি অতি পুরাতন বটগাছ আছে; দত্ত মহাশয় সেখানে আমাদের সবাইকে ডাকিয়া

বসাইলেন। তাঁহার আদেশানুক্রমে আমাকে সংক্ষেপে 'হায়দ্রাবাদ ও নিজাম সম্বন্ধীয় কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়' ব্রতচারীগণের সম্মুখে বলিতে হইল। অনেক রাত্রি হইয়া যাওয়ায় অবাধ ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

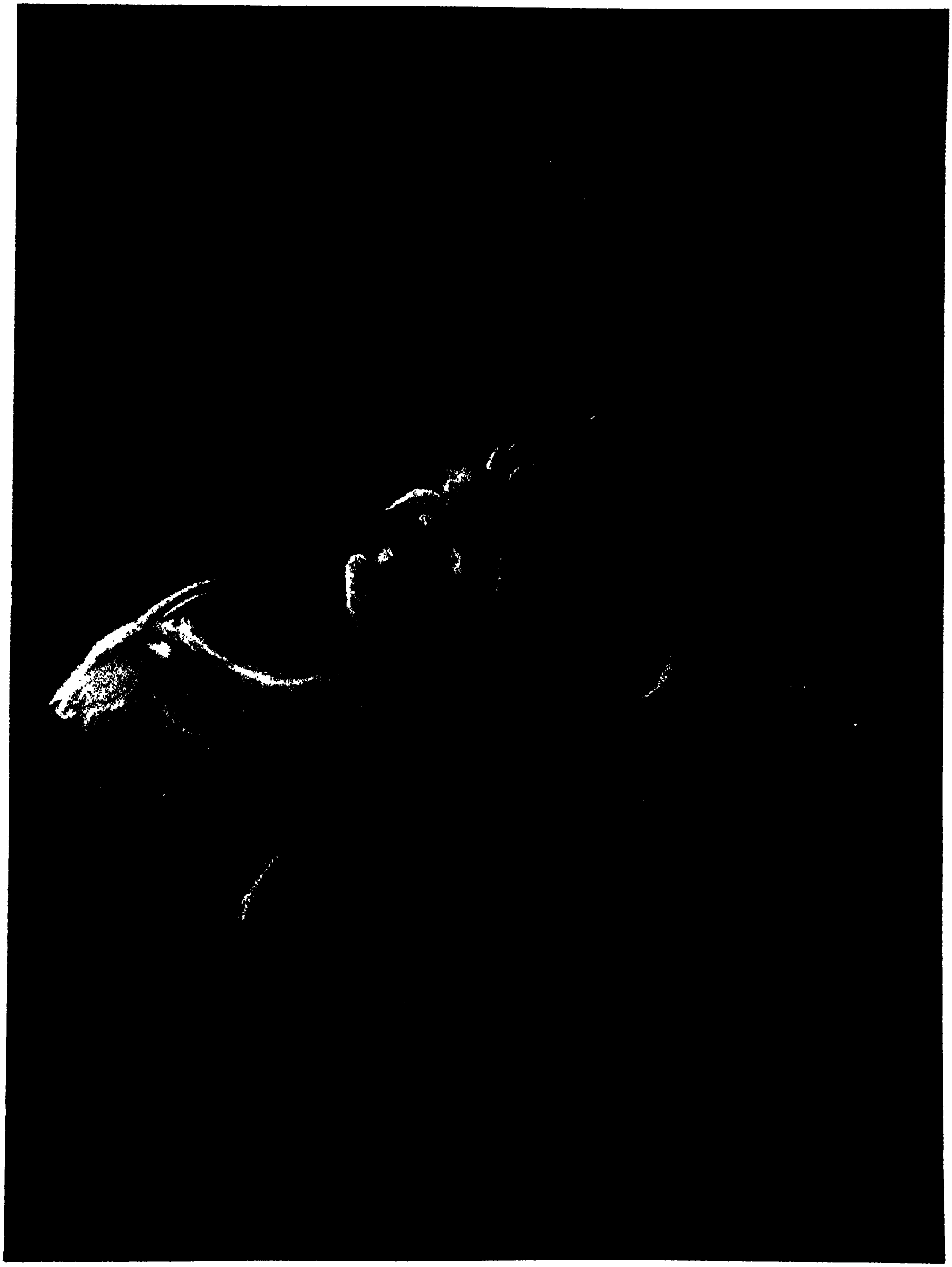
২৯শে আশ্বিন—বিকাল ৪টার সময় হায়দ্রাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নবাব মেদি নওয়াজ জংকে অভিনন্দিত করিবার জন্য আমাদের হোটেলে স্থানীয় গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক 'চায়ের' পার্টি দেওয়া হইয়াছিল। তথায় প্রায় তিন চারি শত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রতচারীগণের প্রদর্শনীও আজ এখানে হইল; সভায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উপস্থিত থাকিয়া ইহার সফলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রত্যেক প্রদর্শনীর শেষে ব্রতচারীর জাতীয় সঙ্গীত "জয় জয় ভারতমাতা" গাওয়া হইত। আজও ঠিক তেমনি ভাবে যখন সঙ্গীতটি গাওয়া হইতেছে এমন সময় সভা হইতে দুইজন বাঙ্গালী মহিলা আসিয়া ব্রতচারীদের সহিত সঙ্গীতে যোগদান করিলেন। ইহা দেখিয়া প্রবর্ত্তকজী জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারা গেল যে কিছুদিন পূর্ব্বে বিমলেন্দু বসু নামক একজন বাঙ্গালী তথায় নৃত্য প্রদর্শন করিতে গিয়া এই গানটিকে তাঁহার স্বরচিত বলিয়া তাহাদের শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া দত্ত মহাশয় খুবই দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভদ্রমহিলা দুইটির পিতাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরিচয়ে জানা গেল তাঁহার নাম জ্ঞানেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, নিজামের অধীনস্থ অন্যতম প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। ইঁহারই তত্ত্বাবধানে ওসমান সাগর প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিয়া আরও গর্ব্ব হইল যে তাঁহারই কন্যা কুমারী সুধা গাঙ্গুলী নিজাম বাহাদুরের "রজত জয়ন্তী" উৎসবে উদ্বোধন সঙ্গীত স্বরূপ ব্রতচারীর জাতীয় সঙ্গীত এই 'জয় জয় ভারতমাতা" গানটি গাহিয়া উপস্থিত সমস্ত লোককে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই হইতেই তথায় বাঙ্গালাগান অনেকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

প্রদর্শনীক্ষেত্র হইতে নিমন্ত্রিত সবাই চলিয়া গিয়াছেন—বসিয়া বসিয়া গল্পগুজব হইতেছিল। এমন সময় স্বতস্ফূর্ত্ত-ভাবেই বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের মনে বিজয়া দশমীর সুর বাজিয়া উঠিল। দেখিতে না দেখিতে পরস্পরে কোলাকুলির সে এক মহাধূম। এদিকে আমাদের হোটেলে দুইজন বাঙ্গালী মুসলমান বাবুর্চ্চী ছিল। তাহারা দৌড়িয়া গিয়া আমাদের জন্য কমলালেবু আনিয়া প্রত্যেককে নমস্কার জানাইয়া হাসিমুখে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। তখন ভাবিলাম এই যে দূরদেশে বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর নাড়ীর টান ইহা কিসের জন্য—দেশে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি।



রক্ ক্যাসেল হোটেল

পরের দিন ৩০শে আশ্বিন 'সিটি-কলেজে' ব্রতচারী অভি প্রদর্শনী হইল। এই দিনের প্রদর্শনীতে ব্রতচারীদের হস্তে একখানি করিয়া কোদাল ছিল। ইহার পর হইতে প্রত্যেক প্রদর্শনীর প্রারম্ভেই পুরুষ ব্রতচারীগণ কোদাল হস্তে প্রাঙ্গণে আসিতেন। ইহা দেখিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী অবাক হইয়া যাইতেন এই ভাবিয়া—যে কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ কোদাল লইয়া গতর খাটিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না ইহা সম্ভবপর হয় কিরূপে? এই দিনের প্রদর্শনীতে সরোজিনী নাইডু, নবাব মেদি ইয়ার জং প্রভৃতি গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া ব্রতচারী আন্দোলনের



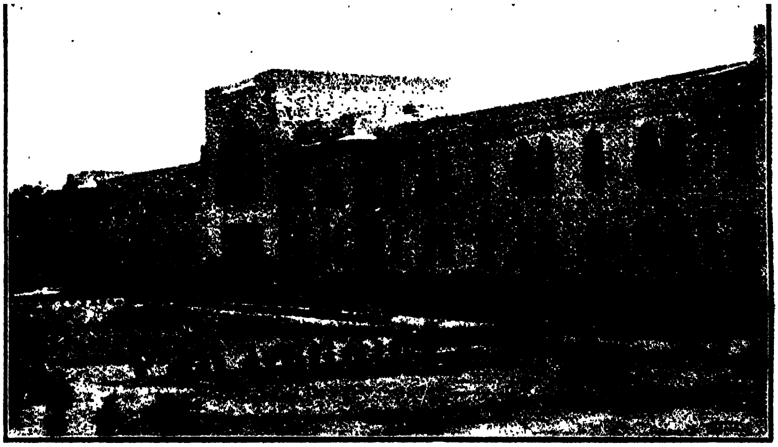
শিল্পী—শ্রীযুক্ত শৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

খেলার সাথী

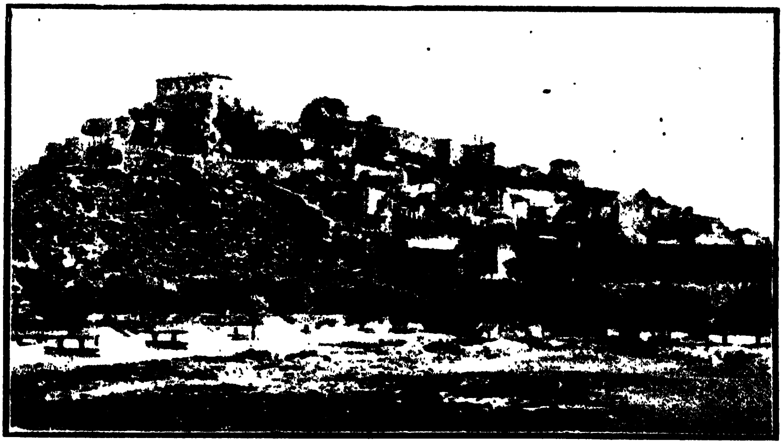
Bharatvarsha Printing Works

ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইহার পর ৩১শে আশ্বিন এবং ১লা কার্ত্তিক ক্রমান্বয়ে 'জাইগীরদার কলেজ' এবং 'গার্ল-গাইড হেড্ কোয়াটার্সে' আমাদের অভি-প্রদর্শনী হইল। 'গার্ল-গাইড্ হেড্ কোয়াটার্সে' প্রদর্শনী করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের খাইতে খাইতে প্রায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। কেহ বা শুইতে গিয়াছে, কেহ বা গল্প করিতেছে, এমন সময় প্রবর্ত্তকজী আমাদের 'ফোন্' করিয়া জানাইলেন যে স্যার আকবর হায়দারীর বাড়ীতে তখনই যাইতে হইবে। সেখানে একটি 'ডিনার পার্টিতে' দুই যুবরাজ ও যুবরাণী' রেসিডেণ্ট্ প্রভৃতি সমস্ত রাজন্যপরিবারবর্গ উপস্থিত আছেন। সাড়ে দশটার মধ্যেই প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় প্রায় ৪৫ মিনিট ধরিয়া ক্লান্তি সত্বেও যে তেজোময় ভাবে ব্রতচারী ছেলেমেয়েগণ প্রদর্শনী দেখাইলেন তাহাতে উপস্থিত সকলে এত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে কখন যে বারটা বাজিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও লক্ষ্য হয় নাই। স্যার আকবর ব্রতচারীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট কুমারী আরতি সেনকে একরূপ কোলে করিয়াই যুবরাজ ও যুবরাণীদ্বয়ের নিকট লইয়া গেলেন। স্যার আকবরের মত একজন সদাশিব ব্যক্তি খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। বারবার বৃদ্ধ আমাদের ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাঁহার ঘরে গিয়া বসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং কিছু না খাওয়াইয়া আমাদের কিছুতেই ছাড়িলেন না। বোধ হয় অনেকেই জানেন যে স্যার আকবর ও তাঁহার পরিবারবর্গ শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম বিশিষ্ট শিষ্য।

পরের দিন ২রা কার্ত্তিক সকালে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু 'রক্ ক্যাসল্ হোটেলে' আসিয়া আমাদের সহিত জলযোগ করিলেন এবং হোটেলের 'ড্রইংরুমে' আমাদের সামনে তিনি 'দেশের স্বরূপ' বুঝিতে হইলে ব্রতচারী আন্দোলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি মনোরম হৃদয়গ্রাহী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। হোটেল প্রাঙ্গণে সমস্ত ব্রতচারীগণকে লইয়া শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সহিত ফটো তোলা হইল।

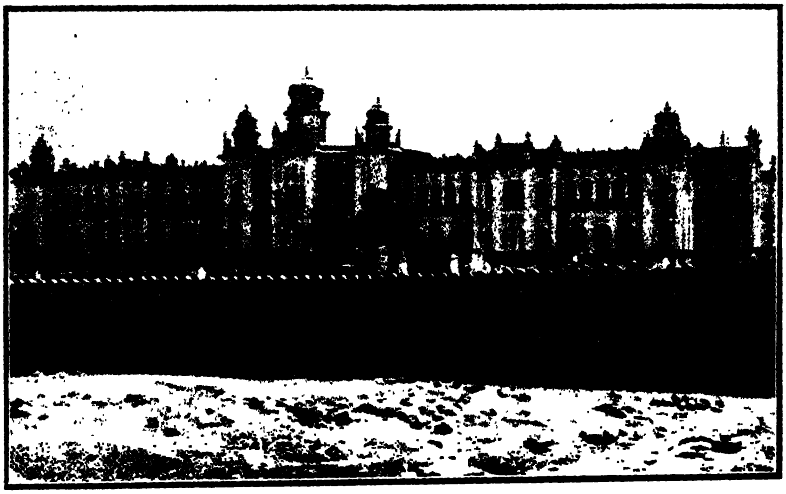


ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাস



গোলকুণ্ডা দুর্গ

এইদিন বিকালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রদর্শনী হইল। সুদীর্ঘ একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া দত্ত মহাশয় যখন নৃত্যগীতে যোগদান করিয়া ছেলেদের আহ্বান করিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এতদূর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে যে একমুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ না করিয়া সকলে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত "জয় জয় ভারতমাতা" গান করিল। উত্তেজনা এত প্রবল হইয়াছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"If anything can be done in India, it will be by the youth of Bengal" (ভারতে যদি কোন কিছু করা সম্ভবপর হয় তবে ইহা একমাত্র বাঙ্গালার যুবকরাই করিবে)। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার দাস মহাশয় প্রদর্শনীক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেন এবং ব্রতচারীর সফলতায় তত্রত্য বাঙ্গালীদের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি নিজে ব্রতচারী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিবেন বলিলেন। অভি-প্রদর্শনী হইয়া যাইবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্-চ্যান্সেলার এবং ভাইস্-চ্যান্সেলর মহোদয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ব্রতচারী আন্দোলনের সফলতা কামনা করেন এবং যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইহাতে যোগদান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রতচারী সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাহার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানান। বিশেষভাবে ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয় যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাটি করেন তাহার তাৎপর্য্যের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম:—"এই আন্দোলনের পশ্চাতে একটি অতি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। ইহা মানুষকে সত্যিকারের স্বদেশানুরাগী করিয়া তোলে। আমি আশা করি এই আন্দোলনের পশ্চাতের সেই অনুপ্রেরণায় একদিন সমগ্র ভারতবাসী একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবে। এই আন্দোলনে ভেদাভেদ জ্ঞান নাই। ইহা এমন একটি আন্দোলন যাহার উৎস দেশের মাটি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই আন্দোলন বহু বহু যুগের প্রাচীন লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যকে পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাতে এমন একটি সতেজ ভাবধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছে যাহা মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ বাড়াইয়া দেয় এবং ইহাই এই আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।"



সিটি কলেজ

সেদিন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একরূপ জয় করিয়াই আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার পরে ৩রা ৪ঠা কার্ত্তিক ক্রমান্বয়ে 'ক্রিকেট-ভূমি', 'বিবেকবর্দ্ধন হাই স্কুল' এবং 'ওয়াই-এম-সি-এ'তে আমাদের প্রদর্শনী হয়। বিশেষভাবে 'ওয়াই-এম-সি-এ' প্রদর্শনীর দিন 'ওয়াই-এম-সি-এ'র সেক্রেটারী মিঃ সাহা এবং নিরঞ্জন সরকার মহাশয়দ্বয় ব্রতচারীদের এই জয়যাত্রায় এতদূর গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা পরের দিন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ব্রতচারী ভুক্তি গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার কোন ব্রতচারী শিবিরে ব্রতচারী শিক্ষা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইহার মধ্যে আমরা একদিন সহরের 'চিড়িয়াখানা' 'মিউজিয়ম' ও বিখ্যাত 'চার-মিনার' দেখিয়া আসিলাম। 'মিউজিয়মে'র চিত্রশালায় প্রাচীন রাজপুত মোগল প্রভৃতি

চিত্র দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহিণী চাঁদবিবির চিত্রখানি চোখে পড়িতেই প্রবর্ত্তকজী সেই স্থানে সমস্ত ব্রতচারী ও কিউরেটারকে সঙ্গে লইয়া 'ভারতে জন্মে মানুষ বহু পুণ্যফলে' গানটি করিলেন। কিউরেটার খাজা মহম্মদ আমেদ মহাশয় সঙ্গীতটির বার বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং হোটেলে ফিরিয়া আসিবার সময় যাহাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয় সেইজন্য তাঁহার নিজের গাড়ীটাও আমাদের দিয়া দিলেন। ৫ই কার্ত্তিক পুনরায় ছেলেরা গোলকণ্ডা দুর্গের উপরিভাগ দেখিতে চলিয়া যান এবং মেয়েরা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া স্থানীয় মাহবুবিয়া গার্লস্ স্কুলে ব্রতচারী অভি-প্রদর্শনী করেন। ঐ দিনই ছেলে এবং মেয়েদের রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটার সময় নিজাম ষ্টেট্ রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউশানে ব্রতচারী প্রদর্শনী দেখাইতে হইয়াছিল। নিজাম ষ্টেট্ রেলওয়ের অধীনস্থ কর্ম্মচারী মিঃ মজুমদার এই দিনকার প্রদর্শনীর একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং ব্রতচারীগণকে চা-পানে খুবই আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

প্রত্যেক প্রদর্শনীতেই লক্ষ্য করিতাম, উপস্থিত আপামর জনসাধারণ ব্রতচারীগণের—বিশেষভাবে পুরুষদের সুগঠিত ও বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং বাঙ্গালার সহজ অনাড়ম্বর জাতীয় সংস্কৃতির পরিস্ফুটনের প্রচেষ্টায় ব্রতচারীগণের এই তেজোময় অভিযানে উপস্থিত প্রত্যেকেই গৌরববোধ করিতেন। এমন কি পর্দ্দানশীন মহিলাগণ পর্য্যন্ত ব্রতচারীদের অধিকাংশ প্রদর্শনী দেখিবার জন্য যেরূপ আকুল আগ্রহ দেখাইতেন তাহা হায়দ্রাবাদে সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের নাম উঠিতেই কিরূপে প্রত্যেকের মস্তক শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িত। নিজেরাও গৌরবান্বিত হইয়াছি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি উন্মুক্ত দেহে 'উচ্চ আসনের সব গর্ব্ব তুচ্ছ করি' বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর এই জয়যাত্রার বৈশিষ্ট্য ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা। যখন তিনি খালি গায়ে প্রদর্শনীতে সমানভাবে নৃত্যগীতে যোগদান করিতেন তখন অনেকে আমার নিকট প্রশ্নও করিত—তাঁহার বয়স সত্যই ৫৬ বৎসর হইয়াছে কিনা। এই কয়দিনের মধ্যেই ব্রতচারী এত সমাদর লাভ করিয়াছিল যে পথে ঘাটে দেখা হইলেই প্রত্যেকে গর্ব্বভরে হাত তুলিয়া বলিত 'জ-সো-ভা'।

৬ই কার্ত্তিক শনিবার শিক্ষামন্ত্রী এবং ব্যায়াম শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ হাদি স্কাউটদের তরফ হইতে নিজাম-কলেজ প্রাঙ্গণে আমাদিগকে বিদায় অভিনন্দন জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে দত্ত মহাশয় হায়দ্রাবাদের আন্তরিক আতিথেয়তার কথা ভুলিতে পারিবেন না বলিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। নিজাম-কলেজ প্রাঙ্গণে শেষদিনের মত ব্রতচারী প্রদর্শনী দেখান হইল। আসিবার সময় কয়েকজন মারাঠা ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের "জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে" গানটি গাহিতে আরম্ভ করিলে আমরাও তাহাদের সহিত গানটি করিলাম। এই দিন আমেরিকা হইতে আগত আমেরিকার প্রেসবুরোর ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ এবং এশিয়াটিক্ একস্‌পিডিসানের ডাইরেক্টর্ কর্ণেল ডোনাল্ড্ রকওয়েল্ ব্রতচারী প্রদর্শনী দেখিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে নিজে দত্তমহাশয়ের



সহরের পাবলিক লাইব্রেরী

নিকট হইতে ভুক্তি গ্রহণ করেন। তিনি এই সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন উহার তাৎপর্য্যের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "যখন আমি এই সব সুগঠিত, বলিষ্ঠ এবং পুরুষোচিত বাঙ্গালীদের সমতান গতি-নৃত্যের বিচিত্র পদবিক্ষেপ লক্ষ্য করিলাম তখন যেন আমার নয়নপথে উদিত হইল একদল অগ্রণী নরনারী নৃত্য-ভঙ্গিমায় ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দেশমাতৃকার সেবায় কি মানসিক কি শারীরিক ভাবে জাতীয়তার এক নব-জাগরণের সূত্রপাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই ভারত-বাসীর রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা এবং ভারতনারীর দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক মুক্তির আশা অন্তর্নিহিত আছে।"

৬ই কার্ত্তিক রবিবার। আজ ব্রতচারীগণ, সেক্রেটারী মিত্রজী, উস্তাদ-আলা নবনীজী এবং মিস্ ঘোষের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা অভিমুখে রওনা দিবেন। কেবলমাত্র আমি ও শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয় অজন্তা, ইলোরা এবং সাঁচী দেখিয়া পরে ফিরিব ঠিক হইল।

রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ব্রতচারীগণ হায়দ্রাবাদ ষ্টেশন পরিত্যাগ করিলেন। আমি ও দত্ত মহাশয় তাহাদের সহিত সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশন অবধি আসিলাম। এই ষ্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেণ অপেক্ষা করে বলিয়া মিলিতকণ্ঠে "জয় জয় ভারত মাতা" গানটি করা হইল এবং সর্ব্বশেষে আমাদের 'জয় সোনার বাঙ্গালার' গানটি গাহিয়া তাহাদিগকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাইয়া বলিলাম 'জ সো-বা'। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণটিও ছাড়িয়া দিল।

অভিলাষ

শ্রীসতীশ রায়

লক্ষ্ণৌ সহরে রাত দশটা। গ্রীষ্মের রাত—নীরবতা ভঙ্গ করে অদূরে সদর রাস্তায় একা চলেছে। লোকজনের সাড়াশব্দও পাওয়া যায়। আহারাদির পর অন্ধকার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে ডাঃ ওহদেদার ধূমপান করছিলেন।

সন্ধ্যে থেকে তিনি পরলোক ও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে দেশী বিলিতী বইগুলো নাড়াচাড়া করেছেন। তাঁর পেশা ডাক্তারী কিন্তু নেশা প্রেততত্ত্ব আলোচনা—সঙ্গীহীন প্রবাসে অবসর-বিনোদনের প্রধান উপায়। দেশী বিদেশী সব লেখকরাই লিখছেন যে মনে বাসনা নিয়ে মরলে, মরেও মুক্তি নেই। "কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।" ডাঃ ওহ্‌দেদার বসে বসে ভাবছিলেন "মনীষীদের সঙ্গে এঁরাও যখন একমত!"

আজ দিনটা গেছে খুব গরম। সারা দুপুর 'লু' চলেছে হু হু করে। ডাক্তার সাহেব দিনের কাজের ভীড়ে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগকে আমল দেন নি মোটেই। এখন চোখে শ্রান্তি নেমেছে। বাগানের নানা ফুলের মিশ্রগন্ধে বাতাস হ'য়েছে ভারী—আর তার সঙ্গে বাদশাহী তামাকের সুরভিত ধোঁয়া মিশ্‌ছে। রাত্রে ছাড়া-পাওয়া গ্রেটডেন কুকুরটা প্রভুর চটির কাছে মুখ রেখে শুয়ে। মাঝে মাঝে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার ঊর্দ্ধগমন লক্ষ্য করছে যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে।

মিসেস ওহ্‌দেদার ঘরে বসে কি একটা বই পড়ছেন। যে রকম মনঃসংযোগ, হয়ত রোমাঞ্চকর কিছু। এমন সময় প্রায়ান্ধকার গেটের কাছ থেকে গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল "ডাগ্‌দার সাব্ ডেরামে হাইয়ে না?" সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা দাঁড়িয়ে উঠে বিকট আওয়াজ করে উঠ্‌ল। কিন্তু লোক্‌টা গেটের হাতা থেকে সরল না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে বিব্রতভাবে বল্‌লে, "আপকো কুত্তা সামাল কর্ লিজিয়ে ডাগ্‌দার সাব!"

ততক্ষণে বেয়ারা ভগবানদীন এসে পড়েছে। খানাপিনায় ব্যস্ত ছিল সে। আপত্তিজনক লোক যাতে অসময়ে অনধিকার প্রবেশ করতে না পারে এও দেখা তার কাজ। সে কুকুরটাকে শিকল দিয়ে আগে বাঁধল; তারপর গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আগন্তুক তাকে প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়েই বললেন, "ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দরকার ছিল আমার খুব জরুরী।"

"এতরাত্রে ত তিনি বাইরে যান না!" ভগবানদীন তার প্রতি সন্দিগ্ধভাবে তাকাতে তাকাতে বল্‌লে। আগন্তুককে সাজপোষাকে মনে হ'ল মুসলমান এবং চেহারায় বড় ঘরণা। বেশভূষা জীর্ণ, যিনি ব্যবহার করছেন তিনি ততোধিক। যদিও সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছেন তবু যেন আওয়াজটা আসছে অনেক দূর থেকে। কাছাকাছির লোক তিনি নন—নইলে ভগবানদীন নিশ্চয়ই তাঁকে পথে হাটে দেখে থাকত কোনোদিন।

"তুমি ডাক্তার সাহেবকে আমার সেলাম দাও, আমি এইখানেই দাঁড়াচ্ছি" আগন্তুক বল্লেন। তখন ভগবানদীনকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হ'ল।

মিসেস ওহ্‌দেদার বল্লেন, "এতরাত্রে তুমি কি করে 'কলে' যাবে? সমস্তদিন ত গাড়ী করে রোদে রোদে ঘুরেছ! নাওয়া খাওয়া কিচ্ছু সময়ে হয়নি। এখন একটু বিশ্রাম না ক'রলে চল্‌বে কেন? 'ডাক্তারি করতে যখন নেমেছি তখন 'কল' এলেই আমাদের ছুটতে হ'বে।" ডাক্তার একটু ক্লান্তভাবে হেসে উঠ্‌লেন। মিসেস ওহ্‌দেদার অসহিষ্ণুভাবে বল্লেন, "তোমার শরীরটা ত ক'দিন খারাপ যাচ্ছে! অসুখে পড়লে তখন দেখবে কে?" ডাঃ ওহ্‌দেদার মিসেসের চিবুকে হাত দিয়ে রঙ্গ করে বল্লেন "এ ডাক্তারণীটি আছেন কি কর্ত্তে?" তারপর পরিহাসের সুর বদলিয়ে শুধোলেন, "রাতে 'কলে' যাওয়া কি আমার এই প্রথম?" মিসেস ওহ্‌দেদার চুপি চুপি বল্লেন "ও লোকটার গলা শুনলে কেমন যেন গা ছমছম করে ওঠে।"

"তোমার যত সব উদ্ভট্টে কথা!" ডাঃ ওহ্‌দেদার সশব্দে হেসে উঠ্‌লেন।

মিসেস ওহ্‌দেদার কিন্তু মুখ ভারী করে বললেন, "অচেনা জায়গায় অপরিচিত লোকের সঙ্গে একরাত যদি নিতান্তই যেতে হয় ত ভগবানদীনকে সঙ্গে নিও।"

'না হলে কি হ'বে? ভূতে ধরবে?"

ডাঃ সহাস্যে শুধোলেন।

"তা'হলে যা খুসী কর! আমার কথা ত আর"—

বাধা দিয়ে ডাঃ বললেন, "না আমি বল্‌ছিলাম যে বেচারা সমস্তদিন খেটেছে খুটেছে, এখন একটু বিশ্রাম করবে না?"

মিসেস ওহ্‌দেদার হেসে ফেল্‌লেন, বললেন 'ডাক্তারের কাছে চাক্‌রী করতে আস্‌বার শাস্তিটা তা'হ'লে পাবে কে?"

ডাঃ ওহ্‌দেদার প্রত্যুত্তরে এবার হাসলেন, হেসে নিজেই যন্ত্রপাতির ব্যাগ নিয়ে উঠে ড্রয়িংরুমে গিয়ে উপবিষ্ট আগন্তুককে বল্লেন, "চলিয়ে সাব!"

বারান্দা থেকে নামতে যাবেন এমন সময় দেখ্‌লেন ভগবানদীনও তৈরী হ'য়ে আস্‌ছে। ডাঃ শুধোলেন, "তুমিও যাবে?"

সে ডাক্তারের হাত থেকে ব্যাগটা টেনে নিয়ে বল্লে "মটরের ত কল বিগ্‌ড়ে গেছে। আমি না গেলে আপনার টাঙা চালাবে কে হুজুর?"

"ওঃ আসল কথাটাই ভুলেছিলুম ত!" ডাঃ ওহ্‌দেদার শুধোলেন, "তোমাকে পাঠালেন কে?"

ভগবানদীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল "মা জী!"

নিশীথ রাতের নির্জ্জনতার মধ্যে দিয়ে টাঙা চলেছে। সহরের পরিচিত পথঘাট আলো জনতা ক্রমশঃ আঁধারে বিলীন হ'য়ে এল। ডাঃ ওহ্‌দেদারের মনে হ'তে লাগল তিনি যেন বরফের পাশে বসেছেন। তিনি ঘাড় কাত করে পার্শ্ববর্ত্তী লোকটিকে দেখ্‌বার চেষ্টা করলেন। মধ্যবয়সী মুসলমান। আভিজাত্যের রেখা তার মুখাবয়বে। ঢিলা হাত পিরিহান, পায়জামা, সেলিমশাহী নাগরায় সজ্জিত। শিরস্ত্রাণে বেশী আড়ম্বর নেই—শাদা টুপি। শাঁকের মত শাদা মুখে হেনারঞ্জিত দাড়ী গোঁফ। শরীর শীর্ণ। কাছেই বসে, কিন্তু মনে হ'চ্ছে সুদূরে তাঁর অবস্থিতি।

ডাঃ ওহ্‌দেদারকে আস্‌বার জন্য সেই যে বলেছিলেন—কি বলেছিলেন মনে নেই—কিন্তু তা'তে একটা একান্ত আগ্রহ সুচিত হ'য়েছিল—যে আকুলতা তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। তারপর আর কথা নেই। অন্ধকার আকাশ অসংখ্য তারায় ঝলমলায়মান। তারা দেখেছে কতকাল ধরে জগত রঙ্গমঞ্চের কত অভিনয়!

গাড়ীর ঝাঁকনিতে ভগবানদীন ঘুমে ঢুল্‌ছে। ডাক্তারের চোখে কেবল ঘুম নেই। গাড়ীটা চলেছে ত চলেইছে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। তার পথ অফুরন্ত। যেন কলে দম দেওয়া গাড়ী—ঘোড়া তাকে টান্‌ছে না। লোকটির আগ্রহ যেন ঘোড়া সমেত গাড়ীটাকে রূপকথার পক্ষীরাজের মত উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সে পথ-বিপথ কিছুই মান্‌ছে না। চাকা দু'টো খুলে পড়বে নাকি? লোকটির ইচ্ছে বুঝি মৃত্যুর চেয়েও দ্রুতগামী! মৃত্যু তাকে ফাঁকি দিয়ে না পালাতে পারে সেইজন্যে যেন যমরাজের সঙ্গে তার পাল্লা।

কোথা দিয়ে যে কোথায় যাচ্ছে—কতদূর গিয়ে যে থাম্‌বে কিছুই জানা নেই। অন্ধকার ঝোপ ঝাড়ে জোনাক জ্বলছে আর নিভছে। সেগুলো যেন কা'দের চোখ টিপে ইসারা! তরু কোটরে পেঁচা ডাক্‌ল— নিশীথ-নীরবতার গলা খ্যাঁকরাণি! গাড়ীর শব্দ তা'কে ডুবিয়ে দিয়ে উধাও! গভীর রাতের সব কিছু স্থিতি বিরতির মধ্যে অফুরন্ত তার যাত্রা! তাঁরাই কেবল যাত্রী সূচীভেদ্য অন্ধকারের। এমন সময় মুসলমান ভদ্রলোকটি হেঁকে উঠ্‌লেন, "সবুর!"

গতিবেগ হঠাৎ সংহত হওয়ায় টাঙাটা একপাশ কাৎ হয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। আচমকা রাশে টান পড়ায় ঘোড়া দু'টো ততক্ষণ প্রায় দাঁড়িয়ে উঠেছে। তিনি নিজে নাম্‌লেন; ডাক্তার সাহাবের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলে উঠ্‌লেন "উতারিয়ে!"

ডাঃ ওহ্‌দেদার নামবার সময় ভগবানদীনকে ডেকে বলে' গেলেন, "যতক্ষণ আমি না এসে পৌঁছুই তুমি এইখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।" "বহুত আচ্ছা সাব!" ভগবানদীন সেলাম করে বললে। ডাঃ ওহ্‌দেদার নাম্‌তে নাম্‌তে চারদিকে তাকালেন। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হ'ল না। কিন্তু একটু ঠাওর করে ডানদিকে তাকাতে নজরে পড়ল—পুরানো দিনের নবাবী আমলের একটা প্রকাণ্ড বাড়ী। তার বালি খসে পড়্‌ছে। জান্‌লাগুলো জীর্ণ। সামনে বাগানের আভাস আছে একটু—সেখানে গাছের চেয়ে আগাছার সংখ্যা বেশী। কৌতুহল ও রহস্য দুই-ই তাঁর মনকে দোলা দিতে লাগল।

মুসলমান ভদ্রলোকটি এসে দরজার হাতলে হাত রাখলেন, অমনি যেন সেটা সহসা খুলে গেল। ডাক্তার বাইরের ঘরে প্রবেশ করলেন তাঁর অনুবর্ত্তী হ'য়ে। বৈঠকখানার পাশের দালান দিয়ে দোতলার সিঁড়ী উঠেছে।

অন্ধকারের ভিতর তাকে অনুসরণ করতে উদ্যত হ'য়ে ডাঃ ওহ্‌দেদার তাঁকে শুধোলেন, "রোগী কোথায়?" লোকটি বল্‌লেন, "আপনাকে একটু কষ্ট করতে হ'বে, তিনি উপরে।"

ডাক্তার একটু হেসে বল্‌লেন, "ও কষ্টে আমি অভ্যস্ত। সিঁড়ী ত দেখছি অন্ধকার!" লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, "তাই ত! সব আলো যে নিভে গেছে! জ্বেলে দেবার মত একটি অনুচরও আমার আজ নেই!"

ডাঃ ওহ্‌দেদার সহানুভূতির স্বরে বল্‌লেন "আপনি আগে চলুন! আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাল্‌তে জ্বাল্‌তে আপনার অনুসরণ করি!" ডাক্তারী ব্যাগটি হাতে করে সিঁড়ী দিয়ে উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে লোকটি বল্‌লেন, "হুজুর মেহেরবান্‌!"

অন্ধকার এবং অপরিচিত সিঁড়ী বেয়ে দেশলাই কাঠি জ্বাল্‌তে জ্বাল্‌তে ডাঃ ওহ্‌দেদার লোকটিকে অনুসরণ করছেন। একটি নেভে সেটিকে ফেলে আর একটি জ্বালেন; এমনি করে ডাঃ ওহ্‌দেদারকে অনেকগুলো দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করতে হ'ল। অবশেষে তাঁরা সিঁড়ী বেয়ে উপরে উঠলেন। ঘর দরজা প্রায় সব বন্ধ। বারান্দায় চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌লেন একটা ভেজানো দরজার ফাঁকে কেবল ক্ষীণ আলোক রেখা বাইরে আসছে। চারদিকে একটা শীতল সোঁদা গন্ধ!

লোকটি প্রথমে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুক্‌লেন, তারপরে ডাক্তার-সাহেবকে বললেন "আইয়ে জনাব!" ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নেই বললেই হয়। একটা নিস্প্রভ তেলের প্রদীপ নিভু-নিভু অবস্থায় জ্বলছে। এক কোণে একখানা মূল্যবান জীর্ণ খাট। তার উপর পরিচ্ছন্ন চাদরে ঢাকা কে একজন শুয়ে—কুণ্ডলীকৃত সাপের মত দীর্ঘ কবরী উপাধান ক'রে। রৌদ্রতপ্ত স্থলপদ্মের মত মুখে মৃত্যু-নীলিমা আসন্ন। দীর্ঘ পক্ষ্মভরা চক্ষু মুদ্রিত। একটা টুলের উপর ডাক্তার-সাহেবকে বসতে ইঙ্গিত করে লোকটি নিঃশব্দে নিকটে দাঁড়াল।

ডাঃ বসে বল্‌লেন, "হাতটা একবার দেখ্‌তে চাই।"

"দেখিয়ে" বলে লোকটি চাদরের ভেতর থেকে একটি শীর্ণ সুন্দর হাত বের করে সন্তর্পণে তুলে ধরল। ডাক্তার সাহেব নাড়ী অনুভব করলেন। ক্ষীণ জীবন-ধারা বয়ে চ'লেছে—স্পর্শ তার তুষার-শীতল।

ডাঃ ওহ্‌দেদার চাইলেন, "একটুখানি কাগজ · না, দিতে হ'বে না, আমার পকেটেই ছাপানো প্যাড্‌টা আছে দেখ্‌ছি। আচ্ছা আপনি এইবার আলোটা একটু তুলে ধরুন ত—হয়েছে! এই প্রেসক্রিপসনটা কাল সকালে আমার দাওয়া-খানায় নিয়ে যাবেন; দাওয়াই মিল্‌বে! রাত্রের মধ্যে রোগিণীর অবস্থা এমন কিছু খারাপ হ'বে না, আশা করছি।" বলে ডাঃ সাহেব টুলের উপর তার লিখিত প্রেসক্রিপসনখানা রাখলেন। যাবার সময় তেমনি দেশলাই কাঠি জ্বাল্‌তে জ্বাল্‌তে ডাঃ ওহ্‌দেদার নীচে নাম্‌লেন। দরজা খুলে ধরে লোকটি ডাঃ সাহেবকে পথ করে দিলেন। তার পর, ডাক্তার সাহেবের আপত্তি করা সত্ত্বেও তাঁর ব্যাগ হাতে গাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলেন এবং ব্যাগটা গাড়ীতে তুলে দিয়ে জেব থেকে কয়েকটি ধাতু মুদ্রা ডাঃ ওহ্‌দেদারের হাতে দিলেন। সেগুলো যে কি ডাক্তার সাহেবের দেখ্‌বার অবকাশ তখন ছিল না। অন্ধকারে ঝিলিক্‌ হান্‌তে লাগল দেখে তিনি তাদের পকেটে পুরলেন বিনা বাক্যব্যয়ে। শ্রান্তিতে ঘুমে তখন তাঁর চোখ জড়িয়ে। মুখে একটা গৌরবপূর্ণ তৃপ্তির ভাব। তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হ'য়েছে। লোকটি তখন হাত মিলাবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে বল্‌লেন, "হুজুর মেহেরবান্‌! আপনার উপযুক্ত দর্শনী দেবার মত অবস্থা আমার নেই। আজ আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ হ'ল। আমার বিবির বেমারীতে লক্ষ্ণৌ সহরের সব চেয়ে বড় ডাক্তারকে আমি ডাক্‌তে পেরেছি। আমি যেমন আজ শান্তি পেলাম, খোদা তেমনি আপনার মঙ্গল করুন।"

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে লোকটির চোখে এক বিন্দু জল দেখা দিল। তিনি তা' রুমাল দিয়ে মুছে ফেল্‌লেন। ডাঃ ওহ্‌দেদার সহানুভূতির সঙ্গে তার হাতে হাত মেলালেন। তাঁর যেন মনে হ'ল তিনি বরফ স্পর্শ করছেন। তারপর ভগবানদীনকে ডাক দিয়ে যখন টাঙ্গায় চড়লেন ততক্ষণে বাড়ীর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

গাড়ীটা ছাড়তে যাবেন এমন সময় তাঁরা শুন্‌তে পেলেন যেন একটা পরিহাসের অট্টহাসিতে বাড়ীর রুদ্ধ দরজা জান্‌লাগুলো সহসা সশব্দে খুলে গেল। ডাক্তারের গা হয়ে উঠ্‌ল ভারী। রোঁয়াগুলো উঠ্‌ল কাঁটার মত দাঁড়িয়ে। ভগবানদীনের হাত থেকে ঘোড়ার রাশ খসে পড়ল। সে তখন গাড়ীর কোণে মুখ গুঁজে ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে! ডাক্তার চকিতে চোখ ফেরালেন।—কোনো দিকে কিছু নেই! শুধু অন্ধকারে নিশাচর বাদুড়গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মত! তারা যেন এক এক থাবা খাপা-ওলা উড়ন্ত অন্ধকার। আর নিশীথ-নীরবতাকে ঝিঁঝিঁর ডাক যেন করাত দিয়ে চিরছে!

ভগবানদীন ঘোড়াকে চাবুক মারল। পিছনে আবার শত লোকের সু উচ্চ হাসির হররা! ডাঃ ওহ্‌দেদার সাহসী লোক। তবু তাঁর মনের ভেতরটা কেঁপে উঠ্‌ল। আজকে তাঁর শরীর খারাপই ছিল। রাত্রি জাগরণ ও এতদূর আস্‌বার শ্রম বোধ হয় তাঁকে অভিভূত করেছিল।

এই অনৈসর্গিক ব্যাপার তাঁর মনের ভ্রম কি? ঠিক করবার আগেই তিনি প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে গাড়ীর কোলে ঢলে পড়লেন। ভগবানদীন আর রাশ টেনে রাখতে পারছে না। ঘোড়া গাড়ীকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে এবার ঘর মুখে।

দিন সাতেক পরের কথা। ডাঃ ওহ্‌দেদার সকালে রোগশয্যা থেকে উঠে বারান্দায় ইজিচেয়ারখানায় বসেছিলেন। সে রাত্রে তিনি কেমন করে কখন এসে পৌঁছিয়েছেন তা' তাঁর জানা নেই। তাঁর চেতনাহীন দেহটাকে ভগবানদীন ও মিসেস ওহ্‌দেদার ধরাধরি করে এনে বিছানায়

শুইয়ে দেন তখন প্রায় রাত দু'টো। তার পর থেকে জ্বর—সঙ্গে বিকারও ছিল। বিশ্রামশূন্য পরিশ্রমই বোধ করি তার একটা কারণ। অন্য কারণ হয়ত ছিল, বৈজ্ঞানিক তা' বল্‌তে চান না। সেদিনকার ভিজিটের দরুণ পাওয়া মুদ্রা ক'টি হাতের উপর রেখে উল্টে পাল্টে দেখ্‌ছিলেন। মুসলমানী আমলের সোনার টাকা—আশরফি! বিচিত্র রকমের উর্দ্দু লেখা—বাদশাহের মোহরাঙ্কিত। বহুদিনের মঞ্জুষাবদ্ধ সযত্নসঞ্চিত জিনিষ! আজকাল তা' আর ব্যবহারে আসে না। নি-খাদ সোনা এবং প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে তা'র যা মূল্য। ডাঃ ওহ্‌দেদার হঠাৎ এক সময় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন। উঠে পেছনে দু'হাত বদ্ধ করে সাম্‌নে ঝুঁকে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। কি যেন চিন্তা করছেন, কিন্তু মন ঠিক করতে পারছেন না। দু'হাত বুকে বেঁধেও দু'চারবার ঘুরতে দেখা গেল। তারপর এক সময় ডাক দিলেন, "ভগবানদীন!"

"হুজুর!" ভগবানদীন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, ছেড়ে ছুটে এল।

"সোফারকে মোটর তৈরী করে আন্‌তে বলত।"

মিসেস ওহ্‌দেদার পশম দিয়ে স্কার্ফ বুন্‌ছিলেন পাশের একখান বেতের চেয়ারে বসে। তিনি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন, শুধোলেন, "যাবে কোথায়?"

"বেশী দূরে নয়, কাছেই...একটু বেড়িয়ে আস্‌তে!" ডাঃ ওহ্‌দেদার সহজভাবে বল্‌লেন।

"শীঘ্র ফিরো কিন্তু!" তিনি আবার পশম বোনায় মন দিলেন।

গাড়ীতে উঠে ভগবানদীনকে সঙ্গে নিলেন, বল্‌লেন, "সে বাড়ীটা কোথায় তোমার খেয়াল আছে ত?"

ভগবানদীন কম্পিত কণ্ঠে "জী হুজুর!" বলে বিবর্ণ হ'য়ে উঠল।

নানা পথ অপথ বেয়ে বনজঙ্গল পার হ'য়ে মোটর থামল একটা মস্ত পোড়ো বাড়ীর সাম্‌নে। বেলা তখন প্রায় দশটা। রৌদ্রালোকে চারিদিক সুস্পষ্ট। দেখা গেল বাড়ীটার দরজায় ঝুল্‌ছে একটা জবরজং গোছের তালা। ভাঙা দেয়ালের গায়ে বট অশ্বত্থ উঠেছে। ফাটলের ফাঁকে ফাঁকে চামচিকের বাসা। ডাক্তার নেমে তালাটা পরীক্ষা করলেন। বেশ মজবুত মনে হ'ল। কপাটে সাবেকী ধাঁচের লোহার পেরেক লাগানো। মরচে লেগে লোহার কব্জা হাঁসকলে জং ধরে গেছে।

পরিত্যক্ত বাগান খাঁ খাঁ করছে। আশে পাশে কোনো জনমানবের সাড়াশব্দ নেই।

ততক্ষণে মোটর নিয়ে সাহেবের ঘোরা-ফেরার খবর গাঁয়ে পৌঁছেছে। পিল পিল করে পিঁপড়ের সারের মত ছেলে বুড়োর আগমন সুরু হ'ল। তা'দেরই মধ্যে একজন মাতব্বর লোক বল্‌লে, "সাহেব, এ বাড়ীতে অপদেবতার বাস। রাত্রে এ তল্লাটে ভয়ে কেউ আসতে চায় না!"

ডাঃ ওহ্‌দেদার সে কথায় কান না দিয়ে শুধালেন "কতদিন ধরে বাড়ীটায় তালা-লাগানো আছে?"

"প্রায় বছর সাতেক হুজুর!" বুড়ো বল্‌তে লাগল, "বড় ভারী আদমীর দৌলতখানা ছিল এই মোকান। অযোধ্যার সেরা সহর লক্ষ্ণৌ—নবাবী-নগর! শেষ নবাব ওয়াজিদ আলি শার ওমরার নাতির এই দৌলতখানা। তখন তাঁর গরীব অবস্থা। এই বাড়ী ছাড়া আর বেশী কিছু মুনাফা মিলত না। এমন সময় তাঁদের মুক্তি দিতে বাড়ীতে মড়ক এল। এক মড়কে রাতারাতি সব উজাড়! কেউ কাউকে জলবিন্দু দেবার ফুরসৎ পায় নি।—গোরে মাটি দেওয়া ত দূরের কথা।"

ডাঃ ওহ্‌দেদার শুধালেন, "তুমি কি এখানে কোনো নোক্‌রি করতে?"

বুড়ো বল্‌লে, "জী! আমি ছিলাম এই বাগানের মালী!"

"এই বাড়ীর তালার চাবীটা তা'হলে তোমার কাছে থাকা সম্ভব।" ডাক্তার সাহেব আগ্রহান্বিত হলেন।

বুড়ো বল্‌লে 'ছিল, কিন্তু অপদেবতার উপদ্রব হওয়ার পর থেকে গোমতীতে ফেলে দিয়েছি হুজুর।"

ডাঃ ওহ্‌দেদার চিন্তিতভাবে বল্‌লেন, "দেখি কি করা যায়। তারপর..."

বুড়ো বল্‌লে "হারেমে যখন এই দুর্ঘটনা ঘটছে ভূতপূর্ব্ব ওমরাওয়ের একমাত্র বংশধর দু'চারজন অনুচরদের সঙ্গে তাঁর জমীদারীর কোনো একটা দূর জঙ্গলে শিকার খেল্‌তে ব্যস্ত। সন্ধ্যেবেলায় খবর যেতেই তিনি তাঁবু থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন একলাই। আসতে রাত হ'য়ে গেল। সব ঘরই প্রায় কবরের মত স্তব্ধ। চাকর চাকরাণী যারা ছিল তারা মড়কের ভয়ে সাঁজ না হতেই পালিয়েছে। একটা ঘরে শুধু আলো জ্বল্‌ছিল মিটমিট করে। আর একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠ্‌ছিল। সে ঘরটা ছিল তাঁর প্রিয়তমা বেগমের। তিনি পাগলের মত ছুটলেন সেদিক পানে। কিন্তু তিনি কি করবেন? রোগ যন্ত্রণায় বেগম তখন অসহায় ভাবে ছটফট করছেন। কিসে যে রোগের উপশম হ'বে তা'ত তাঁর জানা নেই! তাঁর খুব ইচ্ছে হ'ল যে বিবিকে লক্ষ্ণৌ সহরের সবথেকে বড় হকিমকে দেখাবেন—অথচ আজ তাঁর এমন কোনো নোকর উপস্থিত নেই যা'কে তিনি হকিমের বাড়ী পাঠাতে পারেন। তিনি নিজেই নীচে নামলেন। নামতে নামতে তাঁর শরীরে কাল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে। তিনি আর যেতে পারলেন না—সেইখানেই ঢলে পড়লেন। সকালে বৈঠকখানার ফরাসের উপর তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।

ডাঃ ওহ্‌দেদার যেন সে কথায় কান না দিয়ে তাঁর পূর্ব্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন, "বল কি সাত বছর ধরে এমনিভাবে বদ্ধ রয়েছে? এর মধ্যে কেউ খোলে নি?"

বুড়ো ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—'না হুজুর!"

ডাঃ ওহ্‌দেদার বলে উঠ্‌লেন, "একটা ভারী রকমের কুড়ুল আন্‌তে পার কেউ? বখশিস্ মিল্‌বে!"

"জী হুজুর!" বলে সমাগত জনতার ভেতর থেকে একজন ছুটে চলল তার ডেরার দিকে বখশিষের লোভে।

কুড়ুল আনা হ'লে বুড়ো বল্লেন "তালাটা ভাঙতে চান ত হুজুর, আমাকে দিন আমি ভেঙে দিচ্ছি।"

নানান দিক দিয়ে বিচার করে বুড়োর প্রস্তাবটাই ডাক্তার সাহেবের কাছে সমীচীন বলে মনে লাগল। দেখতে বুড়ো হ'লেও লোকটা সাবেকী—গায়ে বিলক্ষণ জোর! তবুও তালাটা ভাঙতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। রীতিমত দামী জিনিষ—যদিও রোদ বৃষ্টিতে মরচে পড়ে পুরাণো হ'য়ে গেছে। বহুদিন বন্ধ জং ধরা দরজাটা একটা আর্ত্তনাদ করে খুলে গেল। তখন সোৎসুক দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে ডাঃ ওহ্‌দেদার ভিতরে ঢুকলেন। তাঁকে ঢুক্‌তে দেখে লোকগুলো ততক্ষণ ভয়ে গেছে পালিয়ে।

বৈঠকখানায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া গেল। বহুদিন দরজা জানলা দেওয়া থাকলে ঘর থেকে যেমন গন্ধ বেরোয়।

বৈঠকখানার পরের বারান্দা থেকে সিঁড়ি উঠেছে। ভগবানদীন, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছিল হাতে একটা টর্চ্চ নিয়ে। ডাঃ ওহ্‌দেদার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে বল্‌লেন "দেখত ভগবানদীন, সিঁড়ির ধাপে ধাপে ও সব কি পড়ে?"

ভগবানদীন হেঁট হয়ে হাতে করে কি কতকগুলো কুড়িয়ে নিল, ভাল করে দেখে বল্‌লে "আধপোড়া দেশলাইয়ের কাঠি হুজুর! প্রায় প্রত্যেক সিঁড়ির ধাপেই আছে।"

ডাঃ ওহ্‌দেদার অন্যমনস্কভাবে উপরে উঠতে উঠতে বল্‌লেন, "হ্যাঁ! থাকবারই কথা!"

উপরে উঠে বারান্দা দিয়ে চল্‌লেন। যে ঘরে সে রাত্রে তিনি রোগী দেখেছিলেন সে ঘরখানি সেদিনকার মত তেমনিভাবে ভেজানো ছিল। তিনি উৎসুক মনে দরজা ঠেলে ভিতরে গেলেন। যে খাটে রোগিনী শুয়েছিলেন সেখানি শূন্য। শিয়রে রয়েছে তেমনি মাটির প্রদীপ নির্ব্বাপিত শিখা!

ডাঃ ওহ্‌দেদার এতক্ষণে ঘরের ভিতরে চারদিকটায় দৃষ্টি ফেল্‌বার অবকাশ পেলেন।

"টুলের উপর ওখানা পড়ে রয়েছে কিসের কাগজ, দেখি ত!"

এখন আর ডাক্তার সাহেবের কণ্ঠস্বরে কোনো বিস্ময়ের সুর নেই। ভগবানদীন তাঁর হাতে কাগজটা দিলে তিনি ভাল করে কাগজের লেখাগুলো পড়ে দেখ্‌লেন। তারপর যেন আপন মনে সহজ-ভাবে বলে উঠ্‌লেন, "আমার নাম ছাপা প্যাডের কাগজে সে রাত্রে যে প্রেসক্রিপসন লিখেছিলুম এখানা সেই কাগজ, বুঝলে ভগবানদীন!"

ভগবানদীন ভগবানের নাম করতে করতে কম্পিতকণ্ঠে কইলে "জী!"

আব্‌ছায়া

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

তোমারে ভুলেছি আমি সেই মধু অর্দ্ধ-বিস্মৃতিতে
স্তিমিত আলোকে যার বাসনা ঘুমায় নিরুদ্বেগে,
নিস্তরঙ্গ জলধিতে উর্ম্মিদল ওঠে না ত জেগে,
সাগরী অপ্সরীগুলি ওঠে ভাসি যবে সন্তরিতে।

আকাঙ্খা নিভিয়া গেছে বেদনাও ঘুচিয়াছে তাই,
অন্তর হয়েছে পূর্ণ সুধাময় মধু পরিমলে।
সে পেলব আবাহন দরশে পরশে আর নাই,
মত্ত ভৃঙ্গ সম আর কারাবন্দী হই না কমলে।

নাই মান অভিমান, অসিদ্বন্দ্ব আশা নিরাশার,
প্রতীক্ষা অসূয়া ভিক্ষা দাবীও দস্যুতা জয়োল্লাস,
উত্তাল তরঙ্গমালা আজি শান্ত নিথর মসৃণ।
আরতির শঙ্খঘণ্টা দীপাবলি ধূম্র ধূপিকার
নির্ব্বাণে নিলীন এবে; প্রতিমার স্মিত মুখাভাস
জাগে চক্ষে জ্বলে যবে দীপে একশিখা স্পন্দহীন।

অপরাজেয় কথাশিল্পী
সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের
• জীবন ও সাহিত্য •

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

বিগত ২রা মাঘ, ১৩৪৪, ইং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ রবিবার সকাল ১০টার সময় কলিকাতা ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরেস পার্কসার্কাস নার্সিং হোমে সর্ব্বজন-প্রিয় গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর ৪ মাস হইয়াছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। কয়েক মিনিটের ভিতরে কলিকাতা হইতে রেডিয়ো যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের সর্ব্বত্র এবং সমগ্র পৃথিবীতে সেই সংবাদ প্রচার করা হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর দুই ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার কয়েকটি ইংরাজি ও বাঙ্গলা দৈনিক পত্রের 'বিশেষ শরৎ সংখ্যা' বাহির হয়। সেদিন কলিকাতা শহরের ভিতরে ও শহরতলীতে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু বিশেষ চাঞ্চল্য আনিয়াছিল; দলে দলে নরনারী পথে ঘাটে সমবেত হইয়া স্বর্গতঃ সাহিত্যিকের উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে থাকেন। একজন ঔপন্যাসিকের মৃত্যুতে সমগ্র দেশের মর্ম্মস্থলে এতখানি গভীর বেদনাবোধ জাগিয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। অনেকে ইহা বলিতে থাকেন, জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোনও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মতো এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি সম্মান ও যশের অধিকারী হন নাই।



শরৎচন্দ্র [১৩৩৮ সাল

কলিকাতার নাগরিকগণ শহরের নানা স্থানে সভা করিয়া বিপুল জনতার সম্মতিক্রমে পরলোকগত সাহিত্যিকের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর সাত মিনিট পরে সেই সংবাদ টেলিফোন যোগে কলিকাতার নানাস্থানে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে পাঠানো হয়। তাহার পরে—যাঁহারা শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন—ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, ক্যাপ্টেন ললিত ব্যানার্জ্জি, সুবোধ দত্ত, এস-সি-চাটার্জ্জি, শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা, মণীন্দ্রলাল বসু, তুষারকান্তি ঘোষ, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন এস, চাটার্জ্জি, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু—প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা শাখা পি ই-এন্ ক্লাবের পক্ষ হইতে শোকসূচক পুষ্পমাল্য পরলোকগত সাহিত্যিকের শবাধারের উপর রাখা হয়। সেই সময় অন্তঃপুরের মহিলাগণ, আত্মীয় ও আত্মীয়াগণ, বন্ধু, অনুরাগী—সকলেই অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন।



পথে শোকযাত্রা ছবি—জে কে সান্যাল

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (শরৎচন্দ্রের মাতুল), হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব ইত্যাদি—তাঁহারা শবদেহ মোটরযোগে শরৎচন্দ্রের বালীগঞ্জের বাড়ী ২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোডে লইয়া আসেন। সম্মুখের দালানের উপর একখানি পালঙ্ক শয্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর মৃতদেহ রাখা হয়। দেখিতে দেখিতে কলিকাতার চারিদিক হইতে সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মোটরযোগে ও পদব্রজে আসিয়া স্বর্গতঃ কথাশিল্পীর গৃহাঙ্গনে সমবেত হইতে থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত

বেলা ৩-১৫ মিনিটের সময় অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ও স্তবকে সুসজ্জিত শবাধার লইয়া মহাসমারোহে শোকযাত্রা বাহির হয়। অশ্বিনী দত্ত রোড, মনোহরপুকুর, লান্সডাউন রোড, এল্‌গিন্ রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড হইয়া শোকযাত্রা কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এলগিন রোডে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বাটি, স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাটী ও খালসা স্কুলের শিখ গুরুদ্বারের সম্মুখে শবাধার থামাইয়া মাল্যদান করা হয়।

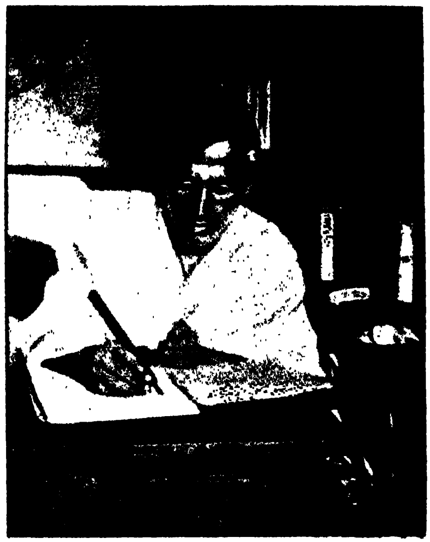
সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর সহিত অপরাজেয় কথাশিল্পীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই শোকযাত্রা পরিচালনা করিবার ভার দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতীয় পতাকা হস্তে লইয়া 'বন্দে মাতরম' ও শরৎচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিতে করিতে সহস্র সহস্র নরনারীর এক বিশাল জনতা শবাধারের সম্মুখে ও পিছনে চলিয়া শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বাঙ্গালার বহু বিশিষ্ট জননায়ক, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, কলেজের ছাত্র ছাত্রী, সম্পাদক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, আইন-পরিষদের সভ্য, সমাজ সংস্কারক, বক্তা, দেশসেবক, উকীল, ব্যারিষ্টর, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়র—ইহা ছাড়া বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নরনারীগণ, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন—সকল জাতের লোক, সকল শ্রেণীর মানুষ, অগণ্য জনসাধারণ তাহাদের একজন পরমাত্মীয় বিয়োগের ব্যথায় বিষণ্ণ মুখে শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলেন। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণ শবাধার বহন করিয়াছিলেন।

শবাধারে মাল্যদান

শোকযাত্রার পথের দুইধারে বাড়ীর বারান্দা, জানালা, ছাদ, উঠান সর্ব্বত্র হইতে শরৎচন্দ্রের ভক্ত ও অনুরাগীগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্ষিত হইতে থাকে। পরলোকগত ঔপন্যাসিকের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে শবাধারের উপর মাল্যদান করা হয়। তাহাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিদ্যাসাগর, স্কটিশচার্চ্চ, সেণ্ট জেভিয়ার্স, আশুতোষ, সিটি, রিপণ ও বঙ্গবাসী কলেজের নাম করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় শবাধারের উপর মাল্যদান করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যথা—সলিলা শক্তি মন্দির, শিমলা ব্যায়াম সমিতি, শিখ গুরুদ্বার, শ্রীহর্ষ, খেয়ালী সঙ্ঘ, কালীঘাট শক্তি মন্দির, বাসন্তী বিদ্যাবীথি, রবিবাসর, ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিট্যুশন্, সাউথ সুবারবন স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ইউনিয়ন, যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘ প্রভৃতির পক্ষ হইতেও মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত মাল্যদান করা হয়।

শ্মশানে

আদিগঙ্গার তীরে যেখানে ভারতবর্ষের কয়েকজন বরেণ্য মহাপুরুষের মৃতদেহ চিতাগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়াছে, যেখানে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, আশুতোষ, শাসমল, যতীন দাস প্রভৃতির নশ্বর দেহ লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইখানে 'শ্রীকান্ত'র অমর রচয়িতা, চিরদুঃখদরদী, আধুনিক কথা-সাহিত্যের নবজন্মদাতা, দরিদ্র-বান্ধব—শরৎচন্দ্রের রোগক্লিষ্ট কঙ্কালখানি চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। শরৎচন্দ্রের সহোদর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। সেই চিতাশয্যার চতুর্দ্দিকে, মহীশূর উদ্যানে,



মুন্সীগঞ্জ সম্মেলনের অভিভাষণ লিখনরত শরৎচন্দ্র

পথে ঘাটে, আদিগঙ্গার ওপারে, নদীর তীরভূমিতে সেদিন যে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোনও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে ঘটে নাই। বহুদূর হইতে পুরবাসিনী মহিলাগণ আসিয়া শ্মশানের প্রায়ান্ধকার তটভূমিতে দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গলার নারী আন্দোলনের ভাবনায়ক ছিলেন 'নারীর মূল্যের' লেখক শরৎচন্দ্র!

শীতকালের মলিন সন্ধ্যা। ৫-৪৫ মিনিট সময়ে শরৎ-চন্দ্রের চিতায় অগ্নি-প্রদান করা হয়। প্রকাশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার মুখাগ্নি করেন। উমাপ্রসাদ শবদেহের বস্ত্রগ্রন্থিগুলি মোচন করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে চন্দনকাষ্ঠ সজ্জিত চিতা লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠে। যে শিখায় পুড়িয়াছিল 'দেবদাস', 'নিরুদিদি', 'জ্ঞানদার মা, দুর্গাসুন্দরী', সেই শিখায় আধুনিক বাঙ্গলার সমাজবিদ্রোহের মন্ত্রগুরু জ্বলিয়া জ্বলিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেন।

বিশিষ্ট শ্মশান বন্ধুগণ

শোকযাত্রা ও শ্মশানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী, মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, বরদাপ্রসন্ন পাইন, কালিদাস রায়, মিঃ ও মিসেস মুকুল দে, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, মাখনলাল সেন, মিঃ কে আমেদ, হরেন ঘোষ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রনাথ রায়, গোপাললাল সান্যাল, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীর সরকার, গিরিজাকুমার বসু, জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রিয়রঞ্জন সেন, শচীন সেন, অবিনাশ ঘোষাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলপ্রতিভা দেবী, জ্যোৎস্না সান্যাল, সতী দেবী, রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,



পুষ্পাচ্ছাদিত শব—চতুর্দ্দিকে জনতা ছবি—কাঞ্চন

অনারেবল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, গুরুসদয় দত্ত, জে-সি-গুপ্ত, রায় বাহাদুর জলধর সেন, ডাঃ জে-এম-দাশগুপ্ত, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমার সুধীন্দ্র নিয়োগী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, হীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক—প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি

যিনি বাঙ্গালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সহিত আমি গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ে অনুভব করিয়াছি মানুষের প্রতি প্রেমে এবং পরিচ্ছন্ন ও সরল জীবনের প্রতি একাগ্রতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। তাঁহার মরণে দেশের ও সাহিত্যের মহৎ ক্ষতিসাধন হইল। আমি অতিশয় শোকাভিভূত হইয়াছি।

—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী

বঙ্গসাহিত্য ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইল। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাঁহার পাঠকমহল ছিল সকলের অপেক্ষা বিস্তৃত। কংগ্রেসের ব্যাপারে তিনি অংশগ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার মরণে বাঙ্গালার কংগ্রেস একজন প্রধান সমর্থনকারীকেও হারাইল। বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের ও তাঁহার পরিবারবর্গের এই শোকে আমরা সকলেই শোকার্ত্ত।

—বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন মহিমাময় সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সমগ্র বাঙ্গলায় যে বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমার সমবেদনা তাহার সহিত যুক্ত করিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গালার দুঃখে দুঃখিত।

—সি-এফ-এণ্ডরুজ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শুধু বাঙ্গালাদেশের বিরাট ক্ষতি হয় নাই, সাহিত্য জগতেরও ক্ষতি হইয়াছে।



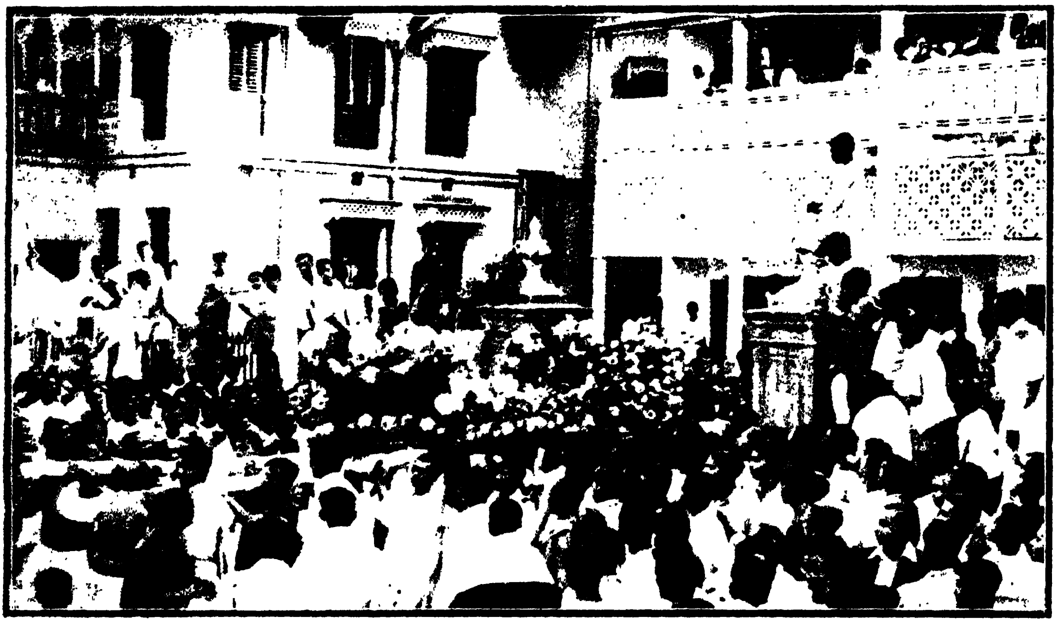
পথে শোক-যাত্রা

ছবি—কাঞ্চন

শরৎচন্দ্র বাঙ্গালার তথা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক। তিনি বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষিত জনগণের ও বাঙ্গালার সরল পল্লীবাসীর সমধিক প্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার উপন্যাস রচনা কৌশল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল এবং বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপন্যাসগুলি অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশী বিক্রয় হইয়াছে। যখন তিনি সুস্থ সবল ছিলেন, তখন তিনি দরদ দিয়া মরমী ভাষায় পরিবর্ত্তনশীল জগতের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্ব—মনুষ্য জাতির ভাবপ্রবণতা ও অনুপ্রেরণার বাস্তব চিত্র আঁকিয়া বহু উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে 'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্ত' হইতে এই জ্যোতিষ্কের তিরোধানে প্রত্যেক সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকগণ অশ্রুপাত করিতেছেন।

শ্রীবি-গোপাল রেড্ডী (মাদ্রাজের মন্ত্রী)

বাঙ্গালা সরকারের অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বলেন :—শরৎচন্দ্রের তিরোধানে আজ বাঙ্গালা দেশ শোকে মুহ্যমান। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার আকাশের যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কয়টি নিভিয়া গেল—তাহার স্থান আদৌ পূরণ হইবে কি না কে জানে? আচার্য্য জগদীশ-চন্দ্রের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই আজ আবার বাঙ্গালীকে



বালীগঞ্জের গৃহ হইতে শব-যাত্রা বাহির হইয়েছে ছবি—জে-কে-সান্যাল

সাহিত্য জগতে অমূল্য রত্ন। তিনি কথ্য ভাষায় উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষার মত এবং রচনার অসীম প্রভাব অন্যান্য উপন্যাসে এখনও পর্য্যন্ত অতি বিরল। সকল বাঙ্গালী প্রত্যাশা করিয়াছিল যে, শরৎবাবু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইবেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে এবং অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে এবং বাঙ্গালার দিকচক্রবাল যে মর্ম্মন্তুদ শোকের আঘাত সহ্য করিতে হইল তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে দুঃসহ। ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রকে আমি শুধু লেখক হিসাবেই জানিতাম না; সাহিত্যিক হিসাবে মানুষের প্রতি তাঁহার অসীম সহানুভূতি, মমত্ববোধ এবং দুঃখী ও নিপীড়িতের মর্ম্মবেদনায় প্রাণ দিয়া অনুভব করা—তাঁহাকে দেশবাসীর একান্ত আপন ও প্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য-স্রষ্টার অন্তরালে তাঁহার যে মনটা লুকান ছিল তাহার বহু পরিচয় পাওয়ার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁহার স্নেহ-প্রীতি লাভ

করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার বন্ধুত্বের মাধুর্য্য, সস্নেহ সাহায্য ও সমর্থনে আমি অভিভূত ছিলাম। বাস্তবিক ব্যক্তিগত জীবনে পরস্পরের প্রীতি নিবদ্ধ বন্ধুত্ব যে পারিপার্শ্বিকতার ক্ষুদ্রতা ছাড়াইয়া কতদূর উঠিতে পারে—তাহার বারবার নিদর্শন পাইয়াছিলাম শরৎচন্দ্রের ব্যবহারে ও চরিত্রে। তাই শরৎচন্দ্রের তিরোধান আমার নিকট আত্মীয়বিয়োগের মতই শোকাবহ। শরৎচন্দ্র যে তাঁহার মণীষা দ্বারা শুধু বাঙ্গালীরই চিত্তজয় করিয়াছিলেন তাহা নয়, পাশ্চাত্য দেশেও তাঁহার প্রতিভা সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছে। বিগত পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণের সময় আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। একবার জেনেভায় লীগ অব নেশন কার্য্যালয়ে জনৈক বাঙ্গালী বন্ধুর নিকট আমি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলাম যে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পাশ্চাত্যদেশে আর কোন বাঙ্গালীর নাম শুনা যায় না। এই কথায় নিকটে উপবিষ্টা একটি বিদেশিনী মহিলা অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বাঙ্গালী লেখকও তো পাশ্চাত্য দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন; তাঁহার দুই একখানি পুস্তক নাটকরূপে রূপান্তরিত হইয়া লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ও বিদেশীয় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বলা বাহুল্য সুদূর পাশ্চাত্য দেশে এই সংবাদে আমি বাঙ্গালী হিসাবে গর্ব্ব বোধ করিয়াছিলাম। এইরূপ বাঙ্গালীর মহাপ্রয়াণে আজ বাঙ্গালী জাতি যে শোকে মুহ্যমান হইবে—তাহা আর বিচিত্র কি? ব্যক্তিগত ভাবে তাহার কথা স্মরণ থাকিলে আমি যে বিয়োগ ব্যথা অনুভব করি—আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতিও তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে; তাই বাঙ্গালীর অন্তর-লোকে চিত্তজয়ী শরৎচন্দ্র চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন। তাঁহার স্বর্গত আত্মার সদ্‌গতি হউক—ইহাই আজিকার দিনে একান্তভাবে কামনা করি।

স্বনামধন্য জননায়ক শ্রীশরৎচন্দ্র বসু বলেন:—বাঙ্গলা মায়ের নয়নের মণি হারাইয়া গেল। তিনি ছিলেন উদার, কোমলহৃদয় ও আবেগময়। তাঁহার অন্তরে ছিল সর্ব্বপ্রকারের অত্যাচারের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। হৃতসর্ব্বস্ব পদদলিতের জন্য তাঁহার হৃদয়ে ছিল সীমাহীন করুণার স্রোতধারা। বাঙ্গালার শ্যামল মাটি হইতে তিনি টানিয়া লইয়াছিলেন দেহ ও মনের রস—আর তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার বিচিত্র সাহিত্যে। যে প্রতিভা নরনারীর কামনা-বাসনাকে শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্যভরা কবিতা ও গল্পে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে পাষাণের মত চিরস্থায়ী করিয়া রাখে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভা সে দলের নয়। তাঁহার লেখনী ছিল সমাজসংস্কারকের। তিনি ভুলিতে পারেন নাই তাঁহার চারিপাশের সমাজকে, ভুলিতে পারেন নাই অত্যাচারিত



শরৎচন্দ্রের মৃণ্ময় মূর্ত্তি [মণি পাল নির্ম্মিত

ভাইবোনদের।...বাঙ্গলা-সাহিত্যের যে ক্ষতি আজ হইল তাহার পরিমাপ করিবার সময় এখন নয়। দুঃখের পর আমরা আজ দাঁড়াইয়া। এখান হইতে শরৎ-প্রয়াণের শূন্যতা ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করা যায় না।

পরবর্ত্তী বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়

এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

নিম্নোক্ত শোক প্রস্তাবটি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, কথাশিল্পী এবং সহজ ও সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের নিপুণ ও দরদী চিত্রকর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে কর্পোরেশন গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি ও সমবেদনা মৃতের পরিবারবর্গকে জানান হইবে।

সুসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া মাননীয় মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী



'চরিত্রহীনের' শরৎচন্দ্র

বলেন, শরৎচন্দ্র ছিলেন দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। প্রথম জীবনে তিনি বহু বাধা বিঘ্ন ও কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সব লোকদিগকে আমরা ভুলিয়াও একবার স্মরণ করি না, নিজেদের কুসংস্কার, দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার জন্য যে সব লোককে আমরা বরাবরই সমাজের বাহিরে রাখিয়া আসিতেছি, সে সব লোকদিগের প্রতি ছিল তাঁহার অপরিসীম দয়া ও সহানুভূতি।

তাঁহার সম্বন্ধে কোন সমালোচনা আমি এখানে উত্থাপন করিব না। কি কৌশল, কি বিষয়বস্তু সমস্ত বিষয়ে ছিলেন তিনি আধুনিক কালের বাঙ্গলা ভাষার অদ্বিতীয় লেখক। নানা ভাষায় তাঁহার লেখা অনূদিত হইয়াছে। সাহিত্যে অগাধ ব্যুৎপত্তির স্বীকৃতিস্বরূপ শেষ বয়সে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। শক্তিশালী লেখক ছাড়াও তিনি ছিলেন প্রকৃত দরদী বন্ধু। বন্ধুত্বাভিলাষী ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে কোন কিছুতে বঞ্চিত হন নাই। যে উদারতা লইয়া তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনে দুঃখ দৈন্য সহ্য করিয়াছেন, নিঃস্ব ও বঞ্চিতদিগের প্রতি তাঁহার সেই দরদের ভাব পরবর্ত্তী জীবনের লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার একখান বই—জানিনা কেন সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। সরকারের মতে তাহা নাকি রাজদ্রোহমূলক। তাঁহার জীবন ছিল চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান।

আমরা আজ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য সমবেত হইয়াছি। কিন্তু তিনি ত প্রকৃতপক্ষে মরেন নাই। আদি গঙ্গার তীরে তাঁহার নশ্বর দেহকে ভস্মীভূত করা হইয়াছে। তাঁহার অবিনশ্বর সৃষ্টি চিরদিন অমর অক্ষয় হইয়া থাকিবে। যতদিন সাহিত্য থাকিবে ততদিন তিনিও থাকিবেন। বহু দুঃখ কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যে জীবনের অবসান হইয়াছে, আশা করি তাহা অনন্ত শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করিবে।

শ্রীযুত শিবপ্রসাদ গুপ্ত :—অপরাজেয় কথাশিল্পী ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত; দেশ একটী উজ্জ্বল রত্ন হারাইল। ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

ভারতবর্ষের অবিসম্বাদী রাষ্ট্রনায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, "করাচীতে অবতরণ করিবামাত্রই আমি ভারতবর্ষের উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের শোক সংবাদ পাইলাম। জানিতাম, কিছুদিন হইতেই তিনি অসুস্থ। কিন্তু এমন কথা ভাবি নাই, তিনি এতশীঘ্র আমাদের পরিত্যাগ করিবেন। শেষবার যখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই, তখন তাঁহাকে অতিশয় প্রফুল্ল ও প্রাণময় দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার অন্তিমকাল এত

নিকটে ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের যে আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, দীর্ঘকাল তাহা শূন্য থাকিবে। বাঙ্গালায় এমন কোন পরিবার নাই যেখানকার আবালবৃদ্ধ নরনারীর নিকট তিনি পরিচিত ও সমাদৃত নহেন।

কিন্তু কেবলমাত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইয়াই যে আমরা শোকাভিভূত হইয়াছি তাহা নহে,শোকপ্রকাশের অপর কারণ—তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাঙ্গালার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জিলায় বিতরণ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবেই অনুভূত হইবে।

তাঁহার সহিত আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর। তাঁহার মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি যে পরিমাণ হইল, তাহা কোনদিনই পূর্ণ হইবে না।

শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের একদিনের কথা আমার মনে আছে; একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—"কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য নহে।" শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—"আমি কিন্তু কিছুদিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।"

শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন বিপন্না তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্ত্তব্য। দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহাতে আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবত তিনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড় একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকার তরুণেরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চির-সবুজ—তরুণ বাঙ্গলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন,



শোকযাত্রার একটি দৃশ্য ছবি—ডি-রতন

সরকার ও পুলিশ তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। তাঁহার "পথের দাবী" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল —তিনি যে কারারুদ্ধ হন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। কারাবাসজনিত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহার সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইতে পারিত। সমাজে যাঁহারা বর্জ্জিত ও উপদ্রুত, তাঁহাদের প্রতি সমবেদনাই শরৎ-সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রেরণা। নিজের জীবন তিনি দুঃখ-দৈন্য ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়াই এই প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। জীবনের এই কঠোর পরীক্ষায় যাঁহারা মুহ্যমান হইয়া পড়েন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের দলে ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী, তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির যুব-সমাজের নিকটে এই বিদ্রোহের বাণীই



'বিরাজ-বৌয়ের' শরৎচন্দ্র

তিনি ছড়াইয়াছেন। সত্যের প্রতি অটুট নিষ্ঠা তাঁহার সাহিত্যে সত্য-প্রচারের প্রেরণাই জোগাইয়াছে।

আমাদের দেশে—বিশেষভাবে বাঙ্গলায় হাস্যরসের বড় অভাব। শরৎ-সাহিত্যে এই হাস্যরসের প্রাধান্য দেখা যায়। দুঃখ-দৈন্য তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিত না বলিয়াই ঘোরতর দুর্দ্দশা বর্ণনাকালেও তিনি হাস্যরসের নির্ঝর বহাইয়াছেন। এতগুলি গুণ একজন মানুষের সচরাচর সম্ভব হয় না—একাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্ব্বোপরি আদর্শ মানব।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (আপার হাউস) শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিবসে (সোমবার ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৮) শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। সেই সভার সভাপতি মাননীয়

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

পরলোকগত শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে উঠিয়া বলেন—

"শরৎচন্দ্র ছিলেন সর্ব্বমনপ্রাণে একজন খাঁটি মানুষ। দেহে, মনে ও চিন্তায় তিনি এই বাঙ্গালারই মানুষ, প্রাচীন ও আধুনিক ভাবের একটি সংমিশ্রিত বাঙ্গালী চরিত্র। আধুনিক জগতে যে সকল প্রবল চিন্তাধারা প্রবহমান, যাহাদের চরম মূল্য আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই—শরৎচন্দ্রের ভিতরে সেই সকল চিন্তার সমাবেশ দেখিতে পাই। অন্য সকল সাহিত্যিকগণের ন্যায় তিনিও বাঙ্গালী জীবনের অন্তর ও বাহিরের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ করিতে হইবে—তাঁহার সেই উজ্জ্বল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যা ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। এই বস্তুই তাঁহাকে কোন্ অজ্ঞাতক্ষেত্র হইতে আকর্ষণ করিয়া বিপুল সাহিত্যযশের মধ্যে বসাইয়াছিল। তাঁহার প্রথম গল্প ও উপন্যাসগুলি পড়িলেই মনে হয়, যে-জগৎ আমাদের এত পরিচিত অথচ যাহার সম্বন্ধে কেহ কিছু আমাদের চৈতন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরে নাই, তিনি তাহাদের উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। জীবনের যে সকল নিত্যবস্তু, কেবলমাত্র প্রতিভাবানেরাই তাহাদের প্রকাশ করিতে পারেন। এই সংসারের প্রেম ও আশা, কামনা ও বাসনা, ক্ষয় ও ক্ষতি—শরৎচন্দ্র এই সমস্তকিছুকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, পাঠশালা-পলাতক ও গৃহবিতাড়িত বালকগণকে, চিনিতে পারি বিষাদময়ী কোমলপ্রাণ নারীদের—অজ্ঞাত মাধুর্য্য লইয়া যাহারা আমাদের যৌথ পরিবারের মধ্যে ফুটিয়া উঠে এবং ঝরিয়া যায়। ছোট-খাটো ত্রুটি বিচ্যুতি, মানুষের উৎপীড়ন, জীবনের উৎস-মুখকে বিষাক্ত করিয়া তুলিবার পথ, সংরক্ষণশীল সমাজের সঙ্কীর্ণ অনুশাসনের পরিধির মধ্যে অসম্পূর্ণ প্রেম ও প্রণয়ের সংঘাত—এই সব। এই সকলের ভিতর দিয়া ইহাও লক্ষ্য করি, এই সকল বাস্তব চিত্রের স্তরে স্তরে একটি উদার হৃদয়ের সহানুভূতি ও মধুর পরিহাসের রসচ্ছটা। এই পথ দিয়াই শরৎচন্দ্র আমাদের অন্তরে

প্রবেশ করিতেন। জীবন, সমাজ ও প্রেমসম্বন্ধে আমাদের সংশয় ও শঙ্কা, সমস্যা ও সন্দেহ, সব কিছুর সহিত তিনি আমাদিগকে নিজেদের নিকটেই পরিচয় করাইয়া গিয়াছেন। আধুনিক জীবনের সহিত বাঙ্গালীর স্বাভাবিক হৃদয়াবেগ ও আপন দেশের সহিত তাহার সংঘাত-চিত্র যেমন করিয়া এই সত্যদ্রষ্টা শিল্পীর তুলিকায় ফুটিয়াছে, চিরদিনের মতো তাহা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হিসাবে প্রাণবন্ত হইয়া রহিল।

কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন শিল্পী ছাড়াও একজন অন্য মানুষ। তাঁহার হৃদয় ছিল প্রকৃত মানুষের ন্যায়। সপ্রতিভ ও শান্ত মানুষ—বিশিষ্ট দুই চারিজন বন্ধুর নিকট তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন এবং কেবলমাত্র সেই বন্ধুগণই অনুভব করিতেন এই বিখ্যাত শব্দশিল্পীর অন্তরালে মানুষ শরৎচন্দ্রের কতখানি মহত্ত্ব লুক্কায়িত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময়কালীন অন্তরঙ্গতা ও ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য-বশে আজ আমি এই শুভসুযোগ পাইয়াছি; কিন্তু আজ একথা বলিতে পারিতেছি না যে, যিনি তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য্যময় ভাবসম্পদের দ্বারা সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন সেই অস্তাচলগত বিরাট প্রতিভার জন্য শোক-প্রকাশ করিব, অথবা মানবসমাজ হইতে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তিরোধান ঘটিল বলিয়া নীরবে মহাকালের নিকট মাথা নত করিব! শরৎচন্দ্রের কথালাপ শুনিলে উল্লাস হইত; তাঁহার খেয়াল-খুশিগুলি ছিল অতি কৌতুকপ্রদ এবং নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁহার দয়ার দান লক্ষ্য করা ছিল আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শরৎচন্দ্র আজ নাই, কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি কালান্তর কাল অবধি অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

বাঙ্গলা কংগ্রেসের অন্যতম নায়ক, আইন পরিষদের অন্যতম দলপতি, শরৎচন্দ্রের বন্ধু

শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী

বলেন—"শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় বাক্যবিন্যাস করবার ক্ষমতা আজ আমার নেই। শেক্সপীয়র সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন, "His was a feast in presence." শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধেও আমি কেবল এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে পারি। সাহিত্যিক হিসেবে শুধু নয়, মানুষ হিসেবেও তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোনো pose ছিল না। আমাদের দেশে এবং



ডক্‌টর শরৎচন্দ্র

বিদেশে বহু বড় লোক দেখেছি; কিন্তু তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখেছি একটা অপ্রাকৃতিক pose. শরৎচন্দ্র অতো

বড় হ'য়েও কিন্তু অতি সরল ছিলেন। তিনি কখনও জানাতে চাইতেন না যে তিনি একজন বড় সাহিত্যিক। তাঁর রসজ্ঞানও অতি প্রখর ছিল। তাঁর এই সব গুণের মূলে ছিল সমবেদনা। শরৎ-সাহিত্য পাঠ করলেই এ-কথা বোঝা যায়। তিনি যে কেবল আমাদের সমাজের দোষ দেখিয়েছেন তা নয়—সমাজের ভবিষ্যৎ-গতি বুঝতে পেরে সাহিত্যের মধ্য দিয়া তিনি তারই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন এমনই একজন, যিনি মহত্তর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আপন জীবনকে পূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন।"

বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ

মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী শরৎচন্দ্রের মাতুল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট জানাইয়াছেন—

বরেণ্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে মাননীয় গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের ও সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হইল। গভর্ণর বাহাদুরের নির্দ্দেশে আমি আপনাকে এই বার্ত্তা জানাইলাম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রবীণ সাহিত্যিক, রায়বাহাদুর

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

বলেন—"শরৎচন্দ্রের তিরোধানে বঙ্গদেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা নানা প্রতিষ্ঠানে, নানা জনসভায়, নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে ঘোষিত হইতেছে। বাংলার সাহিত্য-জীবনে তিনি যে কতখানি স্থান জুড়িয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার বিয়োগেই উপলব্ধি হইতেছে বেশি। তিনি বঙ্গসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে যেদিন প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিনের কথাও মনে পড়িতেছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যকে নানা ভূষণে সাজাইয়া আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন; আজও দেখিতেছি তাঁহার যশোভাতির গগন-স্পর্শী আলোকরশ্মি। নাটোর মহারাজের বালিগঞ্জের উদ্যান-বাটিকায় সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁহাকে যাঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের সে অভিনন্দনে যোগদান করিয়াছিলাম আমি—আর আজ ২৫ বৎসর পরে তাঁহারই অন্তিম শোকযাত্রার জনপ্রবাহের প্রান্তে স্থান লাভ করিয়াছিলাম আমি। সেদিন—আর এদিন।

বঙ্গসাহিত্যের যে দিক বিদ্যুচ্ছটার মত আলোকিত করিয়া তিনি উদিত হইয়াছিলেন, সেদিক আমাদের অন্ধকার ছিল না। আমাদের দেশের উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আমরা অতি অল্পকালেই বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়াছি। এরূপ উন্নতি প্রায় সচরাচর দেখা যায় না। বঙ্গসাহিত্যের সেই শুভদিন যখন আমাদের উন্নতি হইতে উন্নতির পথে চালিত করিতেছিল, তখন শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়। সুতরাং শরৎচন্দ্র সাহিত্যের কক্ষে হঠাৎ প্রবেশ করিয়া যখন আদৃত হইলেন, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম যে আমাদের সুসমৃদ্ধ উপন্যাস-সাহিত্য আরও সমৃদ্ধতর হইবে। সাহিত্যের সেই সুপ্রশস্ত পথে তিনি বরেণ্যগণের সাথী হইয়া চলিবেন—অর্থাৎ



শরৎচন্দ্র

উন্নতির আরও কয়েকটি ধাপ অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু শরৎচন্দ্র পূর্ব্বার্জ্জিত উন্নতির পথে সহায়মাত্র হইলেন না। তিনি কোথা হইতে এক অভিনব বাণী লইয়া আসিলেন। সে বাণী সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল এবং তাহার আহ্বানে সমগ্র জাতি জাগিয়া উঠিল। এক নূতন সুর জাতির প্রাণে ঝঙ্কার তুলিয়া দিল—যেমন ঝঙ্কার কখনও উঠে নাই।

গত ২৫ বৎসর আমাদের জাতীয় জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের যুগ গিয়াছে। মোটামুটি বঙ্গভঙ্গের পর হইতে এই যুগের

প্রবর্ত্তন ধরা যাইতে পারে। এই যুগের ইতিহাস পূর্ব যুগের সঙ্গে জুড়িয়া দিলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা-রক্ষা হইবে না। এই যুগসন্ধিক্ষণে শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশে এক নূতন চেতনা, এক নূতন বেদনা ব্যথার আবির্ভাব হইয়াছে। আগে যাহা সত্য ছিল, আগে যাহা চিরস্থির অটল ছিল, তাহা অ-স্থির হইয়া পড়িল। সব বিষয়েই ওলট-পালট বাধিয়া গেল। কত প্রাচীন ধারণার জীর্ণ অট্টালিকা ধ্বসিয়া ভূমিসাৎ হইয়া গেল; সুপ্রাচীন সভ্যতার মূল মন্ত্রগুলির মধ্যে বহু মন্ত্র ব্যর্থ, নিরর্থক, নির্জীব প্রমাণিত হইয়া গেল। নূতন যুগে নূতন মন্ত্র, নূতন সত্য, নূতন সাহিত্য, নূতন দর্শনের প্রয়োজন অনুভূত হইল সর্বত্র। এই যুগে শরৎচন্দ্রকে পাইয়া বঙ্গসাহিত্য তাঁহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বাণী বিশ্বময় অনুরণিয়া উঠিতেছে, যে বিদ্রোহের ভাব প্রত্যেক মানুষের মনে গুমরিয়া উঠিতেছে, যে অসন্তোষের পাবক-শিখা প্রতিটি অন্তরে ধূমাইয়া উঠিতেছে, তাহারই জীবন্ত, জলন্ত প্রেরণা লইয়া শরৎচন্দ্র লেখনী ধারণা করিয়াছিলেন। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিচ্ছেদ কষ্টকর হইলেও অনিবার্য। নূতন যদি পুরাতনের পথের পথিক হয়, তবে তাহার নূতনত্ব থাকে না। পুরাতনকে আমরা যতই শ্রদ্ধাভক্তির চোখে দেখি না কেন, নূতন না হইলে ত চলে না! পুরাতন চিরস্থায়ী হইলে যে তাহা মজিয়া পচিয়া ব্যর্থ হইয়া যাইত। এই অমোঘ ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য কবি, ভাবুক, দার্শনিক নূতনের সঞ্জীবনী মন্ত্রৌষধি লইয়া মানব সমাজে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয়েন। অনেক সময় এই নূতনত্বের দাবী আমরা মন খুলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের তাহাতে দৈন্যই প্রকাশ পায়। চিত্তের সে দৈন্য অনেক সময়ে তীক্ষ্ণজিহ্ব সমালোচনার মধ্যে ধরা পড়ে। কিন্তু সত্যকে পরাভব করিবে কে?

সত্যের প্রকাশ সাহিত্যে আছে বলিয়াই তাহা চিরদিন সজীব, সবুজ, প্রাণবন্ত থাকে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই প্রাণের পরশ পাওয়া যায় বলিয়াই তিনি বরেণ্য। তাঁহার চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে, তাঁহার রসানুভূতির মধ্যে যে সত্যরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলার নরনারীকে স্পর্শ করিয়াছে মাতাইয়াছে। এমন দরদী কবি, এমন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক, এমন অপূর্ব রসস্রষ্টার মৃত্যুতে তাই এত হাহাকার উঠিয়াছে! বাঙ্গালীর অন্তরের অন্তরতম সুধা মন্থন করিয়া তিনি সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, তাই তাহারা তাঁহাকে হৃদয়ের মণিকুট্টিমে বসাইয়া অর্চনা করিয়াছিল, যেমন অর্চনা হয়ত আর কাহাকেও করে নাই।"

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—ডি-লিট্, রায় বাহাদুর

বলেন:—বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা আজ মনে পড়ে—যেদিন আমি "রামের সুমতি" পাঠ করি; সেদিন এই অজ্ঞাতকুলশীল লেখকটীর ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করিয়া এতটা বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, সেই রচনাটীর উপর চার পাঁচ দিন ক্রমাগত অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম এই লেখকের স্থান বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর পার্শ্বে এবং এই কথা বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করি নাই। সেই সময়ের ভারতবর্ষে ১৫।১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী শরৎ প্রতিভা অভিধেয় এক প্রবন্ধ লিখিয়া আমি তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম। তাহার অব্যবহিত পরে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজগুণেই তিনি দেশ উজ্জ্বল করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আমার গৌরব এই যে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা অর্জ্জিত যশের আমি প্রথম প্রচারক হইতে পারিয়াছিলাম।

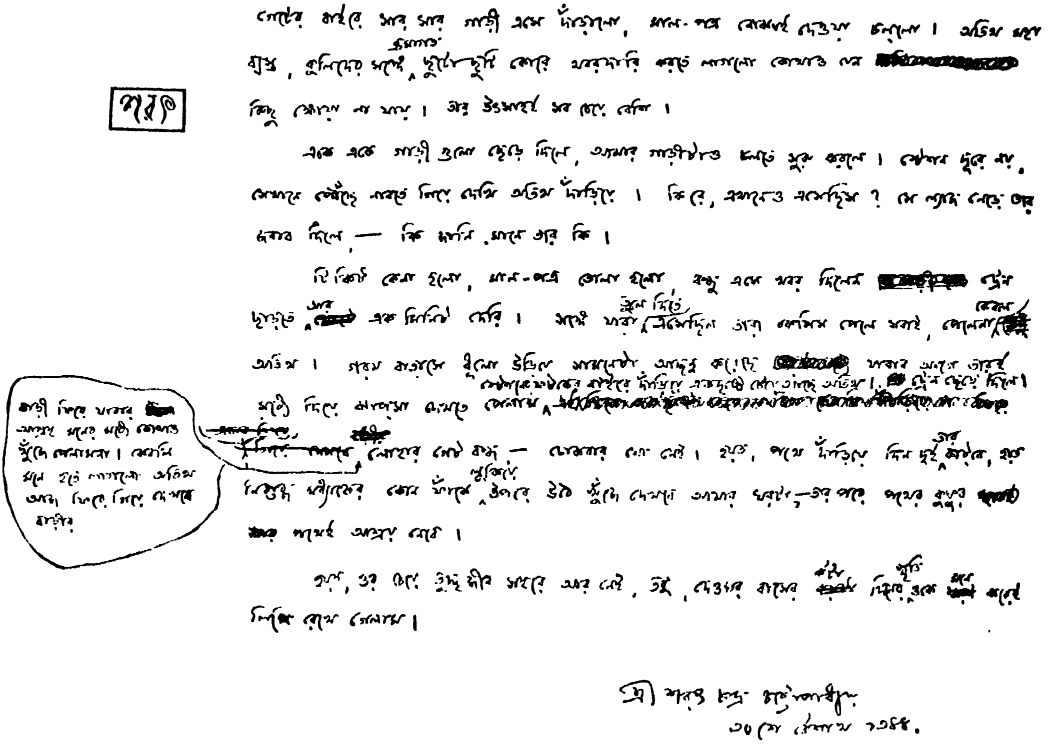
হায় শরৎ, তোমাকে হারাইয়া আমাদের সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন ও সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তুমি যে সুহৃৎগণের কত অন্তরঙ্গ ও প্রিয় ছিলে, তাহা অনেকেই জানেন না।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল প্রতিষ্ঠান শোকপ্রকাশ করেছেন, তাদের কয়েকটির নাম আমরা নীচে উল্লেখ করিতেছি:—

কলিকাতা কর্পোরেশন পৌরসভা, কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট্, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, বঙ্গীয় প্রকাশক সভা, বহরমপুর বন্দীনিবাস, বহরমপুর বয়ন বিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, মহিলা-কলেজ, ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন, ক্রাউন কর্পোরেশন, সাহিত্যবাসর, সমাজপতি স্মৃতি সমিতি, সাহিত্যসেবক সমিতি, রবিবাসর, রসচক্র, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, হিন্দুস্থান ইন্স্যুরেন্স, সিটি গার্লস হাই স্কুল, মহিমা প্রতিষ্ঠান, ডেন্টাল কলেজ,

টেলর মোসলেম হোষ্টেল, ক্যালকাটা একাডেমি, ইভ্নিঙ রিক্রিয়েশন্ ক্লব, রেন্‌বো ক্লব, বিদ্যাসাগর কলেজ, আশুতোষ কলেজ, 'শ্রীহর্ষ' কার্য্যালয়, ভারতীয় সংস্কৃতি সমিতি, মণিপুর সম্মিলনী, শিবপুর দীনবন্ধু ইন্স্‌টিট্যুসন, বালী ওয়েলিংটন ক্লব, পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘ, দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র পল্লীপাঠাগার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, নদীয়া গ্রন্থাগার সভা, রাজবাড়ী ব্যবহারজীব সভা, বহরমপুর আইনব্যবসায়ী সভা, বেলতলা গার্লস স্কুল, যশোহর উকীল সমিতি, মুন্সীগঞ্জ বার লাইব্রেরী, কার্সিয়াং ক্রেশওয়েল ইন্স্‌টিট্যুট্, রংপুর মুসলিম প্রগতি সঙ্ঘ, দিনাজপুর বার লাইব্রেরী, চিত্তরঞ্জন লাইব্রেরী, রাইগঞ্জ বার লাইব্রেরী, রাণাঘাট জনসভা, চুঁচুঁড়া জনসভা, শ্রীরামপুর বনফুল সাহিত্যসমিতি, কলিকাতা জনসাধারণের সভা, সাহিত্য সমিতি, পানিহাটি রূপনন্দা কার্য্যালয়, কান্ত পরিষদ্, বরিশাল টাউন হল্, ময়মনসিংহ টাউন হল্, এলাহাবাদ ভারতীয় বালিকা বিদ্যালয়, ঐ কর্ণেলগঞ্জ হাই স্কুল, প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য মন্দির, ঐ মুঠিগঞ্জ লাইব্রেরী, ঐ মতিমহল সিনেমা, ঐ বিশ্বম্ভর পিকচার প্যালেস, ঐ প্রেম টকিজ, কলিকাতা আইনজীবী সভা, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, গৌহাটি প্রবাসী বঙ্গ ছাত্রসম্মিলনী, কলিকাতা বয়েজ ওন্ হোম, বালী সরস্বতী পাঠাগার, হুগলী আশুতোষ স্মৃতিমন্দির, স্বর্ণময়ী প্রমদাসুন্দরী বিদ্যালয়, কলিকাতা মডেল একাডেমি, বালীগঞ্জ পিপল্‌স্ সমিতি, হাওড়া সঙ্ঘ, বাঙ্গালা সাহিত্য সঙ্ঘ, সানডেজ ডিবেটিং ক্লব, রায় বাগান ক্যানিং হোষ্টেল, মাণিকতলা কংগ্রেস কমিটি, ইনসিওরেন্স ওয়ার্লড্, শ্রীরামপুর গণশিক্ষা পরিষদ্, সোনারপুর সরস্বতী ক্লাব, বাহিরগাছি পাঠাগার, শিবপুর দীনবন্ধু সমিতি, হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রসঙ্ঘ, বাণীমন্দির, ন্যাশন্যাল ইন্স্যুরেন্স্, সলিসিটর সমিতি, সালিখা আলাপনী সভা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান শাখার পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস, আইনের ক্লাস ও শিক্ষক টেনিং ক্লাস, রেডিও কর্পোরেশন, মিলনী ক্লব, ব্রহ্মচারী ক্যাম্প, বেকার হোষ্টেল, রিপন কলেজ, আঞ্জুমান-ই-শাওয়াহিন-ই-ইসলাম, ওয়েলথ্ অফ ইণ্ডিয়া, অশ্বিনীকুমার ইন্‌ষ্টিট্যুট্, শিশিরকুমার ইন্‌ষ্টিট্যুট, ইষ্টার্ণ হারিকেন্ কোম্পানী, ন্যাশন্যাল রেডিও, অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড এসিওরেন্স, সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি, বৌদ্ধ হোষ্টেল, দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, শ্যামনগর কান্তিচন্দ্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, হাওড়া বয়েজ স্কুল, বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, রাজসাহী কলেজ ইউনিয়ন, নওগাঁ (রাজসাহী) কে ডি হাই ইংলিশ স্কুল ; মহামায়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ; সিঙ্গুর হিন্দু বিদ্যার্থী ভবন (রাজসাহী), ক্ষীরোদাসুন্দরী গার্লস হাইস্কুল (দমদম, ঘুঘুডাঙ্গা), বালক সঙ্ঘ (ভবানীপুর), মহামায়া কিশোর সঙ্ঘ, দক্ষিণ কলিকাতা সর্ব্বজনীন পূজা পরিষদ, সেনট্রাল কলেজিয়েট স্কুল, শান্তি ইনষ্টিটিউট, মেদিনীপুর সম্মিলনী, পশ্চিম মাদারীপুর সংস্কার সঙ্ঘ, টালিগঞ্জ হোপলেস ক্লাব, নন্দদুলাল তরুণ সঙ্ঘ, অশ্বিনীকুমার ইনষ্টিটিউট, ভৌমিক লজ (কাণসোণা, পাবনা), রাজা মণীন্দ্র মেমোরিয়েল স্কুল, কল্যাণ সঙ্ঘ, খেয়ালী সঙ্ঘ, ফিল্ম করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, কাশুন্দিয়া তরুণ সঙ্ঘ, বহুবাজার অভিনয় সঙ্ঘ, হাওড়া সেবা সঙ্ঘ, কলিকাতা রিপন কলেজিয়েট স্কুল, কোন্নগর পাঠচক্র, জন্মনা ও আল্পনা সাহিত্য সভা, চক্রবর্ত্তী লজ (তুফানগঞ্জ, কুচবিহার), আরিয়াদহ এসোসিয়েশন, নারিকেলডাঙ্গা হাইস্কুল, বালী ব্যারাকপুর গ্রন্থাগার সমিতি, বি ওয়াই এম এ (বেঙ্গল ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন), ঘোষ নার্সারি, তরুণ সংসদ, ঢাকুরিয়া কসবা কংগ্রেস কমিটী, কোটালীপাড়া সম্মিলনী, আশুতোষ কলেজ হোষ্টেল, ইওর ওন হোম এইচ-ই স্কুল, বালী ছাত্র-সমিতি, ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল রি-ইউনিয়ন, কালীঘাট ইনষ্টিটিউট, এসিয়া মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ, মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, উইমেন্স কলেজ (কলিকাতা), ভূতনাথ মহামায়া বিদ্যালয়, দুর্গানাথ মেডিক্যাল হল (কাণসোণা পাবনা), শ্রীমহেশ্বরী বিদ্যালয়, বাসন্তী বিদ্যাবিথী, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ, বেলেঘাটা চারাবাগান শিশু সম্মেলন, তুলসী ক্লাব, শীলস ফ্রি কলেজ, মিত্রবাটী হিতকারী সমিতি (হুগলী), বগুড়া বার এসোসিয়েশন বি-ওয়াই-এম-এ (কালীঘাট), কলিকাতা মডেল একাডেমী, সেনট্রাল কলিজিয়েট স্কুল, সাধন মন্দির আশ্রম (বড়িষা, ২৪ পরগণা), কলিকাতাস্থ ব্রহ্মদেশীয় ছাত্রবৃন্দ, বঙ্গীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কার্য্যকরী সমিতি বাণী মন্দির, জিলা যুবসঙ্ঘ হাওড়া, ফেডারেশন অব এসোসিয়েশনস্, প্রাইমা ফিল্মস্। গরলগাছা পাবলিক নৈশ শ্রমিক লাইব্রেরী, বেতড় অবৈতনিক নৈশ শ্রমিক বিদ্যালয়, শ্রীরামপুর লোক্যাল বোর্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলা সাহিত্য সমিতি, বঙ্গবাসী কলেজ, যোগদা ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, এডওয়ার্ডস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হিন্দু ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, ব্রহ্মানন্দ পাব্লিক লাইব্রেরী, একাউণ্টস অফিস এসোসিয়েশন, মধুচক্র ও সেবক সঙ্ঘ (রাঁচী) ; প্রবাসী ছাত্র সম্মেলন (গৌহাটী) ; মিলনী সঙ্ঘ (দুমকা) ; রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুল (নয়াদিল্লী)। সরস্বতী এসোসিয়েশন (বেহালা) ; দক্ষিণেশ্বর স্পোর্টিং ক্লাব ; বাণীমন্দির চিৎপুর ; শশিপদ ইনষ্টিটিউট (বরাহনগর) ; শালিখা ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী ; শালিখা হিন্দুস্কুল ; বেলতলা গার্লস হাইস্কুল ; বাঁকুড়া প্রচার সমিতি, ঢাকা বার এসোসিয়েশন, বাইনান বামনদাস স্কুল, শ্রীহট্ট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী, পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদ, ঘাটবন্দর শশিভূষণ রিক্রিয়েশান ক্লাব, নোয়াখালি ক্রিমিন্যাল বার এসোসিয়েশান, বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ পরিষদ, মেদিনীপুর জেলা বৈদ্য প্রতিনিধি-মণ্ডল, ক্যানিং হোষ্টেল, বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটি, ধানকোরা হাইস্কুল, ঊষা সাহিত্য সংসদ (ব্যারাকপুর), খিদিরপুর দুর্গাদাস ব্যায়াম সমিতি, ঢাকা মোক্তার এসোসিয়েশান, শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, বাগেরহাট বার লাইব্রেরী, দর্শনা হাইস্কুল, শ্রীকৃষ্ণপুর বিদ্যামন্দির, বারাকপুর দেবীপ্রসাদ হাইস্কুল, বেণু বীণা সংসদ, ইণ্টালী ইনষ্টিটিউট, প্যারীশঙ্কর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, বঙ্গবাসী কলেজ, হলদীয়া হাইস্কুল, দেবগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, পীতাম্বর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া পাঠাগার, টাঙ্গাইলের অধিবাসিগণ, কৃষ্ণনাথ

শরৎচন্দ্রের হস্তলিপি


গেটের বাইরে সার সার গাড়ী এসে দাঁড়ালো, মাল-পত্র বোঝাই হতে চল্লো। [illegible] কুলিদের সঙ্গে ছুটোছুটি কোরে খবরদারি করতে লাগলো কোথাও [illegible] কিছু খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশি।

একে একে গাড়ী গুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়ীখানাও চলতে সুরু করলে। গেটের দূরে [illegible] সেখানে পৌঁছে [illegible] দেখি [illegible] দাঁড়িয়ে। কি রে, এখানেও এসেছিস? সে [illegible] জবাব দিলে — কি জানি মানে তার কি।

[illegible]

শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১০শে বৈশাখ ১৩৪৪.

কলেজ ইউনিয়ন, রামচন্দ্রপুর (বাঁকুড়া) সরস্বতী পাঠাগার; বংশ গোপাল টাউন হলে বৰ্দ্ধমানের জনসাধারণ; আকড়া জগন্নাথনগর ইনষ্টিটিউট (২৪ পরগণা), বরিশাল শাখা সাহিত্য পরিষদ, এ বি রেলওয়ে স্কুল (তিনসুকিয়া), পূর্ণিমা সম্মেলন (নবদ্বীপ), ছাত্র ফেডারেশন কুমিল্লা), ঢাকা সলিমুল্লা কলেজ, চুঁচুড়া বয়েজ ওন লাইব্রেরী, বোলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হেতমপুর কলেজ, নিখিল ভারত জ্যোতিষ পরিষদ (শান্তিপুর), মেয়ো লাইব্রেরী (কালনা), জামালপুর (ময়মনসিংহ) স্কুল, প্যারীমোহন গ্রন্থাগার (নওগাঁ—রাজসাহী), রাইগঞ্জ, রাজসাহী, খুলনা জনসভা, দিনাজপুর প্রীডাস' এসোসিয়েশন, মুসলীম ইউথস প্রগ্রেসিভ পার্টি (রংপুর), হুগলী মহসীন কলেজ (চুঁচুড়া), মুন্সীগঞ্জ বার লাইব্রেরী, তারকেশ্বরে জনসভা, কৃষ্ণনগর এ ভি স্কুল, সোনামুখী টাউন ক্লাব ও সোনামুখী মিউনিসিপালিটি (বাঁকুড়া), শিল্প উইভিং ইনষ্টিটিউট (বহরমপুর মুর্শিদাবাদ), মালদহ জিলা স্কুল, রংপুরের সমস্ত স্কুল ও কলেজ, রংপুর জেলা কংগ্রেস, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, পাটনা বি এন কলেজে, নাগপুর, কাশিয়াং, বগুড়া, বরিশাল, কৃষ্ণনগর, রাজবাড়ী, বহরমপুর, লক্ষ্ণৌ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের স্কুলসমূহ ছুটী

কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার মিঃ এস এন ঘোষ জানাইয়াছেন যে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক পরলোকগত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কর্পোরেশনের অধীনস্থ সমস্ত বিদ্যালয় ১৭ই জানুয়ারী, সোমবার বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

কলিকাতা পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি সোমবারে বেলা ৪টার সময় সকল দোকান বন্ধ করিয়া শরৎচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের শেষ শয্যা

বিভিন্ন সংবাদপত্রে শরৎচন্দ্রের যে সকল স্বহস্তলিখিত পুরাতন চিঠিপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি কোন না কোন রোগে ভুগিতেছিলেন। ১৯১৩ হইতে ১৯১৬ পর্য্যন্ত রেঙ্গুনে থাকাকালীন, তাহার পর কলিকাতায়, কলিকাতার নিকট হাওড়া শিবপুরে, কাশীতে—প্রায় সকল স্থান হইতেই তিনি তাঁহার অপটু দেহের কথা উল্লেখ করিয়া বন্ধু-সজ্জনকে চিঠি লিখিতেন। এমন কোনও ব্যক্তিগত পত্র নাই যাহাতে তাঁহার অসুখের কথা উল্লেখ ছিল না। অথচ তাঁহার

প্রাণশক্তি ছিল অসাধারণ। এই অসুস্থ দেহ লইয়া তিনি কি না করিয়াছেন। দেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া, বাঙ্গালার পাঠকমহলকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত দেশ-সেবা করিয়া, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতির গুরুকর্ত্তব্যভার বহিয়া, তাঁহার স্বভাবসুলভ অস্থিরতা ও খেয়ালকে খুশি করিয়া তিনি ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার প্রাচুর্য্যময় প্রাণশক্তি যেমন সমাজশাসনের বিরুদ্ধে, সমালোচকগণের বিরুদ্ধে বীরের মতো যুদ্ধ ঘোষণা করিত, তেমনি আপন দেহের জরা ও ব্যাধির বিরুদ্ধেও তাঁহাকে কম লড়াই করিতে হইত না। চিঠিপত্রে তিনি লিখিতেন, অসুস্থ—কিন্তু কাছে গিয়া দেখা যাইত তিনি অসুস্থ বটেন তবে শয্যাগত নহেন, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন শয্যাগ্রহণ করিলেই চিরদিনের মতো থামিয়া যাইতে হইবে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে ৩ ডিগ্রি ৪ ডিগ্রি জ্বর লইয়াও রাত্রিকালে তিনি ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া উঠিলেন। লোকে বলিত, তুমি বাঙ্গালার সর্ব্বোত্তম ঔপন্যাসিক; বলিত, তুমি বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর ঘটাইয়াছ, তুমি বঙ্গভারতীর প্রিয়তম লেখক—কিন্তু এসকল কথা শুনিয়াও শরৎচন্দ্র কোনদিন আপন দেহকে অতি সতর্কতার বিলাসের মধ্যে ডুবাইয়া রাখেন নাই। এক কাণে প্রশংসা শুনিলে তাঁহার অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যাইত। ইহার কারণ এই যে, তিনি প্রশংসা মনে রাখিতে পারিতেন না; তাঁহার অন্তরের ভিতরকার একটি বিস্ময়কর জীবন-বৈরাগ্য নিন্দা ও প্রশংসা হইতে দূরে বসিয়া থাকিত। এমনি করিয়াই তাঁহার জীবন কাটিয়াছে।

বিগত কয়েক মাস তাঁহার অসুখের নানা উপসর্গ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অর্শের পীড়া ছিল বহুদিন হইতে। ইহার উপর লীভার ও কীড্‌নীর দোষ, ঘুষঘুষে জ্বর, শরীরে বেদনা, বাতব্যাধি, ফুলা রোগ, উদরাময়—কিছু কিছু চিকিৎসাও চলিতেছিল। কিন্তু চলিলে কি হইবে? ঔষধের বদলে চা ও তামাক খাওয়াতেই তাঁহার বেশী আনন্দ; চিকিৎসকের উপদেশ অপেক্ষা চিকিৎসকগণকে লইয়া কৌতুক করার দিকেই তাঁহার নজর ছিল বেশী। তাঁহার হাসি ও রসিকতার সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না, তাঁহার অনিয়মের জন্য তাঁহাকে শাসন করিতে গিয়া অনেকেই হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিতেন। এই অনিয়মটাই তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে বড় কাজ করিয়াছে—এই অনিয়ম তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে—এই অনিয়ম তাঁহাকে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিল, চাকুরী ছাড়াইয়াছিল—এই অনিয়ম তাঁহাকে আপন জীবনের প্রতি অবহেলা করিতে শিখাইয়াছিল এবং এই অনিয়মই তাঁহাকে বাঙ্গালীর আত্মার রহস্য-শিখাকে প্রকাশ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। কিন্তু মানুষের অলক্ষ্যে আর একজন বসিয়া আছেন—সেই মহাকাল আপন খাতায় দাগ টানিয়া টানিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, দেহপ্রকৃতিটা অনেকটা কাবুলিওয়ালার মতো—দিবার সময় সে দেয় প্রচুর, কিন্তু সুদ আদায় করিবার সময় সে মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করে। আপন দেহের প্রতি শরৎচন্দ্রের দীর্ঘকালের অবিচার এইবার সুদ ও আসল আদায় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। যৌবনান্তকালে প্রকৃতির সহিত লড়াই করিবার মতো শক্তি ও উদ্যম কমিয়া আসিয়াছিল; তিনি বিশ্রাম চাহিলেন, লেখাপড়া কমিয়া গেল, শয্যা আশ্রয় করিলেন। তাঁহার স্নান, আহার, নিদ্রা, ভ্রমণ, বৈঠক ও গল্পগুজব—কোনটাই কোনদিন ঘড়ি ধরিয়া চলে নাই—ঘড়ি চোখে পড়িলে তিনি বিরক্ত বোধ করিতেন—কিন্তু এই-বার চিকিৎসকগণের বিধিনিষেধ তাঁহাকে কিছু কিছু মানিয়া চলিতে হইল। অনেক সময়ে তিনি এখানে ওখানে, এপাড়ায় ওপাড়ায়, থিয়েটারে, সিনেমায়, লেক-এ, পার্কে—ঘুরিয়া বেড়াইতেন; বিনা নোটিশে তাঁহার পানিত্রাসের বাড়ী ও বালীগঞ্জের বাড়ী আনাগোনা করিতেন; কিন্তু সেই শক্তি তাঁহার লোপ পাইতে বসিল। তাঁহার রোগের আসল গলদ ছিল তাঁহার উদরের মধ্যে। তাঁহার লীভার, কিড্‌নী প্রভৃতির ক্রিয়া সন্তোষজনক ছিলনা। পাকস্থলীর যে স্বাভাবিক জারক রস খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করিয়া রক্ত ও মলমূত্রে রূপান্তরিত করে, সেই প্রাকৃতিক যন্ত্রের ভিতরে গলদ ঘটিয়াছিল। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় মহাশয় তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন।

চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার মনোমতো

সেবা করিবে কে? আত্মীয়গণের ভিতর একজন মাত্র ব্যক্তিকে তিনি সর্ব্বাধিক পছন্দ করিতেন। তাঁহার আবাল্য সুহৃদ্, বন্ধু, তাঁহার হৃদয়রহস্যের প্রকৃত সন্ধানী, তাঁহার সম্পর্কে মাতুল, সুসাহিত্যিক ও তাঁহার জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিতেন, গাঙ্গুলীরা বড় চতুর হে, ওরা খুব ফন্দীবাজ, সমাজপতি—ওই ছ্যাখোনা আমাদের সুরেন। মিটি মিটি হাসে, ভারি বুদ্ধি!—সুরেনবাবুকে অতিশয় ভালবাসিতেন বলিয়া ক্ষ্যাপাইতে ছাড়িতেন না। যাহা হউক ভাগলপুর হইতে সুরেনবাবু আসিয়া শরৎচন্দ্রের অক্লান্ত শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

অসুখের উপশম হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসকগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণ কলিকাতায় হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে এক ইউরোপীয় নার্সিং হোমে লইয়া যান্। তখন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের সহিত ক্যাপ্টেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন এস চাটার্জ্জি, ডাঃ সুবোধ দত্ত প্রভৃতি আসিয়া শরৎচন্দ্রকে পরীক্ষা করেন। একস্‌-রে দ্বারা তাঁহার অন্ত্রতন্ত্রের আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া দেখা যায় যে খাদ্যনালীর শেষপ্রান্তে দুরারোগ্য ক্যান্সর রোগ গোপনে বাসা বাঁধিয়াছে। শরৎচন্দ্র ছাড়া আর সকলেই ইহাতে ভয় পাইলেন। তাঁহার দেহের অবস্থা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইলেও তাঁহার হৃদয়ের ভিতর ছিল অজেয় সাহস। বহুকাল হইতে তাঁহার আফিঙ খাইবার অভ্যাস জন্মিয়াছিল, তামাকের ত কথাই নাই; কিন্তু ইউরোপীয় নার্সিং হোমে এই সকল বস্তু পাওয়া কঠিন ছিল বলিয়া তিনি কষ্টবোধ করিতেছিলেন। একদিন তিনি বলিলেন, 'যদি তোমরা ও দুটি জিনিস আমাকে না দাও তবে একদিন ভোরবেলা এসে দেখবে যে আমি এখানে নেই; রাতারাতি পাঁচিল ডিঙিয়ে বাড়ী পালিয়ে গেছি।' বাস্তবিক ইহা তাঁহার মুখের কথা নহে; তাঁহাকে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বলিবেন, ইহা শরৎচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। আর এক কথা —এই দীর্ঘকালের অভ্যাসের দরুণ তামাক ও অহিফেন ছাড়িয়া থাকাও একরূপ অসম্ভব। অতঃপর শরৎচন্দ্রকে এই সকল অসুবিধা হইতে মুক্ত করিয়া সুরেনবাবু চিকিৎসকগণের সাহায্যে তাঁহাকে ৪নং ভিক্টোরিয়া টেরেস, পার্ক নার্সিং হোমে লইয়া যান্। সেখানে গিয়া অত অসুখের ভিতরেও শরৎচন্দ্র প্রফুল্ল ছিলেন।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগ হইতেই শরৎচন্দ্রের অনুরাগী, ভক্ত, আত্মীয়, পরিচিত, বন্ধু, শুভার্থী—সকল শ্রেণীর লোকই কেমন করিয়া যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র আর বেশিদিন নহেন। গত ৩১শে ভাদ্র ১৩৪৪ তারিখে যাঁহারা শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই স্মরণ করিবেন যে তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে অনাগত মরণের একটি গভীর করুণ ও অস্ফুট ঝঙ্কার বাজিয়াছিল। হয়ত তিনি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে শ্যেনপক্ষীর মতো মৃত্যু যেন তাঁহার জীবনের আকাশে তাঁহাকে চক্রাকারে ঘিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জীবনের সত্যবাণীকে যাহারা কাগজের পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত করে, মৃত্যুর বার্ত্তা হয়ত আগেই তাহাদের কানে আসিয়া ধ্বনিত হয়।

ব্যাধি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিল। চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া জানা গেল, রোগী অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা ও ধকল সহ্য করিতে পারিবেন না। সকলে প্রমাদ গণিলেন। সংবাদপত্রে প্রতিদিন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উদ্বেগজনক সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। শান্তিনিকেতন হইতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শরৎচন্দ্রকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন, 'সমগ্র বঙ্গদেশ তোমার নিরাময় সংবাদ শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।' পার্ক নার্সিং হোমের চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া জনসাধারণ উৎসুক হইয়া দিবারাত্র শরৎচন্দ্রের সংবাদ লইতে লাগিল। সংবাদপত্রের আফিসে ঘনঘন টেলিফোনযোগে তাঁহার সংবাদের আদানপ্রদান চলিল। কিন্তু যে ঋষি সত্যদ্রষ্টা, যিনি বহু জীবনের স্রষ্টা, যিনি অরণ্যে, দারুণে, শ্মশানে, ঝড়ে, সমুদ্রে, দুঃখদুর্য্যোগে ছিলেন ভয়হীন ও অবিচল, আজও তিনি রহিলেন সাহসে অটল। তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন, আমার সম্পূর্ণ দায়িত্বে আপনারা অস্ত্রোপচার করুন, আমি সহ্য করিব। চিকিৎসকগণ তাঁহার দিকে চাহিলেন। মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তরে ভয় নাই, এই মানুষটি 'পথের দাবীর সব্যসাচীর' জন্মদাতা, এই মানুষটি বাল্যকালে

বন্দুক লইয়া বনে-জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইত, এই মানুষটি বালিশের তলায় ছোরা রাখিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইত, রিভল্‌ভার পকেটে রাখিয়া এই সেদিনও এই মানুষ কলিকাতায় ভ্রমণ করিত। অস্ত্রে এই বিচিত্র পুরুষটির ভয় নাই।

অন্তিম ঘনাইয়া আসিল। ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্র কোন কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, আগামী মাসের এই তারিখে আমাকে স্মরণ ক'রো ভাই! তিনি জানিতেন মৃত্যু নিশ্চিত। এমন অবস্থা হইল যে, কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিবার শক্তিও আর নাই। অবশেষে চিকিৎসকগণ তাঁহার উদরের উপরিভাগে ছিদ্র করিয়া (জুজুনোষ্টমি) একটি রবারের নল পরাইয়া তাহারই সাহায্যে তরল খাদ্যবস্তু, কমলালেবুর রস, গ্লুকোজ্ ইত্যাদি প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিলেন। খানিকটা সুস্থবোধ করিতেই শরৎচন্দ্রের সেই রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে হাসি দেখা গেল। হাসিয়া তিনি সুরেনবাবুর সহিত পরিহাস করিলেন। তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইল, শরৎচন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থবোধ করিতেছেন। কাগজে কাগজে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। শরৎচন্দ্র বঙ্গদেশে ও কলিকাতার সকল সমাজের লোকের নিকট যে অতিশয় প্রিয় ছিলেন এই রোগের ভিতরেও তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। কোন্ এক ব্যক্তি ভুল সংবাদ শুনিয়া একখানা সংবাদপত্রের আপিসে গিয়া জানায়, শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সেই কাগজখানার একটি 'বিশিষ্ট সংখ্যা' দুই ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জনসাধারণ এই আকস্মিক দুঃসংবাদে বিমূঢ় স্তম্ভিত। দেখিতে দেখিতে স্কুল, কলেজ, দোকান পাট, সাধারণ ও জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই জানা গেল, সংবাদটি ভুল। শরৎচন্দ্র যে সকলের কত প্রিয়, কত বড় আত্মীয়, জনসাধারণের অন্তরে তাঁহার মতো সাহিত্যিকের যে কতখানি প্রতিষ্ঠা তাহা উপরের ঘটনা হইতে ভাল করিয়া জানা যায়।

কিন্তু প্রদীপ নিভিবার আগে এমনি করিয়াই হয়ত চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠে। মাত্র তিনটি দিন তাঁহার অবস্থা মন্দের দিকে যায় নাই এই পর্য্যন্ত। নার্সিং-হোমের বাহিরে জনসাধারণ কিছু আশ্বস্ত হইল বটে, সংবাদপত্রগুলিও দেশবাসীর উৎকণ্ঠা কতক পরিমাণে শান্ত করিল ইহাও সত্য, কিন্তু চিকিৎসকগণ তেমনি ম্লানমুখেই রহিয়া গেলেন। তাঁহারা নিশ্চয় জানিতেন যে রাহু রোগীর অন্ত্রস্থলে বাসা বাঁধিয়াছে সে অল্প অল্প করিয়া শরৎচন্দ্রকে গ্রাস করিবেই। নল বসাইয়া পাকস্থলীর ভিতরে খাদ্যবস্তু প্রবেশ করানো কতদিন ধরিয়া চলিতে পারে। ক্যান্‌সর নিরাময় করিবার কোনো ঔষধই আজ অবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, কোনো শাস্ত্রেই ইহার প্রতিকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র। শুক্রবার রাতটাও একরূপ করিয়া কাটিয়া গেল। কিন্তু শনিবার সকাল হইতেই ঝড় উঠিল। ভিতরের অশান্ত বেদনা থাকিয়া থাকিয়া পাক খাইয়া উঠিতে লাগিল। ক্ষীণপ্রাণ রোগী কাতরোক্তি করিতে থাকেন। তখন সেই কণ্ঠে ভাষা কিছু নাই, কেবল আছে শব্দ। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পেট ফুলিয়া উঠে, অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁহাকে অতিশয় কাতর দেখা যায়। যে সংযম ও সহনশীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ, এই নিদারুণ অন্তিমকালে তাঁহার সেই শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লয়। শনিবার রাত্রে তিনি আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। অত্যধিক যন্ত্রণাও তাঁহার মরণের অন্যতম কারণ। চিকিৎসকগণ চঞ্চল হইয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে থাকেন।

কিন্তু যন্ত্রণা বাড়িয়াই চলিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শরৎচন্দ্রের কাতর আর্ত্তনাদ শুনা গেল। তাঁহার অন্তিম-কণ্ঠের শেষবাণী সকলে শুনিলেন, "আমাকে—আমাকে দাও, আমাকে দাও।"

কিন্তু কে তাঁহাকে কি দিবে? কি তিনি চাহিলেন, কি বা পাইলেন না? বাঙ্গালী আপন প্রাণের পাত্র ভরিয়া তাঁহাকে যশ, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি সকলই দিয়াছিল,—তবে কি আরো তাঁহার মহত্তর অতৃপ্তি ছিল? তবে কি যাহারা জীবন-বৈরাগী মহাশিল্পী, ইহলোকে তাহাদের সান্ত্বনা নাই, পরলোকে তাহাদের পরিতৃপ্তি নাই?

রাত চারিটার সময় শরৎচন্দ্র চেতনা হারাইলেন, সেই জ্ঞান আর তাঁহার ফিরিয়া আসে নাই। সকাল সাতটার পরে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অক্সিজেন প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালার সর্ব্বোত্তম কথাশিল্পীর বক্ষস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় বাহিরে আসিয়া জানান, শরৎচন্দ্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে!

অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক শ্রীরমেশচন্দ্র কাব্য-তীর্থ কোষ্ঠি বিচার করিয়া আমাদিকে জানাইলেন, কুড়ি দিনের বেশী শরৎবাবুর আয়ুঃ দেখা যায় না—তন্মধ্যে পূর্ণিমা- প্রতিপদেই বিশেষ আশঙ্কা। বস্তুতঃ হইলও তাহাই, পৌষ-পূর্ণিমাতেই মহাকাল শরৎচন্দ্রকে গ্রাস করিলেন।

এক মুখের সংবাদ সহস্রের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে থাকে। সমগ্র কলিকাতা মহানগরী শোকে ও বিষাদে মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি॥

২১ মাঘ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, তাহা এক অর্থে বস্তুতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে একটা আদর্শের প্রাণোন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রাপ্ত হই। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের যে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সে যুগের স্রষ্টা। তিনি ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—যাহা হইবে এবং যাহা হওয়াই বিহিত তাহাই দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কালের যবনিকা তুলিয়া সেই আদর্শের অনুসরণে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রসসৃষ্টিতে সমাজে তখনও যাহা ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু যাহা ফোটা সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন এবং যাহা ফোটা অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী, তাহাই আমরা দেখিয়াছিলাম। এই জন্যই তাঁহাকে যুগস্রষ্টা বলি। শরৎচন্দ্র যুগস্রষ্টা নহেন, কিন্তু যুগ-প্রকাশক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা যাহা দেখিতে পায় নাই তাহাই আঁকিয়াছিলেন। সেই অদৃষ্ট আদর্শকে চিত্তলুব্ধকর বর্ণবিন্যাসের দ্বারা সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। এইরূপেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমের রসসৃষ্টিতে সমাজে যাহা ছিল, ঠিক তাহা ততটা দেখিতে পাই নাই, যতটা সমাজের গতি কোন্ দিকে চলিয়াছে, কোন্ পরিণামকে অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য করিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজ ছুটিয়াছিল, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। বঙ্কিম-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন ছিল এমন কথা বলা যায় না। তবে তাঁহার সৃষ্টির উপাদানবস্তু ছিল—বাহিরের সমাজের বিধিব্যবস্থা তত নহে, যত সেকালের লোকের অন্তরের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির উপাদান, যাহা হইবে বা হইতে পারে তাহা নহে, কিন্তু যাহা আছে তাহাই। এইজন্য শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা দেখিতে পাই যাহা এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রেও দেখিতে পাই নাই। বঙ্কিমযুগে কেবল একখানি মাত্র উপন্যাস ছিল সমাজচিত্র হিসাবে যাহা বাস্তবিক বস্তুতন্ত্র ছিল। সেখানি স্বর্গীয় তারকনাথ গাঙ্গুলীর "স্বর্ণলতা"। কিন্তু স্বর্ণলতা প্রকৃতপক্ষে সমাজের একটা বিশেষ চিত্রকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সে চিত্র বাঙ্গালী হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের তখনকার চিত্র। এ ছাড়া এ অর্থে সে যুগে আর একখানিও বস্তুতন্ত্র বাঙ্গালা উপন্যাস ছিল না বলিলেও হয়।

শরৎচন্দ্রের আমি যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমাজচিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁহার "পল্লীসমাজে" ইহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁকে চিত্রকর বলিতেছি, ফটোগ্রাফার নহে। ফটোগ্রাফ উঠে কলে; ফটোগ্রাফারের দক্ষতা যন্ত্র ব্যবহারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর উপরে বাহিরের আলোকপাতের নিপুণতায়। কিন্তু চিত্র কলে উঠে না, চিত্রকরের মনে ফোটে। চিত্রকর চোখে যাহা দেখেন, তাহার উপর রসের

আলোক ফেলিয়া, দৃষ্টের সঙ্গে অদৃষ্টের মাখামাখি করাইয়া চিত্র সৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস এই জন্য ফটোগ্রাফ নহে, চিত্র। আমি যতটা দেখিয়াছি, তাহাতে শরৎচন্দ্রের বড় সৃষ্টি আমার মনে হয়, "শ্রীকান্ত" এবং শ্রীকান্তের সখা, গুরু, সুহৃদ, ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গালার নবযৌবন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। বহু শতাব্দীব্যাপী বন্ধনের বেদনায় নিষ্পিষ্ট বাঙ্গালার যৌবন আজ সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া কাটিয়া অদম্য বেগে আপনার অন্তরের উল্লাসে অজ্ঞাত পথে ছুটিয়াছে। ছোট বড় কোন বন্ধন সে মানে না, মানিতে চাহে না। কোন ভয়ের ধার সে ধারে না; কোন ফলাফল চিন্তা সে করে না। আপনার যৌবনকে পরিপূর্ণ রূপে সার্থক করিবার জন্য চারিদিকে সে ছটফট করিতেছে; ইন্দ্রনাথের মধ্যে শরৎচন্দ্র সমাজের আধার ও আবেষ্টনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার নবযুগের বিদ্রোহী যৌবনকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। এ চিত্র বাঙ্গালী ধুতিচাদরে সজ্জিত বটে, কিন্তু বিশ্বজনীন যৌবনের চিত্র। গ্রীকশিল্পী যেমন পাথরে Apollo Velvedere এপোলো বেলভিডিয়ারের ছবি খুদিয়া বিশ্ব যৌবনের দেহকে চিরদিনের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের শরৎচন্দ্র সেইরূপ বিশ্ব যৌবনের মনকে বাঙ্গালা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমার মনে হয় ইহাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু; তাঁহার সকল বই পড়ি নাই, কিন্তু একটু আধটু উপরে উপরে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় এই উদ্দাম যৌবনই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্রের এই উদ্দাম যৌবন চিত্রে অসংযত যৌনপ্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়-লালসা ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আদিরসের প্রকট মূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই; আনন্দমঠে ও যেটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে শান্তি ও জীবানন্দের হুড়োহুড়ি জড়াজড়িতে—ততটুকু পর্য্যন্তও—আমি যতটুকু শরৎচন্দ্রের রসসৃষ্টি দেখিয়াছি—ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থ অভিনিবেশসহকারে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে শরৎচন্দ্রের নারীচিত্র অপূর্ব্ব বস্তু; শরৎচন্দ্রের নায়িকারা নিজেরা অতিশয় সংযমী। আপনার প্রকৃতিতে রমণী সর্ব্বত্রই সংযমী; যে মা হইয়া মনুষ্যের সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিবে, বিধাতা তাহাকে সংযমী করিয়াই গড়িয়াছেন। আর শরৎচন্দ্র নারী প্রকৃতির এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মকে তাঁহার নায়িকাদিগের মধ্যে ফুটাইয়া, কি গৃহে, কি সমাজে, কি তাঁহার "পথের দাবীতে" বিদ্রোহী বিপ্লবপন্থীদিগের দলে, সর্ব্বত্র পুরুষদিগের উপরে নারীর অসাধারণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আদিরস যে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে নাই, এমন কথা বলা যায়না। কিন্তু বহুদিন হইতে বাঙ্গালী রসসৃষ্টি করিতে যাইয়া যে আদিরসের "হোলি" খেলিয়াছে, শরৎচন্দ্র—আমি যতটুকু দেখিয়াছি—তাহা করেন নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে কাম অপেক্ষা প্রেম বেশী ফুটিয়াছে; "পথের দাবী"তে এই প্রেম শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুমিত্রা এবং ভারতীর চিত্র এ বিষয়ে অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" শুনিয়াছি এত বিক্রী হইয়াছিল, যাহা নাকি তাঁহার বা অন্য কোন বাঙ্গালা ঔপন্যাসিকের বই এত অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। "আনন্দমঠ" এবং "পথের দাবী" একদিক দিয়া দেখিলে হঠাৎ একই জাতীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; "আনন্দমঠ" একটা উচ্চ আদর্শ দিয়াছে। সে আদর্শ বিদ্রোহ নহে, সে আদর্শ বিপ্লব নহে, সে আদর্শ অরাজকতা নহে। বিদ্রোহ জাগাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে কহিয়াছেন—"বিদ্রোহী আত্মঘাতী"; "আনন্দ মঠ" মুসলমানের অরাজকতাকে নষ্ট করিবার জন্য নামাবশিষ্টমাত্র রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়াছিল; কিন্তু অরাজকতাকে লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করে নাই। "আনন্দমঠ" স্বদেশপূজার শাস্ত্র, কিন্তু যে স্বদেশ-প্রীতি পরজাতি বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত, তাহাকে হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সকল কারণেই "আনন্দ মঠ" প্রকৃতপক্ষে মুমুক্ষুর তীব্র বন্ধন-বেদনাপ্রসূত সান্নিপাতবিকারের চিহ্নমাত্র। "পথের দাবী" পথের মাঝখানেই শেষ হইয়াছে; গন্তব্যে কেবল পৌঁছায় নাই তাহা নহে, গন্তব্যের সঙ্কেত পর্য্যন্ত দেয় নাই। শরৎচন্দ্র যদি একটা ফ্যান্সি চিত্র আঁকিতেন তাহা হইলে তিনি সহজেই "পথের দাবী"কে ঠেলিয়া নিয়া আপনার লক্ষ্যস্থলে তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা অন্যদিকে যতই মনোহর

বা সমীচীন হউক না কেন, যে কালের ও সমাজের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে বস্তুতন্ত্র হইত না। আর এইজন্যই আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুগস্রষ্টা, শরৎচন্দ্র হইয়াছেন যুগ-প্রকাশক।

৺বিপিনচন্দ্র পাল

(১৯২৮ সালে লিখিত)

'সব্যসাচী'

'পথের দাবী যখন প্রথম বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখন শুনিয়াছিলাম এখানি একখানি 'পলিটিক্যাল নভেল' হইবে। হয়ত হইয়াছেও তাই। কিন্তু সে কথা আজ থাক্।

পথের দাবীর বিচিত্র জটিল চরিত্র সৃষ্টির কথাও এখানে তুলিব না। সব্যসাচীর চরিত্রের পরিকল্পনায় লেখকের কৃতিত্ব অধিক, অথবা আটপৌরে অপূর্ব্বর চরিত্রাঙ্কনে তাঁহার রূপদক্ষতার পরিচয় বেশি, সে অযথা তর্কের নিষ্ফল বিচারও এখানে সুরু করিব না।

আজ স্মরণ করিব কেবল সব্যসাচীর জীবনকে চিনিবার, মানুষকে বুঝিবার গভীর সহজ পরমাশ্চর্য্য দৃষ্টিটিকে। আজ অনুভব করিব ভারতবর্ষকে লইয়া তাঁহার অন্তরের অফুরন্ত বেদনা ও অনির্ব্বাণ দাহের অন্তরালে ভারতী ও অপূর্ব্বকে লইয়া তাঁহার গোপন প্রশান্ত আনন্দটিকে।

—ধরিত্রীর বুকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষের এই অবিরাম অক্লান্ত অপচয়ের মধ্যেও মানুষ মানুষকে ভালোবাসে—সেই ভালোবাসার প্রস্ফুটিত রূপ আজিও দেশে দেশে অনাঘ্রাত অনাদৃত নির্য্যাতিত হইলেও—চেনা সহজ।

কিন্তু যাহা আজিও ফুটিয়া উঠে নাই, অথচ ফুটিবার অপেক্ষায় অজানিতে সংগোপনে দিনে দিনে আকুল হইয়া উঠিতেছে, আগে হইতে তাহার পরিপূর্ণ মহিমা অন্তরে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সানন্দে বরণ করিয়া লইবার সাধনা সব্যসাচীর কোথায় কবে কেমন করিয়া শেষ হইল তাহাই ভাবি।

অন্তরে যে সত্যের অস্তিত্ব মানুষ নিজেই জানেনা, অথবা জানিলেও প্রবলভাবে অস্বীকার করিতে চায়, তাহাকেই সুদূরের জ্যোতির্ম্ময় সম্ভাবনা হইতে চিনিয়া চিনাইবার প্রয়াস বারে বারে সব্যসাচী কেমন করিয়া করেন তাহাই ভাবি।

অনাগত ভবিষ্যতে ভারতী অপূর্ব্বর মিলিত জীবনের আনন্দময় সার্থকতার কথা স্মরণ করিয়া, দারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা সব্যসাচী কেমন করিয়া দিয়া যান্, দিকে দিকে ভালোবাসা ও মানবতার নিষ্করুণ কদর্য্য অবমাননার মধ্যে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া তাহাই দেখি।

শ্রীমুরলীধর বসু

শরৎ-সাহিত্য

শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—'অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে থাকেন, তাতে আমার ভাবনার কারণ নেই এইজন্য যে, কাব্য রচনায় আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথা অতি বড় নিন্দুকেও অস্বীকার করতে পারবে না।'

গল্প রচনায় শরৎচন্দ্রের শক্তি তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথকে যদি ব্যালজাক্, গ্যতিয়ে বা প্রস্পার মেরিমের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে শরৎচন্দ্রকে নির্ব্বিবাদে মেঁাপাসা বা শেহভের সমকক্ষ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় নৈরাশ্য বা বিষাদ জীবনের প্রতি অভিযোগ নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি, রঙীন চশমার ভিতর দিয়ে তিনি পৃথিবীকে দেখেছেন, তার ধূসর গৈরিক গাত্রাবাস লক্ষিত হয়নি। শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক, স্বীয় জীবনে পৃথিবীর রূঢ় নির্ম্মমতা ও কুৎসিত কুশ্রীতা তাঁর অন্তরকে পীড়িত করেছে তাই শরৎ সাহিত্য বাস্তবের নিখুঁত ছবি। রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় গল্পে উপন্যাসে নয়—কাব্যে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভার একমাত্র পরিচয় তাঁর গল্প ও উপন্যাসে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন সংস্কারমুক্ত বিবেচক রক্ষণশীল হিন্দু। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তিনি আস্থাবান, কিন্তু অন্যায় লোকাচার বা দেশাচার নির্ব্বিরোধে গ্রহণ করাকে তিনি কোনোদিন ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে করেন নি। সাহিত্য-জীবনের সূচনায় যথেষ্ট অবহেলা ও অপবাদ তিনি সহ্য করেছেন, কিন্তু যা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন তাকে ত্যাগ করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্য—এই জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও অননুকরণীয় চরিত্র চিত্রন শরৎ-সাহিত্যের

বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, গহর, জীবানন্দ, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, কিরণময়ী, দেবদাস, বিজয়া প্রভৃতি চরিত্রাবলী কল্পিত কাহিনীর ঘটনাবলীর পারম্পর্য্যরক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয় নি, জীবন্তে চরিত্রগুলি এমনভাবে আর কোনও সাহিত্যসাধকের রচনায় আত্মপ্রকাশ করে নি। সমাজে, সংসারে, রাষ্ট্রে—অবহেলিত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত নরনারীর ব্যথা ও বেদনা শরৎচন্দ্রের রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাঙালীর সংসারের চিরন্তন মূর্ত্তি তাঁর অন্তরে প্রতিফলিত। স্বপ্ন নয়, ভাববিলাস নয়—সহানুভূতি সমবেদনার মাধুর্য্যে শরৎ সাহিত্য পরিপূর্ণ।

প্রচলিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে শরৎ সাহিত্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আধুনিক সমাজবিপ্লবের মূলেও শরৎ-সাহিত্যের নির্ভীকতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে Times বলিয়াছেন—'when all is said, it is rather by intellectual effort than by political agitation that Indians will win for themselves the place they claim in the great society of nations,' যে কোনো দেশের সাহিত্য বিষয়ে এই জাতীয় মন্তব্যের মূল্য অপরিসীম। গতানুগতিকভাবে ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পতন প্রচারে শরৎ-সাহিত্য সৃষ্ট হয় নি। তাঁর জীবনে আমাদের জাতি ও সাহিত্যের জন্য যে পরিমাণ শ্রদ্ধা তিনি অর্জ্জন করেছেন উত্তরকালের সাহিত্যসাধকদের কাছে তাই পরম পাথেয়। জীবন সায়াহ্নে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি দেশের অপরকে স্পর্শ করেছে। যে আদর্শবাদের প্রেরণায় স্বতোৎসারিত গতিতে শরৎ-সাহিত্য বাঙালীর চিত্ত জয় করেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার মূল্য অপরিমেয়।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে আজ সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান। সাহিত্যাচার্য্যের লৌকিক মৃত্যু তাঁকে আমাদের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও তাঁর সাহিত্য দীর্ঘকাল আমাদের অন্তরকে অনন্ত মাধুর্য্যরসে আচ্ছন্ন করে রাখ্‌বে।

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

—

'আমার দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র'

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সব কথা ছোট প্রবন্ধে লেখা অসম্ভব। অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান দুটি: প্রথমতঃ, তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের কাল এবং আমার পরিণতির একটি অধ্যায়ের সময় এক। আমার সাধনা এখনও চলছে, অথচ শরৎচন্দ্রের সাধনা সর্ব্বাঙ্গীণ হয়ে আজ ফুরাল। আমার জীবনের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাঁর প্রভাব কি ভাবে সম্পাত হবে এখন কি করে বুঝব? দ্বিতীয়তঃ, তাঁর প্রতিভার ক্ষেত্র বাঙলা-সমাজের দুটি শ্রেণীতে বিস্তৃত এবং সেই শ্রেণীদ্বয়ের ভবিষ্যৎ রূপ ও গঠনের সাহায্যেই তাঁর দানের মূল্য যাচাই হবে। আমাদের সমাজ এখনও প্রধানতঃ নিম্ন বিত্তশালীর সমাজ—এই গঠন যদি আরো কিছুকাল থাকে কিম্বা অমর হয় তবে শরৎচন্দ্র অমর হবেন। আর যদি বদলায়, তবে দ্বীপ সৃষ্টিতে প্রবালের মতনই তাঁর কীর্ত্তি আত্মবলির সমতুল্য হলেও হবে কেবল ব্যবহারিক। সেইদিক থেকে শরৎ-সাহিত্য কথাটি নিরর্থক, তখন 'সাহিত্যে-শরৎচন্দ্র' হবে প্রবন্ধের বিষয়। অতএব, শরৎচন্দ্রের সমালোচনার অর্থ আমারই আত্মবিশ্লেষণ, সমাজ-শক্তির বিকলন, তার ভবিষ্যৎ নিরূপণ এবং সেই সঙ্গে সমাজ ও সাহিত্যের সম্বন্ধ বিচার। অনেক সুপণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষ দুটি কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। প্রথমটি অশোভন। তাই আমি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক আলোচনা করব না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় বিশ বৎসরের; তাঁর প্রায় সব লেখাই পড়েছি এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে গল্পগুজোব ও তর্ক করেছি। আমি যেভাবে তাঁকে বুঝেছি তাই লিখছি। মুখে তিনি অনেক সময় অনেক বিপরীত কথা বলতেন—সে-সব বাদ দিলাম।

তিনি পার্‌সন্যালিটিতে বিশ্বাস করতেন। ব্যক্তি-সম্পর্ক রহিত আর্টের স্বকীয়তায় বিশ্বাস তিনি করতেন না। এই কারণে তিনি ছিলেন হ্যাম্যানিষ্ট। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব মানতে গেলে অন্য কোনো ধর্ম্মে বিশ্বাস করার শক্তি থাকে না। ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস সর্ব্বগ্রাসী।

তাঁর ধারণা ছিল মানুষ ফুটতে পায় না সমাজের চাপে। সেইজন্য তিনি সমাজকে তীব্রভাবে কষাঘাত করে গেছেন। কোনো ভণ্ডামি তিনি সহ্য করতে পারতেন না, কারণ

তাঁর মত ছিল এই যে ভণ্ডামির অন্তরালে অত্যাচারই লুকিয়ে থাকে। এই জন্যই তাঁর irony অত কার্য্যকরী।

মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, তাই হ্যুম্যানিষ্টের ধর্ম্ম অনুসারে ঐ সম্বন্ধের রূপ ছিল আততায়ীর। সমগ্র প্রাণ দিয়ে তিনি যুদ্ধ যখন করতেন তখন প্রগতিশীল পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগত, যখন—যেমন বিপ্রদাসে, সামাজিক ঐতিহ্যের সমর্থন করতেন, কিংবা তাকে মানুষের চেয়ে বড় করে দেখাতেন তখন অনেকের খারাপ লেগেছে।

ভাবের ওপর অভিজ্ঞতার সাহায্যে, হৃদয়ের আনুকূল্যে যে সিদ্ধান্ত রচনার বিষয় বস্তু হয় সেটি একদেশদর্শী হতে বাধ্য। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মানুষ ও সমাজের সম্বন্ধের যে প্রকৃতি বেরিয়ে আসে সেটি আর্টিষ্টের হাতে পড়লে অন্যরূপ নেয়। আর্টিষ্ট না হলেও তার দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎ রূপ ও তার পরিবেশে ভবিষ্য-সমাজের মানুষের ছায়া মনের ওপর পড়তে পারে। শরৎচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছিল না। তাই আমরা তাঁর হ্যুম্যানিজম্‌কে বাঙালীর বিশেষত্ব বলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ গরিমা অনুভব করেছি। শরৎচন্দ্রের চোখ ছিল বুকে। এই প্রকার ইন্দ্রিয়গত স্থানচ্যুতিতে তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সে-দৃষ্টির ক্ষেত্র অপ্রসারিত হয়।

স্ত্রীজাতি ছিল তাঁর কাছে নির্য্যাতিত ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ প্রতীক। মেয়েমানুষকে তিনি মেয়ে হিসেবে দেখেন নি, মানুষ ভাবেই দেখেছেন। আরো দুটি প্রতীক তাঁর ছিল —উচ্ছৃঙ্খল মানুষ ও জীবজন্তু। প্রতীক হল নির্ব্বিশেষ, তাই চরিত্রের পার্থক্য পাঠকের চোখে সব সময় ফোটেনি।

মনুষ্যত্বে আস্থাবান ছিলেন বলেই তিনি ছিলেন তেজী। কারুর কাছে হাত পাততে তাঁর মাথা কাটা যেত। এইটাই তাঁর স্বদেশ-প্রেমের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের অত বড় ভক্ত জীবনে দেখিনি, কিন্তু তাঁকেই শরৎচন্দ্র প্রথম প্রথম বই উপহার দিতে ইতস্ততঃ করতেন—পাছে কবি কেবল ভদ্রতার খাতিরে বইএর সুখ্যাতি করেন। এটা দম্ভও নয়, ঈর্ষাও নয়—নিছক মনুষ্যত্ব।

আর একটি মাত্র কথা লিখব। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের সাহিত্যে আর কারুর অমন বিরুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচনা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু তাঁর সহ্য করবার শক্তি ছিল অসীম। মুখের ওপর তাঁকে কত রূঢ় কথা বলেছি, হেসে বলেছেন—'বড্ড গালাগালি দিচ্ছ তুমি, অতটা আমার প্রাপ্য নয়।' একবার মূর্খের মতন বলেছিলাম, 'আপনি যুবকদের betray করেছেন।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলেছিলেন, 'করিনি। যদি করেও থাকি—জানি না, ইচ্ছা করে নয়।' আমি ক্ষমা চাইতে পারি নি তখন, আজ চাইছি, সর্ব্বান্তঃকরণে চাইছি।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতিপূজা

মজঃফরপুর সহরে তখন প্লেগের প্রবল দৌরাত্ম্য সুরু হয়েচে। সহর ছেড়ে আমাদের সহরতলীতে আশ্রয় নিতে হোলো। যে স্থানে আমরা আশ্রয় নিলাম—আম আর লিচুর বাগান। একদিন সেখানে দাঁড়িয়ে দাদাম'শায় বললেন, শরৎবাবুর নাম শুনেছিস ?

বললাম, কে শরৎবাবু ?

দাদামশায় বললেন, লেখক শরৎবাবু, আলমারিতে যাঁর বই রয়েচে—'বিন্দুর ছেলে' 'বিরাজ বৌ' এই সব। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত বইগুলি পড়ে দেখবার সুযোগ তখনও আমার হয় নি। সুতরাং বললাম, না, আমি তাঁর নাম শুনিনি। হঠাৎ তাঁর কথা কেন ?

দাদামশায় বললেন, মনে পড়ে গেল। তিনি এইখানে থাকতেন কি না।

এইখানে, এই জঙ্গলে ?

জঙ্গল কেন রে, তখন এখানে এক মস্ত জমিদারের বাড়ী ছিল, হিন্দুস্থানী জমিদার। শরৎবাবু অনেকদিন তাঁর কাছে ছিলেন। পরীক্ষা দিতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে এইখানে ছিলেন। দুদিনেই জমিদারের প্রাণের বন্ধু হলেন, তাঁকে নইলে জমিদারের গানবাজনার আসর কিছুতেই জমতো না। তিনি খুব ভাল গান গাইতেন, তব্‌লার হাতও ছিল চমৎকার…

তুমি কি করে জানলে ?

আমাদের বাড়ীতে কতবার এসেছিলেন, তোর বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রপাতও সেই থেকে। তোর বাবা

তখনই বলতো, 'শরৎ-দা মস্ত বড় লেখক হবেন!' আমরা তখন বিশ্বাস করিনি।

কিছুকাল পরে দেশে ফিরে এলাম। একদিন হঠাৎ আলমারির তাকের ভিতর খুঁজে পেলাম অপরিচিত হাতের লেখা খানকয়েক চিঠি। ছোট ছোট অক্ষরগুলি কি পরিচ্ছন্নভাবে লেখা! পাতা উল্টে দেখলাম, চিঠিগুলি রেঙ্গুণ থেকে শরৎবাবু লিখেচেন বাবাকে [৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়)]। চিঠিগুলি অসাবধানতা-বশতঃ আমি হারিয়ে ফেলেচি, নইলে সেগুলি থেকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের অনেক কথাই আজ সাধারণের কাছে প্রকাশ করতে পারতাম। ছেলে বয়সে সেই চিঠিগুলি আমি বারম্বার মুগ্ধ বিস্ময়ে পাঠ করেছিলাম। তা থেকে শুধু এইটুকু মনে করতে পারি যে 'চরিত্রহীন' যখন প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন কেউ কেউ গ্রন্থে কয়েকটি ছবি সন্নিবিষ্ট করবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাতে সম্মত হন নি। 'বিন্দুর ছেলে' যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন প্রথম প্রথম তাতে গ্রন্থকারের ফটো থাকতো; কিছুকাল পরে শরৎচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দেশ থেকে কলকাতায় এলাম। তখন স্কুলের লেখা-পড়ার পালা প্রায় শেষ করে এনেচি। দাদামশায় সঙ্গে করে আমায় নিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্রের কাছে শিবপুরের বাড়ীতে। সেই প্রথম দেখলাম তাঁকে। ছবিতে তাঁর মুখে গোঁফ দাড়ি ছিল—কিন্তু আসল মানুষটির মুখে তার পরিচয় পাওয়া গেল না। তবু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, আমি কল্পনার শ্রীকান্তকে যেমন করে দেখেছিলাম, তাঁর সঙ্গে এঁর কোথাও অমিল নেই। এই লোকটিই 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীর' নায়ক। কিশোর-মনে কি করে যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, আজও আমি ভাল করে বুঝতে পারি নি।

তারপর বড় হয়ে শুনলাম, সত্যিই 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী' শরৎচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। তার কতখানি সত্য আর কতখানি কল্পনা—তা আমার জানা নেই; কিন্তু একথা ঠিক যে একমাত্র 'শ্রীকান্ত' রচনা করেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হতে পারতেন। অথচ এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল যে পাঠক-সাধারণ হয়ত এ গল্প পড়ে খুসী হবে না!

বড় হয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কয়েকবার মাত্র দেখা হয়েচে। তার মধ্যে বছর দুই তিন পূর্ব্বের একটি দিনের কথা বিশেষ করে বলবার। তখন Communal award নিয়ে কংগ্রেসী মহলে ভাঙন ধরেচে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ন্যাশনালিষ্ট পার্টি গঠন করেচেন, য়্যানে প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সেই দলে যোগ দিয়েচেন।

শরৎচন্দ্র বললেন, পণ্ডিত মালব্য এতদিনে মস্ত বড় ভুল করলেন।

কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

শরৎচন্দ্র বললেন, কংগ্রেস যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে ভুল করেই থাকে, কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কি সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করা চলতো না? মালব্যজী যে পথ বেছে নিলেন তাতে যে কংগ্রেসকেই দুর্ব্বল করা হবে। অথচ কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে Communal award রদবদলের চেষ্টা কি কোন দিন সার্থক হবে ভাবো?

আমি তখন সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। উৎফুল্ল হয়ে বললাম, আপনার এই অভিমত সর্ব্বসাধারণকে জানাতে পারি?

শরৎচন্দ্র বললেন, লিখে বিষয়টা আমাকে দেখিও।

পরদিন বিষয়টা সাজিয়ে গুজিয়ে লিখে নিয়ে গেলাম। তিনি আদ্যন্ত পড়ে বললেন, কিছুই হয় নি। মোটেই লিখতে পারো নি হে!

জিজ্ঞাসু ভাবে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন, মালব্যজীকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি—সেই কথাটাই কোথাও পরিস্ফুট হয় নি। দেখো, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের সমালোচনা করি ক্ষতি নেই, কিন্তু যে কথাটা বলবো তা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা চাই। তোমাদের—অর্থাৎ সাংবাদিকদের এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। ওটা দাও, আমি নিজেই আগাগোড়া লিখে দেব।

তাঁর সেই রচনা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং এখানে তা সবিস্তার উল্লেখ করবার প্রলোভন সংবরণ করলাম।

এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে তখন কয়েকবার শরৎচন্দ্রের

বাড়ীতে যেতে হয়েছিল। প্রত্যহ বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প-গুজবে কাটিয়েচি। শরৎচন্দ্র যখন গল্প বলতেন, তখন তাঁর মুখের কথাতেই তাঁর অশান্ত জীবনের ছবি একেবারে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। তিনি কেবল গল্প লিখতেন না, গল্প করবার অনন্যসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সভায় তাঁকে মানাতো না, কিন্তু গল্পের বৈঠকে তিনি ছিলেন যাদুকর গল্পী!

দৈনিক দেখতাম, গল্প বলতে বলতেও তিনি যেন খেই হারিয়ে ফেলতেন। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠে অকারণ ঘরময় ঘুরে বেড়াতেন। তারপর হঠাৎ আবার চেয়ার দখল করে, হয়তো বা চোখের চশমাখানা খুলে রেখে, আর এক জোড়া চশমা চোখে লাগিয়ে প্রশ্ন করতেন:—হাঁ, গল্পটা কোথায় ছেড়েছিলাম বলো তো…?

মাসিক পত্রিকায় তিনি সর্ব্বশেষ যে উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেছিলেন, তাও শেষ হয় নি। 'শেষ প্রশ্নের' পর 'শেষের পরিচয়' আমরা পেলাম না। ইদানিং যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেচেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, তাঁর শরীর যতই অশক্ত হয়ে পড়ছিল, মনে মনে তিনি যেন ততখানি অস্থিরতা বোধ করছিলেন। মনের সঙ্গে তাঁর দেহের এই সংগ্রামের আভাস আমি কতদিন তাঁর মুখে স্পষ্ট অনুভব করেচি। কখনও মনে হয়েচে, এই আধুনিক ও নাগরিক জীবনযাত্রা যেন শরৎচন্দ্রের জন্য নয়; এখানে তিনি নিজেকে উৎপীড়িত ও ক্ষুণ্ণ মনে করেন। তাঁর সত্যিকার স্থান রূপনারায়ণের তীরে, প্রকৃতির নিকটতম এবং অকৃত্রিম পরিবেষ্টনের মধ্যে। কারণ দৈহিক অশক্তির সঙ্গে তাঁর মানসিক বার্দ্ধক্য দেখা দেয় নি। রূপনারায়ণের তীরে তিনি হয়তো তাঁর বিস্মৃত শৈশবকে খুঁজে পেতেন, কিশোর বয়সের সেই সব দৌরাত্ম্যের কাহিনী হয়ত ক্ষণকালের জন্যও তাঁর দেহকে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত করে তুলতো!

মধ্যে মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বাক হয়ে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে বসে থাকতেন? কি ভাবতেন তিনি—মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করতাম। মনে পড়ে যেতো Disraeliর কথা। ভাগ্যের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করে Disraelিও শরৎচন্দ্রের মত জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর শেষ বয়সের কথা বলতে গিয়ে আঁদ্রে মরোয়া বলেচেন:

One passion survived in this beaten body and that was the taste for the fantastic. When he was alone forced by his sufferings into silence and immobility, unable even to read, he would reflect with an artist's pleasure on his marvellous adventures. Was there any tale of the thousand and one nights. any story of a cobbler made sultan, that could match the picturesqueness of his own life?

চিন্তামগ্ন দুর্ব্বলদেহ শরৎচন্দ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে—আমারও মনে হত ঠিক এই কথাই। জীবনের অজ্ঞাত-ক্ষেত্র থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁর আকস্মিক অভ্যুত্থানের কাহিনী রূপকথার মত বিস্ময়কর, যাঁর অতীত জীবন সমাজের বিরুদ্ধে লোকাচারের বিরুদ্ধে বিরাট একটা বিদ্রোহ, এককথায় যাঁর জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড adventure, তাঁকে শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করতে দেখা যে কতদূর কষ্টকর, সেকথা যাঁরা ইদানিং তাঁকে না দেখেছেন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন না।

ঠিক এমনি অবস্থায় Disraeli বলেছিলেন:

I am certain there is no greater misfortune than to have a heart which will never grow old.

শরৎচন্দ্র এমন কথা কোনদিন কারও কাছে বলেচেন কি না জানি না, কিন্তু জীর্ণ দেহ নিয়েও তাঁকে নিত্য-নবায়মান মনঃশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েচে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শরৎচন্দ্র যেদিন সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সেদিন তাঁর সম্বন্ধে কত সন্দেহ, কত সংশয়, কত তীব্র বিষোদ্গীরণ। তাঁর অতীত জীবনযাত্রাপ্রণালী সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে তাঁর কাছে পত্র লিখতেও লোকে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এমন কি একবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে কোন এক ব্যক্তি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, খবরের কাগজে মামলার বিবরণ পাঠ করে কেউ কেউ বলেছিল, 'এই সেই নভেল-লিখিয়ে শরৎচন্দ্র'—এ গল্প আমি তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনেচি। কিন্তু তবু তাঁর জয়যাত্রার গতি কোনদিন রুদ্ধ হয় নি। বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁর স্থান কোথায় সে বিচারের ভার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সমালোচকের, কিন্তু বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সাহিত্যে তাঁর স্থান চিরকালের।

তাঁর পার্ব্বতী আর দেবদাস, চন্দ্রমুখী আর বিজলী, সতীশ আর সাবিত্রী, রমা, রমেশ আর জেঠাইমাকে বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েদের চিরকাল সমান দুঃখ আর আনন্দ দেবে। আদি গঙ্গার কূলে তাঁর জন্ম যদি কোনদিন স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত না হয়, তবু তিনি একালের ছেলে আর একালের মেয়েদের মনে বেঁচে থাকবেন।

আমি আগেই বলেচি যে ইংলণ্ডের অমর রাজনীতিক ও ঔপন্যাসিক ডিজরেলির জীবনের সঙ্গে আমি বাঙ্গালার এই কথাকুশলী সাহিত্তিকের জীবনে আশ্চর্য্য একটি সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েচি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। একদা যাঁকে পথের বহু বাধা অপসারিত করে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করতে হয়েছিল, তাঁর কুশল-সংবাদ জানবার জন্য দিনের পর দিন অসংখ্য নরনারী নার্সিং হোমের বাইরে অপেক্ষা করেচে। ডিজরেলির কুশল-সংবাদ জানবার জন্যও ঠিক এমনিভাবে নরনারী তাঁর বাসভবনের বাইরে প্রতীক্ষা করে থাকতো। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ডিজরেলি হঠাৎ মাথা খাড়া করে বিছানায় উঠে বসেছিলেন; যারা তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিল তারা ভেবেছিল, কমন্সসভায় ডিজরেলি যেন বক্তৃতা করতে উঠচেন! কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর বাক্যস্ফুরণ হয় নি। তার পরেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। কি কথা তাঁর বলবার ছিল তা আর জানা যায় নি। শরৎচন্দ্রও অন্তিম-মুহূর্ত্তে চীৎকার করে উঠেছিলেন—"আরও দাও, আমায় আরও দাও · ”

কি চেয়েছিলেন তিনি? খ্যাতি না শান্তি?

এর উত্তর দিতে পারেন শুধু মহাকাল।

ডিজরেলির মৃত্যুর পর যখন রাশি রাশি পুষ্পস্তবক তাঁর মৃত্যুশয্যা অলঙ্কৃত করেছিল, তখন তাঁর বিরোধীদল তা দেখে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু ঘরোয়া তাতে বিচলিত না হয়ে লিখেচেন:

No, Disraeli was very far from being a saint. But perhaps as some old spirit of spring, ever vanquished and ever alive and as a symbol of what can be accomplished in a cold and hostile universe, by a long youthfulness of heart.

বাঙ্গালার এই লোকান্তরিত সাহিত্য-নায়কের সম্বন্ধেও এ কথা বোধ করি অনায়াসে প্রয়োগ করা চলে।

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তি

শরৎচন্দ্র তাঁর মৃত্যুহীন সাহিত্যের সাহায্যে বাঙালীর অন্তরলোকের নিভৃতে বাসা বেঁধেছেন—তাই স্মরণের শুভসিন্দূরে তাঁর স্মৃতিকথা আজ ঘরে ঘরে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। প্রণামের সঙ্গে তাঁকে আমরা গ্রহণ করেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে যেন আমরা বাঁচিয়ে রাখি।

শরৎ-সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর এতো দরদ্ কেন—এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে। এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ করা চলে, কিন্তু সহজ উত্তর দেওয়া চলে না। তবুও যাঁরা বিশ্বাস করেন যে প্রশ্নমাত্রেরই উত্তর আছে, তাঁরা অনেক কিছু বলেন। মানুষের দরদ্ যদি কোন ফর্ম্মুলার সাহায্যে পাওয়া যেত, সংসারের অনেক গরমিল বন্ধ হ'তো। কিন্তু যে-পথকে সহজ বলে প্রচারিত করা হয়, তা' যে সংসারে দুর্গম হ'য়ে উঠে—এই সত্যকে স্বীকার না করলে অনেক সত্যেরই নাগাল পাওয়া যায় না; তাই শরৎ-সাহিত্যের ভিত্তির কথা ভাবতে গেলে শরৎ-সাহিত্যের সম্পূর্ণরূপের কথা ভাবতে হয়—এর প্রতি দরদ্ কোন খণ্ডকারণে নয়। সম্পূর্ণতায় যে-রস পরিবেশিত হয়েছে, তা-ই পাঠককে বিমুগ্ধ করেছে।

মানুষকে বিচার করবার বিবিধ মানদণ্ড আছে—অর্থ, জ্ঞান, গুণ, প্রয়োজনীয়তা। শরৎ-সাহিত্য গুণীকে শ্রদ্ধা করে, জ্ঞানী বা ধনীকে নয়। এই স্বীকৃতিতে নতুন সত্য নিহিত না থাকলেও প্রচলিত মাপকাঠির প্রতি অবজ্ঞা লুকায়িত রয়েছে। আমাদের সমাজ জ্ঞানীদ্বারা শাসিত এবং ধনীদ্বারা শোষিত—এই শাসন ও শোষণের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ জনগণের চিত্তে যে-বিক্ষোভের বন্যা ছল্‌ছল্ করে উঠেছিল, তারই ছন্দে ধ্বনিত হ'য়ে শরৎ-সাহিত্য নতুন সত্য বহন করে নিয়ে এল। শরৎচন্দ্র সমাজের ভিত্তিকে আঘাত করলেন না বটে, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অজুহাতে সমাজ-ধর্ম্মের বিধি-নিষেধকে ডিঙিয়ে মানবতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

দিয়ে গ্রহণ করলেন। শাসনের ভারে যাঁরা অবনত, শোষণের যাঁতাকলে যাঁরা পিষ্ট, তাঁরা শরৎ-সাহিত্যে নতুন ধর্ম্মের স্বাদ পেলেন। বাঙলা-সাহিত্যে এই নতুন চেতনা তিনি এনে দিয়েছেন। শরৎ-সাহিত্যের এই মুক্তধারা বাংলাসাহিত্যে নতুন গতি দিয়েছে—তাই নব নব ক্ষেত্র পুষ্পিত হ'য়ে উঠেছে।

শরৎ-সাহিত্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচারিত হয়েছে, একথা স্বীকার করা সুকঠিন। সমাজে বা রাষ্ট্রে, শরৎচন্দ্র কোথাও কোন গ্রন্থিকে আল্‌গা করতে কাউকে উৎসাহ দেন নি—শুধু মানুষকে বিচার করতে প্রচলিত মাপকাঠিকে অস্বীকার করেছেন। যারা অপাংক্তেয়, তাদের বিচার ক'রে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সমাজে শ্রদ্ধার আসন তাদের জন্য রচনা করেন নি। এবম্বিধ সংস্কার বুদ্ধির ভিতর ভীরুতার নিদর্শন থাকলেও জনপ্রিয়তার হেতু খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজগত দাবীর সঙ্গে ব্যক্তিগত দাবীর পরিণয় শরৎ-সাহিত্যের এক রহস্যময় বস্তু—তারই মায়াজালে বাঙালী পাঠক আবদ্ধ। এই মায়াজাল যে-শিল্পী শ্রম ও নিপুণতার সঙ্গে রচনা করেছেন, তিনি সত্যিই গুণী ও দরদী।

শরৎচন্দ্রের বস্তুবাদ আদর্শবাদের রঙে উজ্জ্বল। শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর কামগন্ধহীন প্রেম না থাকলেও বৈষ্ণব-কবির নিবিড়তা ও তন্ময়তা আছে। তাই তাঁর সাহিত্যে যে-নারী স্বামী ছেড়েছেন, তিনি আবার তাঁকে চেয়েছেন এবং যিনি ভালবেসেছেন, তিনি অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছেন। সেই দেয়া-নেয়ার খেলাতে নিবিড়তা আছে, কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত সমাজসৌধকে তিনি কোন অসঙ্গতিদ্বারা কলঙ্কিত করেননি। যে-সমাজ নিয়তিকে বিশ্বাস করে, সেখানে প্রেমের স্বাধীনগতি অশ্রদ্ধার ভারে মন্থর শরৎ-সাহিত্য যে-নবদর্শন আমাদের গতিহীন সমাজে প্রবর্ত্তন করেছেন, তা'তে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সামাজিক অনুশাসনের দ্বারা সংহত হয়েছে। এই সংহতির রেখা কোথাও সুস্পষ্ট বা কঠিন নয়—তাই শরৎসাহিত্যে অনেকে অসংযমের পরিচয় পেয়ে আঁতকে উঠেন, তাল ও মাত্রার গণ্ডীর ভিতর সুরের বৈচিত্র্যকে যেমন স্বেচ্ছাচারিতা বলা যায়না, তেমনি শরৎসাহিত্যের বৈচিত্র্যও সমাজের ছন্দপতনের চেষ্টা করেনি। সেই ছন্দপতন থাকলে শরৎ-সাহিত্য এতো জনপ্রিয় হ'তে পারতোনা। যে-রস পরিবেশন করলে চিত্ত জয় করা যায়, শরৎসাহিত্যে সেই রসে টৈ-টম্বুর। তাই তাঁর সাহিত্যে যাঁরা আহত হয়েছেন বেশী, তাঁরাই তাঁর প্রধান উপাসক। এই অহঙ্কার শুধু শরৎচন্দ্রই করতে পারেন। নইলে ইংরাজী শিক্ষা ও নাগরিক সংস্কৃতির কোলে যে-সমাজ পরিবর্দ্ধিত, তা'রই প্রাঙ্গণে শরৎসাহিত্যের এত সেবক ও উপাসক ভিড় করে আস্‌তেন না।

য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ লাভ করে আমাদের দেশে ও সমাজে এক নতুন বুর্জ্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে-সর্ব্বত্র এঁদের প্রভুত্ব। শরৎ-সাহিত্য এই নতুন বুর্জ্জোয়াশ্রেণীকে আঘাত করলো—এই দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিকের কাছে মূল্যবান। তাই শরৎচন্দ্র নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন পটভূমি প্রবর্ত্তন করলেন, নর-নারীর অন্তর-বিপ্লব নতুনরূপে বিকশিত করলেন। রসের-হাটে সবাই সমান, সবার দাবীই প্রধান—তাই যাঁরা ব্যথা পেলেন, তাঁরাই গণ্ডুষভরে শরৎ-সাহিত্যের রসগ্রহণ করলেন। দেশের জনসাধারণ শরৎ-সাহিত্যে নতুন অবলম্বন খুঁজে পেলেন, শরৎচন্দ্র দেশবাসীর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন।

আজ শরৎ-সাহিত্য বিচারের দিন নয়—আজ স্মরণ-করবার দিন যে, শরৎসাহিত্য বাঙালীর পরাজিত জীবনের অবসন্ন মুহূর্ত্তগুলিকে আনন্দে ভরে দিয়েছে। শরৎ-সাহিত্যের এই ঐশ্বর্য্য বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ্।

শ্রীশচীন সেন এম-এ, বি-এল

শরৎ কথা

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লেখবার সময় এ-নয়। তিনি যেন আমাকে ঘিরে রয়েছেন, তাঁর আত্মার স্পর্শ যেন অনুভব করছি। মন স্থির নয়, উচ্ছ্বাস—ছাড়া পাবার তরে ছটফট্ করে। তিনি একদিন বলেছিলেন—"লেখায় উচ্ছ্বাস যত বাদ দিতে পারেন ততই ভালো"। আজ লেখার ভালো-মন্দের কথা নাই।—ভাবছি আমাদের এই দুর্দ্দিনের কথাটা জেনেই কি ওই উপদেশটা তিনি দিয়েছিলেন!

তাঁর কোন্ দিনের কোন্ কথাটা লিখবো? তাঁর লক্ষাধিক ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই যা না জানাই সম্ভব, সেইরূপ দু'একটি কথারই উল্লেখ করি।

তাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কারণ তাঁর লেখার মধ্যে বোধহয় কোথাও তিনি ভগবান বা দেবতার উপর নির্ভর করে' উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা পাননি, সহজ-যুক্তির সাহায্যই নিয়েছেন।

তাঁর সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাত। কথা প্রসঙ্গে বললেন—"মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস কর্‌ছেন" ?

বললুম—"সেটা বলা কঠিন, হ'য়ে গেলে অলাভ নেই তো! তবে ঝঞ্ঝাট্ থেকে কতকটা মুক্তি পাবার জন্তে অনেকেরই আসা। ওই সঙ্গে দেশের লোকেও যে কিঞ্চিৎ মুক্তি না পায়—তাও নয়"…"এইটে ঠিক্ বলেছেন" বলে' হাসলেন।

তখন আমরা দশাশ্বমেধের কালীবাড়ীর সামনে এসে পড়েছি।

আমি 'মা'কে প্রণাম করলুম।—দেখি তিনি তফাতে সরে' গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বললেন—"আমাকে নাস্তিক বলে' অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয়" ?

বললুম—"অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তা'তে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে—আপনি পরম আস্তিক" ?

—"কে বললে, কোথায় ?—ভুল কথা"…

"যা নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই, সেই "চরিত্র-হীনে"ই রয়েছে—দিবাকর গৃহদেবতা নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারেনি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্ত সাশ্রু ক্ষমা প্রার্থনা না করে' বাড়ী ফিরতে পারেনি। এই সামান্ত ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন, বিশেষ ক্ষতিও হ'তনা। আপনি পারেন নি"…

"ও কিছু নয় কেদারবাবু, লেখকদের অমন অনেক অবান্তরের সাহায্য নিতে হয়। ঐ একটাই তো ?"…

"বহুৎ আছে। জগতে অবান্তরও বহুৎ আছে। মন প্রিয়টা ধরেই চলে। ওই বই থেকেই বলি;—আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটি "ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল জায়েন্টেস্" বানিয়েছেন, আবার সুরমাকে (পশুটিকে) হিঁদুর ঘরের একটি সরল বিশ্বাসী প্রতিমা গড়েছেন। যার সামনে কিরণময়ী শুদ্ধ নিষ্প্রভ হয়েই ফিরেছিল! এটা করলেন কেনো" ?…

"আমার লেখা এমন করে' কেউ দেখে বলে' জানতুমনা, তাহলে' সাবধান হতুম"…

"অনেকেই দেখেন, যাঁর ভালো লাগে তিনিই দেখেন। দেখুন, নাস্তিকেরা অতি সাবধানী, তাঁরা মাথার সাহায্যে লেখেন বলেই মনে হয়। সুরমাতে মাধুর্য্য রয়েছে—ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া।"

"যান্ যান্ বেলা হয়েছে, নমস্কার।—দেখতে যেন পাই।"

দ্রুত চলে গেলেন।

* * * *

তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী হতে ফেরবার পথে বৃন্দাবন না হয়ে' ফেরেন নি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন আমার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি,—আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজির মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরি নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতিবড় নাস্তিকও যে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান!

বড়কে বাদ দিয়ে কেউ বড় হ'তে পারেন না।

২

তাঁর আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে বলেছি। এইবার তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলি।

অন্তরে অন্তরে তাঁর ছিল উদাস প্রকৃতি—সংসার নির্লিপ্ত। একমাত্র সাহিত্যই তাঁকে দশের মধ্যে টেনে রেখেছিল। তার চেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে অন্য আর কিছুই ছিল না। তিনি ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। কতবারই বলেছেন—"আমি যা লিখি তা যথেষ্ট খেটেই লিখি, অন্তর দিয়েই লিখি—তার চেয়ে ভালো লিখতে আমি চেষ্টা করেও পারিনা"।

এই সাহিত্যই ছিল উদাসীর প্রেমের অবলম্বন। তাই তাঁকে আমরা পেয়েছিলুম। অর্থ, ঐশ্বর্য্য, অট্টালিকা তাঁর মোহের বস্তু ছিল না—কাম্যও ছিল না। তারা নিজেরাই এসে উদাসীকে ঘিরেছিল।

জীবনের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য বহুদিনের। তাঁর লেখা পত্র থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করি—

৯ই এপ্রেল ১৯২৪, বাজে শিবপুর

কেদারবাবু—আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করেন, সে কথা একদিনের জন্যও ভুলিনে।

(খবরের) কাগজে (অসুখের) খবর পেয়ে আমার দীর্ঘ জীবনের কামনা করেছেন, এর ভিতরের বস্তুটি কি ভুল করবার!

কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা কেন? আপনাকে সত্য সত্যই বলছি—কাল যদি এর ফেরবার ডাক্ পড়ে, বলিনে যে বাপু পরশু এসো—একটা দিন পরে যাবো।

অনেক দিন ত বাঁচলাম! * * * আমি শ্রান্ত হয়ে গেছি কেদারবাবু; এ ছাড়া আর বিশেষ কোনো রোগ বালাই নেই। কেবলি আমাকে খাটাতে চায়।

বাজে শিবপুর ১৪-১০ ২৪

* * * বৎসরও আসবে বিজয়াও আসবে, একদিন কিন্তু আপনিও থাকবেন না—আমিও না। আপনি আমার বয়সে বড়, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন—সে দিন যেন আমার বেশি দূরে না থাকে। আমি ভারি শ্রান্ত। তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ দুঃখ, একবার হাসি একবার কান্না—নিতান্তই আমার পুরণো হ'য়ে গেছে। আটচল্লিশ বছর বয়স হ'ল—ঢের হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে—এর পর কি আছে পেতে। নিরর্থক কতকগুলো বিলম্ব হবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিনে।" * * *

সামতাবেড় পাণিত্রাস পোষ্ট, ৮ই বৈশাখ ১৩৩৩

* * * "সে দিন দিলীপকুমার রায়কে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন—শরৎ শুনেছি নিজে * * * নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ করে' বসে' আছেন" * * *

কেদারবাবু, বন্দী-ব্রতই নিয়েছি। সহরেই থাকি বা পাড়াগাঁয়েই বাস করি, আমি সংসারের জোয়ার ভাঁটায়—উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি।

দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে। মনে আছে হয়ত' আপনার—৫১ বৎসরে যাবার দিন কুষ্ঠিতে ধার্য্য করা আছে—আর বড় তার বিলম্ব নাই—বছর দেড়েক। জগদীশ্বর করুন তাই যেন হয়। আর যেন তিনি আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন।" * * *

আরো আছে—থাক, আর নয়। লিখেও সুখ নাই, পাঠেও কারো আনন্দ নাই।

লিখেছিলেন—"আমার বড় ইচ্ছে, এর পর কি আছে পেতে।"—তা তুমি নিশ্চয়ই পেয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমরা চাই—অনেক অশান্তকে শান্তি দিয়েছ, বহু তাপিতকে আনন্দ দিয়েছ, তোমার আত্মা শান্তি পাক্ আনন্দে থাকুক। ক্লান্ত—বিশ্রাম কর'।

শরৎচন্দ্র তাঁর ভালোবাসা ও দরদের দিকটা তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর সাহায্যে নির্ভীকভাবে তাঁর প্রত্যেক পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়—শান্তিজলের মত ছড়িয়ে গিয়েছেন। কিছু লিখে তার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নেই, বাংলার ঘরে ঘরে তা পৌঁছে গেছে।

আমি নিজের একটা কথা বলছি—যা অন্যত্র পূর্ব্বেও বলেছি, এখন উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি।

"পূর্ণিয়া থেকে, এখানকার যা নামী ও দামী জিনিস—ম্যালেরিয়া, সেটি সংগ্রহ করি। * * * পুরো পাঁচ মাস তার উৎপাত স'য়ে, পূজার পর কাশী চলে গেলুম। দেখি তিনিও সঙ্গে এসেছেন—কাশীবাস করতে চান—আমাকেই অবলম্বন করে! * * *

'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান সুরেশ চক্রবর্ত্তীর বাসায় উঠেছি। জ্বর ভোগ করি, ছুটি পেলেই "কোষ্ঠীর ফলাফল" লিখি। সেইটাই ছিল আমার দুঃসময়ের অবলম্বন। * * *

শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্রকে বিজয়ার নমস্কার জানিয়ে বিদায় চেয়ে লিখলুম,—"এইবার 'সত্যের' সন্নিকটে হয়েছি"—ইত্যাদি। তিনি লিখলেন—"এত সত্বর ঈশ্বর হলে চলবে না। দেখা হওয়া চাই—যাচ্ছি। আনন্দ হ'তে বঞ্চিত করবেন না"—ইত্যাদি। পড়ে' মুখে দুঃখের হাসি এল। * * * সত্যই কি আসবেন!

'কোষ্ঠী' আর শেষ বুঝি হয় না। মানব আর আজিজের কথা চলছে। সামঞ্জস্যের দিকে আর নজর নেই; বলবার যা ছিল, তাড়াতাড়ি সেগুলো সারবার দিকেই ঝোঁক।***

শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বদিন—বাইরের ঘরে বসে' লিখছি। সহসা শুনলুম—এইটা কি সুরেশবাবুর বাসা? বাবু গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। লোকটির হাতে গড়গড়া!—অকাট্য পরিচয়।

পিপাসিতের মত ছুটে গিয়ে দেখি—তিনিই তো বটে!

বিদায় বেলায় বাঞ্ছিত দেখা দিতে এসেছেন। চোখে জল এসে গেল, জড়িয়ে ধরলুম।

বললেন—"কি, হয়েছে কি! এখনি যাবেন কোথায়?" বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন।—* * * "ভোলা, শীগ্‌গির তামাক সাজ" বলে' বসলেন। তার পর কত কথা, অসুখের উল্লেখ মাত্র নয়।—অসুখ আবার কি? ও সেরে গেছে। কথাটা ব্রহ্ম বাক্যের মতই কাজ করলে। আমার যে অসুখ ছিল বা আছে, সে কথাটা শরীরে বা মনে অনুভবই করিনি! * * *

তার পর—'দিন যায় রাত্রি আসে', স্নানাহার স্মরণ থাকে না। আনন্দ-মুখর তরুণেরা আসে যায়। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেই হবে;—সুরেশের লাইব্রেরিতে সরস্বতী পূজা—সভাপতি শরৎবাবু। সুরেশের হৈ-চৈ আর আনন্দ থামে না। * * *

এইবার আমার রোগের ব্যবস্থা। উদ্‌যোগ পর্ব্বেই ঘন ঘন গুড়ুক এবং সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা। * * * সময় আমাদের অধীন থাকবে—আধিপত্য করতে দেওয়া হবে না—কি বলেন?—বললুম—অত বজ্র বাঁধুনি দেবেন। হাসলেন—"এই দেখুন না"। * * *

আজ আমাকে নিয়ে বেরুতেই হবে। টঙাওলাকে বলে দেওয়া হ'ল—"কাল্ ঠিক্ আটটায় আসা চাই, দেখিস্—খবরদার বিলম্ব না হয়,—বুঝতা?" হাঁ হুজুর বলে সে চলে গেল।—পরদিন সেলাম করে' জানিয়ে দিলে—ঠিক্ আটটায় হাজির হয়েছে।

বেলা ৯টার সময়—দ্বিতীয় সেলাম। তখন চা খাওয়া চলছে, ভোলা তাওয়া চড়াচ্ছে! গাড়ওয়ানকে বললেন—"এই ছ্যাখ্‌না, চট্ করে' নিচ্চি—সত্বরই যাতা হায়।"

ক্রমে তরুণদের আগমন। তাওয়াও ফিকে মেরেছে।—"ভোলা করচিস কি, বাবুরা এসেছেন—কোন আক্কেল নেই!" * * *

বেলা ১১টায় তৃতীয় সেলাম।—তাই তো কেদারবাবু, এ বেটা যে ছাড়ে না দেখছি! এ বেলা কি যেতে পারবেন?

বললুম—"এঁরা সব দূর থেকে এসেছেন, এঁদের ফেলে"···

"তাই তো—তা ও-বেটা বোঝেনা কেনো।—ওহে—এগারোটা তো বাজ গিয়া, এখন খাও-দাও গিয়ে, তোমাদের আবার 'পাকাতে' হয়। কাশীতে তো কষ্ট দিতে আসতে নেই। যাও—ঠিক্ চারটে বাজলেই আও কিন্তু"···

সে কি বলতে যাচ্ছিল।—"হাঁ হাঁ বুঝা হায়, তোমারা ক্ষতি নেই করে গা—ভাড়া ঠিক্ পাবে গো"। সে চলে গেল।

বললেন—"আচ্ছা বলুন তো, বড় লোকেরা এত সেলাম সয় কি কোরে! উঃ তিন সেলামেই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।—আজ কিন্তু বিকেলে দেরি করলে চলবে না কেদারবাবু। কাজ থাকে তো সেরে রাখুন। তখন যেন···দেখুন চা খাওয়াটা একটা মস্ত ঝঞ্ঝাট, ভারি সময় নষ্ট করে' দেয়। ও কাজটা ফেলে না রেখে, এ বেলাই সেরে রাখলে কি হয়"···

বললুম—"সময় বাঁচাবার এমন সহজ উপায়, ফস্ করে' মাথায় এলো কি কোরে! আপনি উপন্যাসের দিকে মাথাটা দিলেন কেনো—এই সব শক্ত শক্ত আবিষ্কারের দিকে লাগালে যে অনেক কিছু পাওয়া যেতো"!—হাসলেন।

টঙ্গাওলা দু'বেলাই ঠিক্ আসে। রাত ১১টার পর সাত টাকা নিয়ে যায়। দু'দিন এই ভাবে কাট্‌লো।

বললুম—"কাশীতে কাজটা ভালো হচ্ছে কি? আপনি ধর্ম্মভীরু মানুষ—ঘোড়াটার যে ইহকাল পরকাল গেল'—বাতে ধোরে মরবে যে।"

"নাঃ—কাল আর কারো কথা শোনা হচ্ছে না। আপনি সকাল সকাল উঠবেন—পারবেন তো?—যার রোগ তার চিন্তা নেই, সেটা ভালো নয়"···

তৃতীয় দিনও সকালে বেরুনো হ'য়ে উঠলোনা। বৈকালে মরিয়ার মত উঠে পড়া গেল।—"আপনি বাইরের হাওয়া লাগান না, ওই আপনার দোষ। চলুন—হাওয়ায় খানিক ঘোরা যাক্।" পরে—এ-দোকান ও-দোকান ঘুরে, কিছু না পেয়ে শেষে বেঙ্গল কেমিকেলের দু' শিশি 'পাইরেক্স' নিয়ে ফেললেন—"এই খান দিকি—একদম ম্যালেরিয়ার মৃত্যুবান!"

দু'দিন এই ভাবে বেড়ানো চললো। বেশ বুঝতে পারতুম—কথাবার্ত্তা, হাসি রহস্য, সাহিত্য প্রসঙ্গ, সবই আমাকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে। ফেরবার আগের রাত্রে বললেন—"একখানা নাটক লিখুন দিকি, আপনি

নাটক লেখেন না কেনো? আপনার ভাষা, আপনার 'ডায়লগ্' লেখার ভঙ্গী, সবই নাটকের উপযোগী। নাটকের প্রয়োজনও রয়েছে। আরম্ভ করে' দিন। আসুন—আজ নাটক নিয়েই কথা কওয়া যাক্।"…

রাত একটা বাজলো।

বললুম—"কাল চলে যাবেন, শুয়ে পড়ুন"…

বললেন—"আপনি লেখেন তো, আবশ্যক হ'লে আমি খাট্‌তে রাজি আছি।—কথাটা মনে থাকবে তো?"

আমার মনটাকে একটা নূতন কিছুতে নিবিষ্ট ও একাগ্র করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য—(সে কথা পরে শুনেছি)।

তাঁর আন্তরিকতা ও ভালোবাসার গভীরতা আমার অন্তরকে স্পর্শ কোরে আমাকে বিচলিত করছিল। বললেন—"কি ভাবছেন? রোগ আপনার সেরে গেছে‥"

ষষ্ঠ দিনে তাঁকে ট্রেণে তুলে দিয়ে নীরব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বন্ধুবিচ্ছেদবেদনা বহন করছিলুম। বললেন—"কোনো চিন্তা রাখবেন না কেদারবাবু, নাটকের কথাটা ভুলবেন না—বিজয়ার পত্র পাওয়া আমার বন্ধ হচ্ছে না।"

(সত্যই বন্ধ হয়নি বন্ধু।)

ট্রেণ ছেড়ে গেল।

কি আনন্দেই সে কয়দিন কেটেছিল। কোনো নিয়ম রক্ষা করা হয়নি—জ্বরও হয়নি। ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে ভাবতে ভাবতে ফিরেছিলুম—"তুমি কত বড়, তোমার প্রাণ কত কোমল। আমাকে এ সৌভাগ্য দান—তোমাতেই সম্ভব হয়েছিল। তুমি যে বাংলার বেদনা কাতর সাহিত্যিক। তোমার সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহানুভূতি, আজ বাংলার ঘরে ঘরে তোমাকে শ্রদ্ধার আসন দিয়েছে। নিপীড়িতা, পতিতা, অনাথা, ব্যথিতা—তোমাতে ব্যথার-ব্যথী পেয়েছে। তোমার দান বাঙালী সগৌরবে অসীম শ্রদ্ধার সহিত মাথায় করে' রাখবে—বিশ্বের সমাদর আকর্ষণ করবে। হে বাণীর বরপুত্র, আমার দরদী বন্ধু—ব্যথিতের নমস্কার লও।

এই সেদিনের কথা—কত না উৎসাহ কত না আনন্দ নিয়ে, তোমার বন্দনা-বাসরে যোগ দিতে গিয়েছিলুম। আজ মনের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও শরীর বিরোধী হ'ল, সকলেই একা যেতে বাধা দিলেন, সঙ্গীর অভাবে শেষ দেখা হ'ল না!—হবে—হবে, শীঘ্রই হবে বন্ধু! তুমি কালজয়ী হয়ে গিয়েছ—দীর্ঘ জীবন লাভ করেছ—এখন এই আমাদের সান্ত্বনা।

হে ক্লান্ত, হে শ্রান্ত—তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণাম

(খোলা চিঠি)

As for Bengali we have had Bankim, have still Tagore and Saratchandra. That is achievement enough for a single century.

AUROBINDO.

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়

করকমলে—

এইমাত্র আপনার সাদর পত্র পেলাম। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে একটি লেখা চেয়েছেন। এজন্যে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। তবু লিখতে সঙ্কোচ আসে যে। কারণ তাঁর হৃদয়ের দিকটা সম্বন্ধে কিছু বলবার আমার আছে বটে, কিন্তু মুস্কিল এই যে সে বিষয়ে যা-ই লিখি না কেন—নিজের কথা কিছু-না-কিছু এসে পড়বেই। অন্যদিকে অতি সন্তর্পণে নিষ্কলঙ্ক শীলতার প্রতিটি দাবিদাওয়া মেনে লিখতে গেলেও খটকা লাগে: এ ধরণের মামুলি স্মৃতিতর্পণ করা কি সাজে তাঁর সম্বন্ধে,যিনি জীবনে এশ্রেণীর লৌকিকতারই ছিলেন সবচেয়ে বিরোধী?

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে? তারও কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না। কেন না আমি জানি যে আমাদের সাহিত্যে তাঁর দান দীর্ঘজীবী হবেই—আমরা তাঁর সম্বন্ধে লিখি বা না লিখি। তাছাড়া তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে প্রশস্তি লেখবারও অনুকূল সময় তো এ নয়। তাই প্রথমে ভেবেছিলাম লিখবই না। পরে মনে হ'ল—অন্তত কিছু লেখা আমার চাই-ই। বিশেষ ক'রে এই জন্যে—যে তাঁর স্নেহ-প্রবণতার সম্বন্ধে আমার অনেক অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা আছে। তাই মনে হ'ল—এই সূত্রে সহজ ঘরোয়া ভাবে তারই কয়েকটির কথা লিখে যাই না কেন?—আশা করি সহৃদয়

পাঠকপাঠিকা সহজভাবেই নেবেন—বিশেষ যখন স্মৃতি-তর্পণে ব্যক্তিগত কথা বলাটা অশোভন নয়। তাই কলম ধরেছি। চিঠির ভঙ্গিতেই লিখি, কেন না তাতেই আমি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কোথায় আপনার নিশ্চয় মনে নেই, কিন্তু আমার আছে; আপনারই লাইব্রেরিতে—উপরতলায় একটি ঘরে ১৯১৩ সালে। সেই প্রথম দর্শনেই তাঁকে আমি ভালোবেসেছিলাম। বিখ্যাত নাট্যকার মার্লো'র একটি কথা মনে পড়ে; "Who ever loved not at first sight?" আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে সেই শুভদৃষ্টিতে যে রোমান্সের স্পন্দন বেজে উঠেছিল—যে আনন্দের আলো জেগে উঠেছিল—তাতে বাদল আর নামেনি কখনো এই পঁচিশ বৎসরের ঘনিষ্ঠতায়—এমন কি কখনো কোনো সূত্রে এতটুকু মনকষাকষিও হয় নি তাঁর—আর ৺অতুলপ্রসাদের সঙ্গে।

প্রথম শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ি—"রামের সুমতি" গল্প। তখন ৺পিতৃদেব জীবিত। আমি ও আমার বোন্ মায়া তো মুগ্ধ। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন মায়াকে: "কেমন লাগল রে?" সে মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ সংযমের সুরে সন্তর্পণে গম্ভীর ভাবে বলল: "ভালো"। পরে মিলিয়ে নেবেন—ও যদি বাঁচে তবে ক্রিটিক হবেই। বাবা বললেন: "ভালো কি রে? 'চমৎকার' বল্।"

এ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ৺পিতৃদেবের একটা মস্ত গুণ ছিল—তিনি যে-প্রশংসা করতেন সে-প্রশংসায় ক্রিটিক ভঙ্গিমা কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠত না। কারণ তিনি ক্রিটিক ছিলেন না, ছিলেন রসিক, প্রেমিক। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিলত। শরৎচন্দ্রও যখন প্রশংসা করতেন তখন সত্যিই মনে হ'ত প্রশংসা করতে তিনি ভালোবাসেন ব'লেই সাধুবাদ দিচ্ছেন—ক্রিটিক হ'য়ে নাম কেনবার জন্যে না। আমার এক তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান্ ক্রিটিক বন্ধু আমাকে একবার কী তিরস্কারই করেন—লেখেন: "ওহে, কাউকে প্রশংসা করবার সময়ে কম ক'রে বলবে, হাতে রেখে—নইলে এফেক্ট্ হবে না।" (আজও মরমে ম'রে আছি ভেবে যে, আমার "হাতে-না-রাখা" কত কথায়ই এফেক্ট হয় নি—যেখানে তাঁর প্রতি সমালোচনা আমাদের সাহিত্যের নীহারিকা হয়ে রইল!)

শরৎচন্দ্র এ-জাতীয় জীব ছিলেন না—প্রশংসা করতে এক পা এগিয়ে আশে পাশে তাকিয়ে দশ পা পেছুতেন না—এফেক্ট্ হওয়াবার জন্যে। তাঁর কখনো ভুল হ'ত না এমন কথা বলি না—(সংসারে কে-ই বা অভ্রান্ত বলুন?) কিন্তু তিনি ছিলেন দিল্‌দরিয়া: আর যা-ই করুন—ভুলের পরোয়া করতেন না। মানে, প্রশংসার পিছনে তাঁর দিল্ বলত "বহুৎ আচ্ছা"—হৃদয় তুলত জয়ধ্বনি। তাই বুদ্ধি সাবধান হ'তে চাইলেও এঁটে উঠতে পারত না। কারণ তাঁর হৃদয়টা যে ছিল মস্ত।

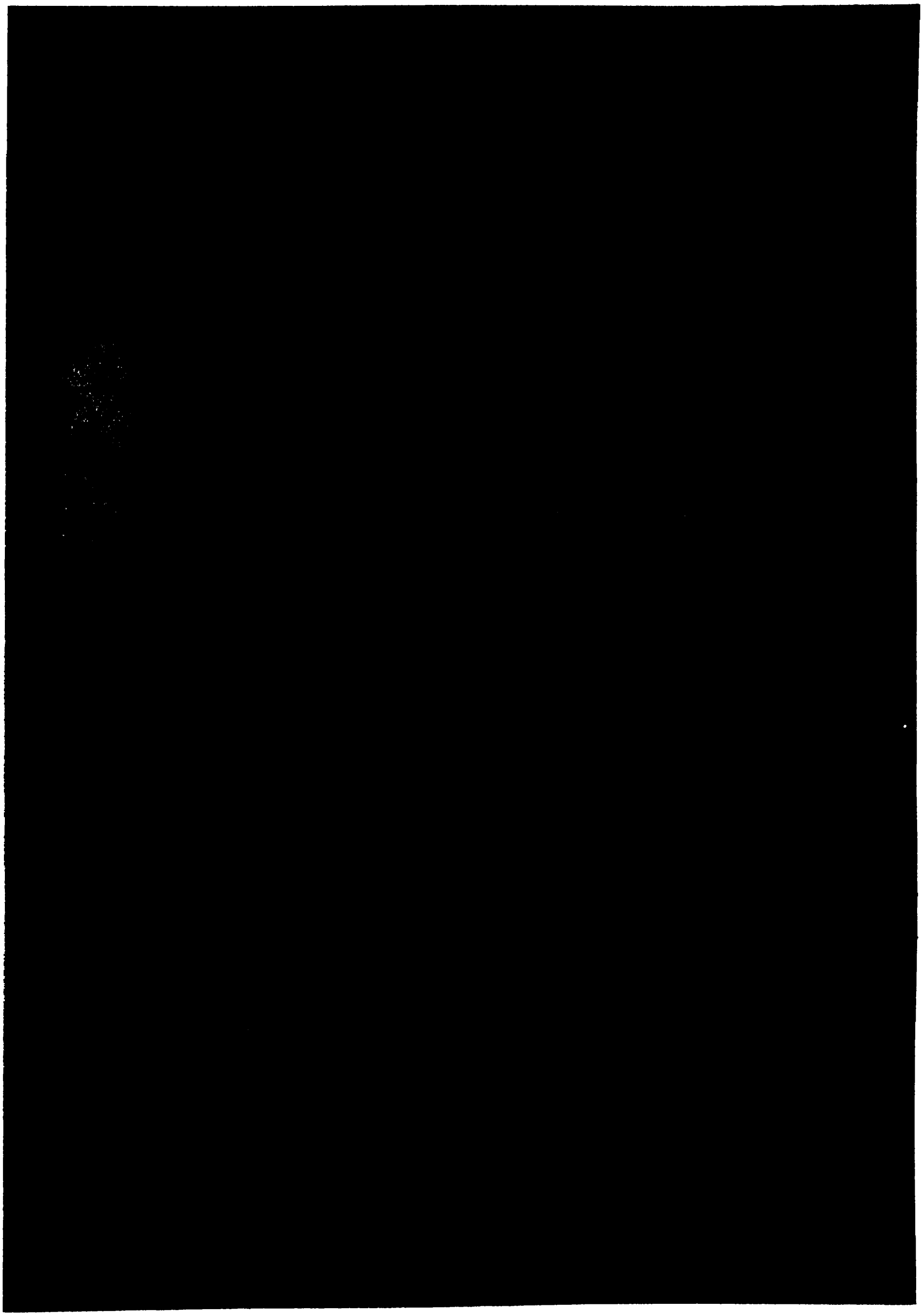
ক্রিটিকরা হয়ত বাঁকা হাসবেন—এ কি ব্যাজস্তুতি হ'ল না? অর্থাৎ—"হৃদয়" বটে, কিন্তু "বুঝ লোক যে জানো সন্ধান"—এতে ক'রে বলা হ'ল না কি যে বুদ্ধিতে তিনি যথেষ্ট—বাকিটা কটাক্ষেই।

কথাটা উঠলই যখন—বলি, এ সম্পর্কে যা আমার মনে হয়েছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে।

তাঁর বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ—উজ্জ্বল—সদা সজাগ। কিন্তু ইংরাজিতে যাকে বলে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল তা তিনি ছিলেন না। তাঁর মূল দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল হৃদয়বত্তার দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ বাইরের বস্তুজগতে তাঁর মূল রীতিটি ছিল অন্তঃশীলা—হৃদয়প্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ নয়, যেমন ধরা যেতে পারে আলডুস হাক্সলির। এ দুই মনীষীর উপন্যাস পড়তে পড়তে একথা আমার কতবারই মনে হয়েছে! আর মনে হয়েছে ঔপন্যাসিক হিসেবে শরৎচন্দ্র আলডুসের চেয়ে এত ঊর্দ্ধে এই জন্যেই। কারণ শিল্পকারুতে বুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে হৃদয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ঢের বেশি গভীর রসের জোগান দেয়। আলডুসের উপন্যাসের ক্ষুরধার বিশ্লেষণাদি পড়তে পড়তে মন বলে: "বাঃ!" শরৎচন্দ্রের রচনা পড়তে পড়তে হৃদয় ব'লে ওঠে: "আহা!"

এই হৃদয়রাগ তাঁর প্রতি কথায় উঠত ফুটে। শরৎ-চন্দ্রের স্নেহের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য যাঁদেরই হয়েছে তাঁরাই একথায় সায় দেবেন। তাই না তাঁর স্নিগ্ধ কথার দুএকটা চূর্ণ ঢেউয়ে এমন সহজে প্রাণমন উঠত দুলে! কিন্তু সেসব কথার ব্যাখ্যান তো হয় না। কারণ সেসব কথার মূল্য যে সব জড়িয়ে তবে—বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখাতে যাওয়া তো চলে না। তবু দুএকটা কথা না বললেই নয়।

তখন আমার বয়স হবে বছর সতের আঠারো—আমি



সাথী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নিশাথকুমার রায়চৌধুরী   Bharatvarsha Printing Works

একটি বাঙালী ওস্তাদের কাছে গান শিখি। এ-লোকটি খুবই ভদ্রঘরের ছেলে ছিল—এক অজ্ঞাতকুলশীলাকে নিয়ে বসবাস করত ব'লে জাতিচ্যুত হয়। শরৎচন্দ্র এ-কথা আমার কাছে শোনেন – কারণ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন—এমন দুশ্চরিত্রের কাছে আমি গান শিখি ব'লে। মানুষকে সুচরিত্র ও দুশ্চরিত্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ ক'রে নীতির ধ্বজা ওড়ানোর পক্ষপাতী আমি ছিলাম না কোনো দিনই, তাই একথা বলতে বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠেছিলাম।

শরৎচন্দ্র কিন্তু হাসেন নি, বললেন : "এ তো হাসবার কথা নয় মণ্টু! এই যুবককে আমি শ্রদ্ধা করি যে সমাজ-চ্যুত হ'ল জাতিচ্যুত হ'ল—তবু মেয়েটিকে ভাসিয়ে দিল না—তার সঙ্গেই ঘরকন্না করছে একনিষ্ঠভাবে। যারা তোমাকে এর কাছে গান শিখতে মানা করে তাদের কথা ভেবে আমার কান্না আসে, হাসি না।"

এক একটি কথায় চম্‌কে যেতে হয়?—যেমন গানে এক একটা সুরের দম্‌কা হাওয়ায় এক একটা চুল ওঠে ঝলমলিয়ে! শরৎচন্দ্রের নানা কথোপকথনে এই ভাবেই আমার কত যে শিক্ষা হয়েছে—এই চমকের পথে! জীবনের কত বেদনার জায়গা যে তিনি দেখিয়ে দিতেন তাঁর ছোট্ট দুএকটি করুণার কথায়—দরদের ব্যথায়—যেমন এই গান-শেখা নিয়ে। একটি পতিতা মেয়ের গল্প শুনেছিলাম তাঁর কাছে—কিন্তু না, সে-কাহিনী এখন বলব না—হয়ত ছাপতে আপনিও ভরসা পাবেন না। পরে হয়ত কোনোদিন নিজের বেদনা বইয়ে লিখব—কারণ সেসব লেখার নিন্দার দায়িত্ব থাকবে তখন একা আমারই।

তবু এটুকু ব'লে রাখলাম এইজন্যে যে তাঁর কাছে জীবনে উদারতার ও অনুকম্পার নানান্ দীক্ষাই পাই—নানা সূত্রে। সংসারে ভালোর জন্যে দরদ প্রকাশ করার রেওয়াজ আছে—তাতে বাহবাও মেলে কম না। কিন্তু বছর কুড়িক আগে মন্দের জন্যে—বিশেষত মন্দভাগিনীর জন্যে—দরদ প্রকাশ করা ছিল রোমহর্ষক কাজ। শরৎচন্দ্রের বহু গল্প, কথোপকথন, ব্যাখ্যানে এই সব দুর্ভাগিনীদের প্রতি তাঁর যে দরদ নিত্যই ফুটে উঠত তাতে—(ক্ষমা করবেন ঘরোয়া কথাটার জন্যে) চোখে জল আসত সত্যিই। জীবনের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি যখন হয় কল্পনার ঘট্‌কালিতে তখন মন বলে : "বাঃ"। কিন্তু যখন প্রেমই এসে জীবনের ছায়ালোকে ফেলে আলো—তখন হৃদয় বলে : "আহা"! শরৎচন্দ্রের মনুষ্যত্ব—humanism-এর গোড়াকার দৃষ্টি-ভঙ্গিটি ছিল এই জীবনবন্ধুর—দরদীর—প্রেমিকের। বিশেষ ক'রে তাঁর নারী-চিত্রণে, শিশু-চিত্রণে ও পশুর দুঃখ চিত্রণে এই দৃষ্টিভঙ্গি ছত্রে ছত্রে উঠেছে ফুটে। তাই তো বার বার তাঁর গল্প উপন্যাস পড়ি—তবু হৃদয় বলে ঐ এক কথা : "আহা!" তাঁর নিষ্কৃতি, চন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, অরক্ষণীয়া প্রভৃতি কতবারই তো পড়েছি, তবু এখনো ফের যেই পড়া সুরু করি বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। সাধে কি রোলাঁ তাঁর শ্রীকান্ত প্রথমভাগের ইংরাজি অনুবাদ প'ড়ে বলেছিলেন : "নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য!" প্রসঙ্গত একটা কথা ব'লে নিই! বছর কয়েক আগে আমি এক রকম আবদার ধ'রেই শ্রীঅরবিন্দকে বলি শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্প পড়তেই হবে। শ্রীঅরবিন্দ তখন অত্যন্ত ব্যস্ত—(শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতি ও মহেশ ছাড়া আর কিছুই বোধহয় তিনি পড়েন নি)—তবু আমার উপরোধে এ-গল্পটি প'ড়ে আমাকে লেখেন : "A wonderful style and a great and perfect creative artist with a profound emotional power." পরে "নিষ্কৃতি" পড়তে পড়তেও আমাকে নানা সময়ে লিখে জানাতেন—ওর সূক্ষ্ম দরদ, নিপুণ দৃষ্টি, বর্ণনাশক্তি, সংযম—আরো কত কি শিল্পসম্পদ প্রেমসম্পদ। সে চিঠিগুলি হাতের কাছে নেই—খুঁজে বের করতেও সময় লাগবে; তাই এপত্রে সেসব উদ্ধৃতি দিতে পারলাম না।

কিন্তু যা বলছিলাম : শরৎচন্দ্র গল্পালাপে কত গভীর সুরই যে ফোটাতেন দুএকটি হাল্কা কথায়। একদিন মনে আছে তাঁর শিবপুরের বাসায় তিনি বলেছিলেন : "অমুক ঔপন্যাসিক তাঁর অমুক চরিত্রকে একেবারে নিখুঁৎ পাষণ্ড ক'রে এঁকেছেন। কিন্তু মানুষকে এরকম নির্জলা মন্দ ক'রে আঁকা উচিত নয় মণ্টু, কাউকেই এভাবে অপমান করতে নেই : সংসারে যেমন নিখুঁৎ দেবতাও নেই, তেম্‌নি নিখুঁৎ শয়তানও নেই।"

আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও যে কথাটা সত্যি—এবিষয়ে সন্দেহ কি? গীতায়ও তাই "সুদুরাচার"-এরও "ক্ষিপ্র-ধর্মাত্মা" হওয়ার কথা আছে।

কিন্তু আমি তাঁর মতামতের আধ্যাত্মিক সত্যাসত্য যাচাই করতে এ-প্রসঙ্গ তুলি নি। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি তাঁর হৃদয়টা স্বভাবতই কত বড় ছিল। হয়ত অনেকে বলবেন: "আহা, ভারি নতুন কথাই বললেন—এ তো যে কেউ তাঁর গল্প উপন্যাস পড়েছে সেই জানে।" না, জানে না। খুব কম লোকেই আন্দাজ করতে পারে কত গভীরভাবে তিনি অপরের ব্যথা বুঝতেন। তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এলে এ জানা সম্ভব হ'ত না। রচনায় তাঁর এ-বেদনার সিকির সিকিও ফোটে নি। তাই গল্প উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি জানা যায় না, তাঁর অনুভবের জীবন্ত বেদনার কথা। কারণ জীবন যে শিল্পকলার চেয়ে ঢের বড়—ছোট আধারে বড় ধরবে কেন? এ সূত্রে আমি জোর দিতে চাইছি তাঁর সেই জীবনেরই বেদনার উপর। কী গভীর বেদনা সে!—মনে আছে একদিন একটা পথের ঘেয়ো কুকুরকে সেই তাঁর আদর ক'রে ডেকে লুচি খাওয়ানো—কুকুর সম্বন্ধে তাঁর গভীর ব্যথার কথা তাঁর গল্পেও মেলে সত্য, কিন্তু চোখের উপর এ-দরদ দেখলে বোঝা যায় যে গল্প থেকে তার গভীরতার তল অনুমান করা যায় না কিছুতেই। এ ঘটনাটা ঘটেছিল মনে হচ্ছে ১৯২৩ সালে দিল্লিতে। যে বছর সেখানে কংগ্রেস হয় সেই বছরে। সালটা আমার ভুল হয়েছে কিন্তু। ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে। দিল্লি থেকে আমরা একসঙ্গে এখানে ওখানে বেড়াই—বৃন্দাবন আগ্রা আরো কোথায় কোথায়। এসময়ে আমরা অনেকদিন ছিলাম একসঙ্গে। কী আনন্দেই যে কাটত দিনগুলি! আর কত যে শিখতাম তাঁর কাছে—রোজই! তাঁর সঙ্গে আরো নানা ভাবে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসাটা ছিল আমার কাছে একটা শিক্ষা, তারও বেশি—দীক্ষা—তাঁর চরণতলে জীবনকে দরদের চোখে দেখার পার্ট নেওয়া। একদিন আমার এক বন্ধু শরৎদার খুব নিন্দা করেন আমার কাছে। আমি চুপ ক'রে থাকি। প্রতিবাদ করি নি এই জন্যে যে প্রতিবাদে সত্য বলতে গেলে তাঁকে ব'লতে হ'ত: "ভাই শরৎবাবুর বড় দিকটা যে তোমার চোখেই পড়ল না; এজন্য দায়িক তাঁর বড় দিকটা নয়, দায়িক তোমারই চোখের দৃষ্টিদৈন্য।"

কিন্তু না, দৈন্য শুধু চোখের নয়—এ দৈন্যের মূলে—সঙ্কীর্ণবুদ্ধির একদেশদর্শিতা। বুদ্ধির ধর্মই যে এই এক-চোখোমি। তাই তো তার দেখা এত অসম্পূর্ণ। কাউকে টুকরো টুকরো ক'রে দেখলে যে তাকে ভুল দেখা হয়—এইটেই সে বোঝে না, বুঝতে চায় না। কেন না সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির স্বভাব—ঔদ্ধত্য, কাজেই সে ভোলে যে সবচেয়ে গভীর দৃষ্টি হ'ল দীনতার দর্শন। শরৎচন্দ্রের ছিল এই দিব্য দৃষ্টি—প্রেমের, দরদের। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতনই প্রেম ও দরদ ছিল তাঁর সহজাত। কিন্তু প্রেম ও দরদকে বুঝতে হ'লে চাই ঐ দুটি বস্তুই—ওদের কোনো বদ্‌লিকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব, মানে যদি কাউকে ঠিক বুঝতে হয়। তাই প্রেমের প্রণালী দিয়ে যে-লোক শরৎচন্দ্রের হৃদয়সিন্ধুর কাছে আসতে চায় নি—ছুঁতে চায় নি তাঁর গভীর প্রেমকে, যে তাঁকে শুধুই দূর থেকে দূরবীণ নিয়ে দেখেছে—সে রাখবে কেমন ক'রে তাঁর প্রেমের বিস্তৃতির খবর? জানবে কেমন ক'রে তাঁর দরদের গভীরতার কথা?

তাছাড়া শরৎচন্দ্রের একটা অভ্যাস ছিল মানুষকে ক্ষ্যাপানো। এসময়ে তিনি ভারি হাল্কামি করতেন—চিঠিপত্রেও! এ-ভঙ্গি হ'ল ফরাসি—প্রকৃতিতে: এর নাম blague: অর্থাৎ কিনা নিপুণভঙ্গিতে রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা এ-ভঙ্গিকে চেনে না তারা স্বতই ওঠে চ'টে—ভাবে কত কী ভুল কথা। এইজন্যেই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এতে আমি দুঃখ পেতাম বরাবরই, কারণ শরৎচন্দ্রকে কেউ গালিগালাজ করলে আমাকে বাজত -(এ বিষয়ে বোধ করি আমি একটু সেকেলে, লয়ালটি বস্তুটিতে আমি বিশ্বাস করি)—কিন্তু শরৎচন্দ্র দারুণ খুসি হ'তেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন।

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি কথা। আমি একবার অনেক খোঁজ ক'রে এক মস্ত উলঙ্গ তিব্বতী যোগীর দেখা পাই কাশীতে। যোগীটি গুপ্ত থাকতেন। অনেক কষ্টে তো তাঁর কাছে পৌঁছই। তিনি হেসে বললেন ভাঙা হিন্দিতে: "পাড়াপড়শিকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে বাপু আমি দারুণ দুশ্চরিত্র—আমি ভগবানের কথ

কী বলব হে?" আমি ভারি রাগ করেছিলাম প্রথমে। কিন্তু সে দীর্ঘ কাহিনী যাহোক শেষটায় তিনি আদর ক'রে কাছে টেনে নিলেন—কী যে চমৎকার—চমৎকার কথা বললেন—আমার ছুটি ভজন গাওয়ার পরে। মনে হ'ল—এ দুই মূর্ত্তি কি একই লোকের! শুনেছি নাকি মহাযোগী বারদীর ব্রহ্মচারীও ভারি উপভোগ করতেন লোককে বুঝিয়ে যে তিনি অতি পাষণ্ডী। শরৎচন্দ্রকে বলতাম: "যাহোক্ সাধুসঙ্গে আছেন বৈ কি—you are in great compauy" শরৎচন্দ্র ধরা দিতে চাইতেন না সহজে।

কিন্তু স্মৃতিকথা শনৈঃ শনৈঃ বড় হ'য়ে যাচ্ছে—তাঁর কথা দু-একটি প্রবন্ধে লিখে তো ফুরোবেও না—কাজেই এ-যাত্রা উপসংহার পর্বে আসি।

আমার এ-প্রবন্ধের বাকী সুরটিতেই আসি ফিরে। বলছিলাম না তাঁর হৃদয়বত্তার কথা? মানুষ হিসেবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে সব চেয়ে টানত তাঁর হাসি ও স্নেহ—অন্তত আমাকে। তাঁর হাসির নানা গল্প লিখব হয়ত কখনো—পরে। আজ শুধু তাঁর হৃদয়ের কথাটাই বলি, আর একটু এম্‌নিই ঘরোয়া ভঙ্গিতে।

শরৎচন্দ্র তাঁর নানা লেখায়ই বার বার বিলাপ করেছেন যে চিঠি লিখতে তিনি পারেন না। কিন্তু তাঁর চিঠির ছত্রে ছত্রে যে-হৃদয়রাগ উজ্জ্বল হয়ে উঠত এ আবেগ-দীন জগতে তার জুড়ি কমই মেলে। নিচে তাঁর দুটি চিঠি উপহার দিই নমুনা হিসেবে:

পরম কল্যাণীয় মণ্টু,

তুমি হয়ত জানো না যে আমি আট নয় মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। লেখা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্যন্ত না। এ-জীবনের ম'ত লেখা পড়া যদি শেষ হয়েই থাকে তো অভিযোগ করব না। মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী—এখনো তাই যেন থাকতে পারি।...

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে আমার চেয়ে কে বড় কে ছোট এ নিয়ে যথার্থ ই আমার মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই। * * * যদি বলতেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ত না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যেই কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়—বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে বসেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এম্‌নি ধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোনো কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।

আমার চিঠি লেখা চিরকালই এলোমেলো হয়, বিশেষত এই পীড়িত দেহে। যদি কোথাও অসংলগ্ন কিছু লিখে ফেলে থাকি কিছু মনে কোরো না। ইতি ৩রা মাঘ ১৩৪২।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় পত্রটি এই:

পরম কল্যাণীয় মণ্টু,

কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে কলকাতার বাড়িতে ফিরেছি।·· তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকাল পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম, বড় আনন্দ হ'ল। একবার সত্যিকার দেখা দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেছি এ জীবনে আর হ'ল না। না-ই হোক্।

তোমাকে যে টাইপ-রাইটারটা পাঠিয়েছি তা যে তোমার পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই।...তোমাকে দিয়ে আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

শ্রীঅরবিন্দের হাতের লেখাটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। এ একটি রত্ন।

শ্রীঅরবিন্দ এত যত্ন ক'রে আমার বইয়ের অনুবাদ দেখে দিচ্ছেন···যাঁরা যথার্থ ই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্যে না ক'রে থাকতে পারেন না তাঁরা। হয় করেন না—কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানেন না।...

কিন্তু আমি তাঁর মতামতের আধ্যাত্মিক সত্যাসত্য যাচাই করতে এ-প্রসঙ্গ তুলি নি। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি তাঁর হৃদয়টা স্বভাবতই কত বড় ছিল। হয়ত অনেকে বলবেন: "আহা, ভারি নতুন কথাই বললেন—এ তো যে কেউ তাঁর গল্প উপন্যাস পড়েছে সেই জানে।" না, জানে না। খুব কম লোকেই আন্দাজ করতে পারে কত গভীরভাবে তিনি অপরের ব্যথা বুঝতেন। তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এলে এ জানা সম্ভব হ'ত না। রচনায় তাঁর এ-বেদনার সিকির সিকিও ফোটে নি। তাই গল্প উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি জানা যায় না, তাঁর অনুভবের জীবন্ত বেদনার কথা। কারণ জীবন যে শিল্পকলার চেয়ে ঢের বড়—ছোট আধারে বড় ধরবে কেন? এ সূত্রে আমি জোর দিতে চাইছি তাঁর সেই জীবনেরই বেদনার উপর। কী গভীর বেদনা সে!—মনে আছে একদিন একটা পথের ঘেয়ো কুকুরকে সেই তাঁর আদর ক'রে ডেকে লুচি খাওয়ানো—কুকুর সম্বন্ধে তাঁর গভীর ব্যথার কথা তাঁর গল্পেও মেলে সত্য, কিন্তু চোখের উপর এ-দরদ দেখলে বোঝা যায় যে গল্প থেকে তার গভীরতার তল অনুমান করা যায় না কিছুতেই। এ ঘটনাটা ঘটেছিল মনে হচ্ছে ১৯২৩ সালে দিল্লিতে। যে বছর সেখানে কংগ্রেস হয় সেই বছরে। সালটা আমার ভুল হয়েছে কিন্তু। ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে। দিল্লি থেকে আমরা একসঙ্গে এখানে ওখানে বেড়াই—বৃন্দাবন আগ্রা আরো কোথায় কোথায়। এসময়ে আমরা অনেকদিন ছিলাম একসঙ্গে। কী আনন্দেই যে কাটত দিনগুলি! আর কত যে শিখতাম তাঁর কাছে—রোজই! তাঁর সঙ্গে আরো নানা ভাবে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসাটা ছিল আমার কাছে একটা শিক্ষা, তারও বেশি—দীক্ষা—তাঁর চরণতলে জীবনকে দরদের চোখে দেখার পার্ট নেওয়া। একদিন আমার এক বন্ধু শরৎদার খুব নিন্দা করেন আমার কাছে। আমি চুপ ক'রে থাকি। প্রতিবাদ করি নি এই জন্যে যে প্রতিবাদে সত্য বলতে গেলে তাঁকে ব'লতে হ'ত: "ভাই শরৎবাবুর বড় দিকটা যে তোমার চোখেই পড়ল না; এজন্য দায়িক তাঁর বড় দিকটা নয়, দায়িক তোমারই চোখের দৃষ্টিদৈন্য।"

কিন্তু না, দৈন্য শুধু চোখের নয়—এ দৈন্যের মূলে—সঙ্কীর্ণবুদ্ধির একদেশদর্শিতা। বুদ্ধির ধর্মই যে এই এক-চোখোমি। তাই তো তার দেখা এত অসম্পূর্ণ। কাউকে টুকরো টুকরো ক'রে দেখলে যে তাকে ভুল দেখা হয়—এইটেই সে বোঝে না, বুঝতে চায় না। কেন না সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির স্বভাব—ঔদ্ধত্য, কাজেই সে ভোলে যে সবচেয়ে গভীর দৃষ্টি হ'ল দীনতার দর্শন। শরৎচন্দ্রের ছিল এই দিব্য দৃষ্টি—প্রেমের, দরদের। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতনই প্রেম ও দরদ ছিল তাঁর সহজাত। কিন্তু প্রেম ও দরদকে বুঝতে হ'লে চাই ঐ দুটি বস্তুই—ওদের কোনো বদ্‌লিকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব, মানে যদি কাউকে ঠিক বুঝতে হয়। তাই প্রেমের প্রণালী দিয়ে যে-লোক শরৎচন্দ্রের হৃদয়সিন্ধুর কাছে আসতে চায় নি—ছুঁতে চায় নি তাঁর গভীর প্রেমকে, যে তাঁকে শুধুই দূর থেকে দূরবীণ নিয়ে দেখেছে—সে রাখবে কেমন ক'রে তাঁর প্রেমের বিস্তৃতির খবর? জানবে কেমন ক'রে তাঁর দরদের গভীরতার কথা?

তাছাড়া শরৎচন্দ্রের একটা অভ্যাস ছিল মানুষকে ক্ষ্যাপানো। এসময়ে তিনি ভারি হাস্কামি করতেন—চিঠিপত্রেও! এ-ভঙ্গি হ'ল ফরাসি—প্রকৃতিতে: এর নাম blague: অর্থাৎ কিনা নিপুণভঙ্গিতে রটানো—যা আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যারা এ-ভঙ্গিকে চেনে না তারা স্বতই ওঠে চ'টে—ভাবে কত কী ভুল কথা। এইজন্যেই তর্কাতর্কির পরে অনেককে তাঁর সম্বন্ধে খুব খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরতে আমি দেখেছি স্বচক্ষে। এতে আমি দুঃখ পেতাম বরাবরই, কারণ শরৎচন্দ্রকে কেউ গালিগালাজ করলে আমাকে বাজত–(এ বিষয়ে বোধ করি আমি একটু সেকেলে, লয়ালটি বস্তুটিতে আমি বিশ্বাস করি)—কিন্তু শরৎচন্দ্র দারুণ খুসি হ'তেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি সময়ে সময়ে দারুণ তর্ক করতাম, কিন্তু তিনি শুধু হাসতেন।

এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি কথা। আমি একবার অনেক খোঁজ ক'রে এক মস্ত উলঙ্গ তিস্বতী যোগীর দেখা পাই কাশীতে। যোগীটি গুপ্ত থাকতেন। অনেক কষ্টে তো তাঁর কাছে পৌছই। তিনি হেসে বললেন ভাঙা হিন্দিতে: "পাড়াপড়শিকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে বাপু আমি দারুণ দুশ্চরিত্র—আমি ভগবানের কথা

কী বলব হে ?" আমি ভারি রাগ করেছিলাম প্রথমে। কিন্তু সে দীর্ঘ কাহিনী যাহোক শেষটায় তিনি আদর ক'রে কাছে টেনে নিলেন—কী যে চমৎকার—চমৎকার কথা বললেন—আমার দুটি ভজন গাওয়ার পরে। মনে হ'ল—এ দুই মূর্ত্তি কি একই লোকের ! শুনেছি নাকি মহাযোগী বারদীর ব্রহ্মচারীও ভারি উপভোগ করতেন লোককে বুঝিয়ে যে তিনি অতি পাষণ্ডী। শরৎচন্দ্রকে বলতাম : "যাহোক্ সাধুসঙ্গে আছেন বৈ কি—you are in great compauy" শরৎচন্দ্র ধরা দিতে চাইতেন না সহজে।

কিন্তু স্মৃতিকথা শনৈঃ শনৈঃ বড় হ'য়ে যাচ্ছে—তাঁর কথা দু-একটি প্রবন্ধে লিখে তো ফুরোবেও না—কাজেই এ-যাত্রা উপসংহার পর্বে আসি।

আমার এ-প্রবন্ধের বাকী সুরটিতেই আসি ফিরে। বলছিলাম না তাঁর হৃদয়বত্তার কথা ? মানুষ হিসেবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সংস্পর্শে এলে সব চেয়ে টানত তাঁর হাসি ও স্নেহ—অন্তত আমাকে। তাঁর হাসির নানা গল্প লিখব হয়ত কখনো—পরে। আজ শুধু তাঁর হৃদয়ের কথাটাই বলি, আর একটু এম্‌নিই ঘরোয়া ভঙ্গিতে।

শরৎচন্দ্র তাঁর নানা লেখায়ই বার বার বিলাপ করেছেন যে চিঠি লিখতে তিনি পারেন না। কিন্তু তাঁর চিঠির ছত্রে ছত্রে যে-হৃদয়রাগ উজ্জ্বল হয়ে উঠত এ আবেগ-দীন জগতে তার জুড়ি কমই মেলে। নিচে তাঁর দুটি চিঠি উপহার দিই নমুনা হিসেবে :

পরম কল্যাণীয় মণ্টু,

তুমি হয়ত জানো না যে আমি আট নয় মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। লেখা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্যন্ত না। এ-জীবনের ম'ত লেখা পড়া যদি শেষ হয়েই থাকে তো অভিযোগ করব না। মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী—এখনো তাই যেন থাকতে পারি।···

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে আমার চেয়ে কে বড় কে ছোট এ নিয়ে যথার্থ ই আমার মনে কোনো আক্ষেপ, কোনো উদ্বেগ নেই। * * * যদি বলতেন আমার কোনো বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ত না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করছি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যেই কোনো আক্রমণেরই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়—বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল করে বসেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এম্‌নি ধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোনো কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।

আমার চিঠি লেখা চিরকালই এলোমেলো হয়, বিশেষত এই পীড়িত দেহে। যদি কোথাও অসংলগ্ন কিছু লিখে ফেলে থাকি কিছু মনে কোরো না। ইতি ৩রা মাঘ ১৩৪২।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় পত্রটি এই :

পরম কল্যাণীয় মণ্টু,

কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে কলকাতার বাড়িতে ফিরেছি।·· তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকাল পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম, বড় আনন্দ হ'ল। একবার সত্যিকার দেখা দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেছি এ জীবনে আর হ'ল না। না-ই হোক্।

তোমাকে যে টাইপ-রাইটারটা পাঠিয়েছি তা যে তোমার পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই।···তোমাকে দিয়ে আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

শ্রীঅরবিন্দের হাতের লেখাটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। এ একটি রত্ন।

শ্রীঅরবিন্দ এত যত্ন ক'রে আমার বইয়ের অনুবাদ দেখে দিচ্ছেন···যাঁরা যথার্থ ই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্যে না ক'রে থাকতে পারেন না তাঁরা। হয় করেন না—কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানেন না।···

তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ মণ্টু। এর বেশি আর কি বলব? চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল, কেমন যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারি নে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হ'ল না—সে আমার অক্ষমতার জন্যে, অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়—এ বিশ্বাস কোরো। ইতি ৩রা মাঘ ১৩৪১

শুভার্থী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ-পত্রটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ মুগ্ধ হন ও আমাকে লেখেন পর দিনই (আমার একটা তর্কের উত্তরে) :—

"Sarat Chatterjee's letter is not a glory of the vital at all, even though it may have come through the vital—but not from it: it is psychic throughout, in every sentence. If I were asked how does the psychic work in the human being, I could very well point to the letter and say "like that." The ordinary vital is another guess thing! The psychic is the soul, the divine spark animating matter and life and mind and as it grows it takes form and expresses itself through these three—touching them to beauty and fineness—it worked even before humanity in the lower creation leading it up towards the hnman, in humanity it works more freely though still under a mass of ignorance and weakness and coarseness and hardness leading it up towards the divine. In Yoga it becomes conscious of its aim and turns inward to the Divine. It sees behind and above it—that is the difference.

Of course all prayer is not heard—the world would be a still more disastrous affair than it is, if everybody's prayers were heard, however sincere. Even the Godward prayer is not always heard—at once, even as faith is not always justified at once. Both prayer and faith are powers towards realisation which have been given to man to aid him in his struggle—without them, without aspiration and will and faith (for aspiration is a prayer) it would be difficult for him to get anywhere. But all these things are merely means for setting the Divine Force in action —and it sometimes takes long, very long even, before the forces come into action or at least before they are seen to be in action or beat their result. The ecstasist is not altogether wrong even when he overstates his case. Even the overstatements sometimes help to convince the Cosmic Power."

ভাবার্থ: শরৎচন্দ্রের চিঠির মহিমা ওর প্রাণবন্ততায় নয়;—কারণ যদিও প্রাণের প্রণালীর মধ্যে দিয়েই ওর ঢেউ উঠেছে, কিন্তু প্রাণ সে-ঢেউয়ের উৎস নয়। এ-পত্রটির প্রতি ছত্র প্রতি আঁখরে অন্তরাত্মার আলো। মানুষের মধ্যে এই অন্তরাত্মা কি ভাবে সক্রিয় হয় একথা যদি আমাকে কেউ শুধায়, আমি অকুণ্ঠে বলতে পারি: "ঐ চিঠির মতন"। অন্তরাত্মাই হ'ল আমাদের অন্তরপুরুষ, দিব্যজ্যোতি: সে-ই বস্তুজগত, প্রাণজগত ও মনোজগতকে তোলে জীবন্ত ক'রে। যতই এর বিকাশ হয় ততই ও রূপোজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে সুকুমার মূর্ত্তি ধারণ করে। মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের জীবজগতেও ওর শক্তি নিরন্তরই সক্রিয় ছিল, কেবল মানুষের মধ্যেও ঢের বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে—করে তাকে দেবত্বের অভিসারী—যদিও বহু অজ্ঞান, দুর্ব্বলতা, স্থূলতা ও কঠিনতার বোঝা ঠেলে তবে। যোগের সঙ্গে ওর সাধারণ ক্রিয়াভঙ্গির কেবল এই তফাৎ যে যোগে ও নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ চেতনা লাভ করে—দেখতে পায় পিছনেও উর্ধ্বেও।…তাই দিব্যশক্তির সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসীও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়—যখন সে নিজের অনুভব সম্বন্ধে অত্যুক্তি ক'রে বসে। কারণ এসব অতিশয়োক্তিও অনেক সময়ে জৈবলীলার প্রত্যয়বুদ্ধিকেই দৃঢ় করে।

আজ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসী—এক্সটেসিস্ট—হ'তে আমার বাধে নি আরো গুরুদেবের ভরসা পেয়ে। আর কিছু না, এ সূত্রে শুধু এইটুকুই আমার বিশেষ ক'রে বলবার কথা যে তাঁর নিঃস্বার্থ স্নেহের স্বাদ যেই পেয়েছে সেই মানবে—যে সে অভিজ্ঞতা থেকে নিঃস্বার্থ স্নেহ কাকে বলে সে সম্বন্ধে কম আলো পায় নি। ম্যাথিউ আর্নল্ড্ বলেছেন না যে ভালো কাব্যই আমাদের মনে নিকষ হ'য়ে বিরাজ করে; অন্য কাব্য ভালো কি না সে-যাচাই করি আমরা তারই আনন্দের

সঙ্গে তুলনা ক'রে! শরৎচন্দ্রের ও অতুলপ্রসাদের ভালোবাসা ছিল এম্‌নিই কষ্টিপাথর। জীবনে এমন দান বড় বেশি মেলে না। অথচ যখন মেলে কত সহজেই মেলে—কোনো যোগ্যতারই দরকার হয় না। সুলভ হওয়াই যে দুর্লভের ধর্ম।

আর একটা কথা শুধু—আমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের শেষ দেখার সংক্ষেপে। গত বছর (১৯৩৭) জুলাই মাসে—কলকাতায় তাঁর বাড়িতে। রাত তখন প্রায় এগারটা। কত কথাই হ'ল। সঙ্গে ছিল কেবল আমার ভাই শচীন।

শেষে বললেন: "তুমি আর কতদিন থাকবে কলকাতায়?"

শচীন বলল: "পনরই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন—তাঁর দর্শন মেলে জানেন তো? তাই মণ্টুদা আগষ্টের এগারই বারই নাগাদ রওনা হবে ভাবছে।"

শরৎচন্দ্র একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "তাহ'লে তো আর বেশি দিন নেই।"

ফের একটু থেমে: "তোমার সঙ্গে এবার কিছুই কথা হ'ল না মণ্টু। পরে আর হবে কি না তা-ও জানি না। কিন্তু তোমাকে আর থাকতেও তো বলতে পারি নে—তাঁর জন্মদিনে তুমি অন্য কোথাও কাটাবেই বা কী ক'রে?"

এম্‌নি ছোট্ট কথা···কিন্তু মনটার মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে···বললাম হেসেই: "কিন্তু কলকাতায় তো প্রায় সবাই বলে কী হবে এসব সেকেলে মনোভাবে?"

—"না মণ্টু," বললেন শরৎচন্দ্র, "আমি মন্ত্র তন্ত্র জপ তপ বুঝি নে। কিন্তু এ বুঝি ও মানি যে পাওয়ায়-মতন কিছুই পাওয়া যায় না প্রণাম করতে না শিখলে।"

একটা উর্দু গজলের ধুয়ো গুণগুণিয়ে ওঠে:

"তোমায় প্রণাম করতে হৃদয় চায়।
মরণকে জীবন দেব না—দেব তোমার পায়।
বৈরাগী এ-প্রাণ শুধু ঐ প্রেমের দুরাশায়॥"

ঢং ঢং ক'রে বারটা বাজল।
প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম।

ইতি—স্নেহের মণ্টু।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি

সৃষ্টির প্রারম্ভে যবে অন্ধকার যুগে—
প্রলয় তমিস্রাগর্ভে জন্ম নিল ধরা
আঁধার সে নব-গ্রহে এনে দিল আলো
নবীন সূর্য্যের দীপ্তি তরুণ চন্দ্রমা!
রবিকরে উদ্ভাসিল বিচিত্র জীবন;
নিখিলের নরনারী লভিল চেতনা;
বিদারি তিমির রাত্রি আবির্ভূত সোম,
পূর্ণ হ'ল চন্দ্রালোকে আনন্দ স্রষ্টার।

কোটীকল্প গেছে পরে কৃচ্ছ্র তপস্যায়,
গ্রন্থ হ'ল বিরচিত, সুললিত ভাষা,
নগর উঠিল জাগি অরণ্যের বুকে
ভাসিল বাণিজ্যতরী অনন্ত সাগরে।
জ্ঞান অন্বেষণে ফিরি লোক লোকান্তরে
কবির দৃষ্টিতে লভি' অভিজ্ঞ দর্শন
সাগরসঙ্গমকূলে গাঙ্গেয় এ ভূমি
নব নব সভ্যতারে লয়েছিল বরি'।

যুগে যুগে প্রতিভার চন্দ্রসূর্য্য তাই
গৌড়ীয় গগনপটে হয়েছে উদয়;
তরঙ্গ তুলেছে মর্ম্মে, জ্বেলেছে প্রদীপ
প্রদোষ করেছে ফুল্ল, উষারে সুন্দর!
শতশত শতাব্দীর অন্তরালে আজও
জাগে সেই যুগান্তের অনির্ব্বাণ জ্যোতি।
তারা গেছে চলি, তবু, আলোকে তাদের
হয়ে আছে সমুজ্জ্বল ভাগীরথী তীর!

কালস্রোত চলিয়াছে অবিশ্রান্ত বহি'—
শাশ্বত নহে ত' কিছু অচঞ্চল ভুবনে,
প্রভাত হয়েছে সন্ধ্যা, নেমেছে শর্ব্বরী
আবার এসেছে দিবা দিব্য বিভা ল'য়ে,
দ্বাদশ-আদিত্য হেন অসামান্য দ্যুতি
সমুদ্ভাত নব রবি আশ্চর্য্য প্রতিভা;
শতচন্দ্রে লজ্জাদিয়ে শরতের চাঁদ
দেখা দিল অকস্মাৎ চন্দ্রহীন ব্যোমে!

ষোড়শকলায় পূর্ণ পূর্ণিমার শশী
বিচ্ছুরিল অপরূপ শ্রীকান্ত কিরণ ;
অনবদ্য সে আলোকে অন্তরলোকের
লভিল সন্ধান যেন জন্মান্ধ মানব ;
অজ্ঞাত যা এতকাল ছিল সঙ্গোপনে
নিভৃত মনের কোণে কুজ্ঝটিকাময়,
ভেদিয়া সে যবনিকা সরায়ে গুণ্ঠন
অদৃশ্যে করিল চন্দ্র পরিদৃশ্যমান !

রহস্যপুরীর রুদ্ধ দক্ষিণের দ্বার
খুলিল যে শক্তিধর, হারাইয়া তারে
অসহায় রসলোক ভাসে অশ্রুজলে
চন্দ্রহারা কোটাচিত্ত ক্রন্দন মুখর।
আছে ত' আকাশে কত সংখ্যাতীত তারা—
একচন্দ্র বিনা তবু সকলি আঁধার !
কে জানে সে কবে পুন নবচন্দ্রোদয়ে
ভাতিবে ত্রিবেণী-তীর্থে ত্রিদিব-জ্যোছনা !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

—

শরৎচন্দ্র

সেদিন ভাবিয়াছিনু মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত আলোকে—
রাত্রির স্বতন্ত্র সৃষ্টি কোন ভাগ্যে হেরিব এ চোখে !
গুপ্ত যাহা, সুপ্ত যাহা দিনান্তের অজ্ঞাত সীমায়,
কোন্ জ্যোতিষ্কের দীপ্তি রুদ্ধ নেত্রে চিনাইবে তায়,—
উদিল শরৎচন্দ্র—অনবদ্য অনিন্দ্য সুন্দর,
সৃজনের ভিন্ন মূর্ত্তি সে আলোকে হইল ভাস্বর ;
শরতের পূর্ণচন্দ্র—তমসার ভালে দীপ্ত টীকা
অপরূপ সৃষ্টি কাব্য রচিল সে জ্যোতির্ম্ময়ী লিখা।

হাসিয়া উঠিল পৃথ্বী লয়ে তার কানন কান্তার
ভূধর প্রান্তর শূন্য লভি' সেই জ্যোৎস্না-পারাবার ;
উচ্ছ্বসি' উঠিল সিন্ধু, গোষ্পদে অপূর্ব্ব শোভা ফুটে,
সৈকতের বালুস্তূপে তুষারের দীপ্তি ঝলি' উঠে ;
গৃহস্থের গৃহে-গৃহে, দরিদ্রের কুটীর প্রাঙ্গণে
পড়ি সেই চন্দ্রালোক নবসৃষ্টি রচিল ভুবনে ;
শ্মশানের বহ্নিশিখা—সে আলোকে সেও মূর্ত্তি ধরি'
ভীষণ-সুন্দররূপে চুপে চুপে চিত্ত নিল হরি' !

তুমি দেখায়েছ কবি, দিবালোকে হেরিনি যে পথ,
তুমি করিয়াছ সৃষ্টি নবরূপে অজানা জগৎ,
তুমি বুঝায়েছ লোকে—মন ছাড়া বড় কিছু নাই,
ছোট বড় পাপ পুণ্য চিত্ততীর্থে মিলিবে সবাই ;
প্রেম যদি সত্য হয়, তুমি তারে চিনিয়াছ ঠিক—
মানবের যাত্রাপথে সেই তার মর্ম্মের মাণিক।
যে দেহ মাটীতে গড়া, থাক্ ত্রুটী, সেও নয় হেয়,
ক্ষণিক স্খলন দোষে পতিতাও নহে অপাংক্তেয়।

মানুষে মানুষ বলি' মমতার নাহি তব পার,
হে দরদী, চক্ষে তব অশ্রু তাই শুকা'ল না আর ;
নির্য্যাতিত বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত যেথায় যে-বা আছে,
একান্ত আত্মীয়রূপে তখনি দাঁড়ালে তার কাছে
স্নেহের উদারধর্ম্মে শুনাইয়া আশ্বাসের বাণী,
অপূর্ব্ব লেখনী তাই চিত্রে চিত্রে সত্য বলি' মানি।
হে মরমী বাঙ্গালীর, বাঙ্গালার মর্ম্মের প্রতীক,
তোমার আদর্শে তাই বঙ্গ তার সঙ্গী চিনে' নিক্।

চন্দ্র আজি অস্তমিত, অন্ধকার ঘনাইয়া আসে,
অন্ধ নিশীথিনীসম বঙ্গবাণী শ্বসিছে হতাশে,
হারায়ে কালের গর্ভে দরিদ্রের অমূল্য রতন
অন্ধ নয়নের দৃষ্টি, স্নেহের সাগর-ছেঁচা ধন।
সাত কোটি নরনারী সেই সঙ্গে করে হায়, হায় !
আঁধারের পূর্ণচন্দ্র, ভাগ্যদোষে আজি সে কোথায় ?
বীণাহীনা সরস্বতী সে আঁধারে হয়ে দিশাহারা—
অহল্যা পাষাণী হ'ল, গঙ্গাবক্ষে জাগিল সাহারা !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

—

মৃত্যু নহে, দেশান্তর—কেন তবে শোক ?
মহামানবেরে যদি চায় দেবলোক,
কিসের বেদনা তাহে ? প্রবোধের তরে,
কতবার এই কথা ভাবিনু অন্তরে ;
আঁখিজল তবু নাহি মানিছে নিষেধ,
এ যে হিয়া—খালি-করা অসহ বিচ্ছেদ ;
তুমি গেলে, আমাদেরে রাখি' বাঁচাইয়া
বাণীর অমৃত তব স্নেহে পিয়াইয়া ।

গিরিজাকুমার বসু

—

এই দুনিয়ার দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ সারা,
মানবত্বের পূর্ণতা লভি' ভাঙিয়া দেহের কারা
আপন রাজ্য দেবলোকে তুমি চলিলে মহোল্লাসে ।
অশ্রুসিক্ত আসনে আমরা দাঁড়ায়ে পথের পাশে
ব্যথিত বক্ষ ধরি'—
ওগো ভারতীর স্নেহের দুলাল, তোমারে প্রণাম করি ।

প্রসাদ বসু

—

যুগসাহিত্য করেছ রচনা চিরতারুণ্য হৃদয়ে বহি,
এনেছ সমাজে বিপ্লব তুমি নির্য্যাতনের যাতনা সহি ।
শিল্পি ! তোমার জীবন-কাব্য গড়িয়া উঠেছে ঝঞ্ঝা বুকে,
জাতির শ্মশানে করেছ সাধনা, কেঁদেছ দেশের দৈন্যদুখে ।

বিশ্বের যারা দলিত মথিত, অপমান সহি কহেনি কথা,
কণ্ঠে তাদের দিয়ে গেছ ভাষা অনুভব করি প্রাণের ব্যথা ।
তাদের নিত্য জীবনযাত্রা কত যে করুণ, অশ্রুমাখা—
সোনার লিপির তুলিতেতোমারনিখিলেরপটেমধুর আঁকা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শরৎচন্দ্র সার্থক নাম
সাহিত্যেরই নীল আকাশে
রইল চির ছড়িয়ে কিরণ
দীপ্তমধুর রসোল্লাসে ।
তোমার তরে সারাজীবন
কোরব স্মৃতির পুণ্যারতি
চির অমর বন্ধু মোদের
রইল তোমার প্রেমের জ্যোতি ॥

শ্রীমতী শোভা দেবী

—

মহামানবের বিদায়ের ক্ষণে
কাঁদিওনা ওগো কেহ
আছে তাঁর দান, রেখে গেছে প্রাণ
লীন শুধু মাটি দেহ ।
মরণ জয়ী জীবন বারতা
শুনাল যে পৃথিবীরে
তাঁর লয় নাই, ধরার আলয়ে
আসিবে সে পুনঃ ফিরে ।

দক্ষিণা বসু

—

অমর ! অজেয়—বাণীজগতের তারা !
প্রয়াণে তোমার বঙ্গজননী নয়নের মণিহারা ।
এই অশ্রু অন্ধ পথে
জ্বাল জগৎ-মনের রথে
প্রিয়, অমৃত, চিরনব তব অশোক আলোর ধারা !
বঙ্গের তুমি, তুমি ভুবনের শরতের
শততারা !

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

—

রবির প্রসাদ মোরা—রবি হতে আমাদের প্রাণ
মোদের অন্তর মথি' জন্ম তব ; তোমার উত্থান
আমাদের পঙ্ক হতে—তুমি আমাদের কাছাকাছি ;
রবিরে মোদের চাই, তোমারে আমরা ভালোবাসি ।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

রাজধানী নহে, দূর অজ্ঞাত নদীর তট,
নির্জ্জন প্রভাত,
নিঃশব্দ গ্রামের পথ মুখরিত করি, শেষে
করে অকস্মাৎ
কোথায় শ্রীকান্ত যায় অনাদৃত জীবনের
স্বপ্নজাল টুটি,
সুরু করে গৃহধর্ম্ম, দেশ হ'তে দেশান্তরে
সিন্ধুপারে উঠি,
সে কথা জানিত কারা ? সহসা ভাসিল সবে
নবভাব স্রোতে !
যে পথে চলেনি কেহ, সে পথের পান্থ সে-ই
এলো কোথা হ'তে ?
সহজে বিজয়ী বীর, অনায়াসলব্ধ যশ
ফেলি হেলাভরে,
শতাব্দীর অশ্রুপাত দিয়ে গেল জননীরে
সকরুণ করে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

—

ব্যথার পূজারী তোমার অর্ঘ্যফুলে
দেবতার হল নবতন প্রসাধন
দুয়ারে তোমার দেবতা এলেন নিজে
দু'বাহু বাড়ায়ে দিলেন আলিঙ্গন।

পৃথিবীরে তুমি বড় ভালবেসেছিলে
বিদায়-বেলায় বাজিল কি প্রাণে ব্যথা
প্রাণের গভীরে মমতা-করুণ বাণী
নয়নের জলে ফুটিল না তাই কথা।

চিরবিদায়ের হতাশা গুমরি মরে
ক্রন্দসী প্রিয়া-ললাটে হানিছে কর,
বৈতরণীর পরপার হতে আসে
চির পরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর !

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

—

তুমি ছিলে সর্ব্বত্যাগী গৃহহারা উদাসী পথিক,
শুধু বাণী চিন্তময়ী স্নেহডোরে বাঁধিল তোমায় ;
গৃহখানি তাই প্রিয় প্রাণলোকে রচিলে সবার,
সে গৃহের দীপশিখা নিভে গেল চকিত ঝঞ্ঝায়।

অর্চ্চনা হয়েছে শেষ, গন্ধ তার মিলাবে না কভু ;
তুমি কবি, অন্তরের প্রিয়তম মরমী বান্ধব।
দেহাতীত দেবলোকে—অন্তরের অন্তঃপুরে বসি',
অশ্রু অর্ঘ্য লহ সখা, তর্পণের ভাষাহীন স্তব।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

—

আমার একান্ত কাছে আমার জানার পরিসরে
যে-হাসি বিলীন হলো, যে-ব্যথা কাঁদিয়া গেল ঝরি,
তাহাদের পরিচয় নিয়েছি কি কভু ক্ষণতরে ?
তারা কি এসেছে ভুলে আমার মরম-পথ ধরি ?

ছিল যে তাদের সাথে তোমারি অন্তর-বিনিময়
তাই তুমি তাহাদের কলকথা শুনেছিলে কানে ;
তাদের বিচিত্র গাথা রচি গেছ অমর অক্ষয়,
তাই নিয়ে মরলোক আপনারে ধন্য সদা মানে।

যেখানে পঙ্কের ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসে রুচি,
যেখানে চলিতে গেলে পদে পদে জড়ায় চরণ,
হে মরমী ! গেছ সেথা ; স্পর্শে তব হলো সব শুচি ;
মধু লাগি করিয়াছ মানবের হৃদয় মন্থন।

যারে কেহ চাহেনাকো, ছোট যাগা—শুধু অবহেলা,
তুমি একা দেখেছিলে তারো বুকে মাণিক্যের খেলা।

শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী

—

রবি অস্তাচল গামী ;
আঁধার আসিছে নামি ;
—ছিনু তাই সদা শঙ্কাতুর।
তবু এ ভরসা প্রাণে
ছিল দিবা অবসানে
জ্যোৎস্নায় হবে অমা দূর।

সম্মুখে রহিল পড়ি
অন্তহীন বিভাবরী ;
হেথা হোথা দু একটি তারা,
গেল আলো, গেল আশা,
বেদনা হারাল ভাষা—
অনুরাগ হ'ল বাণী হারা।

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

শরৎচন্দ্র অস্ত গেল গো
চন্দ্র আসিবে কত
এ হেন চন্দ্র উদিবে কি আর
যে চাঁদ হইল গত ?
অখ্যাত আর অজ্ঞাত কোন
আকাশ হইতে উঠি
মহিমোজ্জল কিরণে সবার
পরাণ লইল লুটি।
কত বেদনার জঞ্জাল তার
বক্ষে বরণ করি
স্নিগ্ধহাস্যে উজলিয়া গেল
ধরণীরে পরিহরি!
পৃথ্বী যাদের কহিল দুষ্টা
তাদের বেদনা জানি
পৃথ্বীনাথের চরণে জানাল
তাদের মর্ম্মবাণী!
রবির প্রতিভা পূর্ণ থাকিতে
শরৎচন্দ্র আসি
নিখিল জনারে মুগ্ধ করিল
করুণা কাতর হাসি!
চরণে তোমার কোটি প্রণিপাত
ত্রিকাল বিজয়ী বীর!
তোমার পুণ্য স্মৃতির চরণে
লুণ্ঠিত মম শির!

মহারাজা বাহাদুর শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিকে শোকসভা ও স্মৃতিসভার সাড়ম্বর সমারোহে মনকে সান্ত্বনার পরিবর্তে যেন বেদনাই দিচ্ছে। এ' যেন তাঁর চলে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে নিজেদেরই প্রচার করা। বিশেষ করে যাঁরা তাঁর সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য পেয়ে তাঁর সংশ্রবে ছিলেন, তাঁরাও যখন তাঁর মহাযাত্রার সপ্তাহকাল অতিক্রান্ত না হতেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধপাঠ ও বড় বড় কবিতা লিখে জনসভায় উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন মন সত্যসত্যই দুঃখে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লো। স্বর্গগত আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদনের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারও উপযুক্ত স্থান কাল আছে মনে হয়।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলবার লিখবার সমস্ত ভাবী কালত' সম্মুখে পড়ে রয়েছে। আজকের দিনে আমার বারে বারে কেবলমাত্র এই একটি কথাই মনকে নিরতিশয় বেদনার্ত করে তুলেচে যে, তিনি সত্যই চিরদিনের মত আমাদের মধ্য হতে চলে গিয়েছেন। আর কখনও কোনও দিনই ফিরে আসবেন না। সুখে দুঃখে, আনন্দে উৎসবে, আপদে বিপদে তাঁর অকৃত্রিম আত্মীয়তা আর পাওয়া যাবেনা।

সেই খামখেয়ালী আত্মভোলা এলোমেলো মানুষটির মধ্যে অতিশয় কোমল এবং অত্যন্ত সেন্টিমেণ্টাল্ একটি অন্তর ছিল, যা' সহজে বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশিত হতনা; বরং শুষ্কতার আবরণে সংগুপ্ত থাকত। যতখানি তিনি গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন, ততখানিই ছিল তাঁর ঈশ্বর সম্বন্ধে মুখে উপেক্ষা। "আমি তো একটি মহা নাস্তিক" এ'কথা তাঁর মুখে বহুবার শুনলেও যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা জানতেন এই মৌখিক কথার মূল্য কতটুকু ছিল তাঁর জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি তাঁর সাহিত্যগুরু বলে মনে মনে পূজা করতেন, কিন্তু সেও তাঁর ঐ নাস্তিকতার আবরণে আবৃত গভীর আস্তিক্য বুদ্ধির মতই ছিল একান্ত সঙ্গোপন। যাঁদের কাছে মন খুলে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাঁরা জানেন, কী নিবিড়তম শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি।

তিনি বলতেন—"বাংলা সাহিত্য বলতে আর অন্য কিছু

আছে কি ? বাংলা পড়তে হলে একমাত্র রবিবাবুই তো সম্বল।" বহুবার তাঁকে দুঃখ করে বলতে শুনেচি—"বাংলা দেশে প্রকৃত রসিক সাহিত্য-সমজদার এখনও বেশী জন্মে নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সম্যক রস গ্রহণ করতে পারে এমন সমজদার শিক্ষিত লোকের মধ্যেও কম।

অধিকাংশ লোকই দেখি বুঝুক না বুঝুক ফ্যাসানের খাতিরে বুঝদারের ভান করে। কিন্তু চেপে ধরলে আবার তারাই দেখি রবীন্দ্র সাহিত্যের দুর্বোধ্যতার অপবাদ দেয় সবচেয়ে বেশি। এদের সাথে একটু বিপরীত সুরে কথা কয়ে দেখেচি এরা প্রাণ খুলে রবীন্দ্রনাথের নিন্দা ও ত্রুটীর তালিকা দিতে সুরু করে দেয় এবং আমাকেও ওদেরই দলের একজন ঠাউরে নিয়ে খুসি হয়ে ওঠে। ঐ সকল লোকরাই যখন আমার রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমারই সামনে আরম্ভ করে, তখন হাসি পায় দুঃখও হয়। আমি অনেক লোকের পরেই এই সূত্রে শ্রদ্ধা হারিয়েচি। আমার এ পরীক্ষায় দু'চারজনকে মাত্র উত্তীর্ণ হতে দেখেচি।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাই শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্থ ছিল ; "বলাকা" ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাব্য। 'বলাকা'র প্রত্যেকটি কবিতা তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন; স্মরণ শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ তীক্ষ্ণ!—কোনওখানে আটকাত না বা ভুল হত না। তাঁর সাথে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনায় যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। বহু দীর্ঘ সন্ধ্যা রাত্রিতে পরিণত হয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেছে আমাদের কাব্য সাহিত্য আলোচনায়।

কতবার তিনি হেসে বলেচেন—সংসারে খাঁটা ভক্ত মেলা ভার রাধু! রবিবাবুর সামনে যারা নিজেদের পরম ভক্ত বলে প্রমাণ করে থাকে, তাদেরও নেড়েচেড়ে দেখেচি ভিতরে ফাঁকি ভরা। আমার সামনে যারা আমার স্তুতিবাদ করে, তারা আড়ালে যে আমার নিন্দাই করবে এ' তো স্বাভাবিকই।

তাঁর দ্বিতলের পাঠকক্ষে যাঁরা যাবার অধিকার পেয়েছিলেন তাঁরা দেখে থাকবেন, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত পূর্ব্বতন ও আধুনিক গ্রন্থ ছিল তাঁর সর্ব্বক্ষণের প্রিয়সঙ্গী। তাঁর মুখে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার গুটিকয়েক পংক্তি প্রায়ই শোনা যেত, অনেকে নিশ্চয় শুনেও থাকবেন। আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়চে শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে বারংবার শোনা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইন ক'টি :—

"বাঁশি যখন থামবে ঘরে, নিভ্‌বে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে পড়বে যবনিকা ;
তখন যেন আমার তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে
হয়না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান্ বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হোলো নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ।"

শরৎচন্দ্র স্বভাবতঃ আত্মগোপনশীল মানুষ ছিলেন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করা ছিল তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁর চরিত্রের মধ্যে একাধিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর গভীর ও বহুবিচিত্র। অনেক আশ্চর্য্য কাহিনীই তাঁর মুখে বহুবার শুনেচি। এই সকল ঘটনা নিয়ে তাঁকে আত্মজীবনী লিখবার অনুরোধ করলে তিনি হেসে বলতেন —"জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিকে অবিকল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় সাহিত্যে রূপ দেওয়া চলে না। সেই অভিজ্ঞতার ফল একমাত্র সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি করার কাজে লাগতে পারে।"

তাঁর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের ইতিহাস নানা বিচিত্র বেদনা ও আনন্দের নিবিড় রসে পরিপূর্ণ। জীবনকে তিনি অবাধ মুক্তির মধ্য দিয়েই চালনা করে নিয়ে এসেছেন। কখনও কোনও বন্ধন জীবনে গ্রহণ করেন নি বা মানেন নি। সংসারে একটি মাত্র বন্ধনকে তিনি স্বীকার করতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তা মেনে গিয়েছেন—সে বন্ধন অকৃত্রিম ভালবাসার। এই বস্তুটির জন্য তিনি সমস্ত কিছুই অবহেলা করতে পারতেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসের নানা স্থানে তাঁর কৈশোর ও যৌবন-কালের জীবনের ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে তাই ফুটে উঠেছে। আপনার জীবনে গভীরতর দুঃখের মধ্য দিয়ে তিনি

জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। সে দুঃখ তাঁর হৃদয়কে খাঁটী সোনা করে তুলেছিল। অন্তর-বেদনার এমনতর পরম অভিজ্ঞতা না থাকলে হয়তো এরূপ গভীর রসসৃষ্টি করা তাঁর ঘটে উঠতো না। শরৎসাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্চে, জীবনের কঠোর বাস্তবতার সাথে সুষমা-স্নিগ্ধ কল্পনার অপূর্ব্ব সুসঙ্গতি।

শরৎচন্দ্রের সেই পরদুঃখকাতর কোমল অন্তঃকরণটির সাথে পরিচয় যাদের ঘনিষ্ঠভাবে ঘটেছিল তাঁর আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ যারা নির্দ্ধারিত ধারায় লাভ করেছে—আজ সাহিত্যস্রষ্টা শরৎচন্দ্রের চেয়ে মানুষ শরৎচন্দ্রকে হারানোর বেদনাই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে এবং উঠবে। সেই নিরভিমানী স্নেহপ্রবণ শুভ্রকেশ মানুষটির প্রসন্ন হাস্যস্মিত-মুখ আর যে তাদের ঘরে সময়ে অসময়ে দেখা দেবেনা, রোগের দিনে আপদ বিপদের দিনে আত্মীয়েরই মত অকৃত্রিম উৎকণ্ঠায় আন্তরিক সহানুভূতি দান করবেনা, বিরামের ক্ষণ তাঁর সাহচর্য্যে নানা আলাপ আলোচনায় রঙ্গরসিকতায় গল্পে কাব্যালোচনায় সুন্দর মধুর হয়ে উঠবেনা—এই ক্ষতিটাই এখন সবচেয়ে বাস্তব হয়ে কঠিন বেদনায় বুকের মধ্যে বাজছে। স্রষ্টা ও শিল্পী শরৎচন্দ্রের মৃত্যু নেই, তিনি অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন তাঁর সৃষ্টিরই মধ্যে। কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্র যে আর নেই এ ক্ষতির দুঃখ তারা ভুলবে কেমন করে—যারা তাঁর সেই স্নেহস্নিগ্ধ অন্তরের দুর্লভ মমতাস্পর্শ পেয়েছিল ?

শ্রী রাধারাণী দেবী

—

সাহিত্যিকগণের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র

এখনো তুমি দেশকে প্রতিদিন নব নব রচনা-বিস্ময়ে নব নব আনন্দ দান করবে এবং সেই উল্লাসে দেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ তোমার জয়ধ্বনি করতে থাকবে। পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুইপাশে যে সব নবীন ফুল ঋতুতে ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার ; অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্ব্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমালা। সেদিন বহুদূরে থাক্। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পাথেয় দাবী করবে ; তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাকো, যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সমাপ্তির শান্তিবাচন থাকে, তোমার পক্ষে সেটা সঙ্গত নয় এ কথা নিশ্চিত মনে রেখো।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে "কালের যাত্রা" নামক একটি নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি।

কালের রথ যাত্রার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র তোমার প্রবল লেখনীর মুখে সার্থক হোক এই আশীর্ব্বাদ সহ তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শুভানুধ্যায়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

শরৎচন্দ্রও রোমাণ্টিক, অসাধারণের উপাসক, কিন্তু সাধারণ রোমাণ্টিক লেখক হইতে তাঁর প্রভেদ আদর্শগত, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা-গত নয়। রোমাণ্টিক লেখকগণ চলতি আদর্শের মাপে চরিত্র গৌরবের পরিমাণ করেন, শরৎচন্দ্র করেন তাঁর নিজস্ব একটি আদর্শ দিয়া। সমাজের চলতি আদর্শে যাদের গৌরবের কোনও অধিকার নাই, তাদের ভিতর তিনি অসামান্য গৌরব দেখিতে পাইয়াছেন, সমাজের বিচারে যারা অবজ্ঞাত তাদের ভিতর তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন বীরধর্ম্মের অপূর্ব্ব প্রকাশ।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

—

শরৎচন্দ্রকে এখন আর যাচাই করা চলবে না, তাঁকে মেনে নিতে হবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে হাজার হাজার বাঙ্গালী নর-নারীকে তিনি আনন্দ দিয়াছেন। তার সে আনন্দ কেবল মুহূর্ত্তমাত্রের নয়, তা' গভীর, তাই বাঙ্গালীর জীবনকে তা' স্পর্শ করেছে, তার কথায় কাজে নিজেকে প্রকাশ করেছে. আবার কখনও বা তার চোখের ঠুলি দিয়েছে ছিঁড়ে, তার মনের বেড়া দিয়েছে ভেঙ্গে।

সোমনাথ মৈত্র

—

শারদোৎসবে এই, যবে প্রতিনিমেষেই
আলো আর কালো চায় ঘেরিতে আকাশ,
তবুও কিরণমালা প্রসন্ন প্রকাশ
নিয়ে আসে আঁখি আর মনের সমুখে
যত কথা উদ্ভাসিত প্রকৃতির বুকে !
তুমি যে "নারীর মূল্য" বেদনায় আনুকূল্য
দিয়াছিলে অজ্ঞাত রাখিয়া নিজ নাম
বহু আগে ভোলে নাই তাই তার দাম
স্বদেশিনী যে যেথায় আছে। জন্মোৎসবে
জনে জনে স্নিগ্ধ মনে আনিয়াছে সবে
কেহ বন্দনার গীতি শুভ কামনার প্রীতি ;
আনন্দের আশীর্ব্বাদ অন্তরের স্নেহ.

গাঁথি লয়ে সামছন্দে প্রীতির প্রশস্তি ;
কহিলাম সবাকার সাথে স্বস্তি স্বস্তি !
হোক শুভ আয়ু দীর্ঘতর,
কাম্যধন লভুক অন্তর।

প্রিয়ম্বদা দেবী

বুকের বেদনা বুঝে লাঞ্ছনা-কাতরে তুমি দিয়াছ সম্মান,
বাৎসল্য, প্রীতি, প্রেম, তোমার ও কথা শিল্পে অপরূপ দান।
দারিদ্র্যে অকুণ্ঠ তুমি, দরিদ্রের চিরবন্ধু স্বগণ বৎসল,
ত্যাগে অনুরাগী হ'য়ে করিয়াছ আপনারে মহান্ উজ্জ্বল !

মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

বাংলায় শরৎচন্দ্র মানবতার প্রথম ঋষি। মানুষ যে দেবতা না হলেও মানুষ হিসাবে নিজেই অনবদ্য ও অনুপম, কোন শাস্ত্র শ্লোক তন্ত্র মন্ত্র তার চেয়ে বড় নয়, তাকে নীতির অঙ্কুশ মেরে নরকের আগুনে তাতিয়ে পিটিয়ে টেনে টুনেও যে খুব বেশি বড় করা যায় না, একথা শরৎচন্দ্রের লেখনীতে যেমন ফুটেছে তেমন আর কোথায় ফুটেছে জানি নে।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বিসুভিয়াসের বুকের তলায় হাজার বৎসরের আগুন জমে থাকে, একটা দিনে সে ক্লেদ বার ক'রে ফেলে, কত জনপদ তার ধাতু নিঃস্রাবে লুপ্ত হয়, কত লোক মরে। বাংলার বুকে হাজার হাজার বৎসর ধরে লক্ষ নরনারীর বুকে তেমনই আগুন জমে ছিল, তারা এমন একজন কাউকে চেয়েছিল যিনি এসে তাদের ব্যথা প্রকাশ ক'রবেন, এই অচল অনড় সমাজকে নাড়া দিয়ে এর মধ্যে যত ক্লেদ, যত আবর্জ্জনা জমে আছে সব প্রকাশ ক'রে দেবেন। মূক নরনারীর নীরব আবেদন যথাস্থানে গিয়ে পৌঁচেছিল, তাদের ডাকে বাংলার আকাশে শরৎচন্দ্রের পূর্ণ বিকাশ হ'তে দেখেছি।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বিংশ শতাব্দীর নবযুগের যে নবতম সমস্যা তার সমাধান করতে হ'লে চাই সহৃদয়তা, সংস্কারমুক্ততা, হৃদয়ের প্রসারতা, দৃষ্টির বিশালতা—শরৎচন্দ্র তারই অগ্রদূত।

অবনীনাথ রায়

দেশের মনের বেদনারে তুমি দিয়াছ ভাষা,
তোমার কণ্ঠে মোরা তাই খুঁজি বাণী।
ব্যক্তিজীবনে চিরদিনকার লুকানো আশা
তারেও খুঁজিয়া ভাষা তুমি দিলে আনি'।

হুমায়ুন কবীর

দীর্ণ করি' ছিন্ন করি' অতীতের সংস্কারের মোহ,
নব নারীদের যুগে শ্রেষ্ঠতম যে ভাব-বিদ্রোহ
সে আজি ওঠে কি রণি' মহামুক্তি-সঙ্গীতের মত,
হে বন্ধু, প্রাণের কাছে সংস্কার কি হোলো পদানত ?

সুকুমার সরকার

মহাশ্মশানের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শরৎচন্দ্র যে আলেখ্য আমাদের সুমুখে আবরণ উন্মোচন করিয়া ধরেন তাহার সহিত কোন চিত্রিত চিত্রের তুলনা হয় না। মহাশ্মশানের রূপ বর্ণনা পড়িতে পড়িতে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সেই অন্ধকার নিশীথিনী, সেই ভয়াবহ মহাশ্মশান প্রদীপ্ত হইয়া আমাদের চক্ষুকেও অন্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে।

মৃণাল সর্ব্বাধিকারী

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির লক্ষণ সংযম এবং সরলতা—শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি এত সহজ বলেই তা গ্রহণ করা এত দুরূহ। আলো হাওয়া আমরা এত অনায়াসে পাই যে তাহার মূল্য চেতনাকে ঘা দেয় না ! শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি অনিবার্য্য সহজবেগে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে।

আশালতা সিংহ

শ্রীকান্ত যে কোনদিন সংসারী হইতে পারে নাই, সমাজের বন্ধন, সংসারের বন্ধন যে কোনদিন তাহাকে বাঁধিতে পারিল না, সে যে সহজ প্রাণধর্ম্মের প্রেরণায় চিরদিন ভবঘুরের মত চারিদিকে ঘুরিয়া মরিল—ইহার মধ্যে ইন্দ্রনাথকে কি আমরা ফিরিয়া পাই না ? আবার এই সহজ প্রাণধর্ম্মের প্রেরণা যখনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যখনই সে ইহার উদ্দাম বেগ সহিতে না পারিয়া রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে এতটুকু অসংযত হইয়া উঠিয়াছে, অমনি অন্নদাদিদি আসিয়া কি তাহাকে তফাতে সরাইয়া লইয়া যায় নাই ?

বিশ্বপতি চৌধুরী

বাঙ্গলার বৈষ্ণব বক্ষে বেঁধেছিল জগাই মাধাই,
অপূর্ব্ব সে চিত্তসুধা, তারি স্বাদ তব চিত্তে পাই ;
নগণ্য পতিতা ভ্রষ্টা দুষ্টে তুমি দিলে সম প্রেম,
ধূলিতে লভিলে মণি, অকল্যাণে দিলে চিত্তক্ষেম।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্র আমাদের ভাবিয়েছেন, কাঁদিয়েছেন। আমাদের বারে বারে আঘাত ক'রতেও ছাড়েন নি কিন্তু সে আঘাত আমাদের নিস্তেজ না ক'রে নব নব কর্ম্ম প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ ক'রেছে। আমাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাধনা অপার, তাঁর বেদনা অপার।

জগৎ মিত্র

অন্ধকারেও ঠিক্ দেখেছে বজ্র আলোর ফুল !
তোমার দেখায় তোমার জানায় হয়নি কোথাও ভুল।
অন্তরেরি অন্তরালের অন্তরঙ্গ প্রিয়,—
আমরা তোমায় তাই মেনেছি একান্ত আত্মীয়।

অপরাজিতা দেবী

মানুষের দুঃখে যে এত মধু আছে, তার পাপের যে এমন অবনীবতা লাবনী থাকতে পারে, তার ষড়্‌রিপু যে আসলে ছদ্মবেশে তার ছয়টি শ্রীদাম সুদাম তুল্য সখা, একথা এমন দরদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের আগে আর কেব'লেছে ?

মণীন্দ্রনাথ রায়

কি কথার সরসতায়, কি বাক্যের সাবলীল স্বচ্ছ ক্ষিপ্রতায়, কি ভাবধারার সুচতুর প্রকাশ-মাধুর্য্যে শরৎচন্দ্রের লেখনী যেন ঐন্দ্রজালিকের মত আমাদের চিত্তে মোহের সঞ্চার করে।

অবিনাশ ঘোষাল

স্বরাজ-সাধনায় নারী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজ আমাদের ইংরাজ Governmentএর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, কিন্তু কেবলমাত্র তাদেরই ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরম নিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি কে নেবে ? এই প্রসঙ্গে আমার কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-খুড়া-জ্যেঠাদের ক্রোধান্ধ মুখগুলি মনে পড়ে এবং সেই সকল মুখ থেকে যে সব বাণী নির্গত হয় তা'ও মনোরম নয়। তাঁরা আমাকে এই বলে' অনুযোগ করেন, আমি আমার বইয়ের মধ্যে কন্যা-পণের বিরুদ্ধে মহা হৈ চৈ করে' তাঁদের কন্যাদায়ের সুবিধে করে' দিইনে কেন ?

আমি বলি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাঁরা চোখ কপাল তুলে বলেন, সে কি ম'শায়, কন্যাদায় যে।

আমি বলি, কন্যা যখন দায় তখন তার প্রতীকার আপনিই করুন, আমার মাথা গরম করার সময়ও নেই, বরের বাপকে নিরর্থক গালমন্দ করারও প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, বাঘের মুখে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে' তাকে বোষ্টম হ'তে অনুরোধ করায় ফল হয় বলেও যেমন আমার ভরসা হয় না, যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচ্ড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে তাকেও দাতাকর্ণ হ'তে বলায় লাভ হ'বে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরে'ও না, তাকে দাঁত খিঁচিয়েও না। আসল প্রতীকার মেয়ের বাপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়গ্রস্তই আমার কথা বোঝে না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে' বলেন—সে কি করে' হ'বে ম'শাই, সমাজ র'য়েছে যে ! সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন ত আমিও বলতে পারি, কিন্তু একা ত পারিনে। কথাটা তাঁর বিচক্ষণের মত শুনতে হয় বটে, আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না ! একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে' নেয়, কেবল মেয়ে বলে', দায় বলে', ভার বলে' নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়ে মানুষকে মানুষ করার ভারও তারই উপরে এবং এখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।

এ সব কথা আমি শুধু বলতে হয় বলে'ই বলছিনে ; সভায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করছিনে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই এ কথা বলছি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন, কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছে না। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্ছেন এ হ'বার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করে'ই এত বড় বস্তু লাভ করা যা'বে না ! মেয়ে মানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করে'ই রেখেছি, মানুষ হ'তে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে' দেখে'ছে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে !

এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিসটা তুচ্ছও নয় এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে' যে ছোট করে' রাখতে চেয়েছে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলি নে, কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হ'বার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী, একে ফাঁকি দিয়ে, যে কেউ যে কোন একটা কিছুকে বড় করে' খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হ'তে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেম্‌নি অজ্ঞাতসারে ছোট করে' ফেলেছে। এ কথা তার মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য। Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং দশের তিনি অনেক মঙ্গল করে' গেছেন কিন্তু তাদের মানুষ হ'তে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বলতে হ'য়েছে 'All my life I have been but a slave-driver !' এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় গ্লানি করে' যে গেছেন সে কেবল জগদীশ্বরই জেনেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর পাঠক ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হ'য়েছে,—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হ'য়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এম্‌নি সত্য। অর্থাৎ যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন করতে সক্ষম হ'য়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা

যে পরিমাণে মুক্ত করে' দিয়েছে—নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের তেম্‌নি খ'সে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হ'বার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে' রাখতে পেরেছে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক এই আশঙ্কাই আমার বুকের উপর জাঁতার মত বসে' আছে। মনে হয়, এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকী রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ার এমন দেশও ত আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা এক তিল দেয় নি, অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমিও বলিনি। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভাবে যদি কখনও এ বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবল মাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্রও নড়াতে পারবে না। শুধু আপাতদৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যে দিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেই দিন থেকে, একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য, বিলাসী এবং হীন হ'তে সুরু করেছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার আরম্ভ হ'য়েছিল। আর সেই দিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক সহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ধরে' ঘুরে' বেড়িয়েছি, আমি দেখতে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে—কিন্তু একটা বড় জিনিস আজও তারা হারায়নি। কেবল মাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হ'বার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ করে' তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখ্‌তে পড়তে জানে এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্ব্বাসিত হ'য়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সত্য কিন্তু একদিন, যেদিন তাদের ঘুম ভাঙবে, এই সমবেত নর-নারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠ্‌বে সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক্‌, খসে' পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হ'বে না,—তাতে বাধা দেয় এমন শক্তিমান কেউ নেই।

শিক্ষার বিরোধ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, ঠকিয়ে-মজিয়েই হোক্‌ বা কেড়ে-বিকড়েই হোক্‌, নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে' ওঠে। তার অতিরিক্ত যা' সেই শুধুই ভার, নিছক আবর্জ্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্য্যের প্রতি লুব্ধ হ'য়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে' থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেচে, ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরছে, ঐ যে শত সহস্র বিদেশী সভ্যতার তোড়-জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেচি, ওর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোন দিন ওর আমদানির মূল শুকিয়ে যায় ত ভোজবাজির মত ওদের অস্তিত্ব এ দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হ'বে না। ও সকল আমরা সৃষ্টি করিনি, করতেও জানিনে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা। আজ ও সকল আমাদের না হ'লেও নয়; অথচ, ওর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে' ওঠেনি। এই যে দেখা দেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পারি, ছাড়তেও না পারি তা' হলে, দুষ্ট-ক্ষুধার মত ও কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম ওদের সৃষ্টি করেচে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও সকল চাই-ই চাই। ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক-গ্যাসের দল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌চে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি, নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানীর সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি; কিন্তু বাণিজ্য জাহাজই বল, আর মোটর গাড়ীই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে, নিজের দেশে, নিজের জিনিসের মধ্যে দিয়ে জন্ম লাভ করে, ততক্ষণ যেমন করে' এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে' আনি, সে আমাদের সত্যকারের ঐশ্বর্য্য নয়। তাই ম্যান্‌চেষ্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাস্‌গো লিনেন এবং মসলিন, স্কট্‌ল্যাণ্ডের পশমী শীতবস্ত্র—তা' সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক এবং দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুক, কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জ্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে' গেছি। আমি বলছিলাম যে মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষে বড় জোর সেইটুকুই তৈরী করতে পারে, কিন্তু তার বেশী সে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করাটা শক্তি, সেটা দেখা যায় না—এমন কি পশ্চিমের দ্বারস্থ হ'য়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হ'তে দেয় না, অতীতের গৌরব কাহিনী মুছে দিয়ে আত্মসম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে, কানের কাছে কেবলি শোনাতে থাকে আমাদের

পিতা পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র, দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্য্যকারণের সম্বন্ধ-জ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমাদের এ দুর্দ্দশা, তা' হ'লে সে শিক্ষায় যত মজাই থাক্, তার সঙ্গেঅবাধ কোলাকুলি একটু দেখে শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার ততোধিক কলকারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচে—কিন্তু ঠিক ঐ সকল আমাদের দেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কি না আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন, এই সকল মহৎ কার্য্য করেছে তারা নিশ্চয় কোন একটি সত্যের জোরে। অতএব ওটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু তো বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে, সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ।

হ'তেও পারে। কিন্তু যে লোক শুধু মারণ উচাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপতে সুরু করেচে, তার কোনটা সত্য আর কোনটা শয়তানী নির্ণয় করা কঠিন। কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন,—"ঐ কথাটাই ত আমরা বার বার বলচি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটা'কে তাল পাকিয়ে এক এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড় হাঁ করেচে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চল্‌তে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিশেষমত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশী অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ—এ কথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে' Culture জিনিসটারও জাত নেই এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে, ত সে কেবল এই জন্যেই, বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে, তারা কেবল অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে, তা' হ'লে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে শ্লোক তুলে তুলে হ'তেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটা গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কি ভাবে সমন্বয় হ'তে পারে আমি জানিনে। যাদের গেল্‌বার মত বড় হাঁ আছে তারা গিল্‌বেই—মনু বা উপনিষদের দোহাই মানবে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমের এত বড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ান চলছে এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ী বেশ তাজা আছে তা'তে আশ্চর্য্য হ'বার আছে কি? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দুপক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে। ফের যদি আবশ্যক হয় তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হ'বে।

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুলচিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে' থাকে, 'ভারতের বাণী কই?' তা' হ'লে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করছে! এই জন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে' ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা কবির থাকলেও আমার নেই। কারণ বাঘের কানে 'বিষ্ণু-মন্ত্র' ফুঁক্‌লে বৈষ্ণব হয় কি না আমি ভেবে পাইনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতায় একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই, কিন্তু ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretationই দেওয়া যাক, তার আসল কথা হচ্ছে ধনী হওয়া। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান,—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়! সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেম্‌নি ধনহীন করে' তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না! সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হ'তেই চায়, ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখলে দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হ'য়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর 'পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হ'য়ে উঠেছে। এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত। আজ আমার কথায়, আমাদের ঋষিবাক্যে সে কি তার সমস্ত civilisationএর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহু যুগ কেটে গেল কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্য্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি। আপনাকে এম্‌নি সতর্ক এম্‌নি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে' রেখে'ছে যে কোনদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায় নি। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশের রাজার মাথার কোহিনুর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্য্যন্ত, যেখানে যা' কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু আজ খাম্‌কা যদি সে ভারতের আধি-ভৌতিক সত্যবস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পদার্থের enquiry করে' থাকে ত আনন্দ কোরব কি হুঁসিয়ার হ'ব—চিন্তার কথা।

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে—এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক্ তারা নেবে না, কারণ তা'তে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না—কথাটা শুনতে খারাপ কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভাল। বাকিটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জ্জনা। তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি ত মারণমন্ত্র যত সত্যই হোক্ তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ কোরব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হোল না—কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না

বলেও থাকতে পারলাম না যে বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয় ; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দু'টো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হ'তে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হ'লেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ দু'টো পদার্থও একেবারে উল্টো, তবু তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না তাদের একটু ধৈর্য্য থাকা ভাল।*

সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই দশ বৎসরে একটা জিনিস আমি আনন্দ ও গর্ব্বের সঙ্গে লক্ষ্য করে' এসেছি যে, দিনের পর দিন এর পাঠকসংখ্যা নিরন্তর বেড়ে চলেছে। আর তেম্‌নি অবিশ্রান্ত এই অভিযোগেরও অন্ত নেই যে, দেশের সাহিত্য দিনের পর দিন অধঃপথেই নেমে চলেছে। প্রথমটা সত্য এবং দ্বিতীয়টা সত্য হ'লে, ইহা দুঃখের কথা, ভয়ের কথা ; কিন্তু ইহার প্রতিরোধের আর যা' উপায়ই থাক, সাহিত্যিকদের কেবল কটু কথার চাবুক মেরে মেরেই তাঁদের দিয়ে পছন্দ মত ভাল ভাল বই লিখিয়ে নেওয়া যাবেনা। মানুষ ত গরু ঘোড়া নয়! আঘাতের ভয় তার আছে একথা সত্য, কিন্তু অপমানবোধ বলেও যে তার আর একটা বস্তু আছে এ কথাও তেমনই সত্য। তার কলম বন্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু ফরমায়েসী বই আদায় করা যায় না। মন্দ বই ভাল নয়, কিন্তু তাকে ঠেকাবার জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বার রুদ্ধ করে' ফেলা সহস্র গুণ অধিক অকল্যাণকর।

কিন্তু দেশের সাহিত্য কি নবীন সাহিত্যিকের হাতে সত্য সত্যই নীচের দিকে নেমে চলেছে? এ যদি সত্য হয়, আমার নিজের অপরাধও কম নয়, তাই এই কথাটাই আজ আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা কর্‌তে চাই। এ কেবল আলোচনার জন্যেই আলোচনা নয়, এই শেষ কয় বৎসরের প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা দেখে' আমার মনে হচ্ছে, যেন সাহিত্য-সৃষ্টির উৎস-মুখ ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। সংসারে রাবিশ বই-ই কেবল একমাত্র রাবিশ নয়, সমালোচনার ছলে দায়িত্ববিহীন কটূক্তির রাবিশেও বাণীর মন্দিরপথ একেবারে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর চারিদিকের সাহিত্যিকমণ্ডলী একদিন বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ উদ্ভাসিত করে' রেখেছিলেন। কিন্তু মানুষ চিরজীবী নয়, তাঁদের কাজ শেষ করে' তাঁরা স্বর্গীয় হয়েছেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট ধারার সঙ্গে নবীন সাহিত্যিকদের অনৈক্য ঘটেছে—ভাষা, ভাব ও আদর্শে। এমন কি প্রায় সকল বিষয়েই। এইটেই অধঃপথ কিনা, এই কথাই আজ ভেবে দেখবার।

আর্টএর জন্যই আর্ট, এ কথা আমি পূর্ব্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য্য আমি এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারিনি। এটা উপলব্ধির বস্তু, কবির অন্তরের ধন।

সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে' অপরকে এর স্বরূপ বুঝান যায় না। কিন্তু সাহিত্যের আর একটা দিক আছে, সেটা বুদ্ধি ও বিচারের বস্তু। যুক্তি দিয়ে আর একজনকে তা' বুঝান যায়। আমি এই দিকটাই আজ বিশেষ করে' আপনাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করতে চাই। বিষ্ণুশর্ম্মার দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত আমরা গল্পের মধ্য থেকে কিছু একটা শিক্ষা লাভ করতে চাই। এ প্রায় আমাদের সংস্কারের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এদিকে কোন ত্রুটি হ'লে আর আমরা সইতে পারিনে। সক্রোধ অভিযোগের বান যখন ডাকে, তখন এই দিককার বাঁধ ভেঙেই তা' হুঙ্কার দিয়ে ছোটে। প্রশ্ন হয় কি পেলাম, কতখানি এবং কোন্ শিক্ষালাভ আমার হ'ল। এই লাভালাভের দিকটাতেই আমি সর্ব্বপ্রথমে দৃষ্টি দিতে চাই।

মানুষ তার সংস্কার ও ভাব নিয়েই ত মানুষ এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানতঃ নবীন সাহিত্য-সেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটুবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়া কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্‌বার। পড়বা-মাত্রই মন তাঁর তিক্ত বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হ'ল বটে কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হ'য়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনে কোন সাহিত্য-সেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন কর্‌লেন না। হয়ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না, হয়ত তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল ; যে জন্যই হউক ; সে দিনের সে ভাবধারা সেইখানেই রুদ্ধ হ'য়ে রইল—সমাজদেহের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হ'তে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হ'ত, এমন উদাসীন হ'য়ে যদি তাঁরা না থাক্‌তেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্য্যাতন সকলই তাঁদিগকে সইতে হ'ত সত্য কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সে দিনের হিন্দুর চক্ষে যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কদর্য্য নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হ'ত আজ অর্দ্ধ শতাব্দী পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হ'য়ে যেত। এমনই ত হয়, সাহিত্য সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা। সে জানে, আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়, অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে ; হউক সে শত বর্ষ পরে, কিন্তু সে দিনের ব্যাকুল, ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত

---

* ১৩২৮ সালে 'গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে' পঠিত।

কালি মুছে দেবে। শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা হানি করা আমার উদ্দেশ্য নয়, প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের সমালোচনা করবার জন্যও আমি দাঁড়াইনি। আমি শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শত কোটি বর্ষের প্রাচীন পৃথিবী আজও তেমনি বেগেই ধেয়ে চলেছে, মানব-মানবীর যাত্রা-পথের সীমা আজও তেমনই সুদূরে। তার শেষ পরিণতির মূর্ত্তি তেমনই অনিশ্চিত, তেমনই অজানা। শুধুই কি কেবল তার কর্ত্তব্য ও চিন্তার ধারাই চিরদিনের মত শেষ হ'য়ে গেছে? বিচিত্র ও নব নব অবস্থার মাঝ দিয়ে তাকে অহর্নিশি যেতে হ'বে—তার কত রকমের সুখ, কত রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষা—থামবার যো নেই, চলতেই হ'বে—শুধু কি তার নিজের চলার উপরেই কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না? কোন্ সুদূর অতীতে তাকে সেই অধিকার হ'তে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হ'য়ে গেছে! যাঁরা বিগত, যাঁরা সুখ দুঃখের বাহিরে, এ দুনিয়ার দেনা-পাওনা শোধ দিয়ে যাঁরা লোকান্তরে গেছেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদেরই চিন্তা, তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথের সঙ্কেতই কি এত বড়? আর যাঁরা জীবিত ব্যথায় বেদনায় হৃদয় যাঁদের জর্জ্জরিত, তাঁদের আশা, তাঁদের কামনা কি কিছুই নয়? মৃতের ইচ্ছাই কি চিরদিন জীবিতের পথরোধ করে' থাকবে? তরুণ-সাহিত্য ত শুধু এই কথাটাই বলতে চায়! তাদের চিন্তা তার আজ অসঙ্গত, এমন কি, অন্যায় বলেও ঠেকতে পারে, কিন্তু তারা না বললে বলবে কে? মানবের সুগভীর বাসনা, নর-নারীর একান্ত নিগূঢ় বেদনার বিবরণ সে প্রকাশ করবে না ত করবে কে? মানুষকে মানুষ চিনবে কোথা দিয়ে? সে বাঁচবে কি করে'?

আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হ'তে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধি-ব্যবস্থার পাশে হয়ত তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়! বর্ত্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে ত তার চতুঃসীমানা সীমাবদ্ধ করা যায় না। গতি তার ভবিষ্যতের মাঝে। আজ যাকে চোখে দেখা যায় না, আজও যে এসে পৌঁছেনি, তারই কাছে তার পুরস্কার, তারই কাছে তার সম্বর্দ্ধনার আসন পাতা আছে।

কিন্তু তাই বলে' আমরা সমাজ সংস্কারক নই। এ ভার সাহিত্যিকের উপরে নাই। কথাটা পরিস্ফুট করবার জন্য যদি নিজের উল্লেখ করি অবিনয় মনে করে' আপনারা অপরাধ নেবেন না। 'পল্লীসমাজ' বলে' আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে' আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়—এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হ'য়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যেকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ'তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হ'বে না, একথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্য-সেবীর কলম সেইখানেই সেদিন বন্ধ হ'য়ে যেত।

আগেকার দিনে বাঙ্গলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা' নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না; ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয়নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানাদিক দিয়ে এই জিনিসটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হ'য়ে উঠেছে।

নেহাৎ মিথ্যে বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোট খাট কারণ থাকলেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই। সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে' মানিনে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হ'য়ে মিলে' আছে। মানুষের খাওয়া-পরা-থাকার মধ্যে এর শাসন-দণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্ত-ভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমস্তই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হ'য়ে ওঠে, এর থেকে রেহাই দিতে কাউকে সমাজ চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে, কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য সাধনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলে' গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তার যথার্থ চিন্তার বহু বস্তু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না।

একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না সে এর নাম করে' ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যে-অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে' নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে' ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে' তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে' চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে' তোলার মত পাপ অল্পই আছে। আপাত-প্রয়োজন যাই থাক, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হ'তে একে মুক্তি দিতেই হ'বে

সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্ত্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না, একথা কোন মতেই ভোলা উচিত নয়।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙ্‌রা করে' তুলে আমার বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরী, জুয়াচুরী, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতি-পুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে যদি গল্পচ্ছলে এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত এক দিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

সাহিত্যের সুশিক্ষা, নীতি ও লাভালাভের অংশটাই এতক্ষণ ব্যক্ত করে' এলাম। যেটা তার চেয়েও বড়—এর আনন্দ, এর সৌন্দর্য্য, নানা কারণে তার আলোচনা করবার সময় পেলাম না। শুধু একটা কথা বলে' রাখতে চাই যে, আনন্দ ও সৌন্দর্য্য কেবল বাহিরের বস্তুই নয়। শুধু সৃষ্টি করবার ত্রুটিই আছে, তাকে গ্রহণ করবার অক্ষমতা নাই, এ কথা কোন মতেই সত্য নয়। আজ একে হয়ত অসুন্দর আনন্দহীন মনে হ'তে পারে; কিন্তু ইহাই যে এর শেষ কথা নয়, আধুনিক-সাহিত্য সম্বন্ধে এ সত্য মনে রাখা প্রয়োজন।

আর একটি মাত্র কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ইংরাজীতে Idealistic ও Realistic বলে' দু'টো বাক্য আছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এই অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অতিমাত্রায় realistic হ'য়ে চলেছে। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না। অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না। তবে কে কতটা কোন ধার ঘেঁসে চল্‌বে, সে নির্ভর করে সাহিত্যিকের শক্তি ও রুচির উপরে। তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্ব্বের মত রাজারাজড়া, জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপ্‌শোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রসসাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে' নিতে পারবে।

কিন্তু আর না। আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি, আর নিতে পারব না। কিন্তু বসবার আগে আর একটা কথা জানাবার আছে। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই বিক্রমপুর বিরাট গৌরবের অধিকারী। বিক্রমপুর পণ্ডিতের স্থান, বীরের লীলাক্ষেত্র, সজ্জনের জন্মভূমি। আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্তরঞ্জন এই দেশেরই মানুষ। মুন্সীগঞ্জে যে মর্য্যাদা আপনারা আমাকে দিয়েছেন, সে আমি কোনদিন বিস্মৃত হ'ব না। আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করুন।*

---

* ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভার সভাপতির অভিভাষণ।

শরৎচন্দ্র বিয়োগ-ব্যথা

অকস্মাৎ একি শুনি, একি নিদারুণ বাণী,
আসিয়াছে কাল রাহু শারদ চন্দ্রমা খানি!
যে জ্যোছনা ধারা পেয়ে আলোকিতা মাতৃভূমি;
জাগালে মায়েরে, যবে শ্বেতপদ্মে ছিলা ঘুমি।
ফেনাইয়া উচ্ছ্বসিয়া
ছুটিল কল্পনা সিন্ধু;
জাগিল অমৃত সহ
দ্যুলোক সম্ভব ইন্দু!—
সে যে কত সহৃদয়
পরের ব্যথার ব্যথী,
সমস্ত হৃদয় ভরা
কতই সহানুভূতি।
লাঞ্ছিত নিন্দিত কত
লভিল স্নেহের ঠাঁই,
কতই অভাগা দুখী,
পেলে সহোদর ভাই।
রামের সুমতি সেই,
দত্তা, পরিণীতা, আর
ব্রহ্মদেশে শ্রীকান্তের
নিত্য নব সমাচার
স্নেহময় চন্দ্রনাথ,
বিরাজ, কুসুম সতী,
সাহিত্যে যে কত রত্ন
বিলায়েছ মহামতি!
সবি কি হইল শেষ?—
এ কি অমঙ্গল কথা,
এখনি লেখনী তব
পাবে চির নীরবতা?
এখনি সে বীণা বাঁশি
থামিল জনম-তরে?
কে হানিল হেন বাজ
বঙ্গের সাহিত্য প'রে?
সত্যই কি চলে গেলে
হাসিমুখ নিয়ে সাথে,
কল্পনার ফুলবন
পোড়াইয়া অগ্ন্যুৎপাতে?
চলি গেলে স্বরগে যে
কে মানা করিবে তাই,
মোরা কাঁদি আমাদের
আর যে শরত নাই!

শ্রীমানকুমারী বসু

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ হইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যে মানপত্র পাঠ করেন, সেটি শরৎচন্দ্রের রচনা।
পার্শ্বের প্রতিলিপিতে দেখা যাইবে, শরৎচন্দ্রের হস্তাক্ষর ও জগদীশচন্দ্রের স্বাক্ষর

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম বর্ষশেষে একান্ত মনে প্রার্থনা করি জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হোক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্য-সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্ত্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারংবার নমস্কার করি। ইতি

শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু

শরৎ চং চট্টোপাধ্যায়। ৮ই অগ্রহায়ণ ৩৮

(শ্রীযুক্ত অমল হোমের সৌজন্যে)

শরৎচন্দ্রের মানবিকতা

অসামান্য চিত্রশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্য-সমাজ একটী অশান্ত ও বিদ্রোহী আত্মা হারাইল। জীবনের বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বহু আবেগ, বহু অন্তঃপীড়ায় সাক্ষী—এই শিল্পী হইয়াছিলেন বাংলার সমাজের অন্তর্নিহিত গূঢ় বেদনার প্রতিমূর্ত্তি। এমন করিয়া কোন সাহিত্যিক সমাজের নিয়ম ও বিধি নিষেধের নির্ম্মমতা ফুটাইতে পারেন নাই যেমন ক্ষুব্ধ ও বিহ্বল হইয়া তিনি ফুটাইয়াছেন। মানবিকতার এমন বিপুল ও গভীর আদর্শ কেহই আঁকিতে পারেন নাই যাহা শত অন্যায় ও অধর্ম্ম, পাপ ও দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ বঙ্কিম পথ দিয়া উজ্জ্বল দীপশলাকার মত তাঁহার কল্পলোকের নরনারীকে দিক্‌দর্শন করাইয়াছে।

অপূর্ব্ব সাহস এই উপন্যাসশিল্পীর—যিনি পাপবিদ্ধ ও অসুন্দরকে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার অক্ষত মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন, সমাজ ধর্ম্মের উপর ন্যায়ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যে ন্যায়ের সম্মুখীন হইয়া প্রেমের মান অভিমান বিরহমিলন নিতান্ত ক্ষুদ্র ও লঘুচঞ্চল হইয়া দেখা দেয়।

তাঁহার বিচিত্র গল্প উপন্যাসে প্রেমের ব্যঞ্জনা হইয়াছে বহু বাধা নিষেধ ও বিচ্ছেদের ঘাতপ্রতিঘাতে। পাশ্চাত্য গল্প উপন্যাসে আমরা ক্ষুব্ধ ও তিরস্কৃত প্রেমের পরিণতির পরিচয় পাই। কিন্তু এই প্রাচ্য শিল্পীর নিকট আমরা প্রেম-নিরাশ নারীর যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়াছি তাহা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। নারীর অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে, তাহার অগৌরব ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে তিনি যে অটল ধৈর্য্য ও অসঙ্কোচ সততার পরিচয় দিয়াছেন তাহা উহার সমস্ত কলঙ্ক ও অধর্ম্মকে শোধন করিয়া দিয়াছে।

ঘৃণিত ও অসুন্দরের অন্তরে সততার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এই মহাপ্রাণ শিল্পী। অসুন্দরকে যে শ্রী ও সম্পদে তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহা কল্প-সুন্দরীর চরণকমলে অম্লান আভা দান করিবে।

সমাজ অনেক সময় মানুষের শুধু যে ব্যর্থতার কারণ তাহা নহে, তাহার পাপেরও কারণ হয়। যাহারা উদ্‌ভ্রান্ত, যাহারা অসৎ পথে গিয়াছে, তাহারা তত দোষী নহে, যতদোষ সমাজ ও জীবনের ঘটনা- বিপর্য্যয়ে যাহা তাহাদের ভ্রান্তি ও অপরাধ সহজ করিয়া দেয়। পাপকে বর্জ্জন করা যদি মানুষের ও সমাজের অসাধ্য হয়, পাপকে সহ্য করিবার ক্ষমতা, ক্ষমা করিবার অধিকার মানুষকে অর্জ্জন করিতে হইবে। বিপুল সাহস, গভীর অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ সমবেদনা না হইলে এই সত্যদৃষ্টি মানুষের হয় না। উদারতম মানবিকতার পরিচায়ক শরৎচন্দ্রের এই অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে চির অমরতা ও বিশ্বসাহিত্যে পরম গৌরবপদ দান করিবে, সন্দেহ নাই।

কত যুগ যাইবে, কত পাঠক বাংলায় বা বিদেশে তাঁহার গল্প উপন্যাসে মুগ্ধ ও আন্দোলিত হইবে। বহুযুগ পরেও তাঁহার সাহিত্য প্রত্যেকের চক্ষের জলে আরও একটু অনাবিলতা প্রদান করিবে, প্রত্যেকের নিষ্ফলতার মধ্যে আরও একটু ধৈর্য্য, প্রত্যেক বিদ্রোহের মধ্যে আরও একটু কোমলতা ও ক্ষমা আনিয়া দিবে। সমাজ নাই, ন্যায় অন্যায় নাই, "সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই"—বাঙ্গালী জাতির বহুবাধাবিঘ্নলব্ধ এই বিপুল অভিজ্ঞতা যাহা তাঁহার সাহিত্যে অপরূপ লিখনভঙ্গী ও অসামান্য সহানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছিল, তাহা যেন যুগে যুগে বাঙ্গালীর লোকাচারের উপর, সমাজধর্ম্মের উপর, ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে। শিল্পী সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গলময় রূপে দেখেন; কিন্তু যখন তিনি অসুন্দরকে সত্যের অপূর্ব্ব গৌরব আলোকে উদ্ভাসিত করেন তখন তিনি শুধু শিল্পী হন না, তিনি সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি ধারণ করিয়া, ব্যক্তির পাপের গরল পান করিয়া হন বিশ্বের প্রেমের ভিখারী।

এই প্রেমে কিরণময়ীর দুর্ণিবারতা অপেক্ষা জাগে বেশী সাবিত্রীর ধৈর্য্য, উহা পার্ব্বতীর রাজপ্রাসাদের সদাব্রত অপেক্ষা অন্নদার গৌরবহীন সাপুড়িয়া-কুটীরের নীরব সেবাপরায়ণতায় অটল প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেম পুরুষকে মর্ম্মন্তুদ পীড়া দেয়, বিদ্রোহী করে—যেমন উহা শ্রীকান্তকে ভবঘুরে, দেবদাসকে উচ্ছৃঙ্খল ও সুরেশকে উন্মত্ত করে। কিন্তু উহা নারীকে শত ব্যর্থতা, নির্য্যাতন ও বেদনার মধ্য দিয়া শ্রেষ্ঠ গৌরব দেয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীই প্রেমের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে, সে সফলতা যেমন অতি করুণ তেমনি অতি গরীয়ান।

এই প্রেম শুধু যে সাহিত্যে নূতন প্রাণসঞ্চার করে তাহা নহে, জাতি ও সমাজকেও নব কলেবর দান করে।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়



যুবক শরৎচন্দ্র

ভাগলপুরে গৃহীত ফটো (বাম কোণে নীচে বসিয়া আছেন)

—শ্রীঅনুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

রাহুর কবলে শরৎচন্দ্র

প্রায় সতেরো বৎসর আগে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর শিবপুরের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। লক্ষ্য ছিলেন শরৎচন্দ্র ব্যক্তিটি; উপলক্ষ্য—"বিজলী"র জন্য লেখা-আদায়। তখনকার দিনে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস প'ড়ে আমার মনে তাঁর শ্রদ্ধার যে স্বর্ণসৌধ গ'ড়ে উঠেছিল, "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা"র মতো শক্ত হাতুড়িও তাতে টোল খাওয়াতে পারে নি। সেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম এবং এই সাক্ষাৎ কোনরূপ পোষাকী ভদ্রতা বা হিসেবী ভাষণের ভাগে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠেনি।—নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ, যে কথা বলেন তার কোনও একটা অক্ষর অস্পষ্ট নয়—ছোট ছোট কথা, আন্তরিকতায় ভরা।

ছোট্ট একখানি ঘর। ঘরের মধ্যে গুটি দুই আলমারি, একটি পুস্তকাধার, একটি রাউণ্ড-টপ্ টেবিল, তার একটি কোনে 'ডাব ও শরৎ' শীলমোহরকরা দামি লেখার কাগজ, একফুট দৈর্ঘ্য ও প্রায় তিন ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট আকৃতি থেকে নানা আকারের নানাপ্রকার ফাউণ্টেন পেন ও একটি গড়গড়া। ঘরের বাইরে প্রায় দরজার কাছেই, সদাজাগ্রত প্রহরী "ভেলি।" ভেলির আদৌ ইচ্ছা নয় যে, তার প্রভুর ভালোবাসার ভাগ আর-কেউ নেয়। এই মনোভাব ভেলির চোখেমুখেই যে ফুটে উঠ্‌তো তাই নয়, সে স্বজাতিসুলভ ভাষায় সে কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ ক'রতো না।

প্রথম পরিচয়ের দিনে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে যে স্নেহ, যে অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচয় পেলাম, তাতে স্বার্থের কথাটা তুলে নিজেকে ছোট ক'রবো না ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব'লেই ফেললাম—"দাদা 'বিজলী'র জন্য লেখা দিতে হবে যে।"

শরৎচন্দ্র বিনা দ্বিধায় সম্মতি দিলেন।

বাড়ীতে ফিরে সহকর্ম্মীদের সগৌরবে জানিয়ে দিলাম—শরৎবাবু লেখা দেবেন।

একথা শুনে কে-একজন-যেন ঠোঁটের প্রান্তভাগে কুঞ্চিত রেখা ও একটুখানি হাস্যবিন্দু প্রদর্শন ক'রে বল্‌লেন—"শরৎচন্দ্রের লেখা যোগাড় করা বড় সহজ কথা নয়।"

মনে মনে সঙ্কল্প করলাম—যেন-তেন-প্রকারেণ শরৎচন্দ্রের লেখা আদায় করতেই হবে। আমার অভিযান সুরু হ'লো। প্রতি সপ্তাহে একদিন তো বটেই, কোন কোন সপ্তাহে দুতিন দিন ক'রেও হানা দিতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু প্রতিবারেই শরৎচন্দ্রের চা ও ভেলির ধমক খেয়ে ফিরতে হ'লো!

লেখা পাচ্ছি না বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু বিচিত্র কাহিনী শুনতে পাচ্ছি, এটাও তো কম লাভ নয়! কিশোর কালে কোথায় যেন এক যাত্রার দলে ছোকরা হ'য়ে গান গাইতেন; যৌবনে যোগী সেজে সন্ন্যাসীর দলে ভিড়ে তাদের সুনীতি ও দুর্নীতির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় লাভ ক'রেছিলেন; সেইকালে কোথায় একজন সুপরিচিতা বৃদ্ধাকে তিনি তাঁর সুমুখ দিয়ে চ'লে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কোথায় যাচ্ছ গো!" ব্যস্তসমস্ত বৃদ্ধা শরৎচন্দ্রের প্রতি আদৌ দৃক্‌পাত না ক'রে চল্‌তে চল্‌তে জবাব দিল—"একটা মণিঅর্ডারের কুপন কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে যাচ্ছি ঠাকুর!" শরৎচন্দ্র যে লেখাপড়া জানেন না, এ বিষয়ে বৃদ্ধার মনে কোনও সংশয় ছিল না! ফী-এর টাকার অভাবে একদা যিনি এফ্ এ পরীক্ষা দিতে পারেন নি, পরবর্ত্তীকালে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্বর্ণ-সিংহাসনের বনিয়াদ তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত কথা অনেক কিছুই পাই কিন্তু আসলের বেলায় মুষল।—গল্প বা প্রবন্ধ কিছুই পেলাম না। এ তারিখে নয়, সে তারিখে—এ হপ্তায় নয়, ও-হপ্তায় প্রভৃতি নানা প্রতিশ্রুতির জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে প্রায় এক বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। যেমন লেখকের ঔদাসীন্য, তেমনি সম্পাদকের ধৈর্য্য!

সম্মুখে শারদীয়া পূজা। সব কাগজেরই বিশেষ সংখ্যা বার হবে, "বিজলী"ও শারদীয়া সংখ্যার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। শরৎচন্দ্র এবারে বল্‌লেন—"ওহে পুজোর সংখ্যায় আমি লেখা দিব নিশ্চয়ই। তুমি ইচ্ছা করলে পুজোর সংখ্যার লেখকদের লিষ্টিতে আগে থেকেই আমার নাম ছেপে দিতে পার।"

হ'লোও তাই। ঘটা ক'রে বিজলীর পাঠকপাঠিকাদের জানিয়ে দেওয়া হ'লো—পুজোয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখবেন।



শরৎচন্দ্র

জন্ম তিথি উ

—শ্রীঅনুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

পূজোর লেখার জন্যে চার পাঁচ দিন ঘুরিয়ে শরৎচন্দ্র আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন, প্রেসে কপি দেবার শেষ দিনটা এবং সেই দিনটায় আমাকে যে ব্যর্থমনোরথ হ'তে হবে না—এ কথা বেশ জোর দিয়েই বললেন। যথানির্দ্দিষ্ট দিনে এবং যথাসময়ে আবার শরৎচন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হওয়া গেল। আমার অভ্যুদয়ে তাঁর মুখে চোখে কোনরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য না ক'রে বুঝ্‌লাম, লেখা বোধ হয় তৈরী হ'য়েই আছে এবং আমার অনুমান সত্যে পরিণত হ'লো, যখন তিনি বললেন, "বোসো, লেখা এনে দিচ্ছি।"

ব'লেই তিনি অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন। প্রায় দশ পনেরো মিনিট পরে এসে আমার হাতে একটুক্‌রো কাগজ দিয়ে বল্‌লেন—"এই নাও।"

সেই কাগজটুকুতে যা লেখা ছিল তার মর্ম্ম এইরূপ—

বিজলীর পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি

আমি পূজার সংখ্যার বিজলীতে লেখা দিব বলিয়া সম্পাদককে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। আমার প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় লেখকদের তালিকায় আমার নামও তাঁরা ছাপিয়াছিলেন। লিখিতে পারিলাম না বলিয়া আমি দুঃখিত। এ ত্রুটি আমারই। "বিজলী"র পাঠক-পাঠিকারা এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি তো তাঁর লেখাটি পড়ে অবাক্‌। বল্‌লাম—একি হ'লো দাদা?

সপ্রতিভস্বরে শরৎচন্দ্র বললেন—"এবারে এইটেই ছেপে দাওগে।"

—ব'লে একটুখানি হাসলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ফিরে এসে, কি-আর-করি, সেইটেই পূজোর সংখ্যার "বিজলী"তে ছেপে নিজেদের দোষখণ্ডন করলাম।

কিন্তু অতঃপর? এর পরেও কিছুমাত্র উৎসাহ-হ্রাস হ'লো না; বরং অধিকতর শক্তিপ্রয়োগে শরৎচন্দ্রের কাছে লেখার তাগিদ আরম্ভ ক'রে দিলাম এবং সেইদিন থেকে সে-বৎসরের প্রায় বারোটি মাস বিগতবর্ষের মতো আমাকে উপহাস ক'রেই অতিবাহিত হ'য়ে গেল। শরৎচন্দ্রের বাটীতে যাতায়াতে ক্লান্তি নাই। তাঁর কাছ থেকে রসালাপ, স্নেহ, আতিথেয়তা সবই পেলাম—পেলাম না কেবল লেখা। কিন্তু এ কথা না বল্‌লে সত্যের অপলাপ হবে যে, সে-বারের মতো এ-বারেও তাঁর কাছ থেকে পূজোর সংখ্যায় প্রবন্ধ-দানের প্রতিশ্রুতি পেলাম। বলা বাহুল্য যে, এবারেও প্রেসে কপি পাঠাবার শেষ দিনটি তিনি আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন। এবারেও পূজোর সংখ্যার লেখকদের মধ্যে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'লো।

ঠিক শেষ-দিনটিতে শিবপুরে হাজির হ'তে কিছুমাত্র ভুল হ'লো না। বাড়ীতে ঢুকেছি—সাম্‌নেই শরৎচন্দ্র। আমাকে দেখবামাত্র তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "এসেছ?—ভালই হয়েছে। এস আমার সঙ্গে।"

এই কথা ব'লে তিনি আমাকে বাইরের ঘরটি দেখিয়ে একবার অন্তঃপুর ঘুরিয়ে এনে আবার বাইরের ঘরে বসালেন। বল্‌লেন—"দেখলে তো, মহালয়ার গঙ্গাস্নানের জন্যে কতলোক দেশ থেকে এসেছে? এর মধ্যে কিছু লেখা যায়?—তুমিই বলো।"

আমি সহাস্যে ও সবিনয়ে বললাম—"দাদা, লেখা যে পাব না, তা আমি আগে থেকেই জানি। পেলে অবশ্য ভালই হ'তো। কিন্তু আজ আমি শুধু লেখার জন্যে আসিনি; আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, আর সেইটেই আজ মুখ্য।"

শরৎচন্দ্র বল্‌লেন—"কি ব্যাপার?"

আমি কাতরভাবে বল্‌লাম—"দাদা, এই সম্পাদকী ক'রে যা মাইনে পাই, তাতে সংসার চলে না; তারজন্যে প্রাইভেট টুইশনী করতে হয়। শুনলাম, রামকৃষ্ণপুরে —এর বাড়ীতে একটি টুইশনী খালি আছে। এও শুনেছি তিনি আপনার খুবই পরিচিত। আপনি দয়া ক'রে যদি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাঁদের একটু ব'লে ক'য়ে দেন—"

দুঃখদরদী শরৎচন্দ্র আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই বল্‌লেন—"চল, এখুনি যাব।"

একটি খদ্দরের বেনিয়ান প'রে ও একগাছি মোটা লাঠি হাতে নিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। দু'জনে বার হলাম। বড় রাস্তার উপরে এসেই একখানা খালি ট্যাক্সি যেতে

দেখে থামানোর জন্য ইঙ্গিত করলাম। ট্যাক্সি কাছে আসতে শরৎচন্দ্র বললেন—"চল হেঁটেই যাব।"

আমি একরূপ জোর ক'রেই তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে নিজে উঠে বসলাম। এই অপব্যয়ের জন্য তিনি আমাকে ভৎ´সনা করতে লাগলেন।

ট্যাক্সি চলেছে সবেগে—রামকৃষ্ণপুরকে পিছনে ফেলে গাড়ী যখন হাওড়া ময়দানে তখন শরৎচন্দ্রের চমক ভাঙলো। হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—"ওহে রামকৃষ্ণপুর যে ছাড়িয়ে এল।"

আমি বললাম, 'চলুন না।' ট্যাক্সি হাওড়া ব্রিজের ওপরে। শরৎদা এবার একটু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন—"কোথায় যাচ্ছ বল তো?"

আমি পূর্ব্বের উত্তরেরই পুনরুল্লেখ করলাম মাত্র।

শরৎচন্দ্রের মনে উদ্বেগ সঞ্চার করিয়ে নানা রাস্তা অতিক্রম ক'রে গোলদীঘির পাশ দিয়ে ট্যাক্সি এসে ঢুক্‌লো পটুয়াটোলা লেনে। এইখানে একটি বাড়ীর সাম্‌নে ট্যাক্সি থামিয়ে শরৎচন্দ্রকে নামতে বললাম। শরৎচন্দ্র চারদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় আনলে বল তো?"

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে উঠ্‌লাম সেই বাড়ীর দোতলার এক কামরায়। সেই ঘরের মধ্যে একখানি চেয়ারে তাঁকে বসিয়ে সাম্‌নের টেবিলে দুখানি টোষ্ট্, দু'টি ডিম, এক পেয়ালা চা, এক প্যাকেট্ সিগারেট, একটি দেশলাই, একখানা রাইটিং প্যাড্ ও দোয়াত-কলম দিয়ে বললাম—"লেখা দিলে পর নিস্কৃতি।"

ব'লে দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে থেকে তালা দিয়ে পাশের ঘরে ব'সে রইলাম। বেলা তখন বোধ হয় ন'টা।

এইটে আমার মেস্। মেসশুদ্ধো লোক শরৎচন্দ্রের এই বন্দীদশার কাহিনী শুন্‌তে লাগলো। প্রায় তিনঘণ্টা পরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে শরৎচন্দ্র চিৎকার সুরু ক'রে দিয়েছেন—"ওহে নলিনী, দরজা খোল, তোমার লেখা হ'য়েছে।"

ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি সত্যই একটি অপূর্ব্ব ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছেন। লেখাটির নাম 'দিনকয়েকের ভ্রমণ কাহিনী'। আগাগোড়া নিজেই প'ড়ে শোনালেন। প্রতারিত হ'য়ে আসার জন্য রাগ নাই, বন্দী হ'য়ে থাকার জন্য বিরক্তি নাই—বরং স্বভাবসুলভ হাস্যপরিহাস করতে করতে আমাকে নিয়ে তিনি তাঁর শিবপুরের বাড়ীতে ফিরে গেলেন!—

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

শরৎচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর যখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যের গতপ্রায় রসধারাকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলেন, ঠিক সেই সময় সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নূতন এক বৈশিষ্ট্য লইয়া আবির্ভূত হইলেন শরৎচন্দ্র। পূর্ব্বে শিক্ষিত-সমাজ ব্যতীত বঙ্গসাহিত্য অন্য কেহ উপভোগ করিতে পারিত না, কারণ সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তদানীন্তন অন্যান্য বহু লেখকই ঐতিহাসিক ঘটনাকে গল্পাকারে লিপিবদ্ধ করিতেন। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার ছবি উহাতে বিশেষ থাকিত না। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনা আরম্ভ করিলেন বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ, আচার ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া—ফলে অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যক্তিকেও তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না। তাহাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, বাঙ্গালীর ঘরের ছবি, তাহাদের নিজের ঘরের ছবি। ইহাই তাহার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। ইহাই শরৎ-সাহিত্য।

তাঁহার এই রচনাবলী পাঠ করিলে শিশুচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অপূর্ব্ব মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কঠোর শাসনের পরিবর্ত্তে স্নেহের শাসন দুর্দ্দান্তকে কি ভাবে সুশান্ত করিয়া তোলে "রামের সুমতি" তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রামের মত দুর্দ্দান্ত বালক পাড়াতে আর ছিল না, কিন্তু এক "নারায়ণী" ব্যতীত এই দুর্দ্দান্তকে আর কেহ শান্ত করিতে পারে নাই। নারায়ণী তাহাকে ভৎ´সনা করিতেন—কিন্তু সে স্নেহের ভৎ´সনা, শাসন করিতেন—কিন্তু সে স্নেহের শাসন। তিনি জানিতেন যে দুর্দ্দান্ত বালককে বশে আনিতে হইলে স্নেহের শাসনই একমাত্র উপায়, কঠোর শাসন নহে। কারণ তাহাতে শিশুর মন আরও বিকল হইয়া উঠে। শাসনের প্রতি তীব্র বিদ্বেষের সঞ্চার হয় এবং একবার এই শাসকের হাত হইতে মুক্তি

পাইলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে তাহার গতি রোধ করা সহজ হইয়া উঠে না।

"নারী চরিত্র" তাঁহার আর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রাজলক্ষ্মী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সকল নায়িকাকে তিনি এমন এক বিচিত্রভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না। তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেক নায়িকার বিভিন্ন ভাবে চোখের সম্মুখে এত বাস্তবতা পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে যে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়। "রাজলক্ষ্মী" একদিন যে "শ্রীকান্ত"কে খেলাচ্ছলে বৈঁচির মালা পরাইয়া তাহার বর বানাইয়াছিল, বহুদিন পরে যখন সেই শ্রীকান্তের সহিত পুনরায় তাহার দেখা হইল তখন দেখা গেল যে সে তাহার খেলার বরকে ভোলে নাই। কোনও দিনই ভুলিতে পারে নাই। "অন্নদা দিদি" স্বামীর প্রতি অচল নিষ্ঠার পরিবর্ত্তে তাহার নিকট হইতে পাইয়াছিল শুধু লাঞ্ছনা। কিন্তু শত লাঞ্ছনা, সহস্র অপমান ও লক্ষ গঞ্জনাও তাহাকে তাহার অবিচল পতিভক্তি হইতে কোনও দিন টলাইতে পারে নাই। বহুদিন পরে যখন সাপুড়িয়া ফিরিয়া আসিল তখন লোকের সমস্ত নিন্দা অপবাদ সে মাথায় তুলিয়া লইয়া তাহার সহিত চলিয়া গেল। সে বুঝিয়াছিল যে অন্যের নিকট সাপুড়িয়া হইলেও এ তাহারই স্বামী। তাহার পর তাঁহার পার্ব্বতী। যে "পার্ব্বতীর" জন্য হতভাগ্য "দেবদাস" নিজের উপর অভিমান করিয়া তিলে তিলে আত্মহত্যা করিল, যে পার্ব্বতী অন্তরের ভিতরে বাহিরে দেবদাস ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না, দেবদাসকে না পাইয়াও কিন্তু সে পার্ব্বতী কোনও দিন তাহার স্বামীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্যের এতটুকু অবহেলা করে নাই। তাহার বুকের ভিতর সর্ব্বদা জ্বলিয়া যাইত, কিন্তু মুখে কোনদিন এতটুকু প্রকাশ করে নাই। সমাজে পতিতার স্থান নাই কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল। মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য যাহারা সব কিছু হারাইয়াছে, জীবনে যাহারা লোকের নিকট হইতে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পায় নাই, শরৎচন্দ্র তাহাদের দিয়াছেন তাঁহার অন্তরের সহানুভূতি। তিনি দেখাইয়াছেন যে পতিতা হইলেও তাহারা মানুষ। তাহারাও ভালবাসিতে জানে। অন্যের মত তাহাদেরও সুখদুঃখ বোধ আছে। জীবনের এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের একটী ভুলের জন্য তাহাদের যে চিরকাল এমনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কাটাইতে হইবে একথা তিনি মানেন নাই।

তাঁহার রচনায় পুরুষ চরিত্রকেও তিনি যেভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাও অবিস্মরণীয়। তাঁহার মহিমের প্রাণ যেন পাষাণে নির্ম্মিত। তাহাকে দেখিলে মনে হয় না যে কোনরূপ দুঃখ তাহার হৃদয়ে রেখাপাত করিয়াছে। এমন কি অবলার গৃহত্যাগও নয়। কিন্তু এই মহিমই আমাদের নিকট আদর্শ-পুরুষ হইয়া দেখা দেয় সুরেশের মৃত্যু শয্যায়। যে সুরেশ তাহার সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়াছিল, সেই সুরেশেরই শেষ আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সব কিছু ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল বন্ধুর কাছে। বিপ্রদাস ছিল অতীব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। কিন্তু অপরের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনওদিন কোনরূপ বিরূপ-ভাব প্রকাশ নাই। তাহার বাড়ীতে ম্লেচ্ছাচার আসা নিষিদ্ধ ছিল সত্য কিন্তু অতিথি সৎকারের জন্য সে সব কিছুরই আয়োজন করিতে কোনওরূপ ত্রুটী করে নাই। মাতৃভক্ত বিপ্রদাস চিরদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহা সত্য, বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা হইতে নিজেকে কিছুতেই বিচ্যুত করে নাই। এই সত্যের সম্মান রক্ষার্থেই একদিন সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই।

শরৎচন্দ্রের রচনার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কাচের মতই স্বচ্ছ কিন্তু সমুদ্রের মত গভীর। সাধারণ-ভাবে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া গেলে বুঝিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না—কিন্তু যদি চিন্তা করা যায় যে তিনি তাঁহার গল্পের ভিতর দিয়া কি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে সে চিন্তা যে কোথা হইতে কোথায় গিয়া পৌঁছায় তাহার কূলকিনারা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরিশেষে শুধু এইটুকু মাত্র বক্তব্য যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা চলে না। করিলে কাহাকেও ফিরিয়া পাওয়া যায় না। উঁহাকে দেখিয়া বলিতে হয়—

সকল অভ্যাস-ছাড়া সর্ব্ব আচরণ হারা
সদ্য শিশু সম
নগ্নমূর্ত্তি মরণের— নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণমো॥

ব্রজ শর্ম্মা

শরৎচন্দ্র ও যুগচিত্ত

বাঙ্গালীর সাহিত্যিক চিত্ত যেমন গীতিমুখর তেমন কথাপ্রবণ। পদগীতি-মুখরিত বঙ্গদেশে বিশ্বসভার গায়ক-কবির আবির্ভাব সুন্দর ও স্বাভাবিক ঘটনা। তেমন মঙ্গল-কথার স্নিগ্ধ-সরস ক্ষেত্র আমাদের এই বাঙ্গালায়, বঙ্কিম রবীন্দ্রের অনুগামী শরৎচন্দ্রের নবকথার প্রবর্তন একটি সুসঙ্গত সহজবোধ্য ঘটনা। দেশবাসীর বিয়োগ-বিক্ষুব্ধ চিত্তে আজ নৈরাশ্যকর একটি প্রশ্নই জাগিতেছে। লোকায়ত সাহিত্যের অপূর্ব পরিণতি বিধান করিয়া যে শক্তিমান্ বাণীপন্থী আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার নরদেব-পূজার প্রজ্বলিত দীপশিখা কে আর অনির্বাণ রাখিবে ?

সংসারে আভিজাত্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু নির্মম আভিজাত্য মানব মনের ব্যাধিবিশেষ। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আভিজাত্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিত হয়। যুগে যুগে, দেশে দেশে উৎকট হৃদয়হীন আভিজাত্য যে বিক্ষোভ-বিলোড়ন, যে প্রলয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, মুখ্যতঃ তাহার কাহিনী লইয়াই আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস। চিরন্তন মানবের না হইলেও, অধুনাতন মানবের দুঃখদ্বন্দ্ব আর্তিবেদনার মূলেও এই নিষ্করুণ উদগ্র আভিজাত্য। আভিজাত্য-ব্যাধিতে ব্যাধিত হয় যখন জাতীয় চিত্ত, তখন তাহার চিন্তাচ্ছন্দে হয় প্রতিপদে যতিভঙ্গ, ভাবপ্রবাহও হইয়া আসে পংকিল, প্রতিহত-গতি। কর্মশক্তিতেও আসিয়া পড়ে অবসাদ, চিত্ততল হইয়া উঠে রিক্ত, নির্বিত্ত। জাতীয় মনের এইরূপ অবসাদ ও দীনতার মুহূর্তে আসিয়াছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—তাঁহার অপরিসীম সহানুভূতির 'হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা' লইয়া। হায়,'যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা'—তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল ?

মুখ্যতঃ রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে উপলক্ষ করিয়া প্রতীচীর সহিত আমাদের যে কিঞ্চিদধিক সার্ধ শতাব্দীর সংস্কৃতিগত পরিচয় তাহাতে জাতীয়জীবনে উপচিত হইয়াছে একটি লভ্য। তাহাকে বলিতে পারা যায়, জাতীয় যৌবনের সুপ্তিভঙ্গ অথবা যুবজন-চিত্তে সহানুভূতির সম্প্রসারণ। বাঙ্গালীর নবীন সাহিত্যে, সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষাপ্রসারে, রাষ্ট্রগঠন প্রচেষ্টায়—এককথায় নব্যসংস্কৃতিগঠনপ্রয়াসে, সর্বত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে এই সুপ্তোত্থিত, ক্রম-প্রসার্যমাণ সহানুভূতি। আবার এই লভ্যটুকু অর্জন করিতে গিয়া আমাদের চিত্ত যে নবতর সংকীর্ণতার অধিষ্ঠানভূমি হইয়া উঠে নাই, তাহাও বলা চলে না। তবে সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

দুর্ধর্ষ স্বাধীনতা ও অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মহামনীষী আশুতোষ অহংমুখী আত্মবিকাশের পথ না খুঁজিয়া দৃষ্টিহীন আত্মদ্রোহিগণের অপযশ ও বৈরবৈরূপ্যের বোঝা চিরজীবন মাথায় বহিয়া 'নব-নালন্দা শিক্ষাগেহ' গঠনে তাঁহার জিতজ্বর কর্মশক্তি ও প্রাণপাতী সাধনা নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারই রচিত বিশ্ববিদ্যার জাতীয় 'চত্বর' 'বিচিত্র-কলা-বিলসিত' করিতে গিয়া এই মহাপুরুষ বিগত শতাব্দীর অর্দ্ধশিক্ষিত রামনিধির 'বিনে স্বদেশী মিটে কি আশা'-সূত্রের জীবন্ত ভাষ্য রচনা করিয়া পরকীয়া ভাষারস-রসিক দিবান্ধ-শিক্ষাবিদ্-বঁধুয়াগণের সূচিভেদ্য মোহতিমির অপসারিত করিয়া বিদ্যাভিসারের নরপতিবর্ত্ম নির্মাণের সূত্রপাত করিলেন।

রামকৃষ্ণ-সহচর গিরিশ কেন রঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন ? রামকৃষ্ণ-পরিকর জীবন্মুক্ত পুরুষ কেন জনসেবাকেই 'দেশ-আত্মার কুণ্ঠা' হরণের ও সুপ্তবিবেকের আনন্দ-জাগরণের 'নান্যঃ পন্থাঃ' বলিয়া সিংহবিক্রমে প্রচার করিলেন ? দুর্ভিক্ষ-প্লাবন, বস্ত্রহীনতা, বৃত্তিহীনতার মর্মভেদী হাহাকার থাকিয়া থাকিয়া কেন ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার পিতৃস্থানীয় আচার্যদেবের সমাধিভঙ্গ করিতেছে ? আর রাজনীতিক আন্দোলন-শ্রান্ত 'কটিমাত্রবস্ত্রাবৃত' গুজরাতী মহাত্মা কেনই বা মৈথিল বিদ্যাপতির বহুজন-কীর্তিত প্রাচীন পদটির ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে শুনাইলেন, 'হরি-(জন) বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন-রাতিয়া' ?

এখন বোধহয় আমরা অসংকোচে বলিতে পারি, জাতীয়তা সাধনের যুগপ্রচেষ্টা এবং শিক্ষা ও সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সম্ভাবনা সূচিত হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার আগমনী গৌরচন্দ্রিকা দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছিল। তরুণ বাঙ্গালায় করুণ হিয়ার সবটুকু অমিয়া মথিয়া তারুণ্যের জয়গীতিকার এই কথাশিল্পী সাহিত্যিক কায়াপরিগ্রহ

করিলেন। এই সহৃদয়াগ্রগণ্য ব্যক্তি সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে সম্ভাবিতকে অভাবিতরূপে, প্রত্যাশিতকে অপ্রত্যাশিত-রূপে সফল করিয়া তুলিলেন। তাই বলিতে প্রবৃত্তি হয় 'ছন্নছাড়া জীবনের দরদীবন্ধুর বঙ্গদেশে আবির্ভাব ছন্নছাড়া 'isolated fact' নহে। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচকের ভাষায় শরৎচন্দ্র 'had his affiliation with the present and the past.'

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা একটা মস্ত ভুল করি তাঁহাকে জীবনের একাংশদর্শীরূপে বুঝিতে গিয়া। তিনি সমাজের উপরি-চর ব্যক্তি নহেন, তলদর্শী ও তলাবগাহী ব্যক্তি। তাঁহার সাহিত্যসাধনা জীবনের দুরবগাহ রসের সাধনা, পীরিতির সাধনা। তাহা একান্তভাবেই মরমের সাধনা, মরম না জানিয়া ধরমবাখান নহে। 'প্রাণের হরি'কে উপেক্ষিত উপোষিত রাখিয়া তিনি পীরিতি-তত্ত্ব বুঝেন নাই। 'গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম' করিয়া তিনি এ তত্ত্ব বুঝাইয়াছিলেন—তাই সেকথা 'শুনিতে জগৎবশ'। তাই যুবচিত্তে তাঁহার একাতপত্র সাম্রাজ্য। দেশদর্শনের উদাত্ত-গম্ভীর আহ্বান বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে জাগিয়াছিল। সে আহ্বানে সত্য করিয়া সাড়া দিয়াছিলেন, সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে একা শরৎচন্দ্র। জীবনের স্থূল সূক্ষ্ম প্রখ্যাত অখ্যাত সুখ্যাত কুখ্যাত সব কিছুকেই তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন, আঁকিয়াছিলেন।

বিষয়টির একটু স্পষ্ট আলোচনার প্রয়োজন। সংসারে শ্রীমান্ ও শ্রীহীন, শুচি ও অশুচি পাশাপাশি বাস করিয়া থাকে। গৃহসুখনিরত শুচিশুভ্র শালীনতার মধ্যে যে সুশৃংখল সুনিয়ত জীবন স্ফূর্ত হয়, তাহার শান্তশ্রী নরনারী উভয়কে বেষ্টন করিয়া সংসারে বিরাজিত। দাম্পত্যে ইহার সুশান্ত সুন্দর অভিব্যক্তি। দাম্পত্যনিষ্ঠ পৌরুষ, পতিব্রত নারীত্ব ভারতবর্ষের বড় হৃদ্য মনোজ্ঞ। বধূধর্ম-চারিণীর 'অচলাশ্রী' জরাযৌবন, শীতবসন্ত, দুঃখসুখ, মিলন-বিরহ, আবাহন-নির্যাতন প্রভৃতি সহস্র অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেও এদেশে অপরিম্লান রহিয়াছে। এই অপরূপ কল্যাণীমূর্তির 'সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়ের' অমিয়াধারায় ব্যাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, কৃত্তিবাস-কাশীরাম, কেতকা-দাস-কবিকঙ্কণ, মধুসূদন-দীনবন্ধু, হেম-নবীন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সকলেরই রসচৈতন্য গাঢ়নিষ্ণাত। আমরা সীতা-সাবিত্রী, দ্রৌপদী-দময়ন্তী, মালবিকা-শকুন্তলা, বেহুলা-খুল্লনা, প্রমীলা-লীলাবতী, শচী-ভদ্রা, ভ্রমর-সূর্যমুখী—আরও কত দেবী-মূর্তির সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। কে বলিতে পারেন, এই চিরভাস্বর দেবীমূর্তির পাদমূলে দাঁড়াইয়া শরৎচন্দ্রের 'মা বলিতে প্রাণ' 'আনচান' করিয়া উঠে নাই? প্রাত্যহিক জীবনে এই দেবীনিবহের সোদরা-কন্যকাগণকে শরৎচন্দ্র পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়াছেন, আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাঁদের সুবর্ণপ্রতিমা গড়িয়াছেন, 'প্রণতিনম্রশিরোধরাংস' হইয়া ইহাঁদিগকে স্তুতি-প্রণতি জানাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস-পাঠকগণকে কি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? আমাদের দেশ যে সত্যই 'মা-বোনের' দেশ, একথা এমন গর্বোদ্বেল হর্ষাপ্লুতচিত্তে কে বলিয়াছেন?

তবে এইপ্রসঙ্গে একটা অভিযোগ বোধ হয় তাঁহার ছিল। এই বন্দ্য-বরেণ্য নারীমূর্তির পার্শ্বে আধুনিক পৌরুষ কিরূপ প্রতিভাত হইবে? এদেশে পৌরুষের বর্তমান স্বরূপ কি? নারীর এই চিরন্তন পূজ্যমূর্তি নিরীক্ষণের নৈতিক অধিকার পুরুষ কতটুকু বজায় রাখিয়াছেন? পৌরুষের ক্ষেত্রে বাচিক, মানসিক ও কায়িক ব্যভিচার যদি মার্জনীয় হয়—শুধু মার্জনীয় নহে, প্রশংসনীয়ও হয়—তবে নারীর মানসব্যভিচারটুকুও কেন অমার্জনীয় হইবে? যে পাশব পৌরুষের 'কলুষ-পরুশ' স্পর্শ এই পূজনীয় মূর্তি অশুচি করিয়া তুলে, যে নির্বীর্য পৌরুষ এই দেবীপ্রতিমার পবিত্রতা-রক্ষণে অসমর্থ, তাহার পক্ষে নারীর শৌচাশৌচ বিচারের স্পর্দ্ধা কি পরম অধর্মাচার নহে, ঘৃণ্য নির্লজ্জ কাপুরুষতা নহে? অভিমানদৃপ্ত অকপট সংশয় যদি শরৎচন্দ্রের এবং তাঁহার প্রভাবে যুগচিত্তের জাগিয়া থাকে তবে সেইজন্যই কি শরৎচন্দ্র ও শরৎসাহিত্য অপাঙ্‌ক্তেয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, শরৎচন্দ্র জীবনের একাংশদর্শী উপরিচর ব্যক্তি নহেন। গৃহসুখবিহীন অনিয়মিত উচ্ছৃংখল জীবনেরও একটা মর্মভেদী সংগীত আছে। সে সংগীতের প্রতি কি চিরকালই আমাদের 'কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ'? জীবনের এই দিক্‌টার সহিত চলার পথে সকলেরই তো অল্পবিস্তর চাক্ষুষ ও শ্রৌত পরিচয় ঘটিয়া থাকে। অবশ্য অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচয় অনেকেরই থাকেনা। থাকার বিপত্তি আছে, শঙ্কা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া সহানুভূতির

পরিচয়ে আপত্তি কি ? শুধু আপত্তি নাই, তাহাই নহে। ইহা সর্বাংগীণ মনুষ্য সাধনের একটি অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়িত্ব। হৃদয়বত্তার ইহা একটি চিরন্তন স্ব-ধর্ম। এই স্বধর্মের পথ বাহিয়া নির্ভীক জীবন-পথিক শরৎচন্দ্র আমরণ চলিয়াছেন। স্বধর্মে নিধন বুঝি তিনি শ্রেয়োরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা বলিব, তাঁহার নিধন নাই। সে অমিত অভয়মন্ত্রোদ্দীপিত দুর্জয় প্রাণের নিধন নাই। তাহার নিত্যতা অতীতে বর্তমানে প্রাচীতে প্রতীচীতে সর্বদেশে সর্বকালে স্বীকৃত।

শরৎচন্দ্রের জীবনে যদি কোন স্থায়ীভাব থাকিয়া থাকে, তবে তাহা সহানুভূতি। কি সুদূরপ্রসারী সুগহনচারা ছিল তাঁহার এই সহানুভূতি! পূর্বেই বলিয়াছি, জীবনের প্রখ্যাত অখ্যাত সবদিকেই ব্যাপক এবং অন্তর্নিবিষ্টভাবে ছিল তাঁহার সমদৃষ্টি। মনস্বিতা ও হৃদয়বত্তার অমিত ঐশ্বর্যদীপ্ত, নরনারীচিত্তের অতিগহনতলে অবতরণ করিয়া খুঁজিতেন তিনি অন্তরের দুঃখদ্বন্দ্ব, স্নেহপ্রীতি, ঘাত-প্রতিঘাতের সবটুকু রহস্য। আবার অবজ্ঞাত, অনভিজাত অথবা সমাজের প্রত্যন্তচর ক্ষুদ্রজীবনের সবটুকু রসমাধুর্যের তিনি ছিলেন বিলাসী ভোক্তা ও সুনিপুণ পরিবেষ্টা। দুর্দান্ত দুধর্ষ কৈশোর আঁকিতে গিয়া তিনি যে রূপদক্ষতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জুড়ি মিলিবে কোথায় ? ইন্দ্রনাথের আভাসটুকুই শুধু আমরা পাইয়াছি কবিকঙ্কণের শ্রীমন্ত-চিত্রে—প্রাচীন প্রাকৃতবাঙ্গালার জীবনরস-রসিক কবির শিশুক্রীড়া-বর্ণনায়—'জলে খেলে মাছ মাছ, ঝালি খেলে চড়িগাছ, জীবন মরণ নাহিজানে'—যাহার প্রতিধ্বনি আমরা পাই একালের 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' উক্তির মধ্যে। 'পরেশের মায়ের পরেশে'র বাতাসালোলুপ ক্ষুদ্র মনটুকুর সমস্ত চাতুরী-মাধুরী ধরিয়া ফেলিলেন শরৎচন্দ্র কিরূপে ? মহেশ গাভীটির সুকরুণ শোকাবহ জীবনাবসান ও তাহার মালিক কৃষকপ্রজা গফুরের সবটুকু দুঃখব্যথা কি করিয়া তিনি বুঝিলেন ? দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, মারী-তাড়িত, অজ্ঞান অশক্ত জনমিবহ কিরূপ শোচনীয় জীবনযাপন করে, আর দলে দলে কিরূপে অতি বন্য পশুর মত মৃত্যুকবলিত হয়, পল্লীচিত্র আঁকিয়া তাহার এরূপ নিদারুণ মর্মঘাতী বিবরণ আর কেহ কি দিতে পারিয়াছেন ?

দেশের শিক্ষিত যুবকগণের কাছে শরৎচন্দ্রের বোধহয় একটা আবেদন ছিল। সে আবেদন অনেকটা বাঙ্গালার অকৃত্রিম যুবজন-সুহৃৎ শিক্ষাব্রতী পুরুষপ্রবর আশুতোষের পদবী সম্মান বিতরণী সভায় জলদ-গম্ভীর অনুযোগ-মধুর বক্তৃতার মতই শুনায়। অথবা জাতি ও সাহিত্যের শুভ-স্বপ্নদর্শী এই মহামানবের সাহিত্যিক অধিবেশনসমূহের ওজোগুণশালী সুচিন্তিত অভিভাষণগুলির মত কতকটা শুনায়। অবৈতনিক পাঠশালার বৈরাগী শিক্ষক বৃন্দাবন, বিলাত-ফেরত বীজাণু-গবেষক, কৃষকসহচর কৃষিশিক্ষক, আপন-ভোলা নরেন্দ্রনাথ, পীড়িত ও পীড়নকারী পল্লী-সমাজের উচ্চশিক্ষিত, একনিষ্ঠ অভিজাত সেবক রমেশ—শরৎচন্দ্রের এই কল্পনা বিগ্রহ-নিচয়ের কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা এদেশে হইবে না ? তাঁহাদের পরিকল্পনা কি লঘু শরদভ্র-খণ্ডের মত আকাশেই মিলাইয়া যাইবে ? দেশের সুশিক্ষিত সুপ্তোত্থিত যৌবন কি অজ্ঞতার গুরুভার জগদ্দল দেশের দীর্ণপঞ্জর বক্ষঃস্থল হইতে নামাইবার এতটুকু প্রয়াসও পাইবেন না ?

শরৎচন্দ্রকে শুধু নারীতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু অথবা পাতিত্য-প্রেমিক বলিয়া জানিলে যেমন ভুল হইবে, পশ্চিম সাগরের বীচিগণনাকারী আত্মদর্শনবিমুখ প্রগতিবাদীদিগের সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেখিলে তেমনই কৃতঘ্নতার পরিচয় দেওয়া হইবে। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পীর একটি সুস্থির সমাহিত সৌন্দর্য্যপিপাসু কবিব্যক্তিত্ব ছিল। নিসর্গতন্ময়তা, বস্তুসম্পর্ক-নিরপেক্ষ-ভাবাকুলতা, বিমান-বিসর্পি-কল্পনা-জীবিতা হয়ত সে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল না। বাস্তব সাম্প্রত জীবনরসে ছিল সেই ব্যক্তিত্ব ভরপুর, দুঃখ ও কারুণ্যের অনুভূতিতে ছিল তাহা তন্ময়। তাই তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গি ছিল সহজ অথচ সুন্দর, ঋজু অথচ ছন্দোময়। ভাষা ছিল তাঁহার নিরলঙ্কার অথচ শাণিত, সংক্ষিপ্ত অথচ দীপ্ত। ভাষা ও রীতি বিচার করিয়া এ ব্যক্তিকে যথার্থই বলা চলে 'The style is the man.'

পরিশেষে একটি কথা বক্তব্য। পাতিত্যের প্রতি শরৎচন্দ্রের ঘৃণা হয়ত আমাদের অপেক্ষাও তীব্রতর ছিল। কিন্তু সে ঘৃণা সত্যিকার পাতিত্যের প্রতি। পতিত-জ্ঞানে অবিচারে নির্মমভাবে উপেক্ষিত মহত্ত্বের প্রতি নহে। শ্রদ্ধাও ছিল তাঁহার মাহাত্ম্য-বিমণ্ডিত তথাকথিত পাতিত্যের প্রতি। পরম শুচি ও অকৃত্রিম তাঁহার এই

শ্রদ্ধা ও ঘৃণাটুকু। এই ভাব দুইটিকে ফুটাইতে গিয়া তিনি জীবনের বিষামৃতের একত্র মিলন ঘটাইয়াছেন। সু-কু, পাপ-পুণ্য তত্ত্বের এই একত্ব-দিদৃক্ষা কি অধ্যাত্ম-সম্পর্কী নহে ?

শরৎচন্দ্র সেই দেশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন—যে দেশের বহুজন-ধিক্কৃত আদিমস্মার্ত ধর্মকে 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ' বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন, যে দেশের পুরাণকথায় *মধুকৈটভ বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত-রূপে পরিকল্পিত, যে দেশের 'প্রচণ্ড-মনোহর' দেবতা শবগণের 'কর-সংঘাত' (সুকৃতি-দুষ্কৃতি ?) কাঞ্চী করিয়া পরিধান করেন এবং যে দেশের দেবীপ্রশস্তিতে সুকৃতিগণ-ভবনের শ্রীরূপিণীর সঙ্গে পাপাত্মতা-সম্ভবা অলক্ষ্মী মূর্তিও বন্দিতা হইয়া থাকেন। শরৎচন্দ্রের জন্ম সেই দেশে, যে দেশের রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক আকুলি-বিকুলির ভাষা, 'নে মা আমার পাপ, নে মা আমার পুণ্য'—যে দেশের আদি-গীতি কবির আত্ম নিবেদনের 'সহজ' সুর—

"সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালমন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য মম
তোমার চরণখানি।"

অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী এম-এ

অভিভাষণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুজনের সমাদর, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠদের প্রীতি এবং পূজনীয়গণের আশীর্ব্বাদ আমি সবিনয়ে গ্রহণ করলাম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাওয়া কঠিন। নিজের জন্ম শুধু এই প্রার্থনা করি, আপনাদের হাত থেকে যে মর্য্যাদা আজ পেলাম, এর চেয়েও এ জীবনে বড় আর কিছু যেন কামনা না করি। যে মানপত্র এই মাত্র পড়া হোল, তা' আকারে যেমন ছোট, আন্তরিক সহৃদয়তায় তেম্নি বড়। এ তার প্রত্যুত্তর নয় ; এ শুধু আমার মনের কথা ; তাই আমারও বক্তব্যটুকু আমি ক্ষুদ্র করেই লিখে' এনেছি।

এই যে অনুরাগ, এই যে আমার জন্মতিথিকে উপলক্ষ করে' আনন্দ প্রকাশের আয়োজন—আমি জানি, এ আমার ব্যক্তিকে নয়। দরিদ্র গৃহে আমার জন্ম, এই তো সেদিনও দূর প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জ্জনেই ব্যাপৃত ছিলাম ; সে দিন পরিচয় দিবার আমার কোন সঞ্চয়ই ছিল না। তাই তো বুঝতে আজ বাকি নেই—এ শ্রদ্ধা নিবেদন কোন বিত্তকে নয়, বিত্তাকে নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অতীত দিনের গৌরবকে নয়, এ শুধু আমাকে অবলম্বন করে' সাহিত্য-লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন।

জানি এ সবই। তবুও যে সংশয় মনকে আজ আমার বারম্বার নাড়া দিয়ে গেছে সে এই যে, সাহিত্যের দিক দিয়েই এ মর্য্যাদার যোগ্যতা কি আমি সত্যই অর্জ্জন করেছি ? কিছুই করিনি এ-কথা আমি বল্‌ব না। কারণ এতবড় অতি-বিনয়ের অত্যুক্তি দিয়ে উপহাস করতে আমি নিজকেও চাইনে, আপনাদেরও না। কিছু আমি করেছি। বন্ধুরা বল্‌বেন শুধু কিছু নয়, অনেক কিছু। তুমি অনেক করেছ। কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত যাঁরা নন, তাঁরা হয়ত একটু হেসে বল্‌বেন, অনেক নয়, তবে সামান্য কিছু করেছেন, এইটিই সত্য এবং আমরাও তাই মানি। কিন্তু তাও বলি যে, সে সামান্যের উর্দ্ধস্থ বুদ্‌বুদ, আর অধঃস্থ আবর্জ্জনা বাদ দিলে অবশিষ্ট যা' থাকে কালের বিচারালয়ে তার মূল্য লোভের বস্তু নয়। এ যাঁরা বলেন আমি তাঁদের প্রতিবাদ করিনে, কারণ তাঁদের কথা যে সত্য নয়, তা' কোন মতেই জোর করে' বলা চলে না। কিন্তু এর জন্যে আমার দুশ্চিন্তাও নেই। যে কাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্ত্তমানের সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হ'য়ে মিলতে না পারে পথ তাকে তো ছাড়তেই হ'বে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায় সে শুধু এই জন্যেই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্য্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে। ক্ষোভ না করে' বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবো যে, আমার দেশে, আমার ভাষায় এতবড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন এক দিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে।

নানা অবস্থা বিপর্যয়ে এক দিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সে দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম,তার সকল ক্ষতিই তারা আমার পরিপূর্ণ করে'দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ —তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক্, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা' আমার অপরাধ বলে' গণ্য করেছেন এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সব চেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না এ বিচার করেও দেখিনি—শুধু সে দিন

যাকে সত্য বলে' অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কিনা এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হয়। হঠাৎ শুনলে মনে ঘা লাগে, তথাপি এ-কথা সত্য বলেই বিশ্বাস করি যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হ'য়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব-চিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য্য বিকশিত হ'য়ে উঠে। মানবচিত্তই যে একস্থানে নিশ্চল হ'য়ে থাকতে পায় না! তার পরিবর্ত্তন আছে, বিবর্ত্তন আছে—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য্য বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুসী হ'য়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

মনে আছে দাশু রায়ের অনুপ্রাসের ছন্দে গাঁথা দুর্গার স্তব পিতামহের কণ্ঠহারে সে কালে কত বড় রত্নই না ছিল! আজ পৌত্রের হাতে বাসি মালার মত তারা অবজ্ঞাত। অথচ এতখানি অনাদরের কথা সে দিন কে ভেবেছিল?

কিন্তু কেন এমন হয়? কার দোষে এমন ঘট্‌ল সেই অনুপ্রাসের অলঙ্কার তো আজও তেম্‌নি গাঁথা আছে। আছে সবই, নেই শুধু তাকে গ্রহণ করবার মানুষের মন। তার আনন্দ বোধের চিত্ত আজ দূরে সরে' গেছে। দোষ দাশু রায়ের নয়, তাঁর কাব্যেরও নয়, দোষ যদি কোথাও থাকে তো সে যুগধর্ম্মের।

তর্ক উঠ্‌তে পারে, শুধু দাশু রায়ের দৃষ্টান্ত দিলেই তো চলে না। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী তো আজও আছে, কালিদাসের শকুন্তলা তো আজও তেম্‌নি জীবন্ত। তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। কিন্তু এর থেকে তার অবিনশ্বরতাও সপ্রমাণ হয় না। তার দোষ-গুণেরও শেষ নিষ্পত্তি করা যায় না।

সমগ্র মানব জীবনে কেন, ব্যক্তি বিশেষের জীবনেও দেখি এই নিয়মই বিদ্যমান। ছেলে বেলায় আমার 'ভবানী পাঠক' ও 'হরিদাসের গুপ্তকথা'ই ছিল একমাত্র সম্বল। তখন কত রস, কত আনন্দই যে এই দুইখানি বই থেকে উপভোগ করেছি, তার সীমা নেই। অথচ আজ সে আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ, কি আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ বলা কঠিন। অথচ এমনই পরিহাস, এমনই জগতের বদ্ধমূল সংস্কার যে, কাব্য উপন্যাসের ভাল মন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধদের 'পরেই। কিন্তু একি বিভ্রান্ত ইতিহাস? এ কি শুধু কর্ত্তব্য কার্য্য, শুধু শিল্প যে বয়সের দীর্ঘতাই হ'বে বিচার করবার সবচেয়ে বড় দাবী?

বার্দ্ধক্যে নিজের জীবন যখন বিস্বাদ, কামনা যখন শুষ্ক-প্রায়, ক্লান্তি অবসাদে জীর্ণ দেহ যখন ভারাক্রান্ত—নিজের জীবন যখন রসহীন, বয়সের বিচারে যৌবন কি বার বার দ্বারস্থ হ'বে গিয়ে তারই?

ছেলেরা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে যখন আমার কাছে উপস্থিত হয়—তারা ভাবে এই বুড়ো লোকটার রায় দেওয়ার অধিকারই বুঝি সবচেয়ে বেশী। তারা জানে না যে, আমার নিজের যৌবন কালের রচনারও আজ আমি আর বড় বিচারক নই। তাদের বলি, তোমাদের সমবয়সের ছেলেদের গিয়ে দেখাও। তারা যদি আনন্দ পায়, তাদের যদি ভালো লাগে, সেইটিই জেনো সত্য বিচার। তারা বিশ্বাস করে না, ভাবে দায় এড়াবার জন্যই বুঝি এ কথা বলচি। তখন নিঃশ্বাস ফেলে ভাবি, বহু যুগের সংস্কার কাটিয়ে উঠাই কি সোজা? সোজা নয় জানি, তবুও বলব, রসের বিচারে এইটেই সত্য বিচার।

বিচারের দিক থেকে যেমন, সৃষ্টির দিক থেকেও ঠিক এই এক বিধান! সৃষ্টির কালটাই হ'লো যৌবনকাল—কি প্রজাসৃষ্টির দিক্ দিয়ে, কি সাহিত্যসৃষ্টির দিক্ দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম করে' মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেম্‌নি ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বন্যা ঝরে' পড়ে' তার উৎসমুখ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।

আজ আমি বৃদ্ধ, কিন্তু বুড়ো যখন হইনি, তখন পূজনীয়গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' অনেকের সাথে ভাষা-জননীর পদতলে যেটুকু অর্ঘ্যের যোগান দিয়েছি, তার বহুগুণ মূল্য আজ দুই হাত পূর্ণ করে' আপনারা ঢেলে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদের নমস্কার করি।*

অভিনন্দন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আবার একটা বছর গড়িয়ে গেল। জন্মদিন উপলক্ষে সে দিনও এমনই আপনাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সে দিনও এম্‌নি স্নেহ, প্রীতি ও সমিতির একান্ত শুভ কামনায় আজকের মতই হৃদয় পরিপূর্ণ করে' নিয়েছিলাম, শুধু দেশের অত্যন্ত দুর্দ্দিন স্মরণ করে' তখন আপনাদের উৎসবের বাহ্যিক আয়োজনকে সঙ্কুচিত করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। হয়ত আপনারা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করেননি, সে কথা আমার মনে আছে। দুর্দ্দিন আজও অপগত হয়নি, বরঞ্চ শতগুণে বেড়েচে এবং কবে যে তার অবসান ঘট্‌বে তাও চোখে পড়ে না; কিন্তু সেই দুর্দ্দশাকেই সবচেয়ে উচ্চস্থান দিয়ে শোকাচ্ছন্ন গুরুতায় জীবনের অক্লান্ত আহ্বান অনির্দ্দিষ্টকাল অবহেলা করতেও মন আর চায় না। আজ তাই আপনাদের আমন্ত্রণে শ্রদ্ধানত চিত্তে এসে উপস্থিত হয়েছি।

---

* ১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসী প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর।

শুনেছি সমিতির প্রার্থনায় কবিগুরু একটুখানি লিখন পাঠিয়েছেন, Libertyতে তার ইংরেজী তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। তার শেষের দিকে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য সেবার অপ্রত্যাশিত পুরস্কার আছে। এ আমার সম্পদ। তাঁকে নমস্কার জানাই এবং সমিতির হাত দিয়ে একে পেলাম বলে' আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই লেখাটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার কথা-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের একটুখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। বিস্তারিত বিবরণও নয়, দোষগুণের সমালোচনাও নয়; কিন্তু এরই মধ্যে চিন্তা করার, আলোচনা করার, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক-নির্ণয়ের পর্য্যাপ্ত উপাদান নিহিত আছে। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' উল্লেখ করে' বলেছেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' তুলনায় এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। এর মূল্য স্বদেশ-হিতৈষণায়—মাতৃভূমির দুঃখ দুর্দ্দশার বিবরণে, তার প্রতীকারের উপায় প্রচারে, তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ 'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে' বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এমন কথা বোধকরি এর পূর্ব্বে আর কেউ বলতে সাহস করেনি। এ কথাও হয়ত নিঃসংশয়ে বলা চলে যে কথা-সাহিত্যের ব্যাপারে এই হচ্চে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত অভিমত। এই অভিমত সবাই গ্রাহ্য করতে পারবে কিনা জানিনে, কিন্তু যারা পারবে, উত্তর কালে তাদের গন্তব্য পথের সন্ধান এইখানে পাওয়া গেল। যারা পারবে না তাদেরও একান্ত শ্রদ্ধায় মনে করা ভালো যে, এ উক্তি রবীন্দ্রনাথের—যাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও instinct প্রায় অপরিমেয় বলা চলে।

গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় স্বদেশের দুঃখের কাহিনী, অনাচার-অত্যাচারের কাহিনী কি করে' যে লেখকের অন্যান্য রচনা ছায়াচ্ছন্ন করে' দেয় আমি নিজেও তা' জানি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় গিয়েও তা' অনুভব করে' এসেচি। বছর কয়েক পূর্ব্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমসাহিত্যসভায় একবার উপস্থিত হ'তে পেরেছিলাম। দেখলাম তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে' বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহুস্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন, বক্তার পরে বক্তা—সকলের মুখেই ঐ এক কথা—বঙ্কিম "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তি-যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত। সকলের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়লো একা 'আনন্দমঠে'র পরে। 'দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণচরিত্রের' উল্লেখ কেউ কেউ করলেন বটে, কিন্তু কেউ নাম করলেন না 'বিষবৃক্ষে'র, কেউ স্মরণ করলেন না একবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে। ঐ দু'টো বই যেন পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক, ওর জন্যে যেন মনে মনে সবাই লজ্জিত। তারপরে প্রত্যেক সাহিত্য-সম্মিলনীর যা' অবশ্য কর্ত্তব্য, অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্য-সেবীদের নির্ব্বিচারে ও প্রবলকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের স্মৃতি সভায় পুণ্য কার্য্য সে দিনের মতো সমাপ্ত হলো। এমনিই হয়।

কিন্তু একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। বঙ্কিমের মত অতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেও বাঙ্গলা ভাষায় নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ' ও কৃষ্ণকান্তের উইল'—বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দু'টি যিনি বাঙ্গালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে' আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল? কারণ, এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে স্বকীয় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে রবীন্দ্রনাথ হয়ত কোনদিন এ সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। আজ সকল কথা তাঁর বুঝিনি, কিন্তু সে দিন হয়ত আমার নিজের সংশয়ের মীমাংসাও এর মধ্যেই খুঁজে পাবো।

কবি তাঁর বাল্য-জীবনের একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে তাঁর চোখের দৃষ্টি-শক্তির ক্ষীণতা। এ তিনি জানতেন না। তাই, দূরের বস্তু যখন স্পষ্ট করে' দেখতে পেতেন না, তার জন্যে মনের মধ্যে কোন অভাব বোধও ছিল না। এটা বুঝলেন চোখে চস্‌মা পরার পরে। এর পরে চস্‌মা ছাড়াও আর গতি ছিল না। এমনিই হয়—এই-ই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম। বাঙ্গলার শিক্ষিত মন কেন যে 'বিজয় বসন্তের' মধ্যে তার রসোপলব্ধির উপাদান আর খুঁজে' পায়না, এই তার কারণ। মনে হয় আধুনিক-সাহিত্য-বিচারেও এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য রচনায় আর যাই কেন না হোক্, শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্ররুচি ও মার্জ্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারম্বার আঘাত করতে থাকলে বাঙ্গলা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক্, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হ'বে তার চেয়েও অনেক বেশী। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।

বলবার হয়ত অনেক কিছু আছে, কিন্তু আজকের দিনে আমি সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হ'ব না।

শেষের একটা নিবেদন। শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন মন দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, তার জবাব দিতে নেই।

আপনারা আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।*

শেষ প্রশ্ন

কল্যাণীয়াসু

এবার তোমার সাহিত্যের সম্বন্ধে বড় প্রশ্নটার উত্তর দিই।

তুমি সসঙ্কোচে প্রশ্ন করেছো, "অনেকে বল্‌চেন আপনি 'শেষ প্রশ্নে' বিশেষ একটা মতবাদ প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন—একি সত্যি?"

সত্যি কিনা আমি বল্‌বো না। কিন্তু 'প্রচার করলে—দুয়ো দুয়ো' বলে রব তুলে দিলেই যারা লজ্জায় অধোবদন হয় এবং না না বলে' তারস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকে আমি তাদের দলে নই। অথচ উল্টে যদি আমিই জিজ্ঞাসা করি এতে অত বড় অপরাধটা হ'লো

---

* ৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ-সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত।

কিসে, আমার বিশ্বাস বাদী-প্রতিবাদী কেউ তার সুনিশ্চিত জবাব দিতে পারবে না। তখন একপক্ষ বে-বুঝের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে কেবলই বল্‌তে থাকবে—ও হয় না—ও হয় না। ওতে art for art's sake নীতি জাহান্নামে যায়। আর অপর পক্ষের অবস্থাটা হ'বে আমাদের হরির মত। গল্পটা বলি। আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীর বছর চারেকের একটি ছেলের নাম হরি—সাক্ষাৎ শয়তান। মার-ধর গালি-গালাজ, একপায়ে কোণে দাঁড় করিয়ে দেওয়া—কোন উপায়েই তার মা তাকে শাসন করতে পারলে না। বাড়ীশুদ্ধ লোকে যখন এক প্রকার হার মেনেছে, তখন ফন্দিটা হঠাৎ কে যে আবিষ্কার করলে জানিনে, কিন্তু হরিবাবু একেবারে শায়েস্তা হ'য়ে গেল। শুধু বল্‌তে হোতো—এবার পাড়ার পাঁচজন ভদ্রলোক ডেকে এনে ওকে অপমান করো। অপমানের ধারণা তার কি ছিল সেই জানে, কিন্তু ভয়ে যেন শীর্ণকায় হয়ে উঠ্‌তো। এদেরও দেখি তাই। একবার বল্‌লে হোলো—প্রচার করেছে! art for art's sake হয়নি। কিন্তু কি প্রচার করেচি, কোথায় করেচি, কি তার দোষ, কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল—এ সব প্রশ্নই অবৈধ। তখন কেউ বা দিতে লাগলো গালা-গালি, কেউবা জোড় হাতে ভগবানের আরাধনায় লেগে গেল—"রূপকার যদি সংস্কারক হয়ে ওঠেন, তবে হে ভগবান ইত্যাদি ইত্যাদি"। ওরা বোধ হয় ভাবেন অনুপ্রাসটাই যুক্তি এবং গালিগালাজটাই সমালোচনা। তাঁদের এ কথা বলা চল্‌বে না যে, জগতের যা' চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তাতেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠ দেবী-চৌধুরাণীতে আছে, ইব্‌সেন-মেটারলিঙ্ক-টলষ্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েলসে আছে। কিন্তু তাতে কি? পশ্চিম থেকে বুলি আমদানি হয়েছে যে art for art's sake—এ সব যেন ওদের নখাগ্রে! গল্পের গল্পত্বই মাটি, কারণ চিত্ত-রঞ্জন হোলো না যে! কার চিত্ত-রঞ্জন? না আমার! গাঁয়ের মধ্যে প্রধান কে? না, আমি আর মামা।

তুমি 'চিত্ত-রঞ্জন' কথাটা নিয়ে অনেক লিখেচো কিন্তু এটা একবার ভেবে দেখোনি যে ওটা দু'টো শব্দ। শুধু 'রঞ্জন' নয়, 'চিত্ত' বলেও একটা বস্তু রয়েছে! ও পদাংশটা বদলায়। চিৎপুরের দপ্তরী-খানায় 'গোলেবকাওলির' স্থান আছে। ও অঞ্চলে চিত্ত-রঞ্জনের দাবী সে রাখে, কিন্তু সেই দাবীর জোরে বার্‌নার্ডশ'কে গাল দেবার তার অধিকার জন্মায় না। স্বীকার করি যে, বুলি আওড়ানোর মোহ আছে, ব্যবহারে আনন্দ আছে, পণ্ডিতের মতো দেখ্‌তেও হয়, কিন্তু উপলব্ধি করার জন্যে দুঃখ স্বীকার করতে হয়। অমুক for অমুক sake বল্‌লেই সকল কথার তত্ত্ব নিরূপণ করা হয় না।

নানা কারণে "পথের দাবী" রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। সে কথা জানিয়েও চিঠির শেষের দিকে লিখেছিলেন, "এ বই প্রবন্ধের আকারে লিখিলে মূল্য ইহার সামান্যই থাকিত, কিন্তু গল্পের মধ্যে দিয়া যাহা বলিয়াছ দেশে ও কালে ইহার ব্যাপ্তির বিরাম রহিবেনা।" সুতরাং কবি যদি একে গল্পের বই মনে করে থাকেন ত এটা গল্পের-ই বই। অন্ততঃ এটুকু সম্মান তাঁকে দিয়ো।

উপসংহারে তোমাকে একটা কথা বলি। সমাজ সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই। ওকাজ অপরের, আমি শুধু গল্প লেখক, তা'ছাড়া আর কিছুই নই।...ইতি—*

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শেষের ক'দিন

মানুষের জীবনে মৃত্যু যে একদিন আস্‌বেই তা' জান্‌লেও তার অনিশ্চয়তা এবং আকস্মিকতা একটা পরম স্বস্তির ব্যাপার; তাই বোধহয় এই বিশ্ব-লীলার পরিকল্পনায় তার স্থান এতবড়!

মৃত্যু তার করালরূপ আর বিরাট্ রহস্য নিয়ে কবে যে শরৎচন্দ্রের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তা' আর কেউ না জান্‌লেও তিনি যে জান্‌তে পেরেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ২৩শে ডিসেম্বর সকালে জনকয়েক বন্ধু এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন: নিশ্চয় সেরে উঠ্‌বেন আপনি। শরৎচন্দ্রের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠ্‌ল! বল্লেন তিনি: আজ কত তারিখ?

২৩শে ডিসেম্বর।

২৩শে জানুয়ারি আমার কথা মনে ক'রো তোমরা··· মনে থাক্‌বে? শান্ত হাসিটি! বল্লেন: কোন সন্দেহ নেই আমার!

জানুয়ারির সেই ২৩ আজই! সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হ'ল!

কোথায় শরৎচন্দ্র আজ!

পূজোর আগে দিন কয়েকের জন্যে এসেছিলাম, দেখ্‌তে তাঁকে।

ম্যালেরিয়ার কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে তিনি তখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নিয়ে মশগুল! কি ক'রে তাকে বাগে আন্‌বেন তারই উপায় খুঁজচেন।

* শ্রীমতী * * * সেনকে লিখিত পত্র।

শরীরকে তিনি অবহেলা ক'রতেন। খাওয়া দাওয়ার লেঠা হয়ত ছিল; কিন্তু ঘটা ছিল না।

দায়ে পড়ে ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত চা ছাড়ি ছাড়ি ক'রছেন; কিন্তু বহুদিনের পুরাতন বন্ধুটির মমতাও ত্যাগ করা কঠিন।

চায়ের বদলে বেলপাতার রসের পরীক্ষা, কিঞ্চিৎ কাঁচা দুধ আর চিনি সহযোগে আমি তখন চালাচ্চি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ক'রে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রলেন।

জিজ্ঞেস ক'রলেন: কতদিন চালাচ্চ?

মাস দেড়েক।

শরীর দেখে মনে হয়, এটা তোমার কাজে লেগেছে। আমাকে অনেকদিন অনেকে এর কথা ব'লেছে; কিন্তু জান ত আমার আলস্য। দেখি, উপকার হয় কিনা।

এই সময় তিনি শিশু-সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু ক'রেছেন। বন্ধু নরেন্দ্র দেবের অনুরোধে 'সোনার কাঠি'র জন্যে লালুর গল্প লিখেছেন।

লালু যে কে, তা' আমি চিনেছি কিনা জান্‌তে চাইলেন। বল্লাম: দুটোই সত্যি গল্প: তুমি বাস্তবকে সাহিত্যের পংক্তিতে তুলে' রূপদান ক'রেছ!

বল্লেন: বেশ লাগে ছেলেমেয়েদের গল্প লিখ্‌তে। এতদিন লিখ্‌লে কত লিখ্‌তে পারতাম। তুমি ফিরে এস, এবার ওদিকে মন দেওয়া যাবে···কিন্তু···

কি কিন্তু?

আমি পরিষ্কার বুঝেছি, আমার দিন সন্নিকট।

মৃত্যু ভয়?

হেসে বল্লেন: অব্যর্থ অনুমান, ভুল নেই; কেননা বাঁচার ইচ্ছেও নেই; সব জিনিষেই একটা নিদারুণ ঔদাসিন্য···কেন বলত?

কথা না ক'য়ে খানিকটা সময় কেটে গেল।

কি? কোন উত্তর দাও না যে?···ঠিক এম্‌নিটি হ'য়েছিল আমার মুকুয্যে মশাইএর। তাঁরও যেন রসবোধ চ'লে গিয়েছিল।

বল্লাম: বয়সও তাঁর যথেষ্ট হ'য়েছিল; তাঁর কথা ঢের আলাদা···জীবনে কাজ তাঁর ফুরিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তোমার কাজ যে অনেক বাকি শরৎ!

কি আর কাজ! রোগের যন্ত্রণা ভোগা ছাড়া?

দেশ তোমার কাছে সাহিত্যের দিক দিয়ে এখনও অনেক কিছু আশা করে।

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র বল্লেন: তা ঠিক; অনেক কিছু ক'রতে পারতাম; কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাতে করিনি। আজ বুঝেচি, সত্যিকার শরীর খারাপ কাকে বলে। ওগুলো বায়না ছিল।···অনেক কাজ বাকি র'য়ে গেল: সময় পেতাম তো অসমাপ্ত বইগুলো···

সে-সময় পাবে হয়ত!

আর পেয়েছি!

ভাগলপুর যাবার সময় এল; যেতে হবেই। যাবার সময় শরৎ বল্লেন: আমিও যাব বাড়ী, নবমী পুজোর দিন।

এই শরীর নিয়ে কাজ নেই শরৎ, তোমার গিয়ে সামতায়। তার চেয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে চল কোথায় চেঞ্জে যাওয়া যাক্‌। বয়স হচ্চে আর অবহেলা ক'রনা।

সেই বৈরাগ্যের হাসি!

চিঠি পেলাম। লিখ্‌চেন শরৎ; ডাক্তার কবিরাজেরা বলেন, আমার লিভারের শিরোসিস্‌ হ'য়েছে। রাজগৃহে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসা যাবে। সেখেনে একটা বাড়ীর ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তোমাকে চিঠি দিলে চ'লে এস।

সেই চিঠি পেলাম ভূতচতুর্দ্দশীর দিন। প্রকাশ লিখ্‌চেন: দাদার শরীর আরও খারাপ হ'য়েছে; তিনি আপনাকে আস্‌তে বল্লেন। খুব সব দরকারী কথা আছে আপনার সঙ্গে। কবে আস্‌বেন, জানাবেন।

কালীপুজোর পরের দিন সকালে রওনা হলাম। একখানা চিঠি দিলাম দেশে, আর একখানা বালীগঞ্জে।

এসে শুন্‌লাম: তিনি পরশু আস্‌চেন। নেহাৎ সেদিন না এলে, শনিবারে নিশ্চয়।

শুক্রবার সকালে মন চাইলে না আর দেরি ক'রতে।

রওনা হ'য়ে গেলাম ন'টার গাড়িতে। সাড়ে দশটার সময় সাম্‌তার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে' দেখি, জীর্ণ-শীর্ণ শরৎচন্দ্র পুকুরের পাড়ে ব'সে মাছ ছাড়াচ্ছেন। আমাকে দেখে' মলিন হাসি হেসে' উঠে এলেন।

কেমন দেখ্‌ছ আমায় ?

ভালো না।

সুরেন, আমার পেটে অবশ্‌ট্রাক্‌শান্‌ হ'য়েছে।

ডাক্তার দেখিয়েছিলে ?

নাঃ, ও আমি জানি।

কিন্তু অমন আন্দাজি জানায় ত কাজ হবে না ; চল ক'লকাতা গিয়ে একটা রীতিমত চিকিৎসা করা যাক্‌।

এ রোগের চিকিৎসা নেই···আমায় শান্তিতে যেতে দাও এই রূপনারায়ণের তীরে, প্রভাসের সমাধির পাশে।

কি যে সব বল তুমি, ব'লে ঘরে জামা-ছাড়তে পালিয়ে গেলাম।

শরৎ ইজিচেয়ারে বাঁকা হ'য়ে ব'সে আছেন। বল্লেন : আজ এ বাড়ীর ছুটি। ও বাড়ীতে সব্বারি নেমতন্ন। আজ যে ভাইফোঁটা। দিদি তো এখেনে নেই ; তবুও ওরা খুব উৎসাহ ক'রে লেগে গেছে···তুমিও যাবে ত ?

ও-বাড়ী তো আমার নতুন নয়।

তবে আমিও যাব তোমার সঙ্গে ; অনেকদিন যাইনি ওখানে।

বেশ, যেও।

বল্লাম বটে ; কিন্তু আমার মন চাইছিল না। যাবার সময় বল্লুম : তোমার আর গিয়ে কাজ নেই শরৎ। ওঁরা খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন, ব'লে পাঠিয়েছেন।

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন : ভারি শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যাব না ? সেইজন্যে যেতে দিচ্ছ না ?

একটু হাস্‌লাম, এ কথার কি উত্তর দেব ?

ফিরে এলে বল্লেন : তোমার সঙ্গে এক-সঙ্গে ব'সে খাইনি অনেকদিন : ইচ্ছে করে, সেই আগেকার মত···

রাতে এক-সঙ্গে ব'সে খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রেছেন নিজেই। উপরে গিয়ে দেখি : একখানা মস্ত কার্পেটের আসনের একপাশে একটা তাকিয়া, তার উপর শরৎচন্দ্র হেলে প'ড়ে খেতে ব'সেছেন।

অস্ত যাবার সময় হেলে পড়া চাঁদের মতই ঠিক দেখিয়েছিল কিনা জানিনে ; কিন্তু অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ ক'রেছিলাম ব'লেই মনে পড়ে আজ !

পরের দিন শনিবার, ক'লকাতা আসার কথা। যাত্রার কোন উদ্যোগই নেই। খানিকটা বেলার পর বড়-মা এসে বল্লেন : কৈ গো, তুমি ইষ্টিশানে যাবার জন্যে তো ব'ল্লে না !

যেতে কি পারব, বৌ ? শরীর যে ভাল নেই।

তবে থাক্‌গে আজ, ব'লে তিনি কর্ম্মান্তরে চ'লে গেলেন।

শেষকালে কাহারদের খবর গেল। তারা জানে, এই



চিতাশয্যায় শরৎচন্দ্র ছবি—শিশির সেনগুপ্ত

মানুষটির কাছে পান থেকে চুণ খসার জো নেই। তারা তক্ষুণি এসে দূরে ব'সে অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

দাড়ি কামাতে কামাতে শরৎ বল্লেন : দেখ্‌ কালীপদ, আমাকে বাচি-মাছের পোনা জোগাড় ক'রে দিতে পারিস্‌ ?

বাচিমাছ বাবু ? কি ক'রবেন ?

পুকুরে ছাড়বো রে।

পুকুরে ? ও মাছ হবে না বাবু।

তুই তো সব জানিস্‌ ; জানিস্‌ মুকুয্যেদের পুকুরে বাচি মাছ আছে ?

হাঁ, হাঁ, বড়বাবু ছাড়িয়ে গেছ্‌লো ; সে সিঁদুরে বাচি··· ঠিক বটে !

তবে ?

সে এখন পাওয়া যায় না।

যায় রে যায়; আমাকে আর শিখোতে হবে না।

কালীপদ অপ্রস্তুতের হাসি হাসতে লাগ্‌ল; বল্লে: বাবু, আপনি সব জানো; তোমাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

আচ্ছা, এই নে—রাখ তোর কাছে; কিন্তু বাচি আমার চাইই চাই; কবে দিবি? আমি দুচার দিনের মধ্যেই ফিরব।

কালীপদ খুশী হ'য়ে দক্ষিণা নিলে।

মনে থাক্‌বে? ঠকাস্ নে যেন।

সময় হ'য়ে আস্‌চে, বল্লুম: তবে আমি এগুই শরৎ? ধীরে সুস্থে যাব।

আচ্ছা, তোমায় পথে ধ'রে নেব।

হিসেব ক'রে দেখ্‌লাম, গাড়ি আসার দশমিনিট আগে নিশ্চয় পৌছব, সে কেন যতই সরিসৃপ-গতিতে যাই।

বিস্তৃত মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চ'লে গেছে পথটি! ধান প্রায় পেকে এসেছে। এলো-মেলো দুপুরের উতলা হাওয়ায় মাটি আর পাকা ফসলের গন্ধে চারিদিক ভরপুর। উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। চলেছি, আর ভাবচি কত কি! কিন্তু মনের এক কোণে প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন তার নিবিড় দুশ্চিন্তার জটাজাল মাথায় নিয়ে উর্দ্ধ-বাহু সন্ন্যাসীর মত দাঁড়িয়ে ব'লছে: পারবি কি? বাঁচাতে পারবি কি, শরৎকে?

কোলা ব্রীজের উপর গুম্-গুম্ শব্দ শুনে যেন হুঁস হ'ল, তাকিয়ে দেখি বীর-বিক্রমে আসছে ছুটে গাড়িখানা! ঘড়িতে দেখি, তখনও কুড়ি-মিনিট বাকি। পিছন ফিরে দূরে-দূরান্তরে দেখলাম প্রদীপ্ত রোদের উত্তাপে কাঁপছে মাঠের উপরের বাতাস! কিন্তু পাল্‌কি কৈ? দেখ্‌তে পাওয়া যায় না! কি হ'লো! ছুট্ ছুট্।

প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর থেকে দেখ্‌তে পেলাম দূরে জীবন চাকর ছুট্‌ছে কৃষ্ণসার হরিণের মত—পাল্‌কির আগে আগে।

জীবন হাঁপিয়ে এসে প'ড়ল। ওদিকে গাড়ি দাঁড়াল, কি দাড়াল না—আবার ফুঁকে গর্জ্জন করে—তাক্ষ বাঁশি বাজিয়ে চ'লে গেল।

শরতের পাল্‌কিখানা প্ল্যাটফর্মের সংকীর্ণ প্রবেশ পথে ধস্তাধস্তি ক'রতেই রয়ে গেল।

পাল্‌কি থেকে মুখ বাড়িয়ে শরৎ বল্লেন: সুরেন, গাড়িখানা আট্‌কাতে পারলে না, ইষ্টিশান মাষ্টারকে ব'লে?

আমি যে নিজেই এসে পৌছতে পারিনি। ট্রেণটা নিশ্চয় বিফোর-টাইম ছেড়ে গেছে!

তাই কি?

ভিতরে গিয়ে জানা গেল ট্রেণের সময়টা পনর মিনিট এগিয়েছে সে মাস থেকে। পল্লীতে সে খবর গিয়ে পৌছয়নি আমাদের।

তবু রক্ষে, শরৎ বল্লেন: আমি আর লজ্জায় বাঁচ্ছিলাম না: এম্‌নি একটা বদ-নাম আছে কিনা আমার!

ততঃ কিম্?

চল, ফিরে যাই বাড়ী। আমি বড় অসুস্থ; শুধু ব'লেছিলাম ব'লেই যাচ্ছিলাম।...কিন্তু তোমার যে ভারি কষ্ট হবে হেঁটে ফিরতে।

তা' একটু হ'লই বা। জুতোটা ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে মাটির পথে চ'ল্‌তে আরামই...কিন্তু.. পথটা এখনও—

ওটা কি পথ? ও যে বাঁধ...কত কষ্ট দিচ্ছি তোমায়। একটা পাল্‌কি নেও। ঘোর আপত্তি ক'রে দ্রুত পথ চ'ল্‌তে সুরু ক'রে দিলাম।

মা-কালীর প্রসাদ খেয়ে আর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার অতি-ভোজনে শরৎ একটা সঙ্কটময় অচল অবস্থায় এসে প'ড়লেন। ক'লকাতা যাওয়া স্থগিদ রাখ্‌তেই হ'ল।

পরের দিন সকালে নীচে এসে শরৎ বল্লেন: দেখ, আমার পেটের মধ্যে এই ক'দিনের খাবার গজ-গজ ক'রছে। একটা কিছু উপায় না ক'রলে তো প্রাণ যায়।

ডাক্তার ডাকি?

তার আগেই কিছু-একটা ব্যবস্থা কর।

নুন-গরম জল গ্লাস দুই খেয়ে যখন পেটের বোঝাইগুলো উঠে গেল, তখন দেখা গেল চার পাঁচদিন যা-কিছু খেয়েছেন —একটু গলেও নি—সৈনিকের মত সব খাড়া হ'য়ে র'য়েছে!

সুরেন, কিছু একটা উপায় করো।

ক'লকাতা যাওয়া এই অবস্থায় সম্ভব নয়; এখানকার সবচেয়ে ভাল ডাক্তার ডাকি?

কি করবে সে ?

আর কিছু না হয়, পথ্যের ব্যবস্থাটাও ত হ'তে পারে।

ডাক্তারবাবু এলেন। ভালোমানুষ লোকটি।

অনেক গবেষণার পর স্থির হ'ল: তরি-তরকারি, এমন কি ভাতও চ'লবে না। পাখীর মাংসের—জগ্‌ স্যুপ; দুধে অরুচি, ক্ষীর চ'লতে পারে।

শরৎ বল্লেন: আধ-সেদ্ধ ডিম, ডাক্তার ?

তাও খাবেন ? আচ্ছা···চ'ল্‌বেও···

না, না, ডিম আমার খুব সহ্য হয়; পেটে একটুও হাওয়া হয় না !

বেশ চলুক, দেখুন, কি রকম থাকেন।

ডাক্তার গেলে শরৎ বল্লেন: সবাই ফেল্‌চে অন্ধকারে ঢিল; কোনটাই লাগে না। চ'লচে এক্সপেরিমেণ্টের পর এক্সপেরিমেণ্ট !

সত্যি ! দিন চারেকের মধ্যে দেখা গেল: যে তিমির, সেই-তিমির ! সেই বেঁকে বসা, সেই ঘন ঘন ঢেকুর; সেই আইঢাই, সেই যাই-যাই !

একদিন শরৎ ডেকে পাঠালেন।

কি শরৎ ?

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দেখালেন: দেখছ এই গাছটা ? এটা ছিল একটা ল্যাংড়া আমের গাছ—কি দশা হ'য়েছে এর ?

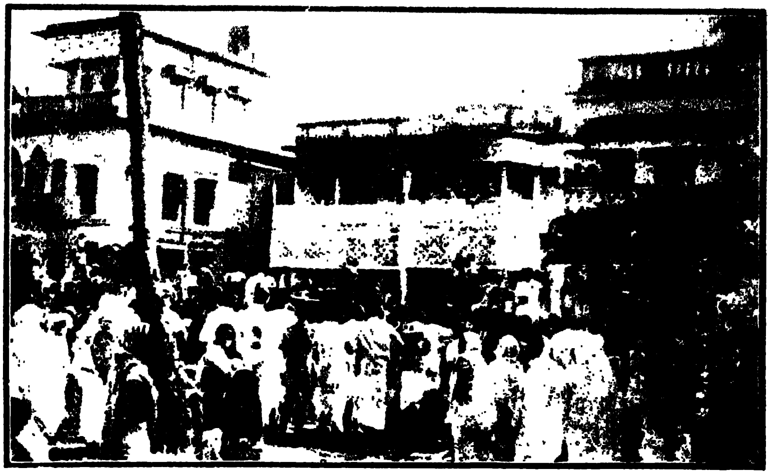
সোজা সুন্দর ছিল গাছটি, ঝোঁকড়া পাতা-ভরা; এখন নীচে থেকে উপর পর্য্যন্ত পাতাগুলি শুকিয়ে গেছে !

বল্লেন শরৎ: গেল বছরে খুব ফ'লেছিল, চমৎকার এত বড় বড় আঁব, কি মিষ্টি, কি সুন্দর স্বাদ—আর কোথাও কিছু নেই, এই দশা ! বলত' ব্যাপার কি ?

গাছটার দিকে সত্যি যেন চাওয়া যায় না। দেখ্‌লেই মনে হয়: নিকট ভবিষ্যতে একটা মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার অমোঘ সূচনা।

ঠিক সেই কথাই বোধ হয় তাঁর মনেও জেগেছিল। আমি কি বলি তার প্রতীক্ষায় আছেন যেন শরৎ। একটু অতর্কিতে, একটা উল্টোপাল্টা ব'লে ফেলাই স্বাভাবিক; কিন্তু আমাকে অতিশয় সতর্ক হ'তে হয়েছিল। তাই বল্লাম: এদেশের মাটি বোধহয় আমগাছের অনুকূল নয়। আমাদের ওখেনে এমনি ফলে-ফুলে পেঁপে গাছগুলো যায় হঠাৎ শুকিয়ে !

দেখছ না, পোকা কি রকম, একটা লাইন ধ'রে চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে, কুরে কুরে খেয়েছে ? কি ব্যবস্থা করি বল ত ?



শরৎচন্দ্রের বালীগঞ্জের বাটীতে জনতা ছবি—শিশির সেনগুপ্ত

পোকা মারা, গোড়ায় সার দেওয়া, লোনা কাটান এবং মাঝে মাঝে প্রচুর জল দেওয়া।

উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তবে বাকি গাছগুলোর করিয়ে দি ? বোল ধরার সময় ত আস্‌চে !

পরের দিন থেকে গাছের গোড়া খুঁড়ে—খোলের জল, চূণ, শিং-এর গুঁড়ো দেওয়া চল্লো। ছাতা মাথায় শরৎ ব'সে আছেন। দেখ্‌ছেন কাজে ফাঁকি দেয় কিনা লোকগুলো।

খানিকটা বেলা হ'লে গিয়ে বল্লাম: আজ আর ওদিক মাড়ালে না যে বড় ?

তুমি যে খোলা-হাওয়ায় থাকতে ব'লেছ। খোলা হাওয়ায় কিছু হয় কিনা জানিনে; কিন্তু এদের কাজের

কাছে থাক্তে বেশ লাগ্‌চে; আজ শরীরটাও ভাল বোধ ক'রছি। অন্তত যন্ত্রণা সব ভুলে গেছি; সেটাই সবচেয়ে বড় লাভ!

সেদিন জান্‌তাম না যে, ঐ ব্যাধির আর কোন চিকিৎসা ছিল না; শুধু ভুলে থাকাই ভাল থাকার একমাত্র উপায়!

এই খেলাই শরৎ অতি বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব ভাবে সুরু ক'রে দিলেন। ফুটে-যাওয়া রজনীগন্ধার গোড়ার গ্যাঁজগুলো রোদ-হাওয়া লাগার জন্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেওয়াতে লাগ্‌লেন!

কোথা থেকে এল গ্যাঁদার চারা। মৌসুমী ফুলের বীজ কি ক'রে পাওয়া যায় ভেবে ভেবে শরৎ একেবারে অধীর, আকুল—উতলা।

আমি হাসি।

শরৎ বলেন: ও আমার একটা মহা-দোষ। যা মনে হবে তা' তক্ষুণি চাই-ই চাই, নৈলে গেলাম আর কি!

ইম্পেসেন্স্ অফ জিনিয়াস্!

বড় বদ-রোগ আমার ওটা কিন্তু।

আচ্ছা, একটা উপায় দেখা যাক্—

উঠে ব'সে—উৎসাহ এবং আনন্দভরা চোখে চেয়ে বল্লেন: কি বলত?

সুবোধকে একটা চিঠি লিখে দিচ্চি—বীজ পাঠিয়ে দেবার জন্যে।

সুবোধ, কে সুবোধ?

চুঁচ্‌ড়োর গো।

ও আবার বীজ পাবে কোত্থেকে?

নিজের বাড়ীতেই; ওদের যে ভারি ফুলের সখ।

তাড়াতাড়ি লেখার সরাঞ্জাম বার ক'রে দিয়ে বল্লেন: বলে দাও আমার না হ'লেই নয়—চাই-ই চাই।

এমনি ক'রে পুকুরে মাছ ছাড়িয়ে, ফল ফুলের গাছের গোড়া খুঁড়িয়ে—তাতে সার দিয়ে, বিকেলে দাবা খেলে', শরৎ নিজেকে ভোলাতে লাগ্‌লেন। কিন্তু রোগ তাঁকে ভুলে রইল না।

এর ওপর চলেছে দুর্দ্দান্ত আত্ম-চিকিৎসা; ট্যাকাডাইম তো মিক অভ্ ম্যাগ্‌নেসিয়া;—থাবা থাবা সোডা, গোটা দুত্তিন ক'রে এক সঙ্গে জেনাস্পিরিণ, এমন দুচার বার দিনে। অবসন্ন বোধ ক'রলে—উন্‌কানিশ নির্জ্জলা।

নীচে নেবে এসে সেদিন সকালে শরৎ বল্লেন; যে-রেটে আমার জোর ক'মে আস্‌চে তাতে আর দু-চার দিনের মধ্যেই ওপরে উঠ্‌তে পারব না দেখ্‌চি।

সত্যিই জোর কমে আস্‌ছিল। চলন আর তেমন বলদৃপ্ত নেই। পা দুখানি শীর্ণ সরু হ'য়ে গেছে—আর তাতে একটা অবসন্ন লট-পট ভাব। মনে হয়, ওরা চায় এইবার সুদীর্ঘ বিশ্রাম!

বল্লাম: তোমার এই আন্দাজি চিকিৎসায়, প্যাটেণ্ট ওষুধের বান ডেকে যাওয়ায় ব্যর্থতা আসাই ত' স্বাভাবিক! বিজ্ঞান ভালোবাস বল, একি অবৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম পদ্ধতি? তুমি এদেশে ব'সে যদি জাহাজ জাহাজ প্যাটেণ্ট ওষুধ খাও ত টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কোন সুফলই আশা করা যায় না!

চেয়ারের উপর শুয়ে প'ড়ে তিনি বল্লেন: বাস্তবিক। বোধহয়, এই ক মাসে দুতিনশো টাকার বাজে ওষুধই ফেল্লাম খেয়ে!

সেইখেনেই যদি লেঠা চুকে যেতো তো বেঁচে যেতুম। ও-গুলো তোমার পেটে ঘা না ক'রে দেয়, এই আমার সবচেয়ে দুর্ভাবনা!

মানা কর না কেন?

শুনবে তুমি?

নিশ্চয়।

বেশ, আমি বলি ছাড় আগে সোডা আর জেনাস্পিরিণ।

রাজি আছি, রাতে যদি ঘুমের অসুবিধে না হয়।

খাওয়াও তোমার বদ্‌লাতে হবে। তোমাকে সম্পূর্ণ তরল খেয়েই থাক্‌তে হবে। কঠিন জিনিষ যে কিছুই সহ্য হয় না!

কিন্তু ওতে যে আমার কিছুমাত্র রুচি নেই···

জানি, কিন্তু ভাত কি লুচি---শক্ত জিনিষ খেলেই তো তোমার কষ্টের শেষ থাকে না—তাত বুঝতেই পার, শরৎ!

মুস্কিল করলে দেখছি, ব'লে শরৎ চুপ্‌টি ক'রে ব'সে রইলেন।

আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছে। নদী থেকে ঝড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া উদ্দাম হ'য়েই ছুটে আস্‌চে—সেদিন আর ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না।

লেখার ছোট্ট ঘরটির সাম্‌নে শরৎ গুটি-গুটি হ'য়ে চেয়ারের ওপর শুয়ে আছেন। ঘরের মধ্যেও যাবেন না, বিছানাতেও শোবেন না।

মেঘমলিন ছায়াচ্ছন্ন দিনের অবসানে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ব'সে পরামর্শ ক'রছি : ক্ষীর সহ্য হয়না, দুধে অরুচি, শুধু ওট-মীল-পরিজ খেয়ে কি ক'রে চলে, মশাই ?

কিন্তু, ডাক্তার বলেন, উপায়ও ত নেই ; ক'লকাতায় নিয়ে যান না। একটা সু-চিকিৎসা না হ'লে……

এমন সময় ঝড়ের গতিতে একখানা পাল্‌কি এসে প'ড়ল। তা থেকে নেবে এলেন মাথায় টুপি একজন হিন্দুস্থানী যুবক।

এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস ক'রলেন : শরৎবাবুর বাড়ী ? তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই…

তিনি বড় অসুস্থ—ঐ ব'সে আছেন।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে যুবকটি কাছে গিয়ে ব'সে বল্লেন : এ কি হ'য়েছে আপনার ?

শেষের পথে যাত্রা সুরু ক'রে দিয়েছি, দেখ্‌ছনা ভাই !

যুবকটি শুব্ধ হ'য়ে কাছে ব'সে রইল। আলো এলে দেখা গেল, শরৎ চোখ বুজে শুয়ে আছেন। একখানা হাত টেনে নিয়ে বিদেশী বন্ধুটি বল্লেন : চলুন আমাদের দেশে। সেখানকার জল, সেখানকার হাওয়ায় আপনি মোটা-তাজা হ'য়ে উঠ্‌বেন।

এই বয়সে ? শরৎ জিজ্ঞেস ক'রলেন।

কি বয়স আপনার ? আমাদের দেশের সত্তর বছরের বুড়োর ছাতিও (বুক) এত্তোখানি উঁচু…চলুন আপনি সেই দেশে !

সেই অবিশ্বাসের হাসি !

লক্ষ্ণৌএ যুবকটির বাড়ী। কণখলে তাঁদের হাওয়া বদলাবার জন্তে বাড়ী আছে, সেইখানে গিয়ে থাকার অনুরোধ করলে, শরৎ উৎসাহভরে উঠে ব'সে বল্লেন :—

কিন্তু ভারি যে শীত হবে সেখেনে : আমি কি সে শীত সহ্য করতে পারব ?……আচ্ছা ভেবে দেখি : পরশু আমি ক'লকাতা যাব। সেখেনে গিয়ে তোমায় চিঠি দেব। তার পর তুমি সব ঠিক ক'রো।

দিস্তেখানেক লুচি উড়িয়ে সবল স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহ নিয়ে যুবকটি পাল্‌কিতে চ'ড়ে ব'সে ঝড়ের মতই ইষ্টিশানের দিকে ছুটলেন শেষ ট্রেণ ধরবার জন্তে !

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটি ছোট্ট গবাক্ষ খুলে দিয়ে যেন তারার আলো দেখে' আর মুক্ত আকাশের হাওয়া খেয়ে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম !

তা হ'লে পরশু যাওয়া হচ্ছে কলকাতা !

অটল হ'য়ে দেশের বাড়ীতে থেকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার কঠোর এবং দৃঢ় সংকল্পের নিষ্পেশনে আমরা যেন দম আট্‌কে মারা যাচ্ছিলাম !

ডাক্তার যাবার সময় চুপি-চুপি কানে-কানে ব'লে গেলেন : আর একদিনও দেরি ক'রবেন না—এই সুবর্ণ-সুযোগ !

আশা হ'ল ; কিন্তু তার চেয়ে বড় ভয় ; মত বদলাতে কতক্ষণ !*

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

---

* শরৎচন্দ্রের একটি জীবনী লেখার জন্ত আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আমাকে অনুরোধ ক'রেছেন। শরৎচন্দ্র আমার আত্মীয় ছিলেন ; কিন্তু শুধু সেই সম্পর্কেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলামনা ; আমি তাঁর আবাল্যসহচর এবং বন্ধুও ছিলাম। তিনি যৌবনে আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং আজীবন সাহিত্য-গুরুরূপে তাঁকে পেয়ে এসেছি। তাঁর পরলোকগমনের পর জীবনী লেখার আহ্বানটি একটি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি। সেই জন্তে হরিদাসবাবুর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কিন্তু এই সুবৃহৎ কাজটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলা নিশ্চয় একার কর্ম্ম নয়। শরৎচন্দ্র বহু-ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাই তাঁর ভক্ত, অনুরক্ত এবং বন্ধুজনের কাছে নিবেদন যে তাঁরা আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রে এই বিরাট কাজটি সুসম্পন্ন করার সহায়তা করেন।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠি-পত্রের নকল, তাঁর কাছে শোনা গল্প কাহিনী প্রভৃতি হরিদাসবাবুর কেয়ারে ভারতবর্ষ আপিসে লিখে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের সবিশেষ বাধিত করবেন। ইতি ২০শে মাঘ ১৩৪৪।

ঘরের মানুষ—শরৎচন্দ্র

যার জন্য সাধনা নেই, আয়োজন নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে বস্তুকেও মানুষের আদর কত! ক্লেশলেশহীন সুদূর যাত্রাপথের নিঃসঙ্গতার মধ্যে যদি সাথী এসে জুটে: অনেকের কাছে সে যেন পরম বিত্ত। যাত্রাশেষে ক্ষণিকের সে সাথীর জন্য বুঝি বা বিচ্ছেদ বেদনাও জাগে।

কিন্তু ঈপ্সিত যদি মনের মত হয়ে আসে, তার চেয়ে আর প্রিয় কে আছে? যার জন্য প্রদীপ জেলে পথ আলো করে রেখেছি, পরম আকাঙ্ক্ষিত সে মানুষটি যদি লগ্ন মেনে নাচ দরজায় এসে দাঁড়ায়—হাসিমুখে বলে —"এসেছি"—তাকে কি না ভালবেসে থাকা যায়?

বাঙ্গালীর জীবনে শরৎবাবুর আবির্ভাব আমার মনে এমনি একটি ছবি ফুটিয়ে তুলে। বিয়ের রাত্রে বরের আবির্ভাবের মত—আবশ্যক, অবশ্যম্ভাবী, প্রিয় এবং প্রার্থিত হলেও এ আগমন আকস্মিক। চাইছি বলেই পাবো, এমন সৌভাগ্য কয়জনের? কিন্তু পাওয়া গেল!

প্রথম শরৎসম্বর্দ্ধনায় তাই আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ের উৎসব মিলে একটা উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল—প্রশ্ন, সন্ধান আর কৌতূহলের অন্ত নেই—এবং যেদিন জানা গেল অপরিচিতের বেশে এলেও তাঁর চারপাশে কোন রহস্য নেই, জটিলতা নেই, আমাদেরই ঘরের মানুষ, বাঙ্গালী —সেদিন মনে প্রাণে সুখী হয়েছি। আত্মীয় বিয়োগের মত আজ শরৎবাবুর তিরোভাব তাই মর্ম্মান্তিক।

... ...

শরৎবাবুর উদয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা অনিবার্য্যতা ছিল। তিনি আপন মহিমায় যে আসন অধিকার করেছিলেন বাঙ্গালীর মনে সে আসন যেন পাতা ছিল, এই আগমনের অপেক্ষা করে। না এলে যেন চলত না—অসম্পূর্ণতা থেকে যেত।

শরৎবাবু এলেন ইংরেজীতে যাকে বলে সাজান রঙ্গমঞ্চে। একশ বৎসর ধরে বাংলায় নব-জীবন-যজ্ঞ চলেছে—বিরাট সব মানুষ বাংলার মাটীতে বিচরণ করছেন—রামমোহন এসেছেন, বঙ্কিম এসেছেন, ভূদেব, মধুসূদন, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—শান্তির মন্ত্র নয়, যীশুর মত সকলেই এনেছেন নিশিত তরবারি। আত্মবিস্মৃত জাতিকে নব জীবনের দীক্ষা দেবার সে কি মহামহিম আয়োজন। আকাশে বাতাসে বিপ্লবের বাণী, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে বিদ্রোহের দ্যোতনা।

বাঙ্গালী ভয় পেয়েছে, অভিমান করেছে, দ্বন্দ্ব করেছে—কিন্তু বিরাটের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেনি—অপ্রস্তুত সুপ্তিমগ্ন গ্রামে বন্যার অতর্কিত আক্রমণের মত এসেছে বিরোধী ভাবের প্লাবন। ভাবালুতার অন্ধকারে শত্রু মিত্র নির্ণয় হয়ত কঠিন হয়েছে—পথ ভুল করেছে, কিন্তু বাঙ্গালী যুদ্ধবিরতির সাদা পতাকা হাতে নিতে লজ্জা পেয়েছে। সে এক অপূর্ব্ব কাহিনী—বাঙ্গালীর বিচিত্র ইতিহাসে সে এক নব পর্য্যায়।

প্লাবনের শেষে পলির মত ভাব—দ্বন্দ্বের বিরতিতে দেখা গেল জাতি লাভ করেছে—নূতন মতি নূতন গতি, নব নিষ্ঠা ও অভিনব দৃষ্টি—এবং সবচেয়ে নূতন যে এই পরম প্রাপ্তিকে ব্যক্ত করবার মত সে পেয়েছে শক্তিমতী বাণী। 'আবার মানুষ হবার' আশা নিয়ে জাতির অগ্রসরের কাহিনী হয়ত অনেকের কাছে অপরিচিত নয়।

কিন্তু বিরাটের জয়-তিলক আঁকা এই বীরের ভিড়ে সাধারণ বাঙ্গালী যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। বাংলার সে যুগের এই অসামান্য মানুষগুলি যেন পর্ব্বতশিখরের মত দুরধিগম্যতার মহিমায় আসীন। নাগরিক জীবনে মানুষ মানুষকে জানতে পায় না, জানবার চেষ্টাও করে না—এই না-জেনে থাকায় সে অভ্যস্ত। গ্রামের গণ্ডীর মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব অপরিচয়ের অপূর্ণতা মানুষকে পীড়া দেয়। পরিচয়ের বা আয়ত্তের অতীত লোকে যে থাকে তাকে নিয়ে অনাগরিকের অস্বস্তির আর সীমা নেই।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠিক এমনি একটি অস্বস্তি বাঙ্গালীকে ক্ষুব্ধ করেছিল—দুরূহ ভাষা, দুরারোহ ভাব শিখর এবং সুদুর্লভ সঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে অনেক'দন তাদের কাছে পর করে রেখেছিল।

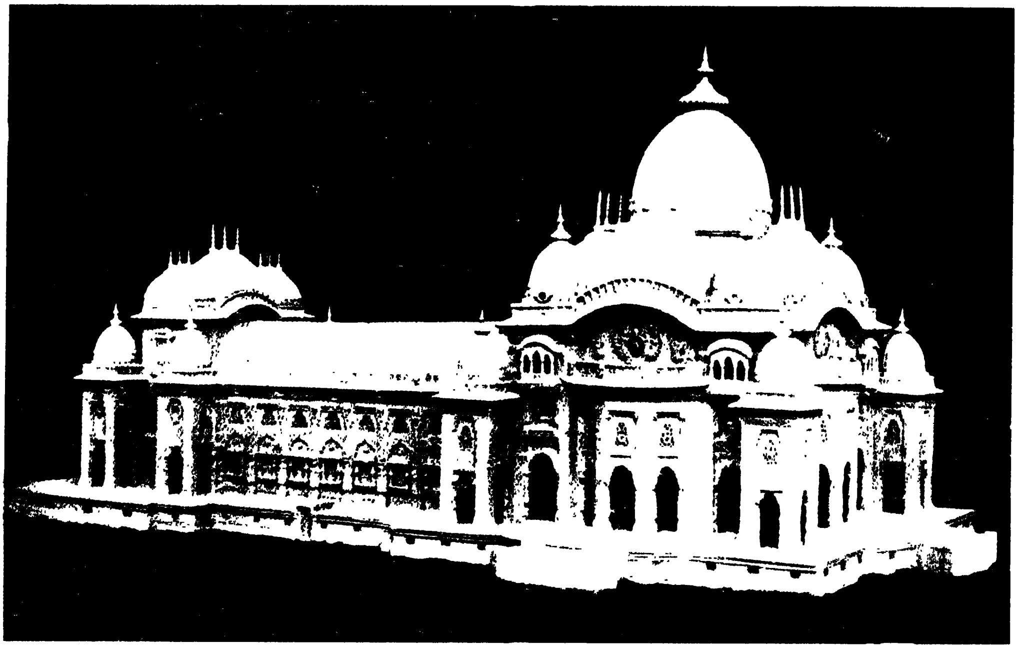
সান্নিধ্যলোভী বাঙ্গালী তাই এমন একটি মানুষের আশায় মনে আসন সাজিয়ে বসে ছিল—বাইরের হলেও যিনি ঘরের বলে উৎসব করা যায়। "দাদা" বলে এক ছুটে কাছে যাওয়া যাবে, হাসিমুখে কথা কইতে বাধবে না এবং ভেবে কথা বলতে হবে না—তবে না আপন?

এ হেন সময় এলেন শরৎচন্দ্র—প্রার্থিত এ আবির্ভাব—

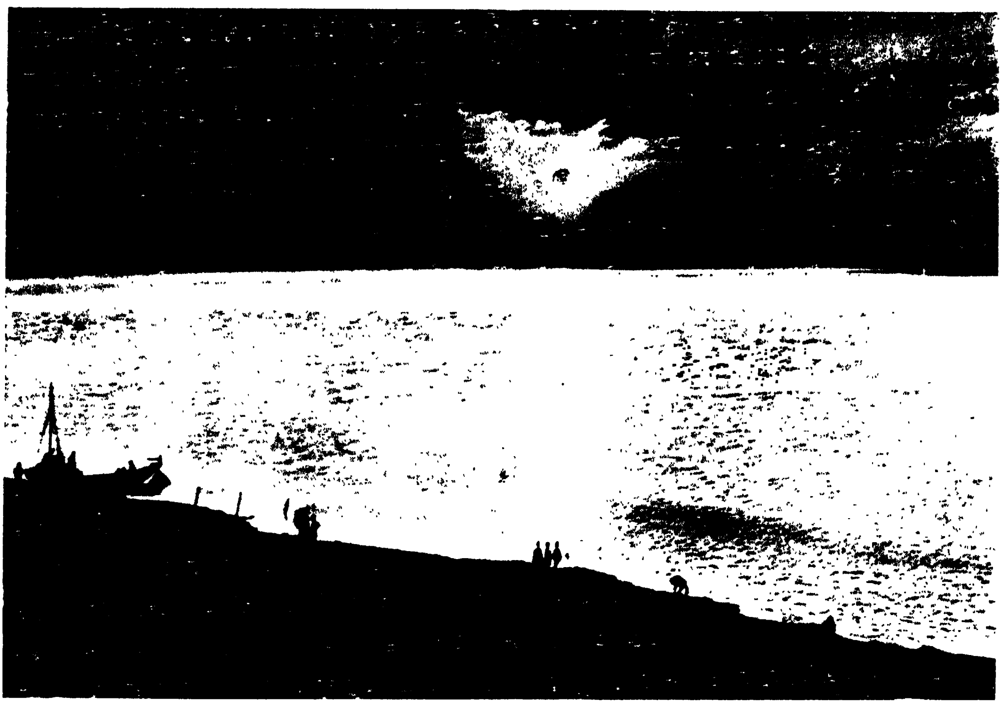




শরৎচন্দ্র



বেলুড়ে শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণদেবের নবনির্ম্মিত মন্দির



চলে যায়

ছবি—শ্রীহিমাংশু সরকার

এমন আপন করে অসামান্যকে বাঙ্গালী কোনদিন তার চণ্ডীমণ্ডপে পায় নি। যতটা আশা ছিল, শরৎচন্দ্র নিঃশেষে তা পূরণ করেছেন এবং কৃতার্থতার নির্বাধ আনন্দে জাতি তাকে আদর করেছে।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের একটি বিশেষত্ব যে তা আকস্মিক। ছোট বড় ভালমন্দ রচনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে জানতে হয়নি। তিনি এলেন সাজান রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণ সজ্জায় প্রস্তুত ভূমিকায়।

"মন্দির" "বড়দিদি" হয়ত সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের অন্যমনস্ক দৃষ্টি এড়িয়েছে, কিন্তু "বিন্দুর ছেলে" "রামের সুমতি" প্রমুখ রচনাবলী থেকেই জাতির শিক্ষিত দলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়ের সূত্রপাত। বাণী সেবার বলিষ্ঠ নিষ্ঠায়, নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে, অপূর্ব্ব প্রকাশ-কৌশলে তিনি যেন সামান্যকালের মধ্যেই চিরপরিচিত হয়ে উঠলেন।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য নিতান্ত অল্প—বেশী করে হিসাব করলেও তা ঘণ্টা দশেক হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পড়ার ঘরে প্রথম পরিচয়ের চিত্রটি আজও আমার মনে অম্লান।

সেদিন শরৎবাবু সঙ্গে এনেছিলেন গ্রামের গন্ধ। তাঁর দৃষ্টির, ভাষার ও ব্যবহারের ঋজুতায় ছিল গ্রাম-জীবনের আন্তরিকতা। সে সন্ধ্যার আবেষ্টনের মধ্যে শরৎবাবুকে খাপ খাওয়ান মুস্কিল, অথচ বুঝতে দেরী হয় না যে তার মধ্যে 'কায়দা' ছিল না। যদি কোথাও originality থাকে, সে তাঁর sincerityর রূপ ভেদ মাত্র।

প্রত্যেক মানুষের একটি বিশিষ্ট গতি আছে—গতির নিয়মে ছন্দ মেনে চলার মধ্যেই যেন জীবনের সার্থকতা। ছন্দচ্যুতির মধ্যে থাকে পরিণতিহীনতার দ্যোতনা। আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের ছন্দ ছিল এই আন্তরিকতায়।

মুখোস পরে বিরাটের অভিনয় করবার যার সাধ, সে শুধু বিদ্রূপ কুড়োয়—মানুষের যদি কোন সাধনা থাকে সে কেবল আপন হবার। আপনাকে অতিক্রম করবার কল্পনা, পৃথিবীর বাইরে যাবার ইচ্ছার মতই অসার, হাস্যকর।

যে সকল রচনায় শরৎচন্দ্র 'দেশের দুলাল', তার মধ্যে তাঁর এই আন্তরিকতা সরল ও সবল আবেগে রূপায়িত হয়েছে। বোধ ও দৃষ্টি এত পরিচ্ছন্ন যে আয়াসের চিহ্নমাত্র নেই। বিরাট বোধের জটিলতাহীন রচনাবলী বাঙ্গালী পাঠককে সেদিন অপূর্ব্ব তৃপ্তি দিয়েছিল। অপরিচিতের সঙ্গে পরিচয়ের "দুর্ব্বোধ্য" রসগ্রহণ চেষ্টার ক্লেশ থেকে শরৎচন্দ্র তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

অতি সান্নিধ্যের ফলে যা ছিল নগণ্য, অতি পরিচয়ে যা ছিল অবহেলিত—তার সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের আবেশ শরৎচন্দ্রের রচনায় যে লীলায় প্রস্ফুটিত তেমন আর কোন দিন বাংলায় হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের কথা বাংলার ঘরের কথা, কিন্তু সে ঘরে থাকে পুরন্দর আর শ্রীগোরা আর বিনোদিনী—ইন্দ্রনাথের বা "দিদির" সেখানে যাবার সাহস হত কি ? বিশেষ নয়, কুলি বাঙ্গালী নির্ব্বিশেষ যে ঘর আশ্রয় করে আছে শরৎচন্দ্র তাঁদের কথাই বলতে চেয়েছিলেন—

বাঙ্গালীকে শরৎবাবু দিয়েছেন তার আশার অতিরিক্ত—কিন্তু মনে হয় তার অপেক্ষা এবং তার সাধ যে তিনি পূরণ করেছেন, এতেই বাঙ্গালী চিরকৃতজ্ঞ, চিরকৃতার্থ।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস। শরৎচন্দ্র তখন থাকতেন পাণিত্রাসে। তাঁর বালীগঞ্জের বাড়ী তখনো তৈরি হচ্ছে। হুগলীজেলা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হবার অনুরোধ নিয়ে আমরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। অনেকদিন তিনি কোন সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন নি। মনে ভয় ছিল, আমাদের অনুরোধ হয়ত তিনি রাখবেন না। তাই ক্ষুদ্রজনের উচ্চ অনুরোধের সুদৃঢ় রক্ষাকবচ হিসাবে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সঙ্গী। মনে মনে ভয় থাকলেও ভরসা ছিল, বাতপঙ্গু মামার এই কষ্টস্বীকার দেখে শরৎচন্দ্র হয়ত আমাদের উপেক্ষা করতে পারবেন না।

দেউলটি ষ্টেশনে নেমে একটু এগিয়ে যেতেই শরৎচন্দ্র যে গ্রামের লোকদের কত প্রিয় তার পরিচয় পাওয়া গেল। শরৎবাবুর বাড়ী কোন্ পথে যাব জিজ্ঞেস করতেই কয়েকটি লোক উপযাচক হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এসে খানিকটা

এগিয়ে দিলেন। দু-একটি কথাবার্তার পর একজন তাঁর পরিচয় দেবার ছলে বললেন, আমাদের গ্রামের জন্তে তিনি কত করেছেন মশাই। স্কুল, রাস্তা, কত কি! একান্ত ভালবাসার পাত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বরে যে শ্রদ্ধা এবং মুখে যে হাসির উদ্ভাস দেখা যায় তা-ই ছিল এই লোকটির।

মাঠের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা এবং বাঁধের উপরকার ধূলিভরা উঁচুনীচু পথ পেরিয়ে পাড়ার ভিতরকার দু-একটি ভাঙা-ভাঙা জটিল রাস্তা শেষ করে পৌছলুম শরৎচন্দ্রের বাড়ী। বাড়ীটা একেবারে রূপনারায়ণের উপর। সামনেই স্বচ্ছ অল্পবিক্ষুব্ধ নদ। ভাগীরথী-তীরের লোক আমরা নদীর অত রূপালি জল দেখিনি। পাশে একটি বারান্দায় শরৎচন্দ্রের বসবার আসন। বারান্দার সামনে নদীর দিকে একটি ছোটঘর—এদিকে ওদিকে কয়েকখানি ইংরেজী বই আর কাগজপত্র, লেখার সরঞ্জাম। বসবার আসনের ঠিক সামনে ছোট্ট একহারা একটি জানলা, তার ভিতর দিয়ে রূপনারায়ণ হঠাৎ এসে চোখে পড়ে। বাইরে বারান্দায় দুটি-তিনটি শরৎচন্দ্রের নিজস্ব আসন—আরামচৌকি, লেখার সরঞ্জাম এবং এক একটি বড়রকমের গড়গড়া। শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বসে লেখাপড়ার কাজ করতে পারেন না, তার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর খেয়ালি চঞ্চল মনের পুরো পরিচয় পেলুম যখন তিনি সলজ্জভাবে আমাদের বসবার আসন নির্দেশ করে দিয়ে বারান্দায় খুব তাড়াতাড়ি পায়চারি সুরু করে দিলেন। দেখলুম, তাঁর শীর্ণ মুখের মধ্যে অপরূপ হচ্ছে তাঁর স্নিগ্ধ ভাবময় দৃষ্টি। এর মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি নয়, দরদী চিত্তের একটা ভাবনিবিষ্টতা সকল মানুষকেই আকৃষ্ট করে। তাঁর মুখের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাকের গর্ত দুটি।

কিছুক্ষণ পরে স্থির হয়ে বসলে আলাপ সুরু হল। উপেনবাবুকে বললেন, কিছু একটা মতলব নিয়ে নিশ্চয়ই এসেছ উপীন। উপেনবাবু স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টিকথার ফাঁকে আমাদের আর্জি পেশ করলেন। তিনি সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব শুনে তো চিৎকার করে উঠলেন। ছোটছেলের মত না-না করতে লাগলেন। সাক্ষাতের প্রথমে যে অসামাজিক ভাব দেখিয়েছিলেন, বুঝলুম, তা তাঁর মনের সলজ্জতা মাত্র; একবার আলাপ সুরু হয়ে গেলে ঘরোয়াভাবে অজস্র কথাবার্তা বলে যান। সঙ্গে সঙ্গে বৈঠকী খোস গল্পের চাটনিও মেলে।

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে অনেক সমস্যা এসে পড়েছিল। সব কথার পুরোপুরি পরপর বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। কথাবার্তার মধ্যে মানুষ শরৎচন্দ্রকে যেমন দেখেছিলুম, তার কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করব। কথাশিল্পের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর—তাঁর গুণ এবং ত্রুটি, মহিমা এবং দুর্বলতা—দুই নিয়েই তিনি যা তাই। আমাদের দেশে প্রতিভাসম্পন্ন লোকদের কথা বলতে গিয়ে সাধারণত আমরা ভক্তির প্রাচুর্যে মানুষটিকে নিজেদের কল্পনায় তৈরি করে দেখ্‌বার চেষ্টা করি। মহিমা এবং দোষ ত্রুটি নিয়ে মানুষটির সত্যিকার পূর্ণ ছবি সহ্য করার শক্তি আমাদের থাকে না। মিথ্যার মোহ এমনি প্রখর। শরৎচন্দ্রকে আমরা শ্রদ্ধা করি—শরৎচন্দ্র যা ছিলেন তার জন্যই--তিনি যা'হলে আরও ভাল লাগ্‌ত তার জন্যে নয়।

সভাপতি হতে রাজী হয়ে শরৎচন্দ্র বললেন, দেখো তোমাদের এই সব বড় বড় সভা আমার মোটে ভাল লাগে না। সভাপতিত্ব করতে গিয়ে দেখেছি, ক'ঘণ্টা বসে রইলুম, না হল গ্রামের পাঁচজনের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ, না কারো সঙ্গে মেলামেশা। সভা করে দশটা প্রবন্ধ পড়ার কোন সার্থকতা বুঝি না—শ্রোতাদের মধ্যে খুব কম লোকেই শোনে। তার চেয়ে ছোটখাটো বৈঠক কর, যাব—দশজনের সঙ্গে গল্প করব, আলাপ পরিচয় হবে—বেশ ভাল লাগবে।

কথা হতে হতে শরৎচন্দ্র হঠাৎ হাঁক দিয়ে বললেন—ওরে, তামাক দে না। কয়েক মুহূর্তপরেই 'পুরাতন ভৃত্যের' মত অম্লানবদনে তাঁর খাসচাকর এসে একটা মস্ত বড় কল্কে গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে গেল। তিনি চেয়ারে শুয়ে পড়ে বেশ আরামে টানতে লাগলেন। আমরা জানালুম, আমাদের সভায় রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধ পাঠাবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন, কবি শুনেছেন যে আমি সভাপতি হব? তাঁর গলার স্বরে বেদনার অস্পষ্ট সুর বাজল। উপেনবাবু হেসে বললেন, কবির বিরুদ্ধে কিছু বল না হে, এরা ভক্তদের এক মহাপাণ্ডা। তারপর গম্ভীর হয়ে মূল কথাটায় ফিরে এলেন, দেখো শরৎ,

কবির ওপর তুমি অভিমান করো ভুল বুঝে। কবি তোমাকে খুবই স্নেহ করেন।

—আমারো কি তাঁর প্রতি ভক্তি কিছু কম! জবাব এল—বারবার তো বলি তাঁর কাছ থেকে আমি অনেক পেয়েচি। ওঁর সাহিত্যের যে তুলনা হয়না আমাদের দেশে। অবাক হয়ে ভাবি, এতবড় প্রতিভা এদেশে জন্মালো কি করে! তাঁর কাছে আমরা যে কিছুই নয়।

কথাপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাবার কথা উঠল। জিগ্‌গেস করলুম তিনিও কি লিখতেন, না আপনার এই প্রতিভা সম্পূর্ণ আপনার নিজের থেকে পাওয়া? শরৎচন্দ্র বললেন, আমার বাবাও খুব উপন্যাস লিখতেন। আমাদের বাড়ীতে একটা পুরোনো ভাঙা সিন্দুকভর্তি তাঁর ছেঁড়া খাতাপত্তর ছিল। ছেলেবয়েসে চুরি করে সেগুলো খুব পড়তুম। বাবা খুব লিখতেন কিন্তু তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কোনখানা শেষ করতে পারতেন না। মাঝপথেই তাঁর উপন্যাসগুলো থেমে পড়ত।

জিগগেস করলুম, সে সব খাতাপত্তর আর কিছু নেই আপনার কাছে?

—না, অনেকদিন ছিল। তার পর কেমন করে যে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেল! এককালে খুব পড়তুম সেগুলো। মনে আছে পড়তে পড়তে কতদিন রাত কেটে যেত।

গল্প করতে করতে শরৎচন্দ্র হঠাৎ আলবলার সংশ্রব ছেড়ে জোরে দাঁড়িয়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি সুরু করে দিলেন। আমার বন্ধু 'পথের দাবী'র ডাক্তারের কথা তুলে প্রশ্ন করলেন—কি একটু ও চরিত্রটা অস্বাভাবিক হয়নি—ও রকম চরিত্র আমাদের সংসারে কি সম্ভব?

জবাব এল, খুবই সম্ভব; বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশেচি, দেখেচি ও রকম চরিত্র। অপরে সম্ভব নয় বললেই মেনে নেব! দেখো, ছেলেবয়েসে আমার একজন মাষ্টার ছিলেন। আমাকে তিনি ভালবাসতেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে কোন যোগ ছিলনা। যখন সবেমাত্র আমার দু একখানা লেখা কাগজে বেরুচ্চে, এমন সময় একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি উপদেশ হিসেবে সেদিন একটা দামী কথা বলেছিলেন, শরৎ, একটা কথা মনে রেখো। যা দেখনি সে সম্বন্ধে কখনো যেন লিখনা। কথাটা আমি খুব মানি। যে জীবন আমি দেখিনি সে সম্বন্ধে আমি মোটেই লিখিনা। এ বিষয়ে আমি খুব সিন্‌সিয়ার। সাহিত্যে ফাঁকি চলে না।

কথাটা ঘুরে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন, অতি-আধুনিকদের তো তাই বলি, তোমরা যে জীবন দেখেচ তার কথা লেখ। অপরদেশে যা মনের তাগিদে হচ্চে তাকে অনুকরণ করতে গেলে এর মূল্য কখনো স্থায়ী হবে না। তখন অতি আধুনিকদের সৃষ্টির-দিকে সবেমাত্র জনসাধারণের পুরোপুরি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মুখে একথা শুনে বিস্মিত হলুম, কারণ তিনি নিজে একদিন সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতি বিতর্ক উপলক্ষে অতি আধুনিকদের সাহিত্যকে সমর্থন করেছিলেন।

ক্রমে কথাশিল্পীর প্রিয় প্রসঙ্গে আমরাএসে হাজির হলুম। সমাজে মেয়েদের আসন কি হীনতার মধ্যে—তার কথা তিনি বেশ আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন। মনের সংস্কার আমাদের কত নিচের বেঁধে রেখে দিয়েচে—সে কথা বলতে বলতে শরৎচন্দ্রের অন্তরের বিদ্রোহী গর্জে উঠলেন। হিন্দুসমাজে ঘরে বাইরে নারী-নির্য্যাতনের বিষয় থেকে ক্রমে মুসলমানের হাতে নারীনির্য্যাতন প্রসঙ্গে এসে পড়লেন। দেখলুম মেয়েদের ওপর তিলমাত্র অত্যাচার পর্য্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারেন না। ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর থেকে জলখাবার এসে হাজির হল। শরৎচন্দ্র বিনীতভাবে এবং সস্নেহে বারবার খাবার অনুরোধ করলেন। খেতে খেতে উপেনবাবু জিগ্‌গেস করলেন, তাঁর কলকাতার বাড়ী কতদূর এগোল। তিনি যা জবাব দিলেন তাতে বুঝলুম কোল-কাতায় থাকার পক্ষপাতী নন। বললেন, আমায় সকলে মিলে ওখানে বাড়ী করালে। আমার ইচ্ছে ছিল কোল-কাতার আশেপাশে গঙ্গার ধারে একখানা ছোটখাট বাড়ী করে থাকব। হ্যাঁহে তোমাদের দেশ কি রকম? জবাব দিলুম, শুনেচি অনেক দিন আগে কোন্নগরে খুব ম্যালেরিয়া হত। এখন তো তার কোন পরিচয় পাইনা।

শরৎচন্দ্র বললেন, ইচ্ছে ছিল তোমাদের দেশের দিকে বাড়ী করি। গঙ্গার ধারে ভাল জমি পাওয়া যায়? দেখো, তাহলে না হয় নতুন বাড়ীখানা দিই বিক্রী করে।

আমি কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে জিগগেস করলুম, পাণিত্রাস কি রকম জায়গা, এখানে ম্যালেরিয়া নেই?

তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, উপীন তুমি সে

গল্প কাননকে করনি। আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, তাঁর বয়েস প্রায় সত্তর। তাঁকে পাণিত্রাসের স্বাস্থ্যের কথা কেউ জিগগেস করলে জবাব দেন, আর কেন বলেন মশাই, এই বুড়ো বয়েসেও খোলা জায়গায় নিশ্চিন্তে একটু তামাক খেতে পাই না।

কথাটার মধ্যে কোথায় হাসি তা ধরতে পারিনি বুঝতে পেরে উপেনবাবু ব্যাখ্যা করে দিলেন, পাড়াগাঁয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে তামাক খেতে নেই। শরতের ভগ্নীপতির চেয়েও বড় এত বুড়ো এখানে আছেন যে তাঁর তামাক খাওয়ার নিয়ত ব্যাঘাত হয়—এমন ভাল স্বাস্থ্য এখানকার। ব্যাখ্যা শুনে আমরা খুব হাসতে লাগলুম।

জলখাওয়া শেষ হলে তিনি আমাদের নিয়ে বাড়ী দেখাতে লাগলেন। ক্রমে আমরা তাঁর বাগানের শেষে একেবারে রূপনারায়ণের তীরে এসে দাঁড়ালুম। সেখানে শরৎচন্দ্রের ছোট ভাইয়ের সমাধির উপর সাদা পাথরের বেদী আছে। রূপনারায়ণের সাদা স্বচ্ছ স্রোতের তীরে জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারিফ করতেই শরৎচন্দ্র বেশ সংযতভাবে বলতে লাগলেন—কিন্তু কণ্ঠে আবেগের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল: যখন ইচ্ছে হয় এই নির্জন জায়গায়টায় এসে বসি, মনটা শান্ত হয়ে আসে।

বারবার দেখেচি পৃথিবীতে এক একটা এমন জায়গা থাকে যেখানে এলে মনটা আপনা থেকেই গভীর তলে তলিয়ে যায়। এইখানে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। উপেনবাবুরা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন। তখন দুপুরবেলা। রূপনারায়ণের ছোট ছোট ঢেউ ছুঁয়ে ঝিরঝিরে বাতাস বইছিল। আমি ভাবতে লাগলুম শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আজ আমার কি ধারণা হল। মনে হতে লাগল, মানুষ কত না ভুল করে। কথাশিল্পী যে আমাদের দেশের সমস্যা নিয়ে এত ভাবেন তা তাঁর সাহিত্য পড়ে মোটেই মনে হয় না। শরৎ সাহিত্যের মধ্যে যে শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তাঁর মনের গড়ন বিশ্লেষণিক এবং বুদ্ধিপ্রধান নয়। শরৎ সাহিত্যে সমস্যা হিসাবে সমস্যা বিশেষ নেই—সমস্যার অপরূপ চিত্র আছে মাত্র। তাঁর সৃষ্ট নরনারী প্রধানতঃ বুদ্ধিপ্রবণ নয়—হৃদয়াবেগপ্রবণ। শরৎ সাহিত্যে intellectual noteএর খুবই অভাব। অথচ শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি ঘণ্টা-কয়েক আলোচনা করে মনে হল, তিনি কতই না ভাবেন—কত সমস্যা—সমস্যা হিসাবে নিয়ত তাঁর মনকে চঞ্চল করে তুলচে। ফেরার পথে পুনরায় ভাবতে লাগলুম। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে দূরে এসে একে একে তাঁর কথা এবং যুক্তিগুলো স্মরণ করতে সুরু করলুম। বিচার করে দেখতে দেখতে নিজের ভুল স্পষ্ট হয়ে এল। বুঝতে পারলুম, আমার আগেকার ধারণাই সত্যি। শরৎচন্দ্র হচ্চেন "that order of minds to whom the analysing, logical, discoursing intellect tells little or nothing; sense, passion and imagination are the avenues by which such minds attain to truth." মনে পড়ল, সমাজে নারী সমস্যা, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যা আলোচনা হল কোন সমস্যাটাকেই তর্কের আকারে সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে তিনি বিচার করলেন না। সহজবোধ, হৃদয়াবেগ এবং কল্পনা দিয়ে তিনি যা উপলব্ধি করেচেন তাই আবেগের সঙ্গে বললেন। মনে হল, কথাবার্তার সময় তিনি খুব ভেবে চিন্তে কথা বলেন না—কথা এত তাড়াতাড়ি আবেগের সঙ্গে অনর্গল আপন খেয়ালে বলেন যে মনে হয় যেন কথাটা বলে ফেললেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। শিল্পী শরৎচন্দ্রের মনের এই বৈশিষ্ট্য যাঁদের চোখে পড়ে নি, তাঁরাই ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেন, তিনি একজন ভয়ঙ্কর সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কিংবা এই ধারণা অতি আধুনিক সাহিত্য-বিচারকের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে বলতে হয় শরৎ সাহিত্যে সমস্যার সমাধান নেই।

প্রথম সাক্ষাতের পর শরৎচন্দ্রের কাছে আরো অনেকবার গেছি। প্রতিবারেই প্রথমবারের ধারণা দৃঢ় হয়েচে মাত্র। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের বিষয়ে দুটি জিনিষ খুব চোখে পড়ত। তাঁর ব্যক্তিত্বে বৈচিত্র্য ছিল না—প্রথম দিনে যে মানুষটিকে দেখেছিলুম, অন্যান্য দিনে কম বেশি সেই একই মানুষকে দেখেচি। তাঁর ধারণা, মনের স্বাভাবিক আগ্রহ তাঁর প্রিয়বস্তু ও বিষয় কি কি—এসব বিষয়ে প্রথম দিনে কোনদিকে যা ধারণা হয়েছিল—ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণাই অপরিবর্তিত আছে, থাকে—কেবল তা আরো নিবিড় হয়েছে মাত্র। শরৎচন্দ্রের মধ্যে নিত্য নূতনত্ব ছিল না। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে চমকপ্রদ

কিছু পাওয়া যেত না। তা মানুষকে কাছে টানত—আপন মহিমায় অভিভূত করে দিত না। তাঁর শক্তির ঝলকানি মনে তীব্র অনুভূতি সঞ্চারিত করে আমাদের ধাঁধিয়ে দিত না। মনে হয়, তাঁর প্রতিভার মধ্যে গভীরতা ছিল—সূক্ষ্মতা ও বিস্তৃতি ছিল না।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

শরৎ-প্রসঙ্গ

রসচক্রের ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্রকে আমরা খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মানুষ হিসাবে তাঁর অনেক গুণ ছিল। সে সব কথা অন্যত্র বলেছি, সুতরাং এখানে তার আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না। আজ কেবল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার ফলে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ভিতরকার যে একটি গোপন কথা জানতে পেরেছি তারই সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব।

শরৎচন্দ্র রসচক্রে এলেই আমরা তাঁকে ঘিরে বসতাম, আর তিনি তাঁর বিচিত্র জীবনের ছোটখাটো নানা ঘটনার কথা আমাদের শোনাতেন। সে সব কথা শুনে আমরা সত্যই অবাক হয়ে যেতাম; আর মনে মনে ভাবতাম, কত বিভিন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরের নরনারীর সঙ্গে তিনি মিশেছেন। তাদের সমাজ, তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, তাদের ধ্যানধারণা, বাসনা-কামনার সঙ্গে কি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর পরিচয় হয়েছে। এইখানেই শরৎ-প্রতিভার ভিত্তিমূল।

শরৎচন্দ্র আধুনিক যুগের কথাশিল্পী। সুতরাং নিছক গল্প শুনে তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন নি। সেই সঙ্গে মানব-মনের বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন রহস্য, আমাদের সমাজজীবনের বহু জটিল সমস্যা, আমাদের নীতিবোধের চিরাচরিত গতানুগতিক আদর্শ সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসাবাদের তিনি অবতারণা করেছেন। এ ব্যাপার আজকালকার যুগে কিছু নূতন নয়। প্রত্যেক সভ্যজাতির আধুনিক কথা-সাহিত্য এই পথেই চলেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই জটিল আঁকাবাঁকা পথে চলতে গিয়ে বর্ত্তমান যুগের কথা-সাহিত্য কতকটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে।—সে তার আসল গন্তব্য পথ থেকে অনেকটা সরে এসেছে। তার ফলে আজকাল যে সকল সমস্যামূলক মনস্তত্ত্বমূলক কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে কোন জিনিসেরই অভাব নেই, অভাব যা কেবল আসল জিনিসের অর্থাৎ গল্পের। শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে কিন্তু এ দুর্ঘটনা ঘটতে বড় একটা দেখা যায় নি। তিনি যত সমস্যাই তুলুন না কেন, যত নূতন জিজ্ঞাসার অবতারণাই করুন না কেন, তাঁর কথা-সাহিত্যে গল্পের অভাব হয়েছে একথা তাঁর অতিবড় শত্রুও বলতে পারবে না। আমরা অবশ্য তাঁর শেষ জীবনের লেখা দু-একটি গ্রন্থকে বাদ দিয়েই একথা বলছি।

তাঁর অতি বড় সমস্যামূলক উপন্যাসগুলিও যে গল্পের দিক থেকে আমাদের এতটুকু বঞ্চিত করেনি একথা তাঁর অতিবড় তার্কিক পাঠকও স্বীকার করবে। এই জন্যেই দেখা যায়, যাঁরা তাঁর নূতন নৈতিক ধারণাগুলিকে আদৌ সমর্থন করেন না অথবা নূতন বা পুরাতন কোন নৈতিক আদর্শ নিয়েই যাঁরা মাথা ঘামাতে চান না কিংবা অতশত বিচারতর্ক করে উপন্যাস পড়বার মত শিক্ষাদীক্ষাও যাঁদের নেই—তাঁরাও তাঁর লেখা পড়ে প্রচুর আনন্দলাভ করেছেন। বলা বাহুল্য সে আনন্দ নিছক গল্প পড়ার আনন্দ।

এ জিনিসটি শরৎচন্দ্রের লেখায় হয় কেন এবং আর পাঁচজনের লেখাতেই বা হয় না কেন, সেইটেই এখন খুঁজে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আধুনিক যুগের আর পাঁচজন কথাশিল্পীর মনের ধাতটারই একটু তফাত আছে। আর পাঁচজন কথাশিল্পী যুগধর্ম্মের প্রভাবেই হোক বা বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার ফলেই হোক, অথবা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ পড়েই হোক—আধুনিক যুগের এই সকল নূতন সমস্যা মনের মধ্যে বাইরে থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। এ জিনিসগুলো তাঁদের কাছে শরীরী হয়ে আসেনি, এসেছে অশরীরী চিন্তারূপে। তারপর এই অশরীরী চিন্তাগুলোকে তাঁরা রূপ দিতে চেয়েছেন গল্পের সাজানো ঘটনার ভিতর দিয়ে। আর শরৎচন্দ্রের মনে মানুষের বিচিত্র জীবন তার বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে এসে সেখানে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং সেই আলোড়নের ফলে তাঁর চিত্তে জেগে উঠেছে নানা চিন্তা, নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা। আর

পাঁচজন লেখক তাঁদের নূতন জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নগুলিকে রূপ দিতে গিয়ে মানুষের জীবনকে আশ্রয় করেছেন, আর শরৎচন্দ্র মানুষের জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফোটাতে গিয়ে বহু প্রশ্ন বহু জিজ্ঞাসা আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন। তাই আর পাঁচজনের লেখায় জীবন অপেক্ষা সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে, আর শরৎচন্দ্রের লেখায় সমস্যা অপেক্ষা জীবন অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই আর পাঁচজনের লেখায় গল্পের এত অভাব, আর শরৎচন্দ্রের লেখায় গল্পের এত প্রাচুর্য্য।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

শরৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পারিবারিক পরিচয়

বাঙ্গলা ১২৮৩, ৩১শে ভাদ্র, ইং ১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺মতিলাল চট্টোপাধ্যায় একজন সংরক্ষণশীল ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের মধ্যে ৺শরৎচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। মধ্যম ৺প্রভাসচন্দ্র (স্বামী বেদানন্দ)। এখন যিনি জীবিত তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র। দুই কন্যা অনিলা ও মনিয়া। একজনের শ্বশুরালয় পাণিত্রাস গোবিন্দপুরে, অপরজনের আসানসোলে। শরৎচন্দ্র বাল্যকালে পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া পিতার সহিত ভাগলপুরে দূরসম্পর্কীয় মামার বাড়ী চলিয়া যান্; সেইখানে থাকিয়াই স্থানীয় তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। এন্ট্রান্স্ পাশ করিয়া সেই স্কুলেরই সংযুক্ত কলেজে এফ-এ পড়িতে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে মাত্র ২০৲ টাকা ফী দিতে না পারিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়াছিলেন। 'ছায়া' নামক হাতে-লেখা মাসিক পত্রে শরৎচন্দ্র প্রথম সাহিত্য রচনা করেন। কলেজ ছাড়িবার অল্পকাল পরেই শরৎচন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু ঘটে। বুঝা যায় অভিভাবকগণের অবহেলা ও অর্থব্যয়ভীতিই শরৎচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষাকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। ইহার পর তিনি 'সাহিত্য-সভা' সৃষ্টি করেন; সেইদিন তাঁহার সভায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তাঁহারা অনেকেই বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেন; উপন্যাস-লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর খ্যাতি তাঁহাদের ভিতরে সর্ব্বাধিক। 'সাহিত্য-সভা' সৃষ্টির পর শরৎচন্দ্র এক হিন্দুস্থানী জমিদারের এষ্টেটে ম্যানেজারের চাকুরী লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। তখন তাঁহার মাত্র বাইশ হইতে চব্বিশ বৎসর বয়স। তিনি সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন, বাঁশী বাজাইতে পারিতেন, ছবি আঁকিতে জানিতেন, তবলায় তাঁহার ওস্তাদ বলিয়া খ্যাতি হইয়াছিল এবং ইহা ছাড়া অভিনয় করিতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা দেখা গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে এই সকল গুণ অপগুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহার প্রথম যৌবনের রচনার মধ্যে—'অভিমান, বালা, মালিনী, শিশু, ব্রহ্মদৈত্য, পাষাণ—' প্রভৃতি এবং আরও দু-একটি রচনা হারাইয়া যায় অথবা অবস্থা বিপর্য্যয়ে নষ্ট হয়। শোনা যায় 'কাকবাসা' নামক গল্পই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রথম রচনা। ইহার পর অপর একজন হিন্দুস্থানী জমিদার মহাদেব সাহুর তাঁবে চাকুরী লইয়া তিনি বিহারের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। বন্দুক লইয়া শিকারেও শরৎচন্দ্রের হাত ছিল। অনেক সময়ে তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর মতো ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেন। পারিবারিক অথবা গার্হস্থ্যবন্ধন তাঁহার সহ্য হইত না। তাঁহার মাতামহের বাস ছিল ২৪ পরগণা হালিশহরে। তাঁহার নাম ৺কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কেদারনাথের দুই পুত্র, বিপ্রদাস ও ৺ঠাকুরদাস। তাঁহারাও ভাগলপুরে থাকিতেন। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস অধুনা পাটনায় বাস করেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন শরৎচন্দ্র কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার পিতা মতিলালের মৃত্যু হয়। অতঃপর শরৎচন্দ্র নিঃসম্বল অবস্থায় সুদূর বর্ম্মায় রেঙ্গুণে চলিয়া যান্। কিছুকাল বাদে জানা যায় সেখানে তিনি ডেপুটি একাউন্ট্যান্ট্ জেনারেলের আপিসে চাকুরী করিতেছেন। সেই প্রবাসে থাকাকালীন বাঙ্গলার বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। সকলেই

অনুভব করিতে থাকেন, সাহিত্যে এক দুর্জ্জয় নব-যৌবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কৌতূহল ও কানাকানির ভিতর দিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশ ও খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার মামারা আসিয়া দেখা দিলেন, বন্ধুগণ আসিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিলেন। অতঃপর রেঙ্গুণের আপিসে সাহেবের সহিত কলহ করিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে একদা অসুস্থ অবস্থায় শরৎচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। রোগা মানুষ, মুখে একরাশ দাড়ি গোঁফ, আধা সন্ন্যাসীর বেশ, সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড কুকুর শিকল বাঁধা, প্রসন্ন মুখে হাসি—শরৎচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্য ও অন্তররহস্য জ্যোতির্ম্ময় হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাঁহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। অনেকেই দাবি জানাইল, আমিই শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়াছি। স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের দাবি সর্ব্বাগ্রগণ্য, কারণ শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সাবেককালের, তাঁহার মুজাফ্ফরপুর বাসের সময় হইতে। তখন শরৎচন্দ্র গৃহ-বৈরাগী পরিব্রাজক।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শরৎচন্দ্র শিবপুরে বাস করিতে লাগিলেন। সাহিত্য সাধনা চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সম্মান, প্রতিপত্তি, সুনাম, প্রতিষ্ঠা ও অর্থ এই নব-যুগপ্রবর্ত্তক কথা-শিল্পীর পদপ্রান্তে আসিয়া স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। দেশে দেশে সাড়া পড়িয়া গেল। ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধের অবসানকাল।

কিছুকাল পরে তিনি হাওড়া জেলার সামতাবেড়-পাণিত্রাস গ্রামে রূপনারায়ণ নদের তীরে একখানি কবি-কুটীর নির্ম্মাণ করেন। মালতীলতায়, চম্পক-যূথিকায় সেই পল্লীকুটীরের প্রাঙ্গণ সাহিত্যিকের তপোবনের যোগ্য ছিল। গৃহাঙ্গনের তলায় স্রোতস্বতের অশ্রান্ত জলধারা, জ্যোৎস্নার কমনীয় আলোছায়া, প্রশান্ত জলরাশির পারাপারব্যাপী প্রসন্ন ছবি—শরৎচন্দ্রের পরিশ্রান্ত জীবন ইহাদের মাঝখানে অপরিসীম তৃপ্তি ও আনন্দে বিহ্বল নিমীলিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া থাকিত।

নদীর এত নিকটে পূর্ব্বে কেহ কখনও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সাহস করে নাই। তিনি সর্ব্বদাই 'তটস্থ' হইয়া থাকিতেন। সেইখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সম্প্রতি মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র দক্ষিণ কলিকাতা বালীগঞ্জে এক সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার পর ইচ্ছামতো সামতাবেড় ও বালীগঞ্জে বাস করিতেন। মৃত্যুর মাত্র ২০ দিন পূর্ব্বে তিনি বালীগঞ্জের বাড়ী হইতে চিকিৎসার্থ নার্সিং হোমে যান্। বিগত ১৬ই জানুয়ারী পার্ক নার্সিং হোমে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ, কবিতা এবং অন্যান্য রচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু একই সংখ্যায় সেগুলিকে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না, আগামী চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' সেগুলি প্রকাশিত হইবে।



সাময়িকী

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু—

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু হৃতস্বাস্থ্য লাভের জন্য অল্পদিনের জন্য ইউরোপের বাদগাষ্টিন সহরে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি লণ্ডনে যাইয়াও কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। গত ১০ই মাঘ সোমবার তিনি বিমানযোগে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তৎপূর্ব্বেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য কৃপালানী কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে সুভাষচন্দ্র আগামী হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ৪ঠা মাঘ এদেশে সে সংবাদও প্রচারিত হইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পর আর কোন বাঙ্গালী কংগ্রেসের সভাপতি হন নাই; দীর্ঘ ১৫ বৎসর পরে বাঙ্গালী আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। আগামী ১৯শে, ২০শে ও ২১ ফেব্রুয়ারী গুজরাটের হরিপুরা গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। সুভাষচন্দ্র যোগ্যতার সহিত কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়া বাঙ্গালার গৌরব বৃদ্ধি করুন, ইহাই শ্রীভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা। তিনি ত্যাগ ও সেবার যে মহান আদর্শ গ্রহণ করিয়া জীবন কাটাইতেছেন, তাহা তাঁহাকে শুধু বাঙ্গালার নিকট নহে, শুধু ভারতের নিকট নহে, সমগ্র বিশ্বের নিকট মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র—

গত ১৬ই জানুয়ারী রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বাঙ্গালার খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী, সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ডাক্তার হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের তিরোধানের পর একই দিনে সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের ও শিক্ষাব্রতী হেরম্বচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ বাঙ্গলা দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। হেরম্বচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থান নদীয়া জেলার কুমারখালির নিকটস্থ হিজলাবট গ্রামে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম-এ পাশ করিয়া ৪ বৎসর ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পরে তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক হন ও ৫৪ বৎসর কাল ঐ কলেজে কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বার্দ্ধক্য হেতু অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন।



শেষশয্যায় হেরম্বচন্দ্র

হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র

জীবনভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়,
সংসার যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ সহায়।
নির্বিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়মাল্য তার।

২রা মাঘ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহযোগে তিনি সঞ্জীবনী পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও সার সুরেন্দ্রনাথ যখন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি সুরেন্দ্রনাথের একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের

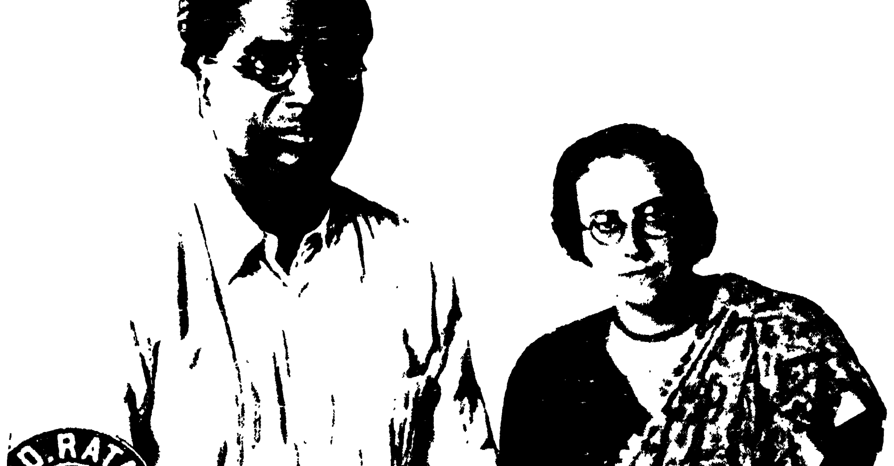


বিদেশ প্রত্যাগত আগামী কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট
শ্রীযুত সুভাসচন্দ্র বসু

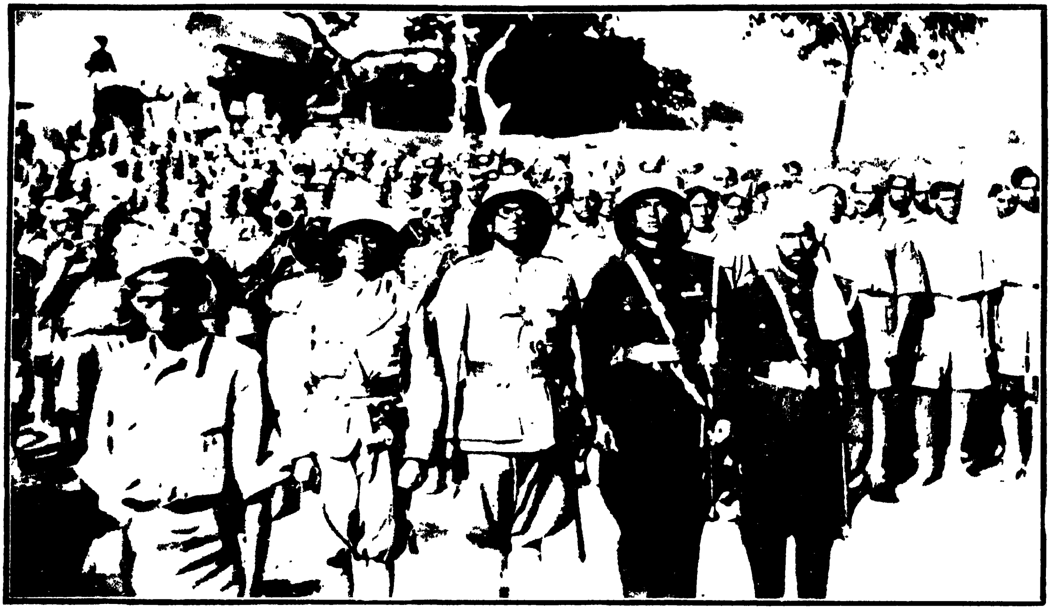
ছবি—ডি রতন



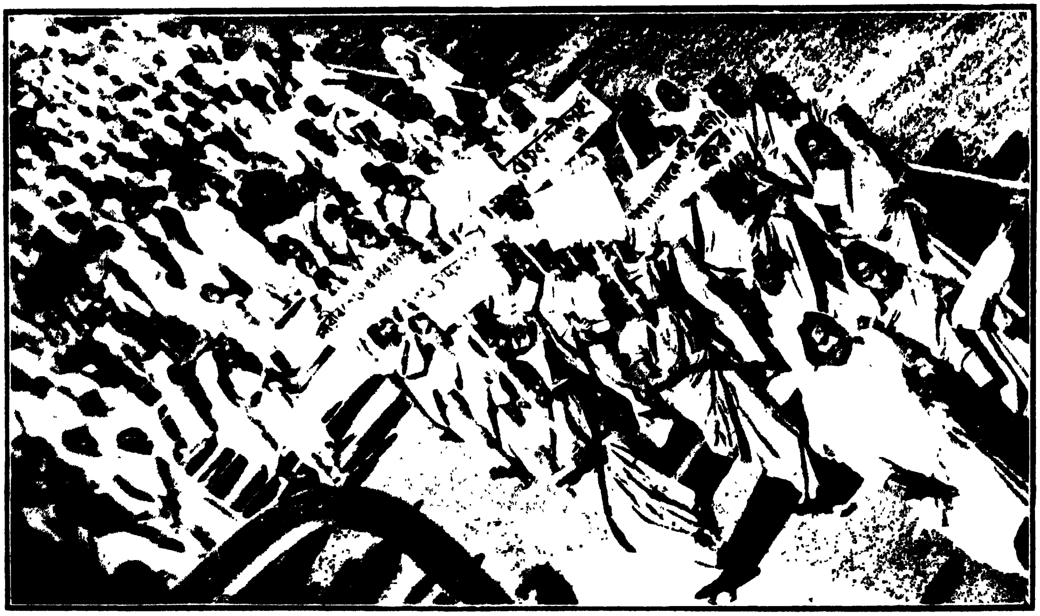
বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক
সম্মিলনের সভাপতি
শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায়



শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর পত্নী



বিষ্ণুপুর সম্মিলনে সভাপতির শোভাযাত্রা—স্কাউটদল ও ব্যাণ্ডদল পুরোভাগে



বিষ্ণুপুর সম্মিলনের শোভাযাত্রায় মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাদল

খ্যাতি সর্ব্বজন-বিদিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ গত যুগের একজন আদর্শ কর্ম্মবীরকে হারাইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়—

শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় বাঙ্গালী; তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। গত ২৪ বৎসর কাল তিনি স্বদেশ হইতে বাহিরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন ও গত ২০শে জানুয়ারী তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। ২৮শে পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া তিনি বিষ্ণুপুর গিয়াছিলেন; সেখান হইতে ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। হরিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর তিনি আবার বাঙ্গালায় আসিবেন। তাঁহার কলিকাতা আগমনে বহু স্থানে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে ও তাঁহাকে নানা সভায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি কিছুদিন বাঙ্গালায় থাকিয়া কংগ্রেসের কার্য্য করিলে বাঙ্গালার কংগ্রেস আন্দোলন আরও সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইবে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী সাগ্রহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিবে।

বসুমতীর মামলায় জয়লাভ—

গত বৎসরের ২৯শে জুন তারিখে 'দৈনিক বসুমতী' পত্রে 'কর্ত্তব্য কি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের আদেশে উক্ত পত্রের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত জামীনের টাকা হইতে ৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে উক্ত প্রবন্ধে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে শত্রুতার মনোভাব সৃষ্টি করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের ঐ বাজেয়াপ্তির আদেশের বিরুদ্ধে বসুমতীর পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল করা হইলে প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি হেণ্ডারসন ও বিচারপতি জ্যাকের আদালতে আপীলের শুনানী হয়। প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি হেণ্ডারসন উভয়ে একমত হইয়া (বিচারপতি জ্যাক বাজেয়াপ্তির পক্ষে ছিলেন) উক্ত আদেশ বাতিল করিয়া দেওয়ায় বসুমতীকে বাজেয়াপ্ত ৫ হাজার টাকা ফেরত দিবার আদেশ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেসনেতা ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বসুমতীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; তিনি মামলার খরচ পাইবার জন্য আবেদন করিলে হাইকোর্ট আদেশ দিয়াছেন যে মামলার খরচ সম্বন্ধে কোন আদেশ দেওয়া হইবে না। কাজেই 'বসুমতী' বাজেয়াপ্ত টাকা ফেরত পাইলেন বটে, কিন্তু এই আবেদনের মামলা চালাইতে তাঁহাদের বোধ হয় ৫ হাজারেরও অধিক টাকা খরচ হইয়া গেল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে—প্রতিপক্ষ দুর্ব্বল বলিয়া প্রবল পক্ষ গভর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন না। কাজেই এ মামলার খরচের টাকা না দেওয়া হাইকোর্টের পক্ষে শুধু অসঙ্গত হয় নাই—গভর্ণমেণ্টের সহিত মামলায় পরাজিত হইলেও প্রতিপক্ষ যাহাতে মামলার খরচ পায়, হাইকোর্টের সেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। তবেই দুর্ব্বল প্রতিপক্ষ ও গভর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে সাহসী হইতে পারে। এই মামলার ব্যয় সম্বন্ধে কি এখন আর অনুরূপ ব্যবস্থা সম্ভব নহে? গভর্ণমেণ্টের আদেশ যে সকল সময়ে ন্যায়সঙ্গত হয় না, তাহা ত এই মামলার রায়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

গত ১২ই জানুয়ারী বুধবার প্রবীণ সংবাদপত্রসেবী কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার, রিপণ কলেজের



শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি

খ্যাতনামা সাংবাদিক স্বর্গীয় তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন। যৌবনে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সার সুরেন্দ্রনাথের সহকারীরূপে 'বেঙ্গলী' পত্রের সম্পাদনেই তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। বহুকাল সংবাদপত্রসেবার পর শেষ বয়সে কিছুকাল তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হইয়াছিলেন। নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত নিজেকে সংযুক্ত রাখিয়া তিনি দেশের ও দশের সেবা করিতেন। তাঁহার মত সুবক্তা এ যুগে অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি মিষ্ট-ভাষী, সদালাপী ও শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন।

নবাব ফারোকীর দুর্ভাগ্য—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের গত নির্ব্বাচনে নবাব সার কে, জি, এম, ফারোকী উত্তর ত্রিপুরা গ্রাম্য মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রে মৌলবী হবিবর রহমন চৌধুরীকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছিলেন। মৌলবী হবিবর রহমন সাহেব ঐ নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে মামলা করায় সম্প্রতি বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টের আদেশে নবাব সাহেবের নির্ব্বাচন বাতিল হইয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের আদেশমত এখন ফারোকী সাহেব মামলার খরচ বাবদ রহমন সাহেবকে ১১ হাজার ৭ শত ৩২ টাকা প্রদান করিবেন। যে সময়ে নির্ব্বাচন হয়, সে সময়ে নবাব সাহেব গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। কাজেই এই পরাজয় ও মামলার খরচ প্রদান ব্যবস্থা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মন্ত্রীরা নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে নামিলে যে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন না—ইহা ঘোষিত হওয়ায় ভবিষ্যতেও লোক সাবধান হইতে পারিবে।

বেলুড় মঠে মন্দির প্রতিষ্ঠা—

গত ১৪ই জানুয়ারী শুক্রবার কলিকাতার নিকটস্থ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মন্দিরটি সম্পূর্ণ হইতে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে—শুনা যায় বাঙ্গালা দেশে আর কোথাও এত বড় মন্দির নাই। স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকাল-মৃত্যু হওয়ায় তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমেরিকাবাসী দুইজন ভক্ত শিষ্যা—শ্রীমতী ভক্তি ও কুমারী অন্নপূর্ণা—ঐ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা প্রদান করায় মন্দির নির্ম্মাণ সম্ভব হইল। মন্দিরের বাহিরের অংশ চুনার প্রস্তরে আবৃত। গর্ভগৃহটি সু-প্রশস্ত ও শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে আবৃত। মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। নাটমন্দিরে এক সঙ্গে এক সহস্র লোক বসিয়া ভজনাদি করিতে পারিবে। মঠের বর্ত্তমান সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ গৃহস্থজীবনে এঞ্জিনিয়ার ছিলেন; তাঁহারই তত্ত্বাবধানে মার্টিন কোম্পানী কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মঠের মধ্যে তিনটি ছোট ছোট মন্দির (রাখাল মহারাজের, স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর) নির্ম্মিত হইয়াছিল—বর্ত্তমানের এই মন্দির প্রত্যহ শত শত ভক্তকে আকৃষ্ট করিবে। মঠের কর্ম্মীরা যে ত্যাগ ও সেবা ধর্ম্মে দীক্ষিত, তাহাই সকলকে মঠের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া থাকে।

সামরিক শিক্ষার দাবী—

গত ২৮শে জানুয়ারী তারিখে একই দিনে দুইটি প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী যুবকদিগের জন্য সামরিক শিক্ষার দাবী জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ঐ দিন কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—"কলিকাতা কর্পোরেশন বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিতেছেন, কলিকাতার মত সহরের অধিবাসীদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ২১ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক কলিকাতার সমস্ত নাগরিক ও করদাতাদের প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৩ মাস করিয়া সম্পূর্ণ সামরিক শিক্ষা দেওয়া হউক।" ঐ দিনই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) অধিবেশনে রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—"ভারতীয় সৈন্য বিভাগে একটি স্থায়ী ইউনিট গঠন করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষার জন্য বাঙ্গালী যুবকদিগকে যাহাতে ভারতীয় সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইতে দেওয়া হয়, সেজন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যেন ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন।" বর্ত্তমান সময়ে উভয় প্রস্তাবেরই মূল্য আছে এবং আমাদের বিশ্বাস, অচিরে এই প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা আরম্ভ হইবে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন—

গত ২৯শে জানুয়ারী হইতে দুই দিন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবারের অধিবেশনের বিশেষত্ব এই যে—সম্প্রতি বিলাত-প্রত্যাগত ও কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুত মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁহার পত্নী এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বগুড়ার খ্যাতনামা কর্ম্মী শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ২৭শে জানুয়ারী তথায় শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একটি কৃষিশিল্পস্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছিল। এবারে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন, বাঁকুড়ার সর্ব্বজনপ্রিয় কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়। প্রথম দিনে রাধাগোবিন্দবাবু ও যতীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার পর সুভাষচন্দ্র সম্মিলনে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"কংগ্রেস ভারতবর্ষে যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, উহা দেশের জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে এবং জনসাধারণের কল্যাণ বিধানই উহার উদ্দেশ্য।" সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে রাজবন্দীদের কথা উল্লেখ করিবার সময় অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন নাই। অভ্যর্থনা সভাপতির অভিভাষণে বাঙ্গালার কর্ম্মীদের মধ্যে দলাদলি মিটমাটের কথা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসার উপায়ের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল।

জেলে রাজবন্দীর মৃত্যু—

গভর্ণমেণ্টের কারাগারের ব্যবস্থার প্রতিবাদে ঢাকা জেলে যে সকল রাজনীতিক বন্দী প্রয়োপবেশন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হরেন্দ্র মুন্সী গত ৩১শে জানুয়ারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। জেলে রাজবন্দীর মৃত্যু এ দেশে নূতন নহে। এই ব্যাপারে দেশে যতই বিক্ষোভ হউক না, এদেশে ইস্পাতের তৈয়ারী শাসন-যন্ত্রের তাহাতে কিছু যায় আসে না।



রামজয় শীল শিশু পাঠশালার সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নাম্‌লো…

শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায় বি-এ

খবরের কাগজখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দি—ভাল লাগে না পড়িতে। কাজ কি আমার জানিয়া—জাপান চীনের মাটি দখল করিল কি না, ফ্রাঙ্কো গৃহযুদ্ধে জয়ী হইতে পারিল কি না! যে অর্থ-সমস্যাটা আমাকে অহরহ ক্লিষ্ট করিতেছে, সে প্রশ্নের উত্তর উহার মধ্যে নাই। দারিদ্র্যের বিভীষিকা চঞ্চল করিয়া দেয় মনকে, স্বস্তি যেন আর পাই না…

গৃহিণী পরিপাটি করিয়া রেকাবীতে খাবার সাজাইয়া আনিয়াছে। টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলে—যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো…

আজ হঠাৎ ঐ মেয়েটির শুচিস্নাত মুখের দিকে চাহিয়া আমার নিজের প্রতি ধিক্কারে সারা মনটা যেন সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে, তবু বলিতে হয়—মণি, চাকরীটা আজ গেল…

চাহিয়া দেখি অকস্মাৎ তাহার মুখখানি যেন কিসের আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই সে আমার নিতান্ত কাছে সরিয়া আসিয়া আমার কাঁধের পরে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহে—যে খাটুনি ছিল…ও তুমি পারতেই না, ছেড়ে দিতে হত…যাক্ গে…

চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চায়। আমার নিজের জন্যে নয়, ওর জন্যে। কি দারুণ নৈরাশ্য ও যে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া মুখে প্রশান্ত স্নিগ্ধ ভাব আনিয়া আমাকে ভুলাইতে চায়! আমি কি কিছুই বুঝি না! পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস এই মাত্রই ত ও চাপিয়া রাখিল, পাছে আমার কাণে আসে…

শরীরটা হঠাৎ অবসন্ন হইয়া আসে। মনে হয় হাঁটিতে গেলেই বুঝি পড়িয়া যাইব, এমনি দুর্ব্বল! ক্লান্তি…ব্যর্থতা …এই কি জীবন!

দুঃখের বরষায় চোখের জল নামিয়াছে, বক্ষের দরজায় আজ বন্ধুর রথ আসিয়া থামিল কই?…মিথ্যা কথা, বন্ধুর রথ থামে না। সে তার বিরামহীন চলার পথে বুকের পাঁজরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া অবহেলায় চলিয়া যায়…

অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মি পশ্চিম আকাশের বুকে রংএর তুলি বুলাইয়া গেল—লাল, নীল, কমলা, আরও কত কি!…সুন্দর…সপ্লেন্‌ডিড্!

পরক্ষণেই মনে হয় মায়া…এ শুধু একটা মিথ্যা অভিনয়, এই আছে, এই নাই…

প্রাণের ভিতরটায় হাহাকার করিয়া ওঠে।

সূর্য্য অস্ত যায়। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া আবার সেই চিরপুরাতন প্রশ্নটাই মনে আসে, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ কোটী জীবের মধ্যে আমার স্থান কোথায়! কতটুকু!…অদূরে তুলসীতলায় ভক্তিমতী মণির শঙ্খ বাজিয়া ওঠে। চাহিয়া দেখি পূজারিণী তার অন্তরের সমস্ত শুচিতা ও নিষ্ঠা দিয়া নিজেকে নিবেদন করিতেছে!…হায় রে! কল্যাণী হয়ত আমারই কল্যাণ কামনা করিতেছে!

না, আর না।…উঠিতেই হইবে। ওর কথা ভাবিলে আমার মন ব্যথায় ভারী হইয়া ওঠে। নিজেকে বারংবার বলি, অমৃতের পুত্র…জাগৃহি…

ঘুরি। যেখানে সেখানে, যখন তখন। আমি কাজ চাই গো, কাজ দাও। কোথায় কাজ! আমারই মত বহু বেকার দিনের পর দিন এমনি করিয়াই আশায় বুক বাঁধিয়া অফিসে অফিসে ঘোরে এবং সন্ধ্যায় ক্লান্ত অবসন্ন শরীর এবং কাতর মন নিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে বসে। হয়ত বহু পরিবার তাহারই উপার্জ্জনের আশায় বসিয়া আছে, মুখে অন্ন নাই তাদের, পরিধানে নাই বস্ত্র…বয়স্থা ভগ্নী,…অসুস্থ শিশুসন্তান… রুগ্না মাতা…ঋণ…এমনি কত কি!

ভাবিতে আর পারি না। রাজ্যের ভাবনা আসিয়া মাথায় জমিয়া যায়…কারও সম্বন্ধে Justice করিতে পারি না। উঠিয়া পড়ি· বারান্দায় একা একা পায়চারি করি!

সাবেক কালের বন্ধুরা বলে…এই ত চাই। 'রেজিগ্-নেশান' দিয়ে ঠিকই করেছ তুমি। আত্মসম্মানে যেখানে আঘাত লাগে, সেখানে তুমি দাঁড়িয়েছ রুখে…ঠিকই করেছ।

আজ বহু দুঃখে মনে হয় দরিদ্রের আত্মসম্মানবোধ একটা luxury. আমার এ অশান্তি এবং দারিদ্র্যের চিন্তা হইতে কে আমাকে রক্ষা করিবে! প্রশংসা! ছাই প্রশংসা …কে চায় প্রশংসা! ওর আর কোন প্রয়োজন নেই আমার। চাই ক্ষুধিতের অন্ন · অন্ন…অন্ন!

মণি বলে, উদ্যোগীকে লক্ষ্মী দেন আশ্রয়, সুতরাং চেষ্টা তোমায় করতেই হবে। হতাশ ভাবে বলি, আচ্ছা… বাহির হইয়া পড়ি। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র সমস্ত শরীরের উপর আনিয়া দেয় ক্লান্তি, কাজের কিন্তু কোন সুবিধা হয় না। পথে দেখা অমলের সঙ্গে। বহুকালের পুরাতন বন্ধু, স্কুলে একসঙ্গে পড়িতাম। তারপর ও ছাড়িয়া দিল পড়া, শুনিলাম গৃহত্যাগ করিয়াছে। ওর কথা মনেই ছিল না, হঠাৎ দেখা হইল আজ। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি খবর? সে বলে, চল একটু বসিগে ঐ ওখানটায়, জ্বর…বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

বসিলাম। ওর মুখ দেখিয়া মনে হয় চিন্তা উহাকে ক্ষয় করিতেছে, চক্ষু কোটরগত, মুখ দীপ্তিহীন।

হঠাৎ মনে হইল দারিদ্র্যের বিভীষিকা কি আমার মুখেও এমনি ছাপ দিয়া গেছে? ··অনেক দিন ত নিজেকে দেখি নাই!

কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সে করুণ ভাবে হাসে, মনে হয় কান্নায় ফাটিয়া পড়িল বুঝি; বলে, বাবার অসুখ, মা নেই, টাকা নেই · নিঃস্ব…খুঁজতে বেরিয়েছি চাকরী। সন্ধান দিতে পারো?

হায় রে! ও চায় সন্ধান আমার কাছে! নিজের দুঃখের কথা বলিয়া ওকে আরও হতাশ করিতে মন সরে না…বলি, আচ্ছা, জানাবো সন্ধান পেলে। · সত্যিই জানাব।

উঠিয়া পড়ি। ভাল লাগে না দুঃখের আওতায় থাকিয়া নিজেকে আরও ক্লিষ্ট করিতে।

রাত্রে শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে থাকি, অমল কি আমার চেয়েও হতভাগ্য?…ঘুম আর আসে না। ঘড়িতে একটার পর একটা বাজিয়া যায়, আমি ছটফট করি, তারপর এক সময় ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে থাকি। মাঝে মাঝে নজর পড়ে মণির দিকে। ও ঘুমাইতেছে…নিষ্পাপ সুন্দর কুসুম। বড় ঘরের আদরিণী কন্যা…গ্রহদোষে আমার ঘর আলো করিয়াছে, নিজেকে নিঃশেষ করিয়া। দারিদ্র্যের ছিন্নবাস ত ওর দেহে মানায় না, ওর রুক্ষ অযত্নবিন্যস্ত সীঁথির সিঁদুর আমার চোখে আনে জল!

এক সময় মণি হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলে, ওকি তুমি শোও নি? এসো, অনেক রাত হয়ে গেছে।·· আবার শুইয়া পড়ি। মণির দিকে চাহিয়া দেখি—প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিয়া আছে, বলে, কেন অধীর হচ্ছো তুমি? কাজ গেছে, আবার হবে…এই আমি বলে দিচ্ছি…দেখে নিও।

হাসি পায় ওর কথায়! বলি, সত্যি হবে? ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, হবে।

হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে হয়, হয়ত বন্ধুর রথ ওরই বক্ষের দরজায় আসিয়া থামিয়াছে এবং উহারই দীপ্ত সুন্দর তেজ মণির অন্তরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া যেন আমাকে উদ্ভাসিত করিতে চায়!

ঐ এক মুহূর্ত্তই। তার পর হঠাৎ কেন যেন শ্রা‥ণর বারিধারার মত আমার দুচক্ষু বহিয়া অবিরত অশ্রুধারা ঝরিতে থাকে, আমি বুঝিতে পারি না · অবসন্ন শরীর এবং দুর্ব্বল হৃদয় নিয়া নিজেকে যেন কিছুতেই সংযত করিতে পারি না…

… … … …

কে যেন জোরে আমাকে বারম্বার ঠেলিতেছে। চাহিয়া দেখি, মণি। ব্যস্ত হইয়া বলে—এত বেলা হ'ল, এখনও তুমি উঠ্‌ছ না কেন?…ভাঙ্গল ঘুম? চা'র জল চড়িয়ে দিয়েছি…হরুবাবু কি যেন একটা জরুরী খবর নিয়ে বাইরে বসে আছেন।

টলিতে টলিতে বাহিরে যাই। হরু হাত বাড়াইতে বাড়াইতে কহে, Lucky boy, তোমায় Congratulate করতে এসেছি হে…চাকরীতে Promotion…কাল তুমি আসার পর এলো খবর। আর একটা Post খালি হ'ল।

জাগ্রতেও আবার সেই চোখের জল যেন বাহির হইয়া আসিতে চায়। বলি, বস, আমি আসছি এখনি।

বিভ্রান্ত হইয়া যাই…অমলের ক্লিষ্ট মুখখানি মনে আসে…

মণিকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া বলি, মণি, অমলের ঠিকানাটা বলতে পারো?…তা যে, আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি!



ভারতের দ্বিতীয় বিজয় ঃ চতুর্থ বেসরকারী টেষ্ট ঃ

মাদ্রাজে চতুর্থ বেসরকারী টেষ্ট খেলা ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে তিন দিনে ৭ই শেষ হয়। ভারত এক ইনিংস ও ৬ রানে বিজয়ী হয়েছে।

নিখিল ভারত —২৬৩

লর্ড টেনিসন —৯৪ ও ১৬৩

বারিপাত, মার্চ্চেন্টের মুদ্রাক্ষেপণের সৌভাগ্য, অমর সিং ও মানকাদের মারাত্মক বোলিং, মানকাদের ও হাভেওয়ালার প্রশংসনীয় ব্যাটিং, খেলোয়াড়দের সঙ্ঘবদ্ধতা, অধিনায়কের খেলোয়াড়দের উৎসাহ-দান ভারতের দ্বিতীয়বার টেষ্ট জয়ের সাফল্যের জন্য দায়ী।



বিজয় মার্চ্চেন্ট (ক্যাপ্টেন—নিখিল ভারত)



ভিনু মানকাদ অমর সিং

ভারতের ক্যাপ্টেন মার্চ্চেন্ট এবারও টসে জয়ী হন এবং হিন্দেলকার ও ব্যানার্জ্জিকে ব্যাট করতে পাঠান। ১০ মিনিট খেলারপর বৃষ্টি আসে, খেলোয়াড়দের প্যাভিলনে আশ্রয় নিতে হয়। ১৫ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। ব্যাটসম্যানদের খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলতে হয়। ব্যানার্জ্জি প্রথম বাউণ্ডারী করেন এবং ৬৫ মিনিট খেলে ১১ রান করে আউট হ'লে মানকাদ খেলতে আসেন। শেষ পর্য্যন্ত মানকাদ ১১৩ রান করে নট আউট থাকেন। তাঁর শত রান তুলতে ২০০ মিনিট



ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট স্পোর্টসের সিনিয়র অবজারভেসন রেস ছবি—কাঞ্চন

লেগেছিল। হাভেওয়ালা দ..শ পিটে ৪৪ করেন। মানকাদ ও হাভেওয়ালার পঞ্চম উইকেট সহযোগিতায় ৮৫ রান ওঠে, এই দু'জনই ভারতকে রক্ষা করেছেন। ক্যাপ্‌টেন মার্চ্চেন্ট এইবার নিয়ে সাতবার ব্যাটিংয়ে অকৃতকার্য্য হলেন। এবারের ১৯ই তাঁর বৈদেশিক দলের বিপক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান। বোলারদের সুবিধাজনক ভিজা মাঠেও ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয় দিনে পুনরায় বৃষ্টি হওয়ায় খেলা ১১-২০ মিনিটে আরম্ভ হয়। মাঠ আরো বিপজ্জনক হয়েছে। মাত্র ১২ রান যোগ করে ২টা উইকেট যায়, তার মধ্যে মানকাদ করে ৭ এবং আমীর ইলাহী ৫। মাদ্রাজের খেলোয়াড় গোপালন শূন্য করেন।

তৃতীয় দিনে ১৭ মিনিট খেলার পরে টেনিসন দলের ইনিংস সমাপ্ত হয় ১০ রান মাত্র যোগ করে। কুড়ি রানের জন্য ফলো-অন্ করতে হলো। টেনিসন দলের ভারত অভিযানের সর্ব্বনিম্ন রান ৯৪ এই খেলায় হলো, সময় লেগেছে ১৫০ মিনিট।

ফলো-অন্ করে টেনিসন দল ১১-৩০ মিনিটে পুনরায় খেলতে নামলেন এবং বেলা ৩ ৫৫ মিনিটে ১৬৩ রান হলে দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্ত হলো।

ওয়েলার্ড সতর্কতার সঙ্গে ও প্রবলভাবে ব্যাট করে ৪০ রান তোলেন, দলের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ রান, তার মধ্যে ৩টা ছয় ও ১টা চার ছিল, সময় লেগেছিল প্রায় ৪০ মিনিট। গোপালন দু'বার ওয়েলার্ডের ক্যাচ ফসকেছে। ওয়ার্দ্দিংটন ও ল্যাংরিজে মিলে ৬১ রান যোগ করে। অমর সিং দু' ইনিংসে ১১ এবং মানকাদ ৬ উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।



ল্যাংরিজ



লর্ড টেনিসন



পোপ

১১-৪৫ মিনিটে টেনিসন দলের খেলারম্ভ হয়, পার্কস্ ও এড্‌রিচে। এড্‌রিচ চারে, পার্কস্ সাতাশে এবং ওয়ার্দ্দিংটন চৌত্রিশে আউট হন। হার্ডষ্টাফ ও ল্যাংরিজে বিপর্য্যয় কিছু পরিমাণ রক্ষা করেন এবং হার্ডষ্টাফ পিটিয়ে খেলে ৬৭ মিনিটে ৫০ রান তোলেন। ২-১৫ মিনিটে বারিপাতের জন্য আবার খেলা বন্ধ হয়, তখন ৫৫ রান ৩ উইকেটে হয়েছে। ৪-১০এ খেলা সুরু হলে অমর সিং ও মানকাদ বিপক্ষকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে। অমর সিং প্রথম তিন ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন এবং মানকাদ ২টি পর পর ওভারে ২টি উইকেট পান। অমর সিং স্লিপে দু'টি ক্যাচ লুফেন। বেলা শেষে টেনিসন দল ৯ উইকেট খুইয়ে ৮৪ রান করতে সক্ষম হয়, ৩০ রান করলে তবে ফলো-অন বাঁচ্‌বে। মার্চ্চেন্ট নিজে ৪টি ক্যাচ নিয়েছেন।

ভারতবর্ষ

চতুর্থ টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

ডি আর হিন্দেলকার···এল-বি, ব পোপ		১১
এস ব্যানার্জ্জি···কট ওয়েলার্ড, ব পোপ		১১
ভিনু মানকাদ···	নট আউট	১১৩
এল অমরনাথ···কট ও ব স্মিথ		৬
ভি এম মার্চ্চেন্ট···ব পোপ		১৯
ডি আর হাভেওয়ালা···কট ল্যাংরিজ, ব পোপ		৪৪
অমর সিং···কট পোপ, ব গোভার		১১
হাজারে···কট পোপ, ব স্মিথ		১৭
ভায়া···এল-বি, ব ওয়েলার্ড		২
গোপালন্···কট গিব্, ব পোপ		০
আমীর ইলাহী···কট পোপ, ব ওয়েলার্ড		৫
	অতিরিক্ত	২৪
	মোট	২৬৩

বোলিং :— প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
গোভার	১৪	১	৭০	১
ওয়েলার্ড	২৫	৬	৫৭	২
এড্রিচ্	৮	২	১৬	০
পোপ	১৯	৫	৫১	৫
স্মিথ	১২	০	৪৫	২

লর্ড টেনিসন দল

চতুর্থ টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

পার্কস্…এল্-বি, ব অমর সিং		১৬
এড্রিচ্…ব অমরনাথ		০
হার্ডষ্টাফ…এল-বি, ব অমর সিং		১৪
ল্যাংরিজ…এল-বি, ব অমর সিং		২৭
ওয়ার্দিংটন…কট আমীর ইলাহী, ব মানকাদ		২৪
গিব্…কট হিন্দেলকার, ব অমর সিং		১৮
পোপ…কট মানকাদ, ব অমর সিং		৩
ওয়েলার্ড…ব অমর সিং		৪০
লর্ড টেনিসন…	নট আউট	৩
স্মিথ…কট মার্চেন্ট, ব মানকাদ		২
গোভার…কট পরিবর্ত্তক, ব মানকাদ		০
	অতিরিক্ত	১৭
	মোট	১৬৩

বোলিং :— দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইঃ
অমর সিং	২৭	১৩	৫৮	৬
অমরনাথ	৪	২	৩	১
মানকাদ	২২·২	৩	৫৫	৩
আমীর ইলাহী	৬	১	১৬	০
হাভেওয়ালা	১	০	৯	০
গোপালন	২	০	৩	০
হাজারে	১	০	২	০

আম্পায়ার :—ব্রিটুহুইটল ও হাসান সা

রঞ্জি ট্রফী ঃ

পশ্চিম জোন ফাইনালে নওয়ানগর এক ইনিংস ও ১৩০ রানে বোম্বাইকে পরাজিত করেছে।

বোম্বাই—৪৫ ও ১১৪

নওয়ানগর—২৮৯ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অমরসিংয়ের মারাত্মক বোলিং ও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাটিংই বোম্বাইয়ের এরূপ শোচনীয় পরাজয়ের কারণ। তাঁর (নট আউট) ১৪০ রান একশত মিনিটে হয়, তার মধ্যে ৮৬ হয়েছে বাউণ্ডারীতে। প্রথম ইনিংসে তিনি ২২ রানে ৬ উইকেট পেয়েছেন, ব্যানার্জ্জি ১১ রানে ২। দ্বিতীয় ইনিংসে বোম্বাইয়ের পক্ষে হিন্দেলকারের ৫৪ রানই সর্ব্বোচ্চ। ভিনু মানকাদ ৪০ রানে ৩, রনভিরসিংজি ১২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।



হিন্দেলকার

বাঙ্গলা ও আসাম—১১০ ও ২১৭

মধ্যপ্রদেশ—১৫৪ ও ১৪৫

পূর্ব্ব জোনের ফাইনালে বাঙ্গলা ও আসাম ২৮ রানে মধ্যপ্রদেশকে এবারও পরাজিত করেছে। মধ্যপ্রদেশের বাঙ্গলার কাছে ইহা তৃতীয় পরাজয়।

প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থেকেও মধ্যপ্রদেশ জয়ী হতে পারে নি। বাঙ্গলার সফলতা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। শেষ দিনের খেলা খুব উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। আশা-নিরাশার মধ্যে দর্শকদের মন ওঠা-নামা করেছে। প্রথমে বাঙ্গলার জয়ের আশা কেহ করে নাই। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসের অধিক রান সংখ্যার বলে মধ্যপ্রদেশ বিজয়ী বলে গণ্য হতো। দ্বিতীয়



ভাণ্ডার গাচ্

(ক্যাপ্টেন—বাঙ্গলা ও আসাম)

ইনিংসে বাঙ্গলা ২১৭ রান করতে সক্ষম হলে সমর্থনকারীদের মনে ক্ষীণ আশা দেখা দেয়—যদি মধ্যপ্রদেশকে ১৭৩ রানের ভিতরে নামিয়ে দিতে পারা যায়। যখন সি কে ১৩ মাস্তাক আলি ৪এ নেমে গেলো ক্ষীণাশা গভীর হয়ে উঠলো। আলেকজাণ্ডারের বল বেশ মারাত্মক হচ্ছে এবং ইণ্ডারও সুন্দর বল দিচ্ছে। ভাণ্ডারকার ও ভায়ার জুটি ভাঙতে বিলম্ব হচ্ছে আর রান সংখ্যা যত বেড়ে চলেছে, সমর্থকদের আশার আলোক তত নিভে আসছে।



সি কে নাইডু
(ক্যাপ্টেন—মধ্যভারত)

বাঙ্গলা জয়ী হলেও মনের কোণে একটু খোঁচ থেকে গেলো, বেশ মন খুলে আনন্দিত হ'তে বোধ হয় কেউই পারেন নি। কারণ, বাঙ্গালী কেহই এ খেলায় বোলিং বা ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। ভার্সিটি ক্রিকেটে সম্প্রতি ডবল সেঞ্চুরীকারী এন চ্যাটার্জ্জিও কোন সাফল্য দেখাতে পারেন নি। কে ভট্টাচার্য্য ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন নি, তবে প্রথম ইনিংসে বোলিংয়ে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ব্যাটিংয়ে ভাণ্ডারগাচ্ ও কাটারই বাঙ্গলাকে রক্ষা করেছেন, তাঁদের সহযোগিতায় পঞ্চম উইকেটে ১৫৪ রান ওঠে। দ্বিতীয় ইনিংসে আলেকজাণ্ডার ও ইণ্ডারের বোলিংয়ে সফলতার জন্যই জয় হয়েছে। এ কামালের ফিল্ডিং অত্যন্ত খারাপ, সে প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকে। তার নাইডুর সহজ ক্যাচ্‌টা ফস্‌কান অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলা যেতে পারে, নাইডু তখন মাত্র ১ করেছেন। মিলার ৪১, এ কামাল ২২, ইন্দার ১৩। সি কে নাইডু ৫০ রানে ৩, হাজারে ২১ রানে ৪, মাস্তাক ২৫ রানে ৩ উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে ভাণ্ডারগাচ্ (ক্যাপটেন) ৮৫, কাটার



হাজারে   ভাণ্ডারকার   ভায়া

৮৫, ইণ্ডার ১২। হাজারে ৮৮ রানে ৫, সি কে নাইডু ২৬ রানে ৩, মাস্তাক ৪৬ রানে ২ উইকেট।

সি কে নাইডু ৭৬, ভাণ্ডারকার ১৭, ভায়া ১৬। কে ভট্টাচার্য্য ২৮ রানে ৩, আলেকজাণ্ডার ৪০ রানে ৩, জে এন ব্যানার্জ্জি ১১ রানে ২। দ্বিতীয় ইনিংসে ভাণ্ডারকার ৫০,



ভিক্টোরিয়া ইনৃষ্টিটিউট স্পোর্টসের বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারিণী কুমারী স্মৃতি চট্টোপাধ্যায় বর্শা নিক্ষেপ করছেন। পার্শ্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিণীদ্বয় দণ্ডায়মান

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ভায়া ৩৯, সৈয়দউদ্দিন ১৭। আলেকজাণ্ডার ৩২ রানে ৪, ইণ্ডার ৩৬ রানে ২ উইকেট।

লর্ড টেনিসন—৪৪৫ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

পাতিয়ালা একাদশ—১৪২ ও ৬৪৫ (উইকেট)

খেলাটি সময়াভাবে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ওয়েলার্ডের ৭৮ রান ৩৮ মিনিটে, তার মধ্যে ৫টি ছয় ও ৭টি চার ছিল। ল্যাংরিজ ৭৭, পার্কস ৬৪, জেমিসন ৪৭, হার্ডষ্টাফ ৪৬। সাহাবুদ্দিন ৬৪ রানে ৩, অমরনাথ ৬৯ রানে ৩, আমীর ইলাহী ৯৬ রানে ২, ওয়ার্দ ৮৯ রানে ১ উইকেট।



ওয়েলার্ড



আমীর ইলাহী

আমীর ইলাহী (নট আউট) ৪৩, মহম্মদ সৈয়দ ২৯। ওয়েলার্ড ৪৬ রানে ৬, এডরিচ ১৯ রানে ২, পিবলস্ ২৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অমরনাথ (নট আউট) ১০৯, হাভেওয়ালা ১০৬। লর্ড টেনিসন সর্ব্ব প্রথম বল করেন এবং ২ ওভার দিয়ে ১ মেডেন পান ও ৪ রান মাত্র দেন। তিনি অমরনাথের উইকেটটি পেতেন, যদি না হার্ডষ্টাফ ঐ অতি সোজা ক্যাচ ফসকাতো।

লর্ড টেনিসন—১৫১ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ৩৯ (২ উইকেট)

সি পি ও বেরার—৭৬ ও ১১২

দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যাপ্টেন ইরাণী ২২, টি এস নাইডু ২৮ ও মেন ২২। পোপ ৪৩ রানে ৪, স্মিথ ৩২ রানে ৩ এবং ওয়ার্দ্দিংটন ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে।

লর্ড টেনিসন—৪৪৮ (৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ৩২৪ (৫ উইকেট)

মাদ্রাজ—৩০৫

গোপালনের খেলার জন্যই ফলো-অন্ বাঁচে। ২ রানের জন্য তার সেঞ্চুরী নষ্ট হয়। ৩ ঘণ্টা খেলে ৯৮ করে, ১২টা চার ছিল। ওয়েলার্ড ১৫ মিনিটে ৩৬ করে, ২টা ছয় ও ৫টা চার। তিন ইনিংসে ১০৭৭ রান ওঠে। এড্‌রিচ্ এই অভিযানে তার নিজস্ব হাজার রান সংখ্যা পূর্ণ করেন, তাঁর নট আউট ১৩০এর মধ্যে ১৫টা চার ছিল। হার্ডষ্টাফ বিদেশীদের মধ্যে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছে প্রথম ডবল সেঞ্চুরী ২১৩ রান করে, যদিও তিনি ২টি সুযোগ ১২৯ ও ২০৮ রানে দিয়েছিলেন। ৫ ঘণ্টা সময় লেগেছে, ২৭টা চার ছিল।



হার্ডষ্টাফ

হার্ডষ্টাফ ২১৩, পোপ ৮৯, পার্কস ৫৩, ইয়ার্ডলে ৩৯। ম্যাক্‌ইভার ১০২ রানে ৪, পার্থসারথি ৭৯ রানে ২।

গোপালন ৯৮, ওয়ার্ড ৬৮, রীড ২৫, রাম সিং ২১, পার্থসারথি ২৫। পোপ ৫৪ রানে ৪, ওয়েলার্ড ৭০ রানে ২, স্মিথ ৬৮ রানে ২, পার্কস ১২ রানে ২।

দ্বিতীয় ইনিংস—এড্‌রিচ (নট আউট) ১৩০, ইয়ার্ডলে



এড্‌রিচ্



গোপালন্

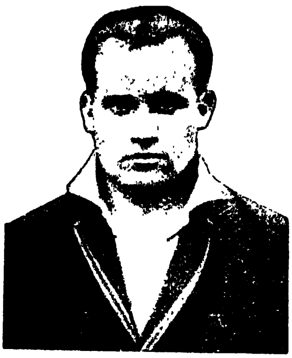
৭১, ওয়েলার্ড ৩৬, পার্কস ৩৫, ম্যাক্‌কর্ম্মকেল ৩৪। গোপালন ৬০, রানে ২, পার্থসারথি ৭৮ রানে ২, রে ৫ রানে ১ উইকেট।

লর্ড টেনিসন—১৪৮ ও ২৯৩

মৈনুদ্দৌলা একাদশ—৩১৭ ও ১২৭ (৪ উইকেট)

লর্ড টেনিসন দলের চতুর্থ পরাজয় ঘটেছে সেকেন্দ্রাবাদে মৈনুদ্দৌলা একাদশের কাছে ৬ উইকেটে। অমরনাথ ১২১ করেন ১৫৫ মিনিটে, ১৪টা চার ছিল। বিদেশীদলের বিপক্ষে তাঁর ইহা তৃতীয় সেঞ্চুরী। শত রান তোলবার পর অমরনাথ পিবল্‌স্‌কে নির্দ্দয়ভাবে পিটেছেন—এক ওভারে কুড়ি রান করে। এস এম হুসেন ৫৩, হাডি ৪৩, ইব্রাহিম খাঁ ২৬। ওয়েলার্ড ৯৩ রানে ৩, ওয়ার্দ্দিংটন ৫৬ রানে ৪। দ্বিতীয় ইনিংসে হিন্দেলকার ৪৭, অমরনাথ ২২, উসাক আহমেদ (নট আউট) ২১।

ল্যাংরিজ ৪৪, পার্কস ৪২, ওয়ার্দ্দিংটন ৩৭। মহম্মদ লতিফ ৩০ রানে ৫, সাহাবুদ্দিন ৬৪ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম তিন উইকেট মাত্র ৩৮ রানে পড়ে, চতুর্থ ৭৯ রানে। ম্যাক্‌করকেল ও ওয়ার্দ্দিংটনের পঞ্চম উইকেট সহযোগিতায় রান হয় ১১৬। ওয়ার্দ্দিংটন



ওয়ার্দ্দিংটন

৮২, ম্যাক্‌করকেল ৫৮, ওয়েলার্ড ৩৭, পিবলস্‌ ২৫, এড্‌রিচ ২০, ল্যাংরিজ ২১। লতিফ ৬১ রানে ৩, সাহাবুদ্দিন ৭৩ রানে ৩, অমরনাথ ৬১ রানে ২, আসাদুল্লা ৬১ রানে ২।



ম্যাক্‌করকেল

লর্ড টেনিসন—৩০৫ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

মহীশূর—৭৩ ও ১৪১

টেনিসন দল এক ইনিংস ও ৮১ রানে জয়ী হয়েছেন। মাত্র ৯০ মিনিটে ৮৩ রানে মহীশূরের সকলে আউট হয়ে যায়। সাফি দারাসা ২৪, কে হস্‌কিং ২৩। এড্‌রিচ্‌ ৩ রানে ৩, স্মিথ ১৯ রানে ৩, গোভার ২২ রানে ৩ ও পোপ ১৯ রানে ১ উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে দারাসা সাহসের সঙ্গে পিটিয়ে খেলে ৫৬ রান করে, কয়েকটি ৪ ও একটি ৬ ছিল। হস্‌কিং ৩২, রামারাও ১৬। গোভার ৩৫ রানে ৫, কিন্তু তার ১০টা 'নো' বল হয়েছে। স্মিথ ৪৮ রানে ৪, পোপ ১৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছে।



গোভার

এড্‌রিচ্‌ ১১০ মিনিটে ৯৬, ১৫টা চার ও ১টা ছয়। তার বিরুদ্ধে আম্পায়ারের এল-



বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের ১০০ মিটার বিজয়িনী মিস বেটি এড্‌ওয়ার্ডস্‌ ছবি—কাঞ্চন



ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট স্পোর্টসের সিনিয়র ব্যালান্স রেস। (দক্ষিণ থেকে দ্বিতীয় ×) বিজয়িনী কুমারী কমলা সেনগুপ্ত ছবি—কাঞ্চন



ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট স্পোর্টসের ৭৫ গজ রেসের প্রতিযোগিনীগণ। (দক্ষিণ থেকে দ্বিতীয় ×) বিজয়িনী কুমারী নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

বির অনুজ্ঞা অনুচিত হয়েছে, বল কোমরের উপরে লেগেছিল। হার্ডষ্টাফ ১০০ মিনিটে ৮৩, ৯টা চার ছিল। পার্কস ৫৫, ওয়ার্দ্দিংটন (নট আউট) ৩১। মোট ::০ রান সংখ্যা ওঠে ১২০ মিনিটে, ২৫০ ওঠে ১৫০ মিনিটে এবং ৩০০ ওঠে ১৮০ মিনিটে। নিকোলাস ৬১ রানে ৩, দারাসা ৪১ রানে ১, রামাস্বামী ৪৩ রানে ১, হস্‌কিং ৪২ রানে ১ উইকেট।

নিখিল ভারত টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলসে—ডি এন কাপুর ৮-৬, ৬ ৪, ৬-৪ গেমে ইসলাম আমেদকে হারিয়ে চ্যাম্পিন হয়েছেন।

পুরুষদের ডবল্‌সে—যুধিষ্ঠির সিং ও জে এম মেটা ৭-৯, ৬-৪, ৮-৬, ৮-১০, ৬-২ গেমে ডি এন কাপুর ও আর কে দেকে হারিয়েছেন।



নিখিল ভারত চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়িনী মিস্ লীলা রাও ও (দক্ষিণে) বিজিতা মিস্ ডুবাস

মিক্সড ডবলসে—জে এম মেটা ও মিসেস ফুটিট ৬-১, ৬-৪ গেমে আর কে দে ও মিস উড্‌ব্রিজকে পরাজিত করেছেন।

মেয়েদের সিঙ্গলসে—মিস লীলা রায় ৬-১, ৬-২ গেমে মিস ডুবাসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলোয়াড় ঃ

অষ্ট্রেলিয়াকে আগামী টেষ্ট খেলতে ইংলণ্ডে যেতে হবে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা নির্ব্বাচিত হয়েছেন। অনেকগুলি নূতন নাম দেখা যায়। নির্ব্বাচকরা তরুণদের ওপর বেশী নজর দিয়েছেন। ব্রাডম্যান অধিনায়ক হবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ওল্ডফিল্ড ও গ্রিমেট নির্ব্বাচিত হন নাই। এস বার্ণসের উপর অষ্ট্রেলিয়া ব্যাটিং সাফল্যের বিশেষ আশা করে, কারণ তার ব্যাটিং এভারেজ এবার খুব ভালো।



ওল্ডফিল্ড



গ্রিমেট

ব্রাডম্যান, ম্যাক্‌ক্যাব, বার্ণেট, ব্রাউন, চিপারফিল্ড ও ফিঙ্গলটন ব্যতীত কেহই পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যান নাই। ফ্লিটউড্‌-স্মিথ, ম্যাক্‌করমিক ও ও'রিলি অষ্ট্রেলিয়াতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন।

ডি জি ব্রাডম্যান (সাউথ অষ্ট্রেলিয়া) ক্যাপ্‌টেন, এস ম্যাক্‌ক্যাব (এন্‌ এস্‌ ডবলিউ) ভাইস্‌ ক্যাপ্‌টেন, ব্রাডকক্‌ (সাউথ অষ্ট্রেলিয়া), বি এ বার্ণেট (ভিক্টোরিয়া), এস বার্ণস্‌, এ জি চিপারফিল্ড, জে এইচ ফিঙ্গলটন (এন্‌ এস্‌ ডবলিউ), ফ্লিটউড্‌স্মিথ (ভিক্টোরিয়া), এ হাসেট (ভিক্টোরিয়া), ই এস হোয়াইট (এন এস ডব্‌লিউ), ই এল ম্যাক্‌করমিক্‌ (ভিক্টোরিয়া), ফ্র্যাঙ্ক ওয়ার্ড, সি ডবলিউ ওয়াকার (সাউথ অষ্ট্রেলিয়া), ডবলিউ ডি ও'রিলী (এন এস ডবলিউ), ডব্‌লিউ এ ব্রাউন (কুইন্সল্যাণ্ড), এম জি ওয়াইট (সাউথ অষ্ট্রেলিয়া)।

ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় ঃ

ভারতীয়—২০৯ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

ইউরোপীয়—১৬৫ (৬ উইকেট)

খেলা ড্র হয়েছে। এন চ্যাটার্জ্জি ৭১, এ কামাল ৫০, এস চ্যাটার্জ্জি (রান আউট) ২৮, কে খাম্বাটা (নট আউট) ২৯। ইওার ৩৯ রানে ৪, মিচেল-ইন্‌স্ ৩২ রানে ১ উইকেট।

কাটার ৩৫, ইওার (নট আউট) ২৬, সি ডবলিউ লংফিল্ড ৩০, টি সি লংফিল্ড ১৭, মিলার ২৩। আলেকজাণ্ডার ৪৭ রানে ৩, জে এন ব্যানার্জ্জি ৫২ রানে ২, এন দত্ত ৯ রানে ১ উইকেট।

ইণ্টার-ভার্সিটি ক্রিকেট ঃ

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি—৩৬৩ (৬ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)
ঢাকা ইউনিভার্সিটি—৯৯ ও ১২৬

কলিকাতা এক ইনিংস ও ১৩৮ রানে ঢাকাকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছে।

এন চট্টোপাধ্যায় ২১৬ রান করে এই প্রতিযোগিতায় রেকর্ড স্থাপন করেছে, ২২টি চার এবং ৫টি ছয় ছিল। এস বাগচি (রান আউট) ৫৪, আর গুপ্ত ৩১। আর সেন ২১০ রানে ৩, সি বোস ১৭ রানে ১ উইকেট।

ঢাকার এস বোস ২০, এস রায় ১৭, বি সেন ১৭। এস রায় ৩৩ রানে ৪, পি সুরেটা ২৩ রানে ৪, এইচ সাধু ২৫ রানে ১, এন চট্টোপাধ্যায় একটি বল দিয়ে ১ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে এম মুখার্জ্জি ২৭, এস রায় ২০, এস বোস ২১। সাধু ৪২ রানে ৪, সুরিটা ৫০ রানে ৪, এস রায় ১৪ রানে ১ উইকেট।

ব্রাডম্যানের উইকেট রক্ষা ঃ

সকলেই জানেন যে ডন ব্রাডম্যান একজন বিখ্যাত ব্যাটসম্যান এবং ভাল ফিল্ডার। ক্রীড়া জগতে নূতন খবর যে ব্রাডম্যান উইকেট রক্ষক হিসাবেও বেশ দক্ষ। সিডনেতে শেফিল্ডশীল্ড ম্যাচ খেলায় ব্রাডম্যানের দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দল ৪ উইকেটে ম্যাক্‌ক্যাবের দল নিউ সাউথ ওয়েলসের কাছে পরাজিত হয়। এই খেলায় দক্ষিণ



কলিকাতা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট দল। ঢাকা দল পরাজিত হয়েছে ছবি—জে কে সান্যাল

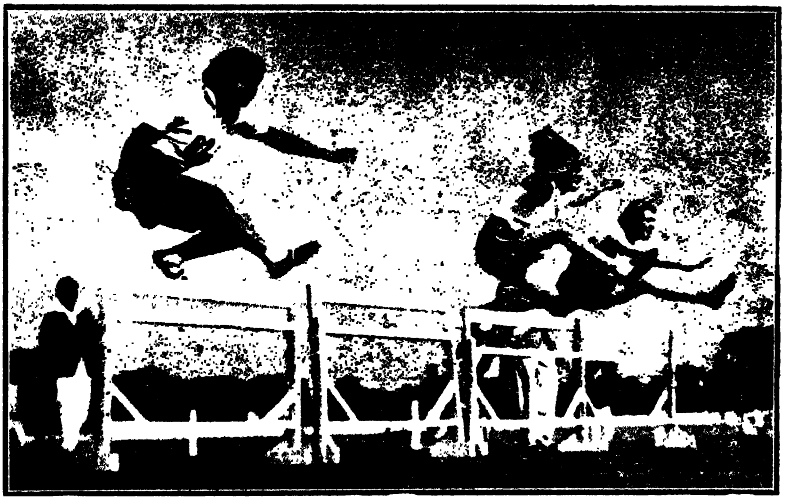


অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি ক্রিকেট দল—কলিকাতা ইউনিভার্সিটির নিকট পরাজিত হয়েছে ছবি—জে কে সান্যাল

অষ্ট্রেলিয়ার উইকেট রক্ষক ওয়াকারের ডান হাতের কড়ে আঙুল জখম হওয়ায় ডন্ ব্রাডম্যান উইকেট রক্ষা করে তিনজনকে ক্যাচ ও একজনকে ষ্টাম্পড করেন।

অষ্টম অলিম্পিক ঃ

নিখিল ভারত অষ্টম অলিম্পিক প্রতিযোগিতা টালা পার্কে সমাপ্ত হয়েছে। পরিচালনা সুচারুরূপে সমাধিত হয় নাই। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়েছে। বহু ব্যাজ-ধারীদের অকারণ কর্ম্ম-ব্যস্ততা দৃষ্ট হয়েছিল। বাইরের প্রতিযোগিদেরও ব্যবহার শোভন হয় নাই। প্রতিযোগিগণ তাঁদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ না করে দর্শকদের আসনে ভিড় করেছেন। পূর্ব্ব বৎসরের বিজয়ী পাঞ্জাব ৫৮ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে স্যর্ দোরাব টাটা ট্রফি লাভ করেছে। বাঙ্গলা ও পাতিয়ালা প্রত্যেকে ৩৬ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান, যুক্তপ্রদেশ ২০ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয় ও মাদ্রাজ ৯ পয়েণ্ট করে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে।



বেঙ্গল অলিম্পিকের ৮০ মিটার বেড়া রেস। বিজয়িনী মিস বেটি এড্ওয়ার্ডস্ (মাঝে) লাফাচ্ছেন ছবি—কাঞ্চন

এবার তিনটি নূতন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে,—স ট্ পু টে জহুর আহমেদ (পাঞ্জাব), ৮০০ মিটারে হাজুরা সিং (পাতিয়ালা) এবং ৪০০ মিটারে এফ্ গ্যাণ্ট জার (বাঙ্গলা)।

এথ্লেটিক্ (মেয়েদের):—

(১) বাঙ্গলা ৩০ পয়েণ্ট,
(২) পাঞ্জাব—১১ পয়েণ্ট

সাইকেল চালনা :—

(১) বাঙ্গলা ও বোম্বাই ৯ পয়েণ্ট প্রত্যেকে

পেণ্টাথলন :—

(১) পাতিয়ালা ১৬ মার্কস্,
(২) ইউ পি ১৮, পাঞ্জাব ২০

মল্লযুদ্ধ :—

(১) বাঙ্গলা ২১ পয়েণ্ট,
(২) পাঞ্জাব ১৩,
(৩) মধ্যপ্রদেশ ৬

কপাটী :—

(১) বাঙ্গলা, (২) মধ্যপ্রদেশ

বাস্কেট বল :—

(১) বাঙ্গলা, (২) পাঞ্জাব

—

(১) পাঞ্জাব, (২) বাঙ্গলা



বেঙ্গল অলিম্পিক কুস্তি প্রতিযোগিতার বিজয়ী মল্লবীরগণ ছবি- জে কে সান্যাল

টেষ্ট আম্পায়ার ঃ

বিদেশে টেষ্ট খেলতে গেলে সেই দেশীয় আম্পায়ারের

বিচারাধীনে খেলতে হয়। আন্তঃর্জ্জাতিক খেলার ইহাও একটা নিয়ম। ভারতে কিন্তু সে নিয়ম খাটে না। সম্প্রতি ভারতীয় ক্যাপ্‌টেনের আপত্তির পর মাদ্রাজ টেষ্টে হাসান সা একজন আম্পায়ার নিযুক্ত হন এবং বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে খেলা পরিচালনা করেন। মন্দের ভালো, তবু একজনও ভারতীয় আম্পায়ার খেলা পরিচালনা করতে পেয়েছেন। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে দু'জন আম্পায়ারই ভারতীয় নিযুক্ত হবেন। ভারতে যোগ্য আম্পায়ারের অভাব নেই।

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

চারটি টেষ্টে সমান ফলাফল হওয়ায় বোম্বাইয়ে পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত খেলা হবে। এই টেষ্টে যে পক্ষ জয়ী হবে সেই রবার পাবে।

হকি লীগ ঃ

১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে প্রথম ডিভিসন হকি লীগের খেলা আরম্ভ। ক্যালকাটা ও ডালহৌসীকে প্রথম বিভাগে রাখবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নূতন নিয়ম প্রণয়ন নিন্দনীয়। যখন কোন ইউরোপীয় দলের (বিশেষতঃ ডালহৌসী বা ক্যালকাটা) দ্বিতীয় বিভাগে নামবার সম্ভাবনা ঘটে, তখনই নূতন নিয়ম করে অধিক সংখ্যক দলের প্রথম বিভাগে খেলবার অনুমতি দেওয়া হয়। ফুটবল লীগে ইহা হয়েছে, এবার হকি লীগেও ঘট্‌লো। ভবিষ্যতে আরো কত হবে! ওঠা-নামা নিয়ম শুধু ভারতীয় দলের মধ্যে প্রযুক্ত হবে, এই বিধান দিলেই সব ল্যাটা চুকে যায়।



মুকুল সঙ্ঘ গার্ল গাইডের সাঁওতালী নাচ ছবি—তারকদাস

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীনবগোপাল দাস আই-সি-এস প্রণীত গল্পগ্রন্থ "অসমাপ্ত"—১৷৹

মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "রাজনটী"—৸৹

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (রায়বাহাদুর) প্রণীত "চণ্ডীদাস চরিত"—২৷৹

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে প্রকাশিত "বাঙ্গালায় ভ্রমণ"—৷৹

সতীশচন্দ্র দাস প্রণীত উপন্যাস "শৃঙ্খলা"—১৷৹

অয়স্কান্ত বক্সী প্রণীত নাটক "অভিসারিকা"—৸৹

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত ছেলেদের জন্য জীবনী "বালক কেশব"—৷৹

শ্রীঅসিতকুমার হালদার প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "কল্লান্তিকা"—১৲

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "স্বামী-স্ত্রী"—১৲

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "দেবীর দেশের মেয়ে"—১৷৹

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সটিক সানুবাদ "শ্রীশ্রীচৈতন্য সাধন রহস্য"—১৷৷৹

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত সটীক 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' (১ম খণ্ড) ২৷৷৹

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার ও শ্রীগিরিজাকুমার বসু সম্পাদিত "নলিনী সুষমা"—.৹

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "প্রেম ও কাম বিজ্ঞান"—১৷৹

শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় প্রণীত "হলদে পুকুর" (গল্প পুস্তক)—১৲

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

ভাব ভবনা



Bharatvarsha Printing Works



দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনা ও আর্থিক চিন্তা

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

সাহিত্য ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, না যুগ-সাধনার পরিস্ফূর্ত্তি—এ তর্ক বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরেও বহুবার হইয়া গিয়াছে: এখানে আর সে প্রশ্নের বিচার করা অনাবশ্যক। ধরিয়া লওয়া যাক্ যে—সাহিত্য রূপাত্মক, সাহিত্যের গৌরব প্রধানতঃ তার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে—ধরিয়া লওয়া যাক যে সাহিত্য ভাবের বাহন নহে—ভাবের প্রতীক মাত্র, সাহিত্যের দীপ্তি আছে মাত্র—দ্যোতনা নাই, সাহিত্য ব্যক্তিসর্ব্বস্ব, সমাজ-নিরপেক্ষ—সাহিত্যকে যাচাই করিতে হইবে সম্পূর্ণ তাহার রসোৎসারিণী ক্ষমতার তীক্ষ্ণতা এবং ব্যাপকতা দ্বারা—অন্য কোন অবান্তর আদর্শের মাপকাঠিতে নয়। এসব কথা মানিয়া লইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে কলা পরিধির বাহিরেও সাহিত্য আছে এবং অন্যান্য কলা নিদর্শনের ন্যায় রসাত্মক কলা-সাহিত্যেরও জাতীয়-সাধনার প্রশান্ততর পর্য্যায়ে একটি নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে। সাহিত্য সাহিত্য হইলেও ইহা জাতির সংহতি-সাধনার অঙ্গীভূত। কাজেই সাহিত্য-সাধনাকে সমাজ-তত্ত্বের স্তরে টানিয়া তুলিয়া বিচার করা চলে। ইহাতে সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয় না, সাহিত্যের নিজস্ব বিশিষ্ট আদর্শকে অতিক্রান্ত করিয়া তাহাকে এক বৃহত্তর ক্ষেত্রের বিভিন্ন আদর্শে বিচার করা হয় মাত্র। তাই যদি না হইবে, যদি বাঙ্গলা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর জাতীয় সাধনার অভিব্যক্তিরূপে গণনা করা না চলিত, তবে সাহিত্যের বৈঠকে দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতির আলোচনার প্রশ্নই উঠিতে পারিত না।

বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার অভাব ত্রুটি আলোচনা করিতে যাইয়া সহস্রাধিক অতীত বৎসরেরও যবনিকার

অন্তরালে গিয়া সেই সাধনার অঙ্কুরোদ্গম অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই—স্থূলভাবে বাঙ্গালীর সাধনার ঐতিহাসিক ধারার মূলসূত্রটী বুঝিয়া লইলেই চলিবে। বাঙ্গালীর সংহত জীবনে পাশ্চাত্য সাধনার প্রভাব পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার বিশিষ্ট ও আসন্ন পরিস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল তাহার ধর্ম্মজীবনে। রমাই পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত এই যে বাঙ্গালীর বিরাট ধর্ম্মসাধনা—তাহার সংজ্ঞা কি? আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনের মূল সংজ্ঞা ইহার অনন্যসাধারণ মানবীয়তা। বাঙ্গালীর ধর্ম্মসাধনায় উপাস্যতে যতটা মানবীয় সম্বন্ধ আরোপ করা হইয়াছে, বাঙ্গালার বাহিরে ভারতবর্ষের কোন অংশে ততটা করা হয় নাই। তাই দেখিতে পাই অ-বাঙ্গালী যাহাকে "ভগবান" বলে, বাঙ্গালী তাহাকে বলে "ঠাকুর"। বাঙ্গালী তান্ত্রিক হোক, কিংবা বৈষ্ণব হোক—শৈব হোক, কিংবা শাক্ত হোক, উপাস্য—উপাস্যকে হয় পিতৃরূপে, কিংবা মাতৃরূপে, কিংবা প্রেমিকরূপে—কোন না কোন মানবীয় সম্বন্ধের ভূমিকায় বহু শতাব্দী ধরিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী যাগ-যজ্ঞ জানে না; বাঙ্গালীর ন্যায় কোন জাতিই এত পৌত্তলিক নয়; বাঙ্গালীর গৃহ-দেবতা আছে, বাঙ্গালীর বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, যাহা বাঙ্গলার বাহিরে অতি অল্পই দেখা যায়। বাঙ্গলার ইতিহাস পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে একবার অষ্টম শতাব্দীতে এবং একবার দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে শূর-রাজগণ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আমদানী করিয়াছিলেন। এক হিসাবে বলিতে গেলে শূররাজগণের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালার মাটীতে যে ধর্ম্মসাধনা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা আর্য্য হইলেও বৈদিক নহে, তাহা অনেকাংশে বাঙ্গালার নিজস্ব সৃষ্টি বলিতে পারা যায়—এটা যেন একটি অভিনব Indian Paganism—এ ত ছিল বাঙ্গালার ধর্ম্মসাধনার উপর মানবীয় সম্বন্ধের ছাপ। মানবীয়তার ভূমিতে ধর্ম্মকে দাঁড় করান হইয়াছিল বলিয়াই দেখিতে পাই বাঙ্গালার মাটীতে স্মৃতিশাস্ত্রের অত কড়া পাহারা, হলায়ুধ, রঘুনন্দন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক বাঙ্গালার সমাজের আষ্টে-পৃষ্ঠে জটিল অনুশাসন বেষ্টনী; তাই মনে হয় ধী-সাধনার ক্ষেত্রেও বাঙ্গালার দর্শন হইয়াছিল বেদান্ত নয়—যতটা হইয়াছিল নব্য ন্যায়। রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিভাই বাঙ্গালার বিশিষ্ট ধী-প্রতিভা। অবশ্য রূপগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনেরা যে বাঙ্গালা দেশে বেদান্তের আলোচনা করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্রহ্মসূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালীর মানবীয় ধর্ম্ম-সাধনারই গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-সাধনা সম্পূর্ণ-ভাবেই বৈষ্ণবীয়ভাবে অনুস্যূত এবং এ সাধনার বিশিষ্ট সংজ্ঞা আর কিছুই নহে, ধর্ম্মজীবনে মানবীয় সম্বন্ধের একান্ত প্রভাব মাত্র।

এই গেল প্রাক্-ব্রিটীশ যুগের কথা। ইংরাজ অধি-কারের পরেও বাঙ্গালীর সাহিত্যসাধনার ধারা অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই যে বাঙ্গালী বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্যের চিন্তাক্ষেত্রে মানবীয় সম্বন্ধের চিরন্তন মালমশ্লাগুলি নিয়া নাড়াচাড়া করিয়া আসিয়াছে। এই নাড়াচাড়ার ফলে বাঙ্গালীর মণীষার বিস্ময়কর পরিস্ফূর্ত্তি হইয়াছে। উপন্যাস, কবিতা, দর্শন, ইতিহাস সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর মৌলিক প্রতিভার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাধনার সংঘর্ষে আসিয়া বাঙ্গালী নিজের সাধনার মূল্য বিচার করিতে শিখিয়াছে। তারই ফলে রামমোহন রায়, অক্ষয় দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, শশধরতর্কচুড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সীতানাথ, ধীরেন্দ্র চৌধুরী, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রামেন্দ্রসুন্দর, হীরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল ও প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতির দার্শনিক রচনার আজ আমরা উত্তরাধিকারী হইয়াছি। ইংরাজ অধিকারের যুগে স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণায় আমরা রাজেন্দ্রলাল, লালমোহন বিদ্যানিধি, কৈলাস সিংহ, রমেশচন্দ্র, রজনীকান্ত, অক্ষয় মৈত্রেয়, রামপ্রাণ, যোগেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, যদুনাথ, রাখালচন্দ্র ও রমাপ্রসাদ প্রভৃতির রচনায় ভারতের ও বাঙ্গালার লুপ্ত ইতিহাস অনেকাংশে ফিরিয়া পাইয়াছি। সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রামগতি, অক্ষয় সরকার, পূর্ণচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, শশাঙ্কমোহন, অজিতকুমার ও নলিনী গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যকে কম সমৃদ্ধ করেন নাই। কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাঙ্গালী প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বাঙ্গালা

সাহিত্যে সর্ব্বপ্রকার চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, শুধু পাওয়া যায় না বাঙ্গালীর আর্থিক চিন্তার। বাঙ্গালীর দার্শনিক চিন্তা জগৎসৃষ্টি ও স্বগুণ—নির্গুণ ব্রহ্মসাধনার পর্ব্বত-অধিত্যকা ছাড়িয়া বড় জোর কৃষ্ণকমলের পজিটিভিজম, কিংবা শশধর রায়ের নৃতত্ত্বের সানুদেশে নামিয়াছে, কিন্তু তাহা অর্থনীতি কিংবা আর্থিকসমাজ আলোচনার নদীমাতৃক প্রান্তরে আজ অবধি নামিল না। বাঙ্গালার ইতিহাস ক্ষেত্রেও তথ্যান্বেষী ঐতিহাসিকরা রাজা উজিরের তথ্য উদ্ধার করিলেন, যুদ্ধ চক্রান্তের অজ্ঞাত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, কিন্তু সহস্রাধিক বৎসরের অতীত বাঙ্গালী-জীবনের আর্থিক অবস্থা নিরূপণ কবিবার জন্য কোন পুরাতাত্ত্বিক ধুরন্ধরই তেমন অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই। সমালোচনার ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই যে সাহিত্যকে হয় ধর্ম্মসাহিত্যের কাঠামতে ফেলিয়া—না হয় আদর্শ চিন্তার মাপকাঠিতে ফেলিয়া বিচার করিবারই সম্পূর্ণ চেষ্টা। সাহিত্য রসাত্মক হইলেও অনেক সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেই যে সে রসসৃষ্টির একটা বিশিষ্ট আর্থিক ভূমি আছে ইহা বাঙ্গালার সমালোচনা সাহিত্য পড়িয়া ঘুণাক্ষরেও মনে হয় না। কল্পনা সাহিত্যে আর্থিক চিন্তার অভাবই সব চাইতে বেশী দ্রষ্টব্য। বাংলা সাহিত্যে নাটক নভেলে আদর্শ চিন্তার এত প্রভাব যে বর্ণিত উপাখ্যানের আর্থিক বাস্তবতা লেখক কিংবা পাঠকের সামনে মুহূর্ত্তের জন্যও ভাসিয়া উঠে না। সব রচনাতেই সমৃদ্ধ জীবনের কথা না থাকিলেও প্রেম দ্বেষ, পাপ-পুণ্য, নীচতা-উদারতা প্রভৃতি মানব চরিত্রের চিরন্তন বড় বড় সংজ্ঞার পর্য্যায়েই চরিত্রগুলি সৃষ্ট ও বর্ণিতজীবন গ্রথিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে দারিদ্র্যের, বিশেষতঃ পল্লীজীবনের বহু চিত্র আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দারিদ্র্যকে প্রায় সব স্থলেই লেখকের করুণা সৃষ্টির রসদরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, দরিদ্র জীবন চিত্রিত করিয়া আদর্শবাদকে উচ্চতর করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু সেই আদর্শ সম্পূর্ণ নৈতিক, একেবারেই আর্থিক নহে। রচয়িতার নিকট দারিদ্র্য Setting মাত্র, ইহার সঙ্গে তার নৈতিক সহানুভূতি আছে—কিন্তু ইহার সঙ্গে কোন আর্থিক চিন্তাই জড়িত নাই। কবিকঙ্কণ ষোড়শ শতাব্দীতে আর্ত্তকণ্ঠে তার পাঠক সমাজের নিকট চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—

"দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
আমানী খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।"

মুকুন্দরাম প্রাচীন সাহিত্যে দারিদ্র্যকে যতটা কঠোর করিয়া দেখাইয়াছেন, আমার মনে হয় আধুনিক রসাত্মক সাহিত্যে ততটা করা হয় নাই। বাঙ্গালার অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যে অনেক সহুরে দরিদ্রপল্লীর কাহিনী আছে, কিন্তু আমার মনে হয় সেখানেও লেখকদের দারিদ্র্য-সহানুভূতির মধ্যেও কোন সুস্পষ্ট আর্থিক চিন্তার পরিচয় নাই।

বাঙ্গালীর আদর্শপ্রবণ মানবীয়তামূলক সাহিত্য-সাধনায় আর্থিক চিন্তার পর্য্যাপ্তি না থাকিলেও এ চিন্তা যে কিছুমাত্র বাঙ্গালার সাহিত্য-সাধকের মন অধিকৃত করে নাই, এ কথা বলা চলে না। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টের ভারতীয় কমিটির নিকট যে সাক্ষ্য দেন, তাহাতে তাহার যথেষ্ঠ আর্থিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় "পল্লীগ্রামের অবনতি" সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন দেখিতে পাই। অক্ষয়কুমারের দৃষ্টি আর্থিক চিন্তার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হইলেও সে চিন্তার কোন গভীরতা ছিল না। কাজেই এক হিসাবে বলিতে গেলে বাঙ্গালীর আর্থিক চিন্তার সূত্রপাত "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের "বাঙ্গালার কৃষক" প্রবন্ধে। বাঙ্গালার আর্থিক সংগঠনে কৃষকের স্থান বঙ্কিমচন্দ্র যেমনটি বুঝিয়াছিলেন, তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে দূরে থাক, বর্ত্তমান শতাব্দীতেও বহুপরে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ বুঝিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু আর্থিক চিন্তার যে সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্র করিয়া গিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে সংস্কার সংরক্ষণের তুমুল সংগ্রামের ফেনিল আবর্ত্তের মধ্যে তাহা আর মাথা তুলিতে পারে নাই। তারপর দেখিতে পাই বাঙ্গালার স্বদেশী যুগের সাময়িক পত্রে কিছু কিছু আর্থিক ব্যাপারের আলোচনা ও চিন্তা। সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা" ঐ যুগের একখানা সমাদৃত গ্রন্থ। কিন্তু উত্তেজনার যুগে অন্যান্য আর্থিক আলোচনার ন্যায় সখারামের পুস্তকে তথ্যাধিক্য যতই থাক, ইহাতে গঠনমূলক কোন আর্থিক চিন্তাই ছিল না। রাষ্ট্রনীতির উত্তেজনায় আর্থিক আলোচনা সে যুগে সরস হইয়া উঠিয়াছিল বটে—কিন্তু ভাবাবেশে "স্বদেশী" শুধু "বয়কটে" পরিণত হইয়াছিল। আজ ভারতে

ম্যানচেষ্টার হইতে আমদানি বস্ত্রের মূল্য ৭০ কোটী হইতে ২০ কোটী দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু ইহা কোন বয়কট আন্দোলন দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। ৩০শে আশ্বিনের দিনে রাখি বাঁধিয়া উত্তেজনার মদিরতায় বাঙ্গালী সেদিন শুল্ক সংরক্ষণ নীতির (Tariff Protection) কথা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বদেশীর পরে বাঙ্গালা সাহিত্যে আর্থিক চিন্তার ক্ষেত্রে দেখিতে পাই "গৃহস্থে"র অভ্যুদয়। "গৃহস্থের" আয়ু তিন বৎসর মাত্র ছিল—১৯১০ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। কিন্তু স্বল্লায়ু হইলেও ইহাকেই বাঙ্গালার আর্থিক চিন্তার সর্ব্বপ্রথম মুখপত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। "গৃহস্থ" স্বদেশী যুগের তরুণগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও অনেকাংশে স্বদেশীযুগের ভাবাবেশবর্জ্জিত বাস্তব-চিন্তার বাহন ছিল। ইহার আর্থিক চিন্তা গণবাদী হইলেও ইহার গণবাদ কার্লাইল—রাস্কিনের ধার করা আর্থিক চিন্তা ব্যতীত কিছুই নহে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এইখানেই বাঙ্গালার আর্থিক চিন্তার অবসান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সমাজতত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা করিয়া এই যে আমরা বাঙ্গালার সাহিত্য সাধনায় আর্থিক চিন্তার অভাব জানাইলাম, তাহাতে বাঙ্গালার সাহিত্য সাধনার সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধেই অভিযোগ প্রকাশ করিলাম; সে অভিযোগ শুধু বাঙ্গালীর সাধনার দিক হইতেই বক্তব্য, কলা সাহিত্যের দিক হইতে নহে। কোন দেশে কলা সাহিত্য ফরমাইসে তৈরী হয় না এবং হইবে না। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালার কলা-সাহিত্যিকগণের ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে পারিপার্শ্বিক জীবনকে উপেক্ষা করিয়া সাহিত্য রচনা করিতে পারেন খুব অল্পসংখ্যক লোক। বর্ত্তমানকালে পারিপার্শ্বিক জীবনে সব চাইতে চরম হইয়া যে সুর অসংখ্য নরনারীর প্রাণে বাজিতেছে তাহা হইল আর্থিক সংগ্রামের সুর। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারীতে যেমন দ্বারভাঙ্গায় বসিয়া কোন সাহিত্যিক প্রকৃতির নিদারুণ অভিশাপ বিস্মৃত হইয়া সাহিত্য জীবনের আশার বাণী শুনাইতে পারেন না, তেমনি কলা সাহিত্যিকেরাও আজ আর্থিক চিন্তা বিস্মৃত হইয়া নির্ব্বিশেষ সৌন্দর্য্যের উদ্দেশে "নিরুদ্দেশ যাত্রা" করিতে পারেন না! বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ-সাহিত্যিক ১২৯৪ সালের বৈশাখ সংখ্যার "ভারতীতে" সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন।

"এই অসীম সৃষ্টিকার্য্য অসীম অবসরের মধ্যেই নিমগ্ন। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা অজস্র অবসরের সমুদ্রের মধ্যে সমস্ত কুমুদকহ্লারপদ্মের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কার্য্যেরও শেষ নাই, অথচ তাড়াও নাই। সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, ইহার জন্য অনেকখানি আকাশ, অনেকখানি সূর্য্যালোক, অনেক-খানি শ্যামলভূমি আবশ্যক।"

কবির এই উক্তির পর পৃথিবীর বুকের উপর পঞ্চাশ বৎসর বহিয়া গিয়াছে। জীবন সংগ্রামের ঘূর্ণী আবর্ত্তে নরনারীর জীবন অবসর-বিরল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সামান্য আকাশ, সামান্য সূর্য্যালোক ও সামান্য শ্যামল ভূমি ভোগ করিবারই বা অবসর কোথায়? কিন্তু তাই বলিয়া আধুনিক জগতে সাহিত্য সাধনার বিরাম হয় নাই। আধুনিক জীবনের ব্যস্ত জীবন-সংগ্রামই আধুনিক সাহিত্যের প্রাণ। জীবন বদ্‌লাইয়াছে বলিয়া সাহিত্য-সাধনা ক্ষান্ত থাকিবে না—ইহার রূপ পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। আজিকার দিনেও যদি বাঙ্গালী আর্থিক জীবনের অগণিত সমস্যা বিস্মৃত হইয়া শুধু আদর্শবাদের চিরন্তনী বেসাতি লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করে, তবে জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য চেষ্টা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।



দারিদ্র্যের ইতিহাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৭)

কারও মুখে একটী কথা নাই। ঘরখানা এত নিস্তব্ধ হয়ে গেল, একটী সূঁচ পড়লেও সে শব্দ শোনা যায়। অন্ধকারও এমন ভীষণভাবে জমাট বেঁধে দাঁড়াল, তার বুকে যেন বাতাস পাওয়া যায় না, মনে হল এখনই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।

নিতাই উপুড় হয়ে পড়েছিল, দুইহাতে মাটি আঁকড়ে ধরেছিল। এক একবার তার দেহটা থরথর করে কেঁপে উঠছিল, এক একবার এক একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দে ক্ষুদ্র ঘরখানা শব্দায়িত করে তুলছিল মাত্র। সুনন্দা দুইহাতে নিজের মুখ ঢেকেছিলেন, তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে অজস্র অশ্রুবিন্দু নিতাইয়ের ক্ষুদ্র দেহের 'পরে ঝরে ঝরে পড়ছিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়—

সুনন্দা অস্থির হয়ে উঠছিলেন—প্রভাতের আর বিলম্ব নাই, ঠাণ্ডাবাতাস বইতে সুরু করেছে। আকাশের এককোণ থেকে যে মস্ত বড় তারাটা জেগে উঠেছে তাকে জানলাপথে দেখা গেল।

দিনের আলো আসছে—

সুনন্দা ডাকলেন, "নিতাই—"

তাঁর কণ্ঠস্বরে স্নেহ ঝরে পড়ছিল।

নিতাই উত্তর দিলে না, একটু নড়লো মাত্র।

তার পিঠের 'পরে হাতখানা রেখে সুনন্দা বললেন, "ওঠো নিতাই, আমার কথা শোন।"

নিতাই উঠলো, একটী কথা তখনও তার মুখে নাই। অভিমানে, দুঃখে, বেদনায় তার ক্ষুদ্র অন্তর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তার কোনও একটীর আভাস দেওয়ার ক্ষমতাও তার নাই।

সুনন্দা বললেন, "বল, তুমি যাবে?"

নিতাই উত্তর দিল না।

সুনন্দা ব্যগ্রকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বল তুমি যাবে? কাল দুপুরে আমাদের বাড়ীতে খেয়ে আমাদের সরকারের সঙ্গে কলকাতায় যাবে, সে তোমায় ভবানীপুরে আমার বন্ধুর বাড়ীতে রেখে আসবে। তোমার কাপড়, জামা, জুতো যা লাগবে সব দিয়ে সে তোমাকে কোন স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে। আমি যেখানেই থাকি, তোমার যা খরচ তা আমি পাঠিয়ে দেব—তোমায় মানুষ করতে"

এতক্ষণ নিতাই স্থিরভাবে তাঁর কথা শুনছিল, এতক্ষণে সে কথা বললে—"না—আমি কোথাও যাব না, আমি এখানেই থাকব; আমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে চাইনে।"

সুনন্দা স্তম্ভিতা হয়ে গেলেন—নিতাইয়ের কথা যেন বিশ্বাস হয়না।

"একি বলছো নিতাই?"

দৃঢ়কণ্ঠে নিতাই বললে, "আমি এতদিনে আমার সত্য পরিচয় জানতে পেরেছি মা, আর আমার এতটুকু দুঃখ নেই। আজ জগৎ আমায় যতই ঘৃণা করুক, লাঞ্ছনা দিক, আমি সব সইব; আমি জানব সে আমার প্রাপ্য—কেউ আমায় মিছে অপবাদ দিচ্ছে না। এই সত্যকে আবিষ্কার করতে আমি কি না করেছি—কোথায় না গেছি, কিন্তু আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে; তুমি আমারই এত কাছে রয়েছ, তা তো আমি কোনদিনই জানতে পারি নি মা।"

সুনন্দা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মুছলেন।

নিতাই বলে যেতে লাগলো, "আমি তাই ভাবছি, কেন তুমি হঠাৎ আমায় একেবারে পাঁচহাজার টাকা দিতে চাইছো। আমি জানি, আমি বুঝতে পেরেছি, আমায় নিজের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়ার সাহস তোমার নেই, তাই তুমি এসো যাও অন্ধকারে, আলো দেখে তুমি শিউরে ওঠো—ভয় পাও। অথচ তুমি আমার মা—তুমি আমায় জগতে এনেছ—"

"আমি তোর দুর্ভাগিনী মা নিতাই—"

বলতে বলতে সুনন্দা উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠলেন।

নিতাই কান্না চেপে শান্তকণ্ঠে বললে, "দুর্ভাগিনী তা আমি জানি, নিজের জন্মরহস্য আমার কাছে অনাবৃত হয়ে গেছে মা আমার। আমি তোমায় অভিশাপ দিতুম—কেন না সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ আমার তুমিই করেছ। তুমি আমায় জগতে এনেছ, অথচ পাছে দায়ী হতে হয় তাই পথের ধারে বিসর্জ্জনও দিয়েছ—"

তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল—অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে সে বললে, "তোমার সন্তানের চেয়ে সমাজ হল আপন, যাকে নিয়ে এলে সে হল তোমার পর। কেন আমায় এ জগতে আনলে মা—কেন আমায় নিয়ে আসার হেতু হলে? আমায় এমন অন্ধকারে ফেলে দিয়ে তুমি বাস করছো আলোময় স্বর্গে, এ দিকে তোমায় ডেকে, তোমায় চেয়ে—আমি যে সারাজন্ম ফিরছি মা।"

অনেকক্ষণ সে নীরব হয়ে রইল—তারপর আবার বললে, "তোমায় অভিশাপ দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে, অভিশাপ দেবনা। আমি এখানে থাকলে পাছে কোন রকমে আমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই তুমি প্রলোভন দেখিয়ে আমায় দূরে পাঠাতে চাচ্ছো?"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সে বললে "এ আমার খুব বড় লাভ, কিন্তু আমি এ চাইনে মা। আমি যে অন্ধকারে রয়েছি এই অন্ধকারই হোক আমার সাথের সাথী, আমি আলো চাইনে, আমি মানুষ হতে চাই নে। ভয় নেই, তোমার আমার সম্পর্কের কথা কেউ জানবে না; এতদিন যেমন লুকানো আছে তেমনই লুকানো থাকবে।"

পূর্ব্বাকাশ অল্পে অল্পে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; সুনন্দার সেদিকে আর দৃষ্টি ছিল না, দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে তিনি ক্ষুদ্র বালিকার মতই ফুলে ফুলে কাঁদছিলেন।

নিতাই বললে, "তুমি বাড়ী ফিরে যাও, ভোর হয়ে এলো। এখনই লোকজন উঠবে, যে কথা গোপন রাখতে তুমি তোমার যথাসর্ব্বস্ব খরচ করে আমাকে এখান হতে সরাতে চাচ্ছো, সে কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে।"

সুনন্দা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন।

নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠলো—

"আজ হতে তুমি আমায় আর এ গাঁয়ে দেখতে পাবে না, তা তোমায় বলে রাখছি মা। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে থাক; আজ যে সত্য তুমি প্রকাশ করে গেলে, এর জন্যে আমি আজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইলুম। প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, জীবনে আর কোনদিন আমায় দেখতে পাবে না, তোমার কাছে চিরদিনই আমি মৃত থাকব।"

পুত্র ও জননী—

জগতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী আপনার—তারা এত পর—এত ব্যবধান তাদের মাঝে!

কি নিয়ে হল এদের পরিচয়? মা তার প্রাপ্য গৌরব নিয়ে সন্তানের সামনে দাঁড়ানোর যোগ্যতা হারিয়েছে, তাই সে দেবী নয়—সে আজ সামান্য নারী মাত্র। মায়ের যে মর্য্যাদা পাওয়ার কামনা প্রত্যেক মায়েই করে থাকে—এ মা সে মা নয়।

সুনন্দা চলতে গিয়ে থমকিয়ে দাঁড়ালেন, একবার ফিরে চাইলেন, আর্ত্তভাবে কেঁদে উঠে বললেন, "আমায় ভুল বুঝিসনে নিতাই—"

এর বেশী বলবার মত কথা এ মায়ের নাই।

নিতাই ম্লান হাসলে মাত্র—

"ভুল? না, তোমায় ভুল বুঝি নি, তবে কোনদিন যে বড় জ্বালা পেলে—বড় বেদনা পেলে—মা নামটা উচ্চারণ করে এতটুকু সান্ত্বনালাভ করব, সে পথ তুমি আমার রাখলে না। মা নাম মনে আনবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে—সেই মেয়ে—যে আমায় কেবল নিয়ে এলো পৃথিবীতে—ছেড়ে দিলে অন্ধকারের মধ্যে অজানা অচেনা লোকের মাঝখানে। সে দেখলে না কে তাকে আশ্রয় দেবে, সে ভাবলেনা সে বাঁচবে কিনা। আমি তোমায় মনে করব—তবু ভাবব আমার দারিদ্র্য আমি নিজেই নিয়েছি; তুমি আমায় ধনী করতে এসেছিলে—আমি নেই নি। তুমি যাও, আর কথা নয়, রাত ফুরিয়ে এলো—দেরী করো না।"

তখনও পথে জমে রয়েছে অন্ধকার, গ্রামের বুকে কেউ জাগে নি। নীড়ে পাখীরা সবে উসখুস করতে সুরু করেছে, গান তখনও গায় নি।

সেই তরল অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে সুনন্দা কোথায় মিলিয়ে গেলেন, তাঁকে আর দেখা গেল না।

নিতাই খোলা দরজা পথে তাকিয়ে রইল সেই দূরের পানে—যেখানে সুনন্দা চিরকালের মতই তার চোখের

সামনে মিলিয়ে গেলেন, আর তাঁকে দেখা যায় নি।

কালো যবনিকা চিরকালের মত মাঝখানে ফেলাই রইল। এ পারে সন্তান—ও পারে জননী, যবনিকা তুলবার শক্তি কারও নাই।

দুর্ভাগিনী—সত্যই সে দুর্ভাগিনী নারীই বটে। যাকে সমাজ—সামাজিক ধর্ম্মাচারের জন্য সন্তানকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, সে সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে থাক—সে বড় দুর্ভাগিনী, সে পথের কাঙালিনীরও অধম।

নিতাই চেয়ে রইল, তার চোখ জ্বালা করতে লাগল।

কি হল এ পরিচয় নিয়ে, কি হল পরিচয় দিয়ে? না জানা যা ছিল তাই যে ভালো ছিল; কিন্তু এ কি করলে নারী, কেন নিজেকে প্রকাশ করতে এলে, কেন ধরা দিলে? অপরিচয়ের ব্যথা যাই থাক, তাতে তো কাঁটা বিঁধতো না।

নিতাই দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকালো।

(২৮)

যাত্রার দল ভেঙে গেল।

কিই বা চিরকাল টিঁকে থাকে? জগতে যা কিছু দেখা যায় সবই তো ভঙ্গুর, কিছুরই আয়ু বেশীদিন নয়। কত রাজ্য লয় হচ্ছে, কত জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ আশ্চর্য্য এই—পৃথিবী যেমন তেমনই রয়েছে, একইভাবে ছয়টা ঋতু আসে যায়—তেমনই আসে অমাবস্যা পূর্ণিমা, আলো এবং অন্ধকার।

অনন্ত একেবারে অন্তঃপুর আশ্রয় করলে; তার ভগবতী অপেরাপার্টির নামে কেউ যে একটা কথা বলবে তা সে সইতে পারবেনা।

ছন্নছাড়া জীবনে অসিত তবু একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছিল, তাও গেল পথের মাঝে হারিয়ে।

অসিত এখন এখান হতে সরে যেতে চায়, কিন্তু পথ কই? পথও তো খোলা নয়, বাণী আবার বিরাট গলগ্রহ যে; একে নামানো যায় কোথায়?

অসিত অকারণেই জগতের 'পরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো—নিজের উপর খুব বেশী রকম। কেন—কেন তার এই অহেতু দয়া, এ দয়াটুকু দেখানোর তো কোন দরকারই ছিলনা। মুসলমান ও হিন্দু এই দুইটী বিরাটজাতির মাঝখানে যে অতিক্ষুদ্র মেয়েটী পড়েছিল, তাকে তুলে এনে আশ্রয় দেওয়ার কি দরকার ছিল তার? সে ভেঙে যেত, গুঁড়িয়ে যেত, নাই বা থাকত তার অস্তিত্ব, তাতেই বা কি?

এই যে বিশাল জগৎ, এর বুকে বুদ্‌বুদের মত কত মানুষ উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, কেই বা তার খবর রাখে? বাণীর সন্ধান রাখত কে? কে সে? সামান্য একটা মেয়ে; এমন কাজ সে করে নি যাতে তার নামটা অন্ততঃপক্ষে কিছুদিনের জন্যেও মানুষের মনে জেগে থাকে।

অসিত ছটফট করে—মুক্তি দাও—তাকে মুক্তি দাও। সুন্দরী ধরিত্রী, তোমার প্রেমপূর্ণ স্নেহালিঙ্গন হতে তাকে মুক্ত কর।

বাণী দরজার বার হতে ভয়কম্পিত কণ্ঠে ডাকে—"বাবা—"

বিকৃতকণ্ঠে অসিত উত্তর দেয়—"কেন মা—"

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই সে চমকে উঠল, বাণী বলতে এসেছিল সংসারের কথা, কিন্তু সেকথা সে হারিয়ে ফেললে।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার ডাকলে—"একটা কথা বলতে চাই বাবা—"

অসিত বললে, "বল—"

বাণী দ্বিধা দূর করে বললে, "আমি কাশী যাওয়ার আয়োজন ঠিক করেছি, আপনি যদি অনুমতি দেন—"

অসিত স্তম্ভিতভাবে বাণীর পানে চেয়ে রইল।

অপ্রত্যাশিত মুক্তি—ভগবান কি বাধ্য ছেলে, চট করে কেমন মুক্তিটা দিয়ে ফেললেন। এই মুক্তিই অসিত এখনই চাইছিল না? আঃ, থাকুক ভগবান, তাঁর সত্তাটাকে কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিয়েই বা মানুষ কি সার্থকতা লাভ করবে? তার চেয়ে 'আছে' বলে সময় অসময়ে যদি এমনই একটু করুণা মেলে—মন্দ কি।

অসিত বললে, "অনুমতি দিতে তো আপত্তি নেই; তবু কার সঙ্গে যাচ্ছো, কোথায় থাকবে সে সব কথাগুলো আমার জানা দরকার নয় কি?"

কার সঙ্গে যাওয়া আর কোথায় থাকা—বাণীর চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরে ওঠে। কেউ নাই তবু সে একাই চলবে।

সাথী সে হারিয়েছে কিন্তু তাতেই বা কি? জীবনে সে আর কাউকেই চলার পথে সাথী করবে না, দরকারই

বা কি? আর সেখানে আশ্রয়? বিশ্বনাথের দরজায় কত অনাথ আতুর জায়গা পায়, বাণী পাবে না কেন?

ভিক্ষা করে খাবে সে, পথে পথে বেড়াবে, তবু সে অসিতকে এমন করে বেঁধে রাখবে না, লোকের কাছে ঘৃণ্য হেয় করে রাখবে না।

চট করে চোখ মুছে শুষ্ক কণ্ঠে সে মিথ্যা কথাই বললে, —"কাশীতে আমার শাশুড়ী আছেন, তাঁর কাছে থাকব। এখান হতে কোন রকমে যাওয়া মাত্র—"

অসিত আরামের সঙ্গে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা, যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দেব এখন, কাউকে দিয়ে না হয় পাঠান যাবে। ভালো কথা, তুমি তোমার শাশুড়ীর কাছেই থেকো, আমি বরং মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসব, কি বল মা?"

কথাটা মিটে গেল।

তারপর সত্যই একদিন সে বাণীকে ট্রেণে তুলে দিয়ে শান্তির নিশ্বাস ফেললে। বাণীর সঙ্গে রইল একদল কাশীযাত্রী, তারা এই গ্রামেরই লোক। অসিত বার বার করে বলে দিলে—সামনে পূজা আসছে, এই পূজায় এবার সে কাশী যাবে এবং বাণীর ওখানেই থাকবে।

অসিত তখন স্বপ্নেও ভাবে নি তার এই আশ্বাস বাক্যটাই হবে বাণীর কাছে ভীতিপ্রদ এবং পাছে অসিত সত্যই কাশী যায় সেই জন্তই সে মধ্যপথে—যাত্রীরা সব যখন কামরার মধ্যে ঘুমে অচেতন, তখন চুপি চুপি নিজের বোঁচকাটা নিয়ে নেমে পড়বে এবং ভাসিয়ে দেবে তার জীবন-তরণী অনির্দ্দিষ্টের পথে।

মাস দেড়েক পরে গ্রামের যাত্রীরা ফিরে এসে প্রচার করলে—বাণী কাশী যায় নি, অর্দ্ধেক রাত্রে সবাই যখন ট্রেণে ঘুমিয়ে ছিল তখন একজন লোকের সঙ্গে কামরা হতে নেমে গেছে।

অসিত একটু হাসলে মাত্র।

দুর্জ্ঞেয় নারীপ্রকৃতি।

এ চেনা যায় না, চিরকাল একত্রে বাস করলেও না। অন্তরের কোন অন্তরালে লুকিয়ে থাকে সত্যকার মানুষটী, প্রকাশ হয়ে পড়ে কর্ম্মক্ষেত্রে।

উদ্দেশে সে দুইটী হাত কপালে ঠেকালে, কাকে সে নমস্কার করলে কে জানে।

যাক, তবু বোঝা কমল, অসিত নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

আজও মনে পড়ে মেনকার কথা।

স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র ফুলটী ভাসতে ভাসতে চলেছে। তীর তাকে আঁকড়ে ধরতে পারলে না, বাঁধার জায়গা তার নাই। মাঝখানের স্রোত বেয়ে সে ফুল ছুটে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে। তার পর দিন যত যাবে তার রং হয়ে পড়বে তত মলিন—তার পর আসবে ধ্বংস-সোজা কথায় যার নাম মরণ। স্রোত চিরকালই একভাবে বয়ে যাবে, ফুলের চিহ্নটুকুও থাকবে না।

তবু সে ফুল পবিত্র, তীরের কাদা তার গায়ে লাগে নি।

অসিত তাকিয়ে দেখলে মেনকা ভেসে চলেছে, জায়গা সে পায় নি। বাণী তীরে পৌঁছে কাদা মেখে আবার পড়ছে স্রোতের মুখে, চলছে ভেসে।

ফিরে সে নিজের পানে চাইলে।

জায়গা সেই পেয়েছে কি? ভেসে চলেছে সেও। কোনখানে গিয়ে তার ভাসার সমাপ্তি হবে তাই বা কে জানে?

চোখের উপর হাতখানা আড়াআড়ি ভাবে রেখে অসিত শুয়ে পড়ে ভাবছিল।

অতীতের লক্ষ কথা—যেন বায়স্কোপের ছবি, একটার পর একটা ভেসে উঠছে।

সতীশ—সতীশ আজ কোথায়?

সেই সতীশ, অটুট স্বাস্থ্য, অমিত সাহস—সে আজ কোথায়? আজও সে জেলে রয়েছে।

অসিত আজও সেই কারখানার স্বপ্ন দেখে—

মেসিন চলেছে খস খস করে, চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ত শ্রমিকের দল।

এই অশ্রান্ত কাজের মধ্যে ছিল অশ্রান্ত আনন্দোৎসব, সারাদিনের খাটুনীর পরে সেই বিরামটুকু ছিল কি আনন্দের, কি শান্তির।

আজ কোথায় কে? মানুষ যারা ছিল তারা সবাই সরে গেল, রয়ে গেল অমানুষের দল, তারা করবে তাণ্ডব-নর্ত্তন—তারা ভাঙবে সুন্দর রচনা, আনবে মৃত্যু—ভয়াবহ বিভীষিকা।

অসিত আর ভাবতে পারে না; হাতখানা চোখের 'পরে চাপা দিয়ে রেখেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

(২৯)

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এসে পড়ল গ্রামের রামধন মণ্ডল।

অসিত বারান্দায় বসেছিল। নিতাই কোথায় চলে গেছে কে জানে, অনেক খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায় নি।

জনশ্রুতি অনেক কথাই প্রচার করে, সব কিছু বিশ্বাস করা চলে না।

গাঙ্গুলী মহাশয় সুনন্দাকে নিয়ে চিরকালের মতই গ্রাম ত্যাগ করে কাশী চলে গেছেন। তাঁর জমীদারি কিনে নিয়েছেন ছোট তরফের কর্ত্তা নিরঞ্জন গাঙ্গুলী। বর্ত্তমানে তিনিই জমিদার।

আজ রামধন এসে সেই কথাই তুলেছিল।

সেই একঘেয়ে পুরানো কথা।

মাঠে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় না, অথচ খাজনা এক পয়সাও কমে নি, জমিদারকে দিতে হয় কড়াক্রান্তি মিটিয়ে।

মাঠে ফসল প্রচুর ফলে না—সেই বা কার অপরাধ? অপরাধ ধরিত্রীর নয়—দেবতারও নয়, প্রত্যেক মানুষের। আজ মানুষ নির্ব্বিবাদে দোষ চাপিয়ে দেয় সেই অদৃশ্য শক্তির 'পরে, কিন্তু নিজেরাই যে কতখানি দায়ী তা কি কেউ ভাবে? কত লক্ষ বৎসর আগে ধরণী যেদিন শ্যামল লতাপাতায় বিমণ্ডিত হয়ে পরমাশ্চর্য্য রূপ পরিগ্রহ করে সমুদ্রের অগাধ জলের মধ্যে আস্তে আস্তে ভেসে উঠেছিল, সে দিন হতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সে মানুষের অনেক চাহিদা মিটিয়েছে। ভগবানের কি, জীবসৃষ্টি করেই তো খালাস—আর কোন ভাবনা নাই। আবার একদিন দেখা মেলে—জীব যখন শেষ নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু সেই জন্ম হতে শেষ নিশ্বাস ফেলা পর্য্যন্ত মানুষের নিত্যকার জীবনের চাহিদা তো বড় কম নয়—এ সব যোগায় কে?

ধরণী অনেক দিয়ে বর্ত্তমানে নিস্বা হয়ে গেছে, তার বুকে সার নাই। আজ যদি সে আবার সমুদ্রের বুকে ডুবে যেতে পারে, যদি তলিয়ে গিয়ে সমস্ত ক্লেদ ধুয়ে মুছে কিছুকাল পরে আবার সে উঠতে পারে, সেই নূতন সৃষ্টিতে নূতন রূপ সে না নিক, তার উর্ব্বরতা শক্তি যে বাড়বেই সে জানা কথা। তখন তার চাহিদা মিটানোর জন্য আকাশের পানে চাইতেও হবে না।

মাঠে ফসল হয় না—তাই কৃষকের গোলা শূন্য। দোষ কারও নয়—না মাঠের, না বৃষ্টির দেবতার, না কৃষকের! বৃষ্টি হয়, জল জমে, ধরিত্রীর বুকে তবু ফসল নাই।

ধনীর অত্যাচার, দরিদ্রের উপর পীড়ন—এ তো চিরকালই রয়েছে, হয় তো চিরকালই থাকবে।

দরিদ্রদের তারা খাটায়, কিন্তু উপযুক্ত পারিশ্রমিক কোনদিনই দেয় না।

কিন্তু এও তো চিরন্তন ব্যাপার। গরীবের কষ্ট চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে—ভগবান তাদের প্রতি বিরূপ, নইলে তারা গরীব হয়ে জন্মাবেই বা কেন?

ওই যে পথের ধারে বসে চীৎকার করে "বাবু, দুদিন খেতে পাই নি—এক মুঠো খেতে দাও," সে কার পাপে? কত আছে বিকলাঙ্গ, খোঁড়া, অন্ধ—কেন ওরা জন্মাল—জন্মালই যদি, মরল না কেন?

ধনী চাবুক চালাবে—করবে হাতের আরাম; দারিদ্র্য তারা সইতে পারে না, তাদের হর্ম্যের পাশে কুঁড়ে ঘর তুলে দেওয়ার জন্যে তাই তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। ব্যাপারটা যদি কোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায় তাতে আসে যায় না, কেন না আইনও স্থলবিশেষে দাঁড়ায় ধনীর পক্ষে।

দেবতারাও পান ষোড়শোপচারে পূজা, ধনীর মানতের ফল।

দারিদ্র্য নাকি উন্নতির পরিমাপক, উন্নতির সহায়ক। কিন্তু অনেক সময় অমৃতও হয়ে ওঠে গরল, দারিদ্র্যই হয় বিষম বাধা। কবি বলতে পারেন, দারিদ্র্য তাঁকে সম্রাট করেছে; সে কথাটা খেটে যায় বর্ণনার সময়ে, বাস্তব জীবনে যে নয় এ জানা কথা।

একার জীবনে দারিদ্র্য বিভীষিকা বিস্তার করতে হয় তো সমর্থ হয় না, সমষ্টিগত জীবনে এর প্রভাব অনুভূত হয়। মানুষ একা নয়, একা থাকতেও পারে না, সমষ্টি নিয়ে তার জগৎ এবং এইখানেই সে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়, দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট হয়।

রামধন বলছিল, "এই তো বড়কর্ত্তা ছিলেন বাবু, জমীদার বলে কোনদিন ভাবিনি, এমনিই ছিল তাঁর স্বভাব। তিনি যে এমন করে আমাদেরকে পরের হাতে তুলে দিয়ে যাবেন তা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।"

সে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

অসিত তবু তাকে দু একটা কথা বলে বুঝাবার চেষ্টা করলে—"কি আর করবে রামধন, কপাল দোষে গরীব হয়ে জন্মেছ, বড়লোকের লাথি ঝাঁটা খেতেই হবে। দেখছো তো, গরীব বলে আমাকেও কিরকমভাবে নির্য্যাতন সইতে হচ্ছে।"

রামধন উত্তেজিত হয়ে বললে, "এ কিন্তু আমরা সইব না বাবু, এর প্রতিকারের উপায় তো আমাদেরই হাতে, কত-কাল আর আমাদের পায়ের তলায় থাকতে হবে, কতকাল আর সইব?"

সে উঠে দাঁড়াল—

"দেখবেন বাবু, এবার কিছু হোক আগে, মায়া কাটিয়ে দিয়ে ছাড়ব। হলুমই বা আমরা গরীব, আমাদেরও ইজ্জত আছে তো? গরীবের গায়ে যে জোর আছে, বুকে সাহস আছে—সেটা একবার ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।"

সে চলে গেল।

তবু খানিকটা সে হালকা হয়ে গেল, খানিকটা মনের কথা বলতে পেরে সে বেঁচে গেল।

অসিত ভাবতে লাগল।

এই পার্থক্যই আনবে সর্ব্বনাশ, দেশ করবে অরাজক।

হয় তো আজ তারই প্রয়োজন বেশী, স্নিগ্ধতার অবসান হোক—যদি আসে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অকল্যাণ—তা আসুক। ধ্বংসের পরে আবার হবে নূতন সৃষ্টি, সে সৃষ্টি হবে অতি সুন্দর—অতি চমৎকার।

সেই সৃষ্টির মানুষ ভুলে যাবে ভেদাভেদ, ভুলে যাবে বড়ছোটর পার্থক্য—সেদিন একই জায়গায় দাঁড়াবে সবাই, একই ধর্ম্ম সকলকে ধারণ করবে, একই আহার্য্য সবাই গ্রহণ করবে।

অকল্যাণের বুকে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, ধ্বংসের বুকে আছে সৃষ্টি, মরণের মাঝে জীবন—গরলের বুকে অমৃত।

আজ মানুষ চায় মৃত্যু—সে শুধু সেই অনন্ত সুখপূর্ণ জীবনলাভের আশায়, বর্ত্তমান ঠেলে ফেলে সে চাইছে দূর ভবিষ্যতকে—অতীত হয়েছে অন্ধকার, বর্ত্তমান হয়েছে জ্বালাপ্রদ, শান্তি দেয় শুধু ভবিষ্যত।

(৩০)

এই সব কৃষকদের সঙ্গেই শেষ পর্য্যন্ত অসিতকে মিশে পড়তে হল।

উপায় নাই যে, ওরা এসে ধর্ণা দিয়ে পড়েছে।

এরাও শ্রমজীবী, খাটবে—তবে এদের অন্ন জুটবে।

পরণে জীর্ণ বস্ত্র, রুক্ষ মাথায় তারা মাঠে চাষ করে—শুকনো মাঠ ধূধূ করে জ্বলে, লাঙ্গলের ফলা মাটির বুকে বসে না—লাফিয়ে ওঠে।

কি দুর্ব্বৎসর, কৃষকদের বাড়ীর উঠানে গোলাগুলো শূন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে, ধান ওঠেনি। কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, তারা কি করে সারা-বৎসর চালাবে, কি করে জমীদারের খাজনা দেবে?

অসিত বললে, "যাতে এ বছরটা খাজনা না দিতে হয়, মাপ পাও তোমরা তারই চেষ্টা করো। সবাই মিলে জমীদারের কাছে গিয়ে পড়, যদি তাঁর প্রাণে দয়া হয়, তিনি মাপ করলেও করতে পারেন।"

যদু সরকার মাথা-জোড়া টাকে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "তাতে কোন ফল হবে না অসিত বাবু, গলা ধাক্কাই খেতে হবে দারোয়ানের হাতে।"

অসিত বললে, "তবু একবার যেতে তো দোষ নেই সরকার মশাই, একবার গিয়েই দেখ না কেন। অপমান বটে, কিন্তু উপায় তো নেই; সকল অপমান এখন মাথা পেতে নিতেই হবে যে—দায় তোমাদেরই, এ কথা মনে কর।"

যদু সরকার গ্রামের মধ্যে মাতব্বর লোক, ঝগড়া বিবাদ যা কিছু হয়, সেই মীমাংসা করে দেয়। এ জায়গাতেও প্রজারা যদু সরকারকে ধরে বসল—তাকেই এগিয়ে যেতে হবে, তারা কেউ যেতে পারবে না, অত সাহস তাদের নাই।

যদু সরকার অসিতকে ধরল—"আপনি চলুন অসিত-বাবু, আপনার কথা জমীদারবাবু শুনলেও শুনতে পারেন, আমাদের কথা শুনবেন না সে জানা কথা।"

জমীদার নিরঞ্জন গাঙ্গুলী বড় কড়া মেজাজের লোক; প্রজারা দুদিনেই এই জমীদারকে চিনে নিয়েছে এবং যমের মত ভয় করতেও শিখেছে।

এই সব গরীব লোকদের দুই পায়ে দললেও এদের করুণ আর্ত্তনাদ যে সদর পর্য্যন্ত পৌঁছাবে না, এ অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহার উৎপীড়নও চলতো বেশ বেশী রকম।

তিনি প্রায় কলকাতাতেই থাকেন; কদাচিত কখনও

বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গ্রামে মাছ ধরতে বা শিকার করতে আসেন। প্রজাদের অভাবঅভিযোগ কিছুই শুনবার অবকাশ তাঁর নাই।

খুল্লতাত সুনন্দার পিতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু, কিন্তু নিরঞ্জন ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। এ রকম নিষ্ঠুর-হৃদয় লোকের কাছে যাওয়ার কথা শুনে যদি যদু সরকারের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাতে তাকে বিশেষ অপরাধী করা চলে না।

তবুও তাকে যেতে হল, অসিত তার সঙ্গে রইল।

বেলা তখন নয়টা—

বাবুর বাড়ী গিয়ে অসিত শুনতে পেলে তিনি তখনও ঘুম হতে জাগেন নি। আরও ঘণ্টাখানেক পরে ঠিক দশটার সময় তিনি জাগবেন, তারপর প্রাত্যহিক নিয়ম পালন করতে যাবে একঘণ্টা—কাজেই এগারটার আগে তিনি বাইরে আসতে পারবেন না।

অপদার্থ ধনী সম্প্রদায়—

ঠিক এমনই আলস্যে এরা অমূল্য দিন কাটায়। অসিত ছোটবেলায় একটা গল্পে পড়েছিল, একজন রাজা তাঁর জীবনে কোনদিন সূর্য্যোদয় দেখতে পান নি—আজ সেই কথাটাই তার মনে হল।

অর্দ্ধেক রাত্রিরও বেশী এরা আমোদপ্রমোদে কাটিয়ে দেয় এবং সেই ক্ষতিটুকু পোষণ করে দিনের অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে। এই আলস্য হয়ে গেছে এদের মজ্জাগত, কোনদিন যে দূর হবে তা মনে হয় না।

আরও অনেক লোক সেখানে অপেক্ষা করছে দেখা গেল, এরা সবাই কোন না কোন অভিযোগ বা প্রার্থনা নিয়ে এসেছে। তাদেরই মুখে শোনা গেল—বাবু যে তিনদিন এখানে এসেছেন, এই তিনদিনই এরা হাঁটছে। হয় তো সারাদিনই এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে, বাবুর দেখা পাওয়া যায় নি।

এই সব দেশের জমীদার, এরাই প্রজার ভালোমন্দের ভার নেয়। অথচ একদিন ছিল—যেদিন জমীদারই ছিলেন দেশের মা বাপ, প্রজার উন্নতি অবনতির ভার ছিল তাঁরই হাতে। আজ এই সব স্থূলাকার বিলাস-পরায়ণ সহর-প্রবাসী জমীদারদের দেখলে সেদিনকার কথা গল্প বলেই মনে হয়। তবু এঁরা তাঁদেরই বংশধর, ভুঁই-ফোঁড় নন।

আজ তাই না প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে, কেন তারা সইবে? তারা খাজনা দেয়, জমীদারের জমীতে বাস করার পরিবর্ত্তে—বিনিময়ে অর্থ দেয়—করুণার উপর নির্ভর করে তারা জমী পায় নি। আত্ম-মর্য্যাদাবোধ তাদের মধ্যে জেগেছে, তারা জানে তারা মানুষ, তাই মনুষ্যত্বের অপমান তারা আজ সইতে রাজি নয়। ঠিক এই জন্যই একদিন যেখানে প্রজা জমীদারে ছিল সৌহার্দ্দ্য, আজ সেখানে হয়েছে অহি-নকুল সম্পর্ক।

আজ তাই প্রজা-বিদ্রোহে জমীদারের জমীদারি বিকিয়ে যাচ্ছে, সরকারের হাতে যাচ্ছে। অপরাধ কার—দেশের, দশের, না জমীদারের; আজ কেউ চায় না কেউ তার পরে অত্যাচার করবে, তাই জমীদার ও প্রজা আজ সমান জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ ভগবানের অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ?

যাই হোক—এ দেশের দুর্ভাগ্য। নিজের বলতে আর কিছু রইল না, আপনার যা তা সব কিছু দিয়ে দেশ আজ নিঃস্ব হয়ে গেছে।

অসিত তাই ভাবছিল।

পার্থক্য দূর হয়ে যাক্—সবাই দাঁড়াবে এসে এক জায়গায়, সেই তো ভালো। আঃ, সে দিন কবে আসবে?

সময় নিঃশব্দে কেটে যাচ্ছিল।

(৩১)

প্রজাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলছিল।

বামনডাঙ্গার ইসমাইল সেখ গজরাচ্ছিল "আমরা তা বলে আর সইব না মণ্ডল; অনেক কেঁদেছি, অনেক পায়ে ধরেছি; অনেক সয়েছি—এবার আমরা যা হয় তাই করব। জেলে যেতে হয়—যাব, কি হবে আর বাইরে থেকে চোখের সামনে বউ ছেলের শুকনো মুখ দেখে? তোমরা যদি সইতে পারো—স'য়ো, আমি মুসলমানের ছেলে, এ অত্যাচার সইতে রাজি আমি নই।"

সাধু মণ্ডল শুষ্ক মুখে বলছিল, "অতটা খাপ্পা হয়ো না মিঞা; যা করবে একটু ভেবে চিন্তে করাই ভালো। হট করে—না ভেবে চিন্তে কোন কাজ করতে নেই।"

ইসমাইল বলছিল, "তোমার মত আমার রক্ত ঠাণ্ডা নয় মণ্ডল। তোমার মত মাথার চুল শাদা হলে হয় তো ঠাণ্ডা হব, কিন্তু এখন আমাদের মত লোক আন্দামানেও

যেতে ভয় পায় না, আজ কেবল সেই কথাটাই বুঝিয়ে দেব।"

অসিত একবার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে।

অসন্তোষ জেগেছে, এ অসন্তোষ এখন দূর করা যাবে না—কাজেই শান্তির আশা দুরাশা। ভগবানের বিধানই এই—অসন্তোষ যেখানে—ধ্বংস সেখানে অনিবার্য্য।

দারোয়ান এসে খবর দিলে, বাবু অসিত বাবুকে ডাকছেন, এখনি যেতে হবে।

অসিত উঠলো।

জমীদার বাবুকে দেখবার কৌতূহল তারও মনে জেগেছিল। নামটা শুনে মনে হচ্ছিল—যেন একে সে চেনে—তিন দিনের মধ্যে বাবুর দেখা সে পায় নি।

সুসজ্জিত বৈঠকখানা, বাবু একখানা ইজিচেয়ারে আধ-শোওয়াভাবে বসে সিগারেট টানতে টানতে সেদিনকার খবরের কাগজখানা দেখছিলেন, ঘরে আর কেউই ছিল না।

অসিত দরজায় দাঁড়িয়ে একবার চেয়ে দেখলে—

হ্যাঁ, সেই বটে—সেই নিরঞ্জন—

একদিন তারা কলেজে একসঙ্গেই পড়েছিল, বেশ আলাপ পরিচয়ও ছিল।

কিন্তু আজ সে পরিচয় না দেওয়াই ভালো; বরং একেবারে অপরিচিতের ভাণও ভালো—তবু বলা ভালো নয়—কোনদিন তারা একত্রে পড়েছিল।

অসিত একটা নমস্কার করলে—

নিতান্ত কর্ত্তব্যের দায়ে অতি শুষ্ক একটা নমস্কার মাত্র, জমীদার নিরঞ্জনবাবু গম্ভীরভাবে একবার চাইলেন মাত্র।

কোনদিন যে পরিচয় ছিল, তার আভাস মাত্র পাওয়া যায় না।

নিতান্ত শুষ্ককণ্ঠে তিনি পাশের একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বসো—তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

অসিত বসল না, দাঁড়িয়ে রইল।

নিরঞ্জন কাগজখানা উল্টাতে উল্টাতে বললেন, "তুমি আলমপুরের প্রজাদের পক্ষ হতে এসেছ শুনলুম; কি বলতে চাও শোনা যাক—বল দেখি?"

অসিত শান্তকণ্ঠে বললে, "আপনাকে সে কথা তো আবেদন পত্রে জানানো হয়েছে।"

নিরঞ্জন তার ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করলেন, তবু স্থিরভাবে বললেন, "তবু আমি যদি সে কথা তোমার মুখ দিয়ে শুনতে চাই, তাতে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। মনে কর তোমার সে আবেদন পত্র ফাইলের অনেক তলায় চাপা পড়ে গেছে, এখন সে পঙ্কোদ্ধার করা ভারি মুস্কিল।"

অসিত একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলে। গরীবের আবেদন-পত্রের কথা ধনীর মনে থাকবে না সে তো জানা কথা। কোনদিনই যা হয় নি, আজ আলমপুরের হতভাগা প্রজাদের বেলাতেই কি তা সম্ভব হবে?

সে বললে "দু তিন বছর ধরে অজন্মা চলছে সে কথা বোধ হয় আপনার জানা আছে। এ বছর এমন অবস্থা হয়েছে, চাষারা একটা ধান গোলায় তুলতে পারে নি, না খেয়ে শুকিয়ে মরছে। এর পরে আছে রোগ, আর তার পরিণতি শোক—

অধীরভাবে নিরঞ্জন বললেন, "শুনেছি, সে সব জানা কথা, কিন্তু তার জন্যে আমায় কি করতে বল? কেউ খেতে পেলে না, কেউ অনাহারে মরল, কেউ অসুখে ভুগছে, এ সব খবরে আমার কি দরকার? এ সবের জন্যে কি আমি দায়ী হব?"

অসিত উত্তর দিলে, "কতকটা—।"

হাতের সিগারেট সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে কাগজ-খানা পায়ের তলায় ফেলে নিরঞ্জন সোজা হয়ে বসলেন—

"তুমি কি বলতে এসেছো অসিত—কি বলতে চাও শুনি? জানি—তুমি বরাবরই এই রকম, কলেজে একসঙ্গে পড়া থেকে তোমায় আমার বেশ জানা আছে, আজ নতুনই তোমার নাম শুনি নি—তোমায় দেখি নি। কতকটা দায়ী—কিন্তু কেন—কিসের জন্যে দায়ী? আমি চিনি তোমায়, বরাবর তুমি আমায় নীচু করবার চেষ্টা করেছ; আজও তাই আমার ওই সব অশিক্ষিত বর্ব্বর প্রজাদের শিক্ষিত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ; ওদের জন্যে নাইট স্কুল করেছ, ওদের শিক্ষা দিচ্ছ জমীদারকে যেন ওরা না মানে। ওরা ঘরের মেঝেয় টাকা পুতে রেখে আমায় ফাঁকি দেয়। তুমি কতটুকু ওদের চেন—কতখানি পরিচয় ওদের পেয়েছ? কিন্তু যাই কর—আমি ওদের ছাড়ব না অসিত, আমি ওদের সামনে ঘরের মেঝে খুঁড়ে একাকার করব।"

সে তা পারবে—অসিত জানে।

যে পরিচয়ের আভাস নিরঞ্জন দিলেন, অসিত তা মেনে নিলে না।

সে কোন জীবন—সে দিন অতীতের কোলে মিশে গেছে—স্বপ্ন মাত্র—জাগরণে তার রেসও খুঁজে পাওয়া যায় না।

অসিতের মনে যে দুর্ব্বলতা জেগেছিল তা ঝেড়ে ফেলে সে বললে, "কিন্তু ঘর খুঁড়লেই কি আপনি টাকা পাবেন? ওদের 'পরে এই যে অত্যাচার করবেন, এর জন্যে ওরা কি আপনার নামে নালিস করবে না মনে করেন?"

নিরঞ্জন একেবারে জ্বলে উঠলেন, তীব্রকণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ—আনতে পারে—আনবে, কিন্তু তারও মূলে যে তুমিই থাকবে তাও আমি জানি অসিত। লিডারের কাজ ভালো, সম্মান যথেষ্ট মেলে, কিন্তু দায়িত্বও যে তাদের আছে সেটা মনে রেখো। ভালো হলে তাদের যেমন নাম হবে, মন্দ হলেও তেমনি তাদের নাম হবে, লাভে হতে লোকের অভিশাপ কুড়াতে হবে।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে তিনি বললেন, "আর তুমি মনে করো না অসিত, আমি তোমায় সহজে ছেড়ে দেব। আমি তোমায় সহজে ছাড়ব না, আমার বিরুদ্ধাচরণ করে তুমিও একটী মুহূর্ত্ত আমার অধিকৃত জায়গায় বাস করতেও পারবে না। আমি ভালোভাবে তোমায় বলছি—অনুরোধ করছি—তুমি এক মাসের মধ্যে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাও।"

তিনি যে ঠিক এই রকমই একটা প্রস্তাব করবেন, তা অসিত কতকটা আন্দাজেই ধরেছিল। সে স্তব্ধভাবে কেবল তাঁর পানে চেয়ে রইল।

নিরঞ্জন বললেন, "তুমি এসেছ যাতে ওদের খাজনা মাপ করা হয়। যদিও আমার ক্ষতির কথা, তবু আমি করতে পারতুম—যদি ওরা তোমার মত নিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ না করতো। আজও তোমায় বলছি অসিত, তোমায় অনুরোধ করছি—আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও;—তুমি ওদের ছেড়ে দিয়ে যাও, আমি ওদের দেখব—ওদের মাপ করব। কিন্তু তুমি যে আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে আসবে, আর ওরাও যে আমার আদেশ না মেনে তোমার আদেশ মাথা পেতে মেনে নেবে, এ ধৃষ্টতা আমি সইব না, কখনই সইব না।"

একটা হালকা নিশ্বাস ফেলে অসিত বললে, "আপনি সত্য কথা বলছেন—আমি চলে গেলে আপনি এদের দেখবেন, এদের এ বছরের খাজনা মাপ করবেন?"

নিরঞ্জন উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, করব। আমি তোমায় সত্য কথা দিচ্ছি অসিত, সত্যই আমি তোমার ক্ষমতাকে ভয় করি, তোমায় এড়াতে চাই। আমি জানি—আমি যদি গুলি চালাতে আদেশ করি—ওই সব প্রজারা মরবে তবু তারা একটী পাও সরবে না; কিন্তু তুমি যদি একটী আদেশ কর, ওরা তখনই মাথা নীচু করে চলে যাবে, ওরা তোমার এত বাধ্য। তোমার জন্যই আজ ওরা নিগৃহীত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে—এ কথাটা তুমি মনে রেখো অসিত। কেবল তোমার জন্যই আমি ওদের পরে অত্যাচার করছি, তুমি আজ চলে যাও, আমি ওদের ছেড়ে দেব।"

ধীরকণ্ঠে অসিত বললে, "ভালো কথা, আমি চলে যাব; কিন্তু আপনি যে আপনার কথামত কাজ করবেন তার প্রমাণ কি?"

নিরঞ্জন বললেন, "আমার কথা—"

অসিত একটু হাসলে, বললে, "না, আমি আজ আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি নে। আমার বিশ্বাস হবে প্রমাণ দিয়ে, আপনি লিখে আমার হাতে দিন, আপনার কথার চেয়ে লেখার মূল্য আছে মনে করি।"

নিতান্ত অসহায়ের মতই নিরঞ্জন বললেন, "জানি তোমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। বল, কি লিখে দিতে হবে?"

তিনি প্যাড ও কলম তুলে নিলেন।

অসিত বললে, "বেশী কিছু নয়, শুধু লিখে দিন আপনি স্বেচ্ছায় লিখছেন—এ বছরের খাজনার জন্যে প্রজাদের পীড়ন করবেন না, তাদের খাজনা রেহাই দিলেন। একটা বছর খাজনা না পেলেও আপনার এমন কিছু বেশী কষ্ট হবে না, অথচ আপনারই প্রজারা বাঁচবে।"

নিরঞ্জন খস খস করে লিখে নাম সাইন করে কাগজখানা অসিতের হাতে দিয়ে বললেন, "পড়ে দেখ—"

কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে ফেলে অসিত বললে, "দেখবেন—যেন শেষটায় পুলিসে ডাইরি করবেন না, আমি জোর করে আপনার কাছ হতে লিখিয়ে নিলুম। শেষটায় যেন গুণ্ডামীর দায়ে না পড়তে হয়।"

নিরঞ্জন একটু হেসে বললেন, "তার মূল মারা রইল—আমি স্বেচ্ছায় লিখছি—এই কথাটা লেখাতে। যদিও স্বেচ্ছায় নয়—তবু আইন বাঁচানো কাজ হয়েছে।"

অসিত আন্তরিকতার সঙ্গে অভিবাদন করলে, বললে, "আমি কালই চলে যাব; আপনি কাল হতে আর আমায় এখানে দেখতে পাবেন না—কথা দিয়ে যাচ্ছি। আপনি আপনার কথা রাখবেন। যদি আবার কোন দিন ফিরে আসি, আপনার প্রজাদের যেন সুখী ও সন্তুষ্ট দেখতে পাই, আপনার প্রতি ভালবাসা যেন তাদের মনে খুঁজে পাই।"

আস্তে আস্তে সে বার হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

দশম গ্রহ

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়

প্রহ্লাদপুরের প্রাণনারাণ ঘোষালের রাজত্বে অর্থাৎ স'পাঁচ গণ্ডার সাড়ে ন' আনীর বড় হিস্যার জমিদারী এলাকায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জলপান করত। অর্থাৎ তাঁর প্রতাপ-পরাক্রমের কথা বল্‌তে এই প্রসিদ্ধ উপমাটি ব্যবহৃত হত। তাঁর সৃষ্টিধর গঙ্গাগোবিন্দ সৃষ্টিছাড়া গোঁ ধরে কলকাতায় এলেন পড়তে। সতীর্থের সৌখ্যসূত্রে বিলিতী বনেদীঘরের স্বাতীর সঙ্গে পড়লেন প্রেমে। কালাপানির ওপারে কালাতিপাত না করে এলে, এপারের কলোনীতে ঘরবাঁধার নিয়ম নেই—এবাড়ীর মেয়ের তেমন পাত্রসূত্রে গোত্রান্তর নিষিদ্ধ। স্বাতী নক্ষত্রে একফোঁটা জলের অপরূপ সৃষ্টির কথা প্রসিদ্ধ। স্বাতীর আঁখি ছলছল হ'তেই বাপমায়ের চোখের বক্সাদি মান্য না করে, গঙ্গাগোবিন্দ পাড়ি দিলেন সাত সাগরের পথে। চোদ্দ সাগর ঘুরে এসে কর্‌লেন স্বাতীকে সাথী—তাঁর দিন-রজনীর চন্দ্র-সূর্য্যহারা একতম তারা।

প্রহ্লাদপুরে আর আহ্লাদের কিছু রইল না। জমিদারী কর্‌লেন বিক্রী—বাঘ ও গরু সবাইকে দিলেন নিষ্কৃতি। কলকাতায় বাড়ী হল, গাড়ী হল, সোসাইটি হল—সাত সাগর পারের দেশের বিরহ-তপস্যা সুরু হল। কিন্তু ব্যারিষ্টারি জম্‌ল না। বাড়ীতে ধরল ফাট, গাড়ী গ্যারেজে লাগ্‌ল লড়াই; সাগর পারের দেশটা ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। স্বাতী কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। তার যা কর্‌বার তা সে করেছিল। সোসাইটিকে স্বাতী দিল তার মেয়ে চিত্রা-এলা। চিত্রা-এলা কোটিকে গোটিক হয়।

গঙ্গাগোবিন্দের ব্যারিষ্টারি জম্‌ল না। বাড়ীর বাহির ও অন্তর দুটোরই রঙ, চটতেই থাক্‌ল। বাইরের ফাট আর মনের ফাটে চল্‌ল পাল্লা। পূর্বপুরুষের জমিদারীর জমা যত হতে লাগ্‌ল শেষ, পূর্বপুরুষের দাবিটা ততই যেন নিঃশেষে হতে লাগ্‌ল শেষ। পূর্বপুরুষের বৃত্তি পেতে বস্‌ল লোপ, প্রবৃত্তিটা মাথা খাঁকিয়ে হাঁ হাঁ করে এল হেঁকে। সেই যে বাঘে গরুতে একঘাটে জলপানের প্রতাপের কথা বলেছিলুম—এবার সেটা সূর্য্যের প্রতাপ থেকে বেশী বালির দাহ হয়ে এসে ভর কর্‌ল গঙ্গাগোবিন্দের ওপর। আড়ম্বরশূন্য এই রুক্ষতায় মনে হচ্ছিল গঙ্গাগোবিন্দ খেপে যান নি, কিন্তু খেপে যাচ্ছেন। এই মহামরুর একটি মরুদ্যান—চিত্রা-এলা। বাপ মায়ে অনেক ভেবে অনেক বেছে নাম রেখেছিলেন—চিত্রা। সোসাইটির সুপারিশে পরে নাম দাঁড়াল এলা। বেশী দিনের কথা নয়, দু'নামই চল্‌ত। গঙ্গাগোবিন্দ এখন আর কোন নামই যেন সইতে পারেন না; মেয়েকে ডাকেন খুকী বলে।

এই খুকীরও বিয়ের কথা ভাব্‌তে হয়। প্রহ্লাদপুরের মেয়ে হলে যত ভাব্‌তে হত, এখন তার চেয়েও শক্ত করে ভাব্‌তে হয়। এখন সে সঙ্গতি নেই, কিন্তু পাত্র-গুণের অসঙ্গতির তালিকার বহর বহুবেশী বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। মেয়েতে মায়ের রূপ অপরূপ হয়ে ফুটেছে, বাপের বংশমর্য্যাদা সহজশ্রীতে গৌরবান্বিত হয়েছে। মেয়ের বিয়ের কথা বড্ড ভাব্‌তে হয়।

মেয়ে এসে মা-বাবাকে বল্‌লে চিড়িয়াখানা ভ্রমণ বৃত্তান্ত। প্রাণীতত্ত্বের নানা নিগূঢ় কথাও শোনা গেল—সঙ্গে শোনা গেল ডাঃ দত্তের নাম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে চিড়িয়াখানায়; দেশে ও বিদেশে তিনি এই শাস্ত্রে পার হয়েছেন, তাঁরই বিদ্যার ঢেউ লেগেছে এলার বিবরণে। জন্তু-জীবনের প্রতি এলার আকর্ষণের প্রমাণ পাওয়া গেল। কৃতী পণ্ডিতের বিশদ আলোচনায় প্রাণীবিদ্যার নব নব দিক নিত্য নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হল; অন্ততঃ এটা বেশ বোঝা গেল, এলা নূতন আলোর সন্ধান পেয়েছে। গৃহে মেয়ে মাকে জীবতত্ত্বের নানা আলোচনায় মাতিয়ে তুল্‌ল। মেয়ে ও মায়ের মধ্যে সহানুভূতির যে সহজ সৌখ্য ছিল, তার নিত্য উপজীব্য হল জীবতত্ত্বকথা। বাবা-মা দু'জনেরই ক্রমে মনে হল—শ্রেষ্ঠ জীব ও শ্রেষ্ঠ কথা হচ্ছে, ডাঃ দত্ত। এলার নিজের ছিল—ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া, লর্ড অফ্ প্যারাডাইস ইত্যাদি—গিনি পিগ্, আর লাল

মাছ। কথায় মনে হয় ও রাখতে চায় বা কেউ দিতে চায় ওকে একটা জেব্রা ও হরিণ। ডাঃ দত্তের নিজস্ব প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানার বিবরণও শোনা গেল। ডাঃ দত্তের আশ্চর্য্য জন্তুপ্রীতির নানা আশ্চর্য্য গল্প শোনা গেল; তিনি যখন বেড়াতে বেরোন সঙ্গে থাকে না বন্ধুবান্ধব, থাকে কোন জীবজন্তু।

ডাঃ দত্তের সন্ধান নিতে হল। সন্ধান নেওয়া একটুও শক্ত নয়। উত্তরবঙ্গের সিকিটা তাঁর একার। বংশ বারভূঁঞিয়ায় ঠেকেছে। কলকাতায় তেতাল্লিশখানা বাড়ী। প্রায় আধ ডজন বিলিতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মারা তিনি। চরিত্র আচার্য্য-মার্কা। শুধু দ্বিধা ছিল, এখনও ধরা পড়েন নি কেন? কারণটি জানাও কঠিন হল না—জীবজন্তুর টানে এঁর মানুষের প্রেমে পড়বার অবকাশ ঘটে নি। জীব-জন্তুর প্রতি দয়ামায়ায় বুদ্ধ-বিদ্যাসাগর।

অনতিবিলম্বে পত্র পাওয়া গেল। ডাঃ দত্ত গঙ্গাগোবিন্দের সাক্ষাৎ-প্রার্থী; বিশেষ পারিবারিক কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার অনুমতি চান। পত্র পৌঁছবার পূর্ব্বেই উভয়পক্ষের পরিচিত মাননীয় ও গণনীয় বন্ধু এসে পাত্র ও পত্র প্রসঙ্গের ইঙ্গিত করে গেলেন। পাত্রের কথায় বলেছিলেন: বর্দ্ধমানের বংশ, কুচবিহারের সহবৎ—আর ঠাকুর বাড়ী ও লাহা বাড়ী জড়িয়ে বিদ্যেবুদ্ধি।

গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের ত্রিশ বছর বয়স উড়ে গেল। বাড়ীর সবচেয়ে পুরোণো চাকর সাহেবের এ মূর্ত্তি কখনও দেখে নি। স্বাতীর মনে পড়ল, কত কতদিন আগেকার এমনি ড্রয়িংরুমের, ড্রয়িংরুমের বাইরের আনন্দচঞ্চল উচ্ছ্বসিত এক ছেলে—তারও নাম ছিল গঙ্গাগোবিন্দ।

সাদর সম্মতিজ্ঞাপন পত্র গেল।

সামনের ১০ই তারিখ উভয়পক্ষের সাক্ষাৎ স্থির হল।

বৈঠকখানা ঝাড়ানাড়া সুরু হল। বাড়ীকে ভদ্রলোকের ভদ্র-অভ্যর্থনার যোগ্য করবার যোগাড়-যন্তর চলল। অর্থাৎ বাড়ীর ও বংশের নামকরা যত জিনিস, তার গাদি লাগল বৈঠকখানা ঘরে।

গঙ্গাগোবিন্দের বুঝি নিজের মেজাজের ওপর নিবাত-নিষ্কম্প বিশ্বাস ছিল না। মনে বিঁধছিল দুটি কথা—পাত্রের অনন্ত পশু-প্রীতি ও সে ছবি-আঁকিয়ে নয়। দুটি পেগের সাহায্য নিলেন গঙ্গাগোবিন্দ। ছেলে শিকার করে না রেসে যায় না—এ খবরও তিনি নিয়েছিলেন। খুকীর খবর কিনা মন ঠিক করতে পারছিল না। ঐতিহাসিক বনেদী ঘর হলেও তাঁর মনে ছেলের যথার্থ আভিজাত্য সম্বন্ধে বেশ একটা কিন্তু কিন্তু লাগছিল। বিশেষ করে পাত্রের অতি বিখ্যাত অস্বাভাবিক পশুপ্রীতি। অনেকেই তাঁকে বলেছিল—ডাঃ দত্তের গাড়ীতে প্রতিদিন নতুন জানোয়ার দেখা যায়। জানোয়ার সঙ্গে না নিলে তাঁর নাকি বেড়ান হয় না। বাজারে ডাঃ দত্তের নাম নাকি পশুপতি। কিন্তু ভুললে চলবে না, ডাঃ দত্ত বাংলা দেশে মাত্র একটি। আর গঙ্গাগোবিন্দের নেই প্রয়োজনমত সামর্থ্য। নিজের জীবনের সকল ব্যর্থতা সার্থক হোক্ খুকীর বিবাহিত জীবনে।

গঙ্গাগোবিন্দ হাঁকলেন—দরওয়ান্!

দরওয়ান এসে ঘাড়টাকে লম্বা করে ঝুলিয়ে, আরও লম্বা সেলাম করল।

গঙ্গাগোবিন্দ হুকুম করলেন—পাঁচ বাজে যো বাবুসাহাব আয়েঙ্গা, উনকো বহুত, বহুত, খাতেরসে লে আনা। বহুত, খাতেরসে সিধা হিঁয়া লে আনা। একটু থামিয়া, বড় একটি নিশ্বাস সঞ্চয় করে বললেন—আউর দেখো, উনকো সাথ যো কোই কুছ ভি হোঙ্গে—সাথ সাথ উও ভি আয়েঙ্গে। চাহে, বান্দর হো, শের হো, গাধা হো। যো ভি জানওয়ার সাথ হোগা উও ভি খাতিরসে সামিল চলা আয়েঙ্গে। ইয়া, যো যো ভি হোঙ্গে—। সমঝা এঃ? খাতিরসে লে আনা।

দরওয়ান আর একবার ঝুঁকে পড়ে বলল—জী, হুজুর।

গঙ্গাগোবিন্দ দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে বলতে লাগলেন—হাঁ, বহুত খাতেরসে লানা, সাবকো আওর সাবকো সাথ যো ভি জানওয়ার হো।

দরওয়ান—জী, হুজুর।

গঙ্গাগোবিন্দ—জ্যারাসে কুচ ইধার উধার চুক্ হো তো, মঁায় সিধা তুমকো জাহান্নাম ভেজেঙ্গা—বরাবর জাহান্নাম।

দরওয়ান আর একবার, জী, হুজুর বলে চলে গেল।

স্বাতী কি বলতে যাচ্ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তাকে থামিয়ে দিয়ে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন—সংসারে আমার বরাত শুধু সইবার, আপনার লোক সব্বাইয়ের ভুল অপরাধ সইতেই তো আছি আমি! একমাত্র মেয়ের জামাই হবেন—সইতে হবে না! আনুক্ সঙ্গে করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার—আমি সইব। তার চিড়িয়াখানা উপড়ে আনলে, তাও সইব। জানি আনবে ভালুক, নইলে গরিলা, নয় কেউটে। প্রাণ দিনে দিনে পিশে বার হচ্ছেই—এবার জামাই একেবারে শেষ করলেই তো বাঁচি। তোমারই ত মেয়ে—বনে গিয়ে একটা বনমানুষ বে করলেই পারতো! আমাকে প্রাণে মরতে হ'তনা।

স্বাতী এবার বললেন—দেখো, আমাকে বলবার সময়ের তোমার অভাব হবেনা। যে পাত্র আসছেন তাঁর যোগ্যতার কথা তুমি সব জান। আরও জান, চিত্রার মন কত নরম। তোমার ব্যবহারে ডাঃ দত্ত যদি বাধা পান, তুমি ব্যথা দেবে চিত্রাকে, শুধু আমাকে নয়।

গঙ্গাগোবিন্দ জ্বলে উঠলেন—আমি লাঠি মেরে জামায়ের ঠ্যাং ভাঙব, মাথা ফাটাব, নয়! উঁ! উঁ! আমায় এসেছ ভদ্রতা শেখাতে তুমি! উঁ! উঁ! আনুক ওরাংওটাং সঙ্গে, আনুক গোখ্রো সঙ্গে! বাড়ীঘর চষে যাক্! চুরমার করে যাক্, বলি কিছুতো—হুঁ!

স্বাতী বেরিয়ে গেলেন। জানতেন, থাকলে গঙ্গাগোবিন্দের মেজাজ চড়তেই থাকবে। শুধু বলে গেলেন—কি পাগলামী করছ! যতই জানোয়ার ভালবাসুক, জানোয়ার পুষুক, অমনি সব জন্তু নিয়ে কেউ কারুর সঙ্গে দেখা করতে আসে নাকি!

গঙ্গাগোবিন্দ মেজাজ বেদোরস্ত হওয়ায় এবার একটি ছোট পেগ গ্রহণ করলেন।

পাঁচটা বাজ্‌তে আধ মিনিটের সময় নিঃশব্দে ডাঃ দত্তের স্বহস্ত-চালিত সুদীর্ঘ হিস্‌পানো সুইজা মটোরগাড়ী বাড়ীর গেটে এসে থাম্‌ল।

অভাবনীয় ঘটনা ঘটে, এটা শুধু শোনা কথা নয়, এটা জানা কথা। কেমন করে ঘটে—কেন ঘটে তা বোঝা না গেলেও। কয়েনসাইডেন্সের যে কলিসন হয়, তার রহস্য ও রসিকতা অজ্ঞেয়। যুক্তি-তর্কের স্যাঁয়-কচ্‌কচির পৃথিবীতে নিরুদ্দিষ্ট একটা দমকা হাওয়া এসে বদ্ধতার আবিলতাকে উড়িয়ে দেয়। কাদের একটা রামছাগল কেমন করে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ীর সামনে এসে পড়েছিল। সেও দাঁড়িয়েছে, বাড়ীর বাগানের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাইছে, ঠিক তখনি গাড়ীও এসে দাঁড়াল বাড়ীতে। ছাগলের হাড়ে হাড়ে বাস করে—চঞ্চলতা, কৌতূহল-প্রবৃত্তি। ছাগল গৃহপালিত পশু, মানুষের সঙ্গ তার কাম্য। ডাঃ দত্তের সহজ জন্তুপ্রীতি বুঝি এই জন্তুটি সহজেই টের পেল। ডাঃ দত্ত গাড়ী থেকে নামতেই ঘুরে এসে ছাগলটি পাশে দাঁড়াল; গাড়ীটা পরীক্ষা করতে চায়। ডাঃ দত্ত একটু হেসে ছাগলটার দিকে চাইলেন। সে হাসির মধ্যের প্রকৃত সহৃদয়তা ছাগলটার টের পেতে বাকী রইল না। ছাগলটা ডাঃ দত্তের দিকে এগিয়ে এল। ডাঃ দত্ত আর একটু হেসে ছাগলটার মাথায় একটু হাত রাখলেন। প্রতীক্ষিত মাননীয় অতিথিকে এগিয়ে নিতে বেরিয়ে এল দরওয়ান। তখন ডাঃ দত্ত ও ছাগল রাস্তা থেকে বাড়ীতে ওঠবার সিঁড়িতে। কোন ভুজাওয়ালার আদরের ছাগল ডাঃ দত্তের চোখের চাউনীতে হাতের স্পর্শে প্রশ্রয়ের আমেজ পেল। ডাঃ দত্তের সঙ্গে ছাগল ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করল। দরওয়ান হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বাঘও নয়, গোরিলাও নয়, গোখ্‌রোও নয়। ছাগলটাও এমন শান্ত এবং প্রভুভক্ত যে বৈঠকখানায় যেতে একটু জোর করা বা তাড়া করারও দরকার হল না। সোজা প্রভুর সঙ্গে চলে গেল। গঙ্গাগোবিন্দ উঠে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। ছাগলটা সানন্দে চীৎকার করে উঠ্‌ল—ব্যা, ব্যা।

ঘরে গঙ্গাগোবিন্দ একা। উঠে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বল্লেন—ডাঃ দত্ত, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভারি আনন্দ হল; মেয়েরা ভেতরে আছেন, এখনি আসবেন।

গঙ্গাগোবিন্দ ছাগলটাকে আদর করে আস্তে আস্তে থাব্‌ড়াতে লাগ্‌লেন—অতিথির চিত্তে তার খুশীর হিল্লোল পৌঁছুবার উদ্দেশ্যে। অতিথির সাথীটিকে দেখে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছ্‌লেন, কিন্তু মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পেল না। ডাঃ দত্তের দৃশ্যটি বড় ভাল লাগল, সহজেই মনে হল ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে আত্মীয়তা করা শক্ত হবে না। ছাগলটা স্বজাতীয় চঞ্চলতা বশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গৃহস্বামী ও অতিথি উভয়েই ছাগলের গুণকীর্তনে মগ্ন হলেন। চীনে ঘাসের তৈয়ারী বিলিতী একটা কুশনের অর্দ্ধেকটা ছাগলটা খেয়ে ফেল্‌ল। গঙ্গাগোবিন্দ দাঁত কড়্‌মড়্‌ করে উঠ্‌লেন।

ডাঃ দত্ত তখন বল্‌ছিলেন—চমৎকার ছাগলটা!

গঙ্গাগোবিন্দ বল্‌লেন—ভারি চমৎকার! কয়েক মুহূর্ত থেমে, একটি নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—আমি খুব ছাগল ভালবাসি। আরও কয়েক মুহূর্ত থেমে বল্‌লেন—আর এর সহবৎও চমৎকার।

সহবৎ—চমৎকার ছাগলটা তখন আর একটা কুশন চাখ্‌ছিল। ডাঃ দত্ত গৃহস্বামীর অসাধারণ পশুপ্রীতি দেখে অত্যন্ত চমৎকৃত হচ্ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের গৌরবর্ণ মুখের উগ্র কঠোরতা ও কড়া কটা-গোঁফে এমন একটা রুক্ষতা স্পষ্ট ছিল, তা কারও চোখ এড়িয়ে যাবার বস্তু নয়। মেজাজটা যে বেশ একটু চড়া—চিত্রা এমনই দু'চারটে কথা কয়েকবারই যেন কেমন করে বলেছিল। এমন আশ্চর্য্য জন্তু-জানোয়ার ভালবাসার কথা তো একেবারেই উল্লেখ করে নি।

গঙ্গাগোবিন্দ বল্‌লেন—জীবজন্তুর ওপর আপনার তো অসাধারণ ভালবাসা।

ডাঃ দত্ত জবাব দিলেন—সত্যি-সত্যিই জন্তু-জানোয়ার আমার বড্ড ভাল লাগে।

তখন গঙ্গাগোবিন্দ আবার বল্‌লেন—কোন জন্তুই আপনি বাদ দেন না?

ডাঃ দত্ত একটু লজ্জিত-নম্র স্বরে বল্‌লেন—প্রায় সব জন্তুই আমার কেমন ভাল লাগে!

গঙ্গাগোবিন্দ প্রায় মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার কি এমন অনেক পোষা জানোয়ার আছে?

ডাঃ দত্ত উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লেন; "এমনি" কথাটির সঙ্গতি সে উৎসাহে দৃষ্টি এড়িয়ে গেল—হাঁ, আমার ভারি পোষ-মানা তিন্‌টে কুকুর আর দুটো হরিণ আছে। একটু থেমে বল্‌লেন—একটা ছোট চিড়িয়াখানা আমার আছে। আবার একটু থেমে বল্‌লেন—যদি একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখে আসেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বল্‌লেন—দুষ্টুমি টুষ্টুমি করে নাকি?

সোজা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ডাঃ দত্ত জবাব দিলেন—একটু আধটু। কিন্তু আপনার মতনই আমি জন্তু-জানোয়ারদের গোলাখুলি দেখতে ভালবাসি।

ছাগলটা একটা বেশ বাহাদুরী লাফ মেরে ঘরের একপাশে লেখবার টেবিলটার ওপর চড়ল।

গঙ্গাগোবিন্দ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, কি বল্‌তে গিয়ে ঢোক গিলে বল্‌লেন—বেড়ে লাফায় তো! মনে মনে গজরাতে লাগ্‌লেন, "হারামজাদাকে কাবাব করে খেলেও রাগ যায় না!

ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—বেড়ে লাফায়, বেড়ে লাফায় তো। মনে মনে ভাবতে লাগ্‌লেন—এ কি! সাজানো ড্রয়িং-রুমে ছাগলের তাণ্ডব-নৃত্য এঁরা সয় কেমন করে! প্রকাশ্যে বল্‌লেন—কোন কিছু ভাঙ্‌বে না তো?

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে গম্ভীর ভাবে গঙ্গাগোবিন্দ জবাব করলেন—ভাঙুক না, ভাঙ্‌লেই বা! মুখটায় কেমন একটু হাসির আভা এনে বল্‌লেন—ভাঙাই তো চাই।

ডাঃ দত্ত—ভাঙাইতো চাই? এঁ্যা? ওগুলো তো খুব দামী চিনের বাসন! এঁ্যা! দামী নয়! এঁ্যা!

গঙ্গাগোবিন্দ—না। ওর যদি ভাঙ্‌বার মতি হয়, কিছু দাম নয় ওর। বুঝ্‌লেন, এই ঘরটা আমার সারা জীবন এমনি করে সাজানো ; এই দেখে দেখে আমি একেবারে হায়রাণ হয়ে গেছি। একটু ওলট-পালট—বেশ হয়।

ছাগলটার এবার মতি হল, ওখান থেকে লাফিয়ে আর একটা টেবিলে পড়া। ঠিক তাই করল। লাফিয়ে পড়ে অন্য টেবিলটায় ঠিক দাঁড়িয়ে রইল। মাত্র তাতে একজোড়া চীনেমাটির দুর্লভ ফুলদানী স্থানচ্যুত হয়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ল।

ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—খুব লাফায় তো! চমৎকার balance তো! আমি তো ভেবেছিলুম সবশুদ্ধ চুরমার করবে। ভারি ফূর্ত্তি পেয়েছে! এ্যা!

গঙ্গাগোবিন্দ বল্‌লেন—হ্যা, ভারি ফূর্ত্তি। ওদের ফূর্ত্তি দেখলেই আমার ফূর্ত্তি হয়। আবার, এমন লোকও আছে অমন ছাগলকে এখুনি বলি দিত।

ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—দিত নাকি! বটে! আমি কিন্তু অমন লাফাতে কোন ছাগলকে কখনও দেখি নি। হ্যা! হ্যা! ঐ দেখুন, আপনার ঐ হাতে বোনা সিল্কের বুদ্ধ-মূর্ত্তির পরদাখানা খাচ্ছে। ওটা বর্ম্মার বুঝি? আপনার রাগ হচ্ছে না?

গঙ্গাগোবিন্দ যেন একটু উত্তেজিত হয়েছিলেন—রাগ! রাগ! অবলা ছাগলের ওপর রাগ! কখনও না। হ্যা, ওটা বর্ম্মার। সে কবে কিনেছিলুম আড়াইশো টাকায়। পুরণো হয়ে গেছে। এবার নতুন হবে।

ডাঃ দত্ত মনে হল খুব উৎসাহিত হয়েছেন, বললেন জন্তুদের ভালবাসায় আপনি আমাকে অনেক ছাড়িয়ে গেছেন। জানেন, হৃদয়ের সত্যিকারের মহত্ত্বের কষ্টিপাথর হচ্ছে এই প্রেম, এই ধৈর্য্য। জন্তু দিয়ে অনেকবার আমার বিশেষ বন্ধুদের পরীক্ষা করেছি। এ ছাগলটার ভারি বিশেষত্ব আছে। মাথা আছে। আপনি দেখবেন।

গঙ্গাগোবিন্দ একই ভাবে বল্‌লেন—হাঁ, দেখব।

ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—ঐ দেখুন, আবার লাফ দিচ্ছে।

গঙ্গাগোবিন্দ উঠে দাঁড়ালেন।

ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—সামনের টেবিলটার আশ্চর্য্য পালিশ তো! এমন পালিশ কখনও দেখি নি। ওর ওপরে পিছলে যাবে না তো! লাফটা দেখ্‌তে হলো। উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলেন।

গঙ্গাগোবিন্দও সম্মোহিতের ন্যায় চেয়ে রইলেন।

ছাগলটা লাফ দিয়ে পড়ে পিছ্‌লে গেল। কিন্তু সাম্‌লে নিল। দুজনেই টেবিলটার কাছে গেলেন। পালিশ কেটে কেটে বিশ্রী দাগ হয়ে গেছে। ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—এত দামী টেবিলটাকে নষ্ট করল! আপনার রাগ হচ্ছে না?

গঙ্গাগোবিন্দ উত্তর করলেন—টেবিলটা সাতশ' টাকায় ল্যাজারাসের কাছে কেনা। যদি এটুকু না সইতে পার্‌লো, তো ওটাকে এখুনি জ্বালানি কাঠ করা উচিত।

—মিসেস্ ঘোষালও কি এমনি ছাগল ভালবাসেন?

—বাসেনই তো! বাসেনই তো! নিশ্চয়। ওয়াই তো এর মূল। না বাস্‌লে, আমি ছাড়্‌ব? কথাগুলির ঠিক মানে কেমন যেন একটু অস্পষ্ট রইল। কথার পেছনে যেন কথান্তর আছে। অতিথি যেন কাকে ঢাকবার জন্য ব্যগ্রস্বরে বল্‌লেন—না, না, এমন চমৎকার ছাগলকে নিশ্চয়ই তাঁরা ভালবাসেন।

গঙ্গাগোবিন্দের আগের কথায় যদিই কিছু অস্পষ্টতা থাকে, ডাঃ দত্তের এই আগ্রহের স্বরে তা গেল একেবারে তলিয়ে। গঙ্গাগোবিন্দ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—নিশ্চয়ই আল্‌বাৎ—আমার বাড়ীর সবাই এই ছাগলকে ভালবাসবে, ভালবাসে। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বল্‌লেন—কি বুদ্ধি, কি বুদ্ধি ছাগলটার! অমন সব জানোয়ারকে মিসেস ঘোষাল নিজের হাতে চা খাওয়ান, কাট্‌লেট্ খাওয়ান, স্যাণ্ডউইচ্ খাওয়ান—

ডাঃ দত্ত যেন বেশ একটু অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন—চা খাওয়ান, কাট্‌লেট, স্যাণ্ডউইচ্—এ্যাঁ!

গঙ্গাগোবিন্দ উচ্ছ্‌সিত হয়ে উঠ্‌লেন—তাই তো বলি, কি বুদ্ধি ছাগলটার! ওর যদি গাধার মত বুদ্ধি হত, মিসেস ঘোষাল এখনি ওকে দূর করে দিতেন। ছাগল—দখিন হাওয়ার মত চঞ্চল, এই তো তিনি বলেন—দখিন হাওয়ার মত দোদুল। শান্ত হাবাগবা জানোয়ার আমরা দুচোখে দেখ্‌তে পারি না।

ছাগলটা যেন অনেক কথা বুঝ্‌ল। সেও বোঝাতে চাইল, শান্ত হাবাগবা ছাগলের সাত পুরুষের সম্পর্কেও সে কেউ নয়। ল্যাজারাসের টেবিলের কাঁচের মত পালিশের ভাল করে দফারফা করে গঙ্গাগোবিন্দের ঠাকুর্দ্দার আমলের অতি সূক্ষ্মকাজ-করা কাশ্মিরী টেবিল লক্ষ্য করে দিল লাফ্। দূরত্ব যথেষ্টই ছিল, লাফটা হল সার্কেসী। সবই ঠিক হল, কিন্তু কাশ্মিরী পশমী-কাজের টেবিল ঢাকাটায় পা গেল জড়িয়ে, সুতরাং গেল পিছ্‌লে। ছোট একটি ভূমিকম্প ঘট্‌ল। টেবিল, ছাগল, টেবিলের ওপর দাদাশশুরের বাবার আমলের জয়পুরী শ্বেতপাথরের ভারি মিহি জালীকাজের পুষ্পপাত্র, ঐ জয়পুরী ছবির ফ্রেম ইত্যাদি সবশুদ্ধ মিশে একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। ছায়াবাজীর খেলা। মুহূর্ত্ত-পরেই দেখা গেল, ছাগলটা শুধু সম্পূর্ণ অক্ষত নয়, প্রশান্তভাবে ভাঙা শ্বেতপাথরের পাত্রের ফুল বেছে বেছে শুঁকে শুঁকে ভক্ষণ করছে ও পাশের দুটো রূপোর বাঁধানো কাঁচের ফুলদানী ভেঙে যে জলধারা গড়িয়ে যাচ্ছিল, তারি একটুখানি থেকে থেকে চক্‌চক্ করে চাখ্‌ছে।

ডাঃ দত্ত হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মিস্ ঘোষালও খুব ছাগল ভালবাসেন? ভাব্‌ছেন, বিয়ে হলে এই প্রলয়ান্তকারী ছাগল সঙ্গে নেবে কি? সে বাড়ীর ড্রয়িংরুমে একে ঢোকাবে কি? হনুমানের লঙ্কাধ্বংস এর চেয়ে ঢের সহনীয়।

গঙ্গাগোবিন্দের কাণ দুটো লাল টুকটুক করছে। প্রায় দেড় মিনিট কোন কথা কইলেন না, তারপর বল্‌লেন—নিশ্চয়ই! বাসেই তো এমন ছাগল ভাল। ভাব্‌ছেন জামাতা দশম গ্রহ। দশম গ্রহ! দশম গ্রহ কি? সে কি দম বন্ধ করে মানুষ মারা, ফাঁসী দিয়ে, চেঁচাতে পারবে

মা, না ছুরী-বসান, না করাত দিয়ে কাটা ? বড়লোক জামাইয়ের কত—কত দাম ? বললেন—আমার তুলনায় কারও কিছু নয়—আপনারও নয়। এ ছাগল আমায় যাছু করেছে। আমার মনোভাব জানাবার ভাষা নেই।

ডাঃ দত্ত বললেন—আপনার যোগ্য কথা।

চুপ্‌চাপ। মানুষ দুজনে চুপ্‌চাপ্—অপর জীবটি নয়।

অজবর সহসা দেখ্‌ল সামনেই তার জুড়িদার। তার আজ্‌কের মহা ছাড়পত্রের বুঝি অংশীদার। পৃথিবীতে আজ এই ছাগলটি যে ক্ষমতা পেয়েছে, যমালয়ের মহিষটিও তা কোন দিন আশা করে নি। রুষিয়া যত বৃহৎই হোক্ না কেন—ষ্ট্যালিন ও ট্‌টস্কি দুজনের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব নয়। সামনের সারা দেওয়াল জোড়া ভিনিসিয়ান আয়নার ভেতরের ছাগলকে সহ্য করার পাত্র সে নয়, আর সে মতিও আজ মগজে স্থান পাওয়া অসম্ভব, একথা আর বলে দিতে হবে না। ছাগলটা পালোয়ান বীরপুরুষ। অজকুলের গরুড়স্তম্ভ, শিখিধ্বজ, কপিধ্বজ—মহাছাগল, রামছাগলকুলতিলক রাম রামছাগল। একটি মাত্র ঢুঁতে সামনের আর্শী ফর্সা হয়ে গেল।

ডাঃ দত্ত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বনেদীকুলের অচঞ্চলতা ক্ষণিকের জন্য অদৃশ্য হল। গলা যেন বসে গেছে, বললেন—এ্যাঁ, আয়নাটা চুরমার করল!

এমন ঘটনায় পৃথিবীতে গঙ্গাগোবিন্দ ছাড়া আর কেউ কখন এমন সরস সদয় কথা বলে নি: ভাঙ্‌বে বই কি! বিলক্ষণ! বেশ করেছে, বেশ করেছে, ভেঙে খুব করেছে। ওটা আমার শশুরবাড়ী থেকে গচিয়েছিল। শুনেছি এত পুরণো ওটা—যে ওরাই তার ঠিকানা রাখে না। ভালই হল, এবার তবু একটা নতুন হবে। দেখে শুনে রাধাবাজার থেকে আনা যাবে। গঙ্গাগোবিন্দের স্বর কিন্তু সম্পূর্ণ রস-বর্জ্জিত; যুদ্ধে হেরে সেনাপতি বুঝি এমনি করেই আদেশ দিয়ে থাকেন এ-ডি-সিদের।

ডাঃ দত্তের জড়ভরতের কথা মনে পড়ল; বিরাট জ্ঞান লোপ পেয়েছিল একটা জন্তুর স্নেহে এমন রাজার—যাঁর নামে নাম হয় এই দেশের ভারতবর্ষ। আবার হঠাৎ একটা কথা মনে এল—পাগল! শিউরে উঠ্‌লেন। গঙ্গাগোবিন্দের মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, উঁচু বংশের, উঁচুদরের লোকের মুখ। দেখ্‌লে একটু অস্বস্তি লাগে—মনে হয়, ভারি রাগী লোক। এ মুখে আর এ কথায় মেলে না।

গঙ্গাগোবিন্দও ডাঃ দত্তের মুখের দিকে চাইলেন। দেখ্‌লেন, কেমন একটা হতভম্বভাবে অর্থহীন চোখে চেয়ে আছে। হঠাৎ একটা কথা মনে এল—পাগল! একটু পরে আবার চাইলেন, এবার মুখের ও চোখের ভাব বদ্‌লেছে—বুদ্ধিদীপ্ত শান্তশ্রী—ভাল করে দেখ্‌লেন। এমন সহজ শান্ত সুবোধ ভদ্রলোকের ছাগল নিয়ে এমন দুর্দান্ত অত্যাচার! বুঝ্‌তে পার্‌লেন তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না, শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়্‌ছে, মুখখানা পাকা বিলিতী বেগুন হয়েছে; হাত কাঁপছে—জোর করে আর আট্‌কে রাখা যাবে না; ছাগলটার পিণ্ডী চট্‌কাবেই; অজ্ঞান না হয়ে যান, সন্ন্যাসরোগ না আসে! মৃত্যুঞ্জয়! মৃত্যুঞ্জয়!

গঙ্গাগোবিন্দ উঠে দাঁড়ালেন; একটু পরে কি কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ কর্‌লেন—দেখি—স্ত্রী—প্রস্তুত—এমনি কিছু। হন্‌হন্ করে চলে গেলেন।

নীচু করে টাঙান বেশ বড় একখানা দুষ্প্রাপ্য চীনে প্লেটের দিকে এবার ছাগলটার নজর পড়ল। তার ঠিক ওপরেই একখানা বিলিতী তৈলচিত্র। সেটাও বোধ হয় দৃষ্টি এড়ায় নি। ছাগলটা সামনের সোফাটায় চড়ল; পাশেই উঁচু একটা টব-রাখার ওপর সামনের পা তুলে দিল। ছাগলটার ব্যালেন্সের দিকে ডাঃ দত্ত চেয়ে রইলেন। মুখটা আর সামনের একটা পা উঠল প্লেট্‌টার ওপর। পড়্‌ল সেটা মাটিতে। পা'টা হড়্‌কে গিয়ে ঢুক্‌ল তৈলচিত্র ফুটো করে, আট্‌কে রইল ফ্রেমটার সঙ্গে। ছাগলটা প্রায় ঝুলে পড়্‌ল ছবিটার সঙ্গে। গুরুভার সহ্য কর্‌তে না পেরে, ছবিটা জমী নিল। ছাগলও পড়্‌ল সেই সঙ্গে। ডাঃ দত্ত হাঁ হাঁ করে উঠ্‌লেন। ছাগলটা শান্ত নির্ব্বিবাদে মাটিতে হাঁটু গেড়ে তৈলচিত্র ভক্ষণে লেগে গেল।

পথে গঙ্গাগোবিন্দও হাঁ হাঁ করে উঠ্‌লেন। ব্যস্তগতিতে ধাক্কা লেগেছিল স্ত্রীর সঙ্গে। স্ত্রী ও কন্যা তখন বাইরে আস্‌ছিলেন।

স্বাতী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কেমন লাগল?

গঙ্গাগোবিন্দ কেমন কয়েকটা উৎকট আওয়াজ কর্‌লেন।

মা ও মেয়ে অস্থির হয়ে প্রশ্ন কর্‌লেন—কি হল? কি হল?

এবার গঙ্গাগোবিন্দ চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—ভুত! ভুত!—মানুষ না ভুত! ভুত!

মা ও মেয়ে দুজনে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—ও কি, ছি! ছি! চুপ! চুপ!

মেয়ে বলল—বাবা শান্ত হও, শান্ত হও বাবা!

বাবা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—শান্ত! শান্ত! আমি ভয়ানক শান্ত; শান্তির চোটে ফেটে যাব! ফেটে যাব। ছাগল! ছাগল! জানোয়ার! জানোয়ার! ছাগলটা—

স্বাতী বল্‌ল—কার ছাগল? কি হয়েছে?

গঙ্গাগোবিন্দ চেঁচাতে লাগলেন—দত্তের ছাগল! ঐ হতভাগাটা ছাগল এনেছে—আমার সর্বনাশ করবে, আমায় মারবে। রাক্ষুসে ছাগল এনেছে সঙ্গে।

একটু দম নিয়ে গঙ্গাগোবিন্দ বল্‌তে লাগলেন—ভুতুড়ে ছাগল এনে ডোবাল সব! এক এক করে ছাগলটা সব ভাঙ্‌বে—মিষ্টি মধুর হেসে দত্ত বল্‌বেন—চমৎকার ছাগল, কি বুদ্ধি, কেমন চমৎকার লাফাতে পারে! ইসারা করে করে ওই চুরমার করাচ্ছে সব; আর শান্তভাবে বল্‌ছে, ষেড়ে ছাগল তো! আর আমাকে বল্‌তে হবে, খুব সহবৎ তো ছাগলটির! একে একে আমার সর্বনাশ কর্‌বে, আর আমায় বলতে হবে, চমৎকার ছাগল! শান্ত ছাগল আমার দু'চক্ষের বিষ! ভগবান! ডোবালে! ডোবালে! শান্ত! শান্ত! যাও, যাও, মা-মেয়ে গিয়ে শান্ত হও। যাও, শীগ্‌গির যাও, শান্ত হও, শান্ত হও। জন্তু দিয়ে ইনি নাকি বন্ধুদের ভারি পরীক্ষা করেন। পাগল! ভুত!

হঠাৎ ঝনঝন করে মোরাদাবাদী ট্রে পড়ার শব্দ হল।

—যাও যাও, দেখ দেখ, হারামজাদা কোথায় চড়্‌ল।

তখনি আবার আলমারীর কাঁচভাঙার ঝন্‌ঝন্ শব্দ শোনা গেল। বোঝা গেল খেলনার আলমারীর শেষ গতি হল।

—যাও! যা…ও। ঐ মনিবও লেগেছে ভাঙতে! দেখ! দে…খ! পাগল! পাগল! গঙ্গাগোবিন্দ দৌড়ে চলে গেলেন, বল্‌লেন—মাথায় জল দি, বরফ! বরফ!

মা মেয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—কি হল? তুমি তো বল্‌লে—অতি শান্ত ভদ্রলোক।

মেয়ে দৃঢ়ভাবে বল্‌ল—আমি ঠিক বলেছি। আমি ঠিক জানি। একটু থেমে আবার দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌ল—রাখুক্ ছাগল! আমি পরে ছাগল ছাড়াব। তুমি চল, শান্ত হও, অস্থির হয়ো না।

দুজনে ড্রয়িংরুমে ঢুক্‌লেন। মা হাঁ কর্‌লেন। বনেদী কালচার বুঝি ডুবল। এখুনি বুঝি কি বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। ছাগলটা তখন স্বাতীর হাতের কাজ একটা বার্ড অফ্ প্যারাডাইস ও দিগন্ত প্রসারিত অকূল সাগর তীরে দণ্ডায়মান মহাত্মা গান্ধি ভক্ষণে ব্যস্ত। এটা কি প্রলয় নাচনের ষ্টুডিও? ডাঃ দত্ত বিমোহিত হয়ে ছাগলটার দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে বল্‌ছেন—হুঁ! হুঁ! খুব। খুব তো! মেয়েদের প্রবেশ তিনি দেখ্‌তে পান নি। ছাগলটা মাঝে মাঝে সাড়া দিচ্ছে—ব্যা, ব্যা।

স্বাতী সাম্‌লে নিলেন। যা ভাঙ্‌বার তা ভেঙেছে; যা হবার তা হয়েছে। কিন্তু, ভুললে চলবে না, মেয়ে যাকে মন দিয়েছে, তাকে পাবার ভরসা ঠিক আছে। সহজেই মনে পড়ল, বনেদী ঘরের ছেলে অস্থির চঞ্চলতার অপরাধ কিছুতেই মার্জনা করবে না। হঠাৎ মনে হল ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক সহসা স্থাপন করতে হয়তো ডাঃ দত্ত পরীক্ষা করছেন। কথাটা মনে হতে মনে ভরসা এল। ছাগলটা তখন একটা হোয়াটনটে চড়ে, দেয়ালে টাঙানো সুপ্রাচীন বহুমূল্য রেশমী বৌদ্ধ পতাকা ছবি আহরণে ব্যস্ত; পতাকা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। ছাগলটা হোয়াটনট্ শুদ্ধ উল্টে গেল। মনের কথাটা ফিস্‌ফিস্ করে মা মেয়েকে বল্‌লেন; মনে জোর কর্‌তে বল্‌লেন—পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হতে বল্‌লেন। ডাঃ দত্ত দৌড়ে গিয়ে ছাগলটাকে ধর্‌লেন। মেয়ে মাকে বল্‌ল—ডাঃ দত্ত বিশিষ্ট বন্ধুদের জন্তু দিয়ে পরীক্ষা করেন। গঙ্গাগোবিন্দও একটু আগে অমনি কি বলেছিলেন মনে পড়্‌ল।

—নমস্কার, ডাঃ দত্ত।

ডাঃ দত্ত ফিরে চাইলেন। দেখ্‌লেন, মা ও মেয়ের অতি শান্ত সম্পূর্ণ অনুপক্রত মূর্ত্তি। সে মুখ দেখে বুঝ্‌তে বাকী রইল না—তাঁরা এমন দৃশ্যে অভ্যস্ত। অতি অভ্যস্ত নইলে এমন দৃশ্য এমন চোখে দেখা অসম্ভব।

দু'-চারটি করে কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগল। এরূপ ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক তাই ঘটল: ছাগজাতি ও বিশেষ করে এই ছাগলটি হল কথার কেন্দ্র।

স্বাতী বল্‌লেন—ছাগলটার আজ খুব ফুর্ত্তি হয়েছে তো!

ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—মিঃ ঘোষালও ঐ কথা বল্‌ছিলেন। আপনাদের এত জন্তু-জানোয়ার ভাল লাগা দেখে আমার খুব আশ্চর্য্য লেগেছিল; ভারি ভালও লেগেছে।

এলা বল্‌ল—আমি তো বলেছিলুম, আমি পাখীটাখী পুষতে খুব ভালবাসি।

নিঃশ্বাসরুদ্ধ ব্যাকুলভাবে ডাঃ দত্ত প্রশ্ন কর্‌লেন—তুমিও কি এঁদের মত এমনি ছাগল ভালবাস?

ডাঃ দত্ত চুপ করে রইলেন। ছাগলটার দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ বলে উঠ্‌লেন—ঐযে, ওটা আপনার দিকে তাক্ কর্‌ছেনা!

স্বাতী নড়্‌বার আগেই কিছু বোঝার আগেই ছাগলটা দিল লাফ্। চুল ছুঁয়েছিল কিনা বোঝা গেল না। স্বাতীর মাথা ডিঙিয়ে ছাগলটা পড়্‌ল কার্পেট ডিঙিয়ে মোম-ঘসা পাকেট মেজেয়। পিছ্‌লে পড়ে নয়, সরে গেল, পাটা মচ্‌কালওনা। মাথার ওপর দিয়ে রামছাগলের লাফের অভিজ্ঞতা এই প্রথম—অতিথির মুখের দিকে চেয়ে যেমন শান্ত হয়ে স্বাতী বসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই তিনি বসে রইলেন। বনেদীঘরের ছেলে ডাঃ দত্ত সেই অচঞ্চলতা লক্ষ্য না করে পারেন নি। গঙ্গাগোবিন্দের সখের খাতির মা যদি এমনি করে সইতে পারেন, মেয়েও তার পতির এর তুলনায় একটু-আধটু পশুর সখ সহজেই নিজের বলে নিতে পার্‌বে, একটু-আধটু অমিল বাধার প্রাচীর সৃষ্টি কর্‌বেনা। এদেশের আধুনিক শিক্ষিত মেয়ের মত আত্ম-অধিকারের স্বপ্ন-বিলাস নিয়ে মিথ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবে না। এমন কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার যার মা বুদ্ধদেবের মত ভ্রূক্ষেপ না করে উড়িয়ে দিতে পারেন, তাঁর মেয়ের মনের জোর স্বামীর দুর্দ্দিনে অতিবড় আশ্রয় হবে। ছাগলটার নানা পাগলামি এবং মা ও মেয়ের প্রশান্ত হাসিমুখ ডাঃ দত্তের প্রেমের নিগড়কে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে তুল্‌ল।

ছাগলটার লাফালাফির সখ এবার যেন খানিকটা মিটে গেছল।

এবার বড় শান্তভাবে এলার মাদ্রাজী শাড়ির জরীর আঁচলটা একটু চিবুল।

তারপরেই, আবার বোধহয়, তার হাড়েহাড়ে পাহাড়ী দেশের যে আকর্ষণ আছে, তাতেই তাকে টেনে নিয়ে গেল গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটার কাছে। তড়াক্ করে চড়্‌ল পিয়ানোটার ওপর। পা পড়ল রীডের ওপর, বাজানাটায় হল যেন একটু উত্তেজিত। একটু নড়েচড়ে সুদারায় খুর ঠুক্‌তে লাগ্‌ল যেন খুব বুঝে বুঝে।

ডাঃ দত্ত অস্থির হয়ে বল্‌লেন—পিয়ানোটায় চড়েছে, এতে রাগ হচ্ছে না আপনার, সত্যি!

স্বাতী শান্তভাবেই বল্‌লেন—বাজাক্ না পিয়ানোটা। খারাপ লাগ্‌ছে আপনার?

ডাঃ দত্ত কথাটা এড়িয়ে বল্‌লেন—ভারি সখ তো বাজনার ছাগলটার!

ছাগলটা তখন স্বরলিপি ভক্ষণে ব্যস্ত। সে কাজে অরুচি হলে, ঘুরে ঘুরে দুম্ দুম্ করে রীডের ওপর পায়চারি শুরু হল ছাগলের।

তখন সুরশাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হল। রাগ-রাগিণীর উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ; আধুনিক যুগে আমাদের সুরে পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব ; কালোয়াতীর বিরুদ্ধতা ত্রিপদ কীর্তন হতে ভাটিয়ালী সুর-সঙ্গীত তত্ত্বের মর্মকথা উদ্ঘাটিত হতে লাগ্‌ল।

স্বাতী স্বীকার কর্‌লেন—মিঃ ঘোষালও খুব গান ভালবাসেন, তবে ওঁর সখ ছবির।

ডাঃ দত্তের যার জন্ত আসা সে কথার কিছুই এখন তোলাই হয় নি। বল্‌লেন—আর একবার কি উনি আস্‌তে পার্‌বেন ?

স্বাতী একটু চম্‌কে উঠ্‌লেন—এলা মা, দেখতো তোমার বাবার মাথায় জল দেওয়া হল কিনা। বরফ দিতে বারণ কর।

এলা উঠে গেল।

ডাঃ দত্ত একটু সঙ্কুচিতভাবে বল্‌লেন—সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখন মাথায় জল দিচ্ছেন। বরফ দেবেন ?

স্বাতী অস্থির হয়ে পড়্‌লেন—এই, মাথা ঘুরলে জল দিলে একটু ভাল লাগে।

ডাঃ দত্ত ব্যাকুল হয়ে বল্‌লেন—মাথা ঘুরছে, এ্যা ! কেন ? কিছু হয়েছে না কি—উত্তেজনা ?

ছাগলটা তখন একটা আশ্চর্য্য বেসুর বের কচ্ছে।

স্বাতী অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়্‌লেন—না, উত্তেজনা আর কি ! মানে ছাগলটা আজ খুব চঞ্চল হয়েছে, না ?

গঙ্গাগোবিন্দের পুনরাগমন আশঙ্কায় ছাগলটাকে একটু শান্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

—এখানে, আপনাদের আগে ছাগল ছিল না কখনও ?

—না। আপনি, কিন্তু, ভাব্‌বেন না ছাগল আমরা কম ভালবাসি। এলাতো জন্তু পাখীটাখী খুব ভালবাসে।

ডাঃ দত্তের মাথা কেমন গুলিয়ে গেল। গঙ্গাগোবিন্দের যেন কেমন একটা ধরণ। মানুষে সহজে তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগই করে। তাঁকে নিয়ে নানা ভাবনা ভেবে কেউ জড়িয়ে পড়্‌তে চাইবে না। ছাগল নিয়ে তিনি যে কাণ্ড কর্‌ছিলেন, পথের দর্শক হিসাবে তার মজাটাই উপভোগ কর্‌ছিলেন ডাঃ দত্ত। স্বাতীর দিকে কিন্তু আবার মন অমনি সহজেই এগিয়ে আসে—একটু আত্মীয়তার স্পর্শ পেতে আকাঙ্ক্ষা হয়। মা এবং মেয়েও যখন ছাগল নিয়ে মেতে উঠ্‌লেন, ডাঃ দত্তের বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। এত দামিদামি জিনিষ ছাগলের পাগলামিতে নষ্ট হচ্ছে, আর মালিকেরা সবাই মিলে তাতে প্রাণপণ উৎসাহ দিচ্ছে—বাড়ীশুদ্ধ সবাইয়ের কোথায় যেন কিছু একটু গোলমাল আছে। যতটা মনে পড়ে, তাতে তো মনে হয়, এলা বলেছিল—তার বাপ একটু অধীর, সময় সময় পরের যুক্তি একটু কম বোঝেন, তাঁর খুশীমত কথা না শুনলে তাঁর স্বাস্থ্যহানির ভয় আছে। বিবাহের একপক্ষ ছেলেদের বাবাদের এসব গুণ দুর্লভ নয়, এইতো জানা ছিল। তবে এলার মত মেয়ের যিনি বাপ হয়েছেন, তিনি তো ছেলের বাবার বাবা। হঠাৎ বল্‌লেন—আপনারা আমায় একটু মাথার ছিটের কথা শুনে থাক্‌বেন—

স্বাতী বল্‌লেন—আমি তো বিশ্বাস করিনা।

ডাঃ দত্ত আবার বল্‌লেন—লোকে কিন্তু বলে। কিন্তু দেখুন, জন্তু-জানোয়ার ভালবাসা, আর সোজাসুজি কথা বলা—এইমাত্র আমার ছিট। এতে কি আপনাদের খুব আপত্তি ?

স্বাতী বল্‌লেন—আমাদের আপত্তি !

ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—দেখুন আজ আমি এসেছিলুম আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে—এলার পাণিপ্রার্থনা কর্‌তে। আমি অপেক্ষা কর্‌তে প্রস্তুত আছি, এলা আমায় দেখুক, আপনারা আমায় দেখুন।

স্বাতীর স্নেহময় বাক্যের সময় ভিতরে পিতা পুত্রীর একটু অন্য-ধরণের আলাপ চল্‌ছিল।

গঙ্গাগোবিন্দ চেঁচাচ্ছিলেন—পাগল ! পাগল ! বদ্ধ পাগল !

মাথা হেঁট করে এলা বল্‌ছিল—না বাবা, শুধু ঐ একটা বিষয়ে একটু ইয়ে আছে। মা বল্‌ছিলেন—ও এসব কচ্ছে আমাদের পরীক্ষা কর্‌তে ; তুমিও তো বল্‌ছিলে। খুব আস্তে আস্তে বল্‌লে—পরে আমি ছাগল ছাড়িয়ে দেব বাবা।

ডাঃ দত্তের বিশিষ্ট বন্ধুদের ছাগল দিয়ে পরীক্ষা করার অভ্যাস বা রীতির কথা-উল্লেখ গঙ্গাগোবিন্দের মনে পড়ল। স্ত্রীর স্বাভাবিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতাও কোনদিন তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তবু নিজের অভ্যাসবশে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—পরীক্ষা ! পরীক্ষা কচ্ছে ! পাগল, ছন্ন ?

মাথা হেঁট করে খুব নীচুস্বরে এলা বল্‌ল—উনি জন্তু-জানোয়ার খুব ভালবাসেন কিনা, তাই পরীক্ষা কচ্ছেন—আমরা কেমন জীবজন্তু ভালবাসি। আমাদের ভদ্রতা, আচার—এসবও দেখ্‌ছেন।

—জীবজন্তু ভালবাসি ! ভেঙ্‌চিয়ে বল্‌লেন—জীবজন্তু ভালবাসি, চুলোয় যাক্ জীবজন্তু !

—বাবা, বাবা একটু ঠাণ্ডা হও। উনি সত্যিই খুব ভালমানুষ। মা কেমন শান্ত আছেন। একটু থেমে বল্‌লে—উনি কেমন সব সময় শান্ত আছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের দেড়শকোটি মানুষের পৃথিবীতে ঐ মেয়ে ছাড়া আর কেউ নাই।

আবার অনেককাল আগেকার যৌবনদিন মনে এল। তিনি বল্‌লেন—ভাখ্, তোর বুড়ো বাপটাকে কি একেবারে পাগল কর্‌বি ? আমার সন্ন্যাস হোক ? উনি সব সময় শান্ত ছিলেন !—এ্যা, ঐ আয়না আর কখন চোখে দেখবে ! ঐ টেবিল আর কখন হবে ! একটা হতভাগা রামছাগল ! বলি, আমি যদি একটা বুনো গরিলা নিয়ে ওর বাড়ী ঢুক্‌তুম ? সব সময় শান্ত থাক্‌তেন ? থাক্‌তেন ?

—কিন্তু, বাবা, এতো একটা পোষা ছাগল। আর শান্ত কিনা—

—হাঁ, ঐ ছাগল শান্ত, সবাই শান্ত ! তবে আমিই পাগল। কিন্তু ভাখ্, যদি আমিই পাগল হই, ঐ দত্তটা বদ্ধ পাগল—উন্মত্ত পাগল, ছন্ন—আমার হাজার গুণ পাগল, লাখগুণ পাগল ! তুই ওকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌বি ? বল্। বল্ !

—আমার যে করতেই হবে—এত আস্তে বল্লে যে প্রায় শোনাই যায় না।

—ত্থাখ্, একটা অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে বিয়ের প্রস্তাব করতে যে সঙ্গে করে একটা বুনো ছাগল নিয়ে আসে, সে শোবার ঘরে চালান করবে বুনো শোর, ছেলের দোলনায় পুরবে গোখ্রো সাপ। একটু থেমে আবার বল্লেন—তোর মা কি কচ্ছে?

—ত্থাখ মা, মা কত শান্ত হয়ে আমার জন্যে সব সইছেন। ছাগলটা মার মাথার ওপর কি ভয়ানক লাফ্ মারলে, তবুও মার মুখে হাসি ছাড়া নেই। মার মন কি উঁচু! মা সত্যিই ম্যাজেষ্টিক!

—আমাকেও ঐ পাগলটাকে নিয়ে হাসতে হবে? এবার স্বর নিশ্চয়ই অনেক অনেক নরম।

—বাবা আমি তো জানি, তুমি আমার জন্যে কি না পার, বাবামণি!

—চল।

স্বাতীর তখন হাসিমুখ, ম্যাজেষ্টিক্ মনের প্রাণান্ত চরম পরীক্ষা চলছিল। মধুর স্বরে মিষ্টি কথা সহজেই তিনি বলছেন এমনই শোনাচ্ছিল বটে, কিন্তু ঘরে ঢুকে যখন দেখা গেল, ঘরের তিনটে কাঁচের দরজা চুরমার হয়েছে, চিফজাষ্টিসের সম্পত্তি সেলে-কেনা চারটে বইয়ের আলমারীর নীচের তিন পাল্লা কাঁচ ঘরময় ছড়ান, আর শ্বেতপাথরের অত্যন্ত দামী বড় বড় মূর্ত্তিগুলি নির্মমভাবে খণ্ডবিখণ্ড—তাঁর মুখের ও স্বরের প্রশান্তি যে প্রশান্তি—তাতে অত্যন্ত সন্দেহ ঘটাই স্বাভাবিক।

ঘরেতে কাংড়ার একখানা ছবি ছিল। স্বাতী সেটা দেখাবার জন্য উঠলেন। ছাগলটা তখন আলমারী খোলা পেয়ে মূল্যবান আইনশাস্ত্র আহার করছিল। স্বাতী তখন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে ছবিটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন; একটা হাত ছিল দেওয়ালে। ছাগলটার তখন বিদ্যায় অরুচি হল। একটু এক্সারসাইজের ইচ্ছা হয়েছিল নাকি! পেছন থেকে মারলে ঢুঁ স্বাতীকে।

স্বাতী একবার একটু শব্দ করলেন—উঁ!

ডাঃ দত্ত ছাগলটাকে তাড়িয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—লাগেনিতো? লাগেনিতো আপনার?

স্বাতীর ভীতি বা চাঞ্চল্য একটুও লক্ষ্য হল না—একটুও না।

দরজায় দাঁড়িয়ে গঙ্গাগোবিন্দ আপনমনে বল্লেন—হু! ম্যাজেষ্টিক্! হাসিমুখ!

স্বাতী হাসিমুখে বল্লেন—ওতো মারতে আসেনি। শুধু খেলা কচ্ছে।

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে গঙ্গাগোবিন্দ বল্লেন—খেলা!

ছাগলটা এবার জানালার দিকে গেল। মনে হল জানালার সঙ্গে যুদ্ধ হবে। ডাঃ দত্ত বল্লেন—ছাগলটা বোধ হয় ঐদিকে বাইরে যেতে চায়। বাইরের জীব, অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে বন্ধ আছে। বের করে দিলে হয় না?

গঙ্গাগোবিন্দ বল্লেন—হাঁ, নিশ্চয়ই। সামনেই আমার বাগানটায় ছেড়ে দিচ্ছি। ডাঃ দত্ত, এমন ফার্ণের কালেক্শন্ এদেশে বোধ হয় কারও নেই। আর ঐ হতভাগা মালীগুলো! এমন গুছিয়ে বাগান করবে! এমন সাজিয়ে গুজিয়ে বাগান করবে যে লোকে হাঁ করে থাকে এই মতলব। সাজান-গোজান আমার দুচক্ষের বিষ। আমি চাই এলোমেলো, একেবারে একটা যাচ্ছে-তাই স্বাভাবিক, ম্যাজেষ্টিক ওলট্-পালট্। কিন্তু মালীগুলো অতি হতভাগা। ছাগলটা গেলে ফিরবেনা।

ডাঃ দত্ত বিশেষ কিছু বুঝ্লেন না, কিন্তু বল্লেন—তবে ওটা এখানেই থাকুক্। এ্যা!

খুব যেন আপ্যায়িত করছেন, এমনি করে গঙ্গাগোবিন্দ বল্লেন—না, না, এই একটা বন্ধ ঘরে আর কতক্ষণ থাক্বে? এখানে আর কি করবে! বাকী বাড়ীটা দেখে আসুক! কি বলুন?

ডাঃ দত্ত—আপনার যেমন ইচ্ছে। আপনার বাড়ীর সব জায়গাই কি ছাগল বেড়াতে দেন, এই ঘরটাতে আগে—

কথা শেষ করতে না দিয়েই গঙ্গাগোবিন্দ বল্লেন—আমার বাড়ীতে কোথায়ও ছাগল ঘুরে বেড়ায় না। আমার বাড়ী ছাগল চরেনা। আমার বাড়ী ছাগল আসে না। ভদ্রলোক আসে, অতিথি আসে। অতিথি ভদ্রলোকের সঙ্গে আসে।

স্বামীর ওপর চোখ রেখে স্বাতী বল্লেন—স্বাগত অতিথির সঙ্গে যে আসে সেই সুস্বাগত। শেষের দিকের কথা বলা হল, ডাঃ দত্তের দিকে একটু হেসে।

স্বামীর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে বল্লেন—নিত্যকার অতিথি নয়। আজ—

কথা শেষ হবার আগেই এলা হাসতে হাসতে বল্ল—ডাঃ দত্ত, আপনার বাড়ীর সবজায়গায়ই কি ছাগল-টাগল ঘুরে বেড়ায়?

ডাঃ দত্ত প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলেন—এ রোগ তাঁকে সারাতেই হবে। ডাক্তার অশিক্ষিত মা নয়, তাকে ছুরি ধরতে হয়—তিনি বল্লেন—আমার বাড়ীর সর্বত্র ছাগল ঘুরে বেড়ায়! অন্যত্র যেখানে যাই করুক্ আমি কিছু মনে করতে পারি না; কিন্তু আমার ওখানে ওসব আমি কি করে সইতে পারি!

গঙ্গাগোবিন্দ লাফিয়ে উঠ্লেন।

এলা চেঁচিয়ে উঠ্ল—বাবা!

গঙ্গাগোবিন্দ তার চারগুণ চেঁচিয়ে বল্লেন—না শান্ত নয়, কিছুতেই আর শান্ত নয়। ম্যাজেষ্টিক্ নয়। আমি বলবই, বলবই। ডাঃ দত্ত, আপনি বলতে চান, আপনার বাড়ীর ভেতর আপনি ছাগল ছাড়েন না?

স্বাতী বল্লেন—ডাঃ দত্ত আজ—

বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে, সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে গঙ্গাগোবিন্দ বলে চল্লেন—ডাঃ দত্ত, আপনি বলতে চান, এমন চমৎকার, এমন বুদ্ধিমান, এমন সহবৎ-ওয়ালা, এমন সুন্দর রামছাগলকে দামী দামী কার্পিচারওয়ালা ঘরে আপনি একটু ফূর্ত্তি করতে দেন না? ডাঃ দত্ত, এমনি আপনার জীবজন্তু ভালবাসা। এমন চমৎকার রামছাগল দামী দামী ছবি খাবে, দামী দামী আয়না ভাঙ্বে, দামী টেবিল গুঁড়ো

করবে—অপরিচিত ভদ্রমহিলাকে ঢুঁ মারবে—এসব আপনার বাড়ীতে আপনি সইবেন না ?

ডাঃ দত্ত মাটির দিকে চেয়ে, একবারও এলার দিকে না ফিরে যেন মুখস্ত-পড়া বলে যাচ্ছেন, এমনি করে বলে গেলেন—না। লোকে আমার জন্তু-জানোয়ার ভালবাসা নিয়ে ঠাট্টা করে। আমি তা জানি—তা সইতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু যতই চমৎকার রামছাগল হোক্, আমার বাড়ীতে কোন ভদ্রমহিলাকে ঢুঁ মারবে, আমার ফার্ণিচারের পিণ্ডশ্রাদ্ধ করবে, এ আমি কেমন করে সই ! কেউ আমার চেয়ে জীবজন্তু ভালোবাসে, এ দেখ্‌লে আমার খুব আনন্দই হয়, হয় তো একটু হিংসেও হয়। কেউ ছাগল নিয়ে তাঁর বাড়ী যদি চষেন—সে তাঁর খুশী। আমার কি কথা থাক্‌তে পারে ! আমার কি আপত্তি থাকতে পারে ! আমি তাঁকে কোন দোষ দেব না। কিন্তু, আমি তা পারব না, এখনও আমায় বল্‌তে হবে। আমাকে ভুল বুঝ্‌বেন না—আমি মিনতি কচ্ছি। শেষের কথা কয়টা যেন এবার চোখ তুলে বিশেষ করে এলাকেই বলা হল। অনেকক্ষণ অনেক কথা বল্‌তেই হবে মনে হচ্ছিল—বন্ধ হয়ে তারা ছটফট কচ্ছিল, তারা মুক্তি পেল।

গঙ্গাগোবিন্দ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন—চুপ ! চুপ করো। আমার মাথার শির কেটে যাবে ! আমার শির কেটে যাবে ! পাগল হব, সন্ন্যাস হবে ! কি বললে, কি বল্‌লে ? অন্যে যদি ছাগল দিয়ে বাড়ী চাষ করে, তোমার কোন আপত্তি নেই ? এ্যা !

কোন বনেদী সহবতেই এমন ক্ষিপ্ততা লক্ষ্য না করা অসম্ভব। ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—কি হয়েছে মিঃ ঘোষাল ? আপনি কি অসুস্থ ? আমার কথায় কি অপরাধ ঘটেছে ? একবার স্বাতীর দিকে একবার এলার দিকে চাইলেন। আস্তে আস্তে স্বাতীকে বললেন—আমি তো বলেছি, আপনারা আমায় দেখুন, আমি আপনাদের কাছে কিছু সাজ্‌তে পারব না।

গঙ্গাগোবিন্দ একটু যেন শান্ত হয়েছেন—না, কিছুমাত্র অসুস্থ না। যা হবার তা হয়েছে। তার আর চারা নেই। কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু, খুকি, এ হবে না, কিছুতেই হবে না, কোন কিছুতেই না।

এলা ডাকল—বাবা, বাবা।

স্বাতী বল্‌লেন—শুনছ—ঠাণ্ডা হও, শোন, ডাঃ দত্ত—

—বাবা বাবা নয়, শোন টোন নয়। ও পাগল, বদ্ধ, বদ্ধ পাগল। এ কিছুতেই হবার নয়। ওটা এব্‌সোলিউট্‌লি ম্যাড, ষ্টার্ক্‌ লুনাটিক্।

ডাঃ দত্ত নিজের দুরবস্থার কিছু কিছু বুঝ্‌লেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁরই সন্দেহ হয়েছিল, গঙ্গাগোবিন্দের মাথার গোল আছে, ক্রমেই স্থির করছিলেন, গঙ্গাগোবিন্দ পাগল। এবার তিনি বিস্মিত হলেন, তাঁরই মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে এত সন্দেহ জেগেছে। জানতেন, পাগলকে তর্ক করে বাধা দিলে সে আরও ক্ষেপে যায় ; তার কথায় সায় দিয়েই তার উল্টো গাইতে হবে। সুতরাং বল্‌লেন—মিঃ ঘোষাল, আমারই নিজের কথা নিজে বলতে ত্রুটি ঘটেছে। এ ছাগলটা নিশ্চয়ই অসামান্য। এর গুণে আমি মোহিত। ছাগলের ওপর, সকল জন্তুজানোয়ারের ওপরই আমার ভালবাসা তো প্রসিদ্ধ।

গঙ্গাগোবিন্দ যেন রক্তহীন হয়ে গেলেন। বললেন—স্যাথ—। আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লেন না।

ডাঃ দত্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে বল্‌লেন—বলুন।

—তোমার ঐ হতভাগা ছাগলটাকে এখুনি দূর কর। দূর কর। নইলে আমি গুলি করবই।

গঙ্গাগোবিন্দের হাতে বন্দুক থাকলে নিশ্চয়ই তিনি গুলি করতেন।

ডাঃ দত্ত উঠে দাঁড়ালেন—কার ছাগল ?

—কার ছাগল ? কার ছাগল ?

—হাঁা, কার ছাগল ওটা ?

—তোমার, তোমার।

যে শান্ত নির্লিপ্ততা ডাঃ দত্তের মুখশ্রীতে ছিল তা যেন নিমেষে উড়ে গেল। কি বল্‌তে গেলেন, কিছুই বল্‌তে পারলেন না। ধপ্‌ করে সোফাটায় বসে পড়্‌লেন। সোফাটায় বসেছেন, তাও জান্‌তে পার্‌লেন কি না সন্দেহ।

ছাগলটা কি মনে করে এগিয়ে এল। ডাঃ দত্তের টাইটা হাওয়ায় উড়্‌ছিল, সেটাকে খাবে ঠিক করল। না বুঝেই টাইটা কেড়ে নিলেন। অসহায়ভাবে বল্‌লেন—আমার—আমার ছাগল !

গঙ্গাগোবিন্দ বল্‌তেই লাগলেন—হাঁা, আপনার, আপনার ছাগল। এখুনি, এখুনি নিয়ে যান। পোষা আদরের বলে মানব না। হয় ও মরবে, নয় আমি ফাটব।

মরিয়া হয়ে ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—ওটা তো আমার ছাগল নয়। আমি কেন নিয়ে যাব ? আমার জন্মে অমন বিদঘুটে রাক্ষস দেখি নি।

—জন্মে দেখনি ? জন্মে দেখনি !

—কেমন করে দেখ্‌ব। আমি তো ভেবেছিলুম ওটা আপনার।

এবার গঙ্গাগোবিন্দের সম্পূর্ণ বাক্‌রোধ হল। এবার তিনি পড়লেন দড়াম্‌ করে বসে। দুবার কথা কইতে গিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। শেষে বল্‌লেন—বলতে পার তুমি কি আমায় ভেবেছিলে রাঁচীর পলাতক আসামী ?

অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারীর মত ডাঃ দত্ত বল্‌লেন—না, ঠিক তেমন কিছু তো আমার মাথায় আসে নি। শুধু ভেবেছিলুম, আপনার জানোয়ার পোষার পছন্দ একটু অসাধারণ এবং তাকে আদর দেওয়ার ধারণা অলৌকিক।

গঙ্গাগোবিন্দ রুমাল দিয়ে মুখ মাথা মুছ্‌লেন। তারপর বল্‌লেন—ওটা যে তোমার সঙ্গে ঢুক্‌ল ?

—তাতো ঢুক্‌ল। আপনার দরওয়ানও তো ঢুক্‌ল, কিন্তু তাই বলে আপনার দরওয়ান তো আমার দরওয়ান হল না। আমার আসার সময় যদি একটা বাঘ ঢুক্‌ত, একটা গরিলা ঢুক্‌ত আপনার বাড়ীতে—তাহলে সেটা কি আমার বাঘ, আমার গরিলা হত ? আমি তো ভেবেছিলুম, ওটা আপনার ছাগল।

—আপনার ছাগল নয়, আমার ছাগল নয়। তবে ওটা কার? দরওয়ানকে ডাক। পৃথিবীতে আজ একটা জীবের পরমায়ু ফুরুবেই।

একটু হেসে এলা বল্‌ল—বাবা, তুমি না দরওয়ানকে অত করে বল্‌লে, ডাঃ দত্তের সঙ্গে যে জন্তুই আসুক, তাকে ঘরে ঢোকাবে।

—বল্লুম তো! তাই বলে একটা রাক্ষসকে বাড়ীর মধ্যে ঢোকাবে? ছ্যাখ, ছ্যাখ, রাক্ষসটা এবার অত দামী কার্পেটটাও খাবে। থাক্, থাক্—কিছু যেন রেখে না যায়। থাক্, সব থাক্, থাক্। কিছু আসে যায় না।

কিন্তু, কিছু আসে যায়ও। কার্পেট অতি স্বাদু খাদ্য নয়। মুখে যা ছিল, পেটে যা গেছল, সবই ছাগলটা বের করে দিতে চাচ্ছিল। আর ঘোরতর ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ মানুষ তিনটির দিকে কট্‌মট্ করে তাকাচ্ছিল।

—মিঃ ঘোষাল, বিশ্বাস করুন, ঐ ছাগলটাকে আমি আর কখন চোখেও দেখি নি।

—আমি মাপ চাইছি, ডাঃ দত্ত। আমি করযোড়ে আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি। নয়ত—

—ছি, ছি, ও কি কথা। মিঃ ঘোষাল, এত যখন অভয় দিচ্ছেন, তাহলে একটি কথা ব্যক্ত এখুনি করি?

গঙ্গাগোবিন্দ চম্‌কে উঠ্‌লেন। কঠিন মূর্ত্তি ধরলেন—ছ্যাখ, তুমি কি সর্ব্বনাশ করবে? তুমি কি এখন বলবে, ঐ ছাগলটা নেহাতই তোমার।

—আজ্ঞে না। মোটেই তা নয়। আমি শুধু নিবেদন করতে চেয়েছিলুম—আমি আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী। যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু মা করুণা করে স্নেহ করে সে আবেদন মঞ্জুর করেছেন। আমি করযোড়ে আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

স্বাতী এগিয়ে এসে গঙ্গাগোবিন্দের হাত ধরলেন, বললেন—আশীর্ব্বাদ কর। এলার দুটি করুণ চোখ একান্ত মিনতিতে গঙ্গাগোবিন্দের দু চোখ জুড়ে রইল।

গঙ্গাগোবিন্দের মুখ থেকে একটিও কথা বেরুল না। শুধু এলার হাতখানি তুলে নিয়ে বোধ হয়, ডাঃ দত্তের দিকে এগুতে চাইলেন। ইতিমধ্যে ছাগলের রোষ শেষ সীমায় পৌঁছেছিল। সে রোষ প্রকাশ পেল একটা প্রচণ্ড ঢুঁতে। কন্যাকে ডাঃ দত্তের হাতে সঁপে দেবার জন্য এগুবার কষ্ট স্বীকার গঙ্গাগোবিন্দকে করতে হল না। ক্রুদ্ধ ছাগলের ঢুঁতে গঙ্গাগোবিন্দ পড়লেন মেয়ের ওপর, সে ধাক্কায় এলা আশ্রয় পেল ডাঃ দত্তের বক্ষে।

স্বস্তিক

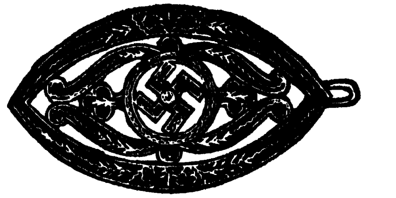
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

ওঁ স্বস্তি—(ওঁ শান্তি) কল্যাণময়ের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের এই বচন হতেই মাঙ্গল্য-চিহ্ন স্বস্তিকের বিস্তার ঘটেছে হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই চিহ্নটী ব্যবহার হচ্ছে এবং হয়েওছিল—তা যে শুধু শুভসূচক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়—এমনই নিছক আলঙ্কারিক প্রয়োগই বেশীর ভাগ।

মেয়েদের কানের দুলে, ব্রোচ্‌এ, নেক্‌লেসের লকেটে, চুড়ীতে, হাতের আর্মলেটে, পূজার আলিম্পনে, যাত্রা কলসে, ঘটস্থাপনায়, চিত্রকরের পটে, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে, কোম্পানীর ট্রেড্‌মার্কে, নূতন ভদ্রাসনের প্যারাপেটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের Certificateএ (Allahabad University) সর্ব্বত্রই স্বস্তিক চিহ্ন অল্প-বিস্তর আমাদের চক্ষুগোচর হয়। এটী বর্ত্তমানেই বিশেষ করে লোকের ব্যবহারে আসছে, পূর্ব্বে অর্থাৎ মাত্র চার-পাঁচ বৎসর আগেও এমন দেখি নি।

প্রকৃতপক্ষে Symbolএর মধ্যে স্বস্তিকের যেন নূতন ঢেউ উঠেছে এবং সেই তরঙ্গের মূল—বর্ত্তমান জার্ম্মান জাতির নাৎসীদলের স্রষ্টা হিটলার।

খ্যাতি, পরিব্যাপ্তি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান স্বস্তিক পেল নূতন করে সারা জগতময় হিটলারের নাৎসী ব্যাজরূপে ব্যবহৃত হয়ে। হিটলারের মত এই যে—স্বস্তিক প্রাচীন আর্য্য-

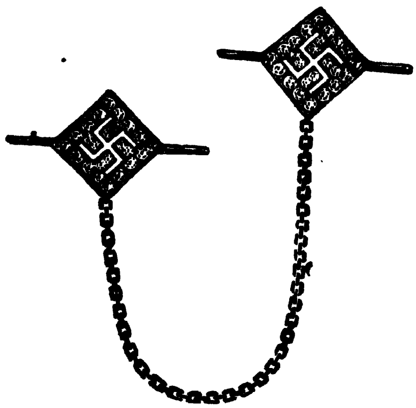


মাথার ক্লীপে স্বস্তিক

সভ্যতার কৃষ্টির পরিচায়ক। জার্ম্মান নৃতত্ত্ববিদ্ ও পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের গবেষণার ফল এই যে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাযাবর আর্য্যজাতি অন্যান্য জাতি হতে নিজেদের

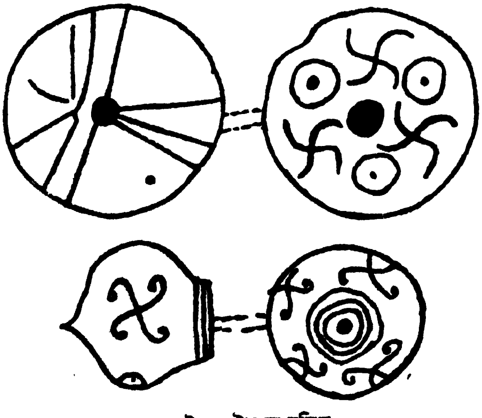
স্বাতন্ত্র্য এবং সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য স্বস্তিক চিহ্ন অবলম্বন করেছিলেন জাতীয় ব্যাজ্ হিসাবে।

আর্য্যজাতির ভারতে উপনিবেশের পরও যে স্বস্তিক তাঁহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হত—তা সমর্থন করে হ্যাভেল বলেছেন



অলঙ্কারে স্বস্তিক

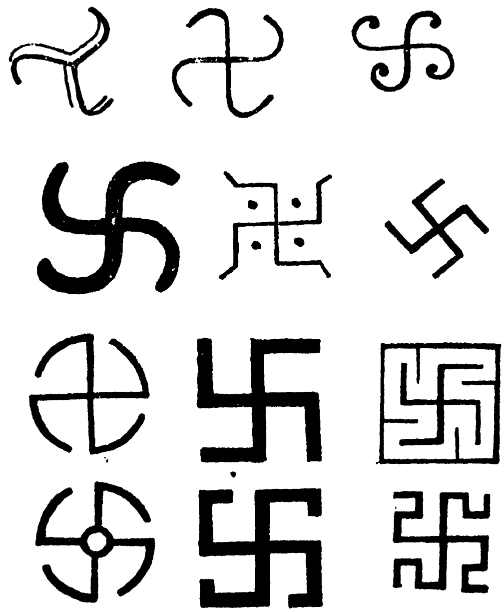
—আর্য্যদের গ্রামের দ্বারদেশে বা প্রবেশ পথে প্রায়ই যে বেদী নির্ম্মাণ করা হত—তার উপর প্রদক্ষিণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন-স্বরূপ স্বস্তিক আঁকা থাকত এবং পুরাতন মানচিত্রে দেখা গিয়েছে যে গ্রামের চৌরাস্তার উপরই এইরূপ থাকত এবং



ট্রয়ের টাকুতে স্বস্তিক

তাহা বোধ করি সূর্য্যদেবের প্রবেশ পথ অর্থে তাঁর চক্রগতিকে অর্থ কোরেই এই চিহ্ন আঁকা থাকত। (১) শুধু এই নয়, হ্যাভেল আরও বলেন যে শত্রুপক্ষ দমনের জন্য সৈন্যদের যে তাঁবু খাটান হত তার আকারটা এই স্বস্তিকের মত করা হত। (২)

আমাদের ভারতবর্ষে স্বস্তিক ব্যবহার হচ্ছে বহুদিন ধরেই এবং বর্ত্তমানে এত প্রচুরভাবে তার ত কথাই নেই। কিন্তু বৈদিকযুগে হিন্দু সভ্যতায় ইহা কতদূর চলিত ছিল তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না তৎকালীন গ্রন্থসমূহে। Cartailhac বলে গেছেন যে epic যুগে চলিত ছিল স্বস্তিকের—রামায়ণে রামের নৌকায় স্বস্তিক চিহ্ন থাকত—এইরূপ বর্ণনা ছিল; এতে আর্য্য-ব্যাজের থিওরির সমর্থন হয় অবশ্য। ভিন্নমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন ভারতবর্ষে



বিভিন্ন রূপের স্বস্তিক

পাণিণির সময় থেকেই স্বস্তিকের প্রারম্ভ—কারণ প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে এক পাণিণির ব্যাকরণেই এর উল্লেখ রয়েছে—গো-পালে তখন স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হত—সেও খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর যুগ।

তবে প্রাচীন নরপতিগণের চলিত মুদ্রায় স্বস্তিকের ব্যবহার ছিল—তার প্রমাণ রাজা আমোঘবর্ষার প্রাচীন মুদ্রায় স্বস্তিকের মত অক্ষর পাওয়া গিয়েছে। (৩)

(১) Havell—History of Aryan Rule, পৃ 109.

(২) Ancient & medieval Architecture—Havell,

(৩) Cambridge History of India—পৃ ৫৩৯

প্রাচীন ব্যবহারের মধ্যে সিদ্ধি বা সুফলের চিহ্ন হিসাবে স্বস্তিক শ্রীশ্রীগণেশ দেবতার সঙ্কেত ধারণ করে আছে। এ ছাড়া বৌদ্ধদের মধ্যে এর বেশ ভালভাবেই বিস্তার ঘটেছিল; কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষ বা স্মৃতিনিদর্শন চৈত্য বা স্তূপে স্বস্তিকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে এবং বৌদ্ধেরা মনে করে এই চিহ্ন ভগবান তথাগত বুদ্ধের বুকের উপর বাহুবন্ধনের সঙ্কেত বিশেষ। ভিন্নমতে শ্রীবুদ্ধের চরণ-যুগলের ছাপ হিসাবে ইহা বৌদ্ধদিগের নিকট অতি পবিত্র। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই তিব্বত, চীন এবং জাপানে স্বস্তিক বিস্তার লাভ করে।

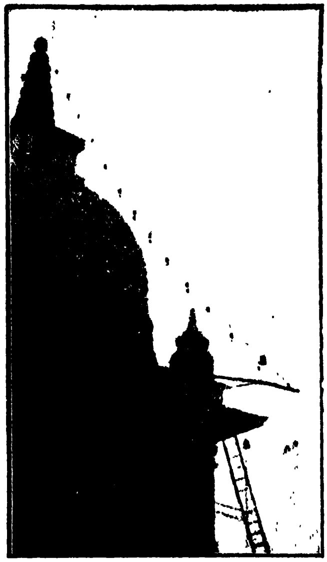
বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তিক—নিতান্ত ঘরোয়া হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্মে, অনুষ্ঠানে, অলঙ্কারে—কোথায় নেই স্বস্তিক। পূজা বা ব্রত উপলক্ষে বা এমনই যে সমস্ত আল্পনা দেয় আমাদের মেয়েরা—তাতে স্বস্তিক আঁকা প্রায়ই দেখা যায়।

স্বস্তিক প্যাটার্ণটা কারুশিল্পে বা সহজাত শিল্পে এমনই সরল হয়ে গেছে যে আমাদের চোখে প্রায়ই পড়ে যায়। সর্ব্বত্রই যে মাঙ্গল্যচিহ্ন বা শুভসূচক চিহ্ন বলে ব্যবহার হয় তা নয়। নিতান্ত সৌন্দর্য্যের দিক দিয়েই এর বৈশিষ্ট্য।

পূজা-পার্ব্বণ বা বিবাহ অনুষ্ঠানে দেখেছি—পুরোহিতগণ ওঁ বা স্বস্তিক এঁকে দেন সিঁদুর দিয়ে। মঙ্গল ঘটে বা দেবতার আসনের বা বেদীর সম্মুখে যেখানে নারায়ণ বসান হয়, সেখানে অনেক সময় স্বস্তিক এঁকে থাকেন। তবে এসব স্থলে স্বস্তিকের চারটী গ্যাপে (Gap) একটু করে ফুটকি দেওয়া থাকে।

কোন কোন জায়গায় হিন্দু সন্তান জন্মগ্রহণের পর ষষ্ঠ দিবসের দিনে যে ষেটেরা পূজা হয় তাতে ধান্য সহকারে স্বস্তিক আঁকা হয়।

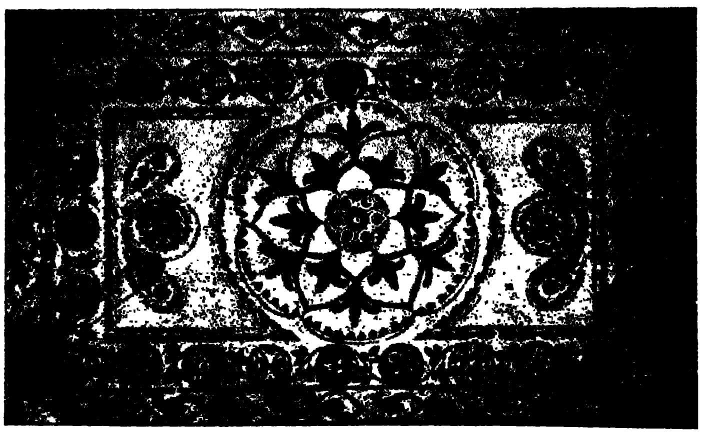
নবরাত্রি উৎসবে গৃহিণী যখন পূজায় বসেন—পূজাবেদীর সামনে তাঁর সরু কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা কৃত সুন্দর এবং সুষ্ঠু যে স্বস্তিকটী অঙ্কিত হয় সে আমাদের হিন্দু মেয়েদের সাত্বিকতার পরিচয় মাত্র। তাই বলি স্বস্তিক আমাদের দেশের ধর্ম্মভীরু জাতির ধর্ম্মের সঙ্গেই জড়ীভূত—জার্ম্মানীর মত রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। এই জন্যই বোধ করি



চাকুরিয়া লেকের বৌদ্ধ মন্দিরে স্বস্তিকচিহ্ন

ইহা বেশীর ভাগই হিন্দু মেয়েদের দ্বারা সংরক্ষিত—যে হেতু ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপর্ব্ব তাঁদের দরদেই পুষ্ট।

গুজরাটে বিবাহরাত্রে হিন্দু মেয়েরা যে যৌতুক পায় তার মধ্যে সুন্দর কড়ি ও পুঁতির কারুখচিত একটী নারিকেল থাকে—সেটীর উপর রঙীন পুঁতির সাহায্যে



বাঙ্গালায় পীঁড়ি চিত্রে স্বস্তিক

চমৎকার একটী স্বস্তিক আঁকা—যেন কল্যাণ কামনা করে নবদম্পতিকে। এটী যে সাধারণভাবে প্রথায় দাঁড়িয়েছে তা নয় এবং মঙ্গল কামনা করাই উদ্দেশ্য—কি এমনই শ্রী ফোটান এর উদ্দেশ্য—তা ঠিকমত অর্থ করা যায় না।

অক্ষয়তৃতীয়া বা দেওয়ালী দিবসে বিপণিতে বিপণিতে যে নূতন খাতা-মহরত হয় তাতে পাঠকবর্গ লক্ষ্য করবেন খাতাগুলির উপর ওঁ গণেশায় নমঃ এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধি কামনার্থ একটী করে লাল সিঁদুরের স্বস্তিক অঙ্কিত থাকে।



গ্রীক মৃৎশিল্পে স্বস্তিক

ইউরোপ আমেরিকায় স্বস্তিক চিহ্ন বহু পূর্ব্বেও শিল্পীর অঙ্কনের অন্তর্ভুক্ত ছিল—আজ জার্ম্মাণীর জাতীয় চিহ্নে গৃহীত হয়ে অবশ্য নূতন করে এর চলন ঘটেছে। ওই জার্ম্মাণীতেই প্রাচীন অলঙ্কারে এবং Vase painting (মৃৎপাত্রের চিত্রাবলীতে) এ স্বস্তিক যথেষ্টভাবে ব্যবহার হত। ব্রোঞ্জযুগে যে সময় Teutonরা বেশ শক্তিশালী ছিল সে সময় তাদের বহিরাভরণে ব্রোঞ্জনির্ম্মিত অলঙ্কারে স্বস্তিক designএর চলিত ছিল।

The Swastika is one of the most ancient and widespread of all ornamental forms appearing in both hemispheres. It occurs in Aegean and archaic Greek pottery and in certain types of fret found in Egypt and Greece.

অতি প্রাচীন স্বস্তিক—সেই দু' তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মিশর এবং গ্রীক্ সভ্যতার অবদানে পুরাতন মৃৎপাত্রে এবং জাফরী কাজে স্বস্তিকের অস্তিত্ব ছিল।

ব্যবিলনের সুসাতে খননাবিষ্কৃত ব্যাবিলন সভ্যতার পুরাতন সামগ্রীর মধ্যে স্বস্তিক প্রচলনের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে। পণ্ডিতগণের মত এই ব্যবিলন থেকেই স্বস্তিক ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়।

ইউরোপে সবচেয়ে বেশী নমুনা পাওয়া গেছে ধ্বংসাবশিষ্ট ট্রয় বা বর্ত্তমান হিজারলিকে (Hissarlik) আবিষ্কৃত টাকুতে (spindle) (ছবিতে দেখ্‌লে বোঝা যাবে)। তারপর গ্রীসে, ক্রীটে (Crete), রোমে, মিলানে কোথায় নয়।

রোমের বহুদিনের পুরাতন সমাধিক্ষেত্রে এবং ইটালীর প্রাগ্‌ঐতিহাসিক স্মৃতি নিদর্শনে স্বস্তিক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে—সভ্য রোমানদিগের পুরাতন কৃষ্টির উদ্ভবের সময় ধন-দৌলতের যে বিশাল ঐশ্বর্য্য হয়েছিল—তার মধ্যে অলঙ্কার এবং সোনারূপার বাসনাদি—এই সমস্ত দ্রব্যে অল্পবিস্তর স্বস্তিক অঙ্কনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

ক্রীট ও গ্রীসের মৃৎপাত্রে যে সুন্দর সুন্দর ফ্রেস্কো ভগ্ন অবস্থায় হাতে এসেছে তাতেও এই চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কিছু কিছু।

এ ছাড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত পম্পাইএর প্রাচীর চিত্রে স্বস্তিক অঙ্কনের পরিচয় পেয়েছেন পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ।

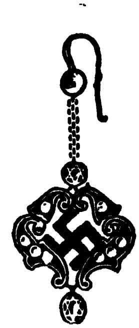
আমেরিকাতেও আশ্চর্য্যভাবে প্রাচীন ইঙ্কা, পেরু ও মেক্সিকোর সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে দেখা গিয়েছে সেখানকার প্রাচীন গোরস্থানে এবং স্থাপত্যশিল্পে স্বস্তিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে কম-বেশী। আমেরিকার পুরানো মৃৎশিল্পে যে সমস্ত design চলিত ছিল তাতে স্বস্তিকও অন্যতম ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

স্বস্তিকের প্রথম উদয় জগতের কোন দেশ থেকে এ বিষয়ে জার্ম্মাণ ও বেলজিয়াম পণ্ডিতগণ বর্ত্তমানে এখনও অনুসন্ধান করছেন—আপাততঃ আর্য্যদিগের নিকট হতে যে এর মূল সূত্রপাত এই মানা হয়েছে। আবার কারও কারও মত পূর্ব্বে বলেছি—ব্যাবিলন থেকে, যেহেতু সুসাতে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এদিকে মিশর সভ্যতার অন্যতম ছাত্র ইলিয়ট Smith বলেন Heliolithic সভ্যতায় সূর্য্য উপাসনা থেকে সপ্তরথীর চক্রগতিকে সাঙ্কেতিক চিহ্নে পরিণত স্বস্তিকের জন্মভূমি মিশর—এইখান থেকেই সে সারা জগতময় ছড়িয়ে পড়েছে।

স্বস্তিক সম্বন্ধে প্রথম অনুসন্ধান করেন অনেকদিন আগে আমেরিকার Smithsonian Inst.এর অন্যতম সভ্য উইলসন—তিনি যে সময় এর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখন পুরাতত্ত্বের এতটা প্রসারলাভ হয় নি। আমাদের দেশে যে স্বস্তিক বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মাঙ্গল্য চিহ্নরূপে ব্যবহার হচ্ছে—উইলসন নিজের দেশের মাপকাঠিতে সেটা মানতে চান নি।

সিদ্ধি বা সুফল অর্থ ছাড়াও স্বস্তিকের আর একটা উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন কোন কোন পণ্ডিতগণ। সেটী হল উর্ব্বরতা (গর্ভজনিত) fertility. এটী স্বস্তিকের সূর্য্যের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ থেকেই derive করেছে। এই মতের সমর্থন করে Mackenji ক্রীটের টেরাকোটা দেবীমূর্ত্তির পূজা বা লিঙ্গ-পূজার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনা করেছেন। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না, যেহেতু এরূপ কোন সম্বন্ধ আমাদের দেশে পাই নাই।



কানের দুলে স্বস্তিক

ভারতের কৃষিসম্পদ—কার্পাস বা তুলা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রবন্ধ

কার্পাসের কথা কিছু বলিতে গেলে একসঙ্গে এত বিষয় মনের মধ্যে আসিয়া জমা হয়, যে সে সম্বন্ধে পর পর সাজাইয়া বলা কষ্টকর হইয়া পড়ে। কার্পাস চাষ, কার্পাস শিল্প ও কার্পাস বীজ এই তিনটী বিষয় একই প্রবন্ধের অঙ্গীভূত, অথচ তাহা একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটীর বিষয় নানা কথা বলিবার আছে। সে আজ বেশী দিনের কথা নয়, ভারতের কার্পাস জগতকে সভ্যতা দিয়া নূতন জাতির হাতে মৃত্যু লাভ করিয়াছে। আবার হয়ত নূতন জীবনের সন্ধান আসিয়াছে, তাই অনেক কথা বলা প্রয়োজন।

আজ কার্পাস বা তুলা ভারতের এক প্রধান সম্পদ। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় তুলার তুলনা নাই। তাহা ছাড়া ঐতিহাসিক দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, তুলা ভারতবর্ষকে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছে।

ইতিহাসের কথা

যতদূর হিসাব পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে তুলার চাষ এবং তুলাজাত দ্রব্যের ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতের গৌরবের কোনও প্রতিদ্বন্দী নাই। যখন ভারতবর্ষে তুলার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তখন পৃথিবীর কোনও স্থানে তাহার নাম জানা ছিল কিনা তাহাই সন্দেহের বিষয়। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি যেমন মানবজাতির সভ্যতার প্রতীক, কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ তেমনই উহার ভিত্তি এবং মানবের আদিম কালের ইতিহাসে কৃষির উন্নতিই মানবের কৃষ্টির প্রথম নিদর্শন। যাহারা তুলা-শিল্পে জগৎকে চমৎকৃত করিয়া পৃথিবীর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইয়াছে, সেই ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহ কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসরের পূর্ব্বেও তুলার নাম শুনিলেও ব্যবহার ও শিল্প সম্বন্ধে কিছু জানিত না। একজন মণীষী এই সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"It would not be far from correct to describe cotton as the central feature of the worlds' modern commerce. Certainly no more remarkable example of a sudden development exists in the history of economic products than in the case with cotton. The enormous importance of the textile today, in the agricultural, commercial, industrial and social life of the world, renders it difficult to believe that little more than two hundred years ago cotton was practically unknown to the civilised nations of the West.

মোট কথা এই যে তুলা আজ জগতের বাণিজ্যের মধ্যমণি বলিয়া

পরিগণিত হইয়া থাকে। যে সকল বস্তু অবলম্বন করিয়া স্বল্পকালের মধ্যে এই বিরাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে তুলাই সর্ব্বপ্রধান। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও সামাজিক জীবনে বস্ত্র যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে যে কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও পাশ্চাত্যে তুলা প্রায় অজ্ঞাত বস্তু ছিল, ইহা আজ বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু ইহাই হইল খাঁটী সত্য কথা। কোন আদিম কাল হইতে ভারত তুলার সন্ধান পাইয়াছে এবং তাহার বস্ত্র শিল্প জগতের সৌখীন বস্ত্র জোগাইয়া আসিতেছে তাহার আজ হিসাব কে রাখে? ইংরাজ, ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতে আসিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করার মধ্যবর্ত্তী কালেই যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তাহাতে জগতের লোককে এক প্রকার ভুলাইয়া দেওয়া হয় যে ভারতে তুলার কোনও ব্যবহার ছিল বা তুলা শিল্প সম্বন্ধে তাহার অধিবাসীর কোনও জ্ঞান ছিল।

তুলা হইতে উৎপন্ন সূতার উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (১।১০৪।৮); তৎপরে অশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (৯।৪) ও লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র (২।৬।১) এই দুই স্থলেও বিশেষ উল্লেখ আছে। সায়ন ভাষ্য ও মন্বাদি সংহিতায় তুলা বস্ত্রের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষে তুলার এবং তুলার বস্ত্রের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই।

ভারতের বস্ত্রশিল্পের পরিচয় জগতে ছাইয়া পড়ে। খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বেও ভারতের বস্ত্র নানা দেশে গিয়াছে এবং অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছে। ৬০ খৃষ্টাব্দে যে পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও ভারতের তুলার এবং বস্ত্রের বাণিজ্যের বিশেষ উল্লেখ আছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—আর যে কোনও দেশের হিসাব লওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে কোনও দেশই ভারতবর্ষ হইতে অন্ততঃ ছয়শত বৎসর পিছনে পড়িয়া আছে। চীন এবং মিশর—ইহারাই ভারতের সহিত অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ে প্রাচীনত্বে সমকক্ষতা লাভ করিয়া থাকে। ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে চীন দেশে যে কার্পাসের চাষ হইত, এ কথা কেহ বলেন না। প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তত্তর জন্ম মহাচীনে তুলার চাষ হয়। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে কোনও সম্রাট একখণ্ড তুলা জাত বস্ত্র বহুমূল্য বলিয়া পরম সমাদরে রক্ষা করিতেন।

মিশরেও সেই অবস্থা। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মিশরেও তুলার চাষ ছিল না। হয়ত কার্পাস বৃক্ষ স্থানে স্থানে ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ যেমন তাহার ব্যবহার বুঝিয়া লইয়া সভ্যতার পরিচয় দিয়াছে, চীন বা মিশর সে গৌরবের অধিকারী নহে।

মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যে সকল গ্রীসীয় সেনা ও সেনাপতি আসিয়াছিল, তাহারাই গ্রীসে কার্পাসবৃক্ষের জ্ঞান লইয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে লিভান্ট হইতে তুলা আমদানী করা হইত। ইংলণ্ডে তুলা চাষ নাই, কিন্তু এই আমদানী করা তুলা দিয়াই ইংলণ্ড পৃথিবীর নানা দেশ হইতে ধনরত্ন আনিয়াছে। অবশ্য ইহাতে ভারতের সহিত যে ব্যবহার ইংরাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাতে তাহার যথেষ্ট কলঙ্ক আছে।

জাতির বিভিন্নতা

আজ আর বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিব না, তুলার মধ্যেই প্রবন্ধ নিবন্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত।

সাধারণতঃ দুই জাতীয় কার্পাস বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের আদিম কার্পাসবৃক্ষ বহুকাল স্থায়ী বলিয়া পরিচিত; ইহারা কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া ফলদান করে (প্রচলিত ভাষায় ইহা "গাছ-কাপাস")। আর এখন যাহা অধিক প্রচলিত, তাহা প্রতি বৎসরই চাষ করিতে হয় (ইহাকে 'চাষ-কাপাস' বলে)। স্থান ভেদে চাষের কাল বিভিন্ন; তবে ভারতবর্ষে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অধিক মাত্রায় তুলা বীজ রোপিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বাৎসরিক চাষের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। চাষ-কাপাস সম্ভবতঃ আরবে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে মুসলমান বিজয়—যেমন দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়াছে, সেই সঙ্গে চাষ-কাপাসের বীজও নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অনুমান করা হয় যে তুরস্ক, আসিয়া-মাইনর, আরমানিয়া, মেসোপোটেমিয়া এবং পারস্য হইয়া "চাষ-কাপাসের" বীজ ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

এই প্রধান দুই শ্রেণীর মধ্যে গুণাগুণ এবং স্থানভেদে তুলার বহু প্রকার বৈজ্ঞানিক বিভাগ আছে। এস্থলে তাহার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য আছে—তাহার কয়েকটী প্রচলিত নাম আছে—তাহা হইতে মাত্র কয়েক রকম তুলার আভাস পাওয়া যায়; যথা:—ধল্লেরা, বাঙ্গাল, খান্দেশ, ওমরা, ধারবাড়, কুমড়া, বরোচ, কোকোনদ, ত্রিনবল্লী, হিঙ্গনঘাট, সিন্ধু, আসাম ইত্যাদি ইত্যাদি। গাছকাপাস বলিতে যে শ্রেণীর তুলা বুঝা যায়, তাহার মধ্যে বাঙ্গলা বা ওকরা, গারো, ভারাদি, সুড়কী প্রভৃতি তুলা পড়ে। কোকোনদ, উমরা, হিঙ্গনঘাট, নাগপুর, বিহার, রোজি বা খরুরা ও বরোদা, পাহাড়ী নামধেয় তুলাসকল নানকিন্ বা চীনা তুলার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

ভারতের চাষ ও ফসল

জগতের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ভারতের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। তুলা চাষেও দেখা যায় আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যকে প্রথম স্থান ছাড়িয়া দিয়া নিজে সংসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। অন্যান্য দেশ যেরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে অন্য দেশ সম্মুখে উঠিয়া পড়িবে। রুষ গণতন্ত্র যেভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে তাহার স্থান ভারতের উপরে হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৯৩৭ সালের ফসলে ভারত পিছনে পড়িয়াছে।

মোটামুটি ২ কোটী ৬০ লক্ষ একর জমিতে ১৯৩৫-৩৬ সালে ৬০ হাজার গাঁইট তুলা জন্মিয়াছে। তুলার মাপ গাঁইট হিসাবে প্রচলিত আছে এবং এক গাঁইটকে ৪০০ পাউণ্ড বা ৫ মণ ওজন বলিয়া ধরা হয়। তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতে জমির শতকরা ৬০.৯ এবং ফসলের ৬৪.৭ অংশ পড়ে। বাকী করদরাজ্যসমূহে যথাক্রমে ৩৯.১ ও ৩৫.৩ ভাগ পড়ে।

মোট জমি ২ কোটী ৬০ লক্ষ একর, মোট ফলন ৭৩ লক্ষ গাঁইট—এইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে।

বৃটিশ ভারতে—

	জমি	ফলন
	%	%
মধ্যপ্রদেশ ও বিরার	১৬ ০	১০'৮
বোম্বাই	১৫'৭	১২'৫
পঞ্চনদ	১০'৮	২০'৯
মদ্র	১০'৩	৯ ৩
সিন্ধু	৩ ৯	৫'৪
যুক্তপ্রদেশ	২'২	৩'২
বাঙ্গলা	'২	'৩

করদ রাজ্যে—

হায়দ্রাবাদ	১৩'২	৯'৬
বোম্বাই	৯'৫	১২'৪
মধ্যভারত	৪'২	৩'০
বরোদা	৩'২	২'৬
পঞ্চনদ	২'৭	৫'৮
গোয়ালিয়র	২'৩	২'০

বাঙ্গলায় তুলার চাষ হয় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে ৫১,৯০০ একর, ময়মনসিংহে ৪,২০০ ও বাঁকুড়ায় মাত্র ১,১০০ একর জমিতে চাষ হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় ঢাকার তুলার মসলিন জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল। অনেকে মনে করেন ঐ তুলার আঁইশ বা তন্তু বিশেষ দীর্ঘ ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তাহা বলেন না। বাঙ্গলার সাধারণ তুলার মত উহার আঁইশও বিশেষ দীর্ঘ নহে—কিন্তু তাহার আরও অনেকগুলি গুণ ছিল, যাহা দ্বারা ঐরূপ সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করা সম্ভব হইত।

তুলা চাষের বিশিষ্ট স্থান

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে কোনও কোনও স্থানে ফলন খুবই বেশী এবং জমি অনুসারে অপর প্রদেশ অপেক্ষা ফলনের পরিমাণও বেশী। বৃটিশ ভারতের কয়েকটী প্রদেশ তুলা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে আবার কয়েকটী জেলায় অধিক পরিমাণ জমিতে চাষ হয়।

মধ্যপ্রদেশ ও বিরারে—আকোলো (৮১৯,০০০ একর), অমরাবতী (৮০৯,০০০), যোৎমল (৭০০,০ ০), বুলদানা, নিমার, নাগপুর, চিন্দবারা ও হোসাঙ্গাবাদ; বোম্বায়ে আহম্মদাবাদ (৫১৭,০০০ একর), দক্ষিণ খান্দেশ (৬৮৭,০০০), ধারবাড়, বিজাপুর, বেলগাঁ, সুরাট; মদ্রে বেলারী (৬৪৬,০০০ একর), কোইম্বাটুর, মাদুরা, ত্রিনবল্লী, রামনাদ; পঞ্চনদে মন্টগোমেরী (৩৪৫,০০০ একর), লায়ালপুর, মুলতান, লাহোর, ফিরোজপুর, সাহাপুর; বিহারউড়িষ্যায় সারণ (৯,০০০ একর), রাঁচি, অঙ্গুল ও আসামে গারো পাহাড় (১৯,০· একর); যুক্তপ্রদেশে আলিগড় (৮৭,০০০ একর), বুলন্দসহর, মথু মীরাট ও সাহারাণপুর (৩৩,৫২৭ একর) জেলা তুলা চাষের জ বিশেষ সমাদৃত।

পৃথিবীতে তুলা চাষ

তুলার প্রয়োজনীয়তার কথা সকল জাতিই আজ বুঝিয়াছে এ যাহাদের জমিতে কিছুমাত্রও তুলা উৎপাদন করা সম্ভব, তাহা সকলেই বিশেষ চেষ্টা করিয়েছে। কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা সম্ভব হয় নাই। যাহাদের দেশে হয়, তাহারা প্রতি বৎসরই পরিমাণ বৃ করিতে চেষ্টা করিতেছে, ফলে জগতে মোট তুলা আসিয়া বেশী মাত্র জমিতেছে। এখন অনেকে আশঙ্কা করেন যে জগতে যেমন চা, পা চিনি প্রভৃতির মোট উৎপন্ন পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন, তুল অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আন্দাজ ৫ কো ২০ লক্ষ গাঁইট তুলা পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে; অথচ প্রকৃতপক্ষে এ তুলার প্রয়োজন আছে কিনা সন্দেহ। এখনও সম্পূর্ণ অঙ্ক পাওয়া য নাই, কিন্তু আশা করা যাইতেছে দেশভেদে ফলনের পরিমাণ নি লিখিতরূপ দাঁড়াইবে—

দেশ	গাঁইট (৪০০ পাউণ্ড)
আমেরিকা	২,৩৪,৩২,০০০
রুষ গণতন্ত্র	৬৬.৯২,০০০
ভারতবর্ষ	৬১,৯৬,০০০
চীন	৫০,০০,০০০
ব্রেজিল	২৫,১৫,০০০
মিশর	২০,০৫,০০০
উগাণ্ডা	২,৫০,০০০

আর্জ্জেণ্টাইনায় সাধারণতঃ প্রায় ৩ লক্ষ ৫২ হাজার গাঁইট তুলা হ কিন্তু অনাবৃষ্টির জন্য দুতিন বৎসর ভাল চাষ হয় নাই এবং ২ ল গাঁইটের বেশী ফলে নাই। আরও সামান্য চাষ পৃথিবীতে হয়, কি তাহা মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে।

পৃথিবীর সমস্ত তুলার মধ্যে এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ভাগ ফলিয়াছে। রুষে ১২'৯ ও ভারতবর্ষে ১ '১ ভাগ পাওয়া য অর্থাৎ মোট ফসলের প্রায় ৭০ ভাগ এই তিন দেশ হইতেই সরবর হয়। কিন্তু এই কয় দেশের জমি হিসাবে ফসলের বহু তারতম্য দে যায়। যে জমিতে ভারতবর্ষে ১'১ ফল পাওয়া যায়, আমেরিক সেখানে ২'৩ এবং রুষে ৩'৭ ফল পাওয়া যায়। তুলা চাষে আর মিশরের তুলনা নাই। ঐ পরিমাণ জমিতে সেখানে ৫'৮ ফলন অর্থাৎ ভারতের ৫ গুণেরও বেশী। এই সব ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের হিসা ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জমির অনুপাতে রুষ ও আমেরিকায় আরও ে ফলন হইয়াছে।

ভারতের বাণিজ্য

যে পরিমাণ তুলা ফলে, ভারতবর্ষে তাহার বেশীর ভাগই লাগে সুতরাং তাহা বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ভাল তুলা যায় ৪৪ দে

৪১ লক্ষ টাকার ; ঝড়তি তুলা (waste)ও যায় ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে উহা যথাক্রমে ৩৩ কোটী ৭৭ লক্ষ ও ৭০ লক্ষ টাকার গিয়াছে।

ভারত হইতে ঐ পরিমাণ টাকার তুলা বাহিরে গেলেও এখানে ১৯৩৬-৩৭ সালে ৫ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকার তুলা বাহির হইতে আসিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর উহা ৬ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকার ছিল।

যাহারা ভারতের তুলা লয়, তাহার মধ্যে জাপান প্রধান ; তাহার পর ইংলণ্ড। দু'পক্ষই বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ। উহাদের কাপড় প্রভৃতি একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লইলে উহারা আমাদের তুলা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লইয়া থাকে।

রপ্তানির মধ্যে—

জাপান	২৫·৪১ কোটী	৫৭·৪ %
ইংলণ্ড	৬·৩১ „	১৪·২ „
বেলজিয়ম	৩· ২ „	৭·৪ „
জার্ম্মাণী	২· ২ „	৪·৯ „
ইতালী	১· ৭ „	৩·৮ „
আমেরিকা	৮৭ লক্ষ	১·৯ „
চীন	৭২ „	১·৬ %
নেদার লণ্ড	·০·৫„	১·২ „
পোলণ্ড	৫০·২ „	১·১ „

ফরাসী, ইন্দো-চীন, স্পেন, মিশর প্রভৃতি অতি অল্পই লইয়া থাকে।

ভারতে আমদানীর মধ্যে—

	টাকা	
কেনায়া	৩·০৬ কোটী	৫২·৩ %
মিসর	১·৮৫ „	৩১·৬ „
সুদান	৪০·৭৯ লক্ষ	৬·৯ „
টাঙ্গানাইকা	৩৪·৮৯ „	৫·৯ „
আমেরিকা	৮ „	১·৭ „

ঝড়তি তুলা আমরা বিশেষ কাজে লাগাই না, কিন্তু অন্যান্য দেশ ৭৬ লক্ষ টাকার উপর ঐ তুলা লইয়া থাকে :—

	টাকা	%
জার্ম্মাণী	২৩·৪০ লক্ষ	৩০·৬
ইংলণ্ড	১৯·৭৬ „	২০·৫
আমেরিকা	১২·১২ „	১৫·৮
বেলজিয়ম	৬·২৫ „	৮·১
ফ্রান্স	৩·৩৬ „	৪·৪
সুইডেন	৬·৫৬ „	২·৩
অন্যান্য	৮·৮৯ „	১১·৬

তুলা ছাড়া তুলা বীজের বহুল ব্যবহার আছে এবং তাহাও কয়েক সহস্র টন বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। কিন্তু তাহা পরে জানাইতে ইচ্ছা রহিল।

দেশীয় মিলগুলিতে প্রায় ২৭ লক্ষ গাঁইট তুলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আমদানী-করা মালও পড়ে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তুলার ব্যবহার

কাপড় বা অন্য কোনও বস্ত্রে কার্পাসের প্রয়োজন আছে। তোষক, বালিশ, গদি, জামার ভিতর আস্তরণ, সুতা, দড়ি দড়া প্রভৃতি মোটামুটী কাজেই আমরা তুলা ব্যবহার করিয়া থাকি। তাহা অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র ব্যবহার পাই ফিতা, ক্যান্‌ভাস্ বা ক্যাম্বিস, তাঁবু, ঝালর, লাইনোলিয়ম্, কার্পেট, মটর প্রভৃতির টায়ার ও লাইনিং করিতে। গ্যাসের ম্যান্টল্ (mantle), কলকারখানার বেল্টিং (belting), ডাক্তারখানার ব্যাণ্ডেজ, তুলার প্যাড, ইংরাজিতে যাহাকে wadding, shoddy প্রভৃতি বলে, এই সব কাজে কিছু তুলা লাগিয়া যায়। কাগজ করিতে এবং তুলা হইতে বিশুদ্ধ সেলুলোজ (celluluse) পাইবার জন্য তুলার বহুল প্রয়োজন।

এখন এই সেলুলোজ সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন : সেলুলোজ হইতে আমরা সেলুলয়েড (বা কাঁচকড়া) পাই। তাহা আবার লাগে ফটোগ্রাফের ফিল্ম করিতে, বোতলের মুখোস বা টুপী করিতে, নানারকম বার্ণিশ বিস্ফোরক, বিদ্যুৎ-রোধক (insulating) কয়েকটী বস্তু, নকল চামড়া, নকল সিল্কের কাপড় (rayon), কলোডিয়ন এবং সেলুলয়েডের অন্যান্য যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে।

আমাদের তুলা আছে, কিন্তু আমরা এ সকল করি না ; ভারতবর্ষে সেলুলয়েড প্রস্তুত করিতে না কি ভারত সরকারের ঘোরতর আপত্তি আছে। বিদেশ হইতে সেলুলয়েডের সীট্ বা চাদর আনিয়া দেশে তাহা হইতে নানা বস্তু তৈয়ারী হইয়া থাকে।

ঝড়তি তুলা যখন বিদেশীরা এত দাম দিয়া লয়, তখন নিশ্চয়ই তাহারা ইহার একটা সদ্ব্যবহার করে। ইহা হইতেও কাগজ হয়। মালপত্র ভাল করিয়া প্যাক বা বস্তা বা বাক্সবন্দী করিতে, সলিতা বা পলিতা, সাদাসিধা কার্পেট প্রভৃতি কাজে বিশেষ উপযোগী। পরিত্যক্ত কীট পাওয়া সুতা ও এই তুলা বিশেষ করিয়া লাগে কারখানায়। যখন কোনও স্থান অনবরত তৈল নিষিক্ত করিবার দরকার হয়, অথচ সূক্ষ্ম সুতা, তুলা প্রভৃতি লাগিয়া থাকিলে ক্ষতি নেই, তখন এইগুলি তেলে ভিজাইয়া প্রয়োজনীয় স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়। আর লাগে বিস্ফোরকে —Gun-catton করিবার জন্য। নাইট্রো সেলুলোজ (nitro-cellulose) এবং ধূমহীন বারুদ করিতে দামী তুলা খরচ না করিয়া ঝড়তি তুলার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। অবশ্য আইনমতে আমরা এ সকল পারি না।

অধুনা তুলার পরিমাণ পৃথিবীতে বেশী হওয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিতেছেন, যাহাতে উচ্চাঙ্গের রাস্তা নি'াণ কার্য্যে তুলার ব্যবহার করা যায়। ইতিমধ্যে পাট সম্বন্ধে এ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

তুলার বীজের দাম নিতান্ত কম নহে ; কিন্তু তাহা এ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

কার্পাস শিল্পে ভারতের স্থান কোথায়, সে বিষয়েও কিছু জানা দরকার। পর প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে।

কবে তুমি আসবে

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী এম-এ

(২০)

যতীশ পুলিশের হেফাজতে কারাভোগ করিতে হাজারিবাগ জেলে যখন আসিয়া পৌছিল তখন বেলা দুইটা। যথারীতি তাহার ওজন লওয়া হইলে একজন পাহারাওয়ালা তাহাকে ত্রিশ নম্বর কামরায় রাখিয়া আসিল। তখনও তাহার কোনো কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। একলা ঘরে বসিয়া এলো-মেলো ভাবিতে ভাবিতে সবে তাহার চোখে ঢুলুনি আসিয়াছে এমন সময় জনা ত্রিশেক কয়েদী সেদিনকার মতো কায হইতে ছুটী পাইয়া পিল্ পিল্ করিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহারাও সেই প্রকাণ্ড ঘরখানিতে বাস করে। নূতন মানুষ দেখিয়া সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ছয় ফুট লম্বা বিরাটকায় একটা কালো লোক তার উঁচু দাঁতের সার বিকশিত করিয়া আগুয়ান হইয়া আসিল ও যতীশের কাঁধে পরমাত্মীয়ের মতো ডান হাতখানা রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"বাবু সায়েবের নাম কি ?"

অবাক হইয়া যতীশ জবাব দিল, "শ্রীযতীশ চন্দ্র—"

"দুত্তোর 'ছিরি'র নিকুচি করেচে। এখানে অবার ছিরি ফিরি কি—সব বিশ্রী। তার পর বাছাধন—চুরি ?"

মূঢ়ের মতো যতীশ কেবল মাথা নাড়িতে পারিল—যে সে তাহা করে নাই।

"তবে ডাকাতি ?" পুনরায় যতীশ শিরঃ-সঞ্চালন করিল।

"তবে খুন, মেয়েমানুষ, জালিয়াতি, রাহাজানি—কি তবে।"

ততক্ষণে যতীশ একটু সামলাইয়া লইয়াছিল, আস্তে বলিল—"স্বদেশী—" মুখের কথা কাড়িয়া লোকটা বলিয়া উঠিল "ও—ভদ্দরলোক ডাকাত"—এবং চোখে মুখে একটা সম্ভ্রমের ভাব ফুটাইয়া ট্যাঁক হইতে একটা তোবড়ানো বিড়ি সোজা করিতে করিতে যতীশের পানে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "বেশ বেশ, মশা'ইর শুভাগমন হোক এবং তামাক ইচ্ছে করুন।"

"ধাঃ—উনি বাবুলোক, তোর বিড়ি উনি খাবেন না জগা," বলিয়া একটা বেঁটে কোটরগতচক্ষু মোটা লোক বিড়িটাকে তাহার হাত হইতে থাবা মারিয়া আত্মসাৎ করিল ও সেটাকে দাঁতে চাপিয়া ট্যাঁক হইতে দেশলাই বাহির করিল।

"দেখ্‌লি শালা মাটুরুর কাণ্ডটা—কোথায় আমি নতুন মানুষের সঙ্গে খাতির কচ্চি আর ওর তামাসাটা দেখ্‌লি !"—বলিয়া জগা মাটুরুকে একটা অশ্লীল গাল দিল।

মাটুরু ততক্ষণে বিড়ি ধরাইয়াছে। একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—"কেন রে বাবা—এত কেন—বাবুটীকে মনে ধরেচে বুঝি। কিন্তু উনি তো তোর বিশুর মতো সোন্দর নয়। খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁপ রয়েচে দেখচিস্ না"—বলিয়া এক চোখ মুদিয়া ও আর একচোখে অশ্লীল কটাক্ষ করিয়া সে মুচ্‌কি হাসিল।

সব দেখিয়া শুনিয়া যতীশের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল। ইহাদের সহিত একদিন নয় দুইদিন নয়—দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তাহার কাটাইতে হইবে !

হঠাৎ তাহার বাঁ হাতে টান মারিয়া একটা প্রৌঢ় মুসলমান কয়েদী কহিল—"আপনি এদিকে আসুন বাবু, ওরা সব ঐ এক রকম।"

যতীশ মুখচোরা লাজুক লোক নয়। যাহা অনিবার্য্য তাহার ভয়ে হা-হুতাশ করা তাহার কোনো দিন অভ্যাস নয়। তাহার অন্তরের শুচিতা ক্লিষ্টবোধ করিলেও সে ততক্ষণ স্থির করিয়া লইয়াছে—এই নরককেই তাহার বাসের যোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে। মুসলমান কয়েদীটির মুখে সে লক্ষ্য করিল সত্যি সম্ভ্রম ও সমবেদনার ছাপ। সে মৃদু হাসিয়া বলিল—"চল, তোমারই সঙ্গে দুটো কথা কওয়া যাক্।"

* * * *

পরদিন ছুটির পরে কয়েদীদের রুদ্ধ আনন্দলিপ্সার উৎকট অভিব্যক্তি সে আরো বিষম। ছুটির ঘণ্টা বাজিবার কয়েক মিনিট পরেই সকলে দুড়্‌দাড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া

যুগপৎ একদল কণ্ঠসঙ্গীত ও একদল যন্ত্রসঙ্গীত সুরু করিয়া দিল। যন্ত্রসঙ্গীত মানে—কেহবা খাবার থালা, কেহ করতালি, কেহ বগল, কেহ বা গালবাদ্যে মাতিয়া উঠিল। সেই ঐক্যতানের সঙ্গে বংশী নামে একটা বিপর্য্যয় মোটা লোক এক দুই তিনের পা ফেলিয়া কোমর দুলাইয়া নাচিতে লাগিল। যতীশ ঘাড় বাঁকাইয়া সেই মুসলমান কয়েদি—নুরমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল,"কয়েদীদের ওপর বুঝি কোনো কড়া শাসন নেই ?"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে নর্ত্তন-নিরীক্ষণনিরত নুরমহম্মদ চক্ষু কপালে তুলিয়া যতীশের দিকে চাহিয়া বলিল—বলেন কি বাবু সায়েব !

ইহার মধ্যে বিশু নামক ১৮।২০ বছরের এক ছোকরা কোমর দুলাইতে দুলাইতে তাহাদের কাছে আসিয়া পড়িতেই কালকার সেই জগা দুই হাতে সেই ছেলেটাকে জাপটাইয়া ধরিল ও দুই গালে সশব্দে চুম্বন করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"মাইরি, ভাই বিশু, তুই একখানা মাল—!"

যতীশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া যেন বিষাইয়া উঠিল। ঘরটার বিশ্রী আবহাওয়া যেন তাহার দেহমনের মধ্যে একটা বীভৎস সরীসৃপের মত শিরশির্ করিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে ! এমন সময় সেই কক্ষ হইতে অনতিদূরে মচ্ মচ্ করিয়া ৫।৬ জোড়া জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। তার পর—আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপও বুঝি এমন বস্তু-পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত করিতে পারিত না। আওয়াজ কানে আসিবামাত্রই যে যেখানে ছিল বসিয়া পড়িয়া কেহ মাথা চুলকাইতে লাগিল, কেহ বা নিজের পা নিজেই টিপিতে লাগিল, কেহ বা ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা কহিতে লাগিল। নিমেষে সেখানে হইল যেন অবিচলিত তুষ্ণীর রাজত্ব। মোটা বংশী বিশুর পিঠের আড়ালে মুখ লইয়া দ্রুত নিশ্বাসে ফুলিয়া-ওঠা দেহখানিকে সামলাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল।

দিনের পর দিন যতীশের চোখের সামনে ইহারই পুনরভিনয় চলিতে লাগিল—এক দিনের সঙ্গে আরেক দিনের পার্থক্য যেমন উনিশ আর বিশ! এই আইনসৃষ্ট অমানুষগুলাকে মানুষ করিতে কি দেবতাও পারেন—যতীশ ভাবে। এমনি করিয়া দিন কাটে। আট মাস কাটিয়াও গেল।

* * * *

ইহার মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জেলের উৎকট জীবনযাত্রা যতীশের কাছে এমন কিছু বিসদৃশ আর ঠেকে না এবং সে ইহাদের সৎপথে লইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছে। প্রথম কয়েক দিন দু' এক জনকে দু' চার কথা বলিয়াছিল বটে, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। সে স্পষ্ট জবাব পাইল যে ওসব মানসিক সৌখীনতা তাহার মতো বাবু ভায়াদের পোষায় ; তাহাদের মত সাধারণ মানুষের এই নরককুণ্ডে পচিতে হইলে এই রকম উৎকট আনন্দই প্রয়োজন। ঝিমাইয়া পড়া মনটাকে চাঙ্গা তো করিতে হইবে।

ইহার মধ্যে নূতন দুইটি লোকের সঙ্গে যতীশের একটু ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। একজন এক ঘোষ, বি-এ পাশ, চল্লিশ টাকার কেরাণীগিরি করিত। বৌএর জন্য গহনা চুরি করিয়া জেলে আসিয়াছে। অপরটি ১৬।১৭ বছরের এক ছোকরা, নাম বিনোদ—ভারী সুন্দর দেখিতে—যতীশ তাহার নাম রাখিয়াছে "বিনোদিনী"। সেদিন ঘোষ আর যতীশের ইণ্টেলেকচুয়েল আলোচনা হইতেছিল—জেল ডিসিপ্লীন লইয়া—এমন সময় বিনোদকে নুরমহম্মদ হাতের কব্জি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া কহিল "এই দেখেচেন বাবু, আপনার বিনোদিনীর কাণ্ড"—এবং বাঁ হাতের মুঠা খুলিয়া দেখাইল—৮।১০টা কাঁচি সিগ্রেট। সে যতীশেরই পকেট হইতে চুরি করিয়াছে। যতীশ এখন সিগ্রেট খায়, অবশ্য লুকাইয়া। রাগিলে ইংরেজী বুকনি ঝাড়ে, যথাসম্ভব কায ফাঁকি দেয় এবং নিঝুম রাতে যেদিন ঘুম আসে না—বালকের মত নিজের দুর্গতি স্মরণ করিয়া কাঁদে।

যতীশ চোখ পাকাইয়া কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—"ফের চুরি, বিনোদিনী"—বিনোদ দাঁত বাহির করিয়া হাসে। সুন্দর ধব্‌ধবে দাঁত, রাঙা মাড়ির তলায় মুক্তার মতো সাজানো। তার অর্দ্ধেক ঢাকিয়া টুকটুকে লাল ঠোঁট কাঁপিয়া কাঁপিয়া সারা হইতেছে। "যাও—আর খবরদার যেন নিও না—মার খাবে" যতীশ বলিল।—নুরমহম্মদ বিনোদের কব্জি ছাড়িয়া দিলে বিনোদ নুরের পিঠে এক চাঁটি মারিয়া কহিল—"ভারী কল্লেন—নালিশ করে ওঁর গুটঠাউরের কাছে।" নুরমহম্মদ গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সে এই ছেলেটাকে দেখিতে পারিত না।

গায়ের চামড়া কটা বলিয়া সবাই যেন আস্কারা দিয়া একে মাথায় তুলিয়াছে!

বিনোদ আসিয়া যতীশের গা ঘেঁসিয়া বাধ্য শিশুটির মত বসিল। এর পর ঘোষের সঙ্গে তর্ক আর তেমন জমিল না; ঘোষ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল "যাও তোমার বিনোদিনীকে নিয়ে একটু বাইরে ঐ দিকে ঘুরে এসো।" রাজার জন্মদিন বা অম্নি কোনো একটা কিছু উপলক্ষে সেদিন কায অর্দ্ধেক দিন ছুটি। যতীশের বিনোদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়া সবাই 'যতীশের বিনোদিনী' বলে; বিশেষতঃ নামটা যখন তারই দেওয়া। যতীশ বিনোদ বাহির হইয়া গেল।

শরতের শান্ত অপরাহ্ণ। এইমাত্র এক পশ্লা বৃষ্টি হইয়া গেল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাঙ্গা মেঘের আলো আসিয়া বিনোদের উজ্জল গৌরবর্ণ কপোলে ললাটে কণ্ঠে কাঁধে লুটাইতেছে। চৌদ্দ ফিট্ উঁচু দেয়ালের ওপারে একটা মস্ত শিশুগাছ, তাহার মগডালের ছায়াটা আসিয়া জেলকম্পাউণ্ডের ভিতরে পড়িয়াছে। সেইখানে দুইজনা বসিল। বিনোদ চালাক ছেলে—সে যতীশের হাতখানি থাকিয়া থাকিয়া আদর করিয়া নিজের গালে চাপিয়া ধরিতেছে। যতীশ সেই সুকুমার মুখের দিকে আপনা-ভোলা হইয়া চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ সে এম্নি ছিল জানে না—হঠাৎ একটা কাকের কর্কশ ডাকে সম্বিৎ পাইয়া দুঃসহ লজ্জায় ও রাগে সে যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বিনোদের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া সে নিজের মুখ ঢাকিল। হঠাৎ যতীশের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিনোদ চুপি চুপি তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া চারিদিকে চট্ করিয়া একবার তাকাইয়া বলে—"একটা সিগ্রেট খাবে, চারপাশে কেউ নেই—" হঠাৎ মুখ খিঁচাইয়া যতীশ বলে "বিনোদ তুই যা—পালা এখান থেকে বল্‌চি!"

ছেলেটা হতভম্ব হইয়া যায়। ফের যতীশ খিঁচাইয়া ওঠে—"গেলি নে হতভাগা—এমন এক চাঁটি মারব"—

বিনোদ আস্তে আস্তে অবাক হইয়া সরিয়া পড়ে। তারপর যতীশের দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে।

রাতে ঘোষের সঙ্গে দেখা। চোখ তখনো তাহার জবাফুলের মত লাল। যতীশ বলে "ভাই ঘোষ, কি কষ্টে বাঁচি বলত। যে-দেহের কোনো দাবী নিজের উপর স্বীকার করিনি, বোধ করিনি—ঘোষ, তা যে আমায় এবার পুড়িয়ে মারছে! একটি নারীকে জীবনে আমার ভালো লেগেছিল, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে কোনোদিন লালসার আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে পারে নি। তার চিন্তা আমার কর্ম্মযজ্ঞে ধূপসুরভির মত গগন আচ্ছন্ন করে থাকত। সেই আমার আজ একি হ'ল ঘোষ বলতে পার? ক্রিমিকীটের মত ক্লেদপূর্ণ পঙ্কিলতা ছাড়া আমার যেন আজ উপায় নাই। অথচ সমস্ত অন্তরাত্মা ঘিন্-ঘিন্ও করে। আমি কি হ'লাম, কি হ'লাম।"—বলিয়া যতীশ হাতে হাত রগড়াইতে লাগিল। চক্ষে ও ঠোঁটের কোণায় রুদ্ধ আক্রোশ গর্জ্জাইতেছে—পারিলে যেন সে নিজেকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়। ঘোষ নিঃশব্দ সহানুভূতিতে যতীশের কাছে সরিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ঘোষের বয়েস একটু বেশী—সে জানে দেহের জুলুম কি কুশ্রী, কি ভয়ানক। ঘরে অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী তাহার বলিয়াছিল—"যাও আমার কাছে আর এসোনা। বারো বছর বিয়ে করেচ, একগাছা রুলি পর্য্যন্ত দিতে পারলে না। ভারী আমার ভালোবাসা, যাও আমায় ছুঁতেও পাবে না।" তবেই না ঘোষ চোর হইয়াছে। সে জানে ভদ্রসন্তান হইয়া কিসের তাড়নায় চুরিও তাহার কাছে শ্রেয় হইয়াছিল।

(২১)

মাসকয়েক গত হইল যতীশ জেলে গিয়াছে। কিন্তু সংসারের পক্ষে অকেজো এই লোকটি বিদায় হইবার পর পরিবারের রূপান্তর হইয়াছে অনেক। খাওয়া-দাওয়া স্কুল-কলেজ কাছারী—এসবের কায চলিয়াছে একই তালে, কিন্তু শ্রাবণ ঘনঘটাচ্ছন্ন বাদলসন্ধ্যার মতো একটা ম্লান ছায়া যেন সকলের উজ্জল আনন্দকে চাপিয়া বসিয়াছে। ব্যারিষ্টার সাহেবের পার্টি ফার্টি প্রায় বন্ধ—অবশ্য বিনয় এখনও প্রায়ই অপরেশবাবুর সহিত গল্প করিবার অছিলায় আসে এবং লীলার সহিত দু'চার মিনিট নিভৃত অবকাশের সুযোগ খুঁজিয়া ফেরে। লীলার এখন সেই বয়েস যখন কোনো দুঃখ মনকে বেশীদিন অভিভূত করিয়া রাখিতে পারেনা। ইহাই যৌবনের একাধারে গৌরব ও দুর্বলতা। দেখা গেল এই ধাক্কা সেই কাটাইয়া উঠিল প্রথম এবং

তাহার স্বভাবসুলভ উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—"মেজদা'র জন্য দুঃখ না করে—করা উচিত আনন্দ, —তিনি দেশের জন্য কারাবরণ করেচেন। পরাধীন দেশের মানুষের এর চাইতে বড় গৌরব কি আর কিছুতে আছে নাকি!"

রমাও ভাবে, সত্যই তো, এর চাইতে বড় গৌরব কি আর আছে—এই আদর্শের জন্য সাধনা! তার মামলার বিবরণ সে খুঁটিনাটি পড়িয়াছিল—রমা জানিত যতীশ সাধারণ বিপ্লবী নয়, রুশিয়ার সোভিয়েটদের সহিত কি ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত ছিল। যতীশের ঘরে ইদানীং গাদা গাদা পলিটিক্সের বই জড় হইয়াছিল, রমা সে সব ঘাঁটিয়া কমিউ-নিজ্‌মের মূলসূত্র আবিষ্কার করিল। কি সুমহান্ ত্যাগের আদর্শের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত! কি সার্বভৌমিক ইহার সাধনা! দেশের গণ্ডীতে এর আদর্শের পরিধি সীমাবদ্ধ নয়, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এর বিস্তার। হোক না এর সাফল্য অবিশ্বাস্য, সুদূর-পরাহত—তবু জীবন যদি উৎসর্গ করিতে হয় ত এত বড় আদর্শের জন্যই করা উচিত। সার্থকতা দিয়া তো জীবনের পরিমাপ নয়—এর আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও তার সাধনা দিয়াই তার সত্যিকার মূল্যবিচার হয়। যতীশের জীবন সমগ্র বিশ্বের যত নিপীড়িত দুঃস্থের জন্য—এই কথা মনে করিয়া রমার বুক তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু তাহার অন্তরে যতীশের জন্য শুধু শ্রদ্ধাই সঞ্চিত হইতেছিল কি? যখন তাহার খালি ঘরটার দিকে দৃষ্টি পড়িত—বুকটা বেদনায় এত টনটন করিয়া ওঠে কেন সে ভাবিয়া পায় না। কয়দিনের পরিচয় তাহার এই লোকটির সঙ্গে এবং এই স্বল্প পরিচয়েও সে কি শুধু অবহেলা অপমানই তাহার নিকট হইতে পায় নাই? তা ছাড়া ঐ ঘরটিতে সে কতটা সময়ই বা থাকিত? আজ দেরাদুন, কাল শিলং, পরশু লক্ষ্ণৌ—এম্‌নি তো ছিল তার গতি। মাসে এক সপ্তাহ ছিল তাহার ঐ ঘরখানিতে অবস্থিতি; তবু তাহার অনুপস্থিতিতেও ঐ ঘরখানি তাহার কর্ম্মপ্রাণ অস্তিত্বের মূক সাক্ষী ছিল। এখন ঐ ঘরটা যেন তার জেলের কয়েদীর রূপটাই মনে করাইয়া দেয়। হয়ত যতীশ জাঙিয়া পরিয়া খালি গায়ে ঘানি ঘুরাইতেছে, হয়ত ক্ষেতের মাটি চষিতেছে—হয়ত—রমার দুইচক্ষে জল ভরিয়া আসে। এম্‌নি ভরিয়া আসে অশ্রু আর একটি মানুষের চোখে, তিনি যতীশের পিতা। অপরেশবাবুর সঙ্গে রমার বন্ধন যেন দিনদিন দৃঢ়তর হইয়া আসিতেছিল এবং যে অদৃশ্য রজ্জু দুইজনাকে এমনি করিয়া একত্র বাঁধিতেছিল সে হইল যতীশের প্রতি এই দুইটি মানুষের মমত্ববোধ।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া রমা এলোমেলো নানা কথা ভাবিতেছে, এমন সময় ভৃত্য ভজুয়া বৈকালিক মেলের একখানা মোটা খামের চিঠি তাহার হাতে দিয়া গেল। লেপাফার উপর হাজারিবাগ জেলের 'Passed by Censor' ছাপ মারা! হঠাৎ তাহার বুকের সমস্ত রক্ত ছলাৎ করিয়া যেন হৃৎপিণ্ড হইতে উছলাইয়া পড়িয়া তাহার সমস্ত অঙ্গ অবশ করিয়া আনিল। কিছুক্ষণ সে চিঠিখানা মুঠার মধ্যে সজোরে ধরিয়া নিজের ঘরে যাইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিল; তারপর বক্ষঃস্পন্দন মৃদুতর হইলে খুলিয়া পড়িতে লাগিল। প্রথমেই পাঠ দেখিয়া সে অবাক্! তাহাতে লেখা:—

হাজারিবাগ জেল।
তারিখ—

রমা, আমার এরকম চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হবে, হয়তো বা জেলে আমার মাথা বিগড়ে গেছে এই মনে করবে; কিন্তু এ পত্র না লিখে আমার নিষ্কৃতি ছিল না। নিজেকে শাসিয়েছি বিস্তর। জেলের বাইরে কায ছিল, তাতে তখন ডুবে থাকতুম। তুমি আমার কাযের অন্তরায় বলে তোমাকে ঘৃণা করবার চেষ্টা করতুম, ভাণ করতুম। কিন্তু এখানে আমি দুর্ব্বল—বড় অসহায় হয়ে পড়েছি। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি আজ ক্ষতবিক্ষত, তুমি তাতে স্নিগ্ধ প্রলেপ দাও। আমায় তোমার একবারও মনে পড়ে কি? মনে হয় বুঝি পড়ে—নৈলে তোমায় এ চিঠি লিখ্‌তে হয়ত সাহসই পেতাম না।

তোমায় আমি অবহেলা দেখিয়েছি তা তুমি ভুলে যেয়ো। জানবে সে আমার সত্যিকার অবহেলা নয়; সে তোমার থেকে আত্মরক্ষা করতে আমার অক্ষমতার প্রতিক্রিয়া। আমি তো পরাজয় স্বীকার কচ্চি রমা!

নারী আমার কাছে নরকের দ্বার নয়, নারী আমার কাছে অবহেলার বস্তু নয়, তবু তোমায় কেন আমি এড়িয়ে চলেছি তার কৈফিয়ৎ দিচ্চি। আমাদের সাধনার পক্ষে শান্তিময় পারিবারিক জীবনযাপন সম্ভব নয় এই জন্য।

আমার জীবন বিপদ্-সঙ্কুল, তার সঙ্গে তোমায় জড়াতে চাওয়া স্বার্থপরতা মনে হোতো। কিন্তু এখানে এসে অবধি ভাবচি— বিবাহই যৌন-জীবনের একমাত্র পরিণতি নয়; একথা শুনলে তুমি হয় তো শিউরে না-ও উঠ্‌তে পারো, কারণ তুমি সংস্কারান্ধ মেয়েমানুষ নও; যুক্তির স্বচ্ছ প্রখর আলো তোমার মন উদ্ভাসিত করে আছে। আমি তোমায় বিয়ে করতে পারি না; কিন্তু আমি তোমায় ভালোবাসি, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে যত প্রেমিক তাদের প্রিয়ার জন্য চোখের জল ফেলেচে, আমার ভালোবাসা তাদের কারো চাইতে দুর্বল নয়—এ কথা তোমায় আমি জানাতে চাই। বিগত পক্ষাধিককাল আমার মুখে রুচি নেই, রাতে ঘুম নেই— বুকে অহরহ রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌চে। আজ তোমার কাছে অন্তরের বোঝা নামিয়ে স্বস্তি পেলুম। যে কদর্য্যতার পাঁকে অহরহঃ ডুবে আছি, তোমায় শুধু 'ভালোবাসি' এই কথাটি বলে যেন তার অর্দ্ধেক কুশ্রীতা অপনীত হয়ে গেল। নাই বা তোমায় পেলাম—তথাপি আমার সুখ তুমি কেড়ে নিতে পারবে না—তোমায় ভালোবেসেচি, তোমায় সে কথা বলেচি। ইতি

যতীশ

চিঠি পড়িতে পড়িতে রমার অশ্রুধারায় বুক ভিজিয়া গেল।

রমা কাগজ কলম লইয়া পরদিন উত্তর দিতে বসে। কিন্তু লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেখে কিছুই লেখা যায় না, কিছুই মনের মত হয় না। তিনখানা চিঠি তখন লিখিয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিল। তারপর হতাশ হইয়া ভাবিল, দুই একদিন সময় লইয়া কথাগুলা গুছাইয়া লিখিলেই চলিবে। কিন্তু দুই দিন গেল, তিনদিন গেল, চারদিন গেল। তারপর জবাব দিতে অযথা বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পঞ্চম দিনে নিজের উপর বিরক্ত হইয়া শুধু লিখিল—

"শ্রীচরণেষু,

আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাকে কি লিখিব ভাবিয়া পাইতেছি না। এ হতভাগিনীর দিবার যোগ্য কোনো সম্পদই নাই যে। ইতি

রমা

জীবনের বিচিত্র গতি! পত্র ডাকে দিয়া রমা ভাবিতে লাগিল নিয়তির দুর্বার আকর্ষণ তাহাকে কোনদিকে টানিয়া লইতেছে কে জানে? বিজয়কুমারের জন্যও তাহার চিত্ত এমনি উন্মুখ হইয়াছিল তো? কিন্তু পরক্ষণেই মন বলিল, না—এত ভালো হয়ত বিজয়কে সে বাসে নাই। তা' ছাড়া সে কপট অসচ্চরিত্র। যতীশের পাশে তাহার আসন! কিন্তু আশ্চর্য্য যে বিজয়ের কপটতা ও অসচ্চরিত্রতা সে কোনো দিন ঘৃণার চক্ষে দেখে নাই! আজ তবে সে নজির কেন?

(২২)

ইহার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। বিনয়ের ঠাকুরমা তার বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করায় পুত্রের ঈঙ্গিতানুযায়ী তাহার পিতা অপরেশের নিকট লীলার সহিত বিনয়ের বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থাপিত করিলেন। অপরেশের অমত করিবার কিছুই ছিল না; যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। লীলা শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় রমার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়া গেল "কবে যে মেজদা ফিরবেন জানিনে রমাদি;—বাবাকে তোমার যত্নে আছেন বলেই কতকটা নির্ভাবনায় ছেড়ে যেতে পাচ্চি, নৈলে মেজদা যাবার পর তাঁর যা শরীরের অবস্থা হয়েচে!"

বাস্তবিকই যতীশের জেল হওয়ার পর অপরেশের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকেন, প্রায়ই চোখের জল ফেলেন। রমা হইয়াছে তাঁর পক্ষে যেন অন্ধের যষ্ঠি। উঠিতে বসিতে খাইতে বাগানে সান্ধ্যভ্রমণে রমাকে তাঁর চাই। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় রমার এই বয়সে তাঁর মত বৃদ্ধ রুগ্নের পরিচর্য্যা করিতে নিশ্চয়ই আনন্দে চিত্ত ভরিয়া ওঠে না এবং তিনি স্বার্থপরের মত নিজের আরামের জন্য এই আশ্রিতা মেয়েটির ওপর হয়ত জুলুম করেন। কিন্তু একদিন ঈঙ্গিতে সে কথা উত্থাপন করিতেই রমা এমন কাঁদিয়া কাট বসায় যে অপরেশ নিঃসঙ্কোচে তাহার পর হইতে তার কাছে সেবা লইতেন। এই মেয়েটিকে তিনি বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন; পত্নী-বিয়োগের পর আর কাহারও যত্নে যেন এত আন্তরিকতার স্পর্শ তিনি পান নাই—এমন কি পুত্রবধূ বা কন্যার সেবাতেও না।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত অপরেশের পায়ে গরম জলের

সেক দিয়া রমা তাহার ঘরে আসিয়া শুইল। কিছুতেই তাহার ঘুম আসিতেছে না ; এলোমেলো চিন্তা মাথার মধ্যে উৎপাত সুরু করিয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রি। সুবিস্তার বাগানের মাঝখানে অপরেশের বাড়ী। রমার ঘরের বাইরের দিকের দরোজা খুলিলে বাগানের একটা সরুপথে পড়া যায়। সেখান হইতে তিন-চার হাত দূরেই একটা হাস্‌নাহেনার ঝাড়। মৃদু হাওয়ায় তার মিষ্ট গন্ধ রমার ঘরে ভাসিয়া আসিতেছিল। হেনার ঝোপে থাকিয়া থাকিয়া ঝিঁঝিঁ-পোকার কলতান রাত্রির নিস্তব্ধতাকে গভীরতর করিয়া তুলিতেছিল। মেঘাবৃত চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না খানিকটা খোলা জানালা দিয়া ঘরের মেজেয় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। দেয়ালের কুলুঙ্গীতে একটা টাইমপিস্ ঘড়ি টিক্ টিক্ বাজিয়া চলিয়াছে। রমা বিরক্ত হইয়া আলো জ্বালিয়া একটা বই লইয়া বসিল। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। হঠাৎ বাইরের দিকের দরোজায় রমা যেন মৃদু করাঘাতের শব্দ পাইল। কান খাড়া করিয়া সেদিকে মনোযোগ দিতেই আবার দ্বারে করাঘাত, সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় কে বলিল, —"দরোজা খোল।" রমার দেহ ভয়ে আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবার মেয়ে নয়। আস্তে আস্তে দরোজার পাশে গিয়া সে কান পাতিল। এবার সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল—"আমি যতীশ, পালিয়ে এসেচি, শীগ্‌গির দরোজা খোল রমা।" এ কণ্ঠস্বর রমার ভুল হইবার নয়। সে ত্রস্তহস্তে আলো নিবাইয়া দরোজা খুলিয়া দিল। যতীশ ঘরে ঢুকিল বিচিত্র বেশে! চোস্ত-পাজামা আর আচকান পরা, মাথায় পাগড়ী, চোখে চশমা, মস্ত গোঁপ! তাহাকে একদম চেনা যায় না! ঘরে ঢুকিয়া রমার বিছানার উপর বসিয়া সে নকল গোঁপ ও চশমা জোড়া খুলিয়া বলিল—"জেলে বন্ধ হয়ে থাকা আমার পোষাল না রমা, পালিয়ে এলুম। জেলে পচে মরার চাইতে যুঝে মরাই ভালো কি বল?" রমার বাক্‌শক্তি যেন তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল, সে শুধু মাথা নাড়িল—তাও অর্থহীনভাবে। যতীশ তাহার হাত ধরিয়া একেবারে কাছে টানিয়া বলিল—"তুমি যে ভীষণ ঘাবড়ে গেছ দেখ্‌চি, চেঁচিয়ে আমার আগমন জানিয়ে দেবে নাকি?" সে কথায় উত্তর না দিয়া রমা এবার বলিল, "পালিয়ে তুমি বাড়ীতেই এলে, পুলিশে এখানেই আগে খোঁজ করবে না কি?" মৃদু হাসিয়া যতীশ বলিল "ঠিক তার উল্টো। আমার মত ফেরার জেল থেকে পালিয়ে বাপ-মা'র আদর খেতে বাড়ী ফিরে যায় না এ তারা বিলক্ষণ জানে। তাই এখানে খোঁজ পড়বে সব শেষে। তা যাই হোক, তোমাকে একবার না দেখে ফের মরণের খেলায় ঝাঁপ দিতে মন সরল না," বলিয়া সে পকেট হইতে একটা গুলিভরা রিভলভার বাহির করিয়া পাশের টিপয়টার উপর রাখিল। সেদিকে একবার চাহিয়া কম্পিতবক্ষে রমা প্রশ্ন করিল,—"কি করে তুমি পালালে? কি করে? কি করে বা এতদূর এলে?" হাসিয়া যতীশ বলিল—"হাওয়ায় উড়ে আসিনি গো—রেলগাড়ী চড়েই এসেচি ; আর কি করে পালালুম সে অনেক কথা। কেন, খবরের কাগজে দেখনি যে হাজারিবাগ জেল থেকে কয়েদী পালিয়েচে?" রমা উত্তর দিল "কাগজ প্রায়ই দেখি বটে, তবে ও খবরটা হয়ত কোন কারণে নজরে পড়ে নি। কিন্তু তোমার খাওয়া দাওয়া হয়েচে ত আজ?"

যতীশ তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—"কেন, তা নৈলে শরৎবাবুর নায়িকাদের মত রাঁধতে লেগে যাবে নাকি আমার জন্য?"

রমা বলিল, "না। তবে ভাঁড়ার থেকে কিছু তৈরী খাবারের চেষ্টা দেখ্‌তে পারি চুপি চুপি।"

"সে সব এখন থাক। ওসব আমার হয়ে গেছে, আমরা উপোসী থাকি নে কখনও। এবার তোমার সঙ্গে দুটো কথা কয়েনি—আবার সাড়ে চারটায় আমায় পালাতে হবে।"

তারপর কত কথা। তার কতকগুলার অর্থ আছে, বেশীর ভাগের নাই। যতীশ অনাবশ্যক কথা বলিতে পারে রমা কদাচ ভাবিতে পারিত না ; সে স্বপ্নেও জানিত না এই শুষ্ক কাঠখোট্টা মানুষটির মধ্যেও অনুরাগের এমন উজ্জ্বলতা থাকিতে পারে! রাত যখন চারটা যতীশ বলিল, "এবার পালাই।"

"এখনি?"—মনিবন্ধের ঘড়ি তুলিয়া একটু হাসিয়া রমাকে দেখাইতে সে বলিল "ওমা, এর মধ্যে চারটে বেজে গেল?"

যতীশ ফের হাসিয়া বলে "আমাদের জন্য তো সময় বসে থাকবে না। আচ্ছা আসি তবে। কাল যদি এলাহাবাদে থাকি, রাত ১২টা থেকে একটার মধ্যে পারি তো আসব।

তবে এলাহাবাদে থাকা আমার পক্ষে মুস্কিল—চারদিকে সবাই জানে আমায়।"

যদি কেহ যতীশকে চেনে—কল্পনায় রমা শিহরিয়া বলিল "তার চাইতে তুমি এলাহাবাদ ছেড়ে আজই চলে যেও।"

যতীশ হাসে আর বলে—"কিন্তু এখানে কায আছে যে কাল পর্য্যন্ত। ভয় কি রমা, জানই ত আগুন মোদের খেলার জিনিস, দুঃখ মোদের পায়ের দাস!"

রমা তার ভীরু চোখ নামাইয়া অস্ফুটে বলে—"আমার যে অত সাহস নেই!"

এবার যতীশ গোঁফজোড়া নাকের নীচে চাপিয়া দেয়, রিভলভারটা পকেটে ফেলে চশমাটা হাতের মুঠায় লইয়া ধীরে ধীরে বাগানের অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

পরের দিন রমার কাটে না। ঘড়ি যেন সব বিকল হইয়া গিয়াছে; সূর্য্যের গতি অস্বাভাবিক মন্থর! ভোর হয় ত দুপুর হয় না, দুপুর হয় ত সন্ধ্যা হয় না। কিন্তু অবশেষে সন্ধ্যাও হইল, ক্রমে সবাই খাইয়া দাইয়া শুইতে গেল; নিশীথের নিস্তব্ধতা তারাখচিত আকাশের তলে ঝিমাইতে লাগিল। বাগানের দিকের দরোজা খোলা রাখিয়া রমা সজাগ বিছানায় শুইয়া। রাত্রির অন্ধকারে এক ঘরে তাহার মত অবিবাহিতা এক নারী এক পুরুষের প্রতীক্ষা করিতেছে—ইহাতে যে লজ্জা আছে, ইহাতে যে সামাজিকতঃ তাহার সর্ব্বনাশ হইতে পারে—ইহা রমার মত শিক্ষিতা মেয়ের কি একবারও মনে হইল না? দুই চক্ষু মেলিয়া সে বাইরের অন্ধকার যেন গিলিতেছে। ক্রমে গির্জ্জার ঘড়ীতে বাজিয়া চলিল বারোটা, একটা, দুইটা। নিদ্রাহীন চক্ষু তাহার জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু চক্ষে ঘুম নাই। তাহা হইলে যতীশ আর আজ আসিতে পারিল না। পাগল ত—কি বিপদে পড়িল কে জানে?—এই কথাই মনে উঠিল সর্বাগ্রে। তার পর মনে হইল কাযের লোক—হয় ত হঠাৎ এলাহাবাদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে। যদি গিয়াছে ত যাক—শুধু ভগবান্ তাহাকে দৈহিক কুশলে রাখুন। হোক না যতীশ কমিউনিষ্ট, ভগবান্ মানে না - কিন্তু সে তো মানে। তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা কি ভগবান শুনিবেন না? ক্রমে কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদ মধ্য গগনে পৌছিয়া ফিকে আলো ছড়াইতে ছড়াইতে পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া পাংশু হইয়া গেল। কাক দু' একটা ডাকিয়া উঠিল কা—কা। রমার যেন বুক ঠেলিয়া কান্না উঠিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি দরোজা খুলিয়া উঠানে পড়িল। কলতলায় খুব খানিকটা ঠাণ্ডা জল চোখেমুখে ছিটাইয়া ষ্টোভ ধরাইতে গেল। সে রোজ প্রত্যুষে নিজে হাতে অপরেশবাবুকে চা করিয়া দেয়।

কিন্তু না। দিনে দিনে সপ্তাহ উৎরাইল। সপ্তাহ ঘুরিয়া আসিল মাস। কিন্তু যতীশের কোনো সংবাদ নাই। মানসিক উৎকণ্ঠার চিহ্ন রমার মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। চেষ্টা করিয়া তো তা আর ঢাকা যায় না। যে দেখে সেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করে তাহার শরীর কি অসুস্থ? রমা আরো মরমে মরিয়া যায়। সময়ে সময়ে তার এই ভাবিয়া আনন্দও হয়—যে তপঃক্ষীণা গৌরীর মতো সেও তাহার প্রিয়ের জন্য দেহ তিলে তিলে ক্ষয় করিতেছে।

হঠাৎ একদিন শেষে যতীশের একখানা চিঠি আসিয়া পৌছিল—না বুঝিল সে তাহার মাথা, না মুণ্ডু। তাহাতে লেখা—"দেবি, তোমারি কৃপায় আমাকে আমি ফিরিয়া পাইয়াছি;—তোমায় প্রেম জানাইতে কুণ্ঠা হয়—নমস্কার লও।" আম্বালার ছাপ!

আবার দশ বারো দিন বাদে আর দুই লাইন "শীঘ্রই বোধ হয় ওদিকে যেতে হবে। সে সৌভাগ্যের কথা মনে করে সময়ে সময়ে থর থর করে কাঁপতে থাকি।"

রমার হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যে এক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া আসিতে চায়। সে দু' হাতে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়ে। আবার সেই রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটে। কিন্তু অন্তরের আশঙ্কা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, তার প্রিয়মিলন আসন্ন—রমার চোখের কোলের কালী ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসে। গালে ফের আসে লালের ছোপ। কলেজের বইএর সঙ্গে তো আজকাল আড়ি হইয়া গেছে। রমা রাতের আঁধারে গুন গুন করিয়া গায়—"বাজ্‌ল তূর্য্য আকাশ পথে সূর্য্য আসেন অগ্নিরথে।"—

কল্পনার চক্ষে সে স্বপ্ন দেখে—ভারতবর্ষের দুর্দিনের ক্লিষ্ট অন্ধকার ভেদ করিয়া ঐ কার বিজয় রথ আসিতেছে—হস্তে তাহার উদ্দাম চঞ্চল অশ্ববল্গা, মস্তকে তাহার ভগবানের আশীর্ব্বাদ ঝরিয়া পড়িতেছে—রথী শ্যামকান্তি যতীশ। রমার রোমাঞ্চ হয়। থাকিয়া থাকিয়া চক্রধর-

পুরের কথা মনে পড়ে। বিজয়ের কথাও কি মনে পড়ে না?—পড়ে। সেই তো তাহার ঘুমন্ত যৌবনকে জাগাইয়াছিল। তারপর আসিল কত বেদনা-বিক্ষুব্ধ রাত্রি—আবার কি জীবনের নবারুণোদয়ের সূচনা হইল! পদ্মপত্রে জল-বিন্দুর মত অন্তরের পাত হইতে যে বেদনাশ্রু-ধারা কবে পিছলাইয়া কালসমুদ্রের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে জানে না। আবার সূর্য্যের আলো ভালো লাগে, ভালো লাগে পাখীর গান, দক্ষিণা হাওয়া, শরতের মেঘ।

শীতের তীক্ষ্ণতা পৃথিবীকে করে রিক্ত, ব্যথাতুর, বৈরাগী। কিন্তু ধরিত্রীর যৌবন অমর অজেয়—বসন্তে আবার সে মুঞ্জরিত হয়—আবার জন্ম নেয় তার নব-যৌবন। ধরিত্রীর সন্তান মানুষেরও সেই এক চেষ্টা। তার যাত্রা-পথে কত সুখের দোলা কত দুঃখের প্লাবন; কত আশার নব জন্ম, কত নৈরাশ্যের অন্ধকার, কত জয়ের দুন্দুভিধ্বনি, কত পরাজয়ের গ্লানি। কিন্তু এই আবর্ত্তের ভিতর দিয়া চলে জীবনের অবারিত গতি, দুঃখকে দুই ধারে ঠেলিয়া দিয়া সুখকে করে বরণ—এ জয়যাত্রায় তার প্রধান অস্ত্র যৌবন। যৌবন দৈন্য জানে—কিন্তু মানে না পরাজয়। এই যৌবন যখন মরে জীবনের কি আর তখন মূল্য? তখন তার একটানা পরাজয়ের ইতিহাস হয় সুরু। রমার যৌবন তেমনি দুঃখের সাগরে তার জীবন-তরীকে বানচাল হইতে দিল না।

কিন্তু তিলে তিলে পলে পলে মানুষে যে আশার সৌধ গড়িয়া তোলে, অদৃষ্টের নিষ্ঠুরাঘাতে এক লহমায় তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এম্‌নি যখন রমার জীবনপাদপ পৃথিবী হইতে রসসংগ্রহের চেষ্টায় দ্বিতীয়বার উন্মুখ হইয়া উঠিল—অভাগিনীর কপালে তাহা সহিল না এবং শুধু তাহার নয়, অপরেশবাবুর সমস্ত পরিবারের উপরই যেন বজ্রাঘাত হইল। রাস্তায় সেদিন সংবাদপত্র বিক্রেতারা চেঁচাইতেছিল—"খবর খবর; পুলিশের সঙ্গে পলাতক আসামীর রিভলভার যুদ্ধ; পুলিশ খুন, আসামীও খুন।" ব্যাপার এই—যতীশের অবস্থিতি টের পাইয়া লাহোরে পুলিশ এক রাত্রে তাহাকে অনুসরণ করে। সহরের বাইরে একটা আম্রবনের মধ্যে পলায়ন অসম্ভব বিবেচনায় সে একটা গাছের আড়ালে আশ্রয় লয় ও রিভলভার চালাইতে থাকে। ফলে দুইজন পুলিশ ও সে নিহত হইয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া রমা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অপরেশবাবুর শরীর একেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, এই সংবাদ পৌছিবার দিন সন্ধ্যাবেলা হার্টফেল হইয়া তিনি মারা গেলেন। রমা দ্বিতীয়বার যুগপৎ প্রিয়হারা ও পিতৃহীনা হইল।

উপসংহার

ধীরে ধীরে কালপ্রবাহ বহিয়া চলে। একে একে কুড়ি বৎসর গড়াইয়া গেল। দৈবের বিচিত্র গতি। মাদ্রাজে কোনো স্কুল পরিদর্শনে গিয়া অন্নামলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রৌঢ় অধ্যাপক শ্রীবিজয়কুমার দত্ত দেখেন—রমা সেখানে শিক্ষয়িত্রীর কায করিতেছে। রমাকে হারাইয়া বিজয়কুমার বিমনা হইয়া কিছুদিন ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর তাহার নিজের জন্য মাসিক পাঁচশো টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত রাখিয়া বাকী সমস্ত সম্পত্তি একটি নারী চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য এক বোর্ড অব ট্রাষ্টের হাতে দিয়া দেয়। পরে চিত্ত নিরোধের জন্য ফের আরম্ভ করে পড়াশুনা। দুই বৎসর পরে সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি লইয়া ফ্রান্স ও ইংলাণ্ড যায় এবং বছর তিনেক পর ডি-লিট হইয়া পুনরায় দেশে ফেরে। এবার তাহার পড়ার নেশায় পাইয়াছিল। বাড়ীতে রাশি রাশি বই জমিয়া উঠিতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরেই অন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার আমন্ত্রণ আসে ও সে সেখানে কায লইয়া চলিয়া যায়। রমাও তাহার ভবঘুরে জীবনে বিজয়ের নিয়োগের সে সংবাদ কাগজে দেখিয়াছিল। তবে খুব সন্দেহ হইলেও একেবারে ঠিক করিতে পারে নাই এ সেই বিজয়কুমার দত্ত কিনা; কারণ পি এইচ্-ডি, ডি-লিট্—সে পূর্বে ছিল না। তারপরও প্রায় বারো বৎসর পর তাহাদের দেখা। বিজয়ের প্রথম দৃষ্টিতে প্রত্যয় হয় নাই যে সামনে তাহার রমা দাঁড়াইয়া। কিন্তু না, তাহা কি ভুল করিবার? নাই বা থাকুক যৌবনের সেই দীপ্তি, চর্ম্মের সে মসৃণতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সে তারুণ্য চঞ্চলতার আভাস;—হোক না কুঞ্চিত কেশের মধ্যে সিতিমার প্রক্ষেপ—কিন্তু সেই তো মুখ, সেই চাহনি, সেই দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি, সেই কপালের উপর লুটাইয়া পড়া অবাধ্য চুলের গোছাটি পর্য্যন্ত।

"আপনি এখানে ?—" বাঙ্গালায় বিজয়কুমার বলিলেন, —তাঁহার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট কাঁপিতেছিল। মাটির পানে চাহিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া রমা বলিল—"হ্যাঁ—ওঃ—কত আপনাকে এই বিশ বছর ধরে খুঁজচি—শেষে যে আপনার দেখা পেলাম এ যেন বিশ্বাস হচ্চে না। কিন্তু আপনার আত্মীয়স্বজন এখানে কে আছেন ?"

"কেউ না। আমি বোর্ডিংএ থাকি।"

"আপনার সঙ্গে কথা কইবার সময় কি করে পাব বলুন না। অনেক যে আছে কথা বল্‌বার।"—ছেলেমানুষের মতো প্রৌঢ় অধ্যাপক বলিয়া চলিলেন।

"কিছু কথা নেই"—তেমনি নতমুখে রমা বলে। এবার কিন্তু বিজয়কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—"একবার ফাঁকি দিয়ে পালিয়েচেন—কিন্তু আমার যা বক্তব্য আছে আপনার শুনতেই হবে"—স্থিরপদে হেড্‌ মিষ্ট্রেসের দিকে অগ্রসর হইয়া বলেন—"Miss Sen is an old acquaintance, Excuse us fo a quarter of an hour"—এবং এক রকম হুকুমের জোরেই বলিয়া বারান্দার এক প্রান্তে রমাকে লইয়া এক নিশ্বাসে যাহা বলিয়া গেলেন তাহার মর্ম্ম এই। তরুবালার শয়তানীর কথা যখন বিজয় জানিতে পারেন তখন রমা চক্রধরপুর ছাড়িয়া গিয়াছে ;—সেই হইতে অজানা অন্ধকারে রমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি প্রৌঢ় হইয়া গেলেন। আর রমা যাহা ভাবিয়াছে তাহা নয় ; তরুবালা গণিকা মাত্র—সে বিজয়ের কেহ নয়, কোনোদিন কিছু ছিলও না। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি শেষ করিলেন—"এই মাত্র আমার বলবার ছিল। এটুকু বলবার অধিকার আমি ছাড়তে রাজী নই। আপনি যদি অতীতের ওপর যবনিকাই টেনে দিতে চান অবশ্য সে জন্য আমার কিছু বলবার নেই। আচ্ছা বিদায়। আপনার ইতিহাস জানতে অদম্য ইচ্ছা হচ্চে কিন্তু জিজ্ঞাসা করে আর ধৃষ্টতা প্রকাশ করব না।"

পনের মিনিটও লাগিল না—দশ মিনিটেই কথা শেষ হইয়া গেল এবং মিস্‌ সেন শিক্ষয়িত্রীদের দলে নিঃশব্দে মিশিয়া গেলেন।

বৃদ্ধবয়সে মানুষের চিত্তসংযম নাকি ঘটে—কিন্তু বিজয়কুমার নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলেন না। অত্যল্প পরে শরীর অসুস্থতার অছিলায় সেদিনকার মত পরিদর্শন বন্ধ রাখিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন।

সপ্তাহান্তে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া বিজয়কুমার রমার একখানা চিঠি পান, তাহাতে লেখা—

"জীবনের অপরাহ্ন বেলায় আপনার সঙ্গে ফের দেখা হোলো—যখন আমি রিক্ত, যখন আমার কিছুমাত্র গৌরব করবার না আছে উপায়, না ইচ্ছা। আপনি আমার সংসর্গ থেকে দূরে থাকুন—সেই ভালো ; জানেন, আমার স্পর্শে বিষ আছে। আপনার একাগ্র প্রেমের সামনে এ কথা উচ্চারণ করতে আমার লজ্জা বোধ হচ্চে—কিন্তু তবু বল্‌চি—জীবনে আমি আর একজনকেও ভালোবেসেছিলাম। আমার উষ্ণ নিশ্বাসে সে শুকিয়ে গেছে। আপনার বর্ত্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে আমি পরিচিত নই—কিন্তু পূর্বে তা যা ছিল আমিও আজকাল সেই রকম ভাবি—একজন ন্যায়বান্‌ পরমেশ্বর কোথাও আছেন কি না। বয়েস হলে নাকি ভগবানে বিশ্বাস বাড়ে আমার তো দেখ্‌ছি উল্টা। কিন্তু সে যাক।

জীবনের কাছে দু' দু'বার ব্যাকুল হয়ে হাত পেতে ব্যর্থমনোরথ হয়েচি—তাই স্থির করেচি আর তার কাছে কিছু চাইব না। অন্ততঃ ব্যাকুল কামনা নিয়ে চাইব না। সে বড় জ্বালা। চাকুরী করেছি সম্বল—অভাব আমার জীবনে অল্প। দিন গুণ্‌ছি ঝরাপাতার মতো কবে জীবনের ডাল থেকে খ'সে যাব। মনের স্থিরতা অনেকটা পেয়েচি —তা ফের না হারাতে হলে আপনার সান্নিধ্য আমার অবাঞ্ছনীয়। আশা করি আমার মানে আপনি বুঝবেন। আপনাকে সেদিন কিছু বল্‌তে পারি নি, তাই এ পত্র। ইতি।"

তার পর বৃদ্ধ পণ্ডিত বিজয়কুমারের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিল—আবোল-তাবোল যা তা বকিয়া এক দীর্ঘ পত্রে তিনি রমার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। এই বলিয়া সে পত্র শেষ করিলেন যে জীবনেরই এই অভিপ্রায় যে তাঁহারা মিলিত হোন, নহিলে ফের এমন করিয়া আশ্চর্য্যভাবে সাক্ষাতই বা তাঁহাদের হইবে কেন ?

রমার উত্তর আসিল "আমায় ক্ষমা করুন। এ সব কথা আর বলিবেন না, তাহা হইলে চিঠির উত্তর দেওয়া অসম্ভব হইবে।"

কিন্তু মানুষের সংকল্প দেখিয়া বিধাতা পুরুষ হাসেন। পরের এক বৎসর স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ অব-

কাশের মধ্যে দুজনার একাধিকবার দেখাও হইল কিন্তু রমার সেই এক উত্তর—"না"। বৎসরের শেষ ভাগে হঠাৎ বিজয়কুমার ভীষণ রোগে পড়িলেন—প্লুরিসী। উপভোগের কামনা যাহা করিতে পারে নাই এবার সেবার প্রয়োজন তাহাই করিল। একদিন শীতের তুহিনার্দ্র সন্ধ্যায় এক মুমূর্ষু রোগীর সঙ্গে রমার অবশেষে সত্যিই বিবাহ হইয়া গেল—অবশ্য রেজেষ্ট্রী করিয়া।

বিবাহের দুই মাস পরে এক ফাল্গুনের সন্ধ্যায় বিজয়কুমার নিজের বাংলোর বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া আছেন। রোগ সারিলেও দেহে প্রচুর দুর্বলতা। এমন সময় রমা সুপ লইয়া আসিল।

"এটুকু খেয়ে ফেল ত।"

"দাও"—একটু একটু করিয়া চুমুক দিতে দিতে বিজয়কুমার বলিলেন—"রমা—এই দ্বিতীয়বার তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুল্লে। তোমায় এ সময় না পেলে নির্বান্ধব আমার কি দশা হোতো? আমি কিন্তু নিজেকে ভাগ্যবান্‌ই মনে করি। আযৌবন যা দেহমন দিয়ে একাগ্র কামনা করেচি তা আমার সত্যি লাভ হোলো।"

রমা বলিল, "আর আমি সুখের আশা বিসর্জন দিয়ে তবে ভাগ্য-দেবতাকে হাতে পেলাম। ভাগ্যবতী আমিই কম কিসে? শুধু জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এই কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।"

সুরুয়ার পেয়ালাটা রাখিয়া বিজয়কুমার রমাকে পাশে বসাইলেন ও তাহার একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কেন রমা, সন্ধ্যার কি নিজের গৌরব নেই—সে কি তুচ্ছ?"—আস্তে আস্তে আবৃত্তি করিয়া চলিলেন—

"We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind;
In the primal sympathy
Which having been must ever be
In the soothing thoughts that spring
Out of human suffering;
In the faith that looks through death,
In years that bring the philosophic mind.

সমাপ্ত

প্রতিধ্বনি

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

মাঝে ক্ষুদ্র গিরিনদী, তুমি শালবন,
ওপারে দাঁড়ায়ে আছ শ্যামলী আমার।

আমি বালকের মত শুধু বারবার
পুতরবে কত নামে করি আবাহন
তোমারে আমার কাছে। আনে সমীরণ
ক্ষণে ক্ষণে প্রতিধ্বনি, তোমার ওপার
পাঠায় যা প্রত্যুত্তরে, স্ফুরে না তাহার
আপনার মর্ম্ম বাণী কভু উচ্চারণ।

তথাপি আনন্দে মোর কাটে সারা-বেলা,
মোর সুরে সুরে শুনি মধু অনুধ্বনি,
সেই সাড়াটুকু নিয়ে শুধু মোর খেলা।
বুঝি অনুকূলা তুমি, নীরবে রহনি,
আমার বাণীতে তব ডুবে যায় ভাষা,
তবু অন্তে দেয় সায় মোন ভালবাসা।





Bharatvarsha Printing Works

খিচিংয়ের পথে—ময়ূরভঞ্জ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৬ই নভেম্বর বাঙ্গলা ৩০শে কার্ত্তিক সোমবার বেলা ১২টার সময় খিচিং রওনা হইলাম। খিচিং দেখিবার জন্যই এবার ময়ূরভঞ্জে আসা। অনেকদিন খিচিং আসিব আসিব ভাবিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের কাছে অনেক পত্রও লিখিয়াছি। তিনিও আমাকে যাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, কিন্তু আমার সুযোগও হয় নাই সুবিধাও হয় নাই—এইবার পণ করিলাম—না, এবার যাইতেই হইবে। তারপর হঠাৎ যেমন ভ্রমণকারীদের হয়, তেম্‌নি লোটাকম্বল না হইলেও একটী মায়ালোক লুকাইয়া আছে। পথের সৌন্দর্য্য যেমন চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল তেমনি পরদিন সকালবেলা ক্ষিতীশ-বাবু যখন বলিলেন—"আজ বেলা ১২টার সময় আপনার খিচিং যাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছি"—তখন আমার মনে বাস্তবিকই এমন একটা আনন্দ হইল যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা চলেনা। যাঁহারা দেশভ্রমণ করিতে ভালবাসেন তাঁহারাই আমার অন্তরের কথাটা যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এত সহজে খিচিং যাইবার সুযোগ মিলিবে পূর্ব্বে তাহা ভাবি নাই।



সাঁওতাল পুরুষ ও নারী

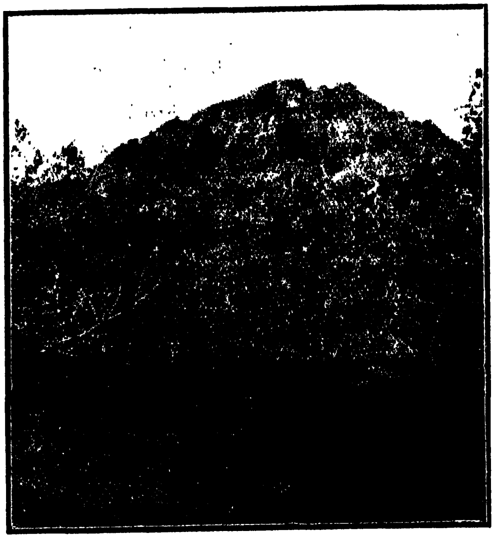


কোল পুরুষ ও নারী

সুটকেশ্ আর বিছানার বাণ্ডেলটী লইয়া ময়ূরভঞ্জ রওনা হইলাম। আমি ময়ূরভঞ্জের চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আসিবার সময় পথে শালবন-শ্রেণী এবং দূরে শিমলিপাল গিরিশ্রেণীর উচ্চ নীলশিখরগুলি দেখিয়া মনে হইতেছিল, ঐ পাহাড়ের গায়ে বুঝি এক

আমার যাইবার পক্ষে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেজন্য ক্ষিতীশবাবু রাজষ্টেটের দুইখানা মোটর গাড়ীরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একখানাতে আমি চলিলাম—অপরখানিতে চলিলেন আমার পথপ্রদর্শক 'guide and philosopher' শ্রীযুক্ত কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী বি-এ।

ইনি "ময়ূরভঞ্জ ক্রনিক্‌ল্" নামক ও "ভঞ্জপ্রদীপ" নামক দুইখানা মাসিক কাগজের সহকারী সম্পাদক। পাণিগ্রাহী মহাশয় উড়িষ্যার তরুণ সাহিত্যের একজন সুলেখক, তিনি



বিধুভাণ্ডার পাহাড়

বহুবার খিচিং বেড়াইতে আসিয়াছেন, ষ্টেটের লোকজনের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে ; তারপর বয়সে তরুণ, অনেক বিষয়েই 'ওয়াকিফ্‌হাল' বলিয়া ক্ষিতীশবাবু ইঁহাকে আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন।

আমি ভাবিয়াছিলাম দুইজনে একসঙ্গেই যাত্রা করিব। পূর্ব্বে কথা ছিল কালিন্দীবাবু ঠিক বেলা ১২টার সময় বেলগরিয়া প্রাসাদে আসিবেন এবং আমরা দুইজনে একসঙ্গে রওনা হইব—কিন্তু বেলা ১টা বাজিয়া গেল তখনও যখন কালিন্দীবাবু আসিলেন না, তখন আমিই তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। তখন ভদ্রলোক সবেমাত্র খাইতে বসিয়াছিলেন, এরূপ সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত করা অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া শুধু এই সংবাদটুকু দিলাম যে আমি রওনা হইলাম তিনি যেন অবিলম্বে আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করেন।

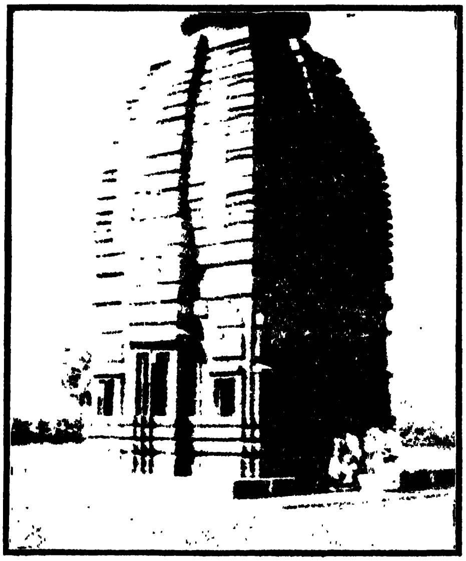
এইবার খিচিংএর পথে যাত্রা সুরু হইল। লালমাটীর পথ—সুন্দর পরিচ্ছন্ন। পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই যে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পথ এমন সুন্দর হইতে পারে। প্রথমেই বারিপদার তলবাহিনী বুরাবলং নদীর সেতু পার হইয়া আমাদের গাড়ী পশ্চিম-উত্তরদিকে চলিতে লাগিল। দেশটা পর্ব্বতময়, বনজঙ্গলে পূর্ণ—কাজেই পথ যে সর্ব্বত্র সমতল নয়—সেকথা না বলিলেও চলে। গাড়ী চলিতে লাগিল, দুইদিকে ধানের ক্ষেত, বিস্তীর্ণ মাঠ, কোল ও সাঁওতালদের গ্রাম, আর অতিদূরে সীমান্তরেখায় বনের নীলিমা ও পর্ব্বতশ্রেণীর নীলিমা একসঙ্গে যাইয়া নীল-আকাশের গায়ে মিলাইয়া গিয়াছে। উদার আকাশ, মুক্ত প্রান্তর, বন্ধুর পথ, বিক্ষিপ্ত শিলারাশি, দূরে জলাশয় এবং কোল্‌দের ও সাঁওতালদের পল্লীকুটীরশ্রেণী চক্ষু এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিল। মোটর ৪০ মাইল বেগে চলিতেছে, তবু মনে হইতেছে যেন তেমন বেগে চলিতেছে না।

বারিপদা হইতে খিচিং সবশুদ্ধ প্রায় একশতমাইল দূর



বিধুভাণ্ডার পাহাড়ে দেবতার স্থান

—পুরাপুরি একশত মাইল না হইলেও প্রায় কাছাকাছি। বারিপদা হইতে খিচিং পর্য্যন্ত পথটী অতিশয় সুরক্ষিত। কোথাও কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। এইপথে যে দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায় সে দিকেই শিমলিপাল গিরিশ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইবে। খানিক পরে বেলা প্রায় ৩টার সময়ে আমরা গভীর শালবনশ্রেণীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। এদিকে ওদিকে দুচারিটা ছোট ছোট পাহাড়, ইংরাজিতে যাহাকে hillock বলে, এদেশী ভাষায় ডু-ড়ি—তাহাই দেখিতেছিলাম। সেই পাহাড়গুলির কোনটীতে ঘনজঙ্গল, কোনটীতে কেবলমাত্র শিলারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, গাছপালা নাই বলিলেই চলে ; দেখিলাম সেই সকল



কুটাই তুণ্ডির মন্দির (পুনর্নির্ম্মিত)

ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে গোরু, ছাগল ও মহিষেরা মনের আনন্দে চরিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও বা কোলের ছেলে-মেয়েরা রাখালের কাজ করিতেছে, আবার ইহাদের মধ্যে কাব্যসৌন্দর্য্য নাই এমন কথা বলিতে পারিনা। কোন কোন কোল্ বালকের বাঁশীর সুরে সুরে অগ্রহায়ণের পীতরৌদ্রে উদ্ভাসিত শ্যামলপ্রান্তর যেন সজীব ও মুখর হইয়া উঠিতেছিল। কখনও বা গাড়ী পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে ঢালুভাবে নীচের দিকে নামিতেছিল আবার উপরে উঠিতেছিল। এইরূপ পাহাড়িয়া ঝরণা বা পার্ব্বত্য নদী ও তাহার পাশে উচ্চভূমি দেখিতে পাইলাম। অনেক কোল্ ও সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়েরা রান্নাবান্না করিতেছে। বোধ হয় তাহারা হাটের ফেরতা হাটবাজার করিয়া বাড়ী ফিরিতে দেরী হইবে বলিয়াই পথে রান্নাবান্না সারিতেছে, এইভাবে চলিতে চলিতে আমরা ক্রমশঃ দক্ষিণপশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলাম এবং হঠাৎ দেখিতে পাইলাম একটী শালবনবীথি অতিক্রম করিয়াই গাড়ী একটা পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

এই পর্ব্বতটীর নাম বিধুভাণ্ডার। পাহাড়টী ময়ূরভঞ্জের বামনহাটি মহকুমায় অবস্থিত। যাঁহারা শিলং কিংবা দার্জ্জিলিং, সিম্‌লা, নৈনিতাল বেড়াইতে গিয়াছেন তাঁহারা এই পথটীর প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারিবেন। তেমনই পাহাড়ের গা কাটিয়া বিসর্পগতিতে ইহার পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। পথটী প্রায় সাত মাইল,



খৈর ভণ্ডন নদী—অপর পারে বিরাট-গড়ের ধ্বংসাবশেষ

সকলের উপরকার অংশটা প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চ হইবে। সমতল অপেক্ষা এই স্থানটী অনেকটা ঠাণ্ডা এবং আমরা রীতিমত একটু শৈত্য অনুভব করিতেছিলাম। এইখানে পাহাড়ের গায়ে একটী গাছের তলায় কতকগুলি মাটীর ঘোড়া সাজাইয়া একজন লোক বসিয়াছিল—শুনিলাম যে এই সব দেবতার সেবক। এ দেবতার নাম দ্বারগুনি ঠাকুরাণী। আর এই পথের নাম ঘাটির পথ। এই পর্ব্বতটী এবং তাহার আশেপাশের শৃঙ্গগুলি গভীর জঙ্গলে পূর্ণ। এই বনে অনেক হাতী, চিতা বাঘ, বন্য শূকর এবং ভালুক

বাস করে। পাহাড়ের নীচে সমতল ভূমিতে যখন ধান পাকে তখন হস্তীযুথ নীচে নামিয়া আসিয়া ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া যায়। হস্তীর এরূপ অত্যাচারের হাত হইতে দরিদ্র প্রজাদের কৃষিসম্পদ্ রক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে হস্তীর খেদা করা হয়। অনেক সময় এই পার্ব্বত্য পথের যাত্রীদের বন্য হস্তীর সম্মুখে যে পড়িতে না হয় তাহাও নহে। এইজন্য সাঁওতাল এবং কোল্ চাষারা এই সময়ে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বিশেষ সতর্ক থাকে। আমাদের কাছে এই পার্ব্বত্য-পথটী বড়ই মনোহর লাগিয়াছিল, চারিদিক বেড়িয়া বনভূমি এবং পর্ব্বতমালার সুন্দর দৃশ্য, আর এখান হইতে দূরে সমতল ভূমির যে দিগন্তবিস্তৃত সৌন্দর্য্য আমাদের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছিল তাহার বর্ণনা কবির কথায় বলা যাইতে পারে—"অবারিত মাঠ, গগন ললাট,



বিরাট গড়ের ধ্বংসাবশেষ

চুমে তব পদধূলি"—দূরে চক্রবাল রেখায় আকাশ যেন নামিয়া আসিয়া মাতা বসুন্ধরাকে স্নেহ-চুম্বনে আবদ্ধ করিয়াছেন!

আমরা এই পর্ব্বতের বুকে ঘন তরুশ্রেণীর শাখায় শাখায় পাখীদের কল-কূজন শুনিলাম—অনেকগুলি টিয়া পাখীকে কিচিরমিচির করিয়া ঝগড়া করিতে দেখিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল এইখানে নামিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকের এই নীরব গাম্ভীর্য্য—এই তরুলতার শ্যামলতা, বনপুষ্পের বর্ণ-সুষমা পূর্ণভাবে অন্তর মধ্যে উপভোগ করি, কিন্তু গাড়ীর চালক বলিল—স্থানটী নিরাপদ নয়! কাজেই আমি সেই সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। করঞ্জিআয় যাইবার পথে একটি অতি সুন্দর সেতু পার হইয়াছিলাম, সেতুটির নাম ভগুানের পুল।

আমাদের গাড়ী বেলা প্রায় যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে এরূপ সময়ে করঞ্জিয়া নামক স্থানে আসিল। করঞ্জিয়া পাঁচপীড় মহকুমার প্রধান সহর। খোলা মাঠের মধ্যে সুন্দর সহরটী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথ ঘাট। এখানকার মহকুমা হাকিমের সঙ্গে যাইবার সময় দেখা করিবার কথা ছিল। ইনি ময়ূরভঞ্জের আদম-সুমারীর বিবরণ লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার নাম মৌলবী মুহম্মদ লেইক-উদ্দীন। কিন্তু আমাদের চালক গোপাল বলিল—এইখানে দেরী করিলে খিচিং পহুঁছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে। কাজেই আমি আর এসময়ে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম না। কারণ শরীরটাও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খাওয়া দাওয়ার পর একটু মাত্রও বিশ্রাম না করিয়াই রওনা হইয়াছিলাম। আর মনে হইতেছিল



খিচিংএর বড় দেউল—পুনর্গঠন কার্য্য চলিতেছে

কতক্ষণে খিচিং যাইয়া পহুঁছিব। করঞ্জিয়া হইতে খিচিংএর দূরত্ব ২০ মাইলের বেশী নহে।

করঞ্জিয়া ছাড়িয়া এক ঘন বনের মধ্যে আসিলাম। কেবল শালবন—এই বন এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে দিনের বেলায় বনের ভিতরের দিক্‌টা অন্ধকারেই থাকে। এই নিবিড় শালবন শ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—কোথাও কোথাও শালগাছ ছাড়াও অন্যান্য তরুরাজি দণ্ডায়মান থাকিয়া বনটাকে আরও ভয়সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। এক স্থানে ছোট একটী পাহাড়িয়া নদীর উপর ছোট বাঁশের পুলটী বে-মেরামতি অবস্থায় ছিল, এজন্য গাড়ী পুলের পাশ দিয়া নদীর বুকে যে সামান্য জল

ছিল তাহার ভিতর দিয়াই পারে উঠিল। এখান হইতে বোধ হয় এক মাইল পথও উত্তীর্ণ হই নাই এমন সময় হঠাৎ গাড়ীর গতি থামাইয়া দিয়া গোপাল বলিল "ঐ দেখ জানোয়ার"—। আমি সহসা মনে করিতে পারি নাই যে জানোয়ার বলিয়া সে কি বুঝাইতেছে, আমি জিজ্ঞাসা করিতেই সে বলিল 'বাঘ'—কেন জানি, আমার কোন ভয় হইল না। দেখিলাম পথের ঠিক উপরে বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্য মহাশয় যেন নিশ্চিন্ত-ভাবেই বসিয়া লেজ নাড়িতেছেন—তাহার চোখ দুইটী আগুনের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। শিকারের বইতে পড়িয়াছিলাম যে আগুন কিম্বা আলো দেখিলে হিংস্র জন্তুরা ভয়ে পলাইয়া যায়। গোপাল যখন তড়িৎগতিতে flash light ফেলিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল, অমনি ব্যাঘ্র—পুঙ্গব পথ অতিক্রম করিয়া বনমধ্যে অন্তর্হিত হইল। একবার



ঠাকুরাণীর হাতায় প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

গোয়ালপাড়ায় শ্রীসূর্য্যের পাহাড় বেড়াইতে গিয়া একটা বাঘকে ক্ষণিকের জন্য আমাদের মাথার উপর দিয়া লাফাইয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। সে সময়ে বাঘের বীরত্ব বেশ একটু প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—এইবার আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে স্বচক্ষে ব্যাঘ্রের গতিবিধি আরও সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিলাম।'

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে দু চারিটা বাঁক ঘুরিয়া একটা খোলা মাঠে আসিতেই দেখিতে পাইলাম বাঁ দিকে একটী ছোট মন্দির। এই মন্দিরটির নাম কুটাই-তুণ্ডির মন্দির। গোপাল বলিল আমরা খিচিং আসিয়াছি। আর একটু যাইয়া আমরা খিচিংএর ধ্বংসাবশেষের কাছে পঁহুছিলাম। সম্মুখেই মিউজিয়াম রহিয়াছে। আমাদের গাড়ী পঁহুছিবামাত্র খিচিং যাদুঘরের কিউরেটার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রপ্রসাদ বসু ওরফে 'বীরবল' আমাকে পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমি কেবলমাত্র ঘরের মধ্যে যাইয়া বিছানাপত্র ফেলিয়া বসিয়া আছি এমন সময় পাণিগ্রাহী মহাশয়ের গাড়ীও সশব্দে আসিয়া পঁহুছিল—তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে—রাত্রি প্রায় ৭টা হইবে। দূরে খিচিংএর পল্লী হইতে কীর্ত্তনের সুর আসিয়া কানে পঁহুছিয়াছিল। বাহিরে জ্যোৎস্নার প্লাবন ধারা চারিদিকের বন জঙ্গলকে যেন রজতের ধারায় স্নান করাইয়া দিতেছিল। আমার মন তখন অতীত ইতিহাসের যুগে ফিরিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল এই সেই খিচিং—যেখানে একদিন ভঞ্জ রাজাদের—প্রথম গৌরব-গরিমা-প্রদীপ্ত ভাস্করের মত দীপ্যমান হইয়াছিল।—এমনই সময়ে বীরবল মহাশয়ের (শৈলেন্দ্রবাবু) ভৃত্য আসিয়া যখন এই সুদূর প্রান্তরের



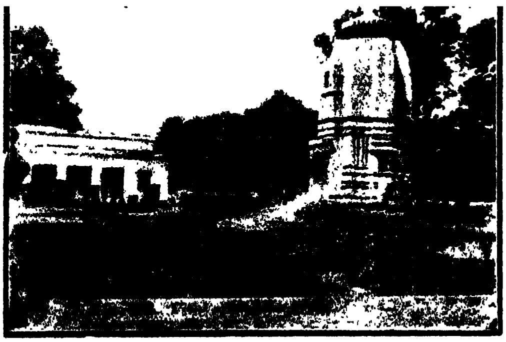
প্রাচীন ধ্বংস চিহ্ন

মধ্যেও অতিথি-সেবার জন্য চায়ের পেয়ালা আনিয়া উপস্থিত করিল তখন আমাদের মত চা-খোরের মনে হইল—আঃ বাঁচিলাম—খিচিং আসা সার্থক হইয়াছে।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক থাকে যাঁহারা বৈষয়িক লোকদের কাছে পাগল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—আমাদের এই বীরবলবাবু সেই শ্রেণীর পাগল, খিচিংএর মাটীর প্রত্যেকটী অণুপরমাণু যেন তাঁহার দেহের রক্ত-কণিকা। তিনি আমাদিগকে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবার পরেই নিজের হাতে একটী হারিকেন লণ্ঠন লইয়া যাদুঘরের হাতার মধ্যে লইয়া আসিলেন এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে ধ্বংসাবশেষের একটা সাধারণ বর্ণনা করিলেন।

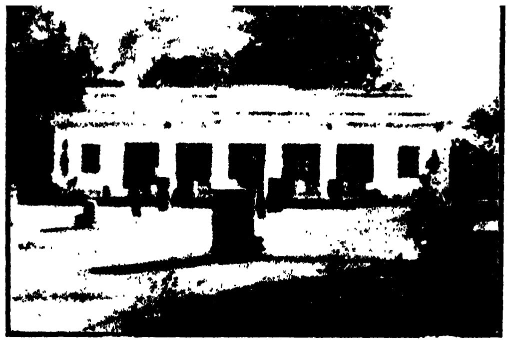
কিন্তু রাত্রিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখাটা নিরাপদ মনে করিলাম না, কেন না বীরবলবাবু কথা-প্রসঙ্গে সাপের ভয় দেখাইতেও দ্বিধা করেন নাই, কাজেই সে রাত্রির মত আহারাদির পরে শয্যার আশ্রয় লইলাম।

পরদিন সকালবেলা চা পানের পরেই আমরা খিচিংএর যাদুঘরটী দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। বীরবল মহাশয় এই বনের মধ্যে নগর বসাইয়াছেন। মহারাজবাহাদুর এজন্য অর্থব্যয় করিতে কোনরূপ কার্পণ্য করেন না। যাদুঘরে যাহা কিছু দেখিলাম সে সম্বন্ধে বলিবার পূর্ব্বে খিচিংএর একটু প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া লওয়া ভাল। তাহা না হইলে পাঠকবর্গ সব কথা ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। খিচিং ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী। এই স্থানটী খৈরভণ্ডন এবং কণ্টাখৈর নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই



খিচিংএর চন্দ্রশেখর মন্দির পুনর্গঠিত

নির্জন স্থানের চারিদিক্ বেড়িয়া ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে—এই সকল ধ্বংসাবশেষের বেশীর ভাগই গ্রাম্যসীমার বাহিরে পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। পশ্চিম দিকে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক ইষ্টকস্তূপ, খোদিত ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড কতকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ এক সময়ে বিদ্যমান ছিল। অনেকে বলেন এই প্রস্তরস্তম্ভগুলির সহিত বিখ্যাত বারহুতের প্রাচীন বৌদ্ধ-কীর্ত্তির যে সকল ধ্বংসচিহ্ন বিদ্যমান আছে তাহার সহিত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিচিহ্ন এই খিচিংকে কেন্দ্র করিয়াই বর্ত্তমান রহিয়াছে। খিচিং নামটী খিজিঙ্গকোট্ট বা খিজিঙ্গ নামেই পূর্ব্বে পরিচিত হইত। বর্ত্তমান খিচিং নাম ঐ খিজিঙ্গকোট্ট বা খিজিঙ্গ শব্দেরই অপভ্রংশ, এইখানে এক সময়ে প্রাচীন ভঞ্জ রাজাদের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান সময়েও যে সকল প্রাচীন মন্দির, রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ এবং মূর্ত্তি ও ইষ্টকস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইতে এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন রাজধানী খিচিংএর ধ্বংসাবশেষ উত্তরে খৈরভণ্ডন নদী এবং দক্ষিণে কণ্টাখৈর নদী পর্য্যন্ত বিরাজমান, এই দুইটী পার্ব্বত্য নদী খিচিং গ্রামের দুই প্রান্ত ধৌত করিয়া বহিতে বহিতে অবশেষে ৩ মাইল দূরে বৈতরণী নদীর সহিত যাইয়া মিশিয়াছে। খিচিংএর ৫ মাইল উত্তর দিকে সিংভূম জেলার কোল্‌হান অবস্থিত, আর দক্ষিণে বৈতরণীর অপর পারে কেয়নঝোর রাজ্যসীমা বর্ত্তমান। ভৌগোলিক অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে এক সময়ে খিচিং ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পশ্চিমাংশ, কেয়নঝোর এবং



খিচিংয়ের যাদুঘর

কোল্‌হান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া খিচিং রাজধানী ছিল।

আমি কাহারও যখন ঘুম ভাঙে নাই—সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে সেই সময়ে একবার খিচিংএর উত্তর দিকটা বেড়াইয়া আসিয়াছিলাম। দেখিয়া মনে হইল, হাঁ, স্থানটী রাজধানীর উপযুক্ত ছিল বটে। দুই দিকে নদী, জলের অভাব নাই, বিস্তৃত প্রান্তর যে দিকে ইচ্ছা বাড়ীঘর প্রস্তুত করিবার পক্ষে কোনরূপ বাধারই কারণ নাই। তার পর দূরে দূরে পর্ব্বতমালা বিরাজমান—কাজেই এইরূপ সুরক্ষিত স্থানটী নানাদিক দিয়াই সেকালের রাজারা রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা খিচিং বেড়াইতে যাইবেন, তাঁহাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ এই—তাঁহারা যেন চারিদিকের ধ্বংসাবশেষ এবং

প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া সকলের শেষে যাদুঘরটী দেখিতে আসেন।

ময়ূরভঞ্জের এই প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের মূলে ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রাম নিবাসী ৺কামাখ্যাপ্রসাদ বসু মহাশয় ধন্যবাদের পাত্র। তিনি খিচিংএর প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম খিচিংএর ইতিহাসের সহিত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমরা প্রথমতঃ দেখিতে গেলাম—কুতাইতুণ্ডী বা কুটাই-তুণ্ডী মন্দিরটী—ইহার অপর নাম নীলকণ্ঠেশ্বর। পূর্ব্বে ইহা ভগ্ন অবস্থায় ছিল এবং ইহার চারিদিকে প্রস্তর খণ্ডগুলি এখানে সেখানে পড়িয়া ছিল। কেহ মনেও করিতে পারে নাই যে এই সমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড হইতে আবার একটী সুন্দর মন্দির গঠিত হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই এবং আনন্দের কথাও বটে যে কামাখ্যাবাবুরই পুত্র বীরবলবাবু আপনার স্বভাবজাত শিল্পকৌশল দ্বারা এই মন্দিরটী পুনর্গঠন করিয়াছেন।

এই জাতীয় মন্দিরকে সংস্কৃত স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী নাগর নামে অভিহিত করে। দশ বৎসর পূর্ব্বেও কুটাই-তুণ্ডী মন্দিরের চারিদিক বেড়িয়া মাটীর স্তূপ ছিল। চারিদিকের প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। মন্দিরের শিখর বা চূড়াও ভূপতিত অবস্থায় ছিল—কিন্তু বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থাপত্য-বিদ্যাবিশারদদিগকেও বিস্মিত করিয়া দিয়া বীরবলবাবু এই মন্দিরটীকে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

খিচিংএর মন্দিরগুলির একটা বিশেষত্ব আছে, উড়িষ্যার প্রাচীন মন্দিরের সম্মুখে এক একটী করিয়া মুখমণ্ডপ (পূজারী-দের ও তীর্থযাত্রীদের বসিবার স্থান) থাকে কিন্তু এখানকার মন্দিরে সেরূপ কোন মুখমণ্ডপ নাই। এই মন্দিরের গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। আমরা আসিবার সময়ে সকলের আগে এই মন্দিরটী দেখিতে পাইয়াছিলাম। কুটাইতুণ্ডী দেখিয়া বরাবর ঠাকুরাণীশিলা বা যেখানে প্রাচীন খিচিংএর মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে সেইখানে আসিলাম। এই ঠাকুরাণী কিঞ্চকেশ্বরী নামে পরিচিত। ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবারের ইনি ইষ্টদেবী। ইনি চামুণ্ডা মূর্ত্তিরূপে বিরাজিতা। রাজধানী বারিপদে এবং বাহালদা নামক স্থানেও এইরূপ কিঞ্চকেশ্বরী দুইটী মূর্ত্তি রহিয়াছে। যেমন জগন্নাথদেব ময়ূরভঞ্জ রাজাদের আরাধ্য দেবতা, তেমনি খিচিঙ্গেশ্বরীও তাঁহাদের ইষ্টদেবী। কিঞ্চকেশ্বরী নাম খিচিঙ্গেশ্বরীর অপভ্রংশ মাত্র।

এইবার ঠাকুরাণীর হাতার মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাইলাম তাহার পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বে মন্দিরের যে হাতা ছিল তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। সেই হাতার বাহিরের অনেকটা লইয়া—বর্ত্তমান সময়ে হাতার বিস্তৃতি অনেকটা বাড়াইয়া লওয়া হইয়াছে। প্রবেশের পথটি অতি সুন্দর, ডুরাণ্টার বেড়া দিয়া চারিদিক ঘেরিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রশস্ত পথের দুইধারে ফুল ও ফলের বাগান, বেশীর ভাগই কলা গাছ; দেশী ও বিদেশী অনেক ফুলের গাছ সযত্নে রোপণ করায় স্থানের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা কৌতুহলী



খিচিংয়ের ডাক বাংলো

চিত্তে ঠাকুরাণীশালার হাতার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কয়েকটী বড় বড় গাছ আকাশের গায়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচীন হাতার মধ্যে প্রবেশ করিলেই দক্ষিণদিকে খিচিঙ্গেশ্বরীর আশ্রয়স্থল দেখিতে পাওয়া যায়। আজও সেখানে কোন মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই, খড়ের চালা-ঘরে দেবী বিরাজমানা, একজন পূজক আছেন তিনি প্রত্যহ পূজা করেন। দূর গ্রাম হইতে গ্রামবাসীরা পূজা দিতে আসে, পাঁঠাবলি প্রায় প্রত্যহই হয়, ঠিক মধ্যস্থলে বড় দেউল ও এক কোণে শেখরের মন্দির বিদ্যমান ছিল; সেই মন্দির একেবারে ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল—উহার ইষ্টক প্রস্তর ও মূর্ত্তি ইত্যাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, খননকার্য্য দ্বারা তাহার উদ্ধার হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজা প্রতাপচন্দ্র দেবভঞ্জ এই মন্দিরটীর পুনর্গঠনের জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন

এবং বীরবল মহাশয়ের উপরেই এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার ভার সমর্পিত হইয়াছে; আমরা দেখিতে পাইলাম মন্দিরের ভিত্তি অনেকদূর পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। যিনিই এখানে বেড়াইতে আসিবেন তাঁহার নিকটেই এই অদ্ভুতকর্ম্মা শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের অসাধারণত্ব বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে খিচিংএর এই প্রধান মন্দির বা বড় দেউল নামে মাত্র লোকের কাছে পরিচিত ছিল; কেননা, গভীর জঙ্গলের মধ্যে ইট মাটী ও পাথরের স্তূপ ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান ছিলনা। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই ধ্বংসস্তূপের উপরে একটী ছোট ইটের মন্দিরের মধ্যে খিচিঙ্গেশ্বরী বিদ্যমানা ছিলেন, কিন্তু ১৯২২-২৩ সালে যখন এই প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেবের অনুরোধ ক্রমে এবং স্যার জন্ মার্শেল সাহেবের নির্দেশক্রমে খিচিং আসেন সে সময়েই বৈজ্ঞানিক উপায়ে এ স্থানের খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই কার্য্যে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি চন্দ মহাশয়ের পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান ও খনন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়কে এই খননকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের প্রত্নতত্ত্বানুরাগী কর্ম্মচারী স্বর্গত কামাখ্যাপ্রসাদ বসু মহাশয় এবং পণ্ডিত তারকেশ্বর গাঙ্গুলী মহাশয় প্রেরিত হইয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণের ও উহার উদ্ধারের ইতিহাসের সহিত নগেন্দ্রবাবু ও রমাপ্রসাদবাবুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।—আমরা বারান্তরে—খিচিংয়ের প্রাচীন কীর্ত্তি ও শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দিব।

আত্মহত্যা

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

মেট্রোপোলিস হোটেলের একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসে বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীঅমিতাভ বসু মহাশয় তাঁর নূতন নাটকের প্রুফ দেখছেন। টেবিলের উপরে টেলিফোন। পাশে টিপয়তে জলের গ্লাস। এমন সময় একজন চাকর এসে তাঁকে একটা স্লিপ দিল।

অমিতাভ—(পড়িয়া) ননীলাল দত্ত—"রিপোর্টার"—আচ্ছা তাকে পাঠিয়ে দে।

ভৃত্য চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ননীলাল এল। মুখ শুকনো, গায়ের কাপড় জামা একটু ছেঁড়া হলেও ফর্সা।

অমিতাভ—বসুন—নমস্কার। আপনার কোন কাগজ—

ননী—দেখুন সত্যি করে বলতে গেলে আমি তো কোন কাগজের লোক নই। আপনি বাড়ী আছেন জেনেই আমি এসেছি। আপনার দয়ার কথা কে না জানে বলুন। (করুণ ও কম্পিত কণ্ঠে) আজ আমার যা অবস্থা হয়েছে তা শুনলে আপনার নিশ্চয়ই আমার প্রতি একটু সহানুভূতি জাগবে। আমি—

অমিতাভ—(চেয়ার থেকে উঠে) মাফ করবেন আমায়, এখুনি একবার বেরোতে হবে।

ননী—(চেঁচিয়ে) আপনাকে শুনতেই হবে।

অমিতাভ—আমার কিন্তু না গেলেই নয়।

ননী—(চীৎকার করে) বসুন, দয়া করে বসুন।

অমিতাভ—(ভীত এবং বিরক্তভাবে) বেশ বসছি, যা বলবার শিগ্‌গির বলুন।

ননী—শুনুন। আমি বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি মধুসূদন দত্তের বংশে জন্মেছি। আমি জন্ম-কবি। আমার বাবার ইচ্ছে ছিল আমি তাঁর তেলের ব্যবসায় ঢুকি। তাই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই। দু'বছর ধরে কত কবিতা কত নাটক লিখলাম, কিন্তু কোথাও আদর হ'ল না। কাগজে নিলে না—কোন থিয়েটারে আমার নাটক অভিনীত হ'ল না।

অমিতাভ—(আবার চেয়ার থেকে উঠে) তাইত' বড় দুঃখের কথা—তা আমি—

ননী—বসুন। (উৎসাহের সঙ্গে) চাকরীর চেষ্টা প্রাণপণ করলুম—কোথাও মিলল না। হাতে যা ছিল—সব এই দু'বছরে শেষ হয়ে গেল। কতদিন অনাহারে গাছতলায় শুয়ে কাটিয়েছি কিন্তু ধৈর্য্য হারাই নি। আমি জানি আমার প্রতিভা আছে। টিঁকে থাকতে পারলে একদিন না একদিন বিখ্যাত হব—নিশ্চয়—

অমিতাভ—(করুণভাবে) শুনুন আমার সময়—

ননী—(তার কথা গ্রাহ্য না করে করুণ স্বরে) আর তো আমি পারছি না। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী দুদিন থেকে আমার নূতন নাটকের অভিনয়ের চেষ্টা করব ভেবেছিলুম—কিন্তু সে আমায় বাড়ী ঢুকতে দিলে না। তিন দিন থেকে একটা দানা মুখে যায় নি। আমি কি করব—কোথায় যাব—(একটু ক্রন্দন ভাব)

অমিতাভ—(পকেট থেকে একটা টাকা বার করে) একটা টাকা পেলে—

ননী—(তীব্রভাবে হেসে) কি বল্লেন? টাকা—একটা টাকা! আমাকে !! মধুসূদন দত্তের বংশে জন্ম। আমি তো ভিখারী নই।

অমিতাভ—আমার এরকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

ননী—আপনিও লেখক, আমিও লেখক। আপনার কাছে আমি সহানুভূতির আশায় এসেছিলুম। ভিক্ষে করতে আসি নি। না—না—এ অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। (হঠাৎ পকেটের ভেতর থেকে এক ছোরা বের করে) আমি মরব—আপনার সামনেই আত্মহত্যা করব।

অমিতাভ—(ভীতভাবে) কিন্তু—

ননী—না আমি মরবই। আমার বেঁচে থেকে লাভ কি ?

অমিতাভ—আপনি কি আমার সামনে আত্মহত্যা করবার জন্যে এখানে এসেছেন ?

ননী—হাঁ। আমি খ্যাতি চাই—যশ চাই। লোকে আমায় জানুক এই আমার আশা ছিল। কিন্তু তা মেটেনি। আপনি একজন বিখ্যাত নাট্যকার। আপনার সামনে মরলে কাগজে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে। হয়ত আমার লেখা বই কেউ কেউ পড়বে। আমার মৃত্যু সম্বন্ধে হয়ত আপনি একটা নাটকও লিখতে পারেন।

অমিতাভ—প্রাণ গেলে আর এ খ্যাতি নিয়ে কি হবে ?

ননী—তবু একটা তৃপ্তি। বুঝব, মরবার পর সকলের মুখে আমার নাম ঘুরবে। এই আমার শান্তি। আমি মরব—(ছোরাটাকে খাপ থেকে বের করে নিজের বুকে ঠেকিয়ে) আপনাকে অনেক কষ্টে ফেল্লুম, কিছু মনে করবেন না।

অমিতাভ—দাঁড়ান।

ননী—কেন ? (ছোরাটাকে নামাল)

অমিতাভ—আপনার মরবার অধিকার নেই।

ননী—কেন নেই ? জীবনে আমার কি সম্বল—কি আশা আছে বলুন। আমি ঘর থেকে বিতাড়িত। আত্মীয়স্বজন আমায় ঘৃণা করে। বন্ধুবান্ধবরা আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি বিয়ে করিনি। আমার কোন দায়িত্ব নেই। আমার প্রাণে কারুর কোন দাবী নেই।

অমিতাভ—দেশের দাবী আছে। এই তরুণ বয়সে এভাবে প্রাণ ত্যাগ করা উচিৎ নয়।

ননী—দুঃখে কষ্টে তারুণ্য আমার উবে গেছে।

অমিতাভ—দুঃখ কষ্ট চিরকাল মানুষের থাকে না। ভবিষ্যতে—

ননী—(কষ্টে হাসি হেসে) ভবিষ্যৎ। আমার ভবিষ্যৎ নেই। এই ছোরা দেখছেন। এক সময়ে পয়সা ছিল—২৫৲ টাকা দিয়ে সখ করে কিনেছিলুম। আজ সেই ছোরা চিরশান্তি দেবে। (দাঁড়িয়ে উঠে ছোরাটাকে বুকের উপর ধরলে)

অমিতাভ—(চীৎকার করে) থামুন।

ননী—(ছোরা নামিয়ে) কেন ?

অমিতাভ—একটা কথা। দেখুন আপনি এমনি কিছু নিতে রাজী ন'ন। আমি বহুদিন ধরে একটা ছোরা কিনব কিনব করছি। আপনার ছোরাটা যদি আমায় দেন, আমি আপনাকে ২৫৲ টাকা দিতে পারি। এটা ভিক্ষে নয়—এতে আপনার সম্মানে আঘাত লাগবে না।

ননী—টাকার আমার দরকার। এতে খুব সুবিধা হবে বটে—কিন্তু—

অমিতাভ—এতে আর কিন্তু নেই।

ননী—মানে কয়েকদিন পরে যখন এই টাকা ফুরিয়ে যাবে অথচ ছোরাটাও কাছ ছাড়া হয়ে যাবে তখন কি করব ?

অমিতাভ—এমনও তো হতে পারে যে এই কয়েকদিন পরে আপনার দুঃখের অবসান হবে। এমন বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আশা ছেড়ে দেবার পর আশার বস্তু পাওয়া গেছে।

ননী—তা হয়।

অমিতাভ—আমাদের সমুদ্রগুপ্ত—কবি—নাম শুনে থাকবেন নিশ্চয়। এমন এক সময় গেছে যখন খেতে পেত না। একদিন আর কষ্ট না সহ্য করতে পেরে লেকের জলে ডুবে মরতে গিছল। এমন সময় তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সমস্ত কথা শুনে সেই বন্ধু তাকে দশ টাকা দিয়ে বলে—"তুমি দু'দিন সবুর কর। আমার প্রেস আছে—তোমার বই কাল নিয়ে যেও।" সেই সমুদ্রগুপ্ত আজ বঙ্গবিখ্যাত কবি।

ননী—তা বটে।

অমিতাভ—আপনারও হবে। আমি বলছি আপনি খ্যাতি লাভ করবেন। চিরকাল মানুষের সমান যায় না। দুঃখের পর সুখ আসবেই।

ননী—(কিছুক্ষণ ভেবে) মানুষের কি দুর্ব্বল মন। আমি আজ আত্মহত্যা করব বলেই ঠিক করে বেরিয়েছিলুম। অথচ আপনার কথায় আমার মনে যেন আশার সঞ্চার হচ্ছে।

অমিতাভ—নিশ্চয়ই আপনার এবার সুখের দিন আসছে (পকেট থেকে ২৫৲ টাকার নোট বের করে)। এই নিন।

ননী—আপনি যখন বলছেন—অগত্যা। (টাকা নিয়ে ছোরাটা খাপে পুরে অমিতাভকে দিলে) আবার আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে।

অমিতাভ—আর তো শীগ্‌গির দেখা হবে না। আমি এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। সাড়ে এগারটা বেজে গেছে—বারোটায় আমার গাড়ী। আমার এক বন্ধু মিনিট পনেরর মধ্যে এখানে আসবেন।

ননী—তিনিও নিশ্চয়ই লেখক।

অমিতাভ—খবরের কাগজের নাম করা Editor, রসরচনায় নিপুণ হস্ত। ভস্মলোচনের নাম শুনেছেন বোধহয়। সেটা আমার বন্ধুর ছদ্ম নাম। ভাল নাম সৌরেন রায়।

ননী—আচ্ছা—আমি তবে চল্লুম। নমস্কার—চিরজীবন আপনার কথা আমার মনে থাকবে—(প্রস্থান)।

অমিতাভ—আমারও মনে থাকবে। উঃ মাথা ধরে উঠেছে। (জানলা খুলে) যাক্—বিদেয় হয়েছে বাঁচা গেছে। এস্পিরিণটা আবার কোথায় গেল। (Aspirin ট্যাবলেট নিয়ে কুজো থেকে জল গেলাসে ঢালছেন এমন সময় সৌরেনবাবুর প্রবেশ। হাতে একটা ছোট ব্যাগ। হাসি হাসি দুষ্টুমি-মাথা মুখ)

সৌরেন—কি হে তুমি এখনও এখানে? আমি ভেবেছিলুম চলে গেছ।

অমিতাভ—(Aspirin খেয়ে) আর বল কেন? যা মুস্কিলে পড়া গিছল?

সৌরেন—ব্যাপার কি? এস্পিরিণ খাচ্ছ। মুখ শুকনো দেখাচ্ছে।

অমিতাভ—না দেখানোই আশ্চর্য্য। একটা কেলেঙ্কারীর হাত থেকে বেঁচে গেছি।

সৌরেন—(আশ্চর্য্য ভাবে) মানে?

অমিতাভ—এক আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গিছল। বলে আমি কবি। কেউ আমার লেখা ছাপে না। বড় কষ্টে আছি—খেতে পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোরা বার করে আত্মহত্যা করে আর কি? শেষে অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে তার—

সৌরেন—ছোরাটাকে তুমি কিনে নিলে।

অমিতাভ—হাঁা, তুমি কি করে জানলে।

সৌরেন—খালি লেখ। কখনও খবরের কাগজ তো পড়বে না। আমাদের এসব সন্ধান রাখতে হয়। এ নুতন নয়—এর আগেও এরকম সে ভদ্রলোক অনেকবার করেছে। মধুসূদন দত্তের বংশধর—বংশ-গৌরব—আরও সব বড় বড় কথা। ভিক্ষে নেব না—অপমান করবেন না—

অমিতাভ—(রাগে ফুলতে ফুলতে) তুমি তো সব জান দেখছি। এ কোথায় যাবে বলতে পারো। জোচ্চোরটাকে জেলে দেওয়া উচিত।

সৌরেন—কেন? আর জেলে দেবেই বা কি করে? তার দোষটা কি? সে তোমায় ছোরা কিনতে বলেনি। তুমিই বরঞ্চ তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজী করে কিনেছ। আত্মহত্যা সে করব বলেছিল—করেনি। শুধু বলবার জন্য জেল হয় না।

অমিতাভ—আমার Positionএ তুমি যদি পড়তে তো বুঝতে—

সৌরেন—আমার তো বেশ মজাই লাগত'।

(এমন সময় ভৃত্যের প্রবেশ—হাতে একটা স্লিপ)

সৌরেন—ননীলাল দত্ত—রিপোর্টার।

অমিতাভ—(চীৎকার করে) আবার সেই হতভাগা। আমি এখুনি পুলিশ ডাকব। (টেলিফোন তুলতে গেলেন। সৌরেনবাবু বাধা দিলেন)

সৌরেন—আহা চট কেন? দেখি না—কি বলতে চায়—(চাকরকে) তোকে কি জিজ্ঞেস করলে।

চাকর—তিনি জিজ্ঞেস করলেন—"নতুন বাবু এসেছেন" আমি বল্লুম "হাঁা"।

সৌরেন—বেশ করেছিস্—উপরে পাঠিয়ে দে—(ভৃত্যের প্রস্থান)

সৌরেন—ও ভেবেছে যখন নতুন বাবু এসেছেন—পুরাণো বাবু নিশ্চয়ই চলে গেছেন—বেড়ে মজা হবে—

অমিতাভ—আমার ট্রেণের সময়—

সৌরেন—ট্রেণ মিস্ করবে। সময় নেই। বিকেলের ট্রেণে যেও। ঐ তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—চট করে এই ছোরা আর তোমার গায়ের কাপড়টা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে লুকোও। দেখ কি হয়।

(অমিতাভ পাশের ঘরে গিয়ে লুকালেন। সৌরেন ব্যস্ত ভাবে লিখিবার ভাণ করিলেন। ননীলাল ঢুকল)

সৌরেন—বসুন—নমস্কার—আপনার কোন কাগজ?

ননী—দেখুন সত্যি করে বলতে গেলে আমি তো কোন কাগজের লোক নই। আপনি বাড়ী আছেন জেনেই আমি এসেছি। আপনার দয়ার কথা কে না জানে বলুন? (করুণ ও কম্পিত কণ্ঠে) আজ আমার যা অবস্থা হয়েছে তা শুনলে আপনার নিশ্চয়ই আমার প্রতি একটু সহানুভূতি জাগবে—আমি—

সৌরেন—না শুনেই জাগছে। শুনে তো জাগবেই।

ননী—শুনুন। আমি বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি মধুসূদন দত্তের বংশে জন্মেছি। আমি জন্ম কবি। আমার বাবার ইচ্ছে ছিল আমি তাঁর তেলের ব্যবসায় ঢুকি। তাই আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই। দু'বছর ধরে কত কবিতা কত নাটক লিখলাম, কিন্তু কোথাও আদর হোল না। কাগজে নিলে না—কোন থিয়েটারে আমার নাটক অভিনীত হ'ল না।

সৌরেন—আহা—

ননী—(উৎসাহের সঙ্গে) চাকরীর চেষ্টা প্রাণপণ করলুম—কোথাও মিলল না। হাতে যা ছিল সব—এই দু' বছরে শেষ হয়ে গেল। কতদিন অনাহারে গাছের তলায় শুয়ে কাটিয়েছি কিন্তু ধৈর্য্য হারাই নি। আমি জানি আমার ক্ষমতা আছে। টিঁকে থাকতে পারলে একদিন না একদিন বিখ্যাত হব—কিন্তু (করুণ সুরে) আর তো আমি পারছি না। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী দু'দিন থেকে আমার নূতন নাটকের অভিনয়ের চেষ্টা করব ভেবেছিলুম—কিন্তু সে আমায় বাড়ী ঢুকতে দিলে না। তিন দিন থেকে একটা দানা মুখে যায় নি। আমি কি করব—কোথায় যাব—(একটু ক্রন্দন ভাব)।

সৌরেন—(পকেট থেকে একটা টাকা বার করে) একটা টাকা পেলে—

ননী—(তীব্রভাবে হেসে) কি বলেন? টাকা—একটা টাকা! আমাকে!! মধুসূদন দত্তের বংশে জন্ম। আমি তো ভিখারী নই।

সৌরেন—না, না—আমার এ রকম কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

ননী—আপনিও লেখক, আমিও লেখক। আপনার কাছে আমি সহানুভূতির আশায় এসেছিলুম। ভিক্ষে করতে আসিনি। না—না এ অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। (হঠাৎ পকেটের ভেতর

থেকে এক ছোরা বার করে) আমি মরব—আপনার সামনেই আত্মহত্যা করব।

সৌরেন—করেন কি ?

ননী—মরব—মরা ছাড়া গতি নেই।

সৌরেন—তবে অবশ্যই মরা উচিত।

ননী—আপনি বাধা দেবেন না কিন্তু।

সৌরেন—না, না। বাধা দেব কেন ? আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। এতদিনে একটা লোকের মত লোক দেখলুম। আপনার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। আপনি সাহায্য নেন না—ঠিক করেন। দু'দশ যা আমি দেব—সে তো খরচ হয়ে যাবেই। তখন আপনি কি করবেন। চিরকাল তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। আপনার অভাব মিটবে না কিন্তু আত্মমর্য্যাদা ধূলিসাৎ হবে। আমারই কি মরতে ইচ্ছে হয় না—আপনি ভাবছেন আমি খুব সুখী—কিন্তু আমার কাহিনী শুনলে আপনার চোখে জল আসবে। বহুদিন থেকে আত্মহত্যা করবার আমারও ইচ্ছে আছে কিন্তু সাহস হয় নি। (থিয়েটারী ভঙ্গীতে) আজ আপনাকে দেখে যে সাহস আমার মনে জেগেছে। এ জীবন শুধু স্বপ্ন—সব মায়া। অশান্তি, দ্বেষ, হিংসায় ভরা। আমিও আপনার সঙ্গে যাব—সেই অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে যেথা রাগ নেই, দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, কামনা নেই—শুধু আছে শান্তি। দেরী করবেন না—দেরী করবেন না—

ননী—কিন্তু—

সৌরেন—এতে কিন্তু নেই। আপনি আগে করুন, তার পর আমিও করি। কিংবা যদি বলেন আমি আগে মরি তার পর আপনি। দিন ছোরাটা আমায় দিন—(হাত পাতিলেন)

ননী—না, না—আমি নিজের প্রাণ নষ্ট করতে পারি কিন্তু আপনার প্রাণের উপর আমার কোন অধিকার নেই। আমার জন্য আপনিও আত্মহত্যা করবেন এ আমি সহ্য করতে পারব না।

সৌরেন—বেশ—তবে শুধু আপনি মরুন। আমি এই জ্বালাময় জগতে দুঃখ ভোগ করি। মরুন—দয়া করে মরুন—আমি এই শান্তিপূর্ণ স্বর্গীয় তিরোভাব দেখে মনুষ্য জীবন সার্থক করি।

ননী—প্রতিজ্ঞা করুন, আমার পর আপনি আত্মহত্যা করবেন না।

সৌরেন—আমি ভগবানের নামে শপথ করেছি। আপনাকে হিংসে হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই। বিদায়—বন্ধু—চিরবিদায়। (ক্ষণকাল মুখ ফিরিয়ে আবার তার দিকে চেয়ে) মরেন নি ? এখনও বেঁচে আছেন ?

ননী—মানে—কি বলে—এই ছোরাটায় বিশেষ ধার নেই। (পাশের ঘরের দরজা খুলে অমিতাভ বেরিয়ে এলেন। হাতে উন্মুক্ত ছোরা)

অমিতাভ—কিন্তু আমারটায় ধার আছে।

সৌরেন—এই নিন। এটা দিয়েই কাজ সারুন।

ননী—(কাঁদ কাঁদ ভাবে) দেখুন সবই যখন ধরা পড়ে গেছে তখন সত্যি কথা বলি। হালদার কোম্পানি ছুরী কাঁচি ছোরা ইত্যাদি তৈরী করে—আমি তার Salesman—এই রকম ভাবে দিনে দু'তিনটা ছোরা আমি বিক্রী করি। এর পর আর বোধ হয় এ চাকরী আমার থাকবে না। জানাজানি হয়ে গেলে কেউ আর আমায় বাড়ী ঢুকতে দেবে না।

সৌরেন—Salesman বটেই ! আচ্ছা এর আগে কি করতে !

ননী—আজ্ঞে—থিয়েটার করতুম। ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া হতে ছাড়িয়ে দিয়েছিল। আর কোথাও চাকরী পাই নি।

সৌরেন—তা আবার থিয়েটারে যাও না কেন ?

ননী—কোথায় যাব বলুন ? চেনা শুনা না থাকলে কেউ নিতে চায় না।

সৌরেন—হ্যাঁ হে অমিতাভ। তোমার নতুন বইতে এই রকম একটা লোকের দরকার ছিল—বলছিলে না। তা এঁকে একবার try কর' না।

অমিতাভ—না—কোন দরকার নেই।

সৌরেন—তুমি বুঝতে পারছ না। যে সত্যিকারের জীবনে এত বড় অভিনয় করছে সে যে ষ্টেজে কত Natural হবে তা তুমি বুঝছ' না। একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?

অমিতাভ—(চিন্তা করে) বেশ যখন বলছ'—দেখি। কিন্তু এখন কোন কথা দিতে পারছি না।

ননী—(আনন্দের সঙ্গে) দয়া করে আমায় একটা chance দিন ? আপনার কাছে আমি কেনা হয়ে থাকব। আমি নিশ্চয়ই আপনাকে খুশী করতে পারব—আর যদি না পারি—

সৌরেন—(হেঁসে) তবে আত্মহত্যা করবে।

ননী—(কুণ্ঠিত ভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

সৌরেন—(হেসে) তোমার আত্মহত্যা রোগ আর সারবে না।

যবনিকা



ঝিন্দের বন্দী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুই ভাই

পরদিন প্রাতঃকালে গৌরী তখনো অনভ্যস্থ রাজপালঙ্ক ছাড়িয়া উঠে নাই—সর্দ্দার ধনঞ্জয় ভারী মখমলের পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন—'ঘুম ভেঙেছে?'

গৌরী চোখ মুছিতে মুছিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিল 'ভেঙেছে। তুমি উঠ্‌লে কখন?'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'আমি ঘুমই নি।—দেওয়ান দেখা করতে আসছেন। তাঁকে সব কথা বলেছি।'

গৌরীর বুকের ভিতরটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এইবার তবে রাজা অভিনয় আরম্ভ হইল! সে একবার চক্ষু বুজিয়া মনকে স্থির ও সংযত করিয়া লইবার চেষ্টা করিল। সুদূর কলিকাতায় দাদা ও বৌদিদির মুখ একবার মনে পড়িল।

ধনঞ্জয় তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া সাহস দিয়া বলিলেন, 'কোনো ভয় নেই—আমি আছি।'

ঘরের বাহিরে খড়মের শব্দ হইল, পরক্ষণেই দেওয়ান বজ্রপাণি ভার্গব প্রবেশ করিলেন।

বিশেষত্ববর্জ্জিত শীর্ণ চেহারা—বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, দেখিলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয়—

বজ্রপাণি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শয্যায় উপবিষ্ট গৌরীকে একবার দেখিয়া লইয়া হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।—ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ কুমার কেমন আছেন? জ্বর বোধকরি নেই?'

ধনঞ্জয় সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—'আজ কুমার ভালই আছেন। ডাক্তার গঙ্গানাথের ঔষধে উপকার হয়েছে বলতে হবে। আজ বোধহয় বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।'

বজ্রপাণি বলিলেন—'সেটা উচিত হবে কিনা গঙ্গানাথকে আগে জিজ্ঞাসা করা দরকার।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'সে ত নিশ্চয়ই। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা না করে কোনো কাজই হ'তে পারে না; বিশেষতঃ অভিষেকের যখন আর মাত্র অল্পদিন বাকি তখন সাবধানে থাকতে হবে ত!'

গৌরী নির্ব্বাকভাবে একবার ইহার মুখের দিকে, একবার উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। কিন্তু কাহারো মুখে তিলমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। যেন সত্যকার কুমারের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুইজন পরম হিতৈষীর মধ্যে চিন্তাযুক্ত গবেষণা হইতেছে।

বজ্রপাণি বলিলেন—'কুমার তাহলে এখন শয্যাত্যাগ করুন—আমার পূজা এখনো শেষ হয়নি।' বলিয়া এই বৃদ্ধ রূপদক্ষ পুনশ্চ গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপার কি? আমার আবার অসুখ হল কবে?'

ধনঞ্জয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—'আপনি আজ পঁচিশ দিন অসুখে ভুগছেন—মাঝে অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছিল, এখন একটু ভাল আছেন। রাজবৈদ্য এসে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে, আপনার বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা হয়েছে কিনা।'

গৌরী খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল—'বুঝেছি। কিন্তু অসুখটা কি হয়েছিল সেটা অন্তত আমার ত জানা দরকার।'

ধনঞ্জয় মৃদু হাসিলেন—'অত্যধিক মদ খাওয়ার দরুণ আপনার লিভার পাকবার উপক্রম করেছিল।'

গৌরী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া আরো খানিকটা হাসিল। এতক্ষণে সে আবার সুস্থ অনুভব করিতে লাগিল, কহিল—'এ এক রকম মন্দ ব্যাপার নয়। একেই বলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'হাসি নয়, কথাগুলো মনে রাখবেন—শেষে বেফাঁস কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে না যায়! নিন্, এবার বিছানা ছেড়ে উঠুন।'

গৌরী শয্যাত্যাগের উপক্রম করিতেছে, এময় সময় একটি বার-তের বছরের মেয়ে ভিতরের একটা দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। ফুটন্ত গোলাপের মত সুন্দর হাসিহাসি মুখখানি, রাঙা ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়া মুক্তার মত দাঁতগুলি একটুমাত্র দেখা যাইতেছে—গৌরী অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। মেয়েটি পালঙ্কের কাছে আসিয়া মৃদু সুমিষ্টস্বরে কহিল—'কুমার, স্নানের আয়োজন হয়েছে।'

গৌরী সবিস্ময়ে ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'এটি কে?'

ধনঞ্জয় মেয়েটির পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—'তুমি বাহিরে অপেক্ষা করগে, কুমার যাচ্চেন।'

মেয়েটি একবার ঘাড় নীচু করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। তখন ধনঞ্জয় বলিলেন—'এটি আপনার খাস পরিচারিকা।'

'সে কি রকম?'

'রাজ অন্তঃপুরে পুরুষের প্রবেশাধিকারনেই; রাজবংশীয় পুরুষ ছাড়া আমরা কয়েকজন মাত্র প্রবেশ করতে পারি। অন্দরমহলে চাকর বাকর সব স্ত্রীলোক; আপনি যতক্ষণ অন্তঃপুরে থাকবেন ততক্ষণ স্ত্রীলোকেরাই আপনার পরিচর্য্যা করবে।'

গৌরী অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বলিল,—'এ আবার কি হাঙ্গামা। এ যে আমার একেবারে অভ্যাস নেই সর্দ্দার।'

'তা বললে আর উপায় কি? রাজবংশের যখন এই কায়দা তখন মেনে চলতেই হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল—'কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে ত দাসী চাকরাণী বলে মনে হলনা। মনে হল ভদ্রঘরের মেয়ে।'

'শুধু ভদ্রঘরের নয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। ওর বাবা ত্রিবিক্রম সিং ঝিন্দের একজন বনেদী বড়লোক।'

বিস্ফারিত চক্ষে গৌরী বলিল—'তবে?'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'এটা একটা মস্ত মর্য্যাদা। রাজ্যের যে-কেউ নিজের অনূঢ়া মেয়ে বা বোনকে রাজ-অন্তঃপুরে রাজার পরিচারিকা করে রাখতে পেলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। আমার যদি মেয়ে থাকত আমিও রাখতাম। অবশ্য পরিচারিকা নামে মাত্র—রাণীদের কাছে থেকে সহবৎ শিক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য।'

'এরকম পরিচারিকা আমার কয়টি আছে?'

'উপস্থিত এই একটি; আর যারা আছে তারা মাইনে করা সত্যিকারের বাঁদী।'

অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল—'কিছু মনে করো না সর্দ্দার। কিন্তু এই রকম প্রথায় বনেদী ঘরের মেয়েদের কিছু অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই কি?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'সম্ভাবনা নেই এমন কথা বলা যায়না, তবে বাস্তবে কখনো কোনো অনিষ্ট হয়নি। এরা বনেদী ঘরের মেয়ে বলেই একরকম নিরাপদ।'

গৌরী বলিল—'কিন্তু শঙ্করসিংএর মত চরিত্রের লোক—'

'শঙ্করসিং এর একটা মহৎ গুণ ছিল—তিনি নিজের অন্তঃপুরের কোনো স্ত্রীলোকের দিকে চোখ তুলে চাইতেন না।'

গৌরীর মন বারবার এই সুন্দরী মেয়েটির দিকেই ফিরিয়া যাইতেছিল; সে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, এ মেয়েটি কতদিন এই অন্তঃপুরে আছে?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'তা প্রায় দু'বছর। ও-ই এখন বলতে গেলে অন্দর মহলের মালিক—রাণী ত কেউ এখন নেই। গত মাস-দুই ও এখানে ছিলনা, ওর বাপ ওকে বিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল, তাই আজ সকালেই আবার ফিরে এসেছে।'

গৌরী গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'চমৎকার মেয়েটি কিন্তু!'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ, তবে এখনো বড্ড ছেলেমানুষ। ত্রিবিক্রম কেন যে সাত তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে দেবার জন্যে লেগেছেন তা তিনিই জানেন।'

গৌরী বলিল—'কেন মেয়েটির বিয়ের বয়স ত হয়েছে!'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'এদেশে মেয়ে পূর্ণ যৌবনবতী না হলে বিয়ে হয়না। পর্দ্দাপ্রথা ত নেই, সাধারণত মেয়েরা নিজেরাই মনের মতন বর খুঁজে নেয়। অবশ্য বাপ-মা'র অনুমতি পেলে তবে বিয়ে হয়।'

গৌরী মনে মনে বলিল—'বাংলাদেশের চেয়ে ভাল বলতে হবে।'

এই সময় সেই মেয়েটি দরজা হইতে আবার মুখ বাড়াইয়া বলিল—'কুমার, আপনার স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে যে।'

গৌরী হাসিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, সকৌতুকে চিবুক ধরিয়া তাহার মুখটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার নাম কি ?'

সঙ্কোচশূন্য দুইচক্ষু গৌরীর মুখের পানে তুলিয়া মেয়েটি বলিল—'আমি চম্পা।'

কিছুক্ষণ গভীরস্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গৌরী বলিল—'সত্যি। তুমি চম্পা—সূর্য্যের সৌরভ।'

স্নানান্তে যে ঘরটায় গিয়া গৌরী আহারে বসিল, সে ঘরের জানালার নীচেই কিস্তার কালো জল ছলছল শব্দে প্রাসাদমূল চুম্বন করিয়া চলিয়াছে। জানালার বাহিরের রৌদ্র প্রতিভাত ছবির দিকে তাকাইয়া গৌরী একটা নিশ্বাস ফেলিল। বাংলা দেশে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। দূরে পরিষ্কার আকাশের পটে কালো পাহাড়ের রেখা, নিকটে আলো-ঝলমল খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী—নদীর দুইকূলে দুটি সমৃদ্ধ নগর। প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে একটি সরু ক্ষীণদর্শন সেতু দুই নগরকে স্থলপথে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেতুর উপর দিয়া জরীর ঝালর টাঙানো তাঞ্জাম, দ্রুতগতি টাঙা, রংবেরঙের পোষাক পরিহিত পদাতিক যাতায়াত করিতেছে। নদীবক্ষে অজস্র ছোট ছোট নৌকা ব্যস্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে।

বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গৌরী বলিল—'এ কোন্ অমরাবতীতে আমাকে নিয়ে এলে সর্দ্দার। মনে হচ্চে যেন সেই সেকালের প্রাচীন সুন্দর ভারতবর্ষে আবার ফিরে এসেছি।'

ধনঞ্জয় ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—'অমরাবতী যদি ভাল করে দেখ্‌তে চান ত আমার সঙ্গে আসুন। এখনো ডাক্তার আসতে দেরী আছে।'

গৌরীকে লইয়া ধনঞ্জয় প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। প্রকাণ্ড সমচতুষ্কোণ মাঠের মত ছাদ, কোমর পর্য্যন্ত উঁচু পাথরের কাজ করা প্যারাপেট দিয়া ঘেরা। চারিকোণে চারিটি গোল মিনার বা স্তম্ভ, সরু সিঁড়ি দিয়া তাহার চূড়ায় উঠিতে হয়। দুইজনে নদীর দিকের একটা মিনারে উঠিলেন; তখন সমগ্র ঝিন্দ-ঝড়োয়া দেশটি যেন চোখের নীচে বিছাইয়া পড়িল।

কিস্তা নদী এইস্থানে প্রায় তিনশ গজ চওড়া, যত পূর্ব্বদিকে গিয়াছে তত বেশী চওড়া হইয়াছে। গৌরী পরপারের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—'ওটি কি ?'

'ওটি ঝড়োয়ার রাজপ্রাসাদ।'

শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড রাজভবন, ঝিন্দ্ রাজপ্রাসাদের যমজ বলিলেই হয়। চারিকোণে তেমনি চারিটি উচ্চ বুরুজ মাথা তুলিয়া আছে। এদিকটা প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগ; প্রাসাদের কোল হইতে শতহস্ত প্রশস্ত সোপানসারি নদীর কিনারা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে।

ঘাটের দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, ওদিকের রাজভবনেও আসন্ন উৎসবের হাওয়া লাগিয়াছে। অনেক স্ত্রীলোক—সকলেই রাজপুরীর পুরস্ত্রী—জলে নামিয়া স্নান করিতেছে। তাহারা কেহ রাণীর সখী, কেহ ধাত্রী, কেহ পরিচারিকা, কেহ বা বর্ষীয়সী আত্মীয়া। যাহারা অল্পবয়সী তাহারা বুক পর্য্যন্ত জলে নামিয়া নিজেদের মধ্যে জল ছিটাইতেছে; অপেক্ষাকৃত প্রবীণারা তাহাদের ধমক দিতে গিয়া মুখে জলের ছিটা খাইয়া হাসিয়া ফেলিতেছে। তদপেক্ষাও যাহারা প্রাচীনা—যাহারা এ সংসারের অনেক খেলাই দেখিয়াছে—তাহারা ঘাটের পৈঠায় বসিয়া ঝামা দিয়া পা ঘষিতেছে এবং চাহিয়া চাহিয়া ইহাদের রঙ্গরস দেখিতেছে। মাঝে মাঝে সুমিষ্ট কলহাস্যের উচ্ছ্বাস উঠিতেছে।

সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া গৌরী চারিদিক ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। এটা কি, ওটা কি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শেষে বহুদূরে পূর্ব্বদিকে যেখানে নদী শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেই দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিল—'একটা পুরোণো কেল্লা বলে মনে হচ্চে, ঐ যে দূরে—ও জিনিসটা কি ?'

'কেল্লাই বটে—ওর নাম হচ্চে শক্তি-গড়, প্রায় তিনশ' বছর আগে ঝিন্দের শক্তিসিং তৈরী করিয়াছিলেন। এখন শক্তিগড় আর তার সংলগ্ন জমিদারী উদিত সিংএর খাস সম্পত্তি। স্বর্গীয় মহারাজ ভাস্কর সিং বাবুয়ান হিসেবে ঐ সম্পত্তি ছোট ছেলেকে দিয়ে গেছেন।'

'বাবুয়ান কাকে বলে ?'

'রাজার ছোট ছেলেরা, যাঁদের গদীতে বসবার অধিকার নেই, তাঁরা উচিত মর্য্যাদার সঙ্গে থাকবার জন্য কিছু কিছু সম্পত্তি পেয়ে থাকেন—তাকেই বাবুয়ান বলে।'

'উদিত বুঝি ঐখানেই থাকে ?'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া সিংগড়েও তার একটা বাগান বাড়ী আছে—সেখানেও মাঝে মাঝে এসে থাকে।'

'দেখছি ছোট ছেলেরাও একেবারে বঞ্চিত হন না!'

'মোটেই না। তাঁদের অবস্থা অনেক সময় বড় ছেলের চেয়ে বেশী আরামের। রাজা হবার ঝঞ্ঝাট নেই, অথচ মর্য্যাদা প্রায় সমান। সাধারণত দরবারের বড় বড় সম্মানের পদ তাঁরাই অধিকার ক'রে থাকেন।'

'হুঁ, উদিত কোন পদ অধিকার করে আছেন?'

ধনঞ্জয় হাসিয়া বলিলেন—'তিনি রাজ্যের সবচেয়ে বড় পদটা অধিকার করবার মৎলবে ফিরছেন—তার চেয়ে ছোট পদে তাঁর রুচি নেই। কিন্তু সে পদের আশা তাঁকে ছাড়তে হবে, অন্তত যতদিন ধনঞ্জয় ক্ষেত্রী বেঁচে আছে।'

গৌরী বলিল—'তা ত বুঝতে পারছি—কিন্তু শঙ্কর সিংএর কোনো খবরই কি পাওয়া গেল না?'

'কিছু না। তিনি একেবারে সাফ লোপাট হয়ে গেছেন। আমার সন্দেহ হচ্চে এর মধ্যে একটা ভীষণ শয়তানী লুকোনো আছে। হয়ত আর কিছু না পেয়ে উদিত তাকে গুমখুন করেছে। উদিত আর ঐ ময়ূর-বাহনটার অসাধ্য কাজ নেই।'

গৌরীর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল—'যদি তাই হয়, তাহলে উপায়?'

ধনঞ্জয়ের মুখ লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন—'যদি তাই হয় তাহলেও উদিতকে গদীতে বসতে দেব না। সিংহাসনে উদিতের চেয়ে আপনার দাবী কোনো অংশে কম নয়।'

গৌরী স্তম্ভিত হইয়া বলিল—'সে কি! আমার আবার দাবী কোথায়?'

'ও কথা থাক' বলিয়া ধনঞ্জয় নীচে নামিতে লাগিলেন।

নামিয়া আসিয়া দুইজনে একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই ঘরটি প্রাসাদের সদর ও অন্দরের মধ্যবর্ত্তী—এইখানে বসিয়া রাজা দর্শনপ্রার্থীদের দেখা দিয়া থাকেন। বিশালায়তন ঘরের চারিদিকে বহু জানালা ও দ্বার; মেঝেয় চার ইঞ্চি পুরু পারসী কার্পেট পাতা; রেশমের গদি-আঁটা কৌচ ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ সাজানো আছে। রাজার বসিবার জন্ম ঘরের মধ্যস্থলে একটি সোনার কাজ করা মখমল-ঢাকা আবলুশের চেয়ার। দেয়ালের গায়ে সূক্ষ্ম পর্দ্দায় আবৃত বড় বড় ভিনীসিয় আয়না।

গৌরী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরে নকিব দ্বারের নিকট হইতে ডাক্তারের আগমন জানাইল; ডাক্তার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বয়সে প্রৌঢ়—গঙ্গানাথ দ্বারের নিকট হইতে রাজাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া হাস্যমুখে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন। দু'একটা মামুলি কুশলপ্রশ্নের পর গৌরীর কব্জিটা আঙুলে টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন—'বাঃ, নাড়ী ত দিব্যি চলছে দেখছি, আমার চিকিৎসার গুণ আছে বলতে হবে।' বলিয়া নিজের গূঢ় কৌতুকে হাসিতে লাগিলেন। গৌরী ও ধনঞ্জয় মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

ডাক্তার বলিলেন—'এবার জিভ্ দেখি'—গৌরী জিভ্ বাহির করিল—'চমৎকার! চমৎকার! লিভারটাও একবার দেখা দরকার।' লিভার পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারের মুখে সন্দেহের ছায়া পড়িল—'আপনার এত ভাল স্বাস্থ্য আমি অনেক দিন দেখিনি।' একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—'ও জিনিসটা কি সত্যিই ছেড়েছেন নাকি?'

গৌরী মুখখানা ম্রিয়মাণ করিয়া বলিল—'হ্যাঁ ডাক্তার, ও বিষ আর আমার সহ্য হচ্ছিল না।'

ডাক্তার সানন্দে দুই করতল ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—'বেশ বেশ, আমি বরাবরই বলে আসছি ও না ছাড়লে আপনার শরীর শোধ্রাবে না—কিন্তু এতটা উন্নতি আমি প্রত্যাশা করিনি; এ হাওয়া বদ্লানোর গুণ!'

ধনঞ্জয় মৃদুস্বরে বলিলেন—'তাতে আর সন্দেহ কি?' ডাক্তারকে একটু দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া ধনঞ্জয় চুপি চুপি বলিলেন—'কথাটা যেন প্রকাশ না হয় ডাক্তার, তুমি ত সব জানোই। এবার কুমারকে বাংলা দেশ থেকে ধরে এনেছি।'

ডাক্তার অবাক হইয়া বলিলেন,—'কি বাংলাদেশে গিয়ে উনি এত ভাল ছিলেন? সেখানে যে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া!'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ভাল যে ছিলেন তা ত দেখতেই পাচ্চ। যা হোক, উনি এতদিন তোমার চিকিৎসাধীনে এখানেই ছিলেন—একথা যেন ভুলো না।'

'তা কি ভুলি।' বলিয়া ডাক্তার গৌরীকে তাহার পুনঃপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যের জন্ম বহু অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া এবং

নিজের চিকিৎসার আশ্চর্য্য গুণ সম্বন্ধে পুনশ্চ রসিকতা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৌরী ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিল—'ডাক্তার সব কথা বুঝি জানে না?'

ধনঞ্জয় মৃদুহাস্যে বলিলেন—'না, গঙ্গানাথ খুব উঁচুদরের ডাক্তার; কিন্তু বড় বেশী কথা কয়। যেটুকু না বললে নয় সেইটুকুই ওকে বলা হয়েছে।' তারপর গৌরীর পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—'সাবাস! ডাক্তারে যখন জাল ধরতে পারেনি তখন আর ভয় নেই।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'আসল কথাটা কে কে জানে?'

'আমি, দেওয়ান বজ্রপাণি আর রুদ্ররূপ'—ধনঞ্জয়ের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে রুদ্ররূপ উত্তেজিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া চাপা গলায় বলিল—'হুঁসিয়ার, কুমার উদিত আসছেন—' বলিয়া আবার পর্দ্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

'বেশী কথা বলবেন না, যা বলবার আমিই বলব'—গৌরীর কানে কানে এই কথা বলিয়া ধনঞ্জয় জানালার কাছে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। গৌরীর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িল। এইবার সত্যকার পরীক্ষা।

নকিব নাম ডাকিবার পূর্ব্বেই উদিত দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দুই হাতে পর্দ্দা সরাইয়া দাঁড়াইল; কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে গৌরীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর ফাঁদে পড়িবার ভয়ে সন্দিগ্ধ শ্বাপদ যেমন এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে সন্তর্পণে অগ্রসর হয় তেমনি ভাবে উদিত ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইল। অবিশ্বাস, বিস্ময় ও উত্তেজনায় তাহার সুশ্রী মুখখানা বিকৃত দেখাইতে লাগিল।

নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না এমনিভাবে সে গৌরীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। সংশয়পূর্ণ বিস্ময়ে তাহার মুখখানা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। গৌরীও দুইচক্ষে বিদ্রোহ ভরিয়া উদিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই। কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কাটিয়া গেল।

ধনঞ্জয়ের অনুচ্চ কণ্ঠের হাসি এই নিস্তব্ধতার জাল ছিঁড়িয়া দিল। তিনি বলিলেন—'একেই বলে ভালবাসা! আপনি আরোগ্য হয়ে উঠেছেন দেখে কুমার উদিতের হৃদয় এতই পূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না। অভিবাদন করতেও সাফ্ ভুলে গেছেন।—বসতে আজ্ঞা হোক, কুমার!'

ধনঞ্জয়ের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উদিত গৌরীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাহার ডান হাতখানা লইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল। অস্পষ্ট কণ্ঠে মামুলি দু' একটা আনন্দসূচক শিষ্ট কথা বলিয়া অভিভূতের মত কৌচে গিয়া বসিল।

গৌরী ইতিমধ্যে নিজেকে বেশ সামলাইয়া লইয়াছিল; তাহার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি ভর করিল। সে বলিল—'ধনঞ্জয়, ভাই আমার সাত-সকালে ব্যস্ত হয়ে আমার খোঁজ নিতে এসেছেন—শীঘ্র ওঁর জন্যে গরম সরবতের ব্যবস্থা কর।—কি করব আমার উপায় নেই, ডাক্তারের মানা, নইলে আমিও এইসঙ্গে এক চুমুক খেতুম।'

উদিতের মনে হইল যেন তাহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কেবল গৌরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, একটা কথাও বলিতে পারিল না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'উদিত, তুমি কি একলা এসেছ ভাই? সঙ্গে কি কেউ নেই?'

উদিত জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল—'ময়ূরবাহন এসেছে—বাইরে আছে।'

গৌরী আগ্রহ দেখাইয়া বলিল—'বাইরে কেন? এখানে নিয়ে এলেই ত পারতে—ময়ূরবাহন বুঝি এল না? বড় লাজুক কিনা—আর, লজ্জা হবারই কথা—কত মদ যে আমাকে গিলিয়েছে তার কি ঠিকানা আছে! ভাগ্যে সময়ে সামলে নিয়েছি, নইলে তুমিই ত সিংহাসনে বসতে উদিত! লিভার পেকে উঠ্‌লে আর কি প্রাণে বাঁচতাম!'

উদিত নিজের চোখের উপর দিয়া ডান হাতখানা একবার চালাইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'এবার আমি উঠি। আমি একবার—আমাকে একবার শক্তিগড়ে যেতে হবে—'

ধনঞ্জয়ের চোখে নষ্টামি নৃত্য করিয়া উঠিল, তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'তা কি কখনো হয়! কাল বাদে পরশু অভিষেক, আপনার সঙ্গে কত পরামর্শ রয়েছে, আর আপনি এখনি চলে যাবেন? লোকে দেখলেই বা মনে করবে কি? ভাব্‌বে আপনার বুঝি দাদার অভিষেকে মত নেই।

—তাছাড়া আপনার সরবৎ এল বলে, না খেয়ে গেলে রাজাকে অপমান করা হবে যে! বসুন—বসুন। অভিষেক সভা সাজানো হচ্ছে—সেদিকে গিয়েছিলেন নাকি?'

নিরুপায় উদিত ধনঞ্জয়ের দিকে একটা বিষদৃষ্টি হানিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

ধনঞ্জয় বলিতে লাগিলেন—'অভিষেকের কি বিধি-ব্যবস্থা হয়েছে আপনি ত সবই জানেন—আপনাকে আর বেশী কি বল্‌ব? সকাল বেলা পঞ্চতীর্থের জলে স্নান ক'রে রাজবংশীয় সমস্ত জহরৎ পরে রাজা অভিষেক সভায় গিয়ে হোমে বসবেন। সেখানে তিন ঘণ্টা লাগবে। হোম শেষ করে পুরোহিতের আঙ্গুলের রক্ত-টীকা প'রে রাজা বাইরে আসবেন। তখন অভিষেক সম্পন্ন ক'রে শোভাযাত্রা আরম্ভ হ'বে। রাজা প্রথম হাতীর ওপর সোনার হাওদায় থাকবেন—তার পরের হাতীতে রূপার হাওদায় আপনি থাকবেন। সবশুদ্ধ দেড়শ' হাতী আর ছয়শ' ঘোড়া শোভাযাত্রায় থাকবে। নগর পরিভ্রমণ ক'রে ফিরে আসবার পর দরবার বস্‌বে। দরবারে প্রথমেই ঝড়োয়ার রাজ-কুমারীর সঙ্গে রাজার তিলক হবে—ঝড়োয়ার মন্ত্রী অনঙ্গদেব অনেক সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে স্বয়ং তিলক দিতে আসবেন। তিলক শেষ হলে ভারত-সম্রাটের অভিনন্দন পত্র ও আর আর রাজা-রাজড়াদের অভিনন্দন পাঠ করা হবে। তারপর মহারাজ সভা ভঙ্গ করে বিশ্রামের জন্য অন্দরে প্রবেশ করবেন।

এদিকে রাজ্যময় উৎসবের আয়োজন হয়েছে সে ত আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন। সহরের প্রত্যেক বাড়ীটি ফুল পতাকা পূর্ণকুম্ভ দিয়ে সাজানো হবে, যারা তা পারবে না সরকারী খরচে তাদের বাড়ী সাজিয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত দিন খাওয়া-দাওয়া, আমোদআহ্লাদ, মল্লযুদ্ধ, বাইজীর নাচ, হাতীর লড়াই চলবে। সন্ধ্যার পর নদীতে নৌ-বিহার হবে। সহরে নাচ-গান দেয়ালী-বাজী সমস্ত রাত চলবে। সাত দিন ধরে সহর এমনি সরগরম হয়ে থাকবে।'

উদিতের মুখ উত্তরোত্তর কালীবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সে হয় ত আর সহ্য করিতে না পারিয়া একটা বেফাঁস কিছু করিয়া ফেলিত কিন্তু এই সময় ভৃত্য সোনার থালার উপর কাচের পূর্ণ পানপাত্র বহন করিয়া উপস্থিত হইল।

পানপাত্র উদিতের হাতে দিয়া গৌরী বলিল—'এই নাও উদিত, খাও। আমারও লোভ হচ্ছে—কিন্তু আমি খাব না। সংযমী হওয়াই মনুষ্যত্ব।' উদিত এক চুমুকে পাত্র শেষ করিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

মদের প্রভাবে তাহার হতবুদ্ধি ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। সে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—'আপনার অসুখের সময় আমাকে মহলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কেন?'

গৌরী নিরুপায়ভাবে হাত নাড়িয়া বলিল—'ডাক্তারের মানা উদিত, ডাক্তারের মানা। গঙ্গানাথ কি রকম দুর্দান্ত লোক জান ত? একেবারে হুকুম জারি করে দিলে কারুর সঙ্গে দেখা করতে পাব না।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'কিন্তু এমনি ভ্রাতৃভক্তি কুমার উদিতের—উনি প্রত্যহ একবার করে আপনার খোঁজ নিয়ে গেছেন।'

স্নেহবিগলিতকণ্ঠে গৌরী বলিল,—'ভাইয়ের চেয়ে আপনার আর কে আছে বল? কিন্তু তবু এমনি পাজি দেশের লোক, উদিতের নামেও মিথ্যে দুর্নাম দেয়—বলে ও নাকি আমার বদলে সিংহাসনে বসতে চায়! বল ত উদিত,—কত বড় মিথ্যে কথা!'

হঠাৎ চাপা গলায় উদিত গর্জ্জন করিয়া উঠিল—'তুমি কে?'

অতি বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া গৌরী বলিল—'আমি কে? উদিত, উদিত, তুমি কি বল্‌ছ? আজকাল কি সকালবেলা মদ খাওয়া তুমি ছেড়ে দিয়েছ! আমাকে চিনতে পারছ না! ধনঞ্জয়, দেখছ উদিতের মুখ কি রকম লাল হয়ে উঠেছে। এখনি গঙ্গানাথকে ডাকা দরকার!'

রুদ্ররূপকে ডাকিয়া ধনঞ্জয় হুকুম দিলেন—'কুমার উদিত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, শীঘ্র গঙ্গানাথকে ডেকে পাঠাও।'

অসীম বলে নিজেকে সংযত করিয়া উদিত দাঁতের ভিতর হইতে বলিল—'থাক, ডাক্তারের দরকার নেই।—আচ্ছা চললাম, আবার দেখা হবে' বলিয়া রাজার দিকে একবার মাথা ঝুঁকাইয়া উদিত সিং দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

ধনঞ্জয় রুদ্ররূপকে কাছে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিলেন; রুদ্ররূপ প্রস্থান করিলে গৌরীর নিকট আসিয়া

বসিয়া বলিলেন—'গোড়াতেই উদিতকে এতটা ঘাঁটানো ঠিক হয় নি। একটু চেপে চললেই হত। তা যাক, যা হবার তা ত হয়েই গেছে।'

গৌরী বলিল—'শত্রুতা করতে হলে ভাল করে করাই ঠিক, আধমনা হয়ে শত্রুতা করা বোকামি। কিন্তু কি ব্যাপার বল ত? উদিত বুঝতে পেরেছে?'

ধনঞ্জয় ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'না, বুঝতে পারেনি ঠিক, কিন্তু বেজায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। এর ভেতর কিছু কথা আছে, ভ্যাবাচাকা খেলে কেন?'

গৌরী বলিল—'শঙ্কর সিংকে খুন করেনি ত?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'না, খুন বোধ হয় করেনি। খুন করলে আপনাকে দেখবামাত্র জাল রাজা বলে বুঝতে পারত। তাইত! উদিত অমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল কেন?' বলিয়া ধনঞ্জয় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিলেন।

তারপর দেশের বহু গণ্যমান্য লোককে দর্শন দিবার পর সভা ভঙ্গ হইল। কোনো কিছু ঘটিল না, সকলেই রাজার রোগমুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া একে একে প্রস্থান করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নদীর দিকের একটা খোলা বারান্দায় সিল্কের নরম গালিচা পাতা হইয়াছিল; তাহার উপর মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়া গৌরী সোনার আলবোলায় তামাক টানিতেছিল। ধনঞ্জয় তাহার সম্মুখে পা মুড়িয়া বসিয়াছিলেন।

আকাশে আধখানা চাঁদ সবেমাত্র নিজের রশ্মিজাল পরিস্ফুট করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নদীর জল-ছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস যদিও মাঝে মাঝে শরীরে একটু কাঁপন ধরাইয়া দিতেছে, তবু এ মনোরম স্থানটি ছাড়িয়া গৌরী উঠিতে পারিতেছিল না। নদীর পরপারে ঝড়োয়ার রাজ-বাড়ীতে আলো জ্বলিয়া উঠিল, একে একে সব বাতায়নগুলি আলোকিত হইল—নদীর কালো জলে সেই ছায়া কাঁপিতে লাগিল। দু'জনে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

একবার খড়ম পায়ে দিয়া বৃদ্ধ বজ্রপাণি দুএকটা প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে গৌরী বলিল—'আচ্ছা, বুড়ো মন্ত্রী এত কাজ করছেন, আর তুমি ত দিব্যি আমার কাছে বসে আড্ডা দিচ্ছ?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'আড্ডা দিচ্ছি এবং আরো দুদিন দেব। অভিষেক না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে চোখের আড়াল করছি না। শঙ্কর সিং ত গেছে, শেষে কি আপনাকেও খোয়াব নাকি?'

'আমারও খোয়া যাবার ভয় আছে নাকি?'

'বিলক্ষণ আছে। আসলই যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন নকল হারাতে কতক্ষণ?'

গৌরী গম্ভীর হইয়া বলিল—'সত্যি? শঙ্কর সিংএর কি কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না?'

'কিছু না, যেন কর্পূরের মত উবে গেছেন। অন্য অন্য বারেও খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হয়েছে বটে, কিন্তু এ রকমটা কোনো বার হয় নি। সন্দেহ হচ্ছে সত্যি সত্যিই গুমখুন করলে না ত? তা যদি করে থাকে—'

রুদ্ররূপ প্রবেশ করিল। চাঁদের আলো ছিল বলিয়া অন্য আলো ইচ্ছা করিয়াই রাখা হয় নাই, ধনঞ্জয় ঠাহর করিয়া বলিলেন—'রুদ্ররূপ নাকি? এসো, কোনো খবর পেলে?'

রুদ্ররূপ উভয়কে অভিবাদন করিয়া গালিচার উপর পা মুড়িয়া বসিল। চম্পা রুদ্ররূপকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া-ছিল, তাহাকে অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'চম্পা, রাজার জন্যে পান আনতে বল ত মা!'

চম্পা প্রস্থান করিল। তখন রুদ্ররূপ বলিল—'কুমার উদিত আর ময়ূরবাহন এখান থেকে বেরিয়ে সটান ঘোড়া ছুটিয়ে শক্তিগড়ে গিয়েছেন, পথে কোথাও থামেন নি। এইমাত্র খবর নিয়ে লোক ফিরে এসেছে।'

ধনঞ্জয় হঠাৎ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—'ওঃ! ওঃ! কি আহাম্মক আমি—কি নালায়েক আমি। এটা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।'

গৌরী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—'কি বুঝতে পারনি?'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ইচ্ছে ক'রে আমায় ভুল খবর দিয়ে বাইরে পাঠিয়েছিল। ঐ শয়তান ষ্টেশন-মাষ্টারটা উদিতের দলে—ও-ই আমাকে বলেছিল যে কুমার শঙ্করকে ছদ্মবেশে মেয়েমানুষ সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে চড়তে দেখেছে। এখন সব বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু আমি যে এখনো কিছুই বুঝলাম না!'

'বুঝলেন না?—শঙ্করসিংকে শক্তিগড়ে বন্ধ করে

রেখেছে! দেশে থাকলে পাছে আমি জানতে পারি, তাই মিথ্যে খবর দিয়ে আমাকে সরিয়েছিল। এ ঐ হাড়-বজ্জাত ময়ূরবাহনটার বুদ্ধি।'

অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে রুদ্ররূপ দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিল—'কিন্তু তা যদি হয় তাহলে শক্তিগড়ে তল্লাস করলেই ত—'

'শক্তিগড় উদিতের নিজের জমিদারী—সেখানে সে আমাদের ঢুকতে দেবে না।'

'ফৌজ নিয়ে যদি—?'

'পাগল! জোর করে যদি শক্তিগড়ে ঢুকি তাতে বিপরীত ফল হবে। উদিত সিং বমাল সমেত ধরা দেবে ভেবেছ? তার আগে শঙ্কর সিংকে কেটে কিস্তার জলে ভাসিয়ে দেবে।'

আবার দীর্ঘকাল সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া ধনঞ্জয় কহিলেন—'না, এখন আর কিছু হবে না—সময় নেই। অভিষেক হয়ে যাক—তার পর—। রুদ্ররূপ, তুমি এখানে থাকো, আমি একবার মন্ত্রীর কাছে চল্‌লাম। যতক্ষণ না ফিরি এঁকে ছেড়ো না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নৌ-বিহার

রাজ-অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

দিনের অনুষ্ঠান ও তাহার আনুসঙ্গিক সমারোহ শেষ হইয়া যাইবার পর রাত্রির আমোদ-প্রমোদের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। কিস্তার জল হাজার হাজার সুসজ্জিত নৌকায় ভরিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক নৌকাটি সারি সারি বেলোয়ারী ঝাড়ের রঙীন আলোয় ঝকমক করিতেছে। কোনো নৌকায় সারঙ্গী তবলা সহযোগে কলকণ্ঠী ললনার গান চলিতেছে। কোনো নৌকার ছাদ হইতে আতসবাজি আকাশে উঠিয়া নানা বর্ণের উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ডে ফাটিয়া পড়িতেছে। কোনো নৌকা হাঙ্গরমুখ, কোনো নৌকা ময়ূরপঙ্খী। কোনোটি পালের ভরে মন্থর মরাল-গতিতে চলিতেছে, কোনোটি মাল্লার দাঁড়ের আঘাতে জল মথিত করিয়া ঘুরিতেছে। প্রায় সকল নৌকাই দুই রাজপ্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকুর মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি হইয়া চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে, যেন এই সম্মোহন বৃত্ত ছাড়িয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। দুই তীরে দুই রাজসৌধ সর্ব্বাঙ্গে আলোকমালা পরিধান করিয়া যেন ঔজ্জ্বল্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরকে সকৌতুকে আহ্বান করিতেছে।

একটি বজরাকে সকলেই সসম্ভ্রমে দূরে দূরে রাখিয়াছে। একটি করিয়া লাল ও একটি করিয়া সবুজ আলোর ঝালর দেখিয়া বুঝা যায় এটি রাজ-বজরা। নৌকাটি ফুলপাতা, জরি মখমল ও জহরৎ দিয়া সুন্দরভাবে সাজানো। তাহার পশ্চাতে রূপার ডাণ্ডার মাথায় ঝিন্দের রাজপতাকা উড়িতেছে।

নৌকার ছাদের উপর মখমলের চাঁদোয়ার নীচে তাকিয়া ঠেস্ দিয়া নবাভিষিক্ত রাজা বসিয়া আছেন, সঙ্গে মন্ত্রী বজ্রপাণি, সর্দ্দার ধনঞ্জয় এবং রুদ্ররূপ। বাহিরের লোক এখানে কেহই নাই—মাঝি-মাল্লারা সব নীচে। কিন্তু তবু সকলেই নীরব—কিছু অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে দু'একটা কথা হইতেছে।

বজ্রপাণি বলিলেন—'আমি শুধু উদিতের মুখখানার কথা ভাবছি। যখন ইংলণ্ডেশ্বরের অভিনন্দন পড়া হচ্ছে তখন তার মুখ দেখেছিলে? আমার ভয় হচ্ছিল একটা বিশ্রী কাণ্ড বুঝি বাধিয়ে বসে।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'হুঁ, আর ঐ ময়ূরবাহনটা। তিলকের সময় এমনভাবে চেঁচিয়ে হেসে উঠল, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল সভা থেকে গলা টিপে বার করে দিই। শুধু একটা কেলেঙ্কারি হবে এই ভয়ে পারলাম না।'

ভার্গব বলিলেন—'ওরা এম্‌নি ছাড়বে না, শীঘ্রই একটা কিছু করবে। আমাদের খুব সতর্ক থাকা দরকার।'

উদিত ও ময়ূরবাহন মিলিয়া যে একটা কিছু করিবেই সে-সম্বন্ধে তিনজনের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না; কিন্তু কি করিবে, কোন্ দিক হইতে আক্রমণ করিবে—সেইটাই কেহ ধারণা করিতে পারিতেছিলেন না।

গৌরী সেই প্রশ্নই করিল—'কি করতে পারে ওরা?'

বজ্রপাণি মাথা চুলকাইয়া বলিলেন—'সেটা জানা থাকলে আগে থাকতে তার প্রতিকার করা যেত। এখন সতর্কভাবে প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য পথ নেই।'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। রাজ-বজরার

ত্রিশ গজের মধ্যে অন্য কোনো নৌকা ছিল না, কিন্তু মধু-পাত্রের চারিপাশে মক্ষিকার মত সকল নৌকাই রাজ-নৌকাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছিল। অলক্ষিতে ব্যবধান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। একটা নৌকা হইতে সারঙ্গী সহযোগে নারীকণ্ঠের গীত স্পষ্ট কানে আসিতেছিল, এমন কি দাঁড়টানার ছপ্ ছপ্ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে নর্ত্তকীর পায়জামিয়ার নিক্কণও শুনা যাইতেছিল।

চতুঃপ্রহরব্যাপী উৎসবের পর নানাবিধ ভাবনা ও উত্তেজনার ফলে গৌরী ঈষৎ ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল—সে তাকিয়ার উপর মাথা রাখিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। ঝড়োয়ার আলোকদীপ্ত প্রাসাদের মাথায় নবমীর চাঁদ স্থির হইয়া আছে—সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা দেওয়ানজি, যার সঙ্গে আজ আমার পাকা দেখা অর্থাৎ তিলক হল তিনি দেখতে কেমন?'

ভার্গব গম্ভীরমুখে বলিলেন—'রাণীর মতন। এর বেশী আমাদের বলতে নেই, তিনি একদিন আমাদের মা হবেন।'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'তা যেন বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে তাঁর তিলক হল আমার সঙ্গে, অথচ বিয়ে হবে আর একজনের সঙ্গে—এতে আপনাদের শাস্ত্রমতে কোনো দোষ হবে না?'

বজ্রপাণি নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। ধনঞ্জয়ের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; এই চিন্তাটাই তাহাকে সবচেয়ে বেশী ক্লেশ দিতেছিল। ঝিন্দের পাটরাণী যে ধর্ম্মতঃ একজনের বাগদত্তা হইয়া পরে রাজার মহিষী হইবেন, সমস্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে এই ব্যাপারটাই ধনঞ্জয়ের সবচেয়ে অরুচিকর ঠেকিতেছিল। কঠিনপ্রাণ যোদ্ধার মত তিনি ভালর সঙ্গে মন্দটাও গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তে সুখ ছিল না।

তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—'তিনি এসব কিছু জানতে পারবেন না।'

গৌরী বলিল—'তা ঠিক, মনের অগোচরে পাপ নেই। তা সে যাক, বিয়েটা কতদিন পরে হবে কিছু ঠিক হয়েছে কি?'

বজ্রপাণি বলিলেন—'তার এখনো দু'মাস দেরী আছে।'

গৌরী প্রশ্ন করিল—'কিন্তু এই দু'মাসে শঙ্কর সিংকে যদি উদ্ধার না করা যায় তাহলে বিয়েটাও কি বকলমে আমাকে করতে হবে নাকি?' বলিয়া সকৌতুক শঙ্কর তিনজনের মুখের পানে চাহিল।

সহসা এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিল না। ধনঞ্জয় ভ্রূকুটি করিয়া কার্পেটের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। রুদ্ররূপ উদাসীনভাবে চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিল। ভার্গব একটিপ নস্য লইয়া কি একটা বলিবার উপক্রম করিলেন, এমন সময় বজরার ভিতর হইতে একজন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'সামাল, হুঁসিয়ার!'

তারপর মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। গৌরী সচকিতে উঠিয়া বসিয়া নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল একখানা সরু ছুঁচোলো নৌকা সমস্ত আলো নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে টর্পেডোর মত তাহার বজরার মধ্যস্থলে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে—ধাক্কা লাগিতে আর দেরী নাই, মধ্যে মাত্র বিশ হাতের তফাৎ। নৌকার ক্রূর অভিসন্ধি বুঝিয়া লইতে গৌরীর তিলার্দ্ধ সময় লাগিল না, সে একলাফে উঠিয়া বজ্‌রার ধারে চাঁদির রেলিং ধরিয়া হাঁকিল—'খবরদার। তফাৎ যাও।'

উত্তরে অন্ধকার নৌকার ভিতর হইতে একটা উচ্চকণ্ঠের হাসির আওয়াজ আসিল। পরমুহূর্ত্তেই বজরা ও নৌকার ভীষণ সঙ্ঘাতে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। বজ্‌রার সমস্ত ঝাড় লণ্ঠনগুলা ঠোকাঠুকি হইয়া ঝন্‌ঝন্ শব্দে ভাঙিয়া নিভিয়া গেল এবং বজ্‌রাখানা ভয়ঙ্কর একটা টাল খাইয়া প্রায় কাৎ হইয়া পড়িল। সেই অন্ধকারের মধ্যে গৌরী অনুভব করিল—জ্যামুক্ত তীরের মত সে শূন্যে উড়িতে উড়িতে চলিয়াছে।

শুনা যায়, আকস্মিক বিপৎপাতে মানুষের উপস্থিত-বুদ্ধি লোপ পাইয়া কেবল প্রাণরক্ষার চেষ্টাই জাগ্রত থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এইরূপ উড্ডীয়মান অবস্থাতেও গৌরী যে-কথাটা ভাবিতেছিল, আসন্ন জীবন মৃত্যু সঙ্কটের সহিত তাহার কোনো যোগ নাই। সে ভাবিতেছিল, ঐ যে হাসিটা অট্টহাসের ডাকের মত এখনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল ঐ হাসি সে পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছে?

এই ভাবিতে ভাবিতে বজরা হইতে বিশ হাত দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াই গৌরী নিস্তার জলে তলাইয়া গেল।

হঠাৎ কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে এই অতর্কিত অবগাহনের ফলে গৌরীর মন হইতে অন্য সমস্ত চিন্তা দূর হইয়া মনে হইল এইবার তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সে ভাল সাঁতার জানিত বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলনা, কোনো রকমে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে জল কাটিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। পতনের বেগে সে বহুদূর নীচে নামিয়া গিয়াছিল তাই উঠিতে দেরী হইল। প্রায় আধ মিনিট পরে ভাসিয়া উঠিয়া সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস টানিয়া চোখ মেলিল।

চোখ মেলিয়াই কিন্তু আবার তাহাকে ডুব মারিতে হইল। ইতিমধ্যে রাজ-বজরায় দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া চারিদিক হইতে নৌকাসকল ভিড় করিয়া আসিয়াছিল—বজরা ঘিরিয়া ভীষণ চেঁচামেচি ও হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল। গৌরী মাথা তুলিয়াই দেখিল—একখানা প্রকাণ্ড নৌকা তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। সে সজোরে নিশ্বাস টানিয়া আবার ডুব দিল।

ডুব সাঁতার দিয়া খানিকটা দূর গিয়া আবার সে ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু মাথা তুলিতে পারিল না, একখানা নৌকার তলায় মাথা ঠুকিয়া গেল। গৌরীর মনে হইল মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, বায়ুর অভাবে ফুসফুস এখনি ফাটিয়া যাইবে। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়িয়া সে আরো কিছুদূর গিয়া মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু এবারও নৌকার তলায় মাথা লাগিয়া তাহাকে মাথা জাগাইতে দিলনা।

গৌরী তখন নৌকার তলদেশ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল—কোথাও না কোথাও নৌকার তলা শেষ হইয়াছে নিশ্চয়, সেইখানে গিয়া মাথা জাগাইবে এই তাহার অভিপ্রায়। কিন্তু এদিকে ফুস্‌ফুসের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে—সংজ্ঞাও প্রায় লুপ্ত। সেই অর্দ্ধ চেতনার মধ্যে মনে হইতেছে, বুঝি নৌকার কিনারা আর মিলিবেনা।

কতক্ষণ এইভাবে চলিবার পর হঠাৎ কিনারা মিলিল। দু'টা নৌকা ঠেকাঠেকি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের হালের দিকে সামান্য একটু ত্রিকোণ স্থান। সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে গলা পর্য্যন্ত জাগাইয়া, প্রায় একমিনিট ধরিয়া দীর্ঘ কম্পমান কয়েকটা নিশ্বাস টানিবার পর গৌরীর মাথাটা কিছু পরিষ্কার হইল। কিন্তু বিপদ তখনো শেষ হয় নাই। গৌরী চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল যতদূর দেখা যায় অগণ্য অসংখ্য নৌকা ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রত্যেক নৌকার আরোহী একযোগে অর্থহীন চীৎকার করিতেছে। গৌরীও চীৎকার করিয়া তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিল কিন্তু সেই বিষম গণ্ডগোলের মধ্যে তাহার ক্ষীণকণ্ঠ কেহ শুনিতে পাইলনা।

গৌরী একবার ভাবিল, নৌকার পার্শ্ব ধরিয়া ঝুলিয়া থাকি—কখনো না কখনো উদ্ধার পাইব। কিন্তু তাহাতেও ভয় আছে; নৌকাগুলা স্রোতের বেগে দুলিতেছে পরস্পর ঘর্ষিত হইতেছে। যদি কোনোক্রমে মাথাটা দুইনৌকার জাঁতাকলে পড়িয়া যায় তাহা হইলে গুঁড়াইয়া একেবারে ছাতু হইয়া যাইবে। সুতরাং ঝুলিয়া থাকাও দীর্ঘকালের জন্য নিরাপদ নয়।

মিনিট পাঁচেক পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া গৌরী স্থির করিল—এত নৌকার ভিড়ের বাহিরে যাইতে হইবে। নৌকার ভিড় রাজ-বজরার নিকটেই বেশী, অতএব বজরা হইতে যত দূরে যাওয়া যায় ততই নিরাপদ। গৌরী তখন ভাল করিয়া একবার দিক্ নির্ণয় করিয়া লইয়া আবার ডুব মারিল। নৌকাগুলার হাল যেদিকে সেইদিকেই মুক্তির পথ এই বুঝিয়া সে প্রাণপণে ডুব-সাঁতার কাটিয়া চলিল।

প্রায় বিশ গজ সাঁতার দিয়া সে আবার ভাসিয়া উঠিল। হাঁ, অনেকটা ফাঁকা আছে। নৌকার ভিড় আছে বটে কিন্তু অতটা ঘনীভূত নয়। আপাততঃ ডুব-সাঁতার দিবার আর কোন প্রয়োজন নাই।

সকল নৌকাতেই আলো আছে—কিন্তু সে আলো শোভার জন্য, মজ্জমানকে পথ দেখাইবার জন্য নয়। কিন্তার জল অন্ধকার। গৌরী দু'একটা নৌকার আরোহীদের ডাকিবার চেষ্টা করিয়া ক্লান্তিবশতঃ বিরত হইল। কেহ তাহায় ডাক শুনিতে পায় না, সকলেরই বাহ্যেন্দ্রিয় দূরে বজরাটার উপর নিবদ্ধ।

গৌরী তখন তীরের দিকে চক্ষু ফিরাইল। দূরে—কত দূরে তাহা ঠিক আন্দাজ হয় না—নদীর কূল হইতে উচ্চ প্রাসাদের মূল পর্য্যন্ত সারি সারি শুভ্র সোপান উঠিয়া গিয়াছে—যেন কোন স্বপ্নদৃষ্ট দৈত্যপুরী। ঠাণ্ডা জলে এতক্ষণ থাকিয়া গৌরীর সমস্ত অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতে-

ছিল, সে ওই দৈত্যপুরী লক্ষ্য করিয়া ক্লান্তভাবে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

ঘাটের আরো কাছে যখন পৌছিল তখন চাঁদের ফিকা আলোয় তাহার মনে হইল যেন ঘাটের শেষ পৈঠার উপর সারি সারি কাহারা দাঁড়াইয়া আছে। গৌরীর হাতপা তখন শিথিল হইয়া আসিতেছে, চক্ষুর দৃষ্টি ধোঁয়া ধোঁয়া হইয়া গিয়াছে—ঘাটে পৌছিতে আর কত দেরী!

না, আর চলে না, দেহ অসাড় হইয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া কি বলিল! কি বলিল? 'একটু—আর একটু বাকি! এইটুকু সাঁতার কেটে এস!' কাহার গলা? অচল-বৌদির না? তবে এটুকু যেমন করিয়া হোক যাইতেই হইবে।

প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় গৌরী জল হইতে সোপানের উপর উঠিল। তারপর একজনের কুঙ্কুম-চর্চ্চিত পায়ের নিকট মাথা রাখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

মলু ও শীতঋতু

শ্রীকমল সরকার বি-এ

মলুবাবু গৃহত্যাগ করবেন।

অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কথা—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্ভাবনায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার আগে তাঁর এই হঠাৎ-বৈরাগ্যের কারণটা কি—সে-বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করা দরকার। আমরা যতদূর জানি, বাড়ীতে তাঁর 'ধর্ম্মসাধনার' পথে কোনওদিন কোনও বিঘ্ন এ পর্য্যন্ত কেউ ঘটায়নি। পুত্র বা পরিবার তাঁকে সংসারের কঠিনতম বন্ধনে জড়িত করে' ফেলবে এমন আশঙ্কা তাঁর একেবারেই নেই—কারণ আজ পর্য্যন্ত উনি অবিবাহিত। অর্থকৃচ্ছ্র তার কথা যদি তোলেন তো বলবো, যে সামান্ত দু'চার পয়সার ঘুড়ি লাটাই ছাড়া ওঁর পয়সাকড়ির দরকারই হয়না এবং সে পয়সাও চাইলেই মার কাছ থেকে পাওয়া যায়।

মলুকে মাষ্টার মশাইয়ের কাছে জ্যামিতির পড়া দিতে হবেনা, তার আজ গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি হ'বার সম্ভাবনা আছে, এমন কথা কাকপক্ষীর মুখেও শোনা যায়নি। তবুও যে সে এই শীতের সকালে নবীন সন্ন্যাসীর মতন সংসার ত্যাগ করতে চলেছে, তার একটু কারণ আছে। ব্যাপার আর কিছুই নয়; কাল বিকেলে মলুদের বাড়ী পোষ্ট অফিসের পিওন একখানা পোষ্টকার্ড দিয়ে যায়। তাতে কি লেখা ছিল মলুর অবশ্য তা জানবার কথা নয়; কিন্তু চিঠিখানা পড়ে' তার মা তাকে ডেকে বলেছেন যে আজ সকালে তাদের বাড়ীতে ক'লকাতা থেকে তার এক মামীমা আসবেন। এইমাত্র সংবাদ এবং এ তা না হয়ে' সে যে চুপি চুপি বাড়ী থেকে পালাচ্ছে, তার কারণ ও ভয়ঙ্কর লাজুক-প্রকৃতির ছেলে। অপরিচিত—অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ করবার কথা হলে' ও যে ভৌতিকভাবে অন্তর্ধান করতে পারে, এ প্রবাদ ও দুর্নাম ওর আত্মীয়-স্বজন মহলে যথেষ্ট আছে। আজকে বাড়ী থাকার বিপদ মলু বেশ ভালো ক'রেই ভেবে দেখেছে। প্রথমতঃ, তার যে মামীমা আজ আসছেন, তাঁকে এর আগে সে কখনও দেখেনি। দ্বিতীয় এবং আরও মুস্কিলের কথা এই যে তিনি—মহিলা। এমতাবস্থায় পলায়ন ছাড়া অন্য কোনও সহজপথ মলুর অন্ততঃ মাথায় আসেনা।

আপাততঃ গৃহত্যাগ করলেও দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময় যে একবার বাড়ী ফিরতেই হবে এ সম্বন্ধে মলু সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। কিন্তু মাঝখানের এই সময়টুকু কাটানো যায় কি ভাবে? কিছু খাদ্যের সংস্থান করা একান্ত প্রয়োজন। আর কিছু পাবার কথা নয়, কেননা খাবার জিনিসপত্র সমস্তই তার মা ভাঁড়ার ঘরে চাবী বন্ধ করে' রেখেছেন। তবে একটা কথা ওর মনে পড়ল—কাল রাত্তিরে মুড়ীর টিন্‌টা দাবার কুলুঙ্গীতেই যেন ছিল। ব্যস্, অন্ন-সমস্যার সমাধান এক-মুহূর্ত্তে হয়ে' গেল। টিপিটিপি কুলুঙ্গী থেকে মুড়ির টিন পেড়ে মলু কোঁচড় ভর্ত্তি করে' নিলে। মুড়ীর আনুষঙ্গিক নারকেলনাড়ু, বাতাসা বা ঐ ধরণের কিছুর জন্যে ও মোটেই ব্যস্ত হ'ল না। কারণ ও জানে, ঘোষালদের উঠোনে শীতের এই সময়টা সারি সারি উনুনে খেজুর-গুড় জ্বাল দেওয়া হয় এবং সেখানে গেলেই যে তার গুড় খাবার নিমন্ত্রণ হবে, এ সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অতি সন্তর্পণে খিড়কির দোর খুলে মলু গাঁয়ের পথে বেরিয়ে পড়ল। শীতের সকাল এতক্ষণে অন্ধকারের ঘোর থেকে জেগে উঠেছে। পথে লোক-চলাচল নেই বললেই হয়—শুধু গাঁয়ের ওধার থেকে চাষীদের ধানঝাড়ার একটা একটানা ঝপ্‌ঝপ্ আওয়াজ ভেসে আসছে। সেই আধঘুমন্ত পুরীর মধ্যে দিয়ে মলু এগিয়ে চললো রূপকথার রাজপুত্রের মতন।

রাস্তায় নেমে একটা কথা মনে পড়ায় ওর ভারী হাসি পেল। কাল চিঠিটা পাবার পর বাড়ীতে কথা উঠেছিল যে আজ মামীমার শুভাগমন উপলক্ষে তাকে ফর্সা জামাকাপড় পরে' সারাদিন ফিট্‌ফাট হয়ে' থাকতে হবে। কাল রাত্তিরে তার বহুদিনের একটা শান্তিপুরী ধুতি আর একটা গরম কোট বার করে' রাখা হয়েছে, এ পর্য্যন্ত সে দেখে এসেছে। অথচ এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মলুবাবু তার সেই পুরোণো হাফ্‌-প্যান্ট আর আধ-ময়লা ফ্লানেলের সার্ট পরে' গ্রাম-পর্য্যটন করতে যাচ্ছেন। মা-র আর সব ভালো, শুধু কাপড়-জামা ময়লা করলে বা ধূলো কাদায় ছোটাছুটি করলে কেন যে তিনি অত রেগে ওঠেন, ও তা কিছুতেই বুঝতে পারেনা। অবশ্য ভালো জামা-কাপড় পরতে যে তার ইচ্ছে হয়না এমন কথা বলা ভুল। কিন্তু মহা-সমস্যার কথা এই যে ঐগুলো পরে' না যাবে মাঠে দৌড়োদৌড়ি করা, না যাবে ঘাসের ওপর বসা। আরও এক কথা ; এখনকার দিনে অনেক জায়গায় ধান-ঝাড়া হচ্ছে—এক একটা খামারে খড়ের গাদা স্তূপাকার হ'য়ে উঠেছে। গা বেয়ে বেয়ে তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করা যে কি ভয়ানক উত্তেজক ব্যাপার, তা বোধহয় হিমালয় অভিযানকারীর দলও বুঝে উঠতে পারবেনা। ফর্সা জামাকাপড় পরলে সেই মজাটির কল্পনা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হয়। তার চেয়ে পড়ে' থাক্‌, ধুতি ও কোট মার বাক্সের নিরাপদ ও গোপনতম কোণে। ও জামাকাপড় একবার পরলে মামীমার খাতিরে না হোক্‌, অন্ততঃ সেগুলো ময়লা হ'বার ভয়েও মা তাকে সারাদিন ঘর থেকে ছাড়তেন না।

যাক্‌, কথায় কথায় মলুর সঙ্গে আমরা অনেকদূর এসে পড়েছি। তালবন পেরিয়ে, গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে' আরও কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আমরা চলতে পারতুম। কিন্তু ওর বাড়ীর দিকে একবার ফেরা দরকার—কেননা, এতক্ষণে ওর মামীমার আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। গল্পে পক্ষপাতিত্বটা কিছু নয়।

মলুর মামীমা বিমলাদেবী ক'লকাতার লোক হ'লেও সেখানকার বাসিন্দা ন'ন। মাত্র তিনচার বছর আগে পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন দেশের এই বাড়ীতে—মলুদের সঙ্গে। এই গ্রাম্য আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের অর্দ্ধেক কেটেছে। তারপর পল্লী-জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে বাঁচতে বাঁচতে হঠাৎ তাঁর ভাগ্যাকাশে দেখা দিল পূর্ণচন্দ্র। সহর থেকে ওঁর স্বামীর চিঠি এল যে অফিসের কাজে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। এখন আর তিনি স্ত্রীপুত্রদের পাড়াগাঁয়ের গণ্ডী আবেষ্টনের মধ্যে রাখতে রাজী ন'ন। অত্যন্ত সুখের কথা। প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে বিমলাদেবী তাঁর তল্পিতল্পা গুছোলেন এবং সেই যে ক'লকাতাবাসী হয়ে' পড়লেন, আর তিনি বছরের মধ্যে দেশের নাম মুখেও আনলেন না। গতবছর পুজোর সময় মলুর মা ওঁদের অনেক করে' আসতে লিখেছিল। উত্তরে বিমলাদেবী লিখেছিলেন, 'গেলে একবার ভালো হয় জানি, কিন্তু যে জলকাদা আর খানাডোবার দেশ তোমাদের, ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে যেতে ভরসা পাইনা। তাছাড়া একবার গেলে যে চট্‌ করে' চলে' আসবো এমন সুবিধেও নেই। বড়দিনের সময় না হয় একবার চেষ্টা করে' দেখবো।'

আসল কথা এই যে, ওঁদের হঠাৎ-পাওয়া অর্থ আর ক'লকাতার নিজস্ব আব্‌হাওয়ার মধ্যে সম্পর্কটা এমন ঘনীভূত হয়ে' উঠেছে যে তার থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং সম্ভাবনা থাকলেও সে মুক্তি এ বাড়ীর কেউ আকাঙ্ক্ষাও করেনা। সহরের কোটরগত জীবনটাকে যারা বন্ধন বলে' মনেই করেনা, তাদের কাছে মুক্তির কি অর্থ হ'তে পারে ?

আজ দীর্ঘ তিন বছর পরে যখন বিমলা ও তাঁর ছেলেমেয়ে এ বাড়ীতে পা দিলেন, তখন মলুর মা লক্ষ্মী আনন্দের চেয়ে বিস্ময়ই বোধহয় বেশী অনুভব করেছিল। তার কারণ মানুষের যেটুকু পরিবর্ত্তন লোকে সামান্য একটু বিস্ময়সূচক ধ্বনি দিয়ে সহনীয় করে' তুলতে পারে, বিমলা ও তাঁর দুই ছেলে মেয়ে—সুজিত ও লীনার পরিবর্ত্তন তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছিল। লক্ষ্মী বিস্মিত হ'ল এদের বেশভূষা দেখে, বিস্মিত হ'ল এদের কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে। বিশেষ করে' সুজিত ও লীনা তাঁর চোখে প্রথম দৃষ্টিতে এক অদ্ভুত মায়ার জাল বুনলে। ওদের দু'জনেরই বয়স কম ; কিন্তু এরই মধ্যে ওরা কথায়বার্ত্তায় চালচলনে বিশেষ রকম পটু। দু'জনের মুখেই স্বাস্থ্যের দীপ্তি—সমস্ত শরীরের মধ্যে কোথাও ওদের এককণা ময়লা খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কাপড়জামার মধ্যেও তাদের আভিজাত্য অতি সুস্পষ্ট। সুজিতের গায়ে সিল্কের সার্ট, মাফ্‌লার ও কোট ; আর লীনা ছোটমেয়ে হ'লেও কুঁচিয়ে পরেছে একখানা ভালো রঙীন শাড়ী ও তার উপযুক্ত জামা ও আভরণ। তাড়াতাড়ির মধ্যেও অনেকটা নিজের অজান্তে লক্ষ্মী সুজিত ও মলুর মধ্যে একটা তুলনামূলক সমালোচনা করে' ফেললে। সুজিতের পাশে মলুর সেই ফ্লানেলের সার্ট পরা ধূলোকাদা মাখা মূর্ত্তিখানা কল্পনা করতে গিয়ে তার মনে দুঃখ ও অতৃপ্তির একটা হাসি ফুটে উঠল।

কিন্তু একটা ব্যাপারে লক্ষ্মী একটু আহত হ'ল। এতদিনের পর দেখা—ও স্বভাবতঃই আশা করেছিল যে সুজিত ও লীনা তার কাছে এসে তাকে প্রণাম করবে এবং সেই সুযোগে ওদের দু'জনকে সে একবার কোলের কাছে টেনে নেবে। কিন্তু প্রথম থেকেই বিমলা দেবী তাঁর পারিবারিক কথাবার্ত্তা ও আলাপ-আলোচনায় আবহাওয়া এমন ভরিয়ে তুললেন যে প্রণাম করবার মতন একটা শান্ত মুহূর্ত্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে' উঠল। 'আসতে কি পারি ভাই—যা ঝামেলা সংসারের ! তার ওপর এই বড়দিনের ছুটির মধ্যে ওঁকে আপিস যেতে হবে। চাকর-বামুন রেখে এসেছি, কিন্তু তাতে কি ওঁর মনের মতন হবে ? উনি তো আসতে দিতেই চান্‌ না, ছেলেরাও ছুটিতে পশ্চিমে যাবার দিকে ঝুঁকেছিল। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে এই বেরুতে পারলুম। আর ওদেরও বলি, হাজার হোক দেশ বটে তো ; এক একবার আসতে হবে বৈকি !'—ইত্যাদি ঘরোয়া বিবরণে বিমলা মুখর হয়ে' উঠলেন। ছেলেমেয়েরাও এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লে না। অত্যন্ত

উৎসাহ ও বিজ্ঞতার সঙ্গে তারা তাদের সংসারের ও সমাজের খুঁটিনাটি খবর দিয়ে মাকে সাহায্য করতে লাগল।

পথশ্রমটুকুর সম্পূর্ণভাবে অপনোদন করবার পর বিমলার মনে পড়ল কথাটা।

—হ্যাঁ রে. তোরা তোদের পিসীমাকে গড় করেছিলি তো?

সুজিত তার খেলার মধ্যে সামান্য একটু অবসর করে' নিয়ে রান্নাঘরে রন্ধন-নিরত লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে বলে' উঠলো—পিসীমা তোমায় গড় করতে ভুলে গিয়েছিলুম, নমস্কার। তার হাত দু'টো কপাল পর্য্যন্তও উঠল না—দু'হাত একবার একত্র করে'ই সে তার খেলার মধ্যে ডুবে গেল। আর লীনা—সে তখন লক্ষ্মীর সযত্ন-রোপিত লাউ গাছটি রান্নাঘরের চালা থেকে টেনে নামাতে ব্যস্ত—মা-র কথা তার কাণেও গেল না।

তা হোক্, লক্ষ্মী ভাবলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যদি প্রণাম করতে ভুলে যায়, সেটা এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ নয়। হাজার হোক্ তাদের বয়স কম।

লক্ষ্মীর মনের মধ্যে যেটুকু মেঘ জমেছিল, সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেল বিমলার একটা কথায়।

—লীনা কেমন নাচতে শিখেছে জানো না বুঝি?

নাচ? সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যে অতবড় একটা গুণের অধিকারী হ'তে পারে, এটা লক্ষ্মীর কাছে নিতান্তই কল্পনার জিনিস। বিস্ময়বিমূঢ়কণ্ঠে সে উত্তর দিলে, কই না?

—গেল বছর ও চমৎকার একটা মেডেল পেয়েছে নাচের জন্যে। আর আমাদের পাড়াতে তো ধরতে গেলে ওর রোজ নেমন্তন্ন। একজন ভালো মাষ্টার রাখবো ভাবছি, কিন্তু টাকাকড়িতে সবসময় কুলিয়ে উঠতে পারিনা ভাই। এসব জিনিস একজন মাষ্টারের কাছে না শিখলে —ওরে ও লীনা, তোর পিসিমাকে একবার সেই 'আরতি-নৃত্য'টা দেখিয়ে দেতো। মালা, মুকুট-এসব আর এখানে কোথায় পাবি বল্, তা তুই অমনিই দেখিয়ে দে।

লক্ষ্মী নৃত্যবিশেষজ্ঞ নয়, অপলক চোখে সে দেখলে ছোট এই মেয়েটির নৃত্য-ভঙ্গিমা। সত্যি আশ্চর্য্য! আমাদের আশে পাশে যে সব মানুষ ঘুরে বেড়ায়, তাদের দিয়ে এত বড় একটা জিনিস যে সম্ভব হ'তে পারে, এটা বিশ্বাস করতে লক্ষ্মীকে কষ্ট করতে হয়েছিল।

নাচের পর সুজিতকে অনুরোধ করা হয়েছিল একটা 'রেসিটেশান্' করবার জন্যে। উত্তরে জানা যায় যে বাঙলা 'পিস্'টা সে ভুলে গেছে। ইংরিজী কবিতাটা সে বলতে পারে বটে, কিন্তু পিসীমা তো আর ইংরিজী বুঝবেন না।

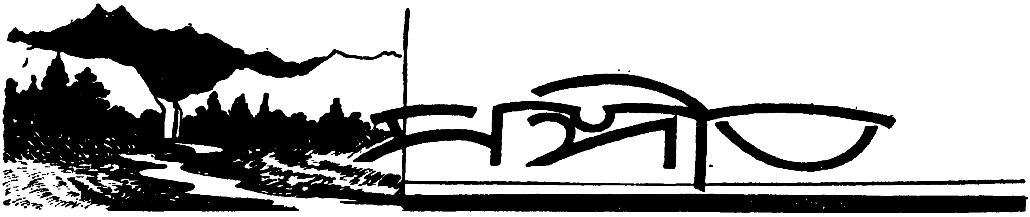
কিন্তু কি দুষ্টু ছেলে এই মনু। দেখোতো, সেই কোন্ সকালে সে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরবার নাম নেই! কোথায় কোন্ পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে হয়তো সে হাঁসের দলকে তাড়া দিচ্ছে, আর নয়তো কোন্ কাঠবেড়ালীর পেছনে মাঠে মাঠে ছুটোছুটি করছে। এদিকে দাবার রোদ চলে' গিয়েছে, নারকেল গাছের লম্বা ছায়া ক্রমশঃ গাছের গোড়ায় এসে জড় হ'ল। এত বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে না দেয়ে সে আছেই বা কি করে'? লক্ষ্মী হঠাৎ অত্যন্ত রেগে উঠল। আজ মনু একবার আসুক ঘরে! দিনকতক খুব শাসন না করলে ওর ঐ পাড়া-বেড়ানোর অভ্যেস যাবে না।

ওর জন্যে অপেক্ষা করা নিরর্থক জেনে লক্ষ্মী বিমলা ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে দিলে। শীতের বেলা—দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে আসবে। এদিককার কাজ সব সারা হয়েছে—শুধু ঘাটের দু'একটা খুচরো কাজ চুকলেই এবেলার মতন তার ছুটি। এর মধ্যে মনু এসে পড়ে ভালোই—আর না আসে তো থাকুক্ সে সারাদিন উপোস করে'। ছেলের প্রতি বিরক্তিতে লক্ষ্মীর মুখ লাল হয়ে' উঠল, দু'একখানা বাসন আর একটা গামছা হাতে নিয়ে সে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো পুকুর ঘাটের দিকে।

এদিকে আমাদের মনুবাবু অনেক ঘুরে ফিরে শেষ পর্য্যন্ত ওদের খিড়কির ঘাটের কাছে এসেই দাঁড়িয়েছে। তার কারণ বেলাও হয়েছে' এবং ক্ষুধার তাড়নাও হঠাৎ এমন প্রবলভাবে বাড়তে সুরু করেছে যে বাড়ীর বাইরে আর কোনও ক্রমেই থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ কি ভাবে যে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা যায় সেই সমস্যাটা অনেক ভেবেও সে সমাধান করতে পারেনি। সামনাসামনি ঢুকলে যে কলকাতার সেই মামীমা প্রভৃতির সামনে দাঁড়িয়ে অপদস্থ হতে হবে, সে বিষয়ে তার সংশয় মাত্র ছিলনা। অনেক ভেবেচিন্তে ও খিড়কির ঘাটে অপেক্ষা করাই উচিত মনে করলে। তার কারণ, জল নিতে বা বাসন মাজতে কেউ না কেউ ঘাটে আসবেই এবং তাকে দেখতে পেলে—প্রহার বা বকুনি না এড়াতে পারলেও—খাবার সুবিধে একটা হবেই।...

ছেলের মূর্ত্তির দিকে যখন নজর পড়লো, তখন লক্ষ্মী ভেবে পেলে না, সে হাসবে কি কাঁদবে। রোদ্দুরে রোদ্দুরে ওর মুখখানা লাল, দুপুরের গরমে কপালে ঘাম উঠেছে জমে'। অত করে' যে ফর্সা জামাকাপড় পরবার কথা বলেছিল, তার চিহ্নমাত্র ওর গায়ে নেই। সেই পুরোনো সার্ট আর ময়লা প্যাণ্ট! দপ্ করে' লক্ষ্মীর মনে পড়ল সুজিত আর লীনার কথা। কেমন ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটি! কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় তাদের! অপরের তুলনায় নিজেকে ছোট মনে করা বা নিজের ওপর রাগ হওয়া আমাদেরই একটা ধর্ম্ম। উদ্যত রাগে লক্ষ্মী এগিয়ে গেল মনুর দিকে।......

কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল লক্ষ্মীর দৃঢ়মুষ্টি এসেছে শিথিল হয়ে'—আর তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে এক বিশ্বজয়ী হাসি। দুই ব্যগ্র বাহু দিয়ে পরম স্নেহে ও মনুকে বুকের ভেতর টেনে নিলে, আর চুমোয় চুমোয় তার দুই গাল বিপর্য্যস্ত করে' তুললে।



ভৈরবী—কহরবা

(ভজন)

মোরে প্যারে গিরিবরধারীজী দাসী ক্যোঁ বিসার ডারী।
দ্রোপদীকী লাজ রাখী সব দুখসোঁ নিবারী।
প্রহলাদ পেজ * পারী নৃসিংহ দেহধারী ॥
ভীলনীকে ঝুঠে বের খায়ে কছু জাত ন বিচারী
কুবজা সোঁ নেহ লায়া গৌতমকী নারি তারী।
প্যাসী ফিরোঁ দরশ বিন তলফোঁ মোহে কাহে বিসারী
মীরাকোঁ দরশন দীজে গিরিধর অপনি ওঁর নিহারী ॥

মীরাবাঈ

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গীতসাগর

১´	•	১´	০
{ পা -া পা দা |	পা মা হ্মা মা |	জ্ঞা রা জ্ঞা সা |	জ্ঞা ঋা সা -া } |
মো - রে প্যা	০ রে গি রি	ব র ধা ০	০ রী জী -
জ্ঞা -া রা -া |	-া -া ণ্‌া -া |	ণ্‌া সা ঋা জ্ঞা |	ঋা -া সা -া |
দা - সী -	- - ক্যোঁ -	বি সা ০ র	ডা - রী -
১´	০	১´	০´
পা -া পা -া |	-া -া পা -া |	পা ধা ণা র্সা |	ণদা -া পা -া |
দা - সী -	- - ক্যোঁ -	বি সা ০ র	ডা - রী -
১´	•	১´	•
জ্ঞা পা মা দা |	-া -া পাসা -া |	জ্ঞা রা জ্ঞা মা |	জ্ঞঋা -া সা -া ‖
দা ০ সী ০	- - ক্যোঁ ০	বি সা ০ র	ডা - রী -

* পেজ = প্রতিজ্ঞা। ভীল = কিরাত, নিষাদ।

{ দা মা দা ণা | র্সা -া র্সা -া | ণা -া র্সর্রা র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা র্ঋা র্সা
দ্রো প দী কী লা - জ - রা - থী ০ ০ ০ ০ স ব

১´ ০ ১´ ০
ণা ণা র্সা র্সা | ণদদা -া পা -া } | জ্ঞা জ্ঞা পা -া | পা পা -া পা |
ছ্ থ সোঁ নি বা ০ - রী - প্র হ লা - দ পে - জ

১´ ০ ১´ ০
জ্ঞপা দণা ধা ণা | পা ণা দা পা | ম্া মা -া মা | জ্ঞপা দণা দা পা |
পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রী নৃ সিং - হ দে ০ ০ ০ ০ হ

১´ ০
মজ্ঞা রজ্ঞা মা জ্ঞরা | সঋা জ্ঞা ঋা সা ||
ধা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ রী

১´ ০ ১´ ০
ণ্া ণ্া সা রা | জ্ঞা -া মা মা | জ্ঞা -া জ্ঞা রা | জ্ঞা ঋা সা সা |
ভী ল নী কে ঝু - ০ ঠে বে - র থা ০ য়ে ক ছু

১´ ০ ১´ ০
সা ঋা ণ্া ণ্া | সা রা জ্ঞা মা | জ্ঞা -া সা জ্ঞা | ঋা -া সা -া |
জা ০ ০ ত ন ০ ০ বি চা - ০ ০ ০ - রী -

১´ ০ ১´ ০
সা সা পা -া | পা পা -া পা | দা -া পা মা | জ্ঞমা পা মা -া |
কু ব জা - সোঁ নে - হ লা - ০ ০ ০ ০ ০ য়া -

১´ ০ ১´ ০
জ্ঞা -া মা মা | মা জ্ঞমা জ্ঞা মা | জ্ঞা -া ঋা -া | -া -া সা -া ||
গৌ - ত ম কী না ০ ০ রী তা - ০ - - - রী -

১´ ০ ১´ ০
{ জ্ঞা মা দা ণা | র্সা -া র্সা -া | র্সা র্ঋা র্সর্ঋা র্জ্ঞা | র্ঋসা ণা র্সা র্সা |
প্যা ০ ০ সী ফি - রেঁ - দ র শ ০ ০ ০ ০ ০ বি ন

১´ ০ ১´ ০
দা ণা র্সর্রা র্জ্ঞা | -া -া র্রা ণা | ণা -া র্সা র্জ্ঞা | র্ঋা -া র্সা -া } |
ত ল কোঁ ০ ০ - - মো হে কা - হে বি সা ০ রী -

১ˆ ০ ১´ ০
সর্ᐟা -া ণদা -া | -া -া পা -া | পা পা দা দা | দপা মা পা মা |
মী - রা - - - কোঁ - দ র শ ন দী ০ ০ ০ জে

১´ ০ ১ ০
জ্ঞা পা সা পা | দা -া স্মা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা মা | জ্ঋা -া সা -া ||
গি রি ধ র অ - প নি ঔ ০ র নি হা - রী -

তিব্বত

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণ

লিপুলেখ গিরিবর্ত্মের ওধার থেকে তিব্বত চোখে প'ড়ল। একদিকে হিমালয় বিশাল শ্যামল বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে তার



সুসজ্জিতা ভোটরমণী—তিব্বত যাবার পথে ভারতের উত্তরতম প্রান্তে এদের বাস

দিগন্তবিস্তৃত বাহু দিয়ে ভারতের সীমা নির্দ্দেশ কোরছে; অন্যদিকে বালুময় তিব্বতের গৈরিক মালভূমির ওপর তুষার-মণ্ডিত ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী। তিব্বতের পাহাড়গুলো বর্ণ-বৈচিত্র্যে অপূর্ব্ব, তবে তাদের মধ্যে হিমালয়ের বিশালতা ও কাঠিন্য নেই—অধিকাংশই বালি পাথরের।

কঠিন তুষারপথের ওপর দিয়ে গিরিবর্ত্ম থেকে তিব্বতের বুকে নেমে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে একটা ছোট গ্রাম পেলাম। ভালুকের মত লোমশ ও দীর্ঘকায় কুকুর-

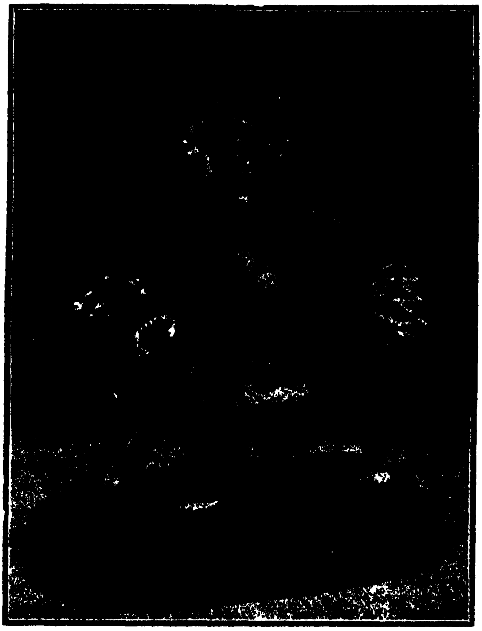


কৈলাস চূড়া—তিব্বত

গুলো বিদেশী দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল, গ্রামের ছেলে বুড়োর দল প্রবল ঔৎসুক্যে তাদের হাতের কাজ ফেলে আমাকে দেখতে লাগলো।

কি নোংরা ও দরিদ্র এরা! পরণের লম্বা আলখাল্লা-গুলো বিশ্রী তেল চিট্‌চিটে ময়লা, শত তালি দেওয়া, চিমটী

কাটলে নিশ্চয়ই অনেকটা ময়লা উঠে আসবে। চোখের কোণে পিঁচুটী জমা হয়েই চোলেছে, দাঁত মাজার হাঙ্গামা মা-বাপ শেখায় নি। মাথায় মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেণী-



একটি তিব্বতী দেবমূর্ত্তি

বদ্ধ লম্বা চুল। অনেকগুলো ছোট ছোট বেণী তৈরী কোরে সেগুলো আবার একসঙ্গে বেণীবদ্ধ করে। সম্ভবতঃ বছরে একবার এই বেণী খোলার প্রয়োজন হয়, কারণ বাঁধবার সময় এত প্রচুর পরিমাণে থু থু ব্যবহার করে যে তার জন্ম আর বাঁধবার গুণে বার বার বেণী খুলবার দরকার হয় না। যারা গরীব তারা পশমের বা ভেড়ার চামড়ার জামা ব্যবহার করে। চামড়ার লোমশ দিকটা ভেতরে রাখে। 'শোম্বা' বা পশমের বিচিত্র-বর্ণের হাঁটু পর্য্যন্ত জুতো প্রায় সকলেই পরে। মেয়েরা দেখতে অতি কুশ্রী, সহসা বোঝা মুস্কিল—কে মেয়ে এবং কে পুরুষ। মেয়েদের কারু মুখে স্ত্রীসুলভ কমনীয়তা বা শ্রী চোখে পড়ে নি, সবারই মুখে একটা কাঠিন্য ও পুরুষালির ছাপ। যদিও এরা খুব ফর্সা কিন্তু প্রকৃতির উপদ্রব—শীতে এবং হাওয়ায় এদের মুখ হাত লালচে কালো। তার ওপর মেয়েরা মুখে একরকম রঙ মাথে তাদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখতে—এ একটা প্রাচীন প্রথা। মেয়ে পুরুষ সকলেরই মুখগুলো চাড়ীর মত বড়, হনুগুলো সুস্পষ্ট।

দিগন্তবিস্তৃত মালভূমি মরুভূমির মত ধুধু কোরছে, তার মধ্যে কদাচিৎ কোথাও ডুএকটা ক্ষীণ জলধারা দেখা যায়। এদেরই কোনটার আশেপাশে কলাই, সরষে, ভুট্টা ও গমের চাষ হয়। তিব্বতের আয়তনের তুলনায় তার কর্ষণযোগ্য জমি নগণ্য। ব্যবসাবাণিজ্যও বিশেষ কিছু নাই; শুধু সোহাগা, নুন এবং সামান্য কিছু সোনা ও মৃগনাভী তিব্বত বিদেশে রপ্তানী করে; তার বদলে সে বাইরে থেকে কেনে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড়, বিলাসের যা কিছু। তাই এরা সাধারণতই দরিদ্র। অল্পদিনের মধ্যেই তিব্বতে জীবন একঘেয়ে হোয়ে উঠল। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও সামাজিক জীবনে এমন বৈচিত্র্য কিছু নাই যা বিদেশীকে বেশীদিন আটকে রাখতে পারে। কিছুদিনের মধ্যেই এখানকার রিক্ততা এবং এক-ঘেয়েমী থেকে মুক্তি পাবার জন্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো। বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক



পার্ব্বত্য পথ

কাটিয়ে 'দারু'-পায়ী নোংরা তিব্বতীদের মাঝে এই মরুভূমিতে বেশীদিন থাকতে কার ভাল লাগে। বাইরের জগতে প্রলয় ঘটলেও এখানে তার সংবাদ পাওয়া যাবে না; সম্ভবত এই এক-ঘেয়েমী কাটাবার জন্যই তিব্বতে 'দারু' বা 'ষান' চলে অবারিতভাবে। ঘরে ঘরে মদ তৈরী হয়; প্রায় প্রত্যেক মেয়ে পুরুষেই তাদের আলখাল্লার মধ্যে কাঠের বোতলে মদ পুরে রাখে এবং খেয়ালমত বা দুই পরিচিতের মধ্যে দেখা হোলে কাঠের বাটীতে মদের আদান প্রদান চলে; আর তেমনি চলে চা—এদের চায়ের প্রস্তুত প্রণালী আলাদা। গরম জলে কাঁচা চায়ের পাতা বহুক্ষণ ধরে সিদ্ধ হয় এবং পরে কাঠের কাপে নুন এবং এক ঢেলা মাখন বা চর্ব্বি সহ পরিবেশিত হয়। দুধচিনির সম্পর্কহীন এই চা পান করা আমাদের কর্ম্ম নয়। যদিও তিব্বতীয়রা বৌদ্ধ, তবুও মদমাংসে ওদের অরুচি নাই, অধর্ম্মও হয় না। সম্ভবতঃ আবহাওয়ার শৈত্য এর জন্যে দায়ী।

সত্যি কি বিশ্রী আবহাওয়া এখানকার। আমরা গিয়েছিলাম আষাঢ় শ্রাবণ মাসে, তখনই রাত্রের প্রবল শীত অসহ্য মনে হোত। মুখের ও হাতের চামড়া—যে অংশগুলো ঢাকা থাকতো না—ফেটে চৌচির হোয়ে কালো হ'য়ে গিয়েছিল। আষাঢ় শ্রাবণেই মাঝে মাঝে বিকালের দিকে শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাত হোত, কাজেই এখানকার পৌষ মাঘের প্রচণ্ড শীত কল্পনা কোরে দেখতে পারেন। শীতের জন্যই বোধহয় ঘরবাড়ীগুলো বেশী দরজা জানালা বর্জ্জিত এবং পাহাড়ের কোলে কোলে। মাটী এবং পাথরে তৈরী সাধারণ বাড়ীগুলোর মধ্যে গঠনসৌন্দর্য্য কিছু নাই, তবে এগুলি শক্ত নাকি খুব, যদিও লোহা লক্কড়ের সঙ্গে তারা একবারে সম্পর্কবিহীন।

তিব্বতের মজা এই যে দুপুরবেলা এখানে বেশ গরম। প্রখর রৌদ্রে যখন এর বুকের বালি এবং বালি-পাথরের পাহাড়গুলো গরম হোয়ে ওঠে তখন গায়ে জামা রাখা দায়। এই গরমের সঙ্গে প্রকৃতিও রুদ্র হয়ে ওঠেন—দুপুরবেলা হু হু শব্দে হাওয়া চলে। সে হাওয়ায় উৎক্ষিপ্ত বালুকণা ছুঁচের মত হাতে মুখে বিঁধতে থাকে। তবে এই হাওয়ার জন্যেই দিনের গরমটা অনেক কম থাকে। রাত্রে শান্ত প্রকৃতি ক্রমশঃই শীতল হয়ে উঠে লেপের ভেতরে জামা কাপড় মোড়া দেহটাকে কাঁপিয়ে দিতে থাকে।

বৌদ্ধ 'লামা' (ভিক্ষু) এবং গোম্বার (মঠের) জন্যে তিব্বতের প্রসিদ্ধি আছে, এর কারণ প্রায় প্রত্যেক পরিবারের ছোট ভাইকে ভিক্ষু হোতে হয়, এই এখানকার রেওয়াজ।

অবিবাহিত যুবকেরা মাথায় টুপী পরেনা, পিঠে বেণী দোলায়; কুমারীরা বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত কেশ বিন্যাস করেনা বা মাথায় কোন অলঙ্কার পরেনা। একটী সমগ্র পরিবার অর্থাৎ সকল ভাই একটী মাত্র মেয়েকে বিয়ে করে; এই স্ত্রী সকলেরই ঘরণী। এর ছেলেমেয়েরা বড় ভাইকে বাবা বলে, অন্য ভাইদের 'কাকা' বলে। বড় ভাই মারা গেলে ছেলেরা বাপের সম্পত্তির মালিক হয়, তাতে কাকাদের আপত্তি চোলবে না। শুনলাম যদি ভাইদের সংখ্যা মাত্র দু'তিনজন হয়, তাহলে গৃহিণী অন্য আর একটী স্বামীকে পতিত্বে বরণ কোরে তাকে শুদ্ধ নিয়ে ঐ পরিবারে বাস কোরতে পারে। আবার কেউ কেউ বোল্লে তা নয়; সাধারতঃ ভাইএর সংখ্যা বেশী হোলো দুতিন ভাই স্ত্রীর সঙ্গে বাস করে, বাকী ভাইরা হয় বিদেশে থাকে, নয় 'লামা'



তিব্বতের চিরতুষারাবৃত প্রবেশপথ

হয়। সম্ভবতঃ এ ব্যাপারটা ব্যক্তিগত রুচি এবং সংস্কারের ওপর নির্ভর করে। মেয়েদের সংখ্যা-লঘিষ্ঠতাই এই প্রথার মূল কারণ। তাছাড়া ওরা বলে—একটী মাত্র স্ত্রী গৃহের কর্ত্রী হওয়ায় গৃহবিচ্ছেদ হয় না, যদিও ভাই ভাইএ মনোমালিন্য যথেষ্ট হবার সম্ভাবনা। বিয়ের এমন চমৎকার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। বড়ভাইএর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ কোরতে পারে, তাতে অন্যান্য ভাইদের সম্মতির প্রয়োজন হয় না। স্বামীর দেওয়া গহনা হাত থেকে খুলে দিলেই বিবাহ বিচ্ছেদ হোল। নয়টী বিবাহবিচ্ছেদের পর স্ত্রীলোক বিধবা বোলে গণ্য হয়। স্বামীদের কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছেদের উপায় নাই। নারী এখানে দুর্ল্লভ বোলেই তাদের সম্বন্ধে সামাজিক আইন এক-চোখো। 'আঁনে' অর্থাৎ স্ত্রীর খাতির এখানে সব পরিবারেই খুব বেশী।



তিব্বতী ঝব্বু ও ঝব্বু পালক

এখানকার বিবাহযোগ্য বয়স সাধারণত ২২ থেকে ২৫ বৎসর। ছেলে মেয়েদের মাবাপ বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ঘর বর ঠিক মিল্‌লে বিয়ের ব্যবস্থা হয়। মেয়ে যায় বরের বাড়ী, মেয়ে বিদায়ের সময় আমাদের দিকের মতই মা বাপ আত্মীয়স্বজন কান্নাকাটী করে। রাস্তায় মেয়ে পক্ষ ৩টী এবং পাত্র পক্ষ ৩টী ভোজের ব্যবস্থা করেন। পাত্র পক্ষের সদর দরজা কিন্তু বন্ধ থাকে, পাত্রী পৌছানোর পর একজন মন্ত্রপূত তরবারি দিয়ে সদর দরজার সামনের ভূতপ্রেত, যারা কন্যার সঙ্গে হয়ত এসেছে, সব তাড়িয়ে দেয়; তারপর কনে ঢুকতে পায়। পাত্রের মা দই ছাতু মাখন দিয়ে পাত্রীকে গ্রহণ করেন। এরপর পাত্রীকে এবং বিবাহ সভায় যারা উপস্থিত থাকে সকলকে এক এক টুকরো রেশম দেওয়া হয়—এইটাই বিবাহ বন্ধনের নিদর্শন। এরপর ভোজ্য পেয়ের ব্যবস্থা। এটা শুনেছি ভদ্রমতে ব্যবস্থা। সাধারণ বিবাহের ব্যবস্থায় আর একটু বৈচিত্র্য আছে। পাত্র সদলবলে মনোমত পাত্রীর বাড়ী যায়, তাদের দেখবামাত্র পাত্রীপক্ষ সদর দরজা বন্ধ কোরে দেয় এবং ঢেলা, গোবর, আবর্জ্জনা প্রভৃতি ছুঁড়ে পাত্রপক্ষকে সম্বর্দ্ধনা করে। এমন মধুর সম্বর্দ্ধনা সহ্য কোরেও পাত্রপক্ষ যদি তিনদিন অপেক্ষা করে, তবে পাত্রীর বাড়ীর দরজা খুলবে এবং তখন ভোজ্যপেয় দিয়ে যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন হবে; কিন্তু যদি পাত্রীপক্ষের পাত্র পছন্দ না হয় তাহলে দরজা আর খুলবেনা। বিয়ে স্থির হোলে পাত্রকে 'কন্যাপণ' দিতে হয়।

বিয়ের মত শব সংকারের ব্যবস্থাতেও উৎসব ও বৈচিত্র্য আছে। জলে, মাটীতে, আগুনে এবং শকুনি মারফত শবদেহের সংকার করা হয়। সাধারণত শব দেহকে খণ্ড খণ্ড কোরে শকুনি দিয়ে খাওয়ান হয়। বসন্ত রোগে কেউ মারা গেলে তাকে মাটীতে পুঁতে ফেলে। শব সংকারের পর পূজার্চ্চনা ও ভোজের ব্যবস্থা আছে।

এদের পূজার বীজমন্ত্র "ওম্ মণিপদ্মে হুম।" এইমন্ত্র যেখানে সেখানে লেখা দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে ধারে বহু পাথরের স্তূপ এবং এক একটা লম্বা দেওয়াল দেখা যায়—এগুলিকে বলে "ছোরটেন"। এইধর্ম্মস্তূপ-গুলির পাথরে "ওম্ মণিপদ্মেহুম্" অক্ষরগুলি হয় খোদিত, নয় শুধু লেখা থাকে। যে কোন ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতী তাদের পাশ দিয়ে যাবে, সেই ঐ কথা কটী লিখে একটী পাথর "ছোরটেনে" যোগ দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় কোরবে। সর্ব্বদাই এগুলিকে ডাইনে রেখে পথ চোলবার রীতি। এগুলির ওপর রঙ বেরঙের পতাকা বা ছেঁড়া ন্যাকড়া ওড়ে, সেগুলোও ভক্তদের দান। তিব্বতের সকল লামার হাতেই একটী কোরে 'মণিচক্র' থাকে। এই চক্রটীর মাঝে একটী কাগজে বহু সংখ্যক 'ওম্ মণিপদ্মে হুম্' বীজমন্ত্র লেখা থাকে মন্ত্রটী এক একবার ঘোরার সঙ্গে ঐ মন্ত্র ততবার উচ্চারণের ফল লাভ হয়। এই বীজ মন্ত্রটীর অর্থ কতকটা এই 'হে পদ্মস্থিত মণি আমি তোমাকে প্রণাম করি"।

তিব্বতীরা সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু। ভিক্ষুককে তারা

সহজে দ্বার থেকে বিমুখ করেনা। ধর্ম্ম মন্দিরে গেলে মন্দিরদ্বারে কিছু কিছু প্রণামী সকলেই দেয়, সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত বীজমন্ত্র যতবার সম্ভব উচ্চারণ করে। তাই বলে তিব্বত দেশটা শুধু ধার্ম্মিকেই ভর্ত্তি নয়। চোর ডাকাতের সংখ্যাও এখানে যথেষ্ট। যারা পেশাদার ডাকাত নয়, তারাও সুযোগ সুবিধা পেলেই বিদেশীর সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়। একটা কোরে গাদা বন্দুক এবং তরবারী ও ছোরা নিত্য সহচর। ঘোড়ায় চড়ে সশস্ত্র বলিষ্ঠবপুগুলি যখন পাশ দিয়ে পেরিয়ে যায় বা আশে পাশে মন্থরগতিতে চলে তখন সত্যিই বুকটা কাঁপে। আমাদের সঙ্গে একটা রিভলবার, একটা বন্দুক এবং একটা তিব্বতী গাদা বন্দুক থাকা সত্ত্বেও দুবার আমাদের ওপর আক্রমণের চেষ্টা কোরেছিল, তবে ওরা বিলিতী বন্দুককে ভয় করে খুব এবং তাই ওদের লোভ খাবার বা টাকার চেয়ে বেশী এই বন্দুকের ওপর।

মুখস-নাচ তিব্বতীদের একটা প্রিয় উৎসব—এটা শুধু আনন্দের উৎসব নয়—এরসঙ্গে ধর্ম্মও খানিকটা মেশান আছে। এক একজন লামা এক একটা বিরাট বীভৎস শিঙওয়ালা মুখ পোরে বিকটভাবে নাচে।

এদের পরিধানে বেশ জমকালো পোষাক থাকে, হাতে থাকে ছুরি। প্রথমটা ধীরে ধীরে আরম্ভ কোরলেও দামামার তালে তালে নাচ ক্রমশঃ রুদ্র হোয়ে ওঠে।

তিব্বত বহুমূল্য ও প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রায় প্রতি 'গোম্বায়' বা ধর্ম্মমন্দিরে শতশত পুঁথি আছে, কিন্তু ভাষা না জানার জন্যে এগুলি সম্বন্ধে আমার জানবার কোন সুযোগ হয় নাই। এখানে বৌদ্ধমত ও তান্ত্রিকতা মিশিয়ে একটা শঙ্করধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় প্রতি মন্দিরেই বুদ্ধমূর্ত্তি এবং তারা ও মহাকালের মূর্ত্তি আছে। অনেক মঠে শিবলিঙ্গও আছে; বোধহয় ভারতে হিন্দুদের



তিব্বতী মণিস্তূপ। শবদাহের পর ভস্মাবশেষের সঙ্গে মাটী মিশিয়ে একটি ছোট মূর্ত্তি তৈরী কোরে সেগুলি এই মণিস্তূপের মধ্যের কুলুঙ্গীর মধ্যে রাখে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এক একটি পৃথক স্তূপ রাখা হয়; সাধারণ লোকদের ভস্মাবশেষে তৈরী মূর্ত্তিগুলি তিন চারটি একসঙ্গে রাখা হয়

মধ্যে যখন যে মত প্রবল হোয়েছে তারই খানিকটা প্রভাব তিব্বতের ধর্ম্মমতের ওপরেও পড়েছে।

ভারতবাসীর কথা

শ্রীধ্রুবচন্দ্র মল্লিক

প্রবন্ধ

ভাষা, ধর্ম্ম ও স্বভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জাতি ভারতের অধিবাসী। ১৮,০৮,৬৭৯ বর্গ মাইলের উপর শ্বেত ও পীতবর্ণ ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮ নরনারীর বাস। এ' সংখ্যা মনুষ্যজগতের পঞ্চমাংশ। কৃষ্ণকায় মানবের দর্শন মিলিলেও সে সংখ্যা অল্প এবং তাদের সহিত কাফ্রিদের কোন প্রকার সাদৃশ্য না থাকায় তারা 'কালা-আদমি' বা নিগ্রো নয়। বন্য ও জঙ্গলা মানুষের অবস্থিতি সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। কোল, ভিল, সাঁওতাল প্রভৃতি অনুরূপ জাতি বর্ব্বর-শ্রেণীভুক্ত। দ্রাবিড় জাতি ভারতের আদিম অধিবাসী, আর্য্যেরা সর্ব্বপ্রথম ইহাদের আক্রমণের পর উত্তরপূর্ব্ব মার্গ হ'তে ভারতে প্রবেশ করে। এই সকল জাতি হ'তেই আমরা পুরুষানুক্রমে কালের গতির সাথে ভেসে চলেছি। কোন্ দেশে মানুষের প্রথম সৃষ্টি এবং কোন্ দেশে মানুষের প্রথম বাস তার সঠিক কিনারা মেলে না। অতীতের ভেসে আসা যা কিছু

সম্পদ—নানা প্রকার যুক্তির সংমিশ্রণে মীমাংসার সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে, তাহাই আদি মানবের ইতিহাস।

জলবায়ুর তারতম্যের উপর জনসংখ্যার আধিক্য ও স্বল্পতা বিশেষরূপে নির্ভর করে। উর্ব্বর ভূমি, উত্তম জলবায়ু এবং বারিপাতের প্রাচুর্য্য যেখানে বেশী সেখানে মানুষের বসবাস অধিক। জাহ্নবী-তীরস্থ স্থানসমূহে তা পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কারণও আছে। নদী, রেল, কয়লা, লৌহ-আকর প্রভৃতি ভূতত্ত্বসংক্রান্ত সুবিধা ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়তায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি করে। মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে সমস্তই স্পষ্ট হ'য়ে পড়ে। খুব বেশী বসবাসের স্থানগুলি লাল রঙে ঘোর। সবুজবর্ণ স্থানগুলিতে অধিক লোকের বাস এবং অন্য রঙ বিশিষ্ট স্থলে বসতির তারতম্য আছে। আর্য্যাবর্ত্ত, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সমুদ্রতীরস্থ মালভূমি, ট্রাভাঙ্কোর ও কোচিনের কোন কোন স্থলে প্রতি বর্গ মাইলে ছয় শত লোকের বাস।

বহুদিন পূর্ব্বে যখন নগর বা সহরের অস্তিত্ব ছিল না তখন সকলের পল্লীতেই বাস ছিল। ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত নানা প্রকার উন্নতির পর সহরের উৎপত্তি হ'য়েছে। ভারতে বড় সহর মাত্র ৩৮টী এবং বাকি সাত লক্ষ গ্রাম—তার মধ্যে মধ্যম ও ছোট সহরের সংখ্যা ২৫৩৭। পল্লীতে শতকরা ৮৯ জন লোক বাস করে। কেমন সে মেঠো বুনো আড়ম্বরহীন পল্লীর শোভা। প্রকৃতি যেন সেখানে বসেই তার অবস্থিতি জানায়। আমরা থাকি কোলাহলমুখরিত সহরের মধ্যে, পল্লীর উৎজাত চাল ডাল তরিতরকারী খাই। সিনেমা দেখি। মটর, বাস, লরী চলে গেলে পেট্রলের গন্ধ কি বিটকেল লাগে। আর পল্লীতে বৃষ্টির পর সোঁদা সোঁদা গন্ধ কি মিষ্টি! মনে হয় কিসের একটা শুভ্রতা। চন্দ্রমার অমল জ্যোৎস্না নিথর নিশীথে পল্লীর আঁকা-বাঁকা পথের উপর হাসে, আর কৃত্রিম আলোয় উদ্ভাসিত সহরের পথে রিক্স গাড়ীর ঠুঙ-ঠুঙ শব্দ—মধ্যে মধ্যে মটরের হুস্ হুস্ গতি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। পল্লীবাসীরা কি সরল! হৃদয় খোলা—মন খোলা প্রাণ। আড়ম্বর দেখিয়ে সহরের লোক কত প্রকারে ঠকায়। ঐরূপ পল্লীতে আমাদের ৮৯% ভাই বোন দাদা-দিদিরা থাকেন। বাঙ্গালায়—কলিকাতা, ঢাকা ও অন্যান্য ছোট সহরে মানবের বাস হাজারে ৬০ জন।

পৃথিবীতে জনসংখ্যার উচ্চতর নিদর্শন ছিল চীনে। এখন ভারতের লোকসংখ্যা চীনকে অতিক্রম করেছে। মাদ্রাজে নারী পুরুষ অপেক্ষা হাজারে ২৫টী বেশী এবং পাঞ্জাবে ১৬২টী কম। ভারত ললনার আধিক্য ও স্বল্পতা এই দুটী প্রদেশেই মেলে, বাঙ্গালায় বিধবার সংখ্যা খুব বেশী। ভারতে ১৫·৫% বিধবার মধ্যে নারী সংখ্যার প্রতি হাজারে ২২৬টী বিধবা বাঙ্গালায় আছে। এতগুলি বিধবার স্থলে বিবাহিত নারী হ'লে লোক বৃদ্ধি যে কত হ'ত তার হিসাব জানি না। সম্প্রতি শতকরা ৪৭টী নারী এবং ৫৩টী পুরুষ ভারতের অধিবাসী, সেজন্য উভয়ের বিবাহ হ'লে বিধবা নারীর উদ্বৃত্ত যে থাকতো না, তা খুব প্রাঞ্জল। এত বিধবার বর্ত্তমানেও এখন ১০·৬% জনসংখ্যার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত শারীরিক অবনতিও হ'য়েছে। পূর্ব্বের মত জীবনের দীর্ঘত্ব আর নেই। প্রতিদিন ২১,২০০০ নরনারীর মৃত্যু হয়, প্রতি মিনিটে চারিটী শিশু জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে এ' জগৎ ছেড়ে চলে যায়। কলেরা, ম্যালেরিয়া ও বসন্ত রোগে কত জীবন যে স্তিমিত হয় তার সঠিক হিসাব নেই। দশ বছরের গড়পড়তায় দেখা গেছে যে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রতি মিনিটে দশজন, বসন্ত রোগে প্রতি ঘণ্টায় আটজন এবং কলেরায় প্রতি দিনে ৭৮৯ জন প্রাণত্যাগ করে। মধ্যপ্রদেশে মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং আসামে খুব কম। অনেকের অনুমান যে লোকসংখ্যার আধিক্যই না কি নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির আমন্ত্রক। জানি না তাঁদের এ-অনুমান অমূলক কি না!

বার্ম্মায় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অনেক। সেখানে শতকরা পঞ্চাশ বৎসর উর্দ্ধে ১১·৩ জন মানব হ'তে জানা যায় যে তারা দীর্ঘায়ু। আর এদিকে বাঙ্গালী জাতিই বোধ হয় স্বল্পায়ু হ'য়ে পড়েছে। নানা প্রকার সংক্রামক রোগের প্রাবল্য, জীবনীশক্তি লুপ্ত, খাদ্যবস্তু এবং তার উপরে দীনতা বাঙ্গালীকে বেশী দিন বাঁচতে দেয় না। মধ্যপ্রদেশে মৃত্যুসংখ্যার হার বেশী বটে কিন্তু সেখানের সঠিক সংবাদ আমার অজানা হ'লেও, জলবায়ু বাঙ্গালা অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয় এবং সেখানের লোক কেবল খাদ্যপ্রাণহীন 'কলে'-ছাঁটা চাউলের—মাড় ফেলে দিয়ে—ভাত খেয়ে জীবনধারণ করে না। জীবনের দৈর্ঘ্যে ভারতবর্ষ সকলের নীচে—ইহার সহিত অন্যান্য দেশের মৃত্যুসংখ্যা এবং প্রত্যাশিত জীবনের দৈর্ঘ্য দেওয়া গেল।

প্রত্যাশিত জীবন

	সাধারণ দৈর্ঘ্য
ইংল্যাণ্ড	৫২·৫
ইউনাইটেড-ষ্টেটস (আমেরিকা)	৫১·৫
ফ্রান্স	৪৮·৫
জার্ম্মাণী	৪৭·৪
জাপান	৪৪·৩
ভারতবর্ষ	২২·৭

মৃত্যুসংখ্যা (১০০০এ)

	১৯১১	১৯২৫
ইউনাইটেড-ষ্টেটস, আমেরিকা	১২·৯	১১·৫
ইংলণ্ড	১৪·৬	১২·৫
ফ্রান্স	১৬·৭	১৩·৫
জার্ম্মাণী	১৬·৪	১৩·৬
ভারতবর্ষ	৩০·৫৯	২৭·২

পাগল, কালাবোবা, অন্ধ ও কুষ্ঠীরা অতি দুঃখে দিন যাপন করে। অপরের উপর নির্ভর ব্যতীত অন্য উপায় নেই। আমাদের দেশে এদের রক্ষার্থে যে অর্থব্যয় হয় তা অপর্য্যাপ্ত। কোন প্রকারে দিন কেটে চলে। অনেকের কোন দিন আহার জোটে, কোন দিন জোটে না। কেহ বা



Bharatvarsha Printing Works

দোলযাত্রা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেরম্বকুমার গাঙ্গুলী

দেখে। লোকের কাছে তারা যেন আবর্জ্জনার রূপান্তর। এ'দের শতকরা সংখ্যা এই—

	পুরুষ	নারী
পাগল	·০০১৩	·০০০৮
কালা বোবা	·০০২৯	·০০১৯
অন্ধ	·০০৫৭	·০০৫৯
কুষ্ঠী	·০০১৭	·০০০৭

ভারতীয় নানা জাতির মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। শতকরা ৬৮·২ জন হিন্দু, ২২·১৬ জন মুসলমান এবং বাকি শিখ, জৈন, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রভৃতির বাস। এই সকল জাতি গঠিত ১৮টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু শিক্ষিত লোকের সংখ্যা মাত্র ৮%। পরদার পদ্ধতি থাকায় শিক্ষিত মহিলা খুবই কম। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শিক্ষিত লোক বার্ম্মায়, তারপর মাদ্রাজে, বাঙ্গালায়, বোম্বেতে, আসামে, বিহার-উড়িষ্যায় ইত্যাদিতে। স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে উন্নত ট্রাভাঙ্কোর, কোচিন, বরোদা ও মহীশূর। আমাদের ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই অল্প, কিন্তু ডেনমার্ক ও জার্ম্মাণীতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শিক্ষিত, অথচ ঐ শিক্ষিতদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার, মেথর, চাকর, কুলি, মজুর, সকল প্রকার লোকই আছে। ইউনাইটেড ষ্টেটসে শিক্ষাপ্রাপ্ত শতকরা ৯৫·৫ পুরুষ, ৯১ নারী এবং ইংলণ্ডে ৯৭·৪ ও ৯১·৫—কিন্তু ভারতে ৫·২ পুরুষ ও ১·৫ নারী। এখানে সকল জাতির মধ্যে পারসীরাই বেশী শিক্ষিত, তারা প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ লেখাপড়া জানে। ইহার পরে বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু, শিখ ও মুসলমান। জৈনের সংখ্যা খুব কম। ভারতে প্রাইমারী স্কুল আছে প্রায় দুই লক্ষ, সেকেণ্ডারী এগার হাজার এবং কলেজ আড়াই শত হ'তে তিন শত। পূর্ব্বে আমাদের বাঙ্গালায় অনেক দেশীয় পাঠশালা এবং টোল ছিল। Mr. Keir Hardie in "India"তে বলেছেন—Max Muller on the strength of official document concerning education in Bengal prior to the British occupation asserts that there were 80,000 native schools, or 1 to every 400 of the population. ইহা হ'তে অনুমান করা চলে যে বাঙ্গালায় শিক্ষার বিস্তৃতি বেশী ছিল।

সর্ব্বসমেত ১২৫টী ভাষা ভারতের অধিবাসীরা বলে থাকে, তার মধ্যে নয়টী দেশীয় ভাষাই চল্‌তি। হিন্দি, বাংলা, তেলেগু, মহারাট্টি, তামিল, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী ও উড়িয়া। ইহা ব্যতীত আরও তিনটী ভাষার চালু আছে—মালয়ালাম, পস্তু এবং আসামী। প্রায় দশ কোটি লোক হিন্দি ভাষা বলে, ৫ কোটি বাঙ্গালা, তিন কোটি তেলেগু এবং অন্য চলতি ভাষা এক হ'তে দুই কোটি।

ভারতে অধিকসংখ্যক লোক কৃষিজীবী। সুজলা, সুফলা দেশে এরূপ না হওয়াই বিচিত্র। অন্য কোন প্রকার কাজের সুবিধা নেই, সেজন্য বাঁচবার উদ্দেশ্যে সকলকে কৃষিজীবী হ'তে হ'য়েছে। তবুও অন্য দেশ অপেক্ষা চাষের কাজে ভারতবাসী খুবই নিকৃষ্ট। কিন্তু তাতেও এমন কিছু এসে যায় না, কারণ দেশের প্রয়োজন হিসাবে যে চাষ বেশী হ'য়ে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু জমির অনুপাতে ফসলের পরিমাণ বড় কম—এটুকুই যা দুঃখের বিষয়। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও নানা প্রকার উপদ্রবের উপর ফসলের হ্রাস ও বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে। সরকার কর্তৃক জমিতে জল সেচনের যে ব্যবস্থা হ'য়েছে তা সমস্ত শস্যজাত জমির $\frac{1}{8}$ ভাগ কার্য্যকরী করে তুলেছে। সেজন্য অনেক কৃষকদের আর আকাশের 'পরে মেঘের আশায় বসে থাকতে হয় না। জলসেচিত মোট জমি ২৯,৮৮৮০০০ একার। এ ব্যবস্থা সকল দিক হ'তেই রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। ফসল ভালই হ'চ্ছে, উপরন্তু ইহা নাকি মিতব্যয়ী, পূর্ত্তকার্য্য নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধায়ক এবং জাতিগঠনের সহায়ক। এ কার্য্যের জন্য রাজস্ব হ'তে ১৫০৮৯ লক্ষ টাকা খরচ হ'য়েছে। এখনও ন্যূনাধিক তিন শত জল-সেচনের ব্যবস্থানুরূপ কাজ হাতে রয়েছে। কিছুদিন পর বোধ হয় ভারতের এ ব্যবস্থা পৃথিবীতে শীর্ষ স্থান অধিকার করবে সেরূপই অনুমান করা গেছে এবং ইহা যদি সর্ব্বপ্রকারে সকল দিক হ'তে সমস্ত জমির উপর কার্য্য করে তাহ'লে ভারতের আশু সম্পদ যে নিকটে তা আশা করা চলে। কিন্তু কত দিনে ব্যবস্থাটুকুর পূর্ণত্ব আস্‌বে তার হিসাব যে অজানা!

এত বড় দেশে ৮৬১৮টা কারখানা বর্ত্তমান, তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং তৎপরে মাদ্রাজ ও বাঙ্গালার স্থান। কারখানার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ১৯৩৩-৩৪এ দুই শত কারখানার উদ্বোধন হ'য়েছে। যত হয় ততই ভাল, কারণ ভারতে শ্রমশিল্পী মাত্র ১০%। এখানে লৌহ-নির্ম্মিত উত্তম যন্ত্রপাতি এবং সব কিছুই বিদেশ থেকে আনাতে হয়। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা কমেছে। অন্যপ্রকার বস্তুও বিদেশ হ'তে আসে। চিনির আমদানিই পর্য্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। পূর্ব্বে ব্যবসা বাণিজ্যে বহু সম্পদ ভারতকে পুষ্ট করে তুল্‌তো। দূর বিদেশে পণ্যদ্রব্য নিয়ে যেতে কত সওদাগরের নৌকাডুবি হ'য়েছে তা অতীতের সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইতিহাসেও লেখা আছে ওলন্দাজেরা যখন এখানে আসে তখন ব্যবসা পূর্ণগতিতে চল্‌তো। তারা কত লুণ্ঠন করেছে। এখন আর সেরূপ ব্যবসা নেই। ভারতে কর্ম্মীর সংখ্যা এই—

কৃষি শিল্প—	৬৬·৪%
শ্রম শিল্প—	৯·৯৫%
ব্যবসা বাণিজ্য—	৫·১৩%
স্থানান্তরে বহন বা প্রেরণ—	১·৫২%

১৯৩১-৩২ সালে মাথা পিছু কর ছিল ৪৸/১১।০, এখন বেড়ে হ'য়েছে ৫৲১০। আমরা এত দীন যে এই কর দিতেই কত কষ্ট বোধ করি কিন্তু অপর দেশের অধিবাসীরা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী দিয়ে থাকে। অন্য দেশের সহিত এ'বিষয়ে মাথা পিছু প্রতি পাউণ্ডে কতটা তারতম্য তার তালিকা এই—

ভারতবর্ষ (৩১-৩২)—	০·৪২ পাউণ্ড (৫·৭ টাকা)
ফ্রান্স (৩১-৩২)—	১০·৯ „
জার্ম্মাণী (৩২-৩৩)—	৭·৮ „

ইটালী (৩২-৩৩)—	৭·৩	„
জাপান (৩২-৩৩)—	১·৭	„
ইউনাইটেড কিংডম (৩২-৩৩)—	১৯·৩	„
ইউনাইটেড ষ্টেটস (আমেরিকা) ১৯৩২	১৭·৩	

এ' হ'তে বেশ পরিষ্কার হ'য়ে পড়ে যে কোন দেশ ধনী। উক্ত দেশগুলির সরকার বেশী কর পান, সেজন্য এ'দেশ অপেক্ষা অধিক ব্যয় করতে পারেন। তালিকার তারতম্যের অনুপাতে সকল দেশে খরচ হ'য়ে থাকে। গেল বছর ভারতে রাজস্ব আদায়ের কথা ছিল ১,২২,৭৬, ৪১,০০০ টাকা এবং খরচ বাবদ উদ্বৃত্ত থাকবে ৬,২৯,০০০ টাকা।

ভারতের উন্নতি হ'য়েছে। কিন্তু সকল দিক হ'তে তার রূপ ও প্রতিভা যে ফুটে উঠেছে এ'কথা বলা চলে না। আদব কায়দার মধ্য দিয়ে শিক্ষার সাথে ভারতের উন্নতি রাজসরকারের নিকট হ'তে। তবে জ্ঞানলাভের প্রথম প্রতিভাটুকু এম্‌নি এসে পড়তো কি না বলা যায় না। প্রগতি বিকাশের কিনারা অজানা থাকে। অনুমানের উপর নির্ভর করে তার পরিণাম। সেজন্য দেশীয় শিক্ষার স্রোতে অতীতের রূপ যে আজও থাক্‌তো তার আভাষ মেলে শাস্ত্রবিশ্বাসীদের নিকট হ'তে। প্রাচীন ও আধুনিক রুচি বিরোধের বিশ্লেষণ অসীমে রাগাই ভাল। বৈজ্ঞানিক উন্নতি মানুষকে চমৎকৃত করেছে, কিন্তু পুরাণের কথা পুর্ব্বে পুষ্পরথ ছিল, যা এখন উড়ো জাহাজ—যোগীরা যোগবলে দূরের সংবাদ জেনে নিতেন, যার সমতা রাখে এখন বেতার যন্ত্র। এমন লৌহ ও ইস্পাত কত দিন হ'তে ভারতে পড়ে রয়েছে যার অনুরূপ আর কেউ তৈরী করতে পারলে না। শিল্প,—যা অট্টালিকা ও ধর্ম্মমন্দিরের উপর রয়েছে, —তার দ্বিতীয়টী আর হ'ল না। এ-কথা কি সত্যি যে এখনকার ইঞ্জিনীয়ার অতীতে মিস্ত্রী ছিল।

নদী প্রবাহের ন্যায় ভারতবাসীর দিন কেটে চলে। জোয়ার ভাঁটার টান মাঝে মাঝে আসে। বন্যার পর নদীগুলি স্ফীত হওয়ার মত কদাচিৎ ভারতের গতি জেগে উঠে আবার স্তিমিত হ'য়ে পড়ে। এমনি যাওয়া আসার মাঝে রঙিন নেশার শত খেলা—আনন্দ ও ব্যথায় দিগন্তে চলে যায়। পড়ে থাকে শুধু তার অস্পষ্ট করুণ সুর। কাণে এসে বাজে—বাতাসের স্পন্দনে। থেকে থেকে কি যেন মনে হয়। অজানাতে হাসে তার রূপ। জানি না সেটুকু আনন্দের না বিষাদের।

জলমগ্ন ব্যক্তির জীবন রক্ষার উপায়

শ্রীসৌরেন বসু

প্রবন্ধ

শরীর উন্নত ও সক্ষম রাখিবার ব্যায়ামসকলের মধ্যে সন্তরণ শ্রেষ্ঠ। ইহার অভ্যাসে কেবলমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের উন্নতি এবং বিশুদ্ধ রক্ত চলাচলের সহায়তা হয়না; ইহাতে মাংসপেশী সকল সুদৃঢ় হয় এবং মানসিক উন্নতি হয়। উপরন্তু সন্তরণ মানুষের অনেক সময় অনেক উপকারে আসে। শুধু নিজেকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই যে সন্তরণ জানা প্রয়োজনীয় তাহা নহে, অপরের জীবন বিপন্ন হইলে তাহাকেও বাঁচাইতে হইতে পারে, সুতরাং সকলেরই সন্তরণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং জগতের সকল শিক্ষার মধ্যে সন্তরণ শিক্ষাও যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

পৃথিবীতে প্রতি বৎসর বহু সহস্র লোক শুধু জলে ডুবিয়া মারা যায়। তাহার মধ্যে সন্তরণে অনভিজ্ঞ অনেক লোক অপরকে উদ্ধার করিতে যাইয়া হয় আপনি—না হয় উভয়েই বিপন্ন হয়। সকলেই কিছু কিছু সন্তরণ জানিলে জলমগ্ন ব্যক্তির সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইত। অতএব সকলেরই পক্ষে সন্তরণ এবং তৎসহিত জলমগ্নব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার পন্থাগুলি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেক সময় বহুলোক অপরকে উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজে বিপন্ন হয়। সুতরাং অপরকে বাঁচাইবার উপায় ও তৎসহিত নিজেকেও নিরাপদ রাখিবার কৌশল জানা বিশেষ প্রয়োজন। জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজের মস্তিষ্ক ঠিক রাখা অত্যন্ত কঠিন। জলমগ্ন-প্রায় ব্যক্তিরও কোন জ্ঞান থাকেনা, সে সম্মুখে যাহা পায় তাহাই অবলম্বন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে উভয়েরই বিপদের সম্ভাবনা। এই

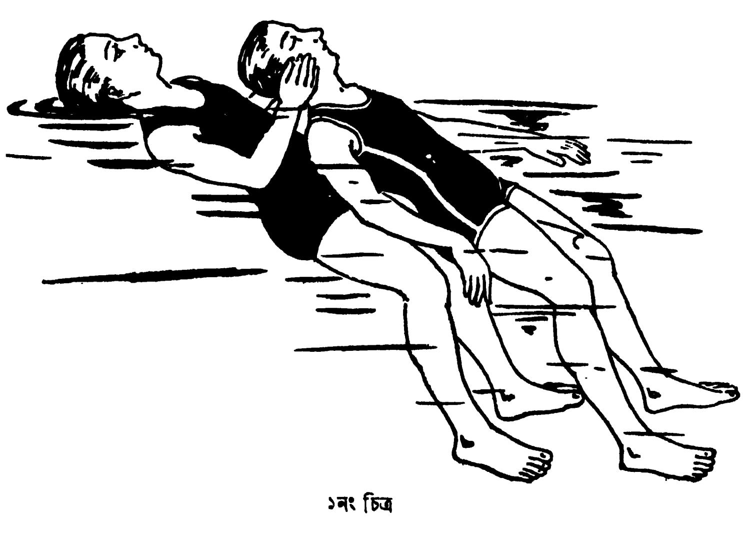
প্রবন্ধে Royal Life-Saving Society কর্ত্তৃক অনুমোদিত জলমগ্নব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার কয়েকটী কৌশল ও নিয়মাবলী দেওয়া হইল। ঐগুলি ভালরূপে অভ্যাস করিয়া রাখিলে বিপদের সময় বিশেষ উপকারী হইবে।

জলনিমগ্ন হইবার সময় যে কোন ব্যক্তি প্রথমতঃ হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, মাঝে মাঝে জলের উপর মাথা তুলিতে থাকে ও সাহায্যের জন্য চীৎকার করিবার চেষ্টা করে এবং এই কারণে জল খাইয়া ফেলে। হঠাৎ জলনিমগ্ন হয় এবং পুনরায় জলের উপর মাথা তুলিতে চেষ্টা করে। আবার যতক্ষণ দম থাকে, ততক্ষণ সে ঐরূপ বাঁচিবার চেষ্টা করে। কখন কখন ডুবিয়া গিয়া আবার মাথা তুলিতে থাকে; এইরূপে বারম্বার নিশ্বাস লইবার জন্য মাথা তুলিতে চেষ্টা করে। কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে এবং পেটের মধ্যে জল ঢুকিয়া যাইলে শ্বাসরোধ হইয়া ডুবিয়া যায়—অনেকের মতে ৩।৪ বার উঠিতে চেষ্টা করার পর ডুবিয়া যায়। এমন অবস্থায় জীবনরক্ষীর মোটেই সময় নষ্ট না করিয়া তৎক্ষণাৎ—যথাসম্ভব সত্বর—জামা কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া জলে ঝম্পপ্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ বিলম্ব হইলে হয় তো মগ্ন ব্যক্তিকে খুঁজিয়াপাওয়া যাইবেনা। জলে ঝম্পপ্রদান করিবার পূর্ব্বে পূর্ণশ্বাস লইয়া এবং জলে নামিয়া এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎ হইতে তাহার দিকে অগ্রসর হইবেন (কারণ সামনাসামনি অগ্রসর হইলে জলমগ্ন ব্যক্তি উদ্ধারকারীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, ইহাতে উভয়েরই বিপদের সম্ভাবনা)। তাহার পর তাহাকে পিছন দিক হইতে ধরিয়া ধীরে ধীরে তীরের দিকে বহিয়া আনিবেন। উদ্ধারের পাঁচটী নিয়ম বা প্রণালী আছে। তাহার বর্ণনার পূর্ব্বে দুই একটী কথা বলিয়া রাখি। জীবনরক্ষিগণ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে জলমগ্নব্যক্তিকে টানিয়া আনিবার সময় তাহার মুখ যেন জলের উপরিভাগে থাকে। আরও লক্ষ্য রাখিবেন যে তাহার যেন কোনরূপ ঝাঁকানি না লাগে। তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিবেন যাহাতে সে মনে করে যে সে নিরাপদ আশ্রয়লাভ করিয়াছে। যদি কোন নদীর মধ্য হইতে আনিতে হয় তাহা হইলে স্রোতের বিপক্ষে না যাওয়াই ভাল, কারণ ইহাতে অনেক দম নষ্ট হয় ও ক্লান্তির সম্ভাবনা।

যদি এমন হয় যে জলমগ্ন ব্যক্তি জলের তলায় চলিয়া গিয়াছে তাহা হইলে জলের উপরিভাগের বুড়বুড়ি লক্ষ্য করিলেই তাহার স্থান নির্দ্দেশ করা সহজ হইবে। জলের স্রোত না থাকিলে সোজাসুজিভাবে এবং স্রোত থাকিলে স্রোতের পক্ষে বাঁকাভাবে বুড়বুড়ি উঠিতে থাকে। অতএব বুড়বুড়ি লক্ষ্য করিয়া জলের নীচে যাইয়া মগ্ন ব্যক্তিকে উবুড় করিয়া শোওয়াইয়া তাহার স্কন্ধে দুই হাত দিয়া ধরিবেন ও বাম পায়ে মাটির উপর জোর রাখিয়া ডান পায়ের হাঁটু মগ্ন-ব্যক্তির কোমরে চাপিয়া তাহার কাঁধ ধরিয়া সবলে টানিলে দুইজনেই সহজে জলের উপর ভাসিয়া উঠিবেন। তাহার পর প্রয়োজনানুযায়ী নিম্নলিখিত যে কোন একটী প্রণালী দ্বারা তাহাকে তীরের দিকে বহিয়া আনিবেনঃ—

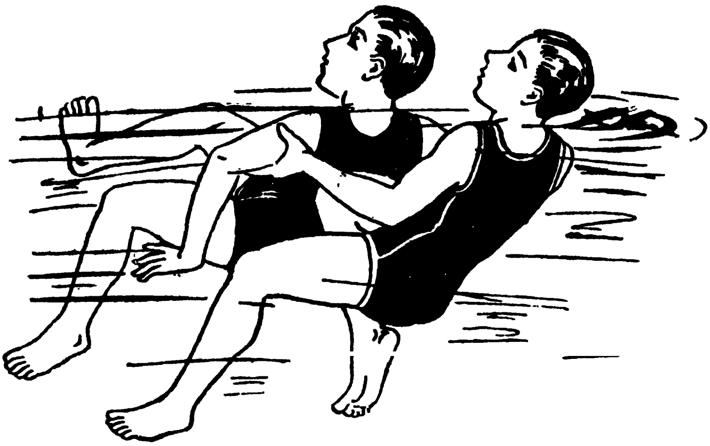
বহিয়া আনিবার প্রণালী

১। জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তিকে চিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা তাহার মাথার দুই পাশে এমন করিয়া ধরিবেন যাহাতে তাহার কাণ দুইটী আপনার হাতের চেটোয় ঢাকা পড়ে।



১নং চিত্র

তাহার পর নিজেও চিত হইয়া তাহাকে আপনার বক্ষের উপরিভাগে রাখিয়া ধীরে ধীরে কেবলমাত্র পদদ্বয় সঞ্চালন পূর্ব্বক চিত সাঁতার কাটিবেন। ১নং চিত্র।



২নং চিত্র

২। যখন দেখিবেন যে জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তি এরূপ ছটফট্ করিতেছে যে তাহাকে আয়ত্তাধীনে আনা কঠিন, তখন তাহাকে পূর্ব্বের মত চিত করাইয়া তাহার হস্তদ্বয়ের



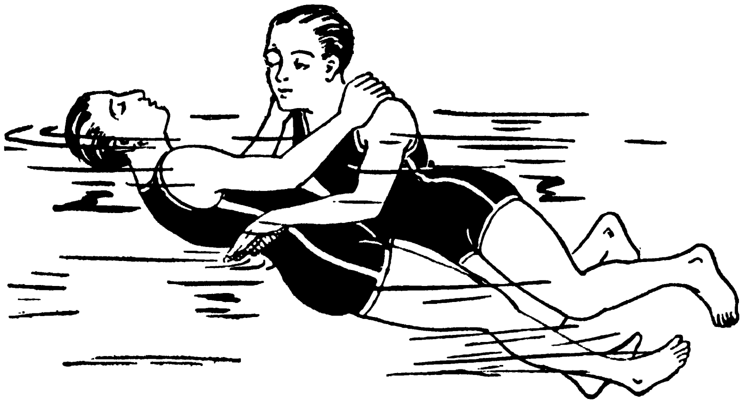
৩নং চিত্র

কনুইয়ের উপরিভাগ শক্ত করিয়া ধরিবেন। তাহার পর তাহার বাহুদ্বয়কে সোজাভাবে উঁচু করিয়া ধরিয়া পূর্ব্বের মত চিত সাঁতার কাটিবেন। এই প্রণালীতে ধরিলে সে কোনরূপ ঝটাপটি করিতে বা তাহার জীবনরক্ষীকে জাপ্টাইয়া ধরিতে পারিবেনা। ২নং চিত্র।

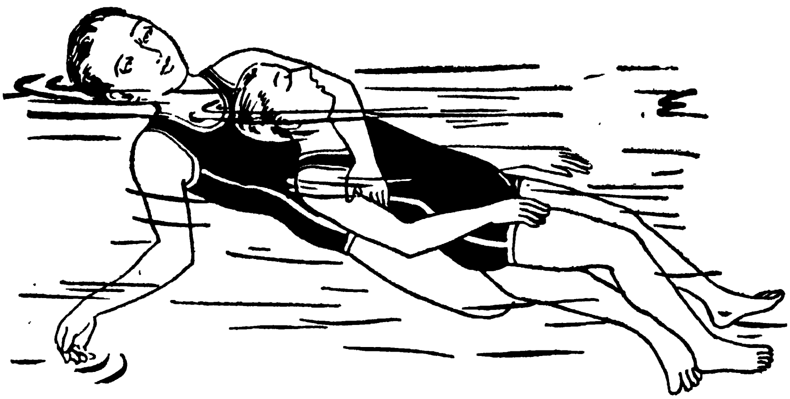
৩। যদি দেখেন তাহার হাত ধরা বড় কঠিন (বা সেই ব্যক্তি খুব মোটা), তাহা হইলে আপনার হাত দুইটিকে তাহার বগলের তলা দিয়া চালাইয়া তাহার বুকের উপরিভাগে রাখিয়া আপনার হস্তের কনুইদ্বয়ের উপরিভাগের সাহায্যে তাহার হাত দু'টিকে উপর দিকে রাখিয়া ঠেলিয়া চিত সাঁতার কাটিবেন। ৩নং চিত্র।

৪। যদি দেখেন সে ব্যক্তি সাঁতার জানে, অথচ ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে অথবা তাহার কোথাও শির টানিয়া ধরিয়াছে বা সে আপনার কথার বাধ্য, এমত অবস্থায় তাহাকে সাহায্যের নিমিত্ত আপনার দুই স্কন্ধের উপর তাহার হাত দু'টিকে সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া ধরিতে দিয়া তাহাকে পিছনদিকে মাথা রাখিয়া চিত হইতে বলিবেন। তাহার পর আপনি তাহার উপরিভাগে উবুড় হইয়া হাত ও পা দুইই সঞ্চালনপূর্ব্বক চিত সাঁতার কাটিতে থাকিবেন। ইহাই সবচেয়ে সহজ পন্থা যাহার দ্বারা তাহাকে অনায়াসে বহুদূর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। ৪নং চিত্র।

৫। উপরিউক্ত অবস্থার নিমিত্ত আর একটী উপায় আছে। যাঁহারা ভাল উপর হাত পাড়ি দিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা খুবই সুবিধাজনক হইবে। এখন আপনার একটা হাত মগ্নপ্রায় ব্যক্তির একটী হাতের তলা দিয়া অথবা একটী স্কন্ধের উপর দিয়া অপর পার্শ্বের বগলের



৪নং চিত্র



৫নং চিত্র

তলা অবধি চালাইয়া দিন। অথবা তাহার জামা কাপড় একহস্তে মুঠা করিয়া ধরিয়া যে কোনরূপে নিজেকে তাহার নিকট হইতে তফাৎ রাখিয়া অপর হস্ত দ্বারা পাড়ি দিয়া অথবা চিত সাঁতরাইয়া যাইবেন। ৫ম চিত্র।

আত্মরক্ষা

জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তিকে যথন উদ্ধার করিতে যাওয়া যায় তথন মগ্নপ্রায় ব্যক্তি তাহার জীবনরক্ষীকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে এবং ইহাতে উভয়েরই বিপদের সম্ভাবনা তাহা বলিয়াছি। এইজন্য জীবন-রক্ষীর নিজেকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার সাধারণ তিনটী উপায় আছে।

১। মগ্নপ্রায় ব্যক্তি যদি আপনার হাতের কব্জি চাপিয়া ধরে তথন আপনার দুই হাতই নীচের দিকে মোচড় দিয়া একটী জোর টান মারিলেই সে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। ৬নং চিত্র।

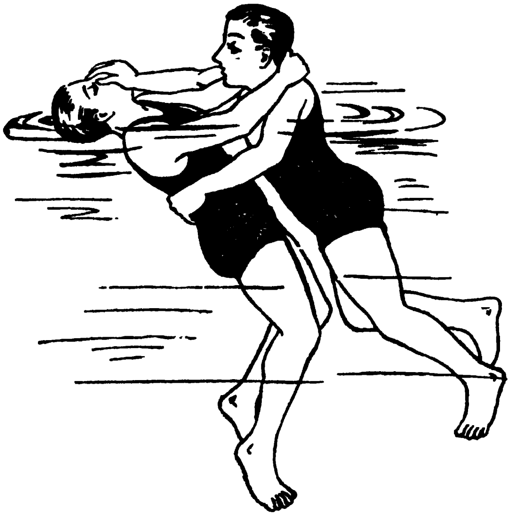
২। যদি সে আপনার গলা জড়াইয়া ধরে, তথন আপনি একটী পূর্ণ শ্বাস গ্রহণ করিয়া মগ্নপ্রায় ব্যক্তির উপর ঝুকিয়া পড়িয়া আপনার বামহস্ত দ্বারা তাহার কোমর ধরুন এবং আপনার দক্ষিণ হস্ত তাহার হাতের উপর দিয়া লইয়া গিয়া অঙ্গুলী দ্বারা তাহার নাক এবং হাতের চেটোর দ্বারা তাহার থুৎনী চাপিয়া ধরিয়া যথাসাধ্য জোরে ধাক্কা মারিলেই সে আপনাকে ছাড়িয়া দিবে। তাহার নাক চাপিয়া ধরিলে সে নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য মুখ হাঁ করিলেই তাহার মুখে জল ঢুকিয়া যাইবে। তথন সে হাঁপাইয়া উঠিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিবে। ৭নং চিত্র।



৬নং চিত্র

৩। আর যদি সে আপনার সমস্ত দেহ জাপ্টাইয়া ধরে, তখন একটী পূর্ণ শ্বাস লইয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আপনার বামহস্ত তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে পিঠের দিক দিয়া আঁকশির মত চাপিয়া ধরুন এবং আপনার দক্ষিণ হস্তের চেটো তাহার থুৎনীর উপর রাখুন; তাহার পর আপনার দক্ষিণ পদের হাঁটু তাহার পেটের উপর লাগাইয়া একই সময়ে দক্ষিণ হস্ত ও হাঁটু দ্বারা জোরে ধাক্কা মারিলে ও আপনার বাম হস্তের দ্বারা তাহার স্কন্ধ জোরে নীচের দিকে টান দিলে সে আপনার আয়ত্তে আসিবে। ৮নং চিত্র।

স্মরণ রাখিবেন যখনি আপনি মগ্নপ্রায় ব্যক্তির বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইবেন তখনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না



৭নং চিত্র

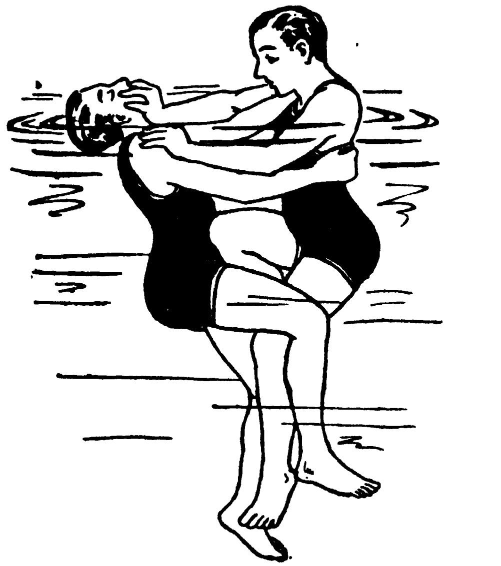
করিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলির যে কোন একটীর দ্বারা তীরের দিকে লইয়া যাইবেন।

শুশ্রূষা

জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে তীরে উঠাইবার পর অবিলম্বে একজন ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন। কারণ অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে জল হইতে উঠাইবার কয়েক ঘণ্টা পরেও কাহারও কাহারও জ্ঞান হইয়াছে। আর একটী কথা, রোগীর জ্ঞান ফিরাইবার জন্য বা পেটের ভিতর হইতে জল বাহির করিবার সময় রোগীকে খুব সাবধানের সহিত নাড়াচাড়া করিবেন।

যদি রোগীর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে মাটিতে উবুড় করিয়া শোওয়াইয়া দিবেন ও জামা কাপড় খুলিয়া দিয়া যাহাতে পুনরায় শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। নিকটে কোন ভীড় হইতে দিবেন না। রোগীর প্রতি কোনরূপ অযত্ন প্রকাশ করিবেন না; তাহার হাত পা মোচড়াইবার চেষ্টা করিবেন না বা তাহাকে দাঁড় করাইবেন না।

যদি রোগীর শ্বাস ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া না যায়



৮নং চিত্র

তাহা হইলে রোগীকে শুধু পাশ ফিরিয়া শোওয়াইয়া দিলে রোগী স্বভাবতঃ আপনিই সুস্থ হইয়া যায়। এমত অবস্থায় রোগীর নাসারন্ধ্রে নস্য, লঙ্কার গুড়া কিংবা স্মেলিং সল্ট প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া

যখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজন হইবে তখন রোগীকে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া আপনি তাহার পার্শ্বে রোগীর মাথার দিকে মুখ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিবেন। তাহার পর আপনার হস্ত দুইটী তাহার কোমরের পিছনদিকে মেরুদণ্ডের উপর

চাপিয়া ধরিয়া দুই হস্তের অঙ্গুলিগুলি তাহার দুই পার্শ্বের পাঁজরার তলা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দিয়া রোগীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে এরূপভাবে চাপ দিতে থাকিবেন যাহাতে মাটির উপর রোগীর পেটে চাপ পড়ে। কিন্তু খুব জোরে চাপ দিবেন না। তাহার পর সোজা হইয়া বসিয়া তৎক্ষণাৎ আবার পূর্ব্বের মত চাপ দিবেন। অনবরত ৪।৫ সেকেণ্ড অন্তর এরূপভাবে চাপ ও আল্‌গা দিবেন। আল্‌গা দিবার সময় রোগীর কোমর হইতে আপনার হাত ছাড়িয়া না যায়। যখন চাপ দেওয়া যায় তখন ফুসফুস্ হইতে হাওয়া বাহির হইয়া যায়, আবার আল্‌গা দিলে হাওয়া ঢুকিতে থাকে। ক্রমাগত এরূপ চাপ ও আল্‌গা দিলে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ না স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয় ততক্ষণ পূর্ব্বোল্লিখিত প্রণালী অনুযায়ী কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া করাইতে হইবে। এই অবসরে অপর লোকের সাহায্যে রোগীর শরীর ও পাঁজরায় ফ্লানেল, পায়ে গরম জলের বোতল অথবা হাত পা ঘষিয়া দিয়া তাহার শরীর বেশ গরম রাখিবেন। রোগীর স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনও তাহার শরীর হইতে ভিজা জামা কাপড় খুলিতে বা তাহাকে কিছু খাওয়াইতে চেষ্টা করিবেন না।

ভালরূপে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাইলে রোগীকে সাবধানে চিত করিয়া শোওয়াইয়া তাহার শরীর গরম করিবার চেষ্টা করিবেন। চিত করিয়া শোওয়াইবার সময় হাত পা মোচড়াইয়া আঘাত না লাগে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। তাহার পর তাহার হাত, পা ও শরীরের সর্ব্বত্র ফ্লানেল কিংবা রুমালের দ্বারা ঘসিবেন। হাত পা প্রভৃতি সর্ব্বদা উপরের দিকে টান দিয়া ঘসিবেন অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত শিরার রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে চালিত হয়। রোগীকে কম্বল প্রভৃতি গরম কাপড়ের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবেন। রোগী একটু সুস্থ হইবামাত্র তাহাকে নিকটস্থ কোন বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহার শরীরে পেটের উপর, বগলের তলায়, উরুর মধ্যস্থলে ও হাত পায়ের চেটোয় গরম জলের বোতল দিবেন। রোগী যদি ব্যথা অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করে তাহা হইলে বুকে একটু সরিষার তৈল মালিশ করিয়া দিবেন।

পথ্য ও নিদ্রা

তাহার পর এক চামচ জল দিয়া যদি দেখেন যে রোগী গিলিতে পারে তখন তাহাকে অল্প গরম দুধ, চা, কফি অথবা একটু ব্র্যাণ্ডি খাইতে দিবেন ও রোগীকে নিদ্রা যাইতে



লেখক

দিবেন। রোগী ঘুমাইয়া পড়িবার পরও তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে চলিতেছে কিনা লক্ষ্য রাখিবেন। ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া রাখিবেন।



জোছনার মায়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দুঃখ আমার শুনিবে বন্ধু? শুনগো বন্ধু মোর,
তোমার সঙ্গে বন্ধু পাতাতে হয়ে গেল নিশিভোর;
সুদীর্ঘপথ সারা দিনমান, দু'জনে এলাম চলি,
গোপন কথার আভাসে বন্ধু, এলে কি আমারে ছলি?
পান্থনিবাসে আনকথা কয়ে কাটাইয়া দিলে রাত
দিবস রজনী আসে এ জীবনে, এলনা সুপ্রভাত।
বন্ধু তোমারে চিনি
করঙ্কে তব মন-পাখী মম আছে চিরবন্দিনী।

কঠিন পৃথিবী আলোকে আঁধারে করে মোরে বঞ্চনা
ফিরে যদি যাই বন্ধু আমারে দিয়োনাক গঞ্জনা,
সংসার বড় কঠিন বন্ধু, কঠিন তোমার প্রাণ
পাষাণের গায়ে লাগেনা আঘাত, মরুতে আসেনা বাণ,
আল্‌গা স্রোতের দাগ পড়ে না'ক কখনো নদীর গায়
জান ত বন্ধু কি গভীর প্রেম চকোর-চন্দ্রিকায়
মিছে জোছনার মায়া
নিশি ডাকে জাগি ধরিবারে চাই আপনমনের ছায়া।

সুধা লোভী মন মৃত্তিকা ছাড়ি হল যে উর্দ্ধগতি
তৃষ্ণা কি তার মিটেছে বন্ধু? তুমি চঞ্চল-মতি,
উত্তরে চল দখিণে মন, নয়ন পূর্ব্ব দিকে
আমার নয়নে স্বপ্নের রঙ ক্রমে হয়ে আসে ফিকে,
ঘুম ভাঙে ভাঙে, জাগিতে পারি না, স্বপ্ন ভাঙার ভয়ে,
ভিক্ষার ঝুলি হ'ল যে শূন্য অকারণ অপচয়ে,
বন্ধু তোমারে বলি,
পথে পথে তব মন কুড়াইতে তোমারি সঙ্গে চলি।

বন্ধু তুমি ত জান ভাল করে' সে কিসের প্রলোভনে,
পথে পথে মোর বিফল যাত্রা, কাহার অন্বেষণে,—
কোনো সন্ধান দিলে না বন্ধু, শুধু ঘুরিলাম পিছে,
ছায়ার মতন শুধু অকারণ, প্রার্থনা হ'ল মিছে,—
নয়নের জলে ধোয়ানু চরণ, চরণে রাখিনু মাথা,
হেন নির্দ্দয় কে জানিত আগে, হায় রে অধম দাতা,
আমার মনের পাতে,
ফুলের কাঁটার দাগ পড়ে গেল সুগভীর বেদনাতে।

চতুরিকা

"বনফুল"

১

'খাটেতে ছারপোকা আছে?' শুধালাম তারে
উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভুরু সে কহিল—"আরে
তারাই ত টেনে রাখে আছি তাই সবে,
মশারী না হলে নিত উড়াইয়া কবে।"

২

নতি করি দেবতারে—ভয় করি অসুরে
ভালবাসি মানুষেরে—ঘৃণা করি পশুরে
মুস্কিল করিয়াছে নানাবিধ মুখোসে
নারিকেল ছিল যাহা হইয়াছে হুঁকো সে।

৩

ঘুমন্ত গরুর নাকে ঠোকরায় কাক
ধড়মড়ি জাগি গরু কহে—'থাক্ থাক্
নাক ওটা—ঠুক্‌রোনা—ওহো গেছি গেছি!'
কাক কহে, "থাম্ বাপু সাফ্ করিতেছি!"

৪

"চাই ভাল টুথ্ পেস্‌ট্"—নিমগাছ হাঁকে,
'একি তব আচরণ'—শুধালাম তাকে।
"আত্মরক্ষা মহাধর্ম্ম! সুতরাং ভাই
দাঁতন ছাড়িয়া সবে কিনিও উহাই!"

অপরাজেয় কথাশিল্পী

সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্রের

• জীবন ও সাহিত্য •

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

কল্যাণীয়েষু

তোমার অনুরোধটি আমার পক্ষে সহজে স্বীকার্য নয় একটু চিন্তা করলেই তা বুঝতে পারবে। তার প্রধান কারণ দাবি চারদিক থেকে এসেছে, অনেককে নিরাশ না করলে একজনের আশা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অর্থাৎ পুণ্য যতটুকু অর্জন করব অপরাধের পরিমাণ তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে পড়বে। অথচ হরির লুঠের মতো চারদিকে রচনার হালকা বাতাসা ছড়িয়ে দেওয়া আমার অভ্যস্ত নয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিঘ্নরূপে সাতাত্তর বছরের উপর জয়ধ্বজা উঁচিয়ে বসে আছে জরা, কর্মের পথে যেটুকু বরাদ্দ সে মঞ্জুর করেছে সেটার উপর নির্ভর করে নিমন্ত্রণের আয়োজন করতে লজ্জা বোধ করি। মহাকাল হঠাৎ এক সময়ে কৃপণ গবর্মেন্টের মতো বেতন লাঘব করতে আরম্ভ করে, আমার উপর সম্প্রতি সেই বিধান চালানো হয়েছে। এতদিন যাদের মুঠো ভ'রে দিতে পেরেছি আজ তারা ক্ষমা করে না।—কৃপণতা যে আমার নয়, কৃপণতা কালেরই, সে কথা তারা কিছুতেই মানতে চায় না, কেননা কালকে গাল দিলে সে তার গায়ে লাগে না। সেইজন্যেই শরতের মৃত্যুতে একখানি সার্বজনীন চৌপদী পাঠিয়ে দেওয়ার বেশি আর কিছু করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে শরতের যে প্রশস্তি পাওনা ছিল নিতান্ত অবিবেচকের মতো শরতের মৃত্যুর পূর্বেই তা অকৃপণ লেখনীতেই সেরে রেখেছি; আমার মৃত্যুর পরে শরৎ এই কথাটি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করবেন, বোধ করি এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। আমার ভাগ্যে উল্টোটাই ঘটে, তাই আমার জীবিতকালে অকারণে অসহিষ্ণু হয়ে আমার প্রতি শরৎ অবিচারই করেছেন—যদি ঠিক সময়মতো মরতে পারতুম তাহলে নিঃসন্দেহই যথোচিতভাবে সেই গ্লানিটা মার্জনা করে যেতেন। শরতের জন্যে তোমাদের শোককৃত্য যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমার পক্ষের এই কথাটা মনে রেখো যে, আমি যখন বিদায় নেব তখন শরৎ থাকবেন না। আমার জীবন-রঙ্গভূমিতে যবনিকাপতনের সময় আসন্ন, এখন থেকেই ভেবে দেখো বড়ো আওয়াজের হাততালিটা পাওয়া যাবে কার কাছ থেকে। একটা ভালোমতো তালিকা যদি পাঠিয়ে দাও তবে সেইটে চোখের সামনে রেখে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই যতটা পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে মরতে রুচি হয় না।

আমার আয়ুকালের মধ্যে বাংলাসাহিত্যে পরে পরে তিনটে পর্ব দেখা দিয়েছে। আমি যখন আসরের জাজিমটার একধারে জায়গা ক'রে নিয়েছিলুম, তখন কবির উচ্চ আসনে ছিলেন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সিংহাসনে, মধুসূদন বিদায় নিয়ে গেছেন। এঁরা চলে যাবার কিছু পূর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল। প্রথম পর্বে আমি ছিলুম সকলের চেয়ে বয়সে ছোটো, দ্বিতীয় পর্বে

সকলের চেয়ে বয়সে বড়ো। তার ফল হয়েছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে আমার বয়স্যতার সম্বন্ধ ঘটতে পারে নি। একলা পড়ে গিয়েছিলুম। সৌভাগ্যক্রমে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার গুণে বয়সের বাধা পেরিয়ে সত্যেন্দ্র আমার কাছে আসতে পেরেছিলেন। তাই কাব্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় মিলতে পেরেছিল। এই দুয়ের মিলনে আমি যে রস পেয়েছিলেম সেটাকে আমি মস্ত লাভ ব'লে মনে করি। আমার বিশ্বাস মানুষরূপে তিনি আমার কাছে আসাতে কবিরূপে তিনিও আমাকে বেশি সত্য করে পেয়েছিলেন।

তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তাঁর যেমন নৈকট্য ঘটেছে তাঁর পূর্ববর্তীদের আর কারো তেমন ঘটে নি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের এবং কালের। এটা সহজ কথা নয়। এটা শুনতে স্বতোবিরোধী, কিন্তু দেখা যায়, কৃত্রিমতা সহজ, স্বাভাবিক হওয়াই সহজ নয়। তেমনি নিজের দেশকালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সকলেই যে নিজের দেশে কালে জন্মগ্রহণ করে তা নয়। জন্মবিধাতা জাতককে স্থান নির্ণয় করে দেবার উপলক্ষে সব সময়ে বর্তমানের সময় নির্ণয় করে চলেন না, সাহিত্যে তার ফলাফল হয় বিচিত্র। যথোচিত দেশকাল থেকে চিরনির্বাসনে যারা জন্মেছে এমন লোকের অভাব নেই। সৃষ্টিবৈচিত্র্যের জন্যে তারও প্রয়োজন আছে।

বলা কওয়া নেই, শরৎ হঠাৎ এসে পৌঁছলেন বাংলা সাহিত্য-মণ্ডলীতে। অপরিচয় থেকে পরিচয়ে উত্তীর্ণ হোতে দেরি হোলো না। চেনা শোনা হবার পূর্ব থেকেই তিনি চেনা মানুষ হয়ে এসেছেন। দ্বারী তাঁকে আটক করেনি। সাহিত্যে যেখানে পাঠকদের চিত্ত-পরিচয় এবং লেখকের আত্ম-পরিচয় অব্যবধানে এক সঙ্গে ঘটে, সেখানে এই রকমই হয়—পূর্বরাগ আর অনুরাগের মাঝখানে সময় নষ্ট হয় না।

সেই সময়টাতে কর্মের টানে এবং বয়সের ভেদে আমি দূরে পড়ে গেছি। ছেড়েই দিয়েছি কলকাতায় বাস। আমার সম্বন্ধে দেশে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলছিল, অধিকাংশ সময়ে তা সত্যও নয়, প্রিয়ও নয়। আমার মন তাই দূরে চলে এসেছিল। এই সময়েই শরতের অভ্যুদয়। শান্তির জন্যে যে নিভৃত কোণ আশ্রয় ক'রে আপন কর্মের বেষ্টনে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলুম, সেখান থেকে শরতের সঙ্গে কাছাকাছি মেলবার কোনো সুযোগ হোলো না।

কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয়নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয় যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয়নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়ো দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।

[৺শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য 'ভারতবর্ষে'র পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নিকট আবেদন জানাইয়াছিলাম, কবি তাহার উত্তরে এই পত্রখানি পাঠাইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন]—লেখক

শরৎচন্দ্র

আমি কি ইংরেজী কি বাঙলা কোন বই পড়ে সহসা চমকে উঠিনে। থেকে থেকে চমকে উঠা আমার ধাতে নেই। কিন্তু কোনও বই যদি আমায় চমক লাগায়—তাহলে তার যে অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে অন্ততঃ আমার কাছে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আমি বহুকাল পূর্ব্বে "কুন্তলীন পুরস্কারে" একটি ছোট গল্প পড়ে বিস্মিত হয়েছিলুম। সে গল্পটির নাম বোধ হয় "মন্দির"। গল্পের নীচে লেখকের নাম ছিল না। পরে খোঁজ করে জানতে পারলুম যে এই নূতন লেখকের নাম 'শরৎচন্দ্র' যে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে আমরা সকলেই শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করতে প্রস্তুত। পরিচিত লেখকের নাম দেখে তাঁর লেখার প্রতি আমাদের মন অনুকূল হয় এবং তাঁর খ্যাতির প্রভাব আমাদের মতামতের রূপ দেয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন কি নামহীন লেখকের রচনা আমাদের নয়ন মন আকৃষ্ট করে সেখানে আমরা একটি যথার্থ নতুন লেখককে আবিষ্কার করি। "মন্দির" গল্পটির কথা-বস্তুও সম্পূর্ণ নূতন, তার উপর সেটি ছিল সুগঠিত। সাহিত্য-সমাজে আমি একজন Critic ব'লে সুপরিচিত যদিচ পুস্তক সমালোচনা আমার ব্যবসা নয়। সে যাই হোক, সমালোচকের আর যে গুণই থাক্ না কেন তিনি Perception য়ে বঞ্চিত নন্। কোনও বই পড়ে তাঁর মনে একটি অভূতপূর্ব্ব impression হলে—তারপর Critic বাগবিস্তার করতে পারেন। যে কথায় কোনও impression করে না, তার বিষয় কিছু বক্তব্য থাকে না। অবশ্য এস্থলে আমি সমগ্র বইয়ের কথা বলছিনে, বলছি তার কোনও বিশেষ অংশের কথা।

এখন আমার উক্তরূপ impressionএর দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি।

কিরণময়ীর প্রথম দর্শন লাভ করে আমি চমৎকৃত হই। দোতলায় মুমূর্ষু স্বামী পড়ে আছেন, আর স্ত্রী নটী সাজে সজ্জিত হয়ে স্বামীর বন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে নীচে নেমে এলেন। এ ব্যাপার দেখে আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হয়, —কিরণময়ীর রূপ দেখে নয়—তার psychologyর পরিচয় পেয়ে। এ রকম ছবি সাধারণ লেখকরা আঁকতে পারেন না।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের "ভ্রমণ-বৃত্তান্তে" রাতদুপুরে ভাগলপুরের গঙ্গায় একটা ডিঙ্গিতে ভেসে পড়ার বর্ণনাটি আমার কাছে অতি চমৎকার লেগেছিল। লেখকের শক্তির পরিচয় এ বর্ণনায় পুরো ফুটে উঠেছে। যাঁর কলম এ সব দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমার "শরৎদা"!

বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশের শরৎচন্দ্র তাঁহার পূর্ণজ্যোৎস্নায় ভাসিতে ভাসিতে সহসা মৃত্যুর অতীন্দ্রিয় মহিমার অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যে আপনাকে লুক্কাইত করিলেন—'কাঙ্গাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে!' রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যাকাশে তাঁহার আবির্ভাবও যেমন আকস্মিক, তাঁহার তিরোধানও তেমনি অতর্কিত! যাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তির কৌমুদীকে প্রকাশিত করিবার জন্য একদিন যে সমস্ত বাল্যবন্ধুগণ কতই না চেষ্টা করিয়া বিফল-প্রযত্ন হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার অতর্কিত পূর্ণপ্রকাশ দেখিয়া সানন্দে প্রণাম করিয়াছিলেন আমি তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ জগতে নাই, কেহ বা এ জগতে আছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিষয় কিছু লিখিবার জন্য হঠাৎ এই সাহিত্যজগত হইতে চ্যুত শরৎচন্দ্রের ছোট বেলাকার "ছোট্ট পুঁটুর" নিকট আহ্বান আসিল কেন? সাহিত্যজগতেও 'অঘটনঘটন-পটীয়সী' মায়ার খেলা পূর্ণভাবেই বিরাজিত, নহিলে এমন ঘটিত না। শরৎদাদার যে 'মায়া' তাঁহার 'পুঁটুর' উপর ছিল সেই 'মায়াই' যে ইহা ঘটাইল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তরুণ জীবনে সেই অনুদিত শরৎচন্দ্রের চারিদিকে যে কয়টী অস্ফুট তারা অথবা তাঁহারই অনুদিত জ্যোৎস্নালোকে যে কয়টী অফোটা সাহিত্যিক ফুল ফুটিবার সম্ভাবনাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল—আমি তাহাদেরই একটী। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্যাকাশে দেখা দিয়া শরৎচন্দ্রের পার্শ্বে ভাসিয়াছেন, কেহবা অকালেই

নিবিয়াছেন—কেহবা জীবনাকাশ হইতে চ্যুত না হইলেও শরৎ-মহিমার ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেই আপনাকে অস্তমিত করিয়াছেন। আমি এই শেষের দলের মধ্যেই একজন। কিন্তু শরৎদার বিষয়ে আমাদের অন্ততঃ এইটুকু গর্ব্বের বিষয় আছে যে আমরা সেই অনুদিত শরৎচন্দ্রকে সকলের আগেই পূজিয়াছি এবং পূর্ণচন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহারই আলোকে দাঁড়াইয়া অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি। যখন সমস্ত বঙ্গসাহিত্যাকাশে আমাদের সাহিত্য 'রবির' আলোকে উদ্‌ভাসিত, তখন বাঙ্গলার বাহিরের একটা অনতিখ্যাত সহরের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষুদ্রতম সাহিত্যসভার মধ্যে যে আমরা একটী পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনাকে দেখিয়াছিলাম এ গৌরব আমরা করিতে পারি।

মনে পড়ে একদিন আমাদের সেই খেলাঘরের সাহিত্য-সভায় যুবক শরৎচন্দ্রের একটা রচনা লইয়া ঘোর তর্ক করিতে করিতে প্রায় হাতাহাতির জোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি গায়ের জোরে সবারই চাইতে দুর্ব্বল হইলেও গলার জোরে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলাম না। হয়ত কিছু বেশীই ছিলাম, তাই আমার সেই 'এতটুকু যন্ত্র' হইতে একটু বেশী শব্দই বাহির হইয়াছিল এবং আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম—'বঙ্কিমের চাইতেও শরৎদার লেখা ভালো।' অবশ্য সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র একজন অখ্যাত তরুণ সাহিত্যিকের লেখা লইয়া আর একটী তরুণতর যুবকের এই ধৃষ্টতায় সেদিন তাঁহার মহিমালোকে বসিয়া নিশ্চয়ই সস্নেহ উপেক্ষায় হাসিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর যখন আমার পরিণত জীবনেই দেখিলাম যে সেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার মূল্য নিরূপণ উপলক্ষে একটা সাহিত্যিক লাঠালাঠির সূচনা হইয়াছে এবং এমন কি বর্ত্তমান সাহিত্যসম্রাটও সেই তর্কধূলার মধ্যে তাঁহার ঋষিকল্প মুখখানি লইয়া উকিঝুঁকি মারিতেছেন তখন আমিও হাসিয়া লইয়াছি।

কিন্তু মৃত্যুর পর শোকপ্রকাশের মধ্যে যে একটা কৃত্রিমতা আছে তাহাই আমার বাধা দিতেছে। কারণ কথায় বলে

"থাকতে দিলেনা ভাত কাপড়,
মরণে করবে দান সাগর!"

এই 'দান সাগর' অনেকেই করিয়াছেন এবং তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে অনেক উচ্চ স্থানও পাইয়াছে। তবু সে সমস্তই মরার পর দান-সাগরের মতই একান্ত নিস্ফল—তা সে Tennysonএর In memoriumই হউক, আর Shellyর Adonaisই হউক। কারণ সেই সমস্ত জীবন-কথার মধ্যে প্রাণটাই থাকে না—থাকে কথার জাল বোনা, থাকে অধরকে ধরিবার বৃথা চেষ্টা!

আমার পূর্ব্ব জীবনের শরৎদার কথা বলিতে যাওয়া মানে—আমার জীবনের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণময় অংশ তাহাকেই স্মরণ করা। কিন্তু তাহা কি কেহ সম্পূর্ণ-ভাবে পারে? প্রাণ জিনিসটার সংজ্ঞা নাই, কারণ তাহার মত আর কিছুই নাই—সে একেবারে 'কেবল' মূর্ত্তি! তাহার অংশ নাই—তুল্য নাই, তাহা ক্ষণাবলম্বী অনুভব-ধারা ছাড়া অন্য কোনরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এমন কি জীবনকে স্মরণ করা যায় কি না সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। ঘটনা স্মরণ হইতে পারে, জীবন নয়। প্রাণহীন ঘটনার প্রয়োজন ইতিহাসে থাকিতে পারে; কিন্তু আজ যাহা সত্যকারের সুখদুঃখানুভূতি—তাহাতে তাহার স্থান কোথায়। আজ যে ক্রন্দনে বাঙ্গলার সাহিত্যাকাশ পূর্ণ, তাহার মধ্যে সেই জীর্ণ পুরাতনের স্থান কোথায়? তাই আজ যখন আমাকে আমার প্রথম যৌবনের জীবনের কথা স্মরণ করিয়া লিখিবার আহ্বান আসিল তখন আমি চমকিত হইয়া ভাবিলাম—সেই পুরাতন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাপা-পড়া স্মৃতির খনি আবার কি করিয়া খনন করিব? পারিব কি?—পারিব না। যাহাকে ফুরাইতে দিয়াছি তাহা কি শেষ হয় নাই? সেই Myrtle and Ivyর সত্যকারের Sweet two and twentyর দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে—আছে শুধু একটা হায় হায় মাত্র! অন্ধকার বাঙ্গলাব্যাপী হাহাকারের মধ্যে সেই ব্যক্তিগত জীবনের হায়হায়ের স্থান নাই—নিশ্চয়ই নাই।

যাক, এখন যাঁর কথা লিখিতে বসিয়া আপন কাঁদুনির ঝুলি ঝাড়িলাম তাঁরই কথা আরম্ভ করিব। কিন্তু আগেই বলিয়া রাখিতেছি যে সত্য বলিব; কিন্তু আমার অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছায় যদি সেই সত্যকে কিছু বানাইয়া বলি তাহাতে আশা করি কেহ দোষ ধরিবেন না। কারণ যখন বনে যাইবার বয়স পার হইয়াছি তখন একটা বেপরোয়া ভাব আসিয়া গিয়াছে। অতএব সত্য বলিব

এবং হয়তো বানাইয়াও বলিব—কারণ ঐ দুইটার মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা আর আমার নাই। স্মৃতিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশঃ এবং তাহার পর যাহা হয় তাহা সাহিত্য জগত হইতে আমার অনেক দিনই হইয়াছে; এখন স্থূল জগত হইতে এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ অথচ আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেহটা যাইলেই হয়।

শরৎচন্দ্রকে প্রথম যখন দেখি তখন তিনি ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে পড়েন। আমার সঙ্গে সহপাঠীরূপে দেখা হয় নাই—দেখা হইয়াছিল শাস্তা—আদেশ-দাতারূপে। আমি তখন স্কুলের ছাত্র এবং মাষ্টার পণ্ডিতের বিশেষতঃ দাদাদের গম্ভীর তত্ত্বাবধানের মধ্যে শাসিত ও পালিত। কিন্তু স্কুলের ছাত্র হইলে কি হয়, কবিতা দেবীর সুড়সুড়ি বা কাতুকুতু ছোট বয়স হইতে নিশ্চয়ই মানুষ অনুভব করে। আমি এবং আমার ভগ্নী নিরুপমা উভয়েই তাহা অনুভব করিয়াছিলাম—বিশেষতঃ আমার ভগ্নী তখন আমাদের বাড়ীর সমজদারদের মধ্যে বেশ একটু খ্যাতিই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমার তখন বাড়ীর সাহিত্যিক মহলে কোনো খ্যাতিই হয় নাই, কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া ইংরাজি কবিতার অনুবাদ অথবা বাঙ্গলা কবিতার পুনরনুবাদ করিতাম। রবীন্দ্রনাথেরও তখন আমাদের বাড়ীতে প্রসার প্রতিপত্তি হয় নাই। তখনও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি এবং লেখকদিগের প্রবল প্রভাব। আমরা দুইটী ভাইভগ্নী প্রাক্-রবীন্দ্রী কবিগণের লেখার ভাঙাচোরাই হউক আর অনুকরণই হউক—একটা কিছু করিতাম। দাদারা বা মাষ্টার মহাশয়রা কখনো ভালবাসতেন, কখনো বা হাসি বিদ্রূপে বিব্রত করিতেন; কিন্তু তথাপি গোপনে গোপনে আমাদের কবিতার খাতা পুরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কেমন করিয়া জানি না সেই সব লেখা বিশেষতঃ নিরুপমার খাতাখানা শরৎচন্দ্রের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল। দাদাদের মধ্যে কেহ হয়ত তাহা শরৎদার হাতে দিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁহার সমবয়স্কের মধ্যে একজন উচ্চ জগতের জীবরূপে এবং অত্যদ্ভুত "ল্যাড়া" নামে অভিহিত। উপরন্তু তাঁহার তাৎকালিক স্বাক্ষরিত নাম St. Clare Lara। জানি না তখন তিনি কবি Byronএর Lara কবিতা পড়িয়াছিলেন কিনা, কিন্তু বায়রণের ধরণটী যে পরে তাঁহাকে পাইয়া বসিবে ইহা বোধহয় তাহারই পূর্ব্বাভাষরূপে তাঁহার নাম সহিটীর মধ্যেও প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটীকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা যাওয়া করিতে বা দাবা পাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।

কিন্তু এ হেন শরৎচন্দ্র—সেই Lara—একদিন হঠাৎ আমার ছোট কুঠুরীর মধ্যস্থিত অতি ক্ষুদ্র টেবিলটার পার্শ্বে আসিয়া হাজির! আমি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলাম—তিনি আমার কবিতার খাতাখানা টেবিলের উপর সজোরে ফেলিয়া বলিলেন—"কি ছাই লেখো, খালি অনুবাদ—তাও আবার ভুলে ভরা। নিজের কিছু নেই তোমার লিখবার?"

আমি ত শুনিয়াই পৌনে মরা! কিন্তু তারপর কখন যে আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল এবং কবে যে তাঁহার খোলার ঘরের বইখাতাপত্রে-ভরা টেবিলের পাশে বসিবার অধিকার পাইলাম তাহা আজ স্মরণ হয় না; কেবল এইটুকু মনে আছে যে তাঁহার সেই প্রথম জীবনের সাহিত্য-সাধনার কুটীরের মধ্যে অতি সহজেই আমার স্থান হইয়াছিল। দিনের পর দিন তাঁহারই সাহচর্য্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকাননে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলাম।

মনে পড়ে তাঁহার সেই ছোট ঘরখানির মধ্যে বসিয়া তাঁহার বাল্যজীবনের কত কথাই না শুনিয়াছি। তাঁহার তখনকার অপটু লেখার মধ্যে কত না ভবিষ্যতের গৌরবের ছায়া দেখিয়াছি এবং আশা করিয়াছি। সর্ব্বোপরি স্মরণ হয় তাঁহার জীবনের সঙ্গীদের কথা, যাঁহাদের একজনকে অন্ততঃ তিনি পরবর্ত্তী জীবনে শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথরূপে চিরকালের জন্য অমর করিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের রসস্রষ্টা রূপই শেষ জীবনে প্রকটিত—কিন্তু যৌবনে একাধারে নট, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্রী এবং কাব্যরসজ্ঞ কবি—কত না নূতন নূতন রূপে তাঁহাকে দেখিয়াছি। মনে পড়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবের ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের লিখিত 'জনা'র অভিনয়। 'জনার' পার্টের অভিনয়ে তরুণ শরৎচন্দ্র যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর—(তিনকড়ি কি?) অভিনয়ের মধ্যে তাহা দেখিয়াছিলাম কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের অভিনয়ে যে গম্ভীর সংযত তেজস্বিতা ও শোকপ্রকাশের

ভঙ্গী দেখিয়াছিলাম কলিকাতার প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহা পাই নাই বলিয়াই স্মরণ হয়।

আমরা সে সময় যে পাড়ায় থাকিতাম তাহার নাম "খঞ্জরপুর"। সেই পাড়ার প্রতিবাসী বালক ও যুবকগণ শরৎচন্দ্রের নায়কত্বে আমাদের লইয়া ছোট একটা থিয়েটার পার্টি গঠন করিয়াছিল। তাহাতে যে অভিনয় হইত শরৎচন্দ্র ছিলেন তাহার প্রযোজক এবং শিক্ষক। সেই সময়ে অভিনয়ের পোষাকে যে ফটো তোলা হইয়াছিল তাহার একখানি অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের এলবামে ছিল—কিন্তু ক্রমশঃ তাহা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তারপর আর তাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

এই থিয়েটারের রিহার্সাল অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত স্থানে হইত—নদীর ধার (তখনকার যমুনিয়া এখন নাই) হইতে মুসলমানের কবরস্থান, দেবস্থান—কোনো স্থানই বাদ যাইত না। Shakespearএর Midsummer Nights Dreamএর গ্রাম্য অভিনয় চেষ্টার সমস্ত হাস্য ও করুণ রসটা আমরা প্রত্যক্ষভাবেই তখন অনুভব করিয়াছিলাম। তখন অবশ্য আমাদের Shakespear পড়িবার বয়স নয়, কিন্তু বিশ্বকবি যাহা হয়ত কল্পনা করিয়াছিলেন আমাদের বেপরোয়া শরৎচন্দ্রের উৎসাহে তাহা বর্ত্তমানকালে স্থূলেই ঘটিয়াছিল।

তারপর মনে পড়ে, বেশী করিয়া মনে পড়ে আমার প্রিয়তম সুরেন গিরীন উপেনের কথা।—ইঁহাদের দেখিবার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্রের কৃপায় ইঁহারা আমার আপনার জন হইয়া গিয়াছিলেন। উপেন গিরীনের কবিতার প্রশংসা—তাঁহাদের লিখিবার সাজসরঞ্জাম—কি করিয়া তাঁহারা আলমারির পাশে লুকাইয়া বসিয়া কবিতা লিখিতেন—কি করিয়া তাঁহারা বিদ্যালয়ের পড়াশুনার অত্যাচারের মধ্যেও সময় করিয়া কাব্যদেবীর পূজা করিতেন—সবই শরৎদার মুখে শুনিতাম—সবই যেন এখন সেদিনের কথা বলিয়া মনে হয়। অথচ কোথায় তারা, আর কোথায় আমি!

তারপর কবে যে সুরেন গিরীনের সঙ্গে প্রথম দেখাশুনা হইল মনে নাই। শরৎদার কৃপায় কখন যে বাঙ্গালী-টোলার গাঙ্গুলী বাড়ীর মধ্যে আমার স্থান হইল ঠিক স্মরণ করিতে পারিতেছি না। এইটুকু কেবল মনে আছে যে আমাদের একখানা হাতে লেখা কাগজ বাহির করিবার ব্যাপার লইয়া এই ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী-টোলার গাঙ্গুলী বাড়ী তখন ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের মধ্যে একটা শিক্ষা, দীক্ষা ও আভিজাত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত। সেই গাঙ্গুলী বাড়ীর দুইটী অপরিণতবয়স্ক যুবকের সঙ্গে জড়িত হইয়া আমিও তাঁহাদের একজন হইয়া গেলাম। অবশ্য ভাগলপুরে আমাদের বাড়ীর তখন একটু প্রতিপত্তিও ঘটিয়াছিল; কারণ আমার স্বর্গগত পিতৃদেব তখন ভাগলপুরের প্রধান সবজজ এবং তখনকার কালে সবজজিয়তি একটা সম্মানেরই পদ ছিল।

শরৎদা একদিন হঠাৎ প্রস্তাব করিলেন যে যখন আমরা এতগুলি কুঁড়ি সাহিত্যিক ফুটি ফুটি করিতেছি তখন একটা কাজ করা যাক। একটা হাতের লেখা কাগজ বাহির করা যাক। যে মুহূর্ত্তে বলা সেই মুহূর্ত্তেই কার্য্যারম্ভ।

এই মাসিকপত্র খানির সম্বন্ধে আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ব্বেই কিছু লিখিয়াছেন। অতএব সে বিষয়ে কোনো পুনরুক্তি না করিয়া আমার যতটুকু স্মরণ হয় তাহাই এখানে লিখিতেছি। এ বিষয়ে আমার স্মৃতি খুব প্রখর নয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি। এই মাসিকপত্রখানা আমাদের কুঁড়ি-সাহিত্যিকদের সভার মুখপত্র হইল। ইহার প্রথম সম্পাদক যোগেশচন্দ্র এবং মুদ্রাকর গিরীন্দ্রনাথ, লেখক অনেকগুলি এবং লেখিকা মাত্র একটী—তিনি আর কেহ নয়, আমারই অন্তঃপুরচারিণী বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী নিরুপমা। ইনি আমাদের বন্ধুদের দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকিয়াও আমাদের বন্ধুবর্গের একান্ত আপনার ছোট বোনটাই হইয়াছিলেন। ইঁহার তখনকার লেখা কবিতা বা প্রবন্ধ যাহা কিছু আমাদের সভার জন্য লিখিত হইত তাহা আমাকেই সভায় পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত এবং সভার মতামত আমাকেই বাড়ী গিয়া শুনাইতে হইত। আমাদের সাহিত্য-সভার গুরুগম্ভীর মন্তব্য তখন তাঁহাকে কখনো দুঃখ কখনো আনন্দ দিয়াছে—কিন্তু আজ তাহা কেবল সুখেরই স্মৃতিমাত্র!

সাহিত্য সভা—হাঁ সত্য সত্যই একটা সাহিত্য সভা এই তরুণদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাসিকপত্রখানির নামকরণ হইয়াছিল "ছায়া"। এই সাহিত্য-সভার অধিবেশন যে কোথায় কোনদিন হইত তাহার ঠিকানাই

ছিল না। যেমন বেপরোয়া বেঁদাড়া তরুণ-সাহিত্যিকের দল—তেমনি ছিল তাঁহাদের মিলিত হইবার স্থান। কখনো বা ভাগলপুরের সরকারী বিদ্যালয়ের মস্ত বড় বাঁধান পয়োনালীর মধ্যে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সভ্যগণের প্রবন্ধ পাঠ এবং আলোচনা—কখনো কোনো মাঠে বা গাছতলায় বা টিলার উপর চড়িয়া এই সব তরুণপ্রাণের নিবিড় মিলন। ইহার মধ্যে চেঁচামেচিও ছিল, তর্কাতর্কিও ছিল—সবই ছিল। প্রয়োজন যখন মিলন, তখন বিনা প্রয়োজনের কর্ম্ম-ব্যস্ততাই ছিল আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

এই সময় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বোধহয় কলিকাতায় পড়িতেন। তিনি এবং তাঁহার কয়েকটী বন্ধুতে মিলিয়া ভবানীপুরে আমাদের 'ছায়ারই' মত আর একখানা কাগজ হস্তযন্ত্রেই বাহির করিয়াছিলেন। তাহার নামটা ঠিক স্মরণ হয় না—বোধহয় "তরণী"। যাহাই হউক সেই কাগজখানা আমাদের ছায়ার বিনিময়ে ভাগলপুরে পাঠান হইত। আমরা তাহা পাঠ করিয়া ফেরত পাঠাইতাম। বোধহয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভায়ারও ঐ তরণীতেই সাহিত্যসাধনার হাতে খড়ি। আমাদের 'ছায়া'তে ঐ কাগজের লেখকগণের মুণ্ডপাত হইত এবং যথানিয়মে আমাদের মুণ্ডপাতও ভবানীপুরের বন্ধুরা তাঁহাদের কাগজে করিতেন। কি গুরুগম্ভীর সেই সমালোচনা—যদি সে সময়ের "সাহিত্য"-পত্রিকার সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ও তাহা পড়িতে পাইতেন তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয় বুঝিতেন যে তাঁহার উপযুক্ত সমালোচক-বংশধর তখনই অনেক বাঁশবনের ঝোপেঝাড়ে প্রচুর গজাইয়া উঠিতেছে।

শরৎচন্দ্র চিরদিনই বেপরোয়া—কোনো দ্বিধা তাঁহাকে কখনো বাধা দিতে পারিত না এবং শেষ জীবনে এই একান্ত নির্ভিকতার ভাবকেই সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কত না নূতন জীবনের সৃষ্টি এবং নূতন ভাবকে রূপ দিয়া গিয়াছেন। সেইজন্যই বোধহয় তিনি বাল্যজীবনের এই সঙ্গী কয়টীর অনেকেরই মধ্যে ইহা সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সঙ্গী কয়টীকেও এই সময় অনেকটা বেপরোয়াই করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার এই পরম নির্ভিকতা যে আমাদের মধ্যে কতখানি প্রবেশ করিয়াছিল তাহার দু'টা একটা উদাহরণ দিই।

আমাদের খঞ্জরপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলা কবর আছে। আমরা হিন্দুর ঘরের ভীরু ছেলে, কিন্তু এই পরম সাহসিকটীর সঙ্গগুণে "মামদো" ভূতই বল—আর ব্রহ্মদৈত্যই বল—সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবর স্থানের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশি চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ম সহ গান চলিতেছে এবং আমরা ২।৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনের রক্ত নয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিম্বা থিয়েটারের রিহার্সাল কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া সতরঞ্চিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি। বাল্যকাল হইতে তিনি ভয় কাহাকেও করিতেন না এবং কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বাধাও তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। বহু দিনের বহু কার্য্যে তিনি ইহা দেখাইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই বোধহয় তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার নিজ প্রকৃত জীবনের এবং সৃষ্ট জীবনের মধ্যেও সেই একান্ত নির্ভিকতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। আমাদের মত অনেক ভীরু যেখানে গিয়া থামিতে বাধ্য হইয়াছে তিনি সেখানে থামেন নাই। তাই আজ তাঁহার সাহিত্যিক অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার সেই বেপরোয়া ভাবটাকেই আরও বাড়াইয়া ফুলাইয়া তুলিবার শক্তি পাইয়াছেন। তরুণ অবস্থাতেই তিনি যেন কোন নিয়মের ধারা মানিতে চাহিতেন না। তিনি যেন জীবন দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে সৃষ্টির ধারার মধ্যে কেবল যে নিয়ম আছে তাহা নয়, বেনিয়মও আছে। সৃষ্টি ব্যাপারটার মধ্যে অনেকটাই খেয়ালীর খেয়াল আছে এবং কাজ করিতেছে। Evolutionএর মধ্যে "সহসা" এবং "হঠাতের" স্থান অনেকখানি। তাই বোধহয় তন্ত্রশাস্ত্রে দেখা যায় যে মূলাধার চক্রের অধিষ্ঠাতা—চতুর্ব্বাহুযুক্ত ব্রহ্মা ও শিশু—

"শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদ বাহুঃ।"

তাঁহার এই নির্ভিকতা এবং শিশুসুলভ বেয়াড়া বেঁদাড়া ভাবই তাহার জীবনকে শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক সমস্ত নিয়মকানুন মানার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছিল; তিনি যেমন প্রাকৃতিক ও সামাজিক নিয়ম কোনটাকেই নিজের জীবনে

তেমন আমল দেন নাই, প্রকৃতি ও সমাজ কতকটা সেই জন্যই যেন তাঁহার স্থূল দেহটাকে ক্ষমা করে নাই। আমার মনে হয় যে তাঁহার এই অকালমৃত্যু—এই যশও সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন গগনে হঠাৎ শরৎচন্দ্রের চিরতিমিরাবৃত হওয়ার কারণও সেই আপনার উপর অযথা বলপ্রয়োগ!

কিন্তু তিনি যে আত্মজীবনসমুদ্রমন্থন প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নিজপক্ষে হলাহল উঠিলেও বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে সুধাই উঠিয়াছে—কি বিষ উঠিয়াছে তাহার বিচার করিবার অধিকার বোধহয় আমার নাই। কারণ সাহিত্যে যে পথ তিনি ধরিয়াছিলেন আমার ন্যায় ভীরু সে পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাক সে কথা, কিন্তু এটা ঠিক যে রস-স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের মন্থন হইতেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টি হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। শরৎচন্দ্রের জীবন-দেবতাও তাঁহার জীবনকে নিঙ্‌ড়াইয়াই রস বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল।

তাঁহার জীবনের আর একটা কথা এবং বোধহয় সর্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার অসাধারণ ভালবাসার ক্ষমতা। শেষ জীবনে যে ভালবাসা পোষা পাখী এমন কি সামান্য একটা রাস্তার কুকুরের জন্যও অজস্র ব্যয়িত হইয়াছিল—পূর্ব্ব জীবনেও তাহা আমরা যে কতবার কত রকমে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে গেলে সামান্য একটা প্রবন্ধে কুলাইবে না—প্রবন্ধটা গল্পে পরিণত হইবে। সেইভালবাসাই বহুদিনের বিস্মৃতির আবরণকে ভেদ করিয়া হঠাৎ একদিন দুইটী Fountain penএর আকারে আমার ও আমার ভগ্নী নিরুপমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নিরুপমা তখন দিদি ও অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে কিছু যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, আমিও তখন "স্বেচ্ছাচারী" লিখিয়া ভারতীতে ছাপাইয়াছি। শরৎদা যে কোথায়, তাহাও যেন তখন আমাদের তেমন স্মরণেই ছিল না। এমন সময় আমার নামে একটী একেবারে সোনার কলম, নিরুপমার নামেও একটা waterman। আমি ত উহা পাইয়া অবাক! এত দামী কলম লইয়া কি করিব?

"আছে শেষে সেটা চোরের ভাগ্যে"—এই মনে করিয়া দাদাকে পত্র দিলাম। তিনি লিখিলেন—"বেশ করেছি দিইছি, তোকে ওতেই লিখতে হবে।" যেমন অদ্ভুত বেঁদাড়া মানুষ, তেমনি তাঁহার হুকুম। আমি উহা ফেরত পাঠাইয়া লিখিলাম যে—এ তো একটা গহনা, এ দিয়ে কখনো লেখা যায়! আপনি যা দিয়ে লেখেন তাই একটা পাঠাবেন—বাস্ আর কোথায় যাইব—আর একটা রূপায় মোড়া প্রকাণ্ড লেখনীর বংশদণ্ডাঘাত।

আজ তিনি চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু সেই কলমও চলিয়া গিয়াছে। চোরেরা ত আমার শরৎদা নয়। আমি অবশ্য লজ্জায় সেকথা তাঁহাকে লিখিতে পারি নাই—কিন্তু সে দুঃখটা আমার বৃদ্ধ বয়সের মনের সবভোলার ঘরের মধ্যেও নির্ভুলভাবে জমা হইয়া রহিয়াছে। লিখিতে বসিয়া আজ আমার এই শুষ্ক চক্ষেও জল আসিতেছে।

আমার লেখায় পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির থাকিতেছে না; কিন্তু আমি নিরুপায়—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ গানের মাত্রা-তাল ঠিক রাখা এ অবয়সে আমার দ্বারা অসম্ভব—অতীত অনাঘাত, সব ফাঁক—সবই গুলাইয়া যাইতেছে।

শরৎচন্দ্র সে সময় যে সকল ইংরাজী ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পড়িতেন তাহা এখনো আমার মনে আছে। মিসেস্ হেনরি উড্ এবং মারি করেলীর উপন্যাসের তিনি একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং লর্ড লিটনের প্রতিও তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহারই প্রমাণ তিনি দিয়া গিয়াছেন লিটনের My Novelএর ধরণে শ্রীকান্তের পর্ব্বের পর পর্ব্ব চালাইয়া। অবশ্য শেষ জীবনের বড় বড় উপন্যাসগুলির বিষয় আমি কিছু বলিতে পারিব না। কারণ তাঁহার সহিত আমার ২১।২২ বৎসরের বয়সেই প্রত্যক্ষ যোগ এক প্রকার কাটিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার বাঙ্গলার বাহিরের জীবনের সহিত আমার একেবারেই পরিচয় হয় নাই। তবে তিনি নিজের উপর যে প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির অত্যাচার চালাইয়াছিলেন তাহার ফল তিনি সাহিত্য জগতে অকৃপণ হস্তে ঢালিয়া দিলেও কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি তিনি অত্যন্ত অবিচারই করিয়াছিলেন। নহিলে এত শীঘ্রই তাঁহাকে আমরা হারাইতাম না।

তিনি যখন রেঙ্গুনে ছিলেন তখন দু'একখানি পত্র আমায় লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে চিঠিপত্র গুছাইয়া রাখা, কোনো কিছু গুছাইয়া রাখা—আমার অভ্যাসের বাহিরে। তাই সে সমস্তই আমি হারাইয়া বসিয়াছি।

আজ তাহা থাকিলে তাঁহার জীবনচরিত রচনায় হয়ত সাহায্য হইত।

পরিণত জীবনে তাঁহার বাজে শিবপুরের বাড়ীতে কয়েকবার তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছে। তখন তিনি সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সেই প্রতিষ্ঠার দায়ে তিনি মহা-আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ভীড়ভীতিগ্রস্ত। শেষ জীবনে তিনি কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি যখন আমার সেই তাকিয়াপ্রেমিক তাম্রকূটরসিক দাদাটীর কথা স্মরণ করিতাম তখনি ভাবিতাম সেই Agoraphobia গ্রস্ত মানুষটী কি করিয়া ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে। ওকথা যাউক—সেই বাজে শিবপুরের বাড়ীতে যখন তাঁহাকে দেখি তখনো দেখিলাম সেই আমার বাল্য জীবনের ভালবাসাসর্ব্বস্ব মানুষটাই সেখানে নানা ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়াই রহিয়াছেন। সেই হাসি—সেই চঞ্চলতা—সেই মহাব্যস্ততা।

আমি এবং আমার একটী পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত উভয়ে যখন দুয়ার ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম তখন একটা বিশ্রী কালো কুকুর আমাদের যে অভ্যর্থনা করিল তাহা স্মরণ করিলে এখনো মনে হয় যে Agoraphobia গ্রস্ত মানুষের উপযুক্ত দারোয়ানই তিনি দ্বারে স্থাপন করিয়াছিলেন। Hydrophobiaর ভয় দেখাইয়া তিনি বোধহয় নিজের জন্য একটু বিশ্রামের অবসর করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

কুকুরটার চেঁচামেচিতে উপর হইতে বকিতে বকিতে নামিয়া তিনি যখন দেখিলেন যে এ আর কেউ নয়—তাঁহারই পুঁটু—তখন আর এক মূর্ত্তি। সেই চিরপরিচিত মূর্ত্তি। আমরা গিয়াছিলাম কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ফিরিবার জন্য, কিন্তু হইল ঠিক তার বিপরীত—তিনদিন তিন রাত্রি অবিশ্রাম গল্পগুজব এবং অতীত জীবনের পাতার পর পাতা উল্টান। ক্রমাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা চা, তামাক এবং মাঝে মাঝে নানাবিধ খাবারের অত্যাচারে আমরা দুই বন্ধুতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম ; কিন্তু শরৎদার ভালবাসার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। আমি শেষে বলিলাম "শরৎদা আপনার এই obscene কুকুরটার প্রথম অভ্যর্থনায় মনে হয়েছিল যে আপনি বুঝি কালভৈরবের সাধনায় মন দিয়েছেন ; কিন্তু এ যে দেখছি একেবারে সেই আগেকার নটরাজের মূর্ত্তিই বেরিয়ে এল।" শরৎদা কোন উত্তর না দিয়া সেই কুকুরটার মুখ ধরিয়া চুম্বন করিলেন মাত্র !

তাঁহার অতি-ভালবাসার আর একটা নিদর্শন ঐ বিশ্রী কুকুরটাই। সে কুকুরটার কথা অনেকেই লিখেছেন —কিন্তু সেই সঙ্গে সেই কুকুরের মালিকটার প্রাণটা বুঝিতে নিশ্চয়ই কাহারো ভুল হয় নাই। শরৎদা ঐ রকমেরই মানুষ ছিলেন—তাঁহাকে যে একটু ভালবাসিয়াছে তাহার কাছে তাঁহার কোনো কিছুই ঢাকা থাকিত না। এই স্নেহময় প্রাণটার সমস্তটুকুই ছিল একেবারে খোলা। দোষ বল, গুণ বল—সমস্তই ছিল উদার উন্মুক্ত। যেমন ছিল তাঁহার খিল্‌খিল্ তরলহাসি, তেমনি ছিল তাঁহার তরল স্বচ্ছ ব্যবহার! এ তরল সরস প্রাণটী যেমন আঘাত-অসহিষ্ণু ছিল, তেমনি ছিল পরের বেদনায় দরদী। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর একটা গরুর প্রসববেদনার কাতরধ্বনিতে সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়াছিলেন এবং সেই মূক অসহায় জীবের যন্ত্রণার উপশম করিতে না পারিয়া সারারাত্রি সৃষ্টিকর্ত্তাকে গালি পাড়িয়াছিলেন। বিশ্ব রচনার মধ্যে কোথায় যে গলদ আছে তাহা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না। "আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" বলিয়া সহস্র বেদবেদান্ত চিৎকার করিলেও জন্মমৃত্যুর দুঃখানুসঙ্গিতা লক্ষ্য না করিয়া মানুষ পারে না। স্নেহময় শরৎদাও পারিতেন না।

বাল্যজীবনে শরৎদাদা যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখা বেশী করিয়া পড়িতেন তাহার মধ্যে চার্লস ডিকেন্‌স বোধহয় তাঁহার কাছে বেশী আদর পাইয়াছিলেন। অনেকদিন ডিকেন্‌সের ডেভিড্ কপারফিল্ড হাতে করিয়া এখানে সেখানে—এ বাড়ী ও বাড়ী পর্য্যন্ত করিতে দেখিয়াছি। মিসেস্ হেনরী উডের ইষ্টলিন্ খানিও প্রায় তদ্রূপ আদরই পাইয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখার মধ্যে ডিকেন্‌স বা উডের লেখার তেমন প্রভাব দেখা গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। বোধহয় মধ্যবয়সে কলিকাতা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তিনি যে সমস্ত আধুনিক লেখকদের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাহারই ফল তাঁহার লিখিত উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের লেখার দোষগুণ সম্বন্ধে বলিবার কোনো

অধিকার আমার নাই। তিনি আমার বাল্যজীবনের সাহিত্য সাধনার গুরু—তাঁহার রচনা বিষয়ে আমি কিছু বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তাঁহার সাহিত্যিক এবং রস-সৃষ্টির মত ও ধারা আমরা সব সময় অনুসরণ করিতে পারি নাই এবং সেই জন্যই এ বিষয়ে ভবিষ্যত রসজ্ঞের উপর ভার দিয়া আমাদের সরিয়া দাঁড়ানই শোভন।

প্রবন্ধ কিছু বিস্তৃত হইয়া গেল। এইজন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত—কিন্তু যাঁহার বিষয় লিখিতেছি তাঁহার মহত্বের বিষয় শ্রবণ করিয়া আশা করি ধৈর্য্যশীল পাঠকগণ আমায় নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন।

মহাকবি ব্রাউনিংএর দুইটী লাইন তুলিয়া দিয়া এই শোক-স্মৃতি শেষ করিলাম—

"Leave him—still Loftier than the world suspects
Living and Dying"—

শ্রীবিভুতিভূষণ ভট্ট

——

"আমাদের শরৎ দাদা"

বাঙ্গলা সাহিত্য গগনের শরৎচন্দ্র চির অস্তমিত হইলেন—এ সংবাদ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যপাঠকগণের মনে যে দুঃখ আনিয়াছে—যাঁহারা তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন বা একদিন জানিতেন তাঁহাদের দুঃখ আরও খানিকটা বেশী। এই দুঃখের উপরে গণ্ডস্যোপরিবিস্ফোটকরূপে তাঁহার প্রথম সাহিত্য জীবনের সাক্ষীদিগকে তাঁহার সেই প্রথম সাহিত্য-সেবার কথা বলিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া প্রকাশকেরা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ তাঁহার তিরোধানে সে দিনের স্মৃতি তাঁহাদের মনে বেদনাই আনিতেছে, বিশেষ যাঁহাদের দ্বারা বহুদিন তাঁহার সঙ্গে কোন যোগসূত্র রাখাই ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁহাদের পক্ষে আজ ইহাতে একটি শ্রুতিকটু প্রবাদ-বচন যেন পরিস্ফুট হইয়া লজ্জার কারণই ঘটিবে।

আমরা ভাগলপুরে থাকাকালীন তাঁহার প্রথম সাহিত্য-জীবনে তাঁহাকে যে জানিতাম এই কথার কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদসহ সেদিনও আনন্দবাজারে তাঁহার প্রথম সাহিত্য-জীবনের অন্তরঙ্গ-দিগের মধ্যে দাদা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্টের নাম প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। ১৩৩২ সালের 'কল্লোলে' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুসরণে ১৩৩৯ চৈত্র সংখ্যার 'জয়শ্রী'তে শ্রীমতী বিভা বক্সীও শরচ্চন্দ্রের প্রথম জীবন কথার আলোচনায় এ বিষয়ে কিছু লেখেন। বহুদিনের কথা বলিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র দাদার (তিনি আমার দাদার প্রিয়তম বন্ধু) প্রকাশিত লেখার মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে কিছু অস্পষ্টতা ও অসাবধানতার দোষ থাকে; শ্রীমতী বিভাবক্সীও সেটুকুর অনুসরণ করায় অগত্যা সেই সময়ে আমাকে শরৎদাদার সহিত আমাদের পরিচয় ও সাহিত্য জীবনের সম্বন্ধ বিষয়ে "পুরাতন দিনের আলোচনা" নামে ১৩৪০ সালে জয়শ্রীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় খানিকটা লিখিতে হইয়াছিল। তারপরে ১৩৩৮ সালে (?) "বঙ্কিমশরৎসম্মিলনী" (প্রেসিডেন্সী কলেজ) হইতে শ্রীমান অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে "শরৎচন্দ্র মরীচি" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশের কথা জানাইয়া আমাদ্বারা "আমাদের সহিত শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও সাহিত্য-জীবনের সম্বন্ধ" বিষয়ে একটা দীর্ঘ রচনা লেখাইয়া লন্; কিন্তু "শরৎচন্দ্র মরীচির" পরিবর্ত্তে সেটা যে "মার্ত্তণ্ড-ময়ূখমালা"র মরীচিকায় মিলাইবে তাহা তখন বুঝিতে পারিলে অন্ততঃ সেটার একটা কপি রাখাও চলিত। তথাপি উক্ত দুইটী লেখার এবং যথাসাধ্য স্মৃতির অনুসরণ করিয়াই আমাকে সেদিনের কথা বলিতে হইবে। ইহাতে অনিবার্য্য ভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত কথা আসিয়া পড়িবে; সেজন্য কুণ্ঠিত হইলেও তাহা বাদ দিবার উপায় নাই।

আমার দাদারা তাঁহাকে কতদিন হইতে জানিতেন তাহা ঠিক্ জানিনা (মেজ্‌দা ৺ইন্দুভূষণ ভট্ট বোধহয় তাঁহাকে "আদমপুর ক্লাবেই" প্রথম জানেন!)। কিন্তু আমি জানিলাম যখন আমার লেখা কবিতা লইয়া দাদারা অত্যন্ত আলোচনা করেন তখন। দাদাদের এক বন্ধু তাঁহার নাম শ্রীশরৎচন্দ্র (মেজ্‌দা কিন্তু ইঁহাকে 'ন্যাড়া' বলিয়াই উল্লেখ করিতেন!)—তিনিও দাদাদের মারফৎ আমার লেখার পাঠক এবং সমালোচক। প্রথম জীবনের সে অকিঞ্চিৎকর লেখার পাঠক আমাদের পরিবারের কয়েকটি সমবয়স্ক-দিগের মধ্যেই পূর্ব্বে আবদ্ধ ছিল। দুইটী ভাজ, একটি ভগ্নী এবং একটি দুই বৎসরের বড় সহোদর ভাই—ইনিই শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট! ফার্ষ্ট ইয়ারে বা স্কুলের ছাত্ররূপে

তিনিও তখন অজস্র কবিতা লিখেন, তাই আমার সহযাত্রী হইলেন। ভাজ দুইটীর কল্যাণেই আমার সেই লেখা ও বৈমাত্রেয় বড় ভাই ভগিনীপতি প্রভৃতির মধ্যে প্রচারিত হইয়া ক্রমে তাঁহাদের বন্ধু মহলেও প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহার অল্পদিনের মধ্যেই মেজভাজ মেজ্‌দার নিকট হইতে এক বৃহদায়তন খাতা আমাদের সেই ক্ষুদ্রপরিসর 'সাহিত্যচক্রে' (যাহাতে তদানীন্তন বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখকদিগের গদ্য উপন্যাস এবং কাব্যকবিতাদি পঠিত ও আলোচিত হইত সেইখানে) হাজির করিলেন। তাহা অতিসুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান'! শুনিলাম দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা সকলে অভিভূত তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে—"এই গল্পটা প'ড়ে একজন 'ন্যাড়াকে মার্‌তে ছুটে; তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়।" ক্রমে বৌদিদি দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন "অভিমানের" লেখকের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি-স্বভাব বিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিমদিকে যে প্রকাণ্ড মস্‌জেদ ছিল (শুনা যাইত তাহা নাকি সাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত! কোন গভীররাত্রে সেই মস্‌জেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণ-চত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো "যমানিয়া" নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন "এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড"! আমাদের সেই অল্পদিন অধিকৃত বাসাটি উক্ত নদীর তীরে সুবিস্তৃত সুউচ্চ টিলার উপরে অবস্থিত ছিল; তাহার চারিদিকের অসমতল ভূমিতে তাহাকে পার্ব্বত্য অধিত্যকার মতই দেখাইত। সেই বাটীর অধিকারীর আত্মজনের কয়েকটি স্মৃতি সমাধি নদীতীরের টিলার গাত্রে ক্রমোচ্চভাবে স্থাপিত ছিল। আমাদের দল একদিন সেই স্মৃতি সমাধি হইতে বায়ুপথে ভাসিয়া আসিয়া গানের এক লাইন্ আবিষ্কার করিল—"আমি দুদিন আসিনি, দুদিন দেখিনি, অমনি মুদিলি আঁখি"। ইহার পরে দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি; কিন্তু বাঁশী কখনো সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের রচিত আরও একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল "গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল আঁধার আজি কুঞ্জবন"। আমাদের পাড়া খঞ্জরপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন, সেজন্য উক্ত মস্‌জেদ ও নদীতীর প্রভৃতি তাঁহার বিচরণ স্থান ছিল এবং দাদাদের কাছেও প্রায়ই আসিতেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম—তিনি আমাদের ছোট্‌দাদারই বিশিষ্ট বন্ধু! ইহাতে আমাদের দল সেদিন বিশেষ গর্ব্বই বোধ করিয়াছিল।

আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোটদা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁহার সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ঐ সব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। একদিন দেখি—ছোট্‌দা আমার একটা নূতন কবিতার মাথায় লিখিয়া দিয়াছেন "আরো যাও—আরো যাও—দূরে—থামিওনা আপনার সুরে"! পরে শুনিলাম শরৎদাদা নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন "ঐ একটা ভাব আর একটা কথা ছাড়া বুড়ি যদি আর পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে।" এই কথাই ছোট্‌দার হাতে উক্ত কবিতাকারে আমার লেখার মন্তব্যরূপে বর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটী লিখিয়া তাঁহাদের খুসি করি তাহার কয়েকছত্র মনে পড়িতেছে; সেও একটী 'সমাধি'র উদ্দেশেই কল্পনার সঞ্চরণ—এও হয়ত অলক্ষে পূর্ব্বতন কবিদিগের কবিতার অনুসরণ বা অনুকরণ?

"ধরণীর সুস্নিগ্ধ বুকেতে কত শান্তি ঢাকা আছে ভাই
নদীতীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি লুকায়েছ তাই!

* * *

নদী গায় সকরুণ তান, হুহু ক'রে উঠিছে বাতাস
এ বুঝি তোমারি খেদ গান, এ বুঝি তোমারি দীর্ঘশ্বাস।"

ইত্যাদি। সেই ক্রম-বর্দ্ধিতাকার খাতাখানার কথা আজও মনে আছে—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশে-পাশে তাহার তরুণ জীবনের সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি ছোটদাকে বলিয়াছিলেন যে "বুড়ি যদি চেষ্টা করে তো গদ্যও লিখিতে পারিবে।" কিন্তু সেকথা

তখন বোধহয় আমরা তেমন বিশ্বাস করি নাই। ক্রমে আমরা শরৎ দাদার আরও কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই। "বাসা" (যার নাম সুরেন্দ্রভাই 'কাক বাসা' দিয়াছেন), 'বাগান' (ইহাতে 'বোঝা' 'কোরেল গ্রাম' কাশীনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প ছিল!) 'চন্দ্রনাথ' 'শিশু' 'পাষাণ' (এই গল্পটিকে আর দেখিলাম না। একজন পরমাণুবাদী নাস্তিক পিতার সন্তানের মানসিক সংঘাতের যন্ত্রণায় আমরা এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে সে গল্পটির কথা আজও মনে আছে; পরে শুনিয়াছি যে অভিমানের মত সেখানিতেও একটী প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তকের ছায়া ছিল। কিন্তু ঐ দুইটী গল্পে যে তরুণ শরৎচন্দ্রের কতখানি প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল সে দুইটি নষ্ট না হইলে আজ তাহার বিচার হইত)। এই 'শিশু' গল্পটিই পরে 'বড়দিদি' নাম ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে তাঁহাদের "সাহিত্য-সভা" ও 'ছায়ার' কথাও জানিতে পারি। আমার লেখাও তাহাতে 'শ্রীমতী দেবী' নামে তাঁহারা দিতে লাগিলেন। একটু আধটু গদ্য লেখার চেষ্টা আসিলেও শরৎদাদার গল্প পাঠে সে ধৃষ্টতা প্রকাশে তখন বোধহয় আমাদের লজ্জা আসিত। শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, আমার ছোট্‌দা—ইঁহাদের সঙ্গেই আমার কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত। শরৎ-দাদাই বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন এবং ছোট্‌দার মারফৎ তাহা আমি পাইতাম। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বোধহয় এই 'ছায়ার' সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার উপরে আক্রমণ করিয়া উক্ত কবিদলের মধ্যে কে যে এই কবিতাটুকু লিখিয়াছিলেন তাহা আজ মনে নাই; কিন্তু কবিতাটুকু মনে আছে—

"ঐ কুঞ্চিত কেশ মার্জ্জিত বেশ ক্রিটিক্ যোগেশ ক্রুদ্ধ
বলে দীনতার ছবি যত সব কবি কারাগারে হবি রুদ্ধ!"

শ্রীমান সৌরীনের অধিনায়কত্বেই (?) বোধহয় ভবানীপুর হইতে ঐরূপ "অঙ্গুলী-যন্ত্রে" মুদ্রিত 'তরণী' নামে মাসিক পত্রের সহিত 'ছায়ার' সম্পাদক দুই মাস অন্তর বদল হইত এবং তার প্রত্যেক সভ্য দুই মাস ধরিয়া 'ছায়া' সম্পাদন করিয়া নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতেন। 'তরণী' কাগজখানিও প্রত্যেকের কাছে প্রেরিত হইত এবং তাহার লেখাগুলির সমালোচনা প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে করিয়া সম্পাদকের নিকটে পাঠাইতেন। এইরূপে সমালোচনা শক্তির বিকাশও শরৎচন্দ্র সাহিত্যসঙ্গীগুলির মধ্যে আনিবার নানাবিধ পথ নির্দ্দেশ করিতেন। শরৎ দাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা' ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন্ মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—

"—ফুলবনে লেগেছে আগুন"। সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটী নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথার' বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।

এইরূপে তিনি সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন। তবে আমার লেখা 'তারার কাহিনী' 'প্রায়শ্চিত্ত' ও এইরূপ ছোট ছোট গদ্যাকারে গল্প তাঁহাদের ছায়ায় প্রকাশিত হইলেও গল্প লেখার ক্ষমতা অন্ততঃ আমার মধ্যে সে সময়ে আসে নাই। শ্রীমতী অনুরূপা এবং স্পর্শমণির লেখিকা সুরূপা দিদি (৺ইন্দিরা দেবী)র উৎসাহেই আমি প্রথম একটা বড় গল্প লিখি। উচ্ছৃঙ্খল নামে বহু পরে সেটা প্রকাশিত হয়। শরৎদাদা বোধহয় তখন গোড্ডা নামক স্থানে চাকরী করিতে গিয়াছিলেন, অথবা মজঃফরপুর আদি দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সেই গল্প পাঠে তাহার মাথার উপরে লিখিয়া দেন "তুমি যে নিজের মত করিয়া অনুকে ফুটাইতে পারিয়াছ ইহাতে বড় সুখী হইলাম।"

ইহার পরেই বোধহয় "দেবদাস" লেখা হয়। ঠিক্ মনে পড়ে না। 'শুভদা' নামে একখানা খাতার অনেকখানি লেখা হইলেও সেটি আর শেষ হয় না—(এইখানে কতকগুলি কথা আছে যাহা মাত্র ব্যক্তিগত; সেকথার আলোচনা উক্ত জয়শ্রীতে পুরাতন কথার আলোচনায় করা গিয়াছে, তাই এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি)। আমরা যখন ভাগলপুর হইতে চিরদিনের মত চলিয়া আসি তখন বোধহয় তিনি ভাগলপুরে ছিলেন না। ব্রহ্মদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

'মন্দির' গল্প লেখা আমরা দেখি নাই; কিন্তু তিনি

ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে উক্ত গল্প পড়িয়াই তাহা যে শরৎ দাদার লেখা—ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি। পরে 'যমুনায়' তাঁহার পুরাতন ও নূতন লেখা নানা গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পরে তিনি একবার আমাদের বাড়ীতে (বহরমপুরে) আসিয়া কয়েক দিন অবস্থানও করিয়াছিলেন। একটি কথার স্মরণে তাঁহার স্নেহের পরিচয় আজও মনে আসিতেছে; কথাটি নিতান্তই পারিবারিক কথা! ছোট্‌দা তখন বি-এল পাশ করিয়াছেন কিন্তু ৺পিতৃদেবের মৃত্যুর জন্য যে তাঁহাকে তাঁহার বড় সাধের এম-এ পড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি প্রস্তাব করেন—ছোট্‌দা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া এম-এ পড়িবেন। আমরা তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি 'চরিত্র-হীন' লিখিতে আরম্ভ করেন এবং যমুনায় তাহা প্রকাশিত হইলে আমাদের কেমন লাগিতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান্।

ইহার বহুদিন পরে সাহিত্য-সম্রাটরূপে বহরমপুরে তিনি আর একবার আসিয়াছিলেন এবং অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গেও দেখা করিয়া যান্। সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে দাদা এবং তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু মহলে যাহা আলোচনা হইয়াছিল সেকথাটিও আজ মনে পড়িতেছে। তাঁহার জন্য মস্ত বোট-পার্টি সজ্জিত—মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী (অধুনা মহারাজ) স্বয়ং অপেক্ষা করিতেছেন—সময় বহিয়া দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইতেছে—"উৎসব-রাজের" দেখা নাই! তখন বেশীর ভাগ ব্যক্তিই এজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কে নাকি বলিয়াছিলেন "এইত ঠিক্—কবি কি সকলের হাতধরা নিয়মে বাঁধা পুতুল হবে? সে স্বাধীন স্বতন্ত্র—তার বশেই সকলে চলবে—সে কারও বশে নয়।" বহু সাধ্যসাধনায় সে পার্টিতে নাকি তাঁহাকে অল্পক্ষণের জন্য মাত্র উপস্থিত করিতে পারা গিয়াছিল (কিম্বা একেবারেই না কিনা সেকথা আজ আমাদের স্পষ্ট মনে পড়ে না।)

আজ তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে একটা শ্রাদ্ধতিথির কথা মনে পড়িতেছে। যাহাতে তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অবরোধপ্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেদিন আমার ৺স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ দিন। উক্ত 'যমানিয়া' নামে অভিহিত গঙ্গার ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদূরে একটী ঠাকুরবাড়ী ছিল; তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আমার এক মাতৃতুল্যা বয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃজায়া (জ্যেষ্ঠতাতের পুত্রবধূ) আমাকে সেইখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম —দাদারা বা ভগ্নীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন নাই; (বোধহয় দুঃখে) মাত্র ছোটদা আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম তিনিই শরৎদাদা। উক্ত কার্য্যের দানাদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অসঙ্কোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎ দাদা বলিলেন "ছাখ দেখি—কতটা হাঙ্গামে পড়তে হল—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়ে না দিয়ে তখনি দিলে না কেন?" আমি খুবই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভীমরুল (যাহা পশ্চিমে বড্ড বেশী) উক্ত শ্রাদ্ধ কার্য্যের মধ্যেই আমাকে মক্ষম ভাবে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল; কিন্তু সেটা এমন সময়—যাহার মধ্যে চঞ্চল হওয়া বা আসন ত্যাগ করা উচিত মনে হয় নাই; যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে তখন তাঁহারা জানিতে পারিয়া বিষম ব্যস্তভাবে তাহার প্রতিষেধার্থ ছুটাছুটী বাধাইয়া দিলেন। ছোট্‌দার সঙ্গেই শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে একবার দধি একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন —অথচ তখন আমাদের সঙ্গে পরিচয় সামান্যই। প্রতিবাসী এবং দাদাদের বন্ধু ভাবেই সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন মাত্র। শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে বাড়ী ফিরিতেছি—দেখি তখন শরৎ দাদা আমাদের বাড়ীর দিক হইতে পুঁটুলীর মত কি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ছোট্‌দার হাতে দিলেন। ছোট্‌দা তাহা ভ্রাতৃজায়ার হাতে দিলে দেখি একখানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা— ৺শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে যাহা বাড়ীতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধহয় সে সময় আবার সেগুলা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ্ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেই

ছিলেন—ছোট্‌দা মুখ ফিরাইয়া চোখ্‌ মুছিতেছে এবং একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্য্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল। শরৎদাদার বন্ধুবর্গ যে তাঁহার মনকে খুব কোমল পরদুঃখকাতর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন সেদিনে আমাদের নিকটেও তাহা এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।

শ্রীনিরুপমা দেবী

শরৎ-স্মৃতি

প্রতিদিনের বিচিত্রঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে যে সুরটি একজন মানুষের প্রতি কথায় আচরণে দৃষ্টিতে অধরোষ্ঠের ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে, তার ভিতর সেই লোকটির ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। তিনি যদি লেখক হন, তবে নিজ রচনার মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু সেটা তাঁর নৈর্ব্যক্তিক আত্মিকরূপের একটি দিকমাত্র। আসল মানুষটিকে সেখানে প্রত্যক্ষ করতে পারিনা। স্বকীয় রচনার মাধুর্য্যে যে গুণী আপামর সাধারণ সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন, তিনি আর এ জগতে নাই। তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁদের স্মৃতিতে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্থূলসূক্ষ্ম বহু অভিজ্ঞান রেখে গেছেন। সেই নিদর্শনগুলি আজ আমাদের কাছে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে।

চকমকি পাথরে সুপ্ত বহ্নি থাকে। আর একটা চকমকির সংঘাতে ও সংঘর্ষে যেমন একটা ক্ষণিক আভা জাগে, তেমনি আমরা প্রতিদিনের জীবনে যাদের সংসর্গে আসি, তারা আমাদের সুপ্ত চেতনার পাষাণ ঠুকে ঠুকে যেন নানা রঙ-বেরঙের ক্ষণপ্রভা উদ্দীপ্ত করে। সেই ক্ষণিক আলোকে আমরা পরস্পরের পরিচয় পাই। আমাদের ভাব চিন্তা সংস্কার শক্তি দুর্বলতা সব ধরা পড়ে সে বিচিত্র আভাসে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাত পরিচয় ঘটেছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁর আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছেন, নানা আলাপনের উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী রইল আগামী যুগের অধ্যয়ন আলোচনার জন্য। তাদের মূল্য নিরূপণ করতে হলে যে পরিস্থিতির প্রভাবে ও প্ররোচনায়, সুখ দুঃখের বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় শরৎচন্দ্রের সহজাত প্রতিভা ও অনুকম্পা উৎসারিত হয়েছিল তাঁর অন্তঃসলিলার মুক্ত-ধারায়, সেই সব অনুকূল প্রতিকূল ঘটনাবলী ও পাড়া-পড়সীদের কাছ থেকে মাথটমাশুল কতখানি তিনি আদায় করেছিলেন—তার একটা হদিশ পাওয়ার প্রয়োজন আছে। এইসব মালমসলা হবে তাঁর জীবন সংহিতার ভাষ্য।

ভ্রমরের একটা নাম মধুলিহ, কারণ সে ফুলে ফুলে মধু আস্বাদন করে এবং তার আর একটা নাম মধুকর, যেহেতু সে সৃষ্টি করে নানা পুষ্পনির্য্যাসে স্বকীয় মধু। শরৎচন্দ্র গৌড়জনের জন্য যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে গিয়েছেন, সে মধু কোন পদ্মবনে কোন মালঞ্চে কোন আরণ্য নিভৃতে সঞ্চিত হয়েছে তার সন্ধান লাভ করলে আমরা দেখতে পাব সমগ্র বাংলার পল্লীসহরে তার সুবিস্তীর্ণ পটভূমি।

আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে অব্যাহতগতি শুধু সাহিত্যিকের। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকদের আমরা শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাঁদের বুঝতে হলে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, অর্ব্বাচীনের কাছে তাঁরা দুজ্ঞেয়। পাণ্ডিত্যের একটা তকমা আছে। চাপরাশের কাছে সবাই প্রণত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ডিগ্রিই হোক বা অন্য কোনরূপ বৈদগ্ধ্যের উপাধিই হোক—নির্ব্বিচারেই তা সাধারণের কাছে সম্ভ্রম আদায় করে। আমরা মেনেই নিই যে, লোকটা মার্কামারা—মেকি নয়। কিন্তু অধ্যাপক উকীল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের মত সাহিত্যিক উপাধিধারী নন। বাহিরের সম্বলের মধ্যে তাঁর আছে কেবল কালিকলম আর কাগজ, আর আছে অন্তর্গূঢ় প্রতিভা। নিছক আত্মশক্তি ও অতন্দ্রিত সাধনার বলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ভুবনবিজয়ী হন। নদীর মতই আপনার খরধারার আবেগে পথ কেটে চলেন, কূলে কূলে অমৃতধারা বিতরণ ক'রে। তিনি স্বয়ম্ভু, আত্মস্রষ্টা, তাঁর ব্যক্তিত্ব তার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি।

যে পথ বিপদসঙ্কুল, সাধারণের অগম্য ও নিষিদ্ধ সেখানে তাঁর অপ্রতিহতগতি। প্রাণের প্রেরণা স্থানে অস্থানে তাঁর জীবনতরীকে নিয়ে যায়। কত ঝড়ঝঞ্ঝা নৌকাডুবির দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করে তিনি তাঁর দুর্লভ পসরাটি পূর্ণ ক'রে আনেন, আমরা নির্ব্বিঘ্নে ঘরে ব'সে তার আনুকূল্য ভোগ করি। প্রমিথিউস্‌ স্বর্গ থেকে

অগ্নি অপহরণ করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ গিরিগহ্বরে বন্দিদশা ও চিল শকুনের চঞ্চু প্রহরণ। কিন্তু তাঁর কল্যাণে ঘরে ঘরে জ্বলল প্রদীপ, পাকশালার উনানে জ্বলল রন্ধনের আগুন। ডুবুরি যদি প্রাণভয় বিসর্জ্জন ক'রে অতলস্পর্শে ডুব না দিত, তবে সাগরের রত্নরাজিকে উদ্ধার করত কে?

শরৎচন্দ্রের অনুভূতি ও ভাবপ্রকাশ ছিল নিত্যযুক্ত তাঁর রচনায়, বার্ণস্ বা রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন কথা ও সুর যমজ হয়ে দেখা দিয়েছে। ব্যথার সঙ্গে অশ্রু, ক্ষতের সঙ্গে রক্তপাত, প্রেমস্পর্শের সঙ্গে পুলক যেমন চিরসম্পৃক্ত। যে সত্য জীবনে পরিপাক লাভ করেছে, ধূমলেশহীন শিখার মতই তা জ্যোতির্ম্ময়। আগুনটা ভাল ক'রে ধরেনি যে কাঠে, তাতে ফোটেনা ত বহ্নিদীপ্তি, কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠে কেবল ধূম্রজাল।

শিবপুর কলেজে ছিলাম যখন, সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। বছর কুড়ি আগেকার কথা। আমি তাঁর লেখার ভক্ত ছিলাম; সশরীরে যখন দর্শন দিলেন তখন তাঁর কল্পমূর্ত্তিটি পেল তার বাস্তভিটা আমার চোখে। ভক্তের সঙ্গে ভক্ত-বৎসলের প্রীতি স্বাভাবিক, অল্পদিনেই অন্তরঙ্গ পরিচয় হ'ল। আমি আজন্ম সহরে বন্দী, আর তিনি পথের উদ্‌ভ্রান্ত পথিক; আমার পল্লীবুভুক্ষু মন তাঁর মুক্তপ্রাণের খোলা হাওয়ায় হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। সে সময় ঘনঘন আমাদের দেখাশুনা হ'ত, আর বাধত চিরচলিষ্ণু জঙ্গমের সঙ্গে এই স্থাবরের মল্লযুদ্ধ। স্বতঃস্ফূর্ত্ত রেডিয়ামের কণা যেন অজস্র বর্ষিত হ'ত আমার অন্ধকার মনের পর্দ্দার উপর, স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে উঠত জ্বলে জ্যোতির্বিন্দুগুলি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত কেবল গল্প আর তর্ক। তাঁর জ্ঞানবৃক্ষের ডালে ডালে ঝাঁকি দিয়ে সংগ্রহ করতাম পরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফলসম্ভার। পুঁথিগত বিদ্যা নয়, পরের বুলি কপ্‌চানো নয়—তাজা প্রাণের বহু সুখদুঃখ-সঞ্চিত অম্লকটুমধুর দ্রাক্ষাগুচ্ছ। প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর। সিনেমার ফিল্মে আঁকা অফুরন্ত চিত্রাবলী, নানা ঘটনার পরম্পরা দরদী হৃদয়ের স্নেহরসে অনুরঞ্জিত। স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবনে যেমন বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ, মুক্তগতির লীলা—তেমনি আবার বহু অনুশাসনে নিষ্পিষ্ট রুদ্ধশ্বাস প্রাণধারায় আছে প্রবল বিক্ষোভ ও বেদনা। স্বেচ্ছাবৃত দৈন্যদুর্গতিতে কত প্রাণঋদ্ধি ও মহত্ত্ব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে এই বাংলার অন্তঃপুরে এবং আঁস্তাকুড়ে তার ইঙ্গিত পেতাম শরৎচন্দ্রের সহৃদয় ঘোষণায়। তাঁর যুক্তি-বিচারের প্রতিষ্ঠা ছিল প্রত্যক্ষের মর্ম্মস্থলে, আর অটুট বিশ্বাস ছিল আপনার সূক্ষ্মদর্শী অনুভূতির উপর। হলে-যা-হতে-পারত সেই সম্ভাব্যতাকে দেখে প্রেমিকের যে দৃষ্টি, শরৎচন্দ্রের সেই দৃষ্টি ছিল। বেসুরা জীবনের অন্তর্গূঢ় সুরটি তাঁর কাণে জাগত। তাঁর প্রবীণ হৃদয়ের এই সহানুভূতি ও আশাশীলতা আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল। মানুষের ভাল এবং মন্দ দুইই তিনি যথেষ্ট দেখেছিলেন, তাই খাঁটি আর মেকির পার্থক্যটা চমৎকার বুঝতেন। মতে—আদর্শে—দৃষ্টিকোণের সংস্থানে, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে আমাদের বৈসাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট, বাদানুবাদের অন্ত ছিলনা, কিন্তু মনে পড়েনা কখনো সেজন্য কোনো মনোমালিন্য হয়েছিল আমাদের মধ্যে। তাঁর উদার প্রেমিক হৃদয় সব ব্যবধান অতিক্রম ক'রে হৃদয়ের মিলন কেন্দ্রটিতে সহজে উপনীত হ'ত। ছোট ছোট দু একটি কথায় ঝলমলিয়ে উঠত অভিজ্ঞ জীবনের দামিনী দীপ্তি।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি বোধকরি আত্মবিরোধ। আদর্শের সঙ্গে অন্তরের গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বে আজন্মের শিক্ষা দীক্ষা সঙ্গ সংস্কার এবং সর্ব্বোপরি দৈবনির্ব্বন্ধ অন্তরের নির্দ্দেশকে জীবনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে। এ ব্যর্থতা আমাদের সকলের জীবনেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। যাঁদের নাই অথবা থাকলেও ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, তাঁরা মহাপুরুষ। কিন্তু মানুষের ত্রুটি প্রমাদ ভীরুতা অক্ষমতা যেমন সত্য, তেমনি তার আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব, অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা, অনায়ত্ত আদর্শের জন্য ব্যাকুলতাও বেদনা বোধহয় গভীরতর সত্য। পৃথিবীর নদীপর্ব্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যবিস্তার, দিবারাত্রির আলো অন্ধকার আমাদের দৃষ্টিগোচর, তার খনিজ গুপ্তধন সাগরগর্ভের রত্নাবলি অলক্ষ্যের অন্তরালে সুরক্ষিত গোপন সম্পদ।

"আজিকে হয়েছে শান্তি—জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে।" শরৎচন্দ্রের নশ্বর জীবনাংশ শ্মশানভস্মে বিলীন হয়েছে। অবিনশ্বর যা, তাঁর চিত্তসঞ্চিত ঋদ্ধিসম্ভার যা, অপূর্ণ জীবনের পূর্ণতার মূলধন যা, তার যথেষ্ট নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্য রচনায়। সেই সম্পদের

উত্তরাধিকারী বাংলার বর্ত্তমান ও আগামী যুগ। সাহিত্যিকের জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় তাঁর রচনার সত্যে কল্যাণে ও সৌন্দর্য্যে। আসুন, আমরা তাঁর বিদেহী আত্মিক বৈশিষ্ট্যের পর্য্যালোচনায় ধন্য হই। যাঁরা তাঁর ভঙ্গুর জীবনের সঙ্গে বন্ধুরূপে আত্মীয়রূপে যুক্ত ছিলেন তাঁদের অন্তরে মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তিটুকুই অমর হয়ে রইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শরৎ-কথা

আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয় চাঁদ স্নিগ্ধচোখে আমার দিকে চেয়ে আছে ; এ আমার—একেলা আমার। ভাবতে পারিনে—ভাবতে হয়ত ব্যথা লাগে, চাঁদের এই স্মিতদৃষ্টি সকলেরই উপর। শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেও অমনি একটা ভাব হত। মানুষের 'পরে এমন দরদ আর কোথাও দেখিনি। তিনি মুখেও বলতেন—মানুষ ছাড়া আর কিছু বুঝিনে। আমার সব গল্পই মানুষের গল্প। মুখে যাই বলনা কেন, তোমরাও ঐ মানুষের গল্প শুনতে চাও, তাই আমাকে এত ভালবাস।

সামতাবেড়ের পল্লীবাসে শরৎচন্দ্রকে দু'একবার দেখেছি। বালীগঞ্জের শরৎচন্দ্র ছিলেন চাল-চিত্রহীন প্রতিমার মতো। পল্লীর আবেষ্টনীতে তাঁকে যে না দেখেছে, সে তাঁকে উপলব্ধি করবে কি করে? মনে পড়ে সেটা শীতকাল। উঠান ও বারাণ্ডা ভরে গেছে, গ্রামের নানাবয়সী স্ত্রী-পুরুষের সকলের মাঝখানে ইজিচেয়ারে বসে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র। পাশেই এক বাঁশের চোঙা ভরতি রকমারি ফাউণ্টেন পেন। ষ্টিমার থেকে নেমে বালির চড়া ভেঙে অবশেষে উঠানে পৌছান গেল। সস্নেহ আহ্বান এল—এসো, এসো, এসো—

সুদূর গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কীর্ত্তি অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করা গেল। শুধু পয়সা দিয়ে দায় সারা নয় ; ঘর-গৃহস্থালীর সকল খবর নিয়ে তবে এক একজনের ছুটি। একজনকে বললেন—তোর মেয়ে কেমন আছে রে ছবির মা?

—ভাল আছে দাদাঠাকুর, ওষুধ তোমার ধন্বন্তরী—

—কিন্তু ছেলেটাকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি। ভেসে ভেসে শেষে ঐ চড়ায় এসে আটকাল। কাকে শকুনে ভিড় করেএসেছে—দেখে থাকতে পারলামনা, তুলে আবার মাঝনদীতে ফেলে দিয়ে এলাম। বামুনকে দিয়ে শেষটা মড়া ফেলিয়ে ছাড়লি, হাঁরে ছবির মা?

বুড়ো ছবির মা আঁচলে চোখ ঢাকল।

সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতায় কিসের একটা সভা—শরৎচন্দ্র সভাপতি। খাওয়া-দাওয়ার পর ক'জনে রওনা হয়েছি, দেউলটি এসে ট্রেণ ধরতে হবে।

—দাদাঠাকুর!

সর্ব্বনাশ, পিছন ডাকে! তুলসীবাবু সভয়ে বললেন—বিপদ-আপদ না ঘটলে বাঁচি।

শরৎচন্দ্র বললেন—ঘটবে বলেই ত ঠেকছে। সভাপতি করেছে—বক্তৃতা না শুনে কি ছেড়ে দেবে সহজে?

দু' তিনটে লোক মাঠের দিক দিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। একজন হুঙ্কার দিয়ে উঠল—আবার চলেছ কলকাতায়? এই যে বল্লে পায়ের ধুলো দেবে সকালবেলা—

শরৎচন্দ্র বিব্রতভাবে বলে উঠলেন—দেবো—দেবো। রাত্রেই ফিরে আসছি—

লোকটা কিন্তু একবিন্দু প্রত্যয় করল না। ঘাড় নেড়ে বলল—হুঁ—আসতে দিচ্ছে তারা? বেচারা আমি! আমারই দিকে তারা কটমট করে তাকায়। বোঝা গেল, অপরাধী আমাকে ঠাউরেছে। কলকাতা থেকে এক একটা দুর্গ্রহ এসে তাদের দাদাঠাকুরকে টেনে নিয়ে যায়—এটা তারা কিছুতে বরদাস্ত করতে পারে না।

শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন—দেখো হে তুলসী—শিগ্‌গির যদি কাজ চুকে যায়, আজই ফিরতে হবে কিন্তু।

তারপর ঐ চাষাভূষোদের কথাই চলল। তারা জানেনা তাদের দাদাঠাকুরের আর কোন রকম স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সভাসমিতি উপলক্ষে যারা এসে শরৎচন্দ্রকে গ্রাম থেকে টেনে নিয়ে যায়, তাদের পরে এদের মহা রাগ। হাসিমুখে শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন—একদিন কিন্তু সত্যি সত্যি আমার বড় দুঃখ হয়েছিল। একখানা টেলিগ্রাম এসেছে, সেটা পড়াবার জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেছে। এমন কি মাইল দেড়েক গিয়ে ভিন্ন গ্রাম থেকে পড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি সেইখানটায় বসে। অথচ এতগুলোর

মধ্যে একটা লোকেরও মনে এ কথাটা জাগল না—যে টেলিগ্রাম পড়বার মতো ইংরাজি-বিদ্যা দাদাঠাকুরের থাকলেও থাকতে পারে।

সকাল বেলাকার সেই ছবি-মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠল। মেয়েটি কুলীন জাতের নয়। বছর আষ্টেক বয়সে বিয়ে হয়। পতিটি পিতামহকল্প—অন্তত বয়সের দিক দিয়ে—সত্বরই পরমাগতি লাভ করলেন; রইল মেয়েটা আর তার অটুট স্বাস্থ্য। সম্প্রতি ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা নাকি কোন কোন সমাজ-মণির বংশদুলালকে খারাপ করছে। বংশদুলালেরা যে পাড়ার বাইরের পথ না চেনেন এমন নয়। বিপন্ন মা-মেয়ের দিন কাটছিল দাদাঠাকুরের দয়ায়। মেয়েটির অনেক দুঃখের ধন একটি ছেলে—সেটিও আগের দিন মারা গেছে।

সেই ছবি এবং তার মা আজ কোথায় কেমন আছে জানিনা। দাদাঠাকুরের বিয়োগব্যথা তারা কি ভাবে নিয়েছে? আমাদের কাছে শরৎচন্দ্র বেঁচে আছেন তাঁর চিরজীবী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে—তাদের ত কিছুই রইল না।

সেকালে দেশে অন্নের অভাব ছিল না, হৃদয়েরও ছিল তেমনি অবাধ প্রাচুর্য্য। জ্ঞাতি বন্ধু আপনার নিয়ে বৃহৎ সংসার···অগুণতি ঘর, বাড়ীতে অতিথি এলে ঘরের গোলক ধাঁধা ভেদ করে সে বেচারা আর বেরুবারই পথ পেত না। আর কষ্টে স্বষ্টে পথ যদি বা মিলল, গৃহকর্ত্তা অমনি আগলে দাঁড়ালেন—'না হে, এত বেলায় আর যায়না—চলো, চলো,···চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসিগে। আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র সেই মজলিসী জাতের শেষ বংশধর। বিংশ শতাব্দীর কর্ম্মব্যস্ত মানুষ আমরা—কিন্তু তাঁর কাছে গেলে সাধ্য কি যে উঠে চলে আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লঘুপক্ষ পাখীর মতো উড়ে পালাচ্ছে—কাজের ক্ষতি হচ্ছে, মন ব্যস্ত—তবু বসে থাকতে হবেই। কত গল্প—নিজের সম্বন্ধে, আশে পাশে দশজনের সম্বন্ধে, সাধারণ সাধারণ কত কি কাহিনী। একদিন তাঁকে বলেছিলাম—আপনার গল্প মগ্ন হয়ে শুনি, কিন্তু বিশ্বাস করিনে। সমস্ত মিথ্যা—ফাঁকি—আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলেন।

শরৎচন্দ্র বললেন—জীবনটাই তো ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে গেলাম ভাই। তোমরা সব স্কুল কলেজে কত খাটনি খেটে পড়াশুনো করেছ, সে সময়টা আমি ফাঁকি দিয়ে তামাক মেরে কাটিয়েছি।···তারপর সারা জীবন খালি মিথ্যে কথা লিখে লিখেই এত ভালবাসা কুড়িয়ে গেলাম।

আর একদিন বলেছিলেন—আমার লেখার মধ্যে সবাই আমাকে খোঁজে। কেউ বলে, আমি গোঁড়া হিন্দু, কেউ বলে আমি একজন নাস্তিক। কেউ বলে 'চরিত্রহীন' বইটায় আমার নিজের কাহিনী রয়েছে, কেউ বলে শ্রীকান্ত আমারই আত্মজীবনী। আমায় নিয়ে সবই কথা কাটাকাটি চলে, দূরে দাঁড়িয়ে আমি হাসি।

আমি বললাম—আপনি মায়াবী। চরিত্রগুলোকে এমন জীবন্ত করে এঁকেছেন যে মিথ্যা বলে কেউ মানতে চায় না।

একটুখানি ভেবে নিয়ে তিনি বললেন—মিথ্যাও হয়ত তারা নয়। জীবনে কত মানুষ দেখলাম, কত রকম মানুষের সঙ্গে মিশেছি। লিখবার সময় সেই সব মানুষের মনের মধ্যে ডুব মেরে বসি। তখন আর সম্বিৎ থাকে না।

মনের মধ্যে আসন জুড়ে বসবার শক্তি যে তাঁর কত বড়, সমগ্র দেশের মানুষ আজ তার সাক্ষী দিচ্ছে। শিল্পী শরৎচন্দ্রের কোন দিন মৃত্যু হবে না, কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্রের সঙ্গ যারা চিরদিনের মতো হারাল, তাদের দুঃখের পরিসীমা নেই।

শ্রীমনোজ বসু

শরৎ-প্রয়াণে

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে বাঙ্গলা আজ কণ্ঠহীন হইয়াছে। যে সুললিত কণ্ঠ অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সহিত এতদিন বাঙালীর নিবিড়তম গভীরতম সুখদুঃখের বাণী বিশ্ববাসীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিল সে কণ্ঠ আজ নীরব; যে লেখনী বাঙালীর জীবনের তুচ্ছ সাধারণ কথাকে এতদিন অপূর্ব্ব মাধুরী মণ্ডিত করিয়াছিল সে লেখনী আজ স্তব্ধ হইয়াছে।

সারা বাঙলা আজ তাই মূঢ় স্তব্ধ বেদনায় নির্ব্বাক হইয়া এই সর্ব্বনাশ সুধু অনুভব করিতেছে।

এ সর্ব্বনাশ যে কত বড়, বাঙালীকে শরৎচন্দ্রের দান যে কত বৃহৎ, কত মহার্ঘ—তাহা নির্ণয় করিবার সময় আজ নয়,

মুহ্যমান বঙ্গবাসীর তাহা হিসাব করিবার শক্তি বা অবসর আজ নাই।

আমরা আজ সুধু সেই প্রতিভার অবলুপ্ত অবতারের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রতীক্ষা করিব সেইদিনের—যে দিন এই প্রতিভার স্ফুরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে ও বিশ্বসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের মূল্য নির্ণয় হইবে ও তাঁর স্মৃতি এমন একটা গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে যে গৌরব শরৎচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিতে পান নাই।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের লোকান্তরপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাঁর সাহিত্য নিয়ে চুলচেরা বিচার সম্ভবও নয়—তাঁর ব্যক্তিত্ব এখনো আমাদের চোখের সাম্নে এমন সুস্পষ্টরূপে জাগরূক রয়েছে যে তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্য-বিচার আজ এক রকম দুঃসাধ্য। অথচ সত্যকার সমালোচনা মানেই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে সাহিত্যকে দেখা ও বোঝা এবং সেই দর্শন ও মননকে অন্যের গোচরে আনা। এই জন্যই সমসাময়িকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য সমালোচনা করা প্রায়ই ঘটে ওঠে না। বিশেষ ক'রে শরৎচন্দ্রের মতো সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ প্রতিভার সমালোচনা করা—কারণ তাঁর সৃষ্টির পরিধি এত ব্যাপক, তাঁর দৃষ্টির বৈচিত্র্য এত বেশী—যে তাঁকে প্রচলিত সাময়িক সাহিত্যের ছকবাঁধা পথে আটকানো যায় না—তিনি স্বকৃত আদর্শের পথে স্বয়ংসিদ্ধ, কোন মতবাদ বা দলীয় আন্দোলনের অনুপূরক হিসাবে তাঁর সাহিত্য জন্মায় নি। কাজেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা কোন সমালোচনা করতে প্রয়াস পাবো না।

ব্যক্তিগতভাবে বর্ত্তমান লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কতটা সম্বন্ধ ছিল, পত্রান্তরে তা সংক্ষেপে লেখবার চেষ্টা করেছি—দেশের গণ্যমান্য বহু লেখক-লেখিকাই তা লিখেছেন। কাজেই তারও পুনরাবৃত্তি নিরর্থক। বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের কাল থেকে সুরু করে একেবারে মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত যাঁরা তাঁর নিত্য-সাহচর্য্য লাভ করতে পেরেছেন, এ কাজে তাঁদেরই সমধিক অধিকার। আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ মাত্র গত সাত আট বৎসরের—তখন তিনি বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে একচ্ছত্র সম্রাট, আমরা ভাগ্যান্বেষী নবীন ছাত্র। তবে সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের তিনি ভালোবেসেছিলেন এবং এত বেশী ভালোবেসেছিলেন যে তাতে অনেকেরই ঈর্ষা উদ্রিক্ত হয়েছিল। সেজন্যে অন্তরালে আমরা তাঁর জন্য দীর্ঘকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করবো, কিন্তু দেশের পাঠকপাঠিকাদের কাছে সেজন্যে কোন দাবী দাওয়া থাকা স্বাভাবিক নয়। বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লেখক হিসাবে তাঁর জন্যে সমস্ত দেশই শোকার্ত্ত—সেই শোকের একজন সাধারণ অংশীদাররূপে আমাদের দাবী আর কত দূর যেতে পারে?

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার যুগে আমরা ছাত্র ছিলাম। তখন আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর প্রবেশ করেছি, বঙ্কিমের প্রভুত্ব তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাজ ক'রছে। কৃষ্ণকান্তের উইল থেকে চোখের বালিতে এসে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু দোষে গুণে যে জীবন আমরা নিত্য যাপন করি তাকে আরো স্পষ্ট ক'রে আমরা সাহিত্যে পাবার জন্যে লুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম। শরৎচন্দ্র ঠিক সেই সময়ই আবির্ভূত হলেন এবং প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দেশের চিত্তবৃত্তিকে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নিলেন। হঠাৎ একদিন আমরা আবিষ্কার ক'রলাম যে তিনি একান্তই আমাদের।

ভাবাবেগের ঢেউ কাটিয়ে যখন বিচার-বুদ্ধির শক্ত জমিতে পা পড়লো, তখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা করার দুষ্টবুদ্ধি মাথায় আসে নি এমন নয়—কেতাবী যুক্তিতর্কের জাঁতাকলে ফেলে বিশ্লেষণ করে' দেখার ইচ্ছা হয় নি এমন নয়—কিন্তু সমস্ত অপচেষ্টাকে ছাপিয়েই তিনি আমাদের হৃদয়কে জয় করেছিলেন। সে তাঁর অনন্যসাধারণ ষ্টাইল আর অকপট অনুভূতির জোরে—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অতিমানুষী প্রভাবের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এত বড় বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য দাবী করার শক্তি আর কারুরই হয় নি—হওয়া সহজও নয়।

বলা বাহুল্য তাঁকে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত বলা যায় না—তিনি জীবিত থাকলে একথা শুনে হয়ত কাণ

মলেই দিতেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি যে একান্ত তাঁরই ছিল এবং তাঁর ষ্টাইলও যে কারুর ধার-করা নয়, একথা কোন প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য খবরের কাগজে তাঁকে দীন দুঃখী ও নির্য্যাতীতের বন্ধু এবং পতিতাদের পেট্রণ ব'লে ঘোষণা করা হয়ে থাকে—সরল-হৃদয় শরৎচন্দ্রও এতে খুসী হতেন এবং মনে করতেন এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুতঃ এটা সাহিত্য-বিচারে সুলভ ismএর দোহাই ছাড়া—এর উর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এত বড় ছিলেন ; ism জিনিসটা জীবদেহে অস্থি সংস্থানের মতো অন্তর্লগ্ন জিনিস—এ যে রচনায় গলাবাজী ক'রে বাইরে আত্মস্বাতন্ত্র্য দাবী করে সে রচনা আর যাই হোক, সাহিত্য হয় না।

শরৎচন্দ্র কোন দিনই মনে করেন নি যে পাপতাপ পতনস্খলনই জীবনের চরম গতি বা পরম প্রসাদ। কিন্তু জীবনে এদের স্বীকৃতি আছে—নীতিজ্ঞানবশে এদের উড়িয়ে দিতে যাওয়া নিরর্থক—এদের মেনে নেয়াতেই জীবনের সার্থকতা—তাই তিনি এদের শ্রদ্ধা দিয়ে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর যদি মিশনারী বুদ্ধির আতিশয্য থাকতো তাহ'লে তিনি এদেরই মহিমান্বিত করে তুলতেন এবং এদের পাশে এসে ক্ষমা প্রেম পবিত্রতা তুচ্ছ হয়ে যেতো। বস্তুতঃ তা তিনি করেন নি—দরিদ্রকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন, কিন্তু অদরিদ্রের বিরুদ্ধেও তিনি জেহাদ ঘোষণা করেন নি ; পতিতাকে তিনি মর্য্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু সতীর বিরুদ্ধেও তাঁর কোন নালিশ ছিল না। জীবনকে যিনি সত্যিকার চোখ দিয়ে দেখেছেন, তাঁর দৃষ্টি কোন-দিনই সে রকম একদেশদর্শী হতে পারে না। এখানেই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী শুধু তাঁরই—তিনিই দেশকে বুঝিয়েছেন যে মানুষ দেবতাও নয়, দানবও নয়—দুয়ের উপাদানই তাতে আছে, তার চেয়ে বেশীও কিছু আছে, তা তার মানবত্ব। এই সর্ব্বাঙ্গীন মানবত্বের উপাসক বলেই তিনি আমাদের নমস্য।

তাঁর সাহিত্যে বিশ্বমানব নেই—তারা পরস্পরবিরোধী অন্তর্বৃত্তির প্রতিনিধিরূপে একে অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় না। তারা ভালো-মন্দ দোষগুণ নিয়ে একান্ত আমাদেরই মতো মানুষ—তারা দোষ করে আমাদেরই মতো, আমাদেরই মতো দোষের উর্দ্ধে ওঠে—ক্ষমা দিয়ে প্রীতি দিয়ে মমতা দিয়ে। সাহিত্যের মধ্যে তাদের মেনে নেয়াতে সত্যকেই মেনে নেয়া হয়, আর যে সাহিত্য তাই মেনে নেয় সেই সাহিত্যই সত্যিকার জাতীয় সাহিত্য হয়। সেদিক থেকে তাঁর মতো খাঁটি বাঙালী লেখক এ যুগে আর কেউ নেই—বাংলাকে আর কেউ এত ভালো করে দেখে নি, এত ভালো কেউ বাসে নি। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দোষে গুণে বাঙালী জাতটা, বাংলা দেশটা বেশ' —তাঁর সাহিত্য তাঁর সেই ঐকান্তিক উক্তিরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। যুগ যুগ ধরে তা থেকে বাঙালী প্রাণের খাদ্য আহরণ করবে।

শরৎচন্দ্র আজ নেই—তাঁর সাহিত্য আছে, চিরদিনই থাকবে। কিন্তু যে মানুষটির জীবনব্যাপী সাধনা ও উপলব্ধি সাহিত্যের ভেতর দিয়ে মস্ত হয়ে জাতির মনপ্রাণকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছে, তাকে চিরদিনের জন্যে এত বড় করে দিয়েছে তাঁরও কি সত্যিই বিনাশ আছে!'

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শরৎচন্দ্র

(সনেট)

অনন্ত অম্বরলীন সে কোন্ তপন
বৈজয়ন্ত দীপ জ্বালি' বীজের নিশায়
পলে পলে ছন্দি' তোলে প্রসূন-লগন !
যবে তার সৃষ্টি-শিখা কাঁপে ত্রিযামায়,
উৎসারিয়া বক্ষ হ'তে প্রস্ফুটন-বিভা
উছলে সুনীলাঙ্গন আলোর হিল্লোলে,
সহসা কি মূর্তি লভে অরূপ-প্রতিভা
ধরণীর স্বপ্নময় রূপের উৎপলে।

সৃজনের সে কমল নিরালা সঙ্গীতে,
সুরভি, সৌবর্ণে আর পুষ্পল ঝঙ্কারে
ক্ষণতরে সঞ্চলিয়া, চলেছে নিভৃতে—
যেথায় বিরাজে ওই সন্ধ্যার ওপারে
নবীন-ভাস্বর-রাগ-রঞ্জিত-অধর
শিল্পীর অন্তর-সখা অনাদি-সুন্দর।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী

শরৎচন্দ্র

দেহের সীমার মাঝে কি অতল মর্ম্মের স্পন্দন
এনেছিলে, হে পথিক ! এ মর্ত্ত্যের হাসি ও ক্রন্দন
তোমার পরশরসে সিক্ত করি' ক'রেছ গভীর ;
তোমার বিকাশবাণী ঝঙ্কারিল বঙ্গভারতীর
তন্ত্রীর হৃদয়তন্ত্রে সঙ্গোপন অনল উৎসের
তীব্রতম রাগিণীর তরঙ্গিত দীপ্তপ্রবাহের
স্ফটিকগতির ধারা। হে প্রাণ, অম্লান, অনাবিল !
তোমার চলার ছন্দ বহে নাই বিভ্রান্ত জটিল
বুদ্ধির বঙ্কিত পথে। হে পৃথ্বীর স্বভাব-প্রেমিক !
তুমি পুষ্পসুকোমল, বজ্রসম দুর্জ্জয় নির্ভীক ;
সীমাহীন হে বেদনা,
হে বিশাল আনন্দময়তা !
দেশের কালের মাঝে ধরা দিলে, দেশকালহীন
তবু তুমি ; হে প্রেমিক, হে প্রতিভা, হে চিরনবীন !
মরতার ছদ্মবেশে এনেছিলে অক্ষর অমৃত
অমর-হৃদয়পদ্মে, সে ধারায় করিলে সিঞ্চিত
ধরণীরে ; তব মৃত্যুহীন সত্তা করিয়া বরণ
অনির্বাণ মহিমায় মরণের সার্থক মরণ।

নিশিকান্ত—পণ্ডিচেরী

শরৎচন্দ্র

পড়িতে ছিলাম গ্রন্থ নিরালা সন্ধ্যায়—
উত্তরের বায়ু এসে প্রদীপ কাঁপায় !
বাতায়ন কেঁপে ওঠে, উড়ে যায় বই—
বিজলী চমক দেখি মূক হয়ে রই।
ঝরে ধারা অবিরল আসে ভেজা বায়ু
কম্পিত দীপটির কেড়ে নেয় আয়ু !
আঁধার ঘনায়ে আসে ; আসে কালো মেঘ—
কেবলি বাড়িতে থাকে পবনের বেগ !
হঠাৎ অবাক্ মানি—শরতের চাঁদ—
জলদের ফাঁক দিয়া পাতে মায়া ফাঁদ !
থেমে গেল জলধারা, দেখি চরাচর
তুলে লই পুঁথিখানি কোলের উপর।
আছে ঝড়, আছে ঝঞ্ঝা—সত্য সমুদয়—
তারি মাঝে আছে চন্দ্র দিব্য জ্যোতির্ম্ময় !

শ্রীঅখিল নিয়োগী

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা

সবেমাত্র আমাদের সাহিত্য-সাধনা সুরু হইয়াছে—সন তের শত উনিশ সালের মাঘ মাসে স্বর্গগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্যে" "বাল্যস্মৃতি" নামে একটী গল্প প্রকাশিত হয় ; লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পল্লী-গ্রামের এক গরীব বামুন কলিকাতার কোন "মেসে" ঠাকুরের কাজ করিত, তাহাকে লইয়া গল্প। পাড়াগাঁয়ের লোককে লইয়া গল্প. গল্পটী আমাদের ভাল লাগিল। ইহার পূর্ব্বে আমরা শরৎচন্দ্রের নাম শুনি নাই। তাঁহার কোন লেখা পড়ি নাই। পরের দুই মাসে ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যার সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' বাহির হইল, কাশীনাথ আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। কাশীনাথ পড়িলাম, পড়া বন্ধ করিয়া কাঁদিলাম।

কাশীনাথ পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম ; কিন্তু কাশীনাথ যে খুন হইল, কমলা যে আত্মহত্যা করিল, ইহা আমাদিগকে ব্যথিত করিল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। মনে হইল সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিব, ভিতরের খবরটা জানিয়া লইব। সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

ভগবৎ কৃপায় একদিন সুযোগ মিলিল। কলিকাতায় আসিয়া ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধরদাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম ; প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহার স্নেহলাভে ধন্য হইলাম। অতঃপর একদিন ভারতবর্ষ কার্য্যালয়ে ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ত্রিতলের একটী ঘরে শরৎচন্দ্রের দর্শনলাভ করিলাম।

সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শরৎচন্দ্র বসিয়া সিগারেট খাইতেছিলেন, দাদা পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমি প্রণাম করিলাম। তিনি 'হয়েচে হয়েচে' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। আমি বীরভূমের

লোক জানিয়া তিনি বলিলেন "আমি বীরভূমের খানিকটা দেখে এসেচি, কিন্তু নান্নুর আর কেন্দুলী দেখা হয় নাই, একবার দেখে আসতে হবে"। আমি উৎসাহিত হইয়া হেতমপুর রাজবাড়ীর নামে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম এবং বীরভূমের কোথায় কোথায় গিয়াছেন জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন "যদি কখনো বীরভূম যাই আপনাকে খবর দোব। আমি ট্রেণে সাঁইথিয়া বোলপুরের পথে কতবার যাতায়াত করেচি। একবার সাঁইথিয়ায় নেমে দিন দুই ঘুরে ঐ অঞ্চলটা দেখে গিয়েছিলেম। আর একবার ছোট খাট একটা দলের সঙ্গে বক্রেশ্বর দেখ্‌তে এসেছিলাম। আমি কিছুদিন বনেলী ষ্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চল্‌চে। ষ্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্ম্মচারী সেই কাজে ষ্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলেম। ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন করে নাচগানের মজলিস দিতেন। সেই সময় আমরা কয়েকজন মিলে বক্রেশ্বর বেড়াতে যাই। বক্রেশ্বরের শ্মশানটা আমার বড় ভাল লেগেছিল। শিবের মন্দিরের দিকটাও খুব নির্জ্জন"।

প্রথম পরিচয়ের দিনেই এইরূপ প্রাণখোলা আলাপে অত্যন্ত আনন্দ হইল।

এইরূপ প্রাণখোলা আলাপে সাহস পাইয়া "কাশী-নাথের" কথা উত্থাপন করিলাম। 'কাশীনাথ' নাম শুনিয়াই তিনি ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"শুধু কাশীনাথ নয়, সাহিত্যে যে কয়টা গল্প বেরিয়েছে, ওর সব কয়টাই আমার বাল্যকালের লেখা, গল্পে কি যে ছিল মনেও নেই। আমাকে না জানিয়ে একবার দেখতে পর্য্যন্ত না দিয়ে হঠাৎ গল্পগুলো বের' করে দিয়েচে। প্রুফটা পেলে অন্ততঃ একবার চোখ বুলিয়ে দেওয়া যেত। ভায়াকে (ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে) বলে-ছিলাম—ভায়া লিখে দিন ও গল্পগুলো আমার নয়—তা ভায়া কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। দু' একটা কথার পর আমি কাশীনাথের খুন হওয়া এবং কমলার আত্মহত্যার কথাটা তুলিয়া একটু পরিবর্ত্তন করা চলে কিনা দেখিতে অনুরোধ করায় বলিলেন—"ও গল্প কখনো বইএর আকারে বেরুবে কিনা জানিনা। যদি বেরোয় নিশ্চয় পরিবর্ত্তন করতে হবে। তবে ও গল্প আর বই করে ছাপাবার ইচ্ছে নেই।" সাহিত্যে 'কাশীনাথ' প্রভৃতি গল্প প্রকাশিত হওয়ায় তিনি যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন পত্রান্তরে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত পত্র হইতেও তাহা জানা যায়।

অতঃপর কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে কতবার দেখা হইয়াছে। কত সভাসমিতিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি, প্রথম পরিচয়ের দিনের সেই স্নেহের কোন ব্যতিক্রম দেখি নাই। আমি তাঁহার বাজে-শিবপুরের বাসায় এবং পানিত্রাসের বাড়ীতেও কয়েকবার গিয়াছি। একদিনের কথা বলিতেছি।

বাজে-শিবপুরে শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী এবং অনুরক্ত ভক্ত হরিচরণ মিত্র ষ্টার থিয়েটারে স্বর্গগত অপরেশবাবুর নিকটে প্রায়ই আসিতেন। আমরা তাঁহাকে ভূতনাথবাবু বলিয়া ডাকিতাম। তিনি এ্যাব্রেট কোম্পানীর ঘড়ির দোকানে কাজ করিতেন। একটা ছুটীর দিন তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কথা রহিল সকাল ৭টা নাগাইদ পৌছিতে হইবে। তাহা হইলে সমস্ত দিনের বেশীর ভাগ সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কাটাইতে পারিব।

যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। শরৎচন্দ্র এই নিমন্ত্রণের কথা জানিতেন, তাই ভূতনাথবাবু একেবারে আমাকে শরৎচন্দ্রের বসিবার ঘরেই লইয়া গেলেন। একটা মাঝারি টেবিলের তিনধারে তাঁহার নিজের বসিবার চেয়ার ছাড়া আর খান দুই চেয়ার এবং একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল। টেবিলের উপর সুন্দর বাঁধানো খান দুই খাতা, একটী পরি-স্কৃত দোয়াতদানে লাল এবং কাল কালীর দুইটী দোয়াত ও গুটী চার কলম, গুটী দুই দামী ফাউণ্টেন পেন, আর কয়েক খানা বই যত্নসহকারে সাজানো। পাশে একটী প্রকাণ্ড গড়গড়া, চাকর আসিয়া তামাকু দিয়া গেল। আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম, ভূতনাথবাবু বাজারে চলিয়া গেলেন। তামাক খাইতেছি, হঠাৎ গল্প বন্ধ করিয়া কিছু না বলিয়াই শরৎচন্দ্র ব্যস্তভাবে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। মনে হইল কে যেন ডাকিল; আমাকে কিছু না বলিয়া যাওয়ায় মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হইলাম। দেখিতে দেখিতে আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, শরৎচন্দ্রের দেখা

নাই। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি শরৎচন্দ্র আসিতেছেন। চোখে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে, কান্না চাপিবার চেষ্টায় সারা দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। মনে হইল যে তিনি বাড়ীর ভিতরে থাকিতে পারেন নাই। হয়তো আমার কথা তাঁহার মনে ছিল না, এখন বাহিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া সাম্‌লাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; না পারি উঠিয়া যাইতে, না পারি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে। অনেকক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র কথা কহিলেন—"পাখীটা মরে গেল। কোন রকমে বাঁচানো গেল না। তিনদিন মাত্র অসুখটা জান্‌তে পেরেচি, কত চেষ্টাই তো করলেম—আজ তিন বছর পাখীটা সঙ্গে সঙ্গে ছিল, একদণ্ডের জন্য কাছছাড়া করিনি। তেমন বেশী গুরুতর অসুখ তো জানা যায় নি। হঠাৎ বেড়ে ওঠায় বাড়ীর ভেতর থেকে খবর পেয়ে উঠে গিয়েছিলেম। কিছু মনে করবেন না"। মনে যাহা করিলাম, তাহা আর বলিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া দুই একটী কথা বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং ভূতনাথবাবুকে সব কথা বলিয়া কোন রকমে বুঝাইয়া কলিকাতা পলাইয়া আসিলাম।

শরৎচন্দ্রের লেখা পড়িয়া আমরা তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, এমনই ছোটখাট দুই একটী ঘটনায়ও আলাপের মধ্যে দুই চারিটী কথায় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার সরস আলাপ, তাঁহার পরিহাসপ্রিয়তা, তাঁহার মার্জ্জিত রুচি এবং উন্নত চিন্তা সাহিত্যিক-সমাজের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল। এই মানব-প্রেমিক শক্তিমান সাহিত্যসাধকের অনুভূতিপ্রবণ কোমল প্রাণ অল্পেই চঞ্চল হইয়া উঠিত। তাঁহাকে হারাইয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বাক্‌দেবীর চরণপ্রান্তে স্থান পাইয়াছেন। জাতির বেদনাপ্লুত হৃদয়ের অশ্রুপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি কি সেখানে পৌঁছিবে না?

কাশীনাথে তিনি কিরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সাহিত্য ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত কাশীনাথ হইতে নিয়ে তাহা দেখানো হইল।

"সাহিত্য" ২৩বর্ষ—১১শ সংখ্যা—১৩১৯ সালের ফাল্গুন—৯০৬ পৃষ্ঠায় আরম্ভ, ৯২২ পর্য্যন্ত প্রথমাংশ, চৈত্র সংখ্যা ৯৭৫ পৃষ্ঠায় আরম্ভ, ৯৩৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ("শুধু একবার বল এ কাজ তোমার দ্বারা হয় নাই।") এই অংশের পর—

ক্ষতস্থান দিয়া এখন হুহু করিয়া রক্ত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বিন্দু চীৎকার করিয়া উঠিল। বাহিরে ডাক্তার বসিয়াছিলেন, তিনি ভিতরে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন কাশীনাথের প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। (চৈত্রসংখ্যা সাহিত্য ৯৯১ পৃঃ ১৩১৯)

দশম পরিচ্ছেদ

নিদ্রায় জাগরণে চেতনায় অচেতনায় কমলার ছয়দিন কাটিয়া গেল। তাহার প্রাণেরও বড় আশা ছিল না। ডাক্তার খুব সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাই খুব সাবধানে রাখিয়া ছয়দিন পরে তাহাকে জাগাইয়া তুলিল।

ভাল করিয়া চক্ষু চাহিয়া কমলা দেখিল—শিয়রে বসিয়া তাহার মাথা কোলে করিয়া অপরিচিতা বিন্দুবাসিনী বসিয়া আছে। বহুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

"আমি বিন্দু, তোমার স্বামীর ভগিনী।"

"তিনি কেমন আছেন?" বিন্দু ডাক্তারের পরামর্শ মত বলিল "ভাল আছেন।"

"আঃ—আমি কত দুঃস্বপ্নই দেখছিলাম।"

পরদিন কমলা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিন্দুর গলা ধরিয়া বলিল, "ঠাকুরঝি, চল একবার তাঁকে দেখে আসি।" বিন্দুর চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। "আজ নয়; তুমি বড় দুর্ব্বল; আজ যেতে পারবে না।"

"পারব বোন, পারব চল।" কমলা উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া বিন্দু হাত ধরিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে শয্যায় বসাইল। কমলা আবার বলিল "চল না ঠাকুরঝি।"

"কোথায় যাব?" বিন্দু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "দাদা গো"—

কমলা ম্লানমুখে নির্নিমেষনয়নে বিন্দুর অশ্রুবিন্দু দেখিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বলিল—"কিছুতেই কিছু হলো না?" বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না।"

"কবে শেষ হলো?"

"পরশু।"

কমলা বিন্দুর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিল, "তোমার স্বামীর নাম কি বোন?"

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল।

"তাঁদের নাম মুখে আন্‌তে নেই—আমার মনে ছিল না, তুমি আমাকে লিখে দাও।" বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

কাশীনাথের মৃত্যুর একাদশ দিবসে কমলা থান কাপড় পরিয়া রুক্ষকেশে স্বামীর শ্রাদ্ধ করিয়া উঠিল; বিনোদবাবুকে ডাকিয়া বলিল "আমি উইল করেছি, আপনাকে রেজিষ্টারী করে দিতে হবে।"

"উইল কেন মা?"

"আমার আর কেউ নেই—সেইজন্য উইল করে রাখাই ভাল।"

"কার নামে উইল করেছ?"

"আমার স্বামীর ভগিনী বিন্দুবাসিনী দেবীর স্বামী যোগেশবাবুর নামে।"

উকিলবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তোমার এবাড়ীর সম্বন্ধে আরও ত নিকটসম্পর্ক লোক আছে।"

"তাহাদের কিছু কিছু দিয়াছি, অর্দ্ধেক বিষয় আমার স্বামীর ছিল—তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমার নাই—অপর অর্দ্ধেক থেকে কিছু কিছু দিলাম।"

বিনোদবাবু প্রিয়বাবুর দুই রকম উইলই করিয়াছিলেন, তাই সব কথাই জানিতেন; কিন্তু কি জন্য যে উইল বদ্‌লানো হইয়াছিল, জানিতেন না। মনে মনে তাহার এ বিষয়ে বড় কৌতুহল ছিল; তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা তোমার পিতা শেষবারে উইল বদ্‌লাইয়াছিলেন কেন?"

"আমি বদ্‌লাইতে বলিয়াছিলাম।"

"তুমি?"

"হাঁ—আর কোন কথায় কাজ নাই। যোগেশবাবুকে এখন সব দিলাম; তাঁহার পুত্র হ'লে মামার বিষয়ের সেই উত্তরাধিকারী। আর এক কথা বিজয়বাবুকে তাড়াইয়া দিলাম।"

শ্রাদ্ধের তিনদিন পরে একদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত কমলাকে শয্যাগৃহ ত্যাগ করিতে না দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। প্রথমে দাসী আসিয়া ডাকিল, তাহার পর সকলে মিলিয়া ডাকাডাকি করিয়া কমলার কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে দ্বার ভাঙিয়া ভিতরে গিয়া দেখিল—কমলা মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে বিন্দুর নামে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। তাহাতে লিখিত ছিল, "বিন্দু, শুনিয়াছি আত্মহত্যা করিলে নরকে যায়। তাই আত্মহত্যা করিয়া দেখিতেছি, যদি নরকে যাই। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও।"

আমার মনে হয় কাশীনাথ তিনি আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে দুই একটী পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত দিলাম।

"সাহিত্য"—

১। এক সহস্র নগদ ও সর্ব্বাঙ্গের গহনা

২। একজন কলিকাতার বাবু

৩। বল দেখি কমল আমি তোমার ঠিক্ স্বামী না হয়ে স্বামীর ছায়া হলে ভাল হতো নাকি?

৪। মন ঢাকা মধু

৫। কাশীনাথের পাষাণ চক্ষু দিয়া

৬। অবশ্য বাহ্য গোলমাল কোন কালেই ছিল না—আমিও সে কথা বলিতেছি না। অন্তর্দাহ অনেকটা কমিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

৭। তিনি স্বর্গীয় দেবতা

৮। আজ তাহার সন্ধান না করিতে পারিলে সকলকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিব।

৯। চাহিয়া চাহিয়া কমলার ম্লান অধর চুম্বন করিল, নিদ্রিতা কমলা সে চুম্বনে শিহরিয়া উঠিল।

১০। বিন্দু বুঝিতে পারিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। সে জানিত ইহাতে রোগ দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু অর্থাভাব কিছুতেই ঘুচিবে না।

১১। লাঠীর আঘাতে মুখখানা আর চিনিতে পারা যায় না।

১২। ক্রমে ক্রমে স্বামীর অপর দুই ভ্রাতাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অবস্থা জ্ঞাত করিল।

১৩। তারা কেহ নয়। আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম তাই এরূপ হইয়াছে।

পড়িলে মাথায় লাঠীর দাগ হয়! তা আমি জানিনা।

সাহিত্যে কয়েকবার ম্যানেজার শব্দ ইংরাজীতে লেখা আছে।

কাশীনাথ

১।	এক সহস্র নগদ	৮ পৃঃ
২।	একজনবাবু	১২ পৃঃ
৩।	আমি যেন তোমার স্বামী নয়, শুধু তার ছায়া।	১৭ পৃঃ
৪।	মন ঢাকা মধু	২২ পৃঃ
৫।	কাশীনাথের চক্ষু দিয়া	"
৬।	(এ অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে)	২৩ পৃঃ
৭।	(পরিত্যক্ত)	২৭ পৃঃ
৮।	(পরিত্যক্ত)	৩০ পৃঃ
৯।	কমলা জাগিয়াছিল * * যাইবার সময় আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছি বলিয়া কাশীনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।	৪১ পৃঃ
১০।	(পরিত্যক্ত)	৩৩ পৃঃ
১১।	(পরিত্যক্ত)	৪২ পৃঃ
১২।	তাহার পর দুই ভাসুরকে লিখিল	৩৩ পৃঃ
১৩।	কাশীনাথ একটু মৌন থাকিয়া কহিল আমি ভুল বকিয়াছি, আমি তাহাদের চিনিতে পারি নাই।	৪২ পৃঃ

কাশীনাথ ৪৩পৃঃ

১০

জ্ঞানে অজ্ঞানে তন্দ্রায় আচ্ছন্নের মত কমলার দুই দিন কাটিয়া গেল। তাহার জন্য ডাক্তারের মনে মনে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল, তাই তাহার উপদেশে অত্যন্ত সতর্কভাবে তাহাকে সকলে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। আজ দুইদিন অবিশ্রাম চেষ্টাও শুশ্রূষায় সন্ধ্যার পরে তাহাকে সচেতন করিয়া উঠাইয়া বসাইল।

ভাল করিয়া চোখ চাহিয়া কমলা দেখিল, যে এতক্ষণ তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে?

অপরিচিতা কহিল—আমি বিন্দু, তোমার স্বামীর ভগিনী

কমলা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে হাত নাড়িয়া ঘরের সমস্ত লোককে বাহির করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিল—আমি কতক্ষণ এমন অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছি ঠাকুরঝি ?

৪৪ পৃঃ—

বিন্দু কহিল পরশু সকালে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলে বৌ, এর মধ্যে আর তোমার হুঁস হয়নি।

—পরশু ! কমলা একবার চমকিয়া উঠিয়াই স্থির হইল। তাহার পরে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রকার সাড়া না পাইয়া বিন্দু শঙ্কিতচিত্তে তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ডাকিল—বৌ !

কমলা মুখ তুলিল না কিন্তু সাড়া দিল। কহিল—ভয় কোরো না ঠাকুরঝি, আমি আর অজ্ঞান হব না।

সে যে অন্তরের মধ্যে আপনাকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বিন্দু তাহা বুঝিল। তাই সেও ধৈর্য্য ধরিয়া মৌন হইয়া রহিল।

আরও কিছুক্ষণ এক ভাবে বসিয়া কমলা কথা কহিল। বলিল—তুমি যে আমাকে নিয়ে এই দুদিন ব'সে আছ ঠাকুরঝি, আমার সেবা করতে কি করে তোমার প্রবৃত্তি হোলো ? আমি নিজে ত কখন এমন করতে পারতাম না।

বিন্দু কথাটা ঠিক্ বুঝিতে না পারিয়া কহিল—কেন প্রবৃত্তি হবে না বৌ, তুমি ত আমার পর নও। আমাদের পরিচয় নেই বটে, কিন্তু দাদার মত তুমিও তো আমার আপনার। তাঁর মত তোমার সেবা করাও ত আমার কাজ। বৌ—তুমি ত জানো না, কিন্তু এসে পর্য্যন্ত কি ক'রে যে আমার দিন কেটেচে, সে ভগবানই জানেন। একবার দাদার ঘর, একবার তোমার ঘর। তাঁর কাছে যখন যাই, তখন তোমার জন্যে প্রাণ ছটফট করে, আবার তোমার কাছে এসে বসলে তাঁর জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠি। বিকেল বেলা থেকে তিনি একটু সুস্থ হ'য়ে ঘুমোচ্চেন দেখে (৪৫ পৃঃ) তোমার কাছে স্থির হয়ে বসতে পেরেছিলাম। এ যাত্রায় দাদা যে রক্ষে পাবেন, এ আশাই ত কারো ছিল না বৌ !

কমলা বলিয়া উঠিল—বেঁচে আছেন ?

বিন্দু ঘাড় নাড়িয়া কহিল—বেঁচে আছেন বৈকি। ডাক্তার বল্লেন, আর ভয় নেই জ্বর কমে গেছে।

কমলার মুখখানি অকস্মাৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াই তাহা মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। একবার তাহার আপাদমস্তক থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া বিন্দুর কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল।

বিন্দু চেঁচামেচি করিয়া কাহাকেও ঘরে ডাকিল না। তাহার মাথা কোলে করিয়া বসিয়া নিঃশব্দে পাখার বাতাস করিতে লাগিল। এই মেয়েটার স্বাভাবিক ধৈর্য্য যে কত বড়, সে পরীক্ষা তাহার স্বামীর পীড়ার সময়ই হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যু যাহার শিয়রে আসিয়া বসিয়াও বিচলিত করিতে পারে নাই, এখন কমলার জন্যও সে অস্থির হইয়া উঠিল না। কিছুক্ষণে সংজ্ঞা পাইয়া কমলা চোখ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল—সে কোথায় আছে। তাহার পরে সেই কোলের উপরই উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রাণপণে নিজের বুক চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে ক্রন্দন এত গাঢ়, এত গুরুভার যে তাহা বিন্দুর ক্রোড়ের মধ্যেই শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতে লাগিল। তাহার একবিন্দু তরঙ্গও ঘরের বাহিরে কাহারো কাণে গিয়া পৌঁছিল না। নির্জ্জন বাহিরে রাত্রির আঁধার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, শুধু এই স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে দুইটী তরুণী রমণী একজন তাহার বিদীর্ণ বক্ষের সমস্ত জ্বালা আর একজনের গভীর শান্ত ক্রোড়ের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে লাগিল।

৪৬ পৃঃ—ক্রমশঃ শান্ত হইয়া কমলা স্বামীর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিল ; কিন্তু কেন যে নিজে গিয়া তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না, তাহা বিন্দু কিছুতেই ভাবিয়া পায় নাই। একবার এমনও ভাবিবার চেষ্টা করিয়াছিল—হয়ত বড় লোকদের এমনই শিক্ষা এবং সংস্কার। সেবা শুশ্রূষার ভার চাকর দাসীদের উপরে দিয়া বাহির হইতে খবর লওয়াই তাহাদের নিয়ম। হঠাৎ কমলা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ঠাকুরঝি তোমার দাদার জ্ঞান হ'লে আমাকে কি একবারও খোঁজ করেন নি ?

—একবার করেছিলেন—বলিয়াই বিন্দু হঠাৎ থামিয়া গেল। কমলা তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়া শুধু উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টিতে বিন্দুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বিন্দু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—দাদার জ্ঞান হ'লে তিনি আমাকে তুমি মনে করে গলা ধ'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—বল কমলা এ কাজ তুমি করনি ? আমি মরেও সুখ পাব না কমলা শুধু একবার বল এ কাজ তোমার দ্বারা হয় নি ?

কমলা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বলিল, তার পরে ?

বিন্দু কহিল—আমি ত জানি নে বৌ, তিনি কোন্ কথা জান্‌তে চেয়েছিলেন।

—আমি জানি ঠাকুরঝি, তিনি কি জান্‌তে চান্—বলিয়া কমলা একেবারে সোজা উঠিয়া বসিল।

বিন্দু কমলার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—তুমি সে ঘরে যেওনা বৌ।

—কেন যাব না ?

—ডাক্তার নিষেধ করেছিলেন—তুমি গেলে ক্ষতি হ'তে পারে।

(৪৭ পৃঃ)—আমার ক্ষতি আমার চেয়ে ডাক্তার বেশী বোঝে না ঠাকুর ঝি, আমি তাঁর কাছেই চললুম। ঘুম ভেঙ্গে আবার যদি জান্‌তে চান, আমাকে ত তার জবাব দিতে হবে ? বলিয়া কমলা বিন্দুর হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল—আমি মাথা সোজা রেখে চলতে পারব না বোন্, আমাকে দয়া ক'রে একবার তাঁর কাছে দিয়ে এস ঠাকুর ঝি।

মনে মনে কহিল—ভগবান্ হাতের নোয়া যদি এখনো বজায় রেখেচ ঠাকুর, তা হ'লে সত্যি মিথ্যের বিচার করে আর তা কেড়ে নিয়ো না।

দণ্ড আমার গেছে কোথায়—সে তো সমস্তই তোলা রইলো। শুধু এই কোরো প্রভু, তোমার সমস্ত কঠিন শাস্তি যাতে হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতে পারি আমার সেই পথটুকু ঘুচিয়ে দিয়ো না।

স্বামীর ঘরে ঢুকিয়া কমলা কিছুতেই আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। তাহার দুই দিনের উপবাসক্ষীণ দেহ ও ততোধিক দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া স্বামীর পদতলে প'ড়িয়া গেল।

কাশীনাথ জাগিয়াছিল ; কে একজন তাহার পায়ের কাছে বিছানার উপর পড়িল তাহা সে টের পাইল। কিন্তু ঘাড় তুলিয়া দেখিবার সাধ্য ছিল না, তাই জিজ্ঞাসা করিল—কে, বিন্দু ?

বিন্দু বলিল—না দাদা, বৌ।

কমল, তুমি এখানে কেন ?

বিন্দু জবাব দিল। শিয়রে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—সাম্‌লাতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে দাদা।

কাশীনাথ চুপ করিয়া রহিল। বিন্দু পুনরায় কহিল—আজ রাত্রে আসতে আমি মানা করেছিলাম। আমি নিশ্চয় জান্‌তাম্ দুদিনের পরে এইমাত্র যার জ্ঞান হ'য়েচে, সে কিছুতেই এ ঘরে ঢুকে নিজেকে সাম্‌লে রাখতে পারবে না।

(৪৮ পৃঃ) স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কমলা নীরবে পড়িয়াছিল, তাহার অবিচ্ছিন্ন তপ্ত অশ্রুধারা কাশীনাথ আপনার শীতল পায়ের উপর অনুভব করিতেছিল ; তাই ধীরে ধীরে কহিল—হাঁ বোন্, না এলেই তার ছিল ভাল।

কমলার প্রতি চাহিয়া বিন্দুর নিজের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। আঁচলে মুছিতে মুছিতে বলিল—সে ভাল কি কেউ পারে দাদা ? তুমি ভাল হ'য়ে ওঠো, কিন্তু এই দু'টো দিন বৌএর যে কেমন করে কেটেচে সে আমি জানি আর ভগবান জানেন। নিজেও বোধ করি জানে না।

ভগবানের নামে কাশীনাথ চোখ বুজিয়া তাহার বাহিরের দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে ফিরাইয়া অন্তরের দিকে প্রেরণ করিল। যেখানে বিশ্বের সমস্ত নরনারীর অন্তর্যামী চিরদিন অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার শ্রীচরণে যেন এই প্রশ্ন নিবেদন করিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর চোখ চাহিয়া কহিল—আমার প্রাণের আর কোন আশঙ্কা নেই কমলা—উঠে বোসো—

বিন্দু কহিল—দাদা, তুমি আমার কাছে যে কথা জান্‌তে চেয়েছিলে, বৌ তার উত্তর দিতে তোমার কাছে এসেচে।

কাশীনাথের পাংশু ওষ্ঠাধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল ; কহিল—আর কারুকে কোন জবাব দিতে হবে না বিন্দু, যে দুদিন ও অচেতন হ'য়ে পড়েছিল তার মধ্যে আমার সমস্ত জবাব পৌঁছে গেছে—বলিয়া বাঁ হাতে ভর দিয়া কাশীনাথ উঠিয়া বসিল। ডান হাতে কমলার মাথাটী জোর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া ডাকিল—কমল !

কমলা সাড়া দিল না, তেমনই সজোরে পায়ের উপর মুখ চাপিয়া পড়িয়া রহিল, তেমনই তাহার দু চক্ষু বহিয়া প্রস্রবণ বহিতে লাগিল।

বিন্দু ব্যস্ত হইয়া উঠিল—তুমি উঠো না দাদা, ডাক্তার বলেন আবার যদি—

কাশীনাথ হাসিমুখে কহিল—ডাক্তার যাই বলুন বোন্, আমি তোদের বলচি, আর ভয় নেই, এ যাত্রা আমাকে তোরা ফিরিয়ে এনেচিস্।

তার পরে কমলার রুক্ষ চুলগুলি হাতের মধ্যে লইয়া ক্ষণকাল নাড়াচাড়া করিয়া কাশীনাথ পুনরায় শুইয়া পড়িল।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

—

চন্দ্র অতন্দ্র নভে

শরৎচন্দ্র আজ নেই। বাঙলা সাহিত্যকে অপরূপ সম্পদে সমৃদ্ধ ক'রে বাঙালীর চিত্তে তাঁর চিরস্থায়ী আসন রেখে মরমী শিল্পী চিরদিনের জন্যে প্রস্থান করলেন। সাহিত্যের অঙ্গনে এতদিন যে বিশেষ সুরটি বাজছিল আজ সে সুর চিরদিনের জন্যে থামল। সমগ্র জাতির মর্ম্মমূলে সেই মহাপ্রতিভার অকাল তিরোধান কতখানি আঘাত করেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে যে ক্ষতি সবচেয়ে বড়—বলতে গেলে অপুরণীয় ব'লে বোধ হ'চ্ছে—তা শুধু তাঁর সাহিত্যের জন্য নয়—মানুষটির জন্যও। সে মানুষটি বিলীয়মান খাঁটি বাঙালী-মজলীশের প্রতীক ছিলেন। তাঁর জীবনের অতি নিকট সংস্পর্শে এসে কতদিন না আমার মনে হ'য়েছে—মানুষটি যেন একটি অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা, তারই উৎসমুখের ধারাজলে অবগাহন ক'রে যে পুলকে যে রসানুভূতিতে চিত্ত ভরে উঠত এই আনন্দহীন জগতে বুঝি সে জীবনানন্দের তুলনা নেই। আর সেই জীবনানন্দের নিখুঁত ও পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলুম তাঁর গল্পে—মজলীশে। আজ সেই সব ছোট বড় গল্পের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই গল্পের কথক শরৎচন্দ্রকে। তাঁর মুখ থেকে সেই সব গল্প যাঁরা শুনেছেন তাঁদের কাছে বোধকরি চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে তাঁর অননুকরণীয় সরস কথনভঙ্গী।

তাঁর একটি গল্প মনে পড়ে। শরৎচন্দ্র তখন বর্মা থেকে সবেমাত্র কলিকাতায় ফিরেছেন। থাকেন বাজে শিবপুরে বাড়ী ভাড়া ক'রে। সেখানকার এক বুড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পাড়ায় থাকে—কাজেই দেখাশুনো ও দুটো চারটে কথাবার্ত্তা হয় রোজই। একদিন তিনি দেখলেন সেই বুড়ি একটা মনি-অর্ডারের ফর্ম নিয়ে ভারী ব্যস্তভাবে

তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়ে চ'লেছে ; শরৎচন্দ্র তাকে ডেকে এতো ব্যস্ততার কারণ ও গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বুড়ী জানাল সে কোনো এক ভদ্দরলোকের কাছে যাচ্ছে—বড় দরকার। শরৎচন্দ্র বললেন—ও বুড়ীমা, শুনিই না বাছা কি দরকার তোমার। বুড়ী যেতে যেতেই বললে, এই মনি-অর্ডারের কুপনের ওপর একটা ছোট চিঠি এসেচে, তাই যাচ্চি এই চিঠি পড়াতে সেই ভদ্দরনোকের কাছে। শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন : বুড়ীটা ভাবত এ এক লুচিভাজা বামুন, কুপোনের ওপর দু'ছত্তর বাঙলা চিঠি পড়ার বিদ্যেও এর নেই।

এই বাজে শিবপুরে থাকার সময়কার আর একটি গল্প তিনি বলেন। সেই সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর হঠাৎ তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্মায় এবং তিনি বিস্তর টাকা খরচ ক'রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ভালো ভালো সব বই কিনে গভীরভাবে সেই বই অধ্যয়ন করতে সুরু করলেন এই বিদ্যে আয়ত্ত করতে। অনেকদিন অধ্যয়নে কাটাবার পর তাঁর ইচ্ছে হ'লো—নিজে লোকের চিকিৎসা ক'রে এইবার দেখবেন কতখানি কৃতকার্য্য হন। শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন, বিদ্যে তো আয়ত্ত করা গেলো কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর—পেসেণ্ট খুঁজতে লাগলুম। বাড়ীতে যারা আসে সবাইকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিগেস করি তাদের কিছু অসুখ হ'য়েছে কিনা। সবাই বলে—না, কিছু হয়নি ? গরহজম ? মাথাব্যথা ? চোঁয়া ঢেকুর ? অম্বল ? সবাই বলে—না কোনো অসুখই হয়নি। বেজায় দমে গেলুম—কিন্তু রুগী খোঁজায় বিরত হলুম না—শেষে কি রুগী না পেয়ে এমন বিদ্যেটা মাঠে মারা যাবে ! যাই হোক অনেক চেষ্টা চরিত্তিরের পর বাড়ীর পেছনদিকের এক গয়লানীর অসুখ হ'তে একদিন আমার কাছে এলো। খুব ভালো ক'রে দেখেশুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বললুম, দু'একদিন পরেই এসে আবার ওষুধ নিয়ে যেও বাছা—আর যদি তোমার কেউ জানাশুনো থাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো—অমনি ওষুধ দেব। কিন্তু সেই যে সে গেলো আর আসে না। একদিন বাড়ীর পিছনদিকের জানলাটা খুলে দেখি সে গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্চে। তাকে ডেকে বললুম, হাঁ বাছা—তোমার সেই যে কি অসুখ করেছিল আমার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে গেলে—আর আসো না কেন ? গয়লানী বললে, সেই খেয়েই সেরে গেছি আর দরকার নেই। বাবাবা—এতো পড়লুম অমনি চিকিৎসা করব ওষুধ দেব তাতেও রুগী জুটল না, যাও বা জুটল তাকে আর চিকিৎসা করতে হ'লো না, এক ওষুধে সেরে গেলো।

শরৎচন্দ্র যখন অরক্ষণীয়া গল্পটির শেষ পরিচ্ছেদ ভারতবর্ষে দেন তখন তার উপসংহার অন্যভাবে ক'রেছিলেন। সেটি পড়ে তাঁর চিরশুভার্থী বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাজেষ্ট করেন—ঐ ভাবে শেষ না করে এই ভাবে (বর্ত্তমান গ্রন্থে যে উপসংহার আছে) শেষ করলে ভালো হয়। শরৎচন্দ্র তাই ক'রেছিলেন। বই বেরবার কিছুদিন পরেই মফস্বলের এক ক্লাবের কতকগুলি ভদ্রলোক হরিদাসবাবুকে চিঠি লিখে জানান যে তাঁদের ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তুমুল তর্ক এমন কি বাজী রাখাও হ'য়েছে উপসংহারের বক্তব্য নিয়ে। একদল বলছে, জ্ঞানদার সঙ্গে অতুলের বিয়ে হবে শরৎবাবু এই ইঙ্গিতই করেচেন, আর একদল বলছে, না তা কখনোই না। অতএব হরিদাসবাবু যেন শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—জ্ঞানদাকে অতুল শ্মশান থেকে নিয়ে যাবার পর তাদের কি হ'লো এবং তিনি কি বলেন সে কথা যেন তাঁদের হরিদাসবাবু জানান। শরৎচন্দ্র আসতেই হরিদাস-বাবু তাঁকে সব কথা বললেন। শরৎচন্দ্র পড়লেন বিপদে ; বললেন, আপনার জন্যেই তো এই বিপদ হ'লো-বেশ দিয়েছিলুম জ্ঞানদাকে জলে ডুবিয়ে মেরে, অতুলটা কালো মেয়ের হাত থেকে বাঁচত, লেখক বাঁচত, প্রকাশক বাঁচত, এখন এর কি জবাব দেব আমি তো ভেবে পাচ্চিনে—এরকম চিঠি রোজ এলেই তো গেছি। ব'লে হাসতে হাসতে বললেন, তারা তো জানতে চেয়েছে জ্ঞানদা ও অতুলের শ্মশান থেকে যাবার পর কি হ'লো ? আচ্ছা লিখে দিন : শরৎবাবু বলিলেন—তারপর তাহাদের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই ; সুতরাং কি হইল তিনি বলিতে পারেন না।

এই রকম কত গল্পই তিনি করতেন। কত দিন কত রাত্রি তাঁর চারপাশে ব'সে তাঁর অনুরাগী বন্ধু স্নেহভাজনরা কি অবিমিশ্র আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠেছেন—প্রাণখোলা হাসি হাসবার সুযোগ পেয়েছেন তার বুঝি সীমা নেই। কিন্তু শুধু হাসির গল্পই তিনি বলেননি, ব'লেছেন নিজের জীবনের অদ্ভুত সব গল্প। রুদ্ধনিশ্বাসে আমরা তা শুনতুম,

কত মানুষ কত ঘটনা ছায়াচিত্রের মতো চোখের সামনে ভেসে উঠত, অন্তর ভরে উঠত সহানুভূতিতে। সেদিন তাঁর মুখের এই সব গল্পকে গল্পই মনে করতুম; আজ মনে হয় হয়তো তিনি নিছক গল্পের জন্যেই গল্প বলতেন না, সেই গল্পের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকত একটি দরদী জীবন-রসিক। তাঁর সাহিত্যেও এই দরদী জীবনরসিকটিকে আমরা শিল্পীর ছদ্মবেশে কখনো-কখনো দেখে থাকব। রাঙা নদীর তরঙ্গের উপর দিনান্তের পলাতক আলোর আভাসের মতো মাঝে মাঝে নির্বিকার শরৎচন্দ্রের মধ্যে সেই দরদী জীবনরসিককে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু কি কথা তাঁর সাহিত্যে তাঁর জীবনে বার বার নানা সুরে আমাদের বলতে চেয়েছেন? কি মন্ত্র জীবনের তিনি শুনিয়েছেন?

কি সে? তাঁর সাহিত্য আর জীবন উপক্রত বঞ্চিত অপমানিত মানুষের কথাই আমাদের শুনিয়েছে। ব'লে গেছে: 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' বলে গেছে: জীবন প্রবাহের আবর্ত্তে মানুষ অসহায়, ঘটনার দাস, নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার ভুলভ্রান্তি অন্যায়-অপরাধ সব ক্ষমা ক'রে তাকে ভালোবাস। জীবনের সব-চেয়ে বড় ধর্ম—প্রেম সেবা ক্ষমা, সব মানুষের মধ্যেই জীবন-দেবতার এই শ্রেষ্ঠ দানগুলি—ধর্মগুলি প্রচ্ছন্ন র'য়েছে। মানুষের ভুলভ্রান্তিই বড় নয়, তার মধ্যেকার আসল মানুষটাই বড়, তাকেই দেখা সত্য দেখা। মানুষ দেবতা নয় সে মাটির পৃথিবীর মানুষ—দোষে আর গুণে। A man is a man for a' that.

শরৎ-সাহিত্যের মূল সুর দুঃখবাদের। তবু তাঁর সাহিত্যের সকরুণ দুঃখবাদকে অতিক্রম ক'রে তাঁর বলিষ্ঠ আশাশীলতা এই ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর মানুষের কাণে অভয়বাণী দিয়ে বলে, জীবনে গভীর নৈরাশ্য—অকথিত বেদনা—স্বপ্নভঙ্গ আছে জানি কিন্তু তাতে বিচলিত হ'য়ো না। জীবনের সব বিফলতা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে গভীরভাবে ভালো-বাসতে শেখো—স্থূল বাস্তবতার শত আঘাতেও যেন স্বপ্নভঙ্গ না হয়, তাহ'লে একদিন 'কার জন্যে বেঁচে থাকব?' এই প্রশ্নটির জবাব জীবন থেকেই পাবে।

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কংগ্রেস-সভাপতি কর্ত্তৃক শোক প্রকাশ

বাঙ্গলার পক্ষে গৌরবের কথা—এবার গুজরাটের হরিপুরায় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে ভারতের সাহিত্যগগন হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িল। যদিও বহুবর্ষ তাঁহার নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরেই শুধু পরিচিত ছিল, তথাপি তিনি ভারতের সাহিত্য-জগতেও কম পরিচিত ছিলেন না। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড়। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার কংগ্রেসের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।"

কংগ্রেসে শোক-প্রস্তাব গৃহীত

তাহা ছাড়া ১৯শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে অন্যান্য কয়েকজন রাষ্ট্র-নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতেও শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।



নীলার দিদি

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

শরতের জ্যোৎস্নায় পথঘাট ভাসিয়া গিয়াছে। আকাশ নির্মল—মেঘমেদুর নীলিমায় আবার ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া হুহু শব্দে ট্রেণ ছুটিয়াছে, প্রথম শ্রেণীর প্রশস্ত কামরায় বসিয়া চাটার্জ্জি সাহেব এদিক ওদিক দেখিতেছিলেন। সাত মাসের মেয়ে গীতা এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি বোধকরি তখন দশটা বাজে। নবোঢ়া পত্নী অনিলা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া মেয়েটিকে ঘুম পাড়াইতে সফলকাম হইয়াছে, সেদিকে চাটার্জ্জি সাহেবের ভ্রূক্ষেপ নাই।

'ওগো শুনচো তোমার মেয়ের কথা

চাটার্জ্জি সাহেব মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি নীলা ?

আবার তুমি নীলা ডাকছো। আমি ত আর নীলা নই, নীলার দিদি !

অনিলার চেয়ে নীলা নামটি ঢের ভালো।

তা'হলে যে নীলা অভিমান করবে।

চাটার্জ্জি সাহেব হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা নীলা, শিলঙে সবাই তোমাকে নীলার দিদি বলে ডাকে, আর আমি বললেই যত দোষ হয়ে যায়, না ?

মুখখানি রাঙা করিয়া অনিলা কহিল, দোষ হয় কি গুণ হয় জানি না। তোমার যা খুসি তাই বলে ডেকো। কিন্তু তা' বলে রাগ করো না যেন !

হাঁ, নিশ্চয়ই রাগ করব—বলিয়া চাটার্জ্জি সাহেব একটু হাসিয়া উঠিলেন।

প্রবাসে সরকারের দপ্তরে বড় কাজ করিয়া চাটার্জ্জি সাহেব বহুদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। পাড়াগাঁয়ের নামে তাঁহার গায়ে জ্বর আসে। পাড়াগাঁ' বলিতে চাটার্জ্জি সাহেব শুধু বোঝেন—ম্যালেরিয়া, ঝোপঝাড়, সাপ শেয়াল, দলাদলি, রেসারেসি—অবশ্যি কথা যে একেবারে মিথ্যা নয়, তাহা বলা চলে না। বাপদাদার আমলে প্রতি বৎসরই পূজায় বাড়ী যাইতেন, ইদানীং আর হইয়া উঠে না। এবার নীলার দিদির জেদাজেদিতে পূজার ছুটিতে শুধু বারো দিনের জন্য দেশে যাইতেছেন।

অনিলা আজন্ম সহরে মেয়ে। পল্লীগ্রামের নামে তাহার মনপ্রাণ নাচিয়া উঠে। এতক্ষণ খুকীরও কি আনন্দ ছিল। হাত নাড়িয়া মুখে গাড়ী চলার শব্দ অনুকরণ করিতেছিল, ঝক্, ঝক্, ঝক্। তার মা ত হাসিয়াই খুন। কথায় কথায় কহিল, দেশে যাবো, কি চমৎকার লাগছে আমার, আর গীতার কি ফুর্ত্তি জানো !

চাটার্জ্জি সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তোমাদের মেয়েদের ঐ একটা জিনিস আমি পছন্দ করি না। সেইটি হচ্ছে আতিশয্য—সব তা'তেই একটা কিছু বেশী-বেশী ভাব দেখানো। জানো নীলা, তুমি এখন অফিসারের স্ত্রী গ্রামে গিয়ে যেন যার তার সাথে আবার মেলামিশা করো না।

চাটার্জ্জি সাহেব যে ভঙ্গীতে কথাটি বলিলেন, অনিলার কাণে এ সব বড় বিসদৃশ শুনাইল। অনিলা মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, গ্রামের লোক বুঝি আর মানুষ নয়—কি যে বলো তুমি, বলিয়াই তরল হাসিতে বিরক্তির কণ্ঠস্বর সহসা ডুবাইয়া দিয়া কহিল, এই লাল শাড়িটা পরেচি, কেমন হয়েছে দেখতে বল তো !

—মার্ভেলাস, বলিয়া চাটার্জ্জি সাহেব আলস্য ভাঙিয়া কহিলেন, চাঁদপুরে যখন নামবে, তখন কিন্তু নীল শাড়িখানি পরে নিয়ো। নীল শাড়িতে নীলার দিদিকে যা মানায় তা' আর কি বলব ! আর তোমার সেই মিনা করা দোদুল-দুল জোড়া—আর সেই হারের পদ্ম-লকেটটি !

রাত্রি বারোটা অবধি বিচিত্র সাজসজ্জার কথা চলিল। সুন্দরী স্ত্রীকে নানা রকমের শাড়ি ও সৌন্দর্য্য প্রসাধনের আধুনিক রুচিসম্মত চাকচিক্যে মনোরম পরিচ্ছদে দেখিতে তিনি বড় ভালোবাসেন। সবচেয়ে আরো ভালোবাসেন, যখন দশজনের সে দৃশ্য দেখিয়া চোখ টাটায় ঈর্ষায় —তখন গর্ব্বে চাটার্জ্জি সাহেবের বুক এক হাত উঁচু হইয়া উঠে !

আখাউড়া ষ্টেশনে চেকার আসিয়া টিকিট দেখিয়া নামিয়া যাইতেই চাটার্জ্জি সাহেব একবার চোখ বুজিবার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। গাড়ীর দোলায় অনিলা নিরুদ্বেগে গীতার কাছে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সে ঘুম আসিয়াছে, এ কথা নিশ্চিত। আর কোন স্ত্রী স্বামী জাগিয়া থাকিলে একটু গা না গড়াইয়া পারেন !

চাঁদপুর ষ্টেশন আসিতেই কুলীর কলরবে, অসংখ্য আলোর ঝিকিমিকিতে চাটার্জ্জি সাহেব ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন।

নীলা ততক্ষণে নীল শাড়ি পরিয়া মখমল খচিত স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়া গীতাকে জামা কাপড় পরাইতে ব্যস্ত ছিল।

ট্রেণ থামিতেই পিপীলিকা শ্রেণীর মত যাত্রীর দল হুহু করিয়া নামিয়া পড়িতেছে। তাহাদের তাড়াহুড়া করিবার প্রয়োজন নাই। ষ্টীমার আসিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বাকী। বরিশাল, ঢাকার যাত্রীরা কে কোথায় গিয়াছে কে জানে, অসংখ্য কেরায়া নৌকার মাঝিরা দেশ দেশান্তরে চলিয়াছে যাত্রী লইয়া। তাহাদের প্রাণে যেন বাবুদের চেয়ে

আনন্দ—উৎসবের মাত্রা আরো অনেক বেশি। দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া ট্র্যাঙ্কে টাকা গুঁজিয়া তাহারা দেশে যাইবে, ছেলেপিলের মুখের হাসি দেখিয়া কত যে শান্তি পাইবে, সে কথা বলিতে গেলে এখানে আর গল্প বলা চলে না।

রীতিমত রৌদ্র উঠিয়াছে। চাটার্জ্জি সাহেব নদীর ধারে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন। জলের তোড় দেখিয়া ঘাবড়াইলেন না বটে, তবে মনে মনে একটু ভয় হইল। নদীর ওপারে বাজার, পাটের গুদাম, অসংখ্য বাড়ি, ঘর, দ্বিতল বাটি, আইস্ ফ্যাক্টরীর বড় বড় টিনের ঘর মন্দ লাগিল না, তবে নীলাকে এই সব বাড়ীঘর দেখাইতে তাহার মন সরিতেছিল না। এমন সময় রব উঠিল, বরিশাল ষ্টীমারের ধোঁয়া দেখা যাইতেছে। সত্যিই তাই! অমনি পোঁটলা পুঁটলি, ট্রাঙ্ক, বাক্স বিছানা কুলীর দল আসিয়া টানাহেঁচড়া সুরু করিয়া দিল। একটু সবুরগুণ কাহারও যেন নাই। ষ্টীমার যখন চলিতে সুরু করিল, তখন দেখা গেল, একটি যাত্রীও তীরে বসিয়া নাই। সকলেই আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়াছে। তবু এই উঠানামা ব্যাপার লইয়া কত বাক্‌যুদ্ধ, কলহ ঝগড়া, গাত্রঘর্ষণ, কোলাহল। মোটে দুই ঘণ্টার পথ, চোখের নিমেষে কাটিয়া গেছে। ষ্টেশনে ষ্টীমার থামিতেই দেশের লোকজন আসিয়া হাজির। এখানে আরদালী বেয়ারার বালাই নাই, তাহাদিগকে না আনিয়া কি বোকামি করিয়াছেন এইসব কথা নিয়া চাটার্জ্জি সাহেব মনে মনে মাথা ঘামাইতেছিলেন।

নৌকার জন দুই মাঝি জিনিসপত্র টানিয়া পাটাতনের উপর আনিয়া রাখিল। একটা চিকণ পাটি পাতিয়া দিয়া তাহার ওপর মাথার গামছা দিয়া মুছিতে মুছিতে বুড়া মাঝি কহিতে লাগিল—কর্ত্তা অনেকদিন পরে দেশে আইছেন, এইবার আর আমাগো চিন্তা কি পোলাপানে খাইয়া বাঁচব। মা ঠাকরুণরে যে লইয়াছেন ভালো করছেন।

কথা শুনিয়া চাটার্জ্জি সাহেব হতভম্ব হইয়া গেলেন। জীবনে যাহাকে কেহ কোনদিন সাহেব ছাড়া বলিতে সাহস করে নাই, আজ দেশের এই সব ছোটলোকরা তাহাকে বলে কিনা কর্ত্তা। তাহার চোখদুটি রাগে ক্ষোভে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য মনাইকর সঙ্গে আসিয়াছিল, নীলা তাহার কাছে খুঁটিনাটি করিয়া গ্রামের সব কথা জানিয়া লইতেছিল। কেষ্ট কুমার যে এবার প্রতিমা গড়িয়াছে, তাহা নাকি দেখিবার মতন একটা—কিছু। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন না করা পর্য্যন্ত নীলার ঔৎসুক্য একটুও কমিতে পারে না। সে বার বার মনাইয়ের কাছে তাহাই ভালো করিয়া জানিয়া শুনিয়া লইতেছিল। গীতা মনে মনে ভয় পাইল এই কথা শুনিয়া যে, সিংহের কেশর টানিয়া ধরিয়াছে অসুর ম'শায়, আর সিংহ তাহার হাতে কামড় দিয়াছে, ঝরঝর রক্ত পড়িতেছে।

চাটার্জ্জি সাহেব এই সব কথাবার্ত্তা শুনিয়া একেবারে থ' খাইয়া গেলেন। নেহাত দায়ে পড়িয়া দেশে আসিয়াছেন, তার উপর কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবী ও পাম্পসু পায়ে দিয়া চলাফেরা করিবার কথা ভাবিতেই মাথায় যেন বাজ ভাঙিয়া পড়িল। উপায়ও নাই, জননী গৃহে আছেন, চোখ বুজিয়া সব সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নাই ভাবিয়া মনে মনে নিরস্ত হইলেন।

গ্রামে আসিয়া পৌঁছিতেই দলে দলে লোকজন নমস্কার জানাইয়া সরিয়া গেল। বৃদ্ধের দল আসিতেই জননী বারবার পায়ের ধুলি গ্রহণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, না করা ছাড়া গতি নাই, নেহাত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাহা করিতে হইল।

বাড়ীর ভিতরে আসিতেই একজন নগণ্য লোকের সাথে মুখোমুখি দেখা হইল। নগণ্য এই হিসাবে, তাহার গায়ে কোন জামা চাদর নাই, পায়ে জুতা নাই, না আছে পরণে পরিষ্কার কাপড়। নাম রামসুন্দর, কর্ত্তাদের আমলের ভাণ্ডারী। আনত হইয়া প্রণাম করিয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, ভাইর বেটা দেশে আসছেন, কত আনন্দের কথা। আপনার বাবার সাথে একসাথে খেলাধূলো করছি, কত মারামারি, ঝগড়াঝাটি হইছে তার লেখাজোখা নাই। আপনাদের ভাত কাপড় খাইয়া-পইরা-ই আমরা মানুষ।

নীলার আনন্দের সীমা নাই। সে এতদিনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার মত মিলিয়াছে সখী, সাথী। টাটকা ফল-মূল, তরি-তরকারী, মাছ দুধ, খাওয়ার অপর্য্যাপ্ত জিনিস, জীবনে সে এত চোখে দেখে নাই। পুকুরে সাঁতার কাটিয়া এপাড়া ওপাড়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রতিমা দেখিয়াই সে ব্যস্ত। চাটার্জ্জি সাহেবের খোঁজ খবর লইবার মত তাহার অবসর কোথায়। আর সহরের মত সর্ব্বক্ষণ কথা বলিবার সুযোগ এবং সুবিধা সহজে মেলে না। চাটার্জ্জি সাহেব গ্রামের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া আছেন—নীলার সাথে হঠাৎ দুপুর বেলা ছাদে দেখা। খালি পায়ে আলতা রঙিন পা দু'খানি স্যাণ্ডেল হারা দেখিয়াই তাহার মেজাজ চড়িয়া যাইতেই কহিলেন, একেবারে পাড়াগেঁয়ে ভূত হয়েছ দেখছি। ভালো কাপড় চোপড় পরতে পারো নি?

নীলা প্রতিবাদের সুরে কহিল, এ গরীব দেশ, এখানে সব লোক দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না; তার ওপর আবার এ বৎসর অজন্মা হয়েছে, তুমি তার কোন খোঁজ খবর রাখো। আর আমি এসে এখানে ফুলবাবু হয়ে সেজেগুজে বেড়াবো, সে আমি কিছুতেই পারবো না। আমার লজ্জা করে না?

চাটার্জ্জি সাহেব আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, তা' যাদের ভালো কাপড় চোপড় আছে তারাও পরবে না, এ বড় অন্যায় কথা। তুমি জানো, মেয়েদের ভালো পোষাক পরিচ্ছদে দেখতে আমি খুব ভালোবাসি।

নীলা হাসিয়া কহিল, এ দশ বারো দিন না হয় নাই বা দেখলে। এবার চাটার্জ্জি সাহেব একটু রাগতভাবে কহিলেন, তুমি দিন দিন কেমন জানি হয়ে যাচ্ছ। ওকি, হাতের সব চুড়ি, গহনাপত্র কি করেছ?

—বাক্সে তুলে রেখে দিয়েছি। আবার যাবার দিন পরে যাব।

—কেন, তার মানে?

—সে আমি তোমাকে কিছুতেই বোঝাতে পারবো না!

সবারই পরণে লাল টকটকে পাড়ের শাড়ী—পরিষ্কার ধবধবে জর্জেট, ক্রেপ, রেশমী শাড়ির বালাই নাই, হাতে দুই গাছি করিয়া শাঁখা, কপালে সিঁদুর। মুখ ভরা হাসি যেন লাগিয়াই আছে। কথায় কথায় বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্য্যের বহর, মোটর গাড়ী, পাইক বরকন্দাজের বড় বড় কথা বলিয়া এখানে কেহ প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তোলে না। প্রাণখোলা হাসি, সাদাসিদা চালচলন, সাধারণ কথাবার্ত্তা, এ সব অনিলার দেখিতে শুনিতে বেশ ভালো লাগে।

দুপুরে সন্ধ্যাবেলা এ বাড়ী হইতেও বাড়ী বেড়াইয়া আসে। কত রকমের ফলমুল নারিকেলের সন্দেশ, মেঁায়া, নাড়ু পরম পরিতৃপ্তির সহিত সে সদ্ব্যবহার করে। এখানে টি-পার্টি নাই, তবে চা-পানের প্রচলিত প্রথা যে একেবারে নাই, সে কথা বলা চলে না। চা-সমিতির কৃপায় গ্রামের কৃষকেরা পর্য্যন্ত চা-পানের অভ্যাস সুরু করিয়াছে।

নীলার দিদিকে পাইয়া যেন গাঁয়ের মেয়েরা হাতে আকাশ পাইয়াছে; অমন সুন্দর হাতের চুল বাঁধা, আদর যত্নের লোভ কেহই সহজে ছাড়িতে চায় না। এক বাক্স ভরা যে কয়খানি সুন্দর কাপড় সহর হইতে আনা হইয়াছিল, সব কয়খানি প্রায় সে বিলাইয়া দিয়াছে। স্বামী যে একটু অসন্তুষ্ট হইবেন, সে কথা একবার ভাবিয়া আবার ভুলিয়া যাইত।

গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তাহাকে পাইলে যে কত খুসী, সে কথা ভাবিয়া অনিলা মনে মনে একটু পুলকগর্ব্ব অনুভব করে। ছেলে মেয়ের দল যখন দল বাঁধিয়া অনিলাদের ঘরেবাইরে জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া বসে, অনিলা নিজের হাতে সে সব পরিষ্কার করিতে লাগিয়া যায়। চাটার্জ্জি সাহেবের চেঁচামেচিতে বাড়ীর লোকজন আসিয়া একত্রে জড়ো হয়, বোধ করি ডাকাত বাড়ীতে পড়িলেও এত গোলমাল হয় না।

একদিন গাঙ্গুলী বাড়ীর একটি মেয়ে, নাম তার মালতী, আসিয়া কহিল—দিদি, আমাদের বাড়ী যাবে একদিন বেড়াতে?

কেন যাবোনা ভাই, স্নিগ্ধ হাসিয়া অনিলা কহিল—আজ আমার সৌভাগ্য, আজ কার মুখ দেখে না জানি ঘুম থেকে উঠেছিলাম।

মালতী কৌতুক করিয়া কহিল, দাদাবাবুর মুখ দেখে নিশ্চয়ই···

—সে আর বলতে বোন, যা' বলেছ তুমি—বলিয়া গলাগলি হইয়া দুইজনে হাসিয়া কুটপাট হইল।

হাসি থামিলে পর মালতী কহিল, দাদাবাবুকে নিয়ে যাবে কিন্তু। ছোট বেলায় নাকি তোমাদের সতীশবাবুর সাথে কত জানাশোনা ছিল ওর। কত মারধর করেছে, কতদিন একসঙ্গে সাঁতার কাটতে গিয়েছে, কত ভাব ছিল ওর সাথে। উনি দু'দিন এসে ফিরে গিয়েছেন, দেখা হয়নি নাকি, না বাড়ী ছিলেন না

বিকেল বেলা চাটার্জ্জি সাহেবকে এক রকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়াই অনিলা মালতীদের বাড়ি বেড়াইতে রওনা হইল। সন্ধ্যা হয়-হয় প্রায়, অষ্টমীর চাঁদ আকাশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পথে কোথাও আলোর বন্দোবস্ত নাই, জোনাকী-জ্বলা পথের দুই ধারে আম জাম সুপারির বাগ বাগিচা, শেয়ালের বসতি; দলে দলে লোকজন এই আলো আঁধারের মাঝখানে আন্দাজে ভর করিয়া পথ চলিয়াছে। পূজার ঢাকীদের ঢক্কা নিনাদে গ্রামখানি মুখরিত, কোন কোন চণ্ডীমণ্ডপে এইমাত্র সন্ধ্যারতি সুরু হইয়াছে, তালে তালে নাচিয়া পাড়ার ছোট বড় ছেলেরা আসর জমাইয়া তুলিয়াছে।

গাঙ্গুলী বাড়ীর কাছাকাছি একটি খালের ওপর বাঁশের সাঁকো কোন মতে স্বামী স্ত্রী পার হইয়া গেল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানী ভৃত্য ভজুয়া কিছুতেই এই অভিনব সাঁকোর ওপর দিয়া পারাপার করিতে সাহসী হইল না।

চণ্ডীমণ্ডপের কাছে আসিয়া চাটার্জ্জি সাহেব দেখিলেন, জনকয়েক রসিক ছোকরা ধুপধুনা মাথায় নিয়া ধিনধিন করিয়া সারা আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করিতেছে। দেখিয়াই তাহার চক্ষু স্থির হইল। ইহাদের আগুনের ভয় নাই, সভ্যতার জ্ঞান কাণ্ড নাই...এই সব যুবকদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানরহিত দেখিয়া তিনি নিজেই মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু সহসা তাহার চমক ভাঙিয়া গেল সতীশকে সুমুখে দেখিতে পাইয়া। সতীশকে তাহার মনে আছে, কিন্তু এখন তেমনভাবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল। সতীশ তাড়াতাড়ি কহিল, ঘরে এসে বসো ভাই। বাইরে কেন?

চাটার্জ্জি সাহেব জবাব দিলেন—তা' এখানেই বেশ আছি, আবার ঘরে কেন? মানে ঘরে একদল লোক বসিয়া হৈ চৈ সুরু করিয়াছিল, তিনি সেই সব আদৌ পছন্দ করেন না।

সতীশ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা কি হয়। এস ভাই এস! গ্রামে যখন এসেছ, তখন সহুরে ভাব একটু ছাড় ভাই!

সতীশ যখন নাছোড়বান্দা, অনন্যোপায় হইয়া চাটার্জ্জি সাহেবকে ঘরে গিয়া বসিতে হইল, কিন্তু মনে মনে যত রাগ হইল অনিলার উপর। সে-ই তো তাহাকে এই বিপদে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে।

তার পর সতীশের সাথে যত রকমের বাজে কথা দুনিয়ায় আছে তাহাই সুরু হইল। চাটার্জ্জি সাহেব 'হাঁ, না' বলিয়া কোন রকমে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু অন্দর মহলে অনিলার কোন সাড়াশব্দ নাই দেখিয়া তিনি চুপ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে গ্রামের ইংরেজী স্কুলের বৃদ্ধ রাইমোহন পণ্ডিতমহাশয় গলা ছাড়িয়া এমন উচ্চ কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান ধরিয়াছেন যে সেখানে আর বসিয়া থাকা একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভিতর হইতে ডাক আসিতেই সে যাত্রা কোন মতে বাঁচিয়া গেলেন। অন্দরে গিয়া দেশীপ্রথায় চাটার্জ্জি সাহেবকে দস্তুরমত চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় গলাধঃকরিয়া উঠিতে হইল। পূজার এই কয়দিন মিষ্টিমুখ না করিয়া কোন ভদ্রলোক পূজার বাড়ী হইতে যাইতে পারে না, সতীশ পূর্ব্ব হইতেই চাটার্জ্জি সাহেবকে এই কথা জানাইয়া দিয়াছিল। তবু যেন কেমন কেমন তাহার আত্মসম্মানে বাধিতেছিল। তিনি এত বড় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, সাহেবসুবোর হাত ধরিয়া বেড়ান; আগামী সম্রাটের জন্মদিনে খেতাব লাভের আশা আছে, আর জনকয়েক নিষ্কর্ম্মা যুবকের দল, বৃদ্ধেরা, তাহার সাথে গা মাখামাখি করিতে সাহস পাইতেছে। এই সবের আরও প্রশ্রয় পাইতেছে নীলার দিদির কাছে।

ফেরার পথে মালতী খানিকটা দূর অবধি আসিয়াছিল। অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, আর একদিন আসবেন কিন্তু যাবার আগে। নীলা হাসিয়া সম্মতি দিতেই মালতী দীঘির পার হইতে হাসিমুখে ফিরিয়া গেল।

পথে পড়িয়া চাটার্জ্জি সাহেব রসিকতা করিয়া কহিলেন, ও—নীলা! তুমি সব জিনিসই বড় বাড়াবাড়ি করে তোল, এ আমার ভালো লাগে না।

নীলার দিদি চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নয়। ফস্ করিয়া জবাব দিল—তুমি না এলেই পারতে, আমার খুব ভালো লাগে, তাই আমি আসি। তোমার ভালো না লাগে, তুমি এসো না।

চাটার্জ্জি সাহেব এবারের মত চুপ করিয়া গেলেন। সাধারণ লোক-জনের সাথে মেলামিশা করিতে তাহার সম্মানে আঘাত লাগে এ ধারণা তাহার বহুদিন হইতে ছিল। গ্রামে আসিয়া সে ধারণা তাহার আরও বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু নীলার দিদিকে চারি চক্ষের উপর পাড়ার ছেলে মেয়ে হইতে প্রৌঢ়া, বৃদ্ধারা যে স্নেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন, ইহাতে তাহার মনে একটু খট্‌কা লাগিল এবং ধীরে ধীরে মনোভাবের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের আভাস লক্ষ্য করিয়া চাটার্জ্জি সাহেব নিজেই মনে মনে অবাক হইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে ছুটি ফুরাইয়া আসিল। সেদিন নীলার দিদিদের ফিরিয়া যাইবার কথা। দুপুর হইতেই স্ত্রী পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ যুবা, বৌ-ঝিদের আনাগোনায় নতুন বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সকলের মুখে সেই এক কথা—নীলার দিদি আজ চলিয়া যাইতেছে। সকলের সাথে হাসিমুখে অনিলা বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। চোখ দুটি অশ্রুতে টলমল করিতেছে, তথাপি উদ্গত অশ্রু কোনমতে সংবরণ করিয়া সে ঘোমটার আড়ালে সুন্দর মুখখানি ঢাকিয়া লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। পাড়ার ছোট খাট ছেলে মেয়েরা শাড়ির আঁচল ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়া দিল, মনে মনে এই ভাব যেন ধরিয়া রাখিবে, আর কোথাও যাইতে দিবে না। তাহারা জানে এই তাহাদের নীলার দিদি; তাহাদের ভাই বোন, মা পিসী, মাসী সবাই ডাকে নীলার দিদি, এমন কি পাড়ার হাড়ি ডোম, মুচিরা পর্য্যন্ত—তাই ছেলেপেলেরাও নীলার দিদি নাম ধরিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে।

এমন সময় মরণ মাঝি নৌকা ঘাটে আনিয়া বাঁধিল। সর্ব্বত্র যেন একটা চঞ্চলতার সৃষ্টি হইল। চাটার্জ্জি সাহেব বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিতেই গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার শোকাশ্রু বর্ষণের মাঝখানে তাহার মনে পড়িল, বিজয়া দশমীর অব্যবহিত পরেই এই বিদায় দৃশ্য যেন সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছে, নীলার দিদির আয়ত দুইটি চক্ষু যেন ছলছল করিতেছিল, হয়ত অকাল বাদল নামিয়া আসিবে; এমন সময় শত সহস্র সস্নেহ মমতাময় ও সুকোমল হস্তের অযাচিত আশীর্ব্বাদ তাহার মাথার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। অপরিসীম আনন্দে চাটার্জ্জি সাহেবের অন্তর মথিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে এক রোমাঞ্চের শিহরণ খেলিয়া গেল, তাঁহারও ইচ্ছা হইল ওই সমবেত নরনারীর সাথে প্রাণ মিশাইয়া তিনিও একবার স্বদেশের তরে এক ফোঁটা জল ফেলিয়া যান।

নৌকাখানি ঘাট ছাড়িয়া বহুদূর আসিলেও সকলেই একদৃষ্টে যতদূর দেখা যায় চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বিস্ময়ে পুলকে চাটার্জ্জি সাহেবের সকল মান অভিমান ভাল হইয়া গেল। পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণপথে আরূঢ় হইতেই তাহার চক্ষু দুটি ক্রমাগত সজল হইয়া উঠিতে লাগিল।

বসন্তে

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

ফাগুন মাসের জ্যোস্নাজলে ডুব্‌লো ধরা,
কোন্ অচিন পুরের বাঁশীর সুরে উদাস করা,

ফুটেছে মাধবী ফুল, আমের মুকুল, ডালে ডালে
শোন ঐ গাহে কোয়েল, শ্যামা দোয়েল,

নাচে তার তালে তালে,
শীতের হাওয়া আজ্‌কে রাতে জ্যান্তে মরা।

আম্র মুকুল ঘন সৌরভে,
বকুল মল্লিকাফুল গৌরবে,
মাধবিকা তব চিরসেবিকা,
অশোক পলাসে রাজটীকা,
মুখরিত বনবীথি কোকিল রবে।
নীলকান্ত মণি গগনতলে,
লহরে লহরে তারা জ্বলে,
তোমারই বিজয় গীতি গাহে সবে।

বন্দুক অভ্যাস ও বন্যহস্তী শিকার

মহারাজকুমার শ্রীসুধাংশুকান্ত আচার্য্য, মৈমনসিংহ

প্রবন্ধ

বয়স যখন সবে ষোল তখন থেকেই আমার সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতামহ স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহোদয়ের প্রিয় বন্দুকগুলি ও শিকারের সাজসরঞ্জামের প্রতি। পিতামহের স্বহস্ত-নিহত ব্যাঘ্র ইত্যাদি অসংখ্য বন্যজন্তুর শেষ চিহ্নগুলি দিন দিন আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠ্‌তে থাকে। ধীরে ধীরে আমার মন পিতামহের অর্থাৎ কর্ত্তাদা'র প্রমাণ (Life-size) তৈল-চিত্রের উপর আকৃষ্ট হয়ে পড়্‌লো। স্বর্গীয় কর্ত্তাদা'কে সজীব দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তথাপি তাঁহার তৈল চিত্রটী আমার কাছে বড্ড সুন্দর বোধ হচ্ছিলো। ৺কর্ত্তাদা'র তেজোদীপ্ত মুখখানি ক্রমে ক্রমে যেন আমায় শিকার শিখ্‌বার জন্য উৎসাহ দিতে লাগ্‌লো। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহারাজা শ্রীযুত শশিকান্ত আচার্য্য মহোদয়ও শিকারের প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত এবং বিখ্যাত শিকারী বলে তাঁহার যশও আছে বেশ। বাবার ভালো বন্দুকগুলি থাকৃতো সুন্দরভাবে সাজানো। ৺কর্ত্তাদা'র রচিত শিকার কাহিনী পড়ে আমার মনে শিকার শিখ্‌বার সাধ হলো অত্যন্ত বেশী। বাবার বন্দুকগুলি হাতের কাছে ছিলো বটে কিন্তু বাবা Ammunition অর্থাৎ গুলিবারুদ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক। গুলি বারুদ প্রভৃতির জিম্মা ছিলো বাবার একজন বিশ্বস্ত খানসামার উপর। আর ঐ খানসামাটী ছিলো বন্দুকের জহুরি। বহু চেষ্টা সত্বেও আর সহজে বন্দুক ও বারুদ একত্র করে বন্দুক অভ্যাসের সুযোগ পেলুম না।

আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর পূজনীয় শ্রীযুত শীতাংশুকান্ত আচার্য্য মহোদয় বাবার কাছ থেকে সযত্নে বন্দুক অভ্যাস করে প্রায়ই আমার চোখের সাম্‌নে উড্ডীয়মান্ পাখী বধ করে তাঁহার শিকার সাফল্য দেখাইয়া আমাকে চমৎকৃত কর্ত্তেন। এতো দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা মিটাবার সুযোগ শেষে একদিন পেলুম দাদার কাছ থেকে। সেদিন আমরা মোটরে কাশী যাচ্ছিলুম, পথিমধ্যে টায়ারের দম ফটাস্ হওয়ায় দাদা গাড়ী থেকে বন্দুক নিয়ে নেমে পড়েন। আমাদের রাস্তার দু'ধারে বড় বড় গাছ। গাছের উপর অনেক ঘুঘু পাখী তখন ডাক্‌ছিলো। আমিও গাড়ী থেকে নেমে দাদার পিছু পিছু পাখী শিকার দেখ্‌বার জন্য চল্‌ছিলুম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন! দাদা মৃদুহাস্যে বন্দুকটী আমার হাতে বোঝাই করে দিয়ে বৃক্ষোপরি বিরাজমান্ একটী ঘুঘুকে নিশান কর্ব্বার কৌশল আমায় হাতে কলমে শিখিয়ে দিলেন। পরে দাদার ইঙ্গিত মতে অত্যন্ত উৎসাহ ও মনোযোগের সঙ্গে ঘুঘুটীকে লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলুম। যাহাতক ঘোড়া টেপা, আর অমনি "দম্" শব্দের সাথে পাখীটী মৃৎপিণ্ডের মতো বৃক্ষমূলে পড়ে গেলো। জীবনের প্রথম শিকার-সাফল্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ কর্ব্বার জন্য কৃতজ্ঞতামিশ্রিত হাসিভরে অম্‌নি দাদার হাতে বন্দুকটী দিয়ে দৌড়িয়ে পাখীটা ধরে দেখ্‌লুম—গুলি লেগেছে ওর বুকের উপর।

ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর বাবা অতি যত্নের সাথে আমায় বন্দুক ধরার প্রণালী ও শিকারীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় নিয়মগুলি শিক্ষা দিয়ে দিলেন। বাবার কাছ থেকে বন্দুক ব্যবহারের পাকাপাকী আইন কানুনটা বেশ করে জেনে নিয়ে পড়্‌তে সুরু কর্‌লুম—আফ্রিকার জঙ্গলে বড় বড় নামজাদা শিকারীদের পশুবধের জীবন্ত বিবরণ। পরে কয়েক বছর বাবার সাথে ছোটোখাটো শিকার নিজ হাতে কর্ত্তে শিখে শেষে এসে পড়্‌লুম একদম আসামের নিবিড় বন জঙ্গল ও বাঘ ভাল্লুকের দেশে।

আমাদের আসামের বাংলাটা ডাবাং ডিষ্ট্রিক্টের জঙ্গলদৈ মহকুমার অন্তর্গত কালাইগাঁও গ্রামে অবস্থিত। আসামের আরণ্য ভূমি হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন। বাংলার অদূরে নিবিড় বনানীর অভ্যন্তর হতে বিবিধ বিহগকুলের সুমধুর কণ্ঠস্বরে প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন

স্বতঃই এক অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব আনন্দে উৎফুল্ল হতে লাগ্‌লো। বাংলায় পদার্পণ কর্ত্তেই শুনলুম—বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য হাতীটার ধ্বংসলীলার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। হাতীটা ছিলো একটা প্রকাণ্ড গুণ্ডা বন্য হাতী। আসামের লোকদের সবচেয়ে ক্ষতি করে বুনো হাতী। বুনো হাতী যে কেবল মানুষ মেরে লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করে. তা' নয়—ফসলের দারুণ ক্ষতি করে বন্য হাতীগুলি। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের হাতীটা দিনের বেলা নিবিড় জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে থেকে রাত্রিতে গ্রামের মধ্যে ঢুকে ক্রমে ক্রমে বহু বাংলা ভেঙ্গে ফেলার দরুণ স্থানীয় সরকার-



মহারাজকুমার সুধাংশুকান্ত আচার্য্য—লেখক
—সঙ্গে নিহত হস্তীর শুঁড়

পক্ষ সর্ব্বসাধারণের নিরাপদের জন্য হাতীটাকে সাবাড় কর্ব্বার আদেশ দিয়েছিলেন। জীবলীলা সম্বরণ করার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত হাতীটা ছয়শতের অধিক নরহত্যা করেছিলো বলে জানা গিয়েছে। দিন দিন হাতীটার অত্যাচার বেড়ে চল্লে কর্তৃপক্ষ অচিরে গজরাজকে দুনিয়া থেকে বিদায় দেবার জন্য হাতীর হত্যাকারীকে উহার মূল্যবান্ দন্তসমেত নগদ দুইশত টাকা পারিতোষিক প্রদানের ইস্তেহার জারি করে দিলেন। ঘোষণাপত্র জারি হবার পর বহু শিকারী পারিতোষিক লাভের ইচ্ছায় আপ্রাণ চেষ্টা করে হাতীটাকে বধ কর্ত্তে না পেরে নিষ্ফলতার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমাদের বাংলায় এসে হাতীটার বিষয় তাদের অভিজ্ঞতা আমাকে সরল ভাবে জানাতে লাগলো। এদিকে গ্রামবাসীদের সারা বছরের ভরসাস্থল ধানভরা ক্ষেতগুলি হাতীটার অবাধ বিচরণের ফলে একদম তৃণহীন হয়ে উঠ্‌লো। ক্রমে হাতীটা আসামের ঐ অঞ্চলের লোকদের কাছে Proclaimed Elephant অর্থাৎ ইস্তেহারের হাতী বলে সুপরিচিত হয়ে পড়্‌লো। হাতীটাকে বধ কর্ব্বার বাসনা নিয়ে আমি বহুদিন সকালে, সন্ধ্যায়, দুপুরে, রাত্রে আমার



হস্তী "বিজয় সিংহ"

আসামের শিকারের চিরসাথী শ্রীমান্ পদনাথ বড়াকে নিয়ে ভীষণ জঙ্গলের ভেতর কাটিয়েছি। একদিন রাত্রিতে হাতীটাকে অতি দূরে দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো মাত্র দু'এক মিনিটের জন্য, কিন্তু সেদিন হাতীটা বিদ্যুৎবেগে সূচিভেদ্য অন্ধকারের ভেতর গা ঢাকা দিয়ে আমায় একদম অপ্রস্তুত করে ফেল্লে। হাতী সংহারের অদম্য উৎসাহ নিয়ে বিবিধ শ্বাপদসঙ্কুল, বিষধরসর্পবহুল গভীর বনের ভেতর ঢুকে কতো বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কুঞ্জরশ্রেষ্ঠের পেছনে ঘুরেফিরে আমার ওকে

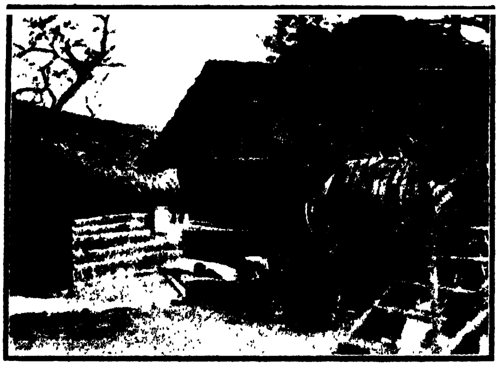
চিনে নেবার সুযোগটা হয়েছিলো বেশ। হাতীটা যেমন ছিলো প্রকাণ্ড উঁচু, তেম্‌নি শুঁড়টার বামধারে ছিলো একটা প্রকাণ্ড দুগ্ধ-ফেন-নিভ মসৃণ সুদৃঢ় দন্ত। অভিনব বাহ্যাকৃতি ভিন্ন হাতীটাকে নিঃসন্দেহে চিনে ফেল্‌বার সুযোগ ছিলো আর একটা। হাতীটার বিশেষত্ব ছিলো—ওর অত্যন্ত দ্রুত গমনের শক্তি। এতো বড় বপু ঠেলে পদচতুষ্টয়ের নীচে প্রতি নিয়ত অজস্র বন জঙ্গল ভেঙ্গে সবেগে চল্‌বার সময়ও হাতীটার আগমনসূচক কোন শব্দ পাওয়া যেতো না। আমার বিশ্বাস হস্তী-ধুরন্ধরের নিঃশব্দ গমনের শক্তিটাই ওকে এযাবৎ বহু বিপদ বিঘ্নের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর দিনটা আমার ক্ষুদ্র জীবনের পক্ষে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখ্‌বার মতো বটে। ঐ দিন প্রাতঃকালে আমাদের বাংলায় খবর এলো হাতীটা মাত্র



নিহত হস্তীর পার্শ্বে মহারাজকুমার

সাত মাইল দূরে আছে। হাতীটার মেজাজ শুন্‌লুম তখন নাকি অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে উঠ্‌ছিলো। সংবাদ পাওয়া মাত্র বাবার প্রিয় শিকারের বিখ্যাত হাতী ভীমদর্শন "বিজয় সিংকে" ইজিম ও গিরণ নামধারী মাহুতদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে হাওদা এঁটে পাঠানো হলো। বেলা প্রায় আটটার সময় আমাদের মোটর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকুমার সোম, শ্রীমান্ পদনাথ ও আমি প্রাতরাশ সমাপনান্তে আমার প্রিয় ৪৬৫।৫০০নং D. B. B. L. "বিজয়শ্রী" Rifleটী নিয়ে মোটরে হাতীর বিচরণ-ভূমির উদ্দেশ্যে প্রস্থান কর্‌লুম। গন্তব্যস্থলে পঁহুছিয়ে বিজয়সিংহের উপর থেকে করিকুলাবতংশের সাথে সাক্ষাৎকার করা স্থির হলো। পদনাথ ও আমি বিজয়সিংহের হাওদায় চড়ে বস্‌লুম। নৃপেনবাবু পায়ে হেঁটে করিরাজকে কুর্ণিশ কর্‌বার জন্য ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। ক্রমে আমরা হাওদার উপর বেলা তিনটা পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিলুম। বেলা প্রায় চা'রটার সময় নৃপেনবাবু হাতীটার সন্ধানপ্রাপ্তিসূচক সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র পদনাথ ও আমি হাতী থেকে নেমে পড়্‌লুম। কিছুদূর অগ্রসর হলে নৃপেনবাবুর সঙ্কেত মতো আমাদের বাঞ্ছিত দন্তমহাকায় শতপল্লীবিধ্বংসী মত্ত মাতঙ্গের দর্শন লাভের সুযোগ পেলুম। হাতীটা তখন আমার থেকে ৭০০।৮০০ হাত দূরে একটা ধানক্ষেতে মনের আনন্দে ধান দ্বারা জলযোগ কর্চ্ছিলো। Rifleএ দু'টী solid bullet বোঝাই করে গজরাজের সম্মুখীন হতে থাকলে হঠাৎ আমায় হাতীটা দেখ্‌তে পেয়ে কাণ খাড়া করে বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে সোজা তেড়ে আস্‌তে



কালাইগাঁওয়ে বাংলা

লাগ্‌লো। একটা ছোট গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে বন্দুক উত্তোলন কর্‌লুম। যখন হাতীটা মাত্র আমার চেয়ে দু'শত হাত দূরে—সাহসে ভর করে তখন মাথা লক্ষ্য করে একটা আওয়াজ কর্‌লুম। আওয়াজের সাথে হাতীটা হঠাৎ ঘাড় নেড়ে থেমে পড়্‌লো। গুলিটার সাফল্য বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে ঐ সুযোগে হাতীটার ঘাড় লক্ষ্য করে ফের আওয়াজ করা গেলো। এবারের আওয়াজের পর হাতীটা তৎক্ষণাৎ ধান ক্ষেতের কতকাংশ ভীমবেগে আলোড়িত করে ধান ক্ষেতের উপর বসে পড়্‌লো। ঈদৃশী অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মনে স্থির সিদ্ধান্ত হলো গজরাজের সুনিশ্চিত নিধন। ইত্যবসরে rifleটী পুনঃ বোঝাই করে নিয়ে বিজয় সিংহের হাওদায় চড়ে নৃপেন বাবুর একান্ত অনুরোধে পড়ে প্রায় এক শত হাত দূর থেকে একটা আওয়াজ করে

হাতীটার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলুম। এবারের গুলি খেয়ে উঠে পড়্‌বার চেষ্টা দেখাতেই অম্‌নি হাতীটার মাথার উপর ফের এক গুলি বসিয়ে দিলুম। হাতীটা এখন ঠিক যেনো অন্তিমে শ্রীগোবিন্দের অভয় চরণে শরণ নিবার পবিত্র বাসনায় আকাশের পানে প্রকাণ্ড শুঁড়টা তুলে দিলে। তার পর একটা অদ্ভুত শব্দের সঙ্গে সুদৃঢ় দন্তটী সজোরে ভূমিতে বিদ্ধ করে অতিকায় প্রাণীটা তার মাতঙ্গলীলার যবনিকা চিরদিনের তরে টেনে দিলো। কিয়ৎকাল পরে হাতীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে নৃপেনবাবু বিজয়উল্লাসে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীসহকারে করিরাজের স্পর্শ-সুখ লাভেচ্ছায় হাতীটার কাছে গেলেন। পদ ও আমি নৃপেন বাবুর পশ্চাদনুবর্ত্তনের জন্য হাতী থেকে নেমে অগ্রসর হতে লাগ্‌লুম। হাতীটার ললাটদেশে চক্রাকার ঘন নীল চিহ্ন দেখে নৃপেনবাবু একদম কাবু হয়ে আট দশ হাত পিছিয়ে বসে পড়্‌লেন। পেছনে তাকিয়ে আমায় দেখে নৃপেনবাবু ভীতিবিহ্বলভাবে মাতঙ্গরাজের রাজচক্রবর্ত্তী চিহ্নের প্রতি আমার সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট কর্‌লেন। জীবনে অসংখ্য হাতী আমাদের নজরে পড়েছে কিন্তু এবম্বিধ প্রোজ্জ্বল নীলিমামেদুর সুদুর্লভ চিহ্ন ইতিপূর্ব্বে কদাপি দেখি নাই। কতকটা কুসংস্কারপ্রসূত ভীতিতে নৃপেনবাবু আমায় ঐ দিনের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে আস্‌লেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে হাতীর নিধনস্থল লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। একটা বিরাট তৃপ্তির সাথে ক্লান্ত দেহে হৃষ্ট মনে বাংলায় ফির্‌লুম। পরদিন হাতীটার কাছে আমার ফটো নেওয়া হলো। হাতীর সংহার বার্ত্তা অবগত হয়ে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ আমায় congratulate কর্লেন। আমার ইচ্ছানুক্রমে পারিতোষিকের ২০০৲ টাকা দরিদ্র-ভাণ্ডারে দেওয়া হলো। হাতীর মূল্যবান্ দন্তটী শিকার সাফল্যের স্মৃতি-স্বরূপ আমাদের বাংলায় শোভা পেতে লাগ্‌লো।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন

লেডী অবলা বসু

বাঙ্গালা দেশে নানা দিক দিয়া নানা মঙ্গল প্রতিষ্ঠান জাতীয়-জীবনের শুষ্কপ্রায় প্রাণধারাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। একদল নিঃস্বার্থ কর্ম্মী সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এইগুলির সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ-দারিদ্র্য অভাবঅভিযোগ দূর করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা সফলও হইতেছেন। জাতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালার শিক্ষা সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া এরূপ অনেক-গুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। সাধারণের কাছে একথা ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে শিক্ষার উন্নতি না হইলে জাতির মুক্তি নাই। আমি এইরূপ একটী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয় আজ উল্লেখ করিব। প্রারম্ভ হইতে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে।

যে অপরিসীম বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া এদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন করা সম্ভব হয়, আমি তাহা জানিয়াছি। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতিরেকে ইহা একের কায নহে।

আজ আমি যে প্রতিষ্ঠানটীর কথা বলিব, তাহার নাম নারীশিক্ষা সমিতি ; ২৯৪।৩ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতায় ইহা স্থাপিত। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এই সমিতি স্থাপিত হয় ; এই সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার স্বামী আমেরিকাতে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে ফিরিবার পথে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও তাঁহাকে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন। দেশের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে চির-

দিনই আমার উৎসাহ। আমার স্বামী ইয়োরোপ আমেরিকাতে বহুবার বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন; তাঁহার সহিত যখন যেস্থানে গিয়াছি সে দেশের শিক্ষাপ্রণালী জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া সর্ব্বদা সে বিষয় জানিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অতি অল্পকালমধ্যে প্রাচ্যের অবজ্ঞাত জাপান কোন শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল তাহা জানিবার প্রবল বাসনা ছিল। জাপানে গিয়া বুঝিলাম—জাপানের উন্নতির মূলে তাহার শিক্ষা। স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়া আমার অনেক বিষয়ে জ্ঞান জন্মিল। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্কুল কলেজে যে শিক্ষা প্রচলিত, তাহার সহিত আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোনই সংস্রব নাই। জাপানে দেখিলাম ঠিক ইহার বিপরীত; সেখানে পুঁথিগত বিদ্যার সহিত সকলপ্রকার গৃহকর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম শেখানো হয়। বিদ্যালয়ে যেমন গান বাজনা প্রভৃতি সকল প্রকার Cultural শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি গোপালন, কৃষিকর্ম্ম, কাপড় ধোওয়া, ইস্ত্রি করা, রান্না করা প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম ও অতিথিঅভ্যাগতকে আদর অভ্যার্থনা প্রভৃতি দৈনন্দিন গৃহস্থের আবশ্যকীয় সকলপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের নিকট নূতন বোধ হইবেনা; সুতরাং তাহার বর্ণনা দ্বারা সময় নষ্ট করিতে চাইনা। মোটের উপর সেখানকার শিক্ষাপ্রণালীর সুফল দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম।

আপনারা জানেন সকল সুসভ্য দেশের মধ্যে জাপানে শতকরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক লিখনপঠনক্ষম।

সুশিক্ষার এই সকল সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া আমার ধারণা হইল যে দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার না হইলে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলি আমাদের দৈনন্দিন কাজে না লাগাইতে পারিলে আমরা বাঁচিতে পারিবনা।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমাদের দেশে প্রাথমিক-শিক্ষা বিস্তার, বিশেষতঃ মেয়েদের অজ্ঞানতা দূর কি করিয়া করা যায়—ইহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। কারণ পুরুষদের জন্য করিবার লোকের অভাব নাই; দেশে সে বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু মেয়েদের জন্য তখনও কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা আরম্ভ হয় নাই।

মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই; কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার অতি কঠিন কায। এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নারীশিক্ষা-সমিতি গঠিত হয়। পরলোকগত সতীশরঞ্জনদাশ ও স্যর বিনোদ মিত্র মহাশয় এবং আরও ২১জন বন্ধু এই কার্য্যে উৎসাহিত হইয়া তাহার Life member হন এবং সমিতির নিয়মাবলি গঠন করিয়া দেন।

তখনও কলিকাতা কর্পোরেশনের হস্তে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হয় নাই; সেজন্য নারীশিক্ষাসমিতির প্রথম কার্য্য কলিকাতাতেই আরম্ভ হয় এবং তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লওয়া হয়। কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে স্থানীয় ভদ্রলোকদেরও সাহায্য পাওয়া যায়; কেহ নিজ গৃহপ্রাঙ্গণ ও পূজার দালান বিদ্যালয়ের ব্যবহার্থ দান করেন। কলিকাতায় ও কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে প্রায় ১০।১২টী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; কোনস্থানেই সমিতিকে গৃহ ভাড়া করিতে হয় নাই; এমন কি অনেকস্থলে পুরমহিলাদেরও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। সমিতির কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যালয় এক্ষণে উচ্চ ইংরাজী বা মধ্য ইংরাজীতে পরিণত হইয়াছে; ১টি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইয়াছে। অনেকের নিজস্বগৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন যখন কলিকাতার প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইলেন তখন সমিতি গ্রামেরদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। পল্লীগ্রামে যথেষ্টসংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবই এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায়।

এই বাঙ্গলা দেশে ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা সাড়ে চার লক্ষের উপর হিন্দু বিধবা অপরের গলগ্রহ হইয়া গৃহের ও ও সমাজের ভারস্বরূপ দুঃখময় জীবন যাপন করেন। এই শোচনীয় অশিক্ষা, হীনতা ও দারিদ্র্যের মধ্যে জাতি কখনও সুস্থ ও সবল হইয়া চলিতে পারে না। নারীশিক্ষাসমিতি দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দৈন্য ও কলঙ্কমোচনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিধবাদের সঙ্কুচিত জীবনকে শিক্ষা ও আত্মমর্য্যাদার গৌরবে আনন্দময় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা জাতীয় জীবনের পক্ষে গৌরবের বিষয়। তাহাদের মঙ্গল শক্তিকে তুচ্ছ না করিয়া তাহাদের শিক্ষিত করিয়

গ্রামের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছোট ছোট বিদ্যার ক্ষেত্র গড়িয়া তোলাই নারীশিক্ষা সমিতির প্রধান কার্য্য। একদিকে যেমন সমিতি দেশের এই প্রচুর প্রাণশক্তিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তেমনি ইহাদের দ্বারা দেশের বিরাট অজ্ঞতা অপসারণেরও চেষ্টা চলিতেছে।

নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপনার পর হইতেই সমিতির নিকট বহু দুঃস্থা বিধবা নিঃসহায় অবস্থায় তাহাদের দুঃখ ও অভাব মোচনের নিমিত্ত সমিতির দ্বারস্থ হন; এই সময় সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিলেন যে তাহাদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া ইহাদিগকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর বাণীভবন নামে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। দুইটী বিধবা লইয়া একটী ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া বাড়ীতে এই আশ্রম খোলা হয়। এক্ষণে প্রায় ৬২টী বিধবা এখানে বিনা ব্যয়ে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতেছে।

এই বিধবাশ্রম যখন প্রথম স্থাপিত হয় তখন ইহার আথিক সঙ্গতি কিছুই ছিল না। ভূতপূর্ব্ব স্কুলইন্সপেক্ট্রেস কুমারী লিলিয়ান ব্রক উৎসাহ দিয়া বলেন যে ইহাকে দাঁড় করাইলে তিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দিবেন। তিন বৎসর অতি কষ্টে বিধবাশ্রম চালাইবার পর তিনি পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়া মাসিক তিনশত টাকা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন।

"বিদ্যাসাগর বাণীভবন দেখিতে আসিবার পূর্ব্বে ভয় পাইয়াছিলাম—না জানি কি দেখিব। আসিয়া দেখিলাম, এই দেশের বিধবাদের জন্য যাহা দরকার এই আশ্রম সেই কাজ করিতেছে। তবে গৃহ অতি ছোট। স্থানাভাবে অনেক আবেদন অগ্রাহ্য করিতে হইতেছে। বাড়ীখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখা হইয়াছে এবং আশ্রমের বন্দোবস্ত ভালই। আমাদের এই প্রকার একটা আশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন। এইখানে যে সমস্ত মেয়েরা শিক্ষা লাভ করিবে তাহারা পরে আমাদের ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া খুব ভাল শিক্ষয়িত্রী হইতে পারিবে। ইহাদের মত ছাত্রীই আমাদের প্রয়োজন।"

বিদ্যাসাগর বাণীভবন যে দেশের একটী বৃহৎ অভাবের সমাধান করিতেছে মাননীয়া লেডি জ্যাকসন মহোদয়া এবং লেডি হার্টগ্ প্রভৃতি মহিলারা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। সরকারী শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টন মহাশয় এবং শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বটমলি মহাশয়ও তাঁহাদের মন্তব্যে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্য ব্যতিরেকে এই বৃহৎ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। দানশীল ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াদের মধ্যে স্বর্গীয়া হরিমতি দত্তের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা হইয়াও এই আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিক আশ্চর্য্যের বিষয়। তিনি বিধবাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণের জন্য এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন এবং নারীশিক্ষা সমিতির কার্য্যের জন্য দশ হাজার টাকা দান করেন। তদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের মাতা শ্রীযুক্তা সুশীলা চন্দ্র পাঁচ হাজার টাকা, শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা মল্লিক ১০০০৲ টাকা এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট স্বর্গীয় স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ৮০০০৲ টাকা দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নারীশিক্ষা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। এই কার্য্যে অভিজ্ঞতার দরুণ তাঁহারা নারীশিক্ষা সম্বন্ধে একটী আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। নারীজাতির জীবনের স্বাভাবিক গতির সহিত সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষার এখানে বিরোধ নাই। বরং জীবনযাত্রার স্বাভাবিক উদার বিকাশের পক্ষে এই শিক্ষাই আনুকূল্য সাধন করে। গ্রামে লেখাপড়া শিখিয়া আত্মার উন্নতি সাধনের সঙ্গে যাহাতে প্রত্যেকের একান্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে পারে সমিতির শিক্ষা প্রণালীতে সেই চেষ্টাও আছে।

বর্ত্তমানে সমিতির তত্ত্বাবধানে ২৪টি গ্রামে প্রাথমিক বালিকাবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। গ্রামে কাজ করিবার মত শিক্ষয়িত্রী পাওয়া অসম্ভব। এজন্য সমিতির বর্ত্তমান সমস্যা—কি করিয়া বিশেষভাবে গ্রামের জন্য —শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা যায়। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে M. E. standard পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মহিলাশিল্পভবনে নানাবিধ শিল্পকার্য্যও শিখিয়া থাকেন এবং নার্সিং ও প্রাথমিক সাহায্যবিধিরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহারা জুনিয়ার ট্রেনিং পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বাণীভবনে জুনিয়র ট্রেনিং বিভাগ খোলা হইয়াছে। ট্রেনিং পাশ করিবামাত্র ভবনের ছাত্রীদিগকে গ্রামের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইভাবে সমিতি গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষয়িত্রীর অভাব পূরণের চেষ্টা করিতেছেন।

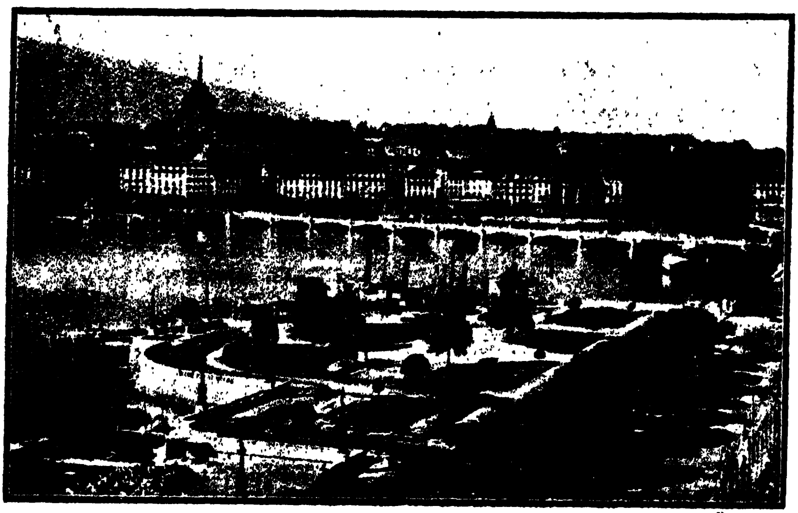
ইয়ুরোপ পরিচয়

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক ডি, এস্ সি, পল্ (রোম)

প্রবন্ধ

গত মহাযুদ্ধের শেষ তোপ নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে প্রায় উনিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইয়ুরোপীয় মহাশক্তির আগ্নেয়গিরি কখনও কখনও ধূমোদ্গীরণ করিয়া থাকিলেও এখন পর্য্যন্ত অগ্নিবর্ষণ করিবার অবসর পায় নাই। নাৎসি-বিপ্লবের ধ্বংসলীলা হইতে সে নব্য জার্ম্মাণীর অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা একটির পর একটি করিয়া তেমনি সন্ধির চুক্তিপত্রগুলি ছিন্ন করিয়াছে। তাহাতে ইয়ুরোপের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সংরক্ষণী দল তর্জ্জনী উত্তোলন করিতে ভরসা পায় নাই। ইতালীর সাম্রাজ্য জয়ের পূর্ব্বাহ্নে গেল. জেনীভার লাঞ্ছনা—শান্তি-বাদের কপট প্রচার বাধা পাইল স্বার্থনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের দিগ্বিজয়ে।

সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জেনীভাতে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল একটি বৃহৎ আদর্শবাদ। বিশিষ্ট কয়েকটি দেশের বিশ্বব্যাপী প্রচার-যন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বত্রই এই কথা দিনরাত ঘোষিত হইতেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ শান্তি-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এই প্রথম নহে। প্রত্যেকটি মহাযুদ্ধের অবসানে অবসাদ-ক্লিষ্ট জাতিগুলি শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছে। ভেষ্টকালিয়ার সন্ধিপত্রেও শান্তিবাদের প্রভূত প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। গত মহাযুদ্ধের অবসানে সমগ্র ইয়ুরাপের শক্তিপুঞ্জের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি এবং জীবনের অপচয় হইয়াছিল এত আর কখনও হয় নাই। তাই শান্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া দেখা দেওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু শান্তি-রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিবার ভার পড়িল যাহাদের উপর—তাহারা বিজিত জাতিগুলির সম্মান কিংবা আত্মরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিল না। আদর্শবাদী উইল্সন্—লয়েড্ জর্জ্জ এবং ক্লামাঁসোর চক্রান্তে পড়িয়া সে চৌদ্দটি সর্ত্তের উদ্ভাবন করিলেন তাহাতে বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ্ সাম্রাজ্যের কল্যাণকামনা ও জার্ম্মাণীকে নিষ্পেষিত করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যের দীর্ঘায়ু কামনা থাকিলেও ঐ অভিশপ্ত মহাদেশের শান্তি-সমস্যার



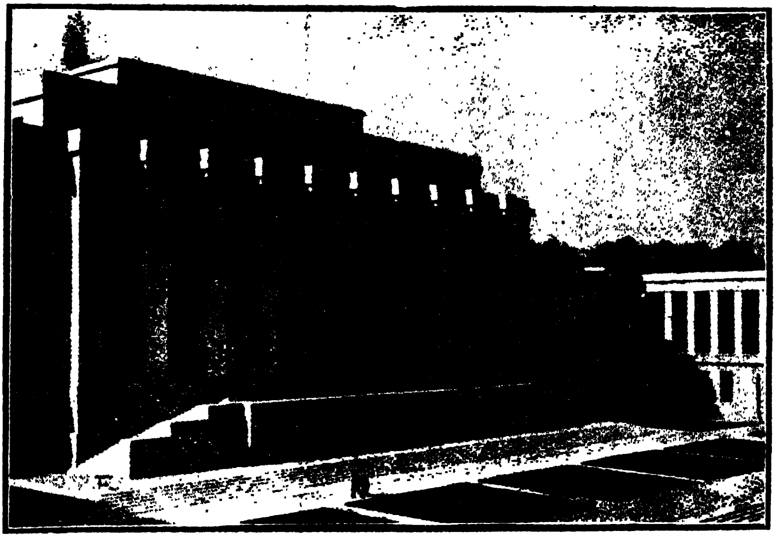
জেনিভার সাধারণ দৃশ্য

ইয়ুরোপের আকাশে বাতাসে একটা মহাতঙ্কবাদের গোপন মন্ত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভূমধ্যসাগরে বিভিন্ন নৌবাহিনীর গর্ব্বিত আস্ফালনের আত্মপ্রবঞ্চনা চলিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইয়ুরোপ শক্তি-পরীক্ষার তাণ্ডবনৃত্যে আত্মবিসর্জ্জন দেয় নাই। স্পেনে পররাষ্ট্রসেবিত অন্তর্বিপ্লব মহাযুদ্ধে পরিণত হয় নাই। সুদূরপ্রাচ্যে জাপান যখন চীনকে আক্রমণ করিল, তখনও দুনিয়ার শান্তি স্থাপনের যন্ত্র নিষ্কর্ম্মা হইয়া রহিল। সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া

সমাধানের গোড়ায় গলদ রহিয়া গেল। ইয়ুরোপের রাজনীতিতে যাহাতে ইংরেজ ও ফরাসীর নেতৃত্ব বজায় থাকে সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংগঠন-পদ্ধতি নিরূপিত হইল। ভের্সাই-প্রাসাদের যে কক্ষে বসিয়া জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হইয়াছিল প্রায় সত্তর বৎসর পরে সেই কক্ষে বসিয়া পরাজয়ের অপমান জার্ম্মানী বুক পাতিয়া লইল। আর জয়ী জাতিদের মধ্যে অতৃপ্ত রহিয়া গেল ইতালী। মহাযুদ্ধে ইতালীর যতখানি ক্ষতি এবং ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল সেই অনুযায়ী পুরস্কার সে পাইল না। জয়ের উল্লাসে ইংরেজ ও ফরাসী রাষ্ট্রীয় নেতারা স্থায়ী শান্তির ভিত্তি যে জাতীয় স্বার্থের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায়—এই কথাটা ভুলিয়া গেলেন। তাহারা ভাবিলেন জার্ম্মাণীকে অস্ত্রহীন আর ইতালিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভবিষ্যতে শান্তির রাস্তা পাকা হইয়া থাকিবে। যে উইলসন্ আট্‌লান্টিকের অপর পার হইতে মুক্তির বাণী লইয়া আসিয়া প্যারিসের আসর গরম করিলেন তিনি স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া পাত্তা পাইলেন না। আমেরিকা রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিল না। ইহাই হইতেছে জেনীভার রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্মকথা এবং সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক তথ্য।

যে সভায় বিশিষ্ট কয়টি দেশের স্বার্থ অনুসারে সর্ব্বপ্রকার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয় সেই সভা আর যাই হোক্, নিরপেক্ষতার দাবী করিতে পারেনা। জয়ী জাতিদের অনাচার জার্ম্মাণী অনেকদিন নির্ব্বিবাদে সহ্য করিল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নিজের দেশের আর্থিক সংগঠনকে রোগমুক্ত করিতে পারিলনা এবং জার্ম্মাণ যুবকশক্তি আত্মনির্ভরতা হারাইয়া ফেলিল। জার্ম্মাণীর জাতীয় জীবনে সেই দুর্দ্দিনের ছিদ্র দেখিয়া প্রতিবেশীদের মন গলিল না। তারপর আসিল বিপ্লবের প্লাবন। নাৎসি দলকে জয়ের বরমাল্য পরাইয়া হিট্‌লার তাহার নেতারূপে জার্ম্মাণীর পুনর্জন্ম সাধনের ভার লইল। ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল, লোকার্ণো সন্ধির চিতাভস্মের উপরে উঠিল অভিমানী জার্ম্মাণীর প্রতিশোধের স্তম্ভ। রাইন্‌ল্যাণ্ডের প্রতি অঞ্চলে প্রতিধ্বনিত হইল সৈনিকদের যুদ্ধসাজের স্পর্দ্ধিত ঝঙ্কার। ফরাসীর প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। জেনীভায় আহূত শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ অক্ষমতার দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

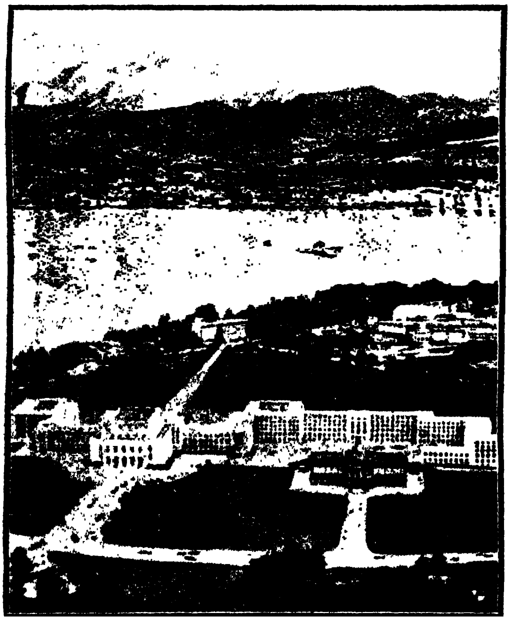
১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়াছিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য্যপদ্ধতি একমাত্র জাপানকে



রাষ্ট্রসংঘের এসেম্ব্লি ভবন

উদ্দেশ্য করিয়া কয়েকটি মন্তব্য পাশ করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। দুনিয়ার সমক্ষে জেনীভার সেই প্রথম লাঞ্ছনা; ইহার ফল আর যাহাই হউক, একদিক হইতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই অপারগ ঔদাসীন্য দেখিয়া অন্য কয়েকটি সাম্রাজ্যাকাঙ্খী দেশ অনেকটা ভরসা পাইল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জাপানকে শাসন করিতে পারিত তবে হয়ত ইতালী আফ্রিকায় তাহার সাম্রাজ্যলাভের স্বপ্ন দেখিত না এবং আবিসিনিয়াকে উপলক্ষ করিয়া জেনীভার ও বৃটেনের এত অপমান হইত না। নিরস্ত্রীকরণের মায়ামৃগের লোভে বৃটেন কোন শক্তিকেই শাসন করিবার মত শক্তিসঞ্চয়ের

আয়োজন করিতে পারে নাই। তাই যখন দেখিল যে ভূমধ্যসাগরে ইতালীর প্রতিপত্তি বাড়িলে এবং আফ্রিকার বুকের উপর ইতালীর সামরিক শক্তির একটি বৃহৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের পথ নিরাপদ রহিবে না, তখন প্রথম ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কুচ্‌কাওয়াজ্‌ দেখাইয়া পরে জেনীভা হইতে আর্থিক শাসনের আয়োজন করিয়া ইতালীর যাত্রাপথ রোধ করিবার চেষ্টা করিল। কি কি কারণে সেই পদ্ধতি তাহার অভীষ্ট সাধনে সক্ষম হইলনা তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। মোটের উপর জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার, জার্ম্মাণীর ভের্সাই সন্ধির



এরোপ্লেন হইতে রাষ্ট্রসংঘভবন ও মঁ ব্লাঁ।

চুক্তিভঙ্গ, ইতালীর ইথিওপিয়া জয়, ইহার সব কয়টা ঘটাই জেনীভার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুনিয়াকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর ক্রমাগতঃ জেনীভার অপমানের বোঝা বাড়িয়াই চলিয়াছে। স্পেনের অন্তর্বিপ্লব লইয়া যে সব কাণ্ড হইয়া গেল তাহাকে ঐ বোঝার উপর শাকের আঁটি চলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ইংরেজ আর ফরাসীর আন্তিক কলহ যতই থাকুক না কেন, ভের্সাই সন্ধির পর হইতে ইহারা দুইজন চলিয়াছিল ইয়ুরোপের রাজনীতিতে হাত ধরাধরি করিয়া—কারণ ইহাদের রাজনীতিক স্বার্থ হইতেছে একত্রে চলা। গোড়ার দিকে ইতালীও তাহার রাজনীতিক স্বার্থের জন্য এই দলে ভিড়িয়াছিল। মধ্য ইয়ুরোপে জার্ম্মাণী খুব বেশী প্রবল হইয়া না যায় সেজন্য ইতালী অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার ভার লইয়াছিল। অথচ জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে হইলে ইতালীর ইংরেজ ও ফরাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। ষ্ট্রেসার যুগ পর্য্যন্ত ইতালী এই পদ্ধতি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছিল। কিন্তু এই ইতালীকে শাসন করিবার জন্য যখন জেনীভার গণতন্ত্রনায়ক সাম্রাজ্যবাদীগণ উহার বিরুদ্ধে আর্থিক বয়কট ঘোষণা করিল তখন ইতালী প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্ধুত্ব খুঁজিতে বাহির হইল। বাড়ীর কাছেই মিলিল এক মহাশক্তিকে, সেও ছিল জেনীভা কর্ত্তৃক সমভাবে লাঞ্ছিত এবং সে ইতালীকে জোগাইতে পারিত কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় যুদ্ধসামগ্রী। বর্ত্তমান ইতালো-জার্ম্মাণ বন্ধুত্বের এইটাই গোড়ার কথা।

আধুনিক ইয়ুরোপের রাজনীতির ইহাই হইল প্রধান সমস্যা—জার্ম্মাণী তাহার ন্যায্য স্থান ফিরিয়া চায়, মহাযুদ্ধে হস্তচ্যুত আফ্রিকার কলনীগুলি দাবী করে। শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সংরক্ষণী দল অর্থাৎ ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স জার্ম্মাণীর এই দাবী মঞ্জুর করিতে রাজী নহে। কেহই এই ব্যবস্থায় রাজী হইতে পারে না। প্রথমতঃ, নিজেদের রক্ত দ্বারা অর্জ্জিত ভূমি বিনাযুদ্ধে কেহই অন্যকে দান করে না; দ্বিতীয়তঃ, যে জার্ম্মাণীর মেজাজের উপরে ইয়ুরোপের শান্তি নির্ভর করিতেছে আপোষে তাহার বলবৃদ্ধি হইতে দেওয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনীতিক স্বার্থ হইতে পারে না। সুতরাং জার্ম্মাণীকে তাহার কলনী উদ্ধার করিতে হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে। খাঁটি জার্ম্মাণ সমস্যা হিসাবে এই প্রশ্নের আলোচনা অন্যত্র করিব, কিন্তু এইখানে এই সমস্যাকে শুধু বিশ্বশান্তি-সাধনের অন্তরায় হিসাবে উল্লেখ করিলাম মাত্র। ইহা ছাড়া ইয়ুরোপের সর্ব্বাঙ্গে দুর্ব্বল ক্ষতস্থানের অভাব নাই। ফ্রান্স ভের্সাই সন্ধিতে জার্ম্মাণীকে আর্থিক এবং সামরিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই; লীট্‌ল্‌ আঁতাত (Little Entente) নামক একটি আশঙ্কা-পূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়া, জুগো-শ্লাভিয়া এবং রোমানিয়া এই তিনটি দেশকে ফ্রান্স তাহার

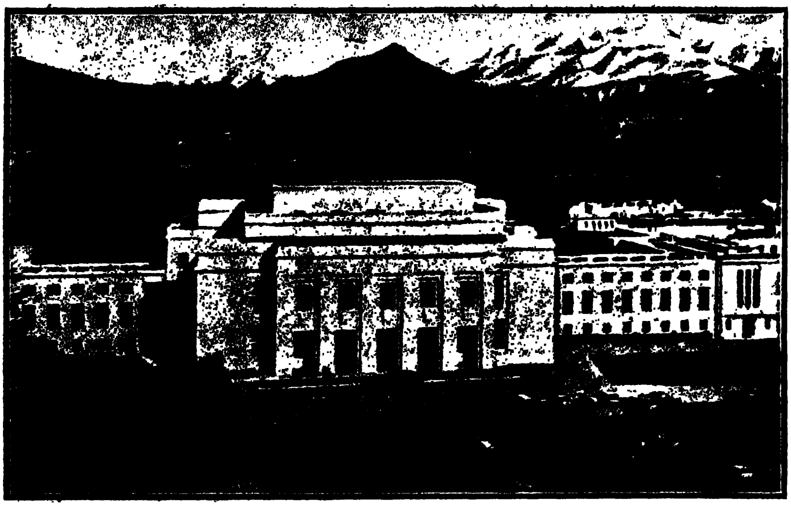
নিজের শক্তির ছায়ায় এবং রাজনীতিক আবেষ্টনের মধ্যে আনিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে একত্র করিয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় জার্ম্মাণ লোকসংখ্যা কম নহে। তাহাদিগকে স্বরাষ্ট্রে উদ্ধার করিবার জন্য জার্ম্মাণীর নজর আছে। হিট্‌লারের কাছে ইহা ত একটা আদর্শের মত। জুগোশ্লোভিয়াকে ইতালির সামরিক শক্তির আওতার বাহিরে রাখা—ইহাও ফ্রান্সের লীট্‌ল্ আঁতাত পদ্ধতির একটি অংশ বিশেষ। এই তিনটি দেশে ফ্রান্স নিজের অর্থে যুদ্ধায়োজনের সাহায্য করিয়াছে। সম্প্রতি পোল্যাণ্ডকেও প্রচুর অর্থ ধার দিয়া ফ্রান্স সমগ্র মধ্য ইয়ুরোপে জার্ম্মাণবিদ্বেষ ছড়াইয়া চলিতেছে। ভাগ্যক্রমে ইতালীর সঙ্গে জার্ম্মাণীর চুক্তি হওয়ায় লীট্‌ল্ আঁতাত প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জুগোশ্লোভিয়া ইতালীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। রোমানিয়া ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট সন্ধিকে পছন্দ করে না; কারণ রোমানিয়ার বল্‌শেভিজ্‌মের আতঙ্ক ইহাতে বাড়াইয়া দিয়াছে। হাঙ্গেরী আজ ইতালীর বন্ধু, কারণ মুসোলিনী হাঙ্গেরীর লুপ্ত রাজ্যসীমানার পুনরুদ্ধারের দাবীকে সমর্থন করিতেছে। হাঙ্গেরীর সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর প্রদেশ ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়া ভর্সাইয়ের সন্ধিতে রোমানিয়ার অন্তর্গত হইয়াছিল। ঐ প্রদেশ হইতে হাঙ্গেরীয়ান প্রতিভার প্রভূত বিকাশ হইয়াছে। হাঙ্গেরী তাহাকে ফিরিয়া চায়। এতদ্ব্যতীত ডান্‌জিগ, ভূমধ্যসাগরের ইংরেজ-ইতালীর কলহ, স্পেনের ভবিষ্যত রাষ্ট্রতন্ত্রে বিরুদ্ধমতবাদী শক্তিপুঞ্জের স্থান ইত্যাদি প্রত্যেকটি লইয়াই একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করা চলে। এমতাবস্থায় এই শত প্রকারের বিরোধ এবং অন্যায়ের মধ্যে যাহারা চিরশান্তির স্বপ্ন দেখেন তাঁহাদের কবি-হৃদয়কে প্রশংসা করি—কিন্তু তাঁহাদের বস্তুনিষ্ঠাকে নয়। আজ খৃষ্টের জন্মের দুই হাজার বৎসর পরেও ইয়ুরোপ খৃষ্টকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিশ্বপ্রেম, প্রতিবেশীর প্রতি বন্ধুবাৎসল্য ইত্যাদি বাইবেলের শোভা বর্দ্ধন করিয়া পর্য্যন্তই ক্ষান্ত হইয়াছে। এই উচ্চাদর্শ কোন খৃষ্টান সমাজ আয়ত্ত করিতে পারে নাই। স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ, লোভের সঙ্গে লোভের বিরোধ—ইহা লইয়াই ইয়ুরোপের ইতিহাস শতাব্দীর পর শতাব্দী পশ্চাতে ফেলিয়া চলিতেছে।



জেনিভার হ্রদে মাউণ্ট ব্লাঙ্কের (মঁ ব্লাঁ) প্রতিবিম্ব

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সমগ্র জগতে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে যুদ্ধ কত দূরে? যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ মাত্র নাই। অনেকদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছিলাম যে রাশিয়ার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান্ শেষ হওয়ার পরেই ইয়ুরোপীয় শান্তির পরিস্থিতি বিচলিত হইবে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এই প্ল্যান্ শেষ হওয়ার পরেও কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তারপর ভার্সাইতে জুগোশ্লোভিয়ার নৃপতির এবং পরে ডাঃ ডল্‌ফুস্‌এর হত্যা, ইথিওপিয়ার লড়াই, জার্ম্মাণীর বাধ্যতামূলক সামরিক-শিক্ষার প্রচলন, চীনজাপান সংঘর্ষ—সব কিছু লইয়াই ইয়ুরোপে মহাযুদ্ধের কল্পনা চলিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্পেনের উপকূলে জার্ম্মাণ রণপোত "ড্যচ্‌লণ্ডে"ও "লাইপ্‌ৎসিগের" উপর কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্টের বোমা এবং টরপেডো নিক্ষেপের পরেও যখন জার্ম্মাণী যুদ্ধ করিতে রাজী হইল না—তখন অনেকের মনেই সন্দেহ উঠিল যে বিভিন্ন

শক্তিপুঞ্জের যুদ্ধায়োজন এখনও সম্পূর্ণ নহে। বস্তুতঃ যুদ্ধ হওয়াটা শুধু যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার উপরেই নির্ভর করেনা। যুদ্ধটা বেশীর ভাগ নির্ভর করে যুদ্ধস্পৃহার উপরে। বর্ত্তমান শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে যুদ্ধ কে চায়? গ্রেট বৃটেন আজ সতর বৎসর যাবৎ যে শান্তিবাদের প্রচার কার্য্য চালাইতেছে তাহা হইতেই বোঝা যাইবে যে বৃটেন যুদ্ধ চায় না। তাহার কারণ এই যে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং নূতন নূতন জাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের তাহার পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি ডোমিনিয়ন ও কলনীতে ইংরেজবিদ্বেষ এত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে কোন মহাযুদ্ধের অবসর পাইলে সেখানে বিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বৃটেনের বর্ত্তমান নৌ ও বিমান শক্তি নিয়া ইজিপ্‌ট হইতে নিউজিলণ্ড্‌ পর্য্যন্ত কাহাকেও শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই। ভূমধ্যসাগরে ইতালী, মরোক্কোতে জার্ম্মাণী, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান ইত্যাদি শক্তিগুলিকে একসঙ্গে যুদ্ধ দেওয়া বৃটেনের ক্ষমতার বাইরে। কাজেই বৃটেন যুদ্ধবিরোধী ও সংরক্ষণবাদী। ফ্রান্সের সমস্যা আরও গুরুতর। সাম্রাজ্য এবং ম্যানডেট্‌ত দূরের কথা, প্রতিবেশী শত্রু-শক্তির বিরুদ্ধে নিজের দেশকে রক্ষা করিবার শক্তিও ফ্রান্সের নাই। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা-হ্রাস, ফরাসী যুবকের যুদ্ধবিমুখতা এবং কল্পনা-বিলাস, চিরন্তনী-অন্তর্বিপ্লব ইত্যাদি নানা কারণে ফ্রান্স যুদ্ধের কথা ভাবিতেও পারে না। তাই ফ্রান্স সংরক্ষণী দলের একজন প্রধান নেতা —জেনীভার কর্ণধার। তৃতীয় শক্তি ইতালী। ইথিওপিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতালী একান্তভাবে না হোক, গোপনে যুদ্ধের আয়োজন চালাইয়াছে এবং ফ্যাসিষ্ট নীতির ভিতর দিয়া বীরত্ব-বাদের প্রচার করিয়াছে। কিন্তু ইথিওপিয়া ইতালীর অধীনে আসার পর হইতে যুদ্ধে ইতালীরও স্বার্থ নাই। কারণ—বর্ত্তমান ইতালীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্বার্থ হইতেছে অধিকৃত সাম্রাজ্যের রক্ষণ ও স্থায়ীকরণ। ইয়ুরোপে যুদ্ধ হইলে ইতালীর পক্ষে ইথিওপিয়া রক্ষা করা দুষ্কর হইবে। কাজেই ইতালী যদিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, কিন্তু আর একটি মহাযুদ্ধের সমর্থন করে না। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে বিপ্লব চলিয়াছে এবং নৃশংসতার তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র জাতিটাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মহাসমরে প্রেরণ করার মত অবস্থা তাহার নাই। তাছাড়া রাশিয়ার রাষ্ট্রিক স্বার্থ যতটা মধ্য-এশিয়ায় এবং চীনদেশে, ইয়ুরোপে ততটা নয়। মজুর-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিপ্লবের আদর্শ বহুদিন হইতে বস্তুনিষ্ঠ নেতা ষ্টালিন ত্যাগ করিয়াছে। কাজেই ইয়ুরোপের পঙ্কিল সলিলে অবগাহন করিবার স্পৃহা তাহার নাই। ফ্রান্সের সহিত রাশিয়ার চুক্তিটা অনেকটা জার্ম্মাণীর সহিত ইতালীর সন্ধির মত—একটা আদর্শবাদের ঐক্যের মধ্যে উহার ভিত্তি; আত্মত্যাগের পরিণতিতে তাহা কখনও পৌছাইবে কিনা সন্দেহ। একমাত্র পরাক্রমশীল শক্তি যাহার যুদ্ধতে কোন লাভ থাকিতে পারে সে জার্ম্মাণী। এই লাভ দুই প্রকারের, প্রথমতঃ গত মহাসমরে লুপ্ত



রাষ্ট্রসংঘের নবনির্ম্মিত মর্ম্মর ভবন। পশ্চাতে মাউণ্ট ব্লাঙ্ক

কলনীর পুনরুদ্ধার; দ্বিতীয়তঃ ফরাসী যে অপমান করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধ লওয়া। কিন্তু জার্ম্মাণীর দৈহিক শক্তি এবং মনস্তত্ব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেও তাহার আর্থিক অবস্থা এখনও অতিশয় শোচনীয় দরের। গত যুদ্ধে জার্ম্মাণী বুঝিয়াছিল সে শুধু সাধু সাহসী সৈনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারাই যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় না। আধুনিক যুদ্ধের আয়োজনে আর্থিক সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জার্ম্মাণী যে নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাও খুব বিজ্ঞানসম্মতপদ্ধতিতে হয় নাই বলিয়া ডাঃ সাকৃট্ অর্থসচিবের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে জার্ম্মাণীর আজ যুদ্ধ করিবার মত আর্থিক আয়োজন নাই। জার্ম্মাণ সেনারা ফ্রণ্টে যাইয়া হয়ত না খাইয়া মরিবে। এই প্রকারে সবদিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমানে ইয়ুরোপে যুদ্ধ হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই। বৃটেন পুনরস্ত্রীকরণের যে বিশাল পরিকল্পনা করিয়াছে তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইয়ুরোপে যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নাই। রাজনীতির সবটুকুই বিজ্ঞান নয়, কারণ কখনও কখনও শুধু একটি মাত্র লোকের মেজাজের উপর একটি জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করিতে পারে; সুতরাং অদূর ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে এইখানে উপনীত হওয়া গেল তাহা বিজ্ঞানসম্মত হইলেও একেবারে যে ধ্রুব সত্য হইবেই এই কথা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলা যায় না।

কে আগে যাইবে

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

আজি পড়িতেছে মনে সে দিনের কথা
প্রথম প্রভাত বেলা যে মধু-বারতা
করেছিল বলাবলি উভয়ের আঁখি;
দু'জনে বেঁধেছি কবে মিলনের রাখী—
    শেফালির নির্জ্জন কাননে,
মনে পড়ে আজি এই জীবনের গোধূলি লগনে।

বাঁধিলাম দুইজনে নদী উপকূলে,
ছায়া-সুশীতল পান্থ-পাদপের মূলে,
মাটির কুটির এক, অঙ্গনে তাহার
আনিলাম যূথী, বেলা, বকুল, কহ্লার;
    দু'জনেতে গাঁথিলাম মালা,
ভরিলাম স্নেহপ্রেমে জীবনের ডালা।

নিদাঘের দ্বিপ্রহরে দিবসের কাজে
ধূলি সমাচ্ছন্ন এই ধরণীর মাঝে,
যাপিলাম কভু সুখে কখন বা দুখে
সহস্র আঘাত মোরা সহিলাম বুকে;
সহিলাম দারিদ্র্যের নিপীড়ন শত
পরাধীন জীবনের বন্ধন সতত।

ধীরে ধীরে বহিতেছে সান্ধ্যবায়ু আজ,
সারা তবু হয় নাই দিবসের কাজ;
নদীর ওপার পানে আছি মোরা চেয়ে
বাহিয়া তরণীখানি ওপারের নেয়ে
    এই ঘাটে কবে ভিড়াইবে,
ভাবিতেছি তীরে বসি তরণীতে কে আগে যাইবে।



শেষের ক'দিন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(২)

সেদিন সকালে চা খেতে খেতে শরৎ বল্লেন: যাচ্চি বটে রবিবারে; কিন্তু রিটার্ণ-টিকিটে ফিরব, চারদিন পরেই।

বল্লাম: তা ফিরো, চলত' আগে।

কেন? ফিরতে দেবে না?

দেবই না বা কেন; আর কার কথা তুমি শোন!

বিলক্ষণ—ব'লে শরৎ কি ভাব্‌তে লেগে গেলেন।

এদিকে নেপথ্যে চক্রান্ত-সভা ব'সে গেল। লক্ষ্মণ ভায়া পাঁজি থেকে উদ্ধার ক'রেছেন যে রবিবার যাত্রা নাস্তি, যেহেতু ত্র্যহস্পর্শ! কিন্তু একথা শরৎকে বলা চলে না; কারণ তিনি শুধু কুসংস্কার-মুক্ত হ'লে রক্ষা ছিল। হয়ত বা জিদ ধ'রে ব'স্‌বেন, ঐ দিনেই যাব।

বড়মা সম্মুখ সমরে অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত; তাঁর সম্বল অশ্রুবান। কিন্তু ফস্‌কালেও ফস্‌কাতে পারে; তাই তাতেও আমরা সন্দিহান। প্রথমে প্রকাশচন্দ্রের উপর ভার হ'ল। দ্বিতীয়, পাঁজি-পুঁথি নিয়ে লক্ষ্মণ। তৃতীয়, আমার কূট-তর্ক এবং সর্ব্বশেষে বড়-মার অশ্রু-বন্যা।

অভিনয় সুরু হ'ল। নির্লিপ্ততা দেখাবার জন্যে আমি ব'সলাম সাম্‌নে—মুকুল আর বাবাকে নিয়ে অঙ্ক কষাতে; কিন্তু কাণটি রইল সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

প্রকাশচন্দ্র ধীর পদ-বিক্ষেপে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হয়ে বল্লেন:

দাদা!

কিরে খোকা?

রবিবারে তো যাওয়া হয় না!

মামা কি বলেন?

সোমবার।

আমিও তাই ভাব্‌ছিলাম। কাল্‌কের মধ্যে কাজ-গুলোও শেষ হ'য়ে উঠ্‌বে না।...বেশ, সোমবারেই; কিন্তু দেখিস্ প্রকাশ, ট্রেণ ফেল হওয়ার লজ্জা আর যেন পাই নে! কুড়েমিরও শেষ নেই আমাদের; এই পনর-কুড়ি দিনে একটা টাইম-টেবল পর্য্যন্ত আনান হ'ল না! যা যা, কাউকে পয়সা দিয়ে ব'লে আয় আন্‌তে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল!

স্নানের সময় গিয়ে দেখি, শরৎ মাটির সঙ্গে শিংএর গুঁড়ো কেমন ক'রে মেশাতে হয় তার বিস্তৃত লেকচার দিচ্চেন—জাত-চাষা, চাকর গোপালটিকে—

বুঝেচিস্? মাটিটা না শুকিয়ে নিলে গুঁড়োবে না। উপরে থেকে মাটি হাল্‌কা হাতে তুলে নে, তারপর শুকোতে দে ঐ রাস্তাটার উপর। শুকোলে ঝুরো হ'য়ে যাবে, তখন হাড়ের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে, বুঝেচিস্ কিনা? উপর উপর ছিটিয়ে দিবি ..আচ্ছা, কাল ত থাক্‌চি, কাল তোকে ঠিক করে দেখিয়ে দেব।

আমার দিকে প্রসন্ন-বদন ফিরিয়ে বল্লেন: যাক্, একদিন, একদিনই লাভ! দেশ ছেড়ে যেতে মন চায় না আমার। প্রকাশ কাল যেতে দেবে না—না হয়, কাল তুমি চ'লে যাও; আমি যাব পরশু।

একদিন এগিয়ে কেন আমি?

কতদিন এসেছ, দিন কুড়িক ত হবেই—বেশী বোধহয়, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-শুনো ক'রে, একটু মুখ বদলান, আর কি?

কে আমার বন্ধু! কার সঙ্গে দেখা-শুনো?...তার কোন দরকার আছে ব'লেই মনে হয় না।

শরৎ হাসলেন, বল্লেন: তবে চল, দুজনেই যাওয়া যাবে বেশ এক সঙ্গেই।

এবার গোপালকে সঙ্গে নিও।

কেন জীবন?

জীবন বড় ভুলো...

কিরে গোপাল, যাবি?

গোপাল চুপ ক'রে রইল।

বল্লাম: গোপাল শোকার্ত্ত, ওর বৌ ম'রেছে—সবে পরশু। তাছাড়া ও তোমার ক'লকাতার বাড়ীও দেখেনি। ওর্ মনটা হাল্‌কা হ'তে পারে এই বদলে।

সে বেশ হবে। কিরে গোপাল যাবি?

যাব, বাবু।

তবে, তোর ভাই কাজ ক'রবে এই ক'দিন। চারদিন পরে, মানে, শুক্রবারে ত ফিরচি।

তখন রূপনারাণে জোয়ার আস্‌ছে। দুজনে এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম—উদ্বেল জল-রাশির অধীর উচ্ছ্বলতা!

শরৎ বল্লেন, এই বাড়ীটা আমায় যে কি টানে! যেন পেয়ে বসেছে।

ক্ষুধিত পাষাণ একখানি! তফাৎ যাও—তফাৎ যাও—সব ঝুট হায়!—কেয়া ঝুট্‌ হ্যায়, মেহেরালি?

শরতের চোখ বাষ্প-করুণ হ'য়ে উঠল!

সোমবার সকালে: "সময় হ'য়েছে নিকট এখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে!" নিবিড় ব্যথায় শরৎচন্দ্রের চোখ দুটি প্রদীপ্ত।

কালীপদ যথাসময়ে যাওয়ার সঠিক সংবাদ জান্‌তে এল: আজ তো যাওয়া ঠিক্ বাবু?

ও-কথার উত্তর না-দিয়ে শরৎ বল্লেন: দেখ্‌ কালীপদ, পুকুরে একটা ভেট্‌কি মাছ সারারাত জালাতন করে বাচ্চা কাৎলা-গুলোকে, কিছু একটা উপায় ব'লতে পারিস্?

ওকে একদিন ধ'রে দেব বাবু।

তোর ভেট্‌কি ধরার জাল আছে?

নেই।

তবে?

সেজকর্ত্তার আছে, চেয়ে আনব···আজ ধ'রতে হবে?

আজ আর সময় কৈ রে?

তবে?

যেদিন তোদের বড়-মা যাবে সেদিন ধ'রে দিবি। আমিও তা'হ'লে খেতে পাব।

বড়-মা এসে প'ড়লেন, বল্লেন: তোর কি আক্কেল ফালি! খালি হাতে এলি। যা এখ্‌খুনি কিছু মাছ ধ'রে দে, বাবুরা আজ আস্‌বে গিয়ে।

কালীপদ ছুট্‌ল তার ত্রুটি-পূরণ ক'রতে।

এদিকে ডাক এসে গেল। সুবোধ ফুলের বীজ পাঠিয়েছেন। শরৎ ব্যতি-ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

বীজগুলো ছিটিয়ে দিয়ে যাই, কি বল?

ও বেডে ত' চ'লবে না, শরৎ: ওতে যে সার দেওয়া হ'য়ে গেছে। সার গ'লতে যে তাৎ হবে তাতে বীজের পঞ্চত্ব ঘট্‌বে।

তবে ওর পাশে একটা জায়গা ক'রে দিক্। তুমি প্রকাশকে ঠিক্ ক'রে বুঝিয়ে দাও · ও প্রকাশ, ওরে খোকা—দেখ্‌ছো আমারও ভুল হচ্চে, পাঠালাম তাকে গ্যাঁদার চারা আন্‌তে।

অবিলম্বে গ্যাঁদার চারা আর দুটো আনারস নিয়ে ফিরে এলেন প্রকাশচন্দ্র।

দাদা, আনারস কেটে দিতে ব'লব?

না প্রকাশ, টক্ খেলে বড় হাওয়া হয় পেটে; কিন্তু লোভও হচ্চে; কি বল সুরেন? দুটো শ্লাইস্, গ্লুকোজ দিয়ে?

খাও।

মন খুলে ব'লচ ত?

কিন্তু ছিব্‌ড়ে ফেলে দিতে হবে।

বড়মা ছুটলেন—যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেছেন, এম্নি ক'রে! আমরা বীজের হেফাজতে মন দিলাম।

ইষ্টিশানের পথে আগেভাগেই বেরিয়ে পড়লাম, একা-একা!

প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে ধানের সোনালি ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেছি, বেঁকা-চোরা, উঁচু-নীচু পথে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের উপর মন্দ মধুর হওয়ার স্পর্শটি ঠিক যেন প্রিয়জনের স্পর্শের মতই সর্ব্ব-দুঃখ-হরা! ডোবার জল, শীতের শুক্‌নো হাওয়াতে, দিন কুড়ির মধ্যে দ্রুত শুকিয়ে এসেছে! সেই জলে, বিচিত্র কৌশলে মাছ ধরছে গরীবের মেয়েরা। বাঁধের পাড়ে লম্বা-লম্বা ছিপ্‌ ফেলে ব'সে গান ধ'রেছে মেছুড়ে ছেলেরা: কালো মায়ের রূপের আলোয় উজল হের সারা-ভুবন! বাঁধের নীচে জলের উপর বিচিত্র-বর্ণ মাছরাঙা পাখী পাখা কাঁপিয়ে লক্ষ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার অধীর উদ্যমে দোলায়মান!

দিন কুড়িক আগে, এই পথে, ঠিক এমনি ক'রেই

চ'লেছিলাম; সেদিন মনে ছিল আশার জোর; আর আজ্‌কে? সন্দেহ নেই, প্রশ্ন নেই, সে দ্বিধা নেই—আছে অপরিমেয় নিরাশা! বাঁচাবার কোন উপায় নেই, রক্ষার পথ নেই, নেই!

চম্‌কে উঠ্‌লাম পালকি বাহকদের হুম্‌কি শুনে! অতর্কিতে মনে হয়, দূরে অস্পষ্ট শুন্‌তে পাই নাকি যমদূতের হুম্‌-হুম? সমস্ত দেহমন কণ্টকিত হ'য়ে উঠে। শীর্ণ-বিবর্ণ মুখ, শুভ্রকেশ, পাল্‌কির মধ্যে শুয়ে প'ড়ে কি দেখ্‌চে ঐ মানুষটি—তার ডাগর দুটি চোখ বিস্ফারিত ক'রে, দিগন্তের সীমানায়?

কালো মায়ের রূপের ঝলক?

কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের জলের অপরাধ তাড়াতাড়ি মুছে ফেলি! পাল্‌কি থেকে আড়াল হয়ে গতি শ্লথ ক'রে পথ চলি! বন্ধুর পথ পায়ে পায়ে বাধা দিয়ে বলে: ফিরে যা, ফিরে যা!

ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্‌মের উপর উঠ্‌তেই নজর প'ড়ল গিয়ে শরতের পাল্‌কি থেকে বার ক'রে দেওয়া শীর্ণ দুখানি পায়ের উপর! দামী কারুকাজ করা নীলচে রঙের মোজার তলায় ঝক্‌-ঝকে বার্নিশ তোলা বাদামী রঙের জুতো।

কি অপূর্ব্ব সাজ মহা-প্রয়াণের! আর এক পাও এগোন যায় না যেন।

শরৎ গোপালকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন:

দূরে দাঁড়িয়ে যে বড়?

এম্নি।

বড় রোদ লেগেছে, না? চোখ দুটো যে লাল! কি হ'য়েছে, সুরেন?

আমার একখানা হাত ধ'রে মৃদু-মৃদু চাপ দিতে লাগ্‌লেন শরৎ। জরাজীর্ণ হাতখানি! মৃত্যুর করাল স্পর্শে তখনি যেন হিম-শীতল!

টিকিট কেনার সময় জিগ্‌গেস্‌ করলেন:

রিটার্ণ কিনি?

বুকের মধ্যে থেকে কি যেন উঠে গলাটা চেপে ধ'রে কথা ব'লতে দেবে না! চোখের মধ্যে বিশ্বের বাষ্প আল্‌গা হ'য়ে হ'য়ে ঝ'রে যেতে চায়! তাই মাথা নেড়ে জানালাম: না।

কেন হে?

কোন দিন কেমন থাক, ঠিক তো নেই! শুক্কুর বারে ফেরা যাবে কিনা, কে ব'লতে পারে?

ঠিক ব'লেছ। দেখেছ, কেমন-যেন আমি 'বোকাটা' হ'য়ে গেছি!

তবুও অনেকের চেয়ে বুদ্ধিমান আছ।

তা থাকৃতে পারি হয়ত', ব'লে হাস্‌লেন শরৎ।

তোমার কেন সেকেণ্ড ক্লাশ। আমরা সুস্থ মানুষ থার্ডেই যাব।

তা' কি কখন হয়?

সবাই চল ইন্‌টারে···গোপালও। ওকে তফাৎ ক'রে ক'টা পয়সাই বা······

গাড়িতে উঠ্‌তেই এক ছোক্‌রা ভূত দেখার মত ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

একি হ'য়েছে আপনার চেহারা!

কথার কোন' উত্তর না দিয়ে শরৎ অন্য দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু ছেলেটিও ছাড়্‌বার পাত্র নয়। এই অতিশয় জরুরি খবরটি দিয়ে শরৎকে আপ্যায়িত করার চেষ্টা যখন বার-বার সে ক'রতে লাগ্‌ল, তখন শরৎ উঠ্‌লেন ঝাম্‌রে:

তুমি ব'লতে চাও আমার চেয়ে আমার কথা বেশী জান? এ ব'লে তোমার কি লাভ হচ্চে, শুনি?

আমার দিকে ফিরে নরম সুরে বল্লেন: এত বোকাটা; নয় কি?

হাস্‌লাম।

শরতের চোখে ক্ষমা-হীন রোষের বহ্নি!

একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ি থামল। একটি ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এসে নমস্কার ক'রে বল্লেন:

কেমন আছেন, দাদা?

তুমিই বল না, কেমন দেখচ?

আগের চেয়ে একটু ভালোই ত।

শরৎচন্দ্রের মুখের উপর প্রসন্নতার মিঠে আলো ঝলক খেয়ে গেল।

বল্লেন তিনি: তুমি যে জাত-ডাক্তার তা আমার বিশ্বাস ছিল; আর আজ সে বিশ্বাস দৃঢ় হ'ল।

হঠাৎ এত বড় সার্টিফিকেট কেন, দাদা?

একটু স্তব্ধ হ'য়ে শরৎ বল্লেন: ভালো যে আমি নেই

তা তুমি বুঝেছ, ডাক্তার; কিন্তু সে কথা ব'লতে নেই, আরও ভাল ক'রে জান; তাই তোমাকে বড় ব'লে মনে করি।

না, না, সত্যিই আপনি অনেকটা ভাল আছেন সে-দিনকার চেয়ে।

শরৎ হেসে বল্লেন: এখন অন্তত সত্যিই ভাল বোধ হয়। কারণটা তোমায় বলি শোন ডাক্তার। দিন কতক থেকে অসুখটাকে ভুলে থাকার চেষ্টা ক'রছি। গাছ, ফুল নিয়ে—যদি সামতায় যাও কোনদিন ত' একবার—কি সব ক'রেছি, দেখে এস।

দাদা, ভাল হওয়ার ওটি বোধহয় সেরা উপায়। মনকে নিরুদ্বেগ ক'রে দিন, দেখ্‌বেন একদিন হঠাৎ কোথা দিয়ে কেমন ক'রে সেরে উঠেছেন।

মাথা নেড়ে শরৎ বল্লেন: এ ক্ষেত্রে কিন্তু তা আর হবে না।

একদিন গিয়ে দেখে এস আমায়।

গাড়ী ন'ড়ে উঠে ছেড়ে গেল।

শরৎ বল্লেন: যাবে তো?

নিশ্চয়।

আমার দিকে একটু সরে এসে বল্লেন, শরৎ: একটা ভারি ভুল হ'য়েছে।

কি?

কালীকে গাড়ী নিয়ে আস্‌তে লেখা হয়নি।

ফোন্ ক'রে আনিয়ে নিলেই হবে।

পথেই জিনিস কেনা সুরু হ'য়ে গেল। এটা-ওটা-সেটা! প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব। জান্‌তাম, ঐ রকম পাগ্‌লামি একটু আছে। হাস্‌চি দেখে দেখে।

কেন হাস্‌চ?

শুধু অকারণ পুলকে।

মনে ক'রেছি, দিনে পঞ্চাশ টাকা ক'রে বাজে খরচ ক'রব এ-কদিন।

টাকা কি তোমাকে কামড়ায়?

কি হবে আমার টাকায়?

যা হয় অন্য লোকের। টাকার সদ্ব্যয় নৈলে লক্ষ্মী আর গণেশের কাছে আমরা দায়ী হই।

নিজের টাকা?

টাকা নিজের হ'লেই ত হাতে আসে।

বাড়ী পৌছে বল্লেন: এইবার তুমি আমাকে সারিয়ে তোল।

তুমি অবাধ্য হ'য়োনা।

ওটি যে আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি।

কুষ্ঠিকে অতিক্রম ক'রতে হবে। অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি।

কি ক'রতে হবে বল।

চল, কুমুদবাবুর বাড়ী: শুক্কুর বারে ফির্‌তে হবে তো?

কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্।

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর বেলায় এসে বিশ্রাম ক'রতে ক'রতে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলেন। আমরা তাঁর বাগানের গাছগুলোর পরীক্ষা আর পর্য্যবেক্ষণ সুরু ক'রে দিলাম। গোলাপ দু-একটা ফুটতে সুরু ক'রে দিয়েছে। মৌসুমী গাছের চারা-গুলো নেহাৎ ছোট, চেনা শক্ত। শরৎ আমার অজ্ঞতায় অধীর হ'য়ে উঠ্‌ছেন।

ডাক্তার নেমে এলেন—এসেই প্রশ্ন: এত দেরি ক'রে ফিরলেন।

শরৎ সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে বল্লেন: তুমি আমায় এই গাছগুলো সব চিনিয়ে দাও তো।

ওর আমি একটাও চিনিনে।

দেখ একবার, তুমি নাকি বিলেত গিছ্‌লে।

ফুলের কারবার ক'রতে যাইনি নিশ্চয়—ব'লে কুমুদবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন: আমার কথার জবাব দিন্...

দেরি? তাতে ক্ষতিটা কি হ'য়েছে কুমুদ?

দীর্ঘদিন রোগ ভুগে কষ্ট নিজেই পাচ্ছেন।

তোমরা তো জবাব দিয়েছ, গো!

জবাব কিসের?

নৈলে আর কবিরাজ দেখাই? তারাই ত ভয় দেখিয়ে দিলে: বলে উদুরি হবে। সেই ভয়ঙ্কর অসুখের ভয়েই তো...

কিন্তু পালিয়ে গিয়ে কি অসুখের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

যে উপায়ে পাওয়া যায় তারই চেষ্টায় গিয়েছিলাম দেশে। কিন্তু মামা ছাড়লেন না। এখন বল, কি করি?

বিধানবাবুকে নিয়ে আসি।

তোমার ঐ এক কথা। কেন? এবার তোমার চিকিৎসা। বিধান তো ব'লে ব'সে আছে—ম্যালেরিয়া··· হ'ল চোখের অসুখ, মাথা ধরা, বিধানের সেই এক বুলি: দাদা এ সব ম্যালেরিয়ার ফ্যাসাদ। না, না, কুমুদ, এবার তোমার হাতেই থাক্‌ব।

বেশ তো, একবার ওঁকে দেখাতে ক্ষতি কি?

বেশ তাই তবে হোক। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি ফির্‌তে চাই; শুক্রবারে যাব। তারমধ্যে যা কিছু ক'রতে হয়, সেরে নিও।

আপনাকে গিয়ে ব'লে আস্‌ব।

মোট কথা শুক্রবারের ছুটোর গাড়িতে আমি চলে যাব দেশে, তা' ব'লে রাখ্‌চি!

কুমুদবাবু হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

সারা সহর চক্কর মেরে ফিরে আসা গেল বেশ রাত ক'রেই বাড়ীতে।

ওটমীলের পরীজ ক'রতেন বড়-মা। ঠাকুরকে দেখিয়ে দিতে গিয়েছিলাম রান্নাঘরে। ফিরে দেখি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে শরৎ একটা বিস্কুটের টিন খুলে বিস্কুট খেতে লেগে গেছেন।

শরৎ, বিস্কুট কবে থেকে লিকুইড্‌ হ'ল?

সপ্রতিভ হাসি হেসে বল্লেন শরৎ: নেসেসিটি! সেখেনে কোন আইন খাটেনা।

ঠাকুর পরীজ নিয়ে ঢুকল। বিস্কুটগুলো সরিয়ে ফেলে শরৎ পরীজ চামচ দুই খেয়ে বল্লেন: চমৎকার হয়েছে ত! কে ক'রেছে—তুমি, নিজে, ঠাকুর?

ঠাকুর হাসে।

সুরেন, এবার থেকে এই দিও আমাকে, তাহলে বিস্কুট খাবনা।

খাবেনা কেন? ডাক্তারদের মত হ'লে, খাবে।

শরৎ শান্ত হ'য়ে চেয়ারের উপর শুয়ে প'ড়লেন।

খানিক পরে ফিরে এসে দেখি শালপ্রাংশু মহাভুজ শ্রীমান্‌ হোঁদলচন্দ্র তাঁর নৈশ-ভ্রমণ সেরে কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। নির্ব্বাক নিঃস্পন্দ শরৎ চেয়ারের উপর অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায়!

কিহে শরৎ, ব্যাপার কি?

শোন নি, স্যর জগদীশ আজ মারা গেছেন?

দেখলাম কাগজে, এখুনি।

কি হ'য়েছিল তাঁর?

বিশেষ কিছুই নয়। হার্টটা দুর্ব্বল ছিল।

শরৎ খানিকটা নিঝুম হ'য়ে প'ড়ে রইলেন। হোঁদল খেতে গেল।

এইবার আমার পালা, সুরেন!

কোন লজিকে?

লজিক নয়, ইন্‌টুইশন।

তাঁর বয়স হ'য়েছিল; তুমি তো তাঁর কাছে ছেলেমানুষ।

শরৎ উঠে ব'সে বল্লেন: কিন্তু হার্টটা আমার ভালই; কিন্তু উদুরি হ'লে খারাপ হ'তে কতক্ষণ?

উদুরির লক্ষণ তো কিছু দেখিনে।

আছে, তলপেটটা আস্তে আস্তে বড় হ'য়ে উঠ্‌ছে।

কই দেখি?

আজ থাক্‌গে; অন্যদিন দেখ। পাও ত মধ্যে মধ্যে ফোলে; সেই দেওঘরে ফুলেছিল।

সে তো ন'-দশ মাইল হেঁটে কে!

কিন্তু আগে তো ও-সব বালাই ছিল না।

আরো আগে তো চুলও পাকেনি! বয়স হচ্চে, আমাদের এ কথা ভুল্‌লে চলে?

তাই যাবার সময়ও সন্নিকট! তাছাড়া, আমাদের বংশে কেউ দীর্ঘজীবী হয়নি।

একান্নতেও এম্‌নি একটা ঢেউ তুলেছিলে, পরিষ্কার মনে পড়ে। চল, চল শুয়ে প'ড়বে; তোমাকে না শুইয়ে যাবনা। আমার চোখ ঘুমে ভেরে এসেছে।

ঘুম কি হবে?

খুব হবে। শুয়ে শান্ত হ'লেই দেখ্‌বে কখন ঘুম এসে গেছে। মন শান্ত কর। মরতে হবে সবারই একদিন।

ভালছেলের মত শরৎ গিয়ে শুয়ে প'ড়লেন।

বেশ বেলায়, আটটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে, শরৎ নেমে এলেন, একমাথা চুল উস্‌কে-খুস্‌কো। মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ।

একি! রাতে ঘুম হয়নি নাকি শরৎ?

না, তিনটে পর্য্যন্ত জেগে কেটেছে···তোমার নাওয়া হ'য়ে গেছে?

না।



বাদ্যগারের কারখানা

শিল্পী—৺ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী

Bharatvarsha Printing Works

চুল দেখে মনে হ'য়েছিল।

হেসে বল্লুম : ওর একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে।

কি সেটি ?

ভূমিকম্পের পর হঠাৎ একদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েব আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত, খুব ভোরে। গরম প'ড়ে গেছে, জামা গায়ে নেই ; কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে।

তুমি মিঃ গাঙ্গুলি ?

আজ্ঞে।

তোমার বাড়ীটা শুন্‌চি ভীষণ জখম হ'য়েছে।

তা হ'য়েছে।

একবার দেখ্‌তে চাই।

ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সায়েব সব কিছু জেনে নিলেন আমার আয় ব্যয়ের কথা। তারপর বল্লেন :

বাড়ীটা বোধহয় ভেঙে দেওয়া দরকার।

তারপর যাব কোথায়, সায়েব ?

নতুন বাড়ী ক'রে নাও।

সে টাকা তো সম্প্রতি হাতে নেই।

লোন নিও।

শুধব কিসে ?

কোন ইঞ্জিনিয়ার এসে দেখে গেছে ?

একজন সায়েব অফিসার এসেছিলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সায়েব গাড়িতে গিয়ে ব'সে বল্লেন : কিছু মনে না ক'রলে একটা কথা বলি : তোমার চুল দেখে তোমার সম্পর্কে আমার অন্যায় ধারণা হয়। বাবু অনুরোধ আমার, সকালে উঠে তোমার চুলটি ঠিক ক'রে দিও।

শরৎ হেসে বল্লেন : সেদিন থেকে সায়েবের অনুরোধ পালন ক'রছ ? আচ্ছা, আমারও মনে থাকবে এ কথা !

শরৎ উপরে চ'লে গেলেন। ফিরে এলে দেখ্‌লাম, মুখখানি তক্‌-তক্‌ ক'রছে ; চুলটি সুন্দর ক'রে ফেরান হ'য়েছে। যতদিন শক্তি ছিল, নিজেই এটি ক'রতেন। তারপর আমরা, তারপর নার্সরা।

সেদিন সকালের দিকেই বোধহয়, কুমুদশঙ্কর এসে খবর দিয়ে গেলেন যে রাত আট্‌টার সময় বিধানবাবুকে সঙ্গে ক'রে তিনি আস্‌চেন।

তখন বেলা পাঁচটা হবে, শরৎ ডাক্‌লেন : চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

আটটার মধ্যে ফেরা চাই।

কেন ?

বা:, ভুলে গেলে ?

ভুলিনি, ভুলিনি। এখনও বাহাত্তুরে পা দিই নি। তিন ঘণ্টার মধ্যে শরৎ সহরটা যেন চ'ষে দিলেন। মাছ ধরার হুইল, সুতো, বঁড়শী—রাশি রাশি! এই চ'লেছেন বেঙ্গল ষ্টোরসে, সেখেন থেকে এস, রায়, তারপর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে। সবাই বলে মাছ ধরার সীজন উৎরে গেছে, পছন্দ সই জিনিস পাওয়া শক্ত। সে কথায় কে করে কর্ণপাত ! শুক্রবারের মধ্যে কেনা-কাটা শেষ ক'রে— ফির্‌তেই হবে বাড়ী। কি তাড়া, কি অধৈর্য্য !

আটটার মিনিট ক'য়েক আগে ফিরে বল্লেন : বড় ক্ষিদে পেয়েছে, ভাল ক'রে খেয়ে নেওয়া যাক।

একটু অপেক্ষা কর শরৎ। পেটটা ভরা থাক্‌লে— ডাক্তারদের পরীক্ষার অসুবিধে হবে।

তাই ব'লে তো মানুষ ক্ষিদেয় মারা যেতে পারে না ? কথার উত্তর না দিয়ে হাস্‌লাম।

তবে দুটো বিস্কুট খাই ?

বিস্কুট খেয়ে শরৎ হুইলগুলোর পরীক্ষা সুরু করলেন : কোন্‌টা কট্‌-কট্‌ ব'লছে, কোন্‌টা কুট্‌ কুট্‌, কোন্‌টা কিট্‌ কিট্‌ !

নীচে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গেট পর্য্যন্ত করছি হান্‌টান্, ডাক্তারদের প্রতীক্ষায়। ঊর্দ্ধে নক্ষত্র-খচিত আকাশ শান্ত স্তব্ধতায় চেয়ে আছে আলোকমালাশোভিত নগরীর দিকে। মানুষের আনাগোনা ক'মে আস্‌চে। মোটরের গতি গেছে বেড়ে, কাজ শেষ ক'রে বাড়ী ফিরতে পারলে যেন বাঁচে !

বিদ্যুৎ-গতিতে এসে দাঁড়াল ডাক্তারদের গাড়ি।

প্রকাণ্ড লম্বা বিধানবাবু, বেঁটে-খাট কুমুদশঙ্কর !

ঝড়ের মত এসে ঢুক্‌লেন। এ যেন চির-পরিচিতের বাড়ী, আহ্বান-আবাহনের কোন প্রয়োজন, পথ দেখাবার দরকার নেই। কে-কোথায় আছে ফিরেও দেখ্‌লেন না তাঁরা। নিজেদের গল্পে মশগুল। সিঁড়ির উপর ঠক্ ঠক, গুম-গুম্, মচ্ মচ্—সটান উপরে উঠে বিধানবাবু তাঁর

পুরুষোচিত উঁচু গলায় বল্লেন : এই যে! কবে ফিরলেন? এ সব আবার কি?

মাছ-ধরার তোড়-জোড় ডাক্তার।

দেশে গিয়ে এই সব খুব চ'লছিল? কৈ—দু-চারটে পাঠিয়ে দিতেন

আস্‌বে ডাক্তার সে ব্যবস্থা ক'রে এসেছি।

উঠে বসুন, জামাটা খুলে ফেলুন—আসুন এই কোচের ওপর।…কিছু খান্‌নি তো…

পেটে হাত দিয়ে বিধানবাবু বল্লেন : তাই তো বড়-বড় ঠেকে। বেশ ক'রে শুয়ে পড়ুন তো! ব্যাপার কি?

শুয়ে প'ড়ে শরৎ বল্লেন : দেশে গিয়ে মাছটা একটু অতিরিক্ত খেয়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটা গেল বেজায় বেড়ে…

জ্বরটর?

না।

বটে! যা হজম ক'রতে পারেন, তার চেয়ে বেশী খেলেন কেন?

লোভ! পাঁচটা ছ'টা ক'রে তপ্‌সে মাছ খেয়েছি, এক-একদিনে…

কাজ ভালো করেন নি। আমাদের দিয়ে খেলে হজম হ'য়ে যেত। পেটের উপর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে একটা চড় মেরে বিধানবাবু বল্লেন :

কট্‌ ইট্‌ : কিঙ্ক-কিঙ্কস্‌…

কট্‌ ইট্‌ ডাক্তার?

কট্‌ ইট্‌ রেড হ্যান্‌ডেড্‌, দাদা!…কি খাচ্চেন?

দুটো চারটে হাফ্‌ বয়েল্‌ড ডিম্‌, টোষ্ট রুটি, বিস্কুট—আর ওট মিল পরিজ…

ঐ চলুক।

দুই ডাক্তার পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি ক'রলেন। তারপর ঠিক ঝড়ের মতই নিমেষে উধাও!

ফিরে আস্‌তে শরৎ জিগ্‌গেস্‌ করলেন :

কি ব'ল্লেন বিধান?

একটা ওষুধ দিয়ে গেলেন।

কুমুদ?

না।

কি একটা ডাক্তারি কথা বল্লে, মনে আছে তোমার?

আছে।

কি হে?

কিঙ্ক-কিঙ্কস্‌।

সে আবার কি, তার মানে?

জানিনে, তোমার মেডিক্যাল ডিক্‌শনারি আছে?

না তো।

ঠাকুর খাবার নিয়ে এল। শরৎ বল্লেন : নিয়ে যাও, খেতে পারব না। দুজনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ব'সে রইলাম। এমন সময় নরেন্দ্র দেব এসে ঘরের হাওয়াটা হাল্কা ক'রে দিলেন।

কি ব'লে গেল ডাক্তারেরা, দাদা?

জান, কিঙ্ক-কিঙ্কস্‌ কি?

নরেন মাথা নাড়লেন।

দেখ সুরেন, আমার একটা চার-ভলুমের ডিকস্‌নারি আছে; ওটাতে পেলেও পেতে পার। ওষুধটা আন্‌তে দিয়েছ?

দিয়েছি; কালীকে।

দেখা গেল : কিঙ্ক-কিঙ্কস্‌ = অন্ত্রের অবরোধ।

নির্ব্বাক দুজনে ব'সে আছি সে রাত্রে। নিঃশব্দ অন্ধকারে বারান্দায় ঘড়ি চলার শব্দ শোনা যায় খট্‌ খট্‌; কটা বাজল জান্‌বার ইচ্ছেও নেই, অবসর ও নেই;—দুজনের হুঁসও নেই, খেয়ালও নেই!

হঠাৎ শরৎ নড়ে-চ'ড়ে উঠে ব'সে ব'ল্লেন :

এ হ'ল রাজা পরীক্ষিতের দশা!

ঠিক মনে হ'ল : নদীর ও-পার থেকে কে কথা কইলে! মনে হ'ল : শরৎ নদী পেরিয়ে ওপার থেকে ব'লচেন : সুরেন, চল্লুম!

বাইরে গিয়ে দেখ্‌লাম। রাতের অন্ধকার ফিকে হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। কিন্তু বুকের চাপ্‌ তেমনি জেঁতে ব'সে আছে—নিশ্বাস যেন বন্ধ হ'য়ে যায়!

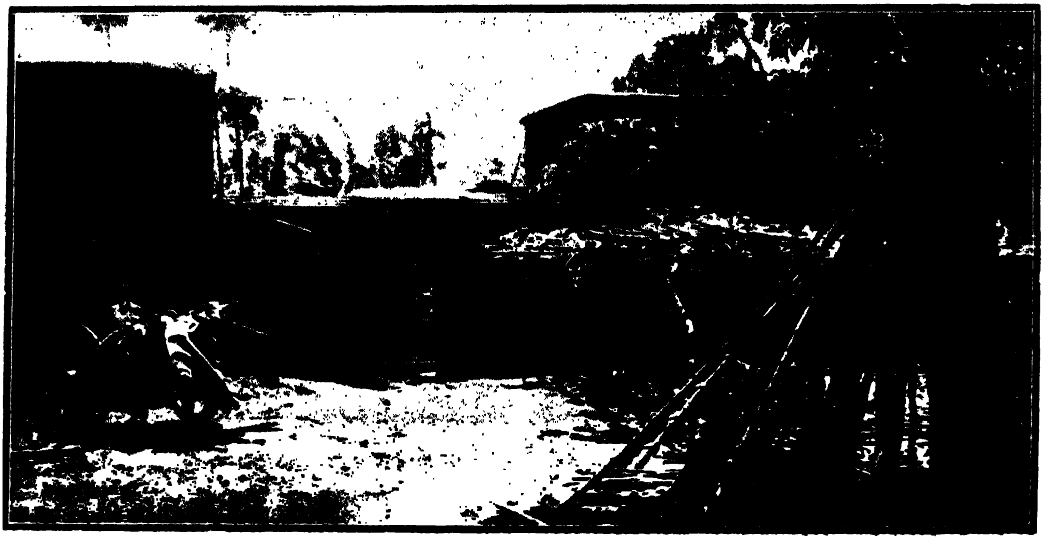
শরৎ ডাক্‌লেন : সুরেন…

ক্রমশঃ

দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী

বাঙ্‌লার অপরাজেয় কথাশিল্পী জনপ্রিয় সাহিত্যিক ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি হুগলী জেলার সদর মহকুমার দেবানন্দপুর গ্রাম; এই গ্রামে তিনি ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। প্রাচীন সপ্তগ্রাম যে সাতখানি মৌজা লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই গ্রাম তাহারই মধ্যে একখানি মৌজা; ইহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিত। নদীটি যদিও মজিয়া গিয়াছে এবং গ্রামখানিও খুবই ছোট, তথাপি ইহার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নবাবী আমলে এই গ্রামের হিন্দু কায়স্থ জমিদার-বংশের অনেকেই আরবি ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এখানে ফার্সিভাষা শিক্ষার একটী কেন্দ্র ছিল। কৈশোর বয়সে বাঙ্‌লার কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এই গ্রামের 'মুন্সী' আখ্যাপ্রাপ্ত জমিদারদের আশ্রয়ে পাঁচবৎসর-কাল থাকিয়া ফার্সিভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেন ও ঐ সময়ে বাং ১১৩৪ সনে তাঁহার প্রথম বাঙ্‌লা কবিতা রচনা করেন। ইহার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে বাং ১২৮৩ সালে এই গ্রামের এক সামান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাঙ্‌লার আধুনিক যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এবং এই গ্রামে থাকাকালেই তাঁহারও সাহিত্য-সাধনার সূচনা হয়। অতএব একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে বাঙ্‌লার সাহিত্যজগতে এই ক্ষুদ্রগ্রামের কিছু দান আছে।



শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরের বাড়ী — ছবি—এ, এন, দাস

শরৎচন্দ্রের পিতা ৺মতিলাল (ওরফে নাটু) চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান্ অথচ আদর্শবাদী, আত্মভোলা অথচ চঞ্চলপ্রকৃতির লোক। মতিলালের মাতৃদেবী সেকালের কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে বলিয়া বিবাহিতা হইয়াও অধিকাংশ সময়েই দেবানন্দপুরে পিতৃগৃহে থাকিতেন এবং মতিলালকে তাঁহার মাতুলরাই এণ্ট্রাস পর্য্যন্ত লেখাপড়া শেখান ও পরে তিনি এফ্-এ পর্য্যন্ত পাশ করিয়াছিলেন। সাহিত্যচর্চ্চায় মতিলালের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং গল্প ও কবিতা প্রভৃতি লেখার খুবই

অভ্যাস ছিল; শরৎচন্দ্র তাঁহার সমবয়স্কদিগের নিকট তাঁহার পিতার লেখা খাতাগুলি অনেক সময়েই পড়িয়া শুনাইতেন। অস্থিরপ্রকৃতির জন্য মতিলাল কখনও কোনও কাজে বেশীদিন লাগিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং এ জন্যই তাঁহার অর্থের অভাব ছিল খুবই বেশী ও সংসারে ছিল অনাটন। যদিও চিরদিনই মতিলালকে অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার মাতৃদেবী মিতব্যয়ী ও সুগৃহিণী ছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার পত্নী শান্তপ্রকৃতির মহিলা হওয়ায় কোনওমতে তিনি গ্রামে সংসার চালাইতেন। মতিলালের মাতুলালয়েই শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়—তখনও মতিলালের নিজ বাসভবন হয় নাই; পরে মতিলাল চাকুরী করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে তাঁহার মাতুলগণ তাঁহাকে তাঁহাদের বাটীর সংলগ্ন আন্দাজ চারিকাঠা মোকররী মৌরসী বাগানজমি বসবাসের জন্য দেন এবং সেইস্থানে তিনি দক্ষিণদ্বারী একতালা একহারা দুই কুঠারি পাকাঘর মায় রোয়াক ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। নানাপ্রকার অভাবের ভিতর দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত বলিয়া মতিলাল ক্রমশই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং এই গ্রামেরই শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী তাঁহার বিরুদ্ধে হুগ্‌লীর প্রথম মুন্‌সেফী আদালত হইতে এক ডিগ্রী পাইয়া এই বসতবাটী ক্রোক করেন। ঐ ডিগ্রীর টাকা মিটাইবার জন্যই মতিলাল ২২৫৲ মূল্যে বসতবাটীখানি তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল ৺অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাং ১৩০৩ সালের ২৩শে কার্ত্তিক সাফ কোবালায় বিক্রয় করেন।

শরৎচন্দ্রের মাতা স্বর্গীয়া ভুবনমোহিনী দেবী চব্বিশ-পরগণার হালিশহর গ্রাম নিবাসী ৺কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। কেদারবাবু ভাগলপুরে তাঁহার দুই পুত্র ৺ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাসকে লইয়া বসবাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। সাংসারিক অভাবের জন্য সময়ে সময়ে শরৎচন্দ্রের মাতা পুত্রকন্যাদের লইয়া ভাগলপুরে পিত্রালয়ে থাকিতেন; শরৎচন্দ্রের মাতুলগণও তাঁহাদের ভগিনীকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ভুবনমোহিনীর একটী বিশেষ গুণ ছিল সেবাপরায়ণতা, এজন্য দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের আত্মীয়গণ সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। যে বৎসরে শরৎচন্দ্রের পিতা দেবানন্দপুরের বাটী বিক্রয় করেন, সেই বৎসরেই ভাগলপুরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্রের জীবনীপ্রসঙ্গে সকল লেখকই তাঁহার ভাগলপুরে শিক্ষালাভকাল হইতেই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বাল্যজীবনও যে বৈচিত্র্যময় তাহা অনেকেই জানেন না। দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার সহপাঠী ও সমবয়স্ক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ অনুসন্ধানে যাহা পাইয়াছি তাহাই লিখিতেছি। তাঁহারা বলেন —বালক শরৎচন্দ্র ছিলেন চঞ্চল ও উদ্দাম প্রকৃতির; তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় তাঁহাদেরই বাটীর নিকটবর্ত্তী ৺প্যারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) পণ্ডিত মহাশয়ের পাঠশালাতে; একটী প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে এই পাঠশালাটী বসিত এবং এখানে অনেকগুলি 'পড়ুয়া' ছাত্রছাত্রী ছিল; শরৎচন্দ্র ইহাদের মধ্যে ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা দুরন্ত কিন্তু মেধাবী। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র 'কাশীনাথ' তাঁহার সহাধ্যায়ী ও সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মহাশয় শরৎচন্দ্রকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন ও অনেক সময়ই তাঁহার দুরন্তপনা নির্ব্বিচারে সহ্য করিতেন। পাঠশালায় দুরন্তপনার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রামে নূতন স্থাপিত ৺সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য মাষ্টার মহাশয়ের বাঙ্‌লা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন ও এই স্কুলে প্রায় তিনি এক বৎসর কাল পড়েন; এই স্কুলেই যখন তিনি বোধোদয় ও পদ্যপাঠ পড়িতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ দশ বৎসরের অধিক নহে। এই সময়ে তাঁহার পিতা বিহারে কোনও স্থানে একটী চাকুরী পান ও স্ত্রী-পুত্রগণকে ভাগলপুরে রাখিয়া দেন। এই সময়েই শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের বাঙ্‌লা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন ও পর বৎসর (ইং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মতিলালও এই সময়ে আবার কার্য্যত্যাগ করিয়া দেশে সপরিবারে ফিরিয়া আসেন, কাজেই শরৎচন্দ্রকে হুগলী শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইতে হইল। তিনি ভর্ত্তি হইলেন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্ত্তমান Class VII) ইং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ও গ্রাম হইতে যাতায়াত করিতেন। গ্রামের অনেকগুলি ছেলেই তখন হুগলী শহরে যাতায়াত করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িত। শরৎচন্দ্র এই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে

উন্নীত হন ; কিন্তু এখানে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর পড়া শেষ করার সুযোগ হইল না। এই সময়ে তাঁহার পিতার ঋণভার এরূপ বেশী হইয়া পড়িয়াছিল যে বিদ্যালয়ের বেতন যোগানও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই এবং কিছুদিনের জন্য স্কুলে পড়াও বন্ধ করিতে হইয়াছিল। ইং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতা পরিবারবর্গকে পুনরায় ভাগলপুরে লইয়া গেলেন এবং পুনরায় চাকুরীর সন্ধানে বাহির হইলেন। শরৎচন্দ্র তাহার পর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয়ে থাকিয়াই তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ভর্ত্তি হইলেন। সুতরাং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে কাটাইয়াছিলেন।

দেবানন্দপুর গ্রাম হইতে যে কয়টী ছেলে হুগলী শহরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত তাহাদের একটী দলের নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র। পাঁচ ছয়জনে এই দলটী গঠিত ছিল ও তাঁহারা একত্রেই স্কুলে যাইতেন; তিন মাইল কাঁচা রাস্তা; গ্রীষ্মকালে ধূলা ও বর্ষাকালে কাদায় রাস্তাটী পরিপূর্ণ থাকিত। শরৎচন্দ্র পথে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করিতে করিতে চলিতেন এবং পথের ধারে বাগান হইতে সুবিধামত সুস্বাদু ফলও সংগ্রহ করিয়া সদ্ব্যবহার করিতেন; পথে তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য দুই তিনটী নির্জ্জন স্থানও স্থির করা ছিল। গ্রাম হইতে বাহিরে আসিয়াই প্রথম তাঁহারা মিলিত হইতেন হুগলী-সাতগাঁও রাস্তার 'মুড়া অশ্বত্থতলায়'—'দত্তা' উপন্যাসে যাহাকে 'ন্যাড়া বটতলা' বলিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে গ্রাম হইতে শবদেহ শহরে গঙ্গাতীরে সৎকারের জন্য লইয়া যাওয়ার সময় এইস্থানে শবাধারটী নামান হইত; কয়েকটী পাটকাঠি জ্বালাইয়া ঐ স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইত ও নিকটবর্ত্তী 'মুন্সীবাবুদের গলায় দ'ড়ের বাগানের' কাছে একটী ডোবায় শবের অনাবশ্যকীয় বিছানাপত্র ফেলিয়া দেওয়া হইত। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব্বে (পৃ ১২৩) 'খাঁয়েদের গলায় দ'ড়ের বাগান' বলিয়া ইহার বর্ণনা আছে। এইস্থান তখনকার ছেলেদের মনে বিশেষ ভীতির সঞ্চার করিত; দুঃসাহসী শরৎচন্দ্রের দলের ছেলেরা তাঁহার সহিত 'মুড়া অশ্বত্থতলায়' মিলিত হইয়া এই 'গলায় দ'ড়ের বাগান' পার হইয়া যাইত। গ্রামের ভিতরেও তাঁহার দলের ছেলেদের একটী গোপনীয় আড্ডা ছিল; শরৎচন্দ্রের পৈতৃক ভবনের অনতিদূরেই সরস্বতী নদীতে যাইবার যে সদর রাস্তা আছে (হুগলী লোক্যাল বোর্ড যে রাস্তাটী শরৎ চট্টোপাধ্যায় রোড নামে অভিহিত করিয়াছেন), তাহার পার্শ্বে 'মুন্সী' জমিদারবাবুদের হেদুয়া পুষ্করিণীর সীমানাস্থিত 'গড়ের' জঙ্গলের মধ্যে নিজহস্তে মাটী কাটিয়া শরৎচন্দ্র একটী বড় রকম গর্ত্ত খনন করেন ও তাহার ভিতর একখানি ঘরের মত রচনা করিয়াছিলেন; এই ঘরে গ্রামের বাগান হইতে গোপনে আম, কাঁটাল, লিচু, আনারস, কলা প্রভৃতি যে সময়ের যে সুস্বাদু ফল তাহা সঞ্চয় করা হইত ও বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া ঐ সকলের গোপনেই সদ্ব্যবহার করা হইত। ছুটীর দিনে দ্বিপ্রহরে বা অপরাহ্নে এবং মাঝে মাঝে স্কুল পলাইয়াও সরস্বতী নদীর তীরে বসিয়া বা গ্রামের জমিদারবাবুদের 'নূতন পুকুর' বা 'দিঘী' পুষ্করিণীর পাড়ে ঝোপের আড়ালে বসিয়া তিনি ছিপ্ ফেলিয়া মাছ ধরিতেন; এই ছিপ্ তিনি নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইতেন। ইহা ছাড়া কখনও একাকী, কখনও বা বন্ধুদের সহিত ফেরি ঘাটে পারাপারের যে ডোঙা থাকিত তাহা খুলিয়া লইয়া বা জেলেদের নৌকা তাহাদের অজ্ঞাতসারে লইয়া নদীবক্ষে দুই তিন মাইল দূর পর্য্যন্ত, হয় কৃষ্ণপুর গ্রামে ৺রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত আখ্ড়া বাটী পর্য্যন্ত বা সপ্তগ্রামের পুল অবধি বেড়াইয়া আসিতেন। কৃষ্ণপুরের এই বৈষ্ণবদের আখ্ড়া বাটী তাঁহার একটী প্রিয় স্থান ছিল এবং বন্ধুদের লইয়া বা একাকী পদব্রজেও এই স্থানে যাইতেন; এই স্থানের বর্ণনা তাঁহার শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব্বে 'মুরারিপুরের আখ্ড়া' নামে (পৃঃ ৫৩৫৫) লিখিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমি নিজেই দেখিয়াছি যে যখনই তিনি দেবানন্দপুরে বেড়াইতে আসিতেন, সরস্বতী নদীতীরে কতকদূর অবধি ঘুরিয়া আসিতেন। নদীতীর তাঁহার বাল্যের অতি প্রিয় ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল বলিয়াই বোধ হয়, পরিণত বয়সে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অনুরোধে রূপনারায়ণ নদীতীরেই বসবাসের জন্য নিজবাটী নির্ম্মাণ করান।

বাল্যজীবনে শরৎচন্দ্র দুঃসাহসীও যেমন ছিলেন, কোমল হৃদয়ও তেমনি তাঁহার ছিল। আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিত। হুগলী

ব্রাঞ্চ স্কুলে যখন তিনি পড়িতেন, তখন আবশ্যক হইলে গভীর রাত্রিতেও একাকী একটী লণ্ঠন ও একটী লাঠি হাতে লইয়া তিন মাইল নির্জ্জন পথ অতিক্রম করিয়া শহর হইতে কোনও রোগীর জন্য ঔষধ আনিতে বা ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে মোটেই সঙ্কোচ করিতেন না বা রাত্রি জাগরণ করিয়া কোনও রোগীর সেবা করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। তাঁহার বালকসুলভ চাপল্যের জন্য যেমন তিনি গ্রামের কতক লোকের অপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার সৎসাহস ও আর্ত্ত-সেবা প্রবৃত্তির জন্য তেমনি ছিলেন অনেকের প্রিয়। স্থানীয় জমিদার ৺নবগোপাল দত্ত মুন্সী মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে অভিযোগকারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। নবগোপালবাবুর পুত্র স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অতুলচন্দ্রও (যিনি তখন বি-এ পড়িতেন ও পরে কর্ম্মজীবনে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হন) শরৎচন্দ্রকে ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য তাঁহার প্রতি অতুলচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের এতদূর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে তাঁহাদের অন্তঃপুরেও শরৎচন্দ্রের যাতায়াত ছিল এবং মহিলাগণও তাঁহাকে বাড়ীর ছেলের ন্যায়ই আদর যত্ন করিতেন। দেবানন্দপুরের আর একটী কায়স্থ পরিবারের সহিত শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনে মেলামেশা ছিল এবং এই বাটীর একটী ছেলের সহিত তিনি প্রায়ই দাবা খেলিতেন; এই ছেলেটীর কনিষ্ঠা ভগিনী—শরৎচন্দ্র যে সময়ে পাঠশালায় পড়িতেন সেই সময়ে—ঐ পাঠশালারই ছাত্রী ছিলেন এবং তখন হইতেই শরৎচন্দ্রের সহিত সর্ব্বদাই সঙ্গিনীর ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইতেন—দুইজনের ভাবও ছিল যত, ঝগড়াও হইত তত। নদীর বা পুকুরের ধারে ছিপ্ নিয়ে মাছ ধরা, ডোঙা বা নৌকা নিয়ে নদীবক্ষে বেড়ান, বৈঁচি ফল পেড়ে মালা গাঁথা, বাগান থেকে গোপনে ফল সংগ্রহ করা, ঘুড়ির সুতা মাঞ্জা ও ঘুড়ি তৈয়ার করা, বনজঙ্গলে বেড়ান প্রভৃতি সকল রকম বালকসুলভ চাপল্যের কাজে এই মেয়েটীই ছিল শরৎচন্দ্রের সহচারিণী। এ কারণেই বোধ হয় এই শৈশব-সঙ্গিনীর প্রকৃতি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কয়েকটী নারী-চরিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। গানবাজনায়ও এই বয়সেই শরৎচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল; গ্রামের ভিতরে গানবাজনার নিয়মিত চর্চ্চার সুযোগ ছিল না বলিয়া একবার তিনি বাটী হইতে পলায়ন করিয়া এক যাত্রার দলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসা হয়।

এই সকল ব্যাপার হইতে এখন মনে হয় যে শরৎচন্দ্রের ভিতর বাল্য বয়স হইতেই অসামান্য প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল; কিন্তু গ্রামের তখন অনেকেই বুঝেন নাই যে এই পাড়াগেঁয়ে 'ডান্‌পিটে' ছেলে ভবিষ্যৎ জীবনে বাঙ্‌লা সাহিত্যে বড় কিছু দান কোরে যাবেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু দুইজন বলিলেন যে যখন শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন তখনই তিনি 'কাশীনাথ' ও 'কাক-বাসা' নামক দুইটী গল্পের আখ্যান ভাগ (plot) লিখিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন—তবে কোন্ গল্পটী প্রথম লেখা তাহা তাঁহারা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ইহাও বলিলেন যে 'কাশীনাথ' গল্পের নায়কের নাম তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা করিয়াই তাঁহাদের পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রের নামানুযায়ী রাখা হয়; সুতরাং শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও ভাগলপুরের বন্ধু শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে বলিয়াছেন ঐ গল্প দুইটি ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলী স্কুলে পড়ার সময় লিখিত হইয়াছিল তাহা সঠিক নহে; হইতে পারে ঐ সময়ে ঐ দুইটী গল্প মার্জ্জিত আকারে পুনর্লিখিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের এই দুইটী বাল্যবন্ধু আরও বলিলেন যে তাঁহার 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়ের চিত্রটীও এই গ্রামের ৺মৃত্যুঞ্জয় মজুমদারের তখনকার কাহিনী হইতে কতকাংশে গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার "পল্লী সমাজে" কেষ্টা বোষ্টম নামে যে একটী লোকের উল্লেখ আছে সেও এই গ্রামে তখন বাস করিয়া মালা, ঘুন্‌সী, আয়না ফেরি করিয়া বেড়াইত।

শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে জন্মভূমির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসরই তিনি দুই একদিন একাকী গ্রামে বেড়াইতে আসিতেন এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের কাহারও বাটীতে কিছু সময় কাটাইতেন ও তাহার পর একবার নদীর তীরে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পথে স্থানীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক বাং ১৩৩৫ সালে তাঁহার

জয়ন্তী দিবসে স্থাপিত "শরচ্চন্দ্র পল্লী পাঠাগার"টী পরিদর্শন করিয়া আসিতেন। এই পাঠাগার স্থাপিত হওয়ার পর তিনি একটী আল্‌মারি ও নিজ উপন্যাস ছাড়াও কতকগুলি বাঙ্‌লা পুস্তক পাঠাগারে দিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা ছিল বর্ত্তমান বৎসরেই তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকটস্থ আর একখানি ছোট বাড়ী খরিদ করিবেন এবং তাহারই একাংশে এই পাঠাগার স্থায়ীভাবেই স্থান পাইবে। তাঁহারই ইচ্ছানুযায়ী এই পাঠাগারটী অবৈতনিক করা হয়; তিনি বলিয়াছিলেন—"ওরে গ্রামের লোকের আগে চোখ ফুটিয়ে দে', তবে তারা নিজেরাই বুঝ্‌বে নিজেদের ভালো মন্দ; যা'রা এখন দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না তারা কি চাঁদা দিয়ে বই প'ড়্‌বে? নাই বা হ'ল অনেক বই, কিছু কিছু কোরে ভাল বই যোগাড় কর।" তাঁহার কথাই এই পাঠাগারের পরিচালকগণ মানিয়া আসিতেছেন; শরৎচন্দ্রের ভক্ত লেখকগণ অনেকেই ইচ্ছা করিলে এই পাঠাগারটীকে সাহায্য করিতে পারেন।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিবসে যখন আমি বালীগঞ্জে শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করি তখন তিনি আমাকে দেবানন্দপুরে বাড়ী খরিদ করার ব্যাপারে অগ্রসর হইতে বলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

ভারতচন্দ্রের ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার বেদীপীঠ দেবানন্দপুর গ্রামকে আজ দুর্ভাগা দেশ বলিতেই হইবে।

অনাহূত বন্ধু

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

স্বপনবিলাসের মায়াময়ী দেবী—
তার পদ সেবি
কাটাইনু চিরদিন, মুগ্ধ ভক্ত হ'য়ে
তৃপ্ত মন লয়ে।

নিত্য মোরে মত্ত করি নূতন খেলায়
ভুলায়ে সে রাখে,
মায়াপুরীমধ্যে তার আবদ্ধ করিয়া
বেড়ি শত পাকে।

মোহজাল সৃষ্টি করি দৃষ্টিপথ মোর
রেখেছে রুধিয়া,
শুনি তার সুললিত সঙ্গীত লহরী
থাকি মুরছিয়া।

রেখেছে সে চারুবেশে রূপের ঝলকে
জিনিয়া হৃদয়,
নৃত্যপর চরণের নূপুর নিক্কণে
ঘোষিয়া বিজয়।

কভু হাতে পায়ে দিয়ে নির্ম্মম বাঁধন
করে নিস্পেষণ,
কভু মনে হয় তার দংশন-দাহন
বড় অসহন।

তবু না কাটাতে চাই তার মোহপাশ,
রহিয়াছে আশ—
আবার সে দিবে এনে, দুঃখ করি নাশ,
উদ্দাম উল্লাস।

ক্লিষ্ট যবে হয় প্রাণ যাতনার ঘায়,
থাকি প্রত্যাশায়—
ফিরিবে সে সুখ যার রঙীন নেশায়
সংজ্ঞা চলে যায়।

রুদ্ধ করি প্রবেশের দ্বার থাকি ব'সে,
পাছে হেথা পশে
হেন যাদুকর কেহ—যাহার পরশে
মায়া যায় খসে।

নিযুক্ত রেখেছি তাই নিশিদিন ধরি
সতর্ক প্রহরী ;
অতর্কিতে তবু তুমি আসিলে উতরি
কোন্ পথ ধরি ?

তোমারে ডেকেছি কিম্বা এনেছি স্মরণে—
পড়ে না ত মনে,
তবে কেন এলে বলো আমার সদনে
বিনা নিমন্ত্রণে ?

বলো শুনি কি বলিবে। ডাকিয়াছি আমি ?
হয়ে অন্তর্যামী
শুনেছ আহ্বান মোর—"এসো ওগো স্বামি ?
মোর কাছে নামি ?"

হয় ত কখনো যবে বেদনা-পীড়িত
হয়েছিল চিত,
কিম্বা স্বপ্নাবেশ হ'তে হয়ে জাগরিত,
মহাভয়ে ভীত,

ডেকেছিনু—"কোথা তুমি ওহে ব্যথাহারি !
সহিতে যে নারি,
দয়া ক'রে তুমি মোরে লও হে উদ্ধারি,
বিপদ-কাণ্ডারি !"

তাই কি দিলে হে দেখা ? বারেকের ডাকা
অবিশ্বাসমাখা
আমার সে অনুরোধ কারো মনে আঁকা
সম্ভব কি থাকা ?

দেখি, দেখি ! একি তব রূপ মনোহর,
অনিন্দ্যসুন্দর !
প্রতি অঙ্গ হ'তে ঝরে সুধার নিঝর—
পূর্ণ শশধর !

ভুবন-ভুলানো এত সৌন্দর্য্য তোমার—
একি ব্যবহার ?
আমার বিলাস-কুঞ্জে তব আসিবার
কিবা অধিকার ?

সহসা স্বপন পাশ যেন খসে যায়
হেরিয়া তোমায়—
অরুণ উদিত হ'লে কুয়াসার প্রায়
কোথা সে মিলায় !

শুধু বন্ধু বলি আজ ভেটিতে আমায়
এসেছ হেথায় ?
ভুলে থেকে, অবশেষে এলে অবেলায়—
তাই হাসি পায়।

ভাল, ভাল—তবু ভাল ! দেখা যদি হ'ল,
বলো, তবে বলো—
পাবো কি করিতে মোর জীবন সম্বল
ও মুখ কমল ?

নয়ন আমার যদি দিয়েছ খুলিয়া
যেও না চলিয়া ;
অদর্শনে পুনরায় কুহেলি আসিয়া
রহিবে ঘিরিয়া।

না, না সখা ! আর তুমি যেওনা চলিয়া
শূন্য হবে হিয়া ;
অভাগারে অযাচিত প্রেম বিতরিয়া
যাইবে ত্যজিয়া ?

তোমারে যে ডাকি নাই কভু ভুলিয়াও
আজ ভুলে যাও ;
যেওনা যেওনা সখা ! ওগো ফিরে চাও,
দাঁড়াও, দাঁড়াও !

একান্ত যাইবে যদি করি অভিমান
ল'য়ে মনপ্রাণ,
আমিও বলিয়া রাখি—"ভাঙিব সে মান
করি নাম-গান !"



নব-রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও বিগত রাষ্ট্রনায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু — ছবি—ডি রতন



কংগ্রেস সভায় মঞ্চ থেকে সভাপতি সুভাষচন্দ্রের অভিভাষণ পাঠ [illegible]



সভাপতির মিছিলে দেশসেবিকাগণ, পুরোভাগে—স্বেচ্ছাসেবক দলের নেত্রী [illegible]



সাময়িকী

কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণ—

গত হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহা সকল দিক দিয়াই মনোজ্ঞ হইয়াছিল। বহুবর্ষ পরে বাঙ্গালীর কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচনে বাঙ্গালা দেশে আপামর জনসাধারণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে সিভিল সার্ভিসের মোহ ত্যাগ করিয়া একজন সামান্য সৈনিকরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাহার পর তাঁহাকে যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, সেরূপ নির্য্যাতন খুব কম নেতার ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। আজ বাঙ্গালার সেই আদরের দুলাল, যুবক বাঙ্গালীর একমাত্র আশাভরসা সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা দ্বিগুণতর হইয়াছে; সকলেই আশা করিতেছেন, তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেস আবার নূতন আন্দোলনে ব্রতী হইবে এবং বাঙ্গালার কংগ্রেসের যে সম্মান লুপ্ত হইয়াছিল তাহা ফিরিয়া আসিবে। আমরা নিম্নে তাঁহার অভিভাষণের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা—

দেশবাসীদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে পুনরায় সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগ করার প্রয়োজন হইতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া যেন আমরা মনে না করি যে আমাদের ভবিষ্যত আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিকতার পথে সীমাবদ্ধ থাকিবে। বলপূর্ব্বক যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনে প্রবলভাবে বাধা সৃষ্টি করিতে আমাদের হয়ত পুনরায় এক বৃহৎ আইনঅমান্য-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

জাতির পুনর্গঠন—

আমার মনে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণ এবং বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে আমাদের প্রধান জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পন্থাতেই সম্ভব হইতে পারে। নূতন পরিকল্পনায় লক্ষ্য হইবে তিনটি বিষয় (১) দেশকে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত করা (২) ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং (৩) স্থানীয় ও সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা দান।

রাষ্ট্রভাষা ও বর্ণমালা—

আমাদের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার মনে হয়, হিন্দী ও উর্দ্দূর পার্থক্য কৃত্রিম পার্থক্য। সবচেয়ে স্বাভাবিক রাষ্ট্রভাষা হইবে উভয়ের একটা মিশ্রণ অর্থাৎ যে ভাষা দেশের অধিকাংশ স্থানে জনসাধারণ তাহার দৈনন্দিন জীবনে এখন ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ণমালা সম্পর্কে আমার মনে হয়—চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ সমাধান হইবে সেই বর্ণমালার গ্রহণে—যে বর্ণমালা গ্রহণ করিলে আমরা জগতের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি চলিতে পারিব। রোমান অক্ষর গ্রহণের কথা শুনিলে আমাদের দেশবাসীর অনেকেই সম্ভবত আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন। বর্ণমালা একটা কিছু অপরিবর্ত্তনীয় পবিত্র বস্তু নহে। একসময়ে আমিই মনে করিতাম যে বিদেশী বর্ণমালা গ্রহণ করা জাতীয়তাবিরোধী। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক পরিদর্শন কালে আমার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যে বর্ণমালা ব্যবহার করে, সেই বর্ণমালা গ্রহণ করিলে কত সুবিধা হয়। আমাদের দেশের জনগণের ইহাতে কোন অসুবিধা হইবে না; কারণ তাহাদের শতকরা ৯০ জনেরও বেশী নিরক্ষর, কোন অক্ষর তাহারা চিনে না। সুতরাং তাহাদের কিছু আসে যায় না।

উপরন্ত রোমান অক্ষর জানিলে তাহাদের পক্ষে বিদেশী ভাষা শিক্ষা সহজ হইবে।

জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য—

আমাদের দেশ যখন দারিদ্র্য, অনশন ও ব্যাধির কবলে জর্জ্জরিত হইতেছে তখন প্রতি দশ বৎসরে জনসংখ্যা ৩ কোটি করিয়া বাড়িতে দেওয়া চলে না। সম্প্রতি যেরূপ দ্রুত জনসংখ্যা বাড়িতেছে সেইরূপ হারে যদি জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। অতএব বর্ত্তমান জনগণকে খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষাদান করিতে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের জনসংখ্যা বাড়িতে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। জনসাধারণের দৃষ্টি আমি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

পুনর্গঠন সম্পর্কে আমাদের প্রধান সমস্যা হইবে—কি করিয়া দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করা যায়। ইহার জন্য আমাদের ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে, জমীদারী প্রথা বিলুপ্ত করিতে হইবে, কৃষকগণকে ঋণভার হইতে মুক্তি দিতে হইবে এবং পল্লীবাসীকে অল্প সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা বস্তু উৎপাদন করে এবং যাহারা ব্যবহার করে, উভয়ের মঙ্গলের জন্যই সমবায় আন্দোলনকে বিস্তৃত করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বামপন্থীদের প্রতি আবেদন—

কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহাকে উপেক্ষা করা নিরর্থক। বাহিরে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বের আহ্বান রহিয়াছে। এই আহ্বানের প্রত্যুত্তর আমাদের দিতে হইবে। এই সঙ্কট-কালে আমরা কি করিব? আমাদের পক্ষে যে ঝড়ঝঞ্ঝা দেখা দিবে, তাহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে একত্রিত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং আমাদের শাসকগণ যে ছলকৌশল বিস্তার করিবেন তাহা আমাদিগকে প্রতিরোধ করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী—

সমগ্রভারত একান্তভাবে আশা ও প্রার্থনা করিতেছে যে মহাত্মা গান্ধী যেন আমাদের জাতির মুক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য এখনও বহু বহু বৎসর জীবিত থাকেন। তাঁহাকে হারাইলে ভারতের চলিবেনা—বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে। আমাদের দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রামকে বিদ্বেষ ও তিক্ততা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন। শুধু তাই নয়—সর্ব্বমানবের দুঃখমোচনের জন্য তাঁহাকে প্রয়োজন। আমাদের সংগ্রাম শুধু বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে—যাহার কেন্দ্রীয় শক্তি হইতেছে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ। অতএব আমরা শুধু ভারতের মুক্তির জন্য লড়িতেছি না, আমরা লড়িতেছি সর্ব্বমানবের মুক্তির জন্য। ভারতের স্বাধীনতা লাভের অর্থ মানবজাতির প্রাণরক্ষা।

কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব—

হরিপুরা কংগ্রেসে এবার যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) কংগ্রেস স্বরূপরাণী নেহরু, সার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণিলাল কোঠারী ও পার্ব্বতী দেবীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছে।

(২) আসামের সুদূর পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীনকারী বীর নাগা রমণী গুঁই—ডালে ৬ বৎসর যাবত কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন—কংগ্রেস অবিলম্বে তাঁহার মুক্তি দাবী করিতেছে।

প্রবাসী ভারতবাসী—

(৩) দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, জাঞ্জিবার প্রভৃতি স্থান এবং মরিশস ও ফিজি দ্বীপের ভারতীয়দের মর্য্যাদা ও অধিকার দিন দিন যেভাবে দ্রুত ক্ষুণ্ণ হইতেছে, তাহাতে কংগ্রেস উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের উপনিবেশ ও অধীনস্থ দেশসমূহে অধিকতর শোষণ-নীতি চালাইবার জন্য যে নূতন আর্থিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে—কংগ্রেস তাহার নিন্দা করিতেছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের ঐ নীতি জাঞ্জিবারে লবঙ্গ ব্যবসায়ের একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান হিসাবে লবঙ্গ ব্যবসায়ী সমিতি গঠন, টাঙ্গানিকায় দেশীয় উৎপন্ন

দ্রব্য বিল, পূর্ব্ব আফ্রিকার যানবাহন পরিকল্পনা, কেনিয়ায় শ্বেতাঙ্গদের জন্য উচ্চজমি সংরক্ষণ এবং মরিশস ও ফিজি দ্বীপে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবাসী ভারতীয়রা তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে বজায় রাখিবার জন্য যে সংগ্রাম চালাইয়াছে, কংগ্রেস সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছে। কংগ্রেস দক্ষিণপূর্ব্ব আফ্রিকার অধিবাসীদের আশ্বাস দিতেছে যে, ঐ সকল দেশের ভারতীয় অধিবাসীরা তাহাদের সহিত শত্রুতাবশতঃ কোন দাবী পেশ করিতেছে না, বৃটীশ যে আফ্রিকাবাসী এবং ভারতীয়দিগকে সমানভাবে শোষণ করিতেছে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য ঐ সকল দাবী জানাইতেছে।"

সিংহল প্রবাসী ভারতীয়—

(৪) সিংহলের শাসন ব্যাপারে কয়েকটী আইন প্রণীত হওয়া এবং বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার আশঙ্কায় সিংহলের জনসাধারণ এবং সিংহলের প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে যে মনোমালিন্য দেখা দেওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। সিংহলের গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণকে কংগ্রেস অনুরোধ করিতেছে যে তাঁহারা যেন সিংহলের ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে কোন বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ না করেন। যে ভারতীয় শ্রমিকরা সিংহলের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে এবং করিতেছে, সম্প্রতি কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচনে ভোটাধিকারে বঞ্চিত করা হইয়াছে বলিয়া কংগ্রেস বিশেষভাবে দুঃখপ্রকাশ করিতেছে। ইহাতে সিংহলের ভারতীয়রা আশঙ্কা করিতেছে যে তাহাদের নাগরিক অধিকার আরও সঙ্কুচিত করা হইবে এবং তাহাদের রাজনীতিক মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করা হইবে। কংগ্রেস আশা করে যে ঐ প্রকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না এবং যদি কোন আইনে ঐ প্রকার আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা এমনভাবে সংশোধন করা হইবে যাহাতে ভারতবর্ষ মনে করিতে পারে যে স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট হইলেও সিংহল এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন—

(৫) জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জ্জন এবং লবঙ্গ ব্যবসায় বর্জ্জন করিবার জন্য কংগ্রেস ভারতীয় জনসাধারণ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে যে অনুরোধ জানাইয়াছিল, তাহাতে সন্তোষজনক সাড়া দেওয়ায় কংগ্রেস তাহাদের প্রশংসা করিতেছে। জাঞ্জিবরের ভারতীয়গণকে এবং ভারতের লবঙ্গব্যবসায়ীদিগকে কংগ্রেস তজ্জন্য অভিনন্দন জানাইতেছে। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ব্যাপারে জাঞ্জিবারের ভারতীয়দের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের এখনও সন্তোষজনক মীমাংসা হইল না বলিয়া কংগ্রেস দুঃখিত। কংগ্রেস পুনরায় ভারতীয় জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেছে যে, তাহারা যেন এখনও লবঙ্গ বর্জ্জন চালাইতে থাকে এবং ব্যবসায়ীদিগকেও লবঙ্গ ব্যবসায় বর্জ্জনের চাপ দিতে থাকে। কংগ্রেস বিশ্বাস করে যে, ঐ ভাবে জাঞ্জিবারের গভর্ণমেণ্ট আপত্তিজনক আইন প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইবে।

চীনের সংগ্রাম—

(৬) চীনের উপর বর্ব্বর সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ আক্রমণ কংগ্রেস উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে। কংগ্রেসের মতে সাম্রাজ্যবাদের ঐ আক্রমণ পৃথিবীর ভবিষ্যত শান্তি ও এসিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক। চীনের জনগণের ঐ অগ্নিপরীক্ষায় কংগ্রেস তাহাদিগকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। তাহারা যে বীরত্বের সহিত স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস তাহাদের প্রশংসা করিতেছে। বিপদের সম্মুখীন হইয়া তাহারা যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি লাভ করিয়াছে, তজ্জন্য কংগ্রেস তাহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার এই সংগ্রামে কংগ্রেস চীনের জনগণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ভারতীয় জনসাধারণকে জাপানী মাল বর্জ্জন করিতে অনুরোধ করিতেছে।"

যুদ্ধের আশঙ্কা—

(৭) সর্ব্বধ্বংসী ব্যাপক মহাযুদ্ধের বিভীষিকা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে বলিয়া কংগ্রেস পুনরায় যুদ্ধ ও

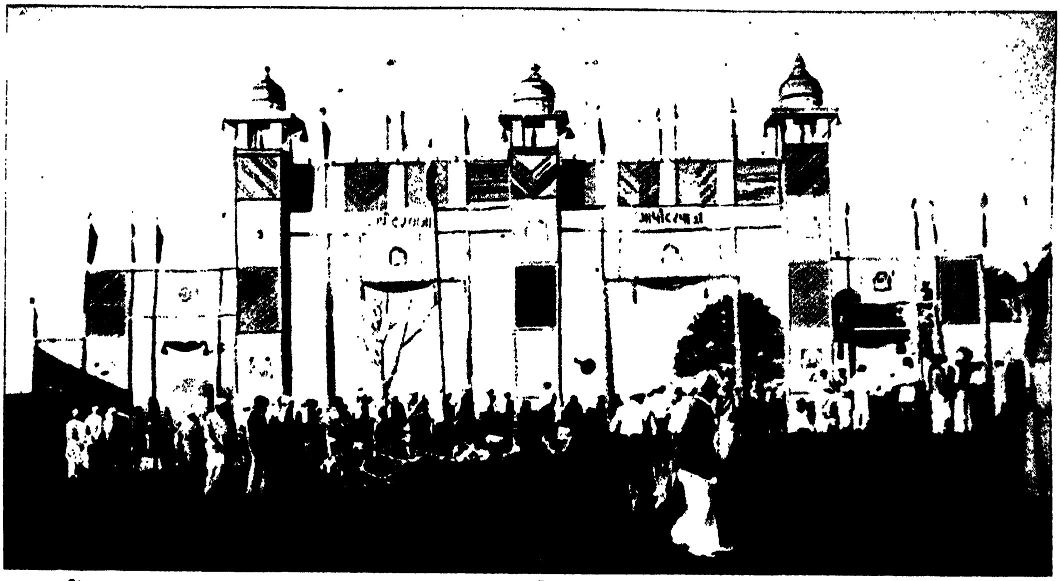
বৈদেশিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের নীতি কি হইবে তাহা ঘোষণা করিতেছে। ভারতীয় জনগণ তাহাদের প্রতিবেশী দেশ এবং অন্যান্য দেশের সহিত শান্তিতে বন্ধুহিসাবে বাস করিতে চাহে; সুতরাং যাহাতে তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধের কারণ না থাকে ভারতীয় জনগণ তাহাই চাহে। তাহারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার ভিত্তিতে নিজদিগকে শক্তিশালী করিতে চাহে। একটি বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেই ঐ প্রকার সহযোগিতা সম্ভবপর। স্বাধীন ভারত সাগ্রহে ঐ প্রকার কোন বিশ্বব্যবস্থার সহিত সহযোগিতা করিবে এবং নিরস্ত্রীকরণ ও পরস্পরের নিরাপত্তার জন্য দাঁড়াইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের মূল কারণ থাকিবে, একদেশ অপর দেশের উপর প্রভুত্ব করিবে এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিপত্তি থাকিবে, ততদিন বিশ্ব সহযোগিতা অসম্ভব। সুতরাং স্থায়ীভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যাহাতে সাম্রাজ্যবাদ না থাকে, এক দেশের লোক অপর দেশের লোককে শোষণ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত কয়েক বৎসর বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত দ্রুত শোচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। ফ্যাসিস্ত শক্তিসমূহের আক্রমণ তীব্র হইয়াছে; জার্ম্মাণী, স্পেন ও সুদূর প্রাচ্যে ফ্যাসিস্ত শক্তিসমূহ নির্লজ্জভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য প্রধানত তাহারাই দায়ী। এখনও নাৎসী জার্ম্মাণী সেই নীতি ছাড়ে নাই এবং স্পেনে বিদ্রোহীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে—তাহারা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষ ঐ প্রকার কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ ঐ প্রকার যুদ্ধে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের জন্য অর্থ ও লোকজন নিয়োগ করিবে না। ভারতের জনগণের মত না লইয়া ভারতবর্ষ কোন যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে না। সুতরাং ভারতে যে সমরায়োজন চলিয়াছে, কংগ্রেস তাহা মোটেই সমর্থন করে না। ভারতে বিমান আক্রমণ হইতে বাঁচিবার এবং অন্যান্য ভাবে ব্যাপক সামরিক আয়োজন করিয়া আসন্ন যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইতেছে। যদি ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াইবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিরোধ করা হইবে।

সংখ্যা লঘিষ্ঠদের অধিকার—

ভারতের মুসলমানগণ ও বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভাবধারায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর যে ক্রমবর্দ্ধমান আকাঙ্ক্ষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কংগ্রেস তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কংগ্রেসের অভিমত এই যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্ব্বসম্প্রদায়ের এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য সংগ্রাম—সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টা দ্বারাই এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হইতে পারে। গত বৎসর কংগ্রেসে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের সদস্যগণ যেরূপ বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন এবং ভারতীয় জনগণের শোষণের উচ্ছেদকল্পে সমবেতভাবে যত্নবান হইয়াছেন, কংগ্রেস ইহাকে বিশেষ শুভ লক্ষণ বলিয়াই মানিয়া লইতেছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটীর কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে কংগ্রেস দৃঢ় আশা জ্ঞাপন করিতেছে এবং নূতন করিয়া ঘোষণা করিতেছে যে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের ধর্ম্ম, ভাষা ও কৃষ্টিগত অধিকারসমূহের সংরক্ষণ কংগ্রেস নিজ প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে এবং কংগ্রেসের সহযোগিতায় ভারতের কোন শাসনতন্ত্র রচিত হইলে তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের অধিকারগুলি পরিপুষ্টির পূর্ণ সুযোগদানের ও জাতির রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও কৃষ্টিগত অগ্রগতিতে তাহাদের তাহাতে যোগ্য প্রতিষ্ঠা দানের আশাও কংগ্রেস পূর্ণমাত্রায় প্রদান করিতেছে।

জাতীয় শিক্ষা—

দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে মাতৃভাষার মারফতে বিনা বেতনে ৭ বৎসরের জন্য শিক্ষা দিবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ও সেই সঙ্গে যাহা হউক একটী বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই কমিটী তাহার মত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর মত ও নির্দ্দেশক্রমে ডাক্তার জাকির হোসেন এবং শ্রীযুত আর্য্য নায়কমের উপর যে নিখিল ভারত শিক্ষাবোর্ড গঠনের জন্য অবিলম্বে



বিঠলনগরে কংগ্রেস প্রদর্শনীর সুন্দর ফটক



সভাপতির মঞ্চে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপরত দেখা যায়



বন্দেমাতরম্ গীত হইবার সময় সুভাষচন্দ্র, মহাত্মাজী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের দাঁড়াইয়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন



রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র মিছিলে বিঠলনগর যাত্রাকালে রথারোহণ করিতেছেন

ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে, সেই বোর্ড গঠনের প্রস্তাবও এই কমিটী অনুমোদন করিতেছে। জাতীয় শিক্ষার মূলগত স্থায়ী কার্য্যতালিকা কার্য্যে পরিণত করার জন্যই উক্ত বোর্ডগঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাঁহাদিগকে উক্ত বোর্ডটি অনুমোদনের জন্যও কমিটী সুপারিশ করিতেছেন।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ না থাকায় আমরা তাহা প্রদানে বিরত রহিলাম।

তৃতীয় দিন শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সম্পর্কেও এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপূর্ব্বে বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে রাজবন্দীদের মুক্তি সমস্যা লইয়া কংগ্রেস দলের মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রিদিগের প্রস্তাবে আংশিকভাবে সম্মত হইলে মন্ত্রীরা উভয় প্রদেশেই পুনরায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন; কাজেই সে সময়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব এখন নিরর্থক হইয়াছে; সে জন্য আমরা তাহা প্রকাশ করিলাম না।

আজমীর মারোয়াড়া—

আজমীর মারোয়াড়ার ১১৫ খানা গ্রামকে ঐ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অস্থায়ী শাসনাধীনে রাখা ও পরে ঐ সকল গ্রামের অধিবাসীদিগকে আংশিক ভাবে যোধপুর ও আংশিক ভাবে উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার পরিকল্পনার কথা শুনিয়া কংগ্রেস বিশেষ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। ঐ সাহসী ও সংঘবদ্ধ গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সংহতিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের ঐ কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের প্রতিবাদ—

নূতন শাসনতন্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছেন যে, স্বাধীনতার ভিত্তিতে এবং গণপরিষদে কোন বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া ভারতবাসীদের নিজেদের প্রস্তুত শাসনতন্ত্রই ভারতবাসীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে। শাসনতন্ত্র বর্জ্জন নীতির অনুগামী হইয়াও কংগ্রেস জাতিকে স্বাধীনতার সংগ্রামে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দিয়াছে; কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এই বিবেচনার কোন হেতু নাই। এমন কি সাময়িক বা অস্থায়ীভাবেও যুক্তরাষ্ট্রগঠনে সম্মতি দেওয়া চলে না; কেন না এই যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতের অধিকতর ক্ষতি হইবে এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইবে। এই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রের মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি স্বীকৃত হয় নাই। কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধী নহে। কিন্তু দায়িত্ব অর্পণের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক রাষ্ট্রগুলির সামান্য অধিকারসম্পন্ন সমভাগে স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবিশিষ্ট এবং গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন বিধান অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। যে সকল দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিবে, তাহাতে প্রদেশগুলির অনুরূপ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান, দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সমবিধান থাকা আবশ্যক; অন্যথায় যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের কল্পনা করা হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইলে বিচ্ছেদের মনোভাব বৃদ্ধি পাইবে এবং রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাহিরে বিরোধের সৃষ্টি হইবে। কাজেই কংগ্রেস প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার পুনরায় নিন্দা করিয়া প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীগুলিকে দেশের জনসাধারণকে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-মন্ত্রিসভাগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনে বাধা দিতে আহ্বান করিতেছে। জনসাধারণের অভিমত উপেক্ষা করিয়া যদি জোর করিয়া যুক্তরাষ্ট্র চালাইবার চেষ্টা হয়, তবে সর্ব্বপ্রকারেই তাহাতে বাধা দিতে হইবে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ও মন্ত্রিসভাগুলিকে তাহাতে সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃত হইতে হইবে। ঐরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে যথাযোগ্য কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের জন্য নির্দ্দেশ ও ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে।"

কৃষক সভা—

ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে কিষাণ সভা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কতকগুলি গোলযোগ দে

দেওয়াতে কংগ্রেস এ সম্বন্ধে তাহার অবস্থা পরিষ্কার করিতে এবং সেগুলির সম্বন্ধে তাহার মতিগতি নির্দ্দেশ করা ভাল বলিয়া মনে করেন। কিষাণদের কৃষক সংঘ-সমূহের সাহায্যে নিজেদের সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার কংগ্রেস ইতিপূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে কংগ্রেস নিজেই প্রধানতঃ একটি কৃষক প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইবার ফলে বহু-সংখ্যক কিষাণ কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছে এবং ইহার নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কংগ্রেস এই সব কৃষক-জনসাধারণের পক্ষে নিশ্চয়ই দাঁড়াইবে এবং প্রকৃতপক্ষে অতীতেও দাঁড়াইয়াছে ও তাহাদের দাবীর পক্ষে সংগ্রাম চালাইয়াছে; ভারতের স্বাধীনতার জন্য সাধনা করিয়াছে—যে স্বাধীনতা আমাদের দেশের সকল লোকের শোষণ হইতে মুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য এবং কিষাণদের শক্তি বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাহাদের দাবীসমূহের সার উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিষাণদিগকে অধিকতর সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইবে এবং কংগ্রেসের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইতে বলা হইবে। সুতরাং ভারতের প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে কংগ্রেস প্রতিষ্টানের প্রতিষ্ঠা ঘটে, সেজন্য কাজ করা প্রত্যেক কংগ্রেস কর্ম্মীর কর্ত্তব্য এবং এই প্রতিষ্ঠান যাহাতে কোনভাবে দুর্ব্বল হয় এমন কিছু করা তাহাদের উচিত নহে। কিষাণসভাসমূহ গঠনে কিষাণদের অধিকার স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ইহাও জানাইতেছে যে, যে-সব কর্ম্মতৎপরতা কংগ্রেসের মূলনীতির বিরোধ, কংগ্রেস তেমন সব কাজের সঙ্গে কোনরূপ সংশ্রব রাখিতে পারে না এবং যে-সব কংগ্রেসকর্ম্মী কিষাণ সভাসমূহের সাফল্য স্বরূপে কংগ্রেস নীতি ও পদ্ধতির বিরোধী আব-হাওয়া সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাদের তেমন কোন কার্য্যকে প্রশ্রয় দিবে না। কংগ্রেস এজন্য প্রাদেশিক কংগ্রেসকমিটীসমূহকে উপযুক্ত নির্দ্দেশ স্মরণ রাখিয়া যেখানে আবশ্যক উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিতেছে।

এই প্রস্তাবের পর কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র আংশিকভাবে সংশোধনের জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সে প্রস্তাবের সহিত জনগণের কোন সম্পর্ক নাই।

সর্ব্বশেষে স্থির হইয়াছে যে আগামী বর্ষে মহাকোশলের একটি গ্রামে (হিন্দুস্থানী, মধ্যপ্রদেশ) কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

সভাপতির শোভাযাত্রা—

১৩ই ফেব্রুয়ারী রবিবার কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে বিরাট মিছিল করিয়া রাজসমারোহে হরিপুর হইতে বিঠলনগর এই ৪ মাইল পথ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বাঁশদা রাজের ৮০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত একখানি ৪ চাকার লাল রথে সুভাষচন্দ্র উপবিষ্ট ছিলেন। নানা অলঙ্কার শোভিত ৫১টি বলদ ঐ রথ টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। সভাপতির রথের পিছনে অন্য ৬খানি শকটে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছিলেন। এই মিছিল দেখিতে লক্ষাধিক লোক পথে সমবেত হইয়াছিল। বিঠল নগরে মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন গান্ধীজির সহিত সুভাষচন্দ্রের এক ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছিল।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটী—

হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে সভাপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নলিখিতরূপ নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন—ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য সংখ্যা মোট ১৫জন। ১৫জন সদস্যের নাম—(১) শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু (সভাপতি) (২) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু (৩) শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ (৪) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল (৫) খান আবদুল গফুর খান (৬) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (৭) শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু (৮) শ্রীযুত জয়রাম-দাস দৌলতরাম (৯) আচার্য্য জে-বি-কৃপালানী (সাধারণ সম্পাদক) (১০) শেঠ যমুনালাল বাজাজ (কোষাধ্যক্ষ) (১২) শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই (১৩) শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব (১৪) ডাক্তার পট্টভী সীতারামায়া (১৫) শ্রীযুত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে।

এবারে বামপন্থী কোন নেতাই ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য-

পদ গ্রহণ করেন নাই। গত বৎসর ঐ দলের শ্রীযুত অচ্যুত পটবর্দ্ধন ও শ্রীযুত নরেন্দ্র দেও ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন।

বাঙ্গালার বাজেট—

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়ের যে হিসাবের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করা যায় না। এই হিসাবে শাসনের কোন বিভাগেই ব্যয়হ্রাস করা হয় নাই বা দরিদ্রের পক্ষে কষ্টকর কোন করই হ্রাস করা হয় নাই। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের বাজেটে ধরা হইয়াছিল—গভর্ণমেণ্টের আয় হইবে ১২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকা—ব্যয় হইবে ১২ কোটি ২১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও উদ্বৃত্ত থাকিবে ৩৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে—আয় হইয়াছে ১৩ কোটি ৪২ হাজার টাকা, ব্যয় হইয়াছে ১২ কোটি ৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ও উদ্বৃত্ত আছে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। ১৯৩৮-৩৯এর হিসাবে আয় ধরা হইয়াছে ১৩ কোটি ১২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা—কাজেই বর্ষশেষে ঘাট্‌তি পড়িবে ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা।

যাহা হউক, নূতন বাজেটে নিম্নলিখিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কিছু কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে—শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী—৮ হাজার টাকা। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল—১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—২৫ হাজার টাকা। যুবক-মঙ্গল-সমিতি—আড়াই লক্ষ টাকা। শ্রমিক-মঙ্গল সমিতি—২০ হাজার টাকা। মহিলাদের ব্যায়াম শিক্ষার জন্য—২৩ হাজার টাকা। কলিকাতা মুসলমান অনাথাশ্রম—২৫ হাজার টাকা। প্রাথমিক শিক্ষা—৫ লক্ষ টাকা। অন্ধত্ব নিবারণ সমিতি—১০ হাজার টাকা। রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—৪৯ হাজার টাকা। শিশুরক্ষা সমিতি—১০ হাজার টাকা। গ্রাম্য স্বাস্থ্য রক্ষা—দেড় লক্ষ টাকা। ম্যালেরিয়া নিবারণ ব্যবস্থা—২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। গ্রাম্য জল সরবরাহ—৫ লক্ষ টাকা। অতিরিক্ত কুইনাইন ক্রয়—২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। পাটের হিসাব প্রস্তুত—১ লক্ষ টাকা। বাজার স্থিরীকরণ—২৫ হাজার টাকা। বালিকাদিগের জন্য পর্দ্দা কলেজ—২ লক্ষ টাকা।

কবিবর হেমচন্দ্রের প্রতি সম্মান—

আগামী বৈশাখ মাসে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মের শত বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে স্থির হইয়াছে। উৎসবের উদ্যোক্তারা তাঁহার স্মৃতি-রক্ষায় ও তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশে মনোযোগী হইয়াছেন। হুগলী জেলার রাজবলহাটে কবিবরের পিতৃভূমি; সম্প্রতি হুগলী জেলা বোর্ড আঁতপুর হইতে রাজবলহাট পর্য্যন্ত পথটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'হেমচন্দ্র রোড' নামকরণ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এইভাবে সকলে চেষ্টা করিলে বাঙ্গালার পুণ্য শ্লোক মহাজনগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইতে পারে। তাঁহার শতবার্ষিক উৎসব যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়—বাঙ্গালা দেশবাসী সকলেরই সেজন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় শিশু চিকিৎসালয়—

কলিকাতায় শুধু শিশুদিগের জন্য স্বতন্ত্র হাসপাতালের অভাব বলিয়া অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান মিঃ কিরণচন্দ্র দে মহাশয়ের পত্নী একটি শিশু-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, আমরা তাঁহার এই সাধু চেষ্টার প্রশংসা করি। এই প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সেক্রেটারী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সেবাসদনের কর্ত্তৃপক্ষ সেবাসদনে একটি স্বতন্ত্র শিশু-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন ও তথায় গত ২ বৎসরে ৫ শতের অধিক শিশু চিকিৎসিত হইয়াছে। সাধারণের সাহায্য দ্বারা সংগৃহীত অর্থে সেবাসদন সংলগ্ন শিশু-চিকিৎসালয়ও পরিচালিত হইয়া থাকে। দে মহাশয়ের পত্নী ঐরূপ আরও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিলে তদ্দ্বারা অধিক শিশুই চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিবে।

বড়লাট পত্নীর আবেদন—

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে মোট ৬১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭ শত ১১ জন লোক মারা গিয়াছে; তাহার মধ্যে শুধু

যক্ষ্মারোগে প্রায় ৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। যক্ষ্মা রোগ একদিকে যেমন নিদারুণ অর্থাৎ প্রায়ই সারে না অন্যদিকে তেমনই উহার চিকিৎসা বহুব্যয়সাধ্য। সে জন্য বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড লিংলিথ্‌গোর পত্নী পরলোকগত সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক যক্ষ্মা-নিবারণ ধন-ভাণ্ডার খুলিয়া এদেশে যাহাতে অধিক সংখ্যক যক্ষ্মা রোগী সুচিকিৎসিত হয় তাহার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইয়াছেন। বড়লাট-পত্নী স্বয়ং ঐ জন্য অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়ায় উক্ত ধনভাণ্ডারে বহু অর্থ সংগৃহীত হইতেছে। জগতের অন্যান্য সভ্যদেশসমূহের তুলনায় ভারতে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। বাঙ্গালা দেশে ডাঃ শ্রীযুত কুমুদশঙ্কর রায়ের পরিচালিত যাদবপুর যক্ষ্মানিবাসে শুধু যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসিত হইয়া থাকে। ঐরূপ চিকিৎসালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বড়লাট-পত্নী তাঁহার সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করিবেন। যক্ষ্মা রোগের সম্ভাবনা দেখিলেই লোক যাহাতে চিকিৎসিত হইতে পারে তাহার চেষ্টাও যেমন প্রয়োজন—হাসপাতালে চিকিৎসার পরও যক্ষ্মারোগী যাহাতে সযত্নে থাকে তাহার ব্যবস্থাও তেমনই প্রয়োজন। কিন্তু এদেশে উভয় ব্যবস্থার কোনটাই হয় নাই। বড়লাট পত্নীর এই চেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক, ইহাই আমাদের কামনা।

অর্থনীতি সম্বন্ধে নুতন কথা—

নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক সংঘ সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া সভাপতি শ্রীযুত মতিলাল রায় মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি "অর্থনীতি" সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন কথা বলিয়াছেন। সেগুলি সকলের প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমরা এখানে সেই কথাকয়টি উদ্ধৃত করিলাম—"মানুষ আগাইয়াছে যুগের সঙ্গে সঙ্গে। চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিধানে শূদ্র অনুগ্রহপুষ্ট হইতে আর চাহে না। হিন্দুর অর্থবিজ্ঞানে তাই ভবিষ্যদ্বাণী আজও শুনি, শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—জাতি ও বংশ পূজার্হ নহে; কর্ম্ম, চরিত্র ও প্রতিভা চির-পূজ্য। এই মনুষ্যত্ব জাতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে নাই, ইহা আজ প্রত্যক্ষ। * * * পরমার্থের সহিত অর্থের বিরোধ একদেশদর্শীর নিকট চিরদিন থাকিবে। ভারত পরমার্থ চাহিয়াও ধনদৌলত ছাড়িতে পারে নাই। কেন না, জগজ্জীবন যত বৃহৎ হউক, ইহার প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য্য। এই প্রয়োজন সত্ত্বেও ধনাহরণে অপ্রবৃত্তি—তাহা চৌর্য্য বৃত্তি। ধনদৌলত যে দেশে খর্ব্ব, সে দেশ উৎসন্নে যায়। বৃত্তিভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ যুগচক্রে নিশ্চিহ্ন হইলেও অর্থ ও তাহার জন্য শ্রম চিরদিন থাকিয়া গিয়াছে।"

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা—

১৩৪৫ সালের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা যথাকালে কলিকাতা ৮৫ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভ্রান্তিমূলক গণনা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের সহিত নবীনতম গবেষণামূলক সংস্কারাদির সাহায্যে নির্ভুল পঞ্জিকা প্রকাশ করাই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রকাশকগণের উদ্দেশ্য। যাঁহারা পঞ্জিকাসংস্কার বিষয়ে আগ্রহান্বিত তাঁহারাই এই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের গণনানুসারে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। দিন দিন ইহার প্রচার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই সর্ব্বত্র এই পঞ্জিকার প্রচলন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদ—

গত বঙ্গীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদ কর্ত্তৃক প্রেরিত ৪টি ছাত্রীই বিশেষ স্থান অধিকার



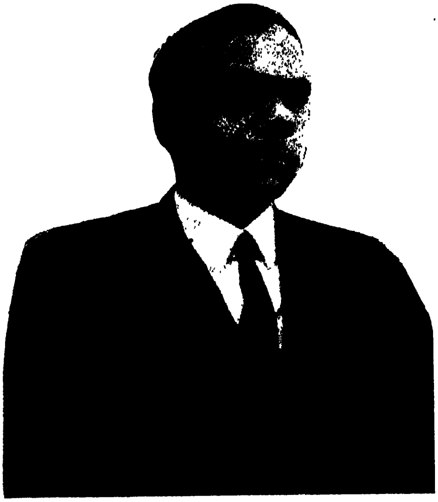
বালীগঞ্জ সঙ্গীত সংসদ

করিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই সংসদের তত্ত্বাবধানে শ্রীযুত প্রভাত ঘোষ কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়াছেন। আমরা এখানে

তাঁহাদের চিত্র প্রকাশ করিলাম। বামদিক হইতে—কুমারী মঞ্জুলিকা সুর, কবিতা রায়, লতিকা পাল, শেফালিকা পাল ও শ্রীযুক্ত প্রভাত ঘোষ।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র মিত্র—

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় গত ২৩শে জানুয়ারী রাত্রিতে দুইমাস গলক্ষত রোগভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। ব্যবসায় ও বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক

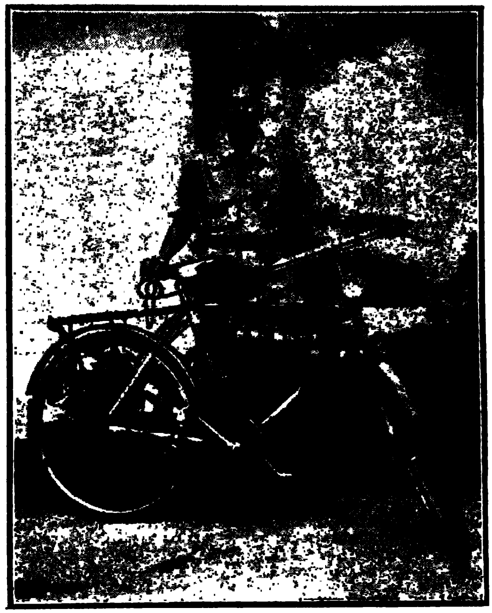


যোগেশচন্দ্র মিত্র

ছিলেন ও তাঁহার রচিত ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকে। গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অর্থনীতি শাখায় তিনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। বালীগঞ্জে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম উদ্যোগী। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

ভূপর্য্যটক ক্ষিতীশচন্দ্র—

ভূপর্য্যটক শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আসামের তিনসুকিয়া হইতে পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। সেবার তিনি প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়াছিলেন। পরে তিনি পাশ্চাত্য ভ্রমণে বাহির হইয়া পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, পেলেষ্টাইন, মিশর, গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, সুইট্জারল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, তুর্কি প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া সম্প্রতি এ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঢাকা জেলার আরিয়ল



ভূপর্য্যটক ক্ষিতীশচন্দ্র

গ্রামের অধিবাসী। আমরা তাঁহার এই ভ্রমণ সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দির—

গত ৩০শে জানুয়ারী চন্দননগর (হুগলী) কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষামন্দিরের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব

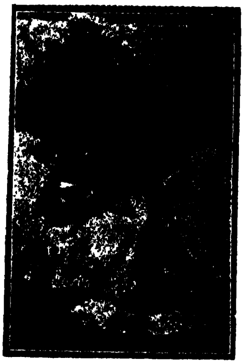


দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী



কমলা কমলদলবিহারিণী

হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা সীতা দেবী উৎসবে সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন। ঐ দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ কর্ত্তৃক বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মূর্ত্ত প্রতীক প্রদর্শিত হইয়াছিল।



বাণী বিদ্যাদায়িনী



ভারতমাতা

আমরা এখানে উক্ত সঙ্গীতের মূর্ত্ত প্রতীকের ৪খানি চিত্র প্রকাশ করিলাম—চিত্রগুলির পরিচয় চিত্রের নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গালী চিকিৎসকের সম্মান—

প্রসূতি চিকিৎসায় প্রসিদ্ধ এবং রেডিয়ম ও রঞ্জন রশ্মি বিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুবোধ মিত্র এম-ডি (বার্লিন) এম-বি (কলিকাতা) এফ্-আর-সি-এস (এডিনবরা) সম্প্রতি লণ্ডন হইতে "এফ-সি-ও-জি" বা প্রসূতি চিকিৎসা সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। স্বর্গীয় ডাক্তার কেদার দাস ভিন্ন আর কোনো ভারতীয় চিকিৎসক এ পর্য্যন্ত "এফ্-সি-ও-জি" অর্থাৎ "ফেলো অফ দি কলেজ অফ্ ওবস্‌টেট্রিকসিয়ান্‌স এণ্ড গায়নাকোলজিষ্টস্" উপাধি পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ইনি একজন 'ফেলো' নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই গৌরব অর্জ্জনের জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।



ডাক্তার সুবোধ মিত্র

সহরের শোভা-বর্দ্ধন—

মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের বাঙ্গালী প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সুযোগ্য ছাত্রী কুমারী



সহরের শোভাবর্দ্ধন

আলাগাকোনে 'পত্রলেখা' নামক একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি এত সুন্দর হইয়াছে যে মাদ্রাজ মিউনিসিপাল

কর্পোরেশনের কর্ত্তারা সহরের শোভাবর্দ্ধনের জন্য উহা ক্রয় করিয়াছেন। মাদ্রাজ পিপল্‌স্‌ পার্কে মূর্ত্তিটি রাখা হইয়াছে। আমরা এখানে মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম। স্থানীয় শিল্পীদিগকে এই ভাবে উৎসাহ প্রদানের আদর্শ অন্যান্য সহরের কর্পোরেশনেও অনুকৃত হইবার যোগ্য।

ব্রহ্মে বাঙ্গালীর উদ্যম—

নাংলেবীন ব্রহ্ম দেশের একটি মহকুমা সহর। তথায় ১২টি বাঙ্গালী পরিবার বাস করে। গত সরস্বতী পূজার সময় সেখানকার বাঙ্গালী বালিকারা 'নিমাই সন্ন্যাস' অভিনয় করিয়াছে। মিঃ এস-পি-বসু ও মিঃ এস-বি-ঘোষ তাহাদের শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে সকল বালিকা অভিনয় করিয়াছিল তাহাদের বয়স ৪ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালীদের এই উদ্যমের প্রশংসা করি। এই সঙ্গে স্থানীয় বালিকাগণের ও অভিনয়ের উদ্যোক্তাগণের একখানি চিত্র প্রকাশিত হইল।



নাংলেবিনে নিমাই সন্ন্যাস অভিনয়ে বাঙ্গালী উদ্যোক্তাবৃন্দ ও অভিনেতার দল। বালক ও বালিকাগণ)



দিল্লীতে নৃত্য উৎসব

দণ্ডায়মান—ইন্দ্রাণী বোর্ণাল এম-এ, টিলা যোশী, সান্ত্বনা চাটার্জ্জি উমা মুগাজ্জা ও চন্দ্রা খান্না
উপবিষ্ট—দীপ্তি মজুমদার, দীপা চাটার্জ্জি, কল্যাণী বসু, স্নেহ চৌধুরী ও অর্চ্চনা চাটার্জ্জী

দিল্লীতে নৃত্য উৎসব—

সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে 'আমরা' কর্ত্তৃক নৃত্য উৎসব হইয়া গিয়াছে। যে সকল বালিকা উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিত্র ও নাম এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল। টিলা যোশীর নৃত্য, দীপ্তি মজুমদার ও স্নেহ চৌধুরীর গান সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস—

কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুত সুন্দরীমোহন

দাসের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৭ই মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীহট্ট সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতা বৌবাজারস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত আই-সি এস মহাশয় সম্মিলনীর পক্ষ হইতে সুন্দরীমোহনবাবুকে



ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস

এক মানপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখ বহু বক্তা সুন্দরীমোহনের আজীবন দেশসেবার কাহিনী বিবৃত করিলে সুন্দরীমোহন তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। আমরা সুন্দরীবাবুর সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

কৃষ্ণনগরে সাহিত্য-সম্মিলন—

গত ২৯শে মাঘ এবং ১লা ও ২রা ফাল্গুন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একবিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ থাকার পর গত বৎসর চন্দননগরে ও এবার কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সম্মিলন বহু সাহিত্যিককে সমবেত করিয়াছিল এবং উভয় স্থানেই সম্মিলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এবার মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন স্বর্গত সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি দারুণ পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহার স্থানে সবুজপত্র-সম্পাদক শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন শাখা-সম্মিলনগুলিতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত (সাহিত্য শাখা), শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সাংবাদিকসাহিত্য শাখা), শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস (কাব্য শাখা), শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী (কথাসাহিত্য শাখা), শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী (পদাবলী-কীর্ত্তন শাখা), ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী (ইতিহাস শাখা), ডাক্তার হরিদাস ভট্টাচার্য্য (দর্শন শাখা), শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (চারুকলা শাখা), অধ্যাপক কুদরতে খোদা (বিজ্ঞান শাখা)। নলিনীবাবু ও হরিদাসবাবু উভয়েই ঢাকার লোক, নলিনীবাবু ঢাকা মিউজিয়মের কিউরেটার ও হরিদাসবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এবারের বৈশিষ্ট্য এই যে দুইজন মহিলাকে দুইটি বিভাগে সভানেত্রীত্ব করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র বঙ্গলক্ষ্মীর সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিতা। শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী কীর্ত্তন প্রচারে যেরূপ উৎসাহশীলা, তাহাতে তাঁহাকে কীর্ত্তন বিভাগের সভানেত্রী পদে বরণ করা শোভনই হইয়াছিল।

সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীটি খুব বৃহৎ না হইলেও তাহাতে গবেষণাকারীদের বহু শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। পুস্তক (মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি), পুরাতন পুঁথি, প্রাচীন গ্রন্থকারগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার প্রাচীন মানচিত্র, প্রাচীন দ্রব্যাদি, মৃৎশিল্প, চারু-শিল্প প্রভৃতি বিভাগে প্রদর্শনী বিভক্ত ছিল। কাব্য, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকালের ও আধুনিক যুগের গ্রন্থকারদিগের মুদ্রিত পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি, কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, রাণী ভবানী, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিক ব্যক্তিদিগের হস্তাক্ষর, প্রাচীনকালের মহাশঙ্খ, মাল্য, বল্কল, কাঠের পুঁথি, নদীয়া জেলার আধুনিক ও প্রাচীন লেখকদিগের নামের তালিকা, রামমোহন রায়ের পাগড়ী, অন্নদামঙ্গলের

(১৭৩১ শকাব্দ) প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, নবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রেরিত ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বেকার পুঁথি ও গৌরাঙ্গপদাঙ্কপূত ভারতের মানচিত্র, বৃটীশ এডমিরালটির সৌজন্যে প্রাপ্ত বাঙ্গালার প্রাচীনকালের মানচিত্র, নদীয়াও বিশেষ করিয়া কৃষ্ণনগরের নানাপ্রকার পুতুল ও অন্যান্য মৃৎশিল্প, চিত্রাদি ও চারুশিল্পাদি প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নদীয়া জেলার প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের রচিত দুই শতাধিক পুস্তক দিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অনেক দ্রব্য প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ এ্যাংলো সংস্কৃত লাইব্রেরী ও পূর্ণিমা সম্মিলন হইতে বহু দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল।

সম্মিলনের শেষে আগামী বৎসরের জন্য শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সহকারী সভাপতি, শ্রীযুত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু যুগ্ম সম্পাদক এবং ডাক্তার সত্যচরণ লাহা কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্মিলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও প্রচার পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটী ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং ইংরাজি স্কুল ও কলেজ সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্তসংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে এই সম্মিলনের মত—বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি উচ্চ, কি নিম্ন, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক —(ক) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে এবং ছাত্ররাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। (খ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাগারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। (গ) উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা বঙ্গ ভাষায় নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি ও ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত। (ঘ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। (ঙ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিম্বদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত। (চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বঙ্গভাষায় পঠনপাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ঢাকা



বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন

বাম দিক হইতে—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের মহারাজকুমার, মূল সভাপতি শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী ও অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক

ফটো—তারক দাস

বিশ্ববিদ্যালয়েও অচিরে এইরূপ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করেন।

(৩) বাঙ্গালা দেশে যে সকল মেডিকেল, এঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুল আছে ও ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন গভর্ণমেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

(৪) বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে

বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিম্বদন্তী, কৃষিকথা, ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ, হস্তলিখিত পুঁথি এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সমিতি গঠন করা হউক।

(৫) এই সম্মিলন স্থির করিতেছেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হউক।

(৭) ফুলিয়ার অমর কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে কবি কৃত্তিবাস ওঝার দান অসামান্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদকে প্রতি বৎসর কবির জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে কবির জন্মতিথি উৎসবের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৮) এই সম্মিলনের কার্য্য আলোচ্য বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত হইবে। ইহার অতিরিক্ত আর কোন শাখা হইতে পারিবে না—(ক) সাহিত্য শাখা (খ) দর্শন শাখা (গ) ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান শাখা



বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিভিন্ন শাখার সভাপতিবৃন্দ

বামদিক হইতে—অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক ডাঃ কুদরতে খোদা, শ্রীযুত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস ও শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

ফটো—তারক দাস

(৬) এই সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃষ্ঠপোষক ও অকৃত্রিম বন্ধু এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম উদ্যোক্তা অমরকীর্ত্তি পুণ্যশ্লোক দানবীর কাসিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের নামে কলিকাতায় একটি সরকারী রাস্তার নামকরণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হউক।

(ঘ) বিজ্ঞান শাখা। সম্মিলন পরিচালন সমিতি উক্ত শাখা চতুষ্টয়ের প্রত্যেক শাখায় আলোচ্য একটি বিশিষ্ট বিষয় ছয় মাস পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনে ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ই আলোচিত হইবে। এতদ্ব্যতীত অভ্যর্থনা সমিতি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আর একটি শাখার অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

গত বৎসরের চন্দননগর সম্মিলনের সভাপতি ও বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবার কৃষ্ণনগর সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি মূল সভাপতি শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় প্রদান করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত ললিত-মোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে নদীয়াবাসী প্রাচীন ও আধুনিক বহু সাহিত্যিকের কথা বিবৃত করেন।

মূল সভাপতি শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"সাহিত্য যে কি বস্তু সে বিষয়ে এ সাহিত্য-সম্মিলনে আমি কোন কথা বলব না। কারণ এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত কথা কেউ বল্‌তে পারে না। আর যদিও পারত, তা হলেও সে কথা শুনে কারও কোন লাভ হ'ত না। কারণ সাহিত্য বস্তুটা কি, আগে থাক্‌তে তা জেনে কেউ লিখ্‌তে বসেন না বা পড়তেও বসেন না। ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। আগে একজন সাহিত্য সৃষ্টি করেন; পরে আমরা ৫জন তাঁর ধর্ম্ম আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাই। এ ক্ষেত্রে নেতি নেতিরও বিশেষ সার্থকতা নেই। কোন লেখা যে সাহিত্য নয়, তাও বলা কঠিন। কোন বস্তুর definition দেওয়া অর্থ তার চৌহদ্দী দেওয়া—অর্থাৎ ক্ষেত্র সংকীর্ণ করা।"

তাহার পর অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে প্রমথবাবু বলেন—"গত বৎসর ঠিক এই সময়ে আমি চন্দননগরে সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্যিকদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বঙ্গসাহিত্য যে দর্শন ও বিজ্ঞানসাহিত্যে দরিদ্র এই স্পষ্ট সত্যটির উল্লেখ করি এবং সেই সঙ্গে একথাও বলি যে ভবিষ্যত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কাউকে কাউকে সাহিত্যিক হতে হবে অর্থাৎ তাঁদের প্রচারিত দর্শন ও বিজ্ঞানকে লোকায়াত করতে হবে। কোন কোন দার্শনিক গ্রন্থ যে উঁচুদরের সাহিত্য তার প্রমাণ Plato-র Dialogue গুলি এবং Bergson-এর গ্রন্থাবলী। এমন কি বেদান্তের শঙ্করভাষ্য যে দেশের লোককে এত মুগ্ধ করেছে, তার একটি কারণ হচ্ছে, তার ভাষার প্রসাদগুণ; আর এ গুণটি যে কাব্যের প্রধান গুণ, তা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালা ভাষায় যে বিজ্ঞানের কথাও অতি স্পষ্ট করে বলা যায়, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত "বিশ্বপরিচয়"। কত সহজ ও স্বচ্ছ ভাষায় যে নব Astronomy ও পরমাণুতত্ত্বের কথা বলা যায়, তার অপূর্ব্ব নিদর্শন এই পুস্তকখানা।"

সাংবাদিক সাহিত্যশাখার সভাপতি আনন্দবাজার-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অভিভাষণ খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের কথাই অভিভাষণে বিবৃত করিয়াছিলেন। সাংবাদিকগণের অভাব অভিযোগ ও অসুবিধার কথা এমন স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে ইতিপূর্ব্বে আর কাহাকেও বলিতে শুনা যায় নাই। প্রথমেই তিনি বলেন—

"যাহারা চিরদিন আপনাদিগকে নেপথ্যে রাখিয়া অপরকে ঘোষণা করে; ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, রাষ্ট্রবীর হইতে অতি সাধারণ লোকও যাহাদের সাহায্যে সমাজে খ্যাতি ও মর্য্যাদা লাভ করে; যাহারা প্রবলের পীড়ন হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য, অন্যায়, অবিচার ও কুব্যবস্থা দূর করিবার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের শুভবুদ্ধিকে সদা জাগরূক রাখিবার প্রয়াস পায়; অথচ আপনাকে অপমান ও পীড়ন হইতে রক্ষা করিতে অক্ষম ও উদাসীন—সেই সাংবাদিক-মণ্ডলীর অবরুদ্ধ হৃদয়ের দুই চারিটী কথা যদি আজ প্রকাশ করিতে পারি এবং যদি তাহা আপনাদিগের সহানুভূতি ও স্নেহলাভ করে, তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব।"

নিজেদের অসুবিধার সম্বন্ধে তিনি বলেন—"সম্পাদককে সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হইবে। সকলের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। সামান্য অসাবধান হইলেই আইন তাহাকে দংশন করিবে। ধনী ও বড়লোকেরা তাঁহাদের ঢাক পিটাইতে অস্বীকার করিলে ক্রুদ্ধ হন; নেতারা তাঁহাদের বিবৃতি বড় বড় হরপের শিরোণামা দিয়া প্রকাশ না করিলে বিষণ্ণ হন; মন্ত্রীদের দোষত্রুটি উদ্‌ঘাটন করিলে তাঁহারা ক্ষিপ্ত হইয়া বড় ডাণ্ডা বাহির করেন; পুলিস ও সিভিলিয়ান-তন্ত্র তাঁহাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপর প্রাত্যহিক কটাক্ষ ও সমালোচনা দেখিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করেন।"

দর্শনশাখার সভাপতি শ্রীযুত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের সর্ব্বশেষে যে কথা কয়টি বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই চিন্তা করিবার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন—

"সমাজের শান্তির জন্য পরের মতবাদের আলোচনা হইতে নিরস্ত থাকা সমীচীন হইলেও ব্যক্তিগত জীবনে অমীমাংসিত মতবাহুল্য পোষণ করা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে। মানুষ পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন মতে বাস করিতে পারে না। যে আত্মায় মতের আভ্যন্তরিক

কলহ চলে, সেখানে চিন্তা ও নীতির শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়। যেমন সুবিন্যস্ত চিন্তা না থাকিলে তর্ক করা চলে না, যেমন বিভিন্ন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে মনের ঐক্য ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ যুগপৎ বিভিন্ন মতবাদ অনুবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলে সমাজে ও স্বীয় জীবনে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হয়। আমাদের সকলের পক্ষে সেই দিন আসিয়াছে যখন ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম কোন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহারা সহজে বিচলিত হয় না। জনসমাজে এই দার্শনিক তত্ত্ব যদি বহুল প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে বুদ্ধকে অনুকরণ করিয়া আমাদের আবার প্রাদেশিক ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে—দর্শন অলস মুহূর্ত্তের কল্পনার খেলা নহে—ইহা দৈনন্দিন জীবনের উৎস ও উপাদান।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসন—

গত ৫ই মার্চ্চ শনিবার বেলা ১০টার সময় বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক



ডাক্তার সুশীল মুখোপাধ্যায়

কন্‌ভোকেসন উৎসব হইয়া গিয়াছে। এখন সিনেট হলে স্থানাভাব হয় বলিয়া গত বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ও এবার বিজ্ঞান কলেজের বৃহত্তর মাঠে উৎসব করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলাররূপে উৎসবে পৌরহিত্য করেন। ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন। গতবার বিশেষ বক্তৃতার জন্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হইয়াছিল, এবার মহামতি সি-এফ-এণ্ড্রুজ কনভোকেসন সভায় বিশেষ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে "জগত্তারিণী স্বর্ণপদক" প্রদান করা হইয়াছে। সুবিখ্যাত চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের "কোট্‌স্ স্বর্ণপদক" প্রাপ্ত হইয়াছেন; গত ৭ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা করিয়াছেন। চ্যান্সেলার মহোদয় নিজে প্রমথবাবুকে ও সুশীলবাবুকে পদক প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা এই মনীষীদ্বয়কে তাঁহাদের সম্মানপ্রাপ্তিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত সম্মিলন—

গত মাঘ মাসে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশনের সহিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনেরও অধিবেশন হইয়াছিল। সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুপুরের মহারাজ শ্রীযুত



শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীপদ সিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপেশ্বরবাবু তাঁহার বক্তৃতায় বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতালোচনার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালার বাহিরের বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন জাতক-শিল্পী।

কিন্তু এদেশে বালকের স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য না রেখেই শিক্ষার ব্যবস্থা চিরদিন হয়ে আসছে; কাজেই, গগনেন্দ্রনাথ যে সহজাত শিল্প-প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শৈশবেই তার কিছু কিছু উন্মেষ দেখতে পাওয়া গেলেও সেদিন কিন্তু সেদিকে তাঁকে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। বাড়ীর আর পাঁচজন ছেলের মতই তাঁকে সাধারণ শিক্ষায় শক্তির অপব্যয় ক'রতে হয়েছিল।

সেণ্ট্ জেভিয়র কলেজে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি যখন অখণ্ড অবসর পেলেন, তখন তাঁর অন্তর্নিহিত শিল্প প্রতিভা এক দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল কলা-লক্ষ্মীর বেদীমূলে শিল্পসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে।

কোনো চিত্র-বিদ্যালয়ে তিনি অঙ্কনশাস্ত্রের প্রথমপাঠ নেননি। কোনো শিল্প-শিক্ষালয়ের ক্রমিক অগ্রসরণীয় ধারা অনুসারে তাঁকে এ পথে এগুতে হয়নি। বিধিবদ্ধ শিক্ষা প্রণালীর সীমা-নির্দ্দিষ্ট সংকীর্ণ অধিকার-ভেদ-মন্ত্রে দীক্ষিত হবার দুর্ভাগ্য ঘটেনি তাঁর কখনো।



গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে পরিবারের মধ্যে গগণেন্দ্রনাথের জন্ম তা' প্রতিভার উর্বর ক্ষেত্র। ঠাকুরবংশের কাছে বাংলাদেশ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানাদিকের উন্নতি ও পরিপুষ্টির জন্য ঋণী। গগনেন্দ্রনাথ শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের সেই ঋণের বোঝা আরও অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন।

প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। পাছে তাঁর সেই দুর্লভ শক্তি শিল্পীচক্রের সুবর্ণ-নেমীর বাইরে পড়ে থাকা একাধিক রূপকারের মত ব্যর্থ হয়ে না যায় এই জন্যই বোধকরি কলা-লক্ষ্মী তাঁকে জন্মকালেই ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মীর প্রাচুর্য্য-পুষ্ট কোলে স্থাপন করেছিলেন। বাংলার শিল্প-সৌভাগ্যের এ এক অপ্রত্যাশিত পরম শুভাদৃষ্ট বলতে হবে।

সুতরাং অনুকূল আবেষ্টন ও শিল্পীর কাম্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই গগনেন্দ্রনাথের কলা-নৈপুণ্য বিকশিত ও বিস্তৃত হবার বাঞ্ছিত সুযোগ লাভ করেছিল। তাঁর অভিনব শিল্প-প্রতিভা তাই যথাযোগ্য পরিণতি ও ব্যাপ্তিলাভের সহজ পথ দিয়েই কলা-রাজ্যের সিংহদ্বার অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে আপনার প্রাপ্য সম্মানটুকু দাবী করতে পেরেছিল।

বাংলার শিল্পীদেরমুখোজ্জ্বল করে গেছেন তিনি, কলা-কুশলীদের গৌরবচূড়া ছিলেন তিনি। তুলি ও রংয়ের মর্য্যাদা নূতন করে বাড়িয়ে গেছেন তিনি।

অসাধারণত্বই ছিল গগনেন্দ্রনাথের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য। তাঁর তুলিকার মুখে, তাঁর বর্ণবিন্যাসের চাতুর্য্যে, তাঁর প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্বে যে কলা বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছিল সে শুধু তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিই নয়, অসামান্যও বটে!

কল্পনা-কুশলী শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের রঙীন তুলিকাই এদেশে সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গচিত্রের বিদ্রূপ-রেখায় কঠিন কশাঘাত করেছিল যত সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের পিঠে। তাঁর সেই "নির্জ্জলা একাদশী" প্রভৃতি করুণ-কঠোর ব্যঙ্গ-চিত্রগুলি এবং জাতীয় দুর্বলতার বিবিধ কৌতুকাঙ্কন (Cartoons) এদেশের চিত্রজগতে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন

সৃষ্টি। গগনেন্দ্রনাথের এই ব্যঙ্গ-চিত্রগুলি কেবল যে ব্যঙ্গ-হিসাবেই উপভোগ্য হ'য়েছিল তা নয়, চিত্র-হিসাবেও সেগুলির মৌলিকতা অসাধারণ।

গগনেন্দ্রনাথের তুলির মুখে তুলে-ধরা বাঙালী জীবনের বহু পরিচিত ঘটনার 'স্কেচ্' বা 'দৃশ্যচিত্র'—যেমন, 'বরের শোভাযাত্রা,' 'প্রতিমা বিসর্জনের মিছিল' বা 'শবযাত্রা' প্রভৃতির তুলনা হয়না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবন কাহিনী তিনি ধারাবাহিক চিত্রের সাহায্যে তুলির মুখে রচনা ক'রে গেছেন। সে এক অপূর্ব্ব সুন্দর সুচিত্রিত নূতন 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'!

য়ুরোপীয় শিল্প-কলার নিত্য নূতন ধারা যখন 'কিউবিজ্‌মের' প্রভাবে সমাচ্ছন্ন, গগনেন্দ্রনাথের রঙীণ তুলিকা সেই কলা রহস্যের কল্পলোকে ডুব দিয়ে সৌন্দর্য্যের এক অভাবনীয় সুখকান্তমণি আহরণ করে এনেছিল। তাঁর অসামান্য শিল্প-প্রতিভা সেই দুর্ব্বোধ্য "কিউবিজ্‌মকে' অতি সহজেই নিজের ঘরের জিনিস করে নিতে পেরেছিল। এদেশের শিল্প-ভাণ্ডারে তিনি এ-এক অমূল্য ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করে রেখে গেছেন। এমন করে কঠিন 'কিউবিজম্'কে ভারতীয় সাজে রূপান্তরিত করা আর কোনো শিল্পীর পক্ষে সম্ভবপর হ'ত কিনা সন্দেহ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একাধিক কাব্যগ্রন্থও গগনেন্দ্র-নাথের অসাধারণ তুলিকাস্পর্শে সচিত্র হয়ে উঠেছিল। গগনেন্দ্রনাথের তিরোধানে চিত্রগগনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হ'ল। এই অসামান্য শিল্পীর গৌরবময় শূন্য আসনের উত্তরাধিকারীর জন্য পথ চেয়ে বাংলাদেশের হয়ত কত যুগ-যুগান্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

যুদ্ধের কথা

অতুল দত্ত

সুদূর প্রাচী

প্রায় সাত মাস কাল ধরিয়া সুদূর প্রাচীতে যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে, আপাতঃদৃষ্টিতে ইহার গতি সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত বলিয়াই মনে হইবে। দুর্দ্ধর্ষ জাপ-সৈন্যের প্রবল আক্রমণ, বীর চীনাবাহিনীর প্রাণপণ প্রতিরোধ, অবশেষে শত্রু-সৈন্যের দারুণ অগ্নিবর্ষণে বিধ্বস্ত চীনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণ—সাধারণ দৃষ্টিতে অদ্যাবধি ইহাই চীন-যুদ্ধের একটানা কাহিনী। কিন্তু এই যুদ্ধের গতি ধীরভাবে লক্ষ্য করিলে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন উপলব্ধ হইবে।

প্রথমতঃ—গত ডিসেম্বর মাসে জাপ-সৈন্য কর্ত্তৃক নানকিং অধিকৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চীনাবাহিনী কেবলমাত্র শত্রু সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহারা শত্রু সৈন্যকে প্রতি-আক্রমণ করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জেনারল্ চ্যাং-ক-কেইর নেতৃত্বে চীনের "আয়রণ-সাইড্" বাহিনী হ্যাচাওর নিকটবর্ত্তী স্থানে জাপ-সৈন্যকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। জাপ-সৈন্যের অধিকৃত নান্‌কিংয়ে চীনা বিমান বহুবার বোমাবর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, ফরমোসা দ্বীপের রাজধানী টাইহকুতে বোমাবর্ষণ করিয়া চীনাগণ ৪০খানি জাপ-বিমান ধ্বংস করিয়াছে। এই সকল জাপ-বিমান প্রায়ই ক্যান্টনের বেসামরিক অধিবাসীর উপর নৃশংসভাবে বোমা বর্ষণ করিত।

দুর্জ্জয় জাপ-সৈন্যের এতদূর অগ্রগতি এবং তাহাদিগের নিকট চীনা সৈন্যের উপর্য্যুপরি এতগুলি পরাজয়ের পর এই প্রতি-আক্রমণের সামরিক মূল্য কিছুই নহে বলিলেই চলে। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে এই প্রতি-আক্রমণ পরিচালনের নৈতিক প্রভাব সৈনিক চিত্তে অসীম। কেবলমাত্র প্রতিরোধে প্রবৃত্ত সৈন্যের পক্ষে পুনঃ পুনঃ বিফলতার পর শত্রুকে অজেয় মনে করা স্বাভাবিক। এইরূপ অবস্থায় তাহারা দেশমাতৃকার পবিত্র বেদীতে জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে পারে, কিন্তু শত্রুকে পরাভূত করিবার আশায় উদ্দীপিত হয় না। পক্ষান্তরে প্রতি-আক্রমণ যদি আংশিকভাবেও সফল হয়, তাহা হইলে জয়ের আশা সৈনিক চিত্তে নব-উদ্দীপনা দান করে।

দ্বিতীয়তঃ—চীনে মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের চিরশত্রু কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের প্রভাব এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট সেনাধ্যক্ষ জেনারল চু-টে সান্‌সী, সিউয়ান্ এবং কান্‌সু প্রদেশের চীনা বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েট-চীন গভর্ণমেণ্টের চেয়ারম্যান্ মিঃ মাও-তেস্-তাং কান্‌সু প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েট সমর-পরিষদের অন্যতম সদস্য জেনারল চৌ-এন্-লাই সেন্‌সী প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, এক দিন যে চিয়াং-কাই-সেকের কম্যুনিষ্ট-নির্য্যাতন ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রপতিদিগের নৃশংসতাকেও অতিক্রম করিয়াছিল, সেই চিয়াং জার্ম্মাণীর মধ্যস্থতায় "কমিণ্টার্ণ"-বিরোধী দলে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

কম্যুনিষ্টগণ সুশিক্ষিত, উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত; তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বিশিষ্ট যোদ্ধা। কম্যুনিষ্টদিগের প্রভাব-বৃদ্ধিতে চীন-যুদ্ধে এক নূতন পর্ব্বের সূচনা হইয়াছে। কম্যুনিষ্টগণ গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে কৃষক ও ছাত্রদিগের মধ্যে কম্যুনিজমের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিতেছে, তাহাদিগকে সমানাধিকারবাদে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতেছে এবং স্বীয় অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক তাঁহার বিভিন্ন ঘোষণাবাণীতে সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করিলেও এতদিন গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন নাই। এই স্থলে মার্শাল্ চিয়াং-কাই-সেকের প্রতিরোধ-নীতির সহিত স্পেনের গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের প্রতিরোধ-নীতির পার্থক্য ঘটিয়াছিল। এতদিনে কম্যুনিষ্টদিগের চেষ্টায় চীনে গণ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং জনসাধারণকে অস্ত্র প্রদান করা হইতেছে।

চীনে কম্যুনিষ্টদিগের সমানাধিকারবাদ প্রচার এবং জনসাধারণকে অস্ত্র প্রদানের ফল কেবলমাত্র বর্ত্তমান সঙ্ঘর্ষেই সীমাবদ্ধ নাই ইহার ভবিষ্যৎ উপকারিতাও মহান। চীনের কম্যুনিষ্টগণ যদি ঈপ্সিত কার্য্য সমাধা করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে চীনের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘাটে মাঠে, প্রান্তরে যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, তাহাতে জাপ সৈন্য বিপর্য্যস্ত হইবে, ইহা নিশ্চিত। কয়েকটী বৃহৎ নগর এবং প্রধান রেলপথ অধিকার করিলেই একটী বিরাট দেশ অধিকৃত হয় না। আজ জাপ-সৈন্য কতকগুলি প্রধান জনপদ ও রেলপথ অধিকার করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র চীনের গ্রামে গ্রামে কৃষকগণ তাহাদিগকে আমরণ প্রতিরোধ করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করিতেছে। চীন যুদ্ধের এই নূতন অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, লীন্ ইউটাঙ্গের উক্তির সত্যতা আজ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সুদূর-প্রাচীর সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইবামাত্র লীন্ ইউটাঙ্গ "নিউ ইয়র্ক টাইমস্" পত্রিকায় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে চীনা সৈন্যের প্রচুর আধুনিক সমরোপকরণ না থাকিলেও জাপান কখনও চীনকে পদানত করিতে সমর্থ হইবে না।

চীনের কম্যুনিষ্টদিগের এই গণ-সংযোগ প্রচেষ্টার এইখানেই শেষ নহে। এই যুদ্ধ শেষ হইবার পরও এই গণ-আন্দোলন ও গণ-শক্তির প্রভাবে ভবিষ্যৎ চীন নূতনভাবে গঠিত হইবে; ভবিষ্যৎকালে কৃষক ও শ্রমিকদিগের স্বার্থের বিরোধী কোন শক্তি চীনে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না। দেশের জনসাধারণ যদি আপনাদিগের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং সেই স্বার্থ রক্ষার উপায়স্বরূপ সামরিক শক্তি যদি তাহাদিগের আয়ত্ত থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের স্বার্থের বিরোধী কোন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভবপর হয় না।

গত জানুয়ারী মাসে জাপান চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়াছে। তাহারা স্বীয় তত্ত্বাবধানে উত্তর চীনে যে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সম্ভবতঃ জাপান উহাকেই চীনের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বলিয়া জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। ইতোমধ্যে উত্তর চীনের মুদ্রা প্রকরণে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে পিকিংয়ে Federal Bank of China নামক একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক বহু পরিমাণে হ্রাস করিয়াছেন।

উত্তর চীনে এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বতঃই মনে হয়, এক্ষণে নানকিং গভর্ণমেণ্টের প্রতি চীনবাসীর অনুরক্তি হ্রাস পাইবে; যুদ্ধের সময় দেশে যে দুঃখ-দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে তজ্জন্য তাহারা নানকিং গভর্ণমেণ্টকেই দায়ী মনে করিবে। ছয় বৎসরের অধিক হইল, মাঞ্চুকোতে জাপানের তত্ত্বাবধানের তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সেখানকার অধিবাসীরা এই শাসন ব্যবস্থাকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লয় নাই। উত্তর চীনের অধিবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা মাঞ্চুকোর অধিবাসীর সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও কম। অথচ এই অঞ্চলের শাসনের জন্য বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও জাপানকে এক লক্ষ জাপ-সৈন্য মজুত রাখিতে হইয়াছে। এই অঞ্চলের জন্য জাপানকে রাজকোষ হইতে প্রতি বৎসর ২০ কোটী ইয়েন্ ব্যয় করিতে হইয়াছে। চীনবাসীর মজ্জাগত জাপান-বিদ্বেষ ও তীব্র স্বাধীনতাপ্রিয়তার উপর মার্শাল চিয়াং-কাইসেকের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে বলিয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—জাপানের অনুগত গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতি চীনবাসীর অনুরক্তি হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক, উহা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে সুদীর্ঘ সংগ্রামে জাপানের নিশ্চিত পরাজয়ের কথা বলিয়াছি। তৎপ্রসঙ্গে জাপানের আর্থিক ও বাণিজ্যগত অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা

প্রয়োজন। এই যুদ্ধে জাপান অদ্যাবধি ২৫০ কোটী ইয়েনের অধিক ব্যয় করিয়াছে। গত ১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান গভর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় হইয়াছিল ২৩০ কোটী ইয়েন্; গত ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে রুষ-জাপান যুদ্ধে জাপানের পক্ষে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৭০ কোটী ইয়েন্। এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জাপান গভর্ণমেণ্টের বাজেটে পর পর ছয় বৎসর ধরিয়া ঘাটতি চলিতেছিল। তাহার পর এক্ষণে এই বিশাল ব্যয় আরম্ভ হইয়াছে!

এই যুদ্ধে জাপানের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ইতোমধ্যেই বিপন্ন হইয়াছে। জাপানী মালের পক্ষে কেবলমাত্র চীনের বাজারই নষ্ট হয় নাই—ফিলিপাইন্ দ্বীপে, দীনেমার-অধিকৃত ইষ্ট-ইণ্ডীজ দ্বীপপুঞ্জে, শ্যামে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার অন্যান্য দেশেও জাপানী পণ্য বিক্রয় হইতেছে না। এই সকল দেশের চীনা ব্যবসায়িগণ জাপানী পণ্য বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত বহু জাপানী জাহাজ এবং কারখানা এক্ষণে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। জাপান সম্প্রতি বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করিয়াছে, ইহাতে তাহার রপ্তানীর পরিমাণও সঙ্কুচিত হইতেছে। তাহার পর পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জাপ-বিরোধী মনোভাব এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ঐ সকল দেশের ব্যবসায়িগণ জাপানী পণ্য আমদানী করিতে সাহসী হইতেছে না। লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলি বহুকাল ধরিয়া জাপানের রপ্তানী বাণিজ্যে সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা জাপানের হুণ্ডী গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে।

সুদূর প্রাচীর এই সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে বৈদেশিক শক্তিবর্গের মনোভাব এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটেন ও মার্কিণ-যুক্ত-রাষ্ট্র চীনের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে জাপানের অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া—বিশেষতঃ দক্ষিণ চীনে জাপানের সামরিক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হওয়ায় তাহারা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে; গত নভেম্বর মাসে প্রধানতঃ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের দৌর্ব্বল্যের জন্যই ব্রুসেলস্ সম্মিলনী বিফল হইয়াছিল। বৃটেন তখন সুদূর-প্রাচী অপেক্ষা তাহার প্রতাপান্বিত প্রতিবেশী ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গকে তুষ্ট করিবার জন্যই অধিক আগ্রহান্বিত। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে, এই সময়েই লর্ড হ্যালিফ্যাক্স জার্ম্মাণীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সময় জাপান হাইনান্ দ্বীপ ও ইন্দো চীনের বন্দরগুলি অধিকার করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করায় ফ্রান্স তখন এতদূর শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল যে জাপানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। মার্কিণ প্রতিনিধির প্রতি কিরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অনুমানসাপেক্ষ। তবে আমেরিকার জনসাধারণ যে তখনও isolationist নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল ইহা নিশ্চিত। ব্রুসেলস্ সম্মিলনীর অল্পকাল পরে ইয়াংসী নদীতে "প্যানে" নামক মার্কিণ "গান্‌বোট" যখন জাপানের বোমা বর্ষণে জলমগ্ন হয়, তখন জানা গিয়াছিল আমেরিকার পরে এই "প্যানে" ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়াই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনমত জাপানের বিরুদ্ধে গঠিত হইয়াছে। এই জন্যই রুজভেল্টের নৌবহরবৃদ্ধির পরিকল্পনা এক্ষণে অনায়াসে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে। নৌবহর যে প্রধানতঃ সুদূর প্রাচীকেই লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধি করা হইতেছে, ইহা নিশ্চিত। অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে উল্লিখিত তিনটী শক্তির যুদ্ধার্থে অবতীর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; বৃটেন্ ও ফ্রান্স যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে অক্ষম, আমেরিকা অনিচ্ছুক। কিন্তু সকলেই এক্ষণে উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুদূর-প্রাচীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছে। ব্রুসেলস্ সম্মিলনী বিফল হওয়ার পর জাপানের বিরুদ্ধে economic sanction প্রবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হইয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে জাপ-বিরোধী মনোভাব গঠিত হওয়ায় বাস্তব ক্ষেত্রে জাপানের বাণিজ্য কিরূপ বিপন্ন হইতেছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। জাপানও এক্ষণে বুঝিয়াছে, মাঞ্চুকো অধিকারের সময় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ যে মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া vain and platonic protest জ্ঞাপন করিয়াছিল, সে মনোভাবের এক্ষণে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জাপানের কম্যুনিষ্ট দমনের বহ্বাস্ফোটে কেহ প্রতারিত হয় নাই। আজ বৃটীশ অধিকৃত হংকংএর পথে বহু অস্ত্রশস্ত্র চীনে প্রবেশ করিতেছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া জাপান এক্ষণে এই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে যে আগামী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে—অর্থাৎ বৃটেনের সমরোপকরণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা কতক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই—সে বৃটেন্‌কে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য করিবে কি না। সম্প্রতি জাপান্ বৃটীশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; হংকংএর নিকটবর্ত্তী প্রাটাস্ দ্বীপ সে অধিকার করিয়াছে, হাইনান্ দ্বীপে প্রবলভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

"কমিণ্টার্ণ"-বিরোধী দলের প্রধান পাণ্ডা জার্ম্মাণী সুদূর-প্রাচীর সঙ্ঘর্ষে বিশেষ উৎসাহী নহে। প্রথমতঃ জাপানের যে শক্তি সোভিয়েট রুষিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারিত, তাহা এইভাবে ক্ষয় হইতে দেওয়া তাহার মনঃপূত নহে। দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধের জন্য চীনে জার্ম্মাণীর বাণিজ্য-স্বার্থ নষ্ট হইতেছে। ইটালী সম্প্রতি জাপানের সহিত কতকগুলি বাণিজ্য-চুক্তি করিয়াছে।

রুষিয়া এই যুদ্ধে অত্যন্ত তৎপরতার সহিত চীনকে সহায়তা দান করিতেছে। প্রধানতঃ রুষিয়ার অস্ত্র-সাহায্য এবং হংকংএর পথে প্রাপ্ত অস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই চীন এই সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত আছে। এতদ্ব্যতীত, ভ্লাডিভোষ্টক এবং উহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে রুষিয়া বিরাট সমরায়োজন আরম্ভ করিয়াছে।

খেলা ধূলা

পঞ্চম বেসরকারী টেষ্ট ঃ

বোম্বাইয়ে পঞ্চম বেসরকারী টেষ্টে ভারত ১৫৬ রানে পরাজিত হয়েছে। লর্ড টেনিসন দল 'রাবার' লাভ করেছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খেলা আরম্ভ হয়ে তৃতীয় দিনে বেলা ৩-৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

ভারতের আশাপূর্ণ হলো না। রাবার পাওয়া ঘটে উঠ্‌লো না, শেষ টেষ্টে পরাজয় স্বীকার করতে হলো। অনেকের মনে দুরাশা দেখা দিয়েছিল যে ভারত বুঝি এবার অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় অসম্ভব সম্ভব করবে—প্রথম দু'টেষ্টে পরপর হেরে শেষ তিন টেষ্টে উপর্য্যপুরী জয়ী হয়ে রাবার পাবে।

প্রথম ইনিংসে ভারত এক রানে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয় ইনিংসে টেনিসন দল ২৮৮ রান করে; কিন্তু ভারতবর্ষ প্রত্যুত্তরে সেই প্রথম ইনিংসের ১৩১ রানই তুলতে সক্ষম হয়। একমাত্র মানকাদ সর্ব্বোচ্চ রান ৫৭ দ্বিতীয় ইনিংসে করেন। প্রথম ইনিংসে তিনিও কিছুই করতে পারেন নি।



লর্ড টেনিসন

ইংলণ্ড বিজয়ী ঃ

বৈদেশিক দলের কেহই শেষ টেষ্টে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। বোলিংয়ে দু' ইনিংসে অমরসিং ও ওয়েলার্ড প্রত্যেকে ৯টি উইকেট নিয়েছেন, পোপ ৮টি, মানকাদ ৩টি।

টেনিসন দল ভারতে মোট ২৪টি ম্যাচ খেলেন,—৮টি জিত, ৫টি পরাজয় ও ১১টি ড্র হয়। তাঁরা মোট ১০টি সেঞ্চুরী করেছেন—৩টি করেছেন গিব্‌, ২টি এড্‌রিচ, ২টি হার্ডষ্টাফ, ২টি ল্যাংরিজ, ১টি লর্ড টেনিসন। একমাত্র হার্ড-ষ্টাফ ডবল সেঞ্চুরী করেছেন। ভারতীয়রা মোট ৭টি সেঞ্চুরী করেছেন, তিনটি হয়েছে টেষ্টে। অমরনাথ করেছেন ৩টি এবং মাস্তাক, মান্‌কাদ, হাভেওয়ালা ও প্রফেসর দেওধর প্রত্যেকে একটি।

ভারতে এই ২৪টি ম্যাচে লর্ড টেনিসন দল মোট রান করেছেন ৮৯৯৩ এবং তাঁদের বিপক্ষে ভারতীয় দলেদের রান সংখ্যা ৭২৩২ হয়েছে। ব্যাটিংয়ে হার্ডষ্টাফ এবং বোলিংয়ে



হার্ডষ্টাফ



এড্‌রিচ



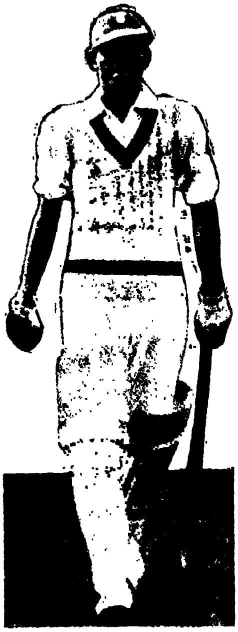
ল্যাংরিজ



গিব

পোপ শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্যাচ নিয়েছেন গিব্ ২৬টি।

বৈদেশিক দলের ফিল্ডিং ও বোলিং উৎকৃষ্ট হয়েছে। অমরসিং যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোলারদের অন্যতম তা' প্রমাণিত



মাস্তাক আলি



ভিনু মানকাদ



দেওধর

করেছেন। মার্চ্চেন্টকে আমরা এবার অধিনায়করূপে পেয়েছি কিন্তু ভারতের ১নং ব্যাটস্‌ম্যান থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। ব্যাটিংয়ে তিনি ১১বার আমাদের হতাশ করেছেন।



অমরনাথ তিনটি সেঞ্চুরী করেছেন

লর্ড টেনিসন দল

পঞ্চম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

পার্কস···কট মানকাদ, ব অমরনাথ		৮
এড্‌রিচ···কট মার্চ্চেন্ট, ব অমর সিং		২
হার্ডষ্টাফ··কট মার্চ্চেন্ট, ব অমর সিং		২০
ইয়ার্ডলে···ব নিসার		৩১
ল্যাংরিজ্···এল-বি, ব অমর সিং		৫
ওয়ার্দ্দিংটন···কট মানকাদ, ব নিসার		১০
গিব···এল-বি, ব অমর সিং		২১
পোপ···ব হাজারে		১৫
ওয়েলার্ড··কট অমরনাথ, ব আমির ইলাহী		৫
টেনিসন···কট মানকাদ, ব অমর সিং		০
স্মিথ···	নট আউট	৪
	অতিরিক্ত	৯
	মোট	১৩০

বোলিং :— প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
অমর সিং	২৫·৫	৯	৪৭	৫
নিসার	১৪	২	২৭	২
অমরনাথ	৬	২	৫	১
হাজারে	৪	০	১৩	১
আমির ইলাহী	৭	২	২৬	১
মানকাদ	২	০	৩	০

ভারতবর্ষ

পঞ্চম টেষ্ট—প্রথম ইনিংস

হিন্দেলকার···কট পোপ, ব ওয়েলার্ড		৯
মস্তাক আলি···কট ওয়েলার্ড, ব পোপ		২
মানকাদ···ব পোপ		০
অমরনাথ···এল-বি, ব পোপ		১৯
মার্চ্চেন্ট···কট ওয়ার্দ্দিংটন, ব পোপ		১৭
রণভির সিংজী···কট এড্‌রিচ, ব ওয়েলার্ড		৮
অমর সিং···কট ওয়েলার্ড, ব পোপ		১৬
হাতেওয়ালা···কট গিব্, ব ওয়েলার্ড		২
হাজারে···কট ওয়েলার্ড ব এড্‌রিচ্		১২
আমির ইলাহী···	নট আউট	৩৮
নিসার···ব ওয়েলার্ড		১
	অতিরিক্ত	৭
	মোট	১৩১

বোলিং :— প্রথম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ওয়েলার্ড	১৫·৫	১	৫৯	৪
পোপ	১৯	৬	৪৯	৫
এড্রিচ	৩	০	৬	১
স্মিথ্	২	০	১০	০

লর্ড টেনিসন দল

পঞ্চম টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

পার্কস···কট হিন্দেলকার, ব নিসার		২০
এডরিচ্···	রান আউট	৫৬
হার্ডষ্টাফ···কট মার্চেন্ট, ব অমর সিং		৫
ইয়ার্ডলে···ব অমর সিং		০
ল্যাংরিজ···ব অমর সিং		৫
ওয়ার্দিংটন···কট মানকাদ, ব অমর সিং		৬৮
গিব্···কট রণভির সিংজী, ব মানকাদ		১৬
পোপ···এল-বি, মানকাদ		৪৯
ওয়েলার্ড···ব মানকাদ		৩৩
টেনিসন···	নট আউট	১২
স্মিথ···	রান আউট	২
	অতিরিক্ত	২২
	মোট	২৮৮

বোলিং :— দ্বিতীয় ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	১৮	২	৭১	১
অমর সিং	৩৩	৮	৯৫	৪
অমরনাথ	১২	৩	৩০	০
হাজারে	৫	১	১০	০
আমীর ইলাহী	২	০	১১	০
মানকাদ	২০·৫	৩	৪৯	৩

ভারতবর্ষ

পঞ্চম টেষ্ট—দ্বিতীয় ইনিংস

মান্তাক আলি···কট টেনিসন, ব ওয়েলার্ড		০
হিন্দেলকার···কট ল্যাংরিজ, ব ওয়েলার্ড		৩
মানকাদ···কট গিব্, ব স্মিথ		৫৭
অমরনাথ···কট সাব্ষ্টিটিউট্, ব পোপ		১৫
মার্চেন্ট···কট এড্রিচ্, ব ওয়েলার্ড		৭
রণভির সিংজী···ব পোপ		২
অমরসিং...ব পোপ		০
হাভেওয়ালা···(আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ)		৮
হাজারে···কট গিব্, ব ওয়েলার্ড		১৬
আমীর ইলাহী···ব ওয়েলার্ড		১৪
নিসার···	নট আউট	১
	অতিরিক্ত	৮
	মোট	১৩১

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
ওয়েলার্ড	১৩	২	৫৮	৫
পোপ	১১	১	২৮	৩
এড্রিচ্	৩	০	৬	০
স্মিথ	৬	০	২০	১
ল্যাংরিজ	২	০	১১	০

নিখিল ভারত অবৈতনিক বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

প্রত্যুষদেব ২৪৮৫—১৮১২ পয়েন্টে এস এইচ্ লিথ্কে হারিয়ে নিখিল ভারত অবৈতনিক বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। প্রত্যুষদেব এবার নিয়ে চার বার চ্যাম্পিয়ন হলেন। ১৯৩২, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালেও বিজয়ী হয়েছিলেন। লিথ্ সাসেক্স কাউন্টি চ্যাম্পিয়নসিপে রানার্স-আপ হয়েছিলেন।

দেবের ব্রেক্—৩৩,৩১,৩২,৪৪,৩২,৩৮;

লিথের ব্রেক্—৫৫,৩৫,৩৫,৩৮,৩৪,৪৯,৪০,৫৩।

ডেভিস্ কাপে ভারতবর্ষ ঃ

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এবার দল পাঠিয়েছেন। দলে আছেন—এল ব্রুক এডওয়ার্ডস্ (ক্যাপটেন) কর্পূরতলার রণবীর সিং (ভাইস্ ক্যাপ্টেন), এস এল আর সোহানী, গাউস মহম্মদ, যুধিষ্ঠির সিং ও জি এম মেটা।

ইঁহারা কাইরোতে মিশর ন্যাসন্যাল চ্যাম্পিয়নসিপে এবং আলেকজাণ্ড্রিয়ার ইণ্টার-ন্যাসন্যাল চ্যাম্পিয়নসিপে খেলবেন। পথে বুডাপেষ্ট প্রেগ প্রভৃতি স্থানেও খেলতে পারেন।

আশা করা যায়, ভারতীয় দল ডেভিস কাপে অষ্ট্রিয়াকে হারিয়ে গ্রীস-বেলজিয়াম বিজয়ীর সঙ্গে খেলবে,



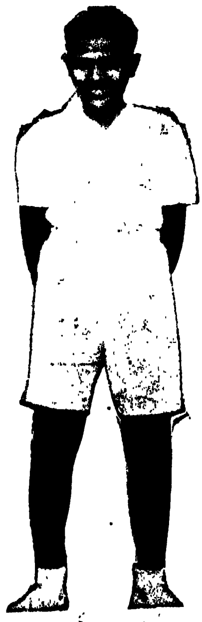
এল্ ব্রুক এড্ওয়ার্ডস্
(ক্যাপ্টেন)



রণবীর সিং
(ভাইস্ ক্যাপ্টেন)



সোহানী ও গাউস মহম্মদ



জি এম মেটা



যুধিষ্ঠির সিং

কারণ বরোত্ত্বি ও ভন্ মেটাক্সাকে ভারতীয়রা পূর্ব্বে ভারতে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেমিফাইনালে উঠ্তে পারলে গ্রেট বৃটেনের সাক্ষাৎ পাবেন।

বিভিন্ন জল-বায়ু সহনে সক্ষমতা এবং কোর্টের মাটীর তারতম্যে অভ্যস্ততার উপরই ভারতীয়দলের কৃতকার্য্যতা অধিক নির্ভর করছে।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বাঙ্গলা ও উত্তর ভারতীয় দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম উঠিয়ে নওয়াতে নওয়ানগর ও হায়দ্রাবাদ একাদশ রঞ্জি ফাইনালে ওঠে।



রঞ্জি ট্রফি

হায়দ্রাবাদ—১১৩ ও ৩১০ (৯ উইকেট)

নওয়ানগর—১৫২ ও ২৭০

গত বৎসরের বাঙ্গলা-জয়ী নওয়ানগর হায়দ্রাবাদের নিকট এক উইকেটে পরাজিত হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে নওয়ানগর দল ২১২ রানে অগ্রগামী থাকায় জীর্ণ উইকেটে ঐ রান সংখ্যা অতিক্রম করা হায়দ্রাবাদের ও দর্শকদের পক্ষে কল্পনাতীত বলে মনে হয়েছিল। হায়দ্রাবাদের এই অপূর্ব্ব জয়ের সমগ্র প্রশংসা তাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ খেলোয়াড় আইবেরার প্রাপ্য। তিনি ত্রুটিহীন খেলে ১৩৭ করে নট আউট থাকেন।

হায়দ্রাবাদ—হুসেন ৩৬, হাইদার আলি ২৭, ভাজুবা ১৬; ব্যানার্জ্জি ৩১ রানে ৪, মুবারক আলি ১৩ রানে ২, ওয়েন্সলে ৩৮ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংস—আইবারা (নট আউট) ১৩৭,



সেণ্ট কলম্বাস কলেজ স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন শ্রীযুত মুখার্জ্জি কলেজের এথ্‌লেটিক সেক্রেটারীর সঙ্গে করমর্দ্দন করছেন

ছবি—বলাই দত্ত



ঢাকার প্রভাস-ঘোষ-চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী নরীকুমার চক্রবর্ত্তী ও হরিদাস চক্রবর্ত্তী



পুলিস স্পোর্টসে কলিকাতা পুলিস ট্রেনিং স্কুল দ্বারা 'ভলটিং হর্স' প্রদর্শন

ছবি—জে কে সান্যাল

হাইদার আলি ৪৬, হুসেন ৫২ ; মুবারক আলি ৪৮ রানে ৩, ব্যানার্জ্জি ৫১ রানে ১ উইকেট।



নিখিল ভারত অলিম্পিকের হাইজাম্প ও ১০০ মিটার বিজয়িনী মিস এডওয়ার্ড, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া ছবি—জে কে সান্যাল



অলিম্পিকের ৩০০০ মিটার সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতার বিজয়ী বি ম্যালকম্ (বোম্বাই) সময়—৫ মিনিট ২৮ সেকেণ্ড ; দ্বিতীয়—আর কে মেহরা (বাঙ্গলা) ; তৃতীয়—এম নন্দী (বাঙ্গলা)

ছবি—কাঞ্চন



অলিম্পিকের বাস্কেট বল প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিনীগণ ছবি—কাঞ্চন

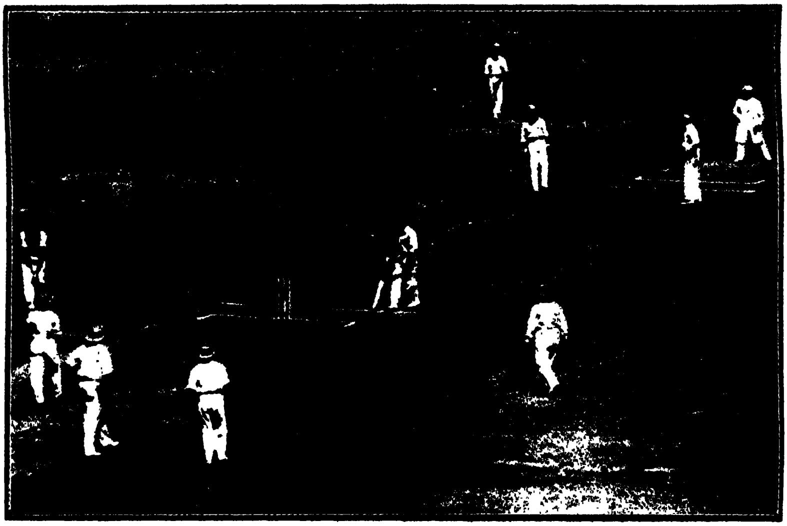
নওয়ানগর—মার্সাল ৩৬, অমর সিং ২১, ব্যানার্জ্জি (নট আউট) ২১, রণজির সিংজী ২৮ ; হাইদার আলি ৫৫ রানে ৪, ইব্রাহিম খাঁ ৪৪ রানে ৩, মেটা ২৬ রানে ২।

দ্বিতীয় ইনিংস—ওয়েন্সলে ৬৭, অমর সিং ৫৭, মোবারক আলি ৬১, ইন্দ্রবিজয় সিংজী ৩৪ ; হাইদার আলি ৯২ রানে ৫, ইব্রাহিম খাঁ ৬৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

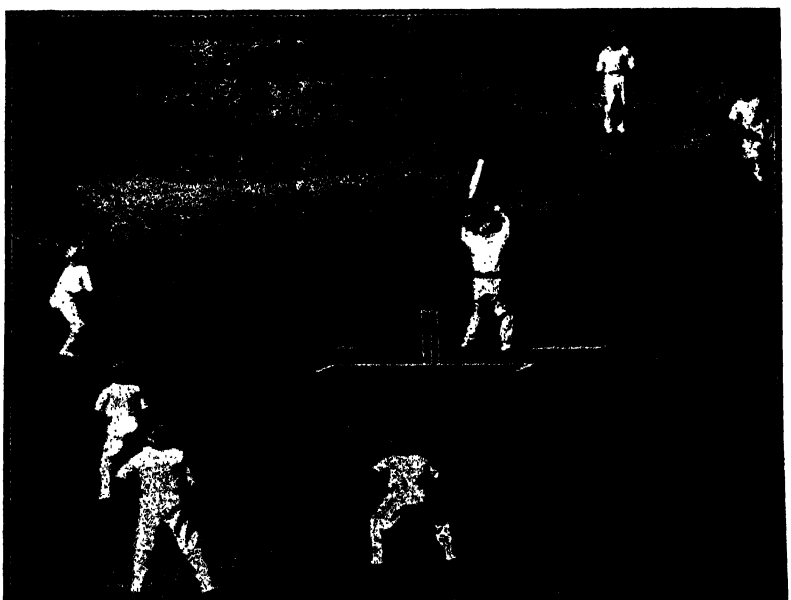
জামসাহেবের সভাপতিত্ব ত্যাগ ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি জামসাহেব তাঁর পদত্যাগ সম্বন্ধে বলেছেন,—তাঁর মতে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বর্ত্তমান কার্য্য নির্ব্বাহের পদ্ধতি অনুসারে কোন সভাপতির পক্ষে মানসম্ভ্রম বজায় রেখে চলা সম্ভবপর নহে। বোর্ডের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ সভাপতিকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁদের মতে প্রেসিডেণ্ট মস্তকের শোভার জন্য—মুকুট বিশেষ। তাঁর মতামত গ্রহনীয় নহে, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার আবশ্যকতাও নাই। মানকাদকে ভারতীয় দলভুক্ত করার ব্যাপারেই সভ্যদের সঙ্গে তাঁর প্রথম মতানৈক্য ঘটে। নির্ব্বাচনকারীদের মধ্যে কর্ণেল মিস্ত্রি মানকাদকে বাদ দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন যে, লর্ড টেনিসনের মতে মানকাদ টেষ্টে খেলবার যোগ্য পাকা খেলোয়াড় নন। আমাদের উপযুক্ত খেলোয়াড়ের দক্ষতার সম্বন্ধে বিপক্ষ দলের বিদেশী নেতার মতামত গ্রহণ করে সত্যকার যোগ্যতাকে অবহেলা করা কতদূর হাস্যাস্পদ ব্যাপার? বিদেশীরা এখানে এসেছে ম্যাচ জয়ী হতে, পরাজিত হতে নয়।

কোন রাজ্য-কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হতে পারে না, যদি তার রাজা থাকে নিউ ইয়র্কে, তার মন্ত্রী থাকে লণ্ডনে এবং তাঁদের কর্ম্মস্থল হয় রাজা বা মন্ত্রীর বাসস্থান থেকে বহু দূরে। সেইরূপ ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্ম্মক্ষেত্র



পঞ্চম টেষ্টে অমর সিংয়ের বলে সর্ট লেগে বিজয় মার্চ্চেণ্ট হার্ডষ্টাফকে লুফেছেন



পঞ্চম টেষ্টে লর্ড টেনিসনকে কট আউট করতে মানকাদের বল লুফবার প্রচেষ্টা

দিল্লী, সভাপতি থাকেন বহু দূরে, অন্যান্য সভ্যরা থাকেন আরো দূরে—ইহাতে কার্য্য পদ্ধতি কখনই উন্নত ও সুচারুরূপে সমাধা হতে পারে না।



পুলিস স্পোর্টসের 'হুইল ব্যারো' দৌড়ে বিজয়ী মিসেস ফিসার ও মিষ্টার ফোর্ড ছবি—জে কে সান্যাল



অলিম্পিকের জাভেলিন নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় প্রথমা—মিস্ ইউ ভিউক (পাঞ্জাব), দ্বিতীয়া—মিস্ পি ম্যাকইন্‌টায়ার (বাঙ্গলা), তৃতীয়া—মিস্ এল্ ক্যারান (বাঙ্গলা)

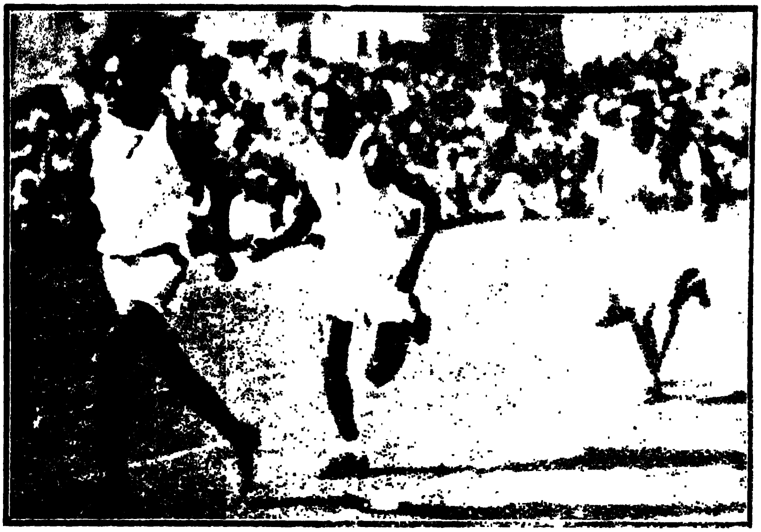
ছবি—কাঞ্চন



মল্লযুদ্ধ—আহীর (বাঙ্গালা) বনাম সিং (পাঞ্জাব)। পাঞ্জাব বিজয়ী ছবি—জে কে সান্যাল

জামসাহেবের সমীচীন মন্তব্যের গুরুত্ব বুঝে যদি কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতি ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে নূতন পদ্ধতিতে কার্য্যারম্ভ করেন, তা' হলে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের উন্নতিই সাধিত হবে। দলাদলিতে ভারতেরই ক্ষতি হচ্ছে। কোন বার জাম সাহেবের কোপে পড়ে কোন যোগ্য খেলোয়াড় দলে স্থান পাচ্ছেন না, আবার কোন

ক্ষেত্রে অন্তের উপর সেই অবিচারই সাধিত হচ্ছে। মানকাদের সৌভাগ্য যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জামসাহেবের মতন একজন শক্তিমান, তাই তিনি দলে স্থান পেয়ে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল ও নিজের সম্মান অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কত প্রতিভাই না সমর্থনাভাবে অঙ্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে।



অলিম্পিকের ২ ও ৩ মাইল দৌড় বিজয়ী রওনক সিং (পাতিয়ালা) ছবি—জে কে সান্যাল

হকি লীগ ঃ

হকি লীগ খেলা চলছে। এবার ১৯টি দলকে প্রথম ডিভিসনে খেলাতে হচ্ছে, কারণ সকলেরই জানা আছে। কাষ্টমস ও রেঞ্জার্স সমান খেলায় ১৪ পয়েন্ট করে প্রথম যাচ্ছে, আর ভবানীপুর ও ডালহৌসী সমান খেলে সমান পয়েন্ট এক করে সর্ব্ব নিম্নে আছে। ভবানীপুর যদি উন্নতি না করতে পারে তো, চুকে গেলো, তার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ভাবনা নেই। তা' না হ'লেই অনিয়মের আবার অনিয়ম করতে হবে কর্ত্তাদের। লোকের লজ্জা হয়, কিন্তু স্পোর্টসের কর্ম্মকর্ত্তাদের সে বালাই নেই। তাঁরা রাস্তার মাঝ দিয়ে চলেন।



রেঙ্গুনের বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রিকেট দল—

দাঁড়িয়ে (বাম থেকে)—চুনী গুহ, তারাপদ ঘোষ (সহঃসম্পাদক), ভুপাল পাল, শৈলেন দে, মণ্টু চক্রবর্ত্তী, নেপাল পাল, তারু ঘোষ ও ভগু গাঙ্গুলি

বসিয়া—কানাই গুহ, কেষ্ট ঘোষ, মনা দাশগুপ্ত (ক্যাপটেন), চিত্ত দাশগুপ্ত ও ভুলু বোস

অষ্ট্রেলিয়ার আগামী টেষ্ট দল ঃ

অষ্ট্রেলিয়া—৫২০ ও ২৪০ (৩ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

তাসমানিয়া—১৯৪ ও ৮১

অষ্ট্রেলিয়ার আগামী টেষ্ট খেলোয়াড় দল ৪৮৫ রানে তাসমানিয়াকে পরাজিত করেছে। ৪টি সেঞ্চুরী এই একটি খেলাতে হয়েছে, প্রত্যেক ইনিংসে দু'টি সেঞ্চুরী। প্রথম ইনিংসে ব্যাডকক্ ১৫৯ ও ব্রাডম্যান ১৪৪ ; দ্বিতীয় ইনিংসে ব্রাউন ১০৮ ও ফিঙ্গলটন ১০৯। বোলিংয়ে ও'রিলী

বিপর্য্যয় ঘটিয়েছে, ৩৪ রানে ৫ ও ১৬ রানে ৬ উইকেট নিয়ে।

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

কয়েকটি ট্রায়াল ম্যাচ খেলবার পরে বাঙ্গলার দল মনোনয়ন হয়েছে। সেই দলের সঙ্গে রেষ্টের একটি খেলা হয়। বাঙ্গলার মনোনীত দল ৪-২ গোলে জয়লাভ করলেও খেলা নিম্নশ্রেণীর হয়েছে। নির্ব্বাচিত দলের খেলায় প্রভূত



অষ্টম অলিম্পিকের মারাথন রেস বিজয়ী অমর সিং (পাতিয়ালা)—
সময়, ২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ১৭-৪ সেকেণ্ড

উন্নতি সাধিত না হলে চ্যাম্পিয়নসিপ লাভের আশা সুদূর পরাহত।

১২ই মার্চ্চ থেকে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। এ বৎসর মাত্র ৪টি প্রদেশ যোগদান করেছে,—বাঙ্গলা, ভূপাল, গোয়ালিয়র ও পাঞ্জাব। অল্প সংখ্যক দল যোগদান করায় এবার প্রতিযোগিতা লীগ প্রথানুযায়ী পরিচালিত হবে।

আই এফ এর কর্ম্মকর্ত্তা ঃ

বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয়েছেন ;—

সভাপতি—মহারাজা সন্তোষ

সহকারী সভাপতি—এইচ্ এন্ নিকল্‌স্

যুগ্ম সম্পাদক—এম দত্ত রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) ও
জি ডেভিস্ (ড্যালহৌসী)

কোষাধ্যক্ষ—কে মুরুদ্দীন



মোহনবাগানের ৪৮ বার্ষিক স্পোর্টসের ১০০০ মিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় সুবোধকুমার সিংহ প্রথম হয়েছেন ছবি—কাঞ্চন

মহারাজা সন্তোষের এই ষষ্ঠবার সভাপতির পদ প্রাপ্তি তাঁর লোকপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। চার বৎসর তিনি ক্রমান্বয়ে সভাপতি হলেন। পূর্ব্ব সম্পাদকদ্বয়ের কেহই পুনর্নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড়ান নাই।

আই এফ এর আয়-ব্যয় ঃ

আয়-ব্যয়ের সম্বন্ধে কিছুকাল বৃথা বাদানুবাদ হবার

পর বার্ষিক রিপোর্ট, যেরূপ সকল ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, পাশ হয়েছে। বাদানুবাদের যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাতেই সাধারণের বেশ বোধগম্য হয়েছে, যে কেমন সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় আই এফএর অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে—গৌর সেনের টাকার যেমন গতি হয়ে থাকে! দু'টি চ্যারিটি ম্যাচের মেডেলের ব্যয় পাঁচশত টাকা প্রত্যেক ম্যাচটির জন্য—অর্থাৎ প্রত্যেক মেডেলের মূল্য ২৩৲ টাকা হিসাবে! ১৯৩৭ সালে পাঁচটি চ্যারিটি ম্যাচের ষ্টাফের পারিতোষিক বাবদ ব্যয় ১১০০৲ ও ২৫০৲=১৩৫০৲



অলিম্পিকের ১০০০০ হাজার মিটার দৌড় বিজয়।—রওনক সিং (পাঞ্জাব)—সময়, ৩২ মিনিট, ১৯ সেকেণ্ড; দ্বিতীয়—চনন্ সিং (পাঞ্জাব); তৃতীয়—এন্ সি গাষ্টন ছবি—কাঞ্চন

টাকা!! এমন কিছু বেশী নয় নিশ্চয়ই—মাত্র ২৭০৲ টাকা প্রতি ম্যাচে। কত লোককে নিমন্ত্রণ করতে হয়েছে, তাদের দেখাশোনা করবার লোকজন চাইতো। রিপোর্টে স্বীকার করতে হয়েছে যে আকর্ষণীয় খেলার আয়োজন সত্ত্বেও চ্যারিটি ম্যাচে আশানুরূপ জনসমাগম হয় নাই।—কেন হয় নাই? তার কারণ কমিটি অনুসন্ধান করেছেন কি? আমরা পূর্ব্বেও লিখেছি,—অত্যধিক চ্যারিটি ম্যাচ করলেই টাকা পাওয়া যাবে না, তাতে সাধারণ দর্শকদের বিরাগ সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হবে। কথায় কথায় চ্যারিটি—লীগের আকর্ষণীয় খেলা হলেই চ্যারিটি—সেই খেলায় সংশ্লিষ্ট ক্লাব মেম্বারদের অতিরিক্ত ব্যয়। টাকা দেবে গরীব ও মধ্যবিত্ত দর্শক ও মেম্বাররা, আর কর্ম্মকর্ত্তারা আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত-অপরিচিতদের নিমন্ত্রণ করে পশ্চিম দিকের সমস্তসারি বেতের চেয়ার ও ভাড়া-করা চেয়ার দিয়ে, ভরিয়ে আসর সরগরম করে আরামে ম্যাচ দেখবেন। এমন বহু ধনী ও মধ্যবিত্ত লোক যাঁরা পূর্ব্বে টিকিট ক্রয় করে খেলা দেখতেন এখন তাঁদের ভাড়া-করা চেয়ারে বসে বিনামূল্যে খেলা দেখতে দেখা যায়।



অলিম্পিকের ১৬ পাউণ্ড সট্ পুট বিজয়ী—জহর আহমেদ (পাঞ্জাব); দ্বিতীয়—এন্ কিরনানডার (বাঙ্গলা); তৃতীয়—মহম্মদ নেওয়ার (পাঞ্জাব) ছবি—কাঞ্চন

চ্যারিটি ম্যাচে বিক্রয়লব্ধ অর্থের সঠিক পরিমাণ পরদিনের সংবাদ পত্রে প্রচারিত হয় না। কখন বহু বিলম্বে আনুমানিক সংখ্যা মাত্র ঘোষিত হয়, এবং অধিক স্থলেই তাও প্রচার করা হয় না। ইহাতে কি সাধারণের মনে সন্দেহের উদয় হয় না।

গত বৎসরের মোট চল্লিশ হাজার টাকা খরচ বাদে চ্যারিটিতে প্রদত্ত হয়েছে। চ্যারিটি লব্ধ অর্থের মোট পরিমাণ এবং তার জন্য সর্ব্বসাকুল্যে ব্যয়ের সঠিক সংখ্যা সংবাদপত্র মারফৎ সাধারণকে জানান কর্ত্তব্য, যদি ভবিষ্যতে সাধারণের সহানুভূতি পাবার আশা রাখ।

রিপোর্টে স্বীকৃত হয়েছে, * * cannot feel that the Association is in a sound position. But for the fact that an unexpected 'bomb shell' was received by a deficit of Rs 5650|- on the anticipated donations towards the travelling expenses of visiting teams in I. F. A. Shield * * শীল্ডে



অলিম্পিকের ৮০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ী—হাজুরা সিং (পাতিয়ালা); দ্বিতীয়—সিপাহী জালাল খাঁ (বাঙ্গলা); তৃতীয়—এ আর মল্লিক (পাঞ্জাব) ছবি—কাঞ্চন

কতকগুলি বাজে গ্রাম্য আনাড়ী দলের যোগদান অনুমোদন করেছিল কারা? অচল মিলিটারী দলের জন্য অর্থ ব্যয়ের দায়ী কে? বাজে দলের শীল্ডে নাম অনুমোদনের আপত্তি আমরা পূর্ব্বেও করেছি। anticipated donation! কোন ক্লাব বা কোন মহাপ্রাণ ব্যক্তি দাতব্য করবেন বলে টাকা দেন নাই? তাদের নাম কেন রিপোর্টে বা সাধারণে প্রকাশিত করা হয় নাই। আর টাকা পাওয় যাবে বলে আগে থাকতে দেনা করে ভোজ আমোদ করবো ইহাও তো বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।

মহারাজা সন্তোষ বারংবার সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত থাকলেই আমরা সুখি হবো না। আমরা দেখতে চাই যে তিনি তাঁর সহযোগিদের নিয়ে, পূর্ব্বের অনাচারের প্রতিকার সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করে এ বৎসরের হিসাবে যাতে সাধারণের কোন ক্ষোভের কারণ না থাকতে পারে তার দিকে প্রখর দৃষ্টি দেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, তিনি মনোযোগ দিলে সহজেই কৃতকার্য্য হতে পারবেন।

আমদানী খেলোয়াড় বন্ধের প্রচেষ্টা ঃ

হকি এসোসিয়েশন স্থানীয় খেলোয়াড়দের খেলায় উন্নতিকল্পে আইন প্রণয়ন করেছিলেন যাতে বাইরের খেলোয়াড় আমদানী না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিয়মের ব্যতিক্রম ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হচ্ছে। বোষ্টমখাঁ, মহম্মদ লায়িম, এস সি বিটি কি বাঙ্গালার বাসন্দা হয়ে গেছেন যে তাঁদের স্থানীয় দলে খেলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে?

ফুটবল এসোসিয়েশনেও প্রতিবারই আমদানী খেলোয়াড়দের বিষয় ওঠে। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় না। এবারও ঐ সম্বন্ধে প্রস্তাব হয়েছে। খেলোয়াড় আমদানী বন্ধের নিয়ম অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু শুধু নিয়ম করলেই হবেন', দেখতে হবে, কোন কারণে কারো জন্য নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়। প্রদেশের উৎকৃষ্ট প্রতিভাদের উন্নতির চেষ্টা করা এসোসিয়েশনের প্রধান কর্ত্তব্য। কোন দল বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ দেখলে চলবে না।

আশা করি, বাঙ্গালার দুই এসোসিয়েশনই সত্বর দৃঢ়হস্তে এই মারাত্মক ব্যাধির কবল থেকে প্রদেশকে রক্ষা করে জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত উপন্যাস 'কলেজের মেয়ে'—১॥০
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস 'প্রিয়তমাসু'—২॥০
মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি অনূদিত খালিদা এদিব খানমের 'স্মার্ণা নন্দিনী'—১॥০
আবুল মনসুর আহমদ প্রণীত উপন্যাস 'আয়না'—১॥০
রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'পদাবলী মাধুর্য্য'—১॥০
শ্রীপঙ্কজভূষণ রায় প্রণীত নাটক 'মুক্তাবাণ'—১॥০
শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস 'স্বর্গ'—১॥০
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রোমাঞ্চ সিরিজের 'রহস্য বিভীষিকা'—৮০
শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত জীবনী গ্রন্থ 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র'—১॥০
শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার প্রণীত জীবনী গ্রন্থ 'কুমুদনাথ'—১৲
শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত গল্পপুস্তক 'শান্তিপুরে অশান্তি'—৶০
শ্রীরাধেশ রায় সঙ্কলিত সংগ্রহগ্রন্থ 'কাহিনী'—॥৶০
শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাণিজ্য গ্রন্থ 'দুধের ব্যবসা'—১॥০
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত জীবনী গ্রন্থ 'আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু'—১৲
শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "পল্লী-সংস্কার"—১॥০

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



রুদ্রতাণ্ডব

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

Bharatvarsha Printing Works



দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এস-সি

বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা সম্বন্ধে বিগত বহু বৎসর যাবৎ এই সুপ্ত বাঙ্গালী জাতিকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করা যাইতেছে। বাঙ্গালীর খাদ্য-সমস্যাও ইহার সঙ্গে জড়িত। গত ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীকে খাদ্য বিষয়ে "ঘরমুখী" করিবার জন্য নানা বক্তৃতা, পুস্তক ও প্রবন্ধে চা-বিস্কুটের সর্ব্বনাশী কুফলের বিষয় ও আবহমান-কালপ্রচলিত চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি ঘরের জিনিসের উপকারিতার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। বাঙ্গালী হুজুগপ্রিয় বলিয়া বড়ই দুর্নাম আছে; সম্ভবতঃ এই হুজুগের বশেই আজ পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সভ্যতা (?) বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিড়া, মুড়ি, খই বা বিস্কুটকে সসম্ভ্রমে স্থান ছাড়িয়া দিয়া পল্লী-অঞ্চলে আশ্রয় লইতেছে। প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বিস্কুটের বিশেষ আমদানী ছিল না—তখন জ্বর হইলে চিনির মুড়কী দিবার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখন আমরা সভ্য (?) হইতেছি এবং যাহা কিছু বিলাতী তাহাই গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গালী দিন দিন কঠিন অর্থসঙ্কটে পড়িতেছে; অথচ গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে অর্থসঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতাও দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে যদি আমার বাড়ীতে একজন আগন্তুক আসেন এবং তাঁহার সম্মুখে মুড়ি ও তৎসঙ্গে নারিকেল-কোরা, শশা ও গুড় জলখাবাররূপে উপস্থিত করি তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন (যদি তাঁহার অবস্থা আমার অপেক্ষা হীন হয়) যে তিনি হীন অবস্থাপন্ন বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সমাদর করা হইল না। পক্ষান্তরে আগন্তুকের অবস্থা আমার অপেক্ষা ভাল হইলে তিনি মনে করিবেন "বেচারা নিতান্ত গরীব ও অসভ্য—তাই এইরূপ গ্রাম্যপ্রথায় আমাকে অভ্যর্থনা করিল।" অপর পক্ষে ঐ আগন্তুকের সম্মুখে যদি নূতন টিন খুলিয়া কয়েকখানা বিস্কুট উপস্থিত করা হয় তাহা হইলে তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ভাবিবেন

—তাঁহাকে কত না সমাদর করা হইল! অনেক স্থলে অতি-শিক্ষিত পরিবারে মার্কিন হইতে আমদানী "পাফ্‌ড্‌ রাইস্‌" (puffed-rice) নামে চাউল হইতে প্রস্তুত হাল্‌কা মুড়ির মত পদার্থ আগন্তুক ভদ্রলোককে নিঃশঙ্কচিত্তে দেওয়া হইয়া থাকে, অথচ দেশের জিনিস মুড়ি দিতে গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের শোচনীয় দুর্ব্বলতা ও দাসমনোবৃত্তির কি চূড়ান্ত পরিচায়ক নহে? সৌভাগ্যের বিষয় এখনও পশ্চিম বঙ্গের বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুড়ি ও খইয়ের মোয়ার যথেষ্ট প্রচলন আছে। কিন্তু সহর হইতে নব্য সভ্যতার যে প্রবাহ গড়াইতেছে তাহা সুদূর পাড়াগাঁ পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইতেছে এবং অনেক স্থলে এখন ভদ্রসমাজে (?) চিড়া মুড়ি খই প্রভৃতির ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে। এস্থলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আর একটি অপব্যয়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের চায়ের মজলিসে ফির্‌পো ও দ্বারিকের ব্যয়সাধ্য খাবারের ব্যবস্থা না হইলেই চলে না।

এদিকে আমাদের মাদ্রাজী ভাইএরা এ বিষয়ে বিশেষ হুঁসিয়ার। তাঁহারা চায়ের পরিবর্ত্তে কাফি পান করেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত ডালমুট প্রভৃতি বিবিধ ভাজি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই কারণে একজন মাদ্রাজীর পার্টিতে যেখানে মাথা পিছু ।৵০-।১০ খরচ হয় সেস্থলে আমাদের ফ্যাসান-দুরস্ত চায়ের মজলিসে মাথা পিছু ১৲-১॥০ টাকার কম পড়ে না। সামান্য আশার কথা এই যে নব্য-বঙ্গ 'ঘরমুখী' হইতে আরম্ভ করিয়াছে; 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' যেমন অনেক শিক্ষিত পরিবারেই সাদরে স্থান পাইতেছে তদ্রূপ সোডা-ওয়াটারের স্থলে ডাবের জল এবং খাদ্যাদি বিষয়েও গৃহপ্রাঙ্গণজাত শাক-সব্‌জি ফল-মূলাদির প্রতি ক্রমশঃ শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইতেছে। দিন দিন টম্যাটো এবং বাতাবী লেবুর কিরূপ আদর বাড়িতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সহজ ভাষায় সাধারণের নিকট পৌঁছিলে শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। পূর্ব্বে বিবিধ পীড়ায় খই মণ্ডের পথ্যের প্রচলন ছিল; চিড়ার জল বা কাথও পেটের অসুখে সুপথ্য বলিয়াই লোকে জানিত। আশা করি অন্যান্য দেশের ন্যায় বাঙ্গালার জনসাধারণও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলির প্রতিই বর্ত্তমান যুগে অধিকতর অনুরাগ দেখাইবেন এবং প্রাত্যহিক জীবনে তাহা প্রতিপালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন।

আজকাল এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি বিবিধ ভাইটামিনের কথা সকলেই জানেন এবং সেগুলি দৈনিক আহার্য্যের মধ্যে পাইবার জন্য সকলেই সাতিশয় আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। ভাইটামিন বি, আমাদের পরিচিত 'এপিডেমিক ড্রপসি' রোগে ফলপ্রদ না হইলেও হৃদযন্ত্রের সুস্থতা ও সাধারণ স্বাস্থ্য উহার উপরে যথেষ্ট নির্ভর করে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভাইটামিন বি$_2$ মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থতার জন্য অপরিহার্য্য এবং এই উভয়বিধ উপকারী ভাইটামিনই চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতে বিস্কুটের অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। অনেকে মনে করিতে পারেন এত উত্তাপে তৈয়ারী এই সব দ্রব্যে ভাইটামিন কি করিয়া থাকিতে পারে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র ভাইটামিন সি উত্তাপে সহজে নষ্ট হয়, অন্য ভাইটামিনগুলি উত্তাপে সহজে নষ্ট হয় না। (আমাদের 'খাদ্য-বিজ্ঞান' পুস্তকের 'ভাইটামিন' অধ্যায়ে সহজ ভাষায় এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।)

অনেকে জানেন, চাউলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮।১০ অংশ নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ বা প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন খুব উপকারী বলিয়া জানা গিয়াছে। এস্থলে বলিয়া রাখি যে চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতেও প্রোটিনের পরিমাণ চাউলের প্রোটিনের পরিমাণের মতই পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধে আলোচ্য সামগ্রীগুলির ভাইটামিনের পরেই ডেক্‌ষ্ট্রিন (dextrin) নামক পদার্থের পরিমাণের প্রতি আমরা বেশী মনোযোগ দিব। অনেকেই অবগত আছেন যে চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতির প্রধান উপাদান শ্বেতসার (starch). উত্তাপে এবং লালা ও অন্ত্রের রসে যে জারক পদার্থ (enzyme) থাকে তাহার ক্রিয়ায় শ্বেতসার প্রথমতঃ ডেক্‌ষ্ট্রিনে পরিণত হয়। ডেক্‌ষ্ট্রিন আবার গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষাশর্করা হইয়া আমাদের রক্তস্রোতে প্রবেশ করিয়া শরীরের তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। একটি কথা মনে রাখা উচিত যে শ্বেতসার অপেক্ষা ডেক্‌ষ্ট্রিন

অনেক সহজপাচ্য পদার্থ। ভাজা চিড়া, মুড়ি, খই, লুচি প্রভৃতিতে ডেক্সট্রিনের পরিমাণ সচরাচর বেশী থাকে। আমাদের ধারণা ছিল বিস্কুটে ডেক্সট্রিনের পরিমাণ বেশী হইবে। কিন্তু পরীক্ষায় অন্যরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরবর্ত্তী তালিকাতে উহা বেশ বুঝা যাইবে। অবশ্য বিভিন্ন বিস্কুটে উহার সামান্য ইতর-বিশেষ হওয়া অসম্ভব নয়।

বৎসরাধিক কাল হইতে বেঙ্গল কেমিক্যালের বায়ো-কেমিক্যাল বিভাগে চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষা চলিতেছে। প্রাণীর উপর (শ্বেত ইন্দুরের) পরীক্ষায় ভাইটামিন বি$_১$ ও বি$_২$ নির্ণীত হইয়াছে এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে উহাদের ডেক্সট্রিনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এস্থলে ভাইটামিন বি$_১$ ও বি$_২$-র সাধারণ উপকারিতা এবং উহাদের দৈনন্দিন চাহিদা সম্বন্ধে কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক—স্নায়ুমণ্ডলীকে দৃঢ় ও স্নিগ্ধ রাখিতে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে, কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করিতে এবং পরিপাক-শক্তি বাড়াইতে ভাইটামিন বি$_১$ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধিরও ব্যাঘাত ঘটে। এই পদার্থের অভাবে পাকস্থলী ও অন্ত্রের জারক-রস সম্যক্ নিঃসৃত হয় না —এ কারণ পরিপাক শক্তি হ্রাস পায়। একজন বয়স্ক সুস্থ লোকের প্রতিদিন ১৫০ ইউনিট ভাইটামিন বি$_১$ প্রয়োজন। আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব কাঁচা লাল চিড়ার প্রতি ১০০ গ্রাম (gramme) বা ৯ তোলাতে ৩৪·৫ ইউনিট ঐ ভাইটামিন লক্ষিত হইয়াছে; সুতরাং যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে একজন বয়স্ক লোক অন্য কোন খাদ্য আদৌ না খায় তবে তাহার বি$_১$ ভাইটামিনের দৈনিক চাহিদা মিটাইতে ($\frac{১৫০}{৩৪.৫} \times ১০০$) গ্রাম বা ৪৩০ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় আধ সের লাল চিড়ার আবশ্যক। আমরা সাধারণ খাদ্যে—মুগ, মটর, মসুরি প্রভৃতি ডা'ল, বাঁধাকপি, বেগুন, শাঁক-আলু প্রভৃতি হইতেও এই ভাইটামিন পাইয়া থাকি। ভাতের ফেন না ফেলিলে উহাতে এই ভাইটামিন বেশ খানিকটা পাওয়া যায়।

ভাইটামিন বি$_২$-র অভাবে চর্ম্মরোগবিশেষ, ক্ষুধামান্দ্য, রক্তাল্পতা প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার অভাবে চোখে ছানি পড়ে বলিয়াও প্রকাশ। জীবনীশক্তির বৃদ্ধি ও শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ সুস্থতাও ইহার উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। পরীক্ষাগারে ভাইটামিন বি$_২$-বঞ্চিত শ্বেত ইন্দুরের যখন ওজন কমিতে থাকে তখন ঐ ভাইটামিনযুক্ত যে পরিমাণ খাদ্য খাইতে দিলে উক্ত ইন্দুরের সাপ্তাহিক দশ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণ খাদ্যে এক ইউনিট ভাইটামিন বি$_২$ আছে ধরা হয়। ভাইটামিন বি$_১$-এর ইউনিটও সাধারণতঃ এইরূপেই স্থির করা হয়। প্রত্যেক বয়স্ক সুস্থ লোকের দৈনিক এরূপ ১৫০ ইউনিট ভাইটামিন বি$_২$ আবশ্যক বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করি আমাদের তালিকাতে ১০০ গ্রাম বা ৯ তোলা মুড়িতে ১১ ইউনিট ভাইটামিন বি$_২$ আছে দেখিলে উহার ধারণা করিতে আর আমাদের বেগ পাইতে হইবে না। বলা বাহুল্য, ভাইটামিন বি$_১$-র মত বি$_২$-ও আমরা বিভিন্ন ডা'লে, বাঁধাকপি, শাঁক-আলু, বেগুন, দুধ, ডিম প্রভৃতি হইতেও পাইয়া থাকি।

নিম্নের তালিকায় চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল :—

	প্রতি ১০০ গ্রাম (৯ তোলা) দ্রব্যে কত ইউনিট		প্রতি ১০০ অংশ কত অংশ
	ভাইটামিন বি$_১$	ভাইটামিন বি$_২$	ডেক্সট্রিন
লাল চিড়া (কাঁচা)	৩৪·৫	১৮·৫	১·৫
" (ভাজা)	৩১·৪	৭·৫	৪·১
সাদা চিড়া (কাঁচা)	২২·৫	১২·৫	১·৭
" (ভাজা)	১৮·৫	৭·৫	২·৮
মুড়ি	১৪·৫	১১·০	৬·১
খই	১৩·০	১৪·০	৫·৭
বিস্কুট	১২·০	১১·১	১·৯

উল্লিখিত তালিকাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি—চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি প্রত্যেক সামগ্রীতেই বিস্কুট অপেক্ষা ভাইটামিন বি$_১$ বেশী আছে; খই এবং কাঁচা চিড়াতে ভাইটামিন বি$_২$ বিস্কুটের চেয়ে বেশী এবং মুড়ি, খই ও ভাজা চিড়াতে বিস্কুট অপেক্ষা অনেক বেশী ডেক্সট্রিন বিদ্যমান। ঈষৎ ভাজা চিড়া মুখরোচক, উহাতে ডেক্সট্রিনের পরিমাণও বেশী, অথচ উহাতে ভাইটামিনেরও বেশী অপচয় হয় না। এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া সাগরদাঁড়ীর কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

'যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ঘরে ফিরে'—
মাতৃদত্ত খাদ্যে শক্তি স্বাস্থ্য পাবি ফিরে।'

এখন বিস্কুটের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত

জলখাবারগুলি—চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি দামের দিক হইতেও কত সস্তা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

২ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চৌদ্দ ছটাক ওজনের এক টিন বিস্কুটের দাম দেশী হইলে ১।৵০—১৷৷০, বিলাতী হইলে ১৸০ হইতে ২৲, টিনের দাম ৶০—।০ আনা তো একেবারে অনর্থক; এখনও অনেক বাড়ীতে মুড়ির চাউল প্রস্তুত হয়, চিড়া, খইও অনেক স্থলে বাড়ীতে তৈয়ারী হইয়া থাকে। চৌদ্দ ছটাক মুড়ির চাউল ঘরে তৈয়ারী করিলে উহার দাম বড় জোর ৵০ আনা পড়ে এবং উহা বালি খোলায় ভাজিয়া লইলে গরম গরম অতি উপাদেয় মুখরোচক মুড়ি প্রস্তুত হয়। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি ২ পাউণ্ড বিস্কুট ও ২ পাউণ্ড মুড়ির দামের পার্থক্য ১৲ হইতে ১৷৷০ পর্য্যন্ত; সুতরাং খাদ্যোপযোগিতার (food-value) দিক হইতে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, তদ্ভিন্ন পয়সার দিক হইতেও আমাদের ঘরের তৈরী চিরপ্রচলিত ও চির-আদরের জলখাবারগুলি বিস্কুটের চেয়ে অনেক বেশী সস্তা। চকচকে টিনের মোড়ক খুলিয়া কয়েকখানি বিস্কুট ছেলেদের দেওয়ার চেয়ে সদ্যভাজা মুড়ি দিলে গৃহিণী যে কত বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন তাহা কর্ম্মঠা প্রাচীনাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ উপলব্ধি করা যায়।

ইহার পরে চিড়া মুড়ি প্রভৃতির অনুপানের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ঈষৎ ভাজা চিড়ার সঙ্গে নারিকেল কুচি বা নারিকেল কোরা ও গুড় অতি উপাদেয় খাদ্য। নারিকেলের স্নেহ-জাতীয় পদার্থ অতিশয় পুষ্টিকর। তদ্ভিন্ন গুড়ের মধ্যে বিভিন্ন শর্করা পদার্থ ছাড়া উপকারী লবণ পদার্থ ও ভাইটামিন বি এবং সি পাওয়া যায়। গুড় যে সাদা চিনির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা এখন সকল খাদ্যবিদ্ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। স্বাস্থ্যবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ডা: বেণ্টলী সর্ব্বদাই বলিতেন—"সাদা চিনির চেয়ে গুড় অনেকাংশে ভাল।" বিলাতের স্বর্গীয় স্বনামধন্য রাসায়নিক আর্মষ্ট্রং সাদা চিনি ও সাদা ময়দাকে অন্তঃসারশূন্য (whited sepulchre) আখ্যা দিয়াছেন। নূতন গুড়ের নলেন গন্ধযুক্ত আস্বাদ অবর্ণনীয়। গুড় চিনির অপেক্ষা দামেও সস্তা—মুখরোচকও বটে, সুতরাং ইহাকে উপেক্ষা করা কতদূর বিকৃতরুচির পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। সাদা চিড়া অপেক্ষা লাল চিড়া যে ভাইটামিনের তরফ হইতে বহু অংশে শ্রেষ্ঠ তাহা পূর্ব্বপ্রদত্ত তালিকাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। পল্লীগ্রামে কলা গুড় চিড়া বা আম কাঁঠাল ও চিড়া (অবশ্য ইহাদের সঙ্গে দধি দুগ্ধ থাকিলে তো সোনায় সোহাগা)—শশা, নারিকেল কোরা, টাটকা মূলা বা কড়াই শুঁটির সঙ্গে মুড়ি—খইএর মোয়া, মুড়কি প্রভৃতি কত সুলভ ও পুষ্টিকর খাদ্য তাহা ভুলিলে জাতীয় স্বাস্থ্যের কি শোচনীয় অধঃপতন হইবে তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই বুঝা কর্ত্তব্য। ভিজান ছোলা, মুগের অঙ্কুর, শাঁক-আলু ও গুড় যে আদর্শ জল-খাবার তাহাও ভুলিলে চলিবে না।

সম্প্রতি একটি ধুয়া উঠিয়াছে—রুটি না খাইলে বাঙ্গালী জীবনসংগ্রামে টিকিতে পারিবে না। ইহার মূলে যথেষ্ট সত্য আছে মনে হয় না। বাঙ্গালায় যব-গম কিয়ৎপরিমাণে জন্মিলেও ধানই এখানকার প্রধান ফসল এবং এই ধানের ভাত খাইয়াই একদিন প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ভীম ও দিব্য প্রভৃতি অমিতবিক্রম ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়াছিল; বিজয় সিংহও 'ভেতো' বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সমগ্র মঙ্গোলীয়ান জাতি—জাপান, চীন প্রভৃতিপ্রাচ্যদেশের অধিবাসীদের ভাতই যে প্রধান খাদ্য তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং বাঙ্গালীকে বীর্য্যশালী হইতে হইলে ভাত ছাড়িয়া রুটি ধরিতেই হইবে এমন কোনও কথা নাই। অবশ্য যাঁহারা চাউল কিনিয়া খান তাঁহাদের পক্ষে আটা ময়দার আংশিক প্রচলন অবাঞ্ছনীয় নয়।

শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে ফলমূলের অভাব নাই। শশা, কলা, টম্যাটো, আম, জাম, কাঁঠাল, জামরুল, নারিকেল, পেয়ারা, লিচু, আতা, আনারস, পেঁপে, লেবু প্রভৃতি ফল অধিকাংশ গৃহস্থের প্রাঙ্গণেই দেখা যায়। এই গুলিতে স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ভাইটামিন সি ও লবণপদার্থ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলের বিভিন্ন শর্করাজাতীয় পদার্থ অতিশয় বলকারী, এই সব ফল চিড়া, মুড়ি, খই বা গুড় প্রভৃতির সহিত জলখাবারের সময় খাইলে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

অতিরিক্ত চা-পানজনিত কুফলের কথা আমাদের 'খাদ্য-বিজ্ঞান' গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে উক্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসকের অভিমত মাত্র উদ্ধৃত করা হইল। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন

সেনগুপ্ত এম-ডি মহাশয় বলিয়াছেন, বাংলাদেশে আবহমান কাল প্রচলিত গুড় ছোলা, আদা ছোলা, ফেনে ভাত ও দুধ—যাহা ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে প্রাতঃকালে জলখাবার রূপে ব্যবহার করিতেন তাহা পুষ্টিকারিতা ও ভাইটামিনের পক্ষ হইতে বাস্তবিক প্রশংসনীয় ছিল। ধনীরা পূর্ব্বোক্ত খাদ্যের সহিত মাখন, মিছরি ও সময়ে সময়ে ছানা খাওয়াতে তাঁহাদের প্রাতরাশ আদর্শ খাদ্যের মধ্যেই পরিগণিত হইত।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান টি-অ্যাসোসিয়েশন তাঁহাদের ব্যবসায়ের সুবিধাকল্পে এ-দেশে চা-এর প্রচলনের নিমিত্ত বিরাট অভিযান আরম্ভ করেন। এ-দেশের লোক দারিদ্র্যপ্রযুক্ত প্রচলিত জলখাবার ও চা দুইটি একসঙ্গে যোগাড় করিতে অসমর্থ হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলখাবার উঠিয়া গিয়া শুধু চা-পানই জলখাবারের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যখন অ্যাসোসিয়েশন তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং দেশবাসী ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চিরাচরিত খাদ্যপ্রথা পরিত্যাগ করিতে থাকেন—তখন কেহই এমন কি দেশের স্বাস্থ্যবিভাগও লোককে সাবধান করিয়া বলেন নাই যে, চায়ের সহিত ব্যবহৃত অত্যল্প মাত্র দুগ্ধ (তাহাও সব সময়ে খাঁটি নয়) ব্যতীত খাদ্য হিসাবে উহার আদৌ কোন মূল্য নাই।

বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও মাসিক পত্রের গল্পলেখকগণ তাঁহাদের লেখার ছত্রে ছত্রে চায়ের বৈঠকের বর্ণনা দ্বারা এই প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন।

ডাঃ জে, ওয়ালটার কার, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস, (লণ্ডন) বলিতেছেন, "চা ও কফি হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, উপযুক্তভাবে প্রস্তুত চা-ও অতিমাত্রায় ব্যবহারে (অনেকের আবার অত্যল্পতেই) অজীর্ণ, স্নায়ুবিকার, হৃৎস্পন্দন, শিরোঘূর্ণন ও অনিদ্রা উৎপন্ন করে। খাদ্যের পরিবর্ত্তে চা-পান এবং পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূরীকরণে চা-এর ব্যবহার—যে সময় মস্তিষ্কের প্রকৃতপক্ষে বিশ্রাম আবশ্যক সে সময় চায়ের প্রভাবে অসাড় করিয়া উহাকে খাটান—অতিশয় অহিতকর।"

কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উইনিপেগ অধিবেশনে কেম্‌ব্রিজের ডাঃ ডবলিউ, এফ, ডিক্‌সন বিবিধ মাদকদ্রব্যের তুলনামূলক সমালোচনায় বলিয়াছিলেন—"যে সমস্ত কারণে স্নায়ুবিকার জন্মে ক্যাফিন সেবন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। চা ও কাফিতে যথেষ্ট ক্যাফিন থাকে। এক পেয়ালা ভাল চায়ে সাধারণতঃ এক গ্রেণেরও অধিক ক্যাফিন দৃষ্ট হয়; সুতরাং প্রত্যেক চা-পায়ী দৈনিক ৫ হইতে ৮ গ্রেণ ক্যাফিন উদরস্থ করিয়া থাকেন এবং ইহা নিতান্ত অবহেলা করিবার নহে। চা-পানে পুনঃ পুনঃ ক্যাফিন শরীরস্থ হইলে মানসিক উত্তেজনা, শিরোঘূর্ণন এবং পরিপাক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

এইরূপ পরিপাকশক্তির দৌর্ব্বল্যকে চা-পান জনিত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (টি-ডিস্‌পেপসিয়া) বলে। অতিরিক্ত চা-পানে অম্লরোগ, পেটকামড়ানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য ও হৃদযন্ত্রের বৈলক্ষণ্য জন্মে।"

খাদ্য হিসাবে বিস্কুটের স্থান কোথায় তাহাও আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইলাম। আশা করি, বাংলার নব্য গৃহলক্ষ্মীগণ তাঁহাদের মাতা মাতামহীর আদর্শ অনুসরণ করতঃ চিড়া, মুড়ি, খই প্রস্তুত ও তাহা পরিবেশন করিয়া পরিজনের স্বাস্থ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন এবং সর্ব্বনাশী চা-বিস্কুটকে কদাচ ত্রিসীমানায় আসিতে দিবেন না।



দারিদ্র্যের ইতিহাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩২)

জনপূর্ণ কোলাহলময়ী নগরী কলকাতা—পথ দিয়ে চলছে অগণ্য লোক—অগণ্য মোটর, ট্রাম, বাস—সবাই কাজে ব্যস্ত, থমকে দাঁড়াবার, পেছন ফিরে চাইবারও সময় কারো নাই।

অসিত এসে দাঁড়াল গঙ্গার ঘাটে।

স্নানের বেলা শেষ হয়ে গেছে, গঙ্গার ধার কতকটা শান্ত। জলের বুকে চলেছে নৌকা, ষ্টীমার, তীরের কল-কারখানা শব্দায়িত, ধূমায়িত—তবু পথের মত অত লোক নাই।

কয়টা দিন এমনই ভাবে কাটছে। কোনও হোটেলে দু' তিন পয়সার ভাত ডাল কিনে খাওয়া, ঘুম এলে ফুটপাতের ধারে শোওয়া।

হ্যাঁ—পথের ধারে এমন ঢের লোকই শুয়ে রাত কাটায়। নাই বা রইল বিছানা, নাই বা রইল মাথায় দেওয়ার কিছু—গায়ে দেওয়ার একখানা চাদর নিশ্চয়ই থাকে—তা সে ময়লাই হোক বা ছেঁড়াই থাক। সেই চাদরের আধখানা পাতা আর আধখানা দিব্য গায়ে দেওয়া চলে; গা মাথা ঢাকা দিয়ে দিব্য আরামে ঘুম দেওয়াও যায়।

জগতে কয়জন পায় মাথার উপর আচ্ছাদন—কয়জন পায় বিছানা—কয়জন পায় পাথার তলার আরাম? যারা পায় তারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যশালী। অনেক লোকই পায় না বিছানা, পায় না মাথার উপরে ছাদ, পায় না নির্দ্দিষ্ট বাসের স্থান। অসীম অনন্ত পথ—চিরদিনের জন্য তাদেরই একায়ত্ব করা, পথের ধার তাদের জন্য চির উন্মুক্ত, তাদেরই স্থান সেই অনির্দ্দেশের বুকে।

মুস্কিল একটু বাধে—যখন আকাশের বুকে মেঘ জমে, বর্ষার জল ঝরে পড়ে। পথের ধূলা হয়ে ওঠে কাদা, গাছেরা রোদের সময় ছায়া দিলেও বৃষ্টির জল বারণ করতে পারেনা, পাতার ফাঁকে ঝরে পড়ে তলায়—চিরপথিকের আশ্রয় ভিজে ভেসে যায়।

অসিত একদিন পরম বিস্ময়ে ভাবতো—এরা কি করে পথের ধারে শুয়ে বুকের মধ্যে হাঁটু দিয়ে ঘুমায়। তার অভিজ্ঞতা আজ তাকে সে জ্ঞান দিয়েছে—ঘুম বারণ করা চলে না—এ আসবেই। এখন নিজের অবস্থা দিয়ে সে এ জ্ঞান পেয়েছে, ঘুম যখন আসবার—সে আসবেই—তা সে শান্তিপূর্ণ জায়গাতেই হোক—কোলাহলের মধ্যেই হোক। বিছানা নাই পাওয়া গেল, ড্রেণের ধারে, বনে জঙ্গলে—যেখানে হোক—ক্লান্তি জুড়াতে সে আসবেই।

পাশের লোকেরা খাসা গল্প করে, সুখদুঃখের পরিচয় দেয়। কেউ কেউ বলে, দেশে তাদের সবই আছে—মস্ত বড় বাড়ীঘর—চাই কি ছোটখাট জমীদারী পর্য্যন্ত। শুধু এইটুকুই মাত্র—কেবল বলতে পারেনা—সব থাকতে তবু কেন তারা এক চাদর মুড়ি দিয়ে ফুটপাতের ধারে পড়ে রাত কাটায়।

কিন্তু অক্ষমের কল্পনাতেও সুখ। সেই হিসাবে খোঁড়া সোজাভাবে হাঁটার, কুঁজো চিৎ হয়ে সটান শোওয়ার, কানা দুইচোখে দৃষ্টি পাওয়ার কল্পনা করে; কেউ বা পথের ধারে আধখানা চাদরের পরে শুয়ে সম্রাট হয়ে হুকুম দেওয়ার স্বপ্ন দেখে।

অপরাধ নয়—পাপ নয়, কেন না এ মানুষের অক্ষমতার গ্লানিতে সান্ত্বনা। মনের অতলে সে গ্লানি কোথায় জমে' থাকে, এই সব অক্ষমেরা তার ঠিকানাও পায় নি, অথচ সেই নিয়েই তাদের কল্পনাবিলাস সুরু হয়ে যায়।

অসিত নীরবে শোনে। ঠাণ্ডা যখন বেশী লাগে, খদ্দরের মোটা চাদরটা দিয়ে সমস্ত মুখখানাও ঢাকে, নির্ম্মল বাতাস পাওয়ার জন্য বার করে রাখে শুধু নাকটা।

নিজের অবস্থায় সে পরম খুসি, এজন্য সে কাউকে দোষ দেয়না। সে একটা দিন জানায় নি—তার কি আছে—কিছু ছিল কিনা। ইচ্ছা করে সে ভুলে গেছে—কোনদিন সে বইয়ের পাতা উল্টেছে, কোনদিন তার অক্ষর পরিচয় হয়েছে।

ইউনিভার্সিটীর সামনে সে একদিন গিয়ে পড়েছিল।

বড় বড় থামওয়ালা বড় বাড়ীটার পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল, অতীতের হাজার কথা মনে পড়েছিল ; পেছনে একটা ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠে দেখেছিল —একজন কনেষ্টবল তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে ধাক্কা দিয়ে পথ হতে সরিয়ে দিচ্ছে।

মনটা হঠাৎ বিষিয়ে উঠল, কিন্তু পূর্ব্বাপর নিজের কথা ভেবে সে হেসে ফেললে।

সে গালাগালি দিতে পারে, তার সে অধিকার আছে। সে জানে না একদিন একটী ছেলে ইউনিভার্সিটীর ওই গেট পার হয়ে তার পাসের সার্টিফিকেটখানা সতৃষ্ণনয়নে দেখতে দেখতে কত আশার স্বপ্ন বুকে নিয়ে পথে নেমেছিল। তখন তার সামনে কোন বাধা ছিল না, মন ছিল আকাশের মত অসীম ও উদার—

আজ সে ছেলেটী কোথায়—কোথায় গেল সে? জিজ্ঞাসা কর বাংলার হতভাগ্য যুবকদের—যাদের স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে গেছে ; যারা পথে বসেছে জুতা সেলাই করতে, পথের ধারে দোকান খুলেছে পান বিঁড়ি বিক্রয় করতে, যারা বি-এ ডিগ্রির সার্টিফিকেট বাক্সে তুলে দুধ বিক্রয় করছে, নানা রকম ব্যবসা করছে। এরা তবু পথ পেয়েছে।

জিজ্ঞাসা কর তাদের—যারা পথ পায়নি খেতে পায়না, অর্দ্ধাহারে অনাহারে শুকিয়ে মরছে, গলায় দড়ি দিচ্ছে, জলে ডুবে মরছে, পটাসিয়াম সাইনাইডের নাম ও অলৌকিক কার্য্যক্ষমতা জানা সত্ত্বেও পয়সার অভাবে কিনতে না পেরে অল্পদামে অক্স্ অ্যাসিড কিনে খেয়ে মরছে।

জিজ্ঞাসা কর সেই সব ছেলেদের—যারা ডিগ্রির সার্টিফিকেট পকেটে নিয়ে সকাল হতে সন্ধ্যা অবধি অফিসের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে বেড়ায়—জিজ্ঞাসা কর তাদের—একদিন তারা কি স্বপ্ন দেখেছে।

অসিত এখন সোজা গিয়ে বসে গঙ্গার ধারে—চমৎকার জায়গা। অদূরে জলে ধূ ধূ করে চিতা—সে জ্বলছেই। কত দেহ আসছে—দিনরাত্রি হরিবোল শব্দের বিরাম নাই। একসঙ্গে কত চিতা জ্বলছে—ধূ ধূ ধূ—আগুনের গর্জ্জন শোনা যায়, চোখে লক লক জিহ্বা দেখা যায়, নাকে আসে বিশ্রী একটা গন্ধ।

অসিত আজকাল যে-ভবিষ্যৎ ভাবে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে এইখানে। প্রথম প্রথম অসহ্য মনে হতো, এখন সয়ে গেছে—হরিবোল শব্দটা শুনে আর সে চমকে ওঠে না।

এই তো দেহের পরিণাম, এরই জন্যে মানুষ কত কিনা করে। কিন্তু কেন—কেন এসব, কি দরকার এ সবের?

সেদিন গঙ্গার ঘাট হতে ফিরবার সময় সে ছিল খুব অন্যমনস্ক ; আজই শ্মশানে দেখে এসেছে—এক অভাগিনী মায়ের মর্ম্মভেদী হাহাকার, তার আছড়ানী—

"গেল, গেল—"

অকস্মাৎ কি যে হয়ে গেল বুঝা গেলনা, কিন্তু খানিক পরেই এলো অ্যাম্বুলেন্স, মূর্চ্ছিত অসিতকে উঠানো হল তাতে।

জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে পাঁচমিনিট আগে সে কত কি-ই না ভাবছিল, সত্য তার সত্যতার প্রমাণ দিলে।

আজ যদি হসপিটালে অসিত মারা যায় কেউ জানবে না; আর জানলেও কেউ নেই যে দুটি ফোঁটা চোখের জল তার জন্যে ফেলবে, কেউ তাকে মনেও করবেনা। কে সে? অগণ্য বিন্দুর মধ্যে অতি নগণ্য অতি ক্ষুদ্র একটী বিন্দুমাত্র, কতটুকু মূল্য তার? ধরণীর বুকে জন্মে সে কতটুকু দিতে পেরেছে, কতটুকু ঋণশোধ করেছে? একফোঁটা জল মাটিতে পড়তে পড়তে শুকিয়ে যায়, ধরিত্রীর আকণ্ঠ পিপাসা তাতে মেটে কি? সে জলের এতটুকু মূল্য নাই, তাই তার দাগও থাকে না।

অসিত প্রথম যখন চোখ মেললে তখনও তার চোখে স্বপ্নের ঘোর—সে যেন অতি শিশু, মায়ের কোলে শুয়ে থাকে। সামনে যত না কিছু দেখা যায় সবই অপরিচিত, কোনটা কি কাজে লাগে তার শিশু-মনের কাছে তা অপরিজ্ঞাত।

একটু নড়ে সে দেখলে—না, সে বড় প্রকাণ্ড বড়। সামনে যা রয়েছে সবই তার জ্ঞাতের মধ্যে, টেবল, ঔষধ, বিছানা—কোনটাকেই চিনতে তার বাকি নাই।

সে উঠবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা।

পাশ হতে কে মিষ্টকণ্ঠে বললে, "এখন উঠবেন না, আরও দুদিন আপনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, ভালো হয়ে যাবেন।"

আরও দুদিন?

অসিত চোখ মুদলো—শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কোথায়, আমার কি হয়েছে।"

পাশে যে ছিল সে উত্তর দিলে, "মোটর অ্যাক্‌সিডেণ্ট—আপনি আহত অবস্থায় আছেন।"

"ওঃ" অসিত চোখ মুদলে—

(৩১)

কতক্ষণ—কতক্ষণ যায়।

বুকের মধ্যে হাতুড়ির আঘাত চলে—হার্ট প্যালপিটেশন—নার্শের আহ্বানে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে ঔষধ দিলেন।

অসিত চোখ মেললে—

জিজ্ঞাসা করলে, "কতদিন এরকমভাবে আছি?"

পাশে যে ছিল সে উত্তর দিলে, "আজ সাতদিন।"

সাতদিন—এ যেন সাতটী মুহূর্ত্ত। সাতটা দিন, অত দীর্ঘ সময় এমনইভাবে চুপে চুপে কেটে গেল? দিনের প্রতিটী মুহূর্ত্তে কত মূল্যবান—কাজ করে বেড়িয়ে দেখেশুনে মানুষ সার্থক করে তোলে এই মুহূর্ত্তগুলিকে, সেই অমূল্য মুহূর্ত্তের সমষ্টি প্রকাণ্ড বড় বড় সাতটা দিন—এমন নিঃশব্দে এলো—আবার চলেও গেল।

অসিত আবার চোখ মেললে—

জিজ্ঞাসা করলে, "আমি কোথায় আছি?"

উত্তর হল, "হস্‌পিটালে—"

হসপিটালে, ডাক্তার, নার্শ—কত কথাই মনে হয়।

হ্যাঁ—এজন্য সে তো প্রস্তুত। সে জানে তার বিছানা পাতা হবে এইখানে, নার্শ করবে তার সেবা, ডাক্তার করবে তার চিকিৎসা। তারপর যখন সব শেষ হয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি চিরদিনের জন্য স্থির হয়ে আসবে, তখন আসবে মুর্দ্দফরাস—নিয়ে যাবে টেনে।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি নার্শ?"

উত্তর পাওয়া গেল না।

পাশ দিয়ে ভারি জুতোর শব্দ করে এক ডাক্তার চলছিলেন, সঙ্গে চলছিল দুটি তরুণী নার্শ। তাদের হাসিগল্প অবিশ্রান্ত চলছিল—যাতে বোঝা যায় না এটা হসপিটাল, এখানে শত শত রোগী রোগ যন্ত্রণা ভোগ করছে, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

সকল মানুষের অন্তর সমান নয়। কেউ বা অতি অল্প ঘটনায় অধীর হয়ে পড়ে, কেউ বা অনেক বেশী আঘাতেও শক্ত হয়ে থাকে। মন কারও অত্যন্ত দরদী, কারও অতি কঠোর।

পাশ হতে আর্ত্ত-কণ্ঠে একজন রোগী ডাকলে—"ডাক্তারবাবু, একটু জল দিতে বলুন, একটু ঠাণ্ডা জল। একঘণ্টা হতে জল চাচ্ছি, কেউ এতটুকু দিলে না ডাক্তারবাবু—।"

ডাক্তার সোজা বার হয়ে গেলেন, দূর হতে হাসিগল্পের গুঞ্জনটাই ভেসে এলো। রোগীটির মুখ হতে একটা আর্ত্ত সুর বার হল—"ইয়া আল্লা, খোদা—মেহেরবান—"

অসিত মাথাটাকে ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে লুঙ্গিপরা এক বৃদ্ধ, একখানা পা' তার কাটা গেছে।

হতভাগ্য দরিদ্র—

জাতি হিসাব এখানে নাই, থাকতেও পারে না; যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ মানুষ মানুষ, মরে গেলে তার দেহটাকে নিয়ে যা তা করা যেতে পারে—তাই কেউ দেয় কবরে, কেউ করে পুড়িয়ে ছাই। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হয়ে গেছে এখানে, তাই এ স্থান মহাতীর্থ। এখানে মানুষ একহাতে জীবনের, অন্য হাতে মরণের গলা জড়িয়ে ধরেছে, হিন্দু মুসলমান খৃশ্চান সব এখানে এক।

ভেদ তবু হয় ধনী দরিদ্রের, ওজন হয় টাকার, তাই মানুষই পায় প্রাণপণ সেবাযত্ন, আবার মানুষই পায় অবহেলা তাচ্ছিল্য। একই জায়গায় তফাৎ এত, পার্থক্য প্রতিপদে।

বায়স্কোপের ছবির মত অসিতের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল তার জীবনের পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা। বাড়ীতে হয় তো অনেক কয়টী পোষ্য, এই বৃদ্ধ দিন খেটে পারিশ্রমিক আনে। মনিবের যথেষ্ট বিশ্বাসী, হিতকারী, মনিব ভালোওবাসেন। অসাধ্য কোনও কাজ করতে গিয়ে কোনও রকমে পা'খানা গেছে; মনিব হয় তো অনেক দয়া করে সোজা পাঠিয়ে দিয়েছেন সরকারী হসপিটালে।

সে ভালো হবে, এখান হতে ফিরে যাবে; তখনও তাকে নিজের এবং পরিবারের জীবিকার্জ্জনের ভাবনা ভাবতে হবে। কিন্তু কিই বা করবে সে? একখানা টানা গাড়ি হয় তো তাকে করতে হবে, অথবা পথের ধারে বসে চাইবে ভিক্ষা।

গ্রামের রাজেন মাঝির কথা মনে পড়ে।

জমীদারের বরকন্দাজ, শরীররক্ষক—সোজা কথায় জমীদারের দক্ষিণ হস্ত। দেহে অসীম শক্তি, বুকে অসীম সাহস, একটা লাঠি ধরে দাঁড়িয়ে একটা হুঙ্কার ছাড়লে একশো লোক ভয়ে পালায়।

জমীদার মহলে গিয়ে কাছারীতে রয়েছেন, গভীর রাত্রে ডাকাতেরা এসে কাছারী আক্রমণ করে। সে সময় যদি রাজেন না থাকত, জমীদারের প্রাণও যেত।

সে একাই সকলকে তাড়িয়েছিল, কিন্তু তাদের একটা লাঠিতে তার দুই পাটি দাঁতশুদ্ধ চোয়াল হয়ে পড়েছিল অচল; জমীদার নিজের কর্ত্তব্যপালন করেছিলেন তাকে হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়ে; এর বেশী আর কিছু আশা রাজেনের পক্ষে করা অস্বাভাবিক। তারপর রোগে পঙ্গু অবস্থায় রাজেন যখন পূর্ব্ব-মনিবের দরজায় ভিক্ষার্থী হয়ে দাঁড়াল তখন মনিব তাকে চিনতে পারলেন না।

এই মানুষের দস্তুর। একটা কথা আছে—'কাজের সময় কাজি, আর কাজ ফুরালেই পাজি।' এটা কেবল ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করে উল্লিখিত হলেও—খাটে সবারই বেলায়।

যতদিন শক্তিসামর্থ্য আছে, আদর ততদিনই—তারপর কেউ কারও নয়।

অসিত গুণ গুণ করে সুর ভাঁজে—

আসা যাওয়া জীবের স্বকর্ম্ম গতিকে,
কে রোধিবে চক্র অনন্ত গতিকে,
যাওয়া আসার পথে কার বা সাথী কে—
যেন পথিকে পথিকে পথের আলাপন।

পথে ফেলে আসা কারও কথা, কোন জিনিসের নামও মনে থাকে না—এই জীব মাত্রেরই বিশেষত্ব।

আদিম যুগে যখন বিবাহপ্রথা ছিল না—তখন নর-নারীর যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতো—বড় হয়ে নিজের পিতা-মাতাকে চিনবার কোন নিদর্শনই তাদের থাকতো না; একথা সহজেই মেনে নেওয়া যায় জন্তুদের দেখলে—তাদের প্রকৃতি অধ্যয়ন করতে পারলে। ইংরাজিতে প্রবাদ আছে—"আউট অব সাইট্, আউট অব মাইণ্ড"—এ প্রবাদ অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

কাজ—কাজ—যতক্ষণ শক্তি থাকবে, সামর্থ্য থাকবে, কেবল কাজ কর—শুধু কাজ কর। নিজেকে নিঃশেষে ঢেলে দাও, মুছে ফেল আপনার অস্তিত্ব।

সুন্দরী ধরণী, তোমার গড়া সবই সুন্দর, সুন্দর নয় মানুষের মন—যা নিয়ে তোমার সব কিছু। এই মন নিয়ে রচিত হল কাব্য উপন্যাস গাথা—এই মন নিয়ে চললো ঝগড়া বিসম্বাদ—হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা; ভালোবাসা অথবা ছলনা—সবই তো এই মন নিয়েই। মনের নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান চললো, কত কূট প্রশ্ন জাগলো, তর্ক উঠলো, সমাধানও হল কোন একরকমে—কিন্তু সাইকোলজি দিল না ঠিক সন্ধান, একটা দেখাতে নিয়ে এলো আর একটা।

অসিত একটু হাসলে।

মানুষের দেওয়া বেদনার আঘাত সইবার ক্ষমতা ভগবান তাকে দিয়েছেন এবং আঘাত সয়ে সয়ে সইবার জন্য সে প্রস্তুতও হয়ে থাকে। এখন সে ভাবে—মানুষ কেন ব্যথা পায়—কিসের জন্য সে সয়ে যায় সব?

মানুষ মানুষই, দেবতা নয়। মানুষ ধুলার ধরণীতে বাস করে, ধূলামাটি মাখে, এখানকারই সুখদুঃখ পেতে সে অভ্যস্ত হয়ে থাকবে।

সবাই এ জানিত-সত্যের কথা জানে—কিন্তু তবু তারা কি পাওয়ার আশা করে? তবু তারা কতখানি চায়, কি পেলে তারা খুসি হয়?

অসিত হেসে ওঠে—হো হো হো—

পাশের বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোকটী চমকে উঠে তার পানে চাইল, মুহূর্ত্তের জন্যও তার পায়ের যন্ত্রণা সে ভুলে গেল।

অন্ধ বেডের রোগী শিউচরণ তার পাশের বেডের রাম দোবেকে সম্বোধন করে বললে—"বাউরা হো গিয়া—"

কথাটা অসিতের কাণে আসে না। সে নিঃশেষে সমস্ত বেদনা মুছে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। পারে কিনা সে জানে, তবু সে শান্তভাবে ঘুমিয়ে পড়ে।

স্বপ্ন দেখে—কার কোলে তার মাথা রয়েছে, কার চোখের জল ঝরে ঝরে তার মাথায় পড়ছে, কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে।

কে সে—বাণী—মেনকা—?—

অসিতের আরো ঘুম আসে—গভীর ঘুম—এখন বোধ হয় কঠিন আঘাত করলেও তার ঘুম ভাঙ্গবে না।

(৩৪)

নার্শ আসে ঔষধ খাওয়াতে—

রোগীর ঘুম ভাঙ্গে না দেখে সে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কপালের উপর হাতখানা আস্তে আস্তে রেখে সে ডাকলে "উঠুন, ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে যে।"

দূরাগত বাঁশীর সুর, মনে হয় আজন্মপরিচিত।

অসিত চোখ মেললে; বিস্ময়ে সে কণ্টকিত হয়ে উঠলো—"একি—মেনকা—তুমি?"

সেই মেনকা, সেই বস্তীবাসিনী মেনকা—যে কারখানায় কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই কুড়াত অজস্র ঠাট্টা তামাসা। এ সেই মেনকা, কিন্তু কি অসম্ভব পরিবর্ত্তন এসেছে তার মধ্যে।

মেনকা হাসতে গেল, কিন্তু হাসি ফুটলনা, তার চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল।

তার হাতখানা অসিতের মাথার পরে তখনও ছিল, সেখানা যে সরাতে হবে সে জ্ঞানও তখন তার ছিল না। অসিত সেই হাতখানার পরে আস্তে আস্তে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "তুমি কাঁদছো কেন মা; তোমার যে সে দুঃখের অবস্থা গেছে, তুমি যে মানুষ হয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছ এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।"

মেনকা নিঃশব্দে কেবল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অসিত একটী কথাও বললে না, চোখ মুদে পড়ে রইল। অনেকক্ষণ ফুলে ফুলে কেঁদে মেনকা নিজেই চুপ করলে।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, "এখন কেমন আছ মেনকা—?"

আর্দ্রকণ্ঠে মেনকা উত্তর দিলে, "মোটেই ভালো নয় বাবা। আমি তো এ চাই নি, আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর ভার বইতে পারছি নে।"

অসিত একটু হেসে বললে, "পাগল, ক্লান্তি কিসের, কি ভার তুমি বইতে পারছো না?"

মেনকা শূন্যদৃষ্টিতে কোনদিক পানে চেয়েছিল; তার পর হঠাৎ যেন তার জ্ঞান ফিরে এলো, বললে, "ওষুধ খান বাবা—"

অসিত ঔষধ খেলে।

একটা হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলে মেনকা বললে, "বাস্তবিকই এ আমি চাই নি বাবা। কেবল উপায় ছিল না বলেই এসেছি, যদি উপায় থাকতো—"

সে চুপ করলে।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি বাড়ী ফিরে যাও নি মেনকা—?

মেনকা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলে, "গিয়েছিলুম, কিন্তু জায়গা কোথাও মিললো না বাবা, সবাই তাড়িয়ে দিলে।"

একটু থেমে—ইতস্ততঃ করে সে বললে, "আচ্ছা বাবা—তার—সেই কানাইয়ের কোন খবর আপনি জানেন কি?"

অসিত মাথা নাড়লে—"না, আমি কারও কোনও খবর পাই নি।"

মেনকা মাথা নীচু করে রইল, তার চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগল। অসিত করুণাপূর্ণনেত্রে তার পানে কেবল তাকিয়ে রইল।

কোথায় ফুটেছিল একটী সুন্দর শুভ্র যুঁই ফুল—অনাঘ্রাত, নির্ম্মল, পবিত্র; তার পাপড়িতে এতটুকু দাগ ধরে নি, বাতাসে দুলে সে কেবল সুগন্ধ বিকীর্ণ করতো। নির্দ্দয় মানুষ তাকে সইতে পারলে না—নিঠুর হাতে সে তুলে নিলে তাকে, তার সমস্ত গন্ধ উপভোগ করে তাকে দলে পিষে ফেলে রেখে গেছে পথের পরে—লক্ষ পথিকের পায়ের তলায়।

দুর্ভাগিনী নারী তবু আজও তাকেই ভালোবাসে, আজও সকল কাজের অবসানে যখন শ্রান্ত দেহখানা বিছানায় ছড়িয়ে দেয়, তখন বড় পরিচিত সেই একখানা মুখই মনে পড়ে যায়। হয় তো যে সব রোগী এখানে আসে প্রত্যেকেরই মুখের পরে তার সতৃষ্ণ দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নেয়, সব আশা ছেড়েও একটী আশার ক্ষীণ সুর তার বুকে বাজে—যদি সে আসে, যদি কোন দিন তার দেখা মেলে।

প্রেম নাকি মরে যায়—কেউ কেউ এ কথা বলে থাকেন। কিন্তু সত্যই কি প্রেম মরে? যদি অনাবিল প্রেম হয়, সে প্রেম মরে না—মানুষ মরে যায়, তার স্মৃতি থাকে। তাই বাইরের সব আকর্ষণ হয়ে যায় মিথ্যা, প্রেমই হয় সত্য এবং সুন্দর।

সেই কানাই—যে পাষণ্ডটা মেনকাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে ভুলিয়ে তার সত্য ভালোবাসার সুযোগটুকু নিয়ে তাকে পথে বার করে এনেছে, তার'পরে কতই না অত্যাচার নির্য্যাতন করেছে, তবু সেই কানাইকেই সে আজও ভালোবাসে, আজও সেই পাপিষ্ঠটাকে সে মনে মনে পূজা করে। ভগবানের আশ্চর্য্য বিধান।

"আবার আসছি—" বলে মেনকা তাড়াতাড়ি চলে গেল। তাকে অনেক রোগীর কাছে যেতে হবে, দেখতে হবে, ঔষধ খাওয়াতে হবে, একটা রোগী নিয়ে থাকলে চলবে না।

শুধু কানাই একা নয়, এমন লোক আরও ঢের আছে যারা ভালোবাসার সুযোগ এতটুকু নিয়ে মেয়েদের নিয়ে যা খুসি তাই করে, তাদের দিয়ে যা খুসি-তাই করায়।

অসিত খোঁজ নিয়ে জানতে পারলে এই নার্সটীর পরে রোগীরা কতখানি আস্থাবান। সাধারণ নার্স হতে এ একেবারেই বিভিন্ন ; ডাক্তারেরাও এর সঙ্গে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলেন।

অসিত বার বার মনে মনে বলতে লাগল—হবে না কেন, না হওয়াটাই যে বিচিত্র ছিল। এ যে মেনকা, গ্রামের মেয়ে, বাইরের আবহাওয়ায় এর মন গঠিত হয় নি, এর চিন্তাধারা পরিপুষ্ট হতে পারে নি। এই মেয়েই অন্য রকম হতো—যদি সে পশ্চিমের আবহাওয়ায় এতটুকু বেলা হতে মানুষ হতো।

আঃ, সব মেয়েই যদি মেনকা হতো—

অসিত চুপ করে পড়ে থাকে।

কয়েকটা দিন পরে অবশেষে সত্যই এলো তার মুক্তির দিন।

মেনকা এসে দাঁড়াল।

অসিত বললে, "চললুম মেনকা—"

মেনকা একটা নিঃশ্বাস ফেললে—"হ্যাঁ, আসুন বাবা। আমার একটা কথা—"

সে যেন কি বলতে চায়, কথাটা মুখে আনতে সঙ্কোচ লাগছিল বোধ হয়।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, "কি বলতে চাও বল—।"

মেনকা নতমুখে বললে, "আপনি একবার দেখবেন বাবা, সে এখনও কি সেখানে কাজ করছে, না কোথাও চলে গেছে ? যদি তার খোঁজটা পান, আমায় একবার—"

সে চুপ করে গেল।

অসিত গম্ভীরমুখে বললে, "হ্যাঁ, যদি পাই তোমায় জানাব। কিন্তু কিই-বা হবে তা জেনে ? যে লোকটা তোমার সব ঘুচিয়েছে, যার জন্য তোমায় আজ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে এই হাসপাতালে নার্সিং করতে আসতে হয়েছে, কি হবে আর সে পাপিষ্ঠটার খোঁজ নিয়ে ?"

মেনকা মুখ তুললে—

তার দুইটী চোখে জল টল টল করছে, আশ্চর্য্য যে উপচে পড়ে নি। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "পাপিষ্ঠ হলই বা, তবু সে—তবু—"

অসিত রাগ করে বললে, "তবু আবার কি ? যে হতভাগা ঘর হতে কোন মেয়েকে প্রলোভন দেখিয়ে টেনে বার করে এনে ছেড়ে দেয় কতকগুলো পশুর সামনে—নিজে যায় পালিয়ে—তাকে তবু ক্ষমা করতে বল তুমি ? না মেনকা, এ অনুরোধ তোমার নিষ্ফল—সে ক্ষমার অযোগ্য। চোর, ডাকাত, এমন কি নরহন্তাকেও আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু যে মহাপাপিষ্ঠ কোনও দুর্ভাগিনী মেয়ের ইজ্জত, সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। এর চেয়ে কেন সে তোমার বুকে একখানা ছোরা একেবারে বসিয়ে দিলে না—সব জ্বালা মিটে যেত। এ রকম করে কেটে কেটে নুন দিয়ে জ্বালানোর কারণ কি ছিল ?"

মেনকা কিছু বলতে পারে না, কেবল তার চোখ ছাপিয়ে জলের স্রোত গড়িয়ে পড়ল।

অসিত কোমলকণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, কথা দিচ্ছি, যদি তার খোঁজ কোনোদিন পাই, তুমি যেখানেই থাক আমি তোমায় জানাব। আজও তুমি তার কথা মনে করে রেখেছ, তাকে ঘৃণা কর নি—এই শুধু আমার কাছে আশ্চর্য্য বলে মনে হচ্ছে। আজ হয় তো তাকে ক্ষমা করব—সে শুধু তোমারই জন্যে, তার জন্যে নয়।"

মেনকা কেবল অশ্রুপূর্ণনেত্রে তার পানে চেয়ে রইল।

অসিত লাঠি ধরে আস্তে আস্তে বার হল।

আবার সেই পথ—

যার শেষ নাই, অসীম অনন্ত—।

একটী পাইও আজ অসিতের পকেটে নাই। পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, গায়ে তেমনই ছেঁড়া একটা জামা, তবু সে ভদ্রসন্তান, প্রশংসার সঙ্গে বি-এ পাস করেছে।

এ ডিগ্রিলাভ তার গর্ব্বের নয়—কলঙ্কের, সে প্রকাশ করে না, সে কাউকে জানায় না, কিন্তু তবুও মনের সংস্কারকে সে তো একেবারে মুছে ফেলতে পারে নি—তবু সময় সময় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

অসিত পথ চলে।

কত লোকই চলেছে; কেউ যাচ্ছে কাজ করতে, কেউ যাচ্ছে কাজের চেষ্টায়। ওই যে ছেলেটী মলিনমুখে একতাড়া কাগজ হাতে নিয়ে হন হন করে চলেছে ওকে অসিত চেনে। বৎসর খানেক আগে ও ছেলে এম-এস-সি ডিগ্রি নিয়ে বার হয়েছে।

কিন্তু কি হল এম-এস-সি ডিগ্রি নিয়ে? চাকরীর বাজারে আজ এম-এ ডিগ্রীর মূল্য এক পাইও নয়। সে ছিল একদিন—যখন কোনক্রমে কয়টী ইংরাজি ওয়ার্ড মাত্র মুখস্ত করে এ দেশের লোক ইংরাজের কাছে চাকরী পেয়েছে। আজ এম-এ পাস করেও লোকে খুঁজছে একটী চাকরী—কুড়ি ত্রিশ টাকা বেতন আজ তার পাসের সম্মান।

অসিত আর হাঁটতে পারে না, একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল।

সামনে পথ দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল, অনেকটা সতীশের মত।

সতীশ—সেই সরল উদারহৃদয় সতীশ—সে আজও হয়তো কোন জেলে বন্ধ রয়েছে। সে নিশ্চয়ই আজ শীর্ণ হয়ে গেছে, তাকে দেখে আজ কেউ চিনতে পারবে না।

জেলের সাধারণ কয়েদি, সে ঘানি টানে, পাথর ভাঙে, আরও হাজার কাজ করে। নানারকম জিনিসপত্র তৈরী, বাগানে কত রকমভাবে ফসল উৎপন্ন করা। জেলের বাইরে হাজার জিনিসের সঙ্গে সে সব মিশে যখন বাজারে বিক্রয় হয়, ক্রেতারা জানতেও পারে না—এইসব জিনিস কারা তৈরী করেছে, কত চোখের জল এসব ধুয়ে দিয়ে গেছে।

অসিত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

(৩৫)

পথের শেষ নাই, পথিক শুধু পথ চলে।

দাঁড়ানোর জায়গা আছে বই কি। এতবড় রাজধানী কলকাতা, খেতে কেউ কাউকে না দিক, দাঁড়ানোর জায়গাটুকু হতে বঞ্চিত করে না। বড় বড় বাড়ী—তিনতালা চারতলা হতে ছয় সাততলা পর্য্যন্ত তার ছায়া আছে, পথের ধারে দুই একটা সযত্নরোপিত গাছের ছায়াও আছে, তারপরে আছে মাঝে মাঝে দুই একটা পার্ক।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বা বসে থাক, কেউ চাইবে না—চলে যাবে। কাজ সবারই আছে, কেউ বসে নাই।

অসিত কিছু চাইতেও পারে না, তার হাত ওঠেনা।

অভিমান করবে—কিন্তু কার পরে?

সে অভিমান বুঝবে কে, জানবেই বা কে? ভগবান—কিন্তু কোথায় তিনি? আছেন কি নাই, তাই বা কে জানে—প্রমাণ কই?

কর্ম্মময় জীবন, তার ওপারে পাঠ্যজীবন—তার ওপারে বাল্যকাল।

একবার সে কপালে হাতটা বুলায়। সামনে আয়না থাকলে ক্ষতচিহ্নটা দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু নাই থাক—হাত বুলিয়ে ক্ষতচিহ্ন বোঝা যায়।

চাবুকের আঘাত—সেই সপাৎ করে শব্দ, আঘাতের বেদনা। অসিত হাত দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে চেয়েছিল, তারপর সে হাত দুখানা সামনে ধরে দেখেছিল।

লাল রক্ত—

হ্যাঁ, রক্তের রং লাল; বড়লোকের আর গরীবের রক্তে প্রভেদ কোথায়? এই যে সাদা চামড়া আর কালো চামড়ার পার্থক্য বাইরে দেখা যায়, রক্তে কিন্তু এতটুকু পার্থক্য নাই।

অসিত সেদিন অনেক কিছু ভাবতে পারত, কিন্তু ভাবতে সে পারে নি। ভাববার শক্তি তার তখন ছিলনা। সে শুধু ভাবছিল রক্ত কেন হল লাল, কেন হল না সবুজ নীল বেগুনি বা আর কোন রংয়ের? দুনিয়ায় রংয়ের তো অভাব নাই, কেবল লাল রংটাকে বীভৎস ও ভয়াবহ করবার জন্ত কেন রক্তকে লাল করা হল?

রক্তে মাদকতা আছে, সে জন্মিয়ে দেয় মনের মধ্যে ভয়। বেচারা ওলিয়ার হাড় মাংস সব যখন যন্ত্রদানবের কঠোর নিষ্পেষণে ছাতু হয়ে গিয়েছিল, যদি লাল রংয়ের রক্তের সঙ্গে মাখা না হতো, দেখতে অমন ভয়াবহ হতো না।

অসিত কপালে হাত বুলাচ্ছিল।

আজ যেন বড় বেশী রকম জালা করছিল মনে হচ্ছিল—

সদ্য আঘাতপ্রাপ্তের বেদনা। দরিদ্রের প্রতি ধনীর অবহেলা—ঘৃণা, নিষ্করুণ ব্যঙ্গ—উপহাস। ধনী কন্যাকে সে পাওয়ার আশা করেছিল, এ যে বামনের হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ধরা।

"এই ড্রাইভার, রোখো - রোখো—"

একটা বিকট গর্জ্জন করে সুদৃশ্য মোটরখানা অসিতের পাশেই দাঁড়িয়ে গেল।

ক্ষিপ্রহাতে দরজা খুলে বার হল একটা মেয়ে—

বড় পরিচিত মুখ—

কথা শুনেই অসিত সচকিত হয়ে উঠেছিল, অনেক বৎসর আগে সে এই সুরই শুনেছিল না? সেই একজনের মাত্র কণ্ঠস্বর—জীবনে আরও অনেকের কণ্ঠস্বর সে শুনেছে, কিন্তু সে কণ্ঠের সুরের রেস কেউই মুছতে পারে নি।

সন্ধ্যা হয়ে গেলেও পথের উজ্জ্বল আলোয় এবং পাশের দোকানগুলোর আলোয় সে আজ বহুকাল পরে মৈথিলীকে দেখে চিনতে পারলে।

তার পাশ দিয়েই মৈথিলী চলে গেল, ঢুকলো গিয়ে দোকানে, আলোয় তার মুখখানা স্পষ্টভাবে দেখা গেল।

আশ্চর্য্য, সে একটুও বদলায় নি, যেমন তেমনিই আছে। চোখে সেই মদিরদৃষ্টি, ঠোঁটে মৃদু চাপা হাসির রেখা, তেমনিই চলাফেরার উদ্ধত ভঙ্গি, সবই তেমনই আছে।

অসিত একটা নিঃশ্বাস ফেললে, আর একবার সে তার কপালে হাতটা বুলালে।

হাঁা, দাগটাও ঠিক তেমনই আছে—কমেও নি, বাড়েও নি। আজও জায়গাটা মাঝে মাঝে চিনচিন করে, মনে হয় ফেটে খানিকটা রক্ত বার হয়ে গেলে সে বাঁচে।

অবহেলা—ঘৃণা—তাচ্ছিল্য—

যেহেতু সে দরিদ্র।

ভগবান—

কিন্তু কোথায় ভগবান, কে ভগবান? অসিত ডাকবে কাকে, কে প্রতিবিধান করবে? ভগবান ধনীর—দরিদ্রের নয়।

মৈথিলী কি একটা কিনে ফিরছিল—অসিত তখন উঠেছে। যদি মৈথিলী তাকে সেখানে দেখতে পায়, যদি চিনতে পারে।

চিনতে যে পারবে না এ কথা ঠিক। মৈথিলী সেই মৈথিলী থাকতে পারে, কিন্তু অসিত সে অসিত নাই। অসিতের কেবল মনের পরিবর্ত্তনই ঘটে নি, দৈহিক পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ ঘটেছে।

তবু মনে হয়—বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার কপালের কাটা দাগটা—হয়তো সেই তাকে ধরিয়ে দেবে, তাকে চিনিয়ে দেবে।

না, সে চেনা দেবে না, সে দূরে চলে যাবে—যেখানে মৈথিলী নাই সেইখানে। আজ মৈথিলীকে সহ্য করার শক্তি অসিতের নাই, মৈথিলীর গায়ের বাতাস আজ বিষ ছড়ায়, ওর কথা কানে বিষ ঢালে; ওকে চোখে দেখলেও চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

চলতে চলতে তবু নিজের অজ্ঞাতসারে সে একবার পেছন ফিরে চেয়ে দেখলে—মৈথিলীর পাশে পাশে চলেছে একটী যুবক—মৈথিলীর কোন বন্ধুই হবে।

আজ অসিতের নেশা ছুটে গেছে, চোখের রং মুছে গেছে, অসিত নূতন জগতের নূতন মানুষ। প্রথম যৌবনে যা তার কাছে অতি ভালো লেগেছিল, তা আজ আর ভালো লাগে না।

কয়েকটী যুবক পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, তাদের চোখ ছিল মৈথিলীর দিকে।

একজন বলছিল—"আরে, ওকে চেনো না তুমি, ও যে আমাদের মিঃ মিটারের মেয়ে মৈথিলী মিটার—অতি বিখ্যাত মেয়ে। ওকে না চেনে এমন লোক প্রায় দেখতে পাবে না। অতি আপ্ টু ডেট, বিয়ে করে নি—করবেও না। আর সত্যি কথা বলতে কি—ওকে বিয়ে করবেই বা কে? ও রকম মেয়েদের সঙ্গে 'ফ্লার্ট' করাই চলে, জীবনের সঙ্গিনীরূপে ওকে নিয়ে ঘর করা চলতে পারে না। উঃ, কি 'ড্রিক'ই করে—বাপস্—কোন মেয়ে ওর সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলতে পারে না এ আমি বাজি রেখে বলছি। দেখছো না ওর পা ফেলার ভঙ্গি—"

ঘৃণায় অসিত আর পেছন ফিরলে না—তাড়াতাড়ি হন হন করে চললো—।

"এই—এই, হটো হটো—"

কি হচ্ছে এবং কে কি বলছে সেটা বুঝবার আগেই

পেছন হতে সুদৃশ্য একখানা মোটর এসে পড়লো একেবারে ঘাড়ের 'পরে—

অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ মাত্র শোনা গেল; সদ্য হস্‌পিটাল হতে মুক্ত দুর্ব্বল অসিত সরতে পারেনি, মিস মিটারের চমৎকার গাড়ীখানা এসে পড়ল তার 'পরে—

থস করে শব্দ করে মোটরখানা থেমে গেল, মিস্ মিটার তার সঙ্গীর সঙ্গে ব্যস্তভাবে নেমে পড়ল।

লোকজন জমে গেল চারিদিকে।

মৈথিলীর গোলাপী নেশা ছুটে গেল, সে নীচু হয়ে আহত লোকটার বিকৃত মুখের পানে তাকালে—।

"আ—অসিত—তুমি—ও মাই গড্—তোমাকে আমি চাপা দিলুম—?"

জীবনটা তখন আছে, জ্ঞানও তখনও ছিল, স্তিমিত ভাবটা আসছিল মাত্র; সকল জড়তা জোর করে দূর করে অসিত একবার চোখ মেললে—।

একবার মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু একটু হাসির রেখা তার মুখে ফুটে উঠে তখনই মিলিয়ে গেল। মৃত্যু তার চোখের উপর কালো একখানা পরদা টেনে দিলে।

দীর্ঘ জীবনের উপর যবনিকাপাত হয়ে গেল এইরূপে।

এতে দুঃখ করবার কিছু নেই, হয়তো ভাববারও কিছু নেই। পথের বুকে এমন ভাবে কত পথিক চাপা পড়ে—মারা যায়, সে তবু ভালো—তার সঙ্গে তার স্মৃতিও নিঃশেষ হয়। কিন্তু যারা বিকলাঙ্গ অবস্থায় পথের ধারে বসে সামান্য একমুষ্টি ভিক্ষা বা একটা পয়সার জন্য সকাল হতে রাত্রি পর্য্যন্ত চীৎকার করে, তাদের পানে তাকিয়ে অনেক পুরাতন অতীতের কথা মনে পড়ে।

কিন্তু এই দরিদ্রের ললাটলিপি—আজীবন পরিশ্রম করে—নিজেকে বিসর্জ্জন দেয় এই রকমে—একেবারে নয়—তিলে তিলে, একটু একটু করে—।

এরই নাম দারিদ্র্যের ইতিহাস।—

সমাপ্ত

ছয় বোন

শ্রীরাইমোহন সামন্ত এম্-এ

পণপ্রথা-বিড়ম্বিত বাংলাদেশে ছয়-কন্যা পিতার দুর্ভাগ্য লিখিতে বসি নাই; কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য—দেবী ভারতীর এই ছয় কন্যার কথা বলিতে আজ কলম ধরিয়াছি। ইংরাজিতে ইহাদের বলে আর্টস্, বাংলায় বলি আমরা কলা। ইংরাজিতে আর্ট কথাটার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক; যে কোন কাজে বুদ্ধি বা কৌশলের প্রয়োজন, তাহাকেই বলা হয় আর্ট; যেমন খেলা একটা আর্ট, মটর চালান একটা আর্ট, মাছধরা একটা আর্ট, মিথ্যে বলা চুরী করা একটা আর্ট, এক কথায় জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সব কিছুই আর্টশ্রেণীভুক্ত। এই সকল আজে বাজে নানানতর আর্ট হইতে পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য কাব্য চিত্র সঙ্গীত নৃত্য ভাস্কর্য্য স্থাপত্য ইহাদের বিশেষ করিয়া বলা হয় ফাইন আর্টস্। বাংলা "কলা" কথাটারও অর্থ কিছু ব্যাপক, যথা ছলা কলা। তাহা ছাড়া কথাটা এমন একটা কদর্থে বহুল প্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে তাহাকে অন্য কোন পরিশুদ্ধ অর্থে ব্যবহার করায় অসুবিধা আছে। তাই ইংরাজির অনুকরণে আমরা দেবী ভারতীর ছয় কন্যাকে চারু-কলা, সুকুমার-কলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। কলার পরিবর্ত্তে আবার 'শিল্প'-শব্দ ব্যবহার করিয়া কখনও কখনও বলি, "চারু-শিল্প," "সুকুমার-শিল্প"। কিন্তু চারু বা সুকুমার শব্দ সুকুমার হইলেও শিল্প কথাটি আমার কাণে বড় ভারী ঠেকে, উহাতে যেন প্রয়োজনের গন্ধ রহিয়াছে, উহা যেন ইংরাজি Industry শব্দেরই সুষ্ঠু অনুবাদ। বহু প্রচলনে হয়ত কথাগুলির অর্থ সঙ্কুচিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। তবে আমার মনে হয় সাহিত্য ধুরন্ধরগণ ফাইন আর্টস্এর অর্থজ্ঞাপক একটি সুন্দর শব্দ গঠন করিয়া বাংলায় প্রচলন করিলে ভাল হয়।

নাম যাহাই হউক নামীদের আমরা চিনি। কাব্য, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, নৃত্য—ইহাদের আমি 'ভারতীর কন্যা' বলিয়া শাস্ত্র-বিগর্হিত কিছু বলিয়াছি কিনা জানিনা; কিন্তু সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি—জগতের ছয়টি শ্রেষ্ঠ বিদ্যার তিনি জননী নন, তাহা ভাবি কি করিয়া? এই ছয় বিদ্যার পরস্পরের সহিত সাদৃশ্য অনেক, তাই ইংরাজিতে ইহাদের বলে Sister arts. আমাদের মানব সংসারে বোনদের মধ্যে যেমন অনেকখানি সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্যও কম

থাকেনা, ভারতীর এই ছয় কন্যার মধ্যেও তেমনি সাদৃশ্যও যতখানি—পার্থক্যও ততখানি। কোথায় তাহাদের মিল আর কোথায় তাহাদের প্রভেদ—তাহাই দেখিবার আজ চেষ্টা করিব।

ইহাদের মধ্যে বয়সে কে প্রাচীন তাহা লইয়া সময় নষ্ট করিব না কারণ পণ্ডিতেরা সে বিষয়ে একমত নন ; ইহাদের আবির্ভাবের ঠিকুজি কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের ভাগ্যেই মিলে নাই। উহাদের জন্মের পৌর্বাপর্য্য যাহাই হউক, ছয় বোনই যে চিরতরুণী—সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। বার্দ্ধক্য ইহাদের সকলেরই পরম শত্রু—বিধাতার বরে সময়ের অমোঘ হস্তাবলেপ হইতে ইহারা নিস্কৃত।

আনন্দাৎ খল্বিদং জগৎ, বিশ্বস্রষ্টার আনন্দের প্রকাশেই এই জগৎ। ছয় বোনের আবির্ভাবের গোড়াতেও মানব মনের উচ্ছ্বল আনন্দ। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিলেন, with the breath of His own spirit. ভগবানের মানস-পুত্রের মধ্যে তাঁহার এই সৃষ্টিপ্রবৃত্তি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গেল, মানব মনের উপ্‌ছে-পড়া আনন্দ হইতে জন্মগ্রহণ করিল এই ছয় বোন।

সৃষ্টির পথে ভগবানই মানুষের শিক্ষা-গুরু—তাঁরই সৃষ্ট জগতের কাছ হইতে মানুষ প্রথম পাঠ লইতে আরম্ভ করিল, ভগবানের সৃষ্টির অনুকরণেই মানুষের সৃষ্টি হইল সুরু। ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া হয়ত সে শিখিল নাচ, কোকিলের কাছে শিখিল হয়ত সে গান—সকাল সন্ধ্যার আকাশের বর্ণচ্ছটা দেখিয়া সে ধরিল তুলি—আপনারই দেহের সৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া গড়িল সে পাথরের মূর্ত্তি—জীবনের বিচিত্ররূপবহুল ঘটনা হইতে আরম্ভ হইল তাহার কল্পনার জগত। এরিষ্টটল বলিয়াছেন all art is mimesis অর্থাৎ সমস্ত সুকুমারশিল্পই অনুকরণ। কথাটা আজকাল আর কেহই মানে না ; তাহারা বলে আমরা নকল করি না—ভগবানের সৃষ্টিকে আমরা আরও সুন্দর করি। * ভগবানের জগতে কত গলদ, আমাদের আর্টের জগতে গলদ নাই, যেমনটি দরকার ঠিক তেমনটি করিয়া আমরা সৃষ্টি করি। ভগবানের গোলাপ সুন্দর মানি, কিন্তু আমাদের কাব্যের গোলাপ অপেক্ষা চিত্রের গোলাপ আরও সুন্দর ; ভগবানের নারী সুন্দর তাহাও মানি, কিন্তু তিলোত্তমা, উর্ব্বশী, শকুন্তলা, ডেসডেমনা কবিই সৃষ্টি করিতে পারে, ভগবান না। কথাটা সত্য, কিন্তু তবুও মানিতে হয় যে মানব মনের সৃষ্টি অনুকরণে আরম্ভ। An art is mimesis না বলিয়া all art begins with mimesis বলিলে এরিষ্টটল ঠিক কথা বলিতেন। মানুষের উদ্দেশ্য ভগবানের অন্ধ অনুকরণ করা নয়—প্রতিযোগিতায় তাহাকে হারান, তাঁর সৃষ্টির থেকেও আপনার সৃষ্টিকে সুন্দর করা, তার সব গলদ সারিয়া লওয়া। তাহাতে মানুষ কতকটা সক্ষমও যে হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হইতে বাধ্য ; সকল ক্ষেত্রেই যে পরে আসে তাহার সুবিধা কত। পূর্ব্ববর্ত্তীর অভিজ্ঞতার উপর সে দাঁড়াইতে পায়—তাহার ভুল সে বর্জন করিতে পারে।

প্রত্যেক কিছু'ই উদ্দেশ্য আছে। ছয় বোনের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি? আজকাল প্রায় অধিকাংশ লোকই মানেন যে ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ (expression) এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আনন্দ দান। অবশ্য দ্বিতীয়টিকে ঠিক পৃথক উদ্দেশ্য বলা চলেনা—ইহা প্রথমটিরই অবশ্যম্ভাবী ফল। প্রথম উদ্দেশ্য সফল হইলেই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সফল হইতে বাধ্য ; কোন কিছুর প্রকাশই চারুশিল্পের লক্ষ্য, প্রকাশ যদি সুষ্ঠু হয় তবে আনন্দফল মিলিবেই।

সাধারণভাবে আমরা যাহাকে প্রয়োজন বলি ছয় বোনের সম্বন্ধে সে প্রয়োজনের কথা আসেই না। প্রয়োজন চরিতার্থতায় যে আনন্দ, ছয় বোনের সেই নিম্নস্তরের আনন্দ লক্ষ্য নয়। প্রয়োজন ব্যতিরেকে, স্বার্থ-শূন্য যে আনন্দ তাহাই ছয় বোনের লক্ষ্য—এমন আনন্দ যাহা অন্য পাঁচজনের সহিত ভাগ করিয়া উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে—ভাগ করিয়া উপভোগ করিলে যে আনন্দ গণিতের নিয়ম অনুসারে কমে না—বরং বাড়িয়া যায়। ছয় বোনের মধ্যে স্থাপত্যেরই প্রয়োজনের সহিত কিছু সম্বন্ধ আছে, কিন্তু স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে তাজমহল তাহাও প্রয়োজনের খাতিরে তৈয়ারি হয় নাই। প্রয়োজনের যেখানে শেষ—চারু-শিল্পের সেখানে আরম্ভ। প্রয়োজনের প্রেরণায় মানুষ যাহা সৃষ্টি করে তাহাকে বলে craft—fine art নয়।

দেখিলাম উদ্দেশ্য উৎপত্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষায় ছয় বোন এক। কিন্তু ইহাদের manner of working বা কাজ করিবার ধরণ এক নয়। এই প্রভেদের অনেকখানিই তাহাদের বিভিন্নবাহনের বৈশিষ্ট্য হইতে উদ্ভূত। সেই বাহনের কথাই এখন বলি।

ছন্দময় বাণী কাব্যের বাহন, সুর তাল সমন্বিত ধ্বনি সঙ্গীতের বাহন, ছন্দময় গতি নৃত্যের বাহন, রেখা ও রং চিত্রের বাহন, প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, মৃণ্ময়, ভাস্করের বাহন ইট কাঠ, চুণ বালি পাথর স্থাপত্যের বাহন।

কাব্যের বাহন বাণী বলিলাম। বাণী অর্থে অর্থজ্ঞাপক শব্দ বুঝিতে হইবে। শব্দ বস্তু বা চিন্তা কিছুই নয়, ইহাদের প্রতীক মাত্র। কাজেই কাব্য একেবারে সোজা কিছু অনুকরণ করিতে পারেনা—একটু ঘুরাইয়া অনুকরণ করে। একটি ফুল যখন আমরা বলি—তখন আমরা একটা ফুলকে সোজা পাঠকের সামনে ধরিনা, মাত্র দুটি শব্দ তাহার কাণে যায় ; শব্দ দুটির নির্দ্দিষ্ট দুইটা অর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে ; পাঠক যদি সেই অর্থের সহিত পরিচিত হয় তবে তাহার মনে একটা পূর্বে দেখা ফুলের ছবি ভাসিয়া উঠিবে। বাংলায় অনভিজ্ঞ কোন বিদেশীর কাণে কিন্তু উহারা শব্দমাত্র, উহারা তাহার মনে কোন অর্থ লইয়া

---

* ষোড়শ শতাব্দীর কবিসমালোচক সিডনীর কাব্যের কৈফিয়ৎ হইতে সামান্য একটু উদ্ধৃত করি। তাঁহার মতে, Nature never sets forth the earth in so rich tapestry as divers poets have done—neither with pleasant rivers, fruitful trees, sweet-smelling flowers, nor whatsoever else may make the too much loved earth <u>more lovely. her world is brazen, the poets only deliver a golden.</u>

নীচের লাইন আমার দেওয়া—লেখক

পৌঁছাইবেনা—কাণ থাকিলেও বাংলা কাব্য সম্বন্ধে সে কালা। কাজেই দেখিলাম কাব্যের বাহন কেবল ধ্বনি বা sound নয়, অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা word ; এইখানে আর একটু কথা বলিবার আছে। কাব্য আমরা সর্ব্বদাই পাঠকের কাণে উচ্চারণ করিবার সুযোগ পাইনা—দূরত্ব তাহার প্রতিবন্ধক। তাই পাঠকের কাণে শব্দকে পৌঁছাইয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। সেই উদ্দেশ্যেই বর্ণমালার সৃষ্টি, ইহারা ধ্বনির সাংকেতিক চিহ্নমাত্র। সুতরাং দেখা গেল—লিখিত কাব্য বর্ণিত চিন্তা হইতে অনেকখানি দূরে। অন্ততঃ দুইটা সাংকেতিক আবরণে ঢাকা—লেখার আড়ালে ধ্বনি এবং ধ্বনির আড়ালে অর্থ। এই দুই সংকেত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইলে তবেই কাব্যের রূপ পাঠকের নিকট প্রকাশ পাইবে।

কাব্যের সহিত চিত্রের এইখানে তফাৎ। চিত্রে মাত্র একবার প্রতীকের আশ্রয় লওয়া হয় এবং সে প্রতীক যথাযথ বস্তুর আকারেরই অনুরূপ ; একটি ফুল বুঝাইতে যে ছবি আঁকা যায় তাহা ঠিক ফুলেরই আকৃতি বিশিষ্ট। কাজেই এই প্রতীকের অর্থ বুঝিতে শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, যাহারই চোখ আছে অন্ততঃ ছবিটা যে কিসের সে তাহা বুঝিতে পারে। চিত্র ও কাব্য হইতে স্থাপত্য বিভিন্ন—এই হিসাবে সে উহা কাহারও প্রতিরূপ নয় ; কোন সংকেতের প্রয়োজন নাই, উহা নিজেই একটা জিনিস। কাব্য, চিত্র ও স্থাপত্যের মধ্যে পার্থক্যটা বেশ পরিষ্কার হইবে—যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের "তাজমহল", "তাজমহলের" কোন চিত্র এবং প্রকৃত তাজমহল—ইহাদের পরস্পরের সহিত তুলনা করি। রবীন্দ্রনাথের "তাজমহল" যিনি বাংলা script (অক্ষর) এবং বাংলা ভাষা ভাল জানেন কেবলমাত্র তিনিই বুঝিতে পারিবেন ; যাঁহার চক্ষু আছে তাজমহল চিত্র দেখিয়া তিনিই বুঝিবেন যে চিত্রের বিষয়বস্তু একটা অপরূপ মর্ম্মরপ্রাসাদ ; আর সত্যকার তাজমহল ত নিজেই একটি অপরূপ মর্ম্মরপ্রাসাদ।

সঙ্গীতের বাহন ধ্বনি (sound)—সে ধ্বনি অর্থের প্রতীক হইতেও পারে—না হইতেও পারে, কারণ সঙ্গীতের শব্দগত অর্থটা আসল বস্তু নয় ; উহা উপরি পাওনা মাত্র। সেইজন্য সেতার, বেহালা, এস্রাজের সুরেলা ধ্বনি মানুষকে কাঁদাইয়া হাসাইয়া দিতে পারে। কোকিলের কুহু তানে স্বর আছে, সুর আছে, ব্যঞ্জনাগত অর্থও কিছু আছে হয়ত, কিন্তু শব্দগত অর্থ নিশ্চয় কিছু নাই। সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের এইখানেই পার্থক্য এবং এইখানেই মিল। প্রভেদ এই যে সঙ্গীতের নিজস্ব স্বরূপ যাহা, তাহা শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে না—যেমন কাব্যের নিজস্ব স্বরূপের জন্য শব্দের ধ্বনি সম্পদ (sound value) অত্যাবশ্যকীয় নয়। আবার মিল যখন উভয়ে উভয়কে সহযোগিতা করে—সঙ্গীতের সুরের ছাঁচে যখন অর্থপূর্ণ শব্দের সংযোগ হয়, কাব্যের ভাবমাধুর্য্য তখন সঙ্গীতময় সুমিষ্ট ধ্বনিতে প্রকাশ পায়। ছয় বোনের পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের কথা (reciprocation) পরে বলিতেছি। এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে—অমিশ্র (pure, abstract) সঙ্গীত যাহা তাহার বাহন অর্থ-অনপেক্ষ ধ্বনি (sound irrespective of sense)—যেমন অমিশ্র কাব্যের বাহন অর্থবাহী ধ্বনি (sound signifying sense) ; সঙ্গীতে ধ্বনিটাই আসল, কাব্যে ধ্বনির অন্তরালে অর্থটাই আসল।

আমাদের এই ছয় বোনের বাহনের পার্থক্য ছাড়া অন্য প্রধান পার্থক্য পটভূমির বিভিন্নতা। সেই দিক দিয়া ছয় বোনকে দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়। কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের পটভূমি সময়—চিত্র, ভাস্কর্য্য এবং স্থাপত্যের পটভূমি স্থান। কাব্য সঙ্গীত বা নৃত্য এক মুহূর্ত্তে প্রতিভাত হয় না। শব্দের পর শব্দ, সুরের পর সুর, ভঙ্গির (pose) পর ভঙ্গি সাজাইয়া তবে একটি সম্পূর্ণ কবিতা, সঙ্গীত বা নৃত্য গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অতি ছোট "কণিকা"র রূপ বিস্তারেও কিঞ্চিৎ সময় লাগে, সঙ্গীতের সঙ্কিপ্তসার গ্রামোফোন রেকর্ড-ও দুই মিনিটের কমে আপনার সম্পূর্ণতায় ধরা দেয় না, নৃত্যনিপুণ উদয়শঙ্করও নিমেষেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারে না। চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য কিন্তু এক লহমাতেই দর্শকের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠে ! ইহাদের প্রকাশের জন্য সময় লাগে না, লাগে স্থান। অবশ্য এই তিন বোনের মধ্যে এই সম্বন্ধে একটু প্রভেদ আছে। চিত্রের space is of two dimensions, plane এর উপরে রেখা ও রংএর দ্বারা চিত্রের বিস্তার ; ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের space is of three dimensions, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা তিনই আছে ইহার।

পটভূমির বিভিন্নতাগত একটা প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাল চলিষ্ণু, কাজেই যে তিন বোনের পটভূমি কাল, তাহারা গতিশীল। যাহা স্থানে প্রতিষ্ঠিত তাহা স্থাণু, গতিপ্রকাশ তাহার পক্ষে সুকর নহে। ছয় বোনের ক্ষমতাকে এই মূল পার্থক্য অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। কাব্যকে par excellence—art placed on time বলা যাইতে পারে। তাই কোন কার্য্য, ঘটনা বা চরিত্রের বিকাশ দেখাইতে কাব্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পটু। কীটস্ তাঁর Ode To The Grecian Urn কবিতায় চিত্রের যে অক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যেও সেই অক্ষমতা আছে। ইহারা কোন একটি বস্তুর একটিমাত্র রূপকে দেখাইতে পারে। সেইরূপ চিরকালের জন্য একরূপই থাকিবে—চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যে রূপের পরিবর্ত্তন নাই, বিকাশ নাই। চিত্রের শ্রীকৃষ্ণ চিরকালই মুখের কাছে বাঁশী লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে—সে বাঁশী আর কখনই বাজিবে না। রবীন্দ্রনাথ তাই ত ছবিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

"চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন,
কেন রাত্রি দিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছো এত দূরে
স্থিরতার চিরন্তঃপুরে।

ছয় বোনের আবেদনও একপ্রকার নয়। সঙ্গীত ও কাব্য আমাদের

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, বাকী চারিজনই আমাদের চক্ষুর ভিতর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ সঙ্গীত ও কাব্য* আমরা শুনিয়া আনন্দ পাই—চিত্র, ভাস্কর্য্য, নৃত্য ও স্থাপত্য আমরা দেখিয়া উপভোগ করি। সুতরাং যাহা শোনা যায় তাহা প্রকাশে সঙ্গীত ও কাব্যই অধিক দক্ষ, যেমন যাহা দেখা যায় তাহা প্রকাশে চিত্র ও ভাস্কর্য্য বেশি পটু।

টেনিসনের বিখ্যাত—

The moon of doves of immemorial elms
And murmuring of innumerable bees,

কপোত-কূজন, তরুমর্ম্মর এবং মধুকরনিকরগুঞ্জনের সম্মিলিত সুমধুর ধ্বনি যেন সোজা পাঠকের কাণের কাছে বহিয়া আনে। কোন চিত্রকরের ক্ষমতা নাই সে এই ধ্বনি সে ছবিতে ফুটাইয়া তুলিতে পারে। সেইরূপ ভারতচন্দ্রের—

টলট্টল, ছলচ্ছল, কলকল তরঙ্গীয় যে জলকল্লোল উত্থিত হয় তাহা চিত্রের নদীতে সম্ভবে না। Shellyর Ode To The West Windএর প্রথম ছত্রেই যেন ঝড়ের শব্দ কাণে আসিয়া লাগে, রবীন্দ্রনাথের—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা।

ইত্যাদিতে বর্ষার বারিপাত শব্দ যেন ধ্বনিত হইয়া উঠে। এইরূপ বহু কবিতার উল্লেখ করা যায়—যাহাদের ধ্বনি-ব্যঞ্জনা চিত্রের তথা ভাস্কর্য্য ইত্যাদির ক্ষমতার বাহিরে।

নদীর সঙ্গীতময় গতি, শতেক পক্ষীর সম্মিলিত সুমধুর কূজন, সমুদ্রের সুগম্ভীর শব্দ যেমন ছবিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায় না—সেইরূপ সকাল সন্ধ্যার বহুবর্ণ আকাশ, নক্ষত্রখচিত অপরূপ রাত্রি, নানা রঙের পুষ্পশোভিত সুন্দর উদ্যান, শ্যামলা বনানী, পদ্মপলাশাক্ষী নারী, ইহারা চিত্রকরের তুলিতে যেমনভাবে ধরা দেয় কবির কাছে তেমন ভাবে দেয় না। ভাস্কর্য্যের প্রসারক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অল্প, কারণ ভাস্করের হাতে রং নাই এবং বহু দৃশ্যের সৌন্দর্য্যই তাহাদের রঙের সমাবেশের জন্য। গঠনের সৌন্দর্য্যই ভাস্কর্য্যের উদ্দেশ্য, নরনারীর মূর্ত্তি ছাড়া সে আর বিশেষ কিছুতেই তাই হাত দেয় নাই। স্থাপত্যের উদ্দেশ্য কোন বস্তু বিশেষের রূপকে প্রকাশ করা নয়, abstract রূপকে গঠন করা। নৃত্যের উদ্দেশ্যও কোন বস্তুকে প্রকাশ করা নয়—বস্তু হইতে বিশ্লিষ্ট তাহার ছন্দটুকুকে ফুটাইয়া তুলা। স্থাপত্য ও নৃত্য—বস্তু বা চিন্তা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি পৃথক—কোন বস্তু বা চিন্তাকে উহারা directly প্রকাশ করিতে পারে না—ইহাদের প্রকাশ ক্ষমতার সবটুকুই নির্ভর করে indirect suggestionএর উপর।

ছয় বোনের আপন আপন এলাকার কথা বলিলাম। কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা আপনার এলাকার মধ্যে থাকিতে ভালবাসে না, মধ্যে মধ্যে একে অপরের এলাকায় যাইয়া একটু বাহাদুরী দেখাইয়া আসে। কাব্যই সেইদিক দিয়া সকলের চেয়ে বেশি চঞ্চল। সঙ্গীতের সুর চুরি করিয়া সে হয় musical, চিত্রের এলাকায় গিয়া কাব্য হয় colourful, picturesque, ভাস্কর্য্যের beauty in repose নকল করিয়া কাব্য হয় statuesque, গঠনের দিকে অতি মাত্রায় নজর দিয়া সে হয় architectonic এবং ছন্দের সহায়ে rythmic ত সে সর্ব্বদাই। অপর পক্ষে সঙ্গীত অর্থশূন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া কাব্যের ন্যায় ভাবে মধুর হইয়া উঠে; চিত্র, রেখা ও রংএর লুক্কায়িত ক্ষমতার দ্বারা গতি, সঙ্গীত, ভাবকে ব্যঞ্জিত করিয়া কবিত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। ইংরাজি pre-Raphaelite যুগে এই এলাকা ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই যুগে চিত্রকর কাব্য চিত্রিত করিতেন এবং কবি চিত্র লিখিতেন। ছয় বোনের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু যাতায়াত ও আদান প্রদানের প্রয়োজন তাহাই শোভন এবং সঙ্গত। মাত্রা ছাড়াইলে অক্ষমতা ধরা পড়ে, কারণ যার কর্ম্ম তারে সাজে কিনা!

* আজকাল অনেকে কাব্য মনে মনে পড়েন অর্থাৎ চোখ দিয়া পড়েন। ইহাতে কাব্য সম্পূর্ণ ধরা দেয় না—কারণ তাহার ধ্বনি-ঝঙ্কার কোন আভাষই পাওয়া যায় না; কাব্যকে সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে হইলে তাহাকে কাণে শুনিতে হইবে। ইহা যদি না মানা যায় তবে সঙ্গীতের স্বরলিপিতে চোখ বুলাইয়া সঙ্গীত উপভোগ হইতেছে বলিতে হইবে—লেখক।

বিঠলনগর দর্শন

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস্-সি

কংগ্রেস নির্দ্দেশ করিয়াছেন অতঃপর কংগ্রেস নগরে হইবে না, গ্রামবাসীদের সংস্পর্শলাভ উদ্দেশ্যে গ্রামপ্রান্তে হইবে। লক্ষলক্ষ নরনারী এই উপলক্ষে সমাগত হইয়া থাকেন; তাহাদের বাসস্থান, সভার স্থান ও জীবনযাত্রার উপকরণ সরবরাহের জন্য তাই প্রতিবৎসর এক একস্থানে এক একটি সাময়িক নগর গড়িয়া উঠে। গতবৎসর ফৈজপুরে, এবার হরিপুরের একপ্রান্তে এই নগর গঠিত হইয়াছিল। এই হরিপুর গুর্জ্জরভূমিতে সুরাট হইতে ৩৯ মাইল দূরে তাপ্তির তীরে অবস্থিত। তাহার দুই মাইল দূরে একটি জঙ্গলসমাকীর্ণ স্থানে সভার স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই নূতন নগরের নাম গুর্জ্জরবীর বিঠলভাই প্যাটেলের নামানুসারে বিঠলনগর।

এই বিঠলনগর পত্তনের নানা বিবরণ বহুদিন ধরিয়া সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম। ৫।৬ লক্ষ লোক সমবেত হইবে, দূর রেলষ্টেশন হইতে এই তীর্থে আগত যাত্রীদের আনিবার জন্য শত শত বাসের ব্যবস্থা হইতেছে, প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে জলসরবরাহের আয়োজন হইতেছে, বৈদ্যুতিক আলো সুরাট হইতে আনা হইতেছে এবং বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জঙ্গল কাটিয়া সমতল করিয়া তাহার উপর নানা আবাস রচিত হইতেছে, শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু নগরের শ্রী সম্পাদনের জন্য এই ৫১-বর্ষীয় জাতীয়সম্মিলনীতে ৫১টি তোরণ রচনায় নিযুক্ত আছেন। এই তীর্থদর্শনের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

৯ই ফেব্রুয়ারী বোম্বে মেলে রওনা হইলাম। পরদিন

অপরাহ্নে জব্বলপুর অতিক্রম করিয়া ভূশায়ালের দিকে অগ্রসর হইলাম। ভূশায়ালে রাত্রি প্রায় ১টায় নামিলাম। ট্রেণ বদল করিয়া মাধি যাইতে হইবে।

ভূশায়ালে আমাকে টিকিট করিতে হইবে। কোথায় টিকিট করিতে হইবে ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া পশ্চাত হইতে ইউরোপীয় পোষাক পরিহিত এক ভদ্রলোক আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইনি অনেক দূরস্থিত টিকিট ঘরে আমাকে লইয়া গেলেন, নিজে টাকা ভাঙাইয়া দিলেন, ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া মাধিগামী গাড়ীতে জিনিসপত্রসহ তুলিয়া দিলেন, গাড়ী ঝাড়ু দেওয়াইয়া, মশা তাড়াইবার জন্য পাখা খুলিয়া দিয়া বিছানা করাইয়া দিলেন। ইঁহার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি ইউরোপীয়ই বটে, পূর্ব্বে সৈন্যদলে ছিলেন, এখন Watch and Ward officer। ২০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার রাজপথে সৈনিকের অসৌজন্য নিত্যকার ঘটনা ছিল। আজ আমি কংগ্রেস যাত্রী বলিয়াই কি সৈনিকের কাছে এত সহায়তা পাইলাম। কালের এই পরিণতি। ১২শত মাইল আসিয়াছি, আরও ১৮২ মাইল দূরে মাধি।

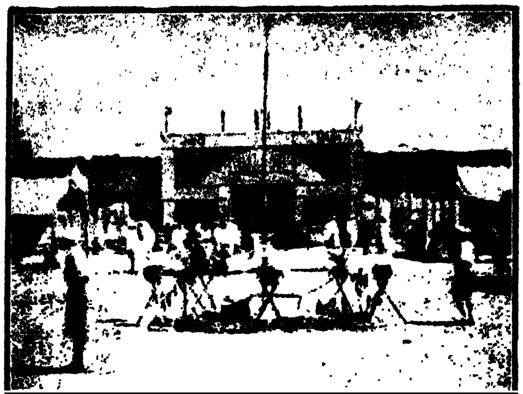
১১ই ফেব্রুয়ারী—এই ট্রেণ ধীরগামী। দুইধারে তুলার ক্ষেত, পর্ব্বতে বেষ্টিত। অমলনার, নান-দরবার ছাড়িয়া বিকালে মাধি পৌছিলাম। ক্ষুদ্র ষ্টেশন, কংগ্রেস উপলক্ষে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। সাময়িক নানা গৃহ, নানা আচ্ছাদন ও বাজারের পত্তন হইয়াছে। প্রতি মিনিটে এক একখানি বাস যাত্রী লইয়া বিঠলনগর অভিমুখে রওনা হইতেছে। ১১ মাইল পথ, পীচ ঢালা নবনির্ম্মিত পথের উপর দিয়া ৩০ মিনিটে বিঠলনগরে পৌছিলাম। দূরে দেখিয়া গেলাম পুলিশের ছাউনী রহিয়াছে, বিঠলনগরে তাহাদের প্রবেশ নিষেধ।

সন্ধান করিয়া স্বয়ংসেবক প্রদর্শিত পথে নির্দ্দিষ্টস্থানে উপনীত হইলাম। উপরে চাটাইয়ের ছাউনী, পার্শ্বে চাটাইয়ের বেড়া—দড়ির খাটিয়া। চাটাই সব একপাট, বাহিরের আলো ঝিকমিক করিতেছে, উপরে চাঁদের আলো।

আহার হইল—রুটি, ভাত, ডাল, নিরামিষ তরকারী, ঘি, খাঁটি পাতলা দুধ। মৎস্য মাংস নাই। কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজ কুচি ইহারা প্রত্যহ খায়, উহা নাকি নিরামিষ। রাত্রি বাড়িল, শীত বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। দিনে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ, রাত্রিতে দারুণ শীত।

১২ই ফেব্রুয়ারী—পরদিন প্রভাতে নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইলাম। বাঁশের লাঠির অগ্রভাগ চিরিয়া ঝাঁটা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাই লইয়া সেবক ও সেবিকারা নগর পরিষ্কার করিতেছে। চাটাই ঘিরিয়া পায়খানা ইতস্ততঃ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে পায়খানা করিয়া নিকটে রক্ষিত মাটি ঢাকা দেওয়াই নিয়ম। যদি কেহ অজ্ঞানতাবশত অন্যত্র মলত্যাগ করে তাহাও ইহারা পরিষ্কার করিতেছেন। এজন্য প্রচারপত্র সর্ব্বত্র লাগান হইয়াছে।

বিঠলনগরের ঠিক মধ্য দিয়া একটি মটর যাতায়াতের দৃঢ় পথ। দুই পার্শ্বে ধূলিময় চওড়া পায়ে চলা পথ। সেই



প্রদর্শনী মধ্যে খাদি ভবন

পথ দিয়া অগ্রসর হইলাম। ডাহিনে দর্শকভবন, বামে 'সি' বাজার। তারপর ডাহিনে প্রতিনিধিভবন অতিক্রম করিয়া কুটুম্ব নিবাস অর্থাৎ family quarters. ইহার পর সেবিকাদের ভবন, ভোজনগৃহ। তারপর বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির সভাগৃহ, প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যালয়, ডাক ও তার আপিস, প্রদর্শনী ভবন। তারপর জাতীয়পতাকা-চক ও শেষ হইল কংগ্রেস প্যাণ্ডাল।

দর্শকভবনে দেখিলাম, প্রতি গৃহে ছয়খানি খাটিয়া পড়িয়াছে; পারিবারিক গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান—রন্ধনশালা ও ভোজন গৃহ বিস্তীর্ণ; বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির গৃহ অতি সজ্জিত, প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যালয় উদ্যান সমন্বিত। ঝাণ্ডা (জাতীয় পতাকা) চকের পার্শ্ব দিয়া এবং বড় রাস্তায়

উপরস্থিত দুইটি তোরণ প্রদর্শনীর প্রবেশদ্বার। শিল্পী নন্দলাল অধিকাংশ সময় ইহার সজ্জায় নিয়োজিত ছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার শ্রম সার্থক।

প্রদর্শনীর পার্শ্ব দিয়া চকের দুই ধারে বিস্তর দোকান পশার। ইহার নাম 'এ' বাজার। সারির শেষ ভাগে দেশীয় জাহাজ কোম্পানী সিন্ধিয়া নেভিগেশনের প্রদর্শনী। তার পর দেখি বেঙ্গল কেমিক্যালের একটি প্রাথমিক চিকিৎসাগার। বামে আর একসারি দোকান। তার পর স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেলের প্রকাণ্ড মৃন্ময় মূর্ত্তি।

বড় রাস্তার বামে 'সি' বাজারের পার্শ্বে গাড়ী রাখিবার



ঝাণ্ডা চকে জাপানী পতাকা ও দামামা সহ বৌদ্ধ সাধু

স্থান। এখানেই বেঙ্গল কেমিক্যাল রোগ সেবার জন্য আর একটি হাসপাতাল খুলিয়াছেন। তার পর গ্রামবাসীদের শত শত চালা, সেবকদের আশ্রম, পরিষ্কারকদের কুটীর, কংগ্রেসের হাসপাতাল। বিস্তীর্ণভূমির উপর এই হাসপাতাল নগরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। হাসপাতালে ঔষধ দিবার ডাক্তার ও সেবা করিবার সেবিকা আছেন। হাসপাতাল ছাড়াইয়া কংগ্রেসের বৃহৎ ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারে বাঁশ, দড়ি, খাটিয়া, ভাণ্ড, চেয়ার, পেরেক কত কি প্রচুর সংগৃহীত। কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তির সহি না পাইলে একটি পেরেকও বাহির হয় না।

পান, কিছু কিছু খাদ্য, ফটো ফিল্ম, জুতা সারাই, জুতার ফিতা, চা, চুরুট, বিস্কুট, পেয়ালা, টর্চ ইহা লইয়া 'বি' বাজার। কিন্তু ধোপা নাই, গাড়ী চড়িবার উপায় নাই, রান্না করিবার উপায় নাই। কংগ্রেসের ইচ্ছা—নিজে কাপড় কাচ, হাঁটিয়া চল, যাহা দেই খাও। যত্রতত্র রান্নার অনুমতি দিলে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হইবে।

বহু দূর হইতে নরনারী আসিতেছেন। সন্ধ্যায় স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। বিঠলনগর দর্শনই তাহাদের কামনা। কত বড় ঘরের ঘরণী পুত্রকন্যা স্বামী লইয়া এই ধূলিময় পথে আনন্দে হাঁটিতেছেন, বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া সঙ্গে আনিত খাদ্য সকলে বণ্টন করিয়া খাইতেছেন; সপ্রতিভ, সহজ জীবনে অভ্যস্ত। গেরুয়া সাড়ী ও সবুজ জ্যাকেট পরিহিতা শতশত সেবিকা ঐক্যতানবাদন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সেবিকারা দরজা, আফিস, পথের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, রোগীর সেবা, সমস্ত প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া রক্ষা করা ইত্যাদি কার্য্যে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

বিঠলনগর স্বাভাবিক প্রণালী সমন্বিত উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। এক পার্শ্বে তাপ্তী নদী, অন্য পার্শ্বে একটি খাল। অর্দ্ধ মাইল চওড়া, দুই মাইল দীর্ঘ। ভূমি রুক্ষ, মাটি পাথর-মিশ্রিত। সর্ব্বত্র জল, পায়খানা ও আলোর সুব্যবস্থা।

বিঠলনগর এখন জাতীয়যজ্ঞের হোতাদের অপেক্ষা করিতেছে। সমস্ত নগরের অধিবাসী আনন্দচিত্তে জাতীয় সম্মিলনীর প্রতীক্ষা করিতেছে। সেবা ও জাতিগঠনের দৃষ্টি লইয়া সমস্ত গুজরাট উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী তাপ্তীর তীরে এক নিরালা কুটীরে ধীরে আজ কিসের সাধনা করিতেছেন তিনিই জানেন। তাঁহার কুটীরের ডাহিনে তাপ্তীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পাড়ে যাইবার এক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—আজ শেষরাত্রে ৫টার পর আর শয্যায় থাকিতে পারিলাম না। এখানে প্রাতে ৭॥টায় সূর্য্যোদয়, ৭॥টায় সূর্য্যাস্ত। তাই প্রাতঃকৃত্য অন্তে ৬টায় যখন বাহির হইলাম তখন উষাকাল।

পথঘাটে ঝাড়ু পড়িতেছে, ভোজনশালায় স্বেচ্ছাসেবকগণ

চা পান করিতেছে, দপ্তরখানায় আসিয়া সংবাদ পাইলাম —আজ বারদৌলীর পথে সুভাষচন্দ্র আসিতেছেন। ঝাণ্ডাচকে সুভাষচন্দ্রকে স্বাগতম্ করা হইবে। জলস্রোতের মত নরনারী আসিতেছে। সাংসারিক সুখ-সুবিধাবর্জ্জিত এই জনমিলনক্ষেত্রে নারীরা এত কষ্ট ও শ্রম কেমন করিয়া সহিতেছে দেখিয়া বিস্ময় বোধ হয়।

সহসা ইউনাইটেড প্রেসের শ্রীযুত বিধুভূষণ সেনগুপ্তের সহিত দেখা হইল। তিনি তাঁহার বাসস্থানে চা'এর নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম তাঁহার সহিত দেখা করিয়া গেলেন। চা-অন্তে মহাসভার প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া আমরা গোশালায় গমন করিলাম। উহা আজ ৯টায় খুলিবে।

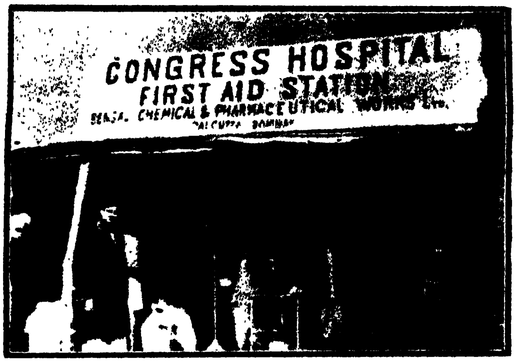
মহাসভার প্রাঙ্গণে বোধ হয় ২৫।৩০টি ফুটবল মাঠ ধরে। উপর খোলা, চাটাইয়ের বেড়া বেষ্টিত। একপার্শ্বে স্বাগতম্ কমিটির উপবেশন স্থান, সম্মুখে উচ্চ মঞ্চ সভাপতির জন্য। তাহার সম্মুখে তাপ্তীর তীর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমি—প্রাকৃতিক গ্যালারী। ভূমিই আসন।

মহাসভার স্থান অতিক্রম করিয়া গোশালার সম্মুখে একটি ফুটবল মাঠের মত স্থান আছে; তাহাতে দুইখানি চৌকীর উপর গদী পাতা, তাকিয়া আছে। উহাই অদ্যকার সভা-মঞ্চ। চতুর্দ্দিকে চিকাগো রেডিয়ো বসান। নন্দদুলাল, রাখাল, গোপাল, যশোদা ইত্যাদি বাক্যসমন্বিত তানপুরা-তবলাসহ গুজরাটী সঙ্গীত হইল। সহসা এক ফেরিওয়ালা বলিয়া উঠিল। "সত্য কহ, বাপুজী আসিতেছেন কিনা।" তুরন্ত জবাব হইল "নহি জী।"

কিন্তু তিন মিনিট পরই গান্ধীজীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সর্দ্দার প্যাটেল ইত্যাদি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইলেন। দিকে দিকে ক্যামেরা খাড়া হইয়া উঠিল, সিনেমা ক্যামেরা ঘুরিতে লাগিল। ২৫৲ টাকা ফিস দিলে এখানে ক্যামেরা ব্যবহার করা যায়।

গুজরাটী ভাষায় গোপালন গো-উন্নতি ইত্যাদির পোষক দীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হইল। একটি বালক সর্দ্দারজীকে বিচার করিতে অনুরোধ করিলেন, হিন্দীভাষা যখন রাষ্ট্র-ভাষা তখন গুজরাটী কেন? সর্দ্দারজী সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গুজরাটী ভাষা কে বুঝিতে পারেন না?" ১৫।২০টী হাত উঠিল। সুতরাং গুজরাটী ভাষা চলিতে থাকিল। সর্দ্দারজীর বক্তৃতা অন্তে মহাত্মাজী কিছু বলিলেন। দাঁত নাই, ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ, একেবারে কাছে বসিয়াও কিছু বুঝিলাম না। রেডিয়োর সম্মুখে গেলাম, সুবিধা হইল না। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত দ্বারা সভা ভঙ্গ হইল। এই গুজরাটী ভাষা অধ্যুষিত আয়তনে বাঙ্গালী-রচিত সঙ্গীত গীত হইতেছে দেখিয়া আমি বাঙ্গালী, অন্তরে শ্লাঘা অনুভব করিলাম।

ফিরিবার পথে সভাপতির রথ দেখিলাম—বারদৌলী চলিয়াছে, অত খ্যাতির কিছু নয়। রৌদ্র উঠিতেছে, বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। প্রতি মিনিটে ২০।২৫টি যাত্রী লইয়া এক একটি বাস নগরে প্রবেশ করিতেছে। পথঘাট নরনারীতে পূর্ণ। বাক্স বিছানা শিশু ঘাড়ে করিয়া যে যাহার বাসস্থানে যাইতেছে—রাস্তার ধূলা, সূর্য্যের তাপ,



ঝাণ্ডা চকে বেঙ্গল কেমিকেলের প্রাথমিক চিকিৎসালয়

পথের শ্রান্তি তাহাদের উজ্জ্বল মুখের দীপ্তি ম্লান করিতে পারে নাই। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর মাঝিতে স্পেশাল ট্রেণ আসিতেছে।

রাত্রি ৭টা ৫০ মিনিটে ঝাণ্ডাচকের পার্শ্বের আলোকোদ্ভাসিত তোরণ দিয়া সুভাষচন্দ্র ৫১ যণ্ডবাহিত রথে চড়িয়া স্বাস্থ্যমণ্ডিত হাস্যমুখে প্রত্যভিবাদন করিতে করিতে বিঠলনগরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ নরনারী পথের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি করিল।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—খাদি প্রদর্শনী দেখিলাম। কলিকাতার তুলনায় বোম্বাই ও গুজরাট অঞ্চলের খাদির মূল্য কম। খাদি শিল্পেরও উন্নতি ঐ অঞ্চলেই বেশী হইয়াছে। সুতা সূক্ষ্ম, রং সুন্দর ও ছাপা মনমোহন।

সিন্ধুদেশ হইতে একজন শিল্পী মিঃ হিঙ্গোরাণী বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত নানা শিল্পদ্রব্য আনিয়া একটি প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত বস্তু দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

আমি যেখানে খদ্দরের সাড়ী কিনিতেছিলাম তাহার পার্শ্বে আসিয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সদলে দাঁড়াইয়া কোটের কাপড় কিনিয়া নিলেন। জওহরলালজী পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন। সহসা কোথা হইতে দুই ইউরোপীয়ান মহিলা আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রদর্শনীর পশ্চাতভাগে মহাত্মাজীর প্রাত্যহিক প্রার্থনা হইতেছে। সমস্ত লোক ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিয়া যাইতেছে। আমিও অনুসরণ করিলাম।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—বিহার ও যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে আদেশ দিয়াছেন এবং গভর্ণরগণ ইহাতে বাধা দিলে উহারা পদত্যাগ করিবেন। ইহা জানিয়া ইহারই নানা দিক আলোচনা করিয়া বিঠলনগর আজ বড় ব্যস্ত।

প্রাতে বিঠলভাইএর মূর্ত্তি উন্মোচিত হইল। আবরণ খুলিয়া সুভাষচন্দ্র দেখিলেন—তাঁহার একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তিও বিঠলভাইএর পার্শ্বে রক্ষিত আছে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে গভর্ণরদের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়াতে গতকল্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া বিঠলনগরে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ইহা যে কংগ্রেসের জয়—দৃঢ়তা সহকারে সকলে এই মত প্রকাশ করিতেছেন। এই ব্যাপারে কংগ্রেস কিরূপ পন্থা অবলম্বন করে তাহার জন্য এখানে সকলে আজ বড় উদ্‌গ্রীব। মহাত্মাজী, জওহরলালজী ও সুভাষচন্দ্রের যে সব ভাষণ আজ পাওয়া গেল তাহাতে কংগ্রেসের শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলে খুশী হইয়াছে। ইহাদের বাক্য ও কর্ম্মপন্থায় দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—বিষয় নির্ব্বাচনী সভা আজ বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত বৃহৎ আচ্ছাদনের নীচে প্রথম সমবেত হইল। বিগত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালের আগমন, কথা, এমন কি ইঙ্গিত পর্য্যন্ত সমবেত জনতার মধ্যে বিদ্যুত তরঙ্গের সৃষ্টি করে দেখিলাম। তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া আগত বর্ষের সভাপতি সুভাষচন্দ্রের অভ্যর্থনার্থ শ্রীযুক্তা নাইডু যে বক্তৃতা করিলেন তাহা অন্তর স্পর্শ করিল। সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও ইনি loud speaker ব্যবহার করিলেন না, তবু ৮ হাজার লোক শুনিতে পাইল। বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ হইলে পর বর্ত্তমান ভারত শাসন আইনের ফেডারেশনের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেসী মুখপাত্র প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই উপস্থিত করিলেন। সমাজতন্ত্রবাদী অনেক খ্যাতনামা নেতা উহার সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। কারণ তাঁহাদের মতে শ্রীযুক্ত দেশাইএর প্রস্তাব যথেষ্ট নিন্দাসূচক ছিল না। এই ব্যাপারের আলোচনা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিয়াছিল, মীমাংসা মুলতুবী ছিল। এদেশে একটি সমাজতন্ত্রবাদী শক্তিশালী দল গড়িয়া উঠিতেছে, এই আলোচনায় ইহা উপলব্ধ হইল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—আজ শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই সংশোধন প্রস্তাবগুলির পাল্টা জবাব দিলেন। ইহার বক্তৃতা-চাতুর্য্য অসাধারণ, নিজের প্রস্তাব অবহেলে পাশ করাইয়া নিলেন। ইনি ইংরাজীতেই সমস্ত বলিলেন। যদিও কংগ্রেসে অধিকাংশ বক্তাই হিন্দী বলিয়াছেন। এমন কি সুভাষচন্দ্রও সম্প্রতি অতি ধীরে ধীরে নূতন আয়ত্ত করা হিন্দী ব্যবহার করিতেছেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—আজ প্রাতে সুভাষচন্দ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন। কলিকাতা হইতে আগত গায়কগায়িকাদল বন্দেমাতরম্ গান করিলেন।

আজ জাতীয় মহাসভার মহাসম্মিলন দিন। অপরাহ্নে প্রায় ৪ লক্ষ নরনারী সম্মিলন ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। ভূমি আসন। উপরে আকাশ, পশ্চিমে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন। নবনির্ম্মিত রথের (Rostrum) উপর দাঁড়াইয়া ২।৩ মিনিট মাত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বাগতম্ করিলেন। তারপর সুভাষচন্দ্র দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত প্রথমে হিন্দিতে, তারপর ইংরাজীতে অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তিনি যাহা লিখিয়া আনিয়াছিলেন বিঠলনগরে অন্য নেতাদের প্রভাবে তাহার কোন কোন অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। তবু তাঁহার বক্তব্যের স্পষ্টতায় সকলে মুগ্ধ।

২০শে ফেব্রুয়ারী—বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় গিয়াছিলাম। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব লইয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। কংগ্রেস কিরূপ দায়িত্বসম্পন্ন এবং কতখানি আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী ঐ প্রস্তাব তাহার প্রমাণ। বস্তুতঃ ইহাদের কার্য্য দেখিয়া শ্লাঘা অনুভব হয়।

অপরাহ্নে আবার মিলিতসভা মহাসম্মেলনের স্থানে হইল। এত জনসমাগম কোনদিন কোন স্থানে দেখি নাই। কোথা হইতে কিসের আহ্বানে কত দূর হইতে ইহারা এই প্রান্তরে আসিয়াছে? অনেক রাত্রে সভা ভঙ্গ হইল।

আজ বিঠলনগর ছাড়িয়া যাইব। দীর্ঘ পথ চলিয়া বাসস্থানে পৌছিলাম। পথের ধূলা আজ ঘুমাইয়াছে, দিকে দিকে ৫১টি তোরণে আলো জ্বলিতেছে। সমস্ত নগর আলোকিত, তীর্থের যাত্রীরা ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিতেছে, শান্ত স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে, সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও সংগঠনশীলতা প্রতিভাত। গত দুই দিন ধরিয়া ধূলার যে ঝড় বহিতেছিল আজ তাহা শান্ত হইয়াছে।

বিঠলনগর আজ নতমস্তকে জাতীয় মহাসভাকে অভিবাদন করিতেছে। বহুজন, বহু জাতি, বহু পথ যেখানে সম্মিলিত হইয়াছে সেখানে আমি আমার প্রণাম রাখিলাম।

নবীনে প্রবীণে

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

ছোট্ট মেয়ে রাধারাণীর পাশে
 প্রবীণ দাদু বাঁধা পড়ে রয়।—
প্রশ্নোত্তর বিশ্বকোষে নাই—
 উত্তর তার তবু দিতে হয়।

'দাদু, তুমি তামাক কেন খাও?'
 'পাখীরা সব উড়তে পারে কেন?'
'আঁধার-ঘেরা কেন আসে রাত
 'কম্বল গায়ে একটা বুড়ো যেন?'

'আচ্ছা, দাদু, তোমার বাবা ছিল?
 'বাবার মতোই চশমা চোখে দিত?
'পুজোর সময় নতুন জামা এনে
 'আদর কোরে তোমায় কোলে নিত?'

'চাঁদটা কেন রোজ ওঠে না, দাদু?
 'সে বুঝি তার মামার বাড়ি যায়?'
'তোমার কেন দাঁত ফোকলা হ'ল?'
 'পুলিসরা সব পাগড়ি কোথায় পায়?'

'ঘুম পেয়েছে, গল্প বল তুমি।
 'না, যাব না, তোমার কোলেই শোব
'ঐ যে, দেখ কি সুন্দর পাখী!
 'ধরে দাও না, ঐটে আমি নোব।'

'আচ্ছা দাদু চাঁদকে পাড়া যায়?'
 'আকাশ যেতে সিঁড়ি কেন নেই?'
'আমি কিন্তু তোমার খাটের নীচে
 'লুকিয়ে পড়ব মা আসবে যেই।'

এমনি কোরেই নবীন প্রবীণ দুটি
 প্রীতির বাঁধন বাঁধে হৃদয় মাঝে,
গভীর হ'তে গভীরতর হয়
 দুপুর সকাল নিত্য মধু সাঁঝে।

নবীন চাহে প্রবীণ সম জ্ঞান;
 প্রবীণ চাহে নবীন রস-ধারা—
না জানায়ে এসেছিল যাহা,
 অবহেলায় হয়েছে যা হারা।

কিন্তু যে, হায়, চিরন্তনের ধারা—
 চাওয়ার পরেই আসে চাওয়ার পাওয়া,
ইচ্ছা কারো থাক্ বা নাহি থাক্,
 চিরন্তনের আসার পরেই যাওয়া।

রাধারাণীর বাজ্‌ল বিদায়-বাঁশী,
 যেতে হবে পিতার ঘরে ফিরে।
কচির প্রেমে বিচ্ছেদের এই বান
 ডাকল যেতে দাদুর হৃদয় ঘিরে।

নাতনীরে তাঁর বুকের মাঝে চেপে
 বলেন, 'রাধু কাঁদিস্ নে ভাই আর,
'সেখানেতেও আর এক দাদু আছে,
 'গিয়েই কত আদর পাবি তার।

কচি প্রাণে সান্ত্বনা না আসে,
 একটি বুলি—'থাকব তোমার কাছে।'
কিন্তু কথা শুন্‌বে কেবা তার ?
 মিনতি, হায়, মিলায় বাতাস মাঝে।

প্রভাত আসে তেমনি মধু বুকে,
 দাদুর ঘুমও তেমনি ভেঙে যায়,
বুকের মাঝে বিষাদ গুমরিয়া
 সারা হৃদয় আষাঢ় মেঘে ছায়।

ভাবেন, প্রভাত খুঁজে বেড়ায় কারে ?
 অর্ঘ্যবরণ কাহার হাসি যাচে ?
বাতাস কাহার পরশটুকু নিয়ে
 ভুবন মাঝে নাচ্‌বে নটের সাজে ?

দুপুরবেলা একলা ঘরের মাঝে
 কণ্ঠ কাহার বাহুর বাঁধন মাগে ?
'দাদু তুমি তামাক কেন খাও ?'—
 প্রশ্ন কাহার বুকের মাঝে জাগে ?

বৈকালেতে শতেক কথার মালা
 কাঁটার মতো বুকের মাঝে ফুটে,
বাঁধন মাগে কচি শ্যামল ডোরে,
 আর যা, যেন ঝরাপাতা, টুটে।

আপন মনে আকাশ পানে চেয়ে
 ভাবেন, রাধু এখান হ'তে গিয়ে
ভাব করেছে নতুন দাদুর সনে,
 গল্প কত চলছে তাঁকে নিয়ে।

বুকের মাঝে রক্ত দ্রুত তালে,
 মাথা নেড়ে উঠে 'না-না' বোলে।—
'আয় রে বুকে, আয় ফিরে আয়, রাধু,—
 'আমায় ফেলে যাস্‌নে অমন চোলে।

'নতুন জগৎ গড়্‌ব দুজন মিলে,
 'কথার ফাঁদে স্বর্গ দেবে ধরা'
'নীরস কঠিন অভাব অভিযোগ
 'তোর পরশে সকল মধুভরা!

'হারিয়ে-যাওয়া স্বপন-ভরা দিন
 'নবীন রূপে পাব তোরি মাঝে;
'প্রভাত-আশে লুব্ধ হয়ে রব
 'ক্লান্ত রবির অস্ত-জীবন সাঁঝে।'

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্রবন্ধ

গ্রাম

ইতঃপূর্বে আমরা সঙ্গীতরত্নাকর-বর্ণিত বাদী সংবাদী প্রভৃতি স্বরের স্বরূপ-পরিচয় প্রদান করিয়াছি। এখন গ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মূর্ছ্না, ক্রম, তান, বর্ণ, অলঙ্কার ও জাতি প্রভৃতি গীতির উপকরণগুলির আশ্রয়স্বরূপ স্বর-সংহতিকে গ্রাম বলে। অধিবাসী লোকসমূহের আশ্রয় স্থানকে যেমন গ্রাম বলা হয়, সেইরূপ মূর্ছ্না, ক্রম, তান প্রভৃতি যাহাকে আশ্রয় করিয়া গীতিরূপে পরিণত হয় তাহারই নাম গ্রাম। মর্ত্যলোকে প্রচলিত এইরূপ গ্রাম দুইটি—ষড়্জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম।

ষড়্জ গ্রাম

সা ৪, রে ৩, গা ২, মা ৪, পা ৪, ধা ৩, নি ২ এইরূপ শ্রুতিসংখ্যাবিশিষ্ট স্বর-সংহতি ষড়্জ গ্রাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মধ্যম গ্রাম

ষড়্জ গ্রামের অন্যান্য স্বরের শ্রুতিসংখ্যা ঠিক রাখিয়া 'পা' স্বরে তিন শ্রুতি ও 'ধা' স্বরে চারি শ্রুতি ব্যবহৃত হইলে তাহাকে মধ্যম গ্রাম বলে। যথা—সা ৪, রে ৩, গা ২, মা ৪, পা ৩, ধা ৪, নি ২।

গান্ধার গ্রাম

দেবলোকে বা স্বর্গে আরও একপ্রকার গ্রাম ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম গান্ধার গ্রাম। গান্ধার গ্রামে ব্যবহৃত স্বর-সমূহের শ্রুতি-সংখ্যা এইরূপ—সা ৩, রে ২, গা ৪, মা ৩, পা ৩, ধা ৩, নি ৪।

শুদ্ধ ও বিকৃত ভেদে স্বর দুই শ্রেণীর। তন্মধ্যে কেবল শুদ্ধ স্বর লইয়া একটি গ্রাম; শুদ্ধ স্বরের সহিত বিকৃত স্বরের মিশ্রণে দ্বিতীয় গ্রাম। ইহার প্রথমটী ষড়্জ গ্রাম; দ্বিতীয়টি মধ্যম গ্রাম। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—সাতটি শুদ্ধ স্বরের সমাবেশে যে গ্রামটি তাহা ষড়্জের নামে পরিচিত হইল কেন? দ্বিতীয় গ্রামটিই বা মধ্যমের নামে পরিচিত হইয়াছে কেন? তদুত্তরে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"ষড়্জঃ প্রধান আদ্যঃ স্যাদমাত্যাধিক্যতস্তথা।
গ্রামেস্বাদবিলোপিত্বান্মধ্যমস্তু পুরঃসরঃ।"

শুদ্ধ স্বরের গ্রামটি ষড়্জের নামে পরিচিত হইবার দুইটি কারণ। প্রথমতঃ ষড়্জ আদি স্বর, দ্বিতীয়তঃ ষড়্জেরই ('পা' ও 'মা' রূপে) সংবাদী স্বর অধিক; এইজন্য শুদ্ধ স্বর-সপ্তকের মধ্যে ষড়্জ স্বরটিই প্রধান; এই নিমিত্ত শুদ্ধ স্বরের গ্রামটি ষড়্জের নামে পরিচিত। একটি গ্রামে বহু লোকের বসতি থাকিলেও যেমন প্রধান গ্রামবাসীর নামেই গ্রামটি পরিচিত হয়, সেইরূপ। এইরূপ বিকৃত স্বর-যুক্ত দ্বিতীয় গ্রামটিও ঐ গ্রামের প্রধান স্বর মধ্যমের নামেই পরিচিত। মধ্যম গ্রামে মধ্যম স্বরের প্রাধান্যের হেতু 'মধ্যম' অবিলোপী স্বর অর্থাৎ মধ্যম স্বরের বিলোপ কখনও হয় না। মধ্যমের লোপ হয় না দুই মতে দুই কারণে। প্রথম মতে—'স রি গ ম প ধ নি' এই স্বরগুলির মধ্যে অধস্তন স রি গ ও উপরিতন প ধ নি যথাক্রমে সম-শ্রুতিবিশিষ্ট বলিয়া পরস্পর সংবাদী; অর্থাৎ ষড়্জ ও পঞ্চম, ঋষভ ও ধৈবত, গান্ধার ও নিষাদ পরস্পর সংবাদী; অবশিষ্ট রহিল মধ্যস্থিত মধ্যম স্বর। এই মধ্যমের কাহারও সহিত পরস্পর সংবাদিত্ব নাই। মধ্যম অবধি স্থানীয় স্বর—"গ্রামে স্যাদবিলোপিত্বাৎ" এই 'অবিলোপিত্বাৎ' অংশের ব্যাখ্যায় চতুর কল্লিনাথ যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহারই অনুসরণে এই কথাগুলি লিখিলাম। আমরা দেখিতে পাই, মধ্যম স্বর ষড়্জ ও পঞ্চমের সহিত পরস্পর সংবাদী, তথাপি কল্লিনাথ মধ্যমের সংবাদী স্বর নাই বলিলেন কেন তাহা এবং মধ্যম কিরূপে অবধিস্থানীয় স্বর—এই দুইটি কথায় তাৎপর্য আমাদের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল না। মধ্যম অবধিস্থানীয় এই বাক্যের সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় সা রি গা ও পা ধা নি এই সম শ্রেণীর বা সমশ্রুতিবিশিষ্ট তিনটি করিয়া স্বরের

মধ্যবর্তী হইয়া মধ্যম স্বরটি উভয়ের সীমা নির্দেশ করিতেছে বলিয়াই ইহাকে বোধহয় অবধিস্থানীয় স্বর বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবিলোপী স্বর ; এইজন্য মধ্যম স্বর প্রধান বলিয়া ইহারই নামে দ্বিতীয় গ্রামটি পরিচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মতটি ভরতাদি সম্মত। এইমতে শুদ্ধ তানকে যখন এক স্বরের বর্জনে ষাড়বিত এবং দুই স্বরের বর্জনে ঔড়ুবিত করা হয়, তখন কোন অবস্থায়ই মধ্যম স্বরের লোপ হয় না ; এইজন্য মধ্যম অবিলোপী স্বর।

এই স্থানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য—কেহ কেহ গ্রামের সহিত মূর্ছনার ভেদ আলোচনা করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হন। বস্তুতঃ গ্রাম ও মূর্ছনা সম্পূর্ণ পৃথক্। নির্দিষ্ট শ্রুতিসংখ্যাবিশিষ্ট স্বর-সংহতির নাম 'গ্রাম'; আর এই স্বর-সংহতির ক্রমিক আরোহ অবরোহের নাম মূর্ছনা। যেমন—সা ৪, রে ৩, গা ২, মা ৪, পা ৪, ধা ৩, নি ২ এইরূপ শ্রুতিসংখ্যাবিশিষ্ট এইরূপ স্বর সমূহকে বলে ষড়্জ গ্রাম, আবার এই ষড়্জ গ্রামে সা রে গা মা পা ধা নি—নি ধা পা মা গা রে সা—ইহা (উত্তর মন্দ্রা নামক) একটি মূর্ছনা।

মূর্ছনা

যথাক্রমে সাতটি স্বরের আরোহ ও অবরোহকে বলে মূর্ছনা। যথা সা রে গা মা পা ধা নি—নি ধা পা মা গা রে সা। প্রত্যেক গ্রামে মূর্ছনা সাত প্রকার, সুতরাং দুই (ষড়্জ ও মধ্যম) গ্রামে—মূর্ছনা চৌদ্দ প্রকার।

ষড়্জ গ্রামের সাতটি মূর্চ্ছনা

(১) উত্তর মন্দ্রা :—সা রে গা মা পা ধা নি—
নি ধা পা মা গা রে সা।

(২) রজনী :—নি় সা রে গা মা পা ধা—
ধা পা মা গা রে সা নি়।

(৩) উত্তরায়তা :—ধা় নি় সা রে গা মা পা—
পা মা গা রে সা নি় ধা়।

(৪) শুদ্ধ ষড়্জা :—পা় ধা় নি় সা রে গা মা—
মা গা রে সা নি় ধা় পা়।

(৫) মৎসরীকৃৎ :—মা় পা় ধা় নি় সা রে গা—
গা রে সা নি় ধা় পা় মা়।

(৬) অশ্বক্রান্তা :—গা় মা় পা় ধা় নি় সা রে—
রে সা নি় ধা় পা় মা় গা়।

(৭) অভিরুদ্গতা :—
রে় গা় মা় পা় ধা় নি় সা—
সা নি় ধা় পা় মা় গা় রে়

পূর্বোক্ত উদাহরণসমূহের মধ্যে প্রথম মূর্ছনা উত্তরমন্দ্রার সকলগুলি স্বরই—মধ্যস্থানের দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি মূর্ছনায় একটি করিয়া মন্দ্রস্থানের নি প্রভৃতি স্বর মধ্যস্থানের স্বর-সমূহের সহিত যোজনা করিয়া মূর্ছনা রচনা করা হইয়াছে। যথা—রজনী মূর্ছনায়—নি সা রে গা মা পা ধা—ধা পা মা গা রে সা নি়। এইরূপ তৃতীয় মূর্ছনায় দুইটি স্বর মন্দ্রস্থান হইতে লইয়া যোজনা করিতে হয়। কোন্ মূর্ছনায় কয়টি স্বর মন্দ্রস্থানের, তাহা বুঝিবার সুবিধার্থ আমরা মন্দ্রস্থানের স্বরগুলির নীচে বিন্দু চিহ্ন যোজনা করিলাম। মতান্তরে কেহ কেহ বলেন যে শ্রুতির উপরে উত্তরমন্দ্রার ষড়্জ স্বর স্থাপিত তথায় মধ্য-স্থানেরই 'নি' প্রভৃতি স্বর যোজনা করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি মূর্ছনা রচনা করিতে হয়। এই মতে পূর্বোক্ত সাতটি মূর্ছনার সকলগুলি স্বরই মন্দ্রস্থানের। প্রশ্ন হইতে পারে—এই মতে প্রথম মূর্ছনার সহিত অন্যান্য মূর্ছনার কোন ভেদই থাকে না। কারণ ষড়্জ স্বরের শ্রুতিগুলি দ্বারাই নবযোজিত নিষাদ স্বর নিষ্পন্ন হইয়াছে। তদুত্তরে তাঁহারা বলেন—দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি মূর্ছনা রচনা কালে (ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে বর্ণিত) সারণার নিয়মে ষড়্জের প্রথম দুই শ্রুতিতে নিষাদ স্বর বসাইয়া তৎপরে ষড়্জ স্বর বসাইবে। এইরূপ অবস্থায় বাইশ শ্রুতির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রুতিতে নিষাদ, ষষ্ঠ শ্রুতিতে ষড়্জ, নবম শ্রুতিতে ঋষভ, একাদশ শ্রুতিতে গান্ধার, পঞ্চদশ শ্রুতিতে মধ্যম, উনবিংশ শ্রুতিতে পঞ্চম, দ্বাবিংশ শ্রুতিতে ধৈবত স্বর স্থাপনা করিতে হইবে। মধ্যম গ্রামের দ্বিতীয় তৃতীয় প্রভৃতি মূর্ছনা রচনা কালেও এইরূপ সারণার নিয়মে স্বরগুলির স্থান পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে। মূর্ছনা-রচনার প্রথমোক্ত মতটি ভরত-সম্মত বলিয়া শার্ঙ্গদেব গ্রহণ করিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবের সংক্ষিপ্ত বাক্যের বিবৃতি প্রসঙ্গে দ্বিতীয় মতটি সম্বন্ধে টীকাকার কল্লিনাথ যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ উল্লেখ করিলাম বটে, কিন্তু মূর্ছনার ঐরূপ পদ্ধতি

কিরূপে প্রযুক্ত হইত তাহা সম্যক্ ধারণা করিতে পারিলাম না। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানে যদি কোন সমাধান পাওয়া যায় তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিব।

মূর্চ্ছনা চারি শ্রেণীর—(১) শুদ্ধ মূর্ছনা। (২) সকাকলীক মূর্ছনা। (৩) সান্তর মূর্ছনা। (৪) সান্তর কাকলীক মূর্ছনা। সুতরাং পূর্বোক্ত চৌদ্দ প্রকার মূর্ছনা এই চারি সংখ্যায় গুণিত হইলে মূর্ছনা হয় ছাপান্ন প্রকার।

সকাকলীক মূর্ছনায় যে 'কাকলী' শব্দ ও সান্তর মূর্ছনায় যে 'অন্তর' শব্দ প্রয়োগ করা হইল, তাহার স্বরূপ-পরিচয়ে শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—

শ্রুতিদ্বয়ং চেৎ ষড়জস্য নিষাদঃ সংশ্রয়েৎ তদা।
স কাকলী মধ্যমস্য গান্ধার স্বন্তরঃ স্বরঃ॥

নিষাদ স্বর যখন ষড়্জস্বরের দুইটি শ্রুতি গ্রহণ করে, তখন তাহাকে "কাকলী নিষাদ" বলে। আর গান্ধার যখন মধ্যম স্বরের দুইটি শ্রুতি গ্রহণ করে, তখন সেইরূপ গান্ধারকে অন্তর 'গান্ধার' বলে। যে মূর্ছনায় "কাকলীনিষাদ" বিদ্যমান থাকে, তাহারই নাম সকাকলীক মূর্ছনা; আর যে মূর্ছনায় অন্তর গান্ধার বর্তমান, তাহার নাম সান্তর-মূর্ছনা; আর যে মূর্ছনায় কাকলী-নিষাদ ও অন্তর-গান্ধার দুই স্বরই থাকে, তাহার নাম সান্তর কাকলীক মূর্ছনা।

ক্রম

প্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি যে কোন স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া সাতটি স্বরের কেবল আরোহে উচ্চারণ করাকে "ক্রম" বলে। সুতরাং পূর্বোক্ত ছাপান্ন প্রকার মূর্ছনার প্রত্যেকটিতে সাতটি করিয়া 'ক্রম' রহিয়াছে। যথা— ষড়্জ গ্রামের প্রথম মূর্ছনা উত্তর মন্দ্রার প্রথম ক্রম—স রি গ ম প ধ নি। দ্বিতীয় ক্রম—রি গ ম প ধ নি স। তৃতীয় ক্রম—গ ম প ধ নি স রি ইত্যাদি। এইরূপে প্রত্যেকটি মূর্ছনায় সাতটি করিয়া ক্রম বিদ্যমান; সুতরাং পূর্বোক্ত ৫৬ ছাপান্ন প্রকার মূর্ছনায় মোট ক্রমসংখ্যা হয় (৫৬ × ৭ =) ৩৯২।

তান

ইতঃপূর্বে মূর্ছনার আলোচনা কালে প্রতি গ্রামে সাতটি করিয়া যে চৌদ্দ প্রকার শুদ্ধ মূর্ছনার কথা বলা হইয়াছে তাহা যখন নিম্নলিখিত নিয়মে এক স্বর বর্জন করিয়া ষাড়ব মূর্ছনায় পরিণত হয়, অথবা নির্দিষ্ট দুইটি স্বর বর্জন করিয়া ঔড়ুব মূর্ছনায় পর্য্যবসিত হয় তখন তাহাকেই বলে শু[দ্ধ] তান। ষড়্জগ্রামের সাতটি মূর্ছনা স রি গ নি এই চারিটি স্বর ক্রমে বর্জন করিয়া চারি প্রকার প্রণালীতে চারি প্রকা[র] ষাড়ব তানে পরিণত হইতে পারে। সুতরাং ষড়্জ গ্রামে[র] ষাড়ব তান (৭ × ৪ = ২৮) আটাশ প্রকার। মধ্য[ম] গ্রামের সাতটি মূর্ছনা স রি গ এই তিনটি স্বর ক্রমে বর্জ[ন] করিলে তিন প্রকার প্রণালীতে তিন প্রকার ষাড়ব তা[নে] পরিণত হইতে পারে, সুতরাং মধ্যম গ্রামের ষাড়ব তা[ন] এইরূপে (২৮ + ২১ = ৪৯) উনপঞ্চাশ প্রকার। 'স প' 'গ নি', 'রি গ' এইরূপে দুইটি করিয়া স্বরের বর্জনে তি[ন] প্রকার হইতে পারে। সুতরাং ষড়্জ গ্রামের সাতটি মূর্ছনার ঔড়ুব তান (৭ × ৩ = ২১) একুশ প্রকার। মধ্য[ম] গ্রামের সাতটি মূর্ছনায় 'রি ধ' ও 'গ নি' এইরূপে দুই প্রকারে দুই স্বরের বর্জন হইতে পারে। সুতরাং মধ্যম গ্রামের ঔড়ুব তান (৭ × ২ = ১৪) চৌদ্দ প্রকার। এইরূপে দুই গ্রামে ঔড়ুব তান (২১ + ১৪ = ৩৫) পঁয়ত্রিশ প্রকার আর ষাড়ব ও ঔড়ুব তান সর্বশুদ্ধ (৪৯ + ৩৫ = ৮৪) চৌরাশী প্রকার।

কূট তান

পূর্বোক্ত ৫৬ ছাপান্ন প্রকার সম্পূর্ণ মূর্ছনা ও অসম্পূ[র্ণ] মূর্ছনার স্বরগুলি যদি পূর্বোক্ত ক্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উচ্চারিত হয়, তবে তাহাকে কূটতান বলে। প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ মূর্ছনায় ক্রমের সহিত কূটতান হয় ৫০৪০ প্রকার। সুতরাং পূর্বোক্ত ৫৬ ছাপান্ন প্রকার সম্পূর্ণ মূর্ছনায় মোট কূটতান হয় (৫০৪০ × ৫৬ = ২,৮২,২৪০) দুই লক্ষ বিরাশী হাজার দুই শত চল্লিশ প্রকার। সম্পূর্ণ মূর্ছনার এক একটি শেষ স্বর পরিত্যাগ করিয়া ষট্ স্বর, পঞ্চস্বর, চতুঃস্বর, ত্রিস্বর, দ্বিস্বর ও একস্বর ভেদে ছয় প্রকার অসম্পূর্ণ ক্রম রচিত হয়।

ষাড়ব ক্রম, যথা—	স রি গ ম প ধ
ঔড়ুব ক্রম—	স রি গ ম প
চতুঃস্বর ক্রম—	স রি গ ম
ত্রিস্বর ক্রম—	স রি গ
দ্বিস্বর ক্রম—	স রি
একস্বর ক্রম—	স

এই ক্রমগুলির প্রত্যেকের ভেদ-সংখ্যা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ষট্‌স্বর বা ষাড়ব ক্রম—	৭২০	প্রকার
পঞ্চস্বর বা ঔড়ুব ক্রম—	১২০	”
চতুঃস্বর বা স্বরান্তর ক্রম—	২৪	”
ত্রিস্বর বা সামিক ক্রম—	৬	”
দ্বিস্বর বা গাথিক ক্রম—	২	”
একস্বর বা আচিক ক্রম—	১	”
অসম্পূর্ণ ক্রমের মোট সংখ্যা	৮৭৩	

যজ্ঞকালে ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রসমূহে একটিমাত্র স্বর প্রযুক্ত হয় বলিয়া একস্বরের তানকে "আর্চিক"-তান বলা হয়। গাথা নামক বেদাংশের প্রয়োগে দুইটি স্বর ব্যবহৃত হয় বলিয়া দ্বি-স্বর তানকে "গাথিক" তান বলে। সামবেদের গান প্রয়োগে যদিও সাতটি স্বরেরই ব্যবহার হয়, তথাপি এই সাতটি স্বর মন্দ্রাদি স্থানত্রয়ে ত্রিবিধ বলিয়া ত্রিস্বর-তান "সামিক"-তান নামে অভিহিত। আর চতুঃস্বর তানটি সাতটি তানের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ইহাকে "স্বরান্তর"-তান বলে।

রূপসনাতনপুরের বগলা চক্রবর্ত্তী

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসনাতনপুর এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ চার পাঁচখানি গ্রামের সকলেই বগলাপদ চক্রবর্ত্তীকে চিনিত। বগলাপদ রূপসনাতনপুরের উচ্চ-প্রাইমারী পাঠশালার হেড্‌পণ্ডিত। 'হেড্' বিশেষণটির বিশেষ কোন অর্থ নাই। কেননা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই পাঠশালার একমাত্র শিক্ষক। শিশুশ্রেণীর মক্‌সো হইতে ষষ্ঠমানের অঙ্ক, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল সকল বিষয়েরই শিক্ষকতা তাঁহাকেই করিতে হয়। একজন মানুষ কেমন করিয়া এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে পারেন সে বিষয়ে বাংলার পল্লী অঞ্চলের পাঠশালার অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে তিনিই সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

চক্রবর্ত্তী নিজে কিন্তু কখনও হেড পণ্ডিত কথাটি ব্যবহার করেন না। তিনি লেখেন হেড্‌মাষ্টার। হেড্‌মাষ্টার কথাটার ডিগ্‌নিটিই নাকি অনেক বেশী।

এই অঞ্চলটায় নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস। লেখাপড়ার চর্চ্চা কম। বছর দশেক পূর্ব্বে রূপসনাতনপুরের অধিবাসীদের সম্মিলিত চেষ্টায় একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। চক্রবর্ত্তী সেই হইতে এই পাঠশালার অধ্যক্ষ। মাইতিদের বাড়ীর সম্মুখের উঁচু জমিটায় স্কুলের ঘর উঠিয়াছে এবং স্কুলের সংলগ্ন ছোট একখানি টিনের একচালায় চক্রবর্ত্তীর বাসস্থান। এই দীর্ঘ দশবৎসর যাবৎ চক্রবর্ত্তী এখানে বাস করিয়া আসিতেছেন। পূজার ছুটিতে, গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে কোন দিনও এখান হইতে নড়েন নাই। চক্রবর্ত্তীর বাড়ী কোথায়, কিংবা বাড়ীতে কেহ আছে কিনা এ সংবাদ কেহ জানে না। চক্রবর্ত্তী যখন নূতন আসিলেন তখন লোকে এসব লইয়া প্রশ্ন করিত। কিন্তু চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে উত্তর মিলিত না। যে চক্রবর্ত্তী নিজের সম্বন্ধে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন, এই প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি একেবারে চুপ করিতেন। অনেক দিন অতীত হইয়া গেছে; চক্রবর্ত্তীর প্রাক্‌সনাতনপুর জীবন লইয়া কেহ আর মাথা ঘামায় না। দীর্ঘকালের ব্যবধান চক্রবর্ত্তীকে রূপসনাতনপুরের একজনা বাসিন্দায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামের সুখে দুঃখে তাঁহারও আজ সমান অংশ প্রাপ্য।

পার্শ্ববর্ত্তী কয়েক মাইলের মধ্যে হাইস্কুল তো দূরের কথা একটা পাঠশালা পর্য্যন্ত নাই। শুধু রূপসনাতনপুরের এই একটা যা' ভরসা। যদিও পাঠশালার বৃত্তটা বড় তথাপি ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট নয়। ত্রিশ চল্লিশের উপরে কখনও উঠেনা। ইহাদের বেতন এবং সরকারী সাহায্য মাসিক পাঁচটাকা দশ আনায় চক্রবর্ত্তীর এবং পাঠশালার দপ্তরী, চাকর কিংবা এক কথায় চক্রবর্ত্তীর সহকারী ভোলার দিন এক রকম করিয়া কাটিয়া যায়। কতটুকুই বা তাহাদের অভাব!

ভোরে উঠিয়া চক্রবর্ত্তী প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া আহ্নিক সারিয়া গ্রামটা একবার বেড়াইতে বাহির হন। গ্রামের চৌমাথায় কানাই দত্তের মুদির দোকানখানা অশ্বত্থগাছের কোল ঘেঁষিয়া উঠিয়াছে। বাহিরে বাঁশের ছোট খোঁটা পুঁতিয়া তাহার উপর একখণ্ড প্রশস্ত তক্তা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দোকানের ক্রেতাদের বসিবার জন্য বেঞ্চ্ করা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা সওদা করিতে আসে তাহাদের বসিবার সুযোগ মেলেনা: গ্রামের লোক সেখানে অনড় হইয়া বসিয়া আড্ডা জমাইয়া তোলে।

কানাই সবেমাত্র দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া দরজায় গোবরজলের ছিটা দিতেছিল। চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়া কহিল—এই যে, প্রাতঃপেন্নাম হই পণ্ডিতমশাই। আপনি বসুন, হুঁকোর বাসি জলটা ফেলে আমি এক্ষুণি তামাক সেজে দিচ্ছি।

হুঁকায় নূতন জল ভরিয়া কানাই চক্রবর্ত্তীকে তামাক সাজিয়া দিল। কানাই চক্রবর্ত্তীর পাণ্ডিত্যকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। সেবার রামখুড়োর নামে কলিকাতা হইতে একটা তার আসিয়াছিল। কলিকাতার এক মেসে তাহার ছেলে কাজ করে; তারটা আসিয়াছিল তাহারই ব্যারামের সংবাদ লইয়া। কিন্তু আসিলে কি হয়, সারা গাঁ খুঁজিয়া একটি লোক পাওয়া গেল না যে ইংরাজী লেখার অর্থটুকু বলিয়া দেয়। চক্রবর্ত্তী শুধু একবার চোখ বুলাইয়া খবরটা বলিয়া দিলেন। কানাই মুদি তখন রামখুড়োর সঙ্গেই ছিল। সেই হইতে সে চক্রবর্ত্তীকে একটা বিদ্যার জাহাজ বলিয়াই ভাবে। মনে করে, কোন্ শাপভ্রষ্ট দেবতা না জানি রূপ-সনাতনপুর পাঠশালার পণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। বিদ্যার যা জোর তাহাতে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল না থাকিলে চক্রবর্ত্তী আজ জজ মাজিষ্টর হইয়া বসিতে পারিত নিশ্চয়।

কানাই প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলে, আর পণ্ডিত মশাই, আমরা তো চোখ থাক্‌তেও অন্ধ হ'য়ে আছি। জন্মটাই বৃথা গেল।

চক্রবর্ত্তী হাসিয়া মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলে—আরে, একি ছেলের হাতের মোয়া যে, যে চাইবে সেই বিদ্যেলাভ কর্‌বে। আমরা একসঙ্গে সেবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষে দিলাম তিরিশজন। পাশ কর্‌লো কয়জন জানিস্? সবে এগারো জন। এই আমি হলেম গিয়ে ফার্ষ্ট, জগদীশ গাঙ্গুলী সেকেণ্ড,—আর রায়খালির হরিশদাশ হলো থার্ড। আর কারো নামও মনে নেই। সেকি আজকের কথা? ইন্‌স্পেকটার ফিলিপ্‌স্ সাহেব এলো প্রাইজ, দিতে। আমাকে ডেকে বল্‌লো, চলো আমার আপিসে ভালো চাকুরী দিয়ে দেবো। কতো হাতে ধরে সাধাসাধি। আমি কিছুতেই গেলামনা। বল্‌লাম, না সাহেব তোমার আপিসে চাক্‌রি করবোনা। বিদ্যা দান করলেও ক্ষয় হয়না, বেড়ে যায়। আমি বিদ্যা দানের কাজই কর্‌বো। নইলে এত ক'রে লেখা পড়া শেখা কেন? বাবা টোল করে গেছেন, আমিও না হয় স্কুল মাষ্টারী কর্‌বো।

ফিলিপ্‌স সাহেবের হাতে ধরিয়া অনুরোধ করার কথা কানাই চক্রবর্ত্তীর মুখ হইতে সহস্রবার শুনিয়াছে। যদিও স্বচক্ষে সে ঘটনাটা দেখে নাই, তথাপি বিশ্বাস করে।

তামাক টানিতে টানিতে চক্রবর্ত্তী কানাইমুদির লাল খেরো বাঁধানো হিসাবের খাতাটা দেখিতে থাকে। পূর্ব্বদিনের ক্রয়বিক্রয়ের হিসাবে কোথাও ভুল গেল কিনা কানাই তাহা চক্রবর্ত্তীকে দিয়া সংশোধন করিয়া লয়। খাতা দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া যায়। আরও অনেকে ইতিমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। খাতাটা রাখিয়া চক্রবর্ত্তী হরিহর গয়লাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—ভাখ্, হরিহর, ছেলের মাইনে ছ'মাস ধরে একটি পয়সা দিচ্ছিস্‌না। তোকে ত' বলে বলে হায়রাণ। ছেলেটাও যাচ্চে দিন দিন গোল্লায়। বিনা পয়সায় কি আর বিদ্যা মেলে? মাস ন' আনা ক'রে ছ'মাসে কত দাঁড়ায় একবার হিসেব করে ভাখ্। ছ' আধে তিন টাকা, আর হলো এক আনা করে ছ' আনা। এই তিন টাকা ছ' আনা পয়সা ফেলে দিলেই তো পারিস্। আজ দিই, কাল দিই করে মিছামিছি কেবল আমাকে ঘুরাচ্ছিস্।

হরিহর সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, কি কর্‌বো পণ্ডিতমশায়! ফসলের অবস্থা তো দেখ্‌ছেন? সরকারের লোক এসে বল্লে, পাট দিতে পারবেনা—জমিতে ধান দাও। পাট ভাল হয়, কিন্তু বাধ্য হ'য়ে ধান দিতে হ'লো। ধান তো পোকায় কেটে দিল, একগাছাও ঘরে উঠে এলোনা। এখন তো খেয়ে বাঁচাই দায় হয়েছে, তা ছেলেকে পড়াবো কেমন করে।

এক মাস দু'মাস তিন মাসের বেতন অনেক ছাত্রের অভিভাবকই বাকী রাখিয়াছে। তাহাদের সকলকে শীঘ্র করিয়া টাকাটা দিয়া দিবার জন্য চক্রবর্ত্তী বলিয়া দিলেন। কিন্তু খুব জোর করিয়া কাহাকেও টাকার কথা বলা চলে না। তাহা হইলে হয়ত' পাঠশালার খাতা হইতে ছেলের নাম কাটাইয়া লইবে। কারণ ইহাদের ধারণা আছে যে চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া কিছু আর জজিয়তী করিবে না। অতএব পাঠশালা হইতে দুদিন আগে আসিয়া ঘরে বসিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু চক্রবর্ত্তী আশায় থাকেন—ছেলে পাঠশালায় যদি আসে তবে আজ না হোক্ দুদিন পরেও টাকাটা পাওয়া যাইতে পারে।

বেলা বাড়িলে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী তখনও বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন। দাসের বাড়ীর বিধবা বড় বৌ মোক্ষদা আসিয়া চক্রবর্ত্তীর সম্মুখে ছোট একটি লাউ রাখিল। কহিল, —নতুন গাছটায় এই প্রথম হ'লো, তাই বামুনকে···

চক্রবর্ত্তী খুসী হইয়া কচি লাউটার আস্বাদ কিরূপ হইবে মনে মনে তাহা জল্পনা করিতে থাকেন। কিন্তু মোক্ষদার আসল মনোভাবটা অনুমান করিতেও তাঁহার কষ্ট হয় না। জিজ্ঞাসা করিলেন—কি গো, দুগ্‌গার কোনো খবর পেলে?

দুর্গা মোক্ষদার একমাত্র মেয়ে। শ্বশুরবাড়ীতে আছে।

মোক্ষদা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—এক মাসের উপর হ'য়ে গেল দুর্গার কোনো খবর পাচ্ছিনে। দুর্ভাবনায় রাত্রে চোখের পাতা পড়ে না। যদি দয়া করে দু'টো অক্ষর লিখে দেন—এই বলিয়া কাপড়ের আড়াল হইতে মোক্ষদা একখানি পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া আবার কহিল—তাও কি আর চিঠি লেখার জো আছে আমাদের গরীব দুঃখীর! এক পয়সা থেকে দাম বাড়িয়ে কিনা হ'লো তিন পয়সা!

কানাই মুদির দোয়াত কলমটা লইয়া চক্রবর্ত্তী চিঠি লিখিতে বসিলেন। দু'কথায় পত্র লেখা শেষ হইল না। ছ'মাসে ন'মাসে এই ত' একখানা পত্র লেখা! তাই পাড়ার সংবাদ হইতে বাড়ীর লাউ গাছে কেমন ফলন হইয়াছে তাহার কিছুই মোক্ষদার পত্রে বাদ পড়িল না। যতটুকু জায়গায় লিখিবার নিয়ম আছে তাহার একটুকুও বাদ পড়িয়া রহিল না। মোক্ষদা যাহা বলিল তাহার সব লিখিতে গেলে স্থান সংস্থান হইত না। চক্রবর্ত্তী পাড়ার অনেককেই চিঠি লিখিয়া দেন। তাই তাঁহার জানা আছে কোন্ সংবাদ লেখা দরকার, আর কোন্ কথাটা বাদ দিলেও চলে।

চিঠি লেখা শেষ হইলে মোক্ষদা চলিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী উঠিয়া পড়িয়া কহিলেন—যাই, ইস্কুলের বেলা হ'লো; আবার হাত পুড়িয়ে রাঁধ্‌তে হ'বে।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়িল এম্নি ভাবে কহিলেন—এই ছাখ্, কানাই, কথায় কথায় আসল কথাটাই গেছি ভুলে। ঘরে আজ চাল নেই। দে তো মোটা দেখে এক পো চাল চট্ করে মেপে।

কানাই কহিল, এক পো কি হ'বে?

—একা মানুষ, একটা দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

চালের ঠোঙাটা হাতে লইয়া চক্রবর্ত্তী ট্যাঁক খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। শেষে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, যাঃ, একটা পয়সাও নেই দেখ্ছি। তা ট্যাঁকেরই বা কি দোষ! ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। ব্যাটাদের কারো একটি পয়সা দেবার নাম নেই।

কানাইর কাছে পূর্ব্বের চার পাঁচ টাকা বাকী আছে। কিন্তু কানাইর অন্তঃকরণটা ভালো। সে কহিল, পয়সার জন্য ভাবছেন কেন পণ্ডিত মশাই; নিয়ে যান্, যখন সুবিধে হয় দাম দেবেন।

চক্রবর্ত্তী যাইতে উদ্যত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কানাইকে বলিলেন—জানিস্ জগদীশ গাঙ্গুলী মাসে এখন পাঁচ পাঁচশো টাকা মাইনে পাচ্ছে। ঐ জগদীশ—আমাদের বারে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষেয় ও দ্বিতীয় হ'লো, আর আমি প্রথম। ফিলিপ্স্ সাহেবের চাকরী আমি নিলাম না, ও যেচে নিল। আমার কাছে দু'বেলা অঙ্ক দেখে নিতে আস্তো, অঙ্কে কাঁচা ছিল কি না! কালো, বেঁটে—দেখ্তে ছিল বিশ্রী। আমরা ডাকতুম জগা ব'লে। সেই জগা কিনা এখন…। শুন্লাম কল্কাতায় নাকি বাড়ী করেছে, গাড়ীও।

চক্রবর্ত্তী ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখে কিছুক্ষণ কানাইএর দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। অদৃশ্যমান লোকটির পিঠের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কানাইএর মনটা সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। যদি দুর্ব্বুদ্ধি না হইত তাহা হইলে কলিকাতার বাড়ী ও হাওয়া গাড়ী চক্রবর্ত্তীরই হইতে পারিত।

ঘরে ফিরিয়া চক্রবর্ত্তী রান্নার জোগাড় করিয়া ভাত চড়াইয়া দিলেন। ভোলা আসিয়া ইতিমধ্যে স্কুলের ঘরটা ঝাঁট দিয়াছে। অনেক ছাত্রও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আসিয়া দিনের পড়া দেখাইয়া কহিলেন, খুব উঁচু গলায় পড়্তে থাক। আমি যেন ঘর থেকে শুনতে পাই। যার গলা শুনতে পাবোনা তাকে এসে পিটাবো, বুঝ্লি? তাহার পর ভোলাকে ডাকিয়া কহিলেন—দেখিস্ তো ভোলা এদিকে একটু, মারামারি বাধিয়ে না দেয় আবার। আমি চট্ ক'রে দুটো মুখে দিয়ে আস্চি।

মোক্ষদা-দত্ত কচি লাউয়ের ঘণ্ট—আর ভাত বাড়িয়া লইয়া চক্রবর্ত্তী খাইতে বসিয়াছেন মাত্র। এমন সময় বাহির হইতে বালক-কণ্ঠে ডাক আসিল, মাষ্টার মশাই।

মুহূর্ত্তের মধ্যে চক্রবর্ত্তীর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঝাঁঝালো গলায় ধমক দিয়া উঠিলেন: এখানে কি? স্কুলে ব'সে পড়গে। তোদের জ্বালায় দুটো মুখে তুলতেও পারবো না।

বাহিরে যে আসিয়াছিল দেখা না দিয়াই সে ফিরিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী কণ্ঠস্বরেই চিনিতে পারিলেন, এ বিশু। বিশু পাঠশালার একমাত্র বামুন ছাত্র—নিঃস্ব বিধবার একটিমাত্র ছেলে। বাড়ী রূপসনাতনপুরে নয়, আসে ভিন্নগ্রাম আমূলিপাড়া হইতে। স্কুলে আসিয়া একদিন বিশু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন যে দুদিন অনাহারের পর এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, তাই দুর্ব্বলতার জন্য……। চক্রবর্ত্তী ডাকিয়া নিয়া সেদিন বিশুকে খাওয়াইয়াছিলেন এবং ইহার পর হইতে যেদিন বাড়ীতে খাওয়া হইত না বিশু আসিয়া সেদিন ঘরের বাহির হইতে 'মাষ্টার মশাই' বলিয়া ডাক দিত। চক্রবর্ত্তী এ আহ্বানের মর্ম্ম বুঝিতেন; তাই বিশুকে ঘরে যাহা থাকিত তাহা দিয়া খাওয়াইয়া দিতেন। কিছু না থাকিলে দুটি পয়সা দিতেন কোনোদিন।

চক্রবর্ত্তীর ঘরে আজ কিছু ছিলনা, একটি পয়সাও ছিলনা। পেটে ক্ষুধায় আগুন জ্বলিতেছিল; যে ভাতদুটি লইয়া বসিয়াছেন তাহাতে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে কিনা সন্দেহ। ইহার উপর কেহ ভাগ বসাইতে আসিয়াছে এই চিন্তাটাই তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। কিন্তু লাউয়ের স্বাদ তাঁহার মুখে বিস্বাদ হইয়া গেল: কল্পনার দৃষ্টিতে বিশুর বিরস বদন কেবলই ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। থালায় অর্দ্ধেক ভাত রাখিয়া চক্রবর্ত্তী উঠিয়া পড়িলেন।

বিশুকে স্কুল হইতে ডাকিয়া ঘরে আনিয়া কহিলেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে নে দেখি।

বিশুর আজ অভিমান হইয়াছে। এমন করিয়া সে আর কোনদিন অপমানিত হয় নাই; অশ্রুজড়িতকণ্ঠে সে কহিল, আজ খিদে নাই, বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।

চক্রবর্ত্তীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা পরিস্ফুট হইয়াই আবার মিলাইয়া গেল। হুঁ, খাইয়া আসিয়াছে না ছাই। কহিলেন—দেরী করিস্নে মিছিমিছি। দুপুর গড়িয়ে গেলো, এখনো স্কুলে যেতে পার্লুম না।

তথাপি বিশু নড়িল না। দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চক্রবর্ত্তীর ইচ্ছা হইল একটু স্নেহস্পর্শে এই বালকটির অভিমানের পর্ব্বতকে গলাইয়া দেন। ইচ্ছা হইল ইহার পিঠে হাত বুলাইয়া নীরবে রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু কিছুই করা হইল না। তাঁহার উদ্বেলিত স্নেহ স্কুলপণ্ডিতের চিরাচরিত রূঢ় আচরণের নিকট সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অবাধ্য ছেলেকে যেমন করিয়া শায়েস্তা করিতে হয়, ইচ্ছা না থাকিলেও শুধু বহুদিনের অভ্যাসবশতঃ তেম্নি করিয়া বিশুকে ধমক দিয়া উঠিলেন: জ্যাঠামো করতে হবে না আর। ভালো চাস্ তো খেয়ে ওঠ্। নইলে কাণে ধরে শিখিয়ে দেবো কেমন করে গুরুজনের সম্মান রাখ্তে হয়।

বিশু ফিরিয়া চাহিল, তাহার চোখে ভয়ের চিহ্ন। বুঝিল এখানে তাহার অভিমানের কোন মর্য্যাদাই সে পাইবে না। তাই ধীরে ধীরে থালার নিকট গিয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিল।

খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও বিশু থালাটা ছাড়িয়া উঠিতে চায় না যেন। তাহার ক্ষুধা অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। চক্রবর্ত্তী তাহা বুঝিলেন।

কিন্তু বুঝিলেই বা তাহার কি করিবার আছে? তাঁহার নিরুপায় অন্তরের নিদর্শনস্বরূপ কোটরাগত নিষ্প্রভ দুইটি চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

মাসের শেষে দেখা গেল, সরকারী সাহায্য এবং ছাত্রদের বেতন মিলাইয়া পনেরো টাকা কয়েক আনার বেশী আদায় হয় নাই। এই টাকা হইতে ভোলাকে দিতে হইবে। ভোলার নির্দ্দিষ্টরূপে কোন বেতন নির্দ্ধারিত নাই। টাকা আদায়ের পরিমাণ অনুযায়ী তাহাকে একটা অংশ দেওয়া হয়। এবার চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে পাঁচটাকা দিলেন। কিন্তু ভোলা কহিল—বাবু, এতে আমার চল্‌বে না; বাড়ীতে অসুখ-বিসুখে টাকা লাগ্‌ছে।

চক্রবর্ত্তী খানিকটা কি ভাবিয়া লইলেন; কানাই মুদির কাছে দেনা জমিয়াছে, তাহা দিতে হইবে। কিন্তু কিছু না বলিয়াই ভোলার হাতে আর দুইটি টাকা তুলিয়া দিলেন। ভোলা তথাপি যায় না। চক্রবর্ত্তী কহিলেন—কিরে?

ভোলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল—বড্ড টানাটানি যাচ্ছে;— চক্রবর্ত্তী এবার ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। মুখভঙ্গি করিয়া ভোলার কণ্ঠস্বর বিকৃতরূপে অনুকরণ করিয়া কহিলেন—বড্ড টানাটানি যাচ্চে—আর আমার বুঝি টাকার বন্যা নেমে এসেছে?

তাহার পর হাতের টাকা, সিকি, আনি-দুয়ানি, পয়সা প্রভৃতি সব মেঝেতে ছড়াইয়া দিয়া কহিলেন—নে, সব নিয়ে যা। আমার তো আর কিছুতে দরকার নাই, যত প্রয়োজন সব তোদের।

ভোলা লজ্জায় মরিয়া গেল। সবগুলি মুদ্রা একটি একটি করিয়া কুড়াইয়া কেরোসিন কাঠের সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। চক্রবর্ত্তী একটি কথাও বলিলেন না।

পরদিন ভোলা কাজে আসিল না। সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী নিজেই বেড়াইতে বাহির হইয়া ভোলার খোঁজ করিতে গেলেন। ভোলা বাড়ীতেই ছিল। অনুপস্থিতির অপরাধ সবিনয়ে স্বীকার করিয়া কহিল, ছেলেটা ব্যারামে শয্যাগত তাই যেতে পারিনি।

চক্রবর্ত্তী ছেলেটিকে দেখিলেন। জ্বরের ঘোরে শয্যায় নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। জ্বরতপ্ত, পাণ্ডুর শিশুমুখটি দেখিয়া চক্রবর্ত্তীর কেমন যেন মায়া হইল। বলিলেন, ক'দিন ভুগ্‌ছে?

—সাতদিন।

—ডাক্তার দেখিয়েছিস্?

—না।

—না, কেন?

ভোলা চুপ করিয়া রহিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, বুঝেছি, টাকা নেই। কিন্তু কালই তো সাত সাতটা টাকা পেলি। কি হলো?

—বাকী শোধ করতেই ফুরিয়ে গেল। মুদির টাকা কিছুতেই না দিয়ে পারলাম না।

—তা আমাকে একবার বলতে লজ্জা হ'লো বুঝি। খুব নবাব হয়েছো দেখ্‌ছি।

তাহার পর হঠাৎ সুর বদলাইয়া স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন, পনেরো টাকার মধ্যে সাত টাকা তোকে দিলাম। আমার থাক্‌লো আটটাকা। ভাখ্, বাইরে আমাদের যে ভাবই থাক্ স্কুলে তো আমি হেড্‌মাষ্টার! স্কুলে বসে আমার চেয়ে তোকে বেশী টাকা কি করে দিই বল দেখি! স্কুলের হেড্‌মাষ্টার আর দপ্তরী যদি এক মাইনেই পায়, তাহ'লে স্কুলের সম্মান, হেড্‌মাষ্টারের পদমর্য্যাদা কেমন করে থাকে? স্কুলের বাইরে এসে যদি একটা টাকা বেশী চাস্ তখন তো আমার দিতে আপত্তি থাকে না!

ভোলা বুঝিতে পারিল না—স্কুল-ঘরের বাহিরে ও ভিতরে কি প্রভেদ। চক্রবর্ত্তী কিন্তু এই প্রভেদটুকুকেই হেড্‌মাষ্টারের ডিগ্‌নিটি আখ্যা দিয়া প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকেন।

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া চক্রবর্ত্তী ট্যাক খুলিয়া ভোলার হাতে দুটি টাকা দিলেন। কহিলেন, কাল সকালেই বলাই ডাক্তারকে এনে দেখাস্। আর, কাল তোর স্কুলে গিয়েও কাজ নেই।

ভোলা টাকা দুইটি গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছিল। চক্রবর্ত্তী তাহা বুঝিয়া কহিলেন, পাগল, আমার জন্য ভাবিস্ তুই! আমি একা মানুষ, আমার কতটুকুই বা অভাব। আর এই স্কুলের উপরই তো আমি ভরসা করে থাকি না। শুধু একবার ইঙ্গিত করলে টাকার রাশ এসে পায়ের কাছে জড় হ'বে। মুখ ফুটে বলতে পর্য্যন্ত হ'বে না। যখন সদরে যাই কত উকিল মোক্তার আমার পায়ের ধূলো নেবার জন্য কাড়িকাড়ি বাধিয়ে দেয়। সব আমার ছাত্র কি না! এখন তারা বড় হ'য়েছে, কিন্তু পণ্ডিত মশায়কে ভোলেনি। জানিস্ তো, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে। যেখানে যাবো সেখানেই, ...আমার কি ভাবনা... হাঃ—

ভোলা মধ্যে মধ্যে চক্রবর্ত্তীর নিকট তাঁহার ছাত্রদের গল্প শুনিত। কিন্তু সত্য কিনা তাহা বুঝিতে পারিত না। কারণ যে দশবৎসর যাবৎ চক্রবর্ত্তী রূপসনাতনপুরে শিক্ষকতা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন ছাত্র উকিল মোক্তার হওয়া তো দূরের কথা, সামান্য প্রবেশিকা পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয় নাই। তবে রূপসনাতনপুর আসিবার পূর্ব্বে অন্য কোথাও চক্রবর্ত্তী শিক্ষকতা করিয়াছেন একথা সে তাঁহার মুখ হইতেই শুনিয়াছে। ভোলা ভাবে, চক্রবর্ত্তী হয়ত সেখানকার ছাত্রদের কথাই বলিতেছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি একদিন বিকালে হারাধন দত্ত আসিয়া চক্রবর্ত্তীকে অনুরোধ করিয়া কহিল—পণ্ডিতমশায়, আজ আমার ছোটো ছেলের নামে মানত, শনি পুজোর আয়োজন করেছি। কিন্তু পুরুত ঠাকুরকে সংবাদ দিতে ভুল হ'য়ে গেছে। এখন পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে খবর দেবার সময়ও নেই। আপনাকে দয়া করে কাজটা উদ্ধার ক'রে দিতে হ'বে।

এরূপ অনুরোধ চক্রবর্ত্তীকে প্রায়ই রক্ষা করিতে হয়। অতএব আজও চক্রবর্ত্তী সানন্দে রাজী হইয়া গেলেন।

দত্তদের উঠানে চাটাইর উপর সতরঞ্চ পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। গ্রামের সকল লোক শনিপূজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া বসিয়াছে। চক্রবর্ত্তী পুঁথিপড়া শেষ করিয়া পূজা সমাপ্ত করিলেন। সিন্নি মাখিবার তখনো বিলম্ব ছিল। তাই হুঁকা হাতে করিয়া সতর.ঞ্চর উপর সকলের মধ্যে আসিয়া বসিলেন।

সীতাপতি পাল একটি ছেলেকে সঙ্গে করিয়া চক্রবর্ত্তীর নিকটে আসিয়া বসিল। কহিল—পণ্ডিত মশাই, এটি আমার ভাগ্নে, এবার বি-এ পাশ করেছে। চিরকাল সহরে থাকে, তাই কয়েক দিনের জন্ম গ্রামে বেড়াতে এসেছে।

চক্রবর্ত্তী সেদিন সকালে কানাই মুদির দোকানে বসিয়া এই ছেলেটির সম্বন্ধে বহু আলোচনা শুনিয়াছেন। বি-এ পাশ লোক দেখিতে পাওয়া রূপসনাতনপুরের অধিবাসীদের নিকট একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। অতএব এই বি-এ পাশ-করা ছেলেটি সমগ্র গ্রামের পক্ষে বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ছেলেটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া চক্রবর্ত্তী না চিনিয়াও গোপনে ইহাকে ঈর্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন—এই গ্রামে বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁহার যে একচ্ছত্র আধিপত্য, বাহির হইতে কে আসিয়া সেই আধিপত্যকে খর্ব্ব করিতে চাহিতেছে। তথাপি ইহার প্রতি তাঁহার নিজের কৌতূহলও কম নয়। লণ্ঠনটা কাছে লইয়া পরম আগ্রহে সীতাপতির ভাগ্নেকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ছেলেটির বয়স কুড়ি একুশ হবে। এতগুলি অপরিচিত লোকের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে।

চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বি-এতে বুঝি রমাপতি সরকারের গণিত পড়েছ?

এটা হইল আলাপের মুখবন্ধ। অল্পবয়সী ছেলেদের সহিত স্কুল মাষ্টাররা পড়ার কথা লইয়াই কথা আরম্ভ করেন। বগলা চক্রবর্ত্তীও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন না।

ছেলেটি ভাবিতেছিল, ইহাদের কেমন করিয়া বুঝাইবে যে স্কুল পাঠশালার মতো কলেজে অঙ্কশাস্ত্রটা অবশ্য-পাঠ্য বিষয় নয়। তাই একটু দেরী করিয়া, খানিকটা ভাবিয়া যখন সে উত্তর দিবার জন্য একটা কিছু বলিতে যাইতেছিল, চক্রবর্ত্তী তখন নিজেই বলিয়া উঠিলেন, —হ্যাঁ, পড়বেইতো; রমাপতি সরকারের গণিত আমরাও পড়েছি কিনা! ওই হোলো গিয়ে বাজারের সেরা বই।

সীতাপতির ভাগ্নে কোনোদিন রমাপতি সরকারের নামও শোনে নাই। চক্রবর্ত্তী—সেই তিরিশ বছর আগেকার পাঠ্য তালিকার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে অথবা হইতে পারে, এ কথাটা খেয়ালই করেন না। বি-এতে কি পড়ানো হয় আর কি হয় না এই সংবাদ ছাত্রজীবনেও বিশেষ কিছু রাখিতেন না এবং আজও জীবন-দেবতা তাঁহাকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন যে তাহা জানিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়া ওঠে নাই। অতএব রমাপতি সরকার যে গণিতে চরম সিদ্ধান্ত নয়, তাহার পরও কিছু থাকা সম্ভব, এ প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগিল না।

পরিচয় শেষ হইল। এইবার স্কুল পণ্ডিতের দ্বিতীয় স্বভাব, অর্থাৎ বিদ্যা-বুদ্ধির পরীক্ষা লওয়া—আরম্ভ হইল। চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—সরকারের গণিতের একেবারে শেষের দিকে একটা প্রশ্নের অঙ্ক আছে, দেখেছো? অঙ্কটার উত্তর দেয়া নেই। অঙ্কটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ফিলিপ.স্ সাহেব পরিদর্শনে এসে ক্লাশে জিজ্ঞেস করলো এই অঙ্কটাই। পারলো না জগদীশ গাঙ্গুলী, যে এখন পাঁচশো টাকা মাইনে পায়। রায়খালির হরিশ দাশও বলতে পারলো না। ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে উত্তর ব'লে দিয়ে সাহেবকে তাক্ লাগিয়ে দিলুম। আচ্ছা, বলো ত' বারো ফুট লম্বা একটা দেয়াল আছে: একটা মাকড়শা যদি দিনের বেলা দু' ফুট করে দেয়ালটা বেয়ে ওঠে আর রাত্রিতে আধ ফুট ক'রে নামে তাহ'লে সবটা দেয়াল বেয়ে উঠ্তে মাকড়শার কদিন লাগ্বে?

কানাই মুদি চক্রবর্ত্তীর পিছনে বসিয়াছিল। উপস্থিত সকলের মনে একটা যুদ্ধের আভাষ জাগিয়া উঠিয়াছে। এই প্রশ্নটা পারা-না-পারার উপরই যেন চক্রবর্ত্তী অথবা সীতাপতির ভাগ্নে, এই উভয়ের মধ্যে কে যে জ্ঞানরাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিবে তাহা নিশ্চিত হইয়া যাইবে।

ভাগ্নে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া সীতাপতি তাহার কাণে চুপি চুপি কহিতে লাগিল, দে না চট্ ক'রে বলে, উত্তরটা তো খুব সোজা!

ভাগ্নের জয়-পরাজয় যেন সীতাপতির নিজের। সীতাপতির পক্ষে উত্তর দেওয়াটা নিশ্চয়ই সহজ নয়; কিন্তু তাহার ভাগ্নে যখন বি-এ পাশ তখন তাহার কাছে প্রশ্নটা অবশ্যই সরল।

ছেলেটি কিন্তু চুপ করিয়াই রহিল। লজ্জায় অথবা এই অর্দ্ধশিক্ষিত লোকগুলির প্রতি অবজ্ঞায়, বুঝা গেল না, সে মাথা হেঁট করিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল।

তাহার এই নীরবতায় সীতাপতি দমিয়া গেল। কানাই মুদি চক্রবর্ত্তীর পিছনে বসিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল।

ছেলেটির মৌনতা চক্রবর্ত্তীর জয় সূচিত করিল, চক্রবর্ত্তী গর্ব্বিত হইলেন কিন্তু আনন্দিত হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল বিদ্যার দৌড় লইয়া আজ ইহার সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিবে। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তিনি নিজের আসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবেন। কিন্তু কাজটা অতি সহজেই মিটিয়া গেল।

ফিরিবার পথে কানাই কহিল, সীতাপতির গুমোরটা আজ গুঁড়ো হয়েছে। ভারী খুসী হয়েছি আমি। ভাগ্নের বিদ্যে-বুদ্ধি কীর্ত্তন করে করে কদিন ধরে কাণ ঝালাপালা করে তুলেছিল।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, বি-এ পাশ করেছে তো ব'য়ে গেছে। দু'পাতা ইংরিজি বেশী পড়েছে বই তো নয়! আমার মতো একটা ছাত্রবৃত্তি পাশ লোকের যে বিদ্যে আছে, ওদের পাঁচটা বি-এ পাশেরও তা নেই। জিজ্ঞেস করেছিলুম তো সাধারণ একটা অঙ্ক, তাই পারলো না। ভূগোল-টুগোল জিজ্ঞেস করলে না জানি কি অবস্থা হ'ত। ফিলিপ.স্ সাহেব ইতিহাস বলো, ভূগোল বলো, অঙ্ক বলো—কোনো প্রশ্ন করে কোনোদিন

ঠেকাতে পারে নি আমাকে। এ কি আর ধান চাল দিয়ে লেখা পড়া শেখা! হ্যাঃ। সাধে কি আর সরকার মাস মাস টাকা গুণে দিচ্ছে! কয়েছে তো সীতাপতির ভাগ্নে বি-এ পাশ—আহুক তো দেখি রূপসনাতনপুরের স্কুলে, দেখা যাক্ সরকার বৃত্তি দেয় কি না!

চক্রবর্ত্তীর ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় গৌরবের বস্তু যে মহামহিমান্বিত সরকার বাহাদুর সহস্র লোকের মধ্য হইতে বাছিয়া তাঁহাকেই বৃত্তিদানের যোগ্য পাত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। হোন্ না তিনি ক্ষুদ্র রূপসনাতনপুরের পাঠশালার তুচ্ছ পণ্ডিত, তথাপি সরকার বাহাদুরের দপ্তরে তাঁহার নাম আছে, ইহাই কি কম বড় শ্লাঘার কথা! সরকারী বৃত্তির এই রাজটীকার পানে চাহিয়া কানাই মুদির শ্রদ্ধাও বাড়িয়া যায়।

সীতাপতি পালের বি-এ পাশ ভাগ্নেকে পরাজিত করিবার বিবরণ লইয়া চক্রবর্ত্তী কানাই মুদির দোকানের আড্ডাটিকে কয়েকদিন যাবৎ সরগরম করিয়া তুলিলেন। জীবনে যেন তাঁহার একটা নূতন উত্তেজনা আসিয়াছে। ছাত্রাবস্থায় জগদীশ গাঙ্গুলীকে পশ্চাতে ফেলিয়া যেরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, আজ বহু বৎসর পরে বুঝি সেই অনুভূতিটাই ফিরিয়া আসিয়াছে।

কয়েকদিন উৎসাহে উত্তেজনায় কাটিল ভালই। কিন্তু হঠাৎ একটা দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। নন্দপুরে নাকি নূতন পাঠশালা খোলা হইতেছে। নন্দপুরের কেশব দাসের কোন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় আই-এ পাশ যুবক বেকার অবস্থায় বহুদিন ঘুরিয়া কোথাও সুবিধা না করিতে পারিয়া এখানে পাঠশালা করিবার মৎলব আঁটিয়াছে। মাসে অন্ততঃ পাঁচটা টাকা তো পাওয়া যাইবে! একেবারে খালি হাতে বসিয়া থাকা অপেক্ষা মন্দ নয়।

নন্দপুর হইতে চারিটি ছেলে চক্রবর্ত্তীর পাঠশালায় পড়িতে আসে। নিজেদের গ্রামে স্কুল হইলে এতদূর হাঁটিয়া তাহারা পড়িতে আসিবে না নিশ্চয়। তা না আসিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু অনেকেই আশঙ্কা করিতে লাগিল যে ইংরাজিশিক্ষিত মাষ্টারের লোভে রূপসনাতনপুরের পাঠশালা ছাড়িয়া অধিকাংশ ছাত্রই নন্দপুরে চলিয়া যাইবে। নন্দপুরের লোকরাও ছেলে ভাঙ্গাইয়া লইবার জন্য বাড়ী বাড়ী হাঁটিতেছে।

চক্রবর্ত্তীর মনে আশঙ্কার দাগটুকুও পড়িল না। তিনি কহিলেন, হ্যাঃ, স্কুল কর্‌লেই হোল আর কি! সরকারী বৃত্তি পাবে এই সব পুঁচ্‌কে স্কুলে? আই-এ পাশ অমন ঢের ঢের দেখেছি। বি-এ পাশ তলিয়ে গেলো, তা আই-এ পাশ তো কোন্ ছার্!

কিন্তু চক্রবর্ত্তীর নিঃশঙ্ক মন সশঙ্ক হইয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব হইল না। বৈশাখ মাসের এক মঙ্গলবারে ভোলার উপর স্কুলের ভার ন্যস্ত করিয়া মাইতিদের বাড়ী মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজাটা চট্ করিয়া সারিতে গিয়াছিলেন, এমন সময় ইন্‌স্পেক্টার সাহেব পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিলেন। ভোলা ছুটিয়া গিয়া খবর দিল। চক্রবর্ত্তীর কথাটা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস হইল না। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় একবার ইন্‌স্পেকটার আসিয়াছিল, তাহার পর এই দীর্ঘকাল যাবৎ নিয়মিতরূপে সরকারের টাকা আসিয়াছে কিন্তু পাঠশালা পরিদর্শন করিতে কেহ আসে নাই। তথাপি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। স্কুলের হাতল-ভাঙ্গা চেয়ারটায় কোট-হ্যাট্-প্যান্ট পরিহিত এক ব্যক্তিকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি ভীত হইয়া উঠিলেন। ভোলা তাহা হইলে মিথ্যা বলে নাই।

ইন্‌স্পেক্টারবাবু ইতিমধ্যে পাঠশালায় ছাত্রদের পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ছাত্রদের উত্তর তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি পাঠশালার পণ্ডিত?

চক্রবর্ত্তী বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—এখানে কত বছর ধরে আছেন?

—এই পাঠশালার আদি থেকে আছি, তা সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা।

মনে হ'চ্চে আপনাকে দিয়ে আর কাজ চল্‌বে না। যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এবার বিদায় নিন্।

চক্রবর্ত্তীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ইন্‌স্পেক্টারবাবু আবার কহিলেন—আপনার পাঠশালায় সাহায্য দিয়ে সরকারী টাকা আর নষ্ট হ'তে দেবো না। পাঠশালায় একটা ব্লাকবোর্ড নাই, ম্যাপ নাই, খেলাধূলার বন্দোবস্ত নাই—একটা ছেলে বল্‌তে পার্‌লো না বোম্বাই সহর ভারতবর্ষের কোন্‌দিকে। এগারো কি ক'রে হয় জিজ্ঞেস্ করায় বলে, এক আর এক এগারো। এক দশ আর এক যে এগারো—একথাটাও বুঝিয়ে দেন্ নি। এক আর এক তো দুই হয়। মোট কথা, এই সব পুরাণো পদ্ধতির দিন আর এখন নেই। নর্ম্মাল পাশ পণ্ডিতেরা সাহায্য চাইছে, তাদের বাদ দিয়ে আপনাকে আর রাখা চল্‌বে না। তা ছাড়া সবচেয়ে বড়ো অপরাধ—আপনি ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়ান্, ছেলেরা যা-ইচ্ছে-তাই ক'রে সময় কাটিয়ে দেয়।

চক্রবর্ত্তীর মাথা তখন ঘুরিতেছিল। কানাই মুদি শুনিলে কি বলিবে—যখন জানিবে সরকারী বৃত্তি তাঁহার অযোগ্যতার জন্য বন্ধ হইয়া গেছে? সীতাপতি তাঁহাকে দেখিয়া হাসিবে, রূপসনাতনপুরের এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধাপূর্ণ আসনখানি টলিয়া উঠিবে। অনেকটা নিজেরই অজ্ঞাতে চক্রবর্ত্তী অগ্রসর হইয়া নীরবে ইন্‌স্পেক্টর-বাবুর হাত দুইটা চাপিয়া ধরিলেন। সেই স্পর্শের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের মিনতি মাখানো ছিল!

ইন্‌স্পেক্টারবাবু হাত মুক্ত করিয়া লইয়া কহিলেন—না, আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না। যোগ্যতর ব্যক্তির আবেদন উপেক্ষা ক'রে আপনার পাঠশালায় টাকা দেওয়া চলে না। তা হ'লে দেশের শিক্ষার পক্ষে অমঙ্গল হ'বে।

চক্রবর্ত্তী এবার ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, টাকা দেওয়া যদি এতই অসম্ভব হয় তবে নাই দিলেন। কিন্তু সরকারী খাতা থেকে দয়া করে আমার নামটা কেটে দেবেন না। এইটুকু ভিক্ষে···ভিক্ষে চাইছি··· বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

আশ্চর্য্য, ইন্‌স্পেক্টরবাবু মনে মনে ভাবিলেন, টাকা চায় না, চায়

শুধু সরকারী খাতায় নিজের নাম। লাভ কি? লোকটা হয়ত পাগল। ইন্‌স্পেক্টরবাবু উঠিয়া গেলেন।

অথচ বলিতে গেলে ইহাই ছিল বগলা চক্রবর্তীর জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। আর্থিক ক্ষতিটা তাঁহার চোখে বড় হইয়া দেখা দিল না। কিন্তু সম্মানহানির লজ্জায় বাঁচিবেন তিনি কেমন করিয়া? ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বগলা চক্রবর্তী সহপাঠীদের বিশেষ করিয়া জগদীশ গাঙ্গুলীর সামাজিক পদমর্য্যাদার কথা স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে যেন নিজের জীবনের ব্যর্থতার বেদনায় আকুঞ্চিত হইয়া উঠিতেন। সত্য করিয়া বলিতে গেলে স্বীয় জীবনের পরিস্থিতিটা বিচার করিবার শক্তি তাঁহার খুব তীব্র ছিল না। নিজেকে এই বলিয়া এতদিন সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছেন যে হাজার হোক তাঁহার প্রতিভাকে সরকার তো স্বীকার করিয়াছেন! ইহাই বা কয়জনের ভাগ্যে মিলে? কিন্তু এই সরকারী তক্‌মাটা যদি আজ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দাঁড়াইবার শক্তি মিলিবে কোথা হইতে?

কয়েকদিনের মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল—নন্দপুর পাঠশালায় সরকার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পরিমাণে তাহা রূপসনাতনপুর হইতেও বেশী। চক্রবর্তীও সরকারী চিঠি পাইলেন—তাহাতে দুঃখের সহিত জানানো হইয়াছে যে রূপসনাতনপুর পাঠশালায় আর সাহায্য দেওয়া হইবে না। সংবাদটা চক্রবর্তী গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও গোপন রহিল না। নন্দপুরের শত্রুর দল রাষ্ট্র করিয়া দিল। মুখে চক্রবর্তী কখনো হার মানিবার পাত্র নন্। কানাই দোকানীর আসরে সকলকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—সব নন্দপুরের শালাদের বজ্জাতি। ওদের চোখ রাঙানিকে ভয় করি আমি? সদরে গিয়ে ফিলিপ্‌স সাহেবকে শুধু একবার বলবো; তখন দেখ্‌বো ওদের মুরদ কতদূর।

চক্রবর্তীর কল্পনায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর গতি থামিয়া গেছে; সেদিনের ছাত্রবৃত্তি ক্লাশের সেরা ছাত্র বগলা চক্রবর্তী, রমাপতি সরকারের গণিত, আর ইন্‌স্পেক্টর ফিলিপস্ সাহেব—আজও অপরিবর্ত্তনীয়রূপে বিরাজ করিতেছে যেন। সেদিন ক্লাশে সহপাঠীদের নিকট ভাল ছাত্র বলিয়া যে সম্মান পাইতেন আজও সংসারের নিকট সেই সম্মানই নিজের প্রাপ্য বলিয়া দাবী করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ফিলিপ্‌স্ সাহেব এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে যে এদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া যাইতে পারেন অথবা এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে পারেন একথাটা চক্রবর্তী খেয়ালই করেন না। তাঁহার মনে হয় ফিলিপস্ সাহেবের কাছে পৌঁছিতে পারিলে ছাত্রাবস্থায় যেরূপ আদর পাইয়াছেন আজও তেমনি পাইবেন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ভয়াবহরূপে কমিয়া গেল। পাঠশালা গুটাইতে হইত; কিন্তু রূপসনাতনপুরের অধিবাসীরা ঠিক করিল যেমন করিয়া হোক্ পাঠশালাটিকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে—নহিলে গ্রামের অসম্মান। শুধু রূপসনাতনপুরের ছাত্র লইয়াই পাঠশালা বসে।

একদিন ভোলা আসিয়া কহিল, নন্দপুরের ওরা খবর দিয়েছে আমাকে: স্কুলের কাজ জানা লোক চায় তারা। আমি গেলে ভালো মাইনে দেবে বলেছে।

চক্রবর্তী জ্বলিয়া উঠিলেন:—সব নেমকহারামের দল! যা, সব চলে যা তোরা। দুটো পয়সার লোভ দেখেছে তো জিভ্ দিয়ে লাল ঝরছে! বলি, তোকে কাজ শিখিয়েছিল কে? নন্দপুরের ঐ কেশব দাস—না এই বগলা চক্রবর্তী? মা সরস্বতীর যদি সেবা করে থাকি কোনোদিন, তাহ'লে দেখ্‌বি চক্রবর্তীর তেজ। নন্দপুরের স্কুলের ভস্মের উপরে আমার স্কুল দ্বিগুণ করে গড়ে তুল্‌বো।

পাঠশালার এই আর্থিক দুরবস্থার দিনে ভোলা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইতে চায়, তাহা মঙ্গলই বলিতে হইবে। কিন্তু চক্রবর্তীর এখানে একটা খেয়াল ছিল। খেয়াল না থাকিলে রূপসনাতনপুরের মতো পাঠশালায় দপ্তরী রাখে না কেহ। একজন দপ্তরী না থাকিলে হেড্-মাষ্টারের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না—শুধু এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভোলাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সরকারী বৃত্তি আজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু চক্রবর্তীর মর্যাদা-বোধ এখনো রহিয়াছে; তাই ভোলাকে ছাড়িতে তাঁহার আপত্তি। তাছাড়া, নন্দপুরের নাম শুনিলেই তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠেন।

সেদিন দুপুরে পাঠশালা-গৃহের বারান্দায় চক্রবর্তী পায়চারি করিতেছিলেন। চার পাঁচ জনের বেশী ছাত্র পড়িতে আসে নাই। মনটা তাঁহার সত্যই এতদিন পরে যেন খানিকটা দমিয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সম্মুখের রাস্তাটার উপর। সারি বাঁধিয়া ছেলের দল নন্দপুরের স্কুলে পড়িতে চলিয়াছে। ইহারা সকলেই তাঁহার ছাত্র ছিল। ঐ তো মাধব, হারাণ, খোকা, টোনা এবং আরও অনেকে চলিয়াছে। সকলের শেষে বঙ্কু। বঙ্কুর বাড়ী এই গ্রামেই। এবার প্রোমোশনের পর পয়সার অভাবে বই কেনা হয় না বলিয়া চক্রবর্তী নিজে তাহার বই কিনিয়া দিয়াছেন। সে-ও এই পাঠশালা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। চক্রবর্তী বিস্মিত হইলেন। ডাকিয়া বলিলেন—বঙ্কু, শুনে যা তো এদিকে।

বঙ্কু আসিলে কহিলেন, তুই পড়্‌বিনে আর এখানে?

বঙ্কু বলিল, না, এখানে আবার পড়ে কেউ? নন্দপুরের স্কুল এখানকার স্কুলের তুলনায় স্বর্গ। এক এক শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা ঘর; ম্যাপ, ভূ-গোলক—আরও কত কি আছে আমি নাম জানি না। ছুটির পর ফুটবল খেলা হয়। এমন স্কুল থাক্‌তে পড়্‌বো কেন এখানে? নূতন স্কুলটা দেখে আসবেন একদিন।

দুঃসহ বিস্ময়ে চক্রবর্তীর চোখ দুটো জ্বালা করিয়া উঠিল। তাহার পয়সায় কেনা বই লইয়া বঙ্কু নন্দপুরের স্কুলে যাইতেছে। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার নিজের পাঠশালাকে যে অবজ্ঞার চোখে দেখে ইহাও মুখের উপরেই বলিয়া গেল। এত সাহস পাইল কোথা হইতে?

সহসা তাঁহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। শক্ত লিক্‌লিকে বেতটা হাতে লইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিলেন, দেখাচ্ছি তোমার নন্দপুরে

যাওয়া।—ক্রুদ্ধ ফণিনীর দ্বিখণ্ডিত রসনার হিস্-স্ শব্দের মতো কথাগুলি ক্রূর হিংসায় ফাটিয়া পড়িল।

কতক্ষণ বঙ্কুর পিঠে বেত ওঠা-নামা করিয়াছিল চক্রবর্ত্তীর খেয়াল ছিল না। ভোলা কোথা হইতে আসিয়া ছোঁ মারিয়া বঙ্কুকে চক্রবর্ত্তীর কবল হইতে মুক্ত করিয়া লইল।

প্রহারটা হইয়াছিল অমানুষিক। বঙ্কু শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক ঘণ্টা তো জ্ঞানই ছিল না। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর। সন্ধ্যার পর গ্রামের মাতব্বরদের বৈঠক বসিল; চক্রবর্ত্তীকেও ডাকিয়া আনা হইল। সকলেরই অভিমত—দুধ দিয়া এমন কালসাপ ঘরে পোষা চলে না। আজ না হয় বঙ্কু মার খাইয়াছে, কাল যে আমার ছেলেও খাইবে না তাহার কি প্রমাণ আছে? হয় পাঠশালা বন্ধ হোক্, নতুবা অন্য লোকের খোঁজ করা হউক। চক্রবর্ত্তীকে দিয়া আর চলিবে না।

কানাই মুদিও আজ চক্রবর্ত্তীর পক্ষ হইয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারিল না। চক্রবর্ত্তী বুঝাইয়া বলিতে গেলেন—কেন কত দুঃখে তাঁহার হাতে বেত উঠিয়াছে। তাঁহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতে যাহাকে পড়িবার বই কিনিয়া দিয়াছেন সে যদি থাম্‌কা অপমান করিয়া বসে তবে কি রাগ হয় না? রাগ হইয়াছিল বলিয়াই তো প্রহারের মাত্রাটা বেশী হইয়া গেছে। কিন্তু চক্রবর্ত্তীর কথা কেহ বুঝিল না।

বৈঠক হইতে বাহিরে আসিয়া চক্রবর্ত্তীর চোখে আজ অত্যন্ত বেদনার মধ্য দিয়া এই রূঢ় সত্যটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে পৃথিবীতে তাঁহার সকল প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে। সংসারে কেহ কোন প্রয়োজনেই আর তাঁহাকে ডাকিবে না। আকাশের অপরিস্ফুট ম্লান চন্দ্রালোকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার বসিয়া যাওয়া চোখ দুটা দিয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

সোজা নিজের বাসায় না ফিরিয়া ভোলাকে ডাকিলেন। কহিলেন, তুই নন্দপুরের স্কুলেই যা। আমাদের স্কুল হয়তো থাকবে না। আমাকেও যেতে হ'বে আর কোথাও। তখন না বুঝে রাগ করেছি তোর উপর ··; তোর তো ছেলে পিলে নিয়ে সংসার—তুই যা। না গেলে কষ্ট পাবি।

গলার স্বরে ভোলা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এমনটি সে আর কখনো শোনে নাই। তাই সাহস করিয়া বলিতে পারিল, আপনিও চলুন ওদের ওখানে; নন্দপুরে একজন সহকারী মাষ্টারের দরকার। আপনাকে রাখ্‌বে নিশ্চয়।

অন্য সময় হইলে চক্রবর্ত্তী কাহারো অধীনে মাষ্টারী করিবার ইঙ্গিতটুকু পাইলেই রুখিয়া মারিতে আসিতেন। কিন্তু আজ রাগের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তথাপি স্বভাব নাকি মরিলেও যায় না। তাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন—পাগল, নন্দপুরে যাবো আমি কোন্ দুঃখে। আজিমগঞ্জের বাবুরা ক'বছর ধরে ক্রমাগত আমাকে খোসামুদ করছে। আমি গেলে তারা আমাকে মাথায় করে রাখ্‌বে। সেখানেই যাবো।

ভোলা আজিমগঞ্জের নাম শোনে নাই কোনোদিন। তথাপি ভাবে খুব বড় জমিদারের বাড়ি বোধ হয়। সেখানে গেলে সুখেই থাকা যায়, চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেলে ভোলা সারারাত্রি ধরিয়া ভাবিল চক্রবর্ত্তীর সহিত সে-ও আজিমগঞ্জে যাইবে কি-না। বাধা শুধু স্ত্রী আর ছোট ছেলেটা। বিদেশে নূতন জায়গায় তাহাদের লইয়া যাওয়া যায় না। চক্রবর্ত্তীর কথা মনে হইতেই ভোলার অন্তঃকরণটা করুণায় ভরিয়া যায়। বিপদে আপদে তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছে। আবার তাঁহারই সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হয়। তা স্ত্রীপুত্র না হয় বাড়ীতে রাখিয়াই যাইবে। কতলোকই তো এমন চাকুরী করিতে যায়!

পরদিন খুব ভোরে উঠিয়া ভোলা চক্রবর্ত্তীকে এই কথাটা বলিতে গেল—সেও তাঁহার সঙ্গে আজিমগঞ্জ যাইবে। চক্রবর্ত্তীকে ঘরে পাওয়া গেল না। ঘরের এক কোণে যেখানে শত তালি যুক্ত ছাতাটি টানানো থাকে সেখানে ছাতাটি নাই। চটি জোড়াটি নাই; গায় দিবার পাৎলা দেশী তাঁতের চাদর এবং বটতলার ছাপানো গীতাখানাও নাই। ভোলার মনে একটা সন্দেহ বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া গেল। তথাপি সে ক্ষান্ত হইল না।

ভোলা গ্রামের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। কোথাও চক্রবর্ত্তী নাই; কেহ তাঁহাকে সেদিন দেখেও নাই। এমন কি কানাই মুদির দোকানের মজ্‌লিস্‌টিতেও চক্রবর্ত্তীর কোনো সন্ধান মিলিল না।



ঝিন্দের বন্দী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'—রমণীগণ মুকুটমণি—'

মূর্চ্ছা ভাঙিতেই গৌরী সটান উঠিয়া বসিয়া চোখ রগ্‌ড়াইয়া বলিল—'মনে পড়েছে—ময়ূরবাহনের হাসি।' তারপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল।

দেখিল, সে মেঝের উপর বসিয়া আছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া একপাল সুন্দরী উৎসুক কৌতূহলীনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। যে তরুণীটির কোলে মাথা রাখিয়া সে এতক্ষণ শুইয়াছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর একজনকে মৃদুস্বরে বলিল—'খবর দে।'

গৌরী বলিল—'ব্যাপার কি! এ আমি কোথায়?'

ক্রোড়দায়িনী তরুণী চপল হাসিয়া বলিল—'আপনি স্বর্গে এসেছেন। কিস্তার জলে ডুবে গিয়েছিলেন মনে নেই?'

গৌরী বলিল—'তা হবে। আপনারা সব কারা?'

তরুণী বলিল—'আমরা সব অপ্সরা!' একটি ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলী রক্তাধরা অষ্টাদশী মোহিনীকে দেখাইয়া বলিল—'ইনি হচ্চেন উর্বশী।' আর একটিকে দেখাইয়া—'ইনি মেনকা। আর আমি—আমি রম্ভা।'

গৌরী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'কাঁচা না পাকা?'

যুবতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—'আপনিই বিচার করে বলুন দেখি?' বলিয়া গৌরীর সম্মুখে বসিয়া নিজের সহাস্য মুখখানি গৌরীর চোখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

গৌরীও জহুরীর মত ভাল করিয়া পরখ করিয়া বলিল—'হুঁ, নেহাৎ কাঁচা বলা চলে না, দিব্যি রঙ্‌ ধরেছে।'

এমন সময় সুন্দরীচক্রের বাহির হইতে একজন বলিল—'আঃ—লছমি, কি বেহায়াপনা করছিস্‌। তোরা সব সরে যা।'

সকলে সরিয়া গেলে, একটি তন্বী বাঁ হাতের উপর শুষ্ক জামা কাপড় ও তোয়ালে লইয়া গৌরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—'এখন বেশ সুস্থবোধ করছেন?'

গৌরী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—'আপনি কি তিলোত্তমা?'

তন্বী বলিল—'না, আমি কৃষ্ণা। কিন্তু পরিচয় পরে হবে; এখন উঠুন, ভিজে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন।'

এতক্ষণ নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গৌরী লজ্জায় একেবারে শিহরিয়া উঠিল। মুক্তার বুঁটিদার ঢিলা-হাতার রেশমী পাঞ্জাবী জলে ভিজিয়া গায়ের সহিত একেবারে সাঁটিয়া গিয়াছে, নিম্নাঙ্গের পট্টবস্ত্রও তথৈবচ। সে জড়সড় হইয়া বলিল—'এঁদের সরে যেতে বলুন।'

কৃষ্ণা সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল—'তোরা বেরো এখান থেকে।'

সকলে প্রস্থান করিল, বেহায়া তরুণীটি যাইতে যাইতে বলিল—'আচ্ছা আমরা আসছি আবার, পেয়েছি যখন সহজে ছাড়ছি না।'

কৃষ্ণা কাপড়গুলা গৌরীর কাছে রাখিয়া বলিল—'আমাদের মহলে পুরুষের পাট নেই, তাই পুরুষের কাপড় জোগাড় করা গেল না। এগুলো সব কস্তুরীর। পরে দেখুন, স্বস্তি যদি বা না পান, সুখ পাবেন নিশ্চয়!' বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিল।

কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিতে গৌরীর বাকি ছিল না। সে মনে মনে ভারি একটা কৌতুকপূর্ণ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ঝড়োয়ার পুরললনাদের এই অসঙ্কোচ রঙ্গ-তামাসা তাহার মনকে যেন এক নূতন রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল। সে ভাবিল, যুবকযুবতীর মধ্যে এমন সুন্দর এমন অবাধ স্বচ্ছন্দ মেলামেশা ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। গৌরী বিবাহিত হইলে বুঝিতে পারিত, বিবাহের রাত্রে নূতন বরকে লইয়া ঠিক অনুরূপ ব্যাপার বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ঘটিয়া থাকে এবং নূতন জামাইয়ের

সম্মুখে ঘোমটা ও পর্দ্দা বাঙালীর অন্তঃপুর হইতেও নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

কাপড় তুলিয়া লইয়া গৌরী দেখিল—সেখানা ছয়-ইঞ্চি চওড়া পাড়-যুক্ত ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী। মনে মনে হাসিয়া গৌরী সেখানা পরিধান করিল। কিন্তু জামা পরিতে গিয়াই লজ্জায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ছি ছি, কৃষ্ণা যে বলিয়াছিল 'স্বস্তি না পান সুখ পাবেন'—তার অর্থ এই। গৌরী তাড়াতাড়ি সেটাকে তোয়ালে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। মনে মনে একটু রাগও হইল। কৃষ্ণা বাহিরে বেশ ভালমানুষটি, লছমির মত চপলা নয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার এত কুবুদ্ধি! দাঁড়াও, তাহাকে জব্দ করিতে হইবে।

উত্তরীয়খানা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইতেই কৃষ্ণা পুনঃপ্রবেশ করিল, বলিল—'হয়েছে? এবার আসুন আমার সঙ্গে।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় যেতে হবে?'

কৃষ্ণা বলিল—'আমি যেখানে নিয়ে যাব। অত কৌতূহল কেন?'

গৌরী বলিল—'বেশ চল। তোমার শাস্তি কিন্তু তোলা রইল।'

নিরীহভাবে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল—'শাস্তি কিসের?'

গৌরীও পাল্টা জবাব দিল—'অত কৌতূহল কেন? শাস্তি যখন পাবে তার কারণও জানতে পারবে।'

কৃষ্ণা গৌরীকে মর্ম্মরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে লইয়া চলিল, সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েছিল বলুন ত? আমরা সবাই ঘাটে দাঁড়িয়ে জলবিহার দেখছিলুম, এমন সময় একটা ভারি গণ্ডগোল শুনতে পেলাম। তার কিছুক্ষণ পরেই আপনি ভাসতে ভাসতে আমাদের ঘাটে এসে হাজির হলেন।'

গৌরী বলিল—'কি যে হয়েছিল সেটা আমি এখনো ভালরকম বুঝতে পারিনি। বাঁটুল থেকে যেমন গুলি বেরিয়ে যায় তেমনি ছিট্‌কে কিস্তার জলে পড়েছিলুম, এইটুকুই মনে আছে।'

দ্বিতলে উঠিয়া একটা দরজার সম্মুখে কৃষ্ণা দাঁড়াইল, একহাতে পর্দ্দা সরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—'ভিতরে যান।'

গৌরীর মনে হইল সে যেন তাহার জীবনের এক মহারহস্যের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে কৃষ্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল—'আর তুমি?'

অল্প হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল—'আমিও আছি। আপনি আগে যান।'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৌরী ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা গৌরী ঘরের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঘরটি প্রকাণ্ড, চমৎকার ভাবে সাজানো, কিন্তু আস্‌বাবের বাহুল্য নাই। ছাদ হইতে চারিটি বহুশাখাযুক্ত ঝাড় সোনালি জিঞ্জিরে ঘরের চারিকোণে ঝুলিতেছে। তাহাদের শাখায় শাখায় অসংখ্য দীপ। ঘরের কোণে কোণে আবলুশ্ কাঠের তেপায়ার উপর প্রায় দু'ফুট উচ্চ পিতলের নারীমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি অর্দ্ধনগ্ন, একহাতে স্খলিত বস্ত্র বুকের কাছে ধরিয়া আছে—অপর হস্তটি ঊর্দ্ধোত্থিত; সেই হস্তে ধৃত অর্দ্ধস্ফুট কমলাকৃতি পাত্র হইতে মৃদু মৃদু সুগন্ধ ধূম উত্থিত হইতেছে। ঘরের মেঝেয় কোনো আস্তরণ নাই, পঙ্খের কাজের উপর নানা বর্ণের ঝিনুক বসাইয়া অপূর্ব্ব কারুকার্য্য করা হইয়াছে। তিনদিকের দেয়ালে দশফুট উচ্চ দরজা ভারী মখমলের পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, চতুর্থ দিকে একটি বাতায়ন। বাতায়ন দিয়া কিস্তার দৃশ্য চোখে পড়ে।

ঘরে কেহ নাই দেখিয়া গৌরী বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিল। পিছন ফিরিতেই দেখিল, যে-দরজা দিয়া সে প্রবেশ করিয়াছে তাহার বাহিরে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণা হাসিতেছে এবং ঘরের ভিতরে সেই দরজারই অনতিদূরে আর একটি নারীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে।

সেই মূর্ত্তিটির দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য গৌরীর হৃৎস্পন্দন যেন রুদ্ধ হইয়া গেল।

ফলফুল লতাপাতার সহিত তুলনা করিয়া সে রূপের বর্ণনা করা অসম্ভব। চুলচেরা বিশ্লেষণ করিতে যাওয়াও মূঢ়তা, কারণ বিশ্লেষণে শরীরটাই ধরা পড়ে—রূপ ধরা পড়ে না। গৌরী নিস্পন্দবক্ষে সেই অপরূপ মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে যেন অজন্তার একটি জীবন্ত চিত্র দেখিতেছে। তেমনি অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে কাপড়খানি পরা, চেলিটি তেমনি মধুর শাসনে ঊর্দ্ধাঙ্গের চপল লাবণ্য সংযত করিয়া রাখিয়াছে, উত্তরীয়খানি তেমনি

স্বচ্ছভাবে দেহটিকে যেন চন্দ্রকিরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, চেলি ও নীবির মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু তেমনি নির্লজ্জ ভাবে অনাবৃত; মাথায় তেমনি বিচিত্র সুন্দর কবরীবন্ধ, হস্তে তেমনি অপরিস্ফুট লীলাকমল। গৌরী নিশ্বাস ফেলিতে ভুলিয়া গেল।

জীবন্ত ছবিটির চোখদুটি একবার কাঁপিয়া খুলিয়া গিয়া আবার তৎক্ষণাৎ নত হইয়া পড়িল।

একটি ছোট্ট হাসির শব্দে গৌরী চমকিয়া চেতনা ফিরিয়া পাইল। সহসা তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল, সে কোথায় আসিয়াছে, এ কোন্ নন্দনবনে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে ?

কৃষ্ণা হাসিতে হাসিতে আসিয়া ছবির হাত ধরিয়া বলিল—'দু'জনেই যে চুপচাপ, চিনতে পারছ না নাকি ? তা হবে, চোখের দেখা ত ইতিমধ্যে হয়নি, সেই যা আট বছর বয়সে একবার হয়েছিল। আচ্ছা, আমিই না হয় নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি—ইনি হচ্ছেন দেবপাদ মহারাজ শঙ্কর সিং—তোমার বর, আর ইনি দেবী কস্তুরী বাঈ—আপনার রাণী। আর কি—পরিচয় হয়ে গেল—এবার তাহলে আমি যাই।'

কস্তুরীবাঈয়ের রজনীগন্ধার কলির মতন আঙুলগুলি কৃষ্ণার হাত চাপিয়া ধরিল। কৃষ্ণা তখন কানে কানে বলিল—'আচ্ছা, আমি যাব না, রইলাম। কিন্তু তোমার প্রভু সাঁতার কেটে আজকের দিনে দেখা দিতে এসেছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা কর।' বলিয়া হাত ধরিয়া তাঁহাকে গৌরীর সম্মুখে লইয়া আসিল।

গৌরী অপরাধীর মত দ্রুতস্পন্দিত বক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল সে ছদ্মবেশে চোরের মত পরস্ব অপহরণ করিতেছে। এই প্রীতির রত্নাগারে প্রবেশ করিবার তাহার অধিকার নাই।

কস্তুরী গৌরীর পায়ের কাছে নত হইয়া প্রণাম করিল। গৌরী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—'থাক থাক—হয়েছে।'

কৃষ্ণা বিদ্যুৎচপল চক্ষে চাহিয়া বলিল—'আপনি জল থেকে উঠেই ওঁর রাঙা পা দুখানির ওপর মুখ রেখে শুয়ে পড়েছিলেন, তাই উনি সেটা ফেরত দিলেন।'

গৌরী দেখিল, কস্তুরীর গাল দুটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে; সেও দেখাদেখি অত্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। তারপর লজ্জা দমন করিয়া সহজভাবে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'কি শুভক্ষণে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, তা এখন বুঝতে পারছি।'

কৃষ্ণা কস্তুরীর গা ঠেলিয়া বলিল—'নাও জবাব দাও। আমি বারবার তোমার হয়ে কথা কইতে পারিনা।'

কস্তুরীর ঠোঁট দুটি একটু কাঁপিয়া উঠিল, সে নতনয়নে ধীরে ধীরে বলিল—'আপনার যে আঘাত লাগেনি এই আমাদের সৌভাগ্য।'

গলাটি একটু ভাঙা-ভাঙা, কথাগুলি বাধ-বাধ; কিন্তু গৌরীর মনে হইল এমন মিষ্ট কণ্ঠস্বর বুঝি আর কাহারো নাই। আরো শুনিবার আশায় সে সতৃষ্ণভাবে কস্তুরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরব; কস্তুরী নতমুখী, নখ দিয়ে পদ্মের পাতা ছিঁড়িতেছে। কৃষ্ণা হাসিয়া উঠিল—'সব কথা ফুরিয়ে গেল ? আর কথা খুঁজে পাচ্ছনা ?—বেশ তাহলে এবার একটু জলযোগ হোক—আসুন।'

ঘরের মধ্যস্থলে মেঝের উপর কার্পেটের আসন বিছাইয়া জলযোগের আয়োজন সজ্জিত করা ছিল; মেঝের কারুকার্য্যের জন্ম এতক্ষণ তাহা গৌরীর চোখে পড়ে নাই। সোণার থালায় ফলমূল ও মিষ্টান্ন সাজানো ছিল; গৌরী দেখিয়া আপত্তি করিয়া বলিল—'এত রাত্রে আবার এ সব কেন ?'

কৃষ্ণা বলিল—'রাত এমন কিছু বেশী হয়নি। বসুন, রাত্রির আহারটা না হয় এখানেই সম্পন্ন হল, ক্ষতি কি ? আজকের দিনে আপনাকে সামনে বসিয়ে খাইয়ে সখির কত তৃপ্তি হবে সেটাও ভেবে দেখুন।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৌরী আসনে বসিল, কস্তুরী কৃষ্ণার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল—'তুমি খাওয়াও—আমি চললাম।'

কৃষ্ণা বলিল,—'তা কি হয়! তুমি বসে না খাওয়ালে উনি খেতে পারবেন কেন ?' গলা খাটো করিয়া বলিল—'তাছাড়া মহামান্য অতিথির অমর্য্যাদা হবে যে!'

দুই সখীতে মেঝের উপর বসিল। গৌরী নীরবে আহার সম্পন্ন করিয়া জলের পাত্রটা তুলিয়া লইয়া দেখিল তাহাতে লাল রঙের পানীয় রহিয়াছে। এই কয়দিন ঝিন্দে থাকিয়া সে জানিতে পারিয়াছিল যে এখানে সংযতমাত্রায় সুরাপান

করা দোষের নয়, এমন কি ছেলেবুড়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অসঙ্কোচে করিয়া থাকে। সুতরাং এ পাত্রের লালপানি যে কোন্ দ্রব্য তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না; সে পাত্রটি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—'আমাকে একটু শাদা জল দিন—মদ আমি খাই না।'

কৃষ্ণা বিস্ফারিতনেত্রে চাহিল, গৌরী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চট্ করিয়া সামলাইয়া লইল—'অর্থাৎ ছেড়ে দিয়েছি, আর খাই না।' ঝিন্দের শঙ্কর সিং যে ঐ রক্তবর্ণ তরল পদার্থটি কিছু অধিক মাত্রায় সেবন করিয়া থাকেন একথা ঝড়োয়ার রাজ-প্রাসাদে অবশ্য অবিদিত থাকিবার কথা নয়।

কস্তুরার মুখ সহসা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে চোখ দুটি একবার গৌরীর মুখের পানে তুলিয়াই আবার নত করিয়া ফেলিল। কিন্তু এই পলকের দৃষ্টিপাতেই তাহার মনের প্রীতিপ্রফুল্ল কথাটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। গৌরীর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

কৃষ্ণা দ্রুতপদে জল আনিতে উঠিয়া গেল; গৌরী ও কস্তুরী মুখোমুখি বসিয়া রহিল। দু'জনেই সঙ্কুচিত, গোপনে কস্তুরীর দেহ আলোড়িত করিয়া লজ্জার একটা ঝড় বহিয়া গেল। ওড়নাখানা সে গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া বসিল।

দুইজনে মুখোমুখি কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়? এদিকে কৃষ্ণাও বোধ করি দুষ্টামি করিয়া ফিরিতে দেরী করিতেছে। গৌরী কণ্ঠের জড়তা দূর করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—'মদ আমি ছেড়ে দিয়েছি, প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে আর ও জিনিস ছোঁবনা।'

কথাটা বলিয়াই সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কেন সে অকারণে এই মিথ্যা কথাটা বলিতে গেল? মদ সে ধরিলই বা কবে, ছাড়িলই বা কবে? শঙ্কর সিংএর ভূমিকা অভিনয় করিবার হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই বলিয়া অপ্রয়োজনে মিথ্যাচারের কি আবশ্যক? সে নিজের উপর ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সে বস্তুটির লোভে সে নিজের অজ্ঞাতসারে ওকথা বলিয়াছিল তাহাও পাইতে বিলম্ব হইল না। আবার তেমনি একটি চকিত সলজ্জ চাহনি স্মিত সপ্রশংস প্রসন্নতার রসে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া গেল।

কি আশ্চর্য্য চক্ষু! কি অপূর্ব্ব সম্মোহন দৃষ্টি! গৌরী মাথা হেঁট করিয়া ভাবিতে লাগিল—এমন সুন্দর লজ্জা সে আর কোথায় দেখিয়াছে কি? ইহারা পুরুষের সম্মুখে অসঙ্কোচে বাহির হয়, ঘোমটার বালাই নাই, অথচ ভাবে-ভঙ্গিতে কোথাও এতটুকু সম্ভ্রম শালীনতার অভাব নাই। বাঙালীর মেয়েরা কি ইহাদের চেয়ে অধিক লজ্জাশীলা?

জলের গেলাস লইয়া কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল, বলিল—'ওদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্চে না, ওরা আসছে সদলবলে এই ঘরে চড়াও করতে।'

জলপান করিয়া গৌরী আসনে উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণা পানের বাটা কস্তুরীর হাতে দিয়া বলিল—'নাও, বরকে পান দাও।'

একটু হাসিয়া একটু লাল হইয়া কস্তুরী পানের বাটা দু'হাতে ধরিয়া গৌরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরী সোনালি তবক-মোড়া পান তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিল।

এমন সময় আর কোনো বাধা না মানিয়া সখীর দল একঝাঁক প্রজাপতির মত ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহাদের কিঙ্কিনী পাঁয়জোরের শব্দে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে আসিয়া গৌরীকে ঘিরিয়া ধরিল; লছমি কপট অভিমানের সুরে বলিল—'সখিকে পেয়ে আমাদের ভুলে গেলেন?'

সখি ব্যূহের বাহিরে কস্তুরী কৃষ্ণার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল—'তোরা এখন যা হয় কর, আমি পালাই।' বলিয়া অলক্ষ্যে ঘর ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ লছমির সহিত রঙ্গ-তামাসার পর গৌরী কৃষ্ণাকে ডাকিয়া বলিল—'একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, সিংগড়ে খবর পাঠানো হয়নি। তারা হয়ত ভাবছে আমি—'

কৃষ্ণা বলিল—'খবর অনেক আগে পাঠানো হয়েছে। আপনার স্মরণশক্তির যে রকম অবস্থা, প্রজাদের পক্ষে মোটেই শুভ নয়।'

গৌরী বলিল—'প্রজাপতিদের মধ্যে পড়ে প্রজাদের কথা ভুলে যাওয়া আর বিচিত্র কি?'

কৃষ্ণা বলিল—'আমরা কি প্রজাপতি?'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'সবাই নয়। তুমি ভিমরুল।'

ভ্রূভঙ্গী করিয়া কৃষ্ণা বলিল—'কেন—আমি ভিমরুল কেন?'

গৌরী বলিল—'মধু'র দিকেও তোমার লোভ আছে, আবার হুল ফোটাতেও ছাড় না।'

বাঁকা হাসিয়া কৃষ্ণা বলিল—'কখন হুল ফোটালাম ?'

গৌরী একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—কস্তুরী নাই। ভৎর্সনাপূর্ণ চক্ষু কৃষ্ণার দিকে ফিরাইয়া বলিল—'তোমার শাস্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, অল্প শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব, কিন্তু তা আর হ'তে দিলে না।'

কৃষ্ণা বলিল—'সে কি ? আপনার জন্য এত করলুম, তবু শাস্তি বেড়ে গেল ?'

ঘাড় নাড়িয়া গৌরী বলিল—'হ্যাঁ।'

'কি করলে শাস্তি থেকে রেহাই পাব বলুন ত ?'

গৌরী উত্তর দিতে-যাইতেছিল, এমন সময় এক প্রৌঢ়া পরিচারিকা আসিয়া কৃষ্ণার কানে কানে কি বলিল। কৃষ্ণা পরিহাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'সর্দ্দার ধনঞ্জয় এসেছেন, বাহির মহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

এত শীঘ্র ! গৌরীর মুখখানা একটু ম্লান হইয়া গেল ; সে যে আর একজনের চরিত্র অভিনয় করিতেছে তাহা স্মরণ হইল। তবু হাস্যমুখে সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল—'আজ তাহলে চললাম। স্বর্গে আসবার ইচ্ছা হলে আবার কিস্তার জলে ডুব দেওয়া যাবে—কি বল রম্ভাবাঈ।'

বোধহয় আগে হইতে মন্ত্রণা ছিল, সকলে একসঙ্গে হাত পাতিয়া বলিল—'আমাদের বকশিশ্ ?'

'কি বকশিশ্ চাও ?'

'আপনি যা দেবেন।'

'আচ্ছা বেশ। আমার সঙ্গে ত এখন কিছু নেই, এমন কি এই কাপড়টা পর্য্যন্ত ধার করা। আমি তোমাদের বকশিশ্ পাঠিয়ে দেব। ভাল কথা, তোমাদের বিয়ে হয়েছে ?'

লছমি বলিল—'না, আমরা সবাই কুমারী।'

শুধু কৃষ্ণার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

গৌরী বলিল—'আচ্ছা বেশ, তাহলে কৃষ্ণা ছাড়া আর সকলকে একটি করে বকশিশ্ পাঠিয়ে দেব।'

কৌতূহলী লছমি জিজ্ঞাসা করিল—'কি বকশিশ্ দেবেন ?'

'একটি ক'রে বর'—বলিয়া হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিল।

অন্দর ও সদরের সন্ধিস্থলে কৃষ্ণা বিদায় লইল, বলিল—'আমার শাস্তি কিসে লাঘব হবে তা ত বললেন না ?'

'আজ নয়—যদি সুবিধা হয় আর একদিন বলব'—একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া প্রতিহারীর অনুসরণ করিয়া গৌরী সদর মহলে প্রবেশ করিল।

মজলিশ-ঘরে ঝড়োয়ার মন্ত্রী অনঙ্গদেও কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ধনঞ্জয় ও রুদ্ররূপকে সসম্মানে মধ্যে বসাইয়া আদর আপ্যায়ন করিতেছিলেন—স্বভাবতঃই নদীবক্ষে দুর্ঘটনার কথা হইতেছিল, ধনঞ্জয় একটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক আখ্যায়িকা রচনা করিয়া বুঝাইতেছিলেন যে ব্যাপারটা নিতান্তই দৈব-দুর্ঘটনা—এমন সময় গৌরী আসিতেই সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইলেন। ধনঞ্জয় দ্রুতপদে কাছে আসিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিয়া কুশলপ্রশ্ন করিলেন—'মহারাজ অক্ষত আছেন ? কোন প্রকার অসুস্থতা বোধ করছেন না ?'

গৌরী হাসিয়া বলিল—'কিছু না, বরঞ্চ ভালই বোধ করছি। কিন্তু তোমার চেহারাখানা ত ভাল ঠেকছেনা সর্দ্দার ? চোট পেয়েছ ?'

ধনঞ্জয় হাসিলেন ; হাসিটা কিন্তু আমোদের নয়। বলিলেন—'বিশেষ কিছু নয়, শরীরে চোট অবশ্যই লেগেছে। কিন্তু সে যাক'—অনঙ্গ দেওয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'এখন অনুমতি করুন, রাজাকে নিয়ে আমরা সিংগড়ে ফিরি। সেখানে সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।'

মন্ত্রী অনঙ্গদেও ঝড়োয়ার পক্ষ হইতে রাজার বিপন্মুক্তিতে আনন্দ ও অভিনন্দন প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন—'কিন্তু আজ রাত্রিটা মহারাজ এই পুরে বিশ্রাম করলে হ'তনা ? মহারাজের শুভাগমন এতই আকস্মিক যে আমরা তাঁর যোগ্য সম্বর্দ্ধনা করবার অবকাশ পেলামনা—'

ধনঞ্জয় দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—'তা সম্ভব নয়। আজ রাত্রে মহারাজকে রাজধানীতে ফিরতেই হবে। পরে মহারাজকে সম্বর্দ্ধনা করবার আপনারা অনেক সুযোগ পাবেন, আজ অনুমতি দিন।'

অনঙ্গদেও সহাস্যে বলিলেন—'উনি এখন আমাদেরও মহারাজ, ওঁর ইচ্ছাই আমাদের কাছে আদেশ।' তাঁহার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে গৌরী ঘাড় নাড়িল—'ভাল, পঞ্চাশজন সওয়ার সঙ্গে দিই ?'

একটু চিন্তা করিয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'তা দিন।—মহারাজ জীবিত আছেন সংবাদ পেয়েই আমি রুদ্ররূপকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এসেছি। পার্শ্বচর আনবার কথা মনেই হয়নি।'

অল্পকাল মধ্যেই সম্মুখে ও পশ্চাতে পঞ্চাশজন বল্লমধারী ঘোড়সওয়ার লইয়া তিনজন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথে কোনো কথা হইল না। গৌরী ঘোড়ার উপর বসিয়া হেঁটমুখে নিজের চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিল। কিস্তার সেতু পার হইয়া সিংগড়ে পদার্পণ করিবার পর ধনঞ্জয় একবার মাত্র কথা কহিলেন, তীক্ষ্ণ চক্ষু তুলিয়া গৌরীকে প্রশ্ন করিলেন—'রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?'

গৌরী নিদ্রোত্থিতের মত মুখ তুলিয়া বলিল—'হয়েছিল।'

ধনঞ্জয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন ন, কিন্তু তাঁহার মুখ ভীষণ অন্ধকার ও ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল।'

নবম পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা

সিংগড়ে প্রাসাদের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে গোপন মন্ত্রণাসভা বসিয়াছিল। গৌরী, ধনঞ্জয় ও বজ্রপাণি গালিচার উপর আসীন ছিলেন, রুদ্ররূপ দ্বারে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে; নগরের আমোদ-প্রমোদ রাজার মৃত্যু-সংবাদে থামিয়া গিয়াছিল, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ হইয়াছে। দূর হইতে তাহার কলরব কানে আসিতেছে।

বজ্রপাণি ললাটের একটা কালশিরার উপর সন্তর্পণে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—'বিপদ এই যে, এ নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে রাজ্যসুদ্ধ এমন একটা সোরগোল পড়ে যাবে—যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ময়ূর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যদি ভিতরের কথাটা ফাঁস ক'রে দেয়, তাহলে আমাদের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌বে। শঙ্করসিংএর বদলে অন্য একজনকে রাজা খাড়া করেছি, এমন কি অভিষেক পর্য্যন্ত করিয়েছি, এই অভিযোগ যদি সে প্রকাশ্য দরবারে আনে—তার সদুত্তর আমাদের পক্ষ থেকে কি আছে?'

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ অভিযোগ লোকে বিশ্বাস করবে?'

বজ্রপাণি বলিলেন—'বিশ্বাস না করুক, একটা সন্দেহ ত জন্মাতে পারে। ময়ূরবাহন যে প্রকৃতির লোক, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। শেষ পর্য্যন্ত সে উদিতকেও ফাঁসিয়ে দিতে পারে, বল্‌তে পারে আসল রাজাকে উদিত শক্তিগড়ে বন্দী ক'রে রেখেছে।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ওকথা যদি বলে—তাহলে সে নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়বে, শঙ্করসিংকে গুম করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়বে।'

বজ্রপাণি বলিলেন—'কিন্তু তাতে আমাদের কোনো লাভ হবে কি? বরং শঙ্করসিং যদি বা এখনো বেঁচে থাকেন, তাঁর প্রাণ সংশয় হয়ে উঠ্‌বে।'

গৌরী অজ্ঞাতসারে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ বজ্রপাণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ যে ময়ূরবাহনের কাজ, তাতে আপনার কোনো সন্দেহ নেই?'

গৌরী বলিল—'বিন্দুমাত্র না। সে হাসি ময়ূরবাহনের একথা আমি হলফ নিয়ে বল্‌তে পারি।'

'আপনি তাকে চোখে দেখেন নি?'

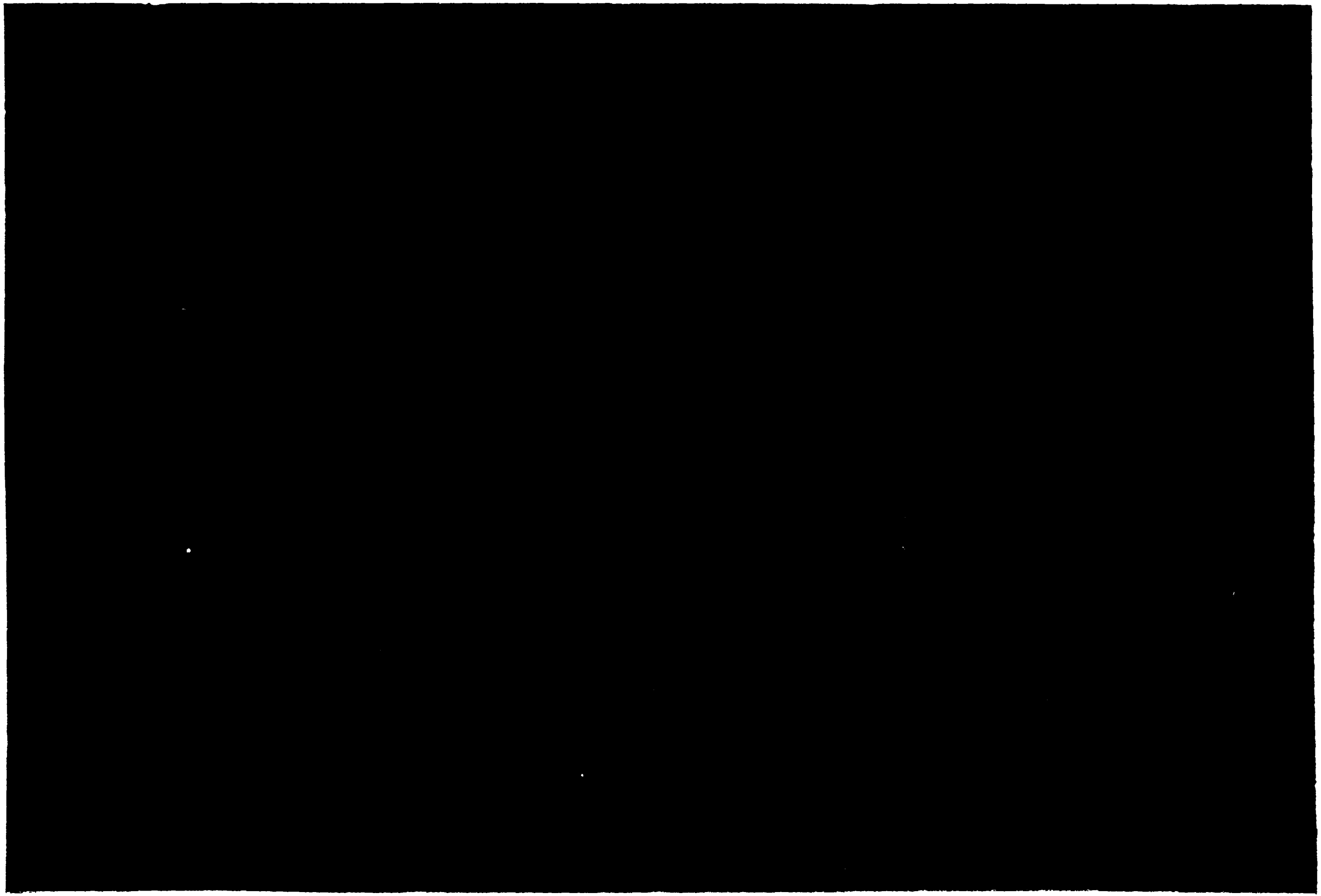
'না।'

'এক হাসি ছাড়া আপনার আর কোনো প্রমাণই নেই?'

'না—কিন্তু—'

বজ্রপাণি হাত তুলিয়া বলিলেন—'জানি। এ যে ময়ূরবাহনের কাজ—তাতে আমারও কোনো সংশয় নেই। সে ছাড়া এমন কাজ করবার দুঃসাহস উদিত সিংএরও নেই। কিন্তু কথা ত তা নয়। ময়ূরবাহনকে শাস্তি দিতে গেলে তার অপরাধ সকলের সামনে সাবুদ্‌ করতে হবে। ময়ূরবাহন কি নিজের দোষ স্বীকার করবে ভেবেছ? বরঞ্চ পঁচিশটা সাক্ষী এনে প্রমাণ করে দেবে যে ও-সময় সে আর এক জায়গায় ছিল। তখন তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রমাণ কি? শুধু ঐ হাসি ছাড়া আর কিছু আছে কি?'

ধনঞ্জয় অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'কিন্তু এত প্রমাণ খুঁজে বেড়াবারই বা দরকার কি? রাজার হুকুমে



শিল্পী— শ্রীযুক্ত খগেন রায়

মেঘ মল্লার

Bharatvarsha Printing Works

যদি আমরা তাকে ধ'রে এনে কয়েদ করে রাখি কিম্বা যদি কোতল করি, তাহলেই বা কে কি বলতে পারে? প্রজার দণ্ডমুণ্ডের উপর রাজার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—অন্ততঃ আমাদের দেশে আছে। রাজা আইন মেনে চলতে বাধ্য নয়।'

বজ্রপাণি ক্লান্ত হাসিয়া বলিলেন—'তুমি বুঝছনা ধনঞ্জয়, রাজার দণ্ডমুণ্ডের অধিকার আছে সে আমিও জানি। কিন্তু ময়ূরবাহন একজন সামান্য মজুর বা দোকানদার নয়, সে দেশের একজন গণ্যমান্য লোক, তার একজন মস্ত মুরুব্বি আছে। রাজা সিংহাসনে বসেই যদি তাকে ধরে এনে বিনা বিচারে কোতল করেন তাহলে রাজ্যে কি ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হবে সেটা ভেবে দেখ। উদিত এই নিয়ে দেশের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলবে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকেও এর মধ্যে টেনে আনবে। তার ওপর জাল রাজার কথাটা যদি কোনোক্রমে বেরিয়ে পড়ে তখন ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে একবার বুঝে দেখ।'

কিছুক্ষণ সকলে নতমুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বৃদ্ধ মন্ত্রীর অকাট্য যুক্তিজাল ভেদ করিয়া ময়ূরবাহনকে শাস্তি দিবার কোনো পন্থাই খুঁজিয়া পাইলেন না।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কি করতে বলেন?'

দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া শেষে বজ্রপাণি বলিলেন—'আজ রাগের মাথায় মরিয়া হয়ে ওরা এই দুঃসাহসিকতার কাজ ক'রে ফেলেছে, তাদের নৌকাখানা ডুবে না যেতেও পারত—মাঝি-মাল্লারা ধরা পড়তে পারত, এমন কি স্বয়ং ময়ূরবাহন হাতে হাতে গ্রেপ্তার হ'তে পারত। সুতরাং এরকম কাজ আর তারা সহজে করবে বলে মনে হয় না।—এক ভয় গুপ্তহত্যা—এঁকে গুপ্তভাবে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু সে জন্য আমি ভয় করি না। সতর্ক থাকলে ওদিক থেকে কোনো আশঙ্কা নেই।'

গৌরী নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিল—'রাজা হবার সুখ ত অনেক দেখতে পাচ্ছি।'

বজ্রপাণি বলিলেন—'আমার মতে এখন কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকাই একমাত্র যুক্তি। শঙ্করসিং যে শক্তিগড়ে আছেন এটা আমাদের অনুমান মাত্র—সে-সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হ'য়ে তারপর তাঁকে উদ্ধার করবার মতলব ঠিক করা যাক। ইতিমধ্যে যদি ময়ূরবাহনকে কোনো রকমে ফাঁদে ফেলতে পারি—' কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে কপালের স্ফীত স্থানটায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কিন্তু ইতিমধ্যে শঙ্করসিংকে উদিত যদি খুন করে?'

মাথা নাড়িয়া ধনঞ্জয় বলিলেন—'তা করবে না। আপনি যে জালরাজা তার একমাত্র প্রমাণ তাহলে লুপ্ত হয়ে যাবে। উদিত নিজের ভাইকে খুন করে আপনাকে গদিতে বসাবে—এতবড় পাগল সে নয়।'

এই সময় বাহিরে পদধ্বনি শুনা গেল। রুদ্ররূপ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল; দ্বারের বাহিরে কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথোপকথন হইল, তারপর রুদ্ররূপ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'মাঝিমাল্লার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। নৌকার জন্যে ডুবুরি নামানো হয়েছিল কিন্তু নৌকা পাওয়া গেলনা; খুব সম্ভব কিস্তার স্রোতের টানে তলায় তলায় ভেসে গেছে।'

সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া সংবাদ শুনিলেন। কিয়ৎকাল পরে ধনঞ্জয় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'হুঁ। ময়ূরবাহনের কপাল ভাল।'

প্রাসাদের দেউড়িতে মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজিল। কিন্তু কাহারো কাণে তাহা পৌঁছিল না, সকলে নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

বাহিরে আবার পদশব্দ হইল; এবার পদশব্দ অপেক্ষাকৃত লঘু, অন্দর মহলের দিক হইতে আসিল। রুদ্ররূপ আবার বাহিরে গেল, অল্পকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া গৌরীর কাণে কাণে কি বলিল।

গৌরী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—'কি! চম্পা আমার জন্যে জেগে বসে আছে! সত্যিই ত, আমি না ঘুমলে যে সে-ছোকরীর ঘুমবার হুকুম নেই। কচি মেয়েটার ওপর কি অত্যাচার দেখ দেখি! না, কালই আমি ওকে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব।—এখন তোমরা মন্ত্রণা শেষ কর সর্দার, আমি চললাম' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধনঞ্জয়ও উঠিয়া অর্দ্ধপথে একটা হাই নিরুদ্ধ করিয়া বলিলেন—'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই। আজ রাতটাও আমাকে বসেই কাটাতে হবে।'

গৌরী বাধা দিয়া বলিল—'না না—সর্দ্দার, তুমি ভারি ক্লান্ত হয়েছ, যাও, নিজের বাড়ীতে একটু বিশ্রাম করে নাও গে। তোমার বদলে রুদ্ররূপ আমার কাছে থাকবে এখন।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'তা হয়না—আমাকেই থাকতে হবে।'

গৌরী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'আমি হুকুম দিচ্ছি সর্দ্দার, তুমি এই মুহূর্ত্তে বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করগে, বেলা আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বে না। যাও—রাজার আদেশ—দ্বিরুক্তি ক'রো না।'

গৌরী পরিহাসের ভঙ্গিতেই কথাটা বলিল বটে—কিন্তু এই পরিহাসের অন্তরালে যে সত্যকার একটা জোর আছে তাহা ধনঞ্জয়ও অনুভব করিলেন। এই বাঙালী যুবকটিকে তাঁহারা রাজা সাজাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার যে একটা অত্যন্ত জোরালো স্বাধীন ইচ্ছা আছে, সকল সময় ইহাকে লইয়া পুতুলখেলা চলিবে না—তাহার প্রথম ইঙ্গিত পাইয়া ধনঞ্জয় ও ভার্গব দুজনেই সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিলেন।

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসুভাবে ভার্গবের দিকে ফিরিতেই তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন—'উনি ঠিক বলেছেন। তুমি যাও, তোমার বিশ্রাম করা নিতান্ত দরকার। রুদ্ররূপ আজ ওঁর প্রহরীর কাজ করুক।'

ধনঞ্জয় গৌরীর দিকে ফিরিয়া ফৌজী স্যালুট্ করিয়া বলিলেন—'যো হুকুম!'

তাহার চোখের দৃষ্টিতে যদি বা একটু শ্লেষের আভাষ প্রকাশ পাইল কণ্ঠস্বরে তাহার লেশমাত্র ধরা পড়িল না।

গৌরী একটু হাসিল, তারপর রুদ্ররূপের স্কন্ধে হাত রাখিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সিংগড়ের রাজপ্রাসাদে যখন এইরূপ মন্ত্রণা শেষ হইতেছিল, বেতপুরের রাজ-অন্তঃপুরেও একটি শয়নকক্ষে তখন সখিতে সখিতে গোপন মন্ত্রণা চলিতেছিল। মন্ত্রণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। শয়নকক্ষের নিভৃত নির্জ্জনতায় দুটি অন্তরঙ্গ সখিতে যে-সকল মনের কথা হয়, তাহা সাধারণের শ্রোতব্য নয়। শুধু সত্যের অনুরোধেই তাহা প্রকাশ করিতে হইতেছে।

কস্তুরীর শয়নকক্ষ হইতে অনেক রাত্রে নিদ্রালু সখিরা একে একে প্রস্থান করিলে পর কৃষ্ণা বলিল—'এবার ঘুমোও। আলো নিবিয়ে দিই?'

শয়নঘরে দুইটি পালঙ্ক; একটিতে কস্তুরী শয়ন করে, অন্যটিতে প্রিয়সখি কৃষ্ণা। কস্তুরী শুইয়া পড়িয়াছিল, কৃষ্ণা তখনো চুলের বিনুনি খুলিতে খুলিতে ঘরে অলসভাবে ঘুরিতেছিল।

কস্তুরী বলিল—'আর একটু থাক্। তোর বুঝি ঘুম পাচ্ছে?'

কৃষ্ণা একটা হাই গোপন করিয়া বলিল—'হ্যাঁ।'—মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার বুঝি আজ আর চক্ষে ঘুম নেই?'

কস্তুরী কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া একটু সলজ্জ হাসিল।

কৃষ্ণা নিজের পালঙ্কে গিয়া বসিল, বলিল—'কি ভাবা হচ্চে জান্‌তে পারি কি?'

'কিছু না। তুই খানিক আমার কাছে এসে শো।'

কৃষ্ণা চোখে দুষ্টামি ভরিয়া বলিল—'এরি মধ্যে আর একলা শুতে ভাল লাগছে না?'

'দূর হ' পোড়ারমুখি!'

'দূর ত হবই। তখন কি আর আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবে?'

'তুই না হয় তখন বিজয়লালের ঘরে যাস।'

'তাই যাব। তুমি চলে গেলে আর কি আমি এ মহলে থাকব ভেবেছ?'

—হঠাৎ কৃষ্ণার দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কস্তুরী দুই হাত বাড়াইয়া বলিল—'আবার কৃষ্ণা!—আচ্ছা আলোটা নিবিয়েই দে।'

আলো নিবাইয়া কৃষ্ণা কস্তুরীর পাশে আসিয়া শয়ন করিল। দুই সখি কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপর কৃষ্ণা বলিল—'আচ্ছা, বিয়ের পরও ত তুমি এ বাড়ীতে থাকতে পার। তখন ত দুই রাজ্যই এক হয়ে যাবে। তিনি কি তোমাকে এখানে থাকতে দেবেন না?'

কস্তুরী জবাব দিলনা, কৃষ্ণা আবার নিজমনেই বলিল,—'না, তা কি করে দেবেন? তাঁকে ত সিংগড়েই থাকতে হবে; আর তোমাকে ছেড়েও তিনি থাকতে পারবেন না। এ বাড়ী তখন শূন্য পড়ে থাক্‌বে।'

কৃষ্ণার গলা জড়াইয়া কস্তুরী বলিল—'তখন তুই এ মহলে থাকিস্। আমি রোজ কিস্তা পার হ'য়ে তোকে দেখে যাব।'

কৃষ্ণা বলিল—'তা কি হবে? তোমার মালিক যেমন তোমাকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবেন, আমার মালিকও ত আমাকে নিজের ভাঙা কুঁড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে পুরবে।'

কস্তুরী বলিল—'সেই ভাঙা কুঁড়ে ঘরে যাবার জন্যে তোর প্রাণ কি করছে তা যদি না জানতাম—তাহলে কি তোকে আমি ছেড়ে দিতাম কৃষ্ণা। আমার সঙ্গে নিয়ে যেতাম।'

দুই সখিতে অনেকক্ষণ নীরবে শুইয়া রহিল। শেষে একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস দমন করিয়া কৃষ্ণা বলিল—'ও কথা থাক—ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। —আজ কেমন দেখলে বল।'

'কাকে?'

'আহা, বুঝতে পারেন নি যেন।'

কস্তুরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'আগে তুই বল, তোর কেমন লাগ্‌ল।'

'আমার আর কেমন লাগা-লাগি কি। ভাল লাগ্‌লেও তুমি ত আর প্রাণ ধরে কাউকে ভাগ দিতে পারবে না।'

'ভাগ চাস্‌?'

'চাইলেও অন্যায় হয় না।'

'কেন?'

'আমার প্রিয়সখিকে তিনি যে কেড়ে নিয়ে যাচ্চেন, তার বদলে আমায় কি দিয়েছেন? খালি শাস্তি দেবেন ব'লে ভয় দেখিয়েছেন।'

কস্তুরী ধরা-ধরা গলায় বলিল—'তোর সখিকে তোর কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না কৃষ্ণা। এ জন্মে নয়।'

'এ জন্মে নয়? ঠিক?'

'ঠিক।'

'আচ্ছা, আমিও তবে আর কিছু চাইনা। আমার সখি আর আমার'—কাণেকাণে—'বিজয়লালের কুঁড়ে ঘর যতদিন আমার আছে ততদিন আমি তাদের বদলে স্বর্গও চাইনে।' বলিয়া দুই সখি অন্ধকারে পরস্পরকে চুম্বন করিল।

কস্তুরী বলিল—'এবার তবে বল্‌, তোর কেমন লাগ্‌ল।'

কৃষ্ণা অনেকক্ষণ উত্তর দিল না; তারপর আস্তে আস্তে যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল—'দেখ, ওঁর নামে অনেক কথাই আমাদের কাণে এসেছে। কথাগুলো এতদিন অবিশ্বাস করবারও কোনো কারণ হয়নি—রাজপুত্রেরা বেশীর ভাগই ত ঐ রকম হয়ে থাকেন। কিন্তু আজ তাঁকে দেখে মনে হল, তার সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম তার অধিকাংশই মিথ্যে কথা।'

কস্তুরী বলিয়া উঠিল—'সব মিথ্যে কথা কৃষ্ণা—একটা কথাও সত্যি নয়!'

কৃষ্ণা বলিল—'হ্যাঁ।—দেখ, এক বিষয়ে আমরা গেরস্তর মেয়েরা রাণীদের চেয়ে সুখী—আমরা স্বামীকে পুরোপুরি পাই। তাই, তোমার কথা ভেবে মনকে চোখ ঠারছিলাম বটে, কিন্তু প্রাণে আমার সুখ ছিলনা। আজ একটিবার মাত্র ওঁকে দেখে আমার প্রাণে শান্তি ফিরে এসেছে; বুঝেছি, আমার এই অনাঘ্রাত ফুলটি সত্যিই মহেশ্বরের পায়ে পড়বে।'

কস্তুরী নীরবে উদ্বেলিত হৃদয়ে এই অমৃততুল্য কথা শুনিতে লাগিল; তাহার মনে হইল কৃষ্ণাকে এত মিষ্টকথা বলিতে সে আর কখনো শুনে নাই। মাটির ঠাকুরকে অভ্যাসমত পূজা করিতে বসিয়া যাহারা অপ্রত্যাশিত ভাবে জীবন্ত হৃদয়দেবতাকে সম্মুখে পায় তাহাদের মনের ভাব বুঝি এমনিই হয়।

কৃষ্ণা বলিতে লাগিল—'পুরুষ মানুষ মন্দ কি ভাল, তার চোখের চাউনি দেখে ধরা যায়। আজ উনি তোমার দিকে চাইলেন, মনে হল যেন চোখ দিয়ে তোমার আরতি করলেন।—যার মনে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে লোভ আছে সে অমন করে চাইতে পারেনা। সত্যি বলছি, ওঁর সম্বন্ধে কোনো কুৎসাই আর আমার বিশ্বাস হয়না।'

অর্দ্ধ-রুদ্ধকণ্ঠে কস্তুরী বলিল—'আমারও না। যতদিন দেখিনি ততদিন মনে হ'ত হয়ত সত্যি। কিন্তু এখন—'

'এখন আমার সখির জীবন-যৌবন সফল হল। কবি গেয়েছেন জান ত?—তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ!'

অতঃপর দুইজনে বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল—'কি ভাব্‌ছ?'

কস্তুরী থামিয়া থামিয়া বলিল—'ভাবছি—একটা কথা।'

'কি কথা?'

'বলব না।'

'লক্ষিটি বল। আমার কাছে মনের কথা লুকুলে কিন্তু ভারি রাগ করব।'

কৃষ্ণার বুকে মুখ গুঁজিয়া মৃদু অস্ফুটস্বরে কস্তুরী বলিল—'ভাবছি, আবার কবে দেখতে পাব।'

কৃষ্ণা কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল—'এখনো যে তিন ঘণ্টা হয়নি—এরি মধ্যে আর না দেখে থাকতে পারছ না?'

কস্তুরী বলিল—'তুই যে বিজয়লালকে রোজ দেখিস, একদিন যদি ঘোড়ায় চড়ে তোর জান্‌লার সামনে এসে না দাঁড়ায় তাহলে সারাদিন ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াস! সে বুঝি কিছু নয়?'

'আমার কথা ছেড়ে দাও, আমার বদ অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার এরি মধ্যে এই! এখনি দেখেছ—আবার এখনি দেখবার জন্যে পাগল! তুমি যে শকুন্তলাকেও হার মানালে!'

'কতটুকুই বা দেখেছি?'

'কেন, আর একটু বেশী করে দেখে নিলেই পারতে? তখন ত কেবলি পালাই পালাই করছিলে!'

'ভারি যে লজ্জা করছিল।'

'তা আমি কি করব—এখন লজ্জার ফল ভোগ কর।'

'কৃষ্ণা—সত্যি বল, আবার কবে দেখা হবে?'

'বিয়ের রাত্রে।'

কস্তুরী চুপ করিয়া রহিল, কৃষ্ণা তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—'অতখানি বুঝি সবুর সইবেনা? তার আগেই দেখতে হবে?—বেশ, মন্ত্রীমশায়কে বলি তিনি রাজাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠান।'

'দূর! সে কি ভাল হবে?'

'কেন মন্দই বা কি হবে? তিনি আজ যেভাবে এসেছিলেন তাতে আমরা তাঁকে সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করতে পারিনি। তাই তাঁকে যদি এবার নিমন্ত্রণ করে আনা হয় তাতে দোষ কি হবে?'

কস্তুরী নীরব রহিল দেখিয়া কৃষ্ণা বুঝিল ইহাতেও তাহার মনঃপূত হয় নাই, বলিল—'এতেও মন উঠ্‌ছে না? তবে কি চাই' মন খুলে বলনা।'

কস্তুরী বলিল—'আর আমি বলতে পারি না। বুঝেছিস্‌ ত।'

'কি?'

'তুই একবার দেখা।'

কৃষ্ণা হাসিল—'অর্থাৎ লুকিয়ে লুকিয়ে—কেউ জানবে না—এই ত?'

কস্তুরী মৌন। কৃষ্ণা তখন বলিল—'আচ্ছা তা আর শক্ত কি? শুধু একবারটি দেখা নিয়ে ত কথা? উনি কিস্তায় জলবিহার করতে বেরুবেন তার বন্দোবস্ত করছি—তুমি ঘাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখো। তা হলে হবে ত?'

'কৃষ্ণা, তুই বড্ড জ্বালাস্‌!'

'হুঁ, তার মানে শুধু দেখলে মন ভরবে না, দেখা দেওয়াও চাই। কেমন?'

কস্তুরী কৃষ্ণাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল, কৃষ্ণা বলিল—'বুঝেছি। কিন্তু কাজটি ত সহজ নয়। একটু ভাবতে হবে।'

'তা ভাব্‌ না—কে বারণ করেছে?'

'কিন্তু আজ নয়, ওদিকে সকাল হ'তে চল্‌ল খেয়াল আছে? এবার ঘুমিয়ে পড়।'

কৃষ্ণা উঠিয়া পড়িল, নিজের শয্যায় গিয়া শুইবার উপক্রম করিয়া বলিল—'কিন্তু আমার একার বুদ্ধিতে বোধ হয় কুলোবে না—আর একজনের সাহায্য চাই।'

'কার?'

'আমার একজন মন্ত্রী আছে—তার।'

কস্তুরী হাসিয়া বলিল—'তা বেশ ত, কাল বাড়ী যা না। অনেক দিন ত যাস্‌নি।'

কৃষ্ণা বলিল—'উঃ কি দরদ—অনুমতি দিতে একটুও দেরী হল না!' বলিয়া কৃষ্ণা শুইয়া পড়িল।

একটা কৌতূহল কস্তুরীর মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সে জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা কৃষ্ণা, তুই বিজয়লালকে খুব ভালবাসিস্‌?'

'কেন বল দেখি?'

'সব সময় তার কথা ভাবিস?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, দেখা হলে কি করিস?'

'হাসি, কথা কই, গল্প করি।'

'আর—?'

'আর কিছু না—ঐ পর্য্যন্ত।' একটু থামিয়া বলিল—

'একদিন শুধু পান দিতে গিয়ে হাতে হাত ঠেকে গিয়েছিল।'

'সেটি বুঝি মনে গেঁথে রেখেছিস?'

কৃষ্ণা চোখ বুজিয়া আবার সেই স্পর্শটা নূতন করিয়া অনুভব করিয়া লইল, বলিল—'ইচ্ছে করে মনে গেঁথে রেখেছি তা নয়—ভুলতে পারা যায় না।'

কস্তুরী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল—'আচ্ছা, এবার ঘুমো।'

দুজনেই ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘুম সহসা আসিল না। দীর্ঘকাল এই ভাবে কাটিবার পর কৃষ্ণা একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ঘুমোলে?'

'না। কেন?'

'একটা কথা ভাবছি।'

'কি কথা?'

'তোমাদের দেখা-সাক্ষাৎ আমি ঘটাতে পারি, কিন্তু লোকে জানতে পারলে তোমার নিন্দে হবে।'

এইবার কস্তুরীর কণ্ঠে রাণীর সতেজ অভিমান প্রকাশ পাইল, সে বলিল—'আমার মালিকের সঙ্গে যদি আমি দেখা করি—কার কি বলবার আছে? আর, আমার কাজের সমালোচনাই বা করে কে?'

এই অসহিষ্ণুতায় কৃষ্ণা অন্ধকারে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—'তা ঠিক।—কাল তাহলে আমি বাপের বাড়ী যাব?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আজ তবে আর কথা নয়।'

দুই সখি পাশ ফিরিয়া শুইল। ক্রমশঃ

সখের ফুল-বাগান

শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

সখ মাত্রেই ব্যক্তিগত রুচির বিকাশ, কিন্তু সব-ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা সমান নয়। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে খাদ্য সম্বন্ধে "অপ্ রুচি" এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে "পর-রুচি" অনুসরণ করা-ই প্রকৃষ্ট। কিন্তু রুচির এই জাতি-বিভাগ অনুসারে বাগানের সখ খাদ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত অথবা পরিচ্ছদ-শ্রেণীর অন্তর্গত—সেকথা বলা কঠিন—কারণ বাগান জিনিসটি নিজের জন্যও বটে, আবার অন্য পাঁচ জনের জন্যও বটে।

রুচি যেমনই হোক, যে-কোনও বাগান তৈরী করতে হলেই উদ্যান-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার—গাছপালার একটা নিজস্ব ধর্ম্ম আছে, তা' মানুষের রুচি নিরপেক্ষ। উদ্যানচর্য্যা এক রকম ফলিত বিজ্ঞান—এর মধ্যে বিজ্ঞানও রয়েছে, আবার আর্ট-ও রয়েছে। সুতরাং বাগানের সখ পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে হ'লে উদ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান দরকার, হাতে-কলমে শিক্ষাও তার চেয়ে কম দরকার নয়। এই হাতে-কলমে-শিক্ষা অর্থাৎ উদ্যানকলা, মাটি ও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। কলকাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থাতে বালিগঞ্জ হর্টিকাল্‌চারাল্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে-সব পরীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে, তার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করছি—বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ স্থানে এ-সিদ্ধান্তগুলি সার্থক হবে, আশা করা যায়।

"সখের বাগান" বলতে অনেক কিছু বোঝায়। আপাততঃ এই প্রবন্ধের সখের বাগান অর্থ বসত বাড়ীর সংলগ্ন ছোটখাট ফুলবাগান। এ-রকম বাগানের প্রথম কথা—বিন্যাস। "It is the initial lay out that makes or mars a garden"। সুতরাং বাগানে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে কাগজে একটা নক্সা তৈরী করা যুক্তি-সঙ্গত। মনে রাখা দরকার যে বাগানের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে, অথচ রাজপথ সংলগ্ন বাড়ী—এবং কোনও কোনও স্থলে নিকটস্থ প্রতিবাসীর বাড়ী—ইত্যাদি সব-কিছুকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে এবং সেই সমগ্রতার একটি অঙ্গ হিসেবে-ই বাগানের বিশেষ সার্থকতা।

সখের বাগানের কয়েকটি অঙ্গ আছে যথা:—উদ্যান-পথ, তৃণ ভূমি, গুল্ম, লতা, মূলজাতীয় গাছ (bulbs) গোলাপ, মৌসুমী ফুল, পাতা-বাহার, অর্কিড ইত্যাদি। এর মধ্যে কোন্‌টি বাগানে স্থান পাবে বা কতখানি স্থান অধিকার করবে সে-বিষয়ে কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম থাকতে পারেনা; কারণ "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ"। তবে নক্সা তৈরীর সময় প্রথম থেকেই মনে রাখা উচিত যে বাগানের শোভা গাছের সংখ্যার উপর ততটা নির্ভর করেনা, বিন্যাস ও নির্ব্বাচনের উপর যত বেশী নির্ভর করে। সংখ্যার লোভে বাগানের আয়তনের অতিরিক্ত গাছ লাগালে নিয়ম মতন ব্যবধান রাখা সম্ভব হয়না। সেজন্য গাছেরও কষ্ট হয়, বাগানেরও সৌন্দর্য্য হানি হ'য়ে থাকে।

নক্সা করাটাকে যদি বাগানের আদিপর্ব্ব ধরা যায়, মাটি ও রাস্তা তৈরী করাকে বাগানের উদ্যোগপর্ব্ব বলা যেতে পারে। দো-আঁশ মাটি-ই অধিকাংশ গাছের পক্ষে প্রশস্ত—অতিরিক্ত এঁটেলো মাটি বা বেলে মাটি ভাল নয়। মাটির "পাট" বাগানের একটা বড় কাজ। কাঁকর, পাথর, আগাছা, সব নিঃশেষ ক'রে, সমস্ত মাটিটাকে খুঁড়ে, উল্‌টে পাল্‌টে, বেশ রৌদ্র-পক্ক করা দরকার। তার পর ঢাল ঠিক করার পালা। জল-নিকাশ বাঙ্গালা দেশের এক গুরুতর সমস্যা। বর্ষাকালে গাছের গোড়াতে জল জমতে দিলেই অনেক গাছের অপমৃত্যু অনিবার্য্য। সুতরাং বড় বাগান হ'লে চারদিক দিয়ে জল-নিকাশের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। আর এক কথা। বাগানের বিশেষতঃ গোলাপ ও মৌসুমী ফুলের পটির—ঢাল দক্ষিণ দিকে হওয়া ভাল। কারণ উত্তরের জমি কিছু উঁচু থাকলে, গাছের ডালপালা দক্ষিণমুখী হবে, শীতকালের দক্ষিণের সূর্য্য-কিরণ প্রচুর পরিমাণে গাছের উপর প্রতিফলিত হ'য়ে গাছের পুষ্টি ও প্রজনন ক্রিয়ার সহায়তা করবে।

পূর্ব্বেই বলেছি, উদ্যান-বিন্যাসের অন্যতম অঙ্গ উদ্যান-পথ। বাস্তবিক সুবিন্যস্ত উদ্যানপথ কেবল যে চলা-ফেরার জন্য আবশ্যক তা নয়, সবুজ গাছপালার মধ্যে তার এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য আছে, তাতে সমগ্র উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করে। বাগান যদি খুব বড় না হয়, কিম্বা গাড়ী যাতায়াতের দরকার না থাকে, অথবা বড় গেটের খাতিরে চওড়া রাস্তা করতে না হয়, তাহলে সাধারণতঃ আড়াই থেকে তিন ফিট প্রশস্ত উদ্যান-পথ-ই যথেষ্ট। রাবিশ, কাঁকর, ইটের খাদরি, চূণ-সুরকি, বালি-সিমেণ্ট ইত্যাদি নানা রকম মশলা দিয়ে বাগানের রাস্তা হ'য়ে থাকে। তার মধ্যে বালি-সিমেণ্ট (৪ : ১) অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাপেক্ষ হলেও তার আয়ু বেশী এবং সব সময় তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। রাস্তার দুধারে Zephyranthes, Alternanthera, Iris, Ixora Chinensis, Jesminum Sambac, Tube Rose ইত্যাদি কোনও রকম গাছ দিয়ে পাড় তৈরী করা প্রশস্ত। শীতকালের মৌসুমী ফুলের পাড় তৈরী করলে রাস্তার অপরূপ শোভা হয়।

গাছ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত রুচির উপর কোনও কথা নেই। সব জিনিস সকলকে সমান আনন্দ দেয়না—কেউ চান ফুলের শোভা, কেউ বা চান গন্ধ, কারও বা শুধু তৃণ-ভূমিতেই তৃপ্তি। কিন্তু গাছ অনুসারে তার জন্য স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, বাগানের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক খোলা থাকা খুব ভাল। সূর্য্যের আলো—বিশেষতঃ সকাল বেলার রৌদ্র—অধিকাংশ গাছের প্রাণ। তবে বিকালবেলা পশ্চিমের খররৌদ্র বরং অনিষ্টকর, সেজন্য বাগানের পশ্চিম দিকে ছায়া-বহুল গাছের সারি থাকা মন্দ নয়। পাতা-বাহার, পাম ইত্যাদি কয়েক জাতীয় গাছ মোটেই গরম সহ্য করতে পারেনা—তাদের জন্য গাছ-ঘর দরকার। কেউ-কেউ আম কাঁটাল ইত্যাদি বড় গাছের ছায়াতে বা ঘনলতা-মঞ্চের নীচে এই সব সুকুমার গাছের সখ মিটিয়ে থাকেন।

যে-কোনও গাছের জন্য বাগানে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করতে হ'লে প্রথমেই তার স্বভাব জানা দরকার—সে আলো চায়—কি ছায়া চায়, তার আকার কি রকম, আয়তন কি রকম, কাছাকাছি অন্য গাছের সঙ্গে তার মিল কতদূর ইত্যাদি। গাছ নির্ব্বাচনের সময় একটি কথা মনে রাখা দরকার—বড় ঋতুতেই বাগানের কোনও না কোনও অংশে উপভোগ করবার মতন যেন কিছু ব্যবস্থা থাকে। কেবল তাই নয়। প্রত্যেক গাছের স্বভাব অনুসারে তাকে ঋতু-বিশেষের অনুকূল অবস্থাতে রাখতে হবে। অর্থাৎ গ্রীষ্ম-কালীন সুগন্ধী ফুল যথা—বেল, যুঁই, চামেলীর গন্ধ উপভোগ করতে হলে গাছগুলিকে বসাতে হবে বাগানের দক্ষিণ

দিকে। আবার যে-সব গাছের গন্ধ নেই, কেবলই শোভা—যেমন জবা, রঙ্গণ ইত্যাদি—তাদের পক্ষে বাগানের উত্তর দিকই প্রকৃষ্ট।

অধিকাংশ গাছ রোপণের উপযুক্ত সময় হচ্ছে বর্ষার প্রথমে, বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টির পর—অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের শেষে বা আষাঢ়ের প্রথম দিকে। কিন্তু গোলাপ শীতকালে লাগানোই নিয়ম—কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে। অবশ্য সতর্ক মালীর হাতে এই সব সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কেবল দারুণ গ্রীষ্মে বা অতিরিক্ত বর্ষার সময়ে কোনও গাছ রোপণের চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয়।

অল্প পরিসরের মধ্যে বিশদ আলোচনা অসম্ভব। কৌতূহলী পাঠকের জন্য বাগান সম্বন্ধে বিস্তর বই আছে। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে বাগানের সখ মেটাবার জন্য দু'খানি বই উল্লেখযোগ্য যথা :—1. Firminger's Gardening in India; 2. An Amateur in an Indian Garden—by Percy Lancaster। বই পড়ার সময় যদি না থাকে বিভিন্ন নার্শারীর ক্যাটালগ্ নাড়াচাড়া করলেও গাছপালা সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সখের বাগানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কয়েকটি ভাল ভাল গাছের উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তবে সমস্যা এই যে কোন্ গাছ বাদ দিয়ে কোন্ গাছের নাম লিখি?—গাছ যে পৃথিবীতে অসংখ্য এবং প্রত্যেক গাছেরই তো কোনও না কোনও রকম গুণ রয়েছে! তা' ছাড়া তালিকা দিতে গেলে লেখকের রুচি অনুসারে পক্ষপাত দোষ খুবই স্বাভাবিক; বিশেষতঃ তালিকা যখন ছোটই হবে স্থানাভাবে। যাহোক্, শেষ নির্ব্বাচন তো বাগানের মালিকের কাজ—নিজের পছন্দ এবং বাগানের আয়তন অনুযায়ী। আমরা কেবল কয়েকটি জনপ্রিয় গুল্ম (shrub), মূল (bulb) ও লতার (creeper) উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করব, কিন্তু এইখানে পরিভাষা-সমস্যা। প্রচলিত বাঙ্গালা নামের বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য নেই; লাতিন্ নামগুলি শব্দ ভারাক্রান্ত—অসাধারণ স্মৃতিশক্তি বা অসাধারণ নেশা না থাকলে মনে রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া গাছ-ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ পছন্দ মতন নামকরণের ফলে ক্রেতার পক্ষে নাম-সমস্যা জটিলতর হ'য়ে উঠেছে। যাহোক্, অগত্যা লাতিন্ নাম—এবং যতদূর জানি প্রচলিত বাঙ্গলা নাম—দুইই লিপিবদ্ধ করা বিধেয়।

১। গুল্ম :—(shrubs)

Jesminum Sambac—বেল (রাই, মোতিয়া, খোয়ে);
Jesminum Grandiflora—চামেলী;
Gardinia Florida—ছোট গন্ধরাজ;
Gardinia Lucida—বড় গন্ধরাজ;
Cestrum Hirsutum Nocturnum—হেস্নাহেনা;
Franciscea Latifolia—প্রাণতোষিণী (?)
Hamiltonia Suaveolens—বনচাঁপা
Hibiscus—জবা বিভিন্ন রঙের
Ixora—রঙ্গণ বিভিন্ন রঙের
Lagerstroemia—ফুরুষ
Magnolia { Mutabilis জরদ চাঁপা
Magnolia { Pumila জহুরী চাঁপা
Murraya Exotica—কামিনী
Nerium (বা Oleander)—করবী, বিভিন্ন রঙের
Olea Fragrance
Rose—গোলাপ অসংখ্য জাতীয়
Plumbago Capensis—রঙ্ চিতা

২। বড় ফুলগাছ

Plumeria—গুলঞ্চ বিভিন্ন রঙের
Michaelia Alba—শ্বেত চাঁপা
Magnolia Grandiflora—হিম চাঁপা (?)
Taberni Montana—টগর;
Nyctanthes Arbortristis—শেফালী
Bauhinia—কাঞ্চন
Clerodendron—ভাঁট
Poinciana—কৃষ্ণচূড়া
Cassia nodosa
Jesminum Arborescence—নবমল্লিকা
Qurupeta Gynensis—নাগলিঙ্গং

৩। লতা :—

Allamanda Aubletii Cathertioa;
Antigonon Leptopus; Bougainevelia;
Clematis; Echites Caryophyllata (মালতী);
Hiptage Madob—(মাধবী);

Passiflora—(ঝুমকা) ;
Pergularia Odora-tissima—(লবঙ্গ লতা) ;
Poivrea Coccenia ; Quis Qualis Indica—(রেঙ্গুণ লতা) ;
Rhyncos-permum Jasminoides—(শ্যামা লতা) ;
Stephanotis Floribonda—(লতানে রজনী গন্ধা)
Jasminum Callophylum—(যা' কলকাতার বাজারে "টেকোমা জেস্‌মিন্" নামে চলে) ;
Jesminum Chinensis—(চীনে যূঁই) ;
Porana Paniculata ; Bignonia ;
Aristolochia Elegans—(হংস লতা) ;
৪। মূল জাতীয় (Bulbs) :—
Tube Rose—(রজনীগন্ধা) ;
Kaempferia Rotunda—(ভূঁই চাঁপা) ;
Hedychium Coronarium—(দোলন চাঁপা) ;
Canna ; Crinum ; Dahlia ; Eucharis ; Gladiolus ; ইত্যাদি।

নামের তালিকা লম্বা ক'রে লাভ নেই—পুঁথির পাতায় গাছের যে পরিচয়, উদ্যান-রচনার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। গাছের পরিচয় সন্ধান করতে হবে গাছেরই কাছে। অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে নাম সংগ্রহ ক'রে নিজের চোখে পরের বাগানে বাগানে নানা রকম গাছপালা দেখে পছন্দ মতন বাছাই ক'রে নিজের বাগান সাজাতে হয়; কেতাবের বর্ণনা প'ড়ে তেমনটি সম্ভব নয়। আর সব-চেয়ে-বড় কথা—গাছের সর্ব্বাঙ্গে আত্ম-পরিচয়ের যে ভাষা রয়েছে, সেই ইঙ্গিত আয়ত্ত করতে হবে—প্রীতির বিনিময়ে। দরদই হ'ল উদ্যান-শিল্পের প্রাণ।

নববর্ষ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম-এ (অকৃসন)

হে সিন্ধু অতলস্পর্শ, বর্ষাবলি লহরে লহরে
দুলিছে সুনীল বক্ষোপরে।
লবণাশ্রু তরঙ্গের হার
বিশ্ব বাসনার
অসীম আকাঙ্খাভরা পলে অনুপলে
নিরালায় গাঁথি গাঁথি চলে
যেন যুগ যুগান্তর ; সে মালা ছিঁড়িয়া ফেলে যায়
সিন্ধু-সিকতায়।

নিখিলের নরনারী হে আকুল বেদনা বারিধি,
অশ্রু ঢালি তোমার পরিধি
প্রসারিত করে অনুদিন
হে নিত্য নবীন।
হে চির বাহিনী ধারা তল তটহারা,
রবি সোম গ্রহ তারকারা
আলোকের ভেলা সম ভেসে চলে স্তব্ধ নীলিমায়
না জানি কোথায়!

তোমার বিশালবক্ষে জন্ম মৃত্যু ফুটে ফেটে যায়
ফেণপুঞ্জে বুদ্বুদের প্রায়,
অনন্তের চক্রবালখানি
করে যে তুফানি।
উর্ম্মিদলে উদ্বেলিত বর্ষপরম্পরা,
মানবের ইতিহাসে ধরা
সুখে দুঃখে পুণ্যে পাপে কিরণে কাজলে বিরচনা,
বৈচিত্র্য কত না!

এ ক্ষুদ্র পরাণ ভরি আছে এক সমুদ্র মহান্
সেথায় জীবন বেদগান
কল্লোলিত উর্ম্মি দলে দলে
সতত উথলে।
কী পুলক কী বেদনা আলো অন্ধকারে
আন্দোলিত করে যে আমারে!
ইন্দ্রিয়ের কূলে কূলে তরী মোর ঘাটে আঘাটায়
ভেসে ভেসে যায়।

ভাসিতে ভাসিতে আজি উপনীত তরী পুনরায়
বৈশাখের স্বর্ণসিকতায়।
বরষের প্রথম দিবসে
কী আনন্দ রসে
ভরিয়া উঠিল চিত্ত হেরিনু যখন
পূর্ব্বাচলে তরুণ তপন
ধীরে আসি দাঁড়াইল উষসীর পানে উর্দ্ধে রাখি
অচপল আঁখি।

লজ্জারুণা ধীরে ধীরে মিশে গেল কিরণে ভাস্বর
সুরে যেন গলি' গেল স্বর,
জাগরণ আনিল দুজনে
নিষুপ্ত ভুবনে।
অনাবিল শুভ্রালোকে ভরিল হৃদয়,
হে আবিঃ, গাহিনু তব জয়,
পবিত্র সাবিত্রী মন্ত্রে যাচিলাম প্রাণের প্রেরণা
নব প্রবর্ত্তনা।

তোমার পসরা ভরি কী এনেছ বল মোর তরে,
কী করুণা আছে থরে থরে
উষারুণা কুহেলির তলে
কিরণ কমলে?
আছে কি ও পসরায় শ্রেষ্ঠ অবদান
সর্ব্ব উপলব্ধির সন্ধান?
—সেই আলাদীন-দীপ করায়ত্ত হয় স্পর্শে যার
নিখিল সংসার?

নবীন জীবন লাগি দাও মোরে তপস্যার ভার
সাধনার গলে পুষ্পহার
সঙ্কল্প পরায়ে দিক্ মোর;
কুলিশ কঠোর
কর এ দুর্ব্বল চিত্ত অগ্নিমন্ত্র দাও,
অতীতের শোচনা ভুলাও।
দাও দীক্ষা মৌনব্রত কর্ম্মরত নব জীবনের,
মন্ত্রটি প্রেমের।

দাও শান্তি মহাজয় অচপল আত্ম প্রতিষ্ঠার,
হাতে হাত রাখিয়া তোমার
বন্ধুর জীবন পথে চলি,
যেন নাহি টলি।
আকাশে বাতাসে আজ আনন্দ উথলে
হাসিমুখে মুছি অশ্রুজলে।
দুনয়ন ভরি আজি আনন্দের সিন্ধু করি পান
অগস্ত্য সমান।

আজি মোর মনে হয় যৌবনের আরব্ধ সঙ্গীত
অন্তরাতে যেন উপনীত,
রাগিণীর পূর্ণাঙ্গ সুষমা
রূপে নিরুপমা
চক্ষে বক্ষে দিল ধরা সূক্ষ্ম জ্যোতির্বাসে
উষার আভাসে।
আঁধারের বিভীষিকা আলোকে রূপসীমূর্ত্তি ধরে
মুগ্ধ আঁখি পরে।

বেসুরে লেগেছে সুর, অসুন্দরে শোভা অভিনব
দৈন্য মাঝে সম্পদ গৌরব
নয়নে ফুটেছে আজি মোর,
হাতে রাখী ডোর
বিমুখ অপ্রিয় যারা বাঁধিল আদরে
মার্জ্জনায় রুদ্ধচিত্ত ভরে।
ব্যথা দিয়াছিল যারা তাহাদেরে করি আলিঙ্গন
অন্তরে আপন।

মধুময় এ ধরণী আজি যে সবারে ভালবাসি
সংসারে কি ফিরিল উদাসী?
দিলে মোর হাতে একতারা,
কণ্ঠে সুরধারা;
আজি গানে গানে মোর ভরিব আকাশ,
ফুলে ফুলে ঢালিব সুবাস,
এত সুর এত গন্ধ বৈশাখের প্রথম দিবসে
কেন প্রাণে পশে?



সঙ্গীত

কথা ও সুর ঃ—কাজী নজরুল্ ইস্লাম্ | স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

দেব-গান্ধার *—সাদ্রা

খেলে নন্দের আঙিনায় আনন্দ দুলাল।
রাঙা চরণে মধুর সুরে বাজে নূপুর তাল॥
নবীন নাটুয়া বেশে,
নাচে কভু হেসে হেসে,
যশোমতীর কোলে এসে দোলে কভু গোপাল॥
ননী দে' বলিয়া কাঁদে কভু রোহিণী কোলে,
জড়ায়ে ধ'রে কদম তরু তমাল ডালে দোলে—
কভু তমাল ডালে দোলে॥
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে
বাজায় মুরলী ল'য়ে
কভু সে চরায় ধেনু বনের রাখাল॥

```
  ১           +          ৩                 •         ১
{ সা -া ধ্া  II  সা  -রা | সরা  -গমা  গরা | রা  রা | সরা  -গা  গা  I
  খে • লে       ন   ন্   দে•   ••    র    আ  ঙি   না•   য়্   আ

        +         ৩             •          ১
I  রসা  -া  |  সরা  -া ধ্া  | ধ্সা -া } |  -া  -া  -া  I
   ন    ন্      দ•    •  দু    লা  ল্      •   •   •

      +          ৩               •          ১
I {  রা  পমা | ধপা  পধা  ধা | পমা মাগ | রগার সা  সা } I
     রা  ঙা    চ    র    ণে    ম   ধু     র   সু  রে
```

---

* 'দেব-গান্ধার' আর একটি অপ্রচলিত রাগ। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকটি অপ্রচলিত রাগের স্বরলিপি দিয়াছি। 'দেব-গান্ধার' রাগের প্রচলন এখনও দাক্ষিণাত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা 'বেলাওল্' ঠাটের ও 'ঔড়ব-খাড়ব' জাতীয়। আরোহী ঃ—স, র, ম, প, ধ, র্স। অবরোহী ঃ—র্স, ধ, প, ম, গ, র, স, ধ্, স।—ইতি, স্বরলিপিকার।

\+ ৩ ০ ১
I সর্সা র্সপা | পধা ধা মা | পা -া | মগা -রসা ধ্া II
বা জে ০ নূ ০ পু র তা ল্ খে ০ ০ ০ লে

\+ ৩ ০ ১
II { রা মা | পা -ধা ধর্সা | র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I
ন বী ন ০ না টু য়া বে ০ শে

\+ ৩ ০ ১
I র্সা র্সর্রা | র্রা -া র্রা | র্সর্রা -র্রর্গা | র্রর্সা -া র্সা } I
না চে ০ ক ০ ভু হে ০ সে ০ হে ০ ০ সে

\+ ৩ ০ ১
I { র্সা র্সধা | ধা ধা ধা | পমরা -মা | মপা -া পা } I
য শো ০ ম তী র কো ০ লে এ ০ সে

\+ ৩ ০ ১
I পর্সা র্সপা | পধা ধা পমা | পা -া | মগা -রসা ধ্া II
দো লে ০ ক ০ ভু গো পা ল্ খে ০ ০ ০ লে

\+ ৩ ০ ১
II { সা রা | মা পা পধা | ধা ধা | ধা -া ধা I
ন নী দে ০ ব ০ লি য়া কাঁ ০ দে

\+ ৩ ০ ১
I পধা ধা | পধপা পমা মা | মা গা | রা -া -া } I
ক ০ ভু রো ০ ০ হি ০ ণী কো ০ লে ০ ০

\+ ৩ ০ ১
I { মা মগা | রগা গরসা সা | সধ্া সা | রগা রসা সা } I
জ ড়া ০ য়ে ০ ধ'০ রে ক দ ম ০ ত ০ রু

\+ ৩ ০ ১
I সর্সা র্সধা | ধর্সা পধা পমা | মপা -া | পা পা পধা I
ত মা ০ ল ডা ০ লে দো ০ ০ লে ক ভু

```
     +          ৩               •           ১
I   পমা মগা | রগা  রসা  রা  | রপা  -া | পা  -া  -া  I
     ভ  মা •   ল •  ডা  লে     দো • •    লে  •   •

     +          ৩               •           ১
I { রা   মা | পা  -ধা  ধর্সা | র্সা  -া | র্সা  র্সা  র্সা  I
     দাঁ  ড়া   য়ে  •   ত্রি     ভ   ঙ্     গ   হ’  য়ে

     +          ৩               ০           ১
I   র্সা  -র্রা | র্রা  -া  র্রা | র্সর্রা র্গর্মর্গা | র্রর্গা  -া  র্সা } I
     বা   •     জা   য়্  মু্     র • লী • •     ল’   •   য়ে

     +          ৩               •           ১
I { র্সা  র্সা | র্সধা  -া  ধণধা | ধপা  -মা | মা  ধা  -পা  I
     ক   ভু     সে  •  চ •      রা   য়্    ধে  •   নু

     +          ৩               ০           ১
I   সা   রা  | রমা -পা  পধা  | পধা  -া | ( -া  -া  -া ) } I
     ব   নে     র  •   রা     পা   ল      •   •   •

     ১
I   পমগা  -রসা ধ্া  II II
     খে •   • •  লে
```

রাহুর গতি-বৈষম্য

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম-এ

পুরাণকারদিগের মতে রাহু অসুর। কশ্যপ ও অদিতির কন্যা সিংহিকা বিপ্রচিত্তি নামক দানবের পত্নী। এজন্য সিংহিকাসুত রাহু অসুর। সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত অমৃত দেবগণ যখন পান করিতেছিলেন, তখন রাহুও গোপনে তাহার অংশ গ্রহণ করে; এই অপরাধে বিষ্ণু তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করেন। ব্রহ্মা তৎপর উহাকে গ্রহ করিয়া দিলেন। সূর্য্য ও চন্দ্র রাহুর অমৃত পানের কথা বলিয়া দিয়াছিল, এই জন্য অদ্যাপি পর্ব্বে পর্ব্বে রাহু প্রতিহিংসাবশবর্ত্তী হইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। এই সকল পৌরাণিক উপাখ্যান ছাড়িয়া দিলে রাহুর অন্যান্য নামেতে জ্যোতিষিক অর্থ কিছু কিছু পাওয়া যায়—চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া আবার ত্যাগ (রহঃ ত্যাগে) করে বলিয়া রাহু, ভানুকে আক্রমণ করে বলিয়া স্বর্ভানু। রাহু দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া ইহা তমোগ্রহ ও তমোময়।

যাহা হউক, রাহু যে পাতগ্রহ অর্থাৎ রবিকক্ষা ও চন্দ্রকক্ষার ছেদবিন্দুই যে রাহু তাহা হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণ অবগত ছিলেন এবং উক্ত পাতের অর্থাৎ রাহুর গতি ও অবস্থিতি তাঁহারা যতটা সম্ভব সূক্ষ্মভাবেই নিরূপণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে এই রাহু Ascending node of the moon's orbit. ফলিত জ্যোতিষে ইহাকে Dragon's head বলে। রাহু চিরবক্রী। পশ্চাদ্দিকে ইহার দৈনিক গতি ৩' ১০."৭৭২ বিকলা, ৬৭৯৩·৪৫৯১ দিনে অর্থাৎ ১৮ বৎসর ২১৯ দিনে ইহা একবার সম্পূর্ণ চক্র আবর্ত্তন করিয়া আসে।

রাহু সত্যই কি চিরবক্রী? সত্যই কি চিরকাল সমবেগে ইহা পশ্চাদ্‌গামী? বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকল বিষয় লইয়া সামান্য আলোচনা করা হইবে। রবিকক্ষাকে চন্দ্রকক্ষা যে দুই বিন্দুতে ছেদন করিয়াছে, উহার একটির নাম রাহু অপরটি কেতু। উত্তরাভিমুখী চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্তের দক্ষিণ হইতে আসিয়া যে বিন্দুতে ক্রান্তিবৃত্তকে অতিক্রম করে তাহাই রাহু এবং দক্ষিণাভিমুখী চন্দ্র যে বিন্দুতে ক্রান্তি-বৃত্তকে অতিক্রম করে তাহাই কেতু। রাহুর ছয় রাশি অন্তরে কেতু চিরকাল অবস্থান করে। কক্ষাদ্বয়ের উক্ত ছেদবিন্দুতে যখন চন্দ্র উপস্থিত হয়, চন্দ্র তখন রাহু বা কেতুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে; তখন চন্দ্রের স্ফুটরাশ্যাদি ও রাহু বা কেতুর স্ফুটরাশ্যাদি সম্পূর্ণ অভিন্ন। তৎকালে চন্দ্র ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) উপরে অবস্থিত থাকে বলিয়া চন্দ্রের শর (celestial latitude) তখন শূন্য হয়। ইহা ভিন্ন অন্য কোন অবস্থানে চন্দ্রের শরাভাব হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যেকালে চন্দ্রের শর শূন্য তৎকালে চন্দ্রের স্ফুটরাশ্যাদিই রাহু বা কেতুর স্ফুট (celestial longitude)। পাশ্চাত্য পঞ্জিকাসমূহে প্রত্যহ চন্দ্রের স্ফুট ও শর যাহা প্রদত্ত হয়, তাহাতে কোন প্রকার ভ্রম নাই বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কেননা সেগুলি নিরন্তর মানমন্দির হইতে প্রত্যক্ষিত হইতেছে। সুতরাং সেগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ-লব্ধ চন্দ্রাবস্থান বলিলেও দোষণীয় হইবে না। ১৯৩৪ খৃঃ অব্দের পাশ্চাত্য কাল-জ্ঞান পঞ্জিকা (Connaissance des Temps) অবলম্বনে চন্দ্রের শর ও স্ফুট হইতে শরাভাব-কালীন চন্দ্রের স্ফুট (যাহা রাহু বা কেতুর স্ফুটের সম্পূর্ণ তুল্য) গণনা করিয়া তাহা হইতে রাহুর যে অবস্থান পাওয়া যায় তাহার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এতৎসহ রাহুর মধ্যাবস্থানও দেখান হইল। প্রদত্ত স্ফুট সকল সায়ন এবং সময় গ্রীণীচ মধ্যরাত্রি হইতে গণিত।

চন্দ্রের শরাভাবের দিন ও সময়	তৎকালের চন্দ্রস্ফুট হইতে গণনালব্ধ রাহুর স্ফুট		পঞ্জিকা-প্রদত্ত রাহুর মধ্যস্ফুট
৪ জানুয়ারী ঘঃ ৫·৫০৪২	৩১৯°	৩৮'·৪	৩২১° ২৪'·১
১৭ জানুয়ারী ঘঃ ৪·৯৩৯৮	৩১৯°	২৩'·০	৩২০° ৪২'·৯
৩১ জানুয়ারী ঘঃ ১০·৭৯২৮	৩১৯°	১৬'·৫	৩১৯° ৫৭'·৭
১৩ ফেব্রুয়ারী ঘঃ ১৬·১০০৪	৩১৯°	১৯'·৭	৩১৯° ১৫'·৭
২৭ ফেব্রুয়ারী ঘঃ ১৭·৮৪৮৯	৩১৯°	২০'·৫	৩১৮° ৩১'·০
২৬ জুলাই ঘঃ ২৩·৮৮৩৪	৩১০°	১৪'·৪	৩১০° ৩৬'·৮
৯ আগষ্ট ঘঃ ১৯·০৭৮২	৩১০°	১৭'·৪	৩০৯° ৫২'·৯
২৩ আগষ্ট ঘঃ ১০·৬৪৮২	৩১০°	১৩'·৯	৩০৯° ৯'·৫

গণনালব্ধ রাহুর স্ফুট যাহা প্রদর্শিত হইল, তাহাই রাহুর স্পষ্টাবস্থান এবং অপরটি রাহুর মধ্যাবস্থান। মানমন্দির হইতে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা রাহুর উক্ত স্পষ্টাবস্থান নিরূপণ করা যাইতে পারে এবং বহুকালের স্পষ্ট অবস্থান হইতে মধ্যস্থান নির্ণয় করা যায়। যাহা হউক, আমরা স্পষ্টরাহুতে নিম্নোক্ত দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছি।

প্রথমতঃ—রাহু চিরকাল সমগতিতে ভ্রমণ করে না, কেননা কখন তাহার গতি ১৩।১৪ দিনে ১৫' কলা পরিমাণ হইতেছে ও কখন বা তাহার অনেক কম হইতেছে এবং **রাহু চিরকাল বক্রী** (retrograde) **নহে,** কখন কখন বক্রত্যাগ করিয়া মার্গী (direct) হইয়া থাকে; যেমন ৩১শে জানুয়ারী বা তাহার নিকটবর্ত্তী কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ২৭শে ফেব্রুয়ারী বা তাহার সন্নিহিত কোন সময় পর্য্যন্ত স্পষ্ট রাহু বক্রী না হইয়া সরলগতিতে চলিয়াছে। সেইরূপ আবার ২৬শে জুলাই হইতে ৯ই আগষ্ট পর্য্যন্ত রাহু মার্গী।

দ্বিতীয়তঃ—মধ্যরাহুর অগ্রে বা পশ্চাতে স্পষ্ট রাহু অবস্থান করে এবং স্পষ্ট ও মধ্যাবস্থানের অন্তর অন্ততঃ পৌনে দুই অংশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গ্রহ সকলের পক্ষে যেমন

স্পষ্ট গ্রহ গণনা করিতে হইলে গ্রহের মধ্যাবস্থানে কতকগুলি সংস্কার প্রয়োগ করিতে হয়, সেইপ্রকার রাহুতেও তাহার মধ্যস্ফুটে কোন প্রকার সংস্কার প্রয়োগ করিয়া স্পষ্টাবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। আমরা সাধারণতঃ রাহুর যে অবস্থানের সহিত পরিচিত তাহা মধ্যরাহু, স্পষ্টরাহু নহে। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অন্যান্য বহুবিধ সংস্কারের ন্যায় রাহুতে প্রদেয় সংস্কারের বিষয়ও অবগত ছিলেন না; সেইজন্য হিন্দু জ্যোতিষে রাহু সর্ব্বদা সমবেগে বক্রগতিতে চলিয়াছে। পাশ্চাত্য পঞ্জিকাসমূহেও রাহুর স্পষ্টাবস্থান প্রদত্ত হয় না, মধ্যরাহুই তথায় দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, রাহু প্রত্যক্ষতঃ পর্য্যবেক্ষণের বস্তু নহে, চন্দ্রের শর নির্ণয়ে রাহুর প্রয়োজন। চন্দ্রের শর নিরূপণের সূত্র (formula) এরূপভাবে রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে স্পষ্ট রাহুর আবশ্যকতা নাই। মধ্যরাহু হইতে নির্ণীত শরে নানা প্রকার সংস্কার প্রয়োগ করিয়া স্পষ্ট শর সাধিত হইয়া থাকে। ফলিত জ্যোতিষে রাহুর আবশ্যকতা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা ভারতীয় জ্যোতিষে রাহু কেতুর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা অনেক অধিক। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য ফলিত জ্যোতিষে রাহু কেতুর প্রয়োগ অতি সামান্যই, সেইজন্যই বোধ হয় তাহাদের পঞ্জিকাতেও (Ephemeris) রাহুর মধ্যাবস্থানই মাত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক, মধ্যরাহুতে যে প্রকার সংস্কারের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে, বস্তুতঃ পাত (node) মাত্রেই এই প্রকার কোন না কোন সংস্কার প্রয়োগ করিতে হয়। ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবরবৃত্ত যেস্থলে মিলিত হয় অর্থাৎ ক্রান্তিপাতবিন্দু যাহাকে ইংরাজীতে First point of Aries বলে তাহারও মধ্যাবস্থান ও স্পষ্টাবস্থান এক নহে। মধ্যাবস্থানে nutation নামক সংস্কার প্রয়োগ করিলে স্পষ্টাবস্থান লব্ধ হয় এবং সেই স্পষ্ট অবস্থানই জ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, মধ্যরাহু হইতে স্পষ্টরাহুর অবস্থান নির্ণয় করিবার সূত্র কি তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ Delaunay সাহেবের মতবাদ অনুসারে R. Radau চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যে সারণী (table) রচনা করিয়াছেন, তাহাতে চন্দ্রের শর নির্ণয়ের জন্য যে সূত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সূত্র বিশ্লেষণ করিলে তাহা হইতে স্পষ্টরাহু নির্ণয়ের ও চন্দ্রাকক্ষাবনতির * স্পষ্টমান নির্ণয়ের সূত্র পাওয়া যায়। উক্ত সূত্র হইতে গণিতের প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্নরূপ স্পষ্টরাহু নির্ণয়ের সূত্র পাওয়া যাইতেছে।

৯৮´·০ × সাইন২ (রবি – রাহু)—৯´·১ × সাইন (রবি – রবিনীচ)

+ অন্যান্য কয়েকটি স্বল্পমান বিশিষ্ট পদ

(এস্থলে রবি অর্থে স্পষ্ট রবি এবং রাহু অর্থে রাহুর মধ্যাবস্থান)

এই সংস্কার ফল মধ্যরাহুতে প্রয়োগ করিলে স্পষ্ট রাহু লব্ধ হইবে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সূত্রের প্রথম পদটিই সর্ব্বপ্রধান। ইহার আবর্ত্তনকাল ৬ মাস। সুতরাং ৬ মাস মধ্যে স্পষ্টরাহু মধ্যরাহুর অগ্রপশ্চাতে সকলপ্রকার অবস্থান অতিক্রম করিয়া আসে। যখন স্পষ্টরবি মধ্যরাহুর সহিত যুক্ত হয় তখন এই সংস্কার ফল শূন্য, অর্থাৎ তখন স্পষ্টরাহুও মধ্যরাহুর সহিত যুক্ত থাকে। তৎপর রাহুকে অতিক্রম করিয়া রবি যতই অগ্রসর হইতে থাকে, স্পষ্টরাহুও তখন মধ্যরাহুকে ছাড়াইয়া অগ্রে গমন করিতে থাকে। রবি যখন রাহু হইতে ৪৫° অংশ সম্মুখে যায়, তখন এই সংস্কার ফল বৃহত্তম হইয়া থাকে অর্থাৎ তখন স্পষ্টরাহু মধ্যরাহু হইতে ৯৮´ কলা অগ্রে। তৎপরে স্পষ্টরাহু পুনরায় পশ্চাতে ফিরিতে থাকে এবং রবি রাহু হইতে ৯০° অংশ সম্মুখে বা কেতু হইতে ৯০° অংশ পশ্চাতে আসিলে স্পষ্টরাহু মধ্যরাহুর সহিত মিলিত হয়। তৎপরে ৯৮´·০ × সাইন২(রবি – রাহু)—৯´ × সাইন(রবি – রবিনীচ) যখন রবি রাহুর ১৩৫° অংশ সম্মুখে অথবা কেতুর ৪৫° অংশ পশ্চাতে তখন সংস্কার ফল পুনরায় পরমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং স্পষ্টরাহু মধ্যরাহু হইতে ৯৮´ কলা পশ্চাতে অবস্থান করে। এই প্রকারে স্পষ্টরাহু মধ্যরাহুর দুই পার্শ্বে যাতায়াত করিতে থাকে। রাহুর জন্য যাহা বলা হইল কেতুর পক্ষেও তাহাই, কেননা কেতু সর্ব্বদাই রাহুর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত

* বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের অন্তর্গত কোণেতে (inclination of the ecliptic) যেরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ চন্দ্রকক্ষা ও রবিকক্ষার মধ্যবর্ত্তী কোণেও রবিচন্দ্রের অবস্থানভেদে সাময়িক হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রবি যেন রাহু কেতুকে আকর্ষণ করিতেছে। রাহু কেতুর মধ্যে যেটি যখন রবির নিকটবর্ত্তী হইতেছে তখন সেইটি রবির দিকে অপসৃত হইতেছে। রবি যখন রাহু বা কেতুর সহিত যুক্ত অথবা তাহাদের নিকট হইতে ৯০° অংশ অগ্র বা পশ্চাতে, তখন রাহু কেতুতে কোন প্রকার বিসৃতি নাই, রবি রাহু বা কেতুর অগ্রে থাকিলে স্পষ্টপাত অগ্রে অবস্থান করে, পশ্চাতে থাকিলে পশ্চাতে অবস্থান করে। সুতরাং সূত্রটিকে আরও সহজভাবে এই প্রকারে লিখা যায়:—স্পষ্টরবি হইতে মধ্যরাহু বা মধ্যকেতু বাদ দাও; অবশিষ্টকে 'ক' বলা যাউক। তাহা হইলে সংস্কারফল = ৯৮′ সাইন (২ক), মধ্যরাহুতে যোজ্য।

'ক'এর নিম্নোক্তরূপ মান অনুসারে রাহু কেতুতে নিম্নোক্তরূপ বিসৃতি হইয়া থাকে। 'ক' হইতে যতবার সম্ভব ৯০° অংশ বাদ দিয়া লইবে এবং রবির নিকটতর পাতটি যাহাতে রবির দিকে অপসৃত হয় তাহাই লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কারফল প্রয়োগ করিতে হইবে।

'ক'	সংস্কারফল
০° অংশ	০ কলা
১৫° „	৪৯ „
৩০ „	৮৫ „
৪৫ „	৯৮ „
৬০ „	৮৫ „
৭৫ –	৪৯ –
৯০° „	০ „

যাহা হউক, আমরা যে সূত্র পাইয়াছি তদনুসারে গণনা করিলে গণনাফল মিলে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। ১৯৩৪ অব্দের ৪ জানুয়ারী ঘঃ ৫।৩০ মিঃ সময়ে মধ্যরাহু ৩২১°।২৪′·১, স্পষ্টরবি ২৮৩°।১০′·৯, সুতরাং (২ক) = –৭৬°।২৬′, প্রথম সংস্কারফল = –৯৫′·৩, সুতরাং স্পষ্টরাহু = ৩১৯°।৪৮′·৮। আরও ৫।৬টি সংস্কারফল লইয়া গণনা করিলে স্পষ্টরাহুর অবস্থিতি লব্ধ হয় ৩১৯°।৩৮′·৩। পূর্ব্বে পর্য্যবেক্ষণজাত রাহুর অবস্থান পাওয়া গিয়াছে ৩১৯°।৩৮′·৪। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সূত্রানুযায়ী গণনাফল প্রত্যক্ষের সহিত মিলিয়া যায়। অন্যান্য দিনগুলি পরীক্ষা করিয়াও প্রায় এই প্রকার ঐক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

রাহুর বক্রত্যাগ কি প্রকার অবস্থায় ঘটিয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। রাহুর দৈনিক গতি পশ্চাদভিমুখে ১৯০″·৮ বিকলা। মধ্যরাহুতে প্রদেয় সংস্কার ৫৮৮০″ সাইন (২ক)। স্পষ্টরাহুর দৈনিক গতি নির্ণয় করিতে হইলে ইহাকে differentiate করিতে হইবে। যে সময়ে রাহু নিশ্চল অবস্থায় থাকে অর্থাৎ বক্রত্যাগ করে অথবা বক্রী হইতে আরম্ভ করে, তৎকালে 'ক'এর মান নিম্নোক্ত সমীকরণ হইতে পাওয়া যায়:—

কোসাইন (২ক) = ·৮৯৫০ + কয়েকটি ক্ষুদ্র পদ।

ইহা হইতে 'ক'এর মান ১৩°।১৫′ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং স্পষ্টরবি যখন রাহু বা কেতুর ১৩°।১৫′ পশ্চাতে উপস্থিত হয়, তখন রাহু কেতু তাহাদের স্বাভাবিক বক্রগতি ত্যাগ করিয়া রবি চন্দ্রের ন্যায় সম্মুখ গতিতে চলিতে থাকে। তৎপর ১৩ দিন পরে রবির সহিত রাহু বা কেতুর মিলন হয় এবং তাহার ১৩ দিন পরে রবি যখন পাত হইতে ১৩°।১৫′ সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন হইতে আবার রাহুর বক্রগতি আরম্ভ হইয়া থাকে। রাহুর নিকটে রবি উপস্থিত হইলে এইভাবে ২৬ দিন রাহু কেতু মার্গী হয়, পুনরায় কেতুর নিকটে রবি আসিলেও ২৬ দিন উহারা বক্রত্যাগ করিয়া মার্গী হইয়া থাকে। অতএব প্রতি বৎসর রাহু কেতু দুই বারে ৫২ দিন বক্রত্যাগ করিয়া সরলগতিতে চলিতে থাকে। রাহুর বক্রত্যাগের কথাতে হয়ত অনেকেই একটু বিস্ময়ান্বিত হইতেছেন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই, পাতমাত্রেরই এই প্রকার গতি-বৈষম্য রহিয়াছে। রাহুতে এই বৈষম্য কিছু অধিক বলিয়া ইহার বক্রত্যাগ হইয়া সরলগতি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিগ্রহ রবির বিপরীত দিকে থাকিলে বক্রী হইয়া থাকে এবং বুধ ও শুক্র রবির সহিত যুক্ত হইলে (inferior conjunction) বক্রী হয়। রাহুর ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, রাহু রবির সহিত যুক্তাবস্থায় এবং বিপরীত অবস্থিতি উভয়েতেই উহার স্বাভাবিক বক্রগতি পরিত্যাগ করিয়া সহজগতিতে চলিতে থাকে।

রবির সহিত পাতের যুতির ১৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩দিন পর পর্য্যন্ত রাহু কেতুর যে বক্রত্যাগের কাল

বলিয়া উল্লিখিত হইল, উহা মধ্যমমান মাত্র। সংস্কারের যে সকল পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে সেগুলি রাহুর অবস্থানে বিশেষ আবশ্যক না হইলেও বক্রত্যাগ গণনায় তাহারা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সেইজন্য বক্রত্যাগ-কালীন রবির ও চন্দ্রের অবস্থানভেদে উক্তকালে কয়েকদিনের পার্থক্য হইয়া যাইতে পারে। প্রবন্ধে জটিলতা পরিহারের উদ্দেশ্যে সে সকল বিষয় আর আলোচনা করা হইল না।

রাহুর যে প্রকার গতির কথা উল্লেখ করা হইল, তাহা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলেও তাহাতে পাওয়া যাইবে। লব্ধ এই সূত্র হইতে স্পষ্টরাহুর অবস্থান অতি সহজেই নিরূপণ করা যাইতে পারে। আমাদের জ্যোতিষ অনুযায়ী জাতকজীবনে ও অন্যান্য গণনায় রাহুর প্রভাব দৃশ্য গ্রহগুলি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, সুতরাং অন্যান্য গ্রহের যেরূপ মধ্যাবস্থান হইতে ফলাদেশ না করিয়া স্পষ্ট অবস্থান হইতে সকল প্রকার জ্যোতিষিক গণনাদি করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ রাহুরও স্পষ্টাবস্থান কেন গ্রহণ করা হইবে না তাহা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্রান্তিপাত বিন্দুতে nutation নামক যে সংস্কার রহিয়াছে, তাহার মান মাত্র ১৭″ বিকলা হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা হয় না। সুতরাং রাহুতে দেড় অংশেরও অধিক সংস্কার কি করিয়া ত্যাগ করা যাইতে পারে ?

আধুনিক কলা,
([illegible])

অধ্যাপক শ্রীযামিনীমোহন কর

প্রবন্ধ

আর্টের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে প্রায় সর্ব্বত্র সকল সময়ে যখনই কোন শিল্পী নূতনত্বের দিকে এগিয়েছেন, তখনই সেই প্রবর্ত্তককে অভ্যর্থনা করা হয়েছে ঘোরতর নিন্দার উচ্ছ্বাস দিয়ে। যদি কোন শিল্পী আমাদের নূতন জিনিস দেন—এমন কিছু দেখিয়ে দেন যা আগে আমাদের চোখে পড়েনি, আমরা তাঁর সুখ্যাতি করি না—তাঁকে ধন্যবাদ দিই না—তাঁর প্রাপ্য হয় গালাগালি। তাঁকে আমরা মূঢ় অর্ব্বাচীন বলে অবজ্ঞা করি এবং এ বিষয়ে আমাদের অগ্রণী হ'ন অন্যান্য শিল্পীরা।

এই যে নূতনের আবির্ভাব—এটাকে আমরা নেব কেমন ভাবে ? তাকে অভ্যর্থনা করব'—না শিল্পজগৎ থেকে তাড়িয়ে দেব, এটা ঠিক করতে হলে প্রথমেই আমাদের ন্যায্যভাবে ওজন করতে হবে তার দানের মূল্যকে। ভাল এবং জাল, প্রতিভা এবং হাতুড়েকে চেনবার জন্য আমাদের একটা মানদণ্ড ঠিক করতে হবে। বুঝতে হবে কোনটা আর্ট, আর কোনটা আর্ট নয়। ছবি আঁকলেই আর্টিষ্ট হওয়া যায় না। গাছকে ঠিক গাছের মত, কোন মানুষকে যথাযথ তার মত—আঁকতে পারলেই তাকে আমরা আর্টিষ্ট বলি না। যে খেলা করছে সাদৃশ্য নিয়ে—তাকে কারিকর বলা চলে, কলাবিদ্ নয়। সত্য অনুরূপতাই আর্টের প্রধান লক্ষ্য নয়। পাশ্চাত্যের এক বিখ্যাত art critic বলেছেন—"It is the function of art not merely to state a fact, but to communicate an emotion and the more simply that emotion is conveyed through the sense to which the particular art directly appeals, the purer and higher is the art."

সত্যের অনুরূপতার যে কোন দাম নেই, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। নিখুঁত এবং নির্ভুল অঙ্কনের ঐতিহাসিক দামই বেশী, শৈল্পিক (artistic) নয়। নির্ভুলতা হ'ল প্রজ্ঞার বিশেষত্ব—আর্ট হ'ল ভাবের খেলা। কোন আর্টের সত্যিকারের দাম খুঁজতে গেলে সেটা বাহির থেকে পাওয়া যাবে না—যা দেখতে পাচ্ছি না সেই ভাব-রাজ্য থেকে টেনে বের করতে হবে—আর্টিষ্ট কি বলতে চান সেই কথা। যা মানুষের মনকে বাহির থেকে টেনে সেই

গোপন অন্তরতম দেশে নিয়ে না যায়, তা আর্ট বলে খ্যাতি-লাভ করতে পারে না।

এই গোপন তত্ত্ব পাওয়া যাবে শিল্পীর চয়ন দেখে। "True art is selection." তিনি কি কি নিয়েছেন, কি ছেড়েছেন, সেগুলিকে কি ভাবে সাজিয়েছেন—কোন কোন জিনিসে জোর দিয়েছেন—এই সব থেকে পাওয়া যাবে তাঁকে—তাঁর রুচি ও চিন্তাধারাকে।

যদিও অনেক সময় একটা বাঁধা-ধরা প্রকাশ করবার রীতি এবং বর্ণবিন্যাসের সাধারণসম্মত ক্রমনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে—কিন্তু সত্যিকারের আর্টে এটা থাকা উচিত নয়। আর্টিষ্ট হচ্ছেন মনোরথের সারথি। প্রত্যেক লোকের চিন্তা-ধারা স্বতন্ত্র, সুতরাং হৃদয়াবেগ কোন নিয়ম মানতে পারে না। বড় শিল্পী চিরকাল নিয়মের বিদ্রোহী—কারণ নিজের কথা বলবার উপাদান গণ্ডীর মধ্যে তাঁরা পান না। উচ্ছ্বাসের বেগ, মনের জোর থাকলে বাঁধন ভেঙ্গে তাঁরা বেরিয়ে পড়েন—নিজের মনের মত করে প্রাণের কথা জগতকে বলতে। তার ফলে নূতন শিল্পধারার জন্ম হয়।



Cezanne—Mont St. Victoire—পাহাড়

তাঁর সমসাময়িকরা জিনিসটাকে অন্য ভাবে নেন। এক রকম জিনিসে যাঁরা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন—হঠাৎ তার মধ্যে একজন নূতন লোক একটা যা ইচ্ছে আরম্ভ করলে যে রকম ভাব হয়—অনেকটা সেই রকম। বেশীর ভাগ লোকের কাছেই তা অবোধ্য, অগম্য—বিশেষ করে শিল্পীদের কাছে। শিল্পরাজ্যে এ বিদ্রোহ তাঁদের সহ্য হয় না। বিদ্রোহীকে দেখেন তাঁরা সন্দেহের চোখে। নূতন ধারাকে সহ্য করতে হয় নিন্দা, অপযশ, নির্য্যাতন।

সত্যি করে বলতে গেলে পদ্ধতিক্রম শিল্প চর্ব্বিত চর্ব্বণ ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তা বুঝবে সকলে। তার মানে করতে মাথা ব্যথা করবে না। বাপ ঠাকুর্দ্দার আমল থেকে যা হয়ে আসছে তাই হলে দৃষ্টিকটুও হবে না, গায়েও লাগবে না। সামান্য একটু বুদ্ধি থাকলেই প্রথাটা আয়ত্ব করা চলবে। School, college এ বেশীর ভাগ শিক্ষাই এই প্রথা-মাফিক আর্টের। বাজারে এরই কদর। সমাজ যা করছে—চিরকাল যা করে এসেছে তাই ভাল—সুতরাং পরিবর্ত্তন অথবা উন্নতির দরকার নেই। সংস্কারক একটা অদ্ভূত জীব—এই রকম মনোভাব নিয়ে সত্যিকারের আর্টিষ্ট হওয়া যায় না। এ ধরণের শিল্পীরা নিজের যুগে হয়ত আদর পান কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ নেই। অনেক আর্টিষ্টের নাম করা যায় যাঁরা একসময়ে বিখ্যাত ছিলেন—প্রত্যেক ঘরে ঘরে তাঁদের আঁকা ছবি থাকত—কিন্তু আজ তাঁরা লুপ্ত। কারণ নূতন কিছু তাঁরা দেন নি—তাঁদের নিজস্ব বলে কিছু ছিল না।

কোন একটা শিল্প কাজকে অমর হতে হ'লে, এই নিজস্ব জিনিসই হল তার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। এটা কি তা ঠিক করে বলা যায় না। কি ভাবে প্রকাশ পায় সে সম্বন্ধেও কোন কথা বলা সম্ভব নয়। সেইজন্য আর্ট সম্বন্ধে নিয়ম কানুন করার কোন অর্থ হয় না।

আর্টের মুখ্য এবং প্রাথমিক কাজ হোল মানুষের প্রাণে

কোন একটী বার্ত্তা বহন করা—যাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নাও হ'তে পারে। অঙ্কন এবং ভাস্কর্য্যে এইরূপ বার্ত্তা বহন করতে হলে দুটো জিনিসের একসঙ্গে প্রয়োজন।



Van Gogh—In the field—মাঠে

প্রথম স্থষ্টিকারীর কল্পনাশক্তি—দ্বিতীয় সেই কল্পনার রূপ দেবার দক্ষতা। কল্পনা এবং তার মূর্ত্তিদান—এই দুটী জিনিস এমন ভাবে মিলিত যে তাদের সীমা নির্ণয় করা মুস্কিল।

কল্পনার ওপর লাগাম কষলে চলবে না। যা দেখা যায় তারও কল্পনা করা চলে —আর যা দৃষ্টির অন্তরালে তারও চলে। বাস্তব আর কল্পনা দুটোকে আলাদা করবার উপায় নেই। কল্পনাপ্রসূ সবই যে রূপকাত্মক হবে তারও কোন মানে নেই।

যে শিল্পীর কাজে যতটা revelation থাকবে সে ততই অমরত্বের দিকে এগোবে। এই revelation বহু রকমে হোতে পারে—বর্ণের বিন্যাসে, অঙ্কন পদ্ধতিতে, বিষয় নির্ব্বাচনে, ব্যাখ্যায়, আরও অনেক কাজে। কিন্তু যে রকম ভাবেই হোক না কেন উচ্চ আসন পেতে হ'লে তাকে দেখাতে হবে নূতন কিছু—"যারে আগে হেরে নি নয়ন"।

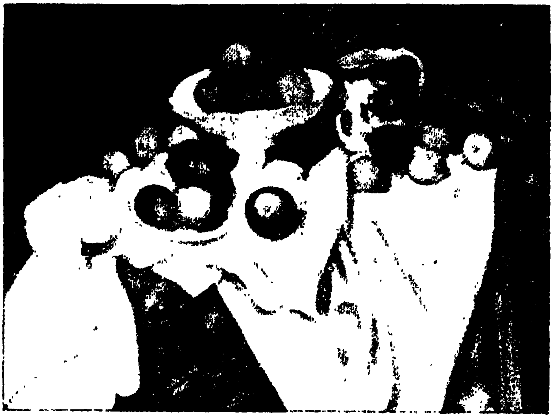
এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই নূতন জিনিস দেবে কে? তার একমাত্র উত্তর হচ্ছে "সত্যিকারের আর্টিষ্ট"। এই মানদণ্ডটির খেই হারিয়ে ফেললেই ললিত কলার ইতিহাস, তার প্রগতি ও ক্রমোন্নতি সব ঝাপসা হয়ে যাবে। নিয়ম কানুন হিসেবে কোন আর্টিষ্টের হয়ত ত্রুটী থাকতে পারে, কিন্তু তার যদি চোখ খুলে দেবার ক্ষমতা থাকে—revealing power থাকে তখন তার সে ত্রুটী আমরা গ্রাহ্য করব না। নিয়ম ও প্রথা মাফিক ত্রুটীহীন এবং নিখুঁত অঙ্কনের চেয়ে তাকে আমরা অনেক উঁচুতে স্থান দেব। বড় বড় নামকরা শিল্পীদের ছবিতে অনেক সময় anatomical কিংবা physical impossibilities থাকে। আর্ট হ'ল জীবনের প্রতিচ্ছবি—এতে জ্যামিতির ভুলের জন্য নম্বর কাটা যায় না। এই দোষগুলি থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ছবি আর্টিষ্টের প্রাণের আবেগ প্রকাশ করতে পারে আমরা তাকে উচ্চাঙ্গের কলার নিদর্শন বলে ধরে নেব। কিন্তু যে রকম ভাবে দেখব যেগুলিকে আমরা ত্রুটী বলছি সেই



Seurat—River side—নদীর ধারে

ত্রুটীগুলিই বরং তার প্রাণের কথাটাকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে।

আজকাল আর্টিষ্টদের হয়েছে মুস্কিল। আর্টের রাজ্যে



Cezanne—Still life

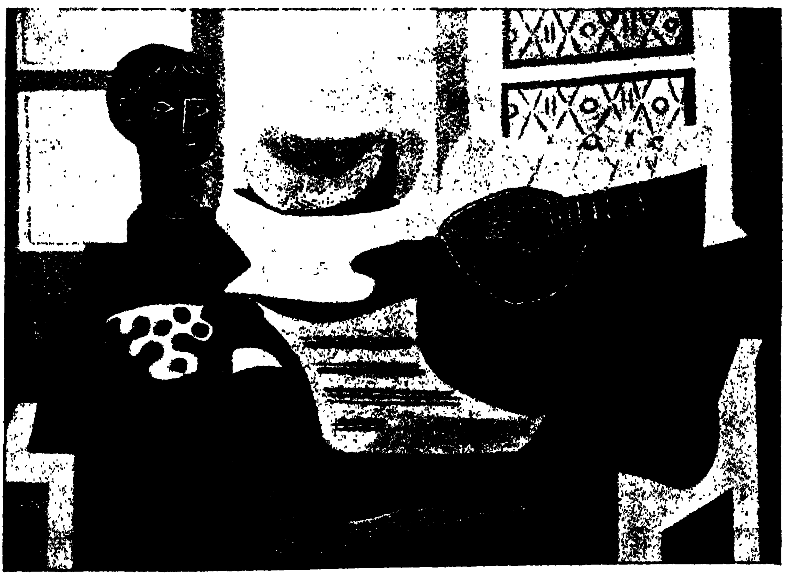
নূতনত্বের সন্ধানে তাঁরা যে পথেই যেতে চান—দেখেন তা চলা পথ। অতীতের বিখ্যাত শিল্পীরা সব দিকই ঘিরে ফেলেছেন। পৌরাণিক যুগের আর্টের দিকে ফিরে দেখেন তাও পরিপূর্ণতায় ভরা। তাঁরা তখন সবুজ প্রাণ মনের উচ্ছ্বাস নিয়ে আর্টের রাজ্যের সীমা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন, নূতন উপনিবেশ গড়তে। মডার্ণ আর্টের জন্ম হয়।

এই ধরণের শিল্পীকে চরমপন্থী বলা চলে, কিন্তু তাকে প্রতারক বলা চলে না। তাকে ভয় হোতে পারে কিন্তু তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। কারণ যদি এই নূতন পথে সে সফলকাম হ'তে পারে তবে সেই একদিন যুগপ্রবর্ত্তক পথনির্দ্দেশকারী বলে সম্মানিত হবে। জগত লুটিয়ে পড়বে তার পায়।

এবার মডার্ণ আর্টের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলব। প্রথম হ'ল প্রত্যয়বাদিতা (Impressionism). অনেকের ধারণা দৃষ্টিক্ষীণতা কিংবা নিকট-দৃষ্টি এই আর্টের উৎপত্তির জন্য দায়ী। এর বিশেষত্ব আলোচনা করবার আগে এই ভুল ধারণাটা দূর করতে হবে।

অনেক বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং গবেষণার পর এই ধারাটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী 'Manet'এর Une "Impression" ছবি থেকে এই প্রথাটী নাম পায়। তাঁর মতে "The principal person in a picture is the light." তাঁর মতাবলম্বীদের আমরা বলি প্রত্যয়বাদী—Impressionists.

আরম্ভে তাদের ছবির মধ্যে একটা আকস্মিক ভাব ছিল—এমন একটা ভাব যাতে মনে হয় the natural pose is caught in a single movement. বিষয় নির্ব্বাচন হোতো প্রকৃতি কিংবা স্বাভাবিক জীবন থেকে—রূপকথা, ইতিহাস, ধর্ম্ম থেকে নয়। পরে এদেরই একটা বিশিষ্ট



Picasso—Le Tapis Rouge

ধারা গড়ে উঠল—যার পদ্ধতি হোল আলোছায়ার খেলা।

এর মূল তত্ত্ব হ'ল দুটী। প্রথম—এক সঙ্গে একই সময়

একটার বেশী জিনিস দেখা এবং চিন্তা করা যায় না। দ্বিতীয়—সাদা এবং কালো বলে সত্যিকারের কোন রঙ্ নেই।

প্রথমটার বিশ্লেষণ হ'ল—যে আমাদের চোখ একটা

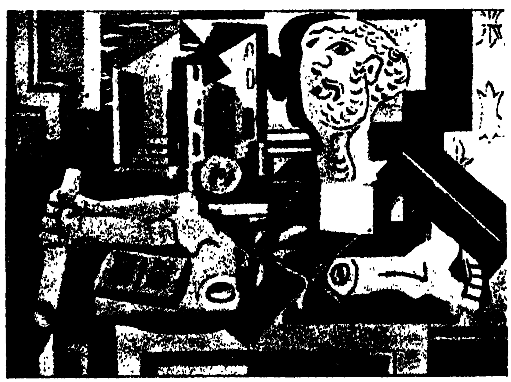


Braque—Fruits—ফল

লেন্স। It adjusts itself automatically to any distance required—but to one distance only at a time. তাহলে ধরুন একটা লোক দাঁড়িয়ে—চোখটাকে তার ওপর focus করলুম। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনের এবং পিছনের সব জিনিস out of focus হয়ে গেল। শিল্পী যদি দশ গজ পিছনে বাড়ীর দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে তখন এই লোকটা out-of-focus হয়ে যাবে। তার সামনে গাছের দিকে দেখলে বাড়ী ও মানুষ ঝাপসা দেখাবে। যদি সবকে আমরা ছবিতে সমভাবে আঁকি—মানে প্রত্যেককে যদি In correct focus ধরি তবে তা অন্যায় হবে। সুতরাং হয় আমাদের একটা জিনিস পরিষ্কার (in focus) এবং বাকী সব ঝাপসা (out of focus) করতে হবে, কিংবা সবই ঝাপসা করতে হবে। সকলকে পরিষ্কার (in correct focus) করা চলবে না।

প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয় কথাটার ওজন আরও বেশী। শিল্পীরা সাধারণতঃ আলো এবং অন্ধকারকে সাদা এবং কালো রঙে প্রকাশ করতেন। কোন রঙকে darker shade দিতে হ'লে কালো এবং lighter shade দিতে হ'লে সাদার সঙ্গে মেশানো হোত। এ প্রথা এখনও চলে। প্রত্যয়বাদীদের মতে বৈজ্ঞানিক যুগে এটা চলা উচিত নয়। সাদা রঙ সাতটা রঙের সমষ্টি এবং কালো রঙ সকল রঙের অস্বীকার, অভাব। নিছক সাদা এবং কালোর কোন অস্তিত্ব নেই। সকলের চেয়ে সাদা যেটা আমরা মনে করি—ভালভাবে দেখলে তার মধ্যে সামান্য একটু হলদে কিংবা নীলচে আভা পাওয়া যাবে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে খুঁজলে সবজে, নীল কিংবা purple রঙের আভাষ মিলবে।

এই দলের অন্তর্গত আর একটা দলকে আমরা ছিন্নবাদী (Divisionist) বলি। তাঁরা Continuity মানেন



Picasso—The Studio—ষ্টুডিও

না। ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুগুলি যদি পাশাপাশি সাজান হয়, আর তাদের মধ্যে দূরত্ব যদি ক্রমশই কমানো যায় তবে

শেষে গিয়ে তারা একটা রেখা হবে। সুতরাং রেখা অবিচ্ছেদ নয়—ভিন্ন ভিন্ন টুকরোর সমষ্টি। ধূসর রঙ দরকার হোলে দু' রকম রঙ মিশিয়ে ধূসর রঙ তৈরী করে তাঁরা ছবিতে দেন না—Violet এবং Yellowish greenএর ছোট ছোট পোঁছ দেন এমন কাছাকাছি করে যে তা দূর থেকে ধূসর দেখায়। অবশ্য এই পোঁছগুলির আয়তন নির্ভর করছে ছবির আয়তনের উপর। কিন্তু তার আসল কথা size নয়—রঙ।



Modigliani—The Young Servant—ঝি

বিন্দুবাদিতা (Pointillism) ও এই যুগের একটা ধারা। বিন্দুসমষ্টি দিয়ে তার বিকাশ। এ ধারায় অঙ্কিত ছবি কাছ থেকে দেখলে মনে হয় যেন সব ঝাপসা—নড়ছে, দূরে গেলে পরিষ্কার ফুটে ওঠে। মরীচিকা সত্য হয়ে যায়। ছিন্নবাদিতা এবং বিন্দুবাদিতা—দু'এরই মূলতত্ত্ব হচ্ছে বর্ণ-বৈলক্ষণ্য।

প্রত্যয়বাদীদের পদ্ধতিতে কয়েকটা ত্রুটী ক্রমে ঢুকে পড়ল। প্রথম—তাঁরা ছবি আঁকাকে বৈজ্ঞানিক কসরৎ করে তুললেন। দ্বিতীয়—তাঁদের শুধু আলো-ছায়া নিয়ে কারবার চলত'—যা আঁকতেন সেই জিনিসগুলির প্রতি



দরজী



Ronault—Clown—ক্লাউন

বিশেষ মনোযোগ দিতেন না। তৃতীয়—প্যাটার্ণ ও ডিজাইন, কল্পনা ও আদর্শের অবহেলা।



Chagall—Flowers and Poet—কবি ও ফুল

Post-impressionism কোন ধারা নয়, শুধু একটা গতি। তাই এঁদের কোন একটা বিশিষ্ট শ্রেণী বা পদ্ধতি



Ernst—The Nymph Echo—জলদেবীর গান

নেই। প্রত্যয়বাদীদের মতে "There are no lines in nature". তাঁদের চিত্রে কোন বাহ্য রেখা থাকত না। এক দল বল্লেন—"Contours are essential to pattern." তাঁদের চিত্রে মোটা মোটা বাহ্য রেখা আঁকলেন।

আর এক দল আনলেন রূপকবাদিতা (symbolism.) রূপকাত্মক এবং সাঙ্কেতিক কলা নূতন নয়—কিন্তু এ যুগের শিল্পীদের রূপকবাদিতা একটু অদ্ভুত। তাঁরা বলেন—"মানুষের দেহ স্তম্ভের মত। একটা পেন্সিলও দেখতে



Oelze—Frieda—মহিলা

স্তম্ভের মত। সুতরাং পেনসিল আঁকলেই মানুষ বোঝা উচিৎ।" এই বিচিত্র ভাবের মূলে হচ্ছে তাঁদের রূপক কথাটার ব্যাখ্যা। প্রত্যেক লোকের নিজ নিজ রচিত সঙ্কেত থাকলে পৃথিবীতে কেউ কারুর মনোভাব বুঝতে পারবে না। আর্টিষ্টের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—নিজের ব্যক্তিত্বকে জগতের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। নিজের এবং জগতের সুরকে করে তুলতে হবে এক—যাতে তার প্রাণের

বিশেষ একটা ঝঙ্কারে জগতের মনোবীণা আপনা হতেই বেজে ওঠে।

সঙ্কেত সর্ব্বদাই সর্ব্বজনসম্মত হওয়া উচিত। নূতন সঙ্কেত তৈরী করাতে আপত্তি নাই। কিন্তু সেটা সইয়ে সইয়ে করতে হবে। যতটা সম্ভব নিদর্শন দেখে যাতে আসলের কথা মনে পড়ে সেই ভাবে আঁকতে হবে। হয়ত এমন হতে পারে যে কোন দিন পেন্‌সিল আঁকলে মানুষ বোঝাবে। এর মূল্য সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোন অভিমত দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। আজ তাঁদের ছবি আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না—কিন্তু কোন দিন কেউ বুঝবে না এ কথা বলা চলে না। অপেক্ষা করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলতে পারে।

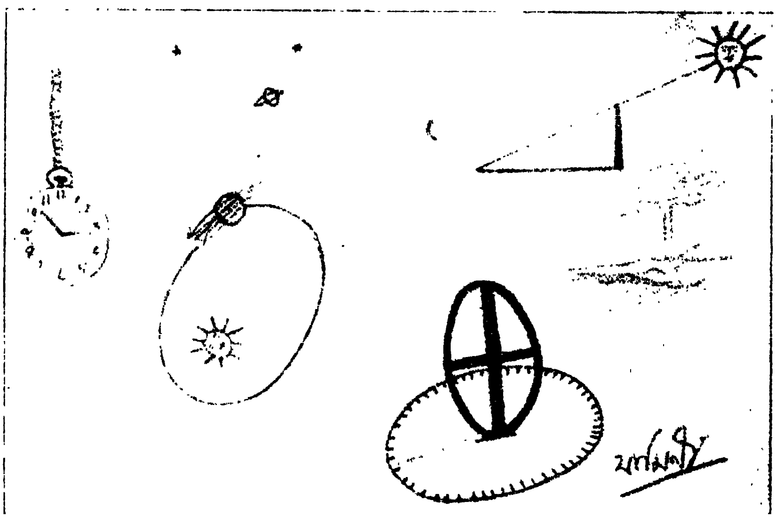
এই সময় দেখা গেল আর এক দল গড়ে উঠছে—যাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তখন detail was regarded much more ruthlessly, salient features were emphasised to the extent of deliberate distortion if such means aided the pictorial effect. The element of caricature was admitted in serious work.

সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যের মাপকাটী বদলাতে হ'ল। ছবির বাহ্যিক সৌন্দর্য্য আর আবশ্যকীয় অঙ্গ রইল না। এই দলের নাম হ'ল উদ্দামবাদী (Fauvists wild men.) Fauvism হ'ল মুক্তির গতি। যা কিছু ছবিতে আঁকা সম্ভব সবই চেষ্টা করা হতে লাগল। বিষয় নির্ব্বাচনের কোন গণ্ডী রইল না। চলা পথে আর কেউ গেল না। নূতন নূতন পথ ও পন্থা আবিষ্কৃত হ'ল।

সৃষ্টি হলেই তার তত্ত্বকথা তৈরী হয়। বাহিরের সৌন্দর্য্য ছাড়াও যে আর্টের ভিতর সৌন্দর্য্য থাকতে পারে এই হোল Fauvismএর তত্ত্বকথা। তাদের দৃষ্টি আর সকলের দৃষ্টির সঙ্গে মেলে না—তারা মনের মত করে জিনিস সৃষ্টি করে আঁকে, সৃষ্টি করা জিনিসের নকল করে না। সেই জন্য এই ধারায় যাঁরা দীক্ষিত নন তাঁদের চোখে এটা রীতিমত দৃষ্টিকটু হয়ে গেল। লোকের কাছে তারা পাগল আখ্যা পেলে।

এ গতির মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছিল, কিন্তু এই মন্থনের ভিতর দিয়ে যে সুধা উঠেছিল পরবর্ত্তী যুগে তার দাম বড় অল্প নয়।

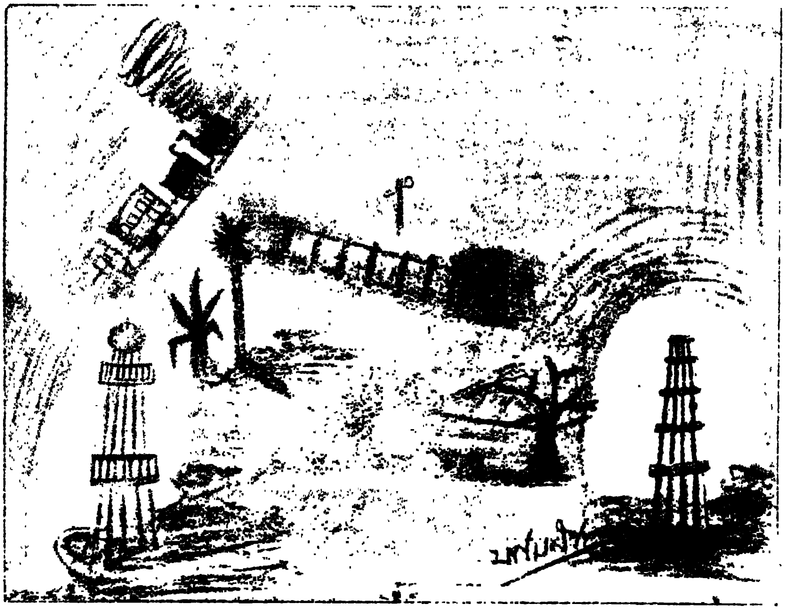
নিজের সময়ে বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী Paul Cezanne প্রত্যয়বাদী নামে খ্যাতি পেয়েছিলেন। এখন তাঁকে Post-impressionismএর জন্মদাতা বলা হয়। তিনি বলতেন—"I want to make of Impressionism something solid and enduring." এই করতে গিয়ে



গতিশীল কলা—সময়

তিনি অনেক সময় কোমল বাঁকা রেখাকে সরল রেখা আর কোণ দিয়ে আঁকতে লাগলেন। ঘনতা প্রকাশের জন্য cubic forms আনলেন। এর বেশী তিনি কিছু করেন নি—করব মনেও ভাবেন নি। কিন্তু তখনকার একদল আর্টিষ্ট এই ধরণের অঙ্কনটাকে বিশদরূপে গ্রহণ করলেন। তাঁরা বল্লেন—"Nature can be expressed by the cube, the cone, the sphere and the cylinder. Any one who can paint these simple forms can paint nature." ঘনবাদিতার (cubism) জন্ম হ'ল।

আপনার হয়ত কোন ঘনবাদীর সঙ্গে তাঁদের ধারা নিয়ে আলোচনা হ'ল। তিনি বল্লেন—"জানেন, আর্টে একটু শক্তি চাই। ওসব লুটিয়ে পড়া ভাব চলবে না। শক্তিই সৌন্দর্য্য।" তাতে আপনি বল্লেন—"কিন্তু ফুলও তো সুন্দর।" আপনার কথা তিনি গ্রাহ্য করলেন না, নিজের মনে বলে চল্লেন—"সরল রেখা বাঁকার চেয়ে শক্তিশালী।" আপনি হয়ত আবার বল্লেন—"কেন? বড় বড় বাড়ী ব্রীজ সবই তো archএর উপর। Engineerরা archকেই তো সবচেয়ে শক্তিশালী বলেন।" তিনি আপনার মুখের দিকে কটমট করে চেয়ে বলবেন—"চুপ করুন। যা বোঝেন না



গতিশীল কলা—কলিকাতা হইতে দিল্লী ভ্রমণ

সে বিষয়ে কথা কইবেন না।" ব্যস্—হয় তাদের মত স্বীকার করুন, না হয় সরে পড়ুন।

মানুষকে আঁকা হতে লাগল সরল রেখা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, octahedron, six-sided prism আরও যত সব জ্যামিতির সুবিধামত figures দিয়ে। তার উপর আবার রঙের বিন্যাস চলল—কোথাও লাল, কোথাও নীল—। যাঁরা তাঁদের অঙ্কন পদ্ধতি জানেন না তারা মনে করলেন—হয় Zigsaw Puzzle—নয়ত কিম্ভূতকিমাকার এক দৈত্য অথবা কিছুই নয় স্রেফ কাজলামী। নিগ্রো এবং জাপানী আর্টের ছাপ এর উপর অতি বেশী রকম আছে—রেখার সারল্যে ও রঙের বিন্যাসে।

ঘনবাদিতার প্রভাব বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়েছে। বিজ্ঞাপন, বিশেষ করে রেলের বিজ্ঞাপনে প্রায় আজকাল এই শ্রেণীর আর্টে ভরা। ফার্ণিচার, মেয়েদের জামা, জুতো, বাড়ীঘর, সিনেমা, থিয়েটার, ফিল্মের সেটিং—সব এই আর্টের অনুরূপ। এক কথায় ঘনবাদিতা জগৎব্যাপী হয়ে পড়েছে। এর মত কিংবা তত্ত্বের মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকতে পারে কিন্তু এর সংযম অবশ্যই স্বীকার্য্য। জগতকে শিখিয়েছে নূতন ভাবে দেখতে। হয়ত এ দৃষ্টি একটু কঠোর—হয়ত আবেগহীন—কিন্তু এর মধ্যেও সুকুমার ও মধুর ভাব আছে। এও মনের অন্তরতম তারে ঝঙ্কার তোলে, পাষাণ থেকে রস নিঙড়ে বের করে।

আদিম যুগে ছিল রেখা চিত্র—One dimensional. তারপর এল ক্ষেত্রজ চিত্র—Two dimensional. ঘনবাদীরা আনলেন ঘনক্ষেত্রজ Three dimensions. আর ভবিষ্যৎবাদীরা (Futurists) আরও একস্তর এগিয়ে গেলেন—তাঁরা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন Fourth dimensionএ। তাঁদের ছবিতে সময় হ'ল অত্যাবশ্যক অঙ্গ। যদি কোন ভবিষ্যৎবাদী "একটা লোক চেয়ারে উপবিষ্ট" এই বিষয় নিয়ে ছবি আঁকেন তবে তিনি সেই লোকটিকে চেয়ারে উপবিষ্ট আঁকবেন আর তার শরীরের মধ্যে চেয়ারের পিঠ এঁকে দেবেন। আপনি যদি প্রশ্ন করেন—"এটা কি?" তিনি গম্ভীর ভাবে বলবেন—"চেয়ারের পিঠ।" তখন আপনি আবার জিজ্ঞেস করতে পারেন—"এটা আবার মানুষের শরীরের মধ্যে আঁকলেন কেন? এটা তো

শরীরের পিছনে ঢাকা পড়ে গেছে।" তিনি উত্তর দেবেন —"ঢাকা পড়তে পারে কিন্তু আছে তো। এই লোকটা যখন উঠে যাবে তখন তো পিঠ দেখা যাবে। যদি না এঁকে রাখেন তখন পিঠ আনবেন কোত্থেকে?" আপনার আর কথা কইবার পথ থাকবে না।

এঁদের মধ্যেই একদল আরও এক পা এগিয়েছেন। তাঁদের artএর নাম হ'ল—গতিশীল কলা (Dynamic art.) এমন জিনিস যার গতি নেই—তার অঙ্কন হ'ল স্থিতিশীল কলা। মনে করুন একজন লোক থালা থেকে খাবার তুলে খাচ্ছে। এঁদের মতে স্থিতিশীল কলা দিয়ে এ ছবি আঁকা সম্ভব নয়। আপনি যদি থালা, লোক এবং খাবার শুদ্ধ তোলা অবস্থায় হাত আঁকেন – এঁরা বলবেন এতে কিছুই বোঝা গেল না। প্রথম সে যে থালা থেকে খাবার তুলেছে তার কোন উল্লেখ হোল না। দ্বিতীয় সেই খাবার যে মুখে উঠবে এমনও কথা বলা হয় নি। এঁরা আঁকবেন থালা আর মুখের মধ্যে গোটা দশেক হাত—বিভিন্ন ভঙ্গীতে। প্রথমটা থালায় খাবারের সঙ্গে ঠেকানো—আর শেষটা মুখে। এই হোল চলচ্চিত্রের গোড়াকার কথা। কিন্তু ফিল্মে যা সম্ভব এতে তা সম্ভব নয়। যদি "কলিকাতা হইতে দিল্লী ভ্রমণ" আঁকতে হয় তখনই হবে মুস্কিল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, হাওড়া ষ্টেশন, রেল লাইন, রেল গাড়ী—দিল্লী ষ্টেশন আর কুতবমিনার আঁকলেই অর্থ পরিষ্কার হয় না। তাতেই বোঝা যাচ্ছে এঁদের বিষয়নির্ব্বাচনক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ।

আর্টিষ্ট কবি। বাঁধনহীন উন্মুক্ত উদার আকাশে তার কল্পনা ওড়ে। কিন্তু সে চিরকাল লোকের বোধশক্তির সীমা মেনে চলত'। ভবিষ্যৎবাদীর পরের যুগের আর্টিষ্ট এই সীমা মানলে না। স্বপ্ন ও কল্পনা নিয়েই তার কাজ—তাই তার আর্টে শিল্পের চেয়ে সাহিত্যের প্রভাব বেশী। মানুষের বাহিরের জীবনের গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে তার কারবার। অবচেতনার প্রকাশ হ'ল তার মূলমন্ত্র। আর্টের রূপ হয়ে পড়ল ব্যক্তিগত। কিম্ভূতকিমাকার দেখতে হ'ল। কিন্তু তার প্রেরণাশক্তি কমল না। এই ধারার নাম হ'ল অবচেতনবাদিতা (Sub-Realism).

এই ধারার উৎপত্তি হ'ল স্বপ্নবাদিতা (Dadaism) থেকে। Dadaism নামটা একটু অদ্ভুত এবং যাঁরা এ নামটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাঁদের বহু অভিধান পরিক্রমণ করতে হয়েছিল। আসলে Dadaismএর কোন ধারা গড়ে ওঠে নি। এটা শুধু অবচেতনবাদিতার সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন অব্যক্ত অবস্থা। এরই গর্ভ থেকে নিজরূপ নিয়ে জন্ম নিল Sub-Realism.

আধুনিক জগতের সংক্ষিপ্ত বিধান অশনে বসনে সর্ব্বত্রই প্রাচুর্য্যকে নির্ব্বাসিত করেছে। হয়ত এর মূলে আছে সময়ের অভাব, অর্থসঙ্কট। ললিতকলাতেও এর প্রভাব পড়েছে খুব বেশী। জটিলতা হয়েছে পরিত্যক্ত। "Simplicity is art." যত সহজ ভাবে প্রকাশ করা যায় তত ভাল। (Nudism) নগ্নবাদিতা আর্টের এক বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আগেকার নগ্নমূর্ত্তি আর এখনকার নগ্নমূর্ত্তি দু'এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে আগেকার দিনে নগ্নমূর্ত্তি আঁকা হ'ত। এখনকার মত হচ্ছে—"Nudism is nature. To depict nature you cannot forego nudism."

আজ বিশ্বশিল্পে দেখা দিয়েছে অনির্দ্দিষ্ট অস্থিরতা, সঙ্কল্পের অনৈক্য। প্রবাহ প্রতিপ্রবাহের সংঘর্ষণ। নগ্নবাদিতা, অবচেতনবাদিতা ইত্যাদির প্রভাব ঠিক ভাবে গ্রহণ না করতে পেরে জিনিসটা বিকৃত হয়ে পড়েছে। সবেতেই যেন একটা ভাঙ্গন ধরেছে। তবে ভাঙ্গবার মধ্যেই গড়বার মন্ত্র সুপ্ত থাকে। এই গড়বার দিকটা জীবনে যতই সুস্পষ্ট হবে—কাব্যে ও কলায় ততই তা প্রস্ফুট হয়ে উঠবে। আধুনিক যুগে বিশ্বময় ভাবের একটা সমুদ্র মন্থন চলছে। তাতে আর্টের পরিণতি কোথায় হবে—কি ভাবে প্রকাশ পাবে—তা কে বলতে পারে?



সোনার শিকল

বীরেন দাশ

রাত গভীর হয়ে আসছে—তবু চৈতনের দেখা নাই…

সারাদিন নিরলস শ্রান্তির পরে দিদির আর বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। ঘুমে তার দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। বার কয়েক পথের দিকে তাকিয়ে দিদি মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। চোখে রাজ্যের ঘুম নিয়ে দিদি কানকে সজাগ রাখতে চেষ্টা করল: কখন বাইরে চৈতনের পায়ের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়! দিদিকে ঘুমন্ত দেখলে হয়ত সে না খেয়েই ঘুমিয়ে প'ড়বে। চৈতন যেন দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে—ভাবতেও ভয় হয়। তন্দ্রাচ্ছন্ন দিদি একটু কেঁপে উঠলে। চোখ খুলে দিদি আর একবার দরজার ফাঁকে উঁকি দিলে। নিঝ্‌ঝুম—নিরালা পুকুর ঘাটের পথ। দিদি হাতের উপর মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়লে। কিন্তু তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও মন সজাগ হয়ে রইল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে দিদি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লে।

কিন্তু মনে উদ্বেগ থাকলে নাকি গভীর ঘুমের মধ্যেও মানুষ অস্বস্তি বোধ করে। কি একটা দুঃস্বপ্নে দিদির ঘুম আকস্মিক টুটে গেল। ধড়মড় করে দিদি উঠে বসলে। না এ বাস্তব নয়—এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। দিদি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাঝের ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা মারলে। দিদি উঠে দাঁড়ালে।

বাইরে ফুটফুটে জোছনা। সিঁড়ির ধারে ঠাকুর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দিদি বাইরের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালে। জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। চৈতন আজ রাতে আর আসবে না হয়ত। আস্তে আস্তে দিদি শোবার ঘরে ফিরলে। দরজায় পা দিতেই দেয়ালের আলোয় চোখে পড়ল চৈতনের এনলার্জ-করা বড় ফটোখানির দিকে। কি জানি কেন, দিদির চোখের কোণে জল উপচে' উঠল।

একটী মাত্র ভাই—পিতৃকুলে তিন গোষ্ঠিতে ঘরে বাতি দিতেও আর কেউ নেই। বিধবা দিদির সমস্ত আকর্ষণ—সকল স্নেহ-ভালবাসা—এই একটী ভাই চৈতনের উপর। পৃথিবীতে তার কেই-বা আছে, কেনই বা সে এই সুদীর্ঘ বিশ বছর ধরে সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে আছে—দিদি আজ সনিশ্বাসে ভাবলে। বিধবার শুভ্র থান পরে দিদি প্রথম যেদিন এ বাড়ীতে এসে ঢুকলে, চৈতন তখন তিন বছরের শিশু। বাবা আগেই চলে গেছলেন: মা ও একদিন গেলেন সে শোক সহ্য করতে না পেরে। গুরুদেব এসে বললেন—আর কেন অনু, এবার কাশী চল। সব নির্ভরই যিনি নিলেন, তাঁর চরণেই নির্ভর কর এবার…

কিন্তু চৈতন?

দিদি যেতে পারলে না। তারপর সুখে দুঃখে সময়ের স্রোত ভাটা দিতে লাগ্‌ল। মায়ের স্নেহ আর পিতার মমতা দিয়ে দিদি চৈতনকে মানুষ করতে লাগ্‌ল।…একদিন চৈতনের দিকে চোখ পড়্‌তেই দিদি বুঝতে পারলে—এতদিনে বাবা বিশ্বনাথের পায়ে আশ্রয় নেবার তার সময় হল: চৈতন বড় হয়েছে।

চৈতনকে ডেকে বললে দিদি: চৈতন, বিয়ে কর।

বিয়ে? অদ্ভুত হেসে উঠল চৈতন।

হাসছিস যে বড়—দিদি বললে।

তোমার কথায়। চৈতন উত্তর দিলে: বিয়ে আমি কোনোদিন করব না।

ব্যস্—দিদি বললে। তোর ইচ্ছেটা কি শুনি? তোদের সংসারে চিরকালই কি আমি বাঁদী খাটব? অজান্তে দিদির স্বরটা কর্কশ হয়ে উঠল।

না। গম্ভীরস্বরে বললে চৈতন: দুজনে একসঙ্গেই সংসার ছাড়ব দিদি। তুমি দিন স্থির কর।

ঠাট্টা করছিস? এ ছাড়া দিদি কিছু বলতে পারলে না।

ঠাট্টা? চৈতন অম্লান হেসে বললে: ঠাট্টা আমায় কোনোদিন করতে দেখেছ? তারপর একটু থেমে বললে: তুমি ত জানই স্বামী অদ্ভুতানন্দ আমার গুরু। শীগ্‌গিরই তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করব।

দিদি স্তম্ভিত, বজ্রাহত। চৈতন যে একবর্ণও উপহাস করছে না, তার ভাবগতিক দেখে দিদির অনেক আগেই বুঝা উচিত ছিল। দিদি দাঁড়িয়েছিল বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে। সহসা তার মনে হল, কোনো অভাবিত আকস্মিক উপায়ে থামটা যেন সরে গেছে। দিদি হাত বাড়িয়ে অবলম্বন খুঁজতে লাগল। চৈতন অদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল। নিমেষে সে এসে তাকে ধরে ফেললে।

দিদি লজ্জিত হয়ে বললে: সত্যি, মাথাটা কেমন ঘুরছিল।

অদ্ভুতানন্দ-প্রীতি দিন দিন চৈতনের বেড়েই চলে। শুধু খাবার সময় চৈতন বাড়ী ফেরে। তাও সবদিন নয়। রাতে ফিরতে ফিরতে বারোটা বেজে যায়। কোনোদিন ফিরেই না।

দিদি কি করবে কিছু ভেবে ঠিক করতে পারে না। চৈতনের যৌবনপুষ্ট দেহের সে-লাবণ্য আর নেই। রুগ্ন মানুষের মত মুখখানি বিশুষ্ক। বহুদিনের অযত্নে মাথার লম্বা বাবরী চুলে জটা ধরেছে। চোখদুটো পাগলের মতো ··

দিদি মার্বেল-পাথরের মেঝেয় মাথা ঠুকে—হে ঠাকুর আমার চৈতনকে শেষকালে তুমি এই করবে—এই তোমার মনে ছিল নিঠুর দেবতা!

কিন্তু দেবতা নির্বিকার

দিদি অন্য উপায় দেখে। চৈতনকে ডেকে বলে: হ্যাঁ রে, তুই কবিতা লেখা একেবারে ছেড়ে দিলি?

চৈতন বলে: কবিতা-লেখা কি ছাড়া যায় দিদি? মদের নেশার চেয়েও কবিতা-লেখার নেশা উগ্র। তবে হ্যাঁ—আগে লেখতাম কাগজে কলমে। আজকাল লেখি মনে মনে।

—টেবিলে তোর দু'খানা চিঠি এসেছে সকালের ডাকে—পেয়েছিস্?

চিঠি? চৈতন অঙ্গসভঙ্গিতে বললে: চিঠি আবার কোত্থেকে আসবে আমার কাছে? চিঠির জন্যে চৈতনের কোনো আগ্রহই দেখা যায় না। দিদি নিজেই টেবিল থেকে দু'খানা কার্ড তুলে আনে। অন্যমনস্কের মত বারেক চোখ বুলিয়ে বলে: একটা সম্পাদকের চিঠি—কবিতা চেয়েছেন।

ও। চৈতন বললে; দ্বিতীয়টি?

দেখ্, বাপু তুই। দিদি হেসে বললে: পরের চিঠি পড়তে নেই।

আহা, নীচের নামটাই পড় না শুধু; চৈতন বললে।

কি জানি—দিদি বললে; রেবা না সেবা—চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি নে'।

সেবা—সেবা দিয়েছে চিঠি? কিন্তু নিমেষেই চৈতনের স্বরের উত্তেজনা নিভে এল। অন্যমনস্কের মত বললে: কি লিখেছে পড় না দিদি?

কেন, তুই পড়তে পারিস নে? কঠিন কণ্ঠে দিদি বললে।

পত্রালাপে গুরুর নিষেধ—চৈতন বললে।

তাই? দিদি আর কিছু বললে না। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চৈতন চলে গেলে দিদি এসে ঢুকলে চৈতনের ঘরে। সেবা কি লিখেছে জানবার জন্যে তার ভারি কৌতূহল হল। হয়ত সেবাকে দিয়েই বর্তমান সমস্যার সমাধানের একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। আশ্চর্য্য, চিঠিটা টেবিলে নেই। চৈতন সঙ্গে করে নিয়ে গেছে! দিদির বিশ্বাস হল না। সহসা মেঝের চোখ পড়তেই কার্ডখানি দিদির চোখে পড়ল। দিদি খুসী হল—খুসী হল এই ভেবে যে চৈতন চিঠিখানি হাতে নিয়েছিল।

*

* *

সেদিন আশ্রমে যেতে যেতে বার বার সেবার কথা চৈতনের মনে ঘোরাফেরা করতে লাগল। চৈতন তাকে জোর করে মন থেকে ঝেড়ে দিতে চাইলে। সে যুবক এবং বলিষ্ঠ। কামিনী এবং কাঞ্চন—এ দুটোর একটার প্রতিও কোনো পক্ষপাত তার মনে কোনোদিন হয়নি। তবু সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলে, সেবার কথা বার বার তার মনে পড়ছে কেন? কেন সে ইচ্ছামাত্র সেবাকে মন থেকে মুছে দিতে পারছে না।

সেবার সঙ্গে চৈতনের পরিচয় অবশ্য বহুদিনের। দীর্ঘকাল তারা পাশাপাশি বাসায় ছিল। আর সেবার মার সঙ্গে চৈতনের দিদির বন্ধুত্ব এমন নিবিড় ছিল যে, এমতাবস্থায় সেবার সঙ্গে চৈতনের পরিচয় না হয়ে পারে না—এবং পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতাকে বন্ধুত্ব বলে। অবশ্য অদ্ভুতানন্দ তখনও এদেশে ভূমানন্দ দান করতে আসেন নি। চৈতনের জীবনের সেই ভাব-প্রধান দৃশ্যপটে অদ্ভুতানন্দের আকস্মিক আবির্ভাব আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

চৈতনকেও স্বীকার করতে হয়, সেবা মেয়েটার অনেক গুণ আছে। সে ভাল গান গাইতে জানে, নাচতে জানে—অভিনয়ে পটু। ঘরের কাজে তেমনি সে সুদক্ষ। চৈতনের ঘর সে মাঝে মাঝে সাজিয়ে দিত। সাজানো মানে কোনো বিশেষ জিনিস বিশেষ স্থানে রাখা। আর সেবা সুন্দরী, একথা শত্রুপক্ষীয়েরাও অস্বীকার করবে না।

একদিন সেবার বাবা বদলি হয়ে গেলেন। একটা কথা মনে করতেও চৈতনের হাসি পাচ্ছে আজ। যাবার দিনে সেবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল আর চৈতনের চোখও শুষ্ক ছিল না। চৈতন একা একা হাসলে।

তার পর সুদীর্ঘ ছেদ। সময়ের টানে সেবার স্মৃতিও ম্লান হয়ে আসে। ম্লান হয়ে হয়ে একদিন জীবনপট থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়। তারপর ফাঁকা, সব ফাঁকা—ধূসর জীবনপথে একটী বিস্মৃত পদচিহ্ন...

* * * * *

দু' বছর পরে,—

দোতলার সিঁড়ির মুখে বসে বসে দিদি চৈতনের অনাগত শিশুর জন্যে নক্সী-কাঁথা সেলাই করছে। দিদিকে দেখে মনে হয়—এ দু বছরে যেন দশ বছর তার বয়স বেড়ে গেছে। মাথার চুল তার শনের মত সাদা ...চোখেমুখে বার্দ্ধক্যের কাল-ছায়া।

সেলাই করতে করতে এক সময় সে মুখ তুলে তাকালে উপরের দিকে। তিন তলার ঘর ক'টা আজ অনেকদিন খোলা হয় নি। দু' বছর—প্রায় দু' বছর হতে চলল। দিদি দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

পাঁচির মা বাড়ীর পুরাণো-ঝি। এসে বললে: ওটা আমাকে দাও দিদি—অসুখ শরীর নিয়ে কেন তুমি এটা করছ?

দিদি নিঃশব্দে সুই-শুদ্ধ কাঁথাখানি এগিয়ে দিলে। সেলাই করতে করতে পাঁচির-মা শুধালে: দাদাবাবু কবে আসবে দিদি?

—কবে আসবে কি করে জানব বলো। দিদি বললে: আসবে হয়ত এর মধ্যে একদিন। দিদি দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

এমন জানলে ····· পাঁচির-মা কথাটা শেষ করলে না।

কি? দিদি শুধালে।

সেবা-বৌদি যে শেষে এমন হয়ে যাবে, পাঁচির-মা বললে: কে জানত বাপু!

বলা বাহুল্য যে সেবার সাথে চৈতনের বিয়ে হয়েছে। আর সে অবশ্য তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। বিয়ের পূর্ব্বমুহূর্তেও চৈতন জানত না যে

সে বিয়ে করতে যাচ্ছে। এ শুধু সম্ভব হয়েছে দিদির ঐকান্তিক চেষ্টায়ই। কিন্তু আশ্চর্য্য, বিয়ের পর সেই সেবাকে নিয়ে চৈতন দিন কয়েকের জন্যে একবার এসেছিল…আর আসে নি।

এ যে কেমন করে সম্ভব হল, দিদির ভাবতেও বিস্ময় লাগে। বরং দিদির ভয় ছিল বিয়ের পর যদি চৈতন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়… সেবার মা'র কাছে আর তার মুখ-দেখাবার উপায় রইবে না।

দিদি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। সুখী হতে চেষ্টা করে—চৈতনের সুখেই ওর দিদির সুখ।

একদিন গুরুদেব এসে বললেন: অম্বু, এতদিনে তোমার সময় হল, এবার চল।

দিদি গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিয়ে বললে: এবার যাব বলেই মনস্থির করেছি গুরুদেব। কিন্তু আমি চলে গেলে চৈতনের ঘর-দোর আগলায় কে? সব যে পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। তারা কি এখানে আসবে না গুরুদেব?

গুরুদেব বললেন: আসবে বৈকি মা; তুমি চলে গেলেই তারা আসবে।

আমি চলে গেলে? দিদি বিস্মিতস্বরে শুধালে।

হ্যাঁ, গুরুদেব বললেন: তাদের এখানে আসার একমাত্র বাধা তুমি। দুঃখিত হয়ো না অম্বু। দুর্নিবার নিয়মই হচ্ছে এটা। তোমার প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে গেছে তাদের কাছে।

দিদির চোখ ফেটে জল এল। কিছুক্ষণ সে কথা কইতে পারলে না।

—আপনিও জানেন বাবা, অবশেষে দিদি বললে: কত কষ্টে আমি চৈতনকে মানুষ করেছি। আমার সেই চৈতনকে এমন পর করলে কে? আপনি তো জানেন, এক সময় সে বিবাগী হয়ে গেছল। কত কষ্টে তাকে ফিরিয়ে এনে জোর করেই এ বিয়ে দি' আমি। দু' বছরও তো হয়নি এখনও। এরি মধ্যে অতখানি?

প্রশান্ত হাসিতে চোখ উজ্জ্বল করে গুরুদেব বললেন: এরি মধ্যে অতখানি। সোনার শিকল—মা সোনার শিকল…

জাপান

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

(৬)

মা যতদিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে ততদিন মাতৃত্বের ষোল আনা দাবী করতে পারে; কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লেই মায়ের মাতৃত্বের একটা ভাগী জুটে যায় মাটী; এই নূতন মা-টী, মাটীর সাহায্য ভিন্ন মা কখনই সন্তান রক্ষা করতে পারেনা। সমুদ্রে দিক্‌বিভ্রান্ত নাবিক ল্যাণ্ড (land) অর্থাৎ মাটী দেখিলে যে কি প্রকার আনন্দিত হয় তাহা একবার ভাবলেই ঐ মাটী মা-টীর প্রতি যে আমাদের কি প্রকার ভালবাসা তাহা বেশ বুঝা যায়। এই বিষয়টী জাপানীগণ এমনভাবে শিক্ষা পায় যে দেশের ডাকে যেতে মা ও ছেলের মধ্যে আদেশ দেওয়া নেওয়ার কোন অনুষ্ঠানই আবশ্যক মনে করেনা; স্কুল কলেজে যাওয়ার মত চলে যায়। শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই পাশ্চাত্য ভাবের ছাঁচে ঢালা, দেশের রঙে রঞ্জিত। নিম্নশিক্ষা বাধ্যতামূলক; যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষা দশবিধ সংস্কারের ন্যায় জাতির জন্মগত সংস্কার। জাপানে শিক্ষার সমস্ত উদ্দেশ্যই হয়েছে দেশের মঙ্গলজনক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আকাঙ্খা প্রত্যেকের মনে সমানভাবে জাগিয়ে দেওয়া। ধর্ম্মের চিন্তাও দেশের মঙ্গলের উপরই প্রতিষ্ঠিত; নিজের মুক্তি কামনায় পোষাকীভাবে অথবা প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে এবং তদ্বারা যথার্থভাবে ভিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত অন্ধ আতুরের গ্রাসাচ্ছাদনের পথ সঙ্কুচিত ক'রে কপট ধর্ম্মপ্রচারের প্রথা জাপানে কোথাও নেই। জাপানে ভিক্ষা করার প্রথা নেই বললেও অত্যুক্তি হয়না! কিন্তু সহানুভূতি এমন ওতপ্রোতঃভাবে সমাজে মিশ্রিত যে ভিক্ষা প্রথাদ্বারা সমাজে যে জড়তার সৃষ্টি হয়, তাহার পরিবর্ত্তে সমাজে চল্‌ছে একটা আবেগভরা উৎসাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সকল দেশেই বাণিজ্যপ্রধান সহর বন্দরের দিকে একটা ঔৎসুক্যপূর্ণ আকর্ষণ থাকে; জাপানে এই আকর্ষণটী মেয়ে পুরুষের মধ্যে সমানভাবে বিরাজিত। মেয়েরা সহরে এসে দোকানে কেনা বেচার কার্য্য অথবা কোন বাড়ীতে চাকরাণীর কার্য্য ক'রে

স্বাবলম্বী হয়ে পড়াশুনা করতে পারলে কোনপ্রকার সুযোগই উপেক্ষা করেনা; মেয়েদের মধ্যে মটর-ড্রাইভার মটরবাস্-ড্রাইভারের সংখ্যাও কম নয়; হেয়ারকাটিং সেলুনে অর্থাৎ ক্ষৌরশালায়, শেলাইয়ের কার্য্যে সংখ্যাতীত; টাইপিষ্টের কার্য্যে অগণিত। মদের দোকানে, সুরাপানের পূর্ণাহুতি প্রদানকারিণীদের সংখ্যা গণনাতীত; প্রকাশ্যভাবে অনুমতি-প্রাপ্ত (licensed) মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরীগণের সংখ্যা দেবতাদের আবশ্যকানুযায়ী! এইসব স্বর্গীয় বিদ্যাধরীদের বিদ্যাদানের কার্য্যে শরীরে যাহাতে দুষ্ট সরস্বতীর আবির্ভাব হয়ে বিদ্যোৎসাহীদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত না করতে পারে তজ্জন্য ইহারা সপ্তাহে দুইবার ডাক্তারদ্বারা পরীক্ষিত হ'য়ে থাকে। বেশ্যাবৃত্তি করলেও মেয়েরা দায়িত্বহীন নয়; বাহ্য প্রস্রাব করার ন্যায় যে সব যুবক প্রকৃতির অসামাজিক দাবীগুলি পূর্ণ করতে উহাদের নিকট যায়, তাহারা যেন কোনপ্রকারে কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা করার কোনপ্রকার ক্রটীই উহারা করেনা।

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য যেমন অটুট, শারীরিক গঠন সৌন্দর্য্যও তেমন নিটোল; ইহাদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিভিন্ন রকমের হলেও প্রকৃতির নিজস্বটুকু দেখে চোখের নেশা মজে না। মেয়েরা কিমনো অর্থাৎ একটা আলখাল্লার মত তিন চারটা জামা গায়ে দিয়ে অবস্থানুযায়ী রেশমের অথবা সুতার কাপড়ের অবি অর্থাৎ একটা পুটলি পিঠে বেঁধে তাবি কাপড়ের ষ্টকিং পরে গেতা অর্থাৎ খড়ম পায় দিয়ে, যখন চলে যায় তখন বিদেশী প্রথমতঃ দেখে একটু চম্‌কে উঠে; কিন্তু পরক্ষণেই চমক্ মচ্‌কিয়ে যায় উহাদের চোখের জ্যোৎস্নায়; স্নিগ্ধদৃষ্টির অনাবিল নির্ব্বাক আহ্বানের নিকট শিষ্টাচারের ভাষাও হার মানে নতশিরে। ইহারা মেয়ে পুরুষ সকলেই নতশিরে শিষ্টাচার প্রদর্শন করে; এই শিষ্টাচার প্রদর্শনের মধ্যেও একটু আর্ট অর্থাৎ একটু কায়দা আছে; ইহারা স্বভাবতঃই শিল্পকলাপ্রিয়; প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সংমিশ্রণ জাপানীদের জাতির বিশিষ্টতা! প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে ইহারা ফুলকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে; বসন্তে ফুটে রোজ্ এবং শরতে ফুটে ক্রিসেন্থিমাম্। এই দুই ঋতুতেই উক্ত ফুল ফুটলে মেয়ে পুরুষ ফুলের বাগানে বেড়িয়ে কাটায়। বলাবাহুল্য ঐসব ফুলের বাগানে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ স্থাপিত হয় অনেক এবং কৃত্রিম সম্বন্ধ স্থাপিত হয় আসলের চেয়ে ঢের্ ঢের্ বেশী। ইহাদের ভোগও যেমন আকণ্ঠভরা, ত্যাগও তেমন প্রাণান্তকর! সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে কেহ বিবাহের পূর্ব্বে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও ভদ্রঘরের মেয়েরা সে পথে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেনা; সময়ে যদি কেহ ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিম্‌টী কাট্‌তে চায়, তবে ভয় করে শাণিত ছোরা; মেয়েরা আত্মরক্ষায় সব্যসাচী! যুযুৎসুও জানে! আপোষে যে সব ব্যভিচার হয়, তাহা সকল সমাজেই দেখা যায়; কিন্তু জাপানে মেয়েদের বিবাহ হলে পতির প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া ইহাদের ধারণাতীত বললেও অত্যুক্তি হয়না। বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা আছে কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় পূর্ব্বে নগণ্য ছিল, ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

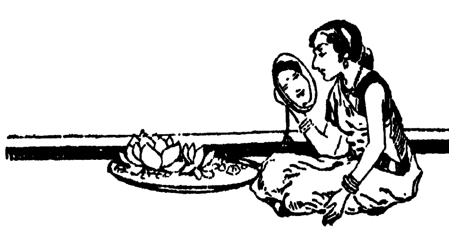
জনসংখ্যা যে জাতির শক্তির মেরুদণ্ড গঠনে একটী বিশেষ শ্রেষ্ঠ উপাদান, ইহা জাপানীগণ মনে প্রাণে বুঝেই গন্ধর্ব্ব বিবাহের সন্তানগুলিকে সমাজে গ্রহণের ব্যবস্থা করে রেখেছে; পিতার নাম অজ্ঞাত হ'লেও সে যে একজন জাপানী ইহাই তাহার গৌরবজনক পরিচয়; অনূঢ়া অবস্থায় মেয়েদের একাধিক সন্তান হ'লেও মা তিরস্কৃত হয়না বলেই ভ্রূণহত্যাও হয়না। নিরপরাধ সন্তান কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে জারজ ব'লে সমাজে উপেক্ষিতও হয়না; কাজেই গূঢ়োৎপন্ন এবং কানীন সন্তানের সংখ্যাও সমাজে নগণ্য নয়। হিন্দুসমাজে বর্ত্তমানে জারজ সন্তানদের প্রতি যে ভাব, তাহা যদি বেদব্যাসদেবের যুগেও থাকত, তাহা হ'লে জারজ পুত্র বেদব্যাসের বৈদিক-প্রতিভা বিকাশের কোন সম্ভাবনাই থাকত না।

যথার্থভাবে বল্‌তে গেলে মহাভারতে জারজ পুত্রগণই যুদ্ধবীর, দানবীর, ধর্ম্মবীর বলে খ্যাতিলাভ করে গিয়েছে বিবাহিতা পত্নীর অসামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা কোনদিন কোন সমাজেই স্থান পায় নাই; জাপানে বেশ্যা রমণীও বিবাহিতা হলে সতীত্বের আদর্শে সমাজে অবজ্ঞাত হয়না। পিতামাতার দুঃখ মোচনের জন্য অনেক সময় জাপানী মেয়েরা অর্থ নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, চুক্তি অন্তে ভদ্রসন্তান কর্ত্তৃক বিবাহিতা হয়ে সমাজের ক্রোড়ে সমভাবেই স্থান পায়। পুরুষগুলির উচ্ছৃঙ্খলতা সকল সমাজেই অপরিহার্য্য সংযোগ; জাপানেও ঠিক্ সেই ভাবই

চল্‌ছে। উহাদের উচ্ছৃঙ্খলতাই যে জারজ পুত্রের উৎপত্তির কারণ, সেই জ্ঞান জাপানীদের এবং ইয়োরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে কতকটা আছে বলেই সমর-বিভাগে সৈন্যদলে বিশেষতঃ নৌবিভাগে খালাসীদলে উক্ত প্রকার সন্তানদের স্থান অগণিত! যথাযোগ্য বাৎসল্য আদরে বঞ্চিত হওয়ায় জারজ সন্তান আত্মনির্ভরশীল হয়ে আকাঙ্খায় ভয় করেনা দুর্গম স্থানে যেতেও! স্বাধীন দেশে ইহারা যে সমাজের একটী বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় অঙ্গ, ইহা অস্বীকার করা যায়না। দেশাত্মবোধ জাপানীদের ধর্ম্মের অঙ্গ-বিশেষ হওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা একপ্রকার নেই বললেও অত্যুক্তি হয়না। সমাজই জাপানীদের জাতির সর্ব্বস্ব; একটী নগণ্য জাপানীও সমাজ হতে চ্যুত হ'তে পারেনা এমনই জাতির বন্ধনের দৃঢ়তা; উপাসনার পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও সমাজে কোনপ্রকার শ্রেণীবিভাগ নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রবেশের পূর্ব্বে জাপানীদের ধর্ম্ম ছিল সিন্তোজিন্ অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষদের পূজা করা। এই পূজার পদ্ধতিও হিন্দুদের মধ্যে যে পূর্ব্বপুরুষদের পিণ্ডাদি দ্বারা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে তাহারই অনুরূপ। অন্নব্যঞ্জনাদি থালা বাটীতে যথাযথভাবে সাজিয়ে গৃহের মধ্যে নির্জ্জন কক্ষে রেখে দেওয়া হয়; প্রার্থনান্তে উহা পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে মনে করে পরিবারস্থ বৃদ্ধকর্ত্তা উহা গ্রহণ করে থাকে। একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই দেখা যায় যে, সিন্তোজিন ধর্ম্মে হিন্দুদের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের ন্যায়ই কতকটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাপানীগণও সিন্তোভাবাপন্ন; পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় ব'লে কোন প্রকারের শ্রেণীবিদ্বেষ সমাজে স্থান পায় না। ইহাদের সমাজ সর্ব্বপ্রকার বাধাবিমুক্ত হওয়ায় জাতির মনটী জাতির নিশান জুড়ে বসে আছে; জাতির নিশানের গৌরব রক্ষা করা ইহাদের আত্মার মুক্তি অপেক্ষা প্রিয়তর ধর্ম্ম। নিজের ব্যক্তিগত গৌরব রক্ষাকেও উপেক্ষা করে না; পশুও প্রাণের মায়া করে; কিন্তু ইহাদের দেশাত্মবোধ এবং স্বীয় ব্যক্তিত্ববোধ এমন ভাবে বিকশিত হয়েছে যে নিজের প্রাণের জন্য কোন প্রকারের অপমানই সহজে নীরবে সহ্য করতে চায় না; ক্রুদ্ধ হলে—প্রতিশোধ গ্রহণে অসমর্থ হ'লে নিজের পেট কেটে হারিকিরি ক'রে বসে! ইহাদের এই আত্মাহুতির ভাব জাতির শক্তিতে সংবদ্ধ ব'লে ইয়োরোপীয়গণ জাপানীদিগকে রক্তপিপাসুক জাতি বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। এই হিসেবে আখ্যা দিতে হলে ইয়োরোপের সকল জাতিই রক্তের পিপাসায় শিরোমণি চূড়ামণি প্রভৃতি উপাধি পাইতে পারে; বিষয়টা হয়েছে জাতির বিদ্বেষের গরল উদ্গার এবং শ্বেত জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর সরল বিধান! কথাটা শুনে জাপানীগণ বলে উহা ব্যবসাদারী কথা! জহুরী জহর চিনে নিয়েছে। ব্যবসাক্ষেত্রে জাপান একপ্রকার অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! ব্যবসাক্ষেত্রে যথার্থ বুদ্ধি নয়, বুদ্ধির শঠতা যে কত প্রকার বিভিন্ন পথে লাভের ফিকির অন্বেষণ করে তাহা সাধারণ লোকের বুদ্ধির ধারণাতীত। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের সুবিধা পেলে কোনপ্রকার সুযোগই উপেক্ষা করতে চায় না। গত মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ যদি নরওয়ের ব্যবসায়ীদের সাহায্যে তামা এলুমিনিয়াম প্রভৃতি জার্ম্মেণীতে চালান না করত, তবে জার্ম্মেণীর পক্ষে এত দীর্ঘ সময়ের জন্য যুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব হ'ত। এহেন ব্যবসায়ীবুদ্ধিতে জাপান সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী হওয়ায় তাহার উপর ইয়োরোপের প্রায় সকল জাতিরই দৃষ্টি পড়েছে ভস্মলোচনের! কিন্তু জাপান দিব্যলোচন প্রাপ্ত হয়ে বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা এমন সুলভে বিভিন্ন প্রকারের মালের আমদানী করছে যে ইয়োরোপীয় কোন প্রতিনিধি ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে জাপানে গিয়ে তথাকার শ্রমিকগণের দুরবস্থা বর্ণন করে জাপান সরকারের প্রতি দোষারোপ করেছে। কিন্তু বিষয়টা হয়েছে যে মহাত্মা গান্ধী যদি বড়লাট হতেন তবে তাহার দৈনিক খরচা হত যে মাত্র চার আনারও কম! প্রাচ্যের শ্রমিকগণের নয় শুধু, সকলেরই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার বিধান যে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির! জাপানী শ্রমিকগণের দৈনিক খরচাও প্রায় ভারতবাসী শ্রমিকগণের ন্যায়। চার পয়সার ডাল ভাত খেয়ে যে শ্রমিক দিন চালাতে পারে তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায়, যে শ্রমিকের দৈনিক খরচা চার শিলিং অর্থাৎ প্রায় তিন টাকা তাহার লাভের কোন সম্ভাবনা আছে কি? ভারত যদি স্বাধীন হত, তবে জাপানকেও হার মানতে হত; ভারতের শ্রমিকদের নিকট ইয়োরোপ তো দূরের কথা!

জাপানী শ্রমিকগণের শুভানুধ্যায়ী ইয়োরোপীয় প্রতিনিধি যাহাই বলুক না কেন—জাপানী শ্রমিকগণ তাহাদের দুরবস্থা অপনোদনের জন্য অন্য কোন জাতির নিকট অথবা জাতিসংঘের নিকট কোন প্রার্থনা করে নাই; তথাপি এমন অযাচিত সহানুভূতি কেন আসে তাহা শ্রমিকগণ বেশ বুঝে নিয়েছে। জাপানের অনেকেরই ধারণা হয়েছে যে এই ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে প্রশান্ত বক্ষে একটা ভয়ানক অশান্তি উৎপত্তির সম্ভাবনা হয়ে পড়েছে এবং সেই সময় উহাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়; কারণ আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকবে না। তবে ইহাও নিশ্চয় যে জাপান প্রশান্তবক্ষে চিরসমাধি লাভ করলেও অন্য জাতির অঙ্গুলি সঞ্চালনে পরিচালিত হবে ব'লে মনেই হয় না। ইতিমধ্যে যদি ইয়োরোপে যদুবংশের ধ্বংসলীলা আরম্ভ হয়ে যায় তবে জাপান প্রাচীতে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেও বস্‌তে পারে। জাপানের ভৌগলিক অবস্থা জাপানকে এমন ভাবে সুদৃঢ় করে রেখেছে যে আমেরিকা প্রায় চার হাজার মাইল হতে—ব্রিটিশ প্রায় বার হাজার মাইল হতে—জাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে যে শক্তি ব্যয় করবে তাহা সঞ্চয় করা একেবারে সহজসাধ্য নয়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে ব্রিটিশের সিঙ্গাপুরের নেভাল বেস্ (naval base) অর্থাৎ জলযুদ্ধ জাহাজের ঘাঁটী, এয়ার বেস্ (air base) অর্থাৎ আকাশমার্গে যুদ্ধ করবার এরোপ্লেনের ঘাঁটী, হঙ্কংস্থ কতিপয় ব্যাটল্ সিপ্, ক্রুজার, লাইট ক্রুজার, সাবমেরিণ প্রভৃতি এবং আমেরিকানদের হাওই ও ফিলিপাইন্ দ্বীপস্থ যুদ্ধের আড্ডা এবং রণসম্ভারগুলি উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু জাপান বর্ত্তমানে যে কতবড় শক্তিশালী জাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে তা জাপানের সঙ্গে অন্য কোন শক্তিশালী জাতির যুদ্ধ না হলে বিশেষ ভাবে ধারণা করাই অসম্ভব বলে মনে হয়। আজকাল সকল স্বাধীন জাতির মধ্যেই স্পাই অর্থাৎ গুপ্তচরের এমন প্রাদুর্ভাব যে উহাদের দ্বারা প্রত্যেক জাতির আভ্যন্তরিক সঞ্চিত শক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ছে, এই কার্য্যটী ইয়োরোপের যত সহজসাধ্য, জাপানে তত সহজ নয়; কারণ একজন ফরাসীকে জার্ম্মেণ অথবা একজন জার্ম্মেণকে ফরাসী সাজতে বিশেষ বেগ্ পেতে হয় না; কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে জাপানী সেজে গুপ্তচরের কার্য্য উদ্ধার করা অসম্ভব না হ'লেও ধরা পড়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। চীনা এবং কোরিয়ান দ্বারা উক্ত কার্য্য উদ্ধার করার কতকটা সম্ভাবনা থাকলেও অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদ্র দ্বারা জাপান-সাম্রাজ্য এমন ভাবে খণ্ডবিখণ্ডিত যে বর্ত্তমানে জাপানীগণ ইহাকে অবিজয়ী বলেই মনে করে; কারণ প্রত্যেক হারবারে প্রবেশের পথে উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতমালার উপর এমনভাবে কামান সজ্জিত যে, বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে যে কোন আক্রমণকারী জাহাজকে ইহারা ধ্বংস করে দিতে প্যারে। সমুদ্রের মধ্যে মাইন ফেলে অবরোধ করে রাখার ব্যবস্থা তো আছেই। আকাশমার্গেও জাপানের মত একটী শক্তিশালী দেশকে আক্রমণ করে নিরাপদ স্থানে যাওয়ার আড্ডা নাই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না; প্রশান্তে বোনিন দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধীনে; এই দ্বীপপুঞ্জ তিনভাগে বিভক্ত; সর্ব্বোত্তরের দ্বীপটী জাপান হ'তে পাঁচশত মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই সব দ্বীপগুলি আগ্নেয়গিরি সংশ্লিষ্ট বলে আয়ের হিসেবে উহাদের বিশেষ কোন মূল্য নাই কিন্তু দেশরক্ষার্থ ঘাঁটীর হিসেবে ইহা জাপানের সিংহদ্বার।

সম্পূর্ণ



খিচিংয়ের প্রাচীন প্রত্নসম্পদ—ময়ূরভঞ্জ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

খিচিংয়ের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ খৈরভণ্ডন ও কণ্টাখৈর নদীর চারিদিক বেড়িয়াই বিদ্যমান। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল প্রত্ন-সম্পদ রহিয়াছে তাহার পরিচয় অনেকদিন হইতেই পুরাতত্ত্ববিভাগের জানা ছিল। ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দের পুরাতত্ত্বের বিবরণীতেও কিচাং (Kichang)এর কথা আছে। সে সময়ে কিচাং কিরূপ ছিল—কি কি মূর্ত্তি সে সময়ে বিদ্যমান ছিল, তার অতি সুন্দর বর্ণনা তাহাতে রহিয়াছে। কিন্তু ১৯২২-২৩ সালে যখন এই প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের জন্য রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় স্বর্গত মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেবের অনুরোধক্রমে ইহার খনন কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখনই ইহার ঐশ্বর্য্য সম্পদ দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। চন্দ মহাশয় অসাধারণ শ্রম ও যত্নের সহিত এ বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। পুরাতত্ত্ববিভাগের ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে কি ভাবে কেমন করিয়া রায় বাহাদুর চন্দমহাশয় ময়ূরভঞ্জের এই প্রাচীন কীর্ত্তি উদ্ধারের কার্য্যে ব্রতী হন, সে কথা রহিয়াছে।

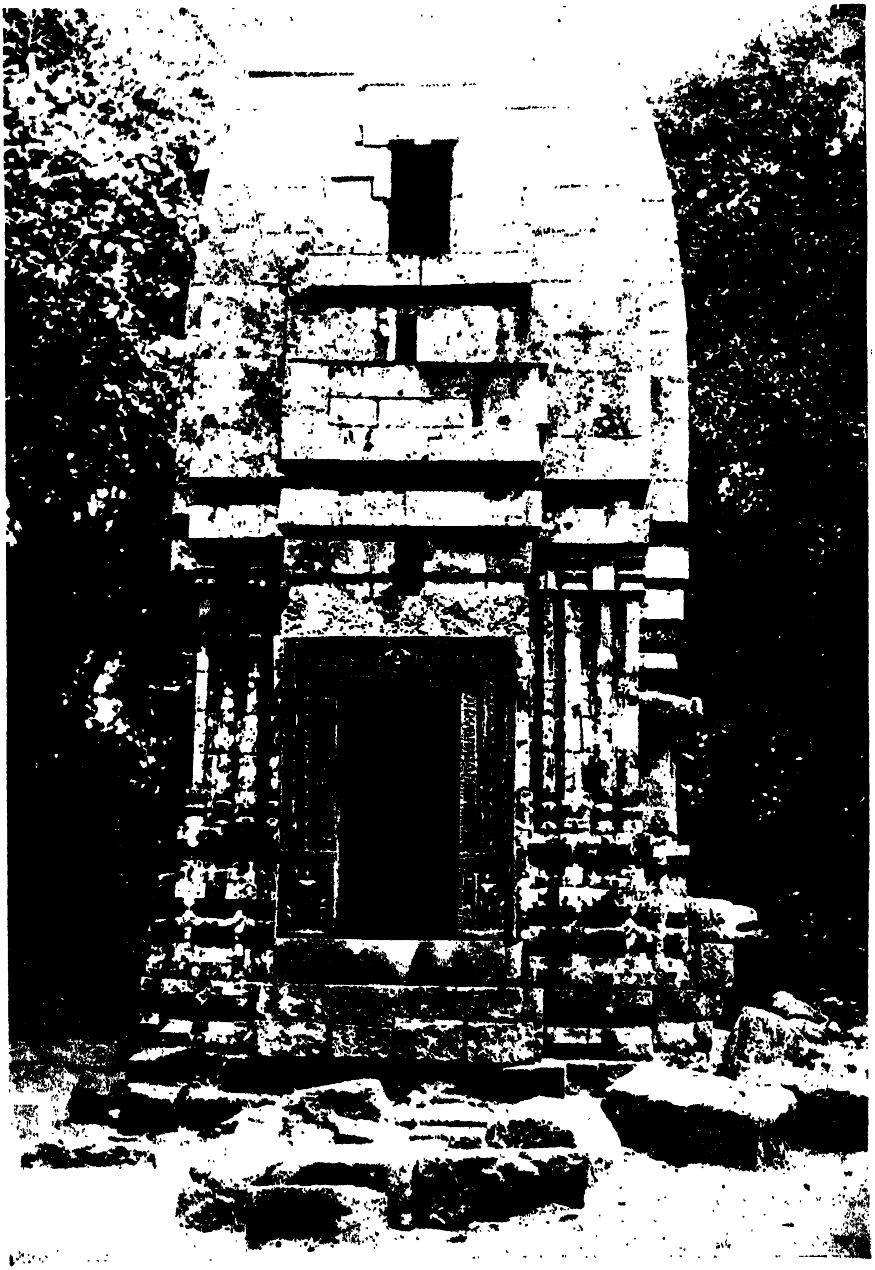
ঠাকুরাণী-মন্দিরের চারিদিকটা খননের পূর্ব্বে কিরূপ দেখিতে ছিল তাহা চিত্র হইতেই পাঠকগণ অনুধাবন করিতে পারিবেন। মূল মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে খণ্ডীয়-দেউলটি অবস্থিত। এই মন্দিরের নাম খণ্ডীয় ইহা হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইতে পারে নাই। ইহার চারিদিকের দেওয়ালটা কেবল গড়িয়া উঠিয়াছিল, উপরের অংশটা 'শিখর' সংযুক্ত হয় নাই। খণ্ডীয় দেউলের পশ্চাতে সেকালে গভীর জঙ্গল ছিল—সেখানে সাপ ও বাঘ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। এই দেউলের দরজার চৌকাটটা অপূর্ব্ব কারুকার্য্যসম্পন্ন। সম্ভবতঃ এইটা মূল চন্দ্রশেখর মন্দিরেরই দ্বারের সহিত সংযুক্ত ছিল। পরে উহা খণ্ডীয় দেউলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। খণ্ডীয় দেউলটিকেও বীরবল মহাশয় পুনর্গঠন করিয়াছেন। এই চৌকাটটার নীচের দিকে গঙ্গা ও যমুনার অতি সুন্দর মূর্ত্তি অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্যের সহিত খোদিত রহিয়াছে। বোধ হয় যাত্রিগণ যাহাতে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিবার পূর্ব্বে গঙ্গা ও যমুনার সলিল ধারায় পবিত্র হইতে পারে সে জন্য দরজার দুই পাশে গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তি খোদিত করা হইয়াছিল।

১৯২৩-২৪ সালে ঠাকুরাণী মন্দিরের এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের খনন কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে দেখা গেল যে সেখানে চারিদিক বেড়িয়া নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর খণ্ড বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কোথাও একটী মূর্ত্তি, কোথাও একটা স্তম্ভের নিম্নভাগ, কোথাও শিখরের অংশ এখানে সেখানে পড়িয়া ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই সকল ধ্বংস চিহ্নের কোনটীতেই কোনরূপ খোদিত-লিপি ছিল না, তবে ঠাকুরাণীর হাতার বাহিরে একটী মৃত্তিকা-স্তূপ খনন করিবার সময়ে সেখান হইতে একটী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্ত্তির নীচে দুই পংক্তি খোদিত-লিপি ছিল তাহা এই—"ওঁ রাজ্ঞ শ্রীরাজভঞ্জস্য লোকেসা ভগবানেয়ং। শ্রীধরণীবরাহেন সহকীত্ত্যাবিনিশ্চিত্ত"। এই অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটী বর্ত্তমান সময়ে খিচিংএর যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

বড় দেউলটী কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল এবং তাহার চারি কোণে চারিটী ছোট মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়—কেন না, প্রত্যেকটি মন্দিরেই ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এই পাঁচটীর মধ্যে কেবলমাত্র চন্দ্রশেখরের মন্দিরটী পুনর্গঠিত হইয়াছে। বড় দেউলটী নির্ম্মাণের জন্য বর্ত্তমান মহারাজা শৈলেন্দ্রবাবুর উপর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমরা দেখিলাম স্থানীয় কোল প্রভৃতি আদিম অধিবাসী মজুরেরা তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী পাথরের কাজ করিতেছে, কারু-কার্য্য করিতে শিখিয়াছে—এক কথায়—তাহারা তক্ষণ কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে।

আমরা এইবার যাদুঘর না দেখিয়া বীরবল বাবুর নির্দ্দেশ মত বিরাটগড় দেখিতে আসিলাম। বিরাটগড় একটী বৃহৎ

ধ্বংসাবশেষ। ইহা বৃহত্তম গড়খাইবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ। মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে এই বিরাট রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে—এখনও অনেক জায়গার খননকার্য্য শেষ হয় নাই। ঠিক্ নদীর বাঁকে এই ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। কোন কোন স্থানের প্রাচীর এখনও খাড়া রহিয়াছে—কোথাও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।



চন্দ্রশেখরের মন্দির—ভগ্নাবস্থায়

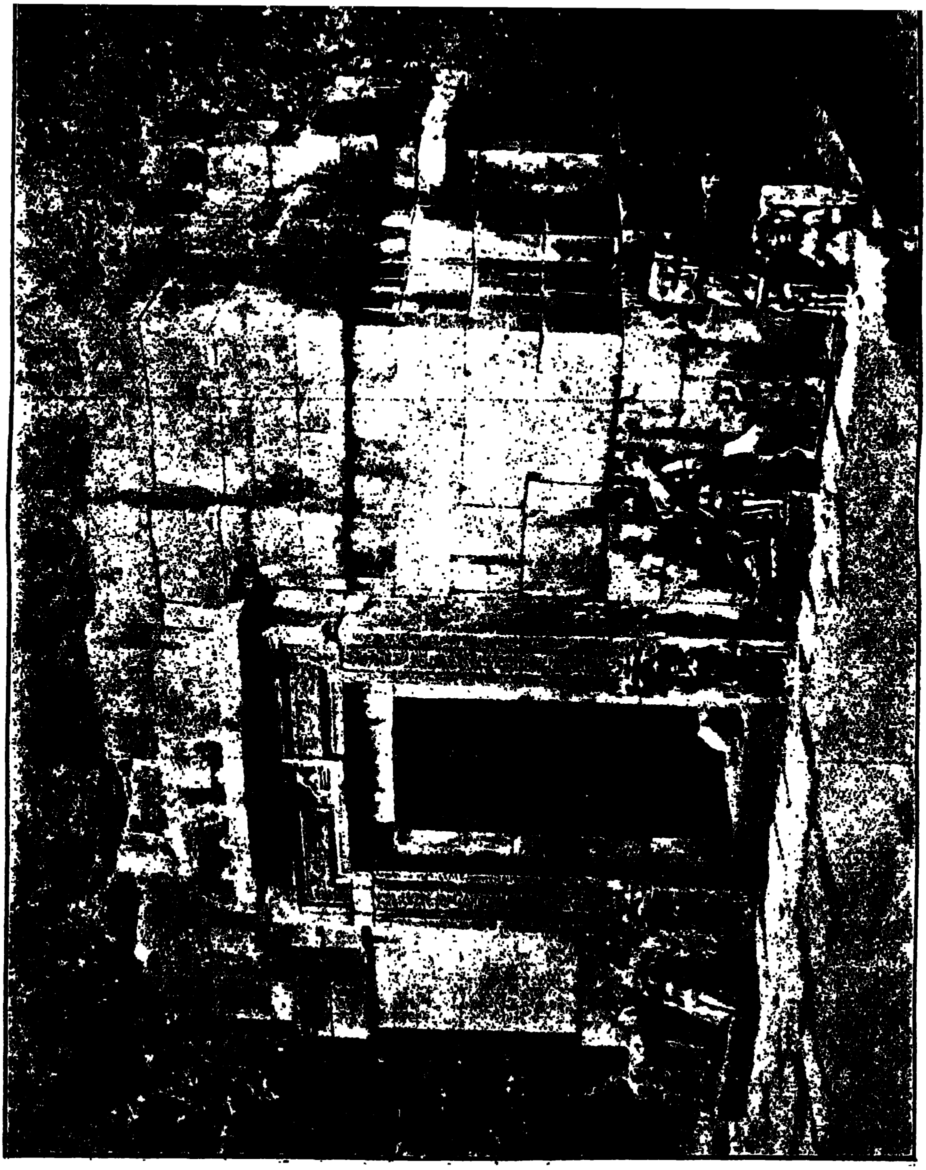
এই গড়ের মধ্যে অসংখ্য ছোট বড় কক্ষ ছিল, দেওয়াল ছিল, অন্দর ও বাহির ছিল—তাহা ভিত্তিমূল দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। অনেকে অনুমান করেন তিনবার এই প্রাসাদটী ধ্বংস হইয়াছিল এবং আবার গঠিত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক না কেন, কি ভাবে কেমন করিয়া এবং কেন এই রাজবাটী পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। নদীর পার এখানে খুবই উঁচু—তবু বর্ষাকালে সময় সময় এই নদীতে যে বন্যার সৃষ্টি হয় সেই বন্যার ফলে অনেক সময় গ্রামের ঘরবাড়ীও ধ্বংস হয় বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। কাজেই এই বাড়ীটি সেইরূপ কোনও বন্যার প্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল কিনা তাহাও বলিতে পারা যায় না। এখান হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এখানে ইটের আকার বড় ও ছোট দুই প্রকারেরই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নদীর পারে দাঁড়াইয়া চারিদিকের সৌন্দর্য্য দেখিলাম। নদীটী একটী বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়া বহুদূর-বিস্তৃত শালবনশ্রেণীর আড়াল দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। এখান হইতে আমরা যে নূতন ডাক-বাঙ্গলা প্রস্তুত হইতেছে সেখানে আসিলাম। ডাকবাঙ্গলাটি বিরাটগড়ের অল্প দূরে নদীর পাড়ে নির্ম্মিত হইতেছে। আজকাল প্রতি বৎসর অনেকেই খিচিং দেখিতে আসেন; দর্শকগণের থাকিবার পক্ষে এইরূপ নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় মেলা সম্ভবপর নহে—একমাত্র বীরবলবাবুর আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোথাও থাকিবার স্থান নাই; এজন্যই মহারাজা এই ডাকবাঙ্গলাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

আমরা বিরাটগড় ও ডাকবাঙ্গলা দেখিয়া সোজা শঙ্করগড়ে আসিলাম। এখানে বর্ত্তমান সময়ে একটী দরজার বা মন্দির তোরণের খানিকটা ব্যতীত আর কিছুই দেখিবার নাই—তবে ভিত্তির অংশ বিদ্যমান আছে। অনেকে বলেন, পূর্ব্বে এই স্থানে শৈবমন্দির ছিল; পরে বৌদ্ধগণ উহা অধিকার করিয়া বৌদ্ধবিহারে পরিণত করেন। এখানে হিন্দুর শৈব মূর্ত্তি এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দুইই পাওয়া গিয়াছে, কাজেই এইরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

শঙ্করগড় হইতে আমরা একটী বাগানের মধ্যে চলিয়া আসিলাম। এস্থানে সারি সারি অনেকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ বিদ্যমান—এগুলি আগাগোড়া ধূসর বর্ণের প্রস্তর দ্বারা গঠিত। এই স্থানটীর নাম চাউলকুঞ্জি। এই স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য এবং গঠন-নৈপুণ্য অনেকটা ভরহুতের স্তম্ভ ইত্যাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কি উদ্দেশ্যে এই স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এখানে কোন মন্দির বা প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল কিনা তাহা এখন বলা কঠিন। যদি সেইরূপ কিছু থাকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে তাহার অন্যান্য অংশগুলি কোথায় গেল? স্তম্ভগুলি সব কয়টী সমান নহে—কোনটী দৈর্ঘ্যে বড়, কোনটি ছোট—কাজেই এগুলির সম্বন্ধে কেহই কোনরূপ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে



ঠাকুরাণীর মন্দিরের হাতা—খননের পূর্ব্বে—খিচিং

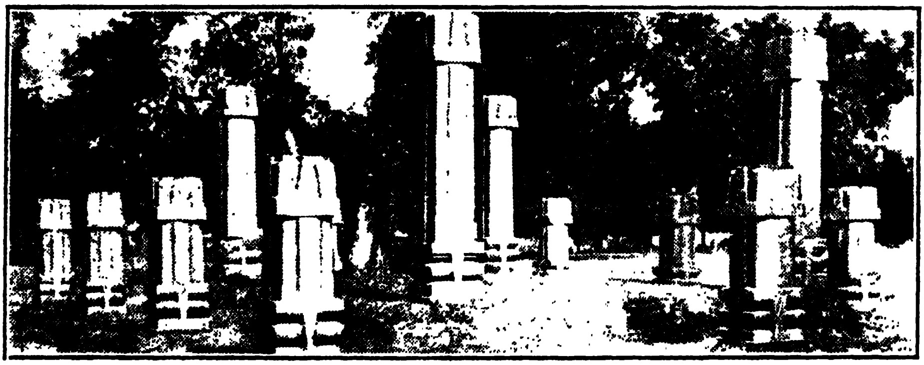


দ্বিতীয় দেউল—বা অসম্পূর্ণ মন্দির—খিচিং

পারেন নাই। চারিদিকের অন্যান্য মন্দির ও ধ্বংসাবশেষ যেরূপ সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা হইয়াছে এই স্থানটীকেও চারিদিক ঘিরিয়া মেহেদী গাছের বেড়া দিয়া তেমনই সুরক্ষিত করা হইয়াছে।

এইবার আমরা পাথরের খনি দেখিতে চলিলাম। খিচিং হইতে স্থানটীর দুরত্ব তিন মাইল হইবে। আমাদের গাড়ী একটী কোল-গ্রামের মধ্য দিয়া চলিল—দুই পাশে মাটীর দেওয়াল-দেওয়া ঘরগুলি, ঠিক মাঝখানে মস্ত বড় একটী তেঁতুল গাছ। উলঙ্গ ছেলে মেয়েগুলি মোটরগাড়ীর শব্দে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কোল রমণীরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে। নদী ও কূপ হইতে জল আনিতেছে দেখিতে পাইলাম। গ্রামের বাহিরে বিস্তৃত মাঠ—এই মাঠের যেন শেষ নাই; কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বীরবলবাবু আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। আমার একটু গর্ব্বও হইল—এই একটী মানুষ কেমন করিয়া নিজের বুদ্ধিবলে এত বড় একটা কাজের ভার লইয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। যেখানে বড় বড় সাহেব ইঞ্জিনিয়ারেরা অসম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন সেইরূপ স্থলে একজন বাঙ্গালী যুবক অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অসাধ্যসাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা কম পৌরুষের কথা নহে।

মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের "সীতারামে" বৈতরণীর কথা পড়িয়াছিলাম। কয়েকবার পুরী যাইবার সময় বৈতরণী পার হইয়াছি—কিন্তু বৈতরণীর তীরে দাঁড়াইবার সুযোগ পাই নাই; এইবার মনে হইল এইত বৈতরণী—এবার উহার সৈকতে দাঁড়াইবার সুযোগ হারাইব কেন? ধীরে



চাউলকুঞ্জির প্রস্তর স্তম্ভ—খিচিং

ধীরে পদব্রজে বৈতরণী লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। সম্মুখে বিরাট মাঠ, মাঠের মধ্য দিয়া পথ—সেই পথ ধরিয়া আমি, বীরবলবাবু এবং কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী মহাশয় অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ধানের ক্ষেতে কোল রমণীরা দলে দলে ধান কাটিতেছিল; পথ দিয়া পসরা মাথায় লইয়া কোল-রমণীরা খিচিংএর হাটে যাইতেছিল। নদীর কাছাকাছি একটা বটগাছের তলায় কোলদের শ্মশানভূমি; সারি সারি প্রস্তর ঢাকা সমাধি, কোলেরা মৃতদেহ মাটিতে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর পাথর চাপা দিয়া রাখে। এই স্থানটী গ্রাম হইতে অনেক দূরে। আমরা এই শ্মশানের উপর দিয়াই বৈতরণী নদীর দিকে চলিলাম। নদীর তীরে আসিয়া কেবলই মনে দূরে বৈতরণীর অপর তীরে কেয়োঞ্জর রাজ্যসীমার বনানী-শ্রেণী দেখা যাইতেছিল—আর অতি দূরে শিমলিপাল পর্ব্বতশ্রেণী বিরাট প্রাচীরের ন্যায় উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি-ভাবে—শিখরের পর শিখর শ্রেণী আকাশের গায়ে সগৌরবে মাথা তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই পাথরের খনিতে আসিয়া পৌছিলাম। একটা পুকুরের মত স্থানে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড পড়িয়া আছে। পাহাড় হইতে পাথরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিবার ফলেই এইরূপ বিরাট গর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে। কি ভাবে কেমন করিয়া পাথর ভাঙ্গিতে হয়, কি ভাবে পালিশ করিতে হয়, কি ভাবে এখান হইতে খিচিং নেওয়া হইয়া থাকে সে সকলই অতি যত্নের সহিত

হইতেছিল—"এই ত, বৈতরণী পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়! আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?" শ্রী খরবাহিনী বৈতরণী-সৈকতে দাঁড়াইয়া একদিন যেকথা বলিয়াছিল, আজ বৈতরণীর তীরে দাঁড়াইয়া আমার মনেও সেই কথা উদয় হইতেছিল। বৈতরণী খরবাহিনী স্রোতস্বিনী—বহুদূর হইতে নীলগিরির পাশে পাশে বহিয়া বহিয়া সে সাগরের দিকে চলিয়াছে। আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম সেখান হইতে দেখিতে পাইলাম—অতি দূরে নীল মেঘের মত নীলগিরির শিখরগুলি নীলগগনের গায়ে রৌদ্র কিরণে ঝলমল করিতেছে—আর তাহার বাঁকে বাঁকে বনরাজিনীলা তটভূমি—আর দুইদিকে পাহাড়ের মত উচ্চ তীর, এই দুই তীরের মধ্য দিয়া বিস্তৃত সৈকত-মধ্যে বৈতরণী প্রবাহিতা হইতেছিল।

বৈতরণীর জলে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম—"এই ত বৈতরণী—পার হইলে নাকি সকল জ্বালা জুড়ায়? আমার জ্বালা জুড়াইবে কি?"···সত্যসত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলন বর্ণনার প্রত্যেক কথা প্রত্যক্ষ করিলাম।—"পশ্চাতে অতি দূরে নীল মেঘের মত নীলগিরির শিখরপুঞ্জ দেখা যাইতেছিল, সম্মুখে নীল সলিল-বাহিনী বক্রগামিনী তটিনী রজত-প্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকত মধ্যে বাহিতা হইতেছিল।"

বৈতরণীর বুকে বড় বড় শিলাস্তূপ। সেই সব শিলাখণ্ডে স্রোতের জল আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কল্ কল্ ছল্ ছল্ শব্দ করিতেছিল। নদী খানিক দূরে যাইয়াই অপর দুইটি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। আমি বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছিলাম, নদী কেমন করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া হঠাৎ বনান্তরালে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিল। আমরা নদীর জল হইতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নানা বর্ণের পাথর কুড়াইয়া



নন্দী—বিরাট শিবমূর্ত্তির পার্শ্বস্থ মূর্ত্তি

লইলাম। দেখিলাম নদীর অপর তীর হইতে কোল পুরুষ ও মেয়েরা নদীর জল যেখানে অল্প সেদিক দিয়া নদী পার হইয়া হাটে চলিয়াছে। আমরাও এইবার খিচিং ফিরিয়া চলিলাম। পথে কীচকগড় এবং অনেকগুলি বড় বড় জলাশয় দেখিলাম। এইভাবে আমাদের খিচিংয়ের চারিদিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা শেষ করিবার পর যাদুঘর দেখিতে চলিলাম।



ভৃঙ্গি মূর্ত্তি

এই যাদুঘরটির মধ্যে এখনও সমুদয় সংগৃহীত মূর্ত্তি সজ্জিত হইতে পারে নাই। তবু যে সকল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম তাহার পরিচয়ই দিতেছি। এই স্থানের একটা বিশেষত্ব এই যে এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন সকল ধর্ম্মের প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি খিচিংএর চারিদিক হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাই সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা যথাক্রমে তাহাদের নাম প্রকাশ করিতেছি।

(১) শৈব মূর্ত্তি—পার্ব্বতী, উমা-মহেশ্বর, শিব, অর্দ্ধ-নারীশ্বর, নটরাজ শিব ইত্যাদি।

(২) বৈষ্ণব মূর্ত্তি—বিষ্ণু ও বৈষ্ণবী।

(৩) শক্তি মূর্ত্তি—পার্ব্বতী, মহিষমর্দ্দিনী, ঈশানী, মহেশ্বরী ইত্যাদি।



অর্দ্ধনারীশ্বর—খিচিং

(৪) গাণপত্য—গণেশ, নটরাজ গণেশ।

(৫) বৌদ্ধমূর্ত্তি—ধ্যানী বুদ্ধ, (পাদস্পর্শ মুদ্রা) অবলোকিতেশ্বর (এই মূর্ত্তিটা ভগ্ন, নিম্নে খোদিতলিপি রহিয়াছে) পদ্মপাণি। প্রথমেই ইহার কথা বলিয়াছি।

(৬) জৈনমূর্ত্তির মধ্যে একটীমাত্র পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি রহিয়াছে।



নটরাজ মূর্ত্তি—খিচিং

তাহা ছাড়া এইখানে বৌদ্ধ তারা, নাগ এবং নাগিনী ও বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর মন্দিরের পার্শ্বদেশ সুসজ্জিত করিবার জন্য নির্ম্মিত অনেক মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমরা এই সকল মূর্ত্তি কয়টীর পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করি না। তবে যে কয়টী মূর্ত্তি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং কারু-শিল্পের দিক দিয়াও অনুপম—তাহাদের কথা একটু উল্লেখ করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি খিচিং যখন ভঞ্জরাজাদের রাজধানী ছিল সেই সময়ে শৈব প্রভাবই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। কেননা খিচিংএর ঠাকুরাণী-বাড়ীর যে বিরাট শিবমূর্ত্তি খিচিংএর বড় দেউলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাহার বিরাটরূপ দেখিলে চিত্ত বিরাট সৌন্দর্য্যের কাছে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারে না। সুন্দর মন্দিরের মধ্যে সুন্দর দেবতার প্রতিষ্ঠা সেকালে শিল্পীগণের ধ্যানের মহিমা প্রকাশ করিয়া তাহাদের চারুকলার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি আমাদিগকে বর্ত্তমান সময়ে বিস্মিত করিতেছে।



শিবমূর্ত্তির মুখভাগ—খিচিং

আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং শিল্প-সমালোচক বন্ধুবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় খিচিংএর মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন আমরা এখানে তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন—"হিন্দুর দেবতা কল্পনার প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুর দেবতা একাধারে উপাস্য এবং উপাসক।" ঋক্ মন্ত্রে আছে যজ্ঞভাগী দেবতারা নিজেরা যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ-লাভ করিয়াছিলেন। যজুর্ব্বেদ মতে স্বয়ং প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারত পুরাণাদিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে, শিব মহাযোগী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রয়োজন মত তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগের দেবদেবী মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শনে এই উপাস্য উপাসকের ভাবে সুন্দর মধুর মিলন দেখায়। দেবতার প্রতিমার কায়ার উপাস্য দেবতার লক্ষণ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু মুখমণ্ডলে

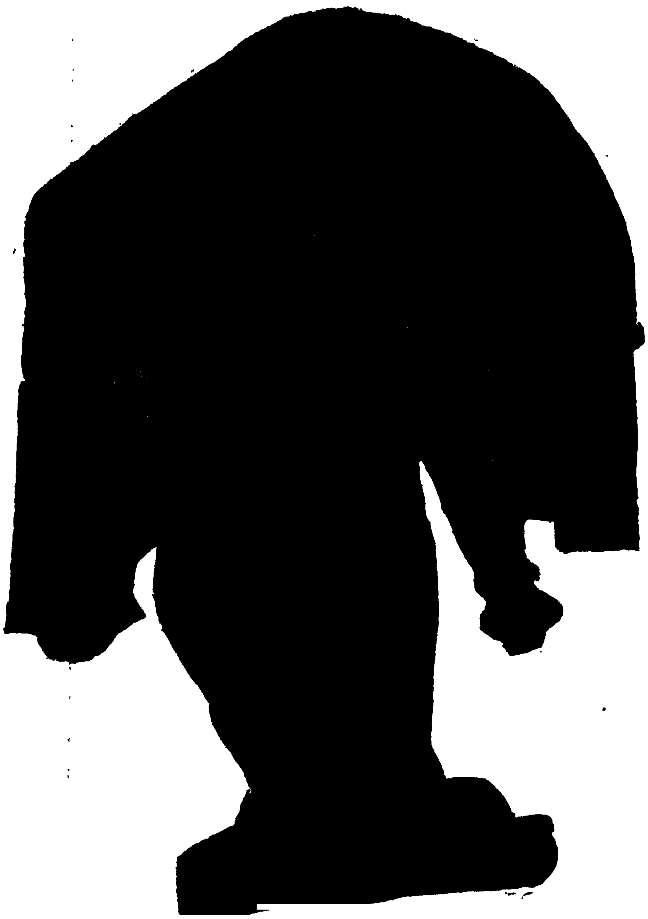


মহিষমর্দ্দিনী—খিচিং

ফুটিয়া উঠিয়াছে গভীর ধ্যানমগ্ন উপাসকের ভাব। একসঙ্গে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, "যত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন।"

মধ্যযুগের হিন্দু শিল্পীরা নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতে এই ধ্যানের বা যোগের ভাব প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। অনেক মূর্ত্তিতে ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহারা এই ভাব ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রাচীন নৃপতিগণ সম্ভবতঃ দশম একাদশ শতাব্দে খিচিংএর ঠাকুরাণীর বর্ত্তমান মন্দিরের সন্নিহিত ভগ্নস্তূপে পরিণত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভগ্নস্তূপে কুড়াইয়া বা খনন করিয়া তিনি যে সকল মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অধিকাংশই বর্ত্তমান সময়ে খিচিংএর যাদুঘরে সুরক্ষিত হইয়াছে।

এইবার আমরা কয়েকটী মূর্ত্তির পরিচয় দিব। মন্দিরের



গণেশ—খিচিং



নারী মূর্ত্তি—খিচিং

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী খিচিং ও তাম্রশাসনোক্ত খিঞ্জিলকোট্টের ভগ্নাবশেষ খননের ভার চন্দ মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান অধিপতির পূর্ব্বপুরুষ বশিষ্ঠগোত্রীয় ভঞ্জবংশীয় ভিতর প্রবেশ করিলেই সকলের আগে বিরাট শিবমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি পড়ে।

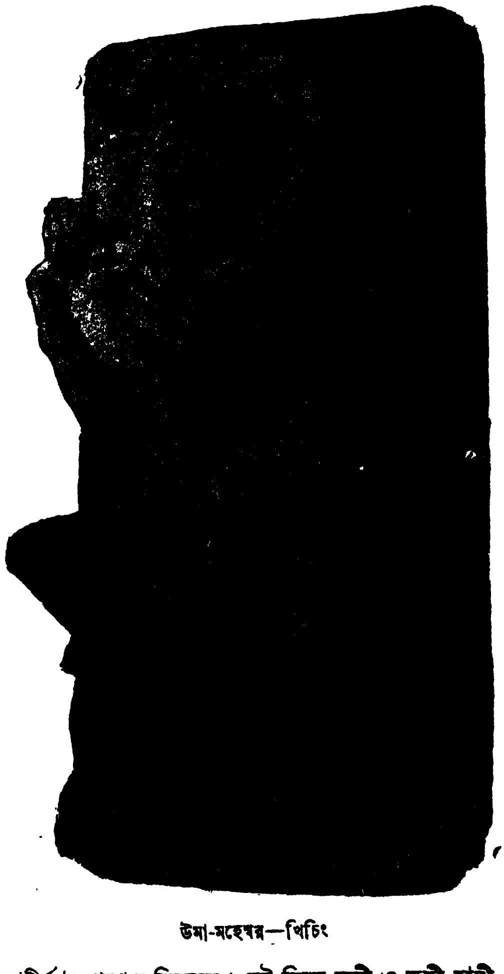
এই মূর্ত্তিটি উচ্চতায় সাত ফিট তিন ইঞ্চি। চিত্র হইতে পাঠকবর্গ তাহার কতকটা আভাস পাইবেন। আমি

এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ শঙ্করগড়ে কয়েকটী বিরাটাকার মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। এইখানকার যাদুঘরের এই বিরাট শিবমূর্ত্তি দেখিয়া সেই শিবমূর্ত্তির কথাই মনে পড়িল। শিব মূর্ত্তিটীর এখন অনেকটা অংশ জোড়াতাড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। শিবের মস্তিষ্ক এবং তাহার ভাঙ্গা হাত পা ইত্যাদি ভগ্ন অবস্থায় ভগ্নস্তূপের এদিকে ওদিকে পাওয়া যায়। পাদপীঠ এবং গঙ্গাযমুনার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দুইটী খণ্ডীয়-



নটরাজ গণেশ—খিচিং

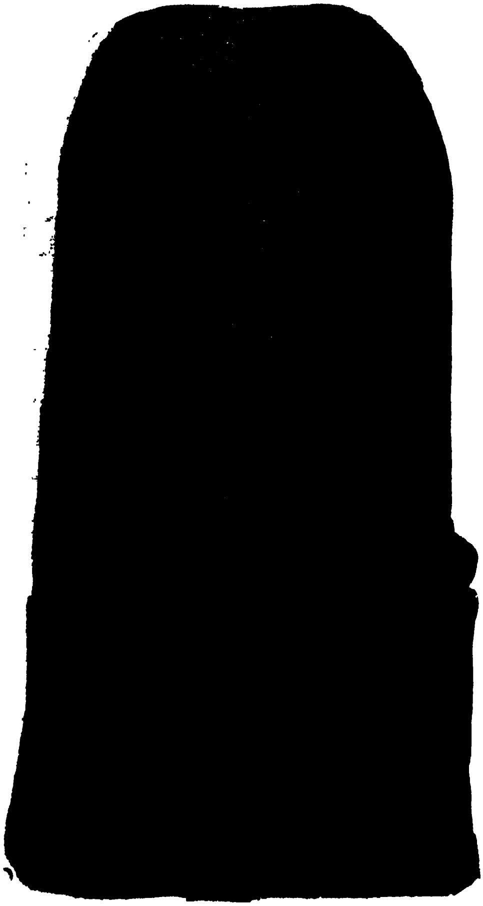
দেউলের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তির মুখের দিকে অপলকে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। ধ্যানমগ্ন শশাঙ্কশেখর ধ্যানে মগ্ন থাকিলেও প্রসন্ন নয়নে তিনি ভক্তের দিকে নতনেত্রে চাহিয়া আছেন। এইরূপ সৌম্যশান্ত দৃষ্টি, মুখের হাসির ভাব ও প্রসন্নতা ফুটাইয়া তোলা কত বড় শিল্পীর সাধনার ফল তাহা পাঠকবর্গ অনুভব করিতে পারেন। মূর্ত্তির দুইদিকে গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি দুইটীর প্রত্যেকটী আবার সুগঠিত। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র এইরূপ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে যে মনে হয় যেন তাহাদের উত্তরীয় বস্ত্র বাতাসে উড়িতেছে। মহাদেবের পদতলে তাঁহার বাহন বৃষমূর্ত্তি—বৃষ ঊর্দ্ধদিকে গ্রীবাভঙ্গী করিয়া যেন শশাঙ্কশেখরের শুভ



উমা-মহেশ্বর—খিচিং

আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেছে। দুই দিকে নন্দী ও ভৃঙ্গী দ্বারী। দুইটী হাত ভগ্ন; নন্দীর দক্ষিণ ঊর্দ্ধের হস্তে জপমালা, অপর হস্তটী ভগ্ন; বামদিকের হস্তে নরকপাল-নির্ম্মিত পাত্র। অন্য মূর্ত্তিটী ও ঐরূপ। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তি দুইটী মন্দিরের বাহিরে ছিল; পরেএখানে আনিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" বিক্রমপুরের প্রত্নসম্পদ নামক প্রবন্ধে নটরাজ শিবের কথা বলিয়াছি; এখানেও একটী নটরাজ শিবের মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তিটী ভগ্ন, তবে বর্ত্তমান সময়ে কোনরূপে উপরের অংশটা জোড়া দিয়া রাখা হইয়াছে; প্রতিমার দেহের অধিকাংশ ভাগই এখন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তথাপি নটরাজ শিবের মুখমণ্ডলে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধজাত যোগানন্দ সমাধির



বুদ্ধ মূর্ত্তি—খিচিং

ভাব পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমনীয় দেহখানি ধীর গম্ভীরভাবে নৃত্যের ছন্দে ছন্দে দোদুল দোলায় বিশ্বলীলার অভিনয় করিতেছে। খিচিংএর মূর্ত্তিতে গতির ও স্থিতির, জ্ঞানের ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য রহিয়াছে, মহাদেব কখন নৃত্য করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাসটুকু আমরা সংক্ষেপে বলিলাম। কূর্ম্ম পুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বর গীতায় কথিত হইয়াছে,—"এক সময়ে সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, কপিল, কনাদাদি মুনিগণ—নরনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞান যোগ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তখন নরঋষি অন্তর্হিত হইলেন এবং নারায়ণ তাপসবেশ পরিত্যাগ করিয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিলেন। এমন সময় শশাঙ্কশেখর শিব আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের অনুরোধ অনুসারে ঋষিগণের নিকট জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উপসংহারে শিব বলিলেন—

"সোঽহং প্রেরয়িতা দেবঃ পরমানন্দ সংশ্রিতঃ।
নৃত্যামি যোগী সততং যস্তদ্বেদ স যোগবিৎ ॥"

অর্থাৎ—"(জগৎ) প্রেরয়িতা (পরিচালক) পরমানন্দময়, যোগী (যোগাভ্যাসরত) সেই আমি সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকি; যে তাহা জানে সে যোগবিৎ"।

তারপর—

"এতাবদুক্ত্বা ভগবান যোগীনাং পরমেশ্বরঃ।
ননর্ত্ত পরমং ভারমৈশ্বরং সম্প্রদর্শয়ন্ ॥"

"এই বলিয়া যোগিগণের পরমেশ্বর ভগবান (শিব) পরম ঐশ্বরভাব দেখাইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।"

খিচিংএর অন্যান্য মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে আমার মন বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিল এখানকার নাগ ও নাগিনী মূর্ত্তি দেখিয়া। এই মূর্ত্তিগুলি খিচিংএর লুপ্ত বড় মন্দিরের বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপ মূর্ত্তি আমার চক্ষে অতি চমৎকার লাগিয়াছিল। বিস্ফারিতনেত্রে কি যেন তাহারা দেখিতেছে। তাহাদের দুইটী হাতই ভগ্ন; মাথার উপরে সাতটী সাপ ফণা মেলিয়া ছত্রাকারে বিদ্যমান।

মাথার মুকুট কারুকার্য্যসম্পন্ন। একটী মূর্ত্তির মুকুট ত্রিকোণাকৃতি মঠের আকারে নির্ম্মিত। কর্ণে কর্ণভূষা কণ্ঠে তিনটী মালা পরস্পর সংলগ্ন। অপর একটী মালা কণ্ঠ হইতে কটীদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। অপর নাগ মূর্ত্তিটীর মাথায় ও পূর্ব্ব মূর্ত্তিটির ন্যায় সাতটি ফণা; কিন্তু এই মূর্ত্তিটির ছত্রাকার ফণাগুলি যেরূপ বিস্তৃত অপরটির তদনুরূপ নহে। এই পার্থক্যটুকু সহজেই চক্ষে পড়ে। দ্বিতীয় নাগ মূর্ত্তিটীর বেশভূষা প্রথম মূর্ত্তিটির অনুরূপ। এই নাগ মূর্ত্তিটী একটী মালা হাতে করিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে সে যেন

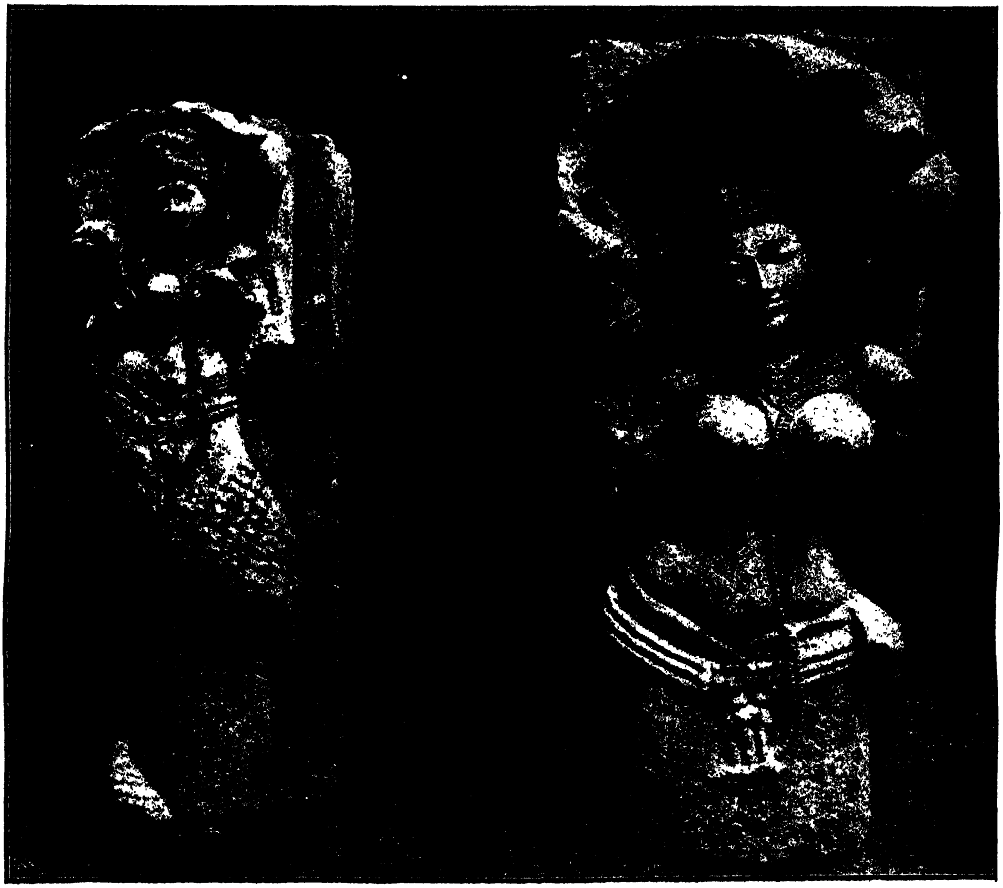
কাহাকেও মালা পরাইয়া দিবার জন্ম উদ্যোগী হইয়াছে। অপর নাগিনী মূর্ত্তি দুইটীও ঐরূপ সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন।

এই নাগ মূর্ত্তির সম্বন্ধে ১৯২৩-২৪ সালে পুরাতত্ত্ব-বিভাগের বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে।

The workmanship of these figures is of very high order and their expression is naturalistic. (Pages 85—87)

দেখিয়া শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিনা।

ঠাকুরাণীর মন্দিরের বাহিরে একটী ক্ষুদ্র মৃত্তিকার স্তূপ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় কামাখ্যাপ্রসাদ বসু মহাশয় খনন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানটী ইটামণ্ডিয়া নামে পরিচিত। ঐ স্থান খননের পর একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ছোট মন্দির বাহির হইয়া পড়ে। ঐ মন্দিরের মধ্যে তিনটী ছোট ঘর[



নাগিনী—খিচিং

এইখানে নটরাজ গণেশ, উমা-মহেশ্বর, বুদ্ধ, মহিষমর্দ্দিনী কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ভৈরব ইত্যাদি আরও অনেক মূর্ত্তি দেখিলাম।

সে সকলের মধ্যে নটরাজ গণেশের মূর্ত্তিটী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আমরা গণেশের আনন্দপূর্ণ নৃত্য-ভঙ্গিমা

এবং একটী বারান্দা ছিল। মধ্যের কক্ষটীতে একটী বৌদ্ধ-মূর্ত্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রা অনুযায়ী পাওয়া যায়। ঐ মূর্ত্তিটীর মাথার উপরে বোধিবৃক্ষের পল্লব ও পত্র ছত্রাকারে শোভিত। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন—এই মন্দিরটী পূর্ব্বে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখানকার আশেপাশে যে

সকল প্রত্নচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অনেক বৌদ্ধ-মূর্ত্তির অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়াছে। অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এখানে একটা কথা বলা যাইতে পারে। অনুমিত হয় ভঞ্জরাজবংশের আদি নৃপতিগণের রাজধানী যখন খিজ্জিঙ্গ-



মাল্য হস্তে নাগ—খিচিং

কোট্টে ছিল এবং যখন খিজ্জিঙ্গকোট্ট একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, সেই সময়ে হয়ত বা হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ পরস্পরে মিলিতভাবে বাস করিতেন। কোনরূপ ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলনা। কোথাও দেখিলাম—মা শিশুকে কোলে করিয়া একটী গাছের শাখার কাছে ধরিয়া আছে। শিশু পুষ্পিত শাখা হইতে পুষ্প চয়ন করিতেছে। অপর মূর্ত্তিটীর চিত্র পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না। সেই মূর্ত্তিটীতে দেখিতে পাইলাম স্নেহময়ী জননী পরম স্নেহভরে সন্তানকে ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ পান করাইতেছেন। আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল এই মূর্ত্তিটীর একটী চিত্র বেশ বড় করিয়া তুলিয়া রাখি। কিন্তু সে সুযোগ



মাতা ও শিশু—খিচিং

আমার হয় নাই। ভবিষ্যতে তাহা পারিব বলিয়া মনে করি।

খিচিং-এর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু আমার মনে হয় এখানকার পুরাতত্ব সম্পর্কিত

আবিষ্কার এখনও শেষ হয় নাই। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন। মহারাজা প্রতাপচন্দ্র এবং তাঁহার সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় এ বিষয়ে যেরূপ মনোযোগ ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতে ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত এই পূর্ব্ব সমৃদ্ধি শুধু



নাগ—খিচিং

ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীর শিল্পানুরাগী এবং ইতিহাসানুরাগী পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

আমরা যখন খিচিং দেখিতে গিয়াছিলাম সে সময়ে বিহার উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি মিঃ ফকাস্ সপরিবারে তাঁহার এক আত্মীয়া তরুণীকে লইয়া খিচিং দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমরা ইঁহাদের সহিত একসঙ্গে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া মূর্ত্তি ইত্যাদি দেখিলাম। ভারতীয় শিল্পের প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ এবং প্রত্যেকটি বিষয় জানিবার মত অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল।

খিচিংয়ের কিউরেটার বা যাদুঘরের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রপ্রসাদ বসু মহাশয়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি



নারী মূর্ত্তি—খিচিং

এইরূপ জনবিরল গভীর অরণ্যের পার্শ্বে এক নিভৃত স্থানে—যেখানে কোল, ভীল ও সাঁওতাল ছাড়া আর কেহই বাস করেনা—তথায় সুন্দরের ধ্যানে থাকিয়া যে সুন্দর মন্দির গড়িতেছেন, যে সুন্দর উদ্যান রচনা করিতেছেন তাহার জন্য শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়।

একদিন এই খিচিংকে কেন্দ্র করিয়া যাহারা মূর্ত্তি ও মন্দির গড়িয়াছিল, তাহাদের শিল্পাদর্শ ছিল অভিনব। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লইয়া ধ্যানবিভোরভাবে এক নূতন আদর্শে প্রতিমা গড়িয়াছিলেন; তাহাদের শিল্পাদর্শ উড়িষ্যার ও উত্তর ভারতের আদর্শ হইতে ভিন্ন। এখানকার মূর্ত্তিসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা



নারী মূর্ত্তি—খিচিং

যায় এখানকার শিল্পীরা গুপ্তযুগের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল। খিচিংএর মূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য করুন, দেখিবেন শ্রীমূর্ত্তির নাক, ভ্রূ এবং মুখমণ্ডলের গঠন সম্পূর্ণ অভিনব। এইজন্যই আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে খিচিংএর একটি স্বতন্ত্র রূপাদর্শ স্থানীয় শিল্পীগণের শিল্পনৈপুণ্য এবং ধ্যানধারণার মধ্য দিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে—এমন করিয়া যাহারা মূর্ত্তি গড়িয়াছিল সেই সকল শিল্পীরা আজ কোথায়? আজ তাহাদের কোন বংশ-পরিচয় কিংবা তাহাদের বংশ-পরম্পরাগত শিল্পানুরাগের কোন স্মৃতিই আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

আমরা এখানে সংক্ষেপে আজ দুই চারিটি মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

ঠাকুরাণী মন্দিরের বাহিরে অর্দ্ধনারীশ্বরের একটি মন্দির ছিল। এখন তাহার ভিত্তি মাত্র পড়িয়া আছে। সেই ভগ্ন মন্দিরের স্তূপ হইতে একটি ভগ্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি খিচিংএর যাদুঘরে আছে। আমি প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুর পুরাপাড়া গ্রাম হইতে একটি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! বাঙ্গালা দেশের কোথাও আজ পর্য্যন্ত আর একটিও অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সংগৃহীত হয় নাই। মূর্ত্তিটি এখন বারেন্দ্রঅনুসন্ধানসমিতিতে আছে। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সম্বন্ধে শীঘ্রই একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিব। সেই মূর্ত্তির সহিত খিচিংএর মূর্ত্তির তুলনাই হইতে পারে না। খিচিংএর মূর্ত্তি বাঙ্গালার অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির কাছে হীনপ্রভ।

খিচিংএর কয়েকটি মূর্ত্তির প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে হইতেছে মাতৃমূর্ত্তি। মায়ের স্নেহময়ী মূর্ত্তিগুলি অপূর্ব্ব, হয়ত একদিন সুযোগ মিলিলে সে বিষয়ে আলোচনা করিব। একস্থানে দেখিলাম—গুরু শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করিতেছেন।

যে দুইদিন খিচিং ছিলাম—সে দুইদিন বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল।

এক সন্ধ্যায় আসিয়াছিলাম, আবার এক সন্ধ্যায় ফিরিয়া চলিলাম। রাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র নীল পর্ব্বতশ্রেণীর এবং গভীর শালবনশ্রেণীর গায়ে গায়ে রূপালি আলো ছড়াইয়া দিয়া নীল আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রাচীন কীর্ত্তি-গৌরবের স্মৃতি বুকে করিয়া খিচিং ছাড়িলাম।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বাগচী

সাধুর আস্তানা

Bharatvarsha Printing Works

সাহিত্যিকের মৃত্যু

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সুকুমারের সাহিত্যিক জীবনের গোড়ার ইতিহাসটা আমাদের জানা নাই। কোন্ শৈশব হইতে সে হোমটাস্কের খাতার মধ্যে গোপনে কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছিল—কিম্বা কবে সেকেণ্ডক্লাসে পড়িবার সময় এক মাসিকপত্রের অফিসের ঠিকানায় একটী গল্প লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, ষ্ট্যাম্প থাকা সত্ত্বেও যাহা প্রেরকের ঠিকানার অভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই—এ সমস্ত তথ্যে আজ আমাদের প্রয়োজনও কিছু নাই। তাহার সেই জীবনের পরিসমাপ্তিই আমাদের আজিকার আলোচ্য।

কাজটা সে করিয়া ফেলিয়াছিল অতিরিক্ত অভাবে পড়িয়াই—মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায়। মা যখন দেশ হইতে চিঠি দিলেন, 'বৌমার কঠিন টাইফয়েড—টাকা না হইলে বাঁচানো শক্ত'—ঠিক সেই সময়টায় তাহার হাতে একটী কানাকড়িও ছিল না। সে মেসে থাকিয়া টুইশান করিয়া কোনও রকমে নিজের খরচ চালাইত এবং কদাচ কখনও দেশে দুই এক টাকা পাঠাইতে পারিত। তাহার গল্প তখন দুই একটী করিয়া বিভিন্ন সাপ্তাহিক এবং মাসিকে সবে প্রকাশিত হইতে সুরু হইয়াছে; কিন্তু তখনও গল্প লিখিয়া টাকা পাইবার মত খ্যাতি হইতে অনেক দেরী। বাংলাদেশে যে সহজে গল্প লিখিয়া টাকা পাওয়া যায় না তাহা সুকুমার জানে, তাহাতে সে দুঃখিতও নয়। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস যে একদিন তাহার লেখা সকলে আদর করিবেই এবং তখন টাকার অভাবও তাহার থাকিবে না।

কিন্তু এখন কি উপায়?

তাহার স্ত্রী ঠিক মানসী নয়; তাহাকে উপলক্ষ করিয়া কোনও সাহিত্যিকই সহস্র কল্পনার ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারিবে না, কিন্তু তবুও সে তাহার বিবাহিতা পত্নী। স্বপ্ন না থাক্—তাহার দায়িত্ব আছে। এই নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে বধূটীরই একমাত্র অলঙ্কার বিক্রীর টাকায় তাহার কলিকাতার প্রথম চারমাস কাটাইতে হইয়াছে—একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং টাকা কিছু চাই-ই, যেমন করিয়া হউক!

কিন্তু টাকা যে কোথাও হইতে ধার পাইবার উপায় নাই, একথাও সত্য। মেসে ত নয়ই—মেসে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না; দুই একজন বন্ধু যাহা তাহার আছে, তাহাদের কাছেও বহুপূর্ব্বেই কিছু কিছু ধার সে করিয়া রাখিয়াছে; এখন চাহিতে গেলে কিছু মিথ্যাভাষণ কিম্বা অপ্রিয় সত্য শুনিতে হইবে।...তাহার কাছেও কিছু নাই; ঘড়ি, কলম এমন কোনও জিনিস নাই, যাহার বিনিময়ে কোথাও কিছু টাকা পাওয়া যায়!

বহুক্ষণ ভাবিয়া অবশেষে সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটী লইয়াই পথে বাহির হইয়া পড়িল। এই উপন্যাসটী সে দেশ হইতেই লিখিয়া আনিয়াছিল, তাহার পর এখানে আসিয়া সে অলস দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ অবসরে আবার বইখানির আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়াছে; তাহার বিশ্বাস বইখানি সত্যই ভাল। প্রকাশকদের কাছে গছাইবার চেষ্টাও সে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার করিয়াছে; কিন্তু কোনও প্রকাশকই বইটী পড়িয়া দেখিতে পর্য্যন্ত রাজী হন নাই; ভদ্র যাঁহারা, তাঁহারা সময়াভাবের নজীর দিয়াছেন; অভদ্ররা বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং নিতান্ত শুভানুধ্যায়ী যাঁহারা, তাঁহারা নামকরা মাসিকে আগে প্রকাশ করিবার সৎপরামর্শ দিয়াছেন। সে অবস্থার আজও পরিবর্ত্তন হয় নাই, আজও কোনও ফল হইবে না—তাহা সুকুমার জানিত, তবুও সে বাহির না হইয়া থাকিতে পারিল না।

সেদিনও পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই প্রায় সব জায়গায় ঘটিল; কেহ হাসিলেন, কেহ বা উপদেশ দিলেন; অবশেষে সন্ধ্যা যখন রাত্রির দিক ঘেঁষিয়া গেল, তখন এক প্রকাশক প্রসন্ন হইলেন। কহিলেন, দেখুন মশাই, সত্যি কথাই বলছি; নতুন লেখকের বই টাকা খরচ ক'রে ছাপবার সাহস আমার নেই।...ওসব বিলিতি ব্যাপার এদেশে চলতে এখনও ঢের দেরী আছে। তবে যদি টাকার আপনার খুব বিশেষ দরকার হ'য়ে থাকে, তাহ'লে একটা সাহায্য আমি আপনাকে ক'রতে পারি। আপনার অথরশিপ বিক্রী করবেন?

বিস্মিত হইয়া সুকুমার কহিল, তার মানে?

তিনি একটু হাসিয়া জবাব দিলেন, মানেটা আর বুঝতে পারলেন না? এক ভদ্রলোক আপনাকে কিছু টাকা দিয়ে দেবেন, তারপর তিনি নিজের নামে এই বই ছেপে বাজারে চালাবেন। লোকে জানবে তিনিই লেখক। দেখুন, রাজী আছেন?

প্রথম কিছুক্ষণ সুকুমার স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর সে মনে মনে রাগিয়া উঠিল—এ কি অন্যায় কথা? তাহার এত যত্নের, এত পরিশ্রমের ধন, এতদিনের চিন্তা ও রাত্রিজাগরণের ফল, একটা লোক সামান্য ক'টা টাকার বিনিময়ে ভোগ করিবে?...তাহার চেয়ে রাস্তায় বসিয়া ভিক্ষা করা ভাল।...কিন্তু প্রথম আবেগটা কমিয়া আসিতেই তাহার মায়ের চিঠির কথা মনে পড়িল; কঠিন ব্যাধি, এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। একটা লোকের জীবনের কাছে তাহার এ আত্মাভিমানের মূল্য কতটুকু?

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমি রাজী আছি। কিন্তু টাকাটা কি এখনই পাওয়া যাবে?

তিনি কহিলেন, তা হয়ত যেতে পারে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি. আপনি এখনই চলে যান্‌--

ঠিকানাটা লইয়া সে তখনই বাহির হইয়া পড়িল। ভবানীপুরের এক বড় উকীল, তাহার নামটা সুকুমারেরও পরিচিত। সুকুমার তাহার পকেটের শেষ ছয়টী পয়সা কণ্ডাক্টারের হাতে গণিয়া দিয়া একখানা ভবানীপুরের টিকিট লইল। টাকা যদি না পাওয়া যায় তাহা হইলে ফিরিবার সময়ে এই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়াই ফিরিতে হইবে।...

সুকুমারের সৌভাগ্যক্রমে উকীলবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি মক্কেলদের ফেলিয়াই উঠিয়া পড়িলেন; সুকুমারকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন, আমাদের ভূপালবাবু কি কপিটা পড়েছেন?

মুহূর্ত্তখানেক ইতস্ততঃ করিয়া মিথ্যা কথাটাই সে বলিয়া ফেলিল, পড়েছেন বৈকি! না হ'লে আর চিঠি দেবেন কেন?

তিনি নীরবে পাতা ছুই পাণ্ডুলিপিটা পড়িয়া কহিলেন—তা আপনি কত চান?

সুকুমার এবার কিছু বিব্রত বোধ করিল। কহিল, এ সব ব্যাপারের যে কি মূল্য ধার্য্য হয় তা-ত আমার জানা নেই; তবে একশ'টা টাকার আমার বিশেষ প্রয়োজন—এইটুকু বলতে পারি।

উকীলবাবু চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, বলেন কি? আমি এর আগে একজন নামকরা লেখকের বই মাত্র পঞ্চাশ টাকায় পেয়েছি। এ বই যে কি হবে, তাও বুঝতেই পারছি না—

অকস্মাৎ যেন প্রচণ্ড একটা রক্তস্রোত সুকুমারের মাথায় প্রবেশ করিল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মদমন করিতে গিয়া তাহার কণ্ঠস্বর করুণ হইয়া উঠিল; সে কহিল, দেখুন নিতান্ত দায়ে পড়েই এ কাজ আমাকে ক'রতে হচ্ছে; নইলে এ যা জিনিস হাজার টাকা দিলেও এর পুরো দাম দেওয়া হয় না—

উকীলবাবু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিলেন, দেখুন দর কষাকষি করার আমার সময় নেই; ষাট টাকা পর্য্যন্ত আমি দিতে পারি। যদি হয় ত টাকা নিয়ে রসিদ লিখে দিয়ে যান, নইলে আমায় ছেড়ে দিন!

ইহার পর আর একটীমাত্র পথই সুকুমারের খোলা রহিল। ষাট টাকা গণিয়া লইয়া উকীলবাবুর কথামত একটা দীর্ঘ এবং জটিল রসিদ লিখিয়া দিয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সারা পথ সে নিজেই মনকে প্রবোধ দিতে দিতে আসিল যে তাহার মত নবীন লেখককে কেহ পাঁচটী টাকাই দিতে চায় না, সে ক্ষেত্রে ষাট টাকা ত কুবেরের ঐশ্বর্য্য। তাহার ক্ষোভের কিছুমাত্র কারণ নাই।

পরের দিন ভোরের ট্রেণে সে দেশে চলিয়া গেল।

* * * *

ইহার পর দুইটা মাস তাহার যে কোথা দিয়া এবং কেমন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ঔষধ, ইন্‌জেক্‌শান, ছানার জল এবং বার্লির মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল, তাহা সে টেরই পাইল না। যমের সঙ্গে এই অমানুষিক যুদ্ধ করিয়া যখন স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিল তখন তাহার ষাট টাকা ত নাই-ই, ঘরের ঘটি বাটী বলিতে যাহা কিছু ছিল সবই অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবার আগেই টাকা পিছু মাসিক এক আনা সুদে গয়লা-বৌ-এর কাছ হইতে পাঁচ টাকা ধার করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া স্নানাহার করিবার পূর্ব্বেই সে যেখানে ছেলে পড়াইত তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে গেল। তাঁহাদের নিজের অবস্থা জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা অন্য মাষ্টার রাখেন নাই; গিয়া শুনিল যে তাহার চাক্‌রীটী আছে, ইচ্ছা করিলে সেইদিন হইতেই সে পড়াইতে পারে।

যাক্‌—! উদরের দুর্ভাবনা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া সে মন্থরগতিতে মেসের দিকে ফিরিতে লাগিল। বহুদিন পরে কলিকাতায় আসিয়াছে, শহরের কোলাহল এবং জনস্রোত বড় ভাল লাগিতেছে; সে একটুখানি এই আব্‌হাওয়াটা অনুভব করিতে চায়! ঘুরিতে ঘুরিতে কলেজ-স্কোয়ারের মোড়ে আসিয়া কাগজের ষ্টলে দাঁড়াইয়া কাগজগুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। অকস্মাৎ একটী মাসিকের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা চোখে পড়িয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার সেই বইটা ইতিমধ্যেই ছাপা হইয়াছে! ঐ ত অর্দ্ধপৃষ্ঠাব্যাপী বিজ্ঞাপন তাহারই সেই বই-এর—"বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'রজতরশ্মি'—জনপ্রিয় ব্যবহারজীব শ্রীপতি চৌধুরীর বিস্ময়কর সৃষ্টি!"

বিজ্ঞাপনটীর দিকে চাহিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শির্‌শির্‌ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা রাখিয়া দিয়া একটা বড় বইএর দোকানে ঢুকিয়া পড়িল, হাঁ মশাই—রজত রশ্মি আছে?

একটী লোক জবাব দিল, হাঁ, বোধ হয় পাঁচ কপি কাল জমা দিয়ে গেছে—দাও ত হে একখানা বার ক'রে।

সুকুমার বইটা প্রায় তাহার হাত হইতে কাড়িয়াই লইল। বাঃ—চমৎকার ছাপা, মোটা এ্যান্টিক কাগজে, সুদৃশ্য বাঁধাই, আগাগোড়া ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে! দেখিলে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। পড়িয়া দেখিল—এক লাইনও বদলানো হয় নাই, বেশ নির্ভুল ছাপা; যেমন করিয়া সে সাজাইতে চাহিয়াছিল, তেম্‌নি করিয়াই সাজানো হইয়াছে—

একমনে সে পড়িয়া যাইতেছিল। সহসা দোকানের একটী ছোকরার ঈষৎ রূঢ় কণ্ঠে তাহার চমক্‌ ভাঙ্গিল—বইটা কি আপনার চাই?

বইটা? দামটা দেখিল দেড় টাকা, একটু ইতস্ততঃ করিয়া দেড়টী টাকাই সে বাহির করিয়া দিল। তাহার পর বইখানা সযত্নে একটা প্যাকিং কাগজে মুড়িয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া স্নানাহার শেষ করিয়াই আবার গোড়া হইতে পড়িতে সুরু করিল।

বইটী যখন শেষ হইল, তখন সে একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। এ বই

নিশ্চয়ই লোকের ভাল লাগিবে, না লাগিয়া পারে না। এতদিনে সাহিত্য সম্বন্ধে অন্ততঃ এতটুকু বোধ তাহার নিশ্চয়ই হইয়া ছ—

কিন্তু এ ভাল লাগার ধাক্কা যে একদা কি প্রচণ্ড ভাবে তাহারই বুকে গিয়া লাগিবে তাহা সে তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। কিছু বুঝিতে পারিল তখনই, যখন রবিবারের এক সর্ব্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে রজতরশ্মির এক কলম ব্যাপী সমালোচনা চোখে পড়িল। সমালোচক বইটীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, সমস্ত চরিত্রগুলির উল্লেখ করিয়াছেন, লেখকের দূরদৃষ্টি, চিন্তাধারার নবীনতা ইত্যাদির স্তুতিগান করিয়া লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই—এই রজতরশ্মি ! গত দশ বৎসরের মধ্যে এমন একখানা বই বাংলা ভাষায় বাহির হয় নাই।

অকস্মাৎ যেন সুকুমারের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। মনে হইল সমস্ত হৃদপিণ্ডে কে নির্ম্মমভাবে মোচড় দিতেছে। অথচ এতবড় সংবাদটা সে কাহাকেও না শোনাইয়া পারিল না ; তাহার প্রতিভা লোক মানিয়া লইয়াছে, না থাক তাহার নাম, তবু তাহারই চিন্তাশীলতা, তাহারই সাহিত্যদৃষ্টির স্তুতি এই সমালোচকের প্রতিটী কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, একথা কাহারও সহিত আলোচনা না করিয়া কি থাকা যায়? সে ভূপতিবাবুকে ডাকিয়া কহিল, দেখেছেন ভূপতিবাবু, একখানা খুব ভাল নতুন বই বেরিয়েছে—

ভূপতিবাবু জবাব দিলেন—ঐ রজতরশ্মির কথা বলছেন ত? ইংরিজী গোঁসাইবাজার কাগজখানাও খুব লিখেছে ; এই যে, দেখুন না !

সাগ্রহে কাগজখানা টানিয়া লইয়া সুকুমার দেখিল কথাটা সত্য, এ কাগজেও কম লেখে নাই। তাহারই সুগভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি, বহুদূর-প্রসারী চিন্তাশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, সেই প্রশংসার চন্দনতিলক সমালোচক ব্যক্তিগত ভাবে বিখ্যাত আইনজীবী শ্রীপতি চৌধুরীর ললাটে পরাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিভার এতবড় একটা দিক এতদিন আত্মগোপন করিয়াছিল বলিয়া অনুতাপ করিয়াছেন।

হয়ত সবটা সত্য নয়, হয়ত ইহার মধ্যে অনেকখানি বন্ধুপ্রীতি লুকানো আছে—কিম্বা শ্রীপতি চৌধুরীর অর্থের জোর ; কিন্তু কথাগুলি ত মিথ্যা নয় ; বহুকালের সাধনা এবং পরিশ্রমের ফলে সুকুমারের কলম হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, এ প্রশংসা তাহার প্রাপ্য !

সুকুমার কাগজটা ঠেলিয়া দিয়া শুষ্কমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভূপতিবাবু কহিলেন, আর একটু বসুন না সুকুমারবাবু—

সুকুমার জবাব দিল, মাথাটা বড় ধরেছে, শরীরটাও ভাল নেই—। যাই এখন।

স্নানাহারের পর আবার সে বইটা বাহির করিয়া আগাগোড়া একবার পড়িল। নাঃ—প্রশংসার একটী কথাও অতিরঞ্জিত নয়, তাহার বুকের রক্ত দিয়া লেখা এ বই-এর আরও অনেক, ঢের বেশী প্রশংসা পাওয়া উচিত।...

আরও বেশী প্রশংসা শীঘ্রই আসিল, আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ভাবে !

হপ্তা দুই পরে কয়েকখানা বাংলা মাসিকপত্রে রজতরশ্মির দীর্ঘ সমালোচনা অর্থাৎ স্তুতি বাহির হইল এবং তাহারই কয়েকদিন পরে সুরু হইল কলিকাতার পথে মাঠে ঘাটে—সর্ব্বত্র প্রশংসার কলগুঞ্জন। এমন বই আর হয় নাই ! আশ্চর্য্য, অপূর্ব্ব বই !!

বড় বড় সাহিত্যরথীগণ ইতিমধ্যে বইটীর উপর দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন ; বোলপুর হইতে সুদীর্ঘ পত্র আসিল—আরও বহু চিঠি আসিবে এরূপ আভাষ পাওয়া গেল। হাওড়ায় ইহারই মধ্যে একটা সভা করিয়া শ্রীপতি চৌধুরীকে অভিনন্দিত করা হইল।

সুকুমার ইহার মধ্যে আর একটা ট্যুইশান পাইয়াছিল ; অর্থাৎ টাকার অভাব কিছু কমিয়াছে, কিন্তু লেখাপড়া তাহার একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে সারারাত ছটফট্ করে, ঘুমাইতে পারে না, মনে হয় তাহার বুকের পাঁজরে কে হাতুড়ির ঘা দিতেছে ; দিনের বেলায় সে সর্ব্বদা লোকচক্ষুর আড়ালে পলাইয়া বেড়ায়, পাছে রজতরশ্মির প্রশংসা তাহাকে শুনিতে হয়। অবশেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া সে একদিন সারারাত জাগিয়া রজতরশ্মির এক দীর্ঘ সমালোচনা লিখিল, প্রাণ ভরিয়া লেখককে গালি দিল, প্রতিটী চরিত্রকে ব্যর্থ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিল, বার বার বোঝাইতে চেষ্টা করিল যে বইটী আর যাহাই হউক্ সাহিত্য হয় নাই। তাহার পর আলোচনাটী একটী বিখ্যাত কাগজের অফিসে ষ্ট্যাম্প খরচ করিয়া পাঠাইয়া দিল।

দিন তিনেক পরেই সেটী ফেরত আসিল। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, "সমালোচনা অকারণ বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে ফেরত পাঠাইলাম। আলোচ্য বইটী আমরা পড়িয়া দেখিয়াছি, আমাদের মনে হয় বইটী যথার্থই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।"

সেদিন রবিবার ; সকলে ভূপতিবাবুর ঘরে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই-খানেই চাকর আসিয়া সুকুমারকে চিঠিখানি দিয়া গেল। রাখালবাবু প্রশ্ন করিলেন, কিসের চিঠি এল মশাই ?

তখন অকারণ কি এক পুলকানুভূতিতে সুকুমারের সারা মন টলমল করিতেছে, সে হাসিয়াই জবাব দিল, ঐ আপনাদের রজতরশ্মিকে গালাগাল দিয়ে এক সমালোচনা লিখেছিলুম, সম্পাদক ফেরত দিয়েছেন। লিখেছেন যে—যে বই সত্যিই ভাল হয়েছে তাকে গালাগাল দিলে ছাপতে পারব না।

রাখালবাবু একটু উষ্ণভাবে কহিলেন, আপনারও ত সত্যিই অন্যায় সুকুমারবাবু ! জানেন যে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে এরকম একটা বই আর বেরোয় নি ! শুধু শুধু গায়ের জ্বালায় গালাগাল করেন কেন? পারেন ত ঐ রকম একটা লিখুন—

ভূপতিবাবু তাঁহাকে থামাইয়া কহিলেন, রাখালের আবার একটু বাড়াবাড়ি করা স্বভাব ; ওসব কিছু নয়, তবে হ্যাঁ—বইটা যে ভাল হয়েছে সত্যি, তাতে-ত আর সন্দেহ নেই। সুতরাং সত্যিকারের সাহিত্য যে সৃষ্টি করতে পারে তাকে গালাগাল দেবার চেষ্টা না ক'রে প্রশংসা করাই উচিত ! নইলে ওতে নিজেরই নীচতা প্রকাশ পায়।

বোমা ফাটার মত অকস্মাৎ সুকুমার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পাগলের মত চীৎকার করিয়া কহিল, কে বলেছে আপনাদের যে বই ভাল হয়েছে? সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে! ছাই হয়েছে!·· কি বোঝেন আপনারা সাহিত্যের? মাথামুণ্ডু, আবোল তাবোল কতকগুলো ব'কে গেলেই মনে করেন যে খুব ভাল সাহিত্য হয়েছে!·· যত সব ইডিয়টের দল—

তাহার পর বেগে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া নিজের বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। একজন কহিলেন, হ'ল কি লোকটার? হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন?

রাখালবাবু মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, হিংসে, আবার কেন! সাপ্তাহিকে দুটো গল্প ছেপে ভায়া আমার একেবারে সাহিত্যিক হ'য়ে উঠেছেন!·· আমরা সব ইডিয়ট আর উনি সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথ!

সেদিন সুকুমার উঠিলও না, খাইলও না। চাকরকে কহিল, শরীরটা ভাল নেই।

বিকালের দিকে এক সময় সকলের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়িয়া ছাত্রের বাড়ী উপস্থিত হইল। সামনে পরীক্ষা, রবিবারেও পড়ানো দরকার। কিন্তু সেখানে ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে যাঁহার সঙ্গে দেখা হইল তিনি ছাত্রের পিতা, হাতে একখানা রজতরশ্মি লইয়া মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন; শিক্ষককে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, আসুন মাষ্টার মশাই, আপনি ত শুনেছি গল্প-টল্প লেখেন—লিখুন দিখি এম্নি একটা বই! খাসা বই লিখেছে ভদ্রলোক—

বিবর্ণমুখে সুকুমার কহিল—দেখুন শরীরটা আমার বড় খারাপ, তাই বলতে এলুম, আজ আর পড়াব না।

তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তাই বটে, শরীরটা আপনার খুবই শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে, তা আপনি আবার কষ্ট ক'রে খবর দিতে এলেন কেন?

সেখান হইতে বাহির হইয়া নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে সে পথ হাঁটিতে লাগিল। আজ তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত অবলম্বন যেন খসিয়া পড়িয়াছে, সমস্ত আশা তাহার মৃত—

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর ভূপালবাবুর বইএর দোকান। তিনি রবিবারেও দোকানে বসিয়া কি একটা হিসাব দেখিতেছিলেন, সুকুমারকে রাস্তা দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া অকস্মাৎ চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিলেন।

—আসুন, আসুন, সুকুমারবাবু,—একটু পায়ের ধুলো পড়ুক!

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুকুমারকে ঢুকিতে হইল। একটু অপ্রস্তুত মুখে ভূপালবাবু কহিলেন, ইস্—বরাত দেখেছেন লোকটার? আর আমারও দুরদৃষ্ট, নইলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌ব কেন! যাই হোক্—দিন দেখি অম্‌নি একখান বই আমায় লিখে, একবার কোমর বেঁধে লাগি—

অত্যন্ত নিস্পৃহকণ্ঠে সুকুমার কহিল, বইটই লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি: বই আর লিখব না।

জোর করিয়া হাসিয়া ভূপালবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, তাই নাকি একটা কথা হয়। আরে একটা গেছে, আর একটায় আবার নাম হবে!...হ্যাঁ, ভাল কথা, শ্রীপতিবাবু আপনার জন্যে একখানা বই রেখে গেছেন, অনেক দিন!

একটী মুহূর্ত্ত—তখনও ভূপালবাবুর হাসি মিলায় নাই; সুকুমারকে বইটী দিতেই সে বইটা মুঠা করিয়া ধরিয়া সবেগে ছুঁড়িয়া দিয়া কোনও দিকে না চাহিয়া বাহির হইয়া আসিল রাস্তায়। সেখান হইতে একেবারে সোজা হাওড়া ষ্টেশন।

শেষ ট্রেণে বাড়ী পৌঁছিয়া যখন মাকে ঠেলিয়া তুলিল তখন রাত্রি বারটা বাজিয়াছে। তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, এ কি রে, এমন অসময়ে? কি ব্যাপার?

সুকুমার কহিল, কলকাতায় আমার শরীর একেবারে ভাল ঠেকছে না মা। সেখানে আর থাকব না; চৌধুরীবাবুরা তাঁদের স্কুলে মাষ্টারী করার কথা একবার তোমাকে বলেছিলেন না? কাল সকালে গিয়ে তুমি তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে সেই ব্যবস্থাই কর। আমি আর ফিরে যাব না—

—তুই কি একেবারে এলি?

—হ্যাঁ।

তিনি আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন—তা জিনিস পত্তর?

—সে থাক্‌গে। ওতে আমার দরকার নেই।··



ঘাত-প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

"কি হবে মা? সে যে আর আস্‌বে, তোকে নিয়ে যাবে—তার ত কোনও ভরসাই দেখি না।"

গভীর একটি নিশ্বাস বুক ভরিয়া উঠিল: মুখখানি লতা আর একদিকে ফিরাইয়া নিল। চক্ষু দুটি ভরিয়া অশ্রুর উচ্ছ্বাস দেখা দিল। মাতা মন্দাকিনীর কথায় কোনও উত্তর তার মুখে ফুটিল না।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে মন্দাকিনী আবার কহিলেন, "মাসে মাসে টাকাও আস্‌ছে—"

মুখখানি লতার কেমন লাল হইয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "টাকা আর রাখ্‌ব না মা। এবার এলেই ফেরত পাঠিয়ে দেব!"

"কি করে তখন চ'লবে? ষাট, ঐ সোনার বাছাটুকু কোলে এসেছে—"

"এসেছে, আমি ত আছি। যে ক'রে হয়—নিজে যদি খাই, ওকেও দুটি খাওয়াতে পারব।"

"নিজেই বা খাবি কি আবাগী? সম্বল যে কিছুই নাই। তোর মামার কি সাধ্যি আছে—তিনটি প্রাণীকে আমাদের পুষ্‌তে পারে?"

"পার্‌লেই বা তাঁর গলগ্রহ হ'য়ে কেন আমরা থাক্‌ব?"

"কি ক'রবি? হাঁ, আমি একটা বিধবা, কারও বাড়ীতে ভাত রেঁধেও একবেলা দুমুঠো—"

লতা উত্তর করিল, "আমিও ভাত রাঁধব। তারপর সেলাই ফোঁড়াই জানি, সুতো কাট্‌তে জানি, লেখাপড়াও যাহক কিছু শিখিছি, আরও শিখ্‌ছি—"

"তাতে আর কতই কুলোবে মা? পাড়াগাঁয়ে এসব কাজে পয়সাই বা কে দেবে, আর কাজ ক'রেই বা তোকে আজ খেতে হবে কেন? অমন রাজপুত্তুরের হাতে দিলাম—কপালের দুঃখু নইলে—"

মন্দাকিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন। একটু দম দিয়া লতা উত্তর করিল, "কেঁদো না মা, হাঁ, ঠিক ব'লেছ, কপালের দুঃখু! কিন্তু কেঁদে কোনও লাভ নেই। দুঃখু যদি কপালে ব'য়ে নিয়েই এসেছি—সইতেই হবে, স'য়ে ব'য়েই জীবনটা কাটাতে হবে।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে মন্দাকিনী কহিলেন, "কিন্তু কেন এত দুঃখু তোর কপালে হ'ল? কারও কোনও মন্দ আমরা করিনি, কার কোনও মন্দ মনে কখনও ভাবিনি। আর তোর মত অমন লক্ষ্মী মেয়ে—"

"লক্ষ্মী অলক্ষ্মী যেই যা হ'ক্ মা, দুঃখু যে যা কপালে নিয়ে এসেছে, ভুগ্‌তেই তাকে তা হবে। কেন হবে, কেন হয়, কেউ তার কিনেরা ক'রতে পেরেছে কি? বিন্দু সেদিন বিধবা হ'য়ে এল; রত্নদিদির অমন সোনার চাঁদ ছেলেটি তিনদিনের জ্বরে ম'রে গেল? কেন হ'ল? কেন গেল? তারাই বা কি ক'রছে? সইছে, জীবনভ'র সইতেই হবে। উপায় ত কিছু নেই।"

ইহার কোনও উত্তর না করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে মন্দাকিনী কহিলেন, "কেউ যদি একটু খোঁজ খবর ক'রে দিত, সে কোথায় আছে, কি ক'রছে—"

লতা কহিল, "কে দেবে? কি ক'রে দেবে? খোঁজ খবর আর পাওয়া যাবেনা। খোঁজ খবর সে দিতেই চায়না?"

"মাসে মাসে টাকা ত আস্‌ছে—"

"আস্‌ছে সে কোন আফিস্ থেকে—আফিসের কে এক বাবু পাঠায়—"

"সেই আফিসে ভাল ক'রে একবার—"

"তারা যে ব'ল্‌তেই চায়না কিছু, ব'ল্‌বেও না। কে এমন আমাদের আছে যে ক'ল্‌কেতায় সে প'ড়ে থেকে খোঁজ খবর এত নেবে? আর নিয়েই বা কি হবে? সে এড়াতে চায়। খোঁজ যদি মেলেও, জোর ক'রে ত আর তার ঘাড়ে গিয়ে চাপতে পারিনে মা। ছি!"

"তোর একটা দাবীও ত আছে। বিয়ে ক'রেছিল—"

"ওসব কথা এখন ভুলে যাও মা।" গলা ভার হইয়া আসিল। মুখখানি লতা আর একদিকে ফিরাইয়া নিল।

অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "কি ক'রে ভুলি মা? তুই-ই বা কি ক'রে ভুলবি? ষাট, ঐ গুঁড়োটুকু তোর কোলে হ'য়েছে—তোর দাবীর কথা না হয় ছেড়েই দিলি। কিন্তু ওর দাবী কি ক'রে ছাড়বি! বড় যখন হবে, কার পরিচয় দিয়ে ও সংসারে দাঁড়াবে?"

অশ্রুর উচ্ছ্বাস অতি আয়াসে সংযত করিয়া লতা উত্তর করিল, "সে পরিচয়, সে মান—ভাগ্যে যদি ওর থাকে, একদিন পাবে। আজ আমার কোলে ও অসহায় শিশু, আমার ভাগ্যের ভাগী হয়েই ওকে থাকতে হবে।"

হরকরা আসিয়া ডাকিয়া জানাইল, টাকা আসিয়াছে। ত্রস্ত চক্ষুমুখ মুছিয়া লতা বাহিরে আসিল। ফরমখানি হাতে লইয়া একটু দেখিল। তারপর 'ফেরত—শ্রীকণকলতা দেবী' এই কয়েকটি কথা লিখিয়া হরকরাকে ফিরাইয়া দিল।

"একি? টাকা ফেরত দিলে দিদি?"

"হাঁ, ডাকঘরে নিয়ে যাও। ডাকবাবুকে ব'লো, ঐ ঠিকেনায় যেন ফেরত পাঠিয়ে দেন।"

মন্দাকিনী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ত্রস্তে বারান্দায় নামিয়া কহিলেন, "ক'রছিস্ কি লতি? সত্যি সত্যিই টাকা ফেরত দিচ্ছিস্!"

"হাঁ, মা!"

"নে, আর পাগলামো করিস্নি বাছা। ভেবেচিন্তে পরামর্শ ক'রে একটু দেখি, পরে যা হয় করা যাবে। টাকাটা আজ এসেছে, সই দিয়ে রাখ্।"

"না মা, মিছে আর হাঙ্গামা ক'রো না। ভেবেচিন্তে যা দেখবার ঢের দেখা হয়েছে, পরামর্শই বা আবার কার সঙ্গে কি ক'রতে যাব? যাও নবীন, টাকা নিয়ে তুমি চ'লে যাও। বাবুকে গিয়ে বল, আজই যেন ফেরত পাঠিয়ে দেন।"

হরকরা নবীন মন্দাকিনীর মুখপানে একবার চাহিল। মন্দাকিনী কহিলেন, "না, নব্‌নে, যাস্নি। দে, কাগজখানা দে, আমি সই দিয়ে রাখ্ছি।"

নবীন কহিল, "আজ্ঞে—আপনার সইতে ত হবেনা। টাকা এসেছে দিদিঠাকরুণের নামে—"

"ওর নামটাই আমি লিখে দিচ্ছি বরং—"

"সে যে জাল করা হবে পিসী ঠাক্‌রুণ—"

"জাল! জাল কিসের? ফাঁকি দিয়ে কার টাকা ঠকিয়ে নেব ব'লে ত অসাক্ষাতে তার নাম সই ক'রে দিচ্ছিনা? সাম্‌নে ও দাঁড়িয়ে—"

"তাতেই আরও ফ্যাসাদ হ'য়েছে। সই দিয়ে যে উনি টাকা রাখ্‌তে চাচ্ছেন না—"

"তা না চাক্; আমি ওর মা ব'লছি টাকা রাখ্‌ব। তুই দে, কাগজটা আমাকে দে—"

"না, না, তাও কি হয় পিসী-ঠাক্‌রুণ! যার টাকা সে নেবনা ব'ল্লে আর কাউকে আমরা দিতে পারিনে। আপনি ত অবুঝ নন, লেখাপড়াও শিখেছেন—"

ফিরিয়া লতার হাতখানি ধরিয়া মন্দাকিনী তখন কহিলেন, "দোহাই তোর লতি: আমি মা, হাত ধ'রে ব'লছি, কথাটা ঠেলিস্নি। আজ টাকাটা রাখ্। একটা বন্দেজ যা হয় ক'রে নিই, এর পর মাসে বরং—"

হাত ছাড়াইয়া নিয়া লতা উত্তর করিল, "না না, মিছে আর কেন মা? ও টাকা এ হাতে আর ছোঁব না। বন্দেজ—সে যা হয় এম্‌নিই হবে। একটা মাস ত? না খেয়ে মরবনা। জিনিস পত্তরও ত দু'খানা আছে। হাতে টাকাও কিছু আছে। যাও নবীন, তুমি চ'লে যাও।"

বলিয়াই লতা গৃহমধ্যে চলিয়া গেল।

নিরুপায়ভাবে মন্দাকিনী কন্যার দিকে একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া নবীনের দিকে ফিরিলেন। নবীন কহিল, "কি ক'রব পিসী-ঠাক্‌রুণ? আচ্ছা, দেখি বরং বাবুকে ব'লে ক'য়ে—আজ যদি রাখ্‌তে পারি, কাল ফের নিয়ে আস্‌ব।"

গৃহমধ্য হইতে লতা কহিল, "না, মিছে ফের নিয়ে এসোনা। টাকা আমি রাখ্‌বনা।"

নবীন চলিয়া গেল।

রাগে ও দুঃখে অধীর হইয়া মন্দাকিনী কন্যাকে কতক্ষণ গালি পাড়িলেন। তারপর নিজের ও কন্যার ভাগ্যকে বহু ধিক্কার দিলেন। শেষে নীরবে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। মাতার কোনও কথা লতা কানেও তুলিল না। ঘরের পিছনে বেড়ার আড়ালে ঘেরা একটা চালার নীচে তাহাদের পাক হইত। একটা হাঁড়ী

হইতে কতকগুলি খেসারীর ডাল কুলায় ঢালিয়া নিয়া লতা তাহা বাছিতে বসিল। যেন কিছুই হয় নাই; অন্যান্য দিনের মত এখন পাকশাক করিয়া খাইলেই হয়। ডাল বাছিয়া রাখিয়া কলসীটি লইয়া লতা পুকুর ঘাটে গেল; একটা ডুব দিয়া এক কলসী জল তুলিয়া আনিল। তারপর চাল ডাল ধুইয়া আনিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

"আর এমন দস্যি ছেলেও হ'য়েছে। কবে যে কোথায় অপঘাতে একটা সর্ব্বনাশ ঘটাবে—" বলিতে বলিতে বলিষ্ঠ একটি শিশু কোলে মন্দাকিনীর ভ্রাতৃজায়া রটন্তী ঠাকুরাণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"ওমা? একি? কি হ'য়েছে? কাঁদ্‌ছ কেন ঠাকুরঝি?"

শিশুকে নামাইয়া দিতেই ছাড়া পাইয়া সে আবার ছুটিয়া বাহিরের দিকে চলিল।

"এই দ্যাখ! আবার ছুট দিল। আঃ এমন—" বলিতে বলিতে রটন্তীও বারান্দায় নামিলেন তাড়াতাড়ি পৈঠা বাহিয়া নামিতে পা ফস্কিয়া শিশু গড়াইয়া উঠানে পড়িল, চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রটন্তী গিয়া শিশুকে তুলিলেন। ষাট ষাট বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষের জল ও গায়ের ধূলা মুছিতে লাগিলেন। লতাও পিছনের চালা হইতে নামিয়া আসিল। মায়ের কোলে ছেলে দিয়া রটন্তী আবার গিয়া ঘরে উঠিলেন। লতাও পিছন দিয়া পাশের চালায় গিয়া ছেলের মুখে মাই দিল। মন্দাকিনী নড়িলেন না—একটি কথাও কহিলেন না; বসিয়া যেমন কাঁদিতেছিলেন, তেমনই কাঁদিতে লাগিলেন।

রটন্তী কহিলেন, "তা কি হ'য়েছে ঠাকুরঝি? কাঁদছ কেন? নব্‌নেকে দেখলাম—চিঠি-ফিঠি এয়েছে নাকি কিছু? ষাট—জামাই—"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে মন্দাকিনী উত্তর করিলেন—"চিঠি কোথায়? আস্‌বার হ'লে কবেই আস্‌ত। আজ এই তিন তিনটে বছর গেল—"

"সে আর আজ কেঁদে কি করবে ভাই? ভাবা উচিত ছিল—মেয়ের বিয়ে যখন দিয়েছিলে।"

মন্দাকিনী আবার চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "কপালে শেষে এই হবে, তা কি আর তখন ভেবেছিলাম ভাই? অমন ছেলে—চাইলে চক্ষু ফেরান যেত না। কথা শুনলে প্রাণ জুড়োত। যদি দেখ্‌তে বৌ—"

"দেখ্‌তে আর দিলে কই? একটি ভাই তোমার—বিয়ের সময় খবরটিও দিলে না। খবর যদি দিতে, আর আমরা যেতাম, তবে কি আর এমন সর্ব্বনাশটা হয়? তেমন কাঁচা লোক উনি নন। একটি বোন একটি ভাগ্নী—সাত কুলের খবর নিতেন, তবে বিয়েতে অনুমতি দিতেন।"

মন্দাকিনী কহিলেন "বাবা মা ভাই বান্ধব কেউ ছিল না। ক'লকেতায় থেকে প'ড়ত—ওঁর সঙ্গে জানাশুনো খুব হ'য়েছিল—"

"সে যাই বল ভাই, ঠাকুরজামাই লেখাপড়াও শিখেছিলেন, স্কুলেও পড়াতেন, তা কাজটা ক'রেছিলেন একেবারে ছেলেমানুষের মত। হাঁ, বাপ মা ভাই বান্ধব তখন না হয় কেউ ছিল না। তা কোথায় বাড়ীঘর—কোন কুল, কোন বংশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব কে কোথায় আছে, কোনও খবর নেই—ছেলে এসে বললে বিয়ে করব, আর অম্‌নি তার হাতে মেয়ে স'পে দিলেন। খিষ্টেন মিষ্টেনদের কি হয় জানিনে। তা হিন্দু গেরস্তর ঘরে এমন কাঁচা কাজ কেউ কোথাও করে? ঐ যে রূপকথায় বলে, রাত পোয়ালে যার মুখ দেখ্‌লাম তার হাতে মেয়ে দিলাম—ঠাকুরজামাই, ব'ল্‌তে কি ভাই, গঙ্গালাভ ক'রে স্বর্গে গেছেন—কাজটা ক'রেছিলেন ঠিক তেম্‌নি। সত্যিকার ঘর গেরস্থালীতে কেউ এমন করে? বিয়েতে সমাজ সামাজিকতা একটা আছে—তা নেমন্তন্নর চিঠিটি পর্য্যন্ত কাউকে দিলেন না। তাইত আমরা বলাবলি করি, যদি চিঠি আস্‌ত, আর আমরা যেতাম—"

"বড্ড তাড়াতাড়ি করে দিতে হল কিনা? সময় আর ছিল না।"

"কেন, এত তাড়াতাড়িরই বা গরজ হ'ল কিসে? ছেলে ত বিলেত গেল, সেই ছমাস না আট মাস পরে—কবে না ব'লেছিলে?"

"ছ মাস পরে!"

"তবে?"

"বড্ড তাড়াতাড়ি সে করছিল—যেন সবুর সয় না। তার বন্ধু শৈলেন এসেও বড় ধরে ব'সল—"

"সে বন্ধুও ত কোন চুলোয় গে মেরেছে—খোঁজ-খবরটি আর নেই।"

"নাঃ।"

"আর যারা এসেছিল—"

"কে এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি ভাই, আর বন্ধু তিন চারজন ক'ল্‌কেতা থেকে এসেছিল। সন্ধ্যেবেলায় এল, রাত্তিরে বিয়ে হ'ল। আবার সকালেই সবাই চ'লে গেল। তাদের নামটাম উনি হয়ত জান্‌তেন, আমি খোঁজখবর কিছু রাখিনি।"

"রাখ্‌লে আজ কাজে দেখ্‌ত। তা ব'ল্‌তে কি ভাই, যেমন ছিলেন তিনি, তেম্‌নি তুইও ছিলি নেকী; নইলে এমন দশাও হয়? কেন, না হয় উনি যাবার আগেই জেনেশুনে সব রাখ্‌তিস?"

"এত ত তখন ভাবিনি ভাই। হঠাৎ জামাইএর চিঠি এল, কি একটা সুবিধে পেয়ে বিলেত যাচ্ছে। দুশো টাকা পাঠিয়ে দিল, আর লিখ্‌ল খরচপত্রের একটা বন্দোবস্ত হবে। তার মাসখানেক পরেই উনি ব্যামোতে পড়্‌লেন। যখন গেলেন, তখন কি আর ছাই ঐ সব কথা মনে ছিল। জামাইএর কুলবংশের খবর যা জান্‌তেন উনিই জান্‌তেন। তিনিও বলেন নি, আমিও সুধোই নি। আর তখন এমন কিছুও বোঝা যায় নি যে খবর আর পাওয়া যাবে না, কেবল ত্রিশটি ক'রে টাকা মাসে মাসে আস্‌বে খোরপোষের দরুণ।"

"সে টাকাও ত আবার কে যে পাঠায়, কেউ জানে না। ছিরুকে উনি ব'লে দিয়েছিলেন, আফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে। তা আবাগীর ব্যাটারা কেউ কিছু ব'ল্লে না। সে মস্ত বাড়ী, মস্ত আফিস, কত লোক, কথাই বড় কেউ ব'ল্লে না।"

মন্দাকিনী কহিলেন, "দুশো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল, ছ মাস গেল—চিঠি না, পত্তর না, কোনও খবর না। ষাট, ঐ ছেলেটি হ'ল, তারপর হঠাৎ একদিন ত্রিশটি টাকা আর একটা চিঠি এল ইংরেজিতে লেখা—যে মাসে মাসে ওদের খোরপোষের বাবদ ত্রিশটি ক'রে টাকা আস্‌বে। অফিসের ঠিকানায় লতা দুতিনখানা চিঠি লিখেছিল, কোনও জবাব এল না। আরও আশ্চর্য্যি এই, তারপর চুঁচড়ো ছেড়ে এখানে চ'লে এলাম, টাকাও নিয়মমত এখানে আসছে।"

"হয়ত তাদের কোনও লোক আছে গোপনে খবর নেয়, তোমরা কোথায় কখন থাক।"

"চুঁচড়োর ডাকঘর থেকেও খবর নিতে পারে। এখানে এসেও লতা চিঠি লিখেছিল, কোনও জবাব আসে নি।"

রটন্তী কহিলেন, "লোকেও ভাই তোমাদের শত নিন্দে করে। বলে, মেয়ের বিয়ে হ'ল, জামাইএর বাড়ীঘর, বাপ পিতেমো কুলবংশের কোন খোঁজও নেই। তবুও কেউ কিছু করে না। মাসে মাসে কেবল খোরপোষের টাকা আস্‌ছে। তাও কে পাঠায় তার নাম-ধাম কেউ জানে না।"

কাঁদিয়া মন্দাকিনী কহিলেন, "সে টাকাও ত আজ থেকে বন্ধ হ'ল বউ, ঐ ছেলেটা নিয়ে এখন যে কি উপায় কর্‌ব—"

"বন্ধ হ'ল! ওমা, সে কি? কেন, কি লিখেছে তারা? টাকা দেবে না কেন?"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে মন্দাকিনী কহিলেন, "লেখে নি কিছু। টাকাও এসেছে। তা আবাগী ফেরত দিলে—সই দিয়ে রাখ্‌লে না।"

"ফেরত দিল? ওসব কেন?"

"বলে খোঁজখবর কিছু নেয় না। কেবল পেটে দুটি খেতে—তাদের টাকা কেন নেব?"

"তা ব'ল্‌তেই ত পারে? কেন ব'ল্‌বে না? বিয়ে ক'রে ফেলে গেল, আর আজ এই তিন তিনটি বছর তত্ত্ব-খবরই কিছু নিলে না। কোথায় লুকিয়ে থেকে কেবল টাকাই পাঠাচ্ছে। মেয়েমানুষ যেন এম্‌নিই হীনজাত যে কেবল টাকা পেলেই তার হ'ল; মান অপমানের দরদ কিছুই নেই। এ কি কম ঘেন্নার কথা ঠাকুরঝি, যেন বাইরের লোকের মত দুদিনের তরে একটা খেলা ক'র্‌তে এসেছিল—সক মিটল ত খেলার জিনিস পথে ফেলে চলে গেল! ছি ছি ছি? কুলের মেয়ে—তার সঙ্গে এমন জঘন্য একটা ব্যাভার ভদ্দরের ছেলে কেউ কর্‌তে পারে? বেশ ক'রেছে, টাকা ফেরত দিয়েছে। ও নাকি অমন লক্ষ্মী-মেয়ে—আমি হ'লে ছেলে ত ছেলে—বাপমাকে সটাং ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিয়ে আস্‌তাম, হাঁ?"

"খোঁজ যদি পাওয়া যেত—বোঝাপড়া একটা না ক'রে আমিই কি ছাড়্‌তাম?"

"সেই ত হয়েছে জ্বালা ভাই। নইলে—আচ্ছা, টাকা ত ফেরত যাবে। তখন কি একটা তত্ত্ব-খবর নেবে না? লতি পরের মেয়ে—পায়ে ঠেল্‌তে পারে? কিন্তু ছেলে ত তাদের নিজেদের। আর তাই না দরদ ক'রে টাকা পাঠাচ্ছে—নইলে কোথায় সে লুকিয়েছে, লতি কিছু আর নালিশ ফরেদ ক'রে খোরপোষ আদায় ক'র্‌তে পার্‌ত না। হুঁ হুঁ—তাহ'লে এই ছেলের 'পরে একটা দরদ আছে বটে।" বলিতে বলিতে রটন্তী কি ভাবিতে লাগিলেন। নূতন কি যেন একটা রহস্যের সূত্র তাঁহার মাথায় ধরা দিতেছিল।

মন্দাকিনী কহিলেন, "দেখি, টাকা ত ফেরত যাবে। তখন যদি খবর একটা নেয়।"

রটন্তী তেমনই ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন, "খবর হয় ত কিছু নেবে না, ঐ টাকাই ফের পাঠাবে। তবে আমার একটা কথা মনে হ'চ্ছে কি জান ভাই? হয়ত একটা কিছু ঘটেছে—যাতে কোথাও তাকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে। আজকাল নাকি আবার আইনও হ'য়েছে, ছেলেদের ধ'রে দূরে দূরে কোথায় জেলখানায় নিয়ে আটকে রাখে—"

"তা রাখে। আইনের কথা ওঁর কাছেও শুনেছিলাম। তাতে ত আর খবরাখবরের কোনও বাধা থাকে না। চিঠিপত্তরও বাড়ীতে লিখতে পারে। আর সে লিখেছিল বিলেত যাচ্ছে—"

"ওমা তাও ত বটে। কিন্তু—বিলেত—হাঁ—তা সে ত বিলেত হ'ল—সেই সাত সমুদ্দ রক্তের নদীর পারে—সায়েবদের দেশ—কোথাও যদি ব্যামো-পীড়ে হয়ে পড়ে থাকে! তা বিলেতে একট চিঠিপত্তর লিখে, কি তারের খবর ক'রে—"

"কার কাছে লিখ্‌ব? তারের খবরই বা কার কাছে কর্‌ব? কে আমাদের সেথায় আছে?"

রটন্তী কহিলেন, "তা ঠাকুরজামাই ত সেই ক'ল্‌কেত্তার মুলুকে স্কুলে চাকরী ক'র্‌তেন? কত সায়েব-টায়েব সেথায় আছে—"

ভ্রাতৃজায়ার এই গ্রাম্য অজ্ঞতায় দারুণ এই দুশ্চিন্তা ও দুঃখের মধ্যেও মন্দাকিনীর একটু হাসি পাইল। কহিলেন, "পাগল হয়েছিস্ বৌ! সায়েব কে আমাদের জানে, আর তাকেই বা জানে! আর বিলেত ত এই গাঁয়ের মত এতটুকু একটা যায়গা নয়।"

"তা বটে, তা বটে। তবে—"

"ওগো, এদিকপানে একটিবার এসগো! ধর, ধর, এইগুলো ধর! হাত যে ছিঁড়ে গেল।"

রটন্তী বাহিরের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ডাহিন কাঁধে বড় এক ধামা চাউল, বাঁ বগলে একটা কুমড়া এবং হাতে ডাল ও তরকারী ইত্যাদি বাঁধা একটা পুঁটুলী লইয়া স্বামী যোগেশ বাঁড়ুয্যে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে উঠানে আসিয়া ঘরের দিকে চাহিতেছেন। বাজার করিয়া তিনি ফিরিয়াছেন। মুখের কথা মুখেই রহিল। তাড়াতাড়ি রটন্তী নামিয়া আসিয়া কুমড়াটি ও পুঁটুলী স্বামীর হাত হইতে লইয়া বারান্দায় রাখিলেন, ধামাটিও দুইজনে ধরিয়া নামাইলেন। যোগেশ বাঁড়ুয্যে গিয়া বারান্দায় বসিলেন; রটন্তী তামাক সাজিয়া আনিয়া দিয়া একখানি পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

ডাক টিকিট

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে পত্র ব্যবহার ছিল কিনা জানি না। তবে কয়েক বৎসরের মধ্যে হরপ্পাও মহেঞ্জোদারোতে ব্যবিলনের অনুরূপ যে সকল মোহর (Seal) পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় যে হয়ত সে যুগেও পত্র ব্যবহার ছিল। কারণ ব্যবিলনের ইতিহাসে আছে, ব্যবিলনের অধিবাসীরা লিখিতে পড়িতে জানিত। তবে তাহারা কাগজ অথবা পার্চ্চমেণ্টের উপর লিখিত না। ব্যবিলনের মাটিতে খুব ভাল ইট হইত। পত্রাদি লিখিতে হইলে সেই ইট যখন কাঁচা থাকিত, তখন তাহার উপর তাহারা লোহার ত্রিকোণ পাত দিয়া খুদিয়া লিখিত (Cuniform-writing);

কখন বা শুক্‌না ইটের উপর কাদা মাটি দিয়া অক্ষর লিখিয়া তাহা পোড়াইয়া লইত। অতঃপর মাটির খামে ঐ ভাবে ঠিকানা লিখিয়া তন্মধ্যে উক্ত পত্র বন্ধ করিয়া তাহা মোহর চিহ্নিত করিয়া পাঠাইয়া দিত।[১] কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ঐরূপ কোন পত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। টেল্ এল্ অর্মনায় প্রাপ্ত পত্রাদির মধ্যেও ভারতবর্ষের কোন পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। ঋগ্বেদ হইতে জানিতে পারি—সে সময় এই দুই রাজ্য মধ্যে



নৌকাযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত ; ইহাতে আরও মনে হয়, সেই সূত্রেও পত্রাদি লেখার ধারা সে সময় ভারতে জানা থাকা সম্ভব।

কবি কালিদাস তাঁহার কাব্য গ্রন্থাদির মধ্যে শকুন্তলাকে পদ্মপত্রে পত্র রচনা করিতে বসাইয়াছেন এবং নলোপাখ্যানে হংসমুখে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু কালী সিংহের মহাভারতে পত্রের কোন উল্লেখ নাই—নলোপাখ্যানে 'পত্র' স্থানে সংবাদ কথার ব্যবহার আছে। হংসমুখে পত্র-প্রেরণের কথায় অনেকেই হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন। কিন্তু মিশর, ইস্‌রাইল, গ্রীস, রোম প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাস হইতে জানা যায়, সোলেমান—এমন কি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে ঐ সকল রাজ্য মধ্যে পারাবতের সাহায্যে পত্র প্রেরণ হইত।[২]

ইহাতে আমার অনুমান হয় যে পারাবতের সাহায্যে পত্র প্রেরণ ব্যবস্থা কবির জানা থাকায় তিনি কাব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া পারাবতকে আরও নয়নরঞ্জন করিবার জন্য হংসরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে রুক্মিণীহরণ অধ্যায়ে স্পষ্ট আছে যে, সুদামা নামে জনৈক ব্রাহ্মণের সাহায্যে রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণর মধ্যে পত্র আদান প্রদান হইয়াছিল।

পদ্মপুরাণে আছে বিক্রম নামে রাজার পুত্র মাধব, প্লক্ষরাজ গুণাকরের কন্যা সুলোচনাকে সুগন্ধা নামে মালাকরের স্ত্রীর দ্বারা নিজ অঙ্গুরীয়ের সহিত এক পত্র লিখিয়া পাঠান। রাজকন্যা ঐ পত্রের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া নিজহস্তে তাহার উত্তর লিখিয়া মাধবের নিকট পাঠাইয়া দেন।

আনন্দগোপাল সেন মহাশয় বলেন, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সহিত বহির্ভারতে বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার্থ মিশর, ব্যাবিলন, এসিরিয়া, ফিনিসিয়া, ইস্‌রাইল, পারস্য, আরব, রোম প্রভৃতি রাজ্যের সহিত পত্র আদান প্রদান ছিল। সিংহলের সহিত প্রথম পত্র আদান প্রদান হয় বিজয়সিংহের সময়। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের মন্দিরাদিতে সংরক্ষিত প্রাচীন পত্রাদি দেখিলে অনুমান হয়, চীন দেশের সহিতও হিন্দুদিগের পত্র আদান প্রদান ছিল।[৩]

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পত্রাদি ব্যবহার এবং তাহা শীঘ্র প্রেরণের জন্য উষ্ট্রদূত নিযুক্ত রাখার কথা মুদ্রারাক্ষসে আছে। ইহাতে অনুমান হয় গ্রীকবীর আলেকসান্দার

১। Myths of Babylonia and Assyria. 251 p. (by Donald. A. Mackenji)

২। E. Britanica, Flying Post.

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক"

৩। The Post Office of India. 55 62 pp. (by Clarke)

যখন উত্তরপাঞ্জাব ও কাশ্মীর জয় করেন, সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাদের দলভুক্ত থাকায় যে গ্রীকপ্রভাব তাঁহার মধ্যে বিস্তার লাভ করে তাহার ফলেই তিনি উহাদের অনুকরণে নিজ রাজ্য মধ্যে উষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন। পারস্য, মেসিদন ইত্যাদি রাজ্যমধ্যে আলেকসান্দারের বহু পূর্ব্বকাল হইতে ঘোড়ার ডাক স্থাপিত ছিল।[৪]

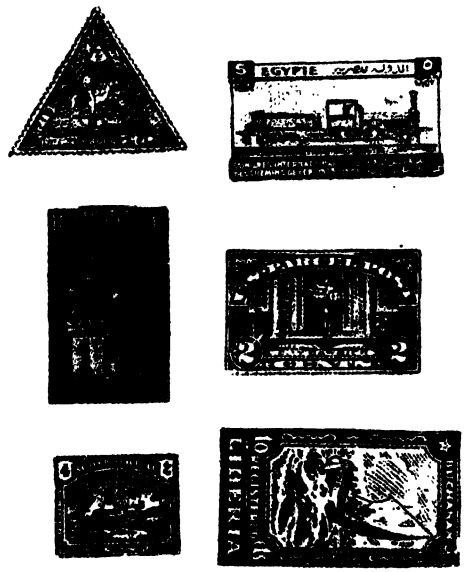
সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র যখন বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য সিংহল দ্বীপে ছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার ভগ্নী সংঘমিত্রাকে তথায় পাঠাইবার জন্য অশোকের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন, গ্রন্থান্তরে একথার উল্লেখ আছে।

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ যখন ভারতভ্রমণে আসেন, সে সময় কনৌজরাজ হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার সহিত একখানি পত্র দেন। ঐ পত্র মোহর করিয়া রাজ-আজ্ঞা সপ্রমাণিত করা হইয়াছিল। ইহাতে হিউয়েন-সাঙয়ের বিশেষ সুবিধা হয়; তিনি ঐ পত্র উক্ত রাজার রাজ্য মধ্যে, যে কোনও প্রদেশে, যে কোনও রাজকর্ম্মচারীকে দেখাইলে তাঁহারা তাঁহার ভ্রমণের জন্য পাল্কী, গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি যানবাহনাদির সুবিধা করিয়া দিতেন।[৫] শোণপতে (Sonpat) হর্ষবর্দ্ধনের একটি মোহর পাওয়া গিয়াছে।[৬]

গুজরাটে সোমনাথদেবের মন্দিরে দেবতার পূজা-স্নানাদির জন্য গঙ্গা হইতে জল এবং কাশ্মীর হইতে ফুল আনার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা হইতে অনুমান হয় সে সময় ডাকচৌকীর কার্য্য এতৎ প্রদেশে জানা ছিল এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন ধাবকের দ্বারা উহা বহন করাইয়া আনার ব্যবস্থা ছিল। তাহা না হইলে কোন একজন লোকের পক্ষে উহা বহন করিয়া আনা সম্ভব হয় না। পরবর্ত্তী যুগে কর্ণেল ব্রাউটন লিখিত 'এ লেটার ফ্রম মারাঠা কোর্ট' নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারি রাজপুতানায় পুষ্করের বিখ্যাত মন্দিরে ফলফুলাদি যোগানের নিমিত্ত উদয়পুর হইতে ধাবক-যাতায়াতের ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল।[৭] অতঃপর আরবীয়গণ সিন্ধুদেশ জয় করিলে তাঁহারা স্বদেশের সহিত আদান প্রদান রাখিবার নিমিত্ত হরকরা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন-খিলিজীর (১২৯৬-১৩১৬) সময় বোধ হয় প্রথম ঘোড়ার ডাক স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক জীয়াউদ্দীন-বারুণী বলেন, ঐ সম্রাট যখনি কোন যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতেন তখনি তিনি সামরিক খবরা-খবরের জন্য ঘোড়ার ডাক এবং ধাবক উভয়ই নিযুক্ত রাখিতেন।[৮] ঐ সম্রাটের বিষয় আরও আছে যে তিনি নিত্য বাজার দর এবং রাজ্যের কোথায় কি ঘটিতেছে তাহাও জানিতে পারিতেন।[৯]

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডাকের যে বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল, তাহা আমরা পর্য্যটক ইব্‌ন-বাটুটার ভ্রমণ বৃত্তান্ত



হইতে জানিতে পারি। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে এইরূপ বর্ণিত আছে—হিন্দুস্থানে ঘোড়ার ডাক এবং হরকরা উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়—ঘোড় সওয়ারেরা সুলতানের সৈনিক। চারি মাইল অন্তর তাহাদের ঘাঁটি আছে এবং প্রতি মাইল অন্তর পর পর তিনটি করিয়া হরকরাদের আড্ডা আছে। ইহাদের প্রত্যেকের হস্তে দুই হস্ত পরিমিত এক চাবুক থাকে। উহারা একহস্তে পত্রাদি লইয়া অপর

৪। From Postal boy to Air mail. 28 p (by Jackson)

৫। Imperial Gazetteer, vol ii—p 30.

৬। See Fleet's Gupta Inscription p 230.

৭। Post Office in India by Clarke. p 10.

৮। Tarikh i-Ferozshahi, Elliot. vol. III. p 203.

৯। Ferishta, Persian text. p 187. Prof K. Qanungo, Sher Shah. p 395.

হস্তে চাবুক ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরবর্ত্তী আড্ডার প্রতি ধাবিত হয়। ঐ সকল চাবুকের মাথায় ঘণ্টা বাঁধা থাকায় ইহাতে একপ্রকার শব্দ হইতে থাকে, এই শব্দ পরবর্ত্তী আড্ডার লোকে শুনিতে পাইলেই তাহাদের একজন বাহির হইয়া আসে এবং উক্ত পত্রাদি লইয়া ঐভাবে পরবর্ত্তী আড্ডার প্রতি ধাবিত হয়। এই কারণে সম্রাট অতি শীঘ্র খবরাখবর পাইতে পারেন।[১০] আফ্রিকান পর্যটকের সমসাময়িক ঐতিহাসিক সাহাবুদ্দীন আবুল আবাস আমেদও ঐ সময় ঐরূপ ডাকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনবাটুটা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদতোগ্‌লকের রাজত্বকালে ভারতে পদার্পণ করেন।[১১]

ইণ্ডিয়া অফিসের কাগজপত্র হইতে জানা যায় ক্রিষ্টোফর



রবার্ট ক্লাইভ

কলম্বস যখন স্পেনিস রাজের সাহায্যে ভারত অনুসন্ধানে বাহির হন সে সময় তাঁহার সহিত তাতার-রাজের নামে একখানি পত্র দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পাঁচ বৎসর পর ভাস্কোডাগামা লিসবন সহর হইতে ভারত অনুসন্ধানে বাহির হন; তিনি ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে কেপ্ অব্ কমরিণ হইয়া মালাবার তীরে কালিকট্ সহরে উপস্থিত হইলে তথাকার রাজার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য জন্মে; এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে একজন আফগান রাজা উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতে ছয়মাসকাল অতিবাহিত করার পর ভাস্কোডাগামা স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় মালাবার রাজ পর্ত্তুগালরাজের নামে তাঁহার হস্তে এক পত্র প্রেরণ করেন; তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল—Vascodegama a noble man of your household has visited my kingdom; there is abundance of cinamon, cloves, ginger, pepper and precious stones; what I seek from thy country is gold, silver, coral and scarlet.[১২]

সেকেন্দার লোদী (১৪৮৮-১৫১৮) বোধহয় প্রথম ডাক-চৌকা (Post Office) স্থাপন করেন।[১৩] ইতিহাসে উল্লেখ আছে যখনি তিনি কোন পথে সৈন্য প্রেরণ করিতেন, তখনি ঐ সৈন্যদিগের নিকট দুইখানি করিয়া পত্র পৌছাইত; দিনমানে পথচলার পর কোথায় যাইয়া থামিতে হইবে এই উপদেশ দিয়া ভোরে এবং ইহা কর উহা কর ইত্যাদি উপদেশ দিয়া মধ্যাহ্নে অথবা সন্ধ্যায়। ইহার কখনও অন্যথা হইত না। রাজ্যের কোথায় কি ঘটিতেছে এ খবরও তিনি নিত্য সংগ্রহ করিতেন। সে সময় ডাক-চৌকীর ঘোড়াদিগকে সর্ব্বদাই বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত।[১৪]

সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০) আগ্রা হইতে কাবুল পথটির জরিপ করিবার আদেশ দেন এবং ঐ পথে ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন। বাবর মেময়র্স'এ আছে ১৭ই ডিসেম্বর ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে চিক্‌মাক্ বেগ (Chiqmag Beg) কে আগ্রা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত পথটি জরিপের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; ইহাতে সে সেইদিনই সম্রাটের আদেশ পালনার্থ পথে বাহির হয়। অতঃপর কার্য্যের নক্সায় এইরূপ বর্ণিত আছে—উক্ত পথে নয় ক্রোশ অন্তর প্রায় ৩৬ ফিট উচ্চ এক একটি মিনার প্রস্তুত করিতে হইবে; তাহাদের

১০। Travels of Ibn Batuta, Lee's Translation. pp 101-102.

১১। See Elliot vol III. p 581.

১২। E. Britanica. India under Vascodegama.

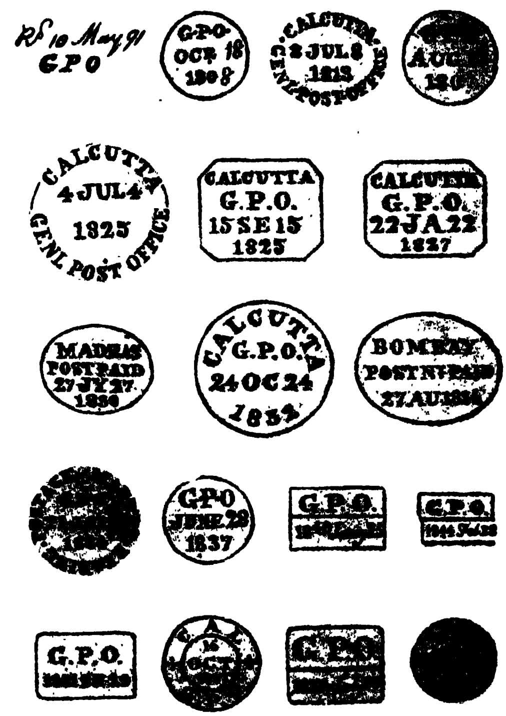
১৩। Elliot vol. v. p 102.

১৪। Tabakat i-Akbari. Persion Text. p 171 Qanungo, Sher Shah p 394.

চূড়া চতুর্দ্দ্বারী হইবে। প্রত্যেক ১৮ ক্রোশ অন্তর ছয়টী করিয়া ঘোড়া বাঁধা থাকিবে; এবং ডাকচৌকীর দারোগা, (Post master) সহিস এবং ঘোড়ার দানার জন্ম খরচ যোগান হইবে। কিন্তু এই কার্য্য প্রকৃত সম্পন্ন হইয়াছিল কিনা তাহার কোন উল্লেখ নাই।[১৫]

শের সাহা (১৫৪০-১৫৪৫) ঘোড়ার ডাকের স্রষ্টা বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সময়ও তাহা ছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারিতেছি। তাহা হইলে তাঁহাকে ঘোড়ার ডাকের স্রষ্টা বলিতে পারি না। তিনি সিন্ধুদেশ হইতে পাঞ্জাব হইয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ২০০০ মাইল বিস্তৃত যে পথ প্রস্তুত করান তাহার উপর ডাকচৌকী ও ঘোড়ার ডাক স্থাপন করেন। ইহাতে মিলাব ও আগ্রা এবং সুদূর বঙ্গদেশ হইতে নিত্য সংবাদাদি পাওয়ার পক্ষে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। নানা পথের উপর তিনি সর্ব্বসমেত ১৭০০ ডাকচৌকী এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতে দুইটী করিয়া ঘোড়া স্থাপন করেন। ইহাতে তাঁহার ৩৪০০ ঘোড়া লাগিয়াছিল।[১৬] এই সময়ের একটি ডাকচৌকীর ধ্বংসাবশেষ এখনও আগ্রা হইতে সেকেন্দ্রা যাইবার পথে দৃষ্ট হয়।

সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) সময় ডাকের যে বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল আইন-ই-আকবরী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাফিখাঁ নামক মুসলমান ইতিহাসে আছে—সম্রাট্ আকবর যে নূতন নিয়ম স্থাপন করেন তন্মধ্যে ডাকমেবড়াগণের নাম উল্লেখযোগ্য, ইহাদের সকলস্থানেই আড্ডা ছিল। আইন-ই-আকবরীতে আছে মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী দ্রুতগামী বলিয়া বিখ্যাত। আকবর ইহাদের ডাকবহন কার্য্যে নিযুক্ত করেন।[১৭] আরও আছে যে, হিন্দুদের একটি সম্প্রদায়কে রায়বড়ী (Raybari) বলা যায়। ইহারা উটের প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ পরিচিত। কি ভাবে পথ চলিলে অল্প সময় মধ্যে দূর পথ অতিক্রম করা যায় সে বিষয় ইহারা উটেদের শিক্ষা দিয়া থাকে। ঘোড়ার ডাক এবং হরকরা রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বপথে চার ক্রোশ অন্তর যদিও স্থাপিত ছিল, তথাপি জরুরী পত্রাদি বহনের জন্ম রাজপ্রাসাদে সর্ব্বক্ষণ উটের ডাক প্রস্তুত থাকিত।[১৮] এই সময় সাধারণত ২৪ ঘণ্টায় ১০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আগ্রা হইতে গুজরাটের আমেদাবাদে ৫দিন মধ্যে ডাক পৌছাইত।[১৯]



রাজা বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুর তাঁহার কলিকাতার ইতিহাসে লিখিয়াছেন:—১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে নিউবেরী ও ফিচ নামক দুইজন সাহেব মহারাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে সম্রাট আকবরের নামে একখানি পত্র লইয়া স্থলপথে সীরিয়া দিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন।

১৫। Memoirs of Babar. Section iii. p. 629.

১৬। Sirkar's, Inland trade and Communication p. 74.

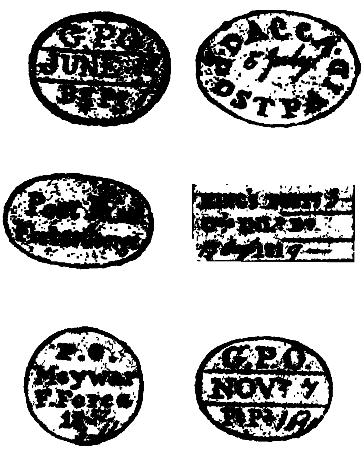
১৭। বিশ্বকোষ, ডাকঘর।

১৮। Ain (Blackman) i. pp147-148.

১৯। An Outline of Postal History by Hamilton. p. 130.

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল ইউরোপীয় পর্য্যটক ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আলেক্সান্ড্রা হ্যামিলটন একজন—যিনি মোগল ডাকের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—পথিমধ্যে প্রতি ১০ মাইল অন্তর ডাকচৌকী এবং তথায় হরকরা বদলের ব্যবস্থা থাকায় মোগল রাজত্বের ডাক খুব শীঘ্র যায়। ইহারা পত্রাদি কারুকার্য্য খচিত একটি বাক্সে বন্ধ করিয়া তাহা মাথায় বহন করে। দিবারাত্র ঘণ্টায় ৫।৬ মাইল পথ চলিয়া ইহারা রাজধানী হইতে সম্রাটের অধিকারভুক্ত-রাজ্যের শেষ সীমান্তে, প্রায় ৮দিনে ডাক পৌছাইত।[২০]

এই সময় রাজ্যের নানাস্থানে সংবাদদাতা নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা ওয়াকুই নভিস (Waqai navis)



অথবা ওয়াকুই নিগার (Waqai niger), শুয়ানিনিগার, (Sawanih niger) কুফিয়া নভিস (Khufia navis) ও হরকরা নামে পরিচিত। ইহারা নিয়মিতভাবে ডাক-চৌকীর দারোগার আদেশ মত কাজ এবং সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া সরকারে প্রেরণ করিতেন। ডাকচৌকীর দারোগা পত্র এবং সংবাদাদি গ্রহণ করিয়া তাহা উজীরের মারফৎ সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লিখিত একখানি পার্সিয়ন পুঁথি হইতে জানা যায়—ওয়াকুই সপ্তাহে একবার, শুয়ানি দুইবার, আকবর বা হরকরা মাসে একবার এবং নকিম (Nakim) ও দেওয়ানের নিকট হইতে মাসে দুইবার চোকের মধ্যে ভরিয়া জরুরী খবরাদি আসিত।[২১] ঐ সকল পত্রাদির সংখ্যা সকল সময় ঠিক না থাকিলেও, ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় সে সময় ডাকের বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের দেওয়ান মুহম্মদ আলিখাঁ লিখিত Mirat-i-Ahmid হইতে ইহা আরও প্রমাণিত হইবে। ইহাতে আছে : প্রদেশস্থ সংবাদদাতাগণের অধীনে অনেক সংবাদ-সংগ্রাহক থাকিত, তাহারা ওয়াকুই নামে পরিচিত। ইহারা জেলায় জেলায় ঘুরিয়া সহরস্থ বিচারালয় ও ব্যবসায়ীদের আড্ডাগুলি হইতে খবরাখবর সংগ্রহ করিয়া আনিত। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় খবরাদি পাইলে তাহা পত্রে লিখিয়া উষ্ট্রের ডাকের দ্বারা রাজসরকারে পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদদাতাদিগের দ্বিতীয় দল শুয়ানি নামে পরিচিত। ইহারা কৌতুকপূর্ণ খবরাখবর প্রেরণ করিত। তৃতীয় দল হরকরা—ইহারা শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে খবরাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইত। এই সময় এলাহাবাদ হইতে আজমীরের সীমান্ত পর্য্যন্ত ডাকচৌকী স্থাপিত ছিল এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতে ঘোড়া ও মানুষ রাজসরকারের পত্রাদি বহনের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। ইহারা ৭দিনে দিল্লী বা সাহাজানাবাদে ডাক পৌছাইত। ব্রোচের (Broach) মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্য অভিমুখেও তৎকালীন একটি ডাক পথ ছিল।[২২]

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ডাক বিভাগের বিষয় যাহা কিছু বলা হইল, সকলই রাজকীয় পত্রাদি আদান প্রদানের কথা। তন্মধ্যে জনসাধারণের পত্রাদি পাঠাইবার কোন সুবিধা ছিল না। জনসাধারণে পত্রাদি পাঠাইতে হইলে তাহা তাহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তির হস্তে পাঠাইত। ব্যবসাবাণিজ্য স্থানে ঐ সকল হরকরাদের বাস ছিল। তাহারা সাধারণত কাসীদ, পাটমার, কেরিয়ার ইত্যাদি নামে পরিচিত। পিটার মণ্ডির সময় (১৬২৪-১৬৩৪) বাজার কাসীদরা ১১।১৫ দিনে পাটনা হইতে আগ্রা,[২৩] ১৫।২০ দিনে দিল্লী

২০। Pinkerton Voyage vol. viii. p. 316.

২১। Mughal administration by Jadu Nath Sirkar. pp 97-101.

২২। Bombay Gazetteer, vol. I. part I. p 214.

২৩। Travels of Peter Monday. vol. ii. p 368.

হইতে সুরাট ২০ পত্র পৌছাইত। ডাক্তার ফ্রায়ার বলেন, দক্ষিণে একমাত্র উহারাই ডাক বহনের কার্য্য করিয়া থাকে।[২৫]

কর্ণেল উইলিয়ম লিখিয়াছেন মহীশূরাধিপতি চিকদেওরাজ ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে মহীশূর মধ্যে প্রথম ডাক স্থাপন করেন। উহারা যদিও গৌণভাবে খবরাখবর সংগ্রহেই ব্যস্ত থাকিত, তথাপি মুখ্যত তাহা পত্রাদি বহনের জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। তথাকার ডাক-অধ্যক্ষ এবং নিম্নতম কর্ম্মচারীরা তাহাদের কার্য্য সমাপনান্তে নিজ নিজ জেলার মধ্যে রাজসরকারের আবশ্যক মত যে সকল খবর আছে বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সেই সকল খবর তাহারা রাজসরকারে পাঠাইয়া দিতেন। হায়দার আলি রাজ্যকালে এই ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।[২৬]

আকবরের রাজত্বকালে পথঘাট এবং ডাকের সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও ইংরাজগণ যখন ভারতে আসেন সে সময়



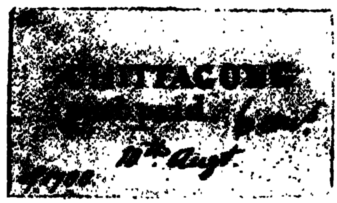
ইহার কিছুই দেখিতে পান নাই। ইলিয়ট বলিয়াছেন—"মোঘল রাজত্বের সে সরাই, পথঘাট, মন্দির ও গাছ সকলের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।" তজ্জন্য প্রথমতঃ ইংরাজেরা কাসিদ বা পাটমারদিগকে নিজেদের পত্রাদি বহনের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইহাতে অত্যধিক খরচ বশতঃ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বোম্বাই ও মাদ্রাজস্থ তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগকে ব্যবসায়ীদের সুবিধা ও কোম্পানির আয় বৃদ্ধির জন্য ডাকঘর স্থাপনের আদেশ দেন। বোম্বাইয়ে এইরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

২৪। Willson, Early Annals of the English in Bengal. vol. ii. part ii. p 90.

২৫। Fryer, East India and Persia vol. i. p 278.

২৬। Wilks, Historical sketches of the South of ndia vol. i. p. 89.

We likewise require you to erect a Post Office for all letters to be brought to and delivered at setting such rates upon each single letters, as may in a few years bring in a vast revenue to the company and a much great convenience to the merchants and trade in general than ever they yet had or understood. For which purpose you (must) order fitting stages and passage boats to go off and return on certain days and proper stages by land to Surat and other places to convey letters with great security and speed. মাদ্রাজেও ঐরূপ আদেশ দেওয়া হয়। ইহাতে মাদ্রাজের কর্ম্মচারী গঞ্জাম এবং কটকের মধ্যে স্থানে স্থানে ডাকঘর স্থাপন করেন। বোম্বাই এবং কলিকাতারও মধ্যে মধ্যে হরকরা মারফৎ পত্র প্রেরণ চলিত। এই সময়



ডাকখরচ কি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা পাওয়া যায় না; তবে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ ছিল—

সেণ্টজর্জ্জ দুর্গ হইতে	ভিজেগাপটাম	।৴০ আনা
" "	বাঙ্গলা	।৶১০ "
" "	সুরাট বা বোম্বাই	৷৷৶৫ "[২৭]

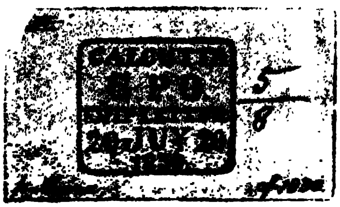
একমাত্র হরকরারাই এ পথে পত্র বহন করিত। অতঃপর ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এই পথে ঘোড়ার ডাক স্থাপনের চেষ্টা হয়; কিন্তু ঐ বৎসর মার্চ্চ হইতে সেপ্টেম্বর মাস মধ্যে কোন পত্রাদি না থাকায় কলিকাতার শাসনকর্ত্তা ঐ ডাক পথ বন্ধ করিয়া দিতে আদেশ দেন।

লর্ড ক্লাইভ ভারত আগমনের পর সম্যক উপলব্ধি

২৭। Vestiges of Old Madras I. p. 544

করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত বন্ধুবান্ধব ও কর্ম্মচারী-দিগের মধ্যে নিয়মিত পত্র চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। তজ্জন্য তিনি রাজধানী হইতে প্রধান প্রধান সহরগুলির মধ্যে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নিয়মিত ডাকচলাচলের ব্যবস্থা করেন এবং তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য শাসনকর্ত্তাদিগের বাটীতে প্রত্যহ রাত্রে ডাক-অধ্যক্ষ (Post master) অথবা তাঁহার সহকারী যে কেহ উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে একস্থান হইতে অন্যস্থানের ডাক ভিন্ন ভিন্ন (Sorting) করণান্তর তাহা বিভিন্ন থলিতে ভরিয়া কোম্পানির নামাঙ্কিত গালামোহর করিয়া প্রেরণের ব্যবস্থা করেন ও যাহাতে ঐ সকল থলি (Bag) সেই সেই স্থানস্থ প্রধান ব্যতীত অপর কেহ খুলিতে না পারে, তজ্জন্য আইন স্থাপন করেন। এতৎব্যতীত ডাকপথের উপর অবস্থিত জমীদারবর্গকে হরকরা যোগাইবার জন্যও তিনি আইন দ্বারা বাধ্য করেন। ইহাতে ডাকের কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিতে থাকে।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় কলিকাতায় প্রথম পোষ্ট মাষ্টার



জেনার্ল কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত জনসাধারণ পত্রাদি লিখিলে তাহার জন্য কোন খরচ দিতে হইত না। কোম্পানিই ডাকের সমস্ত খরচ বহন করিতেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পোষ্ট মাষ্টার জেনার্ল এক নূতন আইনে ঐ প্রথা বন্ধ করিয়া ডাকের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই সময় প্রতি তোলা ওজনের একখানি পত্র ১০০ মাইল যাইতে দুই আনা খরচ ধার্য্য হয়। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য তাম্রনির্ম্মিত এক প্রকার টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা উহা আদায়ের ব্যবস্থা হয়। মাদ্রাজ হইতে সপ্তাহে দুইবার ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থাও এই সময় স্থাপিত হয়। কিন্তু মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই অথবা বোম্বাই হইতে কলিকাতা নিয়মিত ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত কোম্পানি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিদেশীয় বণিকদিগের অনুরোধে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই মাসে দুইবার ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। হায়দ্রাবাদ এবং পুনা হইয়া হরকরারা প্রায় ২৫ দিনে বোম্বাইয়ে ডাক পৌছাইত। ইহাতে ডাকখরচ পত্র প্রতি ২৲ টাকা ছিল। এই সময় সাধারণত নির্দ্দিষ্ট স্থানে পত্র পৌছাইলে তথা হইতে ডাকখরচ আদায় হইত (Bearing)। তজ্জন্য যে সকল পত্রাদির খরচ পূর্ব্ব হইতে আদায় হইত সেই সকল হইতে যে সকলের খরচ অনাদায় থাকিত তাহাদের চিনিবার জন্য ষ্টাম্পের প্রচলন হয়। যে সকল পত্রের খরচ অনাদায় থাকিত তাহাতে কাল কালি ও মোহরের সাহায্যে আদর্শমত ডাকঘরের নাম মুদ্রিত করিয়া পার্শ্বে তারিখ ও কত খরচ আদায় লইতে হইবে তাহা লিখা হইত এবং যে সকলের খরচ পূর্ব্ব হইতে আদায় হইত তাহাতে লাল কালি ও মোহরের সাহায্যে উপরোক্ত উপায়ে মুদ্রিত ও লিখিত হইত।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ডাকখরচ কমিয়া প্রতি ২॥০ তোলায় এইরূপ দাঁড়ায়। বোম্বাই হইতে পুণা—১৩০ মাইল ৵০ আনা

"	" হায়দ্রাবাদ	৫৫০ "	॥০ "
"	" মসলিপটম	৮২৭ "	৸০ "
"	" মাদ্রাজ	১১৫০ "	১৲ টাকা
"	" গঞ্জাম	১২৫৭ "	১।০ আনা
"	" কলিকাতা	১৫৬২ "	১৸৵০ আনা

তদতিরিক্ত প্রতি তোলায় উক্ত খরচ পুনরায় যোগ হইত; যেমন বোম্বাই হইতে কলিকাতা ২॥০ তোলায় ১৸৵০, ৩॥০ তোলায় ৩৵০, ৪॥০ তোলায় ৪৸৵০ ইত্যাদি। এই সময় বোম্বাই হইতে প্রতি বুধবার এবং কলিকাতা হইতে প্রতি সোমবার সপ্তাহে একবার ডাক যাত্রা করিত এবং ডাকপথ বদলাইয়া কলিকাতা হইতে মসলিপটামে ডাক আসিয়া তথা হইতে কলিকাতা ও মাদ্রাজের ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা হয়। ইহাতে বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ২৬ দিনে, মাদ্রাজ ১৭ দিনে এবং মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা ১৯ দিনে পত্র যাওয়ার সুবিধা হয়।

ভাল পথঘাট না থাকায় একমাত্র হরকরারাই এ সময় পত্র বহন করিত; জঙ্গলাকীর্ণ স্থানসমূহ পার হইবার সময় ইহাদের সহিত আলো, মাদল এবং তীরন্দাজ দেওয়া হইত;

তাহারা নির্ভয়ে হরকরাকে জঙ্গল পার করাইয়া দিত। নদ নদীতে নৌকা থাকিত। এতৎব্যতীত ঘোড়া বা অন্য কোন ভারবাহী পশু বা গাড়ীর সাহায্যে ডাক যাওয়ার প্রথা ছিল না। ভারী মালপত্র কোথাও পাঠাইতে হইলে তাহা ভাঙ্গী ডাকে পাঠাইতে হইত। যে সকল হরকরা বাঁকে করিয়া মালপত্রাদি (Parcels) বহন করিয়া লইয়া যাইত তাহাদিগকে ভাঙ্গী ডাক বলা যাইত। পত্রবাহী হরকরাদের ন্যায় ইহারা শীঘ্র চলিতে না পারিলেও এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় কোন ঘড়ি মেরামত করিতে দিলে তাহা প্রায় একমাস মধ্যেই ফিরত পাওয়া যাইত। হরকরারা সাধারণত ৭।৮ মাইল পথ চলার পর বদলী হইয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টায় ৭০ মাইল পথ অতিক্রম করিত।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ ডাকবিভাগ কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে ২।।০ তোলা ওজনের পত্র প্রতি নিম্নলিখিত হারে মাশুল ধার্য্য হয়। যথা—

বারাকপুর, চন্দননগর, হুগলী	৴০ আনা	
শান্তিপুর, বর্দ্ধমান, মুরশীদাবাদ, সুকসাগর, মেদিনীপুর, কুলপী, বালেশ্বর	৵০ ”	
ভাগলপুর, সিউড়ী, ঢাকা, কটক, রঙ্গপুর, বীরভুম, রাজমহল, নাটোর	৶০	
কোচবিহার, পুর্ণিয়া, মুঙ্গের, হরিয়াল	।০	
পাটনা, সিলেট, গঞ্জাম,	।৴০	
বক্সার, চট্টগ্রাম	।৵০	
বেনারস	।৶০	
হায়দ্রাবাদ	১৴০	
পুণা	১।০	
বোম্বাই	১।।৴০	ইত্যাদি

অতঃপর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ডাকখরচের হার বদলাইয়া যায়। এ সময় এক তোলা ওজনের পত্র একহারা পত্র বলিয়া ধার্য্য হইত। তদতিরিক্ত প্রতি অর্দ্ধ তোলায় তাহা আর একখানি পত্র বলিয়া গণ্য হইত।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে জাহাজ পাঠাইয়া মধ্যে মধ্যে ডাকের আদান প্রদান চলিত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানিতে পারি—সে সময় কোন পত্রাদি পাঠাইতে হইলে তাহা মিঃ রিচার্ড আমুটীর নিকট জমা দিতে হইত। মিঃ আমুটী জাহাজ ছাড়িবার প্রায় ১০ দিন পূর্ব্ব হইতে পত্রাদি সংগ্রহের জন্য নিয়মিতভাবে সকাল ১০টা হইতে বৈকাল ৪টা এবং পুনরায় সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কলিকাতা কাউন্সিল হাউসের নীচের তলায় তাঁহার অফিসে অবস্থান করিতেন। এই সময় ডাকের মাশুল এইরূপ ছিল। যথা—

২ আউন্স বা ততোধিক হইলে—	৪৲ টাকা	
৩ ” ” ”	৯৲ ”	
৪ ” ” ”	১৬৲ ”	ইত্যাদি

অতঃপর ১লা জানুয়ারী ১৭৯৮ কলিকাতা হইতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে নিয়মিতভাবে কেপ্ কমরিণ হইয়া বিলাতে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। সে সময় ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া অপেক্ষা বড় আকারের বা গালা-মোহর করা পত্র প্রেরণ নিষিদ্ধ ছিল। প্রেরকের স্বাক্ষরসহ সরকারের সেক্রেটারী মারফৎ উহা পাঠাইতে হইত। মাশুলে নিয়ম ছিল—সিকি তোলা ১০৲ দশ টাকা, অর্দ্ধ তোলা পনের টাকা, এবং এক তোলা ২০৲ টাকা। এই সময় বিলাত হইতে কোন পত্রাদি আসিলে যদিও তাহার জন্য তথায় একদফা মাশুল আদায় হইত তথাপি এখানে তাহা ঠিকানায় পৌছানর জন্য ওজন হিসাবে পুনরায় তাহার উপর ৵০ আনা, ।০ আনা, ।।০ আনা—নির্দ্ধারিত মত খরচ আদায় হইত। ১লা ডিসেম্বর ১৮০৭ লণ্ডন হইতে 'নেলসন' নামক জাহাজে একখানি পত্র যাত্রা করিয়া ১৮ই আগষ্ট ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাহা কলিকাতায় পৌছায়। কলিকাতার ডাকঘরে আদর্শমত ছাপ দিয়া তাহার উপর ।০ আনা খরচ ধার্য্য হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে একখানি পত্র আসিতে খরচ পড়িত ৩ শিলিং ৬ পেনি; উক্ত মাশুল সময় সময় ডাক বিলির সময়ও আদায় হইত। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয় জাহাজে পত্র আদান প্রদান হয়। জাহাজখানির নাম এণ্টারপ্রাইজ (Enterprise). ইহাতে ইউরোপে পত্রাদি পৌছাইতে প্রায় ১১৩ দিন সময় লাগে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুলাই কলিকাতা জেনার্ল পোষ্ট অফিস হইতে আদর্শ মত ষ্ট্যাম্পে মুদ্রিত হইয়া ময়রা (Moira) নামক জাহাজে একখানি পত্র যাত্রা করে। ইহার জন্য এখানে ৫।।০ টাকা খরচ দেওয়া হয় এবং তাহা বিলির সময় তথায় পুনরায় ৫ শিঃ ১০ পেঃ আদায় হয়। এই সময়ের পর্য্যটকদিগের মধ্যে ভিক্টর জেকমণ্ট (Victor Jacquemont) লিখিয়াছেন—সে সময় ভারত-

বর্ষে ডাকবাঙ্গলাগুলিতে পাল্কী এবং ডাকপত্রাদি বহনের জন্য ৩টী করিয়া হরকরা নিযুক্ত থাকিত···তিনি কোন পত্রাদি পাঠাইতে হইলে তাহা উহাদের হস্তে দিয়া ঈশ্বরের কৃপার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কারণ পত্রের আদান প্রদান বড়ই অনিশ্চিত ছিল। তখন ফ্রান্স হইতে উত্তরভারতে একখানি পত্র আসিতে প্রায় আট মাস সময় লাগিত।

পত্রাদি নির্দ্দিষ্ট ডাকঘরে পৌছাইলে তাহা বিলির পূর্ব্বে তারিখ ও ডাকঘরের নাম ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থাও ডাক-টিকিটের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলন হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেষ্টায় কলিকাতা হইতে বহু দূর স্থানের সহিত পত্রাদি আদানপ্রদান ব্যবস্থা স্থাপিত হয়; কিন্তু কলিকাতার মধ্যে এক গলি হইতে অপর গলি পত্র যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রোজারী কোম্পানি তাহার ব্যবস্থা করেন। ৬ই জুন ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদূতে এইরূপ বিজ্ঞপ্তি আছে—গত ২৩শে মে তারিখে রোজারি কোম্পানি কলিকাতায় এক আনা মাশুলের ডাকঘর স্থাপনের বিষয় আপন সকল কথা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন; তাঁহারা কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে চিঠি বাঁটিয়া দিবেন। এক ভরি ওজন পর্য্যন্ত এক আনা মাশুল লাগিবে এবং এক অবধি দুই ভরি পর্য্যন্ত দুই আনা এবং দিনের মধ্যে তাঁহারা তিন বার চিঠি পাঠাইয়া দিবেন; প্রথম বণ্টন প্রাতঃকালে নয় ঘণ্টার সময়ে, দ্বিতীয় বণ্টন দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে, তৃতীয় বণ্টন অপরাহ্নের পাঁচ ঘণ্টার সময়ে হইবেক। ঐ সাহেব লোকেরা কেবল কলিকাতার মধ্যেই চিঠি প্রেরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু কলিকাতার আশ পাশ স্থানে যথা উত্তর দিকে চিৎপুর কাশীপুর প্রভৃতি চাণক পর্য্যন্ত। পূর্ব্বদিকে দমদমা ও নীলগঞ্জ পর্য্যন্ত। দক্ষিণদিকে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর ও ভবানীপুর পর্য্যন্ত, পশ্চিমদিকে হাবড়া সালিকা শিবপুর পর্য্যন্ত। কলিকাতার মধ্যে দিনে তিনবার তাঁহারা চিঠি প্রেরণ করিবেন এবং দমদমা প্রভৃতি স্থানে দিনে দুই বার। এই রীতির আরম্ভ গত ২ জুন সোমবার হইয়াছে।*

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপুরুষেরা পত্র লিখিলে তাহার জন্য কোন খরচ লওয়া হইত না। এই সুবিধা থাকায় তাঁহারা নিত্য বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যথেষ্ট পত্রের আদান প্রদান রাখিতেন। এই সময় ঐ প্রথা বন্ধ হইয়া কেবলমাত্র রাজকীয় পত্রাদির জন্য উক্ত নিয়ম বলবতী থাকিল এবং সর্ব্বসাধারণে রাজকীয় ডাক বিভাগের সাহায্যে রীতিমত পত্রাদি পাঠাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে রাজকীয় ডাক বিভাগের সাহায্যে সর্ব্বসাধারণের পত্রাদি পাঠাইবার নিষেধ না থাকিলেও সরকারী পত্র ভিন্ন অন্য পত্রাদি পাঠাইবার অসুবিধা ছিল। এই সময় কোন পত্রাদি পাঠাইতে হইলে দূরত্ব হিসাবে প্রতি তোলায় নিম্নলিখিতরূপ খরচ দিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির (ডাকঘর) কাছারী হইতে তাহা পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

২০ মাইল	/০ ;	৫০ মাইলে	৵০ ;	১০০ মাইলে	৶০ ;
১৫০ "	।০ ;	২০০ "	।/০ ;	২৫০ "	।৵০ ;
৩০০ "	।৶০ ;	৪০০ "	॥০ ;	৫০০ "	॥/০ ;
৬০০ "	॥৵০ ;	৭০০ "	॥৶০ ;	৮০০ "	৸০ ;
১০০০ "	৸৵০ ;	১২০০ "	৸৶০ ;	১৪০০ "	১৲

ছোট ছোট পার্শ্বেল বা মোড়ক—যাহা ভাঙ্গী ডাকের মারফৎ পাঠান হইত—সেই সকলের খরচ এইরূপ ছিল—প্রতি ৫০ তোলা বা ২০ আউন্সে ৫০ মাইল যাইতে ।৵০ আনা, তদতিরিক্ত প্রতি ৫০ মাইলে ৶০ আনা; এইরূপে ৩০০ মাইলের উর্দ্ধে যাইলে তখন প্রতি ১০০ মাইলে ৶০ আনা, ১২০০ মাইলে ২৸/০ এবং ১৪০০ মাইলে ৩৲ টাকা ধার্য্য হইত।

জেলাস্থ ডাক পথগুলি এই সময় স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী (District Officer) এবং করসংগ্রাহক (Collector)-গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত এবং প্রদেশস্থ প্রধান সহরের ডাক-অধ্যক্ষ (Post-master of the Presidency Town) প্রধান প্রধান ডাকপথে ডাক পরিচালন ও প্রদেশস্থ ডাকঘরগুলির কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সকল কারণে জমীদার ও ব্যবসায়ীদিগের প্রতিষ্ঠিত ডাকপ্রথা বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতঃপর কোম্পানী এক আইন দ্বারা বেসরকারী সমস্ত ডাকপ্রথা উঠাইয়া দিয়া নিজে ডাকের সর্ব্বস্বত্ব গ্রহণ করেন।

* ব্রজেন্দ্রবাবুর সংবাদপত্রে সেকালের কথা—প্রথম খণ্ড ১৮১৮—১৮৩০, পৃঃ ৩৯৭।

এই সময় কোম্পানির পিওনদিগকে একটি করিয়া থলি, কোম্পানির নামাঙ্কিত মোহর, বিশিষ্ট কোমরবন্ধ এবং ঘণ্টা দেওয়া হইত। যে সকল পিওন কলিকাতায় পত্র বিলি করিত তাহাদিগকে একটি করিয়া টুপীও দেওয়া হইত। তাহারা দুয়ারে দুয়ারে যাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া পত্র বিলি করিয়া ফিরিত। সে সময় পূর্ব্ববাঙ্গলা অঞ্চলে পত্র বিলি এমন দুরূহ ছিল যে সময় সময় পিওনদিগকে নৌকা লইয়াও দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানি বাৎসরিক ১৬০,০০০ পাউণ্ড খরচে ইংলণ্ড হইতে সুয়েজ, সিলোন, মাদ্রাজ, কলিকাতা হইয়া চীন পর্য্যন্ত ডাক বহন করিবার ৫ বৎসরের জন্য এক চুক্তি করেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী প্রত্যেক প্রদেশ হইতে একজন করিয়া অভিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী লইয়া তাঁহাদিগকে ডাক বিভাগের উন্নতি স্থাপনার্থ নিয়োজিত করেন ; ইহার ফলে যে সকল পত্রের ডাক মাশুল পূর্ব্বে অনাদায় থাকিত (Bearing) সেই সকলের উপর দ্বিগুণ খরচ আদায় ব্যবস্থা এবং একই মোড়কে (Envelope) দুই বা ততোধিক পত্র দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থাও বোধ হয় এই সময় আরম্ভ হয়। প্রথম মিরাট হইতে দিল্লী গাড়ী করিয়া ডাক যায় ; অতঃপর কলিকাতা হইতে কানপুর। ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ষ্টীমারে ডাক যায় ; তথা হইতে গোযানে দিল্লী যাইবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ইহা স্থায়ী হইতে পারে নাই। ভারতের সর্ব্বত্র মাত্র দুই পয়সা খরচে সিকি তোলা ওজনের একখানি পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা হয় এবং যাহাতে এই কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে তজ্জন্য ডিরেক্টর জেনার্লের হস্তে ইহার ভার ন্যস্ত হয়।

ইহাতে ডিরেক্টর জেনার্ল ভারতবর্ষ ও বর্ম্মাকে ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটির ভার এক একজন পোষ্টমাষ্টার জেনার্লের হস্তে অর্পণ করেন এবং নিজের সাহায্যের জন্য দুইজন ডেপুটী ডাইরেক্টর ও চারিজন এসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টার গ্রহণ করেন। ডাকঘরগুলির ভার প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টারদিগের উপর থাকিল।

এই সময় ডাকঘরগুলি বহু শাখা উপশাখায় বিভক্ত ছিল। প্রধান ডাকঘরগুলি সহর অঞ্চলে স্থাপিত ছিল। প্রেসিডেন্সি পোষ্টমাষ্টার মহাশয়েরা ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন ; শাখাগুলির তত্ত্বাবধানের ভারও ইঁহাদের উপর ছিল। এককথায় ইঁহারা ছিলেন ইন্সপেক্টর অফ দি পোষ্ট অফিসেস্ এবং পোষ্টমাষ্টার জেনার্লরা সুপারিটেণ্ডেণ্ট অফ দি পোষ্ট অফিসেস। উপশাখাগুলি গ্রাম্য শিক্ষক, দোকানদার ইত্যাদির পরিচালনায় থাকিত। এতৎব্যতীত আর এক নিম্নস্তরের শাখা ছিল ; যে সকল স্থান হইতে সপ্তাহে ৫।৭খানি পত্র আদান প্রদান হইত সেই সকল স্থানে হরকরারা সপ্তাহ বা ১৫ দিনে একবার যাইয়া ডাক বিলি এবং সংগ্রহ করিয়া আনিত। শেষোক্ত শাখার কার্য্য সাধারণতঃ হাট-বাজারের দিনে হইত। যে সকল স্থান হাটবাজার হইতেও বহু দূরে অবস্থিত, সেই সকল নিভৃত অরণ্য-অঞ্চলেও হরকরা যাইয়া ভেঁপু বাজাইয়া সাধারণের নিকট তাহার পৌঁছান সংবাদ জ্ঞাপন করিত। তাহা হইলে সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিত। অতঃপর হরকরারা যাহার যাহার পত্র থাকিত তাহা বিলি করিয়া কাহার কোন পত্র পাঠাইবার থাকিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিত।

এই সময় হরকরারা ঝড়, জল, রৌদ্র ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া পাহাড় ডিঙ্গাইয়া, নদনদী সাঁতরাইয়া, বন্ধুর জঙ্গলাকীর্ণ কর্দ্দমময় পথ ভাঙ্গিয়া, মরু পার হইয়া কি ভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া রাজার জন্য দেশের জন্য চীনের সীমান্ত ভামো হইতে বেলুচীস্থানের কোয়েটা পর্য্যন্ত ৩০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পত্রাদি বহন করিয়াছে তাহা নিম্নের চার পংক্তি কবিতাটীতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

> Is the torrent in spate? He must
> ford it or swim.
> Has the rain wrecked the road? He
> must climb by the cliff.
> The service admits not a but, nor an if,
> While the breaths in the mouth, he
> must bear without fail.
> In the name of Emperor—the Over-
> land mail.
>
> Kipling.

এই কার্য্যে কত শত হরকরা বজ্রাঘাতে, হিমপাতে, সর্দ্দি-গর্ম্মিতে, বন্যায়, পাহাড় ধ্বসায়, দস্যুর উৎপীড়নে এবং ব্যাঘ্রসর্পাদি বন্যজন্তুর কবলে প্রাণ হারাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

(ক্রমশঃ)

স্যার ইন্দ্রনাথ

মণি বাগচি

এমন এক একজন লোক সময় সময় পৃথিবীতে আসে যে, বিধাতার সমস্ত বিধান অগ্রাহ্য কোরে নিজেকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করে অর্থাৎ—জন্মের পরও সে আবার নতুনভাবে, তার রুচিমত আর এক জন্ম পরিগ্রহ করে।

স্যার ইন্দ্রনাথ এমনি একজন স্বয়ংজন্মা মানুষ।

সহরের লোককে যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো, তারা কখনও স্যার ইন্দ্রনাথকে দেখেছে কিনা, তা হোলে নিশ্চয়ই তারা বল্‌বে—হ্যাঁ, অনেকবার এবং তাঁকে আমরা ভালো রকমেই জানি। তিনি কি রকম লোক?—অকুণ্ঠভাবেই তারা জবাব দেবে—ধুরন্ধর, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু··। আবার কেউ হয়তো বলবে—অসাধারণ, অদ্ভুত তাঁর ব্রেণ, আর অসামান্য ব্যবসাবুদ্ধি · এ লাইনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এতেও সন্তুষ্ট না হোয়ে, স্যার ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যদি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করো, এমনি ধরণের আরও অনেক কথাই তাঁর বিষয়ে তুমি শুনতে পাবে। কিন্তু স্যার ইন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে পারে এমন একজন লোকও তুমি খুঁজে পাবেনা।

স্যার ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনসাধারণের এই রকম উক্তি ও অত্যুক্তি শুনে মনে হয়, এই কলকাতা সহরে তিনি যে, একজন অসাধারণ লোক—এ কথা যখন তারা বলে, তারা সত্যি কথাই বলে।

এ হেন সর্ব্বজন-বিদিত ধুরন্ধর লোকটি সম্বন্ধে প্রথম এবং প্রধান কথা এই যে, স্যার ইন্দ্রনাথ তাঁর আসল নাম নয়। এই দিগ্বিজয়ী নাম নিয়ে এই সংসারে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর বাপের পদবী ছিল সরকার এবং তাঁর নাম রাখা হয় অবিনাশ সরকার। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বসিরহাটে এই অবিনাশ সরকার নামেই তিনি লালিতপালিত হোয়েছিলেন। বসিরহাটের স্কুলেই অবিনাশ কিছু লেখা-পড়া করে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে, বাপের অবস্থা তেমন ভালো নয়, কাজেই শ্রীমান অবিনাশকে সেই স্কুলে-পড়া বয়সেই বসিরহাটের একটা ছোট্ট কারবারে বেয়ারার কাজ করতে হ'য়েছিল—বেয়ারা থেকে কেরাণী। কিন্তু অবিনাশ ছিল অধ্যবসায়ী এবং উদ্যোগী ছেলে। সেই কারবারের এক সাহেবকে ধ'রে তার কাছে রাত্রে সে পড়তো—খবরটা কেউ জানতনা। কিন্তু ক্ষুদ্র বসিরহাট সাবডিভিসনের অনেকেই সেদিন রীতিমত আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলো যখন তারা জান্‌লো—হাড্‌সন্ ফার্ম্মের সামান্য কেরাণী অবিনাশ আর সামান্য নয়, একেবারে এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট সে। প্রথমটায় কেউ বিশ্বাস করেনি, পরে অবশ্য আর কারো সে সন্দেহ হয়নি। দেশের ইংরেজম্যানদের কাছে অবিনাশ হোয়ে উঠ্‌লো একেবারে আদর্শ যুবক। বেশী কথা বলেনা, শান্তপ্রকৃতি অথচ সিরীয়স্।

তার পর সেই সাহেবের সুপারিশের জোরে, বসিরহাটের কাছাকাছি একটা কো-অপারেটিভ্ ফার্ম্মে বেশ মোটা মাইনের চাকরী পেয়ে গেলো অবিনাশ। শুধু তাই নয়, সরকারী কোয়ার্টারও পেলো সেখানে থাকবার জন্য। ভালো চাকরী আর নিরিবিলি কোয়ার্টার পেয়ে অবিনাশ তখন তার পছন্দমত একটি মেয়েকে বিয়েও কোরে ফেল্‌লে। স্ত্রীর নাম ছিল শ্রীমতী চপলা। সাদাসিধে গো-বেচারা ধরণের মেয়ে; মস্তিষ্ক বোলে পদার্থ কিছু তার মধ্যে না থাক্‌লেও অবিনাশকে সে ভালোবাস্‌তো খুবই। দু'টী প্রাণীর সংসার; শান্তি ছিল, সুখও ছিল। পাঁচ বছর অন্তর অবিনাশের মাইনে বাড়তো। চাকরীর দিক দিয়ে ভবিষ্যতে খুব বড়-লোক হবার উপায় না থাক, কোনো উদ্বেগ ছিলনা অবিনাশের। আপিসের কাজে তার যত্ন ছিল অখণ্ড, আর পত্নী-পরিচর্য্যায় সে ছিল উদার। উদার বল্‌তেই হবে, কেননা মাসের শেষে মাইনের সমস্ত টাকা সে তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিতো। ফুলের বাগান আর খবরের কাগজ—এ ছাড়া অবিনাশের আর কোনো বিলাসিতা ছিলনা। কিছুকাল পরে, সে তার স্ত্রীকে দু'টী পুত্র-সন্তানও উপহার দিয়েছিল। তবু সেই দীর্ঘ সাত বছরের একটানা দাম্পত্যজীবনের মধ্যে অবিনাশ একটি দিনের জন্যেও তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে পারেনি। সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীকে যেভাবে বিশ্বাস কোরে থাকে, সে বিশ্বাসের কথা বল্‌ছিনে। এদিক দিয়ে সে ছিল আদর্শ স্বামী। কিন্তু তার মনের কথা, জীবন সম্বন্ধে তার সব অদ্ভুত ধারণা, অবিনাশ একদিনও স্ত্রীকে খুলে বলেনি। অবশ্য চপলা তার জন্যে কোনো অনুযোগ করতোনা স্বামীর কাছে। সংসারের ধান্দা, ছেলে দুটীকে মানুষ করা আর স্বামীর যত্ন করা—চপলা এই নিয়েই চব্বিশঘণ্টা কাটাতো।

যাই হোক, শুধু যে নিজের স্ত্রী তা নয়, বাইরের কারও সঙ্গেই অবিনাশ কখনও মন খুলে মিশতনা, কথা বলতনা। দেমাক নয়, তার স্বভাবই ঐ রকম বরাবর। সে যে কি ভাব্‌তো আর না ভাব্‌তো, এ জানবার উপায় ছিলনা কারও। এর কারণ আর কিছুই নয়, বাইরের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে তার মনের চিন্তার তফাৎটা এত বেশী ছিল যে তা নিয়ে অবিনাশ কারও সঙ্গে আলোচনা করতে ভরসা পেতনা। নিজে সে স্পষ্টই বুঝ্‌তো—বাইরের অবিনাশ আর ভেতরের অবিনাশ, এ দু'টো একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা লোক। যে সাত বছর সে চাকরীতে ছিলো একটা নিরুদ্ধ আক্রোশ সব সময়েই অবিনাশের মনের মধ্যে ভীষণভাবে ঘুরপাক খেতো। অবিনাশের তাই এক এক সময় মনে হোতো····· কে যেন আমাকে দাবিয়ে রেখেছে; আমার যোগ্যতা এর চেয়ে অনেক বেশী। এখন মাসে পাই একশো টাকা, কিন্তু পাওয়া

উচিত এর দু'শোগুণ বেশী। দশ বছর বাদে হয়তো তিনশ' পাবো,... কিন্তু তখনও ত এইটুকুর মধ্যেই আমাকে দিন কাটাতে হবে, এই বাঁধা মাইনের গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার ত উপায় নেই। আমার বিশ্বাস, নগদ টাকা কিছু যদি হাতে পাই, ভবিষ্যতে অনেক কিছু করতে পারি। যেমন কোরেই হোক, আমার দরকার এখন কিছু টাকা, টাকা, টাকা।

অবিনাশের মাথায় এই চিন্তা যখন দিনরাত ঘুরপাক খাচ্ছে, ঠিক সেই সময় একদিন খবর এলো, চপলার দাদামশাই মারা গেছে। সেই খবরের সঙ্গে আরও একটু খবর ছিলো ; বুড়ো নগদ পাঁচ হাজার টাকা তার এই নাত্‌নীর নামেই উইল কোরে গিয়েছে। চপলার কাছে নয়, অবিনাশের কাছে এটা একটা দারুণ অপ্রত্যাশিত সংবাদ। প্রথমে ঠিক ছিল টাকাটা পেলে পরে সুদে খাটানো হবে। তার পর চপলার মত বদ্‌লে যায়। নিজের বল্‌তে পারে এমন একটা বাড়ী তাদের চাই। স্ত্রীর সম্পত্তিতে অবিনাশ কখনও আগ্রহ দেখায়নি বা একটা বাড়ী কেনা উচিত কিনা, এ নিয়ে কোনো মন্তব্যও সে প্রকাশ করেনি এতদিন। কিন্তু খবরটা যখন পাকাপাকি এলো, তখন অবিনাশ একদিন চপলাকে বল্‌লে—এইবার একদিন কোর্টে গিয়ে উইলটা মঞ্জুর কোরে নিয়ে এসো। টাকাটা হাতে এলে পরে, দুজনে মিলে পছন্দ করে একটা বাড়ী কেনা যাবে, কি বলো ?

—বাড়ী আমার পছন্দ করাই আছে—চপলা বল্‌লো হেসে।

—কোন্‌টা ?

—কাছারীর কাছে লাল রংয়ের সেই ছোট্ট দুতলা বাড়ীটা।

যথাসময়ে টাকাটা চপলার হাতে এলো। লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে একদিন রেখে দিয়ে, পরের দিন হাজার টাকার পাঁচখানা নোট স্বামীর হাতে চপলা তুলে দিলো। বল্‌লো—এখন ডাকঘরে রেখে দাও তোমার নামে। ধীরে সুস্থিরে কেনা যাবে।

এই সুবর্ণ সুযোগেরই অপেক্ষায় অবিনাশ ছিল এতদিন। নোট পাঁচখানা পকেটে পুরে অবিনাশ সেদিন সকাল দশটায় বাড়ী থেকে বেরুলো। পোষ্ট আপিসের দিকে সে গেলনা, গেলো সোজা ষ্টেশনের দিকে। বসিরহাটের লোকের সঙ্গে অবিনাশ সরকারের সেই শেষ দেখা।

অবিনাশের স্ত্রী ইচ্ছে করলে পরে অবিনাশকে অবশ্য আরও দেখা যেতে পারতো। কিন্তু চপলা তা করেনি ; পাড়ার পাঁচজন লোক এবং পুলিশের প্ররোচনাতে সে কিছুতেই স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা আন্‌তে রাজী হয়নি। এটা যেন নিছক একটা পারিবারিক ব্যাপার তার কাছে।

স্বামীর ওপর বিশ্বাস ছিল অগাধ। চপলা তাই মনে কোরেছিল, অবিনাশ নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবে এবং একটা মানুষের মতো মানুষ হোয়েই ফিরে আসবে। বছর দশ বাদে, মারা যাবার দিনটি পর্য্যন্ত চপলার এই বিশ্বাস অটুট ছিলো।

অবিনাশ চলে যাবার পর, সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে চপলা তার মার কাছে এলো ছেলে দু'টিকে সঙ্গে নিয়ে। ভালো ক'রে এদের মানুষ করাই তার এখন কাজ হোয়ে দাঁড়ালো। বাপের মতো ক'রে গ'ড়ে তুলবে এই আশায় সে বেঁচে রইলো। অবিনাশ যেন ফিরে এসে এদিক দিয়ে চপলার এতটুকু ত্রুটী দেখ্‌তে না পায়। কিন্তু বরাতে তখন তার ভাঙন সুরু হোয়েছে। তাই এগারো বছর বয়সে সাতদিনের জ্বরে চপলার ছোটো ছেলেটি মারা গেলো। টানটা ছিল এরই ওপর বেশী, তাই এত বড় শোক সহ্য কোরে বেঁচে থাকা চপলার পক্ষে কঠিন হলো। এর মাসখানেক বাদেই সে মারা যায়। বাবা নিরুদ্দেশ, মা নেই, ভাই নেই—বড় ছেলেটি আর থাক্‌বে কার মুখ চেয়ে। একদিন সন্ধ্যের পর তাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। একমাস দুমাস ক'রে এক বছর কেটে গেলো, তার উদ্দেশ আর মিলল না। পাড়ার লোক সিদ্ধান্ত করলো—মারা গিয়েছে।

বসিরহাটে অবিনাশ-পরিবারের এইখানেই যবনিকা।

* * * *

ইতিমধ্যে, ইন্দ্রনাথ রায় এই নামে অবিনাশ সরকার দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ কোরেছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই তার মনে হোলো—তার ধারণাই ঠিক ; কিছু টাকারই তার দরকার ছিল এতদিন। কোলকাতায় পৌঁছেই—সে যে বসিরহাটের অবিনাশ সরকার, তার স্ত্রী আছে, দু'টী ছেলে—এসব ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে তার মন থেকে মুছে গেলো। এই নামের কেউ যে একদিন ছিলো, তা সে পরিষ্কারভাবেই ভুলে গেলো। কোলকাতার মাটিতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই অবিনাশের অতীত জীবনের খোলস থেকে একেবারে বেরিয়ে এলো—ইন্দ্রনাথ রায়, Seller of quack remedies। ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন প্রসন্ন। কোলকাতায় তখন যুদ্ধের বাজার। ইন্দ্রনাথের কারবারী মস্তিষ্ক তার সুযোগ নিলো ষোলো আনা। মাস ছয়েক বাদেই সহরের বুকে মেসার্স রায় এণ্ড কোম্পানীর প্রকাণ্ড আফিস বস্‌লো।

এর পরের কাহিনী অতি সুদীর্ঘ। ল্যাণ্ড স্পেকুলেশন্ থেকে সুরু কোরে শেষ পর্য্যন্ত কিভাবে ইন্দ্রনাথ কলকাতার তখনকার প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কার রমাপতি বসুকে পথে বসিয়ে নিজে লক্ষপতি হোয়ে উঠলেন, আমাদের গল্পের পক্ষে তা একেবারেই অনাবশ্যক। তারও পাঁচ বছর বাদে ইন্দ্রনাথ যেদিন স্যার ইন্দ্রনাথ হোলেন, তখন প্রায় সমস্ত ব্যাঙ্কের ওপর দিয়ে তাঁর চলাফেরা। ফাইনান্সার এবং বিজ্‌নেস-ম্যাগ্‌নেট্ হিসেবে স্যার ইন্দ্রনাথের নাম তখন লণ্ডনের শেয়ার মার্কেটেও অপরিচিত নয়।

বড়লোক হোয়ে স্যার ইন্দ্রনাথ স্ত্রীর আর খোঁজখবর নেননি বা সে বেঁচে থাকতে তাকে বেনামে কখনও টাকাকড়িও পাঠান নি। সে দুর্ব্বলতা তাঁর ছিল না। তবে স্ত্রী ও ছোটো ছেলেটির মৃত্যুর খবরটা কোনো রকমে যোগাড় ক'রে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হোয়েছিলেন। তার কিছুদিন বাদে বড় ছেলেটির সম্বন্ধে ঐ রকম একটা খবর পেয়ে স্যার ইন্দ্রনাথ একেবারে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। অতীত তা হ'লে সত্যিই একেবারে মুছে গেলো ; জীবনের পটভূমিকায় অবিনাশ সরকারের কোনো চিহ্নই থাক্‌লো না। এখন তিনি সত্যিই স্যার ইন্দ্রনাথ !

চৌরঙ্গীতে লোহার গেটওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ী ; দারোয়ান, বাবুর্চ্চি,

বয়, বেয়ারা আর মোসাহেবের দল; একপাল এ্যালসেসিয়ান ও স্প্যানিয়েল কুকুর; ছ'খানা দামী গাড়ী—এই সবের অন্তরালে থেকে স্যার ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অবিনাশ সরকারের আর কোনওদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে স্যার ইন্দ্রনাথ সোনার স্বপ্ন দেখ্‌তেন আর খেয়াল মতো ব্যাচিলার জীবনের রোমান্স্‌ উপভোগ করতেন।

কিন্তু সেই অবিনাশ সরকারের সঙ্গে এই স্যার ইন্দ্রনাথের একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই দেখা হ'য়ে গেলো। তিনি তখন তাঁর জীবনের মধ্যপথে এবং খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে। গল্প আমাদের সেইখান থেকেই।

অপরিমিত ধন-সঞ্চয়ের একটা পরিশ্রম আছে—আর আছে সেই পরিশ্রমের দরুণ একরকমের মানসিক অবসাদ-বোধ। এমনি অবসাদের এক অলস মুহূর্ত্তে স্যার ইন্দ্রনাথের প্রয়োজন হোলো বিশ্রামের। বছরে এক-মাস কোরে সিমলা-দার্জ্জিলিঙ্‌ত বাঁধা আছেই। কিন্তু এবার যেন বড্ড ক্লান্ত বোধ করলেন তিনি নিজেকে; ঠিক করলেন অন্ততঃ তিন মাসের জন্ত রেসট্‌ নেবেন। ভিয়েনা যাওয়া সাব্যস্ত হলো, পথে বোম্বাইতে সাত দিনের জন্তে হল্ট করবেন্‌। কিন্তু স্যার ইন্দ্রনাথের মত বড় লোকের পক্ষে বিশ্রামের যা প্রধান উপকরণ তাই তাঁর একান্ত অভাব। সুদূর ইউরোপ যাত্রায় সঙ্গে যদি একটি সঙ্গিনী না থাকে, তবে মনের অবসাদ ঘোচে কি ক'রে? অনেক চেষ্টার পর সুচিত্রা রায়ের খোঁজ পাওয়া গেলো। বাংলার ছায়ালোকের সে একজন উদীয়মানা অভিনেত্রী। রূপসী ত বটেই, তাছাড়া অভিজাত বংশের সে মেয়ে। অন্ততঃ বাজারে তাই গুজব। অনেক টাকায় রফার পর সুচিত্রা রাজী হোলো। এ ছাড়া আর একটা জিনিস তাঁর সঙ্গে গেলো—রোলস্‌ রয়েস্‌।

ক্রমে যাবার দিন এগিয়ে এলো। নাগরিকদের তরফ থেকে স্যার ইন্দ্রনাথকে সাড়ম্বরে বিদায় অভিনন্দন জানানো হলো। দেহ-মনে সুস্থ হোয়ে তিনি ফিরে আসুন এই তারা কামনা করলো সর্ব্বান্তঃকরণে।

* * * * *

তাজমহল হোটেলের দরজায় সেদিন সকালে স্যার ইন্দ্রনাথের কালো রোলস্‌খানা যখন এসে দাঁড়ালো, তখন তাঁর সঙ্গে তন্বী সুচিত্রাকে দেখে হোটেলের কেউ অবশ্য অবাক হোলো না। স্যার ইন্দ্রনাথকে তারা চেনে। যতবার তিনি এই হোটেলের আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছেন ততবারই এই রকম একজন সঙ্গিনীকে তাঁর সঙ্গে দেখা গিয়েছে। তবে এইবারেরটি যেন আগের সকলের চেয়ে সুন্দরী।

তাজমহলে স্যার ইন্দ্রনাথের জন্তে সব সময়েই একটা ফ্ল্যাট ঠিক করা থাকে। দামী দামী ফার্ণিচার ইত্যাদি দিয়ে সে ফ্ল্যাট সাজানো। দেশ-বিদেশের ঐশ্বর্য্যের ওপর দিয়ে এমন অক্লেশে যাওয়া-আসা সুচিত্রার মত মেয়ের কল্পনার বাইরে। তবু দু'রাত্রি কাটবার পর ধনকুবের স্যার ইন্দ্রনাথের সঙ্গ একেবারে অসহ্য বোধ হলো সুচিত্রার। কেন, তা কেউ জানে না। তিন দিনের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সুচিত্রা চ'লে গেলো। স্যার ইন্দ্রনাথ তখনও ঘুমিয়ে।

কাগজের প্রথম পাতার বা বড় বড় কোম্পানীর ডাইরেক্টারের তালিকার শীর্ষদেশে স্যার ইন্দ্রনাথের নাম দেখ্‌তে যারা অভ্যস্ত, তারা সেদিন সকালে সত্ত ঘুম থেকে ওঠা স্যার ইন্দ্রনাথকে একবার যদি দেখ্‌তে পেতো তা হোলে বিস্মিত না হোয়ে পারত না। অমন পুরুষত্ব-ব্যঞ্জক চেহারা, গম্ভীর প্রকৃতি স্যার ইন্দ্রনাথ যখন জানতে পারলেন সুচিত্রা চ'লে গিয়েছে তখন তাঁর সমস্ত দাম্ভিক প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তে উদ্দাম হোয়ে উঠ্‌লো যেন। প্রথমটায় তিনি অবশ্য বিশ্বাসই করতে চাননি—সুচিত্রা সত্যিই চ'লে গিয়েছে। বাংলা দেশ থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত রিজার্ভ করা প্রথম শ্রেণীর অমন রাজকীয় আরাম উপভোগ করতে করতে যে মেয়ে তাঁর সঙ্গে এলো এবং আসবার সময়ে যার পরিচ্ছদ ও প্রসাধনে স্যার ইন্দ্রনাথ এককথায় দু'হাজার টাকা খরচ করলেন, সে যে সত্যিই চলে যাবে—একথা কেই বা বিশ্বাস করতে পারে? কিন্তু হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে সঠিক খবর পেয়ে তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত এটা বিশ্বাস করতে হ'লো এবং প্রতিকারের কোনো উপায় না থাকায় ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে হজমও করতে হলো।

আহত-পৌরুষ স্যার ইন্দ্রনাথ পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষিপ্ত হোয়ে উঠ্‌লেন। তখুনি সোজা তাঁর বেড-রুমে এসে তাণ্ডব সুরু ক'রে দিলেন। সাফল্যের দীপ্তিতে যে মুখ সর্ব্বদাই উজ্জ্বল তা যেন সহসা পাংশুবর্ণ হোয়ে উঠ্‌লো। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁর সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে ফুল্‌তে লাগ্‌লো; ঘাড়ের পেশীগুলো কুঞ্চিত হোয়ে উঠ্‌লো। লোমশ হাত দু'খানা মুঠো কোরে, আহত ক্রুদ্ধ পশুর মতো খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে তিনি দাপাদাপি করতে লাগ্‌লেন। তারপর টেবিলের কাছে এসে, হাতের সামনে যা পেলেন একে একে তাই তুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, পা দিয়ে এটা সেটা জোরে কিক্‌ করতে সুরু করলেন।

মেজাজের ওপর দিয়ে এই রকম প্রবল ঝড় বোয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরে স্যার ইন্দ্রনাথ একটু শান্ত হলেন। সোফায় ব'সে আছেন। অবসন্ন শরীর, মনটাও তিক্ত। সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে মাত্র একটিবারের জন্তে চপলার কথা তাঁর মনে পড়লো…এক সেকেণ্ড কি দু' সেকেণ্ড—অতি অস্পষ্ট আবছায়া, যেন কোনো স্বপ্নে-দেখা, ভুলে যাওয়া মুখ।

—যাক্‌ গে, তাতে আর কি হোয়েছে—এই ভেবে স্যার ইন্দ্রনাথ সুচিত্রার ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে নিলেন তাঁর কাছে।—ভালই হোলো; মেয়ে মানুষকে আমি বিশ্বাস করিনে, এই ব'লে ক্ষুদ্ধ মনকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন।

সারাদিন তিনি আর ঘর থেকে বেরুলেন না। সেইখানেই সেদিনের মতো লাঞ্চ্‌ খেলেন। সন্ধ্যার দিকে স্যার ইন্দ্রনাথ আবার তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন। সুচিত্রা বোলে কোনো মেয়ে তাঁর সঙ্গে এসেছিল—সে কথা ভুলেই গেলেন একেবারে। অতীতকে এইভাবে নিঃশেষে ভুলে যাবার ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম। এই ক্ষমতার বলেই ত আজ তিনি স্বনাম-ধন্ত পুরুষ স্যার ইন্দ্রনাথ!

ড্রাইভারকে গাড়ী রেডি করবার হুকুম দিয়ে স্যার ইন্দ্রনাথ যথাসময়ে তাঁর ইভ্‌নিং স্যুট্‌ পরলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ব্যাক্‌ব্রাস্‌ করতে করতে তিনি অনেকটা সহজ হোয়ে উঠ্‌লেন। ফিরে এলো

তাঁর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য আর কঠিন ব্যক্তিত্ব। সিঁড়ি দিয়ে নেমে হল পার হবার সময়, ম্যানেজার থেকে আরম্ভ ক'রে হোটেলের বয়-বেয়ারা সব তাঁকে অভিবাদন জানায়। কোনো দিকে না তাকিয়ে ঐশ্বর্য্যবান ও সুপুরুষ স্যার ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে এসে তাঁর গাড়ীর আরামদায়ক সীটের ওপর উঠে বসলেন।

গাড়ী চললো মালাবার হিলস্-এর দিকে।

নীচেয় গাড়ী রেখে স্যার ইন্দ্রনাথ ওপরে উঠতে আরম্ভ করলেন। বোম্বের এই যায়গাটি তাঁর কাছে সব চেয়ে ভালো লাগে। আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে, দু'ধারে অজস্র তরুণ-তরুণীর মেলা আর ফুলের রঙ দেখতে দেখতে তিনি চ'লেছেন একমনে। সন্ধ্যে হ'লেও হিলের ওপরটা বেশ আলোকিত। দূরে সমুদ্রের নীলরেখা দিগন্তে মিশে আছে, হিলের ঠিক নীচে সমুদ্রের অগভীর উপকূল। আর ক'দিন বাদেই এই সমুদ্র তিনি পাড়ি দেবেন, মনে মনে একবার ভাবলেন স্যার ইন্দ্রনাথ। চারদিকে কলগুঞ্জন, টুকরো টুকরো হাসির পান্না এদিক-ওদিকে ছিটকে পড়ছে। এই বিপুল জনারণ্যে তিনি যেন একা—সহসা তাঁর মনে হোলো—আশে পাশের জনতা থেকে তিনি যেন অসম্ভব আলাদা; তাঁর এই সম্পূর্ণ একাকিত্ব এখানকার এই তরল আবহাওয়ার সঙ্গে ভালোরকমে খাপ খাচ্ছে না যেন। চলতে চলতে তিনি ভাবেন—এই ভালো, এই-ই তাঁর বৈশিষ্ট্য; নইলে কিসে তিনি স্যার ইন্দ্রনাথ!

হিলের সব চেয়ে নিরিবিলি কোণটার দিকে তিনি এগিয়ে চলেছেন। খানিকদূর যাবার পর তাঁর চলার গতি একটু যেন শ্লথ হোয়ে এল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখেন—একটা লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। মাটির ওপর দৃষ্টি রেখে একমনে সে হাঁটছে, সঙ্গে আর কেউ নেই। অনেকটা কাছাকাছি এসে স্যার ইন্দ্রনাথ স্পষ্টই দেখতে পেলেন—লোকটাকে দেখতে তাঁরই মতো উঁচু। নিজের চিন্তায় সে যেন হারিয়ে গিয়েছে। পাশ দিয়ে যখন সে চলে গেলো, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার লোকটার মুখের দিকে তাকালেন স্যার ইন্দ্রনাথ; সবটা দেখা গেল না। তবু এক সেকেণ্ডের জন্য তার বিষয়ে একটু ভেবে দেখলেন···নিশ্চয়ই ও মুখ আমার চেনা, কোথায় যেন দেখেছি আগে।

লোকটাকে আর দেখা যায় না। স্যার ইন্দ্রনাথ আবার হাঁটতে সুরু করলেন! এখুনি যে কাউকে তিনি দেখেছেন, তা আর মনে রইলো না তাঁর। ঘণ্টাখানেক বেড়াবার পর স্যার ইন্দ্রনাথ হোটেলে ফিরে এলেন।

ডিনারের সময় এলো। হোটেলের ডিনার হলে আজ তিনি খাবেন। তখনও বেশী লোক হয় নি। ডিনার স্যুটে স্যার ইন্দ্রনাথ এলেন। কোণের দিকের একটা ছোটো টেবিল বেছে নিলেন। পূর্ব্ব পরিচিত দু'একজনের সঙ্গে দু'চারটে কথাও বললেন নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিতে—যে ভঙ্গির জন্যে স্যার ইন্দ্রনাথ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন হলের আর এক প্রান্তে একটি লোক একাকী ব'সে ডিনার খাচ্ছে। ভালো ক'রে তার দিকে চাইলেন। হাতের কাঁটা চামচে হাতেই রয়েছে, স্যার ইন্দ্রনাথ হাঁ ক'রে লোকটার পানে চেয়ে আছেন······হ্যাঁ, একেই ত আজ সন্ধ্যেয় মালাবার হিলের বাগানে দেখেছেন। আশ্চর্য্য, লোকটার মুখখানা অবিকল তাঁরই মুখের মতো। চুপচাপ খাচ্ছে ব'সে; চেহারাটা চটকদার না হলেও বেশ একটা স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য তার মুখে—আর কঠিন অভিপ্রায় তার দুই চোখে।

ডিনারের পর আর সকলের মতো স্যার ইন্দ্রনাথও লাউঞ্জে এসে বসলেন। এটাও তাঁর ব্যতিক্রম। তা হোক, মনটা আজ খুব ভালো আছে ব'লেই প্রাত্যহিক অভ্যাসের দু'একটা ব্যতিক্রমে তিনি যেন খুসীই হোয়ে উঠছেন আরো। লাউঞ্জে এসে তাঁর একবার মনে হলো, অপরিচিত ঐ লোকটি নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে আসবে এই সুযোগে। এ রকম কত লোকই না এ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে ধন্য হ'য়েছে।

চুপ ক'রে ব'সে আছেন স্যার ইন্দ্রনাথ। এক দুই ক'রে দশ মিনিট কেটে গেল।...না, লোকটি এলনা তা হ'লে। শূন্যমনে সমুদ্রের কালো জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে স্যার ইন্দ্রনাথ একবার কি যেন ভাববার চেষ্টা করলেন। তারপর পকেট থেকে ছোট নোট বুকখানা বের কোরে কালকের এনগেজমেন্টের তালিকার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। ছোটোখাটোগুলো বাতিল কোরে দিয়ে কালকের সবচেয়ে যেটা জরুরী এনগেজমেন্ট সেটার পাশে একটা দাগ দিয়ে রাখলেন। রাত অনেক হয়ে এলো, শরীরও ক্লান্ত। স্যার ইন্দ্রনাথ তখুনি নিঃশব্দে রিটায়ার করলেন।

*　　*　　*　　*

পরের দিন সকাল বেলা। বাথরুমে গিয়ে স্যার ইন্দ্রনাথ সেভিং সুরু করলেন। ব্রাসে সেভিং ক্রীম লাগিয়ে সেটা গালে দেবার আগে আয়নার দিকে একবার তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে ব্রাসটা ঘষতে লাগলেন গালের দু'ধারে। হঠাৎ, কি মনে হলো, ব্রাসটা নামিয়ে রেখে আয়নায় নিজের মুখখানার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। সে দৃষ্টি কঠিন, বিশ্লেষণের দৃষ্টি।

ঠিক সেই সময় নিদারুণ রিক্ততা এলো তাঁর ভেতরে; কাতর হোয়ে উঠলো তাঁর সমস্ত শরীর। এ অভিজ্ঞতা অবশ্য আজ নতুন কিছু নয়।

সাময়িক এই দুর্ব্বলতা। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে সামলে নিলেন স্যার ইন্দ্রনাথ। ভাবলেন—একজনকে কি আর একজনের মত দেখতে হয় না? এক চেহারার মানুষ ত কতই দেখা যায় পৃথিবীতে। চেহারার মিল থাকে বটে, কিন্তু সম্বন্ধের ব্যবধান থাকে অনেক। আয়নার আরও কাছে মুখটাকে এগিয়ে নিয়ে এসে ধরলেন। খুব ভালো করে একবার চেয়ে দেখলেন প্রতিবিম্বটার দিকে। পলকহীন দৃষ্টিতে মুখের প্রত্যেকটি কোণ, প্রত্যেকটি খাঁজ দেখছেন স্যার ইন্দ্রনাথ আর সঙ্গে সঙ্গে কালকের সেই লোকটির মুখখানা স্মরণে আনবার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, আশ্চর্য্য মিল, ভাবলেন তিনি, আর আশ্চর্য্য তফাৎ। দেখতে আমারই মতো, মনে মনে বললেন, কিন্তু স্যার ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তার কই? তেমন দৃঢ়তা কই, জীবনের ওপর এমন নিশ্চিত অধিকার কই—এ সব কিছুই নেই তার। চোখ দু'টো ঠিক আমারই মতো, কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি কি এই চোখের দৃষ্টির মতো? কখনই নয়। নাক? হ্যাঁ,

নাকটা অবিকল আমারই মত, কিন্তু এ রকম বলিষ্ঠ কি? মুখটাও মেলে অনেকটা, তবু অতি সাধারণ সে মুখ, ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র ছাপ নেই সেখানে।

তফাৎ আর মিলের এই রকম মন-গড়া হিসেব করতে করতে স্যার ইন্দ্রনাথ একটু নিশ্চিন্ত হ'লেন। নিজের ওপর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌লো। সুন্দরভাবে সেভ্‌ কোরে, নিপুণভাবে পরিচ্ছদ প'রে নীচেয় ব্রেকফাষ্ট খেতে নাম্‌লেন স্যার ইন্দ্রনাথ।

নামবার সময়, কি কৌতূহল হোলো, লোকটির পরিচয় জানতে হোটেলের আপিসের দিকে একবার গেলেন। স্যার ইন্দ্রনাথের অহঙ্কার, তাঁর গাম্ভীর্য্য ম্যানেজারের জানা। তাই একটি সাধারণ লোকের সম্বন্ধে তাঁর এই অসাধারণ আগ্রহ দেখে সে একটু বিস্মিত হলো।

—ভদ্রলোক কোলকাতা থেকে আস্‌ছেন—সঙ্কোচের সঙ্গে ম্যানেজার বললে।

—কি নাম?

—মিঃ সরকার।

—হোয়াট্‌ সরকার? প্রশ্ন ত নয়, যেন একটা হুমকী।

—মিঃ এ সরকার।

—থ্যাঙ্ক্‌ ইউ—এই বলে স্যার ইন্দ্রনাথ সেখান থেকে চ'লে এলেন। আবার সেই রিক্ততা-বোধ তাঁর মনের এক কোণ থেকে আর এক কোণে ঝিলিক মেরে গেলো।

তবু অত লোকের সামনে, তাঁর আচরণে বা কথাবার্ত্তায় এতটুকু দুর্ব্বলতা খুঁজে পাওয়া গেল না। তাঁর উদ্ধত ভঙ্গিমা আর পালিশ করা ব্যক্তিত্ব সকল সন্দেহকে অতিক্রম কোরে যায়—এ মেক্‌-আপে স্যার ইন্দ্রনাথ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

চায়ের টেবিলে ব'সে তাঁর মনে আবার একটু হাসি পেলো। তিনি ভাবতেই পারলেন না, এটা ভৌতিক ব্যাপার না আর কিছু। তখুনি সিদ্ধান্ত করলেন—একটা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে তাঁর চারদিকে—বোধ হয়, ব্ল্যাক-মেল। সভ্যসমাজের এই ধরণের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে স্যার ইন্দ্রনাথের অনেকবার পরিচয় হ'য়েছে এর আগে। তাই তাঁর সন্দেহ হলো পর-মুহূর্ত্তেই। অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, মনে মনে একবার মিলিয়ে দেখ্‌লেন বর্ত্তমানের এই রহস্যজনক ব্যাপারটা। না—কোথাও ত এর মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ব্ল্যাকমেলিংএর সাধারণ নিয়মের সঙ্গে। এই এ-সরকার, সে যেই হোক, যতটুকু তাকে দেখেছেন সে রকম দুঃসাহসের ছাপ এর চেহারার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি এতটুকু।

তবু এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ব'লেই তাঁর ধারণা হলো এবং স্যার ইন্দ্রনাথ ঠিক করলেন এখুনি এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। তা নইলে, মনের এই অস্বোয়াস্তি নিয়ে ভিয়েনা গিয়েও তিনি শান্তি পাবেন না। চা খেয়ে, গ্রীণস্‌ হোটেলের পাশ দিয়ে তিনি পায়চারী করতে বেরুলেন। খানিক বাদে দেখ্‌তে পেলেন, কালকের সেই লোকটি, গেট্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়ার একধারের একটা বেঞ্চিতে চুপ্‌ ক'রে একলা ব'সে আছে। এই সুযোগ, স্যার ইন্দ্রনাথের মনে হলো। তখুনি তিনি তার পাশে এসে বস্‌লেন। কাছাকাছি বেঞ্চিতে আর কেউ ছিল না তখন।

সতর্ক হ'য়ে বস্‌লেন স্যার ইন্দ্রনাথ। কি ভাবে আলাপটা সুরু করা যায় তাই ভাব্‌লেন একবার।

—ভারী চমৎকার সকালটা, স্যার ইন্দ্রনাথ বল্‌লেন, অনেকটা আপনার মনেই এবং একটু চাপা গলায়।

পাশের লোকটি তাঁর দিকে একবার ফিরে চাইলো। তার দুই চোখে অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি।

—মাফ্‌ করবেন, কি যেন বল্‌লেন আপনি?

—বললাম, ভারী চমৎকার আজকের এই সকালটা।

—ও, হাঁ, তা ঠিক ব'লেছেন। সত্যি, ভারী চমৎকার! এই ব'লে সে চুপ করলো।

পাশ থেকে স্যার ইন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণভাবে লোকটাকে আর একবার দেখে নিলেন। তারপর তিনিও চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। কি আশ্চর্য্য, আমার সঙ্গে আলাপ করতে এর এতটুকু আগ্রহ নেই?—মনে মনে ভাবলেন স্যার ইন্দ্রনাথ। আর একবার ভালো ক'রে চাইলেন তার দিকে। দেখ্‌লেন—সাধারণ হ'লেও পোষাক বেশ পরিপাটি। একটা নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা তার সর্ব্বাঙ্গে। কিন্তু চোখ দু'টো যেন কি রকম!

আবার সেই যন্ত্রণাদায়ক রিক্ততা-বোধ স্যার ইন্দ্রনাথের চেতনাকে আক্রমণ করলো। ভাবলেন—আমি যদি আজ স্যার ইন্দ্রনাথ না হতুম, তা হলে এতদিনে আমার পরিণতি আসলে যেটা দাঁড়াতো—পাশের এই লোকটি যেন ঠিক তারই প্রতিচ্ছায়া। যা চেয়েছিলো আর যা সে পায়নি ঠিক সেই রকম গ্লানিতে এর মনটা ভ'রে আছে। তাই কি? না, তা কি করে হয়?—স্যার ইন্দ্রনাথ আবার চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেন—এ একেবারে আজগুবি, অসম্ভব। এ আমারই দুর্ব্বলতা!

দুর্ব্বলতা কথাটা মনে পড়তেই স্যার ইন্দ্রনাথ একটু উন্নত হোয়ে বস্‌লেন। বাইরের ও ভেতরের আবহাওয়াটা সহজ করবার চেষ্টায় লোকটির দিকে ফিরে তাকালেন। অপূর্ব্ব বিনয় সহকারে বললেন—আমার সঙ্গে আপনার বোধ হয় আলাপ নেই—

লোকটি মুখ তুলে চাইলো তাঁর দিকে।

—আমিই স্যার ইন্দ্রনাথ রায়—কথায় বেশ সতেজ উৎসাহ।

এ নাম সে কখনও শুনেছে ব'লে মনে হলো না।

—ও ধন্যবাদ, বেশ ভদ্রভাবেই লোকটি বল্‌লো। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারী খুসী হলাম স্যার—স্যার চন্দ্রনাথ।

—ইন্দ্রনাথ আমার নাম—প্রত্যেকটি উচ্চারণ দৃঢ় ও স্পষ্ট।

—ও মাফ্‌ করবেন। আমার নাম মিঃ এ সরকার। লোকটির কথায় জড়তা নেই এতটুকু।

—এ সরকার? অবিনাশ সরকার? প্রচণ্ড বিস্ময়ে স্যার ইন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে কথা ক'টা বেরিয়ে এলো।

হাঁ, কি না, লোকটা কিছুই বল্‌ল না।

আবার দু'জনে চুপচাপ। চোখের সাম্‌নে ইন্দ্রজাল দেখ্‌ছেন, স্যার ইন্দ্রনাথের মনে হ'লো। শুধু দেখ্‌তেই এক রকমের নয়, নামটাও বোধ হয় তাই! সমস্ত ব্যাপারটা উল্টে গেল মুহূর্তের ভেতর। তাঁর মনে হ'লো—তিনি যেন নকল ইন্দ্রনাথ, আর পাশের এই লোকটিই আসল অবিনাশ সরকার। তবু তিনি সাম্‌লে নিলেন নিজেকে আশ্চর্য্য ভাবে। সবটা জানা দরকার, শুধু নামে ও চেহারায় মিল থাক্‌লেই হয় না!

—অনেক দিন এখানে আছেন বুঝি? আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

—এই দিন দশ হলো এসেছি, বেশ শান্ত এবং সহজ ভাবেই লোকটি জবাব দিলো।

—বেড়াতে এসেছেন?

—একটু বিশ্রাম নিচ্ছি আর কি! ব'লে সে একটু হাস্‌লো; অদ্ভুত ধরণের হাসি—অনেক দিন হলিডে এনজয় করিনি।

—এতদিন বুঝি খুব খেটেছেন?

—যতটুকু ভগবান খাটতে দিয়েছেন, এই আর কি?

আশ্চর্য্য লোকটি নিজে থেকে একটা কথাও ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করছে না। তবু স্যার ইন্দ্রনাথ আবার সুরু করলেন:

—আপনি কি কোলকাতায় থাকেন?

—না, তবে কোলকাতারই কাছাকাছি।

—কোথায়? বসিরহাট সাবডিভিসনে?

কিছু না ব'লে লোকটি তাঁর দিকে একবার চাইলো।

বসিরহাট নামটা উচ্চারণ ক'রেই স্যার ইন্দ্রনাথ মনে মনে চম্‌কে উঠ্‌লেন। আর একবার ভালো কোরে চেয়ে দেখ্‌লেন লোকটাকে। ইস্পাতের মত কঠিন ব্যক্তিত্ব স্যার ইন্দ্রনাথের, তবু, সত্যি কথা বল্‌তে, ভীষণ ধাঁধা লাগলো তাঁর। ঘাড়ের কাছে একটা শিরা যেন মোচড় দিলো।

—আপনার বুঝি খুব ভালো লাগে যায়গাটা—ব'লেই স্যার ইন্দ্রনাথের খেয়াল হলো—এটা নেহাৎ অবান্তর প্রশ্ন। কোথায় যে লোকটির বাড়ী, তা ত সে এখনও বলে নি।

কি একটা চিন্তা নিয়ে লোকটি যেন তন্ময় হয়ে আছে। কলের পুতুলের মতই সে জবাব দিল—হ্যাঁ, ভারী ভালো লাগে আমার। সেখানে আমার বাড়ী যে।

—ও তাত বটেই। কি রকম বাড়ী—আবার একটা নিছক অনাবশ্যক প্রশ্ন, স্যার ইন্দ্রনাথ যেন নিজের ওপর শাসন হারিয়ে ফেলেছেন।

—কাছারীর কাছে, লাল রঙের, ছোট্ট একখানা দু'তলা বাড়ী।

স্যার ইন্দ্রনাথ ক্রমশঃই পাজ্‌ল্‌ড্‌ হোয়ে উঠ্‌ছেন। চপলা ত ঐ বাড়ীটাই পছন্দ করেছিলো—স্যার ইন্দ্রনাথের মুখোস-পরা অবিনাশ সরকার কথাটা একবার মনে মনে বল্‌লে।

বোধহয় লোকটির কথা তখনও শেষ হয়নি। এবার তাই নিজে-থেকেই সে বল্‌লে—আমার স্ত্রী কিছু সম্পত্তি পেয়েছিলেন, সেই টাকায় আমরা বাড়ীটা কিনেছিলাম।

—ও, নিজের তৈরী করা নয়—কি বলবেন স্যার ইন্দ্রনাথ যেন আর ভেবেই পাচ্ছেন না। কিন্তু তাঁর কথায় এবার বিলক্ষণ ঝাঁজ ছিলো, লোকটি তা লক্ষ্য করল না।

—না, কেনা বাড়ী, বেশী গম্ভীরভাবেই সে বললে—অনেক ঝঞ্ঝাট গিয়েছে জীবনের ওপর দিয়ে বুঝলেন স্যার চন্দ্র—না স্যার ইন্দ্রনাথ। তা হলেও আমরা দু'টী ছেলে নিয়ে বেশ সুখে—

ভদ্রলোকের সুখের কথা আর শেষ হলো না। তার আগেই—ড্যাম্‌, ব্ল্যাকমেলিং স্কাউণ্ড্রেল—এই ব'লে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌লেন স্যার ইন্দ্রনাথ। এইবারের কণ্ঠস্বরে স্যার ইন্দ্রনাথের স্বরূপমূর্ত্তি প্রকাশ পেলো। —মতলব তোমার বুঝতে পেরেছি। ফের যদি এসব কথা বলো—পুলিশে ধরিয়ে দেবো, বুঝ্‌লে? এক পয়সাও পাবে না; স্যার ইন্দ্রনাথ ও রকম অনেক বোগাস্‌ অবিনাশ সরকারকে ট্যাঁকে গুঁজ্‌তে পারে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কথাগুলো চীৎকার ক'রে ব'লে তিনি যেন একটু হাঁপিয়ে উঠ্‌লেন।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে লোকটি তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। তার চোখের দৃষ্টিতে প্রতিবাদের কোনো চিহ্নই নেই। সে যেন পাথর হোয়ে গেলো, অভাবনীয় এই সব কথা শুনে।

—মাফ্‌ করবেন আমাকে, আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে সে বল্‌লে—আপনাকে আমি বুঝ্‌তে পারি নি।

স্যার ইন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

—বুঝ্‌তে ঠিকই পেরেছ, তিনি বল্‌লেন—এইখানে ব'সে ব'সে আরও একটু তলিয়ে বোঝো। আর বেশী কিছু গোলমালের চেষ্টা করো যদি, তা হ'লে—এই বলে এমন একটা ভঙ্গীতে তার দিকে চাইলেন স্যার ইন্দ্রনাথ, যার মানে ভয়ানক অনেক কিছু।

চ'লে এলেন সেখান থেকে তিনি। পা ফেলছেন না ত, যেন পৃথিবীর বুকে সজোরে লাথি মেরে হাঁটছেন, এমনই উদ্ধত স্যার ইন্দ্রনাথের তখনকার গতিভঙ্গি। দীর্ঘ, ঋজু দেহ, এতটুকু অবনমিত নয়।

হোটেলে এসে, সিঁড়িতে উঠ্‌বেন, এমন সময় ব্যস্তসমস্তভাবে ম্যানেজার তাঁকে জানালো—স্যার মাণিকভয় পেস্তনজী তাঁকে একটু আগে ফোন ক'রেছিলেন—

এইটুকু শুনে বাকী কথাটা শোনবার অপেক্ষা না ক'রে স্যার ইন্দ্রনাথ ডান হাতটা তুলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বল্‌লেন—ড্যাম্‌ ইট।

ভুলে গেলেন, আজ স্যার মাণিকভয়ের সঙ্গে তাঁর লাঞ্চ খাবার কথা। কোনো মতে ওপরে উঠে বেড্‌রুমে এলেন স্যার ইন্দ্রনাথ। কেউ এসে বিরক্ত না করে, সেইজন্য ভেতর থেকে দরজার ক্লাচটা তুলে দিলেন।

দেহমনে তিনি যেন অত্যন্ত অসুস্থ। কোনো মতে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লেন। বুকের ভেতর থেকে একটা ভয়ানক আর্ত্তনাদ স্যার ইন্দ্রনাথের গলার কাছাকাছি উঠে এলো। পকেট থেকে রুমালটা বের ক'রে কপালটা একবার মুছে নিলেন। ডানহাতের পাঁচটা বলিষ্ঠ আঙুল দিয়ে কপালটা জোরে চেপে ধরলেন। শরীরটা ভালো বোধ

হচ্ছে না, স্যার ইন্দ্রনাথ ভাবলেন, ডাক্তার দেখালে কি রকম হয়। আমি যেন আর আমি নই। এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই ভালো হোতো। কিসে হঠাৎ ব্যাল্যান্স্ হারিয়ে ফেললাম !

অলক্ষ্যে স্যার ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাঁকে দংশন করতে লাগ্‌লো। অনুশোচনার গ্লানিতে নিজেকে তিনি ভয়ানক বিষাক্ত বোধ করলেন; বুকের ভেতরটা এখনও ধক্ ধক্ করছে।

চেয়ারে ব'সে সমস্ত ব্যাপারটাকে মনে মনে আলোচনা করলেন। নিজের অজ্ঞাতসারে, স্যার ইন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে হাত দু'টো দিয়ে টেবিলের এটা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, কখনও বা চেয়ারের মখমল মোড়া হাতল দুটো শক্ত ক'রে চেপে ধরেন। জিনিসগুলো সব আসল কিনা—বার বার তাই পরীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। ড্রয়ার থেকে পাসপোর্টটা খুলে একবার দেখ্‌লেন—কার নামে সেটা, কার ফটো সেখানে?

এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর কেবলই মনে হোতে লাগ্‌লো—যে লোকটির সঙ্গে একটু আগে তিনি কথা বল্‌লেন, সে ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর সবই নকল। তিনি নিজে, তাঁর এই অগাধ টাকা, মান-মর্য্যাদা—সবই যেন স্বপ্নের মত ভুয়ো, মিথ্যে ব'লেই মনে হ'লো। ভীষণ এই অনুভূতি, স্যার ইন্দ্রনাথের মাথাটা ঘুরতে লাগ্‌লো, মাথার চুল তিনি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলেন। তাঁর কেবলই মনে হ'তে লাগলো—একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ো থেকে তিনি নীচের প'ড়ে যাচ্ছেন !

মানসিক বিপর্য্যয়ের সেই নাটকীয় মুহূর্ত্তে স্যার ইন্দ্রনাথের সহসা মনে প'ড়ে গেলো—তাঁর সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটির কথা, যে মারা গিয়েছে বলে এতদিন তাঁর ধারণা ছিল। হয়তো সেই…না, তার ত কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভালো রকমেই খোঁজ নিয়েছিলেন তিনি—সে যে সত্যিই মারা গিয়েছে এ বিষয়ে কেউ ত কোনো সন্দেহই করেনি। আর যদি সে বেঁচেই থাকে, তার ত এত বয়স হবার কথা নয়। কিন্তু এ লোকটি ঠিক তাঁরই সমবয়সী। অবিকল তাঁর মতো। যেন তিনিই হুবহু। না—না, এ পুরোদস্তুর ব্ল্যাকমেল্, এ না হয়েই যায় না। এখুনি পুলিশে একটা খবর দেওয়া দরকার।

আপন মনে এসব চিন্তা করলেও, আসলে মনকে যে তিনি মিথ্যে বোঝাচ্ছেন, স্যার ইন্দ্রনাথের তাতে কোনো সন্দেহই ছিল না। ভয় দেখিয়ে লোকটা যে তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আসেনি, এটা তিনিই সবচেয়ে ভালো রকমে জানেন। এ আর কিছু, তাঁর ধারণার বাইরে, বুদ্ধির অতীত ভীষণ একটা ব্যাপার—আবার সেই প্রাণান্তকর রিক্তভাবোধ তাঁকে কাতর কোরে তুল্‌লো—তাঁর অস্তিত্বের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সূচের মত বিঁধতে লাগ্‌লো এই রিক্ততার তীক্ষ্ণ অনুভূতি।

সেদিন সমস্ত দুপুর ও বিকেলটা স্যার ইন্দ্রনাথ তাঁর ঘরের মধ্যেই রইলেন। সন্ধ্যে হ'লো, তখনও ঘর থেকে বাইরে কোথাও বেরুবার উদ্যোগ তিনি করলেন না। সিঁড়ি দিয়ে নীচের নাম্‌তে হবে চিন্তা ক'রে তাঁর সমস্ত শরীরটা যেন কেঁপে উঠ্‌লো। অবসাদে তাঁর মন, চিন্তা, বুদ্ধি সমস্ত যেন আচ্ছন্ন, অবশ হোয়ে গিয়েছে।

রাত ন'টা হবে…

—মাটি থেকে পাঁচ হাজার ফিট ওপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন ছুটে চ'লেছে সেই এরোপ্লেন থেকে তিনি নীচেয় পড়ে যাচ্ছেন বাঁচবার আশায় একটা প্যারাস্যুট নিয়েছেন, কিন্তু সেটা কিছুতেই খুলল না—তিনি পড়ে যাচ্ছেন এমন সময় স্যার ইন্দ্রনাথের ঘুম ভেঙে গেলো। সমস্ত শরীরটা ঘামে ভিজে গিয়েছে, হৃৎপিণ্ডের রক্ত-চলাচলের ছন্দ যেন বারবার কেটে যাচ্ছে। বাকী রাতটা বিছানার ওপর তিনি জেগেই কাটিয়ে দিলেন।

অন্ধকার স্তব্ধ ঘর। চাঁদের আলো শার্সীর কাচে ঝকমক করে। স্যার ইন্দ্রনাথের চোখে ঘুম নেই। তাঁর চারদিকে রহস্যঘন স্তব্ধতা; আর বুকে অসহ্য বেদনা। আর মনের দৃষ্টিতে বিভীষিকার প্রেত-মূর্ত্তি।

সকাল হোলো। বাথরুমে গিয়ে স্যার ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ ধ'রে স্নান করলেন। ঠিক করলেন—লোকটির সঙ্গে আর একবার দেখা হওয়া দরকার, তার সব কথা খুঁটিয়ে শুনতে হবে। আসল ব্যাপারটা কি, স্যার ইন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে তাই জান্‌তে চান। এ কি সম্ভব, একবার তাঁর মনে হলো, যেদিন চপলার টাকাগুলো নিয়ে ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রনাথ চ'লে আসেন, সেদিন তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর অজ্ঞাতসারে দু'টো অংশে আলাদা হোয়ে গিয়েছিলো? তার একটা সেখানে, সেই বসিরহাটে থেকে গেলো—আর একটা ভাগ্য অন্বেষণে বেড়িয়ে এসে এই স্যার ইন্দ্রনাথে পরিণত হোয়েছে। বহুকাল পরে সেই দুজনায় আজ এখানে সাক্ষাত হলো! অথবা, তাঁর মৌলিক অস্তিত্বের সবটাই এতদিন সেখানে ছিল—সেই আদি ও অকৃত্রিম অবিনাশ সরকার অবিনাশ সরকারই ছিল—আর এই ইন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যাপারটা তা হ'লে একটা দীর্ঘ এবং অবাস্তব স্বপ্নমাত্র! কে তিনি তা হ'লে? স্যার ইন্দ্রনাথ, না সেই অবিনাশ? আর কেই বা এই লোকটা—? ওরও ত নাম এ সরকার—অবিনাশ সরকার; ও-ও ত বসিরহাটের সেই অবিনাশ সরকার, যার খোলস ছেড়ে এই ইন্দ্রনাথের জন্ম হোয়েছে! তা হোলে তাঁরা দু'জনে কি একই লোক?

মীমাংসা করতে আর কিছুতে পারছেন না স্যার ইন্দ্রনাথ। যতই ভাবেন, এ নিয়ে যতই মাথা ঘামান, আপাদমস্তক তিনি নিজেই ঘেমে ওঠেন, সাব্যস্ত আর কিছু করতে পারেন না। যে মাথায় এত জিনিস খেলে—অর্থনীতির জটিল প্রশ্ন, ফাইনান্সের নানা সমস্যা যাঁর কাছে জলের মত, পৃথিবীর টাকাকড়ির হালচাল যাঁর, বলতে গেলে, এক রকম নখদর্পণেই, সেই স্যার ইন্দ্রনাথের উর্ব্বর মস্তিষ্ক এর কোনো সমাধানই করতে পারল না! নিজেই নিজের কাছে লজ্জিত হোয়ে উঠ্‌লেন স্যার ইন্দ্রনাথ।

চা খাবার পর হোটেল থেকে তিনি বেরুলেন। এদিক ওদিক একটু পায়চারী করলেন। মনে মনে একবার হিসেব করে দেখলেন—জাহাজ ছাড়তে আর ক'দিন বাকী। তারপর, খানিক বাদে কালকের সেই যায়গাটিতে এসে দেখেন, যা আশা করেছিলেন, ঠিক তাই। লোকটি অর্থাৎ অবিনাশ সরকার সেই বেঞ্চিটার ওপর চুপ্ করে একলাটি ব'সে

আছে। আজ যেন তাকে একটু অন্য রকমের দেখাচ্ছে। এগিয়ে এলেন স্যার ইন্দ্রনাথ তার দিকে। চলবার সময় যথাসাধ্য নিজের ব্যক্তিত্বটাকে শানিয়ে নিলেন; চোখের দৃষ্টি ও হাঁটবার ভঙ্গিতে একটা বিচিত্র ধরণের 'ফিনিস্' দিলেন। আজ আর কিছুতেই তিনি দমবেন না।

আশ্চর্য্য! লোকটার সাম্‌নে দিয়ে এলেন, অথচ সে তাঁকে গ্রাহ্যই করল না; যেন দেখ্‌তেই পায় নি এই রকম একটা ভাব দেখালো। স্যার ইন্দ্রনাথ তার কাছে, অনেকটা কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটু ভেবে নিলেন, কি ভাবে কালকের সেই বিশ্রী ব্যাপারটা মেটানো যেতে পারে।

—আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এলুম, মিঃ সরকার, সোজাসুজি আরম্ভ করলেন স্যার ইন্দ্রনাথ। তাঁর কথায় বিনয়ের সঙ্গে সৌজন্য—কাল কি বল্‌তে আপনাকে কি ব'লে ফেলেছি—But I didn't mean a word of what I said yesterday। কি জানেন, ফিফ্‌টির রং সাইডে বয়সটা চল্‌ছে, তার ওপর পরিশ্রম; কি রকম যেন একটু ব্রেক্‌ডাউন হোয়েছে আজকাল। তাই মাঝে মাঝে এই রকম আন্‌ম্যানার্‌লি কাণ্ড ক'রে বসি। আশা করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

সুদীর্ঘ এ্যাপোলজি চাওয়ার পর স্যার ইন্দ্রনাথ লোকটির পাশে বস্‌লেন।

লোকটা একটু হাস্‌লো। সে হাসি প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রসাদের। কথায় অবশ্য পাল্টা-বিনয় দেখাতে সে কসুর করল না। বল্‌লে—নিশ্চয়ই, যদি সত্যিই তাই হয়।

কথাটা গিয়ে একেবারে স্যার ইন্দ্রনাথের অন্তরে বিঁধ্‌লো। কী তীক্ষ্ণ শ্লেষ—যদি সত্যিই তাই হয়, তিনি ভাব্‌লেন। সত্যি যে নয়, তা তিনি ভালো রকমেই জানেন, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি। এরপর কি বলা যেতে পারে তাই তিনি ঠিক করতে লাগ্‌লেন।

লোকটিই নিজে থেকে বল্‌লে—যাক্, এ নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো, কি বলেন, স্যার চন্দ্র না, স্যার ইন্দ্রনাথ। ডাক্তার দেখান এরকম নার্ভাস ব্রেক্‌ডাউন ভালো নয়।

এতক্ষণে একটা খেই পাওয়া গেলো। প্রত্যেক মুহূর্তটি সচেতন হয়ে আছেন তিনি—কঠিন রাশ টেনে মনকে ধ'রে আছেন স্যার ইন্দ্রনাথ। আজ তিনি খুব হুঁসিয়ার হোয়ে কথা বলবেন।

—হাঁ, সেই জন্যেই ত ভিয়েনা যাচ্ছি। আবার একটু ব্লাড-প্রেসারও আছে কি না।

—ও কিছু নয়; বড়লোক মাত্রেই ঐ রকম একটা থাকে শুনেছি।

আবার সেই অন্তর-টিপুনি! এ বেয়াদপি স্যার ইন্দ্রনাথের অসহ্য—তবু তিনি নিরুপায়।

লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাচ্ছেন বললেন?

—ভিয়েনা। স্পষ্ট, কিন্তু তেমন উৎসাহের কথা নয় স্যার ইন্দ্রনাথের।

—ভালো। কিন্তু বোম্বে আপনার কেমন লাগে?

—মানে এই দিকটা? তা মন্দ নয়। বেশ quiet and peaceful.

—তা বটে। এই বলে' লোকটি চুপ করলো একটু। তারপর হঠাৎ স্যার ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—কি জানেন স্যার ইন্দ্রনাথ, আমারও ঠিক আপনার মত অবস্থা।

মাথা থেকে চুলের ডগা অবধি কেঁপে উঠ্‌লো স্যার ইন্দ্রনাথের। বল্‌লেন—কি রকম?

—কাল আপনাকে যা বলেছিলাম, আসলে তা নয়।

—কি তা নয়?

—অর্থাৎ আমি এখানে হলিডে করতে আসিনি।

ও, এই কথা! ভেতরে বাইরে অনেকটা স্বচ্ছন্দ হোয়ে উঠ্‌লেন স্যার ইন্দ্রনাথ। সহজভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—ও তাই নাকি!

—হ্যাঁ। সম্প্রতি স্ত্রী মারা গেছেন। এখানে তাই রিকভার করতে এসেছি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে স্যার ইন্দ্রনাথের ঠোঁট দুটো সাদা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো। মনের ওপর দখল হারিয়ে ফেললেন। আচম্‌কা জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌লেন —আপনার ওয়াইফের নাম—নাম কি চপলা ছিলো?

লোকটি যেন শুনতেই পেলোনা—এইভাবে সে ব'সে রইলো। স্যার ইন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন—লোকটি আগের মতন এ প্রশ্নটাও এড়িয়ে যেতে চায়।

খানিকবাদে লোকটি তাঁর দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্‌লে—বেশ আজগুবি কথা বলেন ত আপনি!

আজগুবি নয়, স্যার ইন্দ্রনাথ মনে মনে ভাবলেন; তাঁর জীবনে একদিন এর চেয়ে বড় সত্যি আর কিছু ছিলনা। অনুভব করলেন, মুহূর্ত্তের জন্যে, চপলার অস্তিত্ব তাঁর চারদিকে। সেই ঝোঁকেই স্যার ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু তিনি কি ১৯১০ সালে মারা যাননি?

এইবার লোকটা তাঁর দিকে চাইলো একটি কঠিন রুক্ষভাবেই। একটা বদ্ধ পাগলের সঙ্গে কথা বল্‌ছে কিনা, তাই সে একবার ভাব্‌লো। আশ্চর্য্য, রাগ্‌লনা কিন্তু সে এতটুকু।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সে বললো—এই ত দুমাসও এখনও হয়নি তিনি মারা গেছেন—অতি মৃদু কণ্ঠস্বর। তারপর কথার ভঙ্গিতে স্বপ্নের একটু আমেজ এনে আবেগের সঙ্গে বল্‌তে সুরু করলো—জীবনের সুখে দুঃখে যে নিত্য সঙ্গিনী ছিল, তাকে হারানো বড় ভয়ানক ক্ষতি। তার অভাবে চারদিক এমন শূন্য বোধ হয় যে সংসারে আর কিছুই ভালো লাগেনা। অবশ্য তেমন স্ত্রী সকলের ভাগ্যে হয়না। সেদিক দিয়ে আমি খুবই ভাগ্যবান ছিলাম। চপলার মত স্ত্রী, হাজারে একটি মেলে—এই পর্য্যন্ত ব'লে, একটু থেমে, স্যার ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চেয়ে, সে আবার বল্‌লে—কিছু মনে করবেন না, আবোল-তাবোল কি বললাম।

স্তব্ধ বিমূঢ়ের মত স্যার ইন্দ্রনাথ ব'সে ব'সে তার প্রত্যেকটা কথা শুনছিলেন। থেকে থেকে তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপ্‌ছিল। সে মুখ যেন আর

স্যার ইন্দ্রনাথের মুখ নয়। হঠাৎ তিনি আতঙ্কগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—চুপ করো, চুপ করো বলছি। আমি আর শুনতে চাইনে।

লোকটি তাঁকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো।

—অধৈর্য্য হবেন না, স্যার ইন্দ্রনাথ। চলুন আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

স্যার ইন্দ্রনাথের কাণে সে কথা গেলনা। ভীষণভাবে আবার চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন—তুমি মিথ্যেবাদী, জুয়োচোর। তুমি ইম্পষ্টার, তুমি ব্ল্যাকমেলার। আমি জানি, তুমি কে। অবিনাশ সরকার তুমি কিছুতেই নও। তুমি পরিমল সরকার—আমার ছেলে।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে লোকটি এবার তাঁর দিকে চাইলো। তারপর সে উঠে দাঁড়ালো।

—অবাক করলেন আপনি। আমার নাম যে অবিনাশ সরকার তা'ত আপনাকে বলিনি।

বিস্ফারিত চোখে স্যার ইন্দ্রনাথ তার দিকে চাইলেন। দীর্ঘদিন এই দ্বৈত-জীবনের অভিনয় করছেন, পরিমলের কণ্ঠস্বর আজ তাঁর কিছুমাত্র মনে নেই। মনের সেই অসহায় ভাবটুকু ধরা পড়লো বাইরে, তাঁর দুই চোখের করুণ দৃষ্টিতে। বুকের কাছে একটি ব্যথা খচ্‌ ক'রে বাজ্‌লো।...না, এ তাঁর কেউ নয়; অবিনাশের ছেলে হ'তে পারে কিন্তু স্যার ইন্দ্রনাথের সে কেউ নয়, কেউ হোতে পারেনা।

—চলুন, আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিই। মনে হচ্ছে আপনি ভয়ানক নার্ভাস্ হয়েছেন, এখুনি ডাক্তার দরকার।

তার একটা কথাও স্যার ইন্দ্রনাথের কাণে গেলনা। কিন্তু এক অভাবনীয় কাণ্ড তিনি করে বস্‌লেন সেই মুহূর্ত্তে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে লোকটাকে একটা ঘুঁষি মারলেন।

—গেট্ আউট্! চীৎকার ব'লে উঠ্‌লেন—দূর হোয়ে যাও আমার সাম্‌নে থেকে।

কোনো প্রতিবাদই সে করলনা এই অসংগত আচরণের। উঠে দাঁড়ালো; কিছু না ব'লে সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে সোজা চ'লে গেল। দীর্ঘ দেহ, মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে হাঁটা—সেই শান্ত পদবিক্ষেপ। যতক্ষণ দেখা যায়, স্যার ইন্দ্রনাথ তার দিকে চেয়ে রইলেন।

খালি বেঞ্চিটার ওপর তিনি ব'সে পড়লেন। দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাক্‌লেন। অসহনীয় বেদনায় তাঁর বুকটা একবার মোচড় দিয়ে উঠ্‌লো। উত্তেজনার ধাকাটা কেটে যাবার পর একটু প্রকৃতিস্থ হলেন তিনি। তারপর উঠে আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে এগিয়ে চল্‌লেন। কে যেন এক নিঃশ্বাসে তাঁর সমস্ত জীবনী-শক্তি চুষে নিয়েছে। ডাক্তার আর ডাক্‌লেন না।

ঘণ্টাখানেক বিছানায় ছটফট্ ক'রে কাটালেন স্যার ইন্দ্রনাথ। লোকটা এখান থেকে চ'লে যায়না কেন? জাহাজটা যদি আজই ছাড়তো? খানিকবাদেই সে ধারণা বদ্‌লে যায়—না, লোকটার সঙ্গে আর একবার দেখা হওয়া দরকার। তার শেষ কথাটা শোনা দরকার।

ডিনারের একটু আগে স্যার ইন্দ্রনাথ নীচেয় এলেন। ম্যানেজারের খোঁজ করলেন।

—Yes, Sir Indernath, ব'লে ম্যানেজার এসে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলো।

—সেই মিঃ সরকারকে আমার একবার দরকার—Very important.

—Certainly, Sir Indernath, এই ব'লে ম্যানেজার পোর্টারকে ডাক দেবে, এমন সময় মিঃ সরকার আস্‌ছে দেখা গেলো।

—ঐযে মিঃ সরকার ডিনারে আসছেন, আঙুল দিয়ে ম্যানেজার দেখিয়ে দেয়।

—থ্যাঙ্ক ইউ—এই বলে স্যার ইন্দ্রনাথ তখুনি লোকটির দিকে এগিয়ে এলেন। মুখোমুখি হতেই তিনি বল্‌লেন—আমাকে মাফ্‌ করবেন, মিঃ সরকার। আমি

লোকটি তাঁকে গ্রাহ্য করলনা আদৌ। পাশ কাটিয়ে গেল। যাবার সময় শুধু পেছন ফিরে একবার বল্‌লে—আপনার সঙ্গে আমার কথা বল্‌তে ঘৃণা বোধ হয়।

কে যেন স্যার ইন্দ্রনাথকে চাবুক মারলো—একথাও তাঁকে আজ বরদাস্ত করতে হলো! মান-অপমান বোধ তখন তাঁর নেই। কাতরভাবে লোকটিকে বল্‌লেন—আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। আমি জান্‌তে চাই... আপনাকে টাকা দেবো, যা চান তাই দেবো, শুধু একটিবার বলুন, কে আপনি? কি নাম আপনার?

লোকটি যেন শুনতেই পেলোনা, এইভাবে সে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চ'লেছে। পেছনে পেছনে চ'লেছেন স্যার ইন্দ্রনাথ—Tell me, who you really are.—তাঁর কণ্ঠস্বরে অতি দীন কাকুতি।

লোকটি সোজা ডাইনিং রুমে ঢুকে গেলো। স্যার ইন্দ্রনাথের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ হোয়ে গেল সশব্দে। সেইখানেই কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সমস্ত শরীর ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। দেহের শিরা উপশিরায় রক্তের স্রোত উদ্দাম হোয়ে উঠেছে।

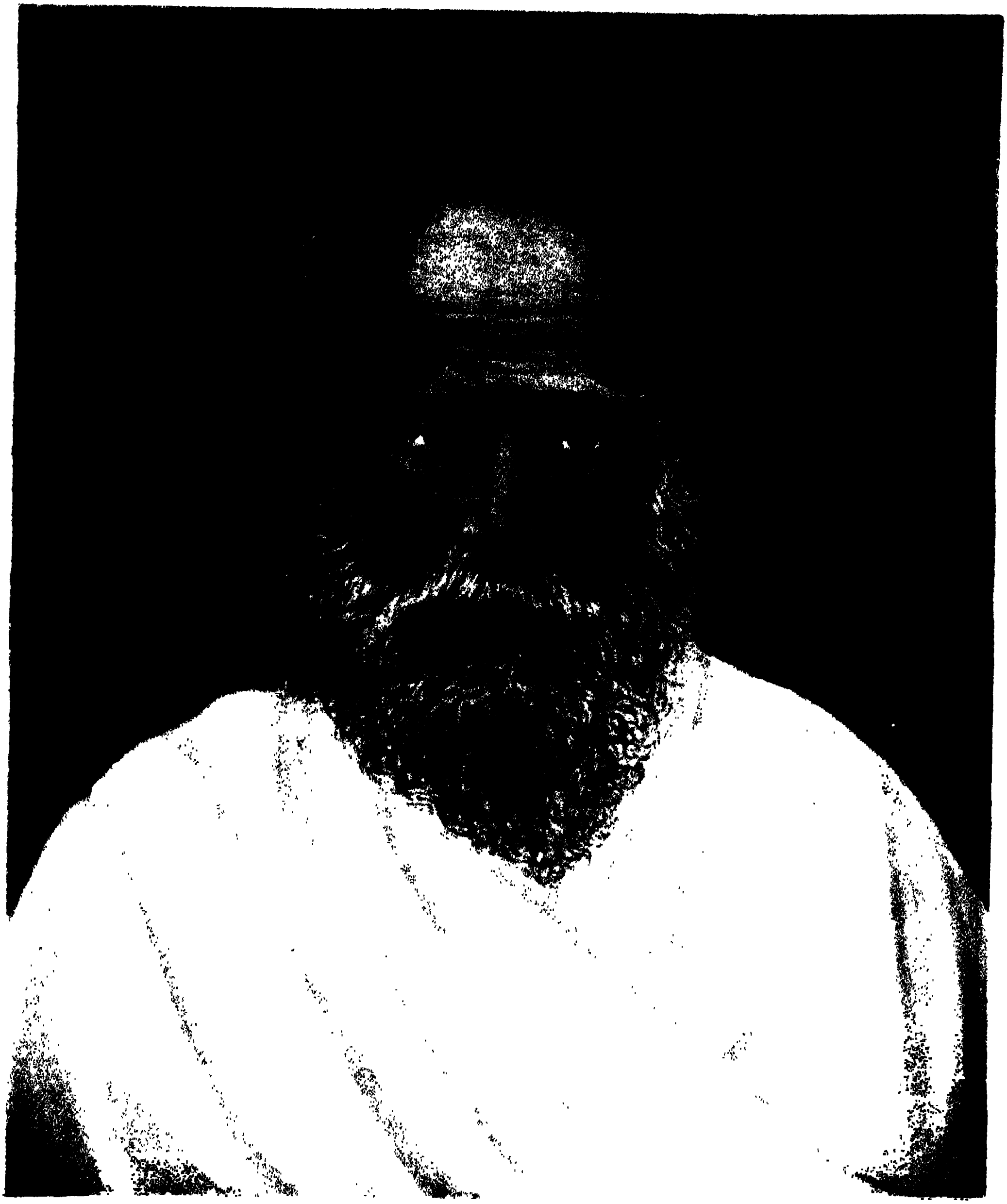
—পোর্টার, চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন তিনি। সমস্ত হোটেলটাকে সচকিত কোরে তুললো আকস্মিক এই গর্জ্জন। ম্যানেজার ছুটে এলো। কি বল্‌বে, ভেবে না পেয়ে তাঁর মুখের দিকে সে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো। রাগে তখন স্যার ইন্দ্রনাথের দু'চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রিয়ে পড়ছে।

—Get my car, get my bags, স্যার ইন্দ্রনাথ আদেশ দিলেন।

ম্যানেজার কিছু বলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু আবার তিনি চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—Get my car, get my bags, এ ছাড়া তাঁর মুখে আর কোনো কথা নেই।

*

স্যার ইন্দ্রনাথের বিরাট রোলস্ ছুটে চলেছে সহরের এক প্রান্ত দিয়ে। ভেতরে ব'সে একটিবার তিনি আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন।



মনটা একটু হাল্কা হোলো বটে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব অনেকটা যেন দমে গেলো ভেতরে ভেতরে। তাই অন্য সময়ের মত বর্ত্তমানের এই ব্যাপারটা তখুনি তাঁর মন থেকে মুছে গেলোনা। স্যার ইন্দ্রনাথের জীবনে এই বোধ হয় প্রথম 'ফেলিওর'। রোলসের আরামদায়ক সীটে ব'সে আছেন তিনি ; কখনও চোখ খুলছেন, কখনও বুঁজছেন। চোখ খুললে চারদিকে বোধ করছেন সেই লোকটির—সেই এ সরকারের অস্তিত্ব, তার সেই বার বার তাঁকে 'স্যার ইন্দ্রনাথ' ব'লে ব্যঙ্গ করা ; আর চোখ বুঁজলেই মনে পড়ে যাচ্ছে—চির-জীবনের নিদারুণ বঞ্চনার ইতিহাস।

বম্বের সীমানা ছাড়িয়ে গাড়ী এর মধ্যে প্রায় চার মাইল রাস্তা এসে প'ড়েছে। বাইরে থেকে বোঝবার যো নেই স্যার ইন্দ্রনাথের ভেতরটা কিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হোয়ে গিয়েছে। দুশ্চিন্তার দুরন্ত প্লাবনে তাঁর ব্যক্তিত্বের তটভূমি কোথায় যেন ভেসে গিয়েছে। তবু নিঃশেষিতপ্রায় ব্যক্তিত্বটাকে একটু সজাগ কোরে নিয়ে স্যার ইন্দ্রনাথ মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন। তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করা ! এতবড় দুঃসাহস। বসিরহাটে গিয়ে খুঁজে বার করবে, কে ও—অবিনাশ সরকার, না, পরিমল সরকার ? না ধাপ্পাবাজ আর কেউ ?······

আর তিনদিন বাদেই তাঁর জাহাজ ছাড়বে—সে কথা স্যার ইন্দ্রনাথ একেবারেই ভুলে গেলেন।

ট্রেণে না গিয়ে, হঠাৎ ঠিক করলেন, কোলকাতা পর্য্যন্ত মোটরেই যাবেন তিনি। এতে মেজাজটা হয়তো শান্ত হতে পারে। এবং যতটা পারেন, নিজেই ড্রাইভ করবেন, তাতে কোরে দুশ্চিন্তার অবকাশ থাকবে না। ড্রাইভিং তিনি ভালই জানতেন। উত্তেজনার সেই মুহূর্ত্তে, ষ্টিয়ারিং হুইলটার ওপর যেই স্যার ইন্দ্রনাথ হাত রাখলেন, বিশ্বস্ত ড্রাইভার আমিনের বুকটা একটু কেঁপে উঠলো।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়—পরের দিন কাগজে সবচেয়ে বড় যে খবরটা দেখা গেলো, সেটা হচ্ছে—মোটর দুর্ঘটনায় স্যার ইন্দ্রনাথের মৃত্যুর শোচনীয় সংবাদ।

পণ্ডিতপ্রবর ৺শশধর তর্কচূড়ামণি

রায় বাহাদুর ৺যতীন্দ্রমোহন সিংহ

জীবনী

পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় গত ১৩৩৪ সনের ১লা ফাল্গুন তারিখে বহরমপুর নগরে পবিত্র ভাগীরথীতীরে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। ফরিদপুর জেলার প্রাণপুর গ্রামে বৈদিক-ব্রাহ্মণবংশে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য পরিব্রাজকশিরোমণি শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এই বংশ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

সেকালে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বালকের যেরূপ শিক্ষা হইত চূড়ামণি মহাশয়েরও বাল্যে সেইরূপ শিক্ষা হইয়াছিল। তিনি বিক্রমপুরের এক টোলে ব্যাকরণ সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করেন, পরে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে—বিশেষতঃ উপনিষদাদি গ্রন্থে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাশীধামে যাইয়া একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাবলে তিনি অতি অল্প সময়ে শাস্ত্রের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ এবং গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। সেজন্য জটিল দার্শনিক তত্ত্বসকলের তিনি অনায়াসে সহজ মীমাংসা করিতে পারিতেন।

তাঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া কাশীমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদ রায় তাঁহাকে নিজের সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করিয়াছিলেন। তিনি বহরমপুরে অবস্থানকালে সুপ্রসিদ্ধ রামদাস সেন মহাশয়ের প্রকাণ্ড পুস্তকাগার হইতে অনেক দার্শনিক গ্রন্থ লইয়া পাঠ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবল জ্ঞানস্পৃহা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শারীরতত্ত্বের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য তিনি বৃদ্ধ বয়সে Physiology ও Anatomyর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং শবব্যবচ্ছেদ দেখিবার জন্য বেলগাছিয়া হাসপাতালে যাতায়াত করিতেন।

কাশীধাম হইতে আগমন করিয়া যখন তিনি উক্ত রায় বাহাদুরের সহিত মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ তাঁহাকে এক মহত্তর কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে ৺শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে যিনি পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন) হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের জন্য এক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। চূড়ামণি মহাশয় ভগবৎপ্রেরণায় সেই আন্দোলনে যোগদান করিলেন।

সম্প্রতি স্বর্গগত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর দীননাথ সান্যাল মহাশয় এই সম্বন্ধে চূড়ামণি মহাশয়ের তিরোভাবের পরেই "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা দ্বারা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত সে সময়কার ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাস কতকটা জানা যাইবে।

"এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালা দেশটীকে যখন একটী প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময় ৺কাশীধাম হইতে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বঙ্গদেশে আসিলেন। কাশী হইতে প্রথমে তিনি বর্দ্ধমানে আসেন। সেখানে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করিয়া তাৎকালিক চিন্তাশীল লেখক ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বুঝিলেন যে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের দ্বারাই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সম্ভব। সে সময়ে ইন্দ্রনাথই ছিলেন তাৎকালিক 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের পরম-হিতৈষী বন্ধু, সহায় ও উপদেষ্টা—ইংরাজীতে যাকে বলে, "Friend, Philosopher and Guide." তিনি স্থির করিলেন যে বঙ্গবাসীকে মুখপত্র করিয়া এবং চূড়ামণি মহাশয়কে বক্তা করিয়া কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মবাণী ধারাবাহিকরূপে লোককে শুনাইতে পারিলে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত লোকের মন হিন্দুধর্ম্মের দিকে ফিরান যাইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাৎকালিক মনীষিগণের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন।

ইহার পরেই বঙ্কিমবাবু তাঁহার সান্‌কী-ভাঙ্গার বাসায় একদিন একটি বান্ধবসম্মিলনীর উদ্যোগ করেন। সেখানে তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করিলে, চূড়ামণি মহাশয়ের কথায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সকলেই সবিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। পরে বঙ্কিমবাবুর অনুমোদনে ও 'বঙ্গবাসীর' উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতি সপ্তাহে চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে লাগিল এবং সেই সব বক্তৃতার সারাংশ বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ও দেশময় প্রচারিত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল।

এই সব বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাৎকালিক শিক্ষিত যুবকবৃন্দের কি প্রবল আগ্রহ এবং বক্তৃতা শুনিয়া তাহাদের কি চমৎকার আনন্দ! প্রথম বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি ছিলেন এবং তৎপরে আরও কয়েকটী বক্তৃতায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ লোকের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সকলেই তখন বুঝিয়াছিল যে ধর্ম্ম বিষয়ে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিক্রিয়ামাত্রই যেমন একস্থান বা এক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে না, এই প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ অল্প দিনের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখনকার চিন্তাশীল লেখকগণ হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার নবপ্রকাশিত 'প্রচারে' ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; অক্ষয়চন্দ্রও তাঁহার নবপ্রকাশিত 'নবজীবনে' ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদির প্রাধান্য দিতে থাকিলেন; বঙ্গবাসী ত এ বিষয়ে চূড়ামণি মহাশয়ের ও হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্রস্বরূপই হইল। চূড়ামণি মহাশয়ের সহকারী যুবক ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় 'বেদব্যাস' নামক মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করিলেন—তাহার প্রধান লেখক ছিলেন স্বয়ং চূড়ামণি মহাশয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই ক্রমে 'বঙ্গবাসী' হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি—হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

কিছুদিন বক্তৃতা করিবার পর চূড়ামণি মহাশয় 'ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য, হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম ও দার্শনিক ব্যাখ্যা বিষয়ে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে মৌলিক। * * *

তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া, তাঁহার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এবং তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া ইহাই এক নূতনত্ব লক্ষিত হইত যে তাঁহার বক্তব্যের আগাগোড়াই তত্ত্ব কথা, বৈজ্ঞানিক ভাবে গ্রথিত। ভাষার ঝঙ্কার,

ভাবের উচ্ছ্বাস তাঁহার বক্তৃতা বা গ্রন্থে কোথাও পাওয়া যায় না।···শাস্ত্র হইতে শ্লোকের বোঝা আওড়াইয়া তিনি শ্রোতা বা পাঠককে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন না। কেবলমাত্র তর্ক ও যুক্তির দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের সার মর্ম্ম ও তত্ত্ব বুঝানই ছিল তাঁহার বিশিষ্ট প্রণালী এবং এই বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফল হইল এই যে, তথনকার ইংরেজী শিক্ষিত লোকে হিন্দুধর্ম্মকে যেরূপ অবহেলা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের যোগ্য বলিয়া ভাবিত, এই প্রতিক্রিয়ায় লোকে বুঝিল যে হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে গূঢ় ভাব নিহিত আছে এবং হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি পরম সনাতন দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; উহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পুষিবার একটা কৌশল নহে। ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের মনোভাবের এই যে পরিবর্ত্তন, ইহাই প্রতিক্রিয়ার মহা ফল। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলে ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে জাতীয় মনোভাব সাহিত্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', 'গীতার ব্যাখ্যা' ইত্যাদি, এমন কি তাঁহার ঐ সময়ের কয়েকখানি উপন্যাসে পর্য্যন্ত এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাবেই ৺চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ৺অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার 'নবজীবনে' নানা লেখকের ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া এই প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল এই যে ইংরেজী শিক্ষিত লোকের চক্ষে হিন্দুধর্ম্ম আর অশ্রদ্ধার বিষয় রহিল না এবং হিন্দু আচার ব্যবহার সকলই যে কুসংস্কার মাত্র এরূপ ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইল। ইহাই এই প্রতিক্রিয়ার মোট ফল।

সেই সময়ে যখন ঋগ্‌বেদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল এবং উহাকে 'কৃষকের গান' বলিয়া রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রবন্ধাদি লিখিলেন, তখন চূড়ামণি মহাশয়ই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে ঐ কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি বুঝাইয়াছিলেন যে, ঋগ্‌বেদ ভারতীয় আর্য্যদিগের অসামান্য জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান যে কতদূর উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল, ঋগ্‌বেদে তাহারই নিদর্শন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে এখন যে সকল গবেষণা হইতেছে, তাহা চূড়ামণি মহাশয়ের উক্তিরই সমর্থন করে।"

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর মনে স্বজাতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে একটা শ্রদ্ধা ও অনুরাগের ভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাহার মূলে চূড়ামণি মহাশয়ের এই ধর্ম্মান্দোলন। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে জগন্মাতার পাদপীঠে শাস্ত্ররূপ বিল্বমূলে বসিয়া যে জাতীয়তার মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হিন্দুজাতিকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি জাগিয়া উঠিয়া আপন বৈশিষ্ট্য ও আপন অধিকার স্থির রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

৺কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, ৺কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই আন্দোলনে চূড়ামণি মহাশয়ের সহায় ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—এমন কি কলিকাতা হইতে কোচবিহার, চট্টগ্রাম হইতে মুঙ্গের পর্য্যন্ত—প্রত্যেক নগরে, উপনগরে এবং প্রধান প্রধান পল্লীতে আহূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন। ইহার ফলে বঙ্গের নগরে নগরে হরিসভা, বাল্যাশ্রম প্রভৃতি ধর্ম্ম-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট যখন সহবাসসম্মতি বিষয়ক আইন (Age of Consent Act) প্রবর্ত্তিত করেন, তখন চূড়ামণি মহাশয়ের নেতৃত্বে সেই আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কলিকাতায় গড়ের মাঠে প্রায় এক লক্ষ লোকের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সেই সভা হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে "আইন চাই না—আইন চাই না" যে-রব উত্থিত হইয়াছিল, সেই রবে রাজ প্রতিনিধির রাজপ্রাসাদ কম্পিত হইয়াছিল। এই আন্দোলন হইতে চূড়ামণি মহাশয়কে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক প্রলোভন দেখান হইয়াছিল; কিন্তু সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ অবিচলিতচিত্তে রাজসম্মান তুচ্ছ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা মহানগরীতে যখন চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্য প্রবলবেগে চলিতেছিল তখন একদিন স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাঙ্গোপাঙ্গসহ আসিয়া তাঁহাকে

দর্শন দিয়াছিলেন। এই দর্শনের পর চূড়ামণি মহাশয়ও দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া অনেকবার তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদেশ-বাক্য শুনিয়াছিলেন; এইরূপে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তিনি নাকি একদিন পরিহাসচ্ছলে চূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"পণ্ডিত! তুমি ত অনেক ধর্ম্মকথা বলিতেছ, তোমার চাপরাস কোথায়? চাপরাস না দেখাইলে যে কেহ তোমাকে মানিবে না।" ইহার উত্তরে চূড়ামণি মহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন "আমার কোন চাপরাস নাই; তবে শাস্ত্রে ঋষিবাক্য যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই প্রচার করিতেছি।" আমার বোধ হয় তিনি আরও বলিতে পারিতেন "আমার চাপরাস ত আপনি নিজে। আমি যে শাস্ত্রকথা বলি, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আপনিই ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"

যাহা হউক তিনি প্রচার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল বহরমপুরে ভাগীরথী তীরে বাস করিয়াছিলেন। উল্লিখিত "ধর্ম্ম ব্যাখ্যা" ব্যতীত তিনি "সাধন প্রদীপ", "ভবৌষধ", "ভক্তিসুধালহরী" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তক এখন আর ছাপা নাই। তিনি দীর্ঘকাল "বঙ্গবাসী", "বেদব্যাস", প্রভৃতি সাময়িক পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা পুনর্মুদ্রিত করিলে একখানি বিরাট গ্রন্থ হইবে। এতদ্ভিন্ন তিনি "চূড়ামণি দর্শন" নামক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য দর্শনাদি অবলম্বনে বহু গবেষণা-মূলক এক প্রকাণ্ড মৌলিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষায় রচনার অর্থ, যাহাতে এই গ্রন্থ বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে জার্ম্মাণি প্রভৃতি বিদ্বৎসমাজে প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থ এখন বারাণসী কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে কাশীতে মুদ্রিত হইতেছে। ছাপা হইলে ইহাও প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা হইবে।

চূড়ামণি মহাশয়ের যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমন জগন্মাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি নিষ্ঠা ছিল। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণোচিত আচার নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার জীবনে আমরা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের ত্রিধারাসঙ্গম দেখিয়া ধন্য হইয়াছি।

শরৎচন্দ্র

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

রবি-চন্দ্রে যুগপৎ উদ্ভাসিত বঙ্গের আকাশ,
পূর্ণিমার লগ্ন পেয়ে মৃত্যু-রাহু করে চন্দ্র-গ্রাস;
কবলিতে সে অমরে না পারিয়া পরাজয় লাজে
পলায় সে ছায়া-ঢাকা গুপ্ত-পথে আঁধারের মাঝে।
'যমুনা'-জলতরঙ্গে শারদী সে কৌমুদীর ধারা
সঞ্চারিল সুধা-রস চঞ্চলিয়া আলোর ফোয়ারা।
বিরচিল সে প্রতিভা 'ভারতবর্ষে'র অলঙ্কার,
অমূল্য রতন-রাজি কাল-স্রোতে ক্ষয় নাহি তার।
বিচিত্র সে দান-লীলা, প্রাণবন্ত 'শ্রীকান্তে'র বাণী,-
ভালবেসে দিনু মোরা যশোময় সিংহাসনখানি,
পরাইনু জয়মালা, ভারতীর পরসাদী হার;—
ঘোষে শঙ্খ সত্য-ধ্বনি গরবিনী বাঙ্‌লা ভাষার।

সাহিত্য-রাষ্ট্রের বীর, ঝরে অশ্রু বিচ্ছেদ-ব্যথায়,
গিয়াছ যে লোকোত্তরে শ্রদ্ধা শুধু পঁহুছে সেথায়।

শেষের ক'দিন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

সকালে উঠে' ডাক্তারের বাড়ী যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ক'রে তৈরি হচ্ছি, শরৎ নেমে এসে বল্লেন : "বেরোবে বুঝি ?—কোথায় যাবে ?" "ডাক্তারের বাড়ী।"

"এত সকালে যেও না। এখেনে আটটার আগে কেউ তৈরি হ'তে পারে না : বুঝেছ, তোমার সাড়ে আট্টার আগে গিয়ে কাজ নেই।" ব'সলাম।

"দেশে যাবার ভারি ইচ্ছে হচ্চে।"

"ওটিকে ক'দিন চাপ্‌তে হবে, শরৎ।" "কেন বলত ?"

"চিকিৎসার একটা রীতিমত ব্যবস্থা না হ'লে তোমার দেশে যাওয়া হ'তেই পারেনা, সাফ্ ব'লে দিচ্চি।" চেয়ারের উপর ঠেস্ দিয়ে প'ড়ে, একটু ভেবে নিয়ে বল্লেন : "এ রোগের চিকিৎসা নেই। অপারেশন ছাড়া আর কি হ'তে পারে ?" "ওটা ঠিক বৈজ্ঞানিকের মত বলা হ'ল না। আমরা জানিনে ; কত উপায় থাকতে পারে। আর, যদি তাই হয় ত' অপারেশনই তোমায় করাতে হবে।"

"আমিও তাই বলি, সুরেন : চল চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে গিয়ে কুমুদকে দিয়ে অপারেশনটা করিয়ে ফেলা যাক্।...... কি বল ?" "সে যদি ডাক্তারদের মত হয় ত' তাই-ই ক'রতে হবে ; কিন্তু আসল কথা হচ্চে ডাক্তারেরা কি বলেন ?—সেইটেই তো সকলের আগে জানা চাই !"

শরৎ হেসে বল্লেন : "অত সোজা নয়, তুমি চেননা ওদের। কথায় বলে না, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা ?" "ও তোমার ফল্‌স এনালজি ! ডাক্তার আর বাঘ, মোটেই একজাতের জীব নয়।"

শরৎ একটা মস্‌করার হাসি হেসে বল্লেন : "ভবতি বিজ্ঞতরঃ ক্রমশঃ জনঃ। সুরেন, তোমার বিজ্ঞতর হওয়ার একান্ত দরকার দাঁড়িয়ে গেছে !"

বল্লাম : "পারলুম না বিজ্ঞই হ'তে যখন এত দিনে, বিজ্ঞতর হওয়ার ধৃষ্টতা মনে না রাখাই ভাল।...বয়সও হ'য়েছে,...চুলও বিলকুল পেকে গেল ! কিন্তু ঘটে বুদ্ধিটা র'য়ে গেল একদম কাঁচা—গ্রীন্ !" শরৎ হাস্‌লেন, "বল্লেন : চুল কি তোমার মনে কর বুদ্ধির তাতে পেকেছে হে ? ও সেই তোমার গৃহ-ভারতীর মাঠের কড়া রোদ্দুরে পেকেছে ! ...এতে তোমার শত্রু-মিত্রের, সব একমত !"

"শুনে যার-পর-নেই সুখী হ'লাম," ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে প'ড়লাম।

"কোথায় চ'ল্লে ?—এই সাত-সকালে, বলত ?" "পার্কে খানিক বেড়িয়ে নিয়ে, যাব কুমুদবাবুর বাড়ী।" "এতও পার তুমি ! এদিকে পার্ক উদ্ধার ক'রলে, ফের কোথায় ?" "কেন, মতিলাল নেহরু রোডে। কাল পোষ্টাপিস্ খুঁজতে গিয়ে দেখে এসেছি !"

"ব'সো ব'সো ! আর, ক্ষিদে করার জন্যে ওই বুড়োদের সঙ্গে দৌড়ে বেড়িয়ে কাজ নেই !" "ক্ষিদের জন্যে নয়। খোলা বাতাসে বেড়ালে, মাথা পরিষ্কার হয়।" "খুব পরিষ্কার আছে মাথা ! তুমি ব'সোত একটু ! আর এক কাপ্ চা খাও ; সারা রাত জেগেই তো কেটেছে।"

দু'-একজন ক'রে বন্ধু-বান্ধবের সমাগমের সম্ভাবনা হ'লেই উঠে গিয়ে ব'লে আস্‌চি ; "দেখুন, চেহারা খারাপের প্রসঙ্গটা একেবারেই ক'রবেন না।" যিনি আবার আগে একদিন এসেছিলেন, তাঁকে বলি : "সেদিনের চেয়ে ভালই তো মনে হয়, এই কথাই ব'লবেন দয়া ক'রে।"

এম্নি ক'রে সাম্‌লে সাম্‌লে, অবশেষে বেরিয়ে পড়ি কুমুদবাবুর বাড়ী সেদিন।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভারি ব্যস্ত তিনি।

বল্লেন : "এক্স-রে পরীক্ষা করাতে হবে।" "কোথায় সেটা হবে ? আপনার ল্যাবোরেটারিতে ?" "হ'তে

পারে। কিন্তু আমার চেয়ে ক্যাপ্‌টেন্ মুখার্জ্জির চোখটা ঢের বেশী ট্রেণ্ড। উনি ঐ কাজই ক'রছেন প্রায় সমস্ত দিনই।" "সে কোথায়?" "চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে।"

চল্লাম সেখেনে। বুড়ো দারওয়ান্ বল্লে: "সায়েব ব্যাঙ্কে গেছেন, এক্ষুণি আস্‌চেন।"

রাস্তার ধারে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লাম—একটা খেজুর গাছে গোটা কুড়ি-বাইশ ডাল! এ দেখ্‌চি এক বিস্ময়ের দেশ! কোন্ ফাঁকে ক্যাপ্‌টেন্ এসে গেছেন। বুড়ো স্লিপের উপর লিখিয়ে নিয়ে চ'লে গেল সায়েবের কাছে। ক্যাপ্‌টেন বল্লেন: "যে ডাক্তার এই পরীক্ষা করাতে চাচ্চেন, তাঁর চিঠি আন্‌তে হবে। তিনি লিখে দেবেন: শরীরের কোন্ অংশের পরীক্ষা হবে।…এ না জান্‌লে কি ক'রে হয়?… আপনি অনুগ্রহ ক'রে—যে কোন ডাক্তারের চিঠি নিয়ে আস্‌বেন…তারপর আমি ডিরেক্‌শন দেব।" "তথাস্তু।"

বেলা এগারটা বেজে গেছে—আমাদের ড্রাইভারের মধ্যাহ্ন চায়ের সময় প্রায় এসে প'ড়েছে, অতএব গাড়িখানা ফিরচে পবন-গতিতে। বাড়ীর কাছাকাছি এসে কালী দুজন মহিলাকে প্রায় চাপা দিয়েছিল আর কি! "কালী, তোমার বাবুর মানা আছে কুকুর-চাপা দিতে: কিন্তু মানুষের মধ্যেও সেই কুকুরের মতো জীবের বাসা আছে। লক্ষ্মী বাপ্‌ধন, মানুষ চাপা দিওনা। বিশেষ ক'রে নিরীহ নারী জাতি!" কালী মুখ টিপে টিপে হাসে। বল্লে সে: "কুকুর চাপা দিলে চাক্‌রির দফা তক্ষুণি রফা; মানুষ চাপা দিলে, ছাড়াও পেলে পেতে পারি।"

মহিলা দু'টির মধ্যে একটিকে বেশ মনে পড়ে: ফর্সা, লম্বা, মোটা-সোটা; চোখে একজোড়া কালো ফ্রেমের চশমা। পায়ে জরির কাজ করা লাল ভেল্‌ভেটের স্যাণ্ডেল; পরণে ধোপদস্ত টক্‌টকে লাল কাশীপেড়ে স্কার্ট শাড়ি। মনে থাকার একটু কারণও ছিল। বাড়ী ফিরে দেখি শরৎ বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে—উঠোনটাকে পরিষ্কার করাচ্চেন চাকরদের দিয়ে। আমি আস্‌তেই বল্লেন: "একটা ভারি মুস্কিলে পড়ে গিয়েছি, সুরেন।" "কি বলত?" "আরে, একটা প্রকাণ্ড ময়ূর কিনে ফেলেছি, এদিকে!" "কই দেখি!"

ডাক দিলেন: "বলরাম, ও বলরাম!" গাঙ্গুলীদের তারের বেড়ার ও-দিক থেকে বলরাম মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল। "কই, মামাকে দেখাও ত তোমার পাখীটা।"

বলরাম অবিলম্বে একটা ময়ূর বার ক'রে আন্‌লে: নেকড়া দিয়ে তার মাথাটা বাঁধা। "মাথায় ঘা-টা নেই তো?" "না বাবু, ওটা মানুষ দেখে ছট-ফট্ করে ব'লে বেঁধে দিয়েছি।" "বটে!" "তোমার কাছে কতদিন আছে?" "বেশী দিন নয়।" "কি খেতে দাও?" "ভাত, মুড়ি, কপির পাতা, আর দিনে গোটা চেরেক পাকা কলা।"

বল্লুম: "এ সব তো হচ্চে বাজে কথা; আসলটা বলত, দাম চাও কত?"

বলরাম সপ্রতিভ হাসে, বলে: "যা' দেবেন আপনারা।"

"তবুও বলরাম, কতোয় কিনেছিলে?" বলরাম ইতস্তত করে; তারপর, ব'লে ফেল্লে: "সাত টাকা!" সাত টাকা যে নয় তা তার ভাব-ভঙ্গি থেকে পরিষ্কার ধ'রে নিতে পারা যায়। শরৎ পাঁচটা টাকা বার ক'রে বল্লেন: "এই রাখ পাঁচ টাকা। দেখ বলরাম, মায়েরা আসুক, তাদের পছন্দ হয়, নিও সাত টাকাই। আর না হ'লে কিন্তু ফেরৎ নিতে হবে পাখী; আর তখন ব'লবে টাকা খরচ হ'য়ে গেছে, সে শুন্‌বো না, আমি।" ঘরে গিয়ে ব'সছি, সঙ্গে সঙ্গে সেই দুটি মহিলা এসে উপস্থিত। "এস বৌমা, ভেতরে এস।"…বৌমাকে ভিতরে ঢুকতে দ্বিধা করতে দেখে বল্লেন: "ও আমার মামা, সুরেন, ওকে দেখে লজ্জা কেন?" বৌমা ঢুকে প্রণাম ক'রছেন, সেই অবসরে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম উত্তরের বারান্দায়। বৌমা শরৎকে নিরীক্ষণ ক'রে, দু'-পা পিছিয়ে গিয়ে বল্লেন: "দাদা! এ কী হ'য়েছে ছিরি আপনার?"

কথার উত্তর না দিয়ে শরৎ একখানা কাগজ মুখের সাম্‌নে তুলে ধ'রলেন, যেন কতই প'ড়ছেন। কিন্তু বৌমাটি এ ইঙ্গিত বুঝলেন না: আবার সেই প্রশ্ন! চেয়ার থেকে উঠে শরৎ গিয়ে দাঁড়ালেন পশ্চিমের একটা জান্‌লার সামনে, বৌমার দিকে সটান্ পিছন ক'রে। কিন্তু বৌমা বেচারি তৃতীয় বার ভুল ক'রলেন। শান্ত হ'য়ে শরৎ ফিরে

বল্লেন : "বৌমা বাড়ী যাও। এত পথ ব'য়ে কি এই ব'লতে এসেছ আমায় ? আমি সবচেয়ে বেশী জানি এ খবর।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শরৎ। আমার পাশে দাঁড়িয়ে বল্লেন : "ময়ূরটাকে কোথায় রাখা যায় বলত ?" "আজ ঐ রান্না ঘরটার ওপাশের ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দিয়ে···" গোপালকে সঙ্গে নিয়ে—দুজনে সেদিকে যাওয়া গেল।

বেলা চারটে বেজে গেছে, উঠি-উঠি ক'রছি দেখে শরৎ জিজ্ঞেস করলেন : "কোথাও যাবে নাকি ?" "একবার কুমুদবাবুর বাড়ী যাব।" "ফের কেন ?" "একটা চিঠি আন্‌তে।" "কিসের চিঠি ?" "ক্যাপ্‌টেন মুখার্জ্জি চেয়েছেন। এক্স-রে পরীক্ষা সম্বন্ধে ডাক্তারের লেখা চিঠি।" "দেখেছ ত', ব'লেছি তোমায়·· ওরা ভারি হাঙ্গাম বাধায়, এই সব ছোট-খাট কথা নিয়ে।" "কিন্তু এটা তো খুব দরকারি ব্যাপার। ডাক্তারের ডিরেক্‌শন নৈলে, উনি কি ক'রবেন, কেমন ক'রে জান্‌বেন ?" শরৎ চেঁচিয়ে ডাক্‌লেন, "কালী, ও কালী···"

পাশের ঘরে বিশ্রাম ক'রতে ক'রতে কালী প'ড়েছিল ঘুমিয়ে। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, কালী এসে দাঁড়াল ! "মামাকে চা দিতে বল ; গাড়ি বার কর ; মামা যাবেন কুমুদের বাড়ী !" "আপনি ?" "আমিও যাব ওঁর সঙ্গে ; তারপর একটু বেড়িয়ে আসা যাবে ; কি বল ?" আমার দিকে ফিরে বল্লেন।

ডাকা-ডাকি ক'রে কুমুদবাবুকে নীচে নামালেন শরৎ। বল্লেন : "আচ্ছা কুমুদ, তোমাদের ব্যাপার কি বলত ! গা-ঢাকা দিয়ে থাকার মতলব ?" কুমুদবাবু আম্‌তা আম্‌তা ক'রে এড়িয়ে গেলেন এই প্রশ্ন। অবশেষে বল্লেন : "কেন সকালে মামা এসেছিলেন ; তাঁকে তো ব'লে দিয়েছি সব।" "ভারি কাজ ক'রেছ ! কোন্ একটা চিঠি লিখে দিলে, কুমুদ ? ওঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে মুকুয্যে। লেফাফা-দুরস্ত ক'রতে ক'রতে, কোনদিন রুগী যাবে টেঁসে !" ডাক্তারের মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি একখানা চিঠি-লেখার প্যাড্ নিয়ে চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিখানি আমার চষমার খাপের মধ্যে সযত্নে রেখে গাড়ীতে ব'সে কালীকে বল্লুম : "চল কালী, একবার চিত্ত-রঞ্জন সেবা-সদনে।" "না কালী, তুমি আমাদের গঙ্গার হাওয়া খাইয়ে একবার নিউ-মার্কেটে নিয়ে চল।" বল্লুম : "চিঠিটা দিয়ে গেলেই হ'ত না ? পথেই ত প'ড়বে ?" "অত তাড়াহুড়ো কিসের সুরেন ?" "দেশে যেতে চাইচো কিনা !" "আর দেশে গিয়েছি·· " "দেখ শরৎ, মনে জোর কর ; শুধু যে এক ভীষ্মেরই ছিল ইচ্ছা-মৃত্যু তা নয়। প্রতি মানুষের মধ্যেই ঐ শক্তি আছে ; তার সাধনা চাই ; প্রয়োগ ক'রতে শেখা চাই !"

অনেকক্ষণ বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকে শরৎ বল্লেন : "কি জানি ! তোমরা কোত্থেকে এত বিশ্বাস পেলে ! সব কথাই নির্ব্বিচারে মেনে নিতে পার ! আমার দ্বারা এটি কোনদিন হ'ল না !" "মানুষ যা-নয়, তাই যদি তার ওপর আরোপ ক'রে দেওয়া বিজ্ঞানের পদ্ধতি হয় তো, তোমার বিজ্ঞানকে নমস্কার করি !" "কেন ? আমি কি তাই করি নাকি ?" হেসে বল্লাম : "বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অন্তত, তাই ঘট্‌ছে !" শরৎ চুপ ক'রে রইলেন। গাড়ি-খানা মোড় নিলে গঙ্গার পথে। একটু পরে শরৎ বল্লেন : "বাঃ রাগ ক'রলে ? কি ব'লছিলে বল।" "বলতে যাচ্ছিলাম স্যাণ্ডোর কথা।" "স্যাণ্ডোর সঙ্গে আমার কিসের সম্বন্ধ ?" "দেহ আর মনের।···স্যাণ্ডো তাঁর যৌবনে পদার্পণ ক'রেই বুঝলেন যে, দৃঢ় মননের দ্বারাই তিনি তাঁর স্বাস্থ্য পেতে পারেন।" "তুমি কি মনে কর সুরেন, যে আমি মনের জোর ক'রলেই সেরে যেতে পারি ?" "নিশ্চয় !" "কিন্তু আমার মনে যে সে-জোর আসে না !" "সেই জোরের সাধনা চাই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা চাই !" "তুমি সত্যি বিশ্বাস কর, না, আমায় প্রবোধ দিচ্ছ, সুরেন ?" "তোমাকে প্রবোধ দেবার ধৃষ্টতা আমি রাখিনে, শরৎ।" "তা আমি জানি।"

স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম দু'-জনে। ছুট্‌চে গাড়িখানা উধাও হ'য়ে, গঙ্গার সজল হাওয়ার মধ্যে, বিপুল বেগে !

শরৎ আমার অলক্ষ্যে রুমাল বা'র ক'রে চোখ মুছে' বল্লেন : "অনেক পেলাম তোমার কাছে।"

খানিকটা পরে ব'ল্লাম : "আজ এ শুধু সত্যের

খাতিরে বলছি: প্রবোধ দেওয়ার প্রয়োজন হ'য়েছিল একদিন; কিন্তু সে তোমার জন্তে নয়।

"সে আবার কবে?" "থাক্‌গে, সে অবান্তর কথা।" "না, না, বল।" "শিবপুরের বাড়ীতে, বড়মার হ'য়েছে ওয়ার-ফিবার—ডবল-নিমোনিয়া। তোমার চিঠি পেয়ে এলাম। দেখি, মনের ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছ তুমি।" "ঐ আমার ভারি দোষ: আমি ভারি নার্ভাস্ হ'য়ে পড়ি!......ঠিক এম্নি হ'য়ে গিয়েছিলাম প্রভাস চ'লে যাওয়ার পর···মনে পড়ে?" "স্পষ্ট!···মাথায় পাগ্‌ড়ি বেঁধে দুপুরের রোদ ভেঙ্গে গিয়ে পৌছলুম—সাম্‌তার বাড়ীতে তোমার। ঘরে নেই, বাইরে নেই—খুঁজে আর পাইনে তোমায়··" "তারপর?" "দেখি, বাবাজির সমাধির কাছে গাছের আড়ালে বিহ্বল হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখছ, রূপনারাণের জলের বিপুল সমারোহ! তোমার সমস্ত চেহারার ওপর যেন কিসের কালো ছায়া পড়ে গেছে ......বুকে কিসের ধাক্কা খেয়ে গেলাম! তক্ষুণি দৃঢ়-সংকল্প জাগ্‌ল মনের মধ্যে—তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবেই হবে।......তখন কথাও শুনতে আমার!" "তখন যে শনির দৃষ্টি ছিলনা!"

হাস্‌লাম: "ও-আবার মান নাকি?" "মানিনে তো কি!···" ব'লে শরৎ সুইচ টেনে দিয়ে গাড়িখানার ভেতরটা আলো ক'রে দিলেন। নিজের হাতের নীলার আংটিটা দেখিয়ে বল্লেন: "কতো হাসি-ঠাট্টা ক'রেছি একদিন এই নিয়ে লোককে। গিরীন অসুখের জন্তে মাদুলি প'রলেন—না বুঝে তাঁর দুঃখ, কত উপহাস ক'রে চিরদিনের জন্তে অপরাধী হ'য়ে রয়েছি তাঁর কাছে!·· জানো তুমি সবই! তোমার সাম্‌নে কদিন এটা পরিনি। ফের প'রলাম তখনই—যখন বুঝলাম, এ নিয়ে বিদ্রূপ তুমি ক'রবেনা···একদিন একটা প্রশ্নও ত' ক'রলে না, সুরেন?" "দরকার হয়নি।"

নিউ-মার্কেটের সাম্‌নে গাড়ি রেখে তখনও আমরা নামিনি। একটা লোক হাতে একতাড়া গ্রে-গ্র্যানাইট্ চিঠির কাগজের প্যাড্ আর খাম নিয়ে উপস্থিত হ'য়ে বল্লে: "বাবু, সমস্তদিন খেতে পাইনি, কিছু যদি কেনেন ত' রাতে খেতে পাই।" লোক্‌টিকে দেখে মুসলমান ব'লে মনে হ'ল। শরৎ কোন কথা না ব'লে স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখটা অবলোকন ক'রতে লাগ্‌লেন। তার হাত থেকে একখানা নিয়ে বল্লাম: "কি দিতে হবে এর দাম, বড়-মীঞা?"

"যা' আপনার ইচ্ছে, বাবু! রাত হ'য়ে যাচ্চে—বাড়ীতে ছেলে-মেয়েরা ক্ষিদেয় ছট্‌-ফট ক'রছে;—যা' দেবেন সেই পয়সায় খাবার কিনে নিয়ে যাব····" কোন কথা না ব'লে দু'খানা প্যাড্ আর শ'খানেক খাম নিয়ে তার হাতে বারো আনা পয়সা দিলাম। শরৎ তার হাত থেকে একখানা প্যাড্ নিয়ে একটা টাকা দিলেন। লোকটি ক্ষিপ্র এদিক-ওদিক চেয়ে শরতের হাতে বারো আনা পয়সা দিয়ে ত্বরিতে অন্তর্দ্ধান! ঠিক যেন কার ভয়ে সে পালিয়ে গেল। অবাক হ'য়ে বল্লাম: "লোকটা যেন কার ভয়ে উধাও হ'ল।" "পুলিশের ভয়ে" শরৎ বল্লেন। "চোরাই মাল বিক্রি ক'রছিল?"

"না, বোধহয় এখেনটায় ফেরী ক'রে বিক্রি ক'রতে দেয় না! লোকটা জোচ্চোর নয়, তা'হ'লে বারো আনা দিত না।" পথে হাঁটতে হাঁটতে শরৎ বল্লেন: "আমি কিন্তু একটা একটাকায় কিন্‌ছিলাম। লোকটা ধ'রতে পারেনি।···গোড়ায় ওর খেতে না-পাওয়ার গল্প মোটেই বিশ্বাস হয়নি।···এখনও মনে হয়—সত্যি নয়। কিন্তু, তুমি যে অত সহজে বিশ্বাস ক'রলে, তাতেই আমার মনটা নরম হ'য়ে গেল। সুরেন, অত সহজে লোককে বিশ্বাস ক'রলে ভারি ঠক্‌তে হয়।"

বল্লাম, "ছোট-খাট ঠকায় লাভও আছে, অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে। ঠ'কেওছি অনেক!"

"তবুও তোমার বিশ্বাসের কমি নেই কিছু!" কথার উত্তর না দিয়ে শুধু নীরবে হাস্‌লাম। "হাস্‌লে যে?" "থাক্‌গে,—এ আলোচনা।" "না, না, বলই না, দুটো মনের কথা।" "অবিশ্বাস ক'রলে ··" "কি হয়?" "মানুষ, —কিছু মনে ক'রবে না তুমি?" "ছোট হ'য়ে যায় তো?" "সিনিক্ হ'য়ে যায়!"

"বুড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তো হ'য়েই যায়—সিনিক্···" "সেইটেই জীবনে সবচেয়ে বড় অভিশাপ্।" "কি রকম?" "ও সব আমার মন-গড়া থিওরি: তোমার শুনে কি হবে? সায়েন্স নয়, ফেতোলজি!" "না,

তোমাকে ব'লতেই হবে।" "শুনে একটি সান্ত্বনা ঝাড়বে তো ?" "না, না ; তুমি বল।"

"এ আমার বিশ্বাস ;—যুক্তি নয় ; এটি বোধহয়— অবিজ্ঞান, অন্ধতা··" "হ'য়েছে ভূমিকা ; বলতো তুমি।"

"মনে হয়, নিজেকে উঁচু ক'রতে হ'লে মনে ক'রে নিতে হয় যে আমার চারিদিকে যা' ভাল, সুন্দর এবং সত্য— তারই সমাবেশ র'য়েছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ—এসব সাংসারিকের ;···" "বেশ মজার কল্পনা তো তোমার! আমার মনে ঐ রকম একটা সাধ আছে বোধহয়। কিন্তু ঠক্‌লে আমি খুব হুঁসিয়ার হবার চেষ্টা করি ; কিন্তু সে হুঁসিয়ারিও বেশীক্ষণ থাকেনা।"

হাস্‌লাম : বল্লাম, "ঠ'কেও মানুষ ত রিক্ত হ'য়ে যায় না!" "সে কি রকম ?" "ধর তোমার কথাই বলি, কিছু মনে ক'রবে না তো ?" "পাগল!" "মনে পড়ে—তুমি যেদিন এই দুনিয়ার পথে স্রেফ্ ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে বেরিয়েছিলে—সেদিন কি ছিল তোমার, ঠিক নিজের বলার মত ? তারপরে, ব'লছ তুমি ঠ'কেছ ; কিন্তু কারুর কাছে প্রার্থীও নয়, আর হেরেও নেই! নয় কি ? ঠ'ক্‌লে তো কত।" "সে কথা ঠিক : কিন্তু জীবনে দুঃখও পেয়েছি অনেক।" "তার আর উত্তাপ নেই ; শুধু চাঁদের আলোর মতই মনের মধ্যে মাধুরী সৃষ্টি ক'রে আছে!—লোকে দাগা দিলেও মনে ত দাগ পড়েনি, শরৎ!"

শরৎ হাস্‌লেন, বল্লেন : "যে যাই অপবাদ দিক্, বাইরে ভেতরে, কোথাও আমি ছোট নই ; অভদ্র নই! সত্যি ; এটাই সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা!"

আব্‌ছা অন্ধকার থেকে হঠাৎ আমরা যেন আনন্দ-লোকের চিত্ত-তলে এসে পৌঁছে গেলাম। আলোয় কুয়কুটি! কাঁচের আলমারির মধ্যে চকমকে জিনিসগুলো— ঝলমল করছে। সেজেগুজে গন্ধ মেখে যেন পরীরা নেচে ফিরচে চারিদিকে! দাঁড়িয়ে আদেখ্‌লের মতো ক'রে দেখ্‌তে লেগে গেলাম। শরৎ সেটা খেয়াল ক'রেন নি। মনে ক'রেছেন আমি সঙ্গে সঙ্গেই আছি! হুঁস হ'ল হঠাৎ : কৈ শরৎ কৈ, চিনিওনে, অধীরও নয় মন ; খোঁজার চেষ্টা না ক'রে বেরিয়ে যাওয়ার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছি আনন্দ-প্রবাহ! ফুলের ষ্টলগুলো দেখা যায়— ওদের আবেদনের আঘাত মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীর উপর। পা এগুতে চায়—এগুইও একপা—তো পেছুই তিন পা! দূরে দেখ্‌লাম : মাথাভারি মাছের মত ডাগর চোক দুটো উদভ্রান্ত ক'রে জন-স্রোতের মধ্যে উজান বেয়ে আস্‌চেন শরৎ! মুখে একটা এমন ভাব, যা দেখে হাসি চেপে রাখা যায় না! মানে :—ছোট্ট ছেলে ভিড়ে হারিয়ে গেলে তবুও সহ্য হয় ; কিন্তু এই বুড়োটার একি কাণ্ড! ধম্‌কে দেবার প্রচেষ্টা সহসা ব্যর্থ হ'য়ে গেল আমার মিটিমিটি হাসি দেখে। "হাস্‌চ যে ?" "তোমার রকম দেখে। হঠাৎ ফিরে দেখি তুমি নেই! তোমাকে খুঁজে বা'র করার বৃথা চেষ্টা না ক'রে আছি দাঁড়িয়ে ; আর একটু পরে গিয়ে দাঁড়াতাম গাড়ির কাছে। এদিকে এসো—ঐ ফুলের ষ্টলে···" "ওদিকে বুঝি ?" ফুলের ষ্টলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, জানিনে কতক্ষণ দু'জনেই যেন বোবা হ'য়ে গেলাম। হুঁস হ'ল একটি অত্যন্ত সুশ্রী বাঙালী সায়েবের মিষ্টি কথায়।

যুবকটি বল্লেন : "একবার আমাদের ষ্টলের দিকে যাবেন ?" "সে আবার কোথায়", শরৎ জিগ্‌গেস্ ক'রলেন। "এই যে কাছেই।" এগিয়ে গিয়ে দেখি চাটুয্যেদের ষ্টল। "আপনাকে কিছু ফুল দিতে চাই!" "ফুল ? নিয়ে কি হবে ? মধ্যে মধ্যে এসে, এম্নি ক'রে দেখে যাব।···আমাকে ফুল দেবেন কেন ?" "দিয়ে আমাদের সুখ, আনন্দ!" "কত লোক ত' আসে, সবাইকে কি দেন ?" হেসে বল্লেন যুবকটি : "সবাইকে তো চিনিনে।" "আমায় চেনেন নাকি ?" "বাংলা দেশে আপনাকে চেনে না কে ?" ততক্ষণে একটা প্রকাণ্ড তোড়া পাৎলা কাগজে মোড়া হ'য়ে গেল। যুবকটি হাতে ক'রে এগিয়ে এসে শরৎকে দিলেন। যুবকটী বল্লেন : "রোজ আস্‌বেন ; একটু সকাল সকাল ; আজ ভালো ফুল ফুরিয়ে গেছে।" "রোজ নয়, এক-একদিন।" ব'লে শরৎ যে পথে এসেছিলেন সেই পথ দিয়ে ফিরতে লাগলেন। "কোথায় চল্লে এখন ?" "সিগারেট কিন্‌তে হবে।" কয়েকটা বাঙালীর দোকান ছাড়িয়ে শরৎ গিয়ে ঢুক্‌লেন একটা সায়েবের দোকানে। খুব বেশী দাম দিয়ে একটা টিন নিলেন। "এত দাম ?" "ভালো জিনিস, আর ঠকালেও

বিস্তর।" "ঠ'কলে কেন?" মুচ্‌কে হেসে বল্লেন: "ওই আর কি, স্বভাব!"

পাশের দোকান থেকে একটি বাঙালী ছেলে বেরিয়ে এসে বল্লে: "আমাদের দোকানে আসুন, স্যর্!" "তোমার দোকান? কোথায়?"

"এই যে!"

ছোট দোকানটি: কিন্তু দাম সস্তা। শরতের হাতের টিন্‌টা দেখিয়ে সে বল্লে: "এটার, কত দিলেন?" "তুমি কতোয় দিতে পার?" "আড়াই টাকা" "তবে দাও একটা: এর আসল দাম বুঝি পাঁচ-সিকে?"

"নাঃ, আপনার কাছে লাভ নিচ্ছি নে।"

"নাঃ, তবে থাক্, তোমার ব্যবসা অচল ক'রে দিতে হবে না।"

"অচল কি স্যর, আপনি আমার দোকানে নেন্ ব'লে—আমার কত কাট্‌তি!" "তবে তো অগ্রিম দেওয়া উচিত।" "তাই নিন্।" শরৎ হাস্‌তে হাস্‌তে একটা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে দিলেন।

বাড়ী ফিরে ফুলগুলোকে ভালো ক'রে রাখা একটা সমস্যা দাঁড়াল। জুৎ-সই ফুলদানি নেই: একটা বড় পিতলের ক'লসীও পাওয়া গেল না। একটা প্রকাণ্ড বাল্‌তির মধ্যে রেখে' ঘরের আলোগুলো সব জ্বালিয়ে দিয়ে জমিয়ে বসার চেষ্টা করা যাচ্চে এমন সময় নরেন দেব এলেন—হাতে মোটা গোছের বই একখানা—আর অনেক পুঁথি-পত্তর।

"ওটা কি হে নরেন?" "সেই অভিধানটা, দেব-সাহিত্য কুটীরের।"

শরৎ একটু দেখে, আমার হাতে দিয়ে ব'ল্লেন: "দেখ তো কেমন হ'য়েছে।"

চষমার খাপ থেকে চষমা খুলে'—মন দিলাম। গৃহিনী-পনার কাজ বাকি—ঠাকুর এসে দাঁড়াল—ভেতরে চ'লে গেলাম। খাবার তৈরি ক'রে ফিরে দেখি শরৎ পড়েছেন ঘুমিয়ে—নরেন বোধহয় তাই দেখেই চ'লে গেছেন। ডাকৃতেও মায়া হয়, রাতও অনেক হ'য়েছে; কি করি ভাব্‌চি এমন সময় খুব্‌লাল চাকরটা এসে কি ব'লে উঠ্‌ল।

সে চায় বাড়ী যেতে। অসুখ তার বাড়ীতে—"জীবনকে আস্‌তে দে—সে এলে তোর ছুটি হবে…"

"না বাবু, আমি কালই যাব··এই চিঠি এসেছে··"

"আচ্ছা দেখি তোর চিঠি!" দুর্বোধ্য মৈথিলী হিন্দিতে লেখা চিঠিটা শরৎ অনর্গল প'ড়ে গিয়ে বল্লেন: "কৈ তোর মার অসুখের কথা নেই ত?…ধান কাট্‌তে যাবি বুঝি?" খুবলাল চ'টে গেল; ধরা প'ড়ে গিয়ে বোধ হয়। সে মেজাজ খারাপ ক'রে ব'ল্লে: "মন হ'য়েছে যাব বাড়ী—অত কৈফিয়ৎ দিতে পারিনে।"

শরৎ রাগ চেপে বল্লেন—"যাস্ অখন—এই রাতে তো যাবিনে? কাল দেব তোর মাইনে চুকিয়ে।"

সকালে দুশ্চিন্তার আকাশ যেন মাথায় প'ড়ল ভেঙ্গে। চষমার খাপ আর পাইনে খুঁজে—এদিকে তার মধ্যে আছে ডাক্তারের চিঠি। সেটি নৈলে এক্স-রে পরীক্ষা অগ্রসর হয় না। এমন মুস্কিলও মানুষের হয়! নিজের বই পত্তর সব হাঁট্‌কে—জামা কাপড় ঝেড়েঝুড়ে—হতাশ হ'য়ে ব'সে আছি—ভাবচি, যাই কুমুদবাবুর কাছে—শরৎ এলেন নেমে।

"গুডমর্নিং, সুরেন।" চুলটি পরিষ্কার ক'রে আঁচ্‌ড়ান, মুখখানি তক্-তকে হাসি হাসি। "একি! আজ বাড়ী যাবে নাকি—সব জিনিসপত্র টেনে বার ক'রেছ যে?"

"না হে, আমার চষমার খাপ্‌টা পাচ্ছি নে।"

"সে পাবে অখন—অনেকদিন এসেছ, আজ একবার বাড়ী ঘুরে এস গিয়ে।" "বটে! এক্স-রে না করিয়ে পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।" "কি হবে এক্স-রে করিয়ে? যা হবে তা কি বোঝা যায় নি?"

ফাঁক্ বুঝে উপরে গিয়ে লেখার ঘরটা খুঁজে দেখ্‌ছি, যদি খাপটা কেউ নিয়ে গিয়ে থাকে। কালী এসে বল্লে: "এই তো দাদু; ওদিকে বাবু ব্যস্ত হ'য়েছেন; বল্‌চেন মামা কোথায় চ'লে গেলেন, রাগ ক'রে;—কি হ'য়েছে দাদু?"

"কিছু না কালী—তুমি আমার চষমার খাপ্‌টা খোঁজ ত; আমি সামলাই গে।" "এই যে, কাকে ফোন্ করছিলে?" "না, ফোন নয়; চষমার খাপ্‌টা"…

"আশ্চর্য্যি মানুষ তুমি, ঐ একটা বাজে জিনিস খুঁজে—হায়রাণ হচ্ছ—নেও, নেও, চা গেল জুড়িয়ে, তামাক গেল নিবে।" চা খেতে খেতে বল্লুম: "তাতে যে কুমুদবাবুর চিঠিটা র'য়েছে।" "তা' আর জানিনে…" ব'লে শরৎ এক-গাল হাস্‌লেন।

"বাঁচা গেল; ছুটি পেলাম দু'দিন।"

"কিসের ছুটি? যাচ্চি এখ্‌খুনি; নিয়ে আস্‌ব আবার।"

"শোন, শোন, সুরেন—বেশ তো থাকা গেছে ক'দিন। এবার তোমার ওষুধ-পত্তর দেও। দেখিনা তাতেই বা কি হয়!" হাসলাম। "হাস্‌চ যে?"

"হাতী ঘোড়া গেল তল,
গাধা বলে কত জল!"

কবিতায় কর্ণপাত না ক'রেই বল্লেন: "ব'লছিলে না, শেলদার কাছে কোন্ দোকান—কালী ও কালী; ওহে বৈঠকখানা বাজারের হাট কবে লাগে?" "আজই তো।" "আজ কি বার?" "শুকুর।" "সকালে তো হ'য়ে উঠ্‌বে না! বিকেলে—কি বল সুরেন? আজ থাক্‌গে কুমুদের বাড়ী যেও না… একটা দিন কেটে যেতে দাও—বিশেষ ক'রে, শনি রবি বারগুলো…আজ না হয় একবার ব্যাঙ্কে যাওয়া যাক্—খুবলাল বেটার মাইনেটা দিয়ে দিতে হবে। ঠাকুর—ও ঠাকুর!" ঠাকুরের সঙ্গে কথা হচ্চে—ওদিকে গৌরীবাবু এলেন। উঠে গিয়ে তাঁকে সাম্‌লে এলাম। গৌরীবাবুর আপিসের তাড়া আছে। তিনি উঠ্‌লেন। বল্লুম, "আপনার ওপর—একটা কাজের ভার দিতে চাই; সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের টিউব ওয়েলের জলটা এনে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।" "বেশ তো; একটা পাত্র দিন!" পাত্র খুঁজতে উপরে চলেছি, শরৎ নিরস্ত ক'রলেন: "বড় বাজার থেকে একটা স্ক্রু আঁটা জার্ম্মাণ সিল্‌ভারের পাত্র আন্‌তে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে বড়বাজারে গেলেই হবে।" বীজু এসে উপস্থিত; বল্লেন: "কি? কি?"

শরৎ বল্লেন: "এই ঠিক লোক পাওয়া গেছে: ও মায় জলটি পর্য্যন্ত এনে দেবে।" বীজুর চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; সলজ্জ হাসি হেসে বল্লেন: "বেশ, আমি দিচ্চি এনে।" শরৎ পাত্রের বর্ণনা ক'রলেন, তারপর বল্লেন: "সবাই বলে ঐ জলে একেবারে পেটে উইও হওয়া বন্ধ হ'য়ে যায়। তাহ'লে অনেকটা রক্ষে—বীজু তুমি এই ভার নেও; কবে আন্‌বে?" "আজই, চান্ তো দুপুরেই।"

গয়ংগচ্ছ ক'রে ব্যাঙ্কে যাওয়া হ'লনা। তিনটের সময় বৈঠকখানা বাজারে গিয়ে একরাশ চারা গাছ—আর চন্দ্রমল্লিকার কুঁড়ি সমেত গোটা বার গাছ আনা হ'ল। এখন চাই টব মাটি সার—আর জুৎসই একখানা বই। শরৎ উৎসাহ ভরে বল্লেন: "ক্রাইশ্যান্‌থিমামের ফুল এ বছরে ফোটাতেই হবে, যা থাকে কপালে।"

হরিদাসবাবু এইসব পরামর্শ শুনে নিশ্চয়ই আমোদ উপভোগ করছিলেন। অবশেষে উঠে যাবার সময় বল্লেন: "দাদা, এ বছরে চন্দ্রমল্লিকার ফুল ফোটাতে পেরে উঠ্‌বেন না। আমি আপনাকে গোটা চারেক গাছ পাঠিয়ে দেব, টব সমেত।" "কবে?" "যেদিন ব'লবেন।" শরতের চোখমুখ যেন বলে: দেরি কেন? আজই, এক্ষুণি! কিন্তু বিপুল আত্ম-সম্বরণের পর বল্লেন: "কাল সকালে।" হরিদাসবাবু মৃদু মৃদু হেসে বল্লেন—চারাগুলো না হয় পাঠিয়ে দেব। গাছ ক'টা—ফুল ফুটলে দেব: এই সময়টা ঠিক তাক্-বাগ্ হেকাজৎ না হ'লে—ফুল ফুটলেই পাঠিয়ে দেব।" অধৈর্য্যের আবেগ সইতে না পেরে শরৎ চেয়ারে নেতিয়ে প'ড়লেন।

বীজু এলেন একটু রাত ক'রেই, হাতে সুন্দর পাত্রটি! শরৎ উঠে ব'সলেন সঞ্জীবিত হ'য়ে। ঘরের হাওয়াটা যেন বদলে গেল! এতদিন পরে, ঠিক জিনিসটা এসে পৌঁছেচে! আর ভাব্‌না কি? "একটু জল দেব, শরৎ?"

"না, এখন নয়; খাওয়ার পর, শোয়ার আগে; ঘুম ভাঙ্‌লে খাব। তুমি এখন ওটা ওই জান্‌লার একপাশে রাখ।"

কি সাবধানতা; কত সঞ্চয় বুদ্ধি! যেন এক ফোঁটাও না অপব্যয় হয়!

খাইয়ে-দাইয়ে কাজ শেষ ক'রলাম; কিন্তু শুতে যাবার নামটি পর্য্যন্ত ক'রেন না শরৎ! শ্রান্ত হ'য়ে একটা তাকিয়ার উপর ঘুমিয়ে প'ড়েছি! জেগে উঠ্‌লাম শরতের খুবলালকে

ডাকার শব্দে। "দেখ্ খুবলাল, ঐ যে জান্‌লায় র'য়েছে জলের পাত্রটা—দেখেছিস ?"

"হুঁ।" "ঐটে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে আয় তো দেখি এদিকে।" "বাঃ ভরাই আছে।"

"এর জলটা—দেখ্ এমনি ক'রে খুল্‌তে হয় ; বাঁ দিকে ঘুরিয়ে—বুঝেচিস্ ? ওপরে, আমার খাটের পাশে, একটা ছোট্ট টেবিল আছে—তাতে একটা বড় কাঁচের গেলাস্ আছে। সেই গেলাসে যে জল আছে সেটা ফেলে দিবি—শুন্‌চিস্ ?" "হুঁ।" "সেই গেলাসে এর জল দিবি, ভ'রে নয় আধ গেলাস। গেলাসটা ঢেকে দিবি ; আর এটা ডাইনে ঘুরিয়ে বন্ধ ক'রে দক্ষিণের জান্‌লায় রেখে দিবি—বুঝেচিস্ তো ঠিক ?"

"হুঁ" ব'লে—খুবলাল বিদ্যুৎ-গতিতে পাত্রটা হাতে ক'রে বেরিয়ে গেল।

তারপরই শরৎ চম্‌কে উঠ্‌লেন ঘরের মধ্যে, বল্লেন : "সর্ব্বনাশ! খুবলাল, ওরে খুবলাল ; জলটা ফেলে দিলি ?" উঠে প'ড়ে দেখ্‌লাম : শরৎ যেন বিভীষিকা দেখে কাল্‌শিট্টে মেরে গেছেন। চোখের উপর ভয় আর হতাশের ধোঁয়াটে আচ্ছাদন ভেদ ক'রে—রাগের বহ্নি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে দেওয়ার জন্তে ভয়ঙ্কর হয়ে বেরিয়ে আসে আর কি! মনে হ'ল, প্রলয় আসন্ন! "খুবলাল, খুবলাল, এদিকে আয় শুয়োর—" খুবলাল কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এসে দাঁড়াল দোরের সাম্‌নে। "ফেলে দিলি সব জলটা ?" "সবটা" বলে পাত্রটা উপুড় ক'রে দেখিয়ে দিলে যে তার কথায় সত্যের কোন কার্পণ্য নেই! শরৎ আমার দিকে ফিরে একটা এমন ডাক দিলেন আমায়—যার মধ্যে আমি একটা সুবৃহৎ মহাকাব্যের আগা-গোড়া কাহিনী এক নিমেষে শুনে ফেলে' পূর্ণ উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলাম! আমার সাম্‌নে যেন পরিস্ফুট হ'য়ে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল সেকালের সেই দেবতাদের যজ্ঞের হবি—অসুরদের কেড়ে খেয়ে যাওয়া! সেই রাতে, দুজনের চোখে-চোখে চাওয়া-চায়িতেই—যেন সব আশার শেষ হ'য়ে গেল! সাম্‌নের চটিটা তুলে শরৎ খুবলালের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। খুবলাল নিমেষে তার চাক্‌রির পোষাকি-বাংলা ছেড়ে—শেষের সম্বল মাতৃ-ভাষার আশ্রয় নিয়ে চীৎকার ক'রে পালিয়ে গেল : "আরে—মার ডালা!" গেটে তালা প'ড়ে গিয়েছিল—খুবলাল সেটা নিমেষে টপ্‌কে গিয়ে কোথায় মিশিয়ে গেল! শরতের গতি রোধ করতে হ'ল।

বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে দেখ্‌লাম : শরৎ বাজ-পাখীতে তাড়া-করা পাখীর ছানার মতই ধুঁক্‌চেন! কণ্ঠে প্রাণটি এসে কোন রকমে আট্‌কে আছে!

ক্রমশঃ

অজ্ঞেয়

তরলিকা দেবী

হে অপরিচিত, কতটুকু মোরে
পরিচয় তব দিলে!
চিরপরিচিত মনে হয়—তবু
সুদূর নীলিমা নীলে—
রহস্ত ঘেরা রহিলে মগন
পরশ জানায়ে করিলে গমন,
অন্তর-চিত ভরিয়া রহিলে
শূন্ত হোলো না দূরে,

এ কেমন খেলা পরিচিত মোর,
নিত্য নূতন সুর।
প্রাণে প্রাণে আমি করি অনুভব,—
যেটুকু পেয়েছি ওগো দুর্লভ,
অনন্তকাল হিয়ায় রাখিয়া
লীলা তরঙ্গ তব
মিটিল না আশ, ছলায় কলায়
পিপাসা বাড়াও নব!

রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে প্রস্তাব

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

গত দুই তিন মাস হইতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে 'রবিবাসরে' ধারাবাহিক আলোচনা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত ও সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন। তৎপরে এ সম্পর্কে আমি যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছি তাহা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে প্রকাশিত হইল। প্রস্তাবের সমর্থক যুক্তি প্রস্তাবের মধ্যেই আছে। সুতরাং সে বিষয়ে পৃথক আলোচনা অনাবশ্যক।

"হিন্দি ভাষাকে নিখিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সম্প্রতি কংগ্রেস কর্ত্তৃক এবং হিন্দি-ভাষাভাষী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব এবং প্রচেষ্টা চলিয়াছে, আমি তাহার বিরুদ্ধে কলিকাতা নগরীর এই খ্যাতনামা এবং প্রভাবশালী সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান 'রবিবাসরে'র পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের এবং ভারতের বাহিরের সকল বাঙলা ভাষাভাষী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এবং অপরাপর সম্প্রদায়ের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রতিবাদ-প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি—যে-হেতু

প্রথমতঃ—১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস্ রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সংখ্যা হিসাবে পশ্চিমা-হিন্দী-ভাষাভাষীর স্থান প্রথম অর্থাৎ প্রতি দশ হাজার জন লোকে ২০৪১ এবং বাঙলা-ভাষাভাষীর স্থান দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রতি দশ হাজারে ১৫২৫; সুতরাং রাষ্ট্রভাষার দাবীর হিসাবে বাঙলা ভাষার একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যাইতেছে পশ্চিমা-হিন্দী (Western Hindi), কারণ সংখ্যানুক্রমিক তৃতীয় ভাষা 'বিহারী'-ভাষীর জনসংখ্যা প্রতি দশ হাজারের হিসাবে মাত্র ৭৯৭ অর্থাৎ বাঙলা ভাষার প্রায় অর্দ্ধেক। কিন্তু পশ্চিমা-হিন্দীকে একটি অখণ্ড সমগ্র ভাষা বলিয়া বিবেচনা করা চলে না। সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ সার জর্জ গ্রীয়ারসনের মতে পশ্চিমা-হিন্দী এমন কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত—যেগুলিকে বিভিন্ন বিভাষা (dialect) না বলিয়া বিভিন্ন ভাষা (Language) বলিয়া গণ্য করাই উচিত—বিভিন্ন বিভাগ-গুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এতই অধিক। তদ্ভিন্ন, পশ্চিমা-হিন্দী দুইটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত—যথা উর্দু এবং হিন্দী। এই সম্পর্কে Encyc opædia Britannica 14th Editionএর ৫৭১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "Urdu has adopted a Persian vocabulary and a few peculiarities of Persian construction, and these, perhaps, combined with the use of high-flown and pedantic Persian and Arabic words, and the general use of the Persian instead of the Nagari character, have induced some to regard Hindusthani or Urdu as a language distinct from Hindi. We must define Urdu as the Persianized Hindusthani of educated Muslims, while Hindi is the Sanskritized Hindusthani of educated Hindus. Urdu, from the number of Persian words which it contains, can only be written conveniently in the Persian character, while Hindi, for a parallel reason, can only be written in th Nagari, or one of its related alphabets." সুতরাং দেখা যাইতেছে পশ্চিমা-হিন্দীর মধ্যে শুধু ভাষাগত সমস্যাই নহে, লিপিগত সমস্যাও আছে। এই নানাভাবে বিভক্ত পশ্চিমা-হিন্দীকে ভারতবর্ষের প্রতি দশ হাজার জন সংখ্যার মধ্যে ৭৯৫৯ জনের উপর বলপূর্ব্বক চালানো অসঙ্গত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—পশ্চিমা হিন্দীর বিরুদ্ধে বাঙলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকার পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, যদিও সমগ্র ভারতবর্ষে ৭,১৫,৪৭,০৭১ জন লোক পশ্চিমা-হিন্দী ও ৫,৩৪,৬৮,৪৬৯ জন লোক বাঙলা ভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু এই উভয় ভাষার যদি

উভয়ের সমশ্রেণীর ভাষাগুলির লোকসংখ্যা যোগ করা যায় তাহা হইলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত দাঁড়ায়। পশ্চিমা-হিন্দী এবং পূর্ব্বা-হিন্দী একটি সমজাতীয় ভাষা-সঙ্ঘ, পক্ষান্তরে বাঙলা, বিহারী, উড়িয়া এবং অসমীয়া অপর একটি সমজাতীয় ভাষা-সঙ্ঘ। একথা আমার নিজের মত নয়, ইহা সর্বজনস্বীকৃত তত্ব। এই তত্ত্বের সমর্থনে Encyclopædia Britannicaর ৪০৭ পৃষ্ঠা হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিতেছি:—"It (the Bengali language) is an immediate descendant of Magadhi Prakrit which spread from South Behar in three lines—southwards, where it developed into Oriya; south-eastwards into Bengal proper, where it became Bengali; and eastwards, through northern Bengal, into Assam, where it became Assamese. Thus the language of northern *Bengal, though usually and conveniently treated as a dialect of Bengali, is, in reality, a connecting link between Assamese and* Behari, the language of Bihar." সুতরাং দেখা যাইতেছে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম একটি সমগোত্রীয় ভাষা-প্রদেশ। পশ্চিমা-হিন্দীর জনসংখ্যায় পূর্ব্বা-হিন্দীর জনসংখ্যা যোগ করিলে মোট জনসংখ্যা হয় ৭,৯৪,১৪,১৭৪, পক্ষান্তরে বাঙলা ভাষার জনসংখ্যায় তদ্জাতীয় ভাষার জনসংখ্যা যোগ করিলে মোট জনসংখ্যা হয় ৯,৪৫,৮৮,৩৫০, অর্থাৎ বাঙলা ভাষার স্বপক্ষে ১,৫১,৭৪,১৭৬ জনের আধিক্য।

তৃতীয়তঃ—বিহারী, উড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষা ছাড়িয়া দিয়া শুধু বাঙলা ভাষা ধরিলেও সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে জনসংখ্যা হিসাবে বাঙলা ভাষা দ্বিতীয় ভাষা। প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ২০৪১ জন পশ্চিমা-হিন্দী ব্যবহার করে, পক্ষান্তরে ১৫২৫ জন বাঙলা ভাষা ব্যবহার করে। বাঙলা দেশে প্রতি দশহাজারে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করে ৯২২৬ জন লোক এবং পশ্চিমা-হিন্দী ব্যবহার করে মাত্র ৫০ জন। আসামে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক অর্থাৎ প্রতি দশহাজারে ৪২৮৯ জন বাঙলা ভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু পশ্চিমা-হিন্দী ব্যবহার করার কোনো উল্লেখ নাই। বিহার ও উড়িষ্যায় প্রতি দশহাজারে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করে ৪৫৮ জন লোক, পক্ষান্তরে পশ্চিমা-হিন্দী ব্যবহারকারী লোকের কোনও উল্লেখই নাই। ব্রহ্মদেশে প্রতি দশ হাজারে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করে ২৫৭ জন ব্যক্তি, পক্ষান্তরে পশ্চিমা-হিন্দী ব্যবহার করে ১৩২ জন।

চতুর্থতঃ—১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন লিপি সম্বন্ধে কোনো বিচার করা হয় নাই। হইলে খুব সম্ভবত বাঙলা লিপিরই প্রাধান্য দেখা যাইত। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে পশ্চিমা-হিন্দী ভাষা প্রধানতঃ দুই প্রকারের লিপিতে বিভক্ত—দেবনাগরী এবং ফার্সি। পক্ষান্তরে মৈথিলী ও অসমীয়া ভাষার লিপির সহিত বাঙলা লিপির কোনও পার্থক্য নাই বলিলেই চলে। দেবনাগরী লিপির হিসাবে পশ্চিমা-হিন্দী হইতে যদি উর্দ্দুর অংশ বাদ পড়িয়া যায় এবং বাঙলাতে মৈথিলী ও অসমীয়া যুক্ত হয় তাহা হইলে লিপির সংখ্যা হিসাবে বাঙলা পশ্চিমা-হিন্দীকে নিশ্চয় অতিক্রম করিয়া যাইবে—এমন কি আরও যে কয়টি ভাষায় দেবনাগরী লিপি প্রচলিত আছে তাহাদের সংখ্যা যোগ করা হইলেও—যাইবে।

পঞ্চমতঃ—ভাষা-সম্পদের এবং সাহিত্য-গৌরবের দিক দিয়া বাঙলা ভাষা যে ভারতবর্ষের সকল ভাষার মধ্যে বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু যেদিন হইতে হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে সেইদিন হইতেই আমাদের এই বহুসম্পদশালী বাঙলা ভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। রাজভাষা হিসাবে ইংরাজি ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দী ভাষা আমাদের ব্যবহারিক এবং অর্থার্জনিক জীবনের উপায় অবলম্বনস্বরূপ অবশ্য-শিক্ষণীয় হইবে এবং অফলপ্রসূ অপ্রয়োজনীয় তৃতীয় ভাষা—বাঙলা ভাষা—কালক্রমে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ নিষ্কাসিত হইয়া মাত্র গৃহ-সংসারের কথোপকথনের ভাষায় পরিণত হইবে। বড় জোর, অবসর-বিনোদনের বস্তু হিসাবে নাটক-নভেল কাব্য-কবিতার মধ্যে সামান্য-কিছু স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

ষষ্ঠতঃ—ইংরাজি ভাষাকে মূলোচ্ছেদপূর্ব্বক বর্জন করিয়া হিন্দীভাষাকে তৎস্থলাভিষিক্ত করা কিছুতেই সমীচীন হইবেনা। তাহা হইলে বিশ্ব-সংস্কৃতির দ্বার অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে জগতের প্রগতির পথে আমরা দেখিতে দেখিতে

পিছাইয়া পড়িব, কারণ ইংরাজি ভাষা জগতের মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। সুদূর আমেরিকা, ইয়োরোপ, এমন কি জাপান এবং চীনের সহিতও এই ইংরাজি ভাষার দ্বারা আমাদের শিক্ষাগত, সংস্কৃতিগত, রাষ্ট্রনীতিগত সর্বপ্রকার চিন্তার বিনিময় চলিতেছে; হিন্দীভাষার দ্বারা সেই কার্য্যসাধন উপস্থিত ত' হইবেই না, সুদূর ভবিষ্যতেও হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যে ইংরাজি ভাষা আমরা বহুদিন ধরিয়া বহু যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছি এবং যাহার দ্বারা আমরা প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছি তাহাকে বর্জন করা কিছুতেই চলিতে পারেনা।

তদ্ভিন্ন, ইংরাজি ভাষার মধ্যে কোন ভারতবর্ষীয় প্রাদেশিক ভাষার নিমজ্জনের আশঙ্কা নাই; কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হইলে সমগোত্রতাবশতঃ তাহার মধ্যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভাষা যে ডুবিয়া মরিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল মহাদেশে প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিরাপদে বর্ত্তমান থাকে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

সপ্তমতঃ—হিন্দী-ভাষাকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে একতার সূত্রে আবদ্ধ করা যাইবে বলিয়া হিন্দীভাষার সমর্থকগণ যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা অসার। সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর ধরিয়া ইংরাজি ভাষা রাজ-শক্তির প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াও এবং স্কুল-কলেজে পঠিত এবং আইন-আদালত ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বত্র ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও লোকসংখ্যার হিসাবে যে নিতান্ত স্বল্পমাত্র প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিন্দী রাষ্ট্রভাষার ভবিষ্যৎ বিশেষ সমুজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়না। তাই যদি হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভারতবর্ষকে হিন্দী শিখাইবার জন্য বিপুল অর্থব্যয় এবং প্রচণ্ড চেষ্টার পণ্ডশ্রমে কি এমন লাভ হইবে তাহা বুঝা কঠিন। ভাষার মিল হইলেই যদি মনের এবং মতের মিল হইত তাহা হইলে বাঙলা দেশ আজ এমন করিয়া হিন্দু মুসলমান সমস্যায় জর্জরিত হইতনা।

অষ্টমতঃ—পূর্ব্বে যে-সকল যুক্তি প্রদর্শিত করিলাম বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশগুলি সম্বন্ধেও সেগুলি, অথবা তাহার অধিকাংশ প্রযুক্ত হইতে পারে; কারণ আসাম, উড়িষ্যা, বোম্বাই, ব্রহ্মদেশ, আজমীর-মাড়বার, বেলুচিস্থান, মাদ্রাজ, বরোদা, কোচিন, হায়দ্রাবাদ, উত্তরপশ্চিমসীমান্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, জম্মু, মহীশূর, রাজপুতানা, গুজরাট, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি প্রদেশে পশ্চিমা-হিন্দী ভাষা হয় অপ্রচলিত ভাষা, নয় অপ্রধান ভাষা।

উপরে যে-সকল যুক্তি এবং কারণ প্রদর্শিত হইল তাহার প্রভাবে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে—

(১) যতদিন না পশ্চিমা-হিন্দী বা অপর কোনো প্রাদেশিক ভাষা সম্পূর্ণভাবে এবং সর্বতোভাবে রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগত্যা লাভ করিতেছে এবং জগতের চতুর্দিকে অন্ততঃ উচ্চ-শিক্ষিত লোকের বোধগম্য না হইতেছে ততদিন এতাবৎ যেমন চলিয়া আসিয়াছে ইংরাজি ভাষাই ভারতবর্ষের ব্যবহারিক ভাষারূপে প্রচলিত থাকুক।

(২) কংগ্রেসের অধিবেশনে যে-সকল আলোচনাদি হইবে তাহা হয় ইংরাজি ভাষায় হইবে, নচেৎ যে-যে দেশে অধিবেশন হইবে তৎ-তৎ প্রদেশের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কংগ্রেসের অধিবেশন যখন বরোদা রাজ্যের কোনো স্থানে হইবে তখন সেই অধিবেশনের বক্তাগণ হয় ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করিবেন, নয় গুজরাটি ভাষা; পশ্চিমা-হিন্দী বা অপর কোনো প্রাদেশিক ভাষায় সেখানে আলোচনা চলিবে না।



আদিম ভিখারী

"বিকে"

সুন্দরী বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। যারা সাধারণের একটু উপরে, সাজেরা বহরে তাদেরি সুন্দরী বলে মেনে নিতে হয়।

সেদিন কার্পোতে কিন্তু দেখলাম একটি সুন্দরী। তার রূপের ঝলকে Louis XIV হলখানি আলো হয়ে আছে। রূপকথার রাজকন্যার কথা মনে হল। "কুচবরণ রঙ্‌, তার মেঘবরণ চুল"। একবার দেখলে আর চোখ ফেরান যায় না। অনেকেই চেয়েছিল তার দিকে। এমন কি যাদের স্ত্রীও ছিল সঙ্গে। শুনলাম সত্যি সে কোথাকার রাণি, কাশীতে বিশ্বনাথের মাথায় সোনার বিল্বপত্র দিয়ে এখানে বেড়াতে এসেছে।

ফিরে এসে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের ধারে বসে আছি। মেঘলা সন্ধ্যা। যৌবনের স্বপ্ন দিয়ে গাঁথছিলাম এক mediæval নাটক সেই অজানা সুন্দরীকে ঘিরে।

একখানি মস্ত 'রোল্‌স্' হুস্ করে সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখি আমারি নায়িকা। পাশে বসে বোধ হয় রাজা, বিপুল দেহ, উগ্র দাম্ভিক চাহনি, কাইজারের ধরণের গোঁফ, কানে হীরের দুল, মাথায় জরীর পাগড়ি। ড্রাইভারের পাশে একটি যুবক, সাহেবী পোষাক পরা, ফরসা ছিপছিপে চেহারা, চোখে রঙীণ নেশা। কল্পনার জাল গেল ছিঁড়ে। মনে মনে বললাম, হায় জীবন দেবতা! কার পাশে বসিয়েছ কাকে। Beauty and the Beast.

পাশে দেখি আর একজনও চেয়ে আছে তারি দিকে। দেখে মনে হল, অনেক দিন থেকেই বেচারী বেকারের দলে নাম লিখিয়েছে। ঘুরে দাঁড়াতে, গ্যাসের আলোয় তার মুখখানি দেখলাম। যেন এক আহত পরাস্ত সৈনিকের অবসাদভরা চাহনি, যে জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে নিরুদ্দেশের খোঁজে।

রাণী ফিরে দেখল। দুজনায় হল চোখাচোখি। রাণীর মুখে এল রক্তের ঝলক, চোখে এল আকাশপারের আলো, ঠোঁটে এল এক টুকরো হাসি, আবার তা মিলিয়ে গেল। রাণী মুখ ফিরিয়ে নিল। পথিক দেখি দাঁড়িয়ে আছে পাথর হয়ে। তার রক্তশূন্য মুখ আরো সাদা হয়ে গেছে গ্যাসের আলোয়। শুধু তার চোখ দুটী যেন জ্বলছে—মোটরের হেড্‌ লাইটের মত। মনে হল যেন এই আলোই যুগ যুগান্তর ধরে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে ভাবলাম তাইত, আমার নায়িকা দেখছি চেনে এই মলিন পথিককে।

রোল্‌স্ গর্জ্জন করে উঠল। তারপর মিলিয়ে গেল পথের কোলাহলের মাঝে। যতদূর দেখা যায় আমরা চেয়ে রইলাম সেই দিকে।

তারপর পথিক চলল ময়দানের অন্ধকারের ভিতর। ভাবলাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি—এই সুন্দরীর সঙ্গে তার আলাপ হল কি করে। কিন্তু সাহসে কুলাল না। তবুও থাকতে না পেরে আমিও তার পেছন নিলাম।

ময়দান পার হয়ে সে গিয়ে পড়ল একেবারে গঙ্গার ধারে। তারপর নির্জ্জন মিলিটারী জেটীর উপর উঠল। আমাকে আসতে দেখে, হেসে উঠল সে, বললে আসুন। কষ্ট হল আপনার। এতখানি হাঁটা বোধ হয় অভ্যাস নেই। যাহোক আমি আত্মহত্যা করতে আসিনি, যদিও আমার দলের অনেকেই করে থাকে। আমি থ হয়ে বসে পড়লাম। বলবার কিছুই খুঁজে পেলাম না। সেও বসল।

আকাশ ভরা মেঘ। এপার ওপারের আলোগুলো অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আগুনের ফুল্‌কীর মতন জ্বলে। নিস্তব্ধতা ভেদ করে মাঝে মাঝে মাঝিদের গলার স্বর শোনা যায়।

আমার সমস্ত সাহস একত্র করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, দেখুন আজ সন্ধ্যায় যে সুন্দরী ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে দেখা দিয়েছিল, আপনি চেনেন তাকে, জানেন সে কে?

সে ঘাড় নেড়ে বললে, জানি। সে এক রাণী। আমি বললাম, যদি কিছু মনে না করেন তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কি করে জানতে চাই। এদেশের মেয়ে বলে ত মনে হয় না।

সে বললে—আশ্চর্য্য হবার কথাও বটে। আমি পথের ভিখারী আর সে রাজরাণী।

দূরে একটা ষ্টীমারের সার্চ্চলাইট ঘুরে ফিরে জেটীর উপর এসে পড়ল। সে তার দিকে চেয়ে রইল। মনে হল যেন এই সার্চ্চলাইটের সাহায্য নিয়ে সে নিজের স্মৃতির অন্ধকার ভেদ করে দেখবার চেষ্টা করছে।

তারপর সে বললে, আপনি হয়ত ভাববেন আমি পাগল। তাতে কিছুই যায় আসে না। এই সুন্দরীর সঙ্গে চেনা আমার হাজার হাজার বছর আগেকার। তখন মানুষ সবে দল বাঁধতে শিখেছে—আর একজনকে দলের ভিতর থেকে তার শক্তির সম্মানে রাজা করে বেছে নিয়েছে। তখন ছিল শক্তির জয়। যার যা দরকার সে নিজের শক্তি ও তেজের জোরে নিত—নয় নিতে গিয়ে প্রাণ দিত।

আমিই সেই যুগে মানুষের ভিতর প্রথম করুণা আবিষ্কার করি। দেখলাম মানুষের দুর্ব্বলতা ভেঙে বেশ সহজ ভাবেই জীবন কাটান যায়। তাই আমি হলাম সেই যুগে প্রথম ভিখারী। আর এই সুন্দরী ছিল সেই দলের প্রথম রাণী।

পথিকের স্বর কেঁপে উঠল। একটু থেমে সে আবার বললে; একদিন দেখলাম রাণীকে সর্পদেবের পূজায় কোজাগর পূর্ণিমার জোছনায়।

ণী যেমন স্তম্ভিত অসাড় হয়ে সাপের সামনে প্রাণ হারায়, আমিও মনি নিজেকে হারালাম। রাণীই হল আমার দিনের চিন্তা রাতের ঘ। দিন যায় মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পাই, আর চঞ্চল মনে বিদ্যুৎ খেলে যায়, ঝড় ওঠে।

একদিন রাজা তার দল নিয়ে গেল শিকারে। দের রেখে গেল সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণে তাদের মাঝে ছিলাম আমিও।

সেদিনও পূর্ণিমা। ছোট নদী, কুলকুল করে বয়ে যায়। পাশে বন। আর তারি এক ফাঁকে আমাদের দলের আস্তানা। সন্ধ্যার জোছনায় বসে আছি নদীর ধারে। বিরহের জ্বালা আর যৌবনের স্বপ্ন নিয়ে। পাশে কে যেন এসে দাঁড়াল। ফিরে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠলাম, রাণী তুমি এখানে!

সে বললে হাঁ। বলে আমার হাত ধরে নিয়ে চলল বনের ধারে। রক্ত আমার নেচে উঠল।

এক বকুল গাছের তলায় এসে রাণী বসল আমাকেও বসালে। কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে, আমার মাথা তার কোলের ভিতর টেনে নিয়ে সে বলল—তুমি কেন অমন বিষাদভরা করুণ চোখে চেয়ে থাক আমার দিকে। কি চাও তুমি!

অনেক কথাই বলবার ছিল। কিছুই বলা হল না। সব যেন মনের ভিতর জমাট বেধে গেল। শুধু বললাম—রাণী, চাই তোমাকে।

রাণীর চোখে এল ভয়। আমার হাতখানি জোর করে চেপে ধরে বললে—কি বলছ তুমি। প্রাণের ভয় নেই তোমার। রাজা টের পেলে যে তোমার মাথা যাবে।

বললাম হেসে, জানি। তবুও চাই তোমাকে।

আমাকে! বলে রাণী কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর বললে, কেন?

এ কেনর উত্তর দেবার শক্তি আমার ছিল না। তাই বললাম—জানি না। জানি শুধু এইটুকু যে চাই তোমাকে। না পেলে জীবনটা হবে ব্যর্থ, বেঁচে থাকার কোন মানেই হবে না। মানুষ চায় সম্পূর্ণতা। আমার সম্পূর্ণতা পাব আমি তোমার মাঝে

রাণী আমার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগল। মনে হল যেন আমার কথাগুলো তাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

হঠাৎ তার দৃষ্টি কঠিন হয়ে, ঘৃণায় তার চোখ দুটি জ্বলে উঠল। সে বললে, তোমার জীবনের দাম কি, তোমায় এরা রেখেছে দয়া করে, পোষা কুকুরের মত। তোমার জীবন পূর্ণ হল বা নাই হল তাতে কি আসে যায়; জন্মেছ শুধু মরবার জন্য; পূর্ণতা পাবার অধিকারী তারা, যারা নিতে জানে তাদের পৌরুষের গৌরবে। রাজা বীর। তার শক্তি আছে, সম্পদ আছে, সম্মান আছে। সে আমায় জয় করে নিয়ে এসে রেখেছে তার প্রেম দিয়ে ঘিরে। তোমার শুধু আকুল কামনা, কাতর ভিক্ষা—কিন্তু ব্যর্থ, শক্তিহীন, পঙ্গু। ভুলে যাও এ শিশুর আব্দার। ভিখারী তুমি, চাও তুমি রাণীর প্রেম!

সে উঠে দাঁড়াল। বললে, যাও ভিখারী—জীবনে আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্মৃতি নিয়ে পড়ে থাক। দুর্বহ জীবন গভীর অবসন্নতায় নত হয়ে থাকবে। মুগ্ধ হয়ে শুনলাম তার কথা। বললাম রাণী তুমি অপমান করে যাও। তবু মনে রেখ, আমি চাই তোমাকে, আমি তোমার পূজারী।

রাগে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। বললে, নির্লজ্জ, কাপুরুষ। যা নেবার শক্তি নেই তা চাও কোন সাহসে! ফিরে চলে যেতে যেতে সে আবার থমকে দাঁড়াল। আমার কাছে এসে হাত ধরে বললে ভিখারী, তুমি চাও আমায়। জেনো পাবে না। তবু আবার দেখা হবে যুগযুগান্তর ধরে। আমি হব রাণী, তুমি ভিখারী। চিনব তোমায়, তুমি যে আমার জীবনের পূজারী।

তার চোখে মুখে ফুটল এক অদ্ভুত হাসি। সেই হাসি আবার দেখি অনেক দিন পর, ইটালীতে মোনা লিসার মুখে। রাণী চলে গেল।

এক টুকরো কাল মেঘ এসে পূর্ণিমার চাঁদকে গ্রাস করে ফেললে। সেই নিবিড় অন্ধকারে আমার মনের আলোও জীবনের মতন নিবল। পথিক থামল। তারপর বিষাদভরা করুণ সুরে আপনমনে বলে গেল, কত যুগ চলে গেছে, সে আজো রাণী, আমি ভিখারী। কতবার আত্মহত্যা করে মুক্তি চেয়েছি, আবার জন্মেছি ভিখারী হয়ে। কাতর করুণা প্রার্থী, যে শিখেছে শুধু চাইতে, ওগো দাও, কিছু দাও, আমি যে রিক্ত, আমি যে কাঙাল। আশার ক্ষীণ আলো বুকে নিয়ে, লজ্জা নাই, অপমান নাই, জানে শুধু হাত পাততে, রাজার কাছে, ধনীর কাছে,—প্রেয়সীর কাছে। কোথাও পায় প্রত্যাখ্যান, কোথাও ব্যঙ্গ গঞ্জনা, কোথাও বুঝি বা তাচ্ছিল্যভরা অবজ্ঞার দানের বোঝা। তারপর ক্লান্ত অবসন্ন দেহভার আর আত্মধিক্কারভরা মন নিয়ে একদিন মরে যায়, আবার জন্মাতে ভিখারী হয়ে।

পথিকের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায় সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে। কখন যে সে উঠে চলে গেল, আমি জানতে পারিনি।



বাঙ্গালায় কাতাশিল্পের ভবিষ্যৎ

শ্রীঅমরনাথ ঘোষ

প্রবন্ধ

বরেণ্য কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

> বাংলার মাটী, বাংলার জল,
> বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
> পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
> পুণ্য হউক, হে ভগবান।

বঙ্গদেশ পুণ্যভূমি। তাহার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে। তাই কবির প্রার্থনায়—তাহার মাটী পুণ্য, জল পুণ্য, বায়ু পুণ্য, গাছের ফলও পুণ্য হইয়াছে।

এমন কি নারিকেল নামক যে সুপরিচিত ফলটী একাধারে পানীয় ও খাদ্যরূপে বাঙ্গালীকে তৃপ্তি দিয়া আসিতেছে, তাহার পরিত্যক্ত খোসাটীও ফেলনার নয়; তাহারও বাণিজ্যিক উপযোগিতা রহিয়াছে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর নিকট তাহার কাণাকড়ি মূল্য নাই; অবহেলায় ও অবজ্ঞায় তাহা দেশ মধ্যে নগণ্য হইয়া আছে। সেই কথাই দেশবাসীকে বলিতে বসিয়াছি।

যে সকল ভারতীয় শিল্প স্ব-প্রতিষ্ঠ ও আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া বহির্বাণিজ্যে মর্য্যাদা পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে কাতা-শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাতা খাঁটী ভারতীয় কুটীরশিল্প। যে সব তাঁত, চরকা, হাতমেসিন ও যন্ত্রপাতি তাহাতে প্রয়োজন হয়, তাহা এদেশের লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রমিক ও মূলধনও এদেশের। মহাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় বিরাট মূলধনের প্রয়োজন হয় না, দেশের টাকা দেশমধ্যেই থাকিয়া যায়। মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার জেলা ইহার ব্যবসায়ে শীর্ষস্থানীয়; সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যও এই শিল্পে সুনাম করিয়াছে। বিশ্বের কাতার বাজারে তাহাদেরই প্রাধান্য; এই শিল্পের সাহায্যে তাহারাই বিদেশ হইতে স্বর্ণ আহরণ করিয়া ভারতলক্ষ্মীর চরণ-কমলে উপহার দিতেছে। বঙ্গদেশের সেখানে কোন স্থান নাই এবং তাহার পরিরক্ষণের কোন অংশ তাহার ভাগ্যে জোটে না। প্রয়োজন আছে, আয়োজন নাই। বাঙ্গালার মত নদীমাতৃকা প্রদেশে, যেখানে নারিকেলের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ বিদ্যমান, সেখানেও কাতার মত একটি অর্থকরী শিল্প প্রতিষ্ঠার কোন উদ্যমই দেখা দেয় নাই। অথচ এই বঙ্গদেশেই লক্ষ লক্ষ টাকার কাতাজাত দ্রব্যের আমদানি হয় এবং তাহার বাজারও সুবিস্তৃত। কিন্তু অধিকতর পরিতাপের বিষয় যে নারিকেলের খোসা হইতে কাতার জন্ম, অব্যবহারে ও অপব্যবহারে তাহার অপচয় হইয়া দেশের একটা মঙ্গলজনক শিল্পের প্রাণ-শক্তির অপচয়ের সঙ্গে ধন-শক্তিরও অবৃদ্ধি ঘটাইতেছে।

চাষের দিক দিয়া নারিকেল ফলনের ক্রমিক উন্নতির চেষ্টা বঙ্গদেশে না হইলেও স্বচ্ছন্দজাত নারিকেল হইতে যে পরিমাণ ছোবড়া পাওয়া যাইতে পারে, তাহাও নগণ্য নহে। তাহা হইতে যোগ্য উপায়ে কাতা প্রস্তুত হইয়া একটি নবতম শিল্পের জন্ম যে বঙ্গদেশে সম্ভব, তাহা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বলা যাইতে পারে। এ দেশের বাজার তাহার লালন, পালন ও বর্দ্ধনের উপযোগীও বটে। ক্রমশঃ এই শিল্প শক্তি অর্জ্জন করিয়া বিদেশের বাজার দখল করিতে পারিবে। ইহা কল্পনার আকাশ-কুসুম নয়। লেখকের পরিকল্পনার মূলে বাস্তব ক্ষেত্রের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, অনুসন্ধিৎসু তাহা যাচাই করিতে পারেন।

কাতা নারিকেলের 'বাইপ্রডাক্ট' (By-product); তাহা হইতে দড়ি, কাছি, পা-পোষ, গালিচা, বুরুষ, ঝাড়ন, গদি, যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহাদের মধ্যে ব্যবসায় হিসাবে কাতাদড়ির প্রসার প্রতিপত্তি বেশী। ইউরোপ ও আমেরিকায় পা-পোষ ও গালিচার খুব কদর। কুটীর শিল্পে কাতর অধিক উপযোগী এবং কুটীর শিল্পেই মালাবার জেলায় কাতার- উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার জেলা কাতা প্রস্তুতের জন্য

বিখ্যাত ; একমাত্র ত্রিবাঙ্কুরে ২০০০০০ শ্রমিক—এই শিল্পের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মদ্রদেশে এই শিল্প অতি পুরাতন। নজীর আছে, ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের সহিত এই শিল্পের সাহায্যে ভারতের বাণিজ্য চলিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইউরোপে যে গ্রেট একজিবিসন বসে, তখন হইতেই ঐ মহাদেশের বণিক সমাজের দৃষ্টি এই শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহার ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়াছে। ক্রমে ক্রমে জার্ম্মাণী, বেলজিয়াম, ইতালি, হলাণ্ড প্রভৃতি দেশে চালান যাইয়া তদ্দেশীয় কারখানায় বিভিন্ন উন্নত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইউরোপে পা-পোষ ও গালিচার প্রস্তুতি ঘটিলেও ভারতের কাতার উপর তাহাদের ভরসা। প্রতিযোগিতায় ভারত-জাত শিল্পের অমর্য্যাদা নাই। গত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মেলায় ত্রিবাঙ্কুর হইতে যে দোকান বসিয়াছিল, তাহার মজুত মালের কিছুই অবিক্রিত ছিল না ; আর বহু দেশের বহু খবরদারী হইয়াছিল।

সিংহল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যেমন নারিকেল প্রচুর জন্মে, তেমনই সেখানে উপযুক্ত পরিচর্য্যা হয়। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় ভারতীয় কাতার চাহিদা বিদেশে বেশী এবং গুণে মানে বড়। স্থান কাল প্রয়োজন ও প্রস্তুত প্রণালীর বিভিন্নতায় কাতারও শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছে। বাজারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন নাম। নারিকেলের জাতি এক, কিন্তু স্থান কাল ও পরিচর্য্যা-ভেদে নানা আকারের। সেইজন্য কাতারও কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। প্রয়োজন মত নারিকেলের খোসার পরিবর্ত্তিত রূপ ; কাতা হইতে বিশেষ বিশেষ আঁশ বাছিয়া বাহির করিবার ফলে একটা আস্ত ছোবড়ার কাতা হইতেই নানা উপশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যবসায়ের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গুণের ও মূল্যের তারতম্য ঘটিয়াছে। নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট কাতার আঁশ চড়া দামে বিক্রয় হইয়া বিদেশে চালান যায়। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহারই বেসাতি এদেশে চলে। আবার উৎকৃষ্ট দড়ি যাহা বরাত দিয়া তৈয়ারী হয় তাহাও যায় বিদেশে। দড়িরও আবার রকম রকম শ্রেণী আছে ; তাহারও আবার বাজার ভেদে কাটতি হয় রকম রকম।

মালাবারের লোকেরা হাতে পাকাইয়া কাতাদড়ি তৈয়ারী করে। প্রস্তুত পদ্ধতি সহজ ও আয়ত্তাধীন। কিন্তু সূক্ষ্ম ও সরু দড়ি প্রস্তুতে ক্ষিপ্রকারিতার কৌশল অভ্যাস ও সময় সাপেক্ষ। এই শিল্পে বড় বড় যন্ত্রপাতির কোন প্রয়োজন নাই। যদিও কেহ কেহ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু দেখা গিয়াছে কি গুণ গরিমায়—কি উৎপাদন প্রাচুর্য্যে অভ্যস্ত কুশল হস্ত অধিক উপযোগী ও গরিষ্ঠ। মেসিনে প্রস্তুত দড়ির দোষ অনেক। তাহার পাক সমগ্র দৈর্ঘ্যের অন্দরে সকল স্থানে সমানভাবে পড়েনা, স্থানে স্থানে হয় মোটা, সরু, আলগা ও ঘন। কিন্তু হাতের প্রস্তুত দড়ির দোষ অতি সামান্য। চরকার উন্নত সংস্করণ এক-প্রকার হাত মেসিনে কাতাদড়ি প্রস্তুত করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে যেমন শ্রম লাঘব করিতে পারা যায় তেমনই উৎপাদন প্রাচুর্য্যও বাড়ান চলে। ব্যবসায়ের পক্ষে ইহাই আধুনিক উৎকৃষ্ট উপায়। পা-পোষ ও গালিচা তাঁতের সাহায্যে বোনা যায়।

বঙ্গদেশে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার একটা প্রধান সুবিধা এই যে এখানে প্রচুর কাঁচা মাল আছে এবং তাহা সংগ্রহেরও উপায় আছে, আর আছে তাহার নিজস্ব বাজার। প্রস্তুত করিবার জন্য যে শিক্ষিত মজুরের প্রয়োজন বঙ্গদেশে তাহারই অভাব ছিল ; কিন্তু বঙ্গীয় শিল্পবিভাগের কল্যাণে যে শিক্ষিত বেকার দল তৈয়ারী হইয়াছে, প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হইলেও তাহারও অভাব নাই। বঙ্গদেশে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ আছে, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা বলেই বলিতেছি। তবে কাতার জন্মস্থান মদ্রদেশে এই শিল্প ও তাহার ব্যবসায় বর্ত্তমানে যে অবস্থায় ও যে আকারে দেখা যায়, ও যে পথে তাহার বিস্তারের সুযোগ ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায় বঙ্গদেশে তাহা অনুসরণ করিয়া সুফল পাওয়া যাইবে না। যে অবস্থার উপযোগী সে অবস্থায় সহজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উপায় ও পথ অনুসরণ করিয়া বিস্তারের সুযোগ দিতে হইবে তবেই এই শিল্প স্বতঃস্ফূর্ত্ত, আত্মনির্ভরশীল হইয়া দেশের অভাব দূর করিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে একটি বিশেষ শিল্প বহুকাল ধরিয়া একটি বিশেষ দেশের সীমানার মধ্যে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইবার ফলে তথাকার মজুর সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা, কর্ম্মকুশলতা, কাঁচা মালের প্রাচুর্য্য ও ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধাদি অনায়াসে ভোগ করিয়া থাকে। অন্য নূতন

প্রদেশে সেই সকল অভাব তো থাকেই, তদুপরি নানা অন্তরায় ও অসুবিধা আসিয়া দেখা দেয়, ইহা আমরা জানি ও স্বীকার করি। সেই জন্যই বলি, কোনরূপ অন্তরায় ও অসুবিধার পথে না গিয়া আত্ম-নির্ভরশীল হইলেই এই শিল্পে প্রাণ সঞ্চার করিবে। তারপর কাটতির ব্যবস্থা করা একটা বড় কথা; বাজারের হালচাল জানা না থাকিলে শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ব্যবসায়ের ভিত্তির উপর এই শিল্পকে দাঁড় করাইতে হইবে।

মালাবারে নারিকেল শিল্পের ব্যবসায় নানা বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে—কাতারও হইয়াছে; বহু হাত ঘুরিয়া পারস্পরিক সহযোগিতায় ব্যবসায়িক মর্য্যাদা পাইয়াছে। কুটীর শিল্পের সীমাবদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে তাহার জন্ম ও লালনপালন হইলেও তাহার পশ্চাতে ধনিকের লক্ষ লক্ষ টাকা খাটিতেছে এবং ধনী ব্যবসায়ী অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের অভাবের সুযোগ লইয়া নিজের কারবার ফলাও করিয়া লইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এসব অবস্থা ও সুবিধা নাই। নদীমাতৃকা লবণাম্বুবিধৌত বঙ্গভূমি কাতাশিল্পের উপযুক্ত স্থান হইলেও, সকল জেলা তাহার উপযোগী নয়; আবার সকল জেলার সকল স্থানের অবস্থান ভাগ নির্ব্বাচনযোগ্য নয়। ২৪পরগণা, খুলনা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, হাওড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতির মধ্যে কতকগুলি স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা কাতা শিল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এইসব জেলায় প্রভূত পরিমাণে কাতা উৎপন্ন করিয়া পরে বাঙ্গালায় অন্যান্য জেলায় তাহা আমদানি করিয়া উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে কাতাদড়ি পাপোষ প্রভৃতি কাতাজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারিবে। বাঙ্গালায় মাদ্রাজের কাতাজাত দ্রব্য জামাই আদরে প্রতিপালিত হইতেছে; বাঙ্গালার কাতা অবশ্যই আপনার ন্যায্যগণ্ডা বুঝিয়া লইবে। কলিকাতা সহরকে কেন্দ্র করিয়া কাতা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার কতকগুলি সুবিধা, সুযোগ ও অনুকূল উপায় আছে তাহাতেই শীঘ্র সুফল দিবে।

এই প্রবন্ধলেখকের আমদানি ও রপ্তানি কার্য্যের অভিজ্ঞতায় বহু বিদেশীর কাতা শিল্প সম্বন্ধে খবরদারী দ্বারা বলিতে পারেন, এই শিল্প বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত হইলে রপ্তানি বাণিজ্যে বাঙ্গালা উপকৃত হইবে। অটোয়া সম্মেলনে কাতা প্রাধান্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়াছে। ১৯৩২ খৃঃ অব্দে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি সার অতুল চাটার্জ্জী যে বিবরণ দাখিল করেন তাহাতে জানা যায়, যুক্তসাম্রাজ্য হইতে ভারতবর্ষ ১৯২৯ খৃঃ অব্দের প্রতি হাজার পাউণ্ড মূল্যের বাণিজ্যে কাতাদড়ি ৩১৯ পাউণ্ড ও পাপোষাদি ৪৩৮ পাউণ্ড মূল্যের অংশ অধিকার করিয়াছিল। আর শুল্কসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে কাতাদড়ি শতকরা ১০ পাউণ্ড ও পাপোষাদি ২০ পাউণ্ড। অটোয়া চুক্তিতে এই—শুল্কসুবিধা আইনের দ্বারা স্বীকার করা হইয়াছে। তাহার কোনরূপ রদ বদল হইবে না—হইলেও বৃদ্ধি হইবে। এই চুক্তি দ্বারা ভারতীয় কাতা গ্রেট ব্রিটেনের বাজার পাইয়াছে এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে স্থান লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া আয়োজনের অনুষ্ঠান করা কিছু অসম্ভবপর নয়।

আমরা কাতাশিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করিয়াছি। বঙ্গদেশে তাহার উদ্যমের আকাঙ্খা করিয়াছি; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, কাতা শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার মৃতপ্রায় নারিকেল তৈল শিল্পটীও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে। নারিকেলের শাঁস হইতে খোপা (copra) প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে তেল হয়। কোচীন বন্দর হইতে মালাবারের যন্ত্র নিষ্কাষিত তৈল বাঙ্গালায় আসিয়া বাজার লইয়াছে। বাজারে কোচিনের কদর ও চাহিদা বেশী; দেশীয় তৈল তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। ইহা সম্ভব হইয়াছে কাতা শিল্পের সহযোগিতায়। মাদ্রাজের কাতা ও খোপার শুভ সম্মিলনে উভয়ের অভ্যুদয়, আর বঙ্গদেশে কাতার অভাবে খোপার বৈধব্য জীবন। নারিকেলের পণ্য-মূল্যকে মাদ্রাজের কাতা ও খোপা ভাগ বাটোয়ারা করিয়া প্রয়োজনমত নিজেদের কাজে লাগাইয়া উভয়েই হইয়াছে গরিষ্ঠ। বাঙ্গালায় নারিকেলের ছোবড়ার কোন পণ্য মূল্য না থাকায় আস্ত নারিকেলের খোপার যে পড়তা দর হয়, তাহাতে বাঙ্গালার তেলের দর কোচিনের তেলের দর হইতে বেশী হইয়া পড়ায় তাহার জনপ্রিয়তা নাই। তাহার উপর সঙ্ঘবদ্ধ অনুষ্ঠান মাদ্রাজে আছে,বাঙ্গালায় তাহার অভাব। বাঙ্গালার খোপার তৈল যে নিকৃষ্ট ইহা ভুল ধারণা।

কাতা প্রস্তুত করিতে ৮।১০ মাস সময় লাগে। দৈনন্দিন কর্ম্মে যোগাড় দিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে কাতা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে; এই অবসরে ক্রীত নারিকেলের সদ্ব্যবহার অর্থাৎ খোপা প্রস্তুত করিয়া নারিকেল তৈল নিষ্কাষণ করিয়া লওয়াই উৎকৃষ্ট পন্থা। ইহাতে দুই উপায়েই অর্থাগম হইবে। এই শিল্পের ব্যবসায়ে লোকসানের কোন ভয় নাই তবে পশ্চাতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক থাকা চাই। এই ব্যবসায়ে ন্যূনপক্ষে ছয় হাজার টাকার মূলধন লইয়া নামা উচিত। টাকাটা যাহা কিছু লাগিবে তাহার বেশীর ভাগ কাঁচা মালের উপরই থাকিবে; এই কাঁচা মালই যে রূপান্তরে কাতা ও খোপা তাহা যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় বিক্রয় করিলেও মূলধন নষ্ট হয় না, এই এক মহা সুবিধা। প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে অধিক লিখিলাম না। পাঠক অনুসন্ধিৎসু হইলে লেখকের কার্য্যকরী পরিকল্পনার সাহায্য পাইতে পারেন।

সাময়িকী

কলিকাতায় ওয়ার্কিং কমিটী—

গত ১লা এপ্রিল শুক্রবার হইতে কয়দিন কলিকাতা এলগিন রোডে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর বাসভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীও ঐ সময় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; প্রায় সকল সদস্যই ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও সীমান্ত-নেতা খান আবদুল গফুর খাঁ শুধু এ সময়ে কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। সিন্ধু দেশে কংগ্রেসের সমর্থন লইয়া যেভাবে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। আসামেও ঐভাবে যাহাতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, সেজন্য কংগ্রেস সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অসুস্থ হওয়ায় পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠন কার্য্যের ভার শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরামের উপর অর্পিত হইয়াছে। মাদ্রাজ ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুত শাম্বমূর্ত্তি বিভিন্ন দেশের ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য বিলাত যাইতে চাহিয়াছিলেন; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে বিলাতে যাইতে নিষেধ করায় তিনি নিবৃত্ত হইয়াছেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রসমস্যা ও বিদেশে ভারতকথা প্রচার সম্বন্ধে সকল কার্য্য করিবার ভার একটি নবগঠিত কমিটীর উপর অর্পণ করা হইয়াছে—রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত কৃপালানী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উক্ত কমিটীর সদস্য হইয়াছেন। বাঙ্গালায় সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা যাহাতে কংগ্রেসের সকল নির্ব্বাচনে যোগদান করিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। ২রা এপ্রিল তারিখে ভারতের শিল্প ও ব্যবসা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটীতে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—অনেকে বিদেশী মূলধন লইয়া ভারতের শিল্পোন্নতির জন্য ভারতে যে সকল কোম্পানী গঠন করিতেছেন কংগ্রেস তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছে। ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনার সময় এবিষয়ে ভারতকে স্বাবলম্বী হইবার উপযুক্ত অধিকার দেওয়া হয় নাই—তাহারই সুযোগ লইয়া বিদেশী বণিকরা এখন এদেশে টাকা খাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেস এবিষয়ে তাঁহাদের অভিমত জানাইয়াছেন যে—ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মূলধন এবং ভারতীয়গণের পরিচালনা ব্যতীত এদেশে নূতন কোম্পানী গঠন করিতে দেওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইবে না। সে জন্য যদি উপযুক্ত মূলধন ও উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাবে ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে তাহাতেও কিছু বলিবার নাই। ৩রা এপ্রিলের অধিবেশনে মধ্যপ্রদেশের পদত্যাগকারী মন্ত্রী মিঃ সরিফের কথা আলোচিত হইয়াছে। মিঃ সরিফ ভুলক্রমে একজন বন্দীকে মুক্তি দান করিয়া পরে নিজের ভুল স্বীকার করিয়াছেন ও মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটী মিঃ সরিফকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। বৃটিশ ভারতের অধিবাসীরা যাহাতে দেশীয় রাজ্যেও নাগরিকের অধিকার লাভ করেন, সে জন্য ভারত শাসন আইনের আবশ্যক পরিবর্ত্তনের জন্যও কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টসমূহকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

গান্ধী সেবা সংঘ সম্মিলন—

গত ২৬শে ও ২৭শে মার্চ্চ উড়িষ্যা প্রদেশে পুরীর নিকটস্থ বারবয়ে গান্ধী সেবাসঙ্ঘের সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সংঘের সভাপতি শ্রীযুত কিশোরীলাল মস্রুওয়ালা সম্মিলনে সভাপতি হইয়া প্রথম দিন একঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—গান্ধী সেবা-সংঘ নিছক রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান নহে, তথাপি রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইহার নিজস্ব অভিমত ও কার্য্যকলাপ রহিয়াছে। গান্ধী সেবাসংঘ রাজনীতি ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে

চাহেন। মহাত্মা গান্ধী তথায় একটি পল্লী শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তাহাতে উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের কৃষি, পশু চিকিৎসা, শিল্প ও স্বাস্থ্যবিভাগ এবং নিখিল ভারত-কাটুনী সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সংঘের দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ২৬শে মার্চ্চ প্রাতে ৬টা হইতে ৯টার মধ্যে সেবাসংঘের প্রায় দুইশত কর্ম্মী প্রদর্শনী ক্ষেত্রে একটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। লোকের মন হইতে ঝাড়ুদারের কার্য্যের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে সম্মিলনের সময় তথায় উড়িষ্যার মন্ত্রী শ্রীযুত নিত্যানন্দ কানুনগো তাঁহার পুত্র কন্যাদের লইয়া ঝাড়ুদারের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সম্মিলন উপলক্ষে তথায় শুধু মহাত্মা গান্ধী নহেন—শেঠ যমুনালাল বাজাজ, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি বহু দেশনেতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের ইতিহাস—

সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর পূর্ব্বে সুপণ্ডিত শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বিক্রমপুরের ইতিহাস" রচনা করিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ পুস্তকও যেমন দুর্লভ হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই বহু নূতন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় নূতন করিয়া বিক্রমপুরের ইতিহাস রচনারও প্রয়োজন হইয়াছে। সেজন্য যোগেন্দ্রবাবু পুনরায় দুই খণ্ডে সুবৃহৎ আকারে 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রকাশে যত্নবান হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বহু মূর্ত্তি, দলিল ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে সকল স্থান হইতে সকল বিবরণাদি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে, সেজন্য তিনি বিক্রমপুরবাসী সকলকেই তাঁহাকে তাঁহার এই কার্য্যে সাহায্য করিতে আবেদন জানাইয়াছেন। সকলের সমবেত চেষ্টার ফলেই যোগেন্দ্রবাবুর কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। আমরা তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।

বঙ্গীয় হোমিওপ্যাথিক সম্মিলন—

গত ২৬শে মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় হোমিওপ্যাথিক সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সৈয়দ নৌসের আলি উক্ত সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাক্তার এস-খান বলেন—গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথিক ফ্যাকালটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন, তাহাই হোমিওপ্যাথিকে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। মন্ত্রী নৌসের আলি বলেন—বাঙ্গলা-দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মধ্যে যে দলাদলি দেখা দিয়াছে, তাহা দূর না করিলে ফ্যাকালটি গঠিত হওয়া সহজসাধ্য হইবে না। সভাপতি ডাক্তার মজুমদার সকল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে এই চিকিৎসা পদ্ধতির গৌরব-বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ করেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা যে সুলভ সে কথা স্মরণ রাখিয়া সকলকে এই চিকিৎসা পদ্ধতির বহুল প্রচারে মনোযোগী হইতে বলেন। সভাপতি মহাশয়ও অচিরে ফ্যাকাল্‌টি গঠনের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

পাতিয়ালার মহারাজা—

পাতিয়ালার মহারাজা সার ভূপীন্দর সিং মহীন্দর গত ২৩শে মার্চ্চ মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নিজে একজন ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন এবং সারাজীবন ক্রিকেট খেলোয়াড়দিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক গঠিত নরেন্দ্র মণ্ডলের চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরূপে একবার গোলটেবিল বৈঠকেও যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের ক্রিকেটখেলার বিশেষ ক্ষতি হইল।

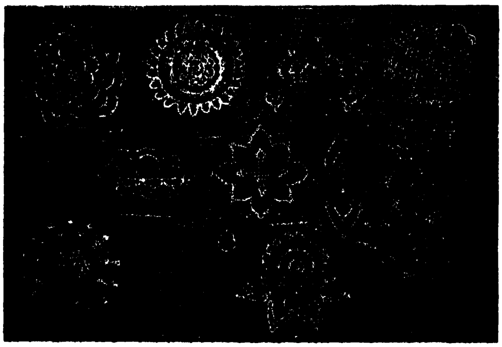
মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর উৎসব—

মেদিনীপুরে শাখা সাহিত্য পরিষদের রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী সার যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-উৎসবও সম্পাদিত হইয়াছে। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বিনয়রঞ্জন সেন এই উৎসবের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বসু,

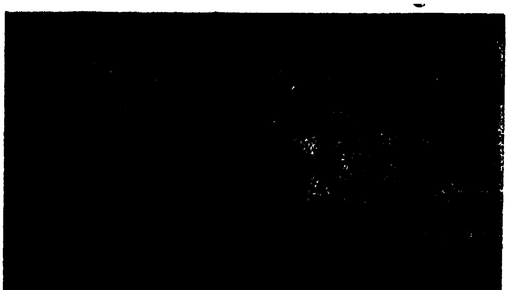
ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কালিপদ দত্ত, শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর প্রভৃতি মেদিনীপুরে যাইয়া ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে মেদিনীপুরবাসীদিগের চেষ্টায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার্থ মেদিনীপুরে "বিদ্যাসাগর হল" নামে একটি গৃহনির্ম্মিত হইবে। সে জন্য ৪২ হাজার টাকা খরচ হইবে। মেদিনীপুরবাসীরা এতদিন পরেও এইভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালাদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন, সন্দেহ নাই।

বড়ি-শিল্প—

মেদিনীপুর জেলার লক্ষ্যা গ্রামের জমীদার স্বর্গত উপেন্দ্রনারায়ণ মাইতি মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীমতী হিরণ্ময়ী



বড়ি শিল্প



বড়ি-শিল্প

দেবী কলিকাতার কয়েকটি প্রদর্শনীতে যে বড়ি-শিল্প প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুইখানি চিত্র আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্রই বড়ি ব্যবহৃত হয়; এই বড়ি যে কিরূপ সুন্দর ও কারুকার্য্যযুক্ত হইতে পারে তাহা হিরণ্ময়ী দেবীর প্রস্তুত বড়িগুলি দেখিলে বুঝা যায়। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙ্গালার



শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী

মনীষীরা এই শিল্প দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং শান্তিনিকেতনের কলাভবনে এই বড়ি রক্ষিত হইয়াছে।

তারকনাথ পালিত—

কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার তারকনাথ পালিত মহাশয় গত ১৮ই ফাল্গুন ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। হুগলী জেলার ভাণ্ডারহাটি গ্রামে তাঁহাদের বাস ছিল; তারকনাথের পিতা মধুসূদনও কবিরাজ ছিলেন এবং ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তারকনাথ বহু গুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। কলিকাতার বহু হোমিওপ্যাথিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সকল সময়েই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন।

কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার বলাগড় নিবাসী স্বনামখ্যাত কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৮ই চৈত্র মঙ্গলবার ৯৩

বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনিও পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় একত্রে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজিতে এম-এ পাশ করেন। কপালীচরণবাবু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্যামাচরণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আইন পাশ করিয়া কিছুকাল তিনি বাঙ্গালার বাহিরে নানাপ্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন; পরে বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুন্সেফী করিয়াছিলেন।

মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা—

বোরিকো সিলবিগায় জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি হাঙ্গেরিয়ার অধিবাসিনী। পূর্ব্বে তিনি সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের মৃত্যু ও অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি অন্যান্য যে সকল বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেগুলিও সব যথাযথ মিলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন—"আগামী মে মাসে বিশ্ব-রাজনীতিক অবস্থা ভয়াবহ অশান্তির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ঐ সময়ে মহাযুদ্ধের আত্মপ্রকাশ ঘটিবে এবং আগামী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ যুদ্ধ চলিবে।" সমগ্র পৃথিবী ত মহাযুদ্ধের জন্য উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু মহাযুদ্ধের ফল কি হইবে, তাহা বোধ হয় কেহ কখনও চিন্তা করেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন—

পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নে শ্রী ও পদ্ম থাকায় বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা উহাতে আপত্তি করিতেছিলেন। সেজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি নূতন প্রতীক চিহ্ন গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নূতন প্রতীকে একটি বৃত্তের মধ্যে সূর্য্যকিরণ সমুদ্ভাসিত একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম ও এই পদ্মের মধ্যস্থলে একটি পদ্মকোরক থাকিবে। এই বৃত্তটিকে অপর একটি বৃত্তে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় বৃত্তে গোলাকার করিয়া "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা সম্প্রসার" লেখা আছে। গত ১২ই মার্চ্চ ঐ সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে; বাঙ্গালার প্রধান তথা শিক্ষামন্ত্রী মৌলবী এ-কে ফজলল হক জানাইয়াছেন—এই নূতন প্রতীকে মুসলমানগণের আপত্তি করিবার কিছুই নাই। পূর্ব্বের প্রতীকেও কাহারও আপত্তি করিবার কিছু ছিল বলিয়া আমরা মনে করিনা। আবার কিছুদিন পরে আবার কেহ আসিয়া নূতন প্রতীকে আপত্তি করিবেন কিনা কে বলিতে পারে?

ব্রহ্মের ডাক ব্যয় হ্রাস—

গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ব্রহ্ম দেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হইলে ব্রহ্মে পত্রাদি প্রেরণের ডাক ব্যয় অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল! গত ১লা এপ্রিল (১৯৩৮) হইতে ঐ ব্যয় কমান হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বর্ত্তমান হার নিম্নলিখিতরূপ করা হইল—পোষ্টকার্ড—এক আনা, রিপ্লাই পোষ্টকার্ড—দুই আনা। এক তোলা পর্য্যন্ত পত্র—৬ পয়সা, প্রতি অতিরিক্ত তোলা এক আনা। দশ তোলা পর্য্যন্ত সংবাদপত্র—২ পয়সা, অতিরিক্ত প্রতি দশ তোলা—২ পয়সা। অন্যান্য জিনিসের ডাক ব্যয়ও হ্রাস করা হইয়াছে। গত এক বৎসর ধরিয়া এই ডাক ব্যয় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছিল—এতদিনে তাহা যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই সুখের কথা।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের মামলা—

গত ২৬শে নভেম্বর কলিকাতার নূতন ইংরাজি দৈনিক "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে গভর্ণমেণ্ট উক্ত প্রবন্ধের জন্য পত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন। গত ২৩শে ফাল্গুন কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। সম্পাদক ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ সেনের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং মুদ্রাকর শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের ঐরূপ একই দণ্ড হইয়াছে। দণ্ডিত ব্যক্তিদ্বয়ের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। সংবাদপত্র সেবায় এইরূপ বিপদ এদেশে অসাধারণ কিছুই নহে; কবে যে ইহার অবসান হইবে, কে জানে?

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ—

গত ৫ই চৈত্র রঙ্গপুরে স্থানীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তথায় যাইয়া উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে রঙ্গপুরবাসীদিগকে তাঁহাদের সংগৃহীত দ্রব্যাদির সাহায্যে বাঙ্গালার একখানা ইতিহাস রচনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদের এই ত্রিংশ বার্ষিক উৎসবের সঙ্গে তথায় 'বঙ্কিম শত বার্ষিক' উৎসবও সম্পাদিত হইয়াছে। বঙ্কিম শত বার্ষিক উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী আরও একটি উৎসব হইবে বলিয়া তথায় স্থির হইয়াছে।

মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী—

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর নিবাসী খ্যাতনামা জননায়ক রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় সম্প্রতি ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবু স্বর্গীয় রাষ্ট্রগুরু সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন সহকর্ম্মী ও ভক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীরামপুরে ওকালতি করিতেছিলেন ও ৩৬ বৎসর কাল অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিক কাল শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন এবং তিন বৎসর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি পত্নী, দুই পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

লবণ শিল্প রক্ষা—

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক গত লবণ আইন আন্দোলনের পর হইতে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বহু স্থানে লবণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক লবণ প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। ফলে বাঙ্গালা দেশে লবণের মূল্য কমিয়াছে এবং বাঙ্গালার বাজারে বিদেশী ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে একদল লোক লবণ শিল্প রক্ষার বিরোধিতা আরম্ভ করায় যাহাতে লবণ শিল্প রক্ষিত হয়, সেজন্য শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশনেতারা এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন। যাহাতে বিদেশী লবণের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে দেশী লবণ রক্ষিত হয়, সে জন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির অবহিত হওয়া উচিত।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা—

আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসুর পরলোকগমনের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পালিত প্রফেসার ডাক্তার দেবেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের পরিচালকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি ডাক্তার দেবেন্দ্রমোহনের স্থানে ডাক্তার মেঘনাদ সাহাকে বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ডাক্তার সাহা বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান; তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁহার পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্র বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসায় বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দ লাভ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের মত সুবৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র ভারতে আর কোথাও নাই। আমাদের বিশ্বাস, ডাক্তার সাহা তাঁহার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে আরও নব নব আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বলতর করিবেন।

কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধী—

মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গালার রাজবন্দীদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে যাহাতে বাঙ্গালার সকল রাজবন্দী মুক্তি লাভ করেন সেজন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। ইতিপূর্ব্বে গান্ধীজি কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার রাজবন্দীদিগকে মুক্তিদানের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর যে বহু রাজবন্দী মুক্তিলাভ করিয়াছেন সে কথা সকলেই অবগত আছেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত গান্ধীজির আলোচনা তখন শেষ হইবার পূর্ব্বেই গান্ধীজিকে কার্য্যান্তরে বাঙ্গালার বাহিরে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। সম্প্রতি গান্ধীজি পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া আবার গত ৮ই চৈত্র বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সেদিন বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ২ ঘণ্টাকাল গান্ধীজি

সহিত গভর্ণরের ঐ বিষয়ে আলোচনা চলিয়াছিল। ৮ই চৈত্র মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর কবীন্দ্র শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গান্ধীজির বাসস্থান ১নং উডবার্ণ পার্কে (শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ী) যাইয়া গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের কথাবার্তা চলিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন বলিয়া গান্ধীজি তাঁহাকে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। গান্ধীজি প্রায় এক সপ্তাহ কাল কলিকাতায় বাস করিয়া বাঙ্গালার নানাপ্রকার সমস্যার বিষয় আলোচনা ও তাহার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজবন্দীদের মুক্তিদান সম্পর্কে তাঁহাকে কয়েকবার বাঙ্গালার স্বরাষ্ট্রসচিব সার খাজা নাজিমুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গান্ধীজি যখন উপাসনা করিতেন, তখন তাঁহাকে বাঙ্গালার খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞগণের গান শুনান হইত। ৮ই চৈত্র শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় সদলে যাইয়া গান্ধীজিকে গান শুনাইয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্র বসুর দান—

রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার কটকস্থ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহখানি কংগ্রেসের কার্য্যে দান করিয়াছেন। গৃহখানিতে শরৎবাবুর পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু মহাশয় বাস করিতেন—৬ বিঘা জমীর উপর বাড়ীটি অবস্থিত। উত্তরাধিকারসূত্রে উহা শরৎবাবু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী বাড়ীখানি কাজে লাগাইবেন। শরৎবাবুর দানের বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা তাঁহার এই গৃহদানে বিস্মিত হইবেন না। শরৎবাবুর মত সদয়-হৃদয় সুধী ব্যক্তি বাঙ্গালা দেশে সত্যই বিরল। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশসেবা করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সৎসাহিত্য প্রচারে দান—

সম্প্রতি মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখার রজত জয়ন্তী উৎসবের সময় মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের রাজকুমার শ্রীযুত নরসিংহ মল্লদেব ঘোষণা করিয়াছেন যে সৎসাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিকট ১১ হাজার টাকা দান করিবেন। ঐ ভাণ্ডারের অর্থে বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশ করা হইবে। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে ঐ ধনভাণ্ডারের অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা হইবে। রাজকুমার নরসিংহ মল্লদেব মেদিনীপুর জেলার বহু জনহিতকর সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। সৎসাহিত্য প্রচারে তাঁহার এই দান বাঙ্গালা দেশে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

সিন্ধু প্রদেশে নূতন মন্ত্রিসভা—

গত ২১শে মার্চ্চ সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী সার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লা ও তাঁহার সহকর্ম্মীদ্বয় পদত্যাগ করিলে খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স প্রধান মন্ত্রী হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। শ্রীযুত মিছলদাস বাজিয়ানী ও পীর এলাহী বক্স অপর দুইজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। নূতন মন্ত্রীরা কংগ্রেস নীতি অনুসারে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন এবং মোটর ও বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক ৩০০৲ টাকা গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রীত্রয়ের মধ্যে পীর এলাহী বক্স অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেস কর্ম্মী ছিলেন ও কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। আল্লাবক্স জেকোবাবাদের জমীদার এবং মিছলদাস করাচীর খ্যাতনামা এডভোকেট।

ব্যায়াম-সমিতির কুস্তী—

গত ২৭শে ডিসেম্বর হইতে কয়দিন কলিকাতায় ব্যায়াম-সমিতি-পরিচালিত বঙ্গীয় কুস্তী প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনে শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে



অভয় প্রামাণিক ও হীরালাল দে

সার হরিশঙ্কর পাল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। শারীরিক ওজনের অনুপাতে প্রতিযোগিতা ৭টি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। মোট ১০৭জন প্রতিযোগী ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ৭ ষ্টোন বিভাগে ১৯ জনের মধ্যে ব্যায়াম সমিতির শ্যাম অধিকারী, ৮ ষ্টোন বিভাগে ৩২জনের মধ্যে সালকিয়া স্বাস্থ্য সমিতির অপূর্ব্ব সরকার, ৯ ষ্টোন বিভাগে ২৪জনের মধ্যে সালকিয়া স্বাস্থ্য সমিতির শচীন গাঙ্গুলী, ১০ ষ্টোন বিভাগে ১২জনের মধ্যে ব্যায়াম সমিতির ঘনশ্যাম দাস, ১১ ষ্টোন বিভাগে বাগবাজারজাতীয়সংঘের নিতাই দাস,১২ ষ্টোন বিভাগে ঘোষেস্ কলেজের শচীন বসু ও হেভী বিভাগে কালিঘাট ব্যায়াম সমিতির ক্ষিতীশ চক্রবর্ত্তী বিজয়ী হইয়াছেন। প্রতিযোগীদের



ব্যায়াম সমিতির বিজয়ী প্রতিযোগীবৃন্দ



শ্যাম অধিকারী ও বীরেন বিশ্বাস

মধ্যে দৈহিক সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায় সালকিয়া স্বাস্থ্যসমিতির নিখিলবন্ধু ভৌমিক শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। ব্যায়াম সমিতির সুনীল সেন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। গত ২রা জানুয়ারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন। কুস্তী প্রতিযোগিতা লইয়াও এদেশে দলাদলির সূত্রপাত দেখা দিয়াছে; তাহা যাহাতে না হয়, সেজন্য সকল দলের কর্ত্তৃপক্ষেরই বিশেষ অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মনোমোহন লাহিড়ী—

আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি রায় বাহাদুর মনোমোহন লাহিড়ী মহাশয় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী শিলংয়ে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু



মনোমোহন লাহিড়ী

দিন যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। গত জানুয়ারী মাসেও তিনি দিল্লীতে "সভাপতি সম্মিলনে" যোগদান করিতে গিয়াছিলেন।



রাষ্ট্রপতিরূপে সুভাষচন্দ্রের প্রথম কলিকাতা আগমনে সম্বর্দ্ধনার শোভাযাত্রা

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

খেলা ধুলা

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় এবার মাত্র ৪টি প্রদেশ—বাঙ্গলা, পাঞ্জাব, ভূপাল ও গোয়ালিয়র—যোগদান করায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে লীগ প্রথায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গলা প্রদেশ এবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাঙ্গলা প্রত্যেক খেলায় জয়ী হয়ে ৬ পয়েণ্ট পেয়েছে।

বাঙ্গলার পক্ষে খেলেছিলেন—এলেন (ক্যাপটেন), ট্যাপ্সেল, হজেস ; এরিক্, ডিফণ্টস্, গ্যালিবর্দ্দি ; এ মিত্র, হেণ্ডারসন, কার্, রেণ্টন, নিস্।

ব্যাকে হজেস উত্তম খেলেছেন, হাফব্যাকে গ্যালিবর্দ্দিই শ্রেষ্ঠ, যদিও তার পূর্ব্বের খেলা নেই। ফরওয়ার্ডে কার্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, রেণ্টন উত্তম, কারের সঙ্গে তার আদান-প্রদান সুন্দর হয়েছিল। এ মিত্র ও নিসের সেণ্টার বেশ ভালই হয়েছে। দ্রুততায় নিস বিপক্ষকে বারবার পরাস্ত করেছে। ট্যাপ্সেলের পূর্ব্ব দক্ষতা অনেক হ্রাস পেলেও



বাঙ্গালার হকি দল। আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং প্রদর্শনী খেলায় রেষ্টদলকে ৩-২ গোলে পরাজিত করেছে ছবি—জে কে সান্যাল

তাকে এখনও বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা যেতে পারে। সেণ্টার হাফ ডিক্‌ন্টস্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল, এগ্রিফ চলনসই।

বিখ্যাত খেলোয়াড় রূপসিং দলের অধিনায়ক থাকাতেও গোয়ালিয়র একটিও পয়েণ্ট পায় নাই। তাঁর খেলাও আশানুরূপ হয় নি, দর্শকদের তিনি হতাশ করেছেন। ধ্যানচাঁদের সহযোগিতা না পেলে তাঁর খেলা খোলে না, বোঝা গেল।



ভূপাল হকি দল ছবি—জে কে সান্যাল



পাঞ্জাব হকি দল ছবি—জে কে সান্যাল

খেলার ফলাফল :

বাঙলা ৪—১ গোলে গোয়ালিয়রকে, ৩—২ গোলে পাঞ্জাবকে, ৪—০ গোলে ভূপালকে পরাজিত করেছে।

ভূপাল ২—১ গোলে গোয়ালিয়রকে হারায়।

পাঞ্জাব ২—০ গোলে গোয়ালিয়রকে হারিয়েছে।

ভূপাল ১—১ গোলে পাঞ্জাবের সঙ্গে ড্র করে।

	খেলা	জিত	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
বাঙলা	৩	৩	০	০	১১	৩	৬
পাঞ্জাব	৩	১	১	১	৫	৪	৩
ভূপাল	৩	১	১	১	৩	৬	৩
গোয়ালিয়র	৩	০	০	৩	২	৮	০

গোলদাতৃগণ :

আর কার্	(বাঙলা)	৭ গোল
ব্রেণ্টন	(বাঙলা)	৩ „
দুখভঞ্জন	(পাঞ্জাব)	৩ গোল
হেণ্ডারসন	(বাঙ্গালা)	১ „
নাসিব	(পাঞ্জাব)	১ „
চিরঞ্জীব	(পাঞ্জাব)	১ „
আহমেদসের	(ভূপাল)	১ „
ফারুক	(ভূপাল)	১ „
মুনির	(ভূপাল)	১ „
ছোটেবাবু	(গোয়ালিয়র)	১ „
রূপসিং	(গোয়ালিয়র)	১ „



গোয়ালিয়র হকি দল ছবি—জে কে সান্যাল

মিত্রের সেণ্টার স্থন্দর হয়েছে। গ্যালিবর্দ্দি প্রশংসনীয় খেলেছেন। হেণ্ডারসন সুবিধা করতে পারেন নি। ট্যাপ্‌সেলের অপেক্ষা হজেস উৎকৃষ্ট খেলেছিলেন। এলেনকে বিশেষ কিছু করতে হয় নাই। রেষ্টের পক্ষে গোলে খলিল নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নাই। ব্যাকে রাজেন্দ্রের খেলা প্রশংসনীয়, পূর্ব্বের খেলা না থাকলেও সেণ্টার হাফে বাম্নিখাঁ বিশেষ খেটে খেলেছেন, গিরিধারীলালও বেশ খেলেছেন। ফরওয়ার্ডে সাকুর, মুনির ও চিরঞ্জীবের খেলা উৎকৃষ্ট হয়েছিল। বলবন্ত সিংয়ের সেণ্টার বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছিল।

রেষ্ট দল :—খলিল আমেদ (গোয়ালিয়র); রাজেন্দ্র সিং (পাঞ্জাব) এবং আবদুল হালিম (গোয়ালিয়র); আসান খাঁ (ভূপাল), বাম্নি খাঁ (ভূপাল) এবং গিরিধারীলাল (পাঞ্জাব); আমেদ শের (ভূপাল), চিরঞ্জীব (পাঞ্জাব),

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ীগণ :

সাল	স্থান	বিজয়ী
১৯২৮	কলিকাতা	যুক্তপ্রদেশ
১৯৩০	লাহোর	ভারতীয় রেলওয়ে (লীগ প্রথায়)
১৯৩২	কলিকাতা	পাঞ্জাব (২—০ গোলে বাঙ্গালা পরাজিত)
১৯৩৬	কলিকাতা	বাঙ্গলা (১—০ গোলে মানভাদার পরাজিত)

বাঙ্গলা বনাম

বাঙ্গালা হকি দলের সঙ্গে অবশিষ্ট দলের বাছাই খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা ৩-২ গোলে জয়ী হয়ে বাঙ্গলার বৈশিষ্ঠ ও চ্যাম্পিয়নসিপের সম্মান রক্ষা করেছে।

কার্, হজেস্, ও রেণ্টন কৃতিত্বপূর্ণ খেলা দেখিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। বাঙ্গলা দলে এরিকের পরিবর্ত্তে স্কট্ খেলেছিলেন। নিস ও



রেষ্ট হকি দল। প্রদর্শনী ক্রীড়ায় বাঙ্গলার নিকট পরাজিত হয়েছে ছবি—জে কে সান্যাল

আবদুল সাকুর (ভূপাল), মুনির আমেদ (ভূপাল) এবং বলবন্ত সিং (পাঞ্জাব)।

আম্পায়ারদ্বয় :—এইচ এম হাফিজ এবং সি নাইডু।

প্যালেষ্টাইনের ভারতীয় দল ঃ

প্যালেষ্টাইনে এবার দ্বিতীয় ওয়েষ্টার্ণ এসিয়াটিক ক্রীড়ানুষ্ঠান হবে। ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্ত ভারতীয় হকিদলের জন্ত নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ নির্ব্বাচিত হয়েছে :—

গোলরক্ষক

১। আর জে এলেন (বাঙ্গলা প্রদেশ)
২। মেহের সিং (পাঞ্জাব প্রদেশ)

ব্যাক

৩। সি ট্যাপসেল (বাঙ্গলা প্রদেশ)
৪। সি হজেস (বাঙ্গলা প্রদেশ)
৫। রাজেন্দ্র সিং (পাঞ্জাব প্রদেশ)

হাফ ব্যাক

৬। বালবীর কিষেণ (পাঞ্জাব প্রদেশ)
৭। বাব্‌রু খাঁ (ভূপাল প্রদেশ)
৮। গ্যালিবর্দ্দি (বাঙ্গলা প্রদেশ)
৯। কালেব (পাঞ্জাব প্রদেশ)

ফরোয়ার্ড

১০। এ মিত্র (বাঙ্গলা প্রদেশ)
১১। চিরঞ্জিব (পাঞ্জাব প্রদেশ)
১২। আর কার (বাঙ্গলা প্রদেশ)
১৩। রূপ সিং (গোয়ালিয়র)
১৪। নিস্‌ (বাঙ্গলা প্রদেশ)
১৫। বলবন্ত সিং (পাঞ্জাব প্রদেশ)
১৬। ছোটেবাবু (গোয়ালিয়র)

মহিলা ইণ্টার কলেজ স্পোর্টস ঃ

ইণ্টার-কলেজ স্পোর্টসের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। বিভিন্ন মহিলা কলেজের ১২৫টি ছাত্রী এবার যোগদান করেছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা অনুভূত হয়েছে। যেরূপ বিপুল উৎসাহ ও অদম্য উদ্যম দৃষ্ট হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে বঙ্গ মহিলা সমাজ ব্যায়ামচর্চ্চায় পশ্চাতে পড়ে থাকবে না। ১২টি বিষয়ের মধ্যে ১০টি বিষয়ে শেষ মীমাংসা হয়েছে। ২টি প্রতিযোগিতা (প্রতিবন্ধক দৌড় ও ভ্রমণ প্রতিযোগিতা) বাতিল করে দেওয়া হয়। মিস সারা এজরা ট্রাক্‌ প্রতিযোগিতা দু'টিতে প্রথম হন, কিন্তু কৃষ্ণা সেন



ইণ্টার-কলেজ স্পোর্টসে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়িনী কুমারী কৃষ্ণা সেন (ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন)

দু'টি ফিল্ড প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং স্কিপিংয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ্‌ পেয়েছেন।

ফলাফল :—



ইণ্টার-কলেজ স্পোর্টসের ১০০ মিটার দৌড় বিজয়িনী মিস্‌ সারা এজরা (স্কটিসচার্চ্চ কলেজ) ছবি— কাঞ্চন

১০০ মিটার দৌড়—১ম, মিস সারা এজরা (স্কটীশচার্চ্চ কলেজ), ২য়, মিস রমা চক্রবর্ত্তী (বেথুন কলেজ), ৩য় মিস হোসেনারা হক্ (ভিক্টোরিয়া) ; সময়—১৫ সেকেণ্ড।

৫০ মিটার দৌড়—১ম, মিস সারা এজরা (স্কটীশচার্চ্চ), ২য়, মিস রমা চক্রবর্ত্তী (বেথুন কলেজ), ৩য়, মিস গায়ত্রী ব্যানার্জ্জি (আশুতোষ) ; সময়—৮ সেকেণ্ড।



সট্-পুট বিজয়িনী কুমারী কৃষ্ণা সেন ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ব্যালান্স দৌড় :—১ম, মিস বেলা ব্যানার্জ্জি (আশুতোষ), ২য়, মিস ক্লারা ডান (ভিক্টোরিয়া), ৩য়, মিস শোভনালাহিড়ী(আশুতোষ)।

স্কিপিং দৌড় :—১ম, মিস শোভনা লাহিড়ী (আশুতোষ), ২য়, মিস কৃষ্ণা সেন (ভিক্টোরিয়া), ৩য়, মিস সারা এজরা (স্কটীশচার্চ্চ)।

সট্ পুট্ :—১ম, মিস কৃষ্ণা সেন (ভিক্টোরিয়া), ২য়, মিস শোভনা গুপ্তা (ভিক্টোরিয়া), ৩য়, মিস রমা নিয়োগী (ভিক্টোরিয়া)।

বর্শা ছোড়া :—১ম, মিস কৃষ্ণা সেন (ভিক্টোরিয়া), ২য়, শোভনা দাস (স্কটীশচার্চ্চ), ৩য়, মিস শোভা দাস (ভিক্টোরিয়া)।



ইণ্টার কলেজ স্পোর্টসের পর্য্যবেক্ষণ প্রতিযোগিতার দৃশ্য—
বিজয়িনী কুমারী অন্নপূর্ণা সেনগুপ্ত (ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন) ছবি—কাঞ্চন

অন্ধের হাঁড়ী ভাঙা :—১ম, মিস বেলা ব্যানার্জ্জি (আশুতোষ), ২য়, মিস বিজলী দাশগুপ্ত (ভিক্টোরিয়া), ৩য়, মিস ইলা ব্যানার্জ্জি (আশুতোষ)।

অবজারভেসন রেস :—১ম, মিস অন্নপূর্ণা সেনগুপ্ত (ভিক্টোরিয়া), ২য়, মিস লীলা রায় (স্কটীশচার্চ্চ), ৩য়, মিস লতিকা চ্যাটার্জ্জি (ভিক্টোরিয়া)।

দৈর্ঘ্য লম্ফন :—১ম, মিস কমলা রায় (আশুতোষ), ২য়, মিস গায়ত্রী ব্যানার্জ্জি (আশুতোষ), ৩য়, মিস রমা চক্রবর্ত্তী (বেথুন কলেজ)।

রিলে রেস :—১ম, আশুতোষ কলেজ, ২য়, স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ, ৩য়, বেথুন কলেজ। (বিজয়ী দলে :—কমলা রায়, অর্পিতা দাস, শোভনা লাহিড়ী ও গায়ত্রী ব্যানার্জ্জি)।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন সিপ্ :—মিস কৃষ্ণা সেন (ভিক্টোরিয়া)।

টীম চ্যাম্পিয়ানসিপ্ :—ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন ও আশুতোষ কলেজ।



ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের মহিলা প্রতিযোগিনীগণ। মহিলা ইণ্টার-কলেজ স্পোর্টসে আশুতোষ কলেজের সঙ্গে একযোগে চ্যাম্পিয়নসিপ পেয়েছেন



আশুতোষ কলেজের প্রতিযোগিনীগণ। মহিলা ইণ্টার-কলেজ স্পোর্টসে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের সঙ্গে চ্যাম্পিয়নসিপ পেয়েছেন ছবি—তারকদাস

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ নৌকাবাচ্ :

২রা এপ্রিল, শনিবার অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বাচ্ প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ড দু' লেংথে ২০ মিনিট ৩২ সেকেণ্ডে জয়লাভ করেছে। গতবার অক্সফোর্ড দীর্ঘ ১৩ বৎসর পরাজয়ের পর জয়ী হয় তিন লেংথে ২২ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ডে। এ বৎসর অক্সফোর্ডের নাবিকদের ওজন খুব বেশী ছিল, তাঁরা ওজন ৪ পাউণ্ড করে প্রত্যেকের কমালেও গড়পড়তা ১৩ ষ্টোন প্রত্যেকের ওজন ছিল।

কেম্ব্রিজ টস জিতে সারের দিক নেয়। বাচ্ আরম্ভ হয় ১৩৷৫৯ সময়ে। অক্সফোর্ড ৫০ গজের মধ্যে সিকি লেংথ অগ্রগামী হয়, মাইল পোষ্টে এক লেংথ এগিয়ে যায়। বাতাসের বেগ খুব বেশী থাকলেও উভয় দলের নাবিকরা জোর দাঁড় টানে। মাইল পোষ্টে পৌঁছায় ৪ মিনিট ১৮ সেকেণ্ডে, হ্যামারস্মিথ ব্রিজে ৭-৩৫, চিস্উইক ষ্টেপ্সে ১২-২১, বার্ণসব্রিজে ১৬-৪০, গন্তব্যস্থলে ২০-৩২।

ক্যালকাটা কাপ্ ঃ

স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ডকে শেষ ম্যাচে ২১-১৬ পয়েণ্টে হারিয়ে, রাগবী ইণ্টার-ন্যাসনাল চ্যাম্পিয়নসিপ্ ক্যালকাটা কাপ্ বিজয়ী হয়েছে। গত বৎসর ইংলণ্ড জয়ী হয়। ১৯৩২-৩৩ সালে স্কটল্যাণ্ড বিজয়ী ছিল।

	খেলা	জয়	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
স্কটল্যাণ্ড	৩	৩	০	৫২	৩৬	৬
ওয়েলস্	৩	২	১	৩১	২১	৪
ইংলণ্ড	৩	১	২	৬০	৪৯	২
আয়ার্লণ্ড	৩	০	৩	৩৩	৭০	০

সেক্রেটারীর পদত্যাগ ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সেক্রেটারী ডি মেলো পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সভাপতি জামসাহেব পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছিলেন। বোম্বাই ক্রিকেট মহলের অনেকের ধারণা যে এবার কণ্ট্রোল বোর্ডে রাজরাজড়ার আধিপত্য কমবে, ভারতীয় ক্রিকেটের মঙ্গল হবে। ডি মেলো অবশ্য পদত্যাগ পত্রে নিজস্ব কারণ দেখিয়েছেন। ১৭ই এপ্রিল তারিখে নূতন সভাপতি ও সেক্রেটারী নিয়োগ হবে। ডি মেলোর স্থানে যশধনওয়ালা সেক্রেটারী এবং সভাপতি হবেন মাদ্রাজের ডাঃ সুব্বারায়ণ বা ডাঃ কাঙ্গা। যিনিই সভাপতি হন না কেন তাঁকেই কণ্ট্রোল বোর্ডের আমুল পরিবর্ত্তন সাধন করতে হবে। নতুবা বিশৃঙ্খলা অপসারিত হবে না।



জি ডেভিস

আই এফ এর য়ুরোপীয় সেক্রেটারী জি ডেভিসের পদত্যাগ সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হয়। পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করতে অনুরুদ্ধ হয়েছেন বলে সংবাদও রটে গেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সঠিক ফলাফল জানা যায় নি। আই এফ এর ভিতরের গণ্ডগোল বেশ ঘনিভূত হয়ে উঠছে।

এ আই এফ এ সংবাদ ঃ

ক্যাপ্টেন জে বি ডোনাল্ডসন সেক্রেটারী এবং পি গুপ্ত কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

আই এফ এর অষ্ট্রেলিয়ায় দল পাঠান অনুমোদন করেছেন। পেশাদারী খেলোয়াড় প্রথা সমর্থন না করতে সকল এসোসিয়েশন ও ক্লাবকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এস মৈন্নুল হকের নূতন আইনগুলি সভায় পাশ হয়েছে। এই আইন গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রদেশের খেলোয়াড়গণকে একাধিকস্থানে বা ক্লাবে খেলতে না



মেয়েদের এথ্‌লেটিক্ চ্যাম্পিয়নসিপের ফুটবল ছোঁড়া প্রতিযোগিতা বিজয়িনী—কুমারী বাণী রায় (বল হাতে), দ্বিতীয়া—আভা বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্যে), তৃতীয়া—অণিমা সেন

ছবি—কাঞ্চন

দেওয়া। কোন প্রদেশের পক্ষে যদি অন্য প্রদেশের খেলোয়াড় একবার খেলেন, তিনি পুনরায় ঐ বৎসরে নিজের প্রদেশের পক্ষে খেলতে পারবেন না। ইহাতে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানী অনেকাংশে বন্দ হতে পারে।

কবে থেকে এই নূতন আইন বলবৎ হবে তা' জানা যায় নাই। এ বৎসর কলিকাতায় বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল খেলোয়াড় খেলবেন তাঁদের উপর ঐ আইন এবার থেকেই প্রযুক্ত হওয়া দরকার। এই আইনেও যে স্থানীয় খেলোয়াড়রা বিশেষ সুবিধা পাবে তা' মনে হয় না। কারণ,

বিভিন্ন প্রদেশের খেলোয়াড়রা কলিকাতার মায়ায় আটক পড়বেনই, স্বদেশের মায়ার চেয়ে কলিকাতার টান অনেক কারণে বেশী। পেশাদারী মনোবৃত্তি বন্ধ করবার উপযোগী আইন প্রয়োগ না করলে খেলোয়াড় আমদানী রদ হবে না। শোনা গিয়েছিল যে আই এফ এ এবার নাকি অনেক কিছু করবেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কিছুই করতে দেখা গেল না।

কোরিন্থিয়ান্স টুরে ফেডারেশনের লাভ ঃ

কোরিন্থিয়ান্সদের টুরে দশ হাজারের উপর লাভ হয়েছে।

সি কে নাইডু সম্মানিত ঃ

হিন্দু জিমখানার ম্যানেজিং কমিটি বর্ত্তমান বৎসরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে এল আর ট্যায়রসি গোল্ড মেডেল মেজর সি কে নাইডুকে প্রদান করেছেন।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়কে প্রতি বৎসর ঐ স্বর্ণ-পদক দ্বারা তাঁরা সম্মানিত করে থাকেন।

বিশ্বের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ঃ

গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য ১৯৪০ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতা টোকিওতে আগষ্ট মাসের পরিবর্ত্তে ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত হবে বলে ঘোষিত হয়েছে।

মিশরের ইণ্টার-ন্যাসনাল টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

আলেকজাণ্ড্রিয়ায় ভারতবর্ষের টেনিস খেলোয়াড়রা কেহই শেষ রক্ষা করতে সক্ষম হন নাই। ডেভিস কাপে রণভির সিং ভাল খেলে ৬-৪, ৬-২ গেমে আলেকজাণ্ডারকে এবং হোপারকে ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়ে দুর্দ্ধর্ষ মেঞ্জেলের কাছে ৬-২, ৬-০ গেমে পরাজিত হন।



ষোল মাইল ইউনিভার্সিটি সাইকেল রেস বিজয়ী ডি ওয়ালটম (মেডিক্যাল) ছবি—জে কে সান্যাল



মেয়েদের এথলেটিক্ চ্যাম্পিয়নসিপের ব্যালান্স রেসের একটি দৃশ্য ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে কতখানি সফলতা দেখাতে সক্ষম হবেন ইহার ফলাফলেই তা' অনুমিত হচ্ছে।

গাউস মহম্মদ তাঁর সুনামানুযায়ী খেলতে পারেন নি। প্রথম রাউণ্ডে কোমসীকে সহজেই পরাস্ত করেন কিন্তু দ্বিতীয়



পার্শি বালিকাদের স্পোর্টসের আরম্ভ ছবি—জে কে সান্যাল

রাউণ্ডে জে গ্র্যাণ্ডগুইলটের সঙ্গে খেলায় অনেক ভুল করেন। চীন খেলোয়ার কোচিন-খি নিকট ৬-০, ৬-৪, গেমে পরাজিত হন। কোচিন-খি সুন্দর ড্রাইভের দ্বারা উপর্য্যুপরী জয়ী হতে থাকে, তার সুন্দর ষ্টাইল ও নির্ভুল মারগুলি সত্যই নয়নানন্দকর।

মামুদ আলম ৯-৭, ৬-৪ গেমে ম্যাণ্ডেলবমকে হারান, ভারত ও মিশরের দুই নব আশার প্রতীকদের খেলাটি অতি সুন্দর হয়েছিল। পরের খেলায় কোচিন-খির সঙ্গে অধৈর্য্যতার জন্য মামুদ বহু ভ্রম করেন এবং পরাজিত হন।

যুধিষ্ঠির সিং প্রথম রাউণ্ডে সাফেকে সহজেই পরাজিত করেন। জারলেণ্ডির সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধের পরে ৬-৪, ৮-৬ গেমে জয়ী হন। কিন্তু পুনসেকের কাছে দাঁড়াতে পারেন নি ৬-১, ৬-৩ গেমে পরাজয় স্বীকার করেন।

সোহানীডোল ও বাসিলনকে অতি সহজেই জেতেন এবং চেজনারকেও বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে জয় করেন। মিটিককে ১০-৮, ০-৬, ১৩-১১ গেমে হারিয়ে সেমি ফাইনালে ওঠেন। প্রতিযোগিতার মধ্যে এই খেলাটি শ্রেষ্ঠ বলে বহু সমালোচক মত প্রকাশ করেন।

পুনসেকের বিরুদ্ধে সোহানী ভাল খেলতে পারেন নি। পূর্ব্বদিনের ম্যাচের ভীষণ প্রতিযোগিতার ফলে ক্লান্তি অনুভব করেন, পুনসেক ৯টি ষ্ট্রেট গেমে জয়ী হন।

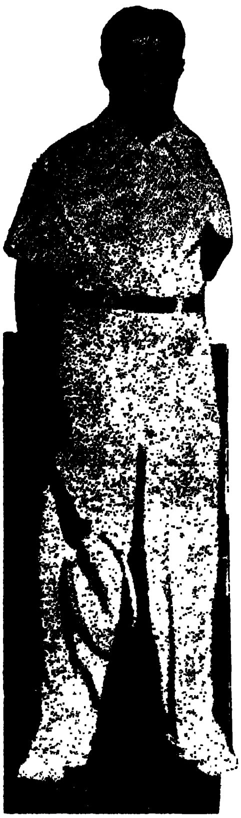


লীলা রাও

মেয়েদের সিঙ্গলসে মিস গ্রেসিন হুইলার, আমেরিকার ক্রম পর্য্যায়ের পঞ্চম খেলোয়াড় অতি সহজেই ফাইনালে ওঠেন। মিস লীলা রাও ৬-৪, ৬-৩ গেমে ম্যাদাম ডুমাসকে এবং ৭-৫, ৬-১ গেমে ম্যাদাম রাথ্যালকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে পৌছান। মিস 'বিলি' ইয়র্কের সঙ্গে খেলায় ভাগ্য বৈগুণ্যে ৬-৪, ৬-৩ গেমে পরাজিত হন। তিনি কয়েকটি গেমে ৪০-'লাভ' করেও দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি সেটও পান নাই। মিস ইয়র্ক মিস হুইলারকে ৬-৪, ১-৬, ৬-২ গেমে হারিয়ে বিজয়িনী হয়েছেন।

সোহানী ও মিস লীলা রাওয়ের চেজনার ও মিসেস এণ্ডারসনের সঙ্গে খেলাটিতে বেগ পেতে হয়েছিল। অপর দিকে জে গ্রাণ্ডগুইলট ও মিস কার্টিস 'স্ক্রাচ' হন এবং হিউজের ও মিস হুইলারের খেলা হিউজের অসুস্থতার জন্য বাতিল হওয়ায়, ফাইনালে মিস ইয়র্ক ও মিটিক ওঠেন। 'নেটে' মিস ইয়র্ক ও মিটিক ভারতীয় দলের পক্ষে অধিক শক্তিশালী ছিলেন, তাঁরা ৬-৪, ৬-২ গেমে অতি সহজেই জয়ী হন।

লীলা রাও 'বিলি' ইয়র্কের সহযোগিতায় মেয়েদের ডবল ফাইনাল খেলায় দুর্ভাগ্যবশতঃ জয়ী হতে পারেন নি। তাঁরা একটি সেট ও ৫-২ গেমে অগ্রগামী থেকেও তাঁদের দীর্ঘাঙ্গী আমেরিকান প্রতিযোগিনী মিস কুটস্ ও মিস হুইলারের উৎকৃষ্ট খেলার কাছে ৩-৬, ৭-৫, ৬-২ গেমে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন।



পুনসেক্

অষ্ট্রেলিয়া অজেয় নয় ঃ

স্যর পেলহাম ওয়ার্ণার, টেষ্ট মনোনয়ন কমিটীর চেয়ারম্যান, ফিঙ্কলে ক্রিকেট ক্লাবের বার্ষিক ডিনারে বলেছেন,—অষ্ট্রেলিয়া দল অজেয় নয়। গত ২২টি ম্যাচে, ইংলণ্ড জিতেছে ১৩, অষ্ট্রেলিয়া ৯। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৫টি টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ১০টি এবং অষ্ট্রেলিয়া ৫টিতে জয়ী হয়েছিল। আমি

পুরুষদের সিঙ্গেলস্ ফাইনালে রোডারিক মেঞ্জেল ৬-৪, ৬-২ গেমে পুনসেককে পরাজিত করেছেন।

ইংলণ্ডে আট-বল ওভার ঃ

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড আট-বল ওভার খেলা অনুমোদন করেছেন। ঐ নিয়ম চলবে ১৯৩৯ সালে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজকে ঐ নিয়মাধীনে ম্যাচ খেলতে সম্মত হতে বলা হবে।

ইংলণ্ডের টেষ্ট নির্ব্বাচক মণ্ডলী ঃ

স্যর পেলহাম ওয়ার্ণার (চেয়ারম্যান), পি এ পেরিন (এসেক্স), এ বি সেলার্স (ইয়র্কসায়ার), এম জে টার্ণবুল (গ্লামোরগন্)।

একজন অপ্‌টিমিষ্ট। তাঁরা শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং বড় যোদ্ধা, তা হলেও আমি মনে করি এ বৎসর আমাদের তাঁদের হারাবার বেশী সুযোগ আছে। উপস্থিত বিলাতের ক্রিকেট খুবই ভাল। আমি ভবিষৎবাণী করছি যে আমরা অষ্ট্রেলিয়াকে এবার হারাবো। সাত শুভ সংখ্যা, মনোনয়ন কমিটির চেয়ারম্যানসিপের আমার এবার সপ্তম বার এবং ইহাই আমার শেষবার।

ডি মণ্ট মোরেন্সি টুর্ণি ঃ

পেশোয়ারের এইচ এল আই প্রথম দিন ৩-৩ গোলে ড্র করে দ্বিতীয় দিনে ২-১ গোলে এন ডবলিউ আর দলকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। উভয় দিনই তীব্র প্রতিযোগিতার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের খেলা হয়। রোনাল্ড ও হার্ভে বিজয়ী পক্ষে এবং ব্রাউন বিজিত পক্ষে গোল করেন। রেলওয়ে খুব চেপে ধরে এবং পরপর তিনটি কর্ণার পেয়ে একটি গোল করে, কিন্তু রেফারি উহা বাতিল করে পেনালটি দেয়, তাতে এমিলি গোল করতে পারে না। শেষ দিকে রেলওয়ে ভয়ানক চেপে ধরেও কিছুতে গোল শোধ করতে পারে না। এইচ এল আই আরো তিনবার এই কাপ বিজয়ী হয়েছে।



কুমার সঙ্ঘ স্পোর্টসের মেয়েদের অর্দ্ধমাইল সাইকেল রেস বিজয়িনী মিস শিখ ছবি—জে কে সান্যাল

সিংহলে অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট দল ঃ

বিলাতাভিগামী অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ক্রিকেট দল কলম্বোয় সিংহল দলের সঙ্গে একটি ম্যাচ খেলেন, খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ারা প্রথমে ব্যাট করে ৯উইকেটে ৩৬৭ রান তুলে ডিক্লেয়ার্ড করেন। ব্যাডম্যান, ও'রিলী, ফ্লিট উড্-স্মিথ, বার্ণেট ও ম্যাক্‌কর্মিক খেলেন নাই। হাসেট ও ব্যাড্‌কক্ প্রত্যেকে ১১৬ রান করেছিলেন। সিংহলদলের প্যারেরা ১০৬ রানে ৫টি উইকেট নিয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সিংহল দল ৭উইকেটে ১১৪ রান করেন। ডিসারাম ৩১, পুলি ৩০। চিপারফিল্ড ২৪ রানে ৪উইকেট নিয়েছেন।



কুচবিহার কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বিজয়ী এরিয়ান ক্রিকেট দল ছবি—জে কে সান্যাল



নিখিলবঙ্গ পেশী সঞ্চালন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিগণ, বিচারক ও কর্ম্মকর্ত্তাবৃন্দ।
বিজয়ী—মিষ্টার স্মিথ (শেষ সারির দক্ষিণে) ছবি—জে কে সান্যাল

খেলোয়াড় পরিবর্ত্তন

২৮২ জন খেলোয়াড় আগামী ফুটবল খেলায় ক্লাব পরিবর্ত্তন করবার জন্য ট্রান্সফার সই করে ক্লিয়ারেন্সের দরখাস্ত করেছেন। গত বৎসরাপেক্ষা সংখ্যা কম।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবর্ত্তন :

এস (ছোনে) মজুমদার (এরিয়ান) ভবানীপুরে,
এস গুঁই (মোহনবাগান) ভবানীপুরে,
কে দত্ত (মোহনবাগান) ইষ্টবেঙ্গলে,
রসিদ (ছোট) (মহমেডান) কালীঘাটে,
নাসিম (মহমেডান) এরিয়ানে,
কে প্রসাদ (ইষ্টবেঙ্গল) এরিয়ানে,
সি ব্রাউটন (ডালহৌসী) ক্যালকাটায়,
এন ঘোষ (এরিয়ান) মোহনবাগানে,
পি ব্যানার্জ্জি (ইষ্টবেঙ্গল) মোহনবাগানে,
জে দত্ত (স্পোর্টিং) মোহনবাগানে,
এস ব্যানার্জ্জি (কালীঘাট) মোহনবাগানে,
মজিদ (ইষ্টবেঙ্গল) মহমেডান স্পোর্টিংয়ে।

কোন কোন ক্লাবে কয়জন যোগদান ও পরিত্যাগ করলেন, তার মোটামুটি তালিকা :—

ক্লাব	যোগদান	পরিত্যাগ
মোহনবাগান	২৬	১০
এরিয়ান্স	২৭	৮
ইষ্টবেঙ্গল	১৪	৯
মহমেডান	৭	৪
ভবানীপুর	১৮	৭
কালীঘাট	১১	১৪

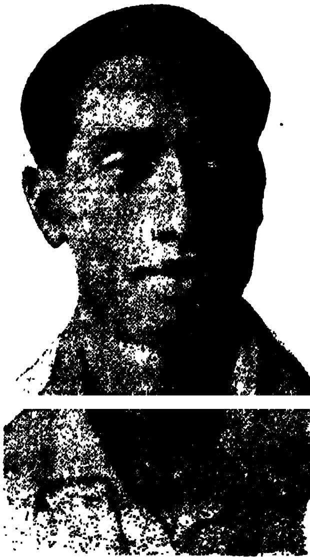
ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড়দের বিলাত যাত্রা ঃ

আজমীরের রাজপুতানা ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে নবীন উদীয়মান ক্রিকেট খেলোয়াড়দের একটি দল আগামী ১২ই এপ্রিল ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করবে। বিলাতে এই দলটি তিন মাস থাকবে, তাঁদের প্রথম খেলা হবে বেকেনহামের সঙ্গে ১০ই মে। সেখানে তাঁদের মোট ২৩টি খেলা হবে। যাঁরা পূর্ব্বে কখনও বিলাতে যান নাই, এমন নবীন খেলোয়াড়দেরই কেবল দলে নেওয়া হয়েছে। বাঙ্গলা থেকে কে বোস ও কে ভট্টাচার্য্যকে দলভুক্ত করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা নির্ব্বাচিত হয়েছেন :—

এ ইউ বোটাওয়ালা (বোম্বাই ও র‍্যাগুার জিমখানা)
বাপোরিয়া (বোম্বাই ও র‍্যাগুার জিমখানা)
এল রামজি (কাথিওয়ার ও ডুন্‌গারপুর)
এন পি কেশরী (ডুন্‌গারপুর)
ভি এস হাজারী (মধ্যভারত)
গোপাল দাস এম এডভানী ডেওয়াস্‌ (করাচি)
এট্টিক হুসেন (আলওয়ার ও টঙ্ক)
কে বোস (কলিকাতা-স্পোর্টিং ইউনিয়ন)
আসাদ ওয়াহাব (ইউ পি ও টঙ্ক)
বি ভি শঙ্কর (করাচি ও সিন্ধু)
তাজাম্মুল হুসেন (দিল্লী ও ডিষ্ট্রিক্ট)
আজিম খাঁ (আলওয়ার ও জয়পুর)
দীপচাঁদ (করাচি)
কে ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা-এরিয়ান)
রামপ্রকাশ (লাহোর)


কে বোস (বাঙ্গলা)

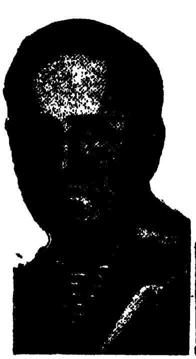

কে ভট্টাচার্য্য (বাঙ্গলা)


হাজারী


খানিরাম চোপরা


গোপালদাস


ডব্‌লিউ ডি বেগ


রামপ্রকাশ


গুলালসিং

আব্বাস খাঁ (করাচি)
ধানিরাম চোপরা (কাশ্মীর ও লাহোর)
সি এইচ ব্যাঙ্কার (আমেদাবাদ)
ডবলিউ ডি বেগ (আজমীর)
গুলার সিং (আজমীর)
জি কে কুরেসি (জয়পুর)

বলদেও স্বরূপ জেনারেল ম্যানেজার এবং মেজর ই ডব্‌লিউ সি রিকেটস্ (এম সি সি দলের দু'বার ভারত অভিযানের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার) বিলাতের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন।

বালীতে কুস্তি ঃ

বালী দক্ষিণপাড়া সম্মিলনীর পরিচালিত কুস্তি প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। ব্যায়াম সমিতির মল্লবীরগণ বিভিন্ন বিভাগে সাফল্যলাভ করেছেন। ফলাফল :—

৭ ষ্টোন :—বিজয়ী—পাঁচুগোপাল পাল (সালখিয়া নব সঙ্ঘ) ; বিজিত—হরি মুখার্জ্জি (বালী দক্ষিণপাড়া)

৮ ষ্টোন :—বিজয়ী—কানাই প্রামাণিক (ব্যায়াম সমিতি) ; বিজিত—সুনীল দত্ত (কলিকাতা ফিজিক্যাল এসোঃ)

৯ ষ্টোন :—বিজয়ী—অভয় প্রামাণিক (ব্যায়াম সমিতি) ; বিজিত—গণেশ কুণ্ডু (ব্যায়াম সমিতি)

১০ ষ্টোন :—বিজয়ী—নারায়ণ পল (চাঁপাতলা ইয়ং) দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য :—নরেন প্রামাণিক

প্যালেষ্টাইন অলিম্পিক ঃ

আগামী প্যালেষ্টাইন অলিম্পিকে যোগ দেবার জন্য নিম্নলিখিত এথ্‌লেটগণ নির্ব্বাচিত হয়েছেন :—

(১) জহুর আমেদ (পাঞ্জাব), গোলা ছোড়া ও ডিসকাস্ ছোড়ায় যোগদান করবেন



জহুর আমেদ



বালী দক্ষিণপাড়া কুস্তি প্রতিযোগিতার বিজয়ী ও বিজিতগণ ছবি—তারকদাস

(২) হাজুরা সিং (পাতিয়ালা) ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে যোগ দেবেন

(৩) চাঁদ সিং (পাতিয়ালা) ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দৌড়ে

(৪) এক গ্যাণ্টজার (বাঙ্গলা) ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে

(৫) রওনক সিং (পাতিয়ালা) ৫০০০ মিটার ও ১০০০০ মিটার দৌড়ে

(৬) সফি (পাঞ্জাব) পোলভল্টে

(৭) নিরঞ্জন সিং (পাতিয়ালা) দৈর্ঘ্য লম্ফন, হপ ষ্টেপ জাম্পে

(৮) বুসী (মাদ্রাজ) দৈর্ঘ্য লম্ফন ও হপ ষ্টেপ জ্যাম্পে

(৯) মহম্মদ মুনির (যুক্তপ্রদেশ) ৪০০ মিটার ও ২২০ মিটার হার্ডলে

(১০) জেড এইচ খান (বাঙ্গলা) ১০০ মিটার দৌড়ে

(১১) সালিমুল্লা (পাঞ্জাব) ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে

(১২) প্রিষ্টলী (মহীশূর) বর্শা ছোড়া ও উচ্চ লম্ফনে

(১৩) এ সিং (পাতিয়ালা) উচ্চ লম্ফনে

(১৪) জেমিসন (বোম্বাই) ৪০০ ও ১১০ মিটার হার্ডলে

(১৫) পি সুইনী (বোম্বাই) ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে

(১৬) সোমনাথ (পাঞ্জাব) হাতুড়ী ছোড়ার জন্য

উক্ত এথলেটগণের মধ্যে জহুর আমেদ গোলা ছোড়ায়, হাজুরা সিং ৮০০ মিটারে, গ্যাণ্টজার ৪০০ মিটারে, সফি পোলভল্টে, নিরঞ্জন দৈর্ঘ্য লম্ফনে, প্রিষ্টলী উচ্চ লম্ফনে নূতন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। ইহা ছাড়া নিরঞ্জন সিং ও সফি প্রথম ওয়েষ্টার্ণ এসিয়াটিক গেমে ১৯৩৪ সালে দিল্লীতে যোগদান করেছিলেন।

হেকল কাপ টেনিস ঃ

ইডেন গার্ডেনে হেকল কাপ প্রতিযোগিতা উপলক্ষে নর্থ ক্লাবের সঙ্গে ক্যালকাটা টেনিস ক্লাবের টেনিস খেলায় নর্থ ক্লাব ৫৪টি গেমে বিজয়ী হয়েছে। নর্থ ক্লাব ১২৬টি গেম এবং ক্যালকাটা ক্লাব ৭২টি গেম জিতেছিল। নর্থ ক্লাবের এই জয় বহু বৎসর পরে হলো।

হকি লীগ ঃ

হকি লীগ খেলা প্রায় শেষ হতে চললো। কলিকাতা কাষ্টমস এবারও লীগ চ্যাম্পিয়ন হবে। শেষ খেলায় রেঞ্জার্সের



এম এ খাঁ (মোহনবাগান)

সঙ্গে যদি তারা হারেও তথাপি গোল-এভারেজে প্রথম থাকবে। অতএব রেঞ্জার্স দ্বিতীয়, মোহনবাগান তৃতীয়, পোর্টকমিশনার চতুর্থ স্থান অধিকার করবে। রেঞ্জার্সের সামসন সর্ব্বাধিক সংখ্যক গোল করেছেন, তারপরই মোহনবাগানের এম এ খাঁ করেছেন।

দ্বিতীয় বিভাগে কে নামবে তা' নিয়ে বেশ প্রতিযোগিতা চলছে। নেমে যেতে হবে দু'টি দলকে—টাউনের নামা নিশ্চিত, আর নামবে ইষ্টবেঙ্গল ও সেণ্ট জোসেফের মধ্যে এক দল। সেণ্ট জোসেফের সকল খেলা শেষ হয়েছে, তারা মোট ১০ পয়েণ্ট করেছে। ইষ্টবেঙ্গলেরও ১০ পয়েণ্ট, তবে তাদের হাতে একটা খেলা আছে, তাতে জিততে বা ড্র করতে পারলে নামা থেকে বাঁচবে।



পি দাস (মোহনবাগান)

হারলে, সেণ্ট জোসেফ থেকে যাবে, তাদের গোল-এভারেজ ভাল।

বিলাতী দলে ভারতীয় খেলোয়াড় ঃ

প্রসিদ্ধ ভারতীয় টেষ্ট খেলোয়াড়দ্বয় অমর সিং ও লালা অমরনাথ বিলাতের ক্রিকেট দলে খেলবার জন্য বিলাত যাত্রা করেছেন। অমর সিং কোলনে ক্লাবে, আর অমরনাথ নেলসন ক্লাবে খেলবেন।

আই এফ এর সিদ্ধান্ত ঃ

ডালহৌসীকে প্রথম বিভাগে রাখবার প্রচেষ্টা সফল হলো না। মিষ্টার পেপারের প্রথম বিভাগে ১৫টি দল খেলবার প্রস্তাব শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে প্রত্যাহার করতে হয়েছে।

সাব কমিটি স্থির করেছেন যে আর্ম্মি স্পোর্টস্ কণ্ট্রোল বোর্ডকে প্রথম শ্রেণীর সৈনিক দলের এবং প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলিকে স্থানীয় সিভিলিয়ান দলের তালিকা আই এফ একে জানাবার জন্য পত্র দেওয়া হবে।

যা-তা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সামরিক বা বে-সামরিক দলকে শীল্ডে খেলবার আমন্ত্রণ করে অযথা অর্থব্যয়ের বিরুদ্ধে আমরা পূর্ব্বেই অভিযোগ করেছি। আই এফ এর সুমতি হয়েছে জেনে সুখি হলুম। আশা করি যে এবার শীল্ডে সত্যকার প্রথম শ্রেণী দলরাই প্রতিযোগিতা করতে অনুমতি পাবে।

বাইটন কাপ ঃ

৪৪টি দল প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে—পশ্চিম থেকেই ২৪টি, স্থানীয় ১৬টি এবং বাঙ্গলার বাইরে থেকে বাকী ২৩টি দল। শোনা যাচ্ছে, নিম্নলিখিত দলগুলি নাকি খুব পুষ্ট, ইহারা প্রতিযোগিতায় তাদের বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারবেন—ঝাঁন্সি হিরোজ, ভুপাল ওয়াণ্ডারার্স, পিণ্ডি টাইগার্স, বি এন আর (হোল্ডার্স), সংসারপুর স্পোর্টস এসোসিয়েশন, বোম্বাইয়ের লুসিটেনিয়ান, লাহোরের ব্রাদার্স ক্লাব, দিল্লী অকেসনালস্, বোম্বাই কাষ্টমস্, আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি।

ধ্যানচাঁদ, রূপসিং, করাচির খোদাবক্স, পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের আক্রাম, গোয়ালিয়রের ছোটেবাবু ও মিরাটের হামিদ ঝাঁন্সি হিরোজ দলে খেলবেন। লুসিটেনিয়াদলে মিণ্টো ও কর্ণোগেঞ্জ খেলবেন।—৮।৪।৩৮

জড়ায়ে ধরিতে আসে যেন

শ্রীঅনুরাধা দেবী

তোমার চোখের পানে চেয়ে মনটা অমন করে কেন ?
দেখেছি সারাটি দিন ব'সে, তবুও মেটে না সাধ যেন !

তোমার চোখের কোণে কোণে আমারি মনের কথা ভাসে,
সলাজ কামনা মোর যত ঘুরিয়া মরে গো তারি পাশে।

অজানা শিশুর হাসি আমি দেখেছি তোমার আঁখিপাতে,—
জড়ায়ে ধরিতে আসে যেন আমারে নরম দুটি হাতে।

তোমার দেহের সাথে তার কত যে নিবিড় পরিচয়,
আমার কাণের কাছে এসে গোপনে তাহারি কথা কয় !

বাহুর বাঁধনে আমি তারে ছিনায়ে এনেছি শত বার,
লাজের কাজল মুছে ফেলে আঁচল পেতেছি বার বার।

তোমার পরশ মাদকতা, শ্যামল হাসির রেখাখানি
আমার ঠোঁটের কাছে এসে করে যে কতই কাণাকাণি।

তোমার প্রাণের কণাটুকু বুকের পীযূষ ধারা দিয়ে
বাঁধিতে বাসনা জাগে মনে, নারীর সফল আশা নিয়ে।

তোমারে ঘিরিয়া নাচে যে গো আগামী কালের শত নর,
আমারি দেহের মাঝে তারা মাগিছে সজীব কলেবর।

ফেনিল পেয়ালা তোলে ভরি মদির মহুয়া রসধারা ;
তোমার শিথিল বাহুপাশে জাগিছে কমল ঘুমহারা।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

সচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস "দেবপতি"—১৷৹

রাধারাণী দেবী প্রণীত সচিত্র কাব্যগ্রন্থ "বনবিহগী"—১৷৵৹

শামসুর নাহার প্রণীত "রোকেয়া জীবনী"—১৲

আবু রুসেদ প্রণীত "রাজধানীতে ঝড়"—১৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "রামধনু"—১৲

অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "রাম চরিতম্"—১৲

শিশিরকুমার বসাক প্রণীত "হিন্দুদের রাজ্য শাসন প্রণালী"—৷৵৹

নরেন্দ্র দেব প্রণীত উপন্যাস "আকাশ কুসুম"—২৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "লাল পাঞ্জা"—১৲

মণি বাগচী প্রণীত "ককটেল্ কনফেশন"—১৲

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী প্রণীত গল্পপুস্তক "পুষ্পচয়ন"—১৷৹

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "পাঁকের ফুল"—২৲

নৃপেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "পত্র পকেটে, সত্য খুন"—৷৵৹

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত "জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার"—২৷৹

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র ষড়বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে

সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বর্ষকাল যে 'ভারতবর্ষ' গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণের পরিচিত, তাহার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি? এই পঞ্চবিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' যে ভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সুদীর্ঘ কাল 'ভারতবর্ষ' প্রতি বৎসরে ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০খানি ত্রিবর্ণ চিত্র, শতাধিক দ্বিবর্ণ চিত্র ও অন্যাধিক ১৫০০ একবর্ণ চিত্র উপহার দিয়াছে; প্রতি মাসে পরলোকগত মনীষীবৃন্দের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা দিয়াছে; এতদ্ভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধরাজি 'ভারতবর্ষ'কে সমৃদ্ধ করিয়াছে; 'ভারতবর্ষ' এই পঞ্চবিংশ বর্ষকাল যে উচ্চতম আসন অধিকার করিয়া আছে, আগামী বর্ষে তাহাকে আরও মনোরম করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৵৹, ভি, পিতে ৬৷৶৹, ষাণ্মাষিক ৩৶৹ আনা, ভি, পিতে ৩৷৹। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক**। ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নম্বর** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

গত ১লা এপ্রিল হইতে ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে পত্রাদি প্রেরণের ডাকের হার পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেজন্য আমরা ব্রহ্মদেশের গ্রাহকগণের বার্ষিক মূল্য গত বৎসরের অপেক্ষা কমাইয়া দিলাম। ব্রহ্মবাসীদিগের জন্য ভারতবর্ষের বার্ষিক মূল্য ৭৲ (সাত টাকা) এবং ষাণ্মাষিক মূল্য ৩৷৹ (তিন টাকা আট আনা) করা হইল।

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] মুখো

শিবাজী ও রামদাস স্বামী

Bharatvarsha Printing Works



দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যসঙ্গীত

দিলীপকুমার

প্রায় দশ বৎসর বাদে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা—২১. ৩. ৩৮ তারিখে জোড়াসাঁকোয়। কত কথাই যে বললেন তাঁর অতুলনীয় সরস ঢঙে—গান সাহিত্য জীবন কিছুই বাদ গেল না। এ-কথোপকথনের অনুলিপি রেখেছেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। কবি সেগুলি ছাপবার অনুমতি দিয়েছেন।

তাতে দুএকটা কথা পরিষ্কার হয় নি। কবিকে তাই আবার প্রশ্ন করতে হ'ল ছাব্বিশে তারিখে সকালবেলা—বেলঘরিয়ায়। পঁচিশে তারিখে কবিকে শ্রীমতী হাসি দেবী কয়েকটা গান শুনিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। তাই আমার বক্তব্যটা পরিষ্কার করবার সুযোগ হ'ল। কবিকে তাঁর "হে ক্ষণিকের অতিথি" গানটি আমার নিজের ঢঙে—অথচ কবির সুর বজায় রেখে—গেয়ে শুনিয়েছিলাম ইচ্ছা ক'রেই—মানে, এই প্রসঙ্গ তুলতেই। এবিষয়ে খুব জরুরি একটা তর্কের সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়ার দরকার বহুদিন থেকেই অনুভব ক'রে আসছি।

*　　*　　*　　*

কবির প্রাতরাশ সমাধা হ'লে বললাম: "কিছু যদি মনে না করেন—"

কবি হাসিমুখে বললেন: "করলেই কি নিষ্কৃতি পাব তোমার প্রশ্নবাণ থেকে? বিদ্ধ করো।"

বললাম: "সঙ্গীত সম্পর্কে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে অনেক দিন ধ'রেই ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সুযোগ হয় নি—জানেনই তো কেন। কথাটা জরুরি, অথচ আমি এখনো পুরোপুরি মনস্থির করতে পারি নি এ সম্বন্ধে। সম্প্রতি আমার ক্রমাগতই আরো বেশি ক'রে মনে হচ্ছে যে ওস্তাদি সঙ্গীত মৃত না হ'লেও মরণাপন্ন—decadent.

অথচ সময়ে সময়ে ভীষ্মদেবের মতন তারাপদর মতন অতি মুষ্টিমেয় দু-একজনের ওস্তাদি সঙ্গীতে যেন নতুন প্রাণশক্তির আভাষ পাই। ওস্তাদি সঙ্গীত আমি অত্যন্ত ভালোবাসি এখনো—জানেনই তো, অথচ যে সব ওস্তাদি গান আগে ভালো লাগত সে সব প্রায়ই দেখি ভালো লাগে না—মনে হয় এদের চাই নবজন্ম, revival নয়—renaissance : কিন্তু হয়েছে কি, শতকরা নিরানব্বইজন ওস্তাদ চান ঐ রিভাইভালই—ও'কে জের-টেনে-চলা। আর্টে বিশুদ্ধ রিভাইভাল ব'লে কোনো জিনিষ নেই ব'লেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, অথচ ভীষ্মদেবের মতন আবদুল করিমের মতন মোতি বাইয়ের মতন দু একজন গুণীর গান শুনতে শুনতে মনে খট্‌কা লাগে : তবে কি এ-গান এখনো পঞ্চত্ব পায় নি ? এ-গান যে এখনো পুরো মরে নি তার প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় যখন দেখি, ধরা যাক্ ভীষ্মদেবের মতন প্রাণবন্ত প্রতিভাবান্ গায়কে এ-সঙ্গীতে এখনো এমন কি সার্গমের মতন মামুলি জিনিসেও নবদীপ্তি আনতে পারে। কেন না তাহ'লেই প্রমাণ হ'ল অন্তত এইটুকু যে এ-স্বরবিন্যাসের প্রাণ আছে—মরা জিনিস তো জীবন্ত মানুষকে প্রাণবন্ত প্রতিভাকে ডাক দেয় না—তার মনে সাড়াও তোলে না। অথচ আশ্চর্য লাগে যখন ওস্তাদি গান শুনতে শুনতে প্রায়ই মনে হয় এ সঙ্গীতের এসেছে জরা—গঙ্গাযাত্রার আর দেরি নেই—এখন চাইতে হবে এ-সঙ্গীতের আত্মার নব-জন্ম নব-দেহে : মানে, এ-সঙ্গীতের শাশ্বত আলো হাওয়া দিয়ে নতুন গানের ফুল ফোটানো এতে নতুন দীপ্তি এনে, প্রেরণা এনে—নব রক্তে একে পুনর্জীবন দিয়ে। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি'—'জীর্ণ বাস ছেড়ে মানুষ যেমন নতুন বাস পরে', তেম্‌নি গানের শাশ্বত প্রেরণাও এক কাঠামো এক ফর্মে বার্ধক্য বোধ করলে নবীন কাঠামো নবীন ফর্মে ঝল্‌কে ওঠে নবদ্যুতিতে—এরই তো নাম শিল্পের নব জন্ম। এই গেল প্রশ্ন পয়লা নম্বর।

"দোসরা নম্বর কী—শুনুন একটু ধৈর্য ধ'রে। কারণ এটা আরও জরুরি হয়ত একদিক দিয়ে।

"আমার যতদূর মনে হয় আপনার সঙ্গে অনেক দিন ধ'রেই আমার একটা মতভেদ মতন আছে একটা বিষয়ে। আপনি মনে করেন—অন্তত আমার এই ধারণা—যে আমাদের গানের যারা রূপকার—performer—তারা সুরকারকে composerকে—এতটুকু লঙ্ঘন করলেও, গান থেকে চুনটি খসালেও, 'মহতী বিনষ্টিঃ'। আমার মনে হয় ওস্তাদি সঙ্গীতের দীর্ঘজীবিতার একটা প্রধান কারণ এই—যেকথা আপনি সেদিন জোড়াসাঁকোয় মেনেছিলেন—যে তাতে বড় শিল্পীর সৃজনী প্রতিভাকে খানিকটা ছাড়া দেওয়া হ'য়ে থাকে। আপনি বলেছিলেন যে যদিও অধিকাংশ ওস্তাদই তাদের প্রতিভার দৈন্যবশে এ স্বাধীনতার অপব্যবহার ক'রে থাকে, তবু এ-স্বাধীনতা দেওয়ার মূল মন্ত্রটি অসত্য নয়। কেন নয় সেটা একটু উদার দৃষ্টিতে দেখতে গেলেই দেখা যায় স্পষ্ট।

"সবদেশের চিন্তাশীল মানুষই স্বীকার করেন যে যে-শিল্পে যে-জীবনযাত্রায় ব্যতিক্রমের জন্যে কোনো প্রশ্রয়ই নেই সে-শিল্পে প্রতিভার খোরাক দুদিনে ক্ষীণ হ'য়ে আসেই আসে। সেদিন আপনি আরো বলেছিলেন, বড় স্বাধীনতা সবাইকার জন্যে নয়। একথা যে সত্য না মানবে কে ? কিন্তু তবু আমাদের বলতে হবে যে বড় স্বাধীনতার স্বাদ সবাই ঠিক মতন না পেলেও, বড় স্বাধীনতার সুপ্রয়োগ-বিধির মর্ম সবাই গ্রহণ করতে না পারলেও, সৃজনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকার যে সবাইয়ের আছে—সমাজে এ সত্যটি স্বীকৃত হওয়া চাই-ই চাই। ওস্তাদি গানে এই সত্যটি মূলত স্বীকৃত হয়েছিল ব'লে হাল আমলেও আবদুল করিম জোহরা বাই মোতি বাই সুরেন্দ্র মজুমদারের মতন সুর স্রষ্টার গান শোনার পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। দিন কয়েক আগে কাশীতে মোতি বাইয়ের অপূর্ব আশাবরী ও ভৈরোঁ শুনতে শুনতে একথা যেন আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। তাই আমি চাই যে অন্তত একশ্রেণীর বাংলা গান থাকবে যাতে সুরকার শিল্পীকে এ-স্বাধীনতা দেবেন—কেন না এ মূলনীতিটি সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে ওস্তাদি গানে এখনো রসিক হৃদয় রসিয়ে উঠত না। এই শক্তিকে আমি বলি সুরবিহার—improvisation ; ওদের দেশেও ওরা বলে এ-শক্তি তোমাদের মস্ত সম্পদ, এ হারিয়ো না যেমন আমরা হারিয়েছি। জানেন হয়ত—রোলাঁ লিখেছেনও আমাকে—যে ওদের দেশেও আগে সুরবিহারের ক্ষমতা ছিল—এমন কি সেদিনও বীটোভ্‌ন্ পিয়ানোয় তাঁর সুরবিহারে সঙ্গীতানুরাগীদেরকে গভীর ভাবে

বিচলিত করতেন। রোমাঁ রোলাঁ তাঁর জীবনীতে লিখেছেন যে অনেক সময়ই দেখা যেত যে বীটোভ্‌নের সুরবিহার যখন থাম্‌ল তখন ঘরে একটি শ্রোতার চোখও শুষ্ক নেই। একথা মানি যে এহেন শক্তি ওদের মধ্যে লাখে ন মিলয় এক। হার্মনির চাপে ওদের মধ্যে এধরণের মেলডিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে—আমার এ-অভিযোগের উত্তরে দশবারো বৎসর আগে রোলাঁ তাঁর একটি পত্রে একথা অকুণ্ঠে মেনে নিয়ে আমাকে লিখেছিলেন যে এর ক্ষতিপূরণ

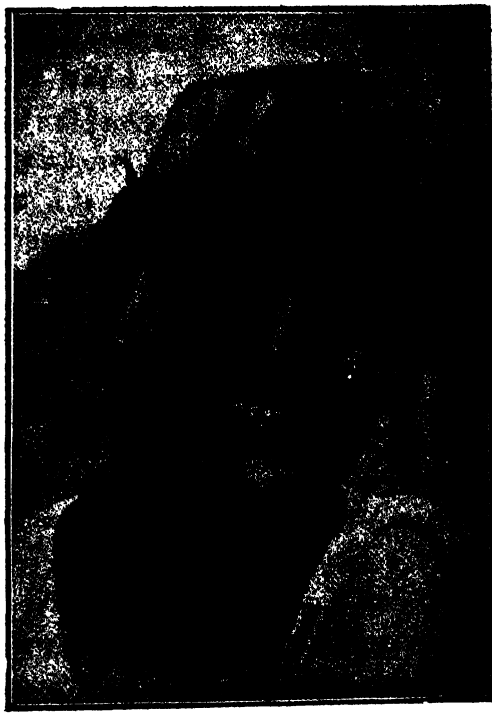


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলেছে যে হার্মনিতে। হয়ত হার্মনি এলে আমাদের সঙ্গীতেরও ঐ অবস্থা হ'ত। কিন্তু সে যাই হোক না কেন সব জড়িয়ে এ-সৃজনী প্রতিভা যে আদরণীয় সে বিষয়ে বোধহয় অভিজ্ঞ মহলে মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা নেই। তাই আমি চাই—ওদের ভাষায়—সুরকারের সুরকে ইণ্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা। বিলেতে, যেখানে হার্মনির দরুণ এত বাঁধাধরা, সেখানেও গুণীর এ স্বাধীনতা মঞ্জুর করেছে ওরা সবাই একবাক্যে ?"

কবি খুব মন দিয়ে শুনলেন পরে ধীরে ধীরে এক এক ক'রে বলতে লাগলেন :

"তোমার পয়লা নম্বর প্রশ্নের উত্তরে গোড়ায়ই আমি ব'লে রাখতে চাই যে হিন্দুস্থানি সঙ্গীত আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি—আজ ব'লে নয়, বাল্যকাল থেকেই। মনে করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরোনো হ'লেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে এ-ই তো হওয়া উচিত। যাঁরা সত্যিকার ভালো হিন্দু-



দিলীপকুমার রায়

স্থানি গান শুনেও বলেন : 'ও কী তা-না-না-না মেও মেও বাপু, ও ভালো লাগে না'—তাঁদেরকে আমি বলব : 'তোমাদের ভালো লাগে না এজন্যে তোমাদের সঙ্গে তর্ক করব না—কেন না রুচি নিয়ে তর্ক নিষ্ফল—কেবল বলব তোমরা একথা সগৌরবে বোলো না, লক্ষ্মীটি ! কারণ ভালো জিনিস ভালো না লাগাটা লজ্জারই বিষয়, গৌরবের নয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর হিন্দুস্থানি সঙ্গীত যখন সত্যিই সঙ্গীতের একটি মহৎ বিকাশ তখন সেটা যদি তোমাদের কারুর

ভালো না-ও লাগে তো সলজ্জেই বোলো—লাগল না, বোলো ও-রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করি নি বা করবার সময় পাই নি, নইলে লাগত নিশ্চয়ই।

"আমার ভালো লাগে। উৎকৃষ্ট হিন্দুস্থানি সঙ্গীত আমি ভালোবাসি, বলেছি বহুবারই। কেবল আমি বলি যে ভালো জিনিসকেও ভালোবাসতে হবে কিন্তু মোহমুক্ত হ'য়ে। সবরকমের মোহই সর্বনেশে। তাজমহল আমার ভালো লাগে ব'লেই যে তাজমহলের স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে প্রতি বসতবাটিতে গম্বুজ ওঠাতে হবে এ কথনই হ'তে পারে না। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত ভালো লাগে ব'লেই যে তার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করতে হবে এ একটা কথাই নয়। অজন্তার ছবি খুবই ভালো কে না মানবে? কিন্তু তাই ব'লে তার উপর দাগা বুলিয়ে আমাদের চিত্রলোকে মুক্তি খুঁজতে হবে বললে সেটা একটা হাসির কথা হয়। তবে প্রশ্ন ওঠে: অজন্তা থেকে তাজমহল থেকে হিন্দুস্থানি সঙ্গীত থেকে আমরা কী পাব? না, প্রেরণা—ইন্স্পিরেশন। সুন্দরের একটা মস্ত কাজ এই প্রেরণা দেওয়া। কিসের? না নবসৃষ্টির। তানসেন আকবর শা ম'রে ভূত হ'য়ে গেছেন কবে—কিন্তু আমরা আজও চলতে থাকব তাঁদের সুরের শ্রাদ্ধ ক'রে? কথনই না। তানসেনের সুর শিখব, কিন্তু কী জন্যে?—না, নিজের প্রাণে যাকে তুমি বলছ renaissance—নবজন্ম—তারই আবাহন করতে। আমিও এই কথাই ব'লে আসছি বরাবর যে নব সৃষ্টির যত দোষ যত ত্রুটিই থাকুক না কেন—মুক্তি কেবল ঐ কাঁটাপথেই—বাঁধা সড়ক গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে মোড়া হ'লেও সে পথ আমাদের পৌঁছিয়ে দেবে শেষটায় চোরা গলিতেই। আমরা প্রত্যেকেই মুক্তিপন্থী—আর কেবল নব সৃষ্টির পথেই মুক্তি, গতানুগতিকতার নিষ্কলঙ্ক সাধনার পথে নৈব নৈব চ।

"হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের জরার দশার কথা বলছিলে। হয়েছে কি, ও-সঙ্গীত হয়ে পড়েছে ক্লাসিক। ক্লাসিক মানে একটা সর্বাঙ্গসুন্দরতার, পার্ফেকশনের ফর্মে অচল প্রতিষ্ঠা। এ হেন পূর্ণতা পূর্ণ ব'লেই মরেছে। পূর্ণতায় সিদ্ধির সঙ্গে আসে স্থিতি। কিন্তু শিল্পের মুক্তি চাইতে পারে না স্থিতির অচলায়তন। তাই ইতিহাসে দেখবে অঘটন ঘটে যখন বেশি খুঁৎখুঁতেপনায় আমাদের ধরে এই ক্লাসিকিয়ানার সেকেলিয়ানার মোহে। গ্রীক রোমানরা ছিল সভ্য জাত এ তো নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু তবু ওদের মতন সভ্যজাতির স্থিতির প্রতিষেধক হ'য়ে এল কারা? না, বর্বররা। কিন্তু কেন এ অঘটন ঘটল ইতিহাসে? ওদের মতন সভ্য জাতের উপর অসভ্যরা কি একান্ত অকারণই চড়াও হয়েছিল? না। সভ্যতা যখন ঘুমিয়ে পড়তে চায় তখন ভূমিকম্পই আসে—অবসন্ন স্থৈর্যের চেয়ে ধ্বংসও ভালো, কুম্ভকর্ণের মোহতন্দ্রার চেয়ে ঝড়তুফানও ভালো। আত্মপ্রসন্ন নির্বিকার চিরস্থিতি নিয়ে করব কি? এই জন্যে দেখবে সব দেশেই ক্লাসিকিয়ানার বিরুদ্ধে একদল প্রাণবন্ত মানুষ করে বিদ্রোহ। কেন করে? তারা ক্লাসিককে ভালোবাসে না ব'লে? না। ভালোবাসে ব'লেই করে। বিদ্রোহ ক'রেই তারা শত্রুকে আপন ক'রে নেয়—তার পাষাণ প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার ক'রে। বলে না রাবণ ছিল রামের মহাভক্ত—কেবল সে চাইত রামকে শত্রুভাবে পূজা করতে?

"হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের বিরুদ্ধে আজ এই যে বিদ্রোহের চিহ্ন দিকে দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাকে তাই অকল্যাণজনক মনে করা সঙ্গত নয়। হিন্দুস্থানি বীণাপাণি আজ শবাসনা—তাঁর এ-আসনকে চাই টলানো। নইলে কমলাসনারও হবে ঐ নির্জীবন আসনেরই দশা—সে মরবে। বাংলা গানে দেখ হিন্দুস্থানি সুরই তো পনের আনা। কাজেই কেমন ক'রে মান্‌ব যে বাংলা গানের সঙ্গে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের দাকুমড়ো সম্বন্ধ? বাংলা গানে হিন্দুস্থানি সুরের শাশ্বত দীপ্তিই যে নবজন্ম পেয়েছে এ-কথা ভুললে তো চলবে না। আমরা যে বিদ্রোহ করেছি সে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, তার আনন্দদানের বিরুদ্ধে না—কেননা আমাদের গানেও তো আমরা হিন্দুস্থানি গানের রাগরাগিণীর প্রেরণাকেই মেনে নিয়েছি। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতকে আমরা চেয়েছি, কিন্তু আপনার ক'রে পেলে তবেই না পাওয়া হয়। হিন্দুস্থানি সুরবিহার প্রভৃতি শুনে আমি খুসি হই, কিন্তু বলি: বেশ—খুব ভালো, কিন্তু ওকে নিয়ে আমি করব কী? আমি চাই তাকে যে আমার সঙ্গে কথা কইবে। প্রাকৃত ও সাধু বাংলার দৃষ্টান্ত নিলে এ-কথাটা পরিষ্কার হবে।

"বিদ্যাসাগরী 'রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্যনির্বিশেষে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন' এ হ'ল অতি ব্যাকরণসম্মত অনবদ্য ভাষা। কিন্তু তবু

বঙ্কিম একে গ্রহণ করেন নি। তাঁকে গাল খেতে হ'ল তাঁর নব ভাষার জন্যে—কিন্তু তবু বঙ্কিমই হলেন ভাষার ধ্বজাবাহী—বিদ্যাসাগর নন।

"আমরাও এই পথেই চলেছি—অর্থাৎ নব সৃষ্টির পথে। বৈয়াকরণিকরা কখনো বা হাসলেন কখনো বা গুরুগম্ভীর স্বরে তর্জন করলেন 'তিষ্ঠ—গুরুচণ্ডালী দোষে ভাষার যে ঘটল ভরাডুবি'। কিন্তু একথা বোধ করি আজ আর বড় কেউ অস্বীকার করেন না যে আমাদের হাতে প্রাকৃত বাংলার অনধিকার প্রবেশে ভাষার ঘটে নি অপঘাত। দু-একজন সেকেলি পণ্ডিত পেডাণ্ট ছাড়া সবাই মানবে যে প্রাকৃত বাংলার সহযোগে বাংলা ভাষার প্রকাশশক্তি বেড়েছে অজস্র রঙে ঢঙে ব্যঞ্জনায়। আর এ সম্ভব হয়েছে জেনো এই গুরুচণ্ডালী দোষের প্রসাদেই। তারই কল্যাণে আজকের বাংলায় সংস্কৃত জীমূতমন্দ্রের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলার কেয়ূর কঙ্কণ মিশে গেল—পর হ'ল আপন, মান্যগণ্য হ'ল প্রিয় পরিজন।

"হিন্দুস্থানি সুরে তাই মিশেল আনতে আমাদের বাধবে কেন? আমি মানি রাগরাগিণীর একটা নিজস্ব মহিমা আছে। এ-ও মানি যে রাগরাগিণীর পরিচয় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঐ যে বললাম তা থেকে প্রেরণা পেতে, তাকে নকল করতে নয়। হিন্দুস্থানি সঙ্গীত কেমন জানো?—যেন শিব। রাগরাগিণীর তপস্যা হ'ল শৈব বিশুদ্ধির তপস্যা। কিন্তু তাইতেই সে মরল। এল উমা—সঙ্গে এল ঐ ফুলের তীরন্দাজ ঠাকুরটি যার নাম ইংরাজিতে 'প্যাশন্'। আমি বলি যুগে-যুগে ক্লাসিসিজ্‌মের শৈব তপস্যা ভাঙতে হবে এই প্যাশনে—স্থাণুকে করতে হবে বিচলিত। নিষ্ক্রিয় নির্বিচলতার মধ্যেও এক রকমের মহিমা আছে মানি—সে মহান্। কিন্তু সৃষ্টির গতি থাকলে তবেই এ স্থিতির নিষ্ক্রিয়তার বৃত্ত হয় পূর্ণ। প্রকৃতি বিনা পুরুষকে চাইলে পরিণাম নির্বাণ—কৈবল্য। সে পথে অন্তত শিল্পের মুক্তি নেই। সাগরপারের ঢেউও আমাদের গানে জাগাক এই প্যাশন—সংরাগ। তাতে ভুল চুক হবে—হোক না—নির্ভুলতম ঘুমের চেয়েও ভুলে-ভরা জাগার দাম ঢের বেশি নয় কি?

"শেষ কথা সুরবিহারের সম্বন্ধে। ইংরেজি ইম্প্রভাইজেশন কথাটির তুমি বাংলা করেছ সুরবিহার—বেশ তর্জমা হয়েছে। এ-ও আমি ভালোবাসি। এতে যে গুণী ছাড়া পায় তা-ও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এ-রকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। আমার আপত্তি এখানে মূল নীতি নিয়ে নয়, তার প্রয়োগ নিয়ে।

"কতখানি ছাড়া দেব? আর কাকে? বড় প্রতিভা যে বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারে এ-কথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ছোট বড়র মধ্যে তফাৎ আছেই যে-কথা সেদিন বলছিলাম।

"আর একটা কথা। গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? ঠেকাব কী ক'রে? তাই আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলি নে যে আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হ'তে হবে। তা যে হ'তেই পারে না। কারণ গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই। তাই এক্সপ্রেশনের ভেদ থাকবেই—যাকে তুমি বলছ ইণ্টার-প্রেটেশনের স্বাধীনতা। বলছিলে বিলেতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর। মঞ্জুর হ'তে বাধ্য। সাহানার মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতাম—বলতে হ'ত—'আমার গান সাহানা গাইছে।' তোমার ঢঙের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তোমার একটা নিজস্ব ঢঙ গ'ড়ে উঠেছে, এটা তো খুবই বাঞ্ছনীয়। তাই তোমার স্বকীয় ঢঙে তুমি 'হে ক্ষণিকের অতিথি' গাইলে যে-ভাবে, আমার সুরের গঠনভঙ্গি রেখে এক্সপ্রেশনের যে-স্বাধীনতা তুমি নিলে তাতে আমি সত্যিই খুসি হয়েছি। এ গান তুমি গ্রামোফোনে দিতে চাইছ, দিও—আমার আপত্তি নেই। কারণ এতে আমার সুররূপের কাঠামোটি structureটি জখম হয় নি। তোমার এ-কথা আমিও স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনে কমবেশি স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশির মধ্যে তফাৎ আছে এ-কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে-স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।"

*　　*　　*　　*

কবির বলা কথাগুলি লিখলাম দ্বিপ্রহরে, ও বিকেলে তাঁকে প'ড়ে শোনালাম। কবি খুসি হয়ে বললেন: "কথাগুলি আমারই এ-কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, লেখাও খুবই ভালো হয়েছে। তুমি ছাপতে পারো।"

নব নায়িকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সনৎ সেনের কি একখানা নূতন উপন্যাস ছাপিয়া বাহির হইলে চারিদিকে এমন হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—মোহনবাগান শীল্ড পাইলে তেমন ঘটে নাই! ছোট ছোট সাপ্তাহিক এবং সন্ত-গজানো ক'খানা মাসিক কাগজে নিত্য সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। কেহ লিখিল,—এত দিনে বাঙলা সাহিত্যে সত্যকার উপন্যাস দেখা দিয়াছে! দু'চারিটা নূতন ফিল্ম-কোম্পানি সনৎ সেনের দ্বারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া রহিল,—বাঙলা-হিন্দী-পুস্ত···প্রভৃতি সব-ক'টা ভার্শন ছবির জন্য দশ পার্শেণ্ট কমিশনের লোভ দেখাইয়া যে কাণ্ড সুরু করিল···

ভরত নাট্যমঞ্চে আমি অভিনয় করি এবং সেখানকার আমি নাট্য-প্রযোজক। কোম্পানি আমাকে বলিল,—সনৎ সেনের কাছ থেকে প্লে-রাইটটুকু কিনে নিন্···বইখানা চারদিকে যে-আগুন লাগিয়েছে, ও-আগুন নেববার আগে সারদা সান্যালকে দিয়ে ড্রামাটাইজ্ করিয়ে বোর্ডে চড়ালে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড করতে পারবো'খ'ন।

সনৎ সেনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। থিয়েটার-লাইনে ঢুকিবার পূর্ব্বে যখন এ্যামেচারি করিয়া বেড়াইতাম, তখন রাজেনদার বৈঠকখানার ঘরে আলাপ-পরিচয়। সনৎ তখন বাঙলা সাপ্তাহিকে থিয়েটারের সমালোচনা লিখিয়া বেড়াইত।

সনৎ সেনের কাছে যাইবার পূর্ব্বে বইখানার সমালোচনা পড়িয়া লইলাম। কোনো সমালোচনায় মিল নাই। কেহ লিখিয়াছে—এমন human touch আর-কোনো বাঙলা উপন্যাসে দেখা যায় না! কেহ লিখিয়াছে—চরিত্রগুলি একেবারে বাস্তব-জীবনের গা ফুঁড়িয়া জন্ম লইয়াছে; কেহ লিখিয়াছে,—রিয়ালিষ্টিক যুগে এমন আইডিয়ালিষ্ট চরিত্র গড়িয়া তোলায় যে অকুতোভয়তা, যে-সাহস··· ইত্যাদি!

বইখানা আমি পড়ি নাই। যে-বই বাহির হইবামাত্র সমালোচকদের মাথায়-মাথায় ডিগ্‌বাজী খাইয়া বেড়ায়, সে বই পড়িতে ভয় হয়! সোডার বোতল খুলিবামাত্র টগ্‌বগানি ফোটে,—সে টগ্‌বগানি-ফোঁশ্‌ফোঁশানি থামিলে তবে সোডা খাওয়া চলে! সমালোচনার টগ্‌বগানি কাটাইয়া বই বাঁচিয়া থাকে, আমি সেই বই পড়ি। এবং এ-বিধি মানিয়া কোনোদিন পস্তাই নাই!

সনৎ সেনের এ-উপন্যাস সম্বন্ধে সে-বিধি মানা চলিল না। মনিবের হুকুম,—ড্রামাটাইজ্ করাইতে হইবে, এবং সে কাজের জন্য মাস-মাহিনা দিয়া যখন নাট্যকার সারদা সান্যাল থিয়েটারে বাঁধা আছে—এবং আমাকে দিতে হইবে সিচুয়েশনের আইডিয়া, তখন এ-বই পড়িতে হইল।

পড়ার পর একদিন সনৎ সেনের গৃহে গেলাম। সে থাকে হ্যারিশন রোডে ব্লু-বিল্ডিংসে তিন-তলার কামরায়।

দেখা হইল। সনতের কামরায় ছিলেন একজন তরুণী এবং দুজন তরুণ। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিলাম। তরুণীটি এযুগের পপুলার impressionaire শ্রীমতী মৃগাঙ্কী দেবী এবং তরুণ দুটি তাঁর বন্ধু···ক্যালকাটা গে-লোফার্শ দলের পাণ্ডা। তাঁরা আসিয়াছেন সনৎ সেনের কাছে—! তাকে দিয়া ছোট একটি প্লে-লেট্ লিখাইয়া এম্পায়ারের বোর্ডে ষ্টেজ করাইবে—এই উদ্দেশ্য লইয়া।

আমার পরিচয় পাইয়া মৃগাঙ্কী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—ঐ সব চরিত্রহীনা মেয়েদের সঙ্গে আপনারা কি বলে' অভিনয় করেন, তাই ভাবি।···অথচ শুনতে পাই, আপনি বেশ ভালো অভিনয় করেন!

সনৎ কহিল—গদাইয়ের প্লে আপনি দেখেন নি?

মৃগাঙ্কী দেবী কহিলেন,—না। মানে, পাব্লিক ষ্টেজে যেতে পারি না তো! তার কারণ, ঐ-এ্যাসোসিয়েশন···

ঘৃণায়-তাচ্ছিল্যে মৃগাঙ্কী দেবীর মুখের যে ভাব দেখিলাম, ···আমি কোনো জবাব দিলাম না।

সনৎ কহিল—আপনারা যদি ব্যবসা-হিসাবে অভিনয়

করতে নামেন, তাহলে ষ্টেজ এই undesirable association থেকে মুক্তি পেতে পারে!

মৃগাক্ষী দেবী কহিলেন—আর্টকে শ্রদ্ধা করি। সে আর্টকে অবলম্বন করে' পয়সার দাস্য···তাতে আর্টের অপমান হয় সনৎবাবু···অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।··· আপনিই বলুন, যদি আপনি পয়সার মুখ চেয়ে লিখতেন, তাহলে কি এমন গল্প-উপন্যাস লিখতে পারতেন! তাহলে আপনি লিখতেন,—"পাঁচ খুন", "মিশিবাবা", "নগ্ন সত্য" এই-রকম সব বই!

সনৎ কহিল,—আপনারা এম্পায়ারে প্লে করবেন বলচেন···সে-প্লেতে গদাইকে নামান্—এ যুগে গদাইয়ের মতো character-player আর পাবেন না। This is my honest opinion.

মৃগাক্ষী দেবী কহিলেন—কিন্তু উনি যে পাব্লিক ষ্টেজের লোক। মানে ··

মৃগাক্ষী দেবীর মুখে আবার সেই ভাব···

এ ইঙ্গিত সহিতে পারিলাম না, কহিলাম,—পাব্লিক ষ্টেজের অভিনেত্রীদের মধ্যে এমন মেয়ে আছে দেখি, অনেক সোসাইটি-লেডির চেয়েও যারা অভিনয়ের আর্টকে ভালোবাসে। ষ্টেজ-সম্বন্ধে আপনার মনে যত খারাপ ধারণাই থাকুক, সেজন্য আমি কোনোদিন লজ্জা বা হীনতা বোধ করি নি!···

তাঁরা চলিয়া গেলে সনৎকে জানাইলাম মনিবের অভিপ্রায় এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য।

সনৎ কহিল—কে ড্রামাটাইজ করবে?

আমি বলিলাম,—সারদা সান্যাল।

সনৎ কহিল—মাপ করো ভাই! যেমন তাঁর মোটা দেহ, তেমনি মোটা রসজ্ঞান।...তাঁর ড্রামাটাইজ-করা বই দেখতে তোমাদের থিয়েটারে বাদুড় ঝোলে, মানি—কিন্তু আমি চাই, নাটক দেখতে যাবে মানুষ। বাদুড়-জাতের দর্শকের মন ভোলানোর নেশা তোমরা ত্যাগ করো—নাট্যলক্ষ্মী প্রাণ পেয়ে বাঁচবেন! তাঁর নাটকগুলো যেন মিউনিসিপাল-মার্কেট···আলু-পটল থেকে মাছ-মাংস পর্য্যন্ত তাতে মেলে—মেলে না শুধু নাটক!

আমি কহিলাম,—কিন্তু জানো তো, অত বড় সবজজ ব্যারিষ্টার...তাঁরাও থিয়েটার দেখে ওঁর লেখার কি সুখ্যাতি করেছেন!

সনৎ কহিল,—জজ-ব্যারিষ্টাররা আইন কানুন-সম্বন্ধে যা বলবেন, মানতে রাজী আছি,—তা বলে' নাটক সম্বন্ধে তাঁদের রায় মানতে হবে,··ছি! তা যদি শিরোধার্য্য করতে হয়, তাহলে তোমাদের সাহিত্য-সম্মিলনে এবার সভাপতি করো কাটলারির মালিক পঞ্চানন কর্ম্মকারকে এবং নাটক লেখাও গিয়ে ঐ ওষুধওয়ালা বিশ্বম্ভর লাহাকে দিয়ে।···

এ সব আলোচনায় পাশ কাটাইয়া প্লে-রাইটের ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কথা রহিল, সনৎ সেন নিজেই তার উপন্যাস ড্রামাটাইজ করিবে; এবং আমি তাকে বাৎলাইয়া দিব, কোথায় কি-রকম থিয়েটারী-প্যাচ দিতে হইবে!

উপন্যাসের প্লটে,—যাকে বলে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত প্রচুর—আছে! নায়ক নায়িকা পাঁচ-ছ'জন। বাছিয়া উহারি মধ্যে কাহাকে সবার বড় করিয়া তুলিবে নির্ণয় করা শক্ত। সব কটি চরিত্রই নিজেকে লইয়া মত্ত। ভালোবাসে সকলে এবং সকলকে! সে ভালোবাসায় প্রচণ্ড বেগ—এবং তার স্রোত বহিয়া চলে সকল দিকে। সে স্রোতে তলাইয়া যায় বীণা রায়; সে স্রোতে বুক ভাঙিয়া যায় মেখলা দত্তর; সে স্রোতে শিবানী ফণিনীর মতো ফোঁশ করিয়া ওঠে; আবার বিধবা তরুণী কান্তি দেবী বরফের মতো জমাট বাঁধিয়া যায়! ভালোবাসা কখনো হয় আইডিয়ালিষ্টিক,—কখনো রীতিমত sexual! তবে সব চরিত্র জীবন্ত! ভাবিলাম, এমন জটিল কল্পনা, জটিলতর মনস্তত্ত্ব, এবং জটিলতম চরিত্র—বাঙলা ষ্টেজের দর্শক এ-জিনিস পাইয়া গুম্ হইয়া যাইবে! বই যত বুঝিতে পারিবে না, ততই তাহা দেখিতে ভিড় জমিবে।

নাটকে ছিল গণিকা ডালিমের চরিত্র। ডালিম যা করে, অদ্ভুত! কখনো বনিয়া ওঠে প্রচণ্ড সতী, আবার কখনো দেখি রীতিমত vulgar সে ব্যাধি!

কথায় কথায় সনৎকে বলিলাম—এই যে গণিকা ডালিমের চরিত্র এঁকেছো, সত্যকার গণিকা সম্বন্ধে কোনো কথা জানো? মানে, আসলে তারা কি-বস্তু···

মৃদু হাস্যে সনৎ বলিল—না। তবে ওদের সম্বন্ধে আমার যা মনে হয়,…

কহিলাম—আচ্ছা, এবারে যখন নাটকের পথে পা দেছ, তখন একবার জীবন্ত লোকের একটু পরিচয় নাও। তাহলে কি হবে জানো, তোমার এ আইডিয়ালিষ্টিকের সঙ্গে রিয়ালিষ্টিকের একটা যোগ থাকবে, তাতে নাটক আরো বেশী জোরালো হবে!

সনৎ কহিল—তাহলে তোমার বিশ্বাস, এ বই থিয়েটারে জমবে না?

কহিলাম—তা নয়। হয়তো ভয়ঙ্কর জমবে…মানে, আমাদের দেশের অডিয়েন্স জানে, এ-সব স্ত্রীলোক মানুষকে শুধু শোষে,—শোষণ ছাড়া এরা আর কিছু জানে না। হাবে ভাবে ভালোবাসার অভিনয় করে—সে ভালোবাসার অভিনয় শোষণের মন্ত্র! তারা তোমার নাটকে দেখবে, তোমার এই গণিকা ডালিম ভালোবাসার কথা মানুষ বলতে গেলে তাকে ধমক দেয়! অথচ ডালিমের বাড়ীতে গিয়ে লোক মুঠোমুঠো টাকা দিয়ে আসে…মানে কি জানো—দর্শকের মধ্যে বেশী লোকই যা নয়, যা হতে পারেনা, যদি তাই হতে দেখে, ষ্টেজের নাটকে, তাহলে ভীষণ মেতে ওঠে।…

ষ্টেজে সনতের সে নাটক খুব জমিয়া উঠিল। অভিনয় আরম্ভ হইবার দু'ঘণ্টা আগে টিকিট-ঘরের সামনে House Full লেখা তক্তা লটকাইয়া দেওয়া হয়। ন'আনার টিকিট থিয়েটারের সামনে আঠারো আনায়, আঠারো আনার টিকিট দেড়টাকায় বিক্রয় হয়। ভিড় তবু কমিতে চায় না!

মাসখানেক পরে সনৎকে কহিলাম—আর একখানা বই লেখো…উপন্যাস ভেঙে নাটক নয়, একদম নাটক লেখো। …নামের সঙ্গে নাটকে পয়সা মেলে অনেক বেশী…

হাসিয়া সনৎ কহিল—সে কথা সত্যি। তবে…তুমি যে সেই বলেছিলে…

আমি কহিলাম,—মনে পড়েছে। পতিতার সতীত্ব—এই theme নিয়ে লেখো·· স্ত্রীর নিষ্ঠা নিয়ে এত নাটক দেখছি…ও-ব্যাপার মামুলি হয়ে গেছে। এখন…মানে…

সনৎ কহিল—Life থেকে সে চরিত্র আঁকবো·· তুমি ব্যবস্থা করবে বলেছিলে…

কহিলাম—সে ব্যবস্থা অচিরে করচি!…

সনৎ কহিল—যে নাটক লিখবো কল্পনা করেচি, তার হিরোইন হবে একজন পতিতা নারী…রূপসী, বয়সে তরুণ… অসাধারণ বুদ্ধিশালিনী·· মেজাজ যেমন একটুতে চটে, তেমনি আবার খুসী হয় ··অর্থাৎ আশ্চর্য্য রকম হবে তার চরিত্র, magnanimous…নাচে-গানে অসাধারণ পটুতা… গলা যেমন মিষ্টি, তেমনি তার দেহের ভঙ্গিতে নাচের ছন্দ ঝরে পড়ে! মনে কপটতা নেই, হিংসা নেই, অহঙ্কার নেই, লোভ নেই…উদার, দরদে মন ভরে আছে, ভালোবাসার জন্য সমস্ত পৃথিবীটাকে ত্যাগ করতে পারে…খুব পড়াশুনা করেছে—কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের আলোচনায় তার সঙ্গে পারা দায়…

চুপ করিয়া সনতের কথা শুনিলাম। পরে কহিলাম,—তোমার সঙ্গে নর্ম্মদার পরিচয় করিয়ে দেবো। খুব accomplished…বোম্বাই ঘুরে এসেছে…এ্যারিষ্টোক্রাট-সমাজে তার খুব খাতির। যেমন গান গায়, তেমনি নাচে! আনা পাবলোভা এঁর সঙ্গে দেখা করে এদেশী নাচের দু' একটা ভঙ্গি শিখে নিয়েছিলেন। তার নাম শুনেচো নিশ্চয়… নর্ম্মদা দেবী…

সনৎ কহিল—দেবী!

আমি কহিলাম—হ্যাঁ। ফিল্ম কোম্পানিতে ঢোকা-ইস্তক দেবী হয়েছে! 'দেবী'তে এদের দাবী হয় ফিল্মে নামার সঙ্গে। শুধু আমাদের এই ষ্টেজে শ্রীমতীরা দাসী রয়ে গেল—দেবী হতে পারলো না—ষ্টেজে না কি এ্যাসোশিয়েসনটা লো—তাই। তা ও-কথা যাক্,—তখন এই নর্ম্মদার পেট্রন ছিল এক মস্ত ধনী…সিল্ক-মার্চ্চেণ্ট ফিরোজ শা।

সনৎ কহিল—তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে?

কহিলাম,—আছে। একটু খাতির করে। বাঙলা ষ্টেজে যাহোক একটু নাম করেছি তো…ইংরেজের কাগজে একবার আমার ছবি বেরিয়েছিল, তার ফলে পাংক্তেয় হতে বাধা ঘটে নি…নর্ম্মদা এখানে আছে…ভাবছিলুম থিয়েটারে নামাবো…বরাবরের জন্য না হয়, মাসখানেক কি দু' মাস …তাতে পাব্লিসিটি পাবে…তারো ইচ্ছা হয়েছে। সেই সূত্রে আমার খাতির একটু বেড়েছে।

সনৎ কহিল—ও!

কহিলাম—জানো বোধ হয় নর্ম্মদার জন্ম ভদ্র-বংশে... এবং বেশ সম্ভ্রান্ত বংশে!

সনৎ কহিল—বটে!

আমি কহিলাম—তাই। ওর হৃদয়ের আবেগ বড় বেশী, তার উপর নাচে-গানে প্রতিভার বিকাশ-সাধনে ওর আগ্রহের সীমা ছিল না। কাজেই বেচারা স্বামীটিকে আশ্রয় করে ছোট্টসংসারে আবদ্ধ থাকতে পারলো না—তাই বেছে নিল বিশ্ব-নিখিল দু'কাঠার পরিবর্ত্তে!...

সনৎ কহিল—বুঝেচি, গ্রামোফোনে যে নর্ম্মদা দেবীর রেকর্ড আছে তাঁর কথা বলচো।

কহিলাম—সেই নর্ম্মদাই!...বেঙ্গলি-মেল্‌বা-নামে তার পরিচয় রেকর্ডের বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যে! ..

বেঙ্গলি মেল্‌বার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলাম। একদিন সন্ধ্যায় ব্রাইট-ভিউ রেস্তোঁরার বারান্দায় চায়ের আসর। সেই আসরে টেবিল ঘিরিয়া আমরা তিনজন... নর্ম্মদা, সনৎ ও আমি।

সনতের পরিচয় দিলাম।

নর্ম্মদার দুই চোখে বিস্ময়ের বিদ্যুদ্দীপ্তি! উচ্ছ্বসিত স্বরে নর্ম্মদা কহিল,—আপনি বই লেখেন!...উপন্যাস! নাটক! বাঃ!.. দেখুন, এই বাইশ বৎসর বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো,.. কিন্তু কোনো লেখককে আজ পর্য্যন্ত সজীব দেহে পাশে দেখিনি!...Luck!

সনৎ কথা কহিল। সাহিত্যের কথা, আর্টের কথা! কিন্তু নর্ম্মদা সে-সব কথার ধার ধারে না। জগতে সে জানে একটি বিষয়—নিজের স্তুতি-বাদ!...

সনৎ যত কথা বলে, উত্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া নর্ম্মদা সেই একই কথার কূলে নিজের উচ্ছ্বাসের তরী আনিয়া ভিড়ায়!

সনৎ মুগ্ধ চিত্তে তার কথা শুনিতে লাগিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল...সে আলোর পাশে বিজলী-বাতির আলো মনে হইতেছিল, যেন পরিহাস!

উচ্ছ্বসিত স্বরে নর্ম্মদা কহিল—চাঁদ উঠেছে! বাঃ!... আচ্ছা সনৎবাবু, আপনারা কবি, বলুন তো, লেখায় চাঁদকে নিয়ে যতখানি বাড়াবাড়ি করেন, মনে-মনে চাঁদকে ঠিক ততখানি শ্রদ্ধা করেন—সত্যি?

মৃদু হাস্যে সনৎ কহিল—চাঁদের আলোয় মনে অনেকখানি অদল-বদল হয় বৈ কি!

নর্ম্মদা কহিল—আমার হয়, তা স্বীকার করবো! যখন বিজলী থিয়েটারে 'শকুন্তলা' প্লে হয়, আমি সেজেছিলুম 'শকুন্তলা'। তার একটা সীনে...মানে, যে-সীনে রাজার বিরহে শকুন্তলা কাতর—আমি বলেছিলুম, সে সীনে আমার চাঁদ চাই...চাঁদের আলোর effect না পেলে প্লেতে তন্ময়তা আনতে পারবো না।

নর্ম্মদা আবার নিজের কাহিনী সুরু করিল—কবে কোন্ নাট্যকারকে দিয়া তার জন্য লেখা ডায়ালগ আগাগোড়া নূতন করিয়া লিখাইয়াছিল—বিপক্ষদের ভাড়া-করা সমালোচক নর্ম্মদার একটা অভিনয়ের মিথ্যা নিন্দা কাগজে ছাপাইয়াছিল বলিয়া নর্ম্মদা তাকে থিয়েটারের গ্রীণরুমে ডাকাইয়া আনিয়া তার গালে চড় বসাইয়া স্পর্দ্ধার সাজা দিয়াছিল! প্রণয়-নিবেদনের সঙ্গে পত্রের মধ্যে হীরার ব্রুচ কবে কোন্ ভদ্রলোক তাকে পাঠাইয়াছিল, ঘৃণা ভরে সে চিঠি ও ব্রুচ সে ফেরত পাঠাইয়াছিল...জীবন-নাটকের নানা অঙ্কের টুকিটাকি কাহিনী বলিতেছিল...

আমি মন দিয়া তার কথা শুনিতেছিলাম। তার এই টুকিটাকি কাহিনী শুনিলে বুঝা যায়, সেরা অভিনেত্রী হইলেও আসলে সে নারী...

সে রাত্রে নর্ম্মদা বিদায় লইলে আমরা গৃহে ফিরিলাম। পথে সনৎকে বলিলাম—কি হে, আলাপ করে কিছু পেলে? মানে, নতুন নাটকে জীবন্ত চরিত্র-সৃষ্টির উপাদান?

সনৎ কহিল—চমৎকার! ঠিক এমনি একটি চরিত্র আমি এঁকেচি আমার নাটকে! নর্ম্মদা দেবী ভাববেন, বুঝি তাঁর কথা লিখেছি,—কিন্তু এঁর সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগে আমি এ চরিত্র লিখেছি...

সবিস্ময়ে আমি চাহিয়া রহিলাম সনতের পানে।

সনৎ কহিল—আর্টের স্বপ্নে বিভোর! পয়সাকড়ির বিষয়ে নির্লিপ্ততা! আমার নায়িকার মনও এমনি উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা। দুনিয়ায় যারা ছোট্ট স্বার্থ-বিলাসী, vulgar,

তারা এসে পদে পদে বাধা তুলে দাঁড়ায়, আমার নায়িকা দু'পায়ে তাদের মাড়িয়ে চলে যাচ্ছেন—রাজেন্দ্রাণীর মতো! তা' হ'লেই দেখচো, আমাদের কল্পনার সঙ্গে বাস্তব কি আশ্চর্য্যভাবে মিলে যায়।

আমি তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিলাম না। মানুষকে আমরা যে চোখে দেখি, কবি সনৎ সে-চোখে দেখে না। কাজেই আমরা যেখানে দেখি, তুচ্ছ মানুষ—ওরা সেখানে দেখে, দেবতা কিম্বা অপ্সরী!

তিন মাস পরে সনতের নূতন নাটকের অভিনয় হইল। সনৎ আমাকে বলিয়াছিল, নর্ম্মদা দেবীকে নিমন্ত্রণ করে কার্ড পাঠিয়ো···

কার্ড পাঠাইয়াছিলাম, বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, নর্ম্মদা দেবী এখানে নাই, লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন···

আরো দু'মাস পরে কলিকাতা সহরের আষ্টে-পৃষ্ঠে রঙীন প্লাকার্ড পড়িল—

ভারতের বহু সুধী-তীর্থে বিজয়াভিযান-সমাপনান্তে কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে বিজয়িনী নৃত্য-রঙ্গিণী নর্ম্মদা দেবীর প্রাচ্য নৃত্য

সেই সঙ্গে ভারতের নৃত্য-ললনাদের বিচিত্র নৃত্য-লীলা এম্পায়ারে তারিখ দেখুন।

সনতের নাটক তখনো পুরা দমে ষ্টেজে রাজত্ব করিতেছে···

সনৎ কহিল—নর্ম্মদা দেবী আসচেন···পথে-ঘাটে প্লাকার্ড দেখলুম—

আমি কহিলাম—আমিও দেখেছি।···

সনৎ কহিল—তিনি এলে তাঁকে একখানা কার্ড পাঠিয়ো···থিয়েটারে আমার এ বইখানা দেখবার জন্য···

জবাব দিলাম—পাঠাবো।···

আট-দশ দিন পরের কথা। সন্ধ্যার আগে থিয়েটারে বসিয়া আছি, টেলিফোনে আমার ডাক পড়িল। রিসিভার ধরিয়া কহিলাম—হ্যালো···

জবাবে শুনিলাম,—গদাইবাবু?

প্রশ্ন করিলাম—হ্যাঁ।···আপনি কে?

—আমি নর্ম্মদা···গ্রীন্ বারে আছি···তেতালায়। রুম নাম্বার সিক্স। কাল একবার আসুন না···সকালের দিকে···

কহিলাম—যাবো।

গেলাম। গিয়া দেখি, নর্ম্মদার নূতন বেশ। পরণে আশমানি-রঙের সাটিনের ঢিলা-পায়জামা, গায়ে সিল্কের চুড়িদার ঢিলা পাঞ্জাবি, গলায় মুক্তার মালা, হাতে হীরার ব্রেশলেট, পায়ে সোনালি-চামড়ার চটি···

ভারত-বিজয়ের বহু কাহিনী বলিল। ওদিকে দিল্লী, লাহোর, আম্বালা, গোয়ালিয়র, জয়পুর; এদিকে পুনা, বোম্বাই, গুজরাট···যেখানে গিয়া নাচিয়াছে—থিয়েটার-বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়াছে···বাঙলা-হিন্দী-উর্দ্দু গান গাহিয়াছে—বাঙলা গানকে ভয়ঙ্কর পপুলার করিয়া আসিয়াছে।

নর্ম্মদা ডাকিল—রহিমা··

পাশের ঘর হইতে এক মুসলমান দাসী আসিল। হিন্দী ভাষায় নর্ম্মদা তাকে প্রশ্ন করিল—গোয়ালিয়রের সেই লোকটির নামটা কি রে?

রহিমা কহিল—কে?

নর্ম্মদা কহিল, আঃ, সেই যে...মাথায় হীরে আর মুক্তার মালা জড়ানো মস্ত পাগড়ী··কানে হীরের কাণবালা···সেই যে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল···নামটা মনে পড়চে না···

রহিমা কহিল—ও, তার নাম অর্চ্চনা সিং···

নর্ম্মদা কহিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অর্চ্চনা সিং···বুড়ো। বয়স হয়েছে। আমার নাচ দেখে মশগুল, গান শুনে পাগল!···ষ্টেজে আমাকে উপহার দিলে, একছড়া জড়োয়া নেকলেশ···তারপর দেখা করতে এলো···প্রকাণ্ড উল্‌শ্‌লী-গাড়ী ছেড়ে দিল আমাকে ব্যবহার করতে। শেষে বলে, বিয়ে করবো! আমি বললুম—পাগল!···মিনতি, অনুরোধ···পায়ে ধরে···লজ্জায় আমি মরি! যখন রাজী হলুম না, তখন বলে কি না, দাও আমার নেকলেশ ফিরিয়ে,···ও-ছড়া আমার দিদিমার গলার নেকলেশ···বহুৎ দাম!

রহিমা বলিল—দিলেই পারতে, কখনো তো সে নেকলেশ তুমি পরলে না···

—ফিরিয়ে দেবো! বলিস কি রহিমা! কেন?··· তাকে যে ঘরে বসিয়ে তার সঙ্গে কথা কয়েছি···তার বুঝি দাম নেই?···হুঁঃ!···(পরে আমার পানে ফিরিয়া) শুনুন তো রহিমার কথা···

আমি হাসিলাম। কহিলাম,—কিন্তু···এ তো paying homage to Art···অর্ঘ্য! পূজার পুষ্প-অর্ঘ্য···আমরা দেবতাকে পূজা করি দেবতার পায়ে ফুল দিয়ে—সে ফুল ফিরিয়ে নিয়ে তুলে রাখি সসম্মানে···বেচারা অর্চ্চনা সিং সে নেকলেশ ফিরে চেয়েছিল সেটিকে শিরোধার্য্য করে রাখবে বলে'··এক্ষেত্রে দেবতা জীবন্ত···পাথরের ঠাকুর নয় যে দামী অর্ঘ্য ফিরিয়ে দেবে···

নর্ম্মদা কহিল—জানেন, আমি তার দর যাচাই করেছিলুম···পনেরো হাজার টাকা দাম···

ছ'চার কথার পর বলিলাম—তোমার নাচের তারিখ এখনো announce করোনি যে···

নর্ম্মদা কহিল—দু'তিনজন এখনো এসে পৌছয় নি—মাদ্রাজ থেকে আসচে পদ্মা, গুজরাট থেকে লছমী বাঈ, আর ট্রাভাঙ্কোর থেকে আসচে চন্দ্রা···তারা এলেই তারিখ announce হবে · দু'তিনদিনের মধ্যে তারা এসে পৌছুবে। টেলিগ্রাম পেয়েছি···

আমি কহিলাম—ভালো কথা, আমাদের থিয়েটারে চলো একদিন···সেই যে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সনৎ সেনের—তাঁর নতুন নাটক প্লে হচ্ছে। ভয়ঙ্কর successful play··এত ভিড় হচ্ছে এখনো যে দেখে তাক লেগে যাবে···

নর্ম্মদা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কহিল—কে সনৎ সেন?···

—সেই যে চৌরঙ্গীর প্রাইভেট গ্রিণে দেখা···তোমার পুরোনো ঠিকানায় একখানা বইও পাঠিয়েছিল···

—ও···হ্যাঁ, হ্যাঁ·· পোষ্ট-অফিস থেকে redirect হয়ে সে বই আমার কাছে গিয়েছিল···ঠিক ঠিক · তা তোমার বন্ধু হলে কি হবে, তার স্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক হয়েছি··· আমায় করেছে সে বইয়ের heroine ·

—তার মানে?···

—তা নয় তো কি! Heroine একজন dancer-woman···ও তো আমি, এমন অভদ্র জানলে তার সঙ্গে আলাপ করতুম না···

আমি কহিলাম—কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ হবার আগে সে ও বই লিখেছে···

—কিন্তু আমার দু'চারজন বন্ধু সে বই পড়ে বলেছে··· ও heroineটি আমি···

কহিলাম—তুমি নিজে পড়েচো সে বই?

—আগে পড়িনি···কত লোক বই পাঠায়, চিঠি পাঠায় কত কি পাঠায় সে সব পড়তে গেলে মানুষ বাঁচতে পারে না ···বন্ধুরা যখন বললে, heroineটা আমি, তখন একবার বইখানা দেখেছি···

কহিলাম—কিন্তু বইয়ের heroine-এর বয়স বাইশ বছর মাত্র ··

নর্ম্মদা কহিল—আমার বয়স আসলে যতই হোক, বাইশ বললে কেউ সন্দেহ করবে না। বয়সকে আমরা কত যত্নে আটকে রাখি···তা জানো?

—কিন্তু নাচে গানে নায়িকার কতখানি প্রতিভা··· তা ছাড়া heroineএর মন পয়সাকড়ির সম্বন্ধে নির্লোভ এবং সে ভালোবাসার কাঙাল ··

নর্ম্মদা একটা রুক্ষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল—আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা ··

অসঙ্কোচে কহিলাম—পাষাণ-প্রতিমা!

নর্ম্মদা নিমেষে যেন কাঠ।···আমি তার পানে চাহিয়া রহিলাম।

একটু পরে নর্ম্মদা কহিল—নাটকে ঐ হীরের আংটির ঘটনা···ও গল্প আমি সেদিন বলেছিলুম···নয়? সেই জোয়ানপুরের কুমার বাহাদুর আমার প্রেমে বিভোর হয়ে নিত্য নূতন উপহার দেয়···একদিন আর-একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন—নিরীহ ভদ্রলোক···আমার গান শুনতে—তাতে কুমার বাহাদুর হলেন রেগে আগুন···এবং ভয়ঙ্কর ঝগড়া · রেগে আমি তার দেওয়া হীরের আংটি দিলুম ড্রেনে ফেলে···কুমার বাহাদুর ভালোবাসার বচনে অজস্র দাতা হলেও এদিকে তো কৃপণ···গেল তাঁর সঙ্গে প্রণয় ছুটে সে ব্যাপারের পর।

গভীর মনোযোগে আমি গল্প শুনিতেছিলাম···

নর্ম্মদা কহিল—সে ব্যাপারের পর কারো উপর মন

কখনো প্রসন্ন থাকে?…এ গল্প সেদিন বলেছিলুম কথায়-কথায়—আর তোমার ঐ সত্যেনবাবু না ভরৎবাবু সে-গল্পটি বেমালুম দেছেন তাঁর নাটকে গুঁজে!…একে বলে, বিশ্বাস-ঘাতকতা· তোমরা দুজনেই এজন্য অপরাধী!

আমি কহিলাম—কিন্তু এ গল্পটি আমি পড়েছিলুম কোন্ মাসিক পত্রে…তা ছাড়া এ গল্পটি নিজের জীবনের বর্ণনা বলে' চালিয়ে দিতে শুনেছি গ্রামোফোন-গায়িকা মনতারাকে—আমাদের থিয়েটারের গজেন্দ্রগামিনীও এ গল্পটি নিজের বলে' চালিয়েছিল…এ তো একটা মামুলি কাহিনী··আর অমৃতবাবুর তরুবালাতেও এমনি একটা কাহিনী যেন আছে বলে মনে পড়ছে…

নর্ম্মদা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, অসঙ্কোচে কহিল—আর পাঁচজনের জীবনে এমন ব্যাপার ঘটেছিল বলে' আমার জীবনে ঘটবে না বা ঘটে নি—এ কথার মানে আমি বুঝতে পারি না…বলো যদি তো সে আংটি আমি এনে তোমায় দেখাতে পারি…ড্রেন থেকে তুলিয়ে আমি সে-হীরেটাকে reset করিয়েছি।

আমি হাসিলাম। হাসিয়া কহিলাম—গজেন্দ্রগামিনী বলেছিল, তার আংটি ছিল পান্নার, হীরের নয়। আর মনতারা বলেছিল, তার আংটিতে ছিল মস্ত একখানা মুক্তো না চুণী!—

তাহলে নিশ্চয় রায় বাহাদুরের কথাও সেদিন বলেছিলুম …রায় বাহাদুর হরেন দাস…রিটায়ার্ড এ্যাডিশনাল জজ…

হরেন দাস নামটা মনে পড়িল। রিটায়ারের সঙ্গে হরেন দাস এককালে নর্ম্মদার বাড়ীতে পড়িয়া থাকিতেন বটে! হরেন দাস নর্ম্মদাকে একখানা বাগান কিনিয়া দেন সিঁতির ওদিকে।

নর্ম্মদা বলিল—রায় বাহাদুর আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল হ্যামিলটনের দোকানে। সেখান থেকে কিনে দেয় আমার পছন্দ-মতো একটা মুক্তোর কলার—তখন আমি প্লে করি ষ্টার থিয়েটারে…তোমরা বোধ হয় তখন কলেজে পড়চো··থিয়েটারে ঢোকোনি। সে কি আজকের কথা…রায় বাহাদুর ছিল ভারী কঞ্জুষ…তাকে দেখেচো?

—না। নাম শুনেছি…বুড়ো বয়সে বৌ মারা যাবার পর বেজায় কাপ্তেন হয়ে ওঠে।

নর্ম্মদা কহিল—জজীয়তী করলেও মেজাজ ছিল ভারী ঠাণ্ডা…তবে দারুণ সন্দিগ্ধ মন। সেবারে সেই সুন্দরবন ট্রিপে বেরুলুম…জাহাজে ছিল এক সুপুরুষ বাঙালী ভদ্রলোক…অল্প বয়স…চমৎকার গান গাইতে পারে…তাকে ভারী ভালো লাগলো…আলাপ করবার এমন চমৎকার ক্ষমতা··তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে আলাপ করতো যেচে সেধে…সেই জাহাজে ছিল একজন সাহেব আর তার মেম··তারা তো আমায় নিয়ে পাগল··বলতো নিমু··সুইট্ নিমু…কিন্তু সে কথা যাক্, একদিন সেই বাঙালী ছেলেটির সঙ্গে বেড়াতে গেলুম…জাহাজ নোঙর করেছিল বিকেলের দিকে আমাদের কথায়…জাহাজে ফিরে এলুম রাত তখন আটটা…জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটছে…ফিরে এসে দেখি, বুড়ো রায় বাহাদুর গুম্ হয়ে বসে আছে…যেন একটা কাঠের কুঁদো! আমায় বললে—যার তার সঙ্গে যেখানে সেখানে যাও কি বলে? আমি বললুম—যার তার সঙ্গে যাবো, এমন দুর্ব্বুদ্ধি আমার কেন হবে!…গিয়েছিলুম এই শুকদেব বাবুর সঙ্গে…বন্ধু!··সবজজ বললে—বন্ধুর সঙ্গে যাবে যদি তো আমার ঐ মুক্তোর মালা গলায় দিয়ে বাহার দাও কোন্ লজ্জায়! কথার সঙ্গে সঙ্গে আমায় দিলে ধাক্কা…সে অপমান সইলুম না তো…তার চোখের সামনে গলার সে কলার ছিঁড়ে দিলুম জলে ফেলে· বুড়ো একেবারে অজ্ঞান! বললে—এত দামের গয়না! আমি বললুম—তুমি ভালোবেসে দিয়েছিলে বলেই তোমার ভালোবাসার দামে আমি ওর দাম কষেছিলুম…তাছাড়া আমার কাছে ওর অন্য দাম ছিল না…

সাশ্চর্য্যে আমি কহিলাম,—বলো কি! এত বড় নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলে··তুমি বুদ্ধিমতী ভাগ্যবতী শ্রীমতী নর্ম্মদা দেবী…!

নর্ম্মদা সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল—সেদিন সারা রাত, তার পরের দিন সারা দিন-রাত রায় বাহাদুরের সঙ্গে কথা কইলুম না…তার ধার মাড়ালুম না… শেষে রায় বাহাদুর আমার পায়ে ধরে মাপ চায়।…আর কলকাতায় গিয়ে রায় বাহাদুর আমায় নিয়ে আবার হ্যামিলটনের দোকানে গিয়ে ঠিক তেমনি আর একছড়া মুক্তোর কলার দেয় কিনে…

কথার শেষে নর্ম্মদা হাসিতে লাগিল…হাসিয়া কহিল—আমাকে বলো নির্ব্বোধ!…ভাবো যে কলার

জলে দিয়েছিলুম, সেটা রায় বাহাদুরের কেনা সেই প্রথম কলার?···তা নয় ··যাচ্ছি বাইরে—যাবার আগে সে কলার বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলুম···যেটা জলে দিয়েছিলুম, সেটা ঝুটো মুক্তোর কলার—থিয়েটারে সাজবার সময় গলায় দি। হুঁঃ! পুরুষ্‌মানুষ আবার বুদ্ধির বড়াই করে। আমাদের একটু হাসি, একটি চাহনির নেশায় তারা না করতে পারে কি, তা জানি না···

কথায় কথায় সনৎ সেনের নাটক চাপা পড়িল··

আমি কহিলাম—তাহলে যাচ্ছ একদিন থিয়েটারে···

নর্ম্মদা কহিল—ক্ষেপিনি তো···যা-তা লেখা···পাগলের মতো মুখস্থ করে বকতে হয় বলেই বাঙলা থিয়েটারে আমার অরুচি ধরে গেছে···পচা মামুলি কথা নিয়ে কারবার! তাই আমি ও লাইন ছেড়ে নাচ-গান নিয়ে আছি···খাসা আছি···মান···ইজ্জৎ···পয়সা···সেই সঙ্গে স্বাধীনতা,··· অবসর···তোমার থিয়েটারে নয়·এসো এম্পায়ারে—ক'দিনই এসো···আমাদের নাচ দেখতে, গান শুনতে··· aristocratic atomsphere···পারো যদি তোমাদের সেই নাট্যকারটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসো···আর কিছু লাভ তার না হোক, বাঙলা নাটক লিখে যে কোনো আনন্দ পাওয়া যায় না, এটুকু সে বুঝবে···কি জানো? আমার এই বিশ বৎসর বয়সে কতই তো দেখলুম···

কহিলাম,—তোমার বয়স বিশ বৎসর···? বলো কি!

হাসিয়া নর্ম্মদা কহিল,—সন্দেহ করো না···আমি হলুম উর্ব্বশী···তাই চিরদিন বয়স রয়ে গেল বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে···It is an art···বুঝলে,এই এক বয়সে থেকে যাওয়া···

এম্পায়ারে গিয়াছিলাম—নর্ম্মদা দেবীর ভারত-জয়ী নাচ দেখিতে, গান শুনিতে···

কণ্ঠ সত্যই অপরূপ···আর নাচ·দেহের প্রতি ভঙ্গিমায় ছন্দের বিচিত্র লীলা!

তার সব দোষ, সব দুর্ব্বলতা ভুলিয়া গেলাম···পুরুষকে তুচ্ছ করিয়া, ··কুহক-চাতুরীতে যত শয়তানীই করিয়া বেড়াক···নাচে-গানে এ নর্ম্মদাকে মিথ্যাচারিণী নর্ম্মদা বলিয়া মনে হয় না···

সত্যকার অভিনেত্রী! পতিতার সঙ্গে এইখানেই গৃহ-সংসার-বন্ধার প্রভেদ!···এর পাশে সনতের কল্পনায়-আঁকা পতিতা নারী···কাঠের পুতুল! সাধে বলি, নারীর যদি পতন হয় তো সে পতিতা নারী এই নর্ম্মদার মতো হোক —সনৎ সেনের লেখা পতিতার মতো না হয়···বইয়ের লেখায় এ-সব পতিতা নারী ন্যাকামির আবরণে এমন বেশে দেখা দেয়···সে-মিথ্যা, কপটাচারের মার্জ্জনা নাই!···

সনৎকে এ কথা বুঝাইয়া বলিয়াছি···বলিয়াছি, পতিতার ছবি যদি আঁকো তো তাকে পতিতা করিয়াই আঁকো—সাধ্বী পতিতা আঁকিয়ো না...আঁকো পতিতা পতিতাই—সে দেবী নয়···মানবীও নয়···

সনৎ বলিয়াছে, এবারে সে সত্যকার পতিতার ছবি আঁকিবে··ঐ নর্ম্মদার মতো···তার মন হইবে এমনি পাথরে রচা! গান-নাচ, এগুলা পাথরের গায়ে ফুটিয়া ওঠে···সে কোটার পরিচয় পতিতা·জানে না—পতিতা তার সন্ধানও রাখে না!

ভারতের কার্পাস শিল্প

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

(১)

পুরাতন কথা

ভারতের কার্পাস শিল্প যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, সে বিষয়ে আজ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদ, অশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত এবং বুদ্ধের যুগে "export of cotton fabric was of worldwide importance" অর্থাৎ ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র-জগতের রপ্তানীর বাজারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৩২১—২৯৭) সুদক্ষ কারিগরের নিপুণ হস্তে অতি সূক্ষ্ম ও

মনোমুগ্ধকর বস্ত্র প্রস্তুত হইত। J. A. Mann সাহেব অনেক তথ্য আলোচনার পর লিখিয়াছেন—"আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারতবর্ষই কার্পাস বস্ত্রের জন্মস্থান।" (India is according to our knowledge the accredited birth-place of the cotton manufactures)

এই সকল বিষয় আজ মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের পর নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহেঞ্জোদারোতে লোকে চরকা কাটিত এবং কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত করিত তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। শীতবস্ত্রের জন্য পশুলোম হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। কার্পাসবস্ত্রের সামান্য টুক্‌রা মৃৎপাত্রের গায়ে সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আজ যে ভাবে পল্লীর গৃহিণী আচার, পুরাতন তেঁতুল প্রভৃতির আধার বস্ত্র দ্বারা কঠিনভাবে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখে সেইভাবে হয়ত কোনও সযত্নরক্ষিত মৃত্তিকাধার বস্ত্রাবৃত অবস্থায় ছিল; আজ তাঁহারই অবশিষ্ট খণ্ড বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়া সে যুগের বস্ত্রশিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বহুদিনের চেষ্টার ফলে ভারতের বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ও এত সুন্দর হইয়াছিল যে আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। সূতা হইতে বস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্তই সামান্য যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত হইত; সেই বস্ত্র অতি সৌখীন হইত এবং ধনী রাজা রাজচক্রবর্ত্তীর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিত। Baines নামে এক পণ্ডিত বলিয়াছেন "The Indians have in all ages maintained an unapproached and almost incredible perfection in their fabrics of cotton—*some of their muslins might be thought the works of fairies, or insects rather than of men.*"

বাঙ্গালার গৌরব এই যে মসলিনের সম্পর্কে—ভারতের মধ্যে ঢাকাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। তাহার মসলিন বিভিন্ন নামে প্রচলিত ছিল এবং জগতের সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইত। তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, মিসর, পারস্য প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায়ীরা বস্ত্রসম্ভার লইয়া গিয়া বাঙ্গালায় অর্থ আনিয়া দিত। সুরাট, কালিকট, মসলিপট্টন, বরোদা, ব্রোচ, লাহোর, মুলতান, সুক্কুর প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল স্থানেই তন্তুবায় শ্রেণী বাস করিত এবং নানা প্রকারের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। বিদেশী বণিকেরা যখন এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখনও ভারতের বস্ত্র শিল্পের অত্যন্ত সুসময়।

মোগল আমলের ইতিহাস

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে মোগল অভিযানের ফলে বস্ত্রশিল্প দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল; কিন্তু মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার লুপ্ত শ্রী বহু পরিমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া আবার তন্তুবায় তাহার তাঁতে মনোনিবেশ করিল এবং বাদসাহ, আমীর, ওমরাহরা প্রাসাদের একাংশে তাঁতশালা ("কারখানা") বসাইয়া নিজেদের রুচিমত বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এ সময়েও ভিজগাপট্টম, আর্কট, নেলোর, তিনবল্লী, টিউটিকোরিণ প্রভৃতি স্থানে অতি সৌখীন ও সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত এবং মস্রের রুমাল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বাদশাহকে উপহার দিবার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা স্থানীয় সৌখীন ও মূল্যবান বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতেন এবং সে সময় সৌখীন পোষাকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় এই সকল শাসনকর্ত্তারা নিজ প্রদেশের তন্তুবায়দিগকে উৎসাহ ও অর্থদান করিতেন। এই প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে স্থানে স্থানে এমন বস্ত্র প্রস্তুত হইত যাহার ধারণা করা এখন কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভারত সম্বন্ধে Tavernierএর মতামত অত্যন্ত মূল্যবান; তিনি বলিয়াছেন যে কতকগুলি বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে স্পর্শদ্বারা তাহার কোনও অনুভূতি হয় না এবং এক পাউণ্ড তুলা হইতে অন্ততঃ ২৫০ মাইল যে সূতা প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ সূতা হইতে বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

কোম্পানীর আমল

বিদেশীর দল এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের দৃষ্টি ভারতীয় বস্ত্রের সৌন্দর্য্য ও শিল্পের উৎকর্ষতার উপর পড়ে। তাহারা বুঝিতে পারে যে ভারতের বস্ত্র যে ধনীরই নিকট উপস্থিত হউক, সেখানেই সমাদর লাভ করিবে। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের এই ব্যবসায়ের যাত্রা সুরু হয় এবং তাহাদের পঞ্চম অভিযানের হিসাবে প্রকাশ পায় যে লাভের অংশ শতকরা ১০০৲ টাকাতেই দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যবসা নিজেদের করায়ত্ত করিবার জন্য ঢাকা, হুগলী, কাম্বে, কচ্, কোচিন, কালিকট্, মসলিপট্টন, ব্রোচ, সুরাট, আমেদাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে তাহারা কুঠী নির্ম্মাণ করে। মশলা, নীল, সোরা, তুলা, রেশমের সঙ্গে এই ব্যবসায়ীর দল সূতার বস্ত্রও লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, যথারীতি ভারতীয় বস্ত্রাদি ও রুমাল ইংলণ্ডে প্রবেশ করিয়া বাজার অধিকার করিয়া বসে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে মিহি বস্ত্র আন্দাজ ৫০,০০০ খণ্ড ইংলণ্ডে যায় এবং আড়াই গুণ লাভে বিক্রীত হয়। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অন্ততঃ এক লক্ষ খণ্ড বস্ত্র প্রবেশ করে এবং কিছু না হইলেও দুই লক্ষ টাকা ভারতবর্ষে একা ইংলণ্ড হইতেই আসে। ওলন্দাজেরাও প্রায় এক লক্ষ টাকার উপর কাপড় লইয়া যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের তুলা ইংলণ্ডে রপ্তানী হইতে থাকে। তখন লোকে সন্দেহ করিতে থাকে যে এই তুলা রপ্তানীর ফলে ইংলণ্ডে বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে থাকে; তখন ভারতের বস্ত্রের আর চাহিদা থাকিবে না; সুতরাং তুলার রপ্তানী বন্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে। ফলে তুলার রপ্তানী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই তুলা রপ্তানীর জন্য ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হয় নাই এবং যতদূর হিসাব পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখিতে পাই যে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে অন্ততঃ দেড় লক্ষ পাউণ্ডের ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডে প্রবেশ লাভ করে।

ভারতের বস্ত্রের এত সমাদর হইতে থাকে যে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীবৃন্দ

সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা বলিতে থাকে যে ভারতের অনেক বস্তুর মধ্যে তাহার বস্ত্র দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ভারতের বর্ব্বর জাতি দিনে এক পেনী পারিশ্রমিকে সারাদিন পরিশ্রম করে এবং তাহাদেরই পুষ্টি করিয়া সুসভ্য খৃষ্টানজাতির ধ্বংসসাধন করা হইতেছে। "As ill-weeds grow apace, so these manufactured goods from India met with such a kind of reception that from the greatest gallants to the meanest cook-maids nothing was thought fit to adorn their persons as the Fabrick from India." বন্যলতা যেমন ধীরে ধীরে সকল স্থান ছাইয়া ফেলে, ভারতের বস্ত্র সেইরূপ মহৎ হইতে ক্ষুদ্র, ধনী হইতে দরিদ্র সকলের নিকট এত প্রিয় হইয়া পড়িতেছে যে তাহাদের ধারণা ভারতীয় বস্ত্র না পরিলে আর অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন হয় না। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করে। তাহারা হিসাব করিয়া দেখাইতে থাকে যে যে-দামে এক গজ ইংলণ্ডীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়, সেই দামে ভারতীয়েরা তিনটা পুরা পোষাকের কাপড় প্রস্তুত করিতে সক্ষম।

১৬৮০ সাল হইতে ভারতীয় বস্ত্রের সমাদর অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং কোম্পানীর লাভের পরিমাণ তদনুপাতে অধিক হইতে থাকে। ১৬৯৭ হইতে ১৭০২ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭২৫ পাউণ্ড মূল্যের ভারতীয় বস্ত্রাদি ইংলণ্ডে আমদানী হইয়া মহাসমস্যার সৃষ্টি করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচুর ভারতীয় বস্ত্র চালান যাইত। ইংলণ্ডের পশম শিল্প দারুণ বিপন্ন হইয়া পড়ে।

উদ্ধারের চেষ্টা

এই অবস্থা হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। নিজেদের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিয়া যখন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, তখন দেশে আইনের আশ্রয় লইতে হইল। ভারতীয় বস্ত্রপরিধানকারী ৫ পাউণ্ড এবং বিক্রেতা ২০ পাউণ্ড দণ্ড দিতে বাধ্য হয়—এরূপ এক আইন ১৭২১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার ফল আশানুরূপ হইল না।

অনুরূপ চেষ্টা ভারতেও চলিতে থাকে। তখন আর ইংরাজ নিরীহ ব্যবসায়ী নহে। ভারতের রাজশক্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বিনাশুল্কে বিলাতী (ইংলণ্ডীয়) দ্রব্য বিক্রয়ের "ফারমাণ" লাভ করে। তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই দাবী করিতে থাকে যে তাহারা যে সকল পণ্যের ব্যবসা করিবে, তাহা আর কেহ বিনাশুল্কে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না। ইহা লইয়া মিরকাসিমের সহিত তাহাদের বিরোধ বাধে এবং মিরকাসিমের রাজ্যনাশ ঘটে। এই সকল কারণে বাঙ্গালার অন্তর্বাণিজ্যের মহা অকল্যাণ হইল। তাহার পর এই রাজ-বণিকের দল স্থির করিল যেখানে তাহারা পণ্য ক্রয় করিবে সেখানে তাহাদের কর্ম্মচারী আসিয়া পছন্দ করিয়া ক্রয় করিয়া লইবার পর তাহারা অবশিষ্ট বস্ত্র অপরকে বিক্রয় করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, দাম সম্বন্ধে তাহাদের মতামতই চরম। যেখানে বহুপরিমাণ বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত, সেখানে চরকার উপর অত্যধিক হারে শুল্ক বসাইয়া দিয়া নিজেদের বিনাশুল্কে আনীত দ্রব্যাদি জোর করিয়া চালাইতে থাকে।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দ্রব্যাদির উপর অন্তর্বাণিজ্যের জন্য নূতন করিয়া শুল্ক ধার্য্য হয় এবং কোনও কোনও দ্রব্যের উপর চতুর্গুণ পর্য্যন্ত শুল্ক ধার্য্য হয়। ফলে ঐ সকল দ্রব্যাদি স্থানীয় পণ্য হিসাবে বিক্রীত হইতে থাকে এবং শুল্কের উপদ্রবে বিক্রয়ের বাজার সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে। ১৭৯৪ হইতে ১৮২৪খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে আমদানী শুল্কের হার পরিবর্ত্তন হইতে হইতে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে ভারতীয় পণ্যের আমদানী বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বিনাশুল্কের বাণিজ্যের ব্যাপারে বিলাতী দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে ভারতে আসিতে পাইত কিন্তু ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের জন্য বিদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভারতীয় কার্পাসবস্ত্রের উপর বিভিন্ন হারে শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। বিলাতে আসিয়া দেশ হইতে রপ্তানী হইয়া গেলে মসলিনের উপর শতকরা দশমাংশ—আর ইংলণ্ডে সেই দ্রব্য ব্যবহৃত হইলে শতকরা ২৭ পাউণ্ড ৬ শিলিঙ ৮ পেন্স শুল্ক দিতে হইত। ক্যালিকোর উপর আমদানী শুল্ক ৩ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেন্স আর ইংলণ্ডে সেই ক্যালিকো ব্যবহৃত হইলে ৬৮ পাঃ ৬ শিঃ ৮ পেন্স শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতী মাল শতকরা আড়াই টাকা শুল্কে ভারতে আসিত তখন ভারতীয় দ্রব্যের উপর ইংলণ্ডে সাড়ে সতেরো টাকা শুল্ক দিতে হইত।

কোনও কোনও ভারতীয় দ্রব্যের উপর, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মিঃ মার্টিনের মতে, শতকরা ৫০০ হইতে ১০০০ গুণ অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হইত। ইহাতে ভারতীয় পণ্যের যে অবস্থা হওয়া উচিত তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। অর্থাৎ এই সময় নাগাদ শিল্পপ্রধান দেশ হইতে ভারতকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হয়।

তৎকালীন আমদানী রপ্তানীর হিসাব

ভারতের রপ্তানী কিভাবে হ্রাস পাইতে থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে পাঠকের বোধগম্য হইবে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকখানির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল।

ইংলণ্ড হইতে ভারতে আনীত দ্রব্যাদির পরিমাণ		ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত দ্রব্যাদির পরিমাণ	
খৃষ্টাব্দ	পাউণ্ড	খৃষ্টাব্দ	গাঁইট
১৭৯৪	১৫৬	১৮০০	২,৬৩০
১৮০১	২১২,০০০	১৮০১	৬,৩৪১
১৮১০	৭৪,৬৯৫	১৮১০	১,১৬৭
১৮১৩	১০৮,৮২৪	১৮১৩	৫৫৭
১৮২৭	২৯৬,১৭৭	১৮২৭	৫৪১
১৮৪৯	২,২২২,০৮৯	১৮৪৯ পাঃ মূল্যের	৬৯৪,৫৮৪

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিলেক্ট কমিটার নিকট মিঃ লারপেণ্ট যে সাক্ষ্য প্রদান করেন তাহাতে তিনি নিম্নলিখিত অঙ্ক দাখিল করিয়া প্রমাণ করেন যে ভারতের সমৃদ্ধিশালী শিল্প অতি অন্যায়ভাবে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

	ইংলণ্ড হইতে ভারতে আনীত বস্ত্র গজ	ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত বস্ত্র সংখ্যা
১৮১৪	৮১৮,২০৮	১,২৬৬,৬০৮
১৮২১	১৯,১৩৮,৭২৬	৫৩৪,৪৯৫
১৮২৮	৪২,৮২২,০৭৭	৪২২,৫০৪
১৮৩৫	৫১,৭৭৭,২৭৭	৩১৬,০৮৬

একধারে যেমন ভারতীয় বস্ত্রাদির উপর শুল্ক প্রয়োজনানুসারে হ্রাস বৃদ্ধি করা হইতে লাগিল, অপরদিকে ভারতীয় তুলা যাহাতে বিনাশুল্কে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে এবং সে কারণে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে পাওয়া যাইতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তুলার উপর শুল্ক রদ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে যথাক্রমে ১৮৩৮ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও মন্দ্রের তুলার শুল্ক রদ করা হয়।

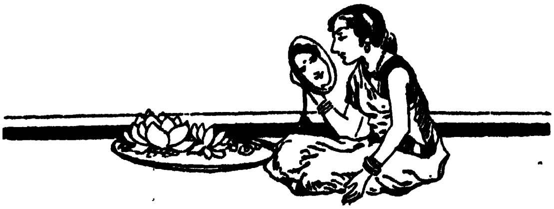
অন্যান্য কারণ

যাহাতে ভারতে কার্পাসজাত বস্ত্রের পরিবর্ত্তে লোকে কেবল তুলার চাষ করে এবং বিলাতী মাল ক্রয় করিতে বাধ্য হয় তাহার বিপুল চেষ্টা চলিতে থাকে। ফলে, আমাদের আমদানী যেমন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তুলাজাত বস্ত্রের রপ্তানী হ্রাস পাইয়া কাঁচা তুলার রপ্তানী সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ইত্যবসরে ইংলণ্ডে কলকারখানার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়া ভারতের শিল্প নষ্ট করিল। দেশের মধ্যে অন্তঃপ্রাদেশিক নানারকম শুল্ক বর্ত্তমান থাকায় একস্থানের পণ্য অন্যস্থানে যাওয়ার পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল, আর ইংলণ্ড ব্যতীত যে সকল দেশে ভারতের কার্পাসপণ্য রপ্তানী হইত, ক্রমে ক্রমে ইংরাজ সেই সকল বাজার দখল করিয়া বসিল। ফলে এককালে যে শিল্প জগতকে চমৎকৃত করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের মুখের অন্নসংস্থান করিত, তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া গেল এবং আমরা আমাদের দৈনন্দিন পরিধেয় বস্ত্রের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে বাধ্য হইলাম।

যখন বিদেশের বাজার নষ্ট হইতে লাগিল তখনও ভারতের কার্পাস-শিল্প মরে নাই। অন্ন এবং বস্ত্র মানবজীবনের দুইটী প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু; সুতরাং লোকে নিজের ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু বস্ত্র তৈয়ারী করিয়াছে। কিন্তু বিদেশাগত বস্ত্রের মূল্য অত্যধিক সস্তা হওয়ায় দেশী কাপড় দেশের বাজারেও হটিতে লাগিল! তাহার উপর বিদেশী সস্তা তৈয়ারী সূতা আসাতে লোকের চরকার উপর আর তত আস্থা রহিল না। আগে যেখানে সূতা কাটা এবং তাঁত বোনা দুইটী কাজে লোককে কর্ম্মরত রাখিত তাহার একটী প্রায় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গেল। লোকে কলের সূতায় কাপড় বুনিতে লাগিল।

যখন ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের আর কোনও আশাই রহিলনা, তখন ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের আমদানী শুল্কের হার হ্রাস করা হইল; এরূপ অবস্থায় এ দয়া না করিলেও কোনও ক্ষতি হইতনা। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের উপর শুল্ক শতকরা ৫ এবং সূতার উপর ৩।০ ধার্য্য হয়; তখন ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডের সূতা ও কাপড়ের উপর অনুরূপ শুল্ক বর্ত্তমান ছিল।

যখন লোকে দেখিল যে কলের বস্ত্রের সঙ্গে আর তাঁতের বস্ত্র প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, তখন এদেশেও লোকে কল চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সন্নিকটে ঘুস্থড়ীতে একটী কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। চরকা নষ্ট হইলেও লোকে তাঁতে কাপড় বুনিতে থাকে এবং লক্ষ লক্ষ গজ কাপড় দেশী কলে প্রস্তুত হইলেও এবং বিদেশ হইতে আমদানী সত্ত্বেও আজ এখনও হাতের তাঁত ভারতবর্ষে বাঁচিয়া আছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন যে ভারতের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ কাপড় হাতের তাঁতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যত কাপড় প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে জমে তাহার শতকরা ২৩ ভাগ তাঁতের প্রস্তুত মাল। ভারতের তাঁত নানারকমে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই। সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষে একেবারে বিফল হয় নাই। দেশের মধ্যে বহু কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এই সভ্যযুগেও যে সকল বিধিনিষেধ ও শুল্কের উপদ্রব আছে, তাহাতে কিছু কিছু অসুবিধা আছে।



সাহিত্য ও সংসার

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

প্রবন্ধ

আমাদের নানাবিধ সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা সংস্কার লইয়া সংসার। যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমরা বিচরণ করি, তাহাই আমি 'সংসার' নামে অভিহিত করিয়াছি। ক্ষুৎপিপাসা, আহারবিহার, অভাব-অভিযোগের যে প্রভাব প্রতিনিয়ত আমাদের জীবন গঠন করিয়া দিতেছে। তাহাই লইয়া ত আমাদের সাহিত্য।

আমাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। নিত্য নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইয়া এই জীবনযাত্রাকে অল্প বা বহু পরিমাণে সঙ্কুচিত, প্রসারিত বা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে। পল্লীগ্রামে আমরা 'পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি, পাখীর ডাকে জেগে'—কিন্তু সহরে কলের ভোঁ বাজে, নয়ত ময়লার গাড়ী ঘড় ঘড় করে, তাতেই জাগরণ নিষ্পন্ন করিতে হয়। পল্লীতে গদাই চাটুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে দাবার চালের সঙ্গে, কুণ্ডলীকৃত তাম্রকুটের ধূমে দলাদলির ঘোঁট পাকাইয়া উঠিত, এখন ইথিরিয়াল রেষ্ট্রেন্টে নবনলিনী (পুরুষ), নীহার (স্ত্রী), সুস্মিতা (?) প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদীর আধুনিকতম মতের প্রয়োগ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা না হইলে চলিবে না। সাহিত্য এইরূপে স্রোতের শৈবালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া কত ঘাটে-অঘাটে লাগিতেছে।

এক সময়ে যখন মানুষ আত্মার জন্য, পরকালের হিতের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, তখন বেদ বেদান্ত পুরাণ রচিত হইয়াছিল। বাংলাদেশের মধ্যযুগে—মধ্যযুগ বলাটা হয়ত একটু শিথিলভাবে হইল, ক্ষমা করিবেন—এই ধর্ম্মের টান সাহিত্যের গাঙে বহিয়াছিল, তাই আমরা জয়দেব, কবিকঙ্কন, ভারতচন্দ্র প্রভৃতিকে পাইয়াছিলাম। কিন্তু তখন হইতেই ধর্ম্মপ্রেরণার কূলে ভাঙন ধরিয়াছে। নিছক ধর্ম্ম লইয়া যে সাহিত্য চলে না, সেই ভাবটি ক্রমেই প্রকট হইতে লাগিল। বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্য এক মহা সমন্বয়ের উদাহরণ; ধর্ম্মের সঙ্গে কাব্যের রাশ ধরিয়া কবিরা জুড়িগাড়ী হাঁকাইয়াছেন। ধর্ম্ম তাহাতে টিকিল কি না, তাহার সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। কিন্তু কাব্যের সোনার কমল যে সেই পুরাতন কৃষ্ণসায়রের নিথর জলে ফুটিয়া উঠিল, এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই।

সর্পদংশনে এদেশে—বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারই প্রশমন-কল্পে অনেক সাহিত্য জন্মলাভ করিল। এখনও লোক যে মরিতেছে না তাহা নয়—কিন্তু সংসারের নানা বিষের কাছে সাপের বিষ বোধ হয় হার মানিয়াছে, তাই আর মনসা-মঙ্গল রচিত হইতে দেখি না।

ধর্ম্মমঙ্গলের অবস্থাও তথৈবচ। অনেক স্থলে ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা এখনও চলে শুনিয়াছি। কিন্তু আর সে তাম্রদীক্ষা নাই, নিম্নবর্ণের উচ্চ অধিকারের সে দাবী নাই। এখন দাবী মন্দির-প্রবেশ, কাউন্সিল-প্রবেশ প্রভৃতি অধিকার লইয়া। সাহিত্যে তাহারই প্রতিধ্বনি পাইতেছি। চণ্ডীদাস-চরিত বলিয়া যে বইখানি পরম শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সম্প্রতি সম্পাদন করিয়াছেন, তাহার অনেকখানি এই বর্ণশ্রেণীর সাম্য-স্থাপনের বর্ণনায় ভরিয়া গিয়াছে।

আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যেও সংসারের প্রভাব বড় কম নহে। যৌথ পরিবার লইয়া হিন্দুদের মধ্যে এক মহা-সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছিল, স্বর্ণলতা প্রভৃতি উপন্যাসে তাহার চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এখন আর যৌথ পরিবার লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি চলিবে কি? বিমাতার অত্যাচার-কাহিনী লইয়া 'বিজয় বসন্ত' প্রভৃতির মত নাটক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন এ সব নিতান্ত ছেলেমি বলিয়া উপেক্ষিত হয়। বহু বিবাহের প্রসঙ্গ ত উঠিতেই পারে না।

বিগত যুগে যাহাতে আমাদের মন আহ্লাদে অভিষিক্ত হইত, এখন আর তেমন হয় কি? আজকাল আমাদের অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির দিনে 'সীতারাম' অচল। এখন শ্রীর অত বেহায়াপনা, ভৈরবীর অত জেঠামি কে সহ্য করিবে? দেবী চৌধুরাণীর ডাকাতি মন্দ নয়, কিন্তু

আজকাল তাঁহাকে অনেক শিখিয়া তবে হাতসাফাই করিতে হইবে। আনন্দমঠের ত অগ্নি-সংকার হইতেছে। জননী জন্মভূমির প্রণাম এখনও চলিতেছে, কিন্তু অর্দ্ধপথে বাধা পাইতেছে। জীবন-প্রভাত মেঘের ছায়ায় ম্লান, জীবন-সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনাইয়া আসিয়াছে। এখন আর আয়েষার বলা শোভা পায় না যে 'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'। বন্দীতে জেলখানা ভরিয়া যায়, জগৎসিংহেরও অভাব নাই, কিন্তু সে আয়েষা মরিয়াছে লোকের ঔদাসীন্যে। প্রেমের আদর্শ কি আর আগের মত আছে?—

শুনিয়া দেখিলুঁ দেখিয়া ভুলিলুঁ
ভুলিয়া পিরীতি কৈলুঁ।

সে আত্মভোলা, সর্বহারা পিরীতি এখন হয়ত temporary insanity বলিয়া পরিগণিত হইবে। এখন ভ্রমর অসহ্য, নিতান্ত প্যানপেনে। এমন নায়িকা লইয়া উপন্যাস রচনা আর চলে না। 'আমি যদি মনপ্রাণ দিয়া তোমাকে ভালবাসিয়া থাকি, আমি যদি সতী হই, আবার তোমাকে আসিতে হইবে।' ভ্রমরের এ কথায় অনেক তরুণীর মুখে হাসি ফুটিবে। 'কি বোকা মেয়ে! সতীত্ব নিয়েই পাগল!' সতীত্ব লইয়া এত বাড়াবাড়ি কেন? সতীত্ব সম্বন্ধে সমাজের মধ্যে তেমন বেশী আগ্রহ যেন কাহারও নাই। সুতরাং উহা লইয়া গল্প রচনা করিলে সে আদিম কালের আন্তিবুড়ীর রূপকথার মত শুনাইবে। রোহিণীও নিতান্ত vulgar. শুধু রূপ যৌবন থাকিলেই কি আর উপন্যাস হয়? দিনকাল বদলাইয়া গিয়াছে। রোহিণী আর একটু accomplished না হইলে সম্ভবতঃ অনেকেরই মনে ধরিবে না। সুতরাং রোহিণীর বারুণীর পুকুরে ডুবিয়া মরা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

যান-বাহনের এই যে এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহাতে পূর্ব্বের সংস্কার কতক্ষণ টিঁকিতে পারে? নগেন্দ্রনাথ কেন যে নৌকা আরোহণ করিবেন, তাহার কোনও সন্তোষজনক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লরেন্স ফষ্টর এখন অবশ্যই মোটর লঞ্চে শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া শটকান দিবেন। আর এখন বেণীবাবু খুড়ি বিপিনবাবু আর বৈকুণ্ঠের বাড়ী ত্যাগ করিবার সময় সেকেণ্ড ক্লাশের গাড়ী ডাকিতে বলিবেন না। বৈকুণ্ঠের খাতার নূতন সংস্করণে 'ট্যাক্সি' এই পাঠ গ্রহণ করা প্রয়োজন হইতেছে। প্রতাপ আর ঘোলা জলে ডুবিতে ডুবিতে বলিবে না 'শৈ—বল, তুমি আমাকে ভুলবে। নয়ত এই আমি ডুবিলাম।' এখন এ রকম নোটীশ দেওয়া অসম্ভব। ট্রেণের নীচে গলা দিয়া মর, নয়ত চক্‌চকে রিভল্‌ভার লও, অথবা দাড়ি কামাইবার ব্লেড্ গলায় বসাইয়া দেও। নদীর মধ্যে এ সব বেয়াদবী আর চলিবে না।

বোরখা পরিয়া চটুল চাহনি নিয়া সুন্দরীরা রাজপথে আর বেরুবেন না। পোর্ট সৈয়দে দেখিয়াছি, এখনও সম্ভ্রান্ত রমণীরা চোখের নীচে পর্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া ভ্রমণ করেন। অবশ্যই তাহার সার্থকতা আছে, কিন্তু আমি তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কারণ কপালের টক্‌টকে রঙ, বয়সের নির্লজ্জ রেখাচিহ্নের অভাব এবং মারাত্মক চক্ষু দুইটি দেখিলেই ত অনেকখানি দেখা হইল। যাহা হউক, আমাদের দেশের অবগুণ্ঠন ত অনেক দিন অপসারিত হইয়াছে। তার সঙ্গে সঙ্গে রমণীর রূপের মোহও অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের তরুণকালে দেখিয়াছি, বেথুন কলেজের গাড়ী যাইবার সময় যুবকের দল যেমন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে তাকাইয়া থাকিত, এখন আর তেমন করে না। কাব্য-সাহিত্য যে দীন হইল, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে প্রেমের গতি চিরদিনই কুটীল। একদিকে নদী মজিয়া গেলে আর এক দিকে রাস্তা করিয়া লয়। এখন টেলিফোনে প্রেম হইতে পারে। কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা নোট বুকের পাতায় কবিতা লিখিয়া প্রেমের বিনিময় করিতে পারে। তা ছাড়া সিনেমায়, লেকের ধারে, রেষ্টুরেন্টে, এমন কি রেস্ কোর্সে পর্য্যন্ত প্রেমের বীজাণু আছে। ব্যাসিলারি প্রেম যে সাংঘাতিক হবে, এ আর আশ্চর্য কি? কবি ও ঔপন্যাসিক এখন এই কল্পনার জাল বুনিয়া এই ব্যাসিলাই ধরিবার ফাঁদ পাতিতেছেন। ইহাতে পুরাতন-পন্থীরা আতঙ্কিত হইতেছেন বটে, কিন্তু সকলেই মুখরোচক বলিয়া মনে করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কালের গতিক দেখিয়া কলম ফেলিয়া তরবারি নয়—তুলি ধরিলেন। দিন কতক ছবিতেই কবির নাম পড়িয়া গেল। যে বুঝিল সে বাহবা দিল, যে না বুঝিল সেও বাহবা দিল। ছবিগুলির আর কোনো গুণ আছে কি না জানি না, একটি গুণ আছে সেটি ছবির অভিনবত্ব। এমনটি আগে কেহ কখনও আঁকে নাই, কেহ হয়ত

আঁকিবেও না। একদিন কবিকে আমি বলিয়াছিলাম যে তিনি যে-কালে ছবি আঁকিতে ব্যস্ত, আমার পক্ষে তাঁহার বহুমূল্য সময় হরণ করা সঙ্গত হইবে না। কবি বলিলেন, 'ছবি আঁকছি? এ ত ধেবড়াচ্ছি।' এ অবশ্য তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ বিনয়। কিন্তু যদি সত্য হয়, তবু লোকে যে মানে না। কবি আলমোড়ায় গিয়া আর এক নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। এতদিন অনুপম সরস গদ্যে হাত পাকাইয়া তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কেতাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানেও প্রতিভার জয়। এমন হয় নাই, হইবার নয়। সাহিত্যের ভাগ্যে যাহা হয় হউক, বিশ্বের সহিত পরিচয়-লাভ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে অন্য কোনো লাভ হউক বা না হউক, অর্থলাভ হইবে। আর লাভ হইবে অনেক তরুণ সাহিত্যিকের। তাঁহারা বিশ্ব-পরিচয়ের এমন সুযোগ কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং কবিত্বময়ী কল্পনার ফুরফুরে হাওয়ায় অটুট বৈজ্ঞানিক সত্যের চাষ হইবে।

ছন্দোবন্ধের সহিত সারা জীবন যুঝিয়া শ্রান্তক্লান্ত কবি গদ্য কবিতার শরণ লইলেন এক শুভ প্রভাতে পুনশ্চ পাঠে। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের ইহা এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। মাইকেল যখন অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন করেন, তখন অনেকে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার অমোঘ প্রভাবে গদ্যকাব্যও সু-চল হইয়াছে। কিন্তু ভয় এই যে অনুকরণে এই প্রতিভার অভাবে সাহিত্য শেষটা গোয়ালার দুধে পরিণত না হয়।

আপনারা এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া বলিবেন সংসারের গতি-ই এইরূপ। আজ যাহা ভাল লাগে, কাল তাহা ভাল লাগে না। একজনের রুচিতে যাহা অতি মধুর, অপরের রুচিতে তাহা নহে। সুতরাং মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে রুচির বিভিন্নতা অনুসারে সাহিত্যের প্রকৃতি বদলাইয়া যায়, তাহার উপর ত কাহারও হাত নাই! আমি বলিতে চাই যে হাত নাই তাহা সত্য; তথাপি দেশকালপাত্রের ছাঁচে যে সাহিত্য তৈরী হয়, তাহার মূল্য কি? মরসুমী ফুলে (Season flowers) আমার চিত্তের সন্তোষ ঘটে বটে, কিন্তু সে ফুল ত স্থায়ী হয় না। দুদিনের জন্য আনন্দের চমক লাগাইয়া তাহা কোথায় উধাও হইয়া যায়। দুদিনের জন্য যাহা দরকার, তাহা আশা মিটাইয়া উপভোগ করিতে ক্ষতি নাই। কিন্তু সাহিত্যের প্রয়োজন কি দু'দিনের? আমাদের যত অনুভূতি বেদনা দেশকালের দ্বারা গঠিত হইতেছে, তাহার অতিরিক্ত কি কিছুই নাই? সাহিত্যের কাজ রস আহরণ করা। পারি-পার্শ্বিক অবস্থার বৈচিত্র্য থেকে রস সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়, একথা মানি। সাহিত্যের সজীবতা নির্ভর করে এই রসাহরণ ক্ষমতার উপর তাহাও সত্য। কিন্তু ইহার উপরে কি এমন কোনও শাশ্বত সত্য নাই, যাহা চিরদিন নরনারীর পক্ষে আস্বাদ্য হইয়া থাকিতে পারে? মাইকেল বলিয়াছেন যে তিনি এমন সুধার সৃষ্টি করিবেন;—গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। শকুন্তলার তপোবন-সৌন্দর্য এখনও ত ম্লান হয় নাই। কুমারসম্ভবের সেই অতুলনীয় চিত্র—পরম যোগী মৌনী মহেশ্বর আর তাঁহার পদে প্রণতা কিশোরী কুমারী গৌরী—এখনও ত ম্লান হয় নাই। হ্যামলেটের অবসাদক্লান্ত সংশয় এখনও তেমনিই সত্য, তেমনই উপভোগ্য হইয়া রহিয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের সেই চির-অতৃপ্ত প্রেম পিপাসা আজও তেমনি অতৃপ্ত রহিয়াছে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল॥

পারিপার্শ্বিক অবস্থার রঙে রঙ ধরাইয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহা কি এমন করিয়া লোকের মন যুগে যুগে মুগ্ধ করিতে পারে?

হিন্দুরা মনে করেন যে সংসার থেকে মুক্ত হইতে পারাই জীবের পরম সাধনার বিষয়। সাহিত্যের পক্ষে সেকথা অবশ্য খাটে না। কবিও বলিয়া দিয়াছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

আমরা বৈরাগ্য চাহি না। নির্লিপ্তভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গেলে সে চেষ্টা কতদূর সফল হয়, তাহাও বলা কঠিন। তবে সংসার যেন সাহিত্যকে চাপিয়া ধরিয়াছে। আমরা যেমন ঠিকে ভুলিয়া সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি—তেমনই আমাদের সাহিত্য সংসারের খুঁটিনাটি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে মানবতার প্রশস্ত ক্ষেত্রে আনিতে না পারিলে সাহিত্য-সাধনা সফল হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। দেশ কাল আধার সাহিত্যের উপর চিরদিনই প্রভাব বিস্তার করিবে। কিন্তু বর্ত্তমানের রঙে সাহিত্যকে রঙাইয়া তুলিলে তাহা ত চিরদিনের তৃপ্তি দিতে সক্ষম হইবে না। যে বেষ্টনী নিত্য নূতন ভাবে রূপায়িত হইয়া নয়নমনের ক্ষণিক তৃপ্তি সাধন করিতেছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সাহিত্য কালজয়ী হইতে পারিবে কি না তাহাই ভাবিতেছি। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিতে বলি না। কিন্তু বর্ত্তমানের উজ্জ্বল আলোকে চক্ষু ধাঁধিয়া গেলে ভবিষ্যৎ নয়নমনের গোচরে আনয়ন করা সম্ভব হইবে না। সত্যকে সুন্দরকে মধুরকে মনের সমস্ত মাধুরী দিয়া রচনা কর, যাহাতে সাহিত্য-সৃষ্টি দেশকালের অতীত রূপে মহীয়ান হইয়া উঠে।

ঝিন্দের বন্দী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দশম পরিচ্ছেদ

বিকল্পক

পরদিন প্রভাতে ঈষৎ জ্বরভাব লইয়া গৌরী শয্যাত্যাগ করিল। তাহার শরীরে রোগ প্রতিরোধ করিবার প্রভূত শক্তি সঞ্চিত ছিল, তাই ক্লান্ত দেহের উপর জলমজ্জনেও তাহাকে বিশেষ কাবু করিতে পারে নাই—নচেৎ নিউমোনিয়া কি ঐ জাতীয় কোনো রোগ পাকাইয়া তোলা অসম্ভব ছিল না।

উপরন্তু কাল রাত্রে ঘুমও ভাল হয় নাই। রুদ্ররূপকে শয়নঘরের দ্বারের কাছে পাহারায় রাখিয়া সে শয্যা আশ্রয় করিয়াছিল বটে—কিন্তু নানা চিন্তায় রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত নিদ্রা তাহার চোখে দেখা দেয় নাই। যতই তাহার মন কস্তুরীবাঈকে কেন্দ্র করিয়া মাধুর্য্যের রসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল, মাধুর্য্যের আবেশে একথাও সে কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই যে—সে অনধিকারী, এই সাহচর্য্যের অমৃত মনে মনে আস্বাদন করিবারও তাহার সত্যকার দাবী নাই। কে সে? আজ যদি শঙ্কর সিংকে উদ্ধার করা যায় কাল গৌরীশঙ্কর রায় নামধারী যুবককে ছদ্মবেশে মুখ লুকাইয়া এদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আর তাহাই ত ঘটিবে—আজ হোক, কাল হোক শঙ্কর সিং ফিরিয়া আসিয়া নিজের নাহ্য স্থান অধিকার করিবে। কস্তুরীবাঈয়ের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। তখন এই অখ্যাতনামা বাঙালী যুবককে কে স্মরণ রাখিবে? দু'একটা ধন্তবাদের বাঁধা বুলি বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিবে। কস্তুরী কিছু জানিতেও পারিবে না।

কিন্তু শঙ্কর সিং যদি ফিরিয়া না আসে? যদি উদিত তাহাকে সত্যই খুন করিয়া থাকে?—গৌরী জোর করিয়া এ চিন্তা মন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিল। সে সম্ভাবনার কথা ভাবিতেও তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কস্তুরীকেও সে মন হইতে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। না—পরের বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর কথা সে ভাবিবে না এবং ভবিষ্যতে—যদিও সে সম্ভাবনা খুবই কম—যাহাতে দেখা না হয় সেদিকে সতর্ক থাকিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সে শেষরাত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়া দেখিল চম্পা দ্বারের কাছে হাজির আছে। আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—'চম্পা, তুমি কি রাত্রে ঘুমোও না।'

চম্পা সরল চোখদুটি তুলিয়া বলিল—'ঘুমিয়েছিলাম ত!'

গৌরী বলিল—'কিন্তু এত সকালে উঠ্‌লে কি করে?'

চম্পা গম্ভীরভাবে বলিল—'আমি না উঠ্‌লে যে মহলের আর কেউ ওঠে না, সবাই কাজে গাফ্‌লৎ করে। তাই সবার আগে আমায় উঠ্‌তে হয়।'

গৌরী হাসিল। বৃহৎ রাজ-সংসারের সহস্র কর্ম্মভারে অবনত এই ছোট্ট মেয়েটি তাহার স্নেহ জয় করিয়া লইয়াছিল। তাহার মনে হইত চম্পা যেন এই ঝিন্দ রাজবংশের রাজলক্ষ্মী। এত সহজ সরল অথচ এমন গৃহিণীর মত কর্ম্মপটু মেয়ে সে আর কখনো দেখে নাই। চম্পাকে প্রাসাদের দাসী চাকরাণী অত্যন্ত সম্ভ্রম ও ভয় করিয়া চলে তাহা সে দেখিয়াছিল। মাঝে যে-কয়মাস চম্পা ছিল না সে-কয়মাসে রাজ-প্রাসাদের অন্দরমহলে একপ্রকার অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল; চম্পার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবার সেখানে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে।

গৌরীর অসুস্থতার কথা শুনিয়া চম্পা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল—'ডাক্তারকে ডেকে পাঠাই। এখনো ত সর্দ্দারজী আসেন নি, রুদ্ররূপকেই পাঠাই।'

'রুদ্ররূপ কোথায়?'

চম্পা হাসিয়া বলিল—'আপনার দোরের বাইরে নাক ডাকিয়ে পাহারা দিচ্ছে।'

'আহা, বেচারা বোধহয় শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে এখন ডেকো না। আমার ডাক্তারের দরকার নেই, তুমি শুধু একবাটি গরম দুধ আমাকে পাঠিয়ে দাও।'

'তা আনছি। কিন্তু ডাক্তারেরও আসা দরকার' বলিয়া চম্পা প্রস্থান করিল।

অল্পকাল পরে রুদ্ররূপ ঘরে ঢুকিয়া স্যালুট্ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার গায়ে তখনো গত রাত্রির যোদ্ধবেশ, কোমরে লম্বিত তলোয়ার, মাথার পাগ্ড়ি অটুট—কিন্তু চোখে ঘুম জড়াইয়া রহিয়াছে। গৌরী হাসিয়া বলিল—চম্পা ঘুমতে দিলে না?'

রুদ্ররূপ লজ্জিতভাবে বলিল—'সকালবেলা একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—' 'তা হোক—বোসো'—গৌরী নিজে একটা কৌচে বসিয়াছিল, পাশের স্থানটা দেখাইয়া দিল।

রুদ্ররূপ বলিল—'কিন্তু চম্পাদেই যে ডাক্তার ডাকতে বললে?'

তা বলুক—'তুমি বোসো।'

রাজার পাশে একাসনে বসিতে রুদ্ররূপ রাজি হইল না। সে ঘরের এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু নিম্ন আসন কিছু চোখে পড়িল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া গৌরী বলিল—'আমার পাশে এসে বোসো, এখন ত বাইরের কেউ নেই।'

রুদ্ররূপ তখন সঙ্কুচিত হইয়া কৌচের একপাশে বসিল। কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর বাহিরে চম্পার পদধ্বনি শুনা গেল। রুদ্র অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া ফৌজীপ্রথায় শক্ত হইয়া গোড়ালিতে গোড়ালিতে ঠেকাইয়া যষ্টিবৎ দাঁড়াইল। রাজার পাশে একাসনে বসিবার বেয়াদবি যদি চম্পার চোখে পড়ে তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না।

রেকাবের উপর দুধের বাটি লইয়া চম্পা প্রবেশ করিল। রুদ্ররূপকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—'তুমি এখনো যাও নি যে?'

রুদ্ররূপ চম্কাইয়া উঠিয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিল—'কুমার বল্লেন—রাজা বল্লেন যে ডাক্তারের দরকার নেই।'

চম্পা মুখ রাঙা করিয়া বলিল—'রাজার মত নিতে আমি তোমায় বলেছিলাম?'

রুদ্ররূপ অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। চম্পা দ্বারের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল—'যাও এখনি।'

করুণ নেত্রে রুদ্ররূপ গৌরীর দিকে চাহিল। গৌরী হাসিতে লাগিল, বলিল—'যাও, রুদ্ররূপ। এ মহলে চম্পার হুকুমই সকলকে মেনে চলতে হয়—এমন কি আমাকেও।'

'যো হুকুম' বলিয়া রুদ্ররূপ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দুধের বাটিতে এক চুমুক দিয়া গৌরী সকৌতুকে বলিল, ...'এখানে সবাই তোমাকে ভয়ঙ্কর ভয় করে—না চম্পা?'

চম্পা সহজভাবে সায় দিয়া বলিল—'হ্যাঁ।'

'বিশেষতঃ রুদ্ররূপ।'

'ও যে ভারি বোকা—তাই ওকে কেবলি বক্‌তে হয়।'

গৌরী হাসিয়া উঠিল। দুধের বাটি শূন্য করিয়া চম্পার হাতে ফেরৎ দিয়া বলিল—'যাও গিন্নি ঠাকরুণ, এখন সংসারের কাজকর্ম্ম করগে।'

রুদ্ররূপ অবিলম্বে ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার গঙ্গানাথ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'বিশেষ কিছু নয়, একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। আজ আর কোনো পরিশ্রম করবেন না—ঘরেই থাকুন।' ব্র্যাণ্ডি ও কুইনিনের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে রুদ্ররূপকে জোর করিয়া ছুটি দিয়া গৌরী একাকী কৌচে হেলান দিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল। কলিকাতা ছাড়িবার পর আজ অসুস্থদেহে তাহার বাড়ীর কথা মনে পড়িল। এ কয়দিন অভিষেকের আয়োজন ও হুড়াহুড়িতে কাহারো নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিলনা—দাদাকে পৌঁছানোর সংবাদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিল, তাহাও ঘটিয়া উঠে নাই। দাদা বৌদিদি নিশ্চয় উদ্বেগে কালযাপন করিতেছেন। আর বিলম্ব করিলে হয়ত দাদা নিজেই টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদ জানিতে চাহিবেন। অভিষেক হইয়া গিয়াছে—এ খবর অবশ্য তিনি সংবাদপত্রে জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু গৌরীই যে রাজা তাহা তিনি বুঝিবেন কি করিয়া? হয়ত নানা দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। গৌরীও ভাবিতে ভাবিতে নিজের অবহেলায় জন্য অনুতপ্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিল।

ঠিক নয়টার সময় ধনঞ্জয় দেখা দিলেন। তাহাকে দেখিয়াই গৌরী বলিয়া উঠিল—'সর্দ্দার, একটা বড় ভুল হয়ে গেছে, দাদাকে খবর দিতে হবে।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'বেশ ত, একখানা চিঠি লিখে দিননা।'

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, চিঠি পৌঁছুতে তিন-

চার দিন দেরী হবে। তার চেয়ে তাঁকে একটা টেলিগ্রাম করে দাও।'

ধনঞ্জয় চিন্তা করিয়া বলিলেন—'সে কথাও মন্দ নয়। কিন্তু আপনার নামে টেলিগ্রাম পাঠালে চলবে না। চারিদিকে শত্রু—এমনভাবে 'তার' লিখতে হবে যাতে আপনার দাদা ছাড়া তার প্রকৃত মর্ম্ম কেউ না বুঝতে পারে।'

গৌরী বলিল,—'বেশ, তোমার নামেই তার পাঠানো হোক। খবরটা দাদার কাছে পৌঁছুলেই হল।—এস, একটা খসড়া তৈরী করি।'

দুইজনে মিলিয়া টেলিগ্রামের খস্ড়া তৈয়ারী করিলেন, তাহাতে লিখিত হইল—

'এখানকার সংবাদ ভাল। শুভকার্য্য হইয়া গিয়াছে—কোনো বিঘ্ন হয় নাই। ব্র ৫। চিন্তা নাই। আপনাকে মাঝে মাঝে সংবাদ দিব। আপনি আপাততঃ চিঠিপত্র লিখিবেন না। ধনঞ্জয়।'

ধনঞ্জয় টেলিগ্রামের মুসবিদা লইয়া প্রস্থান করিলে গৌরী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে লাগিল।

পরদিন অপরাহ্নে গৌরী কিস্তার ধারের মুক্ত বারান্দায় গিয়া বসিয়াছিল। কাছে কেবল রুদ্ররূপ ছিল। আজ গৌরী বেশ ভালই ছিল, এমন কি এইখানে বসিয়া কিছু রাজকার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছিল। বজ্রপাণি কয়েকখানা জরুরী সনন্দ ও পরোয়ানা তাহার দ্বারা মোহর করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যদিও এসকল দলিলে মোহরের সঙ্গে রাজার সহি-দস্তখৎও দেওয়া বিধি, তবু আপাততঃ শুধু মোহরেই কাজ চালাইতে হইয়াছিল। শঙ্কর সিংএর দস্তখৎ গৌরী এখনো ভাল আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

ধনঞ্জয়ও এতক্ষণ গৌরীর কাছেই ছিলেন, এইমাত্র একটা কাজে বাহিরে ডাক পড়িয়াছে তাই উঠিয়া গিয়াছেন।

দু'জনে নীরবেই বসিয়া ছিল। রুদ্ররূপ একটু অন্যমনস্কভাবে কিস্তার নৌকা চলাচল দেখিতেছিল ও কোমরবন্ধে আবদ্ধ তলোয়ারখানা আঙুল দিয়া নাড়িতেছিল। তাহার পাৎলা সুশ্রী ধারালো মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী হঠাৎ প্রশ্ন করিল—'রুদ্ররূপ, ঝিন্দে সবচেয়ে ভাল তলোয়ার খেলোয়াড় কে বলতে পার?'

রুদ্ররূপ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'ঝিন্দের সবচেয়ে বড় তলোয়ার-বাজ বোধহয় সর্দ্দার ধনঞ্জয়—না—ময়ূরবাহন।'

'বল কি?' গৌরী বিস্মিতভাবে চাহিল।

রুদ্ররূপ ঘাড় নাড়িল—'হ্যাঁ—সর্দ্দারজীও খুব ভাল খেলোয়াড়—বিশ বছর আগে হলে বোধহয় ময়ূরবাহনকে হারাতে পারতেন কিন্তু এখন—'

'আর তুমি?'

'আমিও জানি। কিন্তু ময়ূরবাহন কিম্বা সর্দ্দার আমাকে বাঁ হাতে সাবাড় করে দিতে পারেন।'

গৌরী ঈষৎ বিস্মিত চোখে এই সরল নিরভিমান যোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিল—তারপর বলিল—'আচ্ছা তুমি ময়ূরবাহনের সঙ্গে লড়তে পার?'

রুদ্ররূপ একটু হাসিয়া বলিল—'হুকুম পেলেই পারি। লড়াই করব বলেই ত আপনার রুটি খাচ্ছি।'

'মৃত্যু নিশ্চয় জেনেও?'

'হ্যাঁ। মৃত্যুকে আমার ভয় হয়না রাজা।'

রুদ্ররূপের কাঁধে হাত রাখিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কিসে তোমার ভয় হয় ঠিক করে বলত রুদ্ররূপ?'

রুদ্ররূপ চিন্তা করিয়া বলিল—'কি জানি। আপনাকে সম্মান করি—আপনি রাজা, সর্দ্দারকেও সম্মান করি;—কিন্তু ভয় কাউকে করি বলে ত মনে হয় না।'

গৌরী পুনরায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—'কিন্তু আমি জানি তুমি একজনকে ভয় কর।'

রুদ্ররূপ চকিত হইয়া চাহিল—'কাকে?'

'চম্পাকে।'

রুদ্ররূপের মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল, সে নতনেত্রে চুপ করিয়া রহিল।

গৌরী তরলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি চম্পাকে ভালবাসো—না?'

রুদ্ররূপ তেমনি হেঁটমুখে বসিয়া রহিল—উত্তর করিল না।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'ওকে বিয়ে করনা কেন?

রুদ্ররূপ মুখ তুলিল, চোখ দুটি অত্যন্ত করুণ, আস্তে আস্তে বলিল—'আমি বড় গরীব, চম্পার বাবা আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন না।'

গৌরী চমকিয়া উঠিল, রাজার পার্শ্বচর যে গরীব

হইতে পারে একথা সে ভাবিতেই পারে নাই। বলিল—'গরীব ?'

'হ্যাঁ। আমরা পুরুষানুক্রমে সিপাই, আমাদের টাকা-কড়ি নেই।'

'তাতে কি হয়েছে ?'

'ত্রিবিক্রম সিং একজন প্রকাণ্ড বড়মানুষ—রাজ্যের প্রধান শেঠ। তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন কেন ?'

'তুমি কখনো প্রস্তাব করে দেখেছ ?'

'না।'

একটু চিন্তা করিয়া গৌরী প্রশ্ন করিল—'চম্পা তোমার মনের কথা জানে ?'

'না। সে এখনো ছেলেমানুষ—তাকে—' রুদ্ররূপ চকিতভাবে দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—'সর্দ্দার আসছেন। তাঁকে—তাঁর সাম্‌নে—'

'না না, তোমার কোনো ভয় নেই।'

সর্দ্দার ধনঞ্জয় প্রবেশ করিলেন। গৌরী ফিরিয়া দেখিল তাঁহার মুখ গম্ভীর, হাতে একখানা চিঠি। জিজ্ঞাসা করিল—'কি সর্দ্দার ?'

সর্দ্দার নিঃশব্দে চিঠি তাহার হাতে দিলেন। ঝড়োয়ার রাজ-দরবার হইতে দেওয়ান অনঙ্গদেও কর্ত্তৃক লিখিত পত্র—সাড়ম্বরে বহু সমাসযুক্ত ভাষায় অশেষপ্রতাপ দেবপাদ শ্রীমন্মহারাজ শঙ্করসিংহকে সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে এখন মহারাজ বস্তুত ঝড়োয়া রাজ্যেরও ন্যায্য অধিপতি; সুতরাং তিনি কৃপাপূর্ব্বক কিছুকাল তাহার ঝড়োয়া রাজ্যে আসিয়া রাজগৌরবে বাস করতঃ প্রজা ও ভৃত্যবৃন্দের সেবাগ্রহণ করিলে ঝড়োয়ার আপামর সাধারণ কৃতকৃতার্থ হইবে। ঝড়োয়ার মহিমময়ী রাজ্ঞী পরিষদবৃন্দ ও প্রজা সামান্তের পক্ষ হইতে দেবপাদ মহারাজের শ্রীচরণে এই নিবেদন উপস্থাপিত হইতেছে। অলমিতি।

চিঠি পড়িতে পড়িতে গৌরীর মুখে রক্তিমাভা আনাগোনা করিতে লাগিল। পাঠ শেষ হইয়া যাইবার পরও সে কিছুক্ষণ চিঠিখানা চোখের সম্মুখে ধরিয়া রহিল। তারপর সর্দ্দারের দিকে চোখ তুলিয়া দেখিল তিনি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সে তাচ্ছিল্যভরে পত্র ফেরৎ দিয়া বলিল—'এ চিঠি এল কখন ?'

'এই মাত্র।'

'বজ্রপাণি এ চিঠির মর্ম্ম জানেন ?'

'জানেন—তিনিই পত্র খুলেছেন।'

'তুমিও জানো বোধকরি ?'

'জানি।'

ঈষৎ হাসিয়া গৌরী প্রশ্ন করিল,—'তা তোমরা দুজনে কি স্থির করলে ?'

ধনঞ্জয় দুইচক্ষু গৌরীর মুখের উপর নিশ্চল রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'আমরা কিছুই স্থির করিনি। আপনি যা আদেশ করবেন তাই হবে।'

গৌরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, অজ্ঞাতসারে তাহার দৃষ্টি কিস্তার পরপারে শুভ্র রাজসৌধের উপর গিয়া পড়িল। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিল—'ঝড়োয়ায় যাবার কোনো দরকার দেখিনা। ওঁদের লিখে দাও যে অশেষপ্রতাপ দেবপাদ এখন নিজের রাজ্য নিয়েই বিশেষ ব্যস্ত আছেন, তাছাড়া তাঁর শরীরও ভাল নয়। এখন তিনি ঝড়োয়ায় গিয়ে থাকতে পারবেন না।' একটু হাসিয়া বলিল—'চিঠিখানা বেশ মোলায়েম করে ভাল ভাল কথা দিয়ে সাজিয়ে লিখো। কিন্তু সেকাজ বোধহয় বজ্রপাণি খুব ভাল রকমই পারবেন।'

ধনঞ্জয়ের মুখ হইতে সংশয়ের মেঘ কাটিয়া গেল, তিনি প্রফুল্লস্বরে 'যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

গৌরী তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিল—'তাড়াতাড়ি কিছু নেই—কালপরশু চিঠি পাঠালেই চলবে।—এখন তুমি বোসো, কথা আছে।'

ধনঞ্জয় হাঁটু মুড়িয়া গালিচার একপাশে বসিলেন। গৌরী বলিল—'শঙ্করসিং সম্বন্ধে কি হচ্চে ? তোমরা যে রকম ঢিলা-ভাবে কাজ করছ তাতে আমার মনঃপূত হচ্ছে না।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'ঢিলাভাবে কাজ হচ্চে না—তবে খুব গোপনে কাজ করতে হচ্চে। সোরগোল ক'রে করবার মত কাজ ত নয়।'

'কি কাজ হচ্ছে ?'

'শক্তিগড়ে কোনো বন্দী আছে কিনা তারি সন্ধান নেওয়া হচ্চে। ওটা আমাদের অনুমান বৈ ত নয়, ভুলও হ'তে পারে।'

'সন্ধান ক'রে কিছু জানা গেল ?'

'না। এত শীঘ্র জানা সম্ভবও নয়; মাত্র কাল থেকে লোক লাগানো হয়েছে।'

গৌরী চিন্তা করিয়া বলিল—'হুঁ। অন্যদিকে কোনো অনুসন্ধান হচ্ছে?'

ধনঞ্জয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'না, অন্যদিকে যারা শঙ্করসিংএর অনুসন্ধান করছিল তাদের ডেকে নেওয়া হয়েছে। শঙ্করসিং যখন সিংহাসনে আসীন রয়েছেন তখন তাঁর তল্লাস করতে গেলেই লোকে নানারকম সন্দেহ করবে।'

'তা ঠিক, গুপ্তচরেরা নিজেরাই সন্দেহ করতে আরম্ভ করবে।'

'এখন যা-কিছু অনুসন্ধান আমাদের নিজেদের করতে হবে। বাইরের লোককে কোনো কথা ঘুণাক্ষরে জানতে দেওয়া যেতে পারেনা।'

'কিন্তু আমার আর চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগছে না সর্দ্দার। এখন ত অভিষেক হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়ে লাগা দরকার। তোমাদের রাজা-গিরি আর আমার ভাল লাগছে না।'

ঈষৎ বিস্ময়ে ধনঞ্জয় তাহার দিকে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'কিন্তু উপস্থিত কিছুদিন ধৈর্য্য ধরে থাকতেই হবে। অন্ততঃ যতদিন না শক্তিগড়ের পাকা খবর পাওয়া যাচ্ছে।'

আরো কিছুক্ষণ এই বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর ধনঞ্জয় উঠিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, কিস্তার কালো বুকে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইতেছিল। পশ্চিমাকাশের অস্তরাগের পশ্চাৎপটে কিস্তার সেতুটি কঙ্কাল-সেতুর মত প্রতীয়মান হইতেছিল। সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী একটা নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—'রুদ্ররূপ, দারিদ্র্য কি ভালবাসার পথে খুব বড় বিঘ্ন ব'লে তোমার মনে হয়?'

রুদ্ররূপ হেঁটমুখে কি চিন্তা করিতেছিল, চকিতভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

গৌরী মুখের একটা বিমর্ষ ভঙ্গি করিয়া বলিল,—'তার চেয়ে ঢের বড় বড় বাধা আছে—যা অলঙ্ঘনীয়। তুমি হতাশ হ'য়োনা।'

আশার উল্লাসে রুদ্ররূপের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে আরো কিছু শুনিবার আশায় সাগ্রহে গৌরীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঝড়োয়ার প্রাসাদে তখন একটি একটি করিয়া দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছিল। গৌরী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল —'ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে—চল, ভেতরে যাওয়া যাক।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভিমরুলের অনুতাপ

রাণীর সহিত গৌরীর দৈবক্রমে সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাইবার পর হইতে গৌরী ও ধনঞ্জয়ের মাঝখানে ভিতরে ভিতরে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব্বের বাধাহীন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ্রাস পাইয়াছিল অথচ ঠিক মনোমালিন্যও বলা চলেনা। কিন্তু গৌরী যখন ঝড়োয়ায় গিয়া থাকিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল তখন আবার অজ্ঞাতসারেই এই দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়া পূর্ব্বের সৌহার্দ্দ্য ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। গৌরী মাঝের এই দুই দিন অন্তরের মধ্যে যেন একটু অবলম্বনহীন ও অসহায় বোধ করিতেছিল, এখন আবার সে মনে বল পাইল। একযোগে কাজ করিতে গিয়া সহকারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব যে মানুষকে কিরূপ বিকল করিয়া ফেলে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ও তাহার কুফল চিন্তা করিয়া দু'জনেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া উভয়েই আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

ঝিন্দে আসিয়া গৌরী আর একটি অনুগত ও অকৃত্রিম বন্ধু লাভ করিয়াছিল—সে রুদ্ররূপ। বয়স দু'জনেরই প্রায় সমান, অবস্থাগতিকে সাহচর্য্য ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য হইয়া পড়িয়াছিল—তাই পদ ও মর্য্যাদার আকাশ পাতাল প্রভেদ সত্ত্বেও দুজনে পরস্পরের খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। গৌরী যে সত্যই রাজা নয় ইহা রুদ্ররূপ জানিত—সেজন্য তাহার ব্যবহার ও বাহ্য আদব-কায়দায় তিলমাত্র ত্রুটি হয় নাই—কিন্তু তবু মানুষ গৌরীর প্রতিই সে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করসিংএর প্রতি তার মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা বলা কঠিন; সম্ভবতঃ শঙ্কর সিংকে মানুষ হিসাবে সে কোনোদিন দেখে নাই—রাজা বা রাজপুত্র ভাবিয়া তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু

গৌরীর প্রতি তাহার অনুরক্তি এই রাজভক্তিরও অতিরিক্ত একটা ব্যক্তিগত প্রীতির রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল। শঙ্কর সিংএর জন্যও রুদ্ররূপ নিঃসঙ্কোচে প্রাণ দিতে পারিত, কিন্তু গৌরীর জন্য প্রাণ দিতে পারিত আনন্দের সঙ্গে—কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে নয়।

সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিবার পর গৌরী প্রাসাদের বাহির হইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। অবশ্য প্রাসাদে নিষ্কর্ম্মার মত তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইত না, সর্ব্বদাই কোনো না কোনো কাজ লাগিয়া থাকিত। প্রত্যহ সকালে দরবারে গিয়া বসিতে হইত, সেখানে নানাবিধ কাজ মন্ত্রণা ও দেশের বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও আলাপ করাও দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি সর্ব্বপ্রকারে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহার মনে হইত যেন তাহার গতিবিধির চারিপাশে একটা অদৃশ্য দেওয়াল তাহাকে ঘিরিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ধনঞ্জয়ের কাছে নগর ভ্রমণের কথা উত্থাপন করিলে তিনি মাথা নাড়িয়া বলিতেন—'এখন নয়, আরো দু'দিন যাক।' বস্তুতঃ নগরভ্রমণে বাহির হওয়া যে সর্ব্বাংশে নিরাপদ নয় তাহা গৌরীও বুঝিত। দেশে অভিষেকের উৎসব এখনো শেষ নাই, এই সময় গোলমালের মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তবু সে স্বাধীনভাবে নিজের ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

এদিকে শঙ্কর সিংএর কোনো সংবাদই পাওয়া যাইতেছিল না। শক্তিগড়ের দিকে যাহারা তল্লাস করিতে গিয়াছিল তাহারা একে একে ফিরিয়া আসিয়া জানাইয়াছে যে শক্তিগড়ের অর্দ্ধক্রোশের মধ্যে কাহারো যাইবার উপায় নাই—দুর্গ ঘিরিয়া থানা বসিয়া গিয়াছে। সেই গণ্ডীর ভিতর কেহ পদার্পণ করিবার চেষ্টা করিলেই অশেষ ভাবে লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছে। দুর্গের আশে পাশে যে-সকল গ্রাম আছে সেখানেও অনুসন্ধান করিয়া কোনো ফল পাওয়া যায় নাই; গ্রামবাসীরা উদিতের প্রজা ও ভক্ত, কিছু জানিলেও বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশ করে না, উপরন্তু কৌতূহলী জিজ্ঞাসুকে গালাগালি ও মার-ধর করিয়া দূর করিয়া দেয়। একজন দুঃসাহসিক গুপ্তচর নৌকায় করিয়া কিস্তার দিক হইতে দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিল—উদিত তাহাকে ধরিয়া আনিয়া স্বহস্তে এমন নির্দ্দয় প্রহার করিয়াছে যে লোকটা আধমরা হইয়া কোনো মতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অতঃপর আর কেহ ও অঞ্চলে যাইতে রাজি নয়।

এইরূপে শঙ্কর সিংহের অনুসন্ধান কার্য্য চারিদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার নিশ্চল হইয়া আছে!

অভিষেকের দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন অপরাহ্নে গৌরী ও রুদ্ররূপ প্রাসাদ সংলগ্ন ব্যায়ামগৃহে অসি-ক্রীড়া করিতেছিল। ধনঞ্জয় অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন ও বিচারকের কার্য্য করিতেছিলেন।

দেশী তলোয়ার খেলা। দীর্ঘ ও ঈষদ্বক্র তরবারির ফলায় সূক্ষ্ম কাপড় জড়ানো, খেলোয়াড় দু'জনের মুখ ও গ্রীবাদেশ লোহার মুখোসে ঢাকা। খেলার ঝোঁকে দু'জনেই বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে—মুখোসের জালের ভিতর দিয়া তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে। দু'টা তলোয়ারই বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। কদাচিৎ অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিয়া ঝণৎকার উঠিতেছে, কখনো একের তরবারি অন্যের দেহ লঘুভাবে স্পর্শ করিতেছে। ধনঞ্জয় মাঝে মাঝে বলিয়া উঠিতেছেন—সাবাস! চোট্! জখম! ইত্যাদি।

ক্রমে রুদ্ররূপের অসিচালনায় ঈষৎ ক্লান্তি ও শিথিলতার লক্ষণ দেখা দিল; সে গৌরীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করিল। তারপর হঠাৎ গৌরী তাহার ঘূর্ণিত অসিকে পাশ কাটাইয়া বিদ্যুদ্বেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিল, শিরস্ত্রাণের উপর ঝণাৎ করিয়া শব্দ হইল। ধনঞ্জয় বলিয়া উঠিলেন—ফতে!

দুইজন যোদ্ধাই তরবারি নামাইয়া দাঁড়াইল। গৌরী মুখোস খুলিয়া ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছিতে মুছিতে সহাস্যে বলিল—'সর্দ্দার, এবার তুমি এস।'

ধনঞ্জয় নিঃশব্দে তরবারি রুদ্ররূপের হাত হইতে লইয়া গৌরীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তরবারির মুঠ একবার কপালে ছোঁয়াইয়া বলিলেন—'আসুন।'

'মুখোস পরবে না?'

'দরকার নেই।'

অসি চালনায় ধনঞ্জয়ের খ্যাতি গৌরী জানিত, সে সাবধানে নিজের দেহ যথাসাধ্য সুরক্ষিত করিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইল। ধনঞ্জয় শুধু অসিখানা নিজ দেহের সম্মুখে

ধরিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ডাহিনের দিকে একটা ফাঁক লক্ষ্য করিয়া গৌরী সেইদিকে তলোয়ার চালাইল, ধনঞ্জয় অবহেলাভরে তাহা সরাইয়া দিলেন। আবার গৌরী বাঁ দিকে আক্রমণ করিল, কিন্তু কব্জির একটা অলস সঞ্চালন দ্বারা ধনঞ্জয় সে আঘাত নিজ তরবারির উপর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বাঁ হাত দিয়া একটা বিরক্তিকর মাছি তাড়াইতেছেন।

ধনঞ্জয় যতই স্থির ও অবিচলিত হইয়া রহিলেন—গৌরী ততই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে আর সে ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া একপা পিছু হঠিয়া চিতাবাঘের মত ধনঞ্জয়ের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। তাঁহার মাথার উপর তলোয়ারের কোপ বসাইতে গিয়া দেখিল ধনঞ্জয় সেখানে নাই। ধনঞ্জয় কোথায় তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বেই সে নিজের দক্ষিণ হস্তের কেবল মুঠিতে একটা বেদনা অনুভব করিল ও পরক্ষণেই দেখিল তলোয়ারখানা তাহার অবশ হস্ত হইতে পড়িয়া যাইতেছে।

ধনঞ্জয় ভূমি হইতে তলোয়ার তুলিয়া গৌরীকে প্রত্যর্পণ করিয়া হাসিমুখে বলিলেন—'ফতে।'

মুখোস খুলিয়া গৌরী কিছুক্ষণ নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'কি হ'ল বল দেখি?'

'কিছু না, আপনি হেরে গেলেন।'

গৌরী মুখের একটা বিমর্ষ অথচ সকৌতুক ভঙ্গি করিয়া বলিল—'তা ত দেখতেই পাচ্ছি; কিন্তু হারালে কি করে?

'একটা খুব ছোট্ট প্যাচ আছে—আপনি সেটা জানেন না।'

'আমার গোয়ালিয়রের ওস্তাদ তাহলে ফাঁকি দিয়েছে বল!'—একটা চেয়ারের পিঠে কাশ্মিরী শালের ঢিলা চোগা রাখা ছিল, গৌরী সেটা গায়ে দিতে লাগিল, ধনঞ্জয় তরবারি রাখিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন।

এই সময় ব্যায়ামগৃহের খোলা দ্বারের কাছে একজন শাস্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। রুদ্ররূপ বলিল—'কি চাও?'

শাস্ত্রী কহিল—'ঝড়োয়া থেকে একজন ঘোড়সওয়ার এসেছে—মহা..জের দর্শন চায়।'

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি জন্যে দর্শন চায় কিছু বলেছে?'

শাস্ত্রী বলিল—'না, সে কিছু বলতে চায় না।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'রুদ্ররূপ, দেখ কি ব্যাপার।'

কিয়ৎকাল পরে রুদ্ররূপ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে দর্শনপ্রার্থীর নাম সুবাদার বিজয়লাল—রাজার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতেছে না।

ধনঞ্জয় গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি একে চেনেন নাকি?'

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না।'

ধনঞ্জয় ভ্রূকুটি করিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন—'আচ্ছা, তাকে এইখানেই নিয়ে এস।'

ঝড়োয়ার দরবার হইতে প্রেরিত দূতও হইতে পারে, আবার না হইতেও পারে; এই ভাবিয়া ধনঞ্জয় ঘরের কোণের এক মেহগনির আলমারি খুলিয়া একটি রিভলবার তুলিয়া লইয়া তাহাতে টোটা ভরিতে লাগিলেন। আলমারিতে ছোরাছুরি পিস্তল ইত্যাদি নানাবিধ অস্ত্র সাজানো ছিল।

গৌরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'ও কি হচ্চে সর্দ্দার? 'বলা ত যায় না—হয়ত—' বলিয়া সর্দ্দার একটা জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সৈনিক বেশধারী দীর্ঘকায় যুবক রুদ্ররূপের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট রাজাকে দেখিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি? কি চাও?'

যুবক একবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিল; দেখিল অদূরে জানালার পাশে ধনঞ্জয় একটা রিভলবার লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করিতেছেন, পিছনে দ্বারের কাছে রুদ্ররূপ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিল —'মহারাজের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে।'

গৌরী ঈষৎ অপ্রসন্নমুখে বলিল—'তা আগেই শুনেছি। তোমাকে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। আমার সঙ্গে তোমার কী গোপনীয় কথা থাকতে পারে?'

যুবক একটু ইতস্ততঃ করিল, একবার ধনঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে কহিল—'আমি ত্রিষকলের দূত।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গৌরী তাহার দিকে চাহিল—'ত্রিষকলের দূত? ওঃ! কস্তুরী—?'

যুবক গম্ভীরভাবে মস্তক অবনত করিল।

গৌরী তখন প্রফুল্লমুখে বলিল—'কৃষ্ণা—ভিমরুলের দূত! একথা আগে বলনি কেন? তা—ভিমরুলের কি সমাচার?'

যুবক মুখ ফিরাইয়া নীরবে ধনঞ্জয়ের দিকে চাহিল।

গৌরী সহাস্যে বলিল—'সর্দ্দার তুমি যেতে পার। সুবাদারের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।—না, কোনো ভয় নেই—সুবাদার পরিচিত লোকের দূত।'

অনিচ্ছাভরে রিভলবার রাখিয়া ধনঞ্জয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন; তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছেন।

গৌরী রুদ্ররূপকে বলিল—'তুমি ঘরের বাইরে পাহারায় থাকো—কেউ না আসে।'

রুদ্ররূপ নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে গৌরী উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল—'কৃষ্ণার কি খবর?'

যুবক উত্তর না দিয়া পাগড়ীর ভিতর হইতে একটি পত্র বাহির করিয়া গৌরীর হাতে দিল। গৌরী পড়িল, তাহাতে লেখা আছে—

'স্বস্তি শ্রীদেবপাদ মহারাজের চরণে কৃষ্ণাবাঈয়ের শত শত প্রণাম। এই পত্রের বাহক সুবাদার বিজয়লাল ঝড়োয়া-রাজবংশের এবং সেই সঙ্গে আমার একজন বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্ম্মচারী। তাহাকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন।

'আপনি সেদিন আমার উপর রাগ করিয়া আমাকে শাস্তি দিবেন বলিয়াছিলেন। শাস্তির ভয়ে আমি অতিশয় অনুতপ্ত হইয়াছি—স্থির করিয়াছি আজ রাত্রেই প্রায়শ্চিত্ত করিব। আপনাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

'আজ রাত্রি দশটার সময় কিস্তার পুল যেখানে ঝড়োয়ার রাজ্যে আসিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বিজয়লাল উপস্থিত থাকিবে। আপনি আসিবেন। ছদ্ম-বেশে আসিতে হইবে, যাহাতে কেহ আপনাকে চিনিতে না পারে। একজন বিশ্বাসী পার্শ্বচর সঙ্গে লইতে পারেন। বিজয়লাল আপনাকে যথাস্থানে লইয়া আসিবে। ইতি—আপনার চরণাশ্রিতা কৃষ্ণা।'

চিঠি মুড়িতে মুড়িতে গৌরী মুখ তুলিল, কৌতুক তরলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কৃষ্ণা তোমার কে?'—বিজয়লাল নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল—'ও বুঝেছি, তুমি কৃষ্ণার ভাবী সোহর!—কিন্তু কৃষ্ণা হঠাৎ এত অনুতপ্ত হয়ে উঠ্‌ল কেন তা ত বুঝতে পারছি না।' পত্রখানা চোগার পকেটে রাখিয়া বলিল—'হ্যাঁ—আমি যাব। যথাসময় তুমি হাজির থেকো।'

'যে আজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া বিজয়লাল অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। গৌরী আবার বলিয়া উঠিল—'কিন্তু আসল কথাটা কি বলত? এ নিমন্ত্রণের ভিতর একটা গূঢ় রহস্য আছে বুঝতে পারছি। সেটা কি?'

বিজয়লাল বলিল—'তা জানিনা মহারাজ।'

বিজয়লাল গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অত্যন্ত অল্পভাষী। তাহার শ্যামবর্ণ দৃঢ় মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের কথা কিছুই বুঝা যায় না। তবু গৌরী যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত—বিজয়লালের ফৌজী গোঁফের আড়ালে অল্প একটু হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

বিজয়লাল প্রস্থান করিলে গৌরী চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। মনের অগোচরে পাপ নাই বটে কিন্তু আশা আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি মিলিয়া মানুষের মনে এমন একটা অবস্থা সৃষ্ট হয়—যখন সে মনকে চোখ ঠারিতেছে কিনা নিজেই বুঝিতে পারে না। তাই কৌতূহল ও আগ্রহ যতই গৌরীর মনে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ততই সে মনকে বুঝাইতে লাগিল যে ইহা কেবল একটা মজাদার আড্‌ভেন্‌চারের জন্য আগ্রহ, বহুদিন রাজপ্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার পর মুক্তির আশাই তাহাকে উদ্‌গ্রীব করিয়া তুলিয়াছে। নচেৎ কৃষ্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আর কোনো আকর্ষণই থাকিতে পারে না।

অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে কৃষ্ণার এই অনুতাপের মর্ম্ম যে সে অভ্রান্তভাবে বুঝিয়াছে একথা যদি তাহার জাগ্রত মনের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিত তাহা হইলে বোধ করি সে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। অথচ পরিহাস এই যে, ধনঞ্জয় সকল কথা শুনিয়া নিশ্চয় এ প্রস্তাবে বাধা দিবেন ইহা অনুমান করিয়া সে আগে হইতেই মনে মনে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

তাই ধনঞ্জয় যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্যাপার কি? দূত কিসের?' তখন গৌরী চিঠিখানা

সন্তর্পণে পকেটে রাখিয়া দিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'কিছু না। আজ রাত্রে একবার নগর ভ্রমণে বার হব। সঙ্গে কেবল রুদ্ররূপ থাকবে।'

বিস্মিত ধনঞ্জয় বলিলেন—'সেকি! হঠাৎ এরকম—'

গৌরী বলিল—'হঠাৎই স্থির করেছি।'

ধনঞ্জয় বলিলেন—'কিন্তু রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় যাওয়া ত হতে পারে না।'

গৌরী একটু ঝাঁঝালো সুরে বলিল—'নিশ্চয় হতে পারে, যখন আমি স্থির করেছি।'

ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ আকুঞ্চিত চক্ষে গৌরীকে নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'কিন্তু এরকম স্থির করার কারণ জানতে পারি কি?'

'না'—গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু থামিয়া বলিল—'ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা ছদ্মবেশে থাকবো, কেউ চিনতে পারবে না।'

'কিন্তু ঝড়োয়ায় যাওয়া কি আপনার উচিত হচ্চে?'

গৌরীর মুখ সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সংযত স্বরেই বলিল—'উচিত কিনা সেকথা আমি কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না। আমি ঝিন্দের বন্দী নই—আপাততঃ ঝিন্দের রাজা।'

ধনঞ্জয় আবার কি একটা বলিতে গেলেন কিন্তু তৎপূর্ব্বেই গৌরী ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শূন্য ঘরে ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; তারপর অস্ফুট স্বরে বকিতে বকিতে গৌরীর অনুসরণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময়, সাধারণ ঝিন্দী সৈনিকের বেশ পরিধান করিয়া গৌরী ও রুদ্ররূপ বাহির হইবার জন্ম প্রস্তুত হইল। যে কক্ষটায় সাজসজ্জা হইতেছিল সেটা রাজার সিঙার-ঘর—অর্থাৎ ড্রেসিং রুম। চম্পাদেই ও ধনঞ্জয় উপস্থিত ছিলেন।

মাথার উপর প্রকাণ্ড জরীদার রেশমী পাগড়ী বাঁধিয়া গৌরী আয়নার সম্মুখীন হইয়া দেখিল, এ বেশে সহসা কেহ তাহাকে চিনিতে পারিবে না। চম্পা ত ধনঞ্জয়ের দিকে ফিরিয়া সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন দেখাচ্ছে?'

ধনঞ্জয় গলার মধ্যে কেবল একটা শব্দ করিলেন; চম্পা সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিল, ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আপনি যদি ভিখিরির সাজ-পোষাক পরেন তবু আপনাকে রাজার মতই দেখায়।

গৌরী মুখের একটু ভঙ্গিমা করিয়া বলিল—'তা বটে। বনেদী রাজা কিনা।—এখন চললাম। তুমি কিন্তু লক্ষ্মী মেয়েটির মত ঘুমিয়ে পড় গিয়ে—আমার জন্যে জেগে থেকো না। যদি জেগে থাকো, কাল সকালেই তোমাকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

এতবড় শাসনবাক্যে ভীত হইয়া চম্পা ক্ষীণস্বরে বলিল, —'আচ্ছা।'

চম্পাকে জব্দ করিবার একটা অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে বুঝিয়া গৌরী মনে মনে হৃষ্ট হইয়া উঠিল। ধনঞ্জয় বিরস গম্ভীর মুখে বলিলেন—'আপনি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আমাকে কিন্তু জেগে থাকতেই হবে।'

অপরাহ্নে ধনঞ্জয়ের প্রতি রূঢ়তায় গৌরী মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল, বলিল—'তা বেশ ত সর্দ্দার। কিন্তু বেশীক্ষণ জাগতে হবে না, আমরা শিগ্‌গির ফিরব।'

প্রাসাদের পাশের একটি ছোট ফটক দিয়া দু'জনে পদব্রজে বাহির হইল। ফটকের শাস্ত্রী রুদ্ররূপের গলা শুনিয়াই পথ ছাড়িয়া দিল, তাহার সঙ্গীটি কে তাহা ভাল করিয়া দেখিল না।

প্রাসাদের প্রাচীর-বেষ্টনী পার হইয়া উভয়ে সিংগড়ের কেন্দ্রস্থলে—যেখানে প্রকৃত নগর—সেইদিকে যাত্রা করিল।

নগরে তখনো রাজ অভিষেকের উৎসব সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই, এখনো গৃহে গৃহে দীপালী জ্বলিতেছে, দোকানে দোকানে পতাকা মালা ইত্যাদি দুলিতেছে। তবু আনন্দের প্রথম উদ্দীপনা যে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোট্ট রাজ্য হইলেও রাজধানীটি বেশ বড় এবং সমৃদ্ধ। সহরের যেটি প্রধান বাজার তাহাতে বহু লোকের ব্যস্ত গমনাগমন ও যানবাহনের অবিশ্রাম গতায়াত বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টির ইঙ্গিত করিতেছে। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুই ধারে উচ্চ তিন-তলা চার-তলা ইমারৎ—কলিকাতার বড় বাজারের সঙ্কুচিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

উৎসুক চক্ষে চারিদিক দেখিতে দেখিতে গৌরী নিজের বর্ত্তমান অবস্থার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যে

গৌরীশঙ্কর রায়—এখানে আসিবার পর হইতে এ'কথাটা এক প্রকার চাপা পড়িয়া গিয়াছিল; অভিনয় করিতে করিতে অভিনেতাটির মনেও একটু আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াছিল। কিন্তু এখন সে আবার নিজের চোখ দিয়া দেখিতে দেখিতে এই নূতনত্বের রস আস্বাদন করিতে করিতে চলিল। যেন বহুদিন পরে নিজের হারানো সত্তাকে ফিরিয়া পাইল।

সহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় তাহাদের মত বেশধারী বহু ফৌজী সিপাহী ও নায়ক হাবিলদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র সেনানী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উপরন্তু এই রাজ্যাভিষেক পর্ব্ব উপলক্ষে জঙ্গী য়ুনিফর্ম্ম পরা একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাই গৌরী ও রুদ্ররূপ কাহারো বিশিষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করিল না।

বাজারের চৌমাথায় এক পানওয়ালীর দোকানে খুশ্‌বুদার পান কিনিবার জন্য গৌরী দাঁড়াইল। দোকানের সম্মুখে বেশ ভিড় ছিল—কারণ এ দোকানের পান শুধু বিখ্যাত নয় পানওয়ালীও রূপসী এবং নবযৌবনা। রুদ্ররূপ পান কিনিবার জন্য ভিড়ের মধ্যে ঢুকিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া অলসভাবে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে হঠাৎ গৌরীর নজরে পড়িল, অনতিদূরে রাস্তার অপর পারে একটা মণিহারীর দোকান। দোকানটি বেশ বড়, কাচ-ঢাকা জানালায় বিলাতী প্রথায় বহুবিধ মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক পণ্য সাজানো রহিয়াছে এবং প্রবেশদ্বারের মাথার উপর বড় বড় সোনালী অক্ষরে সাইন্‌-বোর্ড্ লেখা রহিয়াছে—

প্রহ্লাদ চন্দ্র দত্ত
মণিহারীর দোকান

গৌরীর একটু ধোঁকা লাগিল। প্রহ্লাদ চন্দ্র দত্ত! বাঙালী নাকি? প্রহ্লাদ নামটা বাঙালীর মধ্যে খুব চলিত নয়—কিন্তু প্রহ্লাদ চন্দ্র! ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি ত নামের মধ্যস্থলে 'চন্দ্র' ব্যবহার করে না। শুধু প্রহ্লাদ দত্ত হইলে অন্য জাতি হওয়া সম্ভব ছিল। গৌরী উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বাঙালীর সন্তান এই সুদূর বিদেশে আসিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছে!

রুদ্ররূপ সুগন্ধি মশ্‌লাদার পান আনিয়া হাতে দিতেই গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'রুদ্ররূপ, ঐ দোকানের সাইন-বোর্ড্ দেখ্‌ছ? কোন্ দেশের লোক আন্দাজ করতে পার?'

রুদ্ররূপ বলিল—'না। পাঞ্জাবী হতে পারে।'

গৌরী বলিল—'উঁহু, বোধ হয় বাঙালী। এস দেখা যাক।'

রাস্তা পার হইয়া উভয়ে দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানের ভিতরটি বেশ সুপরিসর—গোটা চারেক ডে-লাইট্ ল্যাম্প্ মাথার উপর জ্বলিতেছে। দূরে ঘরের পিছন দিকে দোকানদারের গদি।

দোকানে প্রবেশ করিয়া প্রথমে গৌরী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তারপর দেখিল, গদির বিছানার উপর মুখোমুখি বসিয়া দুইজন লোক নিম্নস্বরে কথা কহিতেছে—'তুমি না গেলে চল্‌বে না, আমাকে এখনি ফিরতে হবে, সকালে ষ্টেশনে হাজির থাকা চাই'—'না, আজ আমি পারব না, আমার অনেক কাজ'—এক পক্ষের অনিচ্ছা ও অন্য পক্ষের সাগ্রহ উপরোধ, অস্পষ্টভাবে গৌরী শুনিতে পাইল।

রুদ্ররূপ একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইল, মৃদুস্বরে বলিল—'পিছন ফিরে দাঁড়ান, চিনতে পারবে।'

দু'জনে পিছন ফিরিয়া জানালার পণ্য দেখিতে লাগিল। গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'কে ওরা?'

'একজন ঝিন্দের ষ্টেশন মাষ্টার স্বরূপ দাস—অন্যটি বোধ হয় দোকানদার। চলুন, এখানে আর থেকে কাজ নেই।'

'একটু দাঁড়াও।'

মিনিট পাঁচেক পরে ষ্টেশন মাষ্টার অসন্তুষ্টভাবে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। তাহার কয়েকটা অসংলগ্ন কথা গৌরীর কানে পৌঁছিল—'এই রাত্রে শক্তিগড় যাওয়া··· কাল সকালেই আবার ষ্টেশন···

শক্তিগড় শুনিয়া গৌরী কাণ খাড়া করিয়াছিল, কিন্তু আর কিছু শুনিতে পাইল না।

এতক্ষণে দোকানদারের হুঁস হইল যে দুইজন গ্রাহক দোকানে আসিয়াছে। সে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'ক্যা চাঁহিয়ে বাবুসাব?'

পশ্চিমী ধরণে কাপড় ও ছিটের চুড়িদার পাঞ্জাবী পরা দোকানদারকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া কাহার সাধ্য আন্দাজ করে যে সে পুরাপুরি খোট্টা নয়। গৌরী তাহার সম্মুখীন হইল; তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বাংলা ভাষায় বলিল—'তুমি বাঙালী?'

লোকটি প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়াই সভয়ে দু' পা পিছাইয়া গিয়া আভূমি অবনত হইয়া অভিবাদন করিল। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দু'বার ঢোক গিলিয়া বলিল—'হ্যাঁ, আমি বাঙালী। মহারাজ—আপনি—'

'চুপ্'—গৌরী ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিল—'তুমি কতদিন এখানে আছ?'

হাতজোড় করিয়া প্রহ্লাদ বলিল—'আজ্ঞে, প্রায় পনের বছর। এখানেই বসবাস করছি।'

গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি কায়স্থ? বাড়ী কোন জেলায়?'

প্রহ্লাদ বলিল—'আজ্ঞে কায়স্থ, বাড়ী বীরভূম জেলায়। কিন্তু পনের বছর দেশের মুখ দেখিনি। মাঝে মাঝে যেতে বড় ইচ্ছে করে, কিন্তু কারবার ফেলে যেতে পারি না।'

'দেশে তোমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই!'

'আজ্ঞে না। দূর সম্পর্কের খুড়ো জ্যাঠা যারা ছিল তারা বোধহয় এতদিনে মরে হেজে গেছে। আমি এই দেশেই বিবাহাদি করেছি।'

বাংলা দেশের কায়স্থ সন্তান ঝিন্দে আসিয়া কি ভাবে বিবাহাদি করিয়া ফেলিল, গৌরী ঠিক বুঝিল না; কিন্তু প্রহ্লাদ লোকটিকে তাহার মনে মনে বেশ পছন্দ হইল। সে যে অত্যন্ত চতুর লোক এই সামান্য কথাবার্ত্তাতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। গৌরী বলিল—'বেশ বেশ, খুব খুসী হলাম। আমাকে যখন চিন্‌তে পেরেছ তখন বলি, আমি অপ্রকাশ্যভাবে নগর পরিদর্শন করতে বেরিয়েছি, একথা জানাজানি হয় আমার ইচ্ছা নয়। তুমি হুঁসিয়ার লোক, তোমাকে বেশী বলবার দরকার নেই।—এখন তোমার দোকানে উপহার দেবার মত ভাল জিনিস কি আছে দেখাও।'

'যে-আজ্ঞা মহা—শয়'—প্রহ্লাদ ভালমানুষের মত একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিল—'আপনি এত সুন্দর বাংলা বলেন যে আশ্চর্য্য হতে হয়। বাঙালী ছাড়া এরকম বাংলা বলতে আমি আর কাউকে শুনিনি।'

তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া গৌরী বলিল—'তাই নাকি? তবে কি তোমার মনে হয় আমি বাঙালী?'

'না না—সে কি কথা মহারাজ। আমি বলছিলাম—'

'আমি অনেকদিন বাংলা দেশে ছিলাম, তাই ভাল বাংলা বল্‌তে পারি—বুঝ্‌লে?'

প্রহ্লাদ তাড়াতাড়ি সম্মতি-জ্ঞাপক ঘাড় নাড়িল; তারপর স্বয়ং অগ্রগামী হইয়া দোকানের বহুবিধ সৌখীন ও মহার্ঘ্য পণ্যসম্ভার দেখাইতে লাগিল।

গজদন্ত ও সোনারূপার কারুশিল্পের জন্য ঝিন্দ প্রসিদ্ধ; অধিকন্তু অন্যান্য দেশবিদেশের বাহারে শিল্পও আছে। গৌরী পছন্দ করিয়া কয়েকটি জিনিস কিনিল। কিনিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়া নয়, স্বদেশবাসী দোকানদারের প্রতি মমতাবশতঃ প্রায় পাঁচ সাত শত টাকার জিনিস খরিদ হইয়া গেল। গৌরী মনে মনে স্থির করিল খেলনাগুলি সে চম্পাকে উপহার দিবে।

একটি বৈদ্যুতিক টর্চ্চ্ গৌরীর ভারি পছন্দ হইল। হাতির দাঁতের একটি ভুট্টা—প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা—তাহার ভিতরটা ফাঁপা, সেল্ পুরিবার ব্যবস্থা আছে; সম্মুখে কাঁচ বসানো। ভুট্টার গায়ে একটি মাত্র লাল দানা আছে, সেটি টিপিলেই বিদ্যুৎ বাতি জ্বলিয়া উঠে।

টর্চ্চ্‌টি হাতে লইয়া গৌরী বলিল—'এটা আমি সঙ্গে নিলাম। বাকীগুলো প্রাসাদে পাঠিয়ে দিও—কাল দাম পাবে।'

আহ্লাদিত প্রহ্লাদ করজোড়ে বলিল—'যো হুকুম।'

দোকান হইতে বাহির হইয়া দুইজনে নীরবে দক্ষিণমুখে চলিল। এই পথই ঋজু রেখায় গিয়া কিস্তার পুলের উপর দিয়া ঝড়োয়ায় পৌঁছিয়াছে।

ক্রমে দোকানপাট শেষ হইয়া পথ জনবিরল হইতে আরম্ভ করিল। দু'পাশে আর ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ী নাই—মাঝে মাঝে তরুবীথি; তরুবীথির পশ্চাতে ক্বচিৎ দু একখানা বড় বড় বাড়ী। অধিকাংশই ফাঁকা মাঠ।

ঝিন্দের পথে আলোকের ব্যবস্থা ভাল নয়, বিদ্যুৎ এখনো সেখানে প্রবেশ লাভ করে নাই। দূরে দূরে এক একটা কেরাসিন ল্যাম্পের স্তম্ভ; তাহা হইতে যে ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ হইতেছে পথ চলায় পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। নবক্রীত টর্চ্চ্‌টা মাঝে মাঝে জ্বালিয়া গৌরী চলিতে লাগিল।

মাইল খানেক পথ এইভাবে চলিবার পর একটা প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের লোহার রেলিং রাস্তার ধার দিয়া

বহু দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে দেখিয়া গৌরী টর্চ্চের আলো ফেলিয়া ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিল। বিশেষ কিছু দেখা গেল না, কেবল একটা অন্ধকার-দর্শন বাড়ীর আকার অস্পষ্টভাবে চোখে পড়িল। রুদ্ররূপ বলিল—'এটা উদিতের বাগান বাড়ী।'

আরো কিছু দূর যাইবার পর বাগান বাড়ীর উঁচু পাথরের সিংদরজা চোখে পড়িল। তাহারা সিংদরজার প্রায় সম্মুখীন হইয়াছে, এমন সময় দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা ফীটন গাড়ী কম্পাউণ্ডের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাস্তায় পড়িয়াই গাড়ী বিদ্যুদ্বেগে উত্তরদিকে মোড় লইল, গৌরী ও রুদ্ররূপ লাফাইয়া সরিয়া না গেলে গাড়ীখানা তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িত। গৌরী গাড়ীর পথ হইতে সরিয়া গিয়াই গাড়ীর উপর টর্চ্চের আলো ফেলিল। নিমেষের জন্য একটা পরিচিত মুখ সেই আলোতে দেখা গেল; তারপর জুড়ী-ঘোড়ার গাড়ী তীরবেগে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

গৌরী পিছন ফিরিয়া ক্রমশ ক্ষীয়মাণ চক্রধ্বনির দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া কহিল—'ষ্টেশন মাষ্টার স্বরূপদাস। শক্তিগড়ে যাবার জন্যে ভারি তাড়া দেখ্‌ছি।' একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'গাড়ীখানা উদিতের—না?'

রুদ্ররূপ বলিল—'হাঁ! এইখানেই উদিত সিংয়ের আস্তাবল।'

গৌরী কতকটা নিজমনেই বলিল—'উদিতকে কি খবর দিতে গেল কে জানে। জরুরী খবর নিশ্চয়।'

একটা এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। গৌরী আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় উদিতের ফটকের ভিতর হইতে একখণ্ড কাগজ বাতাসে ওলট-পালট খাইতে খাইতে তাহার প্রায় পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া গৌরী দেখিল—একটা টেলিগ্রাম—কৌতূহলবশে তুলিয়া লইয়া পড়িল, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

স্বরূপদাস—ষ্টেশন মাষ্টার, ঝিন্দ্‌

সন্ধান পাইয়াছি, গৌরীশঙ্কর রায় বাঙালী জমিদার চেহারা অবিকল—

কিষণলাল

টেলিগ্রামখানা মুড়িয়া গৌরী পকেটে রাখিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'যাক, জানতে পেরেছে তাহলে। এইজন্যে এত তাড়া।'

পথে আর বিশেষ কোনো কথা হইল না। রুদ্ররূপ দু'একটা প্রশ্ন করিল বটে কিন্তু গৌরী নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিল, উত্তর দিল না।

একসময় বলিল—'প্রহ্লাদও তাহলে ওদের দলে!'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—ন তস্থৌ

পুল পার হইয়া ঝড়োয়ায় পদার্পণ করিবামাত্র পুলের একটা গম্বুজের পাশ হইতে একজন লোক বাহির হইয়া আসিল; চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল—'কে যায়?'

পথে তখন অন্য জনমানব নাই।

সিপাহী বেশী লোকটাকে ভাল ঠাহর করা গেল না; গৌরী প্রশ্ন করিল—'তুমি কে! বিজয়লাল?'

বিজয়লাল বলিল—'হুজুর হাঁ। আপনার সঙ্গে কে?'

'রুদ্ররূপ।'

'ভাল। আমার সঙ্গে আসুন।'

বিজয়লাল আগে আগে চলিল, গৌরী ও রুদ্ররূপ তাহার অনুসরণ করিল। পুলের এলাকা পার হইয়া বড় সড়ক ছাড়িয়া বিজয়লাল বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তা ধরিল। রাস্তায় আলো নাই, পাশের বাড়ীগুলিও অন্ধকার। সুতরাং কোথায় যাইতেছে গৌরী তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু কিস্তার জল যে বেশী দূরে নয় তাহা মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিল।

এইভাবে প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর বিজয়লাল একটি ছোট ফটকের সম্মুখে থামিল, ফটক খুলিয়া বলিল—'আসুন।'

ফটকের মাথায় স্তম্ভের উপর স্বল্পালোক বাতি জ্বলিতেছিল; গৌরী দেখিল, স্থানটা কোনো বড় বাড়ীর খিড়কির বাগান। বাগান নেহাৎ ছোট নয়, বড় বড় ফলের গাছ দিয়া ঢাকা, স্থানে স্থানে বসিবার জন্য তরুমূলে গোলাকৃতি চাতাল তৈরী করা আছে।

গৌরীর মনে ঈষৎ বিস্ময়জড়িত প্রশ্ন জাগিল—'কার বাড়ী ? এ ত ঝড়োয়ার রাজবাড়ী নয়।'

প্রশ্নটা মনে উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর চমক ভাঙিল—মনের প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা এতক্ষণে তাহার সজাগ মনের কাছে মুখোমুখি ধরা পড়িয়া গেল। কৃষ্ণার নিমন্ত্রণের গূঢ়ার্থও বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, এইজন্য কৃষ্ণা ডাকিয়াছে। কিন্তু সে ত বহুপূর্ব্বে তাহা মনে মনে বুঝিয়াছিল! তবু সে আসিল কেন ? কি প্রতিজ্ঞা সে করিয়াছিল।

এখনো ফিরিবার সময় আছে; কাহাকেও কোনো কৈফিয়ৎ না দিয়া সটান ফিরিয়া যাইতে পারে। বিজয়লাল রুদ্ররূপ বিস্মিত হইবে; কিন্তু তাহাতে কি ? সে ত নিজের কাছে খাঁটি থাকিবে! তবে কি ফিরিয়াই যাইবে ?—কিন্তু—

কস্তুরীবাইকে আর একবার দেখিবার লোভ তাহার মনে কিরূপ দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। না না—সে ফিরিয়াই যাইবে।

কিন্তু এ ত ঝড়োয়ার রাজ-প্রাসাদ নয়। তবে কেন বিজয়লাল এখানে আসিয়া থামিল ? কৃষ্ণা কি তবে অন্য কোনো প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিয়াছে!

মনে মনে এইরূপ দড়ি টানাটানি চলিতেছে এমন সময় কৃষ্ণার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'আসুন মহারাজ।'

আর দ্বিধা করিবার পথ রহিল না। সঙ্কুচিত পদে গৌরী ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিল, বলিল—'মহারাজের জয় হোক। বিধি আজ অনুকূল, তাই গরীবের ঘরে মহারাজের পদার্পণ হল।'

গৌরী গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—'কৃষ্ণা, আমায় ডেকে পাঠিয়েছ কেন ?'

কৃষ্ণা হাসিয়া বলিল—'তা ত চিঠিতেই জানিয়েছিলাম মহারাজ—প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।'

গৌরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, সত্যি কি দরকার বল।'

কৃষ্ণা আবার হাসিল, বলিল—'বুঝতে পারেন নি ? আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি।' তারপর বিজয়লালের দিকে ফিরিয়া কহিল—'আপনারা দু'জনে ততক্ষণ আমার বাগানে বসে আলাপ করুন, আমি মহারাজকে নিয়ে এক জায়গায় যাব।' রুদ্ররূপের মুখে ঈষৎ উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখিয়া কহিল—'ভয় নেই, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি মহারাজকে ফিরিয়ে এনে আপনার হেপাজাত করে দেব।—মহারাজ, আমার সঙ্গে চলুন।—' কৃষ্ণা ফটকের বাহির হইল।

প্রবল চুম্বকের আকর্ষণে লোহা যেমন সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া তাহার অভিগামী হয়, গৌরীও তেমনি তাহার অনুবর্ত্তী হইল। ফটক হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণা সম্মুখ দিকে চলিল। অল্পক্ষণ একটা সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া যাইবার পর গৌরী দেখিল, তাহারা কিস্তার তীরে পৌঁছিয়াছে। সম্মুখেই ছোট্ট একটি পাথর বাঁধানো ঘাট, ঘাটে একটি ডিঙি বাঁধা। মাঝি মাল্লা কেহ কোথাও নাই।

কৃষ্ণা সন্তর্পণে ক্ষুদ্র ডিঙিতে উঠিয়া গলুইয়ে বসিল, পাৎলা লঘু দু'খানি দাঁড় হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল—'এবার আপনি আসুন, ঐদিকে বসুন।'

গৌরী ডিঙিতে উঠিয়া বলিল—'দাঁড় আমায় দাও।'

কৃষ্ণা মুখ টিপিয়া হাসিল—'কোথায় যেতে হবে আপনি ত জানেন না। আপনি দাঁড় নিয়ে কি করবেন ?' বলিয়া দাঁড় জলে ডুবাইল।

গৌরী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কৃষ্ণার দাঁড়ের আঘাতে ডিঙি পূর্ব্বমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল—'চুপ করে বসে কি ভাবছেন ?'

কিস্তার জলের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া গৌরী বলিল—'কিছু না।'

দাঁড় টানিতে টানিতে কৃষ্ণা বলিল—'সেদিন আপনি আমাকে যেরকম শাসিয়েছিলেন তাতে বুঝেছিলুম যে সখীকে দেখে আপনার আশা মেটেনি। তাই আজ সেদিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার ব্যবস্থা করেছি। খুশী হয়েছেন ত ?'

গৌরী চুপ করিয়া রহিল, তারপর ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করিল—'তিনি জানেন ?'

কৃষ্ণা মনে মনে হাসিল, বলিল—'জানেন।' ওপক্ষেই যে আগ্রহ ও অধীরতা বেশী তাহা আর প্রকাশ করিল না।

গৌরীর বুকের ভিতরটা টলমল নৌকার মতই একবার দুলিয়া উঠিল; দু'হাতে নৌকার দু'দিকের কানা চাপিয়া ধরিয়া সে বসিয়া রহিল।

রাজবাটির প্রশস্ত ঘাটের পাশ দিয়া একশ্রেণী সঙ্কীর্ণ সোপান উঠিয়া গিয়াছে, কৃষ্ণা সেইখানে নৌকা ভিড়াইল। গৌরী ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, রাজপুরী অন্ধকার নিঃঝুম—কেবল দ্বিতলের একটি জানালা হইতে দীপালোক নির্গত হইতেছে।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে কৃষ্ণা নিম্নস্বরে বলিল, 'এটি আমার নিজস্ব সিঁড়ি, একেবারে সখীর খাস-মহলে গিয়ে উঠেছে।'

সোপানশীর্ষে একটি মজবুত কাঠের দরজা; কৃষ্ণা আঁচল হইতে চাবি লইয়া দ্বার খুলিল। কবাট উন্মুক্ত করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া অঞ্জলিবদ্ধহস্তে বলিল—'স্বাগত!'

ভিতরে একটি অলিন্দ—অন্ধকার। কৃষ্ণা গৌরীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল—'আমার হাত ধরে আসুন।'

অলিন্দ পার হইয়া একটি নাতি বৃহৎ ঘর। মেঝেয় গালিচা পাতা, গালিচার উপর একস্থানে পুরু গদির উপর মখ্‌মলের জাজিম, তাহার উপর মোটা মোটা মখমলের জরিদার তাকিয়া। আতরদান গোলাপপাশ ইত্যাদি ইতস্তত ছড়ানো—একটি সোনার আলবোলার শীটে সুগন্ধ তামাকুর ধুম ধীরে ধীরে পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। মাথার উপর দুটি মোমবাতির ঝাড় স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিতেছে। এই ঘরের আলোই গৌরী ঘাট হইতে দেখিতে পাইয়াছিল।

আলোকিত ঘরে প্রবেশ করিয়াই গৌরীর হৃৎপিণ্ড একবার ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া উঠিল, গলার পেশীগুলা কণ্ঠ আঁটিয়া ধরিল। সে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে চাহিল—ঘরে কেহ নাই।

'আপনি ততক্ষণ বসে তামাকু খান্, আমি এখনি আসছি' বলিয়া গৌরীকে বসাইয়া হাসিমুখে কৃষ্ণা প্রস্থান করিল।

দুখানা ঘর পরেই কস্তুরীর শয়ন কক্ষ। ঘর প্রায় অন্ধকার, কেবল এককোণে একটি বাতি জ্বলিতেছে। কৃষ্ণা ঘরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর শয্যার দিকে নজর পড়িতেই দ্রুতপদে পালঙ্কের পাশে গিয়া বলিল, —'একি কস্তুরী! শুয়ে যে!'

লাল চেলির পট্টবস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া কস্তুরী শুইয়া আছে; শুভ্র বালিশের উপর তাহার মুক্তাখচিত কবরীর কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণার সাড়া পাইয়া সে আরো গুটাইয়া শুইল, বালিশের ভিতর হইতে মৃদু রুদ্ধ স্বরে বলিল—'না কৃষ্ণা, আমি পারব না, তুই যা।'

কৃষ্ণা শয্যার পাশে বসিয়া বলিল—'সে কি হয় সখি! অতিথিকে ডেকে এনে এখন 'না' বললে কি চলে? ওঠ।'

কস্তুরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না না কৃষ্ণা, আমার ভারি লজ্জা করছে।'

কৃষ্ণা বলিল—'তা করুক। প্রথম প্রথম অমন একটু করে। চোখোচোখি হলেই সেরে যাবে।'

'না, আমি পারব না কৃষ্ণা। ছি, যদি বেহায়া মনে করেন?'

কৃষ্ণা এবার রাগিল, বলিল—'তবে দেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলে কেন? আর আমাকেই বা পাগল করে তুলেছিলে কেন? মহামান্য অতিথিকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে দেখা না করে ফিরিয়ে দেবে? তাতে তিনি কিছু মনে করবেন না?'

কস্তুরী কাতরস্বরে বলিল—'তুই রাগ করিস্‌নি কৃষ্ণা। আমি যে পারছি না—ত্যাখ্, আমার হাত-পা কাঁপছে।' বলিয়া কৃষ্ণার হাত লইয়া নিজের বুকের উপর রাখিল।

কৃষ্ণা তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'সখি, বুক কাঁপছে বলে ভয় করলে চলবে কেন? আজি প্রিয়তম তোমার ঘরে এসেছেন, আজ ত 'রোমে রোমে হরখিলা' লাগবেই। আজ কি লজ্জা করে বিছানায় শুয়ে থাকতে আছে! ওঠ ওঠ সখি, 'ন যুক্তং অকৃতসৎকারং অতিথিবিশেষং উজ্‌ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্—থুড়ি—শয়নম্' বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

কস্তুরী কৃষ্ণার কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপি চুপি বলিল—'সেদিন আচম্‌কা দেখা হয়েছিল—কিন্তু আজ এমনভাবে সেজেগুজে তাঁর কাছে যেতে বড্ড লজ্জা করবে যে কৃষ্ণা।'

কৃষ্ণা বলিল—'বেশ, আজ তোমার লজ্জাই দেবতাকে ভোগ দিও—তাতেও ঠাকুর খুশী হবেন। আর দেরী কোরোনা; তিনি কতক্ষণ একলাটি বসে আছেন।'

কস্তুরী উঠিয়া দাঁড়াইল—'আচ্ছা—কিন্তু তুই থাকবি ত?'

'থাকব। যতক্ষণ তোমাদের বিয়ে না হচ্ছে ততক্ষণ তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না।'

'আচ্ছা, তুই তবে এগিয়ে যা। আমি—যাচ্ছি।'

'দেখো, আবার শুয়ে পড়ো না কিন্তু। আর বরের জন্তে নিজে হাতে করে পান নিয়ে এস।' বলিয়া কৃষ্ণা প্রস্থান করিল।

তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গৌরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়াছিল, কৃষ্ণা ফিরিয়া আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল—'কৃষ্ণা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

অবাক হইয়া কৃষ্ণা তাহার মুখের পানে তাকাইল—'সে কি মহারাজ! আপনি কি রাগ করলেন?'

'না না, কৃষ্ণা তুমি আমার কথা বুঝ্‌বে না, শিগ্‌গির আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।'

'কিন্তু সখী যে এই এলেন বলে!'

'তিনি আসবার আগেই আমি যেতে চাই। চল।' বলিয়া সে কৃষ্ণার হাত ধরিল—

'কিন্তু আমি যে কিছুই—'

'বুঝবে না। তোমরা কেউ বুঝবে না। হয়ত কোনোদিন—কিন্তু এখন সে থাক। চল।' কৃষ্ণাকে সে একরকম জোর করিয়াই দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

অলিন্দের সম্মুখে পৌঁছিয়া সে একবার ফিরিয়া চাহিল। তাহার গতি শিথিল হইয়া গেল, বুকের ভিতর রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। ঘরের অপরপ্রান্তে দ্বারের সম্মুখে কস্তুরী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার হাতে পানের করঙ্ক, পরিধানে রক্তের মত রাঙা চেলি। চোখে ঈষৎ বিস্ময়ের স্থির দৃষ্টি।

গলার মধ্যে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া গৌরী মুখ ফিরাইয়া লইল। তারপর অন্ধের মত সেই অলিন্দের ভিতর দিয়া কৃষ্ণাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

কৃষ্ণার হাত যে তাহার বজ্রমুষ্টিতে বাঁধা আছে তাহা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

* * * *

ধনঞ্জয়ের একটু ঢুল আসিয়াছিল, গৌরী ও রুদ্ররূপ প্রবেশ করিতেই তিনি ঘড়ির দিকে একবার তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৌরী কোনো কথা না বলিয়া আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মাথা হইতে পাগ্‌ড়ীটা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া গলার বোতাম খুলিতে লাগিল।

ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর শুধু বলিলেন—'হুঁ।'

গৌরী কষায়িত চক্ষে একবার তাঁহার পানে চাহিল; যেন আর একটি কথা বলিলেই সে বাঘের মত তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

ধনঞ্জয় কিন্তু তাহাকে কিছু বলিলেন না, রুদ্ররূপের দিকে ফিরিয়া তন্দ্রালস ভারী গলায় বলিলেন—'রুদ্ররূপ, আজ তুমি পাহারায় থাক। আমি চললাম।' বলিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধনঞ্জয় চলিয়া গেলে গৌরী সহসা রুদ্ররূপের দিকে ফিরিয়া বলিল—'রুদ্ররূপ, আজ আমাকে পাহারা দেবার দরকার নেই। তুমি যাও—শুধু আজকের রাত্রিটা আমাকে একলা থাকতে দাও। দোহাই তোমাদের।'

গৌরীর কণ্ঠস্বরে এমন একটা উগ্র বেদনা ছিল যে ক্ষণকালের জন্য রুদ্ররূপকে বিমূঢ় করিয়া দিল; কিন্তু পরক্ষণেই সে সসম্ভ্রমে স্যালুট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ



জার্ম্মাণীর অষ্ট্রীয়া গ্রাস

অতুল দত্ত

(রাজনীতি)

গত মার্চ্চ মাসে ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে এক অভিনব ঘটনা ঘটিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে যে সন্ত্রাসবাদের অবতারণা করিয়া ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় গত পাঁচ বৎসর কাল ইউরোপের সকল শক্তিকে সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে, সেই সন্ত্রাসবাদের সাহায্যেই মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হার হিট্লার ৭৫ লক্ষ নরনারী অধ্যুসিত অষ্ট্রীয়া রাজ্যে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছেন।

হার হিট্লার অত্যন্ত চতুরতার সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে জার্ম্মাণীর সৈন্যবাহিনীর উপর নাৎসী দলের প্রভাব স্থাপন করিয়া হার হিট্লার নিজেকে সেনা-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তৃরূপে অধিষ্ঠিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনা-বিভাগের "অবাঞ্ছিত" ব্যক্তিদিগকে কৌশলে অথবা বলপ্রয়োগে অপসারণ করা হয়। তারপর হার হিট্লার অষ্ট্রীয়ার তৎকালীন চ্যান্সেলার ডাঃ সুস্নিগ্কে আপনার বাসস্থান বার্চেস্গ্যাডেনে আহ্বান করেন। শুনা যায়, হিট্লার সেখানে সুস্নিগের সহিত অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত উদ্ধতভাবে তাঁহাকে কতকগুলি দাবী জানাইয়াছিলেন। বার্চেস্গ্যাডেনের নিভৃত কক্ষে কি কি দাবী উপস্থাপিত হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না। তবে, এই সময়ের ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিলে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ডাঃ সুস্নিগ্ ভিয়েনায় পৌছিয়া অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন সাধন করেন। নূতন মন্ত্রিসভায় নাৎসী নেতা ডাঃ সাইস্-ইন্-কোয়ার্টের হস্তে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভার অর্পিত হয়। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণীর পদচ্যুত প্রধান সেনাপতি জেনারল ক্রীজের অন্তরঙ্গ বন্ধু ফিল্ড-মার্শাল্ ফ্যান্জ জান্সাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। অষ্ট্রীয়ার অধিকাংশ নাৎসী বন্দীই মুক্তিলাভ করে; বে-আইনী নাৎসী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। হার হিট্লারের দাবী পূরণের উদ্দেশ্যেই যে ডাঃ সুস্নিগ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হার হিট্লার কেবল তাঁহার দাবী উপস্থাপিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সুস্নিগ্ ভিয়েনায় প্রত্যাগমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে জার্ম্মান্ সৈন্য সন্নিবিষ্ট হইতে আরম্ভ হয়।

লক্ষ্য করিতে হইবে, অষ্ট্রীয়ার সামরিক বিভাগ এবং পুলিশবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপর নাৎসী প্রভাব বিস্তারের জন্য হিট্লার সর্ব্বপ্রথম জিদ্ ধরিয়াছিলেন। এই দুইটী বিভাগে নাৎসী প্রভাব স্থাপন, নাৎসী বন্দীদিগের মুক্তি এবং নাৎসী প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার—অষ্ট্রীয়ায় নাৎসী অগ্রগতির প্রথম সূচনা।

অষ্ট্রীয়ার নাৎসীগণ মুক্তি পাইবামাত্র নানারূপ অধিকার দাবী করিয়া সর্ব্বত্র দারুণ অশান্তি সৃষ্টি করে। এদিকে নাৎসী নেতা সাইস্-ইন্-কোয়ার্ট জার্ম্মাণীতে গমন করিয়া গোপন পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। কোন্ মুহূর্ত্তে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, প্রধানতঃ তাহাই যে দুইজন নাৎসী নেতা আলোচনা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাইস্-ইন্-কোয়ার্ট অষ্ট্রীয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশিষ্ট নাৎসী নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অকস্মাৎ চারিদিকে নাৎসী আন্দোলন এরূপ প্রবল আকার ধারণ করে যে ডাঃ সুস্নিগ্ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। ইতঃপূর্ব্বে পুলিশ ও সেনাবিভাগের উপর নাৎসী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই তখন এই নাৎসী আন্দোলন দমন করা ডাঃ সুস্নিগের সাধ্যাতীত। কয়েক দিনের মধ্যেই অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠে যে অষ্ট্রীয়াকে নাৎসীদিগের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে দেশবাসীর মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। তদনুসারে ডাঃ সুস্নিগ্ ঘোষণা করেন যে এই বিষয়ে অষ্ট্রীয়ার জনমত গৃহীত হইবে।

ডাঃ সুস্নিগের এই সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিবামাত্র

হিট্‌লার মনে করিলেন, এইবার সুযোগ আসিয়াছে—আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ সুস্‌নিগের নিকট পর পর দুইখানি চরমপত্র প্রেরণ করিলেন। প্রথমখানিতে জনমত গ্রহণের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে বলা হইল। এই দাবী মানিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ আসিল—ডাঃ সুস্‌নিগ্‌কে পদত্যাগ করিতে হইবে। চরমপত্র প্রেরণের অব্যবহিত পরেই স্তালস্‌বার্গে ও অষ্ট্রীয়া সীমান্তের অন্যান্য নগরে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ সৈন্য উপস্থিত হইল। তারপর জার্ম্মাণ সৈন্য ব্রেণার গিরিবর্ত্মে উপস্থিত হয়। ১৪ই মার্চ্চ তারিখে অষ্ট্রীয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্যের সংখ্যা দুই লক্ষে পরিণত হইয়াছিল, বিভিন্ন প্রধান নগরগুলির উপর দিয়া অসংখ্য বোমাবর্ষী বিমান উড়িয়া বেড়াইতেছিল। ১২ই মার্চ্চ তারিখে হিট্‌লার সদলবলে অষ্ট্রীয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি তাঁহার জন্মস্থান লিঞ্জ এবং পরে তথা হইতে ভিয়েনায় গমন করেন। বিভিন্ন স্থানে নাৎসীগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করে। ডাঃ সুসনিগ্‌ পদত্যাগ করিবার পরই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডাঃ সাইস্‌ইন্‌-কোয়ার্ট প্রথমে চ্যান্‌সেলারের পদে এবং পরে প্রেসিডেণ্ট মিক্‌লাস্‌ পদত্যাগ করিবার পর প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত হন। হার হিট্‌লার লিঞ্জে আগমন করিবামাত্র ডাঃ সাইস্‌-ইন্‌-কোয়ার্ট ঘোষণা করেন যে অষ্ট্রীয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সংক্রান্ত সন্ধি বাতিল করা হইল। তারপর হিট্‌লার ভিয়েনায় আগমন করিবার পর বিশ্বজগৎ সবিস্ময়ে শ্রবণ করিল—By a law···the "Anschluss" (union) of Austria and Germany has been brought into effect. The Austrian Army has been incorporated in German Reichswehr and the Austrian Foreign office merged with the German diplomatic service. A plebiscite on the changes is so be held next month. পরে এই plebisciteএর দিন ১০ই এপ্রিল নির্দ্ধারিত হয়। হার হিট্‌লার জার্ম্মাণীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে এই Anschluss সম্বন্ধে ঐ সময়ে জার্ম্মাণীতেও জনমত গৃহীত হইবে।

এইরূপ নাটকীয়ভাবে অষ্ট্রীয়ার রাজনীতিক ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিবার পর তথায় ইহুদিদিগের উপর এবং নাৎসী-বিরোধী ব্যক্তিদিগের উপর দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। ইহুদিদিগের ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, সরকারী কার্য্য হইতে তাহারা বহিষ্কৃত হইয়াছে, ঘাটে পথে সর্বত্র তাহাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে। নাৎসী-বিরোধী অষ্ট্রীয়াবাসীদিগের উপরও দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়ায় সাড়ে ছয় হাজার নাৎসী-বিরোধী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ধৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সিগ্‌মাণ্ড ফ্রয়েড্‌ এবং ব্যারণ রথ্‌চাইল্ডের ন্যায় ব্যক্তিও আছেন। নাৎসীদিগের উৎপীড়ন অষ্ট্রীয়ায় এইরূপ ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে যে, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়া অপমান ও উৎপীড়ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন। গত ১২ই মার্চ্চ হইতে ২১শে মার্চ্চের মধ্যে অষ্ট্রীয়ায় ৯৪জন আত্মহত্যা করিয়াছেন। আত্মহত্যাকারীদিগের মধ্যে একজন অষ্ট্রীয়ার ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার এবং একজন ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার মেজর কে তাঁহার পত্নী ও পুত্রসহ আত্মহত্যা করিয়াছেন।

ডাঃ সুস্‌নিগের বিরুদ্ধে দুইটী হাস্যোদ্দীপক অভিযোগ আনীত হইয়াছে। একটী অভিযোগ—তিনি চ্যান্‌সেলারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় ডাঃ ডল্‌ফাসের হত্যাকারীদিগকে অন্যায় বিচারে দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল; অন্য একটী অভিযোগ—তিনি অন্যায়ভাবে জনমত গ্রহণ করিয়া আপনার সমর্থন লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হার হিট্‌লারের এই ব্যবস্থায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে হিট্‌লার কর্ত্তৃক তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীকে হত্যার সেই মর্ম্মন্তুদ কাহিনী যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা বুঝিবেন—এই ক্ষমতা-মদমত্ত রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে আপনাকে নিষ্কণ্টক করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ সুস্‌নিগের বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কতদূর স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে হার হিট্‌লারের জনমত গ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। ডাঃ সুস্‌নিগের জনমত গ্রহণের সিদ্ধান্তকে তিনি বিরাট ধাপ্পা আখ্যা দিয়াছেন এবং এই জালিয়াতীর জন্য তাঁহাকে বিচারালয়ে উপস্থাপিত করিতেছেন। কিন্তু হার হিট্‌লার নিজে অষ্ট্রীয়ার জনমত গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়া যে বিরাট প্রবঞ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি কোন্‌ বিচারালয়ে

উপস্থাপিত হইবার যোগ্য ? তিনি তরুণবয়স্ক নাৎসীদিগকে ভোটাধিকার দানের উদ্দেশ্যে ভোটদাতৃগণের বয়সের সীমা ২৪ বৎসর হইতে হ্রাস করিয়া ২০ বৎসর করিয়াছেন; অস্পৃশ্য ইহুদীদিগকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন; প্রত্যেক নাৎসী-বিরোধী ব্যক্তিকে পূর্ব্ব হইতেই গ্রেপ্তার করিতেছেন; সমগ্র অষ্ট্রীয়ার নাৎসী-বিরোধীদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া দারুণ ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় নাৎসী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রস্তাবিত plebiscite যে প্রবঞ্চনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। জার্ম্মাণীর plebiscite সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক মার্কিন ধর্ম্মযাজক হিট্‌লারী রাজত্বের মহিমা বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীতে এরূপভাবে জনমত নিগৃহীত হইয়াছে যে তথায় কোন পিতা তাঁহার পুত্রকে শাসন করিতে সাহসী হন না। ঘাটে, পথে, চায়ের দোকানে, প্রমোদভবনে সর্ব্বত্র হিট্‌লারী গুপ্তচরগণ উৎকর্ণ হইয়া আছে। ব্যক্তিগত আলোচনায় নাৎসী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এ হেন জার্ম্মাণীতে জনমত গ্রহণের প্রহসন রাজনীতিক্ষেত্রে কৌতুকের সৃষ্টি করে।

হার হিট্‌লার অষ্ট্রীয়া গ্রাসে উদ্যত হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ মুসোলিনির নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্তির আশঙ্কা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারেন নাই। তাই ব্রেণার গিরিবর্ত্মে জার্ম্মান্ সৈন্য সমাবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসোলিনিকে স্বহস্তে লিখিলেন—at the critical hour for Italy, I demonstrated to you the strength of my sentiments. I do not doubt in future also nothing will be changed in this respect. আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় যখন ইটালীর বিরুদ্ধে economic sanctions প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন জার্ম্মাণী সেই ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে নাই। হিট্‌লার তাঁহার লিপিতে সেই কথারই উল্লেখ করেন। মুসোলিনি এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া চিন্তিত হইলেন; এই সেদিন জার্ম্মাণী পরিভ্রমণের সময় তিনি ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। আজ হিট্‌লার তাঁহার স্বহস্তলিখিত লিপিতে সেই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইলেন! "টাইমস্" পত্রিকার ভাষায় after wobbling dangerously মুসোলিনি হিট্‌লারের পত্রের উত্তর লিখিলেন—We shall never forget that (etc). হিট্‌লার নিশ্চিন্ত হইয়া মুসোলিনিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

মুসোলিনির নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্তির আশঙ্কা করা হিট্‌লারের পক্ষে স্বাভাবিক। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে অষ্ট্রীয়ার উপর মুসোলিনির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সে প্রভাব এত দিন অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ বৎসর জুলাই মাসে অষ্ট্রীয়ার চ্যান্‌সেলার ডাঃ ডল্‌ফাস্ যখন নাৎসীদিগের হস্তে নিহত হন, তখন তত্রত্য নাৎসী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। জার্ম্মাণী তখন অষ্ট্রীয়ার নাৎসীদিগের সাহায্যার্থে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই; কারণ মুসোলিনি তখন ব্রেণার গিরিসঙ্কটে সৈন্য সমাবেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রয়োজন হইলে অষ্ট্রীয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। মনে রাখিতে হইবে, জার্ম্মাণীর সহিত ইটালীর বন্ধুত্ব অধিক দিনের নহে—আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় এই বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। ইটালী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়ায় অষ্ট্রীয়ার উপর ইটালীর প্রভাব একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গত জানুয়ারী মাসে বুডাপেষ্ট সম্মিলনীতে অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরী সম্পূর্ণরূপে ইটালীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। এই সম্মিলনীতে তাহারা ইটালী ও জার্ম্মাণীর মিলনে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, "কমিণ্টার্ণ" বিরোধী চুক্তির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া নিজ নিজ দেশে "কম্যুনিজম্" দমন করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল, সর্ব্বোপরি স্পেনের ফ্যাসিষ্ট নেতা জেনারল ফ্রাঙ্কোর সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। আজ সেই ইটালী হিট্‌লারের মন রাখিবার জন্য অষ্ট্রীয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অগ্রসর হইল না! ফ্রান্স যখন অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে সম্মিলিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ইটালীকে আমন্ত্রণ করিল, তখন মুসোলিনি স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, তিনি জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না।

অষ্ট্রীয়া অধিকার সম্পর্কে হিট্‌লার কৌশলে মুসোলিনির সম্মতি লাভ করিলেও জার্ম্মাণীর সীমান্ত আল্‌প‌্স্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় Pan-Germanism যেরূপ প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইটালী বিশেষ স্বস্তি বোধ করিতেছে

না। গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখে মুসোলিনি প্রতিনিধি-সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে রোম-বার্লিন মেরুদণ্ডের মহিমা বর্ণনা করিলেও তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন—for us—fascists all Frontiers will be defended. মুসোলিনি বিস্মৃত হন নাই যে, জার্ম্মান্-অষ্ট্রীয়ার দক্ষিণ টাইরল্ জেলাটি গত মহাযুদ্ধের পর ইটালীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; মুসোলিনি এই জেলার জার্ম্মান্ ভাষায় লিখিত সমস্ত প্রাচীরলিপি নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন এবং তথায় ইটালীয় ভাষা প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আজ মুসোলিনিকে তুষ্ট করিবার জন্য হিট্‌লার বলিতেছেন, জার্ম্মাণীর দক্ষিণ সীমান্ত ব্রেণার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা; This decision will never be touched or questioned. অথচ হিট্‌লার গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাহার "Mein Kampf" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—The confines of Reich must include every single Germans. কিরূপে প্রত্যেক জার্ম্মান্‌কে Reichএর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব তৎসম্পর্কে হিট্‌লার বলিয়াছেন—For the liberation of oppressed and cut off splinters of a race or of the provinces of an Empire is not effected by reason of any desire of the oppressed population or of a protest by those who remain, but by whatever means of power is still possessed by the remainder of the fatherland which was common to all. It is not by flaming protest that oppressed lands are brought back into the embrace of a common Reich, but by a mighty sword. প্রত্যেক জার্ম্মাণকে Reichএর অন্তর্ভুক্ত করিবার এই আকাঙ্ক্ষা—ব্রেণার পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর সীমান্ত বিস্তৃত হওয়ায় কিরূপে পূর্ণ হইবে? দক্ষিণ টাইরলে জার্ম্মাণ জাতির যে cut off splinters রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে হিট্‌লার উদাসীন থাকিবেন ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা সম্ভব? Mein Kampf গ্রন্থে অষ্ট্রীয়া সম্বন্ধে হিট্‌লার বলিয়াছেন—From my earliest youth I was convinced that Austria's destructiou was a necessary condition for the security of the German race. আজ অষ্ট্রীয়ার ধ্বংস সাধিত হইল; এক্ষণে হিট্‌লার তাঁহার অন্যান্য কল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ খুঁজিবেন ইহা নিশ্চিত।

অষ্ট্রীয়ার ধ্বংস সাধিত হওয়ায় বৃটেন্ কপট অশ্রুপাত করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিট্‌লারের এই রাজনীতিক দস্যুবৃত্তিতে বৃটেনের গোপন সমর্থন ছিল। সংবাদপত্রের পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, জার্ম্মাণীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে গত নভেম্বর মাসে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স জার্ম্মাণীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; এই ঘটনাটী অবলম্বন করিয়া মিঃ চেম্বারলেনের সহিত মিঃ ইডেনের মনোমালিন্য ঘটে এবং মিঃ ইডেন্ পদত্যাগ করিতে চাহেন। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স জার্ম্মাণী হইতে প্রত্যাগমন করিলে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, জার্ম্মাণীকে যে সকল সর্ত্তে বৃটেন্ শান্ত করিতে চাহিতেছে, তাহার মধ্যে একটী সর্ত্ত জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক অষ্ট্রীয়া আত্মসাতে সম্মতি। তখন বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দৃঢ়তার সহিত বলা হয় নাই যে এই সকল জনরব ভিত্তিহীন। তখন হ্যালিফ্যাক্স-হিট্‌লার সাক্ষাৎকার সম্পর্কে যে সকল সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার সবগুলিই অস্পষ্টতা পূর্ণ। কাজেই হ্যালিফ্যাক্স যে অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে উল্লিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন সুযুক্তিপূর্ণ কারণ নাই। জার্ম্মাণীর এই কার্য্যের বিরুদ্ধে লোকলজ্জার ভয়ে ফ্রান্সের সহিত একযোগে বৃটেন্ যে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল উহাতে তাহার আন্তরিকতা ছিল না ইহা নিঃসন্দেহ।

অষ্ট্রীয়া সম্পর্কে বৃটেন্ যতই কুম্ভীরাশ্রু পাত করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে বৃটেন্ আজ আনন্দিত হইয়াছে। বহু দিন হইতে বৃটেন্ রোম-বার্লিন মেরুদণ্ডে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু এতদিন তাহার এই প্রচেষ্টা বাতুলতার পরিচায়ক হইয়াছে। আজ হিট্‌লারের প্যান্-জার্ম্মাণিজম্ রোম-বার্লিন মেরুদণ্ডের ভিত্তি বিকম্পিত করিয়াছে। জার্ম্মাণীর সীমান্ত আল্‌পস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় হিট্‌লারের সর্ব্ব-জার্ম্মাণ মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে ইন্ধন প্রাপ্ত হইল উহা ইটালীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে; সে তাহার পররাষ্ট্র নীতিতে রোম-বার্লিন্ মেরুদণ্ডকে একমাত্র আশ্রয়রূপে ধরিয়া থাকিতে আর সাহসী হইতেছে না। এইজন্য এক্ষণে রোমে যে ইঙ্গ-ইটালীয় আলোচনা চলিতেছে, তাহাতে ইটালীর দিক হইতে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সঙ্কটাপন্ন জেকোশ্লোভেকিয়া

এই প্রসঙ্গে জেকোশ্লোভেকিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। জেকোশ্লোভেকিয়াকে কুক্ষিগত করা হিট্‌লারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অষ্ট্রীয়ায় নাৎসী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র জেকোশ্লোভেকিয়ার ৩৫ লক্ষ Sudeten জার্ম্মাণ তাহাদিগের অস্বাভাবিক দাবীগুলি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে। এক সময় এইরূপ আশঙ্কাও হইয়াছিল যে হিট্‌লার অষ্ট্রীয়ার কার্য্য সমাধা করিয়া জেকোশ্লোভেকিয়ার স্কন্ধে লম্ফ প্রদান করিবেন। এই সময় ফ্রান্স দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করে যে, জেকো-শ্লোভেকিয়া আক্রান্ত হইলে সে নিষ্ক্রিয় থাকিবে না— বৃটেনের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবে। রুশিয়া জানাইয়াছিল যে ফ্রান্স যদি জেকোশ্লোভেকিয়ার সহায়তায় অগ্রণী হয়, তাহা হইলে সে-ও তাহাকে সাহায্য করিবে। কাজেই হিট্‌লার তখন জেকোশ্লোভেকিয়ার অঙ্গস্পর্শ করিয়া ফ্রান্স ও রুশিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু জেকোশ্লোভেকিয়া নিরাপদ নহে। তথায় Sudeten জার্ম্মাণদিগের আন্দোলন সমভাবেই চলিতেছে ; তাহাদিগের দলও ক্রমে পুষ্টিলাভ করিতেছে। জার্ম্মাণ কৃষক দল এবং ক্রিশ্চিয়ান্ সোস্যালিষ্ট দল তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছে। এই দুইটী দলের প্রতিনিধি মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছে। জেকোশ্লোভেকিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ হড্‌জা জার্ম্মাণদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেকোশ্লোভেকিয়ার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে শতকরা ২২ ভাগ জার্ম্মাণ প্রতিনিধি থাকিবে এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিতে জার্ম্মাণ অধিবাসীর আনুপাতিক সংখ্যায় প্রতিনিধি থাকিবে। ইহার ফলে, যে সকল স্থানে জার্ম্মাণ অধিবাসিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথায় তাহারা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভ করিবে। এই সকল সুবিধা দানে জার্ম্মাণ অধিবাসিগণ সন্তুষ্ট হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহ ; কারণ জেকোশ্লোভেকিয়ায় অশান্তি জাগাইয়া রাখিবার জন্য নাৎসী প্ররোচকগণ যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া হিট্‌লার একদিন উপযুক্ত মুহূর্ত্তে জার্ম্মাণীর সহিত জেকোশ্লোভেকিয়ার Anschluss সাধনে অগ্রণী হইবেন।

জেকোশ্লোভেকিয়া সম্পর্কে বৃটেনের মনোভাব আপাত-দৃষ্টিতে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বৃটেন্ মধ্য-য়ুরোপ সম্পর্কে জার্ম্মাণীর যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা দিয়াছে। হিট্‌লারকে এই উৎকোচ প্রদান করিয়াই লর্ড হ্যালিফ্যাক্স তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলেন— জার্ম্মাণীর ঔপনিবেশ পুনঃপ্রাপ্তির দাবীর সাময়িক বিরতি। সংবাদপত্রের পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, গত নভেম্বর মাসে হ্যালিফ্যাক্সের সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরেই হার হিট্‌লার তাঁহার অগাস্‌বার্গের বক্তৃতায় অকস্মাৎ সুর বদলাইয়া বলিয়াছিলেন, উপনিবেশের দাবী ছয় বৎসর কাল ধরিয়া জানাইতে হইবে। হ্যালিফ্যাক্স কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে যে বিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে উহা হইতে জানা যায়, জার্ম্মাণীর অষ্ট্রীয়া আত্মসাতের স্বীকৃতি ব্যতীত আরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল—সুইট্-জারল্যাণ্ডের মত যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অছিলায় জেকোশ্লো-ভিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা। হ্যালিফ্যাক্স কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে প্রকাশিত এই সংবাদ যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা আজ মিঃ চেম্বারলেনের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বুঝা যাইতেছে। মিঃ চেম্বারলেন কিছুতেই জেকোশ্লোভেকিয়া সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না। প্রথমবার বিরোধী দল কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,এই সঙ্গীন বিষয়ে সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে তিনি রাজী নহেন। তারপর গত ২৪শে মার্চ তারিখে তিনি যখন কমন্স সভায় পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁহার অতি প্রত্যাশিত ঘোষণা বাণী পাঠ করেন তখনও তিনি কৌশলে এই প্রসঙ্গটী এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি সকল দিক বজায় রাখিয়া বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী ও জেকোশ্লোভেকিয়ার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য সকল প্রকার সাহায্য দানে বৃটেন প্রস্তুত আছে। জেকো-শ্লোভেকিয়া বিপন্ন হইলে তাহাকে সামরিক সাহায্য দানে বৃটেন অগ্রণী হইবে কি না তৎসম্পর্কে কোন কথা বলা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন না ; কারণ তৎসম্বন্ধে কোন কথা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলিলে, উহা কূটনীতির পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে এবং নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিবে।

হরিপুরার পাড়ি

শ্রীআশু দে

ভ্রমণ

প্রবীণতার প্রধান বিড়ম্বনা রস-গ্রহণ-বৃত্তির খর্ব্বতা। একটা স্থূল উপমার ভাষায় বলা যায়—সিমেণ্ট কাঁচা থাকিলেই রেখাপাত সম্ভব হয়। একবার কঠিন হইয়া জমিয়া গেলে—লক্ষ আঁচড়েও কোনো দাগ বসে না।

সাত বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসে গিয়াছিলাম—করাচীতে। সে অভিজ্ঞতার বিবরণ এই পত্রিকাতেই ১৩৩৮ সালের আষাঢ় সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল এবং তাহাতে কৌতুক-রসের উপাদানের অভাব ছিল না এইরূপ অভিমত শুনিয়াছিলাম।

করাচী কংগ্রেসের সরসতা হরিপুরায় পাই নাই। হরিপুরাকে দোষ দিবার পূর্ব্বে পত্রিকাপত্রের দিকে চাহিলাম। সাত বছর চলিয়া গিয়াছে। যে উৎসুক চোখের সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টিতে কোনো রসবস্তু রেহাই পায় নাই, সে চোখের উপর প্রবীণতার ঘন পরদা পড়িয়া গিয়াছে।

অতএব রস-সৃষ্টির মিথ্যা প্রয়াস ত্যাগ করিলাম। সাদা কথায় এবং চলতি ভাষায় কয়েকটি দিনের ইতিহাস শুনাইয়া যাইব। রসাহরণের ভার পাঠক-পাঠিকার উপরে ছাড়িয়া দিলাম।

* * * * *

সেবারে যেতে হয়েছিল শ্রীযুক্ত তুষারকান্তির উপরোধে—তাঁর পত্রিকার বিশিষ্ট প্রতিনিধি হয়ে—এবারেও তাই—প্রভেদ এই ছিল যে এবারে সম্পাদক-প্রবর স্বয়ং সঙ্গ নিয়েছিলেন এবং ছিলেন তাঁর ভাগিনেয় শচীবিলাস। এই "ত্রিমূর্ত্তির" বিশদ পরিচয়ের প্রয়োজন পরে পূর্ণ প্রকাশ পাবে।

আপাততঃ এইটুকু বলে রাখি যে অজানা দূরদেশে যাত্রা করতে হলে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হতে হয়, তা' এই হরিপুরা-যাত্রার প্রারম্ভে হাওড়া ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মেই আমার শিক্ষা হয়ে গেল। অজানিত অভাব এবং অনর্থের সম্ভাবনায় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি সঙ্গে এনেছিলেন দুটি সিন্দুক এবং দুটি বিশ্বসহ বেলুন। ইংরাজী ভাষায় এদের hold-all বলা হয়। এ বাক্যের তাৎপর্য্য আগে জানতুম না—ঐদিন প্রথম উপলব্ধি করলুম।

গাড়ী ষ্টেশন ছাড়লে দেখা গেল যে সিন্দুক দুটিতে বিরাজমান দুটি সুগন্ধ-সচল সৌখীন হোটেল এবং হোল্ডল দুটিতে দুটি শীত-বস্ত্রের বর্দ্ধিষ্ণু বাজার। লেপ তোষক কাঁথা কম্বল তিন চারিখানি করিয়া তো ছিলই—উপরন্তু পুল-ওভার, সোয়েটার—চেষ্টারফীল্ড, ওভারকোট—ইত্যাদি বিজাতীয় অঙ্গাবরণও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ ছিল।

মোট কথা, মানুষের যে মুখ্য দুইটি অভাব—অন্ন-বস্ত্র – তা'র কোনো সম্ভাবনা সম্পাদক মহাশয় রাখেননি। জিজ্ঞাসা করাতে শুনলুম—"হরিপুরায় ভীষণ শীত!" আন্দাজে অনুমান করা গেল যে হরিপুরা গ্রামের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে—উত্তর মেরুর আরম্ভ ঠিক্ সেই প্রান্তে।

সঙ্গে সঙ্গে আমি একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে এই আড়ম্বরে অবাক্ হবার কিছুই নেই। মহাত্মা গান্ধী চেয়েছেন সৌখীন নাগরিককে কিছু গ্রাম্য জীবনের আস্বাদ দিতে। যতদিন না সাধারণ নাগরিক নিজের অভ্যাসগত মনোবৃত্তি নিরক্ষর নিরভিমানী চাষার সঙ্গে একেবারে অ-ভিন্ন করতে পারবেন—ততদিন সে দেড় হাজার মাইল দূরের এক অজ্ঞাত গুজরাটি গ্রামে পাড়ি দিতে "থার্ম্মস্" ফ্লাস্ক এবং ওভারকোট সঙ্গে নেবেই। আরও অনেক-কিছু করবে—সেকথা যথাস্থানে বলব।

সে রাত্রে উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি। পরের দিন বেলা ১২টা নাগাদ সিন্দুক দুটি একেবারে উজাড় হয়ে গেল। বেলা সাড়ে তিনটায় বোম্বে মেল জব্বলপুরে পৌছল এবং এই "ত্রিমূর্ত্তি" সেখানে নেমে পড়লেন। উদ্দেশ্য, মার্ব্বেল পাহাড় এবং নর্ম্মদা প্রপাত দেখা। পূর্ব্বে দেখা ছিল—তবু আর একবার পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছা হোল।

এ আখ্যানে "কবিত্ব করবার" বাসনা আমার একেবারেই নেই। অতএব মার্ব্বেল পাহাড় এবং নর্ম্মদা প্রপাতের প্রাকৃতিক শোভা-বর্ণনা নিয়ে সময় নষ্ট করব না। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল—আসন্ন সন্ধ্যার মুখে কয়েকটি ফটো নিয়েছিলুম—সেগুলি দিলাম—কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

কেবল ভবিষ্য-যাত্রীর সুবিধার জন্য কয়েকটি তথ্য জানিয়ে দিই। জব্বলপুর ষ্টেশন থেকে নর্ম্মদা-প্রপাত এবং মার্ব্বেল-পাহাড় প্রায় ষোলো মাইল পথ। ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে জিনিষপত্র রেখে আমরা ট্যাক্সিযোগে রওনা হলাম বেলা সাড়ে চারিটা নাগাদ্ এবং ফিরে এলাম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। এই তিন ঘণ্টার ব্যবধানে যা কিছু দ্রষ্টব্য তা সমস্তই দেখা গেল।

একটি অসুবিধের কথা বলে রাখি। মার্ব্বেল পাহাড়ের নৌকায় ধূমপান নিষেধ। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি মৌমাছির চাক বর্ত্তমান। স্বচক্ষে কয়েকটি দেখ্‌লুম। কবে কোন্ যুগে একটি বা দুইটি সাহেব মাঝির নিষেধ অগ্রাহ্য করে নৌকায় বসে তামাক খেয়েছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মৌমাছি এসে আক্রমণ করে তাঁদের মেরে ফেলেছিল। তাঁদের কবর কাছাকাছিই দেখা গেল। সেই থেকে—নৌকাযোগে ধূমপান নিষেধ। যাঁরা তাম্রকূট আহার করে থাকেন, তাঁরা নৌকায় চড়বার আগে নিজেদের প্রস্তুত করে নেবেন।



নর্ম্মদা জলপ্রপাত, জব্বলপুর

রাত্রি ১টার সময়ে অন্য একটি ট্রেণে আমরা জব্বলপুর ত্যাগ করে তারপর দিন বেলা ১১টার সময়ে পৌছলুম "ভুশাবাল" ষ্টেশন। এইখানে আমাদের গাড়ী বদল করে বি-বি-সি-আই লাইনের ট্রেণে চড়বার কথা। ষ্টেশনে নেমে জানা গেল যে সমস্ত ট্রেণের বন্দোবস্ত কংগ্রেসের ভিড়ের দরুণ ওলট্-পালট্ হয়ে গেছে। এর পরের ট্রেণ ছাড়্‌বে সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে।

অতএব সঙ্গে সঙ্গে ঠিক্ করা গেল যে অজন্তা গুহা দেখে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে স্নান আহার সমাধা করে তিন মূর্ত্তি রওয়ানা হয়ে গেলেন বেলা সাড়ে বারোটার সময়ে একটি অতি পুরাতন জীর্ণ ট্যাক্সিযোগে। "ভুশাবাল" থেকে অজন্তা ৪২ মাইল। আমাদের ভরসা ছিল যে মার্ব্বেল পাহাড়ের মত—এই সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় ৪২ মাইল যাতায়াত এবং অজন্তা দর্শন অসম্ভব হবে না।

অসম্ভব হয়নি, কিন্তু অনর্থ যথেষ্ট ঘটেছিল। মোটরকার-



মার্ব্বেল পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে নৌকা পথে—জব্বলপুর

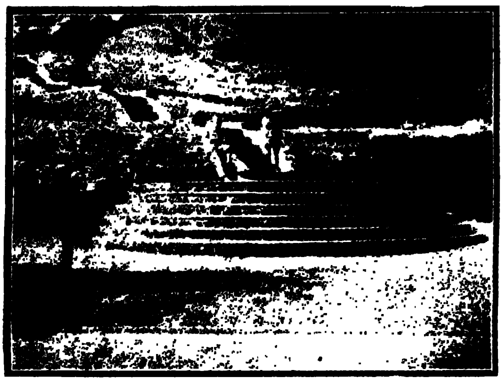
শাস্ত্রে এমন কোনো ব্যাধির উল্লেখ নেই—যা ঐ গাড়ীটির মধ্যে আমরা আবিষ্কার করিনি। যেতে এবং ফিরতে মোটর গাড়ীর যাবতীয় রোগ এবং তাহার মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা সম্বন্ধে অভাবনীয় জ্ঞানলাভ হয়ে গেল।

অজন্তা গুহা যাঁরা দেখবার ইচ্ছা রাখেন তাঁরা যেন কখনও এমন কাজ না করেন। ৪২ মাইল যাওয়া এবং আসা কিছুই নয়। কিন্তু আসল গুহা-দর্শনটি বিশেষ সময়-সাপেক্ষ। রীতিমত পাহাড় পথে অনেকটা "চড়াই" উঠ্‌তে হয়। গুহার সংখ্যাও অনেক। ভিতরে অন্ধকার। তবে ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা আছে। পাঁচ টাকা দর্শনী দাখিল করলে সে বন্দোবস্ত হতে পারে। কিন্তু তা'র জন্য কিছু সময় লাগে। চিত্র শাস্ত্রে অনধিকারীর পক্ষেও

গুহাগুলি দেখা সম্পূর্ণ কর্‌তে প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা লাগে। অন্ততঃ তিন ঘণ্টা।

অজন্তা নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। পাহাড়ের কাছেই কয়েকটি সুদৃশ্য বিশ্রামাবাস আছে দেখলুম। নিজাম সরকারের নিকট অনুমতি নিয়ে রাখ্‌লে সেখানে থাক্‌তে পাওয়া যায়।

অজন্তা থেকে আমরা ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এসে ট্রেণ ধরলুম। তুষারকান্তি যেখানেই নেমেছেন—ষ্টেশনের হোটেলে ঢালাও অর্ডার দিয়ে গেছেন। তার ফলে হোটেলের ম্যানেজার সেই বিশাল সিন্ধুক দুটি আকণ্ঠ ভর্ত্তি করে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আগে সে দুটি উঠ্‌ল, তারপর অন্য মালপত্র এবং সবশেষে এই "ত্রিমূর্ত্তি।" বি. বি. সি. আইএর ট্রেণ ছেড়ে দিল।



অজন্তা পাহাড়ের পাদমূলে সোপান শ্রেণী

রাত্রি কেটে গেল—নির্ব্বিবাদে, সুনিদ্রায়। বারবার মনে পড়ে যেতে লাগল করাচী-যাত্রার শেষ রাত্রের কথা। সে চাঞ্চল্যকর ঘটনাবহুল রজনীর সঙ্গে এই নিরুপদ্রব সুখ-নিশির সাদৃশ্য কোথা? "ভারতবর্ষে"র লেখা থেকে একটু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি: "যত সন্ধ্যা হয়ে এল, ততই প্ল্যাটফর্ম্মের জনতা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। ষ্টেশনে বৈদ্যুতিক আলো নেই, কেরাসিনের স্তিমিত আলো যেন অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত রহস্যাচ্ছন্ন করে তুল্‌তে লাগ্‌ল, আর তারি মধ্যে ঐ রকম অফুরন্ত জনসমুদ্র এবং তাদের কণ্ঠনিঃসৃত জলদগম্ভীরস্বরে জয়নির্ঘোষ। মনে হতে লাগ্‌ল যেন সমগ্র দেশের আকুতি ঐ সহস্র কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছে।··· রাত্রি প্রায় ১২টা। দিনের তুলনায় জনতা ভীষণতর ভাব ধারণ করেছে। সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত এবং কোলাহল অবর্ণনীয়। ···২৪শে তারিখের প্রভাত হোলো।···সারারাত যে দক্ষযজ্ঞ চলেছিল তার সম্যক্ প্রমাণ এতক্ষণে পাওয়া গেল। নেতাদের কামরার জান্‌লার কাঁচ, এমন কি কাঠের ঝিলমিল পর্য্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে···।"

হরিপুরার পথে সে তাণ্ডবলীলার চিহ্নমাত্রও পাইনি। সেদিন আর নেই। আমার নিজের ধারণা এই যে—তা'র কারণ এ নয় যে সাধারণ জনসমাজ কংগ্রেসকে উপেক্ষা কর্‌তে আরম্ভ করেছে। বরং আমার মনে হয় যে এই কয় বৎসরের মাতামাতির পর কংগ্রেস ব্যাপারটি হাটের লোকের কাছে আরও স্বভাবগত, সরল এবং সাদাসিধে হয়ে গেছে। নূতনত্বের সে উন্মাদনা ঝরে গেছে বলেই আর সে চটুলতার দেখা পাওয়া যায়না।

ভোর সাড়ে পাঁচটার সময়ে মাধি ষ্টেশনে পৌছলুম।



অজন্তা গুহার সম্মুখে

তখনো রীতিমত অন্ধকার। করাচীর মত এ অঞ্চলেও ভোরের এবং সাঁঝের আলোটি (Twilight) সুদীর্ঘ হয়ে থাকে। সাতটার আগে সূর্য্যের চিহ্ন দেখা যায় না। সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত স্পষ্ট গোধূলি থাকে। আমরা যখন ষ্টেশনে নামলুম—মনে হোল অর্দ্ধরাত্রি।

একটু খাঁটি সত্যকথা বল্‌ব? ষ্টেশনে কংগ্রেস যাত্রীর সংখ্যা অন্ততঃ একহাজার ছিল—স্বেচ্ছাসেবক একটিরও দেখা পাইনি। পরে যখন সেই অজানা দেশে ভিড় ঠেলে একটি 'বাসে' এসে তিনজনে বস্‌লুম—তখন একজন কংগ্রেস কর্ম্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাত হোল। তিনি বল্‌লেন যে সবশুদ্ধ আটটি ভলান্টিয়ার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই জনতার

সাহায্যার্থে পাঠিয়ে ছিলেন। আমাদের না-দেখ্‌তে পাওয়াতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিলনা। কর্ম্মচারীটিকে তাঁদের পরিচালক হিসাবে পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁর বিব্রত অবস্থা দেখে আমরা নিজেদের অসুবিধা ভুলে গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্কট এই হয়েছিল যে আমাদের মত তিনিও স্বেচ্ছাসেবকদের একটিকেও খুঁজে পান্‌নি। স্বেচ্ছাসেবকদেরও অপরাধ দেওয়া যায়না। হাজারের মধ্যে আটটির ব্যক্তিত্ব জাহির হওয়া সাধারণ কর্ম্মীর কর্ম্ম নয়।

'বাসে' দেড়ঘণ্টা বসে থাকবার পর 'বাস্' ছাড়্‌ল এবং এগারো মাইল অতি সুন্দর পথ পেরিয়ে যখন বিঠলনগরে এসে পৌছল তখন বেলা ৮টা ৮৷৷০টা হবে। এই দেড়ঘণ্টা 'বাসে' বসে থাকবার কারণ এই যে প্রায় ৫০।৬০ টি বাসের মধ্যে কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে যাবে, সে সম্বন্ধে মতের ঐক্য ছিলনা। ঐক্য আন্‌তে ঐ সময়টুকু লেগেছিল।

বিঠলনগরের প্রবেশদ্বারে আরো ঘণ্টাখানেক বাসে বসে থাকবার পর যখন সত্যই নামলুম তখন বেলা ৯টা। এইবার গৃহপ্রবেশ, স্নানাহার এবং কিছু বিশ্রাম। ঘরছাড়া বাঙালী তিনদিনের একটানা গাড়ী চড়ার পর এই কটি সুখ খুঁজেছিল। অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমার সাম্‌নে দুটি পথ খোলা আছে। কংগ্রেসের সুযোগ্য অতিথি মহামান্য লর্ড স্যামুয়েল বাহাদুর—তাঁর নেতানিবাস সংলগ্ন কুটীর ছেড়ে একবার কংগ্রেসনগর ঘুরে গিয়ে বলেছিলেন যে পরিচর্য্যার ব্যবস্থা অপূর্ব্ব হয়েছে! সারা সংবাদপত্রজগতে সে শ্রুতিসুখকর বার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সেই শ্রুতিমধুর সুরে নিজের গলা মিলিয়ে বল্‌তে পারি—"বাস্তবিক অপূর্ব্ব!"

আর এক পথ হচ্ছে—যেমনটি স্বচক্ষে দেখেছি—তেমনটি বলে যাওয়া। লর্ড স্যামুয়েলের জয় হোক্‌—আমি সসম্মানে শেষের পথটিই বেছে নিলুম।

আমি একটি কথা খোলসা করে নিতে চাই। এই যে মহাত্মা প্রণোদিত মত—লোকালয় থেকে বহুদূরে একেবারে 'তেপান্তর মাঠে'র মাঝে জাতীয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান—এ সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। একদল লোক এর গোঁড়া সমর্থক। অপরপক্ষের লোক ঠিক্ তেমনি প্রবল বিরোধী। প্রথমোক্ত দলের মতের আভাস পূর্ব্বে দিয়েছি। শহরের সৌখীন মায়া একেবারে ছিঁড়ে ফেলে চাষার জীবনে এনে নিজেকে দাঁড় করানো এই দলের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় দল বলেন যে মাত্র তিন-চার দিন অসম্ভব অসুবিধা ভোগ করানোতে কার্য্যতঃ বিশেষ কোনো ফলই হয় না।



ঝাণ্ডা চৌকে জনতা

আমি শুধু এই কথাই বল্‌ব যে প্রথম দলের মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেও কংগ্রেসের অদ্ভুত অ-ব্যবস্থার কোনো কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না। হাজার হাজার দর্শকের কাছ থেকে উচিত দর্শনী নিয়ে—তার পরিবর্ত্তে এক অকিঞ্চিৎকর অংশ "বস্তু" দিয়ে বাকি ফাঁকটুকু 'ফিলসফি' দিয়ে ভরানোর কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনে। ছ'টাকা ফী নিয়ে যদি তা'র বিনিময়ে মাত্র একটাকা মূল্যের "ব্যবস্থা" দেওয়া হয় এবং বাকি পাঁচটি মুদ্রা Establishment খরচে চালান করানো হয়—সে অদ্ভুত বিধির অনুমোদন কি করে করা যায় তা আমার মত সামান্য বুদ্ধির অগম্য।

Establishment খরচের অংশ সাধারণ দর্শককে নিশ্চয়ই দিতে হবে। সর্ব্বত্রই হয়ে থাকে। কিন্তু পুরা "দর্শনী"র বণ্টনে যে প্রবল অসামঞ্জস্য ছিল তা'র কোনো কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না। সাড়ে সাত লক্ষ টাকা যদি সত্যই ন্যায্য খরচ বলে ধরে নেওয়া যায়—তা'র মধ্যে অভ্যাগতদের অতি সাধারণ ব্যবস্থারও এত অভাব কেন? অবশ্য এরূপ লোকও যথেষ্ট আছেন যাঁরা এই সাড়ে সাত লক্ষ টাকা খরচের ন্যায্যতা সম্বন্ধে প্রবল বিপক্ষ মত রাখেন। আমি আপাতত: তাঁদের কথা বল্‌ছিনে। আমি বল্‌ছি একটি অতি সাধারণ আর্থিক নীতির কথা: মূল্যের বিনিময়ে মাল না দিয়ে—দর্শনশাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কি আজকালকার দিনে চল্‌বে?

সাহায্য হবে—তা জানেন বিশেষজ্ঞ মহারথীরা। এই কথা বলেন—সাধারণ নগরবাসী এবং সাধারণ গ্রামবাসীও।

কারণ বাস্তবিক হিসাবে কংগ্রেস-নগরে সাধারণ গ্রাম্য-জীবনের কতটুকু থাকে? ভারতবর্ষের কয়টি কৃষাণ কংগ্রেস-নগরের অনুরূপ গ্রামে বাস করে? আমি এই গ্রাম্যজীবনের উপমাটুকুর তাৎপর্য্য এখনো পর্য্যন্ত আয়ত্ত করতে পারিনি। বাস্তবিকই কি কংগ্রেস উপনিবেশগুলি সাধারণ কৃষাণের গ্রামের প্রতীক? যদি তা না হয় তবে ও কৈফিয়তের তাৎপর্য্য কোথায়? মহাত্মা স্বয়ং এই অধিবেশনের মধ্যেই সে "বিশমিল্লাই গলদ্"টুকু ধরে ফেলেছিলেন এবং প্রকাশ্য সভাস্থলে তাঁর অকৃত্রিমতা-সুলভ ভাষায় আক্ষেপ জানিয়েছিলেন।



জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বে—বেদীর সম্মুখ ভাগ

বেলা ৯টার সময়ে এই তিনটি বিদেশী একেবারে বিঠলনগরের কোলাহলের বুকে এসে দাঁড়াল—আশ্রয়ের আশায়। বহু পূর্ব্বে একটি কুটীর-ভাড়ার বাবদে একশত মুদ্রা তার করে পাঠানো হয়েছিল। একঘণ্টা খোঁজ করা সত্বেও সে কুটীরের কোনো সন্ধান কেউই দিতে পারল না। কর্ম্মচারী ও ভলাণ্টিয়ারেরা বেশী বাড়া-বাড়ি দেখলেই গুজরাটি ভাষা প্রয়োগ করতে লাগল। আমরা ওভাষায় পারদর্শী ছিলাম না।

যখন রসিদ দেখিয়ে সত্যই সেই নম্বরের কুটীর সনাক্ত হোল তখন দেখা গেল যে গত তিনদিন থেকে অন্য একটি যাত্রী তা'তে সংসার পেতে অতি স্বচ্ছন্দে বাস করছেন। তিনি কি করে আমাদের কুঁড়েতে গতিপথ পেলেন তা তিনিও বল্‌তে পারলেন না—কর্ম্মচারীরাও নয়। বড় রাস্তার ধারে সমস্ত মালপত্র বিছানা নামিয়ে রেখে এই কোলাহল মুখরিত লোকসমুদ্রে কোনো কূল খুঁজে পাওয়া গেল না।

মহাজনোচিত তুষ্ণীভাব ত্যাগ করতে হোল। বার বার

তেপান্তর মাঠের বিরোধী দল বলেন যে লোকালয়ের সন্নিকটে কংগ্রেসের বসতি হলে এই অসামঞ্জস্যটি হোত না। বহু যোজন দূর থেকে তপতী নদীর জলে বাঁশ ভাসিয়ে এনে রাতারাতি স্বপ্ন-পুরী তৈরী করার বাহাদুরী থাক্‌তে পারে—কিন্তু তা'তে সার্থকতা প্রায় নেই বল্‌লেই হয়। একদিকে সুরাট মিউনিসিপালিটির বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ—অপর দিকে একাত্নো বলদ চালিত রাজরথ—এই মহা-আড়ম্বরের মধ্যে অসম্ভব অসুবিধা ভোগ করে—আমাদের সীতারামের "রামু-শামু" তিন দিনে কতটা ফিলসফি আয়ত্ত এবং পরিপাক করবেন এবং তা'তে জাতীয় উত্থানের কতটা

মনকে প্রবোধ দিলুম: "যস্মিন্ দেশে যদাচার।" পরিচর্য্যা-সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কানাইয়ালাল দেশাইয়ের সন্ধান নিয়ে তাঁর কাছে গেলুম। খুব স্পষ্ট এবং সতেজ ভাষায় দু একটি কথা বলার ফলে তিনি আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন এবং আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন অন্য এক পাড়ায়। সেখানে কয়েকটি "রিজার্ভ" করা কুটীর ছিল—ভাড়া শুন্‌লুম—দেড়শত টাকা। তারই মধ্যে তিনি আমাকে একটি দিলেন। তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ—অকপটচিত্তে তা' স্বীকার করছি। কিন্তু বক্তৃতাটির অনিবার্য্য প্রয়োজন ছিল, এ কথাও বল্‌তে হবে।

তুষারকান্তি এবং তদীয় ভাগিনেয় শচীবিলাসকে রাস্তা থেকে ডেকে আনলুম। নিশ্চিত ছিলুম যে আমার এই কর্ম্মতৎপরতায় উভয়েই আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় একেবারে আত্মহারা হয়ে যাবেন। কিন্তু নতুন বাসস্থানটি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করার পর তাঁরা সে-সব কিছুই করলেন না। তুষারকান্তির শীতাতঙ্ক ছিল এবং কুটীরে সে আতঙ্কের কারণও যথেষ্ট ছিল কুটীরখানির জন্য যে কয়টি চাঁচাড়ির দরমা বরাদ্দ ছিল তাতে সম্পূর্ণ কুটীর হয় না। ফলে একদিকের দেওয়ালে—দেওয়ালের চেয়ে ফাঁকের পরিমাণই বেশী হয়ে গিয়েছিল। সে বিরাট প্রবেশপথ দিয়ে সূর্য্যের আলো, মুক্ত বাতাস, সতেজ হিম—এ সকলের গতিবিধি সুগম এবং সরল হয়েছিল। কিন্তু এ সকল সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব কথাতে বাগবাজারবাসী আশ্বস্ত হতে পারলেন না। রাত্রের চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন।



কলিকাতা হইতে আনীত গায়ক গায়িকা সংঘ

শচীবিলাসের মত সুযোগ্য ভাগিনেয় এ যুগে আর বড় একটা দেখা যায় না। মাতুলের দুরবস্থা দেখে নিজে থেকে ভরসা দিলেন যে অবিলম্বে তিনি কুটীরখানির উন্নতি সাধন করে ফেল্‌বেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, "কি উপায়ে।" তিনি বল্‌লেন—"ধার করে।" এ অদ্ভুত রহস্যোক্তির কোনো অর্থ তখন পেলুম না। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি কুটীরটিকে যেরূপভাবে "আষ্টে পিষ্টে" উপরি-দরমা দিয়ে মুড়ে ফেল্‌লেন—তা দেখে আমরা উভয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কোথা থেকে এত দরমা পেলে জিজ্ঞাসা করাতে আবার উত্তর দিলেন: "ধার করে!" তা'র বেশী আর কিছুই বল্‌লেন না। কিছুক্ষণ পরে পাশের কুটীরগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে গিয়ে রহস্যের সমাধান হয়েছিল। তখনও সে কুটীরগুলিতে অতিথি সমাগম হয়নি। বোঝা গেল—কর্জ্জ করতে শ্রীমান শচীবিলাসকে বিশেষ ক্লেশ পেতে হয়নি।

কুটীরখানি দুইটি ঘরে বিভক্ত। মাটিতে কয়েকখানি দরমা পাতা—বাঁধা নয়। দেওয়ালের মত সেখানেও ফাঁকের প্রাচুর্য্য প্রবল। তার উপর তিনটি খাট। স্বদেশী "নেওয়ারে" মোড়া। বড়ই দুঃখের সহিত বল্‌তে হচ্ছে যে এই "মোড়া"র মধ্যেও ফাঁকের অংশই বেশী ছিল। নেওয়ার-জালের মধ্যে প্রতি ফাঁকটি এক বিঘতেরও বেশী থাকাতে অতর্কিতভাবে খাটে বসামাত্র ঐরূপ একটি বিবরে শরীরের বেশীর ভাগ ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিতম্বপ্রদেশ ভূমি স্পর্শ করে থেমে গেল। অপরের সাহায্য নিয়ে খট্টাঙ্গের নিবিড় আলিঙ্গন-পাশ থেকে মুক্তি পেলুম। বুঝলুম—উপরে কয়েকটি মোটা আচ্ছাদন না দিয়ে ও খাট স্পর্শ করা চলবে না।

দুইটি ঘরে দুইটি ইলেক্‌ট্রিক আলো ছিল। সকালে "কারেণ্ট" ছিল না। সন্ধ্যাবেলা যখন "কারেণ্ট" এল, দেখা গেল একটি আলো "ফিউজ" হয়ে আছে। তিন মিনিটের মধ্যে শচীবিলাস সেটির বিনিময়ে অন্য একটি নিখুঁৎ 'বাল্‌ব' কর্জ্জ করে নিয়ে এলেন।

কুটীরখানির সংলগ্ন দরমা-ঘেরা আর একটি "ফাউ" ছিল—কি উদ্দেশ্যে তা প্রথমটা বোঝা যায় নি। প্রবেশ করে দেখা গেল এক কোণে একটি বালতি আছে। সঙ্গে সঙ্গে রহস্যোদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। ঘরখানি "বাথরুম"—স্নানাগার। দেখে লোভ হোল। কিন্তু স্নানের উদ্দেশ্যে যেই ঘরটিকে স্পর্শ করেছি—সঙ্গে সঙ্গে সেটি একেবারে আধুনিক অজন্তা নৃত্যের পদ্ধতিতে এমন একটি ভঙ্গী ধারণ করলে



প্রথম দিনের অধিবেশনে নেতাগণের আগমন
দ্বিতীয় হইতে যথাক্রমে সুভাষচন্দ্র, বল্লভভাই পেটেল ও শ্রীমতী নাইডু

যা'তে কোনো সাবালক পুরুষের তা'তে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল। শচীবিলাস ওটির উন্নতিসাধন কর্‌তে এগিয়েছিল—আমি নিরস্ত কর্‌লুম। দ্বিতীয় স্পর্শে যে কুটীর-লতিকাটি একেবারে সলজ্জ ধরাশয্যায় লতিয়ে পড়বে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। এরূপ লজ্জাবতী বাথরুম খুব কমই দেখেছি।

অতএব ওকে নাড়াচাড়া না করে আমরা প্রাঙ্গণস্থ সাধারণ "কল" ব্যবহার করা সাব্যস্ত কর্‌লুম। সেটিও এক লোমাঞ্চকর ব্যাপার। "কলে"র এরূপ দুর্দ্দম "তোড়" আমি দেখিনি। প্রথমবারে স্পর্শ করতে না করতে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ বেগে নায়েগ্রা-সুলভ জলপ্রপাতের নমুনা দিল

—তা'তে স্নানার্থী আতঙ্কে সে স্থান ছেড়ে দূরে পালিয়ে গেল। প্রথম পরিচয়ের পর থেকে আমরা দূর থেকে লাঠি বা বাখারি দিয়ে হাতলটিকে সসঙ্কোচে স্পর্শ করতুম। তারপর অগ্রসর হ'তুম।

কোনোরকমে স্নান সারা গেল। তারপর অন্নচিন্তা। অতি নিকৃষ্ট নিম্নস্তরের বিষয় বস্তু। উন্নত দর্শনতত্ত্বের সকাশে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু সব কথাই বলে যা'ব—এই বাসনা নিয়ে আরম্ভ করেছি। মনে কোনো বিদ্বেষ রাখিনি, এইটুকু আমার অবলম্বন।

খ্রীষ্টানী প্রার্থনার ঐ অংশটুকু: "Give us this day our daily bread"—"হে প্রভু, অদ্য আমাদের প্রাত্যহিক রুটিখানি আজ্ঞা করুন"—এটির উপর চিরদিন



রূপতীর তীরে মহাত্মাজীর কুটীর

বিজাতীয় অবজ্ঞা ছিল। বিঠলনগরে এসে সে অবজ্ঞা তিরোহিত হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন থেকে সমস্বরে ঐক্যতান শোনা যেতে লাগল: "হে প্রভু, কৃপা করে রোজকার বরাদ্দ রুটিখানি জুটিয়ে দিন।"

তার গূঢ় কারণ এই যে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ বিঠলনগরে হোটেল স্থাপনা সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক হয়েছিলেন। মাছ মাংস তো নিষিদ্ধ ছিলই—একটি মুসলমানী হোটেল ছাড়া উপরন্তু নিরামিষ হোটেল সম্বন্ধেও অত্যধিক "কড়াকড়ি" ছিল। করাচীতে যে নিরামিষ হোটেলে খেতুম—সে অতুলনীয়। হরিপুরায় যে আহার জুট্‌ত—ওরূপ জঘন্য আহার জীবনে কখনো জোটেনি। আশা করি—জুট্‌বে না। এর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।

অতিরঞ্জিত করে কিছুই বল্‌ছিনে। যাঁদের এ উক্তি গ্রহণ করে নিতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে, তাঁরা যে কোনো সাধারণ দর্শকের কাছে খোঁজ নেবেন। অবশ্য—নেতাদের কাছে নয়। আমি সাধারণ অতিথির কথা বল্‌ছি। "উদর-পূর্ত্তির" মত স্থূল বিষয়ের আলোচনায় এইখানেই ক্ষান্ত দিলাম। অপ্রিয় সত্য বর্ণনারও সীমা থাকা চাই।

একটি অভাবনীয় দুর্লভ ঘটনার কথা এ জীবনে ভুলব না। নিকৃষ্ট খাদ্য দুদিন ধরে খাবার পর এক ভদ্রলোক ঐ দেশীয় মিষ্টান্নের সন্ধানে ছুটেছিলেন। ফিরে এলেন মুখভরা ফেনার রাশি নিয়ে। তা'তে মাঝে মাঝে বুদ্‌বুদ্‌ দেখা দিচ্ছে। বরফি সাব্যস্ত করে যে চতুষ্কোণ শুভ্র বস্তুটিতে কামড় দিয়েছিলেন সেটি ছিল বার্দলির কুটীরে তৈরী সাবান। আমি জানি এ ঘটনা বিশ্বাস করা শক্ত হবে। যথন স্বচক্ষে এই ব্যাপার



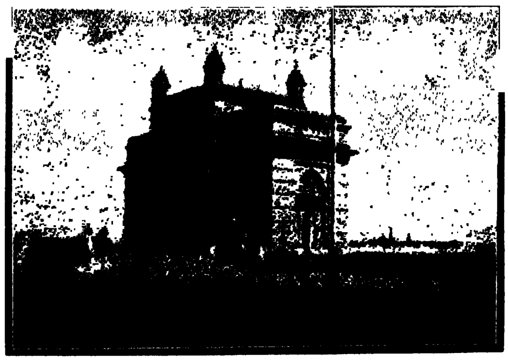
কুটুম নিবাসের প্রাঙ্গণে বঙ্গমহিলা

দেখেছিলুম তখন নিজের চোখকে বিশ্বাস কর্‌তে দ্বিধাবোধ হয়েছিল। অন্যে পরে কা কথা।

আমাদের হরিপুরা বাসের তৃতীয় দিনে যথাক্রমে কুটীরে তিনটি অতিথির আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ বোম্বে সহরের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও তদীয় পত্নী। পরে—তান্নুভাই দেবীদাস দেশাই নামক ঐ সহরেরই একটি সুপরিচিত অ্যাটর্ণী যুবক। কংগ্রেস ফেরত বোম্বে হয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল। সেই কারণে এই তিনটি ব্যক্তিকে আমরা সাগ্রহে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিলুম এবং যস্মিন দেশে যদাচার সম্ভব তদোচিত ব্যবস্থা করে নিয়েছিলুম। পরে সে ব্যবস্থার প্রচুর পরিশোধ লাভ হয়েছিল। সেকথা যথাস্থানে উল্লেখ কর্‌ব। মজুমদার-জায়ার উল্লেখে পুর-

নারীদের কথা মনে পড়্‌ল—যাঁদের বিষয়ে এখনও কিছুই বলিনি। অন্যত্র তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছি—ইংরাজী এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে এইটুকু পুনরাবৃত্তি কর্‌ছি যে এই ধূলি-কোলাহল-বিক্ষুব্ধ জনতা সমাগমের মধ্যে তাঁরা যেভাবে সমস্ত ত্রুটি অসুবিধাকে উপেক্ষা করে স্মিতমুখে নিজেদের এবং তাঁদের মুখাপেক্ষী পুরুষগুলিকে পরিচালনা করে গেছেন—তা বাস্তবিকই প্রকৃত প্রগতির পরিচায়ক। যা কিছু অভিযোগের গুঞ্জন শোনা গেছে, সবই পুরুষের মুখে। বেশী আর কি বল্‌ব? "বহুবলধারিণীং রিপুদলবারিণীং নমামি তারিণীং—মাতরম্‌!"

বন্দেমাতরম্‌—প্রসঙ্গে কলিকাতা থেকে আনীত গায়ক-গায়িকার দলের কথা এসে পড়ে। কংগ্রেসের খোলা বৈঠকের প্রথম দিনে বেদীর নীচেই শ্রীমতী সতী দেবী তাঁর



অ্যাপলো বন্দর—The Gateway of India—বোম্বে

ভগ্নী জয়া দেবী এবং তাঁদের সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাত হোল। তা'র কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে জাতীয় মহাসঙ্গীতের যে বিরাট মূর্ত্তির পরিচয় দিলেন তা' শুনে সমগ্র জনমণ্ডলী ক্ষণকালের জন্য অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এই সঙ্গীতের আসরে শ্রীমতী সতী দেবী ছিলেন দল-নেত্রী এবং তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন পরিচালনার ফলে গানটি একেবারে নিঁখুতভাবে গীত হয়েছিল।

কংগ্রেসের কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। মহাত্মার সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতের সুযোগ একদিন হয়েছিল করাচীতে। ভোর রাত্রের দস্যুর মত পাহারা ডিঙিয়ে নয়। দিনের আলোয় রীতিমত টিকিট দেখিয়ে প্রবেশ করেছিলুম। সে টিকিট অতি অল্প সংখ্যাতেই জারি

হয়েছিল। বহু মূল্যে ভাড়া দেবার যথেষ্ট প্রলোভন এসেছিল—বহু কষ্টে সে প্রলোভনকে সংযত করেছিলুম।

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই মহাশয়কে কথা দিয়েছিলুম যে মহাত্মাকে বিরক্ত ক'রবনা—সে প্রতিশ্রুতি রেখে-ছিলুম। সান্ধ্য ভোজনে ব্যাপৃত মহাত্মার হাত কম্পমান, বহু আয়াসে পাত্রস্থ খাদ্য চামচের সাহায্যে তুলে নিয়ে মুখে দিচ্ছেন—এ দেখে আলাপ করতে সঙ্কোচবোধ হোল।



ঝাণ্ডা চৌকে পতাকা অনুষ্ঠান। মঞ্চের উপর বিশিষ্ট নেতাগণ

নিজে থেকে যা বললেন শুনলুম। মাঝে মাঝে হেসে উঠ্তে লাগলেন। কিন্তু বোধ হোল যেন সে হাসিও কষ্টসাধ্য। মহাদেব দেশাই বল্লেন—রক্তের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেছে, —প্রকৃত সংখ্যাটি কিছুতেই বললেননা। ঠিক্ সেই সময়েই বেহার এবং যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীবর্গের ইস্তফা-দেওয়া নিয়ে সমগ্র কংগ্রেস নগর টলমল—কখন যুদ্ধারম্ভের হুকুম আসে ঠিকানা নেই। মহাত্মার মুখে তার কোনো পরিচয়ের চিহ্নও পেলুম না। করাচীর সেই নিরুপদ্রব নির্ব্বিকার মূর্ত্তি।

অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা যেমনই হোক, মহাসভার কার্য্য-প্রণালীর ধারা সম্বন্ধে খুঁৎ কর্‌বার মত প্রায় কিছুই ছিলনা। প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল। এই বিশাল জনমণ্ডলীর সুশৃঙ্খল স্থিতি এবং গতি বিস্ময়কর —অপূর্ব্ব হয়েছিল। উত্তেজনা প্রায় একেবারেই ছিলনা। মনে হয়—কংগ্রেস নীতি সাধারণ সমাজের মজ্জাগত হয়ে যাবার দরুণ বাইরের চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রভূতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ গৌরব সম্পূর্ণরূপে নেতাদের প্রাপ্য। আশা করা যায়— হুঙ্কার গর্জ্জন চীৎকারের দিন একেবারে চলে গেছে। গেলেই মঙ্গল।

কংগ্রেসের সংলগ্ন প্রদর্শনী, বিপনী, বাজার ইত্যাদি অতি নিকৃষ্ট জাতীয় হয়েছিল। তা'র মূল কারণ ঐ— মরুভূমির মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন। আর কোনো কারণ তো খুঁজে পাইনে। মোট কথা—একমাত্র মহাসভার সুচারু কার্য্যপ্রণালী ছাড়া স্মরণীয় কোনো বস্তুই হরিপুরার প্রান্তরে দেখ্‌তে পাইনি। অন্যত্র কয়েকবার দেখেছি— সেইজন্যে একথার উল্লেখ কর্‌লুম।

এইভাবেই ক'দিন কেটে গেল। আস্‌বার সময়ে ক্ষোভ বা আক্ষেপ নিয়ে আসিনি। আমাদের নিজের জিনিষ, ক্ষোভ কর্‌ব কা'র কাছে? তবে ভবিষ্যত অধিবেশনের কথা স্মরণ করে এই কয়টি কথা প্রকাশ করলুম।

ফিরবার পথে সুরাট এবং বোম্বে সহর হয়ে এলুম। দুইটির একটিও পূর্ব্বে দেখা হয়নি। যাঁরা বোম্বে সহর এখনো দেখেননি, তাঁরা যেন অচিরে সে অভাব পূর্ণ করে আসেন। সমুদ্র, পাহাড়, রেল, ট্রাম, ইলেক্‌ট্রিক আলো— এবং অভিনব প্রাসাদশ্রেণী মিলিয়ে আধুনিক বোম্বে সহর স্বপ্ন দিয়েই তৈরী বলে মনে হয়। ভিক্টোরিয়া গার্ডেন থেকে সন্ধ্যার পর সহরের যে মূর্ত্তি দেখা যায় সেটি যে সপ্ত আশ্চর্য্যের একটি বলে এখনো কেন গণনা করা হয়না তা আমার বুদ্ধির অগোচর। দু'দিন ছিলুম—মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে। তাঁর নিজের এবং তাঁর পত্নীর অতিথিসৎকার অনুকরণীয়।



শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বিশ্রাম

Bharatvarsha Printing Works

শেষদিনের সন্ধ্যায় "তান্নুভাই" তাঁর মোটরে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করার পর বারো মাইল দূরে Santa Cruz এ তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পাশেই Juhu Sea beach, যেখানে মহাত্মা প্রায়ই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে গিয়ে থাকেন। "তান্নুভাই"য়ের বাড়ীর কাছেই পরমহংসদেবের আশ্রম। সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দ মহারাজের সহিত কিছু পরিচয় ছিল। তাঁর নিমন্ত্রণে সান্ধ্য আরতি দেখবার সুযোগ হোল। সেই চিরপরিচিত স্বামীজি-রচিত গুরু-মহিমা-স্তোত্র গুজরাটি বালক বালিকার মুখে অনুপম শোনালো। তারপর "তান্নুভাই" তা'র বাড়ীতে সান্ধ্যভোজনে নিয়ে গেলেন। অবিবাহিত, সুদর্শন, সচ্চরিত্র যুবক। পিতা-মাতা-ভগ্নীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন—সমস্ত বাড়ীটি ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এলেন। অতি শান্তশিষ্ট সংযত পরিবার—আধুনিকত্বের সমস্তই আছে, শুধু উগ্র প্রগল্‌ভতা নাই। উপাদেয় নানা-রকম গুজরাটি খাদ্যে ভোজ সমাপন হোল। তা'র মধ্যে যে মাছ মাংসের সম্পর্ক ছিলনা, সে কথা একবার মনেও আসেনি।

ভোজের শেষে তান্নুভাই আবার মোটরে করে আমাকে বাড়ীতে পৌছে দিতে এলেন। মজুমদার পরিবারের সঙ্গে তান্নুভাইয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলাপ চল্‌ল। আরো ২।৩টি পুরুষ ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। "ম্যাজিকে"র উপরোধ থেকে রেহাই পেলুম না। এরূপ ষোড়শোপচারের বিনিময়ে মামুলি ওজর আপত্তি করতে দ্বিধাবোধ হোল। প্রায় ঘণ্টাখানেক নির্য্যাতনের পর উভয় পক্ষ ক্ষান্ত হলেন। রাত্রি ১২টার সময়ে পরস্পর বিদায় নিয়ে পৃথক হওয়া গেল। সকালের ট্রেণে ফেরৎ পাড়ি এবং তৃতীয় দিনে—বাড়ী। এইখানেই এ ইতিবৃত্তের ইতি। কৈফিয়তের কোনো প্রয়োজনই নেই। তবু এইটুকু লিখে কলম নিবৃত্ত করব—যে যা কিছু লিখেছি তা'র মধ্যে কোনো উদ্দেশ্য করে বা কোনো বিশেষভাবে প্রণোদিত হয়ে কিছু লিখিনি। অকপট সত্যের যেটুকু মূল্য আছে সেইটুকুই এ'র প্রাপ্য—রস-সাহিত্যের কোনো দাবীই এর নেই। জাতীয় মহাসভার চিরদিন জয় হউক।

ছবিগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত

দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের বাঙ্গালা 'হরিভক্তিবিলাস'

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

প্রবন্ধ

এক শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একখানি পুঁথির শেষে পাইতেছি 'ইতি হরিভক্তিবিলাসগ্রন্থ সংপুর্ন্ন'। বৎসরের নির্দ্দেশে ভুল হয় নাই, কারণ উহার পরেই 'ইতি' সংযোগে তারিখটি দেওয়া আছে, "ইতি সন ১২৩৭ সাল তারিক ২২ চৈত্র"। পুঁথিখানি যখন হস্তলিখিত, তখন উহার একজন লিপিকর অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নামটি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। পুঁথিতে তিনি বানানগুলিকে যেরূপ নৃশংসভাবে সংহার করিয়াছেন, নাম প্রকাশ না করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের নাম "শ্রীক্ষেত্রনাথ দ্বিজ", উপাধি ছিল 'তর্কবাগীশ'। পুঁথিতে দুইবার উপাধির উল্লেখ আছে। কোনও 'তর্কবাগীশ' উপাধিশালী ব্যক্তি যত মূর্খ'ই হউন, অতি সামান্য সামান্য বানানে এত বৃহৎ বৃহৎ ভুল করিতে পারেন না। অতএব পুঁথিখানি গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত নয় অর্থাৎ গ্রন্থকার ১২৩৭ সাল অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার অপর পরিচয়ের মধ্যে কেবল দেখা যায়, তিনি ছিলেন 'রায়ান নিবাসী'। বর্দ্ধমানের 'রায়না' জানি, কিন্তু 'রায়ান' কোথায়?

শুনিয়াছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ বিরচিত ধর্ম্মায়ণের একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি আছে। নামে নামে মিলিতেছে, উভয়ের দ্বিজত্বেও মিলিতেছে, উভয়ে এক হওয়া বিচিত্র নয়।

দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের 'হরিভক্তিবিলাস' বেঙ্কটনন্দন গোপালভট্টের নামে প্রচারিত; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি ও সর্ব্বমান্য স্মৃতি-গ্রন্থ 'হরিভক্তিবিলাসের' বা 'ভগবদ্ভক্তিবিলাসে'র ভাষানুবাদ। প্রথমে একটি, কচিৎ দুইটি, সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত, পরে তাহার অনুবাদ বা

ফলিতার্থ প্রদত্ত, এইরূপভাবে পুঁথিখানি বাইশ পাতায় আসিয়া শেষ হইয়াছে এবং প্রথম পাতাখানি ব্যতীত আর সমস্তগুলিই উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বলা বাহুল্য তেতাল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখিত পুঁথি সংস্কৃত 'হরিভক্তিবিলাসে'র স্থায় বিপুলায়তন গ্রন্থের মাত্র একাংশের অনুবাদ ব্যতীত হইতে পারে না। সংস্কৃত 'হরিভক্তিবিলাস' কুড়িটি বিলাসে বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম দশটি বিলাসে বৈষ্ণবের দিনকৃত্যবিধি নিরূপিত আছে, পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিলাসে পক্ষকৃত্য এবং চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে মাসকৃত্যের কথা। দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ এই দ্বাদশ হইতে ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ দিয়াছেন। তাও আবার সবটার নয়, কেবল অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও অবশ্য-করণীয় বিধিগুলির। সংস্কৃতানভিজ্ঞের উপকারে লাগিতে পারে, ইহাই বোধহয় অনুবাদকারীর উদ্দেশ্য ছিল।

বৈষ্ণবীয় সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দৈনিক পুজার্চ্চনা ও উপাসনা ব্যতীত একাদশী-ব্রতপালন অপেক্ষা সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠতর কর্তব্য আর নাই। বাঙ্গালার সাধারণ হিন্দু-ঘরে এই ব্রত-পালন প্রায়শঃ নব-উপবীতী, বৃদ্ধ ও বিধবাদিগের ভিতরে আবদ্ধ। কিন্তু বিশুদ্ধ বৈষ্ণবীয় মতে একাদশী-ব্রত ও পারণ-বিধি প্রত্যেকেরই পালনীয়; অষ্টম-বর্ষীয় শিশু হইতে অশীতিক বৃদ্ধ প্রত্যেকেরই পক্ষে উহা পালন না করা পাপ, পুরুষের করিতে হইবে, নারীরও করিতে হইবে, সধবা বিধবা বিচার নাই। কেবল কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে একান্ত অশক্ত ব্যক্তি ইহার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, যথা অতি রুগ্ন, অতি জরাতুর ইত্যাদি। দ্বিজ ক্ষেত্রনাথের গ্রন্থ এই একাদশী-ব্রতবিধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পুঁথির সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়া লাভ নাই, বরং তাহাতে অনেক ক্ষেত্রেই পরলোকগত লিপিকরের লজ্জার কারণ হইবে; কেবল অনুবাদ হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণবদিগের একাদশী-ব্রত-বিধির, তথা কবির রচনার নমুনা দিতেছি:

"একাদশী তিথি হয় দ্বিবিধ প্রকার।
সংপূর্ন্না নাম এক বিদ্ধা নাম আর॥
সে বিদ্ধা দ্বিবিধা হয় পূর্ব্বাপরভেদে।
পূর্ব্ব বিদ্ধা ত্যাজ্যা ব্রতে সাস্ত্রের নিষেধে॥
পরবিদ্ধা গ্রাহ্যা হয় সর্ব্বথা জানিবা।
সংপূর্ন্না লক্ষণে অতিসয় মন দিবা॥
একাদশী ভিন্না তিথির সংপুন্ন্ নিশ্চয়।
সুর্য্যোদয়াবধি হঞা পরসুর্য্যোদয়॥
ব্যাপি যদি থাকয়ে সংপুন্না নাম তবে।
একাদশী সংপূর্ন্না নাম ভীন্ন (ভিন্ন) মতে হবে॥
সুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালে মুহুর্ত্ত দ্বিতয়ে।
একাদশী আরম্ভ হইলে সংপূর্ন্না নাম হয়॥
পররাত্রি শেষ ব্যাপে অরুণ উদয়ে।
এতাদৃশী একাদশী ব্রতযোগ্যা হয়ে॥

* * * *

নিষেধ বচন সেহ বিষ্ণুজনে নয়।
বৈষ্ণবের একাদশী-ব্রত নিত্য হয়॥
ব্রতদিনে যদি পিতার শ্রাদ্ধকৃত্য হয়।
পারণ দিবসে তাহা করিবে নিশ্চয়॥
অন্য শাস্ত্রমতে যদি কেহো শ্রাদ্ধ করে।
তিনজন জান তবে নরক ভিতরে॥

* * * *

উপবাস পুজাবিধি রাত্রি জাগরণ।
সহস্র নাম গীতা পাঠ নৃত্য সংকীর্ত্তন॥
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ অবশ্য করণ।
পুন পুজাবিধি আর ব্রাহ্মণভোজন॥
ব্রতিজন সর্ব্বকর্ম্ম করি সমাপন।
ত্রয়দশী দিনে প্রায় এ ব্রতের পারণ।
দ্বাদশী থাকএ যদি পারণের দিনে।
তার মধ্যে করিবেক অবশ্য পারণে॥

* * * *

অষ্ট বর্ষাধিক জন ব্রতের অধিকারি।
অশীতি বর্ষ পর্য্যন্ত নহে ব্যভিচারি॥
সর্ব্ববর্ন্নে নিত্য হয় একাদশী ব্রত।
এ ব্রত লঙ্ঘণে দোষ লেখে বহুমত॥
ত্রিষ বর্ষাধিক পিত্তাধি দেহ যার।
নিরন্তর ব্যাধি পিড়া পরিভূত আর॥
অনুকূলে একা (দ) শী ব্রত এ সভার।
সাঙ্গোপাঙ্গে সত্তজনে করে ব্যবহার॥" ইত্যাদি।

পুঁথির শেষ হইয়াছে কার্ত্তিক-কৃত্য বিধিতে। বৈষ্ণবদিগের নিকট কার্ত্তিক মাসের মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—ক্ষেত্রনাথের ভাষায়, "কার্ত্তিকে সব প্রিয় মাসের উত্তম।" ইহার কারণও তিনি জানাইয়াছেন, "রাধিকার প্রিয় মাস কার্ত্তিক জানিবে"। কার্ত্তিকের সাধারণ-কৃত্যগুলি কবির কথায় কতক কতক জানাইতেছি,—

"কার্ত্তিকে সব প্রিয় মাসের উত্তম।
প্রাতঃস্নান কৃষ্ণকথা কির্ত্তন নিয়ম॥
গীতাপাঠ ভাগবত পাঠের নিশ্রবন।
কৃষ্ণের নিয়ম বিধি করিবে কির্ত্তন॥
শ্রবন কীর্ত্তন আর কেষব-পুজন।
হবিষ্যান্ন ব্রহ্মপত্রে প্রসাদ ভোজন॥
পলাশের পত্র সপ্ত ভোজনের পাত্র।
শুদ্রজন বর্জি (র্জি) বেক তার মধ্যপত্র॥

* * * *

অরুণ উদয়ে উঠি নিত্যকৃত্য করি।
প্রাতঃস্নানে বিধি হয় সোময়রি শ্রীহরি ॥
সাধুসেবা গো-গ্রাস-দান কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিশেষে করিবে কৃষ্ণ-চরণ অর্চ্চন ॥
কার্ত্তিকে নিয়ম করি গীতাপাঠ করে।
পুন না আইসে সেই সংসার ভিতরে ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ কিম্বা সহস্র-নাম পাঠ।
পুন না দেখএ সেই সংসারের নাট ॥

*   *   *   *

তৈলে কিম্বা ঘৃতে জার প্রদীপ উজ্জ্বল।
কার্ত্তিকে তাহার কিবা অশ্বমেধে ফল ॥
কার্ত্তিকে প্রদীপ দানে সন্তুষ্ট কেশব।
অতএব দীপ দান করিবে বৈষ্ণব ॥

*   *   *   *

মাঘে প্রয়াগতীর্থ আর বৈশাখে জাহ্নবি।
কার্ত্তিকে মথুরা যদি পায় বিষ্ণুসেবী ॥
দামোদর পূজন মথুরাতে যদি করে।
কদাচিৎ নাহি আসে সংসার ভিতরে ॥

*   *   *   *

কার্ত্তিকে করিবে ব্রতী তৈলাদি বর্জ্জন।
মৎস্য মাংস কাংস্যপাত্রে ভোজন বারণ ॥
রাজমাস সিমির আদি দ্রব্যের নিষেধ।
পালন করিবে জে জে আছে প্রতিষেধ ॥" ইত্যাদি।

ইহার পরে কার্ত্তিকে কৃষ্ণত্রয়োদশী-কৃত্য, কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী-কৃত্য, অমাবস্যা-কৃত্য, প্রতিপৎ-কৃত্য, যমদ্বিতীয়া-কৃত্য, শুক্লাষ্টমী-কৃত্য, প্রবোধিনী-কৃত্য, প্রবোধন-কাল-নির্ণয়, প্রবোধন-বিধি ও সর্ব্বশেষে ভীষ্ম পঞ্চকাদি (অর্থাৎ কার্ত্তিকের শুক্লা-ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চতিথি) ব্রত, ও অধিমাস বা মলমাস (বৎসরের বর্দ্ধিত মাস), এইগুলির কথা।

পুঁথির পরিচয় শেষ করিবার পূর্ব্বে একটা গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রশ্নটা এই—মূল 'হরিভক্তিবিলাস' কাহার রচিত ? 'ভক্তিরত্নাকরে' আছে, "গোপালের নামে শ্রীগোস্বামি সনাতন। করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন।" (প্রথম তরঙ্গ)। কথাটা যে সত্য তাহা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র সাক্ষ্যেও বুঝা যায়, কারণ এই গ্রন্থে দেখা যায়, মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকেই একখানি বৈষ্ণবীয় স্মৃতিগ্রন্থ রচনার আদেশ দিয়া, বর্ণনীয় স্থূল-বিষয়গুলি বলিয়া দিতেছেন (মধ্য, ২৪ পরি, শ্লোক ২১৭ হইতে)। জীব-গোস্বামীও তাঁহার 'ভাগবতে'র দশম স্কন্ধের টীকা-শেষে বলিয়াছেন, 'হরিভক্তিবিলাস' ও তাহার টীকা 'দিক্‌প্রদর্শনী' উভয়ই তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত সনাতন গোস্বামীর রচিত (শ্রীযুক্ত রায় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত "The Vaisnava Literature of Mediæval Bengal", 1917, p. 37)। এতদ্ব্যতীত যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দে' পাই, "সনাতন গোসাঞি কৈল হরিভক্তিবিলাস। তাহাতেই এই বাক্য আছয়ে প্রকাশ ॥ হরিভক্তি-বিলাস যে গোসাঞি করিল। সর্ব্বত্রেতে ভোগ ভট্ট-গোস্বামিরে দিল ॥" (পঞ্চম নির্য্যাস, বহরমপুর সং, পৃঃ ১০৩)। নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেম-বিলাসে'ও সনাতনই গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া জানা যায় এবং রূপ ও সনাতনের আজ্ঞায় গোপালভট্ট "নিজ গ্রন্থ করি তাহা করিল গ্রহণে।" (১৮ বিলাস, বহরমপুর সং, পৃঃ ২৭৫)। দ্বিজ ক্ষেত্রনাথও বলেন,

"অতএব লিখেন ইহা শ্রীল সনাতন।
শ্রীগোপালভট্ট সহ করি বিবেচন ॥
গ্রন্থকর্ত্তা জানিবে জে শ্রীল সনাতন।
দিকপ্রদর্শনী নামা টীকা সুবাখ্যান ॥
এই দুই স্বহস্তলিপি তাহার নির্ম্মাণ।

*   *   *   *

প্রতিষ্ঠার ভয়ে নিজ নাম নাহি লেখে।
প্রতিষ্ঠাকে বিষ্ঠার সমান জেবা দেখে ॥
এই ত গ্রন্থের শেষে আছএ প্রসা (মা) ন।
অতএব ভট্টমহাশয়ের দেন নাম ॥"

অতএব এতগুলি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসংশয়ে বলা যায়, সনাতন গোস্বামীই 'হরিভক্তিবিলাসে'র প্রকৃত রচয়িতা। কিন্তু 'প্রতিষ্ঠার ভয়ে' তিনি নিজের নাম না দিয়া গোপালভট্টের নাম দিয়াছেন, এই কারণ-নির্দ্দেশটি নিতান্তই বাজে, কারণ সনাতন গোস্বামীর নিজের নামেই অপরাপর গ্রন্থ প্রচলিত আছে। স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়া তিনি কেন নিজের নামে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার হেতু অন্যবিধ।



ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

(২)

কানাকানি করিয়া লোকে অনেক কুকথাই বলিত। আজ দুই তিন বৎসর হইল, স্বামী হারাইয়া মন্দাকিনী লতাকে লইয়া ভ্রাতার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েক মাসের একটি শিশু পুত্র তখন লতার কোলে। শ্বশুরকুল হইতে কেহ আর এ নাগাত লতার খোঁজখবর কিছু লয় নাই। মাসে মাসে খোরপোষের টাকা আসে, ইহাই লোকে দেখে। কলিকাতার কোনও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আসে, কিন্তু পাঠাইবার মালিক যে কে, তাহার কোনও স্পষ্ট পরিচয় কেহ জানে না। জামাতার নাম মোহনলাল, কলিকাতায় থাকিয়া পড়িত, পিতামাতা ছিলনা, অবস্থা ভাল, এখানকার পড়া শেষ হইলে বিলাত যায়,—ইহার বেশী কোনও পরিচয় মন্দাকিনী কাহাকেও দিতে পারিতেন না। জামাতা যখন বিলাত গেল, তাহার কয়েকমাস পরেই বিধবা অবস্থায় তিনি ভ্রাতৃগৃহে আসেন। তাহার পর জামাতার আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু টাকা এই ভাবে মাসে মাসে আসিতেছে। লোকে যে কুকথা বলিত, কেন না বলিবে? এ অবস্থায় সহজেই লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে, আদবে বিবাহই হয় নাই,—যে ভাবেই হউক, কোনও ধনী যুবকের সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ হইয়াছিল, এই পুত্র তাহারই ফল। এই সম্বন্ধ সে এখন ত্যাগ করিয়াছে এবং অজ্ঞাত থাকিয়া পুত্র ও তাহার জননীর খোরপোষের টাকা পাঠাইতেছে। অজ্ঞাত তাহাদের, কিন্তু মন্দাকিনী ও তাঁহার কলঙ্কিনী কন্যার জ্ঞাত কি অজ্ঞাত, তাহাই বা কে জানে? একটা কিছু সাফাই ত দিতে হয়, তাই এইরূপ একটা পরিচয় দিতেছে, যাহাকে পরিচয় না বলিলেও চলে। হিন্দু কুলকন্যার বিবাহ হইয়াছে, আর তাহার স্বামীর কি সেই স্বামীর কুল-বংশ আত্মীয়স্বজন পৈতৃক বাসভূমি, কাহারও কি কিছুরই কোনও সংবাদ তাহার নিজের মাতাও রাখেনা, ইহাও কি কখনও হয়?

রাম! এতবড় একটা জাতি মারা কুৎসিত ব্যাপার গ্রামের মধ্যে সকলে গ্রাম্যসমাজে হজম করিয়া যাইতেছে! সকলের গৃহেই ত উহারা যায়, ছোঁয়াছুঁয়ি হয়, ক্রিয়া-কর্ম্মে আর দশজনের সঙ্গে উহারাও আসিয়া মেলে, একসঙ্গে আহারাদি করে। এই ত সেদিন রামতারণ মুখুয্যের বাড়ীতে তার নাতির ভাত হইল, সকলে গিয়া খাইল, আর রাঁধিয়া দিল হতভাগী ঐ লতা—ছি ছি! জাতিধর্ম্ম সব গেল! যতদূর যাহা হইবার হইয়াছে এখন ঐ যোগেশ বাঁড়ুয্যে তার ভগ্নীর ও ভাগ্নীর যাহা হয় একটা গতি করুক, কাশী কি নবদ্বীপ কোথাও পাঠাইয়া দিক্‌, —তারপর মাথা মুড়িয়া গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করুক। নতুবা তাহার সঙ্গে কোনও সংস্রব আর সামাজিকরা রাখিতে পারেন না।

কথা এইরূপ কিছু না কিছু বহুদিন যাবতই হইত। কিন্তু লতা যেদিন টাকা ফেরত দিল, তারপর বড় বাড়িয়া উঠিল। হরকরা যখন মণিঅর্ডার আনিয়া ফেরত দিল, মাতা ও কন্যার বাদপ্রতিবাদের কথাও সব বলিল, গ্রামের কেহ কেহ তখন ডাকঘরে ছিলেন। অনেক আলোচনা ইহা লইয়া হইল। কুৎসিত যে কথাগুলি কানাকানি করিয়া লোকে আগে কখনও বলিত, আজ খোলাখুলি ভাবেই উপস্থিত অনেকে তাহা বলিল। যার যার বাড়ীতে গিয়াও কথাগুলি তাহারা বলাবলি করিল। অনেক ডাল-পালা বাহির হইল। মুখে মুখে গ্রাম ভরিয়া সব গ্লানি ছড়াইয়া পড়িল। চাপাচাপি আর কিছু রহিলনা, ডাকা-ডাকি করিয়াই লোকে যাহা মনে আসিল, মুখে উঠিল, তাহাই বলিতে লাগিল।

কথা এমন অনেক হয়। কিন্তু কথার উপরে কথা যদি প্রতিপক্ষ কেহ কিছু না বলে, যাহাতে উত্তেজনাটা বড় বাড়িয়া ওঠে, আর ঘটনা যদি এমন কিছু তখন না ঘটে যাহা উপলক্ষ করিয়া এই উত্তেজনার মুখে সামাজিক বাস্তব কোনও কর্ম্মে কথাটাকে প্রয়োগ করিবার অবসর লোকে পায়, তবে অনেক বড় কথার আন্দোলনও ক্রমে

মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সর্ব্বদা যাহারা চক্ষের উপরে রহিয়াছে, চক্ষের উপরেই চলাফেরা করিতেছে, ব্যবহারে যাহাদের ত্রুটি কখনও কিছু দেখা যাইতেছেনা, বরং সশ্রদ্ধ ও সকরুণ একটা প্রীতিই তাহা আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদের প্রতি বিরুদ্ধ একটা ভাব বহুদিন কোথাও কেহ বড় পোষণ করিতে পারেনা। অপবাদ যত গুরুই হউক এমনও হইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই, সব অনুমান মাত্র। প্রত্যক্ষ নিত্যকার আচরণ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা এই অপবাদের কারণকে সমর্থন না করিয়া ক্রমে বরং নিরাসনই করিতে থাকে। অপবাদটা ক্রমে একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়, কোন গুরুত্ব কেহ আর বড় অনুভব করেনা। আবার যাহাদের নামে অপবাদ তাহারা যদি সেটা গায় তুলিয়া না লয়,—যেমন করিতেছিল, তেমন সহজভাবেই লোকের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করে, পাঁচরকম কাজকর্ম্মে বাহির হয়, লজ্জা পায়না, মাথা হেঁট করিয়াও ঘরের কোণে বসিয়া থাকেনা, তাহা হইলে এরূপ সব আন্দোলনের ত কথাই নাই, সদ্য ধরাপড়া কোনও দোষের নিন্দামন্দও অচিরে ঠাণ্ডা হইয়া যায়, যদি সামাজিক নিয়মে কি রাজার আইনে একান্ত অমার্জ্জনীয় বা অনুপক্ষেণীয় একটা অপরাধ তাহা না হয়। লোকের একটা চক্ষুলজ্জা আছে, যাহাতে মুখ ফুটিয়া এ অবস্থায় কথা বড় কেহ বলিতে পারেনা; যাহা বলে আড়ালে একটু কানাকানি করিয়াই বলে। আবার সদাসর্ব্বদা নিকট সাহচর্য্যেরও এমন প্রভাব আছে যাহা 'অমানুষ' বলিয়া কাহারও প্রতি কাহারও বিরাগকে ক্রমে দূর করিয়া মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্যের টানটাকেই বড় করিয়া তোলে। অমুক এই দোষে দোষী এই কথাটা যদি একবার মনে কখনও ওঠে, দশবার মনে ওঠে, সে আমারই মত আর একজন মানুষ, আমার প্রতিবেশী, বহু কর্ম্মে আমারই একজন সহযোগী। স্পষ্ট যে এইরূপ মনেই সর্ব্বদা সকলের ওঠে, তাহা নয়। অস্পষ্ট এইরূপ একটা অনুভূতিই মানুষের সঙ্গে মানুষকে, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীকে, সহযোগীর সঙ্গে সহযোগীকে, সহজভাবে মিলাইয়া দেয়, মিলাইয়া রাখে। দোষের কথাটা মনেই বড় আর ওঠেনা। আর মানুষের সবটাই কিছু আর দোষ নহে, গুণও অনেক আছে। অতি দোষীও একেবারে গুণহীন নয়। বাহিরের কাজকর্ম্মে বল, আমোদ প্রমোদে বল কি বিশ্রম্ভালাপেই বল, মানুষে মানুষে অন্তরের যে পরিচয় হয়, সেটায় দোষের কাছে দোষ অপেক্ষা গুণের কাছে গুণটাই ধরা পড়ে বেশী। তাই সহজভাবে যদি মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে, দোষের অপবাদভাগীর ত কথাই নাই, সাক্ষাৎ দোষীকেও লোকে শেষে ভালবাসে, ভাল চক্ষেও দেখে, আপনার মতই আর একজন বলিয়া অনুভব করে। তাহার অনিষ্ট করিতে সাধারণতঃ বড় চায়না। করিতে কেহ চাহিলেও তাহাকে চাপিয়া রাখে।

কিন্তু লতার ভাগ্যে এরূপ কিছু ঘটিলনা। এই দুর্ভাগ্য লইয়া মাতুলগৃহে আশ্রয় লইবার পর লোকসমাজে লতা বড় বাহির হইতনা, যা বা কখনও একটু হইত, তাহাও এখন বন্ধ করিয়া দিল। পুকুর ঘাটে কি ঘাটের পথে কাহারও সঙ্গে যাচিয়া কোনও কথা বলিতনা, কেহ কিছু বলিলে সংক্ষেপে তার উত্তর করিত মাত্র। স্নানান্তে কি কাপড় কাচিয়া জলের কলসী আনিতেছে এমন কেহ লতাকে পথে দেখিলে একটু সরিয়া দাঁড়াইত, পাছে ছুঁত লাগে, ভরা কলসীর জল ঢালিয়া ফেলিয়া আবার গিয়া জল তুলিয়া আনিতে হয়! লতা ভ্রূক্ষেপও করিতনা। ঘাটে বসিয়া কাজ করিতেছে, উচ্ছিষ্ট বাসন হাতে লইয়া কেহ কেহ পাড়ে দাঁড়াইয়া থাকিত, লতা গ্রাহ্য করিতনা, তাড়াতাড়িও কিছু করিতনা, ধীরে সুস্থে নিজের কাজ সারিয়া তবে আসিত। চলিয়া আসিলে কেহ মুচকী হাসিয়া টিট্‌কারী করিত, কেহ মুখ বাঁকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া ঝামটা দিত, কেহ বা গালিও পাড়িত। ছুঁড়ীর একটু আক্কেলও যদি থাকে। কেন বাপু, আলাদা একটা ঘাট করিয়া নিলেও ত পারিস্। তোর জন্যে সকলে ঘরের কাজ ফেলিয়া ছয়দণ্ড ঘাটের পাড়ে দাঁড়াইয়া থাকিবে?

মাতা মন্দাকিনী সদা সর্ব্বদাই এ পাড়ায় ও পাড়ায় বাহির হইতেন, বয়স্কা নারীরা গ্রামে যেমন হইয়া থাকে। দেখা হইলে পাঁচটা কথাও লোকের সঙ্গে বলিতেন। কিন্তু এখন সব বন্ধ হইল। ঘাটে লোকজন নাই, এমন সময় বুঝিয়া গিয়া স্নান করিয়া কি কাপড় কাচিয়া তিনি আসিতেন,—আর ঘরে বসিয়া কাঁদিতেন। লোকে ভাবিত নিশ্চয়ই উহারা দোষী, ধরা পড়িয়া এখন চোর হইয়া আছে।

নিন্দা মন্দ যেই যেখানে যত করুক, বাদপ্রতিবাদ মন্দাকিনী কি লতার সঙ্গে কখনও কাহারও হইতনা, হইবার সম্ভাবনাও কিছু ঘটিত না। তবে বহু কলহ রটন্তী দেবীর সঙ্গে সকলেরই সর্ব্বদা হইত। লতা তাঁহার ভাগিনেয়ী, বিপদে পড়িয়া তাঁহারই শ্বশুরের ভিটায় আশ্রয় লইয়াছে। এক অন্নে না থাকিলেও তাঁহার ঘরেরই একজন লোক সে। অর্থ সামর্থ্যে কুলায় না, এক অন্নে তাহাকে পুষিতে পারেন না। নহিলে কন্যায় আর ভাগিনেয়ীতে তফাৎ কি? কুলীনের ঘরে কত এমন ননদ ভাগ্নী ঘরের লোকের মতই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। প্রতিপালনে একটা দাবীই তাহাদের আছে। ননদ মন্দাকিনীর কোনও দুঃখ কি লজ্জা তাঁহারও সমান দুঃখ লজ্জা। কিন্তু দুঃখের কথা যাহাই থাক্‌, লজ্জার এমন কি হইয়াছে? ঐ লতা—ছিঃ! তাহার সম্বন্ধে এত বড় একটা কুকথা লোকে ভাবিতেও পারে? পোড়া গাঁয়ের সব পোড়ারমুখো পোড়ারমুখীদের পোড়া মুখের পোড়া জিভ কেন খসিয়া পড়েনা? লতা ত ঐ এক ধাতুর মেয়ে—কোনও দিনই লোকের মাঝে বড় বাহির হয়না। তবে মনে নাকি সুখ নাই, স্বামী থাকিতেও এই কাঁচা বয়সে যেন বিধবা—আর সেই স্বামী আছে কি নাই তাহারই বা ঠিক কি? তিন তিনটি বৎসর কোনও খবর নাই। তা এসব বিধবারাও ত বেড়ায় চেড়ায়। যেখানে সেখানে একা না যায় আর যার তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি কিছু না করে, এইটুকু দেখিলেই হইল। তা ওর সবই সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড—কপালও হইয়াছে যেমন সৃষ্টিছাড়া! তবে—সে যা খুসী করুক, এমন আসে যায়না কিছু। আর সত্য, ঐ কচি মেয়ে এত বড় একটা কলঙ্কের কথা উঠিয়াছে, লোকের সামনে সদা সর্ব্বদা বাহির হইতে একটু লজ্জা তার হইতে পারে বইকি? কিন্তু ঐ ঠাকুরঝি—তুই আবাগী কেন ঘরের কোণে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছিস্‌ আর চোকের জল ফেলিতেছিস্‌? সত্যই যেন এমনই একটা কেলেঙ্কারী হইয়াছে, ধরা পড়িয়াছিস্‌, এখন কোন্‌ বনে গিয়া লুকাইবি তার পথ পাইতেছিস্‌ না! নিজের মুখে এমন করিয়া নিজে চুণকালী মাখিতেছিস্‌ লোকে আরও বেশী করিয়া মাখাইবে না কেন? গাঁয়ে বাহির হ, মুখ উঁচু করিয়া বেড়া, কেউ কোনও কথা বলে, কড়া দু'কথা শুনাইয়া দে! এই যে কুকথায় সকলে পঞ্চমুখ হইয়াছে, একটা মুখ তখন থাকিবেনা, কথাও বন্ধ হইয়া যাইবে। ঐ যে কথায় বলে, বেহায়ার বালাই নাই। ঠিকই বলে। সত্য সত্য একটা কিছু হইলেও, লজ্জা যদি না পায়, আর মুখ তুলিয়া বেড়ায়, কে তাকে কয়দিন কি বলে? তা আবাগীরও সময় বুঝিয়া মতিভ্রম হইয়াছে!

রটন্তী গিয়া অনেক ধমক চমক ননদিনীকে করিয়াছেন। এক একদিন গিয়া বলিয়াছেন, চল্‌ অমুক বাড়ীতে গিয়া বেড়াইয়া আসি। হাত ধরিয়াও কত টানাটানি করিয়াছেন; কিন্তু নড়াইতেও পারেন নাই। যেমন মন, তেমন শরীরও তাঁহার এই আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু ননন্দার এই ত্রুটি সুদে আসলে রটন্তী পোষাইয়া নিতেন। সর্ব্বত্র তিনি যেমন আগে, তেমন এখনও বিচরণ করিতেন, বরং কিছু বেশীই করিতেন। এক কথা শুনিলে পঞ্চাশ কথা শুনাইয়া দিতেন। কার ঘরে কবে কি হইয়াছে, কার বধূ ঘোমটা তুলিয়া হাসিয়া কার সঙ্গে ঘাটে কবে কথা কহিয়াছিল, কার কন্যার কোন্‌ চিঠি কবে কার হাতে গিয়া পড়িয়াছিল, কার সৎশাশুড়ী জ্যৈষ্ঠ, মাসেও লেপ মুড়ী দিয়া পিছনের ঘরে এক মাস শুইয়াছিল, ভাতার দু পয়সা আনিতে পারে না এমন কার হাতে কার দেওয়া সোণার বালা তাগা উঠিয়াছিল, কার জা মধ্যে মধ্যে কাশী কি বৃন্দাবনে গিয়া তীর্থবাস করিয়া আসে,—হাঁকে ডাকে এইরূপ কথাও অনেককে বলিতেন।

লোকের রাগ বাড়িয়া গেল। লতার নিন্দায়ও অনেক ডালপালা জুড়িল। কোথা হইতে লতার টাকা আসিত, কে পাঠাইত, তাহারও দুই একটা গল্প রচিত হইয়া প্রচারিত হইল। বাহিরে ত কেলেঙ্কারী করিয়া আসিয়াছে। গাঁয়েও কি ও ভাল?—ঐ ত চৌধুরীদের বাড়ীর সেজবাবু—ও যখন ঘাটে যায়, ওপারে ঘাটে আসিয়া দাঁড়ায়, চোকে চোকে কত কি ইসারা হয়। ঐ বিন্দীতেলিনী কত ওদের বাড়ীতে আনাগোনা করে। এই যে টাকা ফেরত দিয়া বাহাদুরীটা দেখাইল, কোন্‌ ভরসায়? ঐ বিন্দীর হাতে সেজবাবু থোকে থোকে টাকা পাঠায় তাই না?

একটা হুলস্থুল বাধিয়া গেল। ঠিক এমন সময় লতার মাতুল যোগেশ বাঁড়ুয্যের একটি পুত্রের পৈতার দিন

উপস্থিত হইল। এই সব ক্রুদ্ধা নারীরা এবং তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বান্ধবীরা পাড়ায় পাড়ায় পুকুর-ঘাটে ঘোষণা করিলেন, ঐ লতি আর তার মাকে যদি ঘরে ডাকে, যোগেশ বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে জলগ্রহণও কেহ করিবেন না, বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও কেহ পা দিবেন না। নিন্দাবান্দা যিনি যাহাই করুন বা শুনুন, এতটা বাড়াবাড়ি করা পুরুষরা অনেকেই বড় সঙ্গত মনে করিতেছিলেন না। কিন্তু বহু গৃহে নারীদের জিদে শেষে তাঁহাদের হার মানিতে হইল।

(৩)

সন্ধ্যার পর একদিন যোগেশ বাঁড়ুয্যে ঘরে ফিরিয়া চুপি চুপি গৃহিণী রটন্তীকে জ্ঞাপন করিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে—উপেনের পৈতা আর হইল না। কোনও বামুন আচার্য্যের কাজ করিবে না, বাড়ীতে আসিয়া একখানি পাতাও কেহ পাড়িবে না।

"কেন? কি হয়েছে? আমাদের জাত গেছে? কোন্ হারামজাদা হারামজাদী এমন কথা বলে?"

একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া তেমনই চড়া সুরে রটন্তী এই উক্তি করিলেন!

"আরে চুপ চুপ, ক'রছ কি? আগেই চেঁচিয়ে একেবারে পাড়া মাথায় করে তুল্লে যে! একটু স্থির হ'য়ে আগে শোন—"

"কি শুনব? শোনাতে এসেছ ত এই যে অনাথা ঐ দুটো আবাগী—ঐ ঠাকুরঝি আর লতি—তাদের জাত নেই, —আর তার ছুঁৎ লেগে আমাদেরও জেতেস্ত হ'য়েছে? —আ—আঁটকুড়োর ব্যাটা-বেটীরা! গোল্লায় যাক্, গোল্লায় যাক্—উড়ে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাক গাঁ!"

"আহাহা—শোনই না কথাটা—আমাদের জেতেস্ত হয়েছে, এমন কথা ত কেউ বলে নি।"

"কি বলেছে তবে? ঐ ঠাকুরঝি আর লতির জেতেস্ত হয়েছে—তার ছুঁতে যদি আমরা থাকি আর ওপ্নার পৈতেয় ঘরে তাদের ডাকি, তবে আমাদেরও জেতেস্ত কর্‌বে!—কেন, কি ক'রেছে ওরা? কে কি দেখেছে? বলি, ঐ হলধর চাটুয্যে, গঙ্গা বাঁড়ুয্যে, মাধাই মুখুয্যে, শ্যামা ভট্‌চাজ, গোবর চক্কোত্তি—আর ঐ ক্যামাঠাকরুণ, বিন্দের মাসী, ম্যাদার পিসী, ভগার মা—"

"ওগো, তারা নয় গো, কেবল তারাই নয়। এই ত বিকেলে আজ ন'খুড়োদের বাড়ীতে বৈঠক ব'সেছিল—"

"আর বৈঠকে অম্‌নি এক-তরফা রায় হ'য়ে গেল, ওদের জাত নেই!"

"না, ঠিক তা কেউ বলে নি। তবে আমায় ডেকে সবাই ব'ল্লেন—একটা কথা উঠেছে—সবাই আপত্তি ক'র্‌ছে—"

মুখ ভেঙচাইয়া রটন্তী উত্তর করিলেন, "একটা কথা উঠেছে—আপত্তি করেছ! আহা হা! কি সব সামাজিক গো! আর কি বিচের? একটা কথা উঠলেই অনাথা দুটো মেয়েমানুষকে অমনি জাতমারা করে রাখ্‌তে হবে? বলি, কথা ত অমন কত মিন্সেমাগীদের নামেই উঠে থাকে! কই, কে কাকে তার জন্যে জাতমারা ক'রে রেখেছে?"

"বলি ঘরে বসে এখন আমার সঙ্গে বকাবকি ক'রে কি ক'র্‌বে? বৈঠকে গিয়ে যদি বলতে পারতে—"

"কেন, তুমি ব'ল্‌তে পার নি? কেমন মরদ যে ন্যায় অন্যায় দুটো কথা মুখে যোগাল না? যা ব'ল্‌তে নেই, তাই ব'ল্লে, আর অম্‌নি তুমি ন্যাজ গুটিয়ে ঘরে এসে লুকুলে!—বৈঠকে যাব আমি? তা বেশ, যাব, তাই যাব! কাছা খুলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে গে' হেঁসেলে ব'সো, যাব, আমিই বৈঠকে যাব!—বুঝে নেব, কি ক'রে হতভাগারা বলে যে আমার বাড়ীতে এসে খাবে না—যদি ওদের ঘরে ডাকি! ভাসুর শ্বশুর? দূর কর ভাসুর শ্বশুর! এমন অধর্ম্মীদেরও আবার ভাসুর শ্বশুর ব'লে কেউ সরম ক'র্‌তে পারে? উচিত কথা মুখের ওপর গুরুদেবকেও ব'ল্‌তে আছে। হাঁ!"

"গিয়ে বল! আগুন আরও জ্বলে উঠ্‌বে ছাড়া নিভ্‌বে না তাতে।"

"ওঠে উঠুক। কি কর্‌বে ওরা? কেউ খাবে না এসে? না খায় নেই খাবে। ডাল ভাত যা দুটো যোগাড় ক'র্‌তে পারি, কাঙাল ভিকিরীকে ডেকে খাওয়াব।"

"বলি, পৈতেটা ত হওয়া চাই! দেবে কে? পুরুত আচায্যি কেউ আস্‌বে না।—সবাইকে ওরা আট্‌কেছে!"

"সবাইকে আট্‌কেছে! কেউ আস্‌বে না? বটে—বটে!—আঃ হারামজাদারা!—আচ্ছা, দেখ্‌ব! আস্‌বে

না? চুলোয় যাক্! শিরোমণি মশাইকে ডেকে আমি পৈতে দেওয়াব!"

"হাঃ হাঃ হাঃ! ক্ষেপেছ তুমি? শিরোমণি মশাই আসবেন তোমার বাড়ীতে তোমার ছেলের পৈতে দিতে? হাঃ হাঃ হাঃ!"

"কেন আস্‌বেন না?—এ বাড়ী বামুনের বাড়ী না?—ওপ্‌না বামুনের ছেলে না? সত্যি যদি পণ্ডিত তিনি হন, সাধু সাত্ত্বিক একজন মহাপুরুষই হন,—এই যে দেবতার মত ভক্তি লোকে তাঁকে করে—সত্যি যদি সেই ভক্তির যুগ্যি দেবতাই তিনি হন,—অবিশ্যি আস্‌বেন! বিপদে প'ড়ে গিয়ে দ্বারস্থ হব, আর তিনিও ওজর দিয়ে এড়াবেন—সে হতেই পারে না! যদি হয়, বুঝ্‌ব তিনিও ভুয়ো—সব ভুয়ো!—ধম্ম ভুয়ো, পুণ্যি ভুয়ো—পুজো বিয়ে শ্রাদ্ধ পৈতে—সব ভুয়ো! কিছুরই কোনও সার নেই। কাল পূর্ণ হ'য়েছে। ওপ্‌নার পৈতে না হয় নাই হবে। থাক্, ও শূদ্দুর হ'য়েই থাক্। বামুন দেশে আর থাক্‌লে ত? পৈতা এক একটা গলায় ঝোলালেও সব গুয়োটাই শূদ্দুর!—শূদ্দুরেরও অধম! মুখে আন্‌তে নেই এমন কথা—তা ঐ যে শিরোমণি ঠাকুর—থাক্, (যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া) আগেই কেন পাপ কথাটা মুখে তুলব?—তা বৈঠক ত তোমাদের হ'য়েছিল, গাঁয়ের মাথা শিরোমণি ঠাকুরকে ডাকা হয়েছিল?"

"জানি না। তবে এসব সামাজিকতার ঘোঁটে তিনি ত কখনও আসেন না।"

"এ ত আর নিত্যিকার চলতি ব্যাভারী সাধারণ একটা সামাজিকেতার কথা নয়, দুটো মেয়েমানুষের জেতেস্ত হ'তে ব'সেছে, যার বাড়া শাস্তি নাকি আর হ'তে পারে না। একটা শাস্তর পাঁতি এর অবিশ্যি আছে। অত বড় একজন পণ্ডিত দেশে র'য়েছেন, মুক্‌খুরা একটিবার তাঁর কাছে গিয়েও একটা ব্যবস্থার কথা জান্‌তে চাইলে না?"

"জান্‌তে ত হয়। সাধারণ সামাজিকেতার কথা, সে এক রকম। আজ কাউকে ফেলে রাখল, কাল আবার তুলে নিল—কত এমন হচ্ছে। কিন্তু জাতিপাত কারও যদি ক'র্‌তে হয়, শুনেছি ভট্‌চায্যির পাঁতি আগে লাগে। তা শিরোমণি ঠাকুরের কাছে গিয়ে এর একটা কিনেরা করে ফেল্‌তে পার্‌লে মন্দ হয় না। পৈতের কথাটাই বড় কথা নয়। কিন্তু ওরা যে সত্যি জাত মারা হয়ে আমার বাড়ীতে থাক্‌বে—"

"বুদ্ধির গোড়ায় জল এল এতক্ষণে? আমি ত তাই চেঁচিয়ে ম'র্‌ছি! এই রকম একটা কথা নিয়ে জাতই যদি গেল, তবে আর মেয়েমানুষের রইল কি? আর তুমি মার পেটের ভাই, ওরা এত বড় একটা কথা ব'ল্লে, আর রা'টি না ক'রে ব'লে এলে, তাই সই! দুদিন বাদে পৈতে, কি সর্ব্বনাশ হ'ত সত্যি যদি ওদের ত্যাগ ক'রে জ্ঞাতি-কুটুম সামাজিক পাঁজনকে বাড়ীতে এনে খাওয়াতাম! ভাল পুরুষমানুষের ঘর ক'র্‌ছি, এইটুকু হিসেব মাথায়নেই?"

যোগেশ বাঁড়ুয্যে একটু লজ্জা পাইয়া কহিলেন, "আমি ত ঠিক রাজি হ'য়ে আসিনি। ওরা বল্লে, তোমাকে এসে জানালাম। তা এখন শিরোমণি মশাইএর কাছে কে যাবে? আমি ত—"

"তুমি ত গিয়ে সবই কর্‌বে? ঘটে বুদ্ধি কত! সে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। যা হয় আমিই ক'র্‌ব!—বলি, ও ঠাকুরঝি!"

"কি বউ?"

"বলি শুন্‌লি ত সব?"

গভীর একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া গৃহ হইতে মন্দাকিনী উত্তর করিলেন, "শুনে আর কি করব ভাই? কপাল করেছি মন্দ, কত বিড়ম্বনাই যে আছে—"

"বিড়ম্বনা নিজে ডেকে আন্‌ছিস্! কপাল টপাল—ওসব কম্মে ঘটে।—যেমন ভাই, তেম্‌নি বোন্। আস্‌বে কোত্থেকে? একটু বুদ্ধি খরচ করে যদি চ'ল্‌তিস্, এত কথা আজ শুন্‌তে হয়? তা ভাবিস্ নি কিছু। তোদের ছেড়ে ওপ্‌নার পৈতে আমি প্রাণ থাক্‌তে দেব না। দেখি, উনি কি বলেন? পায়ে যদি ভক্তি থাকে, বঞ্চিত হব না। আচাজ্জি পুরুত—চুলোয় যাক, চুলোয় যাক! ওঁকে এনে ওপ্‌নার পৈতে দেওয়াব!—সুড় সুড় করে সবাই তখন টিকি নেড়ে এসে দাঁড়াবে। না আসে বয়ে গেল? উনি একা যদি এসে এঁটো মুখ করে যান, হাজার বামুন ভোজনের কাজ আমার হবে!"

(৪)

বড় পণ্ডিত কেবল নহেন, নিষ্ঠাবান্ একজন সাধক এবং অতি সাধুচরিত্র ব্যক্তি বলিয়াও শিবকিঙ্কর শিরোমণি

মহাশয়ের নাম ছিল। এই গ্রামের কেবল নহে, চারিধারে বহু গ্রামের অধিবাসীরাই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। পূজা জপতপ ও শাস্ত্রাধ্যয়নেই তাঁহার সময় প্রায় অতিবাহিত হইত। আর কয়েকটি শিষ্য ছিল, পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে কিছুকাল তাহাদের লইয়া অধ্যাপনা করিতেন। দুইটি পুত্র—একজন দূরে কোনও টোলে এবং আর একজন কোনও কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। পরিবার তাঁহাদের সঙ্গেই শিরোমণি মহাশয় পাঠাইয়া দিয়াছেন,—নহিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথোপযুক্তভাবে পালন করা সম্ভব হয় না,—সাংসারিক স্বচ্ছন্দতাও ভোগ করা কিছু যায় না। গৃহিণী দুই তিনটি পৌত্র পৌত্রী লইয়া বাড়ীতে থাকেন। নিঃসম্বল একটি কুটুম্ব সপরিবারে গৃহে আশ্রিত আছেন, শিষ্যেরা আছে,—বৈষয়িক ও সাংসারিক কাজকর্ম্ম সহজেই নির্ব্বাহ হইয়া যাইতেছে—সেদিকে কোনও অভিনিবেশ শিরোমণি মহাশয়ের প্রয়োজন হয় না। এসব কার্য্যে চিত্তের বিক্ষেপও বৃদ্ধ বয়সে শিরোমণি মহাশয় প্রাতিকর বলিয়া মনে করেন না। বৈষয়িক ও সামাজিক কোনও ব্যাপারে কেহ উপদেশ নিতে আসিলে, উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত কখনও হন না। কিন্তু যাচিয়া নিজে কাহারও কোনও কথার মধ্যে কখনও যান না।

বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণকৃত্যাদি সারিয়া শিরোমণি মহাশয় বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন,—লম্বা ঘোমটা টানিয়া গৃহ মধ্য হইতে রটন্তী আসিয়া তখন বাহির হইলেন। গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া, চাপা স্বরে কহিলেন, "বাবা, আপনাকে প্রণাম কর্‌ছি, একটু পায়ের ধূলো দিন।" বলিয়া সম্মুখে দুটি যুক্তকর বাড়াইয়া দিলেন।

"কে!—ও! এস মা এস! ব'সো।"

বলিতে বলিতে একখানি পা একটু সম্মুখের দিকে সরাইয়া দিলেন। রটন্তী দুই হাতে পাখানি ধরিয়া ভূনত শিরে তাহা স্পর্শ করাইলেন।

"সুখে থাক মা।"

মাথায় হাত দিয়া শিরোমণি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"বসো মা, বসো।"

একটু সরিয়া আড় হইয়া রটন্তী বসিলেন। শিরোমণি কহিলেন, "তা কি মনে করে মা?—সবাই ভাল আছ ত তোমরা?"

রটন্তী তেমনই চাপা স্বরে কহিলেন, "আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে শরীরগতিক একরকম আছি।—তা বড় একটা বিপদে প'ড়ে আজ আপনার শ্রীচরণে এলাম।—দয়া করে আমাদের রক্ষে কর্‌তে হবে।"

"বিপদ! কি বিপদ মা?"

"সে আর আপনাকে কি বল্‌ব বাবা? মুখ ফুটে বল্‌তেও সরমে ম'রে যাই। ঐ যে আমার ননদ আর ভাগ্নী লতি আমাদের বাড়ীতে আছে—"

"হাঁ; তা কি হ'য়েছে তাদের?—জামাইটির—কোনও খবর—"

"না, ষাট্! তার কোনও মন্দ খবর কিছু আসেনি।"—

"তবে কি হ'য়েছে তাদের?"

"কেন, বাবা কি শোনেন নি কিছু? কেউ ওরা এসে বাবার একটা উপদেশও চায় নি?"

"উপদেশ! কিসের উপদেশ মা? না, কই, কেউ ত আসে নি। শুনিনি ত কিছু।"

"আমিও ত তাই বলি! বাবার কাছে এলে তিনি কি আর এমন ধারা একটা জাতমারা সামাজিকেতায় সায় কখনও দিতেন?"

"জাতমারা সামাজিকেতা! সে কি? কি হ'য়েছে বল ত মা শুনি?"

রটন্তী তেমনই চাপা সুরে উত্তর করিলেন "সে মাথামুণ্ডু আর বাবার কাছে কি বলব? ওরা এই প্রায় বছর তিনেক হ'ল এখানে এসেছে। তা সে জামাইএরও খোঁজখবর কিছু নেই,—শ্বশুরকুল থেকেও তত্ত্ব কেউ কিছু করে না—"

"কেন, শুনেছি ত মাসে মাসে খরচ তারা পাঠায়।"

"তা পাঠায়। কিন্তু কে যে পাঠায় কেউ জানে না। কোন্ এক আপিস থেকে নাকি আসে। সে আপিসেও খোঁজ নেওয়া হ'য়েছিল; তা নামধাম কিচ্ছু তারা ব'ল্‌তে চায় না।"

"তাই নাকি? কেন, মা মন্দাকিনীও কি তাদের নামধাম কিছু জানেন না?"

"সেই ত হ'য়েছে বড় মুস্কিলের কথা বাবা। জামাই আর তার বাপের নামটা কেবল জানে—আর কিছুই ব'ল্‌তে পারে না।"

"সে কি? মেয়ের বিবাহ দিয়েছে—"

রটন্তী কহিলেন, "আমরাও ত তাই বলি। বলি, মেয়ের বিয়ে দিলে, আর তাদের কুলবংশ, দেশ গাঁ, কোনও খবর নিলে না? তা ব'লতে কি বাবা, আমার ননদের বুদ্ধি-শুদ্ধি তেমন পাকা নয়। আমার নন্দাই লেখাপড়াও শিখে-ছিলেন—ইস্কুলেও চাকরী কর্‌তেন—তা তিনিও যে বুদ্ধি-শুদ্ধিতে বড় পাকা ছিলেন, তা মনে হয় না। ছেলের নাকি মা বাপ ভাই বান্ধব কেউ ছিল না, বাপ কিছু টাকা রেখে যায়, তাই খরচ করে ক'ল্‌কেতায় থেকে পড়্‌ত।"

"তা বিবাহ কি করে হ'ল? সম্বন্ধ কে কর্‌লে?"

"আর বাবা, আজকালকার দিনকালও হ'য়েছে যেমন! ঐ যে ছেলেরা এখন দল বেঁধে বেরোয়—'বলোন্তারী'—(ভলাণ্টিয়ারী) না কি বলে—তাই নাকি ক'ল্‌কেতা থেকে চুঁচ্‌ড়োয় এসেছিল—আমার নন্দাই চুঁচ্‌ড়োতেই চাকরী ক'র্‌তেন। চুঁচ্‌ড়োরও অনেক ছেলে জুটেছিল ঐ বলোন্তারীতে। আমার নন্দাই আবার তাদের সর্দ্দারী ক'র্‌তেন। ঐ একটা বাই তাঁর ছিল। কোথাও সভা-টভা হ'ক্ কি রোগপীড়ে দেখা দিক্ কি বড় যোগটোগে গঙ্গার ঘাটে যাত্রীর ভিড় হ'ক্, ছেলের দল নিয়ে হৈ হৈ ক'রে বেড়াতেন। তা ঐ ছেলেটার সঙ্গে তখন জানাশুনো হয়। কি অসুখ হয়ে পড়েছিল, বাড়ীতে এনে তাকে রাখেন।"

হুঁ—সেই সূত্রে বুঝি ঘনিষ্ঠ একটা আলাপ পরিচয় তার সঙ্গে হয়।"

"হাঁ, বাবা। তারপর মধ্যে মধ্যে আস্‌ত যেত। কখনও হয়ত দু তিনদিনও এসে থাক্‌ত। দেখ্‌তে ভাল ছিল, আর আমার ননদ বলে, এমন মিষ্টি কথা ব'লত আর এমন আপন আপন একটা ভাব দেখাত যে পর কেউ ব'লে তাকে আর তাদের মনেই হ'ত না। সেও ওদের দেখ্‌ত যেন আপন বাপ মায়ের মত।"

"হুঁ! তা বিবাহের প্রস্তাব কে করে?"

"ঐ ছেলে নিজে।—একদিন এসে বলে, লতিকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিন! তা দেখুন, মেয়ে যেমনই হ'ক্, বিয়ে দেওয়া ত আজকাল সোজা নয়, টাকাও লাগে কাঁড়ি কাঁড়ি। অবিশ্যি আমরা অত বাছি না। জানাশুনো ঘরের চলনসই একটি ছেলে হ'লেই মেয়ে দিয়ে কৃতার্থ হই। তা ওঁরা ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছেন—সহরে চাকরী করেন, মেয়েকেও লেখাপড়া গান বাজনা শিখিয়েছেন—ছেলেও চান তেম্‌নি ওজনের। টাকা দানসামগ্রী সবই দিতে হয় ওজন বুঝে। তা অমন একটি ছেলে যেচে এসে বিয়ে কর্‌তে চাইল, দাবীদাওয়া কিছু নেই—একেবারে হাতে স্বর্গ পেলেন। অম্‌নি ব'ল্লেন, তাই হবে।"

"তখন কি দেশ গাঁ কুলবংশের কোনও পরিচয় নেওয়া হয় না?"

"ছেলে নাকি বলে, তার বাবা অনেক দিন দেশছাড়া হ'য়ে ক'ল্‌কেতায় ছিলেন। খবরাখবর সে কিছু রাখে না। তবে বাপ পিতেমোর নাম গোত্তরের একটা পরিচয় নেওয়া হয় বই কি?—তবে তা যা নিয়েছিলেন আমার নন্দাই,—ননদ একটিবার সুধোয়ও নি কিছু—"

"তোমরাও ত বিবাহে বোধহয় উপস্থিত হওনি।"

"না বাবা। খবরও একটা আমাদের দেয় নি।—দিলে কি আর যেতাম না? শাশুড়ীর পেটের আর কেউ নেই। সবে ঐ একটি ননদ। তার ঐ সবে একটি সন্তানের বিয়ে—খবর পেলে কি না গিয়ে পার্‌তাম? তা বলে, ছেলে এসে ধরে প'ল, বড্ড তাড়াতাড়ি ক'রে বিয়ে দিতে হ'ল—চিঠি ছাপিয়ে নেমন্তন্ন পাঠাবার আর সময় হ'ল না। তা ছাপান চিঠি না হয় নাই হত। একটু পোষ্টকাঠে লাল কালী দিয়ে দুটি ছত্তর লিখে দিলেও ত পার্‌ত। কাকের মুখে একটু খবর পেলেও আমরা উড়ে যেতাম। আর তাহ'লে কি এমন ধারা একটা কাণ্ড হয়? তন্ন তন্ন করে সব খোঁজ না নিয়ে বিয়েতে ওঁদের অনুমতি দিতে দেওয়াতাম? মেয়েই বা কি আর ভাগ্নীই বা কি? কোথায় কার ঘরে কার হাতে দিচ্ছি, জেনেশুনে ত দিতে হয়?—কি বলেন বাবা! হয় না?"

"হাঁ, সে ত হয়ই। পূর্ব্বাপর একটা নিয়মও ত তাই র'য়েছে। তা বিবাহে বরযাত্র কেউ আসে নি?"

"এসেছিল নাকি ছেলের দুই চারজন বন্ধু যারা। তাই ত ভাবি বাবা, এত তাড়াতাড়িই বা কি দরকার ছিল! দেশ গাঁ কোথায়, ছেলে কি আর সত্যি তা জান্‌ত না? খোঁজখবর করে দুই একটি জ্ঞাতি কুটুম কি আনাতে পার্‌ত না?"

"হুঁ—কাজটা ভাল হয় নি। প্রকৃত পরিচয় অপলাপ ক'রে কেউ হয়ত প্রবঞ্চনা ক'রেও যেতে পারে।"

"তা পারে বই কি বাবা, তা পারে বই কি ? তবে এও ত হ'তে পারে, ছেলে ছোকরার মন, মাথার ওপরে বাপ ভাই কেউ নেই, হঠাৎ বাই চ'ড়ল, বিয়ে করব, দুদিন আর তর সইল না। দেশে খবর পাঠিয়ে জ্ঞাতিকুটুম কাউকে যে আনবে, ওসব হাঙ্গামাই কিছু ক'র্‌তে চাইল না।"

শিরোমণি একটু ভাবিয়া কহিলেন, "হাঁ, সেটাও সম্ভব বটে। আর সেই রকম একটা কিছু হ'য়েছে, এইটেই আমাদের ধ'রে নেওয়া উচিত। তা—বিবাহের পর স্বামীর গৃহে কি লক্তা যায় নাই ?"

"না। ছেলে নাকি ব'লেছিল, তার ত বাড়ী ঘর নেই, কোন্ মেসে না হোটেলে থাকে।—বউ নিয়ে তুল্‌বে কোথায় ? বরযাত্র যে ছোঁড়ারা এয়েছিল, পরদিন সকালেই চ'লে গেল। সে কয়দিন রইল। তার পর মধ্যে মধ্যে আস্‌ত যেত। মাস ছয় পরে নাকি বিলেত চ'লে গেল।—তার পর আর খবর কিছু পাওয়া যায় নি।—ঐ ছেলে ছিল তখন পেটে। অনেক কথাই মনে হয় বাবা বুক ফেটে মরি, কিন্তু মুখ ফুটে ঠাকুরঝিকে ব'ল্‌তে পারি নি।—সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে সেই দেশ—দুমাস ছমাসে খবর পাওয়া যায় না—চেনা লোক ত কেউ সেথায় নেই।—প্রাণে বেঁচে আছে কি না কে জানে ?—আবার কত যুদ্ধু টুদ্ধু নাকি সে দেশে হয়—হয় ত কোথাও কেউ বেঁধে নিয়ে গেছে। কবে খালাস পাবে, পাবে কি না তাই বা কে জানে ? ভেবে আর কুল পাই নে বাবা,—সারাটি রাত এক একদিন চোকের দুটি পাতা এক ক'র্‌তে পারি নে।"

"কিন্তু টাকা ত আস্‌ছে।"

"বাপের টাকা নাকি কিছু ছিল, যাবার আগে হয় ত এমন একটা বন্দেজ কিছু ক'রে গিয়েছিল যে ও'দের খোরপোষ বাবদ এই টাকাটা মাসে মাসে আস্‌বে।"

"কিন্তু যাদের থেকে আস্‌ছে, তাদের কাছে পরিচয় ত একটা পাওয়া যাবে।—তারা কেন সেটা দেয় না ?"

"না, তাও দিচ্ছে না বটে। আর তাতে এমন একটা কথাও মনে হয়, কোনও হতভাগা ফাঁকি দিয়েই গেছে। সক হ'য়েছিল, বিয়ে করবে, ক'রে এ দু'দিন থেকে পালিয়ে গেছে। তবে খোরপোষটা দিচ্ছে, এইটুকু যা মন্দের ভাল। লক্তি নিজেও তাই বোধ হয় মনে করে। এই ত সেদিন খরচের টাকা এল,—রাগ ক'রে ফেরত পাঠিয়ে দিল, সই দিয়ে রাখল না।"

"রাখ্‌ল না ! টাকাটা বন্ধ হ'লে তাদের চ'ল্‌বে কি ক'রে ?"

"সেই ত ভাবনা বাবা। তবে পর ত নয়। ক্ষুদ কুঁড়ো যা জোটে, না হয় ভাগ ক'রেই খাব। তা সে হ'ল পরের কথা।—পেট দিয়েছেন যিনি, খাবারও যে ক'রে হয় তিনিই জুটিয়ে দেবেন। মানুষের মেলে, মানুষ সত্যি কেউ উপোস ক'রেও মরে না :—তা এখন এই যে একটা গোলমাল বেধে উঠ্‌ল—"

"হাঁ, সেই গোলমালটা কি বেধে উঠেছে বল ত মা, শুনি।"

অতি সঙ্কুচিত ভাবে রটন্তী সংক্ষেপে কথাটা শিরোমণি মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলেন।

শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "ছি ছি ছি ! এমন সব কুকথা কি ক'রে লোকে বলে ? আবার তাই নিয়ে জাত্যন্তকর এত বড় গর্হিত একটা কার্য্যও ক'র্‌তে বসেছে !—হাঁ, সন্দেহ একটা হ'তে পারে, অকরণীয় কোনও ঘরে দ্বারকানাথ কন্যা দান ক'রেছেন। আর—" বলিয়াই শিরোমণি মহাশয় কাসিলেন,—

রটন্তী একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর—কি হ'তে পারে বাবা ?"

শিরোমণি কহিলেন, "সে কথাটা মুখে আন্‌তেও সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে মা। তবে এরূপ দুই একটা ঘটনা ঘটেছে বলে শুনেছি। এই যে যুবক—পরিচয় ভাল ক'রে নেওয়া হয় নি—এমনও হ'তে পারে যে ব্রাহ্মণসন্তানই নয়—"

"কি সর্ব্বনাশ ! তা হ'লে ত সত্যিই একটা জাতনাশা কাণ্ড হ'য়েছে ! এখন উপায় !"

"না না, একথা আমি ব'ল্‌ছি না যে এমন দুর্ঘটনা একটা ঘ'টেছেই। একটা সন্দেহ মাত্র হ'তে পারে।—জ্ঞানবিশ্বাস মত ব্রাহ্মণসন্তানের হাতেই ওরা কন্যা সম্প্রদান ক'রেছে।—ওদের কথাই এস্থলে প্রমাণ ব'লে ধরে নিতে হবে। অন্যরূপ ঘটনার প্রমাণ কিছু নেই।"

রটন্তী কহিলেন, "সে রকম কোনও ছুঁতো ধ'রেও ত এ গোলমালটা ওরা বাধায় নি।—ওরা ব'ল্‌ছে—ব'ল্‌ছে—"

"থাক্ মা, আর ও কথা তুলে কাজ নেই।—হাঁ, অসম্ভব,

অকরণীয়, ধর্ম্মহীন ঘোর কলিতে কিছুই নয়।—তবে এক্ষেত্রে সেটা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় ব'লে আমাদের ধ'রে নিতে হবে।"

"হাঁ বাবা, নষ্ট দুষ্ট হ'লে ভাব সাবে কি একটু বোঝা যায় না? আমার ননদকে ত জানেন, বড় ভালমানুষ, খল-কপট কিছু জানে না।—আর ঐ লতি—অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর হয় না।—"

"না না, মা, অত বড় একটা অপবাদের কথা বিনা প্রমাণে গ্রাহ্যই হ'তে পারে না। আর ওঁরা কিনা এই কথা তুলে ওদের জাতিপাত দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রেছেন!—সে অধিকারও ত সাধারণ সামাজিকদের নেই।—তার প্রমাণ চাই, পাঁতি চাই,—না না, এ হ'তেই পারে না।—কিছুতেই আমি এর অনুমোদন ক'রতে পারি না।"

শিরোমণি মহাশয়ের দিকে একটু ঘুরিয়া দুটি হাত জোড় করিয়া রটন্তী কহিলেন, "তাই ত বাবার দ্বারস্থ হ'য়েছি।—বাবা এখন মেয়েকে কি বলেন—ওদের কি ত্যাগ ক'রতে আমরা পারি?"

"না, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তা পার না।"

"তাহ'লে উপেনের পৈতেটার এখন কি হবে?—আয়োজন সব ক'রেছি, পরশু দিন স্থির হ'য়েছে—"

"হরিহরকে ডেকে আমি ব'ল্‌ছি, ক্রিয়াটা গিয়ে নির্ব্বাহ ক'রবে।"

রটন্তী কহিলেন, "বাবা ডেকে ব'ল্লে তিনি যাবেন, কাজটাও ক'রবেন। তবে ওরা শেষে তাকে জেতে ঠেলে রাখ্‌বে, তার পর যদি প্রাচিত্তির টিত্তির একটা করে, ক'রে জেতে ওঠে, তবে ত বাবা, আমাদের সেই জাতমারা হ'য়েই থাক্‌তে হ'ল।"

শিরোমণি একটু ভ্রূকুটি করিলেন; কহিলেন, "তাহ'লে কি ব্যবস্থা এখন হ'তে পারে মা?"

আবার দুটি কর যুক্ত করিয়া রটন্তী কহিলেন, "ব'ল্‌তে ত পারি নে বাবা, দেবতার তুল্যি মহাপুরুষ আপনি—তবে অভয় যদি পাই—"

"ভয়ের কি আছে মা? বল, কি ব'ল্‌তে চাও।"

রটন্তী কহিলেন, "পাপের ঘরে সাক্ষাৎ দেবতাকে ডাকা—সে ত মুখেও আসে না বাবা,—তবে বাবা তাঁর অধম ছেলেমেয়েকে বড় দয়া নাকি করেন—"

একটু হাসিয়া শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "কি মা, আমাকে গিয়ে পৈতাটা দিতে বল?"

রটন্তী উত্তর করিলেন, "মুখে ত বল্‌তে পারি নে বাবা,—তবে মনে মনে সেই ভিক্ষে নিয়েই বাবার পায়ে এয়েছি! আজ এই বিপদে আমাদের আর অনাথা ঐ দুটো মেয়ে মানুষকে বাবাই রক্ষে ক'রতে পারেন।"

"বেশ, তাই হবে। আমিই যাব। তার জন্যে আর অত কথা কেন? একটি ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়ন সংস্কার করাব, আমাদের কাজই ত এই। কিন্তু মা, ছেলেটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সংস্কারটা ব্যর্থ হ'তে দিতে চাই নে।"

প্রণাম করিয়া রটন্তী কহিলেন, "বাবার যেমন আজ্ঞে।—শিষ্যি হ'য়ে বাবার টোলে প'ড়্‌বে, বাবার কাছে সন্ধ্যে গায়িত্রী শিখ্‌বে,—এর বাড়া ভাগ্যি আর আমাদের কি হ'তে পারে বাবা?—হাঁ বাবা, আর একটা ভিক্ষে চাইব?"

"ভিক্ষে কি মা? বল, কি চাও!"

"বাবার পায়ের ধূলো ত বাড়ীতে পাব—তা দুটি পেসাদেও যেন বঞ্চিত না হই। আর আপনার ঐ শিষ্যি কয়টি যে আছে—"

"বেশ, তাই হবে মা,—মধ্যাহ্ন ক্রিয়া পরশু তোমাদের ওখানেই আমাদের হবে।"

"ঐ লতিকে দিয়েই রাঁধাব কিন্তু বাবা।"

হাসিয়া শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "আপত্তি কি মা? তার জাতিপাতের ব্যবস্থা ত আমি করি নি।—"

গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া পাদস্পর্শপূর্ব্বক রটন্তী শিরোমণি মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। কৃতকৃতার্থা হইয়া সকল বিক্ষোভমুক্ত প্রহৃষ্ট চিত্তে গৃহাভিমুখে তিনি ফিরিলেন। পথে রতনের মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। রতনের মা একটু চক্ষু টানিয়া কহিলেন, "কি লো স্যাপ্‌লার মা! আহ্লাদে যে মাটীতে পা পড়ে না! ছেলের পৈতের ক'মণ চালের বরাদ্দ ক'রলি? ক'টা গাঁ নেমন্তন্ন ক'রেছিস্?"

রটন্তী উত্তর করিলেন, "ক'মণের মানুষ হ'লে সব কটা গাঁই নেমন্তন্ন করতাম। তবে বিদুরের ক্ষুদকুঁড়ো নাকি শ্রীকেষ্ট এসেও গেরোণ ক'রেছিলেন—"

"নীলেখেলা ত চল্‌ছেই। তা ক্ষুদকুঁড়ো—অত ছোট নজর কেন দিচ্ছিস্? পাকা ফলারই খাওয়াস্? তা

শ্রীকেষ্ট যখন আস্‌বে, আরসী পড়সী আমরা যেন একটু দর্শন পাই।”

“চোক থাক্‌লে পাবে বই কি, দিদি, পাবে বই কি? নীলেখেলা—তা দেখ্‌বে বই কি দিদি নীলেখেলাই দেখ্‌বে। আসেন যদি লুকিয়ে ত আস্‌বেন না? নীলেখেলাও লুকিয়ে কিছু করবেনা।”

“হাঁ, এখন সদরেই সব হবে। ঢাক ঢাক গুড় গুড় ত কিছু আর নেই।”

“ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেনই বা কার ভয়ে কর্‌ব? তা ইচ্ছে হয় দিদি নীলেখেলাটা দেখো, পেসাদও এসে পেও।”

বলিয়াই পাশ কাটিয়া রটন্তী চলিয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

লুসার্ণে দুটি দিন

শ্রীমতিলাল দাশ

(ভ্রমণ-কথা)

ভূস্বর্গ কাশ্মীর দেখিনি—কিন্তু য়ুরোপের ভূস্বর্গ যদি কোথাও থাকে—তবে সে আছে সুইসদের দেশে। আল্পসের চূড়ার মাঝে নিসর্গের এই যে ভবন—এ বোধ হয় হয়েছিল অপ্সরাদের বিলাসের জন্য—দেবতাদের ক্রীড়া-বিনোদনের জন্য। প্রকৃতির এই সুষমা মানুষ পেয়েছে দানের মত—সদাশয় দাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ বলে। কিন্তু যে



টাউন হল—লুসার্ণ

জিনিসটি বারবার আমার মনের তারে বেজেছে—সে দেবতার গৌরব নয় মানুষের গৌরব-কথা।

য়ুরোপের মানুষ বৈরাগ্য-সাধনের মন্ত্র পড়েনি—তারা ঐহিককে বিসর্জ্জন দিয়ে পরলোকের জন্য তৈরি হয়ে রয়নি—তারা জানে বাঁচবার মন্ত্র—তাঁরা জানে চলবার তন্ত্র।

এই পৃথিবীতে—এই ধূলিমলিন গৃহকে ওরা সুন্দরতর ও মধুরতর করবে এই হ'ল ওদের সাধনা—সে সাধনায় ওরা সিদ্ধিলাভ করেছে—ওরা প্রকৃতির শোভাকে শতগুণে বর্দ্ধিত করে তুলেছে।

লুসার্ণে এসে বারবার ঐ কথাটি মনে পড়েছে—এর ছোটখাট হ্রদ—এর পাহাড়—এর উপত্যকা হয়ত ভারতবর্ষে মেলে—কিন্তু ভারতবর্ষে মিলবেনা সেই ঐকান্তিক ক্লান্তিহীন *অধ্যবসায়—যা এই ছোট সহরটিকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর*



লিডোতে স্নান

করেছে। আমাদের জাতির মাঝে চাই এই অবিরাম যত্ন—এই একনিষ্ঠ তপস্যা—তবেই আমরা বাঁচব—তবেই আমরা শক্তিমান্‌ হয়ে উঠব।

রাত্রি ৮-৩০টায় আমাদের গাড়ী লুসার্ণে এসে পৌছাল—ষ্টেসনে এসে হোটেল ঠিক করা সমস্যা—আমাদের কুলি

বলল—"আল্পিনা হোটেলে যান—ভাল জায়গা"; পাণ্ডে গেল কুকের লোকের সন্ধানে—তারা সেণ্ট্রাল হোটেলে যেতে বলল। সেখানে জায়গা নেই শুনে আল্পিনাতে গেলাম—ঘরগুলি চমৎকার পছন্দ হয়ে গেল।



হ্রদের তীরে লেখক

সান্ধ্য ভোজনের আদেশ দিলাম—ভাত, আম্‌লেট, তরকারি ও ফল—চালগুলি ভাল নয়—তবে ভাত মন্দ করেনি—আমলেট চমৎকার করেছিল—খেয়ে শয়নে পদ্মলাভের চেষ্টায় গেলাম।



লিডোতে সূর্য্যালোকে স্নান

আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আর খুলতে পারিনে—ক্যাচ ছিল একটা, সেটা বন্ধ করে দিয়ে খুলবার যতই চেষ্টা করি ততই হায়রাণ হয়ে উঠি—হোটেলের লোক এসে বাইরে থেকে খুলে দিল—তবেই স্বস্তি। এদের প্রত্যেক স্থানে নূতন কায়দা—নূতন কলকব্জা—নূতন বন্দোবস্ত আনাড়ির পক্ষে সত্যই বিপজ্জনক।

ভোর বেলায় উঠে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে বেড়াতে গেলাম—একটি পার্কের পাশে—পার্ক—সুন্দর সুসজ্জিত—তার মাঝে পক্ষিশালা—তার ছবি তুলে বাসায় ফিরে দেখি বন্ধুরা সবাই ঘুমে অচেতন—এরা য়ুরোপে না এসেই সাহেব—কারণ জৈন বলেছে I. C. S হতে পাণ্ডের আশাও উচ্চ।

বার হ'তে বাজল নটা—এদের আবার সব ঝোঁক চাপল ঘড়ি কিনতে হবে—আমি গেলাম সুইস ক্রেডিটে লেটার অব ক্রেডিট ভাঙ্গাতে—ওরা দেখতে লাগল ঘড়ি।

সেখান থেকে ফিরে রওনা হওয়া গেল—ক্যাথিড্রাল দেখতে।



বন্ধুদল – লুসার্ণ ফাউণ্টেনে

ক্যাথিড্রাল পুরাতন বেনিডিক্ট সাধু সম্প্রদায়ের স্থাপিত—সাধু লিওডিগারের নামে উৎসর্গীকৃত হলকির্চি বা কলেজ চার্চ—এর চারপাশে এখনও এইসব মিশনারিরা বাস করে। পুরাতন গির্জ্জা অগ্নিসাৎ হয়ে গেলে বর্ত্তমান মন্দির সপ্তদশ শতাব্দিতে স্থাপিত হয়েছে।

এই গির্জ্জার মাঝখানে চমৎকার লৌহজালের পর্দ্দা আছে। এর ভিতরের অর্গানটিও প্রসিদ্ধ—ভিতরে কারুকার্য্যময় কাষ্ঠাসনও সুইস শিল্পের গৌরব প্রকাশ করছে।

এখান থেকে কাজিনো বা থিয়েটার গৃহে যাওয়ার পথে পাণ্ডে দশ সেণ্ট খরচ করে অটোমেটিক বাদ্যযন্ত্রে বাজনা শুনল।

য়ুরোপের যন্ত্রতন্ত্র অটোমেটিক কলের খেলা চলছে—তবে বিনা পয়সায় নয়—পয়সা ফেল মজা দেখ—এর জন্য কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে তা বলবার নয়।

থিয়েটারে পরে যাওয়া যাবে বলে সেখান থেকে ফিরে—Grand Panorama দেখা গেল—এটা সুবিস্তৃত তৈলচিত্র—এর ঘটনা ঐতিহাসিক।

প্রাশিয়ার সঙ্গে ফরাসীদের ১৮৭০ সালে যে মহাযুদ্ধ হয়—এটা তারই সমসাময়িক ঘটনা। সুইস্ সীমান্তে ফরাসী সেনাপতি বুরবাঁকি বিপদে পড়িয়া সুইসদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছেন—এই ঘটনাটি জেনিভার কাষ্টি নামক একজন বিখ্যাত চিত্রকর ১২৪০০ বর্গফুটে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—শীতকালের নিসর্গ দৃশ্য—আল্পসের শিখরে শিখরে তুষারের রাশি—ক্লান্ত ভগ্ন-মনোরথ সৈনিকের মুখে



লুসার্ণে গম্বুজ

আর্ত্ত বেদনার ছবি—অত্যন্ত সুন্দর বলেই মনে হয়; তারপর সেকালের একটি সুইস বাড়ী দেখতে চললাম। এরা পয়সা আয় করতে জানে—কোনও জিনিসই এদেশে বিনামূল্যে লভ্য নয়—সেকালের একটি বাড়ী, তার সুন্দর ঘড়ি, তার বিছানা—তার ছবি—তার সাজসজ্জা সব সাজিয়ে রেখেছে। অভিনব কিছু নয়—তবুও প্রাচীনের নাম করে বহু অর্থই এরা উপার্জ্জন করছে।

সেখান থেকে আলগিনিয়ামে গেলাম—এটাও একটা ছবি ঘর—বাইরে থেকে আল্পসের ছবি দেখা গেল—বন্ধুরা অনর্থক পয়সা খরচ করতে রাজি নয় বলে ভিতরে যাওয়া হলনা—ওখান থেকে সিংহের মূর্ত্তি দেখতে চললাম—

এটা স্মৃতি-স্তম্ভ, ষোড়শ লুইয়ের সুইস-রক্ষীদের স্মরণার্থে এটা স্থাপিত, বিপ্লবের দিনে এরা অমানুষিক ভক্তি ও সাহস দেখিয়ে ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছে। একজন দিনেমার স্থপতি মূর্ত্তির পরিকল্পনা করেন।

এখান থেকে Glacier গার্ডেনে গেলাম—তুষারস্রোত কেমন করে দেশ গড়ে তোলে এই যাদুঘরে তার চমৎকার দৃশ্য ও নক্সা সাজানো আছে।



ওয়াগনার হোটেল—লুসার্ণ

একখানি পরিচয়লিপি কিনলাম—পাণ্ডে পড়ে পড়ে চলল—আমরা শুনে শুনে চললাম। তুষার স্রোত পাহাড় ক্ষয় ক'রে কেমন করে নদী, উপত্যকা প্রভৃতি গড়ে তোলে ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তার সুন্দর নমুনা সজ্জিত করেছেন—



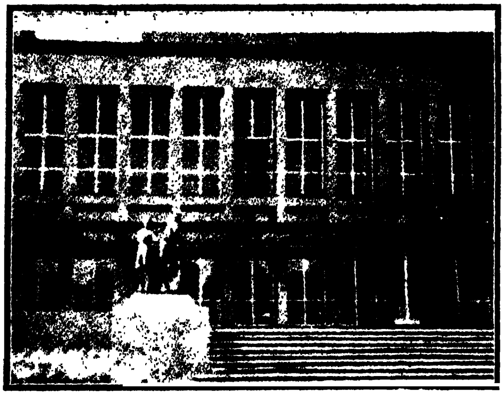
প্রোটেষ্টাণ্ট গির্জ্জা

তাছাড়া সুইজারল্যাণ্ডের পশুপক্ষীদের নমুনা আছে। দেখতে চমৎকার লাগল।

শিক্ষার এই আয়োজনের সঙ্গে হাসির খোরাক ওরা রেখেছে—সেটা গোলক ধাঁধা—মন্দ নয়—গোলক ধাঁধায়

বেশ মজা করে ঘোরা গেল—তারপর উঠলাম আয়নার ঘরে—যেখানে এক এক জনের হাজার হাজার ছবি ফুটে উঠল—আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম।

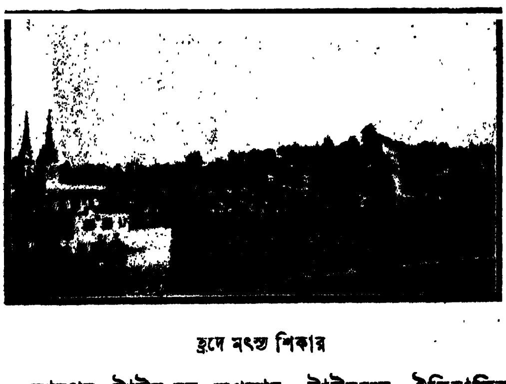
পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম—তাছাড়া মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় বলে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফেরা



আর্ট মিউজিয়াম

গেল—তাতে পাণ্ডে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন—তিনি ট্যাক্সি করতে বলছিলেন—কিন্তু ছোট সহরের মাঝে অতি কাছাকাছি সব দেখবার জিনিস—এর জন্য ট্যাক্সি করলে অনর্থক অর্থব্যয় হ'ত।

বিশ্রাম করে প্রায় তিনটায় বার হওয়া গেল—ঘড়ি কিনবার বাতিকে সেখানে একঘণ্টা নষ্ট হ'ল।



হ্রদে মৎস্য শিকার

তারপর টাউন হল দেখলাম—টাউনহলে ঐতিহাসিক যাদুঘর হয়েছে—সুইসদের প্রাচীন ইতিহাসের মালমশলা একত্র করে রেখেছে—সেকালের পোষাক-পরিচ্ছদ—সৈনিকদের যুদ্ধাস্ত্র—যুদ্ধে জিত পতাকা একত্র করে রেখেছে; অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তনে সামান্য ব্যবস্থা—তার জন্য যথেষ্ট পয়সা নেয়।

এটা দেখে আমরা বর্ত্তমানের টাউন-হলে গেলাম; এটায় অনেকগুলি সুদৃশ্য ছবি আছে—এখানে এখন পৌরশাসনের কার্য্য চলে—একজন বুড়ী আমাদের সব দেখাল আর তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে সব বুঝিয়ে দিল।

একটা ছিল বিয়ের ঘর—পাণ্ডে কনের আসনে বসেছিল—বুড়ী তাই দেখে হাসতে হাসতে বলল—"ওর বরের দরকার আছে—"

ভাষার আড়াল হৃদয়কে আড়াল করেনা—মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে যে প্রীতির যোগ তা যে কত সত্য, কত সুন্দর—তা বিদেশে না এলে এমন করে কখনই জানা যেত না। তারপর টাওয়ার দেখতে গেলাম—লুসার্ণকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে—আত্মরক্ষার জন্য ওর চারিপাশে



লিডো

দুর্ভেদ্য প্রাচীর রাখতে হয়েছিল—অতীতের স্মৃতিমাত্র এই ভগ্নাবশেষ চূড়াগুলি পথিককে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখান থেকে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য দেখতে 'মরণ-নাচন-সেতু'তে—("The dance of death bridge") চললাম। খর জলস্রোতের মাঝে কাঠের সেতু, এর ছাদে মৃত্যুর দুরতিক্রম্য প্রভাব প্রকাশ করা হয়েছে। এর ছবি যাঁরা এঁকেছিলেন তাঁদের মনের ভিতর ভারতবর্ষীয় দৌর্ব্বল্য ছিল—মৃত্যু যখন অনতিক্রম্য পরিণাম তখন চেষ্টাও গতির প্রয়োজন কি—কতকটা এই ভাব।

অনেকগুলি তৈলচিত্র তারা দেখাচ্ছে—যে মৃত্যু কেমন অতর্কিতে এসে পড়ে, উৎসবের মাধুরীকে ম্লান করে—স্নেহের ও প্রীতির আকর্ষণকে উপেক্ষা করে—বিজয়গৌরবকে

তুচ্ছ করে—সে আসছে পলে পলে—অট্টহাসি হেসে। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে উত্তরএ মৃত্যু তার দুরন্ত ভয় দেখিয়েছে—মানুষ তার কাছে নতি স্বীকার করেছে।

বিকালে ঘড়ির দোকানে আসবার সময় কাপেল সেতু ও কাপেলচূড়া দেখেছিলাম—তার তৈলচিত্র লুসার্ণের অতীত কথায় পরিপূর্ণ একটানা মৃত্যুর আকস্মিক আবির্ভাব মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে—এখান থেকে ক্লান্ত বলে ট্রামে করে হোটেলে ফেরা গেল।

সান্ধ্য ভোজন শেষ করে বার হওয়া গেল—রাত্রির আলোকে প্রস্রবণে অত্যন্ত হৃদয়াকর্ষক বলে দেখা গেল—আমি গডহার্ড হোটেলে একটি ঐক্যতান বাদন শুনে বাসায় এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। বন্ধুরা বললেন—ঘড়ির দোকানেও নৈশ হাওয়া খেতে।

সকালে উঠে সবাই মিলে বার হ'তে অনেক দেরী হয়ে গেল—সুকুমার-কলার যাদুঘর দেখতে গিয়ে শুনলাম যে সেটা দশটায় খুলবে—কাজেই জৈনের অনুরোধে মটর বোটে চড়ে' লিডোয় যাওয়া গেল।

লুসার্ণের সৌন্দর্য্যসম্পদ তার সুন্দর হ্রদের মাঝেই পাওয়া যায়—রিগি পাহাড়ের কূলে শান্ত জলাশয় চলেছে—দূর দুরান্তে ছায়াশ্যাম বনানীর পাশ দিয়ে, কালো পাহাড়ের বুক চিরে—সত্যই এ জল-যাত্রা হৃদয়ে অপূর্ব্বের আগমনী বাজায়, কিন্তু আমাদের সময় ও অর্থ দুইই কম—তাই জল-বিহার মনের সাধে হ'ল না। স্বচ্ছ নীল জলের মাঝ দিয়ে বোট চলল—কত দেশদেশান্তর থেকে এসেছে যাত্রী—পৃথিবীর সর্ব্বদেশের মানুষের এই যে মিলন—এ আমার কাছে ভারি চমৎকার লাগে।

লুসার্ণের সরোবরের পাশে পাশে কি স্নিগ্ধ তরুরেখা—আমরা অল্পক্ষণের মাঝেই নামলাম লিডোয়—এখানে দলে দলে স্নানার্থীরা—স্ত্রী ও পুরুষ—রৌদ্রস্নান ও সরোবরে অবগাহন করছে।

ফুলে ফুলে এর স্নিগ্ধ-শ্যামল শষ্পবীথি সাজানো—গুল্মের নিভৃত কুঞ্জের আসন মনকে উধাও ছেড়ে দাও এই আনন্দের কলগুঞ্জনে—কিন্তু দরিদ্রের জন্য নয় এই ভোগ-সম্ভার। লোলুপদৃষ্টিতে আমরা চেয়ে রইলাম এই সব আনন্দ-কাম পর্য্যটকদলের দিকে—এরা ভোগ করতে চায়, পৃথিবীর যেখানে যা কিছু সুন্দর তাকে এরা নিংড়ে নিতে চায়—

কিন্তু আমার ব্যাকুল মনে প্রশ্ন লাগল—কিন্তু এরা কি শান্তি পাচ্ছে?

এদের মনে কি পরিতৃপ্তি জাগছে—এরা কি আনন্দলাভ করছে?

বলা শক্ত, কিন্তু আমার মনে হয়—এই নিরবচ্ছিন্ন গতির মাঝে মানুষের অন্তরাত্মা হাহাকার করছে—এ শুধু বলছে উৎসবের স্পর্দ্ধা—মানুষের হৃদয় এখানে ব্যথায় গুমরে মরছে—

রিগি পাহাড়ে বেড়ানো আমাদের হয়ে উঠল না—কিন্তু সকলের কাছে শুনেছি—এমন চমৎকার শৈলবিহার আর কোথাও মেলে না—দিগ্‌দিগন্তে চলেছে শৈলশিখর, তার বুকের মাঝে বনস্পতির শ্যামল বাসর, রৌদ্রঝলকিত দীপ্তি, সব মিলে রিগি যাত্রীর মন ভুলায়, কিন্তু শ্রুতিসুখের উপর নির্ভর করেই আমাদের বিদায় নিতে হ'ল।

লুসার্ণে বসে এর আশে পাশে দেখবার অনেক সুন্দর স্থান আছে, কিন্তু কর্ম্মের আহ্বান বন্ধুদের উতলা করে তুলেছে—সৌন্দর্য্যের আহ্বান তত জোরোলো নয়।

মটর-বোট ভিড়ল—হাস্যমুখী মেয়েদের দল জাহাজ-ঘাটে ভিড় করে হল্লা করছে—তাদের ছবি তুলে নিলাম।

তার পর এক বিদেশী অজানা বন্ধুকে ধরে আমাদের সকলের ছবি তুলে নিলাম।

সেখান থেকে 'ছবি-ঘর' দেখতে এলাম। চার পাঁচটি কক্ষে চার শ কি পাঁচ শ ছবি—তাই দিয়েই একটা ঘর করেছে, আর তা থেকে পয়সা উঠছে—এটা মন্দ নয়।

য়ুরোপের সর্ব্বত্রই এই ক্ষণিক কৌতূহলের অর্থ দিয়ে বিরাট জিনিস গড়ে উঠছে—আমাদের দেশে এ ধরণের চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। ভারতবর্ষ তার নিভৃত কোণে বসে থাকতে পারবে না—পৃথিবীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বিনিময়ের প্রয়োজন আছে।

আমার মনে হয়—যদি আমাদের দেশের চরিত্রবান যুবকেরা মিলে অর্থশালী লোকেদের অর্থে একটা ভ্রমণ-মন্দির (Travel-Bureau) গড়ে তোলে—আর পৃথিবীর লোককে ডেকে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় দেবার চেষ্টা করে—তাহলে একটা সত্যকার কাজের কাজ হয়।

এই চিত্রশালায় বিশেষ খ্যাতিমান কোনও চিত্রকরের ছবিই নেই—ভাল ভাল ছবির সাথে অত্যন্ত সাধারণ ছবি একত্র করে সাজানো আছে—প্রায় চার শ ছবির মাঝে আমার মনে হয়েছিল গোটা পঁচিশ দেখাবার মত—

দু'একটা ছবির ফটো নিয়েছিলাম—কিন্তু আনাড়ি হাতে তা ওঠে নি।

এখানকার ছবি দেখা শেষ করে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা গেল। হোটেলের লোকেদের ব্যবহার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল—মেয়েটিকে হেসে বললাম—"যদি আবার ফিরে আসি—তবে তোমাদের এখানেই উঠব—"

সে তার নীলনয়ন নত ক'রে বলল—ধন্যবাদ—

একস্প্রেস গাড়ীতে বাজেল হয়ে প্যারিতে রওনা হওয়া গেল। আমরা তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রী—বাজেলে গাড়ী বদলাতে হল। উপত্যকাভূমির মাঝ দিয়ে—শৈলমালার আবহাওয়ায় চলল পথ—

য়ুরোপের মাঝে লুসার্ণ সত্যই আমার মনে কাব্যের আস্বাদ এনে দিয়েছিল। এই যুগে আর এই বয়সে কবিতা-চর্চ্চা শোভা পায় না। হৃদয়ের যে সরলতা—অন্তরের যে মাধুর্য্য কবিতারস আস্বাদনের যোগ্য—জীবন সংগ্রাম সেই সৌকুমার্য্য বিনাশ করছে—পৃথিবীতে আজ জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে উঠেছে—অভাবের তাড়না অপরিসীম অসহ, তাই শান্তির আয়াসের সুযোগ মেলে না।

অশ্রান্ত গতি, দুর্নিবার কল্লোলের মাঝে লুসার্ণ আমার মনের মাঝে এনে দিয়েছিল প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-গম্ভীর শান্তি—তাই লুসার্ণের ছবি সমস্ত কাজের মাঝে মনের কোণে ভেসে ওঠে—কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সেকেলে হয়ে গেছেন—কিন্তু তাঁর কথাই মনে পড়ে, প্রকৃতির মাঝে যে মৌন লাবণ্য আছে—সে জিনিস তার বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখে আনন্দরস—

অবসরের সময় মন যখন শান্ত হয়ে ওঠে—তখন সেই আনন্দ-রস জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

কালের রথঘর্ঘরের শব্দে অনেক কিছু ভুলতে বসেছি—মাধুর্য্যের উপভোগ একালে বোধহয় অসম্ভব—কিন্তু তবু মন ফিরে যেতে চায়—সেই নিবিড় হৃদয়বত্তার মাঝে—সেই আনন্দময় অনুভূতির মাঝে—

গতি বলছে অসম্ভব—সভ্যতা বলছে অসম্ভব—তবু আলোর দেশের, ফুলের দেশের, আনন্দ ও প্রীতির দেশের লোক আমরা—আমরা বলছি—নয় নয়, এ তোমার বিজয়-যাত্রা নয়।

কি যে সত্য একমাত্র মহাকাল জানেন—আজ নীরবে আকাশের তলে—এক অন্ধকার কক্ষে বসে লণ্ডনের উপকণ্ঠে অন্তরের আবেদনকে নমস্কার জানিয়ে শেষ করি।

কারখানার বাঁশী

শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ এম-এ

(রুশীয় কবি Alexey Gustev-এর একটি কবিতার অনুবাদ)

প্রভাতের শান্ত লগ্নে যন্ত্রপুরে বাজে যেই বাঁশী,
নিগ্রহের সে কি গো আহ্বান ?
জানি জানি সে আহ্বান নিগ্রহের নহে বিভীষিকা,
ভবিষ্যের সে যে জয়গান।
কোনদিন কায়ক্লেশে গড়িয়াছি নগণ্য বিপণি,
ছিল না নির্দ্দিষ্ট শ্রমকাল ;
কারখানার বাঁশী এবে বেজে উঠে প্রথম প্রহরে
মুখরিয়া দিক্‌চক্রবাল

মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাই ত্রস্তপদে কর্ম্মের আহ্বানে
—ছুটি মোরা নরনারী যত ;
এক সাথে আমাদের লক্ষ কোটি হাতুড়ীর ধ্বনি
জাগে বজ্রনির্ঘোষের মত।
প্রভাতের শান্ত লগ্নে যন্ত্রপুরে বাজে যেই বাঁশী,
নিগ্রহের সে কি গো আহ্বান ?
জানি জানি সে আহ্বান নিগ্রহের নহে বিভীষিকা,
—প্রভাতের মিলনের গান।



সঙ্গীত

গান

মন মন্দিরে পূজি
মায়ের চরণ কমল।
মায়ের রাঙা পায়ে অর্ঘ্য ঢালি
ব্যথার রাঙা শতদল ॥

প্রেম কুসুম নিয়ে
ভকতি চন্দন দিয়ে
অঞ্জলি দিই মায়ের পায়ে—
ঢালি' অশ্রু-গঙ্গাজল ॥

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি
মা'র আরতির তরে,
চিন্ময়ী মা রূপ ধরে যে
আমার এ অন্তরে।

জননী যে জগন্মাতা,
মায়ের সৃজন স্বয়ং ধাতা,
বিশ্ব-ভুবন লুটায় সদাই
মায়ের ও চরণ-তল ॥

কথা ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক। সুর—৺উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ

{। সা সা II রা মা মা | রমা -পণা ণদা I পা -া -া } | -দা মা -া I
• ম ন ম ন্ দি রে • • • পূ জি • • • • •

I রা মা -া | রমা মপা পণদা I পা রা রমা | -রমা মসা সা I
মা য়ে র্ চ • র • ণ • ক • ম • • ল্ ম ন

I রা মা মা | রমা -পণা ণদা I পা -া -া | -া পদা দমা I
ম ন্ দি রে • • • পূ জি • • • মা • য়ের্

I { পা পর্সা র্সা | র্সা -া -া I দর্সা -র্রজ্ঞা র্রর্সা | ণর্সণা দপা -মপা } I
রা ঙা পা য়ে • • অ • • র্ ঘ ঢা • • লি • • •

I মা পা -া | পা -দা ণা I -ধণধণা পণা ণদা | পা -া -া II
ব্যা থা র্ রা • ঙা • • ঃ • শ • ড • দ • ল্

II া া মা | -পা পদা ণা I ণর্সা -া দণা | ণর্সা র্সা -া I
• • প্রে • ম কু সু • ম নি য়ে •

I া া ণা | ণা ণর্সা র্সা I ণর্সা -র্সা ণর্সণা | দণদা পা -া I
• • ভ ক তি চন্ দ • • • ন • • দি•• য়ে •

I া া পা | পর্জ্ঞা র্রা র্সা I ণদা দণা র্সা | র্সা র্সা -া I
• • অন্ জ • লি দি' মা • য়ে • র্ পা য়ে •

I পদা দমা -া | পা -া দা I ণা -ধণা ণদা | পা -া -া II
ঢা • লি• • অ • শ্রু গ • ঙ্ গা • জ • ল্

II া া সা | ঋা জ্ঞা সা I সা পা জ্ঞমা | মপা পা -া I
• • জ্বা নে র প্র দী • প • জ্বা • লি •

I পা -া পা | পদা পমা -া I পা পদা -ণা | -দণদা -পমা -পা I
মা য় আ র • তি • র্ ত রে • • •• •• •

I া া ণর্সা | র্সা র্সা র্সা I দর্সা -র্জ্ঞা র্সা | ণর্সণা দপা -মপা I
• • চিন ম য়ী মা রূ • • প ধ • রে •• যে• ••

I রা রা -জ্ঞা | মা জ্ঞমপা -ণদপমা I জ্ঞরা -মজ্ঞা রসা | -া -া -া I
আ মা র্ এ অ • • • ন্ ত • • • রে • • • •

I া া মা | পা পদা দণা I ণা ণর্সা -া | ণা র্সা -া I
• • জ ন নী যে জ গ ন্ মা তা •

I া া ণা | ণর্সা র্সর্রা র্রর্সা I ণধা র্সণা -ধণা | ণদা পা -া I
• • মা য়ের্ স্ব জন্ স্ব • য়ং • • • ধা তা •

I া া পা | পর্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I র্রর্সা র্সণা -দণর্সা | র্সা র্সা -া I
• • বি শ্ব • ভু বন্ লু • টা • • • য়্ স দা ই

I পদা দা মা | পা পণা -ধণধণা I ণপা -ণদা পা | -া -া -া II II
মা • য়ে র্ ও চ • • • • র ণ ত • • ল্

* আমার অগ্রজ-প্রতিম সুরশিল্পী স্বর্গীয় উমাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার শেষ জীবনে—মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে—যে সকল গানে সুর সংযোজন করিয়া গিয়াছেন, এ গানখানি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সুর-সংযোজনের দিক হইতে এটি তাঁহার শেষ দান বলা যাইতে পারে।

ছিদাম-ঢালীর ভিটে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

১

রতনের সঙ্গে আমার দৈবাৎ দেখা।

এক আত্মীয়ের বাড়ী যাচ্ছিলাম। দূরের পথ। আকাশটাও একটু মেঘলা ছিল। দুপুরেই বেরুবার ইচ্ছা ছিল। কাজে তা হ'য়ে উঠেনি। অথচ যাওয়ারও দরকার খুব।

কিছুদূর যেতেই আকাশের অবস্থা ঘোরালো হ'য়ে উঠ্‌ল। বাঁধানো রাস্তায় ঘুর-পথ। তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য মাঠের পথ ধর্‌লাম। সেদিক দিয়ে গেলে প্রায় চার-আনী রাস্তার সুবিধা হয়।

ক্ষেতের শস্য কাটা হ'য়ে গেছে। এক-এক জায়গায় খড়ের স্তূপ রয়েছে। আলের নীচে হাঁটাপথের চিহ্ন। সেখান দিয়েই চল্‌লাম।

খানিক দূর গিয়ে প্রকাণ্ড এক মাঠে পড়া গেল। সেখানে উঁচু চোরকাঁটার বন আর মুথো ঘাস। সে মাঠে অগুণ্‌তি গোরু-মোষ চর্‌ছিল।

এদিক-ওদিক চাওয়ার সময় ছিল না। হন্‌ হন্‌ ক'রে হাঁট্‌ছি। পায়ে একটা কিসের ঠোকর লাগ্‌তে একবার নীচের দিকে তাকালাম। তারপর সামনে দৃষ্টি পড়্‌তেই দেখি একটা মোষ সিং বাঁকিয়ে গোঁ গোঁ ক'রে ছুটে আস্‌চে। প্রথমে অত খেয়াল হয়নি। মোষটা কাছাকাছি এসে পড়ায় যখন দেখ্‌লাম তার লক্ষ্য আমাকেই, তখন প্রাণপণে ছুট্‌ দিলাম। কোন দিক দিয়ে কোথায় গেলাম ঠিক ছিল না। কতদূর ছুটে কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া গাছ দেখ্‌তে পেলাম। সেখানে গিয়ে দম নিতে একবার দাঁড়িয়ে পড়্‌লাম। পেছন ফিরে মোষটাকেও আর ছুটতে দেখ্‌লাম না। তখন সেই গাছতলায়ই ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগ্‌লাম।

হঠাৎ পেছন হ'তে কে ব'লে উঠ্‌ল—'কি—কি হয়েচে?'

চেয়ে দেখি—মিসমিসে কালো চেহারার একটা লোক কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে ব'সে বাঁশ চাঁচ্‌ছে। ডান হাতে দা, বাঁ হাতে একখণ্ড বাঁশ ধ'রে ঘাড় বাঁকিয়ে সে-ই আমাকে প্রশ্ন কর্‌ছিল।

নিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আমি জবাব দিলাম—'একটা মোষ তেড়ে এসেছিল। আর-একটু হ'লেই গেছ্‌লাম!'

লোকটা আমার কথা শুনেই গলা ছেড়ে একটা হাঁক দিল—'ও গগ্‌না, গগ্‌না রে!'

নিকট হ'তেই জবাব এল—'কেন?'

এতক্ষণ নজর পড়েনি, জবাব শুনে সেদিকে তাকাতেই দেখি সামান্য দূরে এক ঝাড় বাঁশের আড়ালে একখানি বাড়ী। ছোট্ট একখানা চালা ঘর সেখান হ'তেই দেখা যাচ্ছিল। ঘরের চালে লাউয়ের ডগা, লাউয়ের পাতায় ফাঁকে ফাঁকে শাদা শাদা ফুল।

একটা ছোকরা সেই বাড়ী হ'তে বেরিয়ে এল। গাছ-তলার লোকটা তাকে বল্‌ল—'যা তো গগ্‌না, মাঠে। গণ্ডীটা বুঝি খোঁটা ছিঁড়েছে।'

ছোকরাটী পাঁচনবাড়ি হাতে নিয়ে হেই হেই কর্‌তে কর্‌তে মাঠের দিকে ছুটে গেল।

লোকটা আমাকে বল্‌ল—'ভয় নেই কত্তা, বসুন। গণ্ডীটা বুনো জাতের মোষ, এখনও বজ্জাতি ভাঙেনি। তার উপর নতুন কেনা কিনা, বুনো স্বভাব যেতেও কিছুদিন লাগ্‌বে। ওটাকে ছাড়াও রাখি না। কি জানি, কি ভাবে যেন খোঁটা ছিঁড়েছে।'—বল্‌তে বল্‌তে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বল্‌ল—'তা ওর আর দোষ কি বলুন, কত্তা। ও তো গোঁয়ার জাত। আপনি যে ওকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন। জানেন তো, রাঙা কাপড় দেখ্‌লে ও জানোয়ার ক্ষেপে যায়।'

সত্যিই আমার গায়ে একখানা রাঙা বনাত ছিল। শীত পড়্‌ছিল। যাচ্ছিলামও পরের বাড়ী। কাজেই আলোয়ান-খানা গায়ে দিয়েই নিয়েছিলাম।

লোকটী বল্‌ল—'তা যাক্। আপনার আর ভয় নেই। গগ্‌না গেছে। মুমুক্ষির পো-কে এতক্ষণে সে ছান্দন দড়ি বান্ধন দড়ি ক'রেই ফেলেছে। আপনি বসুন, একটু জিরান। ...তামাক খাবেন ?'—ব'লেই গাছের গুঁড়িতে ঠেসান-দেওয়া একটা হুঁকার মাথা হ'তে কল্‌কেখানা তুলে আমার দিকে এগিয়ে ধর্‌ল।

আমার তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। বল্‌লাম—'আমি খাই না।' সঙ্গে সঙ্গে একটু এগিয়ে গিয়ে তার সামনে বস্‌লাম। লোকটী কল্‌কে ফিরিয়ে নিয়ে হুঁকার মাথায় রাখ্‌ল। তারপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে কল্‌কের আগুনে ছুটো চাপ দিয়ে হুঁকোটা তুলে গুড়ুক গুড়ুক ক'রে টান্‌তে লাগ্‌ল।

একটু পরেই হুঁকো হ'তে মুখ তুলে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে সে জিজ্ঞেস কর্‌ল—'আপনারা ?'

আমি বল্‌লাম—'ব্রাহ্মণ।'

জবাব শুনেই সে হাতের হুঁকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় ক'রে—'পেন্নাম, দেব্‌তা'—ব'লে মাটীতে মাথা ঠেকালো।

এর পরেই একটার পর একটা প্রশ্ন চল্‌ল—'আপনার বাড়ী কোথায় ?'—'এদিকে কোথায় যাচ্ছেন ?'—'সেথানে কে ?'—'অতদূরের পথ এই অবেলায় যাবেন কি ক'রে ?'—ইত্যাদি।

আমি সকল প্রশ্নেরই জবাব দিলাম। অবেলার কথায় বল্‌লাম—'তাই তো ভাব্‌চি! এতদূর এসেও পড়েছি। পথে বিভ্রাটটা না ঘটলে এতক্ষণে আরো অনেকটা পথ যাওয়া যেতো।'

সে বল্‌ল—'তা হ'লেও আর কতদূর যেতেন!' একটু ভেবে তারপরেই আবার ব'ল্‌ল—'আমি বলি কি, দেব্‌তা, একটা কাজ করুন। বেলাটা একেবারেই গেছে। আকাশের ভাবও দেখ্‌চেনই। পথ-ঘাট ভালো নয়। রাত্তিরে অন্ধকারে কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়্‌বেন! তার চেয়ে রাত্তিরটা এখানে থেকে যান।'

'না না, আমার থাকার জো নেই'—ব'লে আমি দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম।

লোকটী একটু হেসে বল্‌ল—'থাকার জো নেই বল্‌লেই কি যেতে পারবেন ? ঝিঁঝিঁই যে বাম। ঐ দেখুন, মাঠে কেমন ধুলো উড়্‌ছে, ঝড় এল ব'লে।'—ব'লে দা আর হুঁকো-কল্‌কে হাতে নিয়ে সে-ও উঠে দাঁড়াল। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বল্‌তে লাগ্‌ল—'এখানে থাক্‌তে আপনার কোনো ভয় নেই। আমার নাম রতন। রত্‌না-ঢালীকে দু-দশ কোশের মধ্যে সকলেই চেনে। তবে, হ্যাঁ, আপনারা ভদ্দর লোক, আমার মত বাগ্‌দীর বাড়ীতে থাক্‌তে একটু কষ্টই হবে। কিন্তু এখন গেলে পথে কষ্ট পাবেন আরো বেশি। থেকে যান, দেব্‌তা, থেকে যান।'

বেশি কিছু বলার আর দরকার হ'লো না। মাঠের ধুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে সত্যিই ক্রমে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। কিছুদূরে দেয়াও ডেকে উঠ্‌ল—কড়্‌-কড়্‌—কড়্‌ড়্‌!

'দেখ্‌লেন তো, দেব্‌তাই বাদী'—ব'লে রতন হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তারপরেই মাঠের দিকে ফিরে গলা ছেড়ে হাঁক দিল—'গগ্‌না রে, ও গগ্‌না, দেয়া ডাক্‌ছে, শীগ্‌গীর গোরু মোষ নিয়ে ঘরে আয়।'

রতন নিজের বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে ডাক্‌ল—'শীগ্‌গীর আসুন।' 'আসুন' ব'লে সে যেন একটা হুকুম কর্‌ল। আমি তার পেছনে পেছনে তার বাড়ীর দিকে চল্‌লাম।

২

বাড়ীখানি ছোট্ট। ভেতরে তিন চারখানা মেটে ঘর। বাইরের দিকে লম্বা একটা ঘরে গোয়াল। সেখানে সারে সারে জাব্‌নার গামলা পাতা। গোয়ালের সামনে একদিক ঘেঁষে একখানি ছোট্ট চৌচালা।

আমরা বাড়ীতে পা দিতেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। রতন আমাকে নিয়ে চৌচালা ঘরখানির ভেতর ঢুক্‌ল। সে ঘরের একপাশে বাঁশের টুকরা বেতের ফালি ভাঙা তক্তা জড়ো করা, আর-একদিকে একটা বাঁশের মাচান। মাচানের উপর মাদুর পাতা। রতন আমাকে মাচানটী দেখিয়ে দিয়ে বল্‌ল—'এখানে বসুন, দেব্‌তা। আমি আপনার সেবার জোগাড় ক'রে আসি।'

আমি কিছু বলার আগেই সে ঘর হইতে বার হ'য়ে গেল।

একটু পরেই বৃষ্টিটা বেশ চেপে এল। আমি মাচানের উপর ব'সেই দেখ্‌তে পেলাম সেই বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে গগ্‌না গোরু-মোষ নিয়ে বাড়ীতে এল।

সে রাত্রে আর যাওয়া হ'লো না। রতন সত্যিই বলেছিল—'বিধিই বাম।' যাওয়ার দরকার খুব, কিন্তু পথে আটক পড়্‌লাম। একেই বলে—অদৃষ্ট।

মাদুরের উপর ব'সেছিলাম। গগ্‌না বিছানাপত্র নিয়ে ঘরে এল। রতন তার পেছনে এসে বল্‌ল—'একটু উঠ্‌তে হবে, দেব্‌তা। বিছানাটা পেতে দি।'

গগ্‌না হাতের বিছানা মাচানের উপর রাখ্‌তেই তাকে সে বল্‌ল—'আগে পেন্নাম কর্, গগ্‌না। বেরাম্ভন ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তোর বাপের চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি।'

গগ্‌না প্রণাম কর্‌তেই রতন আমাকে বল্‌ল—'আমার ছেলে এ। নাম গগন।'

বাপের কথামত গগন একখানা কম্বল মাদুরের উপর বিছিয়ে দিল। বালিশটা শিয়রে রেখে তার পাশে আর-একখানা কম্বল গুটিয়ে রাখ্‌ল। তারপর বাঁশের খুঁটিতে দড়ি বেঁধে মশারি খাটাতে লাগ্‌ল।

রতন বল্‌ল—'দেব্‌তা, এ বিছানা গুরুদেবের, বারমাসই তোলা থাকে। তিনিও বেরাম্ভন আপনিও বেরাম্ভন, তার উপর অতিথি তো গুরুঠাকুরই। গুরুদেব বলেন কম্বল কখনো অশুদ্ধ হয় না। এই কম্বলখানার উপর গড়িয়ে রাতটা একটু কষ্ট ক'রে কাটিয়ে দিন্।' বালিশের পাশের কম্বলটা দেখিয়ে বল্‌ল—'এটা রইলো গায়ে দেওয়ার জন্ম।'

ততক্ষণে মশারি খাটানো হ'য়ে গিয়েছিল। রতন বল্‌ল—'দেব্‌তা, সেবার কি হুকুম হয়? গরীবের ঘরের দুটো ক্ষুদকুঁড়া এবার চড়িয়ে দিন্।'

রান্নাবান্নার আমার অভ্যাস ছিল না। আর হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে এ সময়ে ঝঞ্ঝাট পোহাবার ইচ্ছাও হ'লো না; রতনের কথায় আমি জবাব দিলাম—'না না, রতন, খাওয়ার কিছু কর্‌তে হবে না। খিদেও নেই, বেরিয়েছি অবেলায় খেয়েই।'

'তা কি হয়! গেরস্তর বাড়ী এসে বেরাম্ভন উপোষী থাক্‌বেন! তা হয় না—হয় না।'—বারবার মাথা দোলাতে দোলাতে রতন ব'লে উঠ্‌ল।

আমি যখন কিছুতেই রান্না কর্‌তে রাজী হলাম না, তখন সে ছেলেকে বল্‌ল—'যা তো, গগ্‌না, ভেতরে। তোর মাকে গিয়ে বল্ গুরুদেবের খাবার ঘরেই কিছু কাঁচা জিনিস জোগাড় ক'রে দিতে।' আমার দিকে চেয়ে আমাকেও বল্‌ল—'আপনার বেশি কষ্ট কর্‌তে হবে না। সামান্য একটু জলপান।'

খেতে গিয়ে দেখি সে এক যজ্ঞের ব্যাপার। চিড়া নারকেল গুড় কলা দুধ দই থালায় থালায় কাঁসিতে বাটীতে সাজানো। নারকেল আর দুধ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রতন বল্‌ল—'আমরা ক'রে দিলে তো চল্‌বে না। নারকেলটা কুরে নিতে হবে, আর দুধটা একটু গরম ক'রে নিন্।'

আমি বল্‌লাম—'এ করেছ কি হে, রতন? এত জিনিস কি একজনে খেতে পারে।'

রতন বল্‌ল—'হেঃ! এ আবার খাবার! কোনো রকমে পিত্তিরক্ষার ব্যাপার। গেরস্তর বাড়ী এসে বেরাম্ভন উপোষী রইলেন! ক্ষুদকুঁড়া দুটো জ্বাল দিয়ে নিলেই ভালো হ'তো।'

বাপ-পোয়ের তাগিদ এড়াবার উপায় হ'লো না। রতন আর গগন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কেবলই বল্‌তে লাগ্‌ল—'ওটুকু খান,' 'ওটা মুখে দিয়ে ফেলুন,' 'ও কি করছেন?—ও রাখলে চল্‌বে না'। বাধ্য হ'য়ে আমাকেও সবই মুখে দিয়ে ফেল্‌তে হ'লো।

৩

খেয়েদেয়ে বিছানায় গিয়ে বসেছি, গুড়ুক গুড়ুক ক'রে ছিলিম টান্‌তে টান্‌তে রতন এসে হাজির।

আমি বল্‌লাম—'এ কি, তোমরা খেলেনা এখনও?'

রতন বল্‌লে—'খাব'খন। গগ্‌না খেয়েদেয়ে শুয়েছে, ছেলেমানুষ কিনা। আপনি দেব্‌তা, দয়া ক'রে বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আর আমি এখনই গিয়ে গিল্‌তে বস্‌ব! বলেন কি? এখানে দু-দণ্ড বসি, আপনার পা-টা-আসটা টিপে দি, আপনি ঘুমান, তার পরে ও সব হবে।'

পা-টেপার কথা শুনে আমি পা গুটিয়ে চেপে বস্‌লাম। রতন পায়ে হাত দিতে না পেয়ে মাচানের নীচে মাটীতে ব'সে পড়্‌ল।

রতন যখন নিজের পরিচয় দেয় তখন নাম বলেছিল রতন ঢালী। আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম—'রতন, তোমরা তো বল্‌লে বাগ্‌দী; তোমাদের ঢালী পদবী কেন?'

রতন বল্‌ল—'আজ্ঞে পদবী-টদবী বুঝি না, এটা

আমাদের ছিল পেশা। দশবিশ পুরুষ আগেকার কথা। সে সময় হ'তেই আমরা ঢালী।'

'ঢালী মানে তো যারা ঢাল নিয়ে লড়াই করে। তোমার বাপ-দাদারা কি ঢালতয়োয়াল নিয়ে যুদ্ধ করত নাকি?'

'করতোই তো। তবে বাপ-দাদা নয়। আমার ঠাকুরদা তার ঠাকুরদা তার ঠাকুরদা এই রকম কত ঠাকুরদাই না আগে হবে বলতে পারি না, তাদের একজন ছিল ঢালী। কার ঢালী, জানেন দেব্‌তা? যশোয়ের রাজার, যিনি দিল্লীর বাদ্‌শার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন।'

কথাটা শুনে কৌতূহল হ'লো। বল্‌লাম—'যশোরের রাজা ছিলেন প্রতাপাদিত্য। তিনিই দিল্লীর বাদ্‌শার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তোমার পূর্ব্বপুরুষ ছিল তাঁর ঢালী? প্রতাপাদিত্যের বায়ান্ন হাজার ঢালী ছিল। তোমাদের বংশের একজন ছিল তাদের মধ্যে? তোমরা তো দেখছি বীরের জাত।'

পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের কথায় রতনের মুখে হাসি দেখা দিল। সে বল্‌ল—'হ্যাঁ, দেব্‌তা, তা বল্‌তে পারেন। কিন্তু এখন আর তার আছে কি?—দেখ্‌ছেনই তো, এখন চ্যাঙ্গারি বুনাই আর গোরুমোষ রাখি।' শেষের কথাগুলি বলার সময় তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

'তা না ক'রে করবেই বা কি? এখন তো আর সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই, আর ঢাল-তরোয়ালের দিনই বা কই?'

রতন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্‌ল—'আজ্ঞে, তা নেই, সত্য। কিন্তু কথাটা তো তা নয়। নাম রয়েছে ঢালী, কাজে হয়েছি হালী, অর্থাৎ হালঠেলার জাত। কার জন্যে, জানেন? সেই ঢালীরই, যিনি বংশের মান বাড়িয়েছিলেন। তিনিই আবার সে মান ডুবালেন! নিজেদেরই তা লজ্জার কথা।'

রতনের কথায় মনে হ'লো কি একটা রহস্য নিয়েই যেন তার এ ইঙ্গিত। সে রহস্যটা জানার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কি রকম?'

'শুনতে চান তা?—আচ্ছা, শুনুন।'—ব'লে রতন একটু পেছনে স'রে একটা খুঁটি হেলান দিয়ে বসল। তারপর ধীরে ধীরে এক গল্প আরম্ভ করল।

এ গল্প তারই পূর্ব্বপুরুষের। বাপ-দাদার মুখে সে তা শুনেছে। তারাও শুনেছে তাদের বাপ-দাদার কাছে। এই রকম ক'পুরুষ ধ'রে বাপ-দাদার মুখে মুখে নাকি এ কথা চ'লে আসছে। যাকে নিয়ে এ গল্প, সে ছিল তারই অনেক পুরুষ আগেকার একজন। তার নাম ছিল ছিদাম। রাজা প্রতাপাদিত্যের বায়ান্ন হাজার ঢালীর মধ্যে সে একজন নামজাদা ঢালী ছিল; কালে হ'য়েও উঠেছিল পাঁচশো ঢালীর উপরে সর্দ্দার ঢালী।

যখন প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে দিল্লীর বাদশার লড়াই আরম্ভ হ'লো, তখন ছিদাম-ঢালীরও ডাক পড়ল। মহারাজা মানসিংহ বাদ্‌শার পক্ষে লড়াই চালাতে বাংলাদেশে এলেন। রাজপুত আর বাঙ্গালীর মধ্যে বীরত্বের পরীক্ষা চল্‌ল। বাদ্‌শার যেমন ক্ষমতা তেমনি সৈন্য। প্রতাপাদিত্য তা গ্রাহ্যই করলেন না। ডাঙ্গার যুদ্ধে ঢালীদের সঙ্গে পারে কে? ঢালীরা বাহাদুরীও দেখালো যথেষ্ট। একজন্য ছিদাম ঢালীরই নাম হ'লো বেশি। কিন্তু যুদ্ধে যেদিন জিত হ'লো সেইদিন রাত্রেই এমন এক ঘটনা ঘট্‌ল যাতে পাশার ঘুঁটি উল্‌টে গেল। এর মূলেও ছিল সেই ছিদাম-ঢালী।

এতক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রতন কথা বল্‌ছিল। এবার সে চোখ দুটো নামিয়ে ঘটনাটী বল্‌তে লাগল।

যুদ্ধে হেরে বাদ্‌শার সৈন্যেরা হ'টে গেছে। জয়ের বাহাদুরী ঢালীদেরই। ঢালীর দলে তাই বেজায় ফূর্ত্তি। তারা তাড়ি খেয়ে হল্লা আরম্ভ ক'রে দিল। ছিদাম-ঢালী এক এক কলসী তাড়ি হাতে নেয় আর ঢক্ ঢক্ ক'রে গলার ভেতর দেয়। দলের সকলে তাকে বাহবা দিয়ে বল্‌তে লাগল—'বাঃ, সর্দ্দার, বাঃ! লড়ায়ে তুমি যা বাহাদুরী দেখিয়েছ তাতে রাজা তোমাকে কোলে ক'রেই নাচবেন।' নাচার কথা শুনে ছিদামেরও নাচের নেশা পেয়ে বস্‌ল। সে তাড়ির কলসি মাথায় নিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ সুরু ক'রে দিল। তার দেখাদেখি আর সকলেও মেতে উঠল। তখন ছোট-বড়র তফাৎ রইলো না। যে যাকে কাছে পেল তার গলা জড়িয়ে ধ'রে নাচ্‌তে লাগ্‌ল।

এভাবে অনেক রাত্রি কেটে গেল। তাড়ির নেশায় সকলেই তখন ঢুলুঢুলু। যেখানে যে ছিল সেইখানেই চ'লে পড়্‌ল। ছিদাম-ঢালীও নাচ্‌তে নাচ্‌তে একপাশে গিয়ে ধপাস্ ক'রে মাটীতে শুয়ে পড়্‌ল। এত যে নেশা তাতেও কিন্তু তার একটা জিনিষের ভুল হয়নি। তার হাতের

ঢাল হাতেই ছিল; মাটীতে প'ড়ে গিয়েও সেই ঢালখানিই মাথায় গুঁজে সে শুয়ে রইলো।

রতন এবার আমার দিকে চোখ তুলে বল্‌ল—'তারপর যা হ'লো, দেব্‌তা, তা একেবারেই আশ্চর্য্য। শুনলে বিশ্বাস হবে না, কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিকই। নইলে কি ছিদাম-ঢালীর মাথা বিগ্‌ড়ায়! শুনুন সে কথা।'

সে কথাও ছিদাম-ঢালীরই। ছিদাম ঢাল মাথায় দিয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হ'লো মাথা ধ'রে কে যেন ঝাঁকুছে। ছিদাম তড়াক্ ক'রে উঠে বস্‌ল। তখন ব'সে ব'সেই সে শোনে কে যেন তাকে ডাকৃছে—'ওঠ্, ছিদাম, ওঠ্। হুরীর মুল্লুকে যাবি?' প্রথমে তার মনে হ'লো কে যেন তার কানে কানে কথা কয়। তার পরই শোনে ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে আওয়াজ আসে তার শিয়রের ঢালের ভেতর হ'তেই। ছিদাম কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগ্‌ল। সত্যিই তো—ঢালের মাঝেই তো কে কথা কয়—'ওঠ্, ছিদাম, ওঠ্। হুরীর মুল্লুকে যাবি?' ছিদাম চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে ঢালখানিকে দেখতে লাগল। ঢালের কথা তখন যেন আরো জোরেই শোনা গেল। কার এ স্বর!—ঠিক কর্‌তে না পেরে ঢালখানিকে সে উলটে-পালটে দেখতে লাগ্‌ল! ঢাল নিয়ে তার চিরদিনের কারবার, সেদিনও তা নিয়ে লড়াই ক'রে এসেছে। কিন্তু ঢাল উল্‌টাতেই তখন সে ছাখে—ঢালের ছাউনী ঠেলে বের হ'য়ে এল টুরটুর ক'রে একটা পরী! পরীটা কি সুন্দর আর কত ছোট্ট—হাতের আঙুলের উপর তুলেই তাকে নাচানো যায়! সেই পরীই হাত নেড়ে তাকে ডাকৃছে—'ওঠ্ ছিদাম, ওঠ্। হুরীর মুল্লুক যাবি?' পরীর কথা শুনে ছিদাম আহ্লাদে আটখানা! তাড়াতাড়ি সে ব'লে উঠ্‌ল—'কেন যাবনা? নিয়ে যাবে কে?' পরীটা বল্‌ল—'আমি। চল্ আমার সঙ্গে।'—ব'লেই সে টুক্ ক'রে মাটীতে লাফিয়ে পড়্‌ল। তার পরেই সুরু হ'লো হাঁটা। পরীটা সামনের দিকে হাঁটে আর মাঝে মাঝে পেছন ফিরে হাত-ইসারা ক'রে ডাকে, ছিদাম সামনের দিকে তাকায় আর টল্‌তে টল্‌তে পরীর পেছনে ছোটে। কোথায় রইল তার পায়ের নাগ্‌রা, কোথায় রইলো মাথার পাগড়ী, কিছুরই খেয়াল ছিল না। কিন্তু ঢালখানিকে সে আঁকড়ে রইলো। তা হাতে নিয়েই পরীর সঙ্গে ছুটল।

কত নদীনালা পার হ'য়ে, ক্ষেতখামার ছাড়িয়ে একটা মাঠে এসে পড়তেই ছিদাম দেখে—সত্যিই সে হুরীর মুল্লুক! চারিদিকে আলোর রোস্‌নাই, রঙ-বেরঙের ছাউনী, আর তার মধ্যে চলছে নাচ-গান! কি সুন্দর!

'বাঃ! ক্যা ফুর্ত্তি!'—ব'লে ছিদাম চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। তারপর সে সেই ছাউনীর দিকে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি কে হাঁক দিয়ে উঠ্‌ল—'কোন হায়?' সঙ্গে সঙ্গে লোক-লস্কর ছুটে এল। তাদের দুজন ছিদামের দুহাত চেপে ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

লোকজনের সোরগোলে তাড়ির নেশা তত্তক্ষণে ছুটে গেছে। ছিদাম চেয়ে ছাখে—তার চারধারে বাদ্‌শার সেপাই আর সে এসে পড়েছে তাদেরই ছাউনীতে! ছিদাম মনে মনে ব'লে উঠ্‌ল—'হে মা কালী, এ কি হ'লো! এই ঢাল নিয়েই তো এতদিন আছি। আজ ঢালের একি ভেল্‌কীতে ম'জলাম!'

কিন্তু ঢালের ভেল্‌কীতে সে নিজে শুধু মজ্‌লে তো কথা ছিল না। পাঁচশো ঢালীর সর্দ্দারকে চেনার বাধা রইলো না। বাদ্‌শার সৈন্তেরা শত্রুকে হাতে পেয়ে তরোয়ালের খোঁচা মেরে মেরে ঢালীদের দশা জেনে নিল। তখনি তারা শিকারীর মত গুটি মেরে মেরে ফিরে গিয়ে ঢালীদের উপর লাফিয়ে পড়্‌ল। ঢালীরা তখনও তাড়ির নেশায় বিভোর। তাদের আর মাথা তোলার জো রইলো না।

এ পর্য্যন্ত ব'লে রতন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। বোধহয় তার মনেও ছিদামের কথাই তোলপাড় কর্‌ছিল—'হা মা কালী, এ কি হ'লো!' একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে বল্‌ল—'অদেষ্ট মানেন তো, দেব্‌তা?—একেই বলে অদেষ্ট।'

আমি বল্‌লাম—'অদেষ্ট না মেনে উপায় কি? আমার নিজের অদেষ্টও তো আজ দেখ্‌লাম!'

রতনের কানে আমার কথা গেল কিনা, বুঝা গেল না। সে ছিদামের কথাই আবার বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল—'এর ফলে রাজার অদেষ্টেও যা ছিল তা হ'লো। আবার অদেষ্টের জোরে দিল্লীর বাদ্‌শাকে ফাঁকি দিয়ে তিনি মা কালীর কাছে চ'লে গেলেন। ছিদামের কপালে ভোগ ছিল; সে ফলও পেল হাতে হাতে। কি হ'লো তার জানেন? প্রথমে তার হাতের ঢাল কেড়ে নেওয়া হ'লো। সেই ঢাল

মাটীতে ফেলে সেপাইরা এক একজন ক'রে তার উপর লাথি মারতে লাগল। ছিদামের মনে হ'তে লাগল—সে লাথি তার কল্‌জের উপরই পড়ছে! সে ছিল মরদের বাচ্চা। এক হেচ্‌কা টানে সেপাইর হাত হ'তে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে গর্জ্জে উঠল—'ঢালই যখন রইলো না, তখন আর এ হাতের দরকার কি! ঢালের সঙ্গে হাতও যাক্।' ব'লেই চট্‌ ক'রে এক সেপাইর হাতের তরোয়ালখানা কেড়ে নিয়ে ঘ্যাঁচ্‌ ক'রে নিজের হাতখানা কেটে ফেল্‌ল।'

নিজের হাতে নিজের হাত কাটার কথা শুনে আমার মাথার রক্ত চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। এক রকম দম বন্ধ করেই আমি জিজ্ঞেস করলাম—'তারপর? তারপর?'

রতন বল্‌ল—'তারপর আর ঢালীকে রোখে কে? তখন সে পাগ্‌লা হাতী। কাটা হাতখানা মাথার উপর তুলে ধ'রে দুদিকে পায়ের লাথি মারতে মারতে সে ছুটে পালালো। কিন্তু সেভাবে বেশি দূরে যাওয়ারও শক্তি ছিল না। কাটা হাতের রক্ত প'ড়ে সমস্ত শরীর রাঙা হ'য়ে গিয়েছিল। তবু সে দু-পায়ে একদিনের পথ ছুটে এল। তারপরই মাথা ঘুরে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে গেল।'

'ক'দিন পরে আর কি ক'রে তার হুঁস হ'লো, মা কালীই জানেন। হুঁস হ'য়ে সর্ব্বনাশের সমস্ত কথাই সে জান্‌তে পারল। তখন সে মনের দুঃখে কামড়ে কামড়ে নীচের ঠোঁটটা একেবারে ছিঁড়ে ফেল্‌ল। তাতেও আপশোষ গেল না। তারপর যাকে দেখ্‌তে পেতো তাকে টেনে এনে কাছে বসাতো আর তার কাছে একে একে সমস্ত কথা খুলে ব'লে জিজ্ঞেস করত—"আমি ঢালের ভেল্‌কীতে না পড়্‌লে কি রাজার রাজ্য যেতো?' উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই তখনি আবার সে কাঁদতে থাকত আর হেচ্‌কি টেনে বলত—"আমি নেমকহারাম, আমি নেমকহারাম। আমার দোষেই রাজার রাজ্য গেল!"

দিনের পর দিন একই কথা ব'লে ব'লে আর সেই কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে কিছুদিন পরে তার মাথা বিগ্‌ড়ে গেল। তারপর একদিন হঠাৎ কোথায় সে চ'লে গেল তার উদ্দেশ রইলো না।'

আমি মনে মনে বল্‌লাম—'আহা, বেচারা!' জিজ্ঞেস করলাম—'উদ্দেশই আর হ'লো না?'

রতন বল্‌ল—হ'য়েছিল, অনেকদিন পরে।' আমি যে ঘাসের মাঠ পেরিয়ে এসেছিলাম সেইদিকে হাত বাড়িয়ে রতন বল্‌ল—'ঐ—ঐখানে। বাদশার এক সেপাই আর ঢালী জড়াজড়ি ক'রে প'ড়ে ছিল। কিন্তু দুজনেই মড়া। ছিদাম-ঢালীর বুকে এক ছোরা বসানো; বাদশার সেপাইর গলা টিপে ধ'রে ঢালীর বাঁ হাত—হাতের পাঁচটা আঙুল তাতে কেটে পড়েছে। লোকে বলে সেই সেপাই-ই ছিদামের হাতের ঢাল কেড়ে নিয়েছিল।'

রতনের কথা তখনও শেষ হয়নি। এবার আমাকে সে জিজ্ঞেস করল—'ঢালী ঐখানে কেন মরল, জানেন দেব্‌তা?'

আমি বল্‌লাম—'কেন?'

রতন বল্‌ল—'ঐ-যে তার ভিটে। ঐ যে মাঠ পেরিয়ে আপনি এসেছেন, যাতে দেখ্‌লেন চোর কাঁটার বন আর মুথো ঘাস, সেইখানেই ছিল ছিদাম-ঢালীর ভিটে। নিজের মাটীতেই নিজে মরল আর মেরেও গেল শত্রুকে—সেই মাটীতেই পা দিয়ে। ঐ ভিটে ছিল রাজার দান। যাঁর দান তাঁর মান রাখল শেষে ঐ ভাবেই।'

রতনের কথার জের টেনে আমিও বল্‌লাম—'প্রাণ দিয়ে, আর প্রাণ নিয়ে।'

রতন বল্‌ল—'হাঁ; আর সে ভিটেরও প্রাণ নিয়ে। তারপর হ'তেই সে ভিটে ছাড়া। আশে পাশে দেখ্‌লেন তো—মাঠে সোনার ফসল ফলে। কিন্তু ঐ জমিতে লাঙল দিয়ে সাত হাত মাটী চষ্‌লেও ফল হয় না। শুধু ঘাস আর ঘাস! ঐ ভিটে এখন লোকে মাড়িয়ে চলে, আর গোরু-মোষের বাথান। বোধহয় নেমকহারামীরই ফল। কি বলেন, দেব্‌তা?'

'হুঁ'—বলা ছাড়া একথার জবাব দেওয়ার আর কিছু ছিল না।

৪

পরদিন ভোরে বিদায়ের পালা। রতন উঠেই আমার কাছে এল। যাওয়ার সময় বল্‌ল—'দেব্‌তা, গরীবের বাড়ী এসে অনেক কষ্ট পেয়ে গেলেন।'

'কি যে বলো, রতন!'—জবাবে এই মাত্রই আমি বল্‌তে পারলাম। তখনও আমার মনের মধ্যে ছিদাম-ঢালীর কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

... ...

আত্মীয়ের বাড়ী গিয়ে কথায় কথায় আমি রতনের কথা বল্‌লাম। সঙ্গে সঙ্গে ছিদাম-ঢালীর কথাও উঠ্‌ল।

আমার আত্মীয় চোখ কপালে তুলে বললেন—'তুমি সেই রত্‌না-বাগ্‌দীর বাড়ীতে ছিলে কাল ? আরে, সে যে একটা আস্ত পাগল ! ছিদাম-ঢালী কেউ ছিল নাকি ? আর থাকলেও, সে জন্মাতে গিয়েছিল বাগ্‌দীর ঘরে ? হাঃ ! তারপর ধুধু করে যে মাঠ, তা হয় কারু ভিটে ? রত্‌না ঐ কথাই সকলকে বলে। তা যদি মান্‌তেই হয় তবে বল্‌তেই হবে—ঐ রত্‌নাই ছিদামের ভূত, আর তার ভিটেয় এতদিনে সরষে হওয়া উচিত ছিল !'

প্রবোধানন্দ ও প্রকাশানন্দ কি একই ব্যক্তি ?

অধ্যাপক শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য এম-এ

প্রবন্ধ

চৈতন্যদেবের পরমভক্ত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিজ্ঞাত। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে (১) তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে ৺কাশীধামে বিন্দুমাধবের মন্দিরের নিকট তাঁহার মঠ ছিল। সে-সময় ৺কাশীধাম মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন তাঁহাদের নেতৃস্থানীয়। বাংলা "ভক্তমালে" তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

প্রকাশানন্দ সরস্বতী কাশীপুরে বাস।
জ্ঞানযোগ-মার্গ-স্থিতি চিন্তয়ে আকাশ॥
বেদান্ত পণ্ডিত যে শাঙ্করিক ভাষ্যমতে।
শ্রীবিগ্রহ নাহি মানে দুই নাশ যাতে॥
যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টদেবেতে অভিন্ন॥
ভক্তি যে পদার্থ তার মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কাঁদে কি কারণে॥

এই মায়াবাদী বৈদান্তিকপ্রবরের সহিত চৈতন্যদেবের বিরোধের কথা "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে"র মধ্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের পর প্রথম ছয় বৎসর ইতস্ততঃ গমনাগমন শেষ করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া যাইবার পথে (১৫১৬ খৃঃ) কাশীতে এই 'কুতর্ককর্কশ মায়াবাদীর' প্রতি কৃপাদৃষ্টি দান করেন এবং তাঁহার চিত্ত হইতে সমস্ত আগাছা অপসারিত করিয়া সেখানে প্রেমবারিসিক্ত ভক্তিবীজ বপন করিয়া যান। নূতন গুরুবরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নূতন নামকরণ হইল প্রবোধানন্দ। তারপর তিনি মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া নন্দকূপে বাস করিতে থাকেন। সেইখানেই তাঁহার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্" রচিত হয়।

উক্ত "চৈতন্যচন্দ্রামৃতে"র টীকাকার নৃসিংহ মহান্তের শিষ্য আনন্দি প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বাংলা "ভক্তমালে"ও দেখা যায়—

প্রকাশানন্দ সরস্বতী যার নাম ছিল।
প্রভু তার নাম প্রবোধানন্দ রাখিল॥

কিন্তু বাংলা "ভক্তমালে" ভক্তগণের জীবনী সম্পর্কিত নানা-প্রকার প্রবাদমূলক গল্প সংকলিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান কতটুকু আছে, তাহা বিশেষ বিচার্য্য। পরন্তু উক্ত প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ যে অভিন্ন ব্যক্তি এ-বিষয়ে সন্দেহের অনেক কারণ আছে। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহাই প্রকাশ করিব।

আমরা দেখিতে পাই, "শ্রীচৈতন্য ভাগবতে" বৃন্দাবন দাস এবং পরে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ৺কাশীধামে অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর

(১) এই প্রসঙ্গে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিত "শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপালভট্ট" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

কথা লিখিয়াছেন (২)। কিন্তু তিনিই যে পরে প্রবোধানন্দ নাম লাভ করিয়া "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারা কোথাও লেখেন নাই। ঐ বার্ত্তা সত্য হইলে কেন তাঁহারা উহা লেখেন নাই, তাহা চিন্তার বিষয়। এদিকে "প্রেমবিলাস" ও "ভক্তিরত্নাকরে" প্রবোধানন্দকে গোস্বামিপাদ গোপালভট্টের পিতৃব্য বলা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশানন্দের নামেরও কোন উল্লেখ নাই; অধিকন্তু প্রবোধানন্দের প্রসঙ্গে এমন কথা আছে, যাহাতে উক্ত প্রবোধানন্দ ও "চৈতন্যচরিতামৃত" বর্ণিত প্রকাশানন্দের অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। অতঃপর আমরা "প্রেমবিলাস" ও "ভক্তিরত্নাকর" হইতে ঐরূপ স্থানগুলি উদ্ধৃত করিব।

চৈতন্যদেব ১৫০৯-১৫১০ খৃষ্টাব্দে (৩) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাত্রা করেন। তাহার পরবর্ত্তী বৈশাখেই তিনি দক্ষিণদেশ পর্য্যটনে বহির্গত হন। বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া আষাঢ় মাসে (অর্থাৎ ১৫১০ খৃঃ—জুন-জুলাই প্রভু কাবেরী তীরস্থ রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব শ্রীবেঙ্কটভট্টের গৃহে বর্ষার চারিমাস তাঁহাকে অতিবাহিত করিতে হয়। "প্রেমবিলাসে" ও "ভক্তি-রত্নাকরে" বেঙ্কটের গৃহে মহাপ্রভুর চাতুর্ম্মাস্য উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে প্রবোধানন্দের অনেক কথা পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ দাস লিখিয়াছেন (৪)—লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক বেঙ্কটভট্টের সহিত হাস্য পরিহাসচ্ছলে:

প্রভু নিজরূপে তাঁরে দিলা দরশন।
আজ্ঞা হৈল তোমার গৃহে আছে যতজন॥
আনহ সভারে মোরে দেখুক এখন।
প্রভু আজ্ঞা শুনি ভট্ট করিল গমন॥
দুই ভাই পুত্রসহ গৃহ পরিকর।
আনিল সভারে তাঁহা প্রভুর গোচর॥

বেঙ্কটের অপর দুই ভ্রাতার নাম ত্রিমল্ল ও প্রবোধানন্দ এবং পুত্রের নাম গোপালভট্ট। এই গোপালভট্টই বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম ও মহাপ্রভুর আসনের উত্তরাধিকারী। তাই

প্রবোধানন্দ পানে প্রভু চান হাসি হাসি।
তোমার শিষ্য সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণরাশি॥
পড়াইয়া সুপণ্ডিত করিবে ইহারে।
বিহা নাহি দিবে ইহা কহিল তোমারে॥

* * *

একবার বৃন্দাবনে পাঠাবে ইহারে।
মোর প্রয়োজন আছে কহিল তোমারে॥

বেঙ্কটের ঘরে চাতুর্ম্মাস্য করিবার সময় মহাপ্রভুর সহিত বেঙ্কট-ভ্রাতা প্রবোধানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহা "ভক্তি-রত্নাকরে"ও স্পষ্টই লিখিত আছে। নরহরি লিখিয়াছেন (৫)

শ্রীবেঙ্কট ভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে॥
ত্রিমল্ল বেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র॥

তারপর

চারি মাস পরে প্রভু করিব গমন।
ইহা মনে করিতে অধৈর্য্য তিনজন॥

---

(২) চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৭শ পরিচ্ছেদ; চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

(৩) চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের দিন সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন:

এই সংক্রামণ উত্তরায়ণ দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭শ পরিঃ)

আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন:

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘমাস।
তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১ম পরিঃ)

১৪৩১ শকের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি হইবে ইংরাজীর ২৩শে ডিসেম্বর ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু মাঘমাসের শুক্লপক্ষ ১৫১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী হইতে ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত। সুতরাং বৃন্দাবন দাস ও কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের দিন এক নহে। উল্লিখিত জ্যোতিষিক গণণায় আমার শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছি।

(৪) প্রেমবিলাস, ১৮শ বিলাস, ১৫২ পৃষ্ঠা, যশোদালাল তালুকদারের সংস্করণ।

(৫) ভক্তি রত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ।

ত্রিমল্ল বেঙ্কট শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনে রহিব কেমনে॥

তারপর

শ্রীচৈতন্য ভট্টের মন্দির হইতে চলে।
ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভু পদতলে॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন।
কহিল অনেকরূপ প্রবোধ বচন॥ (৬)

সুতরাং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে যখন চৈতন্যদেব চাতুর্মাস্য করেন, সে সময় প্রবোধানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু চৈতন্য "চরিতামৃত" অনুসারে এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভু ৺কাশীধামে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার করেন (৭)। "চৈতন্য ভাগবতে"ও দেখিতে পাই যে শ্রীনিমাই গয়াধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর (১৫০৬ খৃঃ) একদিন মুরারি গুপ্তের সম্মুখে বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলেন—(৮)

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥

সুতরাং "চৈতন্য ভাগবত" ও "চৈতন্য চরিতামৃত" অনুসারে প্রকাশানন্দ সরস্বতী ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাশীতে থাকিয়া মহাপ্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। তাহা হইলে প্রকাশানন্দ ও প্রবোধানন্দ যে অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে?

তারপর বেঙ্কট ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দের 'সরস্বতী' উপাধির দ্বারাও তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। তিনি যে দশনামী সন্ন্যাসীদের অন্যতম চিহ্ন 'সরস্বতী' উপাধি গ্রহণ করেন নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। শ্রীপ্রবোধানন্দ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপালকে শৈশব হইতেই এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে গোপাল অচিরেই ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় অজেয় হইয়া পড়িলেন। নরহরি সরকার লিখিয়াছেন (৯)

গোপাল গৌরাঙ্গ প্রেমে মত্ত অনিবার
ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে সর্ব্বত্র জয় যার।
গৌর গুণ মহিমা যে সর্ব্বত্র প্রকাশে॥
মায়াবাদ খণ্ডন করয়ে অনায়াসে॥
গোপাল ভট্টের শ্লাঘা করে শিষ্টগণ।
কিরূপে করিল ঐছে বিদ্যা উপার্জ্জন॥
কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল।
অল্পকাল হইতে অধ্যয়ন করাইল॥
পিতৃব্য কৃপায় সর্ব্বশাস্ত্রে হইল জ্ঞান।
গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান॥
কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যার খ্যাতি সরস্বতী॥

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে প্রবোধানন্দ তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্যই 'সরস্বতী' বলিয়া খ্যাত হইতেন, অন্য কোন কারণে নহে। "প্রেম বিলাসের" বিংশ বিলাসে ভক্তগণের শাখা বর্ণন প্রসঙ্গে মাত্র একস্থানে প্রবোধানন্দের সহিত 'সরস্বতী' উপাধিটি যুক্ত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত 'প্রেমবিলাস' বা 'ভক্তি রত্নাকরে'র অন্য কোথাও 'প্রবোধানন্দ সরস্বতী' এইরূপ পূর্ণনাম নাই।

এই সব কারণে, গোস্বামিপাদ গোপাল ভট্টের আত্মীয় শ্রীপ্রবোধানন্দ ও কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী যে একই ব্যক্তি, ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এখানে ইহাও বক্তব্য যে বারাণসী ধামে উক্ত প্রকাশানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে কোনরূপ প্রবাদ বা স্মৃতিচিহ্ন এখন বর্ত্তমান নাই। সে যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা অবলম্বন করিয়া "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্" নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সে কাব্যখানি ভাব-সমৃদ্ধি ও পদলালিত্যের জন্য এখনও বিশেষ জনপ্রিয়

(৬) 'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তি রত্নাকর' হইতে উদ্ধৃত অংশগুলিতে কোথাও প্রবোধানন্দের নামের সহিত 'সরস্বতী' উপাধিটি যুক্ত নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(৭) চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলার ১৭শ ও ২৫শ পরিচ্ছেদ।

(৮) চৈতন্য ভাগবত, মধ্য খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়।

(৯) ভক্তি রত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ।

রহিয়াছে। "ভক্তমাল" ব্যতীত অন্ত কোথাও প্রকাশানন্দ সরস্বতী কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত নাই। কিন্তু "ভক্তমাল" অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থ "ভক্তি রত্নাকরে" প্রবোধানন্দের কাব্যের স্পষ্ট প্রশংসা রহিয়াছে। যথা (১০)

পরম বৈরাগ্য স্নেহমূর্ত্তি মনোরম।
মহাকবি গীতবাদ্য নৃত্যে অনুপম॥
যার কাব্য শুনি সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহা মহিমা অপার॥

এই সঙ্গীত সুনিপুণ মহাকবির লেখনী হইতেই "শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রামৃতে"র ন্তায় একখানি মনোহর কাব্যের সৃষ্টি অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর "চৈতন্তচন্দ্রামৃতে"র একখানি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর পুঁথিশালায় আছে। এই প্রসঙ্গে পাঠকগণের নিকট সেই পুঁথিখানির সামান্ত বিবরণ দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পুঁথিখানি তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত ১৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১২০৭ সালে ইহার নকল কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু পুঁথিখানিতে কোথাও কোনরূপ ভণিতা না থাকায় অনুবাদকের নাম পাওয়া গেল না। পুঁথিখানির পয়ার খুব সরল ও সাবলীল। নমুনা স্বরূপ কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল (১১)—

পরম রহস্ত কথা করি পরচার।
হেমদণ্ড জিনি বাহু প্রকাণ্ড জাহার॥
আস্ফালয়ে হস্তপদ আনন্দ অপার।
তপ্ত হেম জিনি কান্তি হয়েত জাহার॥
সুন্দর তরুণ তনু কমল নয়ানে।
বিশ্ব ধন্ত করে জার হরি গুণ গানে॥
সেই জে চৈতন্তচন্দ্র প্রভু চূড়ামণি।
বন্দনা করিয়ে তার চরণ দুখানি॥
কোটি মেঘ জিনি জল পড়য়ে নয়ানে।
হাসে কাঁদে গায় অতিশয় ভাবক্ষণে॥
গৌরচন্দ্র ছটা অতি সাধুতে উগারে (?)।
কোটি সুধা সমুদ্রের জেই নিন্দা করে॥ (১২)

* * *

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে কোন কোন জনে।
কৃতার্থ করিলা যোগ্য দেখি সেই জনে॥
হেন অবতার কভু দেখি শুনি নাই।
প্রেমের সমুদ্রে বিশ্ব রাখিল ডুবাই॥

* * *

চিত্তের বাসনা ভেল গৌর গুণ গাইতে।
জেন তেন মতে গাই আপনা শুধিতে॥
শ্রীপ্রবোধানন্দ গোসাঞীর এই গৌরলীলা।
লিখিয়াছেন শ্লোক বন্ধে এই সব খেলা॥
তাহার চরণে করি কুটী পরণাম।
প্রাকৃত প্রবন্ধে কিছু করি গুণ গান॥

পুঁথিখানি মাত্র ১৩৭ বৎসরের পুরাতন হইলেও কবি যে তাহারও পূর্ব্বেকার লোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ ইহাতে মাঝে মাঝে পুরাতন ভাষার বহু লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। যথা—কর্ত্তৃকারকে এ বিভক্তি। যেমন—'কমল নয়ানে', 'কোথা বৈসে এবে সে সব বিকারে' ইত্যাদি। তারপর, 'পড়য়ে নয়ানে', 'হয়েত জাহার', 'কহন না জায়ে' প্রভৃতি স্থানে ক্রিয়াতে সংস্কৃত কর্ম্মবাচ্যের শেষ চিহ্ন লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

ইহা সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ নহে। মূল সংস্কৃত গ্রন্থটিকে আদর্শ স্বরূপ রাখিয়া কবি স্বাধীনভাবে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। বঙ্গ সাহিত্যের অন্তান্ত প্রাচীন অনুবাদ গ্রন্থেও এইরূপ নিরঙ্কুশ ভাষান্তর-করণই দেখিতে পাওয়া যায়।

আলোচ্য পুঁথিখানির প্রতি বৈষ্ণব সাহিত্য রসিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

---

(১০) ভক্তি রত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ।

(১১) তৎসম শব্দগুলির বানান শুদ্ধ করিয়া উদ্ধৃত করা হইল।

(১২) তুলনীয়—

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ড প্রকাণ্ডৌ বাহু প্রোদ্ধৃত্য-মত্তাস্তর তরল তনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্। বিশ্বম্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরি হরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ র্বন্দে তংদেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্ট চৈতন্তচন্দ্রম্॥ প্রবাহৈরশ্রুণাং নবজলদকোটি ইবদৃশৌ দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদ কোটী প্রহসনম্। বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃত নিধি কোটীরিবতনু চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাস কপটং॥ (শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রামৃতম্, শ্লোক ১০ ও ১২)

বেকার

শ্রীসন্তোষকুমার দে

এক থালা লাল মোটা মোটা ভাতের উপর দু'চামচ তরকারি ঢেলে নিয়ে জলধর আর কার্তিক খেতে বসেচে। জলধর কালো, টাক মাথা, বুড়ো মানুষ। আর কার্তিক জোয়ান, সুন্দর স্বাস্থ্য। ভাতের পরিমাণ উভয়েরই প্রায় সমান। শিবু হাঁ করে ওদের খাওয়া দেখছিল।

পুকুরে হাঁসরা ডুব দিয়ে দিয়ে গুগ্‌লি তুলছে, সজনে গাছে একটা কাক কা কা করে ডাকছে, আর তার ঝরে পড়া ফুল ফ্রকের কোঁচড়ে কুড়িয়ে রাখচে ও-বাড়ীর হাসি আর মণ্ট। শিবু মুখ ভার করে সব গভীর ভাবে দেখচে—যেন একটা থিসিস্ লিখবে।

শিবুর একটুও ক্ষিধে পায়নি, তবু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার কার্তিকের আর একবার জলধরের প্রতি গ্রাসটির দিকে ও লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো। অনেকক্ষণ পরে একবার তা জলধরের দৃষ্টিতে পড়ে গেল :

আলুর সের চার পয়সা করে, তাও ওরা রোজ খেতে পায় না। আজ বুঝি তরকারিতে দু'খানা আলু ছিল, তাই নিয়ে কি আনন্দ! কার্তিক একেবারে আনন্দে শিহরিত হচ্ছে। সে জলধরকে বল্লে—আলুতে পেট ভার করে, তুমি বুড়ো মানুষ খেও না খুড়ো, দাও আমারে।

জলধর বল্লে—এ মাসে আর আলুর তরকারি হয়নি কার্তিক, একদিন খাই।

সোঝাসুঝি সুবিধা হল না দেখে একথা সে কথার পরে কার্তিক একবার বল্লে—পুকুরে মাছ আছে। একবার রাতে দু একটা খেও দিলে হয়। পরাণের খে'জাল আনবো খুড়ো? দেখো, দেখো, কত বড় ঘেউডা দিল।

জলে মাছের কোনও আভাস ছিল না, সেই দুটি হাঁস চরছে, তার মৃদু তরঙ্গ। জলধর সেই দিকে চাইতেই কার্তিক হাত বাড়ালো তার পাতের একখানা আলু তুলে নিতে। জলধরের তখন দৃষ্টি পড়েচে শিবুর দিকে, বল্লে—পুকুর পাড়ে কি দেখতেছেন বাবু?

শিবুর উত্তর শুনবার আগেই জলধর অনুভব করলে একখানা হাত তার পাতে এসে পড়েচে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি সে চেপে ধরলে হাতখানা। বল্লে, মাসের মধ্যে একদিন এই একটু আলু, তাও চুরি?

ধরা পড়ে কার্তিক লজ্জা ছেড়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ করলে।

শিবু বল্লে—আলু তোমরা কেনো না কেন রোজ?

শিবুর কথা জলধর নিশ্চয়ই ভুলে যেয়ে থাকবে, নতুবা ষাট বছরের বুড়ো একখানা আলুর জন্য কাড়াকাড়ি করতে ওর সামনে অন্তত লজ্জা পেত! এখন একটু সমঝে নিয়ে বল্লে—ঐ হয়ে ওঠে না। সত্যি কথা বলতে কি জানেন বাবু, সিম দুই সের দেড় সের পয়সায়, সেদিন আপনাদের বাগানের একটা গাছমোচা কাটলাম, তার থোড় আছে, কাঁচকলাও গোটা কয় ছিল—কি দরকার আর আলুর? দামও তো কিছু কম না—চার পয়সা। এখানে বসে ভালোমন্দ খাবো, বাড়ীতে দুটো কু-পুষ্যি আছে, তাদেরও তো দু'টাকা পাঠাতে হয়। আর তাছাড়া আমরা তো আর আপনাদের মত না, এক একজনেরই এক এক সের লাগে, না'লে দেখলেন তো, চুরি-চামারি, টানা-হাঁচড়া। কাহাতক সহ্য হয়?

কার্তিক নীরবে খেয়ে চলেছে, এক রকম শুধু ভাত, সামান্য লবণ মাখা। গ্রাসের সঙ্গে হয়ত একটু সিম কামড়ে নিচ্ছিল, এখন তাও ফুরিয়ে গেছে—শুধু ভাতই খাচ্ছে। শিবু এগিয়ে এসেচে। জলধর একটা সিমেন্টের খোয়া বস্তা বাঁ হাতে পেতে বললে, বসবেন বাবু? আমাদের এখানে নেইও কিছু বসবার, দাঁড়িয়ে থাকলেই বা কেমন দেখায়?

কথা বাড়তে না দিয়েই শিবু বেশ সুস্থভাবে বসে পড়লে। থালার ভাত ফুরিয়ে এলো, জলধর ঘটি থেকে ঢকঢক্ করে জল খেয়ে একটা সতৃপ্ত উদ্গার তুললে; শেষে বল্লে—কাল কাজের শেষে আবার আমার জ্বর আস্‌ল। নবাব পুত্তুরেরা কেউ একটু বাজারে যেতে পারলেন না।

আমি আবার বাবু বিনা মাছ-কোছে খেতে পারিনে। অবস্থা অনুযায়ী স্বভাবটা হয়নি বলেই দুঃখু।

ভৃত্য এসে ডাক দিলে। বাড়ী প্রবেশ করতেই মা চীৎকার জুড়লেন—সকালের ভাত কি আর দশটায় উঠবে, থাকো ঐ মিস্ত্রীদের সঙ্গে চুণ সুরকির মধ্যে বসে, ওতেই পেট ভরবে।

শিবুর পেট ভালো নয়, ক্ষুধার অভাব। বিনা কাজে বিনা পরিশ্রমে উদরের অন্নও সহজে হজম হতে চায়না। ছোট ছেলেপেলেদের পেট কামড়ানো নয়, কোষ্ঠকাঠিন্যও ঠিক নয়, ক্ষুধামান্দ্যে ভুগছে শিবু। সারা গা তার রী রী করে উঠল মায়ের কথায়! মনে হ'ল এক গ্রাস ভাত মুখে তুললে বুঝি অন্নপ্রাশনের অন্নটাও বমি হয়ে পড়ে যাবে।

গম্ গম্ করে গেল সে উপরে উঠে; তেতালার ছাদের পাশে একাকী সে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। তেমনি সতেজ সূর্য—যখন সে স্কুলে পড়েচে, কলেজে পড়েচে তখন যেমন ছিল। আর আজ সে একেবারে নিস্তেজ, কাজহীন, কিন্তু সূর্য তেমনি আছে—সেই চোখ ঝলসানো স্বরূপ, অগ্নিময় তেজোপুঞ্জ।

হয়ত সে সূর্যকে প্রণামই করতে যেতো, এমন সময় ঠাকুর ঘরের দরজা খুলে পিসিমা বেরিয়ে এলেন। বুড়ো-মানুষ, দুদিন ভাই-বাড়ী বেড়াতে এসেচেন—সেখানেও সন্ধ্যা আহ্নিক। সামনে শিবুকে দেখে আদর করে বল্লেন—শিবু যে এখানে দাঁড়িয়ে। আয় বাবা, ঠাকুরের প্রসাদ পাবি।

এক বাটি ক্ষীরের পায়স, জিবে জল আসলেও পেটটা উৎসাহ জানালো না। আকাশে নজর পড়তেই আবার শিবু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—রাখো রাখো তোমার ঠাকুরের প্রসাদ, ক্ষীরের পায়স। কি যে একজাই খা খা—আরে বাপু···

বাধা দিয়ে পিসিমা বল্লেন—না হয় এই আলুর পায়সটাই একটু নে, এটা আমার নিজের রান্না, ঠাকুরের ভোগ, অশ্রদ্ধা করিসনে।

অশ্রদ্ধা করিনে—কিন্তু কেবল খা আর ঘুমো, আর ঘুমো আর খা—এই তোমাদের কথা। রাখো ওসব, প্রসাদ আমি মাথায় দিচ্ছি!

হয়ত একটু বিরক্ত হয়ে থাকবে পিসিমা, তবু শিবু ভাবতে পারলে না ওসব সে কি করে গলা দিয়ে নামাবে। নেমে আসছিল—সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে শুনলে, কার্তিক বলছে—খুড়ো, কয়টিন বালি আর কয়টিন মাটি?

তড়াক করে দু লাফে শিবু পিসিমার কাছে ফিরে গেল,' বল্লে—তুমি মনে কিছু ক'রোনা পিসিমা—সত্যি শুধু খেয়ে আর ঘুমিয়ে আমি স্বস্তি পাইনে। দাও দেখি তোমার আলুর পায়স, সাবাড় করে দিচ্ছি!

পাত্রটা নিয়ে সে নেমে এলো একেবারে পুকুরপাড়ে জলধরদের খড়ের চালায়। পাশে শিলেট চুণ গাদা দেওয়া, তারই পাশে বাটিটা রেখে জলধরের এনামেলের প্লেটটা চাপা দিলে। তারপর কার্তিককে ডেকে বল্লে—সিমেন্টের ব্যাগ রেখে শোন্ তো কার্তিক—জলধরকে ডেকে নিয়ে তোদের ঘরে আয়।

ওদের খাওয়া শিবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, সেই থিসিস লেখার মত গভীর করে। তারপর ওরা হাত ধুতে পুকুরে গেলে ওর কাজ ফুরিয়ে গেল। ও ফিরে এলো। বাটীটা আনার উৎসাহ বা ধৈর্য ছিল না। জলধরও হয়ত হাতে দিতে সাহস করেনি।

ঘরে ফিরতেই দিদি বল্লেন—শিবু, নষ্টামি করিস্‌নে, মা বঁটি পেতে বসেছেন, ঠাকুর ডাল ধুচ্ছে, আয়, আমি ভাত বেড়ে দিচ্ছি। কেন মিছে রাগ করছিস?

দিদির নরম কথায় শিবু থেমে গেল। সেও নরম গলায় বল্লে—দিদি, অক্ষুধায় খেয়ে খেয়ে একটা কঠিন অসুখ আমার না বাধলে কেউ ছাড়বে না। তা ন'য় গেল, কিন্তু একটা লোক শুধু খাবে আর শোবে, শোবে আর খাবে—এ ছাড়া আর তার কিছু করণীয় নেই—বড় জোর না হয় ছবি দেখতে যাবে, কি কষ্ট করে কাগজটা পড়বে, এই কি একটা জীবন? আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আনন্দও নেই, ভবিষ্যৎ নেই—শুধু মূক অতীত, এই নিয়ে মানুষ বাঁচে? শরীর ও মন উভয় বিগড়ানো, তবু কেবল খা আর খা। ওই শিবু খেলে না—শিবুর পিত্তি পড়চে, রাত ন'টা বাজে শিবু এখনো শুলো না, এর পর মাথা ধরবে, শরীর খারাপ করবে। সবাই যেন আমার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করচে। বসে বসে কিছু করতে না পেরে আমি একদিন

মরে যাব তবেই আমার শরীর ভালো হ'বে। বেশ বুঝচ সব। দাও ভাত, আমি খাচ্ছি।

রান্নাঘরে এসে ভাত দেখে তার চক্ষুস্থির! গরম ভাত, ঘি, আলু ভাতে আর বেগুন ভাজা। এই দিয়ে শিবুকে প্রাতরাশ সারতে হ'বে। একটু কষ্টের অবকাশ নেই। পিতার স্বচ্ছলতায় যেন ও ডুবে মরতে বসেচে। এক পোয়া আলু ভাতে একা শিবুর লাগে? ওর অর্দ্ধেক পেলে জলধর-বুড়ো কি খুসী হ'তে পারত!

খেতে বসে শিবুর গ্রাস নামচে না। কি সুখে আনন্দে কার্তিক আর জলধর তাদের ক্ষুধার অন্ন মুখে পুরছিল। বিপুল পরিশ্রমের জন্য ওই মোটা ভাত, নির্ব্যঞ্জন রুক্ষ অন্ন না জানি কি মধুর লাগে! কষ্টে করুণতায় ওর মাঝে বিশাল তৃপ্তি আছে—আছে কাজের আনন্দ, পরিশ্রম করতে পারার গৌরব। আর শিবুর এই অলস সুখে পিতার অর্জিত অনায়াসলব্ধ প্রাচুর্য উপভোগ করার বেদনা কি বিষম ক্লেশকর! এতটুকু অভাব নেই, তাই তা পূরণের আনন্দও নেই! ঠাসা, ভরা, আকণ্ঠ পরিপূর্ণ, কঠিন, কঠোর!

শিবুর মনে হ'ল—কাজ করতে পারার মধ্যে, কিছু-না-কিছু করার মধ্যেই যত আনন্দ! নিষ্ক্রিয়, জড় হয়ে চকচক্ করলেও তা প্রাণস্পন্দন শূন্য। মিথ্যা তার এম-এর ডিগ্রিটা, মিথ্যা তার ভদ্রতার জৌলুষ, মিথ্যা তার পিতার প্রাসাদ। এগুলি তাকে সুখী করতে পারে, আনন্দ দিতে পারচে না। আনন্দপুরীর চাবিকাঠিই বুঝি বিশ্বকর্মার হাতে। বেকারের সেখানে ঠাঁই নেই। শিবুর অজস্র থাক্—তবু সে বেকার, না-করবার সংখ্যা তার অনেক, করবার কি আছে? অল্প হ'ক তবু কিছু যে করে ওই কার্তিক জলধর, ওর চেয়ে তারা আনন্দে আছে।

ভাবতে ভাবতে শিবু উঠে এলো। তার ভাত রইল পড়ে। মা ভাঁড়ার ঘরে গিয়েচেন, এর মধ্যে তার ডাকের বাইরে বেরুনো চাই।

ডাক টিকিট

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

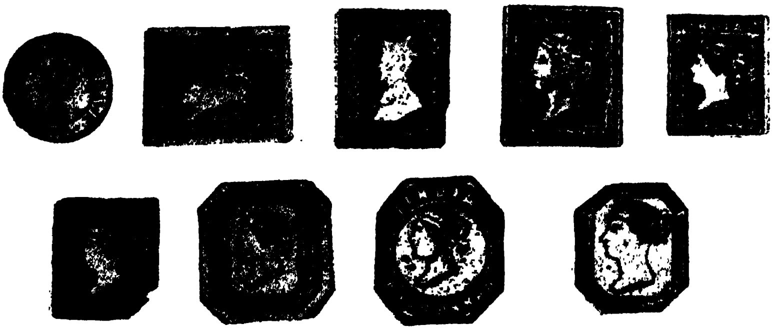
প্রবন্ধ

(২)

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ট্যাঁকশালে (Mint) কর্ণেল ফোরবসের প্রস্তুত সিংহ ও তালতরু অঙ্কিত হইয়া প্রথম ডাকটিকিট বাহির হয়। কিন্তু ট্যাঁকশাল তাহা আবশ্যক মত যোগাইতে পারিবে কিনা সে বিষয় সন্দেহ থাকায় তাহার আদৌ প্রচলন হয় নাই। ঐ সময় কলিকাতা সার্ভে জেনার্লের অফিসেও টিকিট প্রস্তুতের চেষ্টা চলে। তথায় কয়েকবার অকৃতকার্য্য হওয়ার পর মহারাণীর ছবি দিয়া লিথোগ্রাফে ৴১০ পয়সা, ৴০ আনা, ৵০ আনা, ।০ আনা ও ||০ মূল্যের এবং ট্যাঁকশাল হইতে ৵০ আনা মূল্যের টিকিট মুদ্রিত হয়। ঐ সকলের মধ্যে সার্ভেজেনার্লের অফিসে প্রস্তুত ৵০ আনা ও ||০ আনা মূল্যের টিকিট ব্যবহারে আসে নাই, ট্যাঁকশালে প্রস্তুত ৵০ আনার টিকিট ব্যবহার হইয়াছিল। ঐ সকল টিকিট নীল, লাল, সবুজ ও দ্বিবর্ণ ছিল। এই সময় কলিকাতায় সর্ব্বসমেত ৪৭৭৩২৪৯৬ টিকিট প্রস্তুত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে স্যার বার্টলে ফ্রেয়ার কর্তৃক সিন্ধুদেশে (Sind) এক ডাকটিকিট বাহির হয়; কিন্তু ঐ সময় সিন্ধু দেশীয় রাজাদিগের অধীনে থাকায় তাহা কেবল-মাত্র উক্ত দেশ মধ্যেই ব্যবহার হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুর ডাক বিভাগ ভারত সরকারের হস্তে আসিয়া পড়ে এবং উক্ত টিকিট ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়। বিলাতের দে, লা, রু কোম্পানি হইতে সর্ব্বপ্রথম ।০ আনার কাল এবং ||০ আনার গাঢ় লাল রঙের টিকিট আসে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের

আগষ্ট মাসে। একখানি টিকিট হইতে অপর খানি পৃথক করিবার জন্য তৎচতুষ্পার্শ্বে ছিদ্র করার ব্যবস্থা প্রথম এই সময়ই দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বে কাঁচিদ্বারা কাটিয়া পৃথক করার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দে, লা, রু কোম্পানী হইতে টিকিট মুদ্রিত করান হয়। এইবার কেবলমাত্র ।০ আনা ও ॥০ আনা মূল্যের টিকিট না আসিয়া উপরোক্ত সমস্ত মূল্যের টিকিটই বিলাত হইতে আসে। এই সময় দুই আনা মূল্যের টিকিটের রং হয় হরিদ্রা (Yellow), অন্যান্যগুলি সেই ভাবই থাকিল।

ইতিমধ্যে হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া রেলপথ স্থাপিত হয়। কলিকাতা হইতে বেনারস গরু বা মহিষের গাড়ীতে ডাক যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ রেলগাড়ীতে ডাক যাইয়া তথা হইতে গরু বা মহিষের গাড়ীতে বেনারস পর্য্যন্ত ডাক যায়।



এই সময় হইতে দেশীয় ভাষায় লিখিত পত্রাদির উপর ডাকঘর হইতে লাল কালি দ্বারা ইংরাজীতে ঠিকানা লিখিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময় আমরা রেলপথে, ঘোড়ার গাড়ীতে, গরুর গাড়ীতে, মহিষের গাড়ীতে, গাধা, খচ্চর, উট ইত্যাদির পৃষ্ঠে, ডিঙ্গা, বজরা, শিকার, শাম্পান ইত্যাদি নৌকায়, এতদ্ব্যতীত মনুষ্যের কাঁধে, মানুষে টানা ও ঠেলা গাড়ীতে ইত্যাদি দেশ কাল ভেদে নানা অদ্ভুত উপায়ে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা দেখিতে পাই।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পেনিনসুলার এণ্ড ওরিয়েণ্টাল ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানির সহিত ডাক বিভাগের যে নূতন চুক্তি হয় তাহাতে কলিকাতা বন্দরে ডাক আসা বন্ধ হইয়া বোম্বাই বন্দরে ডাক আসার ব্যবস্থা হয়। তাহার পর বৎসর হইতে জাহাজের মধ্যেই প্রধান প্রধান ডাকঘর ও রেলপথের পত্রাদি পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা হয়। ইহাতে জাহাজ বন্দরে পৌছাইলে আর তাহা পৃথক করিতে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া রেলপথে যথাস্থানে পাঠাইবার সুবিধা হইল। এই সময় বিলাত হইতে ডাক পৌছানর প্রায় ২৬ দিন সময় লইত। অতঃপর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃন্দিসি হইয়া ডাক যাতায়াত আরম্ভ হয়।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রেলপথে ডাক যাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন কামরা (carriage) ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; ডাক গার্ডের সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। অতঃপর ডাকের সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহা যে কোনও একখানি সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। গাড়ীর মধ্যে বিভিন্ন স্থানের ডাক পৃথক্ করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা তখনও হইয়া উঠে নাই। সে সময় পথিমধ্যে প্রতি ২০০ মাইল অন্তর একটি করিয়া ডাকঘর স্থাপিত ছিল। ঐ সকল ডাকঘরে পত্রাদি নামাইয়া তাহা বাছাই হইত। এই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভ্রাম্যমান ডাকঘরের সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে আগ্রা মথুরার মধ্যে দ্বিচক্রযানে (cycle) ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হয়।

সে সময় পথ ঘাটের নাম ও নম্বর না থাকায় পত্র মধ্যে ঠিকানা লিখার কিরূপ ব্যবস্থা ছিল নিম্নে তাহার একটি উদ্ধৃত হইল।

(১) If the Almighty pleased, let this envelope having at the city of Calcutta in the neighbourhood of Kolutola at the country house of Sirajudin and Alladad Khan, merchants, be offered to and read by the happy light of my eyes of virtuous manners and beloved of the heart. Meian Sheikh Inajat Ali may his life be long. Written on the tenth of the blessed Ramjan in the year 1266 of the Hijira of our Prophet and despatched as bearing. Having without loss of time paid the postage and received the letter,

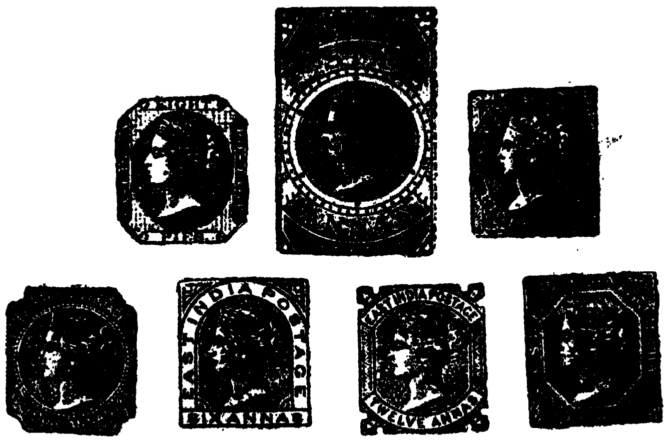
you will read it. Having abstained from food and drink, considering it for-bidden to you, you will convey yourself to Jaunpur and you will know this to be a strict injuction.

এতদ্ব্যতীত বার্ম্মা, কাশ্মীর, বেনারস ইত্যাদি যে সকল স্থানে নৌকা মধ্যে লোক বাস করিত, বা পর্য্যটকরা থাকিতেন সেই সকল স্থানে পত্রাদি পাঠাইতে হইলে নৌকার এবং ব্যক্তিদিগের আকৃতি ও গঠন বিষয়েও কিছু কিছু বর্ণনা ঠিকানা হিসাবে লিখার প্রচলন ছিল। যেমন নৌকা লাল হাঙ্গরমুখ, তাহার পশ্চাতে খানিকটা অংশ তালি দেওয়া, তাহাতে দুইখানি পাল আছে ইত্যাদি—ব্যাণিজ্যপোত হইলে তাহাতে কোন্‌দ্রব্য চালান যাইতেছে, কয়জন মাঝী আছে ইত্যাদি—পর্য্যটক হইলে তাহার চুলগুলা কোঁকড়া, রং ফর্সা, বাঁকা সামান্য খোঁড়াইয়া চলে, পরণে গেরুয়া, হাতে একটি থলি ও লাঠি আছে ইত্যাদি তাহাকে সহজে চিনিয়া লইবার মত বর্ণনাও পত্রমধ্যে সময় সময় লিখিত হইত। ইহাতে পত্র বিলির পক্ষে পিওনদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সময় খামের প্রচলন না থাকায় সর্ব্বসাধারণে পত্রাদি পাঠাইতে হইলে তাহা উপর্য্যুপরি ভাঁজ করিয়া এত ক্ষুদ্র আকৃতিতে পরিণত করিতেন যে তদুপরি পত্রবাহকের নাম ও ঠিকানা লেখা হইলে আর তিল ধারণেরও স্থান থাকিত না। এই কারণে ডাকঘরের ছাপ আসিয়া পড়িত গ্রাহকের নাম ও ঠিকানার উপর, ফলে ঐ ঠিকানা নষ্ট হইত এবং তাহা পাঠোদ্ধার হইবার আর কোন আশা থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে প্রচলিত নানা ভাষা ও ছাঁদে লিখা অক্ষরগুলির সময় সময় পাঠোদ্ধার করাও দুরূহ হইত।

কত শত শত পত্র প্রতি বৎসর ডাকঘরে নিয়ত আসিতেছে; ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে—এই ভাবে ২২৬০৪৮৯ খানি পত্র ভারতের ডাকঘরে ফেরত আসিয়াছিল। এই সকল পত্রের ঠিকানা উদ্ধারের জন্যই ডেড্‌লেটার আফিসের সৃষ্টি হয়। ঐ অফিস বহু চেষ্টার ফলে ঐ বৎসর ১,১০০,০৮৬ খানি পত্রের ঠিকানা পাঠোদ্ধার করিয়া তাহা পাঠাইয়া দেন, বাকী পুড়াইয়া ফেলা হয়। এই অসুবিধা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীকরণের চেষ্টায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দুই পয়সা ও চারি পয়সা মূল্যের খাম বাহির হয়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ডাক সম্মিলন হইলে ভারতবর্ষ তাহাতে যোগদান করে এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে সম্মিলনের সদস্য অসদস্য সকলের মধ্যে পৃথিবীর সকল স্থানে মাত্র ২½ পেনি খরচে পত্র আদান প্রদানের বিধি স্বীকার করিয়া লয়। ইহাতে বহির্ভারতে পত্র প্রেরণের হার লইয়াও আর কোন গোল রহিল না।

ইতিমধ্যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এক পয়সা মূল্যের পোষ্টকার্ড, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় পত্রাদির জন্য 'সারভিস' পোষ্টকার্ড এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রিপ্লাই পোষ্টকার্ড বাহির হয়। এতদিনে

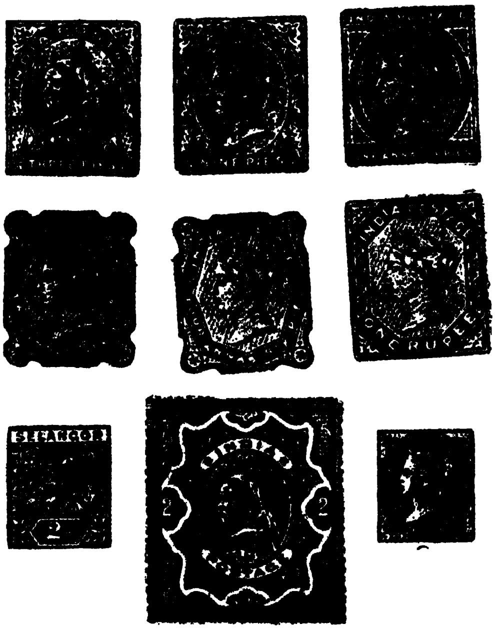


মাত্র এক পয়সা খরচে কেপকমরিণ হইতে কাশ্মীরের শ্রীনগরে পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা হইল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই, সিমলা ও কলিকাতা প্রভৃতি সহরে সর্ব্বক্ষণ ডাক বিলির ব্যবস্থা হয়। ইহাতে দিনে প্রায় ১৬ দফা ডাকবিলি হইত। তখন সহরের এক গলি হইতে অপর গলিতে খবরাদি প্রেরণের জন্যও লোকে পত্র লিখিতে থাকে; ফলে ডাকে পত্রের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে পিওনরা পত্রাদি আনিতে ডাকঘরে যাইবার পর্য্যন্ত সময় পাইত না। এইজন্য পাড়ায় পাড়ায় ডাক বাক্স বসাইয়া ডাকঘর হইতে অপর এক হরকরা মারফৎ পত্র পাঠাইয়া ঐ সকল বাক্সে ভরিয়া রাখা হইত। পিওনরা তথা হইতে পত্র লইয়া বিলি করিত।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ রাজ্যের সর্ব্বত্র ১ পেনি খরচে অর্দ্ধতোলা ওজনের পত্র আদান প্রদানের যে ব্যবস্থা হয় ভারত তাহাতেও যোগদান করে। এই সময় হইতে ১৫ দিনে লণ্ডনে ডাক পৌছানর ব্যবস্থা হয়।

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পূর্ব্বে যাহাদের ডাকের কোনরূপ ববস্থা ছিল না তথায় এবং কাশ্মীর, বরোদা, মহীশূর আদি যে সকল স্থানে পূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল তাহাদের মধ্যেও ক্রমে ভারতীয় ডাক বিভাগের বিস্তৃতি ঘটে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৬৫২টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র ২২টী রাজ্য অবশিষ্ট ছিল ; তাহারা নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে স্বাধীনভাবে ডাক কার্য্য



চালাইয়া লইতেছিল। তন্মধ্যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গোয়ালিয়র, নাভা, ঝিন্দ এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চাম্বা—এই ৫টী রাজ্য নিজ নিজ সীমার মধ্যে অপরের নামাঙ্কিত ডাকটিকিট স্বীকার করিবেন এই সর্ত্তে ভারতবর্ষের ডাকটিকিটের উপর নিজ নিজ দেশের নাম অঙ্কিত করিয়া ব্যবহার করিবার সুবিধা পান। অবশিষ্ট ১৭টী রাজ্য মধ্যে যদিও প্রধানত রাজকীয় পত্রাদি বহনের জন্যই ডাকের ব্যবস্থা ছিল, তথাপি তাঁহারা জনসাধারণের পত্রাদি পাঠাইবার সুবিধার জন্ত স্ব স্ব রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ডাকপথ বিস্তৃত ও নিয়ন্ত্রিত ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন ; ইহার বহির্ভাগে ডাক প্রেরণের কোন ব্যবস্থাই তাঁহাদের ছিল না। এই অসুবিধা দুরী করণের জন্ত শেষে ইহাদের মধ্যেও ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠিত ডাকপথের বিস্তৃতি ঘটে। উপরোক্ত ১৭টী রাজ্যের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

হায়দ্রাবাদ,	ট্রাভাঙ্কোর,	কোচীন,
ইন্দোর,	ভূপাল,	অরচা,
চারকরী,	ডাটীয়া,	ছাতারপুর,*
জয়পুর,	উদয়পুর,*	বুণ্ডি,
কিষণগড়,	সাপুড়া,*	ভোর এবং জুনাগড়,
	লেসবেলা,	

ইহাদিগের মধ্যে নক্ষত্র চিহ্নিত রাজ্য তিনটী ব্যতিত অপর সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যেই নিজ নিজ নাম ও রাজচিহ্ন বিশিষ্ট-ডাকটিকিট ব্যবহার ছিল। ইতিপূর্ব্বে মেওয়ার, মালওয়ার, ভরতপুর, খয়েরপুর, বিকানীর ইত্যাদি যে সকল রাজ্য ভারত সরকারের অধীনে আসিয়া পড়ে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি কিছুকালের জন্ত স্ব স্ব রাজ্যমধ্যে নিজস্ব ডাকটিকিট ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আলোয়ার (১৮৭৭—১৯০২) ; বামড়া (১৮৮৮—১৮৯৪) ; বুসাহীর (১৮৯৫—১৯০১) ; ধড় (১৮৯৭—১৯০১) ; ফরিদকোট (১৮৭৯—১৮৮৭) ; জম্মু ও কাশ্মীর (১৮৬৬—১৮৯৪) ; জালাবর (১৮৮৭—১৯০০) ; ঝিন্দ (১৮৭৪—১৮৮৫) ; নবানগড় (১৮৭৭—১৮৯৫) ; পুঞ্চ (১৮৭৬—১৮৯৪) ; রাজনন্দগাওন (১৮৯২—১৮৯৫) ; রাজপীপলা (১৮৮০—১৮৮৬) ; সেরমোর (১৮৭৯—১৯০২) ; ওয়াধান (১৮৮৮— x)।

এতদ্ব্যতীত নেপাল ও সারাওথ দেশেও ডাকটিকিট বাহির হইয়াছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সরকার ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের আইন উঠাইয়া লইয়া জমীদারবর্গকে ডাকহরকরা যোগানের ভার হইতে নিস্কৃতি দেন। অতঃপর ডাকঘরগুলির আয় হইতেই ডাকের যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত ডাকঘরের মারফৎ পত্র প্রেরণের সংখ্যা কি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নের তালিকাটী হইতে তাহা দেখিতে পাইবেন

বৎসর	ডাকঘরের সংখ্যা	ডাকবাক্সের সংখ্যা	পত্রাদির সংখ্যা	ডাকপথের দূরত্ব
১৮৬০	৮৮৯	১৯২	৪৮,৪৯০,২১২	৪৩,৫৭০
১৮৭০	২,৭৩৬	১,৬০৮	৮৫,৬৮৯,৮২৩	৫২,২৬৩
১৮৮০	৫,২৬৪	৮.৪৪৯	১৫৮,৬৬৬,৮৫৬	৯০,৫৯৩
১৮৯০	৯,৪১৯	১৪,২৭১	৩১৭,৯৫২,৬৪৬	১০৯,২৩২
১৯০০	১২,৯৭০	২৫,৫০৭	৫৩২,২৮২,৭৪২	১৩১,৬২১
১৯০৪	১৫,৪০৩	৩৪,০০৫	৬৩১,৯০২,১২৬	১৪৫,০২৭

পত্র আদান প্রদান ব্যতীত ডাকঘরের আরও কতকগুলি কার্য্য আছে, যেমন—মণিঅর্ডার, সেভিংসব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি ; কিন্তু সে সকল আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে তথাপি সংক্ষেপে তাহাদের কিছু পরিচয় দেওয়া হইল।

(অ) সর্ব্বপ্রথম সেভিংসব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ; কিন্তু ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না।

(আ) টেলিগ্রাফিক বিভাগ সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয় ডায়মণ্ডহারবার ও কলিকাতার মধ্যে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর লর্ড ডালহউসীর চেষ্টায় তাহা অল্পকাল মধ্যেই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারলাভ করে।

(ই) পার্শ্বেল পোষ্টের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তবে বিলাতের সহিত প্রথম পার্শ্বেল আদান প্রদান হয় পি এণ্ড ও কোম্পানীর মারফৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর ইণ্টারন্যাসানল পার্শেল পোষ্ট ইউনিয়ন স্থাপিত হইলে সমগ্র জগতের সহিত পার্শেল আদান প্রদানের সুবিধা হয়।

(ঈ) ভ্যালুপেয়েবল পোষ্টের ব্যবস্থা হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। অতঃপর তাহা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার লাভ করে।

(উ) রেজিষ্ট্রেসন এণ্ড ইনসিউরেন্সের ব্যবস্থা হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। সুধু রেজিষ্ট্রেসনের ব্যবস্থা ইহার বহু পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল।

(ঊ) মণিঅর্ডার ব্যবস্থাও বহু কাল পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, তবে ইতিপূর্ব্বে ১৫০৲ টাকার বেশী মণিঅর্ডার করা যাইত না ; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ঐ নিয়ম বন্ধ হইয়া সকল সংখ্যার টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়।

(ঋ) কুইনাইন বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে।

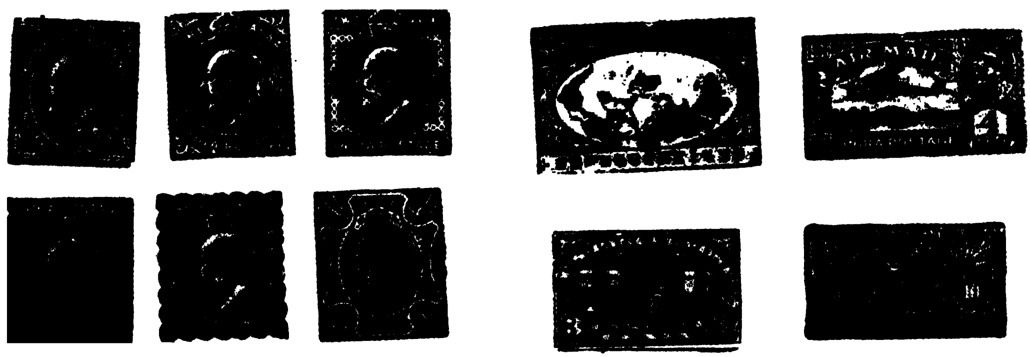
এতদ্ভিন্ন আরও দুইটি কার্য্য কতগুলি স্থানের ডাকঘর করিয়া থাকে ; (১) পথিকের সুবিধার জন্য যানবাহনাদি যুটাইয়া দেওয়া। পূর্ব্বকালে যখন যানবাহনাদির সুবিধা ছিল না, সে সময় ডাকঘর হইতে ডাকপাল্কী যোগানের ব্যবস্থা ছিল। কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহা পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের জানাইয়া রাখিলে সময় মত সকল ব্যবস্থাই প্রস্তুত



থাকিত। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানিতে পারি সে সময় কলিকাতা হইতে কাশী ৫৬৬ মাইল যাইতে ৭০৭৲ টাকা এবং কলিকাতা হইতে পাটনা ৪০০ মাইল যাইতে ৫০০৲ খরচ পড়িত। ঐ পথের মধ্যে কোন স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে যাইতে হইলে তজ্জন্য ১৶০ মাইল ধার্য্য হইত। অতঃপর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে

অক্টোবরের আর একটি বিজ্ঞপ্তি হইতে জানিতে পারি—এই সময় এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক লাগিত না।

(২) যখন ভারত সরকার কোন যুদ্ধ উদ্যোগে সৈন্য প্রেরণ করেন, তখনি তাহাদের সহিত থাকিয়া, তাহাদের পত্রাদি আদান প্রদানের সুবিধা করিয়া দিয়া থাকেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চায়না এক্সপিডিসনারী ফোর্স (China Expeditionary force) ভারতের ডাকঘর যোগ দিয়াছিল; ঐ সময় তথায় যে সকল ডাক টিকিট ব্যবহার হয় সে সকলের উপর C. E. F. ছাপ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে (Great war) যখন ইণ্ডিয়ান এক্সপিডিসনারী ফোর্স যাত্রা করে ভারতের ডাকঘর তাহাতেও যোগদান করে। এই সময় ঐ স্থানে যে সকল ডাক টিকিট ব্যবহার হইয়াছিল তাহাতে I. E. F. ছাপ দেওয়া হইয়াছিল।



উড়োজাহাজে (Air mail) প্রথম ডাক আসে ইজিপ্ট হইয়া বোম্বাইয়ে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে; অতঃপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে সোজা করাচীতে ডাক আসার ব্যবস্থা হয়। এতদিনে মাত্র ৭॥০ দিনে বিলাত হইতে ডাক আসার সুবিধা হইল—যাহা পূর্ব্বে ৭।৮ মাস সময় লইত। উড়োজাহাজে পত্রাদি লিখিবার জন্য ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পৃথক টিকিটের ব্যবস্থা হয়; তজ্জন্য ৵০, ।০, ।৵০, ॥০ ও ৸০ আনা মূল্যের ডাক টিকিটও বাহির হয়। উক্ত টিকিট সংলগ্ন থাকিলেই বুঝা যাইবে যে এই পত্র উড়োজাহাজে পাঠাইতে বলা হইতেছে। ইহার পর আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। লর্ড ডালহউসীর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা মত আজও ডাকের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। তবে মধ্যে মধ্যে ডাকের হারের অনেক প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

ডাক টিকিট কোন সময় বাহির হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সে কথার আর পুনরুল্লেখ না করিয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া মহারাণী পদে অভিষিক্ত হইলে পর যে সকল ডাক টিকিট বাহির হয় নিম্নে তাহাই আলোচিত হইল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৮ পাই মূল্যের ডাকটিকিট বাহির হয়। ইহা সৈনিকদিগের ব্যবহারে লাগিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহাদের পত্র প্রেরণে কোন খরচ লওয়া হইত না, এই সময় উক্ত নিয়ম বন্ধ হইয়া প্রতি তোলায় ৮ পাই খরচ ধার্য্য হয়।



অতঃপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ১০, /০, ৵০, ।০ ও ॥০ আনা—১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ।০, ।৵০, ও ।৶ পাই—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ৯ পাই (১৫) ও ১ টাকা; এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ।৵০ ও ৸০ আনা মূল্যের ডাক টিকিট বাহির হয়; ।৶ পাই মূল্যের ডাক টিকিটটি মার্শালিস হইয়া বিলাতে পত্র প্রেরণের জন্য ব্যবহার হইত।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী পদে অভিষিক্ত হইলে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থানে কেবল মাত্র ইণ্ডিয়া লিখিত হইয়া ১০, ১৫, /০, /১০, ৵০, ৶০, ।০, ॥০, ৸০ ও ১ টাকা মূল্যের ডাক টিকিট বাহির হয়। অতঃপর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৵১০ ও ১

টাকা—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৲ ও ৩৲ টাকা—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৫ পয়সার; এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ৫, ১০, /০, ৵০ ও ৵১০ পয়সা মূল্যের ডাক টিকিট বাহির হয়, এই সময় রংয়েরও কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সপ্তম এডোয়ার্ড ভারতেশ্বর পদে অভিষিক্ত হইলে ১৫ ও /১০ পয়সা মূল্যের ডাক টিকিট বাদে অপর সমস্ত মূল্যের ডাকটিকিটই বাহির হয়। ঐ সকল টিকিটের বাহিরের আকৃতি সেই ভাবই থাকিল কেবল মাত্র সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ছবির স্থানে নূতন রাজার ছবি দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর ।৵০, ৫৲, ১০৲, ১৫৲ ও ২৫৲ টাকা মূল্যের ডাক টিকিট বাহির হয়। শেষোক্ত ডাক টিকিটগুলি টেলিগ্রাফের কার্য্যে ব্যবহার হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে "Indian postage" স্থানে "Indian postage & revenue" লিখিত হইয়া ১০ ও /০ আনা মূল্যের ডাকের টিকিট বাহির হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাট পদে অভিষিক্ত হইলে ৫, ১০, /০, /১০, ৵০, ৵১০, ৷৷০, ।০, ।৵০, ৷৷০, ৸০, ১৲, ২৲, ৫৲, ১০৲, ১৫৲ ও ২৫৲ টাকা মূল্যের ডাকটিকিট বাহির হয়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিলাতের দে, লা, রু কোম্পানী হইতে ডাক টিকিট প্রস্তুত হইয়া আসিতেছিল। অতঃপর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নাসিক হইতে ৫, ১০, /০, ৵০, ।০, ৷৷০, ৸০, ১৲, ২৲, ৫৲ ও ১০৲ টাকা মূল্যের ডাক টিকিট মুদ্রিত হয়।

মধ্যে মধ্যে উপরোক্ত ডাক টিকিটগুলির উপর নানারূপ ছাপ দিয়া নানা দেশে ব্যবহার হইয়াছে, এতৎ প্রদেশেও যখনি কোন মূল্যের ডাক টিকেটের অভাব পড়িয়াছে তখনি অন্য কোনও ডাক টিকিটের উপর সেই মূল্যের ছাপ দিয়া তাহা ব্যবহার হইয়াছে। সরকারী কার্য্যে যে সকল পত্রাদি আদান প্রদান হইয়াছে তাহাতে কখনও "Service" কখনও "On. H. M. S. ছাপ দেওয়া হইয়াছে। এই সকলের বিশেষ বিবরণ Gibons Stamp Monthlyতে আলোচিত হইয়াছে।

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

তরলিকা দেবী

'মন্দিরেরি বন্দী তুমি
তোমায় আমার নেই প্রয়োজন,'
তোমার ঘরে মিট্‌বে না তো
আমার প্রাণের সব আয়োজন।
জীবন নদী বিরাটকে তার
ধরতে যে চায় আলিঙ্গনে
প্রাণের মাঝে, বুকের মাঝে
প্রেমকে রাখি' সঙ্গোপনে!
ক্ষুদ্র সে যে বৃহৎ হ'য়ে
প্রাণ সাগরের অপর পারে
মহান্ হ'য়ে, মধুর হ'য়ে
ছ'ড়িয়ে আছে বিশ্বদ্বারে!
ইঙ্গিতে সে ডাক দিয়ে যায়
শক্তি যোগায় ক্লিষ্ট প্রাণে
বাধার বাঁধন কাটিয়ে দিয়ে
পূর্ণ করে নবীন দানে!

মন্দিরেরি বন্দী পায়ে
ঝরবে না ফুল বক্ষ-ঝরা
ছড়িয়ে গেছে পাপ্‌ড়ি কোথায়
কোন্‌খানে সে দেয় গো ধরা!
সত্য যে তা' বাস্তবে এই
কল্পনাতে যায় না পাওয়া,
রঙীন জালের সূতো দিয়ে,
বহায় না সে মধুর হাওয়া।
গণ্ডী-বাঁধা আবেষ্টনের
মধ্যে কোথাও দেব্‌তা নেই,
সত্যরূপী চেতন জ্ঞানী
সহজ, সরল, নির্ভীকেই
মাড়িয়ে চলে, মিথ্যা গ্লানি
পঙ্কিলতা, সুদুর্দ্দিনে,
আনন্দেরি বন্যা দিয়ে
সব বাধাকে লয় সে জিনে।

নিষেধ বিধির পর্দ্দা ছিঁড়ে
সত্য শিবম্ সুন্দরে
মন্দিরেরে ধ্বংস করি
বসাই বুকের অন্দরে!

কোল্‌-টারের (Coal Tar) গুণাগুণ

শ্রীসলিলচন্দ্র দাশগুপ্ত

প্রবন্ধ

কয়লা একটা তুচ্ছ জিনিস—বাড়ীর আনাচে কানাচে পড়ে রয়েছে—আমরা তাকিয়েও তাকাচ্ছি না ; গায়ে কাপড়ে বা এমনিই কোন জায়গায় আমাদের চলবার অসাবধানতায় একটু ছিটে লাগলেই ঘৃণায় মুখ বিকৃত করি—এই রকম একটা ভাব। এক শতাব্দী আগে কেউ কখন স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে এই তুচ্ছ নোংরা কয়লার ভেতরে এত বড় একটা রসায়নের ইতিহাস সুপ্ত র'য়েছে—আর তাই একদিন রূপে, রসে, গন্ধে আমাদের নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হবে।

রাতের প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে যে সব লাইট-পোষ্ট, এদের কথা আমরা বোধ হয় সবাই জানি—আর এর আলোকও পাই যে "কোল্‌-গ্যাস" (coal gas) নামক একপ্রকার গ্যাস থেকে, এও বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে। গ্যাসটীর নাম যখন "কোল্‌-গ্যাস," তখন আমরা সহজেই আন্দাজ ক'রে নিতে পারি যে এই গ্যাসটীর আমদানী হ'য়েছে "কোল্‌" বা কয়লা থেকে এবং প্রকৃতপক্ষে হ'য়েও থাকে তাই। জ্বালানী গ্যাস হিসাবে এর প্রচলন হ'য়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। যদিও আমাদের দেশে এই গ্যাসের প্রচলন খুবই অল্পদিনের, তবুও ইউরোপের অনেক সহরে এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে প্রায় এক শতাব্দীরও আগে থেকে। এই গ্যাস যে শুধু সেখানে রাজপথ আলোকিত ক'রবার জন্যই ব্যবহৃত হ'ত তা'ও নয়—যেখানেই কোন অগ্নির উত্তাপ দরকার হ'ত, সেখানেই এই গ্যাসের প্রয়োজন হ'তো। তাই অনেকদিন থেকেই এই গ্যাস মানবের অনেক উপকারে আসছে। কয়লার উপকারের সীমা এখানেই শেষ নয়, পরবর্ত্তী শতাব্দীতে এর উপকার মানব-সভ্যতায় কতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে যে পৌঁছেছে, তার অনুমান করাও শক্ত! আজ কয়েকটী কথায় এই 'উপকারের সীমা" কতকটা নির্ণয় ক'রতে চেষ্টা ক'রব।

আমরা "কোল্‌-গ্যাসের" জন্য যখন কয়লাকে দগ্ধ ক'রে থাকি, তখন এই গ্যাসের সঙ্গে আরও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের তথাকথিত নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য পেয়ে থাকি। এদের একটীর নাম "উদ্‌জান ঘটিত যবক্ষারজান" বা "এ্যামোনিয়া" এবং অপরটী একপ্রকার দুর্গন্ধযুক্ত আলকাতরা (Coal-Tar) বিশেষ। এই শেষের দ্রব্যটী নিয়ে শতাব্দী-বর্ষ পূর্ব্বে ভয়ানক মুস্কিলে প'ড়তে হ'তো। এই দুর্গন্ধযুক্ত আলকাতরা-বিশেষ দ্রব্যটী এত অধিক পরিমাণে পাওয়া যেত যে, ইহা স্থানান্তরে অপসারিত ক'রতে অযথা বহু অর্থব্যয় হ'য়ে যেত। এই অযথা অর্থ-ব্যয়ের জন্য প্রথম যখন ইংলণ্ডে এই গ্যাসের শিল্প প্রচলিত হ'লো, তখন এই গ্যাসের দাম এত বেশী পড়ে যেত যে কেবলমাত্র অর্থবান লোক ছাড়া আর কেউ এ গ্যাস ব্যবহার ক'রতে পারতো না। তারপর দু'জন লোক তাদের নিজেদের ব্যয়ে এই "আলকাতরা" অন্যত্র নিয়ে যেতে রাজী হ'লে এই গ্যাসের দাম একটু ক'মে যায়। তারা এই "আলকাতরা" বা "কোল্‌-টার" সিদ্ধ ক'রে উৎক্ষিপ্ত গ্যাস্‌ হ'তে একপ্রকার তেল বের ক'রতে চেষ্টা ক'রতো। তাদের সে চেষ্টা তখন সফল হয় নি, কিন্তু এর কয়েক বৎসর পরে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে স্মরণীয় বৈজ্ঞানিক "ফ্যারাডে" (Faraday) এই "আলকাতরা" থেকে "বেঞ্জিন" (Benzene) নামক একপ্রকার যৌগিক পদার্থ আহরণ করেন। "ফ্যারাডে"র এই অভাবনীয় কৃতকার্য্যতায় পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই "আলকাতরার" ওপর গবেষণা ক'রতে আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হ'য়েছিল যে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ ম্যান্সফিল্ড নামক এক ইংরাজ যুবক, "বেঞ্জিন্‌," "টোলুইন্‌," "জাইলিন," "কার্ব্বলিক এ্যাসিড," "ন্যাপথালিন্‌" "এ্যান্থ্রাসিন্‌" প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের তৈলজাতীয় দ্রব্য এই "আলকাতরা" থেকে আহরণ ক'রতে সমর্থ হন। এই সকল দ্রব্যের শিল্পের সঙ্গে জর্জ্জ ম্যান্সফিল্ডের করুণ, অসহায়, মরণ দৃশ্যও এক চিত্রপটে অঙ্কিত র'য়েছে। নবীন বৈজ্ঞানিক তাঁর এই আবিষ্কারে এতটা উৎসাহিত হ'য়ে পড়েছিলেন যে, তিনি প্রায় অধিকাংশ সময় পরীক্ষাগারে রাসায়নিক গবেষণায় নিবিষ্ট থাকতেন। একদিন অসাবধানতাবশতঃ তাঁ'র পরিচ্ছদ এই সকল সহজদাহ্য তেলের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে অগ্নিদীপ্ত হয় এবং তিনি অসহায় অবস্থায় পরীক্ষাগারে মারা যান! কিন্তু তিনি যে কাজ অসম্পূর্ণ রেখে যান তার আবিষ্কার কিছুদিনের মধ্যেই হ'য়ে যায়। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা দ্বারা স্থির করেন যে, পরিমিত উত্তাপে "কোল্‌-টার" সিদ্ধ ক'রলে উৎক্ষিপ্ত বাষ্প হ'তে "বেঞ্জিন্‌" ও "টোলুইন" পাওয়া যায় এবং এর পর উত্তাপ কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে "কার্ব্বলিক এ্যাসিড্‌," "ন্যাপথালিন্‌," 'এ্যান্থ্রাসিন্‌" প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধ ক'রবার পর বাকী অংশ থেকে কাল-রঙের "বার্ণিশ" পাওয়া যায়। এই থেকেই দেখতে পাওয়া যায় যে—যে-"কোল্‌-টার" একদিন নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত বলে নষ্ট করা হ'তো, তা' থেকে কত মূল্যবান ও দরকারী দ্রব্য আহরণ করা যেতে পারে।

এর পরের যুগে বৈজ্ঞানিকগণ আগের যুগের আবিষ্কৃত দ্রব্যসকল অম্লাক্ত ক'রে তাদের ফল পরীক্ষা ক'রতে লাগলেন। সর্ব্বপ্রথম পরীক্ষা হ'লো "বেঞ্জিন"এর সঙ্গে "যবক্ষারাম্লের," এই দু'টী যৌগিক পদার্থকে

মিশ্রিত করে একটী ভয়াবহ বিস্ফোরক পদার্থের সৃষ্টি হ'লো—আর এর নামকরণ হ'লো "নাইট্রো বেঞ্জিন"। এর আবিষ্কারের পর থেকে কামানের গোলার ভেতর এদের স্থান হ'তে লাগ্‌লো—আর যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুধ্বংস ক'রতেও এর অদ্বিতীয় আর কেউ রইলো না। "বেঞ্জিন" থেকে যেমন "নাইট্রো বেঞ্জিন" "টোলুইন" থেকেও ঠিক একই প্রকারে "নাইট্রো টোলুইন" বলে অন্য একপ্রকার বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে এই সকল বিস্ফোরকের প্রয়োজন দিন দিন বর্দ্ধিত হ'চ্ছে বলে বর্ত্তমান যুগে বহুল পরিমাণে "বেঞ্জিন্ ও টোলুইন্" "কোল-টার" হ'তে আহরণ করা হ'চ্ছে। কিন্তু এই সকল বিস্ফোরক তৈরী করা এত বিপজ্জনক যে, প্রতি পদক্ষেপে অসাধারণ সাবধানতা অবলম্বন না ক'রলে শিল্পাগারের ধ্বংস ও প্রস্তুতকারকগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। গত মহাযুদ্ধের আগে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই সকল বিস্ফোরক প্রস্তুতের জন্য বার্লিনে এক বিরাট কারখানা নির্ম্মিত হ'য়েছিল; কিন্তু সামান্য একটু ত্রুটীর জন্য এই শিল্পাগার বিস্ফোরক দ্রব্যের দ্বারা এরূপ ভাবে বিধ্বস্ত হ'য়েছিল যে এর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সেখান থেকে লোপ পেয়েছিল। যা' হোক বর্ত্তমানে এরূপ শিল্পাগারের আরও অনেক উন্নতি হ'য়েছে এবং ভবিষ্যতে যা'তে আর এরূপ অনিষ্ট হ'তে না পারে, তা'রও যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

"নাইট্রো বেঞ্জিন্" যদিও একটী বিস্ফোরক দ্রব্য তবুও শুনে আশ্চর্য্য হতে হয় যে এই বিস্ফোরক থেকেই একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। এই বিস্ফোরককে উদজান ঘটিত ক'রলে "এ্যানিলিন" (Aniline) নামক আর এক প্রকার নূতন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে একে প্রস্তুত করা গেলেও সোজাসুজি "কোল-টার" হ'তেও একে আহরণ করা যেতে পারে এবং বর্ত্তমান যুগে করাও হ'য়ে থাকে তাই,—আর তার সাথে সাথে এর দামও গেছে অনেক পরিমাণে ক'মে।

"এ্যানিলিন্" আবিষ্কারের পর থেকে রসায়ন জগতে মহা হুলুস্থূল পড়ে যায়। সকলেই সন্দেহ ক'রতে থাকে যে রাসায়নিক উপায়ে "এ্যানিলিন্" থেকে "জ্বরের যম" কুইনিন আহরণ করা যাবে এবং অধিকাংশ রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্ তাঁদের বাক্য কার্য্যে পরিণত ক'রতে "এ্যানিলিনের" ওপর রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ করে দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে কুইনিন আবিষ্কৃত না হ'য়ে "এ্যানিলিন" হ'তে একটী সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ আত্মপ্রকাশ ক'রলো। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়াম পার্কিন তখন কেবলমাত্র ১৮ বৎসরের বালক; তিনি কুইনিনের আশায় অনেকপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে গবেষণা ক'রছিলেন। চঞ্চলমতি বালক কিছুতেই কৃতকার্য্য না হ'য়ে রাগান্বিত হ'য়ে যাবতীয় রসায়ন "এ্যানিলিনের" ওপর ঢেলে দেয়। বালক নিজের দুর্ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখতে পেলে যে "এ্যানিলিন" একটী চমৎকার বেগুনী রঙে (Aniline purple) পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছে। ব্যাপার কিছুই নয়—"এ্যানিলিন্" অমজানঘটিত হবার জন্য তা'র এই চমৎকার রঙে পরিবর্ত্তন। এই বেগুনী রঙের আবিষ্কারের পর থেকেই জার্ম্মেনীতে এই রঙের শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। শুধু এই একটীমাত্র রঙ প্রস্তুতের জন্যই জার্ম্মেনীতে প্রতিবৎসর ৮ হাজার টন্ "এ্যানিলিন্" প্রস্তুত হ'চ্ছে। ডাঃ পার্কিনএর অদ্ভুত আবিষ্কার শীঘ্রই পৃথিবীময় রাষ্ট্র হ'য়ে যায় এবং জার্ম্মেনীর আদর্শ নকল ক'রে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন প্রকার রঙের সৃষ্টি ও বড় বড় রঙের শিল্পাগার নির্ম্মিত হয়।

প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর পরিমাণে রঙের শিল্প প্রচলিত থাকলেও রঙের বাজারে জার্ম্মেনী আজও শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। জার্ম্মেনীতে এত বড় বড় রঙের কারখানা আছে যে, তা'দের এক একটীকে একটী ক'রে সুবৃহৎ নগর ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপ এক একটী কারখানায় অসংখ্য শ্রমিক নিযুক্ত হওয়ায় জার্ম্মেনীতে যে বেকার সমস্যা কতকটা কমে গেছে, সেটা লক্ষ্য করবার জিনিস। একটী কারখানার শ্রমিকসংখ্যা ও পরিচালনাপ্রণালী লক্ষ্য ক'রলে সত্যই আশ্চর্য্য হ'তে হয়! Bayer & Co. জার্ম্মেনীর একটী বড় ফার্ম্ম। এই ফার্ম্মে ৮ হাজার জন শ্রমিক, ৩৩০ জন রসায়ন-শাস্ত্রবিদ, ১০ জন ডাক্তার, ৪০০ জন শিক্ষিত কর্ম্মী, ১৩ শত কেরাণী—সর্ব্বসমেত প্রায় ১০ হাজার জন লোক নিযুক্ত আছে। এদের স্ত্রীপুত্র ধ'রতে গেলে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২৪ হাজারের কাছে,—আর এই বিপুল সংখ্যার প্রত্যেকটী লোক এই একটীমাত্র ফার্ম্মের ওপর নির্ভরশীল। এই সকল ফার্ম্ম জার্ম্মেনীতে যে কত লোকের অন্নসংস্থান ক'রেছে—আর সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যাও যে কত সমাধান হ'য়েছে, তা'র আর ইয়ত্তা নেই। প্রতি বৎসর ৫ কোটী পাউণ্ড মূল্যের রঙ বাজারে প্রেরিত হয়—তার মধ্যে ১৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের রঙই জার্ম্মেনীর।

আমরা আগেই দেখেছি যে "কোল্-টার" শিল্প থেকেই "ন্যাপ-থলিন্" আবিষ্কার সম্ভবপর হ'য়েছে। "ন্যাপথলিন" থেকে বিস্ফোরক পদার্থ ও নানাপ্রকার রঙ তৈরী করা হয় বলে জার্ম্মেনীতেই প্রতি বৎসর প্রায় ১০ হাজার টন্ "ন্যাপথলিন" প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। এই "ন্যাপ-থলিন"এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের প্রতিষেধক বলেও যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এ থেকে রঙ ও বিস্ফোরক পদার্থ এবং নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্য প্রস্তুত হয় ব'লে এর দামও অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়েছে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে ইউরোপের অনেক দেশে, তুরস্ক, পারস্য এমন কি আমাদের ভারতবর্ষেও মাদার (madder) বলে একপ্রকার গাছের চাষ করা হ'তো। এই গাছের শিকড় হ'তে Turkey red বা Alizarin বলে একপ্রকার লাল রঙ প্রস্তুত হ'তো। কেবলমাত্র ফ্রান্স থেকেই এই "মাদার" গাছের শিকড় হ'তে প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের লাল রঙ প্রস্তুত হ'তো। কিন্তু "কোল্-টার" হ'তে "এ্যান্থ্রাসিন্" আহরণের পর হ'তেই এই কৃষিশিল্পটী একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে; কারণ গবেষণা দ্বারা দেখা গেছে যে, "এ্যান্থ্রাসিন্" থেকেও রাসায়নিক উপায়ে এই লাল রঙ প্রস্তুত করা যেতে পারে,—আর এর দামও পড়ে এত সস্তা যে, প্রতিযোগিতায় এই কৃষিশিল্প একেবারেই উপেক্ষনীয়। এই আবিষ্কারের আগে "এ্যানথ্রাসিন্" এত সুলভ ছিল যে প্রতি টন্ নামমাত্র এক কি দু' শিলিং দরে বিক্রী হ'তো; কিন্তু

লাল রঙ আবিষ্কার হবার পর হ'তেই "এ্যান্থ্রাসিন্" এতটা মহার্ঘ্য হ'য়ে উঠেছে যে, প্রতি টন্ প্রায় একশত পাউণ্ড দরেও বিক্রী হ'চ্ছে। "কোল্-টার" শিল্প প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আর একটী দেশীয় কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠানেরও উচ্ছেদসাধন হ'য়েছে। এটী হ'লো নীলের চাষ। আমরা সকলেই বোধহয় জানি যে প্রায় সহস্র বৎসর আগে থেকেই আমাদের ভারতবর্ষ, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশে এই নীলের চাষের প্রচলন কত বেশী ছিল, আর এই শিল্প থেকে কি রকম মোটা লাভও হ'তো। কিন্তু এ্যাডল্ফ্ ফন্ বেয়ার (Adolph Von Bayer) নামক জনৈক জার্ম্মাণ-রসায়নবিদের গবেষণার ফলে আমাদের সেই পুরাতন শিল্প একপ্রকার নষ্ট হ'য়ে গেছে। এই বিখ্যাত রসায়নবিদ ১৮৭৯ সালে "কোল্-টার" শিল্প থেকে রাসায়নিক উপায়ে এই নীল রঙ আহরণ করেন; কিন্তু তৎকালে দেশীয় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিশেষ সুবিধা হয় না। কিছুদিন পরে এই সমস্যারও সমাধান হ'য়ে গেল। ১৫ বৎসর পরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশীয় নীল চাষের ভাগ্য চিরতরে নির্ম্মূল করে এই কৃত্রিম রঙ বাজারে প্রচলিত হ'লো। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েকজন জার্ম্মাণ-রসায়নবিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই রাসায়নিক নীল রঙ শিল্পের এতটা উন্নতি হ'য়েছে যে এই নীল রঙ থেকে লাল, সবুজ, হ'লদে প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার রঙও প্রস্তুত হ'য়েছে। এইরূপে "কোল্-টার" শিল্প হ'তে প্রায় ২ হাজার প্রকার বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি হ'য়েছে এবং এদের প্রত্যেকটীই সৌন্দর্য্যে ও চাকচিক্যে প্রাকৃতিক রঙ থেকে অনেক গুণে ভাল। এই সকল রঙের দ্বারা যে শুধু পরিচ্ছদই রঞ্জিত করা যেতে পারে তাই নয়, অনেক প্রকার রঙের বীজাণুও এই সকল রঙের সাহায্যে চিনতে পারা গেছে। শুনলে আশ্চর্য্য হ'তে হয় যে একপ্রকার কৃত্রিম নীল রঙের সাহায্যেই (Methylene Blue) বৈজ্ঞানিক কক্ কলেরার ও যক্ষ্মার বীজাণু আবিষ্কার ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন এবং এইরূপ একটি গবেষণার পশ্চাদনুসরণ ক'রে ডাঃ ক্যারো একটা সম্পূর্ণ নূতন শ্রেণীর রঙ আবিষ্কার ক'রেছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এরলিক্ আবিষ্কার করেন যে উক্ত একপ্রকার রঙের সাহায্যে স্নায়বিক জাল রঙ করা যেতে পারে এবং উক্ত রঙে গন্ধকের অবস্থিতির জন্যই স্নায়বিক জালের এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হ'চ্ছে বলে তিনি সন্দেহ করেন। তাঁর ধারণা যে অভ্রান্ত তা' প্রমাণ ক'রতে তিনি ডাঃ ক্যারোকে গন্ধকের পরিবর্ত্তে জলযান দিয়ে উক্ত রঙের অবয়বের অনুরূপ একপ্রকার যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত ক'রতে আদেশ করেন। এইরূপ ক'রতে গিয়ে ডাঃ ক্যারো একপ্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর রঙ আবিষ্কার করেন (Rhodamine Colour)

গবেষণা দ্বারা দেখা গেছে যে এক টন্ কয়লা থেকে ২০০ পাউণ্ড "কোল্-টার" পাওয়া যেতে পারে। আর এই "আলকাতরা" দিয়ে যে পরিমাণের রঙ পাওয়া যায়, তা' দিয়ে একগজ প্রশস্ত পশমি পরিচ্ছদের ৭শত ফিট লাল রঙে, ১৪শত ফিট ম্যেজেণ্টা রঙে, দেড় মাইল হলদে-লাল (Scarlet) রঙে, ৩৭০ ফিট কমলালেবু রঙে, ২ মাইল হ'লদে রঙে ও ১৩২০ গজ বেগুনী রঙে রঞ্জিত করা যেতে পারে। কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই প্রতি বৎসর "কোলগ্যাসের" জন্য ১০ লক্ষ টন কয়লা দগ্ধ করা হয়। উৎসৃষ্ট "কোল্টার" হ'তে যে কি পরিমাণে রঙ প্রস্তুত হ'তে পারে তা' সহজেই বুঝতে পারা যায়। সম্ভবতঃ এই পরিমাণের রঙে রঞ্জিত পরিচ্ছদ দ্বারা সমগ্র পৃথিবীটাকেই ঘিরে রাখতে পারা যাবে। রাসায়নিক রঙের শিল্প সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হ'য়েছিল ইংলণ্ডে এবং এর স্বত্ব ইংলণ্ড ২০ বৎসরের জন্য ভোগ করেছিল। কিন্তু এর পরেই এই শিল্প হস্তান্তরিত হ'য়ে যায় এবং সমগ্র পৃথিবীতে রাসায়নিক রঙের শিল্পের একমাত্র নিয়ন্ত্রা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে জার্ম্মেনী।

রঙের বাজারে "কোল্-টার" শিল্পের দৌরাত্ম্যে বর্ত্তমান যুগের কর্ণধারগণ কয়লার ওপর এখন থেকেই সুনজর দিতে আরম্ভ ক'রেছেন।

"কোল্-টার" থেকে শুধু যে রঙই প্রস্তুত হ'চ্ছে তাই নয়—বহু মূল্যের ঔষধও প্রতি বৎসর মানবের বহু উপকারে আসছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গেছে যে কুইনিনকে কুইনোলিন নামক একপ্রকার পদার্থে পরিবর্ত্তিত করা যেতে পারে। কুইনোলিনের অবস্থিতি "কোল্-টার"এ থাকবার জন্য লোকের দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, "কোল্-টার" থেকে রাসায়নিক উপায়ে কুইনিন প্রস্তুত করা যেতে পারে। কুইনিনের আবিষ্কার এযাবৎ সম্ভবপর না হ'লেও রাসায়নিক গবেষণার ফলে "কোল্-টার" হ'তে "Thailin", "Kairin" নামক অনেক মূল্যবান ঔষধ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ নড় "কোল্-টার" হ'তে "Antipyrin" আবিষ্কার করেন। এই ঔষধটী কুইনিন থেকেও জ্বরের অধিক শক্তিশালী প্রতিষেধক বলে প্রমাণিত হ'য়েছে—আর এই ঔষধের আর একটু সুবিধা যে, দামে ইহা কুইনিন অপেক্ষা সস্তা। এর তিন বৎসর পরেই জ্বরের আর একটী প্রতিষেধক "Acetanilide" এই "কোল্-টার" হ'তেই হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়। এই প্রকারে পরবর্ত্তী যুগে "কোল্-টার" থেকে আরও অনেক প্রকার ঔষধ আবিষ্কৃত ও প্রস্তুত হ'য়েছে এবং এর মধ্যে "Phenacetin", "Lactophenin", "Phenecoll", "Veronal", Sulphonal প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের শেষের দ্রব্যটী ভ্রান্তি অপহারক। উপকারী হ'লেও এসকল ঔষধ প্রয়োগ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং সামান্য একটু অসাবধানতায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটতে দেখা গেছে। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য্যজনক যে, বহু অনুভূতিনাশক ঔষধও এই "কোল্-টার" হ'তে আহরণ করা হ'য়েছে! এই সকল ঔষধের মধ্যে "stovaine", "cocaine", "novococaine"এর নাম করা যেতে পারে। এই সকল অনুভূতিনাশক ঔষধের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচার চিকিৎসারও অনেক উন্নতি সাধিত হ'য়েছে। "কোল্-টার" থেকে এমন কি রাসায়নিক উপায়ে এমন একটী ঔষধের আবিষ্কার হ'য়েছে যে, যা'র সাহায্যে মানব শরীরে বিনা রক্তপাতে অস্ত্রোপচার পর্য্যন্ত ক'রতে পারা গেছে। এই ঔষধটীর নাম হ'চ্ছে "Adrenaline"। শরীরের কোন স্থানে এ ঔষধ লেপন ক'রলে সেই স্থানের রক্তবাহী নালী এতটা সঙ্কুচিত হ'য়ে যায় যে, সে স্থানের রক্ত চলাচল শীঘ্রই বন্ধ হ'য়ে যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্থানটীও হ'য়ে পড়ে রক্তশূন্য। এ থেকে স্পষ্ট বলা যেতে পারে যে

"কোল্-টার" শিল্প প্রচলনেই চিকিৎসাশাস্ত্রের এতটা উন্নতি সম্ভবপর হ'য়েছে।"

সাধারণচিনি থেকে ৫৫০গুণ অধিক মিষ্ট "স্যাকারিণ Saccharine) নামক একপ্রকার চিনিও এই "কোলটার" হ'তেই আহরণ করা হয়। এত মিষ্ট হ'লেও এর ব্যবহার শরীরের পক্ষে বিশেষ হানিকর। এর হাত হ'তে মানুষকে রক্ষা ক'রতে সরকার এই "স্যাকারিণের" ওপর এতটা কর বসিয়েছেন যে, সাধারণ লোকের পক্ষে এর ব্যবহার এক প্রকার অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সুস্থ লোকের পক্ষে এই চিনি হানিকর হ'লেও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগীদের ইহা বিশেষ উপকারক। সুতরাং বর্ত্তমানে "স্যাকারিণের" ব্যবহার একমাত্র চিকিৎসকদের হাতে গিয়ে পড়েছে। সরকারের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও এই "স্যাকারিণ" দেশান্তরে চালান দেবার অপরাধে সরকারী লোক কর্ত্তৃক ধৃত হ'য়ে অনেক বিদেশী ব্যবসায়ী ভীষণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছেন।

শুনলে সত্যই আশ্চর্য্য হ'তে হয় যে, কি প্রকারে দুর্গন্ধযুক্ত "কোল্টার" হ'তে সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেও বিভিন্নপ্রকার গন্ধযুক্ত ফুল হ'তে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সুগন্ধিদ্রব্য প্রতি বৎসর জার্ম্মেনী ও ফ্রান্স প্রস্তুত ক'রতো। কিন্তু "কোল্টার" হ'তে রাসায়নিক উপায়ে সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ সকল শিল্প একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে। "কোল্টার" হ'তে আহৃত সুগন্ধিদ্রব্যের মধ্যে—"New-mownhay", "Vanilla", "Ionone" প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি লাভ ক'রেছে। "কোলটার" হ'তে রাসায়নিক উপায়ে "গোলাপের আতর" প্রস্তুতও রসায়ন জগতের সাফল্যের কম বড় নিদর্শন নয়। পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে যে, প্রাকৃতিক "গোলাপের আতর" প্রায় ২০টী মৌলিক সুগন্ধিদ্রব্যে সংগঠিত। জার্ম্মেনীর এক বড় কারখানা রাসায়নিক উপায়ে "কোলটার" হ'তে এই মৌলিক সুগন্ধিদ্রব্যের প্রত্যেকটাকে বিচ্ছিন্নভাবে আহরণ ক'রতে সমর্থ হ'য়েছে এবং এদের সংমিশ্রণে এরূপ একটী কৃত্রিম আতর প্রস্তুত হ'য়েছে যে প্রকৃত "গোলাপের আতর" হ'তে এ পর্য্যন্ত কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই কৃত্রিম আতরের কোনরূপ বিভিন্নতা দেখাতে সমর্থ হয় নি। এ ছাড়াও জার্ম্মেনী রাসায়নিক গবেষণা দ্বারা এতপ্রকার বিভিন্ন সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত ক'রেছে যে একমাত্র জার্ম্মেনীই প্রতিবৎসর ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সুগন্ধিদ্রব্য বিদেশে সরবরাহ ক'রছে।

"কোল্টারের ভেতর একদিকে যেমন সুগন্ধিদ্রব্য অবস্থান করে, অন্যদিকে সেইরূপ নানাপ্রকার বিস্ফোরক দ্রব্যও অবস্থান করে। "Lyddite" ও "mellinite" নামক এমন দু'টী বিস্ফোরক দ্রব্য "কোলটার" থেকে আহরণ করা হোয়েছে যে তাদের সাহায্যে দুরারোহ পর্ব্বতেও রেলপথ পর্য্যন্ত ক'রতে পারা গেছে।

"কোল্-টার" শিল্প থেকে ফটোগ্রাফেরও কম উন্নতি হয় নি। "কোল্-টার" হ'তে আহৃত একপ্রকার রঙ্ ছবি ছাপতে ও ছবির ওপর কিছু লিখতে দরকার হয়। বর্ত্তমান যুগে ফটোমেটিক্ (Photomatic) উপায়ে যে সকল স্থানে ফটো তুলবার ব্যবস্থা আছে, সে সকল ক্যামেরার পর্দ্দায় একপ্রকার রঙ লেপা থাকে। এই রঙ 'কোল্-টার" হ'তেই আহরণ করা হ'য়ে থাকে। এই রঙের সাহায্যেই মানুষের প্রতিকৃতি এত অল্প সময়ে ক্যামেরার পর্দ্দায় উঠ্তে সমর্থ হয়।

প্রকৃতপক্ষে, "কোল্টার" হতে এক শ্রেণীর সম্পূর্ণ নূতন শিল্প জেগে উঠেছে এবং এর প্রচলনের জন্য জার্ম্মেনীতে, ইংলণ্ডে ও যুক্তরাজ্যে অনেক বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এই নূতন শ্রেণীর শিল্প দিন দিনই শক্তি সংগ্রহ ক'রছে ও ক'রবে—আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে ভেঙে উল্টে পাল্টে নূতন করে গড়ে তুলবে।

মৃত্যু

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

"কিন্তু মৃত্যু যখন আসে তখন তাকে কি ঠেকিয়ে রাখা যায় ডাক্তারবাবু?" বলিয়া শশাঙ্কবাবু ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্রের সদাহাস্যোজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইলেন। হাসিয়া গুরুপ্রসাদবাবু কহিলেন "এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার একটা মুস্কিল আছে শশাঙ্কবাবু। জবাব যা দেবো, তার হয় তো প্রমাণ দিতে পারবো না। কারণ মৃত্যু হয়ে গেলে লোকে বল্বে মৃত্যুকে ঠেকানো গেল না; আর যদি বা ঠেকানো গেল, তা হলে লোকে বল্বে মৃত্যু আসে নি। কারণ মৃত্যু যতক্ষণ না প্রাণটা ছিনিয়ে নিয়ে যায় ততক্ষণ তো তাকে মৃত্যু বলে চিন্তে পারি না!...কিন্তু আমি বিশ্বাস করি শশাঙ্কবাবু, যে মৃত্যুকে সত্যিই ঠেকানো যায়—অবশ্য ঠেকাতে জানা চাই।"

ডাক্তার গুরুপ্রসাদের কণ্ঠস্বরে এবং বলার ভঙ্গিতে দৃঢ় বিশ্বাসের অভিব্যক্তি শশাঙ্কবাবুকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাঁহার যেন বিশ্বাস হইতে লাগিল ডাক্তারবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; মৃত্যুকে ঠেকানো যায়, ইহার

চাইতে বড় সত্য যেন আর জগতে নাই। কিন্তু এ বিশ্বাস কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। তারপরই আবার হতাশায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহার কানের কাছে কে যেন বার বার বলিতে লাগিল যে মৃত্যু এবার গোপালকে গ্রাস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবার আর তাহাকে ঠেকানো যাইবে না।

"মৃত্যুকে মানুষ যদি সত্যিই ঠেকাতে পারতো ডাক্তারবাবু" শশাঙ্কবাবু কহিলেন, "তাহলে মানুষ কি অমর হয়ে যেতো না? ভগবান মানুষের কাছে এত বড় পরাজয় স্বীকার করবেন এ কি ভাবা যায়?"

ডাক্তারবাবুর চোখ দুটী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন "কেন ভাবা যাবে না শশাঙ্কবাবু? চিকিৎসা-বিজ্ঞান যেরকম দ্রুত উন্নতি করে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতেই হোক্ বা সুদূর ভবিষ্যতেই হোক্ মানুষ যে অমর হবার উপায় আবিষ্কার করতে পারবে না এ কথা জোর করে বলা যায় না। আর কেউ বিশ্বাস করুক বা নাই করুক শশাঙ্কবাবু, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি—দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি, অমর হবার উপায় মানুষ একদিন আবিষ্কার করবেই করবে। এই আবিষ্কারের পথে আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র এখনই অনেকটা এগিয়ে গেছে।···"

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুগভীর আশ্বাসের সুরে কহিলেন "আপনি একেবারে নিঃসংশয় থাকতে পারেন শশাঙ্কবাবু, মৃত্যু এ যাত্রা আপনার বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁষ্‌তে পারবে না। আপনার ছেলের সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। অবশ্য কেস্ যে অত্যন্ত সিরিয়াস্ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই এবং সেজন্যই আমায় ডেকেছেন। কেস্ সিরিয়াস্ না হলে ডাক্তার গুরুপ্রসাদকে কেউ ডাকে না, আর বাস্তবিক সিরিয়াস্ না হলে সে কেস্ গুরুপ্রসাদ ডাক্তার হাতেও নেয় না। হাঃ হাঃ হাঃ।"

বিজ্‌লী বাতির সুইচ্ টিপিয়া দিলে চকিতে যেমন অন্ধকার ঘরের অন্ধকার দূর হইয়া যায়, গুরুপ্রসাদ ডাক্তারের হাসিতে তেমনি শশাঙ্কবাবুর মনের চিন্তাঘোর যেন এক নিমেষে কাটিয়া গেল। এই অদ্ভুত ডাক্তারটীর অদ্ভুত চিকিৎসানৈপুণ্য সর্ব্বজনবিদিত। অনেকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী বলিয়া থাকেন। ইহাতে কিছুটা অতিরঞ্জন হয় তো হয়, কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও আপত্তি করিতে শুনা যায় নাই।

শশাঙ্কবাবু প্লুতকণ্ঠে কহিলেন "আপনার হাতেই আমার গোপালকে সঁপে দিয়ে তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আছি ডাক্তারবাবু। সবাই তো জবাব দিয়ে গেছে···"

"কিন্তু আমি শুধু প্রশ্নই করবো, জবাব দেবো না। হাঃ হাঃ হাঃ।" ডাক্তার গুরুপ্রসাদ বলিলেন—"সত্যি শশাঙ্কবাবু, জবাব দেওয়া যেন আমার কোষ্ঠীতে লেখে নি। অন্য ডাক্তাররা যাই বলে থাকুন, মৃত্যু কথাটাই আপনার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। মৃত্যুকে নিশ্চয়ই ঠেকানো যায়, আর কেমন করে যায় সেটা ডাক্তার গুরু-প্রসাদ মিত্র কিছু কিছু জানে। তার প্রমাণ অনেকেই পেয়েছেন।···

আপনার ছেলের মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস, জীবনী-শক্তি ওর ভেতর প্রচুর রয়ে গেছে। শুধু রোগের চাপে একটু ঝিমিয়ে পড়েছে, তাকে আবার জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। সেটাই হচ্ছে আমার কাজ। যমে মানুষে লড়াই বলে একটা কথা শুনেছেন তো শশাঙ্কবাবু? সে ব্যাপারটা ঘটাবার এবং যমকে হটাবার একজন মাত্র লোক যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে থাকে তো সে এই ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্র" বলিয়া ডাক্তারবাবু যে হাসি হাসিলেন তাহাতে আত্মগরিমা হইতে আত্মবিশ্বাসের গভীরতাও অনেক বেশী। সে হাসি শূন্যগর্ভ কলসীর বৃহৎ শব্দ নহে; অমিতশক্তিমান সমুদ্রের গম্ভীর নিনাদ।

উকীল শশাঙ্কবাবুর বত্রিশটী টাকা পকেটে লইয়া ডাক্তার গুরুপ্রসাদবাবু তাঁহার গাড়ীতে উঠিলেন এবং শোফারকে চালাইতে হুকুম দিবার পূর্ব্বে শশাঙ্কবাবুকে আরেকবার আশ্বাস দিলেন যে তিনি যখন কেস্ হাতে লইয়াছেন তখন গোপালের সাধ্য নাই যে মারা যায়, অথবা মৃত্যুর সাধ্য নাই গোপালকে ছিনাইয়া নেয়—গোপালকে তিনি বাঁচাইবেনই।···

একমাত্র সন্তান গোপাল। ইহার প্রাণের বাতি নিভিয়া গেলে বংশে বাতি দিতে কেহ থাকিবে না। পরপর তিনটী সন্তান হারাইয়া পত্নী প্রিয়বালা ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন; এবার সবেধন নীলমণি গোপালকেও হারাইলে তিনিও আর প্রাণে বাঁচিবেন না। ভাবিয়া শশাঙ্কবাবু

শিহরিয়া উঠিলেন। এত যত্নে যে বাগান সাজাইয়াছিলেন সে বাগান এমন করিয়াই কি শুকাইয়া যাইবে?

গোপালের রোগম্লান মুখের পানে তাকাইয়া শশাঙ্কবাবু নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! রোগ কি অসাধ্য সাধনই না করিতে পারে! যাহার বিশাল ব্যায়াম-পুষ্ট দেহ বাঙালীর গৌরব ছিল সে আজ কঙ্কালের মত শীর্ণ হইয়া বিছানার সঙ্গে যেন মিশাইয়া গিয়াছে!

অসম্ভব। মৃত্যু যাহার শিয়রে বসিয়া ক্রূর হাসি হাসিতেছে তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবেন গুরুপ্রসাদ ডাক্তার? বাতুল, উন্মাদ না হইলে এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু না করিবারই বা কি আছে? গুরুপ্রসাদবাবু তো সাধারণ ডাক্তার নন! বিশ্বাস হইতে অবিশ্বাসে, অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে শশাঙ্কবাবু ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলিতে লাগিলেন।

গুরুপ্রসাদবাবুর অদ্ভুত অদ্ভুত চিকিৎসার কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল। কবে কোন্ মৃত্যুপথযাত্রীকে এক ফোঁটা ওষুধ দিয়া জীবনের পথে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, কবে কাহার বিরাট টিউমার শুধু ওষুধ খাওয়াইয়া বেমালুম মিলাইয়া দিয়া তাহাকে কঠিন অস্ত্রোপচারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—এই সব কথা মনে করিয়া তিনি নিজকে ভরসা দিতে লাগিলেন। পত্নীকেও বুঝাইয়া দিলেন যে গোপালের রোগটা কিছু কঠিন নয়, শুধু আগেকার চিকিৎসকগণ ঠিকমত রোগটাকে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কথাটা প্রিয়বালা যে ঠিক বিশ্বাস করিলেন তাহা নহে, কিন্তু পাছে তাঁহার অবিশ্বাসের ফলে গোপালের অমঙ্গল হয় এই ভয়ে প্রাণপণে বিশ্বাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যায় ডাক্তারবাবু আবার আসিলেন। শশাঙ্কবাবুর এবং প্রিয়বালার মনে বিষাদের যে মেঘ সারাদিন ভরিয়া ঘনাইয়াছিল, ডাক্তারবাবুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা যেন কোন যাদুমন্ত্রে নিঃশেষ হইয়া গেল। গোপালের রোগ-পাণ্ডুর মুখেও যেন মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

রোগীকে পরীক্ষা করিয়া সহাস্যমুখে ডাক্তার গুরুপ্রসাদ কহিলেন "বাঃ! ওষুধে চমৎকার কাজ হয়েছে। একেবারে আশাতীত, শশাঙ্কবাবু। আর দিন পনেরোর ভেতরে একে যদি বিছানায় বসাতে না পারি তবে আমার নামের প্রথম অক্ষরটার উ-কারটা স্রেফ্ বাদ দিয়ে দেবেন, আমি কোনো আপত্তি করবো না।" বলিয়া রোগীর অসুবিধা বা ক্ষতি না করিয়া যতটা জোরে হাসা যায় ততটা জোরে হাসিয়া উঠিলেন। এই হাসিতে শশাঙ্কবাবু এবং প্রিয়বালার মন আরো অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গেল।

আশান্বিত হৃদয়ে প্রিয়বালা কহিলেন "তাহলে এখন ভালোর দিকেই ডাক্তারবাবু?" বলিয়া এমনভাবে ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকাইলেন যেন তিনি স্বয়ং ভাগ্যবিধাতা, তাঁহারি মুখের কথাটুকুর উপর যেন গোপালের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

"নিশ্চিত ভালোর দিকে।" ডাক্তারবাবু কহিলেন, "সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। আমার সম্বন্ধে কোনো বদ্‌নাম আছে কিনা আমার জানা নেই; কিন্তু আমি মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে ভুলাই এ বদ্‌নাম আমার নেই এ আমি নিশ্চয় জানি মিসেস্ বোস্।…"

নিজহাতে একডোজ ওষুধ তিনি রোগীকে খাওয়াইয়া দিলেন। সেটা বাস্তবিক ওষুধ না শুধু সুগার অব্ মিল্ক্ তাহা অবশ্য ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া সস্ত্রীক শশাঙ্কবাবুর অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না যে মৃত্যুকে এ যাত্রা তিনি হটাইয়া দিতে পারিবেন।

পরক্ষণেই আবার শশাঙ্কবাবুর মনে সন্দেহ জাগিল। হয় তো রোগী খারাপের দিকেই চলিয়াছে, ডাক্তারবাবু রোগীর মাকে ভুলাইবার জন্য ছলনা করিয়াছেন মাত্র। অথবা ইহাও হইতে পারে যে গোপালের গতি এখন একটু ভালোর দিকে, কিন্তু তাহা সাময়িক মাত্র; নিভিবার পূর্ব্বে প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এ সন্দেহ বড় মর্ম্মান্তিক। ডাক্তারবাবুর কাছে পরিষ্কার জবাব পাওয়া দরকার। চিন্তান্বিত মনে শশাঙ্কবাবু ডাক্তারবাবুকে মোটরে তুলিয়া দিতে গেলেন।

গেটের সামনে দাঁড়াইয়া শশাঙ্কবাবু কহিলেন "ডাক্তার-বাবু, একটা প্রশ্ন করবো। ঠিক জবাব দেবেন?"

"নিশ্চয় দেবো।" ডাক্তারবাবু কহিলেন "কি আপনার প্রশ্ন? অবশ্য সেটা আমার বুদ্ধির আওতার ভেতরে হওয়া চাই।"

ক্ষীণস্বরে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে শশাঙ্কবাবু প্রশ্ন করিলেন "সত্যিই কি আপনি মনে করেন গোপালকে আপনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন?"

হাসিয়া ডাক্তার গুরুপ্রসাদ কহিলেন "সত্যি মনে করি বলেই তো আশ্বাস দিয়েছি শশাঙ্কবাবু। মৃত্যু যখন দেখ্‌তে পেয়েছে আমি এ কেস্ হাতে নিয়েছি তখনি সে ভয় পেয়ে গেছে। Death knows full well that Dr. Guruprasad is more dangerous than He. জান্‌লেন শশাঙ্কবাবু? হাঃ হাঃ হাঃ।"

খানিকক্ষণ হাসিয়া তিনি শশাঙ্কবাবুর মন অনেকখানি হাল্‌কা করিয়া দিলেন। আরো হাল্‌কা করিবার জন্ম বলিতে লাগিলেন "মৃত্যু যখন তার সময় মত আসে তখন তার ওপর তো কোনো আক্রোশ থাকা উচিত নয়—তখন সে আসে পরম প্রয়োজনরূপে। কিন্তু অসময়ে যদি সে আস্‌তে চায় তো ঘুঁসির জোরে তাড়াতে হবে তাকে—আর আমরা আছি তো সেই জন্তেই।" বলিয়া বলিষ্ঠ হাত দুটী মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঝাঁকাইয়া দিলেন যেন মৃত্যুর সঙ্গে এখনি মুষ্টিযুদ্ধ সুরু করিবেন। ডাক্তারের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের দিকে তাকাইয়া কল্পনায় তাঁহার ঘুঁসিতে মৃত্যু বেচারার দুর্দ্দশা দেখিয়া শশাঙ্কবাবু মনে মনে শিশুর মত আনন্দ লাভ করিলেন।

কাল ভোরেও আবার আসিবেন, এ আশ্বাস দিয়া বত্রিশটী টাকা পকেটস্থ করিয়া নমস্কার জানাইয়া ডাক্তার গুরুপ্রসাদ শোফারকে চালাইতে আদেশ দিলেন।…

রাত্রিটা সকলেরি বড় উদ্বেগে কাটিল। ঘুম কাহারো ভাল করিয়া হইল না। শেষরাত্রির দিকে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। ভোরবেলা সকলেরি মনে হইল গোপালকে লক্ষ্য করিয়া মৃত্যু যেন দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রিয়বালা কাঁদিয়া কহিলেন "ওগো, তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে খবর দাও। উনি কখন আসেন তার তো ঠিক নেই। এখ্‌খুনি আন্‌তে পাঠিয়ে দাও তিনকড়িকে।"

তিনকড়ি সরকার তাড়াতাড়ি গাড়ী লইয়া রওনা হইয়া গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিল সে গাড়ী লইয়া ম্লানমুখে। তাহার মুখে খবর পাইয়া শশাঙ্কবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভোরবেলা চা খাইতে বসিয়া হঠাৎ ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্র হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন।

হয় তো ঘুঁসি তিনি চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সেটা ঠিক মত লক্ষ্যে পৌছায় নাই; ফলে মৃত্যুর এক ঘুঁসিতে তিনি চিরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

শেষের ক'দিন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অপ্রত্যাশিতভাবে চশমার খাপ্‌টা এল ফিরে। রবিবার অপরাহ্নে রাধারাণী দেবী ঠাকুরের হাতে স্লিপ্ দিয়ে জানিয়েছেন যে নরেন্দ্রের সম্পাদকীয় বিরাট্ পাণ্ডাড়ির মধ্যে খাপখানি অজ্ঞাতবাস ক'রছিল। কৃতজ্ঞচিত্তে খাপখানি হাতে নিয়ে খুলে দেখ্‌লাম কুমুদবাবুর চিঠিখানিও বিরাজ করছে।

তখুনি মনের মধ্যে একটি কথা চ'ম্‌কে গেল। আর এক্স-রে সম্বন্ধে শরতের সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হবে না। কেন না, যত বড়ই নির্ভীক সৈনিক হোক্ মানুষ, দুর্ভাগ্যের কঠিন সত্যকে এড়িয়ে চলার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও তার মধ্যে লুকিয়ে থাকেই!

শুন্‌তে পাওয়া যায়, পৃথিবীর ইতিহাসে মৃত্যু-ভয়-হীনতায় একমাত্র সক্রেটিস্‌ই জয়মাল্য লাভ ক'রে আছেন। শরৎকে একদিন দেখেছি অসুখকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রতে এবং নিজের বাঁচা-মরা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন; একতালার ছাদের উপর থেকে শরৎ অবলীলাক্রমে লাফিয়ে প'ড়তে পারতেন। সেটার প্র্যাক্‌টিশ হ'ত আমাদের মাট-কোঠার দোতালার সিঁড়ি থেকে। চোদ্দটা সিঁড়ি ছিল;

আমরা এক-এক ক'রে চোদ্দটাই যখন পার্‌লাম, তখন একতালার ছাদের উপর থেকে পড়ার জন্তে পশ্চিমের নিভৃত বাগানের মধ্যে শরৎ মাটি খুঁড়িয়ে দিয়ে, নিজে দেখিয়ে দিলেন কি ক'রে মাটিতে পড়ার সময় স্প্রীং দিতে হয়। একটা বেরাল ফেলে দিয়ে দেখা গেল যে ঐ স্প্রীংই চোট্‌টাকে বাঁচিয়ে দেয়।

তারপর শরৎ বিশ্বাস করতেন: সব অসুখই মনের জোরে সারিয়ে দেওয়া যায়। তারপর এল তাঁর অগাধ বিশ্বাস পেটেন্ট ওষুধে এবং শেষ দেখ্‌লাম দৈবে বিশ্বাস করার প্রবণতা: কিন্তু সারা জীবনের দৃঢ় প্রতীতি তখনও বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে!

সেদিনের নীলার সঙ্গে এসেছেন আজ আবার পলা। সেটিকে ধারণ ক'রে পর্য্যন্ত তিনি পালিয়ে আছেন উপরের ঘরে। পালাবার পূর্ণ অবসর দিয়ে আমিও আছি ব'সে নাচের ঘরে। কিন্তু এই বিরহ দুজনের পক্ষেই হ'য়ে উঠ্‌ছে ক্রমেই অসহ।

অবশেষে শরৎ পরাজয় স্বীকার ক'রে নেমে এলেন নীচেই চা খেতে। এসেই আংটিটা আমাকে দেখিয়ে বল্লেন: দেখ, আজ মনে একটা নতুন কথা এসেছে।

কি সেটি?

মানুষ দুঃখে প'ড়ে কুসংস্কারের আশ্রয় নেয়।

যথা?

আমার এই পলার আংটি। কি হ'য়ে যাচ্ছি, দিনকে দিন!

আর কিচ্ছু হওনি শরৎ, শুধু একটু বেশী রকম পীড়িত হ'য়েছ। অসুখে ডাক্তার ডাকা যেমন কুসংস্কার নয় তেমনি মঙ্গল-গ্রহের অপ্রসন্নতায় পলা ধারণ করাকেও আমি কুসংস্কার মনে করিনে।

তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে, মঙ্গল গ্রহ কুপিত হ'লে প্রবাল ধারণ ক'রতে হয়?

ফলিত জ্যোতিষের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জানি ব'লে।

তুমি বিশ্বাস কর?

করি।

শরৎ বিস্ময়-ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, অর্থাৎ বল, কেন?

এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না; কিন্তু ভূয়োদর্শনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যেমন ধর, সিংহ রাশিতে জন্মালে মানুষের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব দেখা যায়। সে রাশভারি হয়। এসব কিছু-কিছু মেলে, আবার কিছু মেলেও না। তোমার রাশিগত ফল, যা এবছরের পাঁজিতে লেখা আছে, তার সঙ্গে তোমার এই অসুখের মিল আছে। কিন্তু কেন যে মেলে, তা জানা যায় না—অন্ততঃ আমি জানিনে।.....প্রায়ই দেখা যায়, বৃহস্পতি বিরূপ হলে টি-বি হয়; আর জ্যোতিষে মুক্তো ধারণ করতে বলে: এদিকে বৈদ্য-শাস্ত্রে টি-বির মস্ত ওষুধ হ'ল মুক্তো!...আবার দেখ্‌তে পাওয়া যায় শনি বিরূপ হ'লে কালো জিনিস ব্যবহার ক'রতে বলে। আমি দেখেছি শনি বিরূপ হ'লে ঘা-ছে হয়: আর হোমিওপ্যাথি গ্রাফাইটিসে খুব সারে।

শরৎ বল্লেন—দুঃখে প'ড়ে পলাও ধারণ ক'রলাম: কিন্তু মনটা বিদ্রোহ করছে।

পরেরদিন সকালে উঠে এক্স-রের জন্তে সেবাসদনে যাব স্থির ক'রেছি, শরৎ এলেন প্রায় ঝড়ের মত, বল্লেন: আজ সোমবার, আজকে বৈঠকখানা বাজারের হাটে যেতেই হবে: ওরে গোপাল যা, যা, কালীকে ডেকে নিয়ে আয়: আচ্ছা ঠাকুর যাক্—তুই আমাদের চা দে।

ঠাকুর এল, বল্লেন: কৈ ঠাকুর, আমার চাকরের কি ক'রলে? আর বেহারের নয়, ছোকরাও নয়, বুড়ো, যে বাংলা বল্লে বুঝতে পারে।...

বৈঠকখানার হাটে কিন্‌তে যাওয়া হচ্চে—লাল মাছ আর গাছের চারা।

গাড়িতে যেতে যেতে শরৎ বল্লেন: দেখ, খাওয়ার পরই পেটে একটা চাপ বোধ করি, সে কেন যত কমই খাই। কিন্তু তারপর গাড়িতে চ'ল্‌লেই সেটা আশ্চর্য্য রকম ক'মে গিয়ে বেশ একটা আরাম বোধ করি—কেন হয় বল ত?

রোগীর কাছে থাক্‌তে থাক্‌তে এইটুকু অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল যে, ঠিক মত একটা উত্তর দিতে না পারলে রোগীকে হিউমার করা যায় না।

বল্লাম তাই: খাবারটার নীচে যাওয়ার পথটা তো ছোটই হ'য়ে গেছে, এই নাড়াচাড়া, গাড়ির জোল্টিংএ নীচে যাওয়ায় সুবিধে পায়, ঝাঁকুনিতে!

তাই ঠিক; আজকে একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলাম; ক্রীমের দুটো পট কালী এনেছিল, দুটোই খেয়ে ফেলে মনে মনে ভয় হচ্ছিল যে ভারি কষ্ট হবে; কিন্তু সেটা চমৎকার ক'মে গেল।

বল্লাম: শুনেছি, বাঁট থেকে দোয়া দুধটাকে হজম ক'রতে হয় না: ওটা একেবারে অ্যাসিমিলেটেড্ হয়। কিন্তু ডাক্তারেরা গরুর দুধ না জ্বাল দিয়ে খেতে মানা করে। শুনেছি গরুর নাকি ভারি টি-বি হয়।

তবে কি মহাত্মাজির মত ছাগলের দুধ ধ'রব নাকি?

শুনেছি—বল্লুম—ছাগলের দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশী, আর ক্রীমটা কম।

শরৎ কি ভাব্তে লাগ্লেন। সেদিনের খবরের কাগজের উপর আমি চোখ বুলিয়ে যেতে লাগ্লাম।

বৈঠকখানা বাজারে বেশ ভিড়, আমি লাল মাছের খোঁজে গেলাম: শরৎ পাখী দেখ্তে দাঁড়ালেন।

মাছ দেখে ফিরে শরৎকে আর দেখ্তে পাইনে। মনে হ'ল ভিড় সহ্য ক'রতে না পেরে গাড়িতে ফিরে গেছেন।

গাড়ির কাছে গিয়ে কালীকে জিজ্ঞেস করি, তোমার বাবু কোথায় হে?

এদিকে আসেন নি।

ফিরে গিয়ে দেখি শরৎ ছাগলের দিকটায় দাঁড়িয়ে দেখ্চেন একটা ছাগল। আমায় দেখে বল্লেন: আসল মুলতানী, আমি দেখেই চিনেছি।

একটা বেঁটে বুড়ো মানুষ; চেহারাটা ঘষা-পয়সার মত। গায়ে ভেল্ভেটের বেগ্নে রংএর ওয়েষ্ট-কোট, তার নীচে হাঁটু অবধি ঝুল, গাঢ় সবুজ রংএর চুড়িদার; সাদা ঢিলে-পায়জামা, পায়ে জরির কাজ-করা একটা নাগরা। থুৎনির নীচে কাঁচা-পাকা একটুখানি দাড়ি—গোঁফের মাঝখানটা কামান!

লোকটার সঙ্গে কথা হচ্চে: শরৎ জান্তে চান, কি জন্যে সে এমন সুন্দর ছাগলটা বেচে দিচ্চে। সে খাস উর্দ্দুতে বল্লে: বাড়ী থেকে 'তার' এসেছে; মেয়ের অসুখ, নিজের দুধ খাওয়ার জন্যে ওটা ছিল: বেচে না দিলে কে দেখে ওটাকে? তাকে তো যেতেই হবে!

কত নেবে?

চল্লিশ টাকা।

ঠিক সেই সময়, একটি ও-দেশী মেয়ে মানুষ, নাকে প্রকাণ্ড সোনার নথ, কাণে জড়োয়ার মাক্ড়ি—দ্রুত এসে বল্লে:—এই কুড়ি টাকা এখুনি দিচ্চি; দশটাকা কাল দেব—আমায় দাও, আল্লা কসম্।

তার সঙ্গে একটা জোয়ান ছেলে, তাকে বল্লে, রহিম দেখ্ তো কি রকম দুধ দেয়—

রহিম বাঁটটা ধ'রে একটা টেরচা টান দিতেই—মেঝের উপর মোটা ধারায় দুধ বেরিয়ে এল জায়গাটাকে ভাসিয়ে দিয়ে।

শরৎ আমায় কানে কানে বল্লেন: নিতেই হবে…

দাঁড়াও, ব্যস্ত হ'য়ো না।

কিন্তু দেরি ক'রলে বে-হাত হ'য়ে যাবে—সুরেন—দেখছ না, ওদের ভাব-গতিক?

কত দুধ দেয় দিনে, বড় মিঞা?

চার সের বাবু। দিনে আড়াই; রাতে দেড়! দশ আনা ক'রে সের—বাজার দর; দিনে আড়াই টাকা: বাবু, ষোল দিনে দাম উশুল!

বটে! এ তুমি লেখাপড়া ক'রে দেবে? সাতদিন দেখে, তবে দাম দেব; নৈলে ফেরৎ নিতে হবে।

তাতে ষাট্ টাকা দিতে হবে।

বেশ তাই দেওয়া যাবে; চল লেখাপড়া করি গে; এই নেও দশ টাকা বায়না।

এই ব'লতেই—বাকি লোকগুলো হায় হায় ক'রতে করতে চ'লে গেল। শরৎকে বল্লুম, তুমি গিয়ে গাড়িতে ব'স, আমি আর কালী লেখাপড়া করাই গে।

শরৎ বল্লেন, অত হাঙ্গামে কাজ নেই, দিয়ে দাও টাকাটা।

নাঃ শরৎ এরা ভারি ঠকায়। লোকটা আমার কাছে ঘেঁসে এসে বল্লে: বাবু, ইনিই শরৎবাবু, বই লেখেন?



শিল্পী—শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন ঠাকুর

যাত্রী

Bharatvarsha Printing Works

তুমি চিন্‌লে কি ক'রে?

সবাই ব'লচে—ওঁর জন্য আলাদা দাম; কুড়ি টাকায় দিয়ে দেব; ওঃ উনি যে মস্ত লোক।

কথাগুলো যদিও আমার কানে কানে হচ্ছিল কিন্তু শরতের কানে গিয়ে যাতে পৌছায় সে বিষয়ে মিঞার কিছুমাত্র বে-খেয়াল ছিল না।

শরৎ বল্লেন: ফের কি বলে?

তোমাকে ও কুড়িতে দিতে চায়। দুধ খেতে দিচ্চে বোধ হয়।

কে আমি?

সাহিত্য-সম্রাট!—এ যে বসুমতীর কাছাকাছি জায়গা!

নিয়ে নাও—কপাল ঠুকে; চার সের বল্‌ছে, আধ সেরও ত দেবে। বড় মিঞার দিকে ফিরে বল্লুম: এক কথা—আঠার টাকা—দাও ভাল, নৈলে হ'ল না, বুঝব।

সে হাত পাতলে। শরৎ তার হাতে টাকাটা দিয়ে দিলেন।

ছাগলকে গাড়িতে তুলে আমরা মহা উল্লাসে বাড়ী ফিরলাম। লাল মাছ—কে কেনে?

মনে হবে, সেকালের নাকুর বদলে নরুণের গল্পের মত একটা আজগুবি কিছু বল্লুম। কিন্তু সত্যি কি গল্পের চেয়ে বেশী আজ্‌গুবি হয় না?

কিন্তু ছাগল কেনার ধাক্কা আরও কিছু কপালে তোলা ছিল আমাদের।

বৈজ্ঞানিক-প্রবর কোন্ ফাঁকে জেনে নিয়েছিলেন যে দেশী ছোলার চেয়ে কাবুলি ছোলা খাওয়ালে দুধ বেশী হয়। তার পর কলাইএর ভুষি আর ছোট-ছোট ক'রে কলে কাটা খড়। এর উপর সব্জি তো চাই!

আমার কিন্তু মনটা ছট্‌ফট্ করছে সেবাসদনে যাবার জন্যে। বাড়ী ফিরে বল্লুম: আমি ওর খড় ছোলা ভুষি নিয়ে আসি গে শরৎ; কালী চল ত।

না, এখন নয়; বেলা হ'য়ে গেছে; ওবেলা গেলেই হবে। ঘরে এসে ব'সে অবাক্ হ'য়ে ভাবি: জানে নাকি যে আমি ফাঁক্ খুঁজ্‌চি সেবাসদনে যাবার; এ বাধা দিচ্চে কে? শরৎ, না তার শনি!

বেলা পাঁচটা বাজে, মনে করি: একটা ফাঁক দেখে বেরিয়ে পড়ি'; কিন্তু শরতের কড়া পাহারা আমার উপর; চা না খেয়ে যাচ্চ কোথায়? জামা প'র্‌লে যে? ব'স ব'স—ওরে মামাকে চা দে, তামাক নিয়ে আয়, কে আছিস্।

বল্লুম: বেরতেও ত' হবে; তোমার ছাগলের খাবার কিনে আন্‌তে হবে তো? রাত হ'য়ে গেলে পাওয়া যাবে না—ফের।

হাওড়া থেকে এলেন নীলরতন আর প্রফুল্ল দেখা কর্‌তে। অনেকদিন পরে দেখা হ'য়েছে, গল্প আর ফুরোতে চায় না।

বেরিয়ে এসে দেখি ছাগল হাংগার ষ্ট্রাইক ক'রে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে; যেন এ বাড়ীর কিছুই খাবে না। ঠাকুরকে ব'লে কিছু দিশি ছোলা ভিজিয়েছিলাম। সেটা এনে দেওয়াতে—কোন আপত্তি হ'ল না—হৈ হৈ শব্দে খেয়ে ফেলে এমন মাথা ঝোঁকাতে লাগ্‌ল—যার মানে, আরো দাও আরো দাও!

যাক্, একদিক দিয়ে একটা উপায় বেরুল!

নীলরতন, উকিল, দু-চোখ বুদ্ধির জৌলুসে ভরা—আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে ক'য়েকটি কথা ব'লে গেলেন—যা' শুনে সে রাতে আমার আর কিছুতেই ঘুম আসে না! রাজগৃহে চ'লে গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়; কিন্তু এক্স-রে চিকিৎসা? তার কি হবে?

আটটার পর তাঁরা গেলে আমরা ছাগলের আহার্য্য কিন্‌তে বার হলাম। ঘরে ব'সে যা মনে হচ্ছিল অতি সহজ-সাধ্য, বেরিয়ে তা কিছুতেই হ'ল না। কলাইয়ের ভুষি হাজরা রোডে পাওয়া যায় না। কলে কাটা খড় আমাদের ইচ্ছামত কেনা যাবে না; কিন্‌তে হ'লে আড়াই সের; এদিকে তা নেবার জিনিস কই? অগত্যা গায়ের কাপড়ে বেঁধে নিয়ে কলাইএর ভূষির বদলে মুসুরের ভূষি, কাবুলের চানার বদলে দিশি ছোলা নিয়ে ফিরে দেখা গেল দশটা বাজতে দেরি নেই!

এখন ছাগল রাখা যায় কোথায়? ময়ূরের ঘরে?

সেখেনে ছাগল যেতেই ময়ূর এক তাক্ থেকে অন্য তাকে লাফিয়ে পড়ে!—আর সেই সঙ্গে—পেটেণ্ট ওষুধের, সিগারেটের, লিকুইড প্যারাফিনের টিনগুলো শব্দ ক'রে মাটিতে প'ড়তেই ছাগল সিং বেঁকিয়ে দু'পায়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল, আর ময়ূর—একটা পরিত্রাহি কেঁকাও ডাক্

ছাড়তেই—ঠাকুর কোম্পানি—বাবা গো মা গো,—গিছি গো—ব'লেই দৌড় !

এই গজ-কচ্ছপ জাতীয় ঘোর যুদ্ধের সূচনায় আমাদের ডাক প'ড়তেই ছুটে গিয়ে দেখি যে সেই ঘরের মধ্যে শিশি-বোতল ভেঙে খালি পায়ের সম্পূর্ণ প্রবেশ নিষেধ; আর ময়ূর যে ভঙ্গি ক'রে ব'সে আছে তাতে চোখ ঠুকরে উপড়ে নেওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়; বিশেষ ক'রে ঐ উত্তেজিত কুলীন মুলতানীর—রোষদীপ্ত, অপিচ বিস্ফারিত চক্ষু-দুটি !

টানাটানি ক'রে ছাগলটা বেরিয়ে এলে আলো নিবিয়ে ঘরটার দোর বন্ধ ক'রে দেওয়া হল।

এখন ছাগল যায় কোথায়? বাচ্ছাটাকে ঝুড়ি চাপা দেওয়া হ'ল এবং ধাড়িকে একটা চটের ওভার-কোট পরিয়ে দিতেই সে আর একবার দু' পায়ে দাঁড়িয়ে ব'ল্লে: যুদ্ধং দেহি! তার মুখের কাছে মসুরির ভূষি দিতে না দিতে সে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে খাওয়ায় মনোযোগ দিলে।

নিরুপায় দেখে আমরা দুজনেই ধরে নিলাম যে শীতটা সে রাতে তেমন কিছু বেশী নয়; মুলতানি ধাড়ি রাতটা যেমন ক'রে হোক্ কাটিয়ে দেবে বাইরেই! সকালে উঠে সব চেয়ে বড় কৌতূহল: ধাড়ী কত দুধ দেয়। শরৎও এলেন তাড়াতাড়ি নেমে। ছাগলটাকে বাইরে এনে দেখা গেল বাঁটে একটুও দুধ নেই!

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে অবাক হ'য়ে রইলাম! ব্যাপার কি? ব্যাটা কি সাফ্ ম্যাজিক দেখালে!

কালী আস্তেই তাকে বল্লাম যে যে-কোন ফাঁকে আমাকে সেবাসদনে নিয়ে যেতেই হবে, দশটার পরই। ফুল গাছের টব কিন্তে যাচ্ছ এখন, মনে রেখ যে দশটার মধ্যে তোমাকে যেমন ক'রেই হোক ফিরতে হবে।

কালী সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাছের চারা আর ছাগলের দুশ্চিন্তা নিয়ে শরৎ ভারি ব্যস্ত; একবার ঘর, আর একবার বার ক'রছেন। আমার কাছে এসে বল্লেন, একবার বেরুতে হবে, কালী এলেই।

কেন?

কিছু মাটি কিনে আনতে হবে, বেলে মাটি চাই, এঁটেল াটি, আর সার মাটি।

কিন্তু সে তোমাকে ও-বেলা ক'রতে হবে, এবেলা গাড়ি আমার চাই-ই।

বুঝেছি, ব'লে শরৎ হতাশ হ'য়ে গিয়ে ব'সলেন চেয়ারে।

কিছুক্ষণ পরে বল্লেন, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

কোন আপত্তি নেই; কিন্তু আজ যদি এ কাজ না হয় ত' সন্ধ্যের ট্রেনে ভাগলপুর ফিরছি অবধারিত।

আমায় একলা ফেলে?

একলা কিসের? আজ লিখে দিলে কাল বড়-মা'রা এসে প'ড়বেন।

না, না, সুরেন, তোমার কথার অবাধ্য হব না; তুমি চ'লে যেও না আমার এই দুঃসময়ে।

চ'লে যেতে চাই কি কম দুঃখে আমিও! ময়ূর আর ছাগল আর ইঁদুর আর বাঁদরের হেফাজৎ করার চেয়ে যদি কোন বড় কাজ না থাকে··

তুমি দেখছ না, আমার এ সব শনি?

হেসে ফেল্লাম। অ্যাক্‌টিং কর্‌ছ? বোকা বোঝাচ্ছ? শনি, না হাতি!

কালী এলে অত্যন্ত ভালো ছেলের মত শরৎ গিয়ে গাড়িতে উঠে ব'সে বল্লেন কালীকে: মামা যেখেনে যাবেন নিয়ে চল।

জানি, ব'লে গাড়ি চালিয়ে দিলে কালী। সেবাসদনের গেটে এসে গাড়ি লাগল। শরৎ বল্লেন: আমি ব'সছি, তুমি যাও।

ক্যাপ্টেন বল্লেন: কদিন দেরি হ'ল যে? ডক্টর্ রায় রোজই খোঁজ নিচ্ছেন।

সে অনেক কথা! এখন বলুন তো কি ক'রতে হবে?

কটার সময় শরৎবাবু তৈরি হ'য়ে আস্তে পার্‌বেন?

সাড়ে আটটা।

বেশ তাই হবে। কাল তাঁকে সাড়ে সাতটার সময় বেরিয়াম খাইয়ে সাড়ে আটটার সময় নিয়ে আস্‌বেন; কাল থেকে কাজ সুরু ক'রে দেওয়া যাবে। দেখুন, দেরি ক'রবেন না। দশটার পর আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

বল্লুম: কোন কারণে যদি না আসা হয়ত ঠিক সাড়ে আট্‌টার সময় আপনাকে ফোন ক'রে দেব।

গাড়িতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে কালীকে বল্লুম: কোন একটা ওষুধের দোকানে চল। কালী গাড়ি ঘুরিয়ে বড় রাস্তায়

বার ক'রে নিয়ে এল "পপুলারের" দোকানে। কাজ শেষ হ'লে শরৎকে বল্লুম—চল এবারে মাটি-সার, খড়-ভূষি, কাব্‌লি-ছোলা কিনে বাড়ী যাওয়া যাক্।

গাড়ি পণ্ডিতিয়ার গয়লা পাড়ায় চ'ল্‌ল।

ওষুধটা দেখিয়ে শরৎ বল্লেন: এটাতে কি ক'রতে হবে সুরেন?

ওটি কাল সকালে ঠিক সাড়ে ছটার সময় তোমাকে নিঃশেষ ক'রে খেয়ে ফেল্‌তে হবে।

এই এতখানি পাউডার?

না গরম জলে দিয়ে। ওটা খেতে খারাপ নয়, মুখার্জ্জি ব'ল্লেন।

তারপর?

যথাসময়ে এসে উপস্থিত হ'তে হবে, ওঁদের কাছে।

আমাকে তুমি ডেকে দিও সকালে।

নিশ্চয়।

এটা খেতে হবে কেন?

ওটা পেট থেকে তোমার ইন্‌টেষ্টাইনে যেতে কত সময় লাগে সেইটেই ওঁরা জান্‌তে চান।

তাতে কি লাভ?

তোমার অবরোধটা কতখানি হ'য়েছে, তাই জানা যাবে। ওটা এক্স-রে-ওপেক। দেখছ না এই লেখা!

শুধু এই?

তাছাড়া আবার কি?

ভারি অন্যায় হ'য়েছে দেরি ক'রে; এটা ঢের আগেই ক'রে ফেলা উচিত ছিল; আমার বুঝতে ভুল হ'য়েছে। দেখ, ভয় আমার বুদ্ধিকে ঘোলাটে ক'রেছে!

তাই তোমার আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ ক'রে—ডাক্তারদের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ স'পে দিতে হবে।

শক্ত তা আমার পক্ষে! আ-জন্ম আমি ভারি স্বেচ্ছাচারী কিনা! কোন বন্ধনের মধ্যে যেতে হ'লে সমস্ত মনটা বিদ্রোহ ক'রে উঠে!

পথে কালী বল্লে: মোটরের ক্লাচ্‌ বদলাতে হবে, গাড়ি আর টানচে না।

মজিয়েছ তুমি। গাড়ি নিয়ে যাও কারখানায়: দেখিয়ে কত খরচ হবে তার এষ্টিমেট নিয়ে এস; এই ত সবে কাজ সুরু হচ্চে—এখন অচল হ'লে চল্‌বে না, কালী!

আমাদের পৌছে দিয়ে—কালী গাড়ি নিয়ে চ'লে গেল।

সন্ধ্যা হবার আগে গোটা দু-তিন ছোকরা, কালো হাফ্‌ প্যাণ্ট আর শার্ট গায়ে এসে উপস্থিত; তারা গাড়িখানা খুলে দেখ্‌তে চায়, কি রকম মেরামত দরকার। শরৎ একখানা কাগজ বার ক'রে বল্‌লেন: মনমোহন, এ এষ্টিমেট্‌ কে ক'রে দিলে, তবে? সায়েব গাড়ি খুলে দেখেনি?

মনমোহন একটু হাস্‌লে, তারপর বল্লে: ওরা নিজেরা কিচ্ছুই করে না; আমার উপর ভার হ'য়েছিল: আমি আন্দাজে ক'রে দিয়েছি: কিন্তু কথা হচ্চে ক্লাচ্‌টা একেবারে বদলে দিতে হবে কিনা। যদি বদ্‌লাতে হয়ত, কোম্পানি ঐ হুইলটার দাম নেবে ছত্রিশ টাকা। আপনি যদি হাওড়া মোটর কোম্পানির কাছে ওটা কেনেন তো বড় জোর টাকা বারো নেবে; তাই ব'লছিলাম, ওটা বাড়ীতে করান না কেন?

তাতে কি সুবিধে হবে?

আপনার ছেচল্লিশের মধ্যেই গাড়ি রিপেয়ার হয়ে যাবে।

শরৎ ভেবে বল্লেন: তা যদি না হয়?

আমি কথা দিচ্চি, তাতেই হবে।

গাড়ির নতুন কন্‌ডিশন ক'রে দিতে—তোমার কি চার্জ্জ হবে, তাই আমাকে বল ঠিক ক'রে।

মনমোহন উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে: আগে আমি নিজে চালিয়ে দেখে আসি বাবু; তারপর আপনাকে ব'লব।

শরৎ বল্লেন, শোন মনমোহন, ঐ পুরোণো গাড়ির পিছনে আমি আর কিচ্ছু খরচ করতে চাইনে; হাজার টাকা দেব, আর ঐ গাড়ির এক্সচেঞ্জে—তুমি আমাকে একটা আট সিলিণ্ডার ফোর্ড গাড়ি কিনে দাও।

তাতে আপনার সুবিধে হবে না বাবু।

কেন?

নতুন গাড়ি, গোড়ায় গোড়ায় ট্রাবল দেবেই দেবে।

আচ্ছা তুমি একটা রাউণ্ড দিয়ে এস তো; তারপর কথা হবে।

মনমোহনের দল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শরৎ আলোগুলো সব জ্বেলে দিয়ে এসে ব'সে বল্লেন: বেশ ছিলাম যখন গাড়ি কিনিনি। কেনার পর থেকে খরচান্ত ক'রে ছেড়ে দিলে। একটা না একটা লেগেই আছে।...কি বল সুরেন, একটা নতুন গাড়ি নিয়ে—চল ভাগলপুর বেড়িয়ে আসি।

একটু সেরে: এখন ঠিক সে সময় আসেনি।

সে সময় আর কোনদিন হবে না।

ঠিক এম্নি কথাই ত দেওঘরে বলেছিলে। তারপর ত বেশ সেরেও গিয়েছিলে।

দেখ, মানুষের ভুল হ'লে একবারই হয়, বারবার হয় না।

বারবার হ'তেও ত দেখা যায়!

আমার তা হয় না।

সুপার-ম্যান?

একদল বন্ধু-বান্ধব এসে উপস্থিত। শরৎ নিজেকে সাম্‌লে, আট-ঘাট বেঁধে ব'সলেন—তাঁদের এন্‌টারটেন্‌ ক'রতে। নিজের মনের অবস্থাটা—কিছুতেই যেন প্রকাশ না হ'য়ে পড়ে!

ঠিক এই ধরণের জমায়েৎ থেকে দূরে থাকাই আমার অভ্যাস। শরৎ সেটা ভালো ক'রে জান্‌লেও সেদিন নিরিবিলি হ'লেই বল্লেন: কি ক'রছিলে তখন?

কখন?

ওরা যখন এসেছিল।

পড়া-শুনো।

পাঁচকড়ি মামার কথা ব'লছিলাম, শুনেছিলে?

ও তো নতুন নয়: অনেকবার শুনেছি।

ঐ উপদেশ আমি চিরদিন স্মরণ রেখেছি।

কিন্তু ঐ উপদেশ পাওয়ার আগে যে অনেক বই লেখা হ'য়ে গেছে তোমার।

হেসে বল্লেন: হোয়ে গেছে, না?

বল্লুম: জানি ওটি কেন লোককে বল, জানি।

কেন বল ত?

ওটি তোমারই ক্রীড্‌—তোমার পাঁচকড়ি মামার নয়। তাঁর উমা প'ড়েছ্‌ত!?

কি জানি মনে নেই।

হাস্‌লাম।

কেন?

আত্ম-গোপন? জানি, তুমি পড়েছ।

শরৎ হাস্‌লেন, মিটি-মিটি। বল্লুম: পাঁচকড়ি মামার কাছে থেকে ওটি পাবার আগে তুমি আমাদের সাহিত্য-সভার মিটিংএ প্রায় প্রতিদিন এ উপদেশ দিতে: যা কিছু লিখ্‌বে নিজের অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে:—মনে পড়ে?

ব'লতুম নাকি?

আবার তুমি এও বল যে, বাস্তব সাহিত্য নয়।

তাত' নয়ই: ব'লে উৎসাহ ভরে নল টেনে নিয়ে তামাক খেতে লাগ্‌লেন।

কিন্তু, বল্লুম, এ দুটো যে ভীষণ পরস্পর-বিরোধী মতবাদ, সে খেয়াল তোমার নিশ্চয়ই আছে!

ওতে মোটেই বিরোধ নেই, সুরেন। যারা বলে বিরোধ আছে—তারা ওটা তলিয়ে বুঝে দেখে না।

আচ্ছা, ধরে নেও আমি বুঝিনি। তোমাকে প্রশ্ন করি' বুঝে নেবার জন্যে?

বেশ কর।

ধর তোমার চরিত্র-হীনের সাবিত্রী। কোন মেসে কি তুমি সত্যিকার পেয়েছিলে ঐ মানুষটাকে?

মানুষটা সত্যি: ওকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। ওর ভাল জানি, মন্দ জানি। ও কি ভাবে জানি: ও কাকে পছন্দ করে জানি, কাকে ঘৃণা করে জানি। ও মানুষের ঐশ্বর্য্যের কোন তোয়াক্কা রাখে না—ও গরীবের মধ্যে সত্যি থাক্‌লে তাকে বেছে বার ক'রে নিতে জানে। এইগুলো সব বাস্তব, আর ওর চরিত্রের উপকরণ: মেসের বাসায় নিয়ে যাওয়া এবং সতীশের সঙ্গে এক ক'রে দেওয়া ওটাই লেখকের গল্প-সৃষ্টির কেরামতি। যাকে বলে সিচুয়েশন। যদি একটা মেসের ঝি, একটা বড় লোকের ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছে এই আমার গল্প হ'ত তো, তা হয়ত বাস্তব হ'ত; কিন্তু ওটাকে আমি সাহিত্য ব'লতে রাজি নই। আর্ট ফর আর্ট, আমি মানিনে। বাস্তব এবং আদর্শের মাঝামাঝি একটা পথ সাহিত্যের পথ; সেটাকে ধরতে পারা নির্ভর করে লেখকের প্রতিভার ওপর। ওখেনে সহজে সন্তুষ্ট হ'লে চলে না। ঐখেনে যে যত ধৈর্য্য ধ'রে আদর্শকে সত্যের স্বরূপে রূপান্তরিত ক'রতে পারে—সেই

তত বড় আর্টিষ্ট!···এর মধ্যে তো বিরোধ নেই কোন জায়গায় সুরেন।

বল্লুম, ঠিক এই কথা, এমনি ক'রেই তুমি আমায় বুঝিয়েছিলে দিনাজপুরে একদিন—সাবিত্রী চরিত্র নিয়ে নয়, সতীশ চরিত্র নিয়ে। সেদিন দৃষ্টান্ত নিয়ে ছিলে আমাদের ভাগলপুরের প্রতিবেশী—বাবুকে!

ঐ আমার মূলধন সাহিত্যের। পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে পর্য্যবেক্ষণ আর পরীক্ষণ ক'রে বাস্তবটাকে আমি আয়ত্ত করি। তার পরে তারই অনুপাতে আদর্শটাকে ধরি: ওটার গরমিলে গল্প বড় অসঙ্গত হয়। আর শেষ হ'ল পরিশ্রম, সেখেনে আমি কোনদিন কুড়েমি করিনে। আমার কথার লোভ নেই, আইডিয়ার মোহ নেই, শুধু কঠোর সংযম। একটাও বেশী কথা বলিনে; একটাও বে-ফাঁস কথা ঢুকতে দিইনে। দরকার হলে, কি পছন্দ না হ'লে পাতাকে পাতা উড়িয়ে দিতে কোন দরদ নেই—নিজের লেখার ওপর নির্দ্দয়তার শেষ নেই, আমার।

বেশ, তা হ'লে তোমার পাঁচকড়ি মামার উপদেশেই এই সব কর, ব'লতে চাও?

না, তা নয়: ওটা আমার মনের একটা সহজ আর স্বাভাবিক পদ্ধতি ছিল: কিন্তু উনি বলাতে জোর পেয়ে গেলুম: মনে হ'ল তা' হলে, আর কোন ভুল নেই ওতে।

তবে লোককে ও সব বল কেন?

শরৎ হাস্‌লেন, হেসে বল্লেন: যারা সত্যিকার বুদ্ধিমান তারা জানে যে, উপদেশ দিয়ে কেউ কাউকে সাহিত্য-সৃষ্টি করাতে পারে না।

তবে আমাদের চিরকাল যে ঐ উপদেশ দিলে?

নিজের আলোটা ফেলি তোমাদের পথে—যদি নিজের শক্তিতে চিনে নিতে পার, পথ তোমরা। (ক্রমশঃ)

মানুষ ও অমানুষ

"আলেয়া"

চিত্র

এক

পদ্মা নদীরই একটা চর···বয়স এর ষাট বছর···

প্রবীণেরা বলে, ভাঙ্‌বার আর কোন আশঙ্কা নেই···

নবীনেরা তা শুনে একটু হাসে

এই প্রবীণের দল এম্নি অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে ঘর বাঁধে, আর পদ্মা তাকে ভেঙে নিয়ে যায়...এমনি ক'রেই প্রবীণেরা একদিন এই নতুন-জাগা-চরে দলে দলে এসে উপস্থিত হয়।

দারুণ দুর্দ্দিনে তারা যাদের আনে নিজের প্রতিবাসী ক'রে—সম্পদের দিনে তাদেরই সঙ্গে লাগে প্রথম সংঘাত···জেগে ওঠে হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহ···

তাদের দমন করবার জন্ম আবশ্যক হয় থানার...থানার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে একদিন এই চরে হাট, দাতব্য চিকিৎসালয়, তশিলদারের কাছারী, স্যানিটারি ইন্‌সপেক্টরের অফিস প্রভৃতি সবই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

আজ এই চর পূর্ণযৌবনা এর শৈশবের ধূসরতার ওপর যৌবনের শ্যামশ্রী এক অভিনব কান্তি দান করেছে··বর্ত্তমানের মানুষ এর অতীতকে একেবারে ভুলে গেছে।

আজ তিন বছর হ'ল এই থানার অধীনে একজন রাজবন্দী থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছে···থানার পাশেই রাজবন্দীর খড়ো ঘর···তার কিছু দূরেই নদী—পদ্মার শাখা···।

একজন ক'রে রাজবন্দী আসে...তারপর একদিন সে চ'লে যায়...আবার নতুন একজন আসে···নতুন যে আসে সে আগেকার রাজবন্দীর কোন স্মৃতি খুঁজে পায় না·· কেবল একটা কুকুর আর একটা বেল-ফুলের গাছ একদিন যে সেখানে কেউ ছিল সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বোশেখ মাস—বেলা প্রায় সাতটা...রাজবন্দী সত্যেন নদীর ধার হ'তে বেড়িয়ে ফিরে আসে···তার চাকর শুকলালের সঙ্গে দেখা হ'তে সে বলে—"বাবু কোথায় গিয়েছিলেন ··আমি আপনাকে খুঁজছিলুম··· চা হয়ে গেছে"...

সত্যেন বলে—""যা, তবে চা নিয়ে আয়"···

—"এই হায়াটায় আগে একটা চেয়ার এনে দিই" বলে শুকলাল একটা চেয়ার এনে দেয়।

সত্যেন চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে বলে—"বা রে, তুই ত বেশ চা করতে পারিস · সুন্দর চা হ'য়েছে · "

শুকলাল বলে—"আপনার আগে যে বন্দীবাবু ছিলেন তিনি দিনে ছ' সাতবার চা খেতেন ··আমি কলের উনান জ্বেলে তৈরী করে দিতুম "

—"সে বাবু বাড়ী গেছে, না অন্য জায়গায় বদলি হয়েছে ?"

—"সে বাবু বাড়ী গেছেন, তাঁর যাবার আটদিন পরে কাল আপনি এসেছেন" বলে শুকলাল নিজের কাজে চলে যায়।

সত্যেন চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে তার নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ··বন্দীনিবাসে তিন শ' চার শ' লোকের সঙ্গে খেলাধুলা ক'রে, পড়াশোনা ও নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে কোন রকমে সময় কেটে যায় এখানে তাকে একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন কাটাতে হবে।

কাল সবেমাত্র এসেছে···এখনও সে নিজের মনকে স্থির করতে পারেনি···নানা বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তার মন চিন্তার জাল বুনে চলে··· হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়ে ছোট্ট ধুতি-পরা একটা লোক তার সামে এসে নমস্কার করে দাঁড়ায়।

সত্যেন প্রশ্ন ক'রে—"তুমি কে ?"

—"আমার নাম মহানন্দ, জাতে নমঃশূদ্র, এই গ্রামে থাকি, শুকলাল আমায় চেনে "

"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

—"বাড়ী আর কি বাবু—একটা মাথা গুঁজবার কুঁড়ে···ওই যে মাঠটা দেখছেন, ওরই শেষে···"

মহানন্দর সাড়া পেয়ে শুকলাল সেখানে এসে হাজির হয়·· বলে "কি মহানন্দ এসে জুটেছ···এখন কিছু হবে না · "

—"তুই বলিস কি শুকলাল বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলুম, আর তুই আমায় তাড়াতে চাস" বলে মহানন্দ সত্যেনের পানে চায়।

সত্যেন বলে—"শুকলাল তোর কাজে যা "

মহানন্দ বলে—' বাবু, আপনারা আছেন তাই দুটো একসঙ্গে খেতে পাই · জমি জায়গা নেই · বন্দীবাবুরা দয়া করে কিছু কিছু দেয় তাই চলে অভাব আছে বলে তাই না আপনাদের কাছে আসি · শুকলালের ব্যবহারটা দেখলেন বাবু···বলে 'সকালবেলা কিছু হবেনা' ··।"

—"ওর কথায় তুমি কিছু মনে ক'রনা, আমি সবে কাল এসেছি··· এখন ত তোমায় দেবার মত বিশেষ কিছু নেই মহানন্দ···ইংরাজি মাস শেষ হ'লে তুমি এস" বলে সত্যেন চেয়ারটাকে আর একটু ছায়াতে এগিয়ে নিয়ে যায়। মহানন্দ বলে—"তা'হলে বাবু মাসকাবারে আসব, কেমন ?"

সত্যেন বলে—"মাসকাবার হ'তে এখনও দিন চারেক বাকী··· টাকা আসতে আরও চার পাঁচদিন লাগবে...তুমি ন'দশ দিন পরে এস।"

—"আপনার টাকা আসবার পরই আসব" বলে সে মাটিতে শুয়ে পড়ে সত্যেনকে প্রণাম করে · মহানন্দ পায়ের ধুলো নেবার জন্যে হাত বাড়ায় · সত্যেন আপত্তি করে···তারপর সে চলে যায়। ··

শুকলাল রান্নায় ব্যস্ত থাকে···

সত্যেন নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে···কত কথাই তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে প্রথম যেদিন সে পুলিস কর্তৃক ধৃত হ'য়ে থানা 'লক-আপ'এ রাত কাটায় সেদিন আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদব্যথা তাকে বিশেষভাবে বিচলিত ক'রে তোলে...সেদিন তার সারারাত্রি চিন্তার মধ্য দিয়ে বিনিদ্র অবস্থায় কেটে যায় ভেতরে একটা টিক্‌টিকি আর বাইরের 'সেনট্রি' ছিল তার সেদিনকার রাতের সঙ্গী···এমনিভাবে সেখানে তার চোদ্দদিন কাটে · সেখানকার অবস্থা যেই ধীরে ধীরে স'য়ে আসে অমি তাকে আসতে হয় জেলে···'আণ্ডার ট্রায়াল প্রিজনার' হিসাবে , সেখানে একেবারে সব কিছু নতুন ··

আইন এবং শৃঙ্খলা সেখানে প্রতিপদে মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে এক ধাপ করে নীচে নামিয়ে দেয়·· একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগত··· বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ নেই . তবুও সেখানে কেউ দশ বছর, কেউ চোদ্দ বছর কাটিয়ে যায়।

প্রায় দেড় মাস এই আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতে করতে সে যে আর সকলের সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে ফেলে তা সে বুঝতে পারে না যেদিন প্রকাশ্য আদালতে খালাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বি, সি, এল, এ,তে বন্দী হয়ে সে প্রেসিডেন্সী জেলে নীত হয় সেদিন সে প্রথম বুঝতে পারে যে যারা পিছনে পড়ে রইল, তারা তার অন্তরকে কতখানি অধিকার ক'রে ছিল।

এম্নিভাবে প্রেসিডেন্সী জেল থেকে ক্যাম্প, ক্যাম্প থেকে সে এই গ্রামে এসে হাজির হয়।

বন্দী জীবনে যেন কোন স্থায়ী আশ্রয় নেই···নতুন আবর্ত্তন পুরোণো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক আসে—'চল'···চলতে হয়···তা ছাড়া যে উপায় নেই।

হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়ে···

দারোগা বাইরে হ'তে ডাকে—"সত্যেন বাবু আছেন নাকি ?"

—"আছি দারোগাবাবু, ঘরের ভেতরে আসুন" সত্যেন জবাব দেয়।

দারোগা বলে—'কি রকম লাগছে ? বড্ড ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে, না ?"

সত্যেন ঘাড় নেড়ে কথাটা অনুমোদন করে।

দারোগা বলে—"চর দেশ এম্নিতেই ফাঁকা···তার উপর সহরের লোকদের কাছে আরও ফাঁকা বলে বোধ হয়··আমি যখন এখানে প্রথম আসি তখন দিন পনর আমার যে কি বিশ্রী লেগেছিল তা' বলবার নয়···"

—"আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন" সত্যেন বলে।—"এই যে বসি" বলে দারোগা সামনের চেয়ারটায় বসে। তারপর বলে—"বিশেষ আপনার অসুবিধা হবে না···দিনকতক পরে মন বসে যাবে · আজ আপনার রান্না হ'য়ে গেছে নাকি ?"

—"কি জানি, শুকলাল বলতে পারে ?"

—"কইরে শুকলাল" দারোগা হাঁক দেয়।

—"কি রে রান্না চড়িয়েছিস নাকি ?" শুকলাল আসতে দারোগা জিজ্ঞাসা করে।

—"না চড়াইনি . এইবার চড়াব" শুকলাল উত্তর দেয়।

—"তবে যা, তোর নিজের রান্না করগে তোর বাবু আমার বাসায় খাবে…বুঝলি" বলে দারোগা ওঠবার উপক্রম করে।

সত্যেন বলে—"চল্লেন, না কি ?"

—"হাঁ যাই…আর কি করব…থানায় একদম কাজকর্ম নেই · সময় যেন কাটে না · মেশবার মত একটা লোক নেই · আমারও অবস্থা আপনাদেরই মতন · তবু আপনাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে এক রকম কেটে যায় · সংসারে আমি একা আর স্ত্রী…চরদেশে এলে লেখাপড়া হবে না ব'লে ছেলেমেয়েগুলোকে দেশ থেকে আনিনি"—

"আচ্ছা, এখানে রোজ ডাক আসে ত ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"না—একদিন অন্তর ··কাছেই পোষ্ট অফিস ··মিনিট পাঁচেকের পথ · পোষ্টমাষ্টারের একটা স্কুলও আছে…তা না হ'লে আট দশ টাকা মাইনের বিদেশী লোকের চলবে কেন ?" বলে দারোগা ঘর হ'তে বেরিয়ে আসে ··সত্যেনও পেছনে পেছনে আসে।

দারোগা জিজ্ঞাসা করে—"আপনার নন্-অফিসিয়াল ভিজিটর এসেছিল কি ?"

—"কই না, কেউ ত আসেনি।"

—"আজকালের মধ্যেই আসবে'খন, আপনি বেশী দেরী করবেন না…ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আমার সব তৈরী হ'য়ে যাবে" বলে দারোগা চলে যায়।

বিকেলবেলা সত্যেন বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হয়…শুকলাল এসে বলে—"বাবু বেড়াতে যাবেন নাকি ?"

—"হ্যাঁ, কেন বলদিকি ?"

—"এখনই তুফান আসবে, আজ আর বেরোবেন না।

—"তুফানটা কি ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"তুফান কি জানেন না ?…ঝড় · চরদেশে কালবোশেখীকে 'তুফান' বলে"

—"মেঘ নেই, তুফান হবে কিরে ?"

—"পশ্চিম আকাশে ওই যে কালো একটু মেঘ দেখছেন, ওই মেঘ দেখুন না, হু হু করে এগিয়ে এসে আকাশ ছেয়ে ফেলবে"

—"তাই নাকি…তবে তোর কথা শোনা যাক" বলে সত্যেন আর বেরোবার উদ্যোগ করে না।

দেখতে দেখতে কালো মেঘটুকু বিরাট দৈত্যের মত সমস্ত আকাশটা ঢেকে ফেলে বহুদূর হ'তে ঝড়ের গোঙানি শব্দ সত্যেনের কানে এসে পৌঁছায় ··সেই কালো মেঘের কোলে শুধু বেপরোয়াভাবে একঝাঁক বক সাদা কাগজের টুকরার মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলে।

শুকলাল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বলে—"বাবু এ দিকের জানালাগুলো আমি দিচ্ছি, ওদিকের গুলো আপনি বন্ধ ক'রে দিন…ঝড় এল বলে ·· ডাক শুনতে পাচ্ছেন না ?"

সত্যেন জানালা বন্ধ করতে করতে উন্মত্ত আবেগে অন্ধের মত ঝড় এসে পড়ে তার ঘরের পশ্চিমদিকে শুধু মাঠ · কোন কিছুর ব্যবধান নেই · সেই দিককার বেড়ার উপর ঝড়ের যত আক্রোশ। ওপরের চালখানা প্রতি মুহূর্ত্তে মড়মড় করতে থাকে…ঝড়ের এক একটা বেগ অন্ধ আক্রোশে পশ্চিম দিকের বেড়ায় মাথা খুঁড়ে চালের ওপরকার খড়-গুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়।

চরদেশের ঝড়ের গল্প সত্যেন শুনেছে বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই…জীবনে তাকে যে সেই ঝড়ের সঙ্গে এম্নি সামনাসামনি হ'য়ে দাঁড়াতে হবে সে কোনদিন তা কল্পনা করেনি।

ভয়ে তার মুখের কথা পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে যায়…বাইরে ঝড়ের প্রচণ্ড হট্টরোল চলতে থাকে সে একান্ত ভীত ও অসহায়ভাবে শুকলালের মুখের পানে চেয়ে থাকে।

শুকলাল বলে—"বাবু ভয় পাচ্ছেন কেন ? এ ঝড় এখনই থেমে যাবে…আধ ঘন্টার বেশী থাকবে না…আপনাদের দেশে ঝড় নেই" ?

—"নারে বাবা, আমাদের কলকাতায় যা কালবোশেখী হয় তা এর সিকির সিকি নয়।"

—"আমাদের এখানে বাবু এ রকম ঝড় প্রায় রোজই হয় এক একদিন এর চেয়ে ঢের বেশী হয়।"

—"তবেই হয়েছে…কোন্ দিন ঘর চাপা পড়ে থাকব ?"

—"এ ঘর পড়বে না বাবু…আমাদের এখানকার লোকেরা যেভাবে ঘর করে সে আপনি দেখলে আশ্চর্য্য হবেন। এ ঘরে সব শালের খোঁটা আর তাদের সব বাঁশের খোঁটা, তাও এতটুকু করে পোতা।"

—"তোদের এখানকার লোকের সাহস আছে . আমার তো এতেই বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে।"

—"ঐ দেখুন বাবু, ঝড় কতো কমে গেছে…আপনি থাকুন, আমি শুক্‌না কাঠগুলো তুলে আসি, বোধহয় বৃষ্টি হবে" বলে শুকলাল চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে ঝড় থেমে যায়…বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বাতাস বইতে থাকে।

ঝড় রুদ্রের মূর্ত্তি·· তাই সে বিলিয়ে চলে সারাদিনের তপ্ত পৃথিবীর দাহ আর ধুলো…বাতাস শান্ত…সে নিয়ে আসে মাটির বুকে স্নিগ্ধবর্ষণ ·· বৃষ্টির ধারা।

দুই

দু চার দিন যায়…সেদিন দুপুরবেলা সত্যেন বাড়িতে চিঠি লিখতে ব্যস্ত থাকে…শুকলাল এসে বলে—"বাবু, মোল্লা সাহেব আসছে…"

—"মোল্লা সাহেব কে—" কথা সত্যেনের শেষ হয়না ··

মোল্লা সাহেব ঘরের দোরে এসে হাজির হয় · বলে—"আদাব বন্দীবাবু"

—"আদব, ভেতরে আসুন" সত্যেন উত্তর দেয়।

মোল্লা সাহেব ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে।…

সত্যেন বলে—"আপনার পরিচয় পেলুম না ত ?"

—"আমি আপনার 'নন-অফিসিয়াল ভিজিটর' আমার নাম কোহেল মোল্লা…ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ক'দিন আসতে পারিনি…আজ এদিকে একটু দরকার ছিল, তাই আপনার সঙ্গে অমি দেখা করে গেলুম। আপনার কোন অসুবিধা নেই ত ?"

—"অসুবিধা আর কি ? তবে ঘরগুলা একটু মেরামত করা দরকার।"

—"ঘর এখন মেরামত করে ত লাভ নেই—এখন প্রায় রোজই তুফান হবে · সেই বর্ষার আগে তুফানটা একটু কমলে ঘর মেরামত হবে" মোল্লা সাহেব জবাব দেয়।

—"তা আপনি এত রোদে বেরিয়েছেন কেন ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"কি করব…'ইউনিয়ন বোর্ডের' এদিক পানে একটা জরুরী কাজ ছিল এখন চলি ··আদব," ব'লে মোল্লা সাহেব চেয়ার হ'তে উঠে পড়ে… তারপর বোশেখের সেই খর রৌদ্রের মাঝখানে মোল্লাসাহেব মাঠের পথ বেয়ে চলতে সুরু করে·· শুষ্ক ধূসর মাঠে রৌদ্র প্রতিফলিত হয়ে পথচারী পথিকের চোখকে ধাঁধিয়ে তোলে কোথাও এতটুকু ছায়া নেই।

সত্যেন জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে চ'লে যাওয়া মোল্লাসাহেবকে দেখতে থাকে দুনিয়ার পশুপক্ষীটা পর্য্যন্ত যখন নিভৃত ছায়া ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় না তখন এই মোল্লাসাহেব দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে পথে বেরিয়েছে অপরের কাজে শুধু খ্যাতি এবং প্রতিপত্তির লোভে · হায় মানুষ !

চারিদিক নিস্তব্ধ নিকটে কৃষ্ণচূড়ার গাছে একটা ঘুঘু শুধু তার করুণ সুরে সমস্ত চর প্রদেশটা প্রতিধ্বনিত করে তোলে · দাওয়ায় কুকুরটা জিভ বার করে ধুকতে থাকে।

সত্যেন তার অর্দ্ধ সমাপ্ত চিঠিখানা সাঙ্গ করে শুকলালকে দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেয় তারপর সে শুয়ে পড়ে।

শুকলালের বয়স বছর উনিশ · জাতে মুসলমান . এই চরেই তার বাড়ী…দুবছর ধ'রে সে রাজবন্দীদের কাজ করছে · রাজবন্দীদের সংস্পর্শে এসে তাঁর আচার ব্যবহার এমন বদলে গেছে যে তাকে আর চরের লোক বলে বিশ্বাস করবার উপায় নেই।

সত্যেনের যখন ঘুম ভাঙে তখন প্রায় পাঁচটা…থানায় হাজরী দিতে গিয়ে দারোগার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দারোগা বলে—"বেড়াতে যাবেন নাকি ?"

—"যাব ত মনে করছি তুফান আসবে না ত ?"

—"না আজ আর তুফান হবে না আপনি তুফানকে অত ভয় করেন কেন ? নেহাৎ যদি তুফানের সময় ঘরে থাকতে ভয় পান ত থানায় এসে উঠবেন··আমার 'ইন্‌সপেক্‌সন'-রুম ত খালিই পড়ে থাকে ..আপনি একটু বসুন…আমি বাড়ী থেকে এখনই একবার ঘুরে আসছি" বলে দারোগা চ'লে যায়…থানার পাশেই তার কোয়ার্টার।

নদীর ধার দিয়ে সত্যেন দারোগার সঙ্গে চলতে থাকে · পিছন হ'তে কুকুরটা কখন এসে তাদের পিছু নেয় জানতে পারে না…হঠাৎ কিসের একটা সন্ধান পেয়ে সে .জলের ধারে ছুটে যায়…দারোগার ত নজরে পড়ে…বলে—"এই যে ব্যাটা এসেছে দেখছি, আপনাদের কুকুরটা খুব প্রভুভক্ত যখন যে আসে তারই অনুরক্ত হ'য়ে পড়ে"।

সত্যেন বলে—"ও যেন ওর অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পেরেছে ওর নিত্য মনিব-বদলান ব্যাপারটায় ও যেন অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে · মজা দেখুন, আমাদের চাকরটার বড় একটা পেছু নেয় না আমি কদিন মোটে ত এসেছি, এরই মধ্যে ও আমায় বেশ চিনে নিয়েছে।"

—"আসল কথা সত্যেনবাবু, ভাল যত্ন পেলে সবাই বশ হয় ·· আপনাদের কাছে ও পেট পুরে খেতে পায়, সারা চর প্রদেশে কে এমন আছে যে একটা কুকুরকে পেটপুরে আলাদা খেতে দেবে পাত কুড়ান যা ফেলা তাই কুকুরের বরাদ্দ" ব'লে দারোগা একটু দাঁড়ায়। তারপর বলে—"চলুন গ্রামের মধ্যে ঢোকা যাক।"

—"চলুন" বলে সত্যেন দারোগার দেখাদেখি ডানদিকের পথ ধরে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে…হঠাৎ সত্যেন বলে—"আজ আপনার সেই কোহেল মোল্লা এসেছিল।"—

"তারপর কি বল্লে ?" দারোগা জিজ্ঞাসা করে।

—"কি আর বলবে···এসেছিল যখন তখন বোধহয় বেলা একটা এদিকে কোথায় কাজ ছিল, তাই একবার আমার কাছ দিয়ে হ'য়ে গেল।"

ইতিমধ্যে তারা গ্রামের মধ্যে এসে পড়ে···পথে যার সঙ্গে দেখা হয় সেই দারোগাকে অভিবাদন জানায় সত্যেনকে দেখে অনেকেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ··তাদের কাছে দারোগা সত্যেনের পরিচয় দেয় · সঙ্গে সঙ্গে সত্যেনও একটা অভিবাদন লাভ করে।

এক সময় দারোগা একটা জীর্ণ চালা দেখিয়ে সত্যেনকে বলে—"এই আপনার মহানন্দর বাড়ী, দুই একদিনের মধ্যেই তার দেখা পাবেন —সে ডেটিনিউদের কাছ হ'তে প্রতি মাসে ভিক্ষাস্বরূপ কিছু নেবেই।"

সত্যেন বলে—"সে ত আমি আসার পরদিনই আমার কাছে গিয়েছিল···তবে কিছু পায়নি·· মাস কাবার হয়ে গেলে আস্‌তে বলেছি।"

—"লোকটার সত্যই অভাব . জমি জায়গা নেই…তবে ওর বিশেষত্ব ও ভিক্ষা করে অধিকারের দাবীতে, দয়াপ্রার্থী হয়ে নয়।"

—"কি রকম ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"দু'চার দিন তার সঙ্গে ব্যবহার করলেই টের পাবেন" বলে দারোগা হাসে।

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটে · তারপর গ্রামের দু'একজন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ··তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে দারোগা অগ্রসর হয়।

সেদিন হাটবার পাশেই পোষ্ট অফিস…মহানন্দ এসে ডাকে··· "মাষ্টার মশাই আছেন নাকি ?"

—"কেন কি খবর, মহানন্দ ?" পোষ্টমাষ্টার জিজ্ঞাসা করে।

সে ভেতরে ঢুকে চুপি চুপি মাষ্টারমশাইকে বলে—"বন্দীবাবুর টাকা এসেছে কি ?"

—"কাল এসেছে, কেন, পাবার কিছু আশা আছে ?"

—"আশা ত তাই করি, টাকা এলে আসতে বলেছে।"

—"দেখ একবার গিয়ে, কি হয়।"

—"বাবুদের কাজকর্ম্ম করতে হয় না সরকার থেকে টাকা পায়··· তা থেকে আমার পাওনা—যা বরাবর পেয়ে আসছি, না দিলে চলবে কেন ?" ব'লে মহানন্দ সেখান হ'তে চলে যায়।

সত্যেনের বাসায় আসতে মহানন্দর সঙ্গে শুকলালের সাক্ষাৎ হয়।

—"কি মহানন্দ, আজ এসেছ কেন·· বাবুর টাকা ত আসেনি" বলে শুকলাল হাসতে থাকে।

—"কে বলেছে শুনি . মিথ্যে কথা বলিস কেন ? · বাবু কোথায় ?"

—"বস আসছে...থানায় গেছে।"

—"হ্যাঁরে শুকলাল, বাবু সিগ্রেট খায় ?"

—"না।"

—"তবে আর কিসের বাবু · আগেকার বন্দীবাবু কি সিগ্রেটটাই না খেত' কি বল্ শুকলাল ?"

ইতিমধ্যে সত্যেন এসে পড়ে...শেষ কথাটা তার কানে যায়··· জিজ্ঞাসা করে—"কি বলবে শুকলাল ?"

—"না এই আপনি কোথায় গেছেন, তাই" মহানন্দ জবাব দেয়।

সত্যেন শুকলালকে বিছানার তলা থেকে একটা সিকি এনে দিতে বলে...শুকলাল একটা সিকি এনে মহানন্দর হাতে দেয়।

মহানন্দ সিকিটার পানে চেয়ে বলে "এই মোটে বাবু ?"

"তবে তুমি কত চাও ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"এতো বাবু দু'হাটের খরচ...পরে তাহ'লে আর কিছু দিতে হবে।"

—"কেন, তোমায় আরও কিসের জন্ত দিতে যাব ?"

—"আমার নেই আপনারা না দিলে খাব কি ?"

—"কাজ করনা কেন ?"

—"চোখে ভাল দেখতে পাই না, নইলে বাবু আর কাজকর্ম্ম করি না · স্ত্রী, দুটো ছেলে." তিনটে মেয়ে বড় মেয়েটার বিয়ে দিয়েছি, তা সেটাও প্রায় এখানে থাকে—এতগুলো পেট কি ক'রে চালাই বলুন দেখি ?"

—"তোমার বাড়ীর মেয়েরা ত ধান্ ভান্তে পারে, আর বড় মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দাও না কেন ?"

—"ধান পেলে ত ভানবে বাবু···ধান কেনবার টাকা কই···সত্যি কথা বলতে কি, লোকেও কেউ বিশ্বাস করে আমাদের ধান ভানতে দিতে চায় না গরীব ব'লে পাছে খেয়ে ফেলি। আর মেয়ের কথা যে বল্লেন, তাকে অনেকবার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়েছি প্রত্যেকবার সে বেটী সেখান হ'তে পালিয়ে আসে · এলে আর যেতে চায় না···এবার মনে করেছি তার মাথা মুড়িয়ে, গলায় মালা দিয়ে বাড়ীতেই রেখে দেব।"

—"তা হ'লে কি সুবিধা হবে ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"সুবিধা আর কি, মেয়েটা যদি নষ্ট দুষ্ট হয় সমাজে আমায় কেউ ঠেলতে পারবে না।"

—"বাঃ', তোমাদের সমাজের বেশ নিয়ম ত তা এখন যাও···এর পর যা হয় দেখা যাবে" বলে সত্যেন বেরিয়ে যায়।

শুকলাল হাট হ'তে তরীতরকারী কিনে ফেরবার সময় এক ডিমওলাকে ডেকে আনে···

পাশের পথ দিয়ে হাটে যেতে যেতে কোহেল মোল্লা জিজ্ঞাসা করে—"কিরে শুকলাল, ডিম কিনছিস ?···তোর বাবু কোথায় ?"

—"বাবু বেড়াতে গেছে মোল্লা সাহেব" শুকলাল জবাব দেয়।

মোল্লা সাহেব হাটে গিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে গ্রামের মাতব্বরের সঙ্গে আলাপ করে···শুকলালকে ডিম দিয়ে ডিমওলা হাটের মধ্যে ঢুকতে মোল্লা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়...মোল্লা সাহেব এগিয়ে এসে বলে—"এই ব্যাটা, ওখানে কার হুকুমে ডিম দিতে গিয়েছিলি ? জানিস তোরে হাজতে পুরতে পারি।"

মোল্লা সাহেবের কথা শুনে মাতব্বর ও এগিয়ে আসে। ডিমওলা উত্তর দেয়—"কার হুকুমে আবার ?···ডিম নেবার জন্তে ডেকেছে তাই না গেছি কেন সেদিন দারোগাবাবুর সামেই ডিম দিয়ে এসেছি...কই তিনি ত কিছু বলেন নি ?"

—"আরে ব্যাটা দারোগাবাবু দয়া করে ছেড়ে দিয়েছে···আমরাও সরকারের লোক ··আমাদের উপর হুকুম আছে কেউ বন্দীবাবুর ওখানে গেলে হাজতে পুরতে।"

—"আমি ত তা জানতুম না মোল্লা সাহেব" ডিমওলা আর্ত্তস্বরে উত্তর দেয়।

—"যাক এবার কিছু বললুম না···ডিম কি দরে দিচ্ছিস ?" মোল্লা সাহেব জিজ্ঞাসা করে।

—"দু পয়সা হালি" (চারটা) বলে সে তার মাথা হ'তে ঝাঁকা নামায়। মাতব্বর বলে—'কতটা ডিম চাই মোল্লা সাহেব।"

—"গোটা দশেক হ'লে হবে" মোল্লা সাহেব উত্তর দেয়।

মাতব্বর দশটা ডিম বেছে মোল্লা সাহেবের ঝাড়নে বেঁধে দেয়। মোল্লা সাহেব পকেট হ'তে তিনটে পয়সা ফেলে দেয়।

ডিমওলা হাত জোড় ক'রে বলে—"আর দুটো পয়সা দেন মোল্লা সাহেব।"

—"আরে ভাই ওই নাও চেন ত ওরে ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট··· সরকারের লোক···যে কাজ করেছ আজ যে হাজতে যেতে হ'ল না এই ঢের" বলে মাতব্বর মোল্লা সাহেবের সঙ্গে ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়।

তিন

পরের দিন সকালবেলা মহানন্দ সত্যেনের বাসায় এসে হাজির হয়··· জিজ্ঞাসা করে—"শুকলাল তোর বাবু বেড়িয়ে ফেরে নি ?"

—"না।"

তারপর একটু চাপা সুরে বলে—"শুকলাল চারটী চাল দে না··· কাল হাট থেকে পাঁচ পোয়া চাল নিয়ে গেছি কাল রাতেই শেষ হয়ে গেছে।"

—"কেন কাল ত বাবু চার আনা পয়সা দিয়েছিল?" শুকলাল জিজ্ঞাসা করে।

—"দিলে কি হবে রে শুকলাল,...চালওলা হাতে পেয়ে পাওনা পয়সা কেটে নিয়ে, পাঁচ পোয়া মাত্র চাল দিয়েছে···আজ তুই না দিলে খেতে পাব না।"

—"বাবু আসুক, না জিজ্ঞেস করে আমি দিতে পারব না।"

—"তুই দে না ভাই, দুটো চাল দিলে তোর বাবু কিছু বলবে না··· আর তোর বাবু জানবেই বা কি করে?" বলে মহানন্দ শুকলালের হাত দুটো চেপে ধরে। শুকলাল হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—"বল কি মহানন্দ···তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়? তুমি আমায় চুরি করতে বলছ···এতো ভাল নয়···এমন কথা আর কোন দিন যেন না শুনি···এবার কিছু বলব না...এর পর হ'লে বাবুকে বলে দেব।"

মহানন্দর মুখখানা নিমেষে এতটুকু হ'য়ে যায়···সে 'কিন্তু' হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রে—"তোর বাবু এখনই আসবে ত' রে?"

—"হাঁ, বাবু এখনই আসবে তুমি বস না" বলে শুকলাল ঘরের মধ্যে চলে যায়।

মহানন্দ বাইরে বসে থাকে মাথার উপর দিয়ে একখানা উড়ো-জাহাজ শব্দ করতে করতে চলে যায়···মহানন্দ ওপর পানে হাঁ করে তাই দেখে এমন সময় সত্যেন এসে পিছন হ'তে জিজ্ঞাসা করে—"কি মহানন্দ, সকালবেলা যে উড়ো জাহাজ দেখছ?"

—"হাঁ বাবু, সকালবেলা এম্নি এলুম আপনার কাছে ·আচ্ছা বাবু, ওই উড়ো জাহাজকে ইচ্ছা করলে আপনি নামাতে পারেন না?" মহানন্দ জিজ্ঞাসা করে।

—"তোমার কি মনে হয়?"

—"আমার মনে হয় পারেন···আগেকার বন্দীবাবু পারতেন।"

—"আগেকার বন্দীবাবু পারত নাকি?" বলে সত্যেন হাসে।

মহানন্দ বলে—"আপনি হাসছেন বাবু ··কিন্তু আগেকার বন্দীবাবুর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এই যে খাসমহলের পুকুর দেখছেন, এতে তশিলদার কিছু মাছ ছাড়ে···আগেকার বন্দীবাবু একদিন সেই মাছ ধরতে যান; তশিলদার মানা করতে তিনি বল্লেন—'সরকারের পুকুর, আপনিও সরকারের লোক আমি ও সরকারের লোক · আপনি যদি মাছ ধরতে পারেন আমিই বা না পারব কেন? এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি লাগবার যোগাড় ··তারপর দারোগাবাবু এসে মিটিয়ে দেন। তাতে বন্দীবাবু বলেছিলেন—'কাল সকালের মধ্যে যদি পুকুরের মাছ না মেরে দিতে পারি ত আমি বামুন নই; আশ্চর্য্য বাবু ·· তার পরদিন সকালবেলা দেখা গেল কতক মাছ মরে ভাসছে, আর কতক খাবি খাচ্ছে। আপনি হাসছেন···বিশ্বাস করছেন না ·· শুকলালকে বরং জিজ্ঞাসা করুন সত্যি কিনা?"

—"তোদের সে বাবু তাহ'লে কিছু মন্ত্র জানত নিশ্চয়।"

—"কি করে জানব বলুন, তবে যা চোখে দেখেছি তাই বল্লুম" মহানন্দ উত্তর দেয়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে · হঠাৎ এক সময় মহানন্দ বলে বসে—"বাবু চারটী চাল না দিলে আজ খেতে পাব না।"

—"তাতে আমার কি?" সত্যেন জবাব দেয়।

—"সে যদি বলেন, তাহ'লে কথা চলে না?···আপনারা না দিলে কে দেবে?" মহানন্দ বলে।

—"আমরা ত দানছত্র করতে আসিনি আর আমি তোমার মত কুঁড়ে লোককে প্রশ্রয় দিই না" বলে সত্যেন শুকলালকে ডেকে বাহিরে ছায়ায় দুখানা চেয়ার দিতে বলে।

মহানন্দ চুপ করে বসে থাকে। সত্যেন বলে "এইবেলা পালাও মহানন্দ, দারোগা আসছে।"—"চারটী দেন বাবু চাল · এই শরীর নিয়ে বাবু খাটতে পারলে আর খাটি না," বলে সে নিজের চেহারাটার পানে চেয়ে দেখে।

ইতিমধ্যে দারোগা এসে পড়ে সত্যেন দারোগাকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দেয়। দারোগা জিজ্ঞাসা করে—"মহানন্দ কি বলে?"

—"ও কাল চার আনা পয়সা নিয়ে গেছে, আজ আবার চারটী চাল চায় কুঁড়ের একশেষ তবু কাজ করবে না ··কি আব্দার।"

দারোগা বলে—"আগেকার ডেটেনিউরা আস্কারা দিয়ে ওর মাথাটী খেয়ে দিয়েছে সেদিন ওকে বল্লুম বাড়ীর ভেতরকার জঙ্গলক'টা সাফ করে দে, একদিনের খোরাক দেব তা দিলে না, চ'লে এল।"

—'ও সব বাবু জোন মজুরের কাজ, ও তো আমার কাজ নয়" মহানন্দ উত্তর দেয়।

সত্যেন বলে "ভিক্ষে করাটাও ত ভিখিরীর কাজ··তা' ভিখিরীর কাজ করতে ত লজ্জা করে না?"

দারোগা সত্যেনকে বলে—"Don't indulge him, drive him away···lazy chap." (আস্কারা দেবেন না, যেমন কুঁড়ে, তাড়িয়ে দিন)

মহানন্দ অবস্থা সুবিধাজনক নয়, বেশ বুঝতে পারে·· তারপর আস্তে আস্তে উঠে চলে যায়। দারোগা বলে—"লোকটার একটা গুণ আছে সত্যেনবাবু, ভাল সারেং বাজাতে পারে।"

--'তাতো জানতুম না···তাহ'লে একদিন শুনিয়ে দিতে বলতুম।" সত্যেন উত্তর দেয়।

দারোগা বলে—'ব'লে দেখবেন না আগেই কত দেবেন কবুল করে নেবে তারপর অন্য কথা।"

—"আচ্ছা লোক ত," সত্যেন জবাব দেয়।

দারোগা বলে—"আবার কাল আপনার একখানা চিঠি এসেছিল আমার 'কেয়ারে'...আমি ত আপনাকে দিতে পারি না ডি, আই, বি-তে পাঠিয়েছি···পরের চিঠিতে আপনি ওঁদের এস, পির কেয়ারে চিঠি দিতে

লিখে দেবেন। নইলে শুধু শুধু আপনার চিঠি পেতে অনেক দেরী হবে, একে ত এখানে এক দিন অন্তর ডাক।"

—"আমি ত তাই লিখে দিয়েছি…ওটা হয়ত আমার সে চিঠি পাবার আগে লেখা।" সত্যেন উত্তর দেয়।

—"তা হ'বে…এই কথাটাই বলতে এসেছিলুম এখন চলি" বলে দারোগা চলে যায়।

সত্যেন নিজের ঘরে এসে বিছানার ওপর বসে জানালা দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে থাকে…নদীর অপর পারে দিগন্তের বুকে সবুজ গাছের ঝোপের আড়ালে অস্পষ্ট গ্রামগুলো চোখের উপর ভেসে ওঠে; সকাল বেলা হতেই সোনালি রোদের মধ্যে একটা উত্তপ্ত জ্বালার আভাস পাওয়া যায় সত্যেন সেই রোদের মধ্যে দিয়ে দূরের পানে চেয়ে নিজের চিন্তার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়…মন তার উধাও হ'য়ে ভেসে চলে কত কিছুকে উপলক্ষ ক'রে…

হঠাৎ তার মনে পড়ে—

"বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোনে
রহিব আপন মনে
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
　　　　করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে
　　তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
　　ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের ক'দিনের কাঁদা আর হাসা।"

সত্যেনও একদিন এম্নি একটা পরিস্থিতিকে তার জীবনের ক' দিনের কাঁদা আর হাসায় ভরিয়ে তুলতে চেয়েছে; তখন এম্নি ধারা কল্পনার মধ্যে সে কত আনন্দ পেয়েছে…মনে মনে কত দিন সে এম্নি একটা নিখুঁত ছবি এঁকে নানা রঙে তাকে রাঙিয়ে তুলেছে সে দিন সে ভেবেছে বাস্তবে হয়ত এম্নি পরিস্থিতির মধ্যকার জীবন তার একান্ত কাম্য; কিন্তু আজ?…তার অতীতের কল্পনা বাস্তবতার রূপ নিয়ে তাকে যে এমনভাবে ছলনা করবে তা সে ভাবতে পারেনি ধরণীর এক কোনে একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা, সন্ধ্যার তারা, জলের ওপারে ভোরের প্রথম আলো, আজ সবই সে পেয়েছে; তবুও সে সুখী নয়—সে আজ ফিরে পেতে চায় তার সহরের বুকে আত্মীয়-স্বজনপরিবৃত কোলাহল-ভরা আনন্দমুখর গৃহখানা।

বাইরে থেকে শুকলাল বলে—"বাবু, একবার বাইরে আসুন, কারা ডাকছে…"

সকলেই মুসলমান…সত্যেন বেরিয়ে আসতে তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলে—"আদব, বাবু"—

—"আদব…ব্যাপার কি?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"বাবু, আপনার কাছে এসেছি…আমাদের একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে" লোকটা উত্তর দেয়।

সত্যেন বলে—"কিসের দরখাস্ত খুলে বল।"

—"আমরা বাবু ঝাউকান্দায় থাকি…কোহেল মোল্লা আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট…আমাদের গ্রামে একটা টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে উনি ব'লে ক'য়ে সেটা নিজের বাড়ীর দোর গোড়ায় বসিয়েছেন। এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে গ্রামের লোকেরা প্রায় সব সময়ই সেটা থেকে জল নেয়। দুপুর বেলা জল নিলে শব্দ হয় তাতে ওঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয় ব'লে উনি দুপুর বেলা ওটা চাবি দিয়ে রেখে দেন…আমরা সকলে মিলে ওঁর কাছে অনেক দরবার করেছি, কিন্তু কোন ফল হয়নি…সরকারের দেওয়া টিউবওয়েল উনিত চাবি দিয়ে রাখতে পারেন না, কিন্তু সে কথা কেউ বলতে সাহস করে না। তাই আপনি যদি আমাদের হ'য়ে একটা দরখাস্ত করে দেন তা হ'লে আমাদের বড্ড উপকার হয়" বলে লোকটা চুপ করে।

—"আচ্ছা, তোমরা দাঁড়াও আমি লিখে দিচ্ছি" বলে সত্যেন ঘরে এসে ম্যাজিস্ট্রেটকে একখানা দরখাস্ত লেখে, তার পর সেটা তাদের এনে দেয়। লোক কটা তাকে সেলাম জানিয়ে চলে যায়।

সে দিন বিকেলের দিকে আবার তুফান সুরু হয়…সত্যেনের বাইরে বেরোন হয়না…সন্ধে বেলা শুকলালের সঙ্গে বসে গল্প করে…কথায় কথায় সত্যেন শুকলালকে জিজ্ঞাসা করে—"হাঁরে শুকলাল, তোর আগেকার বাবু মন্ত্র ব'লে খাসমহল পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দিয়েছিল?"

শুকলাল হেসে উত্তর দেয়—"না বাবু, স্যানিটারিবাবুর কাছে সেই যে কি সাদা গুঁড়ো পাওয়া যায়, অসুখের সময় লোকের বাড়ীতে ছড়ায় সেই গুঁড়ো এনে বালতির জলে গুলে অনেক রাত্রে বাবুতে আর আমাতে পুকুরের জলে ঢেলে দিয়েছিলুম…আমারে বাবু সে কথা কাকেও বলতে মানা করে দিয়েছিল; লোকে ত জানে না, তারা জানে বাবু কি মন্ত্র জানত।"

শুকলালের কথা শুনে সত্যেন হেসে ওঠে…বলে—"তাই তারা বিশ্বাস করে সে বাবু উড়োজাহাজ পর্য্যন্ত নামিয়ে আনতে পারত… তোদের চরের লোকেরা কি বোকা।"

শুকলাল বলে—"নইলে বাবু লোকে কাসেম ফকিরকে অত ভয় করে…সে ফকির কি করে জানেন বাবু?…যার ক্ষেতে ভাল ধান হয় তাকে বলে আমায় এত টাকা দাও কিংবা এত ধান দাও, নইলে তোমার ক্ষেতে শিল চালিয়ে দেব, লোকে ভয়েতে সে যা চায় দেয়।"

—"শিল চালিয়ে দেওয়াটা কি?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"বৃষ্টির সময় যে শিল পড়ে বাবু লোকের বিশ্বাস যে ওই ফকির যার ক্ষেতে ইচ্ছে শিলা বৃষ্টি নামাতে পারে" শুকলাল জবাব দেয়।

—"তুই বিশ্বাস করিস না ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে ··

—"না বাবু, এখন আর ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস নেই" সে জবাব দেয়।

—"ডেটিনিউদের কাছে চাকরী করে তোর বুদ্ধি একেবারে খুলে গেছে...এখন যা রান্নার ব্যবস্থাটা সকাল সকাল ক'রে ফেল দেখি" বলে সত্যেন একখানা বই নিয়ে পড়তে বসে।

চার

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সত্যেন দেখতে পায়—ক'দিনের যত্নের প্রতিদানস্বরূপ বেলফুল গাছটা গোটা দুয়েক ফুল তাকে উপহার দিয়েছে ফুল দুটো হাতে নিয়ে সে মাঠের পথে বেড়াতে বেরোয় · তার কুকুরটা তাকে অনুসরণ করে। সত্যেন পথে চলতে চলতে ভাবে—হয়ত তারই মতন একজন বন্দী জীবনের দুঃসহ ব্যথা ভুলবার জন্যে ওই বেলফুল গাছটা একদিন নিজ হাতে মাটিতে পুতেছিল · ওই গাছটাকে বড় করে তুলবার যত্নের মধ্যে দিয়ে হয়ত সে তার অনেকখানি অবকাশ যাপন করত এবং অন্যমনস্ক থেকে নিজের বর্ত্তমান অবস্থা ভুলে থাকত নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গীস্বরূপই হয়ত একান্ত দুর্দ্দিনে কুকুরটাকে সেই প্রতিপালন করতে সুরু করেছিল ; গাছ এবং পশু এই দুটোর ভিতর সে নিজের অবলম্বন খুঁজতে চেয়েছিল.. পেয়েছিল কিনা সেই জানে। তারপর কতদিন চলে গেছে · কত রাজবন্দীই উত্তরাধিকারসূত্রে এ দুটো জিনিস অযাচিতভাবে পেয়েছিল···এই ফুল দুটোর মধ্যে যেন তাদের সকলকার স্পর্শ আজ বেঁচে রয়েছে · তারা চ'লে গেছে.. রেখে গেছে তাদের স্মৃতি . তাদের একান্ত ব্যথার দান।

—"বন্দীবাবু, কোথায় যান ?" হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়ে··· সত্যেন মুখ তুলে চেয়ে দেখে একজন গ্রামবাসী · সে উত্তর দেয়—"এম্নি এদিকে একটু বেড়াতে যাব।"

"—চলুন বাবু, আমার বাড়ী যাবেন ?" বলে লোকটা সত্যেনকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ দেখায়।

মাঠের পথ তখন প্রায় শেষ হ'য়ে আসে . সুমুখেই গ্রাম·· সত্যেনকে চুপ করে থাকতে দেখে সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে লোকটা বলে—"ওই ত বাবু, আমার ঘর দেখা যাচ্ছে পাঁচ সাত মিনিটের বেশী লাগবে না।"

—"চল তবে" ব'লে সত্যেন তার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

লোকটা একজন অবস্থাপন্ন মুসলমান, সত্যেনকে একখানা জল-চৌকিতে বসতে দেয়।

সত্যেন জিজ্ঞাসা করে—"এ গ্রামের নাম কি ?"

—"মোল্লা ডাঙ্গি।"

—"কোহেল মোল্লার বাড়ী তাহ'লে এই খানেই।"

—"হাঁ বাবু, আর একটু এই পথ ধরে পশ্চিমে গেলেই তার বাড়ী।"

—"মোল্লা সাহেব লোক কি রকম ?"

—"আর বলেন কেন বাবু···সরকার থেকে বুঝি পাটচাষ কমাবার হুকুম হ'য়েছে···এতটুকু জমিতে যার বেশী পাট বোনা হয়েছে ওই কোহেল মোল্লা তার গাছ ভেঙ্গে চুরে তচ্‌নচ্‌ করেছে · আর যার অনেকটা বেশী জমিতে বোনা হয়েছে তার ত কথাই নেই গরীব লোক কিছু বলতে বা করতে পারে না...সবাই বাবু ওরে গালাগাল না দিয়ে জল খায়না আশ পাশে আরও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আছে তারা এ রকম করেনা · আল্লা কি বাবু মনে করেছেন এত অধর্ম্ম সইবে ? আর ওরই বা পয়সা হ'ল কোথা থেকে···ওই পাট বেচে না ? আর এখন সেই পাটের ওপর এত জুলুম। সরকার থেকে একটা টিউবওয়েল দিয়েছে ওর দোরের গোড়ায়...তা দুপুরবেলা কারেও জল নিতে দেয় না বলে "

সত্যেন বাধা দিয়ে বলে' ওঠে—"সে সব শুনেছি : তা ও প্রেসিডেণ্ট হ'ল কি ক'রে ?"

—"বাবু টাকায় কিনা হয় তখন লোকে টাকা খেয়ে ওকে প্রেসিডেণ্ট করেছে, আর এখন সবাইকে ভুগতে হচ্ছে ; টাকা খরচ করে এ প্রেসিডেণ্ট হওয়ার বাবু মানে বুঝি না লাভটা কি? শুধু পরের মন্দ করবার ফিকির, আর নিজেদের মধ্যে দলাদলি বিবাদ বাঁধিয়ে তোলা। আপনারা যদি এই প্রেসিডেণ্ট হওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন তাহ'লে দেশের একটা মস্ত কাজ হয় এও ত একটা স্বদেশী কাজ বাবু—" বলে লোকটা সত্যেনের উত্তরের অপেক্ষা করে।

সত্যেন হেসে বলে—"তোমরা ভাল লোককে প্রেসিডেণ্ট করনা কেন ?"

—"যে ভাল লোক সে এসব ঝঞ্ঝাটে আসতে চায়না বাবু·· আমার এই তিনকুড়ি বয়স হ'ল, গাঁয়ের অবস্থা আগেও যা দেখেছি এখনও তাই দেখছি ইউনিয়ন বোর্ড হয়ে কি আর উন্নতি হয়েছে ?"

সত্যেন উঠে পড়ে · বলে—"মিঞা সাহেব আজ চলি বেলা হ'ল।"

—"আসুন বাবু, আদব্‌" বলে সে খানিকটা সত্যেনকে এগিয়ে দেয়। সত্যেন যখন ঘরে ফিরে আসে তখন বেলা বেড়ে যায় · বৈশাখের খররোদ তার সমস্ত শরীর অবসন্ন করে তোলে—ঘরে এসে সে শুয়ে পড়ে···

শুকলাল জিজ্ঞাসা করে—"বাবু, সকালবেলা কোথায় গিছলেন ? ·· আজ সকালে ত কিছুই খেলেন না···স্নান করে নিন, আমার রান্না হয়ে গেছে।"

—"একটু পরে স্নান করছি...গায়ের ঘামটা মরুক" ব'লে সত্যেন শুকলালকে পাখাখানা দিতে বলে। সে তাড়াতাড়ি পাখা নিয়ে এসে সত্যেনকে হাওয়া করে।

সত্যেন বলে—"পাখা আমায় দে, তোকে হাওয়া করতে হবেনা।"

—"কেন বাবু, আমি হাওয়া করলে কি হয়েছে ?" সে উত্তর দেয়।

—"হবে আর কি ? আচ্ছা শুকলাল, তোর আগেকার বাবুদের জন্য মন কেমন করে না ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"করে না বাবু? করলেই বা কি করছি আপনারাও থাকতে আসেন নি?" শুকলাল উত্তর দেয়।

—"তবে আমায় এত যত্ন করিস্ কেন? আমিও যখন চ'লে যাব তখন ত আবার তোর মন খারাপ হবে? হ্যাঁ রে, বাবুরা যখন চলে যায় তখন তোর চোখে ল আসে?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

শুকলাল কোন কথা বলতে পারে না; তার চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। সত্যেন ব —"কি হ'লরে তোর তুই একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি।"

শুকলাল নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেয়—"একবার বাবু আমার কলেরা হয় তখন গ্রামে চারদিকে কলেরা হচ্ছে·· আমার বাড়ীর লোক পর্য্যন্ত দেখাশুনা করে নি···তখন যে বন্দীবাবু ছিলেন তাঁকে এখানকার সবাই বলেছে যে ওকে বার করে দাও, আমরা আলাদা চাকর এনে দিচ্ছি·· সে বাবু কারও কথা শোনে নি নিজে পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখিয়েছে··সারা দিন রাত না ঘুমিয়ে আমার সেবা করেছে—তবে আমি বেঁচে উঠি; সেই বাবুর জন্যে আমার এখনও বড্ড মন কেমন করে ·· গাঁয়ের লোক তাই অনেকে বলে যে আপনারা দেবতা·· আপনাদের যত্ন করলে পুণ্যি হয় · আচ্ছা বাবু আপনি সে বাবুকে চিনতেন?" বলে সে তার নামধাম বলে।

—"নাম শুনে কই চিনি বলে মনে হয় না···কত বাবুই এম্নিধারা বন্দী আছে, সকলকে চেনা ত আর সম্ভব নয়;" সত্যেন উত্তর দেয়।

—"তা ঠিক" ব'লে সে চুপ করে।

সত্যেন তার মুখের পানে চেয়ে থাকে···শুকলালের মন তখন উধাও হয়ে কোথায় ছুটে চলে তা সেই জানে···

জীবনে যে একবার মানুষের মত মানুষের সংস্পর্শে আসে সে যত নিরক্ষরই হোক না কেন, তার সমস্ত জীবনধারার গতি কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হবেই মানুষের আদর্শের প্রভাব এম্নি বিচিত্র, এম্নি অদ্ভুত ··!

পাঁচ

দিন পনের পরে কোহেল মোল্লার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের দরখাস্তের উত্তর আসে দারোগার কাছে; দারোগা সকাল বেলায় ওই সম্বন্ধে তদন্ত করতে বের হয় এবং দরখাস্তের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়··· কোহেল মোল্লা বাড়ী না থাকায় তার বক্তব্য শোনা হয় না।

বিকাল বেলা লোক মারফৎ তাকে থানায় ডেকে পাঠান হয় ·· কোহেল মোল্লা আসতে দারোগা বলে—"এই যে মোল্লা সাহেব, আপনার নামে এ সব কি অভিযোগ আপনারা প্রেসিডেণ্ট মানুষ, এ ত ভাল নয়।"

দারোগা তখন টিউবওয়েল সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার তাকে বলে। মোল্লা সাহেব জিজ্ঞাসা করে—"কে দরখাস্ত করেছে?"

—"গ্রামের লোকেরা করেছে···কারও নাম নেই · দরখাস্তের অভিযোগ সত্য কিনা জেনে ম্যাজিষ্ট্রেট আমায় রিপোর্ট দিতে বলেছে··· আজ সকালে আপনাদের গ্রামে গিয়ে তদন্ত করে এলুম, দেখলুম অভিযোগ সত্যি। আপনি তখন বাড়ী ছিলেন না, তাই এখন ডাকিয়ে পাঠিয়েছি; এ সম্বন্ধে আপনার কিছু বক্তব্য আছে?"

কোহেল মোল্লা হঠাৎ দারোগার হাত দুটো চেপে ধরে বলে—"দেখুন দারোগা বাবু, আপনি ওটা মিথ্যা বলে রিপোর্ট দিন আমি ও টিউবওয়েল আর কোন দিন বন্ধ রাখব না।"

দারোগা বলে—"না, সে আমি পারব না···এই বোশেখ মাসের দিনে কোথায় লোকে জল দান করে, আর আপনি বৃদ্ধ লোক, তায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, আপনি কিনা দুপুরবেলা ঘুমের ব্যাঘাত হয় বলে টিউবওয়েলে চাবি দিয়ে রাখেন। মাপ করবেন মোল্লা সাহেব আমি মিথ্যা রিপোর্ট দিতে পারব না...তবে আপনার বক্তব্য এই সঙ্গে দাখিল করতে পারি—ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ও তাই আছে।"

এমন সময় থানা-হাজরি দিতে সত্যেন সেখানে উপস্থিত হয়... কোহেল মোল্লাকে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সত্যেন জিজ্ঞাসা করে—"দারোগা বাবু, ব্যাপার কি? মোল্লা সাহেব ও ভাবে দাঁড়িয়ে?"

দারোগা সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার সত্যেনকে বলে। দারোগার কথা শেষ হ'তে মোল্লা সাহেব বলে—"বন্দীবাবু, আপনি আমার বাড়ী গেলে দেখাতে পারি···ঠিক আমার শোবার ঘরের জানালার নীচে টিউবওয়েল দুপুরে শব্দের জ্বালায় একটু ঘুমুতে পাইনা।"···

দারোগা বাধা দিয়ে বলে—"বেশত, আপনার বক্তব্য বন্দীবাবুকে বলুন উনি ইংরিজিতে লিখে দেবেন · আপনি সই করে দিন··· আমি পাঠিয়ে দেব।" তারপর সত্যেনকে বলে—"সত্যেনবাবু, মোল্লাসাহেব যা বলেন দয়া করে একটু লিখে দিন ত আমি এখুনি আসছি।"

দারোগা চলে যায়···সত্যেন মোল্লাসাহেবের বক্তব্য লিখে শেষ করে ···তারপর সই করবার জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। মোল্লাসাহেব কলমটা কালিতে ডুবিয়ে সেটা নাকের কাছ পর্য্যন্ত তুলে ধরে নিবটা একবার ভাল করে দেখে নেয়, তারপর অতিকষ্টে লিখে যায়—

K. Molla
J. U. B. P.

সত্যেন বলে "তারিখটা?"

—"সে দারোগা বাবু দিয়ে দেবে" বলে সে অপেক্ষা করতে থাকে ···সত্যেন থানা হ'তে বেরিয়ে আসে।

সন্ধ্যাবেলা সত্যেন তার ঘরের সামনে চেয়ারটায় বসে থাকে ·· বেড়িয়ে ফেরবার পথে দারোগা বলে—"কি করছেন সত্যেন বাবু?"

—"এই বসে আছি, আসুন" বলে সত্যেন একটা চেয়ার এগিয়ে দেয়।

দারোগা চেয়ারে বসে বলে—"আজ আপনি বেড়াতে যাননি?"

—"গিছলুম একটুখানি ঘুরে তখনই ফিরে এসেছি আপনার কোহেল মোল্লার ব্যাপারটার কি হল ?" সত্যেন জিজ্ঞাসা করে।

—"যা সত্যি তাই লিখে রিপোর্ট দিলুম ··কি ভয়ানক কথা বলুন দেখি · লোকে এক ফোঁটা জলের জন্যে হাহাকার করছে, আর দুপুর বেলা ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে লোকের জল নেওয়া বন্ধ করা···তাও সাধারণের টিউবওয়েল" দারোগা উত্তর দেয়। সত্যেন জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা দারোগা বাবু, ও K. Molla সই করে তারপর J. U. B. P. লিখলে ওটার মানে কি ?"

দারোগা খানিক হাসে · তারপর বলে "আপনি বুঝি ওর ইতিহাস জানেন না ? ও একটা খাজা · মুর্খ এক লাইন বাংলা লিখতে দুটো নিব ভাঙ্গে। পাট বেচে এক সময় বেশ দু'পয়সা ক'রে তারপর সুদে খাটিয়ে তাকে আরও বাড়িয়েছে। পয়সার জোরে ও প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে K. Molla J. U. B. P. এই কটা কথা মক্স ক'রে ক'রে ইংরিজিতে লিখতে শিখেছে। লেখাপড়ার কাজ যা কিছুই ইউনিয়ন বোর্ডের একজন কেরাণী আছে করে · ও শুধু নীচে মক্স করা কথা ক'টা লিখে খালাস। J. U. B. P. Jhonkanda Union Board President. অত কথা লিখতে গেলে বিস্তার কুলোবে না ব'লে সব সংক্ষেপে সারে।"

দারোগার কথা শুনে সত্যেন উচ্চস্বরে হেসে ওঠে...তার হাসি থামতে দারোগা বলে "ওরকম কত আছে .."

—"গ্রামের লোকেরও দোষ আছে·· তারাই ত' প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করে।"

—"গ্রাম দেশে যাদের পয়সা আছে তাদের বিপক্ষতা করবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের নেই...এমন কি আপনি যদি ভরসা দেন তাহ'লেও এদের অধিকাংশ প্রতিপত্তি ও পয়সাওলার বিপক্ষে এতটুকু সত্যি কথা বলবে না ··এই ধরুন টিউবওয়েলের ব্যাপারটা · কতদিন ধ'রে হয়ত এই অত্যাচার ভোগ করে আসছিল ; যখন ওই টিউবওয়েল ছাড়া আর অন্য কোথাও এতটুকু খাবার জল পাবার উপায় নেই, তখনই ওরা মরিয়া হয়ে দরখাস্ত করেছে ··" বলে দারোগা চুপ করে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ চারিদিক ঢেকে ফেলে...দূরে গাছের উপর থেকে কোথায় একটা পেঁচা কর্কশস্বরে চীৎকার করে ওঠে

দারোগা বলে—"আপনার শুকলাল গেল কোথা ?·· তাকে দেখছি না।"

—"সে আজ দুপুর বেলা বাড়ী গেছে . এখনই আসবে বোধ হয়।"

—'আপনাদের শুকলাল চাকরটী বেশ...আমি ন'মাস এখানে এসেছি, দেখছি ত ওকে···বেশ চালাক চটপটে...কাজের লোক।"

—"একটা চাকর তাও যদি ভাল না হয় দারোগাবাবু, তাহ'লে এ নিঃসঙ্গ জীবন কাটান শক্ত হয়ে পড়ে।"

—"তা ঠিক, আপনি বসুন—আমি উঠি" ব'লে দারোগা চলে যায়। শুকলাল তখনও ফেরে না···সত্যেন সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে

ছয়

গ্রীষ্ম শেষ হয়···বর্ষা আসে · জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হ'তে জল বাড়তে সুরু ক'রে পাশের নদীটা এখন প্রায় কূলে কূলে ভরে ওঠে সারাদিন সত্যেনের প্রায় নিঃসঙ্গ কাটে . মহানন্দ বড় আর আসে না...তাকে সত্যেন একদিন তার সারেংটা বাজিয়ে শোনাতে বলেছিল, তাতে সে উত্তর দিয়েছিল—

—"শোনাব বই কি বাবু . কিছু দিলেই শুনিয়ে দেব"·· সত্যেন তার কথা শুনে রেগে ওঠে এবং তাকে আর কোনদিন আসতে নিষেধ করে মহানন্দ সেই থেকে বড় আসে না···

যে দিন বৃষ্টি একটু ধরণ করে সেদিন নৌকা নিয়ে সত্যেন নদীতে বেড়াতে বেরোয় · বর্ষাকালটা তার কাছে বড় অস্বচ্ছন্দকর বলে বোধ হয় মনের ফূর্ত্তি যায় তার নষ্ট হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে দেহের স্বাস্থ্যও হারিয়ে ফেলে।

সেদিন সকালবেলা যখন তার ঘুম ভাঙ্গে তখন তার জ্বরে গা পুড়ে যায় শুকলালকে দিয়ে সে দারোগাকে খবর পাঠায়···দারোগা এসে বলে—"কি সত্যেনবাবু, আবার জ্বর করে বসলেন কখন থেকে জ্বর হয়েছে ?"

সত্যেন উত্তর দেয়—"শেষ রাত থেকে···বড্ড মাথার যন্ত্রণা।"

দারোগা বলে—"ভয় নেই ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে আমি ডাক্তারকে খবর পাঠাচ্ছি শুকলাল তুই এখন তোর বাবুর কাছে থাক · ডাক্তার দেখে গেলে পর আমি একটা কনষ্টেবল দেব'খন, সে থাকবে···তুই তখন তোর রান্না খাওয়া করিস . আর তোর বাবুর দুধসাবু আমার বাড়ী থেকে করে পাঠিয়ে দেব...বুঝলি ?" শুকলাল ঘাড় নাড়ে।

—"আমি এখন যাই...ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করিগে" বলে দারোগা চলে যায়।

যত বেলা .বাড়তে থাকে সত্যেনের জ্বর ও মাথার যন্ত্রণা তত বেড়ে চলে...শুকলাল একা তার কাছে বসে থাকে ও সাধ্যমত তার সেবা করে।

বেলা প্রায় দশটার সময় দারোগার সঙ্গে ডাক্তার আসে...ঔষধপত্রের ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার দারোগাকে নিয়ে থানায় যায়...দারোগা জিজ্ঞাসা করে—"কি রকম দেখলেন ? সাধারণ জ্বর ত ?"

ডাক্তার গম্ভীরমুখে উত্তর দেয়—"সেই কথা বলবার জন্যই ত' আপনাকে ডেকে আনলুম . সাধারণ জ্বর নয়...মুখচোখের ভাব দেখলেন না · সমস্ত শরীর লাল হয়ে রয়েছে . দু'একদিনের মধ্যেই [illegible] বেরোবে।" [illegible]

দারোগা বলে—"তাহ'লে কি করা যায় বলুন দে[illegible] বা কে করে।" [illegible] সেবাশুশ্রূষাই

—"হাসপাতালে পাঠাবার জন্য আমি [illegible] পল্লীগ্রামে সে রকম চিকিৎসা বা [illegible] . একটা লিখে দিই, কারণ একটা রিপোর্ট দিন···দু'এক [illegible] হবেনা, সেইটের সঙ্গে আপনি [illegible] দিনের মধ্যে [illegible]

দারোগা বলে—"সেই ভাল, আপনি তাহ'লে একটা লিখে দিন ·· এই ডেটেনিউ নিয়ে আমাদের যত মুস্কিল...একটু এদিক ওদিক হলেই গণ্ডগোল···তার চেয়ে আপনি যা বললেন ওই ভাল।"

দারোগা সেই দিনই স্পেশাল মেসেঞ্জার দিয়ে সদরে রিপোর্ট পাঠায় ··

কথাটা গ্রামে রাষ্ট্র হ'তে বিলম্ব হয়না...অনেকেই সত্যেনকে দেখতে আসে·· ঘরের ভেতর তারা ঢুকতে পায়না ..বাইরে হ'তে সমবেদনা জানিয়ে চ'লে যায়।

বিকালের দিকে খবর পেয়ে কোহেল মোল্লাও থানায় এসে হাজির হয়···জিজ্ঞাসা করে···"বন্দীবাবুর না কি খুব অসুখ।"

—"হ্যাঁ, সদরে লোক পাঠিয়েছি, ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম এলে কালই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব" দারোগা জবাব দেয়।

কোহেল মোল্লা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করে "বাঁচবার আশা নেই না কি?"

—"আরে মশাই, মরা বাঁচা কি আপনার আমার হাত যে বলব?"

—"না, এত জরুরী তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন··· তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

—"আপনারা সেবা করবার লোক দিন না···তাহ'লে আর পাঠাই না···আপনিও ত নন-অফিসিয়াল ভিজিটার, আপনার ত দেখা উচিত।"

—"হাঁ নিশ্চয়, দেখা ত উচিত। অসুখটা কি?"

—"পক্স...এ বেলা দুটো একটা গায়ে দেখা দিয়েছে"···

—"ইয়া আল্লা···তবে আপনি যা মতলব করেছেন ওই ভাল · হাসপাতালে দেওয়াই ঠিক" বলে মোল্লা সাহেব উঠে পড়ে।

দারোগা বলে—"চল্লেন যে, একবার বন্দীবাবুকে দেখে যান।

—"এখন চলি · কাজ আছে ··অন্য সময় আসব'খন" বলে মোল্লা সাহেব চলে যায়। দারোগা পিছন হ'তে হাসতে হাসতে চেঁচিয়ে বলে—"কি হ'ল মোল্লা সাহেব, ভয় পেয়ে গেলেন?"

মোল্লা সাহেব তার আর কোন জবাব দেয়না।

সত্যেনকে অস্থায়ীভাবে হাসপাতালে পাঠাবার অর্ডার নিয়ে স্পেশাল মেসেঞ্জার পরদিন ভোরে ফিরে আসে।

দারোগা সঙ্গে সঙ্গে নৌকা ঠিক করে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে—সত্যেন তখন অঘোর অচৈতন্য·· তবুও অনেকে এসে তার অজ্ঞাতে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে যায়; আসে না শুধু মহানন্দ...সে তখন হাটে সাউদের দোকানে একখানা কাপড় নিয়ে দর কষাকষি করে।

কে একজন বলে—"মহানন্দ, বন্দীবাবু যে চলে গেল...দেখে এলেনা একবার?"

—"দেখে আর কি হবে ··ও বাবু ভারী কঞ্জুস···না খায় সিগ্রেট, না দেয় পয়সা...শুধু বলে 'খেটে খাও না'...এখানে ওবাবু আর না এলেই ভাল...আর কেউ এলে তবু আমার কিছু পাবার আশা থাকে" ব'লে মহানন্দ কাপড়ের দর করতে মন দেয়।

সত্যেনের নৌকা ছেড়ে দেয় ··শুকলাল সজল চোখে তীরে দাঁড়িয়ে থাকে—কুকুরটা হঠাৎ জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নৌকাটার অনুসরণ করবার চেষ্টা করে ..প্রতিকুল স্রোত তাকে তীরের পানে টেনে আনে...নৌকা তখন অনেকদূর চলে যায়; কুকুরটা সহসা জল হ'তে উঠে এসে নৌকাটাকে লক্ষ্য করে নদীর পাড় ধ'রে ছুটতে থাকে।

পৃথিবী

হীরালাল দাশগুপ্ত

মহাকাল সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্ত্ত মুহুর্মুহুঃ করিছে মন্থন— জন্ম
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন নিরন্তর বেগে মৃত্যু
সীমাশূন্য জ্যোতির্মান এই সৌরলোক। জীবন
এই কাল-সমুদ্রের ফেণার বুদ্‌বুদ সংগ্রাম

ডুবে যাও মহাকাল সমুদ্রের মাঝে—
আরও তলে—আরও তলদেশে,
সেথায় দেখিবে তুমি আজিকার পক্ক শুভ্র কেশ
কালের আগুনে পুড়ে কালো হোয়ে গেছে ;
কামনার কৃষ্ণ-সর্প ফুঁসিয়া গর্জ্জিয়া আর উদ্গারিয়া বিষ
লভিয়াছে শৈশবের সুশান্ত সমাধি !

আবার কাঁপিয়া ওঠে মান্ধাতার মৃত্যু-ক্লিন্ন হাত—
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে—থামিতে না চায়,
অবশেষে অদৃশ্য শত্রুর এক নিষ্ঠুর আঘাতে
মাতৃবক্ষে আছাড়িয়া পড়ে
স্তন্য-পায়ী শিশুর মতন !

ইন্দ্রের সহস্র আঁখি বিঘূর্ণিত অন্তহীন আবর্ত্তের মাঝে,
উর্ব্বশীর অপাঙ্গ ভঙ্গিতে।
নৈমিষ অরণ্যে সেথা বাল্মীকি বীণার তারে তুলিছে ঝঙ্কার।
আর ঐ ইতালীর উজ্জ্বল আকাশে
ভেনাসের নগ্নমূর্ত্তি জ্বলিছে ভাস্বর—
ঝলসিছে পুরুষের চোখ !

মৃত্যু হোতে জন্ম লভি জীবন বিলীন হয় মহাশূন্য মাঝে।
তবু হায় মুহূর্ত্তের তরে মনে হয়,
সাহারার সূর্য্যতপ্ত বালুর কণায়
মৃত 'ফ্যারো' বুঝি মৃত্যুহীন।

দিগন্তে মিলিয়ে যায় দিগন্তের রেখা—
শুধু অপচয়
ভাজা মাটি
কঠিন পাথর···

প্রতীচ্যের পাণ্ডুর আকাশে উড়িতেছে প্রাণহীন বিহগ ধাতব
সুসভ্য বিজ্ঞানী এই বিংশ শতাব্দীর।
এইরূপে গত আর অনাগত দুই পাখা করি ভর
কালের চঞ্চল পাখী রহে অচঞ্চল···

সীমাহীন এই বিশ্ব রূপান্তের মাঝে
দেখে নাই এই মর মানুষের চোখ
আত্মন্ ও আকারের রূপ—
সুনীল তরঙ্গ
রক্তিম গোলাপ
জৈমিনীর মুখ···

ফিরে আসে আপনার অন্তরের অন্তহীনতায় ;
কল্পনা জঠর মাঝে জন্ম লভে মৃত ভ্রূণ রক্তাভ যৌবন।
সবুজ হাসিয়া ওঠে বিবর্ণ পৃথিবী !
কাহার বাঁশীর সুরে রাধিকার জড়াইছে চুল।
জেরুসালেমের দুর্গে ঈশা করে অঙ্গুলি সঙ্কেত।
স্বরগের ইদেন উদ্যানে অচ্যুত আদম ঈভ প্রথম শয়নে
কার্থেজের রাজপথে খেলা করে শিশু হানীবল—
অজ্ঞাত আতঙ্কে ওঠে শিহরিয়া রোম।

একটী স্বপন শুধু !

··· ··· ··· ···

এই সৌর রাত্রিদিন বন্দী করি মহাকালে নক্ষত্র শৃঙ্খলে
নিয়ে যায় কক্ষ হোতে কক্ষের অন্তরে !

এরিস্‌টটলের কাব্য-বিচার

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

প্রবন্ধ

(১)

প্লেটোর সুযোগ্য শিষ্য, মহামণীষী এরিস্টটল যে দার্শনিক জগতে কত বড় স্থান অধিকার করেছিলেন তা এই বললেই বোঝা যাবে—যে ইউরোপ এক হাজার বছর পর্য্যন্ত তাঁর প্রত্যেকটি উক্তিকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে চলেছিল; কখনো যে তাঁর চিন্তায় কোথাও ভ্রান্তি হতে পারে তা ছিল কল্পনাতীত। তাঁকে কেবল দার্শনিক বললে ভুল বলা হয়; এরিস্টটলের চিন্তা ছিল যেন সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্ব বিষয়ে তাঁর উৎসুক মন প্রবেশ করবার চেষ্টা করেচে। দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, বক্তৃতাবিদ্যা, অলঙ্কারশাস্ত্র, প্রাণিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এমন কোনো বিষয় ছিল না যা নিয়ে এরিস্টটল চিন্তা এবং অনুসন্ধান করেন নি। এরিস্টটল যেন ছিলেন সকল জ্ঞানের বিশ্বকোষ। সব বিষয়েই যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন তা নয়, কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তিনি যা সিদ্ধান্ত করে গেছেন তা আজও বিদ্বৎ-সমাজে স্বীকৃত। তাছাড়া, সব বিষয়েই অগ্রগামী হিসাবে তিনি সেই প্রাচীনকালে নানা অসুবিধার মধ্যেও যা করে গেছেন, তা মনে করে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হতে হয়।

খৃঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে এরিস্টটলের জন্ম হয় উত্তর গ্রীসের একটি শহরে। সতেরো বছর বয়সে তিনি তখনকার শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্র এথেন্স নগরীতে গিয়ে প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ৩৪৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে প্লেটোর মৃত্যুর পর তিনি এথেন্স পরিত্যাগ করেন। কিছুকাল পর তিনি মেসিডোনিয়ার মহাবীর আলেকজান্দারের শিক্ষক নিযুক্ত হন। আলেকজান্দার বিজয়াভিযানে যাত্রা করার পর এরিস্টটল এথেন্সে ফিরে আসেন এবং সেখানে লাইসিয়ম-কুঞ্জে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন। লাইসিয়ম উদ্যানের নাম শুনলেই একটি চিত্র জেগে ওঠে। এরিস্টটল সেখানে পাদচারণা করচেন—আর অনর্গল বলে চলেচেন: কথাগুলো মুখ দিয়ে স্পষ্ট উচ্চারিত হতে পারচে না, অথচ অজস্র দ্রুত চিন্তা তাঁর মনকে উদ্দামবেগে নিয়ে যেতে চাচ্চে, আর ছাত্র-মণ্ডলী বিস্ময়মুগ্ধচিত্তে তাঁর গভীর জ্ঞান গবেষণার কণা আহরণ করচে। কি সৌভাগ্যশালী ছিল তারা!

প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল কিন্তু তাঁর গুরুর মতবাদ কাটিয়ে উঠেছিলেন শেষে। প্লেটো তাঁর 'আইডিয়া'র জগৎটাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এই জগৎটাকে তারই ছায়া বলে প্রচার করেছিলেন। এরিস্টটল এই মতটিকে স্বীকার করতে পারেন নি। এরিস্টটল ছিলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের আদিপুরুষ; তিনি বস্তুজগত-নিঃসম্পর্কিত আদর্শবাদকে স্বীকার করতে পারেন নি।

এখানে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। বর্ত্তমান নিবন্ধে তাঁর কাব্য-সম্পর্কিত মতবাদের সামান্য পরিচয় দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। এরিস্টটল বহু বিষয় আলোচনা করেচেন; সব যে সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে তাও নয়। বিশেষ করে তাঁর কাব্যালোচনা বিষয়ক Poetics গ্রন্থখানা দেখে তাই মনে হয়। এখানা যেন বাস্তবিক গ্রন্থই নয়। ছাত্রদের পড়ানোর উদ্দেশ্যে হয়ত স্মারক হিসাবে তিনি এসব কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাই এতে ভাষার মধ্যে রচনাগত কোনো সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয় না। সমস্ত কথা নিয়েও আলোচনা নেই।

তবু এর মধ্যে কাব্যাদর্শ নিয়ে তিনি যে সব সূত্র রচনা করে গেছেন, বহুকাল পর্য্যন্ত তাই নির্ব্বিচারে নতশিরে গৃহীত হয়েচে। এরিস্টটল তাঁর কালের নানা রকমের কাব্যগ্রন্থ দেখে কতকগুলি কাব্যলক্ষণ নিরূপণ করে গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে আরো নূতনতর সাহিত্যরূপের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেই সে সব পরিবর্ত্তিত করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু এরিস্টটলের অভিভূত

করবার যে অসামান্য শক্তি ছিল তা এ থেকেই প্রমাণ হয় —প্রায় এক হাজার বৎসর কাল তাঁর যে কোনো বিষয়ের উক্তি প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। গ্যালিলিও যখন প্রমাণ করতে উদ্যত হলেন যে ভারী এবং হাল্কা উভয় বস্তুই বাধা না পেলে শূন্যে ওপর থেকে নীচের দিকে একই বেগে নেমে আসে, তখন বড় বড় পণ্ডিতেরা সেই পরীক্ষা-প্রয়োগটি দেখতেও স্বীকৃত হয় নি এই জন্য—যে এরিস্টটলের অন্য রকমের মত ছিল। কাব্যালোচনার ক্ষেত্রেও তাই। আজ পর্য্যন্ত এরিস্টটলের লিখিত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা চলচে কত রকমের। যাক, এখন মূল বিষয়ের দিকে অগ্রসর হই।

(২)

দু-হাজার বছর আগে গ্রীস দেশের কাব্য-সাহিত্য আলোচনা করে এরিস্টটল যে-সব কাব্যনীতি নির্দ্দেশ করেছিলেন, আজকের দিনেও যে সে-সব বর্ণে বর্ণে সত্য হবে এমনটি না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু কাব্য-বিশ্লেষণের দ্বারা সে সময় তিনি যে সব কথা বলে গেছেন তার অনেক কথাই যে আজও আমাদের মনন শক্তিকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে তা নিতান্ত সাধারণ কথা নয়। তার পর সে সব কথা বাদ দিয়েও কাব্য-বিচারে যে আরোহ-পদ্ধতি (Inductive method) তিনি প্রয়োগ করেচেন তার জন্য আমরা চিরদিনই তাঁর নিকট ঋণী থাকব।

'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে এরিস্টটলও প্লেটোর মতই কাব্যকে এক প্রকার অনুকৃতি (imitation) বলেই স্বীকার করেচেন। মহাকাব্য, ট্র্যাজেডি, কমেডি, 'ডিথিরাম্বিক' কবিতা এবং যন্ত্রসঙ্গীত—এ সবকেই তিনি অনুকৃতি বলে ঘোষণা করেচেন[১]। অনুকরণ বললেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, কিসের অনুকরণ? এখানে 'অনুকরণ' বলতে যেন তাকে প্লেটোর 'অনুকরণ' বলে না বুঝি। আদর্শবাদী প্লেটো অনুকরণের যে অর্থ করেচেন, বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি বাস্তববাদী এরিস্টটল অনুকরণের সে অর্থ কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন নি। সুতরাং তিনি বলেন যে, কাব্য হচ্চে সেই সব বস্তু বা কর্ম্মের অনুকরণ যা ছিল বা আছে, যা হয়ে থাকে বলে লোকের বিশ্বাস, কিম্বা যা হওয়া উচিত[২]। মানুষের কর্ম্মমাত্রই ভালো অথবা মন্দ হতে বাধ্য, তাই কাব্য কেবল যা বাস্তবিক হয়ে থাকে তারই অনুকরণ নয়, তার চেয়ে ভালো অথবা তার চেয়ে যা মন্দ তার অনুকরণও কাব্যের বিষয় হতে পারে[৩]। সহজ কথায় বলতে গেলে বলতে পারা যায় যে মানবজীবন যে সব কর্ম্মে আপনাকে প্রকাশিত করে বা করতে পারে বলে কল্পনা করা যায়, তারই অনুকরণ কাব্যের আসল কাজ। কিন্তু ইতিহাস আর কাব্য তা বলে এক বস্তু নয়। ইতিহাস যা ঘটেচে তারই বর্ণনা করে ক্ষান্ত, কাব্য কিন্তু যা হতে পারত তার বর্ণনা করে; আর কাব্য ইতিহাসের চেয়ে বেশি দার্শনিক এবং উৎকৃষ্টতর বস্তু এই হিসাবে যে, ইতিহাসের কারবার হচ্চে বিশেষকে নিয়ে, আর কাব্যের কারবার হচ্চে সাধারণ সত্যকে নিয়ে[৪]।

(৩)

মানবীয় কর্ম্মের যে কোনো রকমের অনুকরণ যে কাব্য নয়, সে কথা না বললে কাব্য কথাটার অর্থই থাকে না। কাব্য যে শব্দময় বস্তু সে কথা এরিস্টটল স্পষ্ট করেই বলেচেন। আমাদের দেশে ত কাব্যের একটি সংজ্ঞাই হচ্চে 'বাক্যং রসাত্মকং'। এরিস্টটল বলেচেন, কাব্য অনুকৃতি বটে, কিন্তু এ অনুকৃতি হচ্চে ছন্দ, শব্দ এবং সুর যুক্ত; কোনো কাব্য এই তিনটিকেই কাজে লাগায়, আবার কোনো কোনো কাব্যে এরা পৃথক ভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে[৫]।

কাব্যের উৎপত্তি মানবের অন্তর্নিহিত স্বভাবের মাঝ থেকেই হয়েচে। প্রথমত, অনুকরণ মানুষের একটা স্বভাবজ ধর্ম্ম: সব চেয়ে কুৎসিত এবং নীচ কর্ম্মেরও অনুকরণ ক'রে মানুষ আনন্দ পেয়ে থাকে। অনুকরণ করতে পারাটাই একটা আনন্দের কারণ। অনুকরণের সাহায্যেই মানুষ শিক্ষালাভ করে থাকে এবং নূতন কিছু শেখার মাঝে একটা স্বাভাবিক আনন্দ রয়েচে। দ্বিতীয়ত, ছন্দ এবং সুরবোধ, এ দুটি গুণ আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান থাকে[৬]।

১ Poetics Part I section 1.
২ Poetics Pt. IV sec. 1.
৩ Poetics Pt. I. sec. 3
৪ Poetics Pt. II sec. 6.
৫ Poetics Pt. I sec. 2.
৬ Poetics Pt. I sec. 5

কাব্যের অনুকরণের বাহন যেমন ভাষা, ছন্দ এবং সুর—তেমনি এই অনুকরণের বিশেষ রীতির কথাও এরিস্টটল উল্লেখ করেছেন; এ বিষয়ে তিনি প্লেটোকেই অনুসরণ করেছেন।* কাব্য দুটি বিশিষ্ট রীতিতে রচিত হয়ে থাকে—একটি বর্ণনাত্মক এবং অপরটিকে নাটকীয় রীতি বলা যেতে পারে৭। উদাহরণ: গীতিকবিতা ও আধুনিক কালের উপন্যাস বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত, আর নাটক জাতীয় সাহিত্য নাটকীয় রীতিতে রচিত। প্লেটো রীতির দিক দিয়ে কাব্যকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন: বোধ হয় তাঁর শ্রেণীবিভাগটিই উৎকৃষ্ট।

(৪)

কাব্য যে অসত্য, প্লেটো এ কথা সজোরে ঘোষণা করেন। এরিস্টটল প্লেটোর এই দোষারোপকে স্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বলেন যে কাব্যের সত্যাসত্য-বিচার দর্শনের অথবা রাজনীতির সত্যাসত্য বিচার থেকে স্বতন্ত্র৮। কাব্যের যাথার্থ্য বিচারের মাপকাঠি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোনো কর্ম্ম অথবা উক্তি হয়ত ব্যক্তি অথবা অবস্থা নিরপেক্ষভাবে, নৈতিক আদর্শ বিচারে ভাল অথবা মন্দ হতে পারে, কিন্তু কাব্যে সেই কর্ম্ম অথবা উক্তির ভালো মন্দ বিচার তা দিয়ে চলতে পারে না। সাহিত্যে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনার কালে এরিস্টটলের এই উক্তিটি স্মরণীয়।

তিনি কাব্যসাহিত্যের ভালোমন্দ বিচারের স্বতন্ত্র মাপকাঠি স্থির করেছেন এবং সে মাপকাঠি আজও অচল হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি বলেন যে, কাব্যে কোনো চরিত্রবিশেষ যদি কোনো ভালো বা মন্দ কিছু করে বা বলে, তাতেই যে কাব্য ভালো বা মন্দ হবে তা নয়; আমাদের কাব্য বিচারের বেলা দেখতে হবে যে সেই কাজ বা উক্তি কোন চরিত্রের দ্বারা বলা বা করা হয়েছে, কাকে উদ্দেশ্য করে কোন অবস্থায়, কোন উদ্দেশ্যে, কি ভাবে সেই উক্তি বা কাজের অনুষ্ঠান হয়েছে। যদি এসব অনুষ্ঠান কোনো বৃহত্তর মঙ্গল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অথবা কোনো গুরুতর অমঙ্গলকে নিবারণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তা হলে এ সবকে কাব্যে দোষণীয় বলে মনে করা যেতে পারে না৯।

কাব্যে বাস্তববাদ সম্বন্ধেও এরিস্টটল যা বলেছেন তা বর্ত্তমান কালের গল্পলেখকদেরও হয়ত পথ দেখাতে পারে। অনেকেই হয় ত মনে করেন যে, জীবনে যা কোথাও ঘটেচে তার বর্ণনা দিতে পারলেই তা হবে একেবারে বাস্তব সাহিত্য, আর কখনো যা হয়ত ঘটেনি, ঘটবেও না, তার বর্ণনা দিলেই তা হবে অবাস্তব সাহিত্য। এরিস্টটল কিন্তু তা বলেন নি। তিনি বলেন যে, এমন ঘটনা আছে যা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভাব্যতা যদি না থাকে তা হলে তা কবির পক্ষে বর্জ্জনীয়১০। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। পিতাপুত্রীর অথবা ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে কামাসক্তি অসম্ভব নয়, এমন দৃষ্টান্ত কোথাও কদাচিৎ সম্ভব হয়েচে; কিন্তু সাধারণ মানব প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলেই বলা যেতে পারে ও ঘটনা একটা ব্যতিক্রম: সম্ভব হলেও এর সম্ভাব্যতা একরকম নেই বললেই চলে। সুতরাং ওরূপ ঘটনাকে আশ্রয় করে কাব্য সাহিত্য রচনা করলে তা কাব্য বিচারে অযথার্থ বলেই বিবেচিত হবে।

এরিস্টটল আরো বলেন যে, যেসব ঘটনা অসম্ভব অথচ সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে যাকে মন অগ্রাহ্য করে না, তা অসম্ভব হলেও কাব্যে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং কাব্য বিচারে তাও অসত্য হবে না। এখানে দৃষ্টান্তচ্ছলে হনুমানের গন্ধমাদন পর্ব্বত কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক অথবা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে ওরূপ ঘটনা যত অসত্যই হোক, কাব্যে সত্যাসত্যের যে মাপকাঠি তাতে এ ঘটনা কিছুতেই বর্জ্জনীয় বলে বিবেচিত হবে না।

কাব্যের দোষ বিচার করতে গিয়ে এরিস্টটল কাব্যের যে সব দোষ হতে পারে তাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; এক রকমের দোষ আছে যাকে মৌলিক বলা যেতে পারে। যে কবির অনুকরণের স্বাভাবিক শক্তি নেই, অর্থাৎ যাঁর বিধিদত্ত কবিপ্রতিভা নেই তাঁর কাব্যে যে দোষ হবে তা একেবারে মৌলিক। আরেক রকমের দোষ আছে যা কবির স্বাভাবিক অনুকরণ শক্তির অভাববশতঃ

* দ্রষ্টব্য 'কাব্যবিচারে প্লেটো'—প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৫৪.

৭ Poetics Pt. I sec. 4.

৮ Poetics Pt. IV sec. 3.

৯ Poetics Pt. IV sec. 4.

১০ Poetics Pt. III sec. 6.

নয়। কবিকে জীবনের নানা রকম রূপই অনুকরণ করতে হয়; অনেক সময় জ্ঞানের অভাববশতঃ সে অনুকরণ অযথার্থ হয়ে থাকে। এ দোষ হচ্ছে আকস্মিক—অনিবার্য্য নয়—এ দোষ অনেকটা ক্ষমার যোগ্য বলে এরিস্টটল মনে করেন[১১]।

(৫)

এরিস্টটল কাব্যকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন—ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। মহাকাব্যকে তিনি একরকম ট্র্যাজেডিরই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রীক সাহিত্যের নাট্যরূপটাকেই তিনি যেন খুব বড় করে দেখেছেন এবং সেজন্য তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির যে রকম ব্যাপক আলোচনা দেখা যায় মহাকাব্য এবং অন্যান্য কাব্যরূপ নিয়ে তত কিছু বলতে দেখা যায় না।

এরিস্টটল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার অনুবাদ নানা মুনি নানা ভাবে করেছেন এবং তা নিয়ে বাদানুবাদেরও অন্ত নেই। এখানে যে অনুবাদটি আমার মনে লেগেচে সেটি দিচ্চি:

"Tragedy...is an imitation of a serious and complete action which has magnitude. The imitation is effected by embellished language, each kind of embellishment varying in the constituent parts. It is acted, not narrated; and it uses the agency of pity and fear to effect a purging of these and like emotions.*

ট্র্যাজেডি হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অনুকৃতি আর এই ঘটনাটি একটা বিশেষ আয়তনের হওয়া চাই। এই অনুকৃতি হয়ে থাকে অলঙ্কৃত ভাষায়; ট্র্যাজেডির বিভিন্ন অংশে এই অলঙ্করণটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে। ট্র্যাজেডি কথকতা বা বর্ণনার বিষয় নয়, এটি অভিনয়ের বিষয়। আর ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য হচ্ছে করুণা এবং ভীতির উদ্রেক করে হৃদয় থেকে এই সব ভাব এবং অনুরূপ অন্যান্য হৃদয়াবেগ থেকে মনকে মুক্ত শুদ্ধ করা।

মহাকাব্য সম্বন্ধে এরিস্টটল সংক্ষেপে যা বলেচেন তা হচ্চে এই যে, ভাষার সাহায্যে বড় বড় মানব চরিত্র এবং কর্ম্মের অনুকরণ করাই মহাকাব্যের কাজ। মহাকাব্য রচনা একটি মাত্র ছন্দকে আশ্রয় করেই হয়ে থাকে এবং এর রচনা বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে হয়ে থাকে। ট্র্যাজেডির বর্ণিত ঘটনার সময় একদিনের বেশি নয়, কিন্তু মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনার সময় সম্বন্ধে কোনো বাঁধাবাঁধি নেই[১২]।

কমেডির কাজ ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই হিসাবে—যে কমেডি কোনো বৃহৎ মানবীয় কর্ম্মের অনুকরণ করে না; তার অনুকরণের বিষয় হচ্চে মানুষের সেই সব দোষ ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা যা দুঃখদায়কও নয় এবং ধ্বংসকারীও নয়। মানুষের যে সব ত্রুটি ও স্খলন হাস্যকর সে সবই হচ্চে কমেডির অনুকরণের বিষয়[১৩]।

মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে এরিস্টটল এদের সঙ্গে ইতিহাসেরও তুলনা করেচেন। ইতিহাস একই কালে যে সব ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে তাদের বর্ণনা করে থাকে, মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডিও মোটামুটি ভাবে তাই করে থাকে, কিন্তু তাতে একটা পার্থক্য আছে। ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির পরস্পরের মধ্যে যে যোগসূত্র তা হচ্চে কালের যোগসূত্র; তাদের আভ্যন্তরীণ মর্ম্মগত কোনো যোগ নাও থাকতে পারে; তাদের যোগটা আকস্মিক, কার্য্যকারণের ঐকান্তিক এবং অনিবার্য্য যোগে তারা আবদ্ধ নাও হতে পারে। মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির ঘটনাবলীর মধ্যে সমগ্রতা আছে এবং কার্য্যকারণ যোগে তারা অখণ্ড সম্পূর্ণতা পেয়ে থাকে।

তবে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির মধ্যেও পার্থক্য আছে বটে। মহাকাব্যের পরিকল্পনার প্রসার অনেক বেশি। মহাকাব্যের প্রকাশভঙ্গি বর্ণনাত্মক বলে একই কালে অনুষ্ঠিত অনেক ঘটনাকে মহাকাব্যে স্থান দেওয়া চলে, কিন্তু ট্র্যাজেডিতে তা চলে না। ফলে মহাকাব্যের আয়তনবাহুল্যটা ট্র্যাজেডিতে মোটেই আশা করা যেতে পারে না। ট্র্যাজেডির

১১ Poetics Pt. IV sec. 3.

* Principles of Criticism by W. B. Worsfold p. 40

১২ Poetics Pt. I sec. 9

১৩ Poetics Pt. I sec. 8

ঘটনাবলীর মধ্যে একটি নিবিড় কার্য্যকারণগত যোগ থাকা আবশ্যক ; কিন্তু মহাকাব্যের ঘটনাবলীর মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বাহুল্য অনেক বেশি, কারণ সেখানে কার্য্যকারণ ও পারম্পর্য্যগত যোগ অত্যাবশ্যক নয়। ট্র্যাজেডির মধ্যে আশ্চর্য্যজনক ঘটনার সমাবেশ অসম্ভব না হলেও মহাকাব্যে ও ব্যাপারটিকে স্থান দেওয়া অনেক বেশি সম্ভব ও সহজ[১৪]। সিনেমার যুগে এরিস্টটল যদি জন্মগ্রহণ করতেন তা হলে হয়ত এ পার্থক্যের কথা তাঁর মনেও পড়ত না।

(৬)

পূর্ব্বেই বলেচি যে এরিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্‌স' গ্রন্থে সাধারণভাবে কাব্য লক্ষণাদি নিয়ে আলোচনা করেচেন বটে, কিন্তু বিশেষভাবে ট্র্যাজেডিজাতীয় নাট্যসাহিত্য নিয়েই তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেচেন এবং সেই সূত্রে অনেক মূল্যবান কথাও বলেচেন।

কাব্যের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে প্লেটোর মত কি তা পূর্ব্বেই বলেচি। এরিস্টটল কিন্তু কাব্যকে হিতসাধনের দায় থেকে মুক্তি না দিয়েও তাকে প্রধানত আনন্দমূলক বলে স্বীকার করেচেন। কাব্যের কাজ যে অনুকরণ সে কথা বলেচি, কিন্তু কাব্য এই অনুকরণ করে কি উদ্দেশ্য নিয়ে সে কথা বলিনি। এরিস্টটল বলেন যে সাধারণভাবে কাব্যের উদ্দেশ্য হচ্চে আনন্দদান করা[১৫]। ট্র্যাজেডির কিন্তু এ ছাড়া আরেকটি উদ্দেশ্য এরিস্টটল স্বীকার করেচেন ; ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায় তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এরিস্টটল ট্র্যাজেডির এই উদ্দেশ্যটিকে যে শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করেচেন সেই শব্দটির (catharsis) অর্থ নিয়ে নানারকমের টীকা টিপ্পনী করা হয়েচে। এই শব্দটি মূলতঃ চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে নেওয়া। আমরা যাকে জোলাপ বলে থাকি ও শব্দটির মৌলিক অর্থও তাই। জোলাপের সাহায্যে শরীর থেকে দূষিত মল নিষ্কাসিত করা হয়ে থাকে ; ট্র্যাজেডির সাহায্যেও তেমনি আমাদের হৃদয়কে মলমুক্ত করা হয়ে থাকে, এরিস্টটলের ধারণা এই ধরণের ছিল বলে মনে হয়।

এরিস্টটলের এই সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রোক্লাস বলেচেন যে, আমাদের মনের যে সব প্রবৃত্তিকে একেবারে দমন করে রাখাও সম্ভব নয়, আবার যাদের চরিতার্থ করতে যাওয়াও নিরাপদ নয়, সেই সব প্রবৃত্তিকে কতকটা চরিতার্থতা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ট্র্যাজেডি এবং কমেডি এই সব প্রবৃত্তিকে চরিতার্থতা দিয়ে আমাদের হৃদয়কে নির্ম্মল করতে সাহায্য করে থাকে এবং ফলে বাস্তবজীবনে আমরা প্রবৃত্তির উৎকট উৎপাত থেকে রক্ষা পাই।

"Tragedy and comedy...contribute to the cleansing away of passions which cannot be altogether repressed, nor on the other hand safely indulged, but need some moderate outlet. This they obtain at such dramatic performances, and so leave us untroubled for the rest of the time."

প্রোক্লাসের এই ব্যাখ্যাটি কতদূর সত্য তা আধুনিক মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করে দেখা উচিত। ফ্রয়ডীয় মনস্তত্ব যে ভাবে স্বপ্নবিচার করেচে শিল্পসৃষ্টিকেও সেই ভাবে বিচার করে দেখা উচিত। যাহোক, এখানে এরিস্টটলের সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, কেবল তাঁর বক্তব্যটিকে পাঠকের সম্মুখে যথাযথভাবে উপস্থিত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। এরিস্টটল বোধ হয় মনে করতেন যে ট্র্যাজেডি করুণা এবং ভীতি উদ্রেক ক'রে মানবহৃদয় থেকে কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দূর করতে সক্ষম হয়ে থাকে। জোলাপের ওষুধ যেমন শরীরের মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়ে তার ভেতরকার দূষিত মলকে নিষ্কাসিত করে ঠিক তেমনি।

ট্র্যাজেডিকে আমরা অনেকে বাঙলায় বিয়োগান্ত নাটক বলে নির্দ্দেশ করে থাকি। কিন্তু এরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডি-মাত্রই যে দুঃখের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে তা নয়, যদিচ বিয়োগান্ত হবার দিকেই এর ঝোঁক দেখা যায় সত্য—তাঁর মতে ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তু যদি গুরুত্বপূর্ণ হয় আর তার নায়ক অজ্ঞতাবশত কোনো ভয়ানক কাজ করতে গিয়ে, আকস্মিক ভাবে সেই অজ্ঞতা দূর হওয়ার ফলে যদি সে কাজে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা হ'লেও ট্র্যাজেডি হতে পারে[১৬]। অবশ্য নায়ক যখন অজ্ঞতাবশত কোনো শোচনীয়

১৪ Poetics Pt. III sec. 4.

১৫ Poetics Pt. II sec. 13.

১৬ Poetics Pt. II sec. 14.

বা নৃশংস কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে ফেলে তারপর সে তার ভয়ানক ভ্রান্তি দেখতে পায় (যেমন ওথেলোর ডেসডেমোনা হত্যা) তখন তা ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে বসে। কিন্তু যে ট্র্যাজেডিতে নায়ক হঠাৎ ভ্রান্তি বিদূরিত হওয়ার ফলে কোনো ভয়ানক দুঃখজনক কর্ম্ম করবার মুহূর্ত্তে বাধাপ্রাপ্ত হয় সেই ট্র্যাজেডিই এরিস্টটলের মতে উৎকৃষ্ট[১৭]। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি 'ইফিজীনাইয়া' (Ephigenia) নাটকের উল্লেখ করেছেন।

(৭)

ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণ ক'রে এরিস্টটল ছয়টি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবিষ্কার করেছেন: প্রথম গল্পের প্লট, দ্বিতীয় চরিত্র, তৃতীয় ভাব ও আবেগ, চতুর্থ বাচন ভঙ্গি, পঞ্চম সঙ্গীত এবং ষষ্ঠ সাজ-সজ্জা।

গল্পটিই হল ট্র্যাজেডির মুখ্য অঙ্গ; গল্পটিকে রূপায়িত করবার জন্য চাই চরিত্রসৃষ্টি এবং চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হবে ভাবাবেগ ও বাচন ভঙ্গির সাহায্যে। সঙ্গীত এবং সাজ-সজ্জার প্রভাব এরিস্টটল স্বীকার করেছেন বটে, কিন্তু এদুটিকে তিনি নাটকের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে মনে করেন না[১৮]।

ট্র্যাজেডির গল্পের আয়তন যে খুব বড় হবে না তা সহজেই অনুমেয়, কারণ নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু গল্পটি কেবল যে ছোট হওয়া চাই তা নয়, গল্পের মধ্যে বাঁধুনিও চাই খুব বেশি; তাতে এমন কোনো ঘটনাই থাকবে না যা বাদ দিলেও বাকী গল্পটার অঙ্গহানি ঘটবে না[১৯]।

তারপর ট্র্যাজেডির গল্পটি এমন হওয়া চাই যাতে মনে ভীতি এবং করুণার সঞ্চার হতে পারে। সেজন্য ঘটনাগুলো কার্য্যকারণসূত্রে পরস্পর সম্বন্ধ হবে অথচ সেগুলো হবে অপ্রত্যাশিত। ভীতি এবং করুণা সঞ্চারের জন্য ট্র্যাজেডির নায়ক এমন ব্যক্তি হওয়া উচিত যার মহত্ব বা ন্যায়পরায়ণতা যেমন অসাধারণ হবে না, তেমনি জ্ঞানকৃত কোনো পাপ বা দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেও সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হবে না: মানবীয় যে সব দুর্ব্বলতা অনেকটা স্বাভাবিক সেই দুর্ব্বলতা-প্রসূত কোনো ভ্রান্তি যখন কোনো মহান্ ব্যক্তিকে দুর্দ্দশা-কবলিত করে তখন সেই নায়ককে ট্র্যাজেডির যোগ্য নায়ক বলে মনে করা যেতে পারে। ট্র্যাজেডির নায়কের সৌভাগ্যশালী এবং প্রথিতযশাও হওয়া বাঞ্ছনীয়[২০]।

নাটকের গল্পটিকে ট্র্যাজেডিতে পরিণত করতে হলে তাতে কোনো একটি দুর্ঘটনার আকস্মিক আবির্ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। এরিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির এই যে আবর্ত্তন-কারী ঘটনা (catastrophe) এটি জটিলতাবিহীন এবং দুঃখময় হবে। দুঃখান্তক ট্র্যাজেডিকেই এরিস্টটল সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলে মনে করেন এবং এই কারণেই তিনি ইউরিপিডিসকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক কবি বলে স্বীকার করেছেন[২১]। এই দুঃখময় ঘটনাটিকে বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডিতে পরিণত করতে হলে তা বন্ধুদের মধ্যে সঙ্ঘটিত হওয়া প্রয়োজন। একজনের অনিচ্ছাকৃত বা অজ্ঞানকৃত ঘটনা যখন তারই প্রিয়জনের জীবনে বিপুল দুঃখ নিয়ে আসে তখনই জীবনে সত্যকার ট্র্যাজেডির আবির্ভাব ঘটে। ভালো ট্র্যাজেডির গল্পাংশ নির্ব্বাচনের সময় নাট্যকারকে এদিকে মনোযোগ দেবার জন্য এরিস্টটল পরামর্শ দিয়েছেন[২২]। কিন্তু ট্র্যাজিডির গল্পাংশে কোনো অসম্ভাব্য (improbable) ঘটনাকে নিয়ে আসা যে উচিত নয় সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে[২৩]।

(৮)

গল্পটিকে রূপায়িত করে তুলতে হলে কবিকে চরিত্র-সৃষ্টি করতে হবে। নাটকীয় চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে হলে তাকে কতকগুলি উক্তি এবং আচরণের মাঝ দিয়েই করতে হবে। এই কারণে নাটকে চরিত্র বলতে এক হিসাবে নাটকের মধ্যে যে সব বার্ত্তালাপ অথবা আচরণ থাকে সেগুলোকেই ধরতে হবে। এই সব উক্তি এবং আচরণের প্রত্যেকটি চরিত্রকে যাতে যথাযথভাবে প্রকাশ

১৭ Poetics Pt. II sec. 14.

১৮ Poetics Pt. II sec. 3.

১৯ Poetics Pt. II sec. 5.

২০ Poetics Pt. II sec. 11.

২১ Poetics Pt. II sec. 12 এরিষ্টটল কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে Poetics Pt. II sec. 14তে অন্য মত প্রচার করেছেন বলে মনে হয়।

২২ Poetics Pt. II sec. 14.

২৩ Poetics Pt. II sec. 15.

করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এরিস্টটলের মতে নাটকের চরিত্রগুলো এক একটি বিশেষ 'টাইপ' (type) কে প্রকাশ করবে। অর্থাৎ যদি বীর-চরিত্রকে রূপায়িত করা হয় তা হলে যে বৈশিষ্ট্যটি বীর-শ্রেণীর সাধারণ-ধর্ম্ম সেই বৈশিষ্ট্যটি যাতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় তা করা আবশ্যক। প্রত্যেক মানবচরিত্রের কতকগুলো স্থায়ী লক্ষণ থাকে সেগুলো যেন তার অন্তঃপ্রকৃতিরই প্রতিবিম্ব; আর কতকগুলো লক্ষণ থাকে যেগুলোকে অনিবার্য্য বলে মনে করা যায় না; সেগুলো থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। আমরা কোনো চরিত্রের স্থায়ী স্বরূপটিকে ধরতে পারি এই স্থায়ী মনোবৃত্তিগুলির সাহায্যে। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যে আগাগোড়া একটা সঙ্গতি থাকা অত্যাবশ্যক বলে এরিস্টটল বিবেচনা করেন; এমন কি খামখেয়ালী চরিত্রের খামখেয়ালীপনার মাঝেও একটা সঙ্গতি রয়েছে এবং অসঙ্গতিপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করতে পারলেই কবির সেই চরিত্রসৃষ্টি সার্থক হয়ে থাকে[২৪]।

নাটকের চরিত্র আপনাকে প্রকটিত করে ভাষা এবং ব্যবহারের সাহায্যে। এই ভাষার মাঝ দিয়ে ভাবাবেগ—আকুলতা, আগ্রহ, বিচার, ভয় ক্রোধ অনুকম্পা—আত্ম-প্রকাশ করে এবং শ্রোতার মনকে প্রভাবিত করে থাকে। কবিকে নাটকীয় চরিত্রের ভাবাবেগ দেখাতে হয় ভাষার কৌশলের সাহায্যে। এরিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনা করেন নি, কারণ ভাষণবিদ্যা (Rhetoric) সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই বাচন ভঙ্গিকে 'স্টাইল' বা রীতি বললেও বলা যেতে পারে। কবিকে নাট্য রচনায় উপযুক্ত রীতির আশ্রয় নিতে হবে; অভিনয় কৌশল বাচন ভঙ্গির একটি অংশ হলেও সেটা কবির বিবেচ্য বিষয় নয়[২৫]। ভাষায় শব্দ যোজনা, শব্দ বিন্যাস এবং নানাপ্রকার অলঙ্কার প্রয়োগের সাহায্যেই ভাবাবেগ প্রকাশ পায় বটে, তথাপি তার সম্যক্ রূপায়ন যে অভিনেতার অভিনয় এবং স্বর-বিন্যাসের ওপর নির্ভর করে এরিস্টটলকে তা স্বীকার করতে হয়েচে। কিন্তু এ সম্বন্ধেও এরিস্টটল কেবল উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েচেন। সাজসজ্জা এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে এরিস্টটলের মত পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি: এ দুটির সাহায্যে নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু এদের তিনি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে স্বীকার করেন নি। কিন্তু যে সঙ্গীতের সঙ্গে নাটকের মূল ঘটনার কোন যোগ নেই এরিস্টটল সে ধরণের সঙ্গীতকে নাটকের পক্ষে দোষাবহ বলে মনে করেচেন।

কবির কাব্য রচনা শক্তি সম্বন্ধে প্লেটোর যে সন্দেহ ছিল সেকথা বলা হয়েচে। এরিস্টটল কিন্তু কবির এই শক্তিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তবে কবির এই যে অনুকরণ শক্তি এর প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনিও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি। তাঁর মতে কবির এই রচনা-শক্তি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকও হতে পারে, অথবা দৈবী প্রেরণা প্রভাবে কবি কোনো কোনো সময়ে এই রচনা-প্রতিভা লাভ করে থাকেন এমনও হতে পারে[২৬]।

২৪ Poetics Pt. II sec. 15.

২৫ Poetics Pt. II sec. 23.

২৬ Poetics Pt. II sec. 17.



মধু-চক্র

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

১

আদালতে আসা-যাওয়া করি, কিছু রোজগার হয় না—তবুও দিনগুলো হেসে-খেলে বেশ কাটছিল। মানুষের দিন সমান যায় না, আমারও যায়নি—তাই, যাঁর ছায়ায় হাসি-খেলা করতাম, তিনি একদিন ইহজগৎ ত্যাগ করলেন; আ-শৈশব মাতৃহীন আমি, যৌবনে পিতৃহীন হ'লাম।

শ্মশানে জনতা জমেছে—পিতৃদেবের আফিসের কেরাণীকুল-প্রমুখ অনেকেই এসেছেন পিতৃদেবের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য; পিতার উপরি-কর্ম্মচারী একজন সাহেব, তিনিই বিভাগীয় কর্ত্তা—তিনিও এসেছেন, পুষ্পসজ্জিত শবের পার্শ্বে নীরব ও নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। শব স্পর্শ কোরে আমি শ্মশান-ভূমিতে বোসে আছি—জগৎটা আকারে আমার কাছে খুবই ছোট হোয়ে গেছে—পিতার শবদেহ তা'র অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে!

"ইনিই হোলেন মৃতের একমাত্র পুত্র"—কথাটা কাণে আসতেই আমার চমক্ ভেঙে গেল—চেয়ে দেখলাম—আধা-বয়সী একজন ভদ্রলোক নতমস্তকে সাহেবকে সেলাম জানিয়ে উক্ত কথা বললেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করলেন।

সাহেব নীরব, তিনিও নীরব—আমিও পূর্ব্ববৎ নীরব, কিন্তু নিস্পন্দ নহি। সেই নীরবতা ভঙ্গ কোরে সেই ভদ্রলোকটী আবার বললেন "বড় ভাল ছেলে—'এম্-এ, বি-এল্' পাশ—চাকুরীর বয়স এখনও আছে—আপনার 'অফিসার্' বেঁচে থাকলে তাঁকে পেনসন্ দিতে হ'ত, 'রায় বাহাদুর' খেতাব দিতে হ'ত—সে সমস্ত থেকে তিনি গভর্ণমেণ্ট্‌কে অব্যাহতি দিয়ে চলে গেছেন।" পরক্ষণে আবার নীরবতা—কিন্তু সে নীরবতা আমি অনুভব করি নি—আমার ভেতর ঝোড়ো হাওয়া গর্জ্জন করছিল। কেরাণীবর্গের জনতা জমাট্ বেঁধে গেল; "রায় সাহেবের কেরামতি দেখা যাক্"—এই কথাটা জনতার ভেতর থেকে এসে আমার কানের ভেতর আঘাত করল।

এইবার আমার পালা; রায়সাহেব আমায় বললেন (অবশ্য, পূর্ব্ববৎ ইংরাজীতে)—"কিছু ভেবো না, সাহেব খুব দয়ালু" এবং পরক্ষণেই আবার বললেন "তুমি একটু সুস্থির হও—দু'তিন দিন পরে একটা দরখাস্ত লিখে সাহেবের হাতে দিয়ে এস।" সাহেব বোধহয় মৌন-সম্মতি জানালেন; আমার বুকের ভেতর কাল-বৈশাখী গর্জ্জে উঠে চোক্ দু'টো দিয়ে বেরিয়ে গেল!

২

আদালতে যাওয়া-আসা করা ছেড়ে দিয়েছি—বাড়ীতে বসেই দিনগুলো একরকম কেটে যাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠের দুপুর—চারিদিক্ ঝাঁ-ঝাঁ করছে; অন্ধকার-করা ঘরের মেঝের উপর মাদুর পেতে পাখার তলায় শুয়ে অতীত জীবনের কত কথাই ভাবছি, এমন সময় দরজা একটু ফাঁক কোরে কে-একজন মুখ বাড়িয়ে বললে "কী-গো বড়বাবু, ঘুমুচ্ছ না-কী?"

"ওরে বাস্, জীবদা যে!"—এই কথা বলতে বলতে ঘরের দরজা খুলে জীবদাকে ঘরের ভেতর আহ্বান করলাম। মাদুরের উপর থপাস্ কোরে বোসে পোড়ে ঘর্ম্মসিক্ত পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে খুলতে ঊর্দ্ধমুখে বিজলীপাখার দিকে কাতর নয়নে দৃষ্টিপাত করলেন; আমি উঠে 'রেগুলেটার্'টা ঘুরিয়ে দিলাম—পাখাটা পুরা দমে বন্-বন্ কোরে ঘুরতে লাগল।

"তা'রপর জীব্‌দা, কী মনে কোরে!"

"কেন, আসতে নেই!"

"আমিও তো সেই কথা বোলছি ভাই; বাবা মারা যাবার পর সেই এসেছিলে, আর এই এলে ছ'মাস পরে।"

কথাটা এড়িয়ে জীব্‌দা বললেন "তারপর বড়বাবু, কিছু-কি করা হচ্ছে?"

আমি হেসে উত্তর দিলাম "বুঝতেই পারছ…।"

আমার কথায় বাধা দিয়ে জীবদা বললেন "কেন, কর্ত্তার আফিসে চাকুরী কী হ'ল!"

"আর বোল-না দাদা, সে বিড়ম্বনার কথা !"

আমার কথায় বিরক্তি-প্রকাশ লক্ষ্য কোরে জীব্‌দা হাসতে-হাসতে বললেন "চাকুরীর দরকার কী তোমার ! কর্ত্তা যা' রেখে গেছেন, তাই নেড়ে-চেড়ে চালাও দাদা।"

আমি তক্ষুণি উত্তর দিলাম "ও কথা বোলনা জীব্‌দা —টাকার দরকার নেই যা'র, আজকাল পৃথিবীতে এমন লোক কে আছে !"

আমার এই কথা শুনে জীব্‌দা হাসিমুখে বললেন "এক গেলাস জল আনিয়ে দাও-তো—উঃ, কী গরমই পড়েছে !"

"একটু অপেক্ষা কর, আনিয়ে দিচ্ছি"—এই কথা বোলে আমি ঘর থেকে চোলে গিয়ে সিরাপ-মিশ্রিত জলে বরফের কুচি ফেলে, নিজেই গেলাস্‌টা হাতে কোরে নিয়ে ঘরে ফিরে গেলুম ; গেলাস্‌টা হাতে নিয়েই জীব্‌দা গালভরা-হাসি হেসে বললেন "সাধ কোরে আর বড়বাবু বলি !"

"কেন, এ'রকম অভ্যর্থনা কী আর কখনও পাওনি ? বড়বাবু কথাটা তো আজ প্রথম শুনছি !"

জীব্‌দা সিরাপের গেলাস্ মুখে ঠেকিয়ে গেলাসের পাশ দিয়ে বক্রদৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন —কিছুক্ষণ পরে বললেন "টাকা যদি বাড়াতে চাও দাদা, তা' হোলে ধান-চালের ব্যবসা কর—সুজলা-সুফলা বাঙলা দেশে এ' ব্যবসার হাজা-শুকো নেই।"

একটু হেসে আমি বললাম "আমার তো ও ব্যবসার কিছুই জানা নেই জীব্‌দা।"

বাকী সিরাপ্‌টুকু তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ কোরে জীব্‌দা বললেন "আমি তো ওই ব্যবসা কোরে বুড়ো হোতে চললাম ; বল তো আমি সব ছাখা-শোনা কোরব'খন—বেশী কিছু নয়, পাঁচ হাজার হোলেই প্রথমটা চ'লে যাবে।"

৩

বছর-দুই কেটে গেছে। সন্ধ্যার প্রাক্-কালে যথা-নিয়ম পাড়ার আড্ডায় গিয়ে হাজির হোয়েছি ; ঘরের মাঝখানে দাবা-খেলা হোচ্ছে—দু'জন খেলছে, আর ছ'জন তাদের ঘিরে সেই খেলায় টিপ্পনী কাটছে—ঘরের একধারে একজন হারমোনিয়ম্ বাজাচ্ছে—আর তা'র পাশেই একজন বেশ গম্ভীর চালে একটা নাটকের পাতায়-পাতায় লাল-নীল পেন্সিলে দাগ দিয়ে মহলার জন্ম বইখানাকে ঠিক্ ক'রছে। তারিণী তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে চুপ্‌টী কোরে বিড়ী ফুঁকছিল—আমাকে দেখেই বোললে "ওরে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে" ; আমি কোন উত্তর দেবার পূর্ব্বেই সে আমাকে হাতে ধোরে টেনে নিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে হাজির হ'ল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বল্‌লে "কী রে, রোজগার করবার ইচ্ছে আছে !"

আমি চুরুট্ ধরাতে ধরাতে বললাম "খুব ইচ্ছে আছে, কে বোললে নেই !"

"হ্যাঃ—ইচ্ছে থাক্‌লে, অমন চাক্‌রী ছেড়ে দিস্।"

"মোহনপুর ফ্যাক্‌টরীর সেই চাক্‌রীটার কথা বোলচিস্ তো ?"

বিড়ীর কণাটুকুতে শেষ টান্ দিয়ে তারিণী ব'ললে "হ্যাঁ-রে, হ্যাঁ—ন্যাকা সাজিস্ কেন ? অমন চাক্‌রী করলি না—বল্‌লি কি-না, কুলীর সর্দ্দারী !"

জিজ্ঞাসার সুরে আমি বললাম "কুলীর সর্দ্দারী নয় ?"

"তা বোলবি বৈ-কী ? কারখানা খোলবার সময় আর বন্ধ করবার সময় কুলী-মজুরদের হাজিরা লেখা,—বাস্, এই-তো কায ! অথচ মাস-কাবারে একশ'টী টাকা ঘরে আনতিস্।"

"বেশ্, তাই না হয় হোল—কিন্তু চাক্‌রীটা জুটল কৈ ?"

তারিণী মুখ খিঁচিয়ে বোললে "জুট্‌ল কৈ—জুটবে কোত্থেকে—চেষ্টা করিছিলি ?"—তা'র পরেই স্বাভাবিক ভাবে আবার বললে "সত্যি কোরে বল্ দিখি, রোজগার করবার ইচ্ছে আছে…।"

তারিণীর কথায় বাধা দিয়ে আমি বললাম "সত্যি বোল্‌ছি, রোজগার করবার ইচ্ছে খুব আছে—আর দরকারও যে নেই, কালের হিসেবে সে কথাও তো বোলতে পারিনা।"

তারিণী পকেট্ থেকে পেটেন্ট্-ঔষধ প্রস্তুতকারকের বিতরিত একটা নোট্-বুক বা'র কোরে, তার পাতা উল্‌টে খবরের কাগজের একটা ছোট্ট টুক্‌রো আমার হাতে দিয়ে বললে "এই নে, 'ভেকেন্‌সি-নোটিস্'টা (কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনী)—পোড়ে ছাখ্ দিকি—কেমন খাসা চাক্‌রী ! কেসিয়ারী চাক্‌রী—পাঁচ শ' টাকা মাইনে, লাক্ টাকা জমা।"

বিজ্ঞাপনটা পোড়তে পোড়তে আমি বল্‌লাম "লাক্ টাকা জমা—নগদ লাক্ টাকা ! আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

"ভেবে ছাখা নয়, চেষ্টা কোরতে হ'বে—তোরও ঘরে বেশ-কিছু আসবে, আর অনেক অধমও তরাতে পারবি।"

মৃদু হেসে বললাম "এ' চাকরী জোগাড় করা কী সোজা—বিশেষতঃ আমার পক্ষে!"

তারিণী ধমক্ দিয়ে বললে "বাজে কথা ছেড়ে, ভাল কোরে চেষ্টা কর্ দিখি।"

আমি আড্ডা-ঘরে পুনরায় প্রবেশ কোরতে যাচ্ছিলাম—তারিণী আমাকে বাধা দিয়ে বললে "কিন্তু মনে থাকে—তোর তাঁবে প্রথম চাক্‌রীটা এই শম্মাকে দিতে হবে"!

৪

কেসিয়ারী-চাক্‌রীর চেষ্টায় বটব্যাল-মহাশয়ের বাড়ী গেলাম। বটব্যাল-মহাশয়ের একটু-আধটু লেখা অভ্যাস আছে—খবরের কাগজে লিখে কিছু উপার্জ্জন করেন—তা' ছাড়া আমার মতন দায়গ্রস্ত লোকের কার্য্য-উদ্ধারে সহায়তা কোরে দালালী স্বরূপ কিছু ঘরে আনেন; লাক্-টাকা-জমার কথা শুনে বটব্যাল মহাশয়ের মতলব কিন্তু অন্তদিকে গেল—তিনি বললেন "আরে ভাই, লাক্ টাকা জমা দিয়ে চাক্‌রী কোরবে—এ বিড়ম্বনা কেন!"

"বুঝছেন-না বটব্যাল মশাই, ওইটেই যে পৈত্রিক পেশা"।—এই কথাটা বিনিয়ে-বিনিয়ে বলতে-না-বলতে—বটব্যাল-মহাশয় তাঁ'র গোলাকার দুই চক্ষু বিস্ফারিত কোরে বললেন "লাক্ টাকা জমা দিয়ে চাক্‌রী! আরে ছ্যাঃ! তুমি 'ইয়ংম্যান্' (তরুণ)—লেখা-পড়া শিখেছ——লাক্ টাকা জমা দেবার মুরোদ্ রাখ, তুমি কি-না কোরবে চাক্‌রী! চাক্‌রী যত বড়ই হোক্-না কেন, আসলে গোলামী তো বটে!"

আমি হতাশ হোয়ে বললাম "তা' হোলে আপনি কি এ'বিষয়ে কিছু করবেন না!"

মুচ্‌কে হেসে বটব্যাল-মহাশয় বললেন "আ-হা, ওতো হাতের পাঁচ! ও বিষয় তো চেষ্টা কোরতেই হ'বে, তুমি যখন এসেছ; কিন্তু আমি কি বল্‌ছি জান—একটা ছোট-খাট 'প্রেস্' (ছাপাখানা) কিনে একটা কাগজ বা'র কর,—ব্যস্, এক বছরে 'লীডার্-মেকার্' হোনে যাবে—হাজ্‌রী-লিষ্টিতে নামটা যা'তে বেরোয়, আর সভা-সমিতির ছবির ছাটাইয়ে কানটা যেন না বাদ যায়—এ'সবের জন্ত কত সুপারিশ আসবে"।

পরে বটব্যাল-মহাশয়ের এই হাস্যরসাত্মক কথা স্মরণ কোরে নিজমনেই কত হেসেছি, অথচ তখন কিন্তু হাসি এল না; নিজ অদৃষ্টের উদ্দেশে মনে মনে কটূক্তি কোরে প্রকাশ্যে বললাম "তা'ই না-কি বটব্যাল-মশাই! বলেন কী!"

বটব্যাল-মহাশয় অতি ক্ষিপ্রতার সহিত বললেন "আরে ভায়া, ছাথই-না,—একটা বছর বৈ-তো নয়, দেখ্‌তে-দেখ্‌তে কেটে যাবে, আর টাকাও বেশী দরকার নেই, দশ হাজার হোলেই হবে—যদি গতর একটু বেশী খরচ করা যায়, তা' হোলে পাঁচ হাজারেও কায চালান যাবে।"

আমি হাসতে-হাসতে বললাম "কায তো চালান যাবে,—কিন্তু সেটা 'লীডার্-মেকার্' হ'বার জন্ত, না জেলে যাবার জন্ত!"

বটব্যাল-মহাশয় চট্ কোরে বোলে ফেললেন "সে ঝক্‌মারী আমার—তুমি আমায় জেল্-যাওয়া সম্পাদক কোরো'খন।"

বটব্যাল-মহাশয়ের কাছ থেকে সবেমাত্র বাড়ী ফিরেছি, এমন সময় শশাঙ্ক এসে হাজির—তা'র হাতে একটা বাঁধান খাতা; বৈঠকখানায় প্রবেশ কোরেই সে বললে "দাদা, আপনার জয় হোক্…"।

আমি তা'র কথায় বাধা দিয়ে বললাম "কি-হে, হঠাৎ প্রশস্তি কেন!"

শশাঙ্ক গোঁফ্ জোড়াকে চুমড়ে নিয়ে বললে "বড় চাক্‌রীর চেষ্টা কোরছেন—আপনার নিশ্চয় হবে, আমরা প্রার্থনা কোরছি।"—পরক্ষণেই শশাঙ্ক খাতাখানা খুলে আমার সামনে রেখে দিলে।

আমি জিজ্ঞাসু হোয়ে বললাম "এ' খাতা কিসের জন্ত শশাঙ্ক?"

হাসির রেখায় শশাঙ্কের কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টা অদৃশ্য হোয়ে যা'বার জোগাড় হ'ল—সে গোঁফ্‌জোড়াতে আবার মোচড় দিয়ে বোললে "আমাদের 'সোহং চক্র'রের প্রধান চক্রী তাঁ'র শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্ত মঠ করবেন—এটা তা'রই 'ডোনেশন্'এর (এককালীন দানের) খাতা; আমাদের প্রধান চক্রীর সঙ্গে ম্যানেজারের খুব বন্ধুত্ব আছে—আপনার যা'তে কেসিয়ারীটা হয়, আমি বোলে

দিয়েছি; তিনি ম্যানেজারকে বিশেষ কোরে বলবেন'খন। আপনাকে বিশেষ কিছুই দিতে হবে না, পাঁচ শ' টাকা দিলেই হবে— আপনি সেইটা এখন লিখে দিন্—এর পর সুবিধা মত…"।

"বল কী হে শশাঙ্ক!"—আমার এই বিস্ময়পূর্ণ কথার উত্তরে শশাঙ্ক বললে, "আচ্ছা, বেশ্ তো, এক শ' টাকাই দিন্—কিন্তু সেটা বাকী রাখ্‌লে হ'বে না।"

বটব্যাল-মহাশয়ও শশাঙ্কের সহায়তা ও প্রীতির গ্লানি দূর করবার মানসে হেদুয়ার উত্তর-পূর্ব্ব ধারে একটা বেঞ্চিতে বসে আছি—এমন সময় আমার এক দূর আত্মীয় কলুষ-বাবু কোথা থেকে এসে হাজির হ'লেন।—

"তা'র পর, সব ভাল তো হে—হঠাৎ আজ এখানে চুপ্‌টী কোরে বোসে—সে চাকরীটার কী হ'ল—কিছু হ'ল না বুঝি—আজকাল্‌কার গভর্ণমেণ্ট্ তো এই রকমই হোয়েছে, তা' না হ'লে… —আগেকার দিন যদি হ'ত, বুঝ্‌লে কি-না…, সে এক দিন গ্যাছে—আফিসের লোকেরাই বুঝি 'প্রোমশন্'এর অজুহাতে বাদ্ সাধলে—আরে, আফিসে ঢুকলি কা'র দৌলতে" ইত্যাদি এক রাশি কথা তিনি বোলে গেলেন; বোধ হয়, উত্তরের প্রত্যাশা তিনি করেন নি—আমিও উত্তর দেবার চেষ্টা করি নি। পরক্ষণেই বললেন "তুমি তা' হ'লে বোসো, আমি দু' এক চক্কর ঘুরে আসি।"

কলুষবাবুও হন্-হন্ কোরে এগিয়ে গেলেন, আমিও সটাং বাড়ী ফিরে এলাম—কী-জানি, তিনিও যদি আমার বেকার-কলুষ ধৌত করবার জন্ম উদ্বিগ্ন হোয়ে পড়েন—স্নেহ নিম্ন-গামীও যেমন, দৃষ্টির সীমাও তেমনই গণ্ডীবদ্ধ।

৫

জলের মতন আরও এক বছর কেটে গেল। একদিন অপরাহ্নে ট্রাম্ থেকে লালদীঘীর মোড়ে নেমেছি, ঠিক্ সেই সময় দেখা হ'ল দত্তজার সঙ্গে—অনেক দিন পরে দেখা।

দত্তজা প্রথমেই জিজ্ঞেস্ করলে "কেসিয়ারী-চাক্‌রীটা হ'ল না তো?"

আমি মৃদু হেসে বললাম "তুমি জানলে কী কোরে?"

"দত্তজা সবাইয়ের খবরই রাখে—তোমার মতন তো বড়লোক নয়—তা'কে খেটে খেতে হয়।"

"তা' তো জানি—এখন আছ কেমন, বল।"

"আমাদের আর থাকা-থাকি! তা'রপর, কিছু করছ না তো—বোসে-বোসেই জীবনটা নষ্ট করবে!"

"রোজগারের একটা পথ বাতলে দাও-না ভাই—তোমরা খাটিয়ে লোক, কাযের লোক।"

"এমন পাগল তো দেখি নি! কোল্‌কাতা সহরে পথের অভাব আছে—বড়-রাস্তাই বল, আর গলি-রাস্তাই বল, কোল্‌কাতায় কত পথ বল দিথি! বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল—পথের অভাব কী!"

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম "ঠিক্ বোলেছ।"

দত্তজা এ'বার উৎসাহের সহিত বললে "একটা কথা শুনবে?" আমার কিছু বলবার পূর্ব্বেই সে আবার বললে "একটা মনোহারীর দোকান খোলো—জান-তো আমার কত-বড় একটা দোকান ছিল শ্যাল্‌দার মোড়ে—দু' মাস অসুখে ভুগেই সব নষ্ট হোয়ে গ্যাল, দোকান তুলে দিতে হ'ল…"।

তা'র কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "এখন, তা' হ'লে কোরছ কী?"

"ওই এক ধরণেরই কায—'অর্ডার্স্ সাপ্লাই'এর ব্যবসা, —তবে এ'বার আর দোকান খুলি নি, দত্তজা আর বেল-তলায় যাচ্ছে না; এই ত্যাখ-না, জন্‌বুলের আফিস্ থেকে দু' শ' টাকার অর্ডার নিয়ে যাচ্ছি।"—আমাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই দত্তজা আবার বললে "যদি টাকা বাড়াতে চাও ভাই, একটা মনোহারীর দোকান খোলো; তোমাকে কিছু করতে হবে না—আমি সব কোরব'খন, তুমি দোকানে চুপটী কোরে বোসে থেকো—কপাল যদি মন্দ হয়, তা' হ'লেও খরচ-খরচা বাদে মাসে এক শ'টী টাকা ঘরে তুলতে পারবে…"।

ঠিক্ সেই সময় কালী-ঘাটের ট্রাম্ একখানা এসে থামল; "দত্তজা, তা'হ'লে আসি"—এই কথা বোলেই, ট্রাম্‌টাতে উঠে পড়লাম।

"কালী-ঘাটের ট্রাম্, কালী-ঘাটের ট্রাম্,—নেমে পড়ো"।

ট্রাম্‌গাড়ীর ভেতর থেকেই বললাম "কালী-ঘাটে একটু দরকার আছে।"

"এখানে নেমেছিলে কী কোরতে!"

আমাকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে ড্রাইভার্ ঠং-ঠং-ঠং ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম্‌গাড়ী চালিয়ে দিলে।

৬

কোল্‌কাতার উপকণ্ঠে বাগান-বাড়ীতে এসে দিন-কতক বাস করছি, কিন্তু এখানেও পরামর্শদাতার অভাব নেই; যাঁ'রা ছুটীর দিনে কোল্‌কাতা থেকে আসেন, তাঁ'রা সন্ধ্যাকালে ফেরবার সময় বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হোয়ে বোলে যান "মাড়োয়ারী হোলে এই বাগানে একটা 'ডেইরী' (গোয়ালার ব্যবসা) খুলে ফেলত; আবার কেউ কেউ বোলে যান "'পোল্‌ট্রি' আর 'নার্শরী' আরম্ভ কোরে দাও—সখ্ করাও হ'বে, পকেট্‌ও ভরবে—এ' দু'টো কাযে এখনও 'টু-পাইস্ হাজ্' (দু' পয়সা আছে)।"

প্লানচেটের ভূত *

যাদুকর—পি সি সরকার

প্রবন্ধ

"যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে;
যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা;
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"—

আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন মানুষের জীবন বা দেহ নশ্বর হইলেও আত্মা অবিনশ্বর—অমর। মানুষের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহ ব্যতিরেকেও এক সূক্ষ্মদেহ আছে। এই দেহ বা জীবনের শেষ হইলে সেই দেহের ও জীবনের সুরু হয়। মানুষের মৃত্যুর পর তাহার অবিনশ্বর আত্মা যে সূক্ষ্মদেহ আশ্রয় করে ঐটীই নাকি তাহার ভৌতিক দেহ বা ভূত। ঐ সময় আত্মা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যের বাহিরে—পৃথিবী, জল, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূতে মিশ্রিত থাকে বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহাকে 'ভূত' নামকরণ করা হইয়াছে।

আজকাল আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রভৃতি লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র আলোচনা চলিয়াছে। কেহ ইহাকে অন্ধ কুসংস্কার বলেন, আবার কেহ কেহ বলেন যে ইহার অস্তিত্ব অতিশয় সত্য। কেহ কেহ মৃত আত্মার সহিত কথা কহিতেছেন, সময় অসময়ে প্রশ্ন করিয়া পরামর্শ লইতেছেন—কেহ কেহ বা উহার 'ফটো' তুলিয়া জগৎসমক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন! এই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর দ্বন্দ্ব শুধু ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্যমান এবং উত্তরোত্তর উহার মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আজকাল ওদেশ এবং এদেশ সর্ব্বত্রই আধ্যাত্মিক গবেষণামণ্ডলী সূক্ষ্মানুসন্ধান সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণাও চলিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি 'ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ' বলেন :—

……"I look for Ghosts, but none will force
Their way to me"……

"'Tis falsely said
That there was ever intercourse
Between the living and the dead."

অর্থাৎ—"আমি ভূতকে খুঁজিতেছি, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও কোন ভূত আমার কাছে আসিল না"……

* বলা বাহুল্য ভূত তিন প্রকার। প্রথমতঃ 'ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম' প্রভৃতি পাঁচটীর—'ভূত'। দ্বিতীয়তঃ—আমাদের রঙ্গমঞ্চের 'ব্লাক-আর্টে'র কাল পোষাকপরা নরকঙ্কালবাহী 'মানুষ ভূত'। তৃতীয়তঃ—মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের বাহিরে দেহধারণ করে—সেই 'ভূত'। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর ভূতের সহিত সম্পর্ক নেই। লেখক।

"লোকে মৃতদেহের আত্মার সহিত কথা বলে ইহা মিথ্যা কথা—এরূপ কখনও হয় নাই।"

অপরদিকে প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত 'স্যার আর্থার কোনান ডয়েল' প্রমুখ সকলে বলেন—"আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা কহা চলে, উহার আলোকচিত্র লওয়াও সম্ভবপর। ইহার সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর লেখা চলে।" আমার মনে হয় উভয় মতই চরমপন্থী।

আত্মার অস্তিত্ব ও ইহার অবিনশ্বরত্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ না পাইলেও আমি এই দুইটী মতই সমর্থন করি। কিন্তু ইহা সময় অসময়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে কিনা সেইটী প্রশ্নের বিষয়। বর্ত্তমানে প্লানচেটের সাহায্যে যে ভৌতিক লেখা গ্রহণ করা হয় উহার ভালমন্দ দুইদিক আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। প্লানচেটের প্রচলন এ পৃথিবীতে আদিম যুগ হইতেই নানাদেশে নানাভাবে হইয়া আসিয়াছে। এই 'প্লানচেট' সাধারণতঃ তিনচার প্রকার। প্রথমতঃ 'পেণ্ডুলাম'—অর্থাৎ একটি লম্বা 'চেন' বা সুতার অগ্রভাগে আংটী বা লোহার বল ঝুলাইয়া ধরা হয়। নীচে বর্ণমালার অক্ষর গোল করিয়া সাজান থাকে—পেণ্ডুলাম ঝুলিতে ঝুলিতে একবার এক অক্ষর, পরের বার অপর অক্ষর—এইরূপে যাইয়া প্রশ্নের উত্তর দেয়। কখনও কখনও ঐরূপ অক্ষরের পরিবর্ত্তে একটী কাচের গ্লাসে বা ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ঐ পাত্রে টুং-টুং শব্দ করিয়াও প্রশ্নের উত্তর করে। 'মিডিয়ম'—অর্থাৎ যিনি 'পেণ্ডুলাম'টী ধরিয়া থাকেন তিনি নিজে স্থির ভাবেই ধরিয়া থাকেন অথচ পেণ্ডুলাম একবার এদিক একবার ওদিক আপনাআপনিই ঘুরিয়া শব্দ করিতে থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Magic Pendulum ও ফরাসীতে pendule explorateur বলে। দ্বিতীয়তঃ—হাতের মধ্যে একটী পেন্সিল লইয়া হাতকে অসাড় করিয়া একটী কাগজের উপর ধরা। তখন আপনা আপনিই লেখা হইতে থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে 'Automatic writing' বলে।

তৃতীয়তঃ—সাধারণ একটী টেবিলে তিন চারজন লোক হাত দিয়া বসিয়া থাকে; অথচ সেই টেবিল আপনা হইতেই উঠিয়া নাড়াচাড়া করিতে থাকে। চতুর্থতঃ—সাধারণতঃ প্লান্‌চেট (Planchette)—একটী পানের আকৃতি কাঠের তক্তার উপর তিনজন মিডিয়ম হাত রাখে। ঐ কাঠের মধ্যে তিনটী পা লাগান—প্রথম পা দুইটীতে রোলার লাগান আছে—তৃতীয় পা'টী একটী পেন্সিলের তৈরী। মিডিয়মগণ এই ত্রিকোণাকৃতি কাঠের বা পেষ্ট-বোর্ডের প্লানচেটটী একটী সাদা কাগজের উপর রাখিয়া স্থিরভাবে হাত দিয়া বসিয়া থাকে; তারপর 'ভূত' আসিয়া আস্তে আস্তে ঐ প্লান্‌চেট সরাইয়া সরাইয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া যায়। বলা বাহুল্য যে প্রত্যেকটী ব্যাপারেই মিডিয়ম নিস্তেজ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে—সে নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছুই নাড়ে না বা লিখে না অথচ স্বতঃই ঐ লেখা হইয়া থাকে। কোনও অদৃশ্য শক্তি বা ভূত আসিয়া নিশ্চয়ই ঐরূপ করে—অন্ততঃ সাধারণ লোক তাহাই বিশ্বাস করিবে। এই ভৌতিক ব্যাপার যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেমনই বিস্ময়কর।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই পেণ্ডুলাম প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহু ভবিষ্যৎবাণী করিতেন। প্রকাশ যে দৈবজ্ঞ (augur) একটী বৃত্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতেন—ঐ বৃত্তের চতুর্দ্দিকে বর্ণমালার অক্ষরসমূহ সাজাইয়া রাখা হইত। তারপর দৈবজ্ঞ হাতের অঙ্গুলী হইতে একটী সুতার অগ্রভাগে লোহার রিং ঝুলাইয়া ধরিয়া থাকিতেন—ও দেবতাদিগকে প্রশ্নের উত্তর জানাইতে অনুরোধ করিতেন। পেণ্ডুলামটী তখন এদিক ওদিক করিয়া পর পর এক একটী বিভিন্ন অক্ষরে যাইয়া সমস্ত বিষয় বানান করিয়া বলিয়া দেয়। কথিত আছে যে একজন রোমক সম্রাট তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারীর নাম জানিতে পারিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলেন।

তারপর মধ্যযুগেও সমগ্র ইউরোপে এই পেণ্ডুলাম-প্লান্‌চেটের প্রচলন দেখা গিয়াছে। ক্রমেই যেন ইহা জনসমাজে আদৃত হইয়া উঠিয়াছে। বৃটীশ মিউজিয়মে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের ইতিহাসপূর্ণ এই 'পেণ্ডুলাম' (pendule explorateur) সম্বন্ধে বহু ইংরাজী পুস্তক রক্ষিত আছে। ইটালী, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড—প্রত্যেক জাতির বড় বড় লেখকই এই প্লান্‌চেটের বিস্ময়কর ক্ষমতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটীর ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দের দর্শনশাস্ত্রীয় বিবরণে (Philosophical Transactions) এই পেণ্ডুলামের অদ্ভুত গতির কথা বর্ণিত আছে। সেই প্রবন্ধে মিঃ গ্রে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে—হস্তস্থিত ঝুলায়মান বল সর্ব্বদাই

পৃথিবীর গতি যেদিক সেইদিকেই ঝুলিতে চাহে। মিঃ গ্রে নিজে একজন অতিশয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি নিজেই প্রথম বিদ্যুৎ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন ও তৎকালে তিনি রয়েল সোসাইটির 'সম্মানিত সদস্য' ছিলেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে এই পেণ্ডুলাম হইতে গ্রহনক্ষত্রের গতির একটা প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে এইটী শুধু গ্রহ নক্ষত্র সূর্য্যের যেদিকে ঘুরে সেইদিকেই ঘুরিয়া থাকে। কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে "মনুষ্য হস্ত ছাড়া অন্য কিছু হইতে ঝুলাইয়া দিলে ঐরূপ গতি হয় না।" রয়েল সোসাইটীর সেক্রেটারী মিঃ মর্টিমার নিজেও গ্রে সাহেবের এই মত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের 'ইলেক্‌ট্রিসিটী' কাগজের ৬০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ যে মিঃ হুইলার ইহা সমর্থন করেন নাই। তিনি মনে করেন—মিডিয়ম ঐ পেণ্ডুলামটী হাতে ধরিয়া অজ্ঞাতসারে যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক এই গতির কথা চিন্তা করেন সেই অজ্ঞাত চিন্তা হইতেই ঐ ব্যাপার সংঘটিত হয়—যদিও মিডিয়ম জ্ঞানবশতঃ ঐরূপ করিতে মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি ইহাকে স্বতশ্চল মাংসপেশীর ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই পেণ্ডুলাম প্লানচেট হইতে নানারূপ উত্তর পাইয়া প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক মিঃ রিটার (Ritter) মনে করিলেন যে তিনি নূতন কিছু অদৃশ্য শক্তির আবিষ্কার করিলেন—তিনি ইহার নাম দেন 'সিডারিজম্' (Siderism); তাহার কয়েক বৎসর পর মিসেস্ ডি মর্গান (Mrs. De Morgan) তাঁহার স্মৃতি পুস্তকের (Reminiscences) ২১৬ পৃষ্ঠাতেও এই প্লানচেটের অদৃশ্য ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্লানচেট শুধু সভ্যশিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজেই সীমাবদ্ধ নহে। কারেনদের (Karens) মধ্যে একটী ধাতু পাত্রে সুতা দ্বারা আংটী ঝুলাইয়া মৃত আত্মা বা ভূতের সঙ্গে কথা কহার পদ্ধতি এখনও বিদ্যমান আছে; তাহাদের ধারণা ভূত আসিয়া ঐরূপ ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া শব্দ করে।

এই "প্লানচেটের ভূত" কি?—কেন এরূপ হয়? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে। বিলাতের আধ্যাত্মিক গবেষকমণ্ডলী এতদিন চেষ্টা করার ফলে সবে মাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে এ ভূত মিডিয়মের নিজের অজ্ঞাত মন। মিডিয়ম নিজেই অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতসারে ঐ পেণ্ডুলামে ক্ষমতা দিতেছেন। ইহাকেই পণ্ডিতগণ 'অজ্ঞাত মাংসপেশীর ক্রিয়া' আখ্যা দিয়াছেন। মিডিয়ম নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনও ঐরূপ ঝুলাইতে পারিবে না—কিন্তু মনে মনে গুপ্তভাবে চিন্তা করিতে থাকিলে আস্তে আস্তে মনের গতির সহিত অজ্ঞাতসারে ঝুলিতে থাকিবে। সেই জন্যই মিঃ গ্রে যখন অন্য কোন দ্রব্য হইতে ঐ পেণ্ডুলাম ঝুলাইয়া দিতেন তখন উহা ঝুলিত না। *

এই ত গেল প্লানচেটের ভূতের কথা। বাস্তব জগতে এইরূপ কত ভূত আমরা দিন দিন গড়িতেছি আবার ভাঙিতেছি। নিজের মনই অধিকাংশ সময় স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় ভৌতিক ক্রিয়া করিতেছে ও ভূত দেখাইতেছে। রজ্জুকে সর্পভ্রম করা শুধু চক্ষুর ক্রিয়া নহে—মনই ঐরূপ করার প্রধান কারণ। কোন এক ব্যক্তি শ্মশান ঘাটে রাত্রিতে একা একা নিশান পুতিতে যাইয়া নিজের কাপড় আটকাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। আবার গল্প শুনা যায় কে কোথায় জ্যোৎস্না রাত্রিতে নিজের ঝুলান কাপড় দেখিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের অধিকাংশ ভূতই ঐ শ্রেণীর।

প্লানচেটের ভূত রোমক রাজার উত্তরাধিকারীকে নিহত করিয়াছে—কত সাধু ব্যক্তিকে চোর প্রতিপন্ন করিয়াছে, আরও জগতে কত অমঙ্গল সম্পাদন করিয়াছে তাহার

---

* "The person who holds the suspended ring is unintentionally and unconsciously the source of its motion. Through the imperceptible and uncontrollable tremors of his hand or arm the ring or ball begins to vibrate, and the mode of the vibrations will correspond to his intention. The curious thing, however, is that the sensitive body cannot by any intentional voluntary act, make the ring carry out his wishes, except in the clumsiest manner and with obvious movements of his hand or arm. But he is able to do involuntarily and unconsciously what he cannot perform voluntarily."—Vide Psychical Researches page 21.

ইয়ত্বা নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে কুসংস্কার ধরা পড়িয়াছে তাহাই মঙ্গল।

তবে এই প্লান্চেটের ভৌতিক ব্যাপার শুনিয়াই পাঠকবর্গ যেন মনে না করেন যে আত্মার অমরত্ব নাই, 'ভূত' বা 'ভৌতিক দেহ'ও নাই। আত্মা আছে—'ভূত'ও আছে—তবে আমরা সাধারণতঃ ঠিক যেভাবে আছে মনে করি সেভাবে নাই। আমরা যেন ইংরেজ কবি সেক্সপীরের কথা দুটী না ভুলি—

"There are more things in Heaven
and Earth Horatio
Than are even dreamt of in your
learned philosophy."

বিসর্জ্জন ও আবাহন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

কাল গেছে শেষ চৈত্র—একটী বৎসর হল গত ;
আজিকে বৈশাখ এলো, প্রাতে হল উদ্বোধন তার।
পুরাতন চলে গেল, চিহ্ন তার জাগে শত শত,
যে কাল চলিয়া গেছে আজ তাহা ফিরিবেনা আর।
মনে পড়ে গত বর্ষে, কত কি যে দিয়েছিল আনি,
কত হর্ষ, কত ব্যথা, কত অশ্রু, হাসির উচ্ছ্বাস ;
যে কাল ফুরায়ে গেল আর তাহা আসিবেনা জানি ;
নূতন বৎসর দিবে কত ক্ষণ, কত দিন মাস।

বলেছিনু ডাকি তারে "বন্ধু, আমি কভু ভুলিব না
তোমার দানের কথা—যে ফুল ফুটালে মোর তরে,
সেই ফুলে গাঁথি মালা করি দেবতার আরাধনা,
সেই ফুলে অর্ঘ্য রচি দেছি দেবতার পায়ে ধরে।"
সজল নয়ন তুলি সে চাহিল মোর মুখপানে,
বিবর্ণ মলিন মুখ, সেই মুখ আজও মনে পড়ে,
নক্ষত্রবালারা নিল বরি তারে পুষ্পে, মাল্যে, গানে,
গত সে হয়েছে আজ, নববর্ষ এলো পথ ধরে।

কাল রজনীতে আমি চেয়েছিনু আকাশের পানে,
দেখেছিনু অশ্রুস্নাত বর্ষ যায়—ফিরে ফিরে চায়,
ধরণীর বক্ষপূর্ণ করেছে সে ছোট বড় দানে,
আজ ধরা অশ্রু মুছি শেষ তারে দিতেছে বিদায়।
কাল রাতে দেখেছিনু আকাশেতে নক্ষত্রের মেলা,
দীর্ঘপথ দীপ জ্বালি করেছিল তাহারা উজল,
টলমল করেছিল তার বুকে ক্ষুদ্র এক ভেলা,
পুরাতন ভেসে যায়—আঁখি তার করে ছলছল।

বেল, যূঁই শেষ অর্ঘ্য পুরাতনে দেছে উপহার,
একটী প্রণাম মাত্র, প্রণাম নিয়েছে সাথে মম ;
গত বৎসরের দান জেগে থাক হৃদয়ে আমার
বলি—থাক শুচিশুভ্র পুরাতন বর্ষ, প্রিয়তম।
আজি নব বরষের ধরণীতে হোক উদ্বোধন,
দাও তারে মাল্য রচি, দাও অর্ঘ্য রচি তার পায়,
যাহারা ঘুমায়ে আজও হোক তাহাদের জাগরণ
নূতন এসেছে তাই পুরাতন লইল বিদায়।

অশ্রুসিক্ত আঁখি, তবু হাসি দিয়া করি আবাহন,
হে নূতন, ধরণীতে হোক তব শুভ আগমন।

ইউরোপের চিঠি

অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, পিএচ-ডি

প্রবন্ধ

আমি গত পত্রে St Peters এ Easter উৎসবের কথা বলেছি। এদেশের এই ধর্ম্মোৎসব দেখে আমাদের দেশের ধর্ম্মোৎসবের কথা মনে হল। এখানে উৎসবের একটা পারিপাট্য আছে, বিশেষতঃ এরূপ বিরাট জনসংঘ নিয়ে উৎসবে কোন কোলাহল নেই—এটা খুব সুন্দর। কিন্তু এসব উৎসবেও এদেশের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধও বেশ জাগ্রত—যেন কেমন একটা আইন মেনে চলবার ভাব আছে। এই জন্যই জীবনের সহজ বিকাশ (Spontaneity) বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের অন্তরের বিকাশের স্বাভাবিকতা না থাকলে সেখানে আনন্দ পাওয়া যায় না; কারণ একমাত্র ধর্ম্মস্থানেই মানুষ চায় তার সবটাকে পেতে ও সবটাকে প্রকাশ করতে। মানুষ সেখানে বাঁধাবাঁধি নিয়মের শৃঙ্খলা হ'তে মুক্ত। মানুষ সেখানে তার অন্তরের শুভ্রতায় বিকশিত। এই বিকাশ হবে সহজ, স্বাভাবিক অথচ স্বাধীন। এই দু'য়ের মিশ্রণে ধর্ম্ম-জীবন এবং ধর্ম্মোৎসব হয় আনন্দদায়ক। বাহিরের দৃষ্টি এই আনন্দকে করে লাঘব, কারণ মানুষের অন্তঃ সত্তার বিকাশ হয় রুদ্ধ—শুভ্র ভাবগুলি হয় সংকুচিত। বিশেষতঃ যেখানে বাহিরের অনুষ্ঠানের প্রতি থাকে দৃষ্টি, সেখানে গভীর সত্তার সঞ্চরণ হয় না। আমাদের দেশে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধকদের ভিতর বাহিরের অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানগুলি যে সব সময়ই চিত্তে উদার ভাব জাগায় তা বলা যায় না—ভাবের জাগরণ সব সময়ই নির্ভর করে অন্ত-র্দৃষ্টির উপর। অনুষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য যদিও ভাবের জাগরণ, তবুও কাজের বেলায় ওগুলির ভিতর দিয়ে ভাব বড় জাগে না—কারণ একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা অন্তরের সহজ বিকাশকে নষ্ট করে দেয়। একথা সত্য হলেও কিন্তু আমাদের দেশের বেদমন্ত্রের উচ্চারণের ভেতর দিয়ে একটা পুঞ্জীভূত ভাবের বিকাশ হয়। উপাসনার সহিত সঙ্গীতের সর্ব্বত্রই সম্বন্ধ আছে—কিন্তু শব্দ যেখানে ধ্বনি ও স্বর মাত্র, সেখানে তার শক্তি হয় অত্যন্ত বেশী—মানুষের হৃদয়ের সাধারণ ভাবকে অতিক্রম করে। শব্দই নেয় তখন রূপ এবং প্রকাশ করে তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পদকে।

এই জন্যই আমাদের দেশে সঙ্গীতের চেয়ে উপাসনার মন্ত্রের এত আদর—সঙ্গীতের ভেতর একটা অন্তরের ভাবের প্রকাশ হয়—অন্তর সেই গুহ্যতম গুহায় তাহা প্রবেশ করাতে পারে না। কিন্তু মন্ত্রের ও শব্দের শক্তি অনায়াসেই সেখানে প্রবেশ করে। এই জন্যই মন্ত্র দেয় যে উদ্দীপনা, তা ক্রমশঃ হৃদয়ের সব ভাবকে অতিক্রম করে' জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের স্তরে অনুসন্ধান দেয়—যেখানে থাকে পরম শান্তি জ্ঞানের অত্যুচ্চ প্রতিষ্ঠায়। এই জন্যই প্রকৃত উপাসনায় অন্তরের ভাব কোন কথায় প্রকাশ হয় না। প্রাচীনেরা বলতেন—মৌনই প্রকৃত উপাসনা।

আমাদের দেশে ধর্ম্মের ভেতর দিয়ে সাধক চিরকালই খুঁজেছে আত্ম-স্বারাজ্য। উপনিষদ যুগ থেকে তন্ত্রের যুগ পর্য্যন্ত এই আত্মস্বারাজ্য লাভ হয়েছে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির লক্ষ্য। মন্ত্রের ভেতর দিয়ে সাধক এই আত্ম-অনুভূতির স্তরে নীত হয়। ভারতীয় সাধনার ভেতর এই কৌশল আছে। সুধু একটা হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা ভারতীয় সাধনাকে উদ্বুদ্ধ করে না। ভাবের বিকাশ সুস্থ হতে' পারে, আনন্দের প্রাচুর্য্য দিতে পারে কিন্তু আনন্দের বিকাশই সাধনার উচ্চতম বিকাশ নয়। যে দৃষ্টি দ্বারা পদার্থের স্বরূপ অনুভব করা যায়, যা প্রজ্ঞা লোকে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে, ভারতের সাধনা সেই দৃষ্টিকেই লক্ষ্য করেছে। এইজন্যই ভারতের গভীর সাধনা ব্যক্তিতেই নিবদ্ধ।

অবশ্য সাধনার পথে নানা শক্তি ও সিদ্ধি উপস্থিত হয় —তার ফলে সাধকের শক্তি চারদিকেই ছড়িয়ে পড়ে —অনেক সময় একজন উচ্চাঙ্গের সাধককে ঘিরে একটা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও সাধকের সেই প্রতিষ্ঠার

দিকে থাকে না কোন লক্ষ্য। প্রত্যেক সাধকই হয় একটা শক্তির কেন্দ্র; মানুষের অন্তরের যত শক্তি আছে, তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সব চেয়ে প্রবল। সেখানেই মানুষ পায় এমন বিকাশ ও তৃপ্তি—যা পেলে মানুষের আর কিছু পাওয়ার ইচ্ছা ও চেষ্টা আপনা হ'তেই শান্ত হয়ে আসে। উদার জ্ঞানের সহিত একটা সজীবতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও সেই সজীবতা প্রকাশের স্থূলরূপ সহসা নেয় না। আত্ম-নিষ্ঠ কোন সাধকের কোন সাধারণ ইচ্ছাকে অনুসরণ করে সম্পন্ন হয় না। তার কোন ইচ্ছাই থাকে না। ইচ্ছার নিবৃত্তি হতেই তিনি হন একটা বিরাট্ শক্তির কেন্দ্র। ইচ্ছা বাসনা-মুক্ত হলেই হয় বিরাট। তখনই তার বিশ্ব-রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

এই শাশ্বত বিধানের জন্যই দেখতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষে সাধকসম্প্রদায় এত সজীব। যখনই সাধনা অপ্রতিহত শক্তিতে চলে, তখনই সাধক মাত্রেই হয় একটা শক্তির আশ্রয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রমাণ করে যে মুক্ত পুরুষদের সমাজে কত বড় স্থান। স্বারাজ্য স্থিতি হলেই হয় সাম্রাজ্য সৃষ্টি। ধর্ম্ম সাম্রাজ্য স্বারাজ্য সিদ্ধিকেই অবলম্বন ক'রে গড়ে ওঠে। সাধনা মৌন হলেও, তার সিদ্ধি স্ফূর্ত্ত হয়ে ওঠে, নানাবিধ রূপে সমাজের নানা শক্তির উদ্বোধনে। তাঁর সংস্পর্শে এলেই মানুষের ভেতর নানা শক্তির স্পন্দন হয়।

এই যে ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপনা এ সাধারণ সংঘ স্থাপনার নীতিকে অবলম্বন করে না—স্বভাবের শক্তিতে আপনি স্থাপিত হয়। আকর্ষণ যেখানে বেশী, সেখানে আপনা হতেই সকলেই আকৃষ্ট হয়—মানুষের স্বভাব হচ্ছে, সূক্ষ্মকে সুন্দরকে স্বচ্ছতাকে পেলে স্থূলকে অসুন্দরকে জড়তাকে ত্যাগ করে।

আজকার দিনে এই সত্যকে আমরা শ্রদ্ধা কচ্ছিনা; কারণ আমাদের সাধনা নেই। কিন্তু ইউরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতিকে দেখলে মনে হয়, আমাদের সাধনার শক্তিকে হারিয়ে ফেললে আমরা আরও দুর্ব্বল হব। আধুনিক বিজ্ঞানানুমোদিত শক্তির প্রতিষ্ঠা আমাদের নেই, কিন্তু আমাদের পরীক্ষিত শক্তির উৎস নষ্ট হলে আমাদের অবস্থা আরও ভীষণ হবে। ইউরোপে খৃষ্ট ধর্ম্মের শক্তির পরাভব বিজ্ঞানের নিকট হয়েছে, তার প্রধান কারণ খৃষ্ট ধর্ম্মের ভেতর যে যোগের কথা আছে, তার উদ্বোধন কোথাও বড় নেই। খৃষ্ট ধর্ম্মকে বিশ্বাসের বেদীতে স্থাপিত করা হয়েছে। কোন ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করে একটা শক্তির সঞ্চার হলে, সেই সঞ্চার বেশীদিন ক্রিয়াশীল হয় না, যদি সেই শক্তির বিজ্ঞানের সহিত আমাদের পরিচয় না হয়। ভারতবর্ষের সাধনা ব্যক্তিকে নিয়ে প্রবর্ত্তিত হয়নি। তার ভিত্তি আছে ধর্ম্ম বিজ্ঞানে। সেই বিজ্ঞান যেখানে অধিকৃত হয়, শক্তির সেখানেই জাগরণ হয়। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের সহিত দর্শন ও যোগের সম্বন্ধ আছে। ইহা এখনও ক্রিয়াশীল।

ধর্ম্মের স্বরূপ ইউরোপে ব্যক্তিকে অবলম্বন করে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে রাজশক্তির সহিত ধর্ম্মশক্তি মিলিত হয়ে সমাজের পীড়ারই কারণ হয়েছিল। রাশিয়ার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান প্রচলিত ধর্ম্মকে বিনাশ করেছে, কারণ তা মানবের সুখ, শান্তি, স্বাধীনতার বিরোধী হয়েছিল। ধর্ম্ম মানুষের অভ্যুদয়ের প্রকৃত কারণ; এ মানবের অন্তর সত্তার শুভ্র বিকাশ। এ দেয় ব্যাপকতা, শ্রদ্ধা, জ্ঞান, দিব্যদর্শন ও প্রতিভা। মানুষের বিকাশের পথে—কি গভীরতায়, কি ব্যাপকতায়—এ কখনও বাধা হয় না। ধর্ম্মের এই শুভ্ররূপের যখনি হয় অভাব, তখনই ধর্ম্ম সুখের কারণ না হয়ে দুঃখেরই কারণ হয়। এই জন্যই ধর্ম্ম যখন গতানুগতিক অনুষ্ঠানগত হয়ে পড়ে, তখন তার শক্তির অভাবও হ্রাস হয়, বিশেষতঃ যখন অনুষ্ঠান করে সুধু ভাবপ্রবণতার সৃষ্টি। ভারতবর্ষে ধর্ম্মভাবের অপেক্ষা জ্ঞানের অধিকতর প্রতিষ্ঠা করে। সমগ্র ধর্ম্ম-দৃষ্টি শুধু ভাবেই সন্তুষ্ট হয় না। তা আমাদের সত্তায় সবটাকে স্বচ্ছ ও শোভন করে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাব বিরাটকে অবলম্বন করে উদ্বোধিত হয়—ঐ জন্য প্রথমে মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে উদ্ধার করতে হয়। এর জন্যই বিজ্ঞান ক্ষেত্র, হৃদয় ক্ষেত্র, কর্ম্ম ক্ষেত্র শুদ্ধ করতে হয়।

এই ক্ষেত্রগুলি শুদ্ধ হলে প্রত্যেক মানুষই বিরাটের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সূত্র পায়। ভারতের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান অত্যন্ত রহস্যময়। এই জন্যই তার শক্তি এখনও লোপ পায় নি। প্রাচীন পন্থার সাধনা এখনও নানাবিধ বাধাবিঘ্নের ভিতর সজীব। কিন্তু যেখানে আমাদের সাধনা এখনও দীপ্ত হয় নি সেখানে পাশ্চাত্য ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশী। পাশ্চাত্যের সহযোগে আমরা অনেক কিছু পেতে পারি,

কিন্তু যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ভারতবর্ষকে দিয়াছে তার বৈশিষ্ট্য, সেটা মলিন হলে আমাদের জীবনের গতি বদলে যাবে। অন্ততঃ ভারতবর্ষ তার মণীষায়, সাধনায়, তপস্যায় ও সিদ্ধিতে, যে বিরাট সৃষ্টি করেছে তা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে আসবে। ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-শক্তি স্থির থাকলে তাই হবে আমাদের বাঁচবার উপায়। চারদিক হতে যে শক্তি প্রবাহ আমাদের আদর্শ ও রচনাকে আক্রমণ করছে, তা থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের ধর্ম্মের পূর্ণ রূপকে বুঝতে হবে। হিন্দু চিরদিনই ধর্ম্মের ভেতর দেখেছে অভ্যুদয়ের বীজ। বস্তুতঃ তা জীবনের পূর্ণ পরিণতির কৌশল। যোগ শুধু কর্ম্মের কৌশল নয়, তা সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনের বিকাশ। সমগ্র জীবনের নিয়ামক রূপে হিন্দুর ধর্ম্ম রীতি এত সূক্ষ্ম ও বিরাট। হিন্দুর দৃষ্টি সমন্বয় দৃষ্টি, সমগ্র দৃষ্টি, তার ধর্ম্মও সেইজন্য সনাতন ও সর্ব্বভৌমিক।

ইউরোপে লোকের ভারতবর্ষের উপর, শুধু হিন্দুর উপর নয় মুসলমানদের উপরেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। এইজন্যই কেউ ধর্ম্মের কথা নিয়ে ভারতবর্ষ হতে ইউরোপে গেলে, ইউরোপের নরনারী তাদের কথা বেশ শোনে। তত্ত্ববিদ্যা সমিতি ভারতবর্ষের ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক কথা ইউরোপকে শুনিয়েছে। Bavatsky, Besant ভারতবর্ষের কত উপকার করেছেন তা ইউরোপে গেলে বেশ বোঝা যায়। যাদের কিছু ধর্ম্মপ্রবণতা আছে, তারা সকলেই কিছু কিছু এদের পুস্তক পড়ে ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের উপর অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে। এখনও তাদের শিক্ষা দীক্ষা অনেকের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়। এখানে দেখেছি কৃষ্ণমূর্ত্তির উপর একশ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা আছে। একটি মহিলা আমাকে তাঁদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে কৃষ্ণমূর্ত্তির ছবি দেখালেন এবং বল্লেন "অধ্যাপক, তোমার বক্তৃতার সহিত কৃষ্ণজীর অনেক কথাই মিলে যাচ্চে —এই দেখে মনে হয় তোমাদের দেশের প্রাণে যেন একই ঝঙ্কার, হৃদয়ে একই ভাব, বুদ্ধিতে একই দৃষ্টি। এতেই মনে হয় ভারতের আত্মা এক, বিরাট চেতনায় ভরপুর।"

রোমে বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor of Theologyর সহিত আমার খুব আলাপ হয়েছিল, দেখলাম তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম্মবিকাশকে খুব লক্ষ্য করেন। এসব বিষয়ে তাঁরা খুব সূক্ষ্ম অনুসন্ধান রাখেন। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দকে ও শ্রীঅরবিন্দকে তাঁরা খুব বুঝতে তৎপর। স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীঅরবিন্দের জাতির উদ্বোধন বাণীর সহিত তাঁরা এত পরিচিত যে অনেক সময় বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে এঁরা বড় কৌতূহল প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষে যাঁরা কার্য্য ও চিন্তায় নবীন ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের বিষয় বড় বড় অধ্যাপকেরা ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানতে বড়ই আগ্রহান্বিত। এদের সঙ্গে আলাপ করে মনে হয়েছে ইউরোপের আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা এরা দেখতে চায় ভারতীয় ভারতবর্ষকে। এইজন্য রোমে, বিশেষতঃ শিক্ষিত মহলে বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ আদর। অনেক সময় মনে হয়েছে আমাদের দেশে আমরা এদের চিন্তার ধারার সহিত যতটা পরিচিত, তার চাইতে রোমের কোন কোন অধ্যাপক, বিশেষতঃ কোন কোন Consul, আরও বিশেষরূপে পরিচিত। এসিয়ার ভাবধারার কিরূপ আত্মপ্রকাশ চলছে, তার সংবাদ এঁরা খুব বিশেষরূপে রাখেন, কারণ এঁরা জীবন্ত জাতি, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ভাব ও চিন্তার ধারার সহিত পরিচিত হয়, অনেক সময় রাষ্ট্রের দিক দিয়ে, অনেক সময় কিছু লাভ করবার আশায়। এই দুয়েরই পরিচয় পেয়েছি আমি রোমে। রোমে অনেকে আছেন, বিশেষত গভর্ণমেন্টের foreign departmentয়ে যাঁরা সমগ্র এসিয়ার cultural force (কৃষ্টির রূপ ও শক্তি) এর সাথে বিশেষ পরিচিত। এঁদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছিলেন "ইউরোপ যদিও চেষ্টা করেছে ও করছে তার কৃষ্টিকে বিশ্বের কৃষ্টি করতে, কিন্তু ইউরোপ এ বিষয়ে পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হয়েছে। এসিয়া ইউরোপের আদর্শ সমাজে ও রাষ্ট্রে এখনও গ্রহণ করে নি—এই দেখুন না আপনাদের ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরায় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। দিনকয়েক ইউরোপের সংসর্গে এসে যে পাশ্চাত্য ভাব ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছিল, তা আজ আর নেই। ভারতবর্ষ তার নিজের স্বরূপে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা খুব কাজ করেছে।" কিরূপে ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় ভারতবর্ষকে ভারতীয় করে তুলেছে এবং তার মূল্য কত বেশী তার ধারণা এদেশে সুস্পষ্ট নয়। এরূপ বড় রাজ-

নীতিক ছাড়াও ভারতীয় ভাবধারার সহিত পরিচিত হ'তে অনেকেই তৎপর। এখানে দেখ্ছি সুফী সম্প্রদায়ের বিশেষ সভা-সমিতি আছে। ইনায়েৎ খাঁ, যিনি বরোদা-রাজের রাজসভায় বীণা বাজাতেন, এদেশে এসে সুফী সম্প্রদায়ের সাধনা প্রবর্ত্তিত করেছেন। রোমে, জেনেভায়, প্যারী, লণ্ডন, বার্লিন, এম্‌সটারডামে—উক্ত সুফী সাধক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন। রোমে এই সম্প্রদায়ের সভা আছে। তার সম্পাদিকা একজন বর্ষীয়সী শিক্ষিতা মহিলা—নাম মিসেস ক্রেগ (Craig)। এঁর বাড়ীতে এই সম্প্রদায়ের সভা ও উপাসনা হয়। তাতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা যোগদান করেন। বিশেষতঃ নানা দেশের Consulদের স্ত্রীরা এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। এঁর বাড়ীতে এইরূপ সভায় যোগদান করবার জন্য আমি আহূত হয়েছিলাম। সেদিন সেখানে ছিলেন রোমের Prince Voncompagni, Princess Voncompagni ও Swedenএর Consulএর পত্নী ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা। উপাসনার পূর্ব্বে ৮।৯টা বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হল এবং প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মপুস্তক হতে কিছু কিছু পাঠ হল। হিন্দুদের গীতা হতে ভক্তিযোগের অধ্যায় পাঠ হল। শেষে উপাসনা ও গান হল। এই সুফী সম্প্রদায় যোগ গ্রহণ করে' তার সাধনা করেন। ইনায়েৎ খাঁ ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরজ্ঞ। স্বরের উপর দিয়ে হয় তার সাধনা। আমার সহিত Swedenএর Consulএর স্ত্রীর সহিত আলাপে বুঝলাম তিনি এর উপর খুব শ্রদ্ধান্বিত। তিনি আমাকে বলেছিলেন "আমি এর ভেতর দিয়ে নবীন জীবন পেয়েছি"। কিরূপে স্বরের শব্দহীন গতি চেতনার ঊর্দ্ধ কেন্দ্রগুলিকে উন্মুক্ত করে বৃহত্তর চেতনার সহিত পরিচয় করিয়ে দেয়, তার যথাযথ বর্ণনা আমাকে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি অশরীরী Occult Hierarchy অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন। তাঁরা সাধককে পথে এগিয়ে দেন, এতে কোনই অবিশ্বাস করেন না। আমি এঁদের কথাবার্ত্তায় একটু বিস্মিত হলাম। এসব জিনিস কেউ বড় বিশ্বাস করেন না। আমাদের দেশে অনেকে আছেন, তাঁরাও এসবকে আজগুবি বলে মনে করেন। বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। মানুষের অভিজ্ঞতায় সীমার রেখাপাত কেউ করতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু আমরা পাইনে বলেই অন্যের অভিজ্ঞতাকে অশ্রদ্ধা করবার হেতু নেই। মানুষের সাধারণ মস্তিষ্ক কাজ চালাবার মতই বিকাশ পেয়েছে। কিন্তু কাজের জীবনের সূত্র অনেক অবস্থায় ছিন্ন হয়ে যায়—আমরা সেখানে কিন্তু পাই যা কাজের মস্তিষ্ক কিছু অনুসন্ধান রাখে না। অনেকেই এরূপ ব্যাপারকে একটা Pathological অবস্থা বলবেন; কিন্তু মানবের চেতনার মুক্তির আস্বাদ যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁদের কাছে এ অন্য কিছু। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত চিরকালই আছে, চিরকালই থাকবে। তাকে পেতে হলে মানুষের চেতনার গভীর স্তরে মগ্ন হতে হবে। ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় অনেক তত্ত্বের সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্মের ও সত্যের রূপ থাকে তার নিজের স্বরূপে—অধিকার করবার বুদ্ধি নিয়ে তাকে অধিকার করা যায় না। সেখানে যাবার পথ অন্য। সে পথে যাঁরা বিচরণ করেন, তাঁদের অনেক অলৌকিকত্বের সহিত পরিচয় হয়। এ অলৌকিক বলেই অবিদ্যা নয়, এও বিদ্যা, পরাবিদ্যা।



অধ্যাপক ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সমস্ত যুবক নূতন আলোকের সন্ধানে বিদেশে যাইয়া জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া দেশের উন্নতিকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, ডাক্তার পি-কে (প্রসন্নকুমার) রায় তাঁহাদের অন্যতম। ডাক্তার পি-কে-রায় যে সময়ে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, আনন্দমোহন বসু, পি-এল রায় প্রভৃতিও বিলাতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার শুভাঢ্যা গ্রামে প্রসন্নকুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঢাকার পগোস স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকার সঙ্গত-সভায় প্রবিষ্ট হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। স্কুলে পড়িবার সময় প্রসন্নকুমার বুঝিয়াছিলেন যে অধঃপতিত হিন্দুসমাজের সংস্কার না করিলে আমাদের দেশের কল্যাণ হইবে না, জাতীয় দলাদলির পেষণে আমরা নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর হইয়া যাইব। সে সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে দেশের যুবকগণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিব, তাহার জন্য প্রাণ দিব—ডাক্তার রায় বাল্যজীবন হইতে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের ফলে তাঁহাকে কত যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহার সীমা নাই। ডাক্তার রায় তাঁহার পৈতৃক বাড়ী হইতে সেজন্য বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

প্রসন্নকুমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর দুই বৎসরের মধ্যে ল্যাটিন শিক্ষা করিয়া তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তিলাভ করেন ও বিলাত গমন করেন। বৃত্তির টাকা যাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগিনীদের বিদ্যাচর্চ্চায় ব্যয়িত হয় জননীর সহিত সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। ভ্রাতাভগিনীদের উপর তাঁহার নিজের দায়িত্বজ্ঞান তিনি জীবনে কখনও বিস্মৃত হন নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বি-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ও তৎপরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডি-এসসি উপাধি প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রসন্নকুমার ও আনন্দমোহন বসু এই দুইজন প্রথম পাশ করেন। তাঁহাদের উভয়ের যত্নে বিলাতে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী, ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙ্গালা পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বিখ্যাত ইংরাজ মণীষী লর্ড হ্যালডেন বিলাতে ডাক্তার পি-কে রায়ের সহপাঠী ছিলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উভয়ে একত্র উপাধি গ্রহণ করিয়া পরে উভয়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এডিনবরার পরীক্ষায় উভয়ে সমান নম্বর পাইয়া পাশ করিয়াছিলেন। লর্ড হ্যালডেনের সহিত ডাক্তার রায়ের আজীবন বন্ধুত্ব ছিল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় পাটনা কলেজ, ঢাকা কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করেন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম ভারতীয় এডুকেশন সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল পদেও নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইঁহার প্রণীত একখানি ইংরাজি লজিক পুস্তক এখনও আই-এ পরীক্ষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবসরগ্রহণের পর তিনি কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদে কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়া ডাক্তার রায়কে কলেজসমূহের ইন্সপেক্টারের পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

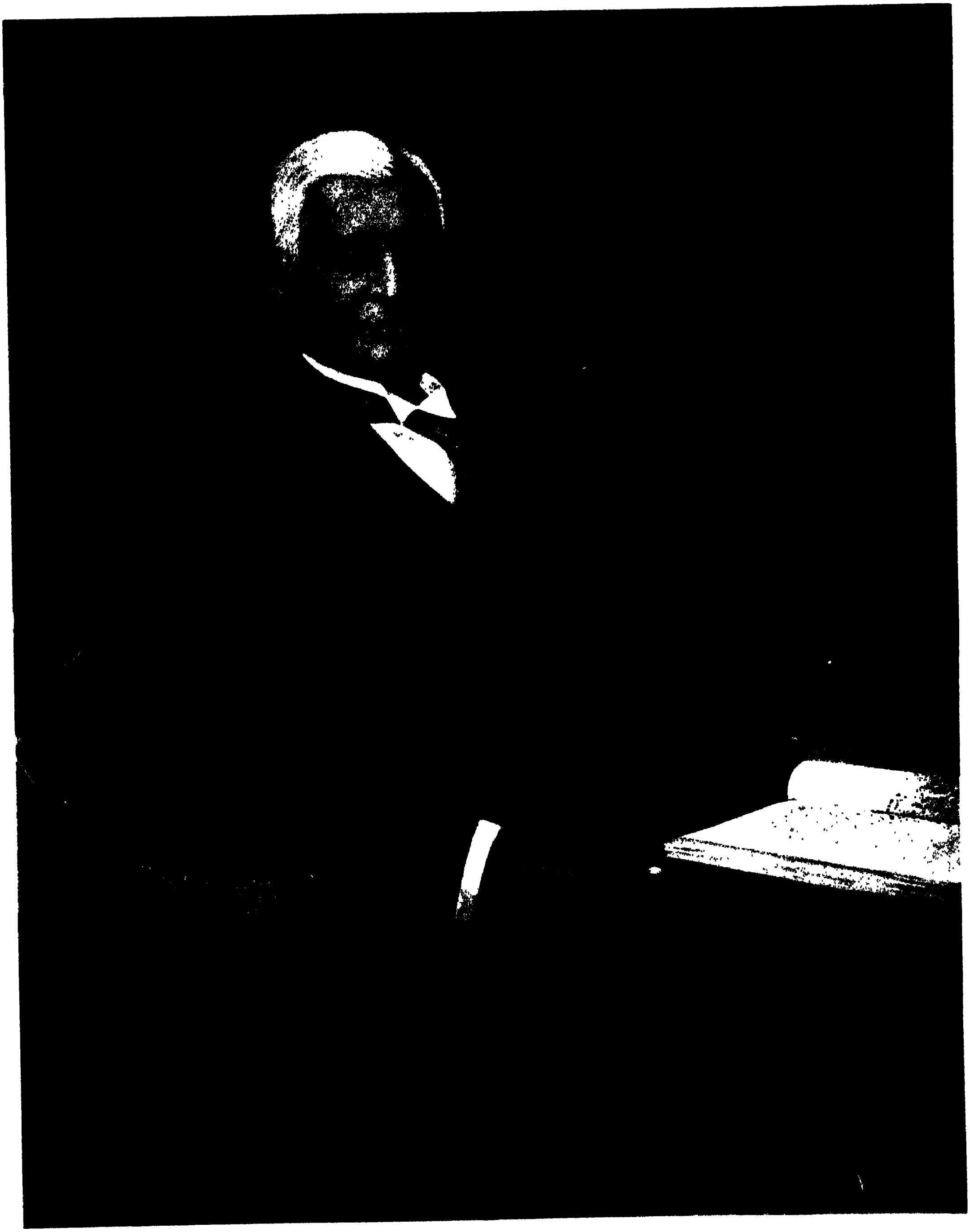
১৯১০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রায়ের বিদুষী কন্যা ললিতা রায়ের সহিত বিহারউড়িষ্যা প্রদেশের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মেটল্যাণ্ড সাহেবের বিবাহ হইয়াছিল।

ডাক্তার রায়ের জ্ঞানপিপাসা ছিল অসীম। এই জ্ঞানতৃষ্ণা চরিতার্থ করাই তাঁহার জীবনের প্রথম এবং শেষ কার্য্য ছিল।

শেষ বয়সে প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যু, একমাত্র উপযুক্ত বয়প্রাপ্ত পুত্রের মৃত্যু, সন্তানসম ভ্রাতার মৃত্যু ও জামাতার মৃত্যু তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভগবানে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস থাকায় তিনি সকল শোক জয় করিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার পত্নী মিসেস পি-কে-রায়ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় দক্ষিণ কলিকাতায় বিখ্যাত গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী হাজারীবাগে ৮২বৎসর বয়সে ডাক্তার পি-কে রায় পরলোক গমন করেন।



জন্ম—১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ   অধ্যাপক ডক্টর পি-কে-রায়   মৃত্যু—১৯৩২ খৃষ্টাব্দ

সাময়িকী

বঙ্কিমচন্দ্র স্মৃতি উৎসব—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও পাইকপাড়া (কলিকাতা) রাজবাড়ীর সম্মিলিত উদ্যোগে পাইকপাড়া রাজবাটীতে গত ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র তিনদিন সমারোহের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই অধিকতর আড়ম্বরের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব সম্পাদিত হইবে। তাহার পূর্ব্বাভাষরূপে এই উৎসবটি করা হইয়াছে। পাইকপাড়ার কুমার শ্রীমান বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁহার পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক-প্রীতি চিরপ্রসিদ্ধ—কুমার বিমলচন্দ্র সেই ধারা বজায় রাখিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। উৎসবের প্রথম দিনে অপরাহ্ন ৬টার সময় ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপি প্রভৃতির একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। শ্রীযুত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির বদান্যতায় ও চেষ্টায় প্রদর্শনীর জিনিসগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত বহু জিনিস প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর সভার উদ্বোধন করেন। তৎপরে বাসন্তী বিদ্যাবীথির বালিকাগণ কর্ত্তৃক বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গানের ও শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনের পর শ্রীযুত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও এক সুদীর্ঘ অভিভাষণপাঠ করেন। হীরেন্দ্রবাবু প্রবীণ সাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত ; তাঁহার অভিভাষণ একদিকে যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাহার পর প্রবন্ধাদি পাঠের পর সে দিনের উৎসব সম্পাদিত হয়। কুমার বিমলচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারা সমাগত সাহিত্যিক-গণকে বিশেষভাবে আদর অভ্যর্থনাদি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের সভাপতিত্বে এক সভায় কবিতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইয়াছিল এবং তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পর পাইকপাড়া রাজা মণীন্দ্র-স্মৃতিমন্দির কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী অভিনীত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্র শত-বার্ষিকী উৎসব—

গত ২রা বৈশাখ হইতে ৮ই বৈশাখ ৭ দিন মহা-সমারোহের সহিত বিভিন্ন স্থানে মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উৎসব সম্পাদনের জন্য শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসুকে (এটর্নী) সভাপতি ও শ্রীযুত পান্নালাল দে'কে (খিদিরপুর) সম্পাদক করিয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সমিতি ৭ দিন ব্যাপী বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ৬ই বৈশাখ কবির জন্মদিন—সেদিন কলিকাতা খিদিরপুরস্থ পদ্মপুকুরের পার্শ্বে কবির বাসভবনে জন্মোৎসব হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সার বিজয়চাঁদ মহাতাব সেদিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বলা হয় যে উৎসব সমিতি হেমচন্দ্রের বাসভবনের নিকটস্থ পদ্মপুকুর স্কোয়ারে কবির একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং তাঁহার জন্মস্থান গুলটিয়া (রাজবলহাট) গ্রামে একটি স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। সেদিন সভায় অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী, ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার কালিদাস নাগ ও শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের (২রা বৈশাখ) উৎসব হইয়াছিল হুগলী জেলার রাজ-বলহাটে—স্থানটি মার্টিন কোম্পানী হাওড়া চাঁপাডাঙ্গা লাইনে আটপুর ষ্টেশনের নিকট। রাজবলহাট যাইবার পথটির নাম হেমচন্দ্ররোড করা হয়—হুগলী জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান

শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় উৎসবে নেতৃত্ব করেন। বেলা ২টার সময় গুলটিয়া গ্রামে হেমচন্দ্র-ভবন প্রাঙ্গণে 'হেমচন্দ্র মণ্ডপে'র ভিত্তি স্থাপন করা হয়—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী তথায় পৌরহিত্য করেন। বেলা ৩টার সময় উক্ত গ্রামেই এক বিরাট মণ্ডপে স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা হইতে সেদিন প্রায় ৮০জন সাহিত্যিক রাজবলহাটে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তখনই কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ পরে সভার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর তথায় শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী 'হেমচন্দ্র ও জাতীয়তা' সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক দীপালোচনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে (৩রা বৈশাখ) খিদিরপুর হেমচন্দ্র লাইব্রেরীতে রায় বাহাদুর শ্রীযুত জলধর সেনের সভাপতিত্বে এক সাহিত্যসভা হইয়াছিল। বহু সাহিত্যিক ঐ সভায় উপস্থিত হইয়া হেমচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-মন্দিরে হেমচন্দ্র উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। পরিষদের সভায় হেমচন্দ্রের জীবনীলেখক শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার হেমচন্দ্রের অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি, গভীর স্বদেশানুরাগ ও হৃদয়ের উদারতার কথা বিবৃত করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিনে (৫ই বৈশাখ) কবির পৈতৃক বাসভূমি হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় উক্ত বাটীর সম্মুখে জমীদার শ্রীযুত কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের প্রাঙ্গণে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সে দিন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মিলনী ও হেমচন্দ্র স্মৃতিসমিতি একযোগে এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ সভাতেও শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পঞ্চম দিনের উৎসবের কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ দিনে (৭ই বৈশাখ) তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসুর সভাপতিত্বে ৪৬ ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটস্থ কুমার সিং হলে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সে দিন সভায় ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সোম প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় প্রতিদিনের সভাতেই ডাক্তার বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্র-স্মৃতিসঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। শেষ অর্থাৎ সপ্তম দিনে বেহালা মিউনিসিপাল টাউন হলে ডাক্তার কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে উৎসব হইয়াছিল। সে দিন সভায় সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এরূপ দীর্ঘদিনব্যাপী নানাস্থানে অনুষ্ঠিত উৎসব সচরাচর দেখা যায় না। হেমচন্দ্রের কথা বাঙ্গালী জাতি কখনও ভুলিতে পারিবে না। তথাপি এই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যে ভাবে তাঁহার স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাঁহার কাব্যরস আস্বাদন করিয়া তাহারা ধন্য হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে শুধু হেমচন্দ্রের নহে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনেরও জন্মের শতবার্ষিক উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য যে একই বৎসরে এই তিন জন বিরাট মহাপুরুষ বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সারা বৎসর ধরিয়া যাহাতে দেশবাসী হেমচন্দ্রের কথা আলোচনা করে, স্মৃতিসমিতির পক্ষ হইতে সেরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে যাহাতে এই উৎসব সম্পাদিত হয়, সে জন্যও সকলকে অনুরোধ করা উচিত। ইহাতে শুধু যে হেমচন্দ্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে তাহা নহে, জাতিও তাঁহার কাব্যালোচনা করিয়া নূতন আদর্শের সন্ধান পাইবে ও তদ্বারা তাহার জয়যাত্রার পথ সুগম হইবে।

বঙ্গীয় অধ্যাপক সম্মিলন—

এবার গত গুডফ্রাইডের ছুটীতে কলিকাতায় ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় অধ্যাপক সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার সকল কলেজের অধ্যাপকগণ এই সম্মিলনে বৎসরান্তে একবার করিয়া মিলিত হইয়া থাকেন। বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ নাগ সম্মিলনের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং রিপন কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ডাক্তার ডি-চক্রবর্ত্তী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে

সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বহু প্রবীণ শিক্ষাব্রতী এবার সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে প্রিন্সিপাল নাগ বলিয়াছেন—"জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন ও সভ্যতার ধারাকে অব্যাহত রাখাই শিক্ষার প্রধানতম উদ্দেশ্য। শিক্ষা যদি এমন লোক সৃষ্টি করিতে পারে যাহারা মানব সভ্যতার প্রগতির সহায়ক হইবে, তবেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সভ্যতার একটি গতিভঙ্গি আছে। সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী হইতে মানুষের চিত্তকে মুক্ত করিয়া শিক্ষা হৃদয়কে বিশাল ও উদার করে, দাস মনোভাব হইতে মুক্ত করে, মনুষ্যত্ব গড়িয়া তোলে, কর্ম্মকুশলতা শিক্ষা দেয় ও অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া দেয়। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় আদর্শ শিক্ষক গড়িয়া তাহাদিগকে সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করে। তাহারা অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন অভিশপ্ত পৃথিবীকে পবিত্র জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে। প্রিন্সিপাল নাগের এই 'আদর্শ শিক্ষকে' দেশ পূর্ণ হউক—তবেই জাতি সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভ করিয়া নবজীবন সম্পন্ন হইবে।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র শতবার্ষিকী—

গত ৩রা এপ্রিল সম্ভাবশতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব তাঁহার নিজগ্রাম খুলনা জেলার সেনহাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। তাহার কয়েকটি কবিতা এখনও বাঙ্গালী মাত্রেরই মুখে শ্রুত হইয়া থাকে। তাঁহার লিখিত—

"চির সুখীজন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে—
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"

* * * *

"কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?"

* * * *

"যেজন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।"

এই সকল কবিতা তাঁহাকে বাঙ্গালার সাহিত্য জগতে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং উৎসব উপলক্ষে তথায় কৃষ্ণচন্দ্রের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এ যুগের লোক কবি কৃষ্ণচন্দ্রকে ভুলিতে বসিয়াছে। কাজেই সেনহাটীর অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সংবাদপত্র সম্পাদকের অব্যাহতি—

ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'ইষ্টবেঙ্গল টাইম্‌স' নামক পত্রে ঢাকা মিউনিসিপালিটীর ট্যাক্স আদায় সম্পর্কে কতকগুলি অনাচারের কথা প্রকাশিত হইলে শ্রীযুত রজনীকান্ত দাস নামক মিউনিসিপালিটির জনৈক কর্ম্মচারী উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত চারুচন্দ্র গুহ ও মুদ্রাকর শ্রীযুত আর-কে-ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঢাকায় ঐ মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। সন্দেহের অবকাশে বিচারক উক্ত উভয় আসামীকেই বেকসুর মুক্তিদান করিয়াছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকের গুরু দায়িত্বের কথা কাহাকেও বলিবার নহে—সম্পাদকগণকে সেজন্য অনেকের বিরুদ্ধেই অনেক অপ্রিয় উক্তি করিতে হয়। কাজেই ইষ্টবেঙ্গল টাইম্‌সের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের এই অব্যাহতি লাভ সংবাদপত্রপরিচালকগণের পক্ষে আনন্দের সংবাদ।

বাঙ্গালার নূতন লাট—

আগামী ১লা জুলাই হইতে ভারতের বড়লাট লর্ড লিংলিথগো ৪ মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা করিবেন। সেই সময় বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ অস্থায়ীভাবে বড়লাটের পদে নিযুক্ত হইবেন এবং আসামের গভর্ণর সার রবার্ট রীড বাঙ্গালার গভর্ণর নিযুক্ত হইবেন। ইহার পূর্ব্বে কোন প্রাদেশিক গভর্ণর বিলাত যাত্রা করিলে তাঁহার

শাসন-পরিষদের প্রাচীনতম সদস্যকেই অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত করা হইত ; কিন্তু এখন আর শাসন-পরিষদ নাই—তাহার স্থলে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে ; কিন্তু পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসৃত হইলে প্রধান মন্ত্রীরই গভর্ণর পদ লাভ করা উচিত ছিল। এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল কেন ? মন্ত্রিমণ্ডলের উপর গভর্ণমেন্টের মনোভাব এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী—

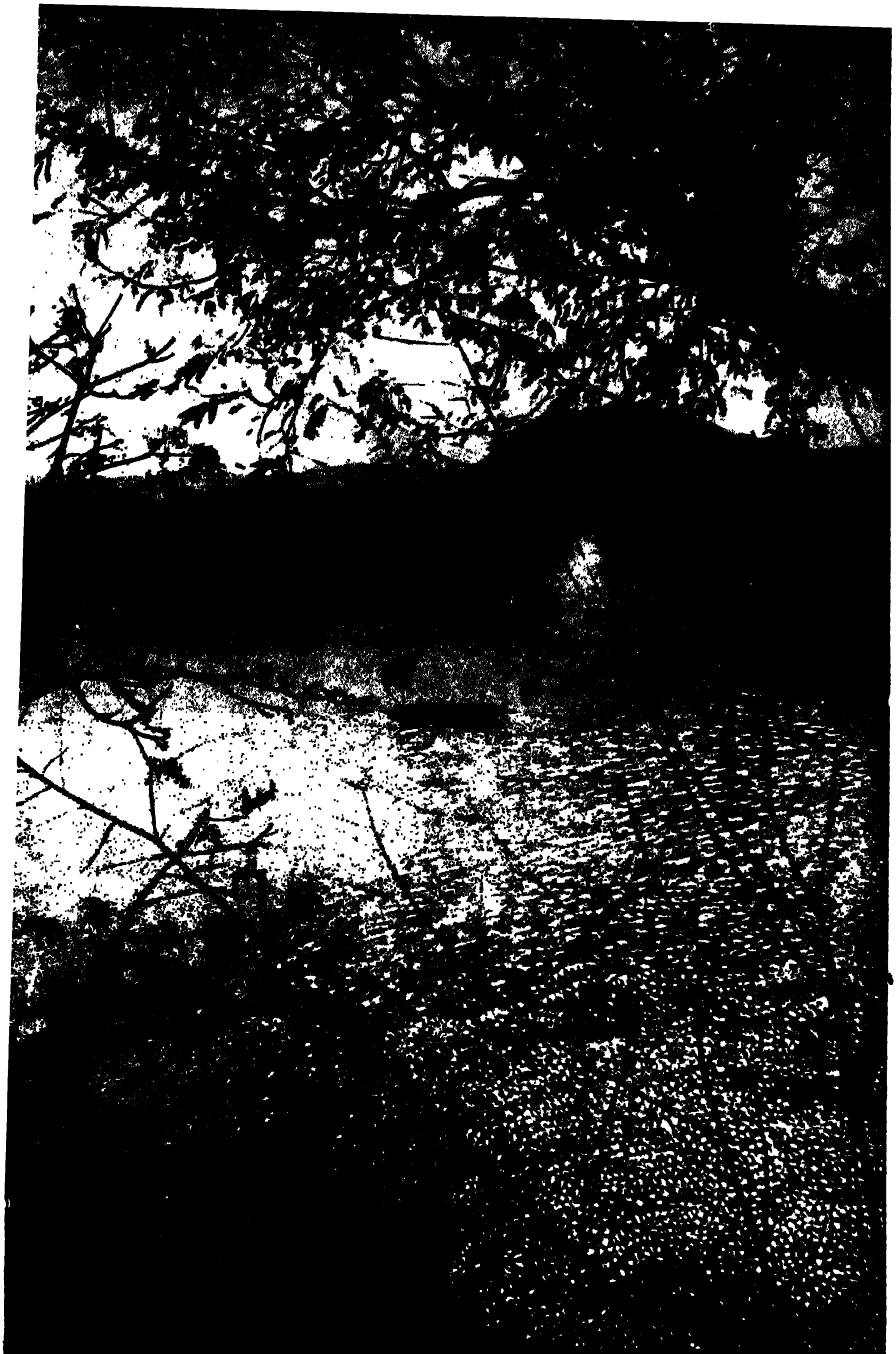
গত ২৩শে চৈত্র কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন শেষ হয়। এরূপ উপর্য্যুপরি ৬ দিন ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন সচরাচর দেখা যায় নাই। শেষের দুই দিন ধরিয়া মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসদলীয় মন্ত্রী মিঃ শরিফের পদত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। ২২শে চৈত্র উক্ত মন্ত্রী মহাশয় ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া নিজ বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। মহাত্মা গান্ধীও সেদিন ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ ঐ বিষয়ে তদন্ত ও রিপোর্ট করিবার ভার এক তৃতীয় পক্ষের উপর অর্পণ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত তদন্তের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শেষ দিনে ওয়ার্কিং কমিটীতে বিহারের বাঙ্গালী অধিবাসীদের একখানি আবেদন পত্র বিবেচিত হইয়াছিল। কংগ্রেস-মন্ত্রীরা বিহারে বাঙ্গালী অধিবাসীদের প্রতি অবিচার করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। সে সম্বন্ধে যথাযথরূপে ব্যবস্থা করিবার ভার শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশকে মুখপাত্র করিয়া বিহার প্রবাসী বাঙ্গালীরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় অবহিত হইয়াছেন। এখন প্রফুল্লরঞ্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজেন্দ্রপ্রসাদবাবু এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করেন, তাহা জানিবার জন্য সকল বাঙ্গালীই উৎসুক হইয়া আছে।

ভারতে বিদেশী কোম্পানী—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর গত কলিকাতা অধিবেশনে ১৯শে চৈত্র তারিখে বিদেশী কোম্পানী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়—"প্রকৃত ভারতীয় কোম্পানী বলিয়া পরিচিত হইবার আশায় নামের শেষে 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' বা ঐরূপ কথা ব্যবহার করে—বিদেশীদের অধীনে বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত এইরূপ কোম্পানীর সংখ্যা যে ভারতবর্ষে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ওয়ার্কিং কমিটী উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য যে রক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ভারতবর্ষে ঐরূপ বিদেশী কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারতবর্ষ সেই রক্ষণনীতির ফললাভে বঞ্চিত হইতেছে। * * * যে সকল কোম্পানী ভারতবাসীগণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত নহে, উহাকে কিছুতেই ভারতীয় কোম্পানী বলা যায় না। যদি বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয় শিল্প করায়ত্ত করিতে থাকে, তবে ওয়ার্কিং কমিটী বরং ভারতীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। কারণ বিদেশী কোম্পানীগুলি ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ শুধু শোষণই করিবে। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটীর অভিমত এই যে--ভারতবাসীদের কর্ত্তৃত্বে, নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনাধীনে ভারতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে। কারণ ভারতবর্ষের রাজনীতিক স্বাধীনতার জন্য তাহা অত্যাবশ্যক।" কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী যে বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়াই এই প্রস্তাবটি উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ব্যবসার বাজারে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে বলিয়াই এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়াছে।

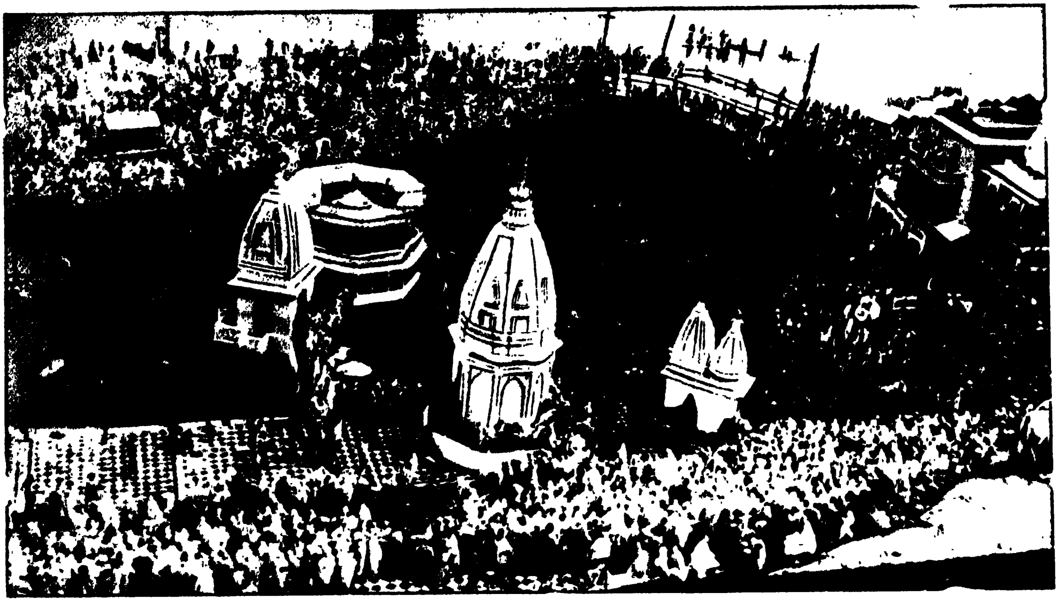
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী—

গত ২৭শে চৈত্র রবিবার কলিকাতা বৌবাজারস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বার্ষিক সাধারণ সভা হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় এবার সভায় কোন দলাদলি দেখা যায় নাই। সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালার সকল দলের কর্ম্মীদের সহিত পূর্ব্বাহ্ণে পরামর্শ করিয়া যে ব্যবস্থা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু কমিটীর সভাপতি, শ্রীযুত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ ও মৌলবী মহীউদ্দীন

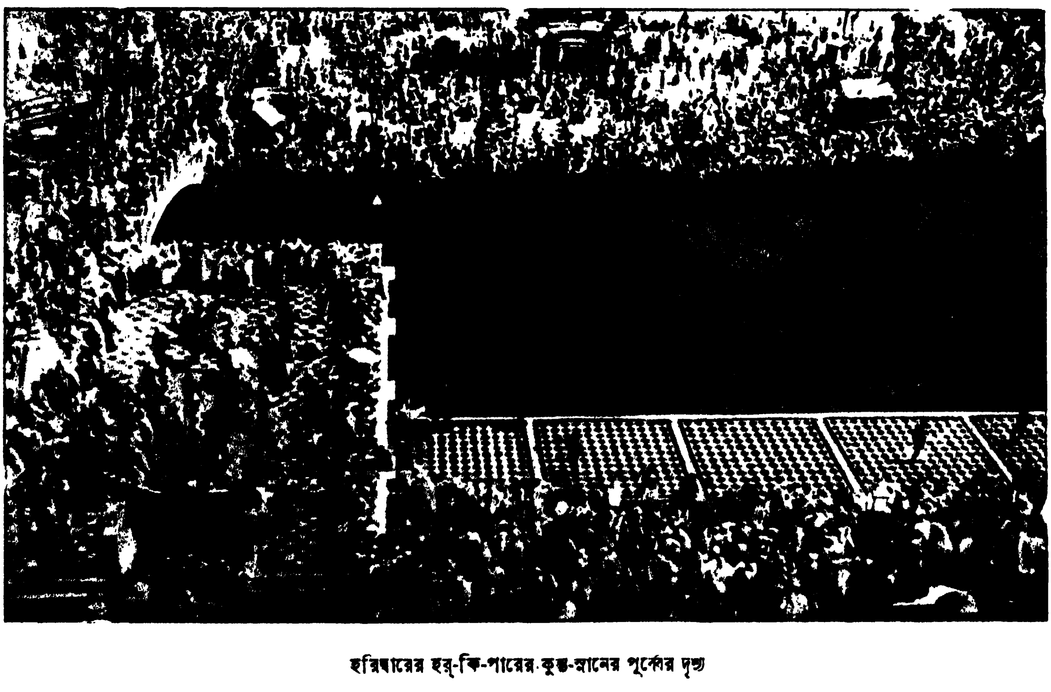


নিরালা যাত্রা

ছবি—পয়োদ দাস, গৌহাটি



কুম্ভমেলায় হরিদ্বারের হর্-কি-পারের দৃশ্য। ৩১শে মার্চ্চ নাগা ও অন্যান্য সাধুরা ঐ পবিত্র গঙ্গাবক্ষে স্নান করছেন এবং অগণিত নরনারী সেই দৃশ্য দেখছেন



হরিদ্বারের হর্-কি-পারের কুম্ভ-স্নানের পূর্ব্বের দৃশ্য

খাঁ—তিন জন সহ-সভাপতি, মৌলবী আস্রাফ-উদ্দীন চৌধুরী সম্পাদক এবং শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত কমল-কুমার সরকার ও শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস সহ-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নাড়াজোলের কুমার শ্রীযুত দেবেন্দ্র-লাল খাঁ কমিটীর কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া ১২৪ জন সদস্যকে লইয়া একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে ৬২ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য এবং বাকী ৬২ জন বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি। সভায় শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব নূতন নামের তালিকা পাঠ করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহার তালিকা গৃহীত হয়। সভায় এবার ৪ শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য নিম্নলিখিত ৫ জন সদস্যকে লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হইয়াছে—শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে এরূপ বিনা বাধায় নির্ব্বাচন প্রায় দেখা যায় না। সুভাষচন্দ্রকে যে সকল দলের কর্ম্মীরাই নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, ইহাও বাঙ্গালার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী নূতন উদ্যমে কার্য্যারম্ভ করিয়া বাঙ্গালার লুপ্ত সম্মান ফিরাইয়া আনিলে তবেই ইহার সার্থকতা।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য, কলিকাতা বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদা মঠের সভাপতি স্বামী নির্ম্মলানন্দজী মহারাজ গত ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার দক্ষিণ ভারতের ওটাপলমস্থ নিরঞ্জন আশ্রমে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। স্বামী নির্ম্মলানন্দ বাগবাজার বসু-পাড়ার দেবনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্র—সংসারাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল তুলসীচরণ দত্ত। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি সর্ব্ব-প্রথম পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন। বেলুড়ে রাম-কৃষ্ণ মঠের যে প্রথম পরিচালক সমিতি গঠিত হয়, স্বামী নির্ম্মলানন্দ তাহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে স্বামী অভেদানন্দ-জীকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি তথায় গমন করেন ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এ দেশে ফিরিয়া আসেন। পরে কয়েক বৎসর হিমালয়ে তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে মহীশূর রাজ্যে আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন ও সারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ২৯ বৎসর কাল তিনি দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন।

ভাবিনী দেবী—

গত রামনবমী তিথিতে হরিদ্বার তীর্থে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের পত্নী ভাবিনী দেবী লোকান্তর গমন করিয়াছেন। ইঁহার ধর্ম্মানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল—তিনি কুম্ভস্নানের জন্য হরিদ্বারে গমন করিয়াছিলেন। ইনি



ভাবিনী দেবী

সেবাপরায়ণা, রন্ধননিপুণা, সৎস্বভাবা ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আমরা শোকার্ত্ত কবিকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

কুমারী পারুল সেনগুপ্তা—

কুমারী পারুল সেনগুপ্তা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দুই

বৎসরের জন্ত মাসিক ১৫ টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি



পারুল সেনগুপ্ত

শৈশবাবধি পাঞ্জাবেই আছেন; বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর। তিনি এখন লাহোর মহিলা কলেজে আই-এ পড়িতেছেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র সেনগুপ্ত এন-ডবলিউ-রেলে কাজ করেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমিশন ও মঠের প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ গত ২৫শে এপ্রিল সোমবার অপরাহ্নে ৭০ বৎসর বয়সে এলাহাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ প্রতিষ্ঠার পর যাঁহারা ইহার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁহাদের মধ্যে চতুর্থ—প্রথম ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ (১৮৯৮-১৯২২), দ্বিতীয় স্বামী শিবানন্দ (১৯২২-১৯৩৪), তৃতীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৯৩৪-১৯৩৭) ও চতুর্থ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (১৯৩৭ মার্চ্চ হইতে ১৯৩৮ এপ্রিল)। সংসারাশ্রমে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নাম ছিল হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ২৪ পরগণা বেলঘরিয়া গ্রামে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তাঁহার জন্ম হয়। ১৫ বৎসর বয়সে পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি পুনা হইতে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া সরকারী চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া মঠে যোগদান করেন। স্বামীজির ইচ্ছায় তিনি বেলুড়ে ঠাকুরের মন্দির নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন—বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাণ তাঁহার পরিকল্পনা মতই হইয়াছে। এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জনামক স্থানে একটি বাটী ক্রয় করিয়া তথায় তিনি মঠ ও সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; এলাহাবাদে বাসকালে তিনি দেবীভাগবতের ইংরাজি অনুবাদ এবং



বিজ্ঞানানন্দ

সংস্কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানা বাঙ্গালা বই লিখিয়াছিলেন।

ডাক্তার বীরেশচন্দ্র গুহ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ এবার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পুরস্কার স্বরূপ ব্রেজিলের 'সায়েন্স এণ্ড আর্টস' একাডেমীর সম্মানসূচক পদক লাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ডাঃ গুহ খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে এ দেশে গবেষণা করিয়া নিজেও যেমন যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার গবেষণা দ্বারা দেশও তেমনই সমৃদ্ধ হইয়াছে। কলিকাতা, লণ্ডন ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভের পর ডাক্তার গুহ আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় শিষ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

মুরলীমোহন সেন—

গত ২৫শে চৈত্র মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের জমীদার ও কংগ্রেসকর্ম্মী মুরলীমোহন সেন মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে



মুরলীমোহন সেন

পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তিনি সুপ্রসিদ্ধ রামদাস সেনের পৌত্র ও মণিমোহন সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি মাতাকে লইয়া কুম্ভ-স্নানে যাইতেছিলেন, পথে জয়পুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। বহরমপুরের এই সেন পরিবার নানা কারণে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মুরলীবাবু জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর কমিশনার ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সার মহম্মদ একবাল—

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সার মহম্মদ একবাল গত ২১শে এপ্রিল লাহোরে ৬২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতের শিয়াল-কোর্টে একবালের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন—সার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও একবালের পূর্ব্বপুরুষগণ একই পরিবারভুক্ত ছিলেন। কিছুকাল এদেশে অধ্যাপকের কাজ করার পর তিনি জার্ম্মাণীতে গমন করিয়া মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষার অধ্যাপক হইয়াছিলেন। 'হিমালয় পর্ব্বত' নামে তিনি যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসামান্য কাব্যপ্রতিভা প্রকাশ পায়। পেশোয়ার হইতে করাচী পর্য্যন্ত দেশ লইয়া গঠিত একটি মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের জন্য ইনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ইসলামিক



মহম্মদ একবাল

আদর্শের প্রতি তাঁহার অসীম প্রীতি ছিল। বর্ত্তমান ভারতে কাব্য প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথের পরই তাঁহার স্থান ছিল।

রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক—

'নদীয়া-কাহিনী' প্রণেতা খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক গত ২২শে এপ্রিল ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। নদীয়া জেলার রাণাঘাটে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি জমীদার হইয়াও স্বয়ং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি চিনির কারখানা

করিয়াছিলেন এবং ইক্ষুচাষ ও গুড় তৈয়ারী করিতেন। তিনি নিজ কৃষি-ক্ষেত্রে বহু ছাত্রকে রাখিয়া তাহাদিগকে উন্নতধরণের বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বহু জনহিতকর

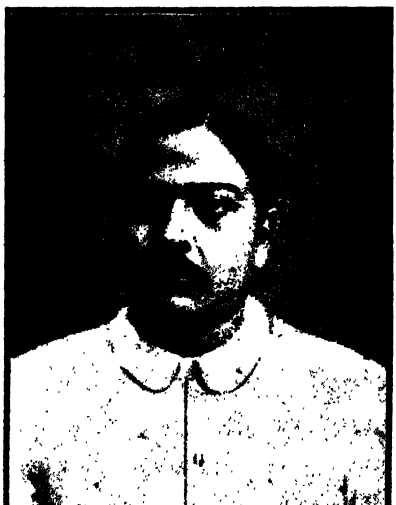


কুমুদনাথ মল্লিক

প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার মত অমায়িক মিষ্টভাষী লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়—

চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ জমীদার পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৯শে এপ্রিল রাত্রিতে মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে



পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ব্বাঙ্কল রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র ও গোন্দলপাড়ার গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র ছিলেন। প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া পরোপকার করিতেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিঠলভাই পেটেল ভাণ্ডার—

সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা, ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বিঠলভাই পেটেল মৃত্যুকালে কিছু টাকা দেশ সেবা কার্য্যে ব্যয়িত হইবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছিলেন। উহা এ পর্য্যন্ত সুদে আসলে ৫৮ হাজার টাকা হইয়াছিল। সম্প্রতি পুরী জেলায় গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের সম্মিলনে মহাত্মা গান্ধী ঐ টাকা সেবা-সঙ্ঘকে দান করিয়াছেন। গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘ বর্ত্তমানে দেশের সর্ব্বত্র রাজনীতিক কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। কাজেই ঐ টাকা তাঁহাদের দ্বারা ব্যয়িত হইলে উহা যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য সার্থক হইবে, মনে করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার বন্দীদের মুক্তির চেষ্টা—

গত চৈত্র মাসের শেষভাগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া মহাত্মা গান্ধী বাঙ্গালার রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ২৪শে চৈত্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে মহাত্মাজী কলিকাতার লাটপ্রাসাদে যাইয়া গভর্ণর লর্ড ব্র্যাবোর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং বন্দীদের মুক্তি সমস্যা লইয়া উভয়ে দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা চলিয়াছিল। ২৮শে চৈত্র সোমবার গান্ধীজী বেলা ৪টার সময় দমদম জেলে যাইয়া ২০৯ জন রাজনীতিক বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন—তথায় গান্ধীজিকে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট কাল থাকিতে হইয়াছিল। দমদম জেলে-চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রভৃতি আছেন। ঐ দিনই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যাইয়াও সন্ধ্যাকালে গান্ধীজি তাঁহার প্রায়

১ ঘণ্টা ২০ মিনিট ছিলেন ও ১২০ জন রাজনীতিক বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ২৭শে ও ২৯শে চৈত্র উভয় দিনই গান্ধীজি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা নাজিমুদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং উভয় দিনই প্রায় দুই ঘণ্টা কাল করিয়া উভয়ের মধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। এখন এই চেষ্টার ফল দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে আটক রাজবন্দীদিগকে মুক্তিদান করিতেছেন। গান্ধীজি বলিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালার একজন রাজবন্দীও জেলে থাকিবেন, ততদিন তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন না। কাজেই আশা হয়, এবার তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে।

জনমতের জয়—

উড়িষ্যার গভর্ণর সার জন হাবাক কয়েক মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাইতে চাহিলে তাঁহার স্থানে ভারত গভর্ণমেণ্ট উড়িষ্যার রাজস্ব-কমিশনার মিঃ ডেনকে অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রীরা জানান যে নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে গভর্ণরের পদে



বিশ্বনাথ দাস

নিযুক্ত করা হইলে তাঁহাদের অধীনে মন্ত্রীদের কার্য্য করা সম্ভবপর হইবে না। প্রথমত কর্ত্তৃপক্ষ এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করেন নাই; তাহার পর সার জন হাবাকের উড়িষ্যা ত্যাগের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাসপ্রমুখ কংগ্রেস মন্ত্রীরা যখন সত্য সত্যই পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে উদ্যত হন, তখন কর্ত্তৃপক্ষের মাথার টনক নড়িল। এখন স্থির হইয়াছে যে সার জন হাবাক আর ছুটী লইবেন না—জনমতের জয় হইয়াছে। আমরা উড়িষ্যার মন্ত্রীদিগকে তাঁহাদের এই জয়ে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ—

গত ২০শে এপ্রিল মাদ্রাজ প্রদেশে গুণ্টুর সহরে অন্ধ্র প্রাদেশিক সংবাদপত্রসেবী সম্মিলনের যে অধিবেশন



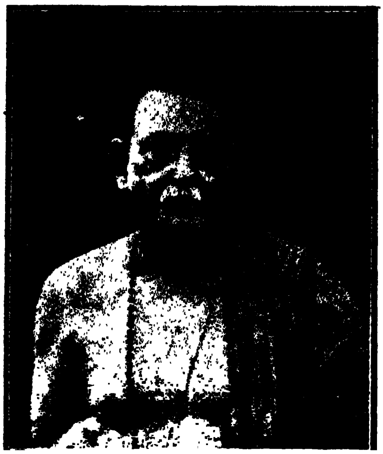
তুষারকান্তি ঘোষ

হইয়াছিল, কলিকাতাস্থ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ তাহাতে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন। তুষারবাবু তাঁহার অভিভাষণে সাংবাদিকদের দুঃখদুর্দ্দশার কথা বিবৃত করিয়াছিলেন। মাদ্রাজের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুত এস রামানাথম্ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ও শ্রীযুত জি-সি পুনাইয়া শাস্ত্রী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালী সাংবাদিকের বাঙ্গালার বাহিরে এরূপ সম্মানলাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—

গত ৭ই বৈশাখ বুধবার প্রবীণ সাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিন তাঁহার

জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ গুরুচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় খ্যাতনামা নেতা ডবলিউ-সি (উমেশচন্দ্র) ব্যানার্জ্জির পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হরিসাধনবাবু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া বৃত্তিলাভ করেন; ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কিছুকাল সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেল অফিসে কার্য্যে প্রবেশ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত একত্র বাস করিতেন; প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার



হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

পর বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্যোগে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' নামক যে পত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতেই প্রথম হরিসাধনবাবুর লেখা প্রকাশিত হয়। হরিসাধনবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রচার' পত্রেও লিখিতেন। হরিসাধনবাবু প্রায় ২৫ খানি উপন্যাস ও সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী কলিকাতার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত রঙ্গমহাল, শীসমহাল, মতিমহাল, সাহাজাদা খসরু, সতীলক্ষ্মী, নুরমহল, লালচিঠি, সতীর সিন্দুর, নীলাবেগম, সুখের বাসর, সফল স্বপ্ন প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি নাটকও কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত দুইখানি পুস্তক হিন্দীতে ও একখানি গুজরাটীতে অনূদিত হইয়াছে।

বিহিটা রেল দুর্ঘটনা—

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই ই-আই-রেলের বিহিটা ষ্টেসনের নিকট রেল দুর্ঘটনার ফলে ১০৭জন যাত্রী নিহত ও ১১৭জন যাত্রী আহত হইয়াছিল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সার জন টমের উপর উক্ত দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে তদন্তের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি তদন্তের রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে রেল কোম্পানীর শৈথিল্যই উক্ত দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ কারণ। সুতরাং যাহারা এই দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছে তাহাদিগকে এবং নিহত ব্যক্তিদিগের পোষ্যদিগকে রেল কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। রেল কোম্পানীও এই মর্ম্মে একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। রেল দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সাধারণত তদন্তের ব্যবস্থা হয় না; কিন্তু এই তদন্তের পর এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং মনে হয় রেল কোম্পানী অতঃপর অধিকতর সাবধানতার সহিত রেল চালাইবার ব্যবস্থায় অবহিত হইবেন।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা—

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালার কয়েকটি জেলায় শিক্ষা-কর প্রবর্ত্তন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি গত ১৪ই এপ্রিল হইতে মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর, নোয়াখালি, নদীয়া, বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা ও ফরিদপুর—এই ৮টি জেলায় শিক্ষা-কর প্রবর্ত্তনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া তদ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য না হইলেও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবেন না। যাহা হউক, এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল—বলিতে হইবে।

বোম্বায়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান কংগ্রেস—

গত ১০ই এপ্রিল হইতে কয়েকদিন বোম্বায়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান কংগ্রেসের (নিখিল ভারত) যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহার ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত বামন-

দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সভাপতির অভিভাষণে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন—“প্রথমেই নজরে পড়ে আমাদের দেশের মাতৃজাতির গার্হস্থ্য জীবনযাপন, স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশু-পালন, শিশুর কল্যাণবিধান প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। যাঁহারা ভবিষ্যতে মা হইবেন, তাঁহাদেরও এ সব বিষয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। * * * প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণ কাজে যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষিত লোক পাওয়া না গেলে পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিতা ধাত্রী-সমস্যা থাকিয়া যাইবে। ধাত্রীবিদ্যায় যদি আমরা যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারি, তবেই পল্লী অঞ্চলের অশিক্ষিতা ধাইদের স্থানে যাইয়া তাহারা কাজ করিতে পারে এবং সমস্যারও সমাধান হয়। এই জাতীয় শিক্ষিতা ধাত্রী পাইতে হইলে রাষ্ট্রের পল্লী অঞ্চলে প্রসূতি-কেন্দ্র খোলা প্রয়োজন। ঐ সকল কেন্দ্রের কাজ হইবে পল্লী রমণীদিগকে ধাত্রী বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তোলা এবং তাহাদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান বিস্তার করা। * * * আমাদের ইহাও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যাহাতে বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজগুলিতে সাধারণ ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুপালন শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকে। ইহাতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের অজ্ঞতা বহুলাংশে দূর হইবে।”

ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু—

আন্দামান প্রত্যাগত দেশকর্ম্মী ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায় গত ১৫ই এপ্রিল কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক বৎসর কাল বহু আবেদনের পর তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল —১৫ বৎসর আন্দামানে থাকিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি ‘বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা’র প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র ছিলেন— মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা লিখিতে পারিতেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার সময় তিনি প্রায় ১২ হাজার টাকা মূল্যের পৈতৃক সম্পত্তি মামলা পরিচালনার জন্য দান করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা স্কটীশ চার্চ্চেস কলেজের ছাত্রগণ উক্ত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়কে কলেজে সম্বর্দ্ধনা করিবেন স্থির করিলে প্রথমতঃ কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন; ফলে কলেজের ছাত্রবৃন্দ তাহার প্রতিবাদে কয়েকদিন ধর্ম্মঘট করিয়া কলেজে যোগদান করেন নাই; সুখের বিষয় পরে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের মতি পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং গত ৩রা বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যায় কলেজ হলে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সুভাষচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে। স্কটীশ চার্চ্চেস কলেজে এরূপ বিরাট অনুষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই, ছাত্রগণ ও অধ্যাপকবৃন্দ প্রায় সকলেই সম্বর্দ্ধনায়



শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

যোগদান করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—“দেশের যুবকগণ যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিতে শিখে এবং নিত্য নূতন আবিষ্কারের জন্য বিপদের মধ্যেও দুঃসাহসের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে তবে যে কোন সমস্যার সমাধান তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। * * * সমষ্টিগত আত্মচেতনা উদ্বোধনের ভার সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই এ জাতি আবার জীবনের সকলক্ষেত্রে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিবে।”

জার্ম্মাণীতে শিক্ষা ব্যবস্থা

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার এম, এ, বি-টি (ক্যাল) ডিপ, এড (এডিন ও ডাব)

প্রুশিয়ার প্রাথমিক স্কুলগুলির উদ্দেশ্য আত্মনির্ভরতা ; দেশ-সেবা ও ভগবানে বিশ্বাসমূলক শিক্ষা দিয়া ছেলেমেয়ে তৈয়ারী করা কিংবা, এক কথায়, মানবীয় বা ভগবৎ শাসন মানিয়া চলে এমন ধারা ছেলেমেয়ে গড়িয়া তোলা। আমেরিকার গণতন্ত্রের পৌরজন তৈয়ারী করার লক্ষ্যের চেয়ে এই লক্ষ্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ধর্ম্মোপদেশের মধ্য দিয়া ভক্তি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, আর দেশাত্মবোধ সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজবংশের গৌরব-কথার সাহায্যে শিখান হয়। অবশিষ্ট বিষয় জীবিকার্জ্জন সম্পর্কে। পাঠ্য বিষয় যথা (১) ধর্ম্ম, জার্ম্মাণ, অঙ্ক ও জ্যামিতি (২) বাস্তব বিষয়—ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিপাঠ ও বিজ্ঞান (৩) অতিরিক্ত বিষয়—গান, ড্রয়িং, ব্যায়াম ও মেয়েদের হাতের কাজ। এই ব্যায়ামের মধ্যে সাঁতার ও জিমন্যাসটিক্‌সও আছে।

পিটার স্যাণ্ডিফোর্ডের মতে জার্ম্মাণীতে মুদ্রিত পুস্তকের চেয়ে শিক্ষকেরই আদর বেশী ; কারণ তিনিই একরকম মৌখিক জীবিত পুস্তক। শিক্ষকের ঠিকমত অনুকরণই ছাত্র ছাত্রীদের চেষ্টার বিষয়। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা প্রণালীতে চিন্তা ও বিচারের অবকাশ খুব বেশী। কিন্তু জার্ম্মাণ প্রণালীতে সেরকম নহে। তবে বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে নব প্রণালীমতে প্রতিষ্ঠিত ফোক স্কুলগুলিতে এ বিষয়ে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। ব্ল্যাকফরেষ্টে, কার্লশাফেন পল্লীর স্কুলে বিষয় ধরিয়া কথোপকথন প্রণালীতে বিদেশী ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার রীতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

মধ্য বিদ্যালয়গুলিতে নয় হইতে পনর বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েরা পড়ে। এখানে বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিশেষভাবে শিখান হয়। আর একটী বিদেশী ভাষাও শিখান হয়। মধ্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় উচ্চতর মধ্যবিত্ত বা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরের। সেজন্য তাহাদের বেলায় বাড়ীর কাজও কিছু দেওয়া হয়। বিদেশী ভাষার মধ্যে ফরাসী বা ইংরাজী এগার বৎসরের সময়ে আরম্ভ করা হয়। বেতন হার উচ্চ বিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক।

উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে, দেশের সেবা ও শাসনযন্ত্র পরিচালনের জন্য বা বিভিন্ন ব্যবসায় শিখিবার জন্য উপযুক্ত লোক তৈয়ারী করা। এই সকল স্কুলে নয় বৎসরের মত পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন ধরণেরগুলির নাম হইল জিমন্যাশিয়াম ; প্রাচীনের সঙ্গে নূতনের মিশ্রণে বাস্তব জিমন্যাশিয়ামের সৃষ্টি ; আর একেবারে নূতন ধরণের স্কুলের নাম হইল "বাস্তব" স্কুল। তবে এখানেও ল্যাটিন শিখান হয়। আর উপরিতন "বাস্তব" স্কুল নামে নব প্রথার স্কুলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতির জন্য প্রস্তুত করিতে কিশোর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রাচীন ধরণের জিমন্যাশিয়াম ও "বাস্তব" জিমন্যাশিয়ামগুলিতে আইন, ধর্ম্ম, শিক্ষকতা প্রভৃতি শিখিতে ছাত্র-ছাত্রীদের তৈয়ারী করা হয়। নবপ্রণালীতে পরিচালিত ফোক স্কুলসমূহ বিগত মহাযুদ্ধের পর হামবুর্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে ব্যাভেরিয়ার অধ্যাপক কার্শেনষ্টাইনারের শিক্ষানীতিই বেশী চলে। তাঁহার প্রচারিত "কুলতুর কুণ্ডে" প্রণালীতে শিক্ষা বিষয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির সমন্বয়মূলক নবনীতিই অনুসৃত হয়। জাগতিক বিষয়াবলী যেমন পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিজড়িত শিক্ষাদানের বিষয়গুলিও তেমনই সম্বন্ধযুক্ত-ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, ইহাতে একই সময়াংশে সাহিত্য, ভূগোল ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে শিক্ষা-দান সম্ভব। এইখানেই কার্শেনষ্টাইনারের নীতির অন্য নীতি হইতে তফাৎ। এক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞান অগাধ ও বহু সম্প্রসারি হওয়া আবশ্যক, যদিও জার্ম্মাণীর শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের পাঠদানের প্রণালীর উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়। লিষ্টভার্ক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিষ্টভার্ক স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় একজন পি, এইচ ডি ও সেনানায়ক ছিলেন। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ্যবিষয়ে লেখ-পট (চার্ট) চিত্র, মানচিত্র প্রভৃতি ইংরাজের ন্যায় অগ্রসর জাতির অবস্থার সহিত তুলনা দেখাইয়া ছেলে-মেয়েরা কেমন সুন্দরভাবে করিয়াছে, দেখিলে জাতীয় শিক্ষা দান প্রণালী সম্বন্ধে কতকটা নূতন ধারণা করা যায়। নবশিক্ষা প্রণালীতে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির কার্য্য দেখিলেই মনে হয় যে তাহাদের উদ্দেশ্য নবজার্ম্মাণ জাতি গড়িয়া তোলা। জাতীয়তা মূলক লক্ষ্য জার্ম্মাণ শিক্ষা ব্যবস্থায় নবপ্রেরণা আনিয়া দিয়াছে। ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের হাতের কাজও শিখানর ব্যবস্থা আছে, ভবিষ্যতে কাজ না পাইলেও এই সকল কাজেও তাহাদের কিছু না কিছু সাহায্য হইতে পারে এই আশায়। একটী স্কুলের প্রায় ৬৫০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় ২৫০ জন মেয়ে।

খেলা ধুলা

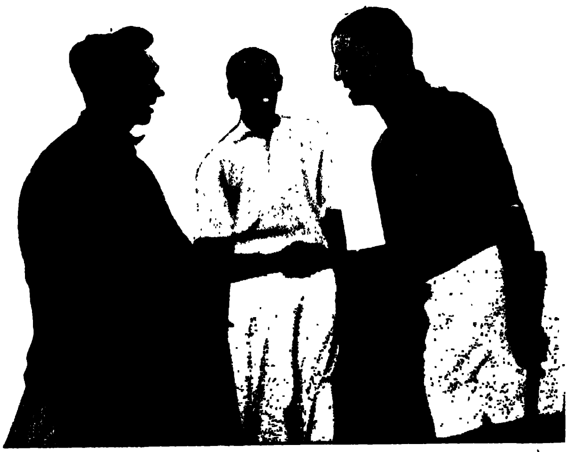
বাইটন কাপ ঃ

কলিকাতা কাষ্টমস বাইটন কাপ বিজয়ী হলো। অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট খেলেও গতবারের বিজয়ী বি এন আর দলকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। খেলা শেষের দু'মিনিট পূর্ব্বে কাষ্টমস এক গোল দিয়ে জয়ী হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ও কাষ্টমসের অখেলোয়াড়ী গুণ্ডামি খেলার এবং নিকৃষ্ট রেফারিংয়ের জন্য বি এন আর সর্ব্বক্ষণ চেপে ধরেও গোল করতে পারলে না। অলিম্পিক খ্যাত দুর্দ্ধর্ষ সেণ্টার ফরওয়ার্ড ডিকি কার দু' তিনটি অব্যর্থ গোল নষ্ট করলে, তাঁদের অন্ততঃ পক্ষে তিন গোলে জয়ী হওয়া উচিত ছিল। গত বৎসরেও বিজিত দল ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স সর্ব্বাংশে ভাল খেলেও বি এন আরের কাছে শেষ মুহূর্ত্তে গোল খায়। History repeats—অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো।

কলিকাতা কাষ্টমস এবার নিয়ে এগার বার বাইটন বিজয়ী হলো। তারা পনেরো বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, আটবার ডবল বিজয়ী (অর্থাৎ, লীগ ও বাইটন বিজয়ী) হয়েছে এবং এবার লীগের একটি খেলাতেও হারে নাই।

বি এন আর গত আট বৎসরের মধ্যে পাঁচবার বাইটন ফাইনালে উঠেছিল, তন্মধ্যে ১৯৩১,৩২,৩৫ ও ৩৮ সালে ফাইনালে এবং ১৯৩৬ সালে সেমিফাইনালে কাষ্টমসের কাছে পরাজিত হয়েছে। মাত্র ১৯৩৭ সালে রেল দল তৃতীয় রাউণ্ডে কাষ্টমসকে ২-০ গোলে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়।

বিজয়ী পক্ষে জার্ডিন ও হজেস দৃঢ়তার সঙ্গে অপূর্ব্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়েছে। তাদের জন্যই কাষ্টমসরা পরাজয়ের হাত থেকে বেঁচেছে। ব্যাক চারজনের মধ্যে হজেস তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছে, এমন কি তাকে বাইটন প্রতিযোগী সকল দলের ব্যাকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাক বললেও অত্যুক্তি হয় না। ফরওয়ার্ডরা কেহই সুনাম রক্ষা করতে পারে নাই, বিপক্ষের পরিশ্রমশীল হাফ লাইনের বিরুদ্ধে। কেবল রেণ্টন যা একটু গোল করবার প্রচেষ্টা করেছিল। সিম্যানের সুযোগ সন্ধানের জন্যই তারা বিজয়ী হলো। যখন প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজেদের পতনের সম্ভাবনা অত্যধিক, সেই সময় সিম্যান বল পেয়ে ভাগ্যলক্ষ্মীর করুণায় গোল করে ফেললে। বিজিতদের ফরওয়ার্ডদের সম্মিলিত আক্রমণ রোধ করতে অপারক হয়ে কাষ্টমসের রক্ষণভাগ পুনঃ পুনঃ নিয়ম বহির্ভূত প্রক্রিয়ায় তাদের বাধা দিয়ে অব্যর্থ গোল বন্ধ করেছে।



প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাপ্টেন দ্বয়ের করমর্দ্দন। বামে কলিকাতা কাষ্টমসের ক্যাপ্টেন হেণ্ডারসন, দক্ষিণে বি এন আরের ক্যাপ্টেন ট্যাপ্সেল, মধ্যে রেফারি বি এন ঘোষ

ছবি—জে কে সান্যাল

কাষ্টমসের এইরূপ অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি অতীব নিন্দনীয়। তথাপি তাদের শক্তিশালী বিপক্ষকে ছলে বলে কৌশলে বাধাদান ও পরাভব না স্বীকার করবার দুর্দ্দমনীয় দৃঢ়তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না।



বাইটন ফাইনালে বি এন আরের সেণ্টার ফরওয়ার্ড অলিম্পিক যশস্বী ডিকি কার গোল করতে অপারক হয়েছেন, কাষ্টমস খেলোয়াড়ের ছলে বলে কৌশলে বাধা দানের জন্য। কাষ্টমস খেলোয়াড় ষ্টিক দ্বারা কারের পা আটকেছে দৃষ্ট হয় ছবি—জে কে সান্যাল



১৯৩৮ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও বাইটন কাপ বিজয়ী কলিকাতা কাষ্টমস্ ছবি—জে কে সান্যাল

ফাইনাল খেলায় টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ মোট ৫৫৭৬৸৵০ টাকা।

লুসিটেনিয়ানরা বোম্বাই লীগের চ্যাম্পিয়ন। তাদের হারাতে কাষ্টমসকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। তাদের আদান-প্রদান নিখুঁত ও দর্শনীয়। ধাক্কা-ধাক্কি বা শারীরিক বলপ্রয়োগ তারা করে না, clear game খেলে। তাদেরও কাষ্টমস অবৈধভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা লাঠি বাজী করে কোন প্রকারে এক গোলে হারিয়েছিল।

প্রথম দিনের খেলায় ১-১ গোল হয়ে ড্র হয়। অতিরিক্ত সময় খেলতে কাষ্টমস প্রথমে রাজী হয় না। তারা বিপক্ষদলের সঙ্গে যে কোনপ্রকারে ড্র করে রক্ষা পেয়েছে, তাদের শক্তি যে ফুরিয়ে গেছে, তা বেশ প্রতীয়মান হয়েছিল। রেফারির আজ্ঞায় তাদের খেলতে হয়েছিল। এদিন খেলান কিন্তু

কাষ্টমস ফাইনালে ওঠে,—মহমেডান স্পোর্টিংকে ৬-০, বি জি প্রেসকে ১-০, জব্বলপুরকে ৪-১, সংসারপুরকে ৩-০, লুসিটেনিয়াকে ১-১, ১-০ গোলে হারিয়ে।

বি এন আর ফাইনালে পৌঁছায়,—মোহনবাগানকে ১-০, পুলিসকে ৫-০, পোর্টকমিশনারকে ০-০, ২-১, কায়স্থ পাঠশালাকে ১-০, বোম্বাই কাষ্টমসকে ১-০ গোলে পরাজিত করে।

ঠিক হয় নি, কারণ অতিরিক্ত সময় খেলা বেশ আধ অন্ধকারে হয়েছিল। মাত্র ৫ মিনিট করে ১০ মিনিট খেলান হয় ১৫ মিনিটের স্থলে। তাও অন্যায় বলে মনে হয়। কারণ যে দল হারতো তাদের উপর অবিচার করা হতো, বাকী ৫ মিনিট খেলা হ'লে হয়তো বা গোল পরিশোধ তারা করতেও পারতো। হকির নিয়মে এরূপ আছে কি যে আম্পায়ার অতিরিক্ত সময় তার ইচ্ছামত সময় নির্দ্দিষ্ট করতে পারবে! কোন খেলা যদি কম সময় খেলান হয় বা আলো কমের জন্য বন্ধ হয় তবে খেলাটি পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে।

সংসার পুরের প্রথম গোল বাতিল হওয়ায়', বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল, তেমনি জনতার মধ্য থেকে ভিয়াসে'র গোলটি অমঞ্জুর হওয়া এবং তৎ-পরিবর্ত্তে কর্ণার দেওয়া আরো বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল।

মোহনবাগান প্রথম রাউণ্ডে বি এন আরের সঙ্গে খেলায় খুব কৃতিত্ব দেখিয়ে সম্মানজনক পরাজয় স্বীকার করে। তাদের ফরওয়ার্ডরা যদি স্বর্ণ সুযোগ নষ্ট না করতো তবে তারাই গতবারের বিজয়ী দলকে পরাজয় করার সম্মান লাভ করতে পারতো। প্রভাস দাসের খেলা এদিন খুব উচ্চদরের হয়েছিল। বি এন আর দল বিধিনিয়ম ভঙ্গ করে কোন প্রকারে তাদের ঐ এক গোল বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। যখনি বিপক্ষ দলের ফরওয়ার্ডরা সুন্দর আদান-প্রদান করে গোলের দিকে এগিয়েছে, অলিম্পিক বিখ্যাত ব্যাক টাপসেল হয় 'কিক্' না হয় অবৈধ ধাক্কা বা লাঠি চালনা দ্বারা আক্রমণ রোধ করেছে।

আম্পায়ারদের পরিচালনা খুবই খারাপ হয়েছে। জুর চুরিও হয়েছে, পাশের জালে বল লাগলো, আম্পায়ার গোল নির্দ্দেশ করলে, তাও দেখা গেছে। অপর আম্পায়ারকে জিজ্ঞাসা করা তার উচিত ছিল। সকল দর্শক ও উভয় পক্ষের খেলোয়াড়রাও গোল হয় নি দেখতে পেয়েছিল, কেবল বংশীধারী দেখতে পান নি।

বোম্বাই দলরা কলিকাতার খেলা পরিচালকদের সম্বন্ধে কি ধারণা নিয়ে গেলো, সে বিষয় পরিচালক মণ্ডলী ভেবে দেখবেন। লুসিটেনিয়া দলের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অন্যায় হয়েছে।



বোম্বাই কাষ্টমস দল ছবি—জে কে সান্যাল

পূর্ব্ববর্ত্তী বাইটন বিজয়ীগণ ঃ

১৯৩০—৩২…কলিকাতা কাষ্টমস
১৯৩৩…ঝাঁন্সি হিরোজ
১৯৩৪…কলিকাতা রেঞ্জার্স ক্লাব
১৯৩৫…কলিকাতা কাষ্টমস
১৯৩৬…বোম্বাই কাষ্টমস
১৯৩৭…বি এন আর

লক্ষ্মীবিলাস কাপ ঃ

আলীগড় ইউনিভার্সিটি দল ৫-১ গোলে সংসারপুর স্পোর্টিংকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। আলীগড়ের নবীন খেলোয়াড়রা হকিতে বিশেষ দক্ষ। বাইটন কাপে

তারা ভাগ্যদোষে পরাজিত হয়। লেফট-ইন ইয়াসিন একাই ৩টি এবং সাবুর ১টি ও নাসির ১টি গোল দেয়। বিজিতপক্ষে গোপাল সিং একটি গোল দেয়। সংসারপুরের গোল দেবার বেশী আগ্রহের জন্ত তাদের রক্ষণভাগ এগিয়ে থাকায় গোল সংখ্যা বেশী হয়। আলীগড় উন্নত ধরণের খেলা দেখিয়েছে এবং যোগ্য দলই বিজয়ী হয়েছে।

বাঙ্গলা বনাম রেষ্ট ঃ

বাঙলা ও রেষ্টের মধ্যে প্রদর্শনী ম্যাচ হয়। বাঙলা দলে নির্ব্বাচিত চারজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় খেলেন নাই—ট্যাপসেল, গ্যালিবর্ডি, কার ও হেওয়ারসন। রেষ্ট দল আরো পুষ্ট হয়েছিল রূপ সিং যোগ দেওয়ায়। খেলাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়। বাঙলার অধিক সুখ্যাতি প্রাপ্য, কারণ তারা ভাঙা দল নিয়ে প্রায় জিতেছিল। শেষ মুহূর্ত্তে সুইনির অপ্রত্যাশিত অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয় গোলটিই তাদের জয়ের প্রতিবন্ধক হয়।



লক্ষ্মীবিলাস কাপে বিজয়ী আলীগড় ইউনিভার্সিটি ছবি—জে কে সান্তাল

প্রথম ভাগে বাঙলা প্রাধান্ত করে এবং প্রথম মিনিটেই রেণ্টন সর্টকর্ণার থেকে গোল দেয়। দ্বিতীয় ভাগে রেষ্টদল অধিক আক্রমণ করে। খেলাটি ৩-৩ গোলে ড্র হয়।

রূপসিং এদিন তাঁর পূর্ব্ব ক্রীড়াচাতুর্য্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রেষ্টের তিনটি গোলের মধ্যে একটি তিনি নিজে দেন এবং অপরটিও তারই চেষ্টার ফলে হয়।



লক্ষ্মীবিলাস কাপের রাণার্স-আপ, সংসারপুর স্পোর্টিং ছবি—জে কে সান্তাল

বাঙলা ঃ—এলেন (ক্যাপটেন—পোর্ট কমিশনার্স); পি দাস (মোহনবাগান) ও

সি হজেস্ (কাষ্টমস্) ; আরিফ (মোহনবাগান), সি ডিকোণ্টস্ (কাষ্টমস্) ও মহম্মদ নায়িম্ (মহমেডান স্পোর্টিং) ; এ মিত্র (গ্রীয়ার্স স্পোর্টিং), রবিন্স (ডালহৌসী), রেবেলো (কাষ্টমস্), রেণ্টন (কাষ্টমস্) ও জি নিস্ (জেভেরিয়ান্স)।

রেষ্ট দল :—লিন্ (বোম্বাই কাষ্টমস্) ; মুস্তাক্ (নিউ ষ্টার) ও আস্‌লাম্ (বোম্বাই কাষ্টমস্) ; নাসীর আলী (আলীগড়), ক্রয়িন (বোম্বাই কাষ্টমস) ও জাহীর (আলীগড়) ; হুইনি (বোম্বাই কাষ্টমস), নাসির আলী (আলীগড়), সাকুর (আলীগড়), রূপসিং (ক্যাপটেন—দলভুক্ত নয়), ফার্ণাণ্ডেজ (লুসিটেনিয়া)।

কাইভান কাপ ঃ

তৃতীয় বিভাগ লীগের রাণার্স্-আপ কলেজিয়ান্স ১-০ গোলে লিলুয়াকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। গত বৎসরে বি এন আর বিজয়ী ছিল।



মিসেস ইন্‌গো সাইমন, পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন মহিলা ধনুর্দ্ধারিণী অনুশীলন রতা



কৃষ্ণকুমার শর্ম্মা,—এলাহাবাদে ৮৮ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট অবিরাম সাইকেল চালনা করে পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন

আগা খাঁ হকি টুর্ণামেণ্ট ঃ

ফাইনালে প্রথম দিনে ভগবন্ত ক্লাব ২-২ গোলে কিরকি ইউনাইটেডের সঙ্গে ড্র করে। দ্বিতীয় দিনে অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে ২-০ গোলে কিরকিকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। নবিসা, মোজেস ও দুর্গাপ্রসাদ রক্ষণকার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করেছে এবং পাঁচজন ফরওয়ার্ডই এমন সুন্দর খেলা দেখিয়েছে, যা বহুদিন দেখা যায় নাই। কিরকির ব্যাক জে ফিলিপস্ ও ডি' সুজার রক্ষণভাগে দুর্দান্ত খেলার জন্ম অধিক গোল হয় নাই।

জি আই পি ২-০ গোলে লুসিটেনিয়াকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে যায়। খেলাটি অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল, লুসিটেনিয়া তাদের সুন্দর আদান-প্রদান ও ষ্টিকের নৈপুণ্য, যার জন্যে তারা এবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়, মোটেই দেখাতে পারে নাই। জি আই পির খেলাও উচ্চাঙ্গের হয় নি। সেমি ফাইনালে জি আই পি ৫-১ গোলে কিরকি ইউনাইটেডের কাছে পরাজিত হয়।

অপর সেমিফাইনালে গত বারের বিজয়ী লাহোর ওয়াই এম সি এ ২-১ গোলে টিকাম্‌গড়ের ভগবন্ত ক্লাবের কাছে পরাস্ত হয়।

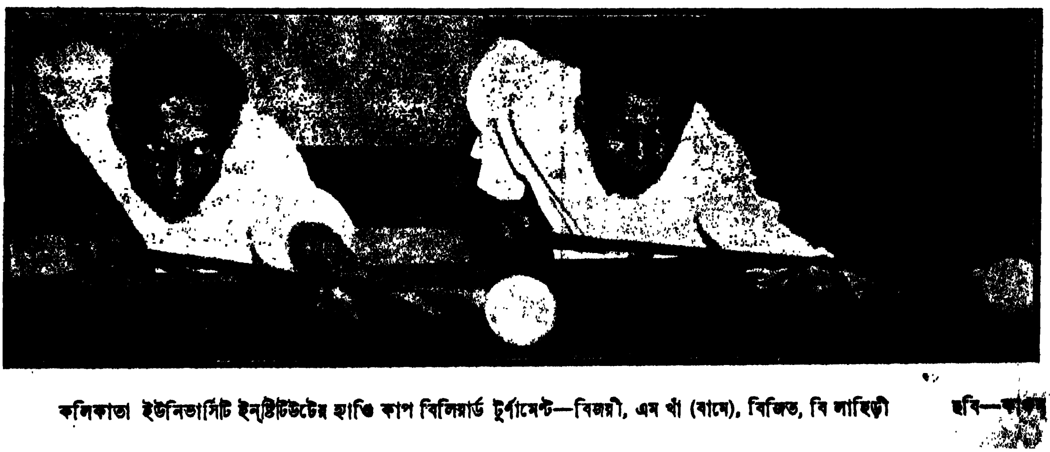
ইণ্টার ন্যাসনাল ফুটবল তালিকা ঃ

ইংলণ্ড ইণ্টার-ন্যাসনাল ফুটবল লীগে ৪ পয়েণ্ট করে প্রথম হয়েছে। শেষ খেলায় স্কটলণ্ড ১-০ গোলে ইংলণ্ডকে হারায়। এ খেলাতে ৯৩ হাজার দর্শক জড়ো হয়েছিল।

	খেলা	জয়	হার	ড্র	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইংলণ্ড	৩	২	০	১	৭	৩	৪
স্কটল্যাণ্ড	৩	১	১	১	৩	৩	৩
আয়ার্লণ্ড	৩	১	১	১	৩	৬	৩
ওয়েলস্‌	৩	১	০	২	৩	৪	২



ওয়েম্বলেতে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের ইণ্টার-ন্যাসনাল ফুটবল ক্রীড়ায় স্কটল্যাণ্ডের গোল আক্রমণের দৃশ্য। ৯৩ হাজার দর্শক জড়ো হয়েছিল



কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের হাণ্ডি কাপ বিলিয়ার্ড টুর্ণামেন্ট—বিজয়ী, এম খাঁ (বামে), বিজিত, বি লাহিড়ী ছবি—কাঞ্চন

রানে পড়ে যায়। ব্র্যাডম্যান ২৫৮, ব্যাডকক্ ৬৭, হাসেট ৪৩।

ফ্লিডউড-স্মিথ ৯৮ রানে ৮ উইকেট নেন।

অষ্ট্রেলিয়া—৬৭৯
(৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)

অক্সফোর্ড—১১৭ ও ৭৫

অষ্ট্রেলিয়া তাঁদের বিলাতের দ্বিতীয় খেলায় এক ইনিংস ও ৪৮৭ রানে জয়ী হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ফিঙ্গলটন ১২৪, ম্যাক্‌ক্যাব ১১০, এ এল হাসেট ১৪৬, ব্র্যাডম্যান ৫৮, ওয়েট ৫৪, চিপারফিল্ড ৫৩।

ইভান্স ১৭১ রানে ৩, দারওয়াল-স্মিথ ১৬২ রানে ২, ম্যাকইন্‌ডো ২০৭ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন।

অক্সফোর্ড পক্ষে প্রথম ইনিংসে ইগার (নট আউট) ৫১, দ্বিতীয় ইনিংসে ২৫।

ফ্লিটউড্-স্মিথ ২৮ রানে ৫ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।



"নৃত্য ও শরীর চর্চ্চার ছন্দ।" লণ্ডনের রয়েল এলবার্ট হলে সম্রাজ্ঞী মেরীর সম্মুখে "নৃত্য ও শরীর চর্চ্চার ছন্দের" প্রদর্শনী। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য মহিলা লীগের অধিনেত্রী মিস প্রুনেলা ষ্ট্যাক পরিচালনা করছেন

এ আর এ ই রিগেটা ঃ

প্রাচ্যের অবৈতনিক বাচ্ সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতা ঢাকুরিয়া লেকে শেষ হয়েছে। কলিকাতার লেক ক্লাব অপূর্ব্ব সাফল্যলাভ করেছে। বোম্বে ও পুণা শেষকালে এসে পৌঁছায় নাই। প্রত্যেক বাচ্‌টিই খুব প্রতিযোগিতা-মূলক হয়েছিল।

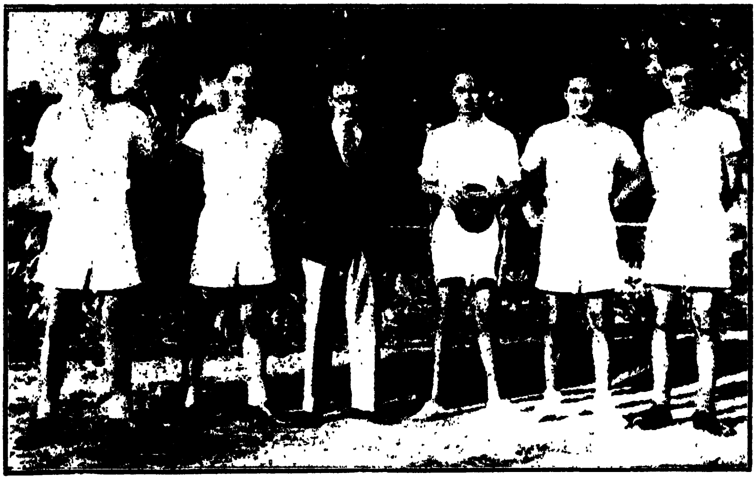


উইলিংডন ট্রফী বিজয়ী কলিকাতা লেক ক্লাব—
রিগেটায় অপূর্ব্ব সাফল্য দেখিয়েছেন ছবি—জে কে সান্যাল

উইলিংডন ট্রফী বিজয়ী হয়েছে লেক ক্লাব ১লেংথে ৩মিনিট ১৮½ সেকেণ্ডে রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে। দলে ছিলেন—বোথারি, পি সি সেন, এ সেনগুপ্ত, কে সি সেন, এস কে বোস।

ভেনেবল্‌স্‌ 'বোল' বিজয়ী হয়েছে মাদ্রাজ বোট ক্লাব, বিজিত কলিকাতা ইউনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাব। সময় ৩ মিনিট ৪২$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ড।

ম্যাক্‌লিন্‌ স্কাল্‌স্‌ বিজয়ী লেক ক্লাব, বিজিত কলিকাতা রোয়িং ক্লাব। কে সি সেন (লেক ক্লাব) ৩ মিনিট ৪০$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ডে ১$\frac{১}{৪}$ লেংথে আদামসকে (কলিকাতা রোয়িং ক্লাব) হারিয়ে জয়লাভ করেন।



রেঙ্গুন রোয়িং ক্লাব ছবি—জে কে সান্যাল



মাদ্রাজ বোট ক্লাব ছবি—জে কে সান্যাল

যক্ষ্মা নিবারণী সাহায্যকল্পে চ্যারিটি ঃ

সম্রাটের যক্ষ্মানিবারণ তহবিলের সাহায্যার্থ একটি চ্যারিটি খেলার আয়োজন হয়। লীগ বা শীল্ডের কোন খেলা চ্যারিটি বলে ঘোষিত হলে হেডওয়ার্ড কোম্পানীকে ২৭৫০৲ টাকা দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁরা ঐ টাকাটা তাঁদের নামে তহবিলে জমা দিতে রাজী হন। মিটিংএ কথা ওঠে ঐ টাকা তাঁরা পেতে পারেন কিনা, কারণ উহা লীগ বা শীল্ডের কোন খেলা নয়।

কিছু আনন্দের বিষয় যে বেতের চেয়ারের মূল্য ১০৲ টাকা করে ধার্য্য হয়েছিল। পূর্ব্বে আমরা বেতের চেয়ারের ক্রমশঃ সংখ্যা বৃদ্ধির সম্বন্ধে অনুযোগ করেছি। বেতের চেয়ারে যাঁরা বসতে চান, তাঁদের সর্ব্ব উচ্চ মূল্যের সাধারণের আসনাপেক্ষা অধিক অর্থ চ্যারিটির তহবিলে দেওয়া উচিত। বিনামূল্যে চ্যারিটির টিকিট নিয়ে শোভাবর্দ্ধন যাঁরা করেন তাঁদের নিমন্ত্রণ করা ভবিষ্যতে বন্ধ করা কর্ত্তব্য। এবার কতগুলি বেতের চেয়ারের মূল্য পাওয়া গেছে সাধারণে ঘোষিত হলে ভাল হয়। কারণ কোন কোন ভাগ্যবান বিনামূল্যে ঐ আসন সংগ্রহ করেছেন আর কতগুলি আসন ধনবানরা অর্থব্যয়ে অধিকার করেছেন, তা' সাধারণের জানা প্রয়োজন। নিমন্ত্রণের সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ হয়নি।

খেলাটি মহমেডান স্পোর্টিং ও অবশিষ্ট দলের মধ্যে হয়। মহমেডান এক গোলে জয়ী হয়েছে। রেষ্টের বাছাই আশানুরূপ হয় নাই। ফুটবল খেলার প্রারম্ভে, যখন সকল দলের খেলাই হয় নাই, খেলোয়াড়দের শক্তির পরিচয়

প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি হর্ষবর্দ্ধ শাল স্তম্ভবংশীয় এবং তাহার অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ। ইহারা ম্লেচ্ছ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ম্লেচ্ছাধিনাথো বিধিচলনবশাদেব জগ্রাহ রাজ্যম্। ৯।

—রত্নপালদেবের বরগাঁও লিপি।

পূর্ব্ববর্ত্তী নরক বংশীয়গণের রাজ্যচ্যুতি সম্বন্ধে এবংশীয় বনমাল ও বলবর্ম্মার তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে।

তস্যান্বয়ে * * * * * * * * * * * * *

প্রাগ্‌ জ্যোতিষেশঃ ক্ষতবৈরীবীরঃ প্রালম্ভ ইত্যদ্ভুত নামধেয়ঃ।

—তেজপুর তাম্রশাসন।

অস্তঙ্গতেষু রাজসু শালস্তম্ভো ভবন্নৃপতিঃ

—সোগাঁ লিপি।

"তস্যান্বয়ে" এবং "অস্তঙ্গতেষু" কথাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে নরক বংশীয়গণের পর শাল স্তম্ভবংশীয়গণ প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইহারা একই বংশের নহে। এই ম্লেচ্ছাধিনাথগণকে কেহই 'ভগদত্তরাজ কুলজ' বলে নাই। সুতরাং নেপাল লিপির 'রাজ্যমতী দেবী' এই বংশ-সম্ভূতা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

হর্ষবর্ম্মা "প্রাগ্‌জ্যোতিষেশঃ" কিন্তু নেপাল লিপির হর্ষদেব "গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশল পতি" কামরূপের উল্লেখ নাই। যদি 'নরক বংশজ' বলিতেই একমাত্র কামরূপ পতি বুঝাইত তবে অবশ্য রাজ্যমতী দেবীকে "ভগদত্ত রাজকুলজা" বলাতেই যথেষ্ট বলা হইয়াছিল। [খ] কিন্তু সমসাময়িক কালে উড়িষ্যায় "কর" উপাধিক নরপতিগণের রাজ্য ছিল। তাঁহারাও নরকবংশীয় বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই বংশের শুভকরদেব আনুমানিক ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন সম্রাট Te-song এর সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পরের কথা। [গ] সুতরাং শাসনকৃৎ যে কামরূপের উল্লেখ করেন নাই—ইহাতে ধারণা হয় যে নেপাল লিপির হর্ষদেব উক্ত প্রদেশের অধিপতি ছিলেন না, তিনি কামরূপের রাজবংশ সম্ভূত কিন্তু "গৌড়োড্রাদি-কলিঙ্গ-কোশল পতি"।

সে সময়ে নেপাল একটী খ্যাতিসম্পন্ন রাজ্য, সেই রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন গৌরবের বলিয়া বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শালস্তম্ভ বংশীয় নরপতিগণের যে তিনখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার কোথাও বা অন্য কোনও কামরূপ শাসনে তাহার উল্লেখ নাই। হর্ষদেব যশঃ কর্ণের ন্যায় পরাজিত হইয়া কন্যাদান করিয়াছিলেন ইহাও হইতে পারে, কিন্তু নেপাল লিপিতে তাঁহাকে যেরূপ গৌরবশ্রীমণ্ডিত দেখা যায় তাহাতে এরূপ ধারণা হয়না। এরূপ অবস্থায় প্রশস্তিকারগণের নীরবতা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক।

হর্ষদেব গৌড় হইতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ অর্থাৎ প্রাচ্য-ভারতের অধীশ্বর। কামরূপের প্রাচীন ইতিহাস প্রণেতা রায় বাহাদুর বড়ুয়া মহাশয়ের মতে [ঘ] এ সময়ের কাহিনী আসামীয় ইতিহাসের এক সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবল হর্জর ও বনমালের তাম্রশাসন ব্যতীত অন্য কোথাও এই মহিমান্বিত নরপতির উল্লেখ নাই। ইহাতেও তাহার বিশাল সাম্রাজ্য জ্ঞাপক কোনও কথা দেখিতেছি না। তিনি (গুণ) বান্ ধার্ম্মিকো নৃপঃ। [ঙ] বল বর্মা বা রত্নপালদেব তাঁহার সম্বন্ধে নীরব। একজন প্রতাপশালী নরপতির প্রতি শাসনকৃৎগণের এরূপ উপেক্ষা বাস্তবিকই প্রচলিত মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ বৃদ্ধি করে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস সম্পূর্ণ উদ্ধার হয় নাই বটে কিন্তু এতাবৎ আবিষ্কৃত কতিপয় প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থ হইতে পূর্ব্ব ভারতের ইতিহাস বিষয়ে অনেকটা জানা যায়। খৃষ্টীয় ৭৩৪—৪৭ অব্দে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা পূর্ব্বদিকে রাজ্যবিস্তার কালে বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া "মগধনাথ"কে পরাজিত করেন এবং তৎপর বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন। [চ] কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (৭১৩—৫৫ খৃঃ অব্দে) যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া কলিঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলে গৌড়মণ্ডল হইতে অসংখ্য হাতী আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়। [ছ] ইহা খৃষ্টীয় ৭৩৬ অব্দ বা তন্নিকটবর্ত্তী কালের ঘটনা। এই দুই বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ললিতাদিত্যের রাজ্যবিস্তার কালে গৌড় মগধপতির সামন্ত রাজ্য ছিল এবং কলিঙ্গ ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লেভির মতে পশুপতি নাথ মন্দিরলিপি খৃষ্টীয় ৭৪৮ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। [জ] ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের জীবদ্দশায় এবং তাহার দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত কাল পরেই কোনও মহিমান্বিত নরপতি নির্ব্বিবাদে গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ-কোশল এক সাম্রাজ্যপাশে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া সম্ভব নহে।

উপরোক্ত বিষয় সমূহ আলোচনা করিয়া যে প্রতীতি জন্মে তাহাই ঐতিহাসিকগণের বিচারের জন্য উপস্থিত করিতেছি। ভাস্কর বর্ম্মার মৃত্যুর পর কামরূপ সিংহাসন শাল স্তম্ভবংশীয়গণের করতলগত হয়। বঙ্গ মগধও অধীনতা পাশ ছিন্ন করে। কিন্তু নরকবংশীয়গণ নগণ্য স্বাধীন নৃপতি বা সামন্তরূপে রাজত্ব করিতে থাকেন। যশোবর্ম্মা এবং ললিতাদিত্যের যুদ্ধের অবসরে এই বংশীয় কেহ শক্তি সঞ্চয় করিয়া কাশ্মীর রাজের মৃত্যুর পর "গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশলপতি" হইয়াছিলেন। ইনিই নেপাল লিপির শ্রীহর্ষ দেব। এই বিশাল সাম্রাজ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু নানা ভাগ্য বিপর্য্যয় সত্ত্বেও নরকবংশীয়গণ পর্ব্বতসঙ্কুল উড়িষ্যা দেশে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্ষেমঙ্কর দেব প্রভৃতি 'কর' উপাধিক

নরপতিগণ ইহাদেরই বংশধর। হর্ষদেব মুক্তাপীড়ের পরবর্ত্তি এবং নেপাল লিপির ১৫৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

[ক] Indian Antiquiry Vol. IX. Page 113.

[খ] পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ—কামরূপ রাজাবলী

[গ] R. D. Banerjee—History of Orissa Vol. I.

[ঘ] K. L. Barua—Early History of Kamrup. Page 146.

[ঙ] হর্জর বর্ম্মার হাইয়ুংথল লিপি [কামরূপ শাসনাবলী]

[চ] বাক্‌পতি রচিত গউরবাহো কাব্য

[ছ] কহ্লনকৃত—রাজতরঙ্গিণী।

[জ] Sylvian Levi—Les Nepal.

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মদনভস্মের পর"—১॥০

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ প্রণীত উপন্যাস "চুক্তির দাবী"—২৲

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ধর্ম্মপ্রসঙ্গ"—১।০

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "শবরী"—১৲

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "অসি ও মসী"—১৲

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "ঘন মেঘের তলে"—২৲

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "দৈনন্দিন রোগের জল চিকিৎসা"—১॥০

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত প্রণীত গল্প পুস্তক "কামিখ্যের ঠাকুর"—১৲

মুজিবর রহমন প্রণীত ইতিহাস "অন্ধকূপ হত্যা রহস্য"—১।০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অকস্মাৎ"—২৲

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মেয়েদের জন্য লিখিত নাটক "হাতে কলমে"—॥

শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রহস্য সিরিজের "গুপ্ত চক্রান্ত"—৸০

শ্রীসুবোধচন্দ্র দে প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "শ্রীরামকৃষ্ণ"—২৲

শ্রীদীনেন্দকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাসমালার "বাগের মঠ"—৸০ ও "নদীতটে নরহত্যা"—৸

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রণীত কবিতাগ্রন্থ "রূপায়ন"—১৲

শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পবিত্র কোরাণ প্রবেশ"—।৴০

শ্রীজ্যোতি সেন প্রণীত গল্পপুস্তক "পান্থ-পাদপ"—১।০

সারদেশ্বরী আশ্রমের স্তোত্র ও সঙ্গীতগ্রন্থ "সাধনা"—১।০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বুমেরাং'—২৲

নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র ষড়বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে

সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বর্ষকাল যে 'ভারতবর্ষ' গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণের পরিচিত, তাহার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি? এই পঞ্চবিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' যে ভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সুদীর্ঘ কাল 'ভারতবর্ষ' প্রতি বৎসরে ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০খানি ত্রিবর্ণ চিত্র, শতাধিক দ্বিবর্ণ চিত্র ও অল্লাধিক ১৫০০ একবর্ণ চিত্র উপহার দিয়াছে; প্রতি মাসে পরলোকগত মনীষীবৃন্দের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা দিয়াছে; এতদ্ভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধরাজি 'ভারতবর্ষ'কে সমৃদ্ধ করিয়াছে; 'ভারতবর্ষ' এই পঞ্চবিংশ বর্ষকাল যে উচ্চতম আসন অধিকার করিয়া আছে, আগামী বর্ষে তাহাকে আরও মনোরম করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬।৵০, ভি, পিতে ৬॥৴০, ষাণ্মাষিক ৩৷৴০ আনা, ভি, পিতে ৩॥০। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক**। ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নম্বর** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

গত ১লা এপ্রিল হইতে ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে পত্রাদি প্রেরণের ডাকের হার পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেজন্য আমরা ব্রহ্মদেশের গ্রাহকগণের বার্ষিক মূল্য গত বৎসরের অপেক্ষা কমাইয়া দিলাম। ব্রহ্মবাসীদিগের জন্য ভারতবর্ষের বার্ষিক মূল্য ৭৲ (সাত টাকা) এবং ষাণ্মাষিক মূল্য ৩॥০ (তিন টাকা আট আনা) করা হইল।

Editor :—
RAI JALADHAR SEN BAHADUR

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta